পারেন না।
া না এন-সির। বরং বিরক্তকর
প ফিরে এলেন। তাঁবুতে ফিরে
দর। নৃপেনের এই আত্মহত্যা
মার চেতনায় ছবি হয়ে বসে
রো ছবি যেন। কেন মরল
য়েছিল? এন-সি আর একটা
রিঙ ওড়ালেন। সোহাগীকে
ম্পই নটবর হালদারের আঠারো
মেয়ে। কালীঘির-এর পাশে
নায় সোহাগী আর নৃপেন-কে
দেখেছিলেন এন-সি। সেদিন
য়ে দিয়েছিল নৃপেনের চোখে।
ন-সিকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়ে-
য়। না, রেখার কথা থাক।
া সুন্দর রিঙ উড়িয়ে রেখাকে
চজা এক টুকরো ন্যাতা কাপড়ে
এন-সি।

হাগীর আরও একটা রূপ এন-সি
ক্যাম্পে। কয়েকদিন থেকেই
ক দৃষ্টিতে তাকাতো এন-সির
লত, একটা কথা আছে স্যার।
কিন্তু একদিন, রাত্রির প্রথম প্রহর
সি তাঁবুতে শুয়ে একটা সিনেমা
শব্দে চমকে উঠলেন, কে?
খোঁপায় কাট-টগরের মালা,
অনাবৃত দুটো শ্যামল বাহু।
র গাছ-কোমর করে জড়ানো
ড়িয়ে সোহাগী প্রথমে হাই-তুলল।
কথায় রুক্ষতা ফেটে পড়ছিল।
াসল, বলল, বারো টাকার
না সুপারিন্ সাহেব।
গট আউট! এন-সি চিৎকার।

আর আশ্চর্য্য যে, সেই সোহাগী এন-সিকে কলঙ্কিত চরিত্রের দায়ে অভিযুক্ত করে কমিশনারকে দরখাস্ত করেছিল। এন্-সির কোন ক্ষতি হয়নি সত্যি, কিন্তু তদন্ত-কালীন লজ্জায় এন-সি মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ছিঃ ছিঃ—এ কি মিথ্যা কলঙ্কের ছাপ পড়ল তার জীবনে? আর এরপর থেকেই সমস্ত শরণার্থীর ওপর মন বিষিয়ে গিয়েছিল এন-সির। বিরূপ হয়ে গিয়েছিল। এই পৃথিবী, এখানে মানুষ, মানুষের মন, তার ভালবাসার পুরানো হিসেবটা পাল্টে গিয়েছিল এন-সির। আজ অন্ততঃ নিজের মনের কাছে স্বীকার করতে কোন বাধা নেই চক্রবর্ত্তীর।

কিন্তু এন-সি ভাবছিলেন, নৃপেন সোহাগীকে পেল না। কারণ সোহাগীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

রেখা-কেও এন-সি পাননি। কতদিন হয়ে গেল। অথচ আশ্চর্য্য, মনে হয় যেন এই ত সেদিনের ঘটনা সব। যেন এই ত সেদিন সিঙ্গাপুর পুনরুদ্ধারের পর এন-সি ছিলেন ডিফেন্স লাইনে। সিঙ্গাপুরের কাছেই একটা পাহাড়ের ঢালুতে 'জীপ্ এ্যাক্সিডেন্টের' পর এন-সি পুরো তিন মাস হাসপাতালে ছিলেন। হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেয়ে ব্যারাকে ফিরে আসতেই 'ডিসমিসাল' নোটিশের খড়্গ ঝুললো এন-সির মাথায়। এন-সি ঢাকায় ফিরে এলেন। আর সেই দিনই পাখাদের খড়-কুটো বয়ে আনা সন্ধ্যায় রেখাদের বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লেন এন-সি। রেখা দরজা খুলে অবাক হয়ে গিয়েছিল, আপনি?

এন-সি হেসে ঘরে ঢুকেছিলেন। কিন্তু রেখার দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিলেন। যেন কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। সন্তর্পণে চেপে গেলেন। তারপর আরও একটু সহজ ভঙ্গীতে নড়ে বসে বললেন, আমার কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে চেহারায়? এন-সি চাপা চাপা হাসতে লাগলেন।

সারা শরীর, পা' থেকে মাথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রেখা, বলল, কৈ কিছুত' দেখছি না।

এন-সি বললেন, কিছুই দেখছ না? সিম্পলি নাথিং।

এন-সির মুখের দিকে তাকালো রেখা। এবার চক্রবর্ত্তী নিষ্প্রাণ এক টুকরো হেসে, কোটের হাতার নীচে 'এ্যাম্পুটেট' করা বাঁ হাতটা তুলে ধরলেন। চমকে উঠে ঐ মুহূর্ত্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল রেখা। বলল, কি হয়েছিল?

—জীপ এ্যাক্সিডেন্ট। চাকরিটা গেল এরই জন্য। এন-সি বললেন।

এরপর দিন, যখন সন্ধ্যায় এন-সি গেলেন রেখাদের বাড়ীতে, প্রথমটায় রেখা এল না। ঢাকায় কাঠের ব্যবসায়ী রেখার বাবা সকাল-সন্ধ্যা বাড়ীর বাইরে। রেখার ভাই সত্যজিৎ আর মা এলেন। রেখা এল অনেক পরে। বন্ধু সত্যজিৎ কি কাজ আছে বলে আগেই উঠে গিয়েছিল, মা-ও এবার উঠলেন। চারদিকে তাকিয়ে এন-সি চাপা গলায় বললেন, কি এতক্ষণ যে?

দুচোখে ভাষাহীন দৃষ্টি রেখার। মুখ ভাবনাহীন নির্লিপ্ত। এন-সি তেমনি ফিস্-ফিসিয়ে বললেন, কেমন ছিলে? যুদ্ধে গিয়েও বেঁচে আছি। দেখ' মরিনি।

আরও কি বলতে যাচ্ছিল এন-সি। কিন্তু মুখের কথা শেষ করতে পারলেন না। রেখার ছোট বোন এল চা নিয়ে। চা রেখে ফিরে যেতেই এন-সির আবেগরুদ্ধ গলা ফিস্-ফিসিয়ে উঠল, তুমি আমারই রেখা, তোমার জন্যই বেঁচে আছি আমি। রেখার হাতটা টেনে নিতেই ছিটকে সরে গেল রেখা। হাতটা সরিয়ে দিল। বিশ্রী একটা পোকা যেন গা বেয়ে উঠেছিল, রেখা ঝেড়ে ফেলল।

আর যান নি এন-সি। মাস কয়েক পর একদিন সত্যজিৎ বলল, রেখার বিয়ে, ছেলেটি ভালই, কোলকাতায় ডাক্তারী করে। বিয়ের সময় তোকে চাই কিন্তু।

এন-সি যান নি। ক' বছরই বা কাটলো তারপর। স্বাধীনতার বেদীমূলে বিভক্ত হলো বাঙলা দেশ। ভ্রাতৃ-হত্যার রক্তগঙ্গায় যখন দেশ ভাসছিল, আগুন জ্বলছিল গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, তখনই পাকিস্তান ছেড়ে দুর্গম পথে কোলকাতায় পালিয়ে এলেন এন-সিরা। সঙ্গে বৃদ্ধা মা আর ন' বছরের ছোট ভাই। তারপর উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগে ক্যাম্প সুপারিন্টেণ্ডেন্টের চাকরিটা পেয়ে এন-সি বেঁচে গেলেন। হ্যাঁ, অনাহার আর অকাল-মৃত্যু থেকে বেঁচে গেলেন। সত্যজিৎরা ঢাকা ছেড়ে কুচবিহারে বাড়ী করেছিল। সত্যজিতের চিঠিতেই এন-সি সে খবর পেয়েছিলেন। পুরানো বন্ধুত্বের সুতোটা এখনও ধরে আছে সত্যজিৎ। অন্ততঃ বছরে দু-তিনটে চিঠিতে।

হাতঘড়ি দেখলেন এন-সি। ঘড়ির কাঁটা থেমেছে সাতটা কুড়িতে। সেকেণ্ডের কাঁটা ঘুরছে অবিরাম। বিশ্রাম নেই। টিক্-টিক্ টিক্-টিক্। বাইরে পায়ের শব্দে চমকে তাকালেন এন-সি। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, হ্যালো ডাক্তার।

কিন্তু ডাক্তার নয়, একটি উদ্বাস্তু মহিলা। পর্দা জোড় হাত করে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি চাই? এন-সি বিরক্ত হয়ে বললেন।

—স্বামীর বড় অসুখ স্যার। আপনাকে দেখতে চ মহিলাটি জোড় হাত করেই বললে।

—অসুখ ত' ডাক্তার দেখাও। আমি কি করব?

—আজ্ঞে না স্যার, আপনাকেই দেখতে চায়।

—হবে না। যেতে পারব না। এন-সি বিশ্রী ভাবে বললেন।

মহিলাটী ফিরে যাবার পর এন-সির কেমন যেন লাগছিল। মানুষের প্রতি স্নেহ-মমতা, দয়া-মায়া একদিন এন-সির ছিল। নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু আজ নেই। আজ এই সব কিছু যেন শুধু ধ্বনিময়, অর্থময়—তাছাড়া অন্য কোন মূল্য খুঁজে পান না এন-সি। কিছুতেই খুঁজে পান না। বরং এন-সি ভাবেন, দয়ামায়া স্নেহ-মমতা-মাখা মানবিক অনুভূতি আজ তিনি হারিয়েছেন। আশ্চর্য! আজ কোন বেদনা আঁচড় কাটে না, দুঃখে আর্ত হয়ে ওঠে না মন। শোকে তাপে দুঃখে নির্লিপ্ত দয়ামায়াহীন এক পাথরের মানুষ তিনি। এন-সির এই বয়সে মানুষের মনে কত কামনা বাসনার ফুল ফুটে থাকে। কিন্তু এন-সির সব শুকিয়ে গেছে। এমন কি, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও এন-সির মনে চুমকি বসায় না। অর্থহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে দাবা খেলা কিম্বা তাস নিয়ে "পেশেন্স" খেলাই যেন এন-সির কাছে বেশী আকর্ষণীয়। এ জীবনে যেন রথাদের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে এন-সির।

ডাক্তার এল আরও একটু পর। এন-সি বলে পড়ে বললেন, এই যে ডাক্তার, এত দেরী যে?

এন-সির পাশেই ধপ করে বসে পড়ে ডাক্তার বলল, আকাশে ভীষণ মেঘ করেছে। ঝড় বৃষ্টি হতে পারে।

—গোল্লায় যাক। এসো এক হাত দাবা খেলি। দাবার গুটীগুলো খাটিয়ায় ঢেলে ফেললেন এন-সি।

খেলাটা কেবল জমে উঠেছিল, বাইরে ঝড় উঠল।

মকা বাতাসে লণ্ঠনটা নিবে গেল এক নিমেষে। একরাশ ধুলো বালি আর শুকনো পাতার ঝাপ্টা যেন আছড়ে এল তাঁবুর ভেতরে। আর বাইরে দিকবিদিক-হারা একদল মত্ত হাতি যেন ছুটছে হন্নে হয়ে। তাঁবুগুলো ভেঙ্গে পড়ছে অসহায় ভাবে। এই তাঁবুটাও বুঝি উড়িয়ে নেবে। আর মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুতের জিহ্বাটা যেন লকলকিয়ে দহন করছিল গাছ-পালা-মাঠ আর তাঁবুগুলি।

ডাক্তার এক সময়ে বলল, চল একবার ঘুরে দেখে আসি। অনেকে জখম হবে।

এন-সি ঠোঁট উল্টালেন, চুলায় যাক, আসুন এবার 'পেশেন্স' খেলি। তারপর খাটিয়ায় শুয়ে পড়লেন এন-সি। বললেন, ছুটি নিন ডাক্তার, চলুন ক'দিন কোথাও ঘুরে আসি।

—কোথায়?

গভীর রাত্রে পাশ ফিরে শুয়ে প্রলাপ বকার মত এন-সি বললেন, দিল্লী-আগ্রা-লক্ষ্ণৌ-আর ডেরিয়ান-সোন্। না হয়, ওয়ালটেয়ার, ব্যাঙ্গালোর, আর ভিজগাপট্টম্।

—হঠাৎ?

—ভাল লাগে না। বড় ক্লান্ত আমি—টু টায়ার্ড। অন্ধকারে দাবার গুটিগুলো ছড়িয়ে ফেললেন এন-সি। বাইরে হিংস্র ঝড় তখনও থামে নি। বরং থেকে থেকে যেন হুংকার ছাড়ছিল।

ডাক্তার এল পরদিন সকালে। তখন বেশ বেলা হয়েছে। চারিদিকে প্রান্তরের রোদ রুক্ষ হয়ে উঠেছে। সেই রুক্ষ রোদের এক চিলতে তাঁবুর ভেতর উঁকি দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল ছায়া রেখে। মাথার ওপর বনাইচা গাছটার ডালে ডালে বুলবুলি আর দোয়েল পাখ্-পাখালী ঝেড়ে ঠোঁট ঘষছিল বুঝি সেই সকাল থেকে।

ডাক্তার ঘরে ঢুকে যেন বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। এন-সি খাটিয়ায় বসেছিলেন চুপ করে। দু' চোখের দৃষ্টিতে অর্থ-হীন শূন্যতা। চক্রবর্তীর এ রূপ, শিলাসনে বসা এই ধ্যানস্থ মূর্ত্তি, ডাক্তার আর দেখেননি কোনদিন। কোন কথা না বলে ডাক্তার পাশেই বসলেন।

গতকাল সন্ধ্যার সেই উদ্বাস্তু মহিলাটি এসে জোড় হাত করে দাঁড়ালো, ডাক্তারবাবু, শীগগীর চলুন।

—কি হলো? ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—স্বামীর অসুখ ছিল, এখন ভুল বকছেন। মহিলাটির দুচোখ চিক চিক করছিল।

ডাক্তার বলল, যাও আমি যাচ্ছি।

এন-সি তাকালেন ডাক্তারের দিকে, তারপর ঐ মহিলাটির হয়ে বললেন, দেখেই আসুন ডাক্তার সাহেব। দেরী করবেন না। প্রিয়জনের মৃত্যুশয্যায় মানুষ বড় অসহায়।

ডাক্তার আরও অবাক হলেন। গত পাঁচ মাসে মানুষ, তার সুখ দুঃখ, ব্যথা-বেদনা আর আশা হতাশার ব্যাপারে চক্রবর্ত্তী যেন নির্লিপ্ত, উদাসীন। কোন মানুষ মরে গেলে অথবা পুত্রের মৃত্যু শয্যার কাতরতায়, কিম্বা সদ্য-বৈধব্যের করুণ আর্ত্তনাদে সাড়া দেন না এন-সি।

ডাক্তার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, আজ কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি আপনার।

চক্রবর্ত্তী বললেন, হ্যাঁ, কিছুই ভাল লাগছে না।

—কেন কি হয়েছে? ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর চোখে চোখ রাখলো।

চক্রবর্ত্তী কিছু বললেন না, কিন্তু ম্লান দুটো চোখে তখনও ছাই ছাই বিষণ্ণ দৃষ্টি ভাসতে লাগলো।

ডাক্তার বলল, কৈ কিছু বলছেন না যে?

এন-সি শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মত হাসলেন, বলবার কিছু নেই।

ডাক্তার লক্ষ্য করল, টেবিলের ওপর পড়ে-থাকা, সকালের ডাকে পাওয়া নীল রঙের লেফাফাটার ওপর এন-সি যেন মনের শূন্যতায় একবার লিখলেন, সত্যজিৎ। কাটলেন। আবার লিখলেন, ঢাকা। তারপর কেটে দিলেন।

ডাক্তার এবার বলল, চিঠিটা কার?

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে 'লেফাফাটা' ডাক্তারের হাতে তুলে দিলেন এন-সি। বুকের রক্ত দ্রুতলয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল সারা শরীরে, ডাক্তার এবার ধীরে ধীরে পড়লেন, 'তোমাকে কি লিখব? আমাদের পরিবারে এক বিরাট 'ট্র্যাজেডি' ঘটে গেল। যার ফলে মা শয্যা নিয়েছেন, বাবা শোকে স্তব্ধ, নির্বাক। রেখা আমাদের ছেড়ে গেছে। এ স্টিফ্ ডেলিভেরী কেস্। বাচ্চাটাকেও বাঁচানো যায় নি। ইতি, তোমারই সত্যজিৎ।'

চিঠিটা শেষ করে ডাক্তার তাকালো এন-সির চোখে, সত্যজিৎ কে ?

—আমার বন্ধু।

—রেখা ?

এন-সি কোন জবাব দিলেন না।

—বলুন রেখা কে ? ডাক্তার স্থির দৃষ্টি ফেলল এন-সির চোখে।

ইচ্ছা করেই যেন কোন জবাব দিলেন না এন-সি। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বসুন কফি খাওয়া যাক।

দক্ষিণ আকাশের রোদ 'ফটো ফ্রেম'টার গায়ে লতিয়ে ছিল, জ্বলছিল হীরার টুকরোর মত। আর সেই ঝিকি-মিকি চোখ ধাঁধানো দ্যুতিতে হারিয়ে গিয়েছিল লাস্যময়ী মেয়েটীর মনোলোভা দেহ-রেখা। ডাক্তার দেখল, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, এন-সির ধূসর আর ছাই-ছাই দুটো-চোখের দৃষ্টি যেন 'ফটোফ্রেমটা' ছুঁয়ে এল একবার। চক্রবর্ত্তী ফিরে এলেন মিনিট দশেক পর। ডাক্তার তখন বেরিয়ে গেছে ক্যাম্পে। রোজ যেমন যায়।

দারোয়ান দু-পেয়ালা কফি নামিয়ে রাখলো টেবিলে। ডেক-চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে রইলেন এন-সি। চোখের দৃষ্টি সম্মুখের দিগন্তে প্রসারিত। আজ অনেক, অনেক দিন পর, হঠাৎ, হঠাৎই মনে পড়ল এন-সির, যুদ্ধের নৈরাশ্য, রেখাকে ভালবাসার তিক্ততা, দাঙ্গা, দেশ-ভাগ আর এই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের নামে শুধু ঘর-হারা মানুষের হাহাকার কান্না শুনে শুনে যে মন মরে গিয়ে, যে অনুভূতিগুলি নির্জীব নিঃসাড় হয়ে মৃতপ্রাণ হয়ে গিয়েছিল, আজ রেখার মৃত্যুতে সেই শিলাভূত মন, আর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোমল হৃদয়ের মানবিক অনুভূতিগুলি যেন ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। দীর্ঘ দিনের সুপ্তি, না সুপ্তি নয়, বরং মৃত্যু থেকে জেগে উঠছে ধীরে ধীরে। হৃদয়-শূন্যতার নির্মম কাঠিন্য থেকে হৃদয় অনুভূতির ফল্গু ধারায় মুক্তি পেয়েছে। রেখা যেন মৃত্যু দিয়ে এন-সিকে মানসিক মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে।

বৈশাখের রুক্ষ রিক্ত মাঠের দিগন্তে দৃষ্টি মেলে দিয়ে এন-সি একটা সিগারেট ধরালেন।

ভুদেব ও বাঙলার নবযুগ

অধ্যাপক শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যক্তি বা জাতির জীবনে ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হইয়া উঠে, তখন বন্যার মত তাহা যুক্তি ও তর্কের দুই কুল ভাসাইয়া চারিদিক একাকার করিয়া ফেলে। উচ্ছ্বাস তাহাদের যে দিকে চালিত করে, তাহারা স্রোতের মুখে ভাসমান তৃণখণ্ডের মত সেই দিকেই ধাবিত হয়।

ব্যক্তির জীবনে যেমন ইহা মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা রূপে দেখাইয়া তাহাকে পথভ্রান্ত করে, জাতির জীবনেও সেইরূপ মিথ্যার বিচিত্র মায়াজাল বিস্তার করিয়া জাতীয় জীবনের গতি ভুলপথে চালিত করে। বন্যার জলোচ্ছ্বাস চলিয়া গেলে চারিদিক কর্দ্দমাক্ত করিয়া রাখিয়া যায়; ভাবের প্রবলতা চলিয়া গেলে পড়িয়া থাকে বিকৃত ইতিহাসের পঙ্ক। এই পঙ্ক হইতে প্রকৃত ইতিহাসকে উদ্ধার করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না, কিন্তু ভ্রান্তিকে ভ্রান্তিরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে ভবিষ্যতে সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

ইতিহাসের গতি কার্য্য-কারণ-পরম্পরায় সম্পৃক্ত; বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহার সূচনা সাধারণ মানুষের অলক্ষ্যে বহুপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসে তাই স্বয়ম্ভুর স্থান নাই। ইহার গতিপথে মাঝে মাঝে প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল আলোকসম্পাত দেখিয়া আমাদের মনে ভ্রান্তি জাগে। যাঁহার মধ্য হইতে এই আলোক বিকীর্ণ হইতেছে দেখি, তাঁহাকেই যুগ-প্রবর্ত্তক, যুগ-জনক বলিয়া মনে করি। তারপর প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে মাতিয়া তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া "বীরপূজা" আরম্ভ করি এবং ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হই।

বাঙলার সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস তথ্য-সমাবেশে বহুলাংশে ত্রুটিহীন হইলেও ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে মাঝে মাঝে ভ্রান্তপথে চলিয়াছে। সম-সাময়িক কালের উচ্ছ্বাস স্তিমিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহা যে ভ্রান্তপথ দেখাইয়া গিয়াছে, তাহা অনেক অনুগামীকেও ভ্রান্ত পথে চালিত করিতেছে। এখন স্থিরভাবে তথ্য প্রমাণ বিচার করিয়া বাঙলার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, তাঁহাদের যথাযোগ্য সম্মান দিতে হইবে।

পুরাতন কাসুন্দি ঘাঁটিয়া লাভের সম্ভাবনা কম। তাই বাঙলা দেশে ও সাহিত্যে যাহাকে নবযুগ বলা হইয়া থাকে, সেই যুগের গতি ও প্রকৃতি হইতে আলোচনা আরম্ভ করাই উচিত। আজিকার বাঙালী

[ত]াহার ঐতিহ্যের যে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে, তাহার বিচিত্র [ই]তিহাস, প্রতিকূল পরিবেশের সহিত সংগ্রাম, বিদেশী শাসনের পক্ষপাত [ও] ঘৃণার মধ্য দিয়া নিজ পথ বাছিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সেই পথে [বা]ঙলার ভবিষ্যৎদ্রষ্টা মহাপুরুষদের নিরবচ্ছিন্ন ধারা পূর্ব্বাচার্যাদের [ধ]র্ম্মকে পরিণতির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। এই ধারাকে যথার্থ[রূ]পে অনুসরণ করিতে গেলে একজন বাদ পড়িয়া গেলে অন্যজনকে [উ]পলব্ধি করা সম্ভব হয় না। এই ধারার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করিতে [হ]ইলে আমাদের আজ উজান পথে চলিতে হইবে।

বাঙালীর বিশিষ্টতা লইয়া অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। [ত]াঁহাদের মধ্যে আমরা আমাদের গৌরবময় অতীতের পরিচয় পাইয়া [আ]ত্মগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠি। কিন্তু বাঙালীর জাতীয় জীবনে যখন সঙ্কট [দে]খা গিয়াছে, যখন বাঙালীর বাঙালীত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তখন [য]াঁহারা সেগুলি কাটাইয়া জাতিকে ঠিক পথে চালাইতে প্রাণপণ চেষ্টা [ক]রিয়াছিলেন, তাঁহাদের আমরা স্মরণ করিনা। আমরা যেরূপ [হ]ইয়াছি, তাহা যাঁহাদের কৃপায় হইতে পারিয়াছি, তাঁহাদের প্রতি [আ]মাদের অসীম কৃতজ্ঞতা আজ স্বীকার করিতে হইবে।

বাঙলায় নবযুগ কবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সঠিক সন তারিখ [নি]র্দ্দেশ করার স্পর্দ্ধা না রাখাই সঙ্গত। তবে একথা নিশ্চয় করিয়া বলা [য]ায় যে, ইউরোপীয়দের আগমন হইতেই ইহার সূচনা হয়। ইউরোপীয়[দে]র সহিত তাহাদের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজকগণও আসিয়াছিল। ধর্ম্মযাজক[গ]ণ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য হিন্দুধর্ম্মের কুসংস্কারের সুযোগ লইয়া যেরূপ [উ]গ্রভাবে হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে থাকে, তাহাতে ইংরাজি শিক্ষা [প্র]বর্ত্তনের প্রধান সমর্থক রাজা রামমোহন রায় পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ ভাবিয়া [শ]ঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই তিনি একদিকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকদের [স]হিত এবং অন্যদিকে কুসংস্কারের সমর্থক ও প্রচারক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের [স]হিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পরেই আসিল ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন। ইংরাজি ভাষা [শি]খিয়া ইংরাজিতে লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নততর রচনা পড়িয়া [ব]াঙালী যুবকবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার দেশীয় ভাবের উপর একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই যুগের ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের পরিচয় রাজনারায়ণ বসু স্বয়ং দিয়াছেন—

"তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন মদ্যপান সভ্যতার চিহ্ন; উহাতে দোষ নাই। আমি এবং আমার কতকগুলি সহচর একত্র হইয়া গোলদীঘিতে বসিয়া মদ খাইতাম। এখন যেখানে সেনেট [হ]াউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি সিক-কাবাবের দোকান ছিল। আমরা গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব [স]হিত না) ঐ কাবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম।"

এই রাজনারায়ণ পরবর্তী কালের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে [সং]স্কারপন্থী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই সংস্কারপন্থীর মূলে ছিল দেশীয় ধর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া খ্রীষ্টানদের রীতিনীতি অন্ধভাবে অনুসরণ করা। তখনকার বাঙালী যুবকগণ মনে করিতেন যে, ইংরাজদের মত বেশভূষা পরা, পানাহার আহারাদি করা, ইংরাজিতে কথাবার্তা বলাই সভ্যতার একমাত্র পরিচয়; দেশীয় প্রথা অনুসরণ করা অসভ্যতারই নামান্তর। ইহার অব্যবহিত পরেই খ্রীষ্টধর্ম্ম-গ্রহণ সংক্রামক হইয়া বাঙালী হিন্দুদের পরিবারকে আক্রমণ করে। সুতরাং নবযুগের প্রারম্ভে বাঙালী যে প্রগতির পথে পা বাড়াইয়াছিল, তাহা অধিক প্রসারলাভ করিলে কালক্রমে বাঙালী বলিতে আর কেহ থাকিত না; দেশ ইঙ্গ-বঙ্গী ট্যাঁশে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

রাজা রামমোহন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের এই আত্মঘাতী ফল প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ জীবনে ইউরোপীয় প্রভাব রোধ করিবার জন্য তিনি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ছাত্রাবস্থা হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। যখন রাজনারায়ণ ও তাঁহার সহচরেরা গোলদীঘিতে বসিয়া জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি ও সিক-কাবাব খাইয়া সভ্যতা ও সমাজসংস্কারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিলেন, তখন (রাজনারায়ণবাবুর ভাষায়) "ভূদেব এবং তাঁহার ন্যায় আর দুই একজনই কেবল সাগরমধ্যস্থিত পর্ব্বতের ন্যায় সেই প্লাবনের মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন।"

এই প্রগতিকে রোধ করা এবং জাতীয় আদর্শ অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করার জন্য বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ভূদেব "সংরক্ষণশীল পন্থী" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু সংস্কার [illegible] রক্ষণশীলতার ভাব সূচিত হয়, তাহা ভূদেবের মধ্যে একেবারেই ছিল না। তিনি কখনও হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন, নির্দ্দোষ মনে করেন নাই। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহাদের সংস্কার সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাদের পরিবর্ত্তে যে ইউরোপীয় ধর্ম্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে তাহা ইহাদের অপেক্ষা কোন ক্রমেই উন্নত নহে।

ভূদেবের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তিনি বংশানুক্রমিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান; সর্ব্বসংস্কারমুক্ত পিতার নিকট হইতে তিনি হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া যুক্তিবাদী হইয়াছিলেন। তাই ইংরাজিশিক্ষালব্ধ যুক্তি ও পিতার নিকট প্রাপ্ত উদার দৃষ্টি লইয়া হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে, স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম্ম এবং জাতীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার অটল শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল। ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদ্বারা বারবার অনুরুদ্ধ এবং প্ররোচিত হইয়াও তিনি কখনই নিয়ম ভ্রষ্ট হন নাই। এইজন্য ভূদেব ইংরাজদের নিকট হইতে যে আন্তরিক শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন, তাহা ইংরাজদের অনুকরণকারী কোন বাঙালী পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা যে এই কালতরঙ্গ রোধ করা

যাইবে না, তাহা ভূদেব ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন। তাই যখন হইতে এডুকেশান গেজেট নামক সাময়িক পত্রিকা পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল (১৮৫৭ খ্রীঃ), তখন হইতেই তিনি নানাবিধ রচনাদ্বারা বাঙালীদের লুপ্ত জাতীয়তাবোধ জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই এডুকেশান গেজেটেই তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। এই রচনাগুলি যেমন বাঙলা গদ্যসাহিত্যের প্রসারে সহায়তা করিয়াছে, তেমনি বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করিয়াছে। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে তাঁহার দানের কথা সম-সাময়িককালে স্বীকৃত হইয়াছে। দীনবন্ধু তাঁহার সুরধুনী কাব্যে লিখিয়াছেন,—

"সুভগ ভূদেব বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন।
গুরু-মহাশয়-গুরু শুভ দরশন॥
বঙ্গদেশ সাহিত্যের উন্নতি সাধক।
কাটিছেন সযতনে অজ্ঞান কণ্টক॥"

মাইকেল মধুসূদন তাঁহার হেক্টর বধ কাব্যের উৎসর্গপত্রে ভূদেবকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ নাই ; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। * * * যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।"

বাঙলা গদ্য রচনায় ভূদেবের রীতিকে সংস্কৃত-শব্দ-প্রধান বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার রচনার যেগুলি পৌরাণিক বৃত্তান্ত লইয়া আলোচনা, সেগুলির ভাষা সংস্কৃত প্রধান হইলেও তিনি সরল সাধুভাষায় উৎকৃষ্ট গদ্যরচনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। বাঙলা গদ্যের আদর্শ রীতি সম্বন্ধে ভূদেব বলিয়াছেন,—

"যাঁহাদের ভাষায় এবং রচনার ভঙ্গীতে পাঠকবর্গের ও শ্রোতৃবর্গের যমযন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাঁহাদের উপদেশ কখনই হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। খৃষ্টানদের এই দোষ অনেক পরিমাণে নব্য ব্রাহ্মদিগকেও স্পর্শ করিয়াছে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। উভয় সম্প্রদায়েরই উপদেশকগণ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অধিকাংশ ভাব সঙ্কলন পূর্ব্বক কেবল অনুবাদ করিয়াই বাঙ্গালাতে বলেন। যাহা কেবল কণ্ঠস্থ হয়, তাহা অনুবাদ করিতেই হয়। যাহা হৃদয়স্থ হয়, মাতৃভাষায় বলিবার সময়ে কেবল তাহাই মাতৃভাষার অনুরূপ মূর্ত্তিধারণ করিতে পারে। অন্য স্থলেও এই কথার ভূয়ঃ প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক কাব্যলেখক বাঙ্গালা রচনার মধ্যে ইংরাজী ভাষাকে কেবল অনুবাদ করিয়া দেন। যাঁহাদের হৃদয়ে ভাবটা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবেশলাভ করে, কেবল তাঁহারাই লিখিবার সময়ে তাহার প্রকৃত বাঙ্গালা পরিচ্ছদ দিতে কৃতকার্য হন। খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের অলঙ্কার স্বরূপ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার প্রধান উদাহরণ স্থল।"

বাঙলা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন ভূদেব। ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি Romance of History (India) অবলম্বনে তিনি এডুকেশান গেজেটে সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময় নামে দুইটি কাহিনী প্রকাশ করেন। অঙ্গুরীয় বিনিময় পড়িয়াই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে পটভূমি করিয়া উপন্যাস রচনার আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীতে (১৮৬৪ খৃঃ) ইহার প্রভাব স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। বঙ্কিম বাঙলা উপন্যাসের জনক হইলেও ভূদেব তাঁহার পথ-প্রদর্শক। যে জাতীয়তাবোধ প্রচার ভূদেবের জীবনের প্রধান ব্রত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যেও স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। দুর্গেশনন্দিনীতে ভূদেব-রচিত কাহিনীর প্রভাব যথেষ্ট থাকিলেও জাতীয় ভাব একেবারেই প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে ভূদেবের এই জাতীয় ভাবেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, ইহার পরিচয় বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী রচনাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়।

বাঙলা সাহিত্যে ভূদেবের আবির্ভাবকে মাইকেল মধুসূদন যথার্থ-ই শুভ বলিয়াছেন। ইহার ফলে বাঙলা সাহিত্য বিদেশী আদর্শের অনুকরণের পথ ত্যাগ করিয়া জাতীয়তাবোধের আদর্শ গ্রহণ করে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' গানে দেশমাতৃকার যে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার গদ্যময় রূপ তিনি ভূদেবের রচনাবলীর মধ্যেই পাইয়াছেন। ভূদেব জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী অধিভারতীকে "সর্ব্বপ্রসূর্জন্মভূমিঃ জননী গোঃপয়স্বিনী। মহাশক্তে জগন্মাতুঃ প্রতিরূপা সুশোভনা" রূপে দেখিয়াছিলেন। দেবীর প্রণামমন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন,—

মাতর্নমামি ভবতীং হি সতীদেহরূপাং।
মাতর্নমামি বসুধাতল পুণ্যতীর্থং॥
মাতর্নমামি পদ্মযুগ্মধৃতা রাশিং।
মাতর্নমামি হিমগৌর কিরীটভূষাং॥

ভূদেব রচনা হইতে দু'একটি বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি অনুধাবন করিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে, :—

"জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্ব্বপ্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান ; যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।" অঙ্গুরীয় বিনিময়

"জননী যদি পীড়িতা না হয়েন তবে তাঁহার স্তন্যই শিশুর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবনোপায়। বাঙালীর পক্ষে বঙ্গভূমিও সেইরূপ। * * * আমরা চেষ্টা করিলেই আপনাদিগের অবস্থা দিন দিন ভাল করিয়া লইতে পারি।" শিক্ষাদর্পণ (মাসিক পত্র)

"ভারতবর্ষের শিরোদেশে হিমগৌর উচ্চ উষ্ণীষের ন্যায় হিমালয় শিখর। ইহার বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র সদৃশ শুভ্রসলিলা গঙ্গা। ইহার পদতল সমুদ্রের দুইটি বাহু প্রস্রুত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত—এই মহাদেশে বাস নিবন্ধন হিন্দু জাতীয়দের মহিমা যে উচ্চ এবং উদার হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ বলা যায়।" পুষ্পাঞ্জলি

"তাঁহারা (ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা) স্বদেশকেই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র এবং পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াছেন, স্বদেশকেই সমুদয় পবিত্র তীর্থের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বদেশেরই আপাদমস্তক মহাদেবী সতীর দেহদ্বারা বিনির্ম্মিত এমত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।" সামাজিক প্রবন্ধ

তাই, ভূদেব যখন ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তখন অধিকাংশ ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালী সাহেবিয়ানার শিক্ষানবীশ হইতে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার

শ্রীজ্যোতির্ময় সেন এম-এস্-সি, এল-এল-বি

অবাধ চলাচল বা বাস

ভারতের প্রত্যেক নাগরিকই সমগ্র ভারতের নাগরিক, ভারতের কোন অংশের বা ভারতের কোন রাজ্যের নাগরিক নহে। সমগ্র ভারতের নাগরিক হিসাবে ভারতের সর্ব্বত্রই তাহার পূর্ণ অধিকার, অর্থাৎ ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তাহার যে সকল অধিকার আছে, সাধারণ-ভাবে কোন রাজ্য সরকার, সে ঐ রাজ্যের অধিবাসী নহে বলিয়া, তাহার ঐ সকল অধিকার বা তন্মধ্যে কোনটি খর্ব্ব বা লোপ করিতে পারেন না।

এই সকল মৌলিক অধিকার মধ্যে ভারতের সর্ব্বত্র অবাধে চলাফেরা করার অধিকার ও ভারতের যে কোন স্থানে অবাধে বসবাস করার অধিকার দুইটি প্রধান অধিকার।

ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (১) ঘ ধারায় ভারতীয় নাগরিকের ভারতের সর্ব্বত্র অবাধে চলাফেরা করার ও ১৯ (১) ঙ ধারায় ভারতের সর্ব্বত্র অবাধে বসবাস করার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে।

১৯ (১) ধারার লিখিত অন্যান্য অধিকারের ন্যায় এই দুইটি অধিকারও কেবল ভারতীয় নাগরিকের অধিকার, ভারতীয় নাগরিক ব্যতীত ভারতের অন্য কোন অধিবাসী এই অধিকার দাবী করিতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ মাত্র ভারতের স্বাধীন নাগরিকই এই অধিকার দাবী করিতে পারেন, কোন অপরাধের জন্য যাহার কারাবাসের আদেশ হইয়াছে বা যিনি আইন-অনুগতভাবে বিচারের জন্য বা বিনা বিচারে কারাবদ্ধ আছেন সেই ভারতীয় নাগরিক এই অধিকার দাবী করিতে পারেন না।

অবাধ চলাফেরার মৌলিক অধিকার ভারতীয় নাগরিকের কেবল একক চলাফেরার অধিকার নহে, ভারতীয় নাগরিকগণের সমবেতভাবে চলাফেরারও অধিকার, শোভাযাত্রার অধিকারও এই অধিকারের অন্তর্গত।

অবাধে চলাফেরা করার এই মৌলিক অধিকার ভারতীয় নাগরিকের ব্যক্তিগত চলাফেরা করার অধিকার। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া চলাফেরা করার অধিকার এই মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মাল আনা নেওয়া করার অধিকার এই মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত নহে, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মাল আনা নেওয়ার অধিকার সংবিধানের ৩০১ ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটি ধারার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

১৯৫১ সনের পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য শস্য স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ইন্দ্র নারায়ণ বেরা সুন্দরবনের নিয়ন্ত্রিত এলাকা হইতে নিয়ন্ত্রিত এলাকার বাহিরে ৩৫০ মণ ধান্য স্থানান্তর করার জন্য একটি লাইসেন্স প্রার্থনা করেন, প্রার্থী বলেন যে তাহার পরিবারে প্রায় ৬০ জন লোক এবং তাহার নিজের জমিতে উৎপন্ন ঐ ধান্য সমস্তই তাঁহার নিজ পরিবারের লোক ও মজুরীদের জন্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টার তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন, প্রার্থী এই আদেশের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে একটি দরখাস্ত করিয়া বলেন যে, ১৯৫১ সনের পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য শস্য স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ অর্ডার সংবিধানের ১৯ (১) ঘ ধারার বিধি-বহির্ভূত। বিচারপতি গোপেন্দ্রনাথ দাশ তাহার রায়ে বলেন যে ঐ আইন জনস্বার্থের জন্য ১৯ (১) ঘ ধারার মৌলিক অধিকারকে যুক্তি-সঙ্গতভাবে খর্ব্ব করায় উহা বিধিবহির্ভূত হয় নাই। কিন্তু বিচারপতি তাঁহার রায়ে ইহা ধার্য্য করেন নাই যে প্রার্থীর ঐ ধান্য স্থানান্তরিত করার কোন মৌলিক অধিকার নাই। (ইন্দ্রনারায়ণ বেরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

১৯ (১) ঘ ও ঙ ধারায় ভারতীয় নাগরিককে চলাফেরার ও বসবাস করার যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভারতের রাষ্ট্রখণ্ড মধ্যে আবদ্ধ। ভারতের বাহিরে ঐ মৌলিক অধিকার কার্য্যকরী হইতে পারে না, তাহাতে অপর রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। এই মৌলিক অধিকার কেবল ভারতের এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে যাতায়াতের অধিকার নহে, প্রকৃতপক্ষে উহা প্রত্যেক রাজ্য মধ্যেও প্রযোজ্য, অর্থাৎ কোন এক রাজ্য মধ্যে এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাতায়াত করার অধিকার প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের আছে। সমগ্র ভারতকে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের পক্ষে কোনরূপ বাধাহীন একটি রাষ্ট্রখণ্ডে পরিণত করা হইয়াছে এবং উহার যে কোন স্থান হইতে যে কোন স্থানে অবাধে যাতায়াত করার ও ঐ রাষ্ট্র-খণ্ডের যে কোন স্থানে বসবাস করার মৌলিক অধিকার প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অধিকার বলে কোন ভারতীয় নাগরিকের অবাধে ভারতের বাহিরে যাওয়ার বা অবাধে ভারতের বাহির হইতে ভারত রাষ্ট্রখণ্ডে প্রবেশ করার কোন মৌলিক অধিকার নাই।

অবাধ যাতায়াতের ও বসবাসের এই মৌলিক অধিকারের একটি ব্যতিক্রম ১৯ (৫) ধারায় লিপিবদ্ধ আছে। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে তপসিলী উপজাতির স্বার্থে অথবা সাধারণের স্বার্থে সরকার এই মৌলিক অধিকার খর্ব্ব করিয়া যুক্তিসঙ্গত আইন করিতে পারিবেন।

তপসিলী উপজাতির লোকদের জীবন প্রণালী, তাহাদের শিক্ষা কৃষ্টি প্রভৃতি অন্য সকল ভারতীয় নাগরিক হইতে পৃথক, সুতরাং তাহাদের ঐ জীবন প্রণালী যাহাতে ব্যাহত না হইতে পারে সেজন্য আইন করার অধিকার সরকারের আছে।

এতদ্ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের স্বার্থেও সরকার ভারতীয় নাগরিকের এই মৌলি— অধিকার খর্ব্ব করিতে পারেন, সাধারণের কোন এক অঞ্চলের স্বার্থেও সরকার ঐরূপ আইন করিতে পারেন। সরকারের এই অধিকার অতি ব্যাপক, প্রায় সমস্ত আইনই কোন না কোন ভাবে সাধারণে— স্বার্থে প্রণয়ন করা হয়, সুতরাং সকল আইনই এই ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে।

কিন্তু এই সকল আইন যুক্তিসঙ্গত হওয়া প্রয়োজন। এই ব্যতিক্রম বলে সরকার যে আইন করেন তাহা যুক্তিসঙ্গত কিনা, তাহা বিচারের ভার আমাদের বিচারালয়ের উপর, অর্থাৎ বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং সর্ব্বো—বি সুপ্রীম কোর্টের উপর। কোন্ কোন্ অবস্থায় এইরূপ আইনের —কোন্ বিধান যুক্তিসঙ্গত তাহা নিরূপণ করা বিচারপতিগণ পক্ষেও সহজ নহে, এবং সুবিজ্ঞ বিচারপতিগণও অনেক সময় এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই, অথচ তাঁহাদের সুবিবেচনা ও বিচারের উপরই ভারতীয় নাগরিকগণের অনেক মৌলিক অধিকারের সীমা ও কার্য্যকারিতা নির্ভর করে। এখানে কয়েকটি মোকদ্দমার বিবরণ দি—হি, তাহা হইতে এ বিষয়ের জটিলতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা —এ— নহে নাই

ডাঃ এন, বি, খাঁড়ে হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ১৯৫০ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে দিল্লীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি আদেশ দিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে দিল্লী ত্যাগ করার জন্য এবং তিন মাস মধ্যে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন —ভলা গ— বলেন। ১৯৪৯ সনের ইষ্ট পাঞ্জাব পাব্লিক সেফটি আইন —ছে কি— আদেশ দেওয়া হয়। ডাঃ খাঁড়ে সুপ্রীম — এই আদেশ রহিত করার জন্য এক দরখাস্ত দিয়া বলেন যে ঐ আইন ও ঐ আদেশ সংবিধানের ১৯ (১) ঘ ধারার বিরোধী ও সংবিধানের বিধি বহির্ভূত। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কানিয়া, ও বিচারপতি ফজল আলি, প্যাতঞ্জলি শাস্ত্রী, মহাজন ও বি,কে, মুখার্জ্জি এই দরখাস্তের বিচার করেন। তিন জন অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি কানিয়া, বিচারপতি ফজল আলি, পাতঞ্জলি শাস্ত্রী ধার্য্য করেন যে ইষ্ট পাঞ্জাব পাব্লিক সেফটি আইন দ্বারা অবাধ চলাচলের মৌলিক অধিকারকে যে ভাবে খর্ব্ব করা হইয়াছে তাহা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ২ জন অর্থাৎ বিচারপতি মহাজন ও বি, কে, মুখার্জ্জী ধার্য্য করেন যে উহা যুক্তিসঙ্গত নহে। তিন জন বিচারপতির মতানুযায়ী ঐ আদেশ বহাল থাকে—কিন্তু ৫ জন সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই, এবং একপক্ষে তিন জন ও অপরপক্ষে দুইজন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে কোন্ আইন যুক্তিসঙ্গত ও কোন্ আইন যুক্তিসঙ্গত নহে উহা বিচার করা অতিশয় কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ।

১৯৪৯ সনের Influx from Pakistan (Control) আইন অনুসারে যে সকল আদেশ দেওয়া হয় ঐ সকল আদেশ যুক্তিসঙ্গত কিনা, এই প্রশ্ন অনেক মোকদ্দমায় উঠে, বিভিন্ন হাইকোর্ট এ বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার আদেশ দেন। —কান্ত ঘোষ একজন ভারতীয় নাগরিক, তিনি পাকিস্তানে গিয়াছিলেন, করাচীতে ভারতীয় হাই কমিশনার তাঁহাকে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করার জন্য পারমিট দেন, ঐ পারমিটের একটি সর্ত্ত ছিল যে তাঁহাকে সোজা কলিকাতা যাইতে হইবে। তিনি ভারতে প্রবেশ করিয়া সোজা কলিকাতা না আসায় তাঁহাকে Influx from Pakistan (Control) আইন অনুসারে ফৌজদারীতে বিচারের জন্য সোপর্দ্দ করা হয়। বিমলাকান্ত তৎবিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরখাস্ত করিলে প্রধান বিচারপতি হ্যারিস ও বিচারপতি এস, আর, দাশগুপ্ত বিগত ১৯৫২ সনের ১০ই মার্চ্চ তারিখে তাঁহাদের রায়ে বলেন যে ঐ আইন দ্বারা ভারতীয় নাগরিকের অবাধ চলাফেরার মৌলিক অধিকারকে যেভাবে খর্ব্ব করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত এবং ঐ আইন সংবিধানের বিধিবহির্ভূত নহে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টে এইরূপ একটি মোকদ্দমার বিচার হয়। উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বিজনোর জিলার নাগিনা থানার এলাকাধীন কল্যাণপুর গ্রামে ঐ মোকদ্দমার প্রার্থী সাব্বির হুসেনের জন্ম হয়, সুতরাং সে ভারতীয় নাগরিক। ১৯৪৮ সনে তাহার ব্যবসায়ের কাজে সে লাহোর যায়, লাহোর হইতে সে ভারতে স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিলে তাহাকে ১৯৪৯ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত অস্থায়ীভাবে ভারতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়, প্রার্থী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আর পাকিস্তানে যায় নাই, সে উত্তরপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট এর নিকট স্থায়ীভাবে ভারতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে, কিন্তু উত্তরপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৯ সনের Influx from Pakistan (Control) আইন অনুযায়ী তাহাকে পাকিস্তানে প্রেরণের আদেশ দেন এবং তৎসাপেক্ষে তাহাকে ১৯৫০ সনের ২১শে জুলাই তারিখ হইতে বিজনোর জেলে আটক করিয়া রাখেন।

সাব্বির হুসেন এই আদেশের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ হাইকোর্টে এক দরখাস্ত করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করে; প্রার্থী তাহার দরখাস্তে বলে যে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার তাহার যে মৌলিক অধিকার আছে উক্ত আইন ও আদেশ তাহার বিরোধী হওয়ায় সংবিধানের বিধি বহির্ভূত হইয়াছে, সরকার পক্ষে বলা হয় যে সরকারের জনস্বার্থে যুক্তিসঙ্গতভাবে অবাধে চলাফেরা ও বসবাসের মৌলিক অধিকার খর্ব্ব করার যে ক্ষমতা আছে ঐ আইন ও ঐ আদেশ তদনুসারেই জারী করা হইয়াছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি রঘুবর দয়াল ও ভার্গব একমত হইয়া বিগত ১৯৫১ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহাদের রায়ে ঐ আইন ও আদেশ সংবিধানের বিধি বহির্ভূত বলিয়া ধার্য্য করেন এবং আসামীকে মুক্তির আদেশ দেন।

১৯৪৯ সনের এই Influx from Pakistan (Control) আইন অনুযায়ী আরোপিত বাধা যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহা কচ্ছ হাইকোর্টে ও নাগপুর হাইকোর্টে বিভিন্ন মোকদ্দমায় বিচারের বিষয়ীভূত হইয়াছে, এবং ঐ সকল মোকদ্দমায় এই সকল বাধা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। যে অবস্থায় এই সকল মোকদ্দমায় উপরোক্ত আইনের বৈধতার প্রশ্ন বিচার হইয়াছে তাহা বিভিন্ন হইলেও মূলত যে সকল

অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া Influx from Pakistan (Control) আইনের বিধান সকলের বৈধতার বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে কোন নির্দিষ্ট মানের সন্ধান পাওয়া কঠিন। বস্তুত কোন্ আইন ও আদেশ সংবিধানের ১৯ধারার বিধান মতে যুক্তিসঙ্গত এবং কোন্ আইন ও আদেশ যুক্তিসঙ্গত নহে তাহা বিচার করার কোন নির্দিষ্ট মান এখন পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, তবে বিভিন্ন মোকদ্দমার রায় হইতে কয়েকটি বিষয় এখন সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, যে প্রয়োজনে ঐ আইন করা হইয়াছে এবং ঐ আইনে যেভাবে মৌলিক অধিকারকে খর্ব্ব করা হইয়াছে তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে ঐ আইনে আইনের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করার জন্য যে কার্য্যপ্রণালী বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা সহজ ন্যায়ের অনুযায়ী হইয়াছে কিনা। এই কার্য্যপ্রণালী ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত কিনা সে বিষয়ে বিচার করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যথা, প্রথমতঃ যে রাজকর্মচারীর উপর এ বিষয়ে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ঐ রাজকর্মচারী একজন অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল কর্মচারী হওয়া চাই, যে কোন রাজকর্মচারীর উপর এই ক্ষমতা অর্পিত হইলে উহা ন্যায় বা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। দ্বিতীয়তঃ যে কারণে এই মৌলিক অধিকার খর্ব্ব করা হইতেছে, তাহাকে জানানের বিধি থাকিতে হইবে এবং এ বিষয়ে তাহার বক্তব্য বলার সুযোগ দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে উপরস্থ কর্মচারীর নিকট আপীল করার বিধান থাকা উচিত। চতুর্থতঃ যে সময়ের জন্য এই খর্বতার আদেশ বলবৎ থাকিবে তাহা অতিরিক্ত না হয়, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আদালত কোন বিশেষ আইন বা আদেশ ১৯ ধারার বিধানমত যুক্তি কিনা সিদ্ধান্ত করিবেন।

বোম্বাই হাইকোর্টের দুইটি মোকদ্দমার বিচার তুলনা করিলে এই বিষয়টি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। একই বিচারপতিগণ এই দুইটি মোকদ্দমার বিচার করেন এবং প্রায় একই সময়ে দুইটি মোকদ্দমার রায় দেন।

জিসিংভাই ঈশ্বরলাল একজন ভারতীয় নাগরিক, তিনি বোম্বাই রাজ্যের আমেদাবাদ জেলায় বাস করিতেছিলেন। ১৯৪৯ সনের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে আমেদবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৯৪৭ সনের Bombay Security Measures Act অনুযায়ী তাহাকে এক আদেশ দেন যে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত সে আমেদাবাদ জিলায় আসিতে বা থাকিতে পারিবে না। প্রার্থী ঐ আদেশের বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টে এক দরখাস্ত দিয়া বলেন যে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে সংবিধানের ১৯ (১) ঘ ও ঙ ধারার বিধান মত ভারতের সর্ব্বত্র অবাধ যাতায়াত ও বাসের তাহার যে মৌলিক অধিকার আছে, বোম্বাইর উক্ত আইনের বিধান সকল তাহার বিরোধী এবং সেইজন্য ঐ আইন সংবিধানের বিধি বহির্ভূত। সরকার পক্ষে বলা হয় যে ঐ মৌলিক অধিকার খর্ব্ব করার যে ক্ষমতা আছে, ঐ ক্ষমতা বলে এই আইন করা হইয়াছে, বিচারপতি চাগলা ও বাভডিকার বিগত ১৯৫০ সনের ১৪ই এপ্রেল তারিখে তাহাদের রায়ে বলেন যে ঐ আইনে যে সময়ের জন্য এই মৌলিক অধিকার হরণ করা যায় তাহার কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই, যাহার এই মৌলিক অধিকার হরণ করা হইতেছে তাহাকে উহার কারণ জানাইবার বা তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিবার কোন বিধান নাই; এই সকল কারণে বিচারপতিগণ Bombay Public Measures Act যুক্তিসঙ্গত আইন নহে ও উহা সংবিধানের বিধি বহির্ভূত বলিয়া ধার্য্য করেন।

এই সঙ্গে অপর মোকদ্দমাটি তুলনা করা যায়।

আব্দুল রহিমান সামসুদ্দিন একজন ভারতীয় নাগরিক, বোম্বাই রাজ্যের থানা জিলার অধিবাসী। থানা জিলার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিগত ১৯৪৯ সনের ২৮শে এপ্রিল তারিখে ১৮৯০ সনের বোম্বাই জিলা পুলিশ আইনের বিধান মত তাহাকে বোম্বাই রাজ্য ত্যাগ করার জন্য এক আদেশ দেন। প্রার্থী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টে এক দরখাস্ত করেন, উপরোক্ত বিচারপতি চাগলা ও বাভডিকার বিগত ১৯৫০ সনের ১৭ই এপ্রিল তারিখে তাহাদের রায়ে বোম্বাই জিলা পুলিশ আইন সংবিধানের ১৯ ধারার বিধি বহির্ভূত নহে বলিয়া ধার্য্য করেন। ঐ আইনে অবাঞ্ছিত লোকেরা করার মৌলিক অধিকার যে ভাবে খর্ব্ব করা হইয়াছে তাহা তাহাদের মতে যুক্তিসঙ্গত, কারণ ঐ আইনে যাহার মৌলিক অধিকার খর্ব্ব করা হইতেছে তাহাকে উহার কারণ জানাইবার ও তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিবার ... ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশের বিরুদ্ধে বোম্বাই সরকারে আপীল করিবার বিধান আছে।

এইরূপ একটি মোকদ্দমার বিচার সুপ্রীম কোর্টেও হইয়াছে। গুরুবচন সিংহ একজন ভারতীয় নাগরিক, বোম্বাই সহরে দাদর অঞ্চলে ভিনসেন্ট রোডে "গোত্রী নিবাসে" তাহার পিতার সহিত সে বাস করিতেছিল, বোম্বাই সহরে তাহার পিতার ইলেকট্রিক দ্রব্যের একটি ব্যবসা আছে। ১৯৫১ সনের ২৩শে জুলাই তারিখে বোম্বাইর পুলিশকমিশনার ১৯০২ সনের City of Bombay Police Act অনুযায়ী এক নোটিশ দিয়া তাহাকে দুইদিন মধ্যে বোম্বাই রাজ্য ত্যাগ করিয়া রেলপথে অমৃতসর যাওয়ার জন্য আদেশ দেন, পরে গুরুবচন সিংহের প্রার্থনা মতে তাহাকে বোম্বাই রাজ্যে কল্যাণে বাস করার আদেশ দেওয়া হয়। গুরুবচন সিং ঐ আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে এক দরখাস্ত করে এবং সংবিধানের ১৯ (১) ঘ ও ঙ. ধারার লিখিত মৌলিক অধিকার দাবী করেন। সুপ্রীম কোর্টের পাঁচজন বিচারপতি পাতঞ্জলি শাস্ত্রী, মহাজন, বিজন কুমার মুখার্জ্জী, এস, আর, দাশ ও চন্দ্রশেখর আয়ার এই মোকদ্দমার বিচার করেন। বিগত ১৯৫২ সনের ৭ই মে তারিখে বিচারপতি বিজনকুমার মুখার্জ্জী এই মোকদ্দমার রায়ে বলেন যে ১৯০২ সনের City of Bombay Police Act এ সমাজের পক্ষে অনিষ্টকারী দুষ্টচরিত্রের লোককে সর্ব্বাধিক দুই বৎসরের জন্য

বহিষ্কারের আদেশ দেওয়ার যে ক্ষমতা পুলিশ কমিশনারকে দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নহে, এবং ঐ আইনে এই আদেশ সম্বন্ধে যে কার্য্য প্রণালী বিধিবদ্ধ আছে তাহাও যুক্তি সঙ্গত, এই আইনে যে সকল কারণে এই বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হইতেছে তাহা বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে জানাইবার, তাহার বাক্তব্য শুনিবার ও সাক্ষী গ্রহণ করার বিধান আছে, এই সকল কারণে ঐ আইন সংবিধানের বিধি বহির্ভূত নহে।

কলিকাতা হাইকোর্টেও এইরূপ মোকদ্দমার বিচার হইয়াছে। খগেন্দ্র নাথ দে পূর্ব্ব পাকিস্থান রংপুর হইতে এক জন উদ্বাস্তু, পশ্চিম দিনাজপুর জিলার বালুরঘাটের অধিবাসী, তাহাকে একজন ভারতীয় নাগরিক ধরিয়া লইয়াই এই মোকদ্দমার বিচার হয়। বিগত ১৯৫০ সনের ১৪ই জুন তারিখে পশ্চিম দিনাজপুরএর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী আর, বানার্জ্জী ১৯৫০ সনের West Bengal Security Act অনুযায়ী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দে কে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুর জিলা ত্যাগ করার জন্য এক আদেশ দেন, পরে ঐ সনের ২২শে জুন তারিখে তাহাকে ২৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুর জিলা পরিত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়। শ্রীখগেন্দ্রনাথ দে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে এক দরখাস্ত করেন, প্রধান বিচারপতি হ্যারিস ও বিচারপতি শম্ভুনাথ বানার্জ্জী এই দরখাস্তের বিচার করেন, প্রধান বিচারপতি হ্যারিস বিগত ১৯৫০ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহার রায়ে বলেন যে ঐ আইনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন কর্ম্মচারীর উপর বহিষ্কারের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করার যে বিধান আছে তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে ও তাহা সংবিধানের বিধি বহির্ভূত। তিনি আরও বলেন যে, যে কারণে কোন ভারতীয় নাগরিকের প্রতি বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হইতেছে তাহা ঐ সময় তাহাকে না জানাইলে ঐ আদেশ ও যুক্তিসঙ্গত আদেশ হইবে না, এবং উহা সংবিধানের বিধি বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে।

এরপর কলিকাতা হাইকোর্টে আরেকটি মোকদ্দমায় ১৯৫০ সনের West Bengal Security Act এর বৈধতা সম্বন্ধে বিচার হয়।

জনাব টোজাম্মল খুণ্ডেল সাহজী একজন ভারতীয় নাগরিক ও জিলা ২৪ পরগণার অধিবাসী। বিগত ১৯৫০ সনের ২৮শে এপ্রিল তারিখে ২৪ পরগণার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৩ মাসের জন্য ২৪ পরগণা জিলা হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেন, পরে ১৯৫০ সনের ৭ই আগষ্ট তারিখে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি আদেশ দিয়া বহিষ্কারের সময় আরও তিন মাস বৃদ্ধি করিয়া দেন। টোজাম্মল উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে এক দরখাস্ত করেন, কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত আদেশ রহিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জয়েণ্ট সেক্রেটারী বিগত ১৯৫০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রার্থীকে ২৪পরগণা জেলা হইতে তিন মাসের জন্য বহিষ্কার করিয়া এক আদেশ দেন, প্রার্থী ঐ আদেশের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে পুনরায় এক দরখাস্ত করেন এবং বলেন যে ১৯৫০ সনের West Bengal Security Act সংবিধানের বিধি বহির্ভূত, বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জী ও ব্রজকান্ত গুহ এই দরখাস্তের বিচার করেন, বিগত ১৯৫০ সনের ১৩ই অক্টোবর তারিখে বিচারপতিগণ তাহাদের রায়ে সিদ্ধান্ত করেন যে ১৯৫০ সনের West Bengal Security Act এ বহিষ্কারের যে বিধান আছে তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে এবং সংবিধানের বিধি বহির্ভূত। কারণ, ঐ আইনে ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার কোন বিধান নাই এবং বহিষ্কারের সময় বৃদ্ধি করার পূর্ব্বে বহিষ্কারের কারণ বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে জানানোর বা তাহার বক্তব্য শ্রবণের বা কোন আপীলের কোন বিধান নাই, তাহাতে ঐ আইনের প্রবর্ত্তিত কার্য্যপ্রণালী যুক্তিসঙ্গত হয় নাই এবং ঐ বিধান সংবিধানের বিধি বহির্ভূত হইয়াছে। বিচারপতিগণ প্রার্থীর বহিষ্কারের আদেশ রহিত করিয়া দেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৯ (১) ঘ ধারায় অবাধ চলাচলের যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভারতের সর্ব্বত্র—একস্থান হইতে অপর স্থানে যাতায়াতের অধিকার, কিন্তু কোন বিশেষ পথ দিয়া যাতায়াতের অধিকার নহে, পথের মালিকের আইনতঃ ঐ পথ বন্ধ করিয়া দেওয়ার বা ঐ পথ দিয়া অপরের যাতায়াতের অধিকার নিয়মিত করার স্বত্ব সর্ব্বদাই আছে। এ বিষয়ে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন হাইকোর্টের একটি মোকদ্দমার উল্লেখ করিতেছি। সি, ফিলিপস্ একজন ভারতীয় নাগরিক, তিনি ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যের ত্রিভাণ্ড্রম্ সহরের নিজ বাড়ীতে বাস করেন, তাহার বাড়ীর দক্ষিণে তথাকার মেয়েদের কলেজ, এই কলেজ ও তাহার বাড়ীর মধ্যে একটি সাধারণের চলাচলের পথ ছিল। মেয়েদের কলেজের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ করার প্রয়োজন ত্রিভণ্ড্রমের মিউনিসিপালিটি ত্রিবাঙ্কুর সরকারের অনুমতি লইয়া আইনতঃ ঐ পথ বন্ধ করিয়া দেন। সি, ফিলিপস উহার বিরুদ্ধে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন হাইকোর্টে একটি দরখাস্ত দিয়া বলেন যে পথ বন্ধ করায় সংবিধানের ১৯ (১)ঘ ধারায় তাহার ভারতের সর্ব্বত্র অবাধ যাতায়াতের যে মৌলিক অধিকার আছে তাহা খর্ব্ব করা হইয়াছে। বিচারপতি গোবিন্দ পিল্লাই বিগত ১৯৫২ সনের ৩রা মার্চ্চ তারিখে তাহার রায়ে বলেন যে অবাধ চলাচলের মৌলিক অধিকার কোন বিশেষ পথ দিয়া চলাচলের মৌলিক অধিকার নহে, উহা এক যায়গা হইতে অপর যায়গায় যাতায়াতের অধিকার, যে পথ দিয়া যাতায়াত করিতে হইবে সেই পথে ঐ পথিকের যাতায়াতের স্বত্ব বা অধিকার সাধারণ আইন অনুসারে থাকা প্রয়োজন।



যান্ত্রিক সভ্যতা ও মহাত্মা গান্ধী

সমর দত্ত

যান্ত্রিক সভ্যতার আবির্ভাব অষ্টাদশ শতাব্দীর উদয় লগ্নে—শ্রম বিপ্লবের প্রতিঘাতে সমস্ত যুগের অবসান হোলো, আর দেখা দিল গণতন্ত্রের উদয়ন। যন্ত্র বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে মানুষ অল্প সময়ের মধ্যে বস্ত্র শিল্পোৎপাদনে উত্তরোত্তর সাফল্যলাভ কোরে যৌথ কারবার সুরু করে দিল। নব নব দেশ অধিকার করে, নব নব উপনিবেশ গঠন ক'রে আফ্রিকার অরণ্যে, আমেরিকার অধিত্যকায়, এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে, ভারতের আসমুদ্র হিমাচল ক্ষেত্রে জড়বিজ্ঞানধর্ম্মী যান্ত্রিক সভ্যতার ধারক ও বাহকগণ নিজেদের প্রভাব ও প্রাধান্য প্রকাশ কোরে কোটি কোটি মানুষকে তাদের ক্রীড়া পুত্তলিতে পরিণত ক'রে ফেল্লো। এমনিভাবে যন্ত্র সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির ফলে মুষ্টিমেয় স্বার্থ গৃধ্নু, পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিকের অধিকারে এলো বিপুল ধনসম্পত্তি। এর ফলে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বচ্ছ সরোবরে দেখা দিল সঙ্কটের শৈবাল।

বিংশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক সভ্যতার সহায়তায় এবং যন্ত্র বিজ্ঞানের সাধনায় মুষ্টিমেয় মানুষ অত্যধিক অর্থশালী হ'য়ে উঠলো। অর্থ বলে বলীয়ান এই ধনিকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের উপর কর্ত্তৃত্ব করবার অধিকার কায়েম কোরল। এরা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও লগ্নী কারবারের মাধ্যমে অর্থ ছড়িয়ে দিয়ে সেই সব দেশ থেকে ধন রত্ন গুটিয়ে নিয়ে কাজে লাগালো নিজেদের ভোগ বিলাসের চরম চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে। তাদের শোষণ নীতির ফলে জনারণ্যে জ্বলে উঠলো বিদ্বেষ, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের দাবানল। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ঘটিত দুইটি মহাযুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ধনিকগোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধি করা। বিশ্বের বহুলোকক্ষয়, বহুদেশ ধ্বংস ও বহুমানুষের আর্ত্তনাদ ও নিঃস্বতার জন্য দায়ী যান্ত্রিক সভ্যতার ধারক ও বাহক মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী যারা যন্ত্রের মালিক—এদের স্বৈরতান্ত্রিক পন্থাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল দুর্ব্বল অথচ সঙ্ঘবদ্ধ জনশক্তি; স্বৈরতন্ত্র, একনায়কত্ব ও ধনতান্ত্রিক-গণতন্ত্রের আবরণে আচ্ছাদিত ধনিকগোষ্ঠীর সার্ব্বভৌম শক্তির অপপ্রয়োগের প্রতি তীব্র আঘাত ক'রে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও শোষণের বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করবার কাজ সুরু হোলো, রাশিয়ার জারের রাজশক্তি তুরস্কের খলিফার অধিনায়কতা, হিটলার ও মুসোলিনীর স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কত্ব, অহিফেন জর্জ্জরিত চীনের চিয়াংকাইসেকের মার্কিণ আঁতাত ধ্বংস করে দিল জনশক্তির বৈপ্লবিক আন্দোলন। কিন্তু তবুও লোভী, ভোগী, স্বার্থান্বেষী শিল্পপতিদের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিষবৃক্ষ সমাজের বিশাল প্রাঙ্গণ থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা আজও সম্ভব হয়নি। তাই আজ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে দেখি অশান্তির বহ্নিশিখা বিশৃঙ্খল জীবনের বিরাট ব্যর্থতা ও উন্নত আদর্শের শৈথিল্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমগ্রবিশ্ব হ'তে মানুষের নৈতিক আদর্শ যেন চির বিদায় নিয়েছে, পৃথিবীর মানসিক ভূগোলেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে নানা রাষ্ট্রের সীমা পরিধির সঙ্গে সঙ্গে, আজ সহায়হীন, সম্বলহীন, বাস্তুহারার মিছিল চলেছে সভ্যতার রাজপথ বেয়ে, উদরান্নের তীব্র অভাবে মাতা আপন সন্তানকে বিক্রয় করছে, ভাগ্য বিপর্য্যয়ে অহরহ ঘটছে নারীর নৈতিক পদস্খলন, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মধ্বজীদের চলেছে ব্যভিচার ও পাপাচরণ। যন্ত্র সভ্যতার অসাধারণ প্রভাবে যে অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশা জনসাধারণকে অভাব, অত্যাচার, অশিক্ষা ও অধর্ম্মের আগুনে পুড়িয়ে মারছে এবং যুগপৎ সে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী অপরিমেয় অর্থ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সুযোগ পাচ্ছে, তার অবসান না হ'লে মানব-সমাজ ক্রমশঃ পশু স্তরে নেমে যাবে।

মানব দুর্গতির তিমির রাত্রির অবসান আনবার মত ব্যক্তির ইতিহাসে কোন দিনই অভাব হয় নি। এই ধূলির ধুলার উপর এমন বিরাট ব্যক্তিত্বের যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা সমস্যার লেলিহান আগুনে দগ্ধ সর্ব্বহারা মানুষের বেদনা দূর করবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় আপন মস্তকে তুলে নিয়েছেন. জীবন-জিজ্ঞাসু গান্ধীজি যান্ত্রিক যুগের এই সর্ব্বগ্রাসী বীভৎসতার বিরুদ্ধে [illegible] বল্লেন—

I doubt if the steel age is an advance upon the fight age. I am indifferent.

তাঁর বিশ্বাস ছিল এই যে যন্ত্রের অসংযত ব্যবহারের জন্যই পুঁজিবাদ এরূপ বৈষম্যমূলক রূপ গ্রহণ করেছে এবং সেইজন্য যন্ত্রের ব্যবহারে মানুষ যদি সংযত হয় তবে পুঁজিবাদের (capitalism) রূপেও পরিবর্ত্তন সাধিত হবে। তবে রাষ্ট্র-আয়ত্ত সংযমের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না। ব্যক্তি যদি আপন চেষ্টায় সংযম ও শুভবুদ্ধির আলোকে অনুপ্রাণিত হয় তাহলে তার আয়ত্তাধীন যন্ত্রের ব্যবহারে ও সংযম দেখা দেবে। তিনি ব্যক্তিকে বড় করে দেখেছেন এবং তাঁর ধারণা ব্যক্তির শুভ বুদ্ধিই তার চালক। মানুষের মহত্তম আদর্শ, সৃজনী প্রতিভা, মনুষ্যত্ববোধ ও শুভবুদ্ধি কিভাবে বিলুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে যন্ত্রবিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি ও যান্ত্রিক সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির ফলে, গান্ধীজি তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন আজ আর মানুষের জন্য বস্তু নয়, বস্তুর জন্যই মানুষ। মানবতা লৌহ-প্রাচীরের অন্তরালে কারারুদ্ধ। সত্য শিব সুন্দরের পূজা অবলুপ্ত। ধনতান্ত্রিক দানবের স্বেচ্ছাচার শতধা বিস্তৃত। তাই মহাত্মাজী নিজের জীবনের মাধ্যমে দেখিয়ে গেছেন নৈতিক আদর্শের মাহাত্ম্য, সত্যের জয় ও আধ্যাত্মিকতার অপরাজেয় মহাশক্তি।

গান্ধীজির মতবাদ যে অভিনব এ কথা বলি না। তাঁর পূর্ব্বে বহুকাল আগে যে সব মহাপুরুষ এসেছিলেন তাঁরাও মানব প্রেমের শ্রেয়োনীতিকে প্রচার করে গেছেন। প্রাচীন মিশরের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুললে দেখা

৩

যায় যে ফ্যারাওদের শাসনকালে মিশরের একদিকে ছিল অগণিত মানুষের হাহাকার, আর্ত্তনাদ, বুভুক্ষা ও কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে কশাঘাতের মজুরী। নির্য্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, পদদলিত মানুষকে ফ্যারাও রাজশক্তির কবল থেকে উদ্ধার করবার জন্য মিশরের মাটিতে আবির্ভূত হলেন মুসা (মোজেজ)—তাঁর আবির্ভাব কাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০০ হইতে ২০০০ বৎসরের মধ্যে। মিশরের প্রাচীন রাজশক্তি অবলুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু ইহুদি দাসবৃন্দের পরিত্রাতা মুসা মরেও অমর হয়ে আছেন।

রোম সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় অনুরূপ অবস্থা। এখানেও দেখা দিয়েছে অযোগ্য গণশক্তির উপর রাজশক্তির স্বেচ্ছাচারিতার জন্য। অর্থজাত উচ্চশ্রেণীর বিলাস-ব্যসন, অর্থলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার কেন্দ্রলালসা এরূপ তীব্র ভাবে দেখা দিল যে তাদের স্বার্থের ইন্ধন যোগাতে গিয়ে দরিদ্র জনগণ বিশেষ ক'রে কৃষক সম্প্রদায় মুমূর্ষু হয়ে পড়লো। ভেঙ্গে গেল রোম সাম্রাজ্যের জাতীয় সৌধ। গথ ও অন্যান্য জাতির আক্রমণে রোমের পতন ত্বরান্বিত হোলো। এইসব মদগর্বিত স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে ন্যাজারেথের যীশুখৃষ্ট শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন নি, তিনি অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন—

Woe un to the Bethsaida! Woe un to thee capernaum. Art thou esealted with buildiugs reaching unto thee heavens! Thou shalt be brought dawn to helt!

কিন্তু তিনি দরিদ্র মানুষের অন্তরে অন্তর মিশিয়ে বলেন—

Come unto me, all ye that labour and are heary laden and I will give you rest—Take my yoke upon you and learn of me for I am meak and lowly of heart, and ye shall fiud rest to your souls.

যীশু মানুষকে যে বাণী শুনিয়েছিলেন তা বস্তু বিশ্বের পার্থিব ভোগা-সক্ত মানুষের রুচিসম্মত বাণী নয়—তাঁর বাণীতে ছিল সভ্যতার সর্ব্বোত্তম মহত্ত্বের অভিব্যক্তি, মানবতার অমোঘ শক্তি।

সভ্যতার বস্তুতান্ত্রিকতাকে কখনই সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারেন নি। এ যুগের যান্ত্রিক সভ্যতার পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করেও তিনি বার বার স্বীয় সত্ত্বার মধ্যে অনুভব করেছেন প্রাচীন ভারতের বিপুল প্রাণস্পন্দন। তাঁর ভেতর থেকে ভারতের শাশ্বত আত্মাই প্রতিফলিত হয়েছে। আপন আত্মিক শক্তির বিকাশের বাতায়ন উন্মুক্ত করে, চিত্তদুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা ও আলস্য পরিহার করে এবং শারীরিক শ্রমের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'লে যে জনসাধারণকে সুস্থ কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থার অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব—এ কথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর আরও বিশ্বাস ছিল যে জনতার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে রচিত ভবিষ্যৎ সুখী-সমাজে বুদ্ধির গুণ বিশেষ নিশ্চয় সমাদৃত হ'বে, কিন্তু কায়িক শ্রমের দায় থেকে কারও অব্যাহতি পাওয়া উচিত নয়। এ ছাড়া সামাজিক সকল মানুষের আয় যে যথাসম্ভব সমান হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তাই দেখি বর্ত্তমান যন্ত্র-সভ্যতার পরিবর্ত্তে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে ফিরিয়ে আনাই গান্ধীজির উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ সে সভ্যতার মধ্যে বৈষম্য ও সামাজিক অত্যাচার ছিল। তিনি যে সভ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন, প্রাচীন সভ্যতা হ'তে তা স্বতন্ত্র। অতীতকে ফিরিয়ে এনে বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি ওকালতি করেন নি, কিন্তু বর্ত্তমান যে অতীত ও ভবিষ্যতের মিলনক্ষেত্র একথা তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

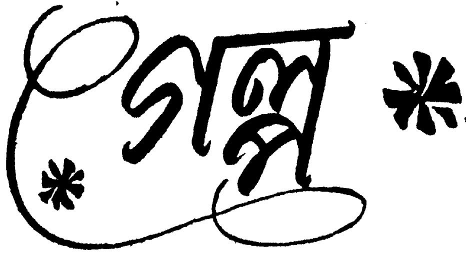
প্রকৃত মানব কল্যাণ সাধন, মানুষের অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশের রুদ্ধদ্বার উন্মোচন এবং সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার সুউচ্চ সৌধ নির্ম্মাণ করার ক্ষেত্রে গান্ধীজির মত ও পথ গ্রহণ করা যে মানব গোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থের দিক হ'তে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ এই কথা চিন্তা করতে সুরু করেছে। এটা নিশ্চয় আশা ও আনন্দের সূচনা।

ভয়

রত্নেশ্বর হাজরা

দু'জনে হাজার প্রেমের কথা বলতে বলতে
হাতে মালা গেঁথে চলতে চলতে
একটা পথের মোহনায় এসে দাঁড়ালাম
দু'জনে দু'দিকে ভিন্ন পথে ছড়িয়ে গেলাম।
অন্ধকারে মাঠ পেরোলাম, আলের শেষে
অতি পরিচিত শব্দ পাশে,
চেয়ে দেখলাম তাহার ত্রাসে
রাত্রি কাঁপে ; ছোট অনুনয় :
'একা যাবোনা, কেমন যেন গা ছম্ ছম্ ভয়!'
ফের হাতে হাত ; চলতে চলতে
এগিয়ে গেলাম বলতে বলতে,
'আমার জীবনে মালা হয়ে যদি আসতে…'

সে বললে নিবিড় হ'য়ে হাসতে হাসতে
'এই অভিনয়
অতীতে করেছি—এখনো করি গো ভয়।'



যান্ত্রিক

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

মহাকালের পরিধিকে যদি ঘড়ির দু'কাঁটার নিয়মে বাঁধা হয়, তবে বিবর্তনশীল মানুষের জীবনই বা না বাঁধা পড়বে কেন? এমনি বুঝে অভিজিৎ।

কাজ করে ঘড়ি-মেরামতি কারখানায়।

কাজের সময়ের একটা ধরা বাঁধা নিয়ম আছে। দশটা-ছটা।

কিন্তু নিয়ম মেনে চল্‌তে হ'বে সব সময় তার মানে নেই। অন্ততঃ অভিজিতের কারখানার মালিক সুরেশ্বর ব্যানার্জির তাই ধারণা। কাজ হ'য়ে গেল ত একঘণ্টা আগেই কেন যাও না: না হয় আরো কিছুক্ষণ বসে হাতের কাজটা শেষ করেই বিদেয় হও। কিন্তু অভিজিৎ মানে নিয়মকে। চলে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায়। কাজে ফাঁকি নেই। যেটুকু করবে, তা হ'বে খরিদ্দারের মনোমত। অনর্থ দু'দণ্ড বসে পাশের কারিগর হরিপদ সমাদ্দারের সঙ্গে খোসগল্প করবে, এমন মন নয় অভিজিতের। হরিপদ গল্প করছে করুক, অভিজিৎ শুধু কানে শুনে যেতে রাজী আছে। কিন্তু রাজী নয়, ফোড়ন দিয়ে দিয়ে হরিপদকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে!

সুরেশ্বর জানেন অভিজিতের কাজের নিয়মানুগ ধারাকে। মাঝে মাঝে অনুযোগ তুলে বলেন: বড় বেশী নিয়মের ভূতকে মেনে চল্‌ছে হে রায়; ওটা যদি সত্যি ঘাড়ে এসে চাপে ত ভবিষ্যত জীবনের সব রস নিঙড়ে বের করে নেবে, দেখো। জানত, এজন্যেই এখানে কড়াকড়ি কিছু নেই।

অভিজিৎ শুনে হাসে; প্রত্যুত্তরে বলে: জানি স্যর্। তবে ভূতই বলুন আর যাই বলুন, একে ছাড়া এখন সহজ হবে না।

বিস্ময় প্রকাশ করেন সুরেশ্বর: কেন বলত?

অভিজিৎ তেমনি বলে: অভ্যাস হ'য়ে গেছে যে স্যর! একেবারে ঘড়ির কাঁটার মত। তবে সে চলে যন্ত্রে, আমাকে চল্‌তে হয় সময় আর নিয়মের মন্ত্রে।

হেসে ওঠেন সুরেশ্বর। একগাল ধুঁয়ো উড়িয়ে বলেন: সুন্দর বলেছ!

অভ্যাসই বটে। তবে সেটা বেড়ে উঠেছে জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক নিয়মে। ঘুম হ'তে ওঠা থেকে রাতে বিছানায় শুতে যাওয়া পর্যন্ত নিয়মটা বড় বেশী রপ্ত হয়ে উঠেছে। মজা এই, নিয়মে বাঁধা কাজটা না হ'লে মেজাজই থাকে না। বিশ্রী মনে হয়।

বাড়ীতে ঘড়ির কাজ রেখেছে অভিজিৎ। আলাদা ব্যবস্থা। ছোট কাঁচের ঘর, তার ভেতর নানা আকারের ভাঙ্গা অকেজো ঘড়ি, আর সরঞ্জাম।

কাজ থেকে ফিরে কিছু মুখে দিয়ে অভিজিৎ বসে গিয়ে সেখানে। কাঁচের ডুমে রাখা কোন হাতঘড়ি। পার্টস্‌গুলো সব বিচ্ছিন্ন—যেন লাসকাটা ঘরে কোন লাসকে 'ডিসেক্সন' করা হ'য়েছে। অভিজিতের কাজ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন পার্টসগুলো প্রথম পরিষ্কার করা, তারপর একত্র করে নূতন ঝকঝকে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়া। একাধারে অভিজিৎ সার্জ্জেন আর প্রাণদাতা। ব্যাপারটা সবই যান্ত্রিক, কোন মজা বা রসের কাণ্ড হয়তো কারো চোখে লাগবে না, কিন্তু অভিজিতের সমস্ত প্রেরণাই এখানে।

আশ্চর্য, সুদীপা বুঝবে না এ'কথা। বিয়ের পর থেকে অনেক চেষ্টা করে দেখেছে। প্রায় তিনবছর ধরে। কিন্তু সুদীপার এক কথা: তোমার জিনিষ তুমিই বোঝ বাপু, ও আমার দরকার নেই।

প্রকৃতপক্ষে সুদীপার দরকার আছে দুটি জিনিষে। এক সংসার যাত্রার ব্যাপারে, আর দ্বিতীয় তার মালিককে।

গত তিনবছরে সুদীপার আব্দার খুবই কম পূরণ করেছে অভিজিৎ। নিজের ধরা-বাঁধা কাজের নিয়মকে ভঙ্গ করতে চায়নি। সুদীপা কোথাও যেতে চাইলে অভিজিৎ কোন ছুতো দিয়ে দেয়। 'টেবিল এলার্ম'টা কোনদিন দেখিয়ে বলে: কাল সকাল আটটায় 'ডেলিভেরী না দিলে মান থাকবে না। নয়তো কোনদিন: অমুক বসে আছে, একঘণ্টার মধ্যেই দিতে হবে ওটা।··· আরেকদিন যাব লক্ষ্মীটি।

সত্যি, আরেকদিন যখন আসে, অভিজিত তেমনি এড়াতে চায়। কিন্তু সুদীপা যদি রাগ বা অভিমানে ফেটে পড়ে তখন এড়ানো অসম্ভব হ'য়ে যায়।

বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও কম নয় অভিজিতের। অভিযোগের অন্ত নেই তাদেরো। সমাজ-গোত্র ছাড়া হয়ে পড়েছে অভিজিৎ। কাজ ত অনেকেই করে, তাই বলে এমন-কাজ-পাগল দেখা যায়না।···সত্যি, একটু আমোদ আহ্লাদ ছাড়া লোকে বাঁচেই বা কি করে? আর যার ঘরে অমন সুন্দরী বৌ, তাকে নিয়ে কোনদিন রাস্তায়, পার্কে বা লেকের ধারে ঘুরতে দেখা যায়নি। আশ্চর্য মানুষ!

যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে শুনে হেসে বলে: গাল-গল্প আমোদ আহ্লাদের দিন অনেক আছে ভাই। কাজের সময়টা মিলবে না। এখন তাই দু'হাতে করে নিচ্ছি।

সুখময়েরই সুদীপার আত্মীয় বলে যাতায়াত বেশী। সেদিন একটা গুরুতর অভিযোগ এনে বলে: করে নিতে ত তোমায় কেউ বাধা দিচ্ছে না ভাই, কিন্তু তারও 'লিমিট' আছে। তুমি যেন সবকেই ছাড়িয়ে গেছ। শুনতে বোধ'য় খারাপ লাগবে, তবু বলছি, তোমার হাতে দীপুর নিরাপত্তাও ভরসা করা যায় না আজকাল।

শুনে চমকে যায় অভিজিৎ। হাতের কাজ থামে: একচক্ষু ম্যাগনিফাইয়িঙ্ গ্লাসটা নামিয়ে রেখে গম্ভীর হ'য়ে বলে: তার মানে কি হোলো?

সুখময় কথাটা বলে কিছু অপ্রস্তুত হয়। তবু না থেমে বলে: তার মানে তোমার উদাসীন ব্যবহার। সেদিন দীপু বিশেষ কান্নাকাটি করাতে বসতে বাধ্য হলাম। তোমার বিধবা শাশুড়ীর কানে কথাটা উঠলে কি ভাল হবে মনে কর?

অভিযোগ গুরুতর। কিন্তু একটা কথা কাউকে বুঝিয়ে উঠতে পারে না অভিজিৎ, সে কাজ ভালবাসে। অভ্যাসের সে কাজ ঘড়ি বাঁধা। কিন্তু সমস্ত কিছু সুখ, আনন্দ থেকে জীবনকে সে বঞ্চিত করেছে, এ কথা মিছে। পুরানো, ভাঙ্গা, অকেজো ঘড়িকে জীবনদানের মধ্যে সে পায় প্রেরণা, পায় ভাল লাগার স্বাদ।

তাই বলে সুদীপাকেও সে বঞ্চিত করেনি। তার হাত খরচের খাতায় বেশ কিছু টাকা দিয়ে রেখেছে অভিজিৎ। মেয়েরা সবচেয়ে যা ভালবাসে, সেই সৌখিন দ্রব্যাদি কিনে ঘর সাজাতে কার্পণ্য করেনি সুদীপা। নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবার কথাটা কী করে উঠে—বুঝতে পারে না অভিজিৎ।

সুখময়ের কথার জবাবে বলে: তুমি ত সব জান সুখময়। আমার যতটা সাধ্য তোমার বোনের জন্যে করছি। তা সত্বেও যদি আমার ব্যবহার তার ভাল না লাগে, আমি নাচার ভাই।

সুখময় বলে: যুক্তিটা তোমার ঠিক হোলো না অভি। ইচ্ছের উপরেই সব হয়। ইচ্ছা করলে তোমার কাজে কিছু সময় ছাটাই করে স্ত্রীর ইচ্ছা পূরণ করতে পার।··· ভাল কথা, শুনেছি তোমার অনেক ছুটি পাওনা, কোথাও গিয়ে ঘুরে এস না! রাইকুল দুই-ই ঠিক থাকবে।

অভিজিৎ সহসা উত্তর দেয় না; একটু হেসে বলে: আচ্ছা, ভেবে দেখি।

হঠাৎ নিজের ঘড়িতে দৃষ্টি পড়ে অভিজিতের। সর্বনাশ··· আটটা পঁয়ত্রিশ···। পাঁচমিনিট বেশী হ'য়ে গিয়েছে যে—

অভিজিৎ চোখ বড় বড় করে লাফিয়ে উঠে পড়ে। পাঁচমিনিটের মেকআপ তাকে করতে হবে। স্নান বোধ হয় হবেনা—

সুখময়কে বিদায় সম্ভাষণও জানানো হয় না। ব্যাপার দেখে সুখময় কিন্তু হাসে।

লোকটা দেখি ঘড়ির মতই যান্ত্রিক···

শেষ পর্যন্ত রাগ করেই সুদীপাকে মার কাছে চলে যেতে হোলো।

ব্যাপার এই:

সুদীপার বন্ধু আভার বিয়ে। উপহার ইত্যাদি যা

দেবার, সুদীপাই বাজার থেকে একা কিনেছে। অনুগ্রহ করে অভিজিত্‌কে বিয়ের আসরে হাজির থাকতে হবে, এই ছিল সুদীপার অনুরোধ শুধু। অনুরোধটা আভারই বলা চলে। কাজ-পাগল লোকটিকে দেখার ইচ্ছা বড় আভার।

অভিজিৎ যেতে রাজী ছিল বরাবর।

বিয়ের দিনও ছিল রবিবার। কারখানার ছুটি থাকলেও ছুটি ছিল না নিজের ঘরে। সমস্তটা দিন ঘড়ির কাজে মশ্‌গুল থাকে অভিজিৎ।

বিকেল ছটার আগে বিয়ে বাড়ীতে পৌছানোর কথা। তিনটে থেকেই প্রস্তুত হচ্ছে সুদীপা। কোন ব্লাউজের সঙ্গে কোন শাড়ী মানানসই, স্থির করে রেখেছে। তাই শুধু নয়। অভিজিতের জন্যে-ও ধুতি-পাঞ্জাবী আর চাদর বেছে রেখেছে।

ঠিক পাঁচটার সময় সুদীপা এলো অভিজিতের ঘরে। আশ্চর্য হ'য়ে দেখ্‌লে অভিজিৎ তেমনি তন্ময়। সে যেন এক ধরণের খেলায় মত্ত। জুয়েল্ পার্টস্‌গুলো একবার সন্তর্পণে লাগাচ্ছে—আবার খুলছে। একটু আঘাতে নেচে নেচে উঠ্‌ছে স্প্রীংগুলো। আশ্চর্য মমতায় একটা স্ক্রুকে দিলে টাইট করে।

সুদীপা ধৈর্য নিয়ে দেখ্‌লে খানিকটা। এক সময়ে বল্‌লে: ওগো শুনছো, হোলো তোমার? যাবে না?

অভিজিৎ না তাকিয়ে শান্ত গলায় বল্‌লে: কোথায় দীপু?

স্বামীকে চেনে সুদীপা। কাজেই বিস্ময়বোধ না করে বল্‌লে: বারে: ভুলে গেছ, আভার বিয়ে না আজ? ছটার আগেই পৌছতে হবে আমাদের—অভিজিৎ চোখ তুলে তাকালে সুদীপার মুখে। তারপর সর্বদেহে দৃষ্টিটা দিল এমন যে প্রথম যেন দেখলে সুদীপাকে। একটা খুসি আর তৃপ্তির আমেজ জাগ্‌লো মনে।

সুদীপা আজ ঘটা করে সেজেছে। সব চেয়ে বিস্ময়কর সুদীপার আঙ্গিক রেখা। কৃশও নয়, মোটাও নয়। সাধারণ মেয়ের চেয়ে উঁচুতে একটু বেশীই হবে। মুখে যেটুকু খুৎ, সে চোখদুটিতে। একটু ছোট। রঙ্‌টা ফর্সা'র ধার ঘেঁসেই চলে আর মাজিত। কাঁধের পাশ দিয়ে সাপের মত দু'বেণী বুক ছুঁয়ে আছে। মাথার ঘোমটা নেই।

: বাঃ!

: কি বাঃ? শুধালো সুদীপা!

অভিজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে ফস্ করে সুদীপার থুত্‌নিটা নেড়ে দিয়ে বল্‌লে: তোমাকে! সুদীপা গাম্ভীর্যের ভাণ করে বল্‌লে: থাক্, আর আদর কর্‌তে হবে না!

একটু অপ্রস্তুত হোলো অভিজিৎ, বল্‌লে: কেন বলত?

: তুমি ত ভীষণ স্বার্থপর, অন্ধ…আদরের জানই বা কি? সুদীপা শাড়ীর আঁচলটা মাথায় তুলে দিলে।

: কেন সব লোক বুঝি আদর কর্‌তে জানে না?—অভিজিৎ বল্‌লে।

: যা জানে, রোজই দেখ্‌তে পাচ্ছি।…তবু ত কোন সুন্দরী মানবী নয়…, যত অকেজো ঘড়ির ছাই…তারই দরদ এত হুঁ—ঠোঁট পান্টালে সুদীপা। হো হো করে হেসে উঠ্‌লো অভিজিত: যাহোক্ এতদিনে কথাটা বুঝ্‌লে! ‥আচ্ছা, চল্, এবার য্যাওয়া যাক্……

গলি থেকে রিক্সায় করে বড় রাস্তায় পৌছে ট্রাম ধর্‌বে, এই ইচ্ছা দু'জনের। চাকর গেছে রিক্সা ডাক্‌তে,…ইত্য-বসরে আশ্চর্যভাবে আবির্ভাব ঘট্‌লো সুরেশ্বরের। এলো নিজ মোটরেই। কোনদিন আসে না সুরেশ্বর এদিকে। একবার এসেছিল অভিজিতের বিয়েতে।

হঠাৎ কি কাজ পড়্‌লো আবার?

কাজই বটে। খুব জরুরী কাজ। অভিজিৎকে কাছে ডেকে বল্‌লেন সুরেশ্বর—যেতে হ'বে এখনই সুরেশ্বরের সঙ্গে।

অভিজিৎ ভুলে গেল সুদীপাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ী যাচ্ছে। উদ্দীপ্ত হ'য়ে বললে: চলুন! স্যর, আমি ত প্রস্তুত হ'য়েই আছি।

সুদীপার মুখে তীর্যকভাবে চাইলেন সুরেশ্বর: কিন্তু বললেন অভিজিৎকে: তবে তোমার স্ত্রী বোধ'য় আরেক-খানে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে আছেন?

অভিজিৎ কোনদিকে না তাকিয়েই বললো: ও কিছু নয়, সামান্য এক বিয়ের ব্যাপার। আপনি চলুন স্যর—

গাড়ীতে উঠে এলো অভিজিৎ।

সুরেশ্বরের ভদ্রতাবোধ ছিল। কথাটা গায়ে মাখ্‌লেন না অভিজিতের। ভেবে নিয়ে বল্লেন যেতেই যখন হ'চ্ছে

তখন তোমার স্ত্রীও কেন চলুন না? পথে বিয়ে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে গেলেই হ'বে।

অভিজিৎ বল্লে:··· দি আইডিয়া! এসো দীপু··· উঠে এসো—

কিন্তু সুদীপা উঠে এলো না। তার সর্বদেহ কঠিন হয়ে গেছে। মাথাটা নেড়ে দিয়ে অস্ফুটে কী বল্লে বোঝা গেল না। তারপর দ্রুত ঘরের দিকে চলে গেল।

কিছুদিন গত হ'য়েছে।

সুদীপা সেই গিয়েছে, আর ফেরেনি। শীঘ্র ফিরবে এমন মনে করে না অভিজিৎ। কারণ, চিঠি দিয়েও উত্তর পাওয়া যায় নি।

বাস্তবিক কোন অর্থ হয় না সুদীপার এমনি রাগের। অভিজিতের অন্যায়টা কোথায়? মালিক নিজে এসেছে বাড়ীতে জরুরী কাজ নিয়ে···তাকে সে সময় ফিরিয়ে দেয়া কি উচিৎ কাজ হোতো?

আভার বিয়েতে সত্যি যায়নি সুদীপা। ঘরে ফিরে সুদীপার রাগ দেখে বোঝাতে চেয়েছিল অভিজিৎ। সুদীপা বোঝেনি।···পরদিনই এক স্যুটকেস হাতে বেরিয়ে গেছে বাপের বাড়ি। বিদায় পর্যন্ত নিয়ে যায় নি যাবার সময়। আশ্চর্য!

রাতে শুতে গিয়ে বিছানাটা ফাঁকা-ফাঁকা মনে হত কেমন। তারপর সব ঠিক হ'য়ে গেছে, কোন কষ্ট-ই আর নেই।

একে একে ঋতু—মাস পার হ'তে থাকে। শরৎ গিয়ে হেমন্ত। শহরে বাস যাদের, ঋতুর আসা-যাওয়া বুঝবেই বা তারা কি করে? কারো সাজানো বাগানে ফুল ফোটে, ঝরে, কে খোঁজ রাখে তার? সার্বজনীন পূজোগুলোর আবির্ভাবে যা বোঝা যায় একটু। বুঝি বা তাদেরও অভিজিতের কর্মজীবনে সম্পর্ক নেই। বিকল অকেজো ঘড়ির কলকব্জা ঘুরাতে ঘুরাতে দিনরাত ঘুরে যায়।

ক'দিন থেকেই চল্‌ছে ব্যাপারটা। রাতের ঘুম একেবারে গেছে। মাথা ভার-ভার। তাই নিয়ে কাজে যাওয়া বন্ধ হোলো না।

সেদিন সকালে গিয়ে বসেছে, যেমন বসে অভিজিৎ। মনে হোলো, মাথায় কিছু আস্‌ছে না। ঘড়ির পার্টসগুলো হাতে গোলমাল হতে লাগলো। কাঁপছে সর্বাঙ্গ। কেমন ঝিম্‌-ঝিম্ কর্‌ছে। ব্যথায় চোখ দুটো কর্‌ছে টন্‌টন্! অসম্ভব বসে থাকা। কোনমতে উঠে দাঁড়াল। চাকরকে ডাক্‌লে। বল্লে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিতে। আর ডাক্তার ডাক্‌তে একজন।

চাকর আজ্ঞা পালন কর্‌তে।

পাড়ারই ডাক্তার—এসে দেখে শুনে মুখখানা গম্ভীর করে বল্‌লেন: ভয়ের কিছু নেই। আপনার দরকার এখন রেষ্টের। অন্তত সাতদিন। হ্যাঁ—শুধু বিশ্রাম।

সাতদিন নয়, তিনদিনেই সুস্থ হ'য়ে গেল অভিজিৎ। অষুধেও বটে, ঘুমেও বটে। ডাক্তার বলেছে—কম করে আরো চারদিন বিশ্রাম।

অভিজিৎ কানে তুললে না সে কথা। পুরাদমে নিজের কাজে লেগে গেল।···

দেখ্‌তে দেখ্‌তে শীত এসে যায়।

বন্ধুরা যারা আসে, গৃহ ও গৃহীর দুর্দশা দেখে সমবেদনা জানাতে থাকে।

কেহ বলে: খুব ত হোলো, আর কেন ভাই?··· এবার যাহোক্ গৃহিণীকে নিয়ে এসো বুঝিয়ে-সুজিয়ে।

অভিজিৎ বলে: সে কি কর্‌তে বাকী রেখেছি, মনে কর? না এলে কি করি বল?

কেহ উত্তর দেয়: অন্যায় তোমারি অভি। সবই ত জানা আছে আমাদের। একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বইয়ের পা ধরে ক্ষমা চাও দিকি।

সুখময়ও আসা বন্ধ করেছিল যেন। হঠাৎ এলো একদিন। একখানা চিঠি দিল অভিজিতের হাতে। চিঠিখানা লিখেছেন তার শাশুড়ী। সুখময় সেখানেই গিয়েছিল নাকি। শাশুড়ী ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখেছেন অনেক কিছু। প্রকৃত সারাংশ এই—অভিজিৎ যদি সময় করে এখানে আসে তবে খুবই আনন্দিত হবেন। সুদীপা সম্বন্ধে কিছু লেখেননি তিনি। সে কথা বলল সুখময় নিজে। জানাল যে, অভিজিৎ সেখানে গেলেই সুদীপা আস্‌বে এখানে। তবে আগে প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে একটা।

অভিজিৎ জিজ্ঞেস করে: কি প্রতিজ্ঞা?

সুখময় কিছুমাত্র ইতস্তত: না করে বল্লে: কারখানার কাজ ছাড়্‌তে হবে তোমাকে।

হেসে ওঠে অভিজিৎ। তারপরই হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে বলে: আচ্ছা ভেবে দেখি। শাশুড়ীর চিঠির উত্তরে জানালে, ছুটি মিল্‌লে অবশ্যই সে যাবে।...

হঠাৎ একদিন কারখানায় অজ্ঞান হ'য়ে গেল অভিজিৎ।

সুরেশ্বর উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার ডাকানো হোলো। ডাক্তার দেখে শুনে বল্‌লেন: নাথিং রঙ্‌। স্ট্রেনিং অব্‌ ব্রেণ। তার উপর লো-ব্লাডপেশার্‌।...প্রচুর রেষ্টের দরকার।

শুনে আশ্চর্য হলেন না সুরেশ্বর। অভিজিতের যে এমনি একটা হবে, বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যেন। সেদিন ঠাট্টাচ্ছলে নিয়মের ভূতের কথা বলেছিলেন অভিজিতকে। তারই সত্যিকারের ক্রিয়া হয়তো এটা।

কিছু সুস্থ হলে অভিজিৎ-কে বাসায় পাঠিয়ে দিলেন সুরেশ্বর। আর সেই সঙ্গে দিলেন কিছুদিনের ছুটিও।

বাসায় এসে নিজের রোগ সম্বন্ধে ভাবলে অভিজিৎ। আঠাশ বছরের জীবনে দশ বছরই কেটেছে ঘড়ির কাজে। এর ভেতর ক'বার শরীর খারাপ হ'য়েছে, কর গুণে বল্‌তে পারে অভিজিৎ। আর সে সব রোগে ছুটি নেবারই দরকার হয়নি। আর এখন এমন অসুখ দাঁড়ালো, যার জন্যে অনেক ছুটি দিতে বাধ্য হোলো সুরেশ্বর নিজে। এত ছুটি দিয়ে কি করবে অভিজিৎ? শুয়ে-থাকা ছুটি-জীবন সত্যি ভাল লাগে না।

পাশের বাড়ীর জীর্ণনোনা দেয়ালের ফাটলে পাকুড়ের একটা চারা কি করে ইতিমধ্যে কচি কিশলয়ের রঙে ভরে উঠেছে। ইট সিমেন্টের কঠিন জগতে এমনি রঙের আলাদা মাধুর্যের স্বাদ আছে বুঝি। আচমকা এক অনুভূতির শিহরণ লাগে অভিজিতের ঘড়ি বাঁধা মনে। শহরে ধোঁয়া আর ধুলায় ধূসর আকাশের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দেয় ময়ূরকন্ঠি রঙে, কেন এমন হঠাৎ-খুসির আলোড়ন? বিছানায় শুয়ে-শুয়ে মুগ্ধ হয় অভিজিৎ।

সুদীপার মুখখানা বড় বেশী মনে হ'তে থাকে। কবে কোন্‌ যুগে ঘর ছেড়ে দিয়েছে যেন। অভিমান শুধু একারই নয় সুদীপার। মরুক্‌, বাঁচুক্‌,—কিছুই জানবে না এবার অভিজিৎ।

পাড়ার ডাক্তার সাবধান করে দিয়ে বল্‌লেন: এবার কথা না শুন্‌লে মুস্কিল, অভিবাবু। আর নিয়ে আসুন বৌমাকে, নয় তো কোন আত্মীয়কে। চাকর-বাকর দিয়ে এসব হয় না।

দূর সম্পর্কের এক প্রৌঢ়া বিধবা পিসিমা ছিলেন। তাঁকে নিয়ে অভিজিৎ আসানসোলের কাছে বরাকরে চলে গেল হাওয়া বদলাতে।

পিসিমা লোকটি খারাপ নন্‌। ভাইয়ের বেটার জন্যে কর্‌তে লাগ্‌লেন ও খুব। কিন্তু এতবড় ছেলেকে শাসন করেন তিনি কি করে?

কতকগুলো অকেজো ঘড়ি সঙ্গে আন্‌তে ভোলেনি অভিজিৎ। একটু ভাল বুঝ্‌লে তাই নিয়ে সময় কাটায়। পুরানো ডায়েলটা বদলায়, নতুন স্প্রিংটা পরীক্ষা করে, জুয়েলগুলো ওয়াশ করে। খেলা-খেলা কাজে প্রেরণা আসে, ভুলে যায় ডাক্তারের উপদেশ। আল্‌গা পার্টস্‌-গুলোতে কী সঞ্জীবনীর মন্ত্র পড়ে,—পঞ্চতন্ত্রের সেই বাঘের গল্পের মত হ'য়ে যায়।

দেখে অস্থিরতা বোধ করেন পিসিমা। মুখে কিছু বল্‌তে পারেন না।

একদিন বল্‌লেন শুধু: হ্যারে টুনু, বৌমার ঠিকানা দেত আমাকে।

সন্দেহভরা চোখে তাকায় অভিজিৎ, বলে: কেন পিসিমা! তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?

পিসিমা হেসে ফেলে বলেন: শোন ছেলের কথা! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেক্‌লো, আমার আবার কষ্ট! তা নয় রে, তা নয়। স্বামীর ঘর ছেড়ে এ্যাদ্দিন বাপের বাড়ী থাকা ভাল দেখায় না, তাই জানানো শুধু বৌমাকে।

অভিজিৎ বলে: তা জানাও,...তবে সে আস্‌বে না।

পিসিমা তেমনি হেসে বলেন: বৌমা ত আমার নির্বোধ নয়...আমি লিখ্‌লে নিশ্চয়ই আস্‌বে দেখিস্‌। দে ঠিকানাটা—

এক টুক্‌রা কাগজে ঠিকানা লিখে দিলে অভিজিৎ।

আবার একদিন নার্ভ 'ব্রেক্‌ ডাউন' হ'য়ে গেল।

.. পিসিমা চোখে দেখলেন অন্ধকার। স্থানীয় ডাক্তার দেখে-শুনে নিজেই একজন নার্সের ব্যবস্থা করে দিলেন।

তবু পিসিমা স্থির থাকতে পারলেন না। কাকে ধরে ।কটা জরুরী 'তার' করে দিলেন সুদীপাকে।

বিকেল হ'য়েছে তখন।

লোহার খাটিয়ায় শুয়ে আছে অভিজিৎ। মুখে ক্লান্তির াপ। চোখ দুটি বুজে আছে। রাতের ডিউটির জন্যেও প্রস্তুত হ'তে নার্স বাইরে যাচ্ছিল। ভিতরে পিসিমা াছেন রোগীর পথ্য তৈরীতে ব্যস্ত,—এমন সময় একটা াড়ার গাড়ী এসে থামল দোর গোড়ায়।

শব্দ পেয়ে নার্স জানালা দিয়ে তাকিয়ে অবাক হোলো কছু। গাড়ী থেকে নামলো অল্পবয়সী অতি সুশ্রী এক ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোক। কিছু একটা ধারণা করতে ারলো নার্সটি, তারপর সংবাদ দিলে পিসিমাকে।

ত্রস্তে বেরিয়ে এলেন পিসিমা।

সুদীপাকে দেখেছেন তিনি একবার। তবু চিনতে ষ্ট হোলো না। তাঁর চোখে জল এসে গেল। এবার থকে দায়িত্ব ঘুচলো হয়তো।

পিসিমা এগিয়ে গিয়ে সুদীপার এক হাত ধরে ললেন: এসো বৌমা!

সুদীপা কোনমতে একটা প্রণাম সেরে বললে: এখন কমন আছেন, পিসিমা?

পিসিমা বললেন: গিয়েই দেখবে। বড় বিশ্রী রাগ । তোমার। ভগবান না করুন, ছেলেটার তেমন কিছু 'লে তোমারি ক্ষতি যে—।

: বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে পিসিমা—বলে এগিয়ে গল সুদীপা।

প্রায় আধঘণ্টা বসে রইলে সুদীপা অভিজিতের পাশে।

একসময় অভিজিৎ চোখ মেলে তাকাল। তাকিয়ে রইলো সন্দেহ-ভরা দৃষ্টি নিয়ে কিছুক্ষণ। ক্রমে দৃষ্টিটা স্বচ্ছ হ'য়ে এসে ফুটে উঠলো খুসির ঝলক। শুধু ধীরে ধীরে বললে: তুমি?

সুদীপা নিজেকে সংযত রেখে বললে: হ্যাঁ—কিন্তু তুমি?

শুষ্ক হাসলে অভিজিৎ। বললে: খারাপ নয়। কিন্তু —খুব স্বস্তিও পাচ্ছি নে।

ব্যস্ত হ'য়ে বললে সুদীপা: কেন বল?

তেমনি হাসলে অভিজিৎ, বললে: যারা যন্ত্রকে ভাল বাসে দীপু,—যন্ত্রছাড়া হলে তাদের কী কষ্ট,—যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক যাদের নেই, তারা বুঝবে না। তুমিও বোঝো নি। তবু এও দেখলুম, মানুষ যদি একেবারে যান্ত্রিক হ'য়ে যেতে চায়, তার শাস্তি দেন নিয়মের ভূত।—সুরেশ্বর ব্যানার্জি যা বলেছেন, কথাটা মিথ্যে নয়। তাই—একটু থেমে গিয়ে বললে: তাই তোমার প্রতীজ্ঞাই রক্ষা করবো দীপু।

মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সুদীপার; বললে: সত্যি বলছো?

সুদীপার হাতখানা নিজের দুর্বল হাতে তুলে নিলে অভিজিৎ। একটু চাপ দিয়ে বললে:—কষ্ট যদিও হবে, তবু সত্যি।

টেবিল ঘড়িটার মত ঘরের এক কোন থেকে টিক্ টিক্ করে উঠলো একটা টিকটিকি। যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। বরাকর নদীর দিক থেকে উঠে এলো এক ঝলক চৈতী হাওয়া— দূরের মহুয়া ফুলের পরশ তাতে।

সত্য-সন্ধানে

শ্রীতমোনাশ মুখোপাধ্যায়

আলোকের পানে চলিতেছি আমি
সুদূরের আহ্বানে
প্রকৃতির সাথে পাল্লা দিতেছি
সুন্দর সন্ধানে।
"অসৎ হইতে সতে নিয়ে যাও
তমঃ হ'তে আলো মাঝে
মৃত্যু হইতে অমৃত পুরে"
এই শুধু হিয়ে বাজে।
কে মোরে চালায়?···কেমনে চালায়?
কোথায় চলেছি আমি?··
তারি খোঁজে আজি বাহির হয়েছি
আমি পুণ্যের কামী।

সুন্দর বনের গহনে

শক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভাটির টান শুরু হয়েছে, জেলেডিঙ্গিতে ওরা খাওয়া দাওয়া সেরে বসেছে, যেতে হবে, ভাটিতে নীচের দিকে। সেখানে যদি মাছের সন্ধান মেলে। বসে থাকবার সময় তাদের নাই। ডিঙ্গিতে রয়েছে কয়েকটা ছোট ছেলেও। লঞ্চে উঠে বিস্মিত দৃষ্টিতে ইঞ্জিনের দিকে চেয়ে আছে।

"মাছ ধরতে পারিস তুই ?"

ঘাড় নাড়ে সে। দাঁড় টানতে পারে সময় অসময়ে।

'কে কে এসেছে তোর সঙ্গে ?"

কেউ নাই আমার ? পাড়ার লোকদের সঙ্গে এসেছি।

মা-বাবা বেঁচে থাকলে জেনে শুনে হয়তো পাঠাতে পারতো না, আবার ভাবি—ছেলে বেলা থেকেই ওরা ভয়কে জয় করেছে, এই শিক্ষা নিশ্চয়ই বিফল হবে না। বাড়ী ওদের মেদিনীপুর জেলার গেঁওখালির কাছে কোন গাঁয়ে। ভাসতে ভাসতে কোন দরিয়ায় এসে ঠেকেছে।

মাছ আর ভাত। ইলিশ মাছ রাঁধতে তেলের প্রয়োজন নাই, বড্ড সুবিধে, কড়াই এ চাপিয়ে দিলেই হলো, আর ভাত। আশ্রয় বলতে নৌকাতে ছইএর বালাই নাই। আড়াআড়ি একটা বাঁশ টাঙ্গান আছে, তাতে শুকুচ্ছে জালের স্তূপ, রাতের বেলায় বড় জোর ছেঁড়া তেরপল না হয় চট টাঙ্গিয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে থাকে। হাত দিয়ে শীত আটকানোর চেষ্টা করে সারা রাত্রি। জলো হাওয়া হাড় অবধি কাঁপিয়ে তোলে, শীত, ডাকাতের ভয় আর দুশ্চিন্তা সব কিছু দেহ মনকে পঙ্গু করে দেয়। রাত্রি আর শেষ হয় না।

মাছের মণ এখানে কুড়ি-বাইশ টাকা, দর কিছু ওঠা নামা করে মাঝে মাঝে। এক একটা দলে অন্ততঃ পাঁচটা করে নৌকা, লোকও অনেক। জালের দাম, নৌকার দাম আছে ; তার উপর আছে খোরাকি। দিনে রোজকার বলতে কোনদিন বা বিশ-ত্রিরিশ মন মাছ, আবার দিনের পর দিন কেটে যায় মাছের চিহ্নও দেখা যায় না। হিসাব করলে প্রত্যেকের অংশে কি যে পড়তা থাকে—ঠিক মালুম করতে পারলাম না।

লঞ্চওয়ালারা—বা মাছ ব্যবসায়ীরা এক বৎসরের মরশুমে বেশ কয়েক হাজার টাকা রোজকার করেন। কোন কোন ব্যবসায়ী সত্তর পঁচাত্তর হাজার টাকা বা তার বেশীও ঘরে তোলেন। তাদের ভক্তির পরিচয়ও দেখলাম, সুন্দর বনের গহনে কোথাও বনবিবির জন্ত গরান খুঁটি আর গোলপাতা দিয়ে ঘর বানিয়ে দিয়েছেন, এক জায়গায় ! দেখলাম কে খানকয়েক করগেটসিটই তুলে বনবিবির মন্দির গড়ে দিয়েছেন।

অবশ্য সে দেউলে কোন পূজারীর পায়ের চিহ্নও পড়ে না, কোন ভাঙ্গা দেবতাও নাই। মাঝে মাঝে সাপ—না হয় বাঘই এসে বিশ্রাম নিয়ে যায় বৃষ্টির সময়। মাঝিদের মুখে নাম শুনেছিলাম 'ঠাকুর-বাড়ী'—

ভেবেছিলাম যে বনের মধ্যেও হয়তো কোন আশ্রয় আছে, মন্দির প্রতিষ্ঠা করে কোন সন্ন্যাসী—কাপালিক কেউ আছেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ওই নিস্তব্ধতাই দেখে এলাম।

জেলে ডিঙ্গিগুলো নীচের দিকে চলে গেল ; জীবনবাবুর ডাকে ফিরে চাইলাম। স্নান করে নিন, স্নান করতে হয়তো অসুবিধা হবে, নোনা জল।"

হেসে ফেলি—পনের দিন এই গাংএ বাস করেছি, ও অভ্যাস হয়ে গেছে। সার্কাসের ট্যাপিজের খেলার মত আর একটা কৌশলও বেশ কব্জায় এনে ফেলেছি, তবে আপনার লঞ্চে তার দরকার হবে না দেখছি। সে ব্যবস্থা আছে।"

'মানে' ? কথাটা ঠিক বুঝতে পারেন না তিনি। পায়খানার দিকে নজর পড়তেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেসে ফেলেন।

কলকাতার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে আমার বাড়ীর কথা, পূর্ব-বঙ্গীয় বন্ধুদের কথাও। বেশ চওড়া হৃষ্টপুষ্ট তৈলাক্ত ইলিশ মাছ ভাজা, ঝাল আর আলু-চচ্চড়ি। মুখরোচক নিঃসন্দেহ, কিন্তু ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যদি পেট আলগে দেয়—তাহলেই তো গেছি, একে আমি পেটুক এবং অজীর্ণরোগী।

জীবনবাবু বলেন,' আরে মশাই, এমন মাছ কলকাতায় পাবেন না, নিন আরও।

'প্রাণ চায়—চক্ষু না চায়—কোনরকমে ভবিষ্যৎ ভেবে লোভ সংবরণ করি—বলবেন না আর।"

হাসেন জীবনবাবু ! এই যে দেখছেন বাচ্চাটা,...দুটো ইলিশ, ধরুন দেড় সের সাতপো দিব্যি মেরে দেবে।'

সাতপো মৎস্যাহারী জীবটির দিকে চেয়ে দেখি—হাত পা জিল জিল করছে, গাংএ জোরে হাওয়া দিলে জলের ধারে কাছে যায় না, যদি ছিটকে পড়ে যায় এই ভয়ে। বেশ একগাল হেসে ছেলেটা বলে ওঠে—

তা আল্লি আল্লার মরজিতে খাতি পারি।"

কোথায় ধরবে পদার্থ টা ঠিক করতে পারি না, মনে হয় ধন্ত তুমি ! ধন্ত তোমার উপর আল্লার ওই মরজি !

খাওয়া দাওয়ার পর লঞ্চের ছাদের সারেংএর ঘরে বিছানা পেতে ছোট খাট একটা ঘুম দেবার চেষ্টা করি। ঘুম আসে না, দুপুরের রোদ বনভূমি নিথর হয়ে লুকিয়ে পড়েছে গাংএর জলে। দূরে—বহু দূরে দেখা যায় নদীর ধারে বনসীমা, যেন আসমানীরংএর একটা শাড়ীর

প্রান্তে আবছা পাড় কে বসিয়ে দিয়েছে। অসীম নির্জ্জনতার মাঝে পড়ে রয়েছি আমরা ক'টি প্রাণী। মোচার খোলার মত দুলছে লঞ্চদুটো।

এই লঞ্চে এর সারেঙ্গ সাহেবও নীচে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, আমাকে তার ঘরের এই অংশটুকু ছেড়ে দিয়ে মিস্ত্রী সাহেব নেমে গেছেন নীচে। বাধা দিতে তিনি বলেন।

না, না, নীচেই বেশ থাকবো, আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

পাশের ছোট লঞ্চে জীবনবাবু গড়াগড়ি দিচ্ছেন, আবার সেই নাসিকাধ্বনি। গাংএর বনের বুকে ওটা কেমন যেন মানুষের অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় জলে জঙ্গলে 'কাৎ হয়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করাটা হয় না, দোলানিতে ব্যাঘাত ঘটে। তাই চিৎ হয়েই শোওয়াটা রেওয়াজ এবং 'চিৎ' হয়ে শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ওই অভ্যাসটি জন্মে যায়।

একটা ইংরাজী গল্পের বই পড়বার চেষ্টা করছি। অখণ্ড অবসর, কোন কাজ নাই, কাজের চিন্তাও নাই। অকূলে ভেসেছি আবার। কখন লঞ্চ নোঙর তুলবে, কখনই বা ক্যানিং যাবে তার ঠিক নাই। যদি আরও মাছ কিছু পাওয়া যায় তার আশাতেই বসে থাকবেন এরা, আমিও দলে ভিড়েছি, দেখা যাক কি হয়। কলকাতার জবান ভুলে গেছি। এলোমেলো চিন্তার জট পাকায় মনে। দেহ মন শুদ্ধ উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে কেদোর চর, বাওয়ালিয়াদের কথাগুলো, বাঘের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা মৃত দেহটা···গর্জনমুখর ঢেউভাঙ্গা সমুদ্র।

বৈকাল হয়ে আসছে। নোঙর উঠলো। দুখানা লঞ্চ চললো আবার নীচের দিকে, জেলেদের সন্ধানে। বাতাস পড়ে গেছে, শান্ত নিস্তরঙ্গ গাংএর বুকে ঢেউ তুলে চলেছে তারা।

বেশ কিছু দূর এসে আমরা জেলেডিঙ্গিগুলোর কাছে হাজির হলাম। ছুটি নৌকা, এক ভাঁটাতে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে, সমুদ্রের মোহানার কাছ বরাবর। দক্ষিণ দিকে চাইলে বহু দূরে···সমুদ্রের মাঝে কালো একটু দ্বীপ দেখা যায়, কেদোর চর। আজ সকালেই তাকে ফেলে এসেছি পিছনে। আর কোন দিন হয়তো ওখানে পৌঁছতে পারবো না; কে জানে বড়দা কি করছেন এখন; ওই খালের ভিতর গভীর বনে এখনও কোন বাওলিয়া সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ঘুরে বেড়ায়। কে গেঁও গাছে কোপ দিয়ে চলেছে চোখ বন্ধ করে, গেঁও আঠার জ্বালা থেকে চোখ বাঁচাতে।

মাছ সামান্য কিছু ধরেছে ইতিমধ্যে, সেগুলো তুলে নিয়ে একখানা লঞ্চ ছাড়বে ক্যানিংএর দিকে। মিস্ত্রী ইঞ্জিন খুলে কি ঠোকাঠুকি করছে।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, বিস্তীর্ণ গাংএর বুকে সূর্য্যের রক্তাভা ঝিকিমিকি তোলে, দূরে কেওড়াগুল্মের অজানা বনের অন্তরালে সূর্য্য নেমে গেল। স্তব্ধ হয়ে আসে চারিদিক। কাকের কর্কশ ডাক এখানে নাই। কয়েকখানা জেলেডিঙ্গি লঞ্চের সঙ্গে বেঁধে বসে আছে। কোলাহল থেমে গেছে ওদের। রাত্রির প্রগাঢ় স্তব্ধতা—নিবিড় তমসা ওদের শিরা উপশিরায় এনেছে কি এক আতঙ্কের ছায়া। ঢেউএর দোলায় দুলছে নৌকা গুলো। আনন্দ কোলাহল সব মুছে গেছে!

লঞ্চের ছাদের উপর ছোট্ট আড়াই হাত পাটি পেতে নামাজ পড়ছে সারেং। স্তব্ধ হয়ে আমি রক্তরাঙ্গা পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে বসে আছি। আমার জীবনে এ একটি স্মরণীয় স্বর্ণসন্ধ্যা। দিনের সব ক্লান্ত কোলাহল থেমে গেছে, আসছে অন্তহীন অন্ধকার; কেঁদে ফিরে গেল সব আশা—সব আলো! অবগুণ্ঠন নেমে এল ধরিত্রীর মুখ ঢেকে।

কে জানে, জীবন ও মৃত্যুর পরম সন্ধিক্ষণ ও বোধ হয় এমনি প্রগাঢ় প্রশান্তি ঢাকা একটি মহামুহূর্ত্ত!

এত রং—এত শান্তি—এত আলো, এত অন্ধকার কোনখান থেকে আসে; কে নিশানা দেখিয়ে পাঠায় জানিনা···অবিশ্বাসী মানুষের মনের রুদ্ধ কপাটে আঘাতের পর আঘাত হেনে সচেতন করে দিতে চায় কোন সুদূরের আনন্দ পিয়াসী মন—অবাক হয়ে দুচোখ মেলে চেয়ে সে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, পাওয়ার প্রসাদে তার শূন্য অঞ্জলিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

"পশ্য দেবস্য কাব্যং
ন মমার না জীবতি।"

কোন দেবতার রচিত এ এক মহাকাব্য; আকাশ বাতাস—অন্তহীন নদীর বুকে কি এক মহা সঙ্গীতের আলাপন; একাব্যের মৃত্যু নাই—ক্ষয় নাই।

চুপ করে বসে আছি, সারেং এসে পাশে দাঁড়াল। কি দেখছেন বাবু?

"এখানে এলে মানুষ সব ভুলে যায়।"

হাসে সারেং। ঘন দাড়ির আড়ালে মুখে ফুটে ওঠে মধুর একটু হাসি, —"সত্যি! ঘরে ফিরে গিয়ে তাই হয়তো মন বসে না। এই দরিয়ায় ফিরে এসে আসমানের দিকে চেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। পূর্বপুরুষ আমাদের দরবেশ দিয়ানা ছিল, তাই বোধ হয় বাইরের ও টান আমার রক্তে মিশে গেছে।

কথায় কথায় বার হ'ল—আদি বাস ছিল সারেংএর পাকিস্থানে। এখন এখানকারই বাসিন্দা। ছেলেবেলা থেকে ও মানুষ হয়েছে ঘুটিয়ারী শরিফের কাছে, এ মাটির মায়া কাটিয়ে যেতে পারেনি। বলে চলেছে সে —"মানুষকে মানুষের চাই বাবু; আমাদের শাস্ত্রে বলে—আল্লার দরবারে পৌঁছতে গেলে 'মারফতের' দরকার হয়। সেই 'মারফৎ' যে কে—তার তল্লাস মানুষ সহজে পায় না। মানুষের সামনে প্রতিটি মানুষের মাঝে তার খোঁজ করতে হয়। তাই ঘর সংসার করেছি; সমাজে বাস করি, নাহলে ওই আসমানের রংসায়রের দিকে চেয়ে চেয়েই দিন কাটিয়ে দিতাম।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকি, এ যে সুফীবাদের তত্ত্ব কথা। এইখানে—এই সুন্দরবনের বুকে অকূল গাংএ ভাসতে ভাসতে এই কথা শুনবো এ কল্পনাও করিনি। অন্ধকারে চুপ করে চেয়ে আছে সারেং দূরের অন্ধকার-মাখা দিগন্তের পানে।

···লঞ্চ ছাড়বার সময় হয়েছে। জীবনবাবুর ছোট লঞ্চ থেকে আমার ব্যাগ, বিছানা তুলে দিয়ে, গেল দোতালায়;—চা ও এসে হাজির, সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা।

জীবনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম। তিনি বলে ওঠেন, আপনার জন্য ক'টা ভালো মাছ আলাদা করে দিয়েছি। নিয়ে যাবেন।

বলে ফেলি—'একি ব্রাহ্মণ সন্তানকে ভোজন—ছাঁদা মায় দক্ষিণা পর্য্যন্ত মিটিয়ে দিচ্ছেন।

হাসতে থাকেন তিনি—না, না, এত দূরের মাছ। তবু বাড়ীতে যাক কিছু।

লঞ্চ ষ্টার্ট দিয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা এগিয়ে চললাম; আবার সেই অসীম নিঃসঙ্গতা। চারিদিকে কোন প্রাণের নিশানা নেই। তার মাঝ দিয়ে চলেছে আমাদের লঞ্চ। পিছনে একজষ্ট পাইপ থেকে গরম ধোঁয়া বার হচ্ছে, পর্দা ফেলিনি, ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাত মুখে হিম লাগায়, বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছি।

নৌকায় যাবার সময় এ সৌন্দর্য্য দেখতে পাইনি; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে গেছি। প্রথম দিকে থাকতো অন্ধকার; তাছাড়া মনের মাঝে কেমন একটা আবছা আতঙ্ক বাসা বেঁধে ছিল, সেই দুশ্চিন্তা পদে পদে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

চাঁদ উঠেছে; এ দৃশ্য দেখবার জন্য কেউ বসে নাই। কেউ আসে না চাঁদনীরাতে সুন্দরবনের বুকে আলোছায়ার জালবোনা দেখতে, কেউ নাই যে কাব্য রচনা করবে এই কল্লোলমুখর জলধারার বুকে চাঁদের আলোর গোপন অভিসার নিয়ে। সে বনভূমি একান্তে নিজেদের এই লীলাভিসারের বাসর সজ্জা পাতে,…হিমকনা চাঁদের কপালে চন্দন লেখা এঁকে দেয়, বাসর জাগাতে আসে সলাজ-চাইনি-ভরা হাজারো তারার দল।

মানুষের সেখানে কোন ঠাঁই নাই। রাতের পর রাত, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরান্তে আসে বৎসর। এরাত্রি মানুষ ঘুমের নিশানা দিয়ে ঢেকে রাখে না, সুন্দরবনে আজও জাগে কুমারী রাত্রি।

সার্চ-লাইটের আলো মাঝে মাঝে যেন ওর ছন্দ পতন ঘটায়। বিশ্রী লাগে ইঞ্জিনের ওই আওয়াজ। ওদের কোন মর্মরই কানে এলো না

"খেয়ে নিন বাবু, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে খানা"

নীচে নেমে গেলাম। চারিদিকে পর্দা ফেলা, ইঞ্জিনের গরমে জায়গাটা লোভনীয় হয়ে উঠেছে।…রহমান এনে দিল ভাত, ইলিশমাছ ভাজা, আর পালংশাক দিয়ে ইলিশমাছের ঝোল। লাল টকটকে ঝোলের রংটা দেখে রসুইকরের আদিনিবাস এবং পেশা কোনটাই বুঝতে কষ্ট হয় না।

পালংশাক দিয়ে ইলিশমাছের ঝোল! দুটো জিনিষ আলাদা আলাদা খেয়েছি—কিন্তু একত্র করে মেকানিক্যাল মিক্সচার, না কেমিক্যাল কমপাউণ্ড হয় তা জানতাম না। মুখে দিয়ে মন্দ লাগলো না, তবে লঙ্কার প্রাচুর্য্য বেশী থাকার জন্য একটু হুস্ হাস্ করতে হল।

উপরে এসে বেশ আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে বসলাম। রাত্রি দুটো তিনটে নাগাৎ ক্যানিং পৌঁছবো। সকালের ট্রেণেই কলকাতায় গিয়ে হাজির হবো। ঘর-পালানী এবার ঘরমুখো হয়েছে।

…সুরেং সিগারেটটা নিয়ে সন্তর্পণে দেশলাই জ্বাললো। আমার দিকে চেয়ে হাসে, "আমার আগুনকে বড় ভয়, দেখ্ছেন তো।

একমুখ চাপ দাড়িগুলো দেখায়।

…"রাতের বেলায় নামবেন না, লঞ্চেই থাকবেন। সকালে খালাসীরা কেউ তুলে দিয়ে আসবে ট্রেনে।"

…গল্প করতে করতে ঘুম নেমে আসে চোখের পাতায়। কলিকাতায় পৌঁছে গেছি।…বাড়ীর বাইরের রাস্তায় ছেলের দল টেনিসবল পিটছে, ঠাকুর বেপাত্তা বাবুকে দেখে মুখ তুলে চাইছে। রাণু মুখ ভার করে আছে। তার সম্পূর্ণ অমতেই চলে এসেছিলাম। এইবার হাতে পেয়ে শোধ তুলবেন আর কি। মুখ ফিরিয়ে আছে, একটু কঠিন কণ্ঠেই বলে—আরও দিনকতক থেকে আসতে পারলে না, শরীরটা সারতো।

জিজ্ঞাসা করলে: মুখ ফিরিয়ে জবাব দিয়ে কর্তব্য সারে। অনুভব করতে পারি এতসহজে ব্রাহ্মণীর মান ভাঙ্গবে না। 'গঙ্গাস্নান করে এসো—অনেক অখাদ্যকুখাদ্য খেয়ে এসেছো।

সাগর স্নান করেও যার পাপ ঘুচলো না, গঙ্গাস্নান করলেই যেন তার পাপ সব ধুয়ে মুছে যাবে। বোঝাবার ক্ষমতা নাই। মন রাখতে বলি "তাই করবো।"

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছাদের উপর সারেং রহমান আরও একজন বেশ উত্তেজনার সুরেই কি বলছে নিজেদের মধ্যে। উঠে পড়লাম। ক্যানিং বোধহয় পৌঁছে গেছি।

—"ক্যানিং এসে গেছে?"

—"ইয়া আল্লা!" দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে ডাকটা বার হয়ে আসে রহমানের মুখ থেকে।

ব্যাপারটা বুঝতে পারি, গভীর রাত্রে পথ হারিয়ে কোথায় এ গাং সে গাংএ ঘুরে বেড়াচ্ছি। পথের কোন হদিশ নাই, আকাশের তারাও কোন কিছু নিশানা দিতে পারছে না। কোথায় যাচ্ছি কোথায় আছি এখন সবই খোদার মালুম।

রাত্রি দুটো বাজে, এই সময় ক্যানিং পৌঁছে নিরাপদে একটু ঘুমিয়ে নিতাম, না কোথা এখনও সেই বনের মধ্যেই পড়ে রইলাম। এ অঞ্চলটা বোধহয় আমলামেথার কাছাকাছি। অর্থাৎ বেশ কুখ্যাত অঞ্চল। সারেঙ্গ বলে—যতক্ষণ আমার ইঞ্জিন চালু আছে ততক্ষণ কোন ভয় নাই বাবু, তবে কোথায় যাচ্ছি—ঠাওর করতে পারছি না।

বাঁ দিককার একটা গাংএ লঞ্চ ঢুকলো—এই দিকে গেলে বোধহয় বিদ্যানদীতে পড়তে পারবো। আর ঘুম আসে না, এতক্ষণে অনুভব করি—লঞ্চে মাত্র ছ'টি প্রাণী, আজ নিষ্ঠুর বিধাতার বিধানে অজানায় ভেসে বেড়াচ্ছি। খালের পাশে সারিবন্দী গাছ, কে যেন মাপজোপ করে বাগান করে রেখেছে, জোয়ালো আলোয় ঝলকে ওঠে অন্ধকার বনতল। দেখতে পাই—একটা ডোরাকাটা কি জানোয়ার আলো পড়তেই লাফ দিয়ে ভিতরে চলে গেল।

রাত্রির প্রহর জাগছি। "এ খাঁড়ি তো নয়, এদিকে কেন হবে? ডাইনে ফেলে এসেছি বোধহয়।"

লঞ্চ আবার ডাইনে ফিরলো পথের সন্ধানে। হঠাৎ দূরে দেখা যায় দুখানা নৌকা। সার্চলাইটের আলোয় দেখতে পাই ওরা দাঁড়বেয়ে চলেছে প্রাণপণে তীরের দিকে। পথের সন্ধান হয়তো ওরা দিতে পারে। চল ওই দিক পানে।

ওদের দাঁড় পড়ছে আরও জোরে। বেশ বুঝতে পারি ওরা যেন এড়িয়ে চলেছে আমাদিগকে; আমাদেরও যে দরকার ওদিকে। সারেং বলে ওঠে—ওদের ব্যাপার দেখে ভাল মনে হচ্ছে না বাবু, পালাবে কেন ওরা?···ভেবেছে আমরা বোধহয় ওদিকে তাড়া করেছি। কে জানে বোধহয় 'ব্ল্যাকের' 'নৌকা।

ব্ল্যাক। যুদ্ধ-ধস্ত ব্যবসায়ীদের বুদ্ধি। এমন 'ব্ল্যাক' কারবার পত্তন করলে যে তার ছোঁয়া গিয়ে পৌঁচেছে এই গহন বনের মধ্যেও, অন্ধকারের রাজত্ব এখানে—সুতরাং যতকিছু 'ব্ল্যাক' এইখানেই এসে জমা হয়েছে।

লঞ্চ গিয়ে ওদের গায়ে ভিড়েছে। থেমেগেছে নৌকা দুটো, কেউ আর ছই থেকে বাইরে আসে না।

—"এ্যাই মাঝি।" কোন সাড়া নাই।

রহমান, সারেং আমি বেরুলাম ছাতের উপর।

"কোন ভয় নাই, বেরিয়ে এস। এটা কোন গাং?"

সার্চলাইটের আভায় দেখি ছই থেকে উঁকি মারছে একখানা কালো মুখ, মাথায় একরাশ চুল জটার মত পাকানো, সারা মুখখানাতে একটা বীভৎসতা।

—"হ্যাম্লিলটনগঞ্জ যাবো কোন গাং ধরে?"

লোকটা একবার বলে ডাইনে—কখনও বলে বাঁয়ে গিয়ে ডাইনে, কখনও বা বলে সোজা। তারপরই মুখটা ঢুকিয়ে নিল কচ্ছপের মত খোলের ভিতর।

—"এ্যাই, বেরিয়ে এসো। কে তোমরা? বেরিয়ে এসো বলছি।" রহমান চীৎকার করে: বেরিয়ে আয়, নাহলে তুললাম লঞ্চ তোদের নৌকার ঘাড়ে।

হাঁকডাকে বার হয়ে এল সে। আবার আবোল তাবোল খানিকটা বলল গড়গড় করে—সেই ডান হাত, আর বাঁ হাতের গোলমাল ঠিকই আছে।

—"ডান হাত কোনটা তোমার?"

লোকটা অবশ্য ডান হাত ঠিকই দেখাল।

আন্দাজেই চললো লঞ্চ। বেশ খানিকক্ষণ চলার পরও কোন কিছুই হদিস মিললো না। সারেঙ বলে···নোঙর ফেল, সারারাত কোথায় ঘুরে বেড়াবো। কাল সকালে দেখা যাবে পথ কোনদিকে।

রহমান বলে ওঠে। ইঞ্জিন বন্ধ করলে—আর স্টার্ট নেবে কিনা জানিনা, তখন?

এতক্ষণে বুঝতে পারি আরও কিনা আছে কপালে। কিন্তু কাঁহাতক ধোয়া যায়? কালকের কথা কাল ভাবা যাবে।

দূরে—বহুদূরে কোথায় শোনা যায় রাত্রির অন্ধকারে কুকুরের ডাক। একটু আশ্বস্ত হই, যতদূরেই হোক মানুষের বসতি আছে, না হলে কুকুর আসবে কোত্থেকে। কানপেতে শুনি—হ্যাঁ কুকুরের ডাকই। রাতের অন্ধকারে নোঙর করল লঞ্চ মাঝ নদীতে। রাত্রি তখন তিনটে। ওদের কারুর খাওয়া হয়নি। ছাদের ঘরে পড়ে পড়ে ভাবছি আমি একা।

তবু ঘুম দিব্যি এসেছিল। এতদিন এই বিপদ দুশ্চিন্তার মাঝে বাস করে—কিছুটা যেন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি ওই জীবনে। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি সকাল হয়ে গেছে। বেশ চাওড়া এক নাম-না-জানা গাংএর মধ্যে ভাসছে আমাদের লঞ্চ। এক পাশে আদিম বনানী, মোরগ ডাকছে সেই দিক থেকে, অন্য দিকে গ্রামের কিছু দেখা যায় না, তবে দূরে দু' একটা ঘরের চিহ্ন চোখে পড়ে।

কাল রাত্রে পৌঁছাবার কথা ক্যানিং, এই লঞ্চ থেকে খাবার জল, চা—চিনি সব কিছুই তুলে দেওয়া হয়েছে যেটা রইল তাতে, সুতরাং আমাদের অবস্থা অন্তভক্ষ ধনুর্গুণঃ। জল সামান্য পড়ে আছে—তাও ময়লাভর্ত্তি।

নোনা জলেই মুখ ধুলাম। জিব জ্বালা করে ওঠে, বিশ্রী স্বাদ, মুখ থেকে তার বিস্বাদ ভাব মিলোতেই চায় না।···সুপুরি চিবিয়ে—সিগারেট টেনে কোন রকমে ভুলবার চেষ্টা করি।

ওরাও উঠেছে নীচে। রহমান যা ভেবেছিল, হয়েছেও ঠিক তাই। ইঞ্জিনও ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু ঘুম তার আর ভাঙ্গছে না।

ইঞ্জিন খুলতে সুরু করেছে ওরা, রহমান রেঞ্জ ঠুকছে আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—ইয়া-আল্লা।

ওর এই ডাক কেন জানি না আতঙ্কই আনে মনে। খাবার দাবার কিছুই নাই, মায় জলটুকু পর্য্যন্ত। লোকালয় অনেক দূরে। লঞ্চ যদি বিকল হয়—কি করে তীরে পৌঁছবো জানি না। নৌকা নয় যে বৈঠা-টেনে নিয়ে যাবে। তারপর এত মাছ রয়েছে লঞ্চে। সে গুলোও পচে উঠবে?

যা অদৃষ্টে থাকে—থাকুক। মিছে ভেবে আর কি হবে।

খানিকক্ষণ পর আমিও চললাম ওদের কাছে। ঠেকাঠুকি করছে তারা, সারেং চুপ করে বসে আছে, বলে ওঠে—'বড্ড গোলমাল করছে ইঞ্জিনটা। দেরী হয়ে গেল আপনার পৌঁছুতে।

'আমার কি এমন কাজ,' ক্ষতি হচ্ছে বরং আপনাদেরই"।

"কি করা যাবে বলুন। পথ হারিয়েই তো গোল বাধলো।"

মা কালী, দুর্গা-সব ঠাকুরকেই যে ডাকছি না, এ কথা বলা যায় না। ইঞ্জিন ফিট হয়ে গেছে, ব্যাটারী লাগিয়ে স্টার্ট দিতে যাচ্ছে রহমান!··· সমস্ত কামনা এক করে চেয়ে আছি নীরব ইঞ্জিনটার দিকে,···নিরাশ করিস নি বাবা। এত সাধ্য-সাধনা করছে এতগুলো লোক দরিয়ায় পড়ে—বেইমান নয় দেখলাম। গর্জন করে উঠলো ইঞ্জিন,···ছোকরা খালাসী দুটো লাফিয়ে উঠে ছুটলো 'গিরাপি (নোঙর) তুলতে, যেন নোঙর এখনই না তুললে ইঞ্জিন রাগ করে বন্ধ হয়ে যাবে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।···লঞ্চ চলছে আবার! আধঘণ্টা খানেক এসে সারেঙের মুখে হাসি ফোটে।

"উঃ কোথায় এসেছি রে! এ যে হ্যামিলটনগঞ্জের খাল!"

ঘুর পথে এসে পড়েছি অনেকখানি।

বনসীমা মিলিয়ে গেল বাঁকের মুখে, পিছনে পড়ে রইল বনভূমি, আমরা প্রবেশ করলাম লোকালয়ে। মাঝে মাঝে দেখা যায় ভেড়ির ওপাশে ছোট ছোট ঘর।

হ্যামিলটন সাহেবের এষ্টেট আবাদ অঞ্চলের মধ্যে বেশ সমৃদ্ধ এলাকা। পাকা বাড়ী, ভালো রাস্তা, গেষ্ট হাউস, স্কুল সবই আছে। সন্দেশখালির সার্কেল অফিসারও আমাকে ওখানে উঠবার জন্য পরিচয় পত্র দিতে চেয়েছিলেন; দেখে যাবার ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু আর হোল না।

সোজা নীচের খাল দিয়ে এসে বিদ্যানদীতে পড়লাম। এই সেই বিদ্যানদী—যাকে আমরা সারা রাত ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি বৃথাই।... কিছুদূর এসেই পড়ল 'বাসন্তী'।

চা—জল-খাবার কিছুই জোটেনি। এক প্যাকেট বিস্কুট পড়েছিল সঙ্গে—তার দু'একখানা চিবুচ্ছি। কোথাও থামতে আর ইচ্ছে নাই। থামবো একেবারে ক্যানিং গিয়ে।

নদীর আর সে সংহার মূর্তি নাই, পুরন্দরের মুখে এসে দেখলাম মাতলার মূর্তি। বেশ প্রশস্ত, এবং গম্ভীর।...বর্ষাকালে এই পুরন্দরের মুখ একটা ভয়াবহ জায়গা। অনেক নৌকা তলিয়েছে ওখানে। এখন শীতের সকাল, আয়নার মত স্থির হয়ে আছে গাং।...লঞ্চ তুফান তুলে এগিয়ে চলেছে। ক্যানিং আসতে আর দেরী নাই। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ধানকলের চিমনী, ক্যানিংএর পাকা বাড়ী দু'একটা।

"খেয়ে দেয়ে যাবেন!"

ক্যানিংএর জেঠিতে লঞ্চ ভিড়েছে। সারেং, রহমান ওরা এসে দাঁড়িয়েছে।

"ট্রেণের দেরী নাই, এই ট্রেণেই যাবো।"

বিদায় দিল ওরা আমাকে। চেনে না, জানে না আমাকে, ভবিষ্যতে কোন দিন দেখা হবার আশাও নাই। তবুও পথ-চলতি একটি মানুষকে যে আতিথ্য প্রীতি ভালবাসা দেখিয়েছে ওরা—তা আমি কোন দিনই ভুলবো না। সাধারণ জীবনের সাধারণ মানুষের দেওয়া এই ভালবাসা কুড়িয়ে ধন্য হয়েছি আমি। মানুষের এই সত্যরূপটিকে প্রকৃতির নিষ্ঠুর ভীষণতার মাঝেও হারাইনি, এ আমার এক অপূর্ব স্মৃতি।

তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা—আমার দিকে চেয়ে। উঠে এলাম সিঁড়ি দিয়ে ঘাটের দিকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রাণ-কণ্ঠাগত হয়ে রয়েছে।

"সরস্বতী পূজোর চাঁদাটা?"

মুখ তুলে দেখি কয়েকটি ছেলে—আধ বুড়োর দল লঞ্চের ঘাটে টিকিট কলেক্টরের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে রসিদ বই। যেন পাওনাটা আদায় করতে এসেছে। কথা না বলে চলে এলাম।

কানে এ'ল বেশ সরস একটা আপ্যায়ন। সরস্বতীর বরপুত্রের দল বিশুদ্ধ বাংলায় আমার উদ্দেশ্যেই 'স্বস্তিবচন প্রয়োগ করছে। সভ্যজগতের প্রথম ধাপে এসে পৌঁচেছি এটা মনে হল। সামনেই গুরুদেবের খাবারের দোকান, মিষ্টি ঠাণ্ডা জল পুরি আর রসগোল্লা, তিনি সপ্তাহপর জিবের তার ফিরে এল। জল! বোধ হয় প্রাণচারেক শেষ করি কয়েক নিশ্বাসে।

কলকাতায় ফিরে এসেছি। সুন্দরবনের স্মৃতি কথা লিখতে বসে আজ চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই দিনগুলো। সেদিন কেটেছিল কত আতঙ্ক, বিস্ময়, রোমাঞ্চের মধ্যে, আজ তা স্মৃতির পর্য্যায়ে এসে পড়েছে!

বেলেঘাটার খাল ধারে একদিন দেখি বড়দার নৌকা—

"সেলামবাবু, কেমন আছেন?"

কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে চলেছি, ডাক শুনে দেখি সুরমান বাওলিয়া, কাঠের নৌকা নিয়ে এসেছে; পিছনে রয়েছে ইসুফ মাঝি। এই পরিবেশে অত্যন্ত বেমানান ঠেকে; সুন্দরবনের গহনে ইসুফের প্রকৃত পরিচয় দেখেছিলাম সেই দিন, কাঁধে রক্তাক্ত মৃতদেহটা, বাঘের মুখ থেকে শিকার ছাড়িয়ে আনছে, দুচোখে কি এক জ্বালা।...মনে পড়ে বিষণ্ণ সন্ধ্যায় খালের বুকে নৌকায় টেমির আলোয় সুরমান পড়তো বনবিবির কেচ্ছা, সুরকরে বিচিত্র এক সুরে। ওর চারিপাশে ঘিরে বসেছে বাওলিয়ার দল। গেঁও কাঠের দেরখোয় বসানো সেই আলো, বাইরে হরিণের ডাকভরা অন্ধকার, নদীর কল্লোলমুখর বাতাস। ওরা সেই জগতের বাসিন্দা, বিদ্যুতের আলো—ছড়ান রাস্তায় ওরা বেমানান।

সেই শুভ্রতা কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি। জিনপরীর গল্প, সমুদ্রের চরে বাটামের বাসা-খোঁজা সুন্দরী কোটরে মধুর চাক—সব আজ গল্প হয়ে গেছে। কইবার মত কোন কথাও আমার নাই।

ওরা অনেক দূরে সরে গেছে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে স্তব্ধ গম্ভীর রহস্য ঢাকা বনানী, সীমাহীন নদী। কবে যেন সেখানে গিয়েছিলাম—সে এক বিস্মৃতির আঁধারঘেরা স্মৃতির আকাশে একটি উজ্জ্বল তারকা।



নবীনচন্দ্রের একটি রচনা

শ্রীদীপককুমার সেন

[পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত নবীনচন্দ্রের কতকগুলি মূল্যবান্ রচনা নির্দ্দেশহীনভাবে আজও সেকালের বাংলা-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। আমরা এখানে 'মহাকবি নবীনচন্দ্রের এতাদৃশ একটি রচনার নির্দ্দেশ ও পরিচয় দিলাম :—

রচনাটির নাম 'কর্ণেল অলকট্।' কবিতা। নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এটি শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'নব্য-ভারতে' (ফাল্গুন, ১৩১৫, পৃঃ ৫৬৯) প্রকাশিত হয়। কবিতাটির সংগ্রহকার—শ্রীআশুতোষ দেব। শীর্ষনামের পর কবিতাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে,—"মহামতি কর্ণেল অলকট্ মহোদয়ের ইং ১৮৮৭ সালে নোয়াখালি নগরে আগমন উপলক্ষে কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের রচিত আবাহন।১" নিম্নে ১ ফুটনোটে লিখিত,—"তমলুকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট স্বর্গীয় কবিবরের স্বহস্ত-লিখিত উক্ত কবিতাটি এখনও বর্ত্তমান আছে। ইং ১৮৮৭ সালে যখন কর্ণেল অলকট্ নোয়াখালিতে পদার্পণ করেন, তখন যোগেন বাবু ও স্বর্গীয় কবিবর নোয়াখালিতে ছিলেন।—সংগ্রহকার।"

'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' (নবীনচন্দ্র সেন—৪১) গ্রন্থে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিতাটিকে 'নব্যভারতে' প্রকাশের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, "কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত রচনা" ব'লে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বোধ করি, এঁরা কেউই জানতেন না যে, প্রকৃতপক্ষে এই কবিতাটিই কবির মৃত্যুর বিশ-বছর পূর্ব্বে শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ বাংলা-সাময়িক-পত্র 'নবজীবনে' (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫, পৃঃ ৭০৪) প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথমত 'নবজীবনে' ও পরে 'নব্যভারতে' প্রকাশিত কবিতাটিতে শব্দ ও ছেদগত বেশ কিছু পাঠভেদ লক্ষিত হয়। অবশ্য তাতে ভাবের দিক্ থেকে কবিতাটির বিশেষ অঙ্গহানি হয়নি। বিশেষ পার্থক্যের মধ্যে—'নবজীবনে' কবিতাটির স্তবক ২টি, কিন্তু 'নব্যভারতে' ৩টি। 'নবজীবনে' ১৪ পংক্তির পর ২য় স্তবক আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু 'নব্যভারতে' ৮ পংক্তির পর ২য় স্তবক ও ১৯ পংক্তির পর ৩য় স্তবক আরম্ভ। 'নব্যভারতে' ২য় স্তবকের শেষে "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই পংক্তিটি 'নবজীবনে' আদৌ নেই। তাছাড়া 'নব্যভারতে' কবিতাটির দু'টি ফুটনোট পাওয়া যায়, যা 'নবজীবনে' পাওয়া যায় না। প্রথমটি, 'মার্কিণ'* (৪র্থ পংক্তির ১ম শব্দ) বলতে America-কে ও অপরটি, 'শান্তি-সিন্ধু' + (৯ম পংক্তির ১ম শব্দ) বলতে Pacific Ocean-কেই বুঝান হয়েছে।

কবিতা দু'টির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের সাধ্য মত চেষ্টা আমরা নিম্নে করলাম :—]

১

সুনীল আকাশে শ্বেত মেঘ মত,
নীল পারাবারে মাতা শ্বেতাঙ্গিনী,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা, গৌরব-গর্ব্বিণী,
মার্কিনের * অঙ্কে বসি ধ্যান রত,
হে শ্বেতর্ষি! তুমি দেখিলে কি, হায়!
আমাদের মাতা পতিতা ভারত
পাশ্চাত্য-সভ্যতা-দর্শন ধূ [ধুঁ]য়ায়
যাইছে ভাসিয়া নিপাতের পথ!

২

শান্তি-সিন্ধু + তীরে শ্বেতাঙ্গ ঈশান
বিষাণ ঝঙ্কারে কহিলে[লি] সম্ভাষি,—
"হায় মা! ফিরিয়া দেখ রাশি রাশি,
"তারাময় তব অতীত বিমান!
"যোগীন্দ্র, মহাত্মা, অমরেন্দ্রগণ
"হিমাদ্রি শেখরে ওই অগণন!
"দাঁড়াইয়া ওই নর-নারায়ণ,—
"পাঞ্চজন্য রবে পুরি[প্লাবি]য়া গগন,
"কহিছে—'ত্যজিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম, নর!
লও একমাত্র আমার শরণ!'
সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

৩

ফিরিলা জননী; দেখিলা চাহিয়া
নক্ষত্র-খচিত অতীত তাঁহার!
তব কণ্ঠ তাহে উঠিছে ভাসিয়া
ডুবা'য়ে পাশ্চাত্য ঝিল্লির ঝঙ্কার।
মৃতা ভারতের দিলে তুমি প্রাণ,
লও পাদ্য-অর্ঘ্য, ঋষি আয়ুষ্মান্!

বানপ্রস্থ

(নাটিকা)

শ্রীকমল মৈত্র

একটি সাধারণ ঘর। ঘরের এককোণে একটি তক্তপোষ, অপর কোণে একটি টেবিল ও চেয়ার। দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলছে, সার্ট।

দেওয়ালের দিকে মুখ রেখে পরম সুখে ঘুমুচ্ছেন এক ভদ্রলোক। তাঁর নাক ডাকার শব্দ বেশ শোনা যাচ্ছে, বাড়ীর ভিতর থেকে নারী কণ্ঠের ডাক এল—'শুনছ।' ভদ্রলোকের নাক ডাকা বন্ধ হল। পরমুহূর্ত্তেই আবার নাক ডাকা সুরু হ'ল

[নেপথ্যে] শুনছ···

প্রবেশ করলেন একজন প্রৌঢ়া। পরিধানে ময়লা কালো পাড়ের শাড়ী। স্থানে স্থানে মশলার দাগ। চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ।

মহিলা। বলি—শুনছ!

নিদ্রিত স্বামীকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন

মহিলা। ওমা! তাই বলি! এমন চিল চীৎকার করছি—কানে যাচ্ছে না কেন? (নিকটে গিয়ে) বলি —শুনতে পাচ্ছ?

উত্তরে শুধু নাক ডাকার আওয়াজ শোনা গেল

মহিলা। নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে দেখনা! (গায়ে ঠেলা মারলেন) বলি কানের মাথা খেয়েছ? শুনছ—(জোরে ঠেলা) বলি—শুনতে পাচ্ছ!

ভদ্রলোক। হুঁ!

মহিলা। হুঁ—কি গো! কত বেলা হয়েছে তার খেয়াল আছে?

ভদ্রলোক। না!

মহিলা। নটা বাজতে দেরী নেই—তা জানো?

ভদ্রলোক। না। তবে এটুকু জানি যে আজ রবিবার। আজ অপিস নেই—আর নেই শূয়োর-খেগো সাহেবের দাঁত-খিঁচুনি!

মহিলা। তাবলে সংসারের অন্য কাজ থাকতে নেই বুঝি?

ভদ্রলোক। সাত সকালে কাজের ফিরিস্তি না দিয়ে বেশ কড়া করে এক কাপ চা নিয়ে এসো! বেড টী—বুঝেছ!

ফুৎ করে বালিশটি আঁকড়ে আবার শুলেন

মহিলা। আঃ আমার পোড়া কপাল! সাত সকাল থেকে চেঁচিয়ে মরছি কেন তাহলে? চিনি যে—

ভদ্রলোক। নেই? বলি বিয়ের সময় তোমার বাবা মা দুটি কথাই বুঝি শিখিয়েছিলেন—নেই আর আনো!

মহিলা। আমার বাবা মার সংসারে অমন নেই নেই বলতে হয় না—

ভদ্রলোক। দেখ গিন্নী! এই সকালে মেজাজটা খারাপ করে দিওনা! বলি চা পাব না, সংসারের কেচ্ছা শুনব তোমার কাছে—

মহিলা। খপ্ করে চিনিটা এনে দাও। আমি জল ফুটিয়ে রাখছি—

ভদ্রলোক। কেন তোমার নবাব-পুত্তর একদিন আনতে পারে না?

মহিলা। তার সকালে কি কাজ আছে বলছিল।

ভদ্রলোক। কাজ মানেই তো স্টুডিয়োর ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে ফিল্মষ্টার হবার স্বপ্ন দেখা! মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছে—বুঝেছ? (চৌকি থেকে নেমে) থলে টলে দেবে নাকি? উঃ ঝকমারির সংসার!

মহিলা ভিতরে চলে গেলেন। ভদ্রলোক ফতুয়া গায়ে দিলেন। বালিশের তলা থেকে পয়সা বার করলেন। ব্যাগ হাতে একটি মেয়ে প্রবেশ করল। সাধারণ শাড়ী একটু ঘুরিয়ে ফ্যাশন করে পরেছে। কাঁধের দুই পাশে বিনুনী ঝুলছে। বেশ আহ্লাদী গোছের হাসি মুখে লেগে রয়েছে

ভদ্রলোক। এনেছিস? দে!

ব্যাগ নিয়ে অগ্রসর হলেন

মেয়ে। বাবা!

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন

ভদ্রলোক। না না, আমি আর অন্য কিছু আনতে পারব না।

মেয়ে। (এগিয়ে গিয়ে) একটা টাকা দাওনা বাবা!

ভদ্রলোক। টাকা! কেন?

মেয়ে। 'শতাব্দীর অভিশাপ' দেখতে যাব।

ভদ্রলোক। ওঃ. সিনেমায় যাবি?

মেয়ে। হ্যাঁ বাবা।

ভদ্রলোক। সিনেমা দেখা বুঝি এখনো কনট্রোল হয়নি?

মেয়ে। (হেসে) কনট্রোল হতে যাবে কোন দুঃখে!

ভদ্রলোক। যাকে তাকে দেখতে দেয়? মানে যাদের বাপের হ্যাণ্ড টু মাউথ অবস্থা—তাদের ছেলে-মেয়েদেরও।

মেয়ে। পয়সা দিয়ে টিকেট কিনলেই—

মেয়ের মার দ্রুত প্রবেশ

মহিলা। এখনও গিয়ে উঠতে পারলে না? জল যে ফুটে—

ভদ্রলোক। একটা ঠিক করো। চা না সিনেমা?

মহিলা। তার মানে?

ভদ্রলোক। তোমার কন্যার দাবী একটাকা! তাকে টাকা দিলে চিনি আনা হয় না—

মহিলা। তোর আবার এক্ষুণি টাকার দরকার পড়ল কেন?

ভদ্র। 'সংসারের অভিশাপ'

মেয়ে। না না বাবা—শতাব্দীর অভিশাপ—

মহিলা। সে আবার কি?

ভদ্র। সিনেমা—

মহিলা। তুমি আগে চিনি এনে দাও (মেয়েকে) তুই পরে যাস!

ভদ্রলোক চলে গেলেন

আচ্ছা তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কবে হবে বলত? দেখছিস—মানুষটা এখনো চোখে মুখে জল দেয়নি—এক কাপ চা পর্য্যন্ত খায়নি। এখুনি তোর পয়সা চাওয়ার ধুম পড়ল?

মেয়ে। বা-রে! তাহলে কখন চাইবো? অন্য দিন তো অপিস! অপিসে যাবার আগে চাওয়া যাবে না। অপিস থেকে তেতে পুড়ে এলে চাওয়া উচিত নয়।

মহিলা। সিনেমা না গেলেই হয়—তাহলে আর চাইতে হয় না।

রাগে দ্রুত পা ফেলে চলে গেলেন

মেয়ে। (ভেংচি কেটে) সিনেমা না গেলেই হয়। তাহলে না খেলেও হয়!

একটি যুবক ভিতর থেকে ঘরে ঢুকল। কেত্তা দিয়ে ধুতি পরা। সার্টের হাতাটি থ্রি কোয়ার্টার করে গোটানো

যুবক। কি বকছিস্ রে আপন মনে?

মেয়ে। তোমার মাথা আর মুণ্ডু!

যুবক। যা বাব্বা! সকাল বেলায় মেজাজ ভারমেছে! ও সিনেমার পয়সা দেয়নি বুঝি বাবা?

মেয়ে। (অভিমানে ফুলে) কবে দেয়?

যুবক। কুছ পরোয়া নেই ফুটকি! আর ক'টা দিন সবুর কর। তারপর দেখব তুই কত সিনেমা—

ফুটকি। তুমি তো রোজই ঐ এক কথা বলছ!

যুবক। না রে না। এই সব 'ফাইনাল' হয়ে গেছে। যা চট্ করে এক কাপ চা নিয়ে আয় তো!

ফুটকি। চিনি নেই।

চলে গেল

যুবক। আঃ নেই নেই যেন মুখের বুলি! মা!

মায়ের প্রবেশ

আমায় এক্ষুণি বেরুতে হবে। এক কাপ চা এখনও পর্য্যন্ত পেলাম না।

মা। বাড়ীতে চিনি নেই। উনি গেছেন আনতে।

যুবক। চিনির জন্যে আটকাবে না। তুমি চা কর—

মা। বিনা চিনিতেই চা খাবি?

যুবক। চিনি নেই তো হয়েছে কি? (পকেট থেকে ছোট ঠোঙা বার করে) তোমার গোপাল ঠাকুর তো দেখি দিব্যি চারখানা সাদা বাতাসা নিয়ে বসে ছিলেন। এই নাও (ঠোঙাটি মার হাতে দিয়া) তাড়াতাড়ি চা দাও। যাও—

মা চলে গেলেন ভিতরে। বাহিরের দরজায় যুবকের বন্ধু দেখা দিল

বন্ধু। তুই এখনো রেডি হসনি?

যুবক। আমি তো রেডি। দাঁড়া চা নিয়ে আসি।

যুবক ত্বরিতপদে ভিতরে গেল। দু পেয়ালা চা নিয়ে ফিরে এল, একটু পরেই। বন্ধু চায়ে চুমুক দিয়েই মুখটা ঈষৎ বিকৃত করল

যুবক। কি মিষ্টি কম লাগছে বুঝি? আর বলিস কেন! এ হল ফ্রেঞ্চ সুগার! ব্যাটাদের দেশে তো আর আখ জন্মায় না! বীটের চিনি—নে হল তোর!

দুজনে চা খেয়ে মহা ব্যস্ততার সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বাইরে কর্তার গলা শোনা গেল

[নেপথ্যে] কৈ রে ফুটকি! (প্রবেশ করে) কই গো! কোথায় গেলে, এইবার দয়া করে—

চোখ গিয়ে পড়ল সদ্য-খাওয়া দুটো চায়ের পেয়ালার উপর। তার মুখের ভাব পরিবর্তন হল

গিন্নী। আসতে পারলে তাহলে? বলি গেছ তো কখন—

কর্তা। না এলেই বোধ হয় ভাল ছিল!

গিন্নী। আবার ঢঙ হচ্ছে। দাও।

থলেটি তার হাত থেকে নিলেন

কর্তা। থাক্। আর তোমায় কষ্ট করতে হবে না। চায়ের প্রয়োজন আর নেই।

গিন্নী। হঠাৎ আবার রাগ হল কেন?

কর্তা। রাগ করাটা খুব অন্যায় না? (আপন মনে) উঃ এতদিনে কি ভুল ধারণাই আমার ছিল! আজ সব ভেঙ্গে গেল। যাক্—সব যাক্! নিজের স্ত্রীই যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়—তাহলে—

গিন্নী। কি পাগলের মত যা-তা বকছ!

কর্তা। পাগল এখনও হয়নি। তবে এ সংসারে থাকলে সত্যি পাগল হয়ে যাব। বাসি মুখে মিথ্যা কথাটা বলতে তোমার মুখে আটকালো না?

গিন্নী। কি বললে? আমি মিথ্যুক! আমি—

কর্তা। খুব হয়েছে! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে সংসারের। আর না—

গিন্নী। তুমি এত বড় কথা বললে? আমি মিথ্যাবাদী?

কর্তা। নয় তো কি? বললেই পারতে যে চা দেব না!

গিন্নী। দেব না বলেছি কখনও?

কর্তা। চিনি আনলে চা দেবে বলেছিলে না? অথচ চিনি ছিল—

গিন্নী। ছিল? যে দিব্যি তুমি বলবে সেই—

কর্তা। আহা দিব্যি দিয়ে তোমার গুণধর ছেলে-মেয়েদের অকল্যাণ করো না।

গিন্নী। তবু তুমি বিশ্বাস করবে না আমার কথা?

কর্তা। এ্যাদ্দিন তো বিশ্বাস করেই এসেছিলাম। যাক যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে এই বয়েসে। তুমি থাক তোমার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। আমি চল্লাম—

গিন্নী। কোথায়?

কর্তা। যেদিকে দু-চোখ যায়।

গিন্নী। তুমি যাবে কোন দুঃখে? আমি মিথ্যাবাদী, ঠগ। আমি চলে যাব—দাদা এলেই—

সবেগে ভিতরে চলে গেলেন। ফুটকি ত্বরিতবেগে ঘরে ঢুকল

ফুটকি। বাবা এসেছ? দাও না—

কর্তা। কি দেব?

ফুটকি। টাকা—একটি মাত্র টাকা।

কর্তা। আবার টাকা!

ফুটকি। আজকে লাষ্ট-শো! একটা দিতে পার না?

কর্তা। না!

ফুটকি। এ তোমার অন্যায় জেদ বাবা।

কর্তা। ন্যায় অন্যায় আজ তোর কাছে শিখতে হবে? সিনেমার জন্য টাকা আমি দেব না—দেব না—

ফুটকি। ভুলে যাচ্ছ বাবা! পেটের ক্ষিদের জন্য যেমন খাওয়া, মনের ক্ষিদে মেটানর জন্য তেমনি সিনেমা! মনকে উপবাসী রাখতে বল তুমি! তুমি না বাবা? ছেলে-মেয়ের ভরণপোষণ করার নৈতিক দায়িত্ব নিতে তুমি বাধ্য!

কর্তা। নৈতিক দায়িত্ব! সে দায়িত্ব পালন করতে যদি আমি অক্ষম হই?

ফুটকি। সে অক্ষমতার জন্য ফলভোগ তোমাকে করতে হবে!

কর্তা। (হঠাৎ সার্টটি কাঁধে ফেলে—চৌকির নীচে থেকে একটি সুটকেশ নিয়ে) ফলভোগ করতেই হবে;

না? ঠিক বলেছিস্ মা? ঠিক বলেছিস? ফলভোগ করতেই হবে!

দ্রুত প্রস্থান। ফুটকি হতভম্ব। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা নিয়ে প্রবেশ করলেন গিন্নী

গিন্নী। কোথায় গেল আবার!

ফুটকি। চলে গেছেন।

গিন্নী। কোথায়?

ফুটকি। জানিনা! (নাটকীয় ভাবে চলে গেল)

গিন্নী। ফুটকি—এই শোন! হতচ্ছাড়া মেয়ের যদি একটু বুদ্ধি থাকে? কেন তাকে যেতে দিলি। এই ফুটকি—

ভিতরে চলে গেলেন। মঞ্চ কিছুক্ষণ শূন্য থাকবে। বাহিরে কাদের গলা শোনা গেল

নেপথ্যে। না না আমায় যেতে দাও বিনোদ! যেতে দাও!

নেপথ্যে। তোমায় আটকে রাখছে কে? শুধু দুটো জরুরী কথা—

প্রবেশ করলেন দুই বৃদ্ধ! একজন এ বাড়ীর কর্ত্তা! আর একজন কর্ত্তার সমবয়সী—শ্যালক বিনোদবিহারী। তাঁর এক হাতে থলে, অপর হাতে কাগজের প্যাকেট

কর্ত্তা। জরুরী কথা তোমার বোনের সঙ্গে বলো। আমি আর এ সংসারে নেই।

বিনোদ। তুমি সংসারে না থাকলে সংসারটা রইল কোথায়?

কর্ত্তা। ওসব তুমি বুঝবে না। সংসার তো আর করলে না। যাক ভালই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। তোমার বোনকে একটু দেখ শুন।

বিনোদ। আহা! কোথায় যাচ্ছ?

কর্ত্তা। যে দিকে দু'চোখ যায়?

বিনোদ। সে চোখ দুটো তো চোখ-বাঁধা বলদের মত এই সংসারের চারপাশে ঘুরপাক মারে।

কর্ত্তা। না না। এ সংসারে আর না। এ সংসারে আর না। যে সংসারে নিজের মেয়ের কাছে শিখতে হয় নৈতিক দায়িত্ববোধ, যে সংসারে নিজের সহধর্ম্মিণী সাত সকালে মিথ্যাচার করে বাজারে পাঠায় এক কাপ চা পর্য্যন্ত না দিয়ে, সেই সংসারের মায়ায় আমি আর জড়াব না। বনে গিয়ে বাস করব। তবু—

বিনোদ। বাংলাদেশে বন কোথায় পাচ্ছ তুমি ব্রাদার। সব সাফ্ করে গেছে মিলিটারিরা। যে দু একটা আছে সেগুলো রিজার্ভ করেছে! ঢুকতে গেলে পারমিশন লাগবে।

কর্ত্তা। না না বিনোদ, তুমি আর বাধা দিও না—

বিনোদ। মোটেই না! এ বয়েসে শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করে বানপ্রস্থই শ্রেয়!

ফুটকির প্রবেশ

ফুটকি। মামা! ওঃ বাবা এসেছ। দাঁড়াও চা নিয়ে—

বিনোদ। দাঁড়া রে পাগলি? দেখ ভাল গলদা চিংড়ী উঠেছিল বাজারে। নিয়ে যা আর মাকে বল—যেন মালাইকারি রাঁধে। আর হ্যাঁ, অপিসের সাহেবের চা থেকে একটু সাম্পেল এনেছি। এক কাপ চা আনতো! (কর্ত্তার দিকে) তুমি তো আবার চা খাবে না। বানপ্রস্থ গ্রহণ করছ!

ফুটকি মৃদু হেসে ভিতরে চলে গেল

হ্যাঁ, কি বলছিলাম! তবে শাস্ত্রবাক্য আমি একটু সংশোধন করতে চাই।

কর্ত্তা। কি রকম?

বিনোদ। বানপ্রস্থ পর্ব্ব আপাততঃ তুমি মুলতুবী রাখ।

কর্ত্তা। না না! তা হয় না—

বিনোদ। আরে শোনই না! তোমার বদলে তোমার পুত্রকে বানপ্রস্থে পাঠাবার ব্যবস্থা সব কমপ্লিট করেছি। উঃ অনেক কষ্টে সাহেবকে রাজী করিয়েছি।

কর্ত্তা। কি ব্যাপার বলত?

বিনোদ। শ্রীমানের চাকরী হয়েছে নাহার কাটিয়ার চা বাগানে।

কর্ত্তা। সে আবার কোথায়?

বিনোদ। বড় মনোরম জায়গা। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে মানুষের টিকিটি দেখতে পাবে না—সিনেমা তো দূরের কথা! তবে মাহিনা পত্তর দেবে ভালই। দুশো টাকা—

কর্ত্তা। দু-শো টাকা!

বিনোদ। তোমার ফুটকির ব্যবস্থা পাকা করেছি।

কর্ত্তা। তারও চাকরি যোগাড় করেছ নাকি?

বিনোদ। তা একরকম চাকরিই বলতে পার—পাকা চাকরি! সেই অপিসের ছেলেটির ফুটকিকে পছন্দ হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় পাকা দেখা দেখতে আসবে। এ মাসের শেষেই ওরা বিয়ে দিতে চায়।

কর্ত্তা। মোকার চাকরী—ফুটকির বিয়ে—মানে—

বিনোদ। এই সময়ে তোমার বানপ্রস্থ গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়—কি বল?

ফুটকি দু পেয়ালা চা দিয়ে চলে গেল

কর্ত্তা। তাহলে গিন্নীকে একবার—

বিনোদ। (বাধা দিয়া) আবার গিন্নীকে কেন? তাকে তো ত্যাগ করে চলেই যাচ্ছ!

কর্ত্তা। আমি একলা, মানে সব দিক—

বিনোদ। হাঁা, হাঁা, তোমায় একলাই থাকতে হবে। তোমার গিন্নীর ব্যবস্থা করেছি। বিয়ের হাঙ্গামা মিটে গেলে তাকেও চালান করব একেবারে কাশীতে—বড়দির ওখানে।

কর্ত্তা। কিন্তু—

বিনোদ। সব ভাগিয়ে দিয়ে বুঝেছ ব্রাদার তোমার এই সাঁকাড়ীপাড়ার বাড়ীটা—বনে—মানে তপোবনে কনভার্ট করব। আর এই দুই ঋষি একান্ত মনে (পকেট থেকে পাশা বার করে) পাশায়—মনঃসংযোগ করব!

দুজনে চায়ের পেয়ালায় চুমুখ ও পাশা খেলায় মত্ত হলেন। গিন্নী একটি পুঁটুলি নিয়ে ঢুকলেন

গিন্নী। দাদা!

বিনোদ। হুঁ!

গিন্নী। দাদা! আমি আর এ সংসারে থাকবো না!

কর্ত্তা। কি ফ্যার ফ্যার করছ বলত? আজ-বাদে কাল বাড়ীতে বিয়ে। আজ পাকা দেখা! এখন নাকি সুরে—দাদা-দাদা! যাও রান্নাগুলো ভাল করে করগে। যাও—ক'চে বারো—

গিন্নী দুজনের দিকে হতাশ ভাবে তাকিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেলেন। দুই বৃদ্ধ পাশা খেলতে লাগলেন

যবনিকা

কালীপূজার প্রসার

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

আমাদের দেশের সামাজিক প্রথার, পূজা-পার্ব্বণের, সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এইসব পরিবর্ত্তনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এইরূপ ইতিহাস আবশ্যক হইয়াছে—এই ইতিহাস লিখিবার উপকরণস্বরূপ কিছু কিছু বহুলপ্রচলিত প্রবাদ বা গল্প অন্যান্য তথ্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া তাহার সম্ভাব্য সত্যতার বিষয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব। কতদূর গ্রহণ-যোগ্য সুধী-পাঠকগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে—

"যেখানেই বাঙ্গালী, সেইখানে মা-কালী
আর আছে দলাদলী।"

এই প্রবাদ হইতে বাঙ্গালীর কালীপূজার প্রতি প্রীতি বুঝিতে পারি। শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বাংলার পাল-পার্ব্বণ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে:—

"দীপান্বিতা কালীপূজাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কিন্তু এই পূজার খুব প্রাচীন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। * * * দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন কালীপূজার অনুষ্ঠান প্রশস্ত * * * এই কারণেই বোধ হয় নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সকল প্রজাকে এই পূজা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, পূজা না করিলে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই আদেশের ফলে প্রতিবৎসর দীপান্বিতার দিন নদীয়ায় দশ সহস্র কালীমূর্ত্তি পূজিত হইতে থাকে।"

কৃষ্ণচন্দ্রের নদীয়া রাজ্য বর্ত্তমান নদীয়া জেলায় আবদ্ধ নহে বা নদীয়া জেলার সবটা নহে। রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্ত্তী তাঁহার Summary of the changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal 1757-1916 পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে:—

"The Nadia Raj, 3151 square miles, correspon ding with Nadia (Sader and Ranaghat sub-

divisions with a very small portion of Southern Meherpur), 24, Pargnas (Barasat and Basirhat sub-divisions. exclusive of Sunderbans), Jessore (Bongong and southeast Sader). Khunlna (west Satkhira). At the time of the Permanent Settlement included also Satsikka and the riparian strip east of the Saraswati)."

ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে কোন কোন অঞ্চল নদীয়া রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ও কোথায় কোথায় কালী পূজার প্রসার হইয়াছিল।

মহারাজা নন্দকুমার লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন। এই ঘটনা ইং ১৭৬৫ আন্দাজ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। মহারাজা নন্দকুমারের দেখাদেখি রাণী ভবানীর ইচ্ছা হইল যে তিনিও এইরূপ লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবেন। তাঁহার দেওয়ানের সহিত পরামর্শ করিলেন —দেওয়ানের নাম লইয়া মত পার্থক্য আছে, কেহ কেহ বলেন—নড়াইল জমীদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায়, আবার কেহ কেহ বলেন দীঘাপতীয়ার দয়ারাম রায় এই সময়ে দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানজী বলিলেন যে আপনি যদি লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন করান, লোকে বলিবে যে আপনি ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া লক্ষ ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতেছেন; আর মহারাজা নন্দকুমার ভাবিবেন যে তাঁহার দেখাদেখি রাণি তাঁহার উপর টেক্কা দিবার চেষ্টা করিতেছেন—বিরক্ত হইবেন। তদপেক্ষা আপনি আর এক ব্যবস্থা করুন; আপনার জমীদারীর অন্তর্গত প্রত্যেক গ্রামে বছর বছর কালীপূজার ব্যবস্থা করুন। বছরে একবার কালীপূজা হইবে, দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করিবেন; মণ্ডল পূজার উপকরণ দিবে; ঢাকী ঢাক বাজাইবে; নাপিত ফুল, বিল্বপত্র দিবে; আর পূজারী ব্রাহ্মণ পূজা করিবেন—ইহাদের জমীদান করুন। আপনার বছরে বছরে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ-ভোজন করান হইবে; কালীপূজার ফল পাওয়া হইবে; গ্রামে গ্রামে বছরে বছরে লোকে আপনার নাম স্মরণ করিবে। আপনার কীর্ত্তি "যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর" থাকিবে। রাণী ভবানী এইরূপ পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহার রাজত্বের মধ্যে বহু গ্রামে এইরূপ জমীদান করেন। গল্পটীর সম্ভাব্য সত্যতার বিষয় একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক।

রাণী ভবানীকে লোকে অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী বলিত। তাঁহার নাটোর রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে ফারমিঙ্গার সাহেব Fifth Reportএর পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে:—

"In the year 1728 the Zamindary of Rajsahi extended from Bhagelpore on the west to Ducca on the east, and included a large sub-division called Nil Chokla Rajshi. which stretched across Murshidabad and Nadia as far as the frontiers of Birbhum and Burdwan. Rajshi this comprised an area of 13,000 Sq. miles, and paid a revenue of 27 lakhes." (Imperial Gazeetteer Vol. XXI, p 162)."

সন ১১৩৫ সালে (ইং ১৭২৮) রাজসাহী জমীদারীতে ১৩৯ পরগণা ছিল; ১১৭২ সালে (ইং ১৭৬৫) পরগণার সংখ্যা বাড়িয়া ১৮১ পরগণা হয়; এবং ১১৮৩ সালে (ইং ১৭৭৬) এই রাজসাহী জমীদারীও ৮৮৯টী মহাল ও ১৬, ১৯৬টী গ্রাম ছিল। (ফার্মিঙ্গার সাহেবের Fifth Reportএর ৩২০ পৃঃ দেখুন)।

বাংলার পরিমাণ ৭৭.৫২১ বর্গমাইল। ইহার মধ্য হইতে যদি আমরা দার্জিলিঙ ও জলপাইগুড়ি জেলা বাদ দিই (কারণ এই দুটী জেলা বহু পরে ইংরাজের হাতে আইসে) তাহা হইলে নবাবী বাংলার পরিমাণ ৭০,০০০ বর্গ মাইল হয়। ইহার ছয়-ভাগের এক ভাগ নাটোর রাজ্যের অন্তর্গত। আকবরের সময় সুবে বাংলায় ৬৮২ পরগণা ছিল—পরে পরগণার সংখ্যা কিছুটা বাড়িয়াছিল। পরগণার সংখ্যা দেখিয়াও মনে হয় যে বাংলার সিকি অংশ বা পঞ্চমাংশ নাটোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

নাটোর রাজ্য-ভুক্ত ১৬,১৯৬টী গ্রামের মধ্যে অর্দ্ধেক গ্রামেও যদি রাণী ভবানী দেওয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কালীপূজার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার প্রত্যেক বৎসর (১২+১ পূজারী) ×৮০০০ ১,০৪,০০০ ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইল। তিনি যে এইরূপ বহুস্থানে কালীপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার বহু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

বহু জমীদারী নাটোর রাজবংশের হাতছাড়া হইলেও রাণী ভবানীর প্রবর্ত্তিত কালীপূজার ব্যবস্থা এখনও বহু হিন্দু-জমীদার মানিয়া চলিতেন। দোয়েম কানুনের ফলে বহু লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইলেও এখনও ঢাকী ঢাক বাজাইয়া যায়, নাপিত ফুল বিল্বপত্র যোগান দেয়। বহুস্থানে কালীপূজা কতদিনের জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর আইসে—রাণী ভবানীর সময় হইতে পূজা চলিয়া আসিতেছে।

ইহাঁদের দেখাদেখি বহু হিন্দু জমীদার, তালুকদার বাংলার নানা স্থানে কালীপূজা কৌলিক পূজা হিসাবে, গ্রামের পূজা হিসাবে প্রবর্ত্তন করেন।

আমরা একথা বলি না যে ইহাঁদের পূর্ব্বে বাংলায় কালীপূজার প্রচলন ছিল না, বা গ্রাম্য কালীঠাকুর ছিল না। ছিল—যেমন থানা খড়দহর অন্তর্গত সুখচর গ্রামের গ্রাম্য কালীঠাকুর প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ব হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন; পরে প্রতাপাদিত্যের দান পাইয়া পূজা সমৃদ্ধ হইয়াছিল; এই জমী বাজেয়াপ্ত হইবার পর গ্রামবাসীরাই চালাইয়া আসিতেছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাণী ভবানীর চেষ্টায় ও উদ্যোগে কালী-পূজার বহুল প্রসার ইংরাজী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঘটে।

গাঁয়ের পথিক

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

দিবসের তরীখানি তীরে নাহি আর,
অস্ত-কিরণ নিমেষে মিলায়।
ছায়াঘন তরুতলে নেমেছে আঁধার,
ত্রস্ত বিহগ ওড়ে নিরালায়।
ঘন গহনের কোলে লুকালো শশক,
স্রস্ত কুসুম কাঁদে বালুচরে,
চারিভিতে চলে যায় বিলুলিত বক
ঝিল্লী-মুখর এমনি প্রহরে।

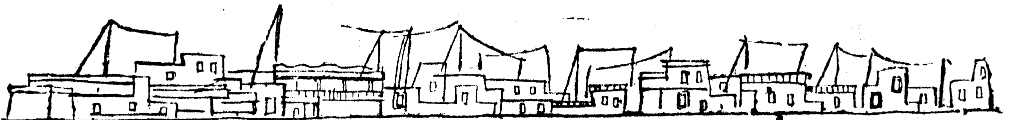
একটি গোপন ব্যথা বহে অবিরাম
চিত্ত মাঝারে পড়িতেছে লুটি,
গগনের দেবালয়ে প্রথম প্রণাম
সন্ধ্যাতারায় উঠিতেছে ফুটি।
কুসুমের মঞ্জরী দুলিতেছে শাখে
আসে সমীরণ ভেসে দূর হতে,
নাম ধরে কেহ মোরে নাহি আর ডাকে
এ গাঁয়ের জনহীন বন পথে।

হেথা যারা এসেছিল খেলাঘর পেতে,
বেসেছিল ভালো ধরণীর ধূলি,
তাহাদের পাইনাক পথে যেতে যেতে
মনে পড়ে অতীতের কথাগুলি।
আমারে যে ডেকেছিল পাতার কুটীর
মাটীর প্রদীপে জ্বেলে দিতে শিখা,
তাহারি যে ডাক শুনে একদা অধীর
নিয়ে এসেছিনু পরাণ-মালিকা।

সেই দিন চলে গেছে—চিহ্নবিহীন
স্মরণ-মধুর হৃদি-কিশলয়;
যাহা কিছু রেখে গেছে মর্ত্ত্যে বিলীন,
চিরদিন কিছু নাহি বেঁচে রয়।
মানুষের মন তবু হারানো অতীত
খুঁজিতে খুঁজিতে চলে যায় দূরে,
গাওয়া হোলো হৃদয়ের যত সঙ্গীত,
ফিরে পেতে চায় অনাগত সুরে।

সজিনা গাছের সারি আর ঝাউবন
রাত্রি-কিনারে দেয় হাতছানি।
সাঁঝের আঁধারে মোর হারালো যে মন
কায়া হয়ে ছায়া করে কানাকানি।
এ গাঁয়ের নীরবতা ব্যথা দেয় মনে
শ্মশান-সমাধি ভরা শতদিক।
সেই মুখখানি ফুটিল যে নির্জ্জনে,
যার সন্ধানে গাঁয়ের পথিক।

সে ছিল আমার মাঝে নামহারা মেয়ে,
তার রেখা রঙে আঁকা ভালোবাসা।
কি যেন কহিতে গিয়ে তার পানে চেয়ে
হারানু আমার মরমের ভাষা।
নিশীথ আকাশ তলে জ্যোছনার খেলা,
ধ্যানের আসনে বসেছে ধরণী।
রূপ হোতে রূপে হেরি আনন্দ-মেলা,
কোথা সেই মেয়ে সোনার বরণী!



সাহিত্যসম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

গত ৬ই বৈশাখ শনিবার সাহিত্য সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী ইহলোক ত্যাগ করেছেন। হিন্দু বাঙ্গালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন এবং বাঙ্গলা সাহিত্য জগতের একটি গৌরব আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর ছিল। রক্ষণশীল হিন্দু ঘরের মেয়ে ও ব হয়ে এবং স্কুল কলেজের শিক্ষা না পেয়েও তিনি পিতা ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, পিতামহ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে গৃহে শিক্ষালাভ করে যে প্রভূত খ্যাতি ও যশের অধিকারিণী হয়েছিলেন—তা যে কোন বাঙ্গালী মেয়ের কাছে চিরকাল আদর্শ হয়ে থাকবে। রবীন্দ্র শরৎ প্রমুখ সাহিত্যরথীর আমলে তাঁদের প্রভাবমুক্ত হয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের যে বিশেষ দিকটি আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর মৃত্যুতে সেই দিকটি শূণ্য হয়ে গেল। এই কারণে বাঙ্গলার সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী সমাজ অনুরূপা দেবীর মহাপ্রয়াণকে বাঙ্গালী জাতির বিশেষ ক্ষতি রূপেই পরিগণিত করবে।

ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী এবং স্বনামধন্য সাহিত্যিক মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা অনুরূপা দেবী কৈশোর বয়স থেকেই সাহিত্য সাধনায় ব্রতী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহার প্রধান পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষক। বাঙ্গালী জীবনের মহৎ ঐতিহ্য বজায় রেখে আমাদের রুচিকে উন্নত করে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল তিনি যেমন গৌরবের সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করে গেলেন তা যে কোন সাহিত্যসেবীর জীবনে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

১২৮৯ সালের ২৪শে ভাদ্র (৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২) রাত্রি দেড়টার সময় মাতুলালয় কলিকাতা রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে অনুরূপা দেবীর জন্ম হয়। তাঁর মাতামহ নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলা নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

অনুরূপা দেবীর জন্মকালের ঘটনাটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ এবং এই কারণে সেটিকে এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি।

তাঁদের সংসারে সেই সময় তাঁর আবির্ভাব আনন্দের পরিবর্তে বিষাদের সূচনা করেছিল। তাঁর জন্মের কিছুদিন আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন—

২৮।৮।৮২ স্বপ্ন দেখিলাম যে মুকুন্দুর (মুকুন্দদেব) একটি দেবদূতের ন্যায় সুন্দর পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে। আর আমি গোবীনকে (অনুরূপার জ্যেঠামহাশয়) বলিতেছি, কিরূপে এমন সুন্দর ছেলে বাঙ্গালীর ঘরে জন্মাইল! ১।৯।৮২ স্বপ্ন দেখিলাম মুকুন্দুর একটি কালো থ্যাবড়া-মেয়ে হইয়াছে। ১০।৯।৮২ মুকুন্দু কলিকাতা হইতে আসিয়া জানাইল যে গত রাত্রে তাহার একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমার সমস্ত সম্পত্তি কোন সাধারণ সৎকার্য্যে উৎসর্গ করিলে হয় না?

এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় অনুরূপার আবির্ভাব পিতামহ ও পিতার নিকট কিরূপ বিষাদজনক হয়েছিল। অবশ্য পিতা মুকুন্দদেব আনন্দিত না হলেও ভূদেববাবুর মত এতটা ভেঙ্গে পড়েন নি। তাঁর ডায়েরীতে সেই সময় তিনি লিখেছেন—"heard the cry "ছেলে হয়েছে"—how my heart leapt with Joy! What pleasant vision swept through my ambitious mind in the minute which elapsed between this and the next announcement it was a girl! It is well, and not be minded, said I."

এই নিরাশার কারণ প্রসঙ্গে অনুরূপা তাঁর "জীবনের শ্রুতিলেখায়" লিখেছেন,—"আমার জ্যেঠামহাশয় ৺গোবিন্দদেবের প্রথম সন্তান নরদেব মাত্র আড়াই বৎসর বয়সে সংসার অন্ধকার করে চলে যাওয়ার পর বড়মার ক্রমান্বয়ে চারটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। আমার মায়ের প্রথম সন্তান ও কন্যা। আবার আমিও যে সেই মূর্ত্তি ধরেই দেখা দেব, এতটা কেউই প্রত্যাশা করেনি। এমন কি এবারে একটি পুত্র-সন্তান জন্মিলে তার জন্ম উপলক্ষে আমার দিদিমা কি কি ঘটা করবেন, তারও একটা বহু বিস্তৃত ফর্দ্দ তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছিল। তার মধ্যে একটা এই যে ষেটেরা পূজায় "গড়ের বাদ্যি" করা হবে। এটা শুনে আমার দাদাবাবু (ভূদেব বাবু) হেসে বলেছিলেন,…"দেখো যেন তোমার গড়ের বাদ্যির জ্বালায় ছেলে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে মেয়ে পাঠিয়ে না দেয়।" ব্রাহ্মণের বাক্যই ফলে গেল শেষে। গড়ের বাদ্যি ছেড়ে আমার জন্মক্ষণে একটা শাঁখও বাজলো না, যদিও পুত্র-সন্তানের শুভাগমন কল্পনায় সেটা আঁতুড় ঘরের দোর গোড়াতেই এনে রাখা হয়েছিল।

আজকের দিনে শ্রদ্ধেয় অনুরূপা দেবীর বিপুল সাহিত্য-অবদান ও অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার কথা স্মরণ করে তাঁর আবির্ভাবের ঘটনা আমাদের মনে বিস্ময়ের সঙ্গে যথেষ্ট কৌতুকেরও সঞ্চার করে। জন্মকালে শাঁখ না বাজার প্রতিশোধ তিনি ভালভাবেই নিয়েছেন। পরবর্ত্তী জীবনে তাঁর যশের ও গৌরবের শঙ্খ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বেজে উঠে, যার মঙ্গলময় ধ্বনি-রেখা কোনদিন মিলিয়ে যাবে না। তাঁর লেখা "মা", "মন্ত্রশক্তি", 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতি গ্রন্থের দেশজোড়া খ্যাতি। শুধু গল্প উপন্যাসের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে নাটক ও ছায়াচিত্ররূপেও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। এখনও তার লোকচিত্ত জয়ের ক্ষমতা কিছুমাত্র হ্রাস হয়নি।

বাল্যকালে অনুরূপা দেবী অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাঁর দস্যিপনায়

সকলে অস্থির হলেও পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর দুই নাতনীর সব অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করতেন। এর পর তাঁদের সংসারে পর পর পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করায় মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির দুঃখটা মুছে গিয়েছিল। বাড়ীর মধ্যে অনুরূপাই প্রশ্রয় পেয়ে সকলের কাছেই খুব আদুরে হয়ে উঠেছিলেন। নানা সদ্‌গুণের জন্যেও তিনি সকলের প্রিয় হতে পেরেছিলেন।

বাল্যকালে তিনি পিতামহের কাছ থেকে সংস্কৃত শেখেন। দীক্ষা-গুরু পণ্ডিত অনন্তরাম মিশ্রের নিকট হতে অনুরূপা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করার সুযোগলাভ করেন। পিতা মুকুন্দদেবও এ বিষয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করতেন। তিনি স্বামীর কাছে শেখেন ইংরাজি।

১২৯৯ সালের ১৩ই ফাল্গুন বালী-উত্তরপাড়া নিবাসী শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শেখরবাবু কর্ম্মোপলক্ষে মজঃফরপুরে বাস করতেন। এইখানে থাকাকালেই অনুরূপা দেবীর খ্যাতি ও যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রথমে তিনি কিছুদিন অনুপমা দেবী এই ছদ্মনামে লিখতেন। পরে ভারতী-সম্পাদিকা ৺স্বর্ণকুমারী দেবীর অনুরোধে নিজের নামে রচনা প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর প্রথম রচনা "টিলাকুঠি" ১৩১১ সালে 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর অনুরূপা ও তাঁর দিদি বিখ্যাত লেখিকা ৺ইন্দিরা দেবী ভারতী পত্রিকায় লিখতে সুরু করেন। সর্ব্বজনবরেণ্য ৺স্বর্ণকুমারী দেবী অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে এঁদের গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই একান্ত উৎসাহে ও প্রেরণায় অনুরূপার সাহিত্য-জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। একথা তিনি তাঁর পরবর্তী জীবনে বারংবার অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তাঁর লেখা "পোষ্যপুত্র" "বাগদত্তা" ভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে। "ভারতবর্ষে"ও তাঁর বহু রচনা প্রকাশ হয়।

শুধু মাত্র সাহিত্য-সেবা নয়—সেই সঙ্গে আদর্শ গৃহিণীরূপে ঘর-সংসারের কাজেও তিনি সকলের প্রশংসার অধিকারিণী হয়েছিলেন। হিন্দু ঘরের আদর্শ বধূ ও জননীর রূপটি তাই তাঁর সাহিত্যে এতটা জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পেরেছে। সংসারের কাজে লিপ্ত থেকে অবসর সময়ে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন থাকার অনুপম চিত্রটি বাঙ্গালীর ইতিহাসে অক্ষয় স্থানলাভের যোগ্য।

নিজে হাতে রান্না করে লোকজনকে খাওয়াতে তিনি খুব ভাল-বাসতেন। তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে রসরাজ ৺অমৃতলাল বসু, ৺জলধর সেন প্রমুখ সাহিত্যিকগণ অনুরূপা দেবীর রান্না খেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে বলে-ছিলেন—"আপনার গল্প উপন্যাসের চেয়ে রান্নার মিষ্টত্ব কিছু কম নয়।"

আমরাও তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দেখতাম—কখনো তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন, কখনো বা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত আছেন। বাঙ্গালী মেয়ের এই অবশ্য করণীয় কাজটির প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর উপদেশ শুধু মৌখিক ছিল না—আপনি আচরি ধর্ম্ম অপরকে শিক্ষা দিবার নীতি তিনি প্রাণপণে পালন করে গেছেন। পূজা পার্বণ ব্রত উপবাস পালনেও তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসীম।

নানারূপ সমাজ সেবার কাজ বিশেষ করে বাঙ্গলার মেয়েদের শিক্ষা ও উন্নয়নমূলক কাজেও তিনি আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। হিন্দু কোডবিলের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে তাঁর অতুলনীয় প্রচার সমস্ত দেশবাসীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেছিল।

মজঃফরপুরে থাকাকালে অনুরূপা দেবী রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরী দেবীর সঙ্গে 'চ্যাপম্যান গার্লস্‌স্কুল' নামে মেয়েদের একটি শিক্ষা-লয় পরিচালনা করতেন। পরবর্তী জীবনে সাহিত্য সেবার সঙ্গে সঙ্গে এইসব সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল কাজের সমুদ্র। অফুরন্ত কাজ নিয়ে তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকতেন। কাজছাড়া তিনি এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারতেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁর অবস্থা দেখে আমরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতুম। তিনি কিন্তু সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা হাসিমুখে বরণ করে নিতেন।

বিধাতার হাতে বনস্পতিরও রেহাই নেই। যতই সে ভেঙ্গে পড়ুক তাকেই আসন্ন ঝড়ের প্রচণ্ড বেগটা সহ্য করতে হবে। অনুরূপা দেবীর জীবনেও এই ঘটেছে। পারিবারিক শোকের সংঘাত, রাজনৈতিক দলীয় উত্তাপ, স্বাধীনতা যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—সবই তাঁকে বরণ করে নিতে হয়েছে।

আজ অত্যন্ত শ্রদ্ধায় তাঁর সবচেয়ে সত্যকার রূপটি প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তা পারছি কৈ? যাঁর জীবনকে রামায়ণ মহা-ভারতের মত একটি মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সে মহাকাব্য-ময় জীবন আমার অক্ষম লেখনীতে ঠিক ফুটে উঠতে পারে না। তাঁর পায়ের কাছে বহুদিন বসবার সুযোগ পেয়েছি। কত ঘটনা চোখের সামনে আজ জেগে উঠছে, আবার চোখের জলে সব ঝাপ্সা হয়ে যাচ্ছে।

১৯৩৪ সালে ১৫ই জানুয়ারী বিহার ভূমিকম্পে আশ্চর্য্যজনকভাবে তিনি মৃত্যু-মুখ থেকে বেঁচে যান। কিন্তু তিনি ভীষণ ভাবে আহত হন। তাঁর প্রিয় নাতনী অরুণা এই ভূমিকম্পে ঘর চাপা পড়ে মারা যায়। এই সময় তিনি মজঃফরপুরে ছিলেন। পরে মজঃফরপুর ত্যাগ করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এরপর জ্যেষ্ঠপুত্র অম্বুজনাথকে হারানর পর তিনি রাণীগঞ্জে পৌত্রের কর্মস্থলে বাস করতে আরম্ভ করেন। এর কয়েক বৎসর পর তাঁর এক ভাই ও এক নাতনী ইহ-লোক ত্যাগ করেন। অনুরূপা দেবীর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তাঁর স্বামী শেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। এছাড়া আরও অনেক দুঃখ শোক ঘরে ও বাহিরে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে; তবু তাঁর কর্ম-স্রোতে এতটুকু গতি হ্রাস হয়নি।

বিহার ভূমিকম্পের সময় নিজে আহত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আর্তত্রাণের জন্যে কল্যাণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতায় তিনি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রেখে জনসেবার কাজে প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন। বারাণসীর হিন্দু মহিলাশ্রম, আর্য্যবিদ্যালয়, মাতৃমঠ প্রভৃতির তিনি অধ্যক্ষা ছিলেন। কলকাতার বাণীপীঠ, নারী কল্যাণ আশ্রম, হিন্দু মহিলাশ্রম প্রভৃতির সঙ্গে শুধু তিনি সংশ্লিষ্ট





কিশোর জগৎ

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

উপানন্দ

বর্ষার নবীন মেঘ এলো আমাদের আকাশে। আজ আর দিনগুলি রৌদ্র-চকিত নয়। বৃষ্টিতে ভরে উঠ্ছে দিগ্‌দিগন্তর। অশান্ত আকাশ। সজল হাওয়ায় দুলে উঠ্ছে বন পথের পুষ্পদল। সাঁঝে সকালে, আঁধার-ঘেরা রাত্রে মেঘে মেঘে যে সুর বেজে উঠ্ছে সেই সুর শুনে শুনে প্রিয়-বিচ্ছেদের স্মৃতি ব্যথিয়ে তোলে মন। জুঁই ফুলের সৌরভে যে মাদকতা আছে তাতে আচ্ছন্ন হয়ে শূন্য প্রাঙ্গণের দিকে চেয়ে চেয়ে বৃষ্টি বিন্দুর মত ঝরে অশ্রুবিন্দু। অনন্ত বিচিত্র জীবন ধারা। কত না ভাবে ও বিচিত্র ছন্দে, কতনা জ্ঞানে ও সৌন্দর্য্যে সে চলেছে এই অনন্ত বিশ্বের ভেতর দিয়ে বৃষ্টি ধারার মত কোন্ অনির্দ্দিষ্ট সার্থকতার সন্ধানে!—এমন দিনেই হারিয়েছি আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে। বিরাট হিমাদ্রির মত যিনি ছিলেন মহান্, তাঁকেই হিমাদ্রি মহাসমাধি রচনা করে দিল দোসরা আষাঢ় বাঙ্গলা সন তেরশো বত্রিশ সালে। দার্জ্জিলিংএর 'ষ্টেপয়্যাসাইড' ভবনে তিনি চিরনিদ্রিত হোলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশে সেদিন ছন্দের মালা গেঁথে দিয়ে বল্‌লেন—'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ। মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।' তিনি আমাদের পরম প্রিয় ছিলেন দেহের ভিতর আত্মার মত। তাঁকে দেখেছি আমরা আত্মভোলা সন্ন্যাসীর মত জীবনের স্তরে স্তরে পদচারণা করতে—একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বৈষ্ণব, রাজনীতি বিশারদ, নেতা, দেশপ্রেমিক আর ত্যাগী মহামানব ছিলেন তিনি। বাল্যে ও যৌবনে পাশ্চাত্য আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হয়েও মনে প্রাণে তিনি ছিলেন বাঙালী। বাংলার আকাশ-বাতাস, বাংলার নদ নদী, বাংলার তৃণ গুল্ম, সবুজ শস্যক্ষেত্র, বাংলার পল্লী জনপদ তাঁর অন্তরে দিয়েছে প্রেরণা অনুপ্রেরণা। আচার আচরণে রীতি নীতিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বাংলার বৈশিষ্ট্যকে তিনি রক্ষা করে চল্‌তেন। বঙ্গ ভারতীর একনিষ্ঠ পূজারী, ভারতমাতার সর্ব্বাগ্রগণ্য কৃতী ঐতিহাসিক সন্তান, বঙ্গজননীর ত্যাগনিষ্ঠ সেবকরূপ আমরা দেখেছি তাঁকে! তিনি যে পরিণত বয়সে দধিচীর মত অস্থিদান করে স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞকে সার্থক করে তুল্‌বেন, তা তাঁর কৈশোর ও যৌবনের খণ্ড খণ্ড কবিতায় প্রতিভাত। আজন্ম সুখের কোলে লালিত পালিত হয়ে, কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টাররূপে ব্যবহারজীবী হয়ে মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা উপায় করে আর সর্ব্বপ্রকার ভোগৈশ্বর্য্য ভোগ করে তিনি তাঁর সমগ্রজীবন রাজসমারোহে অতিবাহিত করতে পারতেন, কিন্তু পরাধীনতার শৃঙ্খলায় আবদ্ধ জন্মভূমির দুঃখ দুর্দ্দশা দেখে তিনি গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন আর দেশের অগণিত নরনারীর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে বুদ্ধের মত বেরিয়ে এসেছিলেন জনগণের মাঝে, সভ্যতার মহারাজপথের ধূলায় ধূসরিত হয়ে তিনি অগ্রসর হোলেন দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথ ধরে স্বজাতিকে আত্মনিহিত বিপন্নতা থেকে উদ্ধারকল্পে। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি বীরভাবুক ও বিজয়পন্থী মনুষ্যত্বের বাণী প্রচারক রূপে সমাদৃত। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন শক্তির কাছে সকলের শির সসম্ভ্রমে নত হোতো। বিরুদ্ধ মতবাদ যুক্তি জালে ছিন্ন করে নিজের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি—প্রজাশক্তি গঠন করে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন স্বরাজ্য দল। মণীষায়, জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ত্যাগে, দানে, গতানুগতিক বাঙালী জীবনে তিনি ভাবের কেদারবাহিনী ধারা বহমান করে গেছেন, নিজের সেবা ধর্ম্মে দেশকে মাতিয়েছিলেন আর বিরুদ্ধবাদীদের সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূল আচরণ রোধ করে দেশের ঐক্য সঙ্কট দূর করেছিলেন—দেশের মাতৃজাতির চিকিৎসার জন্যে তাঁর প্রাসাদোপম বাসভবন দেশের নামে উৎসর্গ করে মহাপ্রাণের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে গেছেন। স্ত্রী পুত্র পরিবারকে সাথী করে তিনি দরিদ্রনারায়ণের রূপ ধরে ঘর-ছাড়া হয়ে মহাপথিক হয়েছিলেন। এরূপ মহান্ আদর্শ পৃথিবীতে একান্ত দুর্লভ।

আজ মনে পড়ে সেদিনের কথা—যেদিন দার্জ্জিলিং থেকে তাঁর মহাপ্রস্থানের বার্ত্তা দেশময় বিঘোষিত হয়েছিল—আজ মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন প্রাতঃকালে কলিকাতা নগরীতে তাঁর মৃতদেহ আনীত হোলো, লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ অবহেলা করে শিয়ালদহ

ষ্টেশন থেকে কেওড়াতলা শ্মশান ঘাট পর্যান্ত নীরবে, সাশ্রুনয়নে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে শবানুগমন করে তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল। তাদের বীর অমর সন্ন্যাসী নেতার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশে গেলে চিতাভস্ম গ্রহণ করে আপনাকে কৃতার্থম্মন্যবোধ করে তারা ঘরে ফিরে ছিল—সেদিনের কথা বর্ষার নবীন মেঘের ভেতর আজ প্রোজ্জ্বল—সেদিনের কথা ভুলবার নয়। বাঙালী ভুলতে পারে না।

আজ সেই মহাপুরুষের কতিপয় অমূল্যবাণী তোমাদের সম্মুখে তুলে ধরছি ;—

"বাঙ্গালী যে অমানুষ তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে অনির্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি। বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙ্গলাকে জানে না।

* * * *

"কোথায় বাঙ্গলার আত্মা! জাগরিত হও, বল—সমস্বরে এই মন্ত্র পাঠ কর, বল এই রূপ আমার, এই প্রাণ আমার। বল—আমার অদৃষ্ট আমিই গড়িব, আমার সাহিত্য আমিই রচিব।"

* * * *

"আবার এমন একদিন আসিবে, যখন ভগবানের আশীর্ব্বাদে বাঙ্গালী জাতি সমগ্র পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, একটা জাতি বলিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে। আমার জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে আমি শুধু এই কামনাই করিতেছি।"

* * * *

"প্রাণ যখন জাগে তখন হিসাব করিয়া জাগে না, মানুষ জন্মায় সে তো হিসাব করিয়া জন্মায় না, না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলেই সে একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে।

* * * *

"বাঙ্গালী আবার বাঙ্গালী না হইতে পারিলে ভারতবর্ষে তাহার স্থান নাই। পৃথিবীর এই মহাপ্লাবনে সে হয় ত বা এবার ভাসিয়া যাইবে, কূল পাইবে না। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে এ প্লাবন শুধু ত্রয়োদশ শতাব্দীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর অভিযান নয়। ইহা পলাশী প্রান্তরে বিশ্বাসঘাতকতার জীর্ণ দ্বারে ক্লাইভের পদাঘাতও নয়। আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি ইহা তাহা অপেক্ষাও নির্ম্মম—তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ—তাহা অপেক্ষাও শোণিত পিচ্ছিল।"

* * * *

"বাধা বিঘ্ন ছাড়া কোন কাজই জাগ্রত হইয়া উঠে না সত্য, কিন্তু দেশবাসীর এত অযথা আক্রমণে মাঝে মাঝে মনটা বড় দমিয়া যায়, দেশত আমার নিজের নয়।"

* * * *

"আমার কাছে দেশ সেবা ইউরোপীয় রাজনীতির অনুকরণ নয়! সে আমার ধর্ম্মের অঙ্গ, আমার জীবন। আমার দেশমাতৃকার মূর্ত্তির মধ্যে আমার ভগবান জাগ্রত।"

"ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি, পিতৃপিতামহগণ সহস্র বৎসর ধরিয়া এদেশে বাস করিয়া গিয়াছেন, এখন আমরা বাস করিতেছি। এদেশের প্রতি ধূলিকণা আমাদের কাছে অতি পবিত্র।"

* * * *

"দেশ বলিলে আমি ইষ্টদেবতাকেই বুঝি। পাশ্চাত্যের দার্শনিক ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া আমি জাতীয়তাকে বুঝিতে শিখি নাই। দেশকে সেবা করিলে মানব সমাজকে সেবা করা হয়। আর মানব সমাজের মনুষ্যত্বের সেবাতেই ভগবানের পূজা সম্পন্ন হয়।"

পাঁচকড়ির প্যাঁচ

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

আম ফলেছে রাঙা রাঙা,
তাই তো পাঁচু চড়লো গাছে।
জানতো সে কি গলির মোড়ে
রাম-জমাদার হাজির আছে?
কোঁচড়টাকে ভর্ত্তি ক'রে
যেই নেমেছে ঘাসের 'পরে,
এক হাতে তার মোচড় দিয়ে
রাম-জমাদার জাপ্‌টে ধরে ;—
চল্‌লো টেনে থানার পথে,
ফল-চুরি তো 'চুরিই বটে?
পাশ দিয়ে বয় কুন্তী নদী,
বল্‌লে পাঁচু—'কি চট্‌চটে
হাত দুখানা লাগ্‌ছে আমার,
দাঁড়াও, ধুয়ে নিচ্ছি জলে।'
রাম-জমাদার কাছেই থাকে,
পাঁচু ঘাটের দিকেই চলে!—
জলে নেমেই বল্‌লে—'তোমার
এলাকাটার বাইরে আমি
জল-পুলিশের রাজ্যে এলাম!'
কথাটা তার সত্যি দামী।
জল-পুলিশের খোঁজে তখন
স্থল-পুলিশের ছুটোছুটি!
কোন ফাঁকে হায় পালায় পাঁচু
সাঁতার দিয়ে কোথায় উঠি'!

সজ্জার কি প্রয়োজন শুনি? সাহেব আসছেন সনাতন হিন্দুগৃহে। তাতে আবার অত ফষ্টিনাষ্টি কেন বাপু।

—ছাখো দাদা যা জানো না, সে সম্বন্ধে কোন ইন্টারী-ফিয়ার করতে এসো না।

হরিপদ মাইনর স্কুলের বিদ্যার বাইরে যে কটি ইংরেজী শব্দ শিখেছিল, সময়ে অসময়ে সেগুলোকে সে সর্বদাই কাজে লাগাত।

বামাপদ বললে, নব্য ছেলেরা তোরা—কোন কিছু বাঁচবিচার তো করবি না। পই পই করে বললাম যে আসছেন একজন বিশিষ্ট অতিথি। তা দিনক্ষণ দেখে নেমন্তন্ন কর,—তা নয় ঠিক মবার দিনে—

—ড্যাম তোমার মধা এ্যাও কথা, হরিপদ খচে গেল, তোমায়ও যে পই পই করে বারণ করেছিলাম, তোমার ঐ রাম-মার্কা টিকিটিকে অন্তত আজকের জন্যে একটু লুকোও, তা তো কিছুতেই করলে না। টিকি গেলে টিকি পাবে কিন্তু সাহেব দেখে যদি খচে যান তখন কিন্তু মহা ফ্যাচাং হবে।

—নে নে আর বকাসনে। সাহেব তো তোর মত নন, বলে বামাপদ বাঁ হাতে সুপুষ্ট টিকিটি পাকাতে পাকাতে চলে গেল।

দেয়ালের দিকে নজর পড়ায় হরিপদ আৎকে উঠে চিৎকার করে উঠলো—এই ছাখো হারামজাদার কাণ্ড। পচা ব্যাটাকে বললাম একটা ইংলিশ সিনারী টাঙাতে, তা নয় টাঙিয়েছে কিনা একটা কালি মূর্তির পট—পচা?

—আজ্ঞে, ভৃত্য পচা হাজির হল।

—কি, ভেবেছিস কী? এ ছবি এখানে কেন?

—আজ্ঞে বড়বাবু বলেছেন।

—যে বাবুই বলুক। নে খুলে নে এক্ষুণি. হরিপদ গর্জ্জনে আদেশ করলে, হ্যাঁ ভাল কথা হিন্দী কথা প্র্যাকটিস্ করেছিস? তোকে যে বয় সাজাব।

—আজ্ঞে হিন্দী দিয়ে কি হবে! সাহেব তো—বাংলা জানেন।

—চোপরাও, হরিপদ গর্জ্জিল, বাংলা। বাংলা ভদ্র সমাজে সাহেব সুবোর কাছে চলে? হরিপদর মুখ ভাবটা যেন সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইংরেজী কথা বলে যেতে পারে।

বাইরে এই, ভেতরে শ্যামাপদ লোমশ দেহ নিয়ে রান্নার তদারকিতে ব্যস্ত। হঠাৎ হা হা করে উঠতেই মেজ বউ স্বামীর মুখের দিকে চাইলো।

—সর্বনাশ করেছিলে মেজবউ। ঐ অতোখানি লঙ্কা বাটা মাংসে দিলে সাহেব একটা কুরুক্ষেত্র করে ছাড়তো। একি তোমাদের মত খেঁদি পেঁচির জিভ—

—কী বল্লে! আমরা খেঁদি পেঁচি, মেজবউ চোখ পাকিয়ে উঠলো, রইল তোমার রান্না। নিকুচি করেছি রান্নার আর নিকুচি করেছে তোমার সাহেবের।

—আরে আরে পাগল হয়ে গেলে নাকি মেজবউ, স্পর্দ্ধা দেখে শ্যামাপদর চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠলো, কি যা-তা বলছ? সাহেবের কানে উঠিয়ে চৌধুরী বংশকে প্রহার খাওয়াবে নাকি!

অনেক বুঝিয়ে তবে ফের তাকে রান্নায় বসালেন শ্যামাপদ।

কালীপদ ওদিকে বিরাট একটা শিল-নোড়া নিয়ে আধসেরটাক সিদ্ধি বাটতে ব্যস্ত। একটা ইয়া বড় জালা ভর্তি সরবত হবে। দুধ পেস্তা বাদাম চিনি ইত্যাদি দিয়ে খুব তরিবত করে জিনিষ বানাবে। আজ একটা দিনের মত দিন, আজ সিদ্ধি না খেলে চলে? বাটছে আর একটু খাচ্ছে। ভ্রাতারাও ফাঁকে ফাঁকে কিঞ্চিৎ টেষ্ট করে যাচ্ছে।

বেলা সাড়ে নটায় মিঃ ম্যাকফারসন এলেন।

আসবার সঙ্গে সঙ্গে চারি ভ্রাতা 'আসতে—আজ্ঞা—হোক' বলে তাঁকে বৈঠকখানায় নিয়ে বসালে। সমস্ত বাড়ীতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। চুপে-চাপে হাঁক ডাক শুরু হয়ে গেল।

পচাকে মাথায় বিরাট একটা হলদে রঙের পাগড়ি পরিয়ে 'বয়' সাজানো হয়েছে। ফল ফুলাদি অর্থাৎ কলা, কাটা আনারস, বেদানা আপেল ও বহু কষ্টে সংগৃহীত কিছু আঙ্গুর এনে টেবিলে সাজানো হল। মাছ হয়েছে, পোলাও মাংস, লুচি, পুডিং তপসে মাছ ভাজা ইত্যাদি সব কিছুই হয়েছে—দু-তিন রকমের মিষ্টান্ন দ্রব্যও আছে।

কালীপদ বড় দুটো কাঁচের যগ ভর্তি সিদ্ধির সরবত এনে টেবিলে রাখলো, সঙ্গে কয়েকটা বৃহদাকার কাঁসার গেলাস। তারপর চার ভ্রাতা প্রায় জোড় হস্তে দাঁড়িয়ে রইল। প্রত্যেকের চোখই সিদ্ধির নেশায় লাল। বামাপদর চোখে ভীতিভাব, শ্যামাপদর চোখে গর্বমিশ্রিত বিনম্রতা, কালীপদর চোখে মুগ্ধতা আর হরিপদর চোখ লজ্জা-ভারাক্রান্ত। তার কেবলি মনে হচ্ছিল কিছুই যোগাড় হয়নি, অশেষ ত্রুটি রয়ে গেছে। সাহেব যেন করুণা করে নিজগুণে সব কিছু ক্ষমা করে নেন—এই প্রকার ভাব ফুটে উঠেছিল তার দৃষ্টিতে।

—সিট্ ডাউন প্লিজ! সাহেব বললেন।

তিন ভাই তৎক্ষণাৎ বসে পড়লো। বামাপদ ম্লেচ্ছ জাতের সঙ্গে খেলে জাত যাবে ভয়ে 'পেট খারাপ হয়েছে স্যার' বলে দাঁড়িয়েই রইল।

হরিপদ একটা গ্লাসে সিদ্ধি ঢেলে সাহেবকে দিলে।

সাহেব বললে, সেকি! আপনারা ড্রিঙ্ক করবেন না?

চার ভ্রাতা সলজ্জভাবে এমন করে মাথা নীচু করলো যেন ভাবটা কেউ ইহজীবনে ও জিনিষ স্পর্শ পর্য্যন্ত করেনি।

—এটা ভাল দেখাচ্ছে না, সাহেব বললেন।

বামাপদ বিশুদ্ধ বাংলায় জানালে, সাহেব যদিও আমরা খাই তাহলেও আপনার মত গুরুজনের সামনে—

—ও নো নো, সাহেব বলে উঠলো, হোয়াটস্ হার্ম। উই আর অল ফ্রেণ্ডস্ হিয়ার। আমরা সব দোস্ত আছি।

চারটি গ্লাসে সিদ্ধি ঢালা হল। আবার ঢালা হল। তাও শেষ হল। আবার ঢালা হল··· এভাবে ঢালাও শেষ কয়েকবার হবার পর ভোজন আরম্ভ হল। পচা সার্ভ করছিল।

সাহেব গোগ্রাসে খাদ্য খেতে লাগলো। মাঝে মাঝে গুণ গুণ করে গানও গাইতে লাগলো।

শ্যামাপদ গুপ্ত একটি চিমটির সাহায্যে জ্যেষ্ঠ বামাপদকে আসল কথাটা উত্থাপন করতে ইসারা করলো।

বামাপদ চমকে উঠে একটু কেশে নিয়ে আরম্ভ করলে, হ্যাঁ দেখুন, বেয়াদপি মাফ করবেন স্যার, মানে আমাদের বাৎসরিক মায়ের পূজো পরশু আরম্ভ হবে।

সাহেব সিগারেট ধরিয়ে বললেন, আই নো দ্যাট।

সাহস পেয়ে কালিপদ বললে, আপনি আমাদের আত্মীয়স্বরূপ।

সংশোধন করে হরিপদ বললে, নিয়ারেষ্ট রিলেশান স্যার।

শ্যামাপদ বললে, আমরা ইচ্ছে করেছি স্যার যে এবার আমাদের পূজো বেশ কমিটি করেই করবো। যদিও বাড়ীরই পূজো, মানে—

হরিপদ বললে, স্যার সেই কমিটিতে আপনাকে সভাপতি থাকতেই হবে। আমরা মনোনীত করেছি আপনাকে।

—গোস্তাফী মাফ করে আমাদের এ মিনতি রাখতেই হবে হুজুর। পারলে বামাপদ সাহেবের পায়ে ধরে, এমনি ভাব। তার চোখের অবস্থা গুরুতর।

সাহেব ধোঁয়া ছেড়ে বললে, গ্ল্যাড্‌লি হব। কিন্তু তোমাদের হিন্দুদের গডেস্ যদি অফেণ্ডেড হন?

হরিপদ বললে, ছি ছি স্যার এটা দুর্গার, আই মিন— আমাদের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য যে আপনার মত—

—আহা হরে চুপ কর, বামাপদ থামিয়ে দিল, মানে হুজুর এ অনুরোধ যদি না রাখেন তাহলে আমরা বড়— নাকটি ফুলে ফুলে কান্না প্রায় আসছে বলে বামাপদ চুপ করে গেল।

সাহেব গুহ্যতত্ত্ব বুঝলেন, বললেন—অল রাইট্। আমায় কত ডোনেসান্ দিতে হবে? ধরো ফাইভ্ হাণ্ড্রেড রুপিজ—

কালীপদ গলে গিয়ে বললে, ছি ছি স্যার, সেকি, মানে—

বামাপদ 'আঃ' বলে কালীপদকে থামিয়ে দিয়ে বললে, [illegible] মাফ করবেন হুজুর। বলে কালীপদকে এক প্রকার টেনেই বাইরে নিয়ে গেল, তারপর চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, উল্লুক, তোর কি কোন বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। আসল কথাটা ভুলে মেরে দিয়েছিস। সাহেব আহ্লাদ করে দেবীর পূজোয় দিচ্ছেন কিছু, তা তা তুই কিনা —বাকিটুকু বলতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে কালীপদকে ধরে ফেলে চুপ করে গেল।

কালীপদর চোখে মিনতি, কোন রকমে জ্যেষ্ঠের পদধূলি নিয়ে বললে, ক্ষমা করো দাদা। তুমি পূজনীয়, ছোট ভাই এর এ অজ্ঞানতাবশতঃ অপরাধ কি ক্ষমা করবে না দাদা? দাদা বল? বলে দুই হাতে দাদাকে ঝাঁকুনি দিতে লাগলো।

বামাপদ গাঢ়কণ্ঠে বললে, যা এবার ক্ষমা করলাম। যা চুপ করে বসে থাকগে যা।

দুজনে টলতে টলতে পুনরায় ঘরে ফিরে এল।

পুনরায় সিদ্ধির গ্লাস পূর্ণ হল ও নিঃশেষিত হল।

হরিপদ ইতিমধ্যে গরম হয়ে উঠে গরম গরম বক্তৃতা আরম্ভ করে দিয়েছে তাদের পূর্বপুরুষদের কাহিনী সম্বন্ধে। কেমন করে তারা বীরত্ব প্রকাশ করতো ইত্যাদি বলতে গিয়ে আরো উষ্ণ হয়ে উঠলো। বললে, জানেন স্যার, আমরা কাউকে কেয়ার করি না। একবার আমার বাবার বাবা, ফাদার-ইন দ গড মানে আমাদের গ্র্যাণ্ডফাদার তরোয়াল দিয়ে সতেরটা সাহেবকে কুচি কুচি—

আঃ হরে—বামাপদ চীৎকার করে থামিয়ে দেয়। কেলেঙ্কারী করবে নাকি। সাহেবের সামনে কি যা-তা বলছ।

হরিপদ গরম তখন, বললে, ড্যাম্ তাতে হয়েছে কি। সত্যি কথা বলতে হরিপদ চৌধুরী থোড়াই কেয়ার করে। হক্ কথা বাবা।

শ্যামাপদ রেগে গেল, থাম উল্লুক। সমস্তই পণ্ড করবে দেখছি। সাহেব রেগে গেলেই তো অস্থির।

বামাপদ জোড় হস্তে ক্ষমা চাইল, বেআদপি মাফ করবেন হুজুর। আহাম্মকের কথায় কান দেবেন না। ও যা বলছে সবৈব মিথ্যে।

সাহেব হাসলো করুণা মিশ্রিত হাসি। তার চোখ ও দেহ সিদ্ধির প্রভাবে স্থির নেই। বললে, আই নো হি ইজ এ্যান ইডিয়ট। ভাল কথা তোমাদের গডেস্ কই?

—সে হুজুর ইয়ের বাড়ীতে, 'কুমোর' কথাটা সাহেব যদি না বোঝে এইজন্যে 'ইয়ে' বলে চালিয়ে দিল বামাপদ।

হরিপদর কেবলি মনে হচ্ছে, সাহেব তাদের কথাবার্তা আদৌ বুঝতে পারছে না, সে নিজে বুঝিয়ে না দিলে চলবে না। তাই 'কুমোরে'র ইংরেজী প্রতিশব্দ ভেবে না পেয়ে বললে, মানে স্যার আমাদের গডেস্ বর্ত্তমানে ক্রোকোডাইলস্ হাউসে আছে, সেখানে তৈরী হচ্ছে। 'কুমীরে'র সঙ্গে 'কুমোর' শব্দের কিঞ্চিৎ মিল আছে বলেই একথা বললো।

সাহেব হাসলো, আই সি পটারস্ হাউসে আছে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, স্যার, শ্যামাপদ বললে, স্বচক্ষে দেখবেন স্যার কি সুন্দর দেবী প্রতিমা আমাদের হয়।

—সরি, আমার দুর্ভাগ্য, সাহেব বললো পূজোর কদিন আমায় বাইরে যেতে হবে ইন্‌স্পেকশানের কাজে।

সকলে প্রায় হায়-হায় করে উঠলো, সেকি, তাহলে উপায়?

স্থির হল আজই কুমোর বাড়ী গিয়ে প্রতিমা বাড়ীতে নিয়ে আসা হবে। নয়, একদিন আগেই এল। কিন্তু সাহেব দেখলে না, এ কোন মতেই হতে পারে না। সাহেবও আনন্দের সঙ্গেই বললে, বেশ বিকেলে যাওয়া যাবে।

কালীপদ বললে, আগে এ ঝঞ্ঝাট ছিল না স্যার। চিরকাল বাড়ীতেই প্রতিমা গড়া হত। কিন্তু—

—কিন্তু একবার, বামাপদ বাধা দিয়ে বললে, ঠাকুর তৈরী হয়ে গেছে। কাঠামো থেকে মাটি লাগানো, রঙ থেকে সাজ সবই বাড়ীতে হত। যাই হোক প্রতিমা তৈরী —পুজোর আগের দিন হঠাৎ কি করে দেবীর দশ হস্তের একটি হস্ত ভেঙ্গে পড়লো। কি বলবো হুজুর, মানে—ইয়ে —হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, হ্যাঁ, মনে পড়ে।

—সঙ্গে সঙ্গেই আমার ঠাকুর্দার বাবার হাতটি টুক করে খসে পড়ে গেল।

ছি দাদা, শ্যামাপদ ভ্রূদুটি কুঞ্চিত করে বলে উঠলো, ওঁর সামনে আর মিছে কথা বলোনা। না স্যার, খামোকা হাত খসে পড়বে কেন? স্বপ্নে দেবী আদেশ দিলেন, আমায় আর বাড়ীতে তৈরী করবি নে। আর ডান হাত কেটে রক্ত দিবি। ঠাকুর্দার বাবা ছিলেন ভীষণ ধর্মপ্রাণ স্যার, তক্ষুণি তিনি একটা ছুরি দিয়ে ডান হাত থেকে কেটে রক্ত দিলেন দেবীকে। কিন্তু কি যেন ত্রুটি ছিল, হাতের ঘা সেপটিক হওয়ায়, হাতটাকে শেষ পর্যন্ত কেটে ফেলতে হল।—

বিকেলবেলা। একটা মস্ত নৌকো ঠিক করা হল। নদীর অপর পারে কুমোর বাড়ী। তারপর সেই নৌকোয় চারি ভ্রাতা ও সাহেব রওনা হয়ে গেল।

আশ্বিনের আকাশ, মেঘে মেঘে সাদা—জলীয় ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল চমৎকার। বামাপদ বললে, যদি অনুমতি করেন স্যার তাহলে আরেকটু সিদ্ধি—

সাহেব সানন্দে ঘাড় নাড়লো। মুখে ইংরেজী সুরে শিস্ দিচ্ছিলেন। গ্লাসপূর্ণ ও ফাঁকা হল কয়েকবার। এবারে প্রত্যেকের চোখে মুখেই রঙ ধরেছে বেশ। সাহেব অনভ্যস্ত গলায়ই গান ধরলে, ইফ দি বার্ড ক্যান ফ্লাই, হোয়াই ক্যান্ নট আই।

পাখীর মত উড়তে না পারার ব্যথাটা সাহেবের বুকে এতটাই বাজছিল যে তার চোখে মুখে পর্যন্ত করুণ ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

কালীপদ সাহেবের ওড়বার বাসনাকে নিরস্ত করবার জন্যেই যেন বললে, আপনাকে স্যার বড় কষ্ট দিলাম আজ। হরিপদ যোগ করলে, ফর নাথিং ট্রাবল্ স্যার।

সাহেব করুণ মুখেই বললে, নট্ এ্যাট্ অল, নট্ এ্যাট্ অল। ইটস্ এ প্লেজেন্ট ডে।

তারপর সুদীর্ঘ শ্বাসে আধা বাংলা ও আধা ইংরেজীতে যা বললে তা এই: এই নেটিভ দেশে এসে পর্য্যন্তই তার ট্রাবল। তার প্রপিতামহের কান্ট্রি হোমে কি সুখেই না সে ছিল। তারা কিন্তু খুব সম্মানী বংশ! তার পিতামহ জুতা তৈরী করলেও তারা খুব অভিজাত ইত্যাদি। ইত্যাদি। সাহেবের চোখে দুঃখে বা নেশায় জল এল। সে রোমাল দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়লো।

এটা দেখে চারভ্রাতারও কেমন কাঁদ কাঁদ ভাব হল। কি করে সহানুভূতি প্রকাশ করা যায় ভেবে না পেয়ে অবশেষে আরেক গ্লাস করে সিদ্ধি খেল।

কুমোর বাড়ী থেকে বিরাট প্রতিমা নৌকোয় তোলা হল। কুমোর অবাক হলেও বাবুদের চক্ষু ও মেজাজ দেখে মুখে কিছু বললে না। নৌকো বাড়ীর পথে চললো। প্রতিমাটি সুন্দর। চারিভ্রাতা অকারণে হঠাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো।

বামাপদ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, মাগো—এ অধমদের ক্ষমা করিস মা। মহাপাতকী আমরা। কত শত অপরাধই না তোর শ্রীচরণে—

আবার চার গ্লাস সিদ্ধি শেষ হল।

সাহেব খুব তীক্ষ্ণ ভাবে প্রতিমা নিরীক্ষণ করলে, পরে বললে, ওহ্ হোয়াট এ বিউটিফুল আফ্রিকান লায়ন।

—মার বাহন স্যার।

—হু ইজ দ্যাট, যুদ্ধরত মহিষাসুরকে দেখে সাহেবের প্রশ্ন।

—ওটা জায়েন্ট স্যার, হরিপদ বললে, মানে 'ইয়ে'র মত। মনে মনে হয়ত হিটলারের নামটা এসেছিল কিন্তু কি ভেবে চেপে গেল।

নৌকো চলতে লাগলো। নদীর মিঠে বাতাসে নেশাটা প্রত্যেকেরই খুলেছে। পশ্চিম দিগন্তে রক্ত গোধূলি—জলও লালে লাল।

আরো কয়েক গ্লাস সিদ্ধি শেষ হল।

তখন নেশার ঝোঁক সপ্তমস্তরে উপনীত। সাহেব সুবো, ভাই ব্রাদার, গুরুজন সব কিছুরই তারতম্য তখন লোপ পেয়েছে।

শ্যামাপদ গাইতে লাগলো। কালীপদ তাল দিতে লাগলো। হরিপদ নাচের ভঙ্গিতে হাততালি দিচ্ছে।

সাহেব যেন উপভোগ করছে এমন ভাবে মাথা নাড়তে লাগলো।

নদীর মাঝখান দিয়ে নৌকো চলেছে। সহসা বামাপদ চীৎকার করে উঠলো—ও হো আজ আমাদের কি শুভদিন।

কালীপদ সাহেবের পা জড়িয়ে ধরতে গেল, অধমকে মনে রাখবেন স্যার। বড় অনাথ আমি।

সাহেব তাকে তুলে বুকে চেপে ধরলো, নো নো মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড: ইটস্ ইম্পসিবল্ টু ফরগেট ইউ।

অকস্মাৎ বামাপদ পুনরায় গর্জ্জিল, আজ না বিজয়া, আর দেরী করা কেন? এসো বল মা দুর্গা কি জয়।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ ফাটিয়ে চারিদাতা 'মা দুর্গা কি জয়' বলে দড়ির বাঁধন খুলে সজোরে প্রতিমাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল।

আর নিজেরাও সেই সঙ্গে উল্লাসভরে জলে লাফিয়ে পড়লো।

এই পর্যন্ত বলে গাঙ্গুলী দাদু ভুড়ুক ভুড়ুক করে নিভে যাওয়া গড়গড়ায় টান দিতে লাগলেন' তারপর বললেন, সেই অকাল বিজয়ার অভিশাপে চৌধুরী বংশ নির্বংশ হয়ে গেল। তাহলেই বোঝ এক সিদ্ধির কি মহিমা।

জেনে রেখো

কোকিল কখন নিজের বাসা তৈয়ারী করে না। পেঙ্গুইন পাখী দাঁড়িয়ে ডিমে তা দেয়। তিতির পাখী একসঙ্গে সবচেয়ে বেশী ডিম পাড়ে। উইলো গাছ থেকে খেলার ক্রিকেট-ব্যাট তৈয়ারী হয়। হকি ষ্টিক এ্যাস কাঠ থেকে প্রস্তুত হয়। টিকটিকি নিজের ল্যাজ খসিয়ে ফেলে। জায়াণ্ট স্কুইড হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রাণী,—এরা উত্তর আটলাণ্টিক অঞ্চলে বাস করে এবং প্রবাল সমুদ্রের মধ্যে পাহাড় তৈরী করে। সবচেয়ে ছোট প্রাণীর নাম সি এনিমরি... জল না নিয়েও বেশ কিছুদিন উট চলতে পারে। তাড়া করলে বালির ভিতর একমাত্র অষ্ট্রিচ পাখী লুকিয়ে পড়ে। দেহের থলির ভেতর বাচ্চা নিয়ে চলে ক্যাঙ্গারু। সবচেয়ে লম্বা প্রাণী হচ্ছে জিরাফ। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ দৈত্য হচ্ছে কালিফোর্নিয়ার জঙ্গলে রেড উড—কুড়ি ফিট ব্যাসার্দ্ধ, ৩৫০ ফিট উঁচু। ক্যানারি দ্বীপের লরেন পাখীই কেবল কাঁদে। উট আর চিতা বাঘের সংমিশ্রণ বিশিষ্ট অবয়ব যুক্ত প্রাণী হচ্ছে জিরাফ। একমাত্র হায়েনা বড় হাড় চিবোয়। স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে হাতী। প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে মুখের হাঁ বড় হিপোপোটমাসের। পক্ষীদের মধ্যে পঙ্গুবুড়োর মত খুঁড়িয়ে হাঁটে পেঙ্গুইন। ছয় মাস চুপচাপ নিষ্কর্ম্মা হয়ে বসে থাকে একমাত্র মেরু প্রদেশের ভালুক।



ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আশ্চর্য্য

সর্ব্ববৃহৎ হ্রদ—উলার হ্রদ, কাশ্মীর।
" নদী—ব্রহ্মপুত্র
" সহর—কলিকাতা ২৯,৮০,৩০৭
সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘপথ—গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড, ১৫০০ মাইল।
" উচ্চস্তম্ভ—কুতবমিনার, দিল্লী।
" উচ্চজলপ্রপাত—গারসোপ্পা প্রপাত, মহীশূর (৯৬০ ফিট)
" বৃহৎ মসজিদ—জুম্মামসজিদ, দিল্লী
" দীর্ঘ সেতু—শোণ ব্রিজ, বিহার (১০,০৫২ ফিট)
" দীর্ঘ দরদালান—রামেশ্বরম্ মন্দির (৪,০০০ ফিট)
" বৃহৎদ্বার—বুলান্দদরওয়াজা, ফতেপুর সিক্রী (১৭৬ ফিট)
" লম্বা প্লাটফর্ম্ম—শোণপুর, বিহার
" উঁচু প্রস্তর মূর্ত্তি—গোমটেশ্বর, মহীশূর (৫৭ ফিট)
" আর্দ্রস্থান—চেরাপুঞ্জি (৪২৮ ইঞ্চি বারিপাত)
" উষ্ণস্থান—বার্ম্মার (রাজস্থান)
" বৃহৎ গুহা—এলোরা, বোম্বাই,
" সুন্দর সৌধ—তাজমহল, আগ্রা।
" বৃহৎ মেলা—শোনপুর মেলা, বিহার।
" ঘন বসতিপূর্ণ স্থান—কেরালা, প্রতিবর্গ মাইল ১,১১,৪৫ ব্যক্তি
" বৃহৎ দ্বীপ—সুন্দর বন (৮,০০০ বর্গ মাইল)
" বৃহৎ গম্বুজ—গোলগম্বুজ বিজাপুর।
আয়তনে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য—বোম্বাই ১৯০,৯১৯ বর্গমাইল।
" " ক্ষুদ্ররাজ্য—কেরালা ১৫০৩৫ বর্গমাইল।
জনতাপূর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য—উত্তরপ্রদেশ ৬৩,২১৫,৭৪২
সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিকল্পিত সহর—নয়াদিল্লী
" বৃহৎ পাঠাগার—ন্যাশান্যাল লাইব্রেরী, কলিকাতা।
" বৃহৎ যাদুঘর—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, কলিকাতা
" বৃহৎ চিড়িয়াখানা—আলিপুর জু, কলিকাতা,
" দীর্ঘ খাল—সর্দ্দা ক্যানাল, উত্তরপ্রদেশ।
" বৃহৎ অরণ্য আয়তন বিশিষ্ট রাজ্য—আসাম
" লম্বা ক্যান্টিলেভার সেতু—হাওড়া ব্রিজ
" প্রাচীন সেতু—গোমতী নদীর উপর আয়রণ ব্রিজ, লক্ষ্ণৌ।

ষট্‌পদী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

কবিতা ব্যথার সৃষ্টি, করে চিত্তে আকুল উদাস
আচ্ছন্ন করে তা মেঘে সুনির্মল চিত্তের আকাশ।
দুঃখ শান্ত করে না তা, দুঃখী জনে কি করিবে তায়?
কবিতা সুখীরই জন্য এর মাঝে বৈচিত্র্য সে পায়।
সুখের প্রাচুর্য যার—সে-ই কিছু করিয়া বর্জন,
কবিত্বে করিতে পারে বেদনার মাধুর্য অর্জন।

(২)

অনিষ্ট করার শক্তি যত পারো করিবে অর্জন
অনিষ্ট কোরো না কারো, মাঝে মাঝে করিও গর্জন।
কর বা না কর ইষ্ট বশীভূত রবে সব লোক,
মানিবে সকলে তোমা ভয়ে হোক, ভরসায় হোক।
ইষ্ট যদি করো কারো দুই-দিনে যাবে তাহা ভুলে
পাছে ক্ষতি করো ভয়ে চিরদিন রবে পদ মূলে।

(৩)

আঁখি মেলি যাহা পাই তাহা শুধু আলোকের ফাঁকি।
সত্যেরে পাইতে হলে মুদিতে হইবে দুই আঁখি।
আকাশের সত্যরূপ ঢেকে রাখে রবির কিরণে
রজনীর অন্ধকার প্রকাশিত করে তা ভুবনে।
জ্ঞানে যারে পাইনাক যা হারাই, ধ্যানে পাই তারে,
দিবসে পাই না যারে পাই তারে রাতের আঁধারে।

(৪)

কাল তটিনীর বুকে বুদ্‌বুদ জাগি ক্ষণ পরে পায় বিলয়।
তাহাদের এই বিম্বজীবন এ একটি পলের বেশি ত নয়।
সেটুকুরও ত্বর সহেনা হায়রে
একে আরে শুধু আঘাত হানে।
যেই অবসানে নেই বিলম্ব তারেও যে তারা
আগায়ে আনে।
বিম্বিত যাতে রবির কিরণ তাহারো গর্ব অল্প নয়।
ভাবে সে বিম্ব কনক ডিম্ব হইয়াছে যেন জ্যোতির্ময়।

(৫)

সুখ্যাতি দুর্লভ ধন। এক আনা সুখ্যাতির লোভে
অখ্যাতি পনেরো আনা অর্জি কেন, মরি তাই ক্ষোভে।
সামান্য সুদের লোভে কেন হায় হারাই আসল,
একথা বুঝেও হায় বুঝিনাক লেখকের দল।
দুঃখের এ দুনিয়ায় শান্তি স্বস্তি বহুমূল্য ধন,
সামান্য যশের লোভে মুক্ত মোরা দিই বিসর্জন।

(৬)

অপরাধ? অপরাধ কি করেছে বলো কেবা ভাবে?
কি করিবে, মনে মোর জমা হলে বহু গালাগালি?
আমার সম্মুখ দিয়া শুভ্রবাসে কেন ওরা যাবে?
জানে না আমার হাতে পিচকারি ভরা আছে কালি?
আঘাত করার লোভ রোষ-ক্ষোভ বুকে হলে জমা
অপরাধ-না-করার অপরাধও করিব না ক্ষমা।

(৭)

দিন দিন বাড়ে যত পথের সঞ্চয়
গতি তত মন্দ হয় চরণের তত বলক্ষয়।
সে সঞ্চয় হয়ে শৈলবৎ
রুদ্ধ করে আগাবার পথ।
হায় মূঢ় সঞ্চয়-মমতা
করে আমাদেরে পঙ্গু হরি নয় চলার ক্ষমতা।

(৮)

নাহি যেথা জাগরণ, স্বপ্নভূমি সেই অলকায়
যক্ষই ফিরিয়া যেতে চায়।
মোরা চাই সত্য, স্বপ্ন, রৌদ্রচ্ছায়া—হর্ষ হাস্য শোক
অশ্রুভরা এই মর্ত্যলোক।
দুর্বহ দুঃসহ তবু বাঁচাইতে চাই হেথা প্রাণ,
স্বর্গ হতে মর্ত্য গরীয়ান।

(৯)

অমৃত তোমারে দিতে চেয়েছিনু তুমি ফিরাইলে মুখ,
লাঞ্ছিত হলো সঞ্চিত আশা, বঞ্চিত হলো বুক।
আজি অসময়ে আসিয়াছ তুমি পাতিয়াছ অঞ্জলি,
থাকিলে দিতাম, নাই অভিমান তুমি ফিরায়েছ বলি'
আজ যাহা আছে তাহাত তোমায় দিবার যোগ্য নয়
জান না বন্ধু বিকৃত হইলে অমৃতও বিষ হয়?

(১০)

মেঘে ঈর্ষা করি গিরি ঊর্ধ্বপানে চায়
ইচ্ছা করে মেঘরূপে ক্ষোভটি মিটায়।
চলিতে না পারে গিরি, জলদ চঞ্চল,
সে ক্ষোভ মিটে না তার ঢালে আঁখিজল।
মেঘেরে ডাকিয়া কয়,—"কেন করতালি
আমিও তোমারি মত দেখ জল ঢালি।"

পীরের ফ্রাঁসোয়াকীলিয়ে বা পেঁর

অনুরূপা দেবী

৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে পেঁর আগ্রায় গিয়াছিলেন। উক্ত স্থান রক্ষা করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। স্বীয় পত্নী এবং ২৪ লক্ষ টাকা (৭২ লক্ষ লিঅ) যাহা তিনি নিজ শ্যালিকা-পুত্র কিল্লাদার জর্জ্জ হেসিঙ্গের নিকট রক্ষা করিয়াছিলেন—লইয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। হেসিঙ্গকে তিনি ঐ মর্ম্মে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্তরে হেসিঙ্গ জানাইয়াছিলেন যে ইচ্ছা করিলে পেঁর আগ্রায় প্রবেশ করিয়া স্বয়ং অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু যতক্ষণ তিনি নিজে ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ততক্ষণ তিনি তাঁহার নৃপতির প্রতি বিশ্বস্ত রহিবেন এবং তাঁহার সকল শত্রুর বিরুদ্ধে উক্ত স্থান রক্ষা করিবেন। হেসিঙ্গ আরও জানাইয়াছিলেন যে টাকাটা সিন্ধিয়ার; একমাত্র তিনিই উহার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম। পেঁরর পত্নী এবং সন্ততিবর্গকে তিনি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পেঁর নগর প্রবেশ করিতে সম্মত হন নাই। সেজন্য ইহার বেশী অপর কিছু লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে ইংরাজেরা তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে। সেই ভরসাতেই তিনি এই ক্ষতিতে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অপরাপর বহুক্ষেত্রের মত পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ এ ক্ষেত্রেও প্রমাণ করিয়াছিল যে, বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি তাহার প্রভুদ্রোহ হইতে যাহারা লাভবান হয় তাহাদের দ্বারাই প্রতারিত হইয়া থাকে।

দিল্লীর ধনী মহাজন আসোনেরাহর্ (?) নিকট পেঁরর আরও ১২ লক্ষ টাকা (৩৬ লক্ষ লিঅ) জমা ছিল। কিন্তু তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী সৈনিকবর্গের প্রবল উত্তেজনার জন্য তাঁহার পক্ষে এই অর্থ উদ্ধার করিতে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। এই সময়েই সমুদয় সতর্কতা বিসর্জ্জন দিয়া তিনি স্বীয় অবমাননা এবং তাঁহার প্রতি যাহার ভার অর্পিত হইয়াছিল সেই জনপদসমূহের এবং সৈন্যগণের সর্ব্বনাশ সমাধা করিয়াছিলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি ইংরাজ সেনাপতিকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি সিন্ধিয়ার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন এবং লখ্‌নৌ যাইবার জন্য একটি পাসপোর্ট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইংরাজী সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত লর্ড লেকের একটি সরকারী ডেস্প্যাচ হইতে এই তারিখটি স্থির হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধান সেনাপতি ম্যাসিয় পেঁরর নিকট হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখ-যুক্ত একখানি পত্র পাইয়াছিলেন; তাহাতে তিনি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং নিজ পরিজনবর্গ, সম্পত্তি এবং যে সকল অফিসর তাঁহার নিকট আছে তাহাদের লইয়া মাননীয় কোম্পানীর এবং নবাব-উজীরের রাজ্যাভ্যন্তর দিয়া লখ্‌নৌ যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। মিঃ পেঁর এতদ্ভিন্ন প্রধান সেনাপতিকে, কতকাংশে ইংরাজ সৈন্য এবং কতকাংশে তাঁহার নিজের দেহরক্ষীগণ লইয়া গঠিত একদল প্রহরীসেনা তাঁহার সহিত দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। জেনারেল লেক তৎক্ষণাৎ মিঃ পেঁরর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে একজন ইংরেজ অফিসরের সমভিব্যাহারে কোম্পানীর রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে লখ্‌নৌ অবধি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি পেঁরকে তাঁহার নিজের রক্ষীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং বৃটিশ জনপদ মধ্যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের সকল নিদর্শনের সহিত যাহাতে তিনি অভ্যর্থিত হন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আমরা দেখিয়াছি তাঁহার চিঠির তারিখ ৫ই সেপ্টেম্বর পেঁর যথা নির্দ্দিষ্টভাবে সিন্ধিয়ার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অবশ্য যদি হীন রাজদ্রোহকে ঐ আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। ৬ই তারিখে তাঁহার মনে পড়িয়াছিল যে দিল্লীর সম্মুখে তখনও প্রত্যেকটিতে ৮০০০ সুশিক্ষিত সৈন্যসম্বলিত দুইটি ব্রিগেড ছিল যাহাদের অফিসরগণ তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতায় কোন অংশ লয় নাই বলিয়া তখনও ইংরাজদিগকে যুদ্ধদান করিতে পারে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ঘটনাবলী তাঁহার অপমান গভীরতর করিবে এবং তিনি কাপ্তেন গুয়েরিনিয়েরকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। আসল পত্রটি আমার নিকট আছে এবং আমি তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রদান করিতেছি—

মহাশয়,

গভীর পরিতাপের সহিত আমি এইমাত্র জানিলাম যে কর্ণেল লুই বুরক্যা বিদ্রোহী হইয়াছেন। পত্রপ্রাপ্তিমাত্রে আপনি এক জোড়া ভাল পিস্তল লইয়া কর্ণেল বুরক্যার কোয়ার্টাসে যাইবেন এবং তাঁহাকে বলিবেন—সেনাপতির নিকট হইতে আমি আপনাকে গ্রেফ্‌তার করিবার আদেশ পাইয়াছি। আপনি আত্ম-সমর্পণ করিবেন কিনা? যদি তিনি বলেন তিনি ঐ কাজ করিবেন না তাহা হইলে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার মস্তিষ্ক উড়াইয়াদিবেন। তাহার পর অফিসর এবং সৈনিকগণকে এই চিঠিখানি দেখাইবেন এবং তাহা করিবার পর আমার নিকট যোগ দিবার জন্য সত্বর ব্রিগেডসহ যাত্রারম্ভ করিবেন।

শিবির, মহাশয়, আমি আপনার
তাং ৬ই সেপ্টেম্বর ১৮০৩ বিশ্বস্ত ভৃত্য
(সাং) সি, পেঁর

আপনি যদি ফরাসীজাতীয় হন এবং মহারাজ দৌলৎ রাও সিন্ধিয়ার কর্ম্মনিরত থাকেন তাহা হইলে আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন।

(সাং) সি, পেঁর

কিন্তু ইহাই পেঁরর একমাত্র বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য ছিল না। তাহার একটি নিজস্ব এজেন্ট ছিল; ঐ ব্যক্তি সেনাদলে বক্সীর কার্য্য করিত। তিনি উহাকে সৈনিকগণের রাজভক্তি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য আমার ব্রিগেডে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার এ চাল ব্যর্থ করিয়াছিলাম এবং উক্ত ব্যক্তিকে বুঝাইয়া রাজার প্রতি বিশ্বাসী থাকিতে সম্মত করাইয়াছিলাম। এতন্মধ্যে সে মেজর দ্রুজ্ঁ্য, মেজর গেসল্ঁ্যা এবং আমার নিকট একটি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়াদিয়াছিল। ফরাসী ভাষায় লিখিত উক্ত দলিলটি আমার নিকট আজও আছে।

পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে যে, মোগল সম্রাটের পক্ষে আমার শিবিরে আসা সম্বন্ধে মনস্থির করার প্রতীক্ষা করিয়া আমি পেঁরর আদেশানুসারে দিল্লীর নগর-প্রাকারের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলাম। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ভারতবর্ষে যেমন দ্রুত প্রচারিত হইয়া পড়ে এমন আর কোন দেশে হয় না। প্রত্যেক ব্রিগেডে সংবাদ-লেখক, প্রত্যেক রাজার সেনাদলে লেখক থাকে, উহাদের কাজ হইল প্রতি সন্ধ্যায় সারাদিনের ঘটনাসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। ২৯শে আগষ্টের ব্যাপার, পেঁরর লজ্জাস্কর পলায়ন এবং তাঁহার লড়িতে অসম্মতি সকল কথাই অতি দ্রুত প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম যে সকল কথা কানে আসিয়াছিল আমি তাহা বিশ্বাস করিতে চাহি নাই এবং যাহারা সে সকল প্রচার করিয়াছিল আমি তাহাদের চুপ করিয়া থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু সংবাদসমূহের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া অচিরেই আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকগুলি খবরাখবর আমার নিকট পৌছিয়াছিল এবং আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে সত্যসত্যই বিপদপাৎ হইয়াছে। অতঃপর আমার ব্রিগেডের প্রধান প্রধান মারাঠা অফিসারগণকে সমবেত করা এবং তাঁহাদের সহযোগে রাজার সকল আপদে বিপদে তাঁহার সাহায্যকল্পে দণ্ডায়মান হওয়া ও ইংরাজদিগকে যুদ্ধদান করার এক স্বীকৃতিপত্র স্বাক্ষর করা—ফরাসীতে লিখিত এই মূল একরার নামা আমার কাছে আছে।

প্রথম ক্রোধোত্তেজনা বিস্ফোরণের পর আমার শিবির মধ্যে সকল বিভাগেই একটা সাধারণ অবিশ্বাসের ভাব দেখা দিয়াছিল। চারদিকে রব উঠিয়াছিল, সব ফিরিঙ্গিরাই দাগাবাজ; সকলে তাহাদের নিমক-হারাম' নেতার সহিত একজোট। পেঁর কর্তৃক প্রেরিত চরেরা বিশৃঙ্খলা ও রাজদ্রোহ সৃষ্টি, সৈনিকগণের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার এবং তাহাদিগকে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিতেছিল। অবস্থা ক্রমে এমন চরমে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল যে আমি আমার ইউরোপীয় অফিসরগণের সমভিব্যাহারে আমারই নিজের সৈনিকগণ কর্তৃক বন্দী-কৃত হইয়াছিলাম। আমার শিবির চারি কোম্পানী সৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছিল এবং নিস্কোষিত তরবারী হস্তে ১২ জন শাস্ত্রী আমার প্রহরায় নিযুক্ত হইয়াছিল। সিপাহীরা জনৈক মারাঠা কর্ম্ম-চারীকে তাহাদের নেতৃপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল; ঐ ব্যক্তি আমি পেঁরর সহিত লিপ্ত কিনা তাহা নিরূপণের জন্য আমার কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল। আমার নির্দোষিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আমার সৈন্যগণ যাহারা আমার অনুরক্ত ছিল পুনর্ব্বার আমাকে দুইদিন পরে অধ্যক্ষতা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু তবুও সৈন্যদলে কতক পরিমাণ স্বাভাবিক সন্দেহ রহিয়া গিয়াছিল; সে কারণ শাস্ত্রী-গণ প্রত্যাহৃত হয় নাই। আমাকে বলা হইয়াছিল যে আমরা যাহার তটে শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থিত ছিলাম, সেই যমুনা নদী উত্তীর্ণ হওয়া এবং ইংরাজদিগকে যুদ্ধ প্রদান করা ভিন্ন সৈন্যগণ নড়িবে না। মেজর গেসল্ঁ্যা পরিচালিত ব্রিগেডেও অনুরূপ ঘটনাসমূহ সংঘটিত হইতেছিল। আমার সময়ে তিনিও ধৃত হইয়াছিলেন এবং আমার মতই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। আমরা কি ভাবে চলিব সে সম্বন্ধে আমরা পরামর্শ করিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার অপেক্ষা সিনিয়র ছিলাম বলিয়া উভয় ব্রিগেডের নেতৃত্ব আমিই গ্রহণ করিয়াছিলাম।

আমাকে প্রদত্ত কর্তৃত্ব শুধু নামেই ছিল। আদেশ দানের পরিবর্ত্তে আমাকেই বরং শৃঙ্খলা-বন্ধতাহীন সৈনিকগণের নিকট হইতে আদেশ গ্রহণ করিতে হইত। ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার সময় নিজেদের পিছনে কোন শত্রু রাখিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহারা আমাকে জানাইয়াছিল যে দিল্লীতে যিনি অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন সেই মেজর দ্রুজ্ঁ্যাকে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করাইতে তাহারা ইচ্ছুক। সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি লোককে প্রবেশ দ্বারসমূহের নিকট পাঠান হইয়াছিল এবং বাদসাহের পতাকা প্রদর্শিত হইয়াছিল। মেজর তাহার উপর অস্ত্রবর্ষণ করিয়াছিলেন। সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ গড়খাই করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি অবরোধের বিরোধী ছিলাম, কারণ উহার জন্য বিলম্ব সমর্থনের অযোগ্য ছিল। তাহা ছাড়া ইংরাজদিগকে পরাজিত করিতে আমি সমর্থ হইলে, পরে ঐ স্থানে প্রবেশ লাভ করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র আয়াসসাধ্য হইত না। কিন্তু আমার যাহারা মন্দ ইচ্ছা করিত তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে সন্দেহাধীনে রাখা এবং তাহারাই সাফল্যলাভ করিয়া-ছিল। গুজব রটিয়া গেল পলায়নের জন্য আমি শিবির মধ্যে একটি সুসজ্জিত অশ্ব সর্ব্বদা রাখিয়া থাকি। ফলে একদা নিশীথে ৩০০ রোহিলা তথায় আসিয়াছিল। আমাকে গভীরতম অবমাননা করাই তাহাদের সঙ্কল্প ছিল। আমার তাম্বুর দ্বারের প্রহরী দেশীয় অফিসর স্বীয় দৃঢ় আচরণের বলে তাহাদের ভয় দেখাইয়া ফিরাইয়া না দিলে অন্ধ উত্তেজনার বশে তাহারা সব কিছুই করিয়া বসিতে পারিত। তিনি শিবিরের দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রবেশ করিতে দেন নাই এবং বলিয়াছিলেন আমার আচরণের জন্য তিনি স্বীয় মস্তক দিয়া জামীন থাকিতে প্রস্তুত আছেন। অতঃপর তিনি শিবিরের কার্ণাৎ তুলিয়া দিয়া উহাদের দেখাইয়াছিলেন যে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন। রোহিলারা তখন ফিরিয়া গিয়াছিল।

এই গোলযোগ প্রশমিত হইতে না হইতেই আমাকে পুনরায় অপর একটির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বশ্যতা সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। দুইটি ব্রিগেডের দেশীয় অফিসারগণ সকলে দল বাঁধিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহাদের সৈনিকগণের উপর

সকল প্রভাব তিরোহিত হইয়াছে এবং আমার নিরাপত্তার জন্ত তাঁহারা আর দায়ী হইতে পারিবেন না। সৈনিকগণের প্রভুভক্তির উপর আত্মনিক্ষেপ করিতে তাঁহারা আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি ব্যাটালিয়নগুলিকে প্যারেড করাইয়াছিলাম এবং তাহাদের বলিয়াছিলাম আমি তাহাদের সকল কথাই শুনিতে প্রস্তুত। আমি আরও বলিলাম যে অতঃপর সাধারণ সিপাহীর মত যুদ্ধ করিতে এবং তাহাদের একজন হইয়া বাস করিতে আমি ইচ্ছুক। আমার এই ভাব উহাদের হৃদয়স্পর্শ করিয়াছিল। তাহারা পরম উৎসাহের সহিত আমার জয়ধ্বনি করিয়াছিল, আমাকে সম্মান করিবার শপথ করিয়াছিল এবং শোভাযাত্রা সহকারে আমাকে শিবিরে লইয়া গিয়াছিল। তথায় আমি তাহাদের অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম।

সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয় পুনরানয়নের উদ্দেশ্য লইয়া আমি নৃপতির জনৈক আত্মীয় বাপু সিন্ধিয়াকে সাহারাণপুর হইতে আহ্বান করিবার এবং নিজে তাঁহার আজ্ঞাধীনে থাকিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এই প্রস্তাব অনুকূলভাবে পরিগৃহীত হইয়াছিল এবং আমিও বাপু সিন্ধিয়ার নিকট সংবাদবাহক পাঠাইয়াছিলাম। তিনিও কালবত্যয় ব্যতিরেকে সেনাদলে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে একটি অনুপণেয় ক্ষতি দৌলৎ রাওসিন্ধিয়ার চাকরীতে আমার সামরিক জীবনের অবসান ঘটাইয়াছিল।

১০ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে দুইজন হরকরা আমাদের নিকট সংবাদ আনিয়াছিল যে ইংরাজেরা আলিগড় দুর্গ সম্মুখ-আক্রমণে অধিকার করিয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। আমাদের সৈন্যদল সহ আমরা নদী পার হইয়া উহাদের সহিত লড়িতে যাই—ইত্যবিধ চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। আক্রমণের প্রথম সুযোগ গ্রহণ করিতে অসমর্থতা এবং শত্রুকে যাত্রারম্ভ করিবার পূর্ব্বে আক্রমণ করিতে না পারার জন্য, অবস্থাচক্র অন্যরূপ হইলে আমি যমুনা নদীর পারেই অপেক্ষা করিতাম এবং বিপক্ষের নদীপার হওয়াতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু আমি তখন যেরূপভাবে অবস্থিত ছিলাম তাহাতে আমার পক্ষে নিজেকে একদিকে ইংরাজদিগের তোপ এবং অপরদিকে দিল্লীদুর্গের তোপের মধ্যে দেখিতে পাওয়া বিচিত্র ছিল না। তদ্ভিন্ন আমি ইহাও ভাবিয়াছিলাম যে সৈন্যগণের মধ্যে শৃঙ্খলা ও বশ্যতা পুনরানয়নের জন্য যে শিবিরে তাহারা বিদ্রোহ করিয়াছিল তথা হইতে উহাদিগকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক। তাহাদের মনে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের ধারণাটাই নদী পার হওয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল। আমি আশা করিয়াছিলাম একবার ঐ ধরণের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে লিপ্ত হইলে তাহারা নিজেরাই সামরিক শৃঙ্খলা ও বশ্যতার প্রত্যাবর্ত্তনের উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিবে। সেকারণ কালবিলম্ব না করিয়া তাহাদের উৎসাহের সুযোগ লইবার অভিপ্রায়ে আমি নিকটতম ব্যাটালিয়নের পতাকাটি গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং উচ্চৈস্বরে সকলেরে জানাইয়াছিলাম যে, যে কেহ ইংরাজদিগের সহিত লড়িতে ইচ্ছুক সে যেন আমার অনুসরণই করে। আমি সোজা নদীতটে গিয়াছিলাম এবং এক কোম্পানী সৈনিকসহ নদী পার, হইয়াছিলাম। তখন সকাল আটটা। রাত্রি ১১টার মধ্যে আমার নিকট ৩০০০ অশ্বারোহী, ১০ ব্যাটালিয়ন পদাতিক এবং বিগ্রেডের তোপখানার ৬০টি কামান ছিল। দিল্লীর সম্মুখে পরিখা মধ্যে আরও পাঁচ ব্যাটালিয়ন রহিল।

মেজর ড্রুজ্য আমি ইংরাজদের পরাজিত করিতে পারিলে আমার প্রতিশোধ স্পৃহার ভয়ে রাত্রিকালে আমার নিকট তাঁহার আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিলেও আমি কোন আপত্তি না করিয়া তাহাতে সহি করিয়াছিলাম।

পরদিন সকাল ৮টার সময় আমি সংবাদ পাইলাম যে বিপক্ষের অগ্রগামী দল আমাদের নিকট হইতে মাত্র দুই লিগ দূরে আসিয়া পহুঁছিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার সওয়ারদের সম্মুখে প্রেরণ করিলাম। উহারা তাহাদের উপর নিপতিত হইয়া সম্পূর্ণভাবে তাহাদের পরাজিত করিয়াছিল। এদিকে আমি যুদ্ধার্থ আমার সৈন্যদল সাজাইতে ব্যস্ত ছিলাম। আমি পংক্তি হইতে প্রায় ৫০পদ সম্মুখে রহিয়াছি, এমন সময় একটি অশ্বারোহী আমার নিকটে আসিয়া পের'র লিখিত একখানি পত্র আমার হস্তে প্রদান করিয়াছিল। উহা আগাগোড়া তাঁহার নিজহাতে লেখা, উহা এখনও আমার কাছে আছে। উহা এইরূপ ছিল,—"লুই এখনই আমার নিকট আইস। আমি তোমাকে কথা দিতেছি যদি আমার প্রস্তাব তোমার নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে তোমার প্রত্যাবর্ত্তনে কোন বাধা দেওয়া হইবে না। আইস, ফ্রান্সের স্বার্থ, তথা সিন্ধিয়ার স্বার্থ বিনাশ করিওনা। আমার নিকট যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র তাহার নামে আমি শপথ করিতেছি যে যদি তুমি সন্তুষ্ট না হও তাহা হইলে তুমি ফিরিয়া যাইতে স্বাধীন থাকিবে। যাত্রা কর আমার প্রিয় লুই, যাত্রা কর, যাত্রা কর।

মথুরা, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮০৩ (মাং) পেঁর

চিঠিখানি আমার পড়া হইলে পরে পত্রবাহক আমাকে গোপনে কিছু বলিবার আছে বলিয়া আমাকে একান্তে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। আমি যদি তখন জানিতাম যে, যে ব্যক্তি ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমাকে ফ্রান্সের স্বার্থ এবং নৃপতির স্বার্থ সম্বন্ধে এরূপ বন্ধুভাবে কথা বলিতে পারে সে-ই ৫ই সেপ্টেম্বর ফ্রান্স এবং নৃপতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ইংরাজ রাজ্যে আশ্রয় লইবার জন্য পাসপোর্টের আবেদন করিয়াছে এবং ৬ই তারিখে আমাকে গুপ্তহত্যা করিবার আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে তাহা হইলে আমার কোনই সন্দেহ থাকিত না যে এই নবীন চরও অনুরূপ কার্য্যভার লইয়া আসিয়াছে এবং আমি অবশ্যই তাহাকে গ্রেফ্তার করাইতাম। কিন্তু আমি উক্ত চরের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এবং তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়াই নিরস্ত হইয়াছিলাম।

যুদ্ধার্থ সৈন্যসজ্জা করিবার কালে মেজর গেসল্যার ব্রিগেড আমার ব্রিগেড অপেক্ষা সিনিয়র ছিল বলিয়া আমি উহাকে ডান দিকে রাখিয়া

ছিলাম। আমার অশ্বারোহী সেনাদলের লক্ষ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে আমি তৎক্ষণাৎ শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক ছিলাম। আমাদের মধ্যবর্ত্তী ভূমি সম্পূর্ণ সমতল ছিল বলিয়া আমি সকল সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকিবার অভিপ্রায়ে রণাঙ্গনে সৈন্য রচনা করিয়া আগুয়ান হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সেজন্য আবশ্যকীয় আদেশাদি আমি দিয়াছিলাম। কিন্তু দক্ষিণপ্রান্তের ব্যাটালিয়াল পাঁচটী পংক্তিবদ্ধভাবে অগ্রসর হইবার পরিবর্ত্তে ডানদিকে ঘুরিয়া গিয়াছিল এবং বামদিকে পথিমধ্যে মার্চ্চ করিবার মত একের পিছনে একজন করিয়া স্তম্ভ গঠন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; ফলে দুই প্রান্তের মধ্যে বিশাল এক ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছিল * —চরম মুহূর্ত্তে এই ব্যাটালিয়নগুলির নিকট হইতে আমি যে অভিজ্ঞতালাভ করিব ইহাই ছিল তাহার দুঃখপূর্ণ পূর্ব্ব সূচনা।

আমার বহু জেদাজেদির পর উহারা তাহাদের বামপ্রান্তস্থ পাঁচটী ব্যাটালিয়ানের সহিত পুনরায় পংক্তি গঠন করিয়াছিল। একটি দ্বিতীয় লাইন গঠন করিতে আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার কোন ব্যাটালিয়নই তথায় স্থান পরিগ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। সুতরাং আমরা ঠিক যেভাবে ছিলাম সেইভাবে শত্রুর সন্নিকটে আসিয়া দেখিলাম যে তাহারা একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর এ পারে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। পূর্ব্বে তাহারা অপর পারে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। আমরা কামানের গোলার পাল্লার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলাম। তথা হইতে আমরা আমাদের তোপখানা হইতে গোলা চালাইতে লাগিলাম ; তথনও আমরা শত্রুর অভিমুখে আগুয়ান হইতেছিলাম। গ্রেপসটের পাল্লার মধ্যে আসিয়া আমরা একযোগে গোলাবৃষ্টি করিলাম, ইহাতে ইংরাজ সেনাদলে বিশৃঙ্খলার সঞ্চার হইয়াছিল এবং তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমরা নদী পর্য্যন্ত উহাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম। অনন্তর আমি সৈন্যদের অধিক অগ্রসর হওয়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলাম এবং শত্রুরা যদি "চার্জ্জ" করিবার জন্য ফিরে অথবা শৃঙ্খলার সহিত তাহাদের অনুধাবন করিবার জন্যই হউক, তাহাদের কেন্দ্রদেশে পুনঃ-সম্বদ্ধ করিয়াছিলাম। ইংরাজ সেনা তাহাদের সাহায্যকারী দলের আশ্রয়ে পুনগঠিত হইয়াছিল এবং আমাদের তোপখানার গোলাবর্ষণ সত্বেও আমাদের বামপ্রান্ত ঘন-সম্বদ্ধভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। আমার সৈনিকগণের উপর যদি আমার কর্ত্তৃত্ব থাকিত তাহা হইলে এইভাবে সৈন্য সঞ্চালন ইংরাজদিগের বিষম ক্ষতির কারণ হইত। আমি আমার দক্ষিণপ্রান্তের প্রতি কতকটা বাম দিক ঘেঁষিয়া সম্বদ্ধ হইতে এবং শত্রুকে "চার্জ্জ" করিতে আদেশ পাঠাইয়াছিলাম। এইরূপে কলম (column) আকারে অবস্থিত ইংরাজ সেনা ছড়াইয়া পড়িবার পূর্ব্বে পার্শ্বদেশে 'আক্রান্ত হইয়া যুগপৎ দুই দিক হইতে অগ্নি বৃষ্টির মধ্যে পড়িত। আমার কথা কেহই শুনিল না। আমি নিজে লাইন ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিলাম এবং মেজর গেসল্যাকে তরবারিহস্তে তাঁহার দলের পুরোভাগে নিশ্চলভাবে অবস্থিত দেখিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ব্যাটালিয়নসমূহ তাঁহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে বক্তৃতা করিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম ; আমি তাহাদিগের নিকট অনুনয় বিনয়, সকাতর প্রার্থনা করিয়াছিলাম. কারণ ভীতিপ্রদর্শনের সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। একটি ব্যাটালিয়ান সম্মুখ দেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, কিন্তু যেথানে ছিল সেইখানেই রহিল। ইতিমধ্যে আমার ব্রিগেডের পাঁচটী ব্যাটালিয়ান অসম সাহসের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছিল। চারি ঘণ্টাকাল শত্রুকে বাধা দিবার পর তাহারা অভগ্ন অবস্থায় যমুনাতটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে, তাহারা নিজেরা যে বিষম ক্ষতি সহ্য করিয়াছিল তাহার অপেক্ষ ও দক্ষিণপ্রান্তের, যাহারা ইতিপূর্ব্বেই বিপরীত দিকে টপ্পলের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, নিষ্ক্রিয়তাতে অধিকতর হতাশ হইয়া উহারা অদৃষ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হইয়াছিল। এতাদৃশ গোলযোগের মধ্যে আমার সৈনিকগণকে পুনঃসম্বদ্ধ করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া আমি যমুনানদী পুনরুত্তীর্ণ হইয়াছিলাম এবং বল্লভগড়ের রাজার আশ্রয়ে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমি শুনিয়াছিলাম দিল্লীতে আমার যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি রক্ষিত ছিল তাহা যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বাদসাহের অনুচরবৃন্দ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরাজদিগের সহিত রফা করিবার পর হিন্দুস্থান পরিত্যাগকালে মেজর ক্রজ্যঁ, যাঁহার এই লুণ্ঠনে অংশ ছিল, স্বীয় সম্পত্তি বহনের জন্য আমার বলীবর্দ্দ-সমূহ ব্যবহার করিয়াছিলেন; পরে ফরক্কাবাদে তিনি সেগুলি বিক্রয় করেন।

এই যুদ্ধ পরাজয় হিন্দুস্থানের পক্ষে বিষম সাংঘাতিক, তাহার ফলে পেঁর কর্ত্তৃক মেজর গেসল্যার ব্রিগেডে সর্ব্বদা রক্ষিত বিশ্বাসঘাতকতা এবং বিদ্রোহের ভাবের প্রতি আরোপ করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে চক্রান্তকারীরা তাহাদের রাজদ্রোহক উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে ঠিক উপযুক্ত মুহূর্ত্তটিকে সবিশেষ চতুরতার সহিত পরিগ্রহণ করিয়াছিল। পরে, ইংরাজ-শিবিরে থাকিতেই, আমি জানিয়াছিলাম যে প্রথমবার ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবার পর ইংরাজরা যখন পুনঃসম্বদ্ধ হইতেছিল তখন আমাদের অশ্বারোহী পল্টনের জনৈক অধিনায়ক উহাদের নিকট গিয়া ভরসা দিয়াছিলেন যে যদি তাহারা আমাদের বামপ্রান্ত মাত্র আক্রমণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে তাহা হইলে আমাদের দক্ষিণপ্রান্ত উহাতে কোন অংশ লইবে না।

১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধটির তিন দিবস পরে আমি আমার আশ্রয়দাতাকে বিপদে ফেলিতে অনিচ্ছুক হইয়া আমার ব্রিগেডের যে সকল ইউরোপীয় অফিসর আমার অনুগমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের সমভিব্যাহারে রণবন্দীরূপে লর্ড লেকের করে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমরা বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়াছিলাম। সমস্ত পথ

---

* সমতলের উপর দিয়া বিস্তৃত সম্মুখভাগ রাখিয়া পংক্তিবদ্ধভাবে (in line) অগ্রসর হওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, সৈন্যগণ আদেশ অমান্য করিয়া একের পিছনে একজন করিয়া স্তম্ভবৎ (in column) অগ্রসর হওয়া পছন্দ করিয়াছিল।

আমরা পেঁরর বিরুদ্ধে যে বিজাতীয় ঘৃণার ভাবের সর্ব্বত্র সঞ্চার হইয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। দেশের অধিবাসীরা জঘন্যতম আখ্যান সংযোগ না করিয়া তাঁহার নামোচ্চারণ করিত না। ইংরাজ অধিকারের বালকবালিকারা তাঁহাকে পাথর ছুড়িয়া এবং কর্দ্দম লিপ্ত করিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। বঙ্গদেশে আসিয়া পৌছিবার পর টিটাগড়ে নিজ বাসস্থান স্থাপন করিতে তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার দালালরা তথায় তাঁহার জন্য সুন্দর একটি সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু টিটাগড় গভর্ণর-জেনারেলের উদ্যানবাটিকার অদূরে অবস্থিত। পেঁরকে স্বীয় প্রতিবেশীরূপে পাইতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন এবং উহাকে অপর একটি বাসস্থান খুঁজিয়া লইতে তিনি আদেশ দিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি ওলন্দাজ অধিকৃত চুঁচুড়াতে নিজ আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন; ঐ স্থান ফরাসী রাজ্য চন্দননগর হইতে এক লিগ দূরবর্ত্তী, যাহা তিনি ন্যায়তঃ আর পুনরায় প্রবেশের অধিকারী ছিলেন না।

৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে পেঁর জেনারেল লেকমে লিখিয়াছিলেন যে তিনি সিন্ধিয়ার চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং নিজ সম্পত্তি আদি সহ ইহাই ছিল অত্যাবশ্যকীয় তথ্য। তিনি বৃটিশ রাজ্যে গমন করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। শত্রু যখন সম্মুখে উপস্থিত তখন নৃপতির কর্ম্মপরিত্যাগ! ইহাপেক্ষা সুস্পষ্ট রাজদ্রোহ আর কিছু কি হইতে পারে? রাজার নিকট ফিরিয়া যাইলে না কেন? স্বভাবতঃ দুর্ভেদ্য কোন দুর্গ, যেমন টাটনের, বাধা প্রদান করিবার জন্য নির্ব্বাচন করিলে না কেন? বিনা যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখ হইতে পলায়ন কেন? তাঁহার মিত্রগণের সাহায্যের নিবেদন কি জন্যই বা প্রত্যাখ্যান করিলে এবং তাঁহার সৈনিকগণকে সম কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্ত্তে কেনই বা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিলে? দুর্গ সমূহ হইতে তোপখানা কেন স্থানান্তরিত করিয়াছিলে? নৃপতিকে এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ অতগুলি বাহিনী ইউরোপীয়কে কি হেতু হতমান করিলে?

যদিও ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি সিন্ধিয়ার কর্ম্মপরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তবুও ৬ই আবার তিনি আমি বিদ্রোহী হইয়াছি এই অজুহাতে আমাকে গুপ্তহত্যা করিবার আদেশ দিবার জন্য জেনারেলরূপে স্বীয় ক্ষমতা পুনঃগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে যে আমি আমার রাজার, আমার সম্মানের এবং আমার দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবার জন্য জনৈক বিশ্বাসঘাতকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলাম। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমি পেঁরর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিলাম, সে সময় তিনি তাহাদের সম্মুখ হইতে কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত সকলকার ঘৃণামিশ্রিত রোষ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য উহাদের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছিলেন। পেঁরর বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচরগণের ষড়যন্ত্রে তাহারা যে সুযোগলাভ করিয়াছিল তজ্জন্য শত্রুকে মূল্যদানে বাধ্য করিয়া আমি স্বীয় মুষ্টিমেয় নির্ভীক সৈন্যসহ একটি শোণিত রণক্ষেত্রে পড়িয়াছিলাম; যে সময় তিনি উহাদের প্রবেশপথ সেইসকল জনপদে উন্মুক্ত করিয়া দিতে ব্যস্ত ছিলেন—যাহা রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। পেঁরই আমাকে নিরস্ত্র করিয়াছেন; ইংরাজরা আমাকে, পরাজিত করিতে পারে নাই।

কিন্তু যে ব্যক্তি ৬ই তারিখে আমাকে গুপ্তহত্যা করিবার আদেশস্বাক্ষর করিবার পর ৯ই তারিখে আমার নিকট প্রস্তাব করিয়া ঘনিষ্ঠ সুহৃদের মত পত্র লিখিতে পারে তাহার সম্বন্ধে কি বলা বা মনে করা যাইতে পারে? তাঁহার অবমাননার এবং তাঁহার শঠতার কিছু অংশ পরিগ্রহণ করিতে বলা ভিন্ন তাঁহার প্রস্তাব সমূহ অপর কিছু হইতে পারিত কি? সেগুলি যদি সম্মানকর কিছু হইত তাহা হইলে তিনি সেগুলি লিখিলেন না কেন? তাহা ছাড়া তাঁহার প্রস্তাব করিবার অধিকারই বা কি ছিল, কারণ ৫ই তারিখে তিনি ত ইংরাজদিগের করে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন?

আমি জানি যে তাহাদের সরকারী ডেস্প্যাচে ইংরাজরা পেঁরর অকীর্ত্তিকর আচরণ লঘুকরণের চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও তাহার জঘন্যতা তাঁহারা ভালরূপই বুঝিতেন। উহাঁরা তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ মানিয়া লইয়াছিলেন এবং কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, প্রথমতঃ তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ইউরোপীয় অফিসারগণের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অকৃতজ্ঞতা। কিন্তু হিন্দুস্থান কি পেঁরর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল? সিন্ধিয়া কি তাঁহাকে সেনাপতিত্ব প্রদানকালে ঐ পদ হইতে অপসারিত করিবার অধিকার হারাইয়াছিলেন? তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত হইয়াছেন কি পেঁরর সকল দায়দায়িত্ব মুক্ত হইয়া যাইবার পক্ষে যথেষ্ট কারণ ছিল? যে নৃপতির তিনি পরিচর্য্যা করিতেন তাঁহার শত্রুগণের এবং আরও গুরুতর কথা এই যে, তাঁহার স্বদেশের চিরশত্রুগণের হস্তে দেশ সঁপিয়া দিতে তিনি কি অধিকারী ছিলেন? আর তাঁহার ইউরোপীয় অফিসারগণের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে, দেখা যাক্ তাহা কি ছিল? তাহা মাত্র এই ছিল যে, উহারা তাঁহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে নাই। সামরিক শৃঙ্খলা অথবা ব্যক্তিগত বন্ধন এ দাবী করিতে পারে না যে কোন অপরাধে ও উহারা তাঁহার সহকর্ম্মী হইবে। উহারা মাত্র তখনই তাঁহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছিল যখন তাঁহার রাজদ্রোহিতা সুস্পষ্ট প্রকট হইয়াছিল এবং তাহাতে সৈন্যদল এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে উহারা পেঁরর স্বপক্ষে কিছু বলিতে গেলেই প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা ছিল।

পেঁর তাঁহার নৃপতির প্রতি, সেনাবাহিনীর প্রতি এবং ফ্রান্সের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ছিল। ভারতবর্ষের যে সকল ফরাসী তাঁহাদের উদ্বেগের কারণ ছিলেন ইবং যাঁহারা তাঁহাদের গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে যথাযথভাবে অনুমোদন প্রাপ্ত না হইলেও স্বদেশ প্রেমের দ্বারা অনুপ্রেরিত ছিলেন এবং তাহারই বশে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া দেশের কাজ করিতেন তাহাদের ধ্বংশ করিতে ইংরাজরা যে কিরূপ আগ্রহ সম্পন্ন ছিলেন তাহা পেঁর জানিতেন। উহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে তিনি কিছুই করেন নাই। ইংরাজদিগের সহিত সন্ধির জন্য আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়া সিন্ধিয়া দাবী করিয়া-

হলেন যে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিকে তাঁহার করে সমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে উহাঁরা সম্মত হন নাই। দিল্লী, আগ্রা এবং আলিগড়ে তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত এবং ইংরাজ হস্তে নিপতিত তাহার ধনসম্পত্তি প্রত্যার্পণের পেঁর কৃত অনুরোধও সেইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। তাঁহার ধনসম্পত্তি সুপ্রচুর ছিল বটে, কিন্তু স্বীয় বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার লাভ ভিন্ন তিনি অতি অল্পেই নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

পেঁর ঈজিপ্ট অভিযানের ব্যর্থতার কারণ ছিলেন।

পেঁর ফ্রান্সের বিশ্বস্ত মিত্র এবং ইংরাজদিগের অশনিস্বরূপ মহাবীর টিপুসাহেবকে আপদকালে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পেঁর ভারতবর্ষে দৃঢ় বদ্ধমূল ফরাসী শক্তির ধ্বংসকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন।

পেঁর ভারতবর্ষের রেগুলার সৈন্যদল সমূহ বিশৃঙ্খল করিয়া দিয়াছিলেন।

পেঁর স্বীয় প্রভু নরপতি এবং পেশবাকে সাহায্য করিতে অসম্মত ও শেষোক্ত ব্যক্তিকে নিজ রাজ্যসহ ইংরাজ করে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

পেঁর. এক কথায় বলিতে, তাঁহার দেশ এবং তাঁহার সৈন্যদল বিশ্বাসঘাতকতা করে শত্রু করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুর্গসমূহ এবং জনপদ ইংরাজ হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বীয় নিদারুণ লোভ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার যূপকাষ্ঠে সমস্ত ইউরোপীয়দিগকে বলি দিয়াছিলেন? তিনি শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

যাঁহারা ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন তাঁহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে পেঁর সিন্ধিয়া এবং অন্যান্য নৃপতিগণ কর্তৃক লিখিত বলিয়া প্রচারিত জালপত্রযোগে আত্মদোষ স্থালনের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন; কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইবে না। এই চিঠিগুলি সবই তাঁহার নিজের করা জাল, বরং দৌলৎ রাও সিন্ধিয়ার সিলমোহর যাহা তাঁহার নিকট থাকিত এবং যাহা তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তদ্দ্বারা মোহরাঙ্কিত;—কারণ এ দেশের প্রথা হইতেছে চিঠিতে স্বাক্ষর করার পরিবর্ত্তে মোহর করিয়া দেওয়া!

ইতিপূর্ব্বে আর কোন লোক অখ্যাত অবস্থা হইতে এতাদৃশ গৌরবোজ্জ্বল অংশে উপনীত হয় নাই এবং আর কোন সাধারণ ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে তাহার স্বদেশের ইহাপেক্ষা অধিক বিপদপাৎ ঘটায় নাই। কিন্তু পেঁর ধনের দ্বারা আত্মোদরস্ফীতি করিয়াছেন, যদিও তিনি তাঁহার সংগৃহীত অর্থের মাত্র সামান্য অংশ রক্ষা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্টতম মণিরত্নসমূহ তাঁহার সম্পত্তি। স্বীয় সম্মানের বিনিময়ে এই স্বর্ণরাশি এবং তাঁহার লজ্জার স্মৃতিচিহ্ন এই মণিরত্ন সমূহ তিনি রক্ষা করিতে থাকুন; এবং যদি তিনি পারেন তাহা হইলে শান্তি এবং বিশ্রাম সুখ তিনি উপভোগ করুন, যে সুখ আত্মগ্লানিবিরহিত বিবেক এবং ব্যক্তিগত সাধারণ উভয়বিধ কর্ত্তব্য পরম বিশ্বস্ততার সহিত নির্ব্বাহিত করার যে আত্মতৃপ্তি শুধু তাহারাই দিতে সমর্থ।

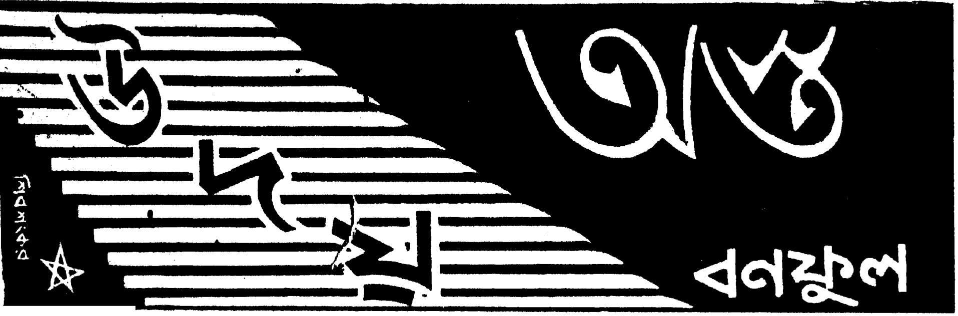
আমার নিজের কথা বলিতে আমি বিবেচনা করি, আমার সকল কর্ত্তব্য আমি পালন করিয়াছি। আমি ভারতবর্ষে আমার স্বদেশের শত্রুগণের বিরুদ্ধে লড়িয়াছি। সেখানে যাহারা আমাকে জানিত তাহারা সকলেই আমার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। রাজন্যবৃন্দ, সৈনিকগণ এবং অধিবাসীবর্গ সকলে একবাক্যে স্বীকার করিবে যে, শাসনকর্ত্তারূপে আমি যাহা কিছু করিয়াছি সব কিছুই সম্পূর্ণ স্বার্থহীনতা এবং গভীরতম বিশ্বস্ততার সহিত করিয়াছি। সেই একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আমি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর যে বীর এতাদৃশ গৌরবের সহিত তাহা শাসন করিতেছেন তাঁহার সাফল্য বৃদ্ধি কল্পে আমার সকল প্রচেষ্টা নিয়োগ করিবার সুযোগ সাগ্রহে পরিগ্রহণ করিব।

(সাং) এল, বুরকুঁা।

মরীচিকা

শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

জীবনের খাতা হতে আর একটি দিন যায় চলে—
রাত্রির বাতাসে ভাসি বিস্মৃত অতীতের কোলে।
শুধু স্মৃতি তার ব্যথা হয়ে কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে—
লুপ্ত হবার লাগি ভবিষ্যতের আঁধার গহনে।
নিঃশব্দে পোহায় রাত্রি-নব প্রাতে অরুণের আলো—
মুছে দেয় মন হতে রাত্রির ভয়াবহ কালো।
আরামে নিঃশ্বাস ছাড়ি উঠে বসে মানুষ আবার—
প্রচারিতে আপনার অহংকার বার বার।
সৃষ্টির এমনি রহস্য—বুঝিবার নাহি অবকাশ—
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতম হয়ে আসে জীবনের শ্বাস
দিনে রাত্রে পলে পলে সুগভীর সুপ্তির সাথে
মৃত্যুর ছায়া ঘনায় সজল নয়ন পাতে।
যুগে যুগে এ নিয়মের নাহি ব্যতিক্রম।
তবু সব জেনে শুনে করি মোরা এতো ভ্রম।



(পূর্বানুবৃত্তি)

১০

কৃষ্ণকান্ত সন্তর্পণে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে পাইলেন কিরণ ওদিকের বারান্দায় বসিয়া ফলের রস করিতেছে। কৃষ্ণকান্ত কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কিরণ এমন ভাব দেখাইল যেন তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই। যেন তাহার সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগও তাহার নাই।

"দূতের মুখে অন্য রকম খবর পেলাম"—মুচকি হাসিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, এইবার তুবড়ির মত ফাটিয়া পড়িল কিরণ।

"তোমাদের আক্কেলকে বলিহারি যাই। না হয় তোমরা এ বাড়ির জামাই-ই হয়েছ, কিন্তু গেরস্তর মুখের দিকে চাইবে-না তা' বলে—"

"সর্ব্বদাই তো চেয়ে আছি, এক দণ্ডও তো চোখ বুজি নি। চক্ষু কি আরও বিস্ফারিত করব ?"

"ক'টা বেজেছে জান"

"জানবার দরকার কি। আপিস তো নেই"

"তা' বলে সময়ে খাওয়া-দাওয়া করবে না ? বউদি কতক্ষণ বসে' থাকবে হাঁড়ি নিয়ে"

"ওতে বাধা দিও না। বউদির ওটা শখ। তা না হ'লে ছুটো ঠাকুর আছে, পার্ব্বতী আছে—"

"যাও না উনুন ধারে খানিকক্ষণ বসে' থাক না গিয়ে, তাহলে শখের মজাটা টের পাবে—"

"আমার শখের জন্যে আমিও মাচার উপর ঠায় বসে' থেকেছি রাতের পর রাত মশার কামড় সহ্য করে'"।

"তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই আমার। রান্না হয়ে গেছে চান কর গে যাও। বাবা গো ধরে' বসে' আছেন তোমাদের সঙ্গে খাবেন। তাঁর পিত্তি পড়ে' যাচ্ছে। তাই ফলের রস দিচ্ছি একটু। এত বেলা হ'ল ক্ষিদে পায়নি ?"

"ঘণ্টা দুই আগে যা খেয়েছি তা তো জানো। খান বারো লুচি, একবাটি আলুর দম, দুটো ডিম, তার উপর মিষ্টি। ক্ষিধে পায় কখনও ?"

"দিন দিন নতুন হচ্ছ দেখছি। ওই ক'টা ফুলকো লুচি খেয়ে ক্ষিধে হয়নি তোমার! মিথ্যুক কোথাকার"

সহাস্য সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিরণ পুনরায় ফলের রসে মন দিল।

"সদানন্দ আর রঙ্গনাথ কোথা, ওদের দিকেও একটু মনোযোগ দাও না, অতটা একচোখো হ'লে লোকে কি বলবে। তা ছাড়া এক সঙ্গেই তো খাব সব। ওরা কি 'রেডি'—"

"রেডি না ছাই। সদানন্দ এতক্ষণে তেল মাখতে বসেছে। রঙ্গনাথ সন্ধ্যা আর স্বাতী সেই যে বেড়াতে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। সব বে-আক্কিলে তোমরা—"

"সোমনাথ কোথা"

"সে উদার ছেলেদের ঘুড়ি তৈরি করে দিচ্ছে ওদিকের বারান্দায়"

বিরুবাবুর বড় কন্যা স্বাতী ও বড় জামাই সোমনাথ আগের দিন সন্ধ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ছোট মেয়ে-জামাই এখনও আসে নাই। সে জন্য বিরুবাবু চিন্তিত আছেন, বারবার স্টেশনে যাতায়াত করিতেছেন।



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

বিশ্রাম

ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

দ্বিপ্রহরে

ফটো : সৌরেন মুন্সী

"যাই, বাবাকে ফলের রসটা খাইয়ে আসি। সত্যি তোমার খিধে পায় নি? যাই হোক, বউদিকে এবার রেহাই দাও তোমরা রান্নাঘর থেকে"

"একটা কথা বুঝছ না তুমি, বউদি রেহাই পেতে চান না। উনি রেঁধে আর পরিবেশন করে' সুখ পান আর হাতে স্বর্গ পান রান্না ভাল হয়েছে বললে। তা বলব"

কিরণ তাহার দিকে একটা হাস্যোজ্জ্বল তির্য্যক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বাবাকে ফলের রস খাওয়াইতে গেল। কৃষ্ণকান্ত গেলেন দক্ষিণ বারান্দায় সোমনাথের কাছে।

৯

সূর্য্যসুন্দর সত্যই অনেকটা ভাল বোধ করিতেছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি যেন একটা নূতন ধরণের নব-জীবন লাভ করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে—যে ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি প্রিয়জনের সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহাকে অসুখ না বলিয়া সুখ বলাই তো উচিত। কেবল একজনের অভাবে তাহার মনের ভিতরটা খচখচ করিতেছিল। পৃথ্বীশ আসিবে কি? তাহাকে কি কুমার খবর দিতে পারিয়াছে? অনেক দিন তো তাহার কোন খবর নাই। সেই চিঠিটির কথা তাঁহার বারবার মনে পড়িতেছিল, গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যে চিঠিটি সে লিখিয়া গিয়াছিল। সে লিখিয়াছিল—"মাই সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন ছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমিও বন্ধনমুক্ত হইয়াছি। তাই আমি এবার ঈপ্সিত পথে চলিলাম। আপনার সেবা করিবার জন্য দাদা, উশনা, কুমার রহিল। আমি দূর হইতে আপনার সংবাদ রাখিব এবং প্রয়োজন বুঝিলে ফিরিয়া আসিব। আমার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা আমার নাই, আর ঘোর স্বার্থপর না হইলে গৃহস্থ হওয়া যায় না, তাই আমি সন্ন্যাস জীবন যাপন করিব ঠিক করিয়াছি। বাড়ির কোন সাহায্য আমি লইব না। আমি প্রায় নিঃস্ব হইয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। কেবল যে বেহালাটি আপনি আমাকে দিয়াছিলেন সেইটি লইয়া যাইতেছি।"…সাত বৎসর হইল পৃথ্বীশ চলিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে সে কুমারকে চিঠি লেখে। সে সব চিঠি কুমার তাঁহাকে দেখাইয়াছে। চিঠিতে কোনও ঠিকানা থাকে না। পোস্টাফিসের ছাপ হইতে একবার হরিদ্বারের নাম পড়া গিয়াছিল, আর একবার কটকের নাম। তবে অল্প কিছুদিন আগে সে কুমারকে পোস্টবক্সের একটা ঠিকানা জানাইয়াছে। লিখিয়াছে, যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ওই ঠিকানায় পত্র দিলে সে পাইবে। পোস্ট বক্স বম্বেতে। কুমার সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাফ করিয়াছে, চিঠিও দিয়াছে। কিন্তু কই পৃথ্বীশ এখনও তো আসিল না, কোন জবাবও আসে নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর কথাটাও তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীশ অজ্ঞান হইয়া যায়। বারো ঘণ্টার পর যখন তাহার জ্ঞান হয়, তাহার পর হইতে তিনদিন সে ক্রমাগত কাঁদিয়াছিল, তাহার পর সাতদিন নির্ব্বাক হইয়াছিল। শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া যাইবার পাঁচদিন পরে হঠাৎ সে গৃহ ত্যাগ করে। সূর্য্যসুন্দর যথেষ্ট খোঁজ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। মানুষের সবই সহিয়া যায়। এতবড় মর্ম্মান্তিক ব্যাপারটাও সূর্য্যসুন্দরের সহিয়া গিয়াছিল। মানুষের মন বড় বিচিত্র। কল্পনার সহায়তায় তিনি ইহার একটা নিগূঢ় তাৎপর্য্যও বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সান্ত্বনা লাভও করিয়াছিলেন। ক্রমশ তাঁহার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহার বাবাই পৃথ্বীশরূপে পুনরায় তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। পৃথ্বীশের মুখের আদলটা না কি তাঁহার বাবার মুখের মতো, বুকটাও ঠিক তেমনি লাল। বাবার মতোই তাহার সঙ্গীতানুরাগ এবং সংসারে অনাসক্তি। অনুপস্থিত পৃথ্বীশকে কেন্দ্র করিয়া মনে মনে তিনি একটা অদ্ভুত স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছিলেন। ইদানীং আর একটা কথা মনে হওয়াতে তিনি পৃথ্বীশকে ফিরাইয়া আনিবার বিশেষ চেষ্টা আর করেন নাই। বোম্বের ঠিকানাটা পাইবার পর কুমার তাঁহাকে বলিয়াছিল—"ঠিকানা তো একটা পাওয়া গেল, এবার আমি না হয় বম্বে গিয়ে মেজদাকে ধরে' নিয়ে আসি। আমি গেলে ঠিক আনতে পারব।" সূর্য্যসুন্দর কিন্তু তাহাকে যাইতে দেন নাই। মুখে বলিয়াছিলেন বটে, "না থাক। কোথা ঘুরে ঘুরে বেড়াবি ওর পিছনে। জোর করে' কি কাউকে ধরে' রাখা যায়? ও যদি আসে, আপনিই আসবে"—কিন্তু মনে মনে তাঁহার অন্য প্রকার

যুক্তি ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'বাবা আমার জন্যই শেষ জীবনে নিজের খেয়াল খুশীর পথ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ঘানি টানিয়াছিলেন। তিনি পৃথ্বীশরূপে আবার যদি আমার কাছে আসিয়াই থাকেন তাহা হইলে আবার তাঁহাকে জোর করিয়া সংসারে টানিয়া আনা কি উচিত হইবে? চলুন না তিনি নিজের পথে, নিজের খেয়ালে…"

তিনি চোখ বুজিয়া এই সবই ভাবিতেছিলেন। বাবার মুখটাই আবার তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আকর্ণ বিশ্রান্ত ঈষৎ রক্তাভ চোখের দিকে তিনি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল একটা চাপা হাসি যেন তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"না, এবার আর তোমায় কষ্ট দেব না"—হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেম।

উর্ম্মিলা মাথার শিয়রে আনত মস্তকে নীরবে বসিয়াছিল, ঘরে আর কেহ ছিল না।

"বাবা, আমাকে কিছু বললেন?"

"না"

সূর্য্যসুন্দর আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন, তাহার পর চোখ খুলিয়া বলিলেন "সন্ধ্যা উষা কোথা"

"মেজদি বাথরুমে। ছোটদি আর ছোট জামাইবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন সোমনাথকে নিয়ে"

"কোথা গেছে—"

"বাহিতলায়"

খবরটি শুনিয়া সূর্য্যসুন্দর প্রীত হইলেন। বাগানে কেহ গেলে তিনি বড় খুশী হন। বাহি নদীর ধারে তাঁহার একটি প্রকাণ্ড আম বাগান আছে। প্রায় চল্লিশ বিঘার বাগান। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কাজ। এই প্রসঙ্গে বন্ধু নীলকমলকে আর ভোজু নাপিতকে মনে পড়িল। বাগানটির সহিত ইহাদেরও স্মৃতি জড়িত আছে।

নীলকমলের বাড়ি ছিল মালদহ জেলার এক গ্রামে। সূর্য্যসুন্দর তাহাদের বাড়ির গৃহচিকিৎসক ছিলেন। নীলকমল বহুদিন হইতে সূর্য্যসুন্দরকে অনুরোধ করিতেছিলেন, 'আপনি যদি বলেন, আপনাকে কিছু ভালো আমের কলম পাঠিয়ে দিই। আপনার ওই জমিটায় চমৎকার বাগান হবে'। তিনি দুইবার অনেক কলম পাঠাইয়াও ছিলেন, কিন্তু সময়াভাববশত সূর্য্যসুন্দর সেগুলি রোপণ করিতে পারেন নাই। দুইবারই প্রায় শতাধিক কলম টবেই শুকাইয়া গিয়াছিল। নীলকমল তখন অনুভব করিলেন এই পন্থায় চলিলে গাছই মরিবে, বাগান হইবে না। তখন তিনি সূর্য্যসুন্দরকে পত্র লিখিলেন, "ডাক্তারবাবু, এবার কলমের গাছ লইয়া আমি নিজে যাইব এবং আপনার বাড়িতে গিয়া কিছুদিন থাকিব। আমার জন্য বাহিরের একটি ঘর এবং চাকর মজুত রাখিবেন"। বহু আমের কলম লইয়া নীলকমল একদিন আসিয়া হাজির হইলেন এবং সূর্য্যসুন্দরের বাড়িতে প্রায় ছয়মাস থাকিয়া বাগানটি সম্পূর্ণ করিয়া গেলেন! তিনি না আসিলে বাহিতলার আমবাগানটি হইত না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার ভোজু নাপিতের কথাও তাঁহার মনে পড়িল। ওই চল্লিশ বিঘা জমির মাঝখানে এক বিঘা জমি ছিল ভোজু নাপিতের। সূর্য্যসুন্দর ভোজু নাপিতের ওই এক বিঘার পরিবর্ত্তে তাহাকে অন্যত্র পাঁচ বিঘা জমি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভোজু তাহাতে রাজি হয় নাই। অন্যত্র এক বিঘা জমি লইয়াই সে তাঁহাকে ওই জমিটুকু দিয়াছিল। টাকা-কড়ির জোরে এসব হয় না, হয় প্রেমের জোরে। সূর্য্যসুন্দর নিজের জীবনে বারম্বার এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

"বাগানে গেছে ওরা? বেশ হয়েছে। কুমার কোথা, সে থাকলে গাছগুলা চিনিয়ে দিতে পারত"

"উনি একটা নৌকো করে' বেরিয়েছেন পাখী শিকার করতে। চরে আজকাল খুব হাঁস বসছে তো"

"ও, তা বেশ করেছে। যদি কিছু মেরে আনতে পারে, জামাইরা এসেছে খাবে আনন্দ করে,"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"

ফলের রস লইয়া কিরণ প্রবেশ করিল।

"রসটা খাও বাবা। লেবুগুলো ভালো আনে নি, সব শুকনো শুকনো—"

সূর্য্যসুন্দর অন্য জগতে ছিলেন, লেবুর বিষয়ে কোন মন্তব্য করিলেন না। হঠাৎ বলিলেন, "তুই জানিস কি, আমার বাবার বড় গেলাস আছে একটা, কাঠের সিন্দুকটায় আছে বোধহয়, খুঁজে দেখ তো"

"ঠাকুরদার গেলাস?"

"হ্যাঁ, দেখিস নি সেটা?"

কিরণের মনে পড়িতেছিল না দেখিয়াছে কিনা। কিন্তু তাহা স্বীকার করিবার পাত্রী সে নয়। খানিকক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "হ্যাঁ-অ্যাঁ দেখেছি, মনে পড়েছে, খুব ছেলেবেলায় দেখেছি। কেন, কি হবে সে গেলাস নিয়ে—"

"সেটা বার কর। দেখব একবার"

"আচ্ছা, উর্ম্মিলা, জানো কোথায় আছে সেটা?"

"না, আমি তো দেখি নি। দিদি জানেন বোধহয়। পুরোনো সব বাসন উনিই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলেন"

"আচ্ছা, ফলের রসটা খেয়ে নাও এখন। আমি দেখছি কোথা আছে সেটা—"

সে সন্তর্পণে সূর্য্যসুন্দরকে ফলের রস খাওয়াইতে লাগিল। কিরণের মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। বাবা হঠাৎ ঠাকুরদার কথা ভাবিতেছেন কেন! অসুখের সময় মৃতের কথা মনে করা তো ভালো লক্ষণ নয়।

রস খাওয়া শেষ করিয়া সূর্য্যসুন্দর বলিলেন, "চম্পা কোথা?"

"সে ওই পিছনের ঘরে, গগনের ফরমাসে তোমার জন্যে স্টোভে কি একটা খাবার করছে"

"কত আর খাব আমি। কি খাবার—"

"আপেল সেদ্ধ করে' কি যেন করছে দু'জনে মিলে। আপেল স্টাফিং না, কি যেন বললে। আমিও ওসব শিখেছিলুম এককালে, এখন ভুলে গেছি। তোমার জামাইটির খাওয়ার শখ বলে' তো কিছু নেই—যা সামনে ধরে' দাও গপ গপ করে' খেয়ে ফেলবে!"

"দুজনে মিলে করছে? গগনও আছে না কি"

"গগনই তো ফরকটুটি তুলেছে। সকাল থেকে তিনজনে স্টোভ আর আপেল নিয়ে কোণের ঘরে ঢুকেছে। একগাদা আপেল আনিয়েছে কাটিহার থেকে"

"আর একজন কে"

"ওই মিস্ বোস। ও তো ছায়ার মতো সর্ব্বদা ঘুরছে চম্পার সঙ্গে। খুব সেবা করে কিন্তু। ও সঙ্গে না এলে এই ভীড়ের বাড়িতে এত রকম হ'য়ে উঠিত না। এখন ভালয় ভালয় সাধের ব্যাপারটা মিটলে বাঁচা যায়"

"নিখিলবাবু যখন ভার নিয়েছেন তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বাড়ির সব ভোজ কাজ তো উনিই করিয়েছেন"

"তুমুল আয়োজন হচ্ছে শুনছি—"

"হ্যাঁ, আমিও তাই শুনছি। সুবাতালী, ওঝাজি, চমকলাল, গোবিন্দ মণ্ডল, নিখিলবাবু এরা সবাই যখন একজোট হয়েছে তখন বৃহৎ ব্যাপারই করে' ছাড়বে"

উর্ম্মিলা সূর্য্যসুন্দরের মাথার চুল কুরিয়া দিতেছিল।

সে স্মিতমুখে বলিল, "ভালই তো হচ্ছে। আমাদের প্রথম বউ—"

সাধের প্রসঙ্গে কাল হইতেই যে সমস্যাটা কিরণের মনে জাগিয়াছিল তাহা এইবার সে ব্যক্ত করিল।

"সাধে একটা কিছু তো দিতে হবে। এখানে তো কিছুই পাওয়া যায় না, কি যে করব তাই ভাবছি। উর্ম্মিলা তুই কি দিবি?"

"আমার নতুন একটা বেনারসী শাড়ি কেনা হয়েছিল, এখনও পরিনি সেটা, সেইটে দিয়ে দেব ভাবছি। মভ, কলার, ওকে সুন্দর মানাবে—"

"আমি কি করি বল তো। আমি একটি সোনার হার দিতে চাই, কিন্তু এখানে তো তৈরি হার পাওয়া যাবে না"

সূর্য্যসুন্দর বলিলেন, "শিবু স্যাকরাকে বললে সে হয়তো করে দিতে পারে।"

"চার পাঁচ দিনের ভিতর কি পারবে?"

"তা পারবে না কেন। কুমারকে বল্ তাকে ডেকে পাঠাক, আমাদের বাড়িতে বসেই করুক না। উর্ম্মিলার একটা কি গয়না তো করেছিল"

উর্ম্মিলা বলিল, "আমার বাজু করিয়েছিলেন উনি ওকে দিয়ে। বেশ সুন্দর গড়েছিল। এই যে দেখুন না—"

উর্ম্মিলা হাত তুলিয়া বাজু দেখাইল, তাহার পর খুলিয়া দিল।

কিরণ উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া মন্তব্য করিল, "পালিশ তত ভাল নয়"

গগন শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল।

"পিসিমা, বাড়িতে 'নাটমেগ' আছে?"

"জানি না তো। কি করবি"

"দাদুর জন্যে যে আপেল স্টাফিংটা করছি তাতে 'নাটমেগ' দরকার। দেখি, মাকে জিগ্যেস করি—"

গগন পুনরায় ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, সূর্য্যসুন্দর ডাকিলেন।

"শোন। চম্পা নাকি ভালো গীটার বাজায় শুনলুম—"

"গীটার, বেয়ালা দুইই বাজায়—"

"সঙ্গে এনেছে যন্ত্রগুলো"

"হ্যাঁ—"

"তাই শোনাক না। খাবার-টাবার করে' কি হবে"

"খেতে খেতে গীটার শুনতে আরও ভালো লাগবে। যদি ঠিক মতো হয়, দেখো কি গ্র্যাণ্ড খেতে"

গগন নাট-মেগের খোঁজে চলিয়া গেল।

কিরণ বলিল, "চমৎকার ছেলে দুটি দাদার। দুটি হীরের টুকরো যেন"

"মেয়ে দুটিও ভাল। বাঁচিয়ে রাখুন ভগবান। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"

"বউটি খুঁত খুঁত করছে তোমার খেতে বেলা হচ্ছে বলে। তুমি বলছ সকলের সঙ্গে খাবে, কিন্তু তোমার জামাইদের তো কারো এখনও চান পর্য্যন্ত হয়নি। কুমার শিকার থেকে ফেরেনি। দাদা পীরপাহাড়ে গিয়ে বসে' আছে। সন্ধ্যারা বাগানে গেছে। ওদের সঙ্গে খেতে গেলে দুটো বেজে যাবে তোমার"

সূর্য্যসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "দুটোই না হয় হ'ল, ক্ষতি কি তাতে। সকাল থেকে তো তিনবার খেলাম। আর কতটুকুই বা খাব আমি—"

পার্ব্বতী এককাপ ওভাল্‌টিন লইয়া প্রবেশ করিল।

"দাদু, মা বললেন এটাও খেয়ে নিতে"

"কি বিপদ। কতবার খাওয়াবি তোরা—"

"মা বললেন খেতে অনেক বেলা হবে, এটা খেয়ে নিন"

ছোটছেলের মত জেদ করিয়া সূর্য্যসুন্দর বলিলেন, "না, না, এখন আর খেতে পারব না। এক্ষুণি তো ফলের রস খেলাম"

পার্ব্বতী ওভাল্‌টিনের কাপটা পাশের তেপায়ার উপর রাখিয়া ঢাকা দিল, তাহার পর রাগতমুখে গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

একটু পরেই বারান্দায় তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"মা, দাদু খাচ্ছেন না। যা বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন তা আর বলবার নয়। তুমি সামলাও এসে। আমার কথা শুনছেন না"

"অতি দজ্জাল মেয়েটা"—কিরণ হাসিয়া সূর্য্যসুন্দরের দিকে চাহিল।

সূর্য্যসুন্দর বলিলেন, "ওকে দেখে আমার উদিৎ সিংয়ের কথা মনে হচ্ছে। উদিৎ সিংকে মনে পড়ে তোর?"

"না"

"খুব ছোট ছিলি তুই তখন। ওরই মতো ছিপছিপে আর ফরসা ছিল উদিৎ সিং। কিন্তু কি প্রতাপ ছিল তার। বামুন দিদিকে মনে আছে?"

"একটু একটু আছে। কুঁজো হ'য়ে লাঠি নিয়ে হাঁটত, না?"

"হ্যাঁ শেষটা কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। সে-ও খুব প্রতাপী ছিল। আমার এক বন্ধু ওকে বলত কুকী"

"কুকী মানে?"

"মেয়ে-রাঁধুনী। কুক—কুকী। রাখালকে একদিন খুন্তি নিয়ে তাড়া করেছিল"

"কেন"

"জুতো পরে' রান্নাঘরে উঁকি দিয়েছিল বলে'। রাখালকে বলত পোড়ামুহা। খুব কালো ছিল তো রাখাল"

পুরসুন্দরী প্রবেশ করিলেন। মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া। যদিও বর্ষীয়সী হইয়াছেন, তবু শ্বশুরের সামনে এখনও তিনি ঘোমটা দিয়ে আসেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, ওভালটিনটা খেয়ে নিন। সকলের সঙ্গে খাবেন বলছেন, কিছু না খেলে পিত্তি পড়ে যাবে। ওটা খেয়ে ফেলুন, বেশী তো দিইনি"

"এইমাত্র ফলের রস খাওয়ালে যে কিরণ—"

"ফলের রসটা ভাতের সঙ্গে খেলে হ'ত। কতটুকু দিয়েছ"

কিরণ বলিল, "খুব কম। আধকাপও নয়"

"তাহলে ওভালটিনটা খেয়ে নিন। ভাত না হয় কম খাবেন। গগন বলেছে ওভালটিনটা খাওয়া দরকার আপনার"

সূর্য্যসুন্দর অনুভব করিলেন খাইতেই হইবে। বাড়ির মধ্যে একমাত্র পুরসুন্দরীকেই তিনি ভয় করেন, তাহার উপর ইহা যখন গগনের প্রেসক্রপসন, তখন কোন প্রতিবাদই চলিবে না।

ক্রমশঃ

কান্ত-কবির হাসির গান ও কবিতা

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

উনবিংশ শতাব্দীর দুঃখ-দৈন্য-সমস্যা-পীড়িত বাঙ্গালী জাতির সাহিত্যে সরস হাসির গানের প্রস্রবণ প্রবাহ ছুটাইয়াছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁহার সুরুচিপূর্ণ, মার্জিত, বিদ্রূপ রসাত্মক গানে বাঙ্গালী সমাজ তাঁহাকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিল। বেদনায় ম্রিয়মান, পরাধীন, ভগ্নহৃদয় দেশবাসী কবির সঙ্গে সুর মিলাইয়া প্রাণ-খোলা হাসি হাসিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার হাসির মধ্যে ছিল বিদ্রূপের কশাঘাত, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি নিষ্ঠুর আক্রমণ। তাই, হাসির গানের রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস রসোত্তীর্ণ সৃষ্টির মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। বিশুদ্ধ হাস্যরসের আমদানি করিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার এই অবদানের স্বীকৃতি চিরদিনই থাকিবে।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরে হাসির গানের অনাবিল স্রোত আনিয়াছিলেন কান্ত-কবি রজনীকান্ত। স্বভাবকবি রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই কৌতুক-কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার হাসির গানে আকর্ষণ আছে। ব্যঙ্গ আছে, কিন্তু ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি নির্মম কশাঘাত নাই। ইহাতে কোথাও এতটুকু সংযমের অভাব ও দলাদলির ভাব পরিলক্ষিত হয় না। কবি নিজেই লিখিয়াছেন,—

"যে হাস্য-রসের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অসামান্য গভীর ভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট হাস্যরস। হাস্যরস যদি উপদেশাত্মক হয়, তাহা হইলে ইহ-জগতে ইহা কখনও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নয়।" এই আদর্শটি স্মরণে রাখিয়াই তিনি হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

কান্ত-কবির রচিত 'বাণী', কল্যাণী, 'বিশ্রাম' ও 'অভয়াতে হাসির গান ও কবিতা পাওয়া যায়। এই হাসির কবিতাগুলিকে হাস্যমিশ্রিত উপদেশাত্মক, সমাজ সম্পর্কীয় ও নিছক আমোদের জন্য হাসির গান—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

সমাজের যাহা কিছু অকল্যাণকর ও নিন্দনীয় এবং হাস্যকর তাহা কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি তাই ব্যঙ্গের ছলে কর্তব্য পথের নির্দেশ দিয়াছেন হাসিতে হাসিতে, হাসাইতে হাসাইতে, এত সোজা কথায় এমন সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় গুরুগম্ভীর উপদেশ আর কোন কবি দিতে পারিয়াছেন কিনা জানিনা। তিনি উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু সে-উপদেশের মধ্যে আত্মগরিমার ভাব নাই, আছে এক অননুকরণীয় মেঠো সুর—যে-সুর বাঙ্গালার প্রকৃত প্রাণের সুর, কবির প্রাণে অনুভূত সত্যের প্রকাশ।

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—কবিতায় ও গানে তিনি সকল শ্রেণীর মনোরঞ্জন করিবেন। তাই ব্যঙ্গ, উপদেশ ও হাসির ছলে তিনি কাহাকেও আঘাত করেন নাই। মাতৃসাধক কবি মায়ের দুঃখ দুর্দশায় অশ্রুপাত করিয়াছেন, স্বদেশের অবনতির বেদনায় ব্যথিতচিত্তে নিজের গায়ে নিজে কশাঘাত করিয়া নিজে কাঁদিয়াছেন, অপরকেও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদাইয়াছেন। তাঁহার হাসির গানগুলি যেন 'হাসির ছলনায় কান্না।"

কবিরা সমাজের কল্যাণব্রতী, কবির সমাজ ও জাতিগঠনের দায়িত্ব ও 'উপেক্ষণীয় নহে। সমাজ ও জাতির সঙ্গে কান্ত কবির পরিচয় কতখানি নিবিড় ছিল, তাহা তাঁহার 'জাতীয় উন্নতি', 'জেনে রাখ', 'বরের দর', "চেহারা বেহাই", 'বিদায়' ইত্যাদি কবিতা হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যায়। কবি জাতীয় উন্নতির নমুনা দেখাইতে যাইয়া বলিয়াছেন:

"যেহেতু, আমরা হ্যাটে ঢাকি টিকি
সাদা জামা ঢাকি শরীরে
'হ্যারি" বলে ডাকি হরিরে।
...যেহেতু, আমাদের সাহস অতুল,
সাহেব দেখলে হয় কিন্তু নামটা ভুল।
যেহেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত—
কীটদষ্ট বাতুলতা বেদ-বেদান্ত
...যেহেতু আমরা পত্নী-আজ্ঞাকারী
প্রাণপণে যোগাই গহনা
আরে বাপরে, তাঁর রুষ্ট আঁখি তাপে
শুকায় প্রেম নদীর মোহনা।"

উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জীবনে যে অবনতি ঘটিয়াছিল এখানে কবি তাহারই প্রতি ইংগিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার—

"মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই যে পাঁচ হাত লম্বা,
সাধু সেই যে পরের টাকা নিয়ে দেখায় রম্ভা,
সেই কপালে বিয়ে করে যে পায় বিশ হাজার পণ
নারীর মধ্যে সেই সুখী যার করতে হয়না রান্না,
ভদ্র সেই যার ফর্সা ধুতি, ফুটফুটে যার জামা
দেশহিতৈষী সেই যার গায়ে "ডসনের" বিনামা
"এম অর্থ্যাং" যে বলে—সে দশকর্মান্বিত—"

ইত্যাদি ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে সমাজের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্ট হয়: সমাজের পুরোহিত—যাহার—

"পৈতে টিকির বলে—
দক্ষিণে; ভোজনে বেড়ে যুত", আর

"মন্ত্র যা বলি, চলে",

যাহার "নিজের বেলায় অকরণীয় কুকর্ম কিছুই নাই",

Peevish মোটামাইনের দেওয়ানী হাকিম" যাহারা—

"শুধু মিল দিয়ে যায় গোঁজা,
কলমে যা আসে করে দিয়ে ঘাড় থেকে
বোঝা নামায়,—যাহাদের সূক্ষ্ম বিচারে—
আসামী জেল খাটে ;—

জজের উকিল—যাহারা "Public movementএর Leader, —'যাহাদের নিকট—Conservice is a marketable thing (which) we sell to the highest bidder."

যাহাদের—"Courtএ ধর্মাবতারের তাড়া,
বাড়িতে গিন্নীর নথ নাড়া,"—

পুরাতত্ত্ববিদ্—

যাহাদের গবেষণার বিষয়—
আকবর শাহ কাছা দিত কিনা,
নুরজাহানের ক'টা ছিল বীণা,
কৃষ্ণের বাঁশীতে ক'টা ছিল ছ্যাদা,
Alexander খেতেন কিনা Sherry,
মীরাবাঈ কানে পরতো কিনা ঢেড়ি,

তাঁহার হাস্যরসাত্মক কবিতার বিষয়বস্তু ছিল।

তাঁহার— "যে পথে বিষয় ত্যাগী প্রেম বিরাগী আসছে কাঁধে
ফেলে কম্বল,
সেইপথে টেরি কেটে চেন ঝুলিয়ে যাচ্ছে হাতে
মদের বোতল।
ওরে গীতা পাঠের সভায় কার কি করবে চুরি
ভাবছে কেবল,
কান্ত কয়, আর বলোনা, আর হলোনা, হলে হবে—
কায়া বদল।"

"যমের বাড়ি নাই কোনও পাজি
তার নাইক দিন কাছাকাছি—
সে তো মানে না বারবেলা, দিকশূল
গ্রহ ও বেলা যার রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিলকুল
অমাবস্যা ত্র্যহস্পর্শ কিছুতে নয় গররাজি।"

—ইত্যাদি

আপাতদৃষ্টিতে হাসির কবিতা, কিন্তু ইহারা হাসির সঙ্গে ভাবিবারও কবিতা বটে।

কান্ত কবি ছিলেন ধর্মপ্রাণ-হিন্দু। খাঁটি বাঙ্গালী এবং বাঙ্গালীর একান্ত প্রিয় কবি। তাঁহার ব্যঙ্গের মধ্যে যাহা আছে সবটুকুই সুন্দর, মনোহর মধুময়। তাঁহার রহস্য বা বিদ্রূপ স্নিগ্ধতামাখা, স্নেহ ও হাসিতে ভরপুর, কিন্তু উহার তলে তলে অশ্রুজলের অবিরল ধারা প্রবাহিত।

তাঁহার—বুড়ো-বাঙ্গালের দ্বিতীয়পক্ষের পত্নীর প্রতি উক্তি :

"বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিচি পায়,
তোমার লাগে কেমতে পারুম হৈয়্যা উঠ্ছে দায়।
আরসি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি
চুল বাঁধনের ফিতা দিচি, আর কি ছাওন যায় ?"—

যেন কবির নিজের চোখে দেখা একটি বাস্তব দৃশ্যেরই রসোত্তীর্ণ কাব্যরূপ। তাঁহার হাস্যরসাত্মক কবিতায় অনাবিল হাস্য, বিশুদ্ধ কৌতুক, মধুর ব্যঙ্গ ও তীব্র শ্লেষের মধ্যে পাঠক সমবেদনাপরায়ণ দরদী কবির সাক্ষাৎ লাভ করে। হাসি ও করুণের অপূর্ব সমন্বয় সাধনের গুণে কান্ত কবির এত জনপ্রিয়তা।

কল্যাণোদ্দেশ্য প্রণোদিত তাঁহার হাসির মধ্যে বাঙ্গালার তদানীন্তন সমাজ ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত জীবের ছবি সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং জনচিত্তকে জাগ্রত করিয়াছে। কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কান্ত-কবি শুধু হাসির জন্য হাসাইবার চেষ্টা করিয়া কান্নার রাজ্যে পাঠকের চিত্তকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, আনন্দাশ্রুকে শোকাশ্রুতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। একদা কবির লেখনীর যাদুমন্ত্র প্রভাবে, আত্মবিস্মৃত পাঠক-পাঠিকা আহ্লাদ পরিহার করিয়া গভীর চিন্তায় সমাহিত হইত। আজও তাঁহার কবিতার ভাণ্ডারে আনন্দের উপাদান খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তিনি তাই কালোত্তীর্ণ কবি।

বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ কবির সংখ্যা মুষ্টিমেয়। বাঙ্গালী ও বাঙ্গালার অন্তররাজ্যে তিনি চির-প্রতিষ্ঠিত কবি, আনন্দরসঘন লোকের দিশারী।



অনুবাদ সাহিত্য



চিঠি

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

[প্রখ্যাত গুজরাতী কথাসাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর যোশীর রচনা থেকে। সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি 'ধূমকেতু' ছদ্মনামে পরিচিত।]

ভোরের ধূসর আকাশে তারাগুলো তখনও ঝিকমিক করে জ্বলছে মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তরে অতীতের সুখ-স্মৃতির মত। শহরের বড় সড়কটায় তখনও লোক চলাচল শুরু হয়নি। সেই জনশূন্য পথে ধীর মন্থর পদে চলেছে এক বৃদ্ধ। শীতের কন্‌কনে হাওয়ায় দেহ তার কেঁপে উঠছে থরথর করে। আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রয়াসে গায়ের ছিন্ন চাদরটা বারবার টেনে ধরে সে। দূরে কয়েকটি কুটীর থেকে যাঁতার ঘর্ঘর শব্দ বাতাসে ভেসে আসে, আর সেইসঙ্গে শোনা যায় মেয়েলি গলার মিষ্টি মধুর গান। গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা এরই মধ্যে শয্যাত্যাগ করে দিনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। গম পিষছে যাঁতায়, আর অনুচ্চকণ্ঠে গান গাইছে আপন মনে। গান শুনতে শুনতে বৃদ্ধ এগিয়ে চলে নিঃসঙ্গ পথে।

চারিদিক তখনও নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু দু' একটা কুকুরের ডাক অথবা ঘুমভাঙা পাখির তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা যায়। শহরের বেশীর ভাগ মানুষ তখনও ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। মাঘের দুর্জ্জয় শীতে ঘুমের ঘোরটা কাটতে চায় না যেন। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা উপেক্ষা করে, লাঠির উপর ভর দিয়ে এগিয়ে চলে বৃদ্ধ। অনেকটা পথ অতিবাহন করেছে সে, আর সামান্য একটু পথ বাকী।

শহরের ফটকটা পেরিয়ে এবার সে একটা সোজা রাস্তা ধরে। রাস্তার একধারে একটানা গাছের সারি, অপরদিকে সরকারী বাগান। রাতের অন্ধকারটা এখানে যেন আরও একটু জমাট, ঠাণ্ডাটাও যেন আরও একটু তীব্র। সোজা রাস্তায় বাতাসটা বইছে অপ্রতিহত গতিতে। শুকতারার ফিকে আলোটা পথের উপর এসে পড়েছে জমাট তুষারের মত।

বাগানের শেষ সীমানায় একটি পাকা ইমারত। তার বন্ধ দুয়ার ও জানলার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা এসে পড়েছে বাইরে। দূর থেকে বাড়িখানা দেখে বৃদ্ধের মন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে। পথশ্রান্ত তীর্থযাত্রী দূরে দেবতার মন্দিরচূড়া দেখতে পেয়েছে যেন। বাড়ির সামনে একটা কাঠের ফলকে বড় বড় হরফে লেখা—পোষ্ট অফিস।

নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে বারান্দায় একটি বেঞ্চিতে বসে পড়ে বৃদ্ধ। ঘরের ভিতরে কর্মরত জনকয়েক কর্ম্মচারীর কথাবার্ত্তা অস্পষ্টভাবে শোনা যায় বাইরে। ওদেরই মধ্যে কে একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে বলতে শুরু করে, "পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দেওয়ান সাহেব......" আওয়াজটা শুনে চম্‌কে ওঠে বৃদ্ধ, কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। ঠাণ্ডাটা যেন দেহের রক্ত জমাট করে দিচ্ছে, কিন্তু মুখে তার কাতরতার চিহ্নমাত্র নেই। উন্মুখ আগ্রহে কান খাড়া করে বসে থাকে সে। চিঠির উপরে লেখা নাম পড়ছে কেরাণী, একটির পর একটি নাম চেঁচিয়ে পড়ছে আর সঙ্গে-সঙ্গে ছুঁড়ে দিচ্ছে অপেক্ষমাণ পোষ্টম্যানদের দিকে। দীর্ঘকালের অভ্যাস, নামগুলি পড়ে যাচ্ছে অনায়াস ক্ষিপ্রতার সঙ্গে—কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দেওয়ানসাহেব......

নামগুলি পড়তে পড়তে হঠাৎ একসময় কেরাণী বিদ্রূপের সুরে চেঁচিয়ে ওঠে, "কোচম্যান আলি!"

ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে বৃদ্ধ, সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার

আকাশের পানে তাকায়, তারপর দু' এক পা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘা দেয় দরজায়।

"গোকুল ভাই!"

"কে ওখানে?"

"কোচন্যান আলির নাম ধরে এইমাত্র তুমি ডাকলে না? আমি এসেছি চিঠি নেবার জন্য।"

পোষ্টমাষ্টার কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকান দরজার দিকে।

"ও একজন পাগল স্তর—রোজই ও আসে চিঠির জন্যে। কিন্তু চিঠি ওর আসেনা একদিনও," কেরানী বলে পোষ্টমাষ্টারকে।

ধীরে ধীরে বৃদ্ধ আবার বেঞ্চিতে এসে বসে পড়ে। এই বেঞ্চির উপর দীর্ঘ পাঁচ বছর সে এসে বসছে এমনি-ভাবে—চিঠির প্রত্যাশায়।

একসময় আলি ছিল একজন দক্ষ শিকারী। শিকারে যতই তার দক্ষতা বাড়ে ততই শিকারের নেশাটাও পেয়ে বসে তাকে। শেষটা এমন হল যে শিকার ছাড়া একটা দিনও কাটানো তার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠল, এমনি অব্যর্থ ছিল তার লক্ষ্য যে বহু দূরে আকাশে উড়ন্ত পাখিও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত না। জঙ্গলের মাঝে পাতার আড়ালে আত্মগোপন করেও খরগোস তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারত না। আর একবার তার নজরে পড়লে মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে হঠাৎ একদিন তার জীবনযাত্রার ধারা গেল বদলে। তার একমাত্র সন্তান মরিয়ম—যাকে সে ভালবাসত প্রাণের চেয়ে বেশী—এক পাঞ্জাবী সৈনিককে বিয়ে করে বাপকে ছেড়ে চলে গেল বহুদূরে। সেই যে সে চলে গেল স্বামীর ঘরে, পাঁচ বছর তার আর কোন খবর নেই। ভালবাসা যে কী আর বিচ্ছেদের বেদনা যে কত মর্মান্তিক, তা এখন বুঝতে পারে আলি। মা বাপ হারিয়ে পাখির বাচ্চাগুলো যখন ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ে তখন তাদের ছটফটানি দেখে আর সে আগেকার মত শিকারীর আনন্দ উপভোগ করতে পারে না।

যদিও তার রক্তে মেশানো ছিল শিকারের নেশা, তবু মরিয়ম চলে যাবার পর থেকে এমন একটা নিঃসঙ্গতা এসেছে তার জীবনে যে এখন শিকারের কথা ভুলে গিয়ে সবুজ শস্যক্ষেত্রের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সে। মাঝে মাঝে গভীর চিন্তায় ডুবে যায় তার মন—তার কেমন মনে হয়, ভালবাসা জগৎ সংসারের প্রাণ, ভালবাসাই সৃষ্টির উৎস, কিন্তু মানুষের ভাগ্যে বিচ্ছেদ বেদনা অপরিহার্য্য।

মনটা বিষাদের ভারে অবসন্ন হয়ে পড়ে, একলা গাছের তলায় বসে অঝোরে সে কাঁদে। সেই থেকে প্রতিদিনই শেষরাত্রে সে ঘুম থেকে ওঠে ডাকঘরে যাবার জন্যে। জীবনে কোনদিনই সে চিঠি পায়নি কারো কাছ থেকে, চিঠির প্রত্যাশাও করেনি কোনদিন, কিন্তু এখন প্রবাসী মেয়ের খবর জানবার জন্য প্রতিদিনই ডাকঘরে এসে হাজির হয় সবার আগে।

ডাকঘর—মামুলী ছাঁদে তৈরী সরকারী দপ্তরখানা—শ্রী সৌন্দর্য্য যার এতটুকু নেই মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার মত—তাই হয়েছে এখন তার তীর্থক্ষেত্র। ঐ বাড়িটারই একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় প্রতিদিনই এসে বসে সে। যখন তার এই অভ্যাসের কথা সবাই জানতে পারে তখন তাকে নিয়ে তামাসা করতে শুরু করে। কোন-দিনই তার কোন চিঠি আসে না, তবু কৌতুক করবার জন্য ডাকঘরের কেরানী প্রায়ই তার নামটা বলে চেঁচিয়ে, আর অমনি সে উঠে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় ব্যস্ত ভাবে। কিন্তু আলির ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে না সহজে। বুকভরা আশা নিয়ে প্রতিদিনই এসে হাজির হয় ডাক-ঘরে এবং ফিরে যায় শূন্যহাতে।

একদিন অভ্যাসমত আলি এসে বসে আছে ডাকঘরের বারান্দায়। দরজা খোলার পরও চুপটি করে সে বসে রয়েছে নিজের জায়গাটিতে।

কেরানী চিঠির উপরে লেখা ঠিকানা পড়তে শুরু করে চেঁচিয়ে, "পুলিস কমিশনার!" উদ্দিপরা একজন ছোকরা এগিয়ে আসে চিঠিগুলি নেবার জন্য।

"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট!" আর একজন পিওন সামনে এসে দাঁড়ায়। অভ্যাসমত একটির পর একটি নাম কেরানী পড়তে থাকে আর চিঠিগুলি নিয়ে পিওনরা বেরিয়ে যায় একে একে।

সবাই চলে যাবার পর আলি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাভরে সেলাম করে ডাকঘরকে—যেন ওটা একটা পবিত্র স্থান, তারপর ধীর মন্থরপদে ফিরে চলে বাড়ির দিকে।

"লোকটা পাগল নাকি?" পোষ্টমাষ্টার জিজ্ঞেস করেন কেরাণীর দিকে ফিরে।

"কার কথা বলছেন, স্যর? আলি? হাঁ, লোকটা পাগলই বটে।" জবাব দেয় কেরাণী। "ঝড় বৃষ্টি কিছুই ও মানে না, গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিনই ও এখানে আসছে চিঠির জন্যে। কিন্তু চিঠি ওর আসেনা।"

"ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। সত্যিই তো কার এমন সময় আছে যে রোজই একখানা করে চিঠি লিখবে ওকে। নেহাৎ পাগল আর কি!"

"লোকটা অনেক পাপ করেছে জীবনে। হয়তো দেবমন্দিরে বা অন্য কোথাও খুন করে থাকবে কাউকে, এখন তাই প্রায়শ্চিত্ত করছে।" মন্তব্য করে কর্ম্মরত একজন কেরাণী।

"পাগলদের আচরণ অদ্ভুত," পোষ্টমাষ্টার বলেন মাথা নেড়ে।

"যা বলেছেন। আমি একবার এক পাগলকে দেখেছিলাম আমেদাবাদে। সে আর কিছুই করতো না, শুধু ধুলো নিয়ে এক জায়গায় জমা করত চূড়োর মত ক'রে। আরেকজন রোজ নদীর ধারে গিয়ে জল ঢালতো একটা পাথরের ওপর।" টেবিলের ওধার থেকে মন্তব্য করে একজন কেরাণী।

"ও আর কী এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার," আরেকজন বাধা দিয়ে বলে, "আমি এমন একজন পাগলকে জানি যে সারাদিন শুধু একটা ঘরের সামনে পায়চারি করে জেলখানার সান্ত্রীর মত। আরেকজন কবিতা আওড়ে যাচ্ছে অনর্গল। তবে সবাইকে হার মানিয়েছে তৃতীয় আরেকটি—যে নিজের গালে চড় মেরে এমনভাবে কাঁদতে থাকে যে মনে হয় যেন আর কেউ তাকে মেরেছে নির্দ্দয়ভাবে।"

সকলে তখন উন্মাদের অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুরু করে। কাজের একঘেয়েমির মধ্যে যেন একটা বৈচিত্র্যের আস্বাদ মেলে।

পোষ্টমাষ্টার উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "পাগলেরা নিজেদের তৈরী এক স্বতন্ত্র জগতে বাস করে। ওরা হয়তো ভাবে আমরাও পাগল। পাগলের জগৎ অনেকটা কবির জগতের মতন।"

শেষের দিকের কথাগুলো বলবার সময় পোষ্টমাষ্টার হাসেন একজন তরুণ কেরাণীকে লক্ষ্য করে। কবিতা লেখার বাতিক আছে বলে সবাই সুবিধা পেলে ঠাট্টা করে তাকে। পোষ্টমাষ্টার কি একটা কাজে অন্য ঘরে চলে যান এবং আবার সবাই নিঃশব্দে কাজ করতে শুরু করে।

* * * *

কয়েকদিন পোষ্ট অফিসে আসেনি আলি। তার এই অনুপস্থিতির কারণটা যে কী—এ নিয়ে খোঁজ করবার মত উৎসাহ বা সহানুভূতি ছিল না কারো, তবে সবাই যে ঐ বিষয়ে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। দিন কয়েক পরে আবার সে এল, কিন্তু এখন যেন সে আরও দুর্ব্বল, আরও শীর্ণ হয়ে পড়েছে, দিন যে ওর ফুরিয়ে এসেছে তা ওর চোখে মুখে পরিস্ফুট। সেদিন আর ধৈর্য্য রাখতে পারে না আলি।

"মাষ্টার সাহেব," পোষ্টমাষ্টারকে লক্ষ্য করে সে বলে, "মরিয়মের কাছ থেকে কোন চিঠি এসেছে আমার নামে?"

পোষ্টমাষ্টার তখন বিশেষ ব্যস্ত—একটা জরুরী কাজে বাইরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। বিরক্তির সুরে বললেন, "কাজের সময় জ্বালাতন করো কে হে তুমি?"

"আমার নাম আলি," অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয় আলি।

"তা আমি জানি......জানি। কিন্তু তুমি কি মনে করো মরিয়মের নাম আমরা খাতায় লিখে রেখে দিয়েছি?"

"লেখা যদি না হয়ে থাকে, দয়া করে লিখে রাখুন। চিঠি যদি আসে ওর কাছ থেকে, রেখে দেবেন যত্ন করে—কি জানি আমি হয়তো নাও আসতে পারি।"

গাঁয়ের মানুষ আলি, নিরক্ষর সরল, জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছে পাখি শিকার করে, কেমন করে ও জানবে মরিয়মের নামের এক কপর্দ্দকও মূল্য নেই অপরের কাছে।

মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত হয়ে পড়ে পোষ্টমাষ্টারের পক্ষে। রাগে গর্জ্জন করে ওঠেন, "তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? বেরিয়ে যাও এখান থেকে। তোমার চিঠি এলে আমরা কি খেয়ে ফেলবো নাকি?"

রাগে গজ গজ করতে করতে পোষ্টমাষ্টার বেরিয়ে যান ব্যস্তভাবে।

ডাকঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে আলি। দু'চার পা এগোয়, আবার পিছন ফিরে তাকায় ডাকঘরের দিকে। নিতান্ত অসহায় বোধ করে সে নিজেকে। চক্ষু বাষ্পভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। বিশ্বাস না হারালেও তার ধৈর্য্য যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মরিয়মের খবর তবে কি সে পাবে না জীবনে?

ডাকঘরের একজন কেরাণীকে পিছনে আসতে দেখে আলি মুখ ফেরায় তার দিকে।

"দেখো ভাই, আমার একটা কথা শুনবে?" আলি বলে অত্যন্ত করুণ সুরে।

কেরাণী আশ্চর্য্য হয়ে যায়। থমকে দাঁড়িয়ে ভদ্রভাবেই বলে, "বলো কী বলতে চাও।"

"হাতটা পাতো দেখি।" একটি টিনের বাক্স আলি উপুড় করে দেয় তার হাতের উপর। কেরাণী অবাক হয়ে দেখে তার হাতের চেটোয় পাঁচটা গিনি চক্‌চক্ করছে।

"আশ্চর্য্য হয়ো না ভাই," মৃদুস্বরে বলে আলি, "এ তোমার কাজে লাগবে, কিন্তু আমার কাছে আজ ওর কোন দামই নেই। একটা কাজ করতে হবে তোমায়, করবে?"

"কী কাজ?"

আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে আলি বলে, "কী দেখছ ওপরে?"

"আকাশ।"

"আল্লা রয়েছেন ওখানে। আল্লার সামনে এই টাকা দিচ্ছি তোমায়। মরিয়মের চিঠি এলে পাঠিয়ে দেবে আমায় কাছে।"

"কিন্তু কোথায়—কোথায় পাঠাবো সেই চিঠি?" কেরাণী জিজ্ঞেস করে বিমূঢ়ের মত।

"আমার কবরে।"

"কী বললে?"

"হ্যাঁ, যা বললাম ঠিকই। আজ আমার শেষ দিন—আজই আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু দুঃখ এই যে মরিয়মের সঙ্গে আর দেখা হল না। একখানা চিঠিও পেলাম না তার কাছ থেকে।" দু ফোঁটা অশ্রু আলির গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। কেরাণী আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়, শোকাতুর বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

* * * *

আলিকে আর দেখা যায় না, তার খোঁজ নেওয়ার দরকারও মনে করে না কেউ।

একদিন পোষ্টমাষ্টার ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর মেয়ে হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু দু'দিন তার কোন খবর নেই। মনটা অত্যন্ত ব্যাকুল, চিঠির প্রত্যাশায় অফিস ঘরে বসে আছেন উদ্‌গ্রীব হয়ে। পিওন ডাক এনে যথাস্থানে রাখে। একরাশ চিঠি স্তূপীকৃত হয় টেবিলের উপর। পোষ্টমাষ্টার ঝুঁকে পড়েন চিঠির স্তূপের উপর। যেরকম খামে মেয়ের চিঠি আসে ঠিক সেই রকম একখানা খাম নজরে পড়ে তাঁর। সাগ্রহে তুলে নেন খামখানা। খামের উপর কোচম্যান আলির নাম লেখা। পোষ্টমাষ্টার দেখেই চম্‌কে ওঠেন—হাত থেকে খসে পড়ে খামখানা। দুঃখে দুশ্চিন্তায় তাঁর সেই উগ্র মেজাজটা অন্তর্হিত হয়েছে এরই মধ্যে, মনের মধ্যে জেগেছে মানুষের স্বাভাবিক মমতা ও সমবেদনা। বৃদ্ধ এতদিন যে চিঠিখানির প্রত্যাশায় ছিল এ যে সেই চিঠি পোষ্টমাষ্টারের বুঝতে দেরী হয় না। এ নিশ্চয়ই মরিয়মের চিঠি।

"লক্ষ্মীদাস!" পোষ্টমাষ্টার ডাকেন সেই কেরাণীটিকে যাকে আলি দিয়ে গেছে তার সারাজীবনের সঞ্চয়।

"আজ্ঞে।"

"এই চিঠিখানা কোচম্যান আলির। এখন সে কোথায়?"

"জানি না তো স্যর, খুঁজে দেখতে হবে।"

সারাদিন অপেক্ষা করেও মেয়ের কোন চিঠি পান না পোষ্টমাষ্টার। সারা রাত চোখে তাঁর ঘুম আসে না, তিনটের সময় উঠে অফিসঘরে এসে বসেন। মনে মনে বলেন, "চারটের সময় আলি যখন আসবে তখন চিঠিখানা, তাকে দেবো নিজের হাতে।"

আলির অন্তরের ব্যাকুলতা এখন বুঝতে পারেন পোষ্টমাষ্টার। মেয়ের খবরের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় একটি রাত কাটিয়েই আলির প্রতি সমবেদনায় মন তাঁর কানায় কানায় ভরে উঠেছে। বেচারী পাঁচ বছর ধরে রাতের

পর রাত এমনি দুর্ভাবনায় অতিবাহিত করেছে। পাঁচটার সময় দরজায় কার মৃদু করাঘাত শুনতে পান। নিশ্চয়ই আলি এসেছে? চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ান পোষ্টমাষ্টার। তাঁর স্নেহার্ত পিতৃহৃদয় আজ আলির মর্ম্মবেদনা উপলব্ধি করতে পারে। দরজা খুলতেই দেখেন বাইরে আলি দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধের হাতে চিঠিখানা দিয়ে কোমলকণ্ঠে বলেন, "ভেতরে এসো, আলি।"

লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আলি। বার্দ্ধক্যে দেহ নুয়ে পড়েছে, গণ্ডদেশে অশ্রুর রেখা। কেরাণী লক্ষ্মীদাসের সঙ্গে যখন তার দেখা হয় পথে তখন তার মুখের চেহারায় যে কাঠিন্য ছিল আজ আর তা নেই। প্রীতি ও মমতায় কোমল তার মুখ। ধীরে ধীরে মুখ তোলে আলি—চোখে তার এমন একটা অপার্থিব দীপ্তি যা দেখে পোষ্টমাষ্টার পিছিয়ে আসেন ভয়ে আর বিস্ময়ে। অফিসঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় লক্ষ্মীদাস। ভোর পাঁচটায় হাজিরা দিতে হয় তাকে।

"কার সঙ্গে কথা কইছিলেন স্যর? বুড়ো আলি?" জিজ্ঞেস করে লক্ষ্মীদাস। তার কথাগুলো পোষ্টমাষ্টারের কানে পৌঁছয় না যেন। বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে পোষ্টমাষ্টার তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। এক মুহূর্ত্ত আগে এইখানে দাঁড়িয়েছিল আলি, কোথায় অদৃশ্য হল এরই মধ্যে।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্মীদাসের দিকে ফেরেন পোষ্টমাষ্টার। —"হ্যাঁ, আলির সঙ্গেই কথা কইছিলাম," জবাব দেন তিনি।

"বুড়ো আলি তো মারা গেছে, স্যর। কিন্তু ওর চিঠিখানা আমায় দিন।"

"মারা গেছে! কবে মারা গেল? তুমি ঠিক জানো, লক্ষ্মীদাস, ও মারা গেছে?"

"হ্যাঁ, হুজুর—তিন মাস হল ও মারা গেছে," ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে একজন পোষ্টম্যান।

পোষ্টমাষ্টার হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। দরজার কাছেই পড়ে রয়েছে মরিয়মের চিঠি, বৃদ্ধ আলির চেহারা তখনও ভাসছে চোখের সামনে। লক্ষ্মীদাসের মুখে শোনেন আলির সঙ্গে তার শেষ দেখার বিবরণ, কিন্তু তবুও দরজায় ঘা দেওয়ার আওয়াজ আর আলির চোখের জল অবাস্তব বলে মেনে নিতে মন সায় দেয় না। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন পোষ্টমাষ্টার। সত্যই কি আলিকে দেখেছেন তিনি? না, ওটা শুধু কল্পনা?

* * * *

ডাকঘরের দৈনন্দিন কাজ যথারীতি শুরু হয়। কেরাণী খামের উপরে লেখা ঠিকানা পড়ে—কমিশনার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, দেওয়ান সাহেব—আর চিঠিগুলি ছুঁড়ে দেয় অভ্যস্ত দক্ষতায়। পোষ্টমাষ্টার এখন উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন সেইদিকে—যেন প্রতিটি লিপি বহন করে আনছে এক স্নেহব্যাকুল হৃদয়ের মর্ম্মবাণী। এখন আর চিঠিগুলি তাঁর কাছে শুধু লেফাফা আর পোষ্টকার্ড নয়—মানুষের অন্তরের মাধুর্য্যে ভরা এক একটি মূল্যবান রত্ন।

* * * *

সেইদিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মীদাস আর পোষ্টমাষ্টারকে দেখা যায় আলির কবরের পাশে। চিঠিখানি আলির কবরের উপর রেখে আস্তে আস্তে ফিরে আসে তারা।

"লক্ষ্মীদাস, আজ সকালে তুমিই কি প্রথম এসেছিলে অফিসে?" পথ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করেন পোষ্টমাষ্টার।

"হ্যাঁ, স্যর। আমার আগে আর কেউ আসে নি।"

"তাহলে আমি যা দেখলাম সব মিথ্যা। না, এ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কিসের কথা বলছেন আপনি?"

"না, ও কিছু নয়!" কথাটা চেপে যান পোষ্টমাষ্টার। অফিসঘরের সামনে এসে পোষ্টমাষ্টার বিদায় দেন লক্ষ্মীদাসকে। তারপর চিন্তিত মুখে ভিতরে প্রবেশ করে বসে পড়েন নিজের চেয়ারটিতে। আলির অন্তরের আকুলতা বুঝতে না পেরে তাকে তিরস্কার করার জন্য অনুতাপ জাগে তাঁর মনে। মেয়ের খবর আজও পাননি তিনি—সারাটা রাত কাটাতে হবে দুশ্চিন্তার পীড়নে।

সনেট

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন ছায়াঘন প্রত্যুষের আলোতে
বিস্মৃত সায়াহ্নের বাণীহীন প্রতীক্ষাতে—
নির্জন প্রাঙ্গণে, মোর পরাণে
মৌনী বীণার ধেয়ানে,
তব পদধ্বনি শুনি আমি,
দয়িততম আসো তুমি
দীপশিখা সম
আনন্দ স্বপন মম
তুমি আসো, তুমি আসো
আরো, আরো, নিকট আরো।

(শ্রীঅরবিন্দের একটি সনেট্ অবলম্বনে "More Poems")

ধর্ম্ম

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

নানা মনে নানা ভাবের লহর তোলে নিত্য-শোনা শব্দ, ধর্ম্ম। কেহ পায় ভয়, কেহ হাসে ভণ্ডের চাতুরীতে ধর্ম্মের নামে। বৃত্তি যার ভিক্ষা, তার প্রধান মূলধন ঐ শব্দ—ধর্ম্মের নামে দান। দান চরিত্রকে, উদার করে, দরদ মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তোলে। অবশ্য দান ধর্ম্ম। সহজে বুঝি তৈত্তিরীয়োপনিষদের বিধি—

শ্রদ্ধয়া দেয়ম। অশ্রদ্ধয়া দেয়ম।
শ্রিয়া দেয়ম। হ্রিয়া দেয়ম।
ভিয়া দেয়ম। সংবিদা দেয়ম।

শ্রদ্ধায় দান করবে। দান করবে অশ্রদ্ধায়। শোভন-ভাবে দেবে, লজ্জায় দেবে। ভীত হ'য়ে দান করবে—সর্ত্ত অনুসারে দান করিবে।

শোক তাপে জর্জ্জরিত ক্লিষ্ট ভাবে—তার দুঃখের মূলে আছে বুঝি অধর্ম্ম। সে ঠিক রূপ নির্ণয় করতে পারেনা অধর্ম্মের। ভাবে বুঝি তিলক, চন্দন, অবোঝা মন্ত্রের আবৃত্তির অভাব ধর্ম্মহীনতা। কত লোক ভাবেনা তারা ধার্মিক, যদিও পরদুঃখে তারা হয় কাতর। কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বিমুখতায় ক্লেশ পায় যখন অন্তরে মানুষ ভাবেনা যে আলস্য অধর্ম্ম। প্রতিদিনের ভাষায় মানুষ সাধারণতঃ সেই কর্ম্মকে বলে ধর্ম্ম—যেগুলি পূজা পাঠ, অর্চ্চনা বন্দনা, তীর্থ ভ্রমণ ও দেব-মন্দিরে ফুল চন্দন দান ঘিরে। এ সব কর্ম্ম ধর্ম্ম-সাধনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ ব্যাপক।

গীতোপনিষদে নানা কর্ম্ম, বহু ভাব, ব্যক্তিত্বের প্রচুর প্রকাশকে বলা হ'য়েছে ধর্ম্ম। মোট কথা, জীবের আদর্শে নিশ্চিত থাকে যদি গতির পথের শেষ লক্ষ্যস্থল, সে যদি হয় মঙ্গলময়, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি সহায়তা করে সেই শুভপথে অগ্র-গমনের। যে পথে তুচ্ছ স্বার্থপরতার ক্ষুদ্রতা নাই, ঈর্ষা দ্বেষ হিংসার প্রসার নাই, সে পথ ধর্ম্মপথ। একটু ধীরভাবে আলোচনা করলে বোঝা যাবে আদর্শ কর্ত্তব্যের সাধনাই ধর্ম্ম সাধনা। শাস্ত্র বলেছে—

রুদ্রাক্ষং তুলসীকাষ্ঠম, ত্রিপুণ্ড্রম ভস্মধারণম্
যাত্রা স্নানানি হোমাঃ জপ বা দৈবদর্শনম,
ন এতে পুনাত্তিমনুজম যথা ভূতহিতে রতিঃ।

রুদ্রাক্ষমালা তুলসীকাষ্ঠ ত্রিপুণ্ড্র ভস্মধারণ, তীর্থ যাত্রা, স্নান, হোম, জপ বা দেব দর্শন—মানুষকে পবিত্র করতে পারেনা, যদি না থাকে ভূতহিতে রতি। পবিত্র হয় মন—উদারতায় বিশালতায়। কারণ জীব বিরাটের অংশ, সে অমৃতের সন্তান, আনন্দ যার উপাধি। তাই ক্ষুদ্রতায় আনন্দ বিরাজ করেনা, আনন্দ ভূমায়। জগতের যে সব কার্য্য—সেই প্রাচুর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্য, সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্যের উপলব্ধির আয়োজন, সেই সব কার্য্যই ধর্ম্ম।

গীতা আরম্ভ যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র আখ্যা দান ক'রে। সেথায় আত্মীয়-স্বজন, অরি মিত্র সবাই অন্যের প্রাণ সংহারে হ'য়েছে বদ্ধপরিকর। সেথায় প্রশংসা ও সমৃদ্ধি লাভের সহজ উপায় স্রোত বহানো নর-রক্তের। কেমন করে সে ক্ষেত্র হ'তে পারে ধর্ম্ম-ক্ষেত্র? অহিংসা পরম ধর্ম্ম—এই তো নীতি ভারতের। তবে মহা-ভারতের এ বিপর্য্যয় কেন?

সমগ্র গীতা আলোচনা করলে সে জটিল সমস্যার সমাধান হয়। অন্যান্য প্রবন্ধে আমি সে রহস্য সমাধানের প্রয়াস করেছি। উপস্থিত প্রশ্ন ধর্ম্মক্ষেত্র শব্দে ধর্ম্ম কথাটির অর্থ নির্ণয়। ধর্ম্মের ধারণা, বোধগম্য করবার পক্ষে এ বিশ্লেষণের তাৎপর্য্য কতটুকু জ্ঞান পরিবেশন করতে পারে পাঠককে?

যুদ্ধ কর্ত্তব্য ক্ষত্রিয়ের। মানুষের সমাজ সেই রীতি-নীতিতে গঠিত। সেই কর্ত্তব্য-সাধনের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ব্যক্তি যোদ্ধার এবং যোদ্ধ সঙ্ঘের যশ, মান, নীতি। কর্ত্তব্য পালনের প্রণালী কেমন ক'রে আনে ইপ্সিত সাফল্য? তার উপর যুদ্ধের কঠোর কাঠিন্যের বিচার সম্ভব। ধর্ম্ম কর্ত্তব্য-বোধে সমর—নিরাসক্ত নির্ব্বিকার ভাবে। প্রাণ হ'তে হিংসা বর্জ্জন ক'রে, প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে ভক্তিভরে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ—এই সঙ্কেত



আপনার ত্বকও

চিত্রতারকাদের ত্বকের মতই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে

অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জী সৌন্দর্য্যের জন্যে কি করেন শুনুন। "আমার ত্বক মসৃণ ও সুন্দর রাখার জন্যে," তিনি বলেন "আমি প্রতিদিন লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি।" স্নানে ও হাতমুখ ধুতে লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করা সত্যিই আনন্দদায়ক—লাক্স সাবানটি এত কোমল, এত সুগন্ধী। আপনিও আজ থেকেই লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্ন নিতে আরম্ভ করুন না কেন?

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স

টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান



হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

LTS. 569-X52 BG

অতএব যদি লোকায়ত চার্ব্বাক-পন্থী বা নিরীশ্বরবাদী শীল রক্ষা করে তাকেও ধার্ম্মিক বলতে হবে। ধর্ম্ম কর্ত্তব্য পালন। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম প্রতিপাদন করে বলেছিলেন—যদি তুমি ধর্ম্ম-যুদ্ধ না কর তাহলে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি বর্জ্জন করে পাপ অর্জ্জন করবে। ২।৩৩

ধর্ম্মের আদর্শ বর্ণনাই সমগ্র গীতার উপদেশ। এই প্রসঙ্গেই ধর্ম্মকে কর্ম্ম বলেছেন নর-নারায়ণ। বলেছেন—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আরম্ভ করলে বিফলতা নাই। প্রত্যবায় নাই। এই ধর্ম্মের অতি অল্পমাত্র আচরণও মহাভয় হ'তে ত্রাণ করে।

এ স্থলে ধর্ম্ম আখ্যা দিলেন কর্ম্মযোগকে। কর্ম্মযোগ জীবের নিত্য কর্ম্মকে বিশিষ্টতা দান করে। সে মানব-ধর্ম্ম কারণ আদর্শ পথে বিচরণ করতে শিক্ষা দেয় নিষ্কাম কর্ম্ম জগৎ সংসারে। এই প্রসঙ্গেই পরে বলেছেন—সে মোহ কলুষ অতিক্রম করলে তুমি নির্ব্বেদ হবে—তোমার বৈরাগ্য আসবে। সুতরাং বৈরাগীর জীবন যেমন ধর্ম্ম-জীবন, তার পূর্ব্বের অবস্থার কর্ম্ম-জীবনও তেমনি ধর্ম্ম-জীবন। যোগাশ্রমে উন্নত হয় মানুষ গৃহধর্ম্ম-নীতি পালন করলে।

শ্রীমদ্ভাবদ্‌গীতার অন্যত্র ধর্ম্ম শব্দের তাৎপর্য্যের কথা পরে আবার আলোচনা করব। মোট কথা নীতি ও শীলসম্মত প্রতিদিনের কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাথে সাধন করবার প্রথাকেই ধর্ম্ম বলা হয়েছে গীতায়।

অন্যত্রও প্রায় ঐরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ধর্ম্মশব্দ। প্রার্থনা, উপাসনা, যাগ, যজ্ঞ, তীর্থভ্রমণ দান দাক্ষিণ্য যেমনি ধর্ম্ম-কর্ম্ম তেমনি ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাংসারিক জীবনের প্রতিদিনের কর্ম্ম-নীতি ও সদাচার।

ঋগ্বেদে প্রজাপতি স্তোত্রে—কস্মৈ দেবায়—কোন দেবতাকে উদ্দেশ্য করে সে প্রার্থনা রূপ পেয়েছে তাতে পাওয়া যায় সর্ব্বশক্তিমান পরম দেবতার বিভূতি বর্ণনা। তিনি আত্মাকে দান করেন, দেবতারা তাঁর আজ্ঞা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করে অমরত্ব লাভ করেছেন। সেই দেবতার স্তুতিমন্ত্রে পাঠ করি—

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং
সত্যধর্ম্মাজজান
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জ্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।
১০।১২১।৯

তিনি যেন আমাদিগকে আহত না করেন, যিনি পৃথিবীর জনয়িতা। যিনি দ্যুলোককে, সত্য ধর্ম্মকে উৎপাদন করেছেন। যিনি আহ্লাদকর ও বৃহৎ জলসমূহ উৎপাদন করেছেন (সেই) কোন দেবতাকে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্য্যা করব।

আমার মনে হয় বিশ্বের সমস্ত শক্তির ছন্দে নিজের জীবনের সুর মিলিয়ে সেই অচিন্ত্য, বাক্যের অতীত বিভূতি সমন্বিত স্রষ্টার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করাই সত্যধর্ম্ম—যার উল্লেখ করা হয়েছে স্তবে। সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদানের ছন্দকে না মানলে সত্যধর্ম্ম রক্ষা হয় না। সৃষ্টি অসীম। তাকে সীমাবদ্ধ করলে ক্ষুদ্রত্বের অনুভূতি আসে চিত্তে। কিন্তু আপনাকে সেই অসীম বিরাটের অংশ উপলব্ধি করলে ক্ষুদ্রত্ব সমৃদ্ধ হয়, বিশালের সম্ভ্রান্ততা দীপ্ত করে প্রাণকে। এই প্রসারের পন্থাই সত্য ধর্ম্ম পালন। সে ধর্ম্ম পালন করলে অনির্ব্বচনীয় দেবতার দ্বারা আহত হবার সম্ভাবনা থাকে না।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে পাঠ করি যে আচার্য্য বেদ অধ্যয়নের অন্তে শিষ্যকে অনুশাসন করেন এই মন্ত্রে—

সত্যংবদ—সত্য বল। ধর্ম্মংচর—ধর্ম্ম আচরণ কর। সাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ—অধ্যয়নে অনবহিত হইওনা। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। আচার্য্যের জন্য প্রিয়ধন আহরণ করার পর সন্তানের ধারাকে ছেদন ক'রনা। সত্যান্নপ্রমদিতব্যম। সত্যে অনবহিত হইওনা। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম। ধর্ম্মে অনবহিত হইওনা। তারপর বলা হয়েছে কুশল, কল্যাণ, সম্পদ অর্জ্জন (ভূত্য) অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দেব পিতৃকার্য্যে অনবহিত হইওনা। ১।১১।১

তারপর শুনি বাণী—

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব।

আচার্য্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব।

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মানি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি।

যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। ১।১১।২

মাতাকে, পিতাকে, আচার্য্যকে এবং অতিথিকে দেবতা জ্ঞান করবে। যে সমস্ত কর্ম্ম অনিন্দ্য, তেমন কর্ম্ম করবে, তা ব্যতীত অন্য কর্ম্ম নয়। আমাদের যে সকল আচরণ সুষ্ঠু, তেমন আচরণ গ্রহণ করবে।

বলা বাহুল্য এই অমোঘ উপদেশে শীলতা ও সদাচারের সকল উপাদান বর্ত্তমান। ধর্ম্মংচর তার মধ্যে একটি। এ

সবার সংশ্লিষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে ধার্ম্মিক আচরণ সকল সুচরিতকর্ম্ম। সবার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্পদ অর্জ্জন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দেবকার্য্য, পিতৃকার্য্য সমস্তই ধর্ম্মের সহগামী। মাত্র বৈরাগ্য-সাধন ধর্ম্মপথ নয়।

মহাভারত ধর্ম্মশব্দ ব্যবহার করেছে শ্রীকৃষ্ণের মুখে। সেই একই বর্ণনা শোনা যায় ভীষ্মদেবের মুখে।

ধারণাৎ ধর্ম্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্মধারয়তে প্রজাঃ
যৎ সত্যাদ্ধরণসংধুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চিতঃ।

ধারণ (ধৃধাতু) হতেই ধর্ম্ম এ কথা বলা হয়। ধর্ম্ম প্রজাকে ধারণ করে। যা সত্যধারণের সাথে সংযুক্ত, নিশ্চিত তাই ধর্ম্ম।

সুতরাং জনমানবের সেই নীতি ধারণ করাই ধর্ম্ম—যা সত্যকে ধারণ করে রাখে। সত্য পথ শ্রেষ্ঠ জনের আচরণ ও উপদেশ হতে স্থির করা হয়। এই সত্য পথকে ধারণ করাই ধর্ম্ম। তার মধ্যে আছে সকল কর্ত্তব্য—জীব মানবের প্রতি।

পিপাসাতুর যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন যক্ষ—
কশ্চধর্ম্মপরোলোকে, কশ্চধর্ম্মঃ সদাফলঃ
কিং নিয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চসন্ধির্ণজীর্য্যতে।

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কী? কোন্ ধর্ম্ম সুফলদায়ক? কোন্ নিয়মে জীবন যাপন করলে মানুষ শোকগ্রস্ত হয় না? কার সাথে সন্ধি করলে বিনষ্ট হয় না?

বলা বাহুল্য—এখানে ধর্ম্ম অর্থে—বৈদিক ধর্ম্ম, তান্ত্রিক ধর্ম্ম, ভাগবত ধর্ম্ম বা অন্য কোনো বিশিষ্ট মতবাদ নয় মোক্ষ সম্বন্ধে। ধর্ম্ম মানে নিয়ম-ধারণের, আচরণের পদ্ধতি।

যুধিষ্ঠির এ প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন—

আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্ম—দয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ—শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম সর্ব্বদা সুফল দান করে। মনো যস্য ন শোচন্তি—মন যার বশে তার শোক নাই। সদ্ভিঃ সন্ধির্ণজীর্য্যতে—সাধু ব্যক্তির সাথে যার সন্ধি তার বিনাশ নাই।

শাস্ত্রোক্ত আচরণ, সাধুসঙ্গ,মনের উপর আধিপত্য—এই সব সুষ্ঠু আচরণ। শাস্ত্র বহু নীতি বর্ণনা করেছে। এ উত্তরে যক্ষ হলেন না তুষ্ট। তাই আবার প্রশ্ন করলেন। সত্যই তো ব্যাপারটা জটিল। তাই সে জটিল প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

ধর্ম্মের তত্ত্ব বড় গভীর জ্ঞান সাপেক্ষ। সুতরাং শ্রেষ্ঠ মানব যে পথে ভ্রমণ করে সেই পথই ধর্ম্মমার্গ।

বলা বাহুল্য এ বর্ণনা অনেকগুলি রহস্য ঘিরে। মহাজন-নির্দ্ধারণ বড় জটিল ব্যাপার। একজনের আদর্শ মানব, অন্যের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করতে পারে না। অবতার, মেশায়া, প্রফেট, পয়গম্বর এমন কেহ নাই, যাঁকে সারা বিশ্বের সকল মানব মহাজন বোধে পূজা করে। সুতরাং সাধারণ জনের পক্ষে মহাজন নির্ণয় মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। এমন কি একই দেশের মহাজনকে সবাই শ্রদ্ধা করে না। ইংরাজি প্রবচন—ঈশ্বরের দূত নিজের দেশে সম্মানিত হয়না। প্রভু যীশুর জীবন স্মরণ করলে এর সার্থকতা বোঝা যায়। প্রবচন য়িহুদী জাতির সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কেত।

গীতা এ কথা উদারভাবে বলেছে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন যেমন আচরণ করে, সাধারণ ব্যক্তি সেই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নিজের জীবন। মানুষের মন অনুকরণ-প্রবণ। এ বিধিতে শ্রেষ্ঠ এবং সাধারণ উভয় শ্রেণীর পরেই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

মহাভারতের সকল তত্ত্ব অবধারণ করলে সন্দেহ থাকে না যে পূজাপাঠ যাগযজ্ঞ যেমন ধর্ম্মানুষ্ঠান, তেমনি আদর্শ কর্ত্তব্য পালনও ধর্ম্ম সাধনা। জাতি-ধর্ম্ম মানুষের বিভিন্ন। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি, তার যেমন পরিচয় পাই গীতা ও মহাভারতের বিভিন্ন অংশে, তেমনি সমাচার পাই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের আদর্শ নীতির।

পতিব্রতা ধর্ম্ম পবিত্র করে নারীর জীবন। পতিব্রতা ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে এক পবিত্রা নারী ব্রাহ্মণ ঋষিকে কিরূপ শিক্ষা দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে সে কাহিনী মনোরম। এই ব্রাহ্মণ একবার কোপ দৃষ্টিতে একটি বকীকে দগ্ধ করেছিলেন। এমনি ছিল তাঁর তপস্যার সিদ্ধি। ব্রাহ্মণের নাম কৌশিক। তিনি একবার এক গৃহস্থের ঘরে গেলেন ভিক্ষার জন্য। সাধ্বী গৃহিনীর বিলম্ব হল বাহিরে আসতে। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হলেন মর্য্যাদা-

হানির অভিমানে। গৃহিণী ক্ষমা প্রার্থনা করলেন বিলম্বের জন্য। তাতে তুষ্ট হ'লেন না কৌশিক। বল্লেন—স্পর্দ্ধার কথা! স্বামী সেবার জন্য ব্রাহ্মণের অবমাননা। ব্রাহ্মণ হ'তে কি স্বামী বড় ?

পতিব্রতা বল্লেন—ব্রাহ্মণের প্রতাপ আমি জানি। ব্রাহ্মণেরই ক্রুদ্ধ অভিসম্পাতে সাগর অপেয় লবণোদকে পূর্ণ। দণ্ডকারণ্য প্রজ্জলিত হয়েছিল ব্রাহ্মণের রোষে। কিন্তু—

পতি-শুশ্রূষা ধর্ম্মো যঃ স মে রোচতে দ্বিজ
দৈবতেষ্বোপি সর্ব্বেষু ভর্ত্তা মে দেবতা পরম।
অবিশেষেণ তস্যাহং কুর্য্যাৎ ধর্ম্ম দ্বিজোত্তমঃ।

পতি শুশ্রূষা ধর্ম্মই আমার বরণীয়। সকল দেবতার মধ্যে পতিই আমার পরম দেবতা। দ্বিজোত্তম আমি সেই ধর্ম্মই অবিশেষে পালন করি।

মাত্র নিজের ধর্ম্ম বর্ণনা করে মহীয়সী নারী ক্ষান্ত হলেন না। তিনি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম আলোচনা করলেন। বল্লেন, ক্রোধ মহা শত্রু। যিনি ক্রোধ এবং মোহ ত্যাগ করতে পারেন তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি চিরকাল সত্য বলেন, গুরুকে সন্তুষ্ট করেন, হিংসা করেন না, তিনিই ব্রাহ্মণ। এইরূপে বহু সদ্‌গুণের উল্লেখ ক'রে সাধ্বী বল্লেন—ব্রাহ্মণের শাশ্বত ধর্ম্ম হচ্চে—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দম, ঋজুতা এবং ইন্দ্রিয়-সংযম। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। শ্রুতি প্রমাণ ধর্ম্ম। বৃদ্ধানুশাসন ধর্ম্ম।

বলা বাহুল্য সাধ্বী বোঝালেন যে শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্মই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। অবশেষে ব্রাহ্মণকে বল্লেন—আপনি মিথিলাবাসী ধর্ম্মব্যাধের নিকট গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করুন ধর্ম্ম সম্বন্ধে। ব্যাধ ধার্ম্মিক। কারণ তিনি—

মাতাপিতৃভ্যাং শুশ্রূষুঃ, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

মাতাপিতার শুশ্রূষাপরায়ণ। সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়।

সুতরাং এ কথা প্রতিপন্ন হচ্চে যে কর্ত্তব্য পালনই ধর্ম্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

বেদঃ স্মৃতি সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহু—সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম।

বেদ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মার প্রিয়ত্বলাভ—এই চতুর্ব্বিধ লক্ষণ ধর্ম্মের। আত্মার প্রিয়তা অর্জ্জন করা যায় না স্বার্থপরতায়। উপনিষদে বলা হয়েছে—ব্যক্তির মধ্যে সর্ব্বব্যাপক আত্মার বোধই আত্মজ্ঞান। সেই আত্মজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞান। অন্যত্র শুনি—

যদন্যেষাং হিতং নাস্যাৎ আত্মনঃ কর্ম্মপৌরুষম।
অপত্রপেত বা যেন ন তৎ কুর্য্যাৎ কদাচন।

যা দ্বারা অপরের হিত হয়না, নিজের পৌরুষ কর্ম্ম বা যে কর্ম্মের জন্য লজ্জিত হ'তে হয়, এমন কার্য্য কদাপি করণীয় নয়।

গীতায় ক্ষত্রিয় অর্জ্জুনকে উৎসাহ দিলেন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করতে, কারণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হ'ল যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধে কেমন করে হিংসাবৃত্তি দমন করতে হয় সে শিক্ষা দিয়েছেন। সে বিষয় আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি। ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্রের পক্ষে যুদ্ধ ভয়াবহ। কারণ তাদের সংস্কার ও শিক্ষা বিভিন্ন। তারা নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করতে পারবে না। তাই শুনি বাণী—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ।৩।৩৫

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হতে অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্ম পালনে বিনাশ কল্যাণকর। পরধর্ম্ম ভয়সঙ্কুল। আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বিচারে সেই কথাই সপ্রমাণ এই বাণী হতে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত মিলনের মধ্যে যাহা একমাত্র মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়।"

এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যেমন—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম মন্ত্রে, তেমনি এই মন্ত্র-শক্তির সাধন হয় ঐ মিলনের সেতুর সন্ধানে।

সৃষ্টিকে ঘৃণা ক'রে বা উপেক্ষা ক'রে স্রষ্টার প্রাচুর্য্য, ঐশ্বর্য্য বা সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা অসম্ভব।

বৌদ্ধ নীতির ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি—বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—ধর্ম্মমাত্র জগতকে পরিত্যাগ ক'রে নিজের মোক্ষের আয়োজন নয়। জগতকে না মানবার উপায় নাই। বিশ্বসংসার দুঃখে ভরা। তাই দুঃখ আর্য্য সত্য। কিন্তু আর্য্যসত্য বিদ্যমান জীবন রহস্য ঘিরে। দুঃ

নিরোধও জীবনের ধ্রুব সত্য, যদি উপায় অবলম্বন করা যায়। সেগুলি অষ্টাদিক মার্গে ভগবান বুদ্ধ নির্ণয় করেছেন। তাদের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—জ্ঞানদৃষ্টিতে, সুষ্ঠু সুচরিত জীবনযাপন করলে, সত্যে সমাধিলাভ করলে জীবন হয় শুভ। মধুর জীবনের জন্য প্রত্যহ প্রতি মুহূর্তে সাধ্য সদাচার, শীল। পঞ্চশীল উৎকৃষ্ট আচরণের সাধন সঙ্কেত। সকল জীবের প্রতি হিংসা হতে বিরত হ'ব, পরদ্রব্য অন্যায় রূপে গ্রহণ করবনা, মিথ্যা কথা বলবনা, ব্যভিচার করবনা, মাদক দ্রব্য ব্যবহার করবনা—এ প্রতিশ্রুতি শুনতে সহজ। কিন্তু রক্ষা করলে চরিত্রের কী উৎকর্ষতা লাভ হয় সে কথা সবাই বুঝতে পারি। এই ধর্ম্মপালন করতে পারলে, আপনি জ্ঞানের উষা রঙীণ হ'য়ে প্রকাশ হবে চিত্তে। জীবন হবে উজ্জ্বল।

বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব—"সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। কর্ম্ম করতে করতে তবে জ্ঞান হয়। গুরু বলেছেন, এই সব কর্ম্ম কোরোনা। তিনি আবার নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দেন, কি কর্ম্ম করতে করতে মনের ময়লা কেটে যাবে।"

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—পরস্পর বিরোধী নয়। অর্থ সঞ্চয় হয় দুষ্ট, যদি নিজের তুচ্ছ স্বার্থের জন্য মানুষ সঞ্চয় করে ধন। কাম হয় অনভিপ্রেত—যদি কামিনীর লোভ—অতি বড় লোভ—চিত্ত হ'তে সকল সুকোমল ও উচ্চ ভাব নির্ব্বাসিত করে। মোক্ষাভিলাষী স্বার্থপর হ'তে পারেনা। সিংহাবলোকন ন্যায়ের দ্বারা বিচার করলে এই চতুর্বর্গ পরস্পরের সাথে বাঁধা। কালিদাস রঘুবংশের রাজাদের বর্ণনায় যা বলেছিলেন, সে কথা এ সিদ্ধান্তের সমর্থক।

ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাম্ সত্যায় মিতভাষীণাম
যশসে বিজীগিষুণাম প্রজায়ৈ গৃহমেধীনাম—

তাঁরা অর্থ সঞ্চয় করতেন ত্যাগের জন্য, স্বল্পভাষী ছিলেন সত্যের জন্য, বিজয় কামনা করতেন যশের জন্য (ধর্ম্মযুদ্ধ ক'রে) এবং প্রজাবৃদ্ধির জন্য বিবাহ করতেন।

পৃথিবীর সকল অঙ্গকে ভগবানের সৃষ্টি জেনে প্রাণ মধুময় করা জীবনের ধর্ম্ম। করতে হবে—মধুমৎ পার্থিবম্ রজঃ—পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণাকে মধুময়। বিশ্বপ্রেমই ধর্ম্ম।

বৈশেষিক সূত্র বলেছেন যা' থেকে আনন্দের স্ফুরণ এবং অন্তিম মোক্ষ লাভ হয় এমন কর্ম্মই ধর্ম্ম।

যতো অভ্যুদয় নিশ্রেয়সসিদ্ধি স ধর্ম্মঃ।

জীবদেহ ঈশ্বরের আবাস। তাই প্রত্যেক জীবে প্রেম ধর্ম্ম।

ভগবান বাসুদেবো হি সর্ব্বভূতে অবস্থিতঃ
এতদ জ্ঞানমহি সর্ব্বস্য মূলম ধর্ম্মস্য শাশ্বতম্।

ভগবান বাসুদেব সর্ব্বভূতে বিরাজ করেন। এই জ্ঞানই ধর্ম্মের শাশ্বত মূল। তাই মহাপ্রভুর মন্ত্র—নামে রুচি, জীবে দয়া।

পরহিতকর কর্ম্মই ধর্ম্ম—এ বাণী শাস্ত্রের সর্ব্বত্র। প্রভু যীশুর বাণী—তোমার নিজের প্রতি যে আচরণ প্রত্যাশা কর, পরের প্রতি তেমন ব্যবহার কর। আপস্তম্বে শুনি—আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

শান্তিপর্ব্বে (২৬১।৯) জাজলিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

সর্ব্বেষাম ইহ সুহৃন্নিত্যম সর্ব্বেষাম চ হিতে রতাঃ
কর্ম্মণা মানসা বাচা স ধর্ম্মম্ বেদ জাজলি।

ধর্ম্মের এই অর্থ জাজলি—যে কর্ম্মে, মনে এবং বাক্যে এ পৃথিবীতে সবার হবে সুহৃৎ, নিত্য সবার হিতে রত রবে।

শান্তিপর্ব্বে (১৬২।১১) আবার শুনি—

অদ্রোহ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা,
অনুগ্রহশ্চ দানম্ চ সতাম ধর্ম্মঃ সনাতন।

কাজে মনেও বাক্যে সকলভূতে অদ্রোহ, অনুগ্রহ এবং দানই সদ্ব্যক্তির সনাতন ধর্ম্ম।

ধর্ম্মের মূল সম্বন্ধে মনুর সংক্ষিপ্ত নির্ণয় বড় মনোরম। মহাজনের অনুসৃত পথ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি উল্লিখিত এ তালিকায়।

বেদোখিল ধর্ম্মমূলম স্মৃতিশীলেচ তদ্বিদাম
আচারশ্চৈব সাধুনাম আত্মানস্তুষ্টিরেব চ। মনু ২।৬।

ধর্ম্মমূল—বেদ, স্মৃতি, বিজ্ঞজনের শীল, সচ্চরিত্র ব্যক্তির ব্যবহার এবং আপনার আত্মার-বিবেকের-তুষ্টি।

সত্যই তো ইহা ধর্ম্ম। বিবেকের মূলে থাকে সংস্কার, যা পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের অভিজ্ঞতার সার।

ধর্ম্মের মূল বেদ। ঋষিদের ঐকান্তিক প্রার্থনা সত্যই রোমাঞ্চকর। অসত হ'তে সতে নিয়ে যাও দেব, অন্ধকার হতে নিয়ে যাও আমায় জ্যোতিতে, মৃত্যু হ'তে নিয়ে যাও অমৃতে। জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত আকুতি কী এর মাঝে নাই? সেই কর্ম্মই তো সত্য ধর্ম্ম যা' হ'তে জীবনধারা হয় মধুর, চিত্তে প্রকাশ হয় জ্যোতি, জন্ম-মৃত্যুর অভিনয় বন্ধ হয়ে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে হয় চির-বসতি।

শীল ও শিষ্টাচার গৃহস্থের ধর্ম্ম। মনু বলেছেন—

দেশধর্ম্মান জাতিধর্ম্মান কুলধর্ম্মান চ শাশ্বতম,
পাষণ্ডগণধর্ম্মান চ শাস্ত্রেস্মিন উক্তবান মনু ১।১১৪

মানুষের অভিব্যক্তির ক্রম বিভিন্ন। ধাপে ধাপে না উঠ্‌লে, পারেনা নর শিখরে আরোহণ করতে। মনু তাঁর শাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন—দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, শাশ্বত কুলধর্ম্ম এমন কি পাষণ্ডগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করে তারও।

জ্ঞানের যোগ্যতা বিভিন্ন। কিন্তু সুযুক্তি গ্রহণ করবার যোগ্যতা প্রায় সাধারণ। তাই মনু বলেছেন—

যুক্তিযুক্তম বচো গ্রাহ্যম বালাদপি শুকাদপি।
যুক্তিহীনম বচো ত্যাজ্যম বৃদ্ধাদপি শুক্রাদপি।

বালক কিম্বা শুক পক্ষীর মুখ হ'তেও যদি যুক্তিযুক্ত বচন বিবৃত্ত হয়, তা গ্রাহ্য। কিন্তু বৃদ্ধ বা শুক্রাচার্য্যের বচন গ্রহণীয় নয়, যদি কথা হয় যুক্তিহীন।

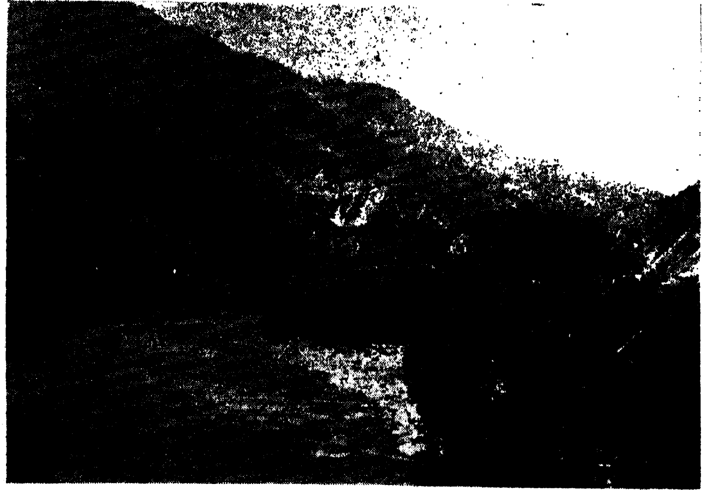


ওয়াঙ্গথ্ নালা—তাজবাস্

ভারতবর্ষে শিকারের জন্য যাঁরা আসেন তাঁদের কাছে রামনগর, কুমায়ূন, চাঁইবাসা, সুন্দরবন, ডুমুরাওন যেমন নাম-করা জায়গা, তেমনি নাম-করা জায়গা এই ওয়াঙ্গাথ্ নালা। নালাটা আর কিছুই নয় সিন্ধ্ নদীর অববাহিকা। খাড়া পাহাড় একদিকে বিদ্রোহ করে কেবল মাথা উঁচু করে, আরও উঁচু করে, কিছু না মেনে, দৃকপাত না করে উঠে গেছে, অন্য দিকে গমকে গমকে ঢল্ বেয়ে বেয়ে উঠেছে। সিন্ধের বাম পারের এই ভ্রুক্ষেপ বিহীন পর্বতের উদ্ধত বিদ্রোহ কিন্তু বনে বনে ঢাকা, গাঢ় সবুজ—এতো গাঢ় যে কালো দেখায়; ডানধারের পাহাড়ের ঢেউগুলি তেমনি আবরণহীন, রুক্ষ। এরই গা চিরে চিরে উঠে গেছে আঁকা বাঁকা মোটর-পথ বেশ শক্ত চড়াই।

এ পথ আজকের পথ নয়। ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার, তাসখন্দ, বোখারা, পামীর, সমরকন্দ, কিরখীজ্, কাসঘর্, ইয়ারকন্দ, লদ্দাক, গিলগিত্, চিত্রাল প্রভৃতি স্থানের কারবার যে সুপ্রাচীন মানবায়নের যুগে সেই যুগের পথ এ। শ্রীনগর, সোনমার্গ, লেহ্, তিব্বত অতি প্রাচীন পথ। এই পথকে তাই সর্বদা সুরক্ষিত রাখতে হয়। এই পথে জুলফিকারের অভিযান, রিঞ্চনের অভিযান; এই পথের ধারে হাব্বার বাড়ী, কোটার নগরী। এই গিরিবর্ত্ম বা গিরিপথ বহুকালের পথ। এখন বলে জো-জি-লা, আর লদ্দাকীরা বলে দ্রাস্। এই লদ্দাকের প্রাচীন নাম ভৌও। এই ভৌও রাষ্ট্রে যাবার পথ ছিল বলে দ্রাসের প্রাচীন নাম ভুতরাষ্ট্রাধ্বন। উত্তর উত্তর-পশ্চিমে এমন ছিল কর্ণাহ্, দরদ্দেশ, হরমুকুট পর্বতের পার। আজ আছে হরমুক পাহাড়ের পারে দর্দ জাতির দেশ।

প্রাচীন নাম নিয়ে এই খেলা করতে বেশ লাগে। পণ্ডিতি দেখান নয় এ। যেমন বাপ পিতামহের নাম বলায় পণ্ডিতি নেই, দিদিমার দিদিশাশুড়ীর সঙ্গে শাহ আলমের স্ত্রীর মিতালী ছিল ভাবতে যেমন রোমাঞ্চ হয়, মীরার গোপাল মন্দিরে গেলে বা হলদিঘাটার মাঠে গেলে যেমন মানসিক অনুভূতির সঙ্গে কায়িক একটা অনুভূতিও হয়, এই সব পুরোনো নামের যোগাযোগ তেমনি মননরাজ্যে একটা বিশেষ রং ধরিয়ে দেয়; বানিহালের নাম যে এককালে বনশালা ছিল, এতে বানিহালের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু না থাক; বুদিল বা সিদাউ গিরিপথের নাম যে সিদ্ধপথ ছিল এ কথা না জানলেও চন্দ্র-সূর্য্য বিবর্তনে হয়তো কোনও অন্তরায় হবার সম্ভাবনা নেই; প্রাচীন পাঞ্চালধারাই যে আজকের পীরপঞ্চল গিরিপথ—এ জেনে তার মিষ্টতা যে খুব বাড়লো বা রুক্ষতা খুব কমলো তা হয়তো

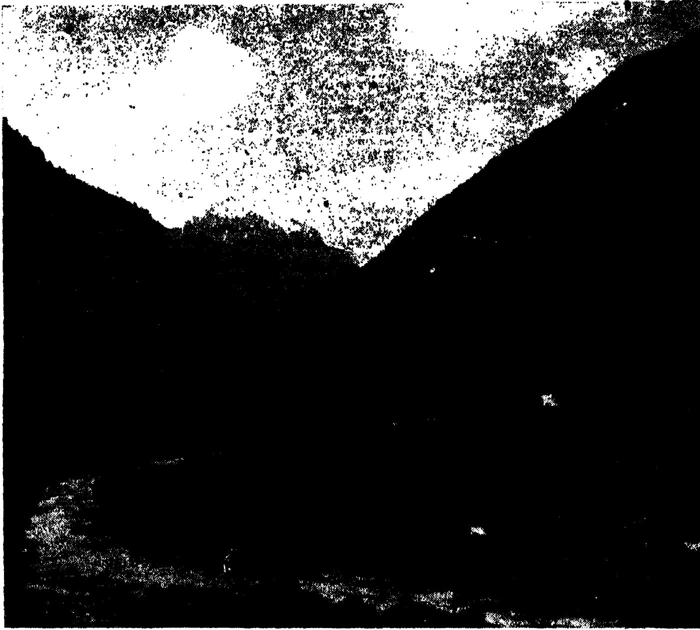


ওয়াংগাথ নালা

নয়; তবু ভাল লাগে ভাবতে ঋষ্যমূকে রাম ছিলেন, পঞ্চবটীতে সীতা ছিলেন, শ্রাবস্তীতে গৌতম পথে পথে ঘুরেছেন, নবদ্বীপে নিমাই বাল্যকাল কাটিয়েছেন। ইতিহাসকে সাক্ষী রেখে রক্তকণিকার এই নৃত্য, এই কালান্তরের সঙ্গে যোগাযোগের নৃত্য, এটাই সংস্কৃতি আর সংস্কার। পম্পিয়াই, কার্থেজের মাটীতে দাঁড়িয়ে, কলোসিয়াম বা প্যান্থিয়নের পাথরে হাত রেখে যে আনন্দ তা আমাদের মনোজগতের আনন্দ। আবার য়ুরোপীয়দের পক্ষে সেটাই হয়তো প্রাণের সাড়া হবে। কিন্তু নালন্দা, অনঙ্গপালের সূর্য্য মন্দির বা হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান মনে করলে জাগে ইতিহাসের সাড়া, প্রাণের নাড়া। তাই প্রাচীন নাম জানতে আমার ভাল লাগে। খশ্-রা যে বহুকাল ধরে বানিহালের দুর্গমে বাসা বেঁধে আছে তাদের নাম যে খশ্ খশ্, একথা শুনলে আমার ভাবতে ভালো লাগে

ঠাকুরমার ঝুলির খোরাক খানিকটা বাস্তবতার ওপর নির্ভর করে। দরবিড়ি নামটা যখন কাশ্মীরে শুনি তখন জানতে পেরে ভালো লাগে দ্বারাবতী, জয়াপীড় প্রতিষ্ঠিত দ্বারাবতীর কথা কল্হন লিখলেও গল্প নয়।

এই প্রাচীন-পিপাসা আছে বলেই কাশ্মীরে এসে নবীন পর্য্যটক, বা সৌখীন পথচারী হয়ে, কেবল wander lust ভ্রাম্যমানের মোহ মেখে ঘুরতে পারিনি। খুঁটিয়ে দেখে, জানতে চেয়েছি। ওয়াঙ্গাৎ নালা আমার কাছে নালা নয় শুধু। মহাপ্রাচীন আর্যসংস্কৃতির বাহক এই পথ। সিন্ধ থেকে হিন্দ্। হিন্দ্স্ নদী। আজকের পাকিস্তানের সিন্ধুনদী বা Indus খাইবারের পথে এসে এই প্রথম বড় নদী। তাই নাম হিন্দ্ বা সিন্দ্। কিন্তু ত্রাসের পথে এলে



মনোহারিণী সিন্ধ নদীর প্রান্ত

এই সিন্দ্ প্রথম বড় নদী। তাই কি এরও নাম সিন্দ্ বা হিন্দ? অসম্ভব কি? ভারতবর্ষ নামেই তো তিনটে দেশ হোলো। কোথায় আমেরিকা, আর কোথায় ভারতবর্ষ। তবু তো ভারতীয় বলতে দুটো দেশের লোকই বোঝালো? পশ্চিমভারত, পূর্বভারত, ভারত, কমল ভারতীয়, কালো ভারতীয়, যতই আখ্যা দিইনা কেন, আবিষ্কারকরা প্রথম পেয়েই Indian বা India নাম দিলেন তো! এ ক্ষেত্রেও ঐ ভুল বা ঐ সাফল্যের তিলক পরবার বা পরাবার বাসনা ছিল কিনা কে বলবে?

এই পথে শ্রীনগর থেকে আসতে পড়ে গন্দরবল। দশমাইল হবে শ্রীনগর থেকে, সিন্ধের দক্ষিণ পাড়ে পাহাড়ের তলায় এককালে সমৃদ্ধ নগরী ছিল। আমরা বাসে যাচ্ছি বামপাড় দিয়ে। পর্যটকদে কাছে গন্দরবলের জবর খাতির। শিকার-পিয়াসীদের জন্যে ডাব বাংলো আছে। মেরে এনে রেঁধে খাও, বা মারবার পথে জিরিে দম নিয়ে নাও। অভিনব সৌন্দর্য্য এখানে জলের। যতদূর দৃষ্টি যা "স্থির নীল নীররাশি অপলক নয়নে চাহিয়া আছে যেন আকাশের সৌন্দর্য দেখিয়া চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছে না।" গন্দরবলে ডাল থেকে নৌকা ঝিলম সিন্ধ হয়ে অনেকে আসে। গন্দরবল অবধি সিন্ধশান্ত, মনোর নৌকা চলাচলের উপযুক্ত।

এরপরেই চড়াই আরম্ভ। ধাপে ধাপে চড়াই। আমরা বেরিয়েছি বেশ সকাল তখন, চা হালুয়া খেয়ে। নিজেরা আগের রাতে ডি আর কেক্ সংগ্রহ করেছিলাম সেগুলিও চালিয়েছি। আবার সঙে আছে সরকারী লঙ্গরখানার ভোজ্য গন্দরবল পর্য্যন্ত বিশেষ সাড়া নে কারও। তারপরেই চড়াই যে সুরু, অর্থাৎ সিন্ধের নাচ আ ফেণা আর কাকলী যেই সুরু—সঙে সঙ্গে সকলের চাঞ্চল্য। আম বাসটায় বেশ মনোমত দল এসেছে আমাদের বোট ছাড়া মনোরমা আর্টিষ্ট শর্মা আর শান্তিনিকেতনে সেই সরোজ বলে মেয়েটী। শর্মাও শান্তিনিকেতনের ছেলে। কাজে দলটা বেশ ভালো জমেছে। ছবি নেওয়া হচ্ছে।

এই পথ চলেছে খাড়া ২ মাইল। যাওয়ার পথে (অর্থাৎ নদী গতিপথের বিপরীতে) ডানদিকে পড়ছে তিলাইল পাহাড়ের সারি বুত্সের পাহাড় বা প্রাচীন ভূতেশ্বর পাহাড়ের খাড়াই। গভা জঙ্গল ঢাকা পথ। এ ধার দিয়ে ফিতের মতো পাইন-ঢাকা একফালি চোখে পড়ে; কেবল উঠে যাচ্ছে আর উঠে যাচ্ছে। শেষ হে তিলাইলের বা ত্রিশূলের চূড়ায়। ভূতেশ্বরের পাহাড়, ত্রিশূল তা চূড়া, তাই বুত্সের পাহাড়, তিলাইল শৃঙ্গ।

আমরা সোনামার্গ যাবো একথা শুনে পাটনার সেই প্রফেসা ভদ্রলোক বল্লেন যাওয়া অসম্ভব। সরকারী বাসচলার পথ বন্ধ ওয়াঙ্গাথ নালার নাম করলে ভীত হয়ে পড়েনা এমন কাশ্মীরী ক আছে। এই পথে বাস চালানো একেবারেই দুরূহ। কিন্তু জুনের মাঝা মাঝি এ পথ শুধুই যে বরফে ঢাকা তাই নয়, যে সব ছোটো ছোটো অসংখ্য নালা পথে পড়ে, তাদের ওপরের সেতুও ভাঙা

সম্প্রতি নাকি শাদা পর্যটকরা অর্দ্ধেক পথ থেকে ফিরে এসেছে।

আমরা কাশ্মীর সরকারকে জোর খবর করেছি। যেমন করে হোক পথ করে দেবার হুকুম হয়েছে। আমাদের বাস চলেছে। দলের অনেকে এদিকে আসেইনি ভয়ে। আমাদের বাস চলেছে ধীরে ধীরে। মাঝে মাঝে থামছে। সিন্ধের জল স্ফীত হয়ে উঠছে, তরঙ্গ এখন ফেণায় ভরতি। কাঠের রাশ সে তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে চলেছে। প্রতি কাঠের গায়ে দাগ কাটা। এসব কাঠ শ্রীনগরে, রামপুরের, রিয়াসীতে ধরা হবে। সেখান থেকে যাবে দিল্লী করাচী, বম্বে, কলকাতা।

সকলেরই উৎসুক্য ওপারে ঐ ফিতের মত যে রাস্তাটা গভীর জঙ্গল চিরে উঠে গেছে ওটা কোথায়। ওরা জানেনা নরনাগা তীর্থের কথা, সোদর তীর্থের কথা। ওরা জানেনা এই খাড়াই নয় মাইল পথের পারে আছে গঙ্গাবল সরোবর। সেই হ্রদের তীরে সোদর তীর্থ, রাজ-তরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে। সোদর তীর্থের পবিত্রতা গয়া, কাশীর পবিত্রতার মতো। সোদর তীর্থের কাছে অমরনাথ অর্বাচীন তীর্থ সেদিনকার। ফলে যুগে যুগে মন্দির গড়ে উঠেছে এখানে। প্রসিদ্ধ মন্দির শিবভূতেশ্বরের মন্দির। রিল্‌হন স্বামীর মন্দির নির্মাতা রিল্‌হন ছিলেন রাজা জয়সিংহের মন্ত্রী। তার ভাই সুমনস এক প্রশস্ত মঠ করে দেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য। এমনি এখানে স্তূপ ছিল; চৈত্য ছিল, বিষ্ণুমন্দির ছিল। নরনাগ মন্দিরের ঐশ্বর্য্যে এতো চিত্তশালী তীর্থ বলে খ্যাত হোলো যে ডামর বিদ্রোহের সময় ডামর সর্দার ধন্বা এখানে এসে সব লুঠ করে। গঙ্গাজলে অস্থি নিক্ষেপ প্রেতকার্য্যের শ্রেষ্ঠ করণীয় বলে গণ্য হোতো। আজও তীর্থকামী বহু আয়াসে এখানে অস্থি নিক্ষেপ করতে যায়। অনেকে ফেরে না এমন দুস্তর পথ। ধন্বাকে দমন করার সময় তাকে এইখানেই বধ করা হয়।

ভৈরবের মন্দিরে এসে ধন্বা আশ্রয় নেন। ডামররা বহু অঘটন ঘটিয়েছেন। তারা চাষবাস করতো, পরে জমীদার হোলো। তারা নিজের নিজের লোকবল রাখতো। ফলে রাজারা যখন বিদ্রোহ দমন ষড়যন্ত্র, বা রাজ-পরিবারের গৃহবিবাদের সময়ে এই ডামরদের সাহায্য নিতে আরম্ভ করলো, ডামররা নিজ নিজ শক্তি বুঝতে শিখে কাশ্মীরের রাজপরিবারকে বারংবার বহুভাবে বিপর্য্যস্ত করেছে। ললিতাদিত্য বারংবার অনুশাসন করে গেছেন যেন ডামরদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে না দেওয়া হয়। তাদের অযথা শ্রীবৃদ্ধি রাজসিংহাসনের নিরপত্তার অন্তরায় হবে। কিন্তু কেউ স্বার্থবশে সে অনুশাসন শোনেনি। ফলে ধন্বা সম্পূর্ণ সোদর-তীর্থ আত্মসাৎ করে বিদ্রোহ ডেকে আনলো। ধন্বাকে ভৈরব মন্দিরে বধ করে সে বিদ্রোহ থামলো; কিন্তু আবিষ্কৃত হোলো কাশ্মীরের রাজ-নৈতিক জীবনের দুই ছিদ্র পথ। কলঙ্কময় ছিদ্র পথ। প্রথম এই যে ডামরশক্তি যদি একতাবদ্ধ হয়, রাজশক্তিকে অনায়াসে খর্ব করতে পারে। এর ফলে কাশ্মীরের ইতিহাসে ডমর বিদ্রোহ এক লোক বলক্ষয়কারী ভীষণ গৃহসংগ্রামের সূচনা করলো, যার ফলে কাশ্মীরের রাজনৈতিক জীবনে রাজযক্ষ্মা ঢুকলো। অন্য ছিদ্রপথ আরও ভয়ঙ্কর। কাশ্মীরের রাজন্যবর্গ জানতে পারলো মন্দিরের ধনাগারের সীমা। বারংবার এই সব মন্দির লুঠ করা, এমন কি দেবতার বিগ্রহ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তার ধাতু লুঠ করা অবধি তারা করতে লাগলো। হিন্দু হয়ে প্রথম শিখলো যে বিগ্রহ বিগ্রহ মাত্র। ধ্বংস করলে কিছু হয় না। লোক-ভীতি, ন্যায় ভীতি ও ধর্ম ভীতি তিনটী পরিহার করার ফলে কাশ্মীরের রাজনীতি হয়ে উঠলো ভয়ঙ্কর। অবন্তী বর্মনের পর সংগ্রাম রাজের মন্ত্রী ভদ্রেশ্বর সোদর তীর্থ লুঠ করেছে। উচ্চলের সময় নিদারুণ অগ্নিদাহ একে নষ্ট করেছে। তবু আজও সোদর তীর্থের ভাঙা মন্দিরগুলি দেখতে বহু-



খসেরা নুন নিতে এসেছে

লাক যায়। সব চেয়ে ক্ষতি করেছে হয়বদল নামে এক পার্বত্য ডামর জাতির আক্রমণ। নিঃসংশয়ে এরা গোব্রাহ্মণ হত্যা করে সোদরতীর্থকে কলঙ্ক করে তার সব কিছু লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল।

ওপারের পথ সেই সোদরতীর্থের দিকে। এ পারে বাস চলেছে দাদকহীন রুক্ষ পথে। বিচিত্র এই নালা। একদিকে বনরাজিনীলা, অন্যদিকে ধূসর রুক্ষতা। এমন বৈচিত্র্য দেখিনি কোথাও। একদিকে শৃঙ্গ হতে উত্তুঙ্গ, শৃঙ্গ হতে শিখর, ক্রমশঃ নগ্ন বর্বরতায় নির্ভর করে নিঃশঙ্ক অভিযান করেছে উর্দ্ধমুখে। অন্যদিকে পাহাড়ের ঢল, ঢেউয়ে ঢেউয়ে উঠে গেছে।

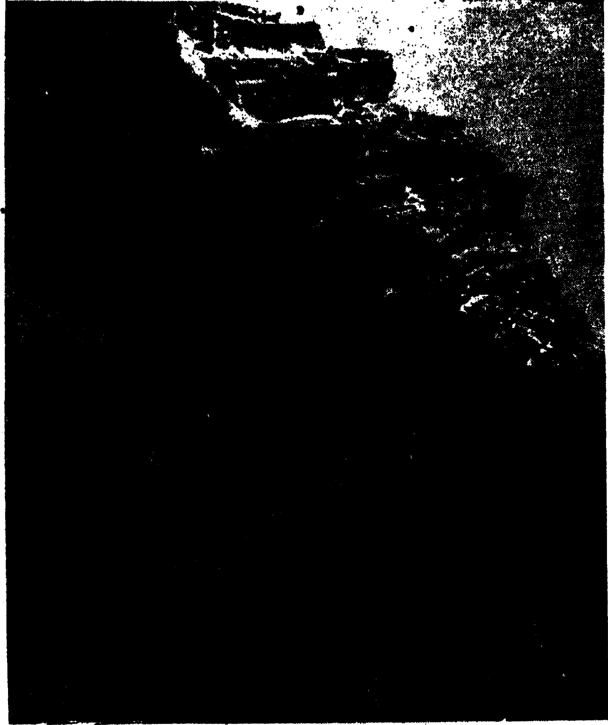
শাদা দুধের মতো জল ফেনায় ভরা। সেই শাদার ধারে ধারে ঘন বন। ২৫ মাইল ধরে এই গভীর জঙ্গল, এই খাড়াই পথ, এই দুরন্ত জলস্রোত চলেছে। সাদা ফার্‌গাছ, স্প্রুস্, পাইন, দেওদারে ভর্ত্তি জঙ্গল। মাবার তলার দিকে নদীর ধারে দেখা যায় ছোটো ছোটো গ্রামের চারপাশে ছোটো ছাটো ক্ষেতখামার। অযত্নেও ফুল ফুটেছে। যুঁই, করবীর থোলো, হলদে হলদে মধুক্ষরা হনিসাক্‌লের ঝাড়, গোলাপের বন। আখরোট, খোবানী আর নাশপাতির গাছ।

এখানেও একটা মিলিটারী পোষ্ট। একটা ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল নদী এসে সিন্ধে মিলেছে। নাম কঙ্গন। এই কঙ্গন নদীর তীরে হব্বার বাড়ী সোনামার্গের কাছাকাছি। এখানে একটা সেনা নিবাস। বরফ জমে আছে পাহাড়ের গায়ে। নদীর জলের ধাক্কা খেয়ে ঝুপ্‌ঝাপ্ বরফ পড়ছে জলে। আমরা দু'চার জায়গা পার হলাম। এমনি কাঠের গুঁড়ি আর নুড়ি ফেলে জবর দস্তি পথ করা। সাবধানী চালক নৈলে মৃত্যু অবধারিত। মাঝে মাঝে বরফ কেটে পথ করেছে। খানিকটা তো বরফেরই টানেলের মধ্য দিয়ে বাস গেলো। বুঝলাম কেন শেতাঙ্গরা পেছিয়ে গেছেন। নদীর ধারের পথ অতি সঙ্কীর্ণ। কোনও মতে বাসখানা যেতে পারে যদি একটুকরো পাথরও না গড়ায়। গড়ালে, ব্যস্।—

বাতাস ঠাণ্ডা কনকনে। কিন্তু নদীর ধারের দু'গজের মধ্যে। দু'-গজের বাইরে গেলেই ঠাণ্ডা বাতাস আর নেই। নালা এতো সঙ্কীর্ণ যে চোঙের মতো একটা বাতাসের স্রোত অনবরত বইছে। সে স্রোতের বাইরে গেলেই বাস্ অতো ঠাণ্ডা নয় আর।

উঠে এলাম সাড়ে সাত হাজার ফুট। একটা হল্ট্, নাম গগনগীর। এখানে বাসটা থামিয়ে মোড় ফেরার আগে দেখলাম ফেলে আসা দীর্ঘ পথ।

এই পথই কি ফেলে এসেছি? ভাবতে বিস্ময় জাগে। কোথায় সেই শিখরের পর শিখরের সারি? সব যেন মাথা নীচু করে নেমে গেছে। পিছনে একটা সুরম্য উপত্যকা, চোখ দৃষ্টি মেলে চায়, শ্রীনগরের উপত্যকার সবুজ চত্বর যেন নয়নাভিরাম বলে বোধ হয়। মনে হয় হাত বাড়ালে যেন ঐ ছবিখানা ছুঁতে পারি। পাহাড়ের মজাই এই; সামনে বিপদ, পিছনে সম্পদ, এ কেবল চোখের মায়া। মনের অবস্থা বিপরীত, সামনেই সম্পদ, অজ্ঞাতের অসহ্য উত্তেজনা।

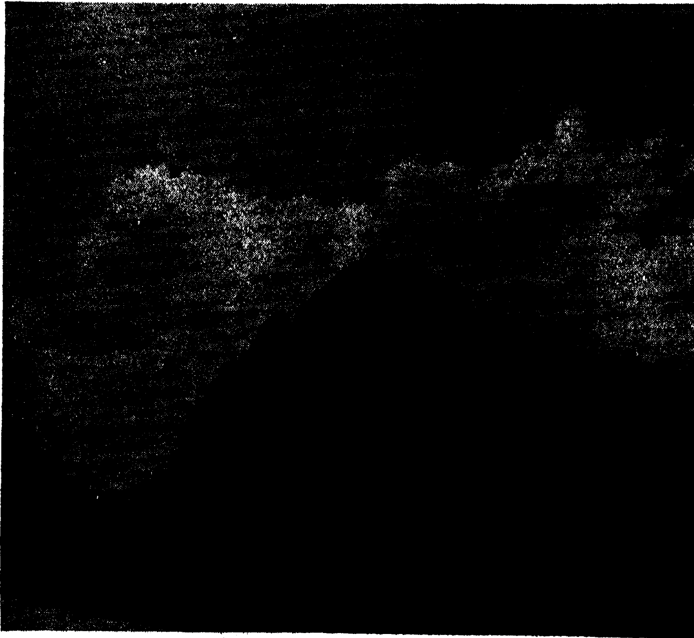


চূড়াগুলি যেন খাজুরাহের মন্দির

কাশ্মীরীরা বলে, বাসওয়ালারা বলে, পর্য্যটকেরা বলে গেছেন—ভারতবর্ষ থেকে লাদাক যেতে গেলে এই ২৫ মাইল পথের মতো ভয়ঙ্কর পথ আর নেই। এ পঁচিশ মাইল পার হলেই প্রথম চোখে পড়বে ম্যাগনিফিসেণ্ট মহামহিমাময় এক পর্বতশৃঙ্গ যেন খাজুরাহো মন্দিরের চূড়া। পর্য্যটকরা নাম দিয়েছে ক্যাথিড্রাল পিক্। বহুদূর থেকে এই শৃঙ্গ দেখা যায়। কঙ্গন নদী এখান থেকে বাঁক খেয়েছে। কঙ্গনারই একটা শাখা তাজ। যে হিমানীপ্রবাহ থেকে এই তাজের জন্ম তার নাম তাজবাস। আমরা তাজবাস যাবো ঠিক করলাম। পথে পেলাম আরেক সেনা নিবাস।

জল বইছে ঢের নীচে দিয়ে। এ দিকে তৃষ্ণায় প্রাণ যায়। সামনে চমৎকার মার্গ—সমতল। আগাগোড়া ঘাসে ঢাকা, ছোটো ছোটো ঘাসের ফুলে যেন চমক লাগিয়ে রেখেছে। বাস আর যাবে না। এখানেই থামলো।

চেয়ে দেখি অন্য দেশ এ। অদ্ভুত পোষাক পরা কয়েকটা লোক কয়েকটা য়াক্ গরু, চমরী গরু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরা পার্বত্য খশ্ জাতি। নুন নিতে এসেছে। পণ্য বিনিময়ে ব্যবসা করে। কিছুতেই ফটো নিতে দেবে না। সোনমার্গে দোকানপাট নেই। এইসব ব্যবসায়ীদের থাকার জন্য দু চারটে আস্তানা আছে। তার মধ্যে খড় পাতা। এক আধটা ছোটোখাটো দোকান। নুন, চিনি, দেশলাই,



ক্যাথিড্রাল পীক

কেরাসিন তেল, সিগারেট পাওয়া যায়। তিন প্যাকেট সিগারেট নিলাম। কিন্তু জল পেলাম না। সেনা নিবাস আছে উল্টো দিকে খানিকটা নেমে। আর নামতে সাহস হোলো না। উঠে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি কোথা থেকে ধোঁয়া উঠছে যেন। একটা বড় ড্রাম পাথরে রেখে তলায় আগুন দিয়ে বরফ তাতিয়ে জল গরম করছে একটা সিপাহী। তার কাছ থেকে জল নিয়ে খেলাম।

জানলাম লোকটা খালায়লী। হঠাৎ সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল। এক নিমেষে যেন বোধ করলাম সমগ্র চৈতন্যসত্ত্বা দিয়ে আমি ভারতীয়। আমি ভারতবর্ষের—আমি একা নই—আমার ক্ষমতা অসামান্যই নয় শুধু অপরিসীম। প্রতিপক্ষ প্রতিপক্ষই নয়, যদি আমরা এক হয়ে দাঁড়াই। কোথায় মালয়ালীর দেশ সুদূর দাক্ষিণাত্যে, আর কোথায় লদ্দাকের কিনারায় এই সোনামার্গ। এখানে এসে এ রক্ষা করছে সীমান্ত। এতো বড় ঐক্য যে দেশের সে দেশকে ঘাঁটাবে কে? সম্মান করবে না কারা?

মনে মনে সিপাহীকে প্রণাম করে চল্লাম তাজবাসের দিকে। উঠবো, আরও উঠবো। তাজ নদীর উৎস দেখবো।

থ্রি মিডশীপ্‌ম্যান্ আমরা,না থ্রী মাস্কেটীয়াস—চললাম অজানা পথে কোনও পথ নেই, পথিক নেই, গাইড নেই—কেবল চলা আর চলা।

একটা লোক একটা ঘোড়া নিয়ে নামছে। একটা নয় আরও একটা। "কত করে ঘোড়া?"

সেই কাণ্ড! "তিন টাকা!

বল্লাম "আট আনা।"

পথ এতো উঁচুনীচু, মাঝে মাঝে সঙ্কীর্ণ, যে ঘোড়া সওয়ার হয়ে থাকা দুরূহ চড়া যাও তবু যায়, নামা সময়ে একেবারে হুড়মুড় ক পড়ে যেতে হয় যেন। আ আচকান আর চুড়িদা পাজামা পরে বেশ ছিলা বেণুর শাড়ী ওকে সমা ভুগিয়ে চলেছে।

কিন্তু এই দুর্গমতার ফাঁ ফাঁকে সেই পরিবেশ যা মন একেবারে বিহ্বল করে দে মাতাল করে দেয়।

এই যে শত শত বাধা বি ত্তির মধ্যে থেকে প মানুষের মন, এর কত গ ঘুঁজি, তার তলায় কত নালি মধ্যে এর কত ধোঁয়া, ক বীজাণু, কত প্রশ্ন। মানুষের মন ঠোকর খেয়ে খেয়ে ভুব গেছে, শুধু মরে যায়নি। অতো গলি, অতো ধোঁয়া সত্ত্বেও ম যায়নি। কেন যায়নি? সেই সেকালের শকুন্তলা দুষ্মন্তের মধ্য তপোবন দেখলে মন ভুলে খেলা আজও আছে, তারা দেখে খুশী, ফু দেখলে আনন্দ, শিশুর হাসিতে তৃপ্তি, মায়ের স্নেহেতে মহিমা দেখা ঐশ্বর্য্য আজও আছে। সেকাল—একাল মানুষের মনে একই সু বাঁধা। কেন এই অবিনশ্বরতা? ক্ষণভঙ্গুর মুমূর্ষু এই পৃথিবীর কো মনের এই অবিনশ্বর রূপটি এলো কি করে? তার কারণ মনে জগতের একটা আকাশ আছে যা দেয়াল, রোগ, ধোঁয়া, ঠোকরে বাইরে। মাঝে মাঝে সংগ্রামক্লিষ্ট মানুষ যখন সেই আকাশেরই দি

ায় তখন সে যেন বাঁচবার আগ্রহ পায়, বাঁচাবার প্রেরণা পায়। এই আকাশ যার করতলগত সে অমর মন নিয়ে জন্মেছে।

আকাশ করতলগত হয়—দর্শনের সেই কথা—ভূমৈব সুখং বলো বা ততীকার কথা 'হস্তামলকাবৎ'ই বলো—হয় করতলগত হয়। হয়তো মুহূর্তের জন্য হয়, ক্ষণেকের জন্য হয়। তবু হয়। আকাশ যারা এই নীলের স্বচ্ছতা, ওর পরেই তো ঐ ধবলগিরিশ্রেণী সগর্বে দাঁড়িয়ে। খেতে হয় মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে। আর এধারে পাহাড় ঠেছে সরাসরি ওপরে, কিন্তু একা ওঠেনি, সঙ্গে নিয়েছে বনস্পতির ল; পল্লবিত, শাখান্বিত, বিরাট একটা বনসত্তার মধ্যে তরু থেকে হীরুহের ভীড়। তাই এ ধারটায় নানা সবুজের বাহার। নীচে চাও বধরে শাদা জল ফুঁশে, গর্জে, দর্পভরে ছুটে চলেছে। এদের যদি কসঙ্গে দেখো, দেখো শাদায় নীলে, দার্ঢ্যে আর স্বচ্ছতায় ছন্দরচনা, দেখো ঘাসে আর জলে আল্‌পনা, দেখো সবুজে আর হরিতের ঘেঁসাঘেঁসি, ন নাচবে, ক্ষণেকের তরে নাচবে। এই ক্ষণিকের মধ্যে অনাদি অনন্তালের মানবমনের অবিনশ্বর মূর্তিটি পাবে।

এই পাওয়া যায় বলেই চলেছি এই দুর্গমে। কোনও দেবতা নেই, নানও লক্ষ্য নেই, কোনও বাস্তবিক আশা নেই; একটা নিরীশ্বর গবাদ যা দেহাশ্রয়ী। বিলাসী একটা আমেজ দেহকে করছে গ্রহ, মন করছে অস্বীকার সে নিগ্রহকে; মন পাড়ি মারছে অস্বীকারের গ মেরে চিন্তাকাশের ফুলে। ঘোড়া আমায় কোন পথে আনলো খিনি। আমার মনপ্রাণ পড়ে আছে ক্যাথিড্রাল পীকের পানে। র চূড়াগুলি যেন ঠিক সেই মন্দির যা খাজুরাহে দেখেছি। কোন বাদিদেবের মন্দিরের চূড়া; কি নিবিড় অরণ্যে ঢাকা। আর চে দিয়ে নদী। নদীর ধার দিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে বরফ গলছে, ই জল মিশছে নদীতে। ঘোড়া চলছে এই বরফের ওপর, এই ক্ষীণ স্রোতের ওপর দিয়ে। যেখানে যেখানে বরফ গলে যাচ্ছে তলায় স উঠছে। একদিনে সব কচিঘাসে ভরে যাবে; সব সবুজ হয়ে যাবে।

ডান ধারে ক্যাথিড্রাল পীক; বাঁ ধারে হরমুখ পর্বতের শাখা বেশ দলে পা ঢেকে একটু নীচু হয়ে এসে মিশছে তাজের অববাহিকায়। পরেই সামনে দেখলাম বিরাট চত্বর হিমানীর। তখন শুধুই মানী হিমপ্রবাহ। জমাট বরফ সমগ্র অববাহিকা ঢেকে দিগন্তে শেছে। পাহাড়ের চূড়া থেকে পাদমূল পর্যন্ত ডাইনে, বাঁয়ে, খে শুধুই শাদা। অল্প কয়েকটা ছেলে ঘুর ঘুর করে ঘুরছে বরফের পর। দূরে পিঁপড়ের মতো কয়েকটাকে দেখা যাচ্ছে। ওপরের যে হিমপ্রবাহ ওর নাম হুপৎগুল্ম। হুপৎগুল্ম পেরিয়ে ঐ দূরে, রও দূরে দ্রাস, যা জোজিলা গিরিপথ। সোনামার্গ থেকে মর্তায়ান, দ্রাস, দ্রাস; এইবার দ্রাস নদী বেয়ে ইস্কাল্ যা সিন্ধুনদে পড়া যাবে, খান থেকে লেহ, লাদাকের রাজধানী। সোনামার্গ আট হাজার কে নয় হাজার, তারপর ১১ হাজার উঠেই পরক্ষণে দশ এবং দ্রাসে হাজার। মাঝে বেশী চড়াই ওৎরাই নেই। লেহ দশ হাজারের ধার। কিন্তু চূড়াগুলি আঠারো, উনিশ হাজার উঁচু। চূড়া বাদ দিয়ে দ্রাসের অববাহিকা ধরে হেঁটে যেতে হয়। সামনে হরমুক পাহাড়। একটা খাড়াই পার হয়ে ওপারে গেলেই অমরনাথ তীর্থ। পথটা অত্যন্ত দুর্গম। নইলে দুদিনের ব্যবধানে এখান থেকে অমরনাথ যাওয়ার পথ আছে। তখন তো সেকথা মনে ছিল না। কথাটা ঘোড়াওয়ালার কাছ থেকে শুনেই মন থেকে মুছে দিলাম।

তবু তাকিয়ে থাকি পথের দিকে। সামনে এসে গেছে হিমানী-প্রবাহ। একজায়গায় প্রবাহ গলে জলের ধারা হয়ে ছুটছে। নদীর জন্মস্থলে এলাম। একটা জায়গায় বসে বলতে পারলাম 'এই বাঁ-দিকে ছুঁলাম নদী'; আর ডাইনে, পেছনে, সুমুখে,—কোথাও নদীর



তাজবাসের হিমানী প্রবাহ

পাত্তা নেই। নদীর জন্মস্থান। জন্মেই তার কী আর্তনাদ। সে জল ছোঁয়া যায়, খাওয়া যায়না; অবলোকনে স্ফূর্তি, আনন্দ, উল্লাস; অবগাহনেই মৃত্যু, সর্বনাশ।

বরফ পেয়ে অসিত চলতে সুরু করতেই চিৎপাত। আমি হেসে বললাম পা ফেলবে গোড়ালীতে ভর করে দেখবে...কিন্তু শেষ করার আগেই আমি দেখি শুয়ে গড়িয়ে চলেছি জমাট বরফে। অসিত আরও জোরে হাসতে গিয়ে অন্ধ হোলো, বরফে আছাড় খেলো। বেণু এবার অসিতকে নির্ভরযোগ্য বিবেচনায় হাত ধরে এগুলো। খেলায় পেলো মন। অনেকটা হাঁটলাম, কিন্তু পোড়া মন থেকে ভয় গেল না। দেখলাম গোড়ালি পেছন দিকে ঠুকে ঠুকে চলার অভ্যাস থাকলে এবং গোড়ালীওলা জুতা থাকলে বরফে চলে আমোদ পাওয়া যায়। বরফে



খশরয় ক্যামেরাতে দেখে যেন নতুন বরের মুখ—লজ্জায় মরে যায় ছবি তোলাতে

ঘাকর আঁকা তীর্থপথ আমি আর কখনও দেখবো কিনা জানিনা। শেষ একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ চাপা দিই।

সেই বরফের টানেল পেরিয়ে কাঠপাতা ফোর্ডিং পার হয়ে বাস চলেছে সন্তর্পণে, হঠাৎ দেখি উঁচু থেকে একটা পর্বতের চূড়া তুমুল বেগে নীচের দিকে নেমে আসছে। দেখতে না দেখতে মুহূর্ত্ত আগে বাসটি যে ফোর্ড পেরুলো তারই নীচে সেই অতিকায় বরফের চাঁই পড়ে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল। কঙ্কনের জলে ঝম করে একটা শব্দ হোল বরফের বিরাট বিরাট খণ্ড ভাসতে ভাসতে জলের বেগে নেমে যেতে যেতে এ ওর গায়ে ধাক্কা লাগাতে লাগল। বরফের পাহাড়টা ভেঙ্গে জলে পড়ে জলটা ছিটকে উঠলো দেখে আতঙ্ক হয়। এক নমেষ তার মধ্যেই তো বাসটা ওই প্রলয়ঙ্কর জায়গাটা পার করে এলো।

আঙ্গুলের কোনও কাজ থাকে না, কেবল অকাজ। বরফে এবার সোল জুতা থাকলে পা কেবল মাথায় উঠতে চায়।

বার কয়েক আছাড় খেয়ে, পথ চলে, ঘোড়ায় চড়ে এবার ক্ষিদের তেজ বুঝতে পারছি। অসিত হাঁক ছাড়লে—"দাদা এবার গনগনে ক্ষিদে। চারটে বাজে। আর কি না খেয়ে থাকা যায়?"

আমরা বেশ ছড়িয়ে নিয়ে বসি একটা পাথরের ওপর। মুলো, গাজর, আদা, লেটুশ, শশা, পেঁয়াজ, টোম্যাটো, লেবু সহযোগে বিরাট এক স্যালাদ্ তৈরী হোলো। গোটা ছয়েক ডিম ছাড়ানো গেলো। চাঁই চাঁই লুচির অত্যাচার, আর হুদো হুদো আলুর দমের দমবাজী।

খাওয়া সেরে ফিরতে আমাদের চারটে পার। বাসওলা মহা খাপ্পা, কিন্তু এ পথ ভুলব না জীবনে। তাজবাসের মতো মনোহারী দুর্গম পথ, ওয়াজার্থ নালার মতো দুর্গম নালা, সোদর তীর্থের মতো পরাভবের



সিন্ধু নদীর জন্মস্থল

ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসলে বড় বড় বিপদের কথা বলা, জানানো ও রক্ষা পাওয়া একটা ষ্টাইল বিশেষ। বাঘ দেখলাম্ বাঘ খেলো না, গভীর খাদে পড়লাম মরিনি ; হাঙর তেড়ে এলো, কেবল বুট জুতোটা গিলে ছেড়ে দিলে, ইত্যাকার কথা লেখার একটা চলন আছে বলেই বিশেষ বিপদের ঘটনা না হলে সেকথা জানানো যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ করিনে। ভ্রমণ হবে উৎসাহিত করার জন্য, দমিয়ে দেবার জন্য নয়। কাশ্মীরে যাঁরা যাবেন তাঁদের বলবো তাজবাস, সোনীমার্গ, ওয়াঙ্গাথ্ নালা, গন্দরবল যেন অবশ্য দেখে আসেন। এমন অনন্যসাধারণ প্রকৃতি-রমনীয় স্থান আর দেখিনি।

ফিরছি ফিরছি। হাসিমুখে দুটো থল আমাদের চেয়ে দেখছে। এতো সরল মুখ—ছবি নিতে গেলাম। একজন তো লজ্জায় মুখ ফিরিয়েই নিলো।

আষাঢ়

রামেন্দু দত্ত

জীবনে আমার মধুমাস গত, চৈত্র গাজন চলে—
পেট পিঠ ফুঁড়ে চড়কেতে ঘুরে ভাসি মা নয়ন জলে !
কাল-বৈশাখী, তাও নাই বাকী, ঈশাণে বিষাণ বাজে
রুষ্ট মহেশ নাচে তাণ্ডব জীবন-শ্মশান মাঝে !
তাতাথৈ-থৈ, সলিল অথৈ, বিপদ সাগর কোলে—
বিষ উঠিতেছে হে নীলকণ্ঠ! আমি ত মায়ের কোলে
ওড়ে জটাজাল ভীষণ ভয়াল অহিভরা মহী লাগে
অতনু হয়েছে ভস্ম, তোমার ললাট-বহ্নি আগে।
সংবর তব তৃতীয় নয়ন, প্রলয়-নাচন রাখো !
স্থিরোভব দেব, সংবর বাস ; অঙ্গে ভস্ম মাখো ॥
জীবনে আবার নামুক আষাঢ়, শীতলি' বসুন্ধরা,
নয়ন-আসারে সে বারি মিশিয়া হউক লবণ-হারা।
শুষ্ক তরুরা মুঞ্জরি' হোক্ কচি-কিশলয়ে ঢাকা
বহ্নি ক্ষরিত কপিষ আকাশ হউক কাজল মাখা।
'ভারতবর্ষে' এ নব বর্ষে শুভারম্ভের সনে—
পহেলী আষাঢ়ে দূর রামগড়ে কবি বন্দনা ভণে।

বিবর্ণ দিন

প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

ধূলায় রুক্ষ কঠিন শুকনো পথ,
সাহারায় কোথা তৃষ্ণার বারি পাই ?
আগুনে ভস্ম সোনার ফসল যত,
আশার স্বপ্ন ব্যর্থ হ'লো যে ভাই।
ফাঁকা বচনের মূল্য খুঁজে কী হ'বে,
বাঁচবার আশে মন তবু উল্লাসে',
উঞ্ছজীবী নিষ্ঠুর করাঘাতে—
হৃদয় ভরেছে প্রলাপের উচ্ছ্বাসে !
অকৃপণ হাতে কবে যে ভরাবে মন,
ফসলের দিন সোনায় ভরিয়ে দিয়ে ;
দগ্ধ হৃদয় বেদনায় ব্যথা হত,
কী হ'বে হায় ব্যর্থ এ-দিন নিয়ে ?
চিতার ভস্মে স্বপ্ন ফুলের দেখি,
উপবাসী মন পিরামিডে প'ড়ে ঢাকা ;
অহল্যা কার স্পর্শে জাগবে বলো,
মহাকাল কী ঘুরিয়ে দেবেনা চাকা ?



অনুরূপা দেবী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

যাঁকে সকলে চেনে, যাঁর পরিচয় লেখা আছে ছড়িয়ে আছে নিজের সৃষ্টির মধ্যে, তাঁকে চেনাবার জন্য লোকের দরকার হয় না। অনুরূপা দেবী ছিলেন তেমনি একজন মানুষ। তাঁর পরিচয় বহু বিস্তৃত। তিনি মহাত্মা ভূদেববাবুর পৌত্রী, স্বধর্মনিষ্ঠ, সৌজন্য অমায়িকতার মধুর উজ্জ্বল চরিত্র মুকুন্দদেবের কন্যা (যাঁর পরিচয় পিতা ভূদেব ও পুত্রী অনুরূপার আড়ালে পড়ে গেছে) কৃতী স্বামীর পত্নী, বিদ্বান ও মাতৃভক্ত পুত্রদের জননী। একজন নারীর এই পরিচয়ই যথেষ্ট সেকালে বা একালে। এবং এই ধরণের বহু পরিচয় শালিনী মহিলাদের মৃত্যুর পর সাময়িক পত্রে একখানা ছবি বা একটু নাম পরিচয়ই লোকে দিয়ে থাকে।

কিন্তু অনুরূপা দেবীর এইসব পরিচয়কে অতিক্রম করে নিজস্ব এক পরিচয় আছে, যা তাঁর সারাজীবনের সাধনা ও সৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছে। তাঁকে তাঁর ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করেছে। কোনোখানেই নারীর এই ব্যক্তি পরিচয় বড় সুলভ নয়—বিশেষভাবে সাহিত্য জগতে। অনুরূপা দেবী সমস্ত পারিপার্শ্বিক, পারিবারিক আশপাশ সম্পর্ককে ছাড়িয়ে অতিক্রম করে গেছেন। কারুর কন্যা, কারুর স্ত্রী, কারুর জননী এই পরিচয়তেই তাঁর পরিচয় শুধু নয়, তিনি বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব শালিনী মহিলা লেখিকা। আমাদের বাঙলা সাহিত্যে মেয়েদের লেখা সাহিত্য খুব বেশী দিনের নয়। ১৮৫৫ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম হয় এবং এই স্বর্ণকুমারী দেবী থেকেই মেয়েদের লেখা কথা-সাহিত্যের যুগ এসেছিল ধরে নিতে পারা যায়। স্বর্ণকুমারী দেবী বহু বিষয় নিয়ে লিখেছেন, পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন পাঠক জানেন।

তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'ভারতী'তেই অনুরূপাদেবীর প্রথম সার্থক উপন্যাস পোষ্যপুত্র প্রকাশিত হয়। তখন তিনি বিবাহিতা। অন্তঃপুরিকা ও 'অসূর্য্যম্পশ্যা'ও বলা যায়। সেযুগে তিনি ঘরেই শিক্ষালাভ করেছিলেন কি ভাবে তা' জানিনা—যেমন মাষ্টার পণ্ডিত গুরুমশাই নিয়ে সেকালে লেখাপড়া শিখতেন মেয়েরা—তাই সম্ভবত। তিনিও লেখাপড়া এবং পড়াশোনার আরম্ভ সেই শিক্ষাতেই করেছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী মশাইয়ের একটী উক্তি থেকে বলি যে সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বশিক্ষিত। তাঁর অভিমত ছিল, সত্যি লেখাপড়ার জন্য স্কুলকলেজে পড়া বা 'পাশের ছাপ' থাকা না থাকায় বিশেষ আসে যায় না…।

অনুরূপা দেবীর সাহিত্যের পরিচয় আমার দেবার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর নাম জানেন না, ও তাঁর লেখা বই পড়েন নি লেখাপড়া জানা এমন বাঙালী বোধহয় নেই। তাঁর কি কি বই, কবে বেরিয়েছে, কোনগুলি বেশী সমাদৃত তাও তাঁদের অজানা নেই।

তাঁর সাহিত্য নিয়ে কিছু আলোচনাও হয়ে গেছে। আরো হবে আশাকরি। কেননা তাঁর উপন্যাস ছাড়াও প্রবন্ধ ছোট গল্প ছোটছোট অজস্র লেখা ও নাটিকাও রয়েছে যা তাঁর বহু বিষয়ে জ্ঞান তাঁর আদর্শের পরিচয় বহন করছে। তবু এটাও সত্য যে তাঁর প্রথম দিকের রচিত উপন্যাসগুলিই সমধিক জনপ্রিয়। তাঁর খ্যাতি ও সেই সব রচনা থেকেই।

একথাও সর্ববাদীসম্মতই মনে হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর পর বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকের মধ্যে অনুরূপা দেবীই প্রধানতম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখিকা। উপন্যাস গল্প ছাড়াও তাঁর নানা বিষয়ের আলোচনায় বলিষ্ঠ চিন্তাশীলতা তেজস্বিতার পরিচয় পাই। একদিকে তিনি যেমন তেজস্বিনী ও নির্ভীক প্রকৃতির ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি স্নেহমধুর সৌজন্যের অভাবও তাঁর চরিত্রে ছিল না। সমসাময়িক প্রায় সব লেখিকাদের সঙ্গেই চেনাজানা ছিল দেখেছিলাম। প্রায় সকলেই তাঁর চেয়ে ছোট বয়সের, সেইজন্য ব্যবহারটাও তাঁর বেশ স্নেহময় ছিল।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হয় বছর কুড়ি আগে বাণী-প্রেসের একটী সভায় সরস্বতী পূজার সময়। তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অম্বুজবাবু জীবিত ছিলেন। তিনি সঙ্গে ছিলেন। তার কয়েক বছর আগেই বিহার ভূমিকম্পে মজঃফরপুরে তাঁর পৌত্রীবিয়োগ হয়। সেই শোক ও বেদনা তখনো মাতা ও পুত্রের মনে অম্লান ছিল। দু একটী কথা মাত্র হ'ল ঐ সব বিষয়েই। তখনো শরীর আঘাতে অসুস্থ তাঁর। তিনিও আহত হয়েছিলেন।

আমি সভা ভাঙ্গার আগেই চলে এলাম। খানিক পরে দেখি উত্তরা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী একটী মালা হাতে নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ীতে। বললেন অনুরূপা দেবী আপনাকে খুঁজলেন এই মালাটী দেবার জন্য। তাঁর স্নেহ-স্মারক মালাটী পেয়ে খুব ভাল লাগল। অথচ সমাজ সম্বন্ধে তাঁর মতামত রক্ষণশীল ধরণের ছিল এবং আমার মত কিছু অন্য ধরণের ছিল। তা তাঁর জানা ছিল। তারপরেও কয়েকবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে তাঁর সম্বর্দ্ধনায়—রামতনু বসু লেনে তাঁর ভগিনীর বাড়ীতে গিয়ে দেখা করেছি। তাঁর ফড়েপুকুরের বাড়ীতেও গিয়েছি।

বহুদিন আগে আমি পাটনায় ছিলাম, তখন আমরা ছোট. আর তিনি স্বনামধন্য প্রখ্যাত লেখিকা তাঁর পিতা মুকুন্দদেববাবু তখন পাটনায় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁদের মিঠাপুরের বাড়ীতে পড়াশোনার আবহাওয়া খুব বলা বাহুল্য। একখানি হাতে লেখা কাগজ বের করেছেন তাঁর বোন সরসীবালা; নাম 'আশা'। কাগজখানিতে লেখার জন্য আমারো আমন্ত্রণ এলো। লিখলাম, মনে হয়, যা হয় কিছু। তখন লিখার ইচ্ছা ও অভ্যাস থাকলেও প্রকাশ হয়নি কিছুই। উনি তখন মজঃফরপুরে আছেন।

সেদিন ফড়িয়াপুকুরের বাড়ীতে বসে নিজের পরিচয় দিয়ে সেই গল্প করলাম তাঁর সঙ্গে। তিনি আমার পিতৃ পরিচয় জানতেন দেখলাম। মানুষকে মনে রাখা, সমাদর করা, স্নেহ করার যে সৌজন্য ও নিষ্ঠাচার দেখেছিলাম তাঁর ব্যবহারে, এযুগে অসংখ্য লেখক-লেখিকার ভীড়ে, যেন আমাদের সেই সহৃদয় সরল জিনিষটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। কেন কে জানে। পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধা উত্তরকালীয়দের স্নেহ সমাদর করার যুগ কি চলে যাচ্ছে? বড়দের কাছে 'সম্মান নত' হওয়া আর কনিষ্ঠদের স্নেহপ্রকাশ করার প্রথাটা উঠে যাচ্ছে?—

মেয়েদের কথা

আবহমানকালের নারী

অনুরূপা দেবী

[অনুরূপা দেবী তাঁর নিজ লিখিত ও ১৯৪৪ সালের লীলা লেকচার পুরস্কার প্রাপ্ত "সাহিত্যে নারী" গ্রন্থটি থেকে তদানিন্তন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে কমলা লেকচারের জন্য, নারী সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয় নিয়ে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেন এবং লেখাও কিছুদূর অগ্রসর হয়। কিন্তু হঠাৎ দৈবদুর্বিপাকে সব কিছুই পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। অনুরূপা দেবীর পুত্রতুল্য শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অনুজনাথের অকাল বিয়োগে আরব্ধ কার্য্য আরম্ভেই বাধা প্রাপ্ত হয়। অনুরূপা দেবী ভগ্নচিত্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে এই অমিত পরিশ্রম প্রচেষ্টা থেকে বিরত হন। তারপর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর ঐ সব লেখা থেকে "ভারতবর্ষ"র "মেয়েদের কথা" বিভাগের জন্য অনুরূপা দেবী এই প্রবন্ধটি রচনা করেন। এরূপ আরও প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য তাঁর ছিল, কিন্তু মৃত্যু এসে বাধা দিল। সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীর এই সুচিন্তিত শেষ প্রবন্ধটি পাঠে পাঠিকাগণই শুধু নন, পাঠকগণও উপকৃত হবেন। ভাঃ সঃ]

বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতপিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ ॥

মহাকবি কালিদাস গ্রন্থারম্ভে জগন্মাতা এবং জগৎপিতার বন্দনা করতে গিয়ে তাঁদের দুজনকে বাক্য এবং অর্থের মতো পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য-ভাবে সম্পৃক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। মানব সভ্যতার জন্মদাত্রী নারীর ইতিহাস আলোচনা করতে বসে আমরা প্রথমেই মহাকবির কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করেছি। মানব সভ্যতার জন্মদাতা পুরুষের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষের সমাজে এবং সাহিত্যে নারীর দান এবং স্থানের কথা বলতে যাওয়া শুধু কঠিনই নয়; তা অসম্ভব। ভারতবর্ষ একদিন তার অর্দ্ধনারীশ্বর দেবতার রূপকল্পনায় এই অত্যন্ত সহজ সত্যটি একান্ত শ্রদ্ধা ভরে স্বীকার করেছিল। পুরুষ-নিরপেক্ষ নারী এবং নারী-নিরপেক্ষ পুরুষের ইতিহাস লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত নারী পুরুষ একান্তরূপেই পরস্পরাশ্রয়ী। যুগে যুগে পুরুষ শিকার করে, চাষ করে উপার্জ্জন করে এনেছে, তার বিজয়লব্ধ বস্তুজাতকে খাদ্যোপযোগী করেছে, খাইয়েছে এবং খেয়েছে। পুরুষ চরখা তৈরী করে দিয়েছে, নারী সুতো কেটে কাপড় বুনে পরেছে এবং পরিয়েছে। তারা গান গেয়েছে এবং নেচেছে,—তার বাঁশী, বীণা, মৃদঙ্গ, মঞ্জরী গড়েছে পুরুষ। পুরুষ বাড়ী গড়েছে, হাঁড়ি গড়েছে, তার মাটি ঠেসে দিয়েছে জল বয়ে দিয়েছে নারী। আবহমান কাল ধরে নারী বিদ্যা চর্চ্চা, শিল্প চর্চ্চা, রূপ চর্চ্চা করে, নেপথ্যে থেকে তার শিক্ষার এবং স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ জোগায় পুরুষ। আবার পুরুষ কাব্যচর্চ্চা ধর্ম্মচর্চ্চা করে, নেপথ্যে থেকে তার অন্ন এবং প্রেরণা জোগায় নারী। যে অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিয়ে জনতাকে মুগ্ধ করে আর যে সব শিল্পী লোকলোচনের অন্তরালে থেকে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বিচিত্র সাজে সাজিয়ে অপরূপ রঙ্গমঞ্চ রচনা করে তার মধ্যে উজ্জ্বল আলোয় অভিনব আনন্দলোক সৃষ্টির কাজে তাকে সহায়তা দেয়, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয়ের সাফল্য তাদের প্রত্যেকের উপরই কিছু না কিছু নির্ভর করে। এ কথা সত্য যে, যে আড়ালে থাকে তাকে সব সময়ে মনে পড়ে না। অপ্রত্যক্ষের চেয়ে প্রত্যক্ষের যশোভাগ্যই বেশী। তাই দেখতে পাই স্বচ্ছন্দচারী পুরুষ যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের আসর জমজমাট করে আছে, নিভৃতচারিনী নারীকে সকল দেশে পুরুষের লিখিত ইতিহাসে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেয় নি। এর জন্য নারী অথবা পুরুষকে কতটা দায়ী তা বলা যায় না। অপ্রত্যক্ষ ভগবান এবং পরলোকের দ্বারা চিরদিন ধরে মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ইতিহাসের পুঁথিতে দুবার উল্লিখিত হবার সম্মানের চেয়ে আড়াল থেকে ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকারকে শ্রেষ্ঠতর বলে হয়ত নারী একদিন মনে করেছিল। আজ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে, সম্মানবোধের সংজ্ঞাও বদলেছে, আজ ইতিহাসের তথাকথিত উপেক্ষিতা নিজের ইতিহাস নূতন করে নিজেই লিখতে বসেছে। তার পক্ষে অভিমান স্বাভাবিক কিন্তু অভিমানবশে সে যেন পুরুষের ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি না করে, সত্যকে বিকৃত করে দেখবার বা দেখাবার প্রবৃত্তি যেন তার না হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে নারী এবং পুরুষের দেহে ও মনে বৈষম্য আছে, সবলতা ও দুর্ব্বলতা আছে, বিভিন্ন বিষয়ে সহজ পটুত্ব এবং অপটুত্ব আছে। এর মধ্যে কোন্ বিষয়ে নৈপুণ্য কতখানি সম্মানের যোগ্য তা বিচার করবার মাপকাঠি আজও তৈরি হয় নি। রন্ধনবিদ্যা বড় না যুদ্ধ বিদ্যা বড়, ঘরে বসে ছেলে মানুষ করা বড় না বনে গিয়ে ধ্যান করা বড়, এসব তর্কের মীমাংসা হয় নি, কোন দিন হবে কি না সন্দেহ। সুতরাং নারী বড় না পুরুষ বড় এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার চেষ্টা না করে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আপন ক্ষেত্রে বড়, উভয়েই উভয়ের একান্ত প্রয়োজনীয় এবং জীবনের

ক্ষেত্রে উভয়েই উভয়ের পরিপূরক, এই কথাটা প্রথমেই স্বীকার করা সঙ্গত। নারী প্রকৃতির নিয়মে পুরুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। ছোট বড়র প্রশ্ন তুলে নিজেদের বড় বা ছোট ভাববার হীন মনোবৃত্তি তাদের বর্জ্জন করতে হবে। পুরুষকে তার প্রাপ্য সম্মান দিলে নারীর প্রাপ্য সম্মান কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না। আবার পুরুষকেও নারীকে তার বিভিন্ন ভূমিকায় সহজভাবে দেখতে এবং সরলভাবে তার প্রাপ্য সম্মান তাকে দিতে দেখলেই যথেষ্ট মনে করব। নারীর প্রতি অবিচার হয়েছে একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় ; যদিই বা সত্য হত, তাহলেও সে অবিচার ফিরিয়ে দেবার অধিকার তাদের জন্মাত' না। বর্ত্তমানের ভুল দিয়ে অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

কোন বিষয়ের আলোচনা করতে গেলে তার গোঁড়ার কথা জানা দরকার। কিন্তু মানব সভ্যতার গোড়ার কথা আমরা কতটুকু জানি? 'কালোহোয়ং নিরবধি, বিপুলা চ পৃথ্বী',—পৃথিবীতে মানব আবির্ভাবের আদি যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বৎসর অগণিত মানব সন্তান জন্মেছে এবং মরেছে। তাদের জীবনেতিহাস আমরা জানি না। তাদের জীবনযাত্রার কোন তথ্য কোনদিন কারো কাজে লাগবে সে কথা তারাও জানত না। আজকের দিনেও কত মহিয়সী নারী পৃথিবীর কতদেশে কতভাবে সমাজের সাহিত্যের সেবা করেছেন তার কতটুকু পরিচয় জগদ্বাসী পেয়ে থাকে? মানুষের জীবনযাত্রা সহজ করবার, সুন্দর করবার জন্য কত আবিষ্কার,—কত ঘট পট রান্না সেলাই, গান গল্প ছড়া, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে কত অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে অরণ্যে, অখ্যাতা অজ্ঞাতা নারীর দ্বারা প্রতিদিন রচিত হয়ে চলেছে তার কয়টার হিসাব আমরা রেখে থাকি? সুসভ্য বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র যুগেই এই। অতীতের সূচিভেদ্য অন্ধকারে ইতিহাসের সন্ধানী আলো ফেলে যে অস্পষ্ট চিত্ররেখা আমরা দেখতে পাই, তাকেই অনুমানের বর্ণ দিয়ে, কল্পনার রংয়ে উজ্জ্বল করে একটা মূর্ত্তি দাঁড় করাই মাত্র। অতীতের ভাষা-সাহিত্যকে বাহন করে আমরা প্রাচীন সমাজে প্রবেশ করতে পারি। তার চেয়ে দূর অতীতে প্রবিষ্ট হতে হলে শিল্প-সাহিত্যকে বাহন করে যেতে হয়। তারও চেয়ে দূর অতীতের সাক্ষী আছে মাত্র কয়েকটা পাথরের অস্ত্র এবং তাদের অধিকারীদের কঙ্কাল-করোটির নিদর্শন। তারপর আর পথ চলবার কোন সম্বলই মানুষের নেই। বর্ণলিপি, চিত্রলিপি, দেহাবশেষের সব নিদর্শন ফুরিয়ে গেলেও অতীতের পথ ফুরায় না। লৌহযুগ, তাম্রযুগ, প্রত্ন-প্রস্তর যুগের কত আগে আদি মানবের ইতিহাস কোন অন্ধতমসাবৃত গুহার অমানিশার অন্ধকারে সুরু হয়েছিল তা আজ কে বলে দেবে? বেদের যে সত্যদ্রষ্টা ঋষি সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করতে সাহস করেছেন, যিনি বলেছেন,—

না সদাসীদ্ নোহসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরং যৎ,
কীমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্ অম্ভকীমাসীদগহনং গভীরম্
নমৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি·····...

'আকাশ, পৃথিবী আলো অন্ধকার দিবারাত্রির প্রভেদ মৃত্যু বা অমৃত্যু কোন কিছুই ছিলনা'—তিনিও আদি মানব সম্বন্ধে সচিন্ত্য সন্দেহে প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছেন,—"কো দদর্শ প্রথমো জয়মানঃ,"—"প্রথমোৎপন্নকে কে দেখেছিল?" প্রশ্নটা তিনি আত্মগতভাবেই করেছেন, এর উত্তর দেবার লোক যে কেউ নেই সে কথাটা তাঁর জানা ছিল। এর সঠিক উত্তর কেউ কোনদিন দিতে পারবে কিনা আজ বলা শক্ত। পৌরাণিকের মত আধুনিকরা মানবে না। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের মত বিভিন্ন, তাও আবার দুদিন অন্তর বদলাচ্ছে ; ভবিষ্য বৈজ্ঞানিকের মত কেউ ঋষিবাক্যের মতো মেনে নেবে, কেউ নেবে না। মানবেতিহাসের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় প্রথম পৃষ্ঠা আমরা হারিয়ে ফেলেছি, ফিরে পাবার কোন আশা নেই। সুতরাং বাধ্য হয়েই আমাদের মাঝখান থেকে পুঁথি শুরু করতে হবে। কিন্তু তাও কি সম্পূর্ণ সম্ভব? বহু সহস্র বৎসর ধরে বহু যত্নে মানুষ যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, দেশে দেশে কালে কালে তা ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, অগ্নিদাহ, রাষ্ট্রবিপ্লব, বর্ব্বরের অত্যাচারে বারে বারে ভেঙ্গে ভেসে দগ্ধ হয়ে ছারখার হয়ে গেছে, তার সমস্ত ঐতিহাসিক মালমশলা সমেত। এই ধরণের এক একটা আঘাতে সমাজের এবং সাহিত্যের যে রত্নরাজি নষ্ট হয়ে গেছে তার মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। থিভস্, কার্ণাক, ব্যাবিলন, নিনেভে, উর, ট্রয়, নসস, পার্সিপোলিস, সুসা, কার্থেজ,সুমের, তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র, সারনাথ, নালন্দা, বিক্রমশিলা, সোমপুর, কান্যকুব্জ, মথুরা, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, আলেকজান্দ্রিয়া, কর্ডোভা, বোগদাদ, সমরখন্দ প্রভৃতি এক একটি মহানগরীর বিরাট বিদ্যাপীঠ ধ্বংস হওয়ার ফলে কত যুগের কত লক্ষ লক্ষ মানুষের সাধনাই নিষ্ফল হয়ে গেছে, কত জ্ঞানবীর, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীরের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে তা আজ কে বলতে পারে? বহু বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যাঁদের স্মৃতি কাল জয়ী হয়ে আছে তাঁরা নিতান্তই সৌভাগ্যবান এবং সৌভাগ্যবতী। কিন্তু তাঁরা নরোত্তম অথবা নারীশ্রেষ্ঠ ছিলেন কিনা সে কথা বলা শক্ত। দেশভেদে, কালভেদে, রুচিভেদে মানুষের স্মৃতি, তুলিকা ও লেখনী যাঁদের নাম বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, তাঁদের মধ্যে অনেকে মানুষ, নামের যোগ্য ছিলেন কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ থাকে। কুহকিনী ক্লিওপেট্রার নাম আজও জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু তপস্বিনী সুলতার নাম ক'জনেই বা জানেন? পররাজ্যাপহারী আলেকজান্দার, নররক্ত-লোলুপ চেঙ্গিজখাঁ এবং তৈমুরলঙ্গের নামে ভারত-আক্রমণকারিণী আসিরিয় সম্রাজ্ঞী সেমিরামিসেরও নাম শোনা যায় ; কিন্তু বিশ্ববিজয়ী আরবশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুকে বঞ্চিত এবং বিপন্ন করবার জন্য মাতৃভূমির লক্ষ লক্ষ নরনারীকে তাদের সাজানো সংসার, তাদের শত শত গ্রাম নগর শস্যক্ষেত্র, ধ্বংস করবার অনুপ্রেরণা দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে যিনি শেষ পর্য্যন্ত বিজয়িনী হয়েছিলেন, সেই মহিয়সী বীর-নেত্রী 'কাহিনা'র কাহিনী কজন শিক্ষিত লোকের জানা আছে? প্রবল-প্রতাপ দিল্লীশ্বর কুতবুদ্দিনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সমরে বিজয়িনী চিতোরেশ্বরী কর্ম্মদেবীর নাম কয়জন জানেন? সে যা হোক, নারীর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই কয়েকটি সত্য স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন,—১) সাহিত্যে এবং সমাজে নারীর দান নর-নিরপেক্ষ নয়। (২)

প্রাকৃতিক নিয়মে নারী পুরুষের দেহে মনে সামঞ্জস্য থাকলেও সাম্য নেই, সুতরাং উভয়ের বিচারের মাপকাঠি ঠিক এক হতে পারে না। (৩) নারীর অতীত এবং বর্ত্তমানের অধিকাংশ ইতিহাস লেখা হয়নি। যেটুকু লেখা হয়েছিল তার মধ্যেও অনেকখানি অংশ দৈববিপর্য্যয়ে এবং মানুষের অত্যাচারে নষ্ট হয়ে গেছে। (৪) নারীর যেটুকু ইতিহাস এত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তার মধ্যেও দেশকাল পাত্রের রুচিভেদে লঘুতে গুরুত্ব এবং গুরুতে লঘুত্ব আরোপ হয়েছে, তা একদেশদর্শী। এক্ষেত্রে একটি প্রবন্ধে সমাজে এবং সাহিত্যে নারীর সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখার চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। অতীতের অসম্পূর্ণ এবং শতধাখণ্ডিত ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় নারীর কথা যেখানে যতটুকু পাওয়া যায় তাও সমস্ত সংগ্রহ করে লেখার শক্তির এবং সময়ের একান্ত অভাব। সেই সুদীর্ঘ কাহিনী শোনবার মত ধৈর্য্যও বর্ত্তমান যুগে অল্প শ্রোতারই আছে। তাই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা না করে সমাজে এবং সাহিত্যে নারী প্রতিভার বিকাশের একটা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব, দু'চারটে স্মরণীয় নাম এবং নারীর জ্ঞাত ইতিহাসের দু'চারটে স্মরণীয় ঘটনা।

প্রাগৈতিহাসিক সমাজে নারী :—

নরনারীর উৎপত্তি নিয়ে বৈজ্ঞানিকে এবং পৌরাণিকে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। বিজ্ঞান বলে যে বহুকোটি বৎসরের ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে স্যাওলার মত জলজ উদ্ভিদ ক্রমে ক্রমে বানরে এবং সেই বানর ক্রমে মানুষে পরিণত হয়েছে। নারীও একজাতীয় মানুষ। তার দেহ সন্তানধারণ, জনন এবং পালনের উপযোগী করে গঠিত ; তার দৈহিক দৈর্ঘ্য এবং শারীরিক শক্তি পুরুষের চেয়ে কিছু কম. মস্তিষ্কের মাপও কিছু ছোট, কিন্তু মোটের উপর তার সুখদুঃখের অনুভূতি এবং পাপ-পুণ্যের ধারণা পুরুষেরই মত। বিজ্ঞানের মতে নারী বানরীর ক্রমোন্নতির ফল। অপরপক্ষে বিভিন্ন দেশের পৌরাণিক মতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ "সৃষ্টিরাদ্যা বিধাতুঃ" মানুষ সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছায় বা নিজের পাপে তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বর্গ থেকে পতিত হয়েছে। বেদে উক্ত হয়েছে ঈশ্বর এক ছিলেন, বহু হ'বার ইচ্ছা ক'রলেন, তিনি নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে পুরুষ এবং নারীর সৃষ্টি করলেন।

দ্বিধাকৃত্বাত্মনোদেহ অর্দ্ধেন পুরুষোভবৎ,
অর্দ্ধেন নারী তসস্যাং স বিরাজ সমৃজৎ প্রভুঃ।
"সইমসেবাত্মানং দ্বেধাহপাতয়ত্ততঃ পতিশ্চ পত্নীচাহ ভবতাম।"

[বৃহদারণ্যক]

এর চেয়ে মানব সৃষ্টির সুন্দরতর কল্পনা আর কোন দেশে আছে বলে জানি না। হিব্রু পুরাণ মতে ঈশ্বর নিজের অনুরূপ করে আদিপুরুষ আদমকে সৃষ্টি করলেন, তাঁর পার্শ্বাস্থি থেকে আদিনারী হবা [ইভ] সৃষ্টি হল। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে তাঁরা স্বর্গ থেকে নির্ব্বাসিত হন, পৃথিবীর সমস্ত মানব তাঁদের সন্তান।

ভারতীয় পুরাণ মতে আদিমানব মনু ব্রহ্মার মানসপুত্র। প্রতিকল্পে চতুর্দ্দশ মনু হয়ে থাকেন। তাঁদের নাম স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, এঁরা গত হয়েছেন। সপ্তম বৈবস্বত মনুর অধিকার বর্ত্তমানে চলছে। সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি এঁরা পরে হবেন। প্রত্যেক মনু এক এক মন্বন্তর অর্থাৎ তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়ি হাজার বৎসর কাল পৃথিবী শাসন করেছিলেন।

কোনদেশের পুরাণের মত অপর এক দেশের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে মিলবে না। তার কারণ সুস্পষ্ট, প্রথম জায়মানকে কেউ দেখে নি। এখন বৈজ্ঞানিকদের যুগ চলছে, তাঁদের মতই বলি। ভূতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মতে অপরিণত সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পরাশি থেকে একটা ক্ষুদ্র অংশ ছিটকে এসে অন্যান্য গ্রহের মতই আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি করেছে। সেই জ্বলন্ত বায়ুরাশি ক্রমশঃ শীতল এবং ঘনীভূত হয়ে কতকাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান মৃতপিণ্ডে পরিণত হয়েছে সে বিষয়ে মতভেদ আছে ; তা' দুশো কোটি বৎসরও হতে পারে দু কোটি বৎসরও হ'তে পারে। প্রথমতঃ পৃথিবী ছিল জীবশূন্যা ; দীর্ঘকাল ধরে তার বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশে অবিশ্রাম ঝড়বৃষ্টি চলেছে, উত্তপ্ত পাহাড় থেকে উত্তপ্ত জলধারা নির্ঝর-রূপে ঝরে এসে ফুটন্ত জলের সমুদ্রে পড়েছে। ক্রমে বায়ুস্তরের জলকণা কমল, সমুদ্রের জল বাড়ল এবং ঠাণ্ডা হ'ল। তারপর চলল ক্রমোন্নতি। তার ও পরে অগভীর কোন খানা ডোবার জলে পৃথিবীর প্রথম জীব জন্ম নিল। বৈজ্ঞানিকদের মতে শ্যাওলার মত জলজ উদ্ভিদ-রূপেই জীবের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল। তারপর পৃথিবীর তাপশৈত্যের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীব নিজের দেহ পরিবর্ত্তন করতে লাগল। জলজ উদ্ভিদ থেকে জলজ কীট, মাছ, অতিকায় জলচর প্রাণী, উভচর সরীসৃপ, পরিশেষে স্থলচর জন্তুতে পরিণত হল। অজৈব, প্রত্ন-জৈব প্রভৃতি যুগ পেরিয়ে অতিকায় স্থলচরদের যুগেরই শেষদিকে দারুকপি বা বনমানুষদের সন্ধান মেলে। এই সময়ে মধ্য এসিয়ার সমভূমির মধ্যে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়নে নগাধিরাজ হিমালয়ের উদ্ভব হয়। বহু বৈজ্ঞানিকের মতে এই হিমাচলই আদি মানবের জন্মস্থান। ক্রম-বিবর্ত্তনের ধারা হিন্দুর দশাবতারে—মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধদেবের ক্রমপরিবর্ত্তনের মধ্যে—যেরূপ মূর্ত্তি পেয়েছে সে কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। চুরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর দুর্লভ মানব জন্মলাভের যে বিশ্বাস হিন্দুর মধ্যে চলে আসছে, তা'র অর্থও সুস্পষ্ট।

বিভিন্ন ভূস্তরে প্রাপ্ত জীবকঙ্কালের সাক্ষ্য সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক অতঃপর পৌঁছেছেন প্রাঙ্‌ মানবের যুগে। প্রাপ্ত নরকপাল হ'তে পরিচিত চীনের অর্দ্ধমানব, যবদ্বীপের কপিমানব, ইংলণ্ডের পিল্ট-ডাউনের প্রাঙ্‌মানব এবং জর্ম্মনীর হাইডেলবুর্গের প্রাঙ্‌মানবের যুগ পার হয়ে আমরা নিয়াণ্ডালথালের "প্রায়-মানবের" দেখা পাই। সে যুগ পৌরাণিকের সত্য যুগ বা স্বর্ণযুগ নয়। জীবনসংগ্রামের পক্ষে সে ছিল এক কঠিনতমতার পূর্ব্ব যুগ। প্রচণ্ড রৌদ্র, নিদারুণ শীত, এবং

ভীষণ বর্ষার ধারাপ্লাবনের মধ্যে সেই লোমশ "প্রায়-মানব"কে সেদিন বনে বনে ফিরতে হত শিকারের সন্ধানে। অতিকায় হাতী, গণ্ডার, সিংহ, ভালুক, বাইসন, হরিণ ছিল তার বনবাসের নিত্য সহচর। শীতের হাত থেকে এবং শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সেদিন মানুষ হিংস্র পশুদের তাড়িয়ে তাদের গুহা দখল করে বাস করতে শিখেছিল। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ব্যবহারও শিখেছিল। সম্মুখ সমরে যে সব জন্তুকে পাথরের বা কাঠের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বিনাশ করা সম্ভব ছিল না তাদের, ফাঁদ পেতে ধরতে এবং বধ করতে তাদের দক্ষতা হয়েছিল। মৃত জন্তুর চামড়া ছাড়িয়ে এবং তা রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে তারা শীত নিবারণ এবং লজ্জানিবারণও করত। জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা তাদের মাথার খুলি পরীক্ষা করে মনে করেন তাদের দৃষ্টিশক্তি এবং স্পর্শশক্তি তীক্ষ্ণ হলেও চিন্তাশক্তি এবং বাক্‌শক্তি বিকশিত হয় নাই। জলপাত্রের এবং রন্ধনপাত্রের ব্যবহার জানা না থাকায় কোনো হ্রদ, নদী বা জলাশয়ের কাছাকাছি তারা দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। আহার্য্য সংগ্রহ বা যুদ্ধ বিগ্রহের ব্যাপারে পুরুষকে প্রধান অংশ নিতে হলেও নারীর সাহায্য সেদিনও তার পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। নারী সেদিন পশুচর্ম্মের সজ্জা এবং তৃণপত্রের শয্যা রচনা করত। পশুমাংস ভোজনের পশুত্বকে অতিক্রম করে সেদিন পুরুষকে স্বচ্ছন্দ বনজাত ফল খাওয়ার প্রথম প্রেরণা দিয়েছিল নারী; শুধু প্রাচীন সাহিত্যেই নয়, প্রাচীন শিল্পেও এর প্রমাণ আছে। বাইবেলের ইভের কাহিনী এর প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করতে পারা যায়। সেদিন সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় অগ্নিকুণ্ড অনির্ব্বাণ জ্বালিয়ে রাখা হত, তার ইন্ধন যোগাত নারী। পাথরের অস্ত্রে শান দিয়ে তাকে সুশাণিত করে রাখা ছিল নারীরই কর্ত্তব্য কার্য্য। সন্তান পালন, আহতের পরিচর্য্যা গৃহসংস্কার, দেহসজ্জা এবং অঙ্গরাগ রচনায় নারীর একাধিপত্য সেদিনও প্রতিষ্ঠিত ছিল। লক্ষ বৎসর ধরে পৃথিবীর বনে প্রান্তরে বিচরণ করবার পর এই প্রায়-মানবের দল লুপ্ত হয়ে গেছে বর্ত্তমান মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষের আগমনে।

বর্ত্তমান মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষদের জন্মস্থান কোথায় ছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ মনে করেন সম্ভবতঃ দক্ষিণ এসিয়ায়, অথবা উত্তর আফ্রিকায়, কিম্বা ভূমধ্যসাগরগর্ভে অধুনা নিমজ্জিত কোন এক ভূখণ্ডে সহস্র সহস্র বৎসরের ক্রমোন্নতির ফলে নিয়্যাণ্ডারথাল জাতিদের বাহু এবং বুদ্ধি বলে অতিক্রম করে তা'রা সহজেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছিল। প্রত্নপ্রস্তরযুগের মানবসমাজে একটির পর একটি দল হাজার হাজার বৎসর ধরে বিভিন্ন সভ্যতার সৃষ্টি করতে করতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। এই সময়ে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আদিমানবের শিল্পচর্চ্চাও আরম্ভ হয়েছিল। পাথর, হস্তীদন্ত, অস্থি প্রভৃতির গায়ে নক্সা করে মূর্ত্তি আঁকতে, নারীর জন্য অলঙ্কার নির্ম্মাণ করতে, তাদেরই পরিধানের জন্য শুষ্ক পশুচর্ম্মে রঙীন ছাপ দিতে, গাছের বাকলে এবং গুহার দেওয়ালে ছবি আঁকতে মানুষ ক্রমে দক্ষ হয়ে উঠল। এই যুগের শেষ দিকের যে সমস্ত শিল্প নিদর্শন কালের কুটিল গতিকে উপহাস করে আজও বিদ্যমান রয়েছে তার মধ্যে স্পেন, ফ্রান্স, ইটালী এবং উত্তর আফ্রিকায় বিভিন্ন জাতীয় শিল্পীর আঁকা গুহাচিত্রাবলীর মধ্যে স্পেনের আল্‌তামিরার পশুচিত্র এবং ফ্রান্সের ডরডগনে এবং আলপেরার নরনারী চিত্রসমূহ প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশেও মির্জ্জাপুরের নিকট গিরিগুহামধ্যে এবং দাক্ষিণাত্যে তিনেভেল্লির সন্নিকটবর্ত্তী শৈলগাত্রে এবং আরও নানাস্থানে এধরণের প্রাগৈতিহাসিক চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বিস্মৃতির তিমির গর্ভে যে অতীত কবে তলিয়ে গেছে এই সব পাষাণময় গিরিগুহার বক্ষোলীন হয়ে সে যেন বহু সহস্রাব্দী ধরে প্রতীক্ষা করছিল, আজকের দিনে মানুষের আগমনে তার অভিশপ্ত পাতাল ভূমির ঘুমন্ত রাজপুরীতে নিদ্রালীন রাজপুত্র রাজকন্যারা সহসা যেন কোন সোনার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ জেগে উঠে আমাদের মনকে শ্রদ্ধায় এবং বিস্ময়ে ভরিয়ে তুলবে বলে। সূর্য্যালোকহীন অন্ধকারে চর্ব্বির প্রদীপ জ্বেলে, অত্যন্ত সাধাসিধে কয়েকটি মাত্র বর্ণসম্পাতে সেদিন তারা যে সব ছবি এঁকে গেছে তা থেকে আজকের দিনেও আমাদের অনেক কিছু শেখবার ছিল। ঐ ছবিগুলির মধ্যে আমরা সেদিনের নারীকে দেখতে পাই তার বিচিত্র পটভূমিকায়। জীবনযাত্রা তখন পূর্ব্বের চেয়ে সহজ হয়েছে, মানুষ সেদিন তাঁবুর ব্যবহার শিখেছে, তীরধনুকের ব্যবহার শিখেছে। পুরুষের নগ্নদেহে পশুশিকার সেদিনের অনেক ছবির বিষয়বস্তু হ'লেও নারীকে শিল্পী অনেক স্থলেই বসনভূষণে সুসজ্জিতা করে এঁকেছেন। এর পূর্ব্ববর্ত্তীযুগের খোদাই চিত্রে সর্ব্বত্র নারীকে বেঁটে এবং মোটা করে হাস্যজনক মূর্ত্তিতে দেখান হ'ত। এখানে তার দীর্ঘঋজু অবয়ব এবং সুসজ্জিত দেহ দেখে বোঝা যায় মানুষ ইতোমধ্যে সভ্যতার প্রথম স্তরে অধিরোহণ করেছে; নারী সৌন্দর্য্যের সম্ভবতঃ উন্নতি হয়েছে অথবা তা'র সম্বন্ধে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে, তা'কে উপহাস করবার বর্ব্বরতা এবং তার নগ্ন সৌন্দর্য্যকে খেলার পুতুল করবার কুৎসিত মনোবৃত্তি সে অতিক্রম করেছে। নারীকে সেদিনের সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ যে শ্রদ্ধা এবং সম্মান দেখিয়েছিল, যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় আজকের দিনের সভ্যতাভিমানী মানুষ তাদের বংশধর হয়েও তাদের সেই উন্নত মনের পরিচয় সর্ব্বত্র দিতে পারে নি। আর্টের নামে নারীসৌন্দর্য্যের লোভনীয় দিকটা শিল্পী এবং কবিদের মধ্যে অনেকে হাটে বাজারে পণ্য করে সমাজের অবনতির সাহায্য করেছেন এবং করছেন। এ রকমও সম্ভব যে, নারী তার পশুজীবনে লজ্জা পেয়ে যেদিন প্রথম আচ্ছাদনের ব্যবহার আরম্ভ করে, সেদিন পুরুষ তখনও তার সেই সভ্যতার অংশী হবার মনোবৃত্তি লাভ করেনি। আজও সকল দেশের আরণ্যকদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায়। সেদিনের গুহাচিত্রগুলিতে তারই ইতিহাস আমরা পাই।

ক্রমেই মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে চলল, নারীর প্ররোচনায় জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে পুরুষ শেষ পর্য্যন্ত সভ্য হল। বনে বনে ঘুরে পশু শিকার না করে নিজেদের বাসস্থানের কাছে পশুপালন করতে শিখল। একদিন যে আহার ছিল তা'র দৈবায়ত্ত, ক্রমে বুদ্ধি বলে এবং পৌরুষের

ফলে তা হ'ল তা'র নিজায়ত্ত। পশুশিকার ব্যতীত কৃষিকার্য্যও হল তাদের আহার্য্য সংগ্রহের অন্যতম উপায়। পর্ব্বত কন্দর ছেড়ে অরণ্যপ্রান্তে যখন প্রাচীন মানব তাদের অস্থায়ী আবাসের সন্নিকটে ফলশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে শিখেছিল তখন সভ্যতার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন এসেছিল বলা চলে। তখন শিকারের সন্ধানে অথবা পশুপালসহ যাযাবর বৃত্তির প্রয়োজন প্রায় শেষ হয়েছিল। ক্রমশঃ কৃষিক্ষেত্রের চারি পার্শ্বে তাকেই ভিত্তি করে গ্রাম এবং জনপদ গড়ে উঠল। এখনকার দিনের মত তখনকার দিনেও কৃষিকার্য্য এবং তদুৎপন্ন শস্যসম্ভার প্রধানতঃ নারীহস্তেই ন্যস্ত ছিল। সে সবের কাটা, ছাঁটা, ঝাড়া, বাছা এসবেই নরের চেয়ে নারীর দক্ষতা আজও আছে। অস্ত্রের আবিষ্কারে আত্মরক্ষার সুবিধা হওয়ার ফলে সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিঃশঙ্ক মনে কুটির এবং প্রাসাদপূর্ণ লোকালয় গড়ে তুলল। সকল দেশে একই সময়ে যে সভ্যতার উন্নতি আরম্ভ হয় নি সে কথা অনুমেয়। কালভেদে, রুচিভেদে, দেশভেদে অথবা সুযোগ সুবিধার অভাবে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ যুগপৎ সর্ব্বত্র একভাবে আরম্ভ হওয়া যে সম্ভব নয় তা বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ইতিহাসের ধারা জানতে হলে সব সময়ে প্রত্নতাত্বিকের কোদালি শাবলের প্রয়োজন হয় না। আজকের দিনেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবনযাত্রার ধারা পৃথিবীতেই জীবিত জাতিদের মধ্যে খুঁজলেপরেই অপরিবর্ত্তিত রূপে দেখতে পাওয়া যায়। সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে আজও আমরা যেসকল শিকারী মানুষ, পশুপালক যাযাবর জাতিসমূহ এবং কৃষিজীবি মানব জাতিকে দেখতে পাই, তারা সকলে আজও নিজেদের মধ্যে জীবনযাত্রার পূর্ব্বধারা অব্যাহত রেখে চলছে। বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাপ্তেন কুক কর্ত্তৃক আবিষ্কারকালে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এবং বঙ্গোপসাগরবক্ষস্থ আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরাও প্রস্তরযুগের সভ্যতাতেই বাস করছিল। মধ্যভারতে ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা এবং দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বত অরণ্য সমাচ্ছন্ন প্রদেশে আজও কত বিভিন্ন জাতীয়মানবসভ্যতা কত বিভিন্ন স্তরে রয়েছে, সে কথা নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের অজানা নয়।

নর যখন পাথরের অস্ত্রকে তার পশুবধ ও শত্রু সংহারের পক্ষে চরম মনে করে পরিতৃপ্ত না থেকে ধাতু আবিষ্কার এবং তদ্দ্বারা অস্ত্র গঠন করলে, নারীও তখন তার গৃহস্থালীর জন্য বাসনকোসন, পিতল, কাঁসা, তামার থালাবাটি, হাঁড়ি, হাতা গড়িয়ে ভাল করে সংসার পেতে বস'ল। অশন, বসন, অলঙ্কার ক্রমেই সুন্দরতর, ক্রমেই উন্নততর হ'তে লাগল। মাটির ঘর এবং খড়ের চাল ক্রমে পাষাণ প্রাসাদে পৌঁছাল। চাকা ঘোরাতে শিখে এবং দেবোপাসনার নানা পদ্ধতি শিখে মানুষ একদিকে চরখায় সুতো কেটে কাপড়, চাকে হাঁড়িকুড়ি গড়ে সস্তার বাসন প্রভৃতি তৈরি করলে, অপরদিকে নারীও বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশে দেবারাধনাকে কেন্দ্র করে তার সমাজজীবনকে গড়ে তুললে। বিশ্বের অলৌকিক অতীন্দ্রিয় শক্তিকে নারী অথবা পুরুষ কে আগে পূজানিবেদন করেছিল বলা যায়না। সকল প্রাগৈতিহাসিক সমাজে নারী এবং পুরুষকে সমভাবে ধর্ম্মসাধনায় নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। মিশর, ব্যাবিলন, ভারতবর্ষ এবং চীন এই চারটী সুপ্রাচীন দেশের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতায় এক বিষয়ে যথেষ্ট মিল দেখা যায়;—পরলোক এবং দৈবশক্তিতে বিশ্বাস এই সব সমাজে অন্ধবিশ্বাস প্রবল ছিল এবং সর্ব্বত্রই পৌরোহিত্যের কাজে নারী এবং পুরুষের প্রথম দিকে প্রায় সমান মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছিল। এই বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে ভারতের আর্য্যসভ্যতা ছিল মনোধর্ম্মী ও আরণ্যাভিমুখী এবং মিশর, ব্যাবিলন এবং দ্রবিড় জাতির সভ্যতা ছিল প্রাণধর্ম্মী ও নগরাভিমুখী। নাগরিক সভ্যতার দেশগুলিতে মন্দির এবং দেবালয়কে কেন্দ্র করে নগর গড়ে উঠেছিল; সেখানে পুরোহিত অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির স্থান ছিল মান্যে শক্তিতে এবং ঐশ্বর্য্যে সবার উপরে। অপর পক্ষে আরণ্যক এবং যাযাবর সভ্যতার দেশে পুরোহিত সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হলেও রাজশক্তি ক্ষত্রিয়দের এবং ধনশক্তি বৈশ্যদের করতলগত ছিল। সমাজ জীবনে জনসাধারণ একজন মাত্র নেতার প্রয়োজন বোধ করে নি। বিভিন্ন দল নিজ নিজ পশুপাল নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে জীবন কাটাত, দৈবাৎ কখন কখন সেইরূপ কয়েকটি দল একজন রণকুশল নেতার অধীনে সম্মিলিত হয়ে নগরসভ্যতার দেশগুলিকে ছারখার করে দিয়েছে, তা'ও ঘটতে দেখা গেছে। সমাজ জীবনের চেয়ে দলগত এবং পরিবারগত জীবনই আজ পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে প্রবল। পুরোহিত সম্প্রদায় কোথাও শুধু দেবতার প্রতিনিধিরূপে, কোথাও জননেতারূপে এবং রাজপদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগে অনেক ক্ষেত্রে আধিপত্য করেছেন, তার প্রমাণ দেখা যায়। দেশভেদে এই পুরোহিতশাসন কোথাও কল্যাণকর, কোথাও বা অকল্যাণকর হয়েছিল। কোথাও শক্তি-লোভী এবং অর্থগৃধ্নু পুরোহিত—তা কি পুরুষ, কি নারী—নিজের স্বার্থের জন্য বৃহত্তর জনস্বার্থ বলি দিতেন,—যেমনতর হয়েছিল মিশরে এবং ব্যাবিলনে। সমাজের যত কিছু জ্ঞান, সব কিছু বুদ্ধি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল পুরোহিতদের হাতে, তাই জনসাধারণ তাঁদের আদেশ লঙ্ঘন করতে সাহস করত না। অপরদিকে ভারতবর্ষে যেখানে পুরোহিত ছিলেন নিঃস্বার্থ কুটিরবাসী সংসারসুখবিতৃষ্ণ ব্রাহ্মণ সেখানে তাঁরা রাজার স্বৈরাচারকে বাধা দিয়ে প্রজারক্ষায় সহায়তা করেছেন। প্রথমে সকল দেশেই পুরোহিতের কাজ ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা এবং যোগ্যতার উপর নির্ভর করত; পরে তা' দলগত এবং বংশগত হয়ে পড়ায় সমাজের অপরাপর অংশে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। তার ফলে কোথাও সমাজের সাধারণ জীবনযাত্রা ক্রমে পুরোহিত এবং বর্ণশাসন উপেক্ষা করে সম্পূর্ণরূপে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিমুখী হ'ল; কোথাও বা পুরোহিতের নামমাত্র প্রাধান্য এবং সমাজে প্রচুর সম্মান থাকলেও কাঞ্চনকৌলিন্যই সমাজের আদর্শ হয়ে দাঁড়াল। এই সব বিরোধ সংঘাত এবং বিবর্ত্তনের মধ্যে নারীর স্থান বিশেষভাবে পৃথক করে দেখা যায় না। ভালোয় মন্দয়, প্রভুত্বে বিদ্রোহে সর্ব্বত্রই সে ছিল পুরুষের সহচারিণী এবং

সহধর্ম্মিনী। তার ইতিহাস ভালো করে আলোচনা করার, তার সমাজগত ও পরিবারগত জীবন এবং চরিত্রকে কয়েকটা পৃথক গণ্ডীতে ফেলে প্রত্যেকটা দিক দেখা সহজ হবে মনে করি। সুতরাং সেইভাবেই নারীর এক একটা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। সমাজগত জীবনে নারীকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন দিক থেকে দেখা চলতে পারে, যেমন:—(১) সাহিত্যিকা ও সুপণ্ডিতা (২) ধর্ম্মপ্রাণা (৩) রণকুশলা (৪) রূপশিল্পী (৫) অভিনেত্রী এবং নৃত্যগীত পটীয়সী (৬) প্রণয়িনী (৭) রাজ্যেশ্বরী (৮) ভূষণপ্রিয়া (৯) কল্যাণী ও অকল্যাণী (১০) ক্রীড়া এবং ব্যায়াম নিপুণা ও (১১) বৈজ্ঞানিকা। পারিবারিক জীবনে নারীকে এই কটি দিক দিয়ে দেখান চলবে। যেমন:—(১) মাতা, (২) পত্নী, (৩) ভগ্নী (৪) কন্যা (৫) বিমাতা (৬) দাসী (৭) সপত্নী।



কাঁচা আমের পায়স

প্রথমে আমের খোসাগুলি ছাড়িয়ে সরু করে কেটে নিতে হবে তারপর অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক নুন মাখিয়ে রাখতে হবে। তারপর সময়মত সেগুলি খুব ভালো ভাবে ধুয়ে পরিষ্কার-করা শিলে কিছুটা ছেঁচে নিতে হবে। এদিকে উনুনে হাড়ি বা কড়া চাপিয়ে ঐ আম ঘিয়ে ভেজে রেখে দিতে হবে। পাকপাত্রে ঘি না থাকলে আরও খানিকটে ঘি দিয়ে এলাচের দানা ফেলে দিন আর ভাজা ভাজা হয়ে এলে পরিমাণ মত দুধ অর্থাৎ দু'সের চারসের যাহোক ঢেলে দিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন। দুধ যখন প্রায় এক চতুর্থাংশ হয়ে আসবে তখন ঐ আম ও অন্যান্য উপকরণ যেমন কিসমিস, পেস্তা বাদাম প্রভৃতি দিয়ে জ্বাল দিতে হবে। দুধ বেশ ঘন হয়ে এলে তারপর নামিয়ে ফেলতে হবে। এই পায়সে চিনি একটু বেশী দেওয়া দরকার নতুবা অম্ল মধুর হবে না। কাঁচা আমের পায়স খেতে খুব মুখরোচক।

আমের পোলাও

আমের 'পোলাও' খুব রসনা তৃপ্তিকর। সুপক্ক মিষ্ট রসালো আমগুলি নিংড়ে রস বের করে নিয়ে একখানা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছেঁকে নিতে হবে। নেংড়া প্রভৃতি আম হোলে খুব ভালো হয়। রস ওজন করে এক-সেরে পরিণত করতে হবে। এরপর আতপ চাউল উত্তম-রূপে ঝেড়ে বেছে ধুইয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। হাঁড়িতে আন্দাজ ছটাক তিনেক ঘি বেশ করে পাকিয়ে কিসমিস-গুলো আধা ভাজা করে রেখে দিন, তারপর ঐ পাকা ঘিয়ে গরমমসলা আর কাঁচা লঙ্কা কিছুটা ভেজে নিন, তারপর চাউলগুলো ছেড়ে দিয়ে খানিকটে করে আদার রস দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। চাউল ফুটতে আরম্ভ করলে একটু একটু করে দুধ দিয়ে নাড়তে থাকুন। এইভাবে দুধটা খাইয়ে হাঁড়ির মুখ এঁটে খুব মৃদু জ্বাল দিন। তারপর যখন চাউল সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমের রস আর চিনি ঢেলে দিয়ে আবার মুখ বন্ধ করে দিন ও দমে চড়িয়ে দিন। যেম্নি জলটা মরে আসবে অম্নি কিসমিস ও বাকী ঘিটুকু ঢেলে দিয়ে কয়েকবার নাড়াচাড়া করে মুখ বাঁধা অবস্থায় নামিয়ে রাখুন। আন্দাজ বিশ মিনিট রেখে দিন, তারপর আবার ঢাকনা খুলে জায়ফলের গুঁড়ো ও কর্পূর দিয়ে নাড়াচাড়া করে আবার ঢেকে রেখে দিন। বেশ কিছুক্ষণ এম্নিভাবে রাখার পর খেয়ে দেখুন কি সুন্দর আমের পোলাও। খেয়ে ও খাইয়ে ভারি তৃপ্তি পাবেন।

একসের চাল আর একসের আমের রসের পোলাও তৈরী করতে লাগবে খাঁটি গরুর দুধ দুসের, আধ সের ভালো ঘি, আধপোয়া ভালো দানাদার চিনি, বারো আনার গরম মসলা, আধপোয়া কিসমিস, একছটাক আদার রস, একটি ধানের পরিমাণ কর্পূর আর আটআনার জায়ফল গুঁড়ো।

—শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

লীলাভূমি



হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

সহরের স্নায়ুতে আবার জেগেছে নতুন চঞ্চলতা। কলা-লক্ষ্মীর মন্দিরে দু-বছর আগে হয়েছিল গন্ধর্বলোকের ঘোষযাত্রা। মহানগরীতে এসেছিল অপ্সরা আনা-প্লাবলোভা। কিন্নরী পাবলোভার নৈবেদ্যের থালা থেকে এখনো প্রসাদ বিতরণের জের মেটেনি। রূপপিয়াসীদের স্তুতি-কীর্তন বহির্দ্বার থেকে প্রবেশ করেছে বিশ্রাম মহলের গুঞ্জন কক্ষে। মরাল নৃত্যের অলৌকিক স্পর্শ নায়িকাদের কটিতটে এখনও থেকে থেকে ঢেউ তোলে কাকলিমুখর বনহংসীর: শাদা ভয়েল শাড়ীর ক্রীজে আর লীলায়িত ভঙ্গিমার গতিছন্দে। হঠাৎ পুবালি বাতাসের নতুন ঝড় এলো থানকোমণির আবির্ভাবে। নৃত্যপটিয়সী থানকোমণি এলো ওদের মনের দুয়ারে মানস সরোবরের লীলাকমল হাতে।

থানকোমণির পায়ের বুড়ো আঙুল নাকি ইন্‌সিওর করা আছে একলক্ষ ডলারে। খবরটা প্রথম এসে পৌছল শিপ্রার কানে।

শিপ্রা ভাবে। ভাবে, কেন সে পারে না অমনি নাচের ছন্দে ঢেউ তুলে পিয়াসী অনুরক্তদের উজান স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে!…পায়ের বুড়ো আঙুলটা কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। চেয়ারটায় পিঠের চাপ দিয়ে রুখ করবার চেষ্টা করে। বুড়ো আঙুলটা কাঁপিয়ে বারবার নিষ্ফল আঘাত করে পায়ের তলায় কার্পেট-বিছানো মেঝেয়। মনের সবটুকু ব্যর্থতা যেন আছাড় খেয়ে পড়ে পরাজয়ের গ্লানিতে।

আনা পাবলোভা!…পাবলোভা পেয়েছে জীবনজোড়া সার্থকতার জয়মাল্য—লরেল!

আর এলাহিজান! একুশ বছরের বাঈজী তার শান-দেওয়া যৌবনের খড়্গাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে স্বাধীন নরপতির রত্ন-সিংহাসন। সর্বাঙ্গে ঢেউ-তোলা অলৌকিক নৃত্যভঙ্গিমায় তার কাঁচা যৌবন জ্বলে উঠেছে রাতের অন্ধকারে ফস্‌ফরাস-ঢালা উপসাগরের মত। 'মাওলা-কেরিম ডুবে মরেছে সেই সাগরে ঝাঁপ দিয়ে। ধনকুবের সদাগর পতঙ্গের মত মরেছে রূপের আগুনে। নরপতি সিংহাসনচ্যুত হয়েছে বিদেশী শাসকের অনুজ্ঞায়। দ্বীপান্তর না হলেও নির্বাসন হয়েছে। শক্তিশালী ইংরেজ কৌশলে মিত্ররাজকে বন্দী করেছে স্বর্গরাজ্যে: বিলাসপুরী ওয়েস্ট উডে—পাম ভিলায়।

তন্বী রাজনটী এলাহিজান প্রাসাদ ছেড়ে এগিয়ে এসেছে জনসমুদ্রে-তার রূপের পানসী বেয়ে।

ইম্‌প্রেসারিও শরৎ ঘোষ আর মিসেস্ ফেয়ারব্যাঙ্ক সেই রজনীগন্ধার গুচ্ছ তুলে ধরেছে লোকচক্ষে: কোরিন্থিয়ান স্টেজে আবার সেই এলাহিজানের অঙ্গে অঙ্গে ঢেউ উঠেছে মুখর নৃত্যের বিলোল বিলাসে।…পান্না অধিকারী গোপনে দশহাজার টাকার নোটের গোছা গুঁজে দিয়ে এসেছে এলাহিজানের হাতে, তার বিরাম কক্ষের নিভৃত মুহূর্তে।

শিপ্রা শত চেষ্টাতেও সেদিন জয়ন্তকে রাজী করতে পারেনি।…পারভার্সান তার নাই। নাচ সে ভালোবাসে। তীক্ষ্ণ রসবোধ তার আছে। চুল-চেরা বিচার করতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৃত্যকলার। তবু সে রাজী হয়নি।

টাকা! শিপ্রা তো কিনেই এনেছিল দুখানা টিকিট। টিকিট দু'খানা ওর টেবিলের ওপর রেখে বলেছিল—ঘণ্টা দুই বৈ তো নয়। তারপর আধঘণ্টা বসবো গিয়ে কার্জন পার্কে বা ইডেনের দক্ষিণে ফাঁকা মাঠটায়।

জয়ন্ত উত্তর দেয়নি। নিতান্ত করুণার সঙ্গে মৃদু একটু হেসে চোখদুটো নামিয়ে নিয়েছিল বইএর পাতায়। নিবিষ্ট মনে পাতা উল্টে উল্টে কি যেন খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছিল।

শিপ্রা থামে নি। আবার বলেছিল—যাবেন না? একটা ইভনিং বৈ তো নয়!

জয়ন্ত শুনেও শোনে নি। তার নীরব উপেক্ষা শান্টিং এঞ্জিনের মত পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল।

শিপ্রা অধৈর্য হয়ে উঠেছিল: ভয় করে বুঝি? পাছে সুনাম নষ্ট হয়।

জয়ন্ত সে-কথার উত্তর দেয় নি। লম্বা ঘাড়টা কেমন একটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল—অপচয় করবার মত সময় আমার নাই।

ভালো: শিপ্রা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আর তিলার্ধও অপেক্ষা করে নি। টিকিট দুখানা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে দিয়ে জয়ন্তর মেস থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল।

নিঃশব্দ অন্যমনস্কতায় দীর্ঘক্ষণ কেটে গেল। পর্দার আড়াল থেকে বয় দুবার উঁকি দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিপ্রার নজরে পড়েনি। খেয়ালও ছিল না তার। অজিত বারবার মুখপানে চেয়েছে আর কাঁটা-চামচে নিয়ে নাড়া-চাড়া করেছে। কিছুক্ষণ আগেও সে অনর্গল কথা বলেছে। কিন্তু হঠাৎ পুরানো কথার ভিড়ে নতুন কথা-গুলো যে কখন হারিয়ে গিয়েছিল শিপ্রা তা বুঝতেও পারেনি।

সংবিৎ ফিরে এলো অজিতের কথায়: ছ'টা যে বেজে গেল!

আ'-অ্যাম স্যরি, আজিৎ!

নিজেকে সজাগ করে নিয়ে শিপ্রা সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলে—খাবে না আর কিছু?

না: একটু থেমে অজিৎ কথাটার বাঁক ফিরিয়ে বলে বালকৃষ্ণণ ভেজিটেরিয়ান। ফিশ-মিট কিছুই খায় না। তবু সুন্দর স্বাস্থ্য। ফার্স্ট ক্লাস টেনিস প্লেয়ার।

জানি: শিপ্রা হাসে। খিলখিল করে হেসে তির্যক দৃষ্টিতে অজিতের মুখপানে চায়।···জেলাসি? হেল্‌থি সাইন!···মনের সঙ্গে কানাকানি ক'রে চোখ দুটো তুলে ধরে অজিতের ঠোঁটের কাছে।

পেয়ালার কিনারায় লঘু হাতে চামচের টুন্‌টুন শব্দ করে বয়কে সংকেত জানিয়ে শাড়ির আঁচলটা পিঠের ওপর টেনে নেয়।

মনটা ওর হঠাৎ কেমন খুসীতে ভরে ওঠে। অজিতের ইচ্ছার অপেক্ষা না রেখে বলে—দুটো আইস্‌বিয়ার।

মিকাডো থেকে বেরিয়ে ওরা যখন চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে দাঁড়ালো তখন সাড়ে ছ'টা। শ্বাসরুদ্ধ রাজপথ যেন একটুখানি হাঁপ ছেড়েছে। মহানগরীর শ্রান্ত চোখে ধীরে ধীরে লাগে কেমন একটা গোলাপী নেশার রঙ। গুঞ্জন-মুখর তরুণ-তরুণী ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে চলে রেড রোড ছাড়িয়ে কেল্লার ময়দানের পথে। চলার গতিছন্দে মনের ভাষা যেন লুটোপুটি করে উদগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। রাস্তা পার হতে গিয়ে অকারণ ওরা গায়েগায়ে ঘনিয়ে দাঁড়ায়। আই-ল্যাণ্ডের বাঁক ফিরে চলমান ট্যাক্সিগুলো হর্ণ দিয়ে মাঠের পথ ধরে। হেড লাইটের ঝলকে ঝকমক করে ওঠে কিয়োস্কের গায়ে সিনেমা-বিজ্ঞাপনের লাল হরফগুলো—সিম্‌শম এণ্ড ডেলাইলা!

অজিতের মুখপানে চেয়ে শিপ্রা আবার হাসে।··· রাস্তার ওপারে ফিটন গাড়ীর কোচম্যানটা মাথার ওপর চাবুক ঘুরিয়ে বারবার পিছন ফিরে চায়: প্রত্যাশা-ভরা সতৃষ্ণ দৃষ্টি যেন নীরবে এক টুকরো রুটির জন্যে হাত পাতে রাতের পৃথিবীর স্বপনপিয়াসী নর-নারীর কাছে।

যাবে একবার নিউ আলিপুর?··· রেখাদির ওখানে।

না।···মন চাইলেও সংকোচ বাধা দেয়। সুরেখার বাড়ীতে অযাচিত আতিথ্য গ্রহণ করতে অজিতের বাধে। শুধু মুখ চেনা। আলাপের সুযোগ তার হয়নি কোনদিন। যে দুদিন দেখা হয়েছে চৌরঙ্গী টেরাসের ক্লাব ঘরে, অজিত শুধু চেয়েই থেকেছে। অসামান্যা নায়িকার মরাল গতিতে কুইন ক্রিশ্চানিয়ার মত সুরেখা তার ঋগ্বেদী ভঙ্গিমায় সরে গিয়েছে এ-পাশ থেকে ও-পাশে, এঘর থেকে ওঘরে। একদিন সঙ্গে ছিল চোপরা, আর একদিন ছিলেন মিস্টার খাণ্ডেলওয়াল।

হাতে মৃদু একটা চাপ দিয়ে শিপ্রা কানের কাছে মুখখানা এনে বলে—এত শাই তুমি ?

অজিত উত্তর দেয় না। কি উত্তর দেবে, ভেবে পায় না।

ওয়েক আপ! বন্ধু, ওয়েক আপ!…অত ইতস্তত কেন? পুরুষ হবে সিংহের মত। জালের ভয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গন্ধ-গোকুল; উদ্‌বেড়ালের উচ্ছিষ্ট মুখে ক'রে হৃষ্টচিত্তে গাছের ডালে বসে লেজ নাড়ে, শিকার দেখে ঝাঁপিয়ে পড়বার সাহস নেই।…মুখের ওপর চোখ দুটো বুলিয়ে নিয়ে শিপ্রা মুহূর্তকাল চেয়ে থাকে অজিতের চওড়া বুকখানার দিকে।

অজিত ওর কথার তাৎপর্য ঠিক বোঝে না। তবে শিপ্রা যে ওর ভীরুতাকে ইঙ্গিত করেই বলে গেল এতগুলো কথা, সেটুকু অনুমান ক'রে নিতে দেরী লাগে না। একটু ইতস্তত করে বলে—আজ নয়। যাবো একদিন আপনার সঙ্গে মিসেস্ খাণ্ডেলওয়ালের সঙ্গে আলাপ করতে।

ছাট'স্ ইট। চলো, তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাই তোমাদের হোস্টেলের সামনে: শিপ্রা চঞ্চলপদে এগিয়ে যায়।

কিংস্‌ওয়ের কাছাকাছি এসে একখানা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামিয়ে একরকম জোর করেই অজিতকে টেনে তোলে। অজিত বাধা দেয় না।

পাশাপাশি ঘন হয়ে ব'সে শিপ্রা ঘাড় বাঁকিয়ে চূর্ণ চলগুলোয় হাওয়া ধরিয়ে দেয়। গাড়ী মোড় ফিরে রেড রোড ধরে। হালকা চুলগুলো বারবার উড়ে পড়ে অজিতের চোখেমুখে।

আজিৎ! বালকৃষ্ণণ ইজ এ ভেজিটেরিয়ান। বাট ইউ আর নট।…তুমি মাংসাশী, না?

সাড়া দেবার শক্তিটুকুও যেন অজিত হারিয়ে ফেলে। ওর স্নায়ুগুলো বুঝি এ-সি কারেন্টের বৈদ্যুতিক তরঙ্গে হঠাৎ কেমন জড়িয়ে আসে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে।

অজিতকে যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে শিপ্রা যখন নিউ আলিপুরে সুরেখার বাড়ীতে এসে পৌঁছলো তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে সাতটা।

সলিটারী হুক। সত্যি সলিটারী! নিস্তব্ধ শান্ত পরিবেশে ছবির মত সুন্দর সুরেখার ছোট বাড়ীখানি। তার চেয়েও সুন্দর সুরেখা নিজে। যেন জমাট-বাঁধা চার্ম!

ট্যাক্সিখানা ছেড়ে দিয়ে শিপ্রা ফটক-টা পার হয়ে কানপেতে অনুভব করবার চেষ্টা করে সুরেখার অন্দর মহলের হৃৎস্পন্দন।…চোপরা, মিষ্টার ওয়ালেস, তার স্ত্রী, ক্লিটন। আরও যেন কে একজন এয়ে জমেছে সুরেখার সান্ধ্য চায়ের আসরে!

চা শেষ হয়েছে, কিন্তু আলাপ শেষ হয় নি। মাঝে মাঝে সুরেখা হাসির ফিনকি ছড়িয়ে আলাপের সুর বেঁধে দেয় সপ্তমে।

ওপাশের চেয়ারখানা থেকে প্রতিধ্বনি ওঠে সুরেখার সেই উচ্ছ্বসিত হাসির; ইংরেজ মহিলার সাধনালব্ধ মাপ-করা মানান-সই ফিন্‌ফিনে হাসি! হয়তো মিসেস্ ওয়ালেস সম্বর্ধিত করে সুরেখার হাসির ফোয়ারাকে প্রতিহাসিতে অনুরণিত ক'রে।

ইউ আর রিয়ালি ভেরি লাকি মিষ্টার চোপরা, টু হ্যাব সাচ এ গুড ফ্রেণ্ড!…মিষ্টার ওয়ালেস তারিফ করে, তারিফ করে সুরেখার আতিথেয়তার, তার পর্যাপ্ত মাধুর্যের। …সেদিনের সেই উর্বশী নৃত্য যেন ওর মগজের ভাঁজে ভাঁজে দাগ কেটেছে।

ক্লিটন স্বল্পভাষী লোক, তাই বেশী কথা বলে না। মাঝে মাঝে যোগ দেয় ওদের আলোচনায়।

শিপ্রা আর অপেক্ষা করে না। ক্ষিপ্রপদে গিয়ে উপস্থিত হয় ওদের চায়ের মজলিসে: এক্সকিউজ মি। গুড ইভনিং লেডিজ এণ্ড জেণ্টল্‌মেন!…

রেখাদি!

এসো শিপারিণ!…শি'জ মাই ফ্রেণ্ড মিস শিপ্রা ডাট…সুরেখা ইনট্রোডিউস করে শিপ্রাকে মিষ্টার আর মিসেস্ ওয়ালেস ও ক্লিটনের কাছে।

শিপ্রার স্মার্টনেস মুহূর্তে আকর্ষণ করে মিস্টার ক্লিটনের দৃষ্টি। মিসেস্ ওয়ালেস করমর্দনের উদ্দেশ্যে হাতখানা বাড়িয়ে দেন: গুড ইভনিং মিস্ শিপারিণ!

সুরেখা বয়কে ডেকে চা আনতে বলবার আগেই শিপ্রা বাধা দিয়ে বলে—চায়ের পিপাসা নেই রেখাদি। ছুটে এলাম একটা প্রপোজাল নিয়ে। সবুর সওয়া গেল না।

শুনেছ তো? থানকোমণি এসেছে কলকাতায়। প্রাচ্য নৃত্যের অপরূপ লীলাপটিয়সী থানকোমণির কুরঙ্গ নৃত্য হবে আই টি এফ পাভিলিয়ানে—শনি ও রবিবার সন্ধ্যায়। যাবে না তোমরা?...অপূর্ব ডান্স! হার মানিয়েছে আনা পাবলোভাকে। কোথায় লাগে ছউ নৃত্য, আর দক্ষিণী কথাকলি।

ডান্স! ওরিয়েণ্টাল?...মিস্টার ওয়ালেস আর ক্লিটন জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। মিসেস্ ওয়ালেসের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয় উৎসাহে।

ঠাণ্ডা হাসির সঙ্গে সুরেখা বলে—কিন্তু প্রপোজালটা কি শুনি?...টিকেট!

ছাঁৎ ক'রে হঠাৎ পরাভবের আঁচ লাগে শিপ্রার আভিজাত্যে। মুহূর্তে নিজেকে সংবৃত করে নিয়ে বলে—মিসেস্ ফেয়ারব্যাঙ্কের কাছে টিকেট আমার অলরেডি বুক করা হয়ে গেছে। ইচ্ছে থাকলে তোমরাও এখনি বুক করে ফেল। নইলে, ভালো সীট পাওয়া যাবে না।...যাক, সে কথা বলতে আসিনি এই সাঁঝের পাহাড় ডিঙিয়ে। রাতের অন্ধকারে তোমাদের এ পাড়ায় আসা মানেই তো দুর্গম গিরি লঙ্ঘন করে উপত্যকায় পৌছনো। যে কোন সময় হিংস্র জন্তুর মুখে পড়া বিচিত্র নয়। নির্জন পুরীর পথে সব সময়ই গা ছমছম করে। মেন আর মোর ডেঞ্জারাস দ্যান লেপার্ডস্।

একজ্যাক্টলি!...মিসেস্ ওয়ালেস হেসে উঠলেন।

সুরেখা কচ কেটে বললে—যাক, তোমার আসল বক্তব্যটা কি, তাই তো শোনা হলো না।

শিপ্রা হেসে ওঠে। খিলখিল করে হেসে বলে—মিস্টার থাণ্ডেলওয়ালকে দেখছি না যে! কথাটা তাঁর সামনে বলতে পারলেই ভালো হতো। তিনি বেশ কিছুটা আনন্দ পেতেন।...অবশ্য মিস্টার চোপরা আছেন উপস্থিত। হি উইল বি মোর ইন্টারেস্টেড। তাঁর আগ্রহই বেশী হবার কথা।...থানকোমণির টো ইনসিওর করা আছে একলক্ষ ডলারে। আমি বলছিলাম, তোমার চোখ দুটো ইনসিওর করা উচিত দশলক্ষ পাউণ্ডে। কুবেরও পুড়ে ছাই হতে পারে যে-চোখের ইঙ্গিতে, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন থাকা উচিত নয়।

সুরেখা যেন ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো: তোমার কি আশঙ্কা করবার কারণ ঘটেছে কিছু, চোখের মাথা খেতে পারি বলে?

বালাই, সে আশঙ্কা করতে যাবো কেন! চোখ তোমার চির-ভাস্বর হোক।...দিগ্বিজয়ের পাশুপাত অস্ত্র। অব্যর্থ সন্ধান!...বন্ধু হয়ে পারি কি তার অমঙ্গল কামনা করতে?

তবে?

ডিগনিটি বাড়তো। থানকোমণির চেয়ে কিসে তুমি কম? রাত্রিদিন মধুপগুঞ্জন তোমার মাধবীকুঞ্জে।...গুড নাইট মিসেস্ ওয়ালেস! জেন্টল্‌মেন!

যেমন আচম্বিতে এসে হাজির হয়েছিল—তেমনি ঝড়ের মত শিপ্রা বেরিয়ে গেল সুরেখার বাড়ী থেকে।

ওরা বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। চোপরা তখনও তন্ময় হয়েছিল হয়তো সুরেখার চোখ দুটোর দিকে চেয়ে। অদ্ভুত স্বপ্ন-ভরা চোখ! কল্পলোকের উর্বশী ভেঙে দিয়েছিল পুরুরবার স্বপ্ন। রাজছত্র লুটিয়ে পড়েছিল পথের ধূলোয়।...ভাগ্যবান থাণ্ডেলওয়াল।

শনিবার সন্ধ্যায় ভিড় জমলো আই টি এফ পাভিলিয়ানে। ময়দানের পথে নানা মডেলের গাড়ীর ভিড়। বাতাস ঝাল হয়ে উঠলো পেট্রোলের কটু গন্ধের সঙ্গে সিগারেটের পর্য্যাপ্ত ধোঁয়া মিশে।

শিপ্রা আজ ইচ্ছা করেই সঙ্গে এনেছে অজিত আর বালকৃষ্ণণ দুজনকেই। বালকৃষ্ণণ ভেজিটেরিয়ান, আর অজিত ঠিক তার উল্টো। শুধু উল্টো তাই নয়, সে ড্রিঙ্ক করে। শিপ্রার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে এখন তার চোখের পাতা নেমে আসে না। কিন্তু বালকৃষ্ণণ মাঝে মাঝে লাল হয়ে ওঠে ওর দৃষ্টির আঘাতে।...কনট্রাস্ট শিপ্রা ভালোবাসে। তাই লাগামটা একটু ঢিল দিয়ে যখন জীবনে সে রেস-হর্সের স্পীড নিতে চায়, বিপরীত-মুখা শক্তিকে পাশাপাশি পাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। একটী মুহূর্তকেও সে শিথিল হতে দেয় না।

পাভিলিয়ানের দিকে পাশাপাশি এগিয়ে যেতে যেতে শিপ্রা বলে—অজিৎ, পারো তুমি পাইলট হয়ে প্লেন ক্রাশ ক'রে রকের ওপর ছিটকে পড়তে?

অজিত একটু থেমে বলে—পারি। যদি ক্লাই জিনে নার্ভগুলো স্ট্রং করে নেওয়া হয়।

হাট'স কাওয়ার্ডিস্।··· কৃষ্ণণ! তুমি পারো না, তুমি?

বালকৃষ্ণণ হাসে। মিষ্টি একটু হাসির সঙ্গে বলে: এয়ার মার্শাল হওয়ার ইচ্ছাই ছিল আমার। তাই এভিয়েশান এঞ্জিনিয়ারিং-এ যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাবা রাজী হয় নি।

এ ডোসাইল বয়। আজ্ঞাবহ শান্ত বালক!···তাই তো বাপ-মা নাম রেখেছেন বালকৃষ্ণণ। যৌবনের কৃষ্ণ ছিল উদ্দাম—উচ্ছৃঙ্খল। বাপ-মা পারেনি তাকে ঘরের কোণে বেঁধে রাখতে। মধুবন তোলপাড় করেছে একা মাধব। তখন আর চুপিচুপি ননী চুরি করে তার মন ভরেনি, মন চুরি করেছে—ডাকাতি করেছে সারা বৃন্দাবনে।

সলজ্জ হাসির সঙ্গে বালকৃষ্ণণ চোখ দুটো নামিয়ে নেয়। অজিত বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে বারবার চায় শিপ্রার মুখপানে। শিপ্রা মুখ টিপে হাসি চুরি করে।

চেনা অচেনা দর্শকে প্রেক্ষাগৃহ ভরে গেল। অনশন ক্লিষ্ট মুমূর্ষু মানুষের পান্থশালায় জীবনের রঙমহলে ওদের পানপাত্র ফেনিল হয়ে উঠেছে। মধুপিয়াসী ভ্রমরদের গুঞ্জনে প্রেক্ষাগারের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যেন রম রম করে। থেকে থেকে হালকা হাসির রিপ্‌ল ওঠে ছোট ছোট আলাপনের ঘূর্ণি স্রোতে।

চোখোচোখি হয়। এ-পাশ থেকে ওপাশে চেনা মহলের নীরব বাক্য বিনিময়। এককোণে গায়ে গা দিয়ে ব'সে কপোত-কপোতীর মত বকম বকম করে লীনা আর বিভোর সেন।···সেদিন কবি-মেলায় বিভোর সেন পেয়েছে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান। তেরোটি মাত্র কবিতা তার ছেপে বেরিয়েছে তিনখানা সাময়িক পত্রে। তাতেই ফুটে উঠেছে তার অসামান্য কবিপ্রতিভা; অনবদ্য শক্তির পরিচয়। পৃষ্ঠ-পোষকেরা উদাত্ত কণ্ঠে চাপা দিয়েছে আর সকলের নীরব অনুভূতিকে।···কবি তো নয়, নতুন যুগের এটমিক ফোর্স!···মুখর হয়ে উঠেছে পর্দাঝুলানো চায়ের দোকানগুলো। বিভোরের জয়গৌরবে নেশার আমেজ জমে উঠেছে লীনার মনে। হয় তো আশঙ্কাও গেছে বেড়ে।

মিস্ শিপারিণ! সেদিন যে এলাহিজালের ডান্সের কথা বলেছিলেন, তার বেলাতেও কি এমনি রাশ্ হয়েছিল অডিটরিয়মে? ··বালকৃষ্ণণ জিজ্ঞেস করে।

নিশ্চয়ই। এলাহিজান তো নয়, বসরাই গোলাপ নূরজাহান! নেটিভ স্টেটের কোর্ট ডান্সার। যার জন্যে বম্বের ধনকুবের মাওলা কেরিমের জীবন গেল। রাজা হলো সিংহাসনচ্যুত।

বালকৃষ্ণণের মুখপানে চেয়ে শিপ্রা হাতখানা অজিতের বাহুর ওপর এলিয়ে দেয়।

ফ্রণ্ট রো'তে পঞ্চাশ টাকার সীটে এসে বসলো সুরেখা, ওয়ালেস দম্পতি, ক্লিটন, খাণ্ডেলওয়াল আর চোপরা।

সুরেখার চোখে চোখ পড়বার আগেই প্রেক্ষাগৃহের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এলো।···পর্দার অন্তরালে উদ্বোধনের সুর বেজে উঠলো অর্কেস্ট্রায়। ওপাশের চেয়ারগুলোয় একে একে এসে বসলো শিল্পবিলাসী সিনেমা-থিয়েটারের নটনটীর দল। নানা ঢঙের পোষাক আর দিশি এসেন্সের গন্ধে অডিটোরিয়ম যেন হঠাৎ কেমন অসহনীয় হয়ে ওঠে।

স্বপ্নের আবেশে দ্রুতলয়ে কেটে গেল দুটি ঘণ্টা। থান-কোমণির সুললিত নিটোল দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে স্পন্দিত হয়ে গেল অপরূপ নৃত্যছন্দ। প্রশংসমান প্রেক্ষাগৃহ মুখর হয়ে উঠলো করতালিতে। পুরাতন স্মৃতি চাপা পড়লো নূতনের আবির্ভাবে।

বালকৃষ্ণণের হাতখানা কোলের ওপর থেকে নামিয়ে দিয়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে শিপ্রা চায় অজিতের মুখপানে—চলো।

সুরেখা ও তার সঙ্গীরা তখন পাশের দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। দর্শকেরা সকলেই দাঁড়িয়ে উঠেছে আপন আপন চেয়ার ছেড়ে।

চেয়ারের গা কাটিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চলে শিপ্রা। সামনে অজিত, পিছনে বালকৃষ্ণণ।

কৃষ্ণণ, কেমন দেখলে?···ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে শিপ্রা জিজ্ঞেস করে।

স্প্লেনডিড!

তাই।···

দ্বিতীয় কথা বলবার আগেই শিপ্রার চোখ পড়লো পাশের সারিতে।···ওদের ঠিক পিছনের 'রো'তেই বসে

ছিল জয়ন্ত আর তার সঙ্গী এক ভদ্রলোক। হয় তো সেই জোয়ারদারের ভাইপো। পাণ্ডুর চেহারা। ইলেক্‌ট্রিকের আলোতে চোখদুটো ঝক্ ঝক্ করে।

মুহূর্তে শিপ্রার রক্তপ্রবাহ কেমন হিম হয়ে আসে। মাথাটা ঝিমঝিম করে। পা দুটো যেন উঠতে চায় না। ...জয়ন্ত! জায়াণ্ট! জয়ন্ত বসেছিল এই দুটি ঘণ্টা ওদের ঠিক পিছনের চেয়ারে?

সঙ্গী ভদ্রলোকটির হাত ধরে জয়ন্ত এগিয়ে গেল গেটের দিকে। একবার চাইলেও না পিছন ফিরে।

ওরা চললো পিছু পিছু।

মেয়েটা হাপ্‌-গেরস্ত?

হঠাৎ শিপ্রার কানে ভেসে এলো সেই সঙ্গী ভদ্রলোকটির অস্পষ্ট কথার একটা টুকরো।

জয়ন্ত কোন উত্তর দেয় না। দৃষ্টিটা অন্যদিকে ফিরিয়ে তার প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়।

কিন্তু শিপ্রা পারে না অন্যমনস্ক হয়ে এড়িয়ে যেতে। ...কার কথা বলে! কার কথা বলে ওই অশিষ্ট ভদ্রলোকটা!...তার?...শিপ্রার?

ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা আকস্মিক অগ্নিস্রোত বয়ে যায়। জলন্ত রাশি রাশি লাভা যেন ছড়িয়ে পড়ে ওর সারা দেহে বিসুভিয়সের বিস্ফোরণে।...নিজের অজ্ঞাতেই পাদুটো থেমে যায়।

মিস্ শিপারিণ!...চলুন, থামলেন কেন?

চলো: নিমেষে শিপ্রার সবটুকু উৎসাহ যেন বাতাসে উবে গেল।

ক্রমশ:

অস্ত ও উদয়

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

সূর্য্য অস্ত যায় যবে দীপ জলে ঘরে,
কে তখন অশ্রু ফেলে রবিকর তরে!
রবি যায় নব দেশে, দেয় তাপ, আলো,
সবাই আদরে ডাকে, বলে—আছ ভালো?
পরদিন ফিরে আসে পুরাতন দেশে,
পূর্ব্বদিকে দেখা দেয় নবারুণ বেশে।
এইরূপে দিন যায়, রাত্রি ফিরে আসে,
দিন-রাত উভয়েরে সবে ভালবাসে।
দিবসে আলোক আর রাত্রিতে আঁধার,
ঘুরিয়া ফিরিয়া দোঁহে আসে অনিবার।
জীবন ফুরায়ে গেলে আসিবে মরণ,
মরণের পরে পুনঃ নবীন জীবন।
এপারে যে অস্ত যাবে ওপারে উদিবে,
যে ফুল ঝরিয়া গেল আবার ফুটিবে।

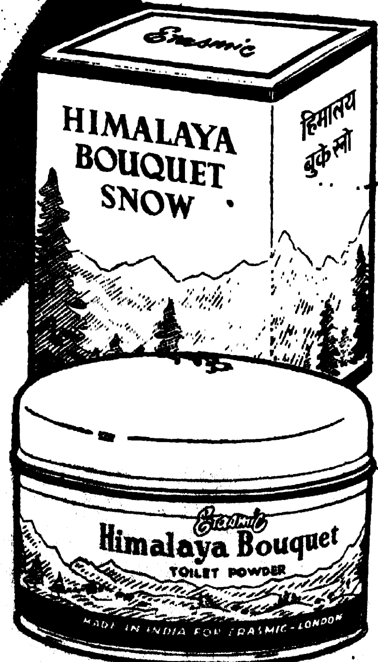
তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন

হিমালয় বোকের সাহায্যে



এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ স্নোটি আপনাকে সুরক্ষিত ও সতেজ রাখবে।

হিমালয় বোকে স্নো



এই মোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।

হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার

[illegible] হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

বিনা রক্তপাতে ফরাসী রাজনীতির বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন গত মে মাসের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিবার একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ ফ্যাসিস্ত শক্তির প্রকাশ্য বিদ্রোহে গণতান্ত্রিক শক্তির নির্ব্বিবাদে পরাজয় স্বীকারের দৃষ্টান্ত এই প্রথম সৃষ্ট হইল ফ্রান্সে।

ফ্রান্সে রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তন—

মাসাধিক কাল ফ্রান্স মন্ত্রিমণ্ডলহীন থাকিবার পর গত ১৩ই মে উদারনৈতিক ক্যাথলিক দলের নেতা মঃ প্লিম্‌ল্যাঁর নেতৃত্বে ফ্রান্সের নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়। সেইদিনই আল্‌জেরিয়ার ফরাসী সামরিক চক্র সেখানকার ক্ষমতা হস্তগত করে। আল্‌জেরিয়াস্থিত ফরাসী সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল রাউল সালাঁ আল্‌জেয়ার্স হইতে ঘোষণা করেন যে, তিনি সাময়িকভাবে আল্‌জেরিয়ার শাসনক্ষমতা হাতে লইয়াছেন। ইহার পরই ফরাসী প্যারাসুট বাহিনীর নেতা জেকী মাসু এক গণ-নিরাপত্তা কমিটী গঠন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, প্যারিসে গণ-নিরাপত্তামূলক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আল্‌জেরিয়ার এই কমিটী কর্ম্মতৎপর থাকিবে। ইহার দুই সপ্তাহ পর কর্সিকায় গণ-নিরাপত্তা কমিটী ক্ষমতা হস্তগত করে।

আল্‌জেরিয়ার এই বিদ্রোহ আকস্মিক নহে। ইহার পশ্চাতে ব্যাপক আয়োজন ছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। পূর্ব্ব হইতে প্রচার করা হইয়াছিল যে, প্লিম্‌ল্যাঁ ক্ষমতা হাতে পাইবার পরই আল্‌জেরিয়ার আরব বিদ্রোহীদের সহিত আপোষ করিবেন। ইহাতে আলজেরিয়ার ফরাসী অধিবাসীরা উত্তেজিত হয়, এবং প্রথমে সেনাবিভাগের হাতে ক্ষমতা দিবার জন্য আন্দোলন সুরু করে। আলজেরিয়ার সামরিক বিদ্রোহের ফলে অবস্থা যখন অত্যন্ত অশান্ত, তখন জেনারল দ্য গল্ এক বিবৃতিতে জানান যে, তিনি ক্ষমতা হাতে লইতে প্রস্তুত। সঙ্গে সঙ্গে আল্‌জেরিয়ার সামরিক কর্তৃপক্ষ ও বেসামরিক অধিবাসী ধ্বনি তোলে —"দ্য গলের হাতে ক্ষমতা চাই!" প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটি যে ব্যাপক ষড়যন্ত্রের ফল, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। মঃ প্লিম্‌ল্যাঁ এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতে থাকেন। তিনি এক বিবৃতিতে বিদ্রোহী নেতা জেনারেল সালাঁর প্রশংসা করিয়া বলেন যে, তিনি প্যারিস কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিতেছেন। পরে আল্‌জেরিয়াবাসী ফরাসীদের খুসী করিবার জন্য তিনি তাঁহার মন্ত্রি-মণ্ডল প্রসারিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যে লা কোস্তে সাতাশ মাস ধরিয়া আল্‌জেরিয়ার আরবদের নির্ম্মমভাবে ঠেঙ্গাইয়াছিলেন, এবং যাঁহার আমলে অনুষ্ঠিত বীভৎস অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফরাসী সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল, মঃ প্লিম্‌ল্যাঁ তাঁহাকে আল্‌জেরিয়া সংক্রান্ত মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত রাখিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হয় না; "দ্য গলকে চাই-ই" বলিয়া ধ্বনি উঠিতে থাকে। দ্য গল্ ঠিক এই অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন; তিনি সর্ত দেন—ফরাসী জাতীয় পরিষদের সমস্ত অ-কম্যুনিষ্ট দলের সমর্থন পাইলে তিনি ক্ষমতা হাতে লইতে প্রস্তুত। তখন দল-কণ্টকিত ফরাসী রাজনীতির চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করিল। আল্‌জেরিয়ার বিদ্রোহ দেখা দিলে যে ফরাসী জাতীয় পরিষদ বিপুল ভোটাধিক্যে প্লিম্‌ল্যাঁ গভর্ণমেণ্টের হাতে জরুরী ক্ষমতা দিয়াছিল, সেই পরিষদ আবার বিপুল ভোটাধিক্যে দ্য গলকে ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল, এবং ছয় মাস পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ রাখিয়া তাহার আসন নিষ্কণ্টক করিতে সম্মত হইল।

সমরনায়কদের দাবী এইরূপ লজ্জাকরভাবে মানিয়া লইবার সমর্থনে একমাত্র যুক্তি—গৃহ-যুদ্ধ নিবারণ। কিন্তু প্রথম হইতে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে উত্তর আফ্রিকার ফরাসী সমরনায়ক ও তাহাদের সমর্থক ফরাসী অধিবাসীদিগকে বিনা রক্তপাতেই সায়েস্তা করা যাইত বলিয়া মনে হয়। দৃঢ়তার পরিবর্তে অত্যধিক স্নায়ুকম্পনে দ্য গল্‌কে বিদ্রোহীদের সমর্থনে বিবৃতি প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং অন্যান্য উপায়েও বিদ্রোহীদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইহার পরিবর্ত্তে বিদ্রোহ ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি প্যারিসে বামপন্থীদের সমর্থনে (কম্যুনিষ্ট সহ) শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইত এবং সে গভর্ণমেণ্ট যদি শাস্তিমূলক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ভয় দেখাইয়া অবিলম্বে বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ দাবী করিত, তাহা হইলে হয়ত অবস্থা এতদূর গড়াইত না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন—আল্‌জেরিয়ার দুর্দ্ধর্ষ আরব বিদ্রোহীদের সহিত ফরাসীদের কঠোর সংগ্রাম করিতেছে। এই অবস্থায় ফ্রান্সের সহিত সম্পর্কচ্যুতির সম্ভা-বনায় আল্‌জেরিয়ার ফরাসী অধিবাসীরা আতঙ্কিত হইত; বিদ্রোহী নেতা সালাঁ-মাসু তাহাদিগকে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিত না। বিদ্রোহী সেনাপতিরাও তাঁহাদের নিজেদের অবস্থা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সালাঁ-মাসুকে তাঁহাদের নিজ নিজ সেনাবাহিনীর আনুগত্য সম্বন্ধেও উৎকণ্ঠিত হইতে হইত। ফ্রান্সের আইন পরিষদে কম্যুনিষ্টরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, ১৯৫৬ সালের

নির্বাচনে সামগ্রভাবে বামপন্থীদের প্রতি জন-সমর্থন সুস্পষ্ট ছিল। দেশের এই রাজনৈতিক ভাবধারা সেনাবিভাগে প্রবেশ করে নাই মনে করিয়া আত্মসন্তোষ লাভ করা উচিত না। বিশেষতঃ, বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তির বিধান অনুসারে ফরাসী সেনাবাহিনী গঠিত; আল্‌জেরিয়ার চার লক্ষ সৈন্যের অধিকাংশই 'কন্‌স্ক্রিপ্ট।' প্যারিসের বামপন্থী সমর্থিত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমরনায়কদের প্রতি এই সেনাবাহিনীর সামগ্রিক আনুগত্য অটুট থাকিত বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যাহা হউক, প্লিম্‌লা গভর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে দৃঢ়তা অবলম্বন না করায় এই সম্ভাবিত অনুকূল অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়। তাহার পরও সোস্তালিষ্ট নেতা মলে প্রভৃতি যদি দুর্ব্বলতা প্রদর্শন না করিতেন—দল হিসাবে সোস্তালিষ্টরা (সোস্তালিষ্ট প্রতিনিধিদিগকে দলের বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত করিয়া ব্যক্তিগতভাবে ভোট দিবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, এবং মোট এক শত প্রতিনিধির মধ্যে অর্দ্ধেকের কিছু কম প্রতিনিধি দ্য গলকে সমর্থন করেন) যদি কম্যুনিষ্টদের সহিত একত্রে দ্য গলের প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে দাঁড়াইত, তাহা হইলেও ফ্রান্সে ঠিক গৃহ-যুদ্ধ আরম্ভ হইত কিনা, তাহাতে সন্দেহ আছে; কারণ উত্তর আফ্রিকার ফরাসী অধিবাসীদের আশঙ্কা, সাধারণ সৈন্যদের আনুগত্যের প্রশ্ন প্রভৃতি তখনও থাকিয়া যাইত। সর্ব্বোপরি, গৃহ-যুদ্ধ যদি অনিবার্য্যই হইত তাহা হইলেও গণতান্ত্রিক আদর্শ বিসর্জ্জন দিয়া এইভাবে ফ্যাসিস্ত পন্থাকে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই উচিত হয় নাই। সমরনায়কদের হুকুমে গভর্ণমেণ্ট ভাঙ্গা-গড়ার এই দক্ষিণ আমেরিকান্ পদ্ধতির এইখানেই শেষ হইবে বলিয়া মনে হয় না। দ্য গল অবশ্য প্রজাতন্ত্র রক্ষার প্রতিশ্রুতি শুনাইয়াছেন। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি কতদূর পালিত হইবে তাহা বলা দুষ্কর।

দ্য গলের প্রতিষ্ঠার পর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ফ্রান্সের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা এখনও অস্পষ্ট। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট এবং অন্য কিছু সংখ্যক বামপন্থী এখনও দ্য গলের বিরোধিতা করিতেছে। এই বিরোধিতা জন-সমর্থনে ক্রমে আরও উগ্র হইয়া উঠিবে কিনা, তাহা বলা যায় না। পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে আমেরিকার সহিত দ্য গলের সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। দ্য গল্ পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহী। এখনও তিনি জার্ম্মানীর অত্যন্ত বিরোধী; রুশিয়ার সহিত যুক্তিসঙ্গতভাবে আপোষ করা তাঁহার নীতি। De Gaulle has made no secret of his desire to re-create the old European balance by restoring the pragmatic alliance with Russia; nor has a decade of cold war in any way mitigated his view that the real enemy lies immediately across the Rhine. (New Statesman). দ্য গল জার্ম্মানীর অস্ত্রসজ্জার বিরোধী ছিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন—নিয়ন্ত্রীকৃত জার্ম্মানীর ঐক্য, যাহা এক সময় রুশিয়াও সমর্থন করিত। এখন অবশ্য জার্ম্মানীর অস্ত্রসজ্জা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এই অবস্থাতেও জার্ম্মানীর আণবিক অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে আমেরিকার সহিত দ্য গলের মতদ্বৈধ ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহার পর, উত্তর আফ্রিকার সমস্যা। টিউনিসিয়া-ফ্রান্সের বিরোধ সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের পত্রকে উপলক্ষ করিয়া গত এপ্রিল মাসে যখন গাইয়ার মন্ত্রিসভার পতন হয়, তখন মার্কিণ-বিরোধিতায় প্রধান অংশ লইয়াছিলেন দ্য গলের ঐকান্তিক সমর্থক সুশতেল। সাম্প্রতিক দ্য গল-কেন্দ্রিক রাজনীতির সহিত যাঁহার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দ্য গলের উত্তর আফ্রিকার সমর্থকরা বলেন যে, টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা কাড়িয়া না লইলে আল্‌জেরিয়া সমস্যার সমাধান অসম্ভব। দ্য গল যদি এই নীতি সমর্থন করেন, তাহা হইলে আমেরিকার সহিত তাহার প্রবল মনোমালিন্য অবশ্যম্ভাবী; কারণ টিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট হাবিব বুরগুইবাকে আমেরিকা হাতে রাখিতে অত্যন্ত আগ্রহী। এই আরব নেতাটি প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবেন বলিয়া আমেরিকা আশা করে। অবশ্য আমেরিকার প্রতি ফ্রান্সের অর্থ-নৈতিক নির্ভরশীলতা দ্য গল সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করিবে। ফরাসী জনসাধারণ যে আর অতিরিক্ত করভার বহন করিতে প্রস্তুত নয়, তাহার পরিচয় তাহারা একাধিকবার দিয়াছে।

লেবাননে অশান্তি—

লেবাননে অশান্তি গত মে মাসের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিরোধী দলের কোন এক সংবাদপত্রের মালিকের হত্যা হইতে এই অশান্তির উদ্ভব। প্রথমে উত্তর অঞ্চলে ত্রিপলিতে বেকারী-বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে এবং ক্রমে উহা সমগ্র লেবাননে প্রসারিত হয়। আমেরিকার সাহায্যে চামুন্ গভর্ণমেণ্ট এখনও বিক্ষোভকারীদের সহিত যুঝিতেছেন। লেবাননে অশান্তি আরম্ভ হইবার প্রত্যক্ষ কারণ যাহাই হউক, ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে বহু পূর্ব্ব হইতে—"...the trouble had been simmering for a long time"—London 'Times.'

লেবাননের অধিবাসীর শতকরা ৫০ ভাগ মেরোনাইট খৃষ্টান (রোমের সহিত সংযুক্ত), ৪০ ভাগ মুসলমান এবং বাকী ১০ ভাগ ড্রুস্ ও রক্ষণশীল গ্রীক্ চার্চ্চের সহিত সংযুক্ত খৃষ্টান। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একতায় এবং পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থায় লেবানন এতদিন তাহার রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে। গত বৎসর প্রেসিডেণ্ট চামুন্ লেবাননকে আইসেনহাওয়ার নীতির অন্তর্ভুক্ত করাইয়াছেন। অসন্তোষ আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতে—জাতি-দেহে বিচ্ছেদের বীজ বপন করিয়াছে চামুন্ গভর্ণমেণ্টের এই নীতি। এই সময় মেরোনাইট প্যাট্রিয়ার্ক সাম্প্রদায়িক অশান্তির আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। লেবাননের মুসলমান সম্প্রদায় আরব জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত। মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসেরের নীতির প্রতি তাহাদের সহানুভূতি। পক্ষান্তরে, সুস্পষ্ট রাজনৈতিক চেতনা যে সব খৃষ্টানের নাই, তাহারা স্বভাবতঃ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গকেই বেশী আপনার মনে করে। এইভাবে লেবাননের সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা বিপরীত রাজনীতিকে আশ্রয় করিয়া উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি বিরোধী পক্ষের মনোভাব আরও কঠোর ও উগ্র হইয়াছিল এই কারণে যে প্রেসিডেণ্ট চামুন্ শাসনতন্ত্র

সংশোধন করিয়া দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হইবার আয়োজন করিতেছিলেন। লেবাননের শাসনতন্ত্র অনুসারে কোন ব্যক্তি পর পর দুইবার প্রেসিডেন্ট হইতে পারেন না। চামুনের প্রেসিডেন্ট থাকিবার কাল আগামী অক্টোবর মাসে শেষ হইবে। প্রথমে লেবাননকে আইসেনহাওয়ার নীতির সহিত সংযুক্ত করিয়া এবং পরে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবার আয়োজন করিয়া চামুন্ বিরোধীপক্ষকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ না করিলে বর্ত্তমান অশান্তি বন্ধ হওয়া অসম্ভব। The current violence is thus a reflection of deep political discord, and it will clearly increase the intensity unless Chamoun retires. (New Statesman) কিন্তু চামুনের অবসর গ্রহণের কোনও লক্ষণ দেখান নাই। সম্প্রতি অবশ্য প্রধানমন্ত্রী সামি সোল্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, গভর্ণমেন্ট শাসনতন্ত্র সংশোধনের চেষ্টা করিবেন না। অর্থাৎ চামুনকে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট করিবার চেষ্টা হইবে না।

জাপানের সাধারণ নির্বাচণ—

গত ২২শে মে তারিখে জাপানে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়। এই নির্ব্বাচনে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দলের হাতেই আবার ক্ষমতা আসিয়াছে। নবুসিকি কিশি সদলবলে ক্ষমতার আসনে রহিয়া গেলেন। ইহা জাপানের স্বাভাবিক সাধারণ নির্ব্বাচন নহে: পূর্ব্ববর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়াছিল ১৯৫৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে। সুতরাং শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে পরবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় ১৯৫৯ সালের প্রথম। প্রধান মন্ত্রী কিশি গত এপ্রিল মাসে নিম্ন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া গত ২২শে মে তারিখের এই সাধারণ নির্ব্বাচনের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এপ্রিল মাসের প্রথমে নিম্ন পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে মিঃ কিশি বলেন যে, জাপ-মার্কিণ নিরাপত্তা চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে আমেরিকা জাপানে পারমাণবিক অস্ত্র আনিতে পারে। ইহাতে সোস্তালিষ্ট দল কিশি মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহারই পাল্টা ব্যবস্থারূপে মিঃ কিশি নিম্নপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া এক মাস পরে সাধারণ নির্ব্বাচনের কথা ঘোষণা করেন।

প্রধান মন্ত্রী মিঃ কিশির দল নির্ব্বাচনে জিতিলেও নির্ব্বাচনের ফল তাঁহাদের আশানুরূপ নহে। এই নির্ব্বাচনে সোস্তালিষ্ট প্রতিনিধির সংখ্যা ১৫৮ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৬৬ হইয়াছে। শক্তিশালী বিরোধী দলরূপে এখনও তাহারা সক্রিয় থাকিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, জাপানে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সোস্তালিষ্টরা মিলিত হইয়াছে এবং দলের নীতি নির্দ্ধারণে বামপন্থীদের প্রাধান্ত। জাপানে কমুনিষ্ট পার্টি অত্যন্ত দুর্ব্বল: ১৯৪৯ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে ৪৬৬ জন প্রতিনিধির নিম্ন পরিষদে মাত্র একজন কমুনিষ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিল; ১৯৫৫ সালে নির্ব্বাচিত হয় দুইজন; গত ২২শে মের সাধারণ নির্ব্বাচনে মাত্র একজন নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অবশ্য সোস্তালিষ্ট দলে গুপ্ত কমুনিষ্ট আছে কিনা, এবং থাকিলে তাহাদের সংখ্যা কত, তাহা বলা দুষ্কর। তবে সোস্তালিষ্টরা যে পররাষ্ট্র নীতির সমর্থক, তাহা হইতে কমুনিষ্ট নীতির যে কোনও পার্থক্য নাই, তাহা সুস্পষ্ট। সোস্তালিষ্টরা রুশিয়ার সহিত স্বাভাবিক সম্পর্ক চায়, কমুনিষ্ট চীনের সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিতে চায়, পিকিং গভর্ণমেন্টকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে চায়, আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামরিক দায়িত্ব হইতে জাপানকে মুক্ত করিতে চায়। আমেরিকার হুকুমে জাপানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার তাহারা ঘোর বিরোধী। জাপান হইতে মার্কিণ ঘাঁটীর উচ্ছেদের জন্য এবং রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের ওকিনাওয়া হইতে আমেরিকার অপসারণের জন্য সোস্তালিষ্টরা আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। তাহাদের যুক্তি আমেরিকা যদি জাপানকে ওকিনাওয়া প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলে সোভিয়েট ইউনিয়নও দক্ষিণ কিউরাইল্ জাপানকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইবে। এ হেন সোস্তালিষ্ট পার্টির প্রতিনিধি সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী নিম্ন পরিষদে এক-তৃতীয়াংশের অধিক ছিল; এবারও তাহাই রহিয়া গেল, যাহার বাস্তব গুরুত্ব খুবই বেশী। জাপানের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে সমরসজ্জা নিষিদ্ধ। অথচ, সুদূর প্রাচ্যে কমুনিষ্ট-বিরোধী শক্তিশালী ঘাটীরূপে জাপানকে ব্যবহার করিতে হইলে তাহার সমরসজ্জা একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে আমেরিকা এবং তাহার অনুগত জাপানী রাজনীতিকরা শাসনতন্ত্রের সংশোধন চাহেন। এই সংশোধনের জন্য নিম্ন পরিষদে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় ভোট-সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিষদে যেমন দক্ষিণ-পন্থীদের ছিল না, এখনও তেমনি রহিল না।

৫।৬।৫৮

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নিমির দিকে তাকিয়ে দেখল অভয়, সে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। আজ নীলাম্বরী পরেছে নিমি। নীল বলতে যা বোঝায়, তার চেয়ে গাঢ়। প্রায় যেন কালো, তবু কালো নয়। রূপোলী আঁশ পাড়। ঘোমটা খুলে গেছে কিংবা খুলে দিয়েছে নিমি নিজে। খোঁপায় রূপো-বাঁধানো চিরুণী গোঁজা। অভয়ের চোখে তার চেয়ে সুন্দর লাগে, খোঁপায় জড়ানো আ-ফোটা টোপা টোপা বেলফুলের মালাখানি। আর ভাল লাগে গলায় জড়ানো ফুলের মালা।

পিতৃ পরিচয় জানা নেই অভয়ের। শুরু থেকে জীবনকে বড় কঠিন ও কুটীল বলে জেনেছে। তবু ভাল লেগেছে বেঁচে থাকতে। এই সংসারকে দেখেই না গান বেঁধে ফেলেছিল অভয়? কঠিন ও কুটীল, দুঃখ ও লাঞ্ছনার পাশে পাশে, সার পেয়েছে অভয় এক বিচিত্র সুন্দর। যেমন নাকি এই মালীপাড়ার মানুষেরা পাড়ার একটি মাত্র জলকলের ধারে রোজ লাইন দেয়। হাহাকার করে, ঝগড়া করে, মারামারি করে, কাঁদে, নিরাশ হয়, তবু হাসে ও বাঁচে সেই দুর্দশার ধন এক কলসী কিংবা এক বাল্‌তি জল ঘরে তুলে, তেমনি। ওই জল বড় মিষ্টি, তার আর এক নাম নাকি জীবন। অনেক দুঃখ আছে, কিন্তু জলটুকুনিও আছে। সেইটি বড় সুন্দর। তাই জীবনের তাগিদ আছে। তাই মানুষ বাঁচে, অভয়ও বাঁচে। কেন? না, মধু আছে জীবনে। সে মধুর নাম জানে না অভয়। সেই বিচিত্র সুন্দরকে ব্যক্ত করার ভাষা তার স্থূল ও অর্বাচীন। যে সুন্দরের অনুভূতি ওর বোবা আবেগের উজানে বহে, আসলে সে অনির্বচনীয়।

সেই অনির্বচনেরই এক বিচিত্র রূপ ধ'রে যেন তার সামনে বসে আছে নিমি। রক্তে দোলা লেগেছে কতখানি, সে হিসেব জানে না অভয়। মন পাগল হয়েছে তার। আপনার জন ব'লে একজনকে সে পেয়েছে আজ এক ঘরে। যার মুখখানি তার বুকের কাছে নিয়ে ভালবাসতে বাসতে, এই মুখের কাছে দুঃখের কথা বলবে।

জীবনের এই বড় বিস্ময়, অভয়ের কাছে যেন কিছুতেই লজ্জা কাটতে চায় না নিমির। চোখে চোখ রাখে নি একবারো, ঠোঁট মুচকোয়নি বারেক। সামনা সামনি বাইরে বুঝি এখনো পদশব্দ শোনা যায় একটু। এখনো ফিস্‌ফিসানির জের কাটে নি পুরোপুরি। সদরে আড়ি পাতা ছেড়ে এবার চোরা-আড়িপাতার চেষ্টা চলছে হয় তো। কেবল দূর থেকে বিশুর মত্ত গলা শোনা যাচ্ছে এখনো। শৈলবালার সুহৃদ বিশু, বুঝি নিমিরও। সারাটা দিন মাতলামি করেছে, সকলের সামনে নিজের বউটাকে, ছেলেমেয়েগুলিকে পিটেছে, ফুলশয্যের নিমন্ত্রণ খেতে বসে ধস্তাধস্তি করেছে অকারণ—এখনো চীৎকার করছে।

এই ঘরে, এখন সে সব তুচ্ছ লাগে। জীবন কোনো কোনোদিন প্রত্যহকে ছাড়িয়ে যায়। আজ ছাড়িয়ে গেছে।

আজকের এই দিন আর জুয়া-খেলা-জিতের মতো অভাবিত নয়, তবু বড় অভাবিত। নিমির মতো এমনি ক'রে ঘুরিয়ে শাড়িপরা, অমন বিবির মতো জামা পরা—শহরের মেয়ে ছিল চিরদিন অভয়ের অপরিচয়ের সংশয়। আজ আর সংশয় নেই।

পিছন থেকে নিমির পিঠে হাত দিয়ে ডাকল সে, ফিরে বসবে না?

নিমি নিশ্চল, নিরুত্তর। কেন? লজ্জা করে না বুঝি মেয়ের। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এত বড় পুরুষটা অভয়, তারো পাগল পাগল মনের কোন্ এক কোণে যেন লজ্জা লজ্জা করে।

অভয় উঠে, নিমির সামনে যেতে যেতে বলে, তবে আমি বসি সামনে। সামনে বসে, নিমির চিবুকে হাত দিয়ে বলল অভয়, এস, ভাব করি।

কিন্তু নিমি তেমনি অনড়। ঘাড় শক্ত, চিবুক ধরে মুখ নাড়ানো যায় না। কেন? অবাক হয় অভয়, একটু যেন সঙ্কোচও হয়।' লজ্জায় এত শক্ত কেন তার বউ।

মাটির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ নিমির। কিন্তু সে-দৃষ্টিতে লজ্জা কিংবা সংকোচের ভাব নেই, কেমন যেন দীপ্ত ও খর। ঠোঁট কিংবা গালের, সারা মুখের, শরীরের কোনো ভঙ্গিতে একটুও হাসির আভাস তো নেই নিমির। বরং শক্ত কঠিন ভাব মুখে ও সর্বাঙ্গে। উঁচু নাকের পাটা স্ফীত স্ফুরিত হচ্ছে ঘন ঘন। কেন? এ শুধু লজ্জা কিংবা, মেয়েমানুষের প্রেমের ছলনা, তা মনে হয় না অভয়ের। তার অনির্বচনীয়ের সুধা রসে এক অর্থহীন আবর্ত পাক খায়। তাকে কি ভাল লাগে নি নিমির? বিয়ের রাত্রি থেকে মুখ ফেরানো তবে লজ্জা নয় শুধু।

আবার নিমির চিবুকে হাত রেখে বলল সে, কি হয়েছে ভাই, বলবে না?

.. সহসা যেন সাপিনীর মতো শুধু তীব্র নিঃশ্বাসের শব্দে, নিমি অভয়ের হাত ছুঁড়ে দিল দূরে। তারপর ক্রুদ্ধ ছোবলের মতো, শাণিত একটি মাত্র শব্দ বেরুল তার গলা দিয়ে, মরণ!

অভয়ের চোখে দেখা দিল চকিত আতঙ্কের ছায়া। যেন মাঝ-দরিয়ায় মাঝির অভয়-চোখে কালো মেঘের বিজলী হানল। সংসারের পথ এত বাঁকা, এমন ক'রে মোড় ফেরে যে, পিছনের সবটুকু একেবারে নিরঙ্কুশ যায় ঢাকা প'ড়ে? বড় আকস্মিক ভাবে ভয়ংকর খাদের কিনারে এসে থমকে দাঁড়াল অভয়। ভয় করছে অভয়ের, ভীষণ ভয়।

কিন্তু এতটুকুতে অভিমান ক'রে ফিরে যাবার মন নয় তার। দু'হাত দিয়ে নিমির দুটি কাঁধ ধরে বলল, কি হয়েছে ভাই, কি অপরাধ হয়েছে অধীনের। নিমির ক্রোধ তাতে শান্ত হল না। কাঁধ ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে বলল, এখানে কেন মরতে? সুবলি ছিনালের কাছে গেলেই হত? যেন মুখের উপর গরম লোহার ছাঁকা লাগল অভয়ের। সুবালার কথা বলে নিমিও—যে-সুবালার রংখানা থেকে বেরিয়ে, যে-নিমির কাছে যেতে চেয়েছে অভয়। কিন্তু সংকোচ কাটিয়ে যেতে পারেনি, অন্ধকার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুধু নিমির একটু হাসির রেশ, দুটি অস্ফুট কথা শুনে এসেছে লোভীর মতো। সেই নিমি বলে সুবালার কথা।

নিমির কাঁধ-ধরা হাত অভয়ের শিথিল হল না। উত্তেজনায় চেপে বসল আরো। বলল, ছিঃ ভাই নিমি, সুবালার কথা তুমি কেন ভাব? গান শুনতে মন করেছিল, তাই গেছলুম।

কিন্তু নিমি শান্ত হয় না। ঠাকুরের থানে ভর হলে যেমন মেয়েমানুষ উলটি-পালটি খায়, উত্তেজিত হয়, দাঁতে দাঁত চাপে, তেমনি অস্থির উত্তেজনায় নিজেকে বিস্রস্ত ক'রে, অভয়ের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল নিমি। চাপা ক্রুর গলায় বলল, থাক্, ওসব ছেনালির ঢং আমি খুব জানি। বড় আমার গায়েনদার এসেছে, মনে করেছ, ওতে সব ছুঁড়িকে ভোলানো যায়। অত সহজ নয়। ছাড়, ছেড়ে দাও আমাকে। নইলে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করব বলছি।

অভয়ের থাবা আরো শক্তই হয়। কিন্তু কথা সরে না তার মুখে। সে যেন ভয়ে ও বিস্ময়ে দেখতে থাকে তার সৌন্দর্যকে, তার মাধুর্যকে, তার দুঃখ রাখবার সুখের ঠাঁইকে। সেই নিমিই। শাড়ীর আঁচল আলুলায়িত। হাল ফ্যাসানের জামায় তার নিটুট স্তনান্তরে বেলফুলের মালা দোলে। সুন্দর ঠোঁটে চোখে ধারালো ছুরির মতো চক্‌চক্ করে নিষ্ঠুর ঘৃণা।

অভয়ের বিশাল শরীরে সেবা-শক্তি যত উত্তাল হয়, গলার স্বর তত নামে।

স্খলিত নীচু গলায় বলে সে, কী জান ভাই তুমি, কী বুঝলে?

নিমি বুঝেছে নিমির মতো। তার একটা জীবন আছে, ধারণা ও বিশ্বাস আছে। এই পাড়ায়, এই পরিবেশে, এখানকার পুরুষদের আশেপাশে, মেয়েদের সঙ্গে সে মানুষ হয়েছে। সে জানে, পুরুষ কি চায় মেয়ে-

মানুষের কাছে, আর মেয়েমানুষের কী দরকার পুরুষদের কাছে। এ পাড়ায়, আর এ পাড়ায় যারা আসে, তারা ক'জন ভাল, ক'জন মন্দ পুরুষ, এই উনিশ বছরের জীবনে নিমি জেনেছে পলে পলে।

ঠোঁট বাঁকিয়ে, বিদ্রূপ ক'রে বলল সে, সেজেগুজে না হয় আজো দরজায় দাঁড়াইনি।

দাঁড়ালে তোমার মতন গায়েনদার কেন আসত, তা কি আর বুঝিনে ভেবেছ? বাতাসা খাইয়ে ভোলাবার বয়স আমার নেই।

নিমির এই মূর্চ্ছা রোগীর ভাব ও কথার কাছে কেমন যেন অসহায় বোধ করে অভয়। বলে, সুবালা ঘরের কাছে থাকে, তাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ।

আরো ভয়ংকরী হ'য়ে উঠল নিমি। বলল, আমি যাব সুবলির কাছে? কেন? কোন্ দুঃখে?, তার চেয়ে নিমি কম কিসে?

—কম বেশীর কথা নয়। সে যা, তুমি তো তা নয়।

নিমি অন্য পথ ধ'রে। বলে, কেন, রাজু বাড়িয়ালির দরজায় দাঁড়ালে সুবলির চেয়ে কি কিছু ছোট থাকতুম? তুমিও ফুর্তি করতে আমার কাছেই আসতে। সে ক্যামতা নিমির আছে।

একটা ভয়ংকর অসহায়তা আর নিষ্ঠুরতা, একই সঙ্গে অভয়কে উত্তেজিত করতে থাকে। সহসা বড় ব্যাকুল হ'য়ে, নিমির কোলের কাছে উপুড় হয়ে বলে, বিশ্বেস কর ভাই নিমি, কোন মন্দ কাজে আমি যাই নি। পাপ মন নিয়ে যাই নি। কোথা থেকে কোথা এলুম, তোমাকে পাব ভেবে, সেই আমার বড় সুখ।

নিমি ঠোঁট কুঁচকে হেসে বলল, পুরুষ যে এমনি করেই হ্যাংলামি করে আমি তাও জানি। কিন্তু আমি তোমায় ছোঁবো না।

পুরুষকে দেবার মতো সব চেয়ে বড় কঠিন শাস্তি যেন ঘোষণা করল নিমি।

অভয়ের মাথায় যেন চাক-ভাঙা ভীমরুলেরা ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। সে একবার ভাবতে চেষ্টা করল, কোথা থেকে সে এসেছিল। কেমন করে মোড় ফিরেছিল তার জীবন। কী স্বপ্ন দেখেছিল সে ভবিষ্যতের। কেমন করে একটি ভালবাসার সুখ বুকে ক'রে ভালবাসতে চেয়েছিল সে। ভালও বেসেছিল মনে মনে।

কিন্তু কিছুক্ষণের জীবন তাকে তার ভবিষ্যৎ দর্শন করাল। তার ভালবাসা যে, সে শুধু একটা তীব্র ঘৃণা, তীক্ষ্ণ সন্দেহ, একটি ভয়ংকর হিংসা। কিছুক্ষণের মধ্যে সব যেন ওলটপালট হ'য়ে গেল, আর একটা ভয়ংকর কিছু ঘটবার আগে যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল তার রক্তধারা। বলল, না ছুঁলে কি হয়?

নিমি যেন রঙ্গিণীর মত হেসে উঠল সারা শরীর দুলিয়ে। তার সেই একই বিশ্রী ভঙ্গিতে বলল, খোকা!

অভয় বড় বড় চোখে নিমির সর্বাঙ্গ দেখতে থাকে। নতুন কিছু, ভীষণ কিছু ত্যাখে—আর তার চোখে কল্‌কল্ ক'রে রক্ত ওঠে। তবু যেন চাপা গলায় বলে, আমি জানি না নিমি।

নিমি হাসে, খিল্‌খিল্ ক'রে হাসে। কি এক বিচিত্র ভঙ্গিতে যেন এঁকেবেঁকে ওঠে সারা শরীর। বলে ঠোঁট উল্টে, না জানলে আর অত কথা কাটাকাটি কিসের? চুপ মেরে থাকলেই তো হয়।

চুপ ক'রে থাকতে চায় অভয়। ঠিক তেমনি বিস্ময়ে, দুঃখে, যেমন করে মানুষ আঁতুড় ঘর দেখতে এসে শ্মশানে পৌঁছোয়, তেমনি যন্ত্রণায় চুপ করে থাকতে চায় অভয়।

কিন্তু তার মা প্রমীলার ঘরে, কবে কোন এক ভেজা ভেজা অন্ধকার রাতে বুকে হেঁটে হেঁটে একটা পুরুষ এসেছিল, আর তার মাকে সাপের মত আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে—পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর সুন্দর গায়ে কুৎসিত অন্ধকারে অভয়ের অস্তিত্বকে দিয়ে গিয়েছিল ছিটিয়ে, সেই অনুভূতিটা রক্তের মধ্যে দপদপিয়ে উঠল অভয়ের। সহসা যেন পিতৃরক্ত উত্তাল হল আজ। দু' হাতে জাপটে ধরল সে নিমিকে।

নিমি যেন ভয় পেল। সে চীৎকার করতে গেল, কিন্তু অভয় তার মুখ চেপে ধরল বুকে—কঠিন আলিঙ্গনে নিষ্পেষিত ক'রে। কাছে এনে ফেলল বিভ্রান্ত নিমিকে। নিমি হাসল কি কাঁদল, বোঝা গেল না। শুধু একটা ভয়ংকর অন্ধকার ও রাতের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলল সে।

ভোর হ'য়ে আসে। তবু যেন অন্ধকার গাঢ় হয়।

নিমি আশ্চর্য শান্ত ভাবে ঘুমুচ্ছে। সুস্থ ঘুমন্ত নিশ্বাস পড়ছে তার। ঠোঁটের কোণে যেন চিক্‌চিক্ করছে একটি তৃপ্তির হাসি।

অভয় সেদিকে দেখতে দেখতে মুখ ঢাকল। এত বড় শরীরে পুরুষের কান্না কোথায় লুকিয়ে থাকে, কে জানে। সে কখনো ফুটে বেরুতে চায় না। শুধু জীবনের আর একটি অধ্যায়কে শুরু হতে দেখছে অভয়।

ক্রমশঃ

আচার্য্য যদুনাথ সরকার

বাংলার প্রবীণতম ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়, ঐতিহাসিক আচার্য্য স্যার যদুনাথ সরকার গত ১৯শে মে রাত্রিতে ৮৮ বৎসর বয়সে তাহার বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। আচার্য্য সরকারের দুইপুত্রই তাঁহার পূর্বে মারা গিয়াছেন—তাহার পত্নী ও তিন কন্যা বর্তমান। তাঁহার পিতা রাজকুমার সরকার যদুনাথের ৩৪ বৎসর বয়সের সময় ৭৪ বৎসর বয়সে মারা যান। রাজকুমার ধনী, জমীদার ও উচ্চশিক্ষিত হইয়া আদর্শ ও নিষ্ঠার জীবন যাপন করিতেন। যদুনাথ পিতার আদর্শে নিজ জীবন গঠন করিয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার কড়ুচমাড়িয়া গ্রামে ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৮৯১ সালে বি-এ এবং ১৮৯২ সালে এম-এ পাস করেন। বি-এ'তে তাঁহার ইংরাজি ও ইতিহাসে অনার্স ছিল—তিনি ইংরাজি সাহিত্যে এম-এ দিয়াছিলেন। রিপণ ও বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনার সময় ১৮৯৭ সালে তিনি পি-আর-এস বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৮ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯০২ সালে পাটনায় গমন করেন। তিনি ইংরাজি সাহিত্যের সহিত ইতিহাসও পড়াইতেন। পাটনায় খোদাবকস্ লাইব্রেরীর সংগৃহীত গ্রন্থ তাঁহাকে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রেরণা দান করে। তিনি ১৯১৭ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় গবেষণা করিয়া তিনি মুসলমান যুগের ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার লিখিত বহু বাংলা প্রবন্ধ সে যুগের বহু সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। ১৯২৬ সালে তিনি অধ্যাপকের কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। তিনি ১৩২২ সালে বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাস শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন এবং ১৩৪২-৪৩, ১৩৪৭-৫১ ও ১৩৫৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৪৪ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-লিট উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। ১৯৪৯ সালে তাহার বয়স ৭৮ বৎসর পূর্ণ হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিল। তিনি শুধু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিতেন না, সাহিত্য আলোচনায় তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ১৩১৪ সালের ভাদ্রমাসের প্রবাসীতে তাঁহার 'কবি হেমচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথ', ১৩১৭ সালের মাঘের প্রবাসীতে বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য, ১৩১৮ সালের জাহ্নবী মাসিকপত্রে 'রজনীকান্ত সেন' প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ ও গল্পের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৩১৮ সালে কবিগুরু তাঁহার অচলায়তন নাটক যদুনাথের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আনন্দমঠ, দুর্গেশনন্দিনী, দেবীচৌধুরাণী, রাজসিংহ ও সীতারামের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বাংলা গ্রন্থের মধ্যে (১) সিয়ার উল মুতাখরীণ (২) শিবাজি ও (৩) মারাঠা জাতির বিকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহার ইংরাজি গ্রন্থ অসংখ্য। অধিকাংশই মারাঠা জাতির ইতিহাস—তিনি বহু ইংরাজি ও উর্দু সরকারী বিবরণ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর দিনও বিকালে তিনি বাসগৃহের নিকটস্থ পার্কে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও সন্ধ্যায় নিয়মিত আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সারা জীবন তিনি নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য যদুনাথের জীবন কথা শুধু বাংলার ইতিহাসের একটি অধ্যায় নহে—সে আদর্শ জীবন-কথা জানিলে তরুণ বাঙ্গালী বহু প্রেরণা ও উৎসাহ লাভ করিবে। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী জাতির যে বিরাট ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূরণ হইবে না।



বর্ষারম্ভ—

ভারতবর্ষের বয়স ৪৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে—এই সংখ্যার সহিত ৪৬ বর্ষ আরম্ভ হইল। এই সুদীর্ঘ জীবনে ভারতবর্ষের এক দিকে যেমন বহু আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, বহুভাবে উহা দেশবাসীর প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করিয়াছে, তেমনই অপর দিকে নানা বিপদ,নানা অসুবিধা আসিয়া তাহার গতিপথ রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় ভারতবর্ষ প্রশংসায় ও নিন্দায় অবিচলিত থাকিয়া ধীরতা ও স্থৈর্য্য.সহকারে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছে। জাতির ইতিহাসে ও জীবনে ৪৫ বৎসর কাল অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইলেও যে সকল লেখক, গ্রাহক, শুভানুধ্যায়ী প্রভৃতির কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করিয়া আমরা এই জীবনের গতিপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছি, আজ তাঁহাদের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির অনলস কর্ম প্রচেষ্টা ইহার মূলে থাকিয়া ইহার অগ্রগতির পথ সুগম করিয়াছে—তাঁহাদের কথা আমরা সর্বদাই স্মরণ করি এবং বিশ্বাস করি, তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ ভারতবর্ষকে দীর্ঘ জীবনদানে সাফল্যমণ্ডিত করিবে এবং ইহা দেশ ও জাতির সমৃদ্ধির সহিত ইহার কাম্য স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নব নব ভাবের উন্মেষ দেখা দিয়াছে—কাজেই এখন আর পূর্বের মত আমাদের রক্ষণশীলতার আবেষ্টনে বদ্ধ থাকিলে চলিবে না। জ্ঞান বিস্তারের নূতন নূতন ক্ষেত্রের সহিত পাঠক সমাজকে যাহাতে আমরা পরিচিত করাইয়া সকলের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি, সে বিষয়ে আমরা সর্বসাধারণের সহযোগিতা, উপদেশ ও নির্দেশ প্রার্থনা করিয়া আমরা সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি, যাঁহার কৃপা এই ৪৫ বৎসর আমাদের সুপথে পরিচালিত করিয়াছে, ভবিষ্যতে কখনও যেন আমরা তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত না হই।

অসহনীয় তাপ-প্রবাহ—

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার হইতে পশ্চিম বঙ্গে যে অসহনীয় তাপ প্রবাহ চলিয়াছে, তাহা আর কখনও ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। কলিকাতার মত সহরে জনসাধারণের ব্য[illegible]তে অতিশয় কষ্টকর হইয়াছে এবং যাহাদের বিজলী পাখা যেতে তাপ নিয়ন্ত্রিত গৃহে বাস করিবার সৌভাগ্য নাই, তা[illegible] অবস্থা চিন্তা করিলে শঙ্কিত হইতে হয়। সর্বত্র [illegible]রভাবে জলাভাব—কলিকাতার গঙ্গায় জলে লবণের ভাগ এত করতে যে কলিকাতায় কলের জল ব্যবহার করা দুঃসাধ্য হইয়া[illegible] ব্যয় যাহাদের জলের কল আছে,তাহাদেরও নলকূপ হইতে পা[illegible] জল সংগ্রহ করিতে হইতেছে। সহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা কোন কালেই পর্য্যাপ্ত ছিল না, এই দারুণ গ্রীষ্মে প্রত্যেক সহরবাসীকে তাহা এবার নিদারুণভাবে অনুভব করিতে হইয়াছে। সহরতলী ও গ্রামাঞ্চলের অবস্থা এই দারুণ তাপাধিক্যে আরও সাংঘাতিক হইয়াছে। লোককে আধমাইল দূর হইতে স্নান, পান বা রন্ধনের জল সংগ্রহ করিতে হয়। প্রায় সকল পুকুর শুকাইয়া গিয়াছে, মাছ মরিয়া যাইতেছে, চাষের আয়োজন করার উপায় নাই, মাঠে তরিতরকারীর গাছ শুকাইয়া যাইতেছে ও ফলে ফসল হইতেছে না। পটোল, বেগুন, উচ্ছে প্রভৃতি তরকারী দুর্মূল্য—আলুর চাহিদা বেশী থাকায় সঞ্চিত আলুর পরিমাণও কমিয়া যাইতেছে। আম, কাঁটাল প্রভৃতি ফল ভাল হইয়াছিল বটে, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে সে সকল ফল বাড়ে নাই বা সুস্বাদু হয় নাই। অত্যধিক গরমে শুধু কলিকাতা সহরে নহে, পশ্চিম বাংলার সর্বত্র মানুষ শত শত সংখ্যায় সর্দিগর্মি হইয়া মারা গিয়াছে। কলিকাতার ঘরের মধ্যে কাজ করিতে করিতে, ট্রাম বা বাসে যাতায়াতের সময় বা পথ চলিতে গিয়া বহুলোক মৃত্যুবরণ করিয়াছে। মাঠে কৃষক

কাজ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে, আর গৃহে ফিরিয়া আসে নাই। জলাভাবে ও খাদ্যাভাবে যে কত লোক মরিয়াছে। তাহার সংখ্যা নাই। এখনও যদি প্রচুর বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে এবার পাট বা ধান চাষ কিরূপে হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া সকলে ব্যাকুল হইয়াছেন। কেন পশ্চিমবঙ্গে গরম এত বাড়িয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, গাছের অভাবই ইহার প্রধানতম কারণ। গত ১৫ বৎসর ধরিয়া এক দিকে যেমন 'অধিক খাদ্য উৎপাদন' চেষ্টা আদৌ ফলবতী হয় নাই, অন্যদিকে তেমনি 'বৃক্ষ রোপণ চেষ্টা'ও প্রায় নিষ্ফল হইয়াছে। সরকারী বস্থায় যে বন-সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে, তাহাও আমরা ন ও মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি স্থানে দেখিয়া করিয়াছি, তাহাও কার্য্যকরী হয় নাই। কত গাছ কাটিয়া ১৮লয় বা বাড়ী নির্মিত হইয়াছে, পথ তৈয়ার হইয়াছে, কতাহার পরিবর্তে নূতন করিয়া বৃক্ষ রোপণ করা হয় ন সাধারণ মানুষ আজ বিভ্রান্ত, বিপথে পরিচালিত, ন ভাল কথা বলিলে তাহারা সে দিকে কর্ণপাত করে । কাজেই গত ২০ বৎসরে পশ্চিম বাংলায় কয়টি নূতন ফলের বাগান হইয়াছে, তাহা আঙ্গুলে গণনা করা যায়। পূর্বে প্রত্যেক গৃহস্থ তাহার গৃহ-সংলগ্ন জমীতে ২।৪টি ফলের গাছ তৈয়ার করিত, আম, কাঁঠাল শুধু নহে, পেয়ারা জামরুল, জাম, আতা, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতির গাছও কম ছিল না। এখন আর কেহ সে কাজ করা প্রয়োজন মনে করে না। ফলে পশ্চিম বাংলা বৃক্ষ শূন্য হইয়াছে—বিরাট সুন্দরবন কাটিয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে, সেখানে কোন প্রয়োজনীয় গাছ কেহ রোপণ করে নাই। গত ১০।১২ বৎসরে বৃক্ষ রোপণ উৎসবে কয়েক লক্ষ করিয়া চারা গাছ বিতরণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু হিসাব করিলে দেখা যাইবে, তাহার হাজার করা একটি বাঁচে নাই—সেগুলি বাঁচাইবার জন্য কেহ চেষ্টাও করে নাই। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে জলাভাব ও গ্রীষ্মাধিক্য হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। এ বিষয়ে সরকারী উদ্যোগের সহিত যদি জনসাধারণের চেষ্টা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়, তবেই বাংলাদেশ আবার গাছপালায় পূর্ণ করা সম্ভব হইবে। ধনী, শিক্ষিত, উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের যত দিন না এ বিষয়ে আগ্রহ বাড়িবে, ততদিন প্রতি বৎসর এই ভাবে হাজার হাজার লোক শুধু দুঃখ ভোগ করিবে না, মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য হইবে। এ বৎসরের প্রচণ্ড গ্রীষ্ম যদি আমাদের এ বিষয়ে মনোযোগী না করে, আমরা যদি ঠেকিয়াও না শিখি, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ এই ভাবে প্রতি বৎসর দারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। মফঃস্বলের বহু সহরেও জলাভাবে ও গ্রীষ্মাধিক্যে শুধু মানুষ মরে নাই, বহু গবাদি পশু মারা গিয়াছে। কৃষ্ণনগরে বহু গাছের বহু বাদুড় গরমে হাজারে হাজারে মরিয়া গিয়াছে। অন্যান্য বহু পাখীও জলাভাবে ও গরমে মারা গিয়াছে। এই অভূতপূর্ব অবস্থার কেন উদ্ভব হইল, সে বিষয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষের কারণ অনুসন্ধান করিয়া সত্বর প্রতীকারের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। জনগণের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে দাবী উপস্থিত করাও কর্তব্য। স্বাধীন দেশের মানুষকে যদি নিত্য নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়, তদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছু থাকিতে পারে না।

ডাক্তার স্বদেশ বসু—

কলিকাতার বিখ্যাত স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ডাঃ স্বদেশ বসু গত ২৯শে মে বৃহস্পতিবার বিকালে তাঁহার ৪৭ চৌরঙ্গী রোডস্থ বাসভবনে মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি এম-এল-এ ও শ্রমিক-নেত্রী ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর স্বামী। স্বদেশ বসু ফরিদপুর জেলায় মুকসুদপুরের ডাঃ সূর্য্যকুমার বসুর পুত্র। বি-এসসি, এম-বি পাশ করিয়া তিনি দীর্ঘকাল চিত্তরঞ্জন সেবা সদনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে তিনি ভিয়েনা ও লণ্ডনে যাইয়া স্ত্রীরোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিয়াছিলেন।

রাম সুন্দর সিং—

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রামসুন্দর সিং গত ২৯শে মে ৮২ বৎসর বয়সে তাঁহার গড়বেতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রাজনীতিক সংগ্রামে বহুবার কারাবরণ করিয়াছিলেন ও দীর্ঘকাল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য ছিলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। এরূপ অক্লান্তকর্মী, নিষ্ঠাবান, সহৃদয় ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়।



বিবাহ বার্ষিকী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে জল্পনা কল্পনা অনেকদিন ধরেই চলছিল। বিকাশ আর নন্দা তাদের বিয়ের দশম বার্ষিক উৎসব এবার ঘটা করে যাপন করবে। গরজটা বিকাশের চেয়ে নন্দারই বেশি। নন্দার দাদা বউদি, দিদি জামাইবাবু সহপাঠিনী বান্ধবীরা সবাই কত নতুন নতুনভাবে তাদের বিয়ের দিনটিকে স্মরণ করে। কেউ স্ত্রীর জন্যে শাড়ি গয়না কিনে নিয়ে আসে, কেউ স্ত্রীকে নিয়ে সহরের বাইরে গিয়ে দিনটি কাটিয়ে আসে, গাড়ি থাকলে গাড়িতে যায়, না হলে ট্রেনে যায়, কেউ বাগানবাড়ি টাগানবাড়িতে গিয়ে পিক-নিক করে, কেউ বা নিজের বাড়িতেই আত্মীয় স্বজনকে ডেকে খাওয়ায়। কতভাবে আমোদ-আহ্লাদ করে। ওসব দূরে থাকুক নন্দা এমন কপাল করে এসেছে যে এ্যানিভার-সারির দিনে ভালো একখানা শাড়িও তার জোটেনা। প্রথম দু'চার বছর বিকাশ কবিতার বই আর ফুল নিয়ে আসত। ক বছর ধ'রে তাও গেছে। গতবার ছিল বিচ্ছুর অসুখ,তার আগের বার নন্দা নিজেই টাইফয়েডে পড়েছিল। বিবাহ বার্ষিকীর দিনে বন্ধু-বান্ধব ফুল কি ধূপকাঠি কিচ্ছু আসেনি, ডাক্তার আর ওষুধ পথ্যই এসেছে। তার আগের বার নন্দা ওই সময়টায় বাবার কাছে কৃষ্ণনগরে ছিল। তার ফলে বিকাশের আর কোন খরচ হয়নি। খামে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েই স্মরণোৎসব শেষ করেছে।

বিকাশ হেসে বলে, 'দেখ ওসব বড় লোকের' উৎসব বড়লোককেই মানায়। গরীবের কি ঘোড়া-রোগ সাজে। সর্বসাকুল্যে পাইতো আড়াই শো। তার মধ্যে বাড়িভাড়া দোকানপাঠ মাসকাবারি দুটি ছেলেমেয়ের খোরাক-পোষাক স্কুলের মাইনে, ডিসপেনসারির ওষুধের বিল মিটিয়ে এ্যানিভারসারি ট্যানিভারসারির কথা কি আর মনে থাকে? যদি বেঁচে-বর্তে থাকি, আর অবস্থাটা ততদিনে ভালো হয়ে যায় আমরা এক সেনটিনারি করব। বিবাহ শতবার্ষিকী। নামটা যেমন গালভরা হবে, উৎসবটাও তেমনি বেশ জাঁমকালো করে করব।

নন্দা রাগ করে জবাব দেয়—কষ্ট করে তোমাকে এতদিন অপেক্ষা করতে হবে না। আমার যা স্বাস্থ্য তাতে দু'চার বছরের মধ্যেই আমি তোমাকে রেহাই দিয়ে যেতে পারব। তখন ঘটা করে দ্বিতীয় পক্ষ কোরো।'

বিকাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গম্ভীরভাবে জবাব দেয়, অত তাড়াতাড়িই কি আর সে ব্যবস্থা করতে পারব? তার আগে একটা তাজমহল তৈরীর ব্যয় আছে না?

নন্দা রাগ করতে করতেও স্বামীর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে বলে 'ঈশ, আমার কী একজন শাজাহানরে।'

তারপর যথারীতি স্বামী স্ত্রীতে সন্ধি হয়ে গেল। বিকাশ বলল, 'আচ্ছা, তোমাকে এবার একখানা দামী শাড়ি কিনে দেব।'

নন্দা বলল, 'কী শাড়ী দেবে বেনারসী?

বিকাশকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে নন্দা ফের হেসে ফেলল? ভয় নেই গো, ভয় নেই। তোমার কাছে সত্যি সত্যি বেনারসীও চাইব না, সিল্ক জর্জেটও চাইব না। তাঁত দাও মিল দাও—যা তুমি হাত তুলে দেবে তাই আমার ঢের। তবে হাসিমুখে দিতে হবে কিন্তু। সব টাকা একখানা শাড়িতে ব্যয় করে বসব এমন বে-আক্কেল আমি নই।'

তারপর মাস ভরে নন্দার জল্পনা-কল্পনা চলে বিবাহ-বার্ষিকীর জন্যে বরাদ্দ করা টাকাটা তারা আর কত সার্থক ভাবে ব্যয় করতে পারে। নন্দার একবার ইচ্ছা হয় শাড়ি ফুল বই টই কেনা ছাড়াও দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে খাওয়ায়। গতবার ফাল্গুন মাসে বীথিকা ভবানীপুর থেকে

তাদের ম্যারেজ—এ্যানিভারসারিতে নিমন্ত্রণ করেছিল। বিকাশ যায়নি, কিন্তু নন্দা না গিয়ে পারেনি। কবিতার বই আর রজনীগন্ধায় টাকা আড়াই খরচ করেছিল। বীথিকা খাইয়েছিল খুব। পোলাও মুরগীর মাংস দই মিষ্টি। অত না খাওয়াতে পারলেও বীথি আর পরেশবাবুকে একবার না বললে কি ভালো দেখায়? আর কিছু না হোক বন্ধুকে ডেকে যদি ডাল ভাত মাছের ঝোল খাওয়ানো যায় তাতেও শান্তি।

কিন্তু এমন স্বামীর হাতেই পড়েছে নন্দা—যার মনে কবিত্ব কল্পনা বলে কোন পদার্থ নেই। তার কেবল হিসাব আর হিসাব। মার্চেণ্ট অফিসের একাউনটস্ ডিপার্টমেণ্টে আর যেন কেউ তুনিয়ায় কাজ করে না। তারা কি সবাই হিসাবের খাতাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে আসে?

প্রীতিভোজের প্রস্তাবে বিকাশ বলে, খেতে বললে শুধু তো আর পরেশবাবু আর তাঁর স্ত্রীকে বললেই চলে না? আরো দু'চার জনকে বলতে হয়। সে এক বিয়ের খরচ। তোমার বাবা কি দ্বিতীয়বার সে খরচ বইতে রাজী হবেন?

নন্দা রাগ করে বলে, 'দায় পড়েছে আমার বাবার। দরকার নেই তোমার কিচ্ছু করে, ফের যদি আমি এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলি তাহলে আমার ফিরিয়ে নাম রেখ।'

কিন্তু নতুন নামে ডাকবার সুযোগ স্বামীকে নিজেই করে দেয় নন্দা। পরদিনই আবার নতুন প্লান করে। ছেলে মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে স্বামীর মশারির মধ্যে এসে বসে, 'আচ্ছা যাক, দরকার নেই এবার আর কাউকে বলে। আসছে বছর বলব। এবার আমরা দুজনে ফটো তুলব, সিনেমা দেখব। সকাল বেলাটা বিচ্ছু আর রীণাকে কোন জায়গা থেকে বেড়িয়ে আনব। তারপর দোতলার মাসীমার কাছে ওদের রেখে আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ব। দুজনে এক সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ফুল কিনব, ধূপকাঠি কিনব, কী বল?

বিকাশ বলে, 'আচ্ছা।'

নন্দা বলে, 'তারপর রাত্রে ফিরে এসে কী করব বল দেখি।' বিকাশ বলে, 'খাওয়া দাওয়াটা সেদিন বেশ ভালোই হবে আশা করি। ভূরি ভোজের পর সহজেই ঘুম পাবে। দশটা বাজতে না বাজতেই দুজনের নাক ডাকতে থাকবে। বিয়ের দিন একটা সানাই বেজেছিল, এ্যানিভারসারির দিন দুটো সানাই বাজবে।'

নন্দা বলে, 'দেখ, ফের যদি ওসব কথা বল, আমি তোমার মুখ দেখব না! সেদিন রাত জেগে জেগে আমরা আমাদের সেই পুরোন চিঠিগুলি পড়ব। তখন কী সুন্দর সুন্দর চিঠিই না তুমি লিখতে। বারবার পড়লেও তা যেন আর ফুরোতে চাইত না। মাঝে মাঝে আবার কবিতা থাকত। কিছু রবীন্দ্রনাথের কিছু নিজের। তখনকার দিনের তোমার অনেক চিঠিই আমি যত্ন করে তুলে রেখেছি। কিন্তু আমার লেখা জবাবগুলির একটাও তোমার বাকসে সুটকেশে কোথাও খুঁজে পাইনি। আমার চিঠি তুমি রাখবে কেন। আমি তো আর ভালো লিখতে পারিনে। যারা পারত—তোমার সেই বান্ধবীদের চিঠি কিন্তু দু'চারখানা এখনো আছে।'

বিকাশ বলে, 'কী যে বল, আমার বান্ধবী টান্ধবী কেউ নেই। গৃহিণী বলতেও তুমি, সচিব বলতেও তুমি, সখি বলতেও তুমি।'

কথাটা একেবারে অসত্য নয়, ছেলেমেয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীজাতিরা অন্য কারো মুখ দেখা একেবারে বন্ধ না করলেও মন দেয়ানেয়ার পালা পুরোপুরিই শেষ করে ফেলেছে বিকাশ। বিশ্বাস-হন্তার খড়্গ নন্দার ওপর যে পড়েনি সেজন্যে কৃতজ্ঞ। তার পরিচিত অনেককে এ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে।

বাদ প্রতিবাদের মধ্যে না গিয়ে নন্দা বলে, 'আমরা তাহলে রাত জেগে চিঠিগুলি পড়ব কী বল।'

বিকাশ আর আপত্তি করেনা। বিয়ের দশ বছর পরে দুটি ছেলে মেয়ের মা হওয়া সত্বেও নন্দা যে এতখানি রোমান্টিক রয়ে গেছে সে কথা জেনে বিকাশের বরং আনন্দই হয়; বিস্ময়ও নিতান্ত কম হয়না। মনের এতখানি সজীবতা ও রাখতে পারল কী করে? নিশ্চয়ই স্বচ্ছল অবস্থার বান্ধবীদের কাছে সব গল্প শুনেছে, কি সৌখীন সমাজ নিয়ে লেখা নবেল টবেল পড়ে হাতের কাছে অন্য কোন পুরুষকে না পেয়ে বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে স্বামীর সঙ্গেই আর একবার প্রেমে পড়বার, কি পড়িপড়ি ভাব করবার সাধ হয়েছে নন্দার। যাই হোক এ সাধ এবার আর বিকাশ অপূর্ণ

রাখবেনা। পরিকল্পনা যে মঞ্জুর তা নন্দাকে সে জানিয়ে দিল।

ভোরবেলার চায়ের আসরেও এসব আলাপ আলোচনা হয়। ষোলই জ্যৈষ্ঠের আর বেশি দেরি নয়। আগে থেকেই তৈরী হতে হবে। নন্দা স্বামীকে অনুরোধ করে লাইফ-ইনসিওরের কোয়ার্টালি প্রিমিয়ামটা যেন এমাসে না দেয় বিকাশ। সামনের মাসে না হয় কিছু ফাইন দিয়েই তা দেওয়া যাবে।

বিকাশ বলে 'আচ্ছা আচ্ছা সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবেনা। ষোলই জ্যৈষ্ঠের অনুষ্ঠান ঠিক মতই হবে।'

বিচ্চু আর বিবলি গম্ভীর হয়ে বাপমার আলোচনা শোনে।

আট বছরের ছেলে বিচ্চু বলে, 'মা, ষোলই জ্যৈষ্ঠ কার জন্মদিন? তোমার?'

নন্দা বলে, 'দূর বোকা।

'বাবার?'

নন্দা হেসে বলে, 'দূর তা নয়।'

বিচ্চুর ছোট বোন ছ'বছরের বিবি বলে, 'দাদাটা বোকা। কিচ্ছু জানেনা।'

বিকাশ হেসে বলে, 'তুই জানিস?'

বিবি বলে, 'জানি। বিয়ের জন্মদিন। তোমাদের বিয়ের।'

বিকাশ হেসে উঠে স্ত্রীকে বলে দেখেছ নন্দা—তোমার মেয়ে এখনই কি রকম সেয়ানা হয়েছে দেখেছ? ওকে যদি আটবছরে গৌরী দান না করতে পারি নবম বছর থেকে পাড়ার ছোকরাদের ও মাথা খেতে সুরু করবে তোমাকে বলে রাখলাম।'

কলের কাছে কাজ করে নন্দার ঠিকে ঝি সুখলতা। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর। কপালের সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা টানা থাকলেও সে কর্তা গিন্নী দুজনের সঙ্গেই কথা বলে। হাসি তামাসায় যোগ দেয়। বিকাশ আর নন্দা দুজনেই ওকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কাজ করতে এসে সুখলতা চা খায়, দু চারটে সুখদুঃখের কথার বিনিময়ও যে না হয় তা নয়। সুখলতা বাসন মাজে, বাটনা বাটে, কয়লা ভাঙে, উনুনে আঁচ দিয়ে দেয়। মাসে আট টাকা করে নেয়। বাইরের কাজ করলেও বিকাশ আর নন্দার ঘরের খবর সে রাখে। কত টাকা মাইনের চাকরি করে বিকাশ, কটাকার কাঁচা বাজার করে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনদিন কোন ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য হয় তা পর্যন্ত সে আন্দাজ করে।

বিকাশের কথা শুনে সেদিন বাসন মাজতে মাজতে সুখলতা বলল, 'ষোলই জ্যৈষ্ঠ খুব ভালো দিন না দাদাবাবু?

বিকাশ বলল, 'কেন বলতো? ভালো দিন নিশ্চয়ই। ক্যালেণ্ডারের লাল তারিখ না হলে কি হবে, আমাদের পক্ষে রাঙা শুক্কুরবার।'

সুখলতা বিকাশের কথার ব্যঞ্জনা সবখানি না বুঝতে পারলেও হাসল, 'আমাদের বস্তীর চক্কোত্তি মশাইও তাই বললেন। তিনটে লগ্ন আছে ওইদিন। তারার বিয়ে ওইদিনই ঠিক করে ফেললাম বউদি।'

তারা সুখলতার বড় মেয়ে! পনের ষোল বছর বয়স হয়েছে। মাথায় এক গোছ কোঁকড়ানো চুল। রঙটা ফর্সা। মুখখানা একটি পানের মত। কথাবার্তা তত বলেনা। কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখলে বোঝা যায় মার মতই বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে।

এর আগে তারাকে মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সুখলতা। মেয়েকে দিয়ে নন্দার পান সাজিয়েছে, কি ময়দা মাখতে বসিয়েছে। তার বদলে চেয়েছে পুরোন শাড়ি ব্লাউজ। সময় সময় না চাইতেও দিয়েছে নন্দা। আহা বেচারা। না দিলে পাবে কোথায়?

নন্দা সুখলতার কথার জবাবে বলল, 'একেবারে ষোলই জ্যৈষ্ঠই ঠিক করে ফেললে? আমাদের কাছে একবার জিজ্ঞাসাও করলেনা?'

বিকাশ পরিহাসের সুরে বলল, 'কেন ভালোই তো হয়েছে নন্দা। আমাদের ফাংশনটা না হয় সুখলতার বাড়ি গিয়েই করা যাবে। তোমার মেয়ের বিয়েতে আমাকে নিমন্ত্রণ করবে তো সুখলতা?'

সুখলতা বলল, 'কী যে বলেন দাদাবাবু। আপনারাই তো মেয়ের বিয়ে দেবেন। আপনারা না দিলে আমার কি সাধ্য আছে ওই মেয়েকে নামানো? আমারও সাধ্য নেই, তারার বাপেরও সাধ্য নেই। বুড়ো নিত্যরোগা যম-ধরা হাঁপানির রোগী। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একটি

পয়সা কামাই করেনি। সব আমাকে দেখতে হচ্ছে। আপনারা না দিলে আমি কোথায় পাব দাদাবাবু।'

বিকাশ কি বলবার আগে নন্দা বলে উঠল, 'তাইতো তোমাকে বলছিলাম সুখলতা। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই মেয়ের বিয়ের তারিখ ঠিক করে ফেললে, এদিকে ওইদিন যে আমাদের একটা বাড়তি খরচ আছে।'

সুখলতা বলল, 'তা জানি বউদি। সেই বাড়তি খরচের মধ্যে দয়া করে একটু হাত ঝাড়বেন তাহলেই আমার হ'য়ে যাবে। পুরুত ঠাকুর বললেন দিনটা খুব ভালো। এদিকে পাত্রপক্ষেরও বেশ গুরুজ। মেয়ে খুব পছন্দ হয়ে গেছে। তাই আর দেরি করলাম না বউদি।'

সুখলতার মেয়ের বিয়ে আর নন্দার বিবাহ-বার্ষিকীর দিন একই সঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল। তোড়জোড় কোন পক্ষেরই কম নয়। নন্দা মনে মনে ঠিক করল, এদিনের সব খরচটা স্বামীর ঘাড়ে ফেলবে না। কাগজ বিক্রী করা টাকা যা সঞ্চয় করেছে তা তো নন্দার নিজেরই সম্পত্তি। তা এই উপলক্ষে ব্যয় করবে। গোপনে গোপনে আরো পাঁচ সাত টাকা যা জমিয়েছে তাও এই দিনের কল্যাণে ভাঙলে দোষ নেই।

কিন্তু সুখলতা ভারি অবুঝ মেয়েমানুষ। তার দাবিদাওয়ার যেন আর শেষ নেই। সে বাটনা বাটতে এক মুখ হেসে বলল, 'বউদি, তারাকে কী দেবেন বলুন।'

নন্দা চুপ করে রইল।

সুখলতা বলল, 'তারাকে কিন্তু একখানা জিনিস দিতে হবে। হাতের হোক কানের হোক একখানা জিনিস আপনারা দেবেন। সারাজীবন আপনাদের দয়া মনে করে রাখব বউদি।'

নন্দা বলল, 'অসম্ভব। এমাসে আমি কিছুই খরচ করতে পারব না তা তোমাকে আগেই বলে দিয়েছি। এ মাসে আমার নিজেরই খরচের সীমা নেই।'

সুখলতা তখন বলতে আরম্ভ করে, 'ঘোষালরা কিন্তু কানের দুল দিয়েছে বউদি।'

নন্দা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তা দিক গিয়ে। যার যা সাধ্য তাই তো দেবে। আমার নেই আমি কোত্থেকে দেব।'

শুধু ঘোষালরা নয়, দত্তরা মুখুয্যেরা চৌধুরীরা সবাই দামী দামী জিনিস দিয়েছে কি দিতে চেয়েছে সুখলতাকে। কেউ চুড়ি, কেউ দুল, কেউ সিলকের শাড়ি, কেউ বা বাসন কোসন। এদের কোন কোন বাড়িতে নতুন কাজ নিয়েছে সুখলতা। কোন বাড়িতে কাজ খুবই সামান্য। শুধু স্বামী স্ত্রীর দুখানা বাসন মেজে দেওয়া, তা সত্ত্বেও সুখলতার কন্যাদায়ে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করছেন। নন্দারা পুরোন মনিব হয়ে যদি এমন বিমুখ হয় তাহলে সুখলতার মত গরীবরা দাঁড়ায় কোথায়।

কিন্তু নন্দা কিছুতেই বেশি প্রতিশ্রুতি দিল না। সে বলল, 'পুরোন শাড়ি ব্লাউস তুমি কম নাওনি আমার কাছ থেকে। তারপর ধার বলেই হোক, আর বকশিস বলেই হোক—ফি বছরে বিশ পঁচিশ টাকা করে বেশি নিচ্ছ। তোমার মেয়ের বিয়েতে আলতা আর তেল সাবানের খরচ বাবদ পাঁচটা টাকা আমি ধরে দিতে পারি, তার বেশি এ মাসে কিছুতেই দিতে পারব না।'

সুখলতা বলল, 'তাহলে আপনি ধান দুর্বা দিয়েই তারাকে আশীর্বাদ করবেন বউদি। আর কিছু আপনার কাছে চাইব না।'

স্পর্ধা দেখ ঝি চাকরের। নন্দা ভাবল তখনই ওকে বিদায় করে দেয়। কিন্তু ঠিকে ঝি সুলভ নয়। তাই মনের রাগ মনেই চেপে রাখতে হল।

বিকাশ স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বলল, এক কাজ করো না! ভাঙাচোরা সোনা যদি কোথাও থাকে ওকে বের করে' দাও, যা হোক কিছু একটা তৈরি করিয়ে নেবে।'

নন্দা বলল, 'থাকলে তো দেব। বিয়ের পর কত গয়না-গাঁটি তুমি আমাকে গড়িয়ে দিয়েছ। জানা আছে মুরোদ। বলে একখানা শাড়ি কিনে দিতে বললে প্রাণ ফেটে যায়।'

বিকাশ আর ঝগড়া না বাড়িয়ে অফিসে চলে গেল।

সুখলতা অবশ্য ধানদুর্বার ভরসায় রইল না। নন্দার কাছ থেকে পাঁচ টাকাই হাত পেতে নিল। বিকাশ নিজের পকেট খরচ থেকে গোপনে আরো পাঁচ টাকা দিল সুখলতাকে। কিন্তু তাতেও কি ওর মন ওঠে? কিন্তু মুখে খুবই ভদ্রতা করল সুখলতা। মিষ্টি হেসে বলল, 'যাবেন কিন্তু দাদাবাবু। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে

একবার গিয়ে পায়ের ধুলো দিয়ে আসবেন বউদি। আশীর্বাদ করে আসবেন তারাকে। দেশে থাকলে আরও কত আমোদ-আহ্লাদ ব্যয়ভূষণ করে বিয়ে দিতাম বউদি। কিন্তু সে কপাল তো ওর নয়।'

নন্দা বলল—যাক গিয়ে জামাইটি তো ভালোই পেয়েছ।'

সুখলতা বলল, 'হ্যাঁ বউদি, আপনাদের আশীর্বাদে ছেলেটি ভালো। বেলেঘাটায় নিজেরই সেলুন আছে। দু-তিনজন লোক তাতে খাটে। ভালো অবস্থা। মেয়েটাকে দেখে শুনে পছন্দ করেছে তাই। নইলে ও সম্বন্ধ কি আমরা করতে পারি?'

নন্দা ভাবল বিয়ের দিন একবার গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবে। অত করে বলছে যখন। পাড়ার মধ্যেই ওদের বস্তি। তাদের সিমলাইপাড়া লেন থেকে মাত্র মিনিট কয়েকের পথ।

তবু যাই যাই করে যাওয়া হল না। সময়ই করে উঠতে পারল না নন্দা। সকাল থেকেই কাজ। কাল রাত্রে গিয়ে দোতলার মাসীমা মেসোমশাইকে থেতে বলে এসেছে। এই প্রৌঢ় দম্পতি তাদের দেখা শোনা করেন, খোঁজখবর নেন, ছেলেমেয়ে দুটিকে ওঁদের কাছে রেখে নন্দা কোনদিন মার্কেটিংএ যায়, কোনদিন বা সিনেমায়। পুরোন বান্ধবীদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাতের ইচ্ছা হয় কোন কোন সময়। কোন একটা উপলক্ষে ওঁদের না বললে কি চলে?

আর দুজন বাইরের লোককে খেতে বললেই তার জন্যে আলাদা বাজার করতে হয়, রান্না-বান্নার একটু বিশেষ ব্যবস্থা না করলে ভালো দেখায় না। ওঁদের আবার বেলায় খাওয়ার অভ্যাস। সব কাজ সারতে সারতে 'দুটো' আড়াইটে বেজে গেল।

এদিকে বিচ্ছু আর বিবি ভারি দুষ্টু হয়েছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে, 'জানিস, আজ আমাদের বাবা মার বিয়ে।'

মাসীমা বলছেন, 'তাই নাকি বিচ্ছু? সম্প্রদান করবে তুমি বুঝি? তুমি তোমার মায়ের বাবা—না বাবার বাবা?'

বিচ্ছুও কম চালাক নয়, সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিচ্ছে, 'আমি মারও বাবা, বাবারও বাবা। আমাকে মাও বাবা বলে, বাবাও বাবা বলে।'

কী দুষ্টুই হয়েছে ছেলে।

বেলা গেলেও এইটুকু ভেবে নন্দার তৃপ্তি যে এমন দিনে অন্তত একটি সুখী দম্পতিকে এই উপলক্ষে আপ্যায়ন করে আজ তাঁদের আশীর্বাদ নিতে পেরেছে। 'বাপ-মা দূরে থাকেন। তাঁদের তো বলতে পারল না। কিন্তু তাঁদের বয়সী দুজনকে বলল।

অনেক বলা-কওয়ার পর বিকাশ সত্যিই সেদিন অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে। বাজার করেছে, ছেলে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসেছে। ওদের টফি আর চকোলেট কিনে দিয়েছে। সবই অবশ্য নন্দার বুদ্ধি, তারই পরামর্শ। বিকেলে বাপ-মাকে এক সঙ্গে বেরোতে দেখে ওদের যাতে হিংসা না হয় সেই জন্যেই এই সব ব্যবস্থা।

তবু গোলমাল যেটুকু হবার তা হলই। নন্দাকে সেজে-গুজে বিকাশের সঙ্গে বেরোতে দেখে বিচ্ছু আর বিবলি দুজনেই বায়না ধরল তারাও যাবে।

বিকাশ পরিহাস করে বলল, 'ক্ষতি কি, ওরাও বরযাত্রী হিসেবে আসুক না সঙ্গে।'

নন্দা বলল 'তোমার কেবল ঠাট্টা। ব্যাপারটাকে তুমি মোটেই সিরিয়াস্‌লি নিচ্ছ না।'

ভুলিয়ে টুলিয়ে বিচ্ছু বিবলিকে মাসিমার কাছেই গছিয়ে রেখে গেল নন্দা। আজ তার ওদের নিয়ে বেরো-বার মোটেই ইচ্ছা নেই। আজ কয়েক ঘণ্টার জন্যে সে শুধু প্রিয়া। জননীও নয়, গৃহিণীও নয়। কিন্তু বেশি দূর বেড়ানো হল না। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, বিকাশের দৌড় শ্যামবাজার। নড়তে চড়তে তার ভালো লাগে না। ছুটির দিনে আয়েস করে শুয়ে বসে ঘুমিয়েই সে তৃপ্তি পায়। আলস্যের চেয়ে সংসারে বড় উপভোগ্য তার কাছে যেন আর কিছু নেই।

তবু অনেক আশ্চর্য কাণ্ড করল বিকাশ। রেষ্টুরেন্টের পর্দা ঢাকা কেবিনে বসে স্ত্রীকে নিয়ে চা আর ফাউল কাটলেট খেল। ছোট একটা ষ্টুডিয়োতে ঢুকে যুগল ফটো তুলল—যাতে বিকাশের চিরদিনের আপত্তি। নাইটশোয়ের সিনেমার টিকিট কিনল দু'খানা। কাপড়ের দোকানে ঢুকে পঁয়ত্রিশ টাকা দামের সিল্কের শাড়ি কিনে বসল। অবাক কাণ্ড।

নন্দা লজ্জিত হয়ে বলল, 'এ কী করলে বলতো। শাড়ির জন্যে আঠের টাকার বেশি তো বরাদ্দ ছিল না।' বিকাশ বলল, 'বরাদ্দ কথাটা বড় বেশি গন্ধ ঘেঁষা। আধুনিক কবিতাতেও ওর ব্যবহার নেই। শাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা তাই বল। পাড় জমিন—,

নন্দা খুসি হয়ে বলল, 'দুইই চমৎকার। আমার পছন্দের চেয়ে তোমার পছন্দ ঢের বেশি ভালো। কিন্তু খরচে কুলোবে কী করে। এত টাকা পেলেই বা কোথায়?

বিকাশ বলল,' 'সেজন্যে ভেবোনা। কারো তবিল তছরুফ করিনি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

নন্দা বলল, 'কিন্তু আমি তো তোমাকে কিছু দিলাম না। বিকাশ আবৃত্তির সুরে বলল—গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়। তোমরা তো নেওয়ার ভিতর দিয়েই দাও।"

তবু চার আনা দিয়ে একটি বেল ফুলের মালা কিনে নিল নন্দা।

তারপর ওরা বাড়ি ফিরল। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মাসীমাকে পাহারায় রেখে ওরা নটার শোয়ে সিনেমা দেখতে যাবে। টিকেট তো কাটাই আছে। দশ বার মিনিট দেরি হলেও কিছু এসে যাবে না।

বাসায় পৌঁছে নিজের শোবার ঘরে এসে মালা গাছটি স্বামীর গলায় পরিয়ে দিতে যাচ্ছিল নন্দা, বিকাশ বাধা দিয়ে বলল, 'এখন না পরে। আজ তো একই সঙ্গে বিয়ে বাসি বিয়ে আর ফুল শয্যা। ফিরে এসে ধীরে সুস্থে সব সারব। এবার··ছেলেমেয়েদের ভোজন পর্বটা আগে সেরে ফেল।

তাই সারল নন্দা। খাওয়াবার পর ওদের ঘুমোবার ব্যবস্থা করল। মাসীমাকে আর একবার অনুরোধ করল ওদের দিকে চোখ রাখতে। তারপর সিনেমায় যাওয়ার জন্যে নতুন শাড়িটি পরতে যাচ্ছে দরজার কড়া নড়ে উঠল। 'কে?'

'আমি মনোমোহন।'

সুখলতার সেই বুড়ো স্বামী হাঁপানীর রোগী মনোমোহন হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছে।

এর আগেও দুএকবার টাকা চাইতে, কি স্ত্রীর কাজ কামাইয়ের কৈফিয়ৎ দিতে এবাড়িতে এসেছে মনোমোহন। বিকাশ ওকে চেনে। কুঁজো, কুদর্শন চেহারা। একবার দেখলে আর ভোলা যায়না।

বিকাশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'কী ব্যাপার। তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে?'

'না বাবু!'

'কেন বর আসেনি?'

মনোমোহন সব খুলে বলল। বর এসেছে। তবু সমস্যা মেটেনি। কারণ বিভ্রাট বর নিয়ে নয়, শাড়ি নিয়ে। লাল রঙের যে দামী শাড়িখানা সুখলতার পিসতুতো ভাই অমূল্যধনের—তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছেনা। সে পালিয়েছে। এইরাত্রে চেৎলা থেকে তাকে আর খুঁজে আনা সম্ভব নয়। এদিকে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে? বাড়তি টাকাই বা কোথায়। ভালো শাড়ির অভাবে বিয়েই বন্ধ হতে বসেছে।

বিকাশ বলল, 'নতুন লালপেড়ে যে কোন একখানা শাড়ি পরিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও।'

মনোমোহন কাতরভাবে বলল, 'তা দেওয়ার উপায় নেই বাবু। বরের কাকা বড় সেয়ানা। সে ঘটিবাটি শুদ্ধ সব জিনিস মিলিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছে। একচুল এদিক ওদিক হলেও ভাইপোর বিয়ে দেবেনা। আমার জান যাবে বাবু। একখানা নতুন কাপড় আমাকে দিতেই হবে।'

বিকাশ ফিরে এল ঘরে। স্ত্রীর কাছে এসে বলল, কী ব্যবস্থা করা যায় বল দেখি। শুনেছ তো সবই।'

নন্দা বলল, 'শুনেছি। কিন্তু এক বর্ণও বিশ্বাস করিনি। সুখলতা জানে আজ আমার শাড়ি আসবে। তাই ছলেবলে সেখানা আদায় করে নিতে এসেছে। ওরা ঠক-জোচ্চোর বদমাস। আমি ওদের একবিন্দুও বিশ্বাস করিনে।'

বিকাশ স্ত্রীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'ছিঃ নন্দা। মানুষকে অত ছোট ভেবনা। তাতে নিজেই ছোট হয়ে যাবে। শাড়ির অভাবে একটি গরীবের মেয়ের বিয়ে হচ্ছেনা, আর তুমি বুড়ো বয়সে জমকালো শাড়ি পোরে সোহাগ করছ, আর ওদের গালাগাল দিচ্ছ, মজা মন্দ নয়।'

নন্দা চীৎকার করে উঠল, 'চুপ, চুপ কর। তোমার দরদ যে কী জন্যে তা আর আমার টের পেতে বাকি নেই। আমি বুড়ী? তুমি তো চিরযৌবনের দখলী স্বত্ব নিয়ে এসেছ, যাও তাই ভোগ কর গিয়ে। আমার কাছে আর তোমায় আসতে হবেনা।'

স্বামীর পাশ কাটিয়ে হাত এড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল নন্দা। তারপর মনোমোহনের হাতে নতুন কেনা সিল্কের শাড়িখানি নিঃশব্দে তুলে দিল।

বিস্মিত মনোমোহন কী যেন বলতে যাচ্ছিল—নন্দা তাকে ধমক দিয়ে বলল 'যাও, এক্ষুণি চলে যাও। আর কথা নয়।'

প্রায় শেষ রাত্ত অবধি ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটির পালা চলল। নন্দা বারবার বলতে লাগল, বিকাশের মত স্বামীর হাতে পড়ে জীবনে একদিনের জন্যেও সে সুখী

হয়নি। চিরটাকাল তার দুঃখে দুঃখে গেল। যতদিন যত রকমের দুর্ব্যবহার তার করেছে বিকাশ, নন্দা তার ফিরিস্তি দিতে লাগল।

বিকাশ বিদ্রূপ করে বলল, 'তোমার যেমন স্মৃতিশক্তি তেমনি কল্পনা শক্তি।'

শেষরাত্রে প্রায় ভোর ভোর সময় স্ত্রীর ঘুমন্ত বিষণ্ণ মুখখানির দিকে চেয়ে বিকাশের বড় মায়া হল। ভিজে চোখ দুটিতে চুম্বন করল। ঠোঁট দুটি ভিজিয়ে দিল চুম্বনে চুম্বনে।

নন্দা চমকে জেগে উঠল। তারপর গভীর অভিমানে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি ছোট, আমি হীন, আমি তোমার যোগ্য নই।'

কিন্তু বিকাশ কিছুতেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিল না। জোর করে ধরে রাখল। তারপর এধরণের দাম্পত্য কলহের ফল যা হয় সেই বাঞ্ছিত পরিণতি হল। মিল হয়ে গেল দুজনের।

নন্দা স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বলল, 'একটা কথা বলব, বল রাখবে?'

বিকাশ বলল, 'বল।'

নন্দা বলল, 'কাউকে যেন বলনা, আমি শাড়িখানা ওদের রাগ করে দিয়েছি।'

বিকাশ স্ত্রীকে আরও কাছে টেনে নিয়ে অতি অনায়াসে একটি মধুর মিথ্যা উচ্চারণ করল, 'বাঃ রাগ করে দিতে যাবে কেন? তুমি ইচ্ছা করে দিয়েছ খুসি হয়ে দিয়েছ। নাহলে কি আর দিতে?'



কৈ কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না ?……

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ কালামাটি ॥

টাস্ ফিল্মস-এর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা এই "কালামাটি"। কয়লা-খনির কর্মীদের জীবনযাত্রা নিয়েই এর গল্প। তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-নিরাশা প্রভৃতি নিয়েই



'কালামাটি' চিত্রের একটি দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও অনুপকুমার

এর চিত্রনাট্য গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আছে অসুখা ছোট সাহেব—য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার; স্ত্রী তাঁর মত্ত নাচ গানে পার্টিতে, স্বামীর দিকে ফিরেও দেখেন না। আর আছে কূটবুদ্ধি ওয়েলফেয়ার অফিসর জ্যোতির্ময়, সরল প্রাণ পরোপকারী কেরাণী নির্ম্মল, খাঁটি মানুষ ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জ্জি, আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খনির শ্রমিকদের ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন গড়া 'বেবি-ক্রেশ'-এর তত্ত্বাবধায়িকা মিসেস অনুপমা রায়, তাঁর পঙ্গু স্বামী ও ছোট্ট মেয়ে মুন্নু। এছাড়া আছে খনি শ্রমিক, কুলি কামিন ও তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

কয়লাখনি অঞ্চলের বহির্দৃশ্য ও কয়লাখনির অভ্যন্তরের কিছু কিছু দৃশ্যই এই চিত্রটির প্রধান আকর্ষণ। এর আগে বাংলা চলচ্চিত্রে কয়লাখনির অভ্যন্তরের এরূপ চিত্র দেখা যায় নি। বহির্দৃশ্যের দৃশ্য গ্রহণের দিক থেকেও চিত্রটিকে একটি দৃষ্টান্ত বলা চলে। কুলি-কামিনদের জীবন ও তাদের কর্ম্মধারার সঙ্গে সহরবাসী সাধারণ নাগরিকদের পরিচয় করিয়ে দেয় এই বাস্তবধর্ম্মী ছবিটি যা পরিচালকের পরিচালনা গুণে বাস্তবময় হয়ে উঠে আজিকার বাস্তবমনা দর্শকদের মনকে নাড়া দিয়ে যায়।

অভিনয়ের দিক দিয়েও চিত্রটি সার্থক হয়ে উঠেছে। কুলিকামিনদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ কারিণী অনুপমার ভূমিকায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের অনুপম অভিনয় মনে রাখবার মতন হয়েছে। এরপরই উল্লেখ করা চলে কয়লাখনির অফিসের কেরাণী নির্ম্মলের ভূমিকায় অনুপকুমারের সাবলীল অভিনয় ও খনির য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের ভূমিকায় অসিতবরণের সংযত ও হৃদয়গ্রাহী অভিনয়। খনির ওয়েলফেয়ার অফিসর জ্যোতির্ময়ের ভূমিকায় জীবেন বসু, শ্রমিক যুবতী মরিয়মের ভূমিকায় মানসী সোম, কুলি যুবক সোমরার ভূমিকায় দিলীপ রায় এবং আরও অনেকে যেমন ভানু বন্দোপাধ্যায়, জহর রায় তপতী ঘোষ—এঁদের প্রত্যেকের অভিনয়ই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। অন্য চরিত্রগুলিও সু-অভিনীত হয়েছে। অভিনয় ও বহির্দৃশ্য

ছাড়াও এ ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে এর পরিচালনা। পরিচালক তপন সিংহ এই ছবির মাধ্যমে সত্যই নতুন কিছু বাংলা ছবির দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। যেমন মূক অভিনয়, অর্থাৎ দূর থেকে দেখা যাচ্ছে দু'জন কথা কইছে—কিন্তু ক্যামেরা কাছে নিয়ে এসে তাদের কথোপকথন না শুনিয়ে দূর থেকে তাদের কথোপকথনের দৃশ্যটি দেখান হল অথচ কথাবার্ত্তার বিষয় বস্তুটি হৃদয়ঙ্গম করতে দর্শকদের কোনও অসুবিধা হল না। এ ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে ইঙ্গিতের মধ্য দিয়েই কাজ সারা হয়েছে অর্থাৎ সব কিছুই স্পষ্ট করে দেখান হয়নি। যেমন, য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের স্ত্রী প্রতি সন্ধ্যায় বন্ধুদের নিয়ে বাড়ীতে আমোদ আহ্লাদ করেন, স্বামীর কোনও খোঁজখবরই নেন না। তাঁর এই আমোদ আহ্লাদের দৃশ্যটি একবারও দেখান হয়নি,—শুধু যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ও বাড়ীর সামনে গাড়ীর ভিড় দেখিয়ে অতি নিপুণভাবে ইঙ্গিতে সারা হয়েছে। এই সব টেক্‌নিক্ পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের দর্শকদের কাছে নতুন না হলেও বাংলা চিত্রে এরকম আগে দেখতে পাওয়া যায়নি। পরিচালক তপন সিংহকে পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রের এই সব নতুন টেক্‌নিককে বাংলা চলচ্চিত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সব টেক্‌নিক্ অনেক আগেই এই দেশীয় চিত্রে পরিচালকদের প্রয়োগ করা উচিত ছিল; যাই হোক, এখন যে প্রতিভাধর পরিচালকদের এদিকে নজর পড়েছে এটা সত্যই আনন্দের কথা।

তবে 'কালামাটি' চিত্রটি যে একেবারে নিখুঁত হয়েছে একথা বলা চলে না। চিত্রটির প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এর দুর্ব্বল গল্পাংশ। শ্রীরমাপদ চৌধুরীর 'বিবি করজ' নামে যে ছোট গল্পটিকে ভিত্তি করে এর গল্পাংশ তৈরী হয়েছে সেই গল্পটি খুবই ছোট্ট; সুতরাং নানাদিক থেকে তাকে বাড়িয়ে এদেশীয় চিত্রের দর্শকদের রুচি অনুযায়ী ১১০০০ ফিটের ওপরে নিয়ে যেতে হয়েছে। অথচ এত বড় না করে ৯০০০ ফিটের মধ্যে রাখলে আরও ভাল হত। এই গল্প বাড়াতে গিয়ে য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের একটি নতুন চরিত্রও সৃষ্টি করতে হয়েছে। চরিত্রটির অভিনয় হয়েছে নিখুঁত, তাছাড়া ম্যানেজারের অসুখী মন ও শান্তিহীন জীবন ও শেষে কর্ম্মস্থল ছেড়ে চলে যাওয়ার দৃশ্য—সব কিছুই দর্শক মনে দাগ রেখে যায় সত্যি; কিন্তু এই চরিত্রটি ঠিক যেন এখানে এক হয়ে মিশে যেতে পারেনি, গল্পের সঙ্গে একাঙ্গিভূত হয়ে যেতে পারেনি—কোথায় যেন ফাঁক থেকে গেছে, কেমন একটু খাপছাড়া হয়ে রয়েছে। এছাড়া খ্রীষ্টান ফাদারের চরিত্রটিরও বিশেষ কিছু তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া ফাদার বেশী উইলিয়ম্ বার্ক যে কটি কথা বলেছেন তা সবই ইংরাজিতে। দেশীয় চিত্রে ইংরাজি বা বিদেশী কথা যত কম থাকে ততই ভাল। ফাদারকে দিয়ে ভাঙ্গা বাংলায় কথা বলালে আরও ভাল মানাত। ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জ্জিও একটু বেশি ইংরাজি বলেছেন। বিশেষ করে ছোট্ট মুন্নুকে কবিতা শেখাবার সময় 'Twinkle Twinkle Little Star' না শিখিয়ে কবিগুরুর ছোটদের উপযোগী কোনও কবিতার লাইন আওড়ালে আরও ভাল লাগত। খনির ভেতর দুর্ঘটনার দৃশ্যটিও স্বাভাবিক রূপ পায় নি, সাজান বলে ধরা যায়। দুর্ঘটনায় মতি সর্দ্দারের মৃত্যু দৃশ্যটিও অযথা বিলম্বিত হয়েছে। আর একটি বিষয় হয়ত অনেকের ভাল লাগলেও যেন মনে হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে মুন্নুর জলে ডুবে মৃত্যুর পর অনুপমার শোকসন্তপ্ত মাতৃ হৃদয়ের অভিব্যক্তি অরুন্ধতী দেবী যখন সংযত অভিনয়ের ভেতর দিয়ে চমৎকারভাবেই ফুটিয়ে তুললেন তখন আবার নদীর জলোচ্ছ্বাস, মাটির বুকে সে জলধারা ক্ষীণ হয়ে শেষে শুকিয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখান যেন অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে। এটি না দেখালেও চলত, আর এরকম একটি বাস্তবধর্ম্মী চিত্রের মধ্যে প্রতীক ও অতিরিক্ত ভাবালুতা যত কম থাকে ততই ভাল। সঙ্গীতের দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় পাঁচখানি গানের মধ্যে একটি মাত্র গানই এই চিত্রের সম্পদ। এই গানটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন যখন শুকায়ে যায়,...।' এটি ছাড়া অন্যান্য গানগুলি কানেই লাগে নি, আর অতগুলি গানের দরকারই বা কি? গান বেশী থাকলেই ছবির গতি শ্লথ হয়ে পড়ে, ভাব নষ্ট হয়, একঘেয়ে ও বিরক্তিকর লাগে। আজকের প্রগতিশীল পরিচালকদের এই দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্করের দেওয়া সুরগুলিও তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী হয় নি।

চিত্রটির 'কালামাটি' নাম থেকে স্বভাবতই মনে হয় কয়লাখনিই ছবিটির একমাত্র বিষয়বস্তু; কিন্তু গোড়ার দিকটা সেইরকম হলেও গল্পের মাঝখান থেকে দেখা যায় অনুপমা রূপী অরুন্ধতীই নায়িকা হয়ে উঠেছেন এবং তাঁকে ও তাঁর 'বেবি-ক্রেশ'কে নিয়েই বেশির ভাগ সময় গল্প এগিয়ে চলেছে ও পরিণতি লাভ করেছে; সুতরাং অনেকস্থলেই বেবি-ক্রেশ ও অনুপমাই হয়ে উঠেছে প্রধান—পটভূমিকাটি যদিও কয়লাখনিই রয়ে গেছে। কিন্তু চিত্রটির থেকে মনে হয় কয়লাখনি ও তার শ্রমিক, কুলিকামিন, কর্মচারী প্রভৃতিদের জীবনযাত্রা ও খনি দুর্ঘটনা দেখানই চিত্রটির আসল উদ্দেশ্য—বিশেষ করে চিত্রটি যখন উৎসর্গিত হয়েছে চিনাকুড়ি কয়লাখনির দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকদের আত্মার উদ্দেশ্যে। তাই ঐরকম ছোট্ট একটি সাজান গোছের দুর্ঘটনা না দেখিয়ে বড় রকমের একটি খনি দুর্ঘটনা ও বহু শ্রমিকের সেই দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার দৃশ্য দেখালে ছবিটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠত এবং আসল উদ্দেশ্যও সফল হত।

এই সূত্রে বিখ্যাত অভিনেতা Walter Pidgen অভিনীত একটি নাম করা পুরাতন বিদেশী চিত্র "How Green Was My Valley"-র কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এই চিত্রটিও কয়লাখনি শ্রমিকদের জীবন নিয়েই রচিত। খনি শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিশেষ করে একটি শ্রমিক পরিবারের জীবনেতিহাস সেই পরিবারেরই একটি ছেলের ছোটবেলাকার ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তারই জবানীতে দেখান হয়েছে। এখানে ছেলেটিই নায়ক এবং তাকে ও কয়লাখনিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এর চিত্রনাট্য। অন্যান্য ছোটখাট ঘটনার সমাবেশ থাকলেও তা আসল কেন্দ্র থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি, আর কয়লাখনি ও তার শ্রমিকদের জীবনযাত্রা দেখানই চিত্রটির আসল উদ্দেশ্য হলেও চিত্রটির নামের দিক থেকে বা অন্য কোনও দিক থেকে গোড়াতেই বলে দেওয়া হয় নি আসল উদ্দেশ্যের কথা। যা দেখাতে যাওয়া হচ্ছে স্পষ্ট করে তা বলা হয়না যে আমি এই দেখাচ্ছি, আসল উদ্দেশ্যটা মুখ্য হলেও তা গৌণই থাকবে অথচ সব সময় চোখের ওপর তা যেন থাকে, অর্থাৎ চোখে আঙুল দিয়ে দেখান চলবে না যে 'আমি এই দেখাচ্ছি'—অথচ আসল দর্শনীয় বস্তুটি ঠিক দেখান হয়ে যাবে,—এটাও চলচ্চিত্রের একটি সুনিপুণ টেকনিক, এবং এই টেক্‌নিক্‌কে এই রকম ধরণের চিত্রেই কাজে লাগান উচিত। আর প্রতিভাশালী পরিচালক-প্রযোজকদের কাছ থেকে দর্শকসমাজ এইরকম উন্নত ধরণের কলাকৌশলই আশা করে। প্রগতিশীল কোন শিল্পকেই ধরাবাঁধা গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করে রাখা চলে না। তাকে বাড়তে দিতে হবে, এগিয়ে নিতে হবে, ভরিয়ে তুলতে হবে—নানাভাবে, নবীন সাজে, নতুন শিল্পকলায়। তবেই তা সার্থক হয়ে উঠবে, আসন পাততে পারবে বৃহত্তর বিশ্বের বিশাল মানব সমাজের মনে। 'কালামাটি'-তে এই রকম নতুন টেক্‌নিকের কিছু কিছু পরিচয় পরিচালক দিয়েছেন; তাই "কালামাটি" এই দিক থেকে একটি বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা বলে অভিনন্দিত করি এর পরিচালক ও প্রযোজককে, ধন্যবাদ জানাই এর কুশলী শিল্পীদের।

* * * *

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র পর পরিচালক শ্রীসত্যজিত রায় অপরাজিতর দ্বিতীয় ভাগকে অবলম্বন করে 'অপুর সংসার' রচনায় শীঘ্রই নামবেন। শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নামে এক প্রতিভাশালী নবাগত অভিনেতা অপুর ভূমিকায় অবতরণ করবেন। সুরসৃষ্টির ভার পণ্ডিত রবিশঙ্করকে দেওয়া হয়েছে।

* * * *

বি-এ-পি প্রোডাকসন্সের 'অদৃশ্য ইঙ্গিত' এর আভ্যন্তরীণ দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে এম-পি ষ্টুডিয়োতে গত ২৯শে মে থেকে। বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অগ্রগতির পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। ছবিখানিতে কিছু নতুনত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করি।

* * *

'রাজলক্ষ্মী' নাটকটি ষ্টার রঙ্গমঞ্চের আগামী আকর্ষণ। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'র তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ অবলম্বনে এই নাটকটি রচিত হয়েছে। অভিনয়াংশে দেখা যাবে সিপ্রা দেবী, নির্মলকুমার, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার প্রভৃতিকে।

* * * *



ভারত গবর্ণমেণ্টের সাংস্কৃতিক দলের নেতা পণ্ডিত রবিশঙ্কর, শ্রীমতী দময়ন্তী যোশী, শ্রীআল্লারাখা এবং শ্রীহরিহর রাও জাপান ভ্রমণান্তে ফিরিবার পর, গ্রামোফোন কোম্পানি ২৩, রাজা সন্তোষ রোড, আলিপুরে এক সান্ধ্য সম্বর্ধনা সভায় তাঁদের অভিনন্দিত করে। সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদের নিকট পণ্ডিত রবিশঙ্কর বলেন যে তাঁর পরিচালিত সাংস্কৃতিক দল ব্যাপক ভাবে জাপানের সর্বত্র ঘুরেছেন। গভীরতা ও সূক্ষ্ম পরিবেশনে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের তুলনায় নীরস হলেও জাতি হিসাবে জাপানীরা নাচগানের পূজারী—কাজেই ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল সর্বত্রই উচ্ছ্বসিত প্রশংসালাভ করেছেন। এই সাংস্কৃতিক দলের সাফল্য মণ্ডিত পরিভ্রমণের জন্যে গ্রামোফোন কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, ই, জর্জ পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও অন্যান্য সভ্যগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সম্বর্ধনা সভায় গৃহীত চিত্র (বাম হইতে) মিঃ ভি, বি, মেনন, জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, ই, জর্জ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, শ্রীমতী দময়ন্তী যোশী, শ্রীহরিহর রাও, ওস্তাদ আল্লারাখা ও শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়।

* * * *

বিদেশী খবর ঃ

British Film Academy কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক পুরস্কার United Nations Award এবার জিন্ কেলী পরিচালিত Metro-Goldwyn-Mayer-এর ছবি "The Happy-Road"-কে দেওয়া হয়েছে। এই পুরস্কারটি সেই রকম চিত্রকেই দেওয়া হয়ে থাকে যাতে ইউনাইটেড্ নেশ্যান্স-এর চার্টারের মূলনীতির কিছুটাও অন্ততঃ প্রদর্শিত হয়। "The Happy Road" হাস্যরসাত্মক চিত্র এবং কিছুদিন আগে কলিকাতাতেও প্রদর্শিত হয়ে গেছে।

* * * *

ব্রাসেল্‌স-এর Film Critic Association তাঁহাদের ১৯৫৭ সালের Grand Prize ইউনাইটেড্ আর্টিষ্ট-এর Sidney Lumet পরিচালিত ও Henry Fonda অভিনীত চিত্র "Twelve Angry Men"-কে প্রদান করেছেন। গত বৎসর আর একটি আমেরিকান ছবি "Picnic"-কে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

* * *

ব্রাসেল্‌স-এর International Fair-এ Walt Disney-র ৩৬০ ডিগ্রী স্ক্রিনের "Circarama" দেখান হবে। একটি পনের মিনিটের Circarama ফিল্ম, যার নাম দেওয়া হয়েছে "Circarama, U. S. A.," সেটি একটি বিশেষ-ভাবে প্রস্তুত একটি গোলাকার প্রদর্শনী গৃহের চতুর্দ্দিকের প্রাচীরে এগারটি প্রজেক্টরের দ্বারা প্রতিফলিত হবে। ঘরটির

মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান দর্শকেরা রঙীন দৃশ্যের মধ্যে নিউইয়র্ক-এ সূর্য্যোদয়, পিটস্‌বার্গ, নিউ-ইংলণ্ডের গ্রাম সকল, ভার্জ্জিনিয়া, মণ্টানার একটি গমের আবাদ, গ্র্যাণ্ড কেনিয়ন্ এবং সানফ্রান্‌সিস্‌কোর গোল্ডেন্ গেট্ ব্রীজ্ দেখতে পাবেন।

"কোনও এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোনো…"

সন্তোষকুমার দে

পঞ্চাশের মন্বন্তর। ভয়ঙ্করী রাক্ষসী তার করাল দংস্ট্রা ও লেলিহান জিহ্বা মেলে এগিয়ে এলো—শুষে নিলে, মুছে দিলে বাংলার ছায়া সুনিবিড় পল্লী জীবনের সবটুকু মাধুর্য। শুধু দুটি মুখের অন্নের আশায় মানুষ বেরিয়ে পড়েছিল সাতপুরুষের বাস্তুভিটা চাষের জমি হালের বলদ সব কিছু ফেলে। কেউ পথেই প্রাণ খোয়ালে, কেউবা শহরের কোলে।

মৃত্যু, ধ্বংস, ক্ষয়, অপচয়…বিভীষিকার সেই ভয়াবহ মুহূর্তে মানুষ বুঝি স্তব্ধ হয়ে ক্ষণ গণছিল। ক্ষণিকের জন্য থেমে গিয়েছিল শিল্পীর তুলি, লেখকের কলম, গায়কের কণ্ঠ। কিন্তু তা সাময়িক বিহ্বলতা মাত্র। অচিরেই জেগে উঠল মানুষের শাশ্বত চেতনা, গর্জন করে উঠল প্রতিবাদের কণ্ঠ। সেই আবেগ, সেই উন্মাদনা, সেই সমবেদনায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের গভীর বিপুল দ্যোতনা নিয়ে যার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মুমূর্ষু বাঙ্গালী আবার গেয়ে উঠেছিল :

"কোনও এক গাঁয়ের বধূর কথা
তোমায় শোনাই শোনো
রূপকথা নয় সে নয়—
জীবনের মধুমাসে কুসুম ছিঁড়ে গাঁথা মালা
শিশির ভেজা কাহিনী শোনাই শোনো॥"

তিনি অবিসম্বাদিত ভাবেই জনগণের চারণ। জাতির চিত্তের বেদনা প্রতিবিম্বিত সলিল চৌধুরীর এই সার্থক রচনা ও সুরকে বাণীমূর্তি দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন যে সমর্থ শিল্পী—তিনি আর কেউ নন, বাংলা ও বাঙ্গালীর অতি প্রিয় গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র-সংগীতে ইতিপূর্বেই তিনি সম্মানের আসন অধিকার করেছেন, জনপ্রিয় হয়েছে তার অগণিত আধুনিক গান। কিন্তু 'গাঁয়ের বধূ' তাঁকে শুধু বাংলায় নয়, সর্বভারতে সুপরিচিত করালে। 'গাঁয়ের বধূ' বাংলা গানটির হাজার হাজার রেকর্ড বিক্রয় হতে লাগল, হিন্দি অনুবাদ বেরুল, বাঁশীতে, হারমোনিঅমে পৃথক পৃথক যন্ত্র সঙ্গীতের রেকর্ডও জনপ্রিয় হল। হেমন্ত সর্বভারতে এক বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করলেন।

কিন্তু সে সাফল্য তাঁর পরবর্তী সাফল্যের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। কলকাতায় যখন তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান অর্জন করলেন তখন আহ্বান এলো বোম্বাই থেকে, বাংলার স্নেহের দুলালকে সমাদর জানালেন বৃহত্তর সঙ্গীত জগতের জ্ঞানী-গুণীরা। বোম্বাইএ যাওয়া অবধি সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে বহুবার তিনি সর্বভারতীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, আমেরিকার 'অস্কার' (Oscar) পুরস্কারের মতো ফিল্মফেআর—ক্লেআর পুরস্কার (Filmfare clare award) পেয়েছেন তাঁর 'নাগিন' চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য। চিত্রে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তিনি এখন একযোগে বোম্বাই—কলকাতা এবং মাদ্রাজে অনেকগুলি ছবিতে কাজ করছেন।

হেমন্তের পরিচালিত 'নাগিন' চিত্রের গান স্বদেশে এবং বিদেশে সমান আদৃত হয়েছে। স্বদেশে 'নাগিন' চিত্রের গানের রেকর্ড কয়েক লক্ষ বিক্রয় হয়েছে। বিক্রয়ের দিক দিয়ে তা 'রেকর্ড' সৃষ্টি করেছে বলা যায়। আবার আমেরিকার 'ক্যাপিটল' (capital) রেকর্ডেও 'নাগিন' চিত্রের গানগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে।

হেমন্তের জনপ্রিয়তার উৎস—সঙ্গীতে তাঁর অকৃত্রিম আকুতি থাকে সাধনা বলাই যুক্তিযুক্ত, তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা আর মনোহর ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি অপূর্ব কণ্ঠ লালিত্য—যা কেবল চেষ্টা যত্নে পাওয়া সম্ভব নয়,—যা

ঈশ্বরের দান বলতে হবে। তাঁর নিরভিমান চারিত্রিক মাধুর্য তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িয়ে তুলেছে।

কিন্তু তাঁর এই সাফল্য অকস্মাৎ আসেনি, অনেকদিন অতন্দ্র সাধনার পর তিনি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ পেয়েছেন। সে জন্য তাঁকে অসীম ধৈর্য ধারণ করতে হয়েছে, অসহনীয় ক্লেশ বরণ করে নিত্য কঠিন আয়াস-সাধ্য রেওয়াজ করতে হয়েছে, অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে। হেমন্তের জীবনকাহিনী তরুণ শিল্পীদের কাছে পরম শিক্ষার খোরাক যোগাবে।

১৯২০ সালে প্রবাসে পুণ্যধাম বারাণসীতে হেমন্ত জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায়, মাতা শ্রীমতী কিরণবালা দেবী। তাঁরা চার ভাই আর এক বোন। বাল্যকালে হেমন্ত চব্বিশ পরগণার জয়নগরের নিকট 'বহড়ু' নামক নিজেদের গ্রামে আসেন। ১৯৩৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শোনা যায় সহপাঠীদের অনুরোধে ক্লাসের ভিতর গান গাইবার জন্য তিনি শিক্ষকদের কাছে তিরস্কৃত হন, আবার পুরস্কৃতও হন —যখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র তখনই রেডিওতে গাইবার সুযোগ পেয়ে। সেই বালক বয়স হতেই সুরলোকে তাঁর বাস, সুরের প্রবাহে সুরু হল তার যাত্রা—উৎসাহের পাল তুলে। তারপর কখনও উজান বেয়ে চলেছেন, কখনও জোয়ারের প্লাবনের মত দুকুল ছাপিয়ে সারা দেশ আনন্দে মাতিয়ে চলেছেন। চলার তার বিরাম নেই। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দেশবাসী তাঁর জয়যাত্রায় অভিনন্দন জানিয়েছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর হেমন্ত যাদবপুর এন্‌জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন এবং প্রায় দু'বছর কারিগরী শিক্ষায় অগ্রসর হন। ভারতবর্ষে এন্‌জিনিআর অনেক চাই এবং এনজিনিআর হয়ে বেরুলে জীবিকা অর্জন অনেক পরিমাণে সুনিশ্চিত হয় তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু গান যিনি প্রাণভরে ভালোবাসেন, নেহাৎ বাস্তব প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে তিনি আত্মবলি দিতে স্বীকৃত হবেন কি করে। অভি-ভাবকদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে যুগে একান্ত অনিশ্চিত ও প্রায় নিগৃহীত গীতশিল্পীর জীবনই বরণ করে নিলেন হেমন্ত, সুরু হল তাঁর দুশ্চর সাধনা।

প্রথম জীবনে তিনি ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে হাতে খড়ি দিয়েছিলেন। সেই সাধনা আরও নিবিড় করে আশ্রয় করলেন তিনি। চর্চা করলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের। বছরের পর বছর নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় ধীর অথচ দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠার বেদিতে আরোহণ করলেন তিনি। দীর্ঘদিন তিনি নিজে গান শিখেছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের গান শিখিয়েছেন, রেডিওতে জলসায় গেয়েছেন। অবশেষে একদিন তাঁর পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত শান্তি বসু তাঁকে নিয়ে গেলেন 'কলম্বিয়া'-য়। কলম্বিয়ায় শৈলেশ দত্তগুপ্তের পরিচালনায় হেমন্তের প্রথম গান রেকর্ডে বেরুল। আজও হেমন্ত কলম্বিয়া রেকর্ডের শিল্পী। ফিল্মের গান অবশ্য "হিজ মাস্টার্স ভয়েস" রেকর্ডে বহু বেরিয়েছে। রেকর্ড শিল্পী হিসাবে হেমন্তের সাফল্য অতুলনীয়। আধুনিক, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কবি গান, ছড়া জাতীয় সঙ্গীত, বাংলা—হিন্দি বহু রেকর্ড বেরিয়েছে তাঁর। আশ্চর্যের বিষয় তার কণ্ঠের যাদুতে প্রতিটি রেকর্ডই আদৃত হয়েছে। 'গাঁয়ের বধূ' 'আনার কলি,' 'নাগিন' প্রভৃতির গান তো 'রেকর্ড' সৃষ্টি করেছে।

হেমন্তের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই এখন যশস্বী হয়েছেন। তাঁর সহোদর শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় একজন সুগায়ক। তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী বেলা মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত-জগতে বিশেষভাবে পরিচিতা। রেকর্ড এবং রেডিও শিল্পী হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শিশুপুত্রও চিত্রে অবতীর্ণ হয়ে প্রশংসা পেয়েছে। ভারত-বিখ্যাত গায়িকা কুমারী লতামুঙ্গেশকর হেমন্তের কাছে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেছেন এবং এই মহারাষ্ট্র দুহিতার কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীতও বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে।

যশ-অর্থ-সম্মান-প্রতিষ্ঠা কোন কিছুই হেম[illegible]শের চারিত্রিক মাধুর্য ছাপিয়ে যেতে পারেনি। আজো সেই নিরভিমান সদাহাস্যময় বন্ধুবৎসল সর্বজনপ্রিয় শি[illegible]ল। যাঁর সৌম্যসুন্দর দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ প্রসন্ন মূর্তি দর্শনমাত্রেই যুগপৎ শ্রদ্ধা-প্রীতি ও আনন্দ আনে।



—কুড়ি—

ছিঃ ছিঃ, কী ছেলেমানুষি যে হয়ে গেল। এতদিন পরে—এই বয়েসে? এই সাতাশে পা দিয়ে? তার মানে পূরবীকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এল?

ভালো করেছে না মন্দ করেছে সে কথাটা পর্যন্ত সত্যজিৎ ভাবতে পারল না। এই হঠাৎ দুর্বলতার লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে সে মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগল। অকারণে এসে কী করে বসল?

একবার আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইল সত্যজিৎ। কালো মেঘ উঠে আসছে দক্ষিণ থেকে, ভিজে ভিজে হাওয়া দিচ্ছে, পাক খেতে খেতে খানিকটা ধুলো উড়ে এল। পাশেই পার্কটার গাছে গাছে কাকেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি নামবে হয়তো।

আঃ—নামুক বৃষ্টি। বিশ্রী গরমের পালা চলছে ক'দিন থেকে। জুড়িয়ে যাক মাটি।

পূরবী সম্পর্কে সত্যজিতের মনটাকে এমন আচমকা জাগিয়ে দিলে কে? পূরবী নিজেই? চশমার ওপর খানিকটা ধুলোর ঝাপ্‌টা এসে পড়ল, দাঁড়িয়ে পড়ে সম...মাটা মুছতে মুছতে তার মনে হল: না—পূরবী নয়। যার -না-দেওয়া, ভালো করে না-বোঝার দিনগুলো টুকরো উঠে...ন সুর জাগিয়ে একদিন নিজের সীমায় এসে ফুরিয়ে তারপরে থাকত স্মৃতি, একখানা গ্রুপ ফোটো-...র একটি বিশেষ মুখ মনে পড়ত—কি পড়ত না। ...ই হয়—এম্‌নিই হত।

কিন্তু: There falls thy shadow Cynara!' এল ...ই। পুরোনো আগুন কবে ছাইয়ের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে, কিন্তু তার উত্তাপটা কোথায় যেন জেগে ছিল এতদিন। বনশ্রীর অনুরাগ প্রথম আলো হয়ে পড়ল পূরবীর মুখে। আর সে ফিরে গেল গড়ের মাঠের কাজল কোমল অন্ধকারে, বুকের চাঁদ-ভাঙা গঙ্গার জলে, সেই সুর-বাঁধা সেতারের মতো একুশ বছর বয়েসে।

তাতে ক্ষতি ছিল না। এই অনিশ্চিত, প্রায় নির্বাপিত জীবন। মুখার্জি ভিলার গ্লানি, আর অনন্ত সেনগুপ্তের চোখের দৃষ্টি। বুদ্ধিবাদী জড় মন যেন একটা কাঁটার বিছানায় নির্বিকল্প সমাধিতে পড়ে আছে। তার মাঝখানে এটুকু স্বপ্ন নেহাৎ মন্দ ছিল না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসেছে সত্যজিৎ। সত্যিই কি পূরবীকে গ্রহণ করবার জন্যে মনে মনে তৈরি হতে পেরেছে সে? পূরবী কেন—কোনো মেয়েকেই কি সে নিতে পারে জীবনে?

ওয়ান মোর ইডিয়সি।

আবার একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। পথের ওপরে কালো ছায়া নেমেছে। বাড়ীর কার্ণিশে কার্ণিশে ঠাঁই নিচ্ছে চড়ুইয়েরা। হিমেল ঠোঁটের চুমুর মতো একফোঁটা জল পড়ল কপালে। বৃষ্টি এল।

ভালো করে বৃষ্টি নামবার আগেই এক ছুটে সত্যজিৎ ঢুকে পড়ল বত্রিশ নম্বরে।

চেনা বাড়ী। একদা নিয়মিত যাতায়াত ছিল। প্রকাণ্ড এই বিচিত্র বাড়ীটার একতলায় সারি সারি দোকান, দোতলায় কিছু সিন্ধি আর পাঞ্জাবী পরিবার, চারতলায় কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, আর তেতলায় একটি বড় হলকে কেন্দ্র করে পাঁচ সাতটি ছোট বড় ঘর। বিশেষ একটি রাজনৈতিক চিন্তায় অনুপ্রাণিত কতগুলো

মানুষ এখানে নানা রকমের সংঘ ও প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছে। বিভিন্ন বয়সের নানা ধরণের শিল্পী, তরুণ-অতরুণ সাহিত্যিক, প্রবীণ অধ্যাপক আর অভিজ্ঞ রাজনীতিক—সকলেরই এখানে সমান আসা-যাওয়া।

একসময়ে খুব জমজমাট ছিল। পুলিসের হানা যত বেশি হত—এখানকার মানুষগুলি যেন তত বেশি করে কাজের উৎসাহ পেত। কিন্তু এখন যেন ভাঁটার টান। মাঝখানে দলীয় নীতির কতগুলো বিপর্যয়ের ফলে সব কিছুই খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেছে। গাইয়ে বাজিয়েরা ছোট ছোট দলে অনেকেই আলাদা হয়ে গেছে, সাহিত্যিকদের আড্ডা হয়েছে চা আর কফিখানায়, অনেকগুলো অফিসও উঠে গেছে এখান থেকে। এখন ভাঙা হাট। সত্যজিৎও বছরে একবারের বেশি পা দেয় কিনা সন্দেহ।

তবু মাঝের হলঘরটি ছেঁড়া ফরাস বিছিয়ে এখনো পুরোনো বন্ধুত্বে হাতছানি দেয়। দেওয়ালের গায়ে এখনো লেনিনের বড় ছবিটি যেন দুটি জীবন্ত চোখ ফেলে তাকিয়ে থাকে। বড় পোস্টারের গায়ে পিকাশোর স্বপ্ন-দেখা সেই সিতপক্ষ কপোতটি এখনো আশা আর বিশ্বাসের বাণী বহন করে।

হলের বাইরে জুতো রেখে ঢুকতে ঢুকতে সত্যজিৎ দেখল, তিনচারটি মুগ্ধ ছেলের মাঝখানে বসে বক্তৃতা দিচ্ছে সুমিত্র মৌলিক। সত্যজিৎ মৃদু হাসল। সুমিত্রের বক্তৃতা দিয়ে কিছুতেই আশ মেটেনা।

পলকের জন্যে তাকিয়ে দেখল সুমিত্র।

—সত্যজিৎ যে? হঠাৎ?

—তোমার বক্তৃতার টানে নয়। বৃষ্টির ভয়ে।

সুমিত্র হাসল। উজ্জ্বল কঠিন চোখে করুণার আভা পড়ল একটুখানি।

—সে তো বুঝতেই পারছি। ব্যাঙ্করাপ্ট্ ইণ্টেলিজেণ্টশিয়া। শামুকের মতো নিজের খোলায় মুখ লুকিয়েছ এখন।

অন্য ছেলেগুলি হেসে উঠল। সত্যজিৎও।

—শামুকের মতো মুখ লুকানো বরং ভালো, কিন্তু মুখ-সর্বস্ব পোলিটিশিয়ান তার চাইতে আরো খারাপ।—সত্যজিৎ জবাব দিলে।

—মুখসর্বস্ব? মোটেই না।—সুমিত্র প্রায় চটে উঠল: তোমাদের মতো ইন্‌অ্যাক্‌টিভ্ ইণ্টেলেক্‌চুয়াল নই। হয়তো শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে পুরোপুরি শামিল হতে পারিনি, কিন্তু তাদের কাছাকাছি অনেকটা—

সত্যজিৎ জুড়ে দিলে: অনেকটা এগিয়েছ চারদিনের দাড়ি রেখে। বিপ্লবী বলেই মনে হচ্ছে বটে!

সুমিত্র এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল: ইয়ার্কির স্বভাবটা তোর আজও গেলনা। সত্যি বলছি, ব্লেড ফুরিয়ে গেছে, ক'দিন থেকে কেনা হয়না—তাই এই বৈপ্লবিক দাড়ি গজিয়েছে। সে যাক—চুপ করে বসে থাক এখন। এদের সঙ্গে একটু সীরিয়াস্ ডিস্‌কাশন করছি—বিরক্ত করিসনি।

সত্যজিৎ চুপ করেই রইল। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। জানলাটার ওপারে আকাশ, ঘরবাড়ী সব ঝাপ্‌সা। জুড়োন-মাটির পিপাসা জুড়িয়ে যাক। রুক্ষ ধুলোয় ভরা তপ্ত পথগুলো স্নিগ্ধ প্রসন্ন হয়ে উঠুক—বিবর্ণ পাতাগুলো শ্যামল-মসৃণ হোক—মরা মাটিতে অঙ্কুরিত হোক নতুন ঘাস—রৌদ্রে চৌচির মাঠের মাটি চন্দন হয়ে উঠুক, লাঙলের ফলায় ফলায় নব-নীবারের গর্ভাশয় রচিত হোক।

দেওয়ালের একদিকে ঘন নীল আকাশে শ্বেত-কপোতের মুক্ত ডানায় রোদ কাঁপছে; আর একদিকে লেনিনের প্রসন্ন ললাট—দুটো চোখ কী আশ্চর্য জীবন্ত! এই বৃষ্টির সঙ্গে—এই নতুন ধানের জন্মগীতির সঙ্গে এদের একটা প্রতীকী সম্পর্ক আছে কোথাও। এই ঘরে, ওই বৃষ্টির শব্দে, দেওয়ালের ছবিগুলোর ব্যঞ্জনায়—পুরোনো দিনের মতো আবার যেন নতুন করে নিজের মধ্যে শক্তি ফিরে পাচ্ছে সত্যজিৎ। এ বুদ্ধিবাদী নৈরাশ্য নয়—চিন্তার নৈরাশ্য নয়—আবার যেন প্রথম জীবনের প্রতীতির মধ্যে নবজন্ম লাভ করছে সে। যখন প্রতিটি মিছিল তার রক্তে সূর্যের কণা ছড়িয়ে দিত—যখন প্রত্যেকটি ধর্মঘট কালপুরুষের মতো মুঠো বাঁধা হাত তুলত আকাশের দিকে।

সুমিত্রের আলোচনার কয়েকটা কথা তার কানে এল। সত্যজিৎ আকৃষ্ট হল।

—তা হলে ইণ্টেলিজেন্সিয়া—অর্থাৎ যাদের 'মেণ্টাল্ লেবারার' বলা যায়—তাদের মধ্যে তিনটে শ্রেণীকে পাওয়া

গেল। প্রথম শ্রেণী যদিও তারা সংখ্যায় বেশি নয়—তারা তাদের ক্যাপিটালিস্ট প্রভুদের নিমকের টানে তাদের সঙ্গেই পড়ে রইল এবং বিধিমত নগদ লাভও তাদের হল। দ্বিতীয় শ্রেণী—সংখ্যায় আরো কম, এরা পুরোপুরি শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হল—'মেণ্টাল্ লেবার' থেকে তারা 'ফিজিক্যাল্ লেবারের' মধ্যেও পা দিল, নিজেদের ভুয়া সুপিরিয়ারিটি কম্প্লেক্স্ ভুলে গিয়ে কদম মেলালো জনসাধারণের সঙ্গে। আর তৃতীয়—

সুমিত্র একবার থামল। একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে বলে চলল: আর তৃতীয় শ্রেণী—যারা সব চাইতে মেজরিটি, তাদের অবস্থাটাই বিচিত্র। ওপর তলার লোকগুলো সম্পর্কে তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে—তারা জানে, ক্যাপিটালিজমের আসল চেহারাটা কী। এই শোষকদের তারা ঘৃণাই করে—এই সমাজ ব্যবস্থার তারা অবসান চায়। আবার অন্যদিকে শ্রমিকের সঙ্গে এক হয়ে যেতেও তাদের বাধে—হাতে কলমে কাজ করাকে ইন্ফিরিয়র বলে মনে করে। সেখানে মানসিক আভিজাত্যই তাদের ডিক্লাস্ড হওয়ার পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা। শেষ পর্যন্ত তারা একটা অদ্ভুত 'নো-ম্যান্স ল্যাণ্ডে' পৌঁছে যায়—সাবজেক্টিভ্ হতে থাকে—সব কিছু সম্পর্কে অকারণে ক্রিটিক্যাল হয়ে ওঠে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে তাদের মন। সেকেণ্ড ওয়ার্লড-ওয়ারের পর পৃথিবীতে এরাই সংখ্যায় সব চাইতে বেশি হয়ে উঠছে—

সত্যজিতের চমক লাগল। কোনো নতুন কথা বলছে না সুমিত্র; এ ধরণের আলোচনা সে প্রচুর শুনেছে, পড়েছেও অনেক। কিন্তু আজ যেন এরা একটা আলাদা সত্য বয়ে আনছে তার কাছে। সুমিত্র যেন তাকেই লক্ষ্য করে বলছে সমস্ত—এ যেন তারই মানসিকতার বিশ্লেষণ। সেও দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর সেই বুদ্ধিজীবীদের দলে—যারা 'ঘরেও নহে, পরেও নহে'—ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে আছে তটস্থ হয়ে।

দেওয়ালে দুটি জীবন্ত ধিক্কারভরা চোখ—শ্বেত কপোতের পালায় রোদ জ্বলছে। কী করতে পারে সত্যজিৎ? অ্যাক্টিভ্ পলিটিক্সে নামতে পারে? না—তার উপায় নেই। শুধু পারে যে কোনো বলিষ্ঠ আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে, নিজের গণ্ডীর ভেতরে যতটা সম্ভব তার সত্যকে ঘোষণা করতে, আর পারে সেই আশা আর বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে—যা পৃথিবীর মানুষকে নবজন্ম এনে দেবে।

কিন্তু তা-ও কি পারে সত্যজিৎ? পারে আশা আর বিশ্বাসকে বুকের মধ্যে জাগিয়ে রাখতে? ওই মুখার্জি-ভিলায় বাস করে? শিবশঙ্কর আর ইন্দ্রজিতের বিকৃতিকে নিজের মধ্যে বহন করে? মনের কূট-তার্কিকটাকে এত সহজেই সরিয়ে দেওয়া কি সম্ভব?

পাশের ঘর থেকে বিমল বেরিয়ে এল।

—সত্যদা যে!

—হাঁ, এলাম ঘুরতে ঘুরতে।

—আজকাল তো ভুলেই গেছেন এদিকটা। শনিবার আসবেন একবার?

—কী আছে শনিবার?

—একটা সিম্পোসিয়াম। নিউ ডেমোক্র্যাসি অ্যাণ্ড্ ইণ্ডিয়া। অনেকেই আলোচনা করবেন। আসবেন? এই বিকেল ছ'টা নাগাদ?

—দেখব চেষ্টা করে।

—বৃষ্টি থেমেছে। সুমিত্রের বক্তৃতাও!

আর একটা বিড়ি ধরিয়ে সুমিত্র বললে, বেরুবে নাকি অধ্যাপক?

—হ্যাঁ, চলো।

দুজনে পথে নামল। বি-এ ক্লাস থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত সহপাঠি। এম-এ পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত আর দেয়নি সুমিত্র। এখন টিউশন করে, আর রাজনীতি।

বৃষ্টিতে ধোয়া পথ। ছেঁড়া মেঘের কোনায় রোদ উঁকি মারছে। ঝর ঝর করে জল নেমে যাচ্ছে পথের ঝাঁঝরি দিয়ে। এলোমেলো হাওয়া। সিনেমার পোস্টারে একটি মেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে লজ্জায় যেন জড়োসড়ো হয়ে আছে।

বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে সুমিত্র বললে, চল্ অধ্যাপক—ওদিকের ওই চায়ের দোকানটাতে। বকে বকে গলাটা শুকিয়ে গেছে। তা ছাড়া অনেকদিন ভালো করে আড্ডা দেওয়া হয়নি।

বাড়ী ফিরে বনশ্রীর পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে বসা উচিত ছিল। কাল থেকে আবার সময় পাওয়া যাবে না। কিন্তু নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছে আজ—কোথাও

একটুখানি প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। সত্যজিৎ বললে, আচ্ছা—চল্—

সুমিত্রের হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া গেল প্রায় একটার সময়। বাড়ী ফিরে খবর পাওয়া গেল হীরেন এসেছিল। আবার আসবে রাত আটটার পরে।

হয়তো নতুন কোনো পাব্লিশার গেঁথেছে হীরেন। একটা কন্ট্রাক্ট্ জুটিয়ে দেবে নোট লেখার। বিদ্যার দালালী। কিন্তু দালালদের যুগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এর হাত থেকে নিস্তার নেই।

সুমিত্রের কথা কানে বাজছে।

—দেখবি, দিন আমাদের আসবেই।

—কিন্তু পার্লামেণ্টারি পলিটিক্সে—

—যে সময়ের যেমন। পুরোনো ভুলকে আমরা তো আর রিপীট্ করতে পারি না। ওয়েট্ মাই ফ্রেণ্ড্—ওয়েট্! ওয়েট্ আপ টু নেক্সট্ ইলেকশ্চন—

রেডিয়োতে খবর বলছে। টীচার্স স্ট্রাইক্ কল্ড অফ। কাগজেই তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। ঠিক যা চাওয়া হয়েছিল তা কি পাওয়া গেল? দাবি মিটল কি পুরোপুরি?

কিন্তু নিজেকে আর সংশয়ের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া নয়। এক কদম এগিয়ে দরকার হলে তিনপা পিছিয়ে যাও। যেটুকুর সূচনা হয়েছে—তা নতুন ইতিহাসের একটা পাতা খুলে দেবে।

অবিশ্বাস করতে পারে পরিতোষের মতো লোক—সে সরকারী চাকরী পেয়ে এখন মার্কসিজম্‌কে রিভাইজ করছে। আর অবিশ্বাস করতে পারে সে-ই—বুদ্ধির শূন্য-জগতে যে উদ্‌ভ্রান্ত।

আশা ছাড়বে না সত্যজিৎ।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে সে বনশ্রীর লেখা নিয়ে বসল। মধ্যে মধ্যে শোনা যাচ্ছে ইন্দ্রজিতের চিৎকার। আল্‌জল্‌সনের গান গাইছে সে। এর পরে হয়তো প্রীতির কাছ থেকে শোনা কীর্তন জুড়ে দেবে তারস্বরে। একবার ভ্রূকুটি করল সত্যজিৎ, তারপর তলিয়ে গেল কাজের ভেতরে।

বীথি বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়ে গেছে দুপুরে। শিবশঙ্কর নিজের ঘরে পড়ে আছেন চুপচাপ—রঘু তাঁর কী পরিচর্যা করছে কে জানে। হয়তো মদ ঢেলে দিচ্ছে গ্লাসে—ডাক্তারের বারণ সত্ত্বেও মদ ছাড়বার মানুষ নন শিবশঙ্কর। সব ভাবনাগুলোকে মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলে দিয়ে সত্যজিৎ এক মনে কাজ করতে লাগল।

চারটের সময় ছুটতে ছুটতে এল প্রীতি। ছাইয়ের মতো মুখ।

—ছোড়দা?

—কিরে? অমন কেন মুখের চেহারা? কী হয়েছে?

—বনশ্রীদি ফোন করছেন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে। রীতেনবাবু সাংঘাতিক অ্যাক্‌সিডেণ্ট করেছেন।

সত্যজিৎ চমকে উঠল, ভয়ানকভাবে। আরো বেশি চমকালো প্রীতির দিকে তাকিয়ে। তারপর উঠে পড়ল দ্রুত।

বনশ্রীই বটে। কান্নায় ভেজা গলা।

—আসতে পারো—এক্ষুনি আসতে পারো একবার? ভীষণ ক্রাইসিস্ যাচ্ছে। বাবা প্রায় সেন্স্‌লেস্ হয়ে বাড়ীতে পড়ে আছেন। আমি একা কী করব এখন? পারবে আসতে?

—এক্ষুণি যাচ্ছি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে সত্যজিৎ তাকালো প্রীতির দিকে। মরা মানুষের মতো তার মুখ। থর থর করে কাঁপছে।

—আমি যাচ্ছি প্রীতি। কোনো ভাবনা নেই, ঠিক হয়ে যাবে।

—আমাকেও নিয়ে চলো ছোড়দা।—প্রীতির গলা কান্নায় ভেঙে পড়ল: আমি—আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।

সত্যজিৎ আবার কিছুক্ষণ স্থির হয়ে প্রীতির মুখের দিকে চেয়ে রইল। যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। যা আশঙ্কা ছিল তা কখন সত্য হয়ে গেছে এর মধ্যেই। আর ফেরানোর পথ নেই।

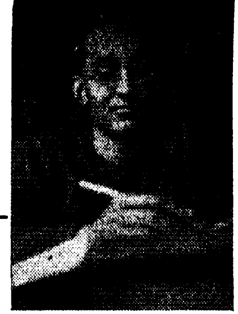
প্রীতিকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। রীতেন যদি না-ই বাঁচে, তা হলে অন্তত শেষবার কাঁদবার সুযোগ পাক ও। এই মুখার্জি-ভিলায় প্রাণভরে সে কান্না ও কোনোদিনই কাঁদতে পারবে না।

অদৃষ্টের কণ্ঠস্বর সত্যজিৎ শুনতে পেলো নিজের গলায়: বেশ চল্—

ইন্দ্রজিৎ চিৎকার করে গান করছে: "Your love is my death—my death—my death—" (ক্রমশঃ)







শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

২৪শে মে জাপ-সম্রাট হিরোহিতো জাপানের টোকিও সহরের মেইজি শ্রাইন পার্কস্থ নবনির্ম্মিত জাতীয় ষ্টেডিয়ামে তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। এই ষ্টেডিয়ামটি এশিয়ার বৃহত্তম ক্রীড়াঙ্গন। উদ্বোধন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির দূত হিসাবে পাঁচ হাজার শ্বেত পারাবত আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়; সেই সঙ্গে ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ইরাণের শাহ, মালয়ের প্রধান মন্ত্রী, জাপানে অবস্থিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত, ৩য় এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জাপানের যুবরাজ আকিহিতো, রাজ পরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তি, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি এবং এশিয়া ক্রীড়া সংস্থার সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ২০টি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

১৯২৮ সালে বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে হপ্-ষ্টেপ্-জাম্প বিজয়ী জাপানের সিকিওডারের সম্মানার্থে একটি ১৫.৪৬ মিটার উচ্চ দণ্ডে এশিয়ার ক্রীড়ার পতাকাটি উত্তোলন করা হয়। দণ্ডটির উচ্চতায় একটি তাৎপর্য্য ছিল; সিকিওডার বিশ্ব অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের হপ্-ষ্টেপ-জাম্পে ১৫.৪৬ মিটার দূরত্ব অতিক্রম ক'রে স্বর্ণপদক এবং অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন ক'রেছিলেন বলেই দণ্ডটির উচ্চতা ১৫.৪৬ মিটার করা হয়েছিল। ৫৩ বৎসরের বৃদ্ধ সিকিওডা মশালবাহী দলের শেষ এ্যাথলেট হিসাবে এশিয়া ক্রীড়া-পূতাগ্নির মশালটি নিয়ে একবার ষ্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ ক'রেন এবং ৮৬টি সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম ক'রে ষ্টেডিয়ামে রক্ষিত বৃহদাকার আধারে ম্যানিলা থেকে আনীত প্রজ্বলিত মশালটি সাহায্যে অগ্নি সংযোগ করেন।

২রা জুন পর্য্যন্ত এই পবিত্র পূতাগ্নি ষ্টেডিয়ামে সযত্নে প্রজ্বলিত রাখা হয়েছিল।

তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানকারী জাপান দলের অধিনায়ক সুসুমো তাকাহাসি সমস্ত যোগদানকারী দেশের পক্ষ থেকে পবিত্র শপথ গ্রহণ করেন।

মার্চ্চপাষ্ট অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের পুরোভাগে পতাকাহস্তে ছিলেন হকিদলের অধিনায়ক বলবীর সিং। ভারতীয় পুরুষ সদস্যদের পরিধানে ছিল সাদা ট্রাউজার, হাল্কা নীল ব্লেজার এবং নীল শিরস্ত্রাণ। মহিলা সদস্যাদের পরিধানে ছিল সাদা শাড়ী।

৩য় এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠানে জাপান তার বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। জাপান পেয়েছে ৬৭টি স্বর্ণ, ৪১টি রৌপ্য এবং ৩০টি ব্রোঞ্জ-পদক, পদকের মোট সংখ্যা ১৩৮। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ফিলিপাইন পেয়েছে ৮টি স্বর্ণ, ১৯টি রৌপ্য ও ২১টি ব্রোঞ্জ পদক, মোট ৪৮টি পদক।

জাপানের সাফল্যের সঙ্গে অন্য দেশগুলির তুলনা করা, হিমালয়ের উচ্চতার সঙ্গে উই ঢিপির উচ্চতার তুলনা করার সমান। ক্রীড়ানুষ্ঠানে সাফল্যের ওপর বে-সরকারী-ভাবে পয়েন্ট বণ্টনের যে রীতি প্রচলিত আছে, তার হিসাবে দেখা যায়, জাপান মোট ৮৩৭ পয়েন্ট পেয়েছে। ২য় স্থান অধিকারী ফিলিপাইন পেয়েছে ৩২৬ পয়েন্ট; আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

তৃতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে নতুন এশিয়া রেকর্ড স্থাপিত

হয়েছে এ্যাথলেটিকসে ২৬টি, ভারোত্তোলনে ২২টি, সাইক্লিংয়ে ৫টি, সুটিংয়ে ১টি সাঁতারে ১০টি। সাঁতারে জাপানী সাঁতারুদল পুরুষদের ৪×১০০ মিটার মিড্‌লি রিলে রেসে ৪মিঃ ১৭.২ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম ক'রে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করে এবং সুয়োসি ইয়ামানাকা ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সাঁতারে ৪ মিঃ ২৩.৯ সেঃ দূরত্বপথ অতিক্রম ক'রে বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

জাপানের এই বিরাট সাফল্য কোন রকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয় বরং অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে টেবল টেনিসে পুরুষদের দলগত বিভাগে এবং ব্যক্তিগত বিভাগের পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় জাপানের পরাজয়ে। জাপান গত চারবছর বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার দলগত বিভাগে জয় লাভ করেছে এবং ব্যক্তিগত বিভাগে একাধিক সাফল্য লাভ করেছে।

ভারতবর্ষের সাফল্য

ভারতবর্ষ মোট ১৩টি পদক লাভ করেছে—৫টি স্বর্ণ, ৪টি রৌপ্য এবং ৪টি ব্রোঞ্জ। ভারতবর্ষের পক্ষে যাঁরা স্বর্ণ পদক লাভ করেন :

শট পুট : পরদ্যুমন সিং। দূরত্ব ১৫.০৪ মিটার (৪৯ ফিট ৪ইঃ)—নতুন এশিয়া রেকর্ড

৪০০ মিটার দৌড় : মিলখা সিং। সময় ৪৭.০ সেঃ

২০০ মিটার দৌড় : মিলখা সিং। সময় ২১.৬ সেঃ —নতুন এশিয়া রেকর্ড

ডিসকাস থ্রো : বলকার সিং। দূরত্ব ৪৭.৬৬ মিটার (১৫৬ ফিট ৪.৩৮ইঃ)—নতুন এশিয়া রেকর্ড

হপ্‌-স্টেপ-জাম্প : মাহিন্দর সিং। দূরত্ব ১৫.৬২ (৫১ফিট ২৩/৪ ইঞ্চি)—নতুন এশিয়া রেকর্ড।

ভারতবর্ষ সুটিং, সাইক্লিং, ভারোত্তোলন, মল্লক্রীড়া, ওয়াটার পোলো, সাঁতার, টেনিস, টেবল-টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। যোগদান করলে আরও কয়েকটি পদকলাভের সম্ভাবনা ছিল।

বাস্কেট বল

বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম ফিলিপাইন, ২য় চীন, ৩য় জাপান। এই তিনটি দেশের প্রত্যেকই ৪টি ক'রে খেলায় জয়ী হয় এবং ২টি ক'রে খেলায় হার স্বীকার করে। বেশী পয়েণ্ট করার জন্যে ফিলিপাইন শেষ পর্য্যন্ত প্রথমস্থান পায়।

টেবল টেনিস : গত চার বছরের বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান জাপান পুরুষ বিভাগে ভিয়েৎনামের কাছে পরাজিত হয়ে বিস্ময়ের উদ্রেগ করে। অবশ্য জাপান মহিলা বিভাগে স্বর্ণপদক পায়।

মহিলা বিভাগে চূড়ান্ত ফলাফল : ১ম জাপান, ২য় কোরিয়া, ৩য় চীন, ৪র্থ হংকং, ৫ম ইরাণ।

ফুটবল :

১ম ফরমোসা, ২য় দক্ষিণ কোরিয়া, ৩য় ইন্দোনেশিয়া। ফাইনাল : ফর্মোসা ৩ : দক্ষিণ কোরিয়া—২ (অতিরিক্ত খেলায় জয়-পরাজয় নিষ্পন্ন হয়) সেমি-ফাইনাল : দক্ষিণ কোরিয়া ৩ : ভারতবর্ষ ১। ফর্মোসা ১ : ইন্দোনেশিয়া—০

ইন্দোনেশিয়া ৪—১ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত করে প্রতিযোগীতায় ব্রোঞ্জপদক ও তৃতীয়স্থান লাভ করে।

হকি :

গোলের গড়পড়তার ভিত্তিতে পাকিস্থান স্বর্ণপদক লাভ করে। মোট চারটি খেলার মধ্যে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান উভয়ই ৩টি ক'রে খেলায় জয়লাভ করে। ভারতবর্ষ বনাম পাকিস্থানের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় ফলে প্রতিযোগীতার নিয়মানুসারে গোল এভারেজের ভিত্তিতে পাকিস্থান প্রথম স্থান পায়। ভারতবর্ষ ১৬টি গোল দেয় এবং ১টি গোল খায়। অপরদিকে পাকিস্থান ১৯টি গোল দেয় কিন্তু পাকিস্থানের বিপক্ষে কোন গোল হয় না। হকি লীগের চূড়ান্ত অবস্থার ফলাফল :

	খেলা	জয়	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
পাকিস্থান	৪	৩	১	০	১৯	০	৭
ভারতবর্ষ	৪	৩	১	০	১৬	১	৭
দঃ কোরিয়া	৪	২	০	২	৬	১৩	৪
মালয়	৪	০	১	৩	২	১৫	১
জাপান	৪	০	১	৩	১	১৫	১

উপর্যুপরি ছয়টি বিশ্ব অলিম্পিক এবং দুইটি এশিয়া গেমসের হকি বিজয়ী ভারতবর্ষ তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করতে অসমর্থ হওয়ায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয়দলের

দলগঠন সম্পর্কে অলিম্পিক বিজয়ী ভারতীয় হকিদলের অধিনায়ক এবং হকি খেলার যাদুকর ধ্যানচাঁদ থেকে আরম্ভ করে অনেকই বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন। তাছাড়া অনেক ত্রুটি বিচ্যুতির কথাও বলা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কবাণী করা হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল পর্য্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

আমরা জানি, খেলায় জয়-পরাজয় আছে এবং এই সত্যটি সহজভাবে মেনে নেওয়াই খেলোয়াড়চিত মনোভাবের পরিচয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ঘটনাটি ভিন্ন রকম। ভারতবর্ষের পরাজয়ের ব্যাপারে বিপক্ষের জয়লাভের সঙ্গত কারণ যতখানি না ছিল তার থেকে বেশী ছিল ভারতীয় হকিদল গঠনে ত্রুটি এবং ব্যক্তিগত পদমর্য্যাদা এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব।

ভলিবল ঃ

পুরুষদের ভলিবল প্রতিযোগিতার দুটি বিভাগেই (৬জনের লীগ এবং ৯ জনের লীগ খেলায়) জাপান জয় লাভ করে। ৬জন খেলোয়াড়ের লীগ খেলায় জাপান ১ম, ইরান ২য় এবং ভারতবর্ষ ৩য় স্থান লাভ করে।

	খেলা	জয়	হার	পয়েণ্ট
জাপান	৪	৪	০	৪
ইরান	৪	৩	১	৩
ভারতবর্ষ	৪	২	২	২
ফিলিপাইন	৪	১	৩	১
হংকং	৪	০	৪	০

সন্তরণ ঃ

সন্তরণ প্রতিযোগিতার ২৬টি অনুষ্ঠানের মধ্যে জাপান ২৫টি অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক লাভ করে। মহিলা বিভাগের ৪০০ মিটার রীলে সাঁতারে জাপান ১ম স্থান লাভ ক'রে কিন্তু আইন অনুযায়ী 'Chang-over' না হওয়ার দরুণ প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়ে।

পদক লাভের তালিকা

		স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	...	৬৭	৪১	৩৩
ফিলিপাইন	..	৮	১৯	২১
দঃ কোরিয়া	...	৮	৭	১২
ইরাণ	...	৭	১৪	১১
ফর্মোসা	...	৬	১১	১৭
পাকিস্থান	...	৬	১১	৯
ভারত	...	৫	৪	৪
ভিয়েৎনাম	...	২	০	৪
ব্রহ্মদেশ	...	১	২	১
সিঙ্গাপুর	...	১	১	১
সিংহল	...	১	০	১
থাইল্যাণ্ড	...	০	১	৩
হংকং	...	০	১	১
ইন্দোনেশিয়া	...	০	০	৩
মালয়	...	০	০	৩
ইসারাইল	...	০	০	২

আফগানিস্থান, কাম্বোডিয়া, নেপাল ও উত্তর বোর্নিও কোন পদক লাভ করেনি।

বেসরকারী পয়েণ্টের তালিকা

জাপান	—	৮৩৭	হংকং	—	৩৮
ফিলিপাইন	—	৩২৬	ইন্দোনেশিয়া		৩৬.৫
ফর্মোসা	—	২২৪	ব্রহ্মদেশ	—	৩০
দঃ কোরিয়া	—	২০৪	সিঙ্গাপুর	—	২৭
পাকিস্থান	—	১৮৭	থাইল্যাণ্ড	—	২৬
ইরান	—	১৭৯.৫	সিংহল	—	১৯
ভারতবর্ষ	—	৮১	আফগানিস্থান		১১
ভিয়েৎনাম	—	৪৬	ইসরাইল	—	৮
মালয়	—	৪৩	উঃ বোর্নিও	—	০

ইংলণ্ড—নিউজিল্যাণ্ড টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ২০৫ রানে জয়লাভ করে। ৫ দিনের খেলা সাড়ে তিন দিনে সমাপ্ত হয়।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ

ইংলণ্ড ঃ ২২১ (মে ৮৪, কাউড্রি ৮১। ম্যাক্‌গিবন ৬৪ রানে ৫ উইকেট) ও ২১৫ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড; রিচার্ডসন ১০০, কাউড্রি ৭০; ম্যাক্‌গিবন ৪১ রানে ৩ উইকেট)।

নিউজিল্যাণ্ড ঃ ৯৪ (ট্রুম্যান ৩১ রানে ৫ উইকেট) ও ১৩৭

সাহিত্য সংবাদ

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

তারকচন্দ্র রায়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়ের নাম বিদগ্ধ সমাজে সুপরিচিত। বছরের পর বছর, মাসের পর মাস তাঁর পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পড়ে আমরা শুধু মুগ্ধ হই নাই, জ্ঞান সমৃদ্ধও হয়েছি। আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয় যে এই জ্ঞানী গুণী ভদ্রলোক শিক্ষক বা অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী নন্। সারাজীবন শাসন বিভাগে রাজকার্যে অতিবাহিত করে কর্মকলরব ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে যখন তাঁর বিশ্রাম নেবার কথা তখন তিনি নূতন উদ্যমে, যুবজনোচিত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে যে দুটি জিনিষ দিলেন তাহা শুধু তাঁর চিত্তের অমিতবিত্তকেই উদ্‌ঘাটিত করলো না, আমাদের জাতীয় জীবনে একটি বিশেষ অভাবও সম্পূরণ করলো। এই যে আদর্শের প্রতি অবিচলিত আনুগত্য, এই যে তাঁর গুরু ডাঃ পি কে রায়ের প্রতি সম্মান দর্শন—দর্শন তোমার নিকট কিছু প্রত্যাশা করে, এক কথায় এই যে নিষ্ঠা—আজকে শুধু দুর্লভ নয়, অনুকরণীয়ও বটে।

ভরতীয় দর্শনের ইতিহাসের (প্রথম খণ্ড) লেখক আমাদের মহেনজোদারো ও হারাপ্পার যুগ হতে বৈদিক যুগ ও মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত মানবমনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্থিত চিন্তাবাদকে বিশ্লেষণ করে তার ইতিহাসের ধারাকে ধরতে চেয়েছেন। পরের যুগের অর্থাৎ তাঁর মতে সূত্রযুগ ও সাম্প্রদায়িক যুগের দার্শনিক কথা পরবর্তী খণ্ডে আলোচিত হবে। মহাকাব্যের যুগে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাবধারা হতে জড়বাদ, চার্বাক মত, জৈন দর্শন, বুদ্ধের আশ্চর্য চতুষ্টয় সষ্টাঙ্গ মার্গ, বৈভাসিক, সৌতান্ত্রিক, যোগাবার, শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, মহাভারত, রামায়ণ কালের চিন্তার ধারা, শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, পাঞ্চরাত্র, শক্তিদর্শন প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। সমালোচকের দল প্রশ্ন তুলতে পারেন যে দার্শনিক চিন্তাধারার বিচারে এই কালবিভাগ ইতিহাস সম্মত কিনা। যারা এই তর্ক তুলবেন তাঁদের শুধু এইটুকুই বলা যায় যে ভারতবর্ষের ইত্যকার ইতিহাসের ধারা ভাবকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে—সাল সন তারিখ অনুশাসন শিলালেখ তার পাথুরে প্রমাণ হলেও মনের ইতিহাসে তার গণ্ডী বারে বারে পার হতে হয়েছে। এই ধারাকে নিছক কালের সীমানায় ধরা যায় না। এ এক অনাদ্যন্তবান ভাবসমুদ্র যাকে বহু ভগীরথ সমৃদ্ধ করেছেন। ভারতীয় দর্শন জীব হতে বিশ্লিষ্ট Inteliectuai appreceation বা বিচার বিতর্ক নয়, অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত—সে জীবন শুধু রাজাসনে নয়, সে জীবন ছিল তপোবনেও—সেখানে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল, মননশীল চিত্ত ও বাধির ধারণা ছিল।

ভারতবর্ষে দর্শনচর্চা কিছু নতুন নয়—হরিভদ্রের ষড় দর্শন সমুদয়ের দিন হতে কতো গবেষণা, কতো বিশ্লেষণ, কতো তর্কবিবেক কতো 'প্রস্থান ভেদ' স্থান পেয়েছে। লেখক সবগুলি ধারাকে একত্রিত করে মণিহার গেঁথে একটি সূত্রে বেঁধে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। তজ্জন্য তিনি শুধু মামুলী ধন্যবাদের পাত্রই নন রসিকের সাধুবাদও পাবেন। দর্শন আজ আর অপাংক্তেয় নয়, বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সীমা-রেখা ক্ষীণ হয়ে আসছে। আজকের জেমস্ জীনস, এডিংটন, থাইনাটাইন, প্রডিঙ্গার হাইসেনবার্গ, নীলস্ বহর, বিজ্ঞানের যে রাজ্যে চলেছেন তার সঙ্গে ততঃ কিম এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

আরো কয়েকটি কারণে এই পুস্তকটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার বিষয়। লেখক শুধু দর্শনের ইতিহাস বিবৃত করেই ক্ষান্ত হন নি—তিনি নিজে বিচার বিশ্লেষণ করে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে অনেক জায়গায় পরিস্ফুট করে দিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়, যেমন বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ কাকে বলে এ কি ঐকান্তিক বিনাশ, শুধু নেতিবাচক—যেমন তৃণ বা কাষ্ঠ পুড়িয়া যায় বা দীপ নেভে না একে বলবো শাশ্বত সত্তার সহিত একীভূত হওয়া, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ব্রহ্ম-বিহার। আবার দেখি লেখক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অবলম্বনে গায়ত্রীর একটি নূতন অর্থ দিয়েছেন। শঙ্করাচার্য্য হতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু সাধক ও মনীষীই নিজ নিজ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বিরাট মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে লেখকের ব্যাখ্যার মূলগত প্রভেদ না থাকলেও চিন্তাগত প্রভেদ যে আছে তাহা লক্ষ্যনীয়। আমাদের দেশে বৌদ্ধ দর্শন বা ষড়দর্শন সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হয়েছে জৈন দর্শন সম্বন্ধে সেরূপ হয় নি। সেইজন্য এই পুস্তকে জৈনদর্শনের ইতিহাস নতুন আলোক সম্পাত করে—বিশেষ করে পাশ্চাত্যদর্শনের আবহাওয়ায় গঠিত আধুনিক মন যেন অনেকান্তবাদ, স্যাৎবাদ গড়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিকতার স্বাদ পান। তার চার্বাক দর্শনের আলোচনাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ভারতীয় দর্শনের মূল কথাটি কি শ্রীঅরবিন্দ তার বিচার আলোচনায় ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। সে দর্শনে সার্থকতা সত্যদৃষ্টি লাভ করে, সত্যসংকল্প হয়ে, সর্বভূতের সঙ্গে এবং সর্বভূতমহেশ্বরের সঙ্গে একাত্মবোধ নিয়ে পরম আলোক আনন্দ শক্তি জ্ঞানের আধার হয়ে পৃথিবীতে দিব্যজীবন যাপন করা। সেই জন্য আমাদের দর্শনের দুটি ধারা। একটি সাংসারিক লোককে উপদেশ দিচ্ছে—যারা এখনও বাহ্য-জীবন নিয়ে ব্যাপৃত, যাদের দৃষ্টি এখনও অন্তরের দিকে ফেরেনি যেমন কেনোপনিষদ। আর একটি ধারা হচ্ছে প্রবুদ্ধ সাধকের জন্য, যারা জ্ঞান ও অজ্ঞানের সম হয়ে দিব্যজীবনের প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী যেমন ঈশোপনিষদ।

ভারতদর্শনের ইতিহাস সেই সমন্বয়েরই কথা ও কাহিনী। জ্ঞানের সেই গোমুখীর ধারা বহুমুখী হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে এই কামনাই করবো।

[প্রকাশক : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ১০৲ টাকা।]

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ : অমল হোম

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীঅমল হোমের পাণ্ডিত্য সুবিদিত। শুধু তাই নয় বিশ্বকবির সাহচর্য্য দ্বারা বাংলার যে সকল মনীষী আপন আপন জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করে নিয়েছেন শ্রীহোম তাঁদের অন্যতম। তাই রবীন্দ্র বিষয়ক তথ্য যা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে তার মূল্য সমধিক।

এই গ্রন্থের অঙ্গপুষ্টি করেছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখকের কয়টি বক্তৃতা, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি। এই চিঠিগুলি সত্যই মূল্যবান এবং আশা করি এরূপ তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থের বিশেষ সমাদর হবে।

[প্রকাশক : এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৲ টাকা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস "রামগড়" (২য় সং)—৪'৫০
মন্মথ রায় প্রণীত নাটিকাগুচ্ছ "নবএকাঙ্ক"—৩'০০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রামের সুমতি" (উপন্যাস—৩২শ সং) ১'০০, "নিষ্কৃতি" (নাটক—৩য় সং)—১'৫০
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "ওরা কাজ করে"—৫'০০
শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত "ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস" (১ম খণ্ড)—১০'০০
শ্রীপূর্ণশশী দেবী প্রণীত উপন্যাস "স্রোতের মুখে"—২'০০

নতুন রেকর্ড

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 76065—'ডাকহরকরা' বাণীচিত্রের দুখানা গান শিল্পী মান্না দের কণ্ঠে অপরূপ হয়েছে। গান দুখানা "লাল পাগড়ী মাথে" ও "ওগো তোমার শেষ বিচারের।"

N 76066—গীতশ্রী ছবি ব্যানার্জী দরদ দিয়েগেয়েছেন 'যোগাযোগ' বাণীচিত্রের দুখানা গান—"পিয়া যব আওযব" ও "তুম্ সঙ্গ কাহে প্রীতি।"

N 76067—'ডাকহরকরা' বাণীচিত্রের দুখানা মনোরম গান "কাঁচের চুড়ির ছটা" ও "মনরে আমার হায় শুনলি না" গেয়েছেন যথাক্রমে গীতা দত্ত ও মান্না দে।

N 82779—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন দুখানা' রবীন্দ্র গীতি—"আজ জ্যোৎস্না রাতে" ও "সখা, আঁধারে একেলা ঘরে। সুর লালিত্যে ও ভাবব্যঞ্জনায় গান দুখানা সত্যিই আমাদের খুব ভাল লেগেছে।

N 82780—"আমি যে গান গাই" ও "যদি প্রেম দিলে না প্রাণে" এ দুখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র তাঁর দরদ ঢালা মধুর কণ্ঠে।

N 82781—সুবীর সেন গেয়েছেন আর দুখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত—"বহু যুগের ওপার হতে" ও "আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে" গান দুখানা আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

কলম্বিয়া

GE 24888—সর্ব্বজনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন দুখানা ভাবমধুর রবীন্দ্র গীতি—"নিশীথে কী কয়ে গেল" ও "বিদায় করেছ যারে।"

GE 24889—"এসো আমার ঘরে" ও "ভাল যদি বাস সখী"—দুখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। গান দুখানায় শিল্পী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

GE 24890—কুমারী বনানী ঘোষ তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে গেয়েছেন আর দুখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত "যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়" ও "বিদায় করেছ যারে।"

GE 30375—'নূপুর' কথাচিত্রের দুখানা গান "ধন্য হব যে মরণে আমি" ও "আমি হার মেনেছি"—গেয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 30376—'নূপুর' কথাচিত্রের আর দুখানা মনোরম গান "চুপি চুপি শোনো" ও "আলোছায়া ঝরা"—গেয়েছেন যথাক্রমে প্রতিমা ব্যানার্জী ও সন্ধ্যা মুখার্জ।

GE 30395—'বৃন্দাবন লীলা' বাণীচিত্রের দুখানা গান "ওগো বড়ী মাঈ কহিতে ডরাই" ও "রাধে গোবিন্দ গোপাল"—গেয়েছেন যথাক্রমে কুমারী আরতি মুখার্জী ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

GE 30396—প্রসূন ব্যানার্জী ও মীরা ব্যানার্জী যুগ্মকণ্ঠে গেয়েছেন "আওয়ল ঋতুপতি রাজবসন্ত" ও চিন্ময় লাহিড়ী গেয়েছেন—"মাগো নমামি ত্বাং তারিণী।" দুখানা গানই 'বৃন্দাবন লীলা'—বাণীচিত্রের।

GE 30397—"খেলবি যদি আয়" ও "গলে বনফুল মালা"—গান দুখানা আমাদের আনন্দ দিয়েছে প্রচুর। গেয়েছেন দুজন দরদী শিল্পী, যথাক্রমে পান্নালাল ভট্টাচার্য ও ছবি ব্যানার্জী।—এ দুখানা গানও 'বৃন্দাবনলীলা' কথাচিত্রের।

GE 30398—'বৃন্দাবনলীলা' বাণীচিত্রের একখানা গান "হিন্দোলে দোলত" গেয়েছেন এ, টি, কানন ও "গরজত ঘন" গানটী গেয়েছেন যুগ্মকণ্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

চিন্তা, কামনা ও চেষ্টনার দ্বারা কারাপ্রাচীর নির্মাণ করিয়া সে কারাবদ্ধ এবং তাহারই মধ্যে নিজেকে 'আত্মা' বলিয়া মনে করিতেছে। জগতের সকল সংস্রব হইতে বিরত হইয়া—মানুষ যখন এইরূপ কারাবদ্ধ হয় তখন তাহা হয় নরক। মনের এমন একটী অবস্থার নাম নরক, যথার্থ প্রেমের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না—যেথায় বিরাজ করে কেবল দুঃখ এবং ক্লেশ।

স্বরূপে মানুষ একক। কিন্তু সে তাহা ভুলিয়াছে। সে অবস্থা বুঝিবার চেষ্টাও কখন করে না। পরন্তু সে অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা সর্বদা করে। রেডিও শুনিয়া, সিনেমা দেখিয়া, লঘু পাঠ্যপুস্তক বা সংবাদপত্র পড়িয়া সে নিঃসঙ্গ অবস্থা হইতে মুক্তির সন্ধান করে। বিদেশে ভ্রমণ করিয়া অথবা বনে গিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র আত্মার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু মুক্তির কোন সম্ভাবনা বা আশা না পাইয়া সে নিজের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়। সে এত ক্ষুদ্র। সে বুঝাইতে চাহে যে, সে মহৎ এবং কেহ তাহা মানিয়া লইলে সে উল্লসিত হয়। সে চাহে বিত্ত, প্রতিপত্তি যদ্দ্বারা তাহার ক্ষুদ্রত্ব বুঝিতে পারে—ক্ষুদ্রে 'আত্মা' তৃপ্ত হয়। কিন্তু যখন সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, সকল স্বপ্নই ভাঙিয়া যায় এবং তাহার কামনা পূর্ণ হইবার কোন আশাই থাকে না, তখন তাহার ব্যর্থতা এক বৃহৎ শূন্যে পরিণত হয়। এইরূপ হীন অবস্থায় যখন মনে হয় যে আনন্দ অন্তরের বস্তু, বাহিরের নহে, তখনই সে ভগবানের করুণা লাভের যোগ্যতা অর্জন করে। করুণা, ভগবান, আত্মা—সবই এক সত্যের নামান্তর মাত্র, যাহার শক্তি অখিল বিশ্ব নূতন করিতেছে, যাহার প্রেম সকলকে একত্বে বন্ধন করিতেছে। এই সত্যই একম্ অনন্তং ব্রহ্ম—ইহার অনুভূতিই কৈবল্য। সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। সত্যই আত্মা, অহম্ একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাকদেবী ব্রহ্মবিদুষী হইয়া ইহার পরিচয় ঋক্‌বেদের আটটী মন্ত্রে বিশদভাবে দিয়াছেন, ইহাই দেবীসূক্ত নামে পরিচিত।

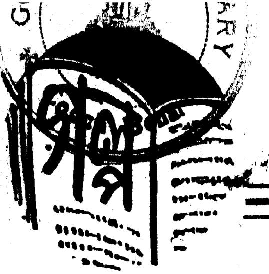
আমরা ঈশ্বর-রিক্ত অর্থাৎ তাঁহার কর্তৃত্ব এবং প্রেম বর্জ্জিত—এইরূপ অনুভূতির নামই দুঃখ বা ক্লেশ। তাঁহার সহিত একত্বের অনুভূতির দ্বারাই আমাদের সকল ক্লেশের অবসান হয়। প্রেমের রাজ্যে দুঃখ বা ক্লেশ থাকে না। ভক্ত ও ভগবানের মিলনে সকল সমস্যার সমাধান হয়। প্রেমই ব্যক্তির বা জাতির সমস্যার সমাধান, কূটনীতি নহে। প্রেম মনের বস্তু নহে, চিন্তা ইহার নাগাল পায় না। ক্ষুদ্র 'আত্মার' বিনাশ না হইলে প্রেমের উদয় হয় না। জীবনের সকল স্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য করার নাম প্রেম বা পরানুরক্তি এবং তাহাতেই পূর্ণ শান্তি লাভ হয়, যে শান্তি শাশ্বত, হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া, অবাঙমনস গোচর হইয়া বিদ্যমান।



অনাথের নাথ

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

পথে যেতে দেখি এক জরাজীর্ণ গাই
পতিত পথের মাঝে; রৌদ্র শির পরে,
অগ্নিশয্যা দেহতলে। হেন শক্তি নাই
উঠিয়া ছায়ায় যায়। মালিক সে ঘরে
নিশ্চিন্ত আরামে আছে। এক মুঠি ঘাস
সকালে রাখিয়া গেছে; তারি ক'টি কণা
খাইয়াছে কোন মতে। ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
চাহে উর্দ্ধপানে। করি পূজার্চনা
পূজারী ফিরিছে ঘরে; ধনিক সে ফিরে
কার্য্য শেষে গৃহপানে। পথিকের দল
দেখে আর পথ চলে; কেহ অতি ধীরে,
কেহ বা ত্বরিতে। হেন কালে নামে জল।
উঠে বসি গাই কহে আপন ভাষায়—
"নাথের নাথ তুমি, বাঁচালে আমায়!



দুই

সঙ্কর্ষণ রায়

রূপক বীথিকাকে বোঝাচ্ছিল, সংখ্যার আবিষ্কারের পেছনে বহু যুগের দার্শনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে। সংখ্যা সম্পর্কে তত্ত্ব কেবলমাত্র সংখ্যাতত্ত্ব নয়। সংখ্যার ধারণা যখন হ'ল তখন থেকেই সভ্যতার সূত্রপাত।

বীথিকা তন্ময় হ'য়ে শুনছিল। দু'জনের কারুরই খেয়াল নেই যে রাত অনেক হ'য়েছে। রূপক ব'লে চলে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কোন সংখ্যার ধারণা সম্ভব নয়। 'এক'কে শুধু 'এক' হিসেবে জানা শক্ত—সজ্ঞান সাধনায় সম্ভব কিনা জানি নে—হয়তো আধ্যাত্মিক মার্গে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়তে চমকে উঠে বীথিকা বললে, স্যার, রাত যে অনেক হ'ল।

হুঁশ হ'ল রূপকের। মাটিতে নেমে আসে যেন। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ বীথিকার মুখের দিকে চেয়ে থেকে সে বললে, নামের সামে-পেছনে অলঙ্কারের আতিশয্য আমি পছন্দ করি নে। স্যারটা বাদ দিতে হ'বে। আমার একটা নাম আছে—সংখ্যাতত্ত্বের মত তা' জটিল নয় এবং উচ্চারণও সহজ—সেই নাম ধ'রে ডাকলেই খুশি হ'ব।

মাথা নীচু ক'রে বীথিকা বললে, সময় লাগবে।

কেন সময় লাগবে! তোমার সাহায্য ছাড়া আমার রিসার্চ সম্ভব নয় বুঝতে তো আমার সময় লাগেনি। তোমাকে দেখা মাত্র বুঝেছিলাম।

দেখা মাত্র!

হ্যাঁ। তুমি বুঝতে পারো নি—বুঝতে দিই নি। মনে মনে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েছি শুধু। আমার নিঃসঙ্গ রিসার্চের মধ্যে এক ঝলক আলোর মত এসেছিল—আসা ত নয় আবির্ভাব—আমার সমস্ত পূর্বধারণার কুয়াশার আবরণ উন্মোচিত হ'তে একটুও সময় লাগেনি—তোমাকে দেখেই আবিষ্কার করেছিলুম 'এক' বিচ্ছিন্নভাবে 'এক' নয়।

বীথিকা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, ভয় হয়, হয়তো ক্রমশঃ আপনার কাছে ধরা প'ড়ে যাবো।

তাই তো চাই। ধরা দাও—দূরে থেকো না।

বীথিকা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, অনেক রাত হ'ল—এবার বাড়ি যেতে হয়।

বেশ, যাও। কিন্তু আমার যেতে দেরি আছে।

আর কতক্ষণ থাকবেন?

তুমি জানো না বীথিকা, প্রায় রাতই এখানে আমি থাকি।

এখানে! কিন্তু খাওয়া-দাওয়া?

একবেলা খাওয়াটা প্রায় অভ্যেস হ'য়ে গেছে। বাড়ি গেলেই তো আর খাওয়া জুটবে না—কোন রেস্তরাঁয় এত রাত্রে খাবার পাওয়া যায় না। অতএব—

বীথিকা ব্যথিত হ'য়ে বললে, আপনি আমাদের বাড়িতে চলুন। সেখানে খেয়ে—

মাথা নেড়ে রূপক বললে, না। এই কাজটা শেষ ক'রে তবে উঠব।

বেশি রাত করলে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি কিছুই যে পাবেন না।

তোমাকে তো বললুম—এখানে রাত কাটাবার অভ্যেস আমার আছে। ফিলজফিক্যাল সোসাইটির জন্য আর্টিকেলটা লিখতে লিখতে দিব্যি কেটে যাবে রাতটা। তুমি এখন যেতে পার।

আমার গাড়িতে ক'রে পৌঁছে দিতে পারতুম আপনাকে আপনার বাড়িতে।

বলছি তো—আমি এখন যাব না।—রূপক ঝাঁঝালো স্বরে ব'লে ওঠে।

বীথিকার চোখ দুটি ছল ছল করে—সে বললে, আমিও তা' হ'লে যাব না। ডিক্সনের প্রবন্ধ থেকে নোট করা যেটুকু বাকি আছে তা' শেষ ক'রে ফেলি না হয়।

বীথিকার মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি হেনে রূপক বললে, কাল এসে কোরো—এখন যাও। তোমার বাড়ির সবাই নিশ্চয়ই ভাবছেন। কেবলমাত্র রিসার্চের কাজে তোমার এত রাত হ'চ্ছে, তা' হয়তো তাঁরা বিশ্বাস করবেন না।

বীথিকার কান দুটো লাল হ'য়ে ওঠে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, যাই।

রূপক হঠাৎ গাঢ়স্বরে ডাকল, বীথিকা!

বেরিয়ে যেতে উদ্যত বীথিকা থমকে দাঁড়ায়। মুখ ফিরিয়ে রূপকের চোখ দুটির দিকে তাকাতেই সে শিউরে ওঠে। তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে হাঁটতে থাকে। শূন্য করিডর দিয়ে যেতে যেতে সে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল—রূপক তার গমন পথের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছে।

বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বীথিকা। স্বল্পালোকিত শূন্য য়ুনিভার্সিটির প্রাঙ্গণে বুইক গাড়িটি অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমন্ত ড্রাইভারকে তুলে দিয়ে গাড়ির মধ্যে উঠে বসল সে।

এতদিন যেন মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে ছিল বীথিকা। সংখ্যাতত্ত্বের যে নতুন পথের হদিস পেয়েছিল, সে পথের পুঁথির পাঠোদ্ধার করতে সে পারছিল না। তার এই ব্যর্থতা যেন তার অন্তঃসারশূন্যতাকে উদ্ঘাটিত ক'রে দেয়। দুঃসাহসী অভিমানের প্রত্যয় নিয়ে সে অগ্রসর হ'য়েছিল—চলতে গিয়ে সে দেখছে যে তার চলার শক্তি নেই।

নিজের ওপর ঘৃণা হ'ল—তার চেয়ে বেশি রাগ হ'ল তাদের ওপর—যারা এতদিন তার এই মোহের প্রশ্রয় দিয়েছে।

সে জানে যে রূপকের মর্মভেদী দৃষ্টি তার অন্তস্থল পর্যন্ত মেপে নিয়েছে—রূপকের কাছে তার ধরা পড়তে আর বাকি নেই। তার এই দুরাশাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে রূপক শুধু তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তাকে দিয়ে নানা দেশের জার্নাল ও রেফারেন্স বই থেকে তথ্য আহরণ করিয়ে নিচ্ছে—তা'ছাড়া সংগৃহীত মালমশলাগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করানো—তার মৌলিক অনুসন্ধিৎসাকে লোপ ক'রে ফেলছে রূপকের সর্বগ্রাসী চাহিদা।

সেদিন রূপকের একটা প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করছিল বীথিকা। প্রবন্ধটা এ্যাট্‌লান্টিক জার্নালের জন্য লিখেছে রূপক। সম্পাদকের কাছ থেকে একাধিকবার তাগাদা এসেছে—রূপকও তাড়া দিচ্ছিল।

বীথিকা হঠাৎ পাণ্ডুলিপি থেকে মুখ তুলে বললে, আমার রিসার্চ প্রবলেমটা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে ডিস্‌কাস করব ভেবেছিলাম।

সংখ্যাতত্ত্বের একটি পত্রিকা পড়ছিল রূপক—মুখ না তুলেই বললে, আমার প্রবলেম কী তোমার প্রবলেম নয়?

আপনি বলেছিলেন, আমার কাজে আপনি গাইড্ করবেন।

ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে রূপক বললে, আমার কাজ কী তোমার কাজ নয়?

বীথিকা ক্ষীণস্বরে বললে, আপনার কাজের নাগাল তো আমি পাই নে।

রূপক এবার মুখ তুলে তাকাল – গম্ভীর স্বরে বললে, পাও না বীথিকা? তা' হ'লে তো পণ্ডশ্রম করছ! যে কাজের থই পাও না, তাতে নিশ্চয় আনন্দও পাও না।

বীথিকা ভয় পেয়ে বললে, আনন্দ পাই নে তা' তো আমি বলিনি। থই না পেলেও বুঝতে চেষ্টা করতেই তো আনন্দ।

বুঝতে কী তুমি চেষ্টা করছ?

বীথিকা নীরব।

রূপক ব'লে চলে, তোমার ধারণা তোমাকে আমি এক্সপ্লয়েট করছি—তাই না? বেশ, তোমাকে আমি অব্যাহতি দিলুম। তুমি তোমার নিজের রিসার্চ নিয়ে থাকো।

বীথিকার চোখ দুটি জলে ভ'রে ওঠে—সে বললে, আপনি ভালোভাবেই জানেন তা' আমি পারব না—একা একা রিসার্চ করবার মত শক্তি আমার নেই।

তা' হ'লে বাড়িতে গিয়ে ব'সে থাকো।

অশ্রু-আকুল দৃষ্টিতে রূপকের মুখের দিকে চেয়ে বীথিকা

বললে, তা' হ'লে ডক্টর নিয়োগীকে গিয়ে বলি যে রিসার্চ স্কলারশিপে আর আমার দরকার নেই।

ব'লে সে উঠে দাঁড়ায়।

রূপক একদৃষ্টে তার জলভেজা মুখের দিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ সে তার দিকে এগিয়ে এসে তার হাত দুটি চেপে ধ'রে বললে, বীথি, তুমি কী বোঝ না তুমি চ'লে গেলে আমার রিসার্চ খোঁড়া হ'য়ে যাবে! আমার পাশে তুমি না থাকলে আমি যে আর এক পাও এগুতে পারব না।

বীথিকা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে—কিন্তু রূপকের শক্ত মুষ্টি তার দুর্বল প্রয়াসকে ব্যর্থ ক'রে দেয়।

রূপক কম্পিত স্বরে বললে, আমার দশ বছরের রিসার্চের ফল আমি তোমাকে দিচ্ছি—আমার যা কিছু কাজ সব তোমার হোক। আজ থেকে আর আমার রিসার্চ নয়, তোমার রিসার্চ। আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করব। আমার নাম-যশ, আমার এতদিনের সাধনা সব কিছুর বিনিময়ে আমি শুধু তোমাকে চাই।

রূপকের উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে বীথিকা যেন বিভীষিকা দেখল—দুর্বল কণ্ঠে সে বললে, ছেড়ে দিন আমাকে।

কথা দাও যে তুমি চ'লে যাবে না।

যেতে তো আমি চাই নে। চ'লে যাবার শক্তি কী আমার আছে!

দিন কয়েক বাদে রূপক বললে, "নাম্বার" জার্নালটির টেন্‌থ ভলিউম তুমি পুরোপুরি কনসাল্ট করেছ বলছিলে না?

বীথিকা বললে, হ্যাঁ, করেছিলাম।

কোন উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ তো তোমার চোখে পড়েনি।

না—সবই গতানুগতিক।

কিন্তু ফিফ্‌থ্‌ নাম্বারে 'থিয়োরী অব্‌ ইন্টিগ্রেশনের' ওপর এই পেপারটি পড়েছিলে।

পড়েছি বোধ হয়। খুব সম্ভব তেমন কিছু মনে ক'রে রাখবার মত নেই ওতে।

রূপক উত্তপ্তকণ্ঠে বললে, তার মানে তুমি পড়ো নি। এমন একটা ব্রিলিয়াণ্ট পেপার তোমার নজরে এল না—কী যে রেফারেন্স ঘাঁটছ ভেবে পাই নে।

বীথিকা আমতা আমতা ক'রে বললে, কার লেখা পেপার?

স্ট্যাটিস্টিকেল ইন্‌ষ্টিট্যুটের তাপস বসুর লেখা। তাপস বসু—কই ওর নাম তো কখনো শুনি নি।

বীথিকা চমকে উঠে বললে—তাপস বসু!

হ্যাঁ তাপস বসু। কিন্তু নামটা শুনে ও রকম চমকে উঠলে কেন? চেন নাকি ওকে?

মুখ নীচু ক'রে বীথিকা বললে, চিনতাম। ও আমাকে ম্যাথমেটিক্স শিখতে সাহায্য করেছে।

শুধু ম্যাথমেটিক্স শিখতে সাহায্য করেছে!—রূপক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায়। বীথিকা দেখল তার নীল চোখ দুটিতে ঈর্ষার জ্বালা। তার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিল রূপক—আবার স্ট্যাটিস্টিকেল ইন্‌ষ্টিট্যুটের জার্নালে মন দিল।

খানিক বাদে রূপক বললে, তুমি তাপসের কাছে একবার যাও বীথিকা—ওর এই ইন্টিগ্রেশনের থিয়োরীটা ভাল ক'রে বুঝে এস।

নিতান্ত উত্তাপহীন স্বরে কথা কটি বলল।

বীথিকা বললে, ওঁকে ডেকে পাঠালে হয় না?

গম্ভীর গলায় রূপক বললে, না। ওর সঙ্গে পরিচিত হ'বার ইচ্ছে নেই আমার।

বীথিকা বললে, কিন্তু—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রূপক বললে, কিন্তু নয়—তুমি এক্ষুণি যাও।

ওঁর পেপারটা ভাল ক'রে না প'ড়ে তো ওঁর সঙ্গে ডিসকাস করতে পারব না।

তাই তো—আমার খেয়াল ছিল না। এই নাও পেপারটা।

তাপস বসুর জটিল ফর্মুলা-কণ্টকিত প্রবন্ধটির দুর্বোধ্যতা ভেদ করতে পারে না বীথিকা। পড়তে গিয়ে তার মাথা ঘোরে।

রূপক বললে, খুব ইণ্টারেস্টিং নয়?

বীথিকা কোন মতে বললে, হ্যাঁ।

কাল বা পরশু যেও একবার তাপসের কাছে। স্ট্যাটিস্টিকেল ইনষ্টিট্যুটের লাইব্রেরীতে তাপসের সঙ্গে

দেখা হ'ল বীথিকার। তাপস তাকে দেখে বললে, হঠাৎ মনে পড়ল আমাকে !

বীথিকা হেসে বললে, কেন, মনে পড়তে নেই নাকি ? তুমি তো আমার খোঁজই নাও না।

তাপসের মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে—সে বললে, খোঁজ নিলেই কী খোঁজ মেলে ? ডক্টর রূপক মিত্রের সঙ্গে ধর্মরকম রিসার্চ করছ—তোমার নাগাল পাওয়ার দুরাশা আমার কী ক'রে থাকবে বলো ?

আরক্ত মুখে বীথিকা বললে, ডক্টর মিত্রের সঙ্গে রিসার্চ করছি এ খবর তা' হ'লে রাখো ?

খবর কানে এসেছে—তোমাদের যুগ্ম প্রচেষ্টার দিকে অনেকেরই উৎসুক নজর আছে কিনা !

নিমেষে বীথিকার মুখের কমনীয়তা অন্তর্হিত হয়—সে বললে, অনেকের মানে কাদের ?

তাপস বললে, অনেকের মানে অনেকের। ডক্টর মিত্রের রিসার্চে অংশ নিয়েছ এতবড় বিস্ময়কর ঘটনা উপেক্ষা করতে হ'লে ডক্টর মিত্রের মত আত্মকেন্দ্রিক হ'তে হয়।

বীথিকার কানের ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ ক'রে ওঠে। তাড়াতাড়ি কথাটাকে চাপা দেবার জন্য সে বললে, নাম্বারে' তোমার যে পেপারটি বেরিয়েছে ওটা সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই তোমার সঙ্গে—অবশ্য যদি তোমার সময় হয় ও আপত্তি না থাকে।

তাপসের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—সে বললে, পেপারটা তোমার নজরে এসেছে !

এসেছে বৈকি। অমন একটা ব্রিলিয়াণ্ট পেপার নজরে না এসে পারে ! সত্যি তাপস, তুমি একটা বর্ণচোরা আম। তোমার সঙ্গে এতদিন এত আলোচনা করেছি, অথচ তোমার রিসার্চ সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করো নি।

বিস্মিত হয়ে তাপস বললে, প্রকাশ করি নি মানে ! আমার তো যতদূর মনে পড়ে, কম পক্ষে পঞ্চাশ বার আমার রিসার্চের বিষয়ে তোমাকে আমি বলেছি।

ছাই ব'লেছ। তোমার ঐ প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কিছুই তো আমি জানি নে।

কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় দৃষ্টিতে বীথিকার মুখের পানে চেয়ে থেকে তাপস বললে, প্রবন্ধটির প্রথম খসড়া তোমাকে প'ড়ে শুনিয়েছিলাম বীথি !

বীথিকা অপ্রস্তুত হ'য়ে বললে, কই—আমার তো মনে পড়ছে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাপস বললে, মনে পড়ছে না ? অবশ্য মনে রাখবার মত তো নয়।

বীথিকা ব্যস্ত হ'য়ে বললে, তোমার ঐ পেপারটা বুঝে নিতে চাই তাপস।

খুব সাধারণ ইণ্টিগ্রেশনের কতগুলো ফর্মুলা ব্যাখ্যা করেছি—তোমার সংখ্যাতত্ত্বের সমুদ্রের পাশে গোষ্পদ ওটা —বুঝে নেবার তো কিছু নেই।

আছে বৈকি ! অমন একটা ইণ্টারেষ্টিং পেপার।

ইণ্টারেষ্টিং !—বীথিকার চোখে চোখ রেখে তাপস বললে, আমার মনে হচ্ছে তোমার নিজস্ব ইণ্টারেস্ট নিয়ে তুমি আসো নি—বোধ হয় ডক্টর মিত্র ইণ্টারেস্টেড্ হ'য়েছেন। তাই না ?

না, না, ডক্টর মিত্র ইণ্টারেস্টেড্ হ'বেন কেন ? আমার রিসার্চে সাহায্য করবে ও পেপারটি।

তোমার রিসার্চ ! শুনেছি তুমি আর ডক্টর মিত্র এক সঙ্গে কাজ করছ। পেপারটা তোমাকে যখন প'ড়ে শুনিয়েছিলাম তখন মনে হয় নি, অথচ এখন তোমার মনে হচ্ছে যে কাজে লাগবে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা কোরো না বীথিকা ! পেছনে ডক্টর মিত্রের ছায়া দেখছি। তুমি ডক্টর মিত্রকে পাঠিয়ে দাও—আমি তাঁর সঙ্গেই আলোচনা ক'রব।

কেন—আমার সঙ্গে আলোচনা করতে দোষ কী ?

ডক্টর মিত্র কেন ইণ্টারেস্টেড হ'লেন তা' তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই।

বীথিকা চুপ ক'রে রইল।

খানিক বাদে তাপস নরম গলায় ডাকল, বীথি !

বীথিকা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি এখন যাই।

ঐ পেপারটি ছাড়া আলোচনা করার মত আর কী কিছু নেই বীথি ?

আমার সময় নেই।

তোমার সঙ্গে যে আমার কথা ছিল। সংখ্যাতত্ত্ব বা ইণ্টিগ্রেশনের ফর্মুলার বাইরেও একটা জগৎ আছে—

বীথিকা বাধা দিয়ে বললে, তার খবর নিতে একটুও আমার আগ্রহ নেই। আমি চললুম।

রূপক এক মনে লিখে যাচ্ছিল। বীথিকা যখন ঘরে ঢুকল সে টের পেল না।

অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে তাকে দেখতে পেয়ে রূপক বললে, এত দেরি যে! তাপস বোসের সঙ্গে খুব লম্বা ডিস্‌কাশন হ'ল বুঝি?

রূপকের গলার স্বরে বিদ্রূপের ব্যঞ্জনা।

আহত দৃষ্টি তুলে বীথিকা বললে, অনেকক্ষণ এসেছি—আপনি টের পান নি।

কী বললে তাপস?

তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি হন নি—আপনাকে বললেন তাঁর কাছে যেতে।

দুঃসহ ক্রোধে রক্তিম হ'য়ে ওঠে রূপকের মুখ—সে বললে, আস্পর্ধা তো কম নয়।

উনি ভেবেছেন ওঁর পেপারটার বিষয় আপনি ইন্টারেস্টেড—আমি নই।

তুমি তাকে সে কথা বলেছ বুঝি?

না—আমি বলতে যাব কেন?

কিন্তু কী ক'রে ও বুঝল যে ওর ঐ ব্লাস্টেড্ পেপারটা সম্বন্ধে আমি ইন্টারেস্টেড?—উত্তেজনায় রূপকের গলার স্বর কাঁপে।

বীথিকা অস্ফুট কণ্ঠে বললে, তাতো আমি জানি নে।

তুমি জানো। আমি জানি তুমি ওকে বলেছ। তুমি ওর কাছে নিশ্চয়ই বড়াই ক'রে বলেছ যে তুমি আমার রিসার্চের পার্টনার। আমার ধারণা তুমি সবাইকে এ কথা ব'লে আমাকে বে-ইজ্জৎ করার চেষ্টা করছ। তুমি কী মনে করো আমার রিসার্চে অংশ নেবার যোগ্যতা তোমার আছে? পার্টনার্‌শিপের অধিকার কখনো তোমাকে দিয়েছি?

দুঃসহ ব্যথায় বিবর্ণ হ'য়ে ওঠে বীথিকার মুখ—সে কিছু বলতে পারল না।

খানিক বাদে রূপক বললে, আমি ভুল করেছিলাম বীথিকা। নাম্বার্সের ডেফিনিশনস গোড়ায় শূন্য থেকে শুরু করা হয়তো যায় না—'এক'কে বুঝতে হ'লে 'দুই'কে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়তো অবাঞ্ছনীয় নয়—কিন্তু আমার রিসার্চ সে একান্তভাবে আমারই—সেখানে দু'জনের স্থান নেই।

বীথিকা অবরুদ্ধ স্বরে বললে, আমারো তাই মনে হয়েছে। আপনার রিসার্চে অংশ নেবার যোগ্যতা যে আমার নেই তা' আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম।

ব'লে উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ ক'রে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রিসার্চ সম্বন্ধে আর কোন মোহ অবশিষ্ট রইল না বীথিকার মনে। সংখ্যাতত্ত্বের জটিল পথে নতুন আলোক সম্পাতের দুরাশা আর তার নেই। সে ভাবল, রিসার্চ স্কলারশিপ ছেড়ে দেবে।

নিতান্তই সময় কাটাবার জন্য লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসে বীথিকা—অন্যমনস্কভাবে বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকার পাতা ওল্টায় সারাদিন ধ'রে।

রূপক হঠাৎ একদিন তাকে ডেকে পাঠাল তার বেয়ারাকে দিয়ে। বীথিকা রূঢ়ভাবে বেয়ারাকে বললে, ডক্টর মিত্রকে বোলো ওঁর সঙ্গে দেখা করবার সময় নেই আমার।

বেয়ারা বিস্মিত হ'য়ে বললে, ওঁর বিশেষ দরকার বলছিলেন।

ওঁকে বোলো আমার সময় হ'বে না।

বেয়ারা চ'লে গেল।

খানিক বাদে রূপকের লেখা একটি স্লিপ দিয়ে গেল বেয়ারা। রূপক লিখেছে তোমার কাছে আমি অপরাধ করেছি—সাক্ষাতে ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই। দেখা দেবে না, এতটা ক্ষমাহীন নিশ্চয়ই তুমি নও।

স্লিপটা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলল বীথিকা।

সন্ধ্যাবেলা লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল বীথিকা—দোতলার সিঁড়ির মুখে সে দেখল রূপক দাঁড়িয়ে আছে।

উসকো খুসকো চুল—উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা—রূপককে সে যেন চিনতে পারছিল না। তার পাশ কাটিয়ে চ'লে যাবার চেষ্টা করতেই রূপক তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলুম বীথিকা।

তার কাতর গলার স্বর বীথিকাকে স্পর্শ করে। মুখ তুলে দেখল পর্বতপ্রমাণ অহঙ্কার যেন ধূলিসাৎ হয়েছে। কিন্তু সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রূপক মিনতি ক'রে বললে, পাঁচ মিনিটের জন্য আমার ঘরে এস বীথিকা।

বীথিকা দাঁতে দাঁত চেপে বললে, আমার সময় নেই।

পাঁচ মিনিটও কী সময় হ'বে না ?

না।

হঠাৎ বীথিকার হাত চেপে ধরে রূপক। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বীথিকা বললে, ছিঃ!

রূপকের ব্যথিত মুখখানির দিকে চেয়ে বীথিকার মনটা ছলছলিয়ে উঠলেও তাড়াতাড়ি সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায়।

সে রাত্রে বীথিকার চোখে ঘুম এল না। অপমানিত রূপকের কুণ্ঠিত ক্লিষ্ট চোখের দৃষ্টি যেন তার বিনিদ্র রাতের আঁধারকে অধিকার ক'রে থাকে। নিজেকে হঠাৎ যেন এক অননুভূত বেদনার মধ্যে সে আবিষ্কার করল।

পরদিন য়ুনিভার্সিটিতে গিয়েই সে রূপকের খোঁজ করল। রূপকের ঘরের দোরগোড়ায় ব'সে ছিল তার বেয়ারা—বীথিকাকে সেলাম ক'রে সে বললে, ডক্টর মিত্র আজ আসেন নি।

বীথিকা অবাক হ'ল। রূপক য়ুনিভার্সিটিতে আসে নি এমন তো হয়নি কোন দিন। সে বললে, আসেন নি কেন ?

বেয়ারা জবাব দিল, তা' তো জানি নে।

বীথিকা শূন্য মনে লাইব্রেরীতে গিয়ে বসল।

রূপক তার পরদিনও এল না। রূপকের ঘরে ব'সে সারাটা দিন কাটাল বীথিকা। টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজপত্রের ওপর বোবা শূন্যতা যেন চেপে ব'সে আছে। রূপকের ফাঁকা চেয়ারটির দিকে চেয়ে রইল সে অনেকক্ষণ —দু' চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ল দর দর ক'রে।

পর পর সাতদিন ধ'রে রূপক অনুপস্থিত। অপেক্ষার গুরুভার সইতে না পেরে বীথিকা য়ুনিভার্সিটির অফিসে গিয়ে হেডক্লার্কের কাছে রূপকের ঠিকানা জানতে চাইল।

হেড্‌ক্লার্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বীথিকার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ওঁর অনুমতি ছাড়া স্বয়ং ভাইস্ চ্যান্সেলারকেও ঠিকানা বলতে পারব না।

বীথিকা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

হেড্‌ ক্লার্ক বললেন, আমি খুব দুঃখিত। আপনি কিছু মনে করবেন না।

বীথিকা আস্তে আস্তে বললে, অনেকদিন ধ'রে তিনি আসছেন না—ওঁর কী হয়েছে জানেন ?

না—কোন খবর পাইনি। ছুটির জন্য কোন দরখাস্তও ডক্টর মিত্র পাঠান নি। হয়তো ওঁর শরীর খারাপ হয়েছে।

আশঙ্কায় বীথিকার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে।

তার ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে শেষ পর্যন্ত হেড্‌ ক্লার্ক বললেন, আপনাকে ঠিকানা বললে ডক্টর মিত্র হয়তো আপত্তি করবেন না। আপত্তি আর সবার ক্ষেত্রে যত প্রবল হোক না কেন—আপনার বেলায় হয়তো—

অসমাপ্ত কথার ওপর যতি টানলেন তিনি মৃদু অর্থব্যঞ্জক হাসি হেসে।

আরক্ত মুখে চোখ নীচু করল বীথিকা।

এক টুকরো কাগজে ঠিকানা লিখে তার হাতে দিয়ে হেড্‌ক্লার্ক বললেন, এই নিন ঠিকানা। ডক্টর মিত্র রেগে-মেগে যদি আমার গর্দান নিতে আসেন আশা করি আপনি আমাকে রক্ষা করবেন।

হেড্‌ ক্লার্কের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না বীথিকা। কাগজের টুকরোটি নিয়ে সে তাড়াতাড়ি অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ির দোতলায় থাকে রূপক। দোতলায় উঠে এল বীথিকা। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা—ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই।

কম্পিত বক্ষে সে বার কয়েক কড়া ধ'রে নাড়ল। কেউ এল না বা সাড়া দিল না।

সে দাঁড়িয়ে থাকে হতভম্বের মত—চ'লে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় পাশের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। খানিকটা অবাক হ'য়ে বীথিকার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনি কী ডক্টর মিত্রের কাছে এসেছেন ?

ভদ্রমহিলার সন্ধানী দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হ'য়ে বীথিকা বললে, হ্যাঁ।

ডক্টর মিত্র খুব অসুস্থ—জ্বরে বেহুঁশ হ'য়ে আছেন।

বাড়িতে আর কী কেউ নেই? কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

কে আর সাড়া দেবে? চাকরটা এখনো ফেরে নি—কোন এক আফিসে আর্দালির কাজ করে।

ওঁর আত্মীয়-স্বজন কী কেউ নেই? মানে কাউকে খবর দেওয়া হয়নি?

উনি তো বলেন—ওঁর কেউ নেই।

বীথিকা নির্বাক।

খানিক বাদে ভদ্রমহিলা বললেন, আমরা ডাক্তার ডেকে আনলুম—উনি তো চ'টে-ম'টে অস্থির—বললেন, ডাক্তার ডাকবার কী দরকার ছিল—এম্নি সেরে যাবে জ্বর।

ডাক্তার কী বললেন? বীথিকার গলার স্বর কাঁপছিল।

বললেন—ডবল নিউমোনিয়া হ'য়েছে।

বীথিকার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কোন মতে আত্ম-সংবরণ ক'রে সে বললে, রীতিমত চিকিৎসা হচ্ছে কী? না উনি তাতেও বাধা দিচ্ছেন?

দিচ্ছিলেন—এখন আর সে ক্ষমতা নেই। কিন্তু মুশকিল হ'য়েছে এই যে রীতিমত শুশ্রূষা হচ্ছে না। কে আর করবে? চাকরটা তো দশটা-পাঁচটা আপিস করে। আমাদেরো সময় হয় না—সময়মত শুধু ওষুধ-পথ্যি খাইয়ে আসি।

তারপর বীথিকার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি বললেন, আপনি ডক্টর মিত্রের কেউ হন নাকি?

বীথিকা বললে, আমি ওঁর ছাত্রী।

আশা করি ওঁর সেবা-শুশ্রূষায় আর কোন ত্রুটি হ'বে না।—ভদ্রমহিলার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে।

তিনি ব'লে চলেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভেতরে যান।

বীথিকা ভেতরে এল। ধূলি-ধূসর বসবার ঘর পেরিয়ে সে শোবার ঘরে ঢুকল। মলিন শয্যার ওপর শুয়ে আছে রূপক চোখ বুঁজে।

রূপকের রুক্ষ শীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বীথিকার বুকের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। তার কপালে হাত দিয়ে দেখল, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

জ্বরে আচ্ছন্ন রুগ্ন ফ্যাকাশে মুখটির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকে বীথিকা। অন্তবিহীন দুস্তর পথ পেরিয়ে আজ এসে পৌঁচেছে সে রূপকের জীবনে। রোগ শয্যার শিয়রে দাঁড়িয়ে সে তার জাগরণ অনুভব করে পরম বেদনার মধ্যে। যে পুষ্পাস্তীর্ণ পথ সংখ্যাতত্ত্বে চাপা প'ড়েছিল সন্ধ্যার মলিন আলোয় প্রকাশ পেল তা' এই রোগশয্যায়। তার ইচ্ছে হ'ল ঐ রোগতপ্ত অসহায় মুখখানাকে বুকে চেপে ধরে বলে, জাগো—স্বীকৃতি দাও আমার এই নূতন জাগার পালাকে।

মাসখানেক বাদে একদিন সকালে রূপকের জন্য ফলের রস তৈরী করছিল বীথিকা—সোফায় ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে দিয়ে ব'সে তার আনত মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল রূপক। সেরে উঠেছে সে—কিন্তু দুর্বলতা পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারেনি এখনো।

বীথিকা বললে, ফলের রস খেয়ে পোষাক বদলে ফেল—ধুতি, পাঞ্জাবী বের ক'রে রেখেছি আমি।

রূপক বললে, কোথাও যেতে হ'বে নাকি?

না। সেজেগুজে ঐ সোফাতে ব'সে থাকবে শুধু। রেজিস্ট্রার আসছেন।

রূপক অবাক হ'য়ে বললে, রেজিস্ট্রার! য়ুনিভার্সিটির দপ্তর ছেড়ে আমার এখানে আসবার উৎসাহ হ'ল কেন ওঁর হঠাৎ? আমার চাকরি খতম করবেন নাকি?

খিল খিল ক'রে হেসে উঠে বীথিকা বললে, না গো না—য়ুনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার নয়—ম্যারেজ রেজিস্ট্রার।

রূপক চুপ ক'রে রইল।

চোখ নামিয়ে বীথিকা বললে, আর আমি দেরি করতে চাই নে। সংখ্যাতত্ত্বনিধি ডক্টর মিত্রকে বিশ্বাস নেই—ওঁর য়ুনিভার্সিটির ঘরটিতে ফিরে গেলে তাঁর মধ্যে আর আমার রূপককে খুঁজে পাবো না ব'লে ভয় হয়। তাই আমার অনেক দুঃখে-পাওয়া পরমপ্রাপ্তিকে বেঁধে রাখতে চাই আমার প্রতিদিনের ভালবাসার মধ্যে। সংখ্যাতত্ত্বের জটিল পথে তাকে খুঁজতে যেতে যেন না হয়।

রূপক হেসে বললে, কিন্তু কথা ছিল আমার রিসার্চে তুমি সঙ্গ দেবে।

আকাশ থেকে মাটিতে নামতে চায় আমার ভালবাসা —তোমার প্রতিদিনের সব কিছু জড়িয়ে থাকতে চায়! লক্ষ্মীটি, আপত্তি কোরো না!

আপত্তি করবার শক্তি তো আমার নেই।

ফুলের সৌরভ জড়ানো রাত। রূপককে জড়িয়ে ধ'রে তার কানে কানে বীথিকা বললে, তোমার রোগশয্যা আমাদের ফুলশয্যা হ'ল। 'একে'র ডেফিনিশন ডিঙিয়ে 'দুই'তে এসে পৌচেছি আমরা। সংখ্যাতত্ত্বের গবেষণার ত্রুটি আমাদের জীবন দিয়ে পূরণ করতে পারবো না আমরা?

উত্তরে বীথিকার ফুলের মত নরম ঠোঁটে তৃষাতুর চুম্বন এঁকে দিল রূপক।

এর পর আর কোন কথা বললে না কেউ।

সাহিত্য-সমারোহ

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিগত ২০শে ও ২১ এপ্রিল তারিখে আকাশবাণীর প্রযোজনায় সর্ব-ভারতীয় সাহিত্য-সমারোহ অনুষ্ঠান নয়াদিল্লীর বিজ্ঞানভবনে সম্পন্ন হয়ে গেল। ভারতীয় সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত তেরটি আঞ্চলিক ভাষার সেরা কথাশিল্পীদের একত্রে একই মঞ্চের উপর সমবেত করে এই জাতীয় সমারোহ অনুষ্ঠানের আয়োজন আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ এর পূর্বেও দুইবার করেছেন। প্রথমবারের অনুষ্ঠান হয় ১৯৫৬ সালে, সেই বছরে সমারোহ অনুষ্ঠানে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে, গল্প, উপন্যাস ছাড়াও রম্যরচনা, প্রবন্ধ, সমালোচনা-সাহিত্য ও কাব্যতত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন ভারতীয় সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত তেরটি আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্ন প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক। তারপর গতবছর ১৯৫৭ সালে শুধুমাত্র গল্প উপন্যাসই সমারোহ অনুষ্ঠানের মূল বিষয়-বস্তু ছিল। এই বছরের সাহিত্য-সমারোহ অনুষ্ঠানে নানা রকমের আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বাদানুবাদ, অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রধান উপজীব্য ছিল নাট্য সাহিত্য। ভারতের ১৩টি আঞ্চলিক ভাষার সবশুদ্ধ ৮৭ জন সাহিত্যিক এই বছরের সাহিত্য সমারোহ অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং দুইদিন ধরে নাট্য সাহিত্যের বিভিন্ন গতি, প্রকৃতি, নাটক রচনার আখ্যানবস্তু, বর্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী নাটক রচনার আদর্শ, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাযুক্ত নাটকসৃষ্টির আবশ্যকতা, নাটককে বিশুদ্ধ সাহিত্যের স্তরে উপনীত করার লক্ষ্য এবং বেতার-নাটকের যথার্থ স্বরূপ ও বেতার-নাটকের সঙ্গে সাধারণ পর্যায়ের নাটকের পার্থক্য প্রভৃতি নানা দিক দিয়ে দুইদিনের বিভিন্ন সময়ে অনেক রকমের আলোচনা হয়। তা ছাড়া প্রত্যেকটি ভাষায় অনেক-গুলো স্বরচিত নাটকও সমবেত নাট্যকারগণ পাঠ ক'রে শোনান। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক ভালো রঙ্গমঞ্চ রয়েছে। এই সব রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী অনেক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নাটকও লেখা হয়েছে। অবশ্য বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী ও তামিল ভাষায় এখন পর্যন্ত যে ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ভালো নাটক রচিত হয়েছে, হিন্দী, কাশ্মিরী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া ও ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় সেই স্তরের নাটক এখনো তেমন লেখা হয়নি। আর এখন চলচ্চিত্র শিল্প যেভাবে সারাদেশের নাটক রচনার প্রয়াসকে বিধৃত করে রেখেছে, তাতে দেখা যায় খুব হাল্‌কা ধরণের সহজে-মন-মাতানো খুচরো নাটক সৃষ্টিতেই অধিকাংশ নাট্যকারদের আজকাল আগ্রহ বেশী। বেশ জোরালো ঘটনা-সংস্থানের উপরে ব্যাপক ও গভীর পরিবেশের অবতারণা করে বিচিত্র ধরণের বর্ণাঢ্য নাটক সৃষ্টির প্রচেষ্টা এখনকার যুগে যেন প্রায় বিরল হয়ে এসেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃতী নাট্যকারগণ গত পঞ্চাশ বছর কাল ধরে যত বিচিত্র ধরণের নাটক রচনা করেছেন, মোটামুটিভাবে তার সমীক্ষা করলে দেখা যাবে যে সাধারণত তিন শ্রেণীর নাটক এঁরা সৃষ্টি করেছেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, চল্‌তি অর্থে আমরা যাকে 'নাটক' নামে আখ্যা দিয়ে থাকি তাকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; তা হ'ল ঐতিহাসিক নাটক পৌরাণিক নাটক এবং সামাজিক নাটক। যদিচ পৃথিবীর সবদেশের সাহিত্যের নাটকগুলোকেই এই রকম তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব, কিন্তু ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয় সাহিত্যে এই তিন জাতের ছাড়া আরো অন্যান্য প্রকৃতির নাটক রচনায় অনেকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। বাংলাতে রবীন্দ্রনাথও প্রতিকী-নাটক, রূপক নাটক প্রভৃতি রচনা করে ধরাবাঁধা চিরাচরিত পথের বাইরে অনেক নতুন নতুন নাট্যধারার প্রবর্তন করেছেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় এই চিরাচরিত তিনটি শ্রেণীর নাটকই বেশী রচিত হয়েছে, তা ছাড়া আমাদের দেশের সব জাতের নাটক রচনাতেই তিনটি প্রবাহ সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হয়ে আছে দেখা যায়। এই তিনটি প্রবাহ নাটক

রচনায় তিন ধরণের রচনা শৈলীর প্রবর্তন করেছে। একটি হ'ল বিদেশী ভাষার উপাদান, বিষয় বস্তু ও রচনা রীতি অবলম্বনে লেখা নাটক, এই দিক থেকে দেখা যাবে ইংরেজী ও ফরাসী নাট্য সাহিত্য ভারতের সব অঞ্চলের নাট্যকারদের রচনার উপরেই অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির ধারা, রচনার পদ্ধতি ও নাটক মঞ্চস্থ করণের কলা কৌশল ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রভাব ভারতীয় ভাষায় রচিত নাটকগুলোকে নতুনভাবে ঢেলে সাজতে আরম্ভ করে। ভারতীয় ভাষায় রচিত নাটকগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় ধারা এসেছে সংস্কৃত নাটক, তথা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে। বলা বাহুল্য পাশ্চাত্য প্রভাবের মতোই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব ও ভারতীয় রচনার উপরে অত্যন্ত জীবন্ত। আধুনিক কালের বহু নাট্যকার সংস্কৃত নাটকের আদর্শে তাঁদের স্ব স্ব ভাষায় নাটক রচনা করেছেন। সংস্কৃত নাটকের নান্দীমুখ ও সূত্রধার কত বিচিত্ররূপে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নাটক রচনায় স্থান পেয়েছে। নাটকের মধ্যে রঙ্গ রস ও কৌতুকের আমদানী, বিশেষ এক ধরণের হাস্যোদ্দীপক বিশিষ্ট চরিত্রের সৃষ্টি, প্রভৃতি তো সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের পরিকল্পনা থেকেই এসেছে। দক্ষিণ ভারতের তামিল নাটক, মালয়ালাম নাটক, এমন কি, দৃশ্য নাট্য, নৃত্য নাট্য, শব্দ নাট্য প্রভৃতি, কথাকলির ব্যঞ্জনা, ভরত-নাট্যমের গুরুগম্ভীর নৃত্য রূপায়ন ইত্যাদি পুরোপুরিভাবে সংস্কৃত নাটকের প্রভাবপুষ্ট ও সংস্কৃত নাটকের মূলানুগ। তারপর তৃতীয় ধারা হল —পাশ্চাত্য প্রভাব ও সংস্কৃতের প্রভাব ছাড়া যথাযথভাবে স্বীকৃতির দ্বারা পাশ্চাত্য ধারা ও সংস্কৃতের ধারা অনুসরণ না করে, বিন্দুমাত্র স্বীকৃতি না জানিয়ে অনায়াসে উক্ত দুই ধারার উপাদান কৌশলে আত্মসাৎ করা, অনুসরণ করা বা ঋণ স্বীকার না করেও অনুবাদ করে কাজে লাগানো। অসমীয়া, ওড়িয়া ও কাশ্মারি ভাষায় হাল আমলের রচিত অনেক নাটকের সন্ধান পাওয়া যাবে, যা একাধিক সংস্কৃত নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য থেকে বেমালুম অনুবাদ করে লেখা, অথচ মূল নাট্যকার তার জন্য স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন নি। রাজা শূদ্রকের লেখা, সংস্কৃত নাটক 'মৃচ্ছকটিকের' ধারা অনুসরণ করে ওড়িয়া ভাষায় নাটক লেখা হয়েছে, নাটকটির বিন্যাস এমনভাবে করার চেষ্টা হয়েছে যে, মূল সংস্কৃত নাটকের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য থেকে অনুবাদের ও মূল সংস্কৃত থেকে অনুকরণের গন্ধ যাতে না পাওয়া যায় তার জন্য নাট্যকার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বেল ফুলের সৌরভ কি মালিনী নিপুণা হ'লেও তার ঝুড়িতে কখনো পাতা চাপা থাকে?

অবশ্য এই মাত্র সেদিনও ওড়িয়া ও অসমীয়া, এই দুই ভাষাতেই নাটক রচনা সুরু হয় বাংলা নাটকের খাঁটি ও মূলানুগ অনুবাদের সাহায্যে। ডি, এল, রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত', 'শাজাহান,' ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' 'প্রতাপাদিত্য', শরৎচন্দ্রের 'দত্তা', 'পল্লী সমাজ', 'ষোড়শী' খুবই সার্থকভাবে ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। তা ছাড়া পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক আরো অনেক বাংলা নাটকের অনুবাদ হয়েছে উক্ত দুই ভাষাতে।

মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছে, যুগপৎভাবে বিদেশী নাট্য সাহিত্যের প্রভাব ও পাশ্চাত্য প্রভাব, সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের প্রভাব এবং সর্বশেষে এমন ধরণের প্রভাব—যাকে প্রভাব না বলে 'অনুকরণ' বা 'অনুসরণ' বলাই বাঞ্ছনীয় এবং সেই অনুকরণ বা অনুসরণ স্বীকৃতির দ্বারা সিদ্ধ ও যুক্ত নয়—ঋণ স্বীকার না করে অনুকরণ, মূল লেখকের রচনার অংশবিশেষ নিজের বলে ব্যক্ত করার অপপ্রয়াস—এই তিন ধরণের তিনটি স্বতন্ত্র প্রবাহ এখনকার কালের সমস্ত ভারতীয় ভাষার নাটক-রচনার প্রচেষ্টার মধ্যে লক্ষণীয়। আমাদের সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত তেরটি ভারতীয় ভাষায় রচিত নাট্যসাহিত্যের মূল গতি ও প্রকৃতি এই তিনটি প্রবাহ থেকেই উৎসারিত হয়েছে, অনেক অনেক ক্ষেত্রে আবার এই ত্রয়ী প্রবাহের একটির সঙ্গে আর একটিকে মিশ্রণ সংযোজন করে, প্রয়োজনবোধে সমন্বয় করে বা একটিকে আর একটির সঙ্গে বিশ্লিষ্ট ক'রে বেশ কিছুসংখ্যক কুশলী নাটক-রচয়িতা খাসা মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতের বিভিন্ন ভাষার নাট্যকারগণ বিদেশী উপাদানের উপর ভিত্তি করে অনেক সার্থক নাটক রচনা করেছেন, আবার সংস্কৃতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকেও তাঁরা নাটক রচনার জন্য প্রচুর উপকরণ আহরণ করেছেন। কিন্তু পুরোপুরিভাবে দিশী ভাবধারাকে উপজীব্য করে কয়খানা ভালো নাটক রচিত হয়েছে? যে জিনিস সম্পূর্ণ ভারতীয়, যার উদ্ভব ভারতের মাটিতে, ভারতবর্ষের গ্রাম্যজীবন, সাধারণ মানুষ, ভারতের সমাজ প্রভৃতির পটভূমিকায় নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক ক্ষমতা-শালী নাট্যকারও অগ্রণী হন নি। ভারতবর্ষের প্রায় সকল অঞ্চলেই নাটক রচনার উপযোগী অনেক দেশজ পদ্ধতি রয়েছে, যা'কে বলা যায় ভারতের নিজস্ব গণনাট্যের উপাদান, পল্লীনাট্য সংস্কৃতির বিচিত্র সব ভাববস্তু, এই সব উপকরণ কয়জন নাট্যকার উন্নততর পর্যায়ে কাজে লাগিয়েছেন? বস্তুতঃ গণনাট্যসংস্কৃতির ধারা অভিনব, তার বৈচিত্র্য অপূর্ব। পল্লী নাট্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা এখন প্রায় ভুলেই গিয়েছি। অথচ তার কলা-কৌশল অফুরন্ত, সমৃদ্ধি অতুলনীয়, সরল সহজ গ্রাম্যজীবনের মতোই তা একাধারে মর্মস্পর্শী ও নয়নবিমোহন। যখন বলা হয়, রাজা রথং নটয়তি, রাজা অভিনয়ের সাহায্যে রথকে রূপায়িত করে তোলেন—সেই সময়ে পল্লী নাটকের রঙ্গমঞ্চে আসল রথ আমদানী করা হয় না, রথের বিন্দুমাত্র চিহ্নও দর্শকরা দেখতে পান না। রাজা অঙ্গ-ভঙ্গীর সাহায্যে রথ চালনা করার ভাব দেখিয়ে রথের উপস্থিতি ও রথ চালানোর ভাব প্রকাশ করেন। গণ নাট্যের বিচিত্র সব পদ্ধতি আধুনিক কালের বিদগ্ধ নাট্যকারগণ কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠতে পারেন। প্রাচীন ভারতের হিন্দু যুগেও গণনাট্যের ধারা দরবারী নাট্য-ধারার পাশাপাশি অব্যাহত ভাবে বিদ্যমান ছিল। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নাটক যখন মঞ্চস্থ হত রাজপরিবারের লোকদের জন্য ও তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজের শ্রোতাদের জন্য, সেই সময়ে দেশের সাধারণ মানুষদের চিত্তবিনোদনের সুবিধার্থে ও রাজদরবারের বাইরে গণ-নাটক পরিবেশিত হত। কিন্তু এখনকার কালে গণ-নাট্যের ধারা অবহেলার বস্তু হয়ে রয়েছে। তার পুনরুজ্জীবন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২০শে এপ্রিল সকাল সাড়ে দশটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ আকাশবাণী সাহিত্য-সমারোহ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এই তৃতীয় বার্ষিক সাহিত্য সমারোহ অনুষ্ঠানে ভারতের তেরটি সংবিধান-স্বীকৃত ভাষার সব শুদ্ধ ৮৭ জন লেখক ও নাট্যকার অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান-ভবনের আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে পণ্ডিত পন্থের দুই দিকে নাট্যকার ও সাহিত্যিকগণ উপবিষ্ট থেকে যেন সমগ্র ভারতবর্ষের যথার্থ বাণীমূর্তিটিকে রূপায়িত করে তুলেছিলেন।

সাহিত্য-সমারোহ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা উপলক্ষে পণ্ডিত পন্থ ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষাগুলোর বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আজকের দিনে ভাষা সংক্রান্ত সব বিরোধের অবসান ঘটানোর জন্য দেশের সাহিত্যিক সমাজের নিকট আবেদন পেশ করা হোক। জনসাধারণ যাতে সকল ভাষার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে, সেই বিষয়ে সাহায্য করার জন্যও সাহিত্যিকদের তৎপর হওয়া উচিত। আমাদের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর ঐতিহ্য অমূল্য। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধনের জন্যই এই সব ভাষার উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতবর্ষের সব ভাষারই মূল প্রায় এক, নানা প্রকার ভাব বিনিময়ের দ্বারা এদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য আজো অক্ষুণ্ণ আছে।

কিন্তু যাঁরা যথার্থই ভাষার শিল্পী, তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে ও ঈর্ষা বিদ্বেষের মনোভাব বিদ্যমান থাকা খুবই দুঃখের। বিভেদের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে ভাষা। বাহ্যিক সীমা অতিক্রম করে ভাষা জীবন্ত থাকে। ভাষার উপর অধিকার সকলেরই সমান, কোন ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের ভাষার উপর নিজস্ব কোন অধিকার নেই।

সকল ভাষাকেই সমৃদ্ধির সুযোগ দিতে হবে, আর মনে রাখতে হবে সব ভাষাই সাধারণভাবে একই সূত্রে গ্রথিত। কোন এক ভাষার দুর্বলতা অন্য আর একটি ভাষাকেও দুর্বল করে রাখতে পারে। আবার এক ঐশ্বর্য ও শক্তি অন্য আর একটি ভাষাকেও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করতে পারে।

যাঁরা যথার্থই ভাষার কারবারী তাঁরা যদি সৃজনী শক্তি ও সৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা ভাষার ব্যবহার করতে রত হন, তা'হলে ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারে।

ভাষার বৈশিষ্ট্য অনেক রকমের। শুধুমাত্র মননশীলতার দিক থেকে নয়, দৈনন্দিন কাজ কর্মের ব্যাপারেও ভাষার যথেষ্ট মূল্য আছে।

পণ্ডিত পন্থ আরও বলেন, আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্য আছে বলে মনে হলেও সকল ভাষাই একটি মূলভাষা থেকে উদ্ভূত। প্রত্যেক ভাষার সৌন্দর্য যাতে ভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিরাও উপলব্ধি করতে পারেন, সেই সম্পর্কে আমাদের যত্নবান হতে হবে। সকল ভাষারই মূল ভাব এক ধরণের, কাজেই এক ভাষাভাষীর পক্ষে অন্য ভাষা বুঝে নিয়ে তার ভাবার্থ গ্রহণ বেশ সহজ ব্যাপার। আমার মনে হয় ভারতের প্রত্যেকটি শিক্ষিত ব্যক্তিই অন্ততঃ তিনটি করে ভাষা শিখতে পারেন; কেন যে তাঁরা তিনটি ভাষা শিখতে পারবেন না, আমি তার কোন কারণই খুঁজে পাই না। হিন্দীভাষীরা একটি করে ভারতের অন্য অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা অবশ্যই শিখবেন, আর অহিন্দীভাষী এলাকার লোকেরাও তাঁদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা ছাড়াও অবশ্যই হিন্দী শিখবেন। কূপমণ্ডূকতার ভাব দূর করার জন্য এমনি একাধিক ভাষা শেখার প্রয়োজন। বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করে ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদাও রক্ষা করতে হবে। ভারতবর্ষের কোন আধুনিক ভাষার প্রতিভাবান লেখক দেশের বাইরেও কিভাবে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, আর সৃজনীশক্তির দিক থেকেও কত উঁচুদরের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন, তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ।

পরিশেষে পণ্ডিত পন্থ মন্তব্য করেন যে, "ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের ভাষাই যেন একটী আর একটির পরিপূরক হয়ে উঠে, তা হ'লেই সারা ভারতব্যাপী রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রদীপ্ত ভাব জাগ্রত হয়ে উঠবে।

পণ্ডিত পন্থের ভাষণের পরে ভারতের সংবিধান-স্বীকৃত প্রতিটি ভাষার একজন ক'রে প্রতিভূস্থানীয় নাট্য-সমালোচক তাঁর নিজস্ব ভাষায় সমসাময়িককালে রচিত নাটক সম্পর্কে একটি নিবন্ধ পাঠ ক'রে শোনান। এই নিবন্ধগুলোতে ভারতের প্রত্যেকটি ভাষায় এখনকার কালে লেখা মৌলিক নাটক ও নাট্যসাহিত্যের নানাবিধ বৈচিত্র্য, তার গতি প্রকৃতি, কলা কৌশল, আঙ্গিক ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক বিষয় বিবৃত করার প্রচেষ্টা হয়। কয়েকটি ভাষায় সমসাময়িক কালের নাট্য-সাহিত্য ও নাটক রচনা সম্পর্কে যে পরিচয় দেওয়া হয় তা সত্যি সত্যিই অনুপম, আর অনেক রকম অজানিত তথ্যে ঠাসবুনোট। কিন্তু অন্য অনেক ভাষাতেই নাটক রচনা নিয়ে আলোচনামূলক যে নিবন্ধ পড়া হয় তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। হিন্দী ভাষায় সমসাময়িক কালের নাটক সৃষ্টি সম্পর্কে একটি আলোচনা পাঠ ক'রে শোনান ডক্টর দশরথ ওঝা আর উর্দু ভাষার সমসাময়িক নাটক রচনা নিয়ে নিবন্ধ পাঠ ক'রে শোনালেন সাজ্জাদ জহরী। তারপর কাশ্মীরী ভাষায় আধুনিক কালের নাটক রচনা সম্পর্কে মতিলাল রাইনা, আধুনিক পাঞ্জাবী নাটক সম্পর্কে গুরবচন সিং তালিব, বর্তমান সময়-কার তামিল নাটক নিয়ে এ রামকৃষ্ণ রাও, মালয়ালাম ভাষার নাটকের উপরে ওমচারী নারায়ণ পিল্লাই, কানাড়া নাটকের আধুনিক গতি প্রকৃতি সম্পর্কে জে নরসিংহমূর্তি, গুজরাটী ভাষায় আধুনিক কালে রচিত নাটক সম্পর্কে ডক্টর ডি, জি, ব্যাস ও সমসাময়িক মারাঠী নাটকের উপরে আলোচনা ক'রে শোনালেন পি, এন, দেশপাণ্ডে। তারপর বাংলা সাহিত্যের সমসাময়িক নাটক সম্বন্ধে নিবন্ধ পাঠ ক'রে শোনালেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, অসমীয়া নাটক সম্পর্কে এম, সি, দেব গোস্বামী ও ওড়িয়া নাটক সম্পর্কে কালিন্দী চরণ পাণিগ্রাহী আলোচনা ক'রে শোনালেন।

বিভিন্ন ভাষায় সমসাময়িক কালের নাটক রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধিকাংশ নিবন্ধকারই তাঁর স্ব স্ব ভাষায় নাটক রচনার পূর্ব-ইতিহাস, প্রসিদ্ধতম নাট্যকারদের নামোল্লেখ, তাঁদের রচনা সম্ভারের ও অ ন্ত উল্লেখযোগ্য নাটকের ফিরিস্তী দেওয়া—আর কোন নাটক কোন সময়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার বর্ণনের দ্বারাই তাঁদের আলোচনা ভারাক্রান্ত ক'রে তোলেন। অত্যন্ত সহজলভ্য ও বহু

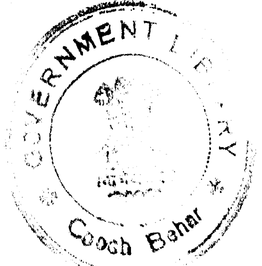
জানিত কিছু তথ্য পেশ ক'রেই তাঁরা সমসাময়িক কালের নাটক সম্বন্ধে আলোচনায় খানিকটা দায়সারা গোছের কাজ করেছেন। প্রতিটি ভাষায় সমসাময়িককালের নাটক রচনার মূলসূত্র কী, তার স্বরূপ কী, তার উপজীব্য বিষয়ের প্রকৃতিই বা কি জাতের, নাটকের রূপায়নে সমঝদার শ্রোতা ও দর্শকদের ঠিক মর্মকথাটি কি পরিমাণে ধরা পড়েছে, সর্বশেষে দৃশ্যনাট্য, চিত্রনাট্য, গণনাট্য প্রভৃতির শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী আধুনিক নাটক-রচয়িতারা কি চিরাচরিত ধরাবাঁধা পথেই এগিয়ে চলেছেন, না তাঁরা বিশেষ কোন নতুন পদ্ধতির অবতারণা করতে পেরেছেন, এই সব প্রসঙ্গের কোন উত্তরই আমরা পেলাম না। এবারকার সমারোহ অনুষ্ঠানে অধিকাংশ নিবন্ধকারই তাঁদের নিজেদের ভাষায় সমসাময়িককালে রচিত নাট্য প্রবাহের যথার্থ আলেখ্যটি তুলে ধরতে সক্ষম হন নি। আকাশবাণীর প্রযোজনায় সর্বভারতীয় শিল্পী-সম্মেলন, সাহিত্য-সমারোহ ইত্যাদি যে সব মহতী অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তা'তে প্রথম শ্রেণীর গুণীজনদের সমাবেশ এত বিরল কেন? ভারত সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার সকল স্তরেই আজকাল ব্যয় সঙ্কোচ করার জন্য একটা হিড়িক পড়ে গেছে। ভারতের সকল অঞ্চল থেকে বাছাই ক'রে ৮৭ জন কৃতী সাহিত্যিকদের রাজধানীতে আমন্ত্রণ ক'রে এনে এই যে বিরাট সাহিত্য চর্চার অনুষ্ঠান হ'ল, তা যদি সরকারী ব্যয় সঙ্কোচন নীতির কড়াকড়ি হিসেব অনুযায়ী নির্ধারিত হত, তা হ'লে তো অর্থ-নীতির স্বাভাবিক নিয়মমত দক্ষিণা অনুসারে উৎকৃষ্টতর বা উৎকৃষ্টতম গুণীদের আমরা সর্বভারতীয় মঞ্চে উপস্থিত দেখতে পেতাম। বোধহয় অডিট রিপোর্টের সন্ধানী চোখ সাহিত্যিকদের স্নেহ-পরিমলের ঢলো-ঢলো লাবণীতে দিশাহারা হ'য়ে যায়!

বিভিন্ন ভাষায় নাটক সম্বন্ধে রচিত নিবন্ধগুলোর মধ্যে উর্দু নাটক সম্পর্কে যে নিবন্ধটি পাঠ করা হয়, তা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য হয়েছিল। উর্দু নাটক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাজ্জাদ জহরী বলেন, প্রথম উর্দু নাটক আমানতের ইন্দ্রসভা লক্ষ্ণৌতে অভিনীত হয় অযোধ্যার শেষ রাজার সভায়। সেই সময়টা ছিল মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতির গোধুলি লগ্ন। অযোধ্যার রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তখনকার দিনে কবিতা, সঙ্গীত ও নৃত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। আমানতের ইন্দ্রসভা একটি নৃত্যগীতমুখর নাটক। এই নাটকটির মঞ্চাভিনয় বহুকাল ধরে চলেছিল। তারপর ১৮৫৭ সালের বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন উর্দু নাট্য সাহিত্যের উপরে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। উর্দু নাটক ও মঞ্চের আর একটি উল্লেখযোগ্য ধারা দেখতে পাওয়া যায় বোম্বাইতে পার্শী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায়; ১৮৭০ সালে পেষ্টন ফ্রানজি উর্দু নাটকের অভিনয়ের জন্য প্রথম রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে আরো কয়েকটি নাট্য সম্প্রদায় বোম্বাই শহরে গড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে আলফ্রেড ও নিউ আলফ্রেড গোষ্ঠী সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করে। উত্তর ভারতের বিভিন্ন উর্দু লেখক এই সব গোষ্ঠীর অভিনয়ের জন্য নাটক রচনা করতেন। তাঁরা সাধারণত ভারতীয় ও পারসীক ক্লাসিক্যাল কাহিনী অবলম্বনে নাটক লিখতেন। ১৯৪২ সাল থেকে উর্দু নাটকের আরও উন্নতি হয়েছে। উর্দু সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গল্প লেখক প্রেমচাঁদের বিখ্যাত কাহিনী "কফনের" নাট্যরূপ দেওয়া হয়, আর তা এককালে লক্ষ্ণৌতে খুবই সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। আব্বাস এবং সরদার জাফরী সাম্রাজ্য-বাদের বিরোধিতামূলক বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক রচনা করেন, সেই সব নাটক বোম্বাই শহরের রঙ্গমঞ্চে খুবই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। উর্দুতে খুব ভালো জাতের অনেক একাঙ্ক নাটকও লেখা হয়েছে। রাজেন্দ্র সিং বেদী, কৃষ্ণচন্দ্র, মান্টো আশক প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা লেখকগণ অনেকগুলো উঁচু দরের একাঙ্কিকা নাটক রচনা করেছেন। রচনা শৈলী ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে উর্দু একাঙ্কিকা নাটকের বিকাশ খুবই আশাপ্রদ। উর্দু নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য অনেকগুলো পেশাদারী নাট্য সম্প্রদায়েরও সম্প্রতি উদ্ভব হয়েছে। পৃথ্বীরাজ কাপুরের পৃথ্বী-থিয়েটার ও তাঁদের দ্বারা মঞ্চস্থ 'পাঠান,' 'জয়সা' ও 'কিষাণ' নাটক আর দিল্লী হিন্দুস্থানী থিয়েটারের দ্বারা মঞ্চস্থ কালিদাসের "শকুন্তলা"র অভিনয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সাজ্জাদ জহীরের উর্দু নাটক নিয়ে আলোচনা ছাড়াও মালয়ালাম নাটক সম্পর্কে ওমচারী নারায়ণ পিল্লাইয়ের নিবন্ধটি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের নাটক অভিনয়ের বহু দিক সম্পর্কে শ্রীপিল্লাই সার্থকভাবে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, কেরল রাজ্যের নাট্য শিল্পের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন আর অতুলনীয়। এই ঐতিহ্যযুক্ত নাট্যপ্রবাহের মধ্যে কথাকলি সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। কথাকলির চাইতেও প্রাচীনতর নাট্যকলা হ'ল কোডিয়াট্টম, অবশ্য কোডিয়াট্টম নৃত্যনাট্য পরবর্তী কালে কথাকলিকেই অধিকতর বৈশিষ্ট্য-যুক্ত ও জীবন্ত ক'রে তোলে। কথাকলি একাধারে দৃশ্যনাট্য, নৃত্যনাট্য ও কাব্যনাট্য। সংস্কৃত নাটকের ধারা এবং তামিল নাটক যুগপদভাবে মালয়ালাম ভাষার নাটকসমূহকে প্রভাবিত করেছে। সমসাময়িক কালের কেরল নাটক নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর আর অফুরন্ত ভাবপ্রবাহে জীবন্ত।

সবচেয়ে বেশী হতাশ হতে হ'ল সমসাময়িক কালের বাংলা নাটক সম্পর্কে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের আলোচনা শুনে। ভদ্র মহাশয়ের নিবন্ধটাকে বাংলা নাটকের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য আলো-চনা মনে না করে বি-এ ক্লাশের পরীক্ষার খাতার রচনা হিসেবে গণ্য করাই বোধ হয় অধিকতর শ্রেয়। ১৮৫৭ সালে রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন কুল সর্বস্ব" রচিত হওয়ার পর থেকে গত ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এক শত বৎসর কাল সময়ের মধ্যে বাংলা নাটকের একটি অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ভদ্র মহাশয় বিবৃত করেছেন। যদিচ বিগত তৃতীয় দশকে লেখা অনেক উল্লেখযোগ্য নাটকের ও চতুর্থ দশকের প্রথম ক'বছরে বাংলাদেশে নাট্য আন্দোলনের যে কয়টি তরঙ্গ দেখা দেয়, তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ পর্যন্ত ভদ্র মশায় করেন নি। সমসাময়িক কালের বাংলা নাটকের মধ্যে "মানময়ী গার্লস স্কুল" আর "দুই পুরুষ" নিঃসন্দেহে দুইটি উল্লেখ-

যোগ্য নিদর্শন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই দুইখানা সেরা নাটকের ও উল্লেখ পর্যন্ত ভদ্র মশায় করলেন না। প্রমথ বিশী মহাশয়ের "ঋণং কৃত্বা," "ঘৃতং পিবেৎ" সমসাময়িক কালের উঁচুদরের স্যাটায়ার, তা ছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুল, উভয়েই একাধিক সার্থক নাটক রচনা করেছেন: রঙ্গমঞ্চেও এঁদের নাটক যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রঙ্গমঞ্চের সার্থকতার কথা উঠ্‌লে মনোজ বসু ও নীহাররঞ্জন গুপ্তের নাটকগুলোর উল্লেখও অবশ্যই করতে হবে। শরৎচন্দ্রের কাহিনী-গুলোর নাট্য রূপায়ন ও সমসাময়িক কালের বাংলা নাটককে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। কিন্তু ভদ্র মশায় নিঃশেষে ও অনায়াসে এঁদের সকলের নাম ও প্রসঙ্গই তাঁর আলোচনা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন, এমন কি আধুনিক নাটক-রচনারক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের কাহিনী বর্ণনের যে ছায়াপাত রয়েছে—সেই স্থূল সত্যটির ও তিনি উল্লেখ করেন নি। ভদ্র মশায় তাঁর আলোচনার এক জায়গায় "আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, তুলসী লাহিড়ীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আমার মতে শচীন সেনগুপ্তের স্থান সবার উপরে। তিনি বাংলা নাটক নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং কয়েকটি নাটক তাঁর প্রতিভার নিদর্শন হয়ে আছে।" তাঁর এই উক্তি কেউ অস্বীকার করবেন না,—কারণ···ভদ্রলোকের এক কথা!



জগৎশেঠদের পাওনা

কমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জগৎশেঠদের অনেককালের পাওনা টাকা শোধ না করেই ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গেল। ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাতের সময় যে টাকা ইংরেজ কোম্পানী শেঠদের কাছে নিয়েছিল, সেই দেনার কথা সরকারীভাবে স্বীকার করেও ইংরেজ সরকার কোনোদিনই সে দেনা আর শোধ করলো না। জগৎশেঠদের পাওনা চিরকালের মত থেকেই গেলো। বর্ত্তমান ভারত সরকারের সে দেনা পরিশোধ করার দায় বা দায়িত্ব আছে কিনা, মামলা না করলে তার ফয়সালা হবে না। হয়ত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে শেঠদের পাওনা তামাদি হয়ে গেছে; কিন্তু নৈতিক দিক থেকে দেখলে সে টাকাটা ভারত ছাড়ার আগে ইংরেজ সরকারে জগৎ শেঠদের বর্ত্তমান বংশধরকে দিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল।

বর্ত্তমান জগৎশেঠ বৃদ্ধ ফতেচাঁদজী হিসেব মত শেষ জগৎশেঠ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জগৎশেঠ উপাধিটারও মৃত্যু হবে। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ হচ্ছেন জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদেরজীর সাত পুরুষ। জগৎশেঠ মহাতাপ-চাঁদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে মোটা টাকা কর্জ্জ দিতেন এবং পলাশীর যুদ্ধের বছর থেকে কয়েক বছর ধরেই মহাতাব রায় কোম্পানীকে লাখ লাখ টাকা ধার দিয়ে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনে সহায়তা করে যান। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট শেঠদের এই অর্থ সাহায্যের কথা স্বীকার করে বলে গেছেন;—such services were peculiarly valuable। ইংরেজ কোম্পানীকে টাকা ধার দেওয়ার পরিণাম কিন্তু ভালো হয়নি। নবাব মীর কাসিম ইংরেজের বিরুদ্ধে যখন লড়াই লাগালেন, তখন প্রথমেই শেঠদের দু'ভাই মহাতাব রায় আর স্বরূপ চাঁদকে ধরে নিয়ে গেলেন এবং গলায় পাথর বেঁধে মুঙ্গেরের গঙ্গায় ডুবিয়ে মারলেন। তা ছাড়া মীর কাসিমের হুকুমে জগৎশেঠদের বাড়ী ও গদী লুঠ করা হয়েছিল, ইতিহাসে তার উল্লেখ আছে।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শেঠদের গদীর মালিক হলেন কুখ্যাত ধনকুবের মহাতাব রায়ের ছেলে জগৎশেঠ খুশাল চাঁদ এবং তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে তাঁর বাবা দফায় দফায় যে ৫০।৬০ লাখ টাকা (আর্কট সিক্কা) কর্জ্জ দিয়েছিলেন, সেই ধারের টাকা ফেরত পাবার জন্যে কোম্পানীকে লিখলেন। লর্ড ক্লাইভ এই দাবী সম্বন্ধে জেনারেল কার্ণাক্ ও মিঃ সাইক্‌স্-এরসঙ্গে আলোচনা করে জানালেন যে ইংরেজ সরকার এই দাবীর মধ্যে ৩০ লাখ টাকার জন্যে দায়ী নয়, তবে ইংরেজ ও মীর-জাফরের সৈন্য বাহিনীর জন্যে জগৎশেঠ মহাতাব রায়ের কাছে যে লাখ টাকা নেওয়া হয়েছিল, সেই দাবী ন্যায়সঙ্গত। আর এই টাকাটা দশ বছরের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও নবাব নাজিম আধা আধি হিসেবে পরিশোধ করে দিতে বাধ্য। ১৭৬৬ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখের কার্য্যবিবরণীতে লেখা আছে:—

Read acquainting us that the two Seats, sons of those who were cut off by Cassim Ally Khan and fell a sacrifice to their attachment to the English Company, have laid before them a claim amounting to between 50 and 60 Lakhs of Rupees. 30 Lakhs of which having been lent to the Jamadars, they do not think the Government answerable for, but their claim of 21 lakhs which were lent to the Nabab Meer Jaffur for the support of his and the English army, they are of opinion, is just and reasonable.*

* Long's Selections from Unpublished Records pp. 437.

জগৎশেঠ মহাতাব রায়ের দেওয়া টাকার মধ্যে একুশ লাখ টাকার দেনা লর্ড ক্লাইভ মেনে নিলেন এবং জগৎশেঠ খুশাল চাঁদ ও মহারাজা স্বরূপ চাঁদের ছেলে মহারাজা উদ্‌মন্ত চাঁদকে জানিয়ে দিলেন যে এই টাকা তাঁদের দশ বছরের মধ্যে শোধ করে দেওয়া হবে।' কিন্তু ঘটনাচক্রে ইংরেজ কোম্পানী সে দেনা গত ১৯০ বছরের রাজত্বের মধ্যে শোধ করে নি, সাতপুরুষের মধ্যে শেঠেরাও তাদের পাওনা টাকা পায় নি। লেখালেখি অবিশ্যি অনেক হয়েছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

এই দেনার কথা ১৭৬৮ সালের ১৬ই মে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবৃন্দ মেনে নিলেন এবং লর্ড ক্লাইভ জগৎশেঠকে টাকাটা দেওয়ার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাতেও তাঁরা সম্মতি জানালেন। ডিরেক্টর বোর্ড বললেন যে শেঠ পরিবার আমাদের জন্যে যত দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন সে কারণে তাঁরা আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারী। চুক্তিমত জগৎশেঠ খুশালচাঁদকে দেওয়া হলো মোট ১০,৬১,৩৭৫৲ টাকা। ১৭৬৮ থেকে ১৭৭১ সাল পর্য্যন্ত তিন বছরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিলেন ৫,৪৬,৩৭৫৲ টাকা, আর নবাব নাজিম দিলেন ৫,১৫,০০০৲ টাকা। কারণ জগৎশেঠদের প্রাপ্য টাকার মধ্যে অর্দ্ধেক কোম্পানী, আর বাকি অর্দ্ধেক নবাব নাজিম বছরে বছরে দিবেন, লর্ড ক্লাইভ এমনি ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৭৭২ সালের ২৯শে জানুয়ারীর রিপোর্টে জগৎশেঠদের পাওনা টাকার কথার উল্লেখ আছে।*

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে হলো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে সরকারী খাজনাখানা ফাঁকা হয়ে যায়। কাজেই ১৭৭২ সালে কোম্পানী জগৎশেঠের পাওনা টাকা দিতে পারলেন না। নবাব নাজিমও কিস্তি খেলাপ করলেন। সেই বছরই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারী খাজনাখানা মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে কলকাতায় নিয়ে গেলেন। সুতরাং এতকাল জগৎশেঠরাও যে কোম্পানীর ব্যাঙ্কার ছিল, সে পদও তাদের গেল। গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে যখন রাজ্যের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় জগৎশেঠ খুশাল চাঁদ গভর্ণরের কাছে বাকি পাওনা আদায়ের দাবী জানিয়ে এক দরখাস্ত করলেন। তিনি আরও জানালেন যে তাঁকে তাঁর পূর্ব্বপুরুষের মত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষ করা হোক। ওয়ারেন হেষ্টিংস সেই আবেদনের উত্তরে জগৎশেঠদের পাওনা টাকার কথা বললেন এবং জগৎশেঠ মহাতব রায় কোম্পানীকে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, তার উল্লেখ করে লিখলেন :—

Your father rendered very important services to the British Government for its establishment in the East, should it please God on my return from my tour, your wishes shall be fulfilled.

কিন্তু ভগবানের দোহাই দিলেও ওয়ারেন হেষ্টিংসকে জগৎশেঠের অভিলাষ পূর্ণ করতে হয়নি। কারণ তিনি রাজ্যভ্রমণ শেষ করে কলকাতায় ফেরার আগেই জগৎশেঠ খুশালচাঁদ মারা যান এবং তাঁর ছেলে জগৎশেঠ হরখচাঁদ শেঠদের গদী পান। ১৭৮০ সালে জগৎশেঠ হরখচাঁদ নাবালক ছিলেন, সুতরাং নাবালককে টাকা দেওয়ার কথাই উঠে না।

হরখচাঁদ ছাড়লেন না। পরের বছর গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশকে তিনি আবেদন করলেন। কিন্তু তাঁর আবেদন মঞ্জুর হলো না। লর্ড কর্ণওয়ালিশ লিখলেন, যে নাবালক হরখচাঁদ যখন সাবালক হবে তখন গভর্ণর জেনারেল তাঁর দাবীর কথা নিশ্চয় ভুলবেন না। তবে লর্ড কর্ণওয়ালিশও শেঠেদের প্রাপ্য টাকার কথা স্বীকার করে গেলেন। গভর্ণর জেনারেল জগৎশেঠ হরখচাঁদ সম্পর্কে যথেষ্ট খেয়াল দিতেন এবং শেঠকে প্রতিশ্রুতি দেন যে সাবালক হওয়ার পর পাওনা টাকাটারও ব্যবস্থা নিশ্চয় করা হবে। কিন্তু সাবালক হতে না হ'তেই জগৎশেঠ হরখচাঁদও হঠাৎ মারা গেলেন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে—আর রেখে গেলেন দুটি শিশু ইন্দ্রচাঁদ আর বিষ্ণুচাঁদকে। পরে ইন্দ্রচাঁদ জগৎশেঠ হলেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে শেঠেদের প্রাপ্য টাকার জন্যে দাবী জানালেন।

এদিকে কোম্পানীর সঙ্গে লেখালিখি চললো। আর ওদিকে দুই ভাই-এ সম্পত্তিভাগের মামলা বেধে গেল। দীর্ঘকাল ধরে ইন্দ্রচাঁদ ও বিষ্ণুচাঁদের মধ্যে মামলা চললো। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও বাটোয়ারা মামলা না মেটা পর্য্যন্ত পাওনা টাকা শোধ করার চেষ্টাও করলেন না। দীর্ঘকাল বাটোয়ারার মামলা চলার পর ১৮২২ সালে একটা ফয়সালাও হলো, আর জগৎশেঠ ইন্দ্রচাঁদও মারা গেলেন। থাকলো জগৎশেঠের বিধবা পত্নী এবং একটি নাবালক ছেলে শেঠ গোবিন্দচাঁদ। ১৮৪৩ সালে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদের দাবী স্বীকার করলেন ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু সেই বছরই মারা যান শেঠ বিষ্ণুচাঁদ। তাঁর ছেলেও তখন নাবালক। শেঠবংশে তখন দুর্দিন নেমে এসেছে। জগৎশেঠ ইন্দ্রচাঁদ ছিলেন খুবই অপব্যয়ী এবং বিলাসী। আয়ের বেশী ব্যয় করে তিনি বহু পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মামলা মোকর্দ্দমায় পড়ে বহু টাকা ঋণগ্রস্ত হন। কাজেই এ সময়ে গভর্ণমেণ্টের কাছে তাঁরা আসল টাকা আদায়ের জন্যে পীড়াপীড়ি না করে চাইলেন পেনশন। শেঠেরা জানতেন যে সরকারী টাকা হাতে আসলেই পাওনাদারদের সে টাকা সব দিয়ে দিতে হবে। শেঠ বিষ্ণুচাঁদের ছেলে শেঠ কিষেণচাঁদের ১৮৫৮ সালের ৩১শে অগাষ্ট তারিখের দরখাস্তে সে কথার উল্লেখ আছে। কাজেই জগৎশেঠ মহাতব রায়ের তৎকালীন বংশধরেরা কোম্পানীর কাছে পাওনা টাকা না চেয়ে পেনশনের জন্যে আবেদন করলেন। কারণ শেঠেদের তখন আর্থিক দুর্দশা প্রায় চরমে পৌঁচেছিল, তার উপর পৈত্রিক ঋণের চাপ।

জগৎশেঠ ইন্দ্রচাঁদের বিধবা এবং ছেলে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদ ভারত সরকারের কাছে পেনশন প্রার্থনা করে যে দরখাস্ত করেছিলেন, ১৮৪৩

---

* Fourth Report from the Committee of Secrecy, pp 122

সালের ২৫শে জানুয়ারীর চিঠিতে বাংলা সরকারের সেক্রেটারী মিঃ বুশবি জানালেন যে—সে দরখাস্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেকটরদের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেই বছর ৩০শে মে তারিখে লণ্ডনে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের এক সভায় জগৎশেঠ ইন্দ্রচাঁদের বিধবা ও ছেলের আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেলো। স্যার জন্ কটন ও পনরঞ্জন ডিরেক্টর ভারত সরকারকে জানালেন যে জগৎশেঠ মহাতব রায় ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার যা করেছেন এবং ব্রিটিশ সরকারের যে সেবা করেছেন সেই মূল্যবান্ ও ঐতিহাসিক সাহায্য ও সেবা স্মরণ করে তাঁরা ভারত সরকারের অনুমোদন মত জগৎশেঠ পরিবারের শেঠ গোবিন্দচাঁদকে মাসিক ১২০০৲ টাকা পেনশন দিবার আদেশ দিচ্ছেন। বাংলা গভর্ণমেন্টের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ সিসিল বীডন্ তাঁর ১৮৪৩ সালের ২৮নং চিঠিতে মুর্শিদাবাদে গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট মেজর জেনারেল এফ-ভি-রেপারকে জগৎশেঠের পেনশনের কথা জানিয়ে দিলেন।

শেঠ কিষেণচাঁদও চুপ করে থাকলেন না। তিনিও শেঠ পরিবারের ছোটতরফ হিসাবে পেনশনের জন্যে এক পৃথক আবেদন করে দিলেন। মেজর-জেনারেল রেনার শেঠ কিষেণচাঁদকে মাসে ৮০০৲ টাকা পেনশন দেওয়ার জন্যে অনুমোদন করলেন। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল আর পেনশন দিতে রাজী হলেন না। ভারত সরকার জানালেন যে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদকে যে পেনশন দেওয়া হয়েছে, সেটা সমগ্র শেঠ পরিবারের জন্যে। তবে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর শেঠ কিষেণচাঁদ তাঁর দাবী জানাতে পারেন। ১৮৫৮ সালে শেঠ কিষেণচাঁদ আবার পেনশনের আবেদন করে জানালেন যে তাঁর পূর্ব্বপুরুষ জগৎশেঠ মহাতব রায় যে টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ধার দিয়াছিলেন, সে টাকা তার বংশধরদের ভবিষ্যতে যাতে কাজে লাগে সেই হিসাবেই কোম্পানীর কাছে আছে এবং সেই টাকা থেকে ভারত সরকার তখন পর্য্যন্ত আর কোনো টাকা সুদে বা আসলে দেন নি। বাংলা সরকার ১৮৫৮ সালের ৩০শে অক্টোবরের চিঠিতে শেঠ কিষণচাঁদকে জানালেন যে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদকে মাসে যে ১২০০৲ টাকা দেওয়া হয়, তা থেকে তাঁকে মাসে ৩০০৲ টাকা দেওয়া হবে। তার বিরুদ্ধে শেঠ গোবিন্দচাঁদ ষ্টেট সেক্রেটারীর কাছে আপীল করলেন। ১৮৫৯ সালের আবেদনের উত্তরে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদকে ষ্টেট সেক্রেটারী স্যার চার্লস উড জানালেন যে

it would be unjust after a lapse of fifteen or sixteen years to diminish the income of Juggut Seth Govind Chand.*

সুতরাং গোবিন্দচাঁদের জীবৎকালে পেনশনের টাকা কমানো হলো না। ১৮৬৪ সালে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদ মারা গেলে তাঁর পোষ্যপুত্র শেঠ গোপালচাঁদ শেঠেদের গদী পেলেন এবং খুল্লতাত শেঠ কিষেণচাঁদের সঙ্গে একত্রে ভারত সরকারকে পেনশনের টাকা ভাগ ক'রে দেওয়ার আবেদন জানালেন। মুর্শিদাবাদের গভর্ণর জেনারেলের এজেন্ট কর্ণেল টমসনের মারফত এই দরখাস্ত পাঠানো হয়। এখানেও তাঁরা কেউ পাওনা টাকার কোনো উল্লেখ না করে মাত্র পেনশনই চাইলেন। ভারত সরকার তাই শেঠ কিষেণচাঁদকে মাসিক ৮০০৲ টাকা পেনশন দেওয়ার আদেশ দিলেন।

জগৎশেঠ গোপালচাঁদ এই আদেশের বিরুদ্ধে আবার আপীল করলেন। বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্ণর শেষ অবধি জানালেন যে শেঠ কিষেণচাঁদের মাসিক পেনশন থেকে ৩০০৲ টাকা জগৎশেঠ গোপালচাঁদকে দেওয়া হবে। এই হুকুম পাওয়ার পর ১৮৬৫ সালের ৫ই জুলাই জগৎশেঠ গোপালচাঁদ সরকারের পেনশন নিতে অস্বীকার করলেন, কারণ তিনি কাকার মাসিক পেনশন কাটাতে রাজি ছিলেন না। তিনি খোলাখুলি সরকারকে জানালেন যে দশলাখ টাকা তাঁরা এখনো ইংরেজ সরকারের কাছে পাবেন। তার সুদের হিসাব করলে এই মাসিক পেনশন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শেঠ কিষেণচাঁদ কিন্তু ১৮৮০ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মাসে ৮০০৲ টাকা পেনশন পেতেন।

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জগৎশেঠদের সাহায্যের কথা ততদিনে ইংরেজ সরকার ভুলে গিয়েছিল। তাই শেঠদের পাওনার কথা কেউ বিশেষ আমলই দেয়নি। শেঠ কিষেণচাঁদের মৃত্যুর পরে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদের বিধবা জগৎশেঠানী প্রাণকুমারী পেনশনের আবেদন করলে, ইংরেজ সরকার জগৎশেঠানীর জন্যে মাসিক ৩০০৲ টাকা পেনশন মঞ্জুর করেন। ইতিমধ্যে শেঠ গোপালচাঁদ মারা যাওয়ায় শেঠানী গোপালচাঁদকে পোষ্য নেন এবং শেঠেদের প্রাচীন ভদ্রাসন ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হলে, ইংরেজ সরকার জগৎশেঠানী প্রাণকুমারীকে নতুন বাড়ীর জন্যে পাঁচ হাজার টাকা দেন। কিন্তু জগৎশেঠ মহাতব রায়ের টাকার কথা বড়লাট ছোটলাট কেউ তোলেন নি। ততদিনে সেই টাকার সুদই কি কম জমেছিল।

১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদের বিধবা জগৎশেঠানি প্রাণকুমারী মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর জগৎশেঠ গোপালচাঁদ ভারতের ষ্টেট সেক্রেটারীর কাছে এক আবেদন করলেন যে যেহেতু আবেদনকারী তাঁদের পূর্ব্বের পাওনা টাকার দাবী জানানোর সময় এটা নয় মনে করে ইংরেজ সরকারের কাছে কিছু পেনশন পাওয়ার প্রার্থনা জানাচ্ছেন। ১৮৯৩ সালে ভারত সরকার শেঠ গোপালচাঁদকে জানিয়ে দিল যে ষ্টেট সেক্রেটারী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অসম্মত হয়েছেন। (Vide letter no 1027G dated 15th January, 1893) অর্থাৎ জগৎশেঠ পরিবারকে কোনো পেনশন দিতে ইংরেজ সরকার অসম্মত হলেন।

ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জ্জন ১৯০১ সালে মুর্শিদাবাদে বেড়াতে আসেন এবং মুর্শিদাবাদে আসার সময় জগৎশেঠদের বাড়ীতেও তিনি পদার্পণ করেন। জগৎশেঠ গোলাপচাঁদ বড়লাটের কাছে পুরানো পাওনা সম্বন্ধে মৌখিক আবেদন জানালে, লর্ড কার্জ্জন তাঁকে আবেদন করতে বলেন। শেঠ গোপালচাঁদ যথারীতি আবেদন পাঠালেন

* Letter no 55 dt. 8th, Nov. 1859

বটে, কিন্তু বাংলা সরকার সে আবেদন ভারত সরকারের কাছে পাঠাতে দিলেন না। সরকারী আইনের প্যাঁচে পড়ে জগৎ-শেঠের আবেদন ব্যর্থ হলো। ভারত সরকারের কাছ থেকে জগৎ-শেঠদের পাওনা টাকা আদায়ের জন্য কোনো ব্যবস্থা করার আগেই ১৯১২ সালে শেঠ গোপালচাঁদ মারা গেলেন।

বর্ত্তমান জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রথমেই সরকারের কাছে তাঁর জগৎ-শেঠ উপাধি স্বীকার করার আবেদন করেন এবং ১৯১৬ সালে বাংলা সরকার তাঁর জগৎশেঠ উপাধি স্বীকার করে নিলেন। (Vide letter dated 17th January, 1916 of Chief Secretary to Government of Bengal)। তারপরে ক্যালকাটা হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে জগৎশেঠ পরিবারের যে ইতিহাস মিঃ লিটল লিখেছিলেন তার মধ্যে জগৎশেঠদের পাওনা টাকা যে ব্রিটিশ সরকার শোধ করেনি, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।* জগৎশেঠ ফতেচাঁদও এই টাকা নিয়ে অনেক আবেদন নিবেদন সারা জীবনে করেছেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে জগৎশেঠ পরিবার যে ১০,৩৮,৬২৪ টাকা পেতেন, এ যাবৎ সে টাকা শোধ হয়নি, কেউ শোধ করার চেষ্টাও করেনি। বর্ত্তমান জগৎশেঠ বলেন যে ইংরেজ সরকার তাঁর ঠাকুরদাদা বা তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের যে টাকা পেনশন দিয়েছেন, তার সব টাকা ধরলেও পাওনা টাকার এত বছরের সুদের সমানও হয় না। ইংরেজ রাজত্বে ভারত সরকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত দেনা পাওনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তখনকার ভারত শাসন আইনের ২০ ও ৩২ ধারায় তার উল্লেখ আছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের মধ্যে তাঁরা 'জগৎশেঠদের পাওয়া টাকা সুদে আসলে শোধ করেন নি, শোধ করার চেষ্টাও করেননি। শেষ পর্য্যন্ত শেঠদের পাওনা টাকা শোধ না করেই তাঁরা ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। বর্ত্তমান জগৎশেঠ ফতেচাঁদজীর কাছে ইংরেজ সরকারে আবেদন নিবেদনের কাগজপত্র এখনও আছে, তা দেখেই জগৎ-শেঠদের পাওনা মারা যাওয়ার এই ইতিহাস লেখা হয়েছে।

* Bengal Past and Present, Vol. XXII, Serial no 43 & 44.

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারিটি সূত্রকে "চতুঃসূত্রী" বলে। এই চারি সূত্রের শঙ্কর-রচিত ভাষ্যকে তাঁহার সমগ্র ভাষ্যের উপক্রমণিকা বলা যায়। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই অধ্যাসের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চতুঃসূত্রীর মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"যুষ্মৎ" শব্দের যাহা বাচ্য এবং "অস্মৎ" শব্দের যাহা বাচ্য, উভয়ে নিতান্ত ভিন্ন। "যুষ্মৎ" শব্দের বাচ্য বিষয় (জ্ঞানের বিষয়), এবং 'অস্মৎ' শব্দের বাচ্য বিষয়ী, (বিষয়ের জ্ঞাতা)—চিৎ পদার্থ। ইহারা অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাব। তাহাদের স্বরূপ ও ধর্ম্মের বিনিময় হইতে পারে না, অর্থাৎ একের স্বরূপ ও ধর্ম্ম অন্যে বর্ত্তিতে পারে না। বিষয়ী চিৎস্বরূপ জ্ঞাতা, বিষয় অচেতন জড়। বিষয়ীর ধর্ম্ম যেমন বিষয়ে বর্ত্তিতে পারে না, তেমনি বিষয়ের ধর্ম্মও বিষয়ীতে বর্ত্তিতে পারে না। সুতরাং চিদাত্মক বিষয়ীতে অচিৎ বিষয়ের ধর্ম্মের আরোপ এবং বিষয়ে বিষয়ীর ধর্ম্মের আরোপকে মিথ্যা বলিতে হইবে। তথাপি অনাদিকাল হইতে বিষয়ীতে বিষয়ের ধর্ম্মের আরোপ এবং বিষয়ে বিষয়ীর ধর্ম্মের আরোপ লোক-ব্যবহারে চলিয়া আসিতেছে। "আমি ইহা, ইহা আমার" প্রভৃতি সর্ব্বদাই লোকে বলিয়া থাকে। ইহা অধ্যাস।

অধ্যাস কি? "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"—পূর্ব্ব-দৃষ্ট বস্তুর স্মৃতিতে রক্ষিত রূপের অন্য বস্তুতে অবভাসই অধ্যাস। পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতিরূপের রজ্জুতে প্রকাশ অধ্যাস। কেহ কেহ (অন্যথা খ্যাতিবাদী নৈয়ায়িক ও আত্মখ্যাতিবাদী বিজ্ঞানবাদিগণ) বলেন "অন্যত্র অন্য-ধর্ম্মাধ্যাসঃ" অর্থাৎ এক বস্তুর ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে প্রতীতি অধ্যাস। আবার কেহ কেহ বলেন (প্রভাকর) "যত্র যদধ্যাসঃ তদ্‌বিবেকাগ্রহ-নিবন্ধনঃ ভ্রমঃ।" যেখানে যাহার অধ্যাস হয় সেখানে উভয়ের পার্থক্য জ্ঞানের অভাববশতঃ যে ভ্রম (যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রম), তাহাই অধ্যাস। সকল মতেই একের ধর্ম্মের অবভাস অন্য বস্তুতে হয়। ভাষ্যকার অন্যত্র "অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধি"ই অধ্যাস, ইহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ যাহা কোনও এক

বিশেষ বস্তু নহে (অ-তৎ), তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া জ্ঞান (তদ্বুদ্ধিঃ) অধ্যাস।

কিন্তু যে প্রত্যক্-আত্মা কখনও বিষয় হন না, তাহাতে বিষয়ও তাহার ধর্ম্মের অধ্যাস কিরূপে সম্ভবপর হয়? যাহা সম্মুখে অবস্থিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহাতেই অন্য বিষয়ের অধ্যাস হইতে পারে, কিন্তু বিষয়ী প্রত্যক আত্মা তো কখনও জ্ঞানের বিষয় হন না। উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, প্রত্যক আত্মা "একান্ত অবিষয়" নহেন। তিনি "অস্মৎ" প্রত্যয়ের বিষয় এবং স্বয়ং-প্রকাশ (অপরোক্ষ)।"

এই প্রকার অধ্যাসকে পণ্ডিতেরা বলেন অবিদ্যা। আর অধ্যাসবর্জন করিয়া বস্তুর স্বরূপের অবধারণকে বিদ্যা বলেন। অধ্যস্ত পদার্থের গুণ ও দোষ দ্বারা তাহার অধিষ্ঠান অণুমাত্রও সম্বন্ধ হয় না। এই অধ্যস্ত পদার্থসকল অবলম্বন করিয়াই লৌকিক ও বৈদিক প্রমাণ প্রয়োগের ব্যবহার হয়। বিধি-নিষেধও মোক্ষপর শাস্ত্রসকলই এই অধ্যস্ত বস্তুসকলকে স্বীকার করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও শাস্ত্রসকলই অবিদ্যাদুষ্ট। অসঙ্গ আত্মা প্রমাতা বা জ্ঞাতা হন না। কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়াদিতে "অহং," মম ভাব না থাকিলে প্রমাতৃত্বও হয়না, প্রমাণের ব্যবহারও হয়না। পশুদিগের সহিত এ বিষয়ে মানুষের প্রভেদ নাই। আত্মা ও অনাত্মার পরস্পরের মধ্যে অধ্যাস হইলেই ব্যবহার সম্ভব হয়। নিষ্ক্রিয় অসঙ্গ আত্মার দ্বারা কোনও ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। এই অনাদি অনন্ত নৈসর্গিক মিথ্যা প্রত্যয়রূপ অধ্যাসই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের প্রবর্ত্তক। এই অনর্থহেতু অবিদ্যার নাশের জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন।

উপরে যে "প্রত্যক আত্মা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অর্থ জীবাত্মা। যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রতিকূল-ভাবে নিজেকে নির্বচনীয় করেন, তিনিই প্রত্যক এবং তিনিই আত্মা। "অসৎ জড় ও দুঃখাত্মক অহংকার প্রভৃতি হইতে ভিন্ন ভাবে সৎ ও চিৎ সুখাত্মকরূপে যিনি প্রকাশিত হন, তিনিই প্রত্যক ও আত্মা" (রত্নপ্রভা), সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির অভ্যন্তরবর্তী, কিন্তু তাহাদিগের হইতে ভিন্ন তাহাদের অধিষ্ঠান যে কূটস্থ আত্মা, তাহাই প্রত্যক আত্মা। অন্তঃকরণরূপ উপাধিযোগে তিনি সোপাধিক। ইনিই জাগ্রৎ অবস্থাতে আমিরূপে অনুভূত হন। সুষুপ্তিকালে যখন অন্তঃকরণের ক্রিয়া থাকে না, তখন অজ্ঞান উপাধিযোগে তিনি যে প্রকার অনুভূত হন, তাহারই স্মৃতি নিদ্রাভঙ্গে "সুখে ঘুমাইয়াছি, কোনও কিছুরই জ্ঞান তখন ছিল না" এই অনুভবে দেখা দেয়। এই জন্যই (উপাধি যোগবশতঃ) শুদ্ধ চিৎস্বরূপ আত্মা অনুভব-গোচর হন। তখন তিনি নিতান্ত অবিষয় থাকেন না। একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে উপাধির যোগে যদি চিৎস্বরূপ আত্মা বিষয় হন, আবার তিনি বিষয় না হইলে যদি তাহাতে উপাধির যোগ হইতে পারে না, তাহা হইলে অনন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে। কিন্তু বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় এই অধ্যাস অনাদি। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যাসে বিষয়রূপে ভাসমান আত্মা, পরবর্ত্তী অধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন। ইহাতে কোনও বিরোধ নাই।

এই উপক্রমণিকার পরে শঙ্কর তাঁহার ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মের কথা শুনিলেই তাহাকে জানা হয় না। ব্রহ্ম শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার মনন ও ধ্যান ব্যতীত হয় না। কর্ম্মের ফল অনিত্য। এইজন্য নিত্যানিত্য বিবেক, (অনিত্য অনাদি বস্তু হইতে নিত্য ব্রহ্মের ভেদ জ্ঞান), ইহামুত্র ফল ভোগ বিরাগ। (ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগে বিরাগ) এবং ছয় সাধন সম্পত্তি যথা—শম (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ), দম (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ) উপরতি (শ্রবণ ও মননাদি ব্যতিরিক্ত কর্ম্ম হইতে বিরতি), তিতিক্ষা (অখেদে দুঃখ-সহন), সমাধান (ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা), শ্রদ্ধা (গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস) অর্জ্জন করিবার পরে ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা করা কর্ত্তব্য। সাধন-সম্পত্তি অর্জ্জন না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা ফলবতী হয় না।

কিন্তু ব্রহ্ম কি? সে সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে। ব্রহ্ম যে, আত্মা ইহালোকে প্রসিদ্ধ। কিন্তু আত্মা কে? কেহ বলেন (শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকও চার্ব্বাকপন্থিগণ) যে চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা। অন্য একদল চার্ব্বাকপন্থী বলেন চেতন ইন্দ্রিয়গণই আত্মা। অপর একদল চার্ব্বাকপন্থী বলেন মনই আত্মা। 'ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা। মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলেন শূন্যই আত্মা। ন্যায় বৈশেষিক মতাবলম্বী বলেন দেহ প্রভৃতি

হইতে ভিন্ন সংসারী কর্ত্তাও ভোক্তাই আত্মা। সাংখ্যগণ বলেন—আত্মা ভোক্তা মাত্র, কর্ত্তা নহেন। পাতঞ্জল মতাবলম্বী বলেন—ভোক্তা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ ও শক্তিমান ঈশ্বর আছেন। কোন কোন বেদান্তী বলেন ব্রহ্ম ভোক্তা জীবের আত্মস্বরূপ। কিন্তু শ্রুতি বলেন, যাহা হইতে জীবের জন্ম মৃত্যু ও স্থিতি হয় এবং যাহাতে অন্তিমে জীব প্রবেশ করে তিনিই ব্রহ্ম।

যাঁহা হইতে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, তিনিই ব্রহ্ম, ইহা অনুমান নহে, ইঁহার প্রমাণ শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এবং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাররূপ অনুভব। বেদান্তবাক্য-কুসুমসকল গ্রথিত করাই ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য। শ্রুতি-বাক্যের বিচার হইতে যে তাৎপর্য্য-নিশ্চয় হয়, তাহা দ্বারাই ব্রহ্ম-জ্ঞান নিষ্পাদিত হয়, অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারা নহে। বেদান্ত-বাক্যের অর্থগ্রহণের দৃঢ়তা-সম্পাদনের জন্য উপনিষৎ-বাক্যের অবিরোধী যে অনুমান, তাহাও প্রমাণ বটে, কিন্তু তাহা শ্রুতি-বাক্যের সহায়ক মাত্র!

ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, কেন না তাহা হইতেই বেদের উৎপত্তি, তিনি শাস্ত্রযোনি। অনেক প্রকার বিদ্যার আকর শাস্ত্র দ্বারা উপবৃংহিত (পুষ্ট), প্রদীপের ন্যায় সর্ব্ব-বিষয়-প্রকাশক, বেদের উৎপত্তি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ হইতেই সম্ভবপর—অন্য কিছু হইতে সম্ভবপর নহে। বৃহদারণ্যকে (২।৪।১০) আছে "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম এতদ্ যৎ ঋক্‌বেদঃ"। কিন্তু বেদ নিত্য, তাহার আবার উৎপত্তি কি? ইহার উত্তর এই যে প্রতি কল্পে একই থাকে বলিয়া বেদ নিত্য। শ্রুতিতে স্পষ্ট আছে "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ (সকল যজ্ঞে যাহাকে আহুতি প্রদান করা হয়, সেই যজ্ঞ শব্দ বাচ্য ব্রহ্ম হইতে) ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে?" (ঋক ও সামগণ জন্মলাভ করিয়াছেন)। ব্রহ্ম হইতে যেমন বেদের উৎপত্তি, তেমনি বেদই ব্রহ্মের অস্তিত্বের প্রমাণ—তাহার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রমাণ।

এই ব্রহ্মই (তৎ) বেদান্তের প্রতিপাদ্য। সকল বেদান্ত বাক্যের সমন্বয় করিয়া দেখা যায় যে তাহারা ব্রহ্মেই সংগত হয়। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় কারণ ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

ফসল

শ্রীবংশী মণ্ডল

এই আকাশের বিস্ময় পূর্ব্বাশার পথের প্রান্তে যেন নামে
শুধু গীতমুগ্ধ মাঠ অগোচরে পর্ণ কিশলয়
শীতের ফসল মাঝে সেদিনের সার্থক সঞ্চয়
আজিকে পেয়েছি বুঝি।
দেশ হতে দেশান্তরে পথে পথে সৃষ্টির সন্ধ্যায়
চলেছে মানব যাত্রী নীলাকাশে বিস্ময় ভরায়
মানুষ কি পেয়েছে তার অগণিত ঋতুর উল্লাস
চেনার আলোকে শুধু তুলে আনে সোনার ফসল।
দিগন্তের বাঁকা চাঁদে স্বতঃস্ফূর্ত্ত দূর মহিমায়
রক্তের অঙ্কুরে বুঝি পায় প্রাণ মহাজিজ্ঞাসার
জীবন কামনা খুঁজি অন্তহীন প্রেমের বন্যায়
একই পথ পায়ে হেঁটে যাই।
ছিলাম মাটীর কাছাকাছি
সূর্য্যে আভা সোনালী সিন্দুর
হেমন্তের স্বর্ণ রঙে সেদিনের বুনেছি ফসল
ধূলায় ছড়ায়ে ছিল চোখ মেলে দেখিয়ে পৃথিবী
সে আকাশ ছিল নীল তপস্যায়
রচনা করেছি।
যুগে যুগে কালে কালে এক খণ্ড সমুদ্রের বাণী
জন্ম হতে মরণের ক্ষয় ক্ষতি বিমুগ্ধ সে ছায়ার ফসল
হৃদয় জড়ায়ে ছিল আপনার রহস্য অঞ্চলে
সেই মধু যামিনীতে জীবনের পানপাত্র ভার
গভীরের স্পর্শ কি পেয়েছি?
শূন্যের ইতিহাসে সে আঁধারে বহ্নির দাহন
সূর্য্যের ভাষায় বুনে দূর হয় দুরন্ত তিমির
প্রাণের ফসল আঁকা নীল ধূলি আজ পৃথিবীর
হৃদয়ের সুপ্ত ডালে পাখা ডাকে তাই
ফসল তুলেছি।

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্কুলবুক সোসাইটি, ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি এবং অনুরূপ যে-সব প্রতিষ্ঠান থেকে পাঠ্যপুস্তক, অনূদিত বই, আর নানা ধরণের গদ্য-রচনার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল, সে-সব প্রতিষ্ঠানের উদ্যমে যে ধরণের গদ্য গঠিত হয়েছিল, তাতে কোন অভিনবত্ব ছিল না। যে তৎসম শব্দ-প্রধান পণ্ডিতি ভাষা এই যুগের সমস্ত গদ্যরচনার সাধারণ উপাদান, সংস্কৃত ঘেঁষা রীতির সেই ভাষাই ঐ সব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহেও প্রাধান্য বিস্তার করেছিল।

পড়ার বই-লিখিয়েরা সাধারণত সমসাময়িককালে প্রচলিত গদ্যভাষার মূল ধারা অনুসরণে বই লিখে থাকেন। সে-যুগেও এই অবস্থার অন্যথা হয়নি, বিশেষতঃ, সে-যুগের প্রধান লেখকেরা কেউ কেউ ছিলেন পাঠ্য-পুস্তক-লেখক ; আবার, পাঠ্য-গ্রন্থ প্রণেতাদের মধ্যেও নাম-করা গদ্য-লেখক ছিলেন। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের অনেক গদ্যরচনা সেকালেই স্কুলপাঠ্যরূপে গৃহীত হয়েছিল। আবার, উইলিয়ম কেরির পুত্র ফেলিক্স কেরি, জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান, জে-ডি-পিআর্স‌ন, উইলিয়ম ইএট্‌স্‌, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের গদ্যরচনা ভালো লেখা বলা চলে।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লেখকের সম্বন্ধে আলাদা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সকলের মিলিত প্রয়াসে বাংলা গদ্যে পণ্ডিতি ধারাও যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, আগের যুগের গদ্যরচনাবিরলতাও তেমনি দূর হয়। অবশ্য সুপাঠ্য গদ্যরচনার অভাব এ যুগেও প্রবলভাবে বর্তমান ছিল। এই সময়ের পাঠ্যপুস্তক প্রায়ই ইংরেজি রচনার অনুবাদ। "বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ" প্রায় আক্ষরিক অনুবাদে ব্রতী ছিলেন। অন্য কোন কোন প্রতিষ্ঠান, যেমন "কলিকাতা ইণ্ডিজিনস্‌ লিটররি ক্লব" (Calcutta Indigenous Literary Club), প্রায়ই ইংরেজি বইএর অনুবাদ প্রকাশ করতেন। এইভাবে এক বিরাট অনূদিত গ্রন্থাবলী গড়ে ওঠে। এই সব বইএর মারফৎ ইংরেজি ভাবধারা তথা পাশ্চাত্য ও আধুনিক চিন্তাবস্তু বঙ্গীয় মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি বাগ্‌ধারা, প্রবচন ও বাক্যগঠনরীতি বাংলা গদ্যভাষাকে প্রভাবান্বিত করতে সুরু করে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ইংরেজি বাগ্‌ভঙ্গির বেশ একটু প্রভাব বাংলা গদ্যভাষায় দেখা যায়। আলোচ্য সময়ে তার সূত্রপাত হয়েছে বটে, কিন্তু ভাষায় সার্বভৌম আধিপত্য, বিস্তার করে রয়েছে একমাত্র সংস্কৃতানুসারিণী রীতি।

কিন্তু বাংলা গদ্য যতই দিন দিন মুখ্য নায়কদের চেষ্টায় পরিবর্তিত হতে লাগল, ঐ সব প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বইগুলোর ভাষাও তত বদলে যেতে দেখা গেল। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার শব্দাড়ম্বর, রামমোহনের রচনার দীর্ঘতর বাক্য গঠন বা পদান্বয়দোষ, পরবর্তী আদর্শের প্রভাবে ক্রমশ অপসারিত হল। বাংলা গদ্যভাষায় তার মূল ধারাটি যেমন ফার্সি শব্দের গুরুপত্রবাহুল্যে কলুষিত হওয়া অবাঞ্ছনীয়, তেমনি সংস্কৃত শব্দের উপল-খণ্ড প্রপীড়িত হওয়াও অসমর্থনীয়, এই সত্য ক্রমশ বেশি লোকের চেতনায় প্রতিভাত হতে লাগ্‌ল। ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি ঘোষণা করেছিলেন, "বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক ; বিশেষত ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।" এ থেকে বোঝা যায় যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাঙালি শিক্ষিত সমাজ ও তাঁদের ইউরোপীয় পোষ্টারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভাষার উদ্দেশ্য দেশীয় লোকের হৃদয়ে প্রবেশ করা এবং সরল ভাষাই সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে শ্রেষ্ঠ সহায়ক। সোসাইটির ঐ ঘোষণার পর প্যারীচাঁদ স্পষ্টই জানিয়েছিলেন যে, তাঁর "মাসিক পত্রিকা" যদি বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়্‌তে চান, পড়বেন, কিন্তু তাঁদের জন্যে ঐ পত্রিকা ছাপা হয় না। "মাসিক পত্রিকা"র এই শিরোনামা দেওয়া হয় যে, "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে।" এমনি করে ক্রমশ ভাষাকে লঘু করে আনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পড়ার বই-এও তার প্রভাব দেখা যায়।

বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও অনুবাদ গ্রন্থের ভাষা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন নয়। যায় যে, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের হাতে এ এসে গেছে। সাময়িকপত্রের দ্বারা বাংলা গদ্যের যে উন্নতি হয়, তার বেশির নিবন্ধ রচনা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হয়নি। এরা সে-যুগে বইএর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃত সাহায্য গদ্যের প্রসারে মূল্যবান্ সাহায্য করেছিল। ভাষা গড়বার সম্বন্ধে প্রকৃত গতানুগতিকতার গণ্ডি ছাড়াতে পারে নি। ১৮১৮

প্রকাশিত কয়েকখানি এই ধরণের বইএর ভাষা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১৮১৮ সালে রামজয় তর্কালংকার-কৃত একটি অনুবাদ-গ্রন্থের ভাষা ছিল দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থের উপযোগী :—

এস্থলে "বন্ধ" শব্দের অর্থ দুঃখ-সংযোগই। সেই দুঃখসংযোগ পুরুষেতে স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিকত্বের লক্ষণ পশ্চাৎ করা যাইবে। যেহেতুক স্বভাবতো বদ্ধ ব্যক্তির মোক্ষের নিমিত্ত বেদবিহিত উপ্ত গুণ হইতে অগ্নির কি কখনো মোক্ষ সম্ভব হয়? যে দ্রব্যে যে স্বাভাবিক গুণ, সে-দ্রব্য যে পর্যন্ত থাকে, তৎপর্যন্ত সে গুণ তাহাতে অবশ্য থাকেই এই অর্থ।

এই রচনা "সাংখ্য প্রবচন ভাষ্য" গ্রন্থের অনুবাদ, দর্শনশাস্ত্রের বইএর সূত্রের মতো সংক্ষিপ্ত বাক্য নিয়ে এর ভাষা গঠিত। আক্ষরিক অনুবাদের জন্যে জায়গায় জায়গায় দুর্বোধ্যও বটে।

১৮২০ সালে ফেলিক্স কেরি "ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা" গ্রন্থে এই ধরণের বাংলা গদ্য রচনা করেন :—

"অপর ঐ গলাপ্রকাকুদের লুণ্ঠমান পর্দার উভয় পার্শ্বে স্থিত অতি বৃহদ্গুটিকা নামে মাংস গ্রন্থিদ্বয়েতে সর্বদা আর্দ্রভাবে থাকে। ঐ মাংস-গ্রন্থিদ্বয় বাদামবীজাকৃতি প্রযুক্ত কোন কোন ব্যবচ্ছেদকেরা তাহারদিগের বাদামগুটিকা সংজ্ঞা করিয়াছেন।"

এখানে বিষয়গৌরবে ভাষাও ভারাক্রান্ত; কিন্তু তবু বাংলাভাষায় লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্রের বই হিসেবে ভাষা মোটের উপর সহজ বলতে হবে। ১৮৩৪ সালে শ্রীরামপুরে ছাপা জন ম্যাক সাহেবের লেখা রসায়ন-শাস্ত্রবিষয়ক বাংলা বই "কিমিয়া বিদ্যার সার" প্রমাণ করে যে, ইচ্ছা থাকলে সমস্ত বিষয় বাংলা ভাষার সাহায্যে অনায়াসেই লেখানো ও পড়ানো যায়—যে-ব্যবস্থা আজ ও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঔদাসীন্য ও নির্বুদ্ধিতাবশত সম্ভবপর হয় নি। ম্যাক লিখছিলেন :—

"আলোকের চলন ও কার্যের দ্বারা অনেকে বোধ করে যে, সে এক-প্রকার বস্তু। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি অনুমান করেন যে, সে বস্তু নহে; কেবল বস্তুর মধ্যগত এক প্রকার বিশেষ সংলড়ন দ্বারা উৎপন্ন।"

রামমোহনের ভাষার তুলনায় এগুলি খুব পিছিয়ে-পড়া ভাষার নমুনা নয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সে-যুগে লঘুভাষায় "নববাবু-বিলাস" লিখে বেশ নাম করেছিলেন। এই ধরণের রচনা "আলালের ঘরের দুলাল"-এর পূর্বাভাষ। কিন্তু মিশনারীরা লঘুতর ভাষায় গদ্য লিখতেন। বিজ্ঞানের নীরস আলোচনাও ১৮২৫ সালের বই ...ের সাহেবের লেখা "পদার্থবিদ্যাসার" গ্রন্থে অতি সরলভাবে ...ভঙ্গিতে করা হয়েছে যার তুলনা তখনকার দিনে বিরল। ...অংশ উদ্ধৃত করে মিশনারিদের সহৃদয় দক্ষতা দেখানো

...পতনের যে দর্শন হয়, সেটা কি?

...পতন নয়। কিন্তু সূর্য-সন্তাপ দ্বারা যে কোন ...উঠে, তাহার মধ্যে স্ফুলিঙ্গ প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহা প্রজ্বলিত হয়; তাহাতে যে পর্যন্ত সে-সকল দগ্ধ না হয় তাবৎ ঐরূপ দর্শন হয়।

শিষ্য : রাত্রিকালে যে আলেয়ার দর্শন হয়, সে কি?

গুরু : অনুমান হয়, যাহাতে অগ্নির যোগ আছে এমন কোন বায়ুবিশেষ হইবে।"

ডব্লিউ. এইচ. পিআর্স নামে এক ধর্মযাজক ১৮২৮ সালে লিখে-ছিলেন, "তাঁহার বালকের সহিত আজন্ম পর্যন্ত এক বিড়ালের বড় প্রীতি ছিল। সেই বালক একসময় পীড়িত হইলে বিড়াল দিবারাত্রি তাহাকে কদাচ ত্যাগ করিত না। আর ঐ বালক যখন মরিল, তখন তাহার কবর না হইলে বিড়াল তাহার শব কখন ছাড়িয়া দিল না।" এখানেও ভাষা বেশ সরল; "কখন ছাড়িয়া দিল না" বাক্যাংশে কাল সম্বন্ধে ভুল প্রয়োগ আর ইংরেজি ভাষার প্রভাব দেখা গেলেও এই "শ্রীরামপুরি বাংলা"-র ছাপ-দেওয়া ভাষা তুলনামূলকভাবে বেশ সহজ ছিল। ঐ রচনাংশে "কখন" শব্দের সঙ্গে "দিল" ক্রিয়াপদ কালনির্ণয়ে গোলমাল বাধায় বলে কানে বাজে; এখনকার ভাষায় হয় "কিছুতেই ছাড়িয়া দিল না," নয় "কখন ছাড়িয়া দেয় নাই" লেখার কথা; কিন্তু তবু অর্থবোধে তেমন অসুবিধা হয় না।

১৮৫৩ সালে রোয়ের নামে এক বৈদেশিক লেখক উপলব্ধি করেন যে, "এতাদৃশ ভাষাতে কোন গ্রন্থ লেখায় উভয় সঙ্কট; কারণ, সংস্কৃত বহুল সাধুভাষায় লিখিলে অপর সাধারণের সুগম হয় না, আর ইতর ভাষায় লিখিলে অতি হেয় ও গ্রাম্যবোধে সাধুগণের অগ্রাহ্য হয়।" কিন্তু তখনও "মধ্যম রীতিতে" গ্রন্থরচনার কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়নি। রোয়ের বা অন্য অনেকে সে-চেষ্টা করলেও তাঁরা পথ খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সাধুভাষাতেই লিখে গেছেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র পথ খুঁজে পেয়েও কার্যত সে-পথে পা দিতে পারেননি।

রামমোহনের পর এযুগের অন্যতম পথিকৃৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষার উৎকর্ষ বিচার্য। তাঁর সম্বন্ধে আচার্য মনোমোহন ঘোষ অনেক প্রচারকার্য করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিশেষ কিছু কৃতিত্ব ছিল না। ব্রাহ্মরা অনেক সময় সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথকে নিয়ে ধর্ম ও সাহিত্যের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে থাকেন যার কোন যুক্তি ও প্রমাণ নেই। রামমোহনের মতোই দেবেন্দ্রনাথও একজন প্রধান গদ্যলেখক। কিন্তু রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের তুলনায় তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য নয়। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"-র অন্যতম লেখক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তাঁর প্রথম দিকের গদ্যভাষায় তিনি রামমোহনেরই অনুসরণ করেছিলেন। ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনায় তাঁর স্থান ঠিক রামমোহনের পরেই। তাঁকে একজন অগ্রণী বলার কারণ, তাঁর বেশ বড় একটি দল ছিল—যে-দলের লেখকেরা তাঁকে অনুসরণ করে গুরুর সম্মান দিতেন। দেবেন্দ্রনাথের গদ্যভাষার উৎকর্ষও বেশ উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন, তাঁর আত্মজীবনী বাংলাভাষার একখানি সেরা বই। কেউ কেউ তাঁর ভাষা বিদ্যাসাগরের ভাষার চেয়েও অগ্রগামী ও উন্নত বলে

জীবন কা...
...কই পথ পা...
...লাম মাটীর ...
...র্যে আভা সোন...

মনে করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে আমরা একথা বলতে বাধ্য যে, পথিকৃৎ হওয়া আর শ্রেষ্ঠ গদ্যরচনা করা এক কথা নয়। অর্থাৎ, কোন নতুন পথ দেখানো, আর সেই পথের শ্রেষ্ঠ পথিক হওয়া এক কথা নয়। দেবেন্দ্রনাথকে বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত রচনাশৈলী ও গদ্যভাষার প্রথম প্রবর্তকও বলা যায় না। একথা নিঃসংশয়ে বুঝতে হবে যে, মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার তুলনায় যেমন রামমোহনের ভাষা নিকৃষ্টতর, বিদ্যাসাগরের ভাষার চেয়ে তেমনি দেবেন্দ্রনাথের ভাষা নিরেশ। অনুরূপ আর একক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিজস্ব একটি গোষ্ঠী ও রচনাশৈলী থাকা সত্ত্বেও অক্ষয়কুমারের তুলনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাষাগত অগ্রগতি বেশী উল্লেখযোগ্য। চিন্তার প্রগতির দিক থেকে হয়ত অক্ষয়কুমার নমস্য, কিন্তু ভাষাশিল্পী হিসেবে ভূদেব অনেক বড়। মন দিয়ে পড়্‌লে বেশ দেখা যায় যে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের তুলনায় যথাক্রমে মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর ও ভূদেব অনেক বেশি উন্নত শ্রেণীর গদ্যরচনা করে গেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সালে যে গদ্যরচনা করেছিলেন, তাই তাঁর প্রথম লেখা। আলোচনার সুবিধার জন্যে তার অংশবিশেষের সঙ্গে আমরা ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর-লিখিত "বেতাল পঞ্চবিংশতি"-র খানিকটার তুলনা করব।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন :—

"যদিও ঈশ্বরারাধনা গুপ্ত এবং প্রকাশ্য উভয়স্থানেই উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে পারে, যদিও যাহার ঈশ্বরভক্তি আছে, কি সজনে কি নির্জনে তাহার ঈশ্বরভক্তিরূপ দীপশিখা কখন নির্বাণ হয় না, প্রকাশ্যে ভজনা করিলে আপনার ও অন্যের একেবারে উপকার হয়। নির্জনে তাঁহার দৃষ্টান্ত কেহ গ্রহণ করিতে পারে না এবং তাঁহার নিকটে ঈশ্বরজ্ঞানোপযোগী বাক্য শুনিয়া কেহ তৃপ্ত হইতে পারে না। সভাতে সকলের সহিত ঈশ্বরারাধনা করিলে ঈশ্বরভক্তির দৃঢ়তা হয়, পরস্পর জ্ঞানালোচনায় জ্ঞানের প্রকাশ অধিক হয়, স্বধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের একস্থানে মিলন জন্য আত্মীয়তা এবং প্রণয়ের বৃদ্ধি হয়, আত্মীয়তা এবং প্রণয়ের বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তিদিগকে জ্ঞান দিবার অনেক উপায় করিতে পারি, অথচ এই প্রকাশ্য ভজনা নির্জন ভজনায় প্রতিবন্ধক নহে এবং সর্বতোভাবে প্রবৃত্তিদায়ক।"

মনোমোহন ঘোষের মতে, "এ রূপটি যে রামমোহনের লেখা থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে তাঁর অনুবর্তী লোকদের লেখায় ক্রমশ ফুটে উঠছিল, তা আগেই দেখা গিয়েছে।" সুতরাং ক্রমবিকাশের পথে দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের অনুগামী মাত্র।

এর সঙ্গে তুলনা করা যাক বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত রচনার :—

"তুই কে? কোথায় যাইতেছিস্? দাঁড়া, তোর নাম কি, বল্।" রাজা কহিলেন, "আমি বিক্রমাদিত্য, আপন নগরে যাইতেছি; তুই কে? কি নিমিত্ত আমার গতিরোধ করিতেছিস্, বল্।" * * * তখন যক্ষ কহিল, "মহারাজ, তুমি আমায় পরাভূত করিয়াছ। তোমার প্রভাব ও পরাক্রম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমায় ছাড়িয়া দাও; আমি তোমায় প্রাণদান দিতেছি।" রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুই বাতুল, নতুবা এরূপ কথা বলিবি কেন? তুই আমায় প্রাণদান কি দিবি? আমি মনে করিলে এখনই তোর প্রাণদণ্ড করিতে পারি।" যক্ষ শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, "মহারাজ, যাহা কহিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ।"

দুজনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের ভাষাই সুসীম ও যথাযথ। তাঁর ব্যবহৃত কোন শব্দ নিরর্থক বা ভুল অর্থদ্যোতক নয়। দেবেন্দ্রনাথ ভাষাগত ভারসাম্য সর্বত্র রক্ষা করতে পারেননি। অক্ষয়কুমারও এ ব্যাপারে কতকটা পশ্চাদ্বর্তী। দেবেন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত রচনায় ভারসাম্য বজায় থাকলেও রচনার সর্বত্র সুসীমতা ও যথাযথ ভাব নেই। "একেবারে" শব্দটির ভুল অর্থে প্রয়োগ তো তিনি করেছেনই, "এবং" শব্দটিও সুপ্রযুক্ত নয়। অন্যত্র "এবং সুতরাং" ধরণের অপটু প্রয়োগও দেখা যায়। তাঁর রচনায় রামমোহনের মতো দীর্ঘ বাক্য প্রয়োগের দোষ কি রকম, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল :—

"এইরূপে বালককালে অত্যন্ত নিপুণরূপে বিচিত্র সৃষ্টির রচনা বিষয়ে অনুশিষ্ট হইয়া জ্ঞানের উদ্রেকে ঈশ্বরের মহিমা কতক জানিতে শক্য হয়, তখন তাহারদিগের বোধ হয় যে, এই অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা অবশ্য একজন আছেন যিনি অনন্তস্বরূপ, কারণ, অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা অনন্তস্বরূপ ভিন্ন সম্ভব হইতে পারে না; এবং সুতরাং তাঁহার আকার নাই, কারণ, যাহার আকার স্বীকার করা যায় তাহাকে আর অনন্ত বলা যায় না; এবং তিনি জ্ঞানস্বরূপ, কারণ, কোন জড় বস্তুর দ্বারা এ অচিন্তনীয় রচনার রচনা হইতে পারেনা; এবং এমত যে নিরাকার নির্বিকার আনন্দস্বরূপ অন্তরস্থিত পরমেশ্বর, তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন ভিন্ন তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না।"

অবশ্য ১৮৪৩ সালে লেখা এই রচনার ভাষার চেয়ে উন্নত ভাষায় অনেক প্রবন্ধ তিনি পরে লিখেছিলেন। ১৮৯৫ সালে সমাপ্ত তাঁর "আত্মচরিত"-এর এক জায়গার ভাষা এই রকম :—

একদিন বেলা চারিটার সময় আমি রাজনারায়ণবাবুকে বলিলাম, "আজ তোমার দৈনন্দিন লেখা শেষ করিয়া ফেল। আজ প্রকৃতির শোভা বড়ই দীপ্তি পাইতেছে; চল, আমরা বোটের ছাদের উপর গিয়া বসি।" তিনি বলিলেন যে, "এখনও বেলার অনেক বাকি; ইহার মধ্যে আমার দৈনন্দিনের জন্য কত ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা কে জানে?" এইরূপে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় দেখি, পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে।

কিন্তু ১৮৯৫ সালের পক্ষে এ ভাষা তেমন অগ্রগতিসম্পন্ন নয়। তখন প্রগতিশীল ভাষা সৃষ্টির কাজ রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে গেছে। ১৮৭৮ সালের আগে ধর্মব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ যে-সব নিবন্ধ রচনা করে গেছেন সেগুলির ভাষা বাংলা গদ্যের গঠনকার্যে প্রভূত সাহায্য করেছে। রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) তাঁর ভাষার সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য এইভাবে ব্যক্ত করেছেন :—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন আপনার প্রণীত "বেতাল পঞ্চবিংশতি" গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন, দেবেন্দ্রবাবুও সেই এক সময়েই "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশ ও সংশোধন দ্বারা সেই উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন।" সুতরাং বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী নন, স্বাধীন অভিযাত্রী।

১৮৪১ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর প্রথম গদ্য রচনায় এই ভাষা ব্যবহার করেন:—

"এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্দ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এই অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহু ক্লেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।"

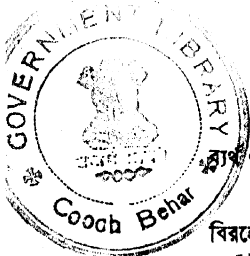
অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের ভাষা দেবেন্দ্রনাথের ভাষার মতোই সংস্কৃত শব্দপূর্ণ হলেও অক্ষয়কুমারের লেখায় বাক্যবিন্যাস অনেক বেশি ঋজু ধরণের। বহু অসমাপিকা ক্রিয়াপদ বাক্য দীর্ঘতর করলেও অক্ষয়কুমারের গদ্যে দেবেন্দ্রনাথের তুলনায় প্রসাদগুণ ঢের বেশি। বিদ্যাসাগর যেমন ছন্দোময় গদ্য রচনা করে গেছেন, তেমন কিছু না পারলেও অক্ষয়কুমারের ভাষা দৃঢ় চরণে অগ্রসর হয়েছে, তার চলায় শৈথিল্য নেই বললেই হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথের গদ্যভাষার চেয়ে অক্ষয়কুমারের রচনার ভাষাগত উৎকর্ষ অনেক বেশি। যদিও সাহিত্য সৃষ্টির পরিমাণ দেবেন্দ্রনাথেরই বেশি আর তাঁর রচনার সাহিত্য গুণও অক্ষয়কুমারের চেয়ে বেশি। অক্ষয়কুমার ভাষাশিল্পী হিসেবে মহত্তর, সাহিত্যিক হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ সার্থকতর। মনোভাব প্রকাশ ও সাহিত্যসৃষ্টির সামর্থ্যের দিক থেকে বিচার করলে অক্ষয়কুমারের ভাষার উপযোগিতা বেশি। স্বভাবে সাহিত্যিক না হওয়ার উন্নততর ভাষার সৃষ্টি করেও অক্ষয়কুমার উপযুক্ত মৌলিক সাহিত্য রচনা করে যেতে পারেন নি। মৌলিক সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী দেবেন্দ্রনাথ সেটা পেরেছিলেন, বিশেষ করে তাঁর "আত্মচরিত"-এ। "স্বপ্নদর্শন"-এ অক্ষয়কুমার কতক পরিমাণে সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছেন। যদিও বানিয়ানের Pilgrim's Progress-এর অনুকরণে তিনি "স্বপ্নদর্শন" লিখেছিলেন এবং ফেলিক্স কেরি, সাটন প্রভৃতি এ ব্যাপারে তাঁর পুরোবর্তী ছিলেন, তাহলেও তাঁর পরিবেশিত সাহিত্যরস উপভোগ্য।

অক্ষয়কুমারের প্রায় সমস্ত রচনাই জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ বলে ধরা যেতে পারে। রচনা-সাহিত্য তাঁর লেখায় একরকম অনুপস্থিত। তিনি বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক এবং গদ্যভাষার ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শক হলেও তাঁর দ্বারা বাংলা সাহিত্য বিশেষ কিছু রসসমৃদ্ধি অর্জন করে নি। রসের ভাণ্ডারে মহর্ষিও ১৮৭৮ সালের আগে কিছু জোগান দিতে পারেন নি। বরং অনুবাদ-সাহিত্যের দ্বারা বিদ্যাসাগর আমাদের হিন্দি, সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের রস আস্বাদন করিয়েছিলেন। সে-যুগে শেক্স্‌পিয়ারের রচনা, ল্যাম্বের গল্প প্রভৃতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অনুবাদ আরো অনেকে পড়ার বই হিসেবে করেছিল। কিন্তু সর্বপ্রথম বিদ্যাসাগরের ভাষাতেই মৌলিক সাহিত্যের উপযুক্ত রসের স্ফুরণ দেখা গেল। তাঁর অনুবাদের ভাষায় মূল রচনার সাহিত্য সৌরভ যতটা অক্ষুণ্ণ আছে তেমন আগে আর কখনও দেখা যায় নি। সেদিক থেকে বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের প্রথম সাহিত্যিক বললে ভুল হয় না।

দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর, মুখ্যত এই তিনজন উনিশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের নিয়ামক থাকলেও "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে তথা ভাষাসৃষ্টির জগতে বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, ঐ তিনজনের লেখক-জীবন আরও বহু বছর বজায় থাকলেও তাঁদের জীবিত কালেই ভাষা ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রণভার বঙ্কিমচন্দ্র নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলেন। গদ্য বিভাগের প্রায় সব শাখায় বঙ্কিমচন্দ্র এমন তেজোদ্দীপ্তভাবে নিজেকে স্থাপিত করেন যে, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়। তাঁদের অস্তিত্ব বাংলা গদ্যের রূপান্তরের দিক থেকে একরকম মূল্যহীন হয়ে পড়ে। (ক্রমশ)

বিরহে লভে প্রেম সার্থকতা

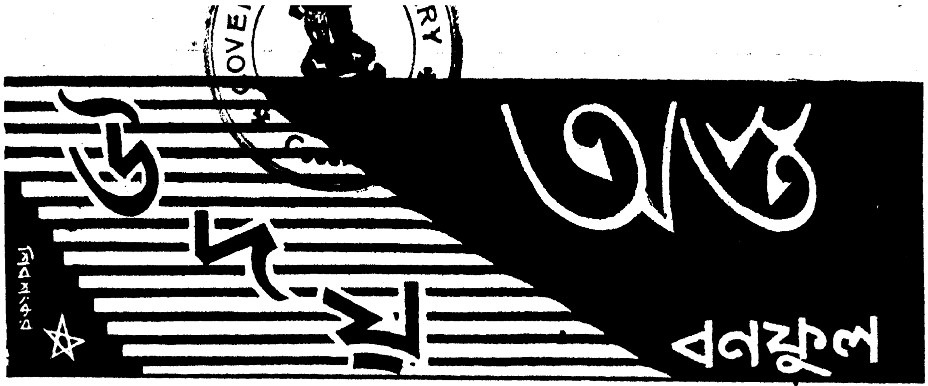
'বৈভব'



ব্যর্থ এ পরাণের
শেষ বারতা
বিরহেই লভে প্রেম
সার্থকতা।

মিলনের বুকে নয়
যেথা সদা জাগে ভয়,
মরণেই জীবনের
সার্থকতা

ব্যর্থ ব্যথার এই
শেষ বারতা।



(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"ঠাকুরঝি, খাইয়ে দাও ওটা"

কিরণ সূর্য্যসুন্দরের গলায় ছোট লোম-ওয়ালা তোয়ালেটা জড়াইয়া দিয়া ফিডিং কাপে করিয়া 'ওভালটিন' খাওয়াইতে লাগিল।

এক চুমুক দিয়াই সূর্য্যসুন্দরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"বাঃ, খুব সুন্দর তো এটা খেতে"

পুরসুন্দরী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "গগন খুব ভালবাসে। বারো টিন কিনে এনেছে আপনার জন্যে"

যতক্ষণ না ওভালটিন খাওয়ানো শেষ হইল ততক্ষণ পুরসুন্দরী আধঘোমটা টানিয়া প্রহরীর মতো এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খাওয়া শেষ হইলে উর্ম্মিলা উঠিয়া নীরবে ফিডিং কাপটি ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তাহার পর মাথার শিয়রে বসিয়া চুলের ভিতর ধীরে ধীরে আঙুল চালাইতে লাগিল।

একটু পরে প্রবেশ করিল গঙ্গা একটা কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া। ধোপার বাড়ির কাপড়, তাগাদায় কাচিতে দেওয়া হইয়াছিল।

পুরসুন্দরী বলিলেন, "গঙ্গা, তোকেই খুঁজছিলাম। বাজার থেকে চট্ করে' গিয়ে কিছু জইত্রী কিনে আন ত। গগন চাইছে। সাইকেলে করে' যা বাবা, ও কি একটা রান্না করছে বাবার জন্যে"

"ও, আচ্ছা—"

গঙ্গা কিরণের দিকে চাহিয়া বলিল, "রতনা ধোপার কাছ থেকে তোমার তাগাদার কাপড়গুলো নিয়ে এলাম। ওদের বাড়িতে বিয়ে লাগছে, না নিয়ে এলে ওই দামী কাপড়গুলো পরতো সবাই মিলে। মিলিয়ে দেখে রেখে দাও এক্ষুণি। পরে আবার বোলো না যেন এটা নেই, সেটা নেই"

বলিয়াই সে জইত্রী আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

পুরসুন্দরীও রান্নাঘরে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু যাওয়া হইল না।

সূর্য্যসুন্দর বলিলেন, "বউমা, শোন। আমার বাবার গ্লাসটা কোথা আছে বল তো"

"বড় কাঠের সিন্দুকে আছে সেটা"

"কাউকে দিয়ে বার করাও তো, দেখব একবার। এখুনি বার করতে বল"

"আচ্ছা"

পুরসুন্দরী চলিয়া যাইবার পর পার্ব্বতী পুনরায় প্রবেশ করিল।

সূর্য্যসুন্দরের দিকে চাহিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমার কথা শোনা হল না। মায়ের কথা শোনা হল। আমি যেন কেউ নই। আচ্ছা"—মাথা ঝাঁকাইয়া সে আবার বাহির হইয়া গেল।

১০

আমবাগানে তিনটি ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া সন্ধ্যা, স্বাতী এবং রঙ্গনাথ বেশ জমাইয়া আড্ডা দিতেছিল। বাগানের চাকরটি তাহাদের মাঝখানে একটি ছোট টেবিলও পাতিয়া দিয়াছিল। স্বাতী সন্ধ্যার চেয়ে বছর চারেকের ছোট হইলে কি হয়, দুজনে বন্ধুত্ব খুব। বিবাহের

পর বয়সের এ পার্থক্যটুকুও ঘুচিয়া গিয়াছে। মেয়েদের সাধারণত ইহাই হয়। তাহাদের মধ্যে পিসি-ভাইঝির দূরত্ব আর ছিল না। স্বাতীর রং খুব ধপধপে ফরসা, চোখ দুটি ছোট্ট ছোট, মুখের উপর ঈষৎ তির্য্যকভাবে বসানো, মুখের ভাবটা একটু মঙ্গোলীয় ধরণের। খুব পাতলা ঠোঁট, চিবুকের মাঝখানে ছোট্ট একটি কালো তিল।

স্বাতী বলিতেছিল, "টেলিগ্রাম পেয়ে কি তাড়াহুড়ো করে' যে আমরা এসেছি ছোট পিসি—তা বলবার নয়। ভয় হচ্ছিল দাদুকে এসে দেখতে পাব কিনা। ছুটি পেতে দু'দিন দেরি হ'য়ে গেল তো। কিন্তু এসে মনে হচ্ছে আমরা যেন দাদুর অসুখের জন্যে আসি নি। এসেছি বউদির সাধ খেতে। দাদুকে তো খুব হাসি-খুশী দেখলুম, মনে হচ্ছে অসুখই হয়নি"

"বাবা বরাবরই ওই রকম, অসুখ হ'লে কাউকে বুঝতে দেন না যে অসুখ হয়েছে। কিন্তু বাবার মনে সুখ নেই বুঝতে পারছি"

"কেন"

"মেজদার জন্যে। মনে মনে উনি মেজদার জন্যেই প্রতীক্ষা করছেন। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে মেজদার নাম ধরে' ডাকছিলেন"

"সত্যি মেজকাকা যে কোথায় আছেন, কে জানে"

রঙ্গনাথ হঠাৎ বলিলেন, "তোমার শাড়ির আঁচলটা নতুন ধরণের দেখছি। হায়দ্রাবাদি বুঝি—"

"হ্যাঁ। হায়দ্রাবাদ থেকেই আনিয়েছি। আপনি বেশ পাড় চিনতে পারেন তো—"

রঙ্গনাথ সন্ধ্যার দিকে একবার চকিত-দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,"আমার ধারণা যাজ্ঞ্যবল্ককেও মৈত্রেয়ীর জন্যে পাড়ের খবর রাখতে হ'ত, যদিও উপনিষদে এ কথা লেখা নেই—"

সন্ধ্যার মুখে হাসি চিকমিক করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

স্বাতী প্রশ্ন করিল,"আপনি তাহলে কি করে' জানলেন এ কথা"

"ক্ষিধে পেলে যাজ্ঞ্যবল্ক খেতেন এ কথাও উপনিষদে লেখা নেই, কিন্তু আমি জানি খেতেন"

সন্ধ্যা বলিল, "উনি আমার দৃষদ্বতীতে কাপড়ের পাড় সম্বন্ধে সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন একটা"

"আচ্ছা, ছোট পিসি, দৃষদ্বতী মানে কি! অমন কটমট নাম রেখেছ কেন কাগজের"

সন্ধ্যা রঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি বল—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "কি দরকার ওসব ইতিহাস শুনে।"

"না বলুন। অনেকে জিগ্যেস করে—"

"তবে শোন। দৃষদ্বতী নদীর নাম। সেকালে আর্য্যরা যখন ব্রহ্মাবর্ত্তে এসেছিলেন তখন দুটি নদীকে তারা দু-রকম মর্য্যাদা দিয়েছিলেন। একটি সরস্বতী, আর একটি দৃষদ্বতী। সরস্বতী ছিল অন্তঃসলিলা, বাইরে থেকে দেখতে শুকনো, কিন্তু বালি একটু খুঁড়লেই স্বচ্ছ পরিষ্কার জল বেরুতো। ওই নদীতে ছোট বড় গর্ত্ত খুঁড়ে জল সংগ্রহ করত সবাই। গর্ত্তগুলোকে তাঁরা বলতেন সরসী, মানে ছোট ছোট পুকুর। যে নদী সরসী তার নাম দিলেন তাঁরা সরস্বতী। আর্য্যেরা জ্ঞানের প্রতীক হিসাবেও পূজা করতেন ওই নদীকে। পরে যিনি জ্ঞানের দেবতা হলেন তাঁরও সম্ভবত ওই নদী থেকেই নামকরণ হল সরস্বতী। দ্বিতীয় নদীটি ছিল অন্য রকম। ছোট বড় অনেক পাথর অতিক্রম করে বইত সে নদী, যেন অনেক বাধা বিঘ্নও তাকে দমাতে পারে নি। ইজিপ্টে নীল নদের ক্যাটারাকটগুলো অনেকটা ওই রকম। পাথরের সংস্কৃত হচ্ছে দৃষৎ, তাই তাঁরা সে নদীর নাম দিয়েছিলেন দৃষদ্বতী। সরস্বতী যেমন ছিল জ্ঞানের প্রতীক, দৃষদ্বতী তেমনি ছিল বীরত্বের প্রতীক। সরস্বতীকে পূজো করতেন ব্রাহ্মণেরা, আর দৃষদ্বতীকে ক্ষত্রিয়েরা। তাই সন্ধ্যা ওর কাগজের নাম রেখেছে দৃষদ্বতী"

"কিন্তু ওতে তো যুদ্ধের বা বীরত্বের কিছু থাকে না। ওতে মেয়েদের সম্বন্ধেই তো গল্প প্রবন্ধ থাকে দেখেছি"

"তোমার ছোটপিসির ধারণা আমাদের সমাজে মেয়েদের খবর মানেই যুদ্ধের খবর। মেয়েরা পরাধীন, মেয়েরা নির্য্যাতিত, তাই মেয়েরা বিদ্রোহ করছে। তাদের মুক্তির জন্যে যা কিছু করা হয় তাই যুদ্ধ। ও কাগজের গল্প কবিতা প্রবন্ধ সব ওয়ার-বুলেটিন"

রঙ্গনাথ গম্ভীর ভাবেই বলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে হাসির আভা উঁকি দিতেছিল। স্বাতী বোকা মেয়ে নয়, কিন্তু সে বোকা সাজিবার ভান

করিত। সে সব বুঝিতেছিল কিন্তু ভান করিতেছিল যেন কিছুই বোঝে নাই।

"এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষ কারা"

"আমরা, পুরুষরা"

নীরব হাসিতে স্বাতীর মুখখানি ভরিয়া গেল, ছোট চোখ দু'টি বুজিয়া আসিল।

"কিন্তু শত্রুর প্রতি আপনাদের ব্যবহার তো অদ্ভুত। শুধু খাওয়াচ্ছেন পরাচ্ছেন না, ভাল ভাল গয়না দিচ্ছেন, সব রকমে প্রশ্রয় দিচ্ছেন"

"আমাদের মধ্যে যারা বিবেকী তারাই দিচ্ছে, অনুতপ্ত হয়ে খেসারত দিচ্ছে। কিম্বা এ-ও হ'তে পারে অনেকে হয় তো ঘুস দিয়ে শত্রুকে বশ করবার চেষ্টা করছে"

সন্ধ্যা সূর্য্যসুন্দরের জন্য উলের দস্তানা বুনিতেছিল। কোন মন্তব্য না করিয়া সে নীরবে বুনিয়া যাইতেছিল। একটি হাসির আভা তাহার সুন্দর কালো মুখখানিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল শুধু। সে মাঝে মাঝে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে রঙ্গনাথকে দেখিতেছিল, কিন্তু সেই দৃষ্টিতে দেখিতেছিল—যে দৃষ্টিতে মা তাহার দুরন্ত সন্তানকে নিরীক্ষণ করে।

"আচ্ছা পিসেমশাই—"

"একবার তো মানা করে' দিয়েছি আমাকে পিসেমশাই বলবে না। পিসেমশাই শুনলেই আমার চোখের সামনে আমার নিজের এক দূর সম্পর্কের পিসেমশাইয়ের ছবি ফুটে ওঠে। রোগা কালো বেঁটে কুঁজো, গুলিখোর। সুতরাং আমি কারো পিসেমশাই হ'তে চাই না"

"কি বলে' ডাকব তাহলে—"

"দাদা বললে ক্ষতি কি—"

"ছ্যাৎ, পিসেমশাইকে দাদা বলা যায় না কি—"

"তোমরা পিতৃতুল্য মাস্টারকে দাদা বল, হবু-স্বামীকেও বিয়ের আগে দাদা বল, পিসেমশাইকে দাদা বললে কিছু বেমানান হবে না। শুনেছি সংস্কৃত তাত শব্দ থেকে বাংলা দাদা কথাটা হয়েছে—"

"তা হোক। দাদা বলে' ডাকা চলবে না। মা ভয়ানক রেগে যাবে তাহলে"

"বেশ, তাহলে শুধু 'পি' বোলো—"

রঙ্গনাথ একবার সন্ধ্যার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। সে নত-নেত্রে নীরবে হাসিমুখে বসিয়া দস্তানাই বুনিতে লাগিল।

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা পিসেমশাই, মিস বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার?"

"না। তবে মেয়েটি ভালো বলেই মনে হয়"

"আলাপ হয়নি, তবে কি করে' বুঝলেন"

"গায়ে পড়ে' আলাপ করবার চেষ্টা করে না দেখে। তোমার ছোটপিসির ওর সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা"

"তাই নাকি ছোটপিসি, আমারও খুব ভালো লেগেছে মেয়েটিকে—"

একথাটা স্বাতী মিথ্যা বলিল। মিস্ বসুকে মোটেই তাহার ভালো লাগে নাই, বরং তাহার মনে হইতেছিল দাদা এই অজ্ঞাত কুলশীলাকে কোথা হইতে লইয়া আসিল, তাহার ফিটফাট ধরণধারণ তাহার সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তাহার বরং একটু ঈর্ষাই হইয়াছিল। তাহার জন্য আলাদা তাঁবু, তাঁবুর ভিতর আলাদা বাথরুম, কাটিহার হইতে তাহার জন্য কমোড, আলাদা একটা মেথরাণী—এসব তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু এর সোজাসুজি মনোভাব ব্যক্ত করিবার মেয়ে সে নয়। প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল মিস্ বসুকে কাহার কেমন লাগিয়াছে।

সন্ধ্যা সংক্ষেপে বলিল, "ভালোই মেয়েটি"

"ও, তাই বুঝি। খুব কাজের?"

"না, ভালো মানে মডার্ণ। আধুনিকা—"

"ও"

রঙ্গনাথ উঠিয়া পড়িলেন এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগানের গাছগুলি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের কিছু জমিদারি আছে, কিছু বাগানও আছে। কিন্তু তিনি নিজে মনোমত আর একটি বাগান করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। সাহিত্যে যে সব দেশী বিদেশী গাছের নাম তিনি পড়িয়াছেন, সেইগুলি একটি বাগানে রোপণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার। নানা পুস্তক হইতে নানারকম বৃক্ষ ও লতার নাম তিনি টুকিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের বিষয়ে অনেক পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও জোগাড় হয় নাই, শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের পরিচালকদের সঙ্গে এ বিষয়ে

তাঁহার পত্রালাপ চলিতেছে। নিজে তিনি সেখানে কয়েকবার গিয়াছেনও। তাই বাগান দেখিলেই তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন এবং নিজের কল্পনায় তা দেন।

সন্ধ্যা বুনিতে বুনিতে হঠাৎ স্বাতীকে প্রশ্ন করিল—"তুই হিন্দুকোডবিলটা পড়েছিস ?"

"ওই খবরের কাগজে একটু আধটু চোখ বুলিয়ে দেখেছি। আমার তত ভালো লাগেনি"

"ভালো লাগেনি কেন"

স্বাতী জানে ছোটপিসির পাল্লা বড় শক্ত পাল্লা। কুট কুট করিয়া প্রশ্ন করিবে, আস্তে আস্তে কুরিয়া কুরিয়া তোমার মনের কথাগুলি টানিয়া টানিয়া বাহির করিবে, তাহার পরই ঝপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিবে যুক্তির জাঁতি-কলে। ও ফাঁদে স্বাতী পা দিবে না।

"কেন, তা-ও কি বলতে পারি। ও নিয়ে আমি মাথাই ঘামাই নি"

"ঘামানো উচিত। আমাদেরই জন্যে ওটা হচ্ছে, আমরা যদি মাথা না ঘামাই তাহলে কে ঘামাবে"

স্বাতী অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁচিয়া গেল সে।

"কে আসছে বল তো ছোটপিসি—"

সন্ধ্যা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ন্যুব্জদেহ একটি বৃদ্ধ লাঠির উপর ভর দিয়া দিয়া তাহাদের দিকেই আসিতেছে। গায়ে একটা আড়ময়লা আল-থাল্লা গোছের জামা, এক মুখ খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি, মনে হয় যেন দশবারো দিন কামানো হয় নাই। পায়ের জুতোটাও ছেঁড়া। কিছুদুর আসিয়াই দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর বাগানের মালীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে শান্তা, দোঠো বাঘান্‌ঢিরো দাত্‌মন্ তোড়ি দে তো বেটা। অভি তক্ মু নেই ধোলোছি—"

শান্তা সসম্ভ্রমে দাঁতন আনিতে ছুটিল।

বৃদ্ধ একমুখ হাসিয়া আগাইয়া আসিল সন্ধ্যার দিকে। তাহার পানের দাগ-লাগা অপরিষ্কার দন্তগুলি দেখিয়া সন্ধ্যা ঘৃণায় মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখভাবে তাহা সে প্রকাশ করিল না, বরং হাসিমুখেই চাহিয়া রহিল আগন্তুকের দিকে। ক্ষীণভাবে ইহাও তাহার মনে হইতে লাগিল মুখটা যেন চেনা-চেনা। বৃদ্ধ কিছুদুর আসিয়া দন্ত বিকশিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়াই রহিল। সন্ধ্যার সহসা মনে হইল তাহার ওই ফোলা ফোলা হাস্য-দীপ্ত চোখের দৃষ্টি হইতে যেন স্নেহের ঝরণা নামিতেছে। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে কথা বলিল।

"কে তুই, কত বড় হ'য়ে গেছিস, চিনিতে পারি না"

"আমি সন্ধ্যা—"

"আরে, আরে তুই সন্ধ্যা। সেই এত টুকুন 'সন্ধ্যা-মুনি রাত-জাগুনি' এতো বড় হয়েছিস তুই ? বাহবা, বাহবা—বাঃ"

মহানন্দে বৃদ্ধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। শান্তা ইতিমধ্যে দুইটি "বাঘান্‌ঢির" (বাঘ-ভেরেণ্ডা) দাঁতন আনিয়াছিল। বৃদ্ধ সে দুইটি লইয়া বলিল, "আমি মুখটা আগে ধুয়ে ফেলি। তারপর তোদের সঙ্গে কথা বলব। আঁধার থাকতেই কিষণপুর থেকে হেঁটে বেরিয়েছি। সোজা আগে তোমাদের বাড়ি গিয়ে ডাক্তারবাবুর খবরটা নিলাম। শুনলাম ভালো আছেন। তারপর এখানে মুখ ধুতে এলাম। এখানে যখনই আসি তখনই বাঘানঢির দাঁতন দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলি। এ বাঘানঢি আমিই লাগিয়েছিলাম এখানে। ওতে ভাল বেড়াও হয়, দাঁতনও হয়। শান্তা দো বালতি পানি উঠা হিঁ তো বেটা—"

একটু দূরে কূপ ছিল্। শান্তার সহিত বৃদ্ধ সেই দিকেই গেলেন। বৃদ্ধকে দুই বালতি জল তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেই সন্ধ্যা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "শান্তা, উনি কে বলতো—"

"কবিরাজ জি"

তখন সন্ধ্যার মনে পড়িল পেট-পচা কবিরাজকে। তাহার ছেলেবেলায় ইনি প্রায়ই আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। খাদ্যরসিক, খুব খাইতে পারিতেন, কিন্তু হজম হইত না। উদরাময়ে ভুগিতেন। নিজেই বলিতেন, "আমার পেটের ভিতরটা পচে' গেছে"—আর হা হা করিয়া হাসিতেন। সেইজন্য বাড়িতে ইহাঁর নাম হইয়া গিয়াছিল পেট-পচা কব্‌রেজ। সন্ধ্যার ইহাও মনে পড়িল, মা ইহাঁকে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। কবিরাজ মহাশয় স্বাতীরও জন্ম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাতীকে তাহার তেমন মনে ছিল না। স্বাতী কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের গল্প শুনিয়াছিল অনেক।

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটপিসি, এই পেট-পচা কবরেজ, না ?"

"হ্যাঁ, বেশ মজার লোক"

সন্ধ্যা পুনরায় দস্তানা-বোনায় মন দিল। হিন্দুকোড বিলের কথা আর উঠিল না, স্বাতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ক্রমশঃ



(পূর্বানুবৃত্তি)

অমরনাথ আবিষ্কার

ক'দিন ধরে মিসেস্ শর্মা জোর তাগাদা লাগিয়েছেন অমরনাথের খোঁজ করার। আদৌ অমরনাথের পথ খোলা আছে কিনা। অমরনাথ হিন্দু-তীর্থ বলে পরিগণিত। সুতরাং এই দুর্গমকে আয়ত্ত করার বাসনা সাহসিক চিত্তে প্রবল হবে। প্রকৃত দুর্জয় যার মন, সে স্পর্দ্ধা না করেই অজেয়কে জয় করে। বিজিতকে জয় করে শ্লাঘা করার প্রবৃত্তি দুর্জয়ের হয় না ; সাহসের আচ্ছাদনে ঢাকা ভীরুর আত্মপরিচয়। আমরা যারা তীর্থকামী, তারা ভীরু ; মনে প্রাণে ভীরু। এই ভয়কেই আমাদের এতো ভয় যে এড়িয়ে যেতে চাই, আর বারবার সাহসের বড়াই করে অসমসাহসিকের সম্মুখীন হই।

এ আকাঙ্ক্ষা তা বলে কেবল দুর্জয়কে আয়ত্ত করার আকাঙ্ক্ষাই নয়। কেমন যেন একটা নাড়ীর টান, অমরনাথের নামের টান। পাপবোধও নয় প্রবল, পুণ্যবোধ তো নেই-ই ; দেবতার মাহাত্ম্যে চিত্তে দেবতার প্রতিষ্ঠা তো সম্ভবও নয়। কাজেই তীর্থাভিলাষীর ধর্মধ্বজ হতে নেই। তবু জানি দুর্গমকে কোল দেবার প্রবল বাসনা জেগেছে মনে। যেতে আমায় হবে।

দুধ যোগাড় করতে গেছি মীরা কদলের বাজারে। একটা গলির মোড় ওমোড় প্রতি দুধের দোকানে গিয়ে হতাশ্বাস হয়ে ফিরছি। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার, আলোয় আধা-আঁধার পথ। একটি যুবক ঐ দেশীয় মাথায় গোল কাল টুপি, আমায় হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন—"অমরনাথ যাবেন ?"

চমকে চাইলাম। কি করে এ জানলো এখন আমার মনে দুধের চিন্তা ছিল না, অমরনাথের চিন্তা ছিল। বল্লাম—"যাবো। নিয়ে যেতে পারবেন ?"

"সাহস আপনার, সহায় আমার, ভরসা অমরনাথের—নিশ্চয় পারবো। এই আমার কাজ।"

"কে আপনি, নাম কি ? কি করেন ?"

"আমি অমরনাথের পাণ্ডা। নাম কোটেশ্বর ; ব্রাহ্মণ, যাত্রীদের অমরনাথে নিয়ে যাওয়াই আমার উপজীবিকা। কি চাই আপনার, দুধ ? কতটা ? আধসের ? ঘটীটা আমায় দিন, আমি দিচ্ছি। দাঁড়ান।"

মুহূর্তে ঘটী নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। চকিতে গরম দুধ নিয়ে ফিরে এলো। মন ঝরঝরে হয়ে গেল। অসিত কল-পাকুড় কিনছিলো, তরা মনে বললাম, "হেঁটে নয় অসিত, শিকারায় চলো। কোটেশ্বরজীর সঙ্গে গল্প করতে করতে চিনার বাগে ফিরি।"

পরে জেনেছিলাম শুধু কোটেশ্বরজীই নয়, কাশ্মীরে এমন শত শত পাণ্ডা আছে, ঘোরাফেরা করেন যাত্রীর তল্লাসে। থাকেন পহালগামের পথে মাটনে। মাটন পাণ্ডাদেরই বসতি। কিন্তু কোটেশ্বরজী যেন চিরকালের জানা সেই তীর্থের 'কাক' নন্। তাঁর সঙ্গে জমে গেল কথা। নিজেদের দুঙ্গা দেখিয়ে দিলাম। সঙ্গে যে বহুযাত্রী যাবে এও জানালাম। উনি বল্লেন, অযথা কোনও বিপত্তির মধ্যে আমাদের টেনে নিয়ে যাবার আগে মাটনে গিয়ে সঠিক খবর উনি জেনে আসবেন। তিন দিন সময় নিয়ে গেলেন।

মিসেস শর্মা বলেন,—"আপনার ওপর নির্ভর ভাই। আমি যাবো ঠিকই ; আপনি পিছিয়ে পড়বেন না।"

আমিও গেলাম দুটো তিনটে ট্যুরিষ্ট ব্যুরোতে। এরা প্রাইভেট্, বেসরকারী কোম্পানী। সরকারী দপ্তর চালাও "না" দিলে দুর্গম হয়ে আছে পথ। পথ-ঘাট, রাস্তা, চিহ্ন, সেতু ইত্যাদি কোনও বালাই নেই—আগাগোড়া রাস্তাই উঁচু-নীচু একাকার। যদি নরম বরফে অতর্কিতে পা পড়ে, বরফ ভেঙ্গে অতল গহ্বরে পড়ে যাওয়া সম্ভবপর।

ভয়ে বুক কাঁপলো যেন। বরফে পা দিয়েছি, তলাটা ফাঁপা, বুঝতে পারিনি। ভেঙ্গে গেলো আর ঢুকে গেলাম তাজের মতো ভাষণ নদীর মধ্যে, বা দুহাজার ফুট নীচে খড্ডে। এ কথা ভাবা যায় না। কিন্তু সে ভয়ের চিহ্ন দেখাইনি মুখে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানরা খাতির যত্ন বেশী করলো কিন্তু বারণ করলো। পাহালগামে ফোন করেছি। তারা যদি বিপদ মুক্তির সংবাদ দেয় তখনই আমরা সাহস করবো নৈলে নয়।

কোথাও সুসংবাদ নেই। তবু মন বলছে অমরনাথ যাবো। মন বলছে এসব বাধা তুচ্ছ। এতদূর এসে অমরনাথ যাবো না, এ সম্ভব নয়।

কিন্তু কে এই অমরনাথ ! কেন এতো প্রতাপ, কতো প্রাচীন এর প্রতিষ্ঠা ? নীলপুরাণে অমরনাথের চেয়ে সোদরতীর্থের বেশী প্রতিষ্ঠা। মহাভারতের বনপর্বে মার্কণ্ডেয় যেখানে যুধিষ্ঠিরকে তাবৎ তীর্থের কাহিনী শোনাচ্ছেন অমরনাথের উল্লেখ নেই। কোথাও কোনও পুরাণে এ তীর্থের নাম শুনেছি মনে পড়ে না। শোনা যায় হিন্দুদের যত তীর্থ আছে, সব চেয়ে অর্বাচীন এই অমরনাথ। এর আবিষ্কার অন্ততঃ কাশ্মীরে মুসলমান আসার পর। রাজতরঙ্গিনীতেও এর কোনও প্রশস্তি নেই। মার্তণ্ড-স্বামীর আছে, পরিহাসকেশবের, মহাবরাহের, মুক্তাকেশবের প্রশস্তি আছে—কিন্তু অমরনাথের নেই। কে তবে অমরনাথ আবিষ্কার করেছে।

করেছে কাশ্মীরী মুসলমান মেষপালক, গুজর বলি আমরা। তাই রাকী পূর্ণিমা অর্থাৎ ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায় রাজা নিজে এর পথ খুলে দেন যাত্রীদের পুরোভাগে থেকে। তখন হিন্দুদের সঙ্গে বহুগুজরও যায় অমরনাথ দর্শনে। যতো হিন্দু তীর্থ দেখেছি এক অমরনাথের গুহায় দেখেছি হিন্দু-মুসলমান সমবেতভাবে শঙ্করের পায়ে প্রণতি নিবেদন করছে।

কাজেই সোনামার্গ থেকে ফিরে অবধি আমাদের কথা—অমরনাথ আর অমরনাথ। পনের তারিখটা বেশ বিশ্রাম নিলাম—মনের মতো নেয়ে খেয়ে গড়িয়ে।

কেবল দুপুর বেলায় অফিস-বোটে একটা কনফারেন্সে যেতে হোলো। লালসিং বললে "সত্যি বলছো লার্ড—? চর্বি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ সত্যি। খোঁজ নিয়েছি। সরকারী নিয়ম কাশ্মীরে বনস্পতি জাত ঘি আসতে পারেনা। এদেশের ঘাসে মেষ ও ছাগের দেহে চর্বি তোমার বা পতিরামের চেয়ে ঢের বেশী জমে। এবং বিধাতা মেষ ও ছাগকে পরোপকারার্থ সৃষ্টি করেছিলেন। ওরা তাই চর্বি দান করে কাশ্মীরে। এই চর্বি মীরাকদলের বাজারে টিন টিন বিক্রী হচ্ছে।

ভগবানদাসজী আর্য্যসমাজী। কয়েকজনই ঐ দলের। "হায়—হায় —তোবা—তোবা—" ডাক ছাড়লেন।

চোখ মট্‌কে বলি,—"ভগবানদাসজী, চর্বি জিনিষ, যা তা নয়, হজম করে যান্। নৈলে বিপদ।"

পতিরাম সাচ্চা জাঠ্। ওদের গাঁয়ে একবার মাংস কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম, রাঁধতে দেয়নি, বলেছিলো "কেউ যদি জান্তে পারে পুঁতে ফেলবে।"

আজ এসব কথা শুনে ওর তো চোখ কান লাল—"চর্বি খেলাম শেষ অবধি? চর্বি?"

"তা-ও স্বজাতির?" বললাম আমি!

দুই হাতে এমন জাপটে ধরে চাপ মারতে লাগলো যে লোহার হলে ভেঙে যেতাম। নেহাৎ সরকারী চাপ সহ্য করা দেহ, তাই বেসরকারী চাপে টস্‌কালো না।

"চেপে যা, হজম কর।"

চটে বল্লে—"কেন? বাঙ্গালী কাঙ্গালী?"

আমি বল্লাম—"সিপাহী বিদ্রোহের মুখ্য কারণ এই চর্বি, মনে আছে? দিল্লী থেকে তাবৎ জৈন আর বৌদ্ধ খেঁটিয়ে এনেছো। যতো লালার দল সকলেরই তো মামুষখেকো রোজগার, কেননা পাঁঠায় অরুচি! ওরা যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পায় যে ওদের কাছ থেকে ঘিয়ের দাম নিয়ে চর্বি খাইয়েছে!—আর ঐ ভয়ে ওরা বাড়ীতে মোষ রেখে ঘী খায়। যার যতো বড় ঘিয়ের কারবার তার বাড়ী ততো মোষ। ওরা জানে বাজারে টিনের ঘি আর বাড়ীতে বাঁটের ঘি। ওরা টের পেলে খেয়ে ফেলবে তোমাদের।"

পতিরাম বললে—"তুই জানসি কি করে চর্বি!—বোলাও কন্‌ট্রাকটর।"

কনট্রাকটর এসেই কেঁদে বললে, "হুজুর বেমালুম ঠগিয়ে দিয়েছে কাশ্মীর রাজ্যের লোক।" অর্থাৎ শ্রীমানের সদিচ্ছার বাঁশে ঘুণ বটে, কিন্তু সেই বাঁশ কাশ্মীরীরা প্রয়োগ করেছে ওরই মান ইজ্জৎ নষ্ট করার ইচ্ছায়।

পতিরাম সোজা মাতৃভাষায় ওকে বললে—"পেজোমী করো—তোমায় আমি ন্যাংটা করে পাঁকে পুঁতে রাখবো! এবার থেকে ঘি কিনে দেবো আমরা।"

ভগবানদাসজী বললেন—"তাই নয় শুধু, যখন মাল কেনা হবে আমাদের লোক সঙ্গে থাকবে। রান্নায় চব্বিশ ঘণ্টা একজন মোতায়েন থাকবে আমাদের পক্ষ থেকে। রোজকার রান্নার ফর্দ দেবে শকুন্তলা, রাঁধবে তোমাদের লোক, জিনিষ কিনবে আমাদের লোক, পরিবেশন আমাদের লোক—"

কনট্রাকটর সরাসরি রাজী। পতিরামকে ওর ভয়, সাপের মুখে ব্যাঙের ভয়ের মতো। পরিত্রাণ পেলে বাঁচে।

কাজেই সে রাত্রে ছানার দালনা, পায়েস যোগে খাওয়া হয়েছিল ভালো।

ডাকলাম পাশের বোটে—"মিসেস্ শর্মা আছেন?"

বেরিয়ে এলেন।

"কি করছিলেন, পূজা-পাঠ?"

বিমল-সলজ্জ হাস্যে মন ভরে দিয়ে বল্লেন,—"পূজা আর কি? একটু গীতা পড়ছিলাম।"

"রোজ পড়েন?"

"শোবার আগে রোজ পড়ি।"

"অনুবাদ না সংস্কৃত?"

"আমি সংস্কৃত জানি, তাই অনুবাদ পড়তে হয় না।"

"আর টীকা?"

"টীকা? গীতার টীকা? কেন? গীতা তো মা। মাকে জানতে গেলে কী টীকার দরকার হয়? নিজেই পড়ি। রোজ পড়ি কি-না। জীবনে কতোবারই তো পড়লাম গীতা। কী মজা জানেন! যত পড়ি ততই যেন নতুন রূপ; ফুরিয়েও ফুরাতে চায় না। যেন আকাশের মতো কোল, মাটীর মতো আকর্ষণ। অদ্ভুত!"

"কলেজে থাকতে হষ্টেলে শোবার আগে আমি বাইবেল পড়তাম। ঠিক এমনটাই মনে হোতো। বাইবেল যেন কানে কানে কথা কয়, হৃদয়ে হৃদয় রেখে। গীতা যেন আঘাত করে চৈতন্যলোকে। বাইবেল যেন ভালবাসা। গীতা যেন মন্ত্র।"

"ধর্মগ্রন্থ যা পড়া যাক্ তার ভেতরেই এই উদারতাটুকুনি আছে।"

"ধর্মের রূপই যে তাই। মনকে আধার করে শান্তির সুধা ভরে দেয়। ধর্মে বৈরাগ্য আনেনা, অবৈরাগ্যও আনে না, কেবল সোজা পথটা বাৎলে দেয়। জীবনকে যেন প্রবাহের পতাকা ধারায় ভাসিয়ে রাখে। সমুদ্রে মিশে যাবার পথই সুগম করে না, সমন্বয়েও পথ বাৎলে আনে। আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাই।"

"আরও পাবেন আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করলে। উনিই আমার ।। গীতা তাঁরই বাক্য যেন।"

কথা অন্য পথে চললো। এ আমার চেনা পথ নয়। কাজেই ন্তর পাড়লাম।—"অমরনাথ যাওয়া হবে?"

বুঝতে পারলেন যে স্বামীর কথার উল্লেখে অন্য কথায় এসে পড়েছি। লেন—"মাপ করবেন। বড্ড ব্যক্তিগত কথায় এসে পড়ছিলাম।" লই খিল খিল করে হাসতে লাগলেন।

হাসছিল চাঁদের আলো। আর খালের ওপারের পপ্‌লারগুলো দছিলো বাতাসে।

একটা কাঠ বোঝাই নৌকা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল না কেউ। প্রকাণ্ড ঝাই নৌকা একা একা ভেসে চলেছে। আশে পাশের শিকারা বা টো নৌকার ঘাড়ে পড়লে তো ধ্বংস অনিবার্য্য; তা ছাড়া যদি আড়া-ড়ি ভাবে কাঠের পুলটার গায়ে ধাক্কা খায় পুলটাই হয়তো হুড়মুড় রে ভেঙ্গে পড়বে। চিনার বাগের মাঝিদের মধ্যে তাই হল্লা উঠেছে। রা কজনায় মিলে নৌকাটাকে বেঁধে রাখার উদ্যমে নিযুক্ত হোলো।

মিসেস শর্মাই কথান্তরের সাহায্য করলেন। বললেন, "কাল কোথায়, লার?"

"উলার নয়, ক্ষীরভবানী। সেই কথা ভেবে ভেবেই আনন্দে মশগুল। াচীন এই ভূক্ষীরবাটীকা মন্দির। এখানে গিয়ে সপ্তশতী আবৃত্তি—াবছি আর রোমাঞ্চ হচ্ছে।"

(২৩)

উলারের পথ

বাঙ্গালীর কাছে ললিতাদিত্যের নাম অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। র্ণসুবর্ণের বিখ্যাত রাজা শশাঙ্ককে নিয়ে বড় কিম্বদন্তী ও াখ্যায়িকাকে আশ্রয় করে বাঙ্গালী মন শশাঙ্ক-কাহিনীতে 'উদয়ন থা'র রোমন্থ বিলাস করে থাকে। রাজ্যবর্দ্ধনকে শশাঙ্ক হত্যা প্রকৃতই রেছিলেন কিনা, মালবের যশোবর্মণদেবের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী প্রকৃতই াত্বিক পর্য্যায়ের ছিল কিনা, ললিতাদিত্যের রাজ্যে শশাঙ্ক হানা দিয়ে-ছলেন কিনা—এর নিঃসংশয়িত সমাধান এখনও হয়নি; তবু ভাবতে বেশ াগে বাংলার শশাঙ্ক কাশ্মীর রাজ্যে হানা দিয়েছিলেন। হয়তো কলহন ৎকালীন লেখকদের সঙ্গে একজোটে ললিতাদিত্য প্রশস্তি গাইতে গাইতে বাধ করলেন যে বাংলার শশাঙ্ককে এনে কাশ্মীরে মাথা মোড়াতে হবে। াই তাঁর গ্রন্থে দুচার পংক্তি গৌড়ীর সেনাদের ও শশাঙ্কের নামেও ঝেড়ে দলেন। হয়তো বা সত্যই কিছু হয়েছিল। দ্বিতীয় লৌহস্তম্ভের রাজা চন্দ্রের ্যাতির মতো ললিতাদিত্য-শশাঙ্ক কাহিনীর ওপরও শত শত বর্ষের বস্মৃতির ধূলি নানা স্তর রচনা করে গেছে। প্রশস্তি গাইতে গিয়ে কলহন রেন নি কি! কাশ্মীরের রাজা পদ্মরাজকে দিয়ে কপটেশ্বর তীর্থের পবিত্র জল কাঁচের বোতল ভরিয়ে মালবের ভোজরাজকে নিত্য পাঠিয়েছেন।

কিন্তু ললিতাদিত্য কাশ্মীরের যে সে রাজা ছিলেন না। তাঁর প্রতাপ অখণ্ড ও অব্যাহত ছিল। এমন সব রাজাদের একটা নেশা থাকে নিজের নামে রাজধানী স্থাপন। এ নেশা ললিতাদিত্যের ছিল। এ নেশা কোন রাজার ছিল না? আলেকজান্দ্রিয়া, কনষ্টান্টিনোপল্, অকবরাবাদ—সবই তো এই নেশার ফল। আসল শ্রীনগরী খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক নির্মাণ করেন। তখন তার নাম হোলো অধিষ্ঠান। এটাই তখন সমৃদ্ধ রাজধানী। বর্ত্তমান তক্ত-ই-সুলেমান থেকে পান্দ্রেথান পর্য্যন্ত হেঁটে গেলে তিন মাইল ব্যাপী ভগ্নস্তূপ চোখে পড়ে। তার মধ্যে কেবল যে হিন্দু কীর্ত্তি আছে তা নয়, নানা বৌদ্ধ কীর্ত্তির মধ্যে একটা বিরাট স্তূপের ধ্বংসাবশেষও চোখে পড়ে। ৬৩১ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন কাশ্মীর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে ছোট্ট একটা নাটক হয়ে গেল রাজ পরিবারে। তখন রাজা দুর্লভ, কর্কোটক বংশজাত বৈষ্ণব। অথচ রাণী বৌদ্ধ। অধিষ্ঠানপুরের বিরাট বৌদ্ধ স্তূপ। রাজা হিন্দু, কাজেই স্তূপে বাতি জ্বলে না। সেই বেদনা স্তূপীকৃত হয় বুদ্ধের সেবিকা রাণীর মনে। সসম্মানে যেখানে তাঁর প্রাণের দেবতাকে তিনি রাখতে পারবেন না, সেখানে তাঁর না থাকাই ভালো। সেই স্তূপের বক্ষ কন্দরে নিহিত অমিতাভ গৌতমের শুভ্র দন্তরাজীর একটি। রাণীর আহারে নিদ্রায় কেবল ঐ ব্যথা, স্তূপে তো প্রদীপ জ্বলে না। এমন সময়ে হর্ষবর্দ্ধনের আক্রমণ এবং অধিষ্ঠান অধিকার। থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ। তিনি এসেছেন কাশ্মীর জয়ে। রাণীর মনে হোলো এ বুদ্ধের আশীর্ব্বাদ। আক্রমণ নয়। কাশ্মীরও রক্ষা পাবে, স্তূপের ভিতরের পরম বস্তুটীরও আদর হবে। বুদ্ধি করে হর্ষের কানে রাণী এ সংবাদ পাঠালেন গোপনে। কাশ্মীর ত্যাগ করলে তিনি দেবেন তথাগতের দেহাস্থি। থামলেন হর্ষ। কি হবে কাশ্মীর নিয়ে, কি হবে ধ্বংস করে জনপদ? "যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে না মানো মণি"—হর্ষবর্দ্ধন দুর্লভের কাছে চাইলেন স্তূপের ভেতরের সেই মণিখণ্ড—ভগবান বুদ্ধের দাঁত। রাজা দুর্লভের কাছে তার কি মূল্য? সানন্দে তিনি মূর্খ বিজয়ীকে এই সামান্য নগণ্য বস্তু দিলেন। মাথায় করে তিনি নিয়ে গেলেন সে সম্পদ্ যা সারা কাশ্মীরের চেয়েও হর্ষবর্দ্ধনের কাছে মূল্যবান। আর রাণী? তিনি জানলেন কাশ্মীর যে মহাবস্তুর পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারেনি সেই পুণ্যস্মৃতিকে তিনি হয়তো স্বেচ্ছায় রাজ্য থেকে বিদায় দিলেন, কিন্তু তার এই ত্যাগের ফলে রক্ষা পেলো কাশ্মীর, সম্মান পেলো বুদ্ধস্মৃতি। প্রতিদিনের অপমান থেকে অব্যাহতি দিলেন জননী সন্তানকে যোগ্যতর সমৃদ্ধতর সংসারে বিদায় দিয়ে।

এই অধিষ্ঠান ত্যাগ করে আসতে হয়েছিল কাশ্মীরের নগরীকে। রাজা প্রবর সেন বর্ত্তমান শ্রীনগরীতে আসেন প্রথম। এর নামও তখন অধিষ্ঠান। কাজেই অশোকের সেই অধিষ্ঠানের নাম হোলো প্রাচীনা-ধিষ্ঠান, যার অপভ্রংশ আজ পান্দ্রেথান। পান্দ্রেথানে একটী সম্পূর্ণ মন্দিরের অবশেষ আজও পাওয়া যায়। ১৭ ফুট চতুষ্কোণ এই মন্দিরের ভাস্কর্য্য দেখতে বহু জনসমাগম হয়। এটি ৯১৫ খৃষ্টাব্দে মেরু নামক এক মন্ত্রীর প্রতিষ্ঠিত মেরুবর্দ্ধন স্বামীর মন্দির।

প্রাচীনাধিষ্ঠান—পন্দ্রেথানই এককালে ছিল অধিষ্ঠান। পরে আবার অন্য অধিষ্ঠান হবার পর অর্থাৎ নতুন দিল্লী হবার পর অপরটার নাম হোলো পুরানো দিল্লী। এই নতুন অধিষ্ঠানের নাম হোলো প্রবরসেনপুর, ষষ্ঠশতকের প্রথম দিকে প্রবরসেন এই নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে রাজা অভিমন্যু প্রাচীন অধিষ্ঠানকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করেন।

আসল কথা শ্রীনগর শ্রীনগরই রইল। রাজারা যে যখন পারছেন, এধার ওধার নিয়ে নিজের নিজের নাম করছেন। পরে ইতিহাস তাকে শ্রীনগর বলেই ধরে রাখলো। এখনকার শ্রীনগর এই প্রবরসেনেরই শ্রীনগর বলতে পারা যায়। হুয়েনসাং বা কলহনও যে শ্রীনগরের বিবরণ দিয়েছেন, এই শ্রীনগরের সঙ্গেই মেলে। ফিরোজাবাদ, তগলকাবাদ, শাহজহানাবাদ সবই মহাকালের যজ্ঞশালায় ভস্ম হয়ে মিলিয়ে যায়, কিন্তু দিল্লী দিল্লীই থাকে। এও সেই বৃত্তান্ত আর কি!

উলারের পথে শ্রীনগরের এই চৌহদ্দী পার হবার পর এক জায়গায় বড় সেতু পেলাম। ঝিলামের অন্যপারে এসে গেলাম। নামছি ঝিলামের প্রবাহ পথে। সেতুটার তলায় বড় বড় বজরায় নদীর জল সেঁচে বালি বার করা হচ্ছে। আর সংগ্রহ করা হচ্ছে নুড়ি। এই নিয়ে ওরা সহর যাবে। কাশ্মীরের সমভূমিতে না গেলে বোঝা যায় না, নুড়ি আর বালি এখানে কতো মহার্ঘ। তাই নানা উপায়ে সংগ্রহ করে এসব জিনিষ নিয়ে যাওয়া হয় শ্রীনগরের বাজারে। এখনও কোনও সুরম্য দৃশ্যতো চোখ পড়ছে না। বেড়ানো সুন্দর, নতুন দেশ সুন্দর, আর সাধারণ ভাবে কাশ্মীরও সুন্দর। কিন্তু এদেশে চোখ পুড়িয়ে এলাম ওয়াজাথ নালা আর সোনামার্গে, এখন এসব ভাল লাগছে না।

ভাল লাগছে না পপলারের নৃত্য, ঝর্ণাধারার সঙ্গে ছুটে-চলা বুলবুল আর ময়নার সার। ভাল লাগছে না গ্রামের পারে কুঁড়ের ধারের ঐ উলঙ্গ শিশুটার বিমল হাসি। কেবল মনে পড়ে সোনীমার্গের পথ। যেদিকে চাই দিগন্তকে ধরে আছে একধারে পশ্লোলী, অন্যধারে হরমুখ পর্বতের হিমানীমণ্ডিত চূড়া। শাদার ওপর নীল। আছে কাছে সবুজের প্রলেপ। দিগন্ত ছোঁয়া মাঠ। সবই ধানের ক্ষেতে ভরা। অদ্ভুত বাতাস। শালিখ আর ঘুঘুর যেন কাতার লেগেছে। কতো হাঁস ধানের ক্ষেতের ধারে ধারে নালার জলে গা ছেড়ে ভেসে চলেছে। যেন এক স্বপ্নরাজ্য।

ক্রমশঃ

বসন্তে

সনৎকুমার মিত্র

শঙ্কার কুয়াশা আর বেদনার শিশিরাশ্রু তার
অবশেষে অপগত। ছড়িয়েছে তাই লজ্জার
লাল ছোঁয়া কপোলের, চিবুকের এখানে ওখানে
হাজার গোপন কথা ঝরে তাই কোকিলের গানে।

কাঁচুলির লাল রঙে, সবুজ শাড়ীর মায়াজালে
সাজিয়েছে অবয়ব, বায়ুর সমুদ্রে তাই ঢালে
ভাঙিয়ে ফুলের ঘুম—পরাগের রেণুর সুবাস;
মৌ-ভোমরার গানে ব্যক্ত করে গুনগুন্ আশ।
তারার প্রদীপ জ্বেলে, সারারাত প্রসাধন শেষে
পাখীদের কলগানে ঘুম চোখে ডাকে হেসে হেসে;
এমন হাজার খেলা—অন্যমুখ স্মরণ দর্পণে
একদা গিয়েছে রেখে, সেই কথা ভাবি অন্যমনে।
এমন বসন্ত দিনে, তাই আমি ভ্রমরের মত
পারিনাক' চুমু খেতে পুষ্পমুখে যত্ন করে অত;
সোনাজলে স্নান করি খুলে সেই অতীতের স্মৃতি,
হাসি-গান ভুলে আজ ফুলে দেখি ছলনার ভীতি।

দীপংকর

শান্তশীল দাশ

সে আসে প্রদীপ হাতে, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালায়:
তবু দ্বার খোলা নাহি পায়।
আঁধারের প্রাণী যত ভালবাসে গভীর আঁধার;
দূর হতে তাকে দেখে আঁধারে লুকায় মুখ
খোলেনাক' দ্বার।
সে আসে দ্বারের কাছে, খানিক দাঁড়ায়;
কারো দেখা পায় নাক', এদিক ওদিক শুধু চায়,
তারপর ফিরে চলে যায়।

আবার সে পথ চলে সোনার প্রদীপখানি নিয়ে,
এ দ্বার ও দ্বার ঘোরে—খোলা দ্বার দিয়ে
ঢোকে সে আঁধার ঘরে; ঘোচায় সেখানে যত কালো,
সোনার প্রদীপ ধরে জ্বেলে দেয় আলো।
চারিদিক আলো ঝলমল:
খুশি মন চেয়ে দেখে আলোর ফসল।

আবার সে ফিরে আসে নীরবে প্রদীপখানি ধরে,
পথ চলে···দূরে যায় সরে।

অমৃত পুরাণ কথা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়



তুলসী-শঙ্খ-লীলা

আকাশে বাতাসে জলে স্থলে এক অপূর্ব বৈচিত্র্য। বন-মর্মরে, পক্ষী কূজনে, পার্বত্য জলপ্রপাতে যেন নতুন সুরালাপ। বদরীকাননে বসন্তের আবির্ভাব ঘোষিত হ'ল। সঞ্চারিত হ'ল দিকে দিকে নবীন প্রাণের হিল্লোল। নব পল্লবিত পুষ্পিত কাননের সেই বসন্ত-সমারোহে মধু-লোভী অলিকুল সানন্দ-গুঞ্জন তুললো। পক্ষীকুল আকুল আনন্দে বনানী মুখরিত ক'রে তুললো। তপোবনবাসিনী রাজা ধর্মধ্বজনন্দিনী তুলসী রোমাঞ্চিতা হলেন। তাঁর শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ শিহরণ প্রবাহিত হ'তে লাগলো যেন। তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠলো আতপ্ত শোণিতধারা। তিনি চমকিত হলেন। পুলকিত হলেন। মুগ্ধ হলেন। আবেশ বিহ্বল নেত্রে অবলোকন করলেন তাঁর সমীপাগত সুবেশ সুন্দর এক আগন্তুকের প্রতি।

কিন্তু একি! আজন্ম তপশ্চারিণী তুলসীর এ চিত্তবিকার কেন? কে এই কন্দর্প সদৃশ মনোহর যুবা? পারিজাত পুষ্পের মাল্য এঁর কণ্ঠে দোলায়িত। কস্তুরী কুমকুম্ আর সুগন্ধী চন্দনচর্চিত কলেবর—ইনি কে? কে ইনি?

ক্ষণমাত্র আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তুলসী সলজ্জে আপন বসনাঞ্চলে মুখাচ্ছাদন করলেন। অনুভব করতে লাগলেন—আগন্তুকের বিহ্বল দৃষ্টি লেহন করছে তাঁর যৌবন নিপীড়িত দেহসম্ভার। তিনি সংকুচিত হ'য়ে পড়লেন।

অকস্মাৎ প্রশ্ন উচ্চারিত হ'ল আগন্তুকের কণ্ঠে: সুন্দরী, তুমি কে? কার কন্যা? একাকিনী এই বিজন বিপিনে কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অবস্থান করছ?

তুলসীর অন্তর সঘনে নৃত্য ক'রে উঠলো, কিন্তু কণ্ঠে বাণী নিঃসারিত হ'ল না। তিনি পূর্ববৎ অধোবদনে নিরুত্তর রইলেন। তাঁর পঞ্জরপ্রাকারভেদ ক'রে হৃদয়ের ঘন ঘন উত্থানপতন ধ্বনি শ্রুত হ'তে লাগলো।

আগন্তুক পুনর্বার জিজ্ঞাসা করলেন: শোভাশালিনী, তুমি কথা কও। আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান ক'রে আমাকে ধন্য কর। তুমি কে এবং কেন এই ক্লেশকর অরণ্যবাস দুঃখ ভোগ করছ?

মানস চাঞ্চল্য সংযত ক'রে ধীর শান্ত স্বরে তুলসী বললেন: আমি ধর্মধ্বজরাজ-তনয়া তুলসী। এই বদরীর তপোবনে তপস্যার জন্য অবস্থান করছি। কিন্তু আপনি কে? এস্থানে আপনার আগমনের হেতু কি? মহাশয় আপনি নিশ্চয়ই শ্রুতির নির্দেশ অবগত আছেন যে, নির্জন স্থানে কোনো কুলকামিনীকে একাকিনী দেখলে তার সহিত বাক্যালাপ করা অন্যায়? যে ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্রে অজ্ঞ, অসচ্চরিত্র [illegible]কুল-সম্ভূত সে নরাধম। শ্রুতির প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নাই। শ্রুতির অর্থও তার বোধগম্য হয় না। আপনি জ্ঞানী এবং ধার্মিক অনুমিত হয়; সুতরাং এস্থান পরিত্যাগ করাই আপনার কর্তব্য। আমার তপস্যার বিঘ্নসাধন করা আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির পক্ষে অনুচিত। আশা করি সে-উদ্দেশ্যও আপনার নয়।

আগন্তুক মধুরহাস্য সহকারে প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন: কল্যাণী! আমিও তপস্বী। আমার নাম শঙ্খচূড়। দীর্ঘ তপস্যান্তে আমি সিদ্ধি লাভ করেছি এবং স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করছি। পথিমধ্যে তোমার দর্শন আমার গতি স্তম্ভিত করেছে।

আর বার তুলসী তাঁর পল্লব-ভারানত মদিরাক্ষী প্রসারিত করলেন শঙ্খচূড়ের প্রতি। আর তার দৃষ্টি আনত করলেন।

শঙ্খচূড় বললেন: দেবী, তোমার স্রকচন্দনশোভিত মধুর সুন্দর সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণযন্ত্রে বাণীর বীণালাপের ন্যায় সুমোহন ঝংকার তুলেছে। তোমার যৌবন-মণ্ডিত দেহ-লাবণ্য আমার তপস্যার্জিত চিত্ত-সংযম যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। মনে হয় যেন তুমি আমার গত-জন্মের বহু আকাঙ্ক্ষিতা প্রিয়া। স্মৃতির প্রগাঢ় অন্ধকার-আবরণ ভেদ ক'রে যেন অতীতের অতিক্ষীণ আলোককণা মানস নেত্রে অবলোকন করছি।

আজন্ম পুরুষসংসর্গবর্জিত তপস্বিনী তুলসী বিচলিত হলেন। তিনি কম্পিত কলেবরে বারংবার অধর দংশন করতে লাগলেন এবং দক্ষিণ করাঙ্গুলিতে অঞ্চলপ্রান্ত জড়িত করতে লাগলেন। তাঁর আনন কখনো আরক্তিম, কখনো পাণ্ডুর হ'তে লাগলো। সহসা ব্যাকুল-কণ্ঠে তিনি শঙ্খচূড়ের বাক্যে বাধা প্রদান করলেন।

—আপনি স্থির হোন। আপনি তপস্বী, আমার ন্যায় একটি কানন-বাসিনী তপোনিরতা কুমারীর প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ আপনার শোভা পায় না। আপনি স্বস্থানে গমন করুন। আপনার তপস্যার্জিত মঙ্গল-সিদ্ধি ক্ষণিক তৃপ্তির মোহে অহেতুক বিনষ্ট করবেন না। যোগীরাজ শঙ্খচূড়, কোনো কামিনীর সুষুপ্ত কামনার দ্বারে আঘাত হানা কোনো তপস্বীর কর্তব্য নয়। আমি যুক্তকরে মিনতি করছি—আপনি প্রস্থান করুন।

শঙ্খচূড় ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন। ক্ষণকাল যেন কি চিন্তা করে পূর্ববৎ প্রশান্তস্বরে বললেন: হে বিদ্যাবতী, তুমি নিশ্চয় জ্ঞাত আছ যে, কোনো বীরের পক্ষে তার আকাঙ্ক্ষিত নারীকে পরিত্যাগ করে প্রস্থান করা বীরধর্মের যোগ্য আচরণ নয়? আমি দনুবংশোদ্ভব দেব-বিজয়ী শঙ্খচূড়। আমার অনুমান হয়, নিয়তির বিধানক্রমেই এই গহন বিপিনে

তোমার আমার সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়েছে। অতএব, ধর্মধ্বজনন্দিনী, আমি তোমার পাণি প্রার্থনা করছি। আমার বাসনা পূর্ণ কর।

শঙ্খচূড় তুলসীর একান্ত নিকটবর্তী হ'য়ে দাঁড়ালেন। উভয়ের কণ্ঠ-বিলম্বিত পুষ্পমাল্যের ও চন্দন বিলোপিত তনু-গন্ধ উভয়ে আঘ্রাণ করতে লাগলেন। তারপর অকস্মাৎ শঙ্খচূড় সলাজ-নম্র তুলসীর কম্পিত পাণি স্পর্শ করলেন।

—আমার প্রতি প্রসন্ন হও তুলসী!

তড়িৎতাড়িতবৎ শিহরিত হলেন তুলসী। আচম্বিত পুরুষস্পর্শে রোমাঞ্চিত কণ্টকিত হয়ে উঠলো তাঁর সর্ব শরীর। দৃষ্টির সম্মুখে ম্লান হ'য়ে এলো পৃথিবীর আলোক সজ্জা।

ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে আবির্ভূত হলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী পিতামহ প্রজাপতি।

—বৎস শঙ্খচূড়! কন্যা তুলসী? আমার আশীর্বাদ গ্রহণ করো।

উভয়েরই উপাস্য দেবতা পিতামহ ব্রহ্মা। তাঁকে সম্মুখে সমাগত দেখে উভয়েই চকিত হ'য়ে উঠলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন।

ব্রহ্মা বললেন: তোমরা আমার পরম ভক্ত। আমার ইচ্ছা তোমরা পরস্পর গান্ধর্ব-বিবাহক্রমে মিলিত হও।

পিতামহের পদতলে উপবিষ্টা ব্রীড়ানত তুলসী এতক্ষণে নিজেকে সংযত ক'রে শান্ত মৃদুস্বরে বললেন: প্রভু, নারায়ণ ভিন্ন অন্য পতি আমার কাম্য নয়। আজন্ম তপস্যায় আমি শুধু এই কামনাই আপনার চরণে নিবেদন করেছি।

স্নেহ-নিস্যন্দিত ভাবে প্রজাপতি চতুরানন বললেন: বৎসে তুলসী! তোমার দুশ্চর তপস্যায় আমি পরম প্রীত হয়েছি। তোমার কামনা অপূর্ণ থাকবে না, যথাকালে নারায়ণকে তুমি লাভ করবে। কিন্তু তার বিলম্ব আছে।

—বিলম্ব আছে?

—হ্যাঁ।

—কতো বিলম্ব প্রভু?

—অনেক।

—অনেক? কিন্তু অন্য কোনো পুরুষকে আমি তো স্বামীত্বে বরণ করতে পারি না প্রভু। আমার স্বামী নারায়ণ। এই দেহ এই মন আমি নারায়ণে সমর্পণ করেছি। যদ্যপি কাম্য পতিলাভে আমার বিলম্ব থাকে, তাহলে পুনর্বার আমি তপস্যারম্ভ করবো।

—তুলসী, জন্মান্তরে তুমি নারায়ণকে পতিরূপে পাবে। তোমার আর ক্লেশকর তপস্যার কোনো প্রয়োজন নেই। এ জন্মে তুমি শঙ্খচূড়কে পতিত্বে বরণ করো। সতী, তুমি জানো না তুমি কে, জানো না তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজা শঙ্খচূড়ের পরিচয়। তোমরা উভয়েই শাপভ্রষ্ট। দেবী লক্ষ্মীর অংশে তোমার জন্ম, নারায়ণের অংশে শঙ্খচূড় জন্মগ্রহণ করেছেন। তোমরা উভয়ে উভয়ের জন্য জন্মেছ এবং জীবনধারণ করছো। কারণ ব্যতীত কার্য হয় না। তোমাদের উভয়ের মিলনের মধ্যেও সৃষ্টির কোনো কারণ নিহিত আছে। সুতরাং গান্ধর্ব-বিবাহ-ক্রমে তুমি রাজা শঙ্খচূড়ের সহিত মিলিত হও। আশীর্বাদ করছি, তোমার সতীত্বের তেজ-প্রভাবে শঙ্খচূড় ত্রিভুবনে অজেয় হবে। তোমাদের কল্যাণ হোক।

প্রজাপতি ব্রহ্মা অন্তর্হিত হলেন।

বহুক্ষণ অতিবাহিত হ'ল।

অবনত-আননা তুলসী তেমনি বসে আছেন। বসে আছেন নির্বাক নিশ্চল। অন্তর সমুদ্র মন্থন করছেন তিনি যেন কোন্ অমৃতের সন্ধানে। যেন জন্ম-জন্মান্তরের অভীপ্সা উদ্বেল হ'য়ে তাঁর মনের দুই কূলে আছাড় খেয়ে পড়ছে। কর্ণকুহরে কুহরিত হ'চ্ছে দেব-প্রজাপতির বাণী:

—জন্মান্তরে তুমি নারায়ণকে পতিরূপে পাবে।...শঙ্খচূড়কে পতিত্বে বরণ কর।

কিন্তু দেব-প্রজাপতি তো বলে গেলেন না—কতোদিন এ দেহ ধারণ করতে হবে তাঁকে। কতোদিন? আরো কতোদিন?

ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে নক্ষত্রগতিতে ছুটে চলেছে তাঁর মন প্রশ্নের সন্ধান নিয়ে।—নারায়ণ কতোদিনে প্রসন্ন হবেন তাঁর প্রতি? এ জন্মের তপস্যা কি তবে ব্যর্থ হ'ল তাঁর?

—দেবী তুলসী!

আহ্বান করলেন সম্মুখে দণ্ডায়মান রাজা শঙ্খচূড়।

তুলসী নিরুত্তর। রাজার সে আহ্বান তিনি শুনতে পেলেন না। তিনি আপন চিন্তার রাজ্যে ধ্যান-সমাহিত। তাঁর সম্মুখে দৃষ্টি নাই, পার্শ্বে দৃষ্টি নাই, অধে ঊর্দ্ধে কোনোদিকে দৃষ্টি নাই। তিনি শূন্য দৃষ্টি মুক্ত আঁখি বসে আছেন মৃন্ময়ী প্রতিমার মতো। গণ্ডের চন্দনশোভা অশ্রুবিধৌত। কণ্ঠের বনমল্লিকার মাল্য ছিন্নপ্রায়। দেহোত্তরী অসংবৃত। এলায়িত কেশদাম দারা অঙ্গে পরিক্ষিপ্ত। মাঝে মাঝে বসন্ত বায়ুর চপল-চাঞ্চল্যে আন্দোলিত হ'য়ে উঠছে চূর্ণকুন্তলরাশি।

রাজা শঙ্খচূড় অপলক নেত্রে চেয়ে আছেন সেই অপূর্ব অবর্ণনীয় রূপ জ্যোতির প্রতি। কি মোহময় সৌন্দর্য। কি তেজোদীপ্ত উদ্ধত যৌবন কি কমনীয় কান্তি!

বহুক্ষণ অতিবাহিত হ'ল। উভয়েই আপনাপন চিন্তায় তন্ময়। শঙ্খচূড়ের মোহমুগ্ধ অচঞ্চল স্থির নেত্র তুলসীর প্রতি দৃঢ়নিবদ্ধ। আর তুলসী, তাঁর আপন তপস্যার ব্যর্থতা কল্পনায় বেদনায় সমুদ্র রচনা ক'রে অবগাহন রত।

আবার আহ্বান করলেন শঙ্খচূড় প্রশান্ত মধুর স্বরে।

—তুলসী!

চিন্তা-বিভোরা তুলসী সাড়া দিলেন না।

—তুলসী!

আস্তে আস্তে শঙ্খচূড় উপবেশন করলেন তাঁর পার্শ্বে। আস্তে আস্তে হস্তার্পণ করলেন তাঁর স্কন্ধদেশে। প্রীতি বিগলিত স্বরে বললেন: দেবী মৌন থেকো না। তোমার সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। তুমি নারায়ণ লাভ করেছ। নারায়ণ তোমার অন্তরে বাহিরে প্রকাশমান।

—নারায়ণ !

তুলসী চমকিত হলেন।

—কই কোথায় ?

—তোমার সম্মুখে, তোমার পশ্চাতে, তোমার পার্শ্বে। দেবী, তুমি পরম বিদুষী। তুমি কি জানো না, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অণু পরমাণুতে পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন নারায়ণ। অ-নারায়ণ কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই কোথাও। সেই পরমব্রহ্ম নারায়ণের অভিপ্রায় অনুযায়ী তোমার আমার জন্ম সম্ভব হয়েছে। আবার একদা সেই নারায়ণের মধ্যেই আমরা লয় প্রাপ্ত হব। অতএব ধর্মধ্বজনন্দিনী, তোমার সাধনা বিফল হয়নি।

—কিন্তু

—কোনো 'কিন্তু' নেই। নারায়ণ সর্বত্র বিরাজমান। তুমি আমার মধ্যে সন্ধান করলেও তোমার নারায়ণকে পেতে পারো।

—পেতে পারি ?

তুলসী অভিভূত দৃষ্টি প্রসারিত করলেন শঙ্খচূড়ের প্রতি।

সহসা মকরকেতন তাঁর পুষ্পধনুতে জ্যা সংযোজিত করলেন। বসন্তসখা বনানী প্রকম্পিত ক'রে আনন্দবার্তা ঘোষণা করতে লাগলো। ময়ূর-পুচ্ছ বিস্তার করে পুলক নৃত্য শুরু করলো। মঞ্জুরিত হ'য়ে উঠলো মালতী কুন্দ করবী প্রভৃতির শাখায় শাখায় অগণিত পুষ্পশোভা।

ধীরে ধীরে শঙ্খচূড়ের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হ'য়ে পড়লেন দেবী তুলসী।

দুই

আর ক্ষোভ নাই। আর দ্বিধা নাই। প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্দেশ-বাণী অবনতশিরে স্বীকার ক'রে নিলেন দেবী তুলসী। নিয়তির নির্মম অনুশাসন অমান্য করার শক্তি তাঁর কোথায় !

এ জন্মে নারায়ণ নয়। এ জন্মের পতি তাঁর পরম বৈষ্ণব রাজা শঙ্খচূড়। রাজা শঙ্খচূড়ের মধ্যেই তিনি নারায়ণের অনুসন্ধানে এজন্ম অতিবাহিত করবেন। রাজাধিরাজ শঙ্খচূড়কে স্বামীত্বে বরণ করে নিলেন তিনি পরম শ্রদ্ধায়। বিগলিত প্রেমানন্দে আপন রূপ-যৌবন সমর্পণ করলেন তিনি রাজাকে। নিঃশেষে দান করলেন আপন ব্রীড়া—ধর্ম, আপন চিত্তের চিন্তা সংশয়। অন্তরের অন্তঃপুরে প্রেমের মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে ইহজীবনের পরম দেবতা, নারী-জীবনের সার্থক ভগবান স্বামীর পূজারতি করতে লাগলেন। সেখানে আর রইলো না নারায়ণের স্থান। সতীর অন্তরে বাহিরে, চিন্তার বিপুল বিস্তারে একমাত্র পুরুষ বিরাজিত রইলেন স্বামী শঙ্খচূড়।...

স্বরাজ্যে সমাবৃত্ত হলেন মহারাজাধিরাজ শঙ্খচূড় রাজ্ঞী তুলসী সমভিব্যাহারে। নব-দম্পতির আগমন বার্তা বিঘোষিত হ'ল সমগ্র রাজ্যে, সমগ্র মর্ত্যলোকে। বিঘোষিত হ'ল অধোলোকে, ঊর্ধ্বলোকে। ত্রিলোকাধিপতি মহাযোগী শঙ্খচূড় তপশ্চারিণী মহাসতী তুলসী দেবীর পাণিগ্রহণ করে আপন-রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হয়েছেন, এ আনন্দ সংবাদ দিকে দিকে পরিকীর্তিত হ'ল। দিকে দিকে উৎসব, আনন্দ, দিকে দিকে প্রীতির উচ্ছ্বাস উদ্বেল উত্তাল হয়ে উঠলো।

নগর-বহির্ভাগে সুশোভিত প্রমোদ-কাননে মধু-যামিনী উৎসব অতি-বাহিত করলেন শঙ্খচূড়-তুলসী। অতঃপর কতো ক্রীড়াময় চপল-চঞ্চল দিবা, কতো অলস মন্থর স্বপ্নিল মধ্যাহ্ন, কতো গীতিরাগমণ্ডিত সন্ধ্যা, প্রেমালাপগুঞ্জিত কতো বসন্তরাত অতিবাহিত হ'ল। উভয়ে নির্জন নিকুঞ্জে মনোবাঞ্ছিত বেশবিন্যাসে পরস্পরকে সজ্জিত করতে লাগলেন। দেবী তুলসী দয়িতের রমনীয় সর্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করে ললাটে কুমকুমাক্ত চন্দনের তিলক রচনা করে দিলেন। বহ্নিতুল্য বিশুদ্ধ পরিধেয়-বস্ত্র ও উত্তরীয় দ্বারা তাঁর অঙ্গসজ্জা সমাপন করলেন। নানা দুঃখ বিনাশন পারিজাতকুসুম-মাল্য গলদেশে বিলম্বিত ক'রে দিলেন। অমূল্য রত্ন নির্মিত অঙ্গুরীয়, ত্রিলোক দুর্লভ মনোহর মণি প্রদান করলেন পতি শঙ্খচূড়কে। অতঃপর সুবাসিত তাম্বুল দান ক'রে স্বামীর পদপ্রান্তে প্রণতা হলেন দেবী তুলসী।

আনন্দ পরিপূরিত আননে, আবেশ আপীড়িত নয়নে অবলোকন করলেন শঙ্খচূড় পদানতা প্রিয়াকে। প্রেমবিগলিত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন তাঁকে। তাঁর নবনীত-কোমল বাহুদ্বয় সস্নেহে আকর্ষণ করলেন।

তিনি ধীরে, অতি ধীরে প্রেমাবেশ-কম্পিত-কলেবরে উঠে দাঁড়ালেন স্বামীর সম্মুখে। বহুক্ষণ উভয়ে উভয়ের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইলেন। বহুক্ষণ অতিবাহিত হ'ল মৌন নীরবতায়। শুধু পরস্পরের নিশ্বাস প্রশ্বাস আর বক্ষের স্পন্দন ধ্বনি শ্রুত হ'তে লাগলো। তারপর একটি বিলম্বিত শ্বাস পরিত্যাগ করলেন শঙ্খচূড়।

—তুলসী, আমায় নানাভাবে, নানাবেশে সজ্জিত ক'রে তৃপ্ত হও তুমি ?

—হ্যাঁ, প্রভু।

—তুলসী, আমিও তোমায় সাজাতে ভালোবাসি। এসো আজ আমি তোমায় মনের মতো ক'রে সজ্জিত করি।

শঙ্খচূড় তখন দৃঢ়-আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করলেন দয়িতাকে। তাঁর বিম্বতুল্য ওষ্ঠপুটে বারংবার চুম্বন অঙ্কিত ক'রে দিলেন। তারপর তাঁর প্রসাধন সাধনে মনোনিবেশ করলেন। ত্রিলোক দুর্লভ দ্রব্য-সামগ্রী দ্বারা তাঁর সর্বঅঙ্গ সুসজ্জিত করলেন। তাঁর কবরীভার নির্মাণ করে তাতে সুবাসিত কুসুম মাল্য বিন্যাস করলেন এবং গণ্ডদেশে সুগন্ধি চন্দনের চন্দ্রলেখা অঙ্কিত করলেন।

দেবী তুলসী নীরবে স্বামীর সেই সোহাগমণ্ডিত সজ্জা রচনা উপভোগ করতে লাগলেন। পরিশেষে—

পুলকিত-মুগ্ধ-লোচনে দানব-রাজ শঙ্খচূড় চিত্তরঞ্জিনী তুলসীর আশ্চর্য রূপ-মহিমা আস্বাদন করতে লাগলেন এবং তাঁর প্রেম-বারিধির অতল গভীরে নিমজ্জিত হলেন। দেবী তুলসীও কন্দর্প সদৃশ স্বামীর রূপোদ্যানে প্রণয়-পুষ্প চয়ন করতে লাগলেন। তাঁরা বিস্মৃত হলেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিস্মৃত হলেন জগতের অন্যান্য বস্তু, বিস্মৃত হলেন আপনাপন কর্তব্য। উভয়ে উভয়ের প্রেমে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন। এমনভাবে অতিবাহিত হ'ল কতো দিবস শর্বরী। কতো সূর্য, আকাশ প্রদক্ষিণ করে অস্তাচলে অন্তর্হিত হলেন, কতো চন্দ্রের ক্ষয় হ'য়ে গেল মহাকাশের পটভূমিকায়।

(ক্রমশঃ)

মহামিলন

অন্নদামোহন বাগচী

(একাঙ্কিকা)

স্থান—কলিকাতা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেনের বাড়ী। সন্ধ্যাকাল। অধর সেনের বৈঠকখানার হলঘরে পরিপূর্ণ জনসমাবেশের মধ্যে কীর্তন হচ্ছে। আসরের একপাশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মুদিত নয়নে বসে আছেন। গায়ে গলাবন্ধ কালোকোট। কোঁচার কাপড় কোটের উপর দিয়ে কোমরে জড়ানো। দুই গালে অবিরল অশ্রুধারা। হাত দুইটি উর্দ্ধে উঠানো। বাহ্যজ্ঞানরহিত দেহটি থেকে থেকে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মত কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঠোঁট দুটি থর থর করে নড়ছে। মুখে অনিন্দ্যসুন্দর স্বর্গীয় হাসিটুকু লেগেই আছে।…সহসা একজন লোক প্রবেশ করে অধর সেনের কানে কানে কী যেন বললেন। শুনামাত্র অধর সেন উঠে ক্ষিপ্রপদে বাহিরে চলে গেলেন—এবং ক্ষণপরেই ফিরে এলেন। সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবু পায়ের জুতাজোড়া অতি সন্তর্পণে ফিতে খুলে চৌকাঠের বাহিরে রেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরিধানে ধুতি ও কামিজ। কাঁধের উপর মটকার একখানা চাদর। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ সহসা চীৎকার করে উঠলেন

রামকৃষ্ণ। এসেছে? ও এসেছে? মা!…মা!

পরক্ষণেই গভীর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হয়ে ঢলে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে কীর্তন থেমে গেল। কয়েকজন ভক্ত তাড়াতাড়ি পাখা হাতে মাথায় বাতাস করতে লাগলেন

অধর। (জনতার দিকে চেয়ে করজোড়ে) আপনারা দয়া করে ভিড় ছেড়ে দিন। আজ আর কীর্তন হবে না।…

বঙ্কিম। (বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে) হোয়টস্ দি ম্যাটার… সেন?

অধর। (মৃদুকণ্ঠে) চুপ! (তাড়াতাড়ি রামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চকণ্ঠে) হরি ওম্! হরি ওম্! হরি ওম্।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে উঠে বসলেন রামকৃষ্ণ। তারপর ব্যাকুল-নয়নে ইতস্তত: চাইতে লাগলেন

রামকৃষ্ণ। ও কই?…কোথায় গেল?

অধর। কার কথা বলছেন? কাকে খুঁজছেন? …আমাকে বলুন—আমি ডেকে দিচ্ছি।

রামকৃষ্ণ। তুমি! তুমি ডেকে দেবে?…(সহসা পার্শ্বে উপবিষ্ট বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি পড়ল। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে) একে?…

অধর। ওঁর নাম বঙ্কিম চাটুয্যে। আমার মত উনিও একজন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন।

রামকৃষ্ণ। (খুশিতে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) এসেছে? আমার কাছে এসেছে? তা তুমি এতক্ষণ বলছনা কেনে গো? আমি যে খুঁজে মরছি।

বঙ্কিম। (সকৌতূহলে) আমাকে খুঁজছিলেন?

রামকৃষ্ণ। তা নয় তো—আর কাকে খুঁজব? আপনি মশায়—আমার কাছে আসবে—আমি তা জানতাম। মা যে আমাকে বলে দিলেন!

বঙ্কিম। (সবিস্ময়ে অস্ফুটকণ্ঠে) স্ট্রেঞ্জ।

রামকৃষ্ণ। আপনি কী বলচ গো? গাল দিচ্ছ নাকি?

বঙ্কিম। (লজ্জিত কণ্ঠে) ছিঃ! ছিঃ! কী যে বলেন! ওতে আমার পাপ হয়।

রামকৃষ্ণ। (ছেলেমানুষের মত হাততালি দিতে দিতে চটুলকণ্ঠে) আজকে যা ছিঃ ছিঃ, কালকে তাই তপ্ত ঘি। পীরিতে মজেছে মন—কিসের এত বাছাবাছি?…তা মশায়—আপনার নিবাসটি কোথায়?

বঙ্কিম। নৈহাটি—কাঁঠালপাড়া।

রামকৃষ্ণ। হতেই হবে। কাঁঠালপাড়া নইলে এমন পাকা কাঁঠালটি মানাবে কেন? আপনি যে একটা পাকা কাঁঠাল গো!…হেঁ… হেঁ… হেঁ…পাকা টসটসে কাঁঠাল।…

বঙ্কিম। সে আবার কী? এত থাকতে শেষ পর্যন্ত কাঁঠাল?

রামকৃষ্ণ। আপনি বুঝলে না? একটা পাকা কাঁঠাল ঘরে থাকলে তামাম বাড়ী 'বেরাণে' ভরপুর হয়ে উঠে।

আচ্ছা আপনি বল দেখি—আর কোন্ ফল এমন বাড়ী মাতাতে পারে? পাড়া মাতাতে পারে? মন মাতাতে পারে?···আম, জাম, আতা, আনারস···কেউ না···কেউ না···

অত্যন্ত খুশি মনে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি তুলে নাচাতে লাগলেন

অধর। বঙ্কিমবাবু একে তো ডেপুটি, তার উপর মস্ত বিদ্বান্। অনেক বইটই লিখেছেন।

রামকৃষ্ণ। শুনেছি গো···সবই শুনেছি। মাষ্টার আমাকে সব বলেছে। কিসের যেন মঠ লিখেছ গো আপনি···অনেক সাধু সন্ন্যাসীর কথা সব লিখেছ তাতে?

বঙ্কিম। (স্মিতমুখে) আনন্দমঠ।

রামকৃষ্ণ। (হৃষ্টচিত্তে)···আনন্দময়ের কলম থেকে আনন্দমঠই যে বেরুবে। আম গাছে কী আমড়া ফলে গো?

বঙ্কিম। তবে তো মশায়···আপনি আসল কথাই শুনেননি। ভাল লেখাটেথা আমার কলমে আসেনা—সবই ঐ টক আমড়ার জাত।

রামকৃষ্ণ। ধ্যেৎ! আপনি মিছে কথা বলছ গো··· বিনয় করছ। তা বাবু—বিনয়টি বড় গুণ; ওটি না থাকলে ঈশ্বর লাভ হয় না। অহং রিপুটির যম—ওকে টুটি চেপে মারতে ওস্তাদ।

বঙ্কিম। (প্রতিবাদের কণ্ঠে) আরে···না···না···, বিনয় টিনয় কিছুই না। ঈশ্বর চিন্তা করবার অবসরও পাইনে—ওসব ভাবটাবও তাই আসেনা। আমার লেখা উপন্যাসের কথা শুনলে আপনি কানে আঙ্গুল দেবেন!

রামকৃষ্ণ। ক্যানে গো! খারাপ কথা-টথা সব লিখেছ নাকি?

বঙ্কিম। খারাপ বলে খারাপ!···চরম খারাপ! সব পরকীয়া প্রেমে ভরপুর। সবই রোহিণী গোবিন্দলাল, প্রতাপ শৈবালিনী, নগেন্দ্র আর কুন্দনন্দিনীর নিষিদ্ধ প্রেমে ঠাসা।

রামকৃষ্ণ। (তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে) তাতে আর কী হয়েছে? কৃষ্ণপ্রেমও তো নিষিদ্ধ প্রেম। কিন্তু শ্রীমতীর মাধুর্য ভাবের রসে টলমল করছে।···আপনি যে কৃষ্ণপ্রেমিক গো, তাই নিষিদ্ধ প্রেম নিয়ে হাত পাকাচ্ছ।··· তা বাবু, মানুষের সামনে ভালমন্দ দুটো ছবিই তুলে ধরতে হয়। ভাল মানুষ ভালটা নিবে—আর নির্বোধ মন্দবুদ্ধি যে—সে ঐ মন্দটা দেখে হাত বাড়াবে। পরে আগুনের ছেঁকা লেগে হাত পুড়িয়ে পিছুটান দেবে।··· এই দেখনা কেন—হাঁসকে দুধে জলে মিশিয়ে খেতে দাও। সে জলটুকু ছেড়ে দুধটুকুই খাবে।···আবার কারও দেখ—পূর্ণিমার চাঁদের অমন মন-মাতানো চোখ-ধাঁধানো জোছনার বদলে তার কলঙ্কটাই বড় হয়ে চোখে পড়ে। আসলে যার যেমন মন—তার তেমনি ধারণা!

বঙ্কিম। কিন্তু আপনার মত এমন গূঢ়ভাবে তলিয়ে তো আর সবাই দেখবেনা—। তারা উপর উপর দেখবে—আর মন্দটুকুর জন্য পঞ্চমুখে নিন্দা করবে।

রামকৃষ্ণ। (অভয়দানের ভঙ্গিতে) করুক না। মন্দের কোলেই যে ভালর জন্ম। আপনি বলনা কেন গো তাদের—পাঁকের কোলেই পদ্ম জন্মায়—গঙ্গার জলে নয়। ভালই হোক—আর মন্দই হোক—আসলে গতি হওয়া চাই···হাঁসের মত। চলতে হবে—সোজা সিধে টানা একপথে—জল কেটে।

বঙ্কিম। আপনি যতই যা বলেন না কেন—মন আমার সিধে নয়। তাই সোজা পথে চলতে পারিনা। মানুষটা আমি বাঁকা কিনা—লেখাও তাই বাঁকা পথ ধরে চলে।

রামকৃষ্ণ। তা যে চলতেই হবে—তুমি যে বঙ্কিম।··· (সহসা বঙ্কিমের সামনে ঝুঁকে পড়ে নিম্নকণ্ঠে)—কার ভাবে তুমি বাঁকা গো?

বঙ্কিম। (কাঁধের চাদরটা নামিয়ে ফরাসের উপর রেখে চেপে বসে) আর বলেন কেন—উপরওয়ালা সাহেবের জুতোর চোটে মশায় হাড়গোড় সব দুমড়ে বাঁকা হয়ে গেছে!

রামকৃষ্ণ। না গো না, তা নয়। আমি জানি। কৃষ্ণভাবে তুমি বাঁকা!

বঙ্কিম। রক্ষে করুন মশায়! বলেছি তো—ওসব ভাবটাব আমার আসে না। আমি নিরেট কাঠখোট্টা মানুষ।

রামকৃষ্ণ। আপনি যে পুরুষ—বাইরে কাঠখোট্টা তো হতেই হবে। কিন্তু অন্তরে কোমল। ঠিক পাকা কাঁঠালের কোয়াটির মতই তুলতুলে। পুরুষ আর প্রকৃতি একসাথে একঅঙ্গে—অভেদ্য। যেমন—কৃষ্ণকিশোর আর

রাইকিশোরী। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, আর শ্রীমতী প্রকৃতি। পুরুষ তাই শরীরকে বাঁকিয়ে ত্রিভঙ্গঠামে তাকিয়ে আছে প্রকৃতির দিকে। আর প্রকৃতি পুরুষের দিকে। দুইয়ে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।···রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন তাই বিশ্বের সব মিলনের সেরা মিলন।

বঙ্কিম। (জনান্তিকে অধর সেনকে) মোষ্ট ইনটেলিজেণ্ট এ্যাণ্ড ফিলজফিক্যাল এক্সপ্লেনেশান। বাট টোল্ড মী দি আদার ডে—ছাট হি ইজ নট সো মাচ্ এডুকেডেট।

অধর। (মৃদু হেসে) বাট আই ডিড নট ইগ্‌নোর হিজ ট্যালেণ্ট এ্যাণ্ড পারশোনালিটি।

বঙ্কিম। (অভিভূত কণ্ঠে) ইট ইজ রিয়ালি ইউনিক!

রামকৃষ্ণ। আপনারা ইংরেজি মিংরেজি করে কী সব বলাবলি করছ গো?

বঙ্কিম। (লজ্জিত হাস্যে) আপনার ব্যাখ্যাটা খুবই ভাল লেগেছে—আমরা তাই বলছিলাম;

রামকৃষ্ণ। এ যে সেই নাপিতের গল্পের মত হল। বাবুর দাড়ি কামাতে গিয়ে কোথায় যেন একটু লাগিয়ে দিয়েছে নাপিত। বাবু রেগে বলে উঠেছেন—ড্যাম! আর যাবে কোথায়! আধা কামানো গাল থেকে ক্ষুর নামিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নাপিত বলে উঠল—আগে বলুন ড্যাম মানে কী? বাবু দেখে বেগতিক। হাতে ঝকঝকে ক্ষুর—তার উপর আস্তিত গুটানো। তখন অনেক সাধ্য-সাধনা করতে লাগলেন—না বাপু, ও কিছুই নয়। লক্ষী আমার, তুই কামিয়ে যা। নাপিত বলল—বেশ, দিচ্ছি কামিয়ে। কিন্তু বলে রাখছি—ড্যাম মানে যদি ভাল হয়—তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাপচৌদ্দপুরুষ সবাই ড্যাম। আর—ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়—তাহলে আপনি ড্যাম, আপনার বাপচৌদ্দপুরুষ শুধু ড্যামই নয়—ড্যাম ড্যামা ড্যাম ড্যাম···ড্যাডাম ড্যাম!

বঙ্কিমচন্দ্র আর অধর সেন হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন

বঙ্কিম। আপনি খুব চমৎকার গল্প বলতে পারেন তো দেখছি, তা প্রচার করেন না কেন?

রামকৃষ্ণ। প্রচার তো আত্ম-অভিমানের কথা। জগৎ সংসার যাঁর সৃষ্টি—প্রচার করতে পারেন এক তিনিই। আমি তুমি হচ্ছি কড়াইয়ের দুধ। তিনি হচ্ছেন আগুনের জাল। জালের বলে দুধ ফোঁস করে উথলে উঠছে। জালটুকু টেনে নাও—ব্যাস সব কায়দা তার শেষ। এক-দম ঠাণ্ডা মেরে যাবে।

বঙ্কিম। এ সব বড় বড় চিন্তা—মহৎ ভাবনা মাথায় আসে না। আর তাছাড়া—কার ভাবনা কে ভাবে মশায়? দুদিনের জন্য সংসারে এসেছি—নেচে গেয়ে প্রাণ খুলে ফুর্তি করব। আর কাজ যদি বলেন তো—মোট তিনটি। আহার, নিদ্রা, আর মৈথুন। ব্যাস—ফুরিয়ে গেল সব ল্যাঠা। এর মধ্যে ও সব ভাবনা চিন্তার সময় কোথায়?

রামকৃষ্ণ। (নাক সিঁটকে) এঃ! বড্ড ছ্যাঁচড়ার মত কথা বললে! সারা দিনরাত যা ভাব—তারই স্বপন দেখ রাতে ঘুমিয়ে। মূলো খেলে সারাদিন তারই ঢেকুর উঠে। তা—যা কর তা কর বাবু, একটু আধটু ওরই মাঝে পরকালের চিন্তা করো। দেখো—সস্তায় বাজীমাৎ হয়ে যাবে।

বঙ্কিম। (উদ্ধত কণ্ঠে) পরকাল আবার কী? ও সব আমি মানিনা।

রামকৃষ্ণ। না মানলে কী হয় গো—বাবুমশায়? যতক্ষণ ঈশ্বর লাভ না হচ্ছে—ঘুরে ফিরে আসতেই হবে এই সংসারে। কম্‌লি নেহি ছোড়েগা!···দেখোনা চেয়ে—সিদ্ধ ধান জমিতে ছিটালে আর গাছ বেরোয় না। তার মানে—তার ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়ে গেছে—সে পেয়ে গেছে। তার আর পুনর্জন্ম নাই। আবার চেয়ে দেখ কুমোরেরা হাঁড়ি শুকোতে দিয়েছে। তার মধ্যে কাঁচা-পাকা সব রকমই আছে। গরু বাছুর হয়তো তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে মাড়িয়ে ভেঙ্গে দিয়ে গেল ওরই কতকগুলো। কুমোর তখন কী করল,—না, যেগুলো পাকা সেগুলো ফেলে দিল। আর কাঁচাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে জল দিয়ে মেখে নিয়ে আবার চাকে তুলে নতুন করে গড়িয়ে নিল। ভেঙেছে বলে রেহাই নেই। তাই বলছিলাম,—শুধু পণ্ডিত হলেই হবেনা—তার সাথে চাই মহত্ব। ঈশ্বর চিন্তাই সেই মহত্ব। চিল শকুনিও তো অনেক উঁচুতে উঠে—কিন্তু নজর থাকে ভাগাড়ের দিকে।

বঙ্কিম। কিন্তু পারি কই? ঈশ্বর চিন্তা যে আসেনা।

সারাদিন তামসিক চিন্তায় মেতে থাকি, আর তাই নিয়ে হৈচৈ করি।

রামকৃষ্ণ। ঘি যতক্ষণ না তাতে—ততক্ষণই থল্‌বল্‌ করে। কিন্তু একবার তেতে গেলে সব নিশ্চুপ। তখন যত পার লুচি বেলে ছেড়ে দাও—টু শব্দটি আর করবে না।

বঙ্কিম। আচ্ছা, আপনি বলুন দেখি—আমার কী ঈশ্বর প্রাপ্তি হবে?

রামকৃষ্ণ। হবে গো হবে। মা যে আমাকে বললেন—তোমার কৃষ্ণ ভাব। শ্রীকৃষ্ণের কথা আপনাকে লিখতেই হবে—আর ঐ সঙ্গে মাকে ডাকার মন্ত্র!

বঙ্কিম। সে আবার কী। ছাত্রজীবনে দুচারটে পদ্যটদ্য লিখেছি, আর হালে কিছু উপন্যাস। ওসব মন্ত্রতন্ত্র আমার কলমে আসে না—আসবেও না কোনদিন।

রামকৃষ্ণ। আসবে গো বাবু—আসবে। ঝিনুক কী জানে যে তার বুকে মুক্তো লুকিয়ে আছে?…আচ্ছা মশায়, আপনি গীতা পড়?

বঙ্কিম। (অপ্রতিভ কণ্ঠে) ইচ্ছে তো করে—কিন্তু সময় পাই না।

রামকৃষ্ণ। এও কী একটা কথা হল? যে রাঁধুনী—সে ওরই ফাঁকে চুলও বাঁধে। আপনি মশায় রোজ গীতা পড়ো। বেশি না পার—এক অধ্যায়…না হয় আধ অধ্যায়…আর না হয় নিদেন পক্ষে দুটো শ্লোক! তখন দেখবে আর কোন কিছুই পড়তে মন চাইবেনা। লিখতেও চাইবে না ওই গীতার কথা ছাড়া। সব গ্রন্থের সেরা গ্রন্থ। সব মন্ত্রের সেরা মন্ত্র। গীতা হচ্ছে অমৃত হ্রদ। একবার যে এক আঁচলা জল খেয়েছে—তার কাছে মণ্ডা মেঠাই কালিয়া কোর্মা…সব তুচ্ছ! আমি বাবু, মুখ্যু সুখ্যু গেঁয়ো মানুষ—আমার কথায় যেন আপনি হাকিম মানুষ—মনে কিছু করোনি।

বঙ্কিম। এটুকু সময়—আপনার সঙ্গ লাভ করে অনেক—অনেক কিছু শিখে গেলাম। আপনার দয়ায় এখন সেগুলো বুকের মধ্যে গেঁথে রাখতে পারি—তবেই হয়। (সহসা ঠাকুরের সামনে নত হয়ে প্রণাম করে) আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—যেন সফলকাম হই।…(মুখ তুলে ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে করজোড়ে) আচ্ছা, অনুমতি করেন তো আজকের মত উঠি—রাত হয়ে গেল।…

রামকৃষ্ণ। (বঙ্কিমচন্দ্রের মস্তক স্পর্শ করে) তা মাঝে মাঝে সময় পেলে এস না কেন দক্ষিণেশ্বরে। নিরিবিলিতে দুজনে সুখদুঃখের দুটো গল্প করা যাবে।…

বঙ্কিম। কৃপা করবেন অধমের উপর—নিশ্চয়ই আসব।…

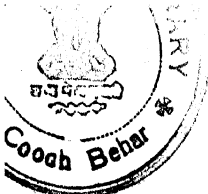
রামকৃষ্ণ। অধম নয় গো…অধম নয়—উত্তম। আর শুধুই উত্তম নয়—পুরুষোত্তম।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মোহিতের মত উঠে চলে গেলেন। যাবার সময় অধর সেনের কাছে বিদায় নিতেও ভুলে গেলেন। কাঁধের চাদরখানাও ফরাসের উপর ফেলে গেলেন—কোনদিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই।…কিছুক্ষণ পরে বঙ্কিমের চাদরটা হাত দিয়ে তুলে নিয়ে রামকৃষ্ণ একদৃষ্টে কী যেন দেখলেন। পরক্ষণেই পরমোল্লাসে শিশুর মত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চীৎকার করে অধর সেনের দিকে চাদরটা এগিয়ে দিলেন

অগো! তোমার 'ফেরেণ্ডে'র মনে ভাবের জোয়ার এসেছে গো! ও এখন আর ওতে নেই। জ্ঞানগম্যি সব লোপ পেয়ে গেছে।…পানাপুকুরের পাড় ভেঙ্গে বর্ষার জল হু হু শব্দে ঢুকে পড়ছে। যাও—চাদরটা দিয়ে কিছুটা পথ ওকে এগিয়ে দিয়ে এস।

যবনিকা





নান্নুরের বিস্মৃত মহামহোপাধ্যায়

শ্রীগৌরীশ্বর ভট্টাচার্য

বৈষ্ণবচিত্তের মধুমাধবীকুঞ্জ এই নান্নুর। বীরভূম জেলার অন্তর্গত ছোট্ট একটি গ্রাম—বাংলা দেশের অন্যান্য গ্রামের মতোই অত্যন্ত সহজ পথে এবং অনিবার্যকারণে ধ্বংসোন্মুখ। স্বাভাবিক অবস্থিতির দৈন্য কিন্তু চৈতন্য প্রেমিক বৈষ্ণবজনের মানসিক অবস্থিতির মহত্ব ও বিশালতাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। আজও বাংলার সুদূর নানা প্রান্তে নিভৃত আখড়ায় বসে বৈষ্ণব মহান্তেরা চণ্ডীদাসের লীলাভূমি নান্নুরের দৃশ্যপট যেন প্রত্যক্ষ করেন, আর তাঁর পদাবলীর অলস রোমন্থনে দিব্য-মাধুর্যে অভিষিক্ত হন। সামাজিক বাধা নিষেধের উর্দ্ধলোকে নরনারীর সহজ সরল সম্বন্ধকে প্রাণমাতানো সংগীত ধ্বনিতে যে বিদ্রোহী মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন তাঁর প্রতিদিনের পথ পরিক্রমায় নান্নুরের ধূলি আজ ব্রজরেণু। ধ্বংসপ্রাপ্ত জীর্ণ চণ্ডীদাসের বাসভূমি এবং রামী ধোপানীর পাট দেখে আজও বৈষ্ণবের চোখে জল আসে—আর সহজিয়া সাধক আপনার মনের মানুষের সাহচর্যে রোমাঞ্চিত হন।

চণ্ডীদাস ছাড়া নান্নুরের দ্বিতীয় পরিচয় নেই। অন্ততঃ ইউনিয়ন-বোর্ডের মানচিত্রের অস্তিত্ব ছাড়া সুধীসমাজ নান্নুর সম্বন্ধে আর কিছুই জানেন না। নান্নুরের খ্যাতি কতোদিনের,—প্রাক্ চণ্ডীদাস অথবা চণ্ডীদাসোত্তর নান্নুরের সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা দীক্ষা প্রণালী কি ছিলো সে সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছুই জানা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বভারতী সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহে চারখানি পুঁথির সন্ধানে নান্নুরের আর এক উজ্জ্বল অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করেছে। চারখানি পুঁথির মধ্যে দুখানি মূল এবং অপর দু'খানি তাদের টীকা। মূল পুঁথির একখানি কাব্য—উদ্ধবচমৎকার কাব্য (বিশ্বভারতী পুঁথি সংখ্যা ৮০২)—অপরটি নাটক—প্রতিনাটক (বিঃ ভাঃ পুঁথি সংখ্যা ৮০৩)। রচয়িতা মহামোহপাধ্যায় জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকার। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এ'র নাম নেই,—সংস্কৃত পাঠক মহলে ইনি অনাগত। এই পুঁথি চারখানি সংগৃহীত না হ'লে মহামহোপাধ্যায় জগদ্দুর্লভ নিরবধিকালের নির্বাক সাক্ষ্যে হয়তো আর এক পংক্তি যোজনা করতেন মাত্র। অবশ্য ইতস্ততঃ তাঁর কয়েকটি ব্যবস্থাদান পত্র, সর্পবন্ধ বা খড়্গবন্ধে অবসর বিনোদনের টুকরো শ্লোক রচনার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সে মাল্য রচনায় মালাকরদের স্মরণ করবার মতো নৈপুণ্যের একান্ত অভাব।* অপ্রত্যাশিতভাবে এড্যাম সাহেবের তদানীন্তন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিবরণীতে জগদ্দুর্লভ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান বিবরণ পাই।† ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্বে বাংলাদেশে কি ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এ্যাডাম সাহেব তাঁর বিবরণীতে তার বিস্তৃত উল্লেখ করেছেন।‡ কোন গ্রামে কতগুলি চতুষ্পাঠী ছিলো, ছাত্র সংখ্যা, অধ্যাপক মশায়ের নাম, রচনা সকলই তিনি কষ্টস্বীকার ক'রে সংগ্রহ করেছেন। বর্তমানে শ্রীযুত এ, সি, মিত্র মশায়ের সম্পাদিত 'সেন্সাস্ রিপোর্ট অব বীরভূম-এ এ্যাডাম সাহেবের বিবরণীর উক্ত অংশ সংগৃহীত হয়েছে। মহামহো-পাধ্যায় জগদ্দুর্লভ ছিলেন চতুষ্পাঠীর খ্যাতনামা অধ্যাপক। তিনি নিজে চারখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উপরিলিখিত গ্রন্থগুলিই সেই চার-খানি গ্রন্থ।

রচনাগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় না থাকলেও মহা-মহোপাধ্যায় যে বহু-অধীত পণ্ডিত ছিলেন তা তাঁর টীকা দু'টি পাঠে বিশেষভাবে অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থকারের নিজের রচিত টীকার মূল্য যে কতোখানি তা' অতি আধুনিক সাহিত্য রসিকদেরও অজানা নয়। শব্দের ব্যাখ্যানে এবং শব্দবিশ্লেষণে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা' অনেক সময় কষ্টকল্পিত মনে হ'লেও তাঁর ন্যায়ালংকার উপাধির সার্থকতা সম্পাদন ক'রেছে। সাহিত্যিক হ'য়েও তিনি যে নৈয়ায়িক একথা তিনি অকুণ্ঠভাবে টীকায় ঘোষণা করেছেন। উক্ত গ্রন্থ দু'খানি বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে এ প্রবন্ধে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। কিন্তু তার আগে একটি অতি-মূল্যবান্ অথচ পণ্ডিত সমাজে অজ্ঞাত তথ্য সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা দরকার। আমি প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের সংগে পরিচিত নই; বা বাংলা সাহিত্যে যে বিবদমান মতামত রয়েছে আমি তার খবর জানি না। কাজেই যে বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই সে বিষয়ে আমি—পুরোনো কথা নতুন ক'রে বললেও দোষের হবে না—'উদ্বাহুরিববামনঃ।' এ বিষয়ে আমি আমার অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। কাজেই অনভিজ্ঞের মতো সমস্যা ব্যূহের অন্তরে প্রবেশ না ক'রে শুধু আমার পুঁথিতে যে উপাদান মিলছে তাই কৌতূহলী সুধীসমাজে উপস্থাপিত ক'রছি।

---

* বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুত পঞ্চানন মণ্ডল মশায় তাঁর "চিঠি-পত্রে সমাজ চিত্রে"র প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর লেখায় জগদ্দুর্লভ সম্বন্ধে চমকপ্রদ খবর পাওয়া যাবে।

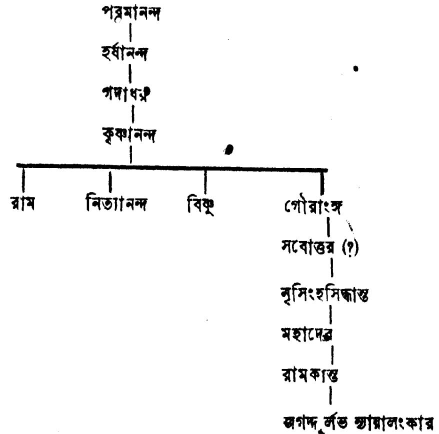
† বিশ্বভারতীর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখো-পাধ্যায় মশায় আমাকে এ সংবাদ দান ক'রে কৃতজ্ঞ করেছেন।

‡ William Adam—Reports on the state of Education in Bengal—(1835 & 1838)—Edited by Anathnath Basu—University of Calcutta—1941 P. 259.

প্রবন্ধের গোড়াতেই উল্লেখ করেছি—নান্নুর চণ্ডীদাসের স্মৃতি-বিজড়িত। বর্তমানে কোনো কোনো পণ্ডিত নান্নুর সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন এবং চণ্ডীদাসকে বীরভূমের অধিবাসী না বলে বাঁকুড়ার ছাতনা গ্রামের অধিবাসী বলতে উৎসাহী হয়েছেন। কোন পক্ষের প্রমাণ বলবত্তর বা কি প্রমাণ সাপেক্ষে উভয় দল স্ব স্ব মতের সমর্থক আমার তা' বিশেষ জানা নেই,—এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা' প্রকাশ করা নয়। আমার বক্তব্য এই যে মহামহোপাধ্যায় জগদ্দুর্লভ বৈষ্ণব হয়েও চণ্ডীদাস স্মৃতি-বিজড়িত স্বীয় বাসভূমি নান্নুরের উল্লেখ প্রসংগে চণ্ডীদাসের নাম করেন নি। কেন করেন নি এই প্রশ্নই বার বার মনকে পীড়া দেয়। তিনি গ্রন্থদ্বয়ের টীকায় বার বার নিজেকে নান্নুরের অধিবাসী বলে অহংকার প্রকাশ করেছেন, নান্নুরের শব্দতাত্ত্বিক গঠনে একটা মনগড়া ব্যাখ্যাও গড়েছেন; কিন্তু আশ্চর্য চণ্ডীদাসের মতো মহাজনের নামোল্লেখে কার্পণ্য প্রকাশ করেছেন। এটা বিস্মরণ জনিত বলে মেনে নিতে মন প্রতিবাদ করে। সত্যিই কি চণ্ডীদাসের খ্যাতি বহুবিস্তৃত ও বহুপ্রসিদ্ধ হওয়ায় মহামহোপাধ্যায় তাঁর নাম উল্লেখ করার কোনও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নি? তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও প্রতিপক্ষের দলকে আশ্বস্ত করা যাবে না। তাঁরা বলবেন—নান্নুরের সংগে চণ্ডীদাসের কোনও সম্বন্ধ নেই। বর্তমানক্ষেত্রে সঠিক কারণের নির্দেশ দেওয়া সুকঠিন। প্রতিনাটকের টীকায় মহামহোপাধ্যায় নান্নুরের গ্রাম্য দেবতা বিশালাক্ষী দেবীর উল্লেখ করেছেন,—'অত্রপুরে আদৃতা বিশালাক্ষী দেবতা গ্রামদেবতা!' এই দেবী 'বিশালাক্ষী' পদটি কোনও বিশেষ দেবীর পরিচায়ক না হয়ে যে কোনো দেবীর বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হ'তে পারে। গ্রাম্য উচ্চারণে বিশালাক্ষী বাশুলী হ'তে বাধা না থাকলেও এই উভয় দেব র অভিন্নতা সাধন আয়ত্ত তথ্যের অপেক্ষা রাখে।

জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকার যে বৈষ্ণব ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার প্রথম প্রমাণ তাঁর রচনার বিষয়বস্তু। উদ্ধবচমৎকার কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিনাটকের নায়ক যদিও রামচন্দ্র তবু বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশে রাম ও সীতা—বিষ্ণু এবং লক্ষ্মী। মহাকাব্যের নায়ক নায়িকার চারিত্রিক গুণাবলী থেকে তাঁরা ভ্রষ্ট,—সম্পূর্ণ বিভিন্ন জলবায়ুতে বৈষ্ণব রসে ও কল্পনায় তাঁদের রূপান্তর ঘটেছে। জগদ্দুর্লভ এই রামচন্দ্রকেই চিত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর উদ্ধব চমৎকার কাব্যের টীকায়।—টীকার প্রারম্ভে বারবার বিষ্ণুস্মরণ করেছেন তিনি। তৃতীয় প্রমাণ—গোপীনাথ তাঁদের গৃহদেবতা এবং গোপীনাথের নির্দেশেই তিনি তাঁর কাব্যরচনা করেন। এখানে একটি প্রশ্ন মনকে বার বার আলোড়িত করে। তা হচ্ছে এই যে জগদ্দুর্লভের পূর্বে কি নান্নুরে বৈষ্ণব জীবন সাধনার সার্থক ধারা প্রবাহিত হ'চ্ছিলো না? তা যদি না হবে তাহলে তন্ত্রসাধনভূমি বীরভূমের অধিবাসী হ'য়ে ন্যায়ালংকার মশাই বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব বিষয়বস্তু অবলম্বন ক'রে সংস্কৃত সাহিত্য রচনায় কি ক'রে ব্রতী হলেন? মহামহোপাধ্যায় প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাস সমস্যাকে আরও কণ্টকিত করে তুলেছেন।

বৈষ্ণব হ'লেও জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকার স্বীয় ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের প্রতি সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। বীরভূম অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই তাঁর খ্যাতি ছিলো এবং আশে পাশের সকল গ্রামেই তিনি তাঁর ব্যবস্থাপত্র (স্মৃতি-নির্দিষ্ট কর্তব্যাদি) দান ক'রতেন। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হ'লেও তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি যে বিশেষ কম ছিল না তারও উল্লেখ রয়েছে। উদ্ধব-চমৎকার কাব্যের প্রারম্ভে বিস্তৃত বংশাবলীতে তিনি নিজের দশপুরুষের নাম দিয়েছেন। এখানে সেই বংশতালিকা প্রদান অপ্রাসংগিক হবে না মনে করি—



গ্রন্থদ্বয় এবং তাদের টীকায় উল্লিখিত বৎসর থেকে আমরা জগদ্দুর্লভের জীবিতকালের একটা আনুমানিক হিসাব কষে নিতে পারি। উদ্ধবচমৎকার কাব্যের পুষ্পিকায় তিনি লিখছেন—'শাকেঽষ্টসাগর পয়োনিধি চন্দ্রসংখ্যে বর্ষেশনৌ স্মরতিথৌ মধুকৃষ্ণ পক্ষে। কৃষ্ণোদ্ধবান্বিতচমৎকৃতকাব্যমেতৎ সংপূর্ণতাং গতং নান্নুর নাম্নি ধাম্নি'—অর্থাৎ ১৭৪৮ শকাব্দে নান্নুরে তাঁর উদ্ধবচমৎকার কাব্য লেখা শেষ হয়। সমসাময়িক বাংলা সনের উল্লেখ ক'রতে গিয়ে তিনি বলছেন—'বর্ষে তু যাবনিকে আধুনিকে (বাংলা সনের ব্যাপারে যাবনিক এবং আধুনিক এই দুই শব্দের প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ) সনাখ্যে তু নেত্ররাম যুগচন্দ্রসিতে চ চৈত্রে যুগ্মৈক সম্মিত দিনে'—অর্থাৎ সন ১২৩৩—১২ই চৈত্র! হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে যে আজ থেকে একশো আটাশ বছর আগে তিনি তার কাব্য সমাপ্ত করেন। উদ্ধবচমৎকারের টীকা রচনা কাল সম্বন্ধে টীকার শেষে বলছেন—'শাকেঽঙ্ক যুগসিন্ধিন্দু সংখ্যেঽব্দে মাসি মাধবে। দ্বাদশেঽহ্নিত্রয়োদস্যাং টীকেয়ং সমপূরি চ॥'—শকাব্দ ১৭৪৯ অর্থাৎ বাংলা ১২৩৪ সাল—১২ই বৈশাখ টীকা সম্পূর্ণ করেন। প্রতি নাটকে'র পুষ্পিকায় তিনি জানাচ্ছেন যে শকাব্দ ১৭৫৪ অর্থাৎ ১২৩৯ সালের ২১শে ফাল্গুন রচনা শেষ হয়। অর্থাৎ কাব্য থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যেতে পারে যে মহামহোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে জীবিত ছিলেন। মুসলমান শাসনের অবসান ঘটেছে তখন—ইংরেজ ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে। সিপাহী বিদ্রোহ প্রতীক্ষমান। একটা যুগসন্ধিক্ষণ। ভারতের মর্মবাণী পরাজয়ের নীরবতা বরণ করে

নিয়েছে,—বিদেশী শাসকের দম্ভ জাতীয় জীবনের কণ্ঠরোধ ক'রতে উদ্যত! আশ্চর্য, এই ক্ষয়িষ্ণু যুগসন্ধিক্ষণে বসেও মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের নব রচনায় উৎসাহী হ'য়ে উঠেছেন। কোন ভবিষ্যৎ বংশধরের দিকে তাকিয়ে তিনি এ অমূল্য সঞ্চয়ে প্রয়াসী হ'য়েছিলেন? ভাবতেও বিস্ময় জাগে, এই দেড়শো বছর আগেও সংস্কৃত-সাহিত্যে গ্রন্থ রচনা অব্যাহত রয়েছে। আর আমরা কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ ভিক্ষা ক'রে সেই ভাষাকে মৃত ভাষা আখ্যা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রছি? ইংরাজী শিক্ষা আমাদের সর্ববিষয়ে মংগল বিধান করেছে সত্য কিন্তু এ কথা স্বীকার ক'রতেই হবে যে আজ আমরা মৃত্তিকার খবর জানিনা, শুধু কতকগুলো 'আইডিয়া' নিয়েই বেঁচে আছি।

উদ্ধবচমৎকার কাব্য চারিটি সর্গে বিভক্ত। যদিও কাব্যটি সংক্ষিপ্ত কলেবরের তবু কবি এঁকে মহাকাব্যের সংজ্ঞায় ভূষিত ক'রেছেন। প্রথম সর্গের শ্লোক সাংখ্য—৩২, দ্বিতীয় সর্গের ৬১, তৃতীয় চতুর্থ সর্গের ৫১টি ক'রে। কাব্যের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যহীন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলে এসেছেন—রাধিকা বৃন্দাবনে। উভয়ে উভয়ের বিরহে কাতর। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য পদে নিযুক্ত হ'য়েছেন। কবি ঘটনার বৈচিত্র্যহীনতার প্রতি নিজেই সচেতন ছিলেন, তাই কাব্যরচনার উপযুক্ত কৈফিয়ৎ কাব্যের প্রারম্ভেই দিয়েছেন—'কবিতাকৃতয়ে ছন্দো-জ্ঞানার্থং গৃহ্যতে ময়া'—এবং পরে—'স্বচ্ছাত্রবর্গৈরুপবোধিতঃ সন্ গ্রন্থং চিকীর্ষেঃহব্যবসায় এষঃ'—স্নেহশীল অধ্যাপক ছাত্রদের ছন্দঃ শোনাবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা করেন। মধ্যযুগীয় রচয়িতাদের মনোবৃত্ত জগদ্দুর্লভেও পরিস্ফুট—দেবনির্দেশই তাঁর কাব্যরচনার এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের মূল কারণ,—'গোপীনাথস্য চরিতং কর্তুমীহে প্রাবৃতঃ (১৪) হয়তো এই গোপীনাথ তাঁদের কুলদেবতা এবং আরাধ্য ছিলেন। স্বগ্রাম নান্নুর সম্বন্ধে তাঁর মমতা এবং গৌরববোধ যথেষ্ট। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই তিনি নান্নুরের উল্লেখ করেছেন—এমনকি টীকাতে এই নান্নুর শব্দের একটা মনগড়া ব্যাখ্যাও জুড়ে দিয়েছেন—'উর গতৌ উরতি জানাতীতুরঃ জ্ঞানী ন উৎরাজ নুরঃ নাস্ত্যনুরোঽজ্ঞানী যত্র স নান্নুরঃ নথাদিত্বান্নক্রোঽনভাবঃ॥১৪॥ পণ্ডিতমশায়ের এ উক্তি যদি যথার্থ কথনের সীমা উল্লেখ না ক'রে থাকে তবে বুঝতে হবে যে নান্নুর পণ্ডিত জগদ্দুর্লভের মতো আরও অনেক জ্ঞানীর আশ্রয়স্থল ছিলো। কিন্তু কে সেই মহা বিস্মরণের সাক্ষ্য দেবে? সেই জ্ঞানি-গণের মধ্যমণি হ'য়ে চণ্ডীদাস যদি মহামহোপাধ্যায়ের মনের নিভৃত প্রকোষ্ঠ ঝংকৃত ক'রে থাকেন, তবে তার বিন্দুমাত্র আভাস দিলেও একটা বৃহত্তর সমস্যার কষ্টকর সমাধানের অবসান ঘটতো!

মহামহোপাধ্যায়ের স্ববিবৃতি অনুযায়ী 'উদ্ধবচমৎকার কাব্য'কে ছন্দানুশাসন বলে গণ্য করা কর্তব্য। কাব্যের মাহাত্ম্য যতোখানিই থাক না কেন, উদ্দেশ্য ছন্দের উদাহরণ দান করা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই! এই উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য যে খানিকটা স্বপথভ্রষ্ট হয় ভট্টি-কাব্য তার প্রধান উদাহরণ! মহামহোপাধ্যায় যদি উদ্দেশ্যবিহীন একখানি কাব্যরচনা করতেন তাহলে আমরা হয়তো পরবর্তী যুগের একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যের রসাস্বাদন ক'রতে সমর্থ হতাম। জগদ্দুর্লভের সে ক্ষমতাও ছিলো। মাঝে মাঝে দু' এক জায়গায় তার স্পষ্ট স্বাক্ষর তিনি এঁকেছেন।

বাংলাদেশে সংস্কৃত ছন্দের যে গ্রন্থখানি বহু পঠিত তা' গংগাদাসের ছন্দোমঞ্জরী। প্রায় সকল চতুষ্পাঠীতেই সাহিত্যের ছাত্রদের এই গ্রন্থ পড়তে হ'তো এবং এখনও হয়। ন্যায়ালংকার মশাই এই গ্রন্থ-খানিকেই আদর্শ ক'রে তাঁর ছন্দঃকাব্য রচনা করেন। এমন কি ছন্দের সংজ্ঞা নির্দেশে ছন্দোমঞ্জরীর ভাষাই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ছন্দোমঞ্জরী অত্যন্ত সরলভাষায় লেখা সর্ববোধ্য ছন্দোগ্রন্থ। সেই গ্রন্থের পর গতানুগতিক পদ্ধতিতে ছন্দোগ্রন্থ লেখার সার্থকতা ছিল না। এতে সময় এবং প্রতিভার অপচয় ঘটেছে। অবশ্য মহা-মহোপাধ্যায় যে যুগের লোক সে যুগ গতানুগতিকতারই যুগ। তাঁর জন্মগ্রহণের পূর্বথেকে ভারতবর্ষে গতানুগতিকতার সূত্রপাত হ'য়েছে। ভারতবর্ষ কর্ম, চিন্তা, শিক্ষা সবেই কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করেছে। নূতন সৃষ্টির উন্মাদনা যেন সমগ্র জাতির মন থেকে লুপ্ত হ'য়েছে—শুধু রোমন্থন আর উদ্গীরণ! টীকার উপর টীকাই রচিত হ'চ্ছে—নূতন কোনো গ্রন্থের সন্ধান নেই। কাব্য রচনা ক'রতে গিয়ে—'কৃষ্ণো হৃষ্টঃ কুব্জ্যাং দৃষ্টঃ॥'—এই জাতীয় শ্লোক রচনার কি দরকার ছিলো? শুধু ছন্দের খাতিরেই এ জাতীয় রচনার আশ্রয় নিতে হ'য়েছে। ছন্দের বিচারে বা সংজ্ঞা নির্দেশেও যদি তিনি অভিনবত্বের সন্ধান দিতেন তাহলে হয়তো পাঠকমন পরিতৃপ্ত হ'তো।

একাক্ষর থেকে আরম্ভ ক'রে একবিংশতি অক্ষর পর্যন্ত ছন্দের নির্দেশদান তিনি করেছেন এবং কেবলমাত্র এক একটি ছন্দের। সকল ছন্দের উল্লেখ তিনি করেন নি। কাজেই তাঁর কাব্য পড়লে বিভিন্ন ছন্দঃ জানা যাবে না,—উপরন্তু কাব্য পাঠের সম্পূর্ণ আনন্দ মিলবে না।

সংস্কৃতে একাক্ষর ছন্দঃ কি প্রকৃতির কৌতূহলী পাঠকের জন্যে জগদ্দুর্লভ থেকেই তার উদাহরণ দিচ্ছি—'শ্রী, র্বো। ভূয়াৎ॥২১' (আপনাদের মংগল হোক)। এই প্রসংগে জানাই যে সংস্কৃত ছন্দঃ প্রধানতঃ দুইপ্রকার,—মাত্রা এবং বৃত্ত। মাত্রা ছন্দে অক্ষরের মাত্রা অর্থাৎ স্বরের হ্রস্বত্ব এবং দীর্ঘত্ব গণনা করে শ্লোক রচনা করা হয়। বৃত্ত ছন্দে অক্ষর সংখ্যা গণনা করতে হয়; এবং এক একটি শ্লোককে সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়। এক এক ভাগকে 'পাদ' বলা হয়। এই এক পাদের অক্ষর গণনা করে ছন্দের বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হয় (সাধারণতঃ সমবৃত্তস্থলে)। অবশ্য এ ছাড়া ছন্দঃ সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে।—এ প্রবন্ধে সে প্রসংগ বাদ দিলাম। আমাদের উপরি-লিখিত শ্লোকে 'শ্রী র্বো। ভূয়াৎ॥, চারিটি পদ এক এক অক্ষরের। শ্লোক—কৃষ্ণো হৃষ্টঃ। কুব্জ্যাং দৃষ্টঃ। (অনুস্বার বিসর্গ বা হসন্তযুক্ত বর্ণ অক্ষর হিসাবে গণনা করা হয় না)। এইভাবে এক এক অক্ষর বাড়িয়ে বাড়িয়ে একুশ অক্ষরের ছন্দঃ পর্যন্ত মহামহোপাধ্যায় তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। সেই একুশ শ্লোকটির উদাহরণ দিচ্ছি—

'নিষ্পন্দা নির্নিমেষা চলবলরহিতা নির্ণয়া শক্যরূপা
নির্ব্যাধিপ্রেমবাষ্পপ্রগলিতনয়নোপেত্য দৃষ্টোদ্ধবেন।
নামাশ্বাসং পরীক্ষ্য স্বয়গদিত হরীত্যেতদাশ্রুত্য সখ্যা
প্রাপ্তপ্রাণেব বীক্ষ্যোদ্ধব ইতি চ চমৎকারতামাপ্য দুঃখী॥
৬১ ২য় সর্গঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কাব্যটি চারিটি সর্গে বিভক্ত। প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুই সর্গেই বিভিন্ন ছন্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে এবং সংগে সংগে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সর্গের শেষেই একুশ অক্ষরের ছন্দের সংজ্ঞাদান শেষ হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গে, কাজে কাজেই তিনি স্বাধীনভাবে তাঁর রচনা নিবদ্ধ করেছেন। যদিও প্রথম বা দ্বিতীয় সর্গ ছন্দের সংজ্ঞাদান এবং উদাহরণে সীমাবদ্ধ হ'য়েছে তবু বলা বাহুল্য তার গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি।

উদ্দেশ্যমূলক কাব্য রচনায় কবির স্বাধীনতা অনেক কম এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী কবি না হ'লে প্রতিভার নিদর্শন এ'কে যেতে পারেন না। জগদ্দুর্লভ সেই শ্রেণীর ক্ষমতার অধিকারী না হ'লেও কবি ছিলেন একথা বলা যায়। এই কাব্যের কয়েক স্থলেই নৈয়ায়িক অধ্যাপকের অন্তরাল থেকে কবি মানুষটি দেখা দিয়েছেন। দুই একটি উদাহরণই এ সত্যের যাথার্থ্য সম্পাদন ক'রবে।

কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহিণী শ্রীরাধিকার বর্ণনাটি অপূর্ব,—যে কোনো প্রথম শ্রেণীর কবির পক্ষে গৌরবজনক। বিরহিণী শ্রীরাধিকা কমলপত্রে শয়ন করে রয়েছেন,—কিশলয় বীজনে বিরহদগ্ধ দেহ শীতল ক'রছে সখীরা। তিনি অচেতন,—সখীরা উৎকণ্ঠায় মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রছে—'বেঁচে আছেন তো?'—অসহিষ্ণু কোনো সখী হাহাকার করে কেঁদে উঠছে আর তার অশ্রুধারায় শ্রীরাধার দেহ সিক্ত হ'চ্ছে—

তাসামন্তঃ কমলশয়না পল্লবৈ বীজ্যমানা
মন্দাক্রান্তা প্রতিমুখ দৃশ্যপ্যাস্তি নাস্তীতিবীক্ষ্যা।
মৃত্যুপ্রায়া বিরহ দহনৈর্দগ্ধ দেহেতি কৃত্বা
হাহারাবং নয়নসলিলৈঃ সিচ্যমানা কয়াচিৎ॥৫৬

উদ্ধব বিরহকাতর বৃন্দাবনের সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছেন। ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন শ্রীকৃষ্ণ! 'কি কি দেখলে উদ্ধব সেখানে?—কাকে কাকে দেখলে? সকলেই কি কাঁদছে? জননী যশোদাকে দেখলে না!'—অপূর্ব বর্ণনার কবি জগদ্দুর্লভ যশোদার ছবি এ'কেছেন! বাৎসল্য রসের এ চিত্র প্রত্যেক রসিক মনকেই আকুল ক'রে তুলবে। 'দূরে অশ্রু-সজল দৃষ্টি জননী যশোদার,—খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে মাখন হাতে ক'রে দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছেন—আয় বাছা, আমার কোলে ফিরে আয়।—স্তনযুগলে দুগ্ধ ধারা ক্ষরিত হ'চ্ছে—

দ্বারি বারিনয়না নবনীতহস্তা
ব্যস্তা প্রসারিতভুজা সুতমাহরান্তী।
এহেহি বৎস মম কচ্ছ ইতি ব্রুবন্তী
চ্যোত্য পয়োধর পয়ঃ কিমুকাপি দৃষ্টাঃ॥
১৪ ৪র্থ সর্গঃ।

এইবার তাঁর অন্য রচনা 'প্রতি নাটক' সম্বন্ধে কিছু বলে এই প্রবন্ধকে শেষ করবো। সংস্কৃত 'মহানাটকের' প্রসিদ্ধি আছে—কলেবর মহাত্ম্যে এবং রচনা পদ্ধতিতে। রামচন্দ্রের জীবনগাথা অবলম্বনে এ নাটক লেখা। এ নাটকের রচনাকার কে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এর দু'টি সংস্করণ বর্তমানে পাওয়া যায়। উভয় সংস্করণের শ্লোক সংখ্যা এবং বিষয় বস্তুতে বিভিন্নতা রয়েছে। একটি সংস্করণ ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের অপরটি বাংলাদেশের সংস্করণের সংগ্রাহক মধুসূদন। ইহা নয় অংশে বিভক্ত এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ কলেবরের। অপর সংস্করণের সংগ্রাহক দামোদর এবং ইহা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কলেবরের। জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকার এই মহানাটক অবলম্বন করেই তাঁর প্রতিনাটক লিখেছেন। সাত অংকে পাঁচশো বত্রিশ শ্লোকে তিনি এই নাটক সমাপ্ত করেছেন। মহানাটকে নাটকের রচনা সম্বন্ধে যে কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে জগদ্দুর্লভ তাঁর নাটকের গোড়ায় এবং শেষে সেই কাহিনীই বিবৃত ক'রেছেন। শ্রীহনুমান্ নাকি নখের ঘায়ে প্রস্তর খণ্ডে মহানাটক রচনা করেন। কিন্তু বাল্মীকির ক্রোধের আশংকায় (মহানাটকে রামচন্দ্রের কীর্তিকলাপ বিবৃত হ'য়েছে—বাল্মীকির রামায়ণের বিষয়ও তাই) সমুদ্রের মধ্যে তা' ফেলে দেন। পরে রাজা বিক্রমাদিত্য (ধার নগরীর রাজা ভোজ) তা উদ্ধার করেন এবং সংস্কার সাধন ক'রে নাটকটি প্রচার করেন। এই কাহিনী ব্যক্ত করে জগদ্দুর্লভ বলছেন যে তিনি আজ্ঞাপ্রাপ্ত হ'য়ে প্রতিনাটকে সেই কাহিনী পূর্ণ করেছেন। হনুমান্ কর্তৃক নখের আঁচড়ে পাথরের চাপে নাটক লেখা এবং তা জলে ফেলে দেওয়া সাধারণ পাঠদের কাছে অবাস্তব মনে হ'লেও অলীক বলে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। পাথরে প্রশস্তি রচনা এদেশে অপরিচিত নয়। মহানাটকের মতো দীর্ঘকলেবরের না হোক্ ছোটো খাটো কাব্য পাথরে উৎকীর্ণ হ'য়েছে তার প্রমাণ আছে। আর মহানাটকের প্রাচীন রূপ যে বর্তমানের মতো দীর্ঘতর ছিল না একথা স্বীকার ক'রতে বাধা নেই।

প্রতিনাটক বৈচিত্র্যহীন। চিরাচরিত প্রথায় রামচন্দ্রের জীবন গাথা এতে বর্ণিত হয়েছে। মহানাটকের ন্যায় এতে নাটকীয় ধর্মের সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে। পুরাণের রীতিতে শ্লোকের পর শ্লোক লেখা হ'য়েছে সরলভাবে কাহিনী বর্ণনার ভংগিমায়। মহানাটককে নির্ভর করেই এতে প্রতিনাটক বলা হ'য়েছে, নইলে এ জাতীয় রচনাকে নাটক আখ্যা দেবার কোনও যুক্তিসংগত কারণ নেই। রামচন্দ্রের বৈকুণ্ঠ গমনে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখানে শেষ অংশের উদ্ধৃতি করছি—

'সাম্রাজ্যং রামরাজ্যং ত্রিভুবনবিদিতং যুক্ততেঽস্মাপি লোকে
শ্রীরামঃ পালয়ং স্তৎ পরমকরুণয়া ভ্রাতৃভিঃ প্রাণতুল্যৈঃ।
স্বাযোধ্যাং রাজধানীং ক্ষয় ভয়রহিতাং মোক্ষধামাপি কৃত্বা
তস্যাং নাকাল মৃত্যুঃ স্ম বসতি দশসাহস্রবর্ষাণি সম্রাট্॥১৮
কর্তা কর্তা ভবেচ্চেদ্রঘুকুল নৃপতি রাম ইচ্ছার্থ সিদ্ধিং
সত্যাদুত্তীর্থ তাতস্য বিপিনবসতেঃ স্বামযোধ্যাং সমেত্য।
প্রত্যাশাসীৎ প্রজানামিতি মনসি বিবিচ্য স্মরণং স্বাম্বেন্দ্র
স্তাভ্যো দত্তার্দ্ধিসোঽস্থে ইহ পুনরগমৎ স্বীয় বৈকুণ্ঠমাস্তিঃ॥১৯

এধ শ্রীরামচন্দ্রচরিত মধুরিমাস্বাদ নৈপুণ্য ধন্যে নাদৌ শ্রীবহ্নপুরাণে রচিতে মহানাটকে সিন্ধুমগ্নে। তৎ পশ্চাদ্বিক্রমাদিত্যরচিত ইহ যন্নোদ্ধ তং তস্য পূর্ত্যৈ সপ্তাং কৈঃ।শ্রীহনুমান্ কৃপয়তু তু জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালংকার ভট্টাচার্য বিরচিতঃ। ইতি নানুর গ্রামনিবাসি মহামহোপাধ্যায় রামকান্ত বিদ্যালংকার ভট্টাচার্য বিরচিতঃ প্রতিনাটকাখ্যো গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ। শিব শিবমস্তু শকাব্দাঃ। ১৭৫৪॥

অনুবাদসাহিত্য



কালো প্রাসাদের অধিপতি

শ্রীতপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

[কনান ডয়েল (Conan Doyle) উনবিংশ শতকের এক বিশিষ্ট এবং প্রতিভাবান সাহিত্যিক। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এডিনবার্গে এঁর জন্ম হয় এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পার্থিব জীবনের অবসান ঘটে। প্রথম জীবনে ইনি চিকিৎসক ছিলেন কিন্তু এতে উপার্জ্জন কম হওয়ায় তিনি তৎকালীন সাময়িক পত্রসমূহে রচনা পাঠাতে থাকেন এবং এতে তাঁর সুনাম ও অর্থোপার্জ্জন দুই-ই ঘটে। এরপর তিনি পুরোপুরিভাবে সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেন। এঁর প্রসিদ্ধ রচনা "A study in Scarlet", "Micah Clarke," "The Sign of Four," "The white Company," "Unclc Bernac" "The Hound of the Baskervillies," "Sir Nigal," ইত্যাদি। এঁর সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ রচনা "The Adventures of Sherlock Holmes" পড়েন নি এমন শিক্ষিত লোক বোধ হয় খুব কমই আছেন। প্রতিটি লেখার মধ্যেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভা এবং বলিষ্ঠ চিন্তাশীলতার সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান।

বর্ত্তমান গল্পটী তাঁর প্রসিদ্ধ "The Load of Chatean Noir"-এর অনুবাদ। ১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী এবং জার্ম্মানদের মধ্যে যে ভয়াবহ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, এটি সেই পটভূমিকায় রচিত। গল্পটির প্রতিটি ঘটনা শিরায় আলোড়ন এবং রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলবে]

যখন জার্ম্মানরা বলপূর্ব্বক ফ্রান্সে প্রবেশ করেছে এবং যখন তরুণ গণতন্ত্রের ক্ষমতা চ্যুতবিচ্যুত হয়ে অ্যার্সিন এর উত্তরদিকে এবং লয়েরএর দক্ষিণে বহিষ্কৃত হয়েছে, এটি সেই সময়ের ঘটনা। কখনও দক্ষিণে, কখনও উত্তরে বেঁকে, কখনও বিচ্যুত হয়ে, কখনও একীভূত হয়ে তিনটি বিরাট সৈন্যদলের ধারা এসে প্যারিসের চারদিকে জমা হয়ে একটি প্রশস্ত হ্রদের সৃষ্টি করল। একটি ক্ষুদ্র ধারা এখান হতে বেরিয়ে গেল উত্তরে, একটি দক্ষিণে, অরলিয়েন্সএর দিকে এবং অপরটি পশ্চিমে নর্ম্মাণ্ডীর দিকে। ভিয়েপেতে ঘোড়ার পেট পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়ে চলতে চলতে বহু জার্ম্মান অশ্বারোহী সৈন্য প্রথম সমুদ্র দেখল।

দেশমাতৃকার সেই মাধুর্য্যমণ্ডিত মুখের উপর নিপীড়ন ও অত্যাচারের চিহ্ন দেখে ফরাসীদের মন ক্রোধে কালো হয়ে উঠল। তারা যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে। তারা বহু চেষ্টা করেছে, সেই অগণিত অশ্বারোহীদের, অসংখ্য পদাতিক-দের এবং ক্ষমতাশালী বন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। একতাবদ্ধ যুদ্ধে তারা পরাজিত হবে না। কিন্তু একজনার সঙ্গে একজনা, দশজনার সঙ্গে দশজনা, তারা তাদের সমান। একজন নির্ভীক ফরাসী এখনও একজন জার্ম্মানকে আক্ষেপোক্তি করাতে পারে—"কেন রাইনএর তীর ছেড়ে এসেছিলাম! যুদ্ধ এবং আক্রমণের মাঝে আরেকটা যুদ্ধ নিভৃতে চলতে লাগল—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত, একদিকে জঘন্য হত্যাকাণ্ড, অন্যদিকে নৃশংস প্রতিহিংসা। চব্বিশ নম্বর পোজেন পদাতিক সৈন্যদলের কর্ণেল ফন্‌গ্রাম্ এই নূতন পরিকল্পনায় সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছিলেন। ছোট নর্ম্যান সহর লেস্ এ্যাণ্ডলিস্‌এর দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। তাঁর পাহারা দেওয়া সৈন্যরা জেলার চারদিকে গ্রামে, গোলা-বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ত। তাঁর জায়গার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোন ফরাসী সৈন্য ছিল না, তবু প্রতিদিন সকালে তিনি সংবাদ পেতেন তাঁর টহলদারী সৈন্যদের তাদের পাহারার জায়গায় মৃত অবস্থায় দেখা গেছে অথবা শুনতেন, যে-সৈন্যদল আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করতে গেছে তারা আর ফিরে নি। কর্ণেল ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বেড়াতেন, তখন গোলাবাড়ী আগুনে ধূ ধূ করে জলত, আর সমস্ত গ্রাম ভয়ে কম্পমান হয়ে থাকত। কিন্তু পরদিন সকালে সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সংবাদ তাঁর কানে আসত। সেই অজ্ঞানা শত্রুদের হাত হতে তিনি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাচ্ছিলেন না। তবুও ঘটনাটা এত জটিল হওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল না। কারণ

উপায়ে এবং পরিচালনায় এমন কতকগুলি সাধারণ চিহ্ন ছিল, যা থেকে নিঃসংশয়ে বোঝা যেত এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড একই জায়গা থেকে সংঘটিত হচ্ছে।

কর্ণেল ফন্‌গ্রাম যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করলেন, কিন্তু কিছুই হল না। অর্থে হয়ত কাজ হতে পারে। তিনি সমস্ত গ্রামে ঘোষণা করে দিলেন যে, সংবাদ দিতে পারলে তাকে ৫০০ ফ্রাঙ্ক দেওয়া হবে। তাতে কিছুই হল না। তারপর ৮০০ ফ্রাঙ্ক। গ্রামের লোকগুলো কিছুতেই পথ-ভ্রষ্ট হল না। তারপর একজন কর্পোরাল এর হত্যাকাণ্ডে তিনি উন্মত্ত হয়ে এক হাজারে উঠলেন এবং একজন চাষী ফ্যাকোস রিজেন এর সন্ধান কিনে নিলেন। তার নর্ম্যান-সুলভ লোভ তার ফরাসীসুলভ ঘৃণার চেয়ে বেশী হল।

কর্ণেল তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান, নীল পরিচ্ছদ পরিহিত, ইঁদুর মুখো জীবনটার দিকে অবজ্ঞাভরে তাকিয়ে বললেন, "তুমি জান কে এই হত্যাগুলো করেছে ?"

—"হ্যাঁ, কর্ণেল।"

—"আর তিনি—?"

—"আমার হাজার ফ্রাঙ্ক, কর্ণেল।"

—"তোমার কথা সত্য কিনা পরীক্ষা না করা পর্য্যন্ত এক পয়সাও পাবে না। বল,কে এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক।"

—"কালো প্রাসাদের কাউণ্ট এসটেস্।"

—"অসম্ভব"—চেঁচিয়ে উঠলেন কর্ণেল, "একজন ভদ্রলোক কখনও এরকম দুষ্কর্ম্ম করতে পারেন না।"

গেঁয়ো লোকটা বিরক্তিতে ঘাড় নাড়ল।

—"আমি বেশ বুঝছি আপনি কাউণ্টকে চেনেন না। শুনুন তাহলে ঘটনাটা, কর্ণেল: আমি যা বলছি সব সত্য, আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমি ভীত নই। কালো প্রাসাদের কাউণ্ট এসটেস্ খুব নির্ম্মম লোক, ভালো সময়েও তিনি নির্ম্মমই ছিলেন। সম্প্রতি তিনি আরো ভীষণ হয়ে উঠেছেন। তাঁর ছেলে মারা যাওয়ায় তিনি এরকম হয়েছেন। ডাওয়ের অধীনে ছিল তাঁর ছেলে। সে বন্দী হয়। জার্ম্মানী হতে পলায়ন করতে গিয়ে সে মৃত্যুবরণ করে। কাউণ্টের ঐ একমাত্র পুত্র। ভদ্রলোক এতে একেবারে উন্মত্ত হয়েছেন। তাঁর চাষাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি চুপিচুপি জার্ম্মান সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তিনি কতজনকে হত্যা করেছেন বলতে পারবো না,—কিন্তু মৃতব্যক্তির কপালে তিনি রক্তের ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে দেন। তাঁর পরিবারের ঐটিই চিহ্ন।"

কথাটা সত্য। নিহত প্রহরীদের প্রত্যেকের কপালে বাঁকা ক্রুশ-চিহ্ন কেটে বসানো, ঠিক শিকারের ছুরি দিয়ে কাটা। কর্ণেল তাঁর দৃঢ় পিঠটা বেঁকিয়ে টেবিলের মান-চিত্রের দিকে আঙ্গুল বুলাতে লাগলেন।

"কালো প্রাসাদও এখান হতে বারো মাইলের বেশী নয়।" তিনি বলে উঠলেন।

—"৯ মাইল এবং ১ কিলোমিটার কর্ণেল।"

—"তুমি জায়গাটা জান ?"

—"ওখানে আমি কাজ করেছিলাম।"

কর্ণেল ঘণ্টা বাজালেন। সার্জ্জেণ্টকে বললেন, "ওকে খেতে দিয়ে বন্দী করে রাখ।"

—"আমাকে আটকিয়ে রাখছেন কেন ? আমি ত আর কিছু বলতে পারব না।"

—"পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তোমায় প্রয়োজন।

—"পথ দেখাতে ? কিন্তু কাউণ্ট ? তাঁর কবলে একবার পড়লে আর—? দোহাই, দোহাই কর্ণেল।"

কর্ণেল হাত নেড়ে তাকে যেতে আদেশ করে বললেন, "ক্যাপ্টেন বোমগার্টেনকে আমার কাছে এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও।"

তাঁর আমন্ত্রণে যে ব্যক্তি উপস্থিত হলেন তাঁর বয়স মাঝামাঝি, গাল ভারী, চোখ নীল, হলদে বাঁকানো গোঁফ, বাদামী মুখাকৃতি, পাগড়ীর নীচ হাতীর দাঁতের মত সাদা। মাথা টাক্‌পড়া, কিন্তু চামড়া সুচিক্কণ। তাঁর উজ্জ্বল পিছন দিকটা তাঁর নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা আয়না ভেবে গোঁফে তা দিত। যোদ্ধা হিসাবে তিনি শ্লথগতি, কিন্তু বিশ্বস্ত এবং নির্ভীক। অন্য কর্ম্মচারীরা যেখানে বিপদের মাঝে পড়তে পারে সেখানে কর্ণেল এঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন।

তিনি বললেন, "আজ রাত্রেই তোমাকে কালো প্রাসাদ রওনা হতে হবে, ক্যাপ্টেন। পথ দেখাতে একজন লোক পাওয়া গেছে। কাউণ্টকে বন্দী করে এখানে আনবে। ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলে তাকে তক্ষুণি গুলি করবে।"

—"সঙ্গে কতজন লোক নেব, কর্ণেল ?"

—"আমাদের চারদিকে গুপ্তচর। আমরা তাকে বন্দী করতে যাচ্ছি এটা জানার আগেই যদি ছোঁ মেরে আনতে পারি তাহলে হবে। বেশী সৈন্য নিলে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। তোমাকেও আমাদের থেকে বিচ্যুত হয়ে ধরা পড়া চলবে না।"

—"আমি যেন জেনারেল গোবেনএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি এমনিভাবে উত্তরদিকে অগ্রসর হব কর্ণেল। তারপর মানচিত্রে যে পথটা দেখছি ঐ পথে বেঁকে তারা জানবার আগেই কালোপ্রাসাদে হাজির হব। কুড়িজন লোক নিলেই—"

—"ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। আমি আশা করি কাল প্রত্যুষে তোমাকে বন্দীসহ দেখব।"

ডিসেম্বরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা রাত্রি। কুড়িজন পোজেন বাসীকে নিয়ে ক্যাপ্টেন বোমগার্টেন লেস্ এ্যাণ্ডলিস্ হতে বেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমের রাস্তা ধরলেন। দু মাইল সেই পথে যাবার পর চাকার দাগেভরা অপ্রশস্ত রাস্তা ধরে তাঁর ঈপ্সিত লোকটিকে ধরবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি চললেন। দীর্ঘ পপ্‌লার গাছের মাঝ দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দ করতে করতে, দুপাশের মাঠের উপর দিয়ে খস্ খস্ শব্দ করতে করতে, ছিপ্ ছিপ্ করে অবিরাম ঠাণ্ডা বৃষ্টি পড়েই চলেছে। ক্যাপ্টেন অগ্রসর হয়েছেন প্রথমে, তাঁর পাশে অভিজ্ঞ সার্জেণ্ট মোজার। ফরাসী গেঁয়ো লোকটার হাতের সঙ্গে সার্জেণ্টএর কব্জি বাঁধা রয়েছে। লোকটাকে কানে কানে বলে দেওয়া হয়েছে যে সহসা আক্রমণ হলে প্রথম গুলি তার মাথার উপর পরীক্ষা করা হবে। নরম ভিজে মাটিতে জুতো কিচ্ কিচ্ করতে করতে, বৃষ্টিতে মুখ নীচু করে সেই নিবিড় অন্ধকারে তাদের পশ্চাতে কুড়িজন লোক চলেছে। তারা কোথায় কি জন্য যাচ্ছে ভেবে মনে উদ্দীপনা রয়েছে এখনো। সাথীদের হারিয়ে মন তাদের নিষ্ঠুর, মমতাহীন হয়ে উঠেছে। তারা জানে এ কাজটা অশ্বারোহী সৈন্যদেরই যোগ্য, কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যদল সমস্ত অগ্রগামী দলের সঙ্গে গিয়েছে,—তাছাড়া যে সৈন্যদলের লোক মারা গিয়েছে তাদের প্রতিশোধ নেওয়া কর্তব্য।

আটটার সময় লেস এ্যাণ্ডলিস হতে তারা রওনা হয়েছিল। চুড়োর উপর বংশচিহ্নশোভিত পাথরের কাজ-করা দুটো গম্বুজ যেখানে লোহার প্রশস্ত দুর্গকে অবলম্বন করে আছে তার সম্মুখে এসে সাড়ে এগারোটায় পথ-প্রদর্শক থামল। যে দেওয়ালে এই দুর্গটা ছিল সেটি ভেঙ্গে পড়েছে, কিন্তু তলদেশে উৎপন্ন ঝোপ-ঝাড়, লতা-গুল্মকে ছাড়িয়ে বিরাট দুর্গটি উঠেছে। গত বছরের হেমন্তকালের ঝরাপাতায় ভর্ত্তি ওকশাখার তলার বীথি দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। পথের প্রান্তে এসে তারা চারদিক পরিদর্শন করল।

কালো দুর্গ সামনেই, দুটো জলভারাবনত মেঘের মাঝ দিয়ে চাঁদ আলোকপাত করে বহুদিনের বাড়ীটাকে আলো-ছায়ায় ভরে দিয়েছে। বাড়ীটা ঠিক ইংরাজী 'L' এর মত দেখতে। খিলেন দেওয়া দরজা সামনে, আর যুদ্ধজাহাজের ছিদ্রের মত পরপর জানালা। উপরে কালো ছাদ—ছাদের কোণগুলি থামে পরিণত হয়েছে। সমস্ত বাড়ীটা নিঃঝুম হয়ে আছে। পেছনে এবড়ো-খেবড়ো ভাসমান মেঘের খণ্ডে আকাশ কালো। নীচে জানালায় শুধু একটি মাত্র আলো জ্বলছে।

ক্যাপ্টেন চুপি চুপি লোকদের আদেশ করলেন। কয়েকজন হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দুয়োরে যাবে, কয়েকজন পশ্চিমদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। তিনি এবং সার্জেণ্ট গোপনে পা টিপে টিপে আলোকিত জানালার দিকে যেতে লাগলেন।

তাকিয়ে দেখলেন ঘরটা খুব ছোট, সাজসরঞ্জামও বিশেষ কিছু নেই। একজন বয়স্ক লোক চাকরের পরিচ্ছদে একটি গলে-যাওয়া মোমবাতির আলোয় এক-খানি ছেঁড়া কাগজ পড়ছে। কাঠের চেয়ারে ঠেস্ দিয়ে বাক্সর উপর পা তুলে সে বসে আছে। পাশের টুলে একবোতল সাদা মদ, আর একটা অর্দ্ধপূর্ণ মদের গ্লাস। জানালার কাচ চূর্ণবিচূর্ণ করে সার্জেণ্ট তার বন্দুক ঢুকিয়ে দিতেই লোকটা ভীষণ চীৎকার করে উঠল।

—"যদি মরতে না চাও তাহলে চীৎকার করো না, সমস্ত বাড়ী প্রহরীবেষ্টিত—পালাবার চেষ্টা করবে না। এস, দুয়োর খুলে দাও, নাহলে ভিতরে গিয়ে তোমার প্রতি কোন মমতা দেখানো হবে না।"

—"দোহাই, গুলি ছুঁড়বেন না। আমি খুলছি দুয়োর, খুলে দিচ্ছি—"

কাগজটা হাতে মুড়ে দৌড়ে ঘর হতে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন তালা খোলার ঘং ঘং শব্দে ও খিল খোলার ঘটাং ঘটাং শব্দে দুয়োর খুলে গেল। তারা তাড়াতাড়ি করে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

—"কালো প্রাসাদের কাউন্ট এসটেস্ কোথায় ?"

—"আমার প্রভু ? তিনি বাড়ীতে নেই।"

—"এত গভীর রাত্রে বাড়ীতে নেই ? মিথ্যে কথা বলার চেষ্টা করেছ কি মৃত্যু।"

—"সত্য কথা, মশায়। তিনি বাড়ীতে নেই।"

—"গিয়েছেন কোথায় ?"

—"জানি না।"

—"কি জন্য গিয়েছেন ?"

—"তাও জানি না। আপনার বন্দুক উঁচিয়ে কিছু হবে না। যা জানি না, মেরে ফেললেও তা বলাতে পারবেন না।"

—"এ সময়ে তিনি কি প্রায়ই বেরোন ?"

—"হ্যাঁ।"

—"ফেরেন কখন ?

—"সকালের আগে।"

ক্যাপ্টেন বোম্‌গার্টেন একটা জার্ম্মান শপথ করলেন ভারী গলায়। তাঁর ভ্রমণ তাহলে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল। লোকটার জবাব এত যথাযোগ্য যে কিছুতেই মিথ্যে হতে পারে না। তিনিও এছাড়া অন্য চিন্তা করতে পারতেন না। তবুও বাড়ীটা খানাতল্লাসী করে নিঃসংশয় হতে হবে। সম্মুখের আর পিছনের দরজায় প্রহরী রেখে কম্পিত চাকরটাকে তিনি সামনে নিয়ে চললেন। কম্পমান আলো পুরানো দেওয়ালে আর ওক দেওয়া বর্গার নীচু ছাদে অস্থির ছায়াপাত করছে। নীচের তলার পাথর বাঁধানো বিরাট রান্নাঘর থেকে বহুদিনের কালো-হওয়া সঙ্গীত-মঞ্চ-শোভিত তেতলার খাবার ঘর পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ীটা অনুসন্ধান করা হল, কিন্তু জীবিত প্রাণীর কোথাও খোঁজ পাওয়া গেল না। সবচেয়ে উপরের তলায় চিলেকোঠায় চাকরের বৃদ্ধা স্ত্রী মেরীকে দেখতে পাওয়া গেল। গৃহস্বামীর আর কোন চাকর নেই। কিন্তু তাঁর উপস্থিতির কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না।

সমস্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে ক্যাপ্টেন বোম্‌-গার্টেনএর অনেক সময় লাগল। বাড়ীটা অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন। মাত্র একজন উঠতে পারে এমনি অপ্রশস্ত সিঁড়ি আঁকাবাঁকা বারান্দার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। ঘরের দেওয়াল এত মোটা যে পাশাপাশি ঘরের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। প্রত্যেক ঘরে বড় বড় আগুনের কুণ্ড, আর দেওয়ালে ৬ ফুট চৌকা জানালা। ক্যাপ্টেন বোম্‌গার্টেন পা দিয়ে ঠুকলেন, পর্দ্দাগুলো সব ছিন্ন-বিছিন্ন করে ফেললেন, তলোয়ারের বাঁট দিয়ে আঘাত করলেন। যদি কোথাও গোপনভাবে লুকোবার জায়গা থাকে তাই। কিন্তু তার কোন খোঁজই পেলেন না।

অবশেষে তিনি বললেন, "একটা বুদ্ধি এসেছে। এই লোকটাকে কড়া পাহারা দাও, আর দেখ ও যেন কারোও সঙ্গে কোন সংযোগ না রাখতে পায়।"

—"আচ্ছা ক্যাপ্টেন।"

—"সামনের পিছনের দরজায় চারজন করে লোক লুকিয়ে রাখ। আমাদের পাখী সকালে দুর্গে ফিরে আসতে পারে।"

—"অপর লোকেরা এখন কি করবে, ক্যাপ্টেন ?"

—"তারা রান্নাঘরে নৈশভোজন আরম্ভ করুক। এই লোকটা তোমাদের মদ-মাংস সরবরাহ করবে। রাত্রিটা বড় ঝোড়ো, বিশৃঙ্খল—গ্রামের রাস্তা হতে এখানে আরামে থাকা যাবে।"

—"আপনি কোথায় থাকবেন, ক্যাপ্টেন ?"

—"আমি খাবার ঘরেই নৈশ ভোজন করব। কাঠ দেওয়া রয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে নেব। কোন বিপদের ইঙ্গিত পেলে আমাকে ডাকবে। ওহে নৈশভোজনের জন্য কি দিতে পারবে ?"

—"মশায়, একদিন ছিল যখন বলতে পারতাম, 'আপনি যা চান,' কিন্তু এখন অনেক চেষ্টা করে লাল মদ এক বোতল, আর বাসি রাঁধা মুরগী একটা দিতে পারি।"

—"যাক, তাতেই চলে যাবে, এর সঙ্গে একজন প্রহরী দাও, আর কোন বেয়াদপি করলে সঙ্গীনের খোঁচায় অস্থির করবে, সার্জ্জেণ্ট।"

ক্যাপ্টেন বোম্‌গার্টেন একজন দক্ষ যোদ্ধা। পূর্ব্ব-প্রদেশে এবং বোহেমিয়ায় থাকাকালীন শত্রুর ঘাড়ে বসে

থাকা খাওয়ায় রপ্ত আছেন। চাকর যখন তাঁর খাবার আনছিল তখন রাত্রিটা আরামে কাটাবার ব্যবস্থা করছিলেন। দশটা বাতির ঝাড় লণ্ঠন তিনি মাঝখানের টেবিলটায় জ্বালালেন। আগুনটা ইতিমধ্যে জ্বলে উঠেছে, চিটপিট শব্দ হচ্ছে, নীল প্রখর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে ঘর। জানালার ধারে গিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ক্যাপ্টেন, চাঁদ গিয়েছে ডুবে, জোরে বৃষ্টি সুরু হয়েছে, বাতাসের প্রবল আর্ত্তনাদের শব্দ হচ্ছে। আবছা, কালো গাছের ছায়াগুলো দুলছে। এই আবহাওয়া তাঁর সুখকর স্থানের উপর এবং চাকরের আনা মদ ও মুরগীর উপর বেশ একটা রুচিকরতা এনে দিল। দীর্ঘ পথ ভ্রমণে তিনি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত। একটা চেয়ারের উপর তলোয়ার, পাগড়ী, রিভলভার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আগ্রহসহকারে খেতে বসলেন। তারপর সামনে মদের গ্লাস নিয়ে ও ঠোঁটের মাঝে সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারটায় ঠেস দিয়ে চারদিকে তাকালেন।

উজ্জ্বল আলোক মালার মধ্যে তিনি বসেছিলেন এবং তাতে তাঁর কাঁধের রূপোর বন্ধনী চক্ চক্ করছিল। তাঁর বাদামী মুখ, ভারী ভুরু, হলদে গোঁফ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেখান হতে বাইরে, সেই পুরাতন ভোজনশালায় সব কিছুই ছায়াময়, আবছা। দেওয়ালের দু'দিক ওক কাঠে মোড়া, অন্য দুদিকে ক্ষিপ্রবেগে অগ্রসর শিকারী কুকুর আর হরিণের ছবি আঁকা ছিন্ন, ময়লা পর্দা ঝুলছে। আগুনের কুণ্ডের উপর, এই বংশের এবং এদের আত্মীয়দের নানারূপ কুলচিহ্নজ্ঞাপক ঢাল সারি সারি সাজানো আর প্রত্যেক ঢালের মাঝে সেই ভয়াবহ ক্রুশ চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে আঁকা।

কালো প্রাসাদের প্রাচীন দুর্গ-মালিকদের চারজনার ছবি আগুনের কুণ্ডের সামনে রয়েছে। সকলের তলোয়ারের মত নাক, বিশিষ্ট আভিজাত্যজ্ঞাপক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তারা প্রায় এক রকমই দেখতে, কেবল পোষাকে বোঝায় কে ধার্ম্মিক আর কে বীর! 'বাল্টিক সাগরের কূলের লোক হয়ে কি আশ্চর্য্য ঘটনাকে এই অহঙ্কারী নর্ম্যান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোজনশালায় রাত্রি যাপন করতে এলাম। তামাকের ধোঁয়াচ্ছন্ন অবস্থায় সেই ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে ক্যাপ্টেন বোম্‌গার্টেন বেশ গুরু আহারে অলস হয়ে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলেন। আগুনটার আঁচ বেশ এবং ক্রমে তাঁর চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল। তাঁর ঠোঁট আস্তে আস্তে বুকের কাছে নেমে এলো, আর দশটা বাতি জ্বল্‌জ্বল্ করে জ্বলতে লাগলো তাঁর প্রশস্ত, স্বচ্ছ টাকের উপর।

হঠাৎ একটা শব্দে তিনি জেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন। সহসা তাঁর বিশৃঙ্খল বুদ্ধিতে মনে হল বুঝি সামনে টাঙানো ঐ ছবিগুলার ফ্রেম হতে কেউ নেমে আসছে। টেবিলের পাশে, তাঁর কাছ হতে অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক বিরাট লোক—অকম্পিত, ধীর, নিশ্চুপ—ভীষণ উজ্জ্বল চোখ দুটি ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষণই নেই। তাঁর চুল কালো, চামড়ার রং জলপাইয়ের মত, সুচোলো দাড়ি। তাঁর সমস্ত শরীর উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড ভয়াবহ নাকের দিকে। বিগত বছরের আপেলের মত তাঁর গাল কুঁকড়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রশস্ত কাঁধ আর অস্থিপূর্ণ গ্রন্থিল হাত হতে বোঝা যায়—বয়স হলেও শরীরের শক্তি তাঁর বিন্দুমাত্র কমে নি। তাঁর চওড়া বুকের উপর দুই হাত ন্যস্ত, মুখ স্থির, প্রশান্ত হাসিতে পূর্ণ।

যে চেয়ারটায় অস্ত্র-শস্ত্র রাখা ছিল সেই চেয়ারটার দিকে ক্যাপ্টেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তিনি বললেন, "দয়া করে অস্ত্র-শস্ত্র খুঁজে কষ্টভোগ করবেন না। কিছু মনে করবেন না, যে বাড়ীর প্রত্যেকটি দেওয়াল মৌচাকের মত নিভৃত পথে ভর্ত্তি সেই বাড়িতে এতখানি আরামে বাস করা আপনার পক্ষে নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছে। শুনলে আনন্দিত হবেন, যখন আপনি ভোজন করছিলেন তখন চল্লিশজন লোক আপনার উপর নজর রাখছিল।

ওঃ, তাই নাকি?—

হাতের মুঠো দৃঢ় করে ক্যাপ্টেন বোম্‌গার্টেন এক পা এগোলেন। কাউণ্ট ডান হাতের রিভলভারটা উচিয়ে বাঁ হাতে ক্যাপ্টেনকে ছুঁড়ে চেয়ারে ফেলে দিলেন।

তিনি বললেন, "দয়া করে বসুন। আপনার সৈন্য-বাহিনী সম্বন্ধে ভাবনার কোন কারণ নেই। তাদের সুব্যবস্থা আগেই হয়েছে। বেশ আশ্চর্য্য যে পাথরের মেঝের তলায় কি হচ্ছে কেউ শুনতে পায় না। তাদের দায়িত্ব হতে আপনি অব্যাহতি পেয়েছেন, এখন নিজের

অবস্থাই চিন্তা করুন। আপনার নামটি দয়া করে বলবেন কি?"

—"আমি চব্বিশ নম্বর পোজেন বাহিনীর ক্যাপ্টেন বোম্গার্টেন।"

—"আপনার ফ্রেঞ্চ ত চমৎকার, যদিও আপনার দেশের লোকের মত Pকে B বলার একটা অভ্যাস আছে। আপনার লোকেরা যখন বলছিল "দয়া করুন" তখন আমার ভারী আনন্দ লাগছিল। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কে আপনার সঙ্গে কথা বলছেন?"

—"কালো প্রাসাদের কাউণ্ট।"

—"ঠিক ধরেছেন। আপনি আমার প্রাসাদে আসতেন আর আমি একটা কথাও বলতে পারতাম না —সেটা খুব পরিতাপের বিষয় হত। অনেক জার্ম্মান সৈন্যের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু অফিসারের সংস্পর্শে আসিনি কখনও। আপনাকে বহু কথা আমার জানাবার আছে।"

চেয়ারে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন ক্যাপ্টেন বোম্গার্টেন। তিনি সাহসী, কিন্তু এই লোকটির আচরণে এমন কিছু ছিল যে ভয়ে তাঁর শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ডানদিক, বাঁদিক, সব দিকেই তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ্ করছিলেন, কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র কোথাও নেই। আর দ্বৈরথ যুদ্ধে এই প্রকাণ্ড শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে তিনি শিশুমাত্র। কাউণ্ট মদের বোতলটা নিয়ে আলোয় দেখতে লাগলেন।

তিনি বললেন, "ছি, ছি, পিয়ারে আপনার জন্য এই করেছে? আপনার দিকে তাকাতে আমার লজ্জা হচ্ছে ক্যাপ্টেন। এর চেয়ে ভাল কিছু করা দরকার।"

তাঁর শিকারের জামায় ঝোলানো একটা বাঁশীতে ফুঁ দিতেই সেই বৃদ্ধ চাকরটি সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে উপস্থিত হল।

তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "১৫ নম্বর পিপে হতে চেম্বারটিন নিয়ে এস!" মুহূর্ত্তের মধ্যে মাকড়সা-জাল ভর্তি বোতলকে শিশুর মত সযত্নে নিয়ে এল। কাউণ্ট দুটি গ্লাস কানায় কানায় ভর্তি করলেন।

তিনি বললেন, "পান করুন, আমার ভাণ্ডারে এইটিই সবচেয়ে উত্তম। রোঁ থেকে প্যারিসএর মধ্যে এর জুড়ি আর নেই। খেয়ে খুশী হন। নীচে বাসি মাংস রাখা আছে। হনফ্লোর হতে এসেছে দুটো টাট্‌কা সামুদ্রিক গল্‌দা চিংড়ি। দ্বিতীয়বার এই মুখরোচক নৈশভোজনে বসবেন না?"

জার্ম্মান অধিপতি মাথা নাড়লেন। তিনি গেলাসটা অবশ্য নিঃশেষে পান করলেন এবং গৃহাধিপতি আবার সেটি পূর্ণ করে—এ ভাল খাবারটা, ও ভাল খাবারটা দেওয়ার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

—"আমার বাড়ীতে সমস্ত কিছুই আপনার। শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষা। তাহলে, আমি মদ খেতে খেতে আপনাকে একটা গল্প শোনাই। একজন জার্ম্মান সৈন্যাধ্যক্ষকে এটা বলার আমার বড়ই আগ্রহ। আমার একমাত্র পুত্র এস্‌টেস্‌এর কথা। সে ধরা পড়ে পালাতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। ছোট মজার গল্প এবং আমি বেশ স্পর্দ্ধার সঙ্গেই বলতে পারি এটা জীবনে আপনি কখনও ভুলবেন না।

"প্রথমেই আপনাকে বলা প্রয়োজন যে আমার ছেলে গোলন্দাজ বাহিনীতে ছিল—ক্যাপ্টেন বৌমগার্টেন। সুশ্রী, তরুণ যুবক, তার মায়ের আশা ও সৌভাগ্যের বস্তু। তার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি মারা যান। তার সঙ্গে ছিল তার সমপর্য্যায়ের একজন সেনানায়ক—সেই-ই খবরটা পৌঁছে দেয়। সে পালাতে পেরেছিল, আমার ছেলে মৃত্যুবরণ করল। সে আমাকে যা কিছু বলেছে, সমস্তই আপনাকে শোনাতে চাই।

"এস্‌টেস্ ৪ঠা অয়েসেনবার্গে বন্দী হয়। বন্দীদের নানাভাবে বিভক্ত করে বিভিন্ন পথে জার্ম্মানীতে পাঠানো হয়। এই এস্‌টেস্‌কে লয়টারবার্গ নামক গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত জার্ম্মান কর্ম্মচারীর কাছ হতে সে ভাল ব্যবহার পায়। দয়ালু কর্ণেল আমার ক্ষুধার্ত্ত ছেলেকে খেতে দিয়েছিলেন, তাঁর সমস্ত ভাল ভাল জিনিষ তাকে দিতে চেয়েছিলেন, একবোতল ভাল মদ খুলেছিলেন, যেমন আমি আপনার জন্য করেছি এবং তাকে কৌটা থেকে সিগারেট দিয়েছিলেন। আমি আমার কৌটা থেকে নেবার জন্য আপনাকে মিনতি :করতে পারি কি?

জার্ম্মান সেনাপতি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন। ঐ হাসিপূর্ণ ঠোঁট আর উজ্জ্বল চোখ দেখে লোকটির সম্বন্ধে ভয় তাঁর মনে বেড়েই চলেছিল।

—"আপনাকে ত জানালাম, কর্ণেল আমার ছেলের প্রতি ভাল ব্যবহারই করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরের দিন বন্দীদের রাইনএর ওপারে এট্‌লিন জেলে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আগের মত সুযোগ হল না। যে কর্ম্মচারী এদের পাহারা দিত ক্যাপ্টেন, সে একটা বদমাইস দুর্বৃত্ত। যে সমস্ত বীর তার কবলে পড়েছে তাদের তিরস্কার ক'রে, খারাপ ব্যবহার করে সে আমোদ পেত। সেই রাত্রে আমার পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে তার একটা কথার প্রত্যুত্তর দেওয়ায় সে এই রকমভাবে তার চোখে আঘাত করেছিল।"

ঘুষির সেই প্রচণ্ড শব্দ সারা কক্ষে ধ্বনিত হতে লাগল। ক্যাপ্টেনের মুখ সামনে ঝুঁকতেই হাত দিয়ে আটকালেন, আর আঙ্গুলের মাঝ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। কাউণ্ট আবার তাঁর চেয়ারে বসলেন। "ঘুষিতে বিকৃত আমার ছেলের শরীরকে সে উপহাসের বস্তু করে তুলেছিল। আপনাকেও এখন একটু উপহাস্যাস্পদ দেখাচ্ছে বৈ কি, ক্যাপ্টেন এবং আপনার কর্ণেল নিশ্চয়ই বলবেন যে আপনি মদ খেয়ে বিশ্রী ব্যাপার করছিলেন। যাই-হোক, আমার ছেলের বয়স অল্প এবং তার দরিদ্র অবস্থা দেখে, একজন দয়ালু মেজর কোন জামীন না রেখে নিজের পকেট হতে দশ নেপোলিয়ন তাকে ধার দেন। তাঁর নাম যখন আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় তখন সেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার ছেলের প্রতি এই সদয় আচরণের জন্য আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

"প্রহরীদের ভারপ্রাপ্ত সেই নির্দ্দয় দুর্বৃত্তটা বন্দীদের সঙ্গে ডার্লেক এবং সেখান থেকে ক্যাল্‌স্‌রো গেল। কালো প্রাসাদের স্পর্দ্ধা আমার ছেলের মধ্যে ছিল বলে ভান-করা আনুগত্যে তার ক্রোধের মোড় ফিরাবার চেষ্টা না করতে, সে যতপ্রকার পারল অত্যাচার চালাল আমার ছেলের উপর। হ্যাঁ, এই ভীরু কাপুরুষ দুর্বৃত্তটার হৃদয়ের রক্ত জমাট বাঁধবে আমার হাতের উপর। তার এতদূর আস্পর্দ্ধা যে সেই শূয়োর আমার ছেলেকে এমনি করে কিল, চড়, লাথি মারল, এমনি করে তার গোঁফ হতে রোম ছিঁড়ে নিল।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে শুঁকড়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগলেন। বৃষ্টির মত অবিরাম প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ছে তাঁর উপর। এই প্রকাণ্ড দানবের হাতে তিনি অক্ষম অসহায়। অবশেষে, অন্ধ প্রায়, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উঠতেই কাউণ্ট তাঁকে ছুড়ে দিলেন সেই কাঠের চেয়ারটায়। নিস্ফল ক্রোধে, লজ্জায় তিনি ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কাউণ্ট বলে যেতে লাগলেন, "এই গ্লানিকর অবস্থায় আমার ছেলের প্রায়ই কান্না পেত। একজন অহঙ্কারী, নির্দ্দয় শত্রুর কবলে সহায়হীন অবস্থায় পড়া যে কত বেদনা-দায়ক, তা আপনি নিশ্চয়ই বুঝছেন। ক্যালস্‌রুতে পৌছানর পর প্রহরীর পশুর মত নির্দ্দয় অত্যাচারে আমার ছেলের মুখে যে ঘা হয়েছিল তা দেখে মমতা হওয়ায় ব্যাভেরিয়ার একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী তার মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়। আপনার চোখ হতে রক্ত পড়ছে দেখে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার এই সুন্দর রেশমের রুমাল দিয়ে বেঁধে দেব কি?

কাউণ্ট সামনের দিকে ঝুঁকতেই ক্যাপ্টেন ঝেঁটকে তাঁর হাত সরিয়ে দিলেন। চেঁচিয়ে বললেন, "আমি এখন তোমার কবলে পড়েছি, দানব—তোমার পীড়ন আমি সহ্য করব কিন্তু ন্যাকামি সহ্য করব না।

কাউণ্ট বিরক্তভরে ঘাড় নাড়লেন।

তিনি বললেন, "ব্যাপারগুলো যেমন ঘটেছিল আমি ঠিক তেমনই আপনাকে বলছি। আমি শপথ করেছিলাম প্রথম যে জার্ম্মান কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার গোপনে কথা হবে, তাকেই এ ঘটনা শোনাব। হ্যাঁ, আমি ক্যালসরুর সেই নবীন ব্যাভেরিয়ার কর্ম্মচারীর কাহিনী পর্য্যন্ত এসেছি। অস্ত্র-বিদ্যায় আমার যে যৎকিঞ্চিৎ পারদর্শিতা ছিল তা আপনি কাজে লাগাতে দিলেন না, বলে আমি সত্যই দুঃখিত। ক্যালস্‌রুতে সে বন্দী অবস্থায় ছিল এক পক্ষ কাল। সন্ধ্যাবেলায় জানালার ধারে সে যখন এসে বসত তখন প্রহরী দলের কয়েকজন ইতর কুকুর তার অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে হাসি তামাসা করত। এখন আমার বোধ হচ্ছে, আপনিও খুব আরামপ্রদ অবস্থার মধ্যে নেই—আছেন কি? আপনি একটা নেকড়েকে ফাঁদ পেতে ধরতে এসেছিলেন, এখন সেই জীবটাই আপনার গলায় দাঁত বসিয়ে পেড়ে ফেলেছে আপনাকে। আঁটো-সাঁটো জামা দেখে মনে হচ্ছে স্ত্রী আছে আপনার। বিধবা একটা হলে বিশেষ কিছু যায় আসে না, আর তারা

খুব বেশী দিন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে না। যা কুকুর, বস্ চেয়ারে গিয়ে।"

"হ্যাঁ, সেই একপক্ষ কাল পরে আমার ছেলে আর তার বন্ধু পালাল। তারা কত দুঃখ পেল, কতটুকুর জন্য অব্যাহতি পেল, সে দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না। শুধু এই বললেই যথেষ্ট হবে যে আত্মগোপন করবার জন্য দুটো কৃষককে তারা বনের মধ্যে আক্রমণ করে তাদের পরিচ্ছদ কেড়ে নিয়েছিল। দিনে গোপন করে রাত্রে হেঁটে যখন তারা রেমিলির কাছে এল—জার্ম্মান সীমারেখা অতিক্রম করবার মাত্র একমাইল—মাত্র একমাইল বাকী ছিল ক্যাপ্টেন, তখন উলানের একদল রক্ষী তাদের সামনে এসে হাজির। নিরাপদ অবস্থার এত কাছে—এত কাছে এসেও ধরা পড়া খুবই দুঃখকর, নয় কি ক্যাপ্টেন?" কাউণ্ট বাঁশীতে দু'বার ফুঁ দিতেই তিনজন নির্ম্মম-মুখো চাষা ঘরে হাজির হল।

তিনি বলে উঠলেন, "এরাই আমার উলানের প্রহরী। হ্যাঁ, তারপর তাদের ভারপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন যখন দেখলেন যে জার্ম্মান সীমারেখার মধ্যে সাধারণ বেশে তারা ফরাসী সৈন্য—তখন কোন বিচার বিবেচনা না করেই তাদের ফাঁসিতে ঝোলানর ব্যবস্থা করলেন। জিন্, মাঝখানের ঐ কড়িটাই বেশ পোক্ত, না?" ঘরের এধার হতে ওধার পর্য্যন্ত প্রশস্ত একটা ওকের বরগার উপর যেখানে ফাঁস দেওয়া দড়ি লাগানো ছিল সেখানে তাকে টেনে নিয়ে ফাঁসটা তাঁর গলায় লাগিয়ে দেওয়া হল। গলার চারদিকে কঠোর নির্ম্মল স্পর্শ অনুভব করলেন ক্যাপ্টেন বোমগার্টেন। চাষা তিনজন দড়িটা ধরে রইল কাউণ্টের আদেশের অপেক্ষায়। পাংশুবর্ণ তবুও দৃঢ় সেনাপতি বুকের উপর হাত রেখে স্পর্দ্ধার সঙ্গে চেয়ে রইলেন কাউণ্টের দিকে।

—"আপনি এখন মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে। আপনার ঠোঁট দেখে বুঝতে পারছি আপনি প্রার্থনা করছেন। আমার ছেলেও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেছিল। একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী সেই সময় সেখানে এসে পড়লেন। তিনি শুনলেন যে ছেলেটী তার মায়ের জন্য প্রার্থনা করছে। তিনি নিজে পিতা বলে তাঁর এত দয়া হল যে তিনি উলানদের চলে যেতে বলে শুধু তাঁর সহকারীর সঙ্গে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তের কাছে রইলেন। যখন ছেলেটীর সমস্ত বিষয় তিনি শুনলেন যে সে প্রাচীন পরিবারের একমাত্র সন্তান—তাঁর মা হৃতস্বাস্থ্য—তখন দড়িটা তিনি ফেলে দিলেন, যেমন আমিও ফেলে দিচ্ছি। আমি আপনাকে চুম্বন করছি যেমন তিনি আমার ছেলের দুইগালে চুম্বন করেছিলেন—আমি যেমন আপনাকে এখন যেতে বলছি তিনিও তেমনি আমার ছেলেকে চলে যেতে বলেছিলেন। সে জ্বরে আমার ছেলে ইহলোক পরিত্যাগ করল, সে জ্বরকে যদিও তাঁর সমস্ত শুভেচ্ছা আটক করতে পারেনি তবুও সেই সমস্ত শুভেচ্ছা আপনার উপর নেমে আসুক।"

এমনি করে, ঝোড়ো বিশৃঙ্খল ডিসেম্বরের প্রভাতে, বিকৃতাঙ্গ, অন্ধ-প্রায়, রক্তাক্ত, লাঞ্ছিত, ক্ষতবিক্ষত ক্যাপ্টেন বোমগার্টেন সেই কালো প্রাসাদ হতে টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন।





নিষ্ঠুর প্রেম

বড় ভয় লাগে, তবু বাসি ভালো, প্রিয়তম, প্রিয়তম !
আমার তিমিরে তোমার এ আলো নির্মম নিরুপম।
মোর নিশীথেরে দীর্ণ করিয়া তোমার অরুণ জাগে
আনি' আনন্দ বেদনাবিধুর আরক্ত অনুরাগে,
মরু অনুভূতি জ্বালাইয়া দোলে করুণা উৎস তব
অকরুণ অভিনব।
আমি মনে ভেবেছিলাম, করেছি আত্মসমর্পণ,
মনে যে আমার কত বাধা আছে তখন বোঝেনি মন।
তোমার প্রেরণা প্রবাহিনী সম যখন বহিল প্রাণে,
প্রাণের পাষাণ খসি' খসি' যায় তখন সে অভিযানে,
জড়-কামনার বন্ধন ছিঁড়ি প্রগতির গতি ধায়
জীবন টুটিতে চায়।

কাঁটার কাননে কাঁটা হ'য়ে যবে ছিলাম কাঁটার সাথে
দিন চ'লে যেত কুটিলবিলাসে বিবসনা বাসনাতে।
তার পরে যবে লভি' অভিলাষ তব কুসুমের লাগি'
বিকাশ বেলার আকাশে চাহিয়া মেলিলাম দুটি আঁখি,
দেখিলাম, একি !—হৃদয়গোলাপ কণ্টকে বুকভাঙ্গা
শোণিতে শোণিতে রাঙা।
জ্বালো, আরো জ্বালো তীব্র বহ্নি ; বন্ধু, বাঁধন খোলো
এ বন্ধনীর সকল গ্রন্থি রূপান্তরিয়া তোলো ;
সুখ দুখ মোর এক হ'য়ে যাক ; ঘুচে যাক আমি-তুমি
স্বর্গ ভূতল মিলনে মিলাক আমার জীবন চুমি।
মোর মৃন্ময় বিদ্রোহ ভাঙো, হানিয়া হানিয়া মোরে
রাখো অতন্দ্র কোরে।

কথা :—নিশিকান্ত

সুর ও স্বরলিপি :—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

র্সা না II পা -া -দা | -নর্সরা - র্সর্সা নদা I পা -া -া | -া দা পা I
ব ড় ভ ০ ০ ০০০ য় লা গে ০ ০ ০ ত বু

I মা -া - পা | পা -দা দপা I মগা -া -া | -া -া -া I
বা ০ ০ সি ০ ভা লো০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা সা ঋা | মা -া -া I পা ণধা সণা দা | পা র্সা না I
প্রি য় ত ম ০ ০ পি য় ০০ ত ম "ব ড়"

-া -া I র্সা র্সা র্স | র্সা র্সা না I র্সা র্জ্ঞা জ্ঞা | র্রা র্সর্সা না I
০ ০ আ মা র তি মি রে তো মা র এ আ লো

I পা -া দা | না -া র্সণা I দনর্সা -র্সনা দা | পা -া -া I
নি য় ম ম ০ নি০ রু০০ ০ প ম ০ ০

I সা সা ঋা | মা -া -া I পা ণধা র্সণা০ দা | পা র্সা না I
প্রি য় ত ম ০ ০ প্রি য় ০০ ত ম "ব ড়"

-া -া I স্মা -া সা | রা মা মা I মা - পা পা | পা পা পা I
০ ০ মো য় নি শি থে রে দী য় ণ ক রি য়া

I পা পা দা | পা সা ণা I দা পা -া | -া -া -া I
তো মা র অ রু ণ জা গে ০ ০ ০ ০

I পা দা দা | দা -া দা I পা দা র্সণা | দা পা পা I
আ নি আ ন ন্ দ বে দ না০ বি ধু র

I মা পা -গা | মা পা পদা ণা I ণদা পা -া | -া -া -া I
আ র ক্ ত অ নু ০০ রা গে ০ ০ ০ ০

I {পা ধা র্সা | র্সা র্সা র্সা I র্সা নর্সা র্রগা | গর্রা র্সা র্সা I
ম রু অ নু ভূ তি আ লা০ ই০ য়া দো লে

I না র্সা র্রর্সা | না -া ধা I -পা -া ধা | না -া -ধপা} I
ক রু ণা উ ৎ স ০ ০ ত ব ০ ০০

I গা মা পা | পা -া দা I পদা - ণা ণদা | পা -া -া I
অ ক রু ণ ০ অ ভি০ ০ ন ব ০ ০

I সা সা ঋা | মা -া -া I পা ণধ র্সণা দা | পা র্সা না II
প্রি য় ত ম ০ ০ প্রি য় ০০ ত ম "ব ড়"

পা পা II সা রা রা | মা মা মা I মা পা পা | পা -া দা I
আ মি ম নে ভে বে ছি লাম্ ক রে ছি আ ০ জ

I দা পদণা -ণদা | পা -া -া I পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া I
স ম০০ য় প ব ণ্ ম নে যে আ মা য়

I র্সা নর্সর্রর্গা র্গা | র্গর্রা র্সা র্সা I না র্সা -র্সনা | ধপা পা ধা I
ক ত০০০ বা ধা আ ছে ত থ ন্ বো ঝে নি

I ধা -না -া | -ণধা -পা -া I না র্সা -র্সনা | ধা নর্সা -র্সনা I
ম ০ ০ ০ ০ ন্ ত থ ন্ বো ঝে০ নি

I ধপা -া -া | -া -া -া I পা পা -গা | পা পা ধা I
মো ০ ০ ০ ০ ন্ তো মা য় প্রে র ণা

I ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা -র্রা | র্রা র্সা র্রর্গর্মা I
প্র বা হি নী স ম য থ ন্ ব হি ল০০

I র্গর্রা র্গা -া | -া -া -া I র্গা র্গা -া | র্গর্রা র্রা -র্সা I
প্রা ণে ০ ০ ০ ০ প্রা ণে য় পা ষা ণ্

I র্গা র্গা র্গর্রা | র্রা র্সা -া I র্রা র্রর্সা -া | না ধা র্সা I
খ সি খ সি যা য়্ ত থ ন্ সে অ ভি

I র্সা না -া | -নধা -পা -া I পা পা ধা | ধা ধণ নধা -পা I
যা নে ০ ০ ০ ০ জ ড় কা ম না ০০ য়

I পা -ধনা না | ধা নধা ধা I পা ধা পা | পা মা পা I
ব ০ন্ ধ ন ছিঁ ড়ি প্র গ তি র গ তি

I পা -া -া | -া -া -া I রা মা -া | মা পা পা I
ধা ০ ০ ০ ০ য়্ জী ব ন্ টু টি তে

I পা -া -া | -ধনা -র্সর্রা -নর্সা I ধা পা -মা | মা ধা ধা I
চা ০ ০ ০০ ০০ ০য়্ জী ব ন্ টু টি তে

I ধা -পা -া | -া -া -া I সা সা ঋা | মা -া -া I
চা ০ ০ ০ ০ য়্ প্রি য় ত ম ০ ০

I পপধণা - ধণা.দা | পা র্সা না II
প্রিয়০০ ০০ ত ম "ব ড়"

-া -া II রা রমা - মজ্ঞা | রা সা সা I সা রা ণ্া | সা সা সা I
০ ০ কাঁ টা০ য় কা ন নে কাঁ টা হ য়ে য বে

I রা মগা - রগা | মা পধা - ধপা I মগা মা -া | -া -া -া I
ছি লা০ ম্ কাঁ টা০ য় সা০ থে ০ ০ ০ ০

I ধা -া ধা | ণা র্সা র্রা I র্সনা র্সা র্সা | ণা ধা ধা I
দি ন্ চ লে যে ত কু০ টি ল বি লা সে

I ধা ণা ধা | পা পা ধণা I ণধা পা -া | -া -া -া I
বি ব স না বা স০ না তে ০ ০ ০ ০

I সা - রা রা | রা রা গা I রা গা মা | পা পা -া I
তা য় প রে য বে ল ভি অ ভি ম্য য্

I পা ধা পা | পধ ধপা মগা রগা I গা মা -া | -া -া -া I
ত ব কু সু০ ০ মে০ র লা গি ০ ০ ০ ০

I গা মা পা | মা পা - মা I রা মা জ্ঞা | রা জ্ঞা সা I
বি কা শ বে লা য় আ কা শে চা হি য়া

I সা রা ণা | -া সা জ্ঞা I জ্ঞরা - সরা সা | -া -া -া I
মে লি লা ম্ দু টি আঁ০ ০ খি ০ ০ ০

I প্া সা সা | -া -া -া I প্া সা সা | -া ন্া সা I
দে খি লা ০ ০ ম্ দে খি লা ম্ এ কি

I রা গা মা | গা মা -া I পা - ধা ণা | ধা ণা - র্সা I
হৃ দ য় গো লা প্ ক ণ্ ট কে বু ক্

I না র্সা -া | -া -ণা -া I ধা ণা ণা | ধা পা পধণা I
ভা ঙা ০ ০ ০ ০ শো ণি তে শো ণি তে০০

I ণধা পা -া | -া -া -া I রা জ্ঞা -সা | সা রা ণ্া I
রা ঙা ০ ০ ০ ০ আ লো ০ আ রো আ

I সা -া -া | রা - গা মা I গা - মা মা | মা - পা মা I
লো ০ ০ তী ০ ব্র ব ণ্ হি ব ণ্ ধু

I পা ধা ণা | ধা ধণর্সা - র্সণা I ধা -া পধা | মা ধা ধা I
বাঁ ধ ন খো লো০০ ০ ব ন্ ধু০ বাঁ ধ ন

I ধা পা -া | -া -া পা I ণধা - পা ধা | ণা - র্সা -ার্র I
খো লো ০ ০ ০ এ ব০ ন্ ধ নী ০ র্

I না র্সা র্সা | ণধা - ণা পমা I পা ণধা - র্রর্সা | পা মজ্ঞা রা I
স ক ল গ্র০ ন্ থি০ রূ পা০ ন্ ত রি য়া

I সরা জ্ঞা -া | -া -া -া I সা রা ণ্া | সা -া -া I
তো০ লো ০ ০ ০ ০ আ রো জ্বা লো ০ ০

I পা র্ধা ধপা | মা গা - মা I পা - ধা র্সা | না র্সা -া I
সু খ দু খ মো র্ এ ক হ য়ে যা ক্

I না র্সা র্রা | -র্জ্ঞা র্রা র্সা I না র্সা - র্রা | -র্রর্সা -ণধা - পধা I
ঘু চে যা ক্ আ মি তু মি ০ ০ ০০ ০

I ধা -া ণা | ধা ণা ণা I ধা ণা র্সা | ণা ধা -া I
স্ব র্ গ ভূ ত ল মি ল নে মি লা ক্

I ধা ণা ধপা | পা ধা ণা I ণধা পা -া | -া পা -া I
আ মা র০ জী ব ন চু মি ০ ০ মো র্

I সা - রা রা | রা -া -াগ রা -া গা | মা গা মা I
মৃ ন্ ম য় ০ ০ বি ০ দ্রো হ ভা ঙো

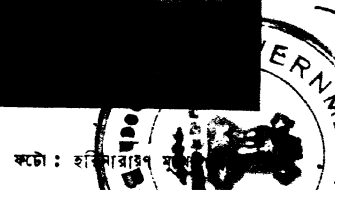
I পা পা ণা | ধা ণা র্সা I না র্সা -া | -া - ণা -া I
হা নি য়া হা নি য়া মো রে ০ ০ ০ ০

I ধা ণা ধপা | পা - ধা ণা I ণধা পা -া | -া -া -া I
রা গো অ০ ত ন্ দ্র ক রে ০ ০ ০ ০

I সা সা ঋা | মা -া -া I পপধণা - ধণা দা। | পা র্সা না IIII
প্রি য় ত ম ০ ০ প্রিয়০০ ০০ ত ম "ব ড়"

প্রশান্ত পরিবেশ

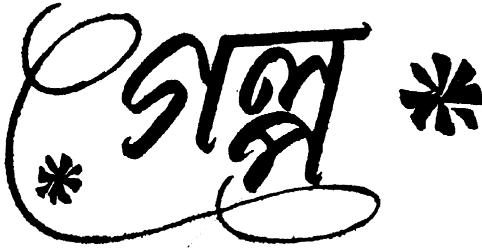
ফটো : হরিনারায়ণ মু





ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

সহরের সৌন্দর্য্য



প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

হাজারিবাগ রোডে আসার কয়েক দিন পরেই আলাপ হয় সুনেত্রা দেবীর সংগে। বিকেল বেলা। তুফান এক্সপ্রেস সবেমাত্র ছেড়েছে। প্ল্যাটফর্মে ও ওভার ব্রিজে বেশ ভিড়। শুধু যাত্রীদের নয়, যাঁরা চেঞ্জে এসেছেন তাঁদেরও। দিনের শেষে স্টেশনে বেড়াতে আসাটা এক রকম মরসুমী রেওয়াজ। মা'কে কাছে না পেয়ে চারি-দিকে তাকাই। প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে এসে দেখি একটি স্থূলাংগী মহিলা মা'র সংগে কথা বলছেন।

সুনেত্রা দেবীর বাড়ি চেতলায়। রীতিমতো বড়লোক। কলকাতায় মস্ত কাগজের কারবার। দক্ষিণাঞ্চলের একাধিক সিনেমার বেশীর ভাগ শেয়ার এঁদের। এখানে আশ্রম রোডে বাড়ি তৈরি হয়েছে বছর আষ্টেক আগে। বছরে দুবার ক'রে এসে এক মাস দেড় মাস থেকে যান। মধ্যবিত্তরা স্বাস্থ্যকর স্থানে আসেন মোটা হবার জন্য, আর ধনীরা আসেন রোগা হবার জন্ত। সুনেত্রা দেবীর নিয়মিত হাজারিবাগ রোডে হাজিরা দেওয়ার মূলে আছে মেদ-বাহুল্য কমিয়ে শরীরটাকে হালকা ক'রে নেওয়া। সে কথা তিনি অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করেন।

সুরিয়ার স্থায়ী বাসিন্দারা আড়ালে সুনেত্রা দেবীকে 'হাতিগিন্নী' ব'লে ডাকেন। বিচিত্র কি, নামের উৎপত্তি তো নামকর্তার ক্ষণিকের খেয়ালে। এ নামটি ভুলিনি, বরং ভালো নামটিই অনেক ভেবে মনে করতে হয়েছে। নাম যাই হোক, হাতিগিন্নীকে সকলেই শ্রদ্ধা করেন। এমন সরল অন্তঃকরণ, সহজ চালচলন, সুন্দর ব্যবহার আজকের দিনে বড় একটা নজরে পড়ে না। মিশুক মানুষ—যেচে সকলের সংগে আলাপ করেন।

মা'র সংগে পরিচয়ের দু-তিন দিনের মধ্যেই সকালে বেড়িয়ে ফিরবার পথে হাতি-গিন্নী আমাদের 'মনোরমা কুটির'এ এলেন। এ বাড়িতে কোন্ বছর কোন্ পরিবার এসেছিল সব তাঁর মুখস্থ। কাছাকাছি আরও দু-একটা বাড়ির ইতিহাস অনর্গল ব'লে গেলেন। আমি তাঁর খবরের বহর দেখে অবাক্। তাঁর কাছে পুরীর পাণ্ডাও হার মানে।

হাতিগিন্নীর অনুরোধে বিকেলেই তাঁর বাড়িতে গেলাম। বাড়ির নাম 'স্বপ্নপুরী'। ছবির মতো বাড়ি। চমৎকার ফুলের বাগান। দূরে পাহাড়ের নীল মিলে গিয়েছে আকাশের নীলে। অস্তরাগে অদ্ভুত দেখাচ্ছে পরেশনাথ মন্দিরের চূড়া। সেই প্রীতি-প্রফুল্ল পরিবেশে এ-কথা সে-কথার পর হাতিগিন্নী মা'কে বললেন—দিদি, ধানোয়ার রোডে এক সাধু বাবা আছেন। জ্ঞানী লোক। হাত দেখেন, ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। কত সদুপদেশ দেন! কত গাছগাছড়ার গুণ জানেন! কঠিন কঠিন রোগ সারিয়ে দেন। আর কথা এমন মিষ্টি যে একবার কাছে বসলে আর উঠতে ইচ্ছে করেনা। কাল যাবেন আমার সংগে?

হাতিগিন্নীর উপরোধ এড়ানো যায়না। তা ছাড়া মা'রও দুর্বলতা আছে। আমি একমাত্র সন্তান। নতুন চাকরিতে ঢুকেছি। কিন্তু দেশের ম্যালেরিয়া ছাড়তে চাইছেনা। তাইতো হাওয়া বদলাতে আসা। আমাকে নিয়ে মা'র চিন্তার অন্ত নেই। সাধুবাবার অশেষ গুণা-বলীর কথা শুনে তখনই সম্মতি দিয়ে ফেললেন।

পরদিন ভোরবেলা হাতিগিন্নী এসে ডাকলেন। আমরা প্রস্তুত ছিলাম। তাঁর সংগী হলাম সানন্দে। বিদেশে বেড়াতে এসেছি। এমন একটা উপলক্ষ ভালো লাগে বইকি। দেহে ভোরের বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শ, মনে সাধুদর্শনের উদ্দীপ্ত ঔৎসুক্য। মাইলখানেক হেঁটে সাধুর আস্তানায় উপস্থিত হলাম। ছোট্ট একখানি ঘর। টিনের ছাদ। কোণে একটু বারান্দা। ঘরের এককোণে জল

চৌকির ওপর ফুল দিয়ে ঢাকা বিগ্রহ। চারদিকে ধূপ জ্বলছে। আর এককোণে একটি গাব-গুবা-গুব। মাঝখানে বাঘছালের ওপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন সাধুবাবা। সবল সুঠাম শরীর। মাথায় জটা। মুখময় গোঁফদাড়ি। ভাসা ভাসা চোখ দুটিতে অস্বাভাবিক দীপ্তি। যথারীতি প্রণাম ক'রে কাছে বসতেই সাধুবাবা বললেন—মংগল হোক।

হাতিগিন্নী বললেন—এঁরা এবার 'মনোরমা কুটির' এ এসেছেন। আপনার কথা শুনে পায়ের ধুলো নিতে এলেন।

সাধুবাবা মধুরকণ্ঠে বললেন—বেশ বেশ। ভগবান মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

মা'কে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার দেশ কোথায় মা?

—নদীয়া জেলায় গোয়াড়ি কেষ্টনগরের কাছে।

—গ্রামের নাম?

—নারাণপুর—বেথোদোড়ি ইস্টিশানে নামতে হয়।

সাধুবাবা চমকে উঠলেন। মা কৌতূহলের সংগে প্রশ্ন করলেন—আপনার দেশও বুঝি ঐ অঞ্চলে?

সাধুবাবা নিরুত্তর। কয়েক সেকেণ্ড পরে গম্ভীরভাবে বললেন—আমরা সন্ন্যাসী। আমাদের পূর্বাশ্রমের কথা বলতে নেই।

মা অপ্রস্তুত। মিনতিভরা সুরে বললেন—গেরস্ত ঘরের মেয়ে। এতে দোষ হয় জানতাম না।

—সংকোচের কোন কারণ নেই। সংসারী লোকের কৌতূহল তো স্বাভাবিক। বিল্বপুষ্করিণীর নাম শুনেছেন তো?

—বেলপুকুরের কথা বলছেন? খুব জানি। বড় গ্রাম, অনেক ঘর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাস, হাই স্কুল আছে।

—হ্যাঁ। বিল্বপুষ্করিণীর একজন পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী ছিল রাঢ় অঞ্চলে। তিনি বহু বিদ্যাবিশারদ। আমি তাঁর কাছে পাঁচ বছর থেকে সামুদ্র বিদ্যা শিক্ষা করেছিলাম। তিনি প্রায়ই নারাণপুরের নাম করতেন। ঐ গ্রামে তাঁর কয়েক ঘর বিশিষ্ট যজমান ছিল। আচ্ছা, আপনার গ্রামে যাতায়াত আছে?

—না। আমি বিশ বছর দেশছাড়া। কালীঘাটে বাস করছি সেই থেকে। দেশে সেটেলমেণ্ট হচ্ছে। তাই ওর খোকাকে যাবার জন্যে লিখেছিল বাড়ি-ঘর জমিজমা বাগান পুকুরের অংশ বুঝে নিতে। খোকা গরমের ছুটিতে গিয়ে এক মাস ছিল। ফিরে আসতেই ম্যালেরিয়া জ্বর। সারে আবার হয়। ছেলেমানুষ। শরীর ঠিক না থাকলে কাজ চালাবে কি ক'রে! ওর শরীরটা যাতে ভালো হয় সেই জন্যই বাড়ি ভাড়া নিয়ে এখানে এসেছি।

—ভাববেন না মা। এখানকার জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর। শীঘ্রই আপনার ছেলের শারীরিক উন্নতি হবে।

সাধুবাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি কাজ কর?

—রিপন কলেজে অধ্যাপনা করি।

—চমৎকার কাজ। জ্ঞানের বিকাশ, মনের বিকাশ। নিজের উপকার, দেশের উপকার। ধন প্রচুর না হলেও মান যথেষ্ট।

রৌদ্রোজ্জ্বল অংগনের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বললেন সাধুবাবা—বেলা হয়েছে। এখন আমি স্নান সেরে পূজায় বসব। আজকের মতো উঠতে হবে। আবার যে দিন ইচ্ছা হবে আসবেন আপনারা।

সাধুবাবুকে প্রণতি জানিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। হাতিগিন্নী আমাদের হাটে নিয়ে গেলেন। প্রকাণ্ড হাট অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সাঁওতালনীদের সামনে ট্যাড়সের চাঙারি। জোলাদের পাশে গামছার বস্তা। পশ্চিমের রৌদ্রে তাপিত কলকাতার 'চেঞ্জার' বাবুদের মাথায় হ্যাট। গাছতলার বৃদ্ধ বিহারীর উনুনের কাছে ধুলোমাখা ছেলে-মেয়েদের সিদ্ধ রাঙা আলু নিয়ে কাড়াকাড়ি। ইঁদারার ধারে জল তোলা নিয়ে ঘাগরাপরা খোট্টা মেয়েদের চুলোচুলি ঝগড়া। মেঠাইয়ের দোকানের মাথার ওপর লোভাতুর চিল-দম্পতির অবিরাম ওঠা নামা। সব মিলিয়ে অভিনব দৃশ্য। চলন্ত ভুবনের এমন জীবন্ত চিত্র সত্যিই ফিল্মের উপযোগী।

এক সপ্তাহ পরে। দুপুরে মা'কে নিয়ে বরাকর নদী দেখতে গেলাম। জল অতি সামান্য—কোন রকমে পায়ের পাতা ডোবে। জলের নিচে বালি চিকচিক করছে। ছোট-ছোট সাদা সাদা মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। পাড়ে রঙ-বেরঙের পাথর—একটু ঘষে-মেজে নিলে বাহারে 'পেপার ওয়েট' হয়। পাহাড়ী নদী প্রকৃতির খেয়ালী মেয়ে। তার রূপের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। হেমন্তে দেখে বর্ষায় চেনা যায় না। ফিরতে দেরি হ'ল। সাধুবাবার আশ্রমের

কাছে যখন এলাম তখন পড়ন্ত বেলা। ছায়ার মায়া-ডোরে বাঁধা পড়েছে পৃথিবী। বাঁধানো বটতলায় ব'সে গাবগুবা-গুব বাজিয়ে গান করছেন সাধুবাবা—'হরি বলতে কেন নয়ন ঝরেনা!' আমাদের দেখে গান থামিয়ে বসতে সংকেত করলেন। বাজনাটি নামিয়ে রেখে স্নেহমাখা সুরে বললেন—বাবাজীর নামটি তো জানা হয়নি।

—সুন্দরগোপাল মল্লিক।

—বাবার নাম?

—যদুগোপাল মল্লিক।

সাধুবাবা আবার চমকে উঠলেন সেদিনের মতো। নিমীলিত নয়নে কি যেন ভাবতে লাগলেন। মনে হ'ল তিনি যেন পথ হারিয়েছেন দূর অতীতের গহন বনে। কিছুক্ষণ পরে নীরবতা ভংগ করলেন স্বপ্নোত্থিতের ভংগিমায়—তোমার বাবার নাম শুনে বহুকাল পরে মনে পড়ছে এক মহাপুরুষের কথা। ডুমকার যদুনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কথা। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। কত দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে যে দুঃস্থ দরিদ্রকে বাঁচিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। আয়ুর্বেদে অসাধারণ জ্ঞান। আমি কিছুকাল তাঁর কাছে আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেছিলাম। পক্ক-কেশ বৃদ্ধ। এতদিনে নিশ্চয়ই মহাপ্রস্থান করেছেন।

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমার হাতটি ধ'রে মিনিট পাঁচেক হস্ত রেখা পরীক্ষা ক'রে মা'কে বললেন—মা, আপনার সুন্দরগোপাল জীবনে যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে। আপনি ভাগ্যবতী।

—আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়। কিন্তু আমি বড় দুঃখিনী।

—কেন মা?

—পাঁচ বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা হই।

—সংসারে বৈধব্য যন্ত্রণা অনেককেই ভোগ করতে হয়। দুঃখ তো আপনার একার নয় মা।

—আমার স্বামী খুব কষ্টে মারা যান।

—কি হয়েছিল?

—আগুনে পুড়ে মারা যান।

সাধুবাবা শিউরে উঠলেন। বিস্ময়সূচক শব্দ শোনা গেল—'ইশ!' মৃদু মস্তক সঞ্চালনের সংগে বললেন—কর্মফল, অমোঘ কর্মফল।

—তাই হবে। রাত্রে খেয়ে-দেয়ে বৈঠকখানায় শুয়ে-ছিলেন। খড়ের চাল ছিল ঘরখানার। তাই গরমের সময় শুতে ভালোবাসতেন ঐ ঘরে। মাঝরাত্রে আশ-পাশের লোক 'আগুন, আগুন' ব'লে চিৎকার ক'রে উঠল। জেগে উঠে আমরা দেখলাম বৈঠকখানা ঘর দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। আমার দেওর ও আরও অনেকে ছুটে গিয়ে ওঁর দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকতে লাগল—'শীগ্‌গির বেরিয়ে আসুন।' উনি সাড়া দিলেন, কিন্তু কিছুতেই খিল খুলতে পারলেন না। যখন কুড়ুল দিয়ে দরজা ভেঙে ফেলা হ'ল তখন আধমরা অবস্থা। বহরমপুর হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন আমার দাদা। ভোর না হতেই ওঁকে বহরমপুরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। দাদা প্রাণপণ চেষ্টা করলেন বাঁচাবার, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। উঃ, কী মর্মান্তিক দৃশ্য! আজও ভুলতে পারিনি।

মা কাঁদতে লাগলেন। সাধুবাবা সহানুভূতিভরা কণ্ঠে সান্ত্বনা দিলেন—স্থির হন মা। যা হবার তা হয়েছে, কেঁদে কি লাভ? ঈশ্বর তাঁর আত্মার সদ্‌গতি করুন। শোক-তাপ নীরবে সহ্য করাই গৃহধর্ম। একটা কথা, আগুন লেগেছিল কি ভাবে?

মা চোখ মুছতে মুছতে বললেন—ভগবান জানেন। তবে দুষ্ট লোকের কাজ বলেই গ্রামবাসী সন্দেহ করেছিল। নারাণপুরের পাশের গ্রাম কুবিরনগর। সেখানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করত। তার তিনকুলে কেউ ছিল না। তার বংশে কবে কে এক পণ্ডিত ছিল সেই অহংকারে মাটিতে পা প'ড়ত না। দিনরাত কি ছাই-পাঁশ পুঁথি ঘাটত—মানুষের সংগে কথা বলত না। ভারি দুর্মুখ। রেগে গেলে যা মুখে আসে তাই ব'লে গালা-গালি করত আর শাপ দিত। তার নাম জানিনে তবে লোকে বলত 'খেপাঠাকুর'। খেপাঠাকুর ছিল আমাদেরই প্রজা। অনেক দিনের খাজনা বাকী। গোমস্তা আদায় করতে গেলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলত—'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আবার খাজনা কিসের রে! আমি পচা গাঁয়ের প'ড়ো ভিটেয় বাস করি এই তোদের সাতপুরুষের ভাগ্যি'। একদিন গোমস্তা যখন তাগাদা করতে গিয়েছিল ঠাকুর তাকে মারতে এসেছিল। তার এই দুর্ব্যবহারে খো

বাবা খুব চটে গেলেন। খেপাঠাকুরকে ডেকে এনে গ্রামের মাতব্বরদের সামনে অপমান করলেন। বললেন—'একমাস সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে যদি খাজনা মিটিয়ে না দাও তো নালিশ করব। আর আমার কর্মচারীর গায়ে যদি হাত দাও তো থানার দারোগাকে জানাব। তোমার গলায় গামছা দিয়ে ধ'রে নিয়ে যাবে। বাড়াবাড়ি করলে হাজতে পুরে মেরে ভূত ভাগিয়ে দেবে।' সেই থেকে খেপাঠাকুর ব'লে বেড়াত—'ব্রাহ্মণের এতবড় অপমান! আমি পৈতে ছুঁয়ে দিব্যি করছি অমুক মল্লিককে দেখে নেব।' এর কিছুদিন পরেই দুর্ঘটনা, আর খেপাঠাকুর নিরুদ্দেশ।

সাধুবাবার চোখ দুটো আলেয়ার মতো দপ ক'রে জ্ব'লে আবার নিবে গেল। দৃঢ় বিশ্বাসে ঝংকার দিয়ে উঠলেন—এ সেই দুর্বৃত্তেরই কাজ। আপনি তাকে দেখেছিলেন কোনদিন?

—না। সে ভিন্‌গাঁয়ের লোক। তাছাড়া আমি জমিদার বাড়ির বৌ, পরপুরুষের সামনে কখনও বেরুইনি।

সাধুবাবা যেন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন—ঠিক ঠিক। আমারই খেয়াল ছিলনা। আপনি অন্তঃপুরচারিণী জমিদার গৃহিণী, আপনি তাকে দেখবেন কেমন ক'রে!

নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললেন—ওখানে যিনি সহস্র চক্ষু নিয়ে ব'সে আছেন কোন পাপই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়না মা। দুষ্কৃতির দণ্ডবিধান তিনিই করেন। তাঁকে স্মরণ করুন, শান্তি পাবেন। * * * রাত হয়েছে। বাড়ি যান। আমার ধ্যানযোগের সময় হ'ল। ভয় নেই, পথে লোকজন পাবেন। এমন সুন্দর জ্যোৎস্নায় অনেকেই বেড়াতে বেরোবেন।

খেপাঠাকুরের কাহিনী শুনতে শুনতে সাধুবাবা বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়েছিলেন। সময়ের আন্দাজ ঠিক হয়নি। রাত একটু বেশীই হয়েছিল। বাতাসে স্বল্প শীতের আমেজ। পথ প্রায় জনহীন। 'শৈলবাস'-এর ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলো ধবধব করছে চাঁদের আলোয়। তাদের ডালে পাতায় পাতায় যেন রূপকথার রহস্য।

দেখতে দেখতে একমাস কেটে গেল। হাতিগিন্নী কলকাতা চলে গেলেন। পরিচয়ের পরিধি পরিমিত। এক এক সময় বড় একলা বোধ করতাম। অগত্যা ঘন ঘন সাধুবাবার আশ্রমে গিয়ে বসতাম। আন্তরিকতায় আত্মীয়তায় তিনি হয়ে উঠলেন প্রবাসের পরমবন্ধু।

শরীরটা যখন উন্নতির পথে এমন সময় হঠাৎ এক দিন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লাম। 'ব্যাসিলারি ডিসেণ্ট্রি'। সুরিয়ায় ডাক্তার মেলেনা। আমাদের সংগে কিন্তু চাকর ছাড়া আর কেউ ছিলনা! সে ছেলেমানুষ। যাই হোক, অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রে স্টেশনের ওধারে হাজারিবাগ রোডের দিক থেকে একজন হোমিওপ্যাথকে নিয়ে এল। তিনি ওষুধ দিলেন কিন্তু বিশেষ ফল হ'লনা। ভয়ে ও ভাবনায় মা'র মাথার ঠিক নেই। দারুণ দুর্বলতার মধ্যেও আমি তাঁকে বললাম—একবার সাধুবাবাকে খবর দিলে হয় না? তিনি কবিরাজী চিকিৎসা জানেন। হাতিগিন্নীর মুখে শুনেছিলাম, আর তিনি নিজেও একদিন বলেছিলেন।

মা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বিশুকে মাথার কাছে বসিয়ে একাই গেলেন সাধুবাবার কাছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সাধুবাবা এলেন। গাছের শিকড় নিয়ে এসেছিলেন। তাই বেঁটে আমাকে খাওয়ালেন। ঘরের কোণে পিলসুজে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বাললেন। আমার বিছানার পাশে পদ্মাসনে ব'সে মুদিতনেত্রে জপ করতে লাগলেন। তাঁকে পেয়ে আমার মনোবল ফিরে এল। নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি সাধুবাবা ঠিক একইভাবে ব'সে আছেন। আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করছি শুনে আবার একবার সেই শিকড়বাটা খাওয়ালেন। মা'র হাতে কতকগুলো কালো কালো শুকনো বীচি দিয়ে বললেন—চিঁড়ের মণ্ডের সংগে একটা ক'রে বীচি গুঁড়ো ক'রে মিশিয়ে চারবার খাওয়াবেন। চিন্তার কারণ নেই। সময়ে ওষুধ পড়েছে ও সুফল দেখা দিয়েছে। ছেলে দুদিনে সেরে উঠবে। আমি সন্ধ্যার পর আসব।

মা গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম ক'রে সাশ্রুলোচনে বললেন—আপনি মহাপুরুষ। আপনার যখন কৃপা হয়েছে তখন সুন্দরের জন্য আমি আর ভাবিনে।

সন্ধ্যার পর কথামতো সাধুবাবা দর্শন দিলেন। আমাকে দুটো বড়ি খাইয়ে দিয়ে যথাস্থানে ব'সে যথারীতি জপ

করতে লাগলেন। নিরুপদ্রব নিদ্রায় কোথা দিয়ে রাত কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। পরদিন সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করলাম। পথ্যের ব্যবস্থা দিয়ে সাধুবাবা বিদায় নিলেন। যাবার সময় মা'কে ব'লে গেলেন—বিপদ কেটে গিয়েছে। কয়েকদিন সাবধানে রাখবেন। আর কোন চিন্তা নেই।

সাধুবাবার ওষুধের গুণেই হোক বা তাঁর সারারাত্রি-ব্যাপী প্রার্থনার জোরেই হোক, আমি এক সপ্তাহের মধ্যে দেহ ও মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম। ছুটি তখনও ফুরোয়নি, কিন্তু মা আর থাকতে চাইলেন না। বিদেশে আমার আকস্মিক সাংঘাতিক অসুখে তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল। কলকাতায় ফিরবার তারিখ ঠিক হয়ে গেল। আগের দিন গোধূলিবেলায় দেখা করতে গেলাম সাধুবাবার সংগে। তিনি আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। আমরাও নিবেদন করলাম সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা। মা বললেন—মানুষ কোথায় কার কাছে কি উপকার পাবে কিছুই জানেনা। আপনার সংগে পরিচয় না হ'লে সুন্দরকে বাঁচাতে পারতাম না। আপনার ঋণ তো এ জীবনে শোধ করতে পারবনা।

—মিছে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন মা। সবই মংগলময়ের ইচ্ছা, আমি নিমিত্ত মাত্র।

—আপনি এখানেই থাকবেন, না অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছা আছে?

—জায়গাটা আমার খুবই মনে লেগেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনোরম। চোখ খুললেই ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করা যায়। নিত্য সংগ লাভ হয় চিরসুন্দরের। এখানে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ ক'রে বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করাই আমার মনের গোপন বাসনা। কিন্তু তেমন সংগতি কই? সময় হ'লে তাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন।

পরদিন সকালে বম্বে মেল ধরবার জন্য স্টেশনে এলাম। মেল অল্পক্ষণ থামে। যাত্রীর ভিড়ও হয়। সংগে জিনিস পত্র রয়েছে। কাজেই উৎকণ্ঠিতভাবে ট্রেনের অপেক্ষা করছি। এমন সময় জনতার মধ্যে সাধুবাবাকে দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হলাম। স্টেশনের কর্মচারীরা তাঁকে বেশ খাতির করে। আমাদের গাড়িতে উঠতে কোন অসুবিধা হ'ল না। ট্রেনের বাঁশি বাজল। সাধুবাবা হাত তুলে আমাদের আশীর্বাদ করলেন। ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর অপরূপ দেবমূর্তি।

কলকাতায় এসে কাজে যোগদান করলাম। অবসর সময়ে বার বার মনে পড়ত সাধুবাবাকে। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। মাস চারেক পরে মা'র সংগে পরামর্শ ক'রে তাঁর অভিলষিত মন্দির নির্মাণের সাহায্যকল্পে প্রাথমিক দান হিসাবে একশ' টাকা পাঠিয়ে দিলাম। দশ দিন বাদে মণিঅর্ডার ফিরে এল। ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না। উদ্‌বিগ্ন হয়ে সুরিয়ায় ছুটলাম গুডফ্রাইডের ছুটিতে সাধুবাবার খবর নিতে। গিয়ে দেখলাম আশ্রম শূন্য। অনেক অনুসন্ধান করলাম। কেউ বলতে পারলে না কোন্ দণ্ডকারণ্যের কোণে আবার কুটির বেঁধেছেন সাধুবাবা। অন্তরে বিস্ময় ও বিষাদ নিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। হপ্তাখানেক পরে একদিন সকালে পিয়ন একখানা চিঠি দিয়ে গেল। খামের ওপর হরিদ্বারের ছাপ। চিঠিতে লেখা ছিল:—

*　　*　　*　　*

মা, আপনার মণিঅর্ডার ফেরত দিলাম। কিছু মনে করবেন না। কালীঘাটের কাঙালী ভোজনে টাকাটা ব্যয় করলে যারপর নাই খুশী হব। আমি যে মহাপাপ করেছি তার জন্য আজীবন অনুতপ্ত। দেশ ভ্রমণ, সাধু সংগ, ধর্ম-শাস্ত্র পাঠ, ভগবানের নাম কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা জীবনটাকে উচ্চ পথে চালিত করবার চেষ্টা করেছি। কবিরাজী জ্ঞানও ঐকান্তিক আরাধনার জোরে শ্রীমান সুন্দরকে মারাত্মক ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা ক'রে কিছু শান্তি পেয়েছি। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আপনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন কি? আমার জন্য দু-চার ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারবেন কি? আমার আত্মার মুক্তির জন্য পরমাত্মাকে ডাকতে পারবেন কি? যদি পারেন তবেই আমার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হবে।

ইতি—

চিরাপরাধী কুবিরনগরের খেপাঠাকুর

শিল্পী ও চেতনার অভিব্যক্তি

প্রশান্তকুমার রায়

'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করে'।

শিল্পীর মানস ধর্ম্মই এই। রূপ তাকে টানছে অরূপের দিকে, অপরূপের সৃষ্টিতে। রেখায়, রেখায়, রঙে, রূপে শিল্পীর শিল্প-কর্ম্ম ভরে উঠছে। যা আছে তার রূপ নয়—আদল, আকৃতি, প্রকৃতি নয়—যা হলে মন আশ্বস্ত হয় সেই রকম ভরাট একটা কিছু চাই। নিজের মনের রঙে বস্তুকে ভাবে রাঙাতে হবে; তার আলো প্রতিবিম্বিত হোক অপরের মনে। অপরকে ডাকতে হবে। সে যোগ না দিলে শিল্পের আস্বাদন সম্পূর্ণ হবে না।

কিন্তু এক রকম করে দেখালে শোনালে চলবে না; নানা বরণের অজস্রতায় শিল্প-কর্ম্ম ভরে তুলতে হবে। রূপ থেকে আনন্দ; সেই জীবনের বিকাশ। শিল্পী বিকশিত হতে চান। শিল্পীর যারা আপন জন তাদেরও বিকশিত হতে হবে। রূপের নেশায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে গেলে তো হবে না, দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করতে হবে। রূপের ঠাটে দৃষ্টি যদি ঘোলাটে হয়ে যায় প্রবৃত্তির স্থূলত্বের পলেস্তারা চোখকে পীড়িত করে তুলবে! মন ভারাক্রান্ত হবে! চোখ কানকে উদার করে প্রাণকে ঐশ্বর্যময় করে তুলতে পারেন যিনি তাকে শিল্পের আসরে মানায়। আর পাঁচজনার মত একটা কিছুর আকৃতিকে তিনিও সম্বল করেন, কিন্তু তার প্রকৃতির পরিচয় দেবার সময় যথার্থ শিল্পী আর পাঁচজনার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠেন। সে পরিচয় সন্ধানীর গূঢ় আবিষ্কারের বর্ণ-চর্চায় উজ্জ্বল। নিছক খবর জানানো প্রাত্যহিক ব্যাপার নয়। খবর জানতে রাজসভায় দৌবারিক আছেন, ভারতচন্দ্র নেই; সেরেস্তায় নায়েব, পাইক, পিয়াদা আছেন, রামপ্রসাদ নেই; চাটুকার আছেন, রস-রসিক নেই। সেখানে রূপের খবর জানাতে, জৌলুস ছড়াতে রূপোপজীবিরা আছেন, অজন্তার চিত্রকররা নেই। খবর জানবার দাসখৎ শিল্পীর জমাখাতায় লোকসানের অঙ্ক বাড়ায়। সে সব থেকে জাত শিল্পী মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, এখানে অরূপরতন কই? রূপ থেকে আনন্দে পৌছাবার পথে এ কোন্ বাধার প্রাচীর গড়ে উঠল? চোখ থেকে প্রাণে কোন বার্ত্তাই যে পৌছল না। বাধা, বাধা, বাধা।

শিল্পী বাধার প্রাচীর ভাঙেন। প্রাণে বিপ্লবের তুফান তোলেন! যা অকল্যাণকর, যা দৃষ্টিকে বস্তুর ভারে পীড়িত করে সে সব কোন্ অতলে তলিয়ে যায়। তারপর শান্ত সমাহিত নিমগ্ন প্রসন্নতায় মনকে শোধিত করে আনন্দের রাজ্যে চিন্তা চেষ্টাকে উত্তরণ করিয়ে দেয়। শিল্প সৃষ্টির সেই পরম লগ্নে শিল্পীর শোধিতপ্রাণে প্রত্যাশিত সকল প্রাণের যোগ ঘটে। "প্রাণে প্রাণে বেঁধে দেওয়া, একটি দীর্ঘশ্বাসে সকল প্রাণের দীর্ঘশ্বাসে মিলিত হওয়া, একটি দৃষ্টিতে সকল চোখের চাওয়া, সৃষ্টির কাজে উৎসের মত এগুলি আছেই আর সৃষ্টির পরিণামও তা-ই —চেতনার উৎস বা চেতনার ফলশ্রুতিও তাই বটে। শিল্পী রং তুলি আর ছেনি নিয়ে রূপ ফোটাতে বসেন, সেই রূপ কি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে? নিখিল প্রাণের যুগ যুগ ধরে সেও কি কুসংস্কার নয়? কাঠুরের কাঠ কাটা, মিস্ত্রীর পাথর ভাঙ্গা, কৃষাণের গরু তাড়ানো—এমনি কত কি, ঘাস ঝরানো রূপ চিরকাল তো দেখে আসছি, ফটো করে ধরেও রেখেছি। শিল্পী এই সমস্তের পেছনে যে গূঢ় অবিরাম ছন্দটি রয়েছে সেইটি নানান উপায়ে হৃদয়ে হৃদয়ে ধরিয়ে দেয়; তখন কাঠ কাটার, পাথর ভাঙ্গার শ্রম সৃষ্টির আনন্দে কেমন শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠে; যার ছবি সেও সহৃদয় হ'য়ে উঠলেন। আর যিনি দৃষ্টি-দুয়ার খুলে দিতে সাহায্য করলেন তিনিও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। তিনি যা আঁকলেন—আকৃতির প্রকৃতি নির্দ্দেশ করলেন—তা আনন্দঘন অভিব্যক্তি। শিল্পী সামাজিক মনকে বেঁধে রাখলেন যা দিয়ে তাকে বলি সংস্কার।

শিল্পীরা সামাজিক মানুষের সংস্কার ভাঙেন, আবার নতুন করে সংস্কার গড়ে তোলেন। একবার পৈতে নিয়ে ব্রাহ্মণের জাতে ওঠেন, পরমুহূর্ত্তেই আবার পৈতে ছেঁড়ার পালা। বামুনের আবার পৈতে-পরিচয় কি! ব্রহ্মার সূত্রযজ্ঞের প্রয়োজন নেই তো। আসলে সব মানুষই শিল্পী। কেউ হয়তো বোবা শিল্পী, বোধটুকু আছে, জন্মগত বোধির অধিকার জন্মেনি। তাকে ধার করে কাজ চালাতে হয়। জাত শিল্পীরা মহাজন। সে সংস্কার পাল্টাবার পথ বাতলায়, দিক দর্শন করায়। তার পদ্ধতি তার নিজের। তার সুন্দরকে আমরা সুন্দর বলিনা; আমাদের সুন্দরের বোধকে তার সুন্দরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি মাত্র। শিল্পীও এইটেই চান, এই মিলিয়ে দেখায় সাহায্য করেন। তার সংস্কারের সঙ্গে আমাদেরটা মেলান, তার দৃষ্টির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি মেলান—শিল্পের ছাদনাতলায় যে পরিচয় ঘটে তা অক্ষয় হোক, তাই তার কামনা। হৃদয়ের মিলনে আত্মীয়তায় তিনি এক থেকে অনন্ত হতে চান। এ তার কোন সজ্ঞান কামনা নয়। সজ্ঞানে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ভয় অহরহ অনেক কিছু আছেই। অথচ মালমসলা এই-ই। এই দিয়েই শিল্পীমনের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড।

শিল্পী যে নিত্যদিনের ব্যথা ভয় সন্দেহ সংশয় নিয়ত বয়ে বেড়ায় তার অর্থ কি? এত যে সাধ্যসাধনা এ কার জন্যে? স্বামী যে দিনরাত খেটেখুঁটে আহার্য জোগাড় করে সে তার বৌছেলেমেয়ের জন্যেই তো। তাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন তুলে দেবার বিনিময়ে পরিতৃপ্তির যে হাসিটুকু সে দেখতে পায় তাই তার সব-পাওয়া! কিন্তু না, একটা কর্ত্তব্য বোধও তাকে দিনরাত কাজ করিয়ে ছাড়ে! সাংসারিক কর্ত্তব্যে সে সজাগ। শিল্পীও সামাজিক কর্ত্তব্যে সজাগ থাকেন। তার

শিল্প সামগ্রীর সংগ্রহ যার তার হাতে পরখ করবার জন্যে দেয়না সে, অথচ সে চায় যে-কে-সে তা তুলে নিক, আদর করুক, নিজের সংস্কারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুক, খুশি হোক। যে শিল্প যতবেশী মানুষের সংস্কারকে ভেঙ্গে গড়তে পারে সে তত বড় শিল্পী—আর যে শিল্পী যত বেশী মানুষের সংস্কারের সঙ্গে নিজের সংস্কার মেলাতে পারে সে তত বেশী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সকল শিল্পীই জনপ্রিয় হতে চায় বটে, কিন্তু কালজয়ী হতে পারবে কিনা সে আশংকার তাড়নাও কম নয়। কাল পরিবেশে শিল্পচেতনা পরিমিতিতে নিবদ্ধ। কাল পরিবেশের চাহিদা একরকম, রুচিপ্রকৃতি প্রবৃত্তি একরকম, নিজেকে দিয়েই শিল্পী তা বুঝে নিতে সক্ষম। তাকে যা জানতে হয়, জানাতে হয়, তা হল কালপরিবেশের ছন্দটিকে, ছন্দের মাত্রাটিকে—তা রঙেই হোক, রেখায়ই হোক, কাহিনী কি পটেই হোক, কণ্ঠে কি যন্ত্রেই হোক। এ সবের স্থূলত্বটুকু ঐ রঙে, রেখায়, লেখায়, সুরে, ধ্বনিতেই থেকে যায়—কিন্তু নির্দেশ যা করে তা অনেকখানিই দেশকালের সীমা ছাড়িয়ে কালজয়ী হবার ব্যাকুলতায় উজ্জ্বল।

কালপরিবেশের বিস্তীর্ণতায় একদিক থেকে শিল্পী ঐতিহাসিকও বটেন। ইতিহাসের ধারা মেনে চলেন। এই অর্থে শিল্পী ঐতিহাসিক যে কাল পরিমাণের মানুষ, মানুষের দুঃখসুখের অজস্র কথা তিনি সজ্ঞানেই হিসাব রাখেন। ইতিহাসের শিক্ষা নিয়েই হৃদয়ের উপর তার পরীক্ষা করেন এবং পরীক্ষামাত্রেই বুদ্ধি নির্ভর প্রয়োগ। যেখানেই বুদ্ধি সেখানেই তর্ক বিতর্ক, যুক্তির মারপ্যাচ আছেই। অর্থাৎ এমন শিল্পী নেই যিনি সমালোচক নন। ঐতিহাসিকের মত তিনি নিরপেক্ষ মোটেই নন। যা দেখেছেন তা নিজের চোখেই, যা শুনছেন একালেরই তা ধ্বনি। তিনি যা সৃষ্টি করছেন তা যখন নিজের কাছে ভালো তখনো নেশা—অমৃতের নেশা, যখন আর পাঁচজনার অনাদরের সামগ্রী, তখনো নেশা—বিষের নেশা। পঙ্ককুণ্ডে নেমেও পঙ্কজ হতে চান সব শিল্পীরাই, কিন্তু হিসেবে ইতিহাসবোধের অভাব অনেক সময়েই ঐ পঙ্কে একেবারে নিমজ্জিত করে ছাড়ে। তার অর্থ, শিল্পী তখন আর কারো কথা ভাবেন না, নিজের উপর নিজের শক্তি যত বেশী প্রয়োগ করেন ততবেশী পঙ্কের গভীরে তলিয়ে যেতে থাকেন। আত্মগত স্বয়ংসর্বস্ব শিল্পের পরিণাম এই-ই হয়। শিল্পী কোন অবস্থাতেই এবং কোন যুগেই নিরপেক্ষ হতে পারেন না। হওয়া উচিত নয়। শিল্পের ইতিহাস সেই কথা শেখায়। নিজের পছন্দ-মত একটা ছন্দকে আবিষ্কার করে নেয় শিল্পী, যে ছন্দ তার মতে আর সকলের শ্রোতব্য হওয়া উচিত। এটা সামাজিক প্রয়োজনের কথা, সামাজিক উচিত বোধ। এই উচিত বোধ নিয়েই শিল্পীর যত ভাবনা। শিল্পীর ঔচিত্য বোধের পেছনে ইতিহাসের শিক্ষা, একালের জীবনাচরণ আর দূরকালের সম্ভাব্য পরিণাম চিন্তা একটা মহাবৃত্ত রচনা করে। অতীত থেকে অনাগত ভবিষ্যৎ এই দূর পথ পরিক্রমায় যাত্রীর মত তাকে বিচরণ করতে হয়। নিজের দিক থেকে যাত্রী আর সকলের যাত্রা-সহচর। তারা পথের দিশারী—এ কথাটা ঠিক নয়। যে চলে নিজের দিশা সে নিজেই খুঁজে নেয়, জ্ঞান বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার আলোয়; শিল্পী সহায়ক মাত্র, পথ চলায় আনন্দ দেয়। এই তার বড় কাজ। তবে তার শিল্প-কর্ম আদর্শ বটে। এবেলা একরকম আদর্শ, ওবেলা আরেক রকম, এই রকমই হয়, কিন্তু না হলেই শিল্পী খুশি হন। শিল্পীর খুশি নিয়ে রসিকের কাজ চলতে পারে কিন্তু কারোর খুশিতে ইতিহাস খণ্ডিত হয়না। শিল্পী বেলার আয়ুষ্কালটা বাড়িয়ে দিতে পারেন মাত্র। সেইখানেই তার দক্ষতার, ভাবনার পরিচয় মেলে। দূরদর্শিতাই তাকে কালজয়ী করে। কিন্তু কাল সীমাহীন; আমাদের বিচারে তর-তমোর মধ্যে 'তর'কে নিয়েই কারবার, 'তম'র বিচারে কোনকালে চূড়ান্ত রায় বেরোবেনা। তবু শিল্প-কর্মকে সামাজিক মানুষ আদর্শ করে। অনেক মানুষের অনেক অবস্থার অনেক প্রাণের কথাই শিল্পীকে বলতে হয়, সেই অনেকের অভিজ্ঞতার, অনেকের ধ্যানের সিদ্ধি তার আয়ত্ব। তাই সে অনেকের একজনও বটে, আবার একজনের কাছে অনেকও বটে। সকলেরই প্রত্যাশা শিল্পী আমার কথা বলুক, আমার আত্মীয় হয়ে উঠুক। গোত্রান্তর গ্রহণে সেও অনিচ্ছুক নয়, বরং তার ভেতরের শক্তি তাকে সেইভাবেই চালাতে চায় কিন্তু বাধা আছে। তার উচিতের পেছনে অনেক দৃষ্টি খোলা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে বাধা অতিক্রম করতে পারলেন কই? তাঁকে নিয়ে কত যাচাই বাছাই, সে আজো চলছেই। সেটাই প্রাণের লক্ষণ। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক যুগে বার বার নিজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিব্যক্তিকে মিলিয়ে দেখবে এটাই স্বাভাবিক। তবে জোরজবরদস্তিও শিল্পীকে সইতে হয়। এককালে আমরা বললাম, রবিবাবু অবুঝ কবি। আবার বললাম, রবিঠাকুর, আভিজাত্যের কবি! ভাবের ঘনঘটা! বড় বেশী কবি কবি! সেই আমরাই আবার বলছি, রবীন্দ্রনাথ মহাকবি অর্থাৎ মানুষের সব সংস্কার তার শিল্প সামগ্রীতে পরিশীলিত হয়ে ধরা দিয়েছে। কিন্তু এখনি কি শুনছিনা, রবীন্দ্রনাথ সর্বসাধারণের (সাধারণ অর্থে সাধারণ সংজ্ঞার যে সংস্কার আমাদের মনে আছে) আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণরূপ দিতে একটা বাধার প্রাকারে এসে ঠেকে গিয়েছেন। কথাটা একহিসেবে সত্যের মত শোনায়। আজ যা চোখের সামনে প্রত্যক্ষ সত্য রবীন্দ্রনাথের কালপরিবেশে তা ততটা স্পষ্ট ছিলনা। শিল্পে অস্পষ্টতার স্থান নেই। শিল্পীর কাছেও তা স্পষ্ট হওয়া দরকার, শিল্পের যারা স্বাদ নেয়, তারাও যখন গ্রহণ করে স্পষ্ট করেই গ্রহণ করে। তবে একের স্পষ্টতা অন্যের স্পষ্টতায় ভেদ আছে। কারণ সংস্কার এক নয়। দুই কাল কখনো এক সংস্কারে গণ্ডীবাধা থাকেনা। যে প্রচণ্ডতায় একজনের সংস্কার ভাঙ্গে, আরেকজনার সংস্কার ভাঙ্গতে তার চেয়ে বেশী শক্তির দরকার হতে পারে। শুধু ভাঙ্গা নয়, গড়ার ব্যাপারেও শক্তি তর-তম আছেই। শিল্পী যেটা আবিষ্কার করেন এবং যা নির্দেশ করেন তার স্পষ্টতা চাই, নইলে চলেনা।

জীবন সংগ্রামের ধারা অহরহ পরিবর্তিত হচ্ছে—রূপান্তর ঘটছে। যে ব্যথায় কাল হেসেছি, আজ হয়তো তা আরো নির্মম অথবা আদৌ



তিথি-পঞ্জী

উপানন্দ

শ্রাবণের বর্ষণ-ঘন ক্ষণে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর দিকে আজ দৃষ্টি প্রসারিত করবো। এই শতাব্দী আমাদের ইতিহাসে সুবর্ণযুগরূপে সমাদৃত। ধর্ম্মে কর্ম্মে, আচার ও আচরণে, মনীষায়, জ্ঞানবিজ্ঞানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দীপালী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, প্রাচ্যদিগন্তে দেখা দিয়েছিল নবযুগের জীবন সূর্য এই যুগে। এর উৎসব যাঁরা করে গেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জন্ম নিয়েছিলেন লোকোত্তর বিরাট প্রতিভা ও মহান্ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। তাঁদের সমগ্র সাধনা, সমগ্র চিন্তা, সকল কর্ম্ম প্রবাহের মাঝেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মহত্তম আদর্শের অভিব্যক্তি। তাঁরা জাতির সমাজজীবনকে সংস্কার করে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার নবসংস্কৃতির রূপদান করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আজ হোক্ আমাদের বক্তব্যের বিষয়। এই শ্রাবণের বর্ষণমুখর পরিবেশের মধ্যে মহাপ্রস্থান করেছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এমনদিনেই জন্ম নিয়েছিলেন বিশ্ববরেণ্য ভারতের নাগার্জ্জুন রসায়নাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, আর নবভারতের স্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ।

পাশ্চাত্য ধরণের বিদ্যার্জনের দ্বারাই যে শুধু সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় এই ধারণাকে দূর করে দিয়েছিলেন সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ছাত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে জ্ঞান, শিক্ষা, কর্ম্ম ও চিৎ-প্রকর্ষের ফসল ফলিয়ে তাঁর স্বদেশবাসীকে মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক হিসাবে তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম। তাঁরই আনুকূল্যে নিরাভরণা ভাষাজননী রাজরাজেশ্বরীর রূপধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগর ছিলেন রাজা রামমোহনের উত্তর-সাধক। তিনি ছিলেন দয়ার সাগর, দানবীর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁর করুণায় নিস্নাত হয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অপরিসীম। মাতা-পিতাকে তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করতেন। মায়ের একটি কথাতেই তিনি চাকুরি ত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। এই মহাপুরুষের শেষ জীবন অশান্তিময় হয়েছিল। যাদের জন্যে তিনি সারা জীবন ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন তারাই তাঁর অশান্তির কারণ হয়েছিল। তিনি আমাদের মানসিক পথ্যের ও অন্তরের অন্নপানের অক্ষয়ভাণ্ডার রেখে গেছেন। এসো, আজ আমরা তাঁর স্মৃতিপূজা করে ধন্য হই।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয় সিপাহী-বিদ্রোহের মাধ্যমে। এই সময়েই একটা যুগান্তর দেখা দিল ইতিহাসের বন্ধুর পন্থায় পদচারণা করে। সিপাহী-বিদ্রোহ দিবস এসেছে এই মাসে,—দুর্গতিগ্রস্ত দেশের পরাধীনতার ভেতর জন্ম নিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজ শাসকবৃন্দের প্রতিকূল মনোবৃত্তির সামনে দাঁড়িয়ে আপনার জয়ধ্বজা তুলে ব্রিটিশ মসনদ প্রকম্পিত করেছিলেন। আমলাতন্ত্র সরকারের সর্ব্বোচ্চ চাপরাশ পেয়েও সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীর মুক্তিকল্পে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করেছিলেন রাজকীয় উচ্চ পদত্যাগ করে,—তাঁর শক্তিরথের চক্রঘর্ঘর ধ্বনি শুধু ভারতে নয়, সাগরপারেও শোনা গিয়েছিল। আজ যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন, তাঁরা এই প্রতিভাধর বাগ্মী রাজনীতিবিশারদ সিদ্ধ ব্যক্তির কাছে রাজনৈতিক বর্ণপরিচয়ের ছাত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁরাই আমাদের রাষ্ট্রকর্ণধার। যে বিদ্যা অপমান ও দুর্গতি থেকে মানুষকে রক্ষা করে, যে আদর্শ মানুষকে মাতৃভূমির সর্ব্বপ্রকার উন্নয়নে সাহায্য করে, সেই বিদ্যা, সেই আদর্শ ছিল সুরেন্দ্রনাথের সহজাত। কংগ্রেসের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনায় তিনি নিজের রক্ত দিয়েই এক একটি ইষ্টকখণ্ড স্থাপন করেছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, সে শক্তি রণক্ষেত্রেও দুর্লভ। তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তার কাছে, তাঁর বি য়



তিথি-পঞ্জী

উপানন্দ

শ্রাবণের বর্ষণ-ঘন ক্ষণে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে আজ দৃষ্টি প্রসারিত করবো। এই শতাব্দী আমাদের ইতিহাসে স্বর্ণযুগরূপে সমাদৃত। ধর্ম্মে কর্ম্মে, আচার ও আচরণে, মনীষায়, জ্ঞানবিজ্ঞানে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দীপালী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, প্রাচ্যদিগন্তে দেখা দিয়েছিল নবযুগের জীবন সূর্য এই যুগে। এর উৎসব যাঁরা করে গেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জন্ম নিয়েছিলেন লোকোত্তর বিরাট প্রতিভা ও মহান্ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। তাঁদের সমগ্র সাধনা, সমগ্র চিন্তা, সকল কর্ম্ম প্রবাহের মাঝেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মহত্তম আদর্শের অভিব্যক্তি। তাঁরা জাতির সমাজজীবনকে সংস্কার করে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার নবসংস্কৃতির রূপদান করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে আজ হোক্ আমাদের বক্তব্যের বিষয়। এই শ্রাবণের বর্ষণমুখর পরিবেশের মধ্যে মহাপ্রস্থান করেছেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ, আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। এমনদিনেই জন্ম নিয়েছিলেন বিশ্ববরেণ্য ভারতের নাগার্জ্জুন রসায়নাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, আর নবভারতের স্রষ্টা ঋষি অরবিন্দ।

পাশ্চাত্য ধরণের বিদ্যার্জনের দ্বারাই যে শুধু সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় এই ধারণাকে দূর করে দিয়েছিলেন সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ছাত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি বৃহত্তর মানবতার ক্ষেত্রে জ্ঞান, শিক্ষা, কর্ম্ম ও চিৎ-প্রকর্ষের ফসল ফলিয়ে তাঁর স্বদেশবাসীকে মহত্তর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক হিসাবে তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম। তাঁরই আনুকূল্যে নিরাভরণা ভাষাজননী রাজরাজেশ্বরীর রূপধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সমাজ-সংস্কারক হিসাবে বিদ্যাসাগর ছিলেন রাজা রামমোহনের উত্তর-সাধক। তিনি ছিলেন দয়ার সাগর, দানবীর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি তাঁর করুণায় নিষ্কাত হয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অপরিসীম। মাতা-পিতাকে তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞান করতেন। মায়ের একটি কথাতেই তিনি চাকুরি ত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। এই মহাপুরুষের শেষ জীবন অশান্তিময় হয়েছিল। যাদের জন্যে তিনি সারা জীবন ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন তারাই তাঁর অশান্তির কারণ হয়েছিল। তিনি আমাদের মানসিক পথ্যের ও অন্তরের অন্নপানের অক্ষয়ভাণ্ডার রেখে গেছেন। এসো, আজ আমরা তাঁর স্মৃতিপূজা করে ধন্য হই।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয় সিপাহী-বিদ্রোহের মাধ্যমে। এই সময়েই একটা যুগান্তর দেখা দিল ইতিহাসের বন্ধুর পন্থায় পদচারণা করে। সিপাহী-বিদ্রোহ দিবস এসেছে এই মাসে,—দুর্গতিগ্রস্ত দেশের পরাধীনতার ভেতর জন্ম নিয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজ শাসকবৃন্দের প্রতিকূল মনোবৃত্তির সামনে দাঁড়িয়ে আপনার জয়ধ্বজা তুলে ব্রিটিশ মসনদ প্রকম্পিত করেছিলেন। আমলাতন্ত্র সরকারের সর্ব্বোচ্চ চাপরাশ পেয়েও সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীর মুক্তিকল্পে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করেছিলেন রাজকীয় উচ্চ পদত্যাগ করে,—তাঁর শক্তিরথের চক্রঘর্ঘর ধ্বনি শুধু ভারতে নয়, সাগরপারেও শোনা গিয়েছিল। আজ যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন, তাঁরা এই প্রতিভাধর বাগ্মী রাজনীতিবিশারদ বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে রাজনৈতিক বর্ণপরিচয়ের ছাত্র বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁরাই আমাদের রাষ্ট্রকর্ণধার। যে বিদ্যা অপমান ও দুর্গতি থেকে মানুষকে রক্ষা করে, যে আদর্শ মানুষকে মাতৃভূমির সর্ব্বপ্রকার উন্নয়নে সাহায্য করে, সেই বিদ্যা, সেই আদর্শ ছিল সুরেন্দ্রনাথের সহজাত। কংগ্রেসের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনায় তিনি নিজের রক্ত দিয়েই এক একটি ইষ্টকখণ্ড স্থাপন করেছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি যে শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, সে শক্তি রণক্ষেত্রেও দুর্লভ। তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তার কাছে, তাঁর বি র।

অধ্যবসায়, স্বদেশ-প্রেমিকতা ও অক্ষুণ্ণ আশার কাছে রাজশক্তির দুরতিক্রম বাধাও স্থায়ী হোতে পারেনি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার তিনি শুধু পথিকৃৎ ন'ন, বুদ্ধিগৌরবে ভারতের সুপ্ত আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে তিনি মহাশক্তির লীলা দেখিয়ে গেছেন। আমরা হতভাগ্যের দল তাঁর শেষ জীবনে নানাভাবে তাঁকে লাঞ্ছিত করেছি, তাই আজ আমরা মূঢ়তা থেকে মুক্তি পেয়েও শোচনীয় অবস্থায় বিমূঢ় হয়ে রয়েছি, যন্ত্রশক্তির চরম বিকাশের দিনেও আমাদের প্রাণশক্তি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, আমরা উপবাসী, রোগজীর্ণ আর সর্ব্বতোভাবে পঙ্গু হয়ে, আজও ইতিহাসের কলঙ্ক মেখে রয়েছি। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর জীবন সন্ধ্যায় যেভাবে আমরা অপমান করেছি, তা ভাবলেও আত্মগ্লানিতে অন্তর বিষিয়ে ওঠে। যাঁর একনিষ্ঠ সাধনায় স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারতবর্ষের জয়-গৌরবলাভ হয়েছে, সেই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে আমরা স্বাধীন ভারতের নবযুগের প্রণতি দান করি। এসো, তাঁর তিরোধান তিথিতে তাঁরই উদ্দেশে স্মৃতি তর্পণ করি। তিনি বাঙালীর অন্তরাত্মা।

চিরকুমার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়নাচার্য্য বৈজ্ঞানিক ও চিন্তানায়ক। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত বাঙ্গালীর পর্ণশ্রীমণ্ডিত উটজ কুটীরে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন এই মাসে। তাঁর ছাত্রজীবনে আমরা দেখেছি তাঁর তীক্ষ্ণপ্রতিভা ও অসাধারণত্ব, কর্ম্মজীবনেও দেখেছি তাঁর অনন্যসাধারণ বিরাট ব্যক্তিত্ব, দেখেছি তাঁর, সংগঠন শক্তি ও দেশভক্তি। তাঁর ছাত্রেরাও বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকও রসায়নবিদ্ হয়েছেন ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রকে তিনি উর্ব্বর করে গেছেন, স্বদেশের চিত্তমরুকে শ্যামল করে গেছেন, আর বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে বিলাস ব্যসন ত্যাগ করে স্বাবলম্বী হয়ে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবার জন্যে মহৎ প্রেরণা দিয়ে গেছেন। তিনি শুধু উত্তম বৈজ্ঞানিক ন'ন, সাহিত্যিকও বটে। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করে স্বাধীনতার আন্দোলনের ইতিহাসে শাশ্বত স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পাশ্চাত্য ভোগবিলাস তিনি ঘৃণার সঙ্গেই বর্জ্জন করেছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের মন্ত্র উদ্‌গাতা হিসাবেও আমরা দেখেছি তাঁর জাতীয়তা বোধ। তিনি ছিলেন ছাত্রদের পরম বান্ধব, কর্ম্মহীন যুবকদের পথপ্রদর্শক, আর আদর্শহীন মানবের ভগবৎ-প্রেরিত পরিত্রাতা। জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁর শ্রমলব্ধ অর্থভাণ্ডার মুক্তহস্তে দিয়ে গেছেন। জাতীয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি বহু গঠনমূলক কাজ করে গেছেন। তাঁর পুণ্য জীবনকথা যতই আলোচিত হবে ততই আমরা আমাদের হারানো সুর ফিরে পাবো। এসো, তাঁকে প্রণাম করি।

এইমাসে জন্মেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ সেইদিনে—যেদিনে আমাদের স্বাধীনতা দিবসের উৎসব। তিনি এসেছিলেন অন্যতম ত্রাণকর্ত্তা হিসাবে। বিশ্বসাহিত্যক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে অধ্যাত্মক্ষেত্রে ও মননের ক্ষেত্রে তাঁর অমূল্য দান অবিস্মরণীয়। ভগবৎসাধনার দ্বারা তিনি অতিপ্রাচীন [illegible] অলৌকিক যৌগিক বার্ত্তা শুনিয়ে গেছেন। কারাগারে তিনি প্রথম ভগবানের দর্শন লাভ করেন। বিশ্ব চেতনার কথা তিনিই শুনিয়ে গেছেন। তাঁর পণ্ডিচেরীর আশ্রম পৃথিবীর অন্যতম মহাতীর্থরূপে পরিগণিত হয়েছে। এসো, তাঁর উদ্দেশে আমরা আমাদের প্রাণের প্রণাম জানাই।

বালকবীর ক্ষুদিরামের শহীদ দিবস এইমাসে। স্বাধীনতার যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে এই কিশোর ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে। এই ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে উঠে গেয়ে গেছে নবজীবনের গান। এসো, সেই কিশোর বন্ধুর উদ্দেশ্যে আমরা স্মৃতি-তর্পণ করি।

বাইশে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিরোধান তিথি। রবীন্দ্র প্রতিভা সমগ্র বিশ্বের কাব্যের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রেই শুধু সার্থক হয়ে ওঠেনি, কবিজীবনের সঙ্গে শিল্পের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন করে সে প্রতিভা বহুমুখী ও বহুরূপী হয়ে মানব-সমাজের পরম বিস্ময় হ'য়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ তিনি স্বদেশের বেদিমূলে বিগ্রহের মত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ভাবজগতের তিনি ছিলেন রাজরাজেশ্বর। বাংলার নবভাব জীবনের স্রষ্টা তিনি। পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন তাঁরই সাধনায় ঘটেছে। বিশ্বভারতী তাঁর অমর কীর্ত্তি। এসো, তাঁর উদ্দেশ্যে আমরা তর্পণ করি। এই মাসে তোমরা স্বাধীনতা দিবস পালন করবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে, আর স্মৃতিপূজা করবে তাঁদের, যাঁরা মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা হয়ে জাতিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন। যেসব মনীষির কথা তোমাদের কাছে বললাম, তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী তোমরা তোমাদের জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জীবনের পথে চললে তোমরাও সত্যপ্রিয়তা, স্বদেশানুরাগ, পরোপকার, জাতীয়তা-বোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর অধিকারী হয়ে সংসার-সমাজের অশেষ কল্যাণ করতে সমর্থ হবে। বিংশ শতাব্দী তোমাদের সাধনায় জাতীয় ইতিহাসে গৌরবলাভ করুক, এইটাই আমরা অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। তোমাদের অন্তরে শিব, বাহিরে শক্তি বর্ত্তমান। যেদিন এই সত্য তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে, সেদিন হবে আমাদের সভ্যতাও সংস্কৃতির জয়যাত্রা, আশা করি তোমরা এ বিষয়ে ভেবে দেখবে।

কে বড় ?

ভূপতি ভট্টাচার্য

একদিন হয়েছে কি, এক নাপিত আর এক মুচিতে লেগে গেছে তুমুল ঝগড়া। কী ব্যাপার ? না, দুজনেই নিজেকে বড় বলে স্বীকার করাতে চায়।

নাপিত বলছে—আরে ব্যাটা মুচি ! তোর [illegible] এই দাড়ি-গোঁফের সামিল।

মুচি বলছে—জাতের কথায় কাজ কী ? জাত ধুয়ে খাবে নাকি ? ব্যাটা নাপিতের সঙ্গে তুলনা দিচ্ছে মুচির !

—আচ্ছা জাতের কথা না হয় তোলাই থাক। পেশার কথাই ধর্। ইস্! কী ঘেন্না! দেখা নেই, শুনো নেই, যার তার জুতো ওই হাতেই ধরিস্! ঠুক্-ঠাক্ পেরেক ঠুকে সারাটা দিন রোদে পুড়ে তিনটে আধলা পাস্। আবার কথা কইতে এসেছিস্ ?

—আর তুই কোন্ সুকম্ম করিস্ শুনি ? কথা নেই, বার্তা নেই—যাকে পেলি চুলের ঝুঁটি কি দাড়ির খোঁচা ধরে ক্যাচর-ক্যাচ! উকুনে ভর্তি মাথা ঘেটে ঘেটে বুড়ো হলি। আবার নিন্দে করছিস্ আমার কাজের ? ব্যাটা দেখবো তখন কোথায় যাস্—যখন তোর জুতোর তলা খসে হবে পাতলা—

—রাখ্—রাখ্! আর কাজের বড়াই করতে হবে না। তোর মুখ দেখলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আরে মলো! তোর জন্মই তো হল এই সেদিন। জুতো এল বাজারে—আর তোরাও গজালি এধারে। আর আমি ? সেই আদ্যিকাল থেকে মানুষের উপকার করে আসছি। যদ্দিন মানুষ আছে, তদ্দিন নাপিত আছে। বুঝলি ? রাজার মাথা ধরে এপাশ-ওপাশ করতে পারে কে ? আর কেউ নয়—এই নাপিত-ভায়া। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ······

—ভ্যাথ্, নাপতে, বেশি পাকামো করিস্ নে। বলি, চুল না ছেটে, দাড়ি না সাফ করে অনেক লোকই তো দিব্যি আরামে রয়েছে। কিন্তু জুতোর তলা ঘসলে কারুর তোয়াক্কা রাখে না, এমন জুতো-আঁকড়া কে আছে বলতে পারিস্ ? রাস্তায় চলছিস্, হঠাৎ পট করে চপ্পলটার একটা স্ট্র্যাপ গেল ছিঁড়ে। তখন ? রাস্তার একরাশ লোকের সুমুখে অপমানের হাত থেকে কে বাঁচায় বলতো ? হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ···এই মুচিশম্মা। ভেবে ভ্যাখ্ একবার—আমি যদি না থাকতুম এই দুনিয়ার লোকগুলোর অবস্থা কী দাঁড়াত! জুতোর তলা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষে কিনা পায়ের চামড়া ঘসতে শুরু করে দিত। দিনকে দিন মানুষ বেঁটে—বেঁটে—আর বেঁটেই হতে থাকত।

—হুঁ! একটা বললেই হল! চামড়ার গন্ধ শুঁকে শুঁকে বুদ্ধিটা একদম তালগোল পাকিয়ে গেছে।

—বাজে বকিস্ নে উকুন-খেকো।

—কী আমি উকুন-খেকো ? আর তুই—তুই পায়ের ময়লা-খেকো।

—পাজি—বেল্লিক—নচ্ছার—

—ছুঁচো—শকুন—গিদ্ধিমাছের মুড়ো।

চলল তাদের এমনি কথা কাটাকাটি। কথা কাটাকাটি থেকে গালমন্দ, আর গালমন্দ থেকে মারামারি বাধে আর কি। নাপিত তার চক্‌চকে ক্ষুরটা বাগিয়ে ধরলে—আর মুচি কিছু না পেয়ে ওর সেই তিনমাথা-ওয়ালা লোহার পিণ্ডটা তুললে শূন্যে।

কিন্তু রক্তারক্তিটা শেষ পর্যন্ত আর হয়ে উঠল না। চারদিক থেকে হাঁ-হাঁ করে লোক ছুটে এসে সব ঠাণ্ডা করে দিলে।

নাপিত আর মুচি তখন রাগে ফুঁসছে। তারা তাদের তর্কের বিচার চাইলে। কিন্তু কে পারে তাদের ওই শক্ত কথার উত্তর দিতে ? তাই তারা সব্বাই একে একে সরে পড়ল।

মুচির মাথায় তখন একটা বুদ্ধি খেলল। কোত্থেকে যেন একটা ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে নিয়ে এল।

বললে—এই আমাদের তর্কের বিচার করবে। ও যার হাত তুলে ধরবে, তারই হবে জিত—সেই হবে বড়।

নাপিত রাজি হয়ে গেল।

মুচি ভাবলে—এ বেশ হল। এবার আমার জিত ঠেকায় কে ? ওই মেয়েটার তো কোনদিন নাপিতের কাছে দরকার পড়বে না, দরকার পড়লে পড়বে আমারই কাছে। তাই ও যে আমার হাত তুলে ধরবে, এ তো খুব জানা কথা।

কিন্তু ব্যাপারটা গেল একেবারে ঘুরে। মুচির মুখে চুণ-কালি মাখিয়ে মেয়েটা নাপিতের হাত তুলে ধরলে।

নাপিত তো খুশিতে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলে। আর মুচি ? ও রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে এই বিচারের কারণ জানতে চাইলে।

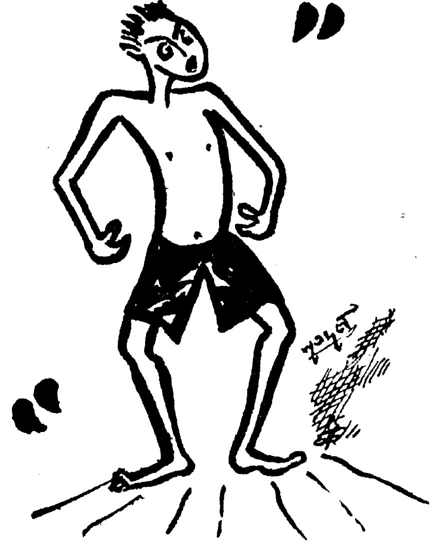
মেয়েটা তখন ঝর্ ঝর্ করে বলে গেল—মানুষ বড় হয় তার কাজে আর দৃষ্টিতে। এখানে দেখছি, কাজের দিক দিয়ে কেউই কম নয়—দুজনেই সমান। তাই দৃষ্টি দিয়েই বিচার হল। মুচির নজর হল সবসময় পায়ের দিকে। কার জুতোর গোড়ালি কতটা ঘসল—এই দেখতে দেখতে ওর দৃষ্টিটা হয়ে গেছে এত নীচু যে ও কখনো কারুর মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতেই পারে না। আর নাপিত ভায়া, তোমার পেশাই তো হল লোকের মাথা দেখে বেড়ানো। তাই তোমার দৃষ্টিটাও হল উঁচু।

মুচি আর নাপিত দুজনেই এতটুকুন মেয়ের বুদ্ধির বহর দেখে থ বনে গেল।

—



ভূত পাগলা ভূতো রাম
ভূত দেখলেই ভয়ে মরে,
ভূতের কথা শুনলে কাণে
ঠক্ ঠকা ঠক্ কাঁপে জ্বরে !
ভূত পাগলা ক'রেছে তাকে
ছোট্ট থেকেই দেখিয়ে ভয়—
ভূত ছাড়াতে ভূতো রামের
তাইতো ওঝা ডাক্‌তে হয় !
ভূতের ওঝা সময় সময়
ভূতোর কাছেও হার যে মানে,
দেখ্‌লে ওঝা কামড়ে ভূতো
মাংস দেহের ছিঁড়ে আনে !
ভূত ছাড়াবেন তার সে কিসে ?
ভাব্‌তে ভাব্‌তে সেদিন রাতে—
মন্ত্রৌষধি হঠাৎ মা তার
পেলেন ভোরের স্বপ্ন সাথে।
মন্ত্র পেয়েই রাম, লক্ষ্মণ,
হনুমানের বীরের ছবি—
ভুলিয়ে মা তার দেখান তাকে
গল্প ক'রে শোনান সবই।
রাক্ষসদের পতন দেখে,
গল্প শুনে বীরের তাঁর—
ক'দিন পরেই ভূতোর ঘাড়ের
ভূত সে হ'ল পগার পার !
সেই থেকে সে নয় আর ভূতো
আজ সে মায়ের বীরের ছেলে ;



ভূত ছাড়ানোর আজ সে ওঝা
ভূত সে তাড়ায় খবর পেলে।

কোণার

শ্রীপার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়

কোলকাতা থেকে ট্রেণে দুশো মাইল, তারপর মোটরে পঁচিশ মাইলের মতো। তবেই কোণার বাঁধ ; ছোটনাগপুরের বিরাট বিরাট পাহাড়-গুলো যাকে অক্টোপাশের মত ঘিরে রেখেছে।

হাজারিবাগ জেলার বোকারো আগে ছিল শুধু ধূ ধূ প্রান্তর, আর শাল-পিয়ালের জঙ্গল। বোকারো নদীর ধারে ধারে, কোণার নদীর তীরে, পাহাড়গুলিতে মাঝে মাঝে দেহাতীদের দু একটি কুঁড়ে ঘর চোখে পড়ত। আরও কয়েক মাইল দূরে কোলিয়ারিকে কেন্দ্র করে নগর সভ্যতার পত্তন সবে শুরু হয়েছে। দেহাতী মেয়ে পুরুষেরা ছুটত সেখানে।

বোকারো আর কোণারের বুকে তখনও অরণ্য সভ্যতার [illegible]

সাম্রাজ্য। এইতো সেদিন গড়ে উঠল বোকারো আর কোণার। হাজারিবাগের নিশীথ অরণ্যচারীরা একদিন সভয়ে লক্ষ্য করল; ট্রাক্টর, ক্রেণ আর ভারি ভারি যন্ত্রপাতির বিপুল শব্দে আর জনকোলাহলে ছোটনাগপুরের সুপ্ত অরণ্যে জেগেছে ময়দানবের ভয়াল পদসঞ্চার।

পাহাড় কেটে গড়ে উঠল নগর—বোকারো। দেশ-বিদেশের ইঞ্জিনীয়র দল এসে প্রতিষ্ঠিত করল এশিয়ার বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। আরও কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ী কোণারের উদ্দাম যৌবনকে বেঁধে ফেলা হোল কংক্রিটের বাঁধনে।...বিহারের অরণ্যানীর প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার সারি সারি বিদ্যুৎমালার আলোকে ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল। গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথের রূপসম্পূর্ণ পালটিয়ে দিয়ে গেল বিশ শতকের সভ্যতার ষ্টীম রোলার। ডি, ভি, সির পিচবাঁধানো এই নোতুন রাস্তা ধরে আমাদের পিকআপ ছুটে চলেছে কোণার বাঁধের দিকে।

পিক-আপের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষই করে দিলেন। আমার এক নিকটতম আত্মীয় বোকারোর ইঞ্জিনীয়র। তাঁদের আপিস থেকে অডিটষ্টাফকে নিয়ে একটি পিক-আপ কোণার যাবে। আমাদের দু'জনের স্থান সঙ্কুলান হয়ে গেল। পাহাড়ের নীচ দিয়ে রূপালী অজগরের মত রাস্তা চলে গেছে এঁকে-বেঁকে। নির্জন পথ। মাঝে মাঝে দু'একটি লরি পাশ কাটিয়ে তীরবেগে চলে যাচ্ছে। পথের ধারে কোথাও হয়ত রাস্তা রিপেয়ার হচ্ছে। গাঁইতি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা দেহাতী মানুষগুলোর চোখে মুখে বোবা বিস্ময়।

দু'পাশে গভীর অরণ্য। সরকারি পরিভাষায় রিজার্ভ ফরেষ্ট। শাল আর মহুয়ার পারস্পরিক প্রতিযোগিতা যেন আকাশ ছোঁবার। সঙ্গীরা বললেন, রাত্রে মোটেই ভাল নয় এ পথ। হাজারিবাগের অরণ্যচারীরা তখন নাকি নৈশ ভ্রমণে বেরোয়। ভালুক কিংবা লেপার্ডের মুখোমুখি হয়নি এমন মোটর ড্রাইভারের সংখ্যা নাকি খুবই কম।

মাইল পনের যাবার পর শেষ হয়ে গেল পিচের রাস্তা। এবার আবার লাল সুরকির পথ শুরু। জেলা বোর্ডের সড়ক। ধুলো উড়িয়ে আমাদের গাড়ী ছুটে চলল।

পৌঁছে গেলাম কোণার। ভেবেছিলাম বোকারোর মতই বোধ হয় পরিকল্পিত শহর হবে কোণার। নগর-সভ্যতার সব কিছু উপকরণের কোন দৈন্য থাকবে না সেখানে। কিন্তু তার পরিবর্তে এক শান্ত-সংযত পল্লীর রূপ দেখলাম। যন্ত্র কোণারের দেহকে বেঁধে ফেললেও...তার মনকে বাঁধতে পারিনি। শাল-পিয়ালের গাছের ফাঁকে ফাঁকে কর্মীদের কতকগুলি অবিন্যস্ত কোয়ার্টার্স। একদিকে টিনের চাল দেওয়া আপিস। লম্বা হাসপাতাল। খেলার মাঠ।

নেই চিমনির ধোঁয়া, নেই কোলাহল। কোণারের আরণ্যক প্রকৃতির বুকে এখনও যেন তপোবনের প্রশান্তি আর মৌনতা।

কর্মী-ভদ্রলোকেরা বললেন—আপনারা এগোন ড্যামের দিকে। জিনিসপত্র রেখে দিয়ে আমরা আসছি।

আমি আর আমার বন্ধু ভবানী নেমে পড়লাম পিক-আপ থেকে। দু'জনে এগিয়ে চললাম ড্যামের দিকে। নীচে নামবার জন্যে ছোট ছোট সিঁড়ি আছে। নেমে পড়লাম নীচে। স্লুইস-গেট দিয়ে জল নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা। দুটি গেট খোলা আছে। বাকীগুলো বন্ধ। ওপাশের অতিরিক্ত জল গেটের ভেতর দিয়ে এসে এপাশের পাষাণরাশিতে মাথা খুঁড়ছে। জলের একটি স্বচ্ছ ধারা পাষাণ স্তূপের মধ্য দিয়ে বোকারোর দিকে চলে গেছে।

কোণার আর বোকারো এই দুটি নদী মিশেছে বোকারো শহর থেকে কিছু দূরে। যাঁর জল বোকারো থার্মল-পাওয়ার-ষ্টেশনের একমাত্র সম্পদ।

এই কোণার, এই শীর্ণাঙ্গী নদীটিকে এত ভয় মানুষের! যার সাথে যুঝবার জন্যে কয়েক কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে সরকারকে। মনের অজান্তেই কথাকটি বোধ হয় বলে ফেলেছিলাম।

আমার ভুলটিকে ভেঙে দিলেন ইঞ্জিনীয়রদের একজন। বললেন—বর্ষায় এর ভীষণ বিধ্বংসী রূপ তো কখনও দেখেন নি। শীর্ণাঙ্গী কোণার তখন মত্ত হস্তীর নৃশংসতায় রূপ নিয়ে গ্রামকে গ্রাম নিয়ে যায় ভাসিয়ে। এর কুলু কুলু শব্দ নাকি পরিণত হয় ক্রুদ্ধ গর্জনে। বাঁধের একপাশে বর্ষার জল ধরে রাখা হয়েছে এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। ক্যানেল দিয়ে শস্যক্ষেত্রের জন্যে ভবিষ্যতে ছাড়া হবে সে জল। দূর থেকে মনে হয় যেন এক সুন্দর হ্রদ। কোণারের অবরুদ্ধ জলের ওপর তখন অস্তগামী সূর্য্যের সোণালী আভা এসে পড়েছে। গোধূলির অস্পষ্টতায় ওপাশের শাল-মহুয়ার জঙ্গলে সিলুয়েট ছবির মায়াময়তা। বিহঙ্গেরা কুলায় ফিরছে। তাদের ব্যাকুল ডানার রূপালী ছায়া কোণারের জলে।

বাঁধের ওপরে কংক্রীট জমানো পথ। ফুলের কেয়ারি করা বাগান। ১৯৫৩ সালে নেহেরু উদ্বোধন করেছিলেন কোণার বাঁধ। একটি স্মারক স্তম্ভ তাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নীচে ইংরেজী হরফে বড় বড় করে লেখা ভারতের জনসাধারণের জন্যে উৎসর্গীত। রাত্রির অন্ধকারে বড় সুন্দর দেখায় কোণার বাঁধ, চারিদিকে যখন নেমে আসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধকার। হাজারিবাগের নিশীথ অরণ্যচারীরা যখন বেরিয়ে পড়ে গহ্বর ছেড়ে তখন এক আকাশ তারার মত ঝিকমিক করে জ্বলতে থাকে কোণার বাঁধ। দীপালোকের মালায় সুসজ্জিত কোণার রাতের অন্ধকারে যেন অভিসারিকার বেশ ধারণ করে। অনেক—অনেক দূর থেকে দেহাতী লোকেরা দেখতে পায় সেই আলো।

আমার বন্ধুটি বিজ্ঞানের ছাত্র। আমার আছে মুগ্ধতা ওর আছে অনুসন্ধিৎসা, আমি দেখতে চাই, ও জানতে চায়। কোণারের ধ্যান-মৌন প্রকৃতির দিকে যখন আমি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলুম—তখন ভবানী প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে ফেলেছে কর্মী ভদ্রলোকটিকে। ওর সঙ্গে কথায় কথায় জানতে পারলাম প্রায় এক লক্ষ টাকার ঘাস কেনা হয়েছে কোণার বাঁধে লাগাবার জন্যে। মাটির ওপর এখন ঘাসের অরণ্য, জলস্রোতের সাধ্য কি তাকে ভেদ করে! আরও জানলাম কোণার বাঁধের এখন প্রধানতম কাজ হচ্ছে বোকারো কারখানাকে জল সরবরাহ

দেওয়া। দারুণ গ্রীষ্মে পাহাড়ী নদীর ধারা বয়ে যায় অবরুদ্ধ। তখন কোণারের সঞ্চিত জলই একমাত্র ভরসা।

ফেরার পথে শুধু মুখে ছাড়লেন না কর্মী ভদ্রলোকটি। নিয়ে গেলেন ওঁদের আপিসে। বেয়ারার হাতে ধূমায়িত চা আর টোষ্ট এলো। কথায় কথায় জমে উঠল পরিচয়। আলাপ হোল কোণারের অন্যান্য ইঞ্জিনীয়রদের সঙ্গে। অধিকাংশই বাঙালী আর বয়সে তরুণ। বোকারোতেও তাই দেখেছি। এই তরুণ বাঙালী ইঞ্জিনীয়রদের হাতেই নোতুন ভারত গড়ে উঠছে। লোকালয় বিবর্জিত এসব অরণ্য অঞ্চলে এঁরা বছরের পর বছর পড়ে আছেন। স্বাধীনোত্তর দেশের ইতিহাস এঁদের নিষ্ঠাকে কখনও ভুলতে পারবে না।

ড্রাইভার হর্ণ দিল। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে। ওরা এগিয়ে দিতে এলেন। নমস্কার বিনিময়ের পর ছ'জনে উঠলাম পিক-আপে। এবারে ফাঁকা গাড়ী। রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে এর এঞ্জিনটা গর্জন করে উঠল।

সেই অরণ্যানীর বুক চেরা পিচঢালা পথ দিয়ে ছুটে চলল আমাদের গাড়ী। স্পীডমিটারের কাঁটাটি কাঁপতে লাগল থর থর করে। তারপর এক সময়ে অরণ্যের মাঝে কোণার বাঁধের উজ্জ্বল আলোর ধারা হারিয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে ঐতিহাসিক নিস্তব্ধতায় শুধু থম থম করতে লাগল ছোটনাগপুরের অরণ্যানী আর ধ্যানমৌন পাহাড়গুলি।

—

সত্যিকারের গল্প

নিখিল সুর

সবে সন্ধ্যে হয়েছে। রাত্রির কালো ওড়না ঢেউ খেলে এগিয়ে আসছে পৃথিবীর বুকে, তাই বার বার বুঝি শিহরণ জাগছে আকাশে বাতাসে, আর তার সঙ্গে নিদারুণ শীতের নির্দয় আলিঙ্গন। দু'য়ে মিলে আবহাওয়াকে করে তুলেছে বিভীষিকাময়। পথে লোকজন অনেক কমে গেছে। প্রয়োজনও এই শীতের মুখে অপ্রয়োজনের সামিল। রাত্রির প্রয়োজনীয় কাজ দিনে সবাই সেরে নিয়েছে। তাই সমস্ত ঘর-বাড়ী বোবা।

কিন্তু আশ্চর্য্য! এই শীতেও একটা লোককে দেখা যাচ্ছে রাস্তার উপর। তার গতি-বিধিতে কোন রকম চঞ্চলতা নেই। পদক্ষেপগুলি মেপে মেপে চলছে। সত্যি কি অদ্ভুত! ...ক গরম কাপড় তুচ্ছ করে মানুষের হাড়-বিঁধান শীতে গাছের সুদৃঢ় শিকড়-কাঁপান কঠিন হাওয়ার দুরন্ত বেগে লোকটির এই নৈশ ভ্রমণের অর্থ কি? বোধ-হয় ওর মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে। কেমন ঘন ঘন তাকাচ্ছে চারিদিকে। সাধারণ একটা গরম ওভারকোটে লোকটির আপদমস্তক ঢাকা। দেখলে মনে হয় অতি সাধারণ একজন পথচারী।

আগন্তুক এগিয়ে যায় একটা গলির ভিতর। গলির দুধারে সারি সারি বাড়ী। কিন্তু মনে হয় জনপ্রাণীহীন। সমস্ত জানলায় সার্সী আঁটা। আগন্তুক প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর দরজা কিংবা জানালার ধারে একবার করে দাঁড়ায়, তারপর আবার ধীরপদে এগিয়ে যায়। না—না—বোধহয় ও আশ্রয় চায়, তা না হলে অমনি করে প্রত্যেক বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াবে কেন? বোধহয় বুঝতে চেষ্টা করে বাড়ীর লোকেদের অস্তিত্ব। কোন রকম অস্তিত্বের ইঙ্গিত পেলেই বুঝি ডাকবে। কিন্তু তাকে বুঝি নিরাশ হ'তে হয়। গলি শেষ হ'তে চললো কিন্তু কোন বাড়ীতে কোন রকম সাড়া পেল না। আর মাত্র কয়েকখানা বাড়ী। হঠাৎ সামনের একটা বাড়ী থেকে কার এক উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে আগন্তুক দ্রুতপদে এগিয়ে গেল।

বাড়ীর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি চোখে পড়ছে। হ্যাঁ, এই ঘর থেকেই শব্দ আসছে, আগন্তুক সন্তর্পণে দরজার ফাঁকে ডান চোখটি রাখলো। চোখে পড়লো ঘরের অভ্যন্তরের দৃশ্য।

এক নিদারুণ দারিদ্র্যের চিত্র। মাত্র তিনটি জীব। মেঝেতে পড়ে আছে মুমূর্ষু মাতা। আর তার বুকের কাছে মুখ গুঁজে কুঁচকিয়ে ঘুমিয়ে আছে একটি উলঙ্গ শিশু। শতছিন্ন একটি কাঁথা মায়ের নিদারুণ শীতকে বাধা দেবার বৃথা চেষ্টা করছে। আর শিয়রে বসে আছে ৭৮ বছরের একটি বালক। চোখে জল, ব্যস্, আর কেউ নেই ঘরে। হ্যাঁ আছে, একটি মোমবাতি, ক্ষীণরশ্মি বিতরণ করে গলে-গলে অশ্রু ঝরাচ্ছে বালকটির প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে।

—মা, আর আমি দেখতে পারি না। এবার নিশ্চয় ভিক্ষে নিয়ে আসবো।

বালকের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—না বাছা, শোন। এখন কার কাছে গিয়ে ভিক্ষে চাইবি? কে তোকে ভিক্ষে দেবে? রাস্তায় কেউ নেই।

আর পরের কাছে হাতপাতা মহাপাপ, তুই যাস্ না। —মায়েরকাতর কণ্ঠধ্বনি।

—না, আমি তোমার এ কষ্ট আর দেখতে পারি না। কিসের পাপ? ভিক্ষে করবো কি পেটের জন্যে? না মা। তুমি বাধা দিও না। আমি যে করে হোক ভিক্ষে করে একটা ডাক্তার নিয়ে আসি।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক উঠে দাঁড়াল।

আবার ক্ষীণ কণ্ঠের নিষেধ ভেসে এল—ওরে, শোন বাছা।

—না মা আমি যাবো।

বালক এগিয়ে এল দরজার কাছে।

আগন্তুক মুহূর্তের মধ্যে সরে গিয়ে আত্মগোপন করলো।

বালক বেরিয়ে গেল দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে। আগন্তুক অনুসরণ করলো বালককে। পাতলা একটা ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে শীতে থর থর করে কাঁপছে। হাত দুটি বুকের কাছে জড় করা। চোখের দৃষ্টি বিহ্বলতায় পূর্ণ। গতি চঞ্চল। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। কিন্তু কোন পথচারীকে চোখে পড়ছে না। হঠাৎ পিছনে আগন্তুকের জুতোর শব্দ শুনে বালক পিছনে ঘুরে দাঁড়াল। আশার সহস্র প্রদীপ জ্বলে উঠলো বালকের বুকে। দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিল আগন্তুকের দিকে।

—আমাকে কিছু পয়সা দেবেন? বড় বিপদে পড়েছি, মায়ের ভীষণ অসুখ। কোনদিন ভিক্ষে করিনি। আজ এই প্রথম, সত্যি বলছি আমি পেটের জন্যে চাইছি না। শুধু মাকে বাঁচাব।

এক নাগাড়ে এতগুলো কথা বলে বালক ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আগন্তুকের মুখের দিকে'।

আগন্তুক যেন কি চিন্তা করতে লাগলো।

বালক আবার ব্যগ্র হয়ে উঠলো—দেবেন না?

আগন্তুকের মুখে কোন কথা নেই। বালক আর অপেক্ষা করলো না। অন্যের সন্ধানে পা বাড়াল।

—শোন। আগন্তুক ডাকলো।

—কি বলুন। বালক ঘুরে দাঁড়াল।

—পয়সা দিয়ে কি করবে?

—ডাক্তার দেখাবো।

—এই নাও। আগন্তুক পকেট থেকে একমুঠো পয়সা বালকের হাতে দিলো। বালকের ছোট মুঠিতে সব ধরলো না। দুটো মাটিতে পড়ে গেল।

বালক বিস্মিত হ'ল, চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করলো —এত?

—হ্যাঁ, এই নিয়ে যাও।

মাটিতে পড়ে যাওয়া পয়সা দুটি কুড়িয়ে নিয়ে বালক ছুটে গেল ডাক্তারের সন্ধানে।

আগন্তুক কিয়ৎক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বালকের দিকে। তারপর পা বাড়াল বালকের ঘরের দিকে।

হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে ঘরের ভিতর দেখে মা চমকে উঠে বললেন—আপনি কে?

—আমি ডাক্তার। আপনাকে দেখতে এসেছি। বলুন আপনার কি কষ্ট হ'চ্ছে।

ডাক্তারের সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বরে মায়ের চোখে জল গড়িয়ে এল।

কাতরকণ্ঠে বললেন—আমার দিন তো ফুরিয়ে এল। আমাকে আর কি দেখবেন, স্বামী মারা গেছেন এক বছর হ'লো। এই এক বছর ধরে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছি এই দুই নাবালক নিয়ে। যা সঞ্চয়ে ছিল মহাজনের সুদে গেছে। আমি চোখ বুজলে আমার বাছাদের কি হ'বে ভাবছি।

—হ্যাঁ। আমি সব বুঝতে পেরেছি। একটা কাগজ দিন তো। আমি একটা অষুদের নাম লিখে দিয়ে যাচ্ছি। এটা খাবেন।

মা কেমন যেন বিস্ময় অনুভব করেন। বিপদেও পড়েন। ঘরে এতটুকু কাগজ নেই।

বললেন—কাগজ তো ঘরে নেই। আমার বাছার বইটির শেষের পৃষ্ঠার একধারে লিখে দিন।

আগন্তুক অষুদের নাম লিখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললো—আপনার বাছা আমাকে পাঠিয়েছিল। সে আসছে এখুনি। আমি এবারে আসি। নমস্কার। আগন্তুক বেরিয়ে গেল।

পর মুহূর্তে ঢুকলো বালক। সঙ্গে অপর একজন ডাক্তার।

—মা ডাক্তার এসেছেন।

মা অবাক হ'য়ে গেলেন—সে কি! একটু আগে যে একজন ডাক্তার আমাকে দেখে গেলেন। বল্লেন তুই পাঠিয়েছিস! আমাকে অষুধের নামও লিখে দিয়ে গেছেন। এই দেখ।

পড়তে না পেরে বালক কাগজটি ডাক্তারের হাতে তুলে দিল। ডাক্তার কাগজ পড়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। একি! এ যে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের লেখা। এতে লেখা আছে যে এই বৃদ্ধার রোগ, দারিদ্র্য। আর ঔষধ, অর্থ। একে রাজকোষ হ'তে প্রয়োজন মত অর্থ দেওয়া হোক।'

জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ এমনি মহানুভব ছিলেন। প্রতিদিন একা অতি সাধারণ নাগরিকের বেশে নগরের গলিতে গলিতে ঘুরে দুঃখীর সেবা করতেন। ধন্য জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ।



ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

জল খেলতে লাগছে মজা

বর্ষারাণীর আগমনে
লাগল মাতন সবার মনে,
বৃষ্টি ঝরে ক্ষণে ক্ষণে
খালে বিলে জংলা বনে।
ভাই-বোনেতে ঘরের মাঝে
থাকতে নাহি পারে আর,
জলের ডাকে একটি ফাঁকে
তাইত হ'ল ঘরের বার।

বৃষ্টি জলে শুধা গায়ে
দুইজনেতে করছে খেলা,
বাড়ীর লোকে হয়ত খোঁজে
কোথায় গেল দুপুর বেলা!—
ভাবছে হেথায় ভাই-বোনেতে
বোধ হয় আজি হবে সাজা,
হলই বা তাই এখন তো ভাই
জল খেলতে লাগছে মজা।

—শু: জু:

ধর্ম্ম



শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ভগবান্ লীলাময়। এ লীলার মূলে কী অভিপ্রায় বিদ্যমান সে সমস্যার ভিন্ন সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বহু বিজ্ঞ। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তি খুঁজে পায়না অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ভগবানের সৃষ্টি লীলার উদ্দেশ্যের। অথচ এটা অস্বীকার্য্য যে বিশ্ব একটা ছন্দে চলে। সেই ছন্দের তাল, লয় এবং বিভিন্ন বিকাশ সম্বন্ধে শুনি মহাজনের বাণী।

মানুষের ধর্ম্ম—ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বাভাবিক কল্যাণকর কর্ম্মের ধারা সকল সমাজে সকল যুগে বর্ণিত হয়েছে। ভিন্ন দেশের সংস্কৃতি বিভিন্ন। তাই ধর্ম্মের রূপও বিভিন্ন। একই সমাজের একই যুগের আদর্শ কর্ম্মকে ধর্ম্ম স্বীকার করলেও দেখি সকল মানুষ জীবন যাপন করেনা সে আদর্শ মত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর বা কলি—কোনো যুগে বা কোনো দেশে তো ছিলনা মিথ্যা, চুরি, ব্যভিচার, হিংসা বা মদ্যপানের একান্ত অভাব। একই যুগে, একই সমাজে নানাস্তরের লোক বিদ্যমান।

একথা দৃঢ় সত্য যে প্রত্যেক জীবের মাঝে যেমন কুজন আছে, তেমনি আছে সুজন। সাধু, অসাধু সবার অন্তরের তলভূমিতে বিদ্যমান শুদ্ধ আত্মা—যার আবরণ অশাশ্বত মায়া। সে শুদ্ধতা সদাই ব্যস্ত আবরণ ভেদ ক'রে আত্মপ্রকাশের জন্য—দিব্যজ্ঞানে স্রষ্টার বেদীতে আত্মসমর্পণের পুণ্যে। সমাজেরও মন্দের আবরণ ভেদের প্রয়াসী শ্রেষ্ঠজন।

অতিমাত্রা দুষ্কৃতির মাঝে দেখে মানুষ সত্যের ঝলক। জ্ঞানের আলোকে, যদি মানুষ গ্রহণ করতে পারে সে সত্যের সঙ্কেত, তার মনে অবতীর্ণ হন নারায়ণ নররূপে। নরের ভাষা, নরের ভাব ভিন্ন লোকে অধর্ম্মের পরিবেশে ধর্ম্মের ভাব ও ভাষা বুঝতে পারে না। সে আলোকের ঝরণাধারায় সে দেখতে পায় রূপ—সুকর্ম্মের, অপ-কর্ম্মের ও বিকর্ম্মের। জ্ঞানের দৃষ্টি দেখিয়ে দেয় সংসারে সে কেমন ক'রে পথ ভোলে। মানুষকে যদি ব্যাকুল করে জ্ঞান, যদি জাগে তার আন্তরিকতা তখন সে দর্শন পায় অবতারের। তার অন্তর্নিহিত সাধুভাব পরিত্রাণ পায়, মন্দভাব বিনষ্ট হয়। মন্দভাব অধর্ম্মের ভাব, সাধুভাব—ধর্ম্ম। তার আকুতির ফলে প্রকাশ পান হৃদ্দেশস্থিত নারায়ণ।

মানব-জীবনের উৎকর্ষতা এখানে। প্রকৃতির আসুরী সম্পদ নষ্ট হয়, দেব-সম্পদ হয় উদ্ধার। ইহাই দুষ্কৃতির দমন সাধুতার পরিত্রাণ—উভয়েই প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান অন্তরে। আর্য্য ধর্ম্মের গরিমা এই বিচারে। শয়তান বা মার—সৃষ্টি ছাড়া অন্যের গড়া ভাব নয়।

যে কথা ব্যক্তির পক্ষে সত্য, সে সিদ্ধান্ত সত্য সঙ্ঘের পক্ষে। ব্যক্তি রত্নাকর যেমন অধর্ম্মের নিধনে বাল্মীকি হয়েছিলেন, তেমনি সমাজে যখন হয় পাপের প্রাদুর্ভাব, অবতীর্ণ হন নির্গুণ ভগবান—সগুণ মানুষ-রূপে। তিনি আবার আক্রান্ত ধর্ম্মভাবকে সংস্থাপন করেন। অধর্ম্মের বিনা[শ] করেন। তাঁর আত্ম-পরিচয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা বলেছিলেন।

তাঁর আবির্ভাবে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে ব্যষ্টি ও সমষ্টির চেতনায়। তাঁর প্রবর্তিত নিয়ম শৃঙ্খলা তিনি দৈব-বলে একেবারে পরিবর্ত্তন করে না। ইহাই লীলা। কেন? তা বুঝি না। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র শ্রীকৃষ্ণে[র] প্রিয়। তবু প্রবর্ত্তিত বিশ্ব ছন্দে তাঁকে দর্শন করতে হয়েছিল নরক। সকল মহাজনের বিপদের কথা মনে হ'লে স্পষ্ট হয় ধারণা—ধর্ম্মনী[তি] শাস্ত্রের নিয়মানুবর্তিতা।

তিনি আত্ম-পরিচয়ে—ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের ক[থা] বলেছেন।

গ্লানি শুনলে মনে হয়—ধর্ম্ম চিরদিন বিশ্ব-সংসারে প্রতিষ্ঠিত সত্য। সে সত্যের অবরোধ—গ্লানি। অধর্ম্মের অভ্যুত্থান—ঐ সত্যই প্রকা[শ] করে যে অধর্ম্ম জীব সমাজের এক উপাধি।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমাজে বিদ্যমান। সামঞ্জস্য নষ্ট হ'য়ে যখন অধ[র্ম্ম] বাড়ে, গ্লানি হয় ধর্ম্মের। এই গ্লানি কি তার পরিচয় পাওয়া যায়—অবতরণের উদ্দেশ্য হতে। বল্লেন—সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্টদে[র] বিনাশের জন্য, ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য। আমি যুগে যুগে অবতী[র্ণ] হই।

সাধু বা সাধুভাবের রক্ষা। শ্রেষ্ঠকে অনুসরণ করে সবাই। তা[র] আদর্শ চরিত্র ও আদর্শ ভাব—ধর্ম্ম। দুষ্টের দমন হ'লে সাধুর পরিত্রাণ। মন্দভাব প্রশমিত হ'লে, স্পষ্ট হয় সাধুভাব। এ ভাব জ্ঞানগম্য হ'লে ক[ী] হয়? বল্লেন—আমার জন্ম, কর্ম্ম দিব্য। এ বিষয় যে স্পষ্ট সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে, সে দেহ ত্যাগ করে, আর পুনর্ব্বার জন্মে না—মামেতি—আমাকে পায়।

সুতরাং সাধুতা ও দুষ্কৃতির জ্ঞান ধর্ম্ম এবং তার সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝলে মুক্তি।

ভারতের সকল শাস্ত্র মানুষকে সমৃদ্ধ করেছে। উপাসনা পদ্ধতি ভিন্নমু[খী] হলেও সকল শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সার কথার সামঞ্জস্য অল্প আয়াসে প্রতীয়মান হয়। ধর্ম্ম প্রতিদিনের আচরণের নির্দেশ। তাই কর্ত্তব্য পথ নির্ণ[য়ে] বিশেষ বিশেষ উপদেশ। অথচ কর্ত্তব্য পথের বিভিন্ন ধারা একমুখ[ী]। মূল শিক্ষায় বিরোধ নাই। ধর্ম্মমূলক কর্ত্তব্য শাস্ত্রের সমান সম্মতিলা[ভ] করেছে। আলোচনার ফলে এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বলা হয়েছে কলিকালে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের কথা। অধর্ম্ম শেষ কথা নয়। আশাবাদী শাস্ত্র। তাই এ তন্ত্র বলেছে অধর্ম্মকে ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন করতে পারে কুলধর্ম্ম। অবশ্য পণ্ডিতগণ সমাজের এই আদর্শ নীতি-শাস্ত্র কুলধর্ম্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেহ বলেছেন, কুল শব্দের অর্থ সনাতন ব্রহ্ম। অতএব যিনি কুলধর্ম্মে জ্ঞানলাভ ক'রে

নির্ব্বিকার ও পাপবিমুক্ত হ'য়েছেন তিনিই কুলতত্ত্বজ্ঞ। বলা বাহুল্য নিষ্কাম কর্ম্মও কর্ম্ম-সন্ন্যাস নীতির পরিপোষক কুলধর্ম্ম—এ অর্থে। অন্য-মতে কুল-ধর্ম্ম মানে কুলকুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ করার উপায়। তা হলে গীতার ধ্যানযোগ মানে কুল-ধর্ম্ম।

সহজ জ্ঞানে, ভাষার সরল অর্থ বিচারে বোঝা যায় মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ। কুলধর্ম্ম পালনের শেষ উপহার মোক্ষ। কিন্তু যে উপায়ে জীবন-যাপন করলে ধার্ম্মিক হওয়া যায়, সে উপায় অন্য শাস্ত্রে বর্ণিত নীতির পরিপন্থী নয়।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শুনি—

"কলিকালের প্রভাবে বৈদিক ও পৌরাণিক দীক্ষা স্থান পাবে না পৃথিবীতে। যখন কলিকাল প্রবল হবে ম্লেচ্ছজাতির রাজারা হ'বে ধন-লোলুপ। স্ত্রীজাতি হবে দুর্দ্দান্ত, কর্কশ, কলহরতা এবং পতি-নিন্দা-পরায়ণা। আর পুরুষও কাম-কিঙ্কর হয়ে গুরুজন এবং বন্ধুবান্ধবের বিরুদ্ধতাচরণ করবে। ধন-লোভান্ধ হয়ে ভ্রাতৃগণ এবং অমাত্যবৃন্দ কলহে রত হবে। প্রকাশ্যভাবে লোকে মদ, মাংস, পান ভোজন করলে কেহ নিন্দা করবে না।"

বলা বাহুল্য ঐ সব নিন্দনীয় ব্যবহার অধর্ম্ম তন্ত্র মতে। কুলাচার অনুষ্ঠান করবেন যাঁরা, তাঁরাই সমর্থ হবেন কলির প্রভাব প্রতিরোধ করতে। কুল-ধর্ম্ম অনুসারে যে গুণ অর্জ্জন করলে কলির প্রভাব অতিক্রম করতে পারবে মানুষ, তার আলোচনায়, কুলধর্ম্মের প্রকৃত রূপ হবে প্রতিভাত। সদ্গুণের বিপরীত ভাব আশ্রয় অধর্ম্ম।

কুলাচার—স্নান, দান, তপস্যা, তীর্থ-দর্শন, ব্রত, তর্পণ এবং পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলা হয়েছে। আর উপদেশ দেওয়া হয়েছে সাংসারিক চরিত্রের বিশিষ্টতা সম্বন্ধে। যারা কুটিলতা ও মিথ্যা-চার বর্জ্জিত, যারা পরোপকারব্রতী এবং সাধুপ্রকৃতি, কলি তাদের কিঙ্কর। কিন্তু কলির কিঙ্কর তারা, যারা কুলাচার বর্জ্জিত হ'য়ে পরের অনিষ্ঠ করে, আর যারা পরস্ত্রী-কামুক।

পরে বলা হ'য়েছে যে কুলধর্ম্মই সত্য। সুতরাং কুলপ্রথা অনুসারে সকল কার্য্য সম্পাদন করা কলির ধর্ম্ম। আনুষ্ঠানিক রীতি প্রতিপালনে সত্যধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হয়।

প্রকৃত ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কী, সে সম্বন্ধে মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রে যে বর্ণনা শুনি, তেমনি বিবরণ পাই বৌদ্ধ শাস্ত্র ধর্ম্মপদের ব্রাহ্মণবর্গে। একটি উদাহরণ যথা—

অদ্বেষ্টাঃ নির্ম্মমঃ শান্তঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নির্ম্মৎসরো নিষ্কপটঃ স্ববৃত্তো ব্রাহ্মণ ভবেৎ।

বলা বাহুল্য, এ সকল গুণ নীতি শাস্ত্রের এবং মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলনের ফলে আমরা ধর্ম্মের ঐ রূপই দেখি। হয়তো কলিকালে অধার্ম্মিকের সংখ্যা অধিক। কিন্তু নীতি-শাস্ত্র যে সকল মন্দ ব্যবহারকে অধর্ম্ম বলেছে—তার যথেষ্ট সেবকের পরিচয় লাভ করা যায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে। গীতার কথা আরও স্পষ্ট বুঝি যে দেব ও অসুর সম্পদ জীবের জন্মগত সংস্কার।

ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র আরও বলেছে—তিনি হবেন অধ্যাপনারত, সর্ব্বলোকহিতৈষী এবং পক্ষপাতবিনির্ম্মুখ। তাঁর কর্ত্তব্য নীচ প্রসক্তি এবং দম্ভ পরিত্যাগ।

বলা বাহুল্য এ কর্ত্তব্য-পথ প্রদর্শিত হ'য়েছে সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রে।

রাজধর্ম্ম কী?

"প্রজার বিত্তে রাজা হবেন লোভশূন্য। সম্মতিক্রমে যে কর লভ্য তাহাই তিনি গ্রহণ করবেন। অঙ্গীকৃত ধর্ম্মকে রক্ষা করবেন এবং পুত্রবৎ পালন করবেন প্রজাকে"।

আজ রাজা নাই ভারতবর্ষে তথা বহু দেশে। কিন্তু সম্মতিক্রমে রাজ-শক্তি যাঁদের হাতে, তাঁদের পক্ষে শাস্ত্রের এই রাজধর্ম্ম কী অবশ্য আচরণীয় নয়?

বৈশ্যের ধর্ম্ম সাধুভাবে বাণিজ্য ও কৃষি। তার পক্ষে পরিত্যাজ্য—প্রমাদ, ব্যসন, আলস্য, মিথ্যা ও শঠতা।

হয়তো গীতার আলোচনায় এসব কথা অবান্তর। অথচ গীতায় বর্ণিত ধর্ম্ম শব্দের অর্থ প্রতিপাদনে সহায়তা করে, বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যবহৃত ধর্ম্ম শব্দ।

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা সপ্তম অধ্যায় বিজ্ঞান-যোগ শিক্ষা দিয়াছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটি স্থূল বিষয় তাঁর প্রকৃতি হতে সম্ভূত। স্থূল সৃষ্টির মূলে সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে—কিন্তু ভূমি জল প্রভৃতির বিকাশ আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝি। মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের সহায়তায় তারা আমাদের প্রতীত হয়। প্রকৃতির ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মনে জাগে। বুদ্ধিগোচর হয় সে উপলব্ধি, তখন অহংকার বোঝায় যে সে প্রতীতি আমার ব্যক্তিত্বের। আমি স্পর্শ করছি, আমি দেখছি, আমি শুনছি, আমি গন্ধ উপভোগ করছি বা রসাস্বাদন করছি—এ আমিত্ব এবং ভোগ ঐ আটটি বিকাশের প্রতিক্রিয়া। এরা প্রকৃতির বিকার বা মায়া—কিন্তু পরব্রহ্মের সংকল্প প্রসূত। এরা পরমতত্ত্বকে অবরোধ করে—অথচ এদের প্রকৃত তত্ত্বের মাধ্যমে উপজিত হয় সে পরমের চরম উপলব্ধি।

এই উপলব্ধি লাভের সহায়ক প্রত্যেক কর্ম্মটি—ধর্ম্মের সাধনা।

কিন্তু শেষ সাধনা কাম-বর্জ্জন। এ ক্ষেত্রে দেখি কামনাও ধর্ম্ম—যদি সে কামনা হয় মোক্ষলাভের। তিনি এই জ্ঞান বিজ্ঞান যোগে ব্যক্ত করলেন তাঁর প্রকৃতির কথা এবং সেই প্রসঙ্গে বল্লেন—ধর্ম্মাবিরুদ্ধ ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।—হে ভরতর্ষভ, ধর্ম্মের অবিরোধী যে কাম তা আমি। কাম এবং অনুরাগ বর্জ্জনের বল পাওয়া যায় তাঁরই শরণে। কিন্তু ধর্ম্মের সহযোগী যে কাম সে কামনা তিনি—সুতরাং তেমন কামনা ধর্ম্মের পরিপন্থী নয়।

কামনা মানুষের প্রকৃতিগত। যা নাই তাকে পাবার অভিলাষ কাম। সে অভিলাষের প্রেরণা আসে নানা কারণে ও সংস্কারে। অনু-রাগও স্বাভাবিক বাঞ্ছাপ্রাপ্ত বিষয়ে। বলবানের কাম ও রাগ বিবর্জ্জিত যে বল—সে বলেরও আধার তিনি। অপ্রাপ্ত বস্তু লাভের বাসনা এবং প্রাপ্ত প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি—জীবের স্বভাব। তিনিই যথার্থ বলবান—

যিনি পারেন কাম ও রাগ বর্জ্জন করতে। সে বল আসে ভগবানের কৃপায়। তাই তেমন বল অর্জ্জনের সকল সুষ্ঠু উপায় ধর্ম্ম। অবশ্য কৃপা অর্জ্জন করতে হবে নিজের চেষ্টায়।

এ কথার পর তিনি বলেছেন যে ধর্ম্মের অবিরোধী কাম—তিনি।

এ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—শাস্ত্রার্থের সঙ্গে অবিরোধী এ কাম। তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি—যেমন দেহধারণাদির মূল প্রয়োজনে ভোজন ও পানাদি।

তা'হলে দেহ-রক্ষা ধর্ম্ম এবং তার জন্য পান ভোজন ধর্ম্ম। তাই শুনি—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।

শ্রীধর স্বামী বলেছেন—নিজের স্ত্রীর সহযোগে পুত্রোৎপাদনের যে কাম—তা আমি।

তা হ'লে সৃষ্টির ধারা রক্ষার জন্য যে শুদ্ধ কাম তা'ও ধর্ম্ম।

তাই মনে হয় মায়াকে ত্যাগ করতে গেলে মায়ার প্রকৃত স্বরূপ জানা এবং বিশিষ্টভাবে বোঝা জ্ঞান বিজ্ঞান—সে শিক্ষায়তনের সকল শ্রম—ধর্ম্ম।

মহাপ্রভু নিরাকারবাদ খণ্ডন করেছিলেন। সে আলোচনা এ প্রবন্ধে অবান্তর। কিন্তু সৃষ্টি, স্থিতি লয় সম্বন্ধে—উপনিষদের শ্লোকের উপর নিজ বাণী প্রতিষ্ঠা করে বলেছিলেন—

ব্রহ্ম হতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়

সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয়।

মায়া অবলম্বন ক'রে সৃষ্টি। সৃষ্টজীব মায়ার অধীন। তিনি বলেছেন মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বর জীবে ভেদ।

ঈশ্বর মায়াধীশ। জীব মায়াবশ।

মায়ার বশ্যতা অতিক্রম করা যায় মায়াধীশের কৃপায়। ব্যাকুল-ভাবে শরণ নিলে দেখিয়ে দেন তিনি উপায়—মায়াময় এই অখিলের বন্ধন মোচনের।

মহাপ্রভু বলেছেন—

ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়তো যাঁহারে

সেই তো ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে। (চৈ চ—৮-৮)

আমার মনে হয় ঈশ্বর জানবার, মোক্ষ পাবার বা শরণ নেবার কামনা —এই বর্ণনার মধ্যে আসে। অবশেষে সকল কামনা ত্যাগ না করলে সত্যে পৌঁছান যায় না। কিন্তু সে অবস্থা লাভ করবার কামনাও ধর্ম্ম। সে প্রত্যাশা নিষ্কাম না হ'লেও—ধর্ম্ম।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেছে—যেহেতু জীব স্বভাবতঃ সঙ্কল্প যুক্ত, সেই কারণে সে ইহজীবনে যে প্রকার সঙ্কল্প বা কামনা করবে, পরবর্ত্তী জীবনেও সেইরূপই কামনাযুক্ত হবে। তাই জীবের কর্ত্তব্য—উত্তম সংকল্প।

ধর্ম্মাবিরুদ্ধ সংকল্প ভগবানের কৃপার প্রেরণা। এমন সংকল্প কামনা-প্রণোদিত হলেও ধর্ম্ম মূলক।

গীতার নবম অধ্যায়ে ধর্ম্ম শব্দ অতি উচ্চভাব প্রকাশ করে। বলা হ'য়েছে—আত্মজ্ঞান ধর্ম্মানুগত পথ। জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মজ্ঞান লভ্য। সে সাধনার অনুগামী সকল কর্ম্ম—ধর্ম্মের কাজ। এ অ আধ্যাত্মিক সাধনা ধর্ম্ম। গীতা বলেছে—

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম ।৯।২।

এই আত্মজ্ঞান অতিগুহ্যতম, বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, পবিত্র উত্তম, প্রত ফলপ্রদ, ধর্ম্মসঙ্গত সুখসাধ্য এবং অক্ষয় ফলপ্রদ।

আত্মজ্ঞান ধর্ম্ম। আত্মজ্ঞানে পরমতত্ত্ব লভ্য।

দেহ-রক্ষা, কুলের সম্ভ্রান্ততা রক্ষা প্রভৃতি লোকহিতকর সকল ক মনুষ্য-ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য-পালনে মনের তেজ বাড়ে, জ্ঞানালোক হয় প্রজ্জ্বলি তখন মানুষের মন চায় আরও উঠতে সংসারের জাল জঞ্জালের বাঁ কাটিয়ে। তখন স্পৃহা হয় আপনার অন্তর দেবতার স্বরূপ জানবা বোধের নানা উপায় আছে। দেহরক্ষা হ'তে সে সব উচ্চ হ'তে উ স্তর—ধর্ম্মের সোপান। ধ্যানের দ্বারা, সমাধির সহায়তায়, ভগবা কৃপা-বর্ষণে আত্মজ্ঞান সম্ভব। সে জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজবিদ্যা। সে ত তত্ত্ব—রাজগুহ্য।

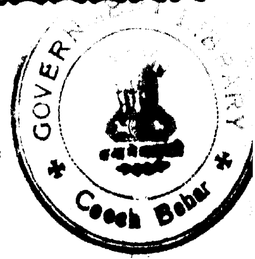
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত ধর্ম্ম শব্দ। অতি সাধারণ কর্ম্ম হ'তে রা বিদ্যা অবধি যখন ধর্ম্ম তখন বুঝতে হ'বে কোনো ধর্ম্ম-কর্ম্ম পর বিরোধী হ'বে না এবং হবেনা এক অন্যের পরিপন্থী। দেহরক্ষা শেষ সোপানে ওঠবার জন্য। সুতরাং ডাকাতি করে লুঠ করব সুবিধা হবে এমন প্রত্যাশায় দেহকে সবল করবার উপায় ধর্ম্ম ন যোগীরা দেহকে সুস্থ রাখে—রোগের যন্ত্রণায় ধ্যানধারণার যা প্রতিবন্ধক না হয়। কুলধর্ম্ম মাত্র সাংসারিক যশমান অর্থলা আয়োজন নয়? দেহ-রক্ষা-ধর্ম্মকে চরম কর্ত্তব্য ভাবলে জীবের প উন্নতি সুদূর পরাহত। জ্ঞান, বিজ্ঞান ধ্যানধারণা প্রভৃতি আত্মজ্ঞা উপায়—ভক্তির প্রেরণায়। সে সাধনা ধর্ম্ম।

চিত্তের ঐকান্তিকতায় একের পর এক ধর্ম্ম পালন করলে উন্ন অবশ্যম্ভাবী যদি শেষ লক্ষ্য থাকে জন্মমৃত্যুর করাল কবল হ' অব্যাহতি। মায়াময় বুঝলে সংসারকে, তার ক্ষণিক আকর্ষণও যেমন হবে বিনষ্ট, তেমনি ভ্রান্ত জগতের প্রতি প্রেম হ'বে অফুরন্ত কারণ আনন্দই বিশ্বের উপাধি এবং আনন্দ ভূমায়। দুঃখ যে জীবনের সাথী, তেমনি তাকে বর্জ্জন করবার সংস্কারমূলক প্রেরণা জীবনের উপাধি। সমদৃষ্টি এক উপায় দুঃখ নিরোধের—যখন উপল হয় দুঃখ মায়ারই এক খেলা। সে অশাশ্বত, গ্রীষ্ম বর্ষার ম ক্ষণিকের অতিথি। অথচ এ মায়া আত্মাকে আত্মভোলা করব আবরণ।

মাত্র জ্ঞান নয়, বিশিষ্ট জ্ঞান আবশ্যক এ উপলব্ধির। সাধকে ধর্ম্মনিষ্ঠা—দেহ, মন, আচরণ সব মিলে জীবনকে করে সমৃদ্ধ, তার যা পথকে করে সমুজ্জ্বল।

বেদ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান নির্দ্ধারণ করেছে। সেগুলি ধর্ম্মকর্ম্ম কিন্তু যাগ-যজ্ঞের প্রেরণা স্বর্গকামনা প্রভৃতি হ'লেও—সাধনা হয় ফ প্রয়াস। অথচ অন্তিম আনন্দধামে পৌঁছে দেয়না যাগযজ্ঞ, যদি সাধনা

আপনার ত্বকও



চিত্রতারকাদের ত্বকের মতই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে

অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জী সৌন্দর্য্যের জন্যে কি করেন শুনুন। "আমার ত্বক মসৃণ ও সুন্দর রাখার জন্যে," তিনি বলেন "আমি প্রতিদিন লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি।" স্নান ও হাতমুখ ধুতে লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করা সত্যিই আনন্দদায়ক—লাক্স সাবানটি এত কোমল, এত সুগন্ধী। আপনিও আজ থেকেই লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্ন নিতে আরম্ভ করুন না কেন?

বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স

টয়লেট সাবান

চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান



হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

LTS. 569-X52 BG

মূলে থাকে মাত্র ফলের কামনা। নিষ্কাম কর্ম্মই কর্ম্মের কৌশল। তাই ভগবান বলেছেন—

তৎপরে নানারূপ স্বর্গসুখ ভোগ ক'রে পুণ্য হয়ে যায় ক্ষয়। সাধকের পুনর্ব্বার জন্ম হয় মর্ত্ত্যভূমিতে। এই রূপে স্বর্গকামনায় বেদ-প্রতিপন্ন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করলে সংসারে বারম্বার যাতায়াত করতে হয়।" *

এয়ী ধর্ম্ম ধর্ম্মের সাধনা, কিন্তু চরম সাধনা নয়।

নবম অধ্যায়ে ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা ভক্ত হবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন ভগবান। সেগুলি সম্বন্ধে অনুশীলন করলে ধর্ম্মের রূপ ফুটে ওঠে।

তিনি বলেছেন…ভজনা চাই. আহার, দান, যজ্ঞ, প্রতি কর্ম্ম তাঁর অর্ঘ্য—এই ভজন। এই তো দৈনন্দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি দুরাচারও যদি অনন্যমন হয়। কারণ সে সম্পূর্ণ যত্নশীল। শীঘ্রই সে ধর্ম্মাত্মা হয়। শীঘ্রই শান্তিলাভ করে। আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না, কৌন্তেয়।†

ভক্তি দেখিয়ে দেয় ধর্ম্মের পথ। সে পথে তাঁকে জানবার প্রকরণ ব্যক্ত করেছেন ভগবান। তিনি বল্লেন—

মদ্গত-চিত্ত হও, আমার ভক্ত হও, হও আমার পূজাপরায়ণ। আমাকে নমস্কার কর। আমার শরণাপন্ন হ'য়ে আত্মসমর্পণ কর। তা হলে আমাকে লাভ করবে।‡

ধর্ম্মের এ পথ মধুময়। এ পথের মাধুরী ভাগবত ধর্ম্ম। এই সাধনার চরম অবস্থা ব্যাখ্যা করলেন শ্রীকৃষ্ণ অধ্যায়ের শেষে। তাই প্রারম্ভে বলেছিলেন, এই ধর্ম্ম রাজবিদ্যা, বল্লেন—

"হে পরন্তপ এই ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ ব্যক্তি আমাকে না পেয়ে মৃত্যু সমাকীর্ণ সংসার পথে বিচরণ করে।"

ভগবান অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে ধন্য করলেন। মনের আবেগে স্তুতিগান করলেন অর্জ্জুন। তিনি শ্রীভগবানের বহু উপাধি উপলব্ধি করলেন। বল্লেন—তুমি অক্ষর পরম ব্রহ্ম। জানবার বিষয় তুমি। এই জগতের তুমিই তো আশ্রয়। তুমি নিত্য। নিত্য ধর্ম্ম রক্ষক তুমি। তুমি যে সনাতন পুরুষ এ মতি আমার।§

বিশ্বরূপ দেখলেন অর্জ্জুন। বুঝলেন বিশ্ব সেই পরমপুরুষের আশ্রিত। ঐ বিশ্ব চলে শাশ্বত নিয়ম শৃঙ্খলায়। সেই সনাতন ধর্ম্মের তিনি রক্ষক। তিনি গড়েছেন জগত—তিনি রক্ষা করছেন। গড়া, চলা ও ভাঙ্গা এর ধর্ম্ম।

মায়া তাঁর সৃষ্টি—মায়া নিয়ম বর্জ্জিত নয়, ধর্ম্ম-বর্জ্জিতও নয়। কারণ মায়াধীশ—ধর্ম্মরক্ষক।

বিশ্বরূপ দেখালেন। শুনলেন তিনি ধর্ম্মগোপ্তা। ধর্ম্মের আবার রূপ বর্ণনা করলেন। সৃষ্টিতে প্রেম স্রষ্টায় ভক্তি। আমি অন্যত্র এ বিষয় আলোচনা করেছি। কিন্তু ভারতী-কথা অপূর্ব্ব তাই উল্লেখ করছি আবার। দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি স্পষ্ট বোঝালেন—ধর্ম্মের এক মধুর রূপ—সৃষ্টিতে শ্রদ্ধা—স্রষ্টার শ্রীচরণে অর্ঘ্য। বল্লেন—

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, যে মৎপরায়ণ হয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মামৃত পান করে, সে ভক্তিমান পুরুষ আমার অতীব প্রিয়।*

সেই পূর্ব্বোক্ত সদ্‌গুণগুলি আলোচনা করলে একদিক হ'তে ধর্ম্ম এবং ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কী সে ধর্ম্মামৃত? কে সে ব্যক্তি যে ধর্ম্মের অমৃতপায়ী।

সে সর্ব্বভূতে বিদ্বেষবিহীন, সকলের সাথে তার মৈত্র, সে করুণ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে তার সমান ভাব। সে ক্ষমাশীল। সেই ধর্ম্মামৃতের আস্বাদন পায় যে সদা সন্তুষ্ট, সংযত-স্বভাব, দৃঢ়-বিশ্বাসী, যে মন ও বুদ্ধি ভগবানে সমর্পণ করে হয়েছে ভক্ত। তার দ্বারা কোনো ব্যক্তি সন্ত্রস্ত হয় না, সে নিজেও সন্তাপ পায়না অন্যের আচরণে। সে হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করেছে। সে নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী। ভগবানের প্রিয় সেই জন যে ভক্ত হৃষ্ট হয় কারও প্রতি দ্বেষও করে না, সে শোকও করে না, আকাঙ্ক্ষা যায় নাই, আর যে শুভাশুভ ফলে সমচিত্ত। শত্রুমিত্র মানে, অপমানে যার চিত্ত সমান। শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখে সমবুদ্ধি, আসক্তি বিহীন সে ব্যক্তি। নিন্দা ও স্তুতিতে যার তুল্য ভাব। সে মৌনী, যৎ কিঞ্চিত লাভে তুষ্ট। সে ভক্ত অনিকেত, স্থিরমতি।

এই আচরণগুলায় যদি আমরা মনোনিবেশ করি, তা হলে বুঝি ধর্ম্ম কী। এই কয়টি শ্লোকে মানুষের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি যে মার্গে পরিচালনা করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, সকলকে স্বীকার করতে হবে সে পথের কষ্ট মোচন হবে ধর্ম্মামৃত পানে। এ ধর্ম্মের পুরস্কার মহান—যদিও পুরস্কারের লোভ বর্জ্জনের স্পষ্ট উপদেশ শুনি তাঁর শ্রীমুখে। যেথায় ঐসব গুণ বিদ্যমান সে জীবনের প্রাচুর্য্য, মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য বিমোহিত করে দুঃখালয় অশাশ্বত জগৎকে।

আবার দিলেন সাধকের পরিচয় ভগবান। সুচরিত্র ভক্তই ধার্ম্মিক। ভগবানই সর্ব্বস্ব—এ সাধনাই মোক্ষ-পথে অগ্রগমনের রহস্য। তিনি বল্লেন—

আমি ব্রহ্মভাবের অমৃতের, অব্যয়ের শাশ্বত ধর্ম্মের (অতএব) ঐকান্তিক সুখের আশ্রয়।†

উপদেশ দিলেন ভগবান সখা অর্জ্জুনের বিষাদ অপনোদনের। ধর্ম্মযুদ্ধের মূল তত্ত্ব বোঝাবার প্রসঙ্গে উপদেশ দিলেন জীবন রহস্যের,

---

* গীতা—৯।২১

† গীতা—৯।৩০।৩১।

‡ গীতা—৯।৩৪।

§ ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যম্
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরম নিধানম্
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তাঃ
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতঃ মে।

---

* যেতু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়। ১২।২০।

† ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।১৪।২৭

জীবন বৈতরণী পার হবার কৌশল—কর্ম্মে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ধ্যানে, ভক্তিতে। নিষ্কাম কর্ম্ম শুদ্ধ করে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। জ্ঞান রূপ দেয় কর্ম্মকে, বিজ্ঞান বুঝিয়ে দেয় সেই মূল যা হ'তে কর্ম্মপ্রেরণা এবং তার আবরণ। ধ্যানে প্রত্যক্ষ হয় সে জ্যোতি। ভক্তি সন্ধান দেয় সে পথের মাধুরীর। আনন্দ-রস পান করে ভক্ত, আত্মন্তরিতায় মাত্র স্বার্থকেন্দ্রে নয় ভূমায়, পরকে আপন বোধে। ভক্তির শুভরূপ শরণ।

শিক্ষা দিলেন শিষ্যকে—মাত্র কথায় না অদৃষ্টপূর্ব্ব বিশ্বরূপ দেখিয়ে। জীবনের রহস্য—ব্যক্তি জীবনের নয়, বিশ্ব-প্রাণের। তাঁর প্রাণ-সখা যে হয়েছিলেন জীবনরথের সারথী।

বুঝলেন শরণতত্ত্ব অধিকার বিস্তার করেছে পার্থের মনোরাজ্যে—মনে, বুদ্ধিতে, অহঙ্কারে। এখন সে নিশ্চয় জ্ঞানের শেষটুকু পাবার অধিকারী। যখন শিক্ষা হয় সফল, প্রকৃত গুরু বোঝেন সে সাফল্য। শিক্ষা ক্ষেত্রকে তিনি করেন বিস্তৃত এবং গভীর। অধিকারীর যোগ্যতা বুঝলেন জগদ্‌গুরু। বুঝিয়েছেন রাজবিদ্যা, গুহ্যতম তত্ত্ব। বীজ হ'তে গাছ উঠেছে।

গাছে উদ্গম হয়েছে মুকুল। আসছে ফুল—তাতে রূপ ও গন্ধ যোজনা করার কাল এসেছে।

গুরু বোঝেন, যখন শিষ্যের মনও জ্ঞান হয় এক। এবার শেষ শিক্ষা দিলেন শ্রীকৃষ্ণ। এ উপদেশ অযাচিতভাবে বর্ষিত হয় তার উপর, যাকে বোঝেন গুরু বর্ষণ সহিতে সমর্থ—অন্তর পরীক্ষার ফলে।

তাই শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—

"সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার শেষ বাণী পুনর্ব্বার শ্রবণ কর, তুমি আমার অতি প্রিয় তাই তোমাকে বলছি। তোমার হিতার্থে।*

দিলেন শেষ হিতোপদেশ। গীতার সার, ধর্ম্মের সার, অধর্ম্ম হতে নিবৃত্ত হবার সার শিক্ষা। ইষ্টতা অর্জ্জন করলে তবে লভ্য এ বাণী।

মমনা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।

—তুমি মদ্গতচিত্ত হও। আমার ভক্ত হও। আমার জন্য যজনা কর। আমাকে নমস্কার কর। আমাকে পাবে। আমি তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি। তুমি যে আমার প্রিয়।

বল্লেন—আমাকেই পাবে। কে তিনি? সে কথা নানা ভাবে নানা ভক্তিতে বুঝিয়েছেন পার্থকে সারা গীতায়। মোক্ষলাভের উপায় সংক্ষেপে বোঝালেন এই শ্লোকে দৃঢ়ভাবে।

এ ভাবে সম্যক অনুপ্রাণিত হ'লে আর তো কর্ত্তব্য বাকি থাকেনা। ধর্ম্ম পুণ্য সঞ্চয়। পুণ্য পাপ বর্জ্জন। পাপ অধর্ম্মের ফল। নিত্য কর্ত্তব্য-পালন—ধর্ম্মের পথে ভ্রমণ জীবন যাত্রায়।

কিন্তু ধর্ম্মের প্রথম অবস্থায় প্রাণে থাকে উদ্দেশ্য, কামনা। সে কামনাও টেনে রাখে। কৃষ্ণ দর্শনে পুণ্য হবে এ চিন্তা ধর্ম্মপথের পাথেয়। কিন্তু যাত্রার শেষ দশায় এ শুভ সংকল্পও পরিবর্জ্জনীয়। তাই গুরু বিল্বমঙ্গলকে বলেছিলেন—কৃষ্ণ দেখার ফল কৃষ্ণ দর্শন।

হয়তো অতিপ্রিয়ের অন্তরতম প্রাণে মোক্ষ-কামনার সন্ধান পেলেন গুরুদেব—নররূপী নারায়ণ। তাই তিনি ভণিতা করলেন প্রতিজ্ঞার—প্রতিজানে। আশ্বস্ত করলেন পার্থকে—প্রিয়পাত্র স্বীকার ক'রে। কিন্তু অবশেষে মুছলেন, শেষ আমিত্বটুকুর অনুভূতি। বল্লেন—

সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

সকল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের চেতনা পরিত্যাগ করে, একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। সকল পাপ হতে আমি তোমাকে মুক্ত করব। শোক ক'র না।

বিষাদযোগে আরম্ভ গীতা। সকল উপদেশ বিষাদ-বর্জ্জনের। সে কথা বল্লেন—মা শুচঃ। সার কথা বোঝালেন, বিশ্বরূপে নানা দেবতা দেখিয়েছেন—তাদের শরণ লয় মানুষ। ধর্ম্ম সাধনায় সহায়তা করেন—তাদের উদ্দেশ্যে পত্র, পুষ্প, ফল ও জলের অঞ্জলি গ্রহণ করেন তিনি। সে কর্ম্ম ধর্ম্ম। কিন্তু সে সব দেবতারা তাঁরই অখণ্ড শক্তির বিভিন্ন খণ্ড-শক্তির দ্যোতক। মনে এ ভাব জাগিয়ে সেই একের শরণ নিতে হবে—এক পরব্রহ্মের। তাই বল্লেন—মামেকং শরণং ব্রজ। পাপ-পুণ্যের-চিন্তার কারণ নাই। তাঁকে শরণ করলে পাপ হ'বে লুপ্ত। পাপ সেই কর্ম্ম যা টেনে রাখে মানুষকে ধর্ম্মের পথ হ'তে। শরণে কামনা নাই। সকল কামনার অঞ্জলি। শরণ অর্থে—সমর্পণ মুছে সে দেয় আমিত্বের রেখা।

শরণ সম্পূর্ণ উপলব্ধি, আত্মজ্ঞান—যার ফলে মায়ার অবসান।

বাঙ্গালী সাধক কবি এই কথা বলেছেন তাঁর পবিত্র প্রাণের উৎস হ'তে—

ধর্ম্মাধর্ম্ম জেনে মর্ম্ম—ধর্ম্মকর্ম্ম সব ত্যজেছি।
এই নীতি শুনি দুর্য্যোধনের মুখে।

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি,
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

ধর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি নাই অধর্ম্মে নাই নিবৃত্তি। হৃদয়স্থিত হৃষিকেশ, তুমি যেমন নিযুক্ত করবে আমাকে, আমি তেমনি কর্ম্ম করব।

সেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অঞ্জলি, হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হৃষিকেশের উপলব্ধিতে জীবনযাত্রা।

ধর্ম্মের এই শেষ কথা।

জীবতো মাত্র যন্ত্র, যন্ত্রী ভগবান। তাই শুনি অন্যত্র—

যন্ত্রস্য গুণ দোষোহি ক্ষম্যতাং মধুসূদন।
অহং যন্ত্রং ভবান যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে।

মধুসূদন যন্ত্রের দোষগুণগুলি ক্ষমা কর। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমার দোষ নাই।

শরণের এ মধুর নিবেদন।

মায়া অশাশ্বত কিন্তু সে আবরণ অস্বীকার করবার উপায় নাই। তাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি, তিনিই তার মোচনের সংস্কার দিয়েছেন জীবের অন্তরে। পূর্ণ শরণ না হলে তাঁর সন্ধান মেলেনা।

প্রত্যেক সুষ্ঠু কর্ম্ম ধর্ম্ম—তারা নিয়ে যায় যাত্রার শেষে যেথা ধর্ম্মাধর্ম্ম মুক্ত হয়, যেথায় বিরাজে পূর্ণজ্ঞানের আনন্দ—আত্যন্তিক সুখ। সে আনন্দের অনুভূতিতে ভয় লোপ পায়।

---

* সর্ব্ব গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।১৮।৬৪



রাত্রির কান্না

সন্তোষকুমার অধিকারী

মেয়েই পছন্দ করে বাজার থেকে ফুল কিনে আনলো। আনলো রক্তগোলাপের তোড়া আর রজনীগন্ধার গুচ্ছ। জানলায় ফিকে সবুজ রঙের পরদা টাঙিয়ে দিলো মীরা। দেয়ালে ঝুলিয়ে দিল কবিগুরুর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। টেবিলের ধূপদানিতে গুঁজে রাখলো সুগন্ধি ধূপকাঠি।

সুরমা এসে অবাক হ'লো। বাঃ! এত খাতির কেন রে? আসছে ত' একটা লোক, যে ছড়া মিলিয়ে পদ্য লেখে শুধু। তার চেয়ে ভালো কাজ আর কিছু পারেনা। তার জন্যেই এতই সমারোহ?

—তুমি থামোত মা।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো মীরা। কবি দীপঙ্কর দত্ত যা' তা' লোক নন। জানো, এখানে এর মধ্যেই কতগুলো প্রোগ্রাম হ'য়েছে তাঁকে নিয়ে। ইউনিভার্সিটির ছেলেরা হাঁ করে বসে আছে কখন তিনি আসবেন বলে। কিন্তু··· সত্যি মা—মীরা পুলকিত কণ্ঠে বললো—আমি ভাবতেই পারিনি যে, তিনি বেছে বেছে কিনা আমাদের বাড়ীতেই উঠবেন? আচ্ছা, তুমিও ত বেশ দুষ্ট! একদিনের জন্যেও বলোনি যে দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে।

সুরমা চুপ করে রইলো। সে ত' ভাবতে পারেনি যে আঠারো বছর পরে সেই অতি অন্তরঙ্গ মধুর মানুষটি এমন অযাচিতভাবে উপস্থিত হ'বে তারই ঘরে!

সে আসছে। মীরা ঘর সাজিয়েছে তার জন্যে। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছে সুরমা। মীরা বেছে বেছে রক্ত-গোলাপ জোগাড় করেছে। আর টকটকে লাল গোলাপ হাতে পেলে একদিন কী খুসীই না হ'তো দীপঙ্কর? তার হাতে কবিতার প্রথম স্ফূরণ ঘটলো যেদিন সুরমাই ত' সেদিন······

—তুমিই ত আমার কবিতা।

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠলো সুরমা। আঠারো বছরের রুদ্ধ নিঃশ্বাস ভেদ করে একটি ব্যাকুল কণ্ঠস্বর ছুটে এসেছে। আঠারো বছর আগেকার এক তম্বী-হৃদয়ের শিহরণ আজও জেগে উঠেছে তার হৃদয়ে। হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলো সুরমা—মীরা, মীরা।

মীরা ছুটে এলো—কিছু বলছো মা?

—হ্যাঁ, ওই বিচিত্রার সভাপতি মুকুলবাবুর বাড়ীতে উনি উঠবেন এমনটাই আগে ঠিক হ'য়েছিল না?

—হ্যাঁ মা। ওরা সেইরকম ব্যবস্থাই করেছিল কিন্তু তারপর চিঠি এলো দীপঙ্করবাবুর যে তিনি আমাদের বাড়ীতেই উঠবেন। তিনি নিজে লিখে জানিয়ে দিয়েছেন।

—আমি বলছিলাম যে, অত হাঙ্গামায় দরকার কি? ওদের কারও বাড়ীতেই তুলতে দে।

—তুমি কি পাগল হ'লে মা? মীরা বিস্ফারিত চোখে চাইলো।—তিনি নিজে উঠতে চেয়েছেন আমাদের বাড়ীতে আর আমরা কিনা ফিরিয়ে দেবো?

—সুরমা।

বাইরে যেন কার কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো। মীরা পলকে ছুটে গেলো। আর পরমুহূর্তেই সে যাকে নিয়ে প্রবেশ করলো তাকে তরুণ বলা চলেনা। তবু যৌবন তাকে এখনও পরিত্যাগ করেনি। গৌরবর্ণ সুদেহ পুরুষ। প্রশস্ত ললাটে চিন্তার ভ্রূকুটি। হাতে একটি ফোলিও ব্যাগ। চুল আর বেশ দুটোই এলোমেলো।

—এই যে সুরমা, একট্রেন আগেই এসে পৌছোলাম। তোমার মেয়ে কি এতবড় হ'য়েছে নাকি?

সুরমা হতবাক হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু মীরা লাফিয়ে উঠলো—আপনি দীপঙ্করবাবু? কি আশ্চর্য্য? মা তুমি কথা বলছো না কেন? আসুন আপনি ঘরে। আমার নাম মীরা।

—মীরা। হ্যাঁ, মনে পড়ছে তোমার নাম। চলো ত মা; ট্রেনে এসে ক্লান্ত হয়ে গেছি। একটু চা করে দেবে। আর···একি মীরা, আমাকে গোলাপের তোড়া দিচ্ছো? লালগোলাপ? দেখছো রমা, তোমার মেয়ে আমাকে লালগোলাপ দিচ্ছে! একি, একি—কি হ'লো তোমার?

সুরমার দুইচোখ অকস্মাৎ জলে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। দুই হাতে চোখে আঁচল চেপে ধরে সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—মীরা ঘরে নিয়ে যা তোর কাকামণিকে।

অনেক রাত্রের আকাশে ফুরিয়ে আসা চাঁদের আলো লুটোপুটি খাচ্ছে তখনও। ভারী ঠাণ্ডা একটা বাতাস শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে। আর বাতাসের মধ্যে দিয়ে গোলাপ কিম্বা রজনীগন্ধার গন্ধ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌তে চাচ্ছে।

মীরা ঘুমুচ্ছে অঘোরে। ঘুমুচ্ছে মীরা পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে, তার ঘুমন্ত চোখের দিকে চেয়ে বসে আছে বিনিদ্র সুরমা। বসে বসে সে ভাবছে—কেন এলো? এতদিন পরে আবার তারই বাড়ীতে কেন ফিরে এলো দীপঙ্কর দত্ত?

ফিরে এলো আঠারো বছর আগের এক করুণ সুস্পষ্ট স্মৃতি। যেদিন এক কিশোরীর প্রথম কামনার রঙ্‌কে ধূসর করে দিয়ে, মিথ্যে ক'রে দিয়ে সে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু সেদিন ত আজ শুধু স্মৃতিই।

কলকাতায় পাশাপাশি দুটি বাড়ী। মামার বাড়ীতে থেকে এম-এ পড়ছে দীপঙ্কর। কিন্তু তার সমস্ত-মন ও সময় জুড়ে রয়েছে এক কিশোরী মেয়ের স্বপ্ন। সেই মেয়েকে নিয়েই সে লিখলো তার প্রথম কবিতা।

সে এক গোধুলিভরা সন্ধ্যা। কোথা থেকে টকটকে লাল একটি গোলাপ ফুল এনে সাজিয়ে দিলো সে দীপঙ্করের টেবিল। মুগ্ধ হ'য়ে বললো দীপঙ্কর—বাঃ! কোথায় পেলে এ ফুল?

সুরমা বললো—কেন? তোমার কবিতা থেকে।

দীপঙ্কর মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইলো—তুমিইত আমার কবিতা।

স্মৃতির ছায়াছবি সময়ের আঘাতে ছিন্ন, বিবর্ণপ্রায়। মাঝে মাঝে উঠে গেছে রঙ্। মুছে গেছে তার অমরতা। শুধু সেই রাত্রির কথা আজও রক্তাক্ত হয়ে আছে তার বুকে।

সুরমা এসে বললো—তোমার নতুন কবিতা শোনা দীপুদা।

দীপঙ্করের চোখে আলোর ঝলক। বললো—আ যা' লিখি সে ত তোমারই ছায়া।

—তবু তোমার মুখ থেকে শুন্‌বো।

আত্মপ্রসাদের অহঙ্কারের দ্যুতিতে জলে উঠ্‌লে সুরমার মুখ।

একসময়ে খাতা বন্ধ করলো দীপঙ্কর। বললো- রাত হ'য়ে গেছে। এবার বাড়ী যাও রমা।

—না।

—না মানে?

—মানে, যাবোনা। তুমি তাড়িয়ে দেবে?

চকচক্ করে উঠলো দীপঙ্করের চোখ। আবেগ ভরা গলায় বললো সে—এত রাত পর্য্যন্ত থাকলে কে কিছু বলতে পারে রমা?

—বলুক। তাহ'লে তোমার খুব লজ্জা করবে, না?

—রমা?

রমা উঠে দাঁড়ালো। মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বললো- তুমি কি শুনেছো আমার বিয়ে?

মুখ নামিয়ে বললো দীপঙ্কর—শুনেছি।

সুরমার চোখে বিদ্যুৎ জ্'লে উঠ্‌লো—তাহ'লে তু মিথ্যুক। তুমি বানিয়ে কথা লেখো শুধু। তোমা ভাবা আছে তাতে একটুও সত্যি নেই। না দীপুদা?

দীপঙ্কর বিবর্ণমুখে ডাকলো—রমা!

—যারা কবি হয় তারা বোকা হয় শুনেছিলাম কিন্তু তারা কি শুধুই মিথ্যে কথা লেখে? সাজানে কথা লেখে? তাতে প্রাণ থাকেনা একটুও?

গোলাপফুলটা তুলে নিয়ে টুক্‌রো টুকরো করে ছিঁ ঘরময় ছড়িয়ে দিলো সুরমা, তারপর অকস্মাৎ ঘর ছে বেরিয়ে গেল।

দীপঙ্করের চোখের সামনে নয়, আড়ালে তার নিজে ঘরে এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলো সুরমা। কি সে ত' শুধু স্মৃতিই।

পরের দিন সকালে প্রভাতের স্নিগ্ধতা মুখে নি আবার দীপঙ্করের ঘরে এসেছিলো সুরমা। কিন্তু কোথা দীপঙ্কর? ঘরময় শুধু ছেঁড়া গোলাপের পাপড়ি, আ

ছেঁড়া খাতার পাতা। দীপঙ্কর—তার কবিতার খাতা ছিঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে গেছে।

মামীমা বললেন—দীপু ত' বাড়ী চলে গেলো মা। হঠাৎ চলে গেলো। বললে দরকার আছে। কবে ফিরবে তাও বললোনা।

* * * *

দীপঙ্কর এসেছে তারপরে আঠারো বছরের ব্যবধানে। কিন্তু আঠারো বছর আগে যে কচিপাতার কাব্য ছিলো সুরমার মনে, আজ সেখানে শুধু চৈত্রদিনের ঝরাপাতার বিদায়বাণী।

ঘরের বাতাসে ফুলের মৃদুমধুর গন্ধ।

কোমল পরিচ্ছন্ন শয্যা। সমস্ত দিনের শ্রান্তি দেহে নিয়েও ঘুমোতে পারলোনা দীপঙ্কর। আঠারো বছরের এক অনুতাপের দুঃসহ জ্বালায় জ্বলছে তার দু'চোখের পাতা। এখানে আসবার আগেত ভাবতে পারেনি দীপঙ্কর—যে এমনি নতুন ক'রে চৈত্রদিনের বনে জ্বলে উঠবে দাবানল।

এম-এ পরীক্ষা আর দেয়নি সে। সুরমার বিয়ে হ'য়ে যাওয়ার খবরে কিছুটা জ্বলেছিলো সে। কিন্তু সুরমার স্বামী যোগেশ তারই সতীর্থ। ধনী ও উদার-চরিত্র যোগেশকে সে শ্রদ্ধাই দিয়েছিলো প্রথম থেকে। কিন্তু অনুতাপের দুঃখ কঠিন হ'য়ে বাজলো যেদিন খবর পেলো সে সুরমা বিধবা হ'য়েছে তিনবছরের মেয়ে মীরাকে কোলে নিয়ে।

তারপর দীর্ঘদিন ধ'রে কাব্য সাধনার অরণ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে দীপঙ্কর। ঘুরে বেড়িয়েছে সে হৃদয়ে ভ্রষ্ট-তারকার মত অন্তর্জ্বালা নিয়ে। তার একক জীবনে প্রীতির স্পর্শ নেই, মাধুর্য্যের স্বাদ নেই, আছে শুধু স্মৃতির স্বপ্ন কিছুটা। কিন্তু দীর্ঘ আঠারো বছরের ব্যবধানেও একটুও ত' বদলায়নি সুরমা।

হঠাৎ বাঁ হাত চোখে ঢেকে অস্ফুট আর্তস্বরে যেন গুমরে উঠলো দীপঙ্কর—রমা…রমা…

বাইরে থেকে সেই মুহূর্তে একঝলক বাতাস এলো ঘরে। দরজাটা একবার খুলে আবার বন্ধ হ'য়ে গেলো। অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে এগিয়ে এলো, আর দীপঙ্করের পায়ের ওপরে আকুল হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো। বিস্মিত বিমূঢ় দীপঙ্কর শুধু নির্ব্বাক হয়ে দেখতে লাগলো—রাত্রির কি ব্যাকুল কান্না? কি আকুল উচ্ছ্বাসের অন্তহীন ব্যথায়-ভরা কান্না!

দীপঙ্কর আবার আর্তনাদ করে উঠলো—রমা?

সকালের আলোয় মীরা চোখ মেলেই ছুটে গেলো দীপঙ্করের ঘরে। আর তারপরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো সুরমার শয্যার কাছে।

—মা, মা, কাকামণি নেই; কাকামণি যে নেই।

সারারাত্রির কান্না চোখে নিয়ে শ্রান্ত, অবসন্ন সুরমা পাশ ফিরে আবার ঘুমোতে ঘুমোতে বললো—হ্যাঁ, চলে গিয়েছে আবার।

ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল



মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙ্গুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"



"আচ্ছা, আমরা নিন্থুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নুতন ফ্রক এনে দেব।"

"আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"



সুশীলা মুন্নিকে, নিন্থুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "ডলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারন আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ডলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"

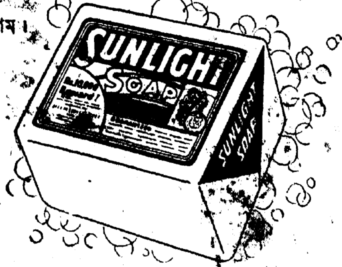
আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দ্দা, পায়জামা, সার্ট, ধুতী, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি তক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যিই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।



আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃণ ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

S. 2588-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত



ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

গত ১লা জুলাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ৭৭ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী হইতে কলিকাতা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিরাট মণ্ডপে এক উৎসব হইয়াছিল। সকাল হইতে ডাক্তার রায়ের গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহার গৃহে যাইয়া তাহাকে শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। বিকালের উৎসবে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, বিভিন্ন মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানসমূহ, বিভিন্ন জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণ প্রভৃতি অভিনন্দন পত্র দান করেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁহাকে সকলেই নিজ নিজ অভাব অভিযোগের কথা জ্ঞাপন করেন। ডাক্তার রায় ভগবানের নিকট দেশবাসীর সেবার জন্য শক্তি কামনা করিয়া বক্তৃতা করেন। ডাক্তার রায়ের জন্মদিন পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা—

গত ৩ শে জুন কলিকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্মিলনে পশ্চিম বঙ্গের ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথা দীর্ঘ সময় ধরিয়া আলোচিত হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল লোক-নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান আছে, তাহাতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলার সন্তানদিগকে অগ্রাধিকার দিবার ও পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় নিযুক্ত করিবার দাবী করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। দুঃখের কথা পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী আসিয়া, কি চাকরী, কি ব্যবসা সকল ক্ষেত্র দখল করিয়া আছে। বাঙ্গালীরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট পরাজিত হইতেছে। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দৃঢ়তার সহিত কোন ব্যবস্থায় মনোযোগী না হইলে বাঙ্গালী জাতি না খাইতে পাইয়া নির্মূল হইয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার সদস্যগণ এ বিষয়ে সর্বদা আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করুন, ইহাই সকলে প্রার্থনা করে। বহু অবাঙ্গালী শিল্পপতির পশ্চিমবঙ্গে কারখানা আছে—তাহারা যাহাতে সর্বত্র বাঙ্গালী কর্মী নিয়োগ করে, সে জন্য সরকারী নির্দেশ না থাকিলে কোন প্রস্তাবেই কোন ফল হইবে না।

ফারাক্কা বাঁধ ও কেন্দ্রীয় সরকার—

গত ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীএস-কে-পাতিল এক সাংবাদিক বৈঠকে কলিকাতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে যত সত্বর সম্ভব ফরক্কা বাঁধ নির্মাণ করাই কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য। উহা পাঁচশালা পরিকল্পনার আওতার বাহিরে। ঐ বাঁধ নির্মাণ কাজ সুরু করার ব্যাপারে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা আছে—যে মুহূর্তে তাহা সম্ভব হইবে তখনই কেন্দ্রীয় সরকার বাঁধ নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিবেন। ঐ একটি বাঁধ নির্মাণের উপর পশ্চিমবঙ্গের বহু সমস্যার সমাধান নির্ভর করিতেছে। গত ৩০শে জুন সোমবার কলিকাতা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সম্মিলনেও একবাক্যে অবিলম্বে ফরক্কায় গঙ্গাবাঁধ নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানানো হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে গঙ্গা বাঁধ নির্মাণের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করা না হইলে পশ্চিমবঙ্গে কোন মৌলিক সমস্যার সমাধান হইবে না। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরীর অস্তিত্বও এই বাঁধের উপর নির্ভর করিতেছে। শ্রীএস-কে পাতিল ঐ সম্মিলনে সভাপতি ছিলেন এবং তথায় তিন ঘণ্টাকাল গঙ্গা বাঁধ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। আমাদের বিশ্বাস সত্বর এই কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

অন্নাভাব—

১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষ হইতে গত ১৫ বৎসর কাল এদেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আমদানী করিয়া কোন প্রকারে এদেশের লোককে আধপেটা খাইতে দেওয়া হইতেছে। কয় বৎসর রেশন প্রথা চালু থাকার ফলে লোক সাড়ে ১৭ টাকা মণ দরে চাউল পাইতেছিল।

গত কয় বৎসর খাদ্যের প্রাচুর্য্যের অছিলায় রেশন প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে সে জন্য পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীণ হইয়াছে। গত কয় বৎসর কোথাও বা বন্যা, আর কোথাও বা অনাবৃষ্টির ফলে এদেশে প্রয়োজনীয় চাউল উৎপন্ন হয় নাই। ব্রহ্ম, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে বেশী দামে প্রচুর চাউল আমদানী করিতে হইতেছে। বাংলার লোক গম খাইতে চায় না—গত কয় বৎসর বাঙ্গালীকে গম খাইতে বাধ্য করা হয়। সে গম এদেশে উৎপন্ন হয় না, আমেরিকা, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে সরকার প্রচুর গম আমদানী করিয়া থাকেন—সেজন্যও সরকারী অর্থ বহু পরিমাণে ব্যয় করিতে হয়। এ বৎসর সুলভ-খাদ্যের দোকানে প্রত্যেক লোককে সপ্তাহে একসের চাল ও একসের আটা দেওয়া হইয়াছে—কাজেই যাহারা কখনও আটা খাইত না, এই দারুণ গ্রীষ্মে তাহারাও আটা খাইতে বাধ্য হইয়াছে। একসের চাউলে কাহারও এক সপ্তাহের খাদ্য হয় না। কাজেই ৭ আনা বা ৯ আনা সের দরে ঐ একসের চাউল কিনিবার পর লোককে ২৮ বা ৩০ টাকা মণে বাজারে চাউল কিনিতে হয়। রেশনের দোকানে অধিকাংশ সময় ৯ আনা সেরের ভাল চাল থাকে না—৭ আনা সেরের চালও সকল সময় খাওয়ার উপযুক্ত নহে। কাজেই প্রত্যেক গৃহস্থ প্রতি সপ্তাহে বাজার হইতে বেশী দামের চাউল সংগ্রহ করিতে বাধ্য হয়। শুধু চাউলের দাম বেশী নহে—সরকারী ব্যবস্থায় চিনির দাম বাড়িয়া ১টাকা ১আনা সের হইয়াছে—সকল রকম ডালই প্রায় ৩০টাকা মণ হইয়াছে। সরিষার তেলের দাম কমিয়া এখন ২টাকা সেরে দাঁড়াইয়াছে। ঘৃত বলিয়া দেশে কিছু নাই—দালদার দামও কম নহে। সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ কি খাইয়া বাঁচিবে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। আলুর দামও মাত্র ২।১ মাস ১০ টাকা মণ ছিল—পরে তাহা ২০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য পরিপূরক খাদ্যের কথা চিন্তাও করা যায় না। কলা এদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে লোক সুলভে পাকা বা কাঁচা কলা পাইতে পারে, সে পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গে কলার চাষ করার লোক বা উৎসাহ দেখা যায় না। নারিকেল একটি ভাল খাদ্য—কিন্তু কাগজে কলমে আমরা অধিক নারিকেল চাষের কথা দেখি—বাজারে একটি নারিকেলের দাম কম পক্ষে ৬ আনা। রাঙ্গা-আলু, চীনা-বাদাম প্রভৃতি এদেশে সহজে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে—কিন্তু তাহাও বাজারে সুলভ নহে। কাজেই মনে হয়, ঐ সকল জিনিষের চাষে সাধারণ মানুষের উৎসাহ নাই। কলা, পেঁপে, নারিকেল, রাঙ্গা-আলু, চীনা বাদাম প্রভৃতি সুলভ হইলে সাধারণ মানুষ ঐ সকল জিনিষ খাইয়া দেহধারণ করিতে সমর্থ হইত। ছোলা, মটর প্রভৃতি কলাই একটু চেষ্টা করিলেই প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যায়—কিন্তু কেন তাহা করা হয় না, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মাছ ও দুধ। গত কয় বৎসর ধরিয়া শুনা যাইতেছে, কলিকাতা ও সহরতলীতে সমুদ্রের মাছ ধরিয়া আনিয়া সুলভে মাছ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে—কিন্তু আজও তাহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব হয় নাই। সাধারণ বাঙ্গালী নিজ নিজ জমীতে পুকুর করিয়া সেখানে মাছ উৎপাদন করার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। সমবায় প্রথায়ও তাহা করা নানাকারণে সম্ভবপর হয় নাই। নদীতে মাছ ধরিবার উপযুক্ত লোকের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে—কাজেই বাজারে ৪ টাকা সেরের কমে ভাল মাছ পাওয়া কঠিন হইয়াছে। দুধের কথা না বলাই ভাল। আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণ গুঁড়া দুধ এদেশে আনা হইতেছে—তাহার অধিকাংশ বিতরণের জন্য পাওয়া যায়—কিন্তু সেই বিতরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট দুধের একাংশও বাজারে বিক্রীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হরিণঘাটায় বিরাট দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র খুলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যও আশানুরূপ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। প্রচুর চাল পাইলে বাঙ্গালী দিনে ৪বার নুন-ভাত খাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকিতে পারিত—কিন্তু সে চাউল পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। অধিক ধান্য উৎপাদনের চেষ্টা কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে না দেখিয়া বর্ত্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা দেশের লোকসংখ্যা কমাইবার চেষ্টা হইতেছে—গত কয় বৎসরে জন্মের হার বাড়িয়া যাওয়ায় ও মৃত্যুর হার কমিয়া যাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা অত্যধিক হইয়াছে—খাদ্যাভাবের তাহাই নাকি অন্যতম কারণ। সরকারের সহিত জনগণের সংযোগের অভাবই

অন্নাভাবের প্রধানতম কারণ। খাদ্য সরবরাহ বা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে। স্বাধীনতা লাভের পর ১১ বৎসর চলিয়া গেলেও আমরা কি এই সাধারণ বিষয়ে অবহিত হইত না? আজ প্রত্যেক দেশবাসীকে অন্নাভাব সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া নিজ নিজ কর্তব্যে অবহিত হইতে হইবে।

আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ২রা জুলাই কলিকাতার আর-জি-কর মেডিকেল কলেজটি আগামী ১০ বৎসর সরকারের পরিচালনাধীন রাখার জন্য একটি আইন গৃহীত হইয়াছে। গত কয় বৎসর হইতে উক্ত কলেজ ও তাহার সংলগ্ন হাসপাতালের পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা হইলে গত বৎসর তথায় সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটী ডাইরেকটর শ্রীহেমন্তকুমার ইন্দ্রকে কলেজের প্রিন্সিপাল করা হইয়াছিল। নূতন আইনের ফলে উক্ত কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালনায় সুব্যবস্থা স্থাপিত হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। বর্তমানে স্বাধীন দেশের সরকার জন-প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত—যত অধিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার সরকার গ্রহণ করেন, ততই দেশের কল্যাণ বর্দ্ধিত হইবে। কাজেই আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ সরকারী পরিচালনাধীন হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইবেন।

রাষ্ট্রভাষারূপে সংস্কৃতের দাবী—

সম্প্রতি কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতা ও মনীষী সংস্কৃত ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী সমর্থন করিয়া বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন—(১) সর্বজনমান্য শ্রীরাজা-গোপালাচারী বলেন—যদিও আমি ইংরাজির পক্ষে কথা বলিয়াছি, তথাপি যদি সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়, তাহাই পছন্দ করিব (২) সর্বোদয় আন্দোলনের নেতা আচার্য শ্রীবিনোভা ভাবে বলেন—সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করা হইলে ভারতবাসী কেহ তাহাতে আপত্তি করিবে না (৩) মধ্য-ভারতের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীসন্তানম্ বলেন—আমি হিন্দীর পক্ষে কথা বলি বটে, কিন্তু আমার মতে সংস্কৃত ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত (৪) ভাষা কমিশনের সভাপতি শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরুও বলেন—সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব হইলে আমি তাহাই সমর্থন করিব। এই সকল সর্বভারতীয় নেতাদের কথা ভারতের সর্বত্র সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলা দেশ ত বহুবৎসর হইতেই সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন করিতেছে। আমাদের বিশ্বাস, শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃতই ভারতের রাষ্ট্রভাষা-রূপে গণ্য হইবে।

ভাষা-ভারতী—

৩৫।১০ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা ২০, নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি হইতে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অবাঙ্গালী বাংলা-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীদিগকে বাংলা ভাষা শিক্ষা দনের জন্য যে ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা দেশবালী সকল সুধী কর্তৃক সমর্থিত ও প্রশংসিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি বাংলা শিক্ষার্থীদের বৈঠক হইতে ভাষা-ভারতী নামে একখানি ছোট সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাংলা ভাষা প্রচারের ব্যবস্থার বিবরণ আছে এবং অবাঙ্গালী কর্তৃক বাংলাভাষায় লিখিত প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। জ্যোতিষবাবুর কার্য্যে বাঙ্গালী মাত্রেরই সাহায্য ও সহ-যোগিতা করা কর্ত্তব্য।

দশঘরা তত্ত্ববিদ্যালয়—

বর্দ্ধমান রাজ কলেজের একটি বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রী তুলসীদাস বসু মহাশয় তাঁহার বাসস্থান হুগলী জেলার দশঘরা গ্রামে 'তত্ত্ববিদ্যালয়' নামে একটি অধ্যাত্ম-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া অসাম্প্রদায়িক অধ্যাত্ম বিদ্যার আলোচনা কেন্দ্র করিয়াছেন। তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য ও পরিচালক। বিশ্বমঙ্গল বাসনায় এই আকুমার-ব্রহ্মচারী কর্মী নীরবে যে সাধনা করিয়া যাইতেছেন, তাহার ফল অবশ্যই দেশবাসী উপভোগ করিবে। তিনি বিদ্যালয় হইতে দেড় টাকা মূল্যের একখানি তত্ত্ববিদ্যা নামক গ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ আয় বিদ্যালয়ের জন্যই ব্যয়িত হইবে। তুলসীদাসবাবুর আরব্ধ কার্য্যের ফলে দেশের বর্তমান আবহাওয়া পরিবর্তনে সাহায্য হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত—

৬৪ বেলগেছিয়া রোড, কলিকাতা—৩৬, নিখিল বঙ্গ ঈশ্বর গুপ্ত জয়ন্তী উৎসব কমিটী হইতে শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ ও শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু সম্পাদিত একখানি 'ঈশ্বর গুপ্ত স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশিত হইয়াছে। দাম দুই টাকা। তাহাতে

কবি সম্বন্ধে (১) মধুসূদন দত্ত, (২) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় (৩) রাজনারায়ণ বসু, (৪) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (৫) অক্ষয়চন্দ্র সরকার (৬) গঙ্গাচরণ সরকার (৭) শিবনাথ শাস্ত্রী (৮) দুর্গাদাস লাহিড়ী (৯) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১০) বিহারীলাল সরকার (১১) দীনেশচন্দ্র সেন (১২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি স্বর্গত লেখকগণের লেখার সহিত বর্ত্তমান যুগের শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ডক্টর রমাচৌধুরী, শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিখিত নিবন্ধাবলী প্রদত্ত হইয়াছে; উৎসব কমিটী এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া এ যুগের তরুণগণের নিকট ঈশ্বর গুপ্তকে পরিচিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই পুস্তকে লিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে পাঠক বিস্মৃতপ্রায় কবির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। গুপ্ত-কবির একখানি ছোট নির্বাচিত-লেখা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে সাধারণ পাঠকগণ উপকৃত হইবে। আমরা এবিষয়ে কমিটীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রবীন্দ্র পুরস্কার—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবৎসর বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকের জন্য ৫ হাজার টাকা রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। ১৯৫৭ সালের শ্রেষ্ঠ কবিতা পুস্তকের জন্য শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ঐ পুরস্কার পাইয়াছেন—তাঁহার কবিতা পুস্তকের নাম 'সাগর থেকে ফেরা'। ১৯৫৭ সালে গবেষণামূলক পুস্তক "পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি" রচনার জন্য শ্রীবিনয় ঘোষও ৫ হাজার টাকা রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। আমরা উভয়কেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

শ্রীঅশোককুমার সেন—

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম নেতা ও এম-পি এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারে আইন বিভাগে রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে পূর্ণ মন্ত্রীরূপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য করা হইয়াছে। একজন বাঙ্গালীর এই সম্মান লাভে বাঙ্গালী মাত্রই আনন্দিত হইবেন। অশোকবাবু পশ্চিমবঙ্গে সমাজ সেবা সমিতি গঠন করিয়া সকল সমাজসেবী কর্মীকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

পরলোকে সূর্য্যনাথ চট্টোপাধ্যায়—

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাইফেল চালক ও বাংলার রাইফেল আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ বাটা সু' কোম্পানির চীফ সেক্রেটারী সূর্য্যনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ২৯শে জুন ৫২ বৎসর বয়সে স্বল্পকাল রোগভোগের পর তাহার ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনের বাসভবনে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। খেলাধূলা জগতে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পশ্চিমবঙ্গ রাইফেল চালনার শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি একজন পুরোধা ছিলেন। সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব, সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাব ও বাটা রাইফেল ক্লাবের সহিত তিনি বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি নিখিল ভারত রাইফেল সুটিং-এ তিনি অসীম কৃতিত্ব অর্জন করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পত্নী—ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা রাইফেল চালিকা শ্রীযুক্তা সবিতা চট্টোপাধ্যায়, পুত্র শ্রীমান অলোক চট্টোপাধ্যায় ও দুইটি বিবাহিতা কন্যা এবং বহু আত্মীয় পরিজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার তথা ভারতীয় রাইফেল সুটিংএর এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বেশ্যাবৃত্তি বন্ধের আইন—

বেশ্যাবৃত্তি বন্ধের জন্য ১৯৩৩ সালে যে আইন প্রণীত হইয়াছিল, তাহা বর্তমানে অকেজো হইয়া যাওয়ায় সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এক নূতন আইন করিয়া ১লা মে (১৯৫৮) হইতে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। ঐ নূতন আইনের বলে কলিকাতার পুলিস কমিশনার বা বিভিন্ন জেলার পুলিস কর্তৃপক্ষ কতকগুলি স্থান হইতে সহজে বেশ্যাবাড়ী তুলিয়া দিতে পারিবেন এবং ঐ ব্যবসায়ে সাহায্যকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে বা বেশ্যাবৃত্তির জন্য সংগৃহীত বালিকাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবেন। প্রতি রাজ্য-সরকার সে জন্য নিজ নিজ রাজ্যে কয়েকটি করিয়া আশ্রম খুলিবেন। বৃদ্ধা বেশ্যা বা বেশ্যাবৃত্তি শিখাইবার উদ্দেশ্যে পালিতা বালিকাগণকে তথায় সৎভাবে জীবন যাপনের সুযোগ ও কুটীরশিল্প শিক্ষার সুবিধা দেওয়া হইবে। জীবিকার্জনের জন্য যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ না করে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখাই নূতন আইনের উদ্দেশ্য। দেশ হইতে সকল প্রকার সামাজিক দুর্নীতি দূর করাই স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তব্য। আমাদের দেশ এ বিষয়ে অবহিত হওয়ায় সকলের প্রশংসার পাত্র হইবেন।

পুনর্বাসনের নামে দুর্নীতি—

সম্প্রতি ২৪ পরগণা জেলার খড়দহ থানা এলাকায় একটি গ্রামে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সরকারী অর্থ-সংগ্রহ করিয়া একদল লোক প্রায় ৮ লক্ষ টাকা তছরূপ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে একজন প্রাক্তন এম-এল-এ শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। দলে কয়েকজন ঠিকাদার ও সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তাঁহারাও ধৃত হইয়াছেন। কয়েক মাস ধরিয়া গোপন তদন্তের ফলে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন লইয়া এইরূপ অভিযোগ নূতন নহে, পূর্বেও এইরূপ কয়েকটি মামলা হইয়াছিল। সরকারী কর্ম-শৈথিল্য এবং দীর্ঘসূত্রতার ফলে এইরূপ তছরূপ হওয়া সম্ভব হয়। এখনও সরকার এ বিষয়ে কোনরূপ কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই এবং গত ১১ বৎসর ধরিয়া পুনর্বাসনের নামে যে অন্যায় চলিতেছিল, তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। কেন এরূপ অবস্থার প্রতিকার হয় না—তাহা দেখা কি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন না?

কলিকাতায় কদলী প্রদর্শনী—

সম্প্রতি কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে নিখিল ভারত কদলী প্রদর্শনী হইয়াছিল। শেষ দিনে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠ প্রদর্শকদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। দুঃখের কথা—ভারতে, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে অতি অল্প চেষ্টায় প্রচুর কলা উৎপন্ন হইতে পারে—কিন্তু সেই কলা চাষের প্রতিও দেশবাসীর মন নাই। থোড়, মোচা, পাকা কলা, কাঁচাকলা, কলার পাতা, কলার পেটো প্রভৃতি দরিদ্র অধিবাসীদের নিত্য ব্যবহার্য্য। ফলের দিক দিয়া পুষ্টিকর ও উপকারী বলিয়া কলা সর্বজনপ্রিয়। প্রদর্শনী দেখিয়া বা পুরস্কারের লোভে যদি পশ্চিমবঙ্গে কলার চাষ বাড়ে, তাহাই লাভের কথা হইবে। সুলভ খাদ্য হিসাবে ১২ মাস পাকা কলা ব্যবহৃত হয়। আশা করি, অতঃপর দেশে কলার চাষ বাড়িবে ও দেশবাসী সুলভে অধিক পরিমাণ কলা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবে।

বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচন—

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্যগণ বিধান পরিষদের ৯ জন সদস্য নির্বাচন করিয়াছেন—কংগ্রেস দলের ৬ জন ও বিরোধী দলের ৩ জন মোট ৯ জন নির্বাচিত হইয়াছেন—(১) শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (২) শ্রীঅরবিন্দ বসু (৩) শ্রীকমলাচরণ মুখোপাধ্যায় (৪) শ্রীকামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় (৫) শ্রীহরিকুমার চক্রবর্তী ও (৬) শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—৬ জন কংগ্রেস দলের। (৭) জনাব আবদুল হালিম, কম্যুনিষ্ট (৮) শ্রীস্নেহাংশুকুমার আচার্য্য—কম্যুনিষ্ট ও (৯) শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী পি-এস-পি। ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীবিভূতি ঘোষ নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। প্রবীণ দেশ-সেবক বিপ্লবী হরিকুমারবাবু ও মহারাজকুমার স্নেহাংশু আচার্য্য নূতন এম-এল-সি হইলেন। কলিকাতা গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্র হইতে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তীও এম-এল-সি নির্বাচিত হইয়াছেন—তিনি পি-এস-পি দলের। কলিকাতা শিক্ষক নির্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীবিজয় বসু ও শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য এম-এল-সি নির্বাচিত হইয়াছেন—উভয়েই নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষে প্রার্থী ছিলেন।

সহরতলীর যাত্রীদের অসুবিধা—

জুন মাসের প্রথম কয়দিন প্রায় প্রত্যহ কলিকাতার উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ সহরতলীর রেলের দৈনিক-যাত্রীদের দুঃখ কষ্টের অন্ত ছিল না। প্রায় প্রত্যহ কোন না কোন লাইনে—কলিকাতা নৈহাটী, কলিকাতা বনগাঁ, কলিকাতা ক্যানিং প্রভৃতিতে সকালে ডাউন ট্রেণ বিলম্বিত হইলে গাড়ী চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। শুনা যায়, জলে লবণের ভাগ বেশী হওয়ায় এঞ্জিনগুলি প্রায়ই বিকল হইয়া যায়—গাড়ী লেট করিলেই দৈনিক যাত্রীদের অফিস আদালতে নিয়মিত সময়ে হাজিরা দেওয়া অসম্ভব হয়—ফলে একদল যাত্রী আপ ও ডাউন উভয় লাইনে গাড়ী চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়। এই ভাবে হাজার হাজার দৈনিক যাত্রীর প্রত্যহ হায়রাণির অন্ত থাকে না। কেন এরূপ হয় ও কি উপায়ে উহা বন্ধ করা যায়, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। এই দারুণ গরমে কিরূপ ভিড়ের মধ্যে প্রত্যহ দৈনিক যাত্রীদিগকে যাতায়াত করিতে হয়, তাহা কাহারও অজানা নাই। তাহার উপর যদি গাড়ী কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার ফলে অযথা বিলম্ব করে, তবে মানুষের পক্ষে উত্তেজিত হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নহে। প্রত্যহ বিলম্বে গাড়ী চলার ফলে লোকের চাকরী রক্ষা

করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেক দৈনিকযাত্রী কারখানার ফটক পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয় ও তাহার ফলে তাহার প্রাপ্য বেতন কমিয়া যায়। রেল কর্তৃপক্ষের এ সকল কথা চিন্তা করার সময় নাই। কাহার দোষে এইরূপ গাড়ী চলাচল অযথা প্রায়ই বিলম্বিত হয়, সে জন্য বেসরকারী তদন্ত কমিটী গঠন করিয়া রেল কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন। শিয়ালদহ-নৈহাটী ও শিয়ালদহ-বনগাঁ লাইনে যাত্রীর ভিড় অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে—সে ভিড় কমাইবার কথাও কর্তৃপক্ষ চিন্তা করেন না—চিন্তা করিলে অবশ্যই এত দিনে কোন না কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইত। কবে ইলেকট্রিক ট্রেণ হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের পক্ষে এই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকা সম্ভব নহে। আমরা আশা করি, গত কয়দিনের বিশৃঙ্খলার কথা স্মরণ করিয়া রেল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সত্বর প্রতীকারে মনোযোগী হইবেন এবং যাত্রী সাধারণের অযথা হায়রাণি বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবেন।

তারকেশ্বর সাংবাদিক সম্মিলন—

হুগলী জেলা সাংবাদিক সংঘের উদ্যোগে গত ১লা জুন রবিবার বিকালে তারকেশ্বরে, ইউনিয়ন ক্লাব ভবনে হুগলী জেলা সাংবাদিক সংঙ্ঘের বার্ষিক সম্মিলন হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রের সহ-সম্পাদক শ্রীদুর্গেশ মোহন নিয়োগী সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন, নিখিল বঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘের সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রধান অতিথি ও ভারতবর্ষ-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। সংঘের সভাপতি শ্রীঅবনী মোহন মজুমদার ও সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের লিখিত ভাষণে সংঘের সাংবাদিকদের অবস্থা ও তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা বর্ণনা করেন। সভাপতি প্রভৃতি তাঁহাদের ভাষণে দেশ ও জাতি গঠনে সাংবাদিকদের দান এবং তাঁহাদের সেবা ও ত্যাগের ইতিহাস বর্ণন করেন। মফঃস্বলবাসী সাংবাদিকরা নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য ও সরকারের নিকট হইতে দাবী আদায়ের জন্য এই ভাবে মিলিত হইলে দেশের অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন হইবে। স্থানীয় এম্-এল্-এ শ্রীপার্বতীচরণ হাজরা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে ও শ্রীনিত্যগোপাল পাল সম্পাদকরূপে সাংবাদিকদের আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন। হুগলী জেলায় বহু সাংবাদিক সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য সকল জেলায় এইভাবে সাংবাদিকদের মিলিত হওয়ার সময় আসিয়াছে।

২৪ পরগণার ইতিহাস সংকলন—

গত ফাল্গুন মাসের ভারতবর্ষে আমরা ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস সঙ্কলন সমিতি গঠনের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলাম। জানুয়ারী মাসের শেষে মজিলপুরে শ্রীকালিদাস দত্তের গৃহে সম্মিলনের পর ২বার কলিকাতা ভারত সভা হলে, বসিরহাটে, বারাকপুরে, বারাসতে, হরিনাভিতে, বোড়ালে, কঙ্কনদিঘীতে ও ক্যানিংয়ে সমিতির কয়েকটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিষয়টি জেলার সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ও কলিকাতা—১২ বিপিন গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ (বৌবাজার) ভারত সভা গৃহে সমিতির কার্য্যালয় স্থাপিত হওয়ায় বহুলোক তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন ও বহুলোক বহু প্রকারের উপকরণও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। ৫।৬ মাসে কাজ যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় আর কিছুদিনের মধ্যে ইতিহাসের খসড়া প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইবে। বহু স্থান হইতে সমিতিকে সে সকল স্থানে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছে—ক্রমে সে সকল স্থান পরিদর্শন করিলে আরও বহু নূতন তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হইবে।

লোনা লীপু

হীরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভিক্ষে আর মেলে না। তবুও ওরা বেরোয়। প্রতিদিন ভোর না হতেই তেলেঙ্গা পিঁপড়ের মত পিলপিল ক'রে এঁদো বাড়ীর ফাটলের ভিতর থেকে দলে দলে ওরা বেরিয়ে পড়ে পেটের দায়ে। কেউ ঝুলি কাঁধে, কেউ শানকি হাতে, কেউ বা টিনের ভাঙা কৌটো হাতে বেরিয়ে পড়ে আপন-আপন ভাগ্যদেবতাকে মাথা নুইয়ে। কপাল ওদের সবারই পুড়েছে। তবু ওরা আজও মানে ওদের কপালের লিখন।

বস্তির অলিতে-গলিতে টবের গাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দে শেষ রাত্রে রোজই অতসীর ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না। নিশ্চল পড়ে থাকে চোখ দুটো বন্ধ করে।···অন্ধ-নুলো-কুঠে ভিকিরীগুলোকে ওরা টবের গাড়ীতে বসিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যায়। দিনের আলো ফুটবার আগেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসিয়ে দিয়ে আসে। সারাটা দিন আপন আপন নির্দিষ্ট স্থানে বসে ওই কানা-খোঁড়া-নুলোর দল সাধা কান্নার সুর টেনে টেনে পথচারিদের করুণা ভিক্ষা করবে···একটি পয়সা দাও। না হয়, উত্তপ্ত ফুটপাতে গড়িয়ে গড়িয়ে করুণ আকুতি জানাবে দুনিয়ার চলমান মানুষের কাছে। অদৃষ্টকে ওরা নির্বিকার চিত্তে মেনে নিয়েছে বলেই ভাগ্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে জানে না। মানুষের কাছে দিনের পর দিন শুধু হাত পাতে। কিন্তু রুখে দাঁড়াতে পারে না কোনদিন। ওরাও যে মানুষ ছিল, অমনি করেই বাঁচতে পারতো পৃথিবীতে, সে কথা কোনদিন মনে হয় না ওদের। দারিদ্র্যের ছিদ্র দিয়ে পূর্বপুরুষদের রক্তে যে পাপ ঢুকেছিল, সেই পাপে ওরা আবর্জনার স্তূপ হয়ে পড়ে আছে পথের দু-পাশে।

কলরব থেমে আসে। দিক্-দিগন্তে যে-যার পথে চলে যায় ক্ষুধার্ত কাকের ছানার মত কলকল ক'রে। রাতের কুলায় ছেড়ে ওরা এবার বেরিয়ে গেল মানুষের দয়া আর উচ্ছিষ্ট কুড়োতে।

অতসীর ঘরের দরজায় কে টোকা দেয়!···কনকন করে কানেস্তারার জীর্ণ কপাটটা। আবার থেমে যায়।···এঘর থেকে ওঘরে সরে যায় পা টিপে টিপে চলার শব্দ।

পদ্ম। নিশ্চয়ই পদ্ম। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে, এ দরজা থেকে সরে গিয়ে নিবারণবাবুর দরজায় কান পেতেছে।

বুঝতে ওর অসুবিধা হয় না। চোখ না খুলেই পায়ের শব্দে পদ্মর উপস্থিতি বেশ বুঝতে পারে অতসী। মনটা বিরক্তিতে ভরে ওঠে :

রাত না পোহাতেই চুলবুলিয়ে উঠেছে গন্নাকাটি মাগী। তাই, চুপিচুপি এসেছে আড়ি পাততে—নিবারণবাবু কোন ঘরে রাত কাটিয়েছে সেই খবরটুকু জানবার মতলবে।

ঘেন্নায় অতসীর মগজের ভিতরটা রিরি করে ওঠে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে নিয়ে পাশ ফিরে শোয়। ভোরের বেলা দরজা খুলে পদ্মকে ঘরে ঢোকাতে চায় না সে। সারাটা সকাল—সারাটা দিন তা হলে বিষিয়ে উঠবে।

পদ্ম আবার ফিরে এলো ওর দরজায় : কিলো অতসী, রাত পোহাল যে! ভিক্ষেয় বেরুবি না?

নিরস্ত হবার পাত্রী সে নয়। এবার দরজাটায় বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকে—ওঠ্। অ অতসী!

অতসী সাড়া দেয় না।

পদ্ম গলার স্বরটা আরও এক ধাপ চড়িয়ে বলে—ভিক মাগা কি ছেড়ে দিলি লো?

হাঁ : বিরক্তির সঙ্গে অতসী জবাব দেয়। কিন্তু দরজা খোলে না।

তা তো ছাড়বিই। কপাল ভালো, এক যেতে না-যেতেই আর এক জোটে। অমন খোরপোষের মানুষ জুটেছে,···তোর আবার ভাবনা কি ?

আপন মনে গজ গজ করতে করতে পদ্ম চলে যায় ওর দরজা ছেড়ে। হয়তো যাবার পথে নিবারণবাবুর দরজায় আর একবার উঁকি দিয়ে যায়।

•

দিন এমনি করেই কাটে। কোনদিন ভিক্ষেয় বেরোয়, কোনদিন বেরোয় না। কোনদিন ভাগ্যে একমুঠো জোটে, কোনদিন বা ঘরে পড়ে থেকে গোটা উপোস দেয়।···তবু বেঁচে আছে অতসী। মরবো মনে করলেই তো মরা যায় না। বাঁচতে যাদের যত বেশী সাধ, তাদের ওপরেই যেন যমের রোখ চেপে থাকে।

এখন আর অতসী প্রায়ই ভিক্ষেয় বেরোয় না। বেরিয়েই বা লাভ কি! সারাটা দিন সেধে যে দু-মুঠোচাল আর দু'চারটে পয়সা পায়, তা থেকে ঘর ভাড়ার তোলা রেখে দুবেলার দু-মুঠো পেটের ভাতও হয় না।

পরণের কাপড়খানা শতছিন্ন হয়েছে। গা ঢাকতে পিঠ উদম হয়।···খোকা যতদিন ছিল ওর কোলে, ও যেন অনেকখানি নিষ্কৃতি পেয়েছিল লজ্জা-সরমের হাত থেকে। খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে ছেঁড়া আঁচলটা বেশী করে টেনে দিত পিঠের ওপর। বুক ঢেকে দিয়েছিল ভগবান। শুধু যে সরমের হাত থেকে বেঁচেছিল, তাই নয়; ওর খালি কলিজাটাও যেন ভরে উঠেছিল খোকাকে পেয়ে।

দীনুকে যে ধরে রাখতে পারবে না সে, তা কি আর জানতো না অতসী ? খুব জানতো। মর্মে মর্মে জেনেছিল সে কথা। যতবার পথে পথে ঘুরে জোর করে ধরে এনেছে, ততবারই হাত-পিছলে পালিয়েছে সে। কপালের জোরে যেটুকু ধরা দিয়েছিল, সেইটুকুই তো সোনার চাঁদ হয়ে এসেছিল ওর বুকে। পানা ডোবায় পদ্মফুল ফুটেছিল মা ষষ্ঠীর দয়ায়।···গেল, সবই ধুয়ে-মুছে গেল আবার। কাঙালের কপালে সুখ সহ্য হয় কখনো ?

না-না-না। বেশ হয়েছে। দীনু আক্ষেপ করে বলেছিল —আর একটা ভিকিরীর বংশ সৃষ্টি হলো। একটা নয়, একশোটা—হাজারটা ভিকিরী জন্মাবে ওই খোকা থেকে। ···বস্তির অলি-গলি ভরে যেত আরো সাতশো গণ্ডা কানা-খোঁড়া-নুলো হা-ভাতে ভিকিরীর বাচ্চায়।

জীবনটার কথা ভাবতে অতসীর ভালো লাগে না। মনটা কেমন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।···যে ক'দিন ওর সোর-সংজ্ঞা ছিল না, নিবারণবাবু হয়তো করেছে কত তদারক। ওষুধ-পথ্যি, আরও না জানি কত কি করেছে! সে কথা ভাবতে অতসী আজ নিজের কাছেই যেন সংকোচে জড়সড় হয়।

নিবারণবাবু চেয়েছিল একখানা কাপড় কিনে দিতে। সে কথা শুনে হাতজোড় ক'রে অতসী অনুনয়ের সঙ্গে বলেছিল—কাপড় আমার লাগবে না। ওই তো, দড়ির ওপর পাটকরা যে কাপড়খানা আছে, তাতেই এখন চলবে ক'মাস। পেটে যাদের ভাত জোটে না, ছেঁড়া কাপড় পরতে কি তাদের লজ্জা করলে চলে নিবারণবাবু ?

নিবারণবাবু আর কোন কথা বলেনি। ক'দিনেই অতসীকে যতখানি চিনেছিল, বুঝতে তার অসুবিধা হয় নি যে, জোর করা চলে না তার ওপর। বেশী কিছু বললে পাছে অতসী বেঁকে বসে, ওর আনা ওষুধ-পথ্যিও মুখে না তোলে, সেই ভয়ে নিবারণ চুপ করে গিয়েছিল।

অতসীকে ওর ভালো লেগেছিল। ভিকিরীর মেয়ে। দারিদ্র্যে জরাজীর্ণ। দু'বেলা পেট ভরে দুমুঠো ভাত পায়নি কোনদিন। পরণে শতছিন্ন একখানা ঠেঁটি কাপড়। তবুও লাবণ্য উপচে পড়ে ওর চোখে মুখে!···নন্দার জন্যে নিবারণ এত করেছে! দুর্নামের বোঝা মাথায় করে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল এই অজ্ঞাতবাসে।···সুন্দরী হয়তো ছিল নন্দা। কিন্তু তার অত বেশ-বাস লাবণ্য-প্রসাধন যেন মুহূর্তে ম্লান হয়ে গিয়েছে অতসীর কাছে। নন্দা ছিল বিলাসের প্রতিমূর্তি। আর অতসী! একটী প্রাণবন্ত নারী। জীবন ওর শুকিয়ে মরুভূমি হলেও, অফুরন্ত হয়ে আছে নারীত্বের উৎস—স্নেহ, মায়া, মমতা।

নিবারণ জানতো যে, দড়ির ওপর পাট করা যে কাপড়খানা ছিল, সেখানা অতসীর নয়, দীনুর। অতসী সেখানা পরে না কোনদিন, পরবেও না। মাঝে মাঝে যখন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, ওই কাপড়খানার ভাঁজ খুলে সে বুকে-মাথায় চাপা দিয়ে পড়ে থাকে হাত-পা গুটিয়ে।···মুখের ঢাকা খুলে, কপালে হাত দিয়ে জ্বরটা দেখতে গিয়ে নিবারণ

কতদিন দেখেছে যে, অতসীর চোখের জলে কাপড়খানা ভিজে উঠেছে। নিবারণের মনের কোণে উন্মুখ ভিজে আকাঙ্ক্ষাটুকু নিমেষে শামুকের মত গুটিয়ে গিয়েছে। অনুভূতি উদগ্র হয়ে উঠলেও, মন ওর পিছিয়ে এসেছে চোরের মত পা-টিপে টিপে।

তবুও যেন কেমন একটা মোহ! কানা মৌমাছির মত নিবারণের মনটা অতসীর আশে-পাশে ঘুরে মরে। ও যে বোঝে না, তা নয়। কিন্তু পারে না নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে। নিবারণ যখনই তুর্বল হয়ে পড়ে, অতসী মমতাভরা হাতে মুছে দেয় ওর মনের আয়নাখানা। নিবারণ বুঝতেও পারে না। কেমন হতভম্বের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অতসীর মুখ পানে।

অনশনক্লিষ্ট মুখে মরা-একটুকরো হাসি টেনে এনে অতসী থেমে থেমে বলে—আচ্ছা নিবারণবাবু, একবার না হয় ভুল করে পা বাড়িয়েছিলেন পিছল পথে। ঝেঁাকের মাথায় এসে পড়েছিলেন বস্তির এই নোংরা ঘরে। কিন্তু আর কেনে?···ভদ্দরলোকের ছেলে, ঘরে ফিরে যান।

নিবারণের মুখে হঠাৎ কোন উত্তর যোগায় না। কি বলবে, ভেবে পায় না।

অতসী কি সত্যি চায়, নিবারণ ওদের এই বস্তি ছেড়ে চলে যাক্!···ওই রুগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সে বস্তির এক কোণে একলাটি পড়ে থাকে। অসময়ে মুখে তার এক ফোঁটা জল দেবারও নাই কেউ। চলৎ-শক্তি যখন থাকে, পাড়া বেড়িয়ে না-হয় পথের পাশে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত পেতে যা তুচার-পয়সা পায়, তাই দিয়ে কোন রকমে দিন গুজরাণ করে। কিন্তু যেদিন সে শক্তিটুকুও থাকে না, নিরম্বু উপোস দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে থাকে ছেঁড়া মাতুরখানার ওপর হাত পা কুঁকড়ে।

নিবারণবাবু!

নিবারণ চমকে ওঠে।

কি ভাবছেন অমন ক'রে?

কিছু না।···নিবারণ অন্যমনস্কতাটুকু সামলে নেয়।

অতসী হাসে: তাই ভালো। ভাববেন না কিছু।··· পুরুষ মানুষ। ভাববার কি আছে! বাড়ী ফিরবার মন যদি না থাকে, দেখে শুনে কাজ কম্ম একটা জুটিয়ে ভদ্দরলোকের পাড়ায় উঠে যান।···বেটাছেলে, হাতে পয়সা হলে কত নন্দা এসে জুটবে আবার।

এবার নিবারণ হাসে। ফিকে হাসির সঙ্গে চাপা গলায় শ্লেষ মিশিয়ে বলে—পয়সাটাই তা হলে সব!

তা ছাড়া আর কি, বলুন?···পয়সা থাকলে তুনিয়ায় সবই হয়। হা ভাত করে যারা বেড়ায়, হাত-পা থাকতেও তারা অমনিস্যি। কুকুর-বেড়ালেরও অধম। মানুষের দরজায় পা বাড়ালে, ছেই-ছেই দূর দূর ক'রে সরিয়ে তফাতে সবাই দেয়।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে অতসীর নাকের পেটিতুটো কাঁপে। কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একটু থেমে, ঢোক গিলে বলে—পথে যেতে নন্দাকে সেদিন দেখেছিলাম। বেশ চনমনে হয়েছে চেহারাটা। মটর গাড়ীতে এক ভদ্দরলোকের গায়ে গা দিয়ে বসেছিল নন্দা। হয়তো কোন পয়সা-আলা লোক!

নিবারণের মনে ধাক্কা লাগলেও চোখ তুটো ঝক ঝক করে ওঠে। একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন ঝলক দিয়ে ওঠে তার চোখের কালো তারাতুটোয়: অতসী!

বলুন!

বয়েস তো তোমারও ছিল। এমন নাক-মুখ-চোখ! মিষ্টি চেহারা। কেন মিছেমিছি জীবনটাকে শেষ করলে এই পচা গলির অন্ধকার এঁদো ঘরে? দিনের পর দিন না খেয়ে শুকিয়ে মরে লাভ কি?

লাভ! লাভ সত্যি নাই, নিবারণবাবু। তবে পুষ্যি-পুত্তুর দেয়ার চেয়ে কোলে মরাও ভালো। বাঁচবার লেগে যারা নিজেকে বিক্রি করে, তাদের চাইতে না-খেয়ে-মরা ভিকিরীরাও অনেক ভালো।···দেহ বেচে, দেহ রাখার চাইতে গলায় দড়ি দিয়ে মরাও ভালো।

নিবারণ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অতসীর মুখ-পানে। ভেবে পায় না, কেমন করে অতসী এমন বদলে গেল। নিতান্ত শান্ত ধীর অসহায় একটা গেরস্ত ঘরের মেয়ে। ভাগ্যবিড়ম্বনায় ছিটকে এসে পড়েছিল ভিকিরীদের মাঝখানে, ওর অন্ধ ভিক্ষুক বাপের হাত ধ'রে। বাপ নিষ্কৃতি পেয়েছে তুঃসহ জীবনের হাত থেকে। কিন্তু ও পারেনি আজও মাকড়সার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে। দীতু পালিয়েছে। আর সে ফিরবে না কোনদিন। তবুও

অতসী পথ চেয়ে দিন গুণছে ওই ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে শুয়ে। বাতাসে কানেস্তারার কপাটটা নড়ে উঠলে, চমকে ওঠে। কান পেতে শোনে পায়ের শব্দ।

ছেলেটাকে যেদিন বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, সেদিন নিবারণ ভেবেছিল—আর তো রইল না অতসীর কোন অবলম্বন। হয়তো ধীরে ধীরে বদলাবে এবার।··· মনে ওর দানা বেঁধে উঠেছিল ক্ষীণ আশার রেণুগুলো।

বদলে সে গেল। কিন্তু নিবারণ যেভাবে ভেবেছিল সে ভাবে নয়। দেখতে দেখতে কেমন যেন সজাগ হয়ে উঠলো অতসী। যে-কথা আগে সে ভাবতেও পারতো না কোনদিন, সে-কথা এখন শুধু ভাবে তাই নয়, বুঝতে শিখেছে। তাই শৈথিল্য এসেছে ওর ভিক্ষাবৃত্তির ওপর। না খেয়ে পড়ে থাকে, তবুও ভিক্ষেয় বেরুতে চায় না। কতদিন নির্জলা উপবাস দিয়েছে। নিবারণকে হাত-জোড় করে বলেছে—আপনার প্যায়ে পড়ি নিবারণবাবু, হোটেল থেকে ভাত আপনি কিনে আনবেন না। আমি খাবো না। শরীরটা ভালো নাই।

ভাত কিনে আনতে নিবারণ আর সাহস করেনি। অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকেছে অতসীর মুখপানে।···আগে অতসী ওকে তুমি বলতো। কিন্তু এখন আর ভুল করেও আপনি ছাড়া বলে না।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পদ্ম কখন আড়ি পেতেছে। নিবারণের চিন্তাটুকু শেষ হবার আগেই গা দুলিয়ে দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে চাপা হাসির ঝলক তুলে—কি লো অতসী, গোসা হলো কিসে ?

অতসী উত্তর দেয় না। মুখখানা বিরক্তিভরে ফিরিয়ে নিয়েছে। নিবারণ সরে গিয়েছে দরজার দিকে।

অতসীর কাণের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে পদ্ম শোলক কেটে বলেছে—মান করিস্ নে রাধে !

আল্‌গা বাঁধন ফস্‌কে যাবে,
পড়বি ঘুঘু ফাঁদে।

থামো পদ্মদিদি : আল কেউটের মত অতসী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখের দিকে চেয়ে পদ্ম কেমন হক-চকিয়ে গিয়েছে।···চোখদুটো যেন আগুনের ভাঁটার মত জ্বলে !

অতসীর সমস্ত সত্তা নিমেষে বিদ্রোহ করে উঠেছে। যে পদ্মকে সে এক মুহূর্ত আগেই ডেকেছে দিদি ব'লে, তার মুখপানে চাইতেও যেন আপাদমস্তক ঘৃণায় ভরে উঠেছে।

অতসীর চোখে এই দৃষ্টি পদ্ম দেখেনি কোনদিন। তার সমস্ত প্রগল্‌ভতা যেন নিমেষে আড়ষ্ট হয়ে যায়। গয়নাকাটা ঠোঁটখানা দাঁত দিয়ে চেপে পদ্ম হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে আর কথা সরে না। জড়সড় হয়ে দুপা পিছিয়ে দাঁড়ায়।

চোখদুটো বন্ধ ক'রে অতসী নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ওর বুকের ভিতর তখন ঝড় উঠেছে। আকস্মিক উত্তেজনার জোয়ারে মগজের শিরাগুলো বুঝি ছিঁড়ে পড়বে। রক্তের ধাক্কায় চোখ-দুটো টনটন করে। কানে ভেসে আসে পুঁটি গয়লানির কান্না। ছেলেটার জন্যে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে ঘরের মেঝেয় পড়ে।

নিবারণ ততক্ষণে তার ঘরে ঢুকেছে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে পদ্মর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে।

ক্রমশঃ

প্রশ্ন

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

সরাইখানায় চাঁদের আলোর হরির লুট,
পূবের আকাশে রক্তিম মেঘে রাত্রি শেষ,
ভরা গঙ্গায় ছল ছল জল, ইল্‌শে গুঁড়ি,
এপারে ওপারে মুখ দেখাদেখি নির্নিমেষ !
হে আকাশচারী—বলকা-রূপিণী রূপোলী মন
অনেক পাওয়ার সীমানা ছোঁয়া এ পুরবী সুর,

কার কাছে কার দেনা শোধ হবে হিসাব নেই,
গোলাপ-বাগের বীথিকাও হায় কি বন্ধুর !
অপায়িনী নয়, তবু ছায়া দূরে সরাতে চাই,
মন-মালঞ্চে বেপথু কুঁড়ির আর্তনাদ,
জীবন-সায়র-উপকুল কেন তীর্থহীন,
কে হদিশ দেবে কোথায় ঘটেছে কি পরমাদ !

শাশ্বত সংস্কার

শ্রীমতী মমতাময়ী দেবী

আমাদের বিবাহকালে শাস্ত্রানুযায়ী নারায়ণশীলা ব্রাহ্মণ ও অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া যে বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে তাহার গুরুত্বকে যান্ত্রিক জগৎ বা আণবিক যুগ যতই কটাক্ষপাত বা ব্যঙ্গ আজ করিতে থাকুক কিন্তু ইহা যে পরস্পর হৃদয় মিলনের এক শ্রেষ্ঠতম প্রয়াস সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিবাহকালীন উচ্চারিত ঐ পবিত্র মন্ত্রগুলির সম্যক গুরুত্ব যদি কেহ মনে প্রাণে একবার বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে বর্ত্তমানে নারীদের বিশেষ রক্ষা-কবচের জন্য যাঁহারা খুব উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহারা সেই কার্য্যের বা প্রচেষ্টার আশঙ্কা বুঝিতে পারিবেন। "যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয় মম" মন্ত্রের গুরুত্ব হয়ত যান্ত্রিকযুগ অস্বীকার করিতে পারে কিন্তু হিন্দুজাতি হিসাবে এই গুলির স্থান আজও উচ্চে।

জাতি হিসাবে আমরা যাহাকে পরম পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি তাঁহাকেই প্রধান সাক্ষী হিসাবে এবং তাঁহারই সম্মুখে এই পবিত্র কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। সুতরাং জাতি হিসাবে হিন্দু যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে ততদিন এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিবে। যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কালের তাগিদে ভারতে বহুরাজ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিন্তু জাতিহিসাবে আমরা কখনও দেউলিয়া হইয়া পড়ি নাই; সংস্কারই বরাবর রক্ষা করিয়া গিয়াছে।

আইন করিয়া কেহ কখন কাহাকেও সাংসারিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারে নাই। নারীকে সত্যই যদি আজ মর্য্যাদার আসন দিতে হয় তাহা হইলে ভারতে ত্রিশকোটী নরনারী যাহাতে রাষ্ট্রের নিকট হইতে সত্যকারের মর্য্যাদার আসন পাইতে পারে তাহার জন্য সমবেত চেষ্টা করা প্রয়োজন। নর ও নারীর মধ্যে বিভেদের প্রাচীর টানিয়া কোন লাভ নাই, কারণ সাংসারিক জীবনে ইহাতে মাত্র অশান্তি বাড়াইবে।

সৃষ্টির আদিকাল হইতে নর ও নারী সমবেত এবং পরস্পরের সহযোগিতায় যে সমাজ জীবন গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা বুঝি বিলুপ্তির পথে চলিয়া যাইবে? বলা বাহুল্য কলি যাহা পারে নাই, মেদিনী যাহা গ্রাস করে নাই, ধ্বংস যাহার বিলুপ্তি ঘটাতে পারে নাই তাহাকে কখনই মনুষ্যকৃত আইন নিশ্চিহ্ন করিতে পারিবে না—কারণ নর ও নারীর সম্পর্ক চিরশাশ্বত।

—

রূপচর্চায় রঙ-এর ব্যবহার

অনামিকা দেবী

ভারতবর্ষের চৈত্র, ৬৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সৌন্দর্য্যানুশীলনে মেয়েরা' পড়লাম। লেখিকা শ্রীমতী সুলোচনা দত্ত দেখলাম আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে একমত, তবে তাঁর প্রধান অভি-যোগ রঙ্ ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যা বলছি তার বিরুদ্ধে।

শ্রীমতী দত্তর বক্তব্যের সারসংকলন করে দেখা গেল যে ইনি রঙ্ ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী। কয়েকটি যুক্তিও তিনি দেখিয়েছেন নিজের স্বপক্ষে। প্রাচীন ভারতে ওষ্ঠ-রঞ্জনের প্রথা প্রচলিত ছিল নারী সমাজে, এ তথ্য জেনেছেন তিনি সাঙ্গাধরের শ্লোক থেকে। সংস্কৃত সাহিত্যে আমার জ্ঞান সীমিত। শ্রীমতী দত্তর শ্লোকটি দেখবার সৌভাগ্য তো হয়নি—এমন কি 'সাঙ্গাধর' নামক ভদ্রলোকটিকেও চিনি না আমি—অকপটে স্বীকার করছি। তবে, প্রাচীন ভারতের বিলাসিনী সমাজে যে ওষ্ঠ ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রত্যঙ্গ অল্প লিপ্ত করা হতো—তা সাঙ্গা-ধরের বাইরে থেকেও প্রমাণ করা কঠিন নয়। কিন্তু, কোনও জিনিষের সু বা কু বিচারের পক্ষে প্রাচীনত্ব কি

একটা প্রমাণ? তাই যদি হয়—অর্থাৎ 'প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল' একমাত্র এই যুক্তিতে শ্রীমতী দত্ত যদি ওষ্ঠ-রঞ্জন প্রথাকে সমর্থন করেন—তবে আধুনিক বক্ষোবন্ধনী ব্যবহারে তাঁর আপত্তি কেন? এটিও তো পাশ্চাত্যানুকরণ না হয়ে প্রাচীন ভারতের 'কঞ্চুলিকার' আধুনিক এবং উন্নততর 'সংস্করণ' হতে পারে। আরও আছে। সাম্প্রতিক-কালে ইঙ্গ-বঙ্গসমাজ-বিহারিণীদের মধ্যে যে লাল জল পান চালু হচ্ছে আস্তে আস্তে—সেটিকেও তো এই একই যুক্তিতে সমর্থন করা যায়। প্রাচীন ভারতের প্রমদাজনের মধ্যে বারুণী পান প্রথা যে প্রচলিত ছিল—এতো বহু কবির কাব্যেই দেখা গেছে। কাজেই একমাত্র প্রাচীনত্বই কোনও প্রথার ভালোমন্দ বিচারের মানদণ্ড নয়—হতে পারে না। পুরাণীমিত্যেব নসাধুসর্বম্—বলেছেন কালিদাস। এত কথা বললাম বটে, কিন্তু আজকের ওষ্ঠ-যষ্ঠির (লিপষ্টিক) অতিব্যবহার নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়, আর তা ব্যাপকভাবেই প্রচলিত হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে। এ তথ্য শ্রীমতী দত্তর পক্ষে অজানা থাকবার কথা নয়। তবু যে তিনি প্রাচীন প্রথার প্রত্যাবর্তনের দোহাই দিয়েছেন—তা শুধু নিজেকে সমর্থন করার দুর্বল প্রয়াস।

নিজের দেহকে সুন্দর করে তোলা কি অপরাধ? আমি যদিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি "ললিত দেহের সৌন্দর্যই নারীর চরম সৌন্দর্য নয়", তবু শ্রীমতী দত্তর প্রশ্নের উত্তরে বলবো যে অপরাধ তো নয়ই—বরং অপরের চোখে নিজেকে সুন্দর করে দেখানর আকাংখা মানব মনের একটি চিরন্তন বৃত্তি। শ্রীমতী দত্ত যদি আমার আগেকার প্রবন্ধটি একটু মন দিয়ে পড়তেন তবে দেখতে পেতেন যে সত্যিকার সৌন্দর্য চর্চার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিনি আমি। সৌন্দর্যকারী নাম করে অসৌন্দর্যের পূজা যে উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছে দিন দিন—আমার অভিযোগ তারই বিরুদ্ধে। সৃষ্টিকর্তা সৌন্দর্যসাধক—বলেছেন শ্রীমতী দত্ত। যদি তাই হয়, তবে বিধাতার অন্যতম সৃষ্টি নারীদেহও তো এমনিতেই সুন্দর। তা হলে, বাইরে থেকে কৃত্রিম রঙ্ প্রয়োগ করা কি খোদার ওপর খোদ্‌কারী নয়।

রঙ্ মাখার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচির প্রকাশ দেখেছেন শ্রীমতী দত্ত। রুচির কথা ছেড়েই দিলাম। কারণ, ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। তাঁর কাছে যেটা সুরুচির পরিচয়—আমি সেটাকেই রুচিবিকারের চূড়ান্ত নিদর্শন বলে মনে করি। তাহলে থাকে সৌন্দর্যবোধ। আচ্ছা আজ যে কৃত্রিম রঙ্ ব্যবহারের উৎকট আতিশয্য দেখা দিয়েছে—তা কি সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায়? তা যদি হতো, তবে কি ওগুলি ব্যবহারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যও থাকতো না? বাঙ্গালিনীর শ্যামল মুখে কটকটে লাল রঙ্ কী সৌন্দর্যবোধের মূলেই আঘাত করে না? না কি কালো জলেই লাল পদ্মের সুন্দরতম প্রকাশ?

সৌন্দর্য চর্চা অর্থে কৃত্রিম রঙ্ ব্যবহার বোঝায় না। স্বাস্থ্যেই সৌন্দর্য। যিনি প্রকৃতই সৌন্দর্য চর্চা করতে চান—তাঁকে প্রথমেই মনোযোগ দিতে হবে নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি। যদি আপনার স্বাস্থ্য ভালো হয়—যদি আপনি রক্তাল্পতায় না ভোগেন—তবে স্বাস্থ্যের আভায় আপনিই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আপনার দেহত্বক—ঠোঁটে নখে দেখা দেবে লালিমা। স্বাস্থ্য চর্চাই আসল সৌন্দর্য চর্চা। আর স্বাস্থ্যই যদি আপনার না থাকে—তবে রামধনুর সাতটা রঙে আপাদমস্তক রাঙিয়ে তুলেও নিজেকে সুন্দরী বলে প্রমাণ করতে পারবেন না।

কিন্তু, এসব কথা বলছি কাকে? শুনছেই বা কে? এক উন্মত্ত অনুকরণের স্রোতে ভেসে চলেছি আমরা। গার্গী-মৈত্রেয়ীর উত্তরাধিকার তো হারিয়ে গেছে কবে। এমন কি সংস্কৃত কাব্যের নায়িকাদের জন্যেও কোন মাথা-ব্যথা নেই আমাদের। আজ আমাদের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্যামা-শশিকলার দল। চোখ-কান বুজে আমরা অনুকরণ করে চলেছি এঁদের ঠোঁটের হাসিটি থেকে চুলের কেতা আর শাড়ী পরবার ভঙ্গি পর্যন্ত। লোক আকর্ষণ করবার জন্যে এঁরা ওষ্ঠাধর রক্তাক্ত করলেন—নির্বিকার-চিত্তে আমরা তারই অনুকরণ শুরু করলাম আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে। শ্রীমতী দত্ত না জানতে পারেন—কিন্তু ওষ্ঠযষ্টি ব্যবহারের পেছনে একটি মাত্রই উদ্দেশ্য আছে—যার উল্লেখ আমি আগেকার প্রবন্ধটিতে করেছি। তবে শ্রীমতী সুলোচনা দত্ত প্রমুখ কয়েকজন হয়তো এর ব্যতিক্রম, তাঁদের রঙ্ ব্যবহার করার পেছনে হয়তো নিজেকে সুন্দর করে তোলার প্রয়াস ছাড়া কিছুই নেই।—কিন্তু—exception proves the rule—অন্ততঃ লজিক তাই বলে।



ডিমের রুটি আর পরোটা

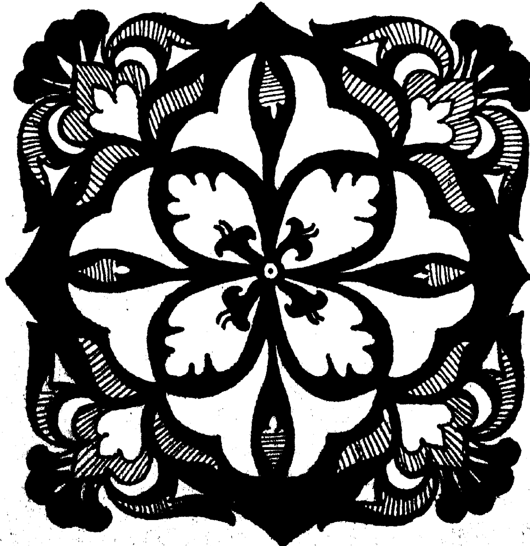
নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ডিমের সাদা ও লাল অংশ একসঙ্গে নিয়ে খানিকটা নুন ও মরিচের গুঁড়ো মিশোতে হবে, তারপর বেশ ভালো ভাবে ফেটিয়ে নিতে হবে, চৌকো করে কেটে পাৎলা পাউরুটির টুক্‌রো একখানা একখানা করে ঐ ডিমের গোলার ভেতর মেখে ঘি বা মাখনে এপিঠ ও ওপিঠ করে নেওয়া দরকার, বেশী ভাজা হোলে ডিমের বৈশিষ্ট্য থাকে না। এরপর চায়ের সঙ্গে খেতে লাগবে ভালো। লুচি পরোটার প্রণালী মত ময়দা মেখে ঠেসে লেচি কেটে গোল করে রাখ্‌তে হবে—তারপর একটি পাত্রে কয়েকটা ডিমের সাদা ও লাল অংশের সঙ্গে নুন, হলুদ, কাঁচালঙ্কা ও পিঁয়াজ বাটা মিশিয়ে বেশ করে মাখাতে হবে। তারপর ঐ ময়দার জল এই ডিমের প্রলেপ দিয়ে আর একখানা লেচি বেলে প্রথম খানার ওপরে মুখে মুখে বসিয়ে চারদিকের ধারগুলি মুড়ে দিন, আর পোচ বা রুটি সেঁকার মত. অল্প ঘি বা মাখনে ভেজে নিন। তাহলেই উৎকৃষ্ট খাবার হবে।

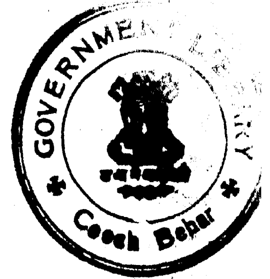
—অম্বুজবালা দেবী

প্রাচ্য-কলা-কেন্দ্রম্‌ ঃ

গত ৭ই জুন ৬২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে প্রাচ্য-কলা কেন্দ্রমের শুভ উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ কালিদাস নাগ, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী ঠাকুর। স্বপনবুড়ো প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা করিতে গিয়া জানান যে, মেয়েদের এই শিক্ষাকেন্দ্রে ছবি আঁকা,নৃত্য গীত এবং তারের যন্ত্রাদি বাজানো শিক্ষাদান করা হবে। যে সব মেয়ে ছবি আঁকা, নৃত্য সংগীত ও সেতার এস্রাজ,গীটার ইত্যাদি বাজনা শিখিতে উৎসুক তাঁদের প্রতি শনি ও রাবিবার বৈকালে এখানে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় শিক্ষাদান করা হবে।

আল্পনা—





—ইন্দিরা বিশ্বাস



ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বড় বিচিত্র অভয়ের এই বিয়ে, বড় বিচিত্র এই ফুলশয্যা। ভয়ংকর বোবা যন্ত্রণা পাক খায় অভয়ের মস্তিষ্কে। সে সারারাত্রি জেগে থাকে, বউ তার ঘুমোয়। জীবনের এ অধ্যায় যে এমনভাবে শুরু হবে, কাল নিমির সঙ্গে কথা বলার এক মুহূর্ত আগেও টের পায়নি।

এখন সন্দেহ হয়, সে দুঃস্বপ্ন দেখেছে সারা রাত। সন্দেহ হয়, নিমি তার সঙ্গে খুনসুটি করেছে শুধু, ছলনা করেছে। অভয়কে রাগিয়ে সে খেলা দেখেছে। নইলে, এখন নিমি এমন নিশ্চিন্তে ও সুখে ঘুমোচ্ছে কেমন ক'রে? এত সুন্দর কেন দেখাচ্ছে তাকে? ঠোঁটের কোণে তার এমন মিষ্টি হাসি কেন ঝিকিমিকি করে? রাত্রে যখন অভয় তার অন্ধ নির্দয় আসুরিক আলিঙ্গন শিথিল ক'রেছিল, মনে করেছিল, এইবার নিমি চীৎকার করবে, ডাকাডাকি ক'রে লোক জড়ো করবে ঘরে। কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। তার জন্যেও প্রস্তুত ছিল অভয়। মনে মনে বলেছিল, তাই হোক, তাই হোক। কেন না, রাগে ও ঘৃণায় তখনো দপ্‌দপ্‌ করছিল তার বুক।

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে প'ড়েছিল নিমি। ঠিক যেমন ক'রে ফেলে রেখেছিল তাকে অভয়, তেমনি দলিত মথিত হ'য়ে, বেশবাস আলুথালু ক'রে, চুলের কাঁটা ছড়িয়ে, সিঁদুরের দাগ সারা মুখে মেখে। সেও যেন এক ভয়ংকর নির্লজ্জ বিদ্রোহ।

একবার বুঝি ভয় হয়েছিল অভয়ের, নিমির চৈতন্য নেই। একবার যেন মনে হয়েছিল, নিমি বুঝি কাঁদছে। তবু শক্ত হ'য়ে বসে অভয় হুস্‌ হুস্‌ ক'রে বিড়ি টেনেছিল শুধু। খানিকক্ষণ পরেই ঘুমন্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ফিরে দেখেছিল, নিমি পাশ ফিরেছে। গাঢ় ঘুমে সে মগ্ন।

এখনো ঘুমোচ্ছে। এটা ছলনা নয়। মানুষের সবই কী বিচিত্র।

তবু, কাল রাত্রের কথা তো ভুলতে পারে না অভয়। শুধু দুঃস্বপ্ন ব'লে পারে না উড়িয়ে দিতে। সে যে কাল অন্ধ আক্রোশে ফুঁসেছিল, দারুণ ঘৃণা করেছিল নিমিকে, তবু এক দুর্জয় বাসনায় নিমির প্রতি অঙ্গ নিষ্পেষিত করার জন্যে, রক্তে তার পাগলা বান ডেকেছিল। মনের একি কারসাজি! সংসারে সবই বিচিত্র। অভয়ও যে বড় বিচিত্র। একই সঙ্গে তার রাগ ঘৃণা, তার উন্মত্ত বাসনা নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেছে নিমিকে।

জীবনে অভয়ের এই প্রথম পাওয়াকে, তার প্রথম ভালবাসাকে, তার বউকে সে জোর ক'রে আলিঙ্গন করেছে। যদি নিমি নিস্তেজ না হ'য়ে পড়ত, তা' হ'লে অভয় তাকে মারত নিষ্ঠুরভাবে।

মনে হওয়া মাত্র উঠে দাঁড়ায় অভয়। একটু পরেই ঘুম ভাঙবে নিমির। চোখ খুলবে সে। আর সেই চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হবে অভয়ের, ভাবতেও কেমন ক'রে ওঠে তার বুকের মধ্যে। সে যে বড় লজ্জা। বড় লজ্জা!

বাইরে কাকপক্ষী ডাক দিয়েছে অনেকক্ষণ। মি'লের প্রথম বাঁশী বেজে উঠল, আশেপাশে লোকজনের গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। জাগছে সবাই।

অভয় তাড়াতাড়ি তার দলা মোচড়ানো জামাটা তুলে গায় দিল। ফিরে তাকাল একবার নিমির দিকে। অগোছালো বেশবাস দেখে থম্‌কাল একটু। কিন্তু গায়ে

হাত দিয়ে কাপড় গুছিয়ে দিতে গেলে জেগে যেতে পারে। নিঃশব্দে ও সাবধানে দরজা খুলে, বাইরে এল অভয়। আবার ঠেলে ভেজিয়ে দিল ভাল ক'রে। দেখল, উঠোনের ওপরেই, বাতাবী তলায় মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে শৈলবালা। পুকুরের উঁচু পাড় ঘেঁষে, রান্নাঘরের দাওয়ায় পাড়ারই দু'তিনটে মেয়েমানুষও ঘুমোচ্ছে। তারা সকলেই শৈলবালারই সই। সকলেরই নেশার ঘুম। সহজে ভাঙবে না।

আয়নায় নিজের মুখ দেখেনি অভয়। দেখলে, দেখতে পেত, তাকেও নেশাখোরের মতোই দেখাচ্ছে। রক্তবর্ণ চোখের দুই কোণে সুগভীর গর্ত। ভ্রু'র পাশেও চিবুকে কেটে যাওয়া ক্ষতের মতো সিঁদুরের দাগ। কিন্তু কোনোদিকে না তাকিয়ে, এ গলি সে গলি ক'রে, বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল সে। সরকারি অফিস আদালত জেলখানার পাশ দিয়ে একেবারে কারখানায় এসে উঠল, সে।

আজ অভয়ের ছুটির দিন। আগামীকালও তার ছুটি। তবুও আর কোথাও সে যাবার জায়গা খুঁজে পেল না। অনাথখুড়োর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে।

প্রথমে দেখা হল একজন চেনা মিস্তিরির সঙ্গে। সে অভয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠতে গিয়ে থেমে গেল। তাড়াতাড়ি অভয়ের হাত ধ'রে বলল, আরে খুড়ো, এস এস, চল ডিপার্টমেণ্টে।

ডিপার্টমেণ্টে নিয়ে, সবাইকে ডাক দিল সে। সবাই জড়ো হ'য়ে টিপে টিপে হেসে খানিকক্ষণ দেখল অভয়কে। তারপর সবাই ফেটে পড়ল হাসিতে। একজন কোত্থেকে একটি ফাটা আয়না নিয়ে এসে ধরল অভয়ের সামনে।

হরি মিস্তিরি বলল, একেবারে পেতক্ষ্য দাগ লিয়ে এসেছ বাবা! বাহ্‌বা! বাহ্‌বা! আর একজন বলল, শালার চোখ দেখ না। এখনো খোয়াড়ি কাটেনি।

—নতুন নেশা, খোয়াড়ি কি এখুনি কাটবে। খোয়াড়ি কাটতে এখন ঝাড়া তিন মাস।

—বছরও ঘুরে যেতে পারে।

কথায় বলে চটকলের মিস্তিরির মুখ। কাজে আর খারাপ কথায় সমান দড়ো। অভয়কে নিয়ে সবাই মাছির মতো ভ্যানভেনিয়ে উঠল।

বুড়ো হরি মিস্তিরি অভয়ের চিবুক ছুঁয়ে বলল, জোট বেঁধেছে তা' হ'লে ভাল।

অভয় হাসল একটু। বোকা বোকা হাসি।

এদিকে সব শেষের ভোঁ বেজে গিয়েছে। সকলের কাজে হাত দেবার সময় হ'ল, এমন সময় এল অনাথ। অভয় ততক্ষণে ঘষে ঘষে মুখের দাগ তুলেছে।

একটু অবাক হ'য়ে বলল, কি গো, খুড়ো, এত সকাল সকাল যে? অভয় হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, চলে এলুম।

—কেন?

—কেন, আসতে নেই?

—আছে বৈ কি! তা' ব'লে ফুলশয্যের রাত পোয়াতে না পোয়াতে কারখানায় আসে কে?

ব'লে অনাথ কয়েক মুহূর্ত অভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে, জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে বল তো?

অভয় বলল, কিছু নয়। ভাল লাগল না, তাই তোমার কাছে চলে এলুম।

—বটে!

অনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আর একবার তাকে দেখে, চীৎকার ক'রে একজনকে বলল, এই নিমে, আমি আসছি। বড় সায়েব এলে বলিস্‌, লেবার অফিসে গেছি।

ব'লে, অভয়ের হাত ধ'রে কারখানার বাইরে, চায়ের দোকানে এসে বসল। বলল, বল্‌ তো, কি হয়েছে? নিমি কিছু বলেছে নাকি?

বলেছে। কিন্তু সে-বলা যে নিমির শুধুই ছেলেখেলা নয়, তা কে জানে। ফুলশয্যের রাত না পোয়াতে, নিমির নামে নালিশ করতে বাঁধল অভয়ের। বলল, না।

—তবে?

অভয় বলল, জীবনখানা কেমন হবে, তাই ভাবছি।

অনাথ বলল, সারারাত কি এই সব ভেবেছিস্‌ নাকি?

—না। রাত পোয়াতে মনে হল, তাই ভাবলুম। খুড়ো, মনে লয়, নিমিকে পাওয়ায় বড় সুখ।

অনাথের ধাঁধাঁ লাগে মনে। ঠিক যেন বুঝতে পারে না অভয়ের কথা। বলল, তা' সে সুখ তো পেয়েছিস্‌, না, কি?

অভয় আবার হাসল। আবার একটু ইঙ্গিতমূলক খোঁচা দিয়ে অনাথ শব্দ করল, অ্যাঁ?

অভয় জোরে হেসে উঠল, অনাথও হেসে উঠল। দুজনের এই উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে দোকানের সবাই ফিরে তাকাল তাদের দিকে।

অনাথ হাসতে হাসতেই বলল, পাগলা কোথাকার। তাই তো, পাগল না অভয়? নিমিকে পাওয়ায় যদি বড় সুখ, তবে নিমির ঘুম ভাঙিয়ে আদর ক'রে আসে নি কেন সে! কি দুটো কথা বলেছে, তার জন্যে কি বিশ্রী পাগলামিই না ক'রে এসেছে অভয়। ছি! সুখ সে পেয়েছে। মিথ্যে কেন বলবে? রক্তে তার বড় সুখের ঢেউ, উথালি পাথালি ক'রে মেরেছে তাকে। তবু বুক জ্বলেছে। সে কিছু নয়। এখন বরং, নিমির জন্যে কষ্ট হচ্ছে মনে মনে।

নিজেকে নিজেই যেন স্তোক দেয় অভয়। বুকের ভিতরে কুণ্ডলী পাকানো ত্রাসটাকে যেন চোখ টিপে রাখে।

অনাথ আবার বলে, কবি নিয়ে কি জ্বালা! দু' গেলাস চা' দিতে বলে, অনাথ আবার বলে অভয়কে, কোথায় ভাবলুম, গান-টান বেঁধে এনেছ মনের ফুর্তিতে। তা' নয়, বলে, জীবনখানা কেমন হবে।

অভয় যেন অবাক হ'য়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে অনাথের দিকে।

অনাথ বলল, কি হল?

—গানের কথা বল্‌ছিলে?

—হ্যাঁ।

অভয় যেন সুপ্তোত্থিতের মত বলল, শোন তা'লে, এখুনি বেঁধে শোনাচ্ছি।

ব'লে, প্রথমে কথায় বলে অভয়, গোলকধামের গোলক ধাঁধাঁ খুড়ো।

কোন্ ছক থেকে কোন্ ছকে যাবে, কখন তুমি কাঁদবে আর কখন তুমি হাসবে, তুমি জান না।

ভালবাসা যায় না চেনা।
সে কখন থাকে, কখন থাকে না
অধম অভয়ে তা বলতে পারে না।
ভালবাসা যায় না চেনা।
সে যে কখন জ্বালায়, কখন কাঁদায়
কখন ভাসায়, কখন হাসায়
ভাল না বাসার মানুষ তা' বলতে পারে না।

অভয় থামলে পরে অনাথ বলল, এ কেমন গান হল খুড়ো? এর মধ্যে তো ফুর্তির মেজাজ পাচ্ছিনে।

অনাথ বলল, আছে খুড়ো, খুঁজে দেখতে হবে। নিধু-মশায়ের টপ্পা শোন নি,

ভালবাসিবে বলে ভাল তো বাসিনে,
আমার স্বভাব এই, আমি তোমা বৈ জানিনে।

এইটি হল খাঁটি কথা খুড়ো। ভালবাসাবাসি কেমন তা' জানি না। ভালবেসে যাব, এই ভেবে নিজের সুখ।

অনাথ ধরতে পারল না অভয়ের কথা, মনটা তার সহজ হল না। কিন্তু সময় ছিল না তার। বলল, এবার আমি যাই, কিন্তু তোমার মনের কথা তো ধরতে পারলুম না। অভয় বলল, ধরবার কিছু নেই, মন আমার ভাল আছে খুড়ো।

বিকেলবেলা যাবে ব'লে অনাথ চলে গেল।

অভয় এল গঙ্গার ধারে। সত্যি তার মনটা ভাল হ'য়ে উঠেছে। সব গ্লানি যেন কেটে গিয়েছে। গঙ্গার ধারে বসে, অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সে গাইল, 'ভালবাসিবে ব'লে ভালতো বাসিনে।'

প্রতি মুহূর্তেই তার নিমির মুখ মনে পড়তে লাগল। একটা তীব্র উল্লাস আবর্তিত হ'য়ে উঠতে লাগল তার রক্তে। প্রচণ্ড আকর্ষণে তাকে টানতে লাগল চুম্বকের মতো। গতকাল রাত্রের সমস্ত গ্লানি ও মনের অন্ধকারটাকে 'কিছু নয়' 'কিছু নয়' বলে সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল জলে। বিদেয় ক'রে দিতে চাইল স্রোতের টানে।

গঙ্গার ধার থেকে উঠে এল সুরীনের বাড়িতে। ভামিনী তাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, কোথায় গেছলে ভোর ঠেঙে?

অভয় হাসি চেপে বলল, কেন?

—কেন আবার? সবাই যে খোঁজাখুঁজি ক'রে মরছে। রাত থাকতে নাকি উঠে বেরিয়ে গেছ?

অভয় বলল, রাত থাকতে কেন যাব। রাত পোয়াতে গেছলম এট্টু কারখানায়।

ভামিনী হেসে উঠল মুখে আঁচল চেপে। বলল, আ পোড়াকপাল আমার। রাতের বিত্তান্ত বন্ধুদের বলতে আর তর সইল না বুঝি? এস, বস। চা খাবে?

—চা কেন এত বেলায়? ভাত খাব না খুড়ি!

ভামিনী ভ্রূ কুঁচকে বলল, ভাত কি এখেনে খাবে নাকি? তোমার শাশুড়ি যে রেঁধে ব'সে আছে।

ভুলেই গিয়েছে অভয়, শৈলবালার বাড়িই তার বাড়ি। ওইখানেই তার সংসার। বলল, তাও তো বটে। তবে দেও, চা-ই দেও এট্টুস্‌খানি।

ভামিনী ডেকে বলল, তবে এস রান্নাঘরে।

রান্নাঘরে যেতে ভামিনী তার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব তো খুশি খুশি দেখছি। খুব জমেছে বুঝি?

অভয় হেসে উঠল। ভামিনী বলল তা বুঝেচি। তবে, চা কেন, খুড়োর কালকের বোতলে এখনো আছে, দেব?

হ্যাঁ, অভয়ের যেন নেশাই লেগেছে। বললে, দেও।

ভামিনী খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল। এগিয়ে দিল বোতল। অভয় চোখ বুজে বোতলের মদ ঢেলে দিল গলায়।

ভামিনী চমকে উঠে, ত্রাসে ব'লে উঠল, ওমা, ছি, অমন কাঁচা খেতে আছে? অভ্যেস নেই, তার ওপরে বিনা জলে—

অভয় হাসল। বলল, এই বেশ লাগছে খুড়ি। তা' খুড়ি জানলে, তোমাদের নিমি বড় সোন্দর মেয়েমানুষ।

ভামিনী বলল, তা' ডাগর হয়েছে, যৈবনকাল।

অভয় বলল, হ্যাঁ, মেয়েটার তোমাদের সারা গতরে যৈবন গো খুড়ি। আমি পাগল হ'য়ে যাব।

ভামিনী হা হা ক'রে হাসল। কিন্তু অভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি হল তার। এ যেন সেই অভয় নয়, আর কেউ। তা' হ'তে পারে। মনের মত মেয়েমানুষ পেলে, পুরুষে কী কথা না বলে? বোবার মুখেও কথা ফুটে যায়। অনেক দেখেছে ভামিনী তার জীবনে।

হেসে বলল, রাতের নেশাই তা'লে কাটেনি এখনো?

—না খুড়ি, নেশা কাটে নাই।

ব'লে হো হো ক'রে হেসে উঠল অভয়। উঠে বলল, চলি, বাড়ি যাই!

কোনদিকে না তাকিয়ে অভয় চলে গেল। ভামিনীর ভ্রূ জোড়া কুঁচকে উঠল একবার। তারপর আপন মনেই হাসল আবার। মনে মনে বলল, ছোঁড়া একেবারে মজেছে।

শৈলবালা, চেঁচিয়ে উঠল অভয়কে দেখে। বেড়াতে বেরিয়েছিল শুনে, বকাঝকা করল জামাইকে।

কিন্তু খেয়ে, দেয়ে সেই যে অভয় শুল, ঘুম ভাঙল একেবারে সন্ধ্যা পেরিয়ে। অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘরেও আলো জ্বলে নি। রান্নাঘরে বোধহয় রান্না হচ্ছে। কড়া-খুন্তির শব্দে তাই মনে হয়।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল অভয়। অনেকখানি হালকা মনে হ'চ্ছে এখন নিজেকে।

এমন সময় হ্যারিকেন নিয়ে ঘরে ঢুকল নিমি। কালকের মত না হলেও, আজো সেজেছে সে। কিন্তু বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকে, অভয়কে দেখেই, মুখ ফিরিয়ে নিল। ঠক্‌ ক'রে বাতি রেখে চলে গেল বাইরে।

অভয়ের ইচ্ছে হয়েছিল, উঠে গিয়ে হাত ধরে নিমির। সেই অবসর পায় নি।

কিন্তু সেই অবসরের জন্যই যেন অভয় বসে রইল। শৈলবালা, আর প্রতিবেশীরা ঘিরে যেন নানান কথা বলা-বলি করল।

অভয় সকলের সঙ্গে কথা বলল, কিন্তু মনটা ছটফট করতে লাগল তার। সকলের সামনে নিমি খেতে দিল তাকে মুখ বুজে। কিন্তু ঘোমটা ছিল তার মাথায়। সেই ঘোমটা ঢাকা মূর্তি দেখে, মন আরো উচাটন হয়ে উঠল। ঘোমটা ঢাকা নিমিকে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় লাগল তার।

ক্রমশঃ





অতুল দত্ত

গত এক মাসে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোনরূপ নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। ফ্রান্সে ও লেবাননে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলীর জের চলিতেছে। বহু বিতর্ক ও কথা কাটাকাটির পর কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট শিবিরের বিজ্ঞানীরা জেনেভায় মিলিত হইয়াছেন।

আণবিক বিশেষজ্ঞ সম্মেলন—

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রধানদের আর একটি সম্মেলন আহ্বানের কথা উঠিয়াছিল। সোভিয়েট রুশিয়ারই এই সম্পর্কে আগ্রহ বেশী। কিন্তু আমেরিকার পক্ষ হইতে বলা হয়, এই ধরণের সম্মেলনের সাফল্য সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে কতকটা নিশ্চিত হইতে না পারিলে সম্মেলন আহ্বান বৃথা। দুই পক্ষের বহু বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির পর মস্কোতে রাষ্ট্রদূতের পর্য্যায়ে এক আলোচনা আরম্ভ হয়; প্রস্তাবিত রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনের কার্য্যসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করা এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে দুই পক্ষের মনোভাব সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে কতকটা জ্ঞান সঞ্চয় করাই ছিল মস্কো বৈঠকের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বৈঠকের কার্য্য বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইতিমধ্যে সোভিয়েট রুশিয়া আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তাহার পর কথা ওঠে—আণবিক বিস্ফোরণ গোপনে ঘটানো সম্ভব কিনা, এবং আণবিক বিস্ফোরণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের নির্ভরযোগ্য উপায় কি, সে সম্বন্ধে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের অভিমত জানা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রসঙ্গ উঠিবার কারণ এই যে, রাশিয়া গোপনে বিস্ফোরণ ঘটাইবে বলিয়া আমেরিকা সন্দেহ করিতে থাকে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বক্তব্য, গোপনে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ অসম্ভব। যাহা হউক, আবার কূট-নৈতিক প্যাঁচ কষা-কষি চলিতে থাকে। সোভিয়েট রুশিয়া এই মর্ম্মে আশ্বাস চাহে যে, আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ রাখাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমেরিকা ইহাতে আপত্তি তোলে এবং বলিতে থাকে যে, সব কিছু ভণ্ডুল করিয়া দেওয়াই সোভিয়েট রুশিয়ার উদ্দেশ্য; সে শুধু, নিজের অনুকূলে প্রচারের জন্যই আগ্রহী। শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট রুশিয়া এই সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হয়। গত ১লা জুলাই হইতে জেনেভার কম্যুনিষ্ট ও অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুই পক্ষই মানিয়া লইয়াছে যে, ইহা নিছক বিশেষজ্ঞ-সম্মেলন, কোন-প্রকার রাজনৈতিক গুরুত্ব ইহার নাই। রাজনৈতিক আলোচনা স্বতন্ত্র-ভাবে চলিতেছে।

দ্য গলের ফ্রান্স—

জেনারেল দ্য গল ফ্রান্সের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর এক মাস অতীত হইয়াছে। আলজেরিয়ার ফরাসী অধিবাসী ও সামরিক কর্ম্মকারীদের দাবীতে তাঁহার ক্ষমতা লাভের সময় ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ অবস্থায় যে আলোড়ন দেখা দিয়াছিল, তাহা থামিয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের জনসাধারণ এই পরিবর্ত্তন বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইয়াছে; কমুনিষ্টরাও আন্দোলনে নামে নাই। ফ্রান্সের রাজনীতিক্ষেত্রে সুদৃঢ় নেতৃত্বের অভাব; আলজেরিয়ার অন্তহীন যুদ্ধের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয়ভার ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে দারুণ নৈরাশ্য আনিয়াছে; তাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে স্থৈর্য্য চাহিতেছে। জেনারেল দ্য গল যেভাবেই ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকুন, তাঁহাকে রাজনৈতিক স্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে ফরাসী জনসাধারণ আপত্তি করে নাই। জনসাধারণের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই হয়ত কম্যুনিষ্টরা নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়া যে ফ্রান্সের এই রাজনৈতিক পট পরিবর্ত্তনে কোনও উচ্চবাচ্য করে নাই, ইহাও ফরাসী কম্যুনিষ্টদের নিষ্ক্রিয়তার অন্যতম কারণ হাওয়া সম্ভব। দ্য গলের সহিত "ন্যাটোর" তথা আমেরিকা মনোমালিন্য ঘটা সম্ভব—আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট শিবিরে হয়ত এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক কম্যুনিষ্ট শক্তি তথা ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টি হয়ত এই অনুমানের ভিত্তিতে দ্য গল সম্বন্ধে নীতি স্থির করে।

দ্য গল্ ক্ষমতা লাভের পর এখন পর্য্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয়ই দিয়াছেন। একটি ব্যাপারে তাঁহার আলজেরিয়ান্ সমর্থকরা বিশেষভাবে নিরাশ হইয়াছে। তাহারা টিউনিসিয়া সম্বন্ধে কঠোর নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল; টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা কাড়িয়া না লইলে আলজেরিয়ার সমস্যা মিটিবে না বলিয়া তাহারা চেঁচাইতেছিল। দ্য গল তাহাদিগকে নিরাশ করিয়া টিউনিসিয়া হইতে ফরাসী সৈন্যের অপসরণ সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট বারগুইবার সহিত চুক্তি করিয়াছেন। এই চুক্তি অনুসারে বিজার্টার নৌঘাটী ব্যতীত সমগ্র টিউনিসিয়া হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারিত হইবে, এবং বিজার্টায় সাময়িকভাবে যে ফরাসী সৈন্য অবস্থান করিবে, তাহারাও টিউনিসিয়ার কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে সেখানে থাকিবে। এই চুক্তিতে জেনারেল দ্য গলের কূটনৈতিক বিচক্ষণতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। আলজেরিয়ার সমস্যার সহিত টিউনিসিয়াকে জড়াইয়া এই রাজ্যটিকে ফ্রান্সের শত্রু করিয়া তোলা হইতেছিল। আমেরিকাও ইহাতে ফ্রান্সের উপর বিরূপ হইতেছিল; কারণ টিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট বারগুইবা সম্বন্ধে মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কদের আশা অনেক,—তাঁহারা এই ব্যক্তিকে আরব জগতে মিশরের প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে

দাঁড় করাইতে চান। টিউনিসিয়ার সহিত দ্য গল গভর্ণমেন্টের এই চুক্তিতে মরক্কোর সুলতানও উৎসাহিত হইয়াছেন; ফ্রান্সের সহিত এখনও মরক্কোর যে বিবাদ আছে, শান্তিপূর্ণভাবে তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারিবে বলিয়া তিনি আশা করিতেছেন। সাম্প্রতিক কালে ফরাসী কর্তৃপক্ষের আচরণে টিউনিসিয়া ও মরক্কো ক্রমেই আল্‌জেরিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল; এই দুইটি প্রতিবেশী রাজ্যের সমর্থনে আল্‌জেরিয়ার বিদ্রোহীরা প্রবাসী আল্‌জেরিয়ান্ গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। দ্য গল্ টিউনিসিয়ার সহিত চুক্তি করিয়া এই আয়োজনে বাধা সৃষ্টি করিলেন। এইভাবে আল্‌জেরিয়ার বিদ্রোহীদের মিত্রহীন করিয়া পরে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অবলম্বন করাই হয়ত তাঁহার নীতি। অবশ্য, নরমপন্থী আল্‌জেরিয়ান্‌দের প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে শাসন সংস্কারের প্রস্তাবও তিনি উত্থাপন করিবেন। আল্‌জেরিয়ার সমস্যা সমাধানের একটা উপায় দ্য গল করিতে পারিবেন বলিয়া ফ্রান্সের অনেকে আশা করিতেছে। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর আল্‌জেরিয়ায় যাইয়া যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে এই সমস্যা সমাধানের কোনও নূতন ইঙ্গিত নাই। আল্‌জেরিয়ার স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করিয়া উহাকে ফ্রান্সের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাতেই যত গোলযোগ। দ্য গল্ আল্‌জেরিয়ায় যাইয়া ঐ রাজ্যটিকে ফ্রান্সের একীভূত (integrate) করিবার কথা শুনাইয়াছেন। এই একীকরণের নীতির কোনও ব্যাখ্যা তিনি করেন নাই। কিন্তু ইহার যে ব্যাখ্যাই হউক, মূলনীতি হিসাবে আল্‌জেরিয়ার স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা স্বীকৃত না হইলে এই সমস্যার সমাধান কিছুতেই হইবে না।

দ্য গলের ক্ষমতা লাভের সহিত সামরিক বিভাগের শৃঙ্খলাহীনতার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে; আল্‌জেরিয়ার সামরিক কর্ম্মচারীরা পূর্ব্ববর্ত্তী ফ্লিম্‌লা গভর্ণমেন্টকে মানিতে চাহে নাই—যাহা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গুরুতর অপরাধ। প্যারিসে গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রকে অচল করিবার জন্য প্যারাসুটের সৈন্যের সাহায্যে সামরিক "ক্যুপ্ দ্য আঁতাতের" ষড়যন্ত্রও তাহারা নাকি করিয়াছিল। দ্য গল্ তাহাদের দাবীতে ও তাহাদের গণতন্ত্র-বিরোধী চক্রান্তের সুযোগে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রথা যদি ফ্রান্সে বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত এই সামরিক কর্ম্মচারীদিগকেই তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে সায়েস্তা করিতে হইবে। বিদ্রোহী সেনাপতিদের দ্বারা গঠিত জন নিরাপত্তা কমিটী এখনও আল্‌জেরিয়ায় সক্রিয় রহিয়াছে; জেনারেল মাসু আল্‌জিয়ার্সের প্রিফেক্ট মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। ফ্রান্সের আশাবাদী মহল মনে করেন যে, জেনারেল দ্য গল তাঁহার অনুরক্ত এই সব সেনাপতিদের সম্পর্কে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সামরিক বিভাগে নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তন করিবেন। মোটের উপর, জেনারেল দ্য গলের ক্ষমতা গ্রহণে ক্রমে ফ্রান্সের ফ্যাসিস্ত শক্তি প্রবল হইয়া উঠিবে বলিয়া প্রথমে যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল, সে আশঙ্কা এখন অনেকেই আর পোষণ করিতেছেন না। ছয় মাসের জন্য তাঁহার হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; এই ছয়মাস পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পর দ্য গলের রচিত নূতন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে গণ-ভোট গৃহীত হইবে। এই নূতন শাসনতন্ত্রে ফ্রান্সের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এবং গণ-ভোটে উহা অনায়াসে গৃহীত হইবে বলিয়া এখন আশা করা হইতেছে।

দ্যগলের ক্ষমতা গ্রহণে ফ্রান্সের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে। "ন্যাটোর" কার্য্যপ্রণালী ও পশ্চিম জার্ম্মানীর অস্ত্রসজ্জা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত যাহাই হউক না কেন, উহার জন্য ফ্রান্সের সহিত ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। তাঁহার টিউনিসিয়া নীতিতে আমেরিকার খুশী হওয়ারই কথা। সম্প্রতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌মিল্যান্ এবং মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মি ডালেস্ প্যারিসে যাইয়া জেনারেল দ্যগলের সহিত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; "ন্যাটো" ও জার্ম্মানীর প্রশ্নে তাঁহারা আশ্বস্ত হইয়া আসিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। তবে, তিনি নাকি আণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন, এবং আমেরিকার নিকট হইতে আণবিক অস্ত্রের গোপন তথ্য জানিবার দাবী জানাইয়াছেন।

লেবাননের গৃহ-যুদ্ধ—

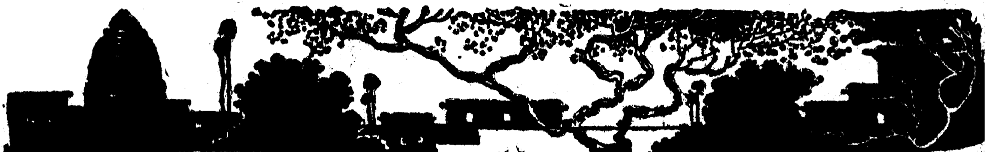
দুই মাসের উপর হইল, লেবাননে গৃহ-যুদ্ধ চলিতেছে। লেবাননের প্রত্যেকটি প্রধান সহর বিদ্রোহীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়াছে। ত্রিপলি, সিডন, টায়ার—এমন কি রাজধানী বেহরুৎ পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের আক্রমণে এখন একরূপ অচল। মুসলমানপ্রধান বেকা উপত্যকায় সরকার পক্ষের সহিত বিদ্রোহীদের মুখোমুখো যুদ্ধ হইয়াছে বহুবার। লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। বিদ্রোহীদের আক্রমণ অপ্রতিরোধ্য হইয়া ওঠায় প্রেসিডেন্ট চামুণ শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী না হইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, এবং প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের সময় অক্টোবর মাস হইতে জুলাই মাসে (২৪শে জুলাই) সরাইয়া আনিবার সিদ্ধান্ত জানান। তবে, নূতন প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবামাত্র চামুণ অবসর গ্রহণ করিবেন কিনা, তাহা তিনি বলেন নাই।

বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পর হইতে লেবাননের চামুণ গভর্ণমেন্ট সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের (মিশর ও সিরিয়া) বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়া আসিতেছেন। লেবাননের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই রাষ্ট্রটির হস্তক্ষেপেই (massive intervention) নাকি বিদ্রোহ এরূপ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে; লেবাননকে গ্রাস করাই নাকি সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। গত মে মাসে এই সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘে লেবাননের প্রথম অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তখন জাতি-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ হইতে প্রসঙ্গটি আরব লীগের ত্রিপলি (লিবিয়া) বৈঠকে উত্থাপন করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। আরব লীগ লেবাননের অভিযোগের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয় নাই। লীগের অধিবেশনে একটি মৃদু প্রস্তাব গৃহীত হয়: গৃহীত প্রস্তাবে সমস্ত আরব ষ্টেশন হইতে আরব-বিরোধী সর্ব্বপ্রকার

প্রচার বন্ধ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। স্বভাবতঃ লেবানন্ গভর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হন না। তাঁহারা পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদে তাঁহাদের অভিযোগ উত্থাপন্ করেন। এইবার নিরাপত্তা পরিষদের পক্ষ হইতে ভারত, নরওয়ে ও ইকুয়েডরের প্রতিনিধি লইয়া একটি পর্য্যবেক্ষক কমিটী গঠিত হয়, এবং জাতি-সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হামারশুল্ড স্বয়ং মধ্য প্রাচ্য পরিদর্শনে আসেন। মিশর, সিরিয়া ও লেবানন্ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি লেবানন্ গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন যে, তাঁহারা যেন এই ঘরোয়া বিরোধ নিজেরাই মিটাইয়া লয়। তিনি মন্তব্য করেন—"Only the Lebanese can save Lebanon." তখনই বোঝা গিয়াছিল যে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেবাননের অভিযোগের বিশেষ প্রমাণ তিনি পান নাই। পরে, জুলাই মাসের প্রথমে পর্য্যবেক্ষক কমিটী রিপোর্ট দিয়াছেন যে, লেবাননের অভিযোগের সমর্থক কোনও প্রমাণ তাঁহারা পান নাই; দুই একজন সিরিয়ান যদি লেবাননের বিদ্রোহে যোগ দিয়া থাকে, তাহা হইলেও এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, বিদ্রোহ লেবানন্ রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণ হইতেই উদ্ভুত।

জাতি-সঙ্ঘ লেবানন্ সম্বন্ধে চামুণ গভর্ণমেণ্টের অনুকূলে কোনও সিদ্ধান্ত না লইলেও আইসেনহাওয়ার নীতির বিধান অনুসারে এই গভর্ণমেণ্ট আমেরিকার সাহায্য চাহিতে পারেন; ইহা ছাড়া অন্যান্য সূত্রে সাহায্য চাহিবার অধিকারও এই গভর্ণমেণ্টের আছে—He (Chamoun) can legitimately ask help from Arab Governments, which would in effect mean Iraq and Jordan, and from America under the Eisenhower doctrine, or from Britain, France, and America under the 1950 Tripartite Agreements, or from the world at large under Article 51 of the United Nations Charter (according to this Article Chamoun, as head of the legitimate Government, has the right of self-defence and the right of calling on friends to help him)—London Times'. কিন্তু জাতি-সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের অভিমত ও জাতি-সঙ্ঘের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষক কমিটীর রিপোর্টের পর লেবাননের অশান্তি এখন নিছক গৃহ-যুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন এই গৃহ-যুদ্ধে বৈদেশিক শক্তির পক্ষ গ্রহণ অত্যন্ত অসঙ্গত। সুতরাং, চামুণ গভর্ণমেণ্টের অধিকার যাহাই হউক, তাহাদের রক্ষার জন্য আমেরিকা বা অন্য কোনও পাশ্চাত্য শক্তি সরাসরি এই গৃহ-যুদ্ধে পক্ষ করিতে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। বলা প্রয়োজন—সম্প্রতি সাইপ্রাসে বৃটেন্ তাহার সামরিক শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে; সাইপ্রাসে অশান্তি দমনের জন্য জঙ্গী ও বোমারু বিমানের বাহিনী এবং ক্রুজার ও বিমানবাহী জাহাজ নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয় নাই। আমেরিকার ষষ্ঠ বাহিনী পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভঙ্গীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রয়োজনমত চামুণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের জন্যই যে এই সব প্রস্তুতি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লেবাননে বিদ্রোহীদের সহিত বাহিরের শক্তির সম্পর্কহীনতা প্রমাণিত হওয়ায় এখন চামুণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বৃটেন্ ও আমেরিকা সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করিবে। ইহার পর লেবাননে হস্তক্ষেপ করিলে সমগ্র আরব জগতে ইহার প্রবল বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী; লেবাননে মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিরোধ স্থায়ী হইবে। Intervention there would weaken, it might even bring to an end, the friendly Governments of Iraq, Jordan and Saudi Arabia by convincing their people of the justice of Nasser's imputations against the western powers,—(London 'Economist') It would be far more likely to split Lebanon irrevocably along sectarian lines than to restore the country to the state which it was in before the trouble started ('Times') এই অবস্থায় চামুণ এখন বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত মুসলমান রাষ্ট্রগুলির শরণাপন্ন হইয়াছেন। তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ ও পাকিস্থান ১৪ই ও ১৫ই জুলাই ইস্তাম্বুলে মিলিত হইয়া লেবাননের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবে। এখানকার পরিস্থিতিকে বাগদাদ্ চুক্তির মুসলমান রাষ্ট্রগুলি নাকি তাহাদের চুক্তির অঞ্চলের পক্ষে বিপজ্জনক মনে করিতেছে। ইস্তাম্বুলের সিদ্ধান্ত এবং ইহার পর বাগদাদ্ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই চুক্তির মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে শিখণ্ডী করিয়া বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষে চামুণ গভর্ণমেণ্টকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সশস্ত্র প্রয়াস করা অসম্ভব নয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন মার্কিণ-পররাষ্ট্র সচিব ডালেস মন্তব্য করিয়াছেন···preservation of Chamoun is a vital U.S. interest.

৮।৭।৫৮





—একুশ—

াইসিস্ আপাতত কেটে গেছে বলে মনে হল। জে, কে, ায় কিছুতেই যেতে চান না—শেষে প্রায় জোর করেই াড়িয়ে দিতে হল তাঁকে। বনশ্রীর চাইতে ভয় পেয়েছিলেন তনিই বেশি—কাঁদছিলেন ছেলে মানুষের মতো।

পুরুষ মানুষের কান্না সত্যজিতের সহ্য হয় না। কেমন াকটা কমিক এফেক্টের সৃষ্টি হয়—অনুভূতিটা যেন প্যারডী য়ে ওঠে। তা ছাড়া জে, কে, রায়—সেই জে, কে, রায় -একদা যিনি কড়া-কড়া জাজ্‌মেণ্ট লিখ্‌তেন, তাঁর ান্নাটা এতই অবিশ্বাস্য যে সত্যজিতের মনে হল: যে নুভূতি তাঁর কোথাও নেই, সেইটেকেই তিনি অস্বাভাবিক জারের সঙ্গে প্রকাশ করতে চাইছেন। এর সবটাই ৃত্রিম; আর কৃত্রিম বলেই এত বিসদৃশ।

তা হলে কী চান জে-কে রায়? রীতেনের মৃত্যু? খুব ক অসম্ভব? জীবনে যিনি অনেক ফাঁসির রায় লিখেছেন, ামাজিক আর পারিবারিক সকলের ভেতরে যা কিছু মিথ্যে, যা কিছু বিকৃতি—তাই নিয়ে যিনি কারবার করেছেন দিনের পর দিন, বাৎসল্যের কোনো সেন্টিমেণ্ট্ থাকা কি সম্ভব তাঁর পক্ষে? আরো রীতেনের মতো ছেলে? ছিতেন তবু সরে গেছে চোখের সামনে থেকে—রীতেন তো প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাঁকে জর্জরিত করে তুলছে। আজ যদি রীতেন না-ই বাঁচে, তা হলে ক্ষতির চাইতেও লাভের দিকটাই তাঁর বেশি।

হাসপাতালের বারান্দায়, সেই ফিনাইল-ব্লিচিং পাউডার —আয়োডীন-বেঞ্জেনের ব্যাধি-রক্ত-মৃত্যুর গন্ধের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সত্যজিৎ চকিত হয়ে উঠল। ছি-ছি, এ রকম ভাবা উচিত নয়। হাজার হোক নিজের ছেলে, আর বলতে গেলে একমাত্র ছেলে। স্নেহ-ভালো-বাসা—বন্ধুত্ব বিজ্ঞানের বিচারে সবই হয়তো জৈবিক আর সামাজিক স্বার্থের চেতন-অবচেতন শৃঙ্খল দিয়ে জড়ানো, হয়তো ওই শৃঙ্খলগুলো ছিঁড়ে গেলে সিলেণ্ডারে ফাঁপানো বেলুনের মতো ওরা মিলিয়ে যায়। তবু সত্যজিৎ এখনো অতটা যান্ত্রিক হতে পারেনি। এখনো তার ভাবতে ভালো লাগে প্রেম জ্যোতির্ময়—বাৎসল্য অম্লান উৎসের। কুসংস্কার বলতে পারো—কিন্তু সংস্কারমুক্ত হিসেবে নিজের ওপর তার দাবি নেই! তা হলে অনেক আগেই সে সুমিত্রের দলে গিয়ে ভিড়তে পারত—এমনভাবে মধ্যবিত্ত মানসিকতার সেই ঘরটায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না—যার মাথার ওপর ছাদ নেই, তলায় ভিত নেই।

প্রেমকে বিশ্বাস করে সত্যজিৎ—পূরবীকে দেখলে সে রোম্যাণ্টিক হয়ে ওঠে; ইন্দ্রজিৎ শিবশঙ্করের একটা বীভৎস অপঘাত কামনা করে—অথচ শিবশঙ্করের চোখে বাৎসল্যের আলো দেখেছে। দেখেছে সে।

গড়ের মাঠের দিক থেকে হাওয়া আসছে, হেমন্তের প্রথম উত্তর স্পর্শ। সামনের একটা গাছ থেকে ঝর ঝর ক'রে পাতা ঝরল একরাশ। এত তাড়াতাড়ি? আজ দ্বাদশী ত্রয়োদশী কিছু হবে—জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে সামনের কম্পাউণ্ডটা। গঙ্গায় জাহাজের বাঁশি। সব মিলিয়ে এক মুহূর্তে নিজের অস্তিত্বটাকে হঠাৎ অত্যন্ত নিরর্থক বলে মনে হল সত্যজিতের। তোমার সুখ-দুঃখ-ভাবনা-দুর্ভাবনার চাইতেও পৃথিবী অনেক বড়ো, অনেক বেশি। রীতেন-বনশ্রী পূরবী যে আজ এই মুহূর্তে এক সঙ্গে মরে গেলেও

এই জ্যোৎস্নায় এতটুকু ছায়া পড়বে না, গঙ্গার দিক থেকে আসবে জাহাজের বাঁশি—দূরের রেডিয়োতে বিলিতী অর্কেস্টায় একবারের জন্তেও ছেদ পড়বে না। তুমি থাকলে পৃথিবীর কোনো লাভ নেই, তুমি চলে গেলে কোনো ক্ষতি নেই।

ক্ষতি আছে মানুষের। স্বার্থের হোক, জৈবধর্মের হোক, অথবা প্রেম-প্রীতি বাৎসল্যের সংস্কারেই হোক। রীতেন যদি না বাঁচে।

বনশ্রী কিংবা জে-কে রায়ের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক। তার নিজের রীতেন সম্পর্কে কোনো মনোভাব নেই—রীতেনের মৃত্যু তার কাছে একটা সংবাদমাত্র। কিন্তু প্রীতি রীতেনকে ভালবাসে।

জ্যোতির্ময় প্রেম? আদিম জৈবরীতি? যা খুশি বলা যায়। কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে একদিনেই একটা আশ্চর্য সম্পর্ক আর আকর্ষণ গড়ে উঠেছে তুজনের ভেতরে। রীতেন যদি বাঁচে (খুব সম্ভব বাঁচবে) তা হলে হয়তো সত্যজিৎকেই রেজেস্ট্রী অফিসে গিয়ে কর্তব্য করে আস্‌তে হবে। শিবশঙ্করের আশীর্বাদ অবশ্য আশা করা বৃথা, অসবর্ণ বিয়েকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারবেন না?

আর প্রীতি? প্রীতি সুখী হবে উড্‌-বী-গ্রোবট্রটারের হাতে পড়ে? এই অদ্ভুত দাড়িওলা অপদার্থ ছেলেটা যে কুৎসিত ইয়াকী ভাষা শিখেছে আমেরিকার সোলজারদের কাছ থেকে, বাপকে বলে 'পপ্‌' সিগারেটকে বলে 'বাট', বন্ধুকে বলে, 'গাই', খুশি হলে বলে ও-লা-লা?' প্রীতির ভার নিতে পারবে এই রীতেন? দিতে পারবে প্রীতিকে —যা প্রত্যেক স্ত্রী পায় তার স্বামীর কাছ থেকে?

কিন্তু রীতেন প্রীতির ভার নিতে পারুক আর না-ই পারুক, প্রীতি নিজেকে তুলে দিয়েছে তার হাতে। ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে যথেষ্ট রক্ত পাওয়া যায় নি—প্রীতি এগিয়ে এসেছে রক্ত দিতে। সত্যজিৎ কিংবা বনশ্রী একটা কথা বলবার আগেই।

হেমন্তের হাওয়ায় আবার একরাশ পাতা ঝরল। এত তাড়াতাড়ি শুরু হয় পত্রঝরার পালা? সত্যজিৎ ঠিক জানে না—বহুদিন সে পাড়াগাঁয়ে যায় নি।

বনশ্রী এসে পাশে দাঁড়াল।

—খুব কষ্ট দিলাম, না?

সত্যজিৎ তাকিয়ে দেখল। বনশ্রীর গলায় এখনো কান্নার রেশ জড়ানো। চিকচিক করছে গাল তুটো। হঠাৎ ভারি ছেলে-মানুষ দেখালো তাকে।

—ভদ্রতার কথা থাক। কিন্তু কাঁদছ কেন এখনো? ভয় তো কেটে গেছে।

—কে জানে—কিছুই বুঝতে পারছি না।

সত্যজিৎ হাসতে চেষ্টা করল।

—ভবিষ্যতে যে বিশ্ব-ভ্রমণে বেরুবে, এত সহজেই তার কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

বলেই সে লজ্জিত হল। যেন সিনিকের মতো শোনালো কথাটা। ঠিক এইভাবে, এখানে, ওভাবে বলাটা বোধ হয় উচিত হল না।

বনশ্রী নিজের দুর্ভাবনাতেই তলিয়ে ছিল বেশি, তাই কথাটা লক্ষ্য করল না, বললে, ওই পাগলামির জন্তই একদিন ও বেঘোরে মারা পড়বে। জানো, আমার আর ভালো লাগে না এসব। ইচ্ছে করে, সব ফেলে দিয়ে দূরে কোথাও একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে চলে যাই।

—সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যাচ্ছ?

—সেন্টিমেণ্টাল নয়। এই ড্রাজারি আর সহ্য হয়না। এমনি করে জীবনের একটা ব্লাইণ্ড্‌ লেনের সামনে এসে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াব, সে-কথা কে জানত!

বনশ্রীর মুখের ওপর জ্যোৎস্না পড়েছে। অস্বাভাবিক শাদা দেখাচ্ছে মুখ। কিছু প্রসাধন ব্যবহার করেনা কেন বনশ্রী?

হেড্‌ মিস্ট্রেস্‌ হলে কি কেবল আত্মনিগ্রহ আর শুষ্কতার সাধনাই করতে হয়?

পকেট হাতড়ে চামড়ার সিগার-কেস্‌টা বের' করে আনল সত্যজিৎ। আস্তে আস্তে চুরুট ধরালো একটা।

—জীবনের সব কিছুই একটা ব্লাইণ্ড্‌ লেনে গিয়ে থামে বনশ্রী। এমন একটা না একটা কানা দেওয়াল আছেই যেখানে গিয়ে সকলকেই থেমে দাঁড়াতে হবে। সে সার্থকতাই হোক আর ব্যর্থতাই হোক। পৃথিবীরও শেষ আছে।

—দর্শনের তত্ত্ব তুলো না। ও শুধু তর্কের জন্তেই তর্ক করা। তুমি বেশ জানো, আমি কী বলতে চাইছি।—

নশ্রী ক্লান্ত গলায় বললে, বাবা মেলাঙ্কলিয়ায় ভুগছেন, এই কম—আর আমি রাতদিন জোয়াল টেনে চলেছি। চাকরি রছি, নোট লিখছি, হয়তো টিউশনও ধরতে হবে এরপর। মিই বলো—এর চাইতে বেশি কিছু কি কোথাও ছিলনা ?

হয়তো ছিল। আউটরাম ঘাটের স্বপ্নবোনা দিনগুলো আকাশের তারায় তারায় সুর বাঁধত—গঙ্গার জল গিয়ে মত সমুদ্রে—নারিকেল বীথি মর্মরিত প্রবাল দ্বীপে জ্যোৎস্নায় কী সব ঝকমক করত চুনি-পান্নার মতো। And the died the swan !'

কারো দোষ নেই। নিজেই সরে গিয়েছিল বনশ্রী। ত্যজিৎও ভুলে গিয়েছিল।

আর একটা সমুদ্রের স্বপ্ন আছে সুমিত্রের চোখে। মার একটা অপরূপ দিগন্তের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে বীথির চোখ।

কিন্তু সে-কথা বনশ্রীকে বলে লাভ নেই।

—বিয়ে করো না কেন ?—আকস্মিকভাবে জিজ্ঞাসা করল সত্যজিৎ।

একবারের জন্যে কি চমকে উঠল বনশ্রী ? ঠিক বোঝা গেল না।

—সে হয়না।

—কেন হয় না ? কাউকে কি ভালোবাসোনি কখনো ?

গঙ্গার দিক থেকে আবার জাহাজের বাঁশি শোনা গেল। আবার কি পুরোনো দিনগুলো ফিরে এল ৃতির ভেতরে। বনশ্রী একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে, এক সময় তোমার সঙ্গ ভালো লাগত। তবু তোমাকেও বিয়ে করার কথা ভাবিনে। এইজন্যেই ভাবিনি যে তখন মনে হত বিস্ময়ের কোথাও শেষ নেই—কোন্‌খানে আমার জন্যে যেন কোন পরমাশ্চর্য অপেক্ষা করে আছে। আগে থেকেই তার পথ বন্ধ করব কেন ? কিন্তু তারপর দেখলাম—একবার থেমে নিয়ে বনশ্রী বললে, সেই পরম আশ্চর্য কোথাও নেই। জগতে এখন কোথাও কিছু নেই—যাকে দেখে তুমি বলতে পারো : এ অভাবনীয়, এ আমার সব স্বপ্নকে ছাড়িয়ে গেছে। তোমার কল্পনাই তোমার সব চেয়ে বড়ো শত্রু—সে কোনোদিন তোমাকে অভিভূত হতে দেবেনা, নত হতে দেবেনা কারো কাছে।

বনশ্রী থামল।

এ হয়তো বিশেষ একটি মনের কথা—সাধারণ সত্য হয়তো নয়। কিন্তু কথা বাড়িয়ে ফল নেই। সত্যজিৎ বললে, তবু একজায়গায় তো রক্ষা করে নিতে পারতে।

—হয়তো পারতাম। তুমি তো ছিলেই। কিন্তু—

কিন্তু পর্যন্ত বলেই থামল বনশ্রী। আর অল্প একটু খোঁচা লাগল সত্যজিতের মনে। বনশ্রী তাকে এত সুলভ ভাবল কী করে ? সে কি কাঙালের মতো অপেক্ষা করে বসেছিল একমুঠো ভিক্ষের আশায় ?

সত্যজিৎ খানিকটা চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলে—জ্যোৎস্নার মধ্যে একরাশ কুয়াশার মতো ধোঁয়াটা ঘুরতে ঘুরতে মিলিয়ে গেল।

—কিন্তু—বনশ্রী বললে,—তারপর দেখলাম বাবাকে, রীতেনকে, বুঝলাম সংসারের অবস্থা। বুঝতে পারলাম, নিজের কথা আর আমার ভাবা চলবেনা।

—সংসারের কাছে আত্মবলি ?

—ঠাট্টা করছ কিনা জানিনা। ফিগারেটিভ্‌ ভাষায় যা-ই বলো, জিনিসটা তা-ই দাঁড়িয়েছে। এদের এমন বিপদের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে নিজের কথা আমি আর ভাবতে পারবনা।

স্নেহ, প্রেম, বন্ধুত্ব। সবই কি জৈবিক আর স্বার্থিক সম্বন্ধের শৃঙ্খলে বাঁধা ? তা হলে বনশ্রীর মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা যাবে কী দিয়ে ? কুসংস্কার ? ইট্‌স্ ইন্ ইয়োর ব্লাড্‌ ? হয়তো তাই হবে।

সত্যজিৎ বললে, জানো, আমি একটি মেয়েকে বিয়ে করব ঠিক করেছি।

—সত্যি ?

—সত্যি।

বনশ্রী আস্তে আস্তে বললে, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌।

কেবিন থেকে প্রীতি বেরিয়ে এল। এসে দাঁড়ালো দুজনের মাঝখানে।

—দাদা—শান্ত স্থির গলায় প্রীতি বললে, দাদা, আজ রাত্রে আমি হাসপাতালেই থাকতে চাই। ওঁকে এ-অবস্থায় ছেড়ে আমি কিছুতেই যেতে পারবনা।

সত্যজিৎ আর বনশ্রীর দু-জোড়া চোখ ঘুরে প্রীতির মুখের ওপর গিয়ে পড়ল। ক্রমশঃ

শেষের কবিতা

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বাঙালী জাতি, সাধারণতঃ, বিশেষ দীর্ঘায়ু নয়। বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই ঘাটের কোঠায় পড়বার আগে অথবা তার অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন; ফলে, আরও দীর্ঘজীবন লাভ করলে, তাঁরা তাঁদের বিভিন্নপ্রকার দানে দেশকে যেভাবে সমৃদ্ধ করতে পারতেন, দেশ তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।...সে-হিসেবে বলা যেতে পারে—আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট দীর্ঘজীবনই লাভ করেছিলেন।—পরিণত বয়স পর্যন্তই তিনি নব নব সৃষ্টির দ্বারা ভাব-সম্পদের ও প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য এবং অন্তরের তারুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।...তথাপি, দীর্ঘায়ু পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও এবং মানসিক শক্তির দিক দিয়ে বার্ধক্যকে অস্বীকার করলেও—সত্তর বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর কবির মনে, স্বাভাবিকভাবেই একথা জেগেছিল যে এই ধরাধামে তাঁর থাকার মেয়াদ ক্রমশঃই কমে আসছে।...তাঁর শেষ সাত-আট বছরের লেখা বহু কবিতাতেই আমরা একটা বিদায়ের সুর অনুভব করি। সেটা অবশ্য প্রচলিত পূরবীর সুর নয়—ভবনদী উত্তরণ করবার জন্য সারাজীবনে কি পাথেয় কবি সঞ্চয় করেছেন, তা' নিয়ে তাঁর চিন্তা নয়, অথবা এই সময়ে লেখা কাব্যগুলির তিনি 'পরিশেষ', 'প্রান্তিক', সেঁজুতি' 'পুনশ্চ' প্রভৃতি নামকরণ করেছিলেন ব'লেও নয়; একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় কবির এই শেষ-ব্যাকুলতা দুটি ভাব আশ্রয় করেছে। একটি হচ্ছে—তিনি যা লিখে গেলেন ভবিষ্যৎ যুগ তার কতটা দাম দেবে!—অর্থাৎ শুধু বিরূপ সমালোচনার ভাগী হবার চিন্তা নয়—কালক্রমে লোকে তাঁকে বিগত-যুগের কবি বলেই মনে করবে কিনা,—তাঁর রচনারাজি যুগ-অতিক্রমকারী চির-আধুনিকরূপে বেঁচে থাকবে কিনা—এই চিন্তা ও সন্দেহ তাঁকে যেন বিচলিত করেছে। আর দ্বিতীয়ত, তিনি এও ভেবেছেন সারাজীবন ধরে তিনি যা বল্‌তে চেয়েছিলেন—যা তিনি জীবনে উপলব্ধি করেছেন সম্পূর্ণভাবে তা' তিনি প্রকাশ ক'রতে পেরেছেন—না তার অনেক কিছুই অকথিত র'য়ে গেল। কারণ, আর তো সময় নেই—আর সে প্রকাশ-শক্তিও তো নেই!—এই শেষ বয়সে বিশ্বের কোনো কিছুকে বিস্ময়ভরা কবির চোখে দেখে—তাকে নবভাবে ফুটিয়ে তুলে তার উদ্দেশে লেখার রঙীণ ইচ্ছা বা কল্পনার সহজ শক্তি কবির আর ছিল না। অবশ্য, এই সময়ের মধ্যেও তিনি 'পৃথিবী', 'আফ্রিকা', 'ওরা কাজ করে' প্রভৃতি তাঁর বিশেষত্বপূর্ণ, অননুকরণীয় বহু মহান কবিতা লিখেছেন—কিন্তু সেগুলি যেন চিন্তাশীল পরিণত মনের সার্থক প্রকাশ;—উদার অপার্থিব কল্পনার সাবলীলতার কোথায় যেন অভাব ঘটেছে, তার উচ্ছ্বসিত গতি যেন কিছু স্তিমিত, সীমাবদ্ধ। তাঁরই ভাষায় বলা চলে 'উর্ব্বশী', 'বর্ষাকাল', 'অহল্যার প্রতি', 'দুঃসময়' 'সাজাহান' প্রভৃতির ন্যায় কবিতার বংশ অতীতযুগের মহাকায় প্রাণীদের মতই তখন তাঁর চিন্তা থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। ভাবের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হওয়ায় কবি তখন কথা ও ছন্দের আধুনিকতাই অবলম্বন করেছেন আর আপনার অন্তরকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে যে ব্যথা তিনি পাচ্ছেন, সেই সংশয় ব্যথাই, সেই আত্মচিন্তাই তখন তাঁর এই শেষের দিকের কবিতায় ফিরে ফিরে প্রকাশ পেয়েছে'—পুনরুক্ত হয়েছে!—

৫ই জুন ১৯৩৫ সালে লেখা 'অবর্জ্জিত' কবিতায় কবি লিখছেন—

আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু
চিরকাল মনে রাখিবে, এমন কিছু
মূঢ়তা করা তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে।
ধুলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধুলো
চুকে গিয়ে তবু বাকি রবে যতগুলো
গরজ যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে।

কবির মনে হচ্ছে যে তাঁর সব লেখাই যে উচ্চস্তরের তা নয়; তিনি ভালমন্দ না বেছেই অনেক রকম লিখেছেন,—হয়ত পরে যে সব লেখা তিনি বর্জন করতেন—তাঁর বন্ধুরা কিন্তু তাঁকে করতে দেন নি এই ব'লে যে তা হ'লে কবির লেখার ঐতিহাসিক ধারা থাকবে না। নিরুপায় কবি তাই বলছেন—যা লিখি, সবই তো সেরা হয় না—ভবিষ্যতের পাঠকেরা হয়ত সব লেখার জন্য তাঁকে অপরাধী করবে।—কবি যদিও ভাবছেন ভাবীকালে তাঁর কোন দান শ্রদ্ধা পাবে তা এখন বলা যায় না,—তাহ'লেও

কিন্তু হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ!

('শেষ হিসাব'—ডিসেম্বর, ১৯৩৮ ॥)—

চেনা-শোনার সাঁঝ-বেলাতে
শুনতে আমি চাই
পথে পথে চলার পালা
লাগল কেমন ভাই।

কবি অনেক পরিশ্রমে নিজ ঝুলিতে যে সব ধন সঞ্চয় ক'রেছিলেন, তা বিস্মৃতি ও প্রকাশ-ক্ষমতা-হীনতার দস্যুতে লুঠে নিয়েছে। তা'তে মনোকষ্ট পেলেও এই আশ্বাস তাঁর ছিল যে যত্নের ধন তিনি গোপনে পুঁজি ক'রে রেখেছিলেন—সেই সব লুক্কায়িত সুন্দর রত্ন তো তাঁর আছে। যে সব জিনিষকে তিনি ব্যর্থ ব'লে ভেবেছিলেন—যা পেতে

তাঁর কোন চেষ্টা করতে হয়নি,—যাদের তিনি কোনদিনই ঝুলিতে সঞ্চয় করেন নি—তারাই আজ তাঁর কাছে বিশেষ অর্থযুক্ত।—

রাত্রি দিনের হাওয়া
ভরল তারাই, দিল তারা
পথে-চলার মানে—
রইল তারাই একতারাতে
তোমার গানে গানে।

২৬শে নভেম্বর ১৯৩৮ তারিখে 'জয়ধ্বনি' কবিতায়—

যাবার সময় হলে জীবনের সব কথা সেরে
শেষ-বাক্যে জয়ধ্বনি দিয়ে যাব, মোর অদৃষ্টেরে
বলে যাব—পরমক্ষণের আশীর্ব্বাদ
বারবার আনিয়াছে বিস্ময়ের অপূর্ব্ব আস্বাদ।

কবি অবশ্য আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন না বা তাঁর সারাজীবনের দুর্ব্বল দিকগুলিও অস্বীকার করছেন না! তিনি ভগ্নমনোরথ হ'য়েছেন—আত্ম-পরাভব তাঁকে ক্ষুব্ধ ক'রেছে;—তিনি তার প্রতিকার করতে পারেননি, সেই ধিক্কার তাঁর প্রাণে গাঁথা রয়েছে। তবু তিনি এটুকু বলতে পারেন যে চিরন্তন মানবের মহিমাকে তিনি কোনদিন উপহাস করেন নি,—বিরাট মানবসমাজকে তিনি হিমালয় দেখার মতই, সমগ্রভাবে, বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন—গুহা-গহ্বরের ভাঙা-চোরা রেখাগুলির জন্য কোনরূপ অবজ্ঞা না ক'রে।

যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

আবার, এই সঙ্গে, বার্ধক্যের দুর্বার গ্রাস থেকে উদ্ধার পাবার শেষ চেষ্টাও তিনি করেছেন। 'প্রবীণ কবিতায় বহিঃপ্রকৃতি থেকে এই সান্ত্বনাই খুঁজেছেন যে নিজের বার্ধক্যে তিনি ফুরিয়ে যান নি। চাঞ্চল্য দূর ক'রে নীরবে চিন্তা ক'রে যাওয়াটাই তো বার্ধক্যের লক্ষণ। নিজের বার্ধক্যে ঝিমিয়ে।পড়া ভাবকে দূরে রেখে কবি তাই নিজেকে বাইরে আসতে বলেছেন। নিজের চারপাশে আগল দিয়ে ভালোমন্দ-বিচারের খোঁটা পুতে রাখলে—কেবল যে বুড়োই হয়ে যেতে হবে দিনে দিনে। কবির বয়স আশি বছর হলো,—কিন্তু

আশি বছর বয়স হবে ওই যে পিপুল গাছ
এ আশ্বিনের রোদ্দুরে ওর দেখলে বিপুল নাচ?

তাই, কবির খেলা শেষ করবার বয়স হ'লেও তিনি চাইছেন

ওগো প্রাচীন চলো এবার সকল কাজের শেষে,
নবীন হাসি মুখে নিয়ে চরম খেলার বেশে!

কিন্তু হায়! সে দিন তার নেই—এটুকু আশাও পূর্ণ হবার দিন তাঁর চলে গেছে।

এল বেলা পাতা ঝরাবারে
শীর্ণ গলিত কায়া, আজ শুধু ভাঙা ছায়া
মেলে দিতে পারে। ('শেষ বেলা' ১১ জানু, ১৯৪০)

তাই এখন শুধু মরণভেরীই বাজছে জীবনের এই ধূসর গোধূলিতে সব স্মৃতি ক্ষীণ ও উদাসীন হয়ে গেছে, সমস্ত ছবিই মুছে এসেছে ম্লান হ'য়ে গেছে! (সাহানা-কর্ণধার ২৮।৯ নতুন বড় ১৬।১।৪০)

'শেষ কথা'—৪ঠা এপ্রিল ১৯৪০॥)

এ ঘরে ফুরালো খেলা
এল দ্বার রুধিবার বেলা
বিলয়-বিলীন দিন শেষে
ফিরিয়া দাঁড়াও এসে।

কবি এ লীলার শেষ পরিচয়ে জীবনের অন্তরতরকে চরম আলোকে, স্বপ্নভাঙা চোখ নিয়ে একবার চিনে নিতে চান,—অন্তিম সঞ্চয়ে কি ফেলে যাবেন তাও দেখে নেবেন।—জীবন ও মৃত্যুর কার্য-কারণ সম্পর্কে তাঁর মনে যেন সমস্যাও জেগেছে! তাই মনে মনে ভাবছেন—

জানিনা, বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।

পদ্মাবক্ষে একদিন 'পূর্ণ যৌবনের বেগে' কবির মনে নিরুদ্দেশ বেদনার জোয়ার জেগে উঠেছিল। 'মানসীর ছায়ামূর্ত্তি বাহি' 'অন্তরের তারে তারে' যদিও এখনো তার রেশ ঝঙ্কারিত হচ্ছে, কিন্তু তার 'বাণী শেষ হয়ে গেছে—

শুধু এক খানি
সূত্র ছিন্ন বাণী
সেদিনের দিনান্তের মগ্ন-স্মৃতি হতে
ভেসে যায় স্রোতে (সাহানা, 'মানসী' ৯।৬।৩৯)

যৌবনের ভিড়ের সময় কবির কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে—সকলের কথা আজ তাঁর মনে নেই, কেননা, কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁর কাছে এসেছে—গেছে;—ক্ষণেকের পরে তারা জনতার স্রোতে মিশে গেছে এবং কবিরও কারো জন্যে চিন্তা করারও বিশেষ প্রয়োজন মনে হয়নি!—কিন্তু এখন—

সে যৌবন মধ্যাহ্নের অজস্রের পালা
শেষ হয়ে গেছে আজি সন্ধ্যার প্রদীপ হ'ল জ্বালা;
চেয়ে দেখি, কথা কই চুপে চুপে
পাই তারে না পাওয়ার রূপে।

(সাহানা, 'অবশেষ' ৩।১২।৩৮)

'আরোগ্য কাব্যের উপহার পৃষ্ঠায় কবি শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর'কে লিখছেন যে তাঁর জীবনের প্রথম প্রভাতে বহুলোক নানা কাজে নানা ভাব নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল, কিন্তু,

আজ যারা কাছে আছো—এ নিঃস্ব প্রহরে
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায় স্পর্শ দিতে।
তোমরা পথিক বন্ধু,

যেমন রাত্রির তারা

অন্ধকারে লুপ্ত পথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে।

এখানে 'পথিক-বন্ধু' কথাটায় 'শ্মশান-বন্ধু'র সুর এসে পড়ছে নাকি?

আবার পরিপূর্ণ জীবনের গর্ব্বে যে সব চিত্র তিনি ভাল ক'রে দেখেন নি—চাষার ছেলেদের ছাগল-তাড়ানো বা মোষ-চরানো,—ভিখারিণীর শাক্ তোলা,—এখন জীবন-প্রান্তে সেই সব ছবিও তাঁর মনে জেগে উঠছে! এখন, বরাবরের মত এই ধরণীকে ছেড়ে যাবার আসন্ন সময়ে সেই সব উপেক্ষিত ছবি কোন দূরের ঘণ্টার রব যেন জীবনের সর্বশেষ বেদনার মতই তাঁর মনে এনে দিচ্ছে।—১৯৪১ সালের ৯ই জানুয়ারী কবি লিখছেন—

দিন পরে যায় দিন স্তব্ধ ব'সে থাকি;
ভাবি মনে, জীবনের দান যত কত তার বাকি
চুকায়ে সঞ্চয় অপচয়!
অযত্নে কী হয়ে গেছে ক্ষয়,
কী পেয়েছি প্রাপ্য যাহা, কী দিয়েছি যাহা ছিল দেয়
কী রয়েছে শেষের পাথেয়।
যারা কাছে এসেছিল, যারা চলে গিয়েছিল দূরে
তাদের পরশ খানি রয়ে গেছে মোর কোন্ সুরে।
অন্য মনে কারে চিনি নাই
বিদায়ের পদ-ধ্বনি প্রাণে আজ বাজিছে বৃথাই,
হয়তো হয়নি জানা ক্ষমা ক'রে কে গিয়েছে চ'লে
কথাটি না ব'লে।
যদি ভুল ক'রে থাকি তাহার বিচার
ক্ষোভ কি রাখিবে তবু যখন রবনা আমি আর।
কত সূত্র ছিন্ন হলো জীবনের আস্তরণময়
জোড়া লাগাবারে আর রবেনা সময়।
জীবনের শেষ প্রান্তে যে প্রেম রয়েছে নিরবধি
মোর কোন অসম্মান তাহা ক্ষত চিহ্ন দেয় যদি
আমার মৃত্যুর হস্ত আরোগ্য আনিয়া দিক তারে
এই কথাই ভাবি বারে বারে।

কবি এ কথাও যেন বুঝতে পারছেন যে তাঁর এদিনের—জীবিত-কালীন গৌরব-উজ্জ্বল দিনের অবসান হবে অর্থাৎ তাঁর সব লেখাই এরূপ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সব সময় সবাই পড়বে না—তবু তিনি আশা রাখেন তাঁর কোনো কবিতা স্থায়ী অস্থায়ী হ'তে পারে

জানি দিন অবসান হবে—
জানি তবু কিছু বাকি রবে।
যদিও—যে গান স্বপনে নিল বাসা
তার ক্ষীণ গুঞ্জন ভাষা
শেষ হবে সব শেষ রাতে। ('অবসান' ১৯।৭।৪০)

কবির মনে হয়েছে তাঁর কাব্যপ্রতিভা যেন ম্লান হ'য়ে এসেছে এবং সম্প্রতি তিনি যা লিখছেন তা' নিয়ে অল্পবিস্তর বিরূপ আলোচনা উঠতে পারে—সে তিনি অনুমানও করছেন—কারণ মানুষ সমালোচক দেবতার মতই কঠোর!—যে উর্বশী শত শত দিন চিত্তবিহারিণী নৃত্যে দেবতাদের মুগ্ধ করে—তাকেও মুহূর্ত্তের ভুলে তালভঙ্গ ক'রে ফেললে—কঠিন অভিশাপের শাস্তিভোগ করতে হয় আর কবিকেও শত শত মনোহারিণী কবিতায় পাঠকবর্গকে তিনি আনন্দদান করলেও বর্ত্তমানের এই অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ রচনাগুলির জন্য সমালোচক কি করবে?—

সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে
যদি ক্ষণকালতরে
ক্লান্ত উর্বশীর
তালভঙ্গ হয়
দেবরাজ করে না মার্জনা।
মানবের সভাঙ্গনে
সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।
তাই মোর কাব্য কলা হয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে;
কী জানি শিথিল যদি ঘটে তার পদক্ষেপ তালে।
নির্মম ভবিষ্য জানি অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে
কীর্ত্তির সঞ্চয়ে
আজ বুঝি হল তার প্রথম সূচনা!
('রোগশয্যায়' ২৭।১১।৪০)

নিজের কাব্য-রচনার সুদূরপ্রসারী ভাব ও অদৃষ্টপূর্ব নৈপুণ্য সম্বন্ধে, প্রথম জীবনে, তাঁর যে নির্ভরতা ছিল—এখন তা যেন একেবারেই কমে গেছে!

আমার কীর্ত্তিরে আমি করি না বিশ্বাস।
জানি কাল সিন্ধু তারে
নিয়ত তরঙ্গ ঘাতে
দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি।

তাঁর সান্ত্বনা শুধু এই যে পৃথিবীর জল বাতাস প্রকৃতি ও ফুল—সকলকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ভাল বেসেছেন, আর এই ভালবাসাই সত্য ও চিরন্তন। এই হচ্ছে তাঁর এজন্মের দান।

বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।
('রোগ শয্যায়' ২৮।১১।৪০)

মৃত্যুর দূত তাঁর শিয়রেও যে এসে দাঁড়িয়েছে—এ কথাটা বিশেষ ক'রে তিনি মনে করতেন তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে, পরে পরে তাঁর ভ্রাতা, ভগিনী ও অন্যান্য কয়েকটি নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটনায়।

আজি জন্মসময়ের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয় মৃত্যু বিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ—(বৈশাখ ১৩৪৭)—

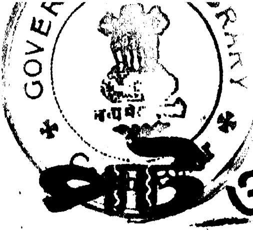
তাই এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এই আলো-ভরা পৃথ্বীতে তিনি সাময়িক অতিথি মাত্রই, এখানে থাকার দিন তাঁর সংক্ষিপ্ত হ'য়ে এসেছে—অজস্র আলোর দাবী আর তিনি করতে পারেন না—অল্প কিছু

চায়া আর কিছু মায়া এ ছাড়া বেশী কোন দাবী করা তাঁর পক্ষে এখন অসম্ভব। এই পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে যেটুকু অভিনয় করবার জন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট, সেটা শেষ হ'লেই তাঁকে যেতে হবে!

এসেছিনু আশী বর্ষ আগে
চ'লে যাব কয় বর্ষ পরে।
তবে—　করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি
বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিয়াছে ক্ষয়।...
সেই অজানার দূত আসি মোরে নিয়ে যাবে দূরে
অকূল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম
মন তাই বলিতেছে আমি চলিলাম।...
বার বার মনে মনে বলিতেছি "আমি চলিলাম'
যেথা নেই নাম—
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়।

একদা যে কবি পরিপূর্ণ বিশ্বাসে ভাবী শতাব্দীর তরুণী পাঠিকাকে তাঁর বসন্ত গান তার বসন্ত দিনে অসঙ্কোচে পাঠাবার প্রস্তাব করতে পেরেছিলেন তার স্পন্দিত হৃদয়ে ধ্বনিত হবার জন্য—আজ কবির আর সেই প্রত্যয় নেই—মৃত্যুর পরে যে সীমাহারা, গ্রহতারা সমন্বিত অসংখ্য জগৎ এক সময় তাঁর কাছে সত্য ছিল আজ তাঁকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর হয়ত সে দৃষ্টিশক্তিও নেই।—বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে আজ তিনি দেখছেন এক ম্লান বিলীয়মান জগৎ—তাই দুর্বল জরা-কম্পিত লেখনী ধরে ব্যাকুল চিত্তে তিনি বারে বারে করুণ বিদায়ের বাণী জানাচ্ছেন—

আমি চলিলাম।
যে-আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশাবে প্রাণবায়ু
ভস্মে যার দেহ অস্ত হবে।
মন বলে আমি চলিলাম
রেখে যাই আমার প্রণাম।
খেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দ্বার
ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাবে আমার প্রণাম।



দৃষ্টি ও সৃষ্টি

শ্রী'শ'—

॥ বাংলা চিত্রে নূতনত্ব ॥

বাংলার চলচ্চিত্র জগতে পরিবর্ত্তনেরই শুধু নয়, নতুনত্বেরও যে একটি যুগ এসেছে তা অনস্বীকার্য্য। এই পরিবর্ত্তনের স্রোতে আর নতুনত্বের ধারায় বাংলা চিত্রের বিরক্তিকর একঘেয়েমী ও শ্লথ গতি ক্রমশই বিলুপ্ত হয়ে দেখা দিচ্ছে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষার জাগরণ। এরই প্রকাশরূপে আমরা পেয়েছি পথের পাঁচালী, কাবুলীওয়ালা, পঞ্চতপা, ডাকহরকরা, কালামাটি প্রভৃতি চিত্রকে। আর এই ধরণের চিত্রগুলিই প্রমাণ করে দিচ্ছে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রকে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতে বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠা করবার সক্রিয় প্রচেষ্টাকে। আমরা অভিনন্দিত করি এই প্রচেষ্টাকে, কামনা করি এর সার্থক প্রকাশ, শুভেচ্ছা জানাই কর্ম্মকর্ত্তাদের অকুণ্ঠ প্রয়াসে। তবে চিত্র-নির্ম্মাতাদের একথাটাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে নূতনত্বের মোহে বিদেশী চিত্রের অন্ধ অনুসরণ যেন না হয়, বা কোনও একটি বিশেষ ধরণের চিত্র সাফল্য লাভ করছে বলে তারই বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। শ্রমিক জীবন সংক্রান্ত কোনও চিত্রের সাফল্যকে উদাহরণ করে যেন ভূরি ভূরি ঐ ধরণের চিত্র নির্ম্মিত না হয়, বা "পথের পাঁচালী"র অন্ধ অনুকরণে বাংলার গ্রামাঞ্চলের চিত্রই যেন অনবরত নির্ম্মিত হতে না থাকে। এরকম ঘটলে বাংলার চিত্রজগতে দুর্দ্দিনই ঘনিয়ে আসবে, অগ্রগতি হবে রুদ্ধ, আর সমস্ত প্রচেষ্টার পরিণতি পর্য্যবসিত হবে ব্যর্থতায়। এ বিষয়ে প্রগতিশীল প্রযোজক-পরিচালকদের দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি। তাঁদের প্রতিটি চিত্রই যেন বিষয়ের বিভিন্নতায়, দৃষ্টিভঙ্গীর নতুনত্বে ও পরিকল্পনার সার্থকতায় যুগান্তকারী সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই সূত্রে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে এ, ডি, ফিল্মস্ শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের "অন্তনগরী" গল্পটি ইংলণ্ড ও ইউরোপেই তোলবার মনস্থ করেছেন। এই প্রচেষ্টা ফলবতী হলে 'অন্তনগরী'ই হবে সর্ব্বপ্রথম বাংলা কথাচিত্র যা পাশ্চাত্যের পটভূমিকায় ও সেই দেশেই চিত্রে রূপায়িত হয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রগতিকে আরও সম্ভাবনাপূর্ণ ও সার্থক করে তুলবে।

* * * *

পশ্চিম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভি, শান্তারাম পরিচালিত ভারতীয় চিত্র "দো আঁখে বার হাত" আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক চলচ্চিত্র ব্যুরোর পুরস্কার লাভ করেছে। ব্যুরোর বিচারকেরা বলেছেন যে এই চিত্রটিতে আত্মত্যাগ ও ঈশ্বরে বিশ্বাস দ্বারা কঠোরমনা মানুষেরও কিভাবে মুক্তিলাভ হতে পারে তা সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

* * * *

বিশ্ব-বিখ্যাত ও বহু-পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় চিত্র "পথের পাঁচালী"র ভাগ্যে আরও সম্মানলাভ ঘটেছে। এই বৎসরের Startford Festival Film Critics award দিয়ে এই বাংলা চলচ্চিত্রটিকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই চলচ্চিত্র উৎসবে ইতালীয় অভিনেত্রী Guilette Masina-কে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার দেওয়া হয়েছে "Nights of Cabiria" চিত্রে অভিনয়ের জন্য। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেছেন Nikolai Cherkassov রুশচিত্র "Don Quixote"-এ অভিনয় করে।

* * * *

ভারত সরকার তাঁদের ফিল্ম ডিভিসন্ কর্তৃক নির্ম্মিত ডকুমেন্টারী চিত্রগুলিকে আরও আটটি ভাষায় 'ডাব্' করার মনস্থ করেছেন। এই ভাষাগুলি হচ্ছে—আসামী, গুজরাটী, কানাড়া, কাশ্মীরি, মালয়ালম্, মারাঠী, ওড়িয়া ও পাঞ্জাবী। এখন পর্য্যন্ত পাঁচটি ভাষাতে ডকুমেন্টারীগুলি 'ডাব্' করা হয়ে থাকে।

* * * *

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নাগিনী কন্যার কাহিনী"র চিত্র গ্রহণ সমাপ্তির পথে এসে পৌঁচেছে। বিশ্ব-বিখ্যাত



বরুণ পিক্‌চার্স'-এর মুক্তি প্রতীক্ষিত চিত্র "জন্মান্তর"-এর একটি দৃশ্যে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।
ছবিটি পরিচালনা করেছেন অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিবেশন করবেন 'নর্ম্মদা চিত্র'।

সুরশিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর এই চিত্রের জন্য যে নেপথ্য সঙ্গীত রচনা করেছেন তা এই চিত্রের বিশিষ্ট আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শ্রীসলিল সেন এবং অভিনয়াংশে আছেন ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, জহর রায় প্রভৃতি।

* * * *

এস, এম, ফিল্ম ইউনিট্-এর "যাত্রী"র কাজ পরিচালক সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদারের তত্ত্বাবধানে এগিয়ে চলেছে। চিত্রটির সঙ্গীতাংশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও মির্জ্জা গালিব-এর কয়েকটি গান এই চিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং গেয়েছেন মঞ্জু গুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীরা, আর সঙ্গীতগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলি গীত হয়েছে কোনও রকম বাদ্যযন্ত্রের সংগত বা সহায়তা ব্যতিরেকেই সম্পূর্ণ ও স্বাভাবিক মনুষ্যকণ্ঠে।

* * * *

"বিশ্বরূপা" থিয়েটার্স ২২শে জুলাই "ক্ষুধা" নাটকের তিন শততম অভিনয় রজনী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। ঐদিন "ক্ষুধা" অভিনয় ছাড়াও—চা পান, পুরস্কার বিতরণ ও গিরিশ গ্রন্থাগারের উদ্‌ঘাটন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

বিদেশী খবর ঃ

John Steinbeck লিখিত ও Warner Brothers প্রযোজিত "East of Eden" চলচ্চিত্রটি এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ মার্কিণ চিত্ররূপে কোপেন্‌হাগেন্-এর চলচ্চিত্র সমালোচকদের প্রদত্ত 'Bodil' পুরস্কার লাভ করেছে।

* * * *

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের প্রস্তুতির পর Metro-Goldwyn-Mayer তাঁদের "Ben Hur" চিত্রটির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি রোমে আরম্ভ করেছেন। Lew Wallaceএর এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করবেন পরিচালক William Wyler. প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন Charlton Heston ও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় আছেন Jack Hawkins, Huge Griffith প্রভৃতি। ইস্রায়েলের তারকা Haya Harareet অবতীর্ণা হবেন Easther-এর ভূমিকায়। চিত্রটি টেক্‌নিকলার রংএ তোলা হবে। Miklos Rosza চিত্রটির সঙ্গীতাংশ রচনা করছেন প্রাচীন রোমের সঙ্গীত ও স্তব গানের ওপর ভিত্তি করে।

* * * *

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Ernest Hemingway-র ১৯৫৪ সালের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ও ৪০টি ভাষায় অনূদিত গল্প "The Old Man and the Sea"কে Warnar Brothers চিত্রে রূপায়িত করেছেন। চিত্রটি সান্-ফ্রান্-সিস্‌কো শহরে ১২ই আগষ্ট সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শিত হবে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন Spencer Tracy এবং পরিচালনা করেছেন John Sturges. চিত্রটি প্রস্তুত হতে তিন বৎসর সময় লেগেছে এবং Cuba, Bahamas, Peru, Ecuador, Panama, Galapagos Islands, Hawaii, California প্রভৃতি স্থানের সমুদ্র জলে চিত্রটির চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

* * * *

ডষ্টয়ভস্কির বিখ্যাত উপন্যাস 'ক্রাইম্ এণ্ড পানিসমেণ্ট' অবলম্বনে আধুনিক যুগোপযোগী করে চলচ্চিত্রের জন্য এক নূতন ভাষ্য রচনা করেছেন Walter Newman. চিত্রটিতে রাশিয়ার বদলে আমেরিকাতেই সব ঘটনাগুলি ঘটান হয়েছে।

Allied Artists এই চিত্রটিকে "Crime and Punishment, U. S. A." এই নাম দিয়ে পরিবেশন করবেন।

ফিরে চল আপন ঘরে…

কুমারেশ ভট্টাচার্য

প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের কথা। বাংলার তখন ছিল সুদিন। দিকে দিকে তার ছিল জয়যাত্রা। জীবন-যুদ্ধে বাঙালী তখন আজকের মত হয় নি বিপর্যস্ত—বিভ্রান্ত। সাহিত্য-বিজ্ঞান-সংগীত সাধনায় সে ছিল আত্ম সমাহিত—ধ্যানস্থ। চিরসুন্দরের পূজারী বাঙালী সাধক সেদিন সাধনায় সিদ্ধি-

লাভ ক'রে তাঁর সাধনালব্ধ ধন শুধু নিজেই ভোগ করেন নি—জনসাধারণের জীবনেও দিয়েছেন গভীর আনন্দ।

আজ থেকে প্রায় ৪৭ বছর আগেকার কথা। একজন তরুণ সংগীত-সাধক সেদিন এই বিরাট কলকাতা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রলেন। প্রায়ই তার আমন্ত্রণ আসতে লাগল শহরের সংগীতপ্রিয় ধনীসম্প্রদায়ের গৃহ থেকে। আজকালের মত তখনকার দিনে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-হেতু পার্কে বা সভা-সমিতিতে জলসার আয়োজন হ'ত না। অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায় প্রায়ই বসত গানের মজলিস্। সে মজলিসে যোগ দিতেন স্থানীয় ও ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে আগত সেরা গুণী গায়ক, ওস্তাদ যন্ত্রী সবাই। শিক্ষারম্ভের অল্পদিনের মধ্যে যে তরুণ গায়কের প্রতিভা দেখে ওস্তাদরা বিস্মিত হ'লেন, যাঁর খ্যাতি লোকের মুখে মুখে অল্পকালের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ল কলকাতা শহরে ও শহরাঞ্চলে, যাঁর কণ্ঠমাধুর্যে ও সুর-লালিত্যে সবাই হলেন বিমোহিত, তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় সংগীতসাধক অন্ধ-গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে।

উত্তর ক'লকাতার সিমলা স্ট্রীটে বনেদী বংশে ১৩০১ সালে ৯ই ভাদ্র শুভ জন্মাষ্টমীর দিনে জন্ম হ'ল একটী সুন্দর শিশুর। পিতামাতা তাই আদর ক'রে নাম রাখলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তিন ভাইয়ের মধ্যে ইনি হ'চ্ছেন কনিষ্ঠ। কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স যখন এক বছর দশ মাস তখন তিনি পিতৃ-স্নেহ হ'তে চিরদিনের জন্যে হ'লেন বঞ্চিত। সংসার-তরণী তখন আর্থিক-ঝড়ে টলমল্। সেই দুর্দিনে একমাত্র বিধবা মা নিজের বুদ্ধিবলে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখলেন।

বাল্যকালে আর দশজন বালকের মতই কৃষ্ণচন্দ্র স্কুলে যেতে লাগলেন। লেখাপড়ায় আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। কিন্তু তিনি ভাল ছাত্র হবেন এটা বুঝি ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। মাত্র তের বছর বয়সে হঠাৎ একদিন চোখে তিনি ঝাপসা দেখলেন, সেই সংগে অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। চিকিৎসা চলল নিয়মিত। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে লাগল। পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যেই তিনি চিরদিনের জন্যে হারালেন চক্ষুরত্ন দুটী। তিনি জীবনে হবেন বিখ্যাত গায়ক—এটা কী তারই ইংগিত?

ছোটবেলা থেকেই সংগীতের প্রতি ছিল তাঁর অনুরাগ। আঠার বছর বয়স থেকে তিনি একাগ্রভাবে সংগীত-সাধনায় মগ্ন হ'লেন। প্রথমে স্বর্গত সুগায়ক শশীভূষণ দে মশাইয়ের কাছে শিক্ষা করতে লাগলেন খেয়াল ও ঠুংরী। মাত্র পাঁচ মাস শিক্ষার পরই হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্ কোম্পানী তাঁকে জানালেন সাদর আমন্ত্রণ। ছয় খানা গান তাঁর রেকর্ড হ'ল। সাধকের উৎসাহ বেড়ে গেল বহুগুণ। নূতন বাজারের অনতিদূরে চিৎপুর রোডের উপর আজ যেখানে 'লোহিয়া মাতৃসদন' স্থাপিত হ'য়েছে ঐ বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছিল



শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

বিখ্যাত ধনী ও সংগীতানুরাগী স্বর্গীয় হরেন শীল মশাইয়ের বসতবাটী।

সে যুগে ভারতে এমন কোন ওস্তাদ গায়ক বা যন্ত্রী ছিলেন না যিনি এ বাড়ীতে একবার না এসেছেন। শীল মশাইয়ের বৈঠকখানায় প্রায়ই জলসার আয়োজন হ'ত। সাধক কৃষ্ণচন্দ্র যেতেন সেখানে নিয়মিত—নব নব সুরের সন্ধানে—গুণী ওস্তাদের সান্নিধ্যলাভের আশায়। এভাবে তিনি সতীশ চট্টোপাধ্যায়, আহম্মদ খাঁ, শনি মহারাজ, ওস্তাদ বাদল খাঁ, জমিরুদ্দিন, কেরামতুল্যা প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত ওস্তাদদের সংস্পর্শে এসে টপ্পা,

খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা করেন। যে সুর একবার কানে বাজে, সে সুর শ্রুতিধরের মত তাঁর আয়ত্ত হয়ে যায়। এ যেন তাঁর ঐশ্বরিক শক্তি।

১৯ বছর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের আর ছয়খানা গান রেকর্ড হয় ঐ একই কোম্পানীতে। 'দীন তারিণী তারা' গান খানা 'হিট্' করে। হাজার হাজার রেকর্ড বিক্রী হয় ঐ গানখানার। দর্জিপাড়ার যতীন গুহর (গোবর বাবু) বৈঠকখানাতেও প্রতি সপ্তাহে দু-তিন দিন বসত গানের মজলিস। তিনিও নানাভাবে উৎসাহিত ক'রেছেন এই অন্ধগায়ককে। এ সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের নাম ও যশ ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। ক'লকাতার মাড়োয়ারী মহল থেকেও আসতে থাকে তাঁর সাদর আহ্বান।

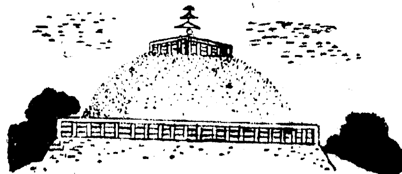
অগাধ সমুদ্রের মত এই সংগীতশাস্ত্র। এর যেন নেই সীমা-পরিসীমা। এত শিক্ষা ক'রেও কৃষ্ণচন্দ্রের মন তৃপ্ত হল না। অবশেষে তিনি সুযোগ পেলেন ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খানের কাছে তালিম নিতে।

সাতাশ বছর বয়সে তিনি প্রথম রংগমঞ্চের সংস্পর্শে আসেন—শিশিরবাবুর সম্প্রদায়ে। সে সময় থেকে সীতা, বসন্তলীলা, পাষাণী, চন্দ্রগুপ্ত, সত্যের সন্ধান, অশোক প্রভৃতি বহু নাটকে অবতীর্ণ হয়ে অভিনয় ও গানে শ্রোতৃবৃন্দকে করেন পরিতৃপ্ত।

এই সময় নির্ব্বাকযুগ থেকে চলচ্চিত্র পদার্পণ করছিল সবাক যুগে। সে এক আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণ। কয়েকখানা মাত্র বাংলা ছবি সবাকচিত্রে রূপায়িত হবার পরই নিউ থিয়েটার্স দেবকী বসুর পরিচালনায় 'চণ্ডীদাস' বাণীচিত্রের কাজ আরম্ভ করেন। এ সময়ে সুসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায় ও চেষ্টায় কৃষ্ণচন্দ্র 'চণ্ডীদাস' কথাচিত্রে অভিনয় করবার সুযোগ পান এবং উক্ত ছবিতে সৌরীনবাবুর রচিত 'ফিরে চল আপন ঘরে' গানখানা গেয়ে সারা বাংলাদেশে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেন। পথে-ঘাটে-মাঠে সর্বত্রই যেন লোকের মুখে মুখে ফিরত ঐ গানখানা। উক্ত ছবির অন্যা[ন্য] গানগুলিও খুবই উচ্চাংগের হয়েছিল। তারপর এ[কে] একে সাবিত্রী, দেবদাস, ভাগ্যচক্র, সুরদাস (ভাগ্য চক্রের হিন্দীরূপ) প্রভৃতি বহু কথাচিত্রে তিনি অভিন[য়] করেছেন—প্রাণমাতানো গান গেয়েছেন। 'কোথা[য়] সীতা, কোথায় সীতা', 'ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী' 'মরণ যেদিন আসবে ঘিরে', 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধূ' 'আমার আঁধার ঘরের আলো সখি জ্বালো', প্রভৃতি তাঁ[র] অসংখ্য গান যিনি একবার শুনেছেন, তিনি কি কখনে[া] ভুলতে পারেন সে গানের সুরঝংকার ও মূর্ছনা? [সে] গানের মিষ্টত্ব কি আজও কানে লেগে নেই? হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্ কোম্পানীও ঐ গানগুলীর রেকর্ড বিক্রী করেছেন হাজার হাজার। 'সুরদাস' হিন্দী ছবিতে অভিন[য়] ক'রে তিনি সবচেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছিলেন এবং তাঁ[র] অভিমত যে ঐ অভিনয়ই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়।

কৃষ্ণচন্দ্র দুবার বম্বে গেছেন। সেখানে দীর্ঘদিন থেকে বহু হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেছেন—গান গেয়েছেন এব[ং] অর্জন করেছেন বিপুল গৌরব। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমা[ন] দে এখন বম্বেতে আছেন এবং সংগীতজ্ঞ হিসেবে তিনি[ও] আজ বিপুল খ্যাতির অধিকারী। কৃষ্ণচন্দ্রের ছাত্রদে[র] মধ্যে শচীনদেব বর্মণ আজ সর্বজনপ্রিয় গায়ক। অপরিমি[ত] যশগৌরবে গৌরবান্বিত হয়েও কৃষ্ণচন্দ্র যে কত সাধার[ণ] নিরহংকার, সদাহাস্যময় তা তাঁরাই জানেন, যাঁরা তাঁ[র] সংস্পর্শে এসেছেন একবার। তাঁর অমায়িক ব্যবহারে [ও] সরলতায় আকৃষ্ট না হ'য়ে উপায় নেই।

কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স আজ ৬৪ বৎসর। জীবনের এ[ই] অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়িয়ে আজও অন্ত নেই তাঁর উৎসাহে[র] উদ্দীপনার। আজও তিনি সংগীত চর্চায় রত। ভগবানে[র] কাছে প্রার্থনা করি, এই সংগীত সাধক সুস্থদেহে নি[য়ে] আরও দীর্ঘদিন দেশবাসীকে সংগীতের মধুর রসে আপ্লু[ত] করুন।



গীতিকবিতায় হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

অধ্যাপক শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত এম-এ

বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে গীতিকবিতার ধারা এক উচ্ছল গতিবেগে বাঙলা ছন্দের জন্মলগ্ন থেকেই বয়ে চলেছে। প্রাচীন বাঙলা থেকে মধ্য বাঙলা যুগেও গীতিকবিতার আনন্দ-আবেগ সমস্ত উচ্ছলতা নিয়েই বয়ে গিয়েছিল ; বৈষ্ণব কবিদের যুগে তো লিরিক আবেগের এক অফুরন্ত মাধুর্য বাঙলা সাহিত্যকে নূতন প্রাণধর্মে সঞ্জীবিত করেছে।

ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে বাঙলা সাহিত্য যে-ভাববিপ্লব এনেছিল, পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শে বাঙলা সাহিত্যের সারস্বত-ভিত্তিতে মহাকাব্যের সৌধ রচনার সে-প্রয়াস কয়েকজন কবির মধ্যে জেগে উঠেছিল, শ্রীমধুসূদনের পরে তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রই প্রধান। কিন্তু তাঁদের মধ্যে আত্মগত ভাব ও কল্পনার উচ্ছলতা নিয়ে গীতিকবিরও একটি উজ্জ্বলরূপ ছিল। মহাকাব্যের একটি ক্লাসিক আবরণের অন্তরালে তাঁদের গীতাত্মক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যেমন একটি বিপুল উচ্ছ্বাস আত্মপ্রকাশ করেছে, গীতিকবিতার ছন্দ-মুখরতার মাধ্যমেও আত্মগত ভাবের প্রকাশে সেইরূপটি দেখা দিয়েছে পরিপূর্ণভাবে। মহাকাব্য রচয়িতা এই দুই বাঙালী কবির এই যে গীতিকবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ, তার একটি বিশেষ মূল্য আছে এবং সে-মূল্যটি হচ্ছে বাঙালীর সংস্কারগত একান্ত সুকুমার ভাবপ্রবণতার প্রাবল্য। এই বৈশিষ্ট্য কবি শ্রীমধুসূদনের মধ্যেও বেশি ছিল। বাঙলা সাহিত্যের মহাকাব্যের যুগেও গীতিধর্মী মানসিক প্রবণতা ঢাকা পড়েনি!

বয়সের কিছু তারতম্য থাকলেও হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে সমসাময়িক এবং দুজনের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য যেমন ছিল, বৈসাদৃশ্যও তেমনি ছিল। হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধের প্রকাশ অনেকটা চারণধর্মী ছিল এবং এইজন্যই তিনি জাতীয় কবি হিসাবে বাঙালীর কাছে বিশেষ একটি শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছেন। নবীনচন্দ্রের দেশাত্মবোধে উচ্ছ্বাস ছিল, কিন্তু ততটা চারণ-ধর্মিতা ছিল না। কিন্তু উভয় কবির মধ্যে সব চেয়ে বেশি সামঞ্জস্য-মূলক মানসপ্রবণতা ছিল প্রেমবোধের দিক দিয়ে। প্রেমানুভূতির ব্যাকুলতায় উভয় কবির প্রাণ যেন একই ছন্দে জেগে উঠেছে—প্রেমের মেঘজ্যোৎস্নাময় পথে হাসি-অশ্রুর সঞ্চয় নিয়ে একই ভাবে দুজনে যাত্রা করেছেন যেন।

নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র উভয়েই যতটা ইন্দ্রিয়ধর্মী কবি ছিলেন, ততটা মনোধর্মী ছিলেন না। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাঁরা রসবোধ দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে, ভাবের অনুরূপ একটি জগৎকে গড়ে' তুলতে চেষ্টা করেন নি; তাঁরা কেবল ইন্দ্রিয় দিয়ে জগৎ ও জীবনের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-দিকে গ্রহণ ক'রে তাই-ই রসপিপাসুদের ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন ছন্দের মাধ্যমে। জগত ও জীবনের যা-কিছু, তা তাঁদের অন্তরলোকে একবার শুধু লাভ করে আবার প্রকাশের রঙ্গমঞ্চে যখন এসে দাঁড়িয়েছে, তখন রূপরসময়ী জগৎ ও সুখদুঃখময় জীবনের সংযোগ-সূত্র নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁদের নিয়ে অনির্বচনীয়তার একটি পৃথক সংগীত লোক সৃষ্টি করতে পারে নি। অথচ সূক্ষ্ম অনুভূতির যে-একটি অনির্বচনীয় রসরূপ, তাই গীতিকবিতায় সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু তাঁদের কবিকল্পনা বা মানসকল্পনার সে-আবেগ, তা' যে-সংস্কৃতি লাভ করেছে, তাতে সূক্ষ্মতার অপেক্ষা স্থূলতাই কিছু বেশি ছিল। তাঁদের কবিতায় ব্যক্তি অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে বটে, কিন্তু ভাবকল্পনার সুষ্ঠু রসরূপ কোন দিক দিয়েই সার্থকভাবে ধরা দেয় নি। ছন্দের মাধ্যমে ব্যক্তি-অনুভূতির যে রসোজ্জ্বল প্রকাশ, সেই তো গীতিকবিতা। এই গীতিকবিতা রচনার প্রয়াসের মধ্যে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বাইরের বস্তুর উপরই দৃষ্টি ছিল, অন্তরের নিজস্ব ভাবাকুলতার রসসংগত প্রকাশ সৌষ্ঠব ততটা ছিল না। এইজন্যই তাঁদের দৃষ্টি প্রধানতঃ বস্তুমুখী।

কিন্তু শুধু কেবল বস্তুসর্বস্ব চিন্তাধারা নিয়ে যে-সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে, তা' কখনো সত্যকার সাহিত্যরস পরিবেশনে সক্ষম হয় না—বস্তুর অতীত একটি মনোময় রসভাবনার সুষ্ঠু প্রকাশই সাহিত্যের সত্যলোককে প্রতিষ্ঠা দেয়। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র গীতিকবিতার দিক দিয়ে এই দিকটিকে সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি এবং এই জন্যই তাঁদের গীতিকাব্যে সূক্ষ্মতর অনুভূতির অনুরণন নেই।

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী,' 'চিত্তবিকাশ' ও নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র মধ্যে অনেকগুলি খণ্ড কবিতা স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন ভাবের কবিতার মধ্যেই কবিকল্পনা মুক্তির পথ খুঁজেছে। আমরা সেই-গুলিকে অবলম্বন করেই উভয় কবির গীতিকাব্যের আলোচনার পথে অগ্রসর হ'বো।

প্রেমের প্রতি যে-দৃষ্টিভঙ্গী হেমচন্দ্রের আছে, প্রায় সেই একই দৃষ্টিভঙ্গী নবীনচন্দ্রের কবিতায়ও প্রকাশের পথটি খুঁজে নিয়েছে। প্রেমের স্মৃতিময় বেদনা দুজনের কবিতায় যেন সমানভাবেই আছে। হেমচন্দ্রের প্রেমস্মৃতি জীবনের দিকচক্রবালে যেমন এক বিষাদের অশ্রুসজল প্রতিমা জাগিয়ে তুলেছে, নবীনচন্দ্রেও সেই প্রতিমা-অংকনের প্রচেষ্টা আছে। হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ,' 'এই কি আমার সেই জীবন তোষিণী' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর হৃদয়-সরোবরে ফুটে' ওঠা প্রেম-শতদলটির জীবনে সে-সার্থকতার সুধাসিঞ্চন ঘটলো না, তারই অনুভূতির এক ব্যাকুলতা আকাশে বাতাসে সংগীতের মত ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে। ব্যর্থপ্রেমের বেদনাময় মুহূর্তগুলি সফলতার আশায় সংশয়ক্লান্ত হ'য়ে গুমরে উঠেছে কবিসংগীতে। কবিপ্রাণে প্রেয়সীর জন্য অনুভূতি যেমন তীব্র ছিল, সেই প্রেমবল্লভাকে না-পাওয়ার হতাশার বেদনাও তেমনি তীব্রতর হয়ে কবির চোখে জলধারা বইয়ে দিয়েছে।

অবিরল জলধারা নয়নেতে ঝরে রে ;
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে।
(হতাশের আক্ষেপ)

কবি যাকে নিজের ভেবেছিলেন, অন্যে যখন তাকে নিয়ে গেল, সেই দুঃখ কবির বুকে বজ্রের মত বেজেছে। জীবনতোষিণী ছিলেন কবির কাছে—'যৌবনের সুধাময়ী সুধাতরঙ্গিণী।' তাকে নিয়ে কবির সবই পূর্ণ ছিল,—কিন্তু সংসারের তা প জীবনতোষিণী কবির শুকিয়ে গেল।

নবীনচন্দ্রেরও কয়েকটি প্রেম-অনুভূতিমূলক কবিতা এই ভাবকেই ধ'রে রেখেছে কবিকল্পনার ছন্দায়িত বৃত্তরেখায়। প্রেমপ্রতিমাকে না-পাওয়ার যে-সুগভীর বেদনা, তাই কবির সমস্ত চেতনাকে পূর্ণ ক'রে রেখেছে বিষাদের অজস্রতায়! 'কি লিখিব' কবিতায় কবি বলছেন—

নিদারুণ দেশাচার উপাড়িয়া বলে,
অপর অদৃষ্টক্ষেত্রে করিল রোপণ ;
এই জনমের মত, সে-আশা হয়েছে গত,
কি লিখিব? আমার সে শৈশব স্বপন!

প্রতিমা-বিসর্জন' কবিতায় কবির বেদনাময় হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে—

কলংকে না ডরিলাম যাহার লাগিয়া,
দেশাচার হায় তাকে নিল কি কাড়িয়া?

'কি লরি' কবিতায় প্রেমের এক সার্থক রূপও ফুটে উঠেছে। প্রেমের সার্থকতায় কবিদৃষ্টিতে জীবন কিছুটা সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কবি তাই বলেন—

যা, দিয়েছি অতি ক্ষুদ্র,
যা' পেয়েছি সে-সমুদ্র,
দিয়ে এই তুচ্ছ প্রাণ, প্রেয়সী আমার,
পেয়েছি অমূল্য নিধি—প্রণয় তোমার।

আবার কবি বলছেন—

সহিব অনন্ত জ্বালা যাবত জীবন।
তবু তুমি সুখে আছ করিলে শ্রাবণ,
শব দেহে সব সবে, বিদায় এখন।

অন্তরের তীব্র প্রেম গোপনতার আবরণে ঢেকে রাখা সম্ভবপর নয় বলেই বেদনার ঝংকার দিয়ে কবি একতারা বাজিয়েছেন এবং প্রেমের শাশ্বতত্ব উপলব্ধি ক'রে অন্তর-জগতে চিরদিন প্রণয়-নিগড়ে বাঁধা থাকতে চেয়েছেন। প্রণয়-প্রতিমার সুখ-সংবাদে তিনি সুখী হবেন, এই আশা ক'রেই 'নিরাশার কাল ছুড়ি' বুকে নিয়েও সেই প্রতিমাটিকে বিসর্জন দিয়েছেন। নবীনচন্দ্রের 'হৃদয়-উচ্ছ্বাস' কবিতায় মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের ও হেমচন্দ্রেরও কিছুটা প্রভাব পড়েছে। তবে কবিতাটি বিশেষ ক'রে বৈষ্ণবভাবের রসে রসায়িত। 'কি লিখিব' কবিতায় প্রেমের একটি আদর্শ ফুটে উঠে প্রাণ ব্যাকুলতার সঙ্গে শুচিস্নিগ্ধতার স্নিগ্ধতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে,—

প্রণয়স্রোতকের অবিচল,
মুহূর্তে পূর্ণিত হ'বে হৃদয়-ভাণ্ডার ;
প্রণয়ে পূরিবে ধরা গগন হইবে ভরা,
অবিচল প্রেমস্বর্গ-কেন বলি আর?

প্রেমমূলক কবিতাগুলিতে উভয় কবিরই বেদনার দিক বেশি প্রাধা লাভ করেছে। কিন্তু নবীনচন্দ্রের বেদনা-বিষাদের কবিতার মধ্যে যে একটি বিলাসিতার ভাব আছে ; হেমচন্দ্রের বেদনা-প্রকাশের ম অকৃত্রিমতার গভীরতা আছে। একজন স্মৃতির তরঙ্গলীলা নিয়ে যে বেদনার খেলা করেছেন, আর একজন সেই তরঙ্গলীলাকে হৃদয়ে প্রেম-সমুদ্রের মধ্যে এক ক'রে নিয়ে যেন বহু বাঞ্ছিতা প্রতিমার ধ্যা করেছেন।

নারীর বেদনায় উভয় কবিই অশ্রু বিসর্জন করেছেন। হেমচন্দ্রে কবিপ্রাণ 'বিধবা রমণীকে অবলম্বন ক'রে হাহাকার করেছে। বেদনা এক চকিত শিহরণ জেগে উঠেছে এই কবিতার প্রথম দুটি ছত্রেই—

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ওই রে।
না হ'লে এমন দশা নারী আর কইরে?

আবার কবি বলছেন—

অবলা রমণী বলে' এতই কি সয় রে?

হেমচন্দ্রের 'ভারত কাহিনী' কবিতায়ও একই সুরের অনুরণন! নবী চন্দ্রের 'বিধবা কামিনী' কবিতায় একই দেশের বিলাপগাথা—

এখনও দেখি যেন নয়নের কাছে,
দীনভাবে, ম্লানমুখে বসিয়া দুঃখিনী।
ভাবিতেছে এ-সংসারে কার ভাবে বাঁচে,
নীরবে বিরলে বসি' কাঁদে অনাথিনী।

প্রেমরসের অসীমতার শুচিছায়ার নারী-জীবন যেখানে সার্থকতা পে চায়, সেইখানের চরম ব্যর্থতার মেঘলোক দেখে উভয় কবির প্র কেঁদে উঠেছে।

সৌন্দর্যবোধের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে আমরা দেখতে পাই, উ কবির কবি-মানসে সূক্ষ্মতর রসসৌন্দর্যের চেয়ে প্রকৃতির বাহ্যসৌন্দর্য অবলম্বন ক'রে ভাবাবেশ জেগেছে। সমস্ত হৃদয়ের অনুভূতির কু বীথিতে পুষ্পস্তবকের মত যে-রূপস্বপ্ন জেগে উঠেছে, তা' ধরা পড়ে প্রকৃতির বৃন্তে, অন্তরের গহন সূক্ষ্মতার যে-কেন্দ্রভূমি তাতে ন সুতরাং প্রকৃতিকে অবলম্বন ক'রে সে-ভাবাবেশ জেগে উঠেছে, তা মধ্যে জীবনচিন্তাও উভয় কবিরই মিশে' গিয়েছে। প্রকৃতি ও জীবনে পটভূমিকায় যেন নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর রেখা-বলয়িত একটি অপরূপ কাব কথাকে তাঁরা দুজনেই রচনা করতে চেয়েছেন। উভয় কবির ভাবাকাশ জীবনরসে রসায়িত। কিন্তু তা হলেও, জীবানুভূতির গহনত স্তরে কবিদৃষ্টির আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়ে গভীর উপলব্ধির ভাবসম্পদে রসসৌকর্যে সমৃদ্ধ ক'রে নিয়ে চিরন্তন ক'রে তুলতে পারেন নি।

হেমচন্দ্রের 'যমুনাতটে', 'অশোকতরু,' 'হের ঐ তরুটির কি দ এখন', 'পদ্মের মৃণাল', 'লজ্জাবতী লতা' প্রভৃতি কবিতা প্রাকৃতি

সৌন্দর্য ও প্রকৃতির কোলে লালিত বিষয়বস্তুকে নিয়ে ছন্দের লীলায়িত ভঙ্গীতে জেগে উঠেছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রকৃতির স্নেহসিক্তি তরুলতার সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ হয়েছেন এবং সৌন্দর্যের একটা চিরন্তন আবেদনও আছে। সেই আবেদনেই কবি-হৃদয়ের ঘটে জাগরণ। হেমচন্দ্রের কবিহৃদয়েরও জাগরণ ঘটেছে এইখানে।

নবীনচন্দ্রের 'সায়ংচিন্তা', 'মেঘনা', 'কে বলিতে পারে', 'একবর্ষ' প্রভৃতি কবিতায় এই দৃষ্টিভঙ্গীই ফুটে উঠেছে।

কল্পনার বলে কবি জগৎ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যানধারণাকে রসমূর্তি দিয়ে আমাদের হৃদয়ের দ্বারে উপস্থাপিত করেন। আমরা যা' দেখিনি, ভাবিনি, কবিকল্পনার রেখাপথ ধ'রে তাই নূতন করে দেখতে শিখি, ভাবতে শিখি। কবি হেমচন্দ্র 'পদ্মের মৃণাল' কবিতাটিতে এমনই একটি ভাবের অভিব্যক্তি দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন—

পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে,
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে।
কখন ডুবায়ে যায় কভু আসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশে পাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।

সরোবরের বুকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি পদ্মের মৃণালকে দেখে কবির দিব্যদৃষ্টির সঙ্গে ভাবচিন্তার যেন গঙ্গোত্রীদ্বার খুলে গিয়েছে। তিনি ভেবেছেন সময়-সমুদ্রের বুকে তরঙ্গ-কল্লোলের বিপুল সংঘাতে মানব-জাতি এরূপেই একবার ডুবে' যাচ্ছে, আর একবার উঠছে। পৃথিবীর আদিম সভ্যতার গুহদ্বার থেকে কত বিবর্তনের বন্ধুর পথ অতিক্রম ক'রে মানুষ এই বর্তমান সভ্যতার স্বর্ণসৌধটি গড়ে তুলেছে। কিন্তু 'কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল?' কোথায় সে আর্য ভারতের অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব? অতীত আজ অতীতেই বিলীন। পৃথিবীতে এখন বর্তমান কালের মানুষের প্রতিপত্তি চলছে। 'পদ্মের মৃণালের মতই জাতির উত্থান ও পতন আছে। এই যে উত্থান পতন, এর পিছনে যেন কোন্ নিয়তির শক্তি নীরবে কাজ ক'রে যাচ্ছে। তাই কবি প্রশ্ন করছেন—'নিয়তির গতিরোধ হবে না কি আর? বর্ণনাবাহুল্যের প্রাধান্য থাকলেও এই কবিতাটিতে কবির হৃদয়ানুভূতির সহজ প্রকাশ ঘটেছে। অন্তরের নিগূঢ়তম ভাবচিন্তার সঙ্গে ছন্দের সাবলীলতা এসে যেন নিজের সুরটিকে মিশিয়ে দিয়েছে।

'লজ্জাবতী লতা' কবিতাটিতে কবির রসচেতনার এক নূতন পরিচয় পাওয়া যায়। কবি অন্যান্য তরুলতা অপেক্ষা 'লজ্জাবতী'র লজ্জাসুলভ যে-বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন, তাতেই গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছে তাঁর কবিমানসে।

ছুঁয়ো না ছুঁয়ে না, ওটি লজ্জাবতী লতা
একান্ত সংকোচ ক'রে, একবার আছে ম'রে,
ছুঁয়ো না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।

কবির ব্যক্তিহৃদয়ের একটি রসপ্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। গীতি-কবিতা হিসাবে এই দিক দিয়ে কবিতাটির সার্থকতা আছে। 'কমল বিলাসী' কবিতাটিতে প্রকৃতির প্রতি কবির অপূর্ব অধ্যাত্মবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবন ও মনের যে একটি সংযোগসূত্র আছে, তারই একটি রাগিণীসংগীত ঝংকার দিয়ে জেগে উঠেছে 'যমুনাতটে' কবিতাটিতে।

হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি;
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন ওঠে মনে চিন্তার লহরী?

তখনই বুঝতে পারি মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতির যে-রসসংযোগ আছে, সেই কথাটি কবি 'বৃন্তভাষা মন' নিয়ে যেমন করুণ শান্ত জ্যোৎস্নাঝরা রাত্রির নিভৃত মুহূর্তে অনুভব করছেন, তেমনি প্রকৃতির পটভূমিকায় নিজ হৃদয়ের বেদনা প্রকাশের ব্যাকুলতাকে উজাড় ক'রে ঢেলে' দিচ্ছেন। প্রকৃতির দিকে চেয়ে নিজ হৃদয়ের ভাব-চেতনাকে জাগ্রত ক'রে তোলার একটি সজাগ প্রয়াস হেমচন্দ্রের মধ্যেই যেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙলা কাব্যলোকে প্রথম দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যখনই তিনি মনের নিগূঢ় রাগিনীকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন, তখনও তথ্যের বস্তুভার তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখে' দিয়েছে। মনের নবজাগ্রত ভাব-কল্পনার আনন্দস্পর্শে প্রকৃতির দৃশ্যরূপকে তিনি বাসনা-অনুযায়ী প্রাণময় ও সুন্দর ক'রে তুলতে পারেননি। প্রকৃতির দৃশ্যভূমিকায় কাব্যচ্ছন্দের নৃত্যরূপ দেখা দিলেও, অন্তর-অনুভূতির সার্থক সংযোগে সত্যিকারভাবে রসমধুর হ'য়ে উঠতে পারেনি। নৈসর্গিক দৃশ্যপট থেকে কবির অন্তরজগতে যখনই রস-লক্ষ্মী অভিসারিণী হ'য়ে যেতে চেয়েছেন, তখনই তা' পূর্ণ হয়েছে। রসলক্ষ্মীর অঙ্গসজ্জাই শুধু সার হ'য়ে রইল, রসসৌন্দর্যের ভাবগভীর শাশ্বতত্ব দেখা দেওয়ার অবকাশ পেল না সেখানে। কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য থাকলেও সৃষ্টির ব্যাপ্তিময়তার প্রকাশ ঘটলো না।

'অশোক তরু' 'হের ঐ তরুটির কি দশা এখন' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির স্নেহসিক্তি তরুর সঙ্গে নিজ জীবনকে তুলনা ক'রে কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। কবির মনের গভীর প্রদেশে যে-বিপুল বেদনা জমা রয়েছে, তা' কবিতাটির প্রতি ছত্রেই আত্মপ্রকাশ করেছে। অশোক-তরুর নিকট কবির আক্ষেপ বেদনা-কাতর কণ্ঠে বেজে উঠেছে,—

তরুরে আমার মন তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাহি শোকানলে ঢালে বারিধারা;
আমি তরু জগতের স্নেহসুখ হারা!

এইখানেই ফুটে উঠেছে একটি সার্থক গীতি কবিতার লক্ষণ। কিন্তু প্রকৃতিকে কবি যখনই দর্শন করেছেন, তখনই তাঁর কবি-মানসে জেগে উঠেছে মানব-জীবনের কথা। তাই যখনই তিনি প্রকৃতির কোন রূপ বর্ণনা করতে গিয়েছেন, বা কোনও তরুলতা, বা ফলফুল বা পশুপক্ষীর বর্ণনা করেছেন, সেইখানেই এসে পড়েছে মানব-জীবনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও পার্থক্য। তখন সেই সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য অবলম্বন ক'রে কবি অনেক

তত্ত্ব কথা শুনাবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন নি। তত্ত্বের প্রাচুর্যে অনেক সময় তাঁর নিসর্গ প্রীতি একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে। এইখানেই ঘটেছে রসাভাস।

নবীনচন্দ্রও 'কে বলিতে পারে' কবিতায় বলেছেন—

কে বলিতে পারে এই জীবন সাগরে,
কখন উঠিবে ঝড় ভীম দুর্নিবার !

তবে কবিতাটির শেষাংশে সুদিনের জন্য প্রতীক্ষাতুর হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

প্রকৃতি ও মানব জীবনের দৃষ্টি কোণ দিয়ে দেখলে নবীনচন্দ্র সেনের 'সায়ংচিন্তা' নামক কবিতাটি চমৎকার। সায়াহ্নের স্তব্ধ বিষণ্ণতায় 'প্রকৃতি সুন্দরী' যখন 'রজনীর প্রতীক্ষায় ললাটে 'সিন্দুর বিন্দু' পরে নিল, তখন প্রকৃতির শ্যামচ্ছায়াময় প্রাঙ্গণে বসে কবির ভাবকল্পনা মানব এবং দেশের ভাগ্য নিয়ে জড়িত হ'য়ে পড়েছে। শিশু জীবনের নির্মল সুন্দর হাসি দেখে শিশুকে ডেকে কবি বল্লেন—

হাস হাস হাস শিশু নহে দিন দূর
সংসার সাগর পারে, বসিয়ে যখন—
বিষাদ তরঙ্গমালা গণিতে গণিতে কালা
হইবে এ ফুল্ল মুখ,—জানিবে তখন,—
নির্মল শৈশব ক্রীড়া সুখের স্বপন !

নিজ জীবনের বহুসঞ্চিত অভিজ্ঞতার তিক্ত স্বাদকে অন্তরে নিয়ে শিশু-জীবনের ভাবীকালের বেদনাময় দিকটিকেও কবি তাদের ডেকে ডেকে যেন বলে' দিচ্ছেন। সন্ধ্যার সুদূর ব্যাপ্ত ম্লান ছায়ার মধ্যে জীবন-ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়ে অতীত কালের শৈশব স্মৃতিতে মন যখন স্বপ্নরসাদিত হ'য়ে উঠেছে, সেই মুহূর্তটিকে শিশুদের দিকে চোখ পড়ে এটুকু মনে পড়িয়ে দেওয়ার কর্তব্যবোধে কবি মন এখানে জেগে উঠেছে হৃদয়পদ্মের এক একটি অভিজ্ঞতার পর্ণ শিশু জগতে যেন ঝরে ঝরে পড়ছে।

'মেঘনা' কবিতাটিকে কবির জীবন সম্বন্ধে ব্যক্তি-অনুভূতির একটি গভীরতম ছাপ পড়েছে। কবি 'মেঘনা'র দিকে চেয়ে হতাশ-কাতরকণ্ঠে যেন বলেন—

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে,
মানব জীবন ?

সারা জীবন বেদনা বহন ক'রে কবি যেমন জীবনের দিগন্তদেশে ক্লান্তির শিথিলতা নিয়ে দাঁড়িয়ে অনাস্তর উপলব্ধি করতে চান, তেমনি বিষাদপূর্ণ জীবনকে হাসির মায়া রঙে রাঙিয়ে নিয়ে মেঘনার জলে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মিশে যেতে চান। নৈরাশ্যের ধূসর ছায়ায় জীবন যেন ভ'রে উঠেছে। অতৃপ্ত কামনা কেবলই হৃদয়ে করে জ্বালার সঞ্চার—হৃদয় কেবলই কেঁদে বলে,—'বাসনায় তৃপ্তি নাই, যাহা চাই নাহি নাহি—।' স্বার্থের দ্বন্দ্বে, প্রবঞ্চনায় ও নারীর ছলনায় সে-সংসার পূর্ণ হ'য়ে রয়েছে, সেই সংসারে যে কেবল দুঃখ ও বেদনাই ভোগ করতে হয়। তাই বেদনার্ত কবি-হৃদয় থেকে ভগবানের কাতর প্রার্থনা জেগে উঠেছে—

ঝটিকায় ঝটিকায় অর্দ্ধেক জীবন
গিয়াছে আমার,
জানু পাতি' মেঘনা তীরে, ডাকি ত্যাজ অশ্রুনীরে,
এবে দয়া কর নাথ, জুড়াও জীবন !
দেও দিনেকের শান্তি মেঘ্না-পতন !

তারপরেই কবির প্রার্থনা—

মিশাও মেঘনার জলে বিষাদ-জীবন।

কবির জীবনকে যেন ভগবান 'হাসাইয়া' নাচাইয়া, চন্দ্রালোকে মালাইয়া রাখেন। নিরাশার কুয়াশা-ঘেরা জীবনের প্রান্তসীমায় কবি-হৃদয়ের এই প্রার্থনা ছাড়া আর কি-ই বা আছে। 'একবর্ষ' শীর্ষক কবিতাটিতে জীবন কবির কাছে কেবল সংগ্রামের আবর্তে ঘেরা। নবীনচন্দ্রের সে-জীবন-দৃষ্টি, তাতে জীবন বেদনা এবং নৈরাশ্যের ধূমরতাতেই ভ'রে উঠেছে,—ভ'রে উঠেছে অলক্ষ্য অশ্রুর সজলতায়।

হেমচন্দ্রেরও 'সংসার' কবিতায় সংসারের প্রতি একটি তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতায় কবির ছন্দ কথা জেগেছে এইভাবে—

সংসার আমার এই সংসারে কিছুই নেই,
সংসার বিষের তরু দুঃখ ফলময়।

কবির চিন্তা কবিতাটিতেও চিন্তার ব্যাপক রূপের সঙ্গে দুঃখবাদ এসে মিশেছে। নবীনচন্দ্রেরও 'হতাশ', 'একটি চিন্তা' প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্তি-জীবনের বেদনার অভিব্যক্তি। 'পরশমণি' কবিতায় হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের বেদনা-ধূসর মুহূর্তটি অশ্রু আবেগে যেন স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছে। আমরা জানি কবি শেষ বয়সে অন্ধ হয়েছিলেন, এবং এই চক্ষু যে সত্যই 'পরশমণি' তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কবি জীবনকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিয়েছেন, এবং এই জীবনের প্রতি কবির এ গভীর মমত্ববোধ আছে। 'পরশমণি'তে কবি বলেছেন—

এই মণি-পরশনে হয় সুখদরশনে,
মানব জনম সার, সফল জীবন।
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন !

কিন্তু 'জীবন-মরীচিকা' কবিতায় নৈরাশ্য-কাতর কবিপ্রাণের তেমনি সর্ব ব্যর্থতার এক করুণ আর্তনাদ,—

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে—
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে।

কিন্তু জীবনের প্রতি গভীর একটি অনুভূতির চিত্র ফুটে উঠেছে, 'জীবন-সংগীত' কবিতাটিতে। অবশ্য কবিতাটি Long-fellow-র Psalm of life কবিতার ভাবানুবাদ, কিন্তু নিজস্বতার ঐশ্বর্যও আছে। বৃহত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা কবির অসীম। 'মহাজ্ঞানী মহাজনের পথটিকে অবলম্বন ক'রে জীবনকে যেমন সার্থকতার পথে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস জেগেছে, তেমনি আদর্শবাদের বৃহত্তর সাধনার সঙ্গে বাস্তব কঠোর জীবনকে স্বীকৃত দিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ছন্দকে জাগিয়ে তোলার অকৃত্রিম প্রচেষ্টাও আছে। নবীনচন্দ্র জগৎ ও জীবনকে এক বিষাদের অনুলেপনে

অনুলিপ্ত ক'রে দেখেছেন, আর হেমচন্দ্র বিষাদের সঙ্গে বলিষ্ঠ অনুভাবনার প্রদীপ্তি দিয়ে জগৎ ও জীবনকে সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

হেমচন্দ্র জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের কবি; নবীনচন্দ্রের যেমন সমাজ চেতনার সঙ্গে রাজনীতির আলোড়ন-আবেগ এসে মিলিত হয়েছে, তাঁর কাব্যধারাতেও ঠিক তেমনি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম থেকেই আত্মচেতনার ভাবাকাশে জাতীয়তার দীপ্ত সূর্য জেগে উঠেছিল। হেমচন্দ্র সেই জাতীয়তাবোধের নব উদ্‌গীতা। প্রিন্স-অব-ওয়েলসের আগমনে 'ভারতভিক্ষা', 'ভারতসংগীত', 'ভারত বিলাস', 'ভারতে কালের ভেরী' 'রিপন-উৎসব' প্রভৃতি কবিতা জাতীয় উদ্‌গীতির এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর ছন্দ-ধ্বনিতে ধ'রে রেখেছে। দেশপ্রেমিক কবি দেশের পরাধীনতার গ্লানি বুকে বহন করে ছন্দের মাধ্যমে তপ্ত গৈরিক প্রবাহ বইয়ে দিয়েছেন। একদিকে কবিপ্রাণে পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা, অন্যদিকে দেশপ্রেমের শঙ্খে উদ্বোধনের উদাত্ত সংগীত।

'ভরত বিলাপ' কবিতায় কবির মর্মযাতনা এইভাবে ফুটে উঠেছে—

ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ-বীণা-ঝংকার,
বাজিত গরজে উথলি আবার
উঠিল ভারত ব্যথিত প্রাণ !

চারণ কবির দৃপ্তকণ্ঠ নিয়ে 'ভারতসংগীতে' কবি গেয়ে উঠলেন—

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ-বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

কবির সমস্ত অনুভবের মধ্যে যে-চেতনা, যে-ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা ধীরে ধীরে নিশীথ রাত্রির পুষ্পসৌরভের মত বিস্তার লাভ করছিল, তাই গীতি রসোচ্ছল স্বতঃস্ফূর্ততায় যেন ফেটে পড়লো; আর আমাদের শিরায় শিরায় বয়ে গেল জাগরণের মাদকতায় ভরা শোণিত প্রবাহ।

'কালচক্র' কবিতাটিতে কবি কালের গতিধারার সাথে আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি কত জাতির উত্থান পতন ঘটলো, তারই একটি যেন চিত্ররূপ দিয়েছেন। কিন্তু শেষে দেশপ্রেমের বেদীভূমিতে বেদনাশ্রু ঢালবারও বাসনা জেগেছে।—

আয় মা জননী আয়,
ল'য়ে তোর মৃত কায়,
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া।

'ভারতে কালের ভেরী' কবিতায় ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ বর্ণনার সঙ্গে কবির ব্যথিত মানব অশ্রুর স্বাক্ষরও আছে।

নবীনচন্দ্রের 'সায়ংচিন্তা' 'ভগ্নাশ বিদেশী', 'ভারত উচ্ছ্বাস' প্রভৃতি কবিতায় দেশপ্রেমের দৃপ্ত কণ্ঠ উদাত্ত হ'য়ে উঠেছে। 'সায়ংচিন্তা' কবিতায় কবি আক্ষেপ ক'রে বলেছেন—

ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর,
কেন পড়িলাম আহা, কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়, আর্যবংশ কীর্তিচয়,
কেন দেখিলাম, আহা কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর ?

এ যেন কবি হৃদয়ের গৈরিক নিঃস্রাব। কবির পলাশীর যুদ্ধের মোহন-লালের বিলাপের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। 'ভগ্নাংশ বিদেশী'তে জন্মভূমির সঙ্গে বিচ্ছেদ-বেদনায় কবি যেন বড়ই কাতর হ'য়ে পড়েছেন। এই কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়ার স্মৃতির একটি সুন্দর রূপকল্পও দিয়েছেন—

দুলিছে সৌন্দর্য তব স্মৃতির গলায়,
দোলে যথা নবলতা সহকার গায়।

কবি তাঁর হৃদয়ের স্মৃতির গলায় এক অপরূপ রূপ সৌন্দর্যের মালা গেঁথে জীবনের বসন্ত দিনে আমাদের সকলকেই যেন দেখিয়ে যাচ্ছেন।

বিশ্রুত কীর্তি সাহিত্যিক ও কবির তিরোধানে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়েই শোকগীতির অশ্রুঅর্ঘ্য নিবেদন করেছেন; দু'জন কবিরই বেদনা-বিহ্বলতা অশ্রুগাঢ় অজস্রতায় ছন্দের পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। রামগতি ন্যায়রত্ন হেমচন্দ্রকে বলেছেন—'অন্তরীক্ষের কবি।' সেই পরিচয়টি তাঁর গীতি কবিতায়ও পরিস্ফুট হয়েছে—যখন দেখি মধুসূদনের মৃত্যুতে 'স্বর্গারোহন' কবিতায় কবি প্রথমেই লিখলেন—

"খোল খোল দ্বার   খেলে দ্রুতগতি
হিরণ্ময় জ্যোতি যার।"
বলিল কৃতান্ত   ডাকি অনুচরে
মুখেতে প্রীতির ভার।

নিজ দরিদ্র জীবনের করুণ ইতিহাসটিও শেষের দুইটি ছত্রে বিষাদমলিন অনুযোগের ভঙ্গীতে উঁকি দিয়েছে—

হায় মা, ভারতি,   চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে ?
যেজন সেবিবে   ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হ'বে।

নবীনচন্দ্রেরও 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতাটি অশ্রুমেঘের সজলতায় যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি বেদনামুখর।

হা অদৃষ্ট কবিবর ! এই কি তোমার
ছিল হে কপালে ?
মধুসূদনের হায়,   শুনে বুক ফেটে যায়,
এই পরিণাম বিধি লিখেছিল ভালে ?

*   *   *   *   *

রাজ্য বিনিময়ে আহা   কেহ নাহি পায় তাহা
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ !

পৌরাণিক ভাবধারার সঙ্গে কবি হেমচন্দ্রের ধর্মভক্তি এসে মিশেছে 'কাশী দৃশ্য', 'মণিকর্ণিকা', 'বিশ্বেশ্বরের আরতি' 'বিন্ধ্যগিরি', 'দুর্গোৎসব' 'ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা' প্রভৃতি কবিতায়। ধর্মভাবের যে-মানসিকতা কবিপ্রাণে আছে, এগুলিকে অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবা:

ধর্মপ্রবঞ্চার অতিরেক অনেকগুলি কবিতাকে কবি হিসাবে সার্থকও হ'তে দেয় নি। নবীনচন্দ্রের এই ধরণের খণ্ড কবিতা বড় একটা নেই। পৌরাণিক ভাবধারা অবলম্বনে 'অশোকবনে সীতা' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন মাত্র। তাও শেষে দেশপ্রেমের এক মানসভূমিকা সৃষ্টি করেছে।

ইংরাজী রোমাণ্টিক কবিদের প্রভাব হেমচন্দ্রের যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাদের মত ভাবগভীরতার স্বাক্ষর তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে নি,—প্রকাশ সৌকর্যও মাঝে মাঝে ছন্দের সাবলীলতায় চরিতার্থতা দাবী করতে পারে না। তাঁর কবিতায় মাঝে মাঝে কল্পনার বিশালতার সঙ্গে মনন চেতনা এসে মিশেছে এ-ঠিক, কিন্তু শিল্প চেতনা তার অনুসঙ্গী হ'তে পারে নি। নবীনচন্দ্রের মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাসের অতিরেক ছিল বলেই তাঁর আখ্যায়িকা-কাব্যের মধ্যেও, বিশেষ ক'রে 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'রৈবতক'-কাব্যে—সংগীতের প্রবেশলাভ ঘটেছে। নবীনচন্দ্রের পক্ষে এ না হ'য়ে উপায় ছিল না।

হেমচন্দ্রের আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে, তা' ব্যঙ্গ রসাত্মক। কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতা সেকালে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর কাব্য-ভাবনায় গুরু গম্ভীর দিক বেশি ছিল বটে, তবুও কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতায় তাঁর হাস্যোচ্ছল কবিমানব পরিচয় পাওয়া যায়। 'হায় কি হলো, 'নেভার নেভার,' 'বাজিমাৎ', 'রেলগাড়ি', 'বাঙালীর মেয়ে', 'দেশালয়ের স্তব' এগুলি ব্যঙ্গরসের আবেদনে ভরপুর হ'য়ে আছে। 'নেভার নেভার' কবিতার আরম্ভটি হাসি ও ব্যঙ্গের চমক নিয়ে দেখা দেয়—

গেল রাজ্য গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রানশান, কেশুঘির মিলার—
নেটিভের কাছে থাড়া নেভার নেভার।
নেভায় সে অপমান হতমান বিবিজান,
নেটিভে পাবে সন্ধান আমাদের 'জানানা' ?

বিবিজান! দেহে প্রাণ! কথনো তা' হ'বে না।

তবে তাঁর ব্যঙ্গ রচনার মধ্যে ধারাবাহিক বর্ণনার অংশই বেশি। Wit অথবা Humour এর মধ্য দিয়ে হাস্যোজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে সাহিত্য-রস পরিবেশনের ক্ষমতা তাঁর খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। নবীনচন্দ্রের এ-ধরণের কবিতা একেবারেই নেই।

সার্থক গীতি কবিতা হিসাবে আমরা যা বুঝি, সেই দৃষ্টিকোণ দিয়ে তুলনামূলকভাবে বিচার ক'রে, হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' ও নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঙ্গিনী'কে সার্থক গীতি কবিতার পর্যায়ে স্থান দেওয়া চলে না। উভয় কবিরই একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা কামনা ও আনন্দ বেদনা প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে আবেগকম্পিত স্বরে আত্মপ্রকাশ করেছে বটে, আত্মবিমুগ্ধ প্রাণ স্পন্দনের পরিচয়ও পাওয়া যায়,—কিন্তু সার্থক গীতিকবিতার সে-সংগীত মাধুর্য ও গতি-স্বাচ্ছন্দ্য তার অভাব আছে। হৃদয়াবেগের সূক্ষ্মতর দিকগুলিকে সুরের আবেশ-স্নিগ্ধতায় অভিসিঞ্চিত ক'রে দুজনের মধ্যে কেউ সার্থকতর ভাবে ব্যক্ত করতে পারেন নি। উভয় কবির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবনার দিক আছে, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-কম্পিত গীতি-রসের যে-আকুলতা, তার সন্ধান বড় বেশি পাওয়া যায় না। বস্তুমুখী কবি দৃষ্টি বস্তুরসের সন্ধান করেছে বটে, কিন্তু লিরিক-আবেগের অসীম আনন্দে মায়া সৌন্দর্যের আবেশে ভরা সূক্ষ্ম ভাবলোকে তাঁদের কবি-কল্পনার জন্য আশ্রয়ভূমি রচনা করতে পারেনি। হেমচন্দ্রের সহজ ভাব-প্রবণতা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সেই ভাব ও উচ্ছ্বাস কেবল বর্ণনাতেই পর্য-বসিত হয়েছে; সূক্ষ্ম ও ভাবময় গীতিসৌন্দর্যের মধ্যে সত্যকার রসপরিণতি লাভ করার যেন সুযোগ পায় নি। সমগ্র বিশ্বব্যাপারকে বস্তুরূপে না দেখে একটি অপরূপ সংগীতের মত তাঁরা অনুভব করতে পারেন নি বলেই গীতি কবিতা হিসাবে তাঁদের কবিতা সার্থক হ'য়ে ওঠেনি। তা'ছাড়া, মহাকাব্য রচনার সে-বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীটি তাঁদের ছিল, তাও এই দিক দিয়ে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটিয়েছে বলে মনে হয়। অতিরিক্ত বস্তুনিষ্ঠাই আত্ম-নিষ্ঠার সহজ প্রকাশকে উচ্ছল হ'তে দেয় নি।

তবে গীতিকবি হিসাবে নিয়ম বস্তুর প্রাচুর্যের দিক দিয়ে, আত্মগত ভাবকল্পনার বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে হেমচন্দ্রকেই একটি বিশেষ স্থান দিতে হয়। নবীচন্দ্রের উচ্ছ্বাস প্রবণতা ছিল, আবেগ ছিল, কিন্তু গীতিকবিতা সুলভ বিষয় বৈচিত্র্য ছিল না। নবীনচন্দ্রের ভাবাবেগে সংযম না থাকায়, গীতিকবিতাগুলি ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্যে ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ হ'তে পারেনি। এই-দিক নিয়ে একটু যদি তিনি সজাগ থাকতেন, তবে বাঙলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের উপরেই তাঁর আসনটা নির্দ্দিষ্ট হ'তো।

শেষ বয়সে অন্ধ হওয়ায় যে-একটি বিষদ গভীর আত্মভাবনা হেমচন্দ্রের মধ্যে জেগেছিল, তাতে তার অনেকগুলি কবিতা একটি লিরিক-মাধুর্য লাভ করেছে।

তবে একটি কৃতিত্ব নবীনচন্দ্রের উপরে সব চেয়ে বেশি আরোপ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীযুগে প্রবহমান পয়ারের যে-ছন্দটি আবিষ্কার ক'রে বাঙলা কবিতার ছন্দদেহে নূতন প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, নবীনচন্দ্র তাঁর 'ভগ্নাংশ বিদেশী' কবিতায় সেই ছন্দটির রূপচর্যা একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী দিয়ে যেন আগেই ক'রে গিয়েছিলেন। যথন সেই কবিতার রূপকে এইভাবে ফুটতে দেখি—

বসি' তব প্রেম ক্রোড়ে ধরিয়া গলায়,
কাতর করুণ স্বরে বলিব তোমায়
দুঃখের কাহিনী যত; নয়ন-আমারে
'চিত্র করি' দেথাইব সকলি তোমারে।

তথন মনে হয়, মিলযুক্ত পয়ারের মধ্যে অসম যতি প্রয়োগ করার রীতি-সৃষ্টির দিক দিয়ে নবীনচন্দ্রই যেন পথিকৃৎ। এইদিক দিয়ে নবীনচন্দ্র গীতিকবিতার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মৌলিকতা দাবী করতে পারেন।






শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

ষ্টকহলমে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রেজিল ৫—২ গোলে সুইডেনকে পরাজিত ক'রে জুলেস রিমেট কাপ জয়ী হয়েছে। ব্রেজিলের পক্ষে এই প্রথম জুলেস রিমেট কাপ জয়। ফাইনালে খেলার মাঠে ৫০,০০০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল। ব্রেজিলিয়ান খেলোয়াড়রা অনবদ্য খেলা দেখিয়ে জুলেস রিমেট কাপের সঙ্গে দর্শকবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। জলসিক্ত পিচ্ছল মাঠ থাকা সত্ত্বেও ব্রেজিলিয়ান খেলোয়াড়দের কদাচিৎ ভুল খেলতে দেখা যায়। দক্ষ শিল্পীর মতই ব্রেজিলের খেলোয়াড়রা খেলার ধারাকে সৌষ্ঠবময় ক'রে তুলেছিল। তাদের খেলার নিখুঁত পদ্ধতি দর্শকদের কাছে ধারণাতীত ছিল। ১৯৫০ সালের ব্রেজিলিয়ান দলের থেকে এ বছরের দলটি কোন অংশে দুর্ব্বল ছিল না। কিন্তু নির্ম্মম ভাগ্যবিড়ম্বনায় ১৯৫০ সালে ব্রেজিল জুলেস রিমেট কাপ জয়ী হতে পারেনি। ফাইনালে তারা পরাজিত হয়। ১৯৩৮সালের প্রতিযোগিতায় ব্রেজিল ব্রোঞ্জপদক লাভ করে। ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরিয়ান দলের কাছে গোড়ার দিকে ব্রেজিলকে হেরে যেতে হয়।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

ফাইনাল : ব্রেজিল—৫ : সুইডেন—২

ফ্রান্স ৬—৩ গোলে পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত ক'রে ব্রোঞ্জ পদকলাভ করে।

সেমি-ফাইনাল : সুইডেন—৩ : পশ্চিম জার্মানী—১ ; ব্রেজিল—৫ : ফ্রান্স—২

কোয়ার্টার ফাইনাল : সুইডেন—২ : রাশিয়া—০ ; নদার্ণ আয়ারল্যাণ্ড—০ : ফ্রান্স—৪ ; পশ্চিম জার্মানী—১ : যুগোস্লাভিয়া—০ ; ব্রেজিল—১ : ওয়েলস—০

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ফলাফল

(১৯৩০ সালে প্রথম আরম্ভ। প্রতি চতুর্থ বৎসরে অনুষ্ঠিত হয়)

১৯৩০ উরুগুয়ে—৪ : আর্জেন্টিনা—২

১৯৩৪ ইটালী—২ : চেকোশ্লোভাকিয়া—১

১৯৩৮ ইটালী—৪ : হাঙ্গেরী—২

১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে খেলা হয়নি

১৯৫০ উরুগুয়ে— : ব্রেজিল—

১৯৫৪ জার্মেনী—৩ : হাঙ্গেরী—২

ইংলণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ড ঃ

লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ডের ২য় টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ইংলণ্ড এক ইনিংস এবং ১৪৮ রানে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। পাঁচদিনের খেলা তিনদিনে সমাপ্ত হয়। প্রথম টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ২০৫ রানে জয় লাভ করে।

ইংলণ্ড : ২৬৯ (কাউড্রি ৬৫)

নিউজিল্যাণ্ড : ৪৭ (লক্ ১৭ রাণে ৫ এবং লেকার ১৩ রাণে ৪ উইকেট) ও ৭৪ (লক্ ১২ রাণে ৪ উইকেট)।

১৯৫৮ সালের উইম্বলডন লন্ টেনিস

১৯৫৮ সালের উইম্বলডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে অনেক অঘটন ঘটনা ঘটেছে। পুরুষদের সিঙ্গলস, মহিলাদের সিঙ্গলস এবং মহিলাদের ডাবলসে

পূর্ব্বঘোষিত একনম্বর বাছাই খেলোয়াড়রা জয়ী হয়েছেন বটে, কিন্তু পুরুষদের ডাবলস ফাইনালে এক নম্বর জুটী অ্যাসলি কুপার এবং নীল ফ্রাসার (অষ্ট্রেলিয়া) 'unseeded' সুইডিস জুটির কাছে হেরে যান। মহিলাদের ডাবলস খেলায় বাছাই একনম্বর জুটীর সঙ্গে unseeded জুটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। মিক্সড ডাবলসের খেলায় বাছাই এক নম্বর জুটি উঠতেই পারেনি। ২নং বাছাই জুটির সঙ্গে ৪নং বাছাই জুটির খেলা হয়, ৪নং জয়ী হয়।

পুরুষদের সিঙ্গলস : অষ্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ান এ্যাসলি কুপার ৩—৬; ৬—৩, ৬—৪, ১৩—১১ গেমে নীল ফ্রাসারকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন। কুপার গত বার ফাইনালে হেরে যান।

পুরুষদের ডাবলস : সেভেন ডেভিডসন এবং উলফ্ স্মিমিট (সুইডেন) ৬—৪ ; ৬—৪, ৮—৬ গেমে ১নং জুটি এ্যাসলি কুপার এবং নীল ফ্রাসারকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : ১নং বাছাই খেলোয়াড় এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ৮—৬, ৬—২ গেমে এঞ্জিলা মর্টিমারকে (বৃটেন) পরাজিত করেন। এই নিয়ে আমেরিকা উপর্যুপরি ১৫ বার মহিলাদের সিঙ্গলস খেতাব লাভ করলে।

মহিলাদের ডাবলস : একনম্বর বাছাই জুটী এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) এবং মেরিয়া ইস্থার বুইনো (ব্রেজিল) আমেরিকান জুটী মিসেস মার্গারেট ডু পণ্ট এবং মিস মার্গারেট ভার্ণারকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : ৪নং বাছাই জুটি আর এন হো এবং মিস এল কগ্‌লন (অষ্ট্রেলিয়া) ২নং জুটি সি কুর্ট নেলসন (ডেনমার্ক) ও মিস এ্যালথিয়া গিবসনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ভারতীয় জুটি নরেশকুমার এবং রামনাথন কৃষ্ণান পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্য্যন্ত খেলেছিলেন। তাঁরা কোয়ার্টার ফাইনালে এ বছরের ডাবলস জয়ী সুইডেনের এস ডেভিডসন এবং উলফ্ স্মিমিটের কাছে হেরে যান। নরেশকুমার এবং কৃষ্ণানের জুটি গত বছরের উইম্বলডন ডাবলস বিজয়ী গার্ডনার মুলয় এবং বাজপেট্টিকে ৩—৬, ৬—৪, ৬—২, ৩—৬, ৭—৫ গেমে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। সিঙ্গলস খেলার ৪র্থ রাউণ্ডে কৃষ্ণান ৮নং বাছাই খেলোয়াড় বেরী ম্যাক্‌কের কাছে হেরে যান। পুরুষদের সিঙ্গলসে ৬জন ভারতীয় খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন—রামনাথন কৃষ্ণান, নরেশকুমার, নরেন্দ্রনাথ, আকতার আলি, প্রেমজিৎলাল এবং উদয়কুমার।

১ম রাউণ্ডের খেলায় হেরে যান নরেন্দ্রনাথ, প্রেমজিৎলাল এবং উদয়কুমার। ২য় রাউণ্ডে পরাজিত হন নরেশকুমার এবং আকতার আলি।

ক্যালকাটা ফুটবল লীগ ঃ

ক্যালকাটা ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগের খেলায় মোহনবাগান ক্লাব ২২টা খেলায় ৩৪ পয়েণ্ট পেয়ে বর্ত্তমানে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে আছে। দ্বিতীয় স্থানে আছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব—২১টা খেলায় ৩১ পয়েণ্ট। ৩য় স্থানে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব—২১টা খেলায় ৩০ পয়েণ্ট। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে পয়েণ্টের দিক থেকে ৩য় স্থানে থাকলেও তাদের অনেকগুলি খেলা এখনও বাকি আছে। তাদের ১৯টা খেলায় ২৯ পয়েণ্ট হয়েছে। সুতরাং লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের পাল্লায় তাদের নিরাশ হবার কিছু নেই।

লীগে উপরের ৪টি দল

	খেঃ	জয়	ড্র	পরা	স্বঃ	বিঃ	পঃ
মোহনবাগান	২২	১৩	৮	১	৩৫	১২	৩৪
মহঃ স্পোর্টিং	২১	১২	৭	২	৩৬	১২	৩১
ইষ্টবেঙ্গল	২১	১১	৮	২	২৬	৭	৩০
ইষ্টার্ণ রেল	১৯	১৩	৩	৩	৩২	১৪	২৯

এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ

ভারোত্তোলন

ফেদার ওয়েট : ১ম লি টাক ইয়ং (কোরিয়া), ২য় ইরান, ৩য় জাপান; ৩৪৫ কেজি (৭৬০·৫ পাউণ্ড)-নতুন রেকর্ড।

লাইট ওয়েট : ১ম টান হো লিয়াং (সিঙ্গাপুর), ২য় জাপান, ৩য় ইরাণ। ৩৭৫ কেজি (৮২৬ পাঃ)—নতুন রেকর্ড।

ফ্লাইওয়েট : ১ম কোরিয়া, ২য় ইরান, ৩য় জাপান

ব্যাণ্টমওয়েট : ১ম জাপান, ২য় ইরান, ৩য়—

মিডল ওয়েট : ১ম কে ইউ মিং (ফর্মোসা), ২য় ইরান, ৩য় জাপান। ৩৮০ কেজি—নতুন রেকর্ড

লাইট হেভী ওয়েট : ১ম মীর্জালাল মোনসৌরী (ইরান), ২য় জাপান, ৩য় কোরিয়া। ৪০০ কেজি—নতুন রেকর্ড

মিডল হেভী ওয়েট : আর এম হোসেন (ইরান), ২য় কোরিয়া, ৩য় মালয়। ৪৩২·৫ কেজি (৯৫৩ পাঃ)—নতুন রেকর্ড

হেভী ওয়েট : পি এ ফিরাগ (ইরান), ২য় দঃ কোরিয়া, ৩য় জাপান। ৪৬০ কেজি (১,০১৩½ পঃ)—নতুন রেকর্ড

কুস্তি

ফ্লাই ওয়েট : ১ম জাপান, ২য় ইরান, ৩য় পাকিস্তান; ব্যাণ্টম ওয়েট : ১ম জাপান ২য় পাকিস্তান, ৩য় ইরান; লাইট ওয়েট : ১ম ইরান, ২য় জাপান; ফেদার ওয়েট : ১ম জাপান, ২য় পাকিস্তান, ৩য় ইরান; মিডল ওয়েট : ১ম জাপান; লাইট-হেভী ওয়েট : ১ম ইরান।

সাহিত্য সংবাদ

প্রজ্ঞাপারমিতা ঃ অজিতকৃষ্ণ বসু

বইখানি বেশ লম্বা চৌড়া। ওজনে ভারি। দেখতে সুশ্রী। প্রচ্ছদপটের উপরে বৌদ্ধ দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার চমৎকার একখানি চিত্র আঁকা। সেই ছবির সঙ্গে বইয়ের নাম মিলে যাচ্ছে দেখে দৃঢ়-বিশ্বাস হয়েছিল যে এখানি নিশ্চয় পতনোন্মুখ বৌদ্ধযুগের তন্ত্র-প্রভাবিত দেবদেবীর আমলের অবলোকিতেশ্বর বজ্রযোগিণীর মতো প্রজ্ঞাপারমিতার মাহাত্ম্য বর্ণনা মূলক একখানি গ্রন্থ। বইখানি পড়বার কোনো তাগিদ আসেনি তাই মন থেকে। যদিও ধর্মালোচনার বয়স হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু সাহস হয়নি ওই সবচেয়ে জটিল ও কুটিল পথে পা বাড়াবার। সংসারে যত বিরোধ, যত বিবাদ সেত ওই ধর্ম নিয়েই ঘটেছে। তাই ওপথে পা বাড়াতে ভয় পাই।

কিছুদিন আগে অসুখে শয্যাগত হয়ে পড়েছিলুম। রোগ যেমন দেহকে দুর্বল করে তেমনি মনকেও কাহিল করে ফেলে। মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে পরলোকের চিন্তা করে। পরাজ্ঞানের সন্ধান লাভে উৎসুক হয়। প্রজ্ঞাপারমিতার একটা আভিধানিক অর্থ হল 'জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা!' ভাবলুম, প্রজ্ঞাপারমিতা তো আমার ঘরেই রয়েছে একবার নেড়ে চেড়ে দেখাই যাক না যদি কিছু জ্ঞানলাভ হয়।

বই পড়তে শুরু ক'রে কিন্তু অবাক হয়ে গেলুম। এতো অবনত বৌদ্ধযুগের পরিকল্পিত দেবী 'প্রজ্ঞাপারমিতা' সম্বন্ধে রচিত পুঁথি নয়! এযে দিব্য সুখপাঠ্য অথচ জ্ঞানগর্ভ একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস! অনাথ পিণ্ডদ চৌধুরীর অসামান্যা সুন্দরী ও অশেষ গুণবতী কন্যা কুমারী প্রজ্ঞাপারমিতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অতি আধুনিক জগতের মানব সমাজ, মানব জীবন ও মানব চরিত্রের এক বিরাট ইতিহাস। এযে সংসার চলচ্চিত্রের এক সজীব চলন্তি ছবি!

আপ্‌শোস হল, আমি মলাট দেখে এ বইখানিকে এতদিন ভুল বুঝে এসেছি। যারা মলাট দেখে বইয়ের সমালোচনা লেখেন তাদের ঠকাবার পক্ষে এ বইখানির বাহ্যরূপ চমৎকার! প্রজ্ঞাপারমিতা যাঁরা মন দিয়ে পড়বেন তাঁরা বুঝবেন গ্রন্থকার হাল্‌কা হাতে আলগা কলমে অবসর বিনোদনের জন্য বইখানি লেখেননি। এরমধ্যে রয়েছে তাঁর দীর্ঘ পরিশ্রম লব্ধ জ্ঞান ও মানব জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধুর সমন্বয়।

প্রজ্ঞাপারমিতাকে ঘিরে চলেছে এ বইয়ের মধ্যে কত যে নর-নারীর সাধারণ ও অসাধারণ জীবন যাত্রার নব নব মিছিল যা এ সংসারে থেকেও আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়, কিন্তু দ্রষ্টার দৃষ্টিতে যে সেগুলি ধরা না-পড়ে পারেনা তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া গেল এ' বইখানির মধ্যে। সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে যে ক'খানি শ্রেষ্ঠ বই পাঠক ও সমালোচক মহলে একটা সাড়া জাগিয়ে তুলতে পেরেছে, যেমন দৃষ্টিপাত, জাগরী, কত অজানারে, মরুতীর্থ-হিংলাজ, লৌহকবাট ইত্যাদি, আলোচ্য বইখানিও যে এই শ্রেণীরই সাহিত্য ভাণ্ডারের এক অমূল্য সম্পদ,—পড়তে পড়তে বারবার এই কথাই মনে হচ্ছিল, আর ভাবছিলুম এ বইখানির বাজারে আজও সেরকম 'বুম' হচ্ছে না কেন? হয়ত এর মূলে রয়েছে এই নাম বিভ্রাট। এর ঐতিহাসিক পরিচয়টাই সুলভ, আভিধানিক অর্থটা উপেক্ষিত। এর ভাষা, এর লিপি চাতুর্য, এর গল্প বলার সরস ভঙ্গী, এর বিবিধ বিচিত্র চরিত্র চিত্রণ, এবং নানা উপজীবিকার ও নানা রূপের নরনারীর মনস্তত্ত্বমূলক অন্তরের নিখুঁত ছবি, যা একমাত্র খানকয়েক নামকরা বিলিতি বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়, 'প্রজ্ঞাপারমিতা' বাংলা সাহিত্যে সেই শ্রেণীর একটি অভিজাত রচনা, যা সাহিত্য ভাণ্ডারের এক চিরন্তন ঐশ্বর্য বলে গণ্য হবে। এর মধ্যে কত যে অগণিত মণিমুক্তা ছড়ানো রয়েছে আশা করি তা একদিন পাকা জহুরীদের নজরে পড়বেই।

[প্রকাশক:—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম ৬৲ টাকা]

নরেন্দ্র দেব

তৃষ্ণা ঃ ফ্রাঁসোয়া সাগঁ ঃ অনুবাদ—কল্পনা রায়

সাম্প্রতিক কালে অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় সাধন করার যে প্রচেষ্টা চলেছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অনুবাদে যতখানি নিষ্ঠা ও সততা প্রত্যাশা করা যায় ঠিক ততখানি আমরা পাই না। এমন অনেক অনুবাদ চোখে পড়ে যার অনেক স্থলেই মূলের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই। মূলের ভাবধারা ও সৌন্দর্য্য যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক অনুবাদকই বিশেষ সচেতন নন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একখানি সম্প্রতি প্রকাশিত ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদ যে বাজার প্রচলিত সাধারণ অনুবাদের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত একথা বলতে পেরে আনন্দ অনুভব করছি। মূল উপন্যাসের নাম Bonjour Tristesse—রচনা করেছেন ফ্রাঁসোয়া সাগঁ নাম্নী অষ্টাদশ বর্ষীয়া এক ফরাসী তরুণী। এক মধ্যবয়স্ক বিপত্নীক ভদ্রলোক, তাঁর দুই বান্ধবী এবং যুবতী কন্যাকে নিয়ে উপন্যাসের আখ্যান বস্তু গড়ে উঠেছে। আশ্চর্যজনক বাস্তবতা ও সত্যকথনের

নির্ভীকতার জন্য উপন্যাসখানি প্রকাশিত হওয়ামাত্র সারা ফরাসী দেশে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই প্রায় পাঁচ লক্ষ কপি বিক্রীত হয়। সত্যকথনের দুঃসাহস ও মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণের গুণে বইখানি যে পাঠককে চমৎকৃত করে দেবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। বাঙলা ভাষায় এ গ্রন্থের অনুবাদ করে শ্রীমতী কল্পনা রায় বাঙালী পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন।

[প্রকাশক: আর্ট এণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স। জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২। দাম—৩৲।]

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

ছড়া ও ছবিতে A B C D: হরেন ঘটক

আলোচ্য গ্রন্থখানির পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়েছে। বহুবিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে বা কিণ্ডারগার্টেনে এই গ্রন্থখানি পড়ানো হয়। ১৯৫৬ সালের সর্ব্বভারতীয় মুদ্রণ ও প্রকাশন প্রতিযোগিতায় শিশু সাহিত্যে ভারত সরকার এটিকে পুরস্কৃত করেছেন।

ছড়া ও ছবির মাধ্যমে ইংরেজী বর্ণপরিচয় দেওয়ার নবতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করে প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও কবি হরেন ঘটক আজ সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

'অ'য় অজগর আসছে তেড়ে' মত 'Ass চলেছে পিঠে বোঝা'—এমিভাবে ছড়া রচনা করে আর তার সঙ্গে বর্ণাঢ্য জন্তু জানোয়ারের চিত্র দিয়ে শিশুদের মনে প্রচুর আনন্দের পরিবেশন করা হয়েছে। 'এ' থেকে 'জেড্' পর্য্যন্ত বর্ণমালাগুলি ছড়া ও ছবিতে সুন্দর রূপ ধারণ করেছে তা ছাড়া ইংরেজী উচ্চারণে যে সর্ব্বসাধারণ ভুল থেকে যায়, গ্রন্থকার সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়ে অক্সফোর্ডের উচ্চারণ রীতি-সম্মত নির্ভুল উচ্চারণ যাতে ছেলেমেয়েদের মুখে শোনা যায় আলোচ্য গ্রন্থে তারও ব্যবস্থা করেছেন। যেমন monkey শব্দের উচ্চারণ 'মাঙ্কি'—'মঙ্কি' নয়। শব্দ চয়ন, ছন্দ ও বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে প্রখ্যাত গ্রন্থকার তাঁর ছড়া রচনার প্রসিদ্ধিকে এগ্রন্থেও অব্যাহত রেখেছেন। এরূপ শিক্ষার বই এদেশে সুলভ নয়।

[প্রকাশক: বামা পুস্তকালয়। ১১এ, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা—১২। মূল্য—১'১৩ নয়া পয়সা।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কালের মন্দিরা" (৩য় সং)—৩'৫০

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত উপন্যাস "কার্টুন" (৪র্থ সং)—২'৫০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "স্বামী" (৩১শ সং)—১'২৫, "চন্দ্রনাথ" (উপন্যাস—৩০শ সং)—১'৫০, "নিষ্কৃতি" (উপন্যাস—৩৪শ সং)——১'৫০, "শুভদা" (১০ম সং)—২'৫০

নতুন রেকর্ড

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 87545—বটুক নন্দী ইলেকট্রীক গীটার বাজিয়েছেন চমৎকার।

N 87546—আলীআমেদ শানাইয়ে রেশমী শালোয়ার সুর বাজিয়েছেন।

কলম্বিয়া

GE 24871—জনপ্রিয় শিল্পী শচীন গুপ্ত গেয়েছেন দুখানা গান "অশোক বনের বন্দিনী গো" ও "জ্যোছনা বিছানো আঙিনায়"। গান দুখানাই ভাল হয়েছে।

GE 24872—কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিমূলক দুখানা অনবদ্য গান গেয়েছেন। গান দুখানা "হৃদি বৃন্দাবনে" ও "হরি তোমার মাতৃরূপ।"

GE 24873—"এক মেঘের" ও "ঘুমভাঙা রোদ্দুরে" দুখানা আধুনিক গান গেয়েছেন শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 30381—'আমি বড় হবো' কথাচিত্রের দুখানা গান "ফিরে আয় ফিরে আয়" ও "সাতটী চাঁপা শুনছো কি" যথাক্রমে গেয়েছেন দুজন জনপ্রিয় শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও গীতশ্রীসন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

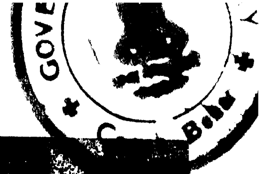
GE 30382—"কড়ি ও কোমল" বাণীচিত্রের দুখানা গান "যায় দিন যায়" ও "অস্ত আকাশে" গেয়েছেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ভুপেন হাজারিকা এবং লতা মুংগেশকর।

GE 30383—'কড়ি ও কোমল' বাণীচিত্রের আর দুখানা গান "ফাগুন মিতালীর স্বপ্ন জাগে" দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছেন আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন মজুমদার। অপর গানখানা "তীর বেঁধা পাখী" চমৎকার গেয়েছেন লতা মুংগেশকর।

GE 30384—'অন্তরীক্ষ' বাণীচিত্রের দুখানা গান "পী আয়ারে" ও 'তরস্ তরস্ গ্যয়ে নয়ন' গেয়েছেন যথাক্রমে প্রতিমা ব্যানার্জী এবং প্রতিমা ও স্বরূপলতা।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

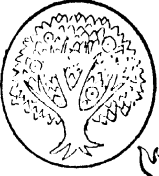
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

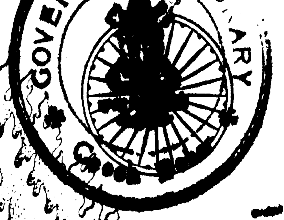


শিল্পী : শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

কৃষ্ণ-লীলা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্









ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৬৫

প্রথম খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

বাঙালী মধ্যবিত্তের ভবিষ্যত

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

াঙলার বর্তমান [illegible] তের ধারক ও বাহক এবং ারতের নব[illegible] অন্যতম [illegible]থিকৃৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত ম্প্রদায়ের [illegible] ইতিহাস খুব বেশী প্রাচীন নয়। ভারতে ংরেজের আগমনের পূর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব একটা ল্লেখযোগ্য [illegible] ছিল বলে মনে হয় না। আজকের ধ্যবিত্ত [illegible] সৃষ্টির মূলে একাধিক কারণ কাজ করেছে। াথমতঃ [illegible] জমিদারী প্রথার কথা ধরা যেতে পারে। রস্থায়ী [illegible] বর্তনের পর বাঙলার আর্থিক জীবনে ক [illegible] উদ্ভব হ'ল। এঁরা হচ্ছেন জমিদার, ালু[illegible] পত্তিদার ইত্যাদি নানাবিধ মধ্যসত্ত-ভোগীর দল। ভূমিকর্ষণকারী কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে রাজকোষে জমা দেবার ক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে এঁদের অবস্থিতি।

মধ্যবিত্তদের দ্বিতীয় ধারার সৃষ্টি হ'ল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, বিভিন্ন নীলকর, চা-কর প্রতিষ্ঠান ও অপরাপর ব্যবসায় বাণিজ্য এবং হৌস ও কুঠির কার্যকলাপের সম্প্রসারণের ফলে। এই সব কার্য পরিচালনার জন্য বহুলসংখ্যক কেরানী, বাবু, মুৎসুদ্দি ইত্যাদির প্রয়োজন হ'ল। ফলে বাঙলার একটি বিশিষ্ট অংশ এই সব জীবিকা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থা ফিরিয়ে নিলেন এবং এঁদের ভিতর কেউ

কেউ আবার চাকুরী দ্বারা অর্জিত অর্থ নিয়োগ করে জমিদারী ইত্যাদি কিনে প্রথমোক্ত মধ্যবিত্তের সংখ্যার স্ফীতি ঘটালেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ব্রীটিশ রাজত্বের পত্তন হ'ল। এর প্রধান কেন্দ্র তখন ছিল বাঙ্গলাদেশ। কলকাতা সে সময় ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী। ব্রিটীশ রাজদণ্ড পরিচালনা ও তার ভিত্তিমূল দৃঢ় করার জন্য বহুসংখ্যক সরকারী কর্মচারী প্রয়োজন। সাধারণ শাসন বিভাগ ছাড়াও সামরিক বিভাগেও বাঙালীরা প্রবেশ করলেন। অবশ্য "বেসামরিক" জাতি রূপে গণ্য হওয়ায় প্রত্যক্ষ ফৌজী কার্যকলাপে বাঙালীরা অন্যান্য প্রদেশবাসীর তুলনায় অধিক সংখ্যায় প্রবেশ করেননি; কিন্তু কমিসারিয়েট ও দেশ রক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরোক্ষ (non-active) সমরবিভাগীয় চাকুরী নিয়ে বাঙালীরা বাঙলার বাইরে সুদূর পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু, ডেরা ইস্মাইল খাঁ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এইভাবে ব্রিটীশ শাসনের ছত্র-ছায়াতলেও বেশ একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাঙালী মধ্যবিত্তদের পুষ্টি ঘটল।

বাঙালী মধ্যবিত্তদের তদানীন্তন পরিস্ফীতি ও পরিব্যাপ্তিতে অতুলনীয় সহায়তা করল ইংরাজী শিক্ষা। মহাত্মা রামমোহন প্রমুখ বাঙলার নবযুগ প্রবর্তকবৃন্দের দুরদৃষ্টি এবং উদ্যমের ফলে প্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিশ্রমে বাঙলার মানসলোকে রোনেসাঁর জন্ম হ'ল। এর সঙ্গে সঙ্গে এই পাশ্চাত্য শিক্ষা বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের পরিপুষ্টিরও সহায়ক হ'ল। দেশের রাজা ইংরেজ এবং রাজকীয় কার্যকলাপ পরিচালনার মাধ্যম ইংরাজী ভাষা। অধিকাংশ বণিক ইংরেজ এবং তাই তাদের হৌস ও কুঠির কাজকর্মও ইংরাজীতে চলে। ইংলণ্ড থেকে কেরাণী ও বাবুদের কাজের জন্য লোক নিয়ে আসা ব্যয়বহুল। তাই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত এতদ্দেশীয়দের চাহিদা সরকারী দপ্তরখানায়, বণিক্‌দের কুঠি ও হৌসে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। এর ফলে ইংরাজী শিক্ষারও প্রসার ঘটতে লাগল। দুপাতা ইংরেজী পড়লেই সাহেবদের কাছে চাকরী পাওয়া যায় এবং সে চাকরীর মাইনে যাই হোক না কেন, আয় প্রচুর। অতএব ইংরেজী শেখার হু হু করে স্কুল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং নবীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর্ষণই নয়, নিছক আর্থিক লাভের প্রেরণাও যে এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের মূলে কাজ করেছে—এ কথা বললে নিশ্চয় সত্যের অপলাপ হবে না। প্রত্যুত উপরের মুষ্টিমেয় সুসংস্কৃত মনের অধিকারীদের কথা বাদ দিলে সর্বসাধারণের পর্যায়ে ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের মূলে যে এই আর্থিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ইংরাজী শিক্ষার কল্যাণে এক দিকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী কর্মচারী এবং কুঠিয়াল সাহেবের বাবুরূপে বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রাচুর্য দেখা দিল এবং অন্যদিকে শিক্ষক অধ্যাপক ইত্যাদিদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে তারাও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়তনকে স্ফীতকায় করতে লাগলেন। দেশে ইংরেজী আইনকানুন চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার ইত্যাদির সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালীর জন্য তাহারাও মধ্যবিত্ত সমাজের এক বড় অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

বাঙালী মধ্যবিত্তদের বৃত্তিগত প্রকার ভেদ সত্ত্বেও একটি জায়গায় এদের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য বিদ্যমান, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চরিত্র-ধর্ম অভিন্ন। মধ্যবিত্তদের কেউই প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক সম্পদ উৎপাদন করেন না। সামাজিক-সম্পদ উৎপাদনকারী কৃষক ও শ্রমিকবর্গ দ্বারা উৎপন্ন শ্রমের একাংশ ব্যবস্থাপক বা দালাল রূপে গ্রহণ করেই তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একদা তাই এই সব বৃত্তিকে নদীর এক কূল ভেঙ্গে অপর কূল গড়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সংখ্যায় অতীব অল্প বলে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, অভিনেতা ইত্যাদি বৃত্তির কথা উল্লেখ না করলেও এঁদের চরিত্র-ধর্মও পূর্ণ মাত্রায় মধ্যবিত্ত।

(২)

জন্মের পর থেকে প্রায় দেড় শতাব্দী কাল পর্যন্ত সময় বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বর্ণ যুগ বলা যায়। এই সময়ে বাঙালী মধ্যবিত্তদের বিজয় রথ ভারতের কোণে কোণে জয় পতাকা উড়িয়ে বেড়িয়েছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি—সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর কৃতিত্ব অবিসম্বাদী ছিল। রাজনীতি এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও এঁরা ছিলেন অদ্বিতীয়। প্রত্যুত একদা এই শ্রেণীর সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষের জন্যই শোনা গিয়েছিল, বাঙলা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে চরম বিকশিত রূপ, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত অভিমতকে কোন মতেই স্তোকবাক্য আখ্যা দেওয়া যায় না।

কিন্তু বিগত তিন চার দশক থেকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের গৌরব-রবি পশ্চিম গগন-মুখী হতে আরম্ভ করে। প্রথমে এটা চোখে না ঠেকলেও আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে বাঙালী মধ্যবিত্তদের ক্ষয়িষ্ণু রূপ স্পষ্টতঃ দৃষ্টি-গোচর। এই মারাত্মক ক্ষয়কে আর অস্বীকার করার উপায় নেই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে যাঁদেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁরাই আজ স্বীকার করবেন যে বাঙলার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবার ন্যূনতম পুষ্টিকর আহার্য পায় না,তারা প্রায় অর্ধাশনে দিনাতিপাত করছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিগত কয়েক দশকে বাঙালী মধ্যবিত্তদের উল্লেখযোগ্য অবদান নেই। সর্ব ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম থাকে, এ কথা মেনে নিয়ে উপরের উক্তি করা হচ্ছে। রাজনীতির আসরে যে বাঙালী আর ভারতের পথিকৃৎ নেই—এ কথা অন্ধ বাঙালী-ভক্তকেও আজ মানতে হয় এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও যে বাঙালী মধ্যবিত্তদের গর্ব করার মত কোন কারণ নেই, তা আজ আর কারও অজানা নেই। মনে হয় এক কালের চরম প্রগতিশীল ও উন্নত বাঙালী মধ্যবিত্ত আজ যেন সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে কোন ক্রমে আত্মরক্ষার জন্য কোণ খুঁজছে। এই দেড় শতাব্দীর মধ্যেই কি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে? ইতিহাসে এমন বহু প্রগতিশীল সভ্যতার বিবরণ পাওয়া যায়, যারা কাল ধর্মে ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বাঙালী মধ্যবিত্তদের বর্তমান জীর্ণ দশা কি সেই মহতী বিনষ্টির সূচনা?

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য—বাঙালী মধ্যবিত্তদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আলোচনা করা হলেও তার পূর্বে বর্তমান ক্ষয়রোগের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করা। রোগের কারণ আবিষ্কৃত হলে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে চিন্তা করা সহজসাধ্য হয়। বিগত তিন চার দশকের ভিতর বাঙলার আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে, যার প্রভাব বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রতিকূল হয়েছে।

ভারত তথা বাঙলায় শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে। এক আধজন বাঙালী ধনী সুদূর-প্রসারী পরিবর্তনের বাহন এই ভারতীয় শিল্পবিপ্লবে পুঁজিপতিরূপে অংশ গ্রহণ করলেও সাধারণভাবে সমগ্র বাঙালী অভিজাত সমাজ বাঙলার অর্থ-ব্যবস্থাকে সামন্ত-বাদের পরিবর্তে শ্রমশিল্প-আধারিত করার কোন সচেতন প্রচেষ্টা করেননি এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে বৃহত্তর বাঙালী জাতি এই শিল্প বিপ্লবের ভবিষ্যত সম্বন্ধে অচেতন বা অজ্ঞ ছিল। আমি শ্রম শিল্পের কারণে উদ্ভূত শ্রমিক সমাজের দানা বাঁধার ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করছি। নূতন নূতন কলকারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষিত বা[illegible]কর্মচারীদের পদের জন্য উমেদার হওয়া ছাড়া গায়ে খে[illegible]জুরী করার প্রতি বাঙালীদের কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। অথচ যে কোন আধুনিক শ্রমশিল্প বা ব্যবসায়ে বাবুশ্রেণীর চাকুরীয়ার তুলনায় মজুরের প্রয়োজন বহুগুণ অধিক। তাই বাঙলাদেশ ভারতীয় শ্রম শিল্প ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হলেও বাঙলার কল কারখানায় বাঙালী মজুরদের সংখ্যা নগণ্য বলা চলে। এর কারণ খুঁজতে গেলে ইংরাজী শিক্ষার দায়িত্ব অনেকটা এসে পড়ে। কিন্তু সে সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বভারতীয় সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রাধান্য হ্রাসের সূত্রপাত হ'ল। কলকাতায় রাজধানী থাকার ফলে এতদিন বাঙালীরা তাদের ন্যায়সঙ্গত অংশেরও অতিরিক্ত যে সব সুযোগ সুবিধা এই ক্ষেত্রে পেয়ে আসছিলেন, এবার থেকে তার অবসানের সূচনা হ'ল। কারণ অন্যান্য প্রদেশও এবার ন্যায়সংগতভাবে ইংরেজ শাসনের প্রসাদের দাবী জানাতে লাগল। বর্তমান উত্তর প্রদেশের অংশ বিশেষ নিয়ে আগ্রা ও অযোধ্যা সংযুক্ত প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হল এবং দিল্লী রাজধানী হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যা এক পৃথক প্রদেশরূপে বাঙলা থেকে আলাদা হয়ে গেল। ঐ ভাবে আসামও পরে এক স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে পরিগণিত হ'ল। অতএব

স্বাভাবিক ভাবে ঐ সব প্রদেশের চাকরী ইত্যাদি সরকারী সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রাধান্য হ্রাস গেল! বাঙালী মধ্যবিত্তকে তাদের মধ্যবিত্ত-সুলভ পেশার জন্য মূলতঃ বাঙলার উপরই নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। কারণ ক্রমশঃ ঐ সব প্রদেশেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল এবং স্বভাবতই তাঁরা ক্ষমতাধিরূঢ় বাঙালীদের নিজেদের মাথা তোলার প্রধান অন্তরায় স্বরূপ দেখতে পেলেন। বাঙলার প্রতিবেশী প্রদেশসমূহে তথাকথিত "বাঙালী বিরোধিতার" একটি মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থার এই পট পরিবর্তন।

অবশেষে এল বঙ্গ-বিভাগ। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ ব্যবচ্ছেদের ফলে পুরাতন বাঙলার এক তৃতীয়াংশ মাত্র এলাকা লইয়া পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হল এবং এই স্বল্পপরিসর এলাকায় এল প্রায় চল্লিশ লক্ষ উদ্বাস্তু। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। [illegible] দেশে মহাত্মা রাম-মোহনের পর থেকে যে নব যুগের সূত্রপাত হয়, তার প্রধান ধারক ও বাহক ছিল বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায়। নানা কারণে বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর তাই হিন্দুদেরই একচ্ছত্র প্রতিপত্তি ছিল। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে বাঙলা তথা ভারতের ব্যবচ্ছেদের পিছনে যে মুসলীম সাম্প্রদায়িকতা কাজ করেছিল, তাকে প্রেরণা জোগাবার কাজে নব জাগ্রত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের বিরাট অবদান ছিল। যাই হোক বাঙলা বিভক্ত হ'ল এবং পূর্ব বঙ্গ থেকে যে সব উদ্বাস্তু এলেন, এঁদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত। এঁরা মূলতঃ ছিলেন ভূমির উপর মধ্যসত্বভোগী অথবা মুসলমান ও নমঃশূদ্র ইত্যাদি সম্প্রদায়ের দ্বারা ভাগ-চাষ করিয়ে নিজেদের ভরণ পোষণ নির্বাহকারী। যে সব চাষী উদ্বাস্তু হয়ে এলেন, শীঘ্র পুনর্বাসনের জন্য জমি ও কৃষির অন্যবিধ সুবিধা না পাওয়া ইত্যাদি সরকারী ত্রুটী, অনেক রাজনৈতিক দলের প্ররোচনা এবং সর্ব শেষে দীর্ঘ দিন যাবত খয়রাতী সাহায্যের উপর নির্ভর করে থাকার পরিণাম-স্বরূপ কর্মবিমুখতার কারণে এঁরাও অনুৎপাদক পেশা গ্রহণ করলেন। লজেঞ্চুস, বিস্কুট বা আচার মোরব্বা ট্রেনে ফেরী করা অথবা ফুটপাথে ছোটখাট দোকান করায় কোন জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি হয় না। ফলে অখণ্ড বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ এলাকাকে আজ এক রকম সমগ্র বাঙলার মধ্যবিত্তদের পালন পোষণের ভার সইতে হচ্ছে।

জমিদারী উচ্ছেদ হবার ফলে পশ্চিম বাঙলার মধ্যবিত্তদের উপর আর এক আঘাত এসে পড়েছে। রাজস্ব-আদায় ক্রিয়ার মধ্যবর্তীরূপে যে সব মধ্যবিত্ত জমিদার বা ঐ জাতীয় লোক মধ্যসত্বভোগীরূপে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন, তাঁরা বৃত্তিচ্যুত হয়েছেন। সোজাসুজি বেনামী করে বা কোথাও কোথাও কো-অপারেটিভের ছদ্মাবরণে সিলিং অর্থাৎ ভূমির উচ্চতম সীমা নির্ধারণের আইনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলেও এ আর বেশীদিন চলবে না। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটাধিকার দেবার ফলে জাগ্রত কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় এখন ক্রমশঃ অধিকাধিক মাত্রায় রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রযত্ন করবেন। দেশের অধিকাংশ ভোটার দরিদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তারা ক্রমশঃ এটা বুঝতে শিখছে যে এ যাবত তারা বঞ্চিত ছিল। তাই তাদের স্বার্থ নিঃসন্দেহেই রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করবে। অনুরূপ কারণের জন্যই ভাগচাষী আইন ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে।

ইংরাজী শিক্ষার কথা সর্বশেষে উল্লেখ করলেও মধ্য-বিত্তদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য এর দায়িত্ব সমধিক গুরুত্ব-পূর্ণ। বর্তমান শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে চারু চর্চামূলক (aca-demic)। সুতরাং এই শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী পেশা হিসাবে মধ্যবিত্তের বৃত্তি ছাড়া অন্য যে কোন রকম কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে এই ধরণের পেশার একটা সীমা আছে! অর্থাৎ এ পেশায় যথেচ্ছ কর্মক্ষম নরনারীকে কর্মে নিয়োগ করা যায় না। তাই একদা যে ইংরাজী শিক্ষা মধ্যবিত্তদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, বিগত ত্রিশ চল্লিশ বৎসরে তা-ই তার শ্রীহীনতার কারণ হল। একদিকে যেমন মধ্যবিত্তসুলভ জীবিকার সমৃদ্ধ অবস্থা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ইংরাজী শিক্ষা নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে তেমনি চাকরী দ্বারা বাবুদের অনায়াসে স্বচ্ছল জীবনযাপন ও ইংরাজী শিক্ষিতদের মনে শ্রম ও শ্রমিকদের প্রতি ঘৃণা বাঙলার কৃষক ও মজুর সমাজের ভিতর ভদ্রলোক হয়ে মাটি কাদার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কাজ করার উপায়স্বরূপ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে মধ্যবিত্তদের আনুপাতিক হার বেড়েই চলেছে।

একশত বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনার পর থেকে বাঙলা দেশে প্রচণ্ড গতিতে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। বাঙলা দেশে বর্তমানে (সদ্য হস্তান্তরিত পুরুলিয়া ও কিষণগঞ্জ এলাকা বাদ দিলে) বোধ হয় এমন কোন মহকুমা নেই যেখানে একটি কলেজ নেই এবং প্রতিটি থানায় একাধিক হাইস্কুল আছে। এক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রতি বৎসর প্রায় এক লক্ষ যুবক যুবতী পোস্ট গ্রাজুয়েট থেকে আরম্ভ করে স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত পরীক্ষাগুলিতে উত্তীর্ণ হয়। এ ছাড়া অন্তত: এর দেড়গুণ বেশী ছাত্র-ছাত্রী এই সব পরীক্ষায় ফেল করে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর এই কয়েকলক্ষ যুবক-যুবতী মধ্যবিত্তদের প্রচণ্ডতম সমস্যা—শিক্ষিত বেকারদের বিশাল বাহিনীর পরিপুষ্টি সাধন করে। এ কথা নিশ্চয় বলাই বাহুল্য যে শিক্ষিত বেকারের আদমশুমারীর দৃষ্টিকোণ থেকে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। গত ২৯শে নভেম্বর বাঙলার বিধান সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রমমন্ত্রী জানান যে পশ্চিম বংগের শহরাঞ্চলে মোট বেকারের সংখ্যা ১১লক্ষ। এর ভিতর একমাত্র কলকাতা ও অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে মধ্যবিত্ত বেকার ২৪৯,৯০০ এবং অন্যান্য শ্রেণীর বেকার ২১৫,১০০ জন। গ্রামাঞ্চলের পূর্ণ ও আংশিক বেকারদের সংখ্যা সরকারের দপ্তরে নেই। আর শ্রমমন্ত্রী প্রদত্ত পরিসংখ্যান ও নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ। কারণ সরকারের কাছে একমাত্র এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যাঁরা চাকরীর জন্য নাম লিখিয়েছেন, খুব সম্ভব তাঁদেরই হিসাব রয়েছে। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখান নেই, এমন বহু বেকারও বাঙলা দেশে রয়েছেন। বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের আর একটি তথ্যের কথাও স্মরণ রাখতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একমাত্র সরকারী খাতে ৪,৮০০ কোটী টাকা ব্যয় করার পরও পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হলে বেকারের সংখ্যা যথাপূর্বং রয়ে যাবে এ কথা পরিকল্পনা প্রণেতাগণ সখেদে স্বীকার করেছেন। নিত্য-বর্ধমান জনসংখ্যাকে এর জন্য তাঁরা দায়ী করলেও এ স্বীকৃতিতে সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা নেই। যাই হোক বর্তমানের এই বহু লক্ষ বেকারের সঙ্গে প্রতি বৎসর প্রায় দেড় বা পৌনে দুই লক্ষ মধ্যবিত্ত চারিত্র-ধর্ম বিশিষ্ট শিক্ষিত বেকারদের জন্য মধ্যবিত্তসুলভ কর্মের সংস্থান করা বর্তমান সরকার তো দূরের কথা, যে কোন সরকারের সাধ্যাতীত। বাঙলা দেশের যাবতীয় কল-কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত কর্ম-নিয়োগ ক্ষমতা এবং সরকারের শক্তি যোগ করলেও প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতি বজায় রেখে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কেউ এ জাতীয় অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিলেও কোন কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তি রাজনৈতিক দলসমূহের এ রকম অসম্ভব প্রতিশ্রুতির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন না।

ক্রমবর্ধমান স্কুল কলেজের দ্বারা শিক্ষিতের অতি-উৎপাদন হবার ফলে আর একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে যেমন অর্থনীতিতে মধ্যবিত্তসুলভ চাকুরীর সংখ্যার তুলনায় কর্মপ্রার্থী মধ্যবিত্তের সংখ্যা বহুগুণ অধিক, অন্য দিকে তেমনি মজুরদের তুলনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীয়াদের বেতন হার বৃদ্ধির পরিমাণও কম। এর সঙ্গে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম যুক্ত হবার ফলে মধ্যবিত্তদের অবস্থা জাঁতিকলে পিষ্ট মুষিকের মত। মধ্যবিত্তদের সংখ্যা প্রয়োজনাতিরিক্ত বলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পরিভাষায় থাকে "পার্জেসিং পাওয়ার" বলে, মধ্যবিত্তদের ভিতর তার স্বাভাবিক স্বল্পতা এসেছে। একটি কর্মখালি হলে মালিক পক্ষ যদি হাজার হাজার দরখাস্ত পান, তাহলে কীসের জন্য ঐ পদপ্রার্থীর বেতন বৃদ্ধি করতে যাবেন? অর্থাৎ যখন মধ্যবিত্তদের সংখ্যা কম ছিল, তারা কৃষক ও শ্রমিকদের কাঁধে বসে যা পেতেন তাতে স্বচ্ছলভাবে চলে গেলেও এখন ভাগীদার অনেক হওয়ায় কারও আর পেট চলছে না।

(৩)

মধ্যবিত্তের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে এইবার বিবেচনা করে দেখা যাক যে গত তিন চার দশক কালের মধ্যে উপরিউক্ত যে সব কারণের জন্য বাঙালী মধ্যবিত্তদের গৌরব রবি অস্তমিত হওয়া আরম্ভ করে, ভবিষ্যতে তার সমাধানের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা? কারণ রোগের মূল যথাপূর্ব রয়ে গেলে রোগীর আরোগ্যলাভ করার সম্ভাবনা থাকে না।

কিছুদিন যাবত বাঙালী যুবকরা কিছু কিছু করে কলকারখানায় শ্রমিকদের কাজ করা শুরু করলেও সমগ্র বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনে এখনও নিজেদের শ্রমজীবীতে রূপান্তরিত করার তেমন কোন সচেতন আগ্রহ দেখা দেয়নি। এত আর্থিক বিপর্যয় সত্ত্বেও বাঙলা দেশে অবাঙালী মজুরদের মোট সংখ্যা বা এমন কি আনুপাতিক হার বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। কেবল কলকাতা, হাওড়া বা আসানসোলের মত শ্রমশিল্প কেন্দ্র এবং তার উপকণ্ঠ এলাকাই নয়, বাঙলার সুদূর পল্লী অঞ্চলেও অবাঙালী শ্রমিকরা ক্রমশঃ অধিকসংখ্যায় সমবেত হচ্ছেন। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী; বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর ইত্যাদি বাঙলার পশ্চিম দিকস্থ জেলা সমূহে ধান রোপন ও কাটার সময় বিহারের সংলগ্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার আদিবাসী শ্রমিক গিয়ে কাজ করে থাকেন। বস্তুতঃ বাঙলার ঐ সব এলাকার কৃষি কর্ম এই সব বিহারাগত শ্রমিকদের উপর নির্ভরশীল—এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। রেল স্টেশন থেকে দশ বার মাইল দূরে মেদিনীপুর জেলার একেবারে গ্রামাঞ্চলে জেলা বোর্ডের রাস্তা তৈরীর কাজে শত শত মধ্য প্রদেশীয়-নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের কাজ করতে দেখেছি। স্মরণ রাখতে হবে যে এ কাজের ঠিকাদাররা বাঙালী হলেও তাঁরা অবাঙালী মজুর নিয়োগ করেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শোনা যাবে যে প্রথমতঃ বাঙালী মজুরের অভাব এবং দ্বিতীয়তঃ বাঙালী মজুররা বেশী পারিশ্রমিক নিলেও কাজ করে অপেক্ষাকৃত কম। বাঙলার গ্রামাঞ্চলে ইদানীং বাঙালী মাঝি, মুচি, মেথর, ধোপা, নাপিত ইত্যাদির সংখ্যা হাতে গুণে বার করা যায়। এ সব বৃত্তির অধিকাংশই এখন অবাঙালীর হাতে। রিক্সা চালকের পেশায় উদ্বাস্তুরা কিছু সংখ্যায় আত্মনিয়োগ করলেও পশ্চিম দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ির মফঃস্বলের ছোট ছোট শহরেও এ কাজ মূলত অবাঙালীদের হাতে।

বিহার, উড়িস্যা এবং আসাম প্রমুখ বাঙলার প্রতিবেশী প্রদেশসমূহের সরকারী চাকরী বা লাইসেন্স, পারমিট, কনট্রাক্ট ইত্যাদি সরকারী প্রসাদপুষ্ট পেশায় বাঙালীদের প্রাধান্য লাভের আর কোন সম্ভাবনা নেই। ঐ সব প্রদেশের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্তরা সর্বশক্তি প্রয়োগে এ প্রচেষ্টায় বাধা দেবেন; কারণ এর সঙ্গে তাঁদের অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কিছুসংখ্যক চাকরী জনসংখ্যার অনুপাতে পেলেও বাঙালী মধ্যবিত্তদের বিপুল চাহিদার তুলনায় তা নগণ্য। বাঙালী ছাত্ররা যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না, এ তো সকলেই জানেন। আর পারলেও এতে কয় জনের সমস্যার সমাধান হবে ?

অদূর ভবিষ্যতে যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দু মধ্যবিত্তরা সেখানে ফিরে যেতে পারবেন, এ রকম কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বরং পূর্ববঙ্গে যে কয়জন হিন্দু মধ্যবিত্ত আছেন, তাঁদের এদিকে চলে আসার আশঙ্কাই অধিক। আর কোন মতে মাটি কামড়ে থাকার কথা ভাবলেও সেখানে মধ্যবিত্তরূপে তাঁদের বাঁচায় পথ কোথায় ? পূর্ববঙ্গ সরকারও ক্রমশঃ কৃষি থেকে মধ্যসত্ত্ব বিলোপের ব্যবস্থা করছেন এবং এই সব আইনের প্রথম শিকার হবেন হিন্দু মধ্যবিত্তরা।

পশ্চিম বাঙলায় জমিদারী প্রথা আর পুনঃ প্রবর্তিত হবে না এবং ভাগচাষী ও জমিতে প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকর্ম করে ফসল উৎপাদনকারী কৃষি শ্রমিক ইত্যাদিদের অধিকারও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যে কোন দলের সরকারকে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এই ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রগতিশীল আইন কানুন তৈরী করতে হবে।

পূর্বেই দেখান হয়েছে যে উৎপাদনমূলক শ্রমের সম্পর্করহিত কেবল চারুচর্চামূলক জ্ঞানাধারিত আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অতি-অনুশীলনের ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে এবং প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রেখে এ সংখ্যা হ্রাসের কোন উপায় নেই।

বাঙলার বৃহৎ ব্যবসায় বাণিজ্য যে অবাঙালীদের করায়ত্ত—একথা সর্বজনবিদিত। অদূর ভবিষ্যতে এক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রাধান্যের কোন আশা নেই। মূলধন, অভিজ্ঞতা এবং সংগঠন শক্তির অভাব ও এক্ষেত্রের কায়েমী স্বার্থ শীঘ্র বাঙালীকে এখানে মাথা তুলতে দেবে না। ছোট খাট দোকান বা ব্যবসায়ের অবস্থাও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। শহরাঞ্চলের কথা বাদ দিলেও পল্লী বাঙলার প্রত্যন্ত প্রদেশে এই সব ব্যবসায় ক্রমশঃ অবাঙালীদের কুক্ষীগত হয়ে যাচ্ছে, তা চোখে পড়ছে।

তাহলে কঃপন্থা? এইবার একটি নিষ্ঠুর সত্য উচ্চারণ করতে হবে। কথাটি যতই অপ্রিয় হোক এবং উট পাখীর মত অলীক আশার বালুকা স্তূপে মুখ গুঁজে যথার্থ অবস্থাকে যতই আমরা অস্বীকার করার চেষ্টা করি না কেন, নগ্ন সত্য হচ্ছে এই যে মধ্যবিত্ত হিসাবে বাঙালী মধ্যবিত্তের সামনে কোন ভবিষ্যতই নেই। অর্থনীতির বর্তমান রূপ বজায় থাকলে সংখ্যার অতিবৃদ্ধির কারণ মধ্যবিত্তদের জীবন রসের অভাবে শুকিয়ে মরতে হবে। উৎপাদক শ্রেণী, অর্থাৎ কৃষক মজুররা অধিকতর পরিমাণে শোষণের ভার সহ্য করতে অপারগ। আর উৎপাদকরা যদি মার্কসীয় পদ্ধতি গ্রহণ করে, তাহলে তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে অবশেষে ধনিকদের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তদেরও কাঁধ থেকে ফেলে দেবে। দ্বিতীয় পন্থাতেও মধ্যবিত্তদের নিষ্কৃতি নেই—শ্রেণী সংগ্রামের রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রবাহে তাদের অস্তিত্ব মুছে যাবে। অর্থাৎ মহাকাল মধ্যবিত্ত বাঙালীর কপালে মৃত্যু পরোয়ানা অঙ্কিত করে দিয়েছেন।

(৪)

কিন্তু কোন ভবিষ্যতই নেই কি? আছে, তবে তা মধ্যবিত্ত হিসাবে নয়। মধ্যবিত্তদের শ্রমিক সমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ গান্ধীজী যাকে শ্রেণী পরিবর্তন বলতেন, বাঁচতে হলে মধ্যবিত্তদের সামনে তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা আজ আর মুষ্টিমেয় আদর্শবাদ পাগলদের অলস কল্পনার বিষয় নয়; কালের দাবী এ। আর সমাজে যদি একটিমাত্র শ্রেণী থাকে, তবে নিঃসন্দেহেই তা হবে উৎপাদকদের শ্রেণী। কারণ এই একটিমাত্র শ্রেণীরই অন্য-নিরপেক্ষ-ভাবে জীবিত থাকার ক্ষমতা আছে। তাই মধ্যবিত্তদের সময় থাকতে প্রাচীরের লিখন পাঠ করে নিজেদের ভিতর যুগোপযোগী পরিবর্তন সংসাধন করতে হবে। মজুর হওয়া এখন আর কোন দয়া দাক্ষিণ্য দেখানর ব্যাপার নয়, নিছক জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই আজ মধ্যবিত্তদের শ্রমিক সমাজে বিলীন হতে হবে। প্রসিদ্ধ গান্ধীপন্থী মনীষী সর্ব সেবাসঙ্ঘের সভাপতি ধীরেন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কথায় বলতে গেলে, "মধ্যবিত্তদের সম্মুখে এবার কর্তব্য নির্ধারণের অন্তিম লগ্ন সমুপস্থিত। কাপড় চোপড় নোংরা হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় তাঁরা যদি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে উৎপাদনমূলক শ্রম থেকে দূরে থাকেন, তবে যে ধোপ-দুরস্ত কাপড় বাঁচাবার জন্য তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা, তাঁদের সে কাপড় তাঁদেরই শরীরের রক্তে লাল হয়ে যাবে। নিজের রক্তপাত করার চেয়ে মাটি কাদা মাখা নিশ্চয় অপেক্ষাকৃত সহজ কার্য।"

গান্ধী-শিষ্য বিনোবাজী তাঁর ভূদান-যজ্ঞ আন্দোলন দ্বারা মধ্যবিত্তদের এক মহৎ উপকার সাধন করছেন। বর্তমান ভারতে কেবল বাঙালী মধ্যবিত্ত নয়, সমগ্র দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে বিনোবাজীর চেয়ে বড় সুহৃদ আর কেউ নেই, প্রেম ও শান্তির পথে তিনি আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভূদান, গ্রামদান, সম্পত্তিদান, বুদ্ধিদান ও শ্রমদান ইত্যাদি কার্যক্রম দ্বারা এক দিকে শ্রেণীসংঘর্ষ-মূলক হিংস্র আন্দোলনের সম্ভাবনা লোপ করে মধ্যবিত্তদের অস্তিত্ব রক্ষা করার পথ করে দিচ্ছেন এবং অন্য দিকে মধ্যবিত্তদের ধীরে ধীরে স্বীয় জীবন পরিবর্তনের সুযোগ দিচ্ছেন। অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে মধ্যবিত্তদের পক্ষে এক ঝটকায় শ্রমিক হওয়া অসম্ভব। ভূদানের পথে ষষ্ঠাংশ থেকে শুরু করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সম্পত্তি সমাজের কর্তৃত্বাধীনে আনার কার্যক্রম থাকায় মধ্যবিত্ত সমাজ জীবন পরিবর্তনের জন্য বেশ কিছুটা সুযোগ পাচ্ছে। ইতিহাস এর চেয়ে বেশী সুযোগ মধ্যবিত্তদের দেবে বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্য মধ্যবিত্তদের স্বর্ণযুগের অভ্যুদয় হয়েছিল, মজুর হয়ে তা কি বিসর্জন দিতে হবে? তা ছাড়া মধ্যবিত্তদের দ্বারা সংস্কৃতির চর্চা হবার ফলে মানব সভ্যতাও তো এক কদম এগিয়ে গিয়েছিল। সবাই মজুর হলে সভ্যতার বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হবে না কি? এর জবাবে বলা হবে যে গান্ধীজী কর্তৃক কল্পিত মজুর আজকের শ্রমিকদের মত বুদ্ধি-চর্চার সম্পর্ক রহিত হবে, এ কথা ধরে নেবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল বুদ্ধিজীবী এবং শ্রম-জীবী নামক দুটি কৃত্রিম শ্রেণীর বিভাজন বিলুপ্ত করে বুদ্ধি-যুক্ত শ্রমিকের এক শ্রেণী প্রবর্তন করা। আজকের শ্রেণী-বিভাজনকে এই জন্য কৃত্রিম বলা হচ্ছে যে এ প্রথা প্রকৃতি-ধর্ম-বিরুদ্ধ। প্রকৃতির এক অলঙ্ঘ্য নিয়মই হচ্ছে এই যে প্রকৃতি অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে স্বতঃই বর্জন করে। বুদ্ধি-

জীবী ও শ্রমজীবী নামক দুই শ্রেণী যদি প্রকৃতির কাম্য হোত, তাহলে প্রকৃতি এক দল মানুষকে কেবল মস্তিষ্ক দিয়ে এবং অপর দলকে কেবল পেশী দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাত। কিন্তু প্রতিটি ব্যক্তির মস্তিষ্ক ও পেশী থাকার অর্থই হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকেরই উভয়বিধ বৃত্তির বিকাশ সাধন করাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য। এই বৃত্তিদ্বয়ের বিকাশের পারস্পরিক হারে মানুষের ভিতর উনিশ বিশের তারতম্য হতে পারে; কিন্তু দুটিকে একেবারে আলাদা করে দেওয়া প্রকৃতির ধর্ম নয়। বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে সমৃদ্ধ গান্ধীজী প্রকৃতির এই মূল সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তাঁর নূতন শিক্ষা পরিকল্পনা বা নঈ-তালিমের প্রবর্তন করেছিলেন। বর্তমানে অনেক জায়গায় গান্ধীজীর নাম দিয়ে যে সব বুনিয়াদী বিদ্যালয় চলছে, তা দেখে গান্ধীজীর শিক্ষাদর্শের বিরূপ সমালোচনা করলে চলবে না। এগুলি আদর্শের বিকৃতি। গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল উৎপাদনমূলক কর্মের মধ্যমে শিশুকে জ্ঞান দান করা এবং শিক্ষাকাল থেকেই সহযোগিতামূলক জীবনচর্যার মাধ্যমে তাকে এক শোষণবিহীন অহিংস সমাজের নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। সরকার গান্ধীজীর শিক্ষা পরিকল্পনার এই সামাজিক বিপ্লব সংসাধনের আদর্শ গ্রহণ না করে কেবল তাঁর বাহ্য কাঠামোর স্বীকার করায় এই বিকৃতি দেখা দিয়েছে। ফলে সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি চারু চর্চামূলক শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা—এতদুভয়ের কোন সদগুণই পায়নি, উভয়ের ত্রুটিই এর মধ্যে দানা বাঁধছে। গান্ধীজী চারুচর্চামূলক নিছক জ্ঞানানুশীলন এবং বৃত্তি মূলক "কেজো" শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিলেন। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উদ্দেশ্যে মস্তিষ্ক অবলম্বন করতঃ তাঁর নঈ-তালিমের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণ করার দ্বারা সুসংস্কৃত মানুষ গড়ার কর্তব্যে নেতৃত্বে গ্রহণ করার ব্যাপারে মধ্যবিত্তরা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

গান্ধীজী কথিত বিকেন্দ্রীয় অর্থনীতি ও মধ্যবিত্তদের পক্ষে খুবই অনুকূল হবে। প্রথমতঃ বেকার সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা বর্তমান ভারতে একমাত্র ক্ষুদ্রায়তন শিল্পভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থারই আছে। ভারতের মত দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার দেশে ভূমি ও পুঁজির মাথা পিছু পরিমাণ এত অল্প বলে অদূর ভবিষ্যতেও আমেরিকা বা রাশিয়ার মত বৃহৎ যন্ত্রশিল্প আধারিত অর্থব্যবস্থা গড়া এখানে সম্ভব হবে না এবং সম্ভব হলেও তা সমীচীন হবেনা। যাই হোক বিকেন্দ্রিত অর্থ ব্যবস্থার মূলাধার কুটীরশিল্পে কাজ করার জন্য অপেক্ষাকৃত কম দৈহিক শ্রমের প্রয়োজন। তাই মধ্যবিত্তদের জীবিকান্বেষণ এবং শ্রেণী পরিবর্তন—উভয় দৃষ্টি থেকেই বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি অত্যন্ত সহায়ক পরিগণিত হবে। কুটীর শিল্পের দ্বারা কর্ম সংস্থানের জন্য পুঁজির প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম বলে বহু মধ্যবিত্ত Self employed কারিগর হিসাবে স্বাধীনভাবে উদরান্নের সংস্থান করতে পারবেন।

সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বাঙালী মধ্যবিত্তদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করলে গান্ধী-পন্থা ছাড়া তাঁদের সামনে আর কোন আশা ভরসার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়না। যুগোপযোগী মানসিক পরিবর্তন তাঁদের ভিতর এসেছে কি—এই প্রশ্নটি বাঙালী মধ্যবিত্তদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের সামনে উত্থাপন করে বক্তব্যের ইতি করা হ'ল।

চরণ-চিহ্ন

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

আমার জীবন নদীর তটের পাঁকের মাঝে মাঝে
তোমার কোমল চরণ-কমল-চিহ্ন পড়ে' আছে।
এই অভাগা নদীর কূলে
যখন তখন মনের ভুলে
একা আসি বাজাও বাঁশি কত সকাল সাঁঝে।
তোমার দুটি পায়ের দাগে
শত শত পদ্ম জাগে
নদীর কূলে ফুলে ফুলে ভ্রমর-বীণা বাজে
আমার জীবন নদীর তটের পাঁকের মাঝে মাঝে।

নদীর জলে তোমার ছায়া
রচে রূপের রঙিল মায়া

ছায়ার ছোঁয়ার হেলায় ভোলায় সকল দুঃখ লাজে।
আমার জীবন নদীর তটের পাঁকের মাঝে মাঝে॥



বাইজীলাল্লের নাতনী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

কছুদিন ধরে লোক নেই কাজ করার, ভারি মুস্কিলে ড়েছি। একে-ওকে বলি, সবাই বলে আনব। কেউ কউ আসেও কিন্তু টেঁকে না, নয়ত আসব বলে আসে । থাকি গণগৌরী দরজার সামনে 'হাওয়া মহলের' পথের পারের পুরাণো বস্তির একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর খানিকটা ড়া নিয়ে। নিচে তার অনেক ভাড়াটে, পুরানো বস্তি লে কিছু সস্তা ভাড়া, সহরের খুব পুরানো জায়গা। হলেও জায়গা ঘিঞ্জি হলেও সামনে অম্বর পাহাড়, নীচে জপ্রাসাদের 'গণগৌরী' দরওয়াজা। সামনে 'হাওয়া হল'। আমার খারাপ লাগত না। আপিসটাও কাছে র। রাজ-এস্টেটের সাধারণ কর্মচারী, মাহিনা কম, ড়ী ভাড়াও কম দিতে হবে বলে ওই পাড়াই বেছে নয়েছিলাম। আমার বাড়ীর মহলটীর ওপরে নিচে যে কত লাক কত ঘরে থাকে আমার জানাও ছিল না।

যাই হোক হঠাৎ আমার আটাপেষা বুড়ী এসে ড়াল।

'মাজী লোক রাখবে?'

তরকারী কুটছিলাম রান্না ঘরে। তাড়াতাড়ি বঁটী কাত রে বেরিয়ে এলাম। কই লোক? কতদিন ধরে খুঁজে রছি, বলে কিনা, লোক রাখবে? কথায় বলে ক্যাঙলা ত খাবি আয়, না হাত ধোবো কোথায়? তাই যেন।

বললাম, 'কই লোক? কতদিন ধরে বলেছি রাখব, স তো জানিস। কাকে এনেছিস? কই সে?'

আটা-পেষাণী বললে, 'রাখবে কিনা জানিনা তো, ই আনি নি। নিয়ে আসছি। কিন্তু তোমাদের ঘরের ত কাজ সে জানে না। কখনো কাজ করেনি জীবনে। শখিয়ে নিতে হবে তোমায়।'

এখন লোক পেলে বাঁচি। শেখানোর দায় সে আমার ইতেই হবে। বললাম, আনতো।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ উপরে উঠে এলো আটাপেষাণীর সঙ্গে একটি ষোলো সতের বছরের মেয়ে—গলা অবধি ঘোমটা দিয়ে। পাতলা গড়ন। হাত পায়ের রং দেখা যাচ্ছিল—বেশ ফরসা।

আটাপেষাণী বললে, 'মাজী এই সেই লোক।'

আমি দ্বিধাভরে চেয়ে রইলাম। বললাম, এযে বড় ছেলে মানুষ মনে হচ্ছে। পারবে কি? আর এত ঘোমটা দিয়েছে কি জন্যে? এখানে তো পুরুষমানুষ কেউ নেই।'

আটাপেষাণী বললে, 'হ্যাঁ তাতো ঠিক, এই 'ঘুংঘট (ঘোমটা) খোল।' সে রাজস্থানী ধরণে দু'আঙুলের ফাঁকে একটা চোখ বের করে আমাদের দিকে চেয়েছিল। একটু অপেক্ষা করে সে ঘোমটাটা খুলে ফেললে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যেন নিমেষের মধ্যেই। রাজস্থানে সুন্দরীর অভাব নেই। কিন্তু ঘোমটার আড়ালে যে এমন একটী অপূর্ব কিশোরী মেয়েকে দেখতে পাব ভাবিনি। ঝি শ্রেণীতেও রাজস্থানী মেয়েদের রূপের—অভাব দেখিনি। কিন্তু এমন মেয়ে! এতো ঘাটেপথে যেখানে সেখানে দেখা যায় না।

অবাক ভাবটা সামলে নিয়ে আটাপেষাণীকে বললুম, 'বড় ছোট মেয়ে। যেন কিছু জানে না, একি কি করে কাজ করবে রে?'

কিন্তু চোখের দৃষ্টি যেন ফেরে না, দেখছি শুধু চেয়ে চেয়ে। কি দেখছি, রং, মুখ চোখ নাক? কোন্‌টা বল্‌ব? সে আপনারা—কল্পনা করে নিন, সেই ভাল। এককথায় যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমনি বিব্রত স্নিগ্ধ অপ্রস্তুত হাসিটী ঝকঝকে দাঁত আর লালটুকটুকে ঠোঁটের মাঝে ফুটে উঠেছে! আমি যেন মুগ্ধ চোখে তাই দেখছি।

'কাঁই দেখেছো? (কি দেখছ)?' জিজ্ঞাসা করলে

আটাপেষাণী। 'কি দেখছি সে আর কি বল্‌ব? বললুম, 'ওকি কাজ পারবে? একেবারে বাচ্চা যে?'

এবারে মেয়েটি বললে, 'হঁ্যা, সব পারব। কি কি করতে হবে বলে দিন, দেখুন না সব পারি কিনা?'

নীচের কল থেকে জল নিয়ে আসা—বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট, মোছা—নানা কাজ সব নাম করলাম। এরকম কাজ—সব জায়গাতেই আছে কিন্তু বাঙালী ধরণে তো। বাসনে কালি থাকবেনা, ঘর মোছা—'ন্যাতা বালতী নিয়ে—কাচা কাপড়ে রান্নার জল ভরে আনা বাঙালীর ঘরে নানা বায়নাক্কা।

সে একটু হেসে ঘাড় নেড়ে বললে, 'সব পারব। তুমি কাপড় দিও, পরে সব কাজ করব।'

'তোর নাম কি?' জিজ্ঞাসা করলাম।

বল্‌লে 'কেশর' (জাফ্‌রাণ)। লালটুকটুকে জাফ-রাণের মতই ঠোঁট আর হাতপায়ের আঙুলগুলির রং। মনে মনে ভাব্‌লাম, নামটা ঠিকই রেখেছে। যদিও রাজস্থানে আমাদের 'লক্ষ্মী দুর্গা" নামের মত 'কেশর' মোহর পদ্মিনী ধরণের নামই খুব বেশী।

আটাপেষাণী তার গমের পরাত নিয়ে নেবে গেল আটা পিষতে। আমাকে বললে—'কাজ তুমি ওকে শিখিয়ে নাও মা এবারে।'

কাজে লাগল কেশর। পরিচয়ও পেলাম। ঐ কচি মেয়ে কেন যে কাজে লেগেছে বুঝতেও পারলাম না। কিন্তু মাথায় বোরলা' (বিয়ের লক্ষণ সোনা বা রূপোর পুঁটে) আঙুলে মেহেদী 'সোহাগ' বা সুভাগ্য-বতীর চিহ্ন। তবে স্বামী-শ্বশুরবাড়ীর ওরা কোথা? ক্রমে পরিচয় পেলাম।

মা বাপ নেই, ঠাকুর্দা ঠাকুমা দিদিমাও নেই।

কে আছে তবে?—আছেন বৃদ্ধা প্রমাতামহী। দিদিমার মা। বুড়ী চোখে কম দেখে এখন, ছানি পড়েছে। ঘরে আর লোক নেই, তাই নাত্‌নীকে বা নাত্‌নীর মেয়েকে কাজে বার করতে হয়েছে। কেশরের বিয়ে হয়েছে বহুকাল। যখন সাতবছরের মেয়ে ছিল। যোধপুরে শ্বশুরবাড়ী, অবস্থাও তাদের ভালো। কিন্তু জামাই সেপাহীতে নাম লিখিয়ে যে কোথায় কোনদেশে চাকরী নিয়ে গেছে ওরা জানে না। জামাইয়েরও সৎমা, বাপ নেই। তারা এর খোঁজ নেয় না। একবার নিয়ে যেতে চেয়েছিল, শ্বশুর থাকতে। এই 'পর' নানী (প্র'-দিদিমা) পাঠায় নি। নিজের জন্যও বটে, মেয়েও ছোট ছিল বলে। গৌনা' (দ্বিরাগমন) হয়নি। এখন বড় হয়েছে, কিন্তু বরও আসেনা তারাও খোঁজ খবর করেনা। ক্রমে কিশোরী কেশরের সঙ্কোচ ভয় কেটে গেল। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাবও হ'ল। কাজও করত—আর বাঙলায় কথা বলারও চেষ্টা করত। গান গাইত খুব ভালো। গলাটি পাখীর মত মিষ্টি ছিল। ঘোমটাটুকু শুধু আমার বাড়ীতেই খুলত। বাইরে সে ঘোমটা নড়ত না, সরত না, নানীর শাসনে। সে নানীই বলত। চোখে ছানিপড়া বুড়ী, তাতে আবার তার দাদামশাইয়ের মা, নিশ্চয়ই অনেক বয়স। দেখতে কেমন—জিজ্ঞাসা করি "তোর নানী বেরোয় না কোথাও" সবাই বলে, কেন রে? কেমন বড় বুড়ো বুঝি?'

সে হাসে—বলে 'হঁ্যা মাজী খুব বুড়ী হয়েছে।' চোখে ঝাপসা দেখে কি না তাই বেরুতে সাহস পায় না।'

কেশরের চাকরী আমার কাছে অনেকদিন হ'ল। বাংলা শিখেছে বেশ। দু'একটা বাংলা কথা কয়, গান গায় আমার মেয়ের সঙ্গে বাংলায়। ওঁর খুব মায়া পড়েছে মেয়েটার ওপর। ছেলেমেয়েরাও খুব ভালবাসে। বলে 'মা; ও আমাদের বোন যেন। ওকে কোথাও যেতে দিওনা—বেশ লেখাপড়া শিখিয়ে বাঙালীর মেয়ে করে নাও।'

আমি হাসি,—'আর ওর বর এলে? শ্বশুরবাড়ী থেকে নিতে এলে? তখন কি করবি?'

তারা চুপ করে যায়। কেশর বলে, আমি যাব না সেই বরের সঙ্গে।' ভাঙা বাংলায় বলে, 'সোসুর বাড়ী ভালো নেই। ছাই।'

আরো দিন যায়। হঠাৎ একদিন সকালে কেশর আর এলো না। বাড়ীর সমস্ত কাজ পড়ে। তাছাড়াও কেন এলো না, কি হ'ল—কাকে দিয়ে খবর নিই। কোন্ দিকে তাদের বাড়ী ঘর তাও জানি না।

ছেলে গেল নিচে আটাপেষাণীর কাছে খবর নিতে। কতক্ষণ পরে—ছেলে ফিরে এলো।

বললে—'মা কেশরের বর এসেছে। দেখতে বেশ সুন্দর গায়ান একটা লোক খাকি সুট পরা—বসে আছে ওদের রের সামনে। আর জানো মা, ওর নানীকেও দেখলাম, ড়ী কি ফর্সা। খাটিয়ায় বসে জামাইয়ের সঙ্গে কথা ইছে। আমাকে দেখে কেশর লুকিয়ে পড়ল। আটা-পষাণী চুপি চুপি বললে, যেন বোলোনা কেশর চাকরী রে তোমাদের বাড়ী।' তাহলে ওরা নিন্দে করবে, য়েও যাবে না হয়ত। বর কেশরকে নিতেই এসেছে। ার চাকরী করবেনা। ছেলে তারপর বললে, 'আর ানো—কেউ কেউ বলছিল এই বাড়ীটি নাকি কেশরের দিমার?'

কেশরকে কেশরের বর নিতে এসেছে—খুবই ানন্দের কথা—আর বেশ ভাল লাগবার কথাও বটে। কন্তু কেন যেন আবার মনটা তবু খারাপ হয়ে গেল। য়েটার ওপর বড় মায়া পড়েছিল সেইজন্যেই হয়তো।

কাজ করতে করতে বললাম—'বেশ হয়েছে। ভালই া—নিয়ে যাবে বইকি। বৌ বড় হয়েছে। আর বাড়ী দের? তাহলে কাজ করবে কেন মেয়েটা। ওসব াজে কথা।...

কেশর আর এলো না। দেখা করতেও না। বে যে সে শ্বশুরবাড়ী গেল, তাও জানতে পারলাম া। ছেলেকেও পাঠালাম না। তারা বাঙালী ছেলেকে খলে সন্দেহ করবে। মেয়েটার লাঞ্ছনা হবে চাকরী রেছিল জানলে। আটাপেষাণী আমাকেও বলে গিয়ে-ইল সেই কথা।

আমিও খুঁজে পেতে 'লোক' পেলাম। তা' সে শুধু কাজেরই লোক। সেতো কেশর নয়—অপরূপা কিশোরীও নয়—চমৎকার কন্যাও নয়।

কাজের মাঝে মাঝে কেশরের কথা ভাবি, বলি সবাই। মার মনে হয়, আহা সে পতিপুত্রবতী হয়ে সুখে াচ্ছন্দে থাকুক। কিন্তু কোথায় কোন্ দেশে তার ঘর? মার কখনো সে আসবে কিনা? এলেও আমাদের সঙ্গে দখা হবে কিনা তাও ভাবি। আবার ভাবি আমরা দি বাঙলাদেশে ফিরে যাই তাহলেও তো আর জীবনে দখা হবে না। কিন্তু এমনিও তো হবে নাই মনে হয়। এমনিই তো হয় পৃথিবীতে।

আরো বোধহয় দেড়বছর গেল। হঠাৎ একদিন রাত্রে আবার আটাপেষাণী এসে বল্লে, মাজী কেশরের নানীর বড় অসুখ একবার তোমাকে ডেকেছে, যাবে কি? সে বলেছে যদি দয়া করে আসেন দু একটা কথা বলবে। তুমি গায়ে চাদর দিয়ে ঘোমটা টেনে চল। কেউ দেখতে পাবে না।'

তখন পর্দার যুগ ওখানে—বাড়াবাড়িও পর্দার। কিন্তু বাঙালীরা আর গেরস্থ মানুষরা তত পর্দা রাখত না। ওই চাদর গায়ে ঘোমটা দিয়ে নানা পালপার্বণে মন্দিরে দেবালয়ে যেতাম।

একটু ভাবলাম। বললাম—'তা' তার আপনার লোকেরা কেউ নেই? কেশর এসেছে? খবর দিয়েছে? আমাকে কি দরকার? আমি কি করব অসুখের? ডাক্তার এসেছে?

আটাপেষাণী হাসলে, 'একি তোমাদের ঘর পেয়েছ যে যাওয়া-আসা 'পীরে' (পিত্রালয়) এত সহজ। এ আমাদের দেশের 'ঘরাণা' ঘর। তাছাড়া ওযে খুব বড় ঘরে পড়েছে। ওর নানীও বড় ঘরের বৌ। আর তোমার ঘরের কথা কেশরের কাছে অনেক শুনেছে, তা তাই হয়ত দেখতে চায়। আর ডাক্তার? কে ডাকবে—কে আছে ওর? একজন বৈদ্যজী আছেন দেখে যান মাঝে মাঝে। ভাবলাম, এ কি রকম হ'ল? চাকরী করতে দিল ছোট্ট মেয়েটাকে। আবার বলে বড় ঘরের মেয়ে বৌ।' কে জানে কি সব ব্যাপার।

'তা আমাকে কেন রে?—আমি তো জন্মে ওকে দেখিওনি। মেয়েটী অবশ্য আমার কাছে ছিল, মায়াও পড়েছিল। তা সুখে থাক নিজের ঘরে সে। আমাকে ডাকে কেন?

উনি বসেছিলেন। ছেলেমেয়েদের বেজায় কৌতূহল—আর দয়াও হচ্ছে সবায়ের। তারা বললে—'যাও না মা, দেখে এসো না বুড়ীকে।'

উনিও বললেন, 'যাও একবার। ডেকেছে, এত লোক থাকতে বাঙালী তোমাকে ডেকেছে কেন। দেখে এসো কি বলতে চায়।' রোগা মানুষ, টাকাকড়ি ধারটার চায় হয়তো।'

পুরানো বস্তির প্রকাণ্ড বাড়ী। তাদের দেওয়ালের

ধরণে আস্ত আস্ত পাতলা পাথরের দেওয়াল। ওখানে বলে 'কাতলা', ওই পাথরের স্তরের স্লেটকে। গোলকধাঁধার মত অলিগলি অন্ধকার কত ঘর কত আঙিনা পার হয়ে আবার একটা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। সব জায়গায় লোক বসতি রয়েছে। আটাপেষাণীর হাতে একটি হেরিকেন। আমার ঘোমটা দেওয়া মুখ। তা অত ঘোমটা কি পোষায় আমাদের।

হাঁপিয়ে উঠেছি যেন। কিন্তু ঘোমটা নড়লে আটাপেষাণী বকছে ঘুংঘট কাড়ে নিকি, তরে।' ঘোমটাটা ভালো করে দাও)। লোকে দেখতে পাবে মুখ'। আর দিচ্ছি ঘোমটা।

পথও শেষ হ'ল। একটা ছাতে এসে দাঁড়ালাম—চৈত্র মাস, দিনে বেশ গরম রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা তখনও।

সামনে কয়েকখানা ঘর। আটাপেষাণী একটা ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। একি ঝিয়ের ঠাকুমা দিদিমার ঘর? এ কাদের ঘর? এর আগে কখনো হিন্দুস্থানী বিশিষ্ট বাড়ীতে যাওয়া আসা করিনি, ধারণা ছিল তারা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং রুচিসম্পন্ন ভাবে থাকতে জানেনা।

ওদেশের মতই ঘরের একটী দিকে একটু উঁচু রকের মত ধরণ! আমাদের দেশের ঘরের মত সবটা সমান ঘর নয়। ছোট ছোট জানালার ধারে সেইখানে একখানি 'নেওয়ারের' (চরকার সুতোর মোটা ফিতে) খাটে একটী বৃদ্ধা শুয়ে আছে। খাটের সামনে একটা জীর্ণ কিন্তু সুন্দর গালিচা পাতা। মাথার দিকের একপাশে একটা প্রকাণ্ড পিলসুজে একটী প্রদীপ জ্বলছে। আর একটা মস্ত পিতলের ওদেশী ঝকঝকে কলসীতে জল রয়েছে। এদিকের দেওয়ালের খুঁটীতে ঘাগরা লুগড়ী' কাঁচুলী ঝোলানো দু'একটা।

খাটের পায়াগুলিতে সুন্দর কাঠের কারুকার্য্য করা। মাথার কাছে রাধাগোবিন্দ ও গঙ্গাজীর ছবি। আরো কয়েকটা পট ও ছবি এদিকে ওদিকে টাঙানো আছে দেওয়ালে। ঘরটী ঝকঝকে পরিষ্কার। মনে ভাবলাম কে পরিষ্কার করে? আবার খাটের দিকে তাকালাম। কেশরের দিদিমা উঠে বসেছে। একটি বৃন্দাবনী ছাপের শাড়ী পরা, ধবধবে ফরসা রং, চমৎকার মুখশ্রী, দাঁতগুলি প্রায় সবই আছে। যদিও চুল পাকা। বৃদ্ধা আমাকে বল্লে—'বসুন বাইজী।'

ঘর এবং ঘরের কর্ত্রীকে দেখে আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি। বেশ সম্পন্ন অবস্থা, আর রুচির পরিচয় আছে ঘরে। বসলাম।

মনের বিরক্তি অস্বস্তি তখন বিস্ময়ে কৌতূহলে পরিণত হয়েছে। যেন রূপকথার কোনো রাজ্যে এসে পড়লাম। কি বলতে চায়, কি করতে চায়, আমাকেই বা ডাকল কেন, নিজের দেশের কারুকে না ডেকে?

বৃদ্ধার মুখের ভাব কথা বলার ধরণ যেন অভিজাতবংশের গৃহিণীর মত গাম্ভীর্য্যময়। কি অভাব, কি প্রয়োজন তার আমাকে—ভাবি। টাকা ধার নয় বোধ হচ্ছে।

আটাপেষাণী ফিরে গেল। বললে তার কাজ আছে। আমাকে পরে এসে নিয়ে যাবে। তাতে দেখলাম, কেশরের প্রদিদিমার সুবিধাই হ'ল যেন।

আমি বাঙালী সৌজন্য করে বললাম, 'কেশর কেমন আছে—আপনার অসুখে' ('আপনারই বলছি তাকে তুমি বলবার উপায় নেই যেন। এমনি তার আকার ভঙ্গী চেহারা) সে আসবে তো দেখতে? আপনাকে কে দেখাশোনা করে এসময়ে?

বৃদ্ধা হাসলেন! মাথার দিকের ঠাকুরের ছবি দেখিয়ে বললেন, 'উনিই দেখাশোনা করেন। নারায়ণ দেখেন। গোবিন্দজী দেখেন। আর কেশরকে কি তারা পাঠাবে? তা' পাঠাবে না। আমাদের ঘরে অত বড় মেয়ে পাঠায় না। তারা ভালই আছে।'

আবার আমাদের ঘর! ভাবি—তাহলে কি সত্যিই ঘরানা ঘর? কথা তো কই, চারদিকে তাকাই, ঘরটীও দেখি। কিন্তু বুড়ীর যে কি প্রয়োজন আমাকে, তা আর বুঝতে পারিনা। মনে মনে উসখুস করি, ভাবি, ভালোয় ভালো—বাড়ীতে কাজ ফেলে এসেছি। আর কাজ না হলেও কতক্ষণ বসি।

আটাপেষাণী এসে পড়ল, বললে 'যাবে মাজী?'

এবারে দিদিমা বুড়ী চকিত হয়ে উঠল যেন। এখনি নিয়ে যাবি? আমার যে কাজের কথা বলা হ'ল না আর একদিন আসবেন কি কৃপা করে?'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কাজ আজই বলুন না? চিঠি পত্র লেখা? তা আমার মেয়ে হিন্দীতে লিখে দেবে'থন; পাঠিয়ে দোব তাকে।'

বৃদ্ধা ফ্যাল ফ্যাল করে অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে একটু চাইলেন। তারপর বললেন—'আর একদিন আসতে হবে বাইজী। আমি সব ঠিক করে রাখব। আজ তো বুঝতে পারিনি, কিছু ঠিক করিনি। মহাদেওয়ের মা আর একদিন আপনাকে নিয়ে আসবে।' মহাদেবের মা হল আটাপেষাণী।

কি ঠিক করবেন? কি আশ্চর্য্য, আমাকে দিয়ে কি কাজ হবে—কি সে কাজ?

বৃদ্ধা আবার বললেন—'আমার একটা চোখ ছানিতে অন্ধ, অন্যটিতে সামান্য দেখি। নইলে আমিই আপনার বাড়ী যেতাম। আর দেখছেন তো কত বয়স হ'ল।' অসুখেও ভুগছি।'

তা দেখছি। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছি, এত অসুখ এত বয়সেও এত রূপ। কেশরের 'আকর' বটে। এই খনি বা আকর থেকেই কেশর রূপ পেয়েছে যেন।

'তাহলে যাই' বলে একটু হাত তুলে নমস্কার করলাম, উনিও প্রতি নমস্কার করলেন 'রাম রাম' বলে।

ছেলেমেয়েরা বললে—'মা আমাদের নিয়ে চল, দেখে আসি কেমন দিদিমা কেশরের।'

বললাম, 'নারে, বুড়ী যদি রাগ করে। পর্দা ওদের খুব।'

ছেলে বললে, 'হ্যাঁ ভারি পর্দা। আমি তো একদিন গিয়েছিলাম, অবিশ্যি তখন ছোট ছিলাম।' মেয়ে বললে, 'তা আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

'আচ্ছা দেখি' বললুম।

তিন চারদিন পরে—আবার ডাক এলো। আটা-পেষাণী নিতে এলো। 'জাস্তা অসুখ হয়েছে বুড়ীর আজ, এখনি চলুন।'

কি বিপদেই পড়েছি—ভাবলাম। তার আপনার লোক কি কেউ নেই?

কি করতে হবে না করতে হবে তাও তো বুঝছি না। চায় কি?

রান্না ও রান্নাঘর রইল পড়ে, ছেলেমেয়ে আগলে রইল বসে। মেয়েকে নিতে দিল না আটাপেষাণী।

রাত্রি হয়ে গেছে বেশ। অতবড় বাটীর প্রায় সব ঘর প্রাঙ্গণই অন্ধকার। সামনের পাহাড়ে অম্বর প্রাসাদের কেল্লার ঘেরা উঁচু পাঁচিল, তার ওপারে নাহারগড়ের কেল্লার পাঁচিল, পাহাড়ের কাছে গণেশগড়ের মন্দিরের সাদা চুড়ো—জ্যোৎস্নায় দেখা যাচ্ছে। আটাপেষাণীর আজ মন ব্যস্ত, এগিয়ে চলেছে; আমাকে ঘোমটা দাও বলে আর ব্যস্ত করবার দিকে দৃষ্টি নেই।

কেশরের দিদিমার (প্র) ঘরে এসে দাঁড়ালাম।

বৃদ্ধা বিছানার ওপর বসেছিলেন। প্রদীপটা আজ খুব বাড়ানো রয়েছে মোটা শলতে দিয়ে। তাছাড়া সেকেলে ধরণের 'শামা' দানে (বাতি দান) একটা বড় মোমবাতি জেলে রেখেছেন।

আমাকে দেখে বললেন—'এসো বাই, তুমি আমার মেয়ের মত, তাই আজ আমি আর বাইজী বললুম না।' মহাদেবের মাকে বললেন, 'তুই যা'—যদি কোনো কাজ থাকে। তারপর দরকার হলে ডাকব। কিন্তু কেউ ডাকবে ভাবনার কথা। আচ্ছা দরজার বাইরে একটু বোস্। আমি একটু কথা বলি এর সঙ্গে।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে আছি। কি ব্যাপার, কি কাজ, গোপন কথাই বা কি—আমাকে একলাই বা কেন ডাকলেন। ভয় ও ভাবনা হচ্ছে। অথচ ভয় যে কিসের তাও জানি না। কিছু গোপন কাজের সাক্ষী করবে—কিন্তু সে কাজটাই বা কি হতে পারে? কেশর থাকলেও বা ভাবতাম কোনো বিপাকে পড়েছেন হয়ত।

মহাদেবের মা বাইরে বসল।

বৃদ্ধা উঠলেন। একটু নুয়ে পড়েছে দেহ, কিন্তু বেঁটে নয়, বেশ দীর্ঘাকৃতি নারী বোঝা যায়। ঘরের একটা কোণ থেকে একটি কাঠের না কিসের সিন্দুক খুলে পিতলের উপর রূপার ফুল ফল পাতা-লতা পাখী ময়ূর আঁকা চমৎকার মীনাকরা একটী বাক্স নিয়ে এলেন।

শুধু ভাবছি, অসুখ বলে নিয়ে এলো আটাপেষাণী। আমি ভাবছি শ্বাস উঠেছে কিম্বা শয্যাগতা! এ কি ব্যাপার!

অবাক হয়ে দেখছি।

বৃদ্ধা এসে আমার কাছে গাল্‌চের উপর বসলেন। হাতির দাঁতের মত রং-এ তাঁর—বলি রেখাময় মুখ চোখ স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম আজ।

কম্পিত হস্তে বাক্সটা একটা চাবী দিয়ে খুলতে লাগলেন। খোলা হ'ল। একটী ছোট সাঁচ্চা জরীর কাজ করা থলে বার করে রাখলেন গালচের ওপর। হাতির দাঁতের একটী চৌকো—আর দুএকটি বাক্স কিসের চন্দনকাঠের হবে, বার করে করে আমার ও তাঁর মাঝে রাখলেন।

তিনিও নিঃশব্দে জিনিষগুলি বার করছেন, আমিও নীরব বিস্ময়ে তাঁর হাতের গতির দিকে চেয়ে আছি।

প্রথমে লম্বা বাক্সটা খুললেন। বাতির আলোয় ঝলমল করে উঠ্‌ল একটী মুক্তার কণ্ঠহার। 'কণ্ঠশ্রী' বলে ওদেশে। মুক্তা ও সোনার উপর মীনা করা চওড়া নেকলেস জাতীয় গহনা। চৌকো বাক্সটিও খুললেন তারপর। চুণী ও মুক্তায় গাঁথা পৈঁছি একজোড়া বেরুল। তারপর চন্দনকাঠের কৌটোটী খুলে তার জিনিষগুলি বের করতে লাগলেন। লাল নীল কাগজে মোড়া মোড়া ওদেশী গড়নের সারি মুক্তার আংটী, হীরের আংটী, কানের গহনা, মুক্তা-বসানো 'বেশর'নথ, সিঁথি মুক্তার কাজ করা; ছোট ছোট আরও সোনার আংটী, পায়ের গাঁই-জোড়, রূপার মল। তারপর খুললেন, জরীর থলেটী। সেটা উপুড় করে দিলেন গালচের উপর আমার সামনে। একমুঠো মোহর—না, এক অঞ্জলি মোহর ঝক ঝক করে উঠল চোখের সামনে।

আমি যেন আলিবাবা 'আখাতীজে'র গল্পের কিম্বা আরব্য উপন্যাসের অন্য গল্পের স্বপ্ন দেখছি। সত্যি কি মিথ্যে বুঝতে পারছি না। আশ্চর্য্য অভিভূতের মতই বসে রইলাম।

তারপর মোহরগুলি গুনে গুনে সামনে সাজালেন। একুশখানা মোহর। কয়েকটা 'আশাতীদের' (অক্ষয় তৃতীয়ায়) বিশেষ করে গড়ানো পাতলা চেপটা মোহর। বাকিগুলো ফারসী ছাপ দেওয়া রাজস্থানী মোটা মোহর। বাক্স থেকে তারপর বেরুলো অনেকগুলি রূপার ওদেশী টাকা (ঝাড়সাহী টাকা)। আর কয়েকটা বিলিতা টাকা 'কলদার' বলে অর্থাৎ কলের তৈরী টাকা।

আমি যেন রূপকথা পড়ছি—ছবিতে অথবা সেকালের নীরব বায়স্কোপ দেখছি। নিঃশব্দেই সব সাজানো আর রাখা হচ্ছে। আমি দর্শক, তিনি যেন বা যাদুকরীর মত আমাকে ভেলকী অথবা আশ্চর্য্য জিনিষের খেলা দেখাচ্ছেন।

এবার তিনি আমার দিকে চেয়ে—আমার হাত ধরলেন। যেন কি বলতে চাইলেন, কিন্তু গলা কেঁপে গেল। চোখে যেন জল এলো।

একটু চুপকরে থেকে তারপর বললেন, বাইজী এই জিনিষগুলি তোমায় রাখতে হবে। এইজন্যে তোমাকে এই দু তিন বার ডেকেছি। এগুলি কেশরের জন্য রয়েছে। তার মার, তার দিদিমার—আর আমার উত্তরাধিকার এগুলি। সেছাড়া আর আমার কেউ নেই—সেই এসবের অধিকারিণী। 'আমার তো' দিন ফুরিয়ে এসেছে। কার কাছে এসব রাখি, তাই তোমাকে ডেকেছি। এ আমার কত দিনে জমানো লুকোনো ধন। কেউ জানে না এর কথা…।

আমি হতবুদ্ধির মত যেন তাঁর হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। অবচেতন মনের ভাবটা যেন পালাই ঘর থেকে।

বৃদ্ধার শীর্ণ নরম হাত কিন্তু কঠিনভাবে আমার হাতটা ধরছিল। তিনি যেন আমার মুখে ও ভাবে বুঝতে পারছিলেন আমার অনিচ্ছা ও বিহ্বলতা। তিনি তো ভাল দেখতেও পান না। কিন্তু অনুভূতি। অনুভূতি অদ্ভুত নয় কি।

বৃদ্ধা বল্‌লেন—তুমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছ, আর ভয় পেয়েছ এসব দেখে—বুঝতে পেরেছি আমি। কিন্তু আজকে আর একটু বসে আমার সব কথা শোন। আর তো আমি সময় পাব না। মরে যাব শীগগীরই মনে হচ্ছে। তোমাকে বার বার ডাকিই বা কি করে।

তুমি জানতে, আমি গরীব বুড়ো মানুষ, তাই নাতনীকে চাকরী করতে তোমার কাছে পাঠিয়েছি। আমার বড় অভাব। অভাব আমার সত্যি আছে, নাতনীকে চাকরীও করতে দিয়েছি, সেও ঠিক। কিন্তু আমার অন্নের অভাব নেই, অর্থেরও অভাব নেই। এই বাড়ী আমার। এ থেকে যা' ভাড়া পাই তাতে আমার চলে যায়। বাড়ীর

ভাড়াটেরা জানে কিন্তু, আমার বাড়ী নয়, যে ভাড়া আদায় করে সেই মুখী আমার ভাই হয় তার বাড়ী। বেশ দৃঢ় গর্বিত ভাবে বললেন, এখন শোনো তারপর, আমি মহারাজা রামসিং এর দাসীপুত্র লালজী সাহেব চন্দন সিংয়ের মেয়ে। চন্দন সিংকে 'রাজা' খেতাব দিয়েছিলেন তাঁর বাপ হুজুর সাহেব। আমি জন্মেছিলাম ঐ চন্দ্র মহলের প্রাসাদের একটা বড় মহলে। আমার বাবা রাজার বাঁদীপুত্র 'লালজী সাহেব' হলেও তখন রাজপুত্রের মতই আদর ছিল তাঁর। যে 'চন্দ্র মহল' দেখেছ মন্দিরের সামনে, সেইখানে আমার ছোটবেলা কেটেছিল। আমার বাপের বাবার বাড়ী। পিতামহের বাড়ী। আমি তাঁর মেয়ে, প্রথম মেয়ে। আমার নাম হ'ল 'লাড়লী' বাই (আদরিণী) এ আবার শ্রীরাধারও নাম। নামও রাখলেন বাবার বাবা। হুজুর সাহেব। 'বাইজীলাল' লাড়লীবাই বলে আমাকে ডাকা হত। রাজকন্যা হল বাইজীরাজ, বাঁদী কন্যাদের আমাদের 'বাইজীলাল বলা হয়। তার পরের গল্প অনেক আমার সব বলা হবে না। আমি বড় হলাম। বিয়ে হ'ল ভাল ঘরে, হুজুর সাহেবের মৃত্যু হল। বাবাও মারা গেলেন। আমার একটী মাত্র ছেলে হ'ল। তারও একটী মাত্র মেয়ে ছিল, তারই মেয়ে ঐ কেশর। এইটুকুই তোমাকে বললাম। রাজা গেলেন, বাপ গেলেন, তারপর ছেলে বৌও রইল না। তাদের একটী মেয়ে আমার ঘাড়ে ফেলে রেখে গেল। সেই মেয়েটার ঘরের কাছে বিয়ে দিলাম আমাদের জানা ভালো ঘরে। সেও গেল মারা ঐ কেশরকে রেখে। কেশরের মা মরে গেলে তার বাপ আবার বিয়ে করে ঘরকরনা করে মরে গেল। কিন্তু সৎমা আর ভাইবোনেরা আছে। এদিকে আমি কেশরের খুঁজে দেখে যোধপুরের এক লালজী সাহেবের ঘরে তার বিয়ে দিলাম। সে জামাইকে তোমার ছেলে দেখেছে।

এখন এই বাড়ী আমার বাবা আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন যতদিন আমি বেঁচে থাকব ততদিনের জন্যে। তারপর 'রাজ্যে' বাজেয়াপ্ত হবে। নয়ত বাবার নাতিরা পাবে ঠিক বলা যায় না। তা' আমি তো অনেকদিন বেঁচে আছি। কেশরকেও আমার কাছে ফেলে রেখে তার বাপ বিয়ে করেছিল। খোঁজখবরও করেনি। ভেবেছিল খরচপত্র দিতে হবে। বিয়ে দিতে হবে। বিয়েতে রাজপুতেদের খরচ খুব হয়। আমিও ছেড়ে দিই নি, আমার তো কেউ নেই।

আমার টাকা ছিল কিছু। আর ছিল অনেক গহনা। আর ছিল এখানকার পুণ্য কারখানা। (রাজকীয় সদাব্রত) থেকে দু'টাকা করে রোজ, নয়ত আটা চাল ফল মিষ্টি ঘৃত চিনির ব্যবস্থা তাদের সরকারী দোকান থেকে।

আমার খাবার অভাব হয়নি কোনোদিন তাই। কিন্তু নানারকম শোকে, রোগে আর নাতনী কেশরের বিয়ে দিতে অনেক গহনা গেল, টাকাও গেল কিছু। রয়ে গেল এই কটা জিনিষ যা' আমার বিয়ের সময় হুজুর সাহেব দিয়েছিলেন। আর বাবা দিয়েছিলেন, তার থেকে কিছু এই। এই মোহরগুলি সেই সময়ের যৌতুক পাওয়া। ছেলেবৌকে নাতনীকে দিয়েছিলাম সবই ফিরে এসেছে কেশরের জন্যেই দেখলাম! অন্দরে থাকি বহু লোক ধোঁকাবাজী করে ঠকিয়েও নিয়েছে টাকা।

বৃদ্ধার চোখ সজল হয়ে এলো। বললেন, এখন এই-গুলি যদি কেশরকে দেবার আগে আমি মরে যাই, কেশরের সৎ মা ভাইয়েরা নিয়ে নেবে। কিম্বা আমার ভাইপোরাই নিয়ে নেবে। যে আগে আসতে পারবে। অবার এখন কেশরের হাতে দিলেও তার হাতে থাকবে না। তার শ্বশুররা নিয়ে নেবে।

আর নিজের আত্মীয়দের যদি আসতে বলি তাহলেও সব জানাজানি হয়ে কেশর পাবে না। আর তোমার কাছে কাজ করতে দিয়েছিলাম, তা মাহিনার লোভেও নয়, অভাবেও নয়।

দিয়েছিলাম বড় হচ্ছে, একটু ধরাবাঁধার মাঝে থাকবে। একটু পড়তে শিখবে তোমার ছেলেমেয়ের কাছে। আর নিশ্চিন্তমনে ছিলাম তোমাদের ঘরে কেউ ওর দিকে খারাপ ভাবে চাইবে না, তোমাদের সুনাম আছে শুনেছিলাম। আমার কেশরের রূপ তো দেখেছ, তাকে আমি কি করে সামলাই তাই তোমার কাছে রেখেছিলাম।

বিচলিত বৃদ্ধা আমার হাত ছাড়েন নি। বললেন এসব রাখবে তুমি? তুমি কেশরের মার মত, তাকে যত্ন করেছ, ভালবেসেছ, সে বলত, জানি আমি।'

হতবুদ্ধি আমি নীরবে শুনছি তাঁর কথা। ঐ সোনা-

রূপা গহনা রাখার দায়িত্ব এক কথা, আর একটু জল-খাবার চা মিষ্টি রুটী দিয়ে স্নেহ করা কথা কওয়া আর এক কথা। নির্বাক বিমূঢ় ভাবে বসে রইলাম। বৃদ্ধা হাতও ছাড়েন নি, মুখের দিকে চেয়েও রয়েছেন।

বললাম, আচ্ছা আমি আজকে যাই। আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে আপনার কাছে আসব। কিন্তু আর একজন কোনো আপনার লোক আমার সাক্ষী থাকুন। আমিও তো মরে যেতে পারি, না দিতে পারি, দুর্বুদ্ধি হতে পারে। টাকা বড় খারাপ জিনিষ। আজ সব তুলে রাখুন। যদি বলেন তো আমার স্বামীও এসে দেখা করবেন।

বৃদ্ধা বুঝলেন আমার দায়িত্বের ভয় ভাবনার কথা। জরা জীর্ণ শুভ্র কম্পিত হাত দুখানি আবার সব জিনিষ গুছিয়ে তুলতে লাগল। আমি 'রাম রাম' বলে বিদায় নিয়ে বাড়ী এলাম।

*   *   *   *

বাড়ী এসে কেশরকে চিঠি দিলাম নানীর অসুখ বলে।

তার পর দিন জিনিষগুলি বাক্স ভরে এনে হিসাব করে দুজনে নিয়ে এলাম। সাক্ষী রইল মহাদেবের মা। আর কোনো লোককে আপনজনকে অথবা নিস্পরকেও তাঁর বিশ্বাস নেই। তবে? কোনো উকীল ডাকি? বললেন, 'না, সব সিলমোহর' করে আপনার কাছে রেখে দিন। দুটো ফর্দ রাখুন একটা মহাদেবের মাকে দিন কেশরকে দেবে। আর একটা আপনিও কেশরকে জিনিষের সঙ্গে দেবেন। সেদিন কোনো উকীলের সামনে দেবেন। আর ভগবান যদি এমনি করেন, যে, কেশর না পায় না থাকে তার সন্তানও না থাকে, দিয়ে দেবেন আমার ভাইপোদের বংশে। এখন তো এই নয়া জমানায় আর রাজা মহারাজারাও রাজা নেই। 'লালজী'রাও ভিখিরী হয়ে যাচ্ছে। জায়গীরও চলে যাচ্ছে সব। 'রাজ' ও রাজা সবই শেষ হয়ে গেছে একালে। একটু হাসলেন, বল্লেন, কি বলে রাজাকে রাজপ্রমুখ? তা মানে কি বাই? লালজী সাহেবের মেয়ে রাজার নাতনী তো। গায়ে রাজরক্ত আছে, বিবেচনা বুদ্ধি ব্যবহারও এমনি যেন ঘরানা ঘরের মতন। আমরা স্বামী স্ত্রী আর মহাদেবের মা তিনজনে বৃদ্ধার দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের জোরে যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। আর ভয় হ'তে লাগল যদি বিশ্বাস না রাখতে পারি। যদি আমরা মরে যাই ছেলেমেয়েরা কেশরের হাতে পৌছে না দিতে পারে। কিছুই তো বলা যায় না।

সেকথাও একবার বললাম। বুড়ী বললেন, "যদি ভগবানের তাই ইচ্ছে হয় তাই হবে। ঠাকুরের ছবির দিকে চেয়ে প্রণাম করলেন ওঁর ইচ্ছা বলে'। যেন বৃদ্ধা হাত থেকে বোঝা নামিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেনই, পাত্রে হোক অপাত্রে হোক।

নিরুপায় হয়ে যেন একমণ পাথরের বোঝা হাতে আর একমন বোঝা মনে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম আমরা।

তারপর দিন কেশবকে চিঠি দেওয়ালাম হিন্দীতে। বৃদ্ধাকে বলেও এসেছিলাম চিঠি লিখছি। একবার তাঁর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। তারপর বললেন, 'তারা কি আর, দেখতে পাঠাবে। জবাব দেয় কিনা তাই দেখ। আমাদের—দেশের 'রীত' তো জানো না তোমরা।'

*   *   *   *

না, জবাব আসেনি।—ভাবলাম চিঠি পায় নি। এবার রেজিষ্ট্রী চিঠি গেল। ফিরে এলো যথাকালে চিঠি লেখা-লেখি করতে করতে মাস দেড়েক শেষ (হঠাৎ একদিন মহাদেবের মা এসে বললে, বুড়ীর আজ অসুখ বেড়েছে আচ্ছন্নভাবে রয়েছেন, কিন্তু ভেতরে জ্ঞান আছে, সব ভাইপোদের ডেকেছেন। বহুলোকে এসেছে।

দু একদিনের মধ্যেই বৃদ্ধার মৃত্যু হল। শুনলাম সরকারী লোকরা এসে বাড়ী দখল করে নেবে ছেলে ওয়ারিস না থাকার জন্য। সব রাজ্যে 'খালসা' হয়ে যাবে। যদিও রাজা নেই রাজ্যও কারুর নয়। ভাইপোরা—পেতে পারে। নাও পেতে পারে।

মহাদের মা ভেবে চিন্তে কেশরকে বেয়ারিং চিঠি দিতে বল্লে, 'গ্রামঘরে' ঘরের বৌ বাইরে এসে সই করে চিঠি নেবে, সে তো সবাই পছন্দ করে না। তুমি বেয়ারিং চিঠি দাও। লেখ, নানী মরে গেছে। কিন্তু জিনিষের কথা লিখলেই তো শকুনির মত শ্বশুর বাড়ীর লোক এসে পড়বে। সে কথা লিখ না।'

বললাম, 'তা, আমি জিনিষ কতদিন বা দেখব।'

সে বললে, 'চুপ করে থাক। ভগবান একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন।'

মনে মনে হাসলাম, এর মাঝে ভগবান কি করে কি করবেন। দেখতে পাচ্ছি—জিনিষের গন্ধ পেলে চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে যাবার লোক আসবে। না এলেও আমার বিপদ। বোধ হয় এই জন্যই মেয়েদের সম্পত্তি লোকে দেয় না, আর দিলেও থাকে না হয়ত।

কিন্তু আশ্চর্য্য রেজেষ্ট্রী চিঠিতেও কোনো কাজ হয়নি, বেয়ারিং চিঠিখানি সেকাজটী সম্পন্ন করলে।

বেশ কিছুদিন পরে একদিন 'সকালবেলা একবন্ধ গাড়ী করে প্রকাণ্ড জোয়ান চেহারা স্বামীর সঙ্গে একটী ছেলে নিয়ে কেশর এসে উপস্থিত হ'ল। মহাদেবের মার ঘরে।

দিদিমা নেই। তার বাড়ী ঘর কার ভাগে পড়বে, অথবা বাজে 'খালসা' (বাজেয়াপ্ত) হবে—সে বাড়ীতে উঠবে কোথায়। আমি কাছাকাছি একটা বাড়ীতে উঠে গিয়েছি। মহাদেবের মা তো অতিথিদের নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠল। কোথায় বসাবে, খাওয়াবে কি? রিস্তেদার (আপনার জন) কারও বাড়ীতে পাঠাবে কি? তাতেও আবার নানা ভয় টাকাকড়ি নিয়ে।

আমার কাছে এলো। বললাম, "নিয়ে আয় এই-খানে। ওরা তো রাজপুত, আমাদের কাছে খাওয়া দাওয়ার আপত্তি করে না। 'বামুন বেলিয়া' হলে মুস্কিল হতো। থাকবে আমার কাছে—তারপর জিনিস নিয়ে চলে যাবে।

কেশর বাঈ এলো। অনেকদিন দেখিনি।

লাল রংয়ের ঘাগরা, ফিকে নীল ওড়না, নানা রংয়ের ছাটে তৈরী কাঁচুলী পরা। গলায় মোটা মোটা সোনার হাঁসুলী ও দেশী গহনা কোমরে গোট, মেখলা হাতে, ওপর হাতে কঙ্কনপৈঁছে তাবিজ ভারি ভারি গহনা, পায়ে নিরেট রূপার তিন রকমের মল—মুরাঠা পাঁয়জোর সরু মল সব শুদ্ধ সের চারেক সোনা রূপার ওজন গায়ে বহন করে তন্বী সুন্দরী কেশর এলো আরো সুন্দর হয়ে যেন। মাথায় সিঁথি সোনার, হাতে পায়ে আঙুলে 'ছল্লা' (আংটী), মস্ত লম্বা জরী ও লাল সুতায় জড়ানো 'চোটী' (বেনী)। বালিকা কেশর কিশোরী কেশর—যে কৈশোর যৌবনের মাঝখানে রয়ে গেছে—সেই কেশর নতুনরূপে সামনে এসে দাঁড়াল রূপে রংয়ে ঝলমল করে। বিদেশে বাপের বাড়ীর দেশে আসবে—প্রথামত সেজেছে। ঘরে উনি ছিলেন, ভয়ে ভয়ে সরে যেতে বললাম। ছেলেকেও বাইরে যেতে বললাম। যদি ওর স্বামী পছন্দ না করে। তখন তো পরিচয় জানাছিল না, আর বালিকা ছিল। আজ যদি তার স্বামী বিরক্ত হয়। রাজোয়াড়ার পর্দা তো বটে।

কেশর কিন্তু তত লজ্জা করলে না। ওর বর একঘরে বসে রইল, সে আমাদের কাছে এসে বসল আগের মতই ঘোমটা সরিয়ে।

গহনার কথা বলতে অবাক হয়ে শুনলাম, সে সব জানে। দিদিমার কি ছিল না ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি সব নিয়ে যাবে তো?' (আর তুই বলতে পারছিনা যেন)। সে হাসলে, বললে, 'নিতেই তো এলাম।'

বললাম্—তোমার নানার ভয় ছিল তোমার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা নিয়ে না নেয়।

সে শুধু হাসলে। একথার উত্তর দিলে না।

কিছু বুঝলাম না।—বললাম, 'এটী কার ছেলে? তোমার ছেলে মেয়ে হয় নি?'

এবারো সে হাসলে। এ ছেলেটি ৫।৬ বছরের, তাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বললে, এ আমারি ছেলে বটে। ছেলে এখনো আমার হয়নি।

আমি সন্দিগ্ধভাবে চুপ করে রইলাম।

তৎক্ষণাৎ কিন্তু ছেলেটী বললে 'এ ছোটী মা আমার।'

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে চুপ করে রইলাম। এবারও কেশর হাসলে। বললে, আমার সতীনের ছেলে।

সতীন? রাজপুতের ঘরে তো অমন বিয়ে হয়। কিন্তু কবে বিয়ে হয়েছে, ওর নানী কি জানত না?' একটু দ্বিধা করে বললাম কী, তোমার ছেলে মোটে হয় নি?

তোমার নানী কি জানত তোমার সতীন আছে? সে যে বলেছিল তোমার ছেলেই যেন তার সব জিনিষ পায়; তোমার বিয়ের আগেই বিয়ে করেছিল?'

'না, নানী জানতেন না। আমিও জানতাম না। ওরা আবার বিয়ে দিয়ে ছিল কোন্ এক সময়ে। কিন্তু এ আমারি ছেলে, আমিই এর মা। কিরে সুন্দর সিং? কে তোর মা?'

সুন্দর সিং তার বিমাতাকে জড়িয়ে ধরে হাসলে। বললে আমার দুজন মা।' দেখলাম ছেলেটী বেশ চালাক

'তাহলে তুমি এসব নিয়ে যাবে? তোমার কাছ থেকে ওরা নিয়ে নেবে নাতো?

না, তা নেবে না। আর ভগবানের যদি ইচ্ছে তাই হয় তো নেবে ওরা। তাই নয় কি? বলুন বাইজী?'

ওর নানীও বলেছিল ভগবানের ইচ্ছার কথা। কত হস্তান্তর হয়ে কেশরের কাছে পৌঁছেচে, তার প্রপিতামহীর সম্পদ। আমার বলবার কি আছে?

মহাদেবের মা, একজন জানা-শোনা উকীল আর আমরা তালিকাসহ মোহর ও গহনার বাক্সটী কেশর ও কেশরের স্বামীর হাতে দিলাম।

বেশ কিছুদিন পরে, অনেকদিন দেশের দিকে যাওয়া হয়নি। একবার যেতে ইচ্ছা হল।

দেশে যাবারই ঠিক ছিল। হঠাৎ মনে হল সামনে 'ঝুলন' এসেছে একবার মথুরা, বৃন্দাবন দর্শন করে দেশে যাই। তীর্থ ও বেড়ানো দুইই হবে।

গোবিন্দজীর গোঁসাইরা আমাদের চেনা শোনা ছিলেন, গিয়ে উঠলাম তাঁদের বৃন্দাবনের হাবেলীতে (বাড়ীতে)।

অষ্টসখী, যমুনাপুলিন, লালাবাবুর কুঞ্জ, বর্ষাণার 'লাড়লী' জীর (রাধিকাজী) মন্দির জয়পুরের রাজার তৈরী—নানা কুঞ্জবন, নানা কুণ্ড ছাড়াও নতুন নতুন আরো মন্দির ও দেখা হচ্ছে। কাশীতে যেমন পথেঘাটে সর্ব্বত্র শিবালয় ও শিব—এখানেও যেন রাধাকৃষ্ণের মন্দিরেরও লীলা-কাহিনীর সীমা সংখ্যা নেই। সকালে বেরিয়ে যাই দেব-দর্শনে, ফিরি অনেকবেলায়। আবার সন্ধ্যায়ও যাই দেবালয়ের আরতি দর্শনে—কীর্ত্তন হরিনাম যজ্ঞে। সেও ফিরি দেবতাদের শয়নারতির কীর্ত্তন শোনার পর। নিধু-বন বন্ধ হয়ে যায় কখন, তারও নানা কাহিনী শুনি। রাত্রে নাকি কোনো প্রাণী সেখানে থাকতে পারে না। বাঁদর হনুমানও থাকেনা। কে নাকি অবিশ্বাসী একদিন রাত্রে লুকিয়েছিল, তারপর সে উন্মাদ হয়ে যায়। আর একজন অন্ধ হয়ে যায়। যত দেবতা, তত মন্দির, ততই লৌকিক আর অলৌকিক কাহিনী। যত ভক্ত হয়ত ততই সংশয়ীও। গল্প শুনি কত রকমের। গান ভজন কীর্ত্তনও কম হয়না। শুনি কিছু কিছু।

আর অনেক রাত্রে গোঁসাইবাড়ী ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। যাবার দিনের আগে নানা কেনাকাটা বাঁধাছাঁদার কাজ পড়ল। ভাবছি কি করে, কি করি, কখন করি।

গোঁসাইজী বললেন, 'আমার একটী জানা মেয়ে আছে বড় ভালো। সে এসে কিছু গুছিয়ে দেবেখন।'

আশান্বিত হয়ে বললাম, 'বাঙালী?' বৃন্দাবনে বাঙালী অনেক। অজস্র।

গোঁসাই হাসলেন বললেন, 'না বাঙালী নয়, হিন্দুস্থানী। কিন্তু বেশ বাংলা জানে। আর তুমি তো হিন্দী জানো।

জিনিষপত্র গোছানো বাঁধাছাঁদা করছি। সহসা গোঁসাই গৃহিণী হিন্দীতে বললেন, 'এই যে, কেশর এসেছ? আপনার লোক এসেছে।'

'কেশর' শুনে আশ্চর্য্য হয়ে মুখ ফেরালাম। কোন্ কেশর? কেশর কে? সেই কেশর কি করে এখানে আসবে? তা' কেশর নামতো অন্যেরও থাকতে পারে।

তখন দরজার সামনে কেশর এসে দাঁড়িয়েছে। হেরিকেনের আলোতে অবাক হয়ে দুজনে দুজনকে দেখলাম। সেই কেশরই তো।

বললাম 'কেশর তুই এখানে!'

সেও বললে 'মাজী, তুমি এখানে এসেছ।'

গোঁসাই গৃহিণী জানা চেনা আছে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের কাজে ফিরে গেলেন।

আমার যেন মুখে কোনো কথা প্রশ্ন এলো না। কেশরও কোনো কথা বললেনা। সহজভাবে বাক্স ও জিনিষ সরাতে লাগল। অন্য জিনিষ ও বিছানা গোছাতে লাগল।

কি জিজ্ঞাসা করব যেন ভেবে পাচ্ছিলাম না। বিধবা সধবা ওদের পোষাকে বড় বোঝা যায় না। শুধু মাথা বোরলা নেই দেখে বুঝলাম সধবা নয়। কিন্তু ছেলে মেয়েও হয়নি? চলে এসেছে কেন? কবে এলো? কেন এলো? এখানেই বা কেন? কেউ কি নেই? সেই ছেলেটা সতীনের? সে কোথা? জিনিষপত্র সব গোছানো বাঁধাছাঁদা হয়ে গেল।

ঘরে জায়গা খালি হ'ল। দুজনের হাতও খালি হল। সহসা সে বললে, 'মাজী, তীর্থ করতে এসেছ!

আজই যাবে? তুমি এসেছ জানলে আমি আগেই দেখা করতে আসতাম।

আমি ভাবলাম—কত যাত্রী আসে তো তেমনি কেউ হবে।'

আমার মনে অনেক প্রশ্ন আর দুঃখ জমা হচ্ছিল যেন। তার হাতে আর সৌভাগ্যের চিহ্ন কাঁচের চুড়ী নেই। (ক্ষণভঙ্গুর কাঁচের চুড়ীই ওখানে ক্ষণভঙ্গুর সৌভাগ্যের লক্ষণ।) সোনার গহনাও কোনোখানে নেই যদিও পরার রেওয়াজ আছে জানতাম। রূপার কি দু'একটা হাতে রয়েছে আর গলায়। আমি চেয়েছিলাম তার দিকে বিহ্বল মনে।

দেখে যেন একটু বিব্রতভাবেই সে বললে 'তোমার জিনিষগুলো নীচে রেখে আসি।'

বললুম, থাক্‌না, টাঙ্গাওয়ালা নিয়ে যাবে'খন। অত ভারি তুই নিস্‌নি। পারবি নি কেশর।'

কেশর শুন্‌ল না—নেবে গেল একটা মোট নিয়ে। কেশর যেন আমার কাছ থেকে পালাল মনে হ'ল আমার।

এবার গোঁসাই গিন্নী এলেন। বললেন, 'আপনি ওকে চেনেন? দেখলাম।'

অন্যমনস্কতা থেকে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। বললাম হ্যাঁ, ওযে ছোটবেলায় জয়পুর 'হাওয়ামহলে'র সামনে পুরানো বস্তির একটা বাড়ীতে আমার কাছে কিছুদিন কাজ করেছিল। তাই চিন্‌তাম। ওর একটী নানী ছিল।

তা এখানে আপনার কাছে কি করে এলো? ওর কি শ্বশুর বাড়ীর কেউ নেই? ছেলেপিলে হয়নি?'

'না ওর ছেলেপিলে নেই। আমরা বৃন্দাবনে চলে এসেছি সে তো অনেকদিন। মাঝে মাঝে জয়পুরে উনি যান। ওর নানীকে উনি জানতেন বাইজীলাল লাড়লীবাই নাম তার। রাজা রামসিংয়ের এক লালজী সাহেবের মেয়ে সে। তাও উনি জানতেন, শ্বশুরঠাকুরের কাছে শুনেছিলেন।

তারপর এই বছর দুই হবে একবার কি কাজে জয়পুরে গিয়ে উনি দেখেন ও মন্দিরে ওঁকে দেখে কিছু বলতে চাইল।

সে অনেক দুঃখের কথা। ওর স্বামী মারা যাবার পর সতীন আর দেবররা সকলে মিলে ওকে ওর সৎমার কাছে যেন বেড়াতে পাঠিয়ে দিলে। গহনা টাকা-কড়ি মোহর সব তাদের সিন্দুকেই রেখে দিলে। বললে, 'ফিরে তো আসবে শীগগীরই। থাক না এখানে।'

তারপর আর কোনোদিন নিতে এলো না, খোঁজও নিলে না। ওর সৎমা আর ভাইয়েরাও বিরক্ত হ'তে লাগল। এমন সময় উনি সেবারে দোলের সময় ওখানে গিয়েছিলেন—ওঁকে মন্দিরে দেখে সব বলে।

উনি ওর শ্বশুর বাড়ীতে চিঠি দিলেন, নিয়ে যেতে বললেন। চিঠির জবাবই এলো না। কোন এক লোক মারফৎ বলে পাঠালেন। কে কার কথা শোনে। তারা বললে, আমাদেরই আজকাল কত কষ্ট যাচ্ছে'। 'ওর ভাবনা তারা আর ভাববে না'। টাকাকড়ি গহনা মোহর ছিল যে কে সেকথা কাকে বলবে, কে বিশ্বাস করবে, করলেই বা আদায় করবে কি করে? সেবারে উনি তো বৃন্দাবনে ফিরলেন। তারপর কোন একসময়ে আবার যখন গেছেন, ও তখন বড় কষ্টতে আছে—খেতেও পায় না ভাল করে পাড়ার পাঁচজন বললে। আর বললে, বাবুজী তুমি নিয়ে যাও। গোবিন্দজীর কোনো সেবায় লাগিয়ে দিও। দুটী প্রসাদ দিও। তাহলে মেয়েটা বেঁচে যাবে। নইলে মরে যাবে কিম্বা খারাপ লোকের হাতে পড়বে। এখানে বড় সহরের চেয়ে বৃন্দাবন ভালো হবে।

গোঁসাই গিন্নি বললেন, সেই অবধি এখানে রয়েছে। গোবিন্দজীর সেবার যত জল সব ভরে কূয়ো থেকে। চন্দন ঘসে। ঠাকুরের ঘর পরিষ্কার করে। ধূপ দীপের যোগাড় করে। প্রতিদিন 'পাড়শ' (পরিবেশিত প্রসাদ) পায় দু'বেলা। আর আমার কাছে থাকে একটু আধটু কাজ করে। আমি মাসে মাসে কিছু দিই। ভারি ভালো মেয়েটি।

কেশর আর ওপরে উঠে আসেনি। গেল কোথায় ভাবতে লাগলাম। গোঁসাই এসে বললেন, "টাঙ্গা আনতে পাঠিয়েছি। চল নীচে যাই মা। জিনিষ পড়ে আছে নিচে।

নীচে নেমে গেলাম।

সিঁড়ীর নীচে আধ অন্ধকার একটা জায়গায় কেশর দাঁড়িয়ে ছিল। জিনিষ পত্র আগলে। মিটমিটে হেরিকেনের আলোতে তার শান্ত বিষন্ন মুখটা দেখতে পেলাম।

বললাম, তুই এখানে।

সহজভাবেই সে বললে, এই যে জিনিষগুলো রয়েছে তাই এখানে দাঁড়িয়ে আছি। যেন আমারি চাকরী করছে।

মনে পড়ে গেল সেই ছেলে আর বর নিয়ে সেজে গুজে জিনিষ নিতে এসেছিল গহনা কাপড় আর রূপের ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করে। সেই অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্য নেই, স্বামী—স্বামীর সন্তানও নেই, কিন্তু রূপ এখনো তেমনি আছে। কিন্তু তার মুখের দিকে আমি যেন আর চাইতে পারছিলাম না।

জানি, এমনিই হয় মেয়েদের ভাগ্য। বিশেষ করে সাধারণ গ্রামের জীবন ও প্রথাতে হয় তো এই রকমই হয়। সন্তানহীনা গ্রামবধূ এদিকেও অনাথা মেয়ে—এই তো হবার কথা। কিন্তু সবই তো তার তারাই পেতো—সেই ছেলেটিই তো সব পেতো—বা সকলে মিলে নিত, তাহলে কিজন্য সরিয়ে বা তাড়িয়ে দিল? তার নানীর প্রাণপণ সঞ্চয়ের কণাটুকুও তার নিজের রইল না। ছেলেটির মুখে মা' শুনেই তো খুশি ছিল ও। তবু তারা ঠকালে ওকে। ছেলেও তো ওর হয়নি। তাহলে তো তাড়াবার বা শত্রুতার অর্থ বুঝতাম।

ডাক্‌লাম কেশর আয়!

কেশর সামনে এলো। জীর্ণ গ্রাম্য ছাপা ঘাগরা, মলিন বিবর্ণ কাঁচুলী ও 'লুগড়ী' বা ওড়না গায়ে। অন্যমনস্ক বিষণ্ণতার ছাপ মুখে। আর হয়ত অগাধ দুঃখের সমুদ্র তার বুকে। যেন ভাবতেও জানে না।

পিঠে হাত দিয়ে বললাম, আমার সঙ্গে যাবি? কেন বললাম কে জানে। না জেনেই বললাম যেন। কোথায় নিয়ে যাব?

সে কাঙালের মত বললে যাব মাজী—তার কালোটে চোখে জল টলটল করে এলো। এবারে আমি জড়িয়ে ধরলাম।

তার চোখের গরম জল ফোঁটায় ফোঁটায় পড়তে লাগল—আমার কাঁধে। এক একটি ফোঁটা যেন অগাধ দুঃখ-বেদনা সমুদ্রের ছোট্ট জমাট করা কণিকা। কত কথা কাহিনী নিরাশা হতাশা তাতে রয়েছে কে জানে সেকথা।

ভাবতে লাগলাম, কিন্তু কোথায় নিয়ে যাব? সত্যি নিয়ে যেতে পারি কি?

একটু পরে কেশর চোখ মুছল। তারপর বললে, 'না মাজী, আর কোথাও যাবনা। এইখানেই গোবিন্দজীর চরণেই পড়ে থাকব। এই আমার তক্‌দীর' (ভাগ্য)।

পিছনে গোঁসাই আর গৃহিণী যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দেখিনি। সহসা গোঁসাই বললেন, 'হ্যাঁ কোথায় যাবে ও? তুমি কি করে কেমন করে রাখবে এই বয়সের বিদেশী মেয়েকে বিদেশ বিভূঁইতে। ও গোবিন্দর চরণের 'কেশর চন্দন' হয়ে এখানেই থাক্‌। (কেশর চন্দন, জাফরাণে রঙানো সুগন্ধ চন্দন—গোবিন্দজীর অঙ্গ সেবা হয় বিশেষ বিশেষ উৎসবে)।

* * * *

টাঙ্গা এলো। গোঁসাই ও গৃহিণীকে প্রণাম করে কেশরের শুভ্র শীর্ণ হাতখানি মুঠো করে ধরলাম। চোখ দুটি সে নামিয়েই রেখেছিল। বোধহয় জলভরা ছিল।

টাঙ্গায় উঠ্‌লাম। তারপর ট্রেণে। তারপর দেশে এলাম। ভাগ্য, ভগবানের ইচ্ছা, 'তক্‌দীর,' আর নিরুপায় মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঞ্চয়ের কথা ভাবি।

আর মনে পড়ে রূপকথার মত কেশরের রূপ ও তার কাহিনী। সেকি 'কেশর চন্দন' হয়েই রইল, থাকবে? আর কি হতে পারত? কি হলে ভাল হ'ত? ততদূর আমার আর কল্পনা পৌঁছয় না।



বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দেবেন্দ্রনাথের ভাষার পর্যালোচনায় এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয় যে, আগের যুগে যেমন ফার্সির তুলনায় সংস্কৃত প্রভাব প্রবলতর হয়েছিল, এই যুগে তেমনি সংস্কৃত প্রভাবের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া কাজ শুরু করে দিয়েছিল। যাঁরা ১৮১৫-৭৮ সালের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতি-রীতির গদ্যের ক্রমাগত উৎকর্ষবিধান ও প্রচারসাধন করছিলেন, তাঁদের রচনাতেও তৎসম শব্দ কমে আসতে লাগল। অবশ্য এই যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বাংলা গদ্যের উপর এত প্রবল ছিল যে, ঐ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও এমন একজন লেখকও পাওয়া যায় না যিনি তৎসম শব্দের অনাবশ্যক প্রাধান্য, বিকৃত ক্রিয়াপদ, আর বঙ্কিম সর্বনামের প্রয়োগ একেবারে বাদ দিতে পেরেছিলেন। তবে, ক্রমশ বাংলা গদ্যভাষা থেকে সংস্কৃতের প্রভাব দূর করার জন্যে শিক্ষিত সমাজ বদ্ধপরিকর হলেন। এই যুগেই সেজন্য একদিকে গদ্যভাষায় সংস্কৃতের অতিরিক্ত প্রাধান্য, অন্যদিকে ক্রমাগত তদ্ভব ও দেশি শব্দ ব্যবহার করে এবং সুবোধ্য কথ্যভাষাসুলভ রীতি ও কলাকৌশলের প্রয়োগে ভাষাকে লঘু ও সুখপাঠ্য করার চেষ্টা দেখা যায়। তার ফলে ভাষার কাঠামোটা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-নির্মিত কঙ্কালের মতোই রয়ে গেছে ; কিন্তু সেই দুরূহ অস্থি-সর্বস্বতা নানা প্রতিভার প্রয়াসে লালিত্যের রক্তমাংস লাভ করেছে আর কথ্যভাষার ভিত্তিতে গঠিত বাগ্‌বিন্যাসরীতির মোলায়েম চামড়াও তার গায়ে লেগেছে। গদ্যভাষার দেহ তখনও উচ্ছল প্রাণহিন্দোলে লীলায়িত চঞ্চল গতি লাভ করেনি বটে, কিন্তু তা হয়ে উঠেছে সুঠাম ও সবল। বাংলা গদ্যভাষা সুগঠিত দেহে অবস্থান করছিল কেবল প্রাণসঞ্চারের অপেক্ষায়। ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সঞ্জীবনকার্য সম্পন্ন করে বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বলে পরিগণিত হলেন। তাঁর কণ্ঠেই এই প্রবল প্রতিক্রিয়ারও তীব্র ঘোষণা শোনা গেল।

বঙ্কিমের আগেই গদ্যভাষার সুঠাম দেহটি খাড়া করে তুলেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর, এই তিনজন প্রথম শ্রেণীর গদ্যরচয়িতা। বাংলা গদ্যের পদবিন্যাসরীতি এঁরাই সুষ্ঠুভাবে প্রবর্তন করেন। রামমোহনের দ্বারা অতি আয়াসে সম্পন্ন পদশৃঙ্খলাবিধান অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের রচনার মধ্যে অনায়াসে সাধিত। দেবেন্দ্রনাথের রচনা রামমোহনের তুলনায় পদবিন্যাসের ব্যাপারে উন্নত হলেও অক্ষয়কুমারের তুলনায় পশ্চাদ্বর্তী। অক্ষয়কুমারের চেয়ে বিদ্যাসাগর এ ব্যাপারে আরো বেশি এগিয়ে যান। আদর্শ সাধু গদ্যভাষা দেহসংস্থানের দিক থেকে বিদ্যাসাগরের হাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে। বাংলা গদ্যে নিখুঁত পদবিন্যাসরীতি বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তনা ; তাঁর এই কৃতিত্বের গৌরব অন্য কোন লেখককে দেওয়া চলে না। এই সাফল্যের গুরুত্বও অসাধারণ। পরে সেটা আরো স্পষ্ট হবে।

অক্ষয়কুমার প্রসাদগুণবিশিষ্ট ঋজু বাক্যময় গদ্য রচনা করেন। তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয় হলেও বিদ্যাসাগরের চেয়ে তাঁকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া নির্বোধের কাজ। ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক থাকার সময় তাঁর প্রথম গদ্যপুস্তক একটি ভূগোল শেখার বই লেখা আরম্ভ হয়। সেটি ১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয়—যার ভাষার নিদর্শন আগেই দেওয়া হয়েছে। সময়ের বিচারে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী। কিন্তু ভাষার উন্নতি সাধনে বিদ্যাসাগর যে অগ্রবর্তী তা যথাসময়ে প্রমাণিত হবে। ১৮৪২ সালে অক্ষয়কুমার ছয় সংখ্যা "বিদ্যাদর্শন" মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪৩ সালে তিনি পত্রিকা-সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেও উৎকট শিরঃপীড়ার জন্য বারো বছর পরে তাঁকে সম্পাদনার কাজ ছেড়ে দিতে হয়। বিদ্যাসাগর তাঁকে মাসিক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। পাঠ্যপুস্তক বিক্রির টাকা বেশি হওয়ায় অক্ষয়কুমার সে-বৃত্তি পরে পরিত্যাগ করেন। ১৮৫২ সালে তাঁর সবচেয়ে সমাদৃত গ্রন্থ ""চারুপাঠ" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ সালে বইটির দ্বিতীয় এবং ১৮৫৯ সালে তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত ভূগোলের বইটির তুলনায় চারুপাঠের তৃতীয় ভাগের ভাষা কতটা অগ্রসর, তা দেখা যাক :—

"একদিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্বক সুললিত লহরীলীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল, কত শত দীপ্যমান হীরকখণ্ড গগনমণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে দিব্যলাবণ্যপরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকীরণ

পূর্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষাস্বরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিলতরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল; কখনও গগনাবলম্বিত মেঘবিম্ব দ্বারা যমুনার নির্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল।"

এই রচনাংশ তৎসম শব্দপরিপূর্ণ হলেও উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন; ধ্বনিভারবাহুল্যে এখনকার ভাষার তুলনায় একটু মন্থরগতি হলেও এই ভাষা মোটের উপর সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল এবং শব্দসৌন্দর্য ও ধ্বনি-গাম্ভীর্যে সমৃদ্ধ। এখানে সংস্কৃতের প্রভাব বাঞ্ছনীয় রূপে আবির্ভূত; তার শব্দাবলী গম্ভীর ঝঙ্কারে বাংলা গদ্যভাষার গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার যৌবনোজ্জ্বল বিদ্যুৎগতি নেই বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাহন হবার মতো প্রকাশসামর্থ্য আছে। পাঠ্য-পুস্তকরূপে এই ধরণের বই বিপুল জনসমাদর লাভ করেছিল। দুঃখের বিষয়, অক্ষয়কুমার তাঁর প্রতিভা মৌলিক সাহিত্যরচনায় নিযুক্ত করেননি।

দেখা যায়, আঠারো বছর সময়ের মধ্যে অক্ষয়কুমারের ভাষা ঋজুতা ও ভারসাম্য অর্জন করেছে। তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে সাহিত্যোচিত সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষ দেখে বোঝা যায়, দেবেন্দ্রনাথের মতো আত্মচরিত বা ঐ ধরণের কোন মৌলিক রচনায় আত্মনিয়োগ করলে তিনি "স্বপ্নদর্শন"-এর ভাষার উৎকর্ষ বাড়াতে পারতেন, ১৮৫২ সালের এক রচনায় তিনি প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন :—

"বসন্তকালে যখন পৃথিবী নানা রসে পরিপূরিত হইয়া পরম রমণীয় পুষ্প-পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক অপূর্ব শোভা প্রকাশ করে এবং পুষ্পভারাবনত তরুশাখাসকল সুমন্দ মারুতহিল্লোলে কম্পিত হইয়া অবিশ্রান্ত কুসুমবর্ষণপূর্বক চতুর্দিক আমোদিত করে ও বৃক্ষশাখারূঢ় বিহঙ্গ সকল মুহুর্মুহু শাখাপরিবর্তনপূর্বক মধুর স্বরে মনের সুখে গান করত পথিকের মন হরণ করে, তখন যাহার নেত্র উন্মীলন করিবার সামর্থ্য আছে এবং শ্রবণেন্দ্রিয় স্ববশ আছে, তাহার অন্তঃকরণ সুধামৃত রসে অভিষিক্ত না হইয়া কতক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?"

এখানে তাঁর গদ্যরচনায় যে-ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার কবিত্ব সে-যুগে দুর্লভ ছিল। এমন রচনা তাঁর "স্বপ্নদর্শন" নিবন্ধে আরো আছে। তত্ত্ব ও তথ্যের সারসংগ্রহে নিযুক্ত এই মহামনবী সৌন্দর্যময়ী ভাষাসৃষ্টিতে উপযুক্ত শক্তিপ্রয়োগ করেননি। তাঁর ১৮৫২-৫৩ সালে প্রকাশিত "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" গ্রন্থ মূল্যবান্ মন্তব্যে পরম সমৃদ্ধ হলেও তার সাহিত্যমূল্য কম। কিন্তু এই বই বা পরবর্তী "ধর্মনীতি" (১৮৫৬), "পদার্থবিদ্যা" (১৮৫৬), "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" (১৮৭০-৮৩) প্রভৃতি রচনার গদ্যভাষাগঠনসংক্রান্ত কৃতিত্বের মূল্য কোন সময়েই কম করে দেখা চলে না। তাঁর গদ্য-রচনার ধারাটি পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনুসৃত হয়ে আরো বেশি উন্নত হয়, যেমন মৃত্যুঞ্জয়ের ধারার চরমোৎকর্ষ বিদ্যাসাগরে দেখা গিয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথের গদ্যরচনার ধারা রাজনারায়ণ বসু ও ঠাকুর পরিবারের অনেকের রচনায় অনুসৃত হয়েছে। এই রচনাশৈলীর অনেক গুণ থাকলেও একটি দোষ এই ছিল যে, এ ধরণের লেখা অতিরিক্ত স্তিমিত চালের জন্য অচিরেই একঘেয়ে হয়ে পড়ে। শান্ত দৃঢ়তা ও ভারসাম্য থাকলেও এই ধারার গদ্যে বক্তব্য এত মন্থরগতিতে প্রকাশিত হয় যে পাঠকচিত্ত অধীর ও বিরক্ত হয়ে পাঠে নিবৃত্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথের এই প্রণালীটি অনুসরণ করেছেন, আর সেই জন্যেই তাঁর "রাজাপ্রজা," "সমূহ", "স্বদেশ" প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থের ভাষাও ক্লান্তিকর। দেবেন্দ্রনাথের অনুগামীদের মধ্যে রাজনারায়ণ "সেকাল আর একাল"-এর মতো সুখপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যাত্মক প্রবন্ধের ভাষা দেবেন্দ্রনাথের ভাষার অনুরূপ গুরুগম্ভীর। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, চন্দ্রশেখর বসু, এমন কি রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিকের রচনা রউপরও দেবেন্দ্রনাথের শান্ত অচঞ্চল বাক্যবিন্যাস রীতির প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যের জন্যেই হোক, কিম্বা লেখক বর্গের শান্তিপ্রিয় চেতনার প্রভাবেই হোক, তাঁদের রচনায় একটু মন্থরতা ও শ্রান্তির ভাব আছে যা তাঁদের ভাষার গতি-শৈথিল্যের হেতু। ঐ মন্দগতি অক্ষয়কুমারের ভাষায় দেখা গেলেও সেখানে দৃঢ়বদ্ধ বাগ্‌বিন্যাস যা বিদ্যাসাগরের দ্বারা সংশোধনের ফল, স্তরে স্তরে সাজানো যুক্তি শৃঙ্খলা যা রামমোহনের প্রভাবের পরিণাম, পাঠককে দুর্গমপথে দৃঢ়পদে যাত্রীর অনুভূতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভাষার মন্দবেগের যাথার্থ সম্বন্ধে নিঃসংশয় করে। দেবেন্দ্রনাথ-প্রমুখ লেখকদের বেলায় সে-কথা প্রযোজ্য নয়। অক্ষয়কুমারের তুলনায় তাঁরা তৎসম শব্দ কম ব্যবহার করলেও এবং অপেক্ষাকৃত লঘু দেশীয় বাগ্‌ধারার প্রভাবে তাঁদের ভাষায় একটু কথ্যভঙ্গিমার আবির্ভাব ঘটলেও আভ্যন্তরীণ প্রাণশক্তির অভাবে তাঁদের ভাষা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। লেখকদের পরস্পরের রচনা তুলনা করলে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁদের রচনার ভাষা অতি উপাদেয়, সরল ও স্বচ্ছন্দ। কিন্তু নিতান্ত একঘেয়ে বলে মাঝে মাঝে বিরক্তিকর। ১৮৬২ সালে লেখা রাজেন্দ্রলালের এই রচনাংশ পড়লে তা বোঝা যাবে :—

"তোমার পবিত্রতার ভয়কে আমার নেত্রযুগলের সম্মুখে প্রহরী স্বরূপ স্থাপন কর, যাহাতে আমার নেত্রযুগল যেন লোভাসক্ত হইয়া দর্শন না করে; তাহা আমার কর্ণদ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন কর, যাহাতে তদ্দ্বয় পাপকর বাক্য শ্রবণে আস্থা না করে; তাহা আমার মুখের সম্মুখে স্থাপন কর, যাহাতে তাহা আর মিথ্যা উচ্চারণ না করে; তাহা আমার মনের সম্মুখে স্থাপন কর, যাহাতে আর দুষ্টতার ভাবনা না হয়; তাহা আমার হস্তদ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন কর, যাহাতে তাহারা আর অন্যায় না করে; তাহা আমার পদদ্বয়ের সম্মুখে স্থাপন কর যাহাতে তাহারা আর অসৎপথে গমন করিতে না পারে; পরন্তু তৎসমুদয়কে এ প্রকারে চালিত কর, যাহাতে তাহারা তোমার আজ্ঞানুবর্তী হয়।"

এই সব রচনায় অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের স্থাপত্যধর্মী দৃঢ় অভি-ব্যঞ্জনা অনুপস্থিত ; তাহলেও এই ভাষা যথেষ্ট অগ্রগতির নিদর্শন।

অক্ষয়কুমারের অনুগামীদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ। তাঁর ভাষা সংস্কৃতানুগ আর অক্ষয়কুমারের মতো দৃঢ়বদ্ধ হলেও এমন ক্ষিপ্র ও সংক্ষিপ্ত বাক্যময় যে বিস্মিত হতে হয়। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে প্রথম রোমান্টিক গল্পসাহিত্যের উপযোগী গদ্য রচনা করা, যদিও অনুবাদ-সাহিত্যরূপে। তিনি ১৮৬২ সালে "ঐতিহাসিক উপন্যাস" নামে এক রচনা প্রকাশ করেন(যা ১৮৫৭ সালে লেখা হয়েছিল। এই বইএ "সফল স্বপ্ন" আর "অঙ্গুরীয় বিনিময়" নামে দুটি রোমান্টিক গল্প আছে যা Romance of History থেকে নেওয়া। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যও Romance of History থেকে দুটি ছোট রোমান্টিক গল্প রচনার প্রেরণা সংগ্রহ করেন। তিনি ১৮৫৭-৫৮ সালে "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" এবং ১৮৬২ সালে "বিচিত্রবীর্য" প্রকাশ করেন। রচনার প্রকাশ-কালের দিক থেকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০—১৯৩২) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫—৯৪) মহাশয়ের অগ্রবর্তী, যদিও রচনা-কালের বিচারে ভূদেবেরই পূর্ববর্তী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ঐ রচনা-গুলি বাংলা গল্পসাহিত্যের প্রথম অনুবাদাশ্রিত রোমান্টিক গল্পরসবিশিষ্ট রচনা। ভূদেব ও কৃষ্ণকমল উভয়েই সংস্কৃত ভাষাগত প্রভাবের একান্ত অনুরাগী হলেও তাঁদের রচনাশৈলীতে কোন আড়ষ্টতা ছিল না। ১৮৬৮—৬৯ সালে কৃষ্ণকমল আর একটি রোমান্টিক কাহিনী Paul et Virginie (ইংরেজি Paul and Virginia) রচনার বাংলা অনুবাদ "পৌলবর্জিনী" প্রকাশ করেন। এই সব কটি রচনাতেই মূলের রোমান্টিকতার মধুর আবেশ সংমিশ্রিত হয়েছে। কিন্তু ভাষায় রোমান্টিক পরিবেশের উপযুক্ত শিহরণ ও চমক সৃষ্টি বঙ্কিমের আগে আর কেউ করতে পারেননি। ভূদেব ও কৃষ্ণকমলের সমকালেই ইংরেজি ভাষায় বঙ্কিমের একাধিক রোমান্টিক রচনা প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাংলা গদ্যে রোমান্স রচনার ব্যাপারে বঙ্কিম, ভূদেব বা কৃষ্ণ-কমল, কারো কাছেই ঋণী নন। একই উৎস পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে একই সময়ে তিনজনেই অনুপ্রাণিত হন। বঙ্কিমের বাংলা রোমান্স একটু দেরিতে প্রকাশিত হলেও তাঁর রচনায় বিষয়বস্তু ও ভাষা কোনটিই ভূদেব বা কৃষ্ণকমলের দ্বারা প্রভাবিত নয়। এ বিষয়ে মনোমোহন ঘোষ ও মোহিতলাল মজুমদার, দুজনের অনুমানই ভ্রান্ত। অক্ষয়চন্দ্র সরকার "দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা" সম্বন্ধে যা লিখেছেন; তারও কোনও প্রমাণ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের অভাবনীয় কৃতিত্বের উৎস ভূদেব বা কৃষ্ণ-কমলে খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

রোমান্টিক বিষয়বস্তুর প্রভাবে ভূদেবের গদ্যভাষা কেমন উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তার একটু নমুনা পরীক্ষা করা যেতে পারে :—

"পথিক…ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ রজ্জুমুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্তী নির্ঝরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুত রসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্যকিরণ প্রায় সর্বতো-ভাবেই আচ্ছাদিত ; কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উপরিস্থ পূর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে।"

ভূদেব ১৮৭২ সাল থেকে আর বাংলা গদ্যের নিয়ামক না হতে পারলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবের যুগেও তাঁর গদ্যপ্রবন্ধের খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর সাধারণ গদ্যরচনার নিদর্শন থেকে বোঝা যাবে যে, তিনি অক্ষয়কুমারের ভাষাকে আরো লঘু ও প্রাঞ্জল রূপ দিয়েছিলেন :—

"কিন্তু আর একটি সভাও ঐ সময়ে সংস্থাপিত হয়। ইহা উদারতর অভিপ্রায়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল। সুতরাং উহার ফল অধি-কতর কালব্যাপী হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য সনাতন বৈদিক ধর্মের সংস্থাপন—ইহার নাম তত্ত্ববোধিনী সভা। এই সভা সর্বতোভাবে রাজকীয় কার্যবিষয়ে সম্পর্কশূন্য থাকিয়া জাতীয় ভাষা এবং ধর্মপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ছল। সুতরাং যেমন দূরদর্শিতা সহকারে এই সভার কার্য আরম্ভ হইয়াছিল, ইহার শুভফল তেমন দূরতর পরবর্তী পুরুষগণের ভোগ্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।"

মিশনারিরা এইযুগে সংস্কৃতের প্রাধান্যকে সুচক্ষে দেখতেন না, একথা আগেও বলা হয়েছে। খ্রীষ্টান লেখকেরা চলতি ভাষার প্রসারই পছন্দ করতেন। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩—৮৫) মহাশয় ১৮৫০ সালে এই অভিমত প্রকাশ করেন :—

"কোন কোন স্থলে যদি সংস্কৃত পদ চলিত হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রয়োগ করিলে হানি নাই। বরং তাহাতে রচনার পারিপাট্য হয়। কিন্তু যে স্থলে রসবিস্তার কিম্বা দীর্ঘ বক্তৃতা করা অভিপ্রেত নহে, সে-স্থলে অপ্রসিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া সহজ শব্দ ব্যবহার করাই উচিত। যাঁহারা গৌড়ীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহারদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যদি তাঁহারা চলিত ভাষার বিপরীত শব্দ প্রয়োগ করিতে সর্বদা প্রয়াস করেন, তবে গৌড়ীয় ভাষার কখন উন্নতি হইবে না। গ্রন্থরচনার শব্দ এবং চলিত ভাষা ক্রমশ একরূপ হইলেই শ্রেয় সম্ভাবনা। ইতর এবং মূর্খ লোকদিগের মধ্যে চলিত অপর ভাষা লিপি-বদ্ধ করা কর্তব্য আমার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু, সাধুভাষার অর্থ, সাধু লোকের বাণী ; অতএব, পণ্ডিতেরা কথোপকথনকালে অভ্যাসবশত যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সামান্য বিষয়ের রচনায় তদপেক্ষা কঠিন শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য হয় না।"

এই মূল্যবান্ মন্তব্যের জন্যে কৃষ্ণমোহন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য। এই অভিমত অনুসারেই ১৮৬২ সালের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" গ্রন্থের ভাষা কথ্যভাষা হলেও অচল ও অনাদরণীয়। ২৮ বছর পরে বঙ্কিম এই অভিমত একটি মূলনীতির আকারে উপস্থাপিত করে বাংলা গদ্যের মূলধারার আত্মবিকাশের পথ সুগম করে দেন। ধর্ম-যাজক কৃষ্ণমোহনের অভিমত তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ভাষাজ্ঞানের পরিচায়ক। চলতি ভাষাই যে স্বাভাবিক ভাষা এবং শিষ্ট জনের কথ্যভাষাতেই যে আদর্শ গদ্য রচিত হতে পারে, সে-সত্য তাঁর আগে আর কেউ এমন

দৃঢ় ভঙ্গিতে বলতে পারে নি। যদিও নিজ রচনায় ঐ সত্য রূপায়িত করার সামর্থ্য কৃষ্ণমোহন, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র কারোই ছিল না। ঐ সত্য রূপ লাভ করল রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও প্রমথ চৌধুরীর সাধনায়।

১৮৬৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক ও গদ্যসাহিত্যের স্রষ্টা শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের অন্যতম বিদ্যাসাগর গদ্যভাষার অতুলনীয় কল্যাণ সাধন করেন। সাধু গদ্যের দেহ-সংস্থান পূর্ণাবয়ব করে তোলার ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটু বলা দরকার যে, তিনি সাধু গদ্য-ভাষার শ্রেষ্ঠ রূপকার ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চেয়ে বড় স্রষ্টা সাহিত্যিক হলেও কেবল ভাষাগঠনের কাজে সাধু গদ্যভাষার ক্ষেত্রে কেউ তাঁকে আজ পর্যন্ত ছাড়াতে পারেন নি। গদ্যভাষা ও সাহিত্যের জগতে তাঁর কৃতিত্বসমূহ মোটামুটি এই :—

(১) বাংলা গদ্যভাষার পদবিন্যাসরীতি অর্থাৎ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া-অব্যয়াদি পদের অন্বয় বা যথাযথ অবস্থান প্রথম বিশুদ্ধভাবে নিরূপণ ও প্রয়োগ করেন বিদ্যাসাগর। এই জন্যে তাঁকে বিনা দ্বিধায় "বাংলা গদ্যের জনক" বলা যায়। কথ্যভাষার গদ্যে প্রমথ চৌধুরীর যে কৃতিত্ব, সাধুভাষার গদ্যে সেই কৃতিত্ব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাপ্য। বাংলা গদ্যের যে পদবিন্যাসরীতি তিনি স্থির করে দেন, আজ শতাব্দীকাল পরেও সাধুভাষার গদ্যের বেলায় তাই সর্বজনমান্য হয়ে আছে। আজও সাধুভাষায় কিছু লিখতে গেলে মোটামুটি তাঁর তৈরি কাঠামোই সকলে গ্রহণ করে।

বাংলা গদ্যের একটি নিজস্ব পদবিন্যাসরীতি থাকা আবশ্যক যা ইংরেজি বা সংস্কৃত রীতির অন্ধ অনুগমন করবে না, এ কথা বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে তাঁর সে-প্রত্যয় ভাষায় রূপায়িত করেন। যে পদবিন্যাসপ্রকরণ তিনি গ্রহণ করেন তা বাংলাভাষার নিজস্ব সম্পদ, ইংরেজি বা সংস্কৃত থেকে ধারকরা নয়; আমরা সাধারণত শিক্ষিত সমাজে যেভাবে কথা বলে থাকি, সেই শিষ্ট কথ্যভাষায় পদগুলির যেমন অন্বয় হয়ে থাকে, ভাষাকে সাধুরূপ দিলেও বিদ্যাসাগর সেই রকম অন্বয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি তখনও কোন সর্বজনস্বীকৃত শিষ্ট কথ্য-ভাষা সারা বাংলাদেশে প্রচলিত না হওয়ায় ভাষাকে কলিকাতার শিষ্ট সমাজের মুখের ভাষার অনুরূপ করা সঙ্গত বলে মনে করেন নি। আজ একটি আদর্শ কথ্যভাষা সারা বাংলাদেশের শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে বলে এ নিয়ে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তখন সারা বাংলাদেশের পাঠকবর্গের কাছে সহজবোধ্য করার প্রয়োজনে ভাষাকে সাধুরূপ দেওয়া সুবিধাজনক বলে তিনি মনে করেছিলেন। গ্রামাঞ্চলের অগণিত পাঠক সেই সময় চলতি ভাষায় লেখা বেশি বুঝত, না সাধুভাষাই বেশি বুঝতে পারত, তা হয়ত তিনি নিঃসংশয়ে অনুভব করেন নি। তবুও তিনি যে-সাধুভাষা গ্রহণ করেন, তা আসলে আদর্শ কথ্যভাষার ঈষৎ বক্র রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ বক্রিমা যুগ-প্রয়োজনে দেশবাসীর স্বার্থে গৃহীত।

প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব পদবিন্যাসরীতি থাকতে বাধ্য। প্রধানত মুখের ভাষাকে ভিত্তি করেই ঐ রীতি গড়ে উঠতে থাকে। মৌখিক ভাষার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষার পদবিন্যাসপ্রণালীর অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে। যাঁরা বাংলা গদ্য গড়ার প্রথম যুগে এ-সত্য বুঝতে পারেন নি, তাঁদের ভাষায় পদান্বয়ে অনেক দোষ দেখা গেছে। রামমোহন ও মৃত্যুঞ্জয়, দুজনের লেখাতেই পদবিন্যাসের ত্রুটি আমরা দেখেছি। সে-যুগে যাঁরা ইংরেজি বা সংস্কৃত বাগ্‌ভঙ্গি বা পদান্বয় অনুকরণ করেছেন, তাঁরাই ভুল করেছেন। সংস্কৃতের সঙ্গেও এ ব্যাপারে বাংলার মিল নেই। "অস্তি কশ্চিৎ বাগবিশেষঃ" ধরণের বিন্যাস সংস্কৃতে আদরণীয়, "আছে কোন বাক্যবিশেষ" বাংলায় অচল। আর ইংরেজির সঙ্গে এ ব্যাপারে বাংলার আশমান-জমিন্‌ ফারাক। এমন কি বাংলা সাধুভাষার পদবিন্যাসরীতিও বাংলা মৌখিক ভাষার কাছে ঋণী, আর সেটাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক, এই সত্য সর্বদা স্মরণ থাকলে বিদ্যাসাগর-গঠিত সাধুভাষার স্বরূপ বুঝতে সুবিধা হবে।

(২) গদ্যরচনায় উপযুক্ত বিরামচিহ্ন বিদ্যাসাগর প্রথম ব্যবহার করতে থাকেন। কমা, সেমিকোলন, কোলন, ফুলষ্টপ, উদ্ধৃতি-চিহ্ন, বিস্ময়-সঙ্কেত, জিজ্ঞাসা-চিহ্ন প্রভৃতি যাবতীয় ছেদ ও যতি বিজ্ঞাপক চিহ্ন তিনিই সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে সার্থক ও যথাযথরূপে কাজে লাগান। আজ পর্যন্ত ঐ সব চিহ্নের সুষ্ঠুতর ব্যবহার কোন বাঙালি লেখকের রচনায় দেখা যায় নি। এখনকার খুব কম লেখকই বিদ্যাসাগরের মতো নিপুণভাবে চিহ্নগুলি ব্যবহার করতে পারেন।

(৩) গদ্যেরও একটি সুসীম নিয়মিত ছন্দ আছে, যথাযোগ্য স্থানে বিরাম গ্রহণ করলে যা বেজে উঠে পাঠক বা শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। বিরামচিহ্ন দিয়ে ঐ যথাযোগ্য বিরতির স্থান চিহ্নিত করা হয়। বিদ্যাসাগর ঐ ছন্দ প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর গদ্যরচনাবলীতে যথেষ্ট পরিমাণে এর প্রয়োগ-কৌশল দেখিয়ে তিনি এই ছন্দের স্পষ্ট রূপ গঠন করেন। গদ্যভাষার ছন্দ অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে যাতে সহজে ধরা পড়ে তার জন্যে তিনি তাঁর রচনায় বিরামচিহ্ন খুব সতর্কভাবে প্রয়োগ করেছেন যাতে একটিও উপযুক্ত বিরতির স্থান বাদ পড়ে না যায়। তাঁর রচনায় ছেদচিহ্নের আধিক্য সম্বন্ধে যাঁরা অভিযোগ করেন, তাঁরা এই বিষয়টা মোটেই বুঝতে পারেন নি।

(৪) বাংলা গদ্যভাষায় প্রথম সাহিত্যগুণসম্পন্ন রচনা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি। তাঁর আগের লেখকদের রচনায় কদাচিৎ সাহিত্য-গুণের আবির্ভাব দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যসৃষ্টি বিদ্যাসাগরের দান। অবশ্য, মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্রের আগে দেখা যায় নি। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণকমল সকলেই অনুবাদ করেছেন। পরবর্তী কালে ভূদেব প্রভৃতিও মৌলিক সাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু বঙ্কিমের আগে নয়। অনুবাদ-সাহিত্যের রূপে হলেও প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যগ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করা বিদ্যাসাগরের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সব রকম ভাব প্রকাশের পক্ষে বাংলা গদ্যভাষা যে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তা বিদ্যাসাগর প্রমাণ করলেন নানা গ্রন্থের অনুবাদ উপলক্ষে সবরকম ভাবই বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে। বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মস্পর্শিতা ও

গতিবেগ না থাকলেও তাঁর ভাষা সাহিত্যরসে সম্পৃক্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরীয় গদ্যভাষা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যরচনার উপযোগী।

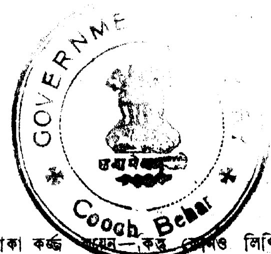
(৫) বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আগেও অনেক অনুবাদ বাংলা গদ্যে প্রকাশিত হয়েছে বটে কিন্তু সেগুলি সাহিত্যপদবাচ্য কিনা সন্দেহের বিষয়। পূর্ণায়তন সাহিত্যগ্রন্থের আদর্শ গদ্য অনুবাদ করে বিদ্যাসাগর প্রকৃত অনুবাদ-সাহিত্যের গোড়াপত্তন তো করলেনই, আদর্শ গদ্যভাষা কেমন হওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধে তরুণ লেখক সমাজের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনও করলেন। বিদ্যাসাগরের আগে অনেক অনুবাদ ও মৌলিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে; রামরাম বসু থেকে অক্ষয়কুমার পর্যন্ত সকলের লেখার আলোচনায় এটা কিন্তু বেশ প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ রচনা ও আংশিক সাহিত্যগুণের সমাবেশ সাধনের ক্ষমতা থাকলেও সরস সাহিত্যগ্রন্থ, এমন কি অনুবাদের মারফতেও, বিদ্যাসাগরের আগে কেউ রচনা করেন নি, বিশেষত পরিপুষ্ট নিখুঁত ভাষায়; সে-ভাষা পাঠককে বাংলা গদ্যপাঠে আকৃষ্ট করেছে, নবীন লেখককে লিখতে উৎসাহিত করেছে।

(৬) বাংলা ভাষা শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থমালা সবচেয়ে ভালো ভাবে রচনা করেন বিদ্যাসাগর। তাঁর বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয় প্রভৃতি শিশুপাঠ্য বই অবলম্বনে এদেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর মাতৃভাষা শিক্ষার পথ সুগম হয়েছে। গদ্যভাষা শিক্ষার হাতেখড়িও ঐ সব বইএর মারফতে ভালো ভাবেই হয়।

(৭) বাংলা ভাষায় প্রথম সাহিত্যের ইতিহাস বিদ্যাসাগর রচনা করেন। তা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস হলেও বাংলা ভাষায় ও ধরণের বই সেই প্রথম। বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত অলঙ্কারের প্রথম সার্থক প্রয়োগও তাঁর। প্রথম সমালোচনা-সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবেও বইটি গ্রহণ করা উচিত। সমালোচনার কাজে এতে বিদ্যাসাগর যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত তার চেয়ে বেশি আর কেউ পারেন নি। অনেকে রাজেন্দ্রলালের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকায় প্রথম সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের গ্রন্থটির প্রকাশ ১৮৫৩ সালে হলেও তার রচনাকাল ১৮৫১ সাল। পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতারাও তাঁর ধারা অনুসরণ করেন। যতদূর জানা যায়, "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব" প্রথম মুদ্রিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের সেবক হিসেবেও তাঁর দক্ষতা অপরিসীম।

(৮) বাংলা ছোট গল্পের ক্ষীণ সূচনা বিদ্যাসাগরের রচনায় দেখা যায়। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত ভুবনের গল্পটি মৌলিক সাহিত্যের ছোট একটি টুকরো বলে মনে করা চলে। সেটি কেবল নীতিশিক্ষা দেয় না, একটি সরস ও সার্থক ছোট গল্পের আভাসও দেয়।

সুতরাং একথা এখন অসঙ্কোচে বলা যায় যে, মৌলিক সাহিত্যের প্রথম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত না হলেও তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত গদ্যরচয়িতাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর শুধু শ্রেষ্ঠ নন, একমাত্র সাহিত্যিক। প্রথম জন্মের পর থেকে বহু জনের আপ্রাণ প্রয়াসে বাংলা গদ্য যে অগ্রগতি অর্জন করছিল, বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসাধনায় তা ভাষাগত সাফল্যের বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপস্থিত হল। ঐ ভিত্তির উপর বঙ্কিমচন্দ্র অনায়াসে সাহিত্যসৌধ নির্মাণ করেন, ভাষাগঠনের জন্যে তাঁকে শক্তির অপব্যয় করতে হয় নি। সে-কাজ কর্মবীর বিদ্যাসাগর আর পাঁচ কাজের মধ্যেই ১৮৬৫ সালের আগেই মোটামুটি শেষ করে রেখেছিলেন। ১৮৭৮ সালে নবীন যুগের সূত্রপাত হবার আগে সাধুভাষার ক্ষেত্রে আর কিছু করণীয় ছিল না। (ক্রমশ)



রাণী রাসমণির গল্প

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী রাণীরাসমণির সম্বন্ধে বাল্যে ও যৌবনে বহু গল্প শুনিয়াছি। এই গল্পগুলি সত্যও হইতে পারে বা অন্য লোকমুখে বাড়িয়া বাড়িয়া এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে যে, যাহার সত্যতা সম্বন্ধে মনে ঘোরতর সন্দেহ আইসে। আমরা এইরূপ দুই-একটী গল্প সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

রাণীরাসমণি ইং ১৮৬১ সালে ৬৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইঁহার স্বামী রাজচন্দ্র দাস ইং ১৮৩৯ সালে মারা যাইলে পর তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন। ইঁহার প্রখর বিষয়-বুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রাণীর স্বামীর নিকট হইতে ১০,০০০৲ টাকা কর্জ্জ লয়েন—কর্জ্জ লওয়ার কোনও লিখিত নিদর্শন ছিল না। প্রিন্স দ্বারকানাথের বদনাম ছিল যে তিনি সহজে কাহাকেও টাকা দিতেন না। এক্ষেত্রে টাকার ত কোনও লিখিত নিদর্শন নাই। রাণী বুদ্ধি করিয়া দ্বারকানাথকে নিজ বাটীতে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন যে আমি স্ত্রীলোক—কি করিয়া বিষয়-পরিচালনা করিতে হয়, জমিদারী শাসন করিতে হয় তাহা জানিনা, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন ত ভাল হয়। দ্বারকানাথ বলিলেন যে আপনি যদি আমার উপর সম্পূর্ণভার দিয়া আম-মোক্তারনামা লিখিয়া দেন ত আমি দেখাশুনা করিতে পারি। রাণী বলিলেন—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে

ত শুধু শুধু খাটাতে পারিনা ; যাহা আমার আয় হইবে তাহার শতকরা কিছু কমিশন আপনাকে দিব—আপনি অনুগ্রহ করিয়া লইবেন কি? দ্বারকানাথ রাজী হইলেন। তাহার পর রাণী বলিলেন যে শুনিতেছি আপনার কাছে আমার স্বামীর কিছু টাকা পাওয়ানা ছিল ইহা কি সত্য? দ্বারকানাথ কমিশনের লোভে স্বীকার করিলেন যে ১০,০০০৲ টাকা তিনি লইয়াছেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে সুদসহ দশ হাজার টাকা রাণীকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর রাণী টাল-বাহানা করিয়া দ্বারকানাথকে আম-মোক্তারনামা লিখিয়া দিলেন না। দ্বারকানাথ পীড়াপীড়ি করিলে বলিলেন যে আপনি শুনিতেছি বিলাত যাইবেন ; আপনাকে আম-মোক্তারনামা লিখিয়া দিলে কাজের অসুবিধা হইবে। দ্বারকানাথ ইং ১৮৪২ সালের জানুয়ারী মাসে বিলাত যায়েন। সময় দেখিয়া মনে হয় এইরূপ ঘটনা ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

রাণীরাসমণি জাতিতে জেলিয়া কৈবর্ত্ত। এজন্য সকল জেলিয়ারা তাঁহাকে মান্য করিতেন। জেলিয়ারা ভাগীরথীতে বিনা-করে বরাবর মাছ ধরে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জেলিয়াদের উপর কর ধার্য্য করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এ বিষয়ে সুবলচন্দ্র মিত্রের বাংলা অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে।—

একবার গবর্ণমেণ্ট গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য জেলেদের উপর কর ধার্য্য করেন। ইহাতে জেলেরা আসিয়া রাসমণির নিকট কাঁদিয়া পড়ে। রাসমণি এই কর রহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় রাসমণি স্বয়ং দশ হাজার টাকা দিয়া ইজারা গ্রহণ করেন। ইহার পরও ইনি জলকর প্রথা রহিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইঁহার আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। তখন রাসমণি এক কৌশলের সৃষ্টি করিলেন। ইনি চড়ায় চড়ায় লোহার শিকল বাঁধিয়া নদীমুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে নৌকা জাহাজ প্রভৃতির গতিরোধ হইল। বণিকগণ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। তখন গভর্ণমেণ্ট রাসমণির নিকট ইহার কারণ জানিতে চাহিলে রাসমণি উত্তর করিলেন—"আমি মাছের জন্য দশ হাজার টাকায় নদী জমা লইয়াছি। নদীর উপর দিয়া নৌকা জাহাজ প্রভৃতি যাতায়াত করিলে মাছ পলাইয়া যাইবে। সুতরাং মাছ রক্ষার জন্য আমি নদীমুখ বন্ধ করিয়া রাখিব।" এই উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। শেষে গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া এই জলকর তুলিয়া দিলেন।

এই গল্প বাল্যকালে স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট, বাড়ীতে বহু বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিয়াছি। ইং ১৮৫৯ সালে গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করেন যে সকল নদীতেই জলকরের উপর কর ধার্য্য হইবে ; এই মর্ম্মে রেভিনিউ বোর্ড ১৮৫৯ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে ৩৬নং সার্কুলার জারি করেন। গভর্ণমেণ্টের বহু জলকর তৌজী আছে। ইহার অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গে। ভাগীরথীতেও জলকর আছে। যে কয়টী বড় বড় জলকরের কথা জানি তাহাদের নাম ও অবস্থান দিয়ে দিলাম। যথা :—

জলকর	জলকরের অবস্থান
১। গঙ্গাপথ জলকর	জঙ্গীপুর-মুর্শিদাবাদ
২। ঐ তৌজী নং ২৮৮৫	জঙ্গীপুরের দক্ষিণ
৩। তরফ নন্দীপুর	লালগোলা-মুর্শিদাবাদ
৪। সিংহেশ্বরী জলকর	জিয়াগঞ্জ
৫। ভাগীরথী জলকর লাখরাজ তৌজী নং বি ৩২৬	লালবাগ-মুর্শিদাবাদ
৬। তৌজী নং ২৮৮৬	বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ
৭। তৌজী নং ২৮৮৭	বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ
৮। গঙ্গাপথ মাগনপাড়া জলকর	বেলডাঙ্গা-মুর্শিদাবাদ
৯। জলকর আট-বাঁক	পাটুলি-পূর্ব্বস্থলী-(নদীয়া)
১০। গঙ্গাপথ ইসলামপুর	মালদহ (উধুয়ানালা)
১১। কাশিমপুর জলকর	নদীয়া
১২। গঙ্গাপ্রসাদ জলকর	নদীয়া

৯।১১ ও ১২ নং জলকর জমীদারের, এক্ষণে পুনরায় সরকারের হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট ভাগীরথীতে জেলেদের উপর মাছ-ধরার জন্য কর-ধার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রাণীরাসমণি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহা সত্য বলিয়া মনে হয় না। তাঁর আপত্তিতে বা যে কোনও কারণেই হউক সরকার কর তুলিয়া দেন কিন্তু রাণীর জলকর ইজারা লইয়া জাহাজ যাতায়াত বন্ধ করা সত্য বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে রায় সাহেব অনিলচন্দ্র লাহিড়ী ইং ১৯৪০ সালে লিখিত—

Report on Rights in Fisheries in the Main Rivers of Bengal নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে :—

"There is a legendary tale about the settlement of fishery in the Hooghly near Dakshineswar with the late Rani Rashmani of Janbazar, Calcutta. It is said that Government settled the fishery rights of the Hooghly with the Rani in the beginning of the nineteenth century. She then obstructed all steamers and boats plying on the Hooghly on the plea that otherwise the fishery would suffer and her interest be in jeopardy. The fishermen approached Rani Rashmani to give them a permanent right in the fishery so that her great name might be remembered by succeeding generations as a great benefactres of their community. As she had great influence at the time over the authorities, it is said Government made a compromise with her by cancelling the lease with the Rani and

deciding that fishermen would enjoy free right of fishing in the Hooghly for ever and that no levy of toll would ever be imposed on them.

"I tried in vain to secure any authenticated papers regarding this legend from the 24-Parganas Collectorate as well as from the heirs of Rani Rashmoni and the fishermen. Whatever might be truth of this tale it is found on enquiry that fishermen who fish in this Hooghly have not paid any rent to anybody for generations."

সরকারী মহাফেজখানায় রাণীরাসমণির সহিত বন্দোবস্তের কাগজপত্রাদিও পাওয়া যায় নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতেও এমন কোন কাগজপত্রাদিও পাওয়া যায় নাই, যাহাতে এই গল্পের সত্যতার সম্ভাব্যতাও নিরূপিত হইতে পারে। রাণী ইজারা লইলে কাগজপত্র কোথায় না কোথায় নিশ্চয়ই থাকিত। সরকার কর্তৃক কর ধার্য্য, জেলেদের নিকট হইতে কর আদায়, রাণীর ইজারা লওয়া, ইজারা বাতিল ও কর রহিত হওয়া প্রভৃতি ১৮৫৯ হইতে ১৮৬১ সাল এই অল্প সময় মধ্যে ঘটা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

রাণীরাসমণির দক্ষিণেশ্বরের বাগানের উত্তরদিকে একটি সরকারী বারুদখানা বা ম্যাগাজিন ছিল। তাহার উপর সর্ব্বদাই গোরা পাহারা ছিল। লোকে বলিত এইটী হইতেছে রাণীরাসমণির কেল্লা। অজ্ঞ জেলেমালারা যে বলিত তাহা নহে, বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকও বলিত। ইং ১৯১১ সালে পোর্টকমিশনারগণ যখন আড়িয়াদহ (শিবতলা ঘাট) হইতে কলিকাতা অবধি ষ্টীমার চালায়, তখন বৈকালে কলিকাতার বহু বাবু প্রথম শ্রেণীর ডেকে বসিয়া গঙ্গার বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে করিতে রাণীরাসমণির কেল্লা দেখিতেন। এখন এই কেল্লার জমী গবর্ণমেণ্ট একটি দেশলাইয়ের কারখানাকে বেচিয়া দিয়াছেন। লোকে বলিলেও যেমন রাণীরাসমণির কোন কেল্লা ছিল না, তেমনি রাণীরাসমণির জলকর বন্দোবস্ত লইয়া ষ্টীমার আটকান গল্পও সত্য নহে। মনে হয় রাণী সরকারকে বলিয়া এই কর উঠাইয়া দেওয়াইতে এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

ব্রতকথা

শ্রীজয়দেব রায়

ছড়া, ব্রতকথার দেশ এই লৌকিক বঙ্গ, বারো মাসে তেরো পার্বণ তো আছেই, শুধু তাই নয়, সারা বছর ধরে আরও কত যে ছোটখাট পালাপর্ব লেগে আছে তার ইয়ত্তা নেই।

পল্লীগ্রামের কুলাঙ্গনাদের বাঁধাধরা গতানুগতিক জীবনে এই সব ব্রত, পার্বণ, পূজানুষ্ঠান যুগিয়ে আসছে আনন্দ, সৃষ্টি করছে বৈচিত্র্য। এগুলি তাদের মধ্যে সৃজনীশক্তির সঞ্চার করেছে, তার ফলে রচিত হয়েছে লোকসাহিত্য। ব্রতকথাই তার মধ্যে প্রধান।

ব্রতকথার মধ্যে পল্লীবঙ্গ পরিপূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্রতকথাতেই আমরা পাই পল্লীর নারীদের গার্হস্থ্য জীবনের অবিকল প্রতিফলন। সারাবর্ষ ধরে নানাবিধ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়, গৃহস্থদের গৃহ উৎসবে নন্দিত হয়ে থাকে, দরিদ্র ভিক্ষুক ও কৃপাপ্রার্থী ব্রাহ্মণদের দান করা হয়। উৎসবের বাঁশীর সুরে শিশুদের মুখে হাসি ফুটে উঠে, পল্লীললনাদের সামাজিক সম্মিলনের সুযোগ ঘটায়।

এই ব্রতপর্ব উপলক্ষেই কুলনারীরা রচনা ক'রে গীতিকবিতা ও ছড়া গান, বর্ষীয়সীরা শৈশবে শোনা উপকথাগুলিকে নিজেদের মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন ক'রে রচনা করেন। ব্রতকথায় আনুষঙ্গিক এই উপকথা ও ছড়াগুলিকে আশ্রয় ক'রে আছে প্রাচীন বঙ্গের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়।

ব্রতকথার সঙ্গে দেশের প্রচলিত ধর্মের কোন যোগ ছিল না। এগুলির সঙ্গে যোগ ছিল হৃদয় ধর্মের। কিছু দক্ষিণা লাভের উপলক্ষ বানাবার জন্য পুরোহিতরা এগুলিকে একটা ধর্মানুষ্ঠানের রূপ দিয়েছিল, কিন্তু মন্ত্র চালাতে পারে নি। ব্রতের মন্ত্র মেয়েরাই রচনা করে রেখেছিল।

সকল ব্রতেরই আচারানুষ্ঠান ও রীতিনীতি প্রায় অভিন্ন। আলিম্পনমণ্ডিত গৃহপ্রাঙ্গণের প্রান্তে নবারুণ সম্পাতে উজ্জ্বল প্রভাতে শুচিবসনা বালিকা কিশোরীরা সারা বর্ষ ধরে একটির পর একটি ব্রত করে চলে, তাদের কামনা যোগ্যবরলাভ, কুমারী জীবনের আর কিছু তো চাইবার নেই, তাদের প্রধান আকিঞ্চন—

ধাতাকাতা বিধাতা তুমি দাও বর।
আমার যেন স্বামী হয় রাজরাজেশ্বর॥

কুমারী জীবনের ব্রতের পর আছে সধবা জীবনের ব্রত। এই ধারায় ব্রতের উদ্দেশ্য স্বামিপুত্রের নিরন্তর মঙ্গল কামনা, গৃহসংসারের শ্রীবৃদ্ধি ও শান্তি প্রার্থনা।

ব্রতের সঙ্গে আছে কৃচ্ছ্র সাধন, তাই বছরের মধ্যে যে দুটি ঋতুতে ক্লেশ স্বীকার করতে হয়, সেই দুই ঋতুতেই ব্রত পার্বণের ধুম পড়ে যায়।

পৌষ মাঘ মাসে বসুমতী কুয়াশার ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে

থাকেন, মায়ের মুখ ভাল ক'রে দেখতে না পেয়ে যেন বসুমতীর কন্যারা ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সূর্যের আলোকই হলেন ধরণীর পালক, সেই সূর্যই আজ ক্ষীণ-তেজা। 'মাঘমণ্ডল' ব্রতে আছে তাঁরই আশ্বাস-বাণীর প্রার্থনা। মাঘমণ্ডল হিম ঋতুর উদ্‌যাপনী ও বসন্তের আগমনী ব্রত। তপনের তপ্ত কিরণের ভিখারিণী হিমার্তা কুমারীরা গায়—

উঠ উঠ সুরুজাই ঝিকিমিকি দিয়া।
তোমারে পুজিব আমি রক্তজবা দিয়া ॥
উঠ উঠ সুরুজাই ঝিকিমিকি দিয়া।
উঠিতে পারি না আমি হিমানীর লাগিয়া ॥

এই মাঘমণ্ডলের ব্রতের আর একটি রূপ 'লাউল্‌ ব্রত'-লাউল-রাওল-রাতুল; রাতুল হ'ল ঋতুরাজ-সূর্যের পুত্র বসন্ত। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর হিমান্তে জন্ম হয় বসন্তের, ব্রতচারিণীরা আকুল আগ্রহে প্রার্থনা করে তার আগমন। তারা আয়োজন করে লাউলের সঙ্গে তাদের ধরণীর কন্যা হালামালার বিবাহের। এই লাউল-হালামালার বিবাহ ও তাদের ঘরকন্নার কথাই হ'ল লাউল ব্রত। গ্রীস দেশীয় উপকথার মতো কবিত্বময় এই উপাখ্যান।

কুমারী বালিকারা এইভাবে তাদের গৃহ সংসারের প্রথম পাঠ গ্রহণ করে খেলার ছলে। বিবাহের আয়োজনে সারা বাড়ী মেতে ওঠে। বালিকাদের আয়োজন ব'লে পরিজনরা উপেক্ষা করে না। গিন্নীরা সব ঘুরে ঘুরে তদারক ক'রে বেড়ান। কন্যাকর্তা সবার কাছে হাতজোড় ক'রে ব'লে চলেছেন—

কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র একটা ব্যস্ততার সাড়া পড়ে যায়—

কাউয়া বলে কা, রাত পোহাইয়া যা !
হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসীর কাঁধা,
আজ লাউলের ঘরবাড়ী বাঁধা ॥
হাঁড়ি পাতিল ঠুকুর ঠুকুর কলসীর কাঁধা
আজ লাউলের কলাবাগান বাঁধা ॥

কলা গাছের তলে লো কাদা মাটি, তাতে ফেললাম কাঁঠালখানি,
কাঁঠালের আগায় লো তুলাখানি, তাতে বসাইলাম বামুনহাটি।
বামুন ভাইয়া, বামুন ভাইয়া, ভাদুলা তামাক খাইও।
আমার লাউলের বিয়ার সময় ফুলমন্ত্র পড়িও।
বারে বারে একুই বারে তুমি আঠিট নিও।
কুমোর ভাইয়া, কুমোর ভাইয়া, ভাদুলা তামুক খাইও ॥

লাউলের ব্রতের উপচারের কথা বলি। একখানা পিঁড়ি, একটা টাট, কতকটা ছানামাটি, দূর্বা আর নবান্নের উপযোগী প্রসাদাদি, আতপচাল, কলা, গুড় প্রভৃতি। টাটের উপর ছানামাটি নিয়ে একটা মন্দিরাকৃতি চূড়া বানিয়ে তা ফুলপাতা দিয়ে সাজিয়ে পিঁড়ির উপর বসিয়ে রাখা হবে, তাই হ'ল লাউল ঠাকুর।

এই ব্রতের সময় হচ্ছে পৌষপার্বণের কাছাকাছি। এ সময়ে বসুন্ধরার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে গৃহস্থের ভাণ্ডার ভরে থাকে। এই সময়টা হচ্ছে গ্রামবাসীদের বিশ্রামের সময়, তাদের হাতে এখন প্রচুর অবসর, তাই ছেলেমেয়েদের বিয়ে-থা দেওয়ার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বালিকারাও তাদের বাপ-মা-র দেখা দেখি বিবাহ-ব্রতের আয়োজন করে। যার প্রসাদে বসুন্ধরা শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছেন, সেই সূর্যের পুত্রের সঙ্গে তাই বসুন্ধরার কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা কল্পিত। এই সময়ে বসুন্ধরার অঙ্গন-বন প্রাঙ্গণ যেন উৎসবের আয়োজনে ভরে থাকে; অতসী, গাঁদা, কুন্দ, জইত, নাগেশ্বরের ফুলের রাশি অজস্র ভারে ফুটে ফুটে ঝরে পড়তে থাকে—

জইত গাছে কে ? ডাল নামাইয়া দে।
সূর্যঠাকুর চাইছেন ফুল, সাজি ভরিয়া দে।
কে যাস লো ম্যালানী, ফুলের সাজি লইয়া ?
ফুল ফুটেছে নানারকম, ডাল পড়েছে নোয়াইয়া ॥

ওদিকে সূর্যের গৃহে লাউলের বিবাহের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। অতিথিদের খাওয়াদাওয়ার প্রচুর আয়োজন হয়েছে। জেলে পুকুরে মাছ ধরার জন্য জাল ফেলে বলল—

সূর্যঠাকুর গো, পুকুরে ফেলাইলাম জাল
তাতে না উঠিল কিছু মাছ।

কিন্তু, এই যে মাছ উঠেছে, জেলেনী চেঁচিয়ে উঠল—উঠলো লো, উঠলো লো, মাছ নিবে কে ?

জেলে—ওই আসে বামুন মেয়ে থালুই হাতে করে।
জেলেনী—থাক থাক বামুন মেয়ে, আপনি নেব ধরে।
যেমন তেমন করে ॥

এই ভাবে গৃহস্থের রান্নাঘরে ভোজের আয়োজনে একটা হৈচৈ পড়ে যায়—

মাছ নিলাম গো, মাছ নিলাম গো—মাছ কুটিবে কে ?
ওই আসে কুটুনী বঁটি হাতে নিয়ে ॥
মাছ কুটলাম, মাছ কুটলাম লো—মাছ ধোবে কে ?
ওই যে আসে ধোয়ানী ঘটি হাতে নিয়ে ॥
মাছ ধুয়েছি, মাছ ধুয়েছি, মাছ রাঁধিবে কে ?
ওই যে আসে রাঁধুনী আগুন হাতে নিয়ে ॥

এইখানেই সব শেষ নয়। ভোজের দিনে হট্টগোলের মধ্যে কর্তাব্যক্তিরা বারবার ব্যস্তসমস্ত হয়ে অন্দরে প্রবেশ ক'রে অতিথিদের খাওয়া-শোওয়ার তদারক করে যান। পল্লীবালিকারা সেকথাও ভোলেনি—

বাপ—পান দিবে কে ?
মেয়েরা—ওই আসছে পান-খাওয়ানী ডিবা হাতে করে।
বাপ—বিছানা পাতিবে কে ?
মেয়েরা—ওই আসছে বিছানা-পাতুনী তোষক হাতে করে।

উৎসব-নন্দিত গৃহপ্রাঙ্গণে প্রতিবেশিনীরাই এইভাবে গৃহস্থবধূদের সাহায্য করে থাকে।

এবার বিবাহের পালা শুরু হয়। বালিকারা লাউল ঠাকুরের পিঁড়ি দুদিক দিয়ে উঁচু ক'রে ধরে ফুল ছিটিয়ে গাইতে থাকে—

এপারে লাউল, ওপারে লাউল কিসের বাস্ত বাজে ?
রাজার বেটা সদাগর বিয়ে করতে সাজে ॥

হিন্দুদের আদর্শ দেবদম্পতি হরপার্বতী, ব্রতচারিণীরা তাঁদের কথা এ প্রসঙ্গে করে—

হালা ধরি মালা ধরি তুইলা ধরি ছাতি।
শিবশঙ্কর বিয়া করেন গৌরীপার্বতী ॥

আগে পল্লীগৃহস্থদের আরও এক ঘর প্রতিবেশী ছিল মালী-মালিনী; আজকের দিনে ডেকরেটার্স'রা তাদের অংশ গ্রহণ করেছে। বিবাহের আয়োজনে তাদেরও অংশ আছে।

মালী—ফুল রুইলাম গাঁয় গাঁয়;
সে ফুল গেল দখিন গাঁয় ॥
মালিনী—দখিন গাঁইয়া মালীরে
মালী—ফুলের ডালি লবিরে ॥
মালিনী—হাতে কলসী, কাঁখে পোলা
কেমনে লব ফুলের ডালা ॥

এর পরে বিবাহের আর একটা বিশেষ সমারোহ রয়েছে। বরকন্যা বিদায় নিলে গৃহস্থকে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে নমস্কারী বিলি করতে হয়। ব্রতচারিণীরা সেকথাও ভোলে না—

আম্বের বইল আসে লো লোচা লোচা
সূর্যেরে দিলাম আমরা তসরের কোচা
আমের বইল আসে লো লোচা-লোচা
চন্দ্রেরে দিলাম আমরা গরদের কোচা ॥

আমের মুকুলের উল্লেখ বসন্তকালের আসন্ন সমাগমের ইঙ্গিত।

এইভাবে ধরণীর মেয়ের সঙ্গে সূর্যের ছেলে ঋতুরাজের বিবাহ সম্পন্ন হ'ল। বিবাহের পর ধরণী-কন্যার প্রথম সন্তান গর্ভে এসেছে। লাউলের বধূর এবার সাধভক্ষণ—

লাউলের বৌলো সাধন্তি
কি কি খাইতে সাধ ?

দেখতে দেখতে লাউলের সন্তানের জন্ম হয়, বসন্ত এসে সারা পৃথিবীকে ফুলে পাতায় ভরিয়ে দেয়—

লাউলের ঘরে ছেইলা হয়েছে, কি কি নাম থুমু।
আম দিয়া হাতে রাম নাম থুমু ॥

ছেলে একটু বড় হ'লে তাকে নানাসাজে সাজাতে হয়। বালিকারা নিজেদের ভাইদের যেমন ক'রে সাজায়, তেমনি ক'রে লাউলের শিশুকে সাজায়।

লাউলের ঘরের ছেইলারে লো কি কি গয়না দিমু ?

কুমারীদের গৃহস্থালীর সাধ প্রচলিত ধারা ধরেই চলে। বাড়ীতে জামাই এলে তাকে কি ভাবে আপ্যায়ন করতে হয়, লাউলের ব্রতে তারও অনুশীলন চলে—

আল চাউলে কাঁচা দুধে চাউল ছান করে।
ধোপাবাড়ী কাপড় থুইয়া লাউল শীতে মরে ॥

স্নানের পর জামাতার আহারের আয়োজন—

চাউল ধুমু, চাউল ধুমু, চাউলের মালো পানি।
চাউল ধুইতে পড়লো চাউল, পাটি বিছাইয়া তুল্‌ল কাউল ॥

এবার পাত্ পাতা হবে। এখানে আবার জামাতার ভাইকেও আনা হয়েছে। আমাদের সংসার তো কেবল দুজনকে নিয়ে নয়, কন্যার বিবাহ কেবল পাত্রের সঙ্গেই নয়, সে সঙ্গে জামাতার গৃহকেও কন্যা-দান করা হয়। বেহাই বাড়ীর চিত্রও তাই দৃশ্য পটে দেখা যায়—

লাউলের বাগানে কেরে কাটে পাত।
লাউলের ছোট ভাই শিবাই কাটে পাত ॥

ভোগের আয়োজন জামাই দেবতারই উপযোগী—

লাউল ঠাকুর, লাউল ঠাকুর, ভাত খাই আইসা রে।
তোমার শাশুড়ী রাইন্ধ্যা থুইছে, জইত গাছের তলে ॥

জামাতাকে খাওয়াবার জন্য সাধাসাধি বাদ যায় না

খাও খাও লাউল, গোটা চারি ভাত।
আমরা শত বইনে ফেলাম নে পাত ॥

এইভাবে জামাতা আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে পালা শেষ হয়ে আসে। শেষ বসন্তের ঝরা পাতা আর শুষ্ক ফুলের রাশিতে উড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে তাপস বৈশাখের পদক্ষেপের মর্মরধ্বনি শোনা যায়। দক্ষিণ বাতাস থেমে যায়, কাল-বৈশাখীর হুঙ্কার শোনা যেতে থাকে। এইবারে একবছরের মতো ব্রত শেষ হয়। বালিকারা মেয়ে জামাই বিদায় দিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘাট থেকে ফিরে আসে—

আইজ যাও লাউল, কাউল আইসো।
নিত্যি নিত্যি দেখা দিও
বছর বছর দেখা দিও ॥*

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত



(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কবিরাজ মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারকম বিকট শব্দ করিতে করিতে মুখ-প্রক্ষালন করিলেন। তাহার পর কটি-দেশে আবদ্ধ গামছাটি খুলিয়া মুখ মুছিলেন। তাঁহার কোমরে একটি বটুয়াও বাঁধা ছিল। বটুয়া হইতে চার-আনা পয়সা বাহির করিয়া শান্তাকে বলিলেন, "যা তো বেটা, বিছুয়াকা দোকানো সে কুছু দহি-চুড়া লে আ... দোটো শাল পাত্তা ভি।" শান্তা চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভুক্ লেগেছে বেটি। কিছু খেয়ে লি। এই শালা পেটই তো জ্বালিয়ে মারলে হামাকে", তাহার পর সংশোধন করিয়া বলিলেন, "হামাকে কেন, সকলকেই"

কবিরাজ মহাশয়ের ভাষা একটু অদ্ভুত ধরণের। কথনও বেশ শুদ্ধ বাংলা বলেন, কথনও আবার হিন্দির বুকনি মিশিয়া যায়। তাঁহার কথা শুনিয়া সন্ধ্যা-স্বাতী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"না, না, হাসির কথা নয়, খাঁটি কথা। পোয়েটরা সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পাতা, ফুল-ফল-জীব-জন্তুর বর্ণনা করে' বলেন—আহা ভগবানের সৃষ্টি কি আশ্চর্য্য, 'এই বিশ্ব-মাঝে যেথানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ', কিন্তু আসল জিনিসটির নাম তাঁরা করেন না, ভগবানের সেরা সৃষ্টি কি জান? পেট! পরিমাণে মাত্র এক বিঘৎ। কিন্তু ওইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য্য সৃষ্টি। ওই দুনিয়ার্র মালিক। তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর ওকে থাজনা দিতে হয়। ও গহ্বর থালি রাথবার উপায় নেই। পেটই আমাদের কাণ ধরে' ছুটু করাচ্ছে চারিদিকে। আমার মতো বুড়োও আমদাবাদ থেকে পাটনী, পাটনী থেকে মাদারিচক, মাদারি-চক থেকে নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ থেকে মনিহারি; মনিহারি থেকে দিরা ছুটে বেড়াচ্ছে ওরই তাগাদায়। কাজিগাঁয়ে, বিষুণমুদির কাছে ওষুধের দাম বাকী পড়ে'ছিল ছ'মাস। অনেক তাগাদার পর আজ বেটা মাত্র চার আনা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেটি পেটায় নম হয়ে গেল—"

কবিরাজ মহাশয় দাঁতগুলি বাহির করিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা বলিল, "আপনি এথানে থাচ্ছেন কেন, বাড়িতেই চলুন না, সেথানেই থাবেন"

"আরে তা' তো থাবই। থবর নিয়ে এসেছি, রান্নার দেরি আছে এথনও। বড় বহু-মা নিজে রান্নাঘরে আছেন, তার মানে ভালো ভালো রান্না হচ্ছে। সে সব পরে থাব। কিন্তু এদিকে পেট যে মানছে না, তাই একটু দহি-চুড়া 'ঘুস দিচ্ছি বেটাকে—"

"জল থাবারও বাড়িতে থেলেই পারতেন—"

"তা পারতাম। তোমাদের বাড়ি তো আমারই বাড়ি। কুমারকে দেথতে পেলাম না। গঙ্গা শালা ঘুর ঘুর করে' মুরব্বিয়ানা করছে দেথলাম। ওটাকে বড় ভয় করি। ঠিক ভয় নয়, ঘৃণা করি। মুখের উপর অপমান করে' দেয়। কুমার একটা কুকুরকে রাজা করে' রেখেছে—শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা—সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে না? এ হয়েছে তাই। ওকে দেথলেই আমি সরে' পড়ি। নিজের মান নিজের কাছে।"

স্বাতী বলিয়া উঠিল, "না, না, সে কি! গঙ্গা-দা কি আপনাকে অপমান করতে সাহস করবে?"

কবিরাজ মহাশয় ঘাড় ফিরাইয়া স্বাতীর মুখের দিকে চোখ মিট্‌মিট্ করিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর সন্ধ্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"ইনি কে? চিনছি না—"

"দাদার বড় মেয়ে, স্বাতী"

"ও, আচ্ছা! বিরুবাবুর মেয়ে! আরে, তবে তো আমার নাত্‌নী। আমার বুড়িমার সৌতীন্।"

কবিরাজ আবার খিক খিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। স্বাতীও হাসিতে লাগিল। কবিরাজ গঙ্গার প্রসঙ্গই তুলিলেন আবার।

"তোমার গঙ্গা-দা একটি গাধ্‌হা। কথায় কথায় চাঁট ছোড়ে। একদিনের কথা শুন। প্রায় একবছর আগেকার কথা। ডাক্তারবাবু তখন এখানে ছিলেন না। তিনি বিরুবাবুর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কুমারও ছিল না! বেলা তখন দেড়টা কি দুটো হবে, আমি এসে পৌঁছে গেলাম কাঁটাক্রোশ থেকে হাঁটতে হাঁটতে। খুব খিদে লেগেছিল। বাড়ির বাইরে কাউকে দেখলাম না। কুমারের কুকুরগুলো বসে' ছিল বারান্দায় আমাকে দেখে ভুকতে লাগল। বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গঙ্গা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তারবাবু কোথা। সে বললে, দিল্লী গেছেন, বড়দার কাছে। 'কুমার কোথা'? 'মাঠে গেছে'। তখন তাকেই বললাম, 'বড় ভুক্ লেগেছে ভাই। কিছু খাবার বন্দোবস্ত কর'। এর উত্তরে বললে কি জান?' 'এটা কি হোটেল যখন তখন খাবার পাওয়া যাবে?' চণ্ডালটার কথা শুনে আমি তো অবাক। বললাম, এটা হোটেল নয় তা জানি, হোটেলেও যখন তখন খাবার পাওয়া যায় না তা-ও জানি। কিন্তু এটা যে ডাক্তারবাবুর বাড়ি, আমার বাড়ি। তুমি ভিতরে গিয়ে খবর দাও যে কবিরাজজি এসেছেন'। গাধ্‌হাটা বললে, 'বউমা এই একটু আগে ঘুমিয়েছে, তাকে আমি জাগাতে পারব না। আপনি বসুন'। সঙ্গে সঙ্গে জুতোটি খেলেন বাছাধন। কপাটের আড়াল থেকে কুমারের বউয়ের গলা শোনা গেল। আমাদের কথা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। গঙ্গাকে লক্ষ্য করে' বললেন, কবিরাজ মশাইকে বসতে বল। আমি এখুনি খাবার দিচ্ছি ওঁকে।' গঙ্গা গজগজ করতে করতে চলে' গেল ভিতরে। একটু পরেই ফিরে এসে বললে, 'আসুন'। গিয়ে দেখি বউমা কার্পেটের আসন পেতে দিয়েছেন। আর খেতে দিয়েছেন চকচকে কাঁসার বাটিতে ঘন দুধ, ভাল চুড়া, মর্ত্তমান কলা, খেজুরের গুড়, আর নারকেলের সন্দেশ। তখনই বুঝলাম—কুমারের বউ মানবী নয়, দেবী। ওর শাশুড়িও দেবী ছিলেন। সে গল্পও শোনাব তোমাদের। খাওয়া শেষ করে' পান চিবুতে চিবুতে বাইরে এসে গঙ্গাকে বললাম, 'কিরে, দেখলি? তা তোর দোষ নেই বেটা। তুই ছোট বংশের ছেলে, তুই এসবের মর্ম্ম কি করে' বুঝতে পারবি। মাথাতে ঢুকবে না তোর। তবে একটা কথা শুনে রাখ, এটা হোটেল নয়, ডাক্তারবাবুর বাড়ি।' তারপর থেকে কিন্তু ওই গঙ্গাটাকে দেখলেই আমি সরে' পড়ি—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিমুখে একবার সন্ধ্যার দিকে, আর একবার স্বাতীর দিকে চাহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "কুমারের কিন্তু ও খুব হিতৈষী। আর সেইজন্যেই আমার কাছে ওর সাতখুন মাপ।"

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "ঠাকুরমার কি গল্প বলবেন বলছিলেন"

"তোমার ঠাকুমা লছ্‌মী ছিলেন। ওঁর জন্যেই তোমার ঠাকুরদার এত সুনাম, এত খাতির, এত উন্নতি। ওঁর চেয়ে ধনী লোক অনেক আছেন এদেশে, কিন্তু ওঁর চেয়ে বেশী খাতির আর কারও নেই। সব তোমার ঠাকুমার জন্যে। উনি ছিলেন আমাদের সকলের মা, সাক্ষাৎ ভগবতী।"

কবিরাজ মহাশয় হাত দুইটি জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

"কি গল্প বলছিলেন যে—"

"তোমার ঠাকুমার সম্বন্ধে গল্প কি একটা? অনেক গল্প। তবে এখন যেটা মনে পড়ছে, শোন। অনেকদিন আগেকার কথা। সেদিনও ডাক্তারবাবু বাড়িতে ছিলেন না। দূরে কোনও কলে গিয়েছিলেন, প্রায়ই যেতেন। তখন বৈশাখ মাস, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। লু বইছে। এই গাঁয়েরই গোপীরাম মাড়োয়ারির স্ত্রীর 'পরসোত্' (সূতিকা) হয়েছিল, আমি চিকিৎসা করছিলাম, "ডাক্তারবাবুই রোগীটি জোগাড় করে' দিয়েছিলেন আমাকে। সেদিন সেই রোগীর খবর নেবার জন্যে কাজিগাঁ থেকে হেঁটে

আসছি আমি। অনেকদিন খবর পাইনি, ওষুধের দামও বাকি ছিল কিছু, যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশায় দুপুর রোদ মাথায় করে' এলাম। আমার তো সর্ব্বদাই—অন্ত ভক্ষ্য ধনুগু'ণ—অবস্থা। এসে শুনলাম, রোগীটি একেবারে ভালো হয়ে গেছে, মানে ভব-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে—"

কথাটা বলিয়া কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত দিয়া আবার থিক্ থিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "বেটা একটি ছিদেম দিলে না আমাকে। তখন কি আর করি। হাঁটতে হাঁটতে তোমাদের বাড়ির দিকেই আসতে লাগলাম। খিদে পেয়েছিল খুব। সকাল থেকে কিছু খাইনি। তোমাদের বাড়ির সামনে যেখানে হাট বসে সেখানে এসে উঠেছি, এমন সময় কম্পাউণ্ডারবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁর মুখে শুনলাম ডাক্তারবাবু বাড়ি নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ক'টা বেজেছে? তিনি বললেন, দেড়টা। বলে' তিনি চলে' গেলেন। আমি হাটের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সেখান থেকে তোমাদের বাড়িটা দেখা যায়। দেখলাম বাড়ির দুয়ার জানালা সব বন্ধ। বন্ধ থাকাটাই স্বাভাবিক, রোদে পুড়ে যাচ্ছে চারিদিক, তার উপরে পছিয়া হাওয়া। আমি ভাবলাম এরকম সময়ে গিয়ে হাজির হওয়াটা ঠিক হবে না। ফিরলাম। ঠিক করলাম ওই বিছুয়ার দোকানেই ধারে কিছু খেয়ে নিয়ে সেখানেই বিশ্রাম করব একটু, তারপর রোদ পড়লে বিকেলে বাড়ি ফিরে যাব। কিছুদূর এগিয়ে গেছি, হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনতে পেলাম, কবিরাজজি, কবিরাজজি। পিছু ফিরে দেখি তোমাদের চাকর ঘিমুয়া ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে এসে বললে, আপ চলিয়ে, মাঈজি আপকো বোলাতী হেঁ। মাঈজি? কোন মাঈজি? সে বললে, আমাদের মাঈজী। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ডাকছেন? তিনি আমাকে দেখলেনই বা কি করে'। অবাক হলাম একটু। তারপর তার পিছু পিছু এলাম তোমাদের বাড়িতে। তোমার ঠাকুমা দরজার আড়াল থেকে বললেন, আপনি হাটের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে, আবার চলে' যাচ্ছেন কেন। যা রোদ। খাওয়া দাওয়া হয়েছে আপনার? সত্য কথাই বললাম, না খাওয়া হয়নি। তোমার ঠাকুমা বললেন, তাহলে স্নান করে' এখানেই চাট্টি খেয়ে নিন। ভাত তরকারি সব আছে। আমার খাওয়া হয়নি এখনও।' আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন। বুঝলে? আমি রাজপুত, আমার প্রাণ পাষাণ, কিন্তু সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। অনেকদিন আগে ভূপেন বোসের লেখা হিন্দু ফ্যামিলি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, সে লেখা এখনও কণ্ঠস্থ আছে আমার। তার একজায়গায় আছে—"With Hindu life is bound up its traditional duty of hospitality. It is the duty of a house-holder to offer a meal to any stranger who may come before midday and ask for one, the mistress of the house does not sit down to her meal until every member is fed, and, as sometimes her food is left, she does not take her meal until well ofter midday, lest a hungry stranger should come and claim one…"। এই আদর্শ তোমার ঠাকুমার মধ্যে দেখেছিলাম সেদিন। এর চেয়েও বড় আদর্শ। কারণ আমাকে দূর থেকে দেখে আমার মনের ভাব বুঝে চাকর পাঠিয়ে ডেকে এনেছিলেন, রাস্তা থেকে ডেকে এনে খাইয়েছিলেন—"

কবিরাজ মহাশয় নীরবে হেঁটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। মনে হইল যেন প্রণাম করিতেছেন। তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া সন্ধ্যাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মায়ের নাম কি ছিল বল তো"

"রাজলক্ষ্মী—"

"বাঃ বাঃ বাঃ—সার্থক নাম। সত্যিই তিনি ডাক্তারবাবুকে রাজা করে' দিয়ে গেছেন। সত্যিই এ অঞ্চলের রাজা উনি—আনক্রাউন্‌ড্ কিং—"

রঙ্গনাথ বাগান পরিক্রমা শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের পিছন দিকে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এই অদ্ভুত আগন্তুকটিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু হঠাৎ তিনি অনুভব করিলেন তাঁহার পিছন দিকে

কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন এবং ঘুরিয়া বসিলেন।

"কে আপনি—"

স্বাতী বলিল, "আমার ছোট পিসেমশায়—"

কবিরাজ মহাশয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"যাক্, দর্শন হয়ে গেল। সন্ধ্যার বিয়ের সময় আমি ছিলাম না, দেশে গিয়েছিলাম! কাছাকাছি হ'লে চলে' আসতাম। কিন্তু রাজপুতানা থেকে আসা যায় না। নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলাম, কিন্তু আসতে পারলাম না। বসুন—"

শান্তা কবিরাজ মহাশয়ের জন্য দহি-চুড়া-গুড় এবং দুইটি শাল পাতা লইয়া হাজির হইল। কবিরাজ অবিলম্বে উঠিয়া একটু দূরে কুপের নিকট চলিয়া গেলেন এবং কূপের নিকটই উবু হইয়া বসিয়া মাটিতে পাতা দুটি পাতিয়া ফেলিলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার আহার সমাধা হইয়া গেল। তাঁহার একটু সময় লাগিল মুখ ধুইতে। বেশ ভালো করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন তিনি।

রঙ্গনাথ নীরবে দেখিতেছিলেন।

মৃদু কণ্ঠে সন্ধ্যাকে বলিলেন, "এদের এই অনাড়ম্বর সরল জীবন যাত্রাতে সভ্যতা, না সভ্যতার অভাব, কি আছে তা ঠিক করা শক্ত।"

সন্ধ্যা বলিল, "কবরেজ মশাই গরীব, কিন্তু অসভ্য নয়। বেশ শিক্ষিত এবং সভ্য"

"আমার কথাটা ধরতে পারলে না তুমি। গরীব হলেও এই টেবিলটার উপর পাতা দুটো পেতে চেয়ারে বসে' খেতে পারতেন। আমাদের সামনে খেতে আপত্তি থাকলে, টেবিল-চেয়ার ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ারও বাধা ছিল না—"

"উনি বরাবরই ওই রকম, এ দেশের ধারাই ওই। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন প্রতি বছর ফসল কাটা হয়ে যাবার পর মাঠে জনমজুরদের খাওয়ানো হ'ত। আয়োজন যৎসামান্য। কেবল থাকত প্রচুর দই, চিঁড়ে আর গুড়। ওরা নিজেরাই কলা-পাতা কেটে আনত, আর কয়েকটা মাটির বড় বড় ঢেলার উপর সেটা পেতে বড় একটা গামলার মতো করে' নিত। তাতে ঢালা হ'ত দই, তার উপর চিঁড়ে আর গুড়। মহানন্দে খেত সবাই—"

এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। মুখ প্রক্ষালন শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। বেশী চেয়ার ছিল না, রঙ্গনাথ দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"তুমি বস, তুমি বস, আমি মাটিতেই বসছি—"

"আপনি এই চেয়ারটায় বসুন"

স্বাতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তা বসতে পারি। তোমার চেয়ারে বসবার হক আমার আছে। ছোট গিন্নী তো—"

সন্ধ্যা বলিল, "ওর চেয়েও ছোট আছে আর একজন। চিত্রা—"

"সে-ও এসেছে?"

"আসে নি। আসবে—"

"আসুক, দেখি তাকে পসন্দ হয় কিনা। একে খুব পসন্দ হয়েছে। আপাতত এই ছোট-গিন্নী থাক—"

মুচকি হাসিয়া স্বাতী ঘরটার দিকে ছুটিয়া গেল, আরও চেয়ার আছে কিনা দেখিবার জন্য। চেয়ার ছিল না, ছিল একটা কাঠের বেঞ্চি। শান্তার সাহায্যে সেইটাই সে বাহির করিয়া আনিল।

সকলে উপবেশন করিলে রঙ্গনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার দেশ বুঝি রাজপুতানায়—"

হ্যাঁ, আমাদের ঠাকুরদা অন্তত তাই বলতেন। আমরা তিনপুরুষ কিন্তু এই দেশেই বাস করছি। তবে দরকার হলে মাঝে মাঝে দেশে যাই। গ্রামে ভাঙা বাড়িটা আছে এখনও,তবে আর থাকবে না। বাড়ি না সারালে থাকে না, আর সারাতে হ'লে পয়সা চাই, সে পয়সা আমার কোথা—

"দেশে আত্মীয়-স্বজন আছে?"

"প্রচুর। বাড়ির কপাট জানলা সব খুলে নিয়েছে। এবার গিয়ে দেখলাম ইঁটগুলোও নিয়ে যাচ্ছে—"

সকলের মুখেই হাসি ফুটিল। রঙ্গনাথ উপলব্ধি করিলেন কবিরাজ সুরসিক ব্যক্তি।

"দেশে গিয়েছিলেন কেন?"

"বক্তৃতা করতে—"

"কিসের বক্তৃতা"

"রাজপুতদের এক সভা হয়েছিল। আজকাল সবাই তো নিজের নিজের ঢোল পিটাতে ব্যস্ত, রাজপুতরাও ব্যস্ত

হয়েছিল। অনেক রাজপুত জমা হয়েছিল সেখানে, আমারও ডাক পড়েছিল"

"কি বললে সবাই"

"কি আর বলবে, নিজেদের ঢাক পেটালে খালি। আমরা হ্যান্ আমরা ত্যান্—এই সব আর কি। টডের রাজস্থান আওড়ালে কেউ কেউ—"

"আপনি কি বললেন—"

কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত চাপা দিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আমি যা বললাম ; তাতে চটে' গেল সবাই"

"কেন, কি বলেছিলেন—"

"বলেছিলাম আমরা নিজেদের যতই বড়াই করি না কেন, সত্যি কথা হচ্ছে রাজপুতরা অতি নির্ব্বোধ জাতি। উদাহরণও দিয়েছিলাম অনেক। রামচন্দ্রই ধরুন। তাকে কি কেউ বুদ্ধিমান বলবে! সৎমার উস্কানিতে বাবা বললে বনে যাও, অমনি সে বনে চলে গেল। তা-ও গেলি গেলি বউটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলি কেন। বউ নিয়ে কেউ কখনও বনে যায়? বনে গিয়েও সে যা করলে তা কোনও বুদ্ধিমান লোক করত না। বউ বললে আমাকে সোনার হরিণ ধরে এনে দাও। অমনি ছুটল হরিণের পিছু পিছু। সোনার জীবন্ত হরিণ হওয়া যে সোণার পাথর বাটির মতোই অসম্ভব—তা সে ভেবে দেখলে না একবার। ছুটল হরিণ ধরতে। তার আগে লক্ষ্মণের ব্যবহারটাও বিবেচনা কর। সূর্পনখা ব্যাভিচারিণী তা মানলুম, তাকে দূর করে' তাড়িয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যেত, তার নাক কান কাটতে গেলি কেন, এটা কি কোন ভদ্রলোকের কাজ? এই সবের ফলেই সীতাহরণ আর লঙ্কাকাণ্ড। এ সব বুদ্ধির পরিচয় নয়। তারপর মহাভারতের গল্পটা ভাবুন। যুধিষ্ঠিরকে কি বুদ্ধিমান লোক বলবেন আপনি? ও তো একটা জরদ্গব। ধর্ম্মপুত্র মানে কি বোকা? ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। ভীষ্মের চরিত্রে একটু নুন ঝাল আছে, কিন্তু কেমন যেন এক-বগ্গা গোছের। তোর বাপ দুশ্চরিত্র বলে' তুই আজীবন কৌমার্য্যব্রত পালন করবি কেন। এর কোন মানে হয়। তারপর কুরু-পাণ্ডবদের কাণ্ডটা দেখুন। তোদের মধ্যে আপোষে ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া হয়েছে মানলুম, বিষয়-সম্পত্তি নিয়েও হামেসাই হয়ে থাকে। তাই বলে' ঘরের বউকে সভার মাঝখানে টেনে এনে উলঙ্গ করবি? আর তাই নিয়ে হাসাহাসি করবি? এ যে ছোট লোকে-রাও করে না। কর্ণ দুর্য্যোধন ওরা কি মানুষ, লম্পট সব। আর ওই অর্জ্জুন লোকটি যেখানে গেছে একটি করে বিয়ে করেছে। ভীম সেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকেও ছাড়ে নি। দুঃশাসন, অশ্বত্থামা তো পিশাচ, ছোট শিশুকে পর্য্যন্ত হত্যা করেছিল অশ্বত্থমা। তারপর ইতিহাসের এলাকায় আসুন! ওই যে পদ্মিনীর গল্প, ও শুনে আপনারা বাহবা বাহবা করেন। আমি তো ওর মধ্যে চূড়ান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। আলাউদ্দিন যখন পদ্মিনীকে দেখতে চাইল তখন তার স্বামী ভীম সিং উত্তর দিলেন—আমাদের স্ত্রীলোকেরা অসূর্য্যম্পশ্যা, কারো সামনে বার হয় না। খাশা কথা। কিন্তু আলাউদ্দিন কত বুদ্ধিমান দেখুন, সে বলে পাঠালে আমার সামনে বের হবার দরকার নেই আয়নায় তার প্রতিচ্ছবি দেখলেই আমি সন্তুষ্ট হব। ভীম সিং অমনি রাজি হয়ে গেল। বুঝুন। সামনে দেখা আর আয়নায় দেখা তফাতটা কি, চোখে তো নিলে। ফল যা হয়েছিল তাতো জানেনই আপনারা। বোকা, বোকা, সব বোকা। ইতিহাসে এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে—সামনে গরুর পাল নিয়ে যুদ্ধকরতে যাচ্ছে, ভাবছে গরু তাদের দেবতা বলে' সকলেরই দেবতা! আজকালকার যুগে আসুন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপুত মানে দারোয়ান, কিম্বা কনেষ্টবল। হোৎকা চেহারা, ইয়া গোঁফ, মগজে এক ছটাক বুদ্ধি নেই। মুনিব হুকুম দিলেই মাথায় লাঠি বসিয়ে দেবে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে। জমিদারে জমিদারে ঝগড়া হচ্ছে, আর ওরা মার-পিট করে' জেল খেটে মরছে। রাজপুতের ইতিহাস মানে নির্ব্বুদ্ধিতার ইতিহাস। ওরা কখনও মুসলমানদের সঙ্গে পারে।"

কবিরাজ মহাশয় বক্তৃতা শেষ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা বলিল, "কিন্তু যাই বলুন, রাজপুতদের ইতিহাস আমাদের দেশের গৌরবময় ইতিহাস"

"ঠিকই বলেছ। গো মানে এখানে গরু। ওদের গর্জ্জনে হুঙ্কারে আমি তো গরুদের হাম্বারব ছাড়া আর কিছু শুনতে পাই না।"

"রাণা প্রতাপকে শ্রদ্ধা হয় না আপনার ?"

"শ্রদ্ধা হয়, কিন্তু ওকে বুদ্ধিমান বলতে পারি না। আকবরের সঙ্গে ওর ভাব করা উচিত ছিল। আরে, আগে বাঁচতে হবে তো। আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। মানসিংহ ওর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু—"

কিন্তু এ আলোচনা বেশীদূর অগ্রসর হইল না। কুমারকে দূরে দেখা গেল, তাহার কাঁধে বন্দুক। তাহার পিছনে বাইক ঠেলিতে ঠেলিতে আসিতেছিল স্টেশন-মাস্টারের ছেলে সুকুমার এবং চাকর ল্যাংড়া। ল্যাংড়ার দুই হাতে অনেকগুলি মরা হাঁস বদ্ধ-পদ অবস্থায় ঝুলিতেছে।

কবিরাজ মহাশয় সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"তুমি শিকার করলে এগুলো ? বাঃ, অনেক পেয়েছ দেখছি"

"দুটো ফায়ার করেছিলাম। জলে পড়ে গেল কয়েকটা, তোলাই গেল না"

"আজ রাত্রে তাহলে থেকে যাই, কি বল"

কুমার সুকুমারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুই গোটা চারেক নিয়ে যা। চারটেতে কুলুবে তো ?"

"দুটোতে যথেষ্ট হবে। মা ওসব খায় না, বাবাও মন্ত্র নিয়েছেন—খাবেন কি না জানি না। আর তো বাড়িতে কেউ নেই। দুটোই নিচ্ছি আমি—"

"বেশ"

সুকুমার গোটা দুই বড় বড় বেলে হাঁস বাইকের হাতলের দুইধারে বাঁধিয়া লইল।

"আমি চলি তাহলে"

"আচ্ছা"

সুকুমার টপ্ করিয়া নিজের নূতন বাইক্‌টাতে চড়িয়া বসিল। এই শিকার-উপলক্ষে নিজের বাইকটাতে যে বারবার চড়িবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহাতেই সে খুশী। এখানে বাইক চড়িবার সুযোগই নাই, বাজারে বা পোস্টাফিসে কতবার আর যাওয়া যায়। আজ সে অনেক সুযোগ পাইয়াছে। অধিকাংশ সময়ই বাইক্‌টা ঠেলিয়া তাহাকে কুমারের পিছু পিছু চলিতে হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সে বাইকটাকে কাজে লাগাইতে পারিয়াছে তো। বালুয়াচকে যখন হাঁস পাওয়া গেল না তখন বাইকে চড়িয়া সে-ই গঙ্গার ধারে গিয়া খবর আনিল যে কাজিগ্রামের বাঁকটায় অনেক হাঁস আছে, সেখানে বসিবার বেশ ভালো একটা আড়ালও আছে। বাইক করিয়া এ খবর না আনিলে কুমারবাবু বালুয়াচক্ হইতেই ফিরিয়া আসিতেন।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "তুমিই রাঁধবে নাকি"

"হ্যাঁ"

"বাঃ, তাহলে তো গ্র্যাণ্ড হবে। কিন্তু একটু অনুরোধ আছে কুমারবাবু"

"কি"

"খুব বেশী লঙ্কা দিও না। আমি অর্শের রুগী তো। আর বেশী লঙ্কা খাওয়াটা তোমাদের পক্ষেও ভালো না"

"বেশ, তাই হবে"

ক্রমশঃ

ভাদ্রের প্রভাতে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আরণ্য কপোত ডাকে সকরুণ সুরে।
বুনো পাখী শীষ দেয়। সোনালি রোদ্দুরে
ঘাসে ঘাসে ঝলমল করিছে শিশির।
শাখায় শাখায় জবা অবনত শির
যেন মৌনী পূজারিণী ধ্যানের আসনে।
ফুটিয়াছে দোপাটীরা। ভ্রমর গুঞ্জনে
মুখরিত পুষ্পবন। করে মধুপান
নানা-রঙা প্রজাপতি। ঊর্দ্ধে ভাসমান
খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি। পৃথিবী সুন্দর
সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে স্নিগ্ধ সবুজ চাদর
শুয়ে আছে রৌদ্রালোকে। মৃদুল বাতাসে
কুসুমিত লতা দোলে। বেড়ায় এ পাশে
দোয়েলের লাফালাফি। ধরণীর রূপ
হেরিতেছি মুগ্ধনেত্রে নিশ্চল নিশ্চুপ।

পরিকল্পনা ও আমাদের দেশ

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য দেশের যে দুইটি উপায় আছে সেই দিকেও লক্ষণীয় এবং আশাপ্রদ উন্নতি দেখা দিয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের উপায় দুটির মধ্যে প্রথমটি হল দেশের উৎপাদনের রপ্তানী বৃদ্ধি করা এবং দ্বিতীয়টি হল ভোগ্যপণ্যের আমদানী হ্রাস করা। এই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বনের দরুণ অর্থাৎ আমদানী ব্যবস্থার. কড়াকড়ি নীতি গ্রহণ করায় যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ তারিখে আমদানী উপদেষ্টা পরিষদে শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর ভাষণ প্রসঙ্গে এই সত্যপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন,—১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ মজুত ষ্টার্লিং হ্রাসের পরিমাণ ছিল ৫৫ কোটি টাকা। ইহার পূর্ব্বের তিন মাসে ছিল এই সংখ্যা ১০০ কোটি। এই হিসাব থেকে এই সত্যই প্রকাশ পায় যে আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করার দরুণ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে ঘাটতি যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে তা অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের সামিলই হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আরও বলেছেন—"বেপরোয়া ঋণগ্রহণের দ্বারা ভবিষ্যৎকে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয় এবং আমাদের সে ইচ্ছাও নাই। যে সমস্ত পরিকল্পনার উৎপাদন হ'তে ঋণের কিছু পরিশোধের উপযুক্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন বা সঞ্চয় করা যাবে, কেবল সেই সকল ক্ষেত্রেই বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করার সর্ত্তে মূলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যথায় আমাদের বর্ত্তমান সম্পদ হ'তে অর্থ সংস্থাপনের উপযোগী শিল্প-স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য দায়ের পরিমাণ বাড়িয়ে যাব," (দিল্লী আমদানী পরিষদে ভাষণ, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮)। শ্রীদেশাইয়ের এই সাবধান বাণী খুবই কালোপযোগী এবং এই নীতি অনুসৃত হলে পর আমাদের বিদেশী মুদ্রা সঙ্কট বহুল পরিমাণে লাঘব পাবে বলেই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে।

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়নে শিল্প-সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করায় আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। কাজেই বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়ে সেই বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের প্রশস্ত পথ আমাদের গ্রহণ করার চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ তারিখে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী নিত্যানন্দ কানুনগোর লাক্ষা রপ্তানির উন্নয়ন পরিষদের উদ্বোধনী ভাষণ অনুধাবন-যোগ্য। তিনি বলেছেন—"যুগযুগান্ত যাবৎ ভারত বিদেশের বাজারে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি করে সেগুলি প্রধানতঃ কৃষিজ যথা—পাট, চা, তামাক, তুলা ও গালা…শিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনে আমাদের ছোট বড় সকল প্রকারের কৃষিজ দ্রব্যাদির রপ্তানি বাড়াবার চেষ্টা করতে হ'বে।" এই সঙ্গে একটু যোগ করে আমরা বলবো—শুধু কৃষিজ দ্রব্যাদির রপ্তানিই নয়, সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদির রপ্তানি বাড়াবার চেষ্টাই আমাদের করতে হবে অর্থ-নৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে। খুবই আনন্দের কথা যে রপ্তানি উন্নয়নের ব্যবস্থাও জাতীয় সরকার করছেন বিভিন্ন রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদের মারফৎ। এ পর্য্যন্ত ভারত সরকার দশটি রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদ গঠন করেছেন, যথা সূতি-বস্ত্র, রেশম ও রেশমবস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য বা প্লাষ্টিক, কাজু ও গোল-মরিচ, অভ্র, চামড়া, তামাক ও লাক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিষদ—তাতে যথেষ্ট সুফলও পাওয়া গেছে; সূতিবস্ত্র, চামড়া, তামাক প্রভৃতির রপ্তানির পরিমাণ লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির রপ্তানিও অতি অল্পকালের মধ্যে (মাত্র দু'বছর সময়ের মধ্যে) যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা খুবই আশাব্যঞ্জক। খুব গর্ব্বের সহিতই বলা চলে যে এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দেশ থেকে প্রায় একশত বার প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি বাইরে রপ্তানি করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এই উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদ আমরা জানতে পারি গত ১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৮ তারিখে ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিষপত্রের রপ্তানি উন্নয়ন পরিষদের কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সভায়। এই সভায় সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রী কে, এল, চৌধুরী ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিষপত্রের যে রপ্তানি তালিকা পেশ করেন তাই থেকেই উক্ত তথ্য প্রকাশ পায়। তিনি ঐ সভায় এক তালিকা পেশ করে দেখিয়েছেন যে গত সালের অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদির রপ্তানির তুলনায় কতগুলি জিনিষের ১৯৫৭ সালের প্রথম এগার মাসের রপ্তানির হার বেড়েছে শতকরা আট হ'তে একশত আটত্রিশ ভাগ পর্য্যন্ত। নিম্নরূপ তালিকা তিনি পেশ করেছিলেন,—

	Commodity	1956	1957
1.	Textile machinery	1,51.654	2,20,151
2.	Sugar Mill	90,784	1,29,622
3.	Rice and Flour Mill	34,286	1,15,083
4.	Oil Mill	8,56,699	13,02,946
5.	Diesel Engines	4,27,721	8,10,796
6.	Centrifugal Pump	53,049	02,471
7.	Bolts, Nuts, Rivets etc	1,81,222	1,92,866
8.	Agricultural Implements	8,83,896	10,36,127
9.	Electric Fans	12,71,638	17,85,169
10.	Sewing machines	5,98,032	7,28,793
11.	G. I. Products	13,72,673	16,30,815

12.	Cast Iron Products	6,70,045	9,58,546
13.	Water Fittings	4,09,318	4,87,419
14.	Stainless steelware	3,00,598	4,97,718
15.	Cut & E. P. N. S. ware	5,25,124	10,28,533

রপ্তানি বাজারের এই উজ্জ্বল ছবি আমাদের পরিকল্পনা রূপায়নের সাফল্যেরই সংকেত বহন করে আনে। রপ্তানি ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার যথেষ্ট গুরুত্ব অনুভব করেই কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৭ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনে একটি রপ্তানী উন্নয়ন বিভাগ খুলেছেন। এই বিভাগের করণীয় হল বিভিন্ন পণ্যের কি এবং কতটা পরিমাণ রপ্তানি বৃদ্ধি সম্ভব—তার একটা লক্ষ্য স্থির করে তাতে পৌঁছবার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করা। সরকারের এই প্রচেষ্টা অভিনন্দন-যোগ্য নিঃসন্দেহ। তবু আমরা মনে করি এই রপ্তানি ব্যবস্থার উপর অধিকতর সজাগ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সূতিবস্ত্র রপ্তানির লক্ষ্য ছিল বছরে একশত কোটি গজ। রপ্তানির হার বৃদ্ধি পেলেও পরিকল্পিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছুতে পারিনি। ১৯৫৭ সালের আট-মাসের রপ্তানির গতি হতে মনে হয় যে ১৯৫৬ সালে যে ৭৪ কোটি ৬০ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানি হয়েছে তা অপেক্ষা ১৯৫৭ সালে ১০ কোটি গজ বস্ত্র অধিক রপ্তানি হবে সত্য, কিন্তু রপ্তানির পরিমাণ পরিকল্পনা কমিশনের রপ্তানির লক্ষ্য থেকে প্রায় ১৫ কোটি গজ কম। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ তারিখে রপ্তানী উপদেষ্টা পরিষদে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের ভাষণে এই তথ্য প্রকাশ পায়। রপ্তানি প্রসঙ্গে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের আর একটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন,—

"শিল্পপতিগণের বোঝা উচিত, তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে বৈদেশিক মুদ্রা এমন কোন জিনিষ বা পদার্থ নয়—যে সরকারের মর্জ্জি অনুসারে তা নিজেদের জন্য যখন খুসী উৎপন্ন করা সম্ভব। শিল্প-গুলিই এই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন করে থাকে, সরকারের পক্ষে সম্ভব শুধু তার সুষ্ঠু ও সমবন্টনের ব্যবস্থা করা।" তিনি এই প্রসঙ্গে আমদানী ও রপ্তানির মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখবার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন যার নির্গলিত অর্থ হল এই যে—দেশের বর্ত্তমান বৈদেশিক অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে শিল্পপতিদের এই দিকে এমনভাবে নজর দিতে হবে যে প্রত্যেক শিল্পই ততটা পরিমাণ উৎপাদন রপ্তানি করতে সচেষ্ট হবে যতটা পরিমাণ উৎপাদন রপ্তানি করলে সেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানীর জন্য যে মূল্যের দরকার হবে তা পরিশোধ করা সম্ভব। ইহার জন্য হয়ত মুনাফা ছাড়াই বিদেশে পণ্য বিক্রয় করতে হতে পারে। প্রয়োজনে কিছুটা স্বার্থত্যাগে প্রস্তুতির মনোভাব নিয়ে শিল্পপতিদের এইদিকে অগ্রসর হতে হবে। রাষ্ট্রের কল্যাণকামী প্রত্যেক নাগরিকই শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের এই অভিমত অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবে বলেই বিশ্বাস পোষণ করি।

মোটের উপর পরিকল্পনা রূপায়নের পথে যে গাঢ় কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল আজ তা তিরোহিত না হলেও তার উপরে যে আশার রূপালী আলো পড়তে সুরু করেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ তারিখে ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ-কালীন প্রধানমন্ত্রী তথা অস্থায়ী অর্থমন্ত্রীর ভাষণে আমরা জানতে পারি যে ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে যে পাইকারী মূল্যমান ১২২ পর্য্যন্ত উঠেছিল, ফেব্রুয়ারী মাসে তা ১০৫এর কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে। তণ্ডুল জাতীয় দ্রব্যের মূল্যমানও শতকরা নয়ভাগ হ্রাস পেয়েছে। আর উৎসাহব্যঞ্জক ও আশাপ্রদ যে সংবাদ আমরা প্রধানমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে জানতে পারি তা হচ্ছে যে ১৯৫৭ সালে ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক ঋণদানের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেকের মত হ্রাস পেয়েছে এবং অপর-পক্ষে উক্তকালীন আমানতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ২১০ কোটি টাকা। তাছাড়া Reserve Bankএর বৈদেশিক সঞ্চয় তহবিল হতে টাকা তোলার চাপও লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত ভাষণে প্রকাশ যে ১৯৫৮ সালের বিগত কয়েক মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চয় তহবিল হতে টাকা তোলা হয়েছে ৩ কোটি টাকা, অথচ বিগত ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় কোয়াটারে ঐ হার ছিল মাসিক ৩৬ কোটি টাকা। ১৯৫৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংসদের বাজেট উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদও দেশের বৈষয়িক পরি-স্থিতিতে উন্নতি হওয়ার কিছুটা আভাষ দিয়েছিলেন।

কাজেই আজকে সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে যে পরিকল্পনা উচ্চাশা-মূলক বলে বিরূপ সমালোচনায় নিরুৎসাহিত বোধ করবার কিছুই নাই।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই সাবধান বাণীও-উচ্চারণ করতে চাই যে বিদেশ হতে সাহায্য সংগ্রহ ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা উন্নতির পথে হলেও তা যেন আবার আমাদের ভিতরে আত্মসন্তোষের ভাব এনে দিয়ে আমাদের নিশ্চেষ্ট করে না তোলে—আশাবাদীর দৃষ্টিভংগী নিয়ে প্রতি-পদক্ষেপে আজকে পরস্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পনা রূপায়নে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে আসতে হবে। কিছুটা স্বার্থত্যাগ ও কিছুটা ত্যাগ স্বীকারের ভিত্তিতে রচিত যৌথ সহযোগিতা উৎপাদন ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে রচিত করবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির ইমারৎ। দেশের শিল্প এবং সমৃদ্ধিতে সকলেই সম-অংশীদার—এই মনোভাব সৃষ্টির আবহাওয়া আজকে তৈরী করতে হবে, তবেই হবে উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য আশানুরূপ ফললাভ। ইহাই হবে পরিকল্পনার স্বার্থক বাস্তবায়নের অন্যতম প্রধান কথা। এ পথের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়েছেন শ্রীবাবুভাই চিনাই (President of the Federation of Indian chambers of commerce and Industry) গত ত্রিষষ্ঠিতম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে অর্থনৈতিক প্রস্তাবের উপরে সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন প্রসঙ্গে, তিনি বলেছেন,—"The question of increased production should be tackled as a national emergency. Both labour and capital by

happy balance between them can contribute greatly in securing this objective. Labour by increasing output in consonance with increase in wages and the capital by freezing their profits at a reasonable rate could check inflation and create more savings. অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্নকে জাতীয় অত্যাবশ্যক প্রশ্নরূপে বিবেচনা করা উচিত। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় শ্রম এবং পুঁজির সন্তোষজনক পারস্পরিক সহযোগিতা। শ্রমের বর্দ্ধিত উৎপাদনানুযায়ী উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা এবং পুঁজির জন্য স্থায্য মুনাফার ব্যবস্থাবলম্বনে এই বিষয়ে সুফল পাওয়া সম্ভব। এতে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই সম্ভব হবে না। ইহা মুদ্রাস্ফীতি রোধেরও সহায়ক হবে এবং আভ্যন্তরিক সঙ্কটের সমস্যা সমাধানেরও সহায়ক হবে। এক কথায় বলা চলে যে শিল্পায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনায় শ্রম প্রশ্নের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা অত্যাবশ্যক। আজকে যদি শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়তার পরিবেশন সৃষ্টি করা যায় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের ভিতরে আসবে উৎপাদনের অনুপ্রেরণা।

"Insurance against both sickness and unemployment appears so very necessary to strengthen the moral and efficiency of the Indian worker that due attention must be paid to this aspect of the problem in any scheme of Industrial planning [Industrial planning ; why and how—chap—IX Dr. N. Das] এই সঙ্গে যদি তারা অনুভব করে যে শিল্প পরিচালনায় তারাও অংশীদার তাহলে তাদের ভিতরে আসবে অধিকতর উৎসাহ। আজকে খুবই আনন্দের কথা যে সরকারী প্রচেষ্টা এই দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে। ১৯৫৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংসদের বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদের উদ্বোধনী ভাষণে আমরা তার পরিষ্কার উল্লেখ দেখতে পাই। তিনি বলেছেন—"শিল্প পরিচালনায় ক্রমশঃ শ্রমিকগণকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়ার পরিকল্পনা কয়েকটি নির্ব্বাচিত শিল্পে প্রবর্ত্তিত হয়েছে। কর্ম্মচারী রাষ্ট্রবীমা পরিকল্পনার ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হচ্ছে।" আজকে বেসরকারী মহলকেও এই বিষয়ে যথোচিত অবহিত হতে হবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য। বর্ত্তমান সামাজিক পরিবর্ত্তিত অবস্থায় পুঁজিপতিদের অনুধাবন করতে হবে যে, পুঁজি বিনিয়োগই শুধু শিল্প পরিচালনায় অধিকার জন্মায় না—শ্রম বিনিয়োগও শিল্প পরিচালনায় অধিকার জন্মায়। এই ত গেল শ্রমিক সমস্যার এক দিক। এ ছাড়া শ্রমিক সমস্যার আর একটা দিক রয়েছে; তা হচ্ছে—একদল উন্নাসিকের ধারণা যে, আমাদের দেশের শ্রমিকদের কর্ম্মদক্ষতা এবং গুণগতমান অন্যান্য দেশের চেয়ে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক নীচে এবং এই ভ্রান্ত ধারণা থেকেই অনেক সময় এবং অনেক ক্ষেত্রেই এসেছে অনেক বিভ্রম এবং বিভ্রাট। তাদের সুস্পষ্টভাবে জবাব দিতে হবে যে তাদের ধারণা সমর্থন যোগ্য নয়। আমাদের দেশের উৎপাদনী পণ্যই তার অন্যথা প্রমাণ করে। এই প্রসঙ্গে গত জানুয়ারী (১৯৫৮) মাসে কলিকাতায় Engineering Export Promotion Councilএর দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের বক্তব্যও উপরিউক্ত উন্নাসিকদের দ্বারা রচিত আমাদের দেশে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অদক্ষতা ও অপটুতার কল্পিত অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

শ্রীদেশাই বলেছেন—"Our workmen are as good as those in most of the advanced countries as is apparent from experience in respect of the goods that are produced here, From what is being done it can be said that our workmen compare not only favourably with those in other countries, but given proper scope and opportunities they were likely to prove superior in skill to many others. We have to bring out the best in our workers to produce things of high quality." অর্থাৎ আমাদের দেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি থেকেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশের শ্রমিকদের কর্ম্মপটুতা যে কোন অগ্রসর দেশের শ্রমিকদের চেয়ে কোন অংশে ম্লান নহে। উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পেলে তারা অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের চেয়ে অধিকতর দক্ষতা দেখাতে পারে। কাজেই আমাদের দেশের শ্রমিক-ভাইদের দক্ষতার অভাব বা অনুরূপ কোন ভিত্তিহীন দোষারোপ করে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী। পরিকল্পনার সফল রূপায়নের জন্য এদিকে যথোচিত সতর্কতা প্রয়োজন।

পরিশেষে এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই যে, পরিকল্পনা রূপায়নের কালে উন্নত ও অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে মূলগত আর্থিক বৈষম্যের কথা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় বার্ষিক ১৫০০ পাউণ্ডেরও বেশী, সেখানে আমাদের দেশে বার্ষিক মাথাপিছু আয় ১০০ পাউণ্ডের ও অনেক নীচে। উন্নত ও অনুন্নত দেশের এই বৈষম্যের কথা ভুলে গিয়ে সমবণ্টন নীতির বাস্তবায়ন সার্থক হবেনা বলেই প্রতিভাত হয়; এই কারণে, উন্নত দেশগুলির জাতীয় আয়ও ,উৎপাদনের প্রাচুর্য্য রয়েছে। সেখানে সকলের জীবন স্বচ্ছল হওয়া সম্ভব, যদি সমবণ্টনের ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করা যায়। অসম বণ্টন ব্যবস্থার সমস্যা আমাদের দেশেও রয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু তবু আমাদের মত অনুন্নত দেশের সমস্যার ধারা অন্যপ্রকারের। আমাদের প্রধান সমস্যা হল ধন উৎপাদনের, সম্পদবৃদ্ধির। আজকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে যে সকল সমাজবাদী রাজনীতিবিদ্‌গণ সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যাকালীন আমাদের দেশে কেবল সমবণ্টনের উপরই জোর দেন—তাঁদের সবিনয়ে এই কথা বলা চলে, সমবণ্টন ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে নিঃসন্দেহে। একথাও অনস্বীকার্য্য যে আমাদের দেশে ধনবণ্টন ব্যবস্থায় যথেষ্ট গলদ রয়েছে যার সংশোধন ও পরিবর্ত্তন নিঃসংশয়ে প্রয়োজন;—কিন্তু আমাদের দেশের উপরে-বর্ণিত আর্থিক রূপের কথা স্মরণ করে প্রধান কথা হবে উৎপাদন বৃদ্ধির এবং প্রথম আওয়াজ তুলতে হবে সম্পদবৃদ্ধির। প্রথমে দেশের সম্পদ বাড়াতে হবে, উৎপাদন বাড়াতে হবে। তারপর যখন উৎপাদন বৃদ্ধির দরুণ, সম্পদ বৃদ্ধির দরুণ জাতীয় আয় এমন পর্য্যায়ে এসে পৌঁছুবে যে দেশের সকল মানুষের সচ্ছলতা সম্ভব সেই সম্পদে, জাতীয় সমৃদ্ধির ন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থা দ্বারা তখনই প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হবে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার। তখনই সার্থকতা লাভ করবে বণ্টন বিভাজনের আন্দোলন, অন্যথায় তা দারিদ্র্য বিভাজনের আন্দোলনে পরিণত হবে।

জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী ডি-লিট্, শাস্ত্রী

জেবউন্নিসার **আত্মকাহিনীর প্রচ্ছদপট** :—১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ। শাহাজাদা আকবরের বিদ্রোহ বিফল হয়েছে, শাহজাদা পলাতক, তাঁর শিবির লুণ্ঠিত। আওরঙ্গজেবের সৈন্যগণ শাহজাদার শিবিরে লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে শাহজাদী জেবউন্নিসার কয়েকখানি গোপন পত্র আবিষ্কার করেছিল। আওরঙ্গজেব নিঃসন্দেহ হলেন যে, জেবউন্নিসা শাহজাদা আকবরের সঙ্গে পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, শাহজাদী জেবউন্নিসা কারাগারে বন্দিনী হলেন—দিল্লীর অদূরে সলিমগড় দুর্গে—হাবসী প্রহরী-বেষ্টিত সঙ্গীহীনা জেবউন্নিসা।

তখনও বাদশাহ বেগম জাহানারা জীবিতা, মুঘলপরিবারের বহু অনাচার অত্যাচারের প্রত্যক্ষদ্রষ্টী জাহানারা। মুঘলরাজপুরীর সকল সন্তানই সকলের সকল ব্যথার কথা জাহানারার নিকট ব্যক্ত করে নিজের মনের ভার লাঘব করে, উপদেশ নেয়। জাহানারার মনে প্রারম্ভ জীবনের তীব্রতা নাই, শান্ত সমাহিত জাহানারা নিজকে ভগবানের চরণে নিবেদন করে তৃপ্তা। বিষবাষ্পে ধুমায়িত মুঘল রাজধানীতে একমাত্র জাহানারার সান্নিধ্যে জেবউন্নিসা শান্তিলাভ করতে পারতেন, কিন্তু সে উপায় নেই, জেবউন্নিসা বন্দিনী। সুতরাং জেবউন্নিসা পত্রের মাধ্যমে বাদশাহ বেগমের নিকট নিজের মনের গোপন কথা ব্যক্ত করেছেন, জীবনের বহু কাহিনী দিনের পর দিন প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে জেবউন্নিসার জীবনের বহু গোপন বার্ত্তা। সেই পত্রগুলি মিলিয়ে জেবউন্নিসার আত্মকাহিনী রচিত হয়েছে।

জাহানারার নিকট সলিমগড় দুর্গ থেকে লিখিত জেবউন্নিসার পত্র

বেগম সাহেবা !

তুমি নিশ্চয়ই জান যে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে তাঁর কন্যা জেবুন্নিসা সলিমগড় দুর্গে কারারুদ্ধা। দুর্গের চারিপার্শ্বে ভীষণ-দর্শন দুর্দ্ধর্ষ নির্মম হাবসী রক্ষীবাহিনী। এই রক্ষীবাহিনী কারান্তরিকার নিঃশ্বাস গণনা করছে। আমার পরিচারিকা ভিন্ন অন্য কোন মানুষের পদধ্বনি আমার শ্রুতিগোচর হচ্ছে না। কি কঠোর এই নিঃসঙ্গ জীবন—শাহান শাহ শাহজাহানের কারাবাসের দিনে তুমি স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে নিয়েছিলে। সে কারাবাস ছিল তোমার স্বর্গবাস। তুমি পিতৃসেবার দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করেছ। সেই দিনগুলি ছিল তোমার আনন্দের মুহূর্ত্ত।

আমি কিন্তু পিতার আদেশে কারাবাসিনী ; এ কারায় আমি স্বেচ্ছায় আসিনি ; এ কারাবাস আমার শাস্তি। তুমি তো তৈমুর বংশের প্রতিটি সন্তানের জীবনকাহিনীর সঙ্গে পরিচিত। মুঘল পিতার পিতৃ-স্নেহের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে চিরন্তন গর্ব্বের সামগ্রী। ভারতে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর পুত্রের রোগশয্যার পার্শ্বে বিহ্বল চিত্তে প্রার্থনা করেছিলেন।—"ইয়া আল্লা আমার পুত্রের কঠিন রোগ নিরাময় কর। খোদা, আমার পুত্রের জীবনের বিনিময়ে তুমি কি মূল্য চাও? আমার সিংহাসন? তুচ্ছ! আমার জীবন? আমার জীবনও আমি আমার পুত্রের জীবনের বিনিময়ে উৎসর্গ করতে পারি। প্রার্থনার অবকাশে হিন্দুস্থান-বিজেতা বাবর তিনবার হুমায়ুনের রোগশয্যা প্রদক্ষিণ করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—পেয়েছি, পেয়েছি। আমার জীবন মূল্যে আমার পুত্রের জীবনলাভ করেছি।" এই তো ছিল তৈমুর বংশের পিতৃস্নেহের রূপ। সম্রাট বাবর মৃত্যুশয্যায় তাঁর বিজিত ভূখণ্ড তাঁর চার পুত্রের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছিলেন ; উদ্দেশ্য ছিল সিংহাসনের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ প্রতিরোধ করবেন। বুদ্ধিমান বাবর অবশ্য জানতেন—এই রাজ্য বিভাগের পরিণতি তৈমুর বংশের ভিত্তি শিথিল করে দিয়ে যাবে, তবু সন্তান স্নেহের মোহে বাদশাহ বাবর তাঁর রাজ্য বিভাগ করে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছিলেন।

বেগম সাহেবা, তুমি তো জান, অর্ধশতাব্দী ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম শক্তি, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা জালালউদ্দীন মুহম্মদ পাদশাহ গাজী আকবর সমগ্র হিন্দুস্থান জয় করেছিলেন ; বাবরের স্বপ্ন তিনি সফল করেছিলেন, সমগ্র মুঘল পরিবারের প্রত্যেকটি সন্তান পাদশাহের অনুগ্রহে তাঁর উপযুক্ত সম্মান, আসন এবং সমৃদ্ধিলাভ করেছিলেন। শাহজাদা সেলিম ঈর্ষাবিদ্ধ হয়ে সম্রাট আকবরের প্রিয়তম বন্ধু, সর্ব্বোত্তম উজীর আবুল ফজলকে হত্যা করিয়েছিলেন। আবুলফজলের মৃত্যুর সংবাদে শাহান শাহ আকবর সাতদিন অন্নজল স্পর্শ করেন নি ; সম্রাট দরবারে দর্শন দান করেন নি—শিশুর মতন চীৎকার করে কেঁদে উঠে বলেছিলেন—"সেকু বাবা, * তুমি কেন আমায় হত্যা কর নি। যে সম্পদ থেকে তুমি আজ পৃথিবীকে বঞ্চিত করলে, যে বিরাট প্রতিভা আজ পৃথিবী থেকে অন্তর্হিত হল, তার পুনরাবর্তন হবে না।" সন্তান স্নেহে অন্ধ হয়ে দূরদর্শী আকবর কল্পনা করতে পারেন নি যে বন্ধু, সখা, মিত্র, সুহৃদ্ আবুল ফজলের হত্যা অদূর ভবিষ্যতে সম্রাটের বিরুদ্ধে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে ; কিন্তু সত্যই তাই হয়েছিল। শাহজাদা সেলিমের বিদ্রোহ মুঘল পরিবারে সিংহাসনের লোভে পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের এই প্রথম

---

* সেকু বাবা শাহজাদা সেলিমের প্রিয় ডাক নাম। মুঘল পরিবারে ভারতীয় প্রথা অনুসারে প্রায় প্রত্যেক সন্তানেরই একটি প্রিয় ডাক নাম ছিল। যেমন দারার পুত্র সুলেমানের নাম ছিল পটল।

প্রকাণ্ড সংগ্রাম। কিন্তু তবু সম্রাট আকবর বিদ্রোহী পরাজিত পুত্রকে ক্ষমা করেছিলেন। মৃত্যুর মুহূর্তে আশীর্বাদ করে পাদশাহ আকবর সেলিমের মস্তকে রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। জিন্নাৎ-মকানী (স্বর্গবাসী) হুমায়ুনের তরবারি তাঁর হস্তে সমর্পণ করলেন। এই তো ছিল মুঘল পরিবারে পিতৃস্নেহের রূপ।

নুরউদ্দীন মুহম্মদ পাদশাহ গাজী জাহাঙ্গীর আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে তাঁর পুত্র খুররমের সফলতায় উল্লসিত হয়ে পাদশাহের সিংহাসনের পার্শ্বে দ্বিতীয় সিংহাসন নির্মাণ ক'রে পুত্রকে সম্মানিত করেছিলেন; এ ছিল মুঘল বংশের পুত্রস্নেহের অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

বেগম সাহেবা, তুমি স্বচক্ষে দেখেছ, তুমি তো প্রত্যক্ষসাক্ষী, শাহান শাহ শাহজাহান তাঁর মাতৃহীন সন্তানদের কি অপূর্ব স্নেহে লালন-পালন করেছিলেন। ঔরঙ্গজেব পিতা শাহজাহানকে তাঁর প্রিয় পুত্র দারার ছিন্নমুণ্ড উপহার দিয়েছিলেন, পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। তবু শাহ জাহানের হৃদয় থেকে পিতৃস্নেহ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় নি। শাহজাহান তাঁর দুর্বিনীত পুত্র ঔরঙ্গজেবকে জীবনের শেষ মুহূর্তে ক্ষমা করেছিলেন, আশীর্বাদ করেছিলেন—এই তো মুঘল পরিবারে পিতৃস্নেহের রূপ, বেগম সাহেবা। তুমি দেখছ আজ, আমার পিতা তাঁর কন্যা জেবউন্নিসাকে কারারুদ্ধ করেছেন। তুমি কি কখনও শুনেছ—মুঘল পরিবারের কোন পিতা তাঁর কন্যাকে কারারুদ্ধ করেছেন? জীবনে তোমার দুর্ভাগ্যে কি সৌভাগ্যে জানি না—তুমি এই প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন করলে যে মুঘল পরিবারে সম্রাট পিতা তাঁর কন্যাকে কারারুদ্ধ করেছেন। সম্রাট আকবর! তুমি না বিধান করেছিলে মুঘল রাজ-কুমারীর বিবাহ হবে না, কারণ তাঁর সন্তান সিংহাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দী হতে পারে; সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বে ভ্রাতা-ভগিনীর সেই বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে। বেগম সাহেবা, আমি তো নিঃসন্তান। মুসলমান শাস্ত্রে নারী খলিফা হতে পারে না, বাদশাহ হতে পারে না। আমি তো সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দী নই। পিতা ঔরঙ্গজেব এবং পুত্র শাহজাদা আকবরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের সুর সলিমগড় দুর্গে এসে পরিণতি লাভ করেছে। একমাসের মাতৃহীন শিশু আকবরকে তাঁর ভগ্নী জেবউন্নিসা মাতৃস্নেহে লালন-পালন করেছিলেন। তাই যেদিন সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কুটীল ভ্রূকুটি শাহজাদা আকবরের দিকে প্রসারিত হল—আমি চমকিত হয়ে উঠলাম। ঔরঙ্গজেব শাহজাদা আকবরকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজদরবারে আহ্বান করেছেন। এ আহ্বানের পরিণতি কল্পনা করে আমি শিউরে উঠেছিলাম, তাই সতর্ক বাণী প্রেরণ করেছিলাম। সে সতর্কবাণীর অনুলিপি তোমার নিকট প্রেরণ করছি।

(শাহজাদা আকবরকে লিখিত পত্রের অনুলিপি)

প্রিয় আকবর, আমি কাল রজনীতে একাকিনী অলিন্দে বসে চিন্তা করছিলাম। চিন্তার স্রোত বয়ে চলেছে অবিশ্রান্ত, অবিরাম। অকস্মাৎ আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম—চন্দ্র তখনও অস্তমিত হয়ে যায়নি। সমস্ত রাজপুরী নিস্তব্ধ, চারিদিকে বিরাট ঘন অন্ধকার—গাঢ়, সূচিভেদ্য। আকাশে তারাগুলি সেই অন্ধকারকে প্রত্যক্ষতর করে তুলেছিল। সেই বিরাট পুরীতে আমি নিতান্ত নিঃসঙ্গ, নিতান্ত একাকিনী। মুঘল রাজপরিবারের প্রত্যেক সন্তানই একক; অথচ প্রত্যেকেই অতি নিকট, কিন্তু কেহ কাহারও নহে; সামান্য স্বার্থের জন্য প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণধার শাণিত ছুরিকা-হস্তে গোপন পথে চলেছে; প্রত্যেকের মনে সন্দেহের ছায়া। রাত্রির অন্ধকার যেন সেই ছায়ারই প্রতীক। মুঘল রাজবংশের দুর্ভাগ্য এই যে হিন্দুস্তানের সিংহাসন মুঘলবীর বাবরকে প্রলুব্ধ করেছিল। বাবর ভারতের সংস্কৃতি ঐতিহ্য ধর্ম—কিছুরই সন্ধান পাননি। সিংহাসনই ছিল তাঁর সাধনা— সিংহাসনের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুস্তানের সিংহাসনের প্রতিটি খণ্ড তৈমুর বংশের রক্ত দ্বারা সংযোজিত করা হয়েছিল। কত অপবিত্র অনাচার, বীভৎস ষড়যন্ত্র, নির্মম হত্যার দৃশ্য আমি মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। চিন্তার শেষ নেই।

অকস্মাৎ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস আমার পশ্চাতে অনুভব করলাম। আমি চমকিত হলাম। আমার পরিচারিকা গুলসন নতজানু হয়ে নিবেদন করল—রাজপুরীতে প্রচার হয়েছে যে শাহানশাহ আলমগীর শাহজাদা আকবরের নিকট ফারমান পাঠিয়েছেন—তুমি নির্ভয়ে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করবে—পিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন। তারপর গুলসন নিবেদন করল, শাহজাদা আকবর শীঘ্রই সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। আমি জানি না এ সংবাদ কতদূর সত্য, এর পরিণতি কোথায়। শাহজাদী, তুমি তো নির্বোধ নও—

আমি বুঝলাম যে মুঘল রাজপরিবারে পরিচারিকাও নির্বোধ নয়।

প্রিয় আকবর! আমার নয়নের মণি আকবর! আমি তোমাকে একটি ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। বাদশাহ আলমগীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছেন, দারা নিহত, সুজা পলায়িত, মুরাদ হত্যা অপরাধে কারারুদ্ধ, বিচারের অপেক্ষায় শৃঙ্খলিত। দিল্লীর সিংহাসনের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দী সুলেমান শিকো কাশ্মীরের রাজা কর্তৃক প্রতারিত, আহত, ক্লান্ত; সুলেমান সিকো কাশ্মীরের দুর্গে বন্দী। তোমার মনে পড়ে, বাদশাহ আলমগীরের ফারমান নিয়ে অশ্বারোহী কাশ্মীরের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল—সুলেমান শিকোকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দিল্লী আনতে হবে। তাঁর পদদ্বয় শোভিত করবে লৌহ শৃঙ্খল, হস্তে রাজপুত্রের উপযুক্ত স্বর্ণ শৃঙ্খল। হস্তিপৃষ্ঠে কাশ্মীর থেকে দিল্লীর পথ এক মাস। এই সুদীর্ঘ পথে রাজ্যের আমীর ওমরাহ প্রজাবর্গ প্রত্যক্ষ দেখবে যথার্থ সুলেমান শিকো বন্দী হয়েছেন—সুলেমান শিকোর মৃত্যুর পরে যেন কোন প্রতারক নিজকে সুলেমান শিকো বলে পরিচয় দিয়ে দিল্লী সিংহাসন দাবী করতে না পারে। আকবর! তোমার মনে পড়ে শাহজাদা দারা শিকোর ছিন্নমুণ্ড স্বর্ণপাত্রে পিতা শাহজাহানের নিকট প্রেরিত হয়েছিল—উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে ছিল, আর কেহ যেন দারা শিকো বলে দাবী করতে না পারে। তারপরে সেই ছিন্ন মুণ্ড দিল্লীর জনতার সম্মুখে আমাদের পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের কবরের পার্শ্বে সর্বজন সমক্ষে সমাহিত করা হয়েছিল।

তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আকবর। বহুদূর পথ অতিক্রম

করে হস্তিপৃষ্ঠে প্রহরীবেষ্টিত শৃঙ্খলাবদ্ধ সুলেমান শিকো দিল্লীর দুর্গ তোরণে যেদিন উপস্থিত হয়েছিল, সেইদিন দিল্লীবাসীর দীর্ঘশ্বাস, আলমগীরকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। সর্বশক্তিমান শাহানশাহ আলমগীর দয়া করে আদেশ করেছিলেন—বন্দীর পদদ্বয়ের লৌহশৃঙ্খল উন্মোচন করা হউক। কিন্তু হস্তের স্বর্ণশৃঙ্খল স্পর্শ করা হল না। আকবর! তোমার মনে পড়ে সেই করুণ দৃশ্য—মুঘলবংশের কোন সন্তান সুলেমান শিকোর মত সুন্দর সুপুরুষ ছিল না। সুলেমান শিকো মাসাবধি পথশ্রমে ক্লান্ত; অতিপরিচিত রাজ দরবারে অত্যন্ত অপরিচিত বিভ্রান্তের মত ইতস্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল—সকলেই অতিপরিচিত—অথচ তারা যেন কত অজানা কত অচেনা; প্রায় সকলেই অতি নিকট-আত্মীয়, অথচ যেন সকলেই কতদূর। ছিন্নবাস জীর্ণ পাদুকা, রুক্ষ কেশ, অবিন্যস্ত বেশ—সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়পুত্র দারা শিকোর পুত্র হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ বাদশাহ সুলেমান শিকোর সে অসহায় মুখ আমি আজও বিস্মৃত হই নাই—সে কি করুণ! কতদিন তার কথা আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করেছি, মনে পড়ে আকবর! ও! কি করুণ সে কাহিনী!

সেদিন মুঘল দরবারে একটা করুণ নীরব আর্তনাদ সমস্ত প্রাসাদকে ব্যথিত করে তুলেছিল, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস দিল্লীর আকাশ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে দিয়েছিল। দরবারে সমস্ত আমীর নতদৃষ্টি—সুলেমান শিকোর চোখের দিকে কেহ দৃষ্টি দিতে পারেনি। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ঝরোখার অপর পার্শ্বে দীর্ঘশ্বাস সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে হয়ত বা মুহূর্তের জন্য বিচলিত করেছিল। মুঘল অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে অনেকেই অশ্রুমোচন করেছিলেন, আমিও ছিলাম তাঁদের মধ্যে একজন। অশ্রু-মোচনের অবকাশে নারীহস্তের করুণ ঝঙ্কারের ক্রমবর্দ্ধমান শব্দ বাদশাহ আলমগীরকে অবহিত করে তুলল। বুদ্ধিমান সম্রাট সমস্ত দরবারের আমীর এবং অন্তঃপুরিকাদের মনোভাব অনুভব করেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি অত্যন্ত সহৃদয়ভঙ্গীতে সিংহাসন থেকে ভূমিতে অবতরণ করলেন। সুলেমান শিকোকে আশ্বস্ত করলেন—সুলেমান! তুমি নির্ভয় হও। তোমার কোন ভয় নাই। আল্লার এই বান্দা যতদিন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন থাকবেন, ততদিন কোন বিপদ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করবেনা। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—তোমার প্রতি দিল্লীর বাদশাহজাদার উপযুক্ত ব্যবহার করা হবে। তুমি সাহস হারিও না সুলেমান। তোমার পিতার মৃত্যু যেন তোমাকে বিচলিত না করে। তোমার পিতা ছিলেন কাফের, ধর্মহীন, পবিত্র ইসলামধর্মে অবিশ্বাসী। আল্লার ধর্মরক্ষার জন্য তুমি যথার্থ মুসলিম প্রজার মঙ্গলের জন্য আমি তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নির্ভয়। বাদশাহের মুখে স্মিত দৃষ্টি, নয়নে কুটিল ইঙ্গিত।

সুলেমান অর্বাচীন, কিন্তু মূর্খ ছিলেন না। সুলেমান ঔরঙ্গজেবের কপট প্রতিশ্রুতি শুনে ক্রোধে অভিমানে তাঁহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হচ্ছিল। পিতার অপমানে পুত্রের লুপ্ত সাহস ফিরে এসেছিল। রাজদরবারের প্রথা অনুসারে সুলেমান বাদশাহ আলমগীরকে সেলাম করল, অবনত-মস্তকে ভূমি স্পর্শ করল। হঠাৎ শৃঙ্খলিত হস্তদ্বয় মস্তক পর্য্যন্ত উত্তোলিত করে সম্রাটকে কি অনুরোধ করেছিল তা' কি তোমার মনে পড়ে? "শাহান শাহ! আপনার ভ্রূকুটির অর্থ অনুমান করতে পারি, কিন্তু আপনার অনুগ্রহকে ভয় করি। আপনার হাসির পশ্চাতে কি হিংস্র প্রতিহিংসা লুকিয়ে আছে তার সাক্ষী চাচা মুরাদবক্স। আমাকে যদি গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন, আমি স্বচ্ছন্দে সে আদেশ গ্রহণ করব। কিন্তু আমার একমাত্র অনুরোধ, পিপাসা নিবৃত্তির জন্য আমাকে পোস্ত (আফিমের জল) দেবার আদেশ করবেন না। আমি জানি, পোস্তের জলপান করলে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যাবে, আমি উন্মাদ হয়ে যাব। আমায় অনুগ্রহ করুন, আমায় মৃত্যু দণ্ড দিন। এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হউক।

বাদশাহ আলমগীর তৎক্ষণাৎ পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করলেন—আমি আল্লার নামে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সুলেমান, তোমাকে পোস্তের জলপান করতে দেওয়া হবে না। আমি জানি পোস্ত বিষ। আমি কি আমার পুত্রকে বিষ পান করতে দিতে পারি?

আকবর, তুমি তো জান গোয়ালিয়র দুর্গে সুলেমান শিকোকে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং প্রথম দিনেই সুলেমান শিকোকে পোস্তের জলপান করতে দেওয়া হয়েছিল। শাহজাদা আকবর। তুমি জান তিন বৎসরের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের নয়নের মণি, মুঘল অন্তঃপুরিকাদের অতি আদরের ধন সুলেমান শিকোকে পোস্তের বিষ দ্বারা তিলে তিলে হত্যা করা হয়েছিল। আকবর! আমার নয়নের মণি, শাহানশাহ আলমগীর তোমাকে দিল্লীতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ফারমন প্রেরণ করেছেন—শুনছি তিনি তোমাকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দিল্লীতে জনশ্রুতি—তুমি তাঁহার ক্ষমার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেছ। তুমি সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হবে। তুমি জান, তোমার জন্মের একমাস পরেই আমাদের মাতা দিলরাস বেগম ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। আমি মাতার যত্নে, ভগিনীর স্নেহে, তোমাকে বুকে করে মানুষ করেছিলাম। হে আল্লা, মেহেরবান! একদিন বেগম সাহেবা যে দৃশ্য দেখেছিলেন, তুমি আমাকে সেই দৃশ্য দেখিও না। আকবর! আল্লা তোমায় কল্যাণ করুন।

জেবউন্নিসার পত্র

বেগম সাহেবা, তোমার নিকট আমার এই পত্রের উদ্দেশ্য আত্ম-পক্ষ সমর্থন নহে। আর যে যাই মনে করুক, তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। তোমাকে আমার মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং আশঙ্কার কথা-গুলি জানিয়ে দেওয়ার জন্যই আজ এই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তোমায় আমার হৃদয়ের গোপন কথাগুলি জানিয়ে দিচ্ছি। তুমি তো জান, শাহাজাদা আকবর আমার কত প্রিয়, তাকে তো আমি বাদশাহ আলম-গীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করি নি। সম্রাট আলমগীর স্বয়ং শাহজাদা আকবরকে মারওয়াড়ের বিরুদ্ধে, চিতোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। মুঘল রাজত্বের স্তম্ভ রাজপুত জাতিকে সম্রাট আলমগীর বিমুখ করে দিয়েছিলেন। রাজপুতদের বিরুদ্ধে শাহাজাদা আকবরের বিফলতার জন্য সম্রাট আলমগীর শাহাজাদা আকবরের

প্রতি রুষ্ট হয়েছিলেন, তাকে অপমান করেছিলেন, পদচ্যুত করেছিলেন। শাহজাদা আকবর বিদ্রোহ করেছিলেন সত্য, তার জন্য দায়ী কে? মুঘল রাজপরিবারের বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ঘটনা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নাই।

শাহজাদা আকবর বিভ্রান্ত, পরাজিত, পরাশ্রিত। সম্রাট বহু চেষ্টা করেও তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারছেন না। সুতরাং সম্রাটের সমস্ত বিদ্বেষ এবং প্রতিহিংসার পাত্র হয়ে উঠল দুর্ভাগ্য শাহজাদা আকবরের হতভাগিনী পত্নী, দুই পুত্র এবং তিন কন্যা। শাহজাদা আকবরের অনুচরবর্গ প্রকাশ্য রাজপথে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত ভ্রাতৃস্নেহের অপরাধে শাহজাদী জেবউন্নিসা সেলিমগড় দুর্গে অবরুদ্ধা। তাঁর বাৎসরিক চারি লক্ষ টাকা বৃত্তি নিষিদ্ধ; জেবউন্নিসার সমস্ত ভূ-সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত।

বেগম সাহেবা, আজ এই নিশীথে আমার মনের উপর দিয়ে কি ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্ছে, তা তুমি অনুভব করতে পারছ। কারণ, মুঘল পরিবারের বহু মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর একমাত্র অবশিষ্ট প্রত্যক্ষ সাক্ষী তুমি—যদিও সেলিমগড়ের কারাপ্রাচীর আমার ও তোমার মধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যবধান রচনা করেছে, তবুও মানুষের সৃষ্ট কোন ব্যবধানই মনের গতিকে রুদ্ধ করতে পারে না। ইয়া আল্লা, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তুমি মানুষের মন এবং চিন্তাকে কোন রূপের বন্ধনে সীমাবদ্ধ কর নাই। তাই আজ আমার মন, আমার চিন্তা আমাকে বহুদূরে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে সম্রাটের ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি নাই, ঘন কৃষ্ণবর্ণ শাণিত অস্ত্রশোভিত ভীষণদর্শন হাবসী সৈন্যের সতর্ক দৃষ্টি নেই। মুঘল সাম্রাজ্যে আমি পরাধীনা, চিন্তার রাজ্যে আমি রাজ্যেশ্বরী।

পাদশা বেগম! তোমার সৌভাগ্য যে তুমি মহাপুরুষ আকবরের আশীর্ব্বাদ লাভ করেছ, পাদশাহ জাহাঙ্গীরের স্নেহস্পর্শ লাভ করেছ, শাহানশাহ শাহজাহানের সেবা করেছ, শেষ পর্য্যন্ত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শ্রদ্ধা লাভ করেছ; তুমি একমাত্র মুঘল পরিবারের সন্তান যার ব্যক্তিত্বের সম্মুখে অনমনীয় বাদশাহ আলমগীরও শির অবনত করেছেন। তাই তোমার নিকট আমার মনের কথাগুলি বলে যাব, হয় তো আর জীবনে সুযোগ হবে না তোমাকে জানাবার—তুমিও সুযোগ পাবে না আমাকে জানবার।

সংসার চলে

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সংসার চলে যন্ত্রের মতো হায়রে!
বনে ফুল ফুটে, নভে চাঁদ উঠে—
ফিরে কেউ নাহি চায় রে!

নির্ব্বোধ পাখী পাগলের পারা
ডালের আড়ালে ঢালে সুরধারা;—
কে শুনিবে সেই অকাজের গান!—
শূন্যে মিলায়ে যায় রে!

এ জীবন চলে চাকার মতন ভাইরে!
আছে বটে দেহ—তবু যেন তায়
প্রাণের চিহ্ন নাই রে!

নিদারুণ নেশা—শুধু টাকা—টাকা—
তবু এ হৃদয় কেন লাগে ফাঁকা?
স্থিতি নাই—আছে উন্মাদ গতি—
অকারণে শুধু ধাইরে!

চলে সংসার গড্ডালিকার প্রায় রে!
দিবস রাত্রি, সূর্য-চন্দ্র,
ছয় ঋতু আসে যায় রে!

দুঃখ ও সুখ, হাসি-কান্নায়
চলে মালা-গাঁথা হীরা-পান্নায়;
রক্ত-ঝরানো জীবনযুদ্ধ,—
করি তার গান গায়রে!

এ জীবন-ঘড়ি টিক্ টিক্ ক'রে চ'ল্‌ছে,—
তবু কোথা তার হ'য়েছে বিকল—
অবিরল মন ব'ল্‌ছে!

কোথায় শান্তি? কোথায় তৃপ্তি
আছে শুধু দাহ,—নাহিরে দীপ্তি!—
চাই পাল্টানো গোটা দুনিয়ার
শুধু খোল নয়—নলচে!

অমৃত পুরাণ কথা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

—তিন—

তুলসী-শঙ্খ-শীলা

মহাপরাক্রমশালী রাজাধিরাজ শঙ্খচূড় অতঃপর রাজ্য-শাসনে মনোনিবেশ করলেন। আর মহারাজ্ঞী দেবী তুলসী রাজ অন্তঃপুরে কমলার ন্যায় বিরাজ করতে লাগলেন। দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হ'ল তাঁর ঔদার্য, তাঁর দান, তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের বারতা। সমগ্র রাজ্যে একটি প্রশান্ত শান্তি বিরাজিত। কোথাও কোনো বেদনার চিহ্ন নাই।

ইতিমধ্যেই রাজাধিরাজ শঙ্খচূড় ত্রিভুবন বিজয় করেছেন। পিতামহ ব্রহ্মার বর প্রভাবে তিনি অমিত বলশালী। তিনি দেবতা দানব অসুর গন্ধর্ব কিন্নর রাক্ষস প্রভৃতির অজেয় এবং সর্বলোকের শাসনকর্তারূপে শাসনপ্রণালী বিস্তার করতে লাগলেন। দেবতাগণ স্বীয় অধিকারচ্যুত হলেন। তাঁরা ভীত শঙ্কিত অন্তরে ভিক্ষুকের ন্যায় যথাতথা বিচরণ করতে লাগলেন। শঙ্খচূড় হরণ করলেন দেবতাদের পূজাহোম বিষয় আশ্রয়। অধিকার করলেন অস্ত্রভূষণ প্রভৃতি সম্পদ সমুদয়। দেবতাদের আর অবশিষ্ট রইলো না কিছু। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নাই, দেবসেনা পলায়িত, ধর্মের শাসন স্তব্ধ। মর্ত্যলোকের যাগযজ্ঞে আর দেবতার আরাধনা হয় না। হোমের অগ্নিতে আর দেবতার নামে হবিঃ উৎসর্গ হয় না। অমৃতলোক অমৃতহারা।

বহুদিন অতিক্রম হ'ল এমনি নিরুদ্যমে নিরুৎসাহে শঙ্খচূড়-ভীতি-ব্যাকুল দেবতাদের। অতিক্রান্ত হ'ল এমনি ত্রাস-চঞ্চল ভয়ংকর ভারু দিন একের পর এক।

কিন্তু এমন শঙ্কিত জীবনযাপন আর কতোকাল সম্ভব? এর আশু পরিসমাপ্তি চাই। এ ভীতি, এ দীনতা অপেক্ষা দেবতাদের মৃত্যুও শ্রেয়।

একদা দেবগণ একত্রিত হলেন। একত্রিত হ'য়ে গভীর পরামর্শান্তে দানবরাজ শঙ্খচূড় নিপাত কামনায় প্রজাপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।

—পিতামহ, আপনারই বরপ্রভাবে আজ শঙ্খচূড়দানব ত্রিলোক-বিজয়ী। আমরা—দেবতা হ'য়েও আজ সামান্য মানবের ন্যায় ভীরু জীবনযাপন করছি। আমরা রাজ্যহারা, অমৃতে বঞ্চিত, মর্ত্যলোকে আমরা আর পূজিত হই না। দানব-ভয়ে কানন-কান্তারে পর্বতগুহায় অতি দীন ভিক্ষুকের ন্যায় আমরা লুকায়িত জীবন অতিবাহিত করছি। আপনি এর প্রতিবিধান করুন।

চতুর্মুখ নীরবে দেবতাগণের সমস্ত অভিযোগ শুনলেন এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। কতোক্ষণ পরে বললেন: কিন্তু আমি নিরুপায়। তবে মহেশ্বর যদি কোনো প্রতিকার করতে পারেন—

—চলুন, তাহলে আমরা আর কালবিলম্ব না করে মহেশ্বরের নিকটে যাই।

অতঃপর পিতামহসহ দেবগণ শিবভবনে গমন করলেন।

কৈলাসে চন্দ্রশেখর সমীপে উপস্থিত হয়ে দেবতাগণ সখেদে আপনাদের দুঃখ ক্লেশের বার্তা জ্ঞাপন করলেন। বললেন: এর প্রতিবিধান আপনি ভিন্ন অপর কেউ করতে সক্ষম নয়, তাই আমরা আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আপনি এর উপায় উদ্ভাবন ক'রে আমাদের নিশ্চিন্ত করুন আশুতোষ।

সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে দেবাদিদেব বললেন: আমি ইতিপূর্বেই এ বিষয় জ্ঞাত হয়েছি। কিন্তু দানবরাজ শঙ্খচূড় পরম বৈষ্ণব। তপস্যা প্রভাবে প্রায় অমর তুল্য। শঙ্খচূড়ের নিধন সাধন অতি দুষ্কর? তবে ইচ্ছাময় নারায়ণ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে। অতএব সকলে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট গমন করুন।

মহাদেবের পরামর্শই শিরধার্য করলেন ব্রহ্মাদি সমাগত দেবতাবৃন্দ এবং পিতামহকে অগ্রবর্তী করে পুনরায় সকলে বৈকুণ্ঠাভিমুখে যাত্রা করলেন।

যথাকালে বৈকুণ্ঠে উপনীত হলেন তাঁরা। উপনীত হলেন বৈকুণ্ঠাধিশ্বর নারায়ণের দ্বার সমীপে। অবলোকন করলেন রত্নসিংহাসনে, শ্যামসদৃশ পীতবাস আর রত্নভূষণশোভিত, অপূর্ব দ্বাররক্ষিগণ উপবিষ্ট। তাদের গলদেশে দোদুল্যমান বনমালা। তারা সকলেই শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী।

সম্মুখে দেবগণকে দর্শন ক'রে তারা পুরদ্বার মুক্ত ক'রে দিল। এইরূপ ষোড়শ দ্বার অতিক্রম ক'রে দেবগণ শ্রীহরির সভায় উপস্থিত হলেন।

বর্ণনাতীত সৌন্দর্য মণ্ডিত সে সভা—নৃত্য-গীত-বাদ্য মুখরিত সে সভা! সৌগন্ধ সুবাসিত সমীরণ সারা সভায় মন্দ মন্দ প্রবাহিত। শ্রীহরি তারকাপরিবৃত শশধরের ন্যায় সে-সভামধ্যে অমূল্য রত্ননির্মিত বিচিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট। কিরীট-কুণ্ডল ও বনমালায় বিভূষিত তিনি। তাঁর সর্বাঙ্গ সুগন্ধী চন্দনসিক্ত। হস্তে ক্রীড়াপদ্ম ধারণ করে আছেন তিনি। দেবী সরস্বতী সুমধুর বীণা বাদ্যে তাঁর বন্দনা করছেন। দেবী কমলা তাঁর চরণ ধারণ ক'রে আছেন। গঙ্গাদেবী তাঁর অঙ্গে শ্বেতচামর বীজন করছেন।

পরমেশ্বরের পরম রূপ দর্শন করলেন দেবতারা। পরমেশ্বরের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হ'ল তাঁদের প্রতি। সহাস্যে তিনি সাদর আহ্বান জানালেন তাঁদের। বিষণ্ণ দেবতাগণ নারায়ণ নির্দেশিত আসনে উপবেশন করলেন। তখন স্মিতহাস্যে নারায়ণ তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন।

চতুর্মুখ ব্রহ্মা ধীরে ধীরে তাঁদের আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। বললেন: দেবতাগণের এ পরম দুঃখের দিনে আপনি ভিন্ন গতি নাই।

দানবরাজ শঙ্খচূড়ের নিধন কামনায় আমরা মহেশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি আমাদের দুর্ভোগের শান্তি বিধান করুন। আমাদের নিশ্চিন্ত করুন।

সুমধুর হাস্যে নারায়ণের আনন উদ্ভাসিত হ'ল। তিনি বললেন: শঙ্খচূড় বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত আছি আমি। কিন্তু শঙ্খচূড় আমার পরম ভক্ত। শঙ্খচূড় পরম বৈষ্ণব! তার নিধন সহজসাধ্য নয়। আমারই প্রদত্ত সর্বমঙ্গল-মঙ্গলকবচ ধারণ করে সে সংসার বিজয়ী হয়েছে। সে-কবচ তার কণ্ঠে থাকতে সে অবধ্য।

দেবতাগণ চমকিত হলেন।

—তা হ'লে উপায়?

—উপায় আছে। তবে তা রীতিমত কষ্টসাপেক্ষ। প্রথমতঃ তার কবচ ছলনার আশ্রয় নিয়ে হরণ করতে হবে। এবং—

শ্রীহরি বিচিত্র হাস্য সহকারে বললেন: তার সাধ্বী পত্নীর সতীত্ব বিনাশ করতে হবে। তারপর একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবই তাকে সংহার করতে সক্ষম হবেন।

দেবতাগণের ললাটদেশ কুঞ্চিত হ'ল। তাঁরা ব্যাকুলভাবে যেন আর্তনাদ করে উঠলেন: এও কি সম্ভব!

—সম্ভব এবং একমাত্র আমার পক্ষেই সম্ভব।

নারায়ণ পিতামহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

—পিতামহ, আপনার অবশ্যই স্মরণ আছে—দেবী তুলসীকে কী বর প্রদান করেছিলেন?

—আছে। যতোক্ষণ তুলসীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে ততোক্ষণ শঙ্খচূড় অজেয় অমর। কোনো শক্তিই তার সংহারে সমর্থ হবে না।

অবরুদ্ধ নিশ্বাসে দেবতাগণ ব্রহ্মা বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করলেন। সামান্যমাত্র যে আশাটুকু তাঁরা মনের মধ্যে পোষণ করছিলেন, তাও অন্তর্হিত হ'য়ে গেল পিতামহের বাক্যে। তবে?—তবে কি আর দেবতাগণের কোনো আশাই নাই? এই দীনতার গ্লানি হ'তে মুক্তি নাই?

দুস্তর-চিন্তা-সিন্ধু মন্থন করতে লাগলেন ক্লিষ্ট দেবগণ।

ভগবান নারায়ণ তেমনি মধু-হাস্য-রঞ্জিত অধরে, পদ্মপলাশ যুগল-আঁখির স্নেহবিচ্ছুরিত দৃষ্টি তাঁদের প্রতি স্থাপন করে বংশীধ্বনি তুল্য সুস্বরে সুরগণকে আশ্বাস দিলেন।

—দেবগণ, তোমরা ভীত হ'য়ো না। চিন্তা পরিত্যাগ করো। শঙ্খচূড় বধের ব্যবস্থা আমিই করবো এবং তার সময়ও সমুপস্থিত।

—কিন্তু প্রভু!

দেবগণ সবিস্ময়ে শ্রীহরির প্রতি তাকালেন।

—আপনাদের উভয়ের নিকটে যে সমাচার অবগত হলাম, তাতে শঙ্খচূড় বধ কেমন ভাবে সম্ভব হবে, আমাদের বুদ্ধির অতীত।

নারায়ণ বললেন: তবে শোন দেবগণ, শঙ্খচূড় সাধারণ দানব নয়। সে মহা যোগী, দানীশ্রেষ্ঠ এবং পরম বৈষ্ণব। আমারই অংশে তার জন্ম দেব শংকরই কেবল তার সংহারে সমর্থ। কিন্তু তাও নির্দিষ্ট সময়ে এবং তার গলের মঙ্গলকবচ অপহৃত হলে।

—মঙ্গলকবচ কেমন করে অপহৃত হবে? কে অপহরণ করবে?

—আমি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দাতা শঙ্খচূড়ের কাছে মঙ্গলকবচ ভিক্ষা ক'রে নেব।

—যদি ভিক্ষা প্রদান না করে দানব-রাজ?

—এ সন্দেহ অমূলক। প্রার্থীকে শঙ্খচূড় কখনো বিমুখ করে না।

—কিন্তু প্রভু, দানবরাজ পত্নী তুলসীর সতীত্ব?

—সে বিষয়েও তোমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারো। সে ভারও আমার।

নারায়ণের আশ্বাস বাক্যে দেবগণ উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন এবং বারংবার তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: এখন আমাদের কর্তব্য কী আদেশ করুন।

নারায়ণ বললেন: আর সামান্য কিছুদিন কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তোমরা এখন শিবলোকে গমন করো। দেবাদিদেবকে আমার সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে বলবে, আমি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। তিনি এলে শঙ্খচূড়-সংহার শূল তাঁর হাতে দেব। তিনি ব্যতীত সে শূল ধারণ করার শক্তি ত্রিভুবনে কারো নাই। ত্রিশূলীই একমাত্র সে-শূলের অধিকারী। তোমরা তাঁকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার কথা বোলো।

—চার—

মহাদেব সমীপে পুনর্গমন করলেন দেবগণ। ব্রহ্মা শ্রীহরির নিকট শ্রুত সমুদয় বৃত্তান্ত বিবৃত করলেন বিরূপাক্ষ সকাশে এবং তাকে দানব শঙ্খচূড় নিধন নিমিত্ত অনুরোধ জানালেন।

ত্রিলোচন সহাস্যে বললেন: শ্রীহরির আদেশ অমান্য করার সামর্থ্য আমার নাই। আমি দানব বধের ভার গ্রহণ করলাম। আপনারা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

আশ্বস্তচিত্তে দেবগণ তখন স্বস্থানে প্রস্থান করলেন।

অতঃপর শূলপানি হরিদত্ত দানব-সংহার শূল আনয়ন করলেন এবং সেই শূল ধারণ করে সুরগণের নিস্তার নিমিত্ত চন্দ্রভাগা নদীতীরবর্তী এক মনোহর বটবৃক্ষতলে যুদ্ধ শিবির স্থাপনা করলেন।

যুদ্ধের বার্তা ঘোষিত হ'ল। গন্ধর্বেশ্বর পুষ্পদন্তকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করা হ'ল। পুষ্পদন্ত শিবাজ্ঞায় শঙ্খচূড়ের নিকটে গমন করলেন।

যথাসময় রাজধানীতে উপনীত হলেন পুষ্পদন্ত। কী সমৃদ্ধিশালী সে নগর! কী অপরূপ শোভা সে নগরের! পুষ্পদন্ত মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। সে-রাজনগরের পরিধি প্রস্থে পঞ্চযোজন, দৈর্ঘ্যে দশযোজন বিস্তীর্ণ। নগর মধ্যে প্রবেশ ক'রে পুষ্পদন্ত শঙ্খচূড়ের ভবন দেখলেন। দেখলেন সে ভবন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলাকার। চতুর্দিকে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা-বিশিষ্ট চারিটি পরিখা এবং সে পরিখার পার্শ্বে অতি উচ্চ গগনস্পর্শী প্রাচীর। যেদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন পুষ্পদন্ত, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যান নগরীর শোভা নিরীক্ষণ ক'রে। নগর পরিভ্রমণের লোভ সংবরণ করতে পারলেন না তিনি। নগরীর চৌদিকে মণিপ্রস্তর নির্মিত লক্ষ মন্দির—রত্নময় সোপান ও রত্নময় স্তম্ভে বিরাজিত। নগরীর মধ্যভাগে পণ্যবীথিকা। বণিকগণ আপনাপন বিপণি সাজ

দ্রব্য সম্ভারে সুসজ্জিত ক'রে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এমন শোভান্বিত সজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন নগরী ইতিপূর্বে আর কোনোদিন দেখেননি গন্ধর্বরাজ।

বহুক্ষণ নগর ভ্রমণ ক'রে শেষে ধীরে ধীরে তিনি রাজ-অট্টালিকার সন্নিকটবর্তী হলেন। অট্টালিকার প্রধান দ্বার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে দেখলেন, সেখানে এক ভীষণ দর্শন পুরুষ শূলহস্তে দণ্ডায়মান। সম্ভবতঃ সে দ্বার রক্ষক। পুষ্পদন্ত তাকে আপনার আগমনের উদ্দেশ্য শান্তভাবে ব্যক্ত করলেন। দ্বারী অতঃপর তাঁকে দ্বার মুক্ত করে দিল। তিনি অভ্যন্তরে গমন করলেন। একব্যক্তি অগ্রবর্তী হ'য়ে তাঁকে পথপ্রদর্শন ক'রে নিয়ে গেলেন রাজদরবারে। তিনি দর্শন করলেন দানবরাজ শঙ্খচূড়কে। দেখলেন সভামণ্ডলের মধ্যভাগে রত্ন-সিংহাসনে তিনি উপবিষ্ট। এক ভৃত্য তাঁর মস্তকে মণিমুক্তাখচিত রত্নদণ্ডযুক্ত অপরূপ মনোহর স্বর্ণচ্ছত্র ধারণ ক'রে আছে। কয়েকজন সুবেশী পার্ষদ শ্বেতচামর দ্বারা তাঁর সেবায় তৎপর।

পুষ্পদন্ত নির্বাক বিস্ময়ে অবলোকন করলেন রাজাধিরাজ শঙ্খচূড়কে।

শঙ্খচূড় সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তাঁর প্রতি। তখন তিনি সবিনয়ে তাঁর আগমনহেতু বর্ণনা করলেন।

—হে রাজেন্দ্র! আমি শিবদূত। আমার নাম পুষ্পদন্ত। আমাকে শংকর আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন।

প্রশান্ত হাস্যে শঙ্খচূড় জিজ্ঞাসা করলেন: কারণ?

—কারণ দেবতারা সংঘবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ত্রিলোচনের শরণাপন্ন হয়েছেন। শ্রীহরির অনুরোধে এবং তাঁর প্রদত্ত অস্ত্রে শক্তিসঞ্চয় ক'রে—যদি সংগ্রাম হয়—সে সংগ্রাম পরিচালনার ভার মহাশূলী স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। অতএব মহাভাগ! উপস্থিত আপনার নিকট আমাকে তিনি প্রেরণ করেছেন এবং আপনাকে একান্তভাবে অনুরোধ করতে বলেছেন—যেন আপনি অচিরাৎ দেবতাগণের ক্লেশ স্মরণ ক'রে তাঁদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

—নতুবা?

—নতুবা আশুতোষ আশু যুদ্ধের জন্য আপনাকে প্রস্তুত হ'তে বলেছেন।

—তথাস্তু। দেবাদিদেব আশুতোষকে আমার প্রণাম নিবেদন ক'রে বলবেন, যুদ্ধের জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত। দেবতাগণ যেন শক্তির বিনিময়ে তাঁদের রাজ্য উদ্ধার ক'রে নেন।

অতঃপর পুষ্পদন্ত প্রত্যাবর্তন করলেন শিবের শিবিরে এবং শঙ্খচূড়ের গর্বিত বাক্ বর্ণনা করলেন শিবসকাশে। তখন দেবগণ মধ্যে যুদ্ধের সাজ সাজ রব ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। এলেন কার্তিকেয়, এলেন বীরভদ্র, নন্দী, মহাকাল, বিশালাক্ষ, এলেন ভয়ংকর অষ্টভৈরব, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু—এলেন ইন্দ্রাদি দেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য। অগ্নিচন্দ্র বিশ্বকর্মা এলেন। আরও এলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কুবের যম জয়ন্ত ও অন্যান্য দেবগণ। তারপর এলেন অষ্টভুজা ভয়ংকরী ভদ্রকালী।

যুদ্ধের জন্য দেবপক্ষ প্রস্তুত হলেন।

অন্যপক্ষে দানবরাজ শঙ্খচূড় মহাদেব প্রেরিত দূত পুষ্পদন্তকে বিদায় দিয়ে অন্তঃপুর অভিমুখে গমন করলেন। চিন্তার এতোটুকু ছায়া পড়েনি তাঁর মুখে। ভীতির কোনো চিহ্ন নেই সেখানে—সেখানে পরিপূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করছে। এমন যুদ্ধ এই প্রথম নয়; ইতিপূর্বে বহুবার এমন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে তাঁকে এবং প্রতিবার বিজয়মাল্য গলদেশে ধারণ করেছেন তিনি। তবে এবারের প্রত্যাসন্ন সংগ্রামে নতুনত্ব এই যে স্বয়ং ত্রিশূলী সংগ্রাম পরিচালনা করবেন।

রাজ-অন্তঃপুরেও যুদ্ধের সংবাদ ইতিমধ্যেই পৌঁচেছে। দেবী তুলসী সে সংবাদ শ্রবণে রীতিমত ব্যাকুলা হ'য়েছেন। তিনি চিন্তাক্লিষ্ট আননে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিলেন। শঙ্খচূড় আগমন মাত্র তিনি ত্বরিতে তাঁর হস্ত আপন কম্পিত হস্তে ধারণ ক'রে ব্যাকুল-চঞ্চল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন: প্রভু! সংবাদ সত্য?

—কী সংবাদ দেবী?

শান্ত হাস্য সহকারে তুলসীকে বক্ষের নিকট অতি যত্নে আকর্ষণ করলেন রাজা শঙ্খচূড়। তুলসীর কিন্তু ভীতি অন্তর্হিত হ'ল না। তেমনি শঙ্কিত স্বরে স্বামীর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন: যুদ্ধ সংবাদ কী সত্য?

—সত্য দেবী।

—মহাদেব সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত প্রেরণ করেছিলেন?

—করেছিলেন।

—তুমি দেবাদিদেবের প্রস্তাবে রাজী হও নাই।

—না দেবী। রাজী হওয়া সম্ভব নয়।

—কিন্তু প্রভু; শুনলাম মহাদেব স্বয়ং এ যুদ্ধের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন? আর সমস্ত দেবতাগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন?

—তুমি যথার্থই শুনেছ তুলসী। এবারের সংগ্রাম সামান্য হবে না। হয়তো অতি ভীষণ সংগ্রাম হবে।

—তবে প্রভু সন্ধি প্রস্তাবে রাজী হ'লেন না কেন? এতে তো আমাদের কোনো লজ্জার হেতু নেই। দেবতাবৃন্দের সঙ্গে—

—সম্ভব নয় দেবী। সন্ধি অসম্ভব।

—কিন্তু মহারুদ্র শংকর—

উচ্চহাস্য করে উঠলেন শঙ্খচূড়।

—তুমি বৃথা ভীত হ'চ্ছ তুলসী। তুমি কি জাননা সমগ্র দেবতার সর্বশক্তি একত্রিত হলেও আমাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার বর-প্রভাবে আমি চির-জয়ী। সাধ্বি, তোমারই সতীত্ব আমায় অমরত্ব দান করেছে।

তুলসীর ম্লান আননে ঈষৎ হাসির রেখা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। তিনি অবনত হ'য়ে স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করলেন।

ক্রমশঃ

বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জ্ঞান-প্রক্রিয়া

শংকরের মতে অদ্বৈত আত্মাই চরম সত্য। তিনিই সর্ব্বত্র বিরাজিত। তাহা হইতে ভিন্ন কোনও বস্তু নাই। বিভিন্ন উপাধিযোগে তিনি বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। ভিতরের অন্তঃকরণ, বা দূরে ঘট ঘটাদি বস্তু, সকলই সেই অদ্বৈত আত্মায় অধ্যস্ত; তিনিই সকলের অধিষ্ঠান। জ্ঞানে এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের তিন রূপে প্রকাশ (১) প্রমাতৃ-চৈতন্য, (২) প্রমাণচৈতন্য এবং (৩) বিষয়-চৈতন্য। অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন রূপ চৈতন্য, অর্থাৎ অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত ও তদ্দ্বারা সীমাবদ্ধ চৈতন্যকে প্রমাতৃ চৈতন্য বলে। অন্তঃকরণের বৃত্তি, অর্থাৎ জ্ঞানকালে অন্তঃকরণ যে রূপ ধারণ করে, তাহা প্রমাণ চৈতন্য। জ্ঞানের যাহা বিষয়, (ঘটাদি) তাহা দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে, বিষয় চৈতন্য বলে। ঘটাদি উপাধি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে ঘটাদি-উপহিত চৈতন্যও বলে। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—সর্ব্বত্রই চৈতন্যেরই প্রকাশ। যাহা বস্তুবিশেষের সহিত অন্বিত না হইলেও, তাহার জন্য সেই বস্তু অন্য বস্তু হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, তাহাই উপাধি। বহিরিন্দ্রিয় কর্তৃক যাহা আনীত হয়, অন্তঃকরণ তাহাদিগকে জ্ঞানোপযোগী করিয়া সজ্জিত করে। অন্তঃকরণকে ইন্দ্রিয় নামে অভিহিত করা হয় না—কেননা ইহা যদি ইন্দ্রিয় হইত, তাহা হইলে ইহা ইহার নিজের অথবা বৃত্তির জ্ঞানলাভ করিতে পারিত না। ইহার অংশ আছে। ইহ আকারে আণবিকও নহে, অসীমও নহে। দর্পণে যেমন বস্তু প্রতিফলিত হয় অন্তঃকরণেও তেমনি তাহারা প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলনের অর্থ তাহাদিগের জ্ঞানলাভ করা, এই জ্ঞানশক্তি অন্তঃকরণ লাভ করে আত্মা হইতে। আত্মাই অন্তঃকরণের মধ্যে দীপ্তিমান এবং বস্তুতঃ আত্মাতেই সকল বস্তু প্রতিফলিত হয়। আত্মার শক্তিতেই অন্তঃকরণ বস্তু-জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

অন্তঃকরণের বৃত্তি চারিপ্রকার—সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব ও স্মরণ। সংশয়াপন্ন অন্তঃকরণকে বলে মন। নিশ্চয়-বৃত্তি যুক্ত অন্তঃকরণকে বলে বুদ্ধি। আত্মসংবিদবৃত্তি-যুক্ত মনকে বলে অহংকার। স্মৃতি ও মনঃসংযোগযুক্ত মনকে বলে চিত্ত। মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত মূলতঃ এক, বৃত্তিভেদে তাহা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। জ্ঞানের কারণ কেবল অন্তঃকরণের সহিত যুক্ত তাহার (তদ্দেশে) অবস্থিত-চৈতন্য নহে। অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যই জ্ঞানের কর্ত্তা। প্রত্যেক জীবের অন্তঃকরণ ভিন্ন বলিয়া তাহার জ্ঞানও অন্যের জ্ঞান হইতে ভিন্ন। সীমাবদ্ধ বলিয়া অন্তঃকরণে সমগ্র জগতের জ্ঞান হয় না।

অন্তঃকরণ যখন ইন্দ্রিয়দিগের মাধ্যমে বাহ্যবস্তুদিগের সংস্পর্শে আসে, তখন তাহার পরিণাম হয়। এই পরিণামকেই বলে বৃত্তি। যখন কোনও ঘটের জ্ঞান হয়, তখন অন্তঃকরণ চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া ঘটে যায় এবং ঘটের আকার প্রাপ্ত হয়। ইহাই তাহার ঘটাকার-বৃত্তি। সকল বস্তুই অজ্ঞানে আবৃত। যখন অন্তঃকরণের ঘটাকারা বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তখন ঘট হইতে অজ্ঞানাবরণ তিরোহিত হয় এবং তাহার উপর চিতের আলোক পতিত হয় এবং তাহার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞেয় বস্তুর রূপপ্রাপ্ত অন্তঃকরণের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশই সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যখন ঘটের প্রত্যক্ষ হয়, তখন অন্তঃকরণের ঘটাকার বৃত্তি ঘটের সহিত মিলিত হয়। তখন ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও অন্তঃকরণ-বৃত্তি-বিশিষ্ট চৈতন্য মিলিত হইয়া ঘটের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। যখন "আমি সুখী" এই জ্ঞান হয়, তখন সুখ ও অন্তঃকরণের বৃত্তি একই দেশস্থিত। উভয়ের ভেদ না থাকাতে ঐ জ্ঞান প্রত্যক্ষ। বিষয় ও অন্তঃকরণবৃত্তি যখন একই দেশে ও কালে অবস্থিত, তখনই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। বিভিন্ন কালে অবস্থিত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। যেমন স্মৃতি জ্ঞান।

অন্তঃকরণের বৃত্তি ইন্দ্রিয়দ্বার পথে বহির্গত হইয়া বিষয়কে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহার গতি সীমাবদ্ধ, সুতরাং অধিক দূরে অবস্থিত বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্তঃকরণ যে ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার উপরেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান নির্ভর

করে। যদি তাহা শব্দাকারে পরিণত হয়, তাহা হইলে শব্দ জ্ঞান হয়. যদি কোনও বস্তুর ভারের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে ভারের জ্ঞান হয়।

যখন ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান হয়, তখন অন্তঃকরণ অগ্নির রূপ ধারণ করে না, কেননা অগ্নির সহিত তখন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ নাই।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে প্রমাতৃ চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য এবং বিষয় চৈতন্য ও তাহাদের উপাধিদিগের (অন্তঃকরণ, বৃত্তি এবং ঘটাদি) একই কালে একত্র সমাবেশের ফলে তাহারা অভিন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলেই বিষয় চৈতন্য হইতে অভিন্ন প্রমাতৃ চৈতন্য অধ্যস্ত ঘটাদি জানিতে পারে। ঘটাকারা বৃত্তি ও ঘট উভয়েই একই স্থানে একত্র থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যে ভেদ থাকে না। অনুমানে বৃত্তি ও বিষয় একত্ব প্রাপ্ত হয় না। অনুমানের সহিত প্রত্যক্ষের এইখানে পার্থক্য। দর্শন ও শ্রবণ কালেই অন্তঃকরণবৃত্তি দেহের বাহিরে গিয়া বিষয়ের সহিত মিলিত হয়। ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শকালে বৃত্তি বাহিরে গমন করে না। বিষয়ই তখন দেহের মধ্যে উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষে বিষয় ও অন্তঃকরণ-বৃত্তি একই কালে অবস্থিত, কিন্তু স্মৃতিতে অতীত ঘটনাই জ্ঞানে আবির্ভূত হয়। অনুমানে অন্তঃকরণ বিষয়ের চিন্তা করে, কিন্তু বাহিরে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হয় না।

প্রত্যক্ষের নানা ভেদ আছে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়াজন্য প্রত্যক্ষ। যে সকল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, তাহারা ইন্দ্রিয়-জন্য, আর যে সকল প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া নাই তাহারা ইন্দ্রিয়াজন্য। কামনা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়াজন্য। বিষয়-চৈতন্য ও প্রমাণ-চৈতন্যের মিলন ও একত্বই প্রত্যক্ষের লক্ষণ—ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া নহে। সুখের প্রত্যক্ষের সময় সুখ ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তি এক হইয়া যায়। কেন না তাহারা এক স্থানেই অবস্থিত। কিন্তু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অন্তঃকরণের ধর্ম্ম হইবেও তাহারা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অন্তঃকরণের সকল ধর্ম্মই প্রত্যক্ষের "যোগ্য" নহে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের স্বভাব হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তাহারা প্রত্যক্ষের "যোগ্য" নহে।

শব্দ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে, যখন শব্দজনিত অন্তঃকরণ-বৃত্তি ও শব্দ জ্ঞানের বিষয় সংমিলিত হয়। যখন দশজন লোকের মধ্যে একজনকে বলা হইল 'তুমি দশম', তখন সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ (বা অপরোক্ষ) পরোক্ষ নহে। যখন চন্দন দেখিয়া বলি, "সুরভি চন্দন" তখন চন্দনের ঘ্রাণ লই না। দূরহইতে দেখিয়াই বলি ঐ সুরভি চন্দন। এখানে চন্দন জ্ঞান প্রত্যক্ষ। সৌরভ জ্ঞান পরোক্ষ। সুতরাং প্রত্যক্ষের প্রকৃত সংজ্ঞা হইবে "সাকার বৃত্ত্যুপহিত—প্রমাতৃ চৈতন্য সত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্ব শূন্যত্বে সতি যোগ্যত্বং বিষয়স্য প্রত্যক্ষং—অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় আপনার সদৃশ বৃত্তির দ্বারা যে প্রমাতৃ-চৈতন্য উপস্থিত করিবে, তাহার অস্তিত্বের সহিত বিষয়ের অস্তিত্বের পার্থক্য না থাকিলে এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষের যোগ্য হইলে সেখানে প্রত্যক্ষ হয়। (বেদান্ত-পরিভাষা)

সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদেও প্রত্যক্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। "বৈশিষ্ট্য অবগাহী" জ্ঞান সবিকল্প প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ সে জ্ঞান বিশেষিত। যাহার মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ থাকে তাহাই সবিকল্প। যেমন "ঘটমহং জানামি", আমি ঘট জানি। এখানে ঘটের গুণের জ্ঞানসহ ঘটের জ্ঞান হইতেছে। "সংসর্গ অনবগাহী জ্ঞান" নির্বিকল্প। যে জ্ঞানে সংসর্গ (বৈশিষ্ট্য) জ্ঞান নাই, তাহা নির্বিকল্প। যেমন "এই সেই দেবদত্ত।" "তুমি সেই।" এই জ্ঞান শাব্দ জ্ঞান বলিয়া যে প্রত্যক্ষ নহে, তাহা নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শাব্দ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়দ্বারা উৎপন্ন না হইলেও জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অন্তঃকরণ বাহিরে আসিয়া দেবদত্ত-রূপ বৃত্তি ধারণ করে এবং প্রমাতৃচৈতন্য ও বিষয় চৈতন্য এক হইয়া যায়। এই জন্য ইহা ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ। "তুমি সেই" এখানেও প্রমাতৃ ও বিষয় চৈতন্য এক হইয়া যায়।

জীব সাক্ষী এবং ঈশ্বর সাক্ষী ভেদেও প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ। অন্তঃকরণকর্তৃক অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীবে। অন্তঃকরণ উপাধিযুক্ত চৈতন্য জীব সাক্ষী। জীব ও জীব-সাক্ষী এই উভয়ের মধ্যে ভেদ এই যে একটিতে অন্তঃকরণ জীবের বিশেষণ, জীব অন্তঃকরণ কর্তৃক বিশেষিত, কিন্তু অন্যটিতে ইহা জীবসাক্ষীর উপাধি মাত্র। বিশেষণ কার্য্যান্বয়ী অর্থাৎ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ও ব্যবর্ত্তক (অন্য হইতে ভেদ সাধক), উপাধির সঙ্গে এখানে কার্য্যের সম্বন্ধ নাই। তাহা ব্যবর্ত্তক ও বর্ত্তমান। "রূপবিশিষ্ট ঘট" এখানে রূপ

বিশেষণ। কিন্তু "কর্ণশস্কুল্যবচ্ছিন্নং নভঃ শ্রোত্রং" এখানে কর্ণের বহির্দৃশ্যমান অংশ (কর্ণশস্কুলী) কর্তৃক অবচ্ছিন্ন আকাশ শ্রোত্র—এখানে কর্ণশস্কুলী উপাধি। নৈয়াবিকারগণ এই উপাধিকে "পরিচায়ক" বলেন।

অন্তঃকরণ জীবের একটা অংশ, কিন্তু জীব সাক্ষীর বাহিরে তাহার আবরণ মাত্র। মায়া-উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর সাক্ষী। তাহা এক, বহু নহে। তাহার উপাধি মায়া এক। সুতরাং ঈশ্বর সাক্ষী চৈতন্যও এক। মায়া উপহিত ঈশ্বর সাক্ষী চৈতন্য অনাদি, কেননা তাহার উপাধি মায়া অনাদি। মায়াবিচ্ছিন্ন চৈতন্য পরমেশ্বর। মায়াকে বিশেষণ ধরিলে ঈশ্বরত্ব পাওয়া যায়, তাহাকে উপাধি ধরিলে সাক্ষীত্ব পাওয়া যায়। ঈশ্বরত্ব ও সাক্ষিত্বের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। কিন্তু ঈশ্বর ও সাক্ষী একই, কোনও ভেদ নাই।

জীবের প্রত্যক্ষ জীবসাক্ষী প্রত্যক্ষ। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর সাক্ষী প্রত্যক্ষ। জীব বহু বলিয়া জীব সাক্ষী প্রত্যক্ষ প্রতি জীবে ভিন্ন। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ এক।

ঈশ্বরত্ব ও ঈশ্বর সাক্ষিত্বে ভেদ থাকিলেও, একই চৈতন্য উভয়ত্র প্রকাশিত কিন্তু ঈশ্বর ও ঈশ্বর সাক্ষীর মধ্যে ভেদ নাই।

সাক্ষী দ্বিবিধ বলিয়া প্রত্যক্ষ ও দ্বিবিধ—জ্ঞেয়গত ও জ্ঞপ্তি (জ্ঞান) গত। জ্ঞেয় (বিষয়) গত প্রাতক্ষের সহিত যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহার সম্বন্ধ। কিন্তু জ্ঞপ্তিগত প্রত্যক্ষ হয় জ্ঞানের—যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের, জ্ঞানের বিষয়ের নহে। "পর্ব্বতঃ বহ্নিমান" এখানে বহ্নি প্রত্যক্ষ হয়না, কিন্তু বহ্নির আকার যে বৃত্তি, তাহা দ্বারা উপহিত চৈতন্যের প্রত্যক্ষ হয়।

উপরে প্রত্যক্ষের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা যথার্থ ও ভ্রান্ত উভয় প্রত্যক্ষেই থাকে। যথার্থ প্রত্যক্ষের বেলায় বিষয়টি অবাধিত হওয়া চাই।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকল সময়ে সত্য হয় না। কথনো কালো রজ্জু সর্পরূপে এবং শুক্তি রজতরূপে প্রত্যক্ষ হয়। এই ভ্রান্তির কারণ অবিদ্যা। সত্য রজতজ্ঞানে যে সকল পদার্থ চক্ষুর সংসর্গে আসিয়া রজতজ্ঞান উৎপাদন করে, ভ্রান্ত রজত জ্ঞানে সে সকল পদার্থ জ্ঞানোৎপাদনে সহায়তা করে না। নেত্ররোগ বিশিষ্ট লোকের দূষিত চক্ষুর সহিত সন্নিহিত শুক্তির সন্নিকর্ষ হইলে অন্তঃকরণে শুক্তির মতো চাকচিক্যময় বৃত্তি উৎপন্ন হয়। সেই বৃত্তিতে বিষয়-চৈতন্য (শুক্তিতে যে চৈতন্যের অধিষ্ঠান) প্রতিবিম্বিত হয়। তাহার পরে অন্তঃকরণে উদ্ভূত বৃত্তি বাহির হইলে বিষয় চৈতন্য, বৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্য এক হইয়া যায়। তাহার পর শুক্তিত্বরূপ অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। এই অবিদ্যা প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভিন্ন বিষয়-চৈতন্যে সংশ্লিষ্ট। চাকচিক্য প্রভৃতি সাদৃশ্য দেখিয়া (শুক্তিতে) রজতজ্ঞান উৎপন্ন হয়। নেত্ররোগ ইহার সহায়তা করে। এইরূপে এই অবিদ্যা রজতরূপ দ্রব্য ও রজতজ্ঞানের আভাসরূপে পরিণত হয় (বেদান্ত পরিভাষা)। শুক্তিত্ব প্রকারিকা অবিদ্যা (বিষয়ে অবস্থিত) চাকচিক্যাদি সাদৃশ্য সন্দর্শন দ্বারা সমুদ্বোধিত রজত সংস্কার দ্বারা রজত জ্ঞানের আভাসাকারে পরিণত হয়। ভ্রান্ত জ্ঞানে অন্তঃকরণের দ্বিবিধ পরিণাম হয়—ইদম্‌রূপ, (শুক্তি), এবং রজতরূপ। রজতরূপ স্মৃতির রূপ। তথন এই দুই রূপের (সত্য ও মিথ্যারূপের) মিলন হইতে ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। ভ্রান্তরূপের যে অস্তিত্ব নাই, তাহা বলা যায় না। তাহার অস্তিত্ব না থাকিলে ভ্রান্তিই হইত না। যাহাকে সত্য রজত বলা হয় শঙ্করের দর্শনে তাহাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু সত্য রজত ও মিথ্যা রজতের মধ্যে ভেদ এই যে মিথ্যা রজত সম্পূর্ণ বিষয়িগত (Subjective), অনুভবকর্ত্তার মনেই কেবল তাহার অস্তিত্ব, তাহা অন্যের অনুভবের বিষয় নহে।

উপাদনের সমান অস্তিত্ববিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তির নাম পরিণাম। দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দধির অস্তিত্ব দুগ্ধের অস্তিত্বের সমান। কার্য্য এখানে স্বীয় উপাদানের পরিণাম। কিন্তু যেখানে কার্য্যের অস্তিত্ব উপাদানের অস্তিত্বের সমান নহে, সেখানে কার্য্যের উৎপত্তির নাম বিবর্ত্ত। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। এখানে সর্প জ্ঞান বিবর্ত। অবিদ্যার দিক হইতে দেখিলে শুক্তিতে ব্যক্ত জ্ঞান পরিণাম (অবিদ্যার), কিন্তু চৈতন্যের দিক হইতে দেখিলে বিবর্ত্ত।

বেদান্তমতে প্রত্যভিজ্ঞাও প্রত্যক্ষ-জ্ঞান—প্রত্যক্ষের সহিত স্মৃতি-সংস্কার-জড়িত। প্রত্যভিজ্ঞায় প্রত্যভিজ্ঞাত বস্তুর অভিন্নতা ও জ্ঞাতার অভিন্নতা উভয়ই থাকে।

বাহ্যজগতের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান এবং স্বপ্নজ্ঞান ও শুক্তিতে রজত জ্ঞানের মতো ভ্রান্ত জ্ঞান—সকলই প্রত্যক্ষ

জ্ঞান। অভিজ্ঞতালব্ধ বাহ্য জগতের জ্ঞানের সহিত স্বাপ্নিক জ্ঞানের ভেদ এই যে—স্বাপ্নিক জ্ঞান অনভিব্যক্ত—স্বরূপ বলিয়া মায়ামাত্র। স্বপ্নে সৃষ্টির মধ্যে (স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু) পরমার্থের গন্ধও নাই। তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত নহে। পরমার্থ বস্তু ধর্ম্ম (সত্য বস্তুর ধর্ম্ম) স্বপ্নে প্রকাশপ্রাপ্ত হয় না। দেশ-কাল-নিমিত্ত-সম্পত্তি-ও-বাধা-রাহিত্যই পরমার্থ বস্তু ধর্ম্ম। এ সকল স্বপ্নে নাই। স্বপ্ন স্থানে রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ নাই, দেহের মধ্যে তাহার থাকিবে কোথায়? দেহ হইতে বাহির হইয়া জীব যে এই সকল দেখে তাহাও সম্ভবপর নহে। সুপ্ত জীব কি ক্ষণকাল মধ্যে শতযোজন দূরে গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে? আবার এমন স্বপ্নও আছে যাহাতে ফিরিয়া আসা দৃষ্ট হয় না। স্বপ্নে কালের বিরোধিতাও দেখা যায়। রাজনীতি স্বপ্ন-দর্শনের সময় দিবস-দর্শন হয়। আবার মুহূর্তমাত্র স্থায়ী স্বপ্নে শত শত বৎসর অতিবাহিত হইতেছে দেখা যায়। স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত, তখন রথাদি দর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয়ের অভাব, অথচ দর্শনশ্রবণাদি হয়। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় জাগ্রৎকালে এমন কি স্বপ্নকালেই বাধিত হয়। যাহা রথ ছিল দেখিতে দেখিতে তাহা মানুষে পরিবর্তিত হয়।

কিন্তু মায়িক হইলেও স্বপ্নে যে সত্যের লেশমাত্রও নাই, তাহা নহে। স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভ ও অশুভের-সূচক। স্বপ্নের কারণ জীবের সুকৃত-দুষ্কৃত (পাপ ও পুণ্য)।

বেদান্তমতে জগৎ মায়িক ও মিথ্যা। তাহা হইলে স্বপ্ন জ্ঞান ও জাগরিত অবস্থায় জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি? প্রাজ্ঞ আত্মাই স্বপ্নের নির্ম্মাণ কর্ত্তা, ইহা কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে। আবার অন্যত্র স্বপ্নকে জীবের ব্যাপারও বলা হইয়াছে। ইহা শ্রুতিতে আছে যে জীব জাগ্রৎ দেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজ বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় আশ্রিত বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বরূপ-চৈতন্যের দ্বারা স্বপ্নানুভব করেন। আবার এই জীবকেই শুদ্ধ ও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলেন, স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার কোনও ব্যাপার নাই, ইহা আমরা বলি না। তিনি সর্ব্বেশ্বর সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাদি সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায়ই; তাহা পারমার্থিক নহে। আকাশাদি সৃষ্টির ও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। যাবৎ না ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিতরূপে থাকে, কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত। এইমাত্র প্রভেদ।

কিন্তু বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীবও তেমনি পরমেশ্বরের অংশ। যেমন দাহ ও প্রকাশ শক্তি অগ্নিও বিস্ফুলিঙ্গ উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তিও জীব ঈশ্বরের সমান। সুতরাং ঐশ্বর্য্য বলে জীবের সৃষ্টিসংকল্প হয় এবং সেই সংকল্পবান জীব স্বপ্নে রথাদির সৃষ্টি করে, ইহা বলাতে আপত্তি কি? উত্তরে শঙ্কর বলেন—অংশাদি ভাব থাকিলেও জীবও ঈশ্বরের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। জীব অসত্য সংকল্প, ঈশ্বর সত্য সংকল্প। জীবের ঈশ্বরত্ব অবিদ্যাকর্ত্তৃক তিরোহিত, আচ্ছাদিত, প্রতিবদ্ধ বা অনভিব্যক্ত, আবরণ বিধ্বস্ত হইলে তাহা প্রকাশিত হয়, তাহার পূর্ব্বে হয় না। দেহের সহিত সম্বন্ধই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোধানের কারণ। এইজন্য জীব স্বপ্নে রথাদি সৃষ্টি করিতে পারে না। স্বাপ্নিক সৃষ্টি যদি সংকল্প পূর্ব্বিকা হইত, তাহা হইলে কেহই অনিষ্ট স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না।





পাত্র চাই—এম-এ পাস। হেডমিস্ট্রেস। সাধারণ ফর্সা। দোহারা। গৃহকর্ম্ম-নিপুণা। পশ্চিমবঙ্গীয়া ভঙ্গ ভরদ্বাজ পাত্রীর জন্য রাঢ়ী পাত্র। যৌতুকাদি দিতে অক্ষম। বক্স নং ৫৭২০ ইত্যাদি।

খবরের কাগজের পাতাটায় চোখ বুলিয়ে আলগোছে রেখে দিল মালতী। দরজার দিকে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে নিল বাবা আসছে কিনা, না, এধারে নেই কেউ।

মুখটা ওর ম্লান হয়ে গেল। রোগা হাতদুটো একটু বোধহয় কাঁপল। ঠোঁট দুটিও। কি দরকার ছিল আবার বিজ্ঞাপন দেবার। অবুঝ বাবাকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। এই তো' মাসদুয়েক আগেও একটি ছেলে এসেছিল তার বন্ধুকে নিয়ে দেখতে। শুনেছিল, ছেলেটি ভাল চাকরী করে। এম-এ-পাস।

পাংশু মুখে একটু পাউডার বোলাতে হোল। চুলও বাঁধতে হোল। ফিকে নীল রঙের শাড়ীখানা পরে হাত দুখানা একটু ঢেকে তাদের সামনে বসেছিল মালতী। শাড়ীটা একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বসেছিল রোগা শরীরটা ঢাকতে।

কিন্তু কিই বা হোল?

মিছিমিছি কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হোল।

—কি বই পড়তে ভালবাসেন ?

—সব রকম।

—কি রঙের শাড়ী ভালবাসেন ?—প্রশ্ন করেছিল ছেলেটি একটু হেসে।

চোখ দুটো ছেলেটির দিকে মেলে ধরে একটু থেমে ও বলেছিল—নীল।

ইচ্ছে হোল প্রশ্ন করে, আপনি কি রঙের সার্ট পরতে ভালবাসেন ? কিন্তু প্রশ্ন করেনি।

ছেলেটি দেখতে বেশ। যদি বিয়ে হয়ই, তাতে বাদ সেধে কি দরকার !

কিন্তু তাও হোল না।

কিছুদিন পরে শুনল, তারা চিঠি দিয়েছে, পছন্দ হয়নি। বড় রোগা।

নিজে কি একেবারে মোটা গোবিন্দ ! শরীরটা রাগে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। রোগা ঠাণ্ডা হাতে চোখদুটো একবার মুছে নিয়ে গালদুটোয় আর একবার পাউডার বুলিয়ে স্কুলের পথে বেরোয় মালতী।

যেতে যেতে মোড়টায় দুচারটে লোকের জটলা দেখে তাকায়,একটি ফুটফটে ছোট্ট ছেলে—মরা। ন্যাকড়ায় মোড়া ছিল। বোধহয় কুকুরে দাঁত দিয়ে টেনে ন্যাকড়া খুলে দিয়েছে।

গা রী রী করে ওঠে। চোখ ফেরায় মালতী।

ঘৃণায় পেটের ভেতরটা মোচড়াতে থাকে। ইচ্ছে হয় পুরুষগুলোকে ধরে চাবকাতে। হয়ত কোন একটি ছেলেমানুষ মেয়ের এই সর্বনাশ করে সরে পড়েছে কোন একটি ছেলে। পুরুষ জাতটার ওপর এক অদম্য আক্রোশ ওর গলা পর্য্যন্ত ফেনিয়ে ওঠে।

হাতের ছোট থলেটা জোরে দোলাতে দোলাতে একটু জোরে জোরেই হাঁটে মালতী। স্কুলে আজ অনেক কাজ। কমিটি মিটিং আছে ছুটির পরে। সেক্রেটারীর বাড়ীতে একবার যেতে হবে দুপুরে। আর ওই মেয়েটাকে আজ কঠিন শাস্তি দিতে হবে। মিছে কথা বলে বাড়ীতে যাবার নাম করে ছুটি নিয়ে একটা ছেলের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ায়। স্বচক্ষে দেখেছেন রেবা দেবী। রিপোর্ট করেছেন মালতীর কাছে। খুব কঠিন শাস্তি দিতে হবে ওকে। ছেলেটাকে রেবা দেবী চেনেন। ও পাড়ার ছেলে। ছেলেটাকে ধরে গোটাকতক চড় বসিয়ে—।

তা কি করে হয় ! কোথাকার কোন ছেলে, তাকে আর কি করে কিছু করা যায় !

—কিছু মনে করবেন না, আপনি কি মালতী মুখার্জি ? ওই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ?

ভ্রূদুটো কুঁচকে তাকায় মালতী। থমকে দাঁড়ায়। চিনতে একটু বিলম্ব হয় না লোকটিকে। মেমসায়েবের ছবিছাপা বুশসার্ট পরে, একটা ঢলঢলে ট্রাউজার পরে, চটি পায়ে সেই লোকটা। গাল-ভাঙা সরু গোঁপের বাহার আছে। কি বিশ্রী আর কি জঘন্য রুচি ! দুটো চড় বসিয়ে দিলে হয় ! যাক।

ও গম্ভীর স্বরে বলে—আপনার কি দরকার ? আপনি কে ?

লোকটা ভাঙা দাঁত বার করে তেমনি হাসে—মানে, আমার বোনকে আপনার স্কুলে ভর্তি করতে চাই।

মালতী তেমনি তিক্ত স্বরে বলে—তা হলে আমার অপিস ঘরে আসবেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক কথা বলে না এমন করে।

বলে আর অপেক্ষা না করে এগিয়ে যায় মালতী। লোকটার দিকে আর তাকায়ও না। একটু জোরেই পা চালায়।

লোকটাকে মুখের ওপর অভদ্র ভাবে বলাটা কি ঠিক হোল ? মনটা একটু কেমন কেমন লাগে। তা হোক। ও সব রুচির লোককে একটু কড়া করে বলাই ভাল। নরম দেখলে হয়ত পেয়ে বসবে।

—শুনছেন ?

ফিরে তাকায় মালতী। অবাক হয়ে দেখে সেই লোকটাই পেছন পেছন এসেছে।

ভ্রূদুটো আপনা-আপনিই কুঁচকে ওঠে ওর।

হাতদুটো জোড় করে বলে লোকটা—কিছু অভদ্রতা করে থাকলে মাপ করবেন।

মাপ চাইতে পেছন পেছন এতটা আসা ? লোকটার কি মাথায় ছিটু আছে ? আপাদ মস্তক তাকায় মালতী।

—নমস্কার। বলে লোকটা ফুটপাতের পাশে একটা ছোট গাড়ীতে গিয়ে বসে স্টার্ট দেয়। তাহলে গাড়ীটা এখানে রেখে প্রথম কথা বলতে গিয়েছিল, না গাড়ী তারই পেছন পেছন এলো ? কিন্তু, লোকটার গাড়ী

আছে এবং নিজের। এই কথাটা ভাবতেই একটু আশ্চর্য লাগছে। চুলোয় যাক। যত বাজে ভাবনা।

স্কুলের দরজায় এসে গেছে মালতী। নিজের ঘরে এসে বসে পাখাটা খুলে দিল। চেয়ারে বসে রইল চুপ করে কিছুক্ষণ।

শরীরটার ভেতরে তখনও কেমন করছে। বমি বমি লাগছে। ন্যাকড়ায় বাঁধা বাচ্চা ছেলেটার কথা মনে পড়ছে তখনও। পাতলা ঠোঁটদুটো ওর কাঁপছে একটু একটু।

একটু সময় চোখ বুঁজে থেকে নিজেকে ঠিক করবার চেষ্টা করল ও। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এল শরীর।

কেরাণী এল। তারপর রেবাদেবী, অপর্ণা, সুলেখা।

অপর্ণা সুলেখার হাত ধরে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল মালতীর কাছে।

—ও ছুটি চাইছে।

মালতী তাকায়।

খিল খিল করে হেসে ওঠে অপর্ণা। ওকি অসভ্যের মত হাসি।

—তোমার কি হোল অপর্ণা?

—কিছু নয়। সুলেখাকে জিজ্ঞেস করুন।

সুলেখা মুখটা নীচু করে একটু মিষ্টি হাসে।

—কি ব্যাপার সুলেখা, তোমার ছুটির কিসের দরকার।

অপর্ণার হাসি কিছুতেই থামে না। হাসতে হাসতে বলে—ওর যে বিয়ে।

বিয়ে! মালতীর মুখটা মুহূর্তে ম্লান হয়ে ওঠে।

মুখে হাসি টেনে বলে—তাই নাকি! এত খুব আনন্দের কথা।

—শুধু কি তাই? বলব নাকি? সুলেখার কোমরে চিমটি কাটে অপর্ণা।

সুলেখা রাগবার ভাণ করে বলে—আঃ! কি হচ্ছে?

মালতী গম্ভীর হয়ে শুধু জিজ্ঞেস করে—কত দিন ছুটি লাগবে?

—তা প্রায় একমাস।—মুখটা নীচু করেই বলে সুলেখা আস্তে।

—একমাস।—ঠোঁটদুটো একটু বড় বড় করে বলে মালতী—তোমার ক্লাসগুলো কাকে দিয়ে করাব অতদিন! আচ্ছা দেখি কি করা যায়!

সুলেখা একটু যেন ভয় পেয়ে তাকায়—কিন্তু।

—দেখি সেক্রেটারীকে বলে দেখি।

গম্ভীর মুখে মালতী চোখটা নীচু করে একটা খাতা খুলে সামনে রাখে।

সুলেখা, অপর্ণা—ওরা নাম সই করে চলে যায় একে একে।

মালতীর কালো মুখখানা পোড়া ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে ওঠে। বিয়ে! মিস্ট্রেসের আবার বিয়ে! সে জানে কোন একটা ছেলে হয়ত সর্বনাশ করতে চাইছে সুলেখার।

পুরুষ জাতকে আবার বিশ্বাস!

এককাজ করলে হয়। সুলেখার ছুটিটা না দিলে হয়ত ওর বিয়েটা বন্ধ হয়ে যাবে।

ঠিক। ছুটি সুলেখাকে দেয়া যাবে না।

ইস্পাত—কঠিন বেগুনী আভা দেখা যায় ওর মুখে।

ছুটি সুলেখাকে দেয়া যাবে না।

কথাকটি মনে মনে আবৃত্তি করে একটু বুঝি তৃপ্তি পায় মালতী—

দিন কয়েক পরে একটা কার্ড দেয় দরওয়ান। একজন লোক দেখা করতে চাইছে। ভিজিটিং রুমে অপেক্ষা করছে।

কার্ডটায় চোখ বুলোয় মালতী। সুধীর চক্রবর্তী।

কে লোকটা? তাকে ডাকবার কারণ কি?

ওঠে মালতী। দেখা করতে যায় বাইরের দিকে একটা ঘরে।

লোকটা ভাঙা দাঁত বার করে হেসে হাতজোড় করে নমস্কার করে। সঙ্গে সঙ্গে বিষিয়ে ওঠে মালতীর মনটা। সেই লোকটা? ঘাড়ে গলায় পাউডার ঘসা। তোবড়ান গাল। একটা পাজামা আর গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী পরণে।

—কি চাই আপনার?

—একটু পরামর্শ ছিল আপনার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে।—রীতিমত অবাক হয় মালতী।

হেসে বলে লোকটা—হ্যাঁ। মানে আমার বোনকে ভর্তি করব, তা কোন কেলাসে করা যায়।

মালতী অত্যন্ত বিরক্ত হয়।

লোকটা বলে—পাড়ার ইস্কুল। এখানে ভর্তি হওয়াই ল। নয়ত আবার কোথা থেকে কি ইয়ে হয়ে যাবে। ছাড়া আপনিও ত পাড়ারই মেয়ে। আমাদের দেখতাই হয়ে ইস্কুলে ঢুকলেন।

লোকটার আশ্চর্য স্পর্ধা ত'। দেখতাই-শোনতাই কি বাজে বকছে।

—তাই বলছিলুম, আপনার হাতেই বোনটাকে দিই। াপনাকে ত কদ্দিন থেকেই দেখছি, বলতে গেলে নাশুনো।

মালতী গম্ভীর হয়ে গেল—এত কথার দরকার নেই। াপনার বোনকে এনেছেন?

—কথা আমি একটু বেশী বলি। মাপ করবেন। াচ্ছা আপনি বাড়ীতে পড়াতে পারেন না?

—না।

—মানে টাকা যা নেন, তার চেয়ে কিছু বেশী দলেও—

—না।

—একশ টাকা যদি দিই।—লোকটা একটা গোলাপী তোয় বাঁধা বিড়ি ধরায়।

মালতীর গায়ের ভেতরটা রী রী করে ওঠে।

—না।—বলে চলে যেতে চায়।

—শুনুন।—বিড়িটা ফেলে দেয় লোকটা—দুশ' টাকা দি দিই।

মালতী ভাল করে তাকায় লোকটার দিকে। লোকটার কি মাথা খারাপ? না, বাপের পয়সায় উড়ছে?

মালতী আবার কঠিন কণ্ঠে বলে—না।

বলে চলে যায় ঘর থেকে।

কেন যে বিজ্ঞাপন দিলেন বাবা! বাবার ওপরেও রাগ হয় মালতীর। আজ আবার আসবে দুটি লোক দেখতে। তাকেই দেখতে আসবে', তার কি দেখবার কিছু নেই? তার কি বলবার কিছু নেই? এত বড় অন্যায়টা কেন সে ও মাথা নীচু করে মেনে নিচ্ছে ও নিজেই বুঝতে পারে না।

তবু আবার মুখে আর হাতে একটু পাউডার বোলাতে হয়। ফিকে নীল রঙের তাঁতের শাড়ীখানা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পরতে হয়। লোক দুটির সামনে এসে রোগা হাত দুটি যতটা সম্ভব ঢেকে বসতে হয়।

একবার তাকাবার লোভও সামলাতে পারে না।

ছেলেটি বেশ, ফরসা, একটু খাট, সুন্দর চেহারা। মস্ত চাকরী করে। চোখ দুটি বেশ ডাগর ডাগর, আবার তাকাতে ইচ্ছে হয়।

—বাংলায় কার লেখা আপনার সব চেয়ে ভাললাগে?

প্রশ্নটি বেশ। ও আস্তে আস্তে বলে—রবিঠাকুরের।

—আপনি রাজনীতি ভালবাসেন?

এ প্রশ্নটাও বেশ।

উত্তর দেয়—খুব বেশী নয়।

এমনি তরো দু'চারটে প্রশ্ন করে ওঠে ওরা।

মালতীও ঘরে চলে যায়। মায়ের কাছে গিয়ে এক গেলাস জল খায়। তারপর বারান্দার দিকে আসে। হয়ত বা ছেলেটিকে আর একবার দেখতে।

ওর কানে আসে কয়েকটি কথা যেন কয়েকটি জলন্ত আগুনের টুকরো।

—একেবারে ঝাঁটার কাঠি! এর চেয়ে স্কেলিটন্ বিয়ে করলেই হয়।—ছেলেটির গলা। বেরুতে বেরুতে বোধহয় বন্ধুকে বলছিল।

মালতীর বুকের ভেতরে আগুনের টুকরোর মত কথাগুলো অসম্ভব জ্বালা ধরায়। কান দুটো গরম হয়ে ওঠে চোখ দুটো জ্বলতে ইচ্ছে হয়।

চৌকির ওপর বসে পড়ে কপালটা ধরে।

মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আজকাল কথা বড় কম বলে মালতী, কিই বা বলবে? কথা বলতে ভালই লাগে না। কাজেই ভাল, অসম্ভব গম্ভীর হয়ে পড়েছে মালতী।

সেদিন অপিস ঘরে বসেছিল। ক্লাস ছিল না।

সুলেখা ঘরে ঢুকল। সামনের চেয়ারটায় বসল মালতী কথা বলল না। একবার তাকিয়ে আবার সামনে একটা বইয়ে মন দিল।

—মালতীদি?

বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, বলো।

—আমার ছুটির কি করলেন ?

—কিসের ছুটি ? বিয়ের ?

সুলেখা সলজ্জ মুখে হাসল।

গা জ্বলে গেল মালতীর। বইয়ে মুখ রেখেই বলল—ছুটি হবে না। এখন নতুন ক্লাস আরম্ভ হয়েছে। ছুটি দেয়া যাবে না।

সুলেখার দিকে তাকাল না মালতী। ও আন্দাজ করতে পারছিল সুলেখার মুখটা নিশ্চয়ই খুব কালো হয়ে উঠেছে।

শুধু কালো নয়। ঘামছিল সুলেখা।

—বিয়ে যে সব ঠিক।

—বিয়ে পিছিয়ে দাও। অম্লান মুখে বলে মালতী।

—সেক্রেটারীকে বলেছিলেন ? বলে সুলেখা।

একটু কঠিন স্বরে বলে মালতী, জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন মনে করিনি। ছুটি দিতে আমি পারব না।

—ছুটি আপনাকে দিতেই হবে। সুলেখার গলাটা কাঁপছে।

তাকায় মালতী, সুলেখার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। চোখ-দুটো জলে ভরে আসছে বোধহয় রাগে।

মালতীও আরও কঠিন হয়—বাজে তর্ক কোর না সুলেখা।

একটু তিক্ত হাসি দেখা যায় সুলেখার ঠোঁটে, আপনার বিয়েতেও কি ছুটি নেবেন না ? বিয়েতে ছুটি দিতেই বুঝি আপনার আপত্তি ?

সুলেখার কথাগুলো শুনে প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে যায় মালতী। সুলেখা উঠে দাঁড়িয়েছে সোজা হয়ে।

মালতীর হাত দুটো কাঁপে। তাকাতে পারে না সুলেখার মুখের দিকে! ওর দগদগে ক্ষতটা কি দেখতে পেয়েছে সুলেখা ?

—মালতী কি একটা বলবার চেষ্টা করে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

—ছুটি আমার চাই। আমি চললুম।

সুলেখা চলে যায়।

মালতী মুখটা নীচু করেই বসে থাকে অনেকক্ষণ। শরীরটা অবশ লাগে। একটুও নড়তে ইচ্ছে হয় না যেন।

আস্তে আস্তে সুলেখার দরখাস্তটা বার করে বার বার দেখতে থাকে। দরখাস্তের লেখাগুলো ঝাঁপসা দেখায়।

কলমটা নিয়ে একমাস ছুটি মঞ্জুর করে দেয় মালতী। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বেয়ারাকে দিয়ে বলে, সুলেখা দিদিমণিকে দেখিয়ে আমার টেবিলে রেখে দিস। অপর্ণা দিদিমণিকে বলিস, আমি বাড়ী চললুম। শরীরটা ভাল নেই।

ধীরে ধীরে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে মালতী।

দিন কতক পরে স্কুল থেকে ফিরে শোনে—আজ আবার একজন ওকে দেখতে আসবে। কথাটা বাবাই জানায়।

মালতী আপত্তি করে—থাক বাবা, আজ শরীরটে আমার ভাল নেই।

ওর মা বলে—তা হোক। দুমিনিট বই ত না। একটু বসবি, দুটো কথা বলবি।

—থাক না মা। আর ভাল লাগে না।

—ও কথা বলতে নেই। বিয়ের নির্বন্ধ কখন যে আসে কেউ বলতে পারে ?

অগত্যা মালতীকে উঠতে হয়।

ছেলেটি নাকি এসে বসে আছে কিছুক্ষণ।

নিতান্ত বিরক্ত হয়ে মালতী একটুও সাজে না। মুখে একটু পাউডার বোলায় না। ঠিক করে নেয়, আজ ও নিজেও কয়েকটা কড়া প্রশ্ন করবে ছেলেকে। যেমন ছিল, তেমনি গিয়ে ঘরে ঢোকে!

—নমস্কার।

গলাটা শুনে চমকে ওঠে মালতী। তাকিয়ে দেখে সেই লোকটা। সমস্ত শরীর জ্বলে ওঠে ওর। লোকটা কতদিন জ্বালিয়েছে ওকে রাস্তায়। স্কুলে বোনকে ভর্তি করবে বলে, কিন্তু বোনকে ত একদিনও আনেনি ?

ওর বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ? জলখাবার আনতে।

মালতী এই ফাঁকে একটু বাঁকা হেসে বলে—বোনকে ভর্তি করতে আর এলেন না ত ?

লোকটা হাত জোড় করে বলে—ক্ষমা চাইছি। মিছে কথা বলেছিলুম। বোন আমার নেই। আমি বাপ-মায়ের একটি মাত্র ছেলে। অবিশ্যি বাপ-মা নেই। মানে কেউই নেই। তাই পড়াশুনো কিছুই হোল না।

—এখানে কি আবার আমার সঙ্গে ঠাট্টা করতে এসেছেন ?

ভ্রূ-দুটো ধনুকের মত বাঁকিয়ে মালতী বলে।

লোকটার মুখটা শুকিয়ে যায়, বিশ্বাস করুন আজ যে উদ্দেশ্যে এসেছি, সেটার চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই। ঠাট্টা আপনার সঙ্গে কোনদিনই করিনি। তবে কি জানেন, মুখ্যু মানুষ ত। তা ছাড়া বুদ্ধিও হয়ত আমার কম, তাই এতদিন বহু চেষ্টা করেও আমার কথাটা ঠিকমত আপনাকে বোঝাতে পারিনি।

—কি বোঝাতে চান ?

—এ বিশেষ কিছু নয়। সোজাসুজিই বলি। চায়ের দালালী করি আমি। তাতে পয়সা বেশ ভালই পাই। আটশ থেকে বারশ টাকা মাসে রোজগার করি। বাবার একখানা বাড়ী ছিল, সেখানেই থাকি। গাড়ী একটা আছে। গুণ কিছু নেই। মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া ত' জানি না।

লোকটা ম্লান হেসে আবার বলে—জানি, আপনার এখানে এ ভাবে আসা আমার অন্যায় হয়েছে। আপনি এম-এ পাশ। কত পড়েছেন! আমার পক্ষে আপনার সম্বন্ধে কোন আশা করা বোধহয় খুবই অন্যায়। অন্যায় নয় ?

মালতীর চোখ দুটো আস্তে আস্তে যেন কোমল হয়ে আসে। লোকটির কথাগুলো বড় করুণ শোনায়, বাপ-মা নেই। একা থাকে। অত টাকা রোজগার করে।

ভাল করে তাকায় লোকটার দিকে। মুখ নীচু করে বসে আছে লোকটা।

বলে আস্তে আস্তে—আমারই অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা উঠি।

উঠতে চায় লোকটি।

মালতী নরম স্বরে বলে, খুব আস্তে—না। অন্যায় আর কি! বসুন। চা আনতে গেছে। আমি বরং দেখি আপনার চা হোল কিনা।

আস্তে আস্তে উঠে বারান্দার দিকে এগোয় মালতী, সব অন্যায় স্বীকার করে নিয়েছে ও। সব।

সৃষ্টি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

প্রত্যক্ষ যারে দেখি বা জানি তাকে মেনে নি। কিন্তু স্থির হ'য়ে চিন্তা করলে বুঝি নিত্য-জানা সকল জীব সব পদার্থ অনিত্য। মানুষের দেহ পরিণত হ'চ্চে প্রতি মুহূর্ত্তে। সূর্য্যের পরিণতি হ'চ্চে সদাই। পৃথিবী অশেষ পরিবর্ত্তনের সাথে প্রতি কলাকাষ্ঠায় ঘুরছে।

কিন্তু বুঝি এ সদা পরিবর্ত্তনের মাঝে এমন সত্তা বিদ্যমান—যার রূপের এরা অশাশ্বত খেলা। আরও বিস্মিত হই কোনো একটি জীব বা মাত্র একটি পদার্থের গঠন এবং আচরণে মনোনিবেশ করলে। মানুষের দেহ আজ ব্যবচ্ছিত হ'য়েছে সূক্ষ্ম ভাবে। বিচিত্র এ শরীর। রক্ত মাংস বসা অস্থি প্রত্যেকের হ'চ্চে পরিণতি। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, জঠর, হৃদ-পিণ্ড ও স্নায়ু প্রত্যেকে বিভিন্ন রূপে কর্ত্তব্য-রত। কিন্তু তাদের সহযোগিতা ও সামঞ্জস্য কী বিচিত্র। সবাই মিলে, বিভিন্ন ভূমিকায় আত্মসমর্পণ ক'রে, একটি জীবনের অভিনয়ে ব্যাপৃত। নীরব অজ্ঞ কর্ম্মী এরা। মন জানে কী হচ্চে অন্তরে, বাহিরে বুদ্ধি তাদের সন্নিবেশ করে। প্রত্যেকের অহঙ্কার জানে ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি তার নিজস্ব। এরা পরিবর্ত্তনশীল, পরিণাম অনুসন্ধানী। কিন্তু যতদিন জীবন থাকে—আমিত্ব জানে সে জীবন•তার—পরিণাম তার দেহের, তার মনের, তার বুদ্ধির। প্রত্যেকের মনের অহঙ্কার জাগায় পৃথকত্বের চেতনা। আরও বিচিত্র সেই জ্ঞান। যারা পরিশ্রমী, অথচ পরস্পরের সহযোগী—তারা সবাই জড়, বুদ্ধিহীন, বিবেকহীন, অথচ কর্ম্মী। শেষ বিশ্লেষণে স্থির হয়েছে পরমাণুর রূপ! বিশ্বের স্রষ্টা জড়। জড়ে জড়ে যোগাযোগ কিন্তু সহযোগিতার ফলে জন্মেছে চক্ষু ও কর্ণ, জিহ্বা ও নাসিকা, ত্বক এবং রক্ত-বিন্দু। কিন্তু একটা দেহে তারা সহযোগী সহ-কর্ম্মী, পরিশ্রমী। এরা প্রত্যেকে অজ্ঞানী—কিন্তু প্রসব করে জ্ঞান। অজ্ঞের সাথে অজ্ঞের বিশিষ্টভাবে মিলন হয়ে জন্মেছে জ্ঞানী প্রাণী। কেমন করে হ'ল, সে কথার শেষ সিদ্ধান্ত করতে পারেনি বিজ্ঞান। মাত্র এক দেহেই কি এই বহু কর্ম্মীর কার্য্য নিবদ্ধ। এরা রবি হতে সংগ্রহ করে তেজ, সকল পদার্থ হতে সঞ্চয় করে রূপ, বায়ু হ'তে লাভ করে গন্ধ, কত পদার্থ হ'তে মনের গোচরীভূত করে রস। আবার সেই বাহিরের জড় পদার্থদের পরস্পর সহযোগিতা, কর্ম্মের সামঞ্জস্য এবং বিধি-নিয়ম অপূর্ব্ব। জলে পড়ে রবিকর, জল হয় বাষ্প। সে একত্র হয়,

বর্ষণ করে আবার জল, ভূমি হয় উর্ব্বর, শস্য জন্মে, জড় হাত তাকে বাড়ায়, কাটে ছাঁটে। সে অন্ন যায় অজ্ঞ জঠরে, দেহ হয় পুষ্ট, মন হয় তুষ্ট, বুদ্ধি হয় সক্রিয়—অহঙ্কার বোঝে এরা আমার কল্যাণরত। আবার একদিন জড় হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ করে কাজ। অহঙ্কারেরও হয় শেষ। দেহের জড় অংশ জোটে অন্য জড়ের সাথে—ব্যস্ত হয় ভিন্ন অভিনয়ে।

এ লীলাই জগত। অথচ প্রত্যেক সজীব আমির কাছে জগতের অতি ক্ষুদ্র টুকরা ব্যক্ত। বাকী অব্যক্ত অনন্তের অংশ। ব্যক্তের সন্ধান দেয় জীবকে জড় ইন্দ্রিয়, অব্যক্তের ধারণা আনে তার প্রাণে বুদ্ধি। সুরের সে কটা মাত্র সপ্তক গুণতে পায়? তার সঙ্গে স্থানেরও বোধ আসে। জানে কত দূরের শব্দ তার কানে প্রবেশ করে সহজে। আজ সে বোঝে দূর দুরান্তের ধ্বনি নিজ ছন্দ :নিয়ে তার কর্ণে প্রবেশ করতে পারে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহচর্য্যে। একস্থলে বসে আজ মানুষ যন্ত্রের পটে দেখতে পায় দূরের দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে টেলিভিসনের সাহায্যে। জড়ের বিধিবদ্ধ ক্রিয়া বিস্ময় জাগায় প্রাণে। বুদ্ধি সদাই রত জড় প্রকৃতির রহস্য অনুসন্ধানে কিন্তু এ সব শক্তির সন্ধানেও ব্যক্ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রহস্য বিশ্বের।

এই সামঞ্জস্য, সহযোগ, সংশ্লেষণ ঘটায় •কে? কেনই বা এ আয়োজন। "কেন"র কোনও উত্তর নাই। কিন্তু এই সৃষ্টির মূলে এক স্রষ্টা আছে—জ্ঞানের এ প্রকৃতি-সুলভ সিদ্ধান্ত। কিন্তু যে সিদ্ধান্ত অনুমান-সাপেক্ষ, তার রূপ বহু। পৃথিবীতে চিরকাল বিভিন্ন মানুষ শুনিয়েছে বিভিন্ন মত মানুষকে।

প্রত্যেক মহাপুরুষের ভক্ত আছে। এ-বিষয়ে বিজ্ঞানের মত বিভিন্ন। প্রত্যেকের ভক্ত আছে। চার্ব্বাককে যে মানে সে মানে তাঁর বাণী।

তাই যে ভক্ত বিশ্বাস করে অবতার শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং, যাঁর বিশ্বাস শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাঁর বাণী, স্বভাবতঃ আগ্রহ জাগে তার চিত্তে এই অপরূপ বিশ্বের সৃষ্টি সম্বন্ধে গীতার কথা শুনতে। শ্রোতা এবং বক্তার জ্ঞানের পার্থক্যও বিশ্ব-বিখ্যাত। জগতের ইহাও এক লীলা। তাই আমরা শুনি ব্যাখ্যা পরস্পর বিরোধী একই তত্ত্বের।

সৃষ্টি সম্বন্ধে গীতার কথা আমাদের মত জীবের প্রাণে কি চিত্র আনে? এ সম্বন্ধে ভগবানের কথাগুলির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা হবেনা অনর্থক।

তিনি বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দেবার সময় বলেছিলেন—সকল ভূত আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং আবার তার লোপ হয়। সে ব্যক্ত মধ্য। অর্থাৎ সে যতদিন জীবন ধারণ করে ততদিন সে ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর। তাকে অন্যে দেখে, তার কথা শোনে, তাকে স্পর্শ করতে পারে। কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়-গোচর অবস্থাটুকুই মাত্র তার জীবন নয়। ব্যক্ত হবার পূর্ব্বে সে ছিল। আবার মরণের পরেও সে থাকবে। ব্যক্তমধ্য শব্দের এই সঙ্কেত। সৃষ্ট জীবের এটি জীবন-সহস্য। কে গড়লে এমন জীবন?

এ বাণীতে আমরা লাভ করি জ্ঞান—যে এ জীবনের পূর্ব্বেও আমরা ছিলাম পরেও বিদ্যমান থাকব। পদার্থ-বাদী, চার্ব্বাক-বাদী প্রভৃতি যাঁরা বলেন—পরজন্ম নাই, তাঁদের মতে আস্থাস্থাপন করা অকর্ত্তব্য তাদের যারা শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন জগদ্‌গুরুরূপে। জীবন বুঝি রূপ ও রূপান্তর। যে শাশ্বত পদার্থকে ঘিরে জগতে যাতায়াত করে জীব। সে আত্মা। সে অবিনশ্বর পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রতি জীবদেহে। দেহ বসন—পরিবর্ত্তনশীল। তেমন জ্ঞানী জীব ও অজ্ঞান অথচ সক্রিয় পদার্থের সৃষ্টির সঙ্কেত কী শ্রীমদ্ভগবতদ্গীতায়?

আপনাকে অবতার-রূপে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। বলা বাহুল্য সে সৃষ্টি প্রকরণ হতে বিশ্ব-সৃষ্টির তত্ত্ব লাভ করা যায়। অবতরণের সৃষ্টি—একটি মনুষ্য-দেহের সৃষ্টি। কিন্তু এ কথাও তিনি বলেছেন যে তাঁর দিব্য জন্ম এবং দিব্য কর্ম্মের রহস্য যে স্পষ্ট বোঝে সে দেহত্যাগের পর আর জন্ম গ্রহণ করে না, তাঁর সাথেই মিলিত হয়। সে জন্ম তত্ত্ব সংক্ষেপে কী?

তিনি অজ—জন্মরহিত। অর্থাৎ পরমেশ্বর অজ। তিনি অব্যয়াত্মা —পরমাত্মা—অবিনশ্বর। তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল সৃষ্ট দেবশক্তি, চেতনও অচেতন সৃষ্টির তিনি প্রভু। এ কথায় আমরা সমগ্র সৃষ্টির তত্ত্ব পেলাম না। তিনি অবতাররূপে অবতরণ করেন—সৃষ্টির যুগে যুগে, ধর্ম্ম সংস্থাপন প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনে। সে যুগে মানুষ উৎপন্ন হয়েছে, তাদের বিশেষ ধর্ম্মপথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে,মানুষের মাঝে ত্রিগুণের কর্ম্মবশতঃ সাধু ও দুষ্ট লোক সৃষ্টি হয়েছে—এমন কি ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য-পথ নির্ণীত হলেও আবার সে পথ পরিহার করতে আরম্ভ করেছে জীব। সুতরাং অবতার সৃষ্টির কথা সাধারণ বিশ্ব-সৃষ্টির কথা নয়।

কিন্তু তা না হলেও তাঁর মনুষ্য-রূপে ব্যষ্টি সৃষ্টি হতে কী মূল তত্ত্ব পাওয়া যায় না? অবশ্য যায়। তিনি বল্লেন—নিজের প্রকৃতিকে স্বীকার ক'রে নিজ মায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করি।

তা'হলে প্রকৃতি এবং মায়া জীব সৃষ্টির প্রকরণ। কারণ তিনি মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হবার সন্ধান দান করছেন, এখানে পাই এক বিশেষ তত্ত্ব—সৃষ্টির কারণ তিনি। গড়েন প্রকৃতি বা মায়ার মাধ্যমে। বলেছেন— প্রকৃতিং স্বাম্—নিজের প্রকৃতি এবং আত্মমায়য়া—নিজের মায়ায়।*

সৃষ্টি তাঁরই স্বভাব। সে প্রকৃতি তাঁর। বাহিরের একটা শক্তি নয় এবং তিনিও নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা নন। সৃজন করেন তিনি স্বয়ং। সকল শক্তি তাঁরই শক্তি। তিনিই সক্রিয়—ক্রিয়ার উপকরণ প্রকৃতি।

এই পুণ্যভূমিতে সাংখ্য দর্শনের উৎপত্তি হয়েছিল। সাংখ্যশাস্ত্রের মতে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে সমস্ত শক্তি নিহিত। সে শক্তির ক্রিয়া জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও রূপের লয়। পুরুষ মাত্র দ্রষ্টা। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ—বিশ্বসৃষ্টি। প্রকৃতি—অনাদি, অনন্ত অবিনশ্বর তেমনি অনাদি অনন্ত, অবিনশ্বর পুরুষ। উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি। মূ প্রকৃতি—অক্ষর। প্রকৃতি হতে উৎপন্ন সকল পদার্থ ক্ষর। পুরুষ ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি ও মায়া হতে বিশ্ব-বিধাতার পৃথকত্ব স্বীকার করলেন

* গীতা—৪।৬ ইত্যাদি

তিনি শিক্ষা দিলেন যে প্রকৃতি এবং মায়া—তাঁরই নিজের এক ভাব। সেই ভাবের দ্বারা তিনি অবতার-রূপী নরদেহধারী একজনকে সৃষ্টি করেন।

পরে তিনি বুঝিয়েছেন সৃষ্টি প্রকরণ ও প্রকৃতির স্বরূপ অন্যত্র।

সপ্তম অধ্যায়ে আমরা সমগ্র সৃষ্টির পরিচয় পাই। তিনি বলেছেন এক পরাপ্রকৃতি আছে তাঁর। অন্যটি অপরা। তাঁর নিজের পরা বা উৎকৃষ্ট প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করে।

এবার তিনি স্পষ্ট বল্লেন যে যদিও এই সমস্ত ভূত পরা ও অপরা প্রকৃতি হতে সম্ভূত—তিনিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ। বল্লেন—হে ধনঞ্জয় আমা হতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নাই। সূত্রে গাঁথা মণি-মুক্তার মত সমস্ত জগৎ আমাতে গ্রথিত। *

তিনি বল্লেন যে তাঁর ভিন্ন প্রকৃতি অষ্টবিধ। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, ব্যোম এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

পরে এ তত্ত্বের আরও বিবরণ আছে। সাংখ্য-দর্শনের মতে প্রকৃতির যে উপাধি, এ বর্ণনায় সে কথা স্বীকার করা হল। কিন্তু তিনি স্পষ্ট বল্লেন—যে তিনি এই প্রকৃতিকে কার্য্যকরী ক'রে, সৃষ্টি করেন—প্রকৃতির স্বয়ং নয়। পরব্রহ্ম হতে পরতর কিছু নাই। তাঁর সৃষ্টি তাঁতে গাঁথা।

তিনি পরে ত্রিগুণের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিন গুণের ওতপ্রোত যোগেই প্রকৃতি। তারা তাঁরই প্রকৃতি। তিনি বল্লেন—

সকল সাত্বিক রাজসিক এবং তামসিক ভাব, জেনো আমা হতেই উৎপন্ন। আমি তাদের অধীন নই। তারাই আমার অধীন।

এই তিনটি ভাবের দ্বারা মোহিত এই সমস্ত জগৎ। মোহিত জীব জানতে পারে না যে আমি এই সকল ভাব হতে শ্রেষ্ঠ এবং আমি অক্ষয়।।

তাই জানি সাংখ্যের মত গীতার মত নয়। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। কিন্তু এ তিন গুণ আসে আমা হতে—বল্লেন ভগবান। সুতরাং তাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই। তাঁরই উপাধি ত্রিগুণ। তাঁরই কর্ম্ম করবার যন্ত্র—প্রকৃতি।

একথা তিনি বল্লেন যে তিন গুণের বিবিধ স্ফুরণ অসংখ্যরূপে হয়। এই স্ফুরণ আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর সৃষ্টি। সে জ্ঞানগম্য হয় ঐ ত্রিগুণের বিকাশে মনের সাহায্যে এবং প্রকৃতির অষ্টপ্রকার সৃজনের এক প্রকরণ বিধির দ্বারা। তিনি এক—সব তাঁতে গাঁথা—সুতরাং সৃষ্টি যন্ত্র এক—একই যন্ত্রীর পরিচালিত। কিন্তু এই সৃষ্টিকে টুকরা টুকরা প্রতীয়মান করবার জন্য তিনি সৃষ্টি করলেন অহঙ্কার। যার ফলে এককে বহুরূপে উপলব্ধি করা হয়। সৃষ্টির মূলে এক পরব্রহ্ম। কিন্তু অহংকার অবিভক্ত এককে বিভক্তরূপে উপলব্ধি করে।

এই মোহ—এককে বহু ভাবা অশাশ্বতে-শাশ্বতজ্ঞান জগত জোড়া। এ কথা মনে রাখতে হবে যে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা মোক্ষের বাণী পরিবেশন করেছে। তাতে সৃষ্টি তত্ত্ব প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত হয়েছে মূল বিষয়ে ভক্তের হৃদয়কে সমৃদ্ধ করবার উদ্দেশে। মোহময় এ বিশ্বে এ সমাচারের ততটুকু প্রয়োজন মূল-শিক্ষা সম্বন্ধে যতটুকুর দ্বারা চিত্তকে সজাগ করা যায়। তাই কথিত হয়েছে ত্রিগুণের কথা—ত্রিগুণের কবল হতে পরিত্রাণের পন্থা প্রদর্শনের জন্য।

তিনি বলেছেন—আসুরী ভাব যাদের জীবনকে অভিভূত করে, তারা তো তাঁর এ-লীলার সন্ধান পায় না। তারা মায়ায় জ্ঞান হারায়। সুতরাং মায়া কি সে কথা সংক্ষেপে অর্জ্জুনকে জানাবার প্রয়োজন ছিল। কারণ তিনি স্বয়ং সে সময় মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন বিষাদে।

সার কথা—তাঁকে সুস্পষ্টরূপে না দেখতে পেলে মায়ায় হয়না অবসান। তাই গীতায় দেখি বিভূতি বর্ণনা, উপলব্ধির উপায় এবং যে শত্রুর কবল হতে আত্মরক্ষার প্রয়োজন তার পরিচয়।

ভগবানই সর্ব্বশক্তিমান—প্রকৃতি তাঁরই প্রকৃতি—যেমন শমদমাদি তাঁর সৃষ্টি, তেমনি তাঁরই সৃষ্টি রাজসিক পিপাসা আর তামসিক মূঢ়তা।

আমি অন্যত্র বহুবার বলেছি যে গীতা বুঝতে হলে তার প্রত্যেক বিষয়ের সমস্ত তথ্য সংশ্লিষ্টভাবে দেখা উচিত। প্রকৃতি সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে যে কথা বলা হয়েছে, তা বিস্মৃত না হলে আমরা অন্যত্র বর্ণিত তথ্যের সম্যক জ্ঞান অর্জ্জন করব। একটি উদাহরণ দিই।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে শুনি—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই জেনো অনাদি। বিকারসমূহ এবং গুণগুলি প্রকৃতি হতে সম্ভূত।

এ শ্লোকের পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে পরব্রহ্মের। সে বর্ণনার মাঝে শুনি যে সব কথা—তা হতে সন্দেহ হবে না যে প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর বিভিন্ন শক্তি। অর্থাৎ এ শ্লোক সাংখ্য-দর্শনের পরিপোষক নয়। আরও শুনি—কার্য্যকারণের কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু উক্ত হয়। আর কথিত হয় যে ভোগ বিষয়ে হেতু পুরুষ।

ইহার অর্থ সংশ্লিষ্টভাবে পূর্ব্বের সব শ্লোকের সাথে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই এক ব্রহ্মের বিভিন্ন ভাব।

এই শ্লোকের পূর্ব্বের ভাবগুলি সম্যক উপলব্ধি হলে আর সন্দেহ হবে না যে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি উল্লেখ করে গীতা সাংখ্য-মতকে পুষ্ট করেছে। সাংখ্যের মতে, তারা মাত্র অনাদি নয়—প্রকৃতি এবং পুরুষ স্বতন্ত্র। দ্বৈতভাব গীতায় নাই।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা। তিনি জানতে চাহিলেন তিনটি তত্ত্ব।

১। প্রকৃতি ও পুরুষ।

২। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ।

---

* এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। ৭।৬।
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।। ৭।৭
যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে
মত্ত এবেতি তান বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি। ৭।১২।
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম। ৭।১৩।

২। জ্ঞান এবং জ্ঞেয়।

এমন প্রশ্নের নিশ্চয়ই কোনোটি অপরটি হতে অসংলগ্ন নয়। প্রশ্ন করছেন ভারত, উত্তর প্রতীক্ষা করছেন কেশবের নিকট। পূর্ব্বে তিনি জীবনের এবং বিশ্ব পরিচালনার বহু রহস্য বিদিত হয়েছেন প্রাণের বিষাদ দৌর্ব্বল্যে শক্তিলাভের আয়োজনে। হয়তো অর্জ্জুনের মনে দ্বৈত ভাবের ছায়া পড়েছে। অভেদ বুদ্ধি জাগাবার জন্যই তো নারায়ণ এমন কি বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন।

তাই ভগবান বোঝালেন যে জীবের যে দেহ সেইটি ক্ষেত্র। এই তত্ত্বটি যে জানে সে হ'ল ক্ষেত্রজ্ঞ। এ হ'ল দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

তা হ'লে প্রকৃত জ্ঞান কি? জ্ঞেয়ই বা কে? শ্রীহরি বোঝালেন যে এ-প্রসঙ্গে জ্ঞান কী এবং জ্ঞেয় কে? কার বিষয় স্পষ্ট বুঝলে—সে বোঝাকে বলে জ্ঞান। সে জ্ঞান কীরূপে অর্জ্জন করতে হয় সে রহস্য সংক্ষেপে অথচ সৎ-কর্ম্মের তালিকা দিয়ে বোঝালেন। জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বুঝলে—অনাদি প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব হবে জ্ঞানগম্য।

সে বোধ হলে—ক্ষেত্রকে বাহিরের ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যে ভাবে দেখা যায়, সে ভাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভূত হ'বে চেতনায়। সেই জ্ঞানে ক্ষেত্রের যখন প্রকৃত-রূপ আত্মপ্রকাশ করবে, তখন প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব স্পষ্ট ফুটে উঠবে চেতনায়। সে জ্ঞান হবে ক্ষেত্রজ্ঞের। তাহলে প্রথম জানতে হবে—ক্ষেত্র কী?

তারপর বুঝতে হবে—তাকে জানা যাবে কেমন করে। কি সে জ্ঞান? তৃতীয় কথা—সে জ্ঞান অর্জ্জন করলে সে ক্ষেত্রজ্ঞকে জানা যাবে সংক্ষেপে কী তাঁর উপাধি। তখন পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে পুরুষ ও প্রকৃতির। সংক্ষেপে বলেছেন তিনি—(১) শরীর ক্ষেত্র (২) জ্ঞান অর্জ্জনের তিনি বিধদ উপায় বিবৃত করেছেন। (৩) সংক্ষেপে তিনি বলেছেন—সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ তিনি। পূর্ব্বে বলেছেন সবার হৃদ্দেশে তিনি অবস্থান করেন। এই তিনটি তত্ত্ব বুঝিয়ে তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতির কর্ম্ম সৃষ্টি। জীব প্রথমে বোঝে তার দেহের কথা। সেই দেহকে শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন ক্ষেত্র। তার কী উপাদান?

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত দশ ইন্দ্রিয় মন, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং তার সাথে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা। এইসব বিকার-যুক্ত পদার্থ-ক্ষেত্র নামে কথিত।*

পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোমের যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব। আমরা পৃথিবী ভোগ করি, জলের রস আমাদের আপ্যায়িত করে। এদের সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। এরা সব নিশ্চয় কোনো মহাভূতের স্থূল বিকাশ।

যে বিকাশ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য অপরা। আমরা প্রত্যেকে এদের ভোগ করি অহংকার বশতঃ। সে বোধ আনে বুদ্ধি। সে বুদ্ধিও অব্যক্তের এক বিকাশ। তাই জীবের এই আটটি উপকরণ তার নিজস্ব। এরাই অন্যের সাথে পৃথকত্ব বোধের উৎপত্তি করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গোচর রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। অবশ্য পাঁচটি ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। কিন্তু আরও দেখি জীবনের উপকরণ। ইচ্ছা ও দ্বেষ। এ কথা পূর্ব্বেও বলেছেন ভগবান। মানুষ জন্মে দুটো প্রবৃত্তি নিয়ে। কোনো বিষয়ে প্রেম কোনো বিষয় ঈর্ষা। এরা ব্যক্তি-জীবনের সাথী তাই ক্ষেত্রের উপকরণ। তার পর সংঘাত এবং চেতনা তার সাথে ধৃতি। মহাভূতের পরিণাম ইন্দ্রিয় এবং তাদের ক্রিয়া শরীরে ইন্দ্রিয়দের সংঘাতে শরীর। কিন্তু এ-সবের মাঝে আছে চেতনা। শুদ্ধ চেতনা বর্ত্তমান সর্ব্বক্ষেত্রে। সে চেতনা সংঘাতে আবৃত! প্রকৃত জ্ঞানে হ অন্তরদৃষ্টি—প্রকৃত চেতনা।

ক্ষেত্রের প্রকৃত কাণ্ড বুঝতে গেলে জ্ঞান চাই উভয়ের—ক্ষেত্রে এবং যিনি ক্ষেত্রের মূলতত্ত্ব তাঁর সম্পর্কে। গীতায় কর্ম্ম ও জ্ঞানে বিবিধ বর্ণনা করেছেন প্রভু। এ প্রসঙ্গে তিনি সংক্ষেপে কতকগুলি সদ্‌গুণ বিবৃত করেছেন। বলা বাহুল্য তাদের আয়ত্ত করতে পারে মনুষ্য চরিত্র ভুলভ্রান্তি এবং বৃথা ভ্রমণের পথ হতে সত্য পথে বিচর করবার সন্ধান ও শক্তিলাভ করতে পারে। সেগুলি—অমানিত্ব বা আত্ম শ্লাঘার অভাব। অদাম্ভিত্ব—প্রকৃত জ্ঞান হ'লে নিজের ক্ষুদ্রাদি ক্ষুদ্রত্বের দম্ভ করবার অবকাশ থাকে না। দম্ভ আমাদের জ্ঞানচ আবরণ করে। তাকে পরিত্যাগ করলে সত্য ও সাম্যের দৃষ্টি লা হয়। অহিংসা হয় সর্ব্বভূতে আত্মজ্ঞানে। আরও চাই ক্ষমা, সরলতা গুরুসেবা আবশ্যক কারণ জ্ঞান দেন জ্ঞানী। আর আবশ্যক সদাচার শুদ্ধ ভাব, স্থিরতা আত্মসংযম। ইন্দ্রিয়ভোগ বিষয়ে রতি থাকলে তে চরিত্র পবিত্র হয় না, সে জ্ঞানকে আবৃত ক'রে রাখে। তাই ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে চাই বিরাগ। আর আবশ্যক অনহংকারিতা। দম্ভ দর্প সবই প্রসূত হয়—অহংকারের ফলে। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এর জীবনের সাথী। আলোচনার ফলে তাদের প্রকৃতি প্রতীয়মান হ'লে তারা হয় নিরুপদ্রব।

স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করবার উপদেশ তিনি দিয়েছেন কিন্তু শিখিয়েছেন আসক্তি পরিবর্জ্জনের উপায় নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা স্নেহ শুদ্ধ করে প্রকৃত জ্ঞানকে। ইষ্টানিষ্টে সদাই সমভাব না উদ হ'লে, প্রকৃত জ্ঞান অসম্ভব, যার দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞের সন্ধানলাভ করা যায়।

গীতার মূল শিক্ষা—কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির সমন্বয়। ভক্তিহী জ্ঞান কী প্রকৃত জ্ঞান? বিশেষ যেখানে সন্ধানলাভে উৎসুক জী ক্ষেত্রজ্ঞের। তাই এ জ্ঞানের তালিকায় দেখি—তাঁর প্রতি অনন্যযো ঐকান্তিক শুদ্ধ ভক্তি। বৃথা সংঘবদ্ধ হ'য়ে সাংসারিক মরীচিকা পিছনে ধাবমান হ'লে কী শুদ্ধা ভক্তি অর্জ্জন করা যায়? তাই আবশ্য জনসমাজ হ'তে আপনাকে সরিয়ে নিয়ে নির্জ্জনস্থানে কালক্ষেপণ নিষ্ঠার সাথে আত্মজ্ঞান লাভ করা তাতেই সম্ভব। অবশ্য গুরু এ জ্ঞানীর সাথে আলোচনায় পুষ্ট হয় জ্ঞান।

শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন—এইরূপ চরিত্রই জ্ঞান। এর বিপরীত অজ্ঞান।*

এইরূপে জ্ঞান অর্জ্জন করলে সন্ধান পাওয়া যায় তাঁর যিনি জ্ঞে ক্ষেত্র কী তা বুঝিয়েছেন। জ্ঞান কী তা বোঝালেন। সে জ্ঞা উপজিলে ক্ষেত্রের প্রকৃত স্বরূপ বোধগম্য হ'বে। আর সেই জ্ঞা ক্ষেত্রের অশাশ্বত মায়ার রূপ প্রকট হবে। বোঝা যাবে প্রকৃতি মায়া প্রসবিনী।

মায়ার আবরণ ঢেকে রাখে প্রকৃত জ্ঞানকে। তাই রজ্জুতে ভ্রম হয়—আবার পিতলকে মনে হয় খাঁটি সোনা। প্রকৃত পরমপুরু জ্ঞান সে আবরণকে উচ্ছেদ করে।

তার পর ক্ষেত্র বুঝিয়ে ভগবান বোঝালেন জ্ঞান কি। এবার বো লেন সেই জ্ঞান হ'লে প্রকৃত পরমপুরুষের চেতনা সমুদ্ভূত হয় প্রা তাই তিনি বল্লেন—

যা' জানবার বিষয়, যাকে জেনে অমৃত লাভ করা যায় তা ব বলব। সেই অনাদি পরব্রহ্ম সৎও নন, অসৎও নন।

তারপর তিনি পরব্রহ্মের উপাধি বর্ণনা করেছেন, সে উপাধি বোঝলে—প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব হবে জ্ঞানগম্য।

* গীতা—১৩।৬।৭

* গীতা—১৮।১২।



(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাশ্মীরে পাখীর বাহার দেখার সময় জুন মাস নয়। কিন্তু ময়নার ার বুলবুলের ঝাঁক যখন তখন দেখা যায়। দালের চারধারের খরোট, চেরী, বাদাম, পীচ, খোবানী আর পপলারের ঘন সন্নিবেশে খীদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলার পক্ষে পরম নিরাপদ স্থান। দালের রধারে পাখী আর পাখা। কতো যে রকম, চমৎকার লাগে ানালী ওরিওলের পক্ষবিস্তার করে এ গাছ থেকে ও গাছে যাওয়া। ছরাঙ্গা লম্বাঠোঁট নিয়ে ঝুপ করে জলে পড়ে যেন একছটা বিদ্যুৎ। ভারবেলা থেকে জ্বালায় কোকিলগুলো। কেবল কুহু আর কুহু। াপিয়া আর ফিঙ্গে যখন তখন দেখতে পাওয়া যায়। কাশ্মীরে ঈগল াছে, সারস আছে, হাঁস আছে; আশ্চর্য্য, নেই কাক। কাক খুবই ম। ১৯৩৯ সনে কি এক রোগে কাকগুলো মরে গেছে। এখন কয় ছরে তবু কিছু কিছু কাক বাড়ছে!

হঠাৎ মনে হয় বিতস্তা এখান থেকে নেমে গেছে উলার। উলার কে আবার চলেছে সোপর, বারামুলা বরাবর পশ্চিম, একেবারে ফরাবাদ পর্য্যন্ত। মুজফরাবাদে গিয়ে ধাক্কা খেল দ্রাভ পাহাড়ের য়, যার গা দিয়ে বয়ে এসেছে কিষণগঙ্গা নদী, হরমুখ পাহাড় থেকে রিয়েছে। মুজফরাবাদে বিতস্তা আর কিষণগঙ্গা এক হয়ে গেল, মে গেল। নেমে গেল সোজা দক্ষিণে যতক্ষণ 'ঝিলম সহর' না এলো। লম সহর থেকে আবার পশ্চিম দক্ষিণ মুখো হয়ে বিতস্তা মিশেছে ু নদে। এই সিন্ধু নদ আর বিতস্তার মাঝে, মজফরাবাদ আর লম শহরের মধ্যে, কেবল পাহাড় আর পাহাড়। কোথায় বাসে যাচ্ছি র, কোথায় মজফরাবাদ আর ঝিলম সহর!

নাঃ, আর চলা গেল না। এখানে বাস না থামালেই চলে না। ওলা গল্প করছে সন্তালের কথা। আমি তাকে যত বলি 'সন্তাল যাবো', সে তত বলে 'সন্তল পথের আরও নীচে পড়বে। আমরা চলেছি ক্ষীর-ভবানী।'

"কিন্তু ক্ষীর-ভবানী কেন?" কণ্ঠে বিরক্তি থাকলেও বামা কণ্ঠ া গেল।

কেউ-কেটা নয়। বিভাগীয় উচ্চপদস্থা কর্মচারিণী। নাম বৈজন্তী। া চেহারা, আঁটসাঁট করে বেঁধে সুশ্রী চটপটে রাখা। চোখে কাজল, ট রং, চুলে শ্যাম্পু, কামানো ভ্রূতে তুলির টান।

সঙ্গে ছিলেন যানবাহন-সচিব ওমপ্রকাশজী। আমায় বল্লেন "চুপ থাকুন। কিছু বলবেন না।" যেন সাবধান করলেন। কিন্তু সঙ্গে রুক্মিণী আছে। ঝগড়া পেলে ছাড়ে না। সরোজ আছে গান গায়। ইন্দ্রলুপ্ত জগজীবন তার ছেলের দল নিয়ে আছে। অধরবিহারী, অসিত, বেণু। আর আছে মন্দার। ওরা ইশারা চালালো। বেশ একটা থম-থমে শঙ্কিত ভাব মুহূর্তে এসে গেল।

ওমপ্রকাশজী বললেন,—"পথে পড়বে, তাই দেখা। বাঙ্গালীদাদার তো আবার পুরোনো জিনিষ দেখতেই সখ।"

শ্রীমতী বৈজন্তী হাসি টেনে বললেন,—"আপনি নিশ্চয়ই পুতুল পূজার দলে ন'ন্?"

আমি হেসে বল্লাম—"নাঃ পুতুল আদর করি, ভালবাসি, খেলা করি। পূজা পারি কৈ?"

শ্রীমতীর মুখ ভারী হোলো।

আর্য্যসমাজীর এই অসহিষ্ণুতা প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা আমার বহুবার ঘটেছে। প্রথম, তখন আমি কিশোর। ভুবনেশ্বরে সুন্দর ভদ্রলোকটীর মাথায় ধবধবে শাদা পাগড়ী দেখে আমার পশ্চিম-বিলাসী চোখ যেন বন্ধু পেলো। ভদ্রলোকের সঙ্গে সত্যিই বন্ধুত্ব হোলো। কিন্তু তার হাত ধরে তাকে যতো টানতাম 'মন্দিরে চলো, কেমন সব মূর্ত্তি আছে দেখবো' ততই সে বলতো, মিষ্টি করে বলতো, 'তুমি দেখে এসো। গল্প শুনবো।' মনে মনে ব্যথা পেয়েছি এমন সব মূর্ত্তি দেখার আনন্দের ভাগ ওকে দিতে পারতাম না বলে। ভাবতাম 'কি এমন পাপ করেছে ও যে নিজেকে এতো অশুচি ভাবে।' তখন এই বিশিষ্ট সমাজের রূপ প্রত্যক্ষ করিনি। পরে করেছি দিল্লীতে এসে। উগ্র আর সঙ্কীর্ণ। কিন্তু এদেরই মধ্যে বড় বড় পণ্ডিতকে দেখেছি কেমন সুন্দর ভাবে গ্রহণ করেছে সকলের প্রত্যয়কে, সকলের আধ্যাত্মিক আশ্রয়কে।

শ্রীমতী নিজেকেই প্রতিমার মতো সাজান বলেই প্রতিমায় তাঁর এতো ঘৃণা!

ওমপ্রকাশজী আমায় ইশারায় জানালেন,—"চেপে যান।"

জগজীবন সোজা প্রশ্ন করে বসলো,—"বহিনজী, ফটো তুলে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করি, ফোটো সাজাই, আর মনের আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টায় এতো ঘৃণা কেন?"

তর্ক এসে গেল। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের এমন সমারোহে ভাল লাগে না তর্ক।

আমি বলি,—"ফোটো তোলা হৃদয়ের একটা দুর্বলতা, ফোটোকে আদর করাও দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া। আদর্শকে রূপে এনে মানুষের

স্বরূপ ধারণ করার চেষ্টা অপরাধ। ব্যাসদেবও অপরাধ স্বীকার করে গেছেন। ধ্যান দিয়ে রূপবিবর্জিত ভগবানের রূপ কল্পনা করাকে তিনি অপরাধ মনে করে ক্ষমা চেয়ে গেছেন।"

শ্রীমতী তো মহাসুখী। "আপনি তাহলে মূর্ত্তিপূজা ঘৃণা করেন? আমি ভাবতে পারিনা প্রকৃতিস্থ মানুষ এই অসভ্য বর্বর আচরণ করে কি করে!"

"সাধারণতঃ করে না। অপ্রকৃতিস্থ হলেই করে। যোগীরা বলে উন্মাদ, ভাবোন্মাদ। ইংরাজীতে বলে ecstatic stage! কিন্তু কোথায় সে উন্মত্ততা? আমরা উন্মাদ আমেরিকান ম্যাগাজিনে আঁকা সুন্দরীদের টয়লেট আর পোষাকের বিভ্রমে। ফলে নিজের হাতে ভ্রূ কামিয়ে আবার সেটা আঁকি।"

শ্রীমতী বল্লেন—"আপনি ব্যক্তিগত আঘাত করে কথা কইছেন। এ অসভ্যতা!"

বেণু বললো, "এ অসভ্যতা আমাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। কথায় কথায়—"

রুক্মিণী বললো, "আমার চোখে কাজল; তা বলে আপনি বলতে চান—"

"কাজল? কাজল আছে নাকি? আমি ভাবলাম বুঝি ঘাম জমেছে।"

হাসতে লাগলো রুক্মিণী, পাগলের মতো হাসি।

অত্যন্ত মিস্‌চিভাস্‌, ভারি মিস্‌চিভাস্‌। এতটুকু শিভালরি নেই। রং কালো বলে—"

জগজীবন বল্লে—"আমার চুল নিয়ে রোজ টানাটানি।"

আমি বল্লাম,—"এটাই হোলো আদর্শবাদ। পাক্কা আর্যসমাজী এই জগজীবন!"

চেঁচিয়ে ওঠে জগজীবন,—"কে? আমি? আর্য্যসমাজী? কথ্‌খনো না!"

আমি বলি, "অবশ্যই তাই। তোমার চুল নেই। অথচ তাই নিয়ে টানাটানি করি। তোমার চুল তো বাস্তব নয়, আদর্শ মাত্র। এতো বিশ্বাস যখন আদর্শে, তখন—"

রামদাস গুপ্ত বল্লে—"সম্বলের কথা বলছিলেন বলুন, এসব শুনে কি করবো?"

মনে পড়লো সম্বলের কথা।—ক্ষীর-ভবানীর কাছাকাছি সহর। এর নাম ছিল জয়পুর। জয়াপীড়ের প্রতিষ্ঠিত নগরী। এখানে এককালে ছিল বিরাট জলাভূমি। জয়াপীড় সেই জলাভূমির জল নিকাশ করে উলারের সঙ্গে এক করে দেন। তার মাঝে এক দ্বীপ। দ্বীপের ওপর বিরাট সহর। সহরের মধ্যে দুর্গ। দুর্গের নাম জয়পুর। সহরের নাম অন্তর্কোট। এই অন্তর্কোটের নির্মাণ কৌশল দেখে মনে হোতো অপ্রাকৃত চেষ্টার ফল এ। তাই কিম্বদন্তী লঙ্কার বিভীষণ বিশেষ ক্ষমতাবান রাক্ষস সৌধশিল্পী ও স্থপতিদের পাঠিয়ে এমন বিচিত্র নগরী স্থাপন করান।

দুর্গং বিধৈঃ পুরায়িত্বা সরো গাধঞ্চ রাক্ষসৈঃ,
চক্রে জয়পুরং কোট্টং ত্রিবিষ্টপ সমং নৃপঃ

এর মধ্যে নির্মাণ করান অপরূপ দেবালয়। তার মধ্যে শান্তাকার ভুজগশয়নং শেষনাগ শয়ান কেশব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সে মূর্ত্তির চমৎকারিত্ব সকলের নয়নাভিরাম।

তৎপুরে চতুরাত্মা চ শেষশায়ী চ কেশবঃ
বিষ্ণুলোক স্থিতিং ত্যক্ত্বা ধ্রুবং বধ্নাতি সন্নিধিং।

বিষ্ণুলোক ত্যাগ করে কেশব যেন এখানেই ছিলেন।

আজ জয়পুর একটী গ্রাম মাত্র। সুম্বল সহর সেই প্রাচীন অন্তর্কোটের পরিচয় বহন করে আছে। এই অন্তর্কোটে হিন্দু কাশ্মীর মাথা নীচু করে মুসলমানের কাছে। শা-মীরের কাছে কোটা করে আত্মসমর্পণ। সুম্বর কাশ্মীরের পানিপথ; অথচ যাত্রীরা সুম্বলে থামে না। এমন কি ক্ষীরভবানীতে থামাতেও নারাজ।

তাদের উৎসাহ উলার দেখায়। তার কারণ সায়েব পর্যটকরা উলারের গান গেয়ে গেছে। অন্তর্কোট, জয়পুর, ক্ষীরভবানীর প্রশস্তি তারা গায়নি।

অথচ গোপাদিত্যের সময়কার এই ভবানী মন্দির বহু প্রাচীন। এই ভবানীমন্দিরকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাশ্মীরে শৈবাচার প্রচারিত হয়। এই শৈবাচার কাশ্মীরের প্রাণের সম্পদ, নিজস্ব সম্পদ। কাশ্মীর সম্বন্ধে লিখতে বসে এই শৈবাচার সম্বন্ধে না লিখলে অনেকখানি বাদ থেকে যায়। তিব্বত হতে কাশ্মীরে সোজাসুজি চীনাচর একটা বিশিষ্ট রূপে প্রবেশ করে, যে রূপ মধ্যএশিয়ায় হিন্দু সংস্কৃতিতে ছিল। এই শিবাচারের মধ্যে জাতিভেদ, বর্ণভেদ ছিল না; সংস্কার বা অস্পৃশ্যতা ছিল না। রুদ্রাধ্যায়ের রুদ্রকে এরা যেন ঘরের শিব করে নিয়েছিলো। আর কোনও দেবতা মানেনি, আর কারুর পূজা। একেশ্বরবাদ এবং মোক্ষপিপাসা, সর্বজীবে শিবদর্শন। এই দর্শনতত্ত্ব কাশ্মীরে বহু সন্ন্যাসীর আচরণীয় হয়ে ওঠার ফলে বিশিষ্ট একটি দর্শন তত্ত্ব জন্ম নিলো কাশ্মীরে—ত্রিকদর্শন। ত্রিকদর্শনে বহু যোগী সিদ্ধ মহাপুরুষ হয়ে গেছেন।

এতো করে ত্রিকদর্শনের কথা বলার প্রয়োজনীয়তা ছিলনা আমার। কিন্তু এই ত্রিকদর্শনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক আছে কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারের সঙ্গে। ভারতবর্ষে একমাত্র কাশ্মীরেই বোধহয় ইসলাম মিশে গিয়েছে দেশের ধর্ম ও প্রত্যয়ের সঙ্গে। প্রকৃত কাশ্মীরী প্রত্যয় যেন ইসলাম প্রত্যয়কে স্বীকার করার পক্ষে পরম উপযুক্ত পাত্র ছিল। ইসলামের একেশ্বরবাদ, সর্বমানবতাবাদ, সর্বজীবে ভগবৎ দর্শনের প্রয়াস, জাতি-গোত্র-বর্ণ বিভেদকে অস্বীকার, মোক্ষলাভের প্রয়াস—এসব যেন ত্রিকদর্শনের একটা অধ্যায়।

কাজেই মীরসৈয়দ আলি হমদনী এবং তাঁর শিষ্যবর্গ যখন ইসলামের দর্শন প্রচার করতে এলেন তখন কাশ্মীর সেই ধর্মকে স্বীকার করলো আত্মীয় ভেবে; মীর আলি হমদানীকে কাশ্মীর ঋষি বলে সম্মান

দেখালে। সিকন্দর বুতশিকন যদি অত্যাচার করে মুসলমান করতো, আজ কাশ্মীরে ইসলাম ও শৈবায়ত ধর্মের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যেতো।

একেবারেই যে দেখা যায় না তা নয়। এখনও এক কাশ্মীরেই মুসলমান দেখি যে নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, ঈদের পরবের সঙ্গে রাখী পূর্ণিমার প্রভেদ রাখে না। কাশ্মীরের মুসলমানকে দেখি হিন্দুর হাতের রান্না খাবার খায় না, জল খায়না, এমন কি সব মুসলমানও সব মুসলমানের হাতে খায় না। কাশ্মীরেই দেখেছি মুসলমান কথা বলছে—যার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ প্রচুর। অপবিত্র, আশা, উপবাস, স্নান ইত্যাদি কথা কাশ্মীরী গ্রাম্য চলন-বলনের মধ্যে পাই।

এগুলো তো সংস্কৃত শব্দ। কতকগুলো আরো শব্দ আমাকে বিস্মিত করেছে, নিছক বাংলার ধ্বনির সঙ্গে তাদের মীড় যেন এক। 'সাধ' খাওয়াই আমরা গর্ভবতীকে, এরা খাওয়ায় 'সাধ-পিড়ি।' পোয়াতিকে ওরা বলে 'লোসাতি' বা 'লোস্য'। বিয়ের 'লগ্ন স্থির' করতে বাংলা পণ্ডিতমশাইকে কাশ্মীরে কষ্ট পেতে হবে না। ওদের 'লগনচীর' উনি দিব্যি বুঝবেন। 'সূতিকা' আমাদের প্রসূতির রাক্ষসী। ওদেরও তাই; ওরা বলে 'সূতক্'। 'জাতুকু'কে 'নবজাতক', বুঝতে কষ্ট হয় না। 'অন্নপ্রাস' সাধারণ কথা; মুখে ভাত দেয় ছেলেদের। কিন্তু আমাদের মেয়েরাই জানে 'আট-ফুল-বাঁধার তাৎপর্য্য; ওরা কিন্তু 'আট্‌ফুল' বাঁধে। মজার ব্যাপার 'খানা-দামাদ।' কুলীন যুগে 'ঘর জামায়ের' মতো 'খানা-দামাদী' প্রথাটা কাশ্মীরে জবর। ছেলেবেলায় ভাল পাত্র এনে বাড়ীতে পোষে। চাকরের মতো খাটায়। ভাবী বৌও-তাকে চোখে দেখে; কিন্তু বিবাহের পর এদের একেবারে আলাদা জীবন। প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং 'খানা-দামাদী' একটা বিশিষ্ট সামাজিক প্রথা হয়ে আছে। বাংলার 'নিতবর' ওদের 'পোতবর' হয়ে আছে। 'পোত মহারাজ' ও বলে কেউ কেউ আদর করে। বাঙ্গাল বলে 'হউর' শ্বশুরকে। কাশ্মীরীরা বিশুদ্ধ বাঙ্গাল উচ্চারণ দ্বারা 'হউর' বলতে শ্বশুর বাড়ী বোঝায়; এবং 'মালন্' বলে পাত্রের বাপের বাড়ীকে। 'হউর' মেয়ের বাপের বাড়ী। থাল বা 'থারি'কে 'সারি'; 'তারি' কে 'আরি, 'পেটকে পেট' বলে ওরা দিব্যি চিন্তা ধরিয়ে দেয় কাশ্মীর বিজয়ী গৌড়েরা কি 'শালি' ধান্যের সঙ্গে গৌড়ী ভাষাও ছড়িয়ে গিয়েছিলো এদেশে?

আরও অপূর্ব মিল দেখি সামাজিক বিধানে হিন্দু মুস্লিম একাঙ্গত্বে। অনিবার্য্য কারণেই যেন কাশ্মীরে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে আছে। রাজনীতির আবডালে লক্ষ্য করার বস্তু যে কাশ্মীরে কোনও বিশিষ্ট হিন্দু সন্তান মুসলমান মায়ের স্তন্য পান না করে বড় হয় না। ধাই-মা ওদের থাকেই; প্রতি ধাই-মা মুসলমান; প্রতি ধাই-মার কাজ নবজাতককে স্তন্য দান। এজন্য ধাই-মার প্রচুর সম্মান সমাজে। ধাত্রীর যদি স্তন্য কোনও কারণে না থাকে অন্য স্তন্যদাত্রী হয়তো হয়, কিন্তু অমুসলমান হয় না। সে স্তন্যদাত্রী ও মুসলমান। অর্থ নৈতিক অসূয়কে (সিনিক) বলবেন 'মুসলমান গরীব', হিন্দু ধনী। তাই স্তন্যদাত্রী রাখতে পারেও; মুসলমানকে আপেক্ষিক কম মূল্যে পায়।' অন্য কোনও তর্কে যাবো না। কেবল বলবো, 'মানলাম বন্ধু; অনুরূপ ক্ষেত্রে বহু মূল্যে বা বিনামূল্যে অন্য কোথাও সাধারণ ব্রাহ্মণপুত্রকে মুসলমানীর দুধ খাইয়ে নির্বিবাদে সমাজে অনুষ্ঠান করো তো!'……না তর্কের বস্তু নয়; সত্যিই কাশ্মীরে ধাই-মা প্রথার সম্মান দেখলে অদ্ভুত একটা সম্ভাবনার আলো চোখে পড়ে। লোভ হয়। এই ছেলেরই পৈতের সময় ধাই-মা প্রধান সম্মানের অধিকারিণী, এবং বিয়ের সময়ে ধাই-মার ছেলে বা না থাকলে অন্য কোনও 'মুসলমান' ছেলেই বরের মাথায় ছাতা ধরে যাবে। একটা বিষয়েই নয় শুধু; 'রু' নাচ এরা শুভকর্মে নাচে, ও সঙ্গে সঙ্গে গায়। এই 'রু' নৃত্য-গীত হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আচরণ করে। মেহেদী লাগিয়ে বিয়ে পাকা করা, ঘটক পাঠিয়ে গুরুজনের মাধ্যমে বিয়ে ঠিক করা, দ্বিরাগমন প্রথা পালন করা, এসব দুই জাতির মধ্যেই সমান। শুভকর্মে চাল, ঘি, আখরোট আর হলুদের ব্যবহার হিন্দু আর মুসলমান উভয়েই করে। পূজা-আর্চা অবশ্য মন্দিরে মসজিদে আলাদাভাবে করা হয়; তবু এক কাশ্মীরেই দেখি মার্তণ্ডে, অমরনাথের, বরাহমন্দিরে, পরিহাসকেশবে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পূজা দান। আবার দেখি হিন্দুরা পূজা দিচ্ছে ভেরনাগের ফতেপুরা দরগায়, মাগনে ওয়ারিপুরা দরগায়। একই পদচিহ্নের পূজা হিন্দু করছে 'বিষ্ণুপদ' বলে, আর মুসলমান করছে 'কদম-ঈ-রসুল' বলে। কাশ্মীরের প্রতি বিখ্যাত মসজিদে যাও; অনুসন্ধান করো। কোনও কুঞ্জতলে, কোনও ছায়াঘন একান্তে পাবে ছোটো একটি হিন্দু উপাসনার স্থান; যেখানে দেখবে সিঁদুর মাখানো, জরীর সাজপরা কোনও না কোনও হিন্দু মূর্তি। সন্ধ্যায় সেখানে ধূপ দিতে মুসলমান মা দাঁড়ায় তার সন্তানকে কোলে করে; হাত পেতে প্রসাদী ভস্ম বা সিঁদুর নিয়ে যায়। প্রতি মসজিদের চৌহদ্দীর ভেতরই শান্তিপূর্ণ ভাবে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ। কাশ্মীর ইতিহাসেই দেখি মুসলমান জনতা বিদ্রোহ করেছে মুসলমান নরপতির বিপক্ষে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার বর্বরতা লক্ষ্য করে। হামাদানের বিখ্যাত মসজিদে লালদীদের নামে খুৎবা পড়া হয়; লালদীকে স্মরণ করে পুণ্যপূত চিত্তে। আজ যারা শ্রীনগরে যায়—জামা-মসজিদ দেখে আসে একটা দর্শনীয় বস্তু বলে। একখানা ফটোগ্রাফও নিয়ে আসে তুলে বা কিনে। কিন্তু কজনে এর মূলের রহস্যে প্রবেশ করে? হিন্দুর কাছে এটা তীর্থ, এখানে এককালে তার প্রিয় শিবমন্দির ছিল। সে মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পীঠ-মহাত্মা যায়নি। জামা-মসজিদে হিন্দু গিয়ে পূজা দিয়ে আসে। লদ্দাক থেকে লামারা আসে, বৌদ্ধ পরিব্রাজক আসে। বলে "জামা-মসজিদ? সে আবার কি? ওতো আমাদের সিৎসুঙ্—ডুব্‌লক্—কাঙ্! প্রাচীন, মহাপ্রাচীন পীঠ! "ওরাতো এসে মোল্লাকে প্রণতি জানায়। পূজা দিয়ে যায়। হিন্দু-মস্লিম-বৌদ্ধের মিলিত অর্ঘ্যে জামামসজিদ পবিত্রতম তীর্থ। ভারত তীর্থ এতোটা ওতোপ্রোত হয়ে জড়িয়ে আছে বলেই কাশ্মীরে মুসলমানের জল ব্যবহার করে, খায়। মুসলমান ধাই-মার সন্তান পরিবারের-গণ্য ব্যক্তিও ক্ষমতাবান্। মুসলমানের তৈরী ছানা, পনীর, আচার, বিস্কুট, রুটী, মিষ্টি হিন্দু অনবরত খাচ্ছে;—জাত যাচ্ছে না। গুলাব সিং এই জল খাওয়ানো আর খাবার খাওয়ানোকে পুরোপুরি হিন্দু করতে জোর

করেও সফল হতে পারেন নি। যে মুসলমান বুত্ পূজা করাকে ঘৃণা করে অন্তর থেকে, (অবশ্য আর্য্য সমাজীদের মতো অতোটা নয়) সেই মুসলমানকেই দেখি কাশ্মীরে সে মহাত্মাদের মূর্ত্তিপূজা করছে, প্রজাবৎসল রাজাদের মূর্ত্তিপূজা করছে এবং সেই একই সূত্রে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তিকেও মালাচন্দনে, ধূপ-দীপে একদিন পূজা করেছে।

ধার্মিক বিশ্বাস এবং ভূত-পরী-দৈত্য দানার গল্পেও এদের সমান বিশ্বাস। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বিশ্বাস করে বানিহালে সন্ত থাকেন। শীতের বাতাস থেকে কাশ্মীরকে রক্ষা করেন। কোঁদ পরগণায় রোজ-লু প্রস্রবণ হঠাৎ বেড়ে গ্রাম ভাসায়। সেই জল নেমে গেলে কাদায় পড়ে থাকে চিহ্ন। এ চিহ্ন বলে দেয় কোন্ পাপে বন্যা হোলো। শিক্ষিত লোকেরাও এ চিহ্ন পড়তে যায়। কাশ্মীরের শিখরে পরীরা থাকে। কিন্তু তার মোহে যেতে নেই। তারা শিষ দিয়ে ডাকে, কিন্তু গেলে রক্ষা থাকে না। এমনি শিষই বুঝি তেনজিং শুনেছিলেন, তাঁর তো আর ঘর-দোর রইলনা। শিখরিণীর প্রেমেই জীবন পণ করে আছেন। হরমুক পাহাড়ের গায়ে নীল রেখাগুলিই যে নাগ-নাগিনীদের ঐ তল্লাটে আসতে দেয় না। প্রতি কাশ্মীরী তা বিশ্বাস করে। সত্যিই হরমুকের কাছাকাছি সাপ নেই। উলার তহশিলের পিংগ্লিস পরগণা শুকিয়ে গেল। লিদার যে গুহাপথে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে পিংগলিসে আসতো সে গুহাপথ বন্ধ হয়ে গেল। কেন? কারণ নদীর দেবতাকে তারা অর্ঘ্য-পূজা দেওয়া বন্ধ করে কুসংস্কার মনে কোরে। গর্ত্ত গেল বুঁজে। গর্ত্তের পাত্তাও রইলোনা। পিংগলিস মরুভূমি হয়ে গেল। আজও সকলে বিশ্বাস করে নদীমাত্রই দেবতা এবং সে দেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য। এতে হিন্দুমুসলমান নেই। জম্মু থেকে কমণ্ডলুতে ভরে বৈশাখ-নাগকে ব্রাহ্মণ আনছিলেন কাশ্মীরে, তাঁকে প্রকাশিত করার আশায়। ব্রাহ্মণ স্নানে নেমেছেন। দুই কিশোরী কমণ্ডলুতে কি আছে দেখার জন্য কমণ্ডলুর ঢাকা খোলে। নাগ যায় পালিয়ে। ব্রাহ্মণ কেঁদে আকুল। তাকে সান্ত্বনা দেয় কে? সাহায্য করে কে? মুসলমান ফকির—নাম মীর-শা বগ্দাদী। তাঁরই মধ্যস্থতায় নাগ বৈশাখ থেকে আশ্বিন জম্মুতে থাকলেও বছরের বাকী কদিন থাকতেন কাশ্মীরে। তা থেকেই কাশ্মীরে এতো জল। এমনি গাথায়, কাব্যে, জীবনে, সমাজে, ধর্মে, আস্থায়, গুরুতে, এমন কি ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানাতেও সেদিন অবধি কাশ্মীরের হিন্দু জীবন ও মুস্লিম জীবন এক ছিলো।

তবে বাকী তফাৎ রইলো কোথায়? এমন জায়গা দেখিনি যেখানে কাশ্মীরের মতো হিন্দু পুরো হিন্দু নয়, মুসলমান পুরো মুসলমান নয়। মানবতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দেয়, আত্মাকে জানায় প্রণতি, দেশকে করে অগ্রগণ্য। মকবুল শেরওয়ানীর সেই কথা—"কাশ্মীরে হিন্দু নেই; মুসলমান নেই। আছে কেবল কাশ্মীরী।"

শুধু তাই কেন। ভারতের ইতিহাসে হিন্দুপোষক বাদশাহের খবর পাই, কিন্তু পাইনা জয়নাল আবেদীনকে, যিনি যোগবাশিষ্ঠ শুনতে শুনতে, ভাগবৎ ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে দেহত্যাগ করেন; পাইনা সাহাবুদ্দীনকে (১০৫৪) যিনি লক্ষ্মী নামে হিন্দু স্ত্রী বিবাহ করেন এবং লক্ষ্মীনগর স্থাপন করে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; পাইনা নুরুদ্দীন বা নন্দ-ঋষির আখ্যান। কাশ্মীরের মুসলমান অদ্ভুত মুসলমান।

কাশ্মীরী বলতে ডোগরাদের বোঝায় না। ডোগরা এবং শিখ শাসনের কালে জাত-কাশ্মীরীদের ওপর অত্যাচার চলেছে প্রায় দুশো বছরের কাছাকাছি। এই অত্যাচারের কাহিনী সকরুণ। শিখদের নামই কাশ্মীরীতে বলা হোতো 'জুলুম্ পরশ্ত্' অর্থাৎ অত্যাচার-পূজক, আবার প্রকৃত কাশ্মীরী ডোগরা মাত্রকে ঘৃণা করেছে বলেই হিন্দুমাত্রকে ঘৃণার চোখে দেখতো। যে কাশ্মীরী-বীর্য্য একদিন আর্য্যাবর্ত্ত, তিব্বত, আফগানীস্থান জয় করেছে, যে কাশ্মীরী-বীর্য্য মামুদ গজনীকে পর্যুদস্ত করেছে, বাবরকে হারিয়েছে, আমেদ শা আবদালীকে বিভ্রান্ত করেছে,—সেই কাশ্মীরীদের সৈন্য বিভাগে চাকরী পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল প্রায় দেড়শো বছর। ফলে যখন শিখেরা চলে গেল, ডোগরারা সরে দাঁড়ালো, তখন যে কাশ্মীরীকে তারা ফেলে গেল সে timid, coward;—ভীরু, কাপুরুষ। কত যুগের অত্যাচারের ফলে যে তারা আজ timid এ কথা না ভেবেই বিদেশী মাত্রেই কাশ্মীরীদের timidity নিয়ে পরিহাস করেছে। অর্থাৎ বিদেশীরা এদের লুটেছে, এদের নারীদের ধরে এনে অত্যাচার করেছে, বিনিময়ে দিয়েছে রৌপ্য। এরা প্রতিবাদ করেনি। তাই এরা timid অথচ সরকারী রেকর্ডে পাই যে কাশ্মীরে চৌর্য্য ছিল না। মামলা ছিল না। এবং কাশ্মীরে তালাক বা সতীত্বহীনতার কথাও কেউ কল্পনায় আনতে পারতো না। সংসারের পরিবেশের ভেতরে কাশ্মীরী রমণী শান্তি আর ব্যবস্থার এক জীবন্ত নিদর্শন ছিল। বেশী দিনের কথা নয় এ। এ রেকর্ড পাই ১৮৯৫তে ও ইংরাজেরই জবানবন্দীতে Lawrence সাহেব সহানুভূতি দেখিয়ে এই timidity সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা এক ধরণের স্বীকারোক্তি বলে এখানে উল্লেখযোগ্য। "A man who can be beaten and robbed by any one with a vestige of authority soon ceases to respect himself and his fellowmen, and it is useless to look for the virtues of a free people amongst the Kashmiris, and unfair to twist them with the absence of such virtues. The Kashmiri is what his ruler has made him." প্রণিধানযোগ্য কথা।

মরে যেতো কাশ্মীর। কিন্তু মরেনি তার আধ্যাত্মিক সত্তার গুণে সে সত্তার হিন্দু-মুস্লিম মিলিত সমাজেও মহাবীজ যুগ-যুগ ধরে সঞ্চিত এবং তার মূল পৌঁচেছে গভীর থেকে গভীরে। কাশ্মীর একদিন শৈবাচারী ছিল বলেই ইসলামের তিক্ত ইতিহাসের তলায় চাপা পড়েনি। এই শৈবাচারের পীঠস্থান ছিল এই ভবানী মন্দির, কালী মন্দির আর শ্রীনগরের শিবমন্দির। ভেঙ্গেছে জয়নাল আবদীনের পিতা সিকন্দর, এবং সেই শিব মন্দিরে গড়েছে বর্ত্তমান জামামসজিদ। কালীমন্দির ভেঙ্গে নির্মাণ করে খঙ্কা-ঈ-মৌলা। সুরেশ্বর, বরাহমুলের বরাহমন্দির, মার্ত্তণ্ড, ঈশান চক্রভৃৎ, ত্রিকেশ্বর এতো মন্দির ধ্বংস করে যে মুসলমানেরাই বিদ্রোহ করে ওঠে। শিকন্দর বুত শিকনের নানা কীর্ত্তির

মধ্যে কীর্ত্তি আছে নিহত ব্রাহ্মণদের সাতমণ যজ্ঞোপবীত দিয়ে তিনি বহ্নুৎসব করেন। দাল হ্রদে হিন্দুর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ তাঁর হস্তগোচর হয়েছিল সব বিসর্জন করেন !!

এই সম্বল, জয়পুর এবং অন্তর্কোট ধ্বংস করে প্রথম শঙ্করবর্মা প্রথম শতাব্দীতে। এর ধ্বংসাবশেষ দিয়ে তিনি নির্মাণ করলেন শঙ্করপুর, যার বর্ত্তমান নাম পাটন্।

কিন্তু সম্বল নয়, সম্বলের চেয়েও অপরূপ নগরী পরিহাসপুর, অন্তর্কোট-জয়পুরের বিপরীত দিকে। পরিহাসপুর ছিল ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের সাধের নগরী। আজ পরিহাসপুরে কেবল ধ্বংসস্তূপ। কিন্তু এই নগরীতে ছিল অনুপম অপরূপ মূর্ত্তি পরিহাস কেশব। শশাঙ্কবধের ইতিকথার সঙ্গে জড়িত পরিহাস-কেশবের বিগ্রহ। শশাঙ্ককে হত্যা করেছে কাশ্মীর রাজা, অন্যায়ভাবে। গৌড়ীয়েরা এর প্রতিশোধ কামনায় কাশ্মীর অধিকার করলো। ললিতাদিত্য নেই তখন। রাজা হত্যার প্রতিশোধে রাজা হত্যা হতে পারলো না। এ আক্ষেপ মেটাতে চায় গৌড়ীয়েরা। ললিতাদিত্যের মতোই ভালবাসতো কাশ্মীরী পরিহাস-কেশব বিগ্রহ। সেই বিগ্রহই এরা ধ্বংস করবে !! কাশ্মীরে 'হায়' 'হায়' রব উঠলো। নগরে বিরাট মন্দির আরও একটি ছিল, রামস্বামীর মন্দির। কাশ্মীরীরা ভ্রম উৎপাদন করার জন্য উন্মত্ত গৌড়ীয়দের নিয়ে এলো রামস্বামী মন্দিরে। পরিহাস-কেশব ধ্বংস করছে মনে করে তারাই রামস্বামী মন্দির ধ্বংস করে।

তা বলে পরিহাস কেশব ও কালের দণ্ডহেলনকে অতিক্রম করতে পারেনি। কিন্তু পরিহাস কেশব মন্দির ধ্বংস করে প্রথমে ডামররা, পরে সিকন্দর। এখন ধ্বংসস্তূপ আছে বেহাতের তীরে। একটী পুরোনো সেতু আর একটি খাল আছে সে যুগের সাক্ষ্য।

এ মূর্ত্তি ছিল আগাগোড়া রূপোর তৈরী, নিরেট। মূর্ত্তি ধ্বংস করেন সিকন্দর। তার তলায় পান এক তাম্রলিপি। তাম্রলিপ্তীতে লেখা "মহাকালের স্পর্শনীয় কেউ নয়; এই বিগ্রহ বা মন্দিরও নয়—এ মন্দির, এ বিগ্রহ ধ্বংস পাবে ১১০০ বৎসর পরে। যে চূর্ণ করবে সে যবন, তার নাম সিকন্দর।" এই কাহিনীর সত্যতা আজ যাচাই করা সম্ভব নয়। তবে আবুলফজল তাঁর পুস্তকে এই কাহিনীর উল্লেখ করে গেছেন।—

রাজতরঙ্গিনীর শ্লোক মনে পড়ে যায়—

ততঃ পরং পরীহাস শীলো ভূলোকবাসবঃ
বিহসদ্ বাসবাবাসং পরীহাসপুরং ব্যধাৎ
বিরেজে রাজতো দেবঃ শ্রীপরীহাস কেশবঃ
লিপ্তো রত্নাকর স্বাপে মুক্তাজ্যোতির্ভরৈরিব।

সেই অপূর্ব মন্দিরের কাছে যেতে পেলাম না। বাস থামলো এসে ক্ষীর ভবানীতে।

ক্রমশঃ



সন্ধ্যামণি সন্ধ্যাবেলা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

শিশির ভেজা বৃন্ত দিয়ে
সন্ধ্যামণি সন্ধ্যাবেলা
বিনি সুতায় বিনিয়ে নিয়ে
হৃদয় নিয়ে করব খেলা ॥
পরিয়ে দেবো কণ্ঠ ঘিরে
ভয় কোরোনা মিথ্যে প্রিয়া—
অধিকারের চুলটী চিরে
ভাগ কোরোনা প্রণয় নিয়া ॥
তোমার যাহা তোমার র'বে—
নির্ভাবনা এ-কারবারে
আমার হিয়া তোমার হবে
যাবজ্জীবন অঙ্গীকারে।
(আদেশ দিলে অর্পিবারে।)
মূল্য দিয়ে হয় কি নিতে
চাইলে পাবে সদয় হয়ে

মূল্য দিয়ে হয় কি নিতে
যৌতুকেরি পরিণয়ে ॥
এ প্রেম সখি নিখাদ সোনা
তাহার পরে জ্বলছে মণি
মণির মালা বক্ষে ধরে
বক্ষ হল হীরার খনি ॥

সেই খনিতে লক্ষ হীরার
শ্রেষ্ঠ যেটী কণ্ঠে দিয়ে
উচ্ছ্বসিত ওই মদিরার—
নেশার আমেজ আসবো নিয়ে ॥
উদ্গারে তার কাব্য রচি
লো রুচিরা বরাঙ্গনা
রসিক জনে সঙ্গোপনে
পৌছে দিলাম একটী কণা ॥

পাশাপাশি

শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী

[মাঝখানে পার্টিশান করা একই বাড়ির এধারে ভাড়া থাকেন সতীশবাবু তস্য পত্নী হরমোহিনী এবং কন্যা নির্মলা। ওধারে ভাড়া থাকেন বেণীবাবু, তস্য পত্নী তারাসুন্দরী এবং পুত্র বিনয়]

(১ক)

(সকাল। ছাত। মাঝখানে সাত ফুট উঁচু পাঁচিল)

সতীশ : ও ছাতে কি বেণী নাকি ?

বেণী : হুঁ।

সতীশ : কি করছ ?

বেণী : চাকরটাকে দিয়ে তেল মালিশ করাচ্ছি ভাই একটু।

সতীশ : কী আশ্চর্য !

বেণী : কেন ? কি হল ?

সতীশ : আরে ! আমিও যে তাই ছাতে উঠেছি।—ঐ তেল মাখাতেই।

বেণী : আশ্চর্য তো ! আমিও, তুমিও ?

সতীশ : হ্যাঁ।—তুমিও, আমিও।—একেই বলে আঁতের টান।

বেণী : ছাতের মাঝখানের এই পাঁচিলটাকে এবার বাড়িওলাকে বলে ভাঙাতে হবে ভায়া। এ আর ভাল লাগছে না। দ্যাখো না, তুমি ওদিকে, আমি এদিকে—মুখ দেখাদেখির জো নেই।

সতীশ : পাঁচিল টপ্‌কে এছাতে চলে এস না হে।—লম্বা টুল-টুল নেই ?

বেণী : আছে। বড্ড নড়বড়ে। সাহস হয় না। তোমার ওদিকে ত মই আছে একটা।

সতীশ। তার বাঁশে ঘুণ ধরেছে !

বেণী : আমাদের হাড়েও।

সতীশ : যা বলেছ।

বেণী : কোথায় তেল ঘষছে এখন তোমার লোকটা ?

সতীশ : পিঠে।

বেণী : (নিজের চাকরকে) এই ভোলা, পিঠে মাথা।

সতীশ : পিঠ থেকে এখন কোমরে নামছে।

বেণী : ভোলা, কোমরে নাম।

সতীশ : বুকে উঠছে।

বেণী : আমিও ওঠাচ্ছি।

সতীশ : পায়ে ধরছে।

বেণী : এই ভোলা, শীগ্‌গির পায়ে ধর্‌।

(খ)

(দুপুর। ঐ ছাত। দু'বাড়ির গিন্নি উঠেছেন দু-দিকের ছাতে)

হরমোহিনী : ওদিকে পায়ের শব্দ পাচ্ছি যেন কার ? দিদির নাকি ?

তারাসুন্দরী : হ্যাঁ ভাই। তুমিও ছাতে উঠেছ আজ।

হরমোহিনী : চুল শুকোতে।—তুমি ?

তারাসুন্দরী : বড়ি।

হরমোহিনী : কিসের দিদি ?

তারাসুন্দরী : ভাজা বড়ি ভাই।

হরমোহিনী : কত্তা আজ খেতে বসে কি বলছিলেন জান দিদি ?

তারাসুন্দরী : কি ভাই ?

হরমোহিনী : তোমার কত্তার নাম করে বলছিলেন যে, অমুক নিশ্চয়ই আমার যমজ ভাই ছিল গেল জন্মে। নৈলে চার মাস বাদে আজ আমিও ছাতে উঠেছি তেল মাখতে ত অমুকও উঠেছে ঠিক আজই !

তারাসুন্দরী : আমাদেরই-বা কম আঁতের টান কিসের ভাই ?—গেল মঙ্গলবারের পর এই আজ আমিও উঠেছি, তুমিও উঠেছ।—আমি না হয় বড়ি শুকোতে, আর তুমি চুল।

হরমোহিনী : আমার চুলের খোঁপাও ঐ বড়িই হয়ে এসেছে দিদি।

তারাসুন্দরী : ঢং কোর না ভাই। কোমর ছাপিয়ে চুল ছড়িয়ে থাকে এখনো। আর বিনয়ের কাজ নেই। বড়ি যদি বলতে হয় তো সে আমার খোঁপা।



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ মেঘাচ্ছন্ন ফটো : গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মেঘলা দিনে

ফটো : জলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

হরমোহিনী : তবু যদি না কাল বিকেলে নিজে হাতে তোমার চুল বেঁধে দিতুম দিদি। ওসব ন্যাকা কথা অন্যদের বোলো দিদি।

তারাসুন্দরী : ভাল কথা, আজ তুমি যে ন্যাদোস মাছের ঝাল পাঠিয়েছিলে না?—কত্তা শুধু তাই দিয়েই হাপুস-হুপুস করে ভাত খেয়ে আপিস গেলেন।

হরমোহিনী : আর তুমি যে ক্ষীরকমলা করে পাঠিয়েছিলে, আমার কত্তা তাই পুরো দু'বাটি খেয়েও বলেন, আরো দাও নৈলে আপিস যাব না।

তারাসুন্দরী : দিয়েছ?

হরমোহিনী : পাগল?—জানই ত ভাই, যেমন লোভী তেমনি পেটরোগা।

তারাসুন্দরী : মেয়ে কোথায়? কলেজে?

হরমোহিনী : হ্যাঁ দিদি। তোমার ছেলে?

তারাসুন্দরী : সেও কলেজে।

(১গ)

(সন্ধ্যা। ঐ ছাত। দু-বাড়ির ছেলেমেয়ে। দু-দিকে নয়। পাঁচিলের ওপর পা ঝুলিয়ে পাশাপাশি বসে বসে কথা হচ্ছে)

নির্মলা : এই, হাসিও না। পাঁচিল থেকে পড়ে যাব।

বিনয় : এই পাঁচিলটাকে আস্তে আস্তে ভাঙবে নির্মলা?

নির্মলা : আস্তে আস্তে?

বিনয় : হ্যাঁ। মানে, একটু একটু করে।—এমন ভাবে পাঁচিলে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে বসে আর ভাল লাগছে না।

নির্মলা : এই?

বিনয় : কি?

নির্মলা : আমরা কিন্তু অনেকদূর এগিয়ে এসেছি।

বিনয় : মানে?

নির্মলা : মানে ফেরার পথ বন্ধ।

বিনয় : কেন? আমাদের সিঁড়ির দরজা ত খোলাই রয়েছে।

নির্মলা : ঠাট্টা নয়, আমরা একটু একটু করে কতটা উন্নতি করেছি লক্ষ্য করেছ?

বিনয় : তাই নাকি? কিসে প্রমাণ হল?

নির্মলা : প্রমাণ? আগে আগে আমরা পাঁচিলের দুপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু-আধটু কথা কইতুম; আজকাল পাঁচিলের ওপর পা ঝুলিয়ে পাশাপাশি বসে গল্প করছি। উন্নতির আর কি দৃষ্টান্ত তুমি চাও বল ত?

বিনয় : উন্নতি? সেইদিন বুঝব যে আমাদের যথার্থই উন্নতি হয়েছে, যেদিন তুমি আপিস যাবার সময় আমাকে কোট পরিয়ে দেবে।

নির্মলা : আহা গো! শখ দেখে আর বাঁচি না। অতই যদি শখ তো যাও না বীরপুরুষ, বল না তোমার বাবার কাছে গিয়ে।

বিনয় : কি বলব? যে, বাবা, আমায় কোট পরিয়ে দেবার জন্যে একটি ফুটফুটে মেয়ে চাই; আর, সেদিক থেকে পাশের বাড়ির নির্মলা হচ্ছে ফিটেস্ট গার্ল? শুনে বাবা কি বলবেন জান?

নির্মলা : হুঁ। জানি। বলবেন, 'কান ধরে ওঠ-বোস কর, হতভাগা বাঁদর। সামনে পরীক্ষা এখন ফাজলামী হচ্ছে?'

বিনয় : উঁহু, হল না।

নির্মলা : তবে?

বিনয় : বাবা বলবেন, তোর আবার কোট কোথায় রে হতভাগা? কোট তুই কোথায় পেলি?—আমার কোট নেই কি না।

নির্মলা : তাহলে বলবে যে·· ···

বিনয় : পাগল হয়েছ! বাবার কাছে ঘেঁষবে কে?

নির্মলা : ছিঃ! বাবাকে এত ভয়?

বিনয় : উপায় কি? একে বাবা, তায় বয়েসে বড়! তার ওপর জান ত, বাবার ঘুষির ওজন বিয়াল্লিশ পাউণ্ড!

নির্মলা : এত বড় ধেড়ে ছেলের গায়ে হাত তোলেন তোমার বাবা?

বিনয় : চট্ করে তোলেন না। তবে, সুযোগ পেলে ছেলেদের ওপর এতবড় মনোপলির অধিকার ছাড়তে কোনো বাবা রাজি হন কখনো?

নির্মলা : অন্যায়।

বিনয় : সন্দেহ নেই।

নির্মলা : ফাজলামা রাখো।—কি ভাবে কথাটা বাবা কিংবা মাকে জানানো যায় তাই ভাবো। এমন করে আর ভাল লাগে না—বলে দিচ্ছি হ্যাঁ।

বিনয় : আচ্ছা, এই অবস্থায় সিনেমার নায়ক-নায়িকারা কী করে মনে করে দ্যাখো তো। অনেক তো সিনেমা দেখেছ—মনে পড়ছে না কিছু ?

নির্মলা : দূর্।—তাদের কথা বাদ দাও। তারা যাই করুক তাতেই বিয়ে। গান গাইলেও বিয়ে, কাঁদলেও বিয়ে, আত্মহত্যা করে মরলেও বিয়ে, বিয়ে করতে না চাইলেও বিয়ে। তাদের শেষ অবধি বিয়ে হবার জন্যেই যে সিনেমার গল্প লেখা হয়। তাদের ভাবনা কি ?

বিনয় : ঠিক বলেছ। ভাবনা আমাদেরই।—একটা বৌদি-টৌদিও নেই যে তাঁর কাছে গিয়ে সাহায্য চাই।

নির্মলা : ভাবো যা হোক কিছু।

বিনয় : তুমিও।

নির্মলা : আজ যাই। সন্ধ্যের পর পড়তে না বসলে মা আবার চেঁচাবেন।

বিনয় : আমারও।—চলি।

নির্মলা : হুঁ। আসি।

বিনয় : হ্যাঁ। চলি।

নির্মলা : চলি বলতে নেই।

বিনয় : আসি।

নির্মলা : এসো।—এই ?

বিনয় : কী ?

নির্মলা : আজকের মতন কালকেও চিনেবাদাম এনো। বসে বসে খাওয়া যাবে বেশ।

বিনয় : কাল কিন্তু তোমাদের দিকের ছাতে খোসা ফেলব। আজ আমাদের ছাত নোংরা হয়েছে।

নির্মলা : এই রে !

বিনয় : কী হল ?

নির্মলা : বিয়ে হলে তুমি কি করবে গো ?

বিনয় : কেন ?

নির্মলা : না বাপু, তুমি কুঁদুলে হবে। খালি ঝগড়া করবে।

বিনয় : শুধু ঝগড়া।—ঠ্যাঙাবো।

নির্মলা : ইস্! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

বিনয় : গাছে না হোক, পাঁচিলে তো উঠেছি সেটাই বা কম কি উঁচু।

নির্মলা : পাঁচিলে উঠলেও কলা পাওয়া যায় বটে, তবে সেটা কি কলা জান ?

বিনয় : কী ?

নির্মলা : লবডংকা !

(দুজনে লাফিয়ে নেমে পড়ল দুদিকে)

(২ক)

(পঁচিশ দিন পরে একদিন। এ-বাড়ির রান্নাঘরে)

সতীশ : গিন্নি, গিন্নি—

হরমোহিনী : কি গো ? চেঁচাচ্ছ কেন ?

সতীশ : ও বাড়ির ঐ বেণী কালকে যে কুমড়ো পাঠিয়েছিল, সেটা কোথায় ?

হরমোহিনী : কেন ?

সতীশ : আগে উত্তর দাও কথার।

হরমোহিনী : আদ্দেকটা ওবেলায় তরকারির জন্যে কুটে ফেলেছি। বাকিটা ভাঁড়ার ঘরে আছে।

সতীশ : নিয়ে এস। ঐ কোটা-টুকরোগুলোও আনবে।

হরমোহিনী : কেন ?

সতীশ : ফেরৎ পাঠাব।

হরমোহিনী : সে কী ?

সতীশ : শুধু কুমড়ো নয়, এ বাড়িতেই ঐ ওদের দেওয়া যেখানে যাকিছু আছে, সব নিয়ে এস। সব ফেরৎ যাবে। কিছু থাকবে না। আমাদের বিয়ের সময় ও' যে একটা মাথার ওড়না দিয়েছিল তোমায়—সেটাও।

হরমোহিনী : এই পঁচিশ বছর পরেও সে-ওড়না থাকে ?

সতীশ : আমাদের নির্মলাকে ক'বছর আগে একটা শাড়ি দিয়েছিল না ?

হরমোহিনী : তা' দিয়ে কবে বাসনউলির কাছ থেকে কাঁচের গেলাস কেনা হয়ে গেছে।

সতীশ : সেই কাঁচের গেলাসটা আনো তাহলে।

হরমোহিনী : ব্যাপারটা কী ?

সতীশ : ও' আমার শত্তুর। বলে কিনা, ছুপালের

দোকানের রাবড়ির চেয়ে শ্যামলালের ছানার পায়েস খেতে ভাল ?

* * *

(২খ)

(সেইদিনই। ও-বাড়ির রান্নাঘরে)

বেণী : বলে কি না শ্যামলালের ছানার পায়েসের চেয়ে ভূপালের রাবড়ি খেতে ভাল ? সব কুছ্ লে আও। সব ফেরৎ যায়গা।

তারাসুন্দরী : এই নাও আমসত্ব। ও-বাড়ি থেকে পাঠিয়েছিল।

বেণী : ঠিক হ্যায়।—একদিন আইসক্রিম খাইয়েছিল না ?

তারাসুন্দরী : হ্যাঁ।—তা সেটা ফেরৎ দেবার উপায় আছে কি ?

বেণী : তাও ত বটে। তাহলে—

তারাসুন্দরী : ও হো মনে পড়েছে।—ও-বাড়ি থেকে গোবর চেয়ে এনেছিলুম সেদিন খানিকটা।

বেণী : ইমিজিয়েটলি ফেরৎ পাঠাও।—আর কিছু মনে পড়ছে ?

তারাসুন্দরী : উঁহু।

বেণী : ঘটি-বাটি-ইলিশমাছের ছ্যাচড়া—দোক্তাপাতা—মাসিকপত্র—মাথারকাঁটা—চুলের ফিতে—লাইব্রেরীর বই—তারকেশ্বরের তাগা—পাগলা কালির বালা—এনিথিং ? ভাল করে মনে করে ত্যাখো। মোটকথা, ও-বাড়ির এক কণা ধুলোও যেন এ বাড়িতে না থাকে।

* * *

(২গ)

(সেইদিনই। মাঝরাতে ছাতের ওপর। পার্টিশনের দুদিকে দুজন)

নির্মলা : এই ?—এসেছ ?

বিনয় : অনেকক্ষণ।—

নির্মলা : কি করব ? বাবা এই এতক্ষণে ঘুমোলেন যে।

বিনয় : আমার বাবা এখনও ঘুমোননি। পায়চারি করছেন ঘরে।

নির্মলা : তাহলে ?

বিনয় : জানতে পারলে বলব, বড্ড গরম তাই ছাতে উঠেছি।

নির্মলা : যাক্—এবার তুমি কী ফেরৎ দেবে দাও।

বিনয় : কী দিয়েছ তুমি যে, ফেরৎ দেব ?

নির্মলা : কিছুই কি দিইনি ?

বিনয় : একদিন ডালমুঠ, একদিন তেঁতুলের আচার, একদিন···

নির্মলা : এই দুঃসময়েও ঠাট্টা করতে মন হচ্ছে তোমার ? শুনেছ, তোমার বাবা আর আমার বাবা দু'জনেই বাড়িওলাকে বলেছেন—পাচিলটাকে আরো উঁচু করে গেঁথে দিতে।

বিনয় : শুনেছি।

নির্মলা : তারপরেও ঠাট্টা বেরোচ্ছে তোমার মুখ থেকে ?

বিনয় : আমি হাসিতে হাসিতে মরণসাগরে দিব ঝাঁপ।

নির্মলা : মানে ?

বিনয় : মরণ ত ঘনিয়ে আসছে, তাই হাসছি।

নির্মলা : মরণ ?

বিনয় : মরণ নয় ? এ বিচ্ছেদ যে মরণ সমান নির্মলা।

নির্মলা : আচ্ছা, তোমার বাবা তো মেনে নিলেই পারতেন যে ভূপালের রাবড়ি ভাল।

বিনয় : কিংবা তোমার বাবাও তো স্বীকার করে নিলেই পারতেন যে শ্যামলালের ছানার পায়েস Better !

নির্মলা : কিংবা বলতে পারতেন তো—দুটোই সমান।

বিনয় : কিংবা এও তো বলতে পারতেন যে, দুটোকে এক সঙ্গে মিশিয়ে নিলে যা হয়, তাই হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা খাদ্য।

নির্মলা : দূর, ভাল লাগছে না কিছু।

বিনয় : বাবা আবার বলেছেন বাড়ি খুঁজতে। পেলেই উঠে যাবেন।

নির্মলা : উফ্! মাগো!

এমনি সময় ছাতে উঠলেন নির্মলার বাবা সতীশবাবু

সতীশ : এত রাত্রে ছাতে কি করছিস রে নির্মলা?

নির্মলা : এই···এই···মানে···

সতীশ : কী করছিস?

নির্মলা : ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, ওবাড়ি থেকে কয়লার গুঁড়ো চেয়ে এনে গুল্ পাকানো হয়েছিল আমাদের ছাতে। তাই সেগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেরৎ দিচ্ছিলুম ও-ছাতে।

সতীশ : ভেরী গুড!—সব ছোঁড়া হয়ে গেছে?

নির্মলা : হ্যাঁ বাবা।

সতীশ : একটাও নেই?

নির্মলা : না বাবা।

সতীশ : আয় নিচে আয়। লক্ষ্মী মেয়ে।

(ওঁরা দুজনে নেমে গেলেন। ও ছাতে উঠলেন বিনয়ের বাবা বেণীবাবু)

বেণী : এত রাতে ছাতে উঠে কি করছিস রে বিনয়?

বিনয় : এই···মানে···ঐ ওবাড়ির ধিঙ্গী মেয়েটা গুল দিচ্ছিল কিনা···

বেণী : গুল্?

বিনয় : হ্যাঁ। মানে গুলপট্টি আর কি, মানে মিথ্যে। মিথ্যে-মিথ্যে সব কথা বলছিল ওর বাবার কাছে, তাই—

বেণী : তাতে তোর কী?

বিনয় : আহা, ছাতে এসেছিলুম শুতে, হঠাৎ কানে এল ওছাতের কথা, তাই পাঁচিলে কান পেতে দাঁড়িয়েছিলুম।

বেণী : ও:! তা বাপের কাছে আমার নামে কি লাগাচ্ছিল রে মেয়েটা?

বিনয় : বলছিল যে তুমি খুব ভাল লোক, খুব দয়ালু, খুব—

বেণী : শুনে বাপ কি বললে?

বিনয় : চুপ করে রইলেন।

বেণী : মেয়েটা সত্যিই ভাল রে।

বিনয় : আর দেখতেও খুব মিষ্টি-মিষ্টি সুন্দর বাবা।

বেণী : উঁ—ও:! চল্ নিচে চল্। চলে আয়। আগে নিচে নেমে আয় হতভাগা!

(৩ ক)

(দিন তিন-চার পরে। এ বাড়ির উঠোনে)

সতীশ : উ:! উঠোনময় রুটি আর পটল ভাজা ছড়িয়েছে ইঁদুরে। জিনিষপত্তর একটু চাপাচুপি দিয়ে রাখতে পার না?

হরমোহিনী : আমাদের তো রুটি হয়নি কাল রাতে পটল ভাজাও নয়।

সতীশ : তবে এগুলো এল কোত্থেকে?

হরমোহিনী : এ নিশ্চয়ই ওবাড়ির রুটি।

সতীশ : ওবাড়ির রুটি! ওবাড়ির রুটি এবাড়ির উঠোনে কেন?

হরমোহিনী। আ:! দু'বাড়ির নর্দমা তো একটা। ইঁদুরে ঐ উঠোনের নর্দমা দিয়ে ওবাড়ির রুটি টেনে এনেছে এবাড়িতে।

সতীশ : চলবে না। বলে দিও। ওবাড়ির রুটি যেন এবাড়িতে না ঢোকে কোনদিন। ভাল হবে না।

*　*　*

(৩ খ)

(পরদিন। ও বাড়ির উঠোনে)

বেণী : বেগুনভাজা আর পরোটা ছড়িয়েছে কে আমাদের উঠোনে?

তারাসুন্দরী : নিশ্চয় ইঁদুর।

বেণী : নির্ঘাৎ ওবাড়ির?

তারাসুন্দরী : তাছাড়া আর কি।

বেণী : বলে দিও, ওবাড়ির বেগুনভাজা এ বাড়িতে এলে খুনোখুনি হয়ে যাবে।

*　*　*　*

(৩ গ)

(আরেকদিন। এ বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে)

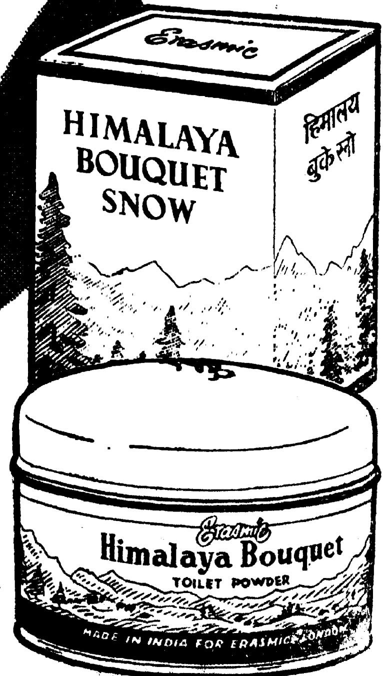
হরমোহিনী : আ:!—মুখপোড়া ইঁদুরটা তো বড় জ্বালালে। কোথা থেকে এক রাশ আধপোড়া বিড়ি এনে জড়ো করেছে ভাঁড়ারঘরের তাকের তলায়।

তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন
হিমালয় বোকের সাহায্যে



এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ স্নোটি আপনাকে সুরভিত ও সতেজ রাখবে।

হিমালয় বোকে স্নো



এই মোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।

হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার

এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

সতীশ : বিঁড়ি ?—এ নির্ঘাৎ ওবাড়ি থেকে টেনে এনেছে। বলে দিও গিন্নি, কারুর আধপোড়া বিড়ি ফের যদি কোনদিন এ বাড়িতে ঢোকে তো সর্ব্বনাশ কাণ্ড হয়ে যাবে।

* * * *

(৩ ঘ)

(সেইদিনই। ওবাড়ির দালানে)

তারাসুন্দরী : এ ম্যা !—আমাদের কয়লা-রাখা বাক্সের কোণে চারটে লাল-লাল ইঁদুরছানা কিলবিল করছে ম্যাগো !

বেণী : ছানা ?—বলে দিও গিন্নি, কারুর ছানা যদি ফের কোনদিন এবাড়িতে ঢোকে তাহলে……

তারাসুন্দরী : আঃ ! ছানা আবার ওবাড়ির হতে যাবে কোন্ দুঃখে ? ছানা তো ইঁদুরের। মাথা-টাথা সব গেছে দেখছি !

* * *

(৩ ঙ)

(সেইদিন। রাত্তির। ছাতে, পাঁচিলের দুধারে দুজন)

নির্মলা : এই—এসেছ ?

বিনয় : হ্যাঁ।

নির্মলা : কী হবে বলতো ?

বিনয় : কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ঝগড়া তো দিন দিন বেড়েই চলেছে।

নির্মলা : অথচ বাবার ডায়েরী খুলে সেদিন কি দেখছিলুম জান ?

বিনয় : কী ?

নির্মলা : খালি হা-হুতাশ। বেণীকাকার নাম করে পাতায় পাতায় কেবলই লিখেছেন, অমুক আজও তো কই এল না ঝগড়া মিটোতেঃ।

বিনয় : আরে, আমার বাবারও তো হুবহু এক অবস্থা !—ডায়রীর পাতাময় কেবল সতীশকাকার নাম। আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে জান ?

নির্মলা : কেউ কারুর কাছে নিচু হবে না।

বিনয় : ঠিক তাই। ইনি ভাবছেন ও' আগে আসুক, উনি ভাবছেন ও' আগে আসুক।

নির্মলা : অর্থাৎ নো হোপ্।

বিনয় : আরে, এতদিনে কবে ভাব হয়ে যেত। ঐ হতচ্ছাড়া ইঁদুরটাই তো বাড়িয়ে তুলছে ঝগড়াটা দিন দিন।

নির্মলা : একটা ইঁদুর-কল পাতো।

বিনয় : পেতেছিলুম। হতাশ হয়েছি।

নির্মলা : ভগবান, ইঁদুরটাকে হাতি করে দাও।

বিনয় : কেন ?

নির্মলা : তাহলে আর গলতে পারবে না নর্দমা দিয়ে।

বিনয় : ধুস্ !—তার চেয়ে বুজিয়ে দিই নর্দমাটা।

নির্মলা : বাঃ ! তাহলে জল যাবে কি করে ?

বিনয় : তাও তো বটে।

নির্মলা : অন্ধকার ! অন্ধকার ! নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ! উফ্, মাগো !

বিনয় : ইউরেকা !

নির্মলা : কি হল ? কামড়ালো কিছুতে ?

বিনয় : পেয়ে গেছি।

নির্মলা : কী ?

বিনয় : উপায়।

নির্মলা : কিসের ?

বিনয় : ইঁদুর কার বাহন বল তো ?

নির্মলা : সিদ্ধিদাতা গণেশের।

বিনয় : ঐ ইঁদুরেই আমাদের কার্যসিদ্ধি করবে।

নির্মলা : অর্থাৎ ?

বিনয় : ইঁদুরে এতকাল রুটি পরোটা বেগুনভাজা বিড়ি আমস্বত্ব এই সব টেনে নিয়ে গেছে তো এবাড়ি থেকে ওবাড়ি ?

নির্মলা : হ্যাঁ।

বিনয় : এবার নিয়ে যাবে অন্য জিনিষ।

নির্মলা : তুমি কি আজকাল ইঁদুরের ভবিষ্যৎ গণনা করতে সুরু করেছ ?

নির্মলা : হেঁয়ালা রাখো।

বিনয় : হেঁয়ালী নয়, নিতান্তই সরল পদ্ধতি। কিন্তু এমন করে নয়। পাঁচিলে ওঠো, কানে কানে বলবো।

(৪ ক)

(পরদিন সকাল। এবাড়ির বসবার ঘর)

সতীশ : আঃ, আমার টেবিলের তলায় একরাশ কুচো কাগজ এল কোত্থেকে ? ফেলে দে তো নির্মলা।

নির্মলা : কুচো কাগজের সঙ্গে একটা ডায়েরী রয়েছে বাবা।

সতীশ : ডায়রী!

নির্মলা : হ্যাঁ বাবা।—ওবাড়ির বেণীকাকার নাম লেখা। নিশ্চয়ই ইঁদুরে টেনে এনেছে বাবা।

সতীশ : নির্ঘাৎ।—দে তো দেখি।

নির্মলা : এই নাও।—আমি বাইরে যাব বাবা ?

সতীশ : উঁ ?—হ্যাঁ।—দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা তো মা।

*   *   *

(৪ খ)

(সেই মুহূর্তেই। ওবাড়ির শোবার ঘর)

বেণী : আঃ,আমার তক্তপোষের তলায় কী এগুলো ?

বিনয় : কুচো কাগজ বাবা। ফেলে দেব ?

বেণী : দে।

বিজয় : কুচো কাগজের সঙ্গে একটা ডায়েরী রয়েছে বাবা।

বেণী : ডায়েরী !

বিজয় : হ্যাঁ বাবা। সতীশকাকার নাম রয়েছে।

বেণী : নিঃসন্দেহে।—দে তো দেখি।

বিনয় : এই নাও।—আমি কুচো কাগজগুলো ফেলে আসছি বাবা।

বেণী : উঁ ?—হ্যাঁ।—দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেয়ো।

*   *   *

(৪ গ)

(আধঘন্টা পরে। এ বাড়ির)

সতীশ : নির্মলা ?

নির্মলা : কি বাবা ?

সতীশ : ভেতরে এস।

নির্মলা : যাচ্ছি বাবা।—তুমি কি কাঁদছিলে বাবা ?

সতীশ : য়্যা ?—না…মানে…কি যেন পড়ল চোখে। এক কাজ করো।

নির্মলা : বল বাবা।

সতীশ : উঠোন থেকে ওবাড়ির কাকাবাবুকে চেঁচিয়ে বল যে তার ডায়রীটা যদি সে ফেরৎ চায় তো যেন সদরে গিয়ে দাঁড়ায়।

নির্মলা : এক্ষণি যাচ্ছি বাবা।

*   *   *

(৪ ঘ)

(সেই মুহূর্তে। ও বাড়ির)

বেণী : বিনয় ?

বিনয় : কি বলছ বাবা ? ভেতরে যাব ?

বেণী : এস।

বিনয় : তোমার চোখে কি বালি-টালি কিছু পড়েছে বাবা ?

বেণী : য়্যাঁ ?—হ্যাঁ।—শোনো, ওবাড়ির কাকাবাবুকে চেঁচিয়ে বলে দাও যে, সে যদি তার ডায়রীটা ফেরৎ চায় তো যেন সদরে গিয়ে দাঁড়ায়।

বিনয় : এক্ষণি বলে দিচ্ছি বাবা।

*   *   *

(৪ ঙ)

(পাঁচ মিনিট পর। সদর দরজায়)

বেণী : এই নাও তোমার ডায়েরী।

সতীশ : এই নাও তোমার।

বেণী : আমারই ভুল। তোমার ভূপালের রাবড়িই ভাল।

সতীশ : উঁহু, আমারই ভুল।—শ্যামলালের ছানার পায়েসের তুলনা নেই।

বেণী : লজ্জা করল না এতদিন ঝগড়া চালাতে ?

সতীশ : লজ্জা করল না এতদিন কথা না কয়ে থাকতে।

বেণী : জান ? এ কদিন রাত্তিরে ঘুমোইনি ?

সতীশ : জান ? এ কদিন আধপেটা খেয়েছি ?

বেণী : নিষ্ঠুর।

সতীশ : পাষাণ।

* * *

(৪ চ)

(সেই মুহূর্তে। অন্দরে)

হরমোহিনী : খুব যা হোক দিদি, ঝগড়া হল কত্তায় কত্তায়—তো তুমি কি না গোবর পর্যন্ত ফেরৎ পাঠালে ?

তারাসুন্দরী : তুমিই বা কোটা-কুমড়ো ফেরৎ পাঠালে ভাই কোন্ প্রাণে ?

হরমোহিনী : আজ কিন্তু দিদি এ-বেলা আমাদের দিকে তোমাদের সকলের নেমন্তন্ন।

তারাসুন্দরী : আর ও-বেলা আমাদের দিকে তোমাদের সবাইকার।

হরমোহিনী : এই নাও দিদি, দুখিলি।

তারাসুন্দরী : এই ধরো ভাই দোক্তা খানিকটে।

* * *

(৪ ছ)

(কিছুক্ষণ পরে। ছাতের ওপরে)

নির্মলা : এই ?

বিনয় : উঁ ?

নির্মলা : আমার মা কি বলছিলেন জান ?

বিনয় : কী ?

নির্মলা : তোমার মাকে ডাকছিলেন বেয়ান বোলে।

বিনয় : আমার বাবা কি বলছিলেন জান ?

নির্মলা : কী ?

বিনয় : সতীশকাকাকে বলছিলেন বেয়াই।

নির্মলা : বাবা আর বেণীকাকা দুজনে মিলে কি ঠিক করেছেন জান ?

বিনয় : কী ?

নির্মলা : ভূপালের রাবড়ি আর শ্যামলালের ছানার পায়েস একসঙ্গে চটকে খাবেন আজ।

বিনয় : আর কি ঠিক করেছেন জান ?

নির্মলা : কী ?

বিনয় : এই পাঁচিলটাকে ভেঙ্গে ফেলবেন শীগগিরই।

নির্মলা : এই রে !

বিনয় : কি হল ?

নির্মলা : তাহলে আমরা রোজ সন্ধ্যেয় বসব কোথায় গো ?

চির যৌবনা

আলো নাগ

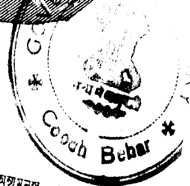
কাঞ্চনের পালা শেষ। ফিরে গেল মৌমাছির দল।
শীর্ণপ্রাণ শিরীষেরা ক্লান্ত দেহে চুমেছে ভূতল।
পলাশে নিভিল বহ্নি, শিমূলে রক্তিমা গেল মুছি'
পর্য্যাপ্ত ফলের ভারে, চটুলতা গেছে তার ঘুচি।
ভাবহীন দৃষ্টি মেলি আকাশ বসেছে যোগাসনে
লাবণ্য মাধুরী তার মুচে গেল ফাল্গুনের সনে।
বসন্তের লীলাভঙ্গে ধরা তবু অটুট যৌবনা
নিদাঘ ঔজ্জ্বল্যে তার সৌন্দর্য্যের নব আবর্তনা।
কৃষ্ণচূড়া অগ্নিময়ী পুঞ্জীভূত স্ফুলিঙ্গের রাগে,
বেগুনী জারুল বনে প্রজাপতিদের মেলা লাগে,
থোলোথোলো গোলঞ্চেরা খুলেছে গন্ধের সদাব্রত,
ল্যাবার নামের গুচ্ছ দোলে পীত আঙুরের মত,
জ্বলে স্বর্ণকণারাশি ক্যাসিয়ার কালো দেহ ভরি—
বৈশাখে নাগরী ধরা দেখা দিল প্রখর সুন্দরী॥



কিশোর জগৎ

একদিন যাঁরা নির্ব্বোধ ছিলেন

উপানন্দ



বিদ্যালয়ে আর মহাবিদ্যালয়ে তোমাদের মধ্যে যারা নির্ব্বোধ, ধীশক্তিশূন্য ও হিতাহিতজ্ঞানরহিত বলে অনাদৃত আর অবজ্ঞেয়, তাদের পক্ষে ভগ্নোৎসাহ হয়ে নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হওয়ার কোন কারণ দেখি না। কেন না পরিণত বয়সে যাঁরা অসাধারণ মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন, সেই সব মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের অনেকেই ছাত্রজীবনে মহামূর্খরূপে লোকসমাজে নিন্দিত হয়েছেন। লেখাপড়ায়, বুদ্ধি বিবেচনায়, কথাবার্ত্তায় বা আচার ব্যবহারে তাঁরা আদৌ ভালো ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন এক গুঁয়ে আর নির্ব্বোধ, লেখাপড়ায় তাঁদের মন কোন মতেই বস্‌তো না। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোন দিনই তাঁদের প্রতি সদয় ছিলেন না। পড়াতে পড়াতে ক্লাসের ভেতর শিক্ষকরা তাঁদের প্রতি কটূকাটব্য উক্তি করে শেষে মন্তব্য করতেন—'গোমুখ্যু, মাথায় গোবর পোরা, বোকচন্দর, গর্দ্দভ, লেখাপড়া কিছু হবে না, ভেড়া চরাও গে, ঘাস কাটো গে ইত্যাদি।' তাঁরা শিক্ষকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাক্‌তেন। তাঁরাই পরবর্ত্তীকালে সাধনার বলে সাহিত্যে-কাব্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্পকলায় জগদ্বরেণ্য হয়ে অনন্তকালের বুকে নিজেদের প্রতিভার শাশ্বত স্বাক্ষর রেখেছেন।

আলবার্ট আইনষ্টাইন মিউনিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিদ্যাভ্যাসের সময় তাঁর শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দকে একেবারে হতাশ করেছিলেন। বিদ্যালয়ে তাঁর মত অত্যন্ত নির্ব্বোধ ছেলে ছিল না বল্‌লেই হয়, পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হোতে পার্‌তেন না, তার ওপর ছিলেন ভীরু, উদাসী আর লাজুক। এরূপ লেখাপড়ার অবস্থা দেখে আইনষ্টাইনের মাতা-পিতা ভেবেছিলেন এই সন্তানের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁকে তাঁরা বল্‌তেন—'তুমি আমাদের বংশের কুলাঙ্গার—'

ছাত্র জীবনে আইনষ্টাইন ভালো করে গুছিয়ে কথা বল্‌তে শেখেননি, জড়তা লক্ষ্য করা যেতো। শিক্ষকরা তাঁকে বিদ্যালয়ে রাখ্‌তে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে তাঁরা মন্তব্য করে বলেছিলেন—এ ছেলে বিদ্যালয়ে কেন যে জ্বালাতে আসে! পড়াশুনায় অন্যমনস্ক, ক্লাসের অনুপযুক্ত,—বুদ্ধিহীন—এমন কি অতি সাধারণ ছেলের মতও মাথা নেই।

আইনষ্টাইন অবশেষে নিজের ইচ্ছামত অঙ্ক ও বিজ্ঞানের অনুশীলন কর্‌তে লাগলেন কিন্তু তার ফল মোটেই ভালো হোলো না। তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে চলে গেলেন। জুরিকে পলিটেকনিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হবার জন্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি পরীক্ষায় শোচনীয়ভাবে অকৃতকার্য্য হোলেন। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা দিয়ে কোনরকমে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলেন বটে, কিন্তু তাঁর ভেতরে নিকৃষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল। যাহোক তিনি, ছাব্বিশ বছর বয়সে, ই-এম্‌সিটু সমীকরণের প্রসঙ্গে যে নূতন তত্ত্ব বিবেচনার জন্যে উপস্থাপিত কর্‌লেন, আমাদের সাম্‌নে তুলে ধর্‌লেন যে মহাজাগতিক রহস্য আপেক্ষিকবাদের মাধ্যমে, তা থেকেই তাঁর আকস্মিক প্রতিভার আলোক স্ফুরিত হয়ে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে, আর যন্ত্রসভ্যতা-পুষ্ট-পার্থিব বিজ্ঞানের অগ্রগমনের পথ-প্রদর্শক হয়েছে।

স্যার আইজ্যাক নিউটনের মহাজাগতিক মতবাদকে আইনষ্টাইন খণ্ডন করেছেন কিন্তু তাঁর মত নিউটন ছাত্র জীবনে নির্ব্বোধ ছিলেন না, কিন্তু অঙ্কে ছিলেন অত্যন্ত কাঁচা। পড়াশুনায় নিউটনের মন বস্‌তো না, বইয়ের পাতা খুল্‌তেন না, আর ক্লাসে পড়াও দিতে পারতেন না। ঘুড়ি, কাঠের ঘড়ি, জলতোলার চাকা এই সব তাঁর খেলার জিনিষ ছিল।

যে সব স্বনামধন্য মহান্ ব্যক্তি বাল্যজীবনে নির্ব্বোধ আর মূর্খের তালিকাভুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিবর্ত্তনবাদের উদ্গাতা চার্লস ডারউইন বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বাল্যাবস্থায় তিনি প্রকৃতির পাঠশালায় পড়্‌বার চেষ্টা করেছেন আর অবহেলা করেছেন বিদ্যালয়ের পড়ায়, ফলে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের ভেতর তাঁর নাম খুঁজে পাওয়া যেতো না। তাঁর

শিক্ষকরা বল্‌তেন—বিদ্যাবুদ্ধিতে এরূপ অপরিপক্ক নিকৃষ্টতম ছাত্র তাঁরা কখন দেখেন নি।

সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, ছাত্রজীবনে তাঁদের অনেকেই ছিলেন যথাটে ইস্কুল-পালানো মেধাহীন, নির্ব্বোধ ছেলে। এই রকম ছেলে ছিলেন অলিভার গোল্ডস্মিথ। ডাব্‌লিনের ট্রিনিটি কলেজ থেকে তাঁর ভাগ্যে কোনদিন ডিগ্রীলাভ হোলো না, বাল্যাবস্থায় তিনি ছিলেন ঠিক গোবরগণেশের মত, কথাবার্ত্তা বল্‌তেন বোকার মত, তার ওপর ছিলেন লাজুক। তাঁকে দেখে কেউ ভালো বল্‌তো না। এডিনবরায় পদার্থ বিজ্ঞান, লণ্ডনে আইন আর হল্যাণ্ডের লিডেনে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল, কোনটাতেই তিনি কখন কৃতকার্য্য হোতে পারেননি। সকল রকম সামাজিক আমোদ-প্রমোদে তিনি বেশী আগ্রহ প্রকাশ কর্‌তেন, গান লিখতেন ভিক্ষুকদের জন্যে আর ঘুরে বেড়াতেন চিন্তাশূন্য হয়ে ভবঘুরের মত—কিন্তু শেষে অলিভার গোল্ডস্মিথ ইংরাজী সাহিত্যে অমর হয়ে রইলেন।

তোমরা বোধ হয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক এড্‌ওয়ার্ড গিব্‌সনের নাম শুনেছ। বিদ্যালয়ে ইনি কোনদিনই লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন না; তাঁর ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁর খুড়ি মা তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। যে সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হোতো, সে সময়ে ঐ মহিলা তাঁকে ভালো-ভাবে লেখাপড়া কর্‌বার জন্যে চাপ দিতেন। তাঁর শিক্ষকরা তাঁকে দেখেছেন অঙ্কে, ইংরাজীতে আর ল্যাটিনে খুব কাঁচা। তাঁকে ভর্ত্তি করা হোলো বিদ্যালয়ে তাঁর ন'বছর বয়সে, কিন্তু লেখাপড়ায় কোন উন্নতি হোলো না। তাঁর নাম কাটিয়ে দেওয়া হোলো বিদ্যালয় থেকে। তিনি ঘরে বসে গৃহ-শিক্ষকদের কাছে পড়াশুনা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

'মূর্খের রাজা' এই অপবাদ মাথা পেতে নিয়েছিলেন স্যার ওয়াল্টার স্কট তাঁর প্রথম জীবনযাত্রার পথে, আর পদে পদে জনসমাজের উপহাসাস্পদ হয়েছিলেন তিনি।

তোমরা তাঁর অনেক লেখাই পড়েছ—ইনি লিখেছেন অসংখ্য গল্প, কতকগুলি সুন্দর উপন্যাস। এঁর লেখায় অজস্র আনন্দ পেয়েছেন ইংরাজী সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা।

এই রকম স্তরের বোকা মূর্খ ছিলেন টমাস চ্যাটারটন। তিনি লেখাপড়ায় অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়ায় বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। আর একটি মূর্খ শিরোমণি ছিলেন লর্ড কেনিজ। যে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত কাঁচা ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে সেই বিষয়েই তিনি মহাপ্রাজ্ঞ হয়ে শেষে সর্ব্বোত্তম স্থান অধিকার করে সর্ব্বজনবরেণ্য হয়েছিলেন। অর্থনীতিতে সব চেয়ে কম নম্বর পেয়ে তিনি কোনরকমে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, অথচ উত্তরকালে কেনিজ বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদরূপে সমাদৃত হয়েছিলেন। তিনি ওয়ার্ল্ড-ব্যাঙ্কেরও ডিরেক্টর হয়েছিলেন।

শিক্ষা সংস্কারকরূপে ফ্রেডারিক উইলহেল্‌ম ফ্রোবেল প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন কিন্তু বিদ্যালয়ে তাঁর মত মহামূর্খ ও নিরেট বোকা সে সময়ে কেউ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে পাঠানো হোলো। তিনি ফরেষ্টারের কাছে শিক্ষানবিশী কাজ নিলেন। তারপর জেলাবিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভর্ত্তি হোলেন, কিন্তু বে-হিসেবী রকমের খরচ করে দেনার দায়ে জেলে গেলেন। কারাগারে যে ক'টা বছর তিনি কাটিয়েছিলেন, সেই কটা বছর ধরেই নিজের মত করে সর্ব্ব বিষয়ে কঠোরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন যাতে তিনি সমাজ-সংসারে একজন বিশিষ্ট শিক্ষক হিসাবে স্থান করে নিতে পারেন। তাঁর সে সাধনা ব্যর্থ হয়নি। জার্ম্মেনে একটি আদর্শ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছেন। সর্ব্বযুগের সর্ব্বদেশের সর্ব্বোত্তম শিক্ষাবিদ্‌গণের অন্যতম হিসাবে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল বাল্যজীবনে বুদ্ধিহীন মেধাশূন্য মহামূর্খ ছিলেন। ছেলেবেলায় তিনি বিদ্যাভ্যাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে লেখাপড়া করানো সমস্যার বিষয় হয়েছিল। অঙ্কশাস্ত্রের সঙ্গে ছিল তাঁর চরম শত্রুতা। তিনি বল্‌তেন—'এই সব সংখ্যাগুলো পরস্পর ধার দেওয়া-দেওয়ি নিয়েই মেতে আছে, কী ঝকমারি; এক সংখ্যার কাছ থেকে আর একটিকে ধার নিয়ে তবে আবার তোমাকে হিসেবে পুরণ করে দিতে হবে—এ সব কাণ্ডকারখানা কে সইবে বাপু:—'

এস্কট স্কুলে তাঁকে বেত খাবার জন্যে প্রায়ই বেত মারার ঘরে ঢুকতে হোতো। যে প্রধান শিক্ষক তাঁকে বেত মার্‌তেন, তাঁর প্রতি প্রতিশোধ নেবার জন্যে চার্চ্চিল বেশ মতলবও এঁটেছিলেন। এর পর দুটি প্রৌঢ়া মহিলা দ্বারা পরিচালিত ব্রাইটনের একটি বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্ত্তি করে দেওয়া হোলো। এখানেও তিনি এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা ও মহামূর্খতার পরিচয় দিলেন যে, বাধ্য হয়ে তাঁকে বিদ্যালয় ত্যাগ কর্‌তে হোলো। তাঁর বিদ্যালয় ত্যাগের সময় মহিলাদ্বয় সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দে প্রমত্ত হবার জন্যে বিদ্যালয়ের আধবেলা ছুটি দিলেন। চার্চ্চহিলের বিদ্যালয় ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। হ্যারোতে, যে সব উত্তীর্ণ ছেলে পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করেছিল তাদের তালিকায় চার্চ্চহিলের নাম ছিল সবার নীচে। স্যাণ্ডহার্ষ্ট মিলিটারী কলেজে প্রবেশ কর্‌বার জন্যে যখন তিনি এগিয়ে গেলেন, তখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাঁর শোচনীয় অকৃতকার্য্যতা প্রকাশ পেয়েছিল। পুনরায় পরীক্ষা দিলেন বটে কিন্তু এবার শুধু পরীক্ষায় ফেল হোলেন না, আগের চেয়েও নম্বর কম পেলেন। তৃতীয়বার পরীক্ষা দিয়ে কোনরকমে পাশ নম্বর রেখে তিনি বেরিয়ে এলেন। এই সব অপযশই তাঁর মধ্যে অত্যন্ত জেদ এনে দিয়েছিল, যার ফলে তিনি আজ পৃথিবীতে গৌরব-শিখরে আরোহণ করতে পেরেছেন। বিদ্যালয়ে যারা বুদ্ধির ঢেঁকি, গোবরগণেশ বা আকাটমূর্খ বলে অনাদৃত হয়, তোমরা জেনে রেখো, তাদের মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে মহান্ ব্যক্তিত্ব—যদি এরা হাল না ছেড়ে দিয়ে বারে বারে অকৃতকার্য্য হয়েও সাধনা করে যায়, তাহলে দেখে এরা একদিন কৃতীপুরুষ হয়ে জননীর মুখোজ্জ্বল করতে পারে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিদেশে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে (কানাডা সমেত) আনুমানিক হিসাবে ২৮০০

ভারতীয় ছাত্র পড়াশুনা করছে, ৩৮৫০ জন গ্রেটব্রিটেনে আর ১২৮জন রাশিয়াতে অধ্যয়নরত। ১৯৫৮ সনের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এইরূপ সংখ্যা পাওয়া গেছে। ১৯৫৮ সনের জানুয়ারী থেকে অক্টোবরের মধ্যে ১,০২০জন ছাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১,১৭৭জন ছাত্র গ্রেটব্রিটেনে অধ্যয়নের জন্যে প্রবিষ্ট হয়েছে। ঐ বছরে রাশিয়ায় কোন ছাত্র পড়্‌তে যায়নি।

ভারতে বৈদেশিক ছাত্রবৃন্দ

পৃথিবীর বিভিন্ন চল্লিশটী দেশ থেকে একশো বাটজন ছাত্র ১৯৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতসরকারের ব্যয়ে পড়্‌তে এসেছে। এই ছাত্রদের ব্যয় নির্ব্বাহ করতে ভারতসরকারকে ৪,০৩,৯৮৫,৬৬ টাকা দিতে হয়েছে। যে সব দেশ থেকে ছাত্ররা ভারতে পড়্‌তে এসেছে, নিম্নে তাদের নাম দেওয়া গেল :—

এডেন, আফগানিস্থান, অষ্ট্রিয়া, ব্রিটিশ ইষ্ট আফ্রিকা, ব্রিটিশ সেণ্ট্রাল আফ্রিকা, ব্রিটিশ ওয়েষ্টইণ্ডিজ, ব্রিটিশ গায়েনা, বর্ম্মা, কাম্বোডিয়া, সিংহল, চেকোশ্লোভেকিয়া, মিসর, ইথিওপিয়া, ফিজি, ঘনা, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, জাপান, মালয়, মরিসাস, নেপাল, নাইগেরিয়া, নরওয়ে, পার্শিয়ান গাল্‌ফ, ফিলিপাইন্‌স, সিকিম, ভুটান, তিব্বত, সাউথ আফ্রিকা, সুদান, সিরিয়া, থাইল্যাণ্ড, ত্রিনিদাদ, ট্রাষ্টটেরিটেরিজ, টিউনিসিয়া, রাশিয়া, নর্থভিয়েৎনাম, সাউথ ভিয়েৎনাম, পশ্চিম জার্ম্মানী ও যুগোশ্লাভিয়া।

বৃষ্টি ধারায় ধন্য তুমি

সলিল মিত্র

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি ঝরে—বর্ষা হলো সুরু,
শুনছি কেবল আকাশ-বুকে মেঘের গুরু-গুরু !
বিষ্টি-ছোঁয়ায় ভিজলো মাটি ফসল হবে ভাল,
চাষীর মনের দ্বন্দ্ব গেল, ঘুচল মনের কাল।
গরম লেগে ঝিমিয়েছিল সব চাষীদের মন,
এবার তারা ফসল বোনার করছে আয়োজন।
লাঙল দিয়ে চষবে মাটি চন্দনেরই মত—
তাদের এবার নতুন কিছু সৃষ্টি করার ব্রত।
উৎসাহেতে শক্ত মুঠোয় ধরবে চাষী হাল,
বৃষ্টি ধারায় ধন্য তুমি, ধন্য বর্ষাকাল।

মুক্তি

শ্রীহরিপদ গুহ

অনেকদিন নতুন বৌদি কোন গল্প বলেন নি। সেদিন তাঁকে একটু অনুরোধ করতেই তিনি গল্প বল্‌তে আরম্ভ করে দিলেন :—

পৃথিবীতে যেমন কোন অন্যায় কাজ করলে তার সাজা—ফাঁসী কিম্বা দ্বীপান্তর, স্বর্গেও তেমনই যদি কেউ পাপাচরণ করে, তবে তারও দণ্ড হয়—চিরদিন মর্ত্তে এসে বাস করা। বেচারার কিন্তু আর স্বর্গসুখ ভোগ করা হয় না ! এটা কিন্তু তাঁদের পক্ষে বড় কম শাস্তি নয় !

সে অনেকদিনের কথা।

একবার দেবরাজ ইন্দ্র কোনো স্বর্গ-বাসীর অসৎ ব্যবহারে বড়ই রুষ্ট হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন—'যাও, পৃথিবীতে গিয়ে রাক্ষস হয়ে জন্ম গ্রহণ কর !'

বেচারা তো 'হাউ হাউ' করে কেঁদে উঠল। দেবরাজের পায়ে ধরে কতই কাকুতি মিনতি জানাতে লাগল। হাজার হোক্ দেবতা তো, তাঁর প্রাণটা একটু নরম হলো। দেবতারা যেমন চট্ করে রেগে উঠেন, আবার থপ করে তেমন ঠাণ্ডাও হয়ে যান।

স্বর্গপতি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—'আমার কথা তো মিথ্যে হবার নয় বাপু, যা ব'লেছি তা হ'তেই হবে। শুধু এইটে ভালো করে জেনে রাখো, যে মুহূর্ত্তে তুমি নিজের ভুল বুঝে রাক্ষসের ধর্ম্ম প্রাণীহিংসা ত্যাগ করতে পারবে, সেই দণ্ডেই হবে তোমার মুক্তি !

সে বেচারা কী আর করে ! কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেলো।

* * *

মস্ত বড় রাজ্য,—প্রকাণ্ড রাজপুরী। প্রাসাদের চুড়ো আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। প্রজারা খুব সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করে, সকলেই বলে—'রামরাজত্বে' বাস করছি !

হঠাৎ তাদের দেশে এক নূতন উৎপাত এসে জুটল।

আজ ওর গরুটা, কাল তার ঘোড়াটা খুঁজে পাওয়া যেতে লাগ্‌ল না। সকলে মিলে রাজ-সভায় এসে নালিশ রুজু করলে। মন্ত্রীরা তখন পরামর্শ করে ঠিক্ করলেন—রাজ্যে নিশ্চয়ই চোর এসেছে!

রাজামশাই দ্বিগুণ পাহারা বসিয়ে দিলেন; সৈন্যেরা সব লাঠি ঘাড়ে নিয়ে, তলোয়ার হাতে করে চোর ধরবার জন্য রাজ্যময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু বৃথা, সব বৃথা; কোন ফলই হলো না। দিন দিন অত্যাচার বেড়েই যেতে লাগলো।

শেষকালে মানুষ নিয়ে টানাটানি পড়ে গেলো। আজ এক প্রজার ছেলে, কাল অন্যলোকের মেয়ে উধাও হতে লাগলো। রাজামশাই আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। তিনি চুপি চুপি অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এক রাত্রে গোপনে পাহারা দিচ্ছেন, এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন—একটা রাক্ষস অশ্ব-শালায় ঢুকে তাঁর বড় আদরের পক্ষীরাজ ঘোড়াটীকে খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। দেখেই তো রাজামশাইর আত্মাপুরুষ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো! তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

মহারাজের চোখে ঘুম নেই, সময়ে খাওয়া নেই; তিনি কেবলই ভাবেন আর ভাবেন—কবে দেশ থেকে রাক্ষস তাড়াবেন! মন্ত্রীদের সঙ্গে অনেক মন্ত্রণা করে তিনি ঢেঁড়া পিটিয়ে দিলেন—'যে এই রাক্ষসকে মারতে কিম্বা রাজ্য হতে দূর করে দিতে পারলে, তাকে রাজা অর্দ্ধেক রাজ্য এবং রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেবেন।'

কত দেশের কত রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র এসে উপস্থিত হলো, কিন্তু রাক্ষস মারতে না পেরে, তার আহারের খোরাক হয়ে পেটের ভেতর গিয়ে তারা স্থান নিলে।···

দেখতে দেখতে রাজা গেলেন, মন্ত্রী মলেন, রাজ্য জনহীন হলো! যা' দু'চার জন রইল, তারা অন্য দেশে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচালে। রাজার বিশাল পুরী খাঁ খাঁ করতে লাগলো! নগর একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়ে গেলো।

* * *

তখন সেই রাজ্যে রাক্ষস একাই মনের সুখে বাস করতে লাগলো। এখন তো আর খাবার কিছু নেই, যা' ছিল সবই খেয়ে সে শেষ করে ফেলেছে, তাই সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্য রাজ্যে চলে যায় সে তার খাদ্য অন্বেষণ করতে, আর ভোরের সময় রাজপুরীতে ফিরে এসে পড়ে-পড়ে ঘুমোয়। মাঝে-মাঝে কোনো পথিক যখন পথ ভুলে সে দিকে আসে, তখন সে তাকে ধরে নিয়ে রাজপুরীতে আট্‌কে রাখে এবং সুবিধামত বেশ মজা করে খায়। এই রকমে তার দিনগুলো কেটে যেতে লাগলো!

একদিন একটী বালিকা তার বৃদ্ধ অন্ধ পিতার হাত ধরে গান গাইতে গাইতে সে-দেশে ভিক্ষা করতে এসেছিলো। মেয়েটি তো অবাক্! এত বড় রাজ্য, একটাও লোক নেই কেন এতে? ভাবলে—রাজ-বাড়াতে গেলে হয় তো কিছু ভিক্ষা মিল্‌তে ও বা পারে! তাই সে ধীরে ধীরে ফটকের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো।

ঠিক সেই সময় বিকট হাস্য করে রাক্ষস তাদের সাম্‌নে এসে হাজির হলো। মেয়েটি তো প্রায় মূর্চ্ছা যায়, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দু'হাত দিয়ে তার বাপকে জড়িয়ে ধরলে। বাপ চক্ষুহীন; সে তো আর কিছু দেখতে পায় না, তবু অবস্থাটা বুঝে নিয়ে আস্তে আস্তে মেয়ের গায়ে মুখে হাত বুলুতে লাগল।

রাক্ষস তার প্রকাণ্ড দুই হাত বাড়িয়ে বল্‌লে—'কচি মাংস খেতে ভারি মজা;—তোকেই আগে খাবো।'

বালিকা তাকে মিনতি করে বল্‌লে—'ওগো, আমাদের যে কেউ নেই! আমায় মারলে বাবাকে কে দেখবে? কে তাঁকে খাইয়ে দেবে?'

রাক্ষস হাস্‌তে হাসতে বল্‌লে—'অতটা আর ভেবে কষ্ট পেতে হবে না। তোকে খেয়ে, তোর বাপকেও শেষ করব!'

মেয়েটি এবার কেঁদে ফেল্‌লে—'ওগো, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমার বাবাকে মেরো না! আমাকে তুমি যত যন্ত্রণা দাও—সব সহ্য করব; বাবার কষ্ট কিন্তু চোখে দেখতে পারব না! তুমি আমায় খাও, আমার কোনো আপত্তি নেই—শুধু সাতদিন সময় আর কিছু টাকা দাও, বাবার একটা বন্দোবস্ত করে আসি। তুমি আমায় বিশ্বাস করো, আমি সত্যই ফিরে আস্‌ব!'

কি জানি, কি ভেবে রাক্ষস তাতেই রাজী হয়ে বহু অর্থ দিয়ে তাকে বিদায় কর্‌লে।

ছাত্র নই। লেপাপড়া শিখে বড় হয়ে সরকারী উচ্চপদে চাকরি করছি ; কিন্তু এখনও সময় সময় মাষ্টার মশায়ের সেই সব টুক্‌রো টুক্‌রো উপদেশ-কথা মনে পড়ে। তখন নিজের পদ-গৌরব প্রভাব-প্রতিপত্তি সব ভুলে যাই। মনে হয় আজও আমি মাষ্টার মশায়ের সেই ছোট্ট ছাত্রটিই আছি।

প্রাতঃস্নান আমার নিত্যকার অভ্যাস। এ অভ্যাসটিও পেয়েছিলাম মাষ্টার মশায়ের কাছে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী নদী। দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে একটি বাঁকের সৃষ্টি করে নদী পূর্বদিকে পথ নিয়েছে। বাঁকের মাথায় বালুচর। বালুচরের মাঝে মাঝে কাশবন। অজানা কত বনফুলের গাছ। কত কাঁটাঝোপ। ছোটবড় বাবলা গাছ। নদীর এপার ঢালু, বালুময়। ওপার উঁচু, মাটির স্তরে সাজান। 'সোনার বরণ তরুণ তপন' পূর্বদিকে উঁকি মারার আগেই মাষ্টার মশায় একগলা জলে এসে নামতেন। সূর্য্য প্রণাম সেরে স্নান করতেন। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গেই প্রায় আমিও আসতাম। কোন কোন দিন একটু দেরী হয়ে যেত, একাই আসতাম। প্রাতঃস্নান করে শরীর ও মন প্রফুল্ল হত। নদীপারের অনির্বচনীয় প্রভাত সৌন্দর্য দেখে নয়ন ও মন মুগ্ধ হত।

সেদিন স্নান সেরে মাষ্টার মশায় যখন উঠছেন আমি তখন ঘাটে পৌছুলাম। তিনি বললেন, শোন সনাতন। আমি কাছে গিয়ে বল্লাম, বলুন মাষ্টার মশায়। ওপারের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে মাষ্টারমশায় বললেন, ওই যে গাছটা দেখছিস্ ওটা সামনের বছর এমনি সময় না থাকতে পারে, কি বলিস ? জবাব দিলাম, তাতো পারেই মাষ্টারমশায়।

—কেন বলত ?—

—বর্ষায় বন্যার স্রোতে ও তরঙ্গের আঘাতে ওপারে হয়ত ভাঙ্গন ধরবে। মাটি ধ্বসে জলে পড়বে। ভাঙ্গনের ধারেই তো গাছটি দাঁড়িয়ে আছে। ওটিও মাটির সঙ্গে জলে পড়ে নির্মূল হয়ে যাবে।—

—ঠিক বলেছিস সনাতন, ঠিক বলেছিস। তাহ'লে নদীতীরে ভাঙ্গন আছে বল।—

—তাতো আছেই মাষ্টার মশায়।—

—তবে কলকাতার ঘাটে কাশী-হরিদ্বারের ঘাটে ভাঙ্গন কিছু করতে পারে না কেন বল দেখি।—

—সেখানকার দু'পারের ঘাট যে সব পাথর দিয়ে মজবুত করে বাঁধান, ভাঙ্গন কি করবে মাষ্টার মশায় ?—

আনন্দে মাষ্টার মশায় আমায় পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, নির্ভুল উত্তর দিয়েছিস, সনাতন। তোদের এই বছরেই ইস্কুলে পড়া শেষ হ'বে। অনেকেই হয়ত আর পড়তে পাবে না। তাদের সংসারের পথে পা বাড়াতে হ'বে। সংসারের পথ বড় ভীষণ পথ, সনাতন। তোর কি মনে হয় ?

বললাম, তা তো বটেই মাষ্টার মশায়। সংসার যে নদীর মতন। এরও কূলে কূলে ভাঙ্গনের ভয় আছে। কখন পাড় ভেঙ্গে পড়ে, কখন ঢেউ এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—তার কিছু ঠিক নেই।

কিন্তু সনাতন, মাষ্টারমশায় বললেন, সংসার-নদীর কূল যদি ধর্ম্মরূপ পাথর দিয়ে শক্ত করে বাঁধিয়ে দিতে পারিস আর কোন ভয় থাকবে না। শুধু ধর্ম্মরূপ শক্ত পাথর চাই সনাতন।

মাষ্টারমশায়ের মুল্যবান কথা ক'টি সেদিনকার মধুর সকালটিকে মধুরতর করে তুলেছিল। সেই একটি সকাল আমার জীবনে অমূল্য হয়ে রয়েছে। মাষ্টারমশায়ের কথা আজও কানে বাজছে—সংসার নদীর কূল যদি ধর্ম্মরূপ পাথর দিয়ে শক্ত করে বাঁধিয়ে দিতে পারিস আর কোন ভয় থাকবে না। শুধু ধর্ম্মরূপ শক্ত পাথর চাই, সনাতন।

আর একটু হ'লেই

শ্রীপ্রভাতকুমার বসু

এক চাষীর ছিল এক মোরগ। গায়ের পালকগুলো যেন সোনার তৈরী। আর মাথার ঝুঁটি ঠিক যেন লাল-টক-টকে আগুনের শিখার মত।

পূবাকাশে যখন শুকতারাটা শেষবারের মত দপদপ করে উঠতো, কালো কালো মেঘগুলো অন্ধকারকে পিঠে চাপিয়ে পিটটান দিত যখন, গাছের পাতায় পাতায় শুরু হোত ভোরাই হাওয়ার ফিসফিসানি—ঠিক তখনই উঁচু

পাঁচিলটার ওপর বসে, একটু ডানা ঝেড়ে গলাটা বাড়িয়ে ডেকে উঠতো ; কক্ কোঁকর কোঁ—এ ডাকে ঘুম ভাঙতো গ্রামবাসীর। ঘুম ভাঙতো পাখীর।

গ্রামের লোকেরা সকলেই ভালবাসে এই মোরগকে। পথের পাশে দেখলেই সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। আহা—রোজ সকালে ঠিক কেমন ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। সকলের আদর আর সোহাগ পেয়ে মোরগ মনে মনে গর্ব অনুভব করে। ও ভাবতে শুরু করলো, ওরই ডাকে বুঝি সূয্যি ওঠে, আঁধার দূর হয়, শুরু হয় পাখীর কল-কলানি।

এদিকে এক শিয়াল ছিল তাকে তাকে। আহা! কি সুন্দর নধর থকথকে চেহারা। একবার কোনরকমে ঘায়েল করতে পারলে—আহা! জিব দিয়ে জল সরে যেন! কতদিন ওই কচি মাংসের স্বাদ পাইনি!

একদিন মোরগ বেরিয়েছে পোকার সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে এক ঘন ঝোপের পাশে এলো।

মোরগের কিন্তু ঠিক চোখে পড়লো, ঝোপের ওপাশে লুকিয়ে শিয়াল। না—এখানে থাকা মোটেই ভালো নয়।

ডানা মেলতে যাবে এমন সময় বেরিয়ে এলো ঝোপের ওপাশ থেকে শেয়াল।

: আরে আরে যাচ্ছ কোথায়? একটা গান শুনিয়ে যাও। বারে বা, সক্কলকে শোনাও, আর আমি বাদ নাকি? না-আমি শেয়াল বলে? জানো, তোমার বাপের সংগে আমার কিরকম বন্ধুত্ব ছিল।

: আচ্ছা, বাবা কি আমার মতো ডাকতে পারতো?

দূরত্ব কিন্তু ঠিক বজায় রেখেছে মোরগ। না—একেবারে বোকা নয়। শেয়াল আবার বুদ্ধি খাটায়।

: তোমার ডাক অবশ্য শুনেছি, তবে দূর থেকে।

তা মনে হয়, তোমার বাপের চেয়ে ভালোই। তবে কি জানো বাবা, ইচ্ছে করলে আরো জোর করতে পারো।

: কেমন করে? একটু কাছে সরে এলো।

: তোমার বাবার ফন্দী করে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে, গলাটা বাড়িয়ে, চোখ দুটো বুজিয়ে যত জোর আছে তত জোর দিয়ে—বুঝেছ। একবার দেখনা একটু চেষ্টা করে। বাপকেও হয়ত হার মানাবে।

মিথ্যে স্তুতিতে ভুললো মোরগ। চোখ দুটো বুজিয়ে গলাটা বাড়িয়ে শুরু করলে চীৎকার।

আর এই তো চাইছিল শেয়াল। এতদিন পরে সুযোগ এসেছে, তা কি আর হাতছাড়া করে ধূর্ত শেয়াল। টপ করে গিয়ে ধরলো টুঁটি—ব্যস,তারপরেই চোঁ চাঁ দৌড়।

শেষ চেষ্টা করলো বেচারী। চীৎকার করে উঠলো, যত জোর ছিল গলায়—যদি তার ডাক শুনে ছুটে আসে গ্রামের লোক, তার মনিব।

আর সত্যিই হোল তাই! সবাই ছুটতে শুরু করলো—চাষী—চাষীর ছেলে—চাষীর কুকুর—সব্বাই।

এ ছোটে পূবে ত ও পশ্চিমে, এ উত্তরে ত ও দক্ষিণে। আহা—অমন আদরের আর গুণের মোরগ। যে কোরেই হোক শেয়ালের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। দৌড়-দৌড়। প্রাণপণে শুধু দৌড়।

: ঐ যাচ্ছে—এই শেয়ালকে মার-মার—ওই যে ব্যাটা মোরগ নিয়ে পালাচ্ছে—চীৎকার করতে থাকে চাষী।

কিন্তু পলাতককে ধরে কার সাধ্যি?

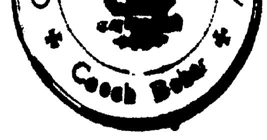
মোরগ কিন্তু শেষ ফন্দী আঁটলো। চুপি চুপি (না বলেও উপায় ছিল না, যা চেপে ধরেছে) বললো শেয়ালকে—ও শেয়ালকা' বলোনা, তোমার সংগে আমি নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি, তাহ'লে আর ওরা তোমার পিছু ধাওয়া করবে না।

শেয়াল দেখলো মন্দ যুক্তি নয়। যা সব ছুটেছে—ধরলেও ধরে ফেলতে পারে—আর তখন সব দিক যাবে। উল্টে হয়ত তারই টুঁটি টিপে শেষ করে দেবে—তার চেয়ে—ও চীৎকার করে উঠলো—

আর সংগে সংগেই ফুড়ুৎ—উড়ে গিয়ে বসলো গাছের ডালে।

শেয়াল বোকা বনে থ। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওপরে একটু। কিন্তু না, বেশী দেরী করবার অবসর কই—ওরা যে এসে পড়লো বলে।





স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রথম যুগ, সমাজজীবনে আসছে একটা নব স্বীকৃতি, নতুন দিগদর্শন, পশ্চিমের খরবেগ এসে ধাক্কা দিচ্ছে পূরবৈয়া বায়ুকে। দেশের জ্ঞানীগুণী চিন্তাশীল মনস্বী যশস্বীরা আত্মসম্বিৎ যেন ফিরে পাচ্চেন, ভারতপথপথিক বাংলাদেশ নতুন গল্প শুনছে, নতুন রহস্য জেগে উঠছে, নতুন কথা বলছে—সে এক রসসঞ্জীবনী প্রাণবন্যা—আগে যার ভগীরথ শঙ্খ বাজায়ে। এই উনবিংশ শতাব্দীর নতুন সংঘাতে ভরা বিচিত্র রসসন্ধানকে আমরা নাম দিলাম—নবজাগৃতির যুগ, রেনাসাঁসের দিন। কিন্তু দরদ দিয়ে বাংলার সত্যকার প্রাণের ইতিহাস যারা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাঙালী চিরকালই সমন্বয়সন্ধানী, তার রক্তের উত্তাল স্রোতে মিশেছে নানান্ ধারা, যুগে যুগে তার মন্ত্র হচ্চে।

'শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'

'কি আর বলিব রে কে করিবে প্রত্যয়, এই মানুষে আছে সত্য নিত্য চিদানন্দময় এই মানবতাবাদের কর্ষিত ভূমি ছিল বলেই পশ্চিমের বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিরীশ্বরবাদ, হারবার্ট স্পেন্সার, জনস্টুয়ার্ট মিল, কাঁত কোঁত মোক্ষমূলরের যতকিছু শিক্ষা বাঙালী আত্মসাৎ করে রূপান্তরিত করে নিয়েছিলো এক রসময় সৃষ্টিতে। এই পরিবেশের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, আবিষ্কৃত হয়েছিলেন, স্বীকৃত হয়েছিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এ এক অপূর্ব রহস্য—তাঁর সঙ্গে নরেন্দ্রের মিলন আর এক অপূর্বতর রহস্য।

ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্ আয়—

দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণপাণি দক্ষিণ দেবতার ডাক্ আসে—ওরে আয়, সুরেশ মিত্তির এসে বলে—চল্ আমার বাড়ী চল্ নরেন, গান গাইতে হবে, ঠাকুর আসছেন।

বিলে শোন্—দক্ষিণেশ্বরে এক পরমহংস আছে, দেখতে যাবি, বলে রাম দত্ত।

পরমহংস বলে একজন সাধুসন্ন্যাসী গোছের লোক দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির বাগানে আস্তানা গেড়েছেন—এমন একটা কথা তখনকার দিনের বাঙালী শিক্ষিত সমাজে অনেকেই জানতেন। আরো জানতেন যে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা তাঁকে নিয়ে হৈ হৈ করেন, ইণ্ডিয়ান মিররে তাঁর অদ্ভুত সরল নিরুপাধিক জীবনযাত্রার কথা বেরোয়। তবু সংশয় যায়না, সন্দেহ ঘোচেনা, যাচাই করে নিতে ইচ্ছে হয়—সত্যই কি ইনি—কেউ বলে বুজরুক্, কেউ বলে পাগল, কেউ বলে ভণ্ড—পাষণ্ডের দল বলে পরমহংস নয়, রাজহংস—নরেন জবাব দিয়েছিলো—বেশ, যদি রসগোল্লা খাওয়াতে পারো ত বলো, আর যদি ভণ্ড হয় তাহলে কান মলে দিয়ে আসবো বলছি, রসগোল্লাই খেয়ে এসে-ছিলেন তিনি—রসো বৈ স—র রসে ভক্তি আর কান মূলতে হয়েছিল নিজেরই—দেখে এসেছিলেন এমন এক মানুষকে যাঁর ভিতর শঙ্কর আর চৈতন্যের হয়েছিল সমন্বয়

যিনি জগতচন্দ্র হার পরেছেন গলায়
অশ্রুজলে সিক্ত করা, প্রেমরসের ভাবন দেওয়া

তবু খটকা যায়না—কি পাবক আছে এঁর মনে—যে ভয় লোভ কাম-কামনা বাসনার অতীত হয়ে আছেন এই নির্বিকার মুক্ত পুরুষ। সকল লোকের সঙ্গে মিশছেন, নমস্কার করছেন, কথা কইছেন—কই ইনি ত চেলাকাঠ নিয়ে কারুকে তাড়া করেন না, বিদ্যার গরমে বেদবেদান্ত তন্ত্র আওড়ান না, বিভূতিময় হয়ে কোন বহিঃপ্রকাশ নেই। কে এই সহজসাধক, মায়ের ছেলে, সব মতের প্রতি যাঁর নিরাবিল শ্রদ্ধা, সব মানুষের প্রতি যাঁর অসীম মমতা—যত মত তত পথ—জীবই শিব—জীবে দয়া নয়, শ্রদ্ধা, প্রেম, সেবা শিবজ্ঞানে বন্দনা—উপরে উঠতে হলে সিঁড়ি দিয়েই উঠি আর ভারা বেয়েই উঠি, ওঠাটাই হচ্চে কাম্য—জলকে পানিই বলি আর নীরই বলি, জল জলই, হেলে দুলেও জল, স্থির থাকলেও জল।

সুরাপান করি নারে সুধা খাইরে কুতুহলে
আমারে মনমাতালে মাতাল করে, মদমাতালে মাতাল বলে

এই সেই পরমপুরুষ যার শিষ্য হলেন নরেন, কমলাক্ষ নরেন, বিদিশানন্দ বিবেকানন্দ।

নরেন বলতেই মনের ছায়াপটে প্রথম যে ছবিটি জাগে—সেটি হচ্চে একটি চঞ্চল দামাল ছেলের ছবি—ঘর ছাড়া ঐ পাগলটাকে এমন করে কেগো ডাকে—কৈশোর যৌবনের বয়ঃসন্ধির দিনে যে চলেছে, ছুটেছে, উর্দ্ধাভিমুখী অভীপ্সা নিয়ে, যে জানতে চায়, যে বুঝতে চায়, যে শিখতে চায়, শুধু ভক্তি গদগদ হয়ে, নয় বিচার বিশ্লেষণ করে, বুদ্ধিদীপ্ত মনন দিয়ে, যার মনে জেগেছে অনন্ত পিপাসা অমৃতভাণ্ডের জন্য উন্মুখী অস্পৃহা, পরই যার কাছে পরম। তাইতো এলো নরেন ঠাকুরের ভাবকে বীর্য্যবান করে তোলবার প্রকৃষ্ট শুদ্ধ শক্তিমান আধার, শুধু তপস্বী নয়, মনস্বী। শুরু করলেন পরীক্ষা শিষ্যকে, শিষ্য করলেন পরীক্ষা গুরুকে—প্রশ্ন হলো, জানো, দেখাতে পারো—পারি, বেদাহমেতং—মণিকাঞ্চনের হোল যোগ। দ্বিতীয় পর্বে দেখি—নরেন তখন নাম নিয়েছেন বিবেকানন্দ—একটা দৃপ্ত পদক্ষেপ, একটা অনির্বাণ তেজ, একটা কম্বুকণ্ঠ, একটা দার্ঢ্য, বলিষ্ঠতা, নিষ্ঠার করুণাঘন প্রতীক, ছুটেছে উল্কার মত, বিদ্যুৎগর্ভ, স্বয়মপ্রকাশ, হিরণ্ময়—মেরুদণ্ড যার

খাড়া, মন যার নমনীয়, স্নেহ যার অনাবিল, 'বাণী যার সকরুণ সান্ত্বনার ধারা'—জ্ঞানের দণ্ড হাতে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত, ভাস্বর পরিব্রাজক—বেদান্তের সূত্র শুধু মুখে নয় কাজে, বিরাটের উপাসনা শুধু বক্তৃতায় নয় জীবনের নিত্য পরিক্রমায়—কাজে লেগে যা, জমি তৈয়ারী কর, ফেলে দে ধ্যান, মুক্তি ফুক্তি, হাজার হাজার বিবেকানন্দ গড়ে উঠবে। দিকে দিকে অচলায়তন ভাঙচে, রুদ্ধ বন্ধ দুয়ারের অর্গল খুলচে, মন জাগচে। আবার সঙ্গে সঙ্গে আর এক ছবি মনে পড়ে—যেন ধ্যানী বুদ্ধ সমাসীন, শান্ত শুদ্ধ সমাহিত কথনো শীর্ষমালার মহৎ মৌনে ধ্যান নিমগ্ন, কখনো কন্যাকুমারিকার অতন্দ্র তরঙ্গরাশির মধ্যে 'ভবিষ্যত ভাগবত ভারতের কল্যাণ চিন্তায় যোগারূঢ়, যে স্বপ্নের ভারতবর্ষ ফুটে বেরুবে ভুনাওয়ালার চুপড়ি থেকে, মুটেমজুর মুদ্দফরাসের ঝুড়ি থেকে, ভাঙ্গীর ঘর থেকে। এই সেই মানুষ যিনি বৈশ্যাধিকারের যুগ থেকে শূদ্রাধিকারকে দেখতে পেয়েছিলেন, বুঝেছিলেন মনুষ্যত্বই জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা—

Siand up, assert yourself, proclaim the God in you, Do not deny him. It is a manmaking religion that we want, manmaking theories that we want. And here is the test of truth—anything that makes you weak, physically, spiritually, reject as poison. Truth is strengthening. Truth is purity আবার বেদান্তকেশরীর গর্জন শোনা যায়—Faith, faith, faith in ourselves. Do you feel? Do you feel that millions and millions have become next door neighbours to brutes? Do you feel that millions are starving today. Millions have been starving for ages. Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it made you also mad?

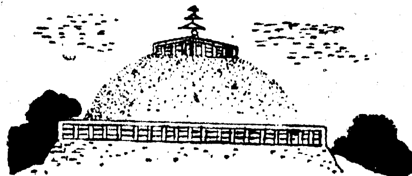
আবার যেদিন খেতরীর রাজদরবারে নৃত্যবাসরে নর্তকী স্মরণ করিয়ে দিলে—

প্রভু মেরা অবগুণে চিত্ত না ধরো
সমদরশী হৈ নাম তিহারো
চাহত পার করো
এক লোহা পূজামে রাখত,
এক রহত ব্যাধ ঘর পর,
পরশকে মন দ্বিধা নেহী হৈ
দুহু এক কাঞ্চন করো

বীর সন্ন্যাসী বুঝেছিলেন—জ্ঞানী কাহে ভেদ করো

এই বাণীই ত ভারতের সনাতন বাণী—আয়ন্ত সর্বত! স্বাহা—এই মন্ত্র জগদ্ধিতায়—শুধু আত্মানং বিদ্ধি নয়, ক্লৈব্যং মাস্ম—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। আজ এই পুণ্যদিনে এই কথাই স্মরণ করবো—নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের কালি, লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ কলহসংশয়, সহেনা, সহেনা আর জীবনেরে খণ্ডখণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়। শুধু বলতে ইচ্ছে করে—এই তো সেদিন তোমরা এসেছিলে, আমরা হয়তো চর্ম চক্ষে দেখিনি আমাদের পিতা-পিতামহ ত দেখেছেন—তবু আমরা—এ দীনতা এ হীনতা ক্ষমা করো প্রভু—তোমার আশার দীপটি জ্বেলে দাও, ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস, আর্তের হাহাকার, নিঃসহায়ের বেদনার মাঝে নিয়ে এসো তোমার শিবচেতনা শৌর্যবীর্য, জ্ঞানবিজ্ঞান, তপ তপস্যা, প্রেম ভালবাসা, কল্যাণতমের রূপ; অর্থনৈতিক জৈবিক মানুষ অসত্য নয়, তার দাবী তার কামকামনাও সত্য—কিন্তু তারও উর্দ্ধে উঠতে হবে পাশ্চত্যের সীমানায়। চিরকালের মানুষ তাই খোঁজে সেই রসবন্ধ রসভাণ্ডকে, সন্ধ্যায় নিভু নিভু প্রদীপের পাশে বসে, আকাশের দিকে চেয়ে, মনের অতলে ডুবে, কর্মের উন্মাদনায়, ধ্যানের নৈঃশব্দে বিজ্ঞানীর বীক্ষণে। আজ তাই আমাদের দরকার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মত বৃহৎ জীবনের অনুশীলন। সেই হবে মূর্ছিত পরাজিত লাঞ্ছিত জীবনের শেষ সম্বল, চরম উত্তরাধিকার। আজ যেন আমরা তামসিকতায় লিপ্ত না হয়ে, রাজসিকতায় মত্ত না হয়ে সাত্বিকতায় অহঙ্কৃত না হয়ে কাজ করে যাই। স্বর্গ বুঝি না, মুক্তি চাইনা, ঐশ্বর্য্য নয়, সিদ্ধি নয়, শুধু এই দুঃখকষ্টের সংসারে, অভাব অনশনের দিনে, মহাপুরুষদের দেওয়া সেবার আদর্শকে প্রেমে গ্রহণ করতে পারি, যে প্রেম নিরঞ্জন, যে প্রেম উর্দ্ধশিখ, যে প্রেম লালসার ক্লেদ হতে মুক্ত, কর্মশিখায় প্রজ্জ্বলিত, আর যেন বলতে পারি, আমায় তেজ দাও, অন্যায় দ্রোহী কর, সহনশক্তি দাও।

তবেই গড়ে উঠবে সাধকশিল্পীর গোষ্ঠী, ত্যাগীভোগীর দল, যোগক্ষেম অনপেক্ষ শুচিদক্ষ কর্মনিষ্ঠরা, অব্যভিচারিণীরা, মায়ের সেবায় লুপ্ত হবে রিক্ততার নিঃস্ব নিঃশ্বাস, বঞ্চনা বেদনার ইতিহাস। দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, ভোগ ত্যাগ হবে, অভাব ঐশ্বর্য্যময় হবে—সেই শিক্ষাই যেন আমরা পাই নরেন্দ্র বিবেকানন্দের সাধনা হতে, জীবন হতে, আদর্শ হতে—বন্দেহং বিবেকানন্দম্—বন্দে মাতরম্।



অনুবাদ সাহিত্য



অশরীরী

(গী-দ্য-মোপাসাঁ)

অনুবাদক ঃ গঙ্গাধর ঘোষাল

আলোচনা হচ্ছিল বর্ত্তমান কালের এক মামলা নিয়ে। কথায় কথায় উঠলো—সমাজ থেকে একেবারে হঠাৎ উধাও হয়ে যাবার গল্প। সবাই হৈ হৈ করে উঠলেন। সকলেরই এই ধরণের কোন না কোন গল্প জানা আছে—সম্পূর্ণ সত্যি গল্প।

আড্ডা চলছিল রু-দ্য গ্রীনেলের বাড়িতে। দলের মধ্যে ছিলাম অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধু ; সন্ধ্যেটা কাটছিল ভালই। সবাই এবার উঠবো উঠবো করছিলেন, কিন্তু গল্পের গন্ধ পেয়ে আবার সবাই চেপে বসলেন। হৈ চৈ একটু শান্ত হলে বৃদ্ধ মারকুই দ্য লা তুর-সামুয়েল যার জীবনের ওপর দিয়ে বিরাশীটা শীত আর গ্রীষ্ম পার হয়ে গিয়েছে একটু এগিয়ে এসে ঝুঁকে বসলেন বাতিদানের দিকে, কম্পিতস্বরে সুরু করলেন বলতে—

"এক অদ্ভুত রহস্যময় ঘটনার কথা আমি বলতে পারি। অদ্ভুত রহস্যময়। সারা জীবন সেটা আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছে। আজ ছাপান্ন বছর প্রায় হয়ে গেছে, তবু সেই ঘটনায় এত ভয় পেয়েছিলাম যে সেই ভয় আজও মনের মধ্যে গভীর ভাবে বাসা বেঁধে আছে। এমন একটা মাস গেল না, যে মাসে ঘটনাটা স্বপ্নে না দেখা দিয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছিল খুব অল্প সময়ের মধ্যে, খুব জোর দশ মিনিট হবে। সেই থেকে আচমকা কোন শব্দ শুনলেই কেঁপে উঠি, অন্ধকারে কোন জিনিষ আবছাভাবে চোখে পড়লেই পড়ি কি মরি করে ছুটে পালাতে যাই। মানে, এখন পর্য্যন্ত অন্ধকার দেখলেই মনে ভয় দেখা দেয়।

"তোমরা অবশ্য বলতে পার, কই, এতদিন আমিত বলিনি তোমাদের।

"তা বলিনি সত্যি, বলবার উপায় ছিল না এর আগে। আজ আমি সব কিছু বলতে পারি। অবাস্তব ভয়ের বিরুদ্ধে জোর করে সহসী হবার কোন প্রয়োজন আছে, আজ আর তা মনে হয় না।"

"ঘটনাটা ঘটবার পর আমি সম্পূর্ণভাবে মনের ভার-সাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম। সব সময়েই অদ্ভুত অস্বস্তি-বোধ করতুম। কারও কাছে তাই কোনদিন এটা প্রকাশ করিনি। কোন রকম ব্যাখ্যা না করে ঠিক যা যা ঘটেছিল হুবহু তাই বলে যাচ্ছি, শোন,—

সেটা ১৮১৭ সালের জুলাই মাস। রুঁয়াতে এক সৈন্য-দলের মধ্যে আমিও আছি। একদিন জেটীর ওপর বেড়াচ্ছি একটা লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। লোকটাকে মনে হচ্ছিল যেন চিনি, চিনি। অথচ কোথায় দেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। আপনা থেকেই আমার গতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লোকটা কিন্তু আমাকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল তার। বছর পাঁচেক লোকটাকে আমি দেখিনি, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল তখন বুঝি তার পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। চুলগুলো সব পেকে গেছে। এমন কুঁজো হয়ে হাঁটছিল যেন সমস্ত শক্তি তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমার মনের বিস্ময় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুঃখ এবং দুর্ভাগ্যের যে ঝড় তার সমস্ত

জীবনকে ছন্নছাড়া করে দিয়ে গেছে তার গল্প শোনাল আমাকে একটু একটু করে।"

"একটী তরুণীর সঙ্গে তার আলাপ হয় প্রথমে, পরে সে আলাপ প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমে পড়ে সে যেন পাগল হয়ে ওঠে। শেষে তরুণীটীকে বিয়ে করে। বিবাহের পর বছর খানেক সমস্ত পার্থিব সুখ ও আনন্দ থেকেও মধুরতর অবস্থায় তারা দুজনে কালাতিপাত করেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন মেয়েটী হাটফেল করে মারা যায়। যেদিন মেয়েটিকে কবর দেওয়া হল সেইদিনই সে প্রাসাদ ছেড়ে চলে আসে; তারপর থেকে কুঁয়াতেই বাস করছিল, তার হাব ভাব দেখে মনে হল যেন মরে বেঁচে আছে। একা এবং বেপরোয়া ভাবে বাস করতো সেখানে। মেয়েটির মৃত্যুতে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিল। সব কিছু শক্তি তার নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কেবলই আত্মহত্যা করার কথা মনে আসতো।"

"নিজের গল্প তার শেষ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো, তারপর আবার সুরু করলো—'আপনার দেখা যখন পেয়েছি, আপনাকে আমার একটা বিশেষ উপকার করে দিতে হবে। আমার পুরাণ বাড়ীতে একবার দয়া করে যেতে হবে আপনাকে। শোবার ঘর থেকে—আমার শোবার ঘর থেকে কতকগুলো কাগজ যদি আমাকে এনে দেন। সেগুলো ভারী দরকার। কোন চাকর বা অন্য কোন লোককে পাঠাতে ভরসা পাই না। যে সে লোক গেলে হবে না, জিনিষটা গোপনীয়। কোন কারণেই আমি সে বাড়ীতে আর ঢুকবো না। বাড়ী থেকে যেদিন চলে আসি সেদিন ও ঘরে একটা তালা লাগিয়ে এসেছিলাম। তার একটা চাবি আপনাকে দিয়ে দেব। ডেস্কের একটা চাবিও আপনার দরকার হবে। মালীর নামে একটা চিঠি আপনার কাছে লিখে দেবখন, সেটা দেখালেই সে আপনাকে ভেতরে নিয়ে যাবে।

'কাল সকালে আমার ওখানে আসুন, চায়ের নিমন্ত্রণ রইল আপনার। আসুন আমার বাড়ীতে সমস্ত ব্যবস্থাই তখন বরঞ্চ ঠিক করে দেওয়া যাবে।'

"কাজটা বলতে গেলে কিছুই নয়। এটুকু উপকার যদি আমাকে দিয়ে হয়, বেশত! কথা দিলাম করে দেব। কুঁয়া থেকে মাইল কয়েক গেলেই তার জমিদারী। ঘোড়ায় গেলে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌছান যায়।"

"পরদিন সকাল দশটার সময় তার ওখানে চাএর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলুম। চায়ের টেবিলে অন্য কেউ ছিল না। কেবল সে আর আমি। সেদিন সে বিশেষ কথাবার্ত্তা বললো না।

"পাছে তার ব্যবহারে কিছু মনে করি তাই আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। বললো, বিগত দিনের সব ছবি, অতীতের সব সুখস্মৃতি তার মনকে এত অভিভূত করে তুলেছে যে একটা কথাও সে বলতে পারছে না। তাকে দেখে মনে হল সে বেশ চিন্তিত আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। যেন কোন রহস্যজনক মানসিক সংগ্রাম তার মনের মধ্যে তখন চলেছে।

"অনেকক্ষণ পর কি করতে হবে আমাকে, সেটা বুঝিয়ে বললো। কাজটা খুবই সহজ। যে ডেস্কের চাবিটা আমাকে দিল—তার ডান দিকের প্রথম টানা থেকে দুটো চিঠির বাণ্ডিল আর অন্য কাগজের একটা বাণ্ডিল নিয়ে আসতে হবে। তারপর বললো, 'সেগুলো কিন্তু দয়া করে পড়বেন না। আমি অবশ্য জানি আপনি পড়বেন না, আপনাকে বলা বাহুল্য।

তার কথায় আঘাত পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে কি একটা উত্তরও দিয়েছিলাম। সে তখন তো তো করে বললো, "আমাকে মাপ করুন, মনের মধ্যে যে কি জ্বালা—চোখে তার জল দেখা দিল।

"বেলা একটার সময় তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে পড়লুম।"

"সেদিন আবহাওয়াটা ছিল উজ্জ্বল। মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়াটা কদম তালে ছুটতে লাগলো, তাল রেখে আমার তরোয়ালটাও পায়ের বুটের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছন্দের সৃষ্টি করতে থাকলো। পাখীর গান শুনতে শুনতে এগিয়ে চললুম। কিছুদুর যাবার পর রাস্তাটা বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। বনের ভিতর দিয়ে যখন যাচ্ছি, গাছের শাখাগুলো আমাকে যেন চুম্বন করতে লাগলো। ভারী আনন্দ হচ্ছিল। মাঝে মাঝে দাঁত দিয়ে গাছের পাতাগুলো চেপে ধরছিলাম। এমন একটা সুন্দর দিন উপভোগ করা কটা লোকের ভাগ্যে ঘটে?

"প্রাসাদের কাছাকাছি যখন পৌচেছি পকেট থেকে মালির চিঠিটা বার করলুম। দেখলুম চিঠিটা সীল করা। ভারী আশ্চর্য্য লাগলো। রাগও হল খুব। একবার মনে হল—দুর ছাই ফিরে যাই। যে আমাকে বিশ্বাস করতে পারলো না। কি আমার এমন দায় পড়েছে তার কাজ আমাকে করতেই হবে ?

"পরে মনে হল, কাজটা শেষ না করে যদি ফিরে যাই আমার ভাবপ্রবণতা অতি মাত্রায় প্রকাশ হয়ে পড়বে লোকের কাছে। বন্ধুটীর যা মনের অবস্থা হয়ত কিছু চিন্তা না করেই সীল করে দিয়েছে।

"প্রাসাদটা বোধ হয় বছর কুড়ি তখন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিল। সদর দরজার কাঠগুলো কবজা থেকে খুলে আসছে। রাস্তায় বড় বড় ঘাস গজিয়ে গেছে। ফুলের বাগানকে আর ফুলের বাগান বলে চেনা যায় না।

"সদর দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিলাম। কাছেই আর এক দরজা থেকে এক বৃদ্ধ বার হয়ে এল। আমাকে দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল। চিঠিটা তার হাতে দিলাম। চিঠিটা পড়লো একবার। তারপর অনেকবার উল্টেপাল্টে কি যেন দেখলো, আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলো। শেষে চিঠিটা পকেটে রেখে আমাকে বললে,

—'কি করতে চান বলুন'।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলুম—"মালিকের চিঠিটা ত পড়লে, তাতেই ত লেখা আছে সব কথা। আমাকে প্রাসাদের মধ্যে যেতে হবে একবার।"

মনে হল লোকটা যেন বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলো, 'তাহলে প্রভু—পত্নীর ঘরে—ঘরের ভেতরে যেতে চান ?'

"আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল ; তৎক্ষণাৎ উত্তর করলাম, 'ঠিক তাই, কিন্তু তোমার এত কৈফিয়তের কি দরকার ? লোকটা ঘাবড়ে গিয়ে আঁই আঁই করে বললো, না স্যার, কিন্তু ব্যাপার হল—তাঁর সেই—মৃত্যুর পর থেকে আর ঘরটা খোলা হয়নি কিনা তাই। যদি দয়া করে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করেন তাহলে গিয়ে একবার সব—

"রাগ হয়ে গেল, তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই মাঝপথে থামিয়ে দিলাম। তোমার মতলব কি বলতো ? চাবি রইল আমার কাছে, ঘরে গিয়ে তুমি ঢুকবে কি করে শুনি ?

লোকটা তখন আর কোন আপত্তি না করে বললো, "আসুন আমার সঙ্গে আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দেই।

"সিঁড়িটা আমাকে দেখিয়ে দাও, ঘর আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারবো ?

"কিন্তু স্যার ব্যাপার হল,······

"আমি আর সামলাতে পারলাম না। জোর করে থামিয়ে দিলাম তাকে। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম পাশে। তারপর সোজা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলাম !

রান্না ঘর পার হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি দুটো বড় ঘর। মালী আর তার স্ত্রী বোধ হয় বাস করতো সেখানে। তারপর বেশ একটা বড় হলঘর। হলঘর পার হতেই দেখলুম সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতেই বন্ধু যে দরজার কথা আমাকে বলে দিয়েছিলেন সেটা নজরে পড়লো।

দরজাটা সহজেই খুলে গেল, ভেতরে ঢুকে পড়লুম। ঘরের ভেতরে এত অন্ধকার যে কোনকিছুই নজরে পড়লো না। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলুম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম। কোন ঘর যদি বহুদিন ব্যবহার করা না হয় তাহলে সে ঘরে যে ধরণের দুর্গন্ধ ওঠে সেই রকম গন্ধে সমস্ত ঘরটা একেবারে ভরপুর ছিল। দুর্গন্ধে নাক জ্বালা করতে লাগলো। চোখ ধীরে ধীরে অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে এলে দেখলুম—বেশ বড়রকমের একটা এলোমেলো সাধারণ শোবার ঘর। বিছানায় চাদর ছিল না, তোষক আর কতকগুলো বালিশ পড়ে রয়েছে। একটা বালিশের ওপর খানিকটা গভীর গর্ত্ত। কেউ যেন অল্প কিছুক্ষণ আগে কনুই কিম্বা মাথা রেখে বিশ্রাম করছিল। চেয়ারগুলো প্রত্যেকটা এদিক-ওদিক সরান। ঘরের সঙ্গে আর একটা লাগোয়া ছোট ঘর। ব্যক্তিগত আরাম কেদারা বলেই মনে হল। মাঝখানের দরজাটা আধখোলা।"

"একটা জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম। খুলতে চেষ্টা করলুম, খানিকটা আলো যাতে ঘরে এসে ঢোকে। ছিটকিনিগুলো এত জং ধরে গিয়েছিল যে কিছুমাত্র নড়াতে পারলাম না। তরোয়াল দিয়ে ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। কিছুতে যখন খুলতে পারলুম না, অস্বস্তি বোধ হতে লাগলো। ছেড়ে দিলাম

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুসী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রতিদিন **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লা জনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।

LIFEBUOY
FOR SAVING LIFE
FOR PRESERVATION OF HEALTH
SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
LIFEBUOY SOAP

L. 273-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত।

ও চেষ্টা। ততক্ষণে চোখটা আরও খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই আলো-আঁধারে ঘরের মধ্যে সব কিছুই প্রায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ডেস্কের সামনে গিয়ে বসলাম।

"একটা চেয়ারে বসে ডেস্কটা খুললাম। নির্দ্দিষ্ট টানাটা টেনে বার করলাম। সেটা সম্পূর্ণ ভর্ত্তি ছিল কাগজে। আমার দরকার ছিল যে তিনটে প্যাকেটের সেগুলো চেনবার উপায়ও জানা ছিল, খুঁজতে সুরু করলাম। প্যাকেটের ওপর লেখাগুলো পড়তে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল যেন, মনে হলই বা বলি কেন—বেশ অনুভব করলাম একটা মৃদু ফিস্‌ফাস্ আওয়াজ। প্রথমটা অত খেয়াল করিনি। মনে হয়েছিল কোন জানলায় হয়ত একটা কাপড়ের টুকরো লেগে আছে সেটাই উড়ছে হাওয়ায়। কিন্তু মিনিটখানেক বোধ হয় হবে, আবার শুনলুম খুব আস্তে, যেন অনুভব করা যায় না এত আস্তে—আবার সেই শব্দ। সমস্ত শরীরে এক অস্বস্তিকর কাঁপুনি দেখা দিল। এত সামান্য কারণে ভয় পেয়ে যাব? আমার আত্মসম্মান আমাকে বাধা দিল। পিছন ফিরে আর তাকালাম না, প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় প্যাকেটটা ততক্ষণে খুঁজে পেয়েছি। শেষ প্যাকেটটার জন্য টানার মধ্যে হাত দিতে যাব—শুনলাম কাঁধের কাছে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। শব্দ শুনে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম। পাগলের মত কয়েক ফুট দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লুম। লাফাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকালাম পিছনে। একটা হাত দিয়ে তখন তলোয়ারের হাতলটা চেপে ধরেছি। যে দৃশ্য দেখলাম, একটু আগে যদি দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ না শুনতাম, তাহলে তখুনি হয়ত পালিয়ে যাবার পথ পেতাম না। দীর্ঘাঙ্গী এক নারী আমার সেই পরিত্যক্ত চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের ভেতর দিয়ে একটা হিম প্রবাহ বয়ে গেল। প্রায় পড়ে যাচ্ছিলাম আর কি! নিজস্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে কাউকে বোঝান যাবে না কি সেই ভয়ঙ্কর যুক্তিহীন ত্রাস। মনটা তখন ফাঁকা হয়ে গেছে। বুকে কোন স্পন্দন নেই, সমস্ত শরীরটা স্পঞ্জের মত নরম পিণ্ডে পরিণত হয়েছে যেন।

ভূত আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু তা সত্বেও একটা ত্রাস দেখা দিল মনে। অতিপ্রাকৃত ভয় থেকে সৃষ্ট অপ্রতিরোধী যাতনার ফলে যে কষ্ট আমি সেই কয়েক মুহূর্ত্তে ভোগ করছিলাম, পরবর্ত্তী সমস্ত জীবনে তা কখনও ভোগ করতে হয়নি। হ্যাঁ, তারপর সে কথা বললো; কথা যদি সে না বলতো তা হলে হয়ত ভয়ে মরেই যেতুম। কথা বললো সে, এক মধুর করুণ স্বরে কথা বললো। আমি যেন প্রাণ ফিরে পেলাম। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যে আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলাম বা চিন্তা শক্তি ফিরে পেয়েছিলাম, তা আমি বলছি না। ভয় পেয়েছিলাম ভয়ানক, কি যে করছি আর কি যে করছি না—খেয়াল ছিল না। কিন্তু তার মধ্যেই আমার যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়েই আমার মুখের ভাব কিছুটা ভদ্রস্থ করে তুলেছি।

"শুনলুম—সে বললো, 'দেখুন আমার একটা বড় উপকার করতে পারেন আপনি।' উত্তর দিতে ইচ্ছে করলো কিন্তু একটা শব্দ উচ্চারণ করাও তখন আমার পক্ষে অসম্ভব। গলা থেকে একটা অর্থহীন আওয়াজ বার হল কেবল।

"আবার বললো, 'পারবেন? পারবেন আমাকে বাঁচাতে? আপনি ইচ্ছে করলেই আমাকে রক্ষা করতে পারেন। কি যে কষ্ট ভোগ করছি। কত কষ্ট যে ভোগ করছি।' ধীরে ধীরে আমার পরিত্যক্ত চেয়ারে বসলো সে। আমার দিকে তখনও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

'করবেন?'

ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ। গলার স্বর তখনও শক্তি হীন।

কচ্ছপের খোলায় তৈরী একটা চিরুণী আমার দিকে এগিয়ে দিল। বিড় বিড় করে বললো, চুলটা তাহলে আঁচড়ে দিন আমার, আমার চুলটা আঁচড়ে দিন। বেঁচে যাই তাহলে, না আঁচড়ালে আমি যেন আর সহ্য করতে পারছি না। আমার মাথার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন! কি যে কষ্ট! এই চুলের যে কি ভার!

তার চুলগুলো দেখলাম খোলা, খুব লম্বা আর কাল। মনে হল চুলের গুচ্ছ চেয়ারের পিছন দিয়ে মাটিকে স্পর্শ করেছে। চিরুণীটা নেবার সময় হাতটা কেঁপে উঠলো। চুলগুলো স্পর্শ করলাম, মনে হল একটা সাপ বুঝি ধরেছি হাত দিয়ে। সমস্ত দেহে আবার সেই শীতল প্রবাহ স্রোত

বহে গেল। কিন্তু কেন এমন হয়েছিল তা আমি আজও জানি না। আজও আমার জানা নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় আঙ্গুলের ডগায় এখনও সে স্পর্শ লেগে রয়েছে যেন। সেদিনকার কথা চিন্তা করলে আজও ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তার চুল আঁচড়ে দিলাম। কি করে যে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা চুলগুলো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করেছিলাম জানি না। ছড়িয়ে, গুটিয়ে ভাঁজ করে দিলাম। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আমার দিকে মাথাটা একটু নত করলো, মনে হল খুসী হয়েছে। হঠাৎ বলে উঠলো 'ধন্যবাদ'। তারপর আমার হাত থেকে চিরুণীটা কেড়ে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল।

দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠবার পর কিছুক্ষণ যেমন ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ভাব বিরাজ করে, মিনিট কয়েক আমার মনের অবস্থাও হয়ে রইল তাই। শেষে আবার চেতনা ফিরে পেলাম। দৌড়ে গেলাম জানলার দিকে—সর্বশক্তি দিয়ে জানালার ওপর আঘাত করলাম, কপাট ভেঙ্গে গেল, আলোয় ভরে গেল ঘর। ছুটলাম দরজার দিকে যে দরজা দিয়ে সে অন্তর্ধান করেছিল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, এতটুকু নড়ান গেল না।

যুদ্ধের মধ্যে সৈন্যদের মাঝে মাঝে তীব্র ইচ্ছে জাগে পালিয়ে যাবার। আমারও তখন ঠিক সেই রকম পাগলের মত অবস্থা। প্যাকেট তিনটে ছোঁ মেরে হাতে তুলে নিলাম, ছিটকে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। আজও মনে করতে পারি না কেমন করে আমার ঘোড়ার ওপর লাফিয়ে উঠেছিলাম, তারপর পালিয়ে এসেছিলাম।

পথে কোথাও আর থামিনি। সোজা রুঁয়াতে নিজের আস্তানায় এসে উঠলুম। নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে সমস্ত ঘটনাটা আদ্যোপান্ত চিন্তা করতে লাগলুম। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, যা দেখেছি তা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনের ভুল, চোখের ভুল। কিন্তু জানলার দিকে এগিয়ে যেতেই চোখ পড়লো বুকের ওপর। জামার বোতামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কয়েক গাছা চুল। কাল লম্বা চুল। আঙ্গুল কাঁপছিল। একটী একটী করে চুলগুলি বোতাম থেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিলাম, ছুঁড়ে ফেলে দিলাম দূরে।

তারপর ডাকলাম চাকরটাকে। বন্ধুটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার আর ক্ষমতা ছিল না। তা'ছাড়া গভীরভাবে অনেক কিছু ভেবে দেখবার দরকার ছিল। বন্ধুটীকে সঠিক কি বলবো না বলবো তাও ভেবে দেখবার দরকার ছিল। চিঠির বাণ্ডিল তিনটী তার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সে একটী রসিদ পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমার সব খবর খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। তারপর যখন শুনলো আমার সর্দিগর্মীর মত হয়েছে—আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। পরদিন সকালে তার কাছে গেলুম, মনে মনে ঠিক করলুম তাকে সব কথা খুলে বলবো। গিয়ে শুনলুম আগের দিন সন্ধ্যায় সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে কিন্তু তখনও আসেনি। সপ্তাহ খানেক অপেক্ষা করলুম, তার কোন সংবাদই পেলুম না। সরকারকে জানালুম। তদন্তও করা হল, কিন্তু কোন খোঁজ খবর আর পাওয়া গেল না।

পরিত্যক্ত প্রাসাদে তন্নতন্ন করে খোঁজ করা হল, কিন্তু সন্দেহজনক কোন কিছু আবিষ্কার করা গেল না। কোন স্ত্রীলোককে সেখানে লুকিয়ে রাখার এতটুকু চিহ্ন কোথাও পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধানে যখন কোন ফল হল না সমস্ত চেষ্টা তখন পরিত্যাগ করা হল। আজ ছাপান্ন বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজও তাদের কোন সংবাদ আমি পাইনি।



ঘাস

অনুবাদক—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

ঘাস গজিয়ে উঠছে—সবুজ লম্বা লম্বা ;
প্রতি বৎসর তা'রা শুকিয়ে যায়, শুকিয়ে মরে যায় ,
আবার জেগে উঠে
বসন্তের হাওয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে ;
পোড়ালেও তা'রা মরে না ;
আবার গজিয়ে উঠে—
বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ।

পুরান পোড়ো রাস্তা—
যেখানে একদিন ছিল ঐশ্বর্য্যের সদম্ভ পদক্ষেপ—
এর আবির্ভাবে
গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠে ;
যুদ্ধ-হত উৎসন্ন নগরীকে
এ ঢেকে দেয়
কোমল সবুজ আস্তরণে ;
বুদ্ধি-হীন অনর্থক দম্ভের সামনে
করে মাথা নত ;
আর
আপনার শ্যামল অজস্রতা নিয়ে—
অপেক্ষা করে
ভাবী কালের অতিথিদের জন্য
যারা চিরকাল আসে
বর্তমানের ধ্বংসের উপর দিয়ে
অলঙ্ঘ্য অলক্ষ্য নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ।

[একটী প্রাচীন চীনা কবিতার অনুবাদ । লেখক—পা-চুই । কাল—ত্যাং-রাজবংশ (৬১৮-৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ)]

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

জুলাই মাসে মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল রাজনৈতিক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। এই ভূকম্পনে বাগদাদ সামরিক জোটের মধ্যবর্ত্তী আরব স্তম্ভটি ভাঙ্গিয়াছে ; সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ-সৌধ অনেকখানি হেলিয়া গিয়াছে। এই বিপন্ন সৌধকে ঠেকো দিয়া খাড়া রাখিবার জন্য সশস্ত্র মার্কিণ সেনাবাহিনী অবতরণ করিয়াছে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব উপকূলে ; বৃটিশ সেনাবাহিনী পৌঁছিয়াছে আরব অঞ্চলের মধ্যক্ষেত্রে।

লেবাননের গৃহ-যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনার জন্য গত ১৪ই জুলাই তারিখে বাগদাদ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত মুসলমান রাষ্ট্রগুলির এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ লেবাননের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ-ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তাই, তাঁহাদের সামরিক জোটের সহযোগী—তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ ও পাকিস্থানকে দিয়া লেবাননের জাতীয়তাবাদী-অভ্যুত্থান দমনের ষড়যন্ত্র হইতেছিল। ইস্তাম্বুল বৈঠকে রাষ্ট্রনায়কদের সমবেত হইবার কথা ; পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জ্জা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুন্‌কে লইয়া পূর্ব্বেই তুরস্কের রাষ্ট্রপতি সেলাল্ বেয়ারের আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; ১৪ই জুলাই প্রাতে ইরাকের তরুণ রাজা ফৈজল্ ও তাঁহার জবরদস্ত প্রধানমন্ত্রী নুরী এস্-সৈয়দের ইস্তাম্বুলে পৌঁছিবার কথা। যথাসময়ে বিমান ঘাঁটিতে অভ্যর্থনাকারীরা সমবেত হইলেন, এবং রাজঅতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জানাইবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিলেন। কিন্তু বাগদাদ হইতে কোনও বিমান ইস্তাম্বুলে আসিল না ; তাহার পরিবর্ত্তে শোনা গেল নানাবিধ ভয়াবহ জনরব। সমবেত রাজনীতিকেরা ব্যস্ততার সহিত ইস্তাম্বুল হইতে আঙ্কারায় ছুটিলেন, সেখানে পাশ্চাত্য জগতের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধার জন্য।

ইরাকে নিঃশব্দ বিপ্লব—

১৩ই জুলাই রাত্রিতে ইরাকে নিঃশব্দে বিপ্লব সংঘটিত হয়। ইরাকী সেনাবাহিনীর তরুণ কর্ম্মচারীরা ন্যূনতম রক্তপাত করিয়া ইরাকের শাসনক্ষমতা হস্তগত করেন। ইহারা সকলেই গভীর আরব জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী, মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ইরাকের রাজা ফৈজল, তাঁহার খুল্লতাত প্রিন্স আবদুল ইলা—যিনি পূর্ব্বে ফৈজলের অভিভাবকরূপে দীর্ঘকাল ইরাকের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের একনিষ্ঠ বন্ধু নুরী-এস-সৈয়দ বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। এই ঘটনা ব্যতীত, ইরাকের কোথাও একবিন্দু রক্তপাত হয় নাই, তিলমাত্র গোলযোগও হয় নাই। অর্থাৎ, সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদলেহন বন্ধ করিবার জন্য যতটুকু রক্তপাত প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত রক্তপাত বিন্দুমাত্রও হয় নাই। বিপ্লবীরা শাসনক্ষমতা হাতে লইবার পরই দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র (মিশর ও সিরিয়া) সঙ্গে সঙ্গে নূতন ইরাক গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লয়, এবং তাহার সহিত পারস্পরিক সাহায্য দানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ক্রমে সোভিয়েট রুশিয়া, চীন, পূর্ব্ব ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ, ভারত প্রভৃতি নূতন ইরাককে মানিয়া লয়। জুলাই মাসের শেষে লণ্ডনে বাগদাদ চুক্তি কাউন্সিলের বৈঠক হইবার পর বৃটেন ও আমেরিকাও নূতন ইরাকী গভর্ণমেণ্টের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। বস্তুতঃ, বিপ্লব সংঘটিত হইবার পর তিন সপ্তাহের মধ্যেই কি স্বদেশে, কি আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন ইরাক এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ইতিমধ্যে নূতন ইরাকী সরকার ম্যাণ্ডেটারী আমলের শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া এক অস্থায়ী শাসনতন্ত্রও প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ন্যূনতম রক্তপাতের দ্বারা এত দ্রুত এত সুষ্ঠু রাজনৈতিক বিপ্লব পৃথিবীতে খুব অল্পই সংঘটিত হইয়াছে। মিশরের বিপ্লবের সহিত তুলনা করিয়া লণ্ডন 'টাইমস' ইরাকের বিপ্লব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, The revolutionary leaders in Iraq have been in some respects quicker off the mark than their Egyptian prototypes. They destroyed the monarchy immediately, whereas the Egyptians waited a year before declaring their Republic. They have also already produced a provisional Constitution, thus cutting out the consultations by which Nasser and his colleagues gradually felt their way to new institutions.

নুরীর শাসন—

১৯৪৮ সাল হইতেই মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষার প্রধান ঘাঁটী ইরাক। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর তুর্কি সাম্রাজ্য হইতে মুক্ত এই আরব রাজ্যটির উপর বৃটেনের ম্যাণ্ডেটারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৩০ সাল হইতে এই রাজ্যে বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খল শিথিল হইতে আরম্ভ করে ; কিন্তু তখন হইতেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অকৃত্রিম বন্ধু নুরী এস-সৈয়দের কর্ত্তৃত্ব এখানে প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যক্তি চৌদ্দবার ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। তবে, এই তাঁহার দীর্ঘ শাসন-কাল সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ নয়। ১৯৩৬ সালে ইরাকে এক সামরিক "ক্যুপ ড

আতাৎ" হয়, এবং দশ মাস কাল উহা স্থায়ী হইয়াছিল ; ইহার পর ১৯৪১ সালে ইরাকে এক নাৎসী সমর্থক "ক্যুপ্" হয়, বৃটিশের সশস্ত্র হস্তক্ষেপে ইহার অবসান ঘটে ; ১৯৪৮ সালে ইঙ্গ-ইরাক পোর্টস্‌মাউথ চুক্তির প্রতিবাদে বাগদাদে দারুণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল ; হাঙ্গামাকারীরা কয়েক সপ্তাহ রাজধানী অবরোধ করিয়া রাখে। প্রত্যেকবার এই সব অভ্যুত্থানের সময় নুরী-এস-সৈয়দ দেশ হইতে পলায়ন করেন এবং পরে বৈদেশিক সাহায্যে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হন। নুরী দেশশাসন করিতেন বৃটিশ ট্যাঙ্ক-কামানে সজ্জিত সেনাবাহিনীর প্রবীণ অধিনায়কদের সহায়তায়, সামন্ত-তান্ত্রিক জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কৌশলে রচিত পার্লামেন্টের সমর্থনে। তাঁহার শাসনকালে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল ; সংবাদপত্রের উপর ছিল কড়া সেন্সর-ব্যবস্থা। ঐ ক্ষুদ্র দেশে দশ হাজার রাজনৈতিক কর্ম্মীকে তিনি জেলে পুরিয়াছিলেন ; রাজনৈতিক অপরাধী অথবা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর নির্য্যাতন চলিত অবাধে। ১৯৫২ সালের পর হইতে প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড ইরাকে দেশোন্নয়নমূলক কার্য্যে ব্যয় হইয়াছে ; কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্দ্দশার লাঘব হয় নাই কিছুমাত্র। সেচ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন, শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয় হইলেও নুরী কিছুতেই সামন্ত-তান্ত্রিক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিতে চাহেন নাই, ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাবেরও কঠোর বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন।

নুরী-শাসনের যাহারা বিরোধী ছিল, তাহাদিগকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, যে সব প্রতিক্রিয়াশীল প্রবীণ রাজনীতিক নুরী এস-সৈয়দের দাপটে মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না তাঁহারা ; ইহারা সকলেই পাশ্চাত্যের অনুগ্রহপ্রার্থী। দ্বিতীয়তঃ, নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা ; ইহাদের সকলেরই প্রেরণার উৎস মিশরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব। বর্ত্তমান ইরাকী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নেতা মহম্মদ কাব্বা হইতেছেন নিষিদ্ধ ইস্তিকলাল (জাতীয়তাবাদী) দলের নেতা ; ইনি ১৯৪১ ও ১৯৪৮ সালে বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন, বিপ্লবী গভর্ণমেন্টের সুপ্রিম প্রেসিডেনসিয়াল্ কাউন্সিলের ইনি সদস্য। দ্বিতীয় নেতা সাদিক শেনশাল ১৯৪৮ সালের অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ; বর্ত্তমানে ইনি অন্যতম মন্ত্রী। তৃতীয়তঃ ব্রীগেডিয়ার আবদুল কোরিম কাসেম্ (বর্ত্তমানে প্রধান মন্ত্রী) সেনাবিভাগের যুব কর্ণেল দলের নেতা। ইহারা সকলেই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের ও ইস্রাইলের বিরোধী, বাগ্‌দাদ চুক্তির প্রতি ইহাদের বিরোধিতা প্রবল।

ইরাক ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈল স্বার্থ—

ইরাক মধ্যপ্রাচ্যের একটি প্রধান তৈল উৎপাদক দেশ। কারকুক্, মসুল ও বাসরায় ইহার প্রধান তৈলক্ষেত্র ; উত্তরাঞ্চলের দুইটি তৈলক্ষেত্র হইতে বৎসরে আড়াই কোটী টন এবং দক্ষিণে বাসরার তৈলক্ষেত্র হইতে নব্বই লক্ষ টন্ তৈল চালান হয়। ইরাকের সমস্ত তৈল উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী। এই প্রতিষ্ঠানের সেয়ারগুলি বৃটিশ পেট্রোলিয়াম, রয়াল্ ডাচ্ শেল্, কোম্পাগ্‌নি ফ্রাঁকে ত্ত পেত্রল্‌স্ এবং মধ্যপ্রাচ্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল ও সকোনি মোবিল্) নামক মার্কিণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত। ইরাক পেট্রলিয়াম্ কোম্পানীর এই সেয়ারহোল্ডার প্রতিষ্ঠানগুলি পরিশোধিত তৈল আন্তর্জ্জাতিক বাজারে বিক্রয় করে। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ইরাক্ গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক নাই ; তাহাদের লাভের অঙ্কে কোনও দাবীও তাঁহাদের নাই। বর্ত্তমান দশকের প্রথম দিকে ইরাণে মোসাদেক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তৈল জাতীয়করণ সংক্রান্ত গোলযোগের পর এখন মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য তৈল উৎপাদনকারী দেশের ন্যায় ইরাক প্রতি ব্যারেল অপরিস্রুত তৈলের অর্দ্ধেক মূল্য (Fifty-fifty norm) রয়ালটি পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহা পরিস্রুত তৈল বিক্রয় লব্ধ লাভের এক নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র "But (the royalty payments) represent only a small proportion—between a quarter and a fifth of the profits derived from the sale of Middle Eastern oil. Royalties are leased on the price per barrel of oil when it baves the producing area, and bear no relation to ultimate selling prices. (Paul Johnson) "...a constant Arab complaint that the well-head price, on which royalties are based, is arbitrarily fixed by the great companies..." (New Statesman)

মধ্যপ্রাচ্যের এই হিমালয়-প্রমাণ লাভের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের। শুধু ব্যবসায়ের পণ্য হিসাবেই নহে—সামরিক উপকরণ হিসাবেও খনিজ তৈলের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে মিত্রশক্তির বিজয় সম্পর্কে লর্ড কার্জ্জন মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আমরা তৈলসমুদ্রে ভাসিয়া বিজয়ের তীরে উপনীত হইয়াছি।" বিমান-বাহিনীর ছত্রছায়ায় যান্ত্রিক বাহিনী-চালিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে এই তৈল-মাহাত্ম্য আরও শতগুণ অধিক প্রযোজ্য। অ-কম্যুনিষ্ট জগতের মোট তৈল সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগই মধ্যপ্রাচ্যের ভূগর্ভে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বিশাল তৈল সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগের উপর বৃটেনের কর্ত্তৃত্ব ছিল। যুদ্ধের মধ্যে ও পরবর্ত্তীকালে মার্কিণ তৈল স্বার্থ ব্যাপকভাবে মধ্যপ্রাচ্যে (প্রধানতঃ সৌদী আরবে ও ইয়েমেনে) প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে পাঁচটি মার্কিণ ও দুইটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান মধ্যপ্রাচ্যের সমগ্র তৈল সম্পদে কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ নীতির প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে এই তৈল-স্বার্থের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক গুরুত্ব ও বাগদাদ চুক্তি—

তাহার পরে, সামরিক স্বার্থ। মধ্যপ্রাচ্য তিনটি মহাদেশের সংযোগক্ষেত্র। পূর্ব্ব বা পশ্চিম ইউরোপের কোনও আক্রমণকারীর এশিয়ার

আফ্রিকায় প্রবেশ বন্ধ করিতে হইলে এই অঞ্চলের সামরিক দুর্গ অলঙ্ঘ্য হওয়া প্রয়োজন। গত দুইটি মহাযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সমরায়োজন চলিতেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে; মধ্যপ্রাচ্য সেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সংলগ্ন। এই অঞ্চলের তুরস্ক অতলান্তিক চুক্তি-সংস্থার সভ্য; সেখানে সোভিয়েট-বিরোধী ঘাঁটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সৌদী আরবেও মার্কিণ-ঘাঁটী স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট-বিরোধী সমরায়োজন পূর্ণ করিতে হইলে সমগ্র অঞ্চল ব্যাপিয়া পাশ্চাত্য শক্তির সুদৃঢ় ঘাঁটী গড়িয়া ওঠা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনে ১৯৫১ সালেই আমেরিকার পক্ষ হইতে আরব রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া তথাকথিত মধ্যপ্রাচ্য কম্যাণ্ড গঠনের চেষ্টা হয়। এই ব্যবস্থায় আরব রাজ্যগুলিতে বৈদেশিক সৈন্য আসিত এবং তাহাদের সামরিক বিভাগে প্রত্যক্ষভাবে বৈদেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত। স্বভাবতঃ, নব জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ আরব রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই এই ব্যবস্থায় প্রবল আপত্তি করিল এবং আমেরিকার অভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারিল না। ইহাই প্রতিক্রিয়ায় আরব রাষ্ট্রগুলিকে সম্মিলিতভাবে সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াস পরিত্যক্ত হইল এবং ইহার আরম্ভ হইল মধ্যপ্রাচ্যের এক একটি রাষ্ট্রকে স্বতন্ত্রভাবে সামরিক জোটে ভিড়াইবার চেষ্টা। ১৯৫৩ সালে 'নিউইয়র্ক টাইমস' মন্তব্য করেন, "এতদিন মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত রাষ্ট্রকে লইয়া সামরিক চুক্তি সম্পাদনের যে চেষ্টা করিতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে; ভবিষ্যতে এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আপাততঃ পাকিস্থানের সহিত আমাদের সামরিক চুক্তি করা উচিত, যেমন তুরস্কের সহিত আমরা করিয়াছি।" মুসলমান অঞ্চলের এক প্রান্তে তুরস্ক ও অন্য প্রান্তে পাকিস্থানের সহিত আমেরিকার সামরিক চুক্তি হইল, এবং দুই প্রান্ত হইতে কূটনৈতিক জাল ফেলিয়া এক একটি রাষ্ট্রকে সামরিক চুক্তির পালুইতে তুলিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই জালে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন ইরাকের নুরী এস, সৈয়দ; ১৯৫৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বাগদাদে তুরস্কের সহিত ইরাকের সামরিক চুক্তি হইল। ইহাই কুখ্যাতি বাগ্‌দাদ্ চুক্তি। পরে, ইরাণ এই চুক্তিতে যোগ দেয়। পাশ্চাত্য শক্তিগুলির মধ্যে বৃটেন প্রত্যক্ষভাবে এই চুক্তিতে যোগ দিয়াছে। বৃটেন, তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ ও পাকিস্থানকে লইয়া মধ্য প্রাচ্যের সামরিক জোট গড়িয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা এই নীতির উদ্গাতা হইলেও আরব জগতের নিকট "ভাল মানুষ" থাকিবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বাগদাদ চুক্তিতে সে যোগ দেয় নাই। তবে, উহার সামরিক কমিটী, অর্থ-নৈতিক কমিটী ও নাশকতা-বিরোধী কমিটীর সভ্য সে হইয়াছে। আরব জগতে বাগদাদ চুক্তির প্রবল বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জাতীয়তাবাদী আরবেরা ইহাকে আরব জগতে বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছে এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রতি অধিকতর বিদ্বিষ্ট হইয়াছে। আরবরা সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট হইতে আক্রমণের আশঙ্কা করে না; সুতরাং কম্যুনিষ্ট-বিরোধী যুদ্ধায়োজনে তাহাদের উৎসাহ নাই। বরং, আরব জগতের বুকের উপর জোর করিয়া ইস্রাইলের প্রতিষ্ঠায় তাহারা বেশী ক্ষুব্ধ। পাশ্চাত্যের সমর্থন-পুষ্ট ইস্রাইলকে এবং বাগদাদ চুক্তিকে তাহারা পাশ্চাত্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রাখার যন্ত্র মনে করিয়াছে। বাগদাদ্ চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয়, তখনই জাতীয়তাবাদী আরবদের বিরোধিতা লক্ষ্য করিয়া 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান' মন্তব্য করিয়াছিলেন, "Whatever military value the pact might possess will be cancelled by the nationalist resentment it has already provoked throughout the Arab world. The Middle East will not be stabilised by military sects and military assistance to ramshackle Governments which rule in defiance of public opinion. (New Statesman & Nation 29. 1. 55.)

সশস্ত্র ইঙ্গ-মার্কিণ অভিযান

লেবাননে পাশ্চাত্য শক্তির অনুরক্ত চামুন গভর্ণমেণ্টের সমর্থনে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আমেরিকা যখন ইতস্ততঃ করিতেছিল, বাগদাদ্ চুক্তির মুসলমান রাষ্ট্রগুলিকে দিয়া যখন ধূয়া তোলা হইয়াছিল যে, লেবাননের পরিস্থিতি তাহাদের পক্ষে বিপজ্জনক এবং জাতীয়তাবাদী আরবদিগকে ঠেঙ্গাইবার নূতন আয়োজন যখন চলিতেছিল, সেই সময় অতর্কিতে ইরাকে বিপ্লব সংসাধিত হইল, বাগদাদ্ চুক্তির বাগদাদ্ হঠাৎ "ধ্বসিয়া পড়িল।" মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল অর্থ-নৈতিক ও সামরিক স্বার্থের দিকে চাহিয়া আমেরিকা আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিল না; ১৫ই জুলাই তারিখেই ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বউপকূলে অবস্থিত ষষ্ঠ নৌবহর হইতে সে লেবাননে মার্কিণ সৈন্য নামাইয়া দিল, তাহার ইঙ্গিতে বৃটিশ সৈন্য অবতরণ করিল জর্ডানে। ইঙ্গ-মার্কিণ ধুরন্ধররা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হইলেন যে, The crisis in Iraq is the crisis of the West's position in the Middle East.—(London 'Times' 15. 7. 58.) বিশ্বের জনমত এই সশস্ত্র অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে; অবিলম্বে মধ্যপ্রাচ্য হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনা-বাহিনী অপসারণের দাবী জানাইয়াছে। লেবাননের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এবং মার্কিণ অধিবাসীর জীবন রক্ষার প্রয়োজনে সেখানে মার্কিণ সৈন্য পাঠানো হইয়াছে বলিয়া আমেরিকার যে কৈফিয়ৎ, তাহাতে বিশ্বের শান্তিকামী জনমত প্রতারিত হয় নাই। লেবাননের স্বাধীনতা যে বাহিরে কোনও শক্তির দ্বারা বিপন্ন হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল; কোনও আমেরি-কানের জীবনও লেবাননে বিপন্ন হয় নাই। এই ধরণের মিথ্যা অজুহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের সৈন্য প্রেরণের অভ্যাস চিরন্তন। জর্ডানের গণ-সমর্থন-বিহীন সামন্ততান্ত্রিক নৃপতিটিকে তখ্‌তে বসাইয়া রাখিবার জন্য এত আগ্রহ কিসের জন্য, তাহা কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় নাই।

শীর্ষ-সম্মেলনের প্রস্তাব

সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়া মধ্যপ্রাচ্য হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য

প্রত্যাহারের জন্য প্রস্তাব তুলিল। আমেরিকা ও বৃটেনের পক্ষ হইতে বলা হইল—জাতি-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে ঐ অঞ্চলে "পুলিসী" ব্যবস্থা না হইলে তাহারা সৈন্য প্রত্যাহার করিতে পারে না। এই কথার নির্গলিতার্থ এই—কোরিয়ায় যেমন আমেরিকার সমর-প্রচেষ্টায় জাতি-সঙ্ঘের লেবেল লাগাইয়া দিয়া সেখানে কতকগুলি দেশের কয়েকজন সিপাহী পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তেমনি লেবাননেও মার্কিণ সমর-প্রচেষ্টায় জাতি-সঙ্ঘের লেবেল আঁটিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রের নামমাত্র সহযোগ আমেরিকা চাহিল। স্বভাবতঃ এই ব্যবস্থায় সোভিয়েট রুশিয়া সম্মত হইল না। ১৯শে জুলাই তারিখে সোভিয়েট রুশিয়া প্রস্তাব করিল—মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য অবিলম্বে চারিটি বৃহৎ শক্তির (বৃটেন, আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ফ্রান্স) একটি শীর্ষ সম্মেলনের ব্যবস্থা হউক ; সেই সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও জাতি-সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেলের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার উপরও সে বিশেষ জোর দিল। বিশ্বের বিক্ষুব্ধ জনমতের সমক্ষে এই প্রস্তাব সরাসরি উপেক্ষা করা পাশ্চাত্য শক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই, এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য তাঁহারা বাঁকা পথ ধরিলেন। আমেরিকা প্রস্তাব করিল—স্বতন্ত্র শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান না করিয়া জাতি-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদেই রাষ্ট্রপ্রধানদের উপস্থিত থাকিবার ব্যবস্থা হউক ; আর সে অধিবেশনে কোন্ কোন্ বাহিরের শক্তি যোগদান করিবে, তাহা স্থির হইবে নিরাপত্তা পরিষদেই। নিরাপত্তা পরিষদে কৃত্রিম সংখ্যাধিক্য ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষের। সুতরাং এই পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কাহারও নিকট অস্পষ্ট রহিল না। ভারতকে কৌশলে বাদ দিবার উদ্দেশ্যেই বাহিরের শক্তিকে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটি নিরাপত্তা পরিষদের উপর ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব ; ইহার কারণ মধ্যপ্রাচ্যে জাতি-সঙ্ঘের সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর পরিবর্ত্তে নিরস্ত্র পর্য্যবেক্ষক দল নিয়োগের পক্ষপাতী ছিল ভারত। সর্ব্বোপরি শীর্ষ সম্মেলনে ব্যক্তিগতভাবে ঘরোয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমেরিকা কিছুতেই সম্মত হয় নাই। মিঃ ক্রুশ্চেভ ঘরোয়া আলোচনার জন্যই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আনুষ্ঠানিকতা বিবর্জ্জিত ব্যক্তিগত আলোচনার সুযোগ না থাকিলে শীর্ষ সম্মেলন প্রকৃত পক্ষে অর্থহীন।

ইতিমধ্যে লেবাননে সকল দলের সমর্থনে প্রেসিডেণ্ট (সমরনায়ক ফুয়াদ চেহাব) নির্ব্বাচিত হওয়ায় লেবাননের অবস্থা এখন শান্ত। ইরাকে নূতন গভর্ণমেণ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাপ্য আন্তর্জ্জাতিক মর্য্যাদাও তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও বৃটেন ও আমেরিকার পণ—আরব জাতীয়তাবাদকে প্রতিরোধের জন্য লেবাননে ও জর্ডানে জাতি-সঙ্ঘের সশস্ত্র "পুলিস বাহিনী" নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই দুইটি দেশ হইতে বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্য অপসারিত হইবে না। "British officials have warned that it would be fatal to Western influence if Britain and the U. S. had to withdraw their forces from Jordon and Lebanon before the United Nations could replace them with a "police" force.—(Geoffery Wakefield 'Daily Mail') শেষ পর্য্যন্ত, সোভিয়েট রুশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকা রুশিয়ার এই প্রস্তাবে আপত্তি করে নাই।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ গোপনে পিকিং-এ গিয়াছিলেন। গত ৩রা আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত ক্রুশ্চেভ ও মাও-সে-তুং-এর যুক্ত বিবৃতিতে স্বতন্ত্র শীর্ষ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং দৃঢ়তার সহিত মধ্যপ্রাচ্য হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের অপসরণ দাবী করা হইয়াছে।

৭।৮।৫৮



মেয়েদের কথা





মন দেয়া-নেয়া

স্বপ্রিয়া ঠাকুর

মন বস্তুটি এমনই যা চোখেও দেখা যায় না, হাতেও ছোঁয়া যায় না। যেমন বাতাস—চোখেও দেখতে পান না, ছুঁতেও পারেন না। এমন কি, বাতাস যে আছে—এও হয়ত সব সময় আপনার মনেই থাকে না। কিন্তু যখনই কোন কারণে বাতাসের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আপনার গায়ে এসে লাগে তখনই তার অস্তিত্ব বুঝতে পারেন। তেমনই মনের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি না হলে মন আছে বলেও সব সময় আমরা টের পাই না। আশা, আনন্দ, দুঃখ, হতাশা প্রভৃতি এসে আপনার মনকে যখন নাড়া দেয় আপনি মনের অস্তিত্ব বুঝতে পারেন। এই মানসিক পরিবর্তনগুলো আবার আসে আপনার প্রতি অন্যের ব্যবহার থেকে। আপনিও আবার ঠিক তেমনি আপনার ব্যবহার এবং আপনার কথা দিয়েই অন্যের মনকে খুসীমত নাড়া দিতে পারেন। পারিপার্শ্বিকের সংস্পর্শে মনের এই আবর্তন ও বিবর্তনকে মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেছেন behaviorisn.

মন দেয়া-নেয়ার রীতিতেই এই পৃথিবীর যা কিছু মধুর এবং যা কিছু তিক্ত সবই গড়ে ওঠে। স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রভৃতি যেমন এই মন থেকেই সৃষ্টি হয়, তেমনই ঘৃণা অবহেলা শত্রুতা প্রভৃতির উৎসও এই মন। সেই মনের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করে কেমন করে আপনি সবারই মনের মত হতে পারবেন সেই সব কৌশল-গুলির আলোচনা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সব সময় মনে রাখবেন, যাঁর মনের উপর আপনি প্রভাব বিস্তার করতে যাচ্ছেন তিনি যেন কোন রকমেই টের না পান যে আপনি কলা-কৌশলের সাহায্যে তাঁর মন জয় করতে যাচ্ছেন।

আরও একটা কথা মনে রাখবেন। মনের চেয়ে আপন জন আর কেউ নাই। তাই আমরা নিজের দোষগুলোকে ছোট করে দেখি। নিজের গুণের সীমানা পাইনা। অতএব আপনাকে ধরেই নিতে হবে যে অন্যের মন আপনার উপর সব সময় বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। আর তাই যদি না হবে, তবে তাকে জয় করার প্রশ্নই বা আসবে কেন?

আমরা প্রথমেই আলোচনা করব কেমন করে আপনার নিজের সংসারটি শান্তিময় হয়ে উঠবে। কেমন করে আপনি আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গের মনের মত হতে পারবেন। তাছাড়া আপনার অভিযানও আপনার আত্মীয়-স্বজন থেকেই সুরু করা ঠিক হবে বলে মনে হয়; কারণ, যার-মন আপনি জয় করতে চান তার স্বভাবটা মোটামুটি আপনাকে প্রথমেই জেনে নিতে হবে। আপনার সংসারে কার রুচি কি রকম, কে কোনটা ভালবাসে, কার কোনটা ভাল লাগেনা—এসব আপনার যত ভাল জানা আছে, অন্য কারও সম্বন্ধে আপনি তত ভাল জানেন না।

খুঁটিনাটি ছেড়ে দিয়ে যা সবার পক্ষে প্রযোজ্য এমন কতকগুলি কৌশল আগেই জেনে নিন :

১। খিটখিটে হবেন না

সংসারে শান্তি আনতে গেলে আপনার নিজের মনকে শান্ত, সুস্থ ও সংযত করে তুলতে হবে প্রথমেই। বিশেষ করে বাক্‌সংযম। শুধু এই মুখের কথাতে পৃথিবীতে যত অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে অন্য কোনও কারণেই আর তত হয়নি। অতএব কথা যত কম বলতে পারেন ততই ভাল।

আপনার স্বামী, ছেলেমেয়ে বা ভাইবোনদের ভালর জন্যেই হয়ত আপনি খিট্‌খিট করেন। তবুও শেষ পর্যন্ত দেখবেন তারাই আপনার উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছে। শুধু তারাই নয় বাড়ীর অন্যান্য আত্মীয়—এমন কি ঝি চাকররাও দেখবেন আপনাকে ভয় করতে আরম্ভ করেছে এবং

আপনার উপর বিরক্ত হয়ে উঠছে। ধরুন, আপনার স্বামী হয়ত অফিস থেকে ফিরে কিছু খেতে চান না। অথচ তাঁর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে আপনি তাঁকে রোজই পেড়াপেড়ি করেন। কিছুদিন পরেই দেখবেন—অফিস থেকে ফিরে তিনি হয়ত আপনার সঙ্গে ভাল করে কথা বলছেন না। এই ক্ষুদ্র বিষয়টি নিয়েই শেষ পর্যন্ত আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য এবং অন্যান্য অশান্তি এসে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

তাহলে কি খাওয়ার কথা তাঁকে আর একেবারেই বলবেন না? নিশ্চয়ই বলবেন। খাওয়াতেও হবে। অন্য সময়ে খুব ঠাণ্ডা মাথায় কথাটা তুলবেন এবং এমনইভাবে আপনার কথাগুলি সাজাবেন যাতে তিনি নিজেই বুঝতে পারেন যে আপনার সারাদিনের সব ব্যস্ততা এবং সব পরিশ্রম তাঁরই স্বাস্থ্যের জন্যে। তিনি যথাসময়ে খাওয়া দাওয়া না করলে আপনি শুধু দুঃখই পান না, আপনার কোন কাজেই আর উৎসাহ আসে না। দেখবেন, তার পরের দিনই হয়ত তিনি নিজেই আপনার কাছে বিকেলের খাবার চাইছেন।

আপনার ছেলেমেয়ে বা ছোট ভাইবোনদের কোন অন্যায় বা দোষক্রটির জন্যে নিশ্চয়ই বকবেন। কিন্তু সেই কথাটা নিয়েই বেশীক্ষণ গজগজ করবেন না। অনেককে দেখা যায়, আজকের অপরাধের সঙ্গে অতীতের একটি, দুটি বা যতগুলি মনে আসে সবগুলির উল্লেখ করে একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছেন। এমনটা কখনও করবেন না।

এবার এই খিটখিটে স্বভাবটা আপনার হল কেমন করে শুনুন: খুব সামান্য ব্যাপারেই আপনি আঘাত পান তো? খুব সামান্য ব্যাপারেই আপনি চটে উঠেন নিশ্চয়ই? অতএব রাগটাকে যদি সংযত করতে পারেন, তা হলেই আপনার এ স্বভাবও আর থাকবে না। রাগ সংযত করতে হলে নিজের দোষ ত্রুটিগুলো অন্যের সঙ্গে তুলনা করবেন।

২। কারও রুচি এবং স্বভাবকে আক্রমণ করবেন না

"তোমার স্বভাবটাই এইরকম।" "তোমার রুচিটাই এমনই বিশ্রী।" এই ধরণের কথা যত কম বলতে পারেন ততই ভাল। আমি বলি, একবারেই বলবেন না। কারণ আপনার এইসব কথা সহ্য তো করবেই না কেউ, বরং সুবিধে পেলেই সে আপনার উপর প্রতিশোধ নেওয়ারও চেষ্টা করবে। নিজের বুদ্ধি রুচি এবং স্বভাবের উপর প্রত্যেক মানুষেরই অসীম শ্রদ্ধা আছে। যে কোন কারণেই হোক না কেন, সেই জায়গাটিতেই যদি আপনি আঘাত দিয়ে বসেন, সে আপনাকে কখনই ভাল চোখে দেখতে পারবে না।

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্রাহাম লিন্‌কন। তাঁর অভাব ছিল না কিছুরই। শ্রদ্ধা, সম্মান, সম্পদ, স্বাস্থ্য—মানুষের সুখী হওয়ার জন্যে যা কিছু দরকার, তার সবগুলিই পেয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে। তবুও শোনা যায় একটা দিনের জন্যেও শান্তি পাননি তিনি। স্ত্রী মেরীটডের স্বভাব ছিল অত্যন্ত খিটখিটে। পদে পদে আব্রাহামকে আক্রমণ করাই ছিল তাঁর সারাদিনের কাজ। আব্রাহাম যতক্ষণ বাড়ীতে থাকতেন, মেরী টড্ তাঁকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দিতেন না। লিন্‌কনের রুচি, লিন্‌কনের স্বভাব, তাঁর চলাফেরা, কথা বলা—সব কিছুর মধ্যেই দোষ এবং ত্রুটি দেখতে পেতেন মেরীটড্। হয়ত সেগুলি শুধরে নিয়ে আব্রাহামকে নিজের মনের মতই করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাত্রাটা এতই চড়ে গেছল যে তার বিষময় ফল স্বরূপ মেরীটডকে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

আব্রাহাম-মেরীটডের সংসার কেন, লক্ষ্য করলে আপনিও এমন সংসার অনেক দেখতে পাবেন যেখানে গৃহিণী তাঁর স্বামীকে বা ছেলেমেয়েকে মনের মত করতে গিয়ে এমনই উগ্রপন্থা অবলম্বন করেছেন যে তার ফলে গোটা সংসারটাই বিষময় হয়ে উঠেছে।

৩। শুচিবায়ুগ্রস্ত হবেন না

সংসারে সবারই প্রতি আপনি সদয় ব্যবহার করেন; সকলকেই সাধ্যমত আদর যত্ন করেন ও ভালবাসেন। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সংসারের কাজের জন্যে আপনি এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম পান না। একদিন যদি আপনি না থাকেন, তবে সংসারটাই হয়ত অচল হয়ে যাবে। সংসারে আপনার এতখানি প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও আপনার উপর

সবাই বিরক্ত হয়ে থাকবে যদি আপনি শুচিবায়ুগ্রস্ত হন। আপনার কাজের ফলভোগ করবে সবাই, কিন্তু আপনাকে ভালবাসবে না কেউই। বরং আপনার আড়ালে আপনাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে তারা। শেষ পর্যন্ত আপনার সামনেই আপনাকে ঠাট্টা তামাসা করবে। হয়ত একটা কুৎসিৎ নামও রাখবে আপনার। এমনি করে সবারই কাছে হেয় হয়ে উঠবেন আপনি।

তাহলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল কি? সংসারের জন্যে আপনার সমস্ত পরিশ্রম, সবারই জন্যে আপনার দরদ—সব বিফল হয়ে গেল। এ রোগটা কিন্তু ইচ্ছে করলেই সারাতে পারেন। মাত্র সাতটা দিন আপনি একটু নোংরা হয়ে থাকুন। দেখবেন, অনেকখানি সেরে উঠেছেন।

৪। অকারণ তর্ক করবেন না

অনেক ব্যাপার নিয়ে অনেক সময় হয়ত আপনার সঙ্গে অন্যের মতের মিল হবে না। তা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবেন না, হলই বা তিনি আপনার ছোট বা সমবয়সী। কারণ, আপনার এই তর্ক করা স্বভাব অন্যের মনে বিরক্তি এনে দেবে। মুখে প্রকাশ না করলেও মনের ভিতর ধীরে ধীরে অপ্রীতি সঞ্চিত হতে থাকবে।

৫। কারও সামনে অন্যের নিন্দা করবেন না

যাঁরই কাছে আপনি অন্যের নিন্দে করছেন তিনিই ভাববেন যে পরের নিন্দে করাই আপনার স্বভাব। অন্য লোকের কাছেও নিশ্চয়ই আপনি তাঁরও নিন্দে করেন। এতে আপনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে। কারও শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস হারালে তাকে ফিরিয়ে আনা বড় কঠিন।

৬। উদারতা ও পারস্পরিক প্রয়োজন-বোধ

আপনার সংসারে নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটেই যে একজনের কোন একটি জিনিষ দরকার বোধে অন্যকে দিতে হয়। অথচ দেখেন, যাঁর জিনিষ তিনি কিছুতেই দিতে চান না। শেষ পর্যন্ত নেহাৎ বাধ্য হয়েই যেন তাকে দিতে হল। আপনি কিন্তু এমনটা কখনও করবেন না। কারণ, এতে হবে কি? আপনার জিনিষ তো গেলই, অথচ যাকে দিলেন সে আপনার দেওয়া জিনিষ নিলে বটে, কিন্তু আপনার এই ভাব দেখে সন্তুষ্ট হল না মোটেই। অতএব তা না করে আপনি ভাবটা এমনই দেখান যেন দেবার জন্যে আপনি প্রস্তুতই ছিলেন, শুধু দরকার হয়নি বলে দেন নি।

আবার এমন অনেক সময় হয় যে আপনার সখের একটা জিনিষ অসাবধানতা বশতঃ কেউ হারিয়ে ফেলেছে বা ভেঙ্গে ফেলেছে। তা নিয়ে যেন কখনও তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসবেন না, তাতে লাভ কিছুই হয় না। যা ভাঙ্গল বা হারাল তা তো ফিরেই পেলেন না, মাঝখান থেকে আপনার মুখের জন্যে অপ্রিয় হলেন সবারই।

সংসারে বাস করতে হলে শুধু নিজেরটা দেখলেই চলে না। অন্যের জন্যেও কিছু কিছু ছাড়তে হয় এবং সইতেও হয়। এই পারস্পরিক ত্যাগ ও সহনশীলতা না থাকলে কোন সংসার বা সমাজ শান্তিপূর্ণ হতে পারে না। এছাড়া, অন্যের প্রয়োজনবোধটাকেও কিছুটা অনুভব করবার দরকার লাগে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে সব সময় সব কিছু বিলিয়ে দেবেন। তবে এইটুকু লক্ষ্য রাখতে হবে যে সংসারে আপনাকে যেন আর পাঁচজনে স্বার্থপর না ভাবে।



কাঁচকলার খোসার কালিয়া

উপকরণ :—কাঁচকলার খোসা, আলু, অল্প দই, লঙ্কা, হলুদ, জিরা, আদা, তেজপাতা, লবণ, সামান্য চিনি, ঘি ও গরম মসলা।

এই কালিয়া রাঁধবার জন্য বেশ কচি কাঁচকলার খোসা হলেই ভাল হয়। খোসাগুলি দু'একদিন ধরে জমিয়ে রাখলেও চলে, তবে বেশ যত্ন ক'রে রাখতে হবে,

যেন শুকিয়ে না যায়। খোসাগুলি খুব সরু সরু ক'রে কুচিয়ে নেবেন এবং ঐ সঙ্গে পরিমাণ মত কিছু আলুও ডুমা ডুমা করে কেটে রাখবেন। কুচানো কাঁচকলার খোসাগুলি প্রথমে বেশ ভালভাবে সিদ্ধ করে জল ঝরতে দেবেন। তারপর কড়াতে তেল দিয়ে লঙ্কা, জিরা ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে তাতে আলুগুলি তুলে দেবেন। আলুগুলি ভাজা হয়ে গেলে খোসাগুলি দিয়ে দেবেন, তারপর হলুদ-লঙ্কা-আদা-জিরাবাটা দেবেন। এই সঙ্গে অল্প দই বা তার অভাবে সামান্য তেঁতুলগোলা জল দিয়ে এবং অল্প একটু চিনি দিয়ে ভালভাবে কস্‌বেন। কসা হয়ে গেলে আন্দাজ মত জল ও নুন দেবেন। রুচি অনুসারে ঐগুলি কস্‌বার সময় অল্প পরিমাণে পিঁয়াজ-বা দিতে পারেন। কালিয়াতে ঝোল গা-মাথা-মাথা থাকা থাকতে নামিয়ে নেবেন। তারপর ঘি ও গরম মসলা দি ঢেকে রাখবেন ও সময়মত পরিবেশন করবেন। এ কালিয়া অসময়ের এঁচড়ের মত খেতেও যেমন সুস্বাদু হ পরিজনের পাতে পরিবেশন করেও ঠিক তেমনি আন পাওয়া যায়।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী
(চন্দননগর)

আঘাত

শ্রীতারিণীপ্রসাদ রায়

তখনো কাটেনি ঘোর
হয় নাই নিশি ভোর—
থম থম ধরা
স্বপন আবেশ
এসেছিলে প্রিয়া-মোর
বাঁধিতে বাঁধন ডোর।

নিঝুম আঁধার রাতে
চাঁপার কলির সাথে
গেয়েছিল গান
পলক বিহীন
নীরব নয়ন পাতে
বীণাখানি ছিল হাতে।

শিউলি বনের মাঝে
সাজি অপরূপ সাজে
চেয়েছিলে তুমি
আকুল নয়নে
সরম জড়ান লাজে
স্মৃতির বেদন বাজে।

তারা বধুদের সাথে
রূপালী আলোর পাতে
এসেছিলে নামি
ধূলির ধরায়
ফুলভরা আঙিনাতে
মালাখানি ছিল হাতে।

আঁচল কালো কাজল
উতল বায়ে পাগল
দখিনায় উড়ি
বুক জুড়ি তব
মেঘের ভারে সজল
অবনত টল টল।

ধূসর মেঘের দলে
মিশিয়াছ বুঝি ছলে
খুঁজি ফেরে মোর
তৃষিত নয়ন
নীল আকাশের তলে
কভু বা সাগর জলে।

আনত চাহনি ভার
দুটী আঁখি তারকার
দুলেছিল গলে
ঝলকানো দোলে
গাঁথন বিহীন তার
চিলতে চাঁদের হার।

মধুর স্বপন রাত
হবে ওগো পরভাত
ভাবি নাই কভু
হানিবে পেয়সী
খেলার খেয়াল সাথ
এহেন নিঠুরাঘাত।

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

পূর্বপ্রকাশিতের পর

কিন্তু আজো গতরাত্রেরই পুনরাবৃত্তি ঘটল। বরং গত-রাত্রের চেয়েও কুৎসিৎ এবং ভয়াবহ। অভয়ের রক্ত-ধারায় আবার সেই আত্মক্ষয়ী পীড়ন শুরু হ'ল।

নিমি যেন মায়াবিনী। চোখে ও ঠোঁটে তার কি এক সর্বনাশের হাসি চমকাতে লাগল ধারালো ছুরির মতো। শিকারীর নিশ্চিত সাফল্যের মতো সেই হাসি, আপন মনে, একরোখা হ'য়ে তার ফাঁদ বিছিয়ে চলেছে। নিপুণ সেই ফাঁদ, অব্যর্থ। শুধু ফাঁদে-পড়া শিকার সেটা তিলে তিলে মৃত্যুর মতো অনুভব করছিল। অভয় দেখল, খাওয়ার পাট চুকিয়ে, পান মুখে দিয়ে, ঠোঁট রাঙিয়ে শৈলবালা আর তার সঙ্গিনীদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পালি করল নিমি। তারপর শৈলবালার সঙ্গিনীরা বিদায় নিল। শুতে যাচ্ছিল শৈলবালা। নিমি নেমে গেল উঠোনে।

শৈলবালা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছিস্?

নিমি বলল, আসছি, তুই শো।

শৈলবালার ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বলল, আসছি মানে? কোথায় যাচ্ছিস এ রাত্তিরবেলা?

শৈলবালার গলায় ক্ষোভ ও সন্দেহের আভাস। নিমি বলল, এই পাশেই, একটু ময়নাদের বাড়ি। ও বসে আছে আমার জন্যে। একটা কথা আছে।

শৈলবালা বলল, আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে। পোহর রাতে উনি চললেন এখন সইয়ের সঙ্গে গুপ্ত কথা বলতে।

গলা নামিয়ে বলল, জামাইকে ঘরে রেখে, কোন্ আক্কেলে এখন তুই চললি? নিমিও মুখঝামটা দিল, চললুম কি একেবারে ন'শো পঞ্চাশ মাইল নাকি? এই তো যাব আর আসব। তুই শো না।

কয়েক নিমেষ চুপচাপ। তাতে শৈলবালার অস্বস্তিটুকু ধরা পড়ল। নিমি চলে গেল। শৈলবালা বলল, ঢং।

তারপর সে শুতে গেল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু অভয় ঘুমের ছলনা ক'রে, মটকা মেরে প'ড়ে রইল। যদি শৈলবালা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, জামাই কি করছে?

কিন্তু অভয়ের শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে আসছে। বুকের মধ্যে জ্বলছে তার। কী অপরাধ করেছে সে? কিসের প্রতি-শোধ নিচ্ছে নিমি এমন ক'রে? এ শুধু কষ্ট দেওয়া নয়, অপমানও বটে। সে যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, নিমির সেই হাসি মুখ। বলছে, কেমন? কেমন মজা? কেন এই মজা দেখাচ্ছে নিমি? সে যখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নিমির জন্য, তখন সে কেন আসছে না? কেন বাইরে বাইরে ঘুরছে?

নিমির খিলখিল্ হাসি শোনা গেল। ময়নাদের বাড়ি কাছেই, উঠোনে উঠোনে ঘেঁষাঘেঁষি প্রায়। বোঝা গেল, দু'জনে বাইরে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি কথা বলছে। আর সেই কথারই আধা-অর্থ ওই হাসিতে ফুটে উঠছে।

শোনা গেল, ময়না বলছে, হাসতে হাসতে, দূর মুখপুড়ি!

নিমির গলা শোনা গেল, সত্যি, মাইরি বল্ছি।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। বোধহয় চাপা গলায় কথা হচ্ছে। তারপরেই আবার হাসি।

এই হাসি যেন অভয়েরই উদ্দেশে, অভয়েরই বুকে বিঁধছে তীক্ষ্ণ খোঁচার মতো। তার সুবিশাল শরীর শক্ত আড়ষ্ট। যেন আঘাত সহ্য করার জন্য দাঁতে দাঁত পিষে, শক্ত হ'য়ে প'ড়ে আছে সে। ফাঁদে পড়া পতঙ্গটাকে,

হুলের খোঁচায় খোঁচায় মরণ যন্ত্রণাটাকে বাড়াচ্ছে। সারা গায়ের পেশী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, ফুলছে, ফুঁসছে যেন সাপের মতো। ঘামছে দরদর ক'রে।

সেই ভয়াবহ কালরাত্রিই কোন্ অদৃশ্য থেকে পিল্‌পিল্ ক'রে এসে, ঘিরে ফেলল অভয়কে। সারাদিনের কথা ভুলে গেল সে। দিনের সেই প্রসন্নতা, গতকাল রাত্রের নিজের পাশবিক আচরণের অনুশোচনা, নিমির ভালবাসার নেশায় মস্‌গুল হ'তে চাওয়ার বাসনা হারিয়ে গেছে কোথায়। তার ভিতরের সেই অন্ধ বিকৃত পশুটা জাগছে আবার।

একটি খেলা-ই জানে নিমি। পশুকে খুঁচিয়ে, জাগিয়ে তোলা। আর দশটি মেয়েমানুষের সঙ্গে অন্য কোথাও তার ফারাক নেই। কিন্তু পুরুষকে দেবার মতো এর চেয়ে বড় শাস্তির খেলা তার অগম্য। শুধু অপরাধ বিচারের মাত্রাজ্ঞান তার নেই। হয় তো, অভয়কে নিরঙ্কুশ পাওয়ার জন্য, এইটিই তার ভূমিকা। কিন্তু নিজের খেয়াল মেটাতে গিয়ে, নিমির প্রাণে সামান্য বিষ ছুঁড়ে দিয়ে যে এই অসামান্য যন্ত্রণাকে সৃষ্টি করেছে, সেই ভামিনী হয়তো কোনদিন এই রাত্রির কথা জানতে পারবেনা। পারলেও বুঝতে পারবে না। বুঝলেও, নিমিরই বাড়াবাড়ি মনে ক'রে তার রাগ হবে।

ভামিনীর সঙ্গে নিমির সেইখানেই তফাৎ। ভামিনী আর নিমি এক নয়। বয়স নয়, মন নয়, জীবনও নয়। অভিজ্ঞতা তো নয়-ই।

তাই নিমির প্রাণে যে সংশয় ধরিয়ে দিয়েছে ভামিনী প্রথম থেকেই, সেই সংশয় থেকে নিঃসংশয় হওয়ার এইটি কষ্টিপাথর নিমির। এই কষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে পরখ করছে সে অভয়কে। এই বিচিত্র কষ্টিপাথরের পরখ এমনি প্রতিশোধেরই মূর্তি ধ'রে আসে। আগুন নয়, সাপ নয়, এ যে মানুষের রক্ত ও মন নিয়ে খেলা, এই ভয়ংকর কথাটা জানে না নিমি। আগুন, সাপ সবই ভয়ংকর, কিন্তু মানুষের রক্ত ও মন তার চেয়েও ভয়ংকর। তার দাহ্য শক্তি এবং বিষক্রিয়া আরো বেশী।

না-জেনে, নিজের মনের পুরোপুরি পাওনাগণ্ডা আদায়ের লোভে, এই ভয়ংকর প্রতিশোধের লীলাখেলা খেলছে নিমি।

অভয় জীবনকে সহজভাবে নিতে গিয়ে, ধাক্কা খেয়ে অসহজ হ'চ্ছে। সে রাগছে, ফুঁসছে, জ্বলছে। সারাদিন ধ'রে, যেটাকে সে মিটে গেছে ব'লে মনে করেছিল, এখন দেখছি, আসল আগুন উস্‌কে ওঠার আগে, এ শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী। নিজেকে তার অভিশপ্ত, শরাহত পশু ব'লে মনে হচ্ছে। এর যেন শেষ নেই, এ মিটবে না বুঝি কোনদিন।

গ্রামে জারজ ক্রীতদাসের জীবনে এরকম আঁকাবাঁকা ঘোরপ্যাচ কিছু ছিলনা। দুটি খেতে পাওয়া বড় কঠিন ছিল। সেই কঠিনতার প্রাত্যহিক অবসানে, ঘৃণা কিম্বা ভালর আবেগে দুটো গান বেঁধে ও গেয়ে দিন চলার মতো সরল প্রাণ ছটফট ক'রে মরতে লাগল এই বেড়াজালে।

সেখানে সরকারি বাবুরা মানুষ গুণতে এসে, তার নামের পাশে লিখেছিল ভূমিহীন কৃষক। এখন সে যন্ত্রের অন্ধিসন্ধি শিখছে, সে মিস্তিরি। জীবন যখন নতুন পথে শক্ত পা ফেলে এগিয়ে চলছে, তখনই এ গণ্ডগোল। তার মনের শরীরের মধ্যে যে একটি দানবীয় শক্তি আছে, সেই শক্তি দাপাদাপি করছে, মাথা খুঁড়ছে।

কারণ সে ভালবেসেছে। আর ভালবাসাটা ফাঁদের মতো জড়িয়ে মারছে তাকে। তাই তার সহজ প্রাণে প্রথম প্রতিক্রিয়া শুধু পশুরই রূপ ধরছে। বোধহয় এটাও জীবনেরই ধর্ম।

কিন্তু রাত বাড়ছে, ঝিঁ ঝিঁর ডাক প্রখর হচ্ছে, বড় রাস্তার গাড়ি যাতায়াতের শব্দ কমছে, মানুষের কোলাহল চাপা প'ড়ে যাচ্ছে ঘরে ঘরে, তবু নিমির সখী-আলাপ শেষ হয় না। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সংকল্প নিতে পারে না অভয়। শুয়ে থাকার যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য হয় না। অন্ধ জোঁকের মতো সে যেন ক্রমেই এলোপাথারি অর্থহীন ভাবনায় রক্তলোলুপ হয়ে উঠতে থাকে।

হাসির শব্দ কমে গেছে নিমির। হয় তো ময়না নেই, সে একলাই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে আর হাসছে এই ঘরের দিকে তাকিয়ে।

পুকুরের উত্তর পশ্চিমের ঘাটে জল ঘাঁটার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ওটা বারোবাসর পাড়ার ঘাট—সেই ছুঁচিবাই মেয়েটা বোধহয় এল চান করতে। যত রাত্রিই হোক,

দেহ-পণ্য সেরে, রোজ না নাইলে নাকি ওর চলে না। তারপর নাকি আবার ঠাকুর পুজোও করে আর প্রসাদ খেয়ে শোয়।

অভয়ের মন যখন ঘৃণায় ও রাগে জ্বলতে জ্বলতেও ক্লান্ত হ'য়ে এসেছে, সেই সময় এসে নিমি ঢুকল ঘরে।

অভয়ের বুকের মধ্যে যেন কাড়ানাকাড়া বাজতে লাগল। সে শান্ত করতে চায় নিজেকে। শান্ত করতে চায়, ভালবাসতে চায়, হাসতে চায়। সারা রাত নিমিকে বুকের কাছে নিয়ে নতুন নতুন গান বাঁধতে চায় সে।

নিমি ঘটি থেকে জল খেতে খেতে একবার আড়চোখে দেখল অভয়ের আড়ষ্ট শরীর। বলল, বাতিটা নিভিয়ে শুতে কি হয়েছিল? মিছিমিছি তেল পুড়ছে।

অভয় না উঠেই বলল, তুমি আসবে, তাই।

নিমি উঠে বসল। নিমি সেই ছায়াটা দেখল। কিন্তু অভয়ের চোখের দিকে তাকালে বোধহয় আর মুখ খুলত না। বলল, তারপর পীরিতের খুড়ি কি বলল আজ দুকুরে?

—কিছু না।

—কিছুটি না?

বিদ্রূপ ঘনাল আবার ঠোঁটের বাঁকে। বলল, শুধু কয়েক ঢোক মাল খাইয়ে ছেড়ে দিলে? একবার সুবলির কাছেও নিয়ে যেতে চাইল না? নিদেন পেয়ারের সাত-কেলে ভাসুর পো'কে নিয়ে—

মুখ ফিরিয়ে স্তব্ধ হল নিমি। দেখল, তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে মোষের মতো কালো মূর্তি। চোখ রক্তবর্ণ, ধক্‌ধক্ ক'রে জ্বলছে। কালকেও ঠিক এমনি মূর্তিই দেখেছিল নিমি। কিন্তু তার মধ্যে অনেকখানি বিহ্বলতা ছিল। আজ সে বিহ্বলতা নেই, প্রচণ্ড ঘৃণার তরল আগুন যেন গলে পড়ছে চোখ থেকে। কালকেও ভয় পেয়েছিল নিমি, আজকে তার চেয়ে বেশী ভয় তার বুকের মধ্যে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। তবু সে বাঁকা হাসি ধরে রাখতে চাইল তাম্বুলরঞ্জিত লাল ঠোঁটে। বলল, এ আবার কি?

অভয় যেন দম বন্ধ করে বলল, কিসের কি?

—এই খেটারি ঢং?

—খেটারি ঢং?

বলছে অভয় আর দেখছে নিমিকে। ঘৃণা হচ্ছে তার, নিমির পানপাতার ছাঁচ-কাটা সুন্দর মুখ। কটা মুখ, হিমানী পাউডার মাখা, লাল টকটকে ঠোঁট, একটু স্থুল ফুলো ফুলো। ঘৃণা করছে, তবু তীব্র পিপাসা অনুভব করছে ওই ঠোঁটের জন্য। ঘৃণা করছে, নিমির উঁচু নীচু নিটুট পুষ্ট শরীর। তবু কানা রক্ত দহে প'ড়ে পাক খাচ্ছে, পশুশক্তি নিষ্পিষ্ট করতে চাইছে এই শরীর।

নিমির ভয়, তবু বিদ্রূপ হেসেই বলল, একে খেটারি ঢং বলে না তো আর কি বলে?

অভয় বলল, তাই বুঝিন? তবে বল, শুনি আর কি বলবে?

নিমিও যেন শক্ত হ'তে চাইল। বলল, আবার কি? ওই ছিনাল খুড়ির বাড়িতে—

—কি?

—হ্যাঁ, ওখেনে আর ভাসুর-পো-গিরি করতে যাওয়া চলবে না।

কথা শেষ হবার আগেই, নিমির মনে হ'ল, প্রচণ্ড একটা ভারী কিছু ঠাস্ ক'রে পড়ল তার মুখের ওপর। সে চীৎকার ক'রে উঠতে গেল, কিন্তু আরো, আরো ভারী, কিছু তাকে যেন নিমেষে তল ক'রে দিল। শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে এল তার। চোখ ফেটে জল এল, তবু কি এক বিচিত্র সুখ-স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগল সে।

তারপর যখন সম্বিৎ ফিরে এল অভয়ের, সে কালকেরই মতো আবার দেখল, ঘুমের কোলে ঢোলে পড়ছে নিমি। অথচ, অভয়ের মনে হ'ল, তার বুক থেকে কি একটা কঠিন বস্তু ঠেলে উঠে আসতে চাইছে, চোখ দুটি ঝাপসা হ'য়ে আসছে যেন। মনে হল, সে হয় তো চীৎকার ক'রে উঠবে। চীৎকার ক'রে ডাকবে, হে ভগবান, ভগবান!

কিন্তু দু' হাতে মুখ চেপে ধরল সে। তীব্র ধিক্কারে নিজেকে সে বিভীষিকার মতো ঘৃণা করছে, নিজেকে পাপী মনে হচ্ছে। মনে পড়ছে তার নিজের ফেলে আসা জীবন, তার সঙ্গে পাশাপাশি কোনো মিল নেই এ জীবনটার। একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন যেন। তাই নিজেকে তার নরকের প্রেতের মতো মনে হচ্ছে।

তার পুরানো জীবনে সে সারাদিন মাঠে কাজ করেছে

তবু খেতে পায় নি। দারুণ ক্ষুধায় সে ঘৃণা করেছে, অভিশাপ দিয়েছে। মাইলের পর মাইল বিশাল ঝোপ-ঘাড়ে বয়ে বেড়িয়েছে, শুধু সে চীৎকার ক'রে গান করেছে। যখন সহ্য হয় নি, তখন পালিয়ে গেছে গ্রাম ছেড়ে শহরে! কুলির কাজ করেছে, গান বাজনা শুনেছে, গাড়িঘোড়া দেখেছে, আবার ফিরে এসেছে গ্রামে। এই যাওয়া আসার মাঝখানে দেখেছে সে, সংসারে অনেক দুঃখ। মানুষ বড় দুঃখী। সে হাসে, কাঁদে। কিন্তু জীবনের কোথায় কতগুলি অ-দেখা বেড়া ঘিরে রেখেছে মানুষকে। মানুষ মুক্তি চায়।

মুক্তি, মুক্তি! এই কথা মনে হতেই, কথা তার আপনি যুগিয়ে উঠেছে মুখে। সে গান বেঁধে ফেলেছে। মুক্তির সেই অর্থ তার অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য।

দুঃখকে অভয় ভয় করেনি। করতে নেই, করলে বাঁচা যায় না। কিন্তু একি জীবন? নিমি তাতে দুঃখ দেয়। কিন্তু সে কেন নির্দয় হয়? জানোয়ার হয় কেন সে? সাঁতরা কবিয়ালকে মেরে প্রাণে তার দুঃখ থাকে না। নিমির মার-খাওয়া ফুলে-ওঠা, রক্ত-জমা নীল ঠোঁট দেখে বুক তার ফেটে যায় কেন তবে? এখনো যে জল জমে আছে নিমির চোখের কোণে মনের এই ভয়াবহ বেড়াজাল থেকে মুক্তি চায় অভয়। মুক্তি চায়, তাই ক্ষমা চাইবার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে সে নিমিকে ধরে ডাক দেয়, নিমি, নিমি।

নিমি চোখের পাতা খোলে। গাঢ় রক্তাভ ঘুমন্ত অচ্ছন্ন দৃষ্টি।

অভয় আবার ডাকে, নিমি।

নিমির ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। বিদ্রূপে নয়, ঘুমন্ত ব'লে। এ মেয়ে, সে মেয়েই নয় যেন, বলে, কি?

অভয় বলে, বড় অন্যায় হয়ে গেছে ভাই।

এবার যেন নিমির চোখে দৃষ্টি ফিরে এল। পরমুহূর্তেই আবার ঢলে প'ড়ে বলল, ছাড়। রাত ক'রে আদিখ্যেতা আমার ভাল লাগে না।

আবার ঘুমিয়ে পড়ল নিমি। তার ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে অভয় বার বার মাথা ঝাঁকতে লাগল। মনে মনে বলল, ও মুখ থেকে সে কোন কুকথা শুনতে চায় না। তাই তার হাত বাধা মানে না।

কিন্তু কম আর বেশী, জীবন একই ধারায় বয়ে চলল। হয়তো নিমির কথার হুল কমে, প্রতিদিনের জীবনে বিদ্রূপ ও উত্তেজনা চাপা প'ড়ে যায় অনেক। কিন্তু চরিত্র বদলায় না সহজে।

অভয় হয়তো প্রতিদিনই রুদ্র হ'য়ে ওঠে না, ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে না। কিন্তু সে দেখল, জীবনের পথ বড় বাঁকা। তার সাধ কখনো পুরোপুরি মেটে না। পিপাসা মেটে না কখনো আকণ্ঠ ভাবে। জীবনে শুধু বাধা, বাধা। ঘরে, কারখানায়, মনের মধ্যে কত রকমের বাধা। নদীর টানা স্রোতে হঠাৎ ঘুর্ণীর মতো।

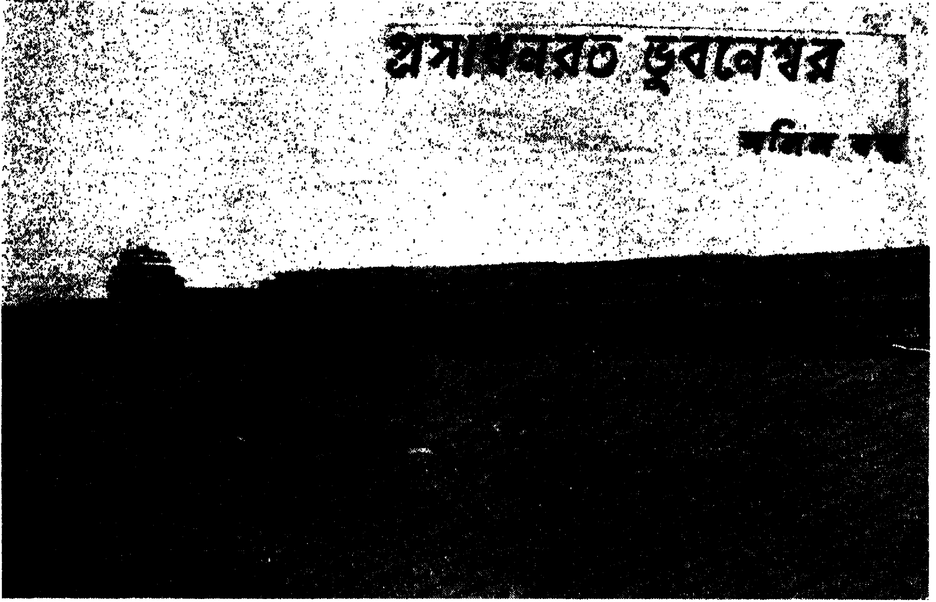
কতদিন কারখানার ছুটির শেষে, সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গার পারে, মধ্যরাত্রে উঠোনে দাঁড়িয়ে বিশ্বসংসারের সঙ্গে একলা একলা কথা বলতে চায় সে। মনের মধ্যে আবোল তাবোল কথা আসে, তাকেই সুর ক'রে বলে। গ্রামে থাকতেও, এ সংসারের নিষ্ঠুরতায় এমন একলা একলা অনেক কথা সুর ক'রে বলেছে। যত বলা যায়, ততই যেন বুকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমা বিষ-বাষ্প উপে যায়, হালকা হয়। সবকিছু সহজ হ'য়ে আসে। সহজভাবেই মনে হয়, মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন? এতো কোন-দিনই ভরবে না, কোনদিন না।

ভামিনী খুড়ির কাছেও সে ঠিকই যায়, পথে পড়লে সুবালার সঙ্গেও কথা বলে। যদিও সুবালার ঘরে যায় না, গান করে না। তবু সুবালা যখন তার গানের প্রশংসা করে, তখন তার মনে একটি যুগপৎ ব্যথা ও আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। ঠিক আগেরই মত। যদিও নিমি আছে, নিমির মন আছে এবং মনে মনে একটি পরাজয় বোধে সে জ্বলে, বিদ্রূপ করে, তবু অভয় ঠিক তার নিজের মতই চলে। নিমির কাছে নিমির মত ক'রে সঁপে দিতে পারে না। নিমি তার নিজে থেকে যতটুকু দেয় ভালবেসে কিংবা ঘৃণা ক'রে, ততটুকু নিয়েই অবিচলিত থাকতে চেষ্টা করে।

মন নিজের কাছে যে-জায়গাটায় মাথা কুটে মরে, যেখানে সে দু'হাত বাড়িয়ে আছে বাকীটুকুর জন্যে, সেখানকার হাহাকার চাপা প'ড়ে থাকে নিজের কাছেই।

কেবল অনাথ খুড়ো তার জীবনটাকে মাঝে মাঝে কষে নাড়া দেয়। কারখানার প্রতিদিনের জীবনে সে যত বেশী লিপ্ত হয়, অনাথ খুড়োর সঙ্গে যতই কথা বলে, ততই এক নতুন দিগন্ত ভেসে ওঠে তার চোখে। তার জন্ম, তার সুদীর্ঘ জীবনের সব ভার বেদনা ও অপমান যেন একটা বিরাট পাথর নড়ে ওঠার মত টলমল ক'রে ওঠে।

ক্রমশঃ

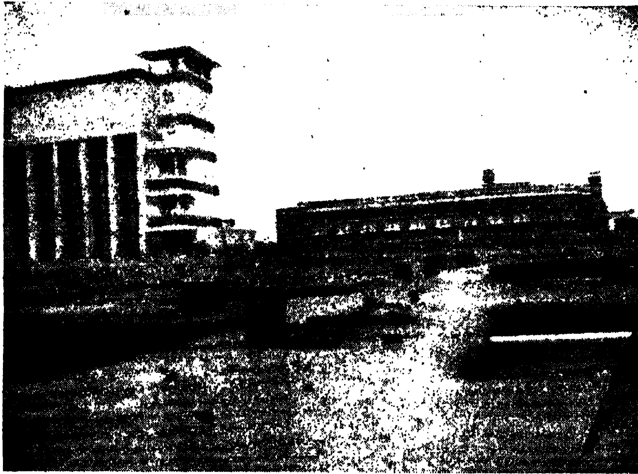


"মার্কেট প্লেস্, ভুবনেশ্বর"

রাজা কফেটুয়া একদিন প্রাসাদের উপর থেকে নেমে এসেছিলেন ভিখিরী মেয়ের রূপে মুগ্ধ হ'য়ে। সেই মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন রাণীর আসনে। ভিখিরী মেয়ের রূপ ছিল, কিন্তু স্বীকৃতি ছিল না খুব বিশেষ, স্বীকৃতি মিলল রাজকৃপা পেয়ে। থিওডোরা আর রোম সম্রাট, সেমিরামিস্ আর সার ব্যারিলনপতি, সবই ত এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তাই মনে হয় খাতির পেতে হলে একটু আধটু রাজদৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা দরকার! ডাগর ডাগর চোখে তুমি হয়ত' আপত্তি তুলবে, 'ওসব 'মনার্কির' যুগ আর নেই, বুঝলে, এটা হ'ল 'এজ্ অব্ ডেমক্র্যাসি'। মাঝে মাঝে তোমাদের গলার চোটে গগন ফাটে, জয়ধ্বনি করো নাকি 'ডেমক্র্যাসির'; তিরানব্বই (১৭৯৩ ফরাসী বিপ্লব) আর সতেরোয় (১৯১৭—রুশ বিপ্লব) তোমরা নাকি পৃথিবী থেকে 'মনার্কিকে' করেছ' উচ্ছেদ। আমার কি মনে হয় জানো, তোমার ঐ 'ডেমক্র্যাসি' আর 'মনার্কি' হয়ত' একই পানীয়, তফাৎ শুধু নতুন আর পুরোন বোতল। তাই যদি না হবে, তবে শান বাঁধানো পথের মাঝে সবুজ ঘাসের গাল্‌চে পেতে আর মাথার উপর প্রতিপ্রভ আলোর রোশনাই জেলেও, তোমার বালিগঞ্জ আজও শুধু দক্ষিণ-পাড়া কেন, 'নয়া কোলকাতা' হ'ল কই? কারণ তো জানই। 'ডেমক্র্যাসির' রাজতক্তা, থুড়ি গণতক্তা আজও যে লালদীঘির পাড়ে।

আচ্ছা, এবার দেখত..., নানা আমাকে নয়, আমাকে তো দেখে দেখে সব দেখার শেষ করে ফেলেছ! আমি বলছি—এবার দেখ ভুবনেশ্বরের দিকে। উড়িষ্যা রাজসরকারের দৃষ্টি প'ড়েছে ভুবনেশ্বরের উপর। পুরোন ভুবনেশ্বরের পাশে গ'ড়ে উঠছে নতুন ভুবনেশ্বর; নতুন উড়িষ্যার নতুন রাজধানী। উড়িষ্যা বড় যে সে রাজ্য নয়, জাঁহাবাজ কলিঙ্গের উত্তরাধিকারী। সেই ইতিহাস-খ্যাত কলিঙ্গ, যে একদিন মুক্ত কৃপাণ চণ্ডাশোককে রাতা-রাতি একেবারে ভিক্ষু ধর্মাশোকে পরিণত ক'রে দিয়েছিল। সেদিনের স্মৃতি আজও জেগে আছে এই ভুবনেশ্বরেরই অদূরে, ধৌউলি গিরি পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদাই করা পাষাণ। খৃষ্টপূর্ব ২৫৭ অব্দের স্মরণীয় দিনের স্মরণে। এ ছাড়া পুরোণ ভুবনেশ্বর ত ইতিহাস আর

ঐতিহ্যে ভরা। হাজারখানেক বছর আগের জৈনসভ্যতার স্মারকলিপি নিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে খণ্ডগিরি আর উদয়গিরির গুহাসভ্যতা। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত নির্বিশেষে আর্ট আর ইতিহাস রস-পিপাসুরা এখানে আসেন চিত্তের খাদ্য-সঞ্চয়ে, 'কোডাকের' ক্যামেরা 'ফোকাশ' করেন লিঙ্গরাজ মন্দিরের 'গ্র্যাঞ্জারে' আর রাজারাণী মন্দিরের 'স্পেলণ্ডারে।' তীর্থযাত্রীরা আসেন পুণ্যের জমার খাতার 'এ্যাকাউণ্টে' অঙ্কের পরিমাণ বাড়াতে, কুণ্ডের পূত সলিলে পবিত্র করেন মন, করেন দেহশুদ্ধি। সরকারের তরফ থেকে সবজায়গাতেই একটা করে সতর্ক বাণীর ফলক ল'টকে দেওয়া হ'য়েছে, বলা হ'য়েছে, 'ওরে মূঢ়, সাবধান, এ সব



ভুবনেশ্বরের পানীয় জলাধার ও সরকারী ভবন

হ'ল ইতিহাসখ্যাত জিনিষপত্র, এর কোন অংশ নষ্ট করার চেষ্টা করেছ কি মরেছ ; গ্রেপ্তার তো হবেই, তবে শাস্তি ভীষণতর হওয়াও বিচিত্র নয়'। কিন্তু উদয়গিরি ছাড়া আর বিশেষ কোথাও তেমন কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ফলক নেই, যা' থেকে দর্শনীয়ের প্রাচীনত্ব বা স্থাপয়িতাদের সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা চলে। এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের একটু বেশী সচেতন হওয়া ঠিক নয় কি? শুধু শাসনের সতর্কবাণীই কি বাঞ্ছনীয়? 'শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে'।

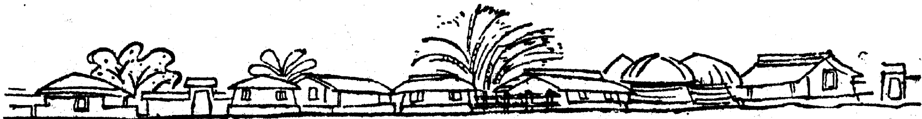
এমনি যে ধর্ম, ইতিহাস আর আর্ট বরেণ্য ভুবনেশ্বর তারই পাশে আধুনিক কৃষ্টি আর কলা নিয়ে গড়ে উঠে চলেছে নতুন রাজধানী 'নয়া ভুবনেশ্বর'। ১৯৪৮ সালে একটা সুন্দর সকালে নতুন সহরের ভিত্তিস্থাপনা ক'রে গেলেন জনগণমন অধিনায়ক শ্রীনেহেরু। পূর্ণ উদ্যমে সুরু হ'ল নতুন রাজধানী গড়া, সুবিখ্যাত জার্মান টাউন-প্ল্যানার ডক্টর কোয়েনস্‌ বার্জার আহুত হলেন এই গুরু-দায়িত্ব পালনে। আজ থেকে প্রায় সোয়া দু'শো বছর আগে বাংলাদেশের টাউন প্ল্যানার বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য রাজা জয়সিংহের আহ্বানে সুদূর রাজস্থানে গিয়েছিলেন, গড়ে উঠে ছিল সাজান সহর জয়পুর। আজ সেই বাংলাদেশের রাজধানী কোলকাতার, বিশেষতঃ আমার উত্তর কোল-কাতার সত্যিকারের কোন প্ল্যান নেই, এ্যাভিনিউ নামে রাস্তার দু'পাশে দেখা যায় শুধু 'ইঁটেগড়া গণ্ডার বাড়ীগুলো সোজা, সবুজ-তৃষিত-চোখ বড় জোর দেখতে পায় বন্ধদোকানের সবুজ পাল্লা। এই ট্র্যাজিডি ভুবনেশ্বরে ঘটতে না দেবার চেষ্টায় সরকার পক্ষ সচেতন। নতুন রাস্তা তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গেই গাছ পোঁতা আরম্ভ হ'য়ে গেছে, এমনি করে এরই মধ্যে দু'হাজারেরও বেশী গাছ পোঁতা হ'য়ে গেছে। স্বয়ং নগর-পালের কর্ত্তৃতাধানেই পরিচালিত হয় এই বাগান বিভাবিভাগ। তা' ছাড়া র'য়েছে নার্শারী, যাঁরা শুধু গাছ পোঁতেন না, জনসাধারণকে দরকার মত সরবরাহ করেন বীজ ও চারা, পরামর্শ দেন কেমন ক'রে ক'রতে হবে পরিচর্য্যা। পরিকল্পিত যে সব পার্ক ও প্রমোদোদ্যান গড়া হবে সেগুলোকেও করা হবে সুশোভিত। প্রচেষ্টা চ'লেছে যেন কিছুমাত্র কোথাও না থাকে অসম্পূর্ণ, না থাকে অপূরণীয়।

সহর সংগঠনে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫ কোটি টাকা খরচ করা হ'য়েছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও দু'কোটি টাকা বরাদ্দ হোল। নতুন সরকারী দপ্তর তৈরী হ'য়েছে, আর তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছে পানীয় জলের ট্যাঙ্ক, পাইপ টানা হ'য়েছে কুয়াখাই নদী থেকে।

তবে এই ট্যাঙ্কই পর্য্যাপ্ত জলসরবরাহের পক্ষে যথেষ্ট নয়, আর একটা ট্যাঙ্ক স্থাপনের চেষ্টাও চ'লছে। সবচেয়ে দর্শনীয় হ'ল নবনির্মিত বাজারটি, হঠাৎ দেখলে কে ব'লবে বাজার, এ বুঝি কোন সরকারী দপ্তর বা গবেষণা মন্দির। আমাদের হগমার্কেট যদি বাজারবিল্ডিংটিকে দেখে, তবে হয়ত' লজ্জায় ঘোমটা টেনে ব'লবে, 'মতে লাজ লাগুছি'। অবশ্য জিনিষপত্রের জমজমাটে হগমার্কেট নাকি ভারতের সেরা ব'লে শুনতে পাই, তোমার 'মার্কেটে যাচ্ছি'র মার্কেটকে সমালোচনা করি, সে সাহস কোথায় আমার? বিস্তৃত জায়গা জুড়ে তৈরী হ'য়েছে সরকারী কর্মচারীদের কোয়ার্টার, সুরম্য, নয়নাভিরাম। আজ পর্য্যন্ত হ'য়েছে প্রায় হাজার দুয়েক এমনি কোয়ার্টার, তবে এর বিভাগ হ'ল আটরকমের। মা না ভুল করোনা, এ 'মনার্কি'-শাসিত ধর্মের 'কাস্ট্ সিস্টেম্ নয়; এ' হ'ল 'ডেমক্র্যাসির' গ্রেডেসন্, সরকারী পদমর্য্যাদা আর দক্ষিণাপ্রাপ্তির মাপকাঠিতে। রাজ্য গবেষণামন্দির, কৃষি কলেজ, পশু চিকিৎসালয় একে একে সবই এখানে উঠে আসছে। একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনাও র'য়েছে, রাষ্ট্রভাষা প্রসার সমিতির ক্লাস ত' ইতিমধ্যেই সুরু হ'য়ে গেছে। গত বছরে এখানে National Extension Service Block খোলা হ'য়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের Accountant General এর অফিসের ভিত্তি স্থাপনা করা হ'য়েছে, আর উঠেও আসছে এখানে। একটা Tourist Information Centre খোলার পরিকল্পনা র'য়েছে অদূর ভবিষ্যতে।

সুবিখ্যাত ইংরিজী প্রবাদ বাক্য বলে, 'খেলাহীন শুধু কাজ, জ্যাক্‌কে কেমন যেন বোকা বোকা ক'রে তোলে'। নয়া ভুবনেশ্বরের কর্তৃপক্ষ মনে রেখেছেন এই প্রবচন। তাদের পরিকল্পনায় তাই আছে একটা কেন্দ্রীয় টাউন হ'ল, সিনেমা, হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট, মায় কফিহাউস পর্য্যন্ত খোলা হবে এখানে। প্রায় ১০০ একর জায়গা শুধু আলাদা ক'রে ধ'রে রাখা হ'য়েছে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানাদির জন্যে। তার মধ্যে Servants of India Society আর St Joseph Convent ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। এখানে সবকিছুই যে সরকারী জমিজমা বা পরিকল্পনা তা' নয়, জনসাধারণও জায়গা পেতে পারে। তবে জনসাধারণের জমিতে বাড়ী বা অন্য যা' কিছু করা হোক না কেন, 'প্ল্যানটা'কে 'পাশ' করিয়ে নিতে হবে সরকারী কর্তৃপক্ষকে দিয়ে। এমনি ক'রে আস্তে আস্তে তৈরী হ'য়ে চলেছে নতুন ভুবনেশ্বর, সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্নার স্বপ্নে। তবে কর্তৃপক্ষকে এখনও বহুদিন ব্যস্ত থাকতে হবে সহর সাজানো কাজে, অনুপ্রাণিত হ'তে হবে বহুবার আমাকে বলা তোমার সেই সুরে, 'সাজানো যতনে কুসুমে রতনে……তোমায় সাজাবো।

জলের উপর নাকি দাগ কাটা যায় না, তেমনি দাগ পড়ে না আমার মনে। এই হোল তোমার অনেকদিনের অভিযোগ, কারণ আমি নাকি মনে রাখতে পারি নি' সেদিনের স্মৃতি, যেদিন কিশোর শেষের আমি হারিয়েছিলুম তোমার মাঝ-কিশোরী চোখের জলজঙ্গলে। তাই সার্থক আমার এমন জলীয় নাম। কিন্তু তোমার এই সিদ্ধান্ত বোধ-হয় বানচাল কোরে দিল আমার এবারের দেখা ভুবনেশ্বর। ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ছেড়ে চলে এসেছি বহুদিন, কিন্তু বারবার মনকে দোলা দিচ্ছে ভুবনেশ্বরের সেবারের কয়েকটা দিন, আর এই প্রসাধনের প্রচেষ্টা। তাই আজ কর্মহীন সন্ধ্যায় নির্জন গৃহকোণে ভাবতে ভাল লাগে যে স্মৃতি সে শুধু তোমার একার নয়, ভুবনেশ্বরেরও। মনে হ'চ্ছে কোনদিন হয়ত' আবার নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাবো, ভুবনেশ্বরেরই ডাকে। রবীন্দ্রনাথ বেদুইন হতে চেয়েছিলেন, পেরেছিলেন কিনা জানি না; কিন্তু আমি তো প্রায় বেদুইনই। উইক্‌ডেতে আমি কেরাণীর টেবিল থেকে পালাই; ছুটির দিন বাড়ী থাকি না; ঝোড়ো কাকে আর ঝরাপাতা চিরদিন আমাকে দরজার বাইরে টেনে আনে, চিলের রোদপোড়া ডানায় পাই অসীমের আমন্ত্রণ।



ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল



মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিমু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রুক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙ্গুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিমু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিমুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিমু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"

নাগিনী-ভূ

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

অপদেবতার আবাসভূমি। কারখানার মাঝে মাঝে প্রশস্ত রাজপথ: মরা মানুষের স্মৃতিফলক ললাটে এঁকে পথযাত্রীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে।…জানা-অজানা কত লোক! কেউ হয়তো বেঁচে থাকতে অসহায় জ্যান্ত মানুষের টুঁটি টিপে রক্ত নিঙড়ে নিয়েছে দিনের পর দিন, কেউ বা নিরন্ন রিক্ততায় হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রহরে প্রহরে চেপে ধরেছে নিজেরই শীর্ণ পাঁজরাগুলো। কাশির ধমকে ফুসফুস দুটো আগুন-তাওয়ানো হাফরের মত ফুলে ফুলে উঠেছে। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠেছে পাণ্ডুর ঠোঁটের কোল বয়ে। অন্ধকার ঘরের কোণে ভাপসা গন্ধ জমাট বেঁধে উঠেছে তার বিষাক্ত নিঃশ্বাসে। বেঁচে থাকতে জোটেনি পেটের একমুঠো ভাত। কিন্তু মরার পরে ওরা শোভাযাত্রা করে জয়ধ্বনিতে মুখর করেছে শ্মশানের পথ। বিপ্লবী! দেশপ্রেমিক! হিরো! মার্টার!…সভা ক'রে সহরের রাজপথে ওরা এঁটে দিয়েছে নামের স্মৃতিফলক: নীল এনামেল প্লেটে শাদা হরফে লেখা নাম।…পুরাণো মরচে-ধরা প্লেটখানা খুলে ফেলে দিয়েছে ডাস্টবিনে। যা থাকে না, তাকে ধরে রাখবার কি প্রাণান্ত চেষ্টা! নির্মম কাল। তবুও অলক্ষ্যে কখন ধরা দিয়েছে লাটসাহেবের খাস বাবুর্চি ছকু খানসামার হাতে।

নগর তো নয়। সত্যি যেন কবরখানা। অলিতে-গলিতে পথে-উদ্যানে মৃত আত্মারা মিটমিট করে চেয়ে আছে কর্মচঞ্চল জ্যান্ত মানুষগুলোর দিকে। প্রেতায়িত ক্ষিপ্রতা ওদের পায়ে। মরণকে এড়িয়ে যাবার জন্তে প্রলয়ের পূর্বমুহূর্তে যেন সবাই আপন আপন জীবন হাতে নিয়ে ক্ষিপ্রপদে চলেছে গন্তব্যের পথে।…তবুও পদক্ষেপ ভুল হয়। ছিটকে পড়ে দৈত্যের মত বাসগুলোর চাকার তলায়, না-হয় শানবাঁধানো ফুটপাতের কিনারায়। কপাল ফেটে যায়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে। উৎসুক জনতা ভিড় করে ঘিরে দাঁড়ায়।…কেউ কেউ এগিয়ে যায়: লোকগুলোকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে, নিষ্পিষ্ট দেহটাকে ধরাধরি করে এম্বুলান্সে তুলে দেয়।

পায়ে পায়ে জীবন ও মৃত্যুর নূপুর বাজিয়ে সারি সারি এগিয়ে চলে কঙ্কাল আর কবন্ধের দল।

সন্ধ্যা হতে না হতে লক্ষ বাতির রোশনাই জ্বলে ওঠে। পথ ও প্রাসাদে ঝলমল করে আলোর মালা। কর্মচঞ্চল জীবনস্রোতে নামে বিলাসের আমেজ। মৌতাত! মৌতাত লেগেছে অন্ধ প্রজাপতির রঙীণ পাখায়। রাতের কালো পাখী ডানা গুটিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কানা গলির কোণে-কোণে, হাসপাতালের পিছনে নিস্তব্ধ মর্গটার থিলানে—যেখানে ধাড়ি ইঁদুরের পায়ের শব্দে ঘুমন্ত পায়রাগুলো সন্ত্রস্ত হয়ে কার্ণিসের কোণে সরে বসে। ময়না ঘরের পরলে-পরলে যেন অপঘাতে-মরা মানুষের প্রেতাত্মাগুলো রাতের অন্ধকারে দল বেঁধে কানাকানি করে। ঝিলমিলের ফাঁকে ফাঁকে বোবা আলোর ইসারা। থিলানে কার্ণিসে জমাটবাঁধা অন্ধকার।

হাঁটতে হাঁটতে জয়ন্ত কতদূর এসে পড়েছে সে খেয়ালও তার ছিল না। হাসপাতালের পিছনের পথটা ধ'রে স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাসের সামনে এসে একবার থমকে দাঁড়ালো।…জগৎ থাকতো এই পোষ্টগ্রাজুয়েট হোটেলে। কিন্তু এখন থাকেনা। অনেকদিন আগে সে উঠে গিয়েছে সেণ্টজেমস্ স্কোয়ারের একটা প্রাইভেট মেসে। সাইকোলজির রিসার্চ করছে গৌরাঙ্গ চলিহার কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করা অধ্যাপক চলিহা গ্রাস-হপারকে টেনে তুলবার জন্তে প্রাণ-

পর চেষ্টায় লেগে পড়েছেন। গ্রাস-হপার হয়েছে প্রজা-পতি। ওর আতেলা টিকির গোছা কখন অলক্ষ্যে জড়িয়ে গিয়েছে অনিতার স্যাম্পুকরা চুলের ডগায়। ওরই সহপাঠিনী অনিতা: চলিহার ভাইঝি।...নারী তো নয়, যেন হাওয়াই দ্বীপের ক্যামেলিয়ন! রূপ নাই, তবুও মিনিটে মিনিটে রঙ বদলায় বহুরূপীর মত: শীর্ণ দেহ-বল্লরীতে রঙ-বেরঙের শাড়ি জড়িয়ে চুলের বিন্যাসটা দেয় বদলে।...জগৎ বঙ্গলক্ষ্মীর ধুতি ছেড়ে গ্যাবার্ডিনের প্যাণ্ট ধরেছে।

জয়ন্তর মনে কেমন যেন একটা রিক্ততা—নিঃসঙ্গতা! এলোমেলো মনটাকে দুদিন কোনরকমে কিছুটা গুছিয়ে এনেছিল বরানগরের নির্জন বাড়ীতে। অবসরের সঙ্গী ছিল লাইব্রেরীর ধূলোপড়া বইগুলো, আর অনবসরে সঙ্গী ছিল সুবিমল। অদ্ভুত মানুষ সুবিমল! ঠিক ওই ফাঙ্গাস-ধরা বইগুলোর মতই সেও যেন মনটাকে আঁকড়ে ধরে। বইগুলোয় ফাঙ্গাস জমেছে পুস্তিনের কিনারায়—গিল্ট-এজের ধার ঘেঁসে, আর সুবিমলের ফাঙ্গাস ধরেছে দুটো ফুসফুসে—পাঁজরার অন্তরালে। ঘুণ ধরেছে ওর জীবনী-শক্তির মজবুত কাঠামটায়। কিন্তু মনে এতটুকুও মরচে ধরেনি। ঝকঝকে ইরাণী ছুরির মত মনের ধারাল গতি। জীবনের আবরণ ভেদ ক'রে মুহূর্তে প্রবেশ করে মনের মণিকোঠায়।...এক নজরে সুবিমল শিপ্রাকে যতখানি আবিষ্কার করেছিল, শিপ্রা হয়তো তারচেয়ে একতিলও কম নয়। তবুও জয়ন্ত পারেনি কথাটা বরদাস্ত করতে। ওর সংস্কারে বেধেছিল। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে আহত সৈনিকের মত দাঁড়িয়ে আছে বলেই বোধহয় সুবিমলের মন থেকে সে-সব বালাই ধুয়ে মুছে গিয়েছে। নইলে, অমন নির্বিকারভাবে হঠাৎ সে হাপ-গেরস্ত পর্যায়ে ফেলে দিতে পারতো না শিপ্রাকে। মাত্র এক ঘণ্টার চোখের দেখা ছাড়া তো নয়। একযুগ ধরে শিপ্রার প্রতিটি পল-বিপলকে নিক্তির ওজনে যাচাই করলেও সুবিমল পারতো না শিপ্রাকে আবিষ্কার করতে।

কথাটা জয়ন্তকে নাড়া দিয়েছিল। মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, কানে শোনার অস্বস্তিটুকুও যেন সে সইতে পারেনি। তবুও প্রতিবাদ করেনি। নীরবে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়েছিল। অন্যমনস্কতায় চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল তার প্রখর সংবিৎকে।...হাপ-গেরস্ত! শিপ্রা হাপ-গেরস্ত?...না না না। মাথাটা ঝাঁকিয়ে কথাগুলো ঝেড়ে ফেলেছে জয়ন্ত।

সুবিমল যা ভাবে, ভাবুক। তার ভাবনায় বাধা দিতে জয়ন্ত চায় না। জীবনটা যার তুলোর আঁশের মত বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, তাকে ব্যথা দিতে জয়ন্ত পারবে না কোনদিন। দেয়ও নি।

তবুও ধরে রাখতে পারে না সুবিমলকে। ওর মনের নিভৃত কোণে কোথায় যেন ছিল একটা বিরাট গহ্বর! সেই অদৃশ্য গহ্বরের গভীরতা থেকে-থেকে আকর্ষণ করতো ওর সারা সত্তাকে।

দোতলার বারান্দাটায় দুখানা বেতের চেয়ার নিয়ে ওরা কতদিন পাশাপাশি বসে থেকেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হয় রাজনীতি, না-হয় সমাজতন্ত্র বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা আলোচনায় কেটেছে কত পড়ন্ত বিকেল—জ্যোৎস্নায় ফুল-ফোটানো সন্ধ্যার নিস্তব্ধ প্রহর। স্বল্পভাষী হলেও জয়ন্ত মুখর হয়ে উঠেছে। অজস্র কথায় ভরে দিতে চেয়েছে সুবিমলের মনটা। কিন্তু পারেনি। হঠাৎ ওর কথার খেই হারিয়ে গিয়েছে সুবিমলের মুখপানে চেয়ে।

আলোচনা থেকে কখন সুবিমল অলক্ষ্যে সরে গিয়েছে অনেক দূরে। মুহূর্তকাল নিষ্পলক দৃষ্টিতে জয়ন্তর মুখ-পানে চেয়ে থেকে বলেছে—পৃথিবীতে বাঁচতেই মানুষ সব-চেয়ে বেশী ভালোবাসে। না, জয়ন্তবাবু?

জয়ন্ত যেন হোঁচট খেয়ে পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে। অসমাপ্ত কথার রাশটা টেনে, ক্ষণকাল নির্বাক্ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলেছে—শুধু মানুষ কেন, সব জীবেরই ইন্‌স্টিংক্ট ওটা। বাঁচবার কথাটা আগে ভেবে নিয়ে, পরে তারা পা বাড়ায়।

তাই: একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে সুবিমলের বুকটা কেঁপে উঠেছে।

একটু থেমে সে আবার বলেছে—তবুও তো মানুষ মরতে চায়। পৃথিবীর বাতাস যখন বিষাক্ত হয়ে ওঠে, মানুষকে বিশ্বাস করতে গিয়ে যখন সারা অন্তর বারবার ক্ষত-বিক্ষত হয় বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বোধহয় সব মানুষই নিশ্চিন্ত বিশ্রাম খুঁজে বেড়ায় মৃত্যুর কোলে।... নয় কি?

জয়ন্ত চমকে উঠেছে : তাই···সত্যি তাই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছে—কোথায়, কিসের আঘাতে সুবিমল হারিয়ে ফেলেছে তার যৌবনোচিত জীবনস্পৃহা : বাঁচবার অদম্য উল্লাস ?

খুঁজে পায়নি। তবুও জয়ন্ত হতাশ হয়নি। সুবিমলের সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরেছে রাত্রিদিন। জীবনের পেয়ালায় বারবার ঢেলে দিয়েছে বাঁচবার উদ্দীপনা। জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছে সিনেমার ম্যাটিনী শো'তে, কোরিন্থিয়নে, ময়দান প্যাভিলিয়নে থানুকোমুনির ডান্সে। কিন্তু পারেনি। কোনকিছুতেই ভয়ে ভুলাতে পারেনি তার সীমাহীন রিক্ততাকে। কেমন একটা অন্যমনস্কতা মাঝে মাঝে রাহুর মত এসে ছেয়ে ফেলেছে সুবিমলের সবটুকু অস্তিত্ব !

ওদের নির্জনবাসে অতিথি সমাগম ছিল না বললেই চলে। একদিন শুধু এসেছিল শিপ্রা। আর সপ্তাহে দুদিন করে এসে দেখে যেতেন জোয়ারদার নিজে। মাঝে একবার করে এসে চেক্-আপ করে যেতেন ডাক্তার সেনগুপ্ত।···পয়সার অভাব ছিল না। তাই স্বাচ্ছন্দ্যের কোন ত্রুটি ঘটেনি কোনদিন।

আশা ও নিরাশার জোয়ার-ভাঁটায় বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। কখনো আশ্বাস দিয়ে, কখনো বা এক-কথা থেকে অন্য কথায় সুবিমলের মনটাকে সরিয়ে নিয়ে জয়ন্ত হাল ধরে ছিল তার জীর্ণ নৌকার। কিন্তু মাঝখান থেকে হঠাৎ যেন কেমন করে সব ওলট-পালট হয়ে গেল !

মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনটা হয়ে উঠেছিল সুবিমলের কাছে নিতান্ত বাস্তব। কল্পনার তিলমাত্র অবকাশ ছিল না তার মনে।

জয়ন্ত যখনই বাসি ফুলগুলো ফেলে দিয়ে নতুন ফুলের গোছা এনে সাজিয়ে রেখেছে ফুলদানিতে, সুবিমল হেসে বলেছে—বেঁচে থাকা মানেই একটানা শুধু যোগ আর বিয়োগের খতিয়ান করা।···যেটা বাসি সেটাকে বাতিল করে, নতুন দিনটাকে আঁকড়ে ধরা।

জয়ন্ত শুধু একবার মুখ তুলে চেয়েছে সুবিমলের দিকে। কোন উত্তর দেয়নি।

ফিকে একটু হাসি ফুটে উঠেছে সুবিমলের মুখে। চোখদুটো বড় করে জয়ন্তর মুখের ওপর রেখে বলেছে—কাল রজনীগন্ধার গোড়ার ফুলগুলো বাসি হয়ে ঝ'রে পড়বে।···আবার দিনের চাকা ঘুরলে, কুঁড়িগুলো ফুটবার আগেই ডাঁটাগুলো সিটিয়ে উঠবে।···এই তো জীবন ! তাই নয় কি, জয়ন্তবাবু ?

হোক তাই। তবুও মানুষ আবার জল বদলে ফুলদানিতে নতুন ফুলের গোছা এনে সাজাবে। প্রতিদিনের এই ক্ষয় আছে বলেই তো নতুনের এত সমাদর। নইলে, বেঁচে থাকাটা হয়ে উঠতো দুঃসহ। ঠাসাঠাসি বর্তমানের চাপে দিনগুলো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠতো।

এক্‌স্‌ক্লিলেন্টলি !—'মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।'

উচ্ছল হাসিতে ভরে উঠেছে সুবিমল। অনেকদিন পরে হঠাৎ তার হাসির ফোয়ারা পাথরচাপা গহ্বরের ফাঁক দিয়ে আলোর পথে উৎসারিত হয়ে উঠেছে।

সেদিন সকাল থেকে সুবিমলের মনটা ছিল খুব প্রসন্ন। জয়ন্ত যেন বেশ একটা স্বস্তি অনুভব করছিল। দায়িত্ব নিয়েছিল কর্তব্যের। কিন্তু মন ওর ধীরে ধীরে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল সুবিমলকে : পরিপূর্ণতা না থাক, তবুও সুবিমলকে ওর ভালো লেগেছিল। সাহচর্যের সান্নিধ্যে ওর মনের নরম তন্ত্রীগুলোয় বেজে উঠেছিল ভালোবাসার সুর—বন্ধুত্ব।

প্রাতরাশ সেরে সুবিমল খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে ইজিচেয়ারে গা ঢেলে বিশ্রাম করছিল ঘরের ভিতর। আর জয়ন্ত দাঁড়িয়েছিল বারান্দার একটী কোণে রেলিঙে ঠেস দিয়ে। টাইটেল-পেজ-ছেঁড়া একখানা পুরানো গ্রীক নাটকের পাতায় মনটা তার সিলভার পোকার মত চলে বেড়াচ্ছিল মন্থর গতিতে।

হঠাৎ চমক ভেঙেছিল, যখন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটী মহিলা। সঙ্গে স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক। মুখখানা চেনা-চেনা। অথচ চিনে উঠতে পারেনি জয়ন্ত।

সুবিমলবাবু আছেন ?

প্রশ্নমান দৃষ্টিতে মহিলাটি চেয়েছিলেন জয়ন্তর মুখপানে।

আঙুলের ছেদ দিয়ে, বইখানা বাঁ-হাতের মুঠোয় বন্ধ করে জয়ন্ত সসম্ভ্রমে দেখিয়ে দিয়েছিল সুবিমলের ঘরটা।

ওঁরা দুজনে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। মহিলাটি আগে, ভদ্রলোক তাঁর পিছনে পিছনে।

সুবিমলের চোখদুটো তখন একটু আলস্যে জড়িয়ে এসেছিল। খবরের কাগজখানা শিথিল হয়ে নুয়ে পড়েছিল বুকের ওপর।

ঠিক তন্দ্রা নয়। হয়তো চোখ বন্ধ করে সুবিমল ভাবছিল কিছু। ওদের পায়ের শব্দে উঠে বসেছিল সিধে হয়ে। নিমেষে চোখদুটো জ্বলে উঠেছিল অন্ধকারের দীপশিখার মত।

রীণা!

হাঁ।

কি চাও তুমি?···কেন! কেন আবার এলে আমার এখানে?···সরে দাঁড়াও। আমি টি-বি রোগী। আমার শ্বাস-প্রশ্বাসে সংক্রামক বিষ!

তা হোক: মহিলাটি এগিয়ে গিয়েছিলেন আরও কাছে। চেয়ারের আর্মে গিয়ে লেগেছিল তাঁর হাল্কা পার্লন শাড়ির আঁচলটা।

সুবিমল সরে বসেছিল।

রীণার মুখপানে চোখদুটো একবার নিজের অজ্ঞাত-সারেই বুঝি মেলে ধরেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে বলেছিল—কই বললে না তো, কি চাও তুমি?

কিছু না।

তবে?···কেন—কেন এলে এই মৃত্যুযাত্রীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসের সীমানায়?

আজ রাত্রেই আমরা চলে যাবো নৈনিতালে। ভালো লাগে না কলকাতার এই কোলাহল।

তাই ভালো। তাই ভালো রীণা। যেখানে মানুষের উৎপীড়ন নাই, সেইখানে চলে যাও।···কিন্তু এখানে—এখানে কেন?

না। এখানে আর কোন প্রয়োজন নেই। শুধু বলতে এসেছিলাম, খোকা রইল মায়ের কাছে। তার ভবিষ্যৎ আছে। বর্তমানও স্বচ্ছল নয়।—সেই কথাটাই জানাতে এসেছিলাম।···রীণা ইতস্তত করে।

অদ্ভুত সহজ দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল সুবিমলের চোখে। ফিকে একটু হাসির সঙ্গে বসেছিল—আর কিছু?

আর! রীণা ক্ষণকালের জন্যে কেমন নির্বাক্ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সুবিমলের মাথার কাছে মুখখানা নিয়ে বলেছিল—পারেন ধার বলে কিছু আমায় দিতে?···নৈনিতাল থেকে ফিরে, ওঁর একটা কিছু সুবিধে হলেই, টাকাটা শোধ করে দেবেন।

থাক—থাক। সেজন্যে ব্যস্ত হতে হবে না।···দ্বিরুক্তি না করে সুবিমল টানা থেকে চেক বইখানা বের করে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। অঙ্কহীন দুখানা চেক সই করে দিয়েছিল রীণার হাতে।···একটু থেমে কম্পিত স্বরে বলেছিল—একটা খোকার।···তোমার মাকে ব'লো, খোকা আর একটু বড় হলে, তাকে যেন বিলেতে কোন কন্‌ভেণ্ট স্কুলে পাঠিয়ে দেন। লেখাপড়া শিখে যদি কোন-দিন মানুষ হয়, বাকী জীবনটা যেন সেখানেই কাটিয়ে দেয়। এ দেশে যেন সে আর ফিরে না-আসে। সেখানে যাতে তার কোন অসুবিধা না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করে যাবো।···আর তোমাদের এই টাকা শোধ কোনদিন করতে হবে না। যদি দরকার হয় আবার জানিও—

হঠাৎ রীণা কেমন থমকে গেল। কিন্তু সে-বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠতে তার দেরী লাগলো না। যেমন নির্বিকার মুখে সুবিমলের ঘরে এসে ঢুকেছিল, তেমনি নির্বিকার সহজ গতিছন্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে ছিল জয়ন্ত। ওদের বিদায় অভিবাদনের প্রত্যুত্তর করবার মত সংবিৎটুকুও যেন ছিল না তার।···কে এই রীণা?···খোকা! কে খোকা?

জয়ন্তবাবু!

জয়ন্ত সজাগ হয়ে উঠেছিল সুবিমলের শান্ত স্থির কণ্ঠ-স্বরে। ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার ইজি-চেয়ারের গা-ঘেঁসে:

কিছু বলছেন?

এক কাপ ক'রে চা খেলে হতো না?···স্নিগ্ধ প্রসন্ন একটা হাসি ফুটে উঠেছিল সুবিমলের চোখেমুখে।

জয়ন্তর বুক থেকে যেন একটা ভারী পাথর নেমে গিয়ে-ছিল। বয়কে চা তৈরি করবার আদেশ দিয়ে বলেছিল—আসুন, বাইরে একটু বসি।

ঠিক যেমন করে ওরা দিনের পর দিন বসে থাকে, তেমনি করে দুজনে দুখানা বেতের চেয়ারে পাশাপাশি বসেছিল বারান্দাটার রেলিঙ ঘেঁসে।

দীর্ঘক্ষণ সুবিমল আর কোন কথা বলেনি।

জয়ন্ত ভাবছিল রীণার কথা। লিলিয়াম গ্রে রঙের শাড়িখানায় রীণা যেন আগুনের শিখার মত দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল। সঙ্গের ভদ্রলোকটি বারবার শুধু জয়ন্ত আর সুবিমলের মুখপানে চেয়েছে। কোন কথা ফোটেনি তার মুখে।

চা খেতে খেতে সুবিমল একটিবার মাত্র বলেছিল খোকার কথা: খোকা যখন বড় হবে, তখন আমি আর থাকবো না এ পৃথিবীতে। এই যা সাঁন্ত্বনা।···নিঃশ্বাসটা কেমন ঘন হয়ে উঠেছিল। চোখদুটো নিমেষের জন্যে বন্ধ করেছিল নিজেকে আত্মস্থ করতে।

তিনদিনের দিন জ্বরটা আবার রিলাপ্‌স করলো। এই তিনটী দিন সুবিমল একটী কথাও বলেনি। মাঝে মাঝে শুধু চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে রুদ্ধ স্নায়ুবেগে।

কপালে হাত দিয়ে জয়ন্ত জিজ্ঞেস করেছে—মাথার যন্ত্রণা বেড়েছে বুঝি?

না।

সুবিমল পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। পাঁজরাগুলোর ভিতর আবার হয়তো সুরু হয়েছিল বৃশ্চিক দংশন। শুধু জ্বরটাই ফেরেনি। প্রবল প্রকোপে আবার দেখা দিল ওর কালব্যাধি। পর পর দুদিন রক্তবমি ক'রে সুবিমল কেমন নির্জীব হয়ে গেল। কিন্তু মুখেচোখে ফুটে উঠলো একটা অস্বাভাবিক স্বস্তির পরিতৃপ্তি।

খোকা!···খোকা ওরই ছেলে। তিন বছরের শিশু: বঞ্চিত হয়েছে মায়ের কোল থেকে।···রীণা, নৈনিতালে গেল শৈলবিহারে তার নতুন স্বামীকে নিয়ে।···বুঝতে জয়ন্তর দেরী হয় নি।

সুবিমল আবার হাসপাতালে গেল। কিন্তু জয়ন্ত থেকে গেল বরানগরের নির্জন বাড়ীতে—জোয়ারদার আর সুবিমলের অনুরোধে।

পথে পথে ঘুরে পাদুটো শ্রান্ত হয়ে আসে। তবুও ফিরতে ইচ্ছা করে না ওর নিঃসঙ্গ আস্তানায়। নির্জনতা জয়ন্ত ভালোবাসে। কিন্তু কালো পর্দার অন্তরালে মনের এই রিক্ততা যেন ওকে উৎক্ষিপ্ত করে তোলে।

রাতের অন্ধকার যত ঘনায়, পথ তত জনবিরল হয়ে আসে। বাতাসের তীব্র ঝাঁজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দ্বিতীয় প্রহরের স্নিগ্ধ স্পর্শে।

পাখনা-ওড়ানো প্রজাপতিদের মেলা শেষ হয়। ফুটপাতের কিনারায় একে একে অন্ধ-কুঠে-নুলো ভিকিরী-গুলো এসে ভূমিশয্যা রচনা করে। ঝিমিয়ে পড়ে ঘুমে। অন্ধকার বস্তির সুড়ঙ্গ থেকে যেয়ো নেংটি ইঁদুরগুলো যেন জনহীনতার অবসরে নিশ্চিন্ত মনে এসে আশ্রয় নিয়েছে পৃথিবীর বুকে।

ঘুরতে ঘুরতে জয়ন্ত অনেকদূর এসে পড়েছে। এবার মোড় ফিরে, ফাঁকা রাস্তাটা ধরে সে হন হন করে এগিয়ে চললো বরানগরের পথে। পা চলে না। তবুও এগিয়ে যায়।

কোম্পানীর বাগানের কাছাকাছি এসে, কি ভেবে জয়ন্ত একবার থমকে দাঁড়ায়।···রাস্তার ওপাশে মেয়েদের কলেজ। ঘন গাছপালার মাথায় মাথায় জমাট-বাঁধা অন্ধকার। দিনের শ্রান্তি মুছে ফেলে, সারা বাড়ীটা যেন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে।

ওর জুতোর শব্দে জেগে উঠেছে ফুটপাতের একটা ভিকিরী মেয়ে। হয়তো বা ঘুম তখনও নামেনি তার চোখে।

মেয়েটা লজ্জায় জড়সড় হয়ে এগিয়ে আসে।···একবারে কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়: কিছু পয়সা দিয়ে যাবেন, বাবু?···সারাদিন ছেলেদুটোর খাওয়া হয়নি। ভোক-ছাদিতে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে।···কাল সকালে উঠেই আবার হয়তো কান্না সুরু করবে একমুঠো মুড়ির জন্যে।

জয়ন্ত চমকে ওঠে: ভিকিরী তো নয়! গেরস্ত ঘরের বৌ। রাতের নির্জনতায় গা ঢাকা দিয়ে পথে বেরিয়েছে পয়সার সন্ধানে। এখনও চোখেমুখে লেগে আছে শালীনতার ছাপ!···বয়েস হয়তো চব্বিশ পার হয়নি। জীর্ণ ময়লা একখানা শাড়ি দিয়ে অতিকষ্টে দেহটা ঢেকে রেখেছে।

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে, সবগুলো পয়সা এক-সঙ্গে বের করে জয়ন্ত মেয়েটার হাতে তুলে দেয়।

পা দুটো কাঁপে। তবুও থামে না। দৃক্‌পাত না করে জয়ন্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলে আস্তানার দিকে।

হতভম্ব দৃষ্টিতে চেয়ে, মেয়েটা জড়প্রদার্থের মত দাঁড়িয়ে রইল ফুটপাতে।

ক্রমশঃ



পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হিসাবে রাজ্যের ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে কিরূপ সংখ্যক বাঙ্গালী কর্মী নিযুক্ত আছে, এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানে কর্ম পরিস্থিতিই বা বর্তমানে কিরূপ—তাহার বিস্তৃত তথ্য পরিবেশনের অনুরোধ জানাইয়া সরকার বিভিন্ন সওদাগরী ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্রে রাজ্য সরকার এই রাজ্যে অবস্থিত ব্যবসা সংস্থাগুলিতে বাঙ্গালী ছেলেদের নিয়োগের দাবী জানাইয়া বলিয়াছেন—রাজ্যের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য বাঙ্গালী ছেলেদের অধিক সংখ্যায় কর্মে নিযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বহুপূর্বে এ বিষয়ে সকল অফিস ও কলকারখানায় মালিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রী জনাব আবদুস্ সাত্তার এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। সকল প্রতিষ্ঠান যাহাতে ঐ সরকারী অনুরোধকে আদেশরূপে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কাজ করে, শ্রমমন্ত্রী মহাশয় সে বিষয়ে অবহিত হইলে দেশের বেকার সমস্যা কতকটা দূর হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও জহরলাল—

শ্রীঅতুল্য ঘোষ গত ৮ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহাতে কংগ্রেসের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টিতে ব্যাঘাত হইতেছে, এরূপ অভিযোগ করিয়া একদল কংগ্রেসসেবী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এক পত্র দিয়াছিলেন এবং পত্রের নকল শ্রীজহরলাল নেহরুর নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। ঐ সম্পর্কে শ্রীনেহরু কলিকাতায় শ্রীবিজয় মিত্রকে পত্রে জানাইয়াছেন—"প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর নেতৃত্বে কোন পরিবর্তনের সুপারিশ করিতে আমি কলিকাতায় যাইব না। কলিকাতায় কংগ্রেসীদের সহিত কংগ্রেস সম্পর্কে আলোচনা করিব। বাংলাদেশে নেতৃত্ব বা অন্যকিছু চাপাইয়া দেওয়ার কাজ আমার নহে। বাংলাদেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের জন্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ যে কাজ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা আছে। তিনি একজন ভাল সংগঠক ও তিনি ভালভাবেই কংগ্রেসের সেবা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে চাই, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা সম্পর্কে আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে।" শ্রীনেহরুর এই পত্র প্রকাশিত হওয়ার পর, আমাদের বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসীদের মধ্যে বিবাদ শেষ হইবে।

মণ্ডল কংগ্রেসকে কর্মতৎপর করা—

গত ১২ই জুলাই দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় ভারতের প্রায় ১৮ হাজার মণ্ডল কংগ্রেস কমিটীকে কর্মতৎপর করিয়া তুলিবার জন্য ৫ দফা কর্মসূচি গৃহীত হইয়াছে। এ বিষয় লইয়া কমিটীতে ৬ ঘণ্টা কাল আলোচনা হইয়াছিল। ৫দফা কর্মসূচি এইরূপ—(১) স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলন সার্থক করিয়া তোলা (২) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি সাধন (৩) সমবায় সংস্থা সমূহ গঠন (৪) সমাজ উন্নয়নকল্পে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থা সমূহের প্রতিষ্ঠা (৫) স্থানীয় অভাব অভিযোগ দূরীকরণ। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধনের পর তাহা কার্য্যে রূপায়িত করিবার উপায় স্থির করার জন্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্র ও তামিলনাদ ঘুরিয়া আসিয়া এই ৫দফা কর্মসূচির প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন।

গান্ধী পিস্ ফাউণ্ডেসন—

১২ই জুলাই দিল্লীতে গান্ধী স্মারকনিধির সভায় স্থির হইয়াছে যে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও কর্মকৌশল সম্বন্ধে গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে গান্ধী পিস্ ফাউণ্ডেসন গঠন করা হইবে। নিধির সভাপতি শ্রীআর-

আর দিবাকর জানাইয়াছেন, ঐ কাজের জন্য এক কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কমিটী ঐ বিষয়ে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবেন। কমিটীর সদস্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, শ্রীনেহরু, শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীধেবর, আচার্য্য কৃপালনী, সুচেতা কৃপালনী, শ্রীরবীন্দ্র বর্মা ও নিধির সেক্রেটারী শ্রীরামচন্দ্রম্। ভারতের ৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করিয়া গান্ধীভবন প্রতিষ্ঠা করা হইবে। তাহা ছাড়া দিল্লী, সবরমতী, সেবাগ্রাম ও মাদুরায়—৪টি জাতীয় গান্ধী স্মৃতি মিউজিয়ামও প্রতিষ্ঠা করা হইবে। প্রতি মিউজিয়ামের জন্য ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ভবনগর ও বোম্বায়ের অধিবাসীরা নিজেরা অর্থব্যয় করিয়া ঐ ২ স্থানেও ঐরূপ আর ২টি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করিবেন। গান্ধীজীর জীবন ও আদর্শ প্রচারের ফলে নূতন ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিবে। কাজেই এ বিষয়ে যত কাজ হয়, ততই কল্যাণের কথা।

বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ—

গত ৫ই জুলাই হইতে ১১ই জুলাই এক সপ্তাহ কলিকাতা ১নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটে পরিষদ ভবনে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসোৎসব হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ডকটর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন দিবসে মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীযোগেন্দ্রমোহন বিদ্যারত্ন, শ্রীরামেন্দ্র-সুন্দর ভক্তিতীর্থ, শ্রীকালীকিঙ্কর কাব্য ব্যাকরণাদিতীর্থ, ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, শ্রীলক্ষ্মীকান্ত তর্কবেদতীর্থ, শ্রীপ্রভাকর মীমাংসাতীর্থ, শ্রীরমেশচন্দ্র সপ্ততীর্থ প্রভৃতি তাহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উৎসবের শেষ দিনে ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী রচিত নূতন সংস্কৃত নাটক 'শক্তিশারদম্' অভিনীত হয়। তাহাতে শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক, শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমেঘনাদ বসাক, শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য, শ্রীসত্যেশ্বর বন্দ্যোপধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গীত বিশারদগণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে প্রকাশিত এবং ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল রচিত শক্তিশারদম্ গ্রন্থের কয়েকটি সংস্কৃত সঙ্গীত ও শ্রীরমা চৌধুরী অনূদিত সেগুলির বাংলা প্রকাশিত হইয়াছে। শক্তিশারদমের বিষয়বস্তুও কয়েক পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের পরিচালনায় পরিষদের মাধ্যমে এদেশে শুধু সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার বাড়িতেছে না, সকল তীর্থ উপাধিধারী পণ্ডিতের বৃত্তি বা বেতনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে, সেজন্য আমরা চৌধুরী মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার—

গত ৫ই জুলাই কলিকাতায় বঙ্গীয়সংস্কৃত শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবের দিবসে পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্র-বিমল চৌধুরী তাঁহার ভাষণে জানাইয়া দেন—"সংস্কৃত শিক্ষার অনির্বাণ দীপশিখা চিরকাল ভারতবর্ষকে রেখেছে দেদীপ্যমান। শিক্ষা পরিষদের তীর্থ আজ সমগ্র ভারতে কেন—পৃথিবীব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। ১৯৫৬ সালে সাংখ্যতীর্থ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারকারী জার্মাণ পণ্ডিত হের কামাল বর্তমানে ইউরোপে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়াসে ব্রতী আছেন, বর্তমান যুগেও মেদিনীপুর জেলায় সফিয়ারাজ অম্বিকা বিদ্যাপীঠের ছাত্র সেখ তাজমহল হোসেন বহু সংস্কৃত পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে সংস্কৃত ভাষার সেবা করিতেছেন হাওড়া জেলায় ছোট কলিকাতা (আমতার নিকট) প্রভৃতি গ্রামে মুসলমানগণ এখনও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। হরিজন সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে সমাজের অধস্তন স্তরের ছাত্ররা শিক্ষালাভ করিতেছেন। কালিম্পং ও দার্জিলিং অঞ্চলের পার্বত্য অধিবাসীরাও সংস্কৃত পরীক্ষা দান করিয়া থাকেন। কালিম্পং হইতে ২১ মাইল দূরে ভারতের শেষ প্রান্তে লিংসে হরেশ্বর সংস্কৃত পাঠশালায় অধ্যাপিকা শ্রীমতী বৃন্দাদেবী কাব্যতীর্থা শিক্ষা দান করেন। পশ্চিমবঙ্গের নূতন এলাকা সম্প্রতি নবনির্মিত সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে কোচ-বিহারে সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের শ্যামসুন্দর চতুষ্পাঠী ও বিজয় চতুষ্পাঠীর পরিচালন ভার সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ২৪পরগণার মূলাজোড় সংস্কৃত কলেজ ও মুর্শিদাবাদের আয়াকালী সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর ভারও সরকার শীঘ্র গ্রহণ করিবেন। বঙ্গদেশ সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষার পদে উন্নীত করিবার দাবী সর্বপ্রথম জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই দাবী যদি স্বীকৃত হয়, সংস্কৃত শিক্ষার পথ আরও অনেক সুগম হইবে। বঙ্গদেশের

একজন উপাধীধারী পণ্ডিতও কোথাও কোন স্থানে বেকার নাই এবং উচ্চশিক্ষার সকল বিষয়ে নিয়োগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে।"

বেলুড়ে মঠের কর্তৃত্বাধীনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব পক্ষে যে বিরাট সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে তাহা আজ আর কাহারও অজ্ঞাত নহে। তারকেশ্বরের মোহন্ত মহারাজের চেষ্টায় সেখানেও সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। নবদ্বীপ—এক সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল—সেখানে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এইভাবে সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষায় পরিণত করিতে দেশের কাহারও আপত্তি হইবে না।

বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন—

গত ১৮ই আষাঢ় গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে ১০৫।২ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটস্থ বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনে একটি অনুষ্ঠান হয়। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ গুরু মহারাজের প্রতিমূর্তিতে পূজা অর্পণ করেন। মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ স্বয়ং সেবায়তনের প্রতিটি রোগীর নিকট গিয়া কুশল সংবাদাদি অবগত হন এবং তাহাদের প্রত্যেককে ফল ও মিষ্টি ও হাসপাতালের পরিচারিকা এবং সেবক-সেবিকাবৃন্দকে নূতন বস্ত্র বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে একটি বৃহত্তর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে কলিকাতার উপকণ্ঠে ৯।১০ বিঘা জমি ক্রয় বাবদ ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত ১,০০,০০০৲ টাকা মহারাজজী ভাণ্ডার সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করেন। পরলোকগতা স্ত্রী সরযূবালা বসুর স্মৃত্যর্থে ইন্দিরা সিনেমার স্বত্বাধিকারী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রদত্ত একটি শয্যা বাবদ ২,৫০০৲ টাকা এবং উপস্থিত ভক্ত, শিষ্য এবং শিষ্যাবৃন্দের নিকট হইতে ১,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত ৩নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্তা চারুশীলা দাসী তাঁর স্বামী স্বর্গত অক্ষয়কুমার ঘোষের স্মৃত্যর্থে মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনের জন্য বার্ষিক ১২,০০০৲ টাকা হিসাবে পাঁচ বৎসরের মোট ৬০,০০০৲ টাকা অগ্রিম দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ভাণ্ডার সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর গুপ্ত মহাশয় বলেন যে ভাণ্ডার যখন অর্ধ লক্ষাধিক টাকার দেনায় দিশেহারা অবস্থায় ছিল, মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আবির্ভাব তখন ভাণ্ডারকে নূতন প্রাণ ও প্রেরণা দান করে। শ্রীশ্রী মহারাজ তাঁর অগণিত শিষ্য ও শিষ্যাবৃন্দের প্রণামীর তহবিল হইতে ৭০,০০০৲ টাকা দান করেন। এবং সেবায়তনের উদ্বোধনী দিবসে ২৬,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাকেই সূচনা করিয়া ১২টি 'ফ্রি বেড' লইয়া এই হাসপাতাল ৫২ সালে আরম্ভ হয়। অনতিকাল মধ্যেই জনসাধারণ ও মহারাজের ভক্ত ও শিষ্য-শিষ্যাবৃন্দের আনুকুল্যে ৫৬ সালে শয্যা সংখ্যা দাঁড়াইল ৫২। বর্তমানে হাসপাতাল বৃহত্তর করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ইহার কর্তৃপক্ষ। এই কলিকাতার অনতিদূরে ৯।১০ বিঘা জমির সন্ধান মিলিয়াছে। সহৃদয় জনসাধারণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাইলে অবিলম্বে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হইবে।

কলিকাতায় দৈনিক যাত্রীর কথা—

কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানগুলি হইতে প্রত্যহ প্রায় ৮ লক্ষ লোক অর্থোপার্জনের জন্য বা অন্য নানাকারণে কলিকাতায় যাতায়াত করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ লোক রেলে হাওড়া বা শিয়ালদহ ষ্টেশন দিয়া যাতায়াত করে। সকাল সাড়ে ৮টা হইতে সাড়ে ১০টার মধ্যে বেশীরভাগ লোক আসে ও বিকাল সাড়ে ৪টা হইতে ৮টার মধ্যে ফিরিয়া যায়। হাওড়া ষ্টেশন দিয়া ৫ লক্ষ ও শিয়ালদহ দিয়া ৩ লক্ষ লোক গমনাগমন করে। শুধু শিয়ালদহ ষ্টেশনে ১১৩খানি আপ ও ১১৪খানি ডাউন ট্রেণ যায় আসে—তন্মধ্যে প্রায় ১০০খানি উপরোক্ত সময়ের মধ্যেই চলে। হাওড়া ষ্টেশনে ১৩৫খানি আপ ও ডাউন ট্রেণ আছে—তন্মধ্যে ৮৪খানি ইলেকট্রিক ট্রেণ হাওড়া ব্যাণ্ডেল ও হাওড়া তারকেশ্বরের মধ্যে যাতায়াত করে। ট্রেণের তুলনায় যাত্রীর ভিড় এত অধিক যে যাত্রীরা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে বা এঞ্জিনে চড়িতে বাধ্য হয়। তাহার উপর সম্প্রতি নানা কারণে ট্রেণ যাতায়াত বিলম্বিত হইতেছে—তাহার ফলে দৈনিক যাত্রীদের দুঃখকষ্টের সীমা নাই। সেজন্য শীঘ্রই শিয়ালদহ ষ্টেশনে একটি নূতন প্লাটফরম ও কাঁকুড়গাছি হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটি লাইন তৈয়ার করা হইবে। কিন্তু বর্তমানের দুর্দশা দূর করার জন্য রেল

কর্তৃপক্ষ কি করিতেছেন, তাহা জনগণকে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন—

কলিকাতায় বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফর্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের ম্যানেজার ও সেক্রেটারী শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন সম্প্রতি বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্স বা জাতীয় বণিক সভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার মত



শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন

যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচনে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। বণিক সভায় তিনিই বোধ হয় প্রথম কর্মী নিযুক্ত হইলেন। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার দ্বারা বণিক সভার প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইবে।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থায় কিছু দিন হইতে নানাপ্রকার গোলমাল হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার অর্ডিনান্স জারি করিয়া ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ করা হইবে এবং সে জন্য ৩ জন সদস্য লইয়া যে কমিটী গঠিত হইয়াছে ডাক্তার রাধাবিনোদ পাল তাঁহাদের একজন। রাষ্ট্রপতি ৭ জন মনোনীত সদস্য লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি গঠন করিয়া দিয়াছেন—শ্রীপাতঞ্জলী শাস্ত্রী, শ্রীমতী হংস মেটা, ডাঃ এচ-এন-কুঞ্জরু, শ্রী এস-কে বসু এম-পি প্রভৃতি ঐ সমিতির সদস্য। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হউক, প্রত্যেক ভারতবাসী ইহাই কামনা করে।

ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা—

পরিকল্পনা কমিশন যে ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, তাহা যাহাতে সত্বর কার্য্যে পরিণত করা হয় সে বিষয়ে উপদেশ দানের জন্য গত ১৩ই জুলাই দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করিয়া তাহার উপর ভার আপত হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর ঐ কমিটীর সভাপতি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তাহার সদস্য হইয়াছেন। সকল রাষ্ট্রেই ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয় নাই। সেজন্য জনগণের অসুবিধা ও কষ্টের অন্ত নাই।

বোম্বাই ও দিল্লীতে অতিবৃষ্টি—

এবার জুলাই মাসেই বোম্বাই ও দিল্লী সহরে পর পর যে অতিবৃষ্টি হইয়া গেল, সেরূপ নাকি গত ১০০ বৎসরের মধ্যে কখনও দেখা যায় নাই। বৃষ্টির ফলে বোম্বায়ে ট্রেণ চলাচল বন্ধ হয়—ফলে সব লোক পথে আটক পড়ে ও নানা দুর্ঘটনায় কয়েকজন মারা যায়। দিল্লীতেও পথ ঘাট, ঘরবাড়ী এমনভাবে অল্প সময়ের মধ্যে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে কয়েকজন মারা গিয়াছে ও বহুলোককে বিস্তর অসুবিধা ও কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। এ সকল দৈব-দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়।

সুসংবাদ—

গত ১৪ই জুলাই তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে গঙ্গার গতি এমনভাবে পরিবর্তিত হইতেছে যে মূল গঙ্গানদের সমস্ত জল পরে শুধু ভাগীরথী নদীর মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইবে—কাজেই ফরক্কা বাঁধ নির্মিত হউক বা না হউক, কলিকাতার ক্ষতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। গঙ্গায় জলের গতি পরিবর্তনের ফলে জঙ্গীপুর ও সুরপুরের মধ্যবর্তী দ্বীপাকার চর ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ধুলিয়ানের নিকট ১০ বর্গমাইল জমী নদীগর্ভে চলিয়া গিয়া ৭ মাইল চওড়া জলরাশি সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকলের ফলে মনে হয়, গঙ্গার সব জল যদি ভাগীরথীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে

ভাগীরথী আবার বহতা হইবে ও সকল স্থানের চড়া নষ্ট হইয়া গভীর খাতে পরিণত হইবে। এই সংবাদ সত্য হইলে সুখের কথা সন্দেহ নাই। নদী-বিশেষজ্ঞগণের সত্বর ঐ স্থান পরিদর্শন করিয়া এ বিষয়ে বিবৃতি প্রকাশ করা কর্তব্য।

পরিকল্পনায় মার্কিণ সাহায্য—

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে (১) কৃষিশিক্ষা ও গবেষণা (২) দমদম বিমান ঘাঁটিতে সূক্ষ্ম রাডার যন্ত্র স্থাপন (৩) কানপুরে যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষায়তন স্থাপন (৪) কলিকাতা ভূতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের ভূপদার্থ বিজ্ঞান শাখার গবেষণায় সহায়তা ও (৫) মধ্যপ্রদেশের বুদ্ধশ্রী নামক স্থানে কৃষি যন্ত্র ট্রেণিং কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি সরবরাহ—এই ৫টি ব্যবস্থার জন্য সম্প্রতি ভারত সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ১০ লক্ষ ৮৮ হাজার ডলার অর্থ সাহায্য লাভ করিবেন স্থির হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের মধ্যে কারিগরী সাহায্য বাবদ মার্কিণ সরকার ভারতবর্ষকে যে ৬১ লক্ষ ডলার দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহার শেষ কিস্তি বাবদ এই ১০ লক্ষ ৮৮ হাজার ডলার বা ৫১ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। মার্কিণের এই অর্থসাহায্য ভারতের অগ্রগতিতে যথেষ্ট উপকার করিবে।

গিরিশচন্দ্র স্মৃতি ভবন—

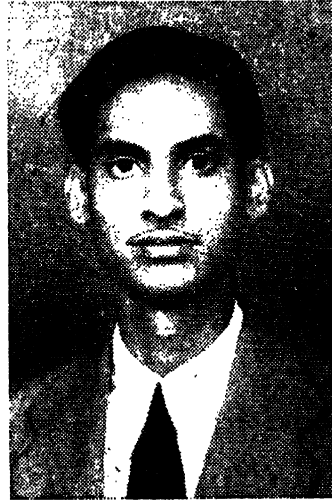
কলিকাতা বাগবাজার ১৩নং বোসপাড়া লেনে (বর্তমানে যতীন্দ্রমোহন এভেনিউ) নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরটি পথের মধ্যস্থলে পড়িলেও সরকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ ঘরের উপর কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট নূতন স্মৃতিভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন ও গত ২২শে জুন কলিকাতা কর্পোরেশন আনুষ্ঠানিক ভাবে ঐ স্মৃতিভবন রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সে জন্য অনুষ্ঠিত উৎসবে নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং বহু বক্তা নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্রের অবদানের কথা বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যাঁহাদের চেষ্টায় এই প্রায় অসাধ্যসাধন সম্ভব হইল, তাঁহারা সকলেই দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

নূতন কারখানার লাইসেন্স—

গত ২১শে জুন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার জানান যে ১৯৫৭ সালের প্রথম ৬ মাসে পশ্চিমবঙ্গে যে সব নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে সেগুলিতে পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ হইলে ৫৬০০ শ্রমিক, ৩১০ কেরাণী ও ৬৮ জন কর্মাধ্যক্ষ পদে লোক গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে। দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে যে বহু নূতন সুযোগ পাওয়া যাইবে, তাহা এই হিসাব হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

উচ্চশিক্ষান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন—

শ্রীমান সুখেন্দু বিকাশ মজুমদার "স্কটিশ কলেজ অফ কমার্স" (গ্লাসগো—স্কটল্যাণ্ড) হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত "বিজিনেজ এডমিনিষ্ট্রেশন এ্যাণ্ড ম্যানেজমেণ্ট" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমান বর্তমানে "ব্রিটিশ ইনষ্টিট্যুইট অফ ম্যানেজমেণ্ট"এর ছাত্র। সে ফ্রান্স,



শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার

বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মানী ও সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণান্তে গত ১৩ই আগষ্ট রাত্রি ১০টায় লণ্ডন হইতে দমদম এরোড্রাম পৌঁছিয়াছে। শ্রীমান মজুমদার বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী শ্রীগুরু লাইব্রেরীর সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুত ভুবনমোহন মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

পল্লী অঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্তমান বৎসর হইতে পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে ৫ম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সে জন্য সরকার ১৯৫৮-৫৯ সালে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন ও আগামী ৪ বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। ঐ ব্যয়ের কিয়দংশ কেন্দ্রীয় সরকার দান করিয়াছেন। শুধু পল্লী অঞ্চলে ঐ ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ না রাখিয়া সহরাঞ্চলেও বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। আশা করি, সরকার এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—

পশ্চিম দিনাজপুরস্থ হিলীর খ্যাতনামা দেশসেবক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার গত ১০ই জুলাই পুরীতে ভারত সেবাশ্রম হইতে রিকসায় গৃহে ফিরিবার পথে রিকসার উপরই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯১৪ সাল হইতে মুক্তি আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং বহুদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সদস্য ও বগুড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি আটক ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সকল অর্থ দেশের কল্যাণকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন।

'সত্যের আলো' পুস্তক—

গত ১১ই জুলাই শুক্রবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় জনৈক কাউন্সিলার 'সত্যের আলো' নামক একখানি পুস্তক সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বর্দ্ধমানজেলার কেচর ডাকঘরের শিমুলিয়া গ্রাম হইতে মোহম্মদ আবু তাহের ঐ পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিয়া মুসলেম সমাজকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বামপন্থী সদস্য সৈয়দ বদরুদ্দোলা ঐ পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। উহাতে ভারতীয় মুসলমানগণকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত করা হইয়াছে। কেন যে ঐ পুস্তক এতদিনেও নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয় নাই, তাহাই বিস্ময়ের কথা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব—

গত ১৮ই জুলাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সভায় অধিকাংশ ভোটে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে ভারতীয় সংবিধানে তপশীলীভুক্ত ১৪টি প্রধান ভারতীয় ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি দানের ও ঐ সকল জাতীয় ভাষার দ্রুত ও উপযুক্ত উন্নতিবিধানের জন্য কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন রাজ্যকে পর্য্যাপ্ত অর্থ-সাহায্য দান করা হউক। ঐ সঙ্গে ইংরাজি ভাষাকেও ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি দানের দাবী করিয়া বলা হয় নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক (সার্ভিস) পরীক্ষাসমূহ আপাততঃ শুধু ইংরাজিতেই পরিচালন করা হউক। ভাষা কমিশন হিন্দীকে সরকারী ভাষারূপে চালাইবার প্রস্তাব করায় তাহাতে অসন্তোষ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াই সিনেট উপরোক্ত দাবাগুলি কেন্দ্র সরকারকে জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের দাবীগুলি উপযুক্ত ভাবেই বিবেচনা করিয়া পরে এ বিষয়ে কর্তব্য নির্দ্ধারণ করা হইবে।

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ—

১৯৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এ পরীক্ষায় লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রীরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এ, আই-এস্‌সি ও বি-এ পরীক্ষায় পাশের হার যথাক্রমে মাত্র ৪৯, ৪২ ও ৪৭ হইলেও ব্রেবোর্ণ কলেজের পাশের হার শতকরা নিরানব্বই ও সাতানব্বই। আই-এ পরীক্ষায় এই কলেজের শ্রীশুক্লা মজুমদার বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন ও দুইজন করিয়া লজিক ও সংস্কৃতে "লেটার" পান। বি-এ পরীক্ষায় এই কলেজের শ্রীমঞ্জুশ্রী রায় দর্শন শাস্ত্র অনার্সে একমাত্র প্রথম শ্রেণী, সংস্কৃত অনার্সে শ্রীমীনাক্ষী ঘোষাল ও শ্রীমঞ্জুলিকা ঘোষ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও তৃতীয় স্থান, চুয়াল্লিশ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ও পাঁচজন ডিসটিংসন লাভ করেন। এই কলেজ দর্শন শাস্ত্র অনার্সে ১৯৫৭ সালেও একমাত্র প্রথম শ্রেণী ও ১৯১৬ সালেও প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় পদ পান।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী—

৩০শে নভেম্বর, ১৯৫৮ উৎসব-সমিতি যে কৃত্যতালিকা স্থির করিয়াছেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র কর্তৃক লিখিত বাংলা পত্রাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশ তাহার অন্যতম। জগদীশচন্দ্রের পত্র যাঁহাদের নিকট আছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক এই উপলক্ষ্যে সেগুলি জগদীশচন্দ্র জন্মশতবার্ষিক সমিতিকে ব্যবহার করিতে দিলে কৃতজ্ঞ হইব। মূল চিঠি পাঠাইলে নকল করিয়া সেগুলি ফেরত দেওয়া হইবে, এবং যাঁহারা

চিঠি ব্যবহার করিতে দিবেন তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রন্থে স্বীকৃত হইবে। শ্রীশিশিরকুমার মিত্র সম্পাদক ৯৩।১ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা—৯।

লোধাদের জন্য উপনিবেশ—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামের অনতিদূরে ২০টি লোধানামক প্রাক্তন অপরাধ প্রবণ-উপজাতীয় লোকজন লইয়া একটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে উক্ত পল্লীটি নির্ম্মিত হয়। লোধাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রতি পরিবারে একটি করিয়া বসতবাড়ী, কৃষি উপযোগী দশ বিঘা জমি, লাঙ্গল, বলদ, কৃষির যন্ত্রপাতি, পশুপালনের জন্য ছাগল, মোরগ প্রভৃতি দান করা হইয়াছে। স্থানীয় কুটীর শিল্পাদির মাধ্যমে তাহাদের জীবিকার্জ্জনের জন্য সাহায্য করা হইয়াছে। গত ২১শে জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপজাতীয় দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার উক্ত উপনিবেশ এবং লোধাদের জন্য নির্ম্মিত বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্পন্ন করেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রচেষ্টায় আজ সুদীর্ঘকাল অবহেলিত একটি জাতি সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পুনর্বাসন কার্য্যে সঙ্ঘকে ৩০ হাজার টাকা অনুদান দিয়াছেন।

পরলোকে পূর্ণচন্দ্র রায়—

গত শনিবার ৩০শে শ্রাবণ রাত্রে ভারতীয় জীবন-বীমা অফিস এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট বীমাবিদ পূর্ণচন্দ্র রায় তাহার সাউদার্ণ এভিনিউস্থিত বাস-ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এস্যুরেন্স লিঃর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। বীমা ব্যবসায়ে দীর্ঘ ৪০ বৎসরকাল কর্ম করার পর ১৯৫৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের এড্ভোকেট ছিলেন। খেলা-ধূলাতেও তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান। প্রথম পুত্র ডাঃ এস-কে-রায় বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীএ-সি-রায় লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের একজন অফিসার। সুলেখিকা বাণী রায় তাঁহার কন্যা। তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবীও সুলেখিকা। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

কবিরাজ সত্যব্রত সেন—

মেসার্স সি-কে-সেন কোম্পানীর অন্যতম পরিচালক কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেনের পৌত্র কবিরাজ সত্যব্রত সেন গত ৫ই আগষ্ট তাঁহার কলিকাতা কাশীবাটস্থ বাড়ীতে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বহু বৎসর তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার থাকিয়া জনগণের সেবা করিয়াছেন। জীবনের



কবিরাজ সত্যব্রত সেন

অধিকাংশ সময় তিনি কলুটোলা অঞ্চলে বাস করিতেন এবং প্রথম জীবন হইতে কংগ্রেসের নিম্নতম হইতে উচ্চতম কমিটীর সদস্যরূপে কাজ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া আয়ুর্বেদ ষ্টেট ফ্যাকালটীর সহ-সভাপতি, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের ট্রাষ্টি, হিন্দু সৎকার সমিতি, রোটারী ক্লাব প্রভৃতির সক্রিয় কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁহার সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহারে সকলে সন্তোষলাভ করিত।

শ্রীমন্ নারায়ণ—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন নারায়ণ সম্প্রতি সর্বভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৯৪০ হইতে ১৯৫২ পর্য্যন্ত ওয়ার্দ্ধায় কমার্স কাগজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি ১৯৫২ হইতে ১৯৫৭ এম-পি ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম-শিল্প কমিশনের সদস্য। গান্ধীজি পরিকল্পিত অর্থ-নীতিক ব্যবস্থায় তিনি বিশ্বাসী ও এ বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

গিরিশ গ্রন্থাগার
ও
'ক্ষুধা'র তিন-শততম অভিনয়

সম্প্রতি বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ে 'ক্ষুধা' নাটকের তিনশততম অভিনয় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এইসঙ্গে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ গিরিশ গ্রন্থাগারে উদ্বোধন উৎসবও সম্পন্ন করেছেন। বাংলাদেশে একসময়ে নাটকের অভিনয় খুবই প্রসারতা লাভ করেছিল এবং তারই ফলস্বরূপ তিনটি এমনকি চারটি পেশাদারী রঙ্গালয় নির্মিত হয়েছে কলিকাতার বুকে। এ ছাড়া অগণ্য অপেশাদারী সংস্থাও গড়ে উঠেছিল বাংলার দিকে দিকে। বাঙ্গালীর মনে নাটকের প্রতি এই আকর্ষণ কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি—ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে অভিনয় কলার প্রতি বাঙ্গালীর মন আকৃষ্ট হয়েছিল। আর নাট্যরসের এই উৎসের জোগান যিনি বাঙ্গালীর ভাবময় মনে দিতে পেরেছিলেন তিনি বাংলার বড় আদরের, বড় গর্ব্বের সন্তান মহাকবি গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র শুধু প্রেরণাই জোগাননি, শুধু উৎসাহই দেননি, তিনি সৃষ্টি করে গেছেন এক অনবদ্য নাট্যসাহিত্যও যা আজ বাঙ্গালীর মহাসম্পদে পরিণত হয়েছে। মহাকবির তিরোধানের বহু বর্ষ পরে বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ এই মহাকবি নাট্যকারের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রাখবার জন্য গিরিশচন্দ্রের নামে এই গ্রন্থাগার স্থাপন করে দেশবাসীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও ধন্যবাদ লাভ করলেন। আশা হয় এই নাট্য-গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বাংলার নাট্য-



'ক্ষুধা' নাটকের তিন-শততম অভিনয় উপলক্ষ্যে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সমাগত সুধীগণ।
(বাম থেকে দক্ষিণে)—শ্রীরাসবিহারী সরকার, কলিকাতার শেরিফ শ্রী এস, সি, রায়, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, ডাঃ শ্রীরাধাবিনোদ পাল, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

সাহিত্য আরও প্রসারতা লাভ করে, বাঙ্গালীর নাট্যপ্রীতিকে আরও বর্দ্ধিত করে, বঙ্গ-নাট্যশালার প্রভূত উন্নতি সাধনে সমর্থ হবে।

"সুধা"-র তিনশততম অভিনয় অতিক্রান্ত হওয়াও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেয় বাঙ্গালী দর্শকদের এই সিনেমার যুগেও নাটকের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান আকর্ষণকে। কিন্তু এই আকর্ষণকে আরও বাড়াতে হবে, আরও পুষ্ট করতে হবে, আরও দৃঢ় করতে হবে এবং দর্শকদের এই অনুরাগ থেকেই, এই পৃষ্ঠপোষকতা থেকেই জন্ম নেবে ভাবীকালের জন-গণ-মন অধিকারী বাংলার নাটক যা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রেও পাবে স্বীকৃতি, পাবে শ্রেষ্ঠ আসন—আর তারই ফলস্বরূপ জ্বলে উঠবে বাংলার দিকে দিকে, মহানগরীর বিস্তৃত বুকে অসংখ্য রঙ্গালয়ের পাদ-প্রদীপ।

এই উপলক্ষে বিশ্বরূপার তরফ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার তাঁর ভাষণে বলেন—

"লণ্ডনের জনসংখ্যা কোল্‌কাতার জন সমষ্টির চেয়ে আনুমানিক আড়াইগুণ বেশী। কোল্‌কাতায় আমাদের তিনটী থিয়েটার, লণ্ডনে ৪৩টী। কোল্‌কাতার একটী থিয়েটার গড়ে বছরে ২৪০টী অভিনয় করে এবং তিনটি মিলে করে ৭২০টী অভিনয়। কিন্তু লণ্ডনের একটী থিয়েটার বছরে করে ৪১৬টী অভিনয় এবং ৪৩টী মিলে করে প্রায় ১৮০০০ অভিনয় এবং এই ৪৩টী থিয়েটারের বিক্রীত টাকার পরিমাণ সেখানে সাড়ে ন কোটী টাকা! শুধু তাই নয়, লণ্ডনের যেটী সবচেয়ে ছোট থিয়েটার সেটীরও বাৎসরিক বিক্রয়ের পরিমাণ ১৭ লক্ষ টাকার ওপর। তার মানে এখানে মিলিত তিনটি থিয়েটারের বিক্রী লণ্ডনের সবচেয়ে ছোট থিয়েটারের বিক্রীর অর্দ্ধেক টাকাও হতে হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যায়।" শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী বলেন যে গিরিশচন্দ্রের পরে কলিকাতায় তিনটি পেশাদারী রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল, মধ্যে আরও একটি যোগ দিয়েছিল, কিন্তু এখন গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর এতদিন পরেও আমরা সেই তিনটির বেশী রঙ্গালয় দেখতে পাচ্ছি না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও কৃষ্টির কেন্দ্রস্থল ও একদা সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী ও অখণ্ডিত বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজধানী এই মহানগরী কলিকাতার বুকে মাত্র তিনটি রঙ্গালয়ের অবস্থিতি সাহিত্যে ও ভাষায় শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী এই বাঙ্গালীর নাট্যসাহিত্যের তথা অভিনয় কলায় প্রতি আন্তরিক প্রীতির পরিচয় বহন করে না।

আশা করি বঙ্গ-রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে অবহিত হয়ে বাংলার বিশাল দর্শকসমাজকে নাটক অভিনয়ের অর্থাৎ রঙ্গালয়ের প্রতি একান্তভাবে আকৃষ্ট করবার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয়ে রঙ্গালয়ের বৃদ্ধিই শুধু নয়, উন্নতিই শুধু নয়—গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলালের উত্তরসাধকগণের আবির্ভাবের পথও প্রশস্ত করতে সমর্থ হবেন।

* * * *

টাস্‌ ফিল্মিস্‌-এর 'কালামাটী' চিত্রের প্রযোজক শ্রীতারা বর্ম্মণ একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর হাতে রাজ্যপালের কয়লাখনি দুর্ঘটনার রিলিফ ফাণ্ডে ও রাজ্যপালের বেনিভোলেণ্ট ফাণ্ডের জন্য ১০০১৲ টাকার ও ৫০১৲ টাকার দুইখানি চেক্‌ প্রদান করেছেন। চিত্র প্রযোজকের এরূপ দান প্রশংসার যোগ্য।

* * * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক নির্ম্মিত আটটি ডকুমেণ্টারী চিত্র এখন সম্পূর্ণ হয়ে প্রচারের অপেক্ষায় আছে। এই চিত্রগুলি হচ্ছে—'স্বাস্থ্য সম্পদ', 'শিল্পের একটা দিক', 'নূতন পথের পথিক', দেখেশুনে চলুন, 'শিশুর বা কাঙ্গা', 'বহুমুখী বিদ্যালয়', 'মানুষ হল জয়ী' ও 'স্বপ্ন হল সত্যি'।

* * * *

নায়ক দেবআনন্দ একটি চিত্রের সুটিং-এর সময় নায়িকা মধুবালাকে একটি ভারী গোছের থাপ্পড় মেরে বসেন! দৃশ্যটি ছিল নায়ক মত্ত অবস্থায় তার

প্রণয়িনীকে একটি গায়িকার গৃহে দেখে রাগ সামলাতে না পেরে একটি চড় তার গালে মারবে। দেবআনন্দ দৃশ্যটিকে অতি বাস্তব করতে গিয়ে নায়িকা মধুবালার গণ্ডে বেশ জোরের ওপরই চড়টি মেরে বসেন। কিন্তু স্যুটিং-এর শেষে মধুবালা দেবআনন্দের দিকে একগাল হেসে বুঝিয়ে দেন চড় খেয়ে তিনি রাগ করেননি মোটেই।

এদিকে নিউ ইয়র্ক-এর একটি খবর হচ্ছে সেক্সপীয়রের "Taming of the Shrew" অবলম্বনে রচিত সঙ্গীতমুখর নাটক "Kiss me, Kate"-র প্রথম অভিনয় রজনীতে প্রথম অঙ্কের শেষে নায়িকা Gane Morgan নায়ক Earl Wrightson-এর প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত হয়ে রাগ সামলাতে না পেরে তার গণ্ডে সজোরে মুষ্টাঘাত করে বসেন, আর নায়িকার প্রচণ্ড মুষ্টাঘাতে নায়কের সংজ্ঞা লোপ পায় এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় এক্স রে করে তার চোয়ালের হাড় ভেঙেছে কিনা দেখবার জন্য! অবশ্য পরে কিছুটা সুস্থ হয়ে Wrightson আবার অভিনয়ে যোগদান করতে সমর্থ হন।

* * * *

বিদেশী খবর ঃ

Dore Schary-র নাটক "Sunrise at Campobello" ১৯৫৭-৫৮ সালের শ্রেষ্ঠ নাটক বিবেচিত হয়ে Broadway Theatre's প্রদত্ত 'Tony' পুরস্কার লাভ করেছে। নাটকটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট Frnklin D. Roosevelt-এর পোলিও রোগাক্রান্ত অবস্থার সঙ্কটময় মুহূর্ত্তগুলি নিয়েই লেখা হয়েছে। Ralph Bellamy প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টের ভূমিকায় অভিনয় করে পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা রূপে 'Tony' পুরস্কার পেয়েছেন, আর "Time Remembered"-এ অভিনয় করে Helen Hayes শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেছেন। Meredith Wilson-এর "The Music Man"-কে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতমুখর নাটক বলে 'Tony' পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

"Elizabeth the Queen" এবং "Mary of Scotland"-এর লেখক Maxwell Anderson "The Golden Six" নামে একটি নতুন ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। নাটকটি সম্রাট অগাষ্টাস্-এর সময়কার রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে লিখিত হয়েছে। 'The Golden Six' নামটি সম্রাট অগাষ্টাসের ছয়টি পৌত্রের থেকেই দেওয়া হয়েছে। নাট্যকার এই নাটকে ডিক্টেটারশিপ্ বা এক-নায়কত্বের বিপদকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং দেখিয়েছেন মানুষের স্বাধীনতা একবার বিপন্ন হলে তাকে ফিরে পাওয়া কত শক্ত।

* * * *

নিউ ইয়র্কের 'Theatre Guild নামক নাটক পরিবেশনকারী সংস্থা তাঁদের চল্লিশটি মরশুম পূর্ণ হওয়ার উৎসব পালন করেছেন। এই Theatre Guild লণ্ডন ও অন্যান্য প্রদেশে প্রদর্শিত নাটকগুলি ছাড়াও খালি নিউ ইয়র্কেই এ পর্য্যন্ত দুইশতর ওপর নাটক প্রদর্শন করেছেন। এর মধ্যে এঁরা সাতটি Pulitzer Prizes ও একটি বিশেষ পুলিটজার পুরস্কার "Oklahoma"-র জন্য লাভ করেন। এঁদের পুরস্কার প্রাপ্ত নাটকগুলির মধ্যে :—Eugene O'Neill-এর "Strange Interlude", William Saroyan-এর "The Time of Your Life", Robert E. Sherwood-এর "Idiot's Delight" ও "There Shall be no Night" এবং Maxwell Anderson-এর "Both Your Houses" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

* * * *

বক্স-অফিসের দিক দিয়ে বর্ত্তমানে নিম্নের চিত্রগুলি সাফল্য লাভ করেছে :—South Pacific (20th. Century Fox), Vertigo (Paramount), Around the World in 80 Days (United Artists), God's Little Acre (United Artists) এবং The Bridge on the River Kwai (Columbia)।

চিত্র পরিচালনার দু'এক কথা

রবীন সরকার *

দেশ বিদেশে বাংলা ছবি পুরস্কার পাচ্ছে—তাতে বাঙ্গালী ধন্য হচ্ছে সত্যি, কিন্তু যারা শিল্পিমনা ব্যক্তি—যারা সমালোচনা করেন—তাঁরা এই রকম সম্মানজনক উপাধি ও ছবি দেখে কি ভাবছেন তা না বলাই ভাল।

যাক্—ওসব দিকে মন দিয়ে কি হবে।

আসুন আমরা একটু ভেবে দেখি ছবি পরিচালনা করতে হলে কি কি করতে হয়। যদি মনে করেন যে পরিচালনা করতে পারেন—এগিয়ে আসুন। মনের কথা খুলে বলুন প্রযোজককে—আর তার মনে বিশ্বাস স্থাপন করুন।

মনে রাখবেন যে ছবি তৈরী করা মানে পর্দার মাধ্যমে ছবি দিয়ে দর্শকদের গল্প বলা। এটা নিশ্চয় জানা আছে যে গল্প ভাল হতে পারে—আবার মন্দও হতে পারে। ভাল ছবি তাকে বলা হয় যে ছবি ভাল করে মন মাতিয়ে গল্প বলতে পারে। আর মন্দ ছবি তাকেই বলতে পারেন যার ভিতরে অভিনেতারা নিরাশ করেছে তাদের মেধাশক্তিকে—অর্থাৎ যারা প্রাণ থাকতে মনের প্রাণ জাগাতে পারে নি। শরীরের প্রাণ আর মনের প্রাণ এই দুইটি যে পৃথক গুণ—এদিকে আমাদের ভাবতে হবে।

তা ছাড়া আমাদের আরও দেখতে হবে গল্পের গাঁথুনি কেমন হয়েছে। বাড়ী তৈরী করার সময় যেমন ভিত তৈরী করে তবে ইট বসিয়ে ঘর তুলতে হয়—তেমনি গল্পের একটা মূল উদ্দেশ্য ঠিক করে নিয়ে তার উপরে নানাভাবে রং চাপিয়ে ঘাতপ্রতিঘাত দিয়ে গল্পের গাঁথুনিকে রূপ দিতে হয়। গল্পের গাঁথুনি বা রচনার দোষে ছায়া ছবিতে গল্প দৃষ্টিও শ্রুতিকটু হয়ে থাকে।

তা ছাড়া আরও দেখতে হয় যে প্রয়োজনা ঠিক মত হয়েছে কিনা। প্রযোজনার দোষেও ছবি মন্দ হয়ে যেতে পারে। কেননা অনেক সময় মন্দ প্রযোজকের জন্য ভাল ভাল পরিচালক মন দিয়ে ছবি পরিচালনা করতে পারেন না। তার ফলে গল্প প্রাণ পায় না।

ছায়াছবি যখন তোলা হয় তখন প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে আরম্ভ করে শেষ অঙ্ক:শেষ দৃশ্য সরাসরি তুলে যায় না। ঘটনা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছবি তোলা হয়। অর্থাৎ একটা ঘটনা দৃশ্যর ছবি শেষ করে অন্য ঘটনা দৃশ্যর ছবি তুলতে থাকে, মনে করা যাক—একটি ছবিতে চার জায়গায় বা চার অঙ্কে একই ঘরের ছবি আছে। চার অঙ্কের ভিতর চারটি দৃশ্যে একই ঘরের ছবি দেখতে হবে। তখন একটা অঙ্কর ছবি শেষ করে ঘরের দৃশ্যটি ভেঙ্গে ফেলে বা সরিয়ে রেখে অন্য দৃশ্যের ছবি তোলে না, সেইজন্য খরচ ও সময় বাঁচাবার জন্য একটি দৃশ্য যে যে অঙ্কে আছে তা আগে শেষ করা হয়—পরে অন্য অঙ্কর অন্য দৃশ্য শেষ করে।

ক্যামেরা যে কতবার তার স্থান বদল করে তা ছবি দেখলেই বোঝা যায়। দেখা গেল কলসী ভাসছে। তারপর ক্যামেরা পেছিয়ে যাওয়াতে দেখা গেল যে একটা মেয়ে কলসী ধরে সাঁতার কাটছে। ক্যামেরা ঘুরিয়ে দেখালো যে কে একজন লোক আসছে পুকুরের দিকে। তখন আবার দেখা গেল মেয়েটী সাঁতার দিয়ে এসে পাড়ে দাঁড়াল। এই সময় সেখানে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কে লতা"? দেখা গেল লতা জলে ডুব মারলো। তখন যে ডাকছিল তাকে দেখবার জন্য ক্যামেরা কাছে নিয়ে গিয়ে দেখলাম—ছেলেটী কে।

যতবার ক্যামেরার স্থান পরিবর্ত্তন হয়েছে—ততবার একটা করে নূতন দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এই দৃশ্যগুলিকে "সট্" আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ক্যামেরাম্যান স্থান পরিবর্ত্তন করতে নির্দ্দেশ দেয় না। মূল পরিচালক প্রতিটি সট্ পরিচালনা করে থাকে। তাকেই সম্পাদনা করতে হয় আবার। তবে—সম্পাদক যে ছবি সংযোজনা করেন বা সম্পাদনা করেন তাকে পরিচালক আর প্রযোজকের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। পরিচালকই বলে দেন কোন কোন ছবিগুলি সংযোজনা করতে হবে—কোনগুলি কত লম্বা হবে বা দূরত্ব হবে—কোনব্যাপার গুলি কেটে বাদ দিতে হবে—ঘটনা অনুযায়ী সাজাতে হবে—কিভাবে তুলনা করে দেখাতে হবে—কি ভাবে গতির সৃষ্টি করতে হবে—আর কোনখানে চরমে তুলতে হবে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত—তা সবই পরিচালকই নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। তবে সম্পাদকের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না।

সেইজন্য পরিচালককে মনের পর্দায় স্পষ্ট ছবি ভাসিয়ে রাখতে হয়। তাকে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে চলতে হয়। অভিনেতাদের কি ভাবে কি

* [লেখক ১৯৩২ সালের "মানময়ী গার্লস স্কুল" ছবিখানির নির্ম্মাণের সময় বাংলার চলচ্চিত্র জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট হন এবং বহু ছবিতে কাজ করেন। রঙ্গমঞ্চেও নৃত্য প্রদর্শন ও পরিচালনা করে সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৯৪৮ সালে লেখক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। ১৯৫০ সালে হলিউডের বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান্ জ্যাক্সন রোজ-এর সঙ্গে থেকে ক্যামেরার কাজ শিক্ষা করেন ও পরিচালক জেমস ডি, কারনের কাছ থেকে চিত্র পরিচালনার কাজ শিক্ষা করে ইংলণ্ডে আসেন এবং ১৯৫৫ সালে ফিল্ম লেবরেটরির কাজে প্রবেশ করেন। এখন সিনে টেকনিসিয়ান দলের সভ্য হয়ে ইংলণ্ডের নানা ষ্টুডিওতে সহকারী ক্যামেরাম্যান্ রূপে কাজ করছেন]

করালে ভাব প্রকাশ পাবে—কোথায় ক্যামেরা বসালে অভিনেতাদের ভাব প্রকাশ সার্থক হবে—স্বরভঙ্গিমা সাউণ্ড মেসিনে কেমন শোনাচ্ছে—সম্পাদনাগারে কেমন গল্প সম্পাদনা হচ্ছে—ইত্যাদির দিকে মন দিয়েও দেখতে হয়। কেন না—ছবির ভাল মন্দ বিভাগীয় পরিচালকের উপর নির্ভর করে। দায়ী হতে হয় তবে মূল পরিচালককে, সেইজন্য মূল পরিচালক বিভাগীয় পরিচালকদের সহায়তায় কাজ উদ্ধার করেন। তবে তাকে সেইভাবে বিভাগের কাজ অংশ জানতে হয় বৈ কি!

ছন্দ না থাকলে ছবি প্রাণহীন হয়। সেইজন্য ছন্দ বজায় রাখবার জন্য ফিল্মের দূরত্ব কম বেশী করতে হয়—। তালমান বজায় রাখতে ঠিক মত না পারলে ছবি দৃষ্টিকটু হয়। দেখতে হয় যে ছবি মারফৎ গল্পের রেশ ঠিকমত বজায় রাখা হয়েছে কিনা। ছন্দ পতন হলে মনে যেমন একটা ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়—তেমনি ছবির ভিতর ছন্দ না থাকলে মনের শান্তি দূরে চলে যায়। সে যতই কায়দা কৌশল দেখানো হোক না কেন—তাতে দর্শক চিত্ত কিছুতেই আবার জোড়া লাগাতে পারবে না। ছন্দই হচ্ছে ছবির প্রাণ, তাল-মান রসাশ্রয় যেমন নৃত্যের প্রাণ—তেমনি ছন্দ মান ও রসাশ্রয় ছবির প্রাণ।

ছন্দ বজায় রাখবার জন্য ফিল্ম কম বেশী কেবল করলে হয় না—সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হয় যে স্বরভঙ্গিমা ঠিক মত প্রকাশ হচ্ছে কিনা—উচ্চারণ ও শব্দের অর্থ প্রকাশ করছে কিনা—অভিনয় ঠিক হচ্ছে কিনা—হাবভাবের জন্য অঙ্গ সঞ্চালন ঠিকভাবে মূর্ত্ত হয়ে উঠছে কিনা। একমাত্র পরিচালককে দেখতে হয় যে নাটকীয় মূল্য আয়ত্তাধীনে আসছে কিনা—আর গল্প প্রকাশ পাচ্ছে কিনা।

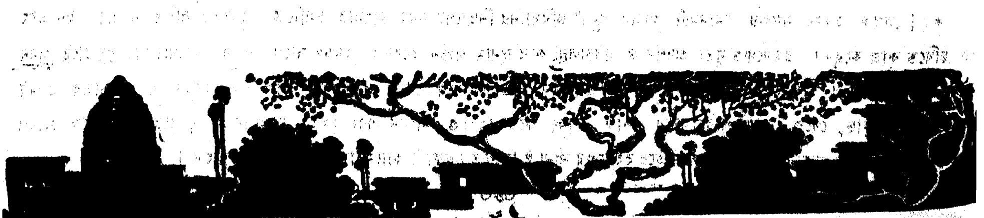
মোট কথা এইটুকু প্রথমে বলতে চাইছি যে যারা আজ ছবি পরিচালনার কাজে এগিয়ে আসছে—তাদের জানতে হবে কি ভাবে গল্প বলতে হয়, কি ভাবে ছবিতে গল্প ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝিয়ে দিতে হয়। অর্থাৎ এটা মনে রাখতে হবে যে চিত্র পরিচালককে দোভাষীর হয়ে কাজ করতে হবে। লেখক যেটা বলতে চেয়েছেন পরিচালককে সেটা বুঝে নিয়ে দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে হবে নিজের ভাষায়।

লেখক লেখেন গল্প—হাতের লেখা লিখে পাতা ভরাট করেন না। অভিনেতা সেই গল্পের চরিত্র রূপায়িত করে—ভাঁড়ামি করে না। ক্যামেরাম্যান তার আলোছায়ার সাহায্যে রং লেপন করে ছবির মেজাজ ও আবেগ সৃজন করে। সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালক ভাবতে থাকে কি ভাবে দর্শকদের মনে আবেগ ফুটাতে পারবে। আর পরিচালক—অর্থাৎ মূল পরিচালক যে ছবির সর্বময় কর্ত্তা সে বৃত্তের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে ছবি কি বলতে চাইছে। পরিচালনা করতে হলে পরিচালককে পড়তে হবে স্ক্রীপ্ট। ছবিতে দেখাতে হবে আর শোনাতে হবে অভিনয় শেখাতে হবে অভিনেতাদের দেখাতেও হবে। ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে আলোচনা করবে, কিভাবে ছবি নিতে পারলে অভিনেতাদের মনের ভাব প্রকাশ পাবে, অন্যান্য বিভাগীয় পরিচালকদের সঙ্গে একমনে প্রাণে কাজ করতে হবে যাতে তারা ছবির কাজে সাহায্য করে।

এতগুলি বিভাগের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে চিত্র পরিচালককে ছবির কাজে এগোতে হয়। গল্পের উদ্দেশ্য সার্থক করবার জন্য তাকে দেখতে হয় যে কাজ ঠিক মত হচ্ছে কি না। গতি ও ছন্দ—যা ছবির প্রাণ—তা' আয়ত্তাধীনে আছে কিনা। মোট উদ্দেশ্য অর্থাৎ পর্দার কাহিনী—অর্থ প্রকাশে সক্ষম হয়েছে কিনা তা দেখতে হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যে ফটোগ্রাফীর ভিতর দিয়ে মেজাজ ঠিকমত খেলতে সাহায্য করছে কিনা।

পরিচালকের ধারণার ভিতর যেসব আসে না, যে সব পছন্দ হয় না—অর্থাৎ যদি কিছু অবান্তর দেখে যাদ্বারা ছবির অর্থ বোধগম্য হবে না—তা বদলে দিতে পিছপা হয় না। কেন না পরিচালক চায় সম্মান কুড়াতে—পরিচালক চায় দর্শকদের আনন্দ বৃদ্ধি করতে—আর চায় গল্পের ছলে কিছু শিখিয়ে দিয়ে যেতে। স্ক্রীপ্টে লেখক যে ভাবে লিখে দিয়ে যান—পরিচালক সেই ভাবে ছবি পরিচালনা করে না। স্ক্রীপ্টের গল্প পাঠ করে—আর ছবির গল্প দেখে যদি ভাবা যায় তবে সেখানে আকাশ পাতাল মনে হয়। লেখক গল্প সৃজন করেন আর পরিচালক ছায়াচিত্র সৃজন করেন।

লেখক যখন গল্প লেখেন—তখন তার ভিতর দিয়ে প্রেমের বন্যা ধারা বইয়ে দেন মেজাজের উত্তেজনায়।—অভিনেতারা অভিনয় করে নিজেদের ব্যক্তিত্ব তুলে ধরবার জন্য, নিজেদের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়ে।—এইসব কাজে অত্যধিক বাড়াবাড়ি যাতে না হয় তার জন্য পরিচালক সচেষ্ট থাকে। এসব কাজ কেবল নিজের জন্য পরিচালক করতে যায় না—কেবল দর্শকদের মনে যাতে না বিরক্তির ছায়া আসে তার জন্য এত পরিশ্রম। তা ছাড়া কোন কোন প্রযোজক যখন এটা দিলে ভাল হয়—ওটা দিলে মনোমত হবে—ইত্যাদি আবদার পরিচালকের কাছে জানাতে থাকেন—তখন পরিচালক সেইসব গ্রহণ করতে পারেন—আবার নাও পারেন, কেননা তাকে ভাবতে হয় দর্শকদের কথা সব সময়।









শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগ ঃ

১৯৫৮ সালের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। মোট ২৮টি খেলায় রেলদল ৪৭ পয়েণ্ট পেয়েছে। ২২টি খেলায় তারা জয়লাভ করেছে অপরদিকে ৩টি খেলা ড্র হয়েছে এবং ৩টি খেলায় তারা হেরে গেছে। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দল ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন নামে ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে। ১৯১০ সালে দলটি যখন ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান করে তখন নাম ছিল ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে (ই, বি, এস, আর)। ১৯১৬ সালে দলের নাম থেকে ষ্টেট (আদ্যাক্ষর এস) কথাটি বাদ দেওয়া হয়। এমনি ক'রে দলের নাম ৯বার বদলে বর্ত্তমানে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে নাম দাঁড়িয়েছে। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় রেলদলের এই প্রথম লীগ বিজয়। প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় মহমেডান স্পোর্টিং দল প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ১৯৩৪ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পায়। শুধু তাই নয়, ১৯৩৪ সাল থেকে কেবল ভারতীয় দলই লীগ প্রতিযোগিতায় অখণ্ড আধিপত্য বজায় রেখে এসেছে। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত হিসাব নিলে দেখা যাবে, মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল—এই তিনদলের মধ্যে কোন না কোন দল লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। ১৯৫৮ সালে ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দলের লীগ বিজয়ের ফলে ঐ তিনদলের সুদীর্ঘকালের একটানা আধিপত্যের ইতিহাসে ছেদ পড়লো। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে লীগ খেলার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোজনা করলো। ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দলের লীগ-জয় অপর একদিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রেলওয়ে দলের পক্ষে যাঁরা এবছর লীগ খেলায় যোগদান করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড়। এই দলের তরুণ খেলোয়াড়রা বড় বড় ক্লাব কর্তৃপক্ষের এবং সমর্থকদের চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে কতখানি সাফল্যের সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে।

লীগ তালিকায় মোহনবাগান দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে ৪৬ পয়েণ্ট পেয়ে। ইস্টবেঙ্গল পায় তৃতীয় স্থান—পয়েণ্ট ৪০। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগের শেষ দিকের খেলায় যোগদান করেনি। যোগদান করে জয়লাভ করলেও তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

১৯৫৮ সালের লীগের খেলায় ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দলের সংক্ষিপ্ত ফলাফল ঃ

জয় (২২) : স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ১—০ ও ১—০, পুলিসকে ৩—০ ও ২—০ ; বালীপ্রতিভাকে ২—১ ও ২—১, ইণ্টার ন্যাশনালকে ২—১ ; হাওড়া ইউনিয়নকে ২—১ ও ৪—০, ওয়াড়ীকে ৪—১ ও ১—০, মহমেডান স্পোর্টিংকে ২—১ ও ২—১, এরিয়ান্সকে ৩—০ ও ২—০, মোহনবাগানকে ১—০, খিদিরপুরকে ৩—১ ও ২—১, জর্জ্জ টেলিগ্রাফকে ২—০ ও ২—১ এবং বি, এন,

রেলদলকে ২—১ গোলে পরাজিত করে। ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল যোগদান না করায় রেলদল ওয়াকওভার হিসাবে জয়লাভ করে।

হার (৩): ইণ্টার ন্যাশানালের কাছে ০—১, রাজস্থানের কাছে ০—২ এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে ০—১ গোলে পরাজিত হয়।

ড্র (৩): রাজস্থানের সঙ্গে ২—২, মোহনবাগানের সঙ্গে ১—১ এবং বি এন আর দলের সঙ্গে ০—০ গোলে খেলা ড্র করে।

রেলদলের পক্ষে গোলদাতা: পি কে ব্যানার্জি ১২, ডি দাস ৯, এস রায় (বড়) ৮, এ সোম ৫, এস নন্দী ৫, পি সিংহ ৪, কে মণ্ডল ২, এ সেনগুপ্ত ১ এবং এস রায় (ছোট) ১।

বৃটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমস ঃ

কার্ডিফে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৃটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমস অনুষ্ঠানে ৩৫টি দেশ যোগদান করে। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে মোট ১০টি বিশ্বরেকর্ড স্থাপিত হয়—সাঁতারে ৬টি, এ্যাথলেটিকসে ৩টি এবং ভারোত্তোলনে ১টি; এবং ২টি বিষয়ে ফলাফল বিশ্বরেকর্ডের সমান হয়।

ইংলণ্ড মোট ৮০টি পদক লাভ ক'রে (স্বর্ণ ২৯, রৌপ্য ২২, ব্রোঞ্জ ২৯) সর্ব্বাধিক পদক লাভের সম্মান লাভ করে। ইংলণ্ডের পরই অষ্ট্রেলিয়ার স্থান—পদক লাভের সংখ্যা ৬৬। দক্ষিণ আফ্রিকা ৩১টি পদক লাভ ক'রে ৩য় স্থান পায়। ভারতবর্ষ পায় ৩টি পদক—২টি স্বর্ণ এবং ১টি রৌপ্য। অপরদিকে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ পাকিস্থান ১০টি পদক লাভ করে। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রথম স্বর্ণ পদক লাভ করেন ৪৪০ গজ দৌড়ে মিলখা সিং। মিলখা সিং এই দূরত্ব পথ ৪৬.৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম ক'রে এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমসে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন। কুস্তি প্রতিযোগিতার 'হেভিওয়েট' বিভাগে লীলারাম ভারতবর্ষের পক্ষে ২য় স্বর্ণপদক লাভ করেন। ওয়েল্টার ওয়েট বিভাগে লক্ষীকান্ত পাণ্ডে রৌপ্য পদক পান, এঁরা দুজনেই সেনাবিভাগের কর্ম্মচারী।

ষষ্ঠ বৃটিশ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ ক্রীড়ায় প্রতিষ্ঠিত বিশ্বরেকর্ড ঃ

এ্যাথেলেটিক্স

(১) ৪৪০ গজ হার্ডলস্ (পুরুষ)—৪৯.৭ সেঃ:—গার্ট পট জিটার (দঃ আফ্রিকা); পূর্বতন রেকর্ড ৫০-৩ সেঃ—জস্ কালব্রেথ (যুক্তরাষ্ট্র); অনুমোদনের অপেক্ষায় ৪৯.৯ সেঃ, গ্লেন ডেভিস (যুক্তরাষ্ট্র)।

(২) বর্শা নিক্ষেপ (মহিলা)—১৮৮ ফুট ৪ ইঃ, মিসেস আনা পাজেরা; পূর্বতন রেকর্ড ১৮২ ফুঃ কনজিভা (সোভিয়েট ইউনিয়ন); অনুমোদন অপেক্ষায়—১৮২ ফুঃ ১০ ইঃ—ডি জাটোবাকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া।

(৩) ৪×১১০ গজ রিলে (মহিলা)—৪৫.৩ সেঃ—ইংলণ্ড দল; পূর্বতন রেকর্ড ৪৫.৬ অস্ট্রেলিয়া।

সন্তরণ

(১) পুরুষদের ৪×১১০ গজ মেডলি রিলে—৪ মিঃ ১৪.২ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া; পূর্বতন রেকর্ড—৪ মিঃ ১৯.৪ সেঃ—অস্ট্রেলিয়া।

(২) মহিলাদের ১১০ গজ ফ্রিষ্টাইল—৬১.৪ সেঃ—ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া); পূর্বতন রেকর্ড ৬১.৫ সেঃ—ডনফ্রেজার।

(৩) মহিলাদের ১১০ গজ ব্যাকস্ট্রোক—১ মিঃ ১২.৩ সেঃ—মার্গারেট এডওয়ার্ড (ইংলণ্ড) এবং ১ মিঃ ১১.৯ সেঃ (দুইবার)—জুডি গ্রেহাম (ইংলণ্ড); পূর্বতন রেকর্ড, ১ মিঃ ১২.৪ সেঃ—মিস এডওয়ার্ডস্।

(৪) মহিলাদের ৪×১১০ গজ ফ্রিস্টাইল রিলে—৪ মিঃ ১৭.৪ সেঃ—অষ্ট্রেলিয়া দল। পূর্ব্বতন রেকর্ড ৪ মিঃ ১৮.৯ সেঃ—অষ্ট্রেলিয়া।

(৫) মহিলাদের ৪×১১০ গজ মেডলি রিলে—৪মিঃ ৫৪ সেঃ—ইংলণ্ড দল; পূর্ব্বতন রেকর্ড—৪ মিঃ ৫৭সেঃ—ওলন্দাজ দল।

ভারোত্তোলন

লাইট ওয়েট: জার্ক ৩৪৭ পাঃ—হাও, লিয়াং তান (সিঙ্গাপুর)।

সাহিত্য সংবাদ

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ঃ শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম,এ, পি-এচ, ডি

গ্রন্থকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক। আলোচ্য গ্রন্থে বারোটী প্রবন্ধ আছে, তন্মধ্যে এগারোটী প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষ, প্রবাসী ; উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। দর্শনের স্বরূপ, ধর্ম্ম ও দর্শন, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, ভারতীয় সংস্কৃতিতে দর্শনের স্থান, 'ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ প্রভৃতি সম্পর্কে গ্রন্থকার বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ ও মানব জীবনের চিরন্তন সমস্যা নিয়ে তিনি যে সব তত্ত্ব কথা উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। জড় ও চেতনা সত্ত্বা দুই বৈরী ভাবাপন্ন তা পরস্পর বিরোধী বস্তু নয়, পরন্তু এরা একই সত্তার দুইটী বিভিন্ন কিন্তু সমভাবাপন্ন ও পরিপূরক দিক্ বা অংশ বিশেষ এই কথাই তিনি শ্রীঅরবিন্দের ভাবধারার মধ্য থেকে পেয়েছেন। সর্ব্বশেষে আচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের দার্শনিক মতবাদ সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রের দার্শনিক প্রতিভা অনন্য-সাধারণ—ভারতের গৌরব এই দার্শনিকের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক প্রতিভায় বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্ব করবার বস্তুও মনে হয় অবলুপ্ত। তাঁর দার্শনিক মতবাদে ছিল মৌলিক চিন্তাধারা—অদ্বৈত-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর দার্শনিক মতবাদ। তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনের মত সৃষ্টি করে গেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি চিত্তাকর্ষক তথ্য বহুল ও মনীষাপ্রসূত। আমরা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে তৃপ্তি লাভ করেছি। দার্শনিক সমাজে গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে এরূপ আশা করা যায়।

[প্রাপ্তিস্থান—দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গীতা জয়ন্তী ঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পরলোকগত পুত্রের স্মৃতিতে গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে গীতা সম্বন্ধে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, সুপণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ্রীসত্যদেব, মনীষী মহেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, গিরীন্দ্রশেখর বসু, আচার্য্য বিনোভাভাবে প্রভৃতির লেখা একত্রিত করা হইয়াছে। গীতার প্রচার সর্বদা কাম্য—কাজেই এই ধরণের পুস্তক যত বেশী প্রকাশিত হয়, ততই মানুষ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

[প্রকাশক—রথীন্দ্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১নং রথীন ব্যানার্জি লেন, ঢাকুরিয়া কলিকাতা—৩১। মূল্য ২৲ টাকা।]

স্বামী নির্মলানন্দ ঃ শ্রীরামপ্রসাদ ঠাকুর

একজন পণ্ডিত, ভক্ত ও সাধু ব্যক্তির জীবনী তাঁহার শিষ্য কর্তৃক লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে বহু সাধু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া এই অধর্ম্ম-প্লাবিত দেশে ধর্মরক্ষায় আত্মনিয়োগ করিয়া জনকল্যাণ সাধন করিয়াছেন। স্বামী নির্মলানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার মত ব্যক্তির কথা প্রকাশিত হইলে লোক তাহা পাঠ করিয়া ধর্মাচরণে আগ্রহশীল হইবে সন্দেহ নাই। স্বামীজি সারা জীবন অধ্যয়ন, অধ্যাপনাতেই জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যই বহু লোককে তাঁহার নিকট আকৃষ্ট করিয়াছিল। স্বামীর আদর্শ জীবন পাঠ করিয়া লোক সেই পথের অনুসরণ করিলে এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ সার্থক হইবে।

[জেলা হুগলী, পোঃ কোন্নগর, ওঙ্কারমঠ হইতে প্রকাশিত—মূল্য দুই টাকা]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আনন্দ প্রতিষ্ঠা ঃ শ্রীচিত্তরঞ্জন

ভগবান্ আনন্দ স্বরূপ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তে। এই গভীর ও মহান তত্ত্ব সুবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থকারের এ পুস্তিকায় বিবৃত হয়েছে। ধর্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এ পুস্তক পাঠের উপকারিতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

[প্রকাশক—শ্রীওঁকার প্রকাশ ব্রহ্মচারী। ১১সি, দিলখুসা ষ্ট্রীট —কলিকাতা ১৭। মূল্য আট আনা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

শ্রীগুরুতত্ত্ব ও গীতা ঃ আচার্য্য শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এলাহাবাদ সত্যগোপাল আশ্রমের আচার্য গোপাল ঠাকুর গুরুগত প্রাণ। গুরুবাদের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। গীতার অন্তঃস্থিত গুরুবাদের ব্যাখ্যা তাঁর দীর্ঘ দিনের সাধনায় উপরোক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। "গুরুব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর" এ পরম মন্ত্র ভারতীয় আধ্যাত্ম সাধনার মূলসূত্র। গুরুপূজা সে সাধনার প্রথম সোপান। সে

সোপান বেদে ঈশ্বর লাভের পন্থা এ গ্রন্থে দর্শিত হয়েছে। ভোগান্ধ জড়বাদী জগতে এ গ্রন্থের বহুল প্রচার অত্যন্ত আবশ্যক।

[শ্রীসত্যগোপাল গীতাশ্রম, এলেনগঞ্জ, এলাহাবাদ। মূল্য মাত্র তিন টাকা]

মায়ামৃগ : সুধীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

পুস্তকটি ছাব্বিশটি কবিতার সঙ্কলন। অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে গ্রন্থকারের রোমান্টিক্ ধর্মী মনের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'ছায়ামিছিল', 'জীবনছন্দ', 'রুদ্রের আবাহন,' 'হারানো দিন' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় কবিতা রচনার কলাকৌশল কবি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

[প্রকাশক : জে, এন, চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স। ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২।]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (১ম খণ্ড—৪র্থ সং)—৬৲
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "কাঁচামিঠে" (৩য় সং)—৩৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দেনা-পাওনা" (১৪শ সং)—৪৲, "হরিলক্ষ্মী" (১০ম সং)—১'৫০
শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অবরোধ"—৩৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "শেষ অঙ্ক"—২'২৫
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "কালো মুখোস"—'৫০
সব্যসাচী প্রণীত "টার্জান এণ্ড হিজ ফ্রেণ্ড"—১'৫০

নতুন রেকর্ড

হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্ ও কলম্বিয়া রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82782—"তোমারে পারিনি যে ভুলিতে" ও "এই রিম্ ঝিম্ বরষা" দুখানা আধুনিক গান গেয়েছেন তালাত মামুদ।
N 82783—শিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুমিষ্ট কণ্ঠে দুখানা অনবদ্য গান "ও চাঁদে আছে কি" ও "চাঁদ নিল বিদায়"।
N 82784—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুখানা সুশ্রাব্য কীর্ত্তন "দুইতো আগে মামুনা" ও "শ্যামধাম কুন্দ দাম"।
N 82785—জনপ্রিয় শিল্পী মান্না দের কণ্ঠে অপূর্ব দুখানা গান—"এই কুলে আমি" ও "চাঁদের আশায় নিভায়েছিলাম"।
N 82786—শ্রীমতী আশা ভোঁসলে গেয়েছেন দুখানা গান—"আমি সুখে আর দুখে" ও "আকাশের দুটী তারা"।
N 87549—আলী আমেদ হোসেনের শানাই বাজনা চমৎকার হয়েছে।
N 87551—মিলনগুপ্তের মাউথ অরগান বাজনা আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।
N 76069—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "পুতুল নেবে গো" ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হয়েছে।
N 76070—"এস খেলি প্রেম প্রেম লেখা" ও "যখন দাঁড়ি পালায়" এই অমবদ্য গানদুটী গেয়েছেন যথাক্রমে মঞ্জুলা সেনগুপ্ত ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলম্বিয়া

GE 24891—প্রখ্যাত শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্যের সুমিষ্ট কণ্ঠে দুখানা গান "আমি যে বিদায় ওগো নিয়েছি" ও "জীবন নদীর দুই তীরে"।
GE 24892—কুমারী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় গেয়েছেন অতুলপ্রসাদের দুখানা গান—"মেঘেরা দল বেঁধে যায়" ও "শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল রাতে"।
GE 24893—সর্বজনপ্রিয় শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গেয়েছেন দুখানা আধুনিক গান—"মেঘমেদুর ঐ দূর নভে" ও "কেন গো দোলা লাগে"।
GE 24894—শ্রীমতী প্রতিমা ব্যানার্জী গেয়েছেন দুখানা শ্যামাসংগীত "ঐ কালোরূপে লাজ পেয়েছে" ও "মা আমি তোর ক্ষ্যাপা বাউল"।
GE 24895—শিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন দুখানা অপূর্ব আধুনিক গান "তোমার ঐ ঘুম জড়ানো" ও "একটি দুটী তারা করে উঠি"।
GE 24896—"রাখালিয়া সুর আনে" ও "তোমার ঐ আমলকি বন" গান দুখানা সুমিষ্টকণ্ঠে গেয়েছেন কুমারী ইলা চক্রবর্তী।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

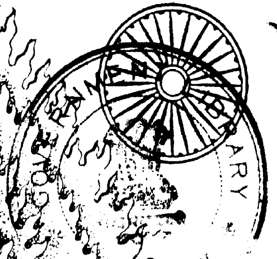


শিল্পী : শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস

মাঠের মাঝে

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস







ভারতবর্ষ

আশ্বিন—১৩৬৫

প্রথম খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

অতীন্দ্রিয়ের সন্ধানে

অসিতকুমার হালদার

সেদিন ছিল বৌদ্ধপূর্ণিমা। ব্রহ্মদেশ থেকে নবাগত এক ঋষিতুল্য মহাথেরর সঙ্গে বৌদ্ধমন্দিরে লখনউ-এ আলাপ করার সুযোগ হল। তিনি কথায় কথায় দুঃখ প্রকাশ করে বল্লেন—"বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা, বোধিদ্রুমের আরতি প্রভৃতি দ্বারা লোকে বুদ্ধের অবমাননাই করে থাকে। বুদ্ধের দেশনার মর্ম যা, তা আজও কেহই বুঝলো না।" কথাটা শুনে বুঝলুম—মহাথের যে আলোকপাত করলেন তার নিকট পৌঁছানো সর্বসাধারণের পক্ষে সাধ্য নয়। এক বুদ্ধের মত পূর্বের ঋষিমুনিরা ছাড়া সেই তুরীয় লোকে—নির্বিকার অনাদিতে লীন হয়ে—এইসব সাধারণ লোকাচারের উর্দ্ধে অধ্যাত্মবোধকে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আর কে অর্জন করতে পেরেচেন এই পৃথিবীতে? বুদ্ধ আবার, এমন কি ব্রহ্মলোকের পরমানন্দধামের অনুভব পরিকল্পনাকেও মনে স্থান দেননি।—তাই তাঁর পক্ষে যা সহজ তা সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ এবং অচিন্তনীয় ব্যাপার।

এইপ্রকার অধ্যাত্ম-চিন্তার দুইটি ধারা আমরা দেখতে পাই।—একটি হ'ল শরীরী মানুষ তার ইন্দ্রিয়গত রসানুভূতির সাহায্যে জাগাতে পারে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে—আর তাতে প্রয়োজন হয় অরূপকে রসগ্রাহ্য করার

জন্য একটি রূপ বা অপরূপ প্রতীক স্থষ্টির। এই পন্থাই হল গৃহী সর্বসাধারণের পক্ষে প্রকৃষ্ট। আর অন্য পথটি হচ্চে অনাগরিক সন্ন্যাসের সাধনা। তাঁদের আজীবন বহু সাধনার দ্বারা এই তুরীয় লোকের ইন্দ্রিয়াতীত সীমা-হীন আঙ্গিনায় চিত্তরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে—শরীরগত স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তিকে অবহত করে—মানস-লোকে অবগাহন করে—তবে অতি অদ্ভুত অনুমেয় শক্তি অর্জন করতে হয়, অতীন্দ্রিয়কে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। এই ঋদ্ধি ক্ষমতাই বুদ্ধ এবং মুনিঋষিরা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তা' এখন বিরল। এই তুরীয় ভাব আসে যখন চিন্ময় অনাদি সত্যের সঙ্গে মানুষ ইন্দ্রিয়-মন-রুদ্ধ করে ধ্যানে যোগযুক্ত হতে পারে।

তখন, মন ও বাক্য স্তব্ধ হয়—ঘ্রাণ ও শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শন নিরুদ্ধ থাকে—ভুমার মধ্যে দেহ এক হয়ে যোগযুক্ত হয়। মৃত্যু বা জীবন বিষয় কোনো জ্ঞানই থাকে না তার। মারলেও গায়ে লাগেনা—দুর্গন্ধ-সুগন্ধ, স্বাদ-বিস্বাদ কিছুই থাকেনা ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (৪।২০ শ্লোকে) এর কথা আছে :

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতিরূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন—
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

—অর্থাৎ দৃশ্যের মাঝে ইঁহার রূপ নাই—চক্ষুর গোচর নহেন কাহারো। যাঁরা হৃদয় ও মানসলোকে ইঁহাকে হৃদয়স্থিত বলে জানেন, তাঁরা অমর হন।

এখন দেখা যাক্ এই অনাদি সত্যকে মানুষ কিভাবে জেনেছে—জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে। এই অনাদি সত্যকে ধরতে গিয়ে বিশ্বস্থষ্টির মূল হেতুকেই গোড়ায় ধরতে হয়। এই স্থষ্টি ও স্রষ্টার তত্বই দর্শনের কূটতত্ব। আমাদের দেশে আদিম মুনিঋষিদের সাধনার মধ্যে আছে এই—আদিভাবের জটিল চিন্তা—যাকে ইংরাজিতে metaphysical speculation বলে। 'মনুস্মৃতি' যা' আ: খৃ: পূ ৩০০০ বৎসরের বলে সকলে জানেন তাতে এই আদি স্থষ্টিতত্বের বিষয় আছে :

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ॥

—অর্থাৎ [প্রথম অবস্থায়] এই সমগ্র জগৎ তম: অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন ছিল। ইহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরও অগোচর, অনুমানের অগম্য, তর্কের সাধ্যাতীত এবং শব্দ প্রমাণের বহির্ভূত হয়ে প্রসুপ্তের মত [ক্রিয়া শূন্য] ছিল।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথও উপনিষোদক্ত অজানার ভাব উপলব্ধি করেছিলেন.গানের দ্বারা তুরীয় লোকে অবগাহন কোরে। তাই গেয়েছিলেন :

"জয় অজানার জয়।
দু-দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে
তাইতে কি তোর এতই ধরে
চিরদিনের বাসাখানা
সেই কি শূন্যময় ?"

আর মহাকবি বৈজ্ঞানিক অনুলোম-প্রতিলোমের প্রক্রিয়ায় যে স্থষ্টি, তার রহস্যকে গানে ফুটিয়েচেন :

"তার অন্ত নাই যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।"

এখন যদি আমরা শাস্ত্রের কথা না ভেবে কেবল মাত্র জ্ঞান বিচারে দেখি, তো দেখবো, অংক কষতে গিয়ে আমরা যেই ১ সংখ্যা নির্দেশ করি, তখনই শূন্য স্থান হয়ে যায় পূর্ণ। আবার ১ সংখ্যার দক্ষিণে যখন শূন্য যোগ করি, তার সংখ্যা হয় দশ। ১-এর দক্ষিণে যত শূন্য যোগ করা যায় ততই দশমিক সংখ্যার অংক বেড়ে যায়। আর ১-এর উত্তর (বা বাম ভাগে) যতই শূন্য দিই না—এক আর বাড়ে না। তাই বামাবর্তনে চক্র বা স্বস্তিকা হিন্দু মতে মৃত্যু এবং দক্ষিণাবর্তনে জন্ম ঘোষণা করে। বুদ্ধের দক্ষিণাবর্তনেই ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছিল ইসিপত্তনে—মৃগদাভে। শূন্যবোধ তখনই ছিল যখন ১ অংক আসেনি। তেমনি সমগ্র জগৎ তমতে লীন ছিল—যখন পর্যন্ত একটি আণবিক রজকণারও উদয় না হয়েচে। কিন্তু এই আণবিক কণা শূন্যের বাইরের জিনিষ ছিল না—অন্তত: বিস্তারিত শূন্যমণ্ডলের ভিতরেই বর্তমান ছিল কিন্তু অপ্রকাশিত ছিল মাত্র। অতএব মহাশূন্যকোশ এবং আণবিক কণা দুই স্বতন্ত্রবস্তু হলেও একই সত্তা। আকার আর নিরাকারের বিবাদ-বিসম্বাদ এইখানেই শেষ হল।

ছান্দোগ্যোপনিষদে ৮ম অধ্যায় অষ্টম খণ্ডে 'আসুরী-

উপনিষদে আছে—জরা-মৃত্যু-শোকপিপাসা ও অশনেচ্ছার-হিত অনাদি সত্তাকে বাইরে থেকে দেখার বিপদের কথা। প্রজাপতির নিকট ইন্দ্র ও বিরোচন (অগ্নি) এলেন উক্ত-প্রকারে সত্তার সন্ধান করতে। তাঁদের এইরূপ অনুসন্ধিৎ-সার মধ্যে বস্তুতান্ত্রিক ভাব দেখেই বোধ হয় প্রজাপতি (ব্রহ্মা) দুজনকে বল্লেন: "চোখে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হল, ইনিই আত্মা (সত্তা) এবং অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম।" ইন্দ্র ও বিরোচন তখন জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ভগবন্! জলে বা দর্পণে যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনি কে?" প্রজাপতি বল্লেন: "এই সমুদয়েই আত্মা পরিদৃষ্ট হন।" [এই 'সমুদয়' কথাটির ভিতর প্রচ্ছন্ন রয়েচে, দৃষ্ট আকার এবং তার বাহিরেও]। প্রজাপতি পাত্রে জল রেখে তাঁদের দেখতে বল্লেন। তাঁরা দুজনে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা কি দেখলে?" তাঁরা বল্লেন: "হে ভগবন্! আমরা সমগ্র আত্মা—লোম ও নখ পর্যন্ত প্রতিরূপ দেখলাম।" প্রজাপতি তাঁদের আবার অলংকারে ভূষিত হয়ে সুবসনে জলপূর্ণ পাত্রে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখতে বল্লেন। তাঁরা তাই করলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমরা কি দেখলে?" তাঁরা বল্লেন: "ঠিক্ যেমন সব অলংকার পোষাকে সেজেছি, জলে ও আমরা অবিকল তাই দেখলুম।" প্রজাপতি (হেসে) বল্লেন: "ইনিই অমৃত ও অভয় এবং ব্রহ্ম।" তাঁরা চলে যেতেই—মনে মনে প্রজাপতি বল্লেন: "এঁরা উপলব্ধি না করেই চলে গেলেন। এঁদের মধ্যে যিনি একেই উপনিষৎ (প্রকৃত জ্ঞান) মনে করবেন—অসুরই হোন্ বা দেবতাই হোন্ বিনাশ প্রাপ্ত হবেন।"

উক্ত প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যাচ্চে—কেবল আকারের মধ্যে বা কেবল নিরাকারের মধ্যে সেই সত্তাকে খুঁজলে চলবে না। উপনিষদে আরো আছে:—বিজ্ঞান মনন-সাপেক্ষ এবং মনন শ্রদ্ধাসাপেক্ষ—শ্রদ্ধা নিষ্ঠাসাপেক্ষ—নিষ্ঠা কর্মসাপেক্ষ—কর্ম সুখসাপেক্ষ; এবং শেষ কথা আছে—ভূমাই সুখ-স্বরূপ। অনাদি সত্তা অর্থাৎ ভূমাই সুখ—যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই। 'যো বৈ ভূমা তৎ-সুখং নাল্পে সুখমস্তি—ভূমৈব সুখং' (ছান্দোগ্য—৭।২৪)। কেবলমাত্র বীজের মধ্যে বা আণবিক কণাতে সেই সত্তা—সুখ নেই—অনাদি অনন্ত ভূমার মধ্যেই তা আছে। অতএব পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দর্শনের (বস্তুতন্ত্রের) উর্দ্ধে ভূমার সুখ বিদ্যমান। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপসীত।' (ছান্দোগ্য—৩।৪)।—অর্থাৎ, সমুদয় ব্রহ্ম (কারণ) এবং তাহা হতেই—সব সমুৎপন্ন—তাহাতেই লীন ও জীবিত থাকে—শান্তভাবে উপাসনা করবে।

এখন শরীরী মানুষের-পক্ষে ইন্দ্রিয়গত রসবিচারের দ্বারা এই সত্তাকে আমাদের দেশে কিভাবে অনুভব করেচেন ভক্তরা—তার কথা বিচার করা যাক্। গোড়ায় এ বিষয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটী গল্প বলি। একবার বিবেকানন্দ (তখনো তিনি পুরোপুরি ঠাকুরের চেলা হননি) তাঁর বন্ধুর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে—দীক্ষা নেন। একদিন তিনি দেখেন যে দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দিরে তাঁর সেই বন্ধুটি প্রতিমাকে প্রণাম করচেন। বিবেকানন্দ তাঁর বন্ধুকে তার দরুণ ভর্ৎসনা করায় ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন: "আহা! রাগ করচেন? ও রসগোল্লা খাচ্চে আর তুমি না হয় সন্দেশ খাচ্চ—তোমারও যখন রসগোল্লা খাবার সাধ হবে তখন খেয়ো।" ঠাকুর এই রসগোল্লার তুলনার দ্বারা শরীরীর ইন্দ্রিয়গত রসবোধের দ্বারা অনন্তকে পূজার কথাই বল্লেন।

এই রসবিচারের দিক দিয়েই ঋষিরা অনাদি সত্তাকে কল্পনা করেচেন (১) ব্রহ্মাকে রক্তবর্ণে বীজস্বরূপ; (২) আয়ুধধারী বিষ্ণুকে নীল আকাশ বর্ণে এবং (৩) শিবকে শ্বেতবর্ণে (বিজ্ঞানেও বলে সবরং এক হলে শ্বেতবর্ণ হয়) —লয়ের প্রতীকরূপে তাই দেখেচেন শিবকে। এঁদের আবার শক্তিকে (ক্ষমতাকে) পত্নীরূপে দেখানো হয়েচে। ব্রহ্মের বেলায় সিতা সরস্বতী জ্ঞান ও ধীশক্তির পরিচয়; বিষ্ণুর বিভূতিস্বরূপা লক্ষ্মীকে কনকবর্ণে ধনরত্নের ঐশ্বর্যের অধীশ্বরীরূপা এবং শিবের পত্নী কালীকে কালো মহাকালের (ধ্বংসের) রূপে খড়্গধারী নরমুণ্ডমালায় দেখেচেন। তাছাড়া ৩৩ কোটী অংকে দেবদেবীর রূপ-কল্পনার কথা বোলে অনন্ত অরূপেরই অসংখ্য সংখ্যা নিরূপণ করেচেন। যে মানুষের যেরূপ অনুভূতি জাগবে সে তেমনি রস-রূপে অনাদিকে হৃদয়গ্রাহ্য করতে পারবে।

ঋষিরা একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়বোধের অতীত অনন্তের বা ভূমার পথ দেখিয়েচেন, তেমনি ইন্দ্রিয় অনুভূতির ভিতর দিয়ে ৩৩ কোটী রূপক কল্পনায় ও অনন্তের কথাই নির্দেশ করেচেন।

এখন এই রসানুভূতির মধ্যে দিয়ে দুইটি প্রবল ধারাও দেখা দিয়েছে ভারতবর্ষে। প্রথমটি ধরা যাক্ (১) বৈষ্ণব ভাব ; (২) দ্বিতীয়টি তান্ত্রিক ভাব। আমরা প্রথমে বৈষ্ণব প্রভাবের কথাই আলোচনা করব। বৈষ্ণব দেখলেন অনন্ত নীল আকাশের বর্ণে—কৃষ্ণকে এবং সেই ভগবান্ জন্মালেন মাটির ঘরে যশোদার কোলে এবং লালিত পালিত হলেন। তাঁরই রচিত বিভূতিই রাধা বা গোপিনীরা। অরূপ রূপের কাছে এসেছে অপরূপ নীল বর্ণে গোপীমন-হরণ-পিয়াসী হয়ে। প্রথম লীলায় কৃষ্ণের (ভগবানের নিজ বিভূতির) মানভঞ্জনের পালা—আকাশ ফিরে পেতে চায় আপন বিভূতিতে—একেবারে প্রেমভরে কোলে গ্রহণ করতে চায় —তার আর নাগাল পায় না—রাধা গোপিনীসহ—কিছুতেই ধরা দিচ্ছেন না কৃষ্ণের কাছে। দ্বিতীয় লীলায় দেখা যাচ্ছে গোপিনীদের সঙ্গে নৃত্যোৎসবে রাসলীলায় মেতেচেন নীলমণি—এমন মেতেচেন যে প্রত্যেক গোপিনীই ভাবচেন কৃষ্ণ তাঁর সঙ্গেই নাচছেন—আকাশ আর তাঁর বিভূতির যোগাযোগ অপূর্বভাবে ঘটেচে এতে। আর শেষ লীলায় দেখা যাচ্ছে—অশেষ অনন্ত পারাবারে (যমুনায়) পার হবার জন্য অনন্ত পথে নৌকার চালক স্বয়ং কৃষ্ণ গোপিনীদের নিয়ে ভেসে চলেছেন।—তার পথ বা কালের নির্ণয় হয় না—Timeless। মোট কথা বৈষ্ণব-ধর্মে নিরাকারকে এই প্রকার রসানুভূতি সংযোগে খুব আপনার করে ধরবার কথাই দেখতে পাওয়া যায়।

এইবার তন্ত্রের তত্ত্ব দেখা যাক। বস্তুতান্ত্রিকভাবেই তন্ত্রের মধ্যে অনাদিকে রসরূপে ধরার চেষ্টা চলছে। তান্ত্রিকেরা অনন্তকে ব্রহ্মযন্ত্রে এবং তার প্রতিরূপ বা বিভূতিকে মাতৃযন্ত্রের মধ্যে অনুভব করেছেন। ব্রহ্মযন্ত্রের অনুলোম প্রতিলোম-প্রজনন মন্থন ফলে বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হয়েচে। আর তার ফলে গ্রহলক্ষণ না হলে, ধরণী বা ধরণীর সর্ববিভূতি (জীব স্থাবর জঙ্গম) সম্ভব হতোনা। আর অনুলোম-প্রতিলোমের প্রজনন মন্থন শূন্যলোকেও যেমন তেমনি জীবলোকেও ঘটচে সেই একই প্রণালীতে। প্রথমেই বলা হয়েচে বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে তমঃ আচ্ছন্ন নির্বেদযুক্ত ছিল। বিবর্তন যজ্ঞে এক থেকে দুয়ের—পুরুষ থেকে প্রকৃতির আবির্ভাব হল। আদিতে আকাশ ছিল বর্ণহীন—বিভূতি বিকাশ সজ্ঞাহীন—অপ্রকাশ, অব্যক্ত ও অব্যয় ছিল। তারপর আকাশ প্রকাশ করলে নীলমণি বর্ণাভাসকে। এই নীলের প্রকাশ হল হলুদ (বা স্বর্ণ) বর্ণের আলোক উদয়ে এবং এই দুই নীল আর হলুদ মিশে সবুজ—এই ধরণীর সৃষ্টি হল। স্রষ্টার অপ্রকাশ অব্যক্ত যন্ত্র (যা আকাশ), তা থেকে ব্যক্ত হল দেহীযন্ত্র (মাতৃযন্ত্র)। এই দেহীযন্ত্র লিঙ্গশরীর সংলগ্ন হয়েই আবির্ভূত হল ধরণীতে। এই লিঙ্গশরীর লয়প্রাপ্ত হবার শরীর।

অন্যদিকে ব্রহ্ম-যন্ত্রের লিঙ্গভাব বা শরীর নেই। এই অশরীরী অব্যক্ত আকাশ থেকে দেহযন্ত্র আবির্ভূত। অতএব আদ্যাশক্তির (আদিপ্রকাশের) দুইটি রূপ পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম phase হল আকারহীন বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শহীন আকাশ—অপ্রকাশ। তারপর প্রকাশ হল মূল জ্যোতিকণা আকারে দেহীর ভাব। এই জ্যোতিগর্ভ (নীল) থেকেই প্রথম সৃষ্টি বেদনায় ফুটে উঠ্‌ল লিঙ্গশরীর গ্রহতারা নক্ষত্র এবং তাহাই মাতৃযন্ত্র। মাতৃযন্ত্র থেকে বহু সৃষ্টি সম্ভব হল। কেবল আদি যন্ত্রেই সৃষ্টি থেমে রইল না। জড় লিঙ্গ অণুকণা থেকে আরম্ভ করে যা গড়ে উঠ্‌লো, তা প্রলয়ের দিকেই চলবে। নিজের দেহের দিকে যে প্রকাশকে দেখি তা' মাতৃযন্ত্রের সৃষ্টি হলেও মৃত্যুতে আবার ফিরে যাচ্ছে—আদি আকাশ যন্ত্রে। প্রতিদিন জন্ম মৃত্যুর খেলা এইভাবে চলেছে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আকাশের তলায় ধরণীতে এসে মায়াবশেই শাশ্বত সত্যের দিকে ভয়ে তাকাতে পারছি না।

জন্ম ও মৃত্যুর সব কারণই সেই-আদি যন্ত্র (আকাশ) এবং মাতৃযন্ত্রের যন্ত্রণার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে আবার আদিতে ফিরে যাওয়াই যে লিঙ্গ শরীরের ধর্ম—এই চেতনা যখন জাগবে তখন প্রত্যক্ষভাবে অতীন্দ্রিয় আদি সত্তাকে আমরা চিনতে পারব। কারো সাধ্য নেই এর চেয়ে স্পষ্ট করে ধরতে বা বুঝতে। মাতৃ যন্ত্র (জড়) এবং ব্রহ্ম যন্ত্র (অব্যক্ত) এই দুয়ের আসলে কোনো ভেদ নেই—ওতপ্রোত হয়ে আছে। মাতৃযন্ত্র materialistic ক্ষেত্রে লয়ের (destruction এর) প্রতীক্ষায় আছে, ব্রহ্মযন্ত্র metaphysical ভাবনায় কেবল আছে—ধরা ছোঁয়ার উপায় নেই। বেদ উপনিষৎ গীতা এবং বুদ্ধ স্বয়ং তার কোনো কিনারা করতে পারেন নি।





কেতকী

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

আদর্শ ভারতনারী বিদ্যাপীঠের গভর্নিঙ বডির বিশেষ জরুরী অধিবেশন বসেছে। উদ্দেশ্যটা একটু অসাধারণ—স্কুলের শ্রেষ্ঠ ছাত্রী দশম শ্রেণীর কেতকী দত্তকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করার প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্যই অধিবেশন।

ব্যাপারটার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে আমাদের কেতকীর পৌর্বাপর্য সংক্ষেপে জানা প্রয়োজন। কেতকী যখন মফঃস্বলের জিলা স্কুল থেকে কলকাতায় এসেছিলো ভারতনারীতে ভর্ত্তি হবার জন্যে, তখন সবাই তার দিকে চেয়ে শুধু একটু হেসেছিলো। হাসবার কথাই বটে। লম্বা ছিপছিপে একখানা দেহ, যেন একটু জোরে বাতাস বইলেই ভেঙে পড়বে। বাহু দুটি তার সেই অনুপাতে শীর্ণ এবং আজানুলম্বিত। মুখখানা লম্বা, নাকটি প্রখর, চোখ দুটি সর্বদাই বিস্ফারিত। চুল ইঞ্চি কয়েক, কিন্তু তাতেই এক জোড়া বিননি বাঁধা হয়েছে—আর তাও পাঞ্জাবী ধরণে। লকেট গলায়, গায়ে সাদা অর্গ্যাণ্ডির জামা, ছাঁটটা যদিও বেবী ফ্রকের। কোমরে আবার কিকে হলুদ রঙের লিননের স্কার্ট। গোড়ালি পর্যন্ত সিল্কের মোজা, পায়ে বক্‌লস আঁটা ভারি জুতো। মাথায় সে প্রায় একটা পুরুষের সমান লম্বা, কিন্তু সমস্ত চোখে-মুখে শিশুত্বের ছোপ। বয়েস চৌদ্দ হবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু আর একটু বিস্ময় বাকি ছিলো। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আর আগেকার রিপোর্টগুলোতে কেতকীর পরীক্ষার নম্বর দেখে শিক্ষয়িত্রীরা হতবাক হয়ে পড়লেন। এত অসাধারণ নম্বর সচরাচর দেখা যায় না। কাগজ-পত্রে জানা গেল জীবনে কেতকী কোনোদিন কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়নি। বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত বিচিত্রতর মেয়েটিকে যথাযোগ্য আদরে অভ্যর্থনা করা হলো কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বালিকা বিদ্যালয় আদর্শ ভারতনারী বিদ্যাপীঠে। তাকে শুধু স্কুল এবং হস্টেলে ফ্রি করাই হলো না, একটা স্কলারশিপও দেওয়া হলো। বহুদর্শিনী শিক্ষিকারা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে কেতকী দত্তের পক্ষে ভারতনারীর মুখোজ্জ্বল করা অসম্ভব নাও হতে পারে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কেতকীর আরো একটা অসাধারণ পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লো। স্কুলের ওপাশে হস্টেল, মাঝখানে খেলার মাঠ। খেলতে খেলতে হয়তো ও এক সঙ্গিনীকে এসে বলে, "ধর না ভাই, একটু আমার হারটা।" সঙ্গিনীর হাতে একটা জিনিস গুঁজে দেওয়া মাত্র সে তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে—হাতের ভিতর একটা বিরাট কেঁচো। দিদিমণিদের কাছে নালিশ পৌছলে ও জবাব দেয়: "কিন্তু বিজ্ঞান বইতে যে লেখা আছে কেঁচো সবচেয়ে সাত্বিক প্রাণী! মাটি ছাড়া কিছু খায় না!" হোস্টেলে সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছে এমন সময় হয়তো একটা আরশুলা উড়তে আরম্ভ করলো। ভাতের থালা উল্টে ফেলে মেয়েরা আর দিদিমণিরা প্রাণভয়ে এদিকে ওদিকে দৌড়তে থাকে, আর পরিত্রাহিভাবে চিৎকার করতে থাকে। কেতকী হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে খপ্ ক'রে আরশুলাটাকে মুঠোর ভিতর ধ'রে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু কি দিদিমণিরা, কি ছাত্রীরা সবাই নিমকহারাম। এত উপকার পেয়েও কেউ ওকে ঘৃণা করতে ছাড়ে না।

ওকে নিয়ে মেয়েদের আর দিদিমণিদের সব সময়ই সমস্যা। লেখাপড়া এবং দুষ্টুমিতে সকলের সেরা হলে কি হবে—দুনিয়া সম্বন্ধে ওর জ্ঞান দশ বছরের মেয়ের চাইতে বেশি নয়। পুরুষ ব'লে যে একটা জাতি আছে আর সে জাতিকে যে ঠিক নারীজাতির মতো দেখা চলে না এ বোধটা ওর আদপেই ছিলো না। একদিন

ছুটির দুপুরে কেতকী হোস্টেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় হঠাৎ ওর মুখের উপর এক টুকরো রোদ এসে পড়লো। বিস্মিত হয়ে মুখ ফেরাতেই দেখলে বিপরীত দিকের বাড়ির চিলেকোঠা থেকে তেতলার লম্বা ছেলেটা আয়না ফেলছে। কেতকী তো মহা খুশী। লাফালাফি কাঁপাকাঁপি ক'রে সবাইকে জড়ো করলো সেখানে। বন্ধুদের কাছে আয়না না পেয়ে ও দৌড়ে হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের ঘরে গিয়ে বললো, "আপনার ছোট আয়নাটা দিন না তৃপ্তিদি—সামনের বাড়ির ছেলেটার মুখে আয়না ফেলবো।"

ওকে নিয়ে সবচেয়ে বিপদে পড়েছিলেন হেডমিস্ট্রেস বাণীদি। পূজোর ছুটির তখন কিছুদিন মাত্র বাকি। ক্লাস নাইনের মেয়েদের মিউজিয়মে নিয়ে যাবার কথা। যাত্রার ঠিক পূর্বে দেখা গেলো ভারতনারীর বাস অচল। মেয়েদের নিরাশ না করার জন্যে ট্রামে যাওয়াই স্থির হলো অগত্যা। ট্রাম কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে এমন সময় একপাল ছেলে হই হই ক'রে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে পড়লো—আর তারপর কেউ গান গেয়ে, কেউ হাততালি দিয়ে, কেউ শিস দিয়ে সমস্ত গাড়িটাকে সরগরম ক'রে রাখলো। ফার্স্ট ক্লাসের পিছনের দিকে বসে কেতকী জানালার দিকে থুতনি রেখে ওর স্বভাবসিদ্ধ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছিলো ছেলেদের দিকে। একসময় হঠাৎ ও ব'লে উঠলো, "ফার্স্ট ইয়ার, ফার্স্ট ইয়ার—সব ফার্স্ট ইয়ার বড়দি!"

হেডমিস্ট্রেস পাশেই ছিলেন ওকে সামলে রাখার জন্যে। বিরক্ত হবার বদলে হেসে ফেললেন: "কী ক'রে বুঝলি?"

"কেন ঐ দাড়ি দেখে। স্কুল ফাইনাল দিয়ে সেই যে দিদির বাড়ি যাবার সময় জীবনে প্রথমবার দাড়ি কামিয়েছিলো তারপর আর নাপিতকে মুখে হাত দিতে দেয়নি। আবার দাড়ি ফেলবে সপ্তমীর দিন। আপনিই দেখুন সব ক'টার মুখে কচি কচি ছাগল দাড়ি।"

ট্রিপল এম-এ প্রবীণা বাণী মজুমদার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন গম্ভীর থাকতে, পারলেন না। রুমালে মুখ ঢেকে বললেন, "চুপ কর।" অন্য মেয়েরা অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লো।

ছেলেরাও বোধ হয় কেতকীর মন্তব্য শুনতে পেয়েছিলো, কেননা অকস্মাৎ তাদের উৎসাহ একেবারে নিভে গেলো। কেউ কেউ নিজের নিজের চিবুকে একবার হাতও বুলিয়ে নিলো অন্যমনস্কভাবে। অন্যদের মধ্যে কেউ কাসতে লাগলো, কেউ গলা খাঁকরি দিতে লাগলো। তারপর শুরু হলো তাদের উচ্চকণ্ঠে আলাপ।

"হাঁ রে নিপ্‌নে, আমরা কোথায় যাচ্ছি রে?"

"যেদিকে দু'চোখ যায়।"

"কোন্ চোখ?"

"গোরুর চোখ—ডাবডেবে পটলচেরা।"

"সে আবার কী রকম গোরু?"

"আধুনিক গোরু। আজকাল গোরুরাও মানুষ হয়ে উঠেছে। তারাও কথা বলে, লেখাপড়া করে, জামা-কাপড় পরে। গাড়িতে চড়ে, হাসে—"

"কিন্তু থাকে কোথায় সে গোরু?"

"সর্বত্র। শুধু চিড়িয়াখানায় ছাড়া।"

চিড়িয়াখানার কথায় প্রথম ছেলেটি একটু উন্মনা হয়ে ওঠে। ক্ষণকাল চুপ থেকে বলে, "আচ্ছা আজ চিড়িয়াখানায় গেলে হয় না?"

কোন দুঃখে পয়সা খরচ ক'রে আলিপুরে যাবো? চিড়িয়াখানা তো আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে। দেখছিস না, রাস্তার লোকগুলো পর্যন্ত যেতে যেতে অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে। গাড়ি চাপা না পড়লেই বাঁচি।

হঠাৎ কেতকী হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো: "রামপাঠা রামপাঠা। আচ্ছা বড়দি চিড়িয়াখানায় রামপাঠা নেয়?"

আবার মেয়েদের সম্মিলিত অট্টহাসিতে ছেলেদের উদ্দীপনা ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেলো। এতক্ষণে বাণীদি হেডমিস্ট্রেস-জনোচিত গাম্ভীর্য ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু শাসন করতে গিয়ে তার মুখ দিয়ে ভারতনারীর ঐতিহ্যবিরোধী কতগুলো শব্দ বেরিয়ে এলো—"চুপ কর বাঁদর কোথাকার। দিনে দিনে ধিঙ্গি হচ্ছেন, গাছের মতো বাড়ছেন, এদিকে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই ন্যাকা।"

কেতকীর কপালে হয়তো আরো কিছু পাওনা ছিলো। সে যাত্রাটা রক্ষা পেয়ে গেলো। গন্তব্যস্থল এসে

াওয়াতেই হোক বা অন্য যে কারণেই হোক, ছেলেরা হুড়-মুড় ক'রে নেমে গেলো পরের স্টপে।

কিন্তু এসব ক্লাস নাইনের ছাত্রী কেতকীর কাহিনী। ক্লাস টেনের কেতকীর সঙ্গে সে কেতকীর অনেক তফাৎ। জায়গাটা কলকাতা হবার দরুণ বান্ধবীদের কৃপায় ও এক বছরে অনেক কিছু জ্ঞান অপহরণ ক'রে ফেললে। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরলো।

হোস্টেল থেকে যতদূর দেখা যায় তাতে মনে হয় উল্টো-দিকের বাড়িটাতে তিনতলার পুরুষ বাসিন্দাদের মধ্যে তরুণ একটিই—সেই আয়না-ফেলা ছেলেটি। কিন্তু প্রায়ই তার ঘরে বহু বন্ধুর সমাগম হতে দেখা যায় এবং ঘরটা ছোট ব'লেই বোধহয় তারা অধিকাংশ সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা সারতে বাধ্য হয়। আর তাদের কথা-বার্তাও নিশ্চয়ই খুব জরুরী ধরণের হয়ে থাকে—কেননা সেই সকাল থেকে বন্ধুদের আসা আরম্ভ হয় আর শেষ হয় সন্ধ্যের পর। কোনো কোনো ছুটির দিনে তো বন্ধুদের সংখ্যা এত বেড়ে ওঠে যে অনেককে নিরুপায় হয়ে ছাদে আশ্রয় নিতে হয়।

একদিন সে বাড়ির ছেলেটি বোধহয় ক্রীড়াচ্ছলে তার কোনো বন্ধুকে একটা কাগজের পুঁটলি ছুঁড়ে মেরেছিলো, কিন্তু সেটা বাতাসে উড়ে এসে পড়লো কেতকীর ঘরে। টেবিল ল্যাম্পের আলোতে কেতকী সেটা খুলে দেখলো। একটু হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটের কোণে। ছেলেটা ফুলের খুব ভক্ত দেখা যাচ্ছে। চোদ্দ লাইনের কবিতায় চোদ্দবার কেতকী ফুলের উল্লেখ।

পরদিন রবিবার। সমস্ত রাত্রি ধ'রে প্রচুর বৃষ্টি হবার পর ঝলমলে রোদ উঠেছে। হেডমিসট্রেস হোস্টেলেই থাকেন। হোস্টেল সুপারের ঘরে যেতে যেতে তিনতলার বারান্দায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। কাপড় শুকোতে দেবার দড়িতে সুতোয় বাঁধা বিশ জোড়া জুতো ঝুলছে সারি সারি। সামনের বাড়ির দিকেও তাকালেন। অন্য রবিবারে এ সময় ছেলেটার ঘর আর বারান্দা জমজমাট থাকে। আজ একেবারে ফাঁকা।

কেতকীর ডাক পড়লো। গম্ভীরভাবে বাণীদি বললেন, "এসব কী?"

আজ্ঞে আমরা জুতো শুকোতে দিয়েছি। কাল রাত্তিরে জলে ভিজে সব ঢোল হয়ে গেছলো।"

"সব মেয়ের জুতো এক সঙ্গে ভিজলো কী ক'রে?"

"রাত্তিরে বারান্দায় ছিলো।"

"কেন? জুতো তো বারান্দায় রাখার কথা নয়।"

"আজ্ঞে কাল বিকেলে আমরা বারান্দায় বের ক'রে রেখেছিলুম, যাতে সকালে উঠেই মনে ক'রে মুচিকে দিয়ে পরিষ্কার করাতে পারি। বর্ষায় ছাতা প'ড়ে জুতোগুলোয় বিচ্ছিরি গন্ধ হয়ে গেছলো।"

হেডমিস্ট্রেস ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন, তা জুতোগুলো ছাদে শুকোতে দিলে ক্ষতি কি ছিলো?

মুহূর্ত চিন্তা না ক'রে কেতকী জবাব দিলো, "আজ্ঞে ঝুলিয়ে না দিলে ভালো ক'রে শুকোয় না, তলাটা ভিজে থেকে যায়। এতে রোদও পাবে, বাতাসও পাবে—খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।"

ধৈর্যহারা হয়ে বাণীদি চেঁচিয়ে উঠলেন, "চুপ করবি পাজি কোথাকার। শীগ্গির নামা বলছি। আর কোনো-দিন এ রকম দুষ্টুমি করলে মজাটা টের পাইয়ে দেবো।"

জুতো সরিয়ে নেওয়া হলো। ও বাড়িতে আগের মতো বন্ধু সমাগম আরম্ভ হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগলো।

কয়েকদিন ধ'রে কেতকী অভিযোগ করছে যে তেতলার বারান্দায় টবের ফুল গাছগুলো পাখিতে খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ কান দিচ্ছে না ওর কথায়। অবশেষে ও একদিন স্বয়ং বাণীদিকে এনে দেখালো—ওর কথা সত্য কিনা। বাণীদির সঙ্গে আরো দুজন দিদিমণি এলেন। গাছগুলোর অবস্থা দেখে বাণীদি বিস্মিত হলেন—সত্যই প্রত্যেকটা গাছ ক্ষত-বিক্ষত। তিনি এর প্রতিকারের কথা ভাবছেন এমন সময় কেতকী বললো, "আচ্ছা বড়দি, আপনি তো ছেলেবেলায় দেশে থাকতেন। সেখানে ক্ষেত-টেত থেকে কী ভাবে পাখি তাড়ানো হয়?"

বাণীদি হঠাৎ আলো দেখতে পেলেন। বললেন, "ঠিক বলেছিস। ছেলেবেলায় দেখেছি আমাদের বাগানে সেপাই টাঙানো থাকতো—এদিকে ওগুলোকে কাক-তাড়ুয়া না কী যেন বলে। হাঁড়িতে চোখ-মুখ এঁকে আর ছেঁড়া কাপড়-জামা পরিয়ে একটা খুঁটির ডগায় টাঙিয়ে রাখা হতো—কাক-পাখি ত্রিসীমানায় ঘেঁষতো না। সেই রকম একটা ক'রে দেনা।"

কেতকী চেঁচিয়ে উঠলো, "ওমা, ও জিনিস তো আমিও দেখেছি। কী বোকা আমি, এত সহজ জিনিসটা কিছুতেই মনে আসছিলো না।"

আদর্শ ভারতনারী বিদ্যাপীঠের হোস্টেলে ইঁদুরের উপদ্রব বড্ড বেশি বেড়েছে। অনেক ফাঁদ পাতা হয়েছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, একটা ইঁদুরও ধরা পড়েনি। উপদ্রবের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে চুল বা চুল জাতীয় জিনিসই ইঁদুরের প্রধান লক্ষ্য। সকালে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে হঠাৎ কোনো দিদিমণি বা মেয়ে লক্ষ্য করে তার চুলের গোছার মাঝখান থেকে খানিকটা চুল অদৃশ্য। ব্যাপারটা সারা স্কুলের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হোস্টেলের মেয়েরা ভয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকে, আর যখন বিছানায় যেতেই হয় মাথায় ভালো ক'রে রুমাল বা গামছা বেঁধে শোয়। বাইরের মেয়েরা ব্যাপারটা শুনেই উদ্বেগে রোগা হয়ে যাচ্ছে। এই বিপর্যয়ে কেতকীর দাম বেড়ে গেছে অনেকখানি। মেয়েরা, এমন কি দিদিমণিরা পর্যন্ত কেতকীকে নিজেদের ঘরে শোবার জন্যে পীড়াপীড়ি করে। তাদের ধারণা কেতকীকে দেখলে ইঁদুর ভয়ে পালিয়ে যাবে, অন্তত কেতকী ইঁদুরকে ধ'রে ফেলতে পারবে। কিন্তু সবই বিফল। কেতকী সঙ্গে থাকলেও সকালে উঠে দেখা যায় এক আধটা চুল টুকরো টুকরো হয়ে বিছানায় প'ড়ে আছে, আর মাথার মাঝখানে থেকে কয়েক গাছা চুল অদৃশ্য। কেতকীর নিজের চুলও রক্ষা পায়নি।

জুতোর বুরুশের উপরেও ইঁদুরের নজর পড়েছে। একদিন সকালে বাণীদি ঘুম থেকে উঠে সবিস্ময়ে দেখেন তাঁর নতুন কালো বুরুশটার লোমগুলো একেবারে পরিষ্কার। আরো কয়েকজনের বুরুশেরও এ অবস্থা হলো। যাই হোক কিছুদিন পর ইঁদুরের উৎপাত আপনা থেকেই থেমে গেলো।

বাণীদি সাতদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন। অ্যাসিস্টাণ্ট হেডমিস্ট্রেস লম্বা চারুদি স্কুলের চার্জে। তিনিও হোস্টেলেই থাকেন। খুব ভোরে ওঠা অভ্যাস তাঁর। সেদিনও তিনি ভোর রাত্রে উঠে কলঘরের দিকে যাচ্ছিলেন হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার ক'রে উঠলেন। বারান্দায় গলায় দড়ি দিয়ে ও কে ঝুলছে? অজ্ঞান হয়েই যেতেন তিনি, অত্যন্ত সাহসিনী ব'লেই সামলে নিলেন কোনোমতে। যে ঘরটা সামনে পেলেন তাতেই ঢুকে প'ড়ে একটি মেয়েকে ঝাঁকিয়ে বললেন। "এই শিগ্‌গির ওঠো। চলো তো একবার বারান্দায়।"

মেয়েটি ধড়মড় ক'রে উঠে বসতেই বারান্দার দিকে তার চোখ গেলো—আর সঙ্গে সঙ্গে 'ও বাবা গো' ব'লে একটা বিকট আর্তনাদ ক'রে সে দু'হাতে মুখ লুকিয়ে ফেললো। চিৎকার শুনে অন্যান্য মেয়েরাও দৌড়োদৌড়ি ক'রে এগিয়ে এলো সে ঘরের দিকে। কিন্তু বারান্দায় আসতেই ভীষণ ভাবে চেচাঁতে চেচাঁতে যে যার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

গোলমাল শুনে কেতকী বেরিয়ে এলো। ভ্রূকুটি ক'রে বললো, "তোমরা চেঁচাচ্ছো কেন? বারান্দায় তো আমি সেপাই টানিয়েছি পাখি তাড়াবার জন্যে।"

সেপাই টানিয়েছে? সাহসে ভর ক'রে সবাই বারান্দায় এলো। হ্যাঁ তাই বটে। একটা গোল কলসীকে উপুড় ক'রে তাতে মাটি দিয়ে চোখ, মুখ, নাক, কান বসানো হয়েছে। ভুরু, ঠোঁট, চিবুক, দাঁত কিছুই বাদ যায়নি। সব জিনিসে আবার রঙ পড়েছে—লাল, নীল, সাদা, কালো, সবুজ, হলদে। আর সব চেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে সেপাইয়ের তেল চুকচুকে বাবরি। কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা থরে থরে কোঁকড়ানো সে চুল—একেবারে আধুনিক কবির মতো। শুধু চুল নয়, সেপাইয়ের আছে একজোড়া পরিপুষ্ট গোঁফ, আর ঘন চাপদাড়ি। পরিধানে তার গেরুয়া রঙের ছেঁড়া পাঞ্জাবি আর শতছিন্ন পায়জামা। বারান্দার উপর থেকে ঝোলানো একটা মোটা দড়ি মূর্তিটার গলায় বাঁধা। সেপাইয়ের মুখটা মোটেই রাক্ষসের মতো নয়, কিন্তু মানুষের মতো হ'লেই অতি বীভৎস, এক মুহূর্তের বেশি তাকানো যায় না।

ইঁদুরের রহস্যটাও যেন এতদিনে একটু পরিস্কার হলো। কথা বলার শক্তি ফিরে এলে লম্বা চারুদি মুখ লাল ক'রে বললেন, "এটা কি ইয়ার্কি! এক্ষুণি সরিয়ে নাও।"

কেতকী জবাব দিলো, "আজ্ঞে নিতে পারি সরিয়ে, কিন্তু তাহলে বড়দি রাগ করবেন। উনিই তো বলছিলেন সেপাই টানাতে।"

সেই শিক্ষয়িত্রী দু'জনকে সাক্ষী মানলো কেতকী।

তাঁরা কেতকীকে সমর্থন করলেন। বাণীদি যে লম্বা চারুদির উপর খুব প্রসন্ন নন তা তিনি জানতেন। আর কিছু তিনি বললেন না বটে, তবে জানিয়ে দিয়ে গেলেন বাণীদি আসা মাত্রই এ সম্বন্ধে এবং মেয়েদের চুল কাটা যাওয়া সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে।

সেপাই ফাঁসিতেই লটকে রইলো। আর সত্যই কাক-পক্ষী ত্রিসীমানায় দেখা গেলো না—ও বাড়ির ঘরে বারান্দার কাছে কোথাও নয়।

কিন্তু সেপাই টানানের জের সেখানেই শেষ হলো না। দশটার সময় স্কুল সুদ্ধু মেয়ে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো হোস্টেলের বারান্দায়। দিদিমণিদের শাসন তর্জনের ফলে ক্লাস আরম্ভ হলো বটে কিন্তু একটা পিরিয়ড শেষ হতেই আবার সবাই হই হই ক'রে ছুটে এলো। লম্বা চারুদি ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলেন কিন্তু কে তাঁকে মানে। একে তাঁর বয়স কম, তার উপর তিনি মাত্র সাতদিনের বড়দি। পাড়ার লোকেরা এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এবার তাদেরও নজর পড়লো। ধীরে ধীরে রাস্তায় লোক জমতে শুরু করলো। স্কুল ছুটি হবার সময় মেয়েদের আর লোকেদের ভিড়ে রাস্তাটা বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হলো।

লম্বা চারুদি এতটা আন্দাজ করতে পারেননি। নিচে কোলাহল শুনে তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর সেক্রেটারির কথা মনে পড়লো। টেলিফোনটা তুলে নিলেন কিন্তু হতাশ হয়ে সেটা রেখে দিতে হলো। সেক্রেটারিও কলকাতার বাইরে।

পরদিন অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করলো। স্কুলে আসার সময় মেয়েরা তাদের বন্ধুদের ডেকে নিয়ে এলো কেতকীর কীর্তি দেখাতে। তাছাড়া মুখে মুখে খবরটা অনেক দূর ছড়িয়েছিলো, আশে-পাশের পাড়া থেকে দলে দলে লোক এসে দেখে যেতে লাগলো। দুপুরের দিকে এত ভিড় হলো যে থানা থেকে পুলিস এলো শান্তিরক্ষার জন্যে। তার একটু পরেই একজন খবরের কাগজের রিপোর্টার এসে হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। লম্বা চারুদি ওকে গেট থেকে হাঁকিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু তাতে বাইরে থেকে সেপাইয়ের ছবি তোলা বন্ধ হলো না। টিফিনের সময় লম্বা চারুদি স্কুল ছুটি দিয়ে দিলেন।

বাণীদি মাত্র দু'দিন হলো বর্ধমানে এসেছেন। গভীর রাত্রে তিনি একটা অদ্ভুত টেলিগ্রাম পেলেন: Sepoy hanged per your order great sensation followed advise Charu। টেলিগ্রামটা উল্টে পাল্টে দেখলেন বাণীদি, কিছুই তাঁর বোধগম্য হলো না। উদ্বেগে সারা রাত্রি ঘুমোতে পারলেন না। সকালে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নিয়েই কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে তিনি চমকে উঠলেন। আদর্শ ভারতনারী বিদ্যাপীঠের ছবি। চিত্র-পরিচিতিতে লেখা: "বালিকার অদ্ভুত শিল্পপ্রতিভা—পক্ষীদের হাত হইতে বারান্দার ফুলগাছ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার ভারতনারী বালিকা বিদ্যালয়ের জনৈকা ছাত্রী এই অদ্ভুত মূর্তিটি প্রস্তুত করিয়াছে। তারপর স্টাফ রিপোর্টারের জবানীতে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

বাণীদি আর মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না। নিজের চোখে সব দেখে শুনে কেতকীর তলব করলেন। বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো গম্ভীর হয়ে বললেন: "এ সবের অর্থ?"

কেতকী আবার শিশুর মতো প্রশ্ন করলো, "কী সব বড়দি?"

ব্যস্, বিস্ফোরণ ঘটে গেলো। এক লাফে চেয়ার থেকে কেতকীর কাছে গিয়ে পড়লেন বাণীদি। সজোরে চুলের মুঠি ধরে ওকে ঝাঁকিয়ে বললেন, "কী সব? তবে বোঝ কী সব?"

উন্মত্তের মতো কেতকীর মুখে মাথায় পিঠে কয়েকটা চড় লাগিয়ে বাণীদি বললেন, "উঃ কত দূর অধঃপাতে গেছিস! লুকিয়ে লুকিয়ে সবার মাথা থেকে চুল কাটা। বাঁদরামির আর জায়গা পাসনি।"

কেতকী শান্ত ভাবেই বললো, "নইলে যে চুল দিতো না কেউ। আর চুল দাঁড়ি গোঁফ লাগিয়েছি বলেই ওটাকে অত মানুষের মতো দেখতে হয়েছে। কলকাতার পাখিগুলো কত চালাক—যা তা সেপাইকে ভয় করে না এতটুকুও। আর সেপাই তো আপনিই টানাতে বলে-ছিলেন বড়দি।"

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়লো। "আমি তোকে এ সব বাঁদরামো করতে বলেছি। দাঁড়া তোকে এমন শাস্তি দিচ্ছি যাতে তোর চিরদিন মনে থাকে।" এই বলে

বাণীদি কেতকীর কান ধরে হিড় হিড় করে তাকে টানতে টানতে উঠানে এনে বললেন, "নীল ডাউন হয়ে থাক।" কেতকী বিনা প্রতিবাদে নীল-ডাউন হলো।

কেতকীর শাস্তি দেখে সমস্ত স্কুল স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। ভারতনারীতে মেয়েদের শারীরিক শাস্তি দেবার রেওয়াজ নেই। ক্লাস টেনের কোনো মেয়েকে প্রহার কল্পনারও অতীত। আর অত বড় মেয়ের নীল-ডাউন? সে যে আরো অভাবিত ব্যাপার। কিন্তু যার জন্যে এত সহানুভূতি তাকে কিন্তু বিশেষ বিচলিত মনে হলো না।

বাণীদির ক্রোধ শান্ত হয়েছে। এ তিনি কী করলেন! জীবনে কোনোদিন কোনো মেয়ের গায়ে হাত তোলেন নি, আর শেষে এত বড় মেয়েকে প্রহার করে বসলেন সকলের সামনে! ছি ছি এতটুকু সংযম নেই তাঁর! চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ক্লান্ত অবসাদে তিনি চোখ বুঁজে প'ড়ে রয়েছিলেন, একটা শব্দে চোখ মেললেন। কেতকী এসে দাঁড়িয়েছে। মাথা নিচু ক'রে ও বললো, "দরোয়ান বলছে আপনি নাকি সেপাইটা রাস্তায় ফেলে দিতে বলেছেন। আমি ওটা পুজোর ছুটিতে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই বড়দি—অনেক কষ্ট করে বানিয়েছি।"

বাণীদি কোমল সুরে বললেন, "আচ্ছা নিতে পারিস। তোর ঘরে গিয়ে রেখে দে।"

কেতকী বললো, "কিন্তু তাহলে যে আমার ঘরে কেউ ঢুকবে না বড়দি।"

বাণীদি মিষ্টি ক'রে হাসলেন: "আর তোর ভয় করবে না বুঝি! আচ্ছা তবে গুদোম ঘরে বা অন্য কোথাও রেখে দিস···যাতে কারু চোখে না পড়ে।"

বাণীদির হাসি কিন্তু কেতকীকে গম্ভীর ক'রে তুললো। কেতকী যখন ক্লাসে ফিরলো, ওর থমথমে মুখ দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেলো।

দু'মাস পরের ঘটনা। আদর্শ ভারতনারী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছেন লেডি কণিকা। লেডি কণিকাকে অবশ্য মোটেই কণিকার মতো দেখতে নয় এবং তিনি নিজেও কণিকা জাতীয়াদের উপর বিশেষ প্রসন্ন নন। মেয়েদের শরীর চর্চায় তিনি উৎসাহ এবং উপদেশ দিয়ে থাকেন সর্বদাই। এই সভায় আসার একটু আগেও তিনি ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের উইমেন্স উইংসে সে বিষয়ে তেজোময়ী বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন।

ভারতনারীর ঐতিহ্য অনুযায়ী এ উৎসবে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই, শুধু স্কুলের বেয়ারা-দারোয়ানদের ছাড়া। নাচ-গান হয়ে গেছে, এবার মেয়েরা 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় করবে। পর্দা উঠবে একটু পরেই। পর্দার ওদিকে কোনো সাড়া শব্দ নেই, পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। অবশ্য শব্দ শোনা যাবার কোনো কারণ নেই, কেননা স্টেজটা পাকা সিমেন্টের তৈরি। দর্শকদের মুখোমুখি অংশটা অর্থাৎ স্টেজের সামনের দিকটা সিমেন্ট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। স্টেজের ভিতরটা ফাঁপা, বাঁশটাঁশ রাখা হয়।

হলঘরের দরজায় দরজায় ভলান্টিয়াররা দাঁড়িয়ে। কেতকীও ভলান্টিয়ারদের মধ্যে একজন। ও দাঁড়িয়েছে স্টেজের বাঁ দিকের দরজায়। সঙ্গে আর একটি মেয়ে। একবার কেতকী ঘাম মোছার জন্যে ওর ব্যাগ থেকে রুমালটা বের করতে যেতেই ঝনঝন ক'রে অনেকগুলো আনি দুয়ানি সিকি গড়িয়ে পড়লো মেঝের উপর। সবার দৃষ্টি সে দিকে আকর্ষিত হলো। লেডি কণিকা পুরু চশমার ভেতর দিয়ে তাকালেন কেতকীর দিকে। কেতকী লজ্জিত হয়ে পয়সাগুলো কুড়োতে আরম্ভ করলো। দুটি মেয়েও এগিয়ে এলো ওর সাহায্যে।

খুচরোগুলো কুড়িয়ে মেয়েটি কেতকীর হাতে তুলে দিলো। আরো লজ্জিত হয়ে কেতকী বললো—"একটা আধুলি যে পাচ্ছি না ভাই।"

মেয়েদুটি আবার খুঁজতে লাগলো। একজন কী মনে ক'রে স্টেজের পাশের দিকের ঝালরটা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখলো আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে সিধে হয়ে দাঁড়ালো। চোখের মণিদুটো তার একেবারে স্থির হয়ে গেছে।

বাণীদি ছুটে গেলেন তার কাছে। লেডি কণিকাও তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সমবেত প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি ডুকরে কেঁদে উঠে বললো, "একটা লোক—স্টেজের তলায় লুকিয়ে রয়েছে।"

"লোক! লোক!"

সারা হলঘরে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটে গেলো।

লেডি কণিকা এক লাফে পিছনে স'রে এলেন। বাণীদি এক হাতে সেই মেয়েটিকে, অন্য হাতে কেতকীকে ধ'রে পিছনে মেয়েদের ভিড়ে মিশে গেলেন। স্টেজের উপর থেকে মেয়েরা দুপদাপ ক'রে লাফিয়ে পড়তে লাগলো! কেউ আছাড় খেলো, কেউ পা ফসকে প'ড়ে গেলো, কেউ অন্যের ঘাড়ে উলটে পড়লো। অনেকগুলো চেয়ার ওলটালো আর ভাঙলো। বাচ্চাদের কান্না, বড়দের আর্তনাদ। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘরের অর্ধেকটা ফাঁকা হয়ে গেলো—সকলেই চেষ্টা করতে লাগলো পিছন দিকে যাবার। এদিকে দরজাগুলো সব বন্ধ, খুলবার কথা কারু মাথায় ঢুকলো না।

সবশেষে স্টেজের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লো রঘুপতি অর্থাৎ মহামায়া মুৎসুদ্দি। হাতে তার বিরাট এক লাঠি। লাঠিটা মেঝেতে ঠুকে বললো, "একটা তো কী হয়েছে! অত ভয় পাচ্ছেন কেন আপনারা?"

মহামায়া বছর তিন চার ধ'রে ক্লাস টেনেই পড়ছে। শরীর চর্চায় সে শুধু ভারতনারীতেই নয়, সারা কলকাতায় সমস্ত মেয়ে-স্কুলের মধ্যে অদ্বিতীয়া। তার জীবনের একমাত্র সাধনা হলো বুকে হাতি তোলা। হাতি ধারণ করার মতো উপযুক্ত শক্তি তার সঞ্চয় হয়েছে ব'লেই মহামায়ার বিশ্বাস, কিন্তু সেটা হাতে-কলমে পরীক্ষা করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তবে সে একবার দরোয়ানদের বকশিস দিয়ে কলকাতার ধর্মের ষাঁড়েদের মধ্য থেকে একটা বাছাই করা ষাঁড়কে আনিয়েছিলো কিন্তু দিদিমণিদের বিরোধিতায় সেটা আর বুকে তোলা সম্ভব হয়নি। মনের দুঃখে তাই সে মাঝে মাঝে বিশেষ আকৃতির কয়েকটা মেয়েকে বুকে তুলে নিজের শক্তির পরীক্ষা করে।

অকুস্থলের দিকে অগ্রসর হলো মহামায়া। পিছন থেকে সবাই তাকে তারস্বরে নিষেধ করতে লাগলো। কিন্তু মহামায়া সঙ্কল্পে অটল। ঝালর তুলে ফেলে নিচু হয়ে দেখলো। হ্যাঁ একটা বিকটাকৃতির মানুষই বটে, গুঁড়িসুঁড়ি মেরে শুয়ে রয়েছে।

পিছনে সবাই নিশ্বাস বন্ধ ক'রে দেখছে। মহামায়া দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে আন্দাজে লাঠিটা দিয়ে সজোরে আঘাত করলো। ফটাস্ ক'রে একটা শব্দ হলো। তবে কি মানুষটার মাথার খুলিটাই ফেটে গেলো? এক সেকেণ্ড···দু সেকেণ্ড···পর মুহূর্তেই স্টেজের তলা থেকে এক ঝাঁক আরশুলা বেরিয়ে এসে আকাশে উড়তে লাগলো।

কয়েকটা আরশুলা মহামায়ার চোখে মুখে জামায় কাপড়ে গিয়ে বসলো। বিকট আর্তনাদ ক'রে মহামায়া লাফিয়ে উঠলো। আর একি, লাফাতে গিয়ে পায়ের তলায় কী যেন একটা নরম নরম···অ্যাঁ···অ্যাঁ···একটা ইঁদুর!! একেবারে চেপটা হয়ে প'ড়ে আছে! মহামায়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো।

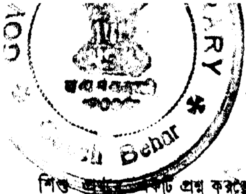
আরশুলাগুলো ততক্ষণে সমস্ত ঘরে উড়তে আরম্ভ ক'রেছে। আর শুধু আরশুলা নয়, রাশি রাশি ইঁদুর। প্রাণভয়ে তারা সমস্ত ঘরে ছোটাছুটি করতে লাগলো। তীব্র আর্তনাদে, কান্নায়, চিৎকারে, অভিশাপে হলঘরটা নরকে পরিণত হলো।

হঠাৎ অনেকগুলো বুটের শব্দ হলো একসঙ্গে। একাধিক দমকলের ঘণ্টাও শোনা গেলো। পাড়ার ছেলেরা কিছুই আন্দাজ করতে না পেরে পুলিসে আর দমকলে খবর দিয়েছিলো। পুলিস অবস্থা আয়ত্তে আনার পর দেখা গেলো মহামায়া, লেডি কণিকা, বাণীদি এবং কয়েকজন অভিভাবিকা মূর্চ্ছিতা। দশটি মেয়ের পা মচকেছে, জনা বিশেকের হাতে পায়ে অল্প চোট লেগেছে, আর বাদবাকি সবারই অল্পবিস্তর জামা কাপড় ছিঁড়েছে। অক্ষত আছে কেতকী। তাকে আহতদের পরিচর্যায় শুধু ব্যস্ত দেখা গেলো।

*　　*　　*　　*

গভর্নিং বডির সদস্যা ও সদস্যদের বক্তব্য শোনার পর প্রেসিডেন্ট সারদাপ্রসাদ বললেন, "এ বিষয়ে আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ পক্ষের মত অনুসারেই চলতে চাই। আশা করি তাতে আপনাদের আপত্তি নেই।"

ভোট নেওয়া হলো। সতেরো জন মেম্বারের মধ্যে প্রস্তাবের বিপক্ষে দশ, স্বপক্ষে সাত। বিরোধকারীরা অবশ্য সকলেই পুরুষ।



সাহিত্য আমরা পড়ি কেন

শঙ্কর গুপ্ত

শিশু [illegible] একটি প্রশ্ন করতে শেখে—কেন? তার আশে পাশে সে অনেক কিছু দেখতে পায়। দেখে অবাক হবার পালা যখন শেষ হয় তখন তার জানার স্পৃহা জাগে। এই কৌতূহলের বশেই তার 'কেন' সুরু হয়। পাখী উড়লেই হয় না—কেন ওড়ে বলতে হবে। বৃষ্টিতে ভিজতে বারণ করলে হবে না—কেন বৃষ্টি হলে জল পড়ে তাকে বলতে হবে। কেন দিয়ে তার জ্ঞানপথের জয়যাত্রার আরম্ভ আছে শেষ নেই। কৌতূহলের নিবৃত্তি চরিতার্থতায়। একটি বিষয় কৌতূহল জাগল, সে প্রশ্ন করলে, কেন। উত্তর পেলেই শান্ত হয়;—আর এক বিষয় কৌতূহল না জাগা পর্যন্ত। কিন্তু এই স্তরে তার আর একটি জিজ্ঞাসা করার অস্ত্র আয়ত্তে আসে,—'তারপর'? গল্প শুনতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে তারপর বলতে শিখে যায়। কেনর নিবৃত্তি যত সহজে হয়, তারপরের তত নয়। আমার গল্পটি ফুরুলো—সত্যিতে কোন গল্পের শেষ নয়, একটি ছড়ার সুরু। একটি বিশেষ বিষয়ের জিজ্ঞাসা কেন? 'তারপর' কিন্তু তা নয়, যদিও প্রশ্নবোধক ভাব আছে। বলে যাও—থেম না—হল তার আসল অর্থ। 'আসলে কেন' হল তারপরের আসল জ্ঞাতব্য।

শিশু কান্না পেলে চেপে রাখতে পারে না, হাসি পেলে খলখলিয়ে হাসে; গরম করলে জামাকাপড় গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে; খিদে পেলে যা পায় খাবলাতে যায়; সে তখন অসভ্য থাকে। সভ্য হবার সঙ্গে সে যা আপ্রাণ শেখে তা হল চাপতে শেখা, গোপনীয়তা। বড় মানুষে তাই বেশী কেন না বলে—খবরের কাগজ পড়ে। তারপর না বলে বই পড়ে। পৃথিবীতে যত পড়ার জিনিষ আছে তার দুটি বিভাগ। একটি কেনর বিভাগ, একটি তারপরের বিভাগ। তারপরের বিভাগটিকে সাহিত্য এবং বাকী সমস্তকে কেনর বিভাগে ফেলা চলতে পারে। কেনগুলো বিচ্ছিন্ন যেন মালার ফুলগুলি, আর তারপরটা যেন সুতো—মালার সুতো।

সাহিত্য আমরা পড়ি কেন—এর এক কথায় উত্তর, আনন্দের জন্যে। আমরা জানি একমাত্র উত্তর কেবল সম্ভব হয় কোন অঙ্কের নির্ভুল উত্তরে। সেখানেও উত্তরে পৌঁছতে গেলে পদ্ধতির সোপান অতিক্রম করতে হয়। অঙ্কের উত্তর ছাড়া আর কোন কথার একমাত্র উত্তর দিতে যাওয়ায় বিপত্তি আছে। কেন না সে সব কথার সার্বজনীন উত্তর তর্কসাপেক্ষ। সাহিত্য কাকে বলব, আমরা মানে কারা—শুধু আমি—না আমি ছাড়া আর সকলে, আনন্দ কি, কাকে আনন্দ পাওয়া বলে, এই সমস্ত বিষয়ে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তবে মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

গল্প শোনা মানুষের আরম্ভ হয় ভাষা শেখার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মিষ্টি খেতেও সে প্রায় সেই সময় থেকেই ভালবাসে। তার মিষ্টান্নপ্রীতি বয়ঃপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে কমে যেতে পারে, লোপ পেতে পারে—কিন্তু গল্প শোনার ইচ্ছে, গল্প ভাললাগার ইচ্ছে কখনও লুপ্ত হয় না—বরং বাড়ে। শুধু বাড়ে নয়, বিচিত্রতার মধ্যে বহুমুখী হয়। এই গল্প শোনার ইচ্ছে থেকেই সাহিত্য পাঠের উৎপত্তি।

সাহিত্য কাকে বলব এ নিয়ে বহু জল্পনা কল্পনা অনেককাল ধরে চলে আসছে। বড় বড় পণ্ডিতেরা মোটা মোটা পুঁথি লিখেছেন এ বিষয়ে; আজও সে কথা গবেষণার অন্ত নেই। সে গোলকধাঁধার ভেতর মাদৃশ অজ্ঞের প্রবেশ করে পথ সন্ধানপূর্বক নিষ্ক্রমণ দুঃসাধ্য। আনাচ কানাচ দিয়ে উঁকি মারতে দোষ নেই তার মধ্যে। সেইভাবে দেখা যাক—ওখানে কি আছে। সংস্কৃত আবিষ্কারকেরা বলেছেন—মানুষের মনে ন রকম ভাব আছে সাহিত্যে, সেই নটি ভাব নটি রসে পরিণত হয়। কোথাও একটি, কোথাও বা একাধিক রসের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের মনের ভাবগুলি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে সেই সেই ভাবের রসরূপ দর্শনে মানুষের মনে এক আনন্দের সঞ্চার করে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা আরও বহু কথা বলেছেন বলে শুনেছি, তবে এইটিই মূল কথা। বিশেষ আলোচনার পর ব্যঞ্জনা প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করে রসোত্তীর্ণ হলেই যে সার্থক সাহিত্য হয় তাঁরা এ পর্যন্ত পৌঁচেছেন। আর সকলেও তাতে খুব একটা আপত্তি করেন নি। কাব্যং গ্রাহ্যং অলঙ্কারাৎ—অনেকের মনঃপূত না হলেও বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং—প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। আমরা আর ম্যাথু আরনল্ড্ থেকে আরম্ভ করে মোহিতলাল মজুমদার পর্যন্ত কাব্য তথা সাহিত্য-সমালোচকদের পর্যবেক্ষণের মধ্যে নাক না গলিয়ে কেবল আমাদের আলোচনার সুবিধের জন্যে রবীন্দ্রনাথের একটি পংক্তি উদ্ধৃত করব। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—জ্ঞানের কথা একবার জানিলেই পুরাতন হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা কখনও পুরাতন হয় না।

এতক্ষণ আমরা যা বলেছি একটি উদাহরণের সাহায্যে তাকে প্রকাশ করা যাক। রতি (নটির প্রথম ভাব) সাহিত্যে প্রতিফলিত হলে শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়। গীত-গোবিন্দে সেটি (শৃঙ্গার) রসোত্তীর্ণ হয়েছে। যুগ্মজীবন সম্পর্কে যৌনতাত্ত্বিক জ্ঞান একবার জানলেই পুরণো হয়ে যায়, কিন্তু মানুষের মনে রতি এই হৃদয়ভাব পুরাতন হয় না। এতে দেখা যাচ্ছে গীতগোবিন্দে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে না; রতি নামক হৃদয়ভাব শৃঙ্গার রসে পরিণত হওয়ায় গীতগোবিন্দ সাহিত্যিক বিচারে রসোত্তীর্ণ হয়ে জনচিত্তে আনন্দ দিচ্ছে। ঠিক সেইভাবে দ্বিতীয় 'রস'কে গ্রহণ করে দেখান যেতে পারে হযবরল হাস্যরসোত্তীর্ণ সাহিত্য। জ্ঞানের কথা ত সেখানে নেই-ই, বরং সাত দুগুণে চোদ্দর

চার নামে হাতে থাকে দশ—পেন্সিলের অজ্ঞতার গাড্ডায় ফেলা হয়েছে।

ছোটবেলার কৌতূহল বলে যে কথা আরম্ভ করেছিলাম এবং সম্ভব করেছি—কৌতূহলের নিবৃত্তি চরিতার্থতায়, রবীন্দ্রনাথের জ্ঞানের কথা একবার জানলে পুরণো হয়ে যাওয়ার সঙ্গে পাঠক তার মিল খুঁজে পাচ্ছেন আশা করি। ছাপার অক্ষরের সবকিছুকে আমি দুভাগে ভাগ করেছি—একটি সাহিত্য এবং অপরটি সাহিত্যবাদে সবকিছু অর্থাৎ একবার জানিলেই পুরাতন হইয়া যাওয়ার' দলে আমরা প্রত্যহ সংবাদ-পত্র পাঠ করি। খবরের কাগজ পড়া হল ছোটবেলার কেনর জের। বেকন নাকি বলেছেন—পৃথিবীতে এমন কোন বই নেই যাতে অন্তত একটা নতুন কথাও জানা যায় না। এই জানা বলে তিনি জ্ঞানের ইঙ্গিত করছেন—না অনুভূতি-বৈচিত্র্যের ইঙ্গিত করছেন—তা আমার বোঝার বাধা নেই। তবে প্রত্যেক বই-ই যে নতুন এতে কোন ভুল নেই। এই সঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে—তা হলে যা পড়ছি সেটি ব্যক্তিক না নৈর্ব্যক্তিক। ব্যক্তিক হলে কৌতূহল চরিতার্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার উদ্দেশ্য শেষ—যেমন সংবাদপত্রপাঠ। নৈর্ব্যক্তিকতার স্তরে পৌছলে তখন সাহিত্যের স্তরে—কেনর দেশ ছেড়ে তারপরের দেশে পৌছন গেল। এর উদ্দেশ্য আনন্দপ্রাপ্তি।

আনন্দ পাওয়া সত্যিতে কি, সেটা একটু দেখা যাক। মদ্যপ মদ্যপানে আনন্দ পায় বলে, সেটা কি আনন্দ? না, সেটি আনন্দের আভাস মাত্র। আনন্দের কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়া নেই। উত্তেজনা কতকটা আনন্দের আভাস দিলেও অবসাদরূপ প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আনন্দের কোন ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। ভারতের ঋষিরা বলেছেন—ব্রহ্মলাভ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির পর যে ভূমানন্দ, তা কেবল ব্রহ্মলাভেই সম্ভব। সকলেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সেই আনন্দের পেছনেই ছুটে চলেছে। সাহিত্যপাঠের আনন্দকে প্রায় সেই আনন্দের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলা হয়—ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ। চরম আনন্দ, ক্লান্তি-হীন অবসাদহীন নৈর্ব্যক্তিক আনন্দই প্রকৃত আনন্দ; অন্য সবকিছু আনন্দের আভাস। একথা বলার সময় অস্কার ওয়াইল্ডের কথা আমি ভুলিনি। তিনি বলেছেন—সাহিত্যে ভালখারাপ বলে কিছু নেই, আছে কেবল ভালভাবে লেখা বা খারাপভাবে লেখা। সুলিখিত বা কুলিখিত অস্কার ওয়াইলডের মতে এই হল সাহিত্য বিচারের নিরিখ। তা বটে কিন্তু আরও একটি অলিখিত নির্দেশ সকলকে মেনে চলতে হয় কেন? সে নির্দেশ রসোত্তীর্ণতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে। রসোত্তীর্ণ না হলে শুধু সুলিখিত হলে তা মানুষকে আনন্দ দেবে কি করে! আনন্দই যদি না দেবে তবে আমরা সাহিত্য পড়ব কেন।

আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে এ আলোচনা সাহিত্যপাঠ তথা সাহিত্য পাঠকের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সাহিত্যিকের সঙ্গে নয়। কিন্তু সবরকম কথাই এসে পড়ছে কারণ সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল সহিতত্ব। লেখকের সঙ্গে লেখার যোগ, লেখার সঙ্গে পাঠকের যোগ এবং লেখকের সঙ্গে পাঠকের যোগ—ব্যুৎপত্তিগতভাবে এই হল সাহিত্যের অর্থ। তাই আনন্দ পাওয়া যেখানে পাঠকের লক্ষ্য, আনন্দ দেওয়াও তেমনি সাহিত্যের সাধনা। এক কল্পনার রাজ্যে লেখক ও পাঠকের খানিক হাত ধরাধরি করে বেড়িয়ে আসা। 'হলে হতে পারত', লেখকের এমন একটা পরিকল্পনায় পাঠকের অনুমোদন। নামগুলো জায়গাগুলো অদল বদল করলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, রস ঠিক থাকলেই হল। নায়িকার পা ভাঙুক ক্ষতি নেই, রসভঙ্গ না ঘটলেই হয়। নায়ক জীবনের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হোক ট্র্যাজেডি জমবে ভাল—কিন্তু রসে যেন অনুত্তীর্ণ থেকে না যায়।

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ সাহিত্যের এক একটি শাখা। আমি বলছি না—আমরা পাঠক-সম্প্রদায় সেই সব শাখার এক একটি শাখামৃগ। আমাদের এক একজনের এক একটা শাখায় বিচরণ করতে ভাল লাগে। কারুর বা একাধিক। যে নটি ভাবের কথা বলা হয়েছে আমাদের সকলেরই মনে সহজাত ঐ ভাব নটি আছে। সব ভাবগুলো হয় ত সমান স্পর্শকাতর নয়। যিনি যে ভাবের ভাবুক তিনি সেই ধরণের বই পছন্দ করেন। রোমাঞ্চ রহস্য গ্রন্থাবলীর পাঠক বীররস এবং বীভৎস রসে হয়ত বেশী আনন্দ পান—অন্যসব রসের বোধ, হয় ত তত সূক্ষ্ম নয়। করুণ রসে আপ্লুত হবার যাঁর ইচ্ছে তিনি হয় ত ট্র্যাজেডি পড়তে ভালবাসেন। খানিকটা স্রোতস্বিনীর মত ইচ্ছে হয় অবগাহন কর, না হয় নিজের পাত্র অনুযায়ী ভরে নিয়ে যাও। "যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এস, ওগো এস মোর হৃদয় নীরে।"

সাহিত্য আমরা পড়ি কেন—এখানে আমরা বলতে গৌরবে বহু-বচন করার মত কোন গৌরব আমার ঝাঁপিতে নেই। আমি পড়ি কেন বলতে গিয়ে বলতে পারতাম—সময় কাটাবার জন্যে, বলতে পারতাম—ফ্যাশানের খাতিরে। তা বললে যাঁরা জ্ঞানীগুণী তাঁরা আমায় অমৃতং বালভাষিতং বলতেন, আর যাঁরা মূর্খ তাঁরা আমায় গোমুখ্যু বলতেন। তা না করেএত কথা বলার করণ, যেখানে বিশেষজ্ঞরা পেছিয়ে আসেন যেখানে হাতুড়ে এগিয়ে যায়—কথাটা আমাকে সাহস যুগিয়েছে। যদি বলি পুস্তক ব্যবসায়ের প্রসার আমাদের কাম্য, তা হলে ত সত্যি কথা বলা হবে না; যদি বলি লেখকদের উৎসাহিত করার জন্যে, তা হ'লে যাঁরা জানেন মৃত্যুঞ্জয় দ্বিতীয়ভাগের বানান বলে আমি হলধর নাম রাখার পক্ষপাতী—তাঁরা ভদ্রসমাজে আমার আসল রূপটি ফাঁস করে দেবেন। তাই যেটি সত্যি তাই বলেছি—আনন্দলাভ করার জন্যে আমরা সাহিত্য পড়ি। শুধু পড়া নয়, আনন্দ পাবার জন্যে পড়া। সেটি শিক্ষা করতে হয়। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্য নামে বইটির একজায়গায় বলেছেন—পড়তে পড়তে যখন গায়ে কাঁটা দেয় তখন তা রসোত্তীর্ণ হয়েছে বুঝতে হবে। শীতে গায়ে কাঁটা দেওয়া নয়, ভয়ে গায়ে কাঁটা দেওয়া নয়—আনন্দে গায় কাঁটা দেবে। "কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল"—রাধার পায় কাঁটা না ফুটতেই আমার গায় কাঁটা দেওয়া চাই।

একজন শুনেছিল চশমা নিলে বেশ পড়তে পারা যায়। চোখ পরীক্ষা করতে গিয়ে কোন কাঁচই তার চোখে লাগছে না, উঁহু এটাতেও পড়তে পারছি না; নাঃ ওটাতেও নয়। শেষকালে দোকানী শুধোলে, মশাই কি পড়তে জানেন? তত্ক্ষণে লোকটি রেগে উঠেছে; পড়তেই যদি জানব, তবে মরতে তোমার বিজ্ঞাপনের কথা শুনে এখানে দৌড়ে আসব কেন? পড়তে ভাল লাগতে শেখার জন্যে আমিও একটা ঐরকম চশমার খোঁজে আছি।



হাবড়া উদ্বাস্তু উপনগরী

শ্রীঅমলকুমার ঘোষ

স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রথম সূচনা এই বাংলাদেশে। আর এই স্বাধীনতা লাভ করতে সবচেয়ে বেশী মূল্য দিতে হ'য়েছে এই বাংলাদেশকেই। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা হয়েছে দ্বিখণ্ডিত। সারা বাংলার এক তৃতীয়াংশ এসেছে ভারতের মধ্যে। আর দুই তৃতীয়াংশের অধিকাংশ হিন্দু পরিবারকে অত্যাচারিত হ'য়ে আশ্রয় নিতে হ'য়েছে এই পশ্চিম বাংলায়। 'গৃহহারা উদ্বাস্তু জীবনের বেদনা যে কত বড়, আর মাথা গোঁজার সামান্য আশ্রয়।

চরম পরিহাসের কত ছবিই না আমরা আজও দেখছি পথে ঘাটে। সত্যি কথা বলতে কি, আজ জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় সঙ্কট হ'য়ে দাঁড়িয়েছে উদ্বাস্তু সমস্যা। হাজার হাজার মানুষের অর্থ-নৈতিক পুনর্ব্বাসন চাই। কি ভাবে, কোন পথে ইহার সমাধান সম্ভব, ইহার সর্ব্বাধিক সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা, উদ্যোগ আয়োজন হ'চ্ছে সরকারী বিভিন্ন পরিকল্পনায়।

বিভিন্ন কারণে পশ্চিমবাংলায় পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী ২৪পরগণা, নদীয়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে উদ্বাস্তু আশ্রয় শিবির ও উপনিবেশ গড়ে উঠেছে বেশী। বহু পতিতভূমি ও জলার বুকে জেগে উঠেছে লোকালয়। ২৪পরগণা জেলার মধ্যে হাবড়া আর যাদবপুর অঞ্চলের উন্নতি সাধন হয়েছে এদিকদিয়ে সবচেয়ে বেশী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের আর্থিক সাহায্যে হাবড়াতে গড়ে তুলেছেন একটী উদ্বাস্তু উপনগরী। সেদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২৪পরগণা জেলা সাংবাদিক সঙ্ঘের সভ্যরূপে দেখে এলাম "হাবড়া উপনগরী"।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮ সাল সকাল সাড়ে আটটায় শিয়ালদহ ষ্টেসন থেকে ষ্টেটবাসে যাত্রারম্ভের কথা। সকাল থেকে অকাল বর্ষণ সুরু। শীত বিদায়ের পালা হলেও গায়ে শীতবস্ত্র ও হাতে ছাতি নিয়ে যথা সময়ে শিয়ালদহে গিয়ে হাজির হলাম। সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কুড়িজন সদস্য ষ্টেশান্ ছাউনীর নীচে ভীড়ে একপাশে আশ্রয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ী আসতেই একে একে উঠে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। সরকারী পরিবহন ব্যবস্থায় নবনির্ম্মিত গাড়ীখানি, তক্-তকে পরিচ্ছন্ন আরামপ্রদ আসন। ইতিমধ্যে জেলা প্রচার আধিকারিক শ্রীচুণীলাল বসু বাদলার দিনে ধূমপায়ী সাথাদের সিগারেট দিয়ে প্রথম অভ্যর্থনা জানালেন। সাড়ে 'ন'টায় যাত্রা হল সুরু। সারকুলার রোড, শ্যামবাজার মোড় ঘুরে সোজা যশোর রোড ধরে গাড়ী চলল এগিয়ে। রাস্তার ধারে কিছুদূর পর্য্যন্ত দেখলাম "বারাসাত বসিরহাট" লাইট রেলপথের পরিত্যক্ত লাইন পড়ে আছে মৃত অতিকায় সরীসৃপের মত। রেল কলোনীর নূতন নূতন বাড়ী উঠছে, তার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে পাতিপুকুর যক্ষ্মা হাঁসপাতাল। একটু এগিয়ে দেখা গেল বাগজোলা ড্রেণ, কলকাতার ময়লা জল নিকাশকারী খাল, জলার বুকে গড়ে উঠেছে বাঙ্গর কলোনী, কৃষ্ণপুর উদ্বাস্তু উপনিবেশ। দমদমের ন্যায় শহরতলীতে এককালে কলকাতার ধনিক শ্রেণীর বাগানবাড়ী তৈরী হোত মুখতঃ আমোদ প্রমোদে অবসর যাপনের জন্য। আর আজ সেখানে উদ্বাস্তু উপনিবেশের স্কুল বসেছে, পাঠাগার, রেডক্রসের সেবাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

দমদম প্রধানত শিল্পাঞ্চল। যশোর রোডের দুপাশে অনেকগুলি ছোটবড় কারখানা রয়েছে—এর মধ্যে "জেসপ কোম্পানী" আর গ্রামোফোন কোম্পানীর নাম করতে হয় সর্ব্বাগ্রে। লর্ড ক্লাইভের স্মৃতিবিজড়িত দুটি অট্টালিকা ঐতিহাসিক স্মৃতিকে বহন করছে। বিংশ শতাব্দীর শিল্পোন্নত যুগে অতীতের ইতিহাস রোমন্থন করা চলে কিনা জানিনা; তবু মনে আসে এই সেই যশোর রোড। এককালে মহারাজ প্রতাপাদিত্য নির্মাণ করেছিলেন এই রাজপথ। তখন কোথায় ঘুমিয়ে ছিল দমদম?

দমদম বিমান ঘাঁটি; গ্লোব নার্শারীকে রাস্তার দক্ষিণে রেখে আমরা মধ্যম গ্রাম চেক্পোষ্টে এসে থামলাম। গাড়ী থেকে নেমে রাস্তার ধারের একটি ছোট্ট চায়ের দোকানে উঠলাম। এখানে আমাদের 'চা' খাওয়ালেন "শ্যামসুন্দর দা", ইনি অনেকেরই পরিচিত। বিদ্যাসাগর কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ও "আর্থিক প্রসঙ্গ" নামক পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট "শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়।"

'চা' পর্ব্ব শেষ করে আমরা বারাসত শহরের উপর দিয়ে "কলকাতা—বনগ্রাম" প্রাদেশিক সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছি। পথিমধ্যে "গুমাগ্রামে", হাবড়া জাতীয় সম্প্রসারণ সংস্থার উন্নয়ন অধিকারিক শ্রী এস্, পি, সাহানা ও সাংবাদিক বন্ধু শ্রীপার্থ চট্টোপাধ্যায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। 'রাস্তাধ পার্শ্ববর্ত্তী একটি কৃষিক্ষেত্রে নলকূপ স্থাপন করে জলসেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সরকারী পরিকল্পনায়, আমাদের দেখান হোল এখানে। এ ব্যবস্থায় ৮০০ বিঘা জমিতে জলসেচ করা যাবে। এজন্য কৃষকদের সামান্য সেচকর দিতে হবে। সেচের ড্রেনগুলির জন্য যে জমি লেগেছে তা জমির সত্বাধিকারীরা বিনামূল্যেই দিয়েছেন। এর জন্য সরকারের বত্রিশ হাজার টাকা অর্থ ব্যয় হবে এবং হাবড়া থানা এলাকায় এরূপ ৮টি পরিকল্পনা কার্য্যে রূপায়িত হচ্ছে। আপাততঃ পরীক্ষামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শুধুমাত্র নদীয়া জেলার ফুলিয়া ও হাবড়া থানার এই সেচ পরিকল্পনার কার্য্য আরম্ভ হয়েছে। এর পর শ্রীসাহানা উক্ত থানার কচুয়া গ্রামে "নিজের ঘর নিজে কর", পরিকল্পনায় কয়েকটী নূতন নির্ম্মীয়মান ঘর দেখালেন। গত বৎসর

বন্যায়, স্থানীয় যে সকল দরিদ্র অধিবাসীর মাটির কুটীর ভূমিসাৎ হ'য়ে গিয়েছিল, এ পরিকল্পনা তাদেরই জন্য। সরকার সাহায্য করছেন ইট পোড়ানর কয়লা, কাঠ, ছাউনীর জন্য টিন দিয়ে। গ্রামবাসীরা তাদের শ্রম দিয়ে গড়ে তুলেছে ছোট ছোট পাকা কুটীর। অনেক সময় টেষ্ট রিলিফের কাজ করেছে নিজ নিজ গৃহ নির্ম্মাণে। কচুয়ার বাগদীপাড়া ঘুরে বেলা ১২টা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম হাবড়া উদ্বাস্তু উপনগরী এডমিনিষ্ট্রেটরের অফিসে। এডমিনিষ্ট্রেটর শ্রী এ, পি, সিংহ আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। চা ও জলযোগের আয়োজন করাই ছিল, তার সদ্ব্যবহার করা গেল।

এখানে হাবড়ার পূর্ব পরিচয় কিছু দেওয়া প্রয়োজন। কলকাতা থেকে প্রায় ৩১ মাইল দূরে ইষ্টার্ণ রেলপথের কলিকাতা বনগ্রাম শাখার হাবড়া ষ্টেশন হতে তিন মাইল দূরে বর্ত্তমান অশোকনগর, কল্যাণগড় নিয়ে এই উপনগরী গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হাবড়া থানার এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সেনাবাহিনীর শিবির ছিল। ঐ সময় এখানে একটি অস্থায়ী বিমান ঘাঁটি স্থাপিত হয়েছিল এবং কংক্রিটের বহু রাস্তাঘাট নির্ম্মিত হয়েছিল। যুদ্ধাবসানে এ অঞ্চল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। আজ নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে।

হাবড়া উপনগরীর মোট আয়তন ৩৬৭৩·০২ বিঘা—এর মধ্যে গড়ে ৫ কাঠা পরিমাণ মোট ৬৭৭৭টী প্লটের আয়তন ১৮০১·০৯। অর্থাৎ সমগ্র উপনগরীর শতকরা ৪৯ ভাগ। রাস্তা আছে শতকরা ৩১ ভাগ, বাকী জায়গায় পার্ক, বাজার প্রভৃতি অবস্থিত। এই উপনগরীতে মোট ৩ হাজার গৃহ নির্ম্মাণ শেষ হ'য়েছে এবং আরও ৭ হাজার গৃহ নির্ম্মিত হবে। বর্ত্তমানে প্রায় ৩৫ হাজার লোক এখানে বসবাস করছেন। এখানে প্রতি পরিবারের জন্য ১২ ফুট × ৯ফুট আয়তন বিশিষ্ট দুইখানি শয়নঘর, সম্মুখে আচ্ছাদিত বারান্দা, রান্নাঘর, সেপটিক ট্যাঙ্ক-পাইখানা সমন্বিত এক একটি পাকা গৃহ নির্ম্মিত হয়েছে। প্রতি গৃহের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে প্রথম কিস্তিতে ২৫০৲ টাকা সরকারকে দিতে হ'য়েছে। কিন্তু ঐ প্রথম কিস্তিছাড়া আজ পর্য্যন্ত বাকী অর্থ আদায় হয় নাই। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল এজন্য সরকারেরও কোন চাপ নেই। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কেহ কেহ জানালেন—ঐ গৃহগুলির অধিকাংশের সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এমন কি অনেকগুলির ছাদ থেকে বর্ষায় জল পড়ে। এজন্য সরকারী কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

সেদিন আমাদের দশটী দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শনের কর্ম্মসূচী রচিত হয়েছিল, কিন্তু সময় সংক্ষেপের জন্য সবগুলির দর্শনলাভ ঘটেনি।

প্রথমে আমরা উপনগরীর জন্য পানীয় জল সরবরাহের যে ব্যবস্থা হচ্ছে তা' দেখতে গেলাম। বর্ত্তমানে এই উপনগরীর বিভিন্ন এলাকায় কতকগুলি নলকূপই পানীয় জলের একমাত্র নির্ভর এবং এ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রচুর। নূতন পরিকল্পনায় ১০" ব্যাসের দুইটী সুগভীর নলকূপ খনিত হ'য়েছে এবং ভূমি হতে ৪০ ফুট ঊর্দ্ধে এক লক্ষ গ্যালনের একটী কংক্রীটের জলাধার নির্ম্মিত হ'য়েছে। দৈনিক মাথাপিছু ৩০ গ্যালন জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। প্রতি গৃহে কল-সংযোগ ছাড়াও পথিপার্শ্বে ৪০০ কল স্থাপিত হবে। জল সরবরাহের সমগ্র পরিকল্পনাটী কার্য্যকরী করতে আনুমানিক এক লক্ষ একাশী হাজার সাতশ টাকা ব্যয় হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তত্ত্বাবধানে এ সকল কার্য্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে।

হাবড়া গোল-মার্কেটটি স্থাপিত হ'য়েছে সমগ্র শহরের কেন্দ্রস্থলে। আধুনিক শহর-পরিকল্পনার-রীতি অনুসারে উপনগরীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাস্তা এসে মিলেছে এইখানে। এ শহরের নক্সা রচনা থেকে সুরু ক'রে পথঘাট, ঘরবাড়ী বেশীর ভাগ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হ'য়েছে উন্নয়ন বিভাগের নির্ম্মাণ পর্ষদের তত্ত্বাবধানে। বাজারের নির্ম্মাণকার্য্য বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে সমাপ্ত হ'য়েও আজও চালু হয়নি। বাজারের মধ্যে বহুসংখ্যক সুদৃশ্য ষ্টল যা নির্ম্মিত হয়েছে তা স্থানীয় উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করা হবে। বর্ত্তমানে এই সব ঘরগুলিতে বিগত বৎসরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আশ্রয় নিয়ে বাস করতে দেখলাম। বাজারের মধ্যে নিজস্ব জল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য ৫ হাজার গ্যালনের ছোট জলাধার আছে।

গোল-মার্কেটের পাশ দিয়ে আমরা হাবড়া মহিলা শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হলাম। এখানে ৪০ জন মহিলাকে তাঁতের কাজ করতে দেখলাম। এখানে প্রত্যেক কর্ম্মীকে সরকার হ'তে মাসিক ৩০ টাকা হারে সাহায্য দেওয়া হয়। এবার পুরুষের জন্য উৎপাদন ও শিক্ষণকেন্দ্রে গিয়ে উঠলাম। এখানে বয়নশিল্প, চর্ম্মশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ, কামারশালার কাজ, ছুতারের কাজ, খেলনা তৈরী প্রভৃতি দশ বারটী বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষাকাল এক বৎসর। প্রতিবৎসর প্রায় ৪০০ জন স্থানীয় উদ্বাস্তু বালক এই কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করে। বহু-উদ্বাস্তু যুবক এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু সীমাবদ্ধ আসন থাকায় সকলে প্রবেশ লাভ করতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠানটীর সম্প্রসারণ করা দরকার। এই উৎপাদন কেন্দ্রের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি দেখিয়া সাংবাদিক দল ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উপনগরীর উত্তর দিকে একটি সুপ্রসন্ন দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হ'চ্ছে, আন্দুল বয়েজ হোমের জন্য। এখানে ৫৫০ অনাথ ছাত্রের বসবাসের মত সর্ব্বাধুনিক ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হাবড়া উপনগরীতে সরকারী সাহায্যে একটী বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে নাম—"রাধা-কেমিক্যাল।" এখানে কারবাইড্ প্রস্তুত হয়। স্থানীয় ১০০ জনের মত উদ্বাস্তুর এখানে কর্ম্ম সংস্থান হ'য়েছে।

উপনগরীর অধিবাসীদের নিকট থেকে আমরা যে অভাব অভিযোগ-গুলি জানতে পারলাম, তার মধ্যে প্রথম উল্লেখ করতে হয় একটি, "হাঁসপাতালের।" এতবড় উপনগরীতে একটী ৫০০ শয্যাযুক্ত হাঁসপাতাল স্থাপন করার আশু প্রয়োজন রয়েছে—যদিও "নারী সেবা সঙ্ঘ" নামে একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের ১০টী শয্যাযুক্ত একটি প্রসূতিসদন আছে। এ অঞ্চলে যক্ষারোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য রূপে যেরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে বর্ত্তমানে ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল ইউনিট্ ছাড়াও একটি "চেষ্ট ক্লিনিক"

স্থাপিত হওয়া উচিত। উপনগরীর এতগুলি মানুষের মানসিক ক্ষুধা মেটাতে কোন সরকারী সাধারণ পাঠাগার এখানে নেই, অথচ এখান থেকে তিনখানি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এখানে একটি উচ্চ বিদ্যালয় আছে। উহা উচ্চতর বিদ্যালয়ে পরিণত করা দরকার। স্থানীয় বিধান সভার সভ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়ের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এখানে শ্রীচৈতন্য কলেজ স্থাপিত হয়েছে। রেলপথের ধারে উহার অট্টালিকা নির্ম্মিত হচ্ছে। এখানকার অধিবাসীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে অশোক নগরে একটী রেলস্টেশন স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে ব্যবস্থাবলম্বন করেছেন।

ঐদিন হাবড়া উপনগরী পরিদর্শনান্তে বসিরহাট মহকুমার দক্ষিণ-চাতরা গ্রামের সর্ব্বজনপরিচিত একনিষ্ঠ সমাজ-সেবক ও সাংবাদিক শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে সাংবাদিক দল মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপনান্তে উক্ত গ্রামের নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়, সংগঠনি ট্রাষ্ট পরিচালিত "পোলট্রী", শ্রীসুধা কান্ত মিশ্র প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহ, এ, জি, হাঁসপাতাল, মরা পদ্মা পরিদর্শন করেন। 'চাতরা' হ'তে বিদায় নিয়ে গোবরডাঙ্গা জমিদার-বাটী, প্রসন্নময়ীর মন্দির ও লক্ষ্মীপুর স্বামিজী-সেবা-সঙ্ঘ পরিদর্শনান্তে সাংবাদিক দল রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকায় কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঋষি রাজনারায়ণ বসু

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

পরাধীনতার নিবিড় তমিস্রা নিবিড়তর হয়ে নেমে এসেছিল বাংলা মায়ের বুকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। তার ওপর তখন বৈদেশিক ভাবধারার মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল এ দেশের শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়। সেই বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে মুক্তির অলোক-বর্ত্তিকা নিয়ে নেমে আসেন বাংলা মায়ের দেব-শিশু রাজা রামমোহন রায়। এক আত্ম-বিস্মৃত মহাজাতির মনে সম্বিৎ ফিরিয়ে এনে তাকে সংগঠন মন্ত্রে দীক্ষিত করার যে বীজমন্ত্র রাজা রামমোহন এদেশবাসীর মনে আরোপিত করে গিছলেন, তাকে ক্রম-পরিচর্য্যায় সঞ্জীবিত ও মুঞ্জরিত করে তুলেছিলেন ঋষি রাজনারায়ণ বসু, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি আদি জন-নায়কগণ। লর্ড মেকলে, ডেভিড্ হেয়ার, উইলিয়ম কলভিন্, হেম্যান উইলসন্, রেভারেণ্ড্ চার্লস্ ভোঁসে প্রভৃতি বহু বৈদেশিক উচ্চশিক্ষিত মনীষীর সক্রিয় সহানুভূতি লাভ করেছিল তৎকালীন সেই তীব্রতম দেশাত্মবোধক আন্দোলন।

ইংরাজী ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড হেষ্টিংস তখন ভারতের বড়লাট। এই হিন্দু কলেজের (নামান্তরে প্রেসিডেন্সি কলেজ) মাধ্যমে তখন ইংরাজী শিক্ষার বিরাট সুযোগ ঘটে এবং এদেশ-বাসীগণ পাশ্চাত্য সাহিত্য, সভ্যতা ও চিন্তাধারার সঙ্গে—অতি দ্রুত পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তদানীন্তন যুব-সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ না ক'রে তার বাহ্যিক চাকচিক্য ও বাহুল্যতায় নিন্দনীয় দিকগুলিই সর্ব্ব-প্রযত্নে আঁকড়ে ধরবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। এমন কি ইংরাজীশিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে নিজেদের পৌরুষ জ্ঞান করতে থাকেন। ফলে হিন্দু-সমাজের কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়। দেশের এই চরম দুর্দ্দিনে, এই অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্ত্তে আবির্ভূত হয়েন ঋষি রাজনারায়ণ বসু তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা ও অক্ষুণ্ণ জনপ্রিয়তা নিয়ে।

এই সর্ব্ব-জনপ্রিয় জননায়কটি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, আদর্শ-বাদী ও ধর্ম্ম-প্রচারক। তিনি নিজে ইংরাজী শিক্ষায় অসাধারণ পণ্ডিত হয়েও পাশ্চাত্য ভাবধারায় একেবারেই আকৃষ্ট হননি—বরং অতি সাদাসিধা ও খাঁটি হিন্দু জীবনযাপন করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে তৎকালীন উদ্‌ভ্রান্ত হিন্দু সমাজকে দ্রুত খৃষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন। আর এ কথাও সত্য যে উনবিংশ শতক ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বর্ণযুগ ও সত্যযুগ। উনবিংশ শতকের এক প্রান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্য প্রান্তে শ্রীঅরবিন্দ—আর ইহারই মাঝখানে প্রলম্বিত যে স্বর্ণসেতু সেই সেতু-বন্ধনের অংশ লইয়াছিলেন সমাজ-সংস্কারক ঋষি রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ।

জেলা ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামে ২৩শে ভাদ্র সন ১২৩৩ সালে ইংরাজী ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ঋষি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় জন্ম-গ্রহণ করেন। বোড়াল গ্রামেই তাঁর বাল্য-জীবন গঠিত ও পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। পরে কলিকাতায় প্রথমে শম্ভু মাষ্টারের স্কুল ও সেখান থেকে ডেভিড হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হয়েন। ইংরাজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হয়েন ও সেখানে তিনি তাঁর অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে তাঁর সহপাঠী মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর, আনন্দকৃষ্ণ বসু, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি অসাধারণ মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেন। তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র। কলেজ জীবনে তিনি বহু-উচ্চবৃত্তি লাভ করেন। ইংরাজী ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও আদি ব্রাহ্ম সমাজের মাধ্যমে উপনিষদগুলির ইংরাজী অনুবাদ করেন। ঐগুলি তৎকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হত ও সর্ব্বক্ষেত্রে উচ্চ প্রশংসা লাভ করত। তিনি ইং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের

অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। ইং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকেই তিনি নানাস্থানে স্বদেশী বক্তৃতা দিতে থাকেন। তৎকালে তাঁর প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা দেন ২৯শে শ্রাবণ ১৭৬৮ শকে (ইং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ) আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ এই পর্য্যায়ে। তাঁর একটির পর একটি জাতীয়তা-উন্মেষক ও ধর্মমূলক বক্তৃতা শুনে সারা ভারতবর্ষের লোক নবচেতনায় ও উদ্দীপনায় মেতে ওঠেন। তিনি ইংরাজী ১৮৫১ থেকে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই প্রায় সুদীর্ঘ ১৮ বৎসরকাল মেদিনীপুরে অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি মেদিনীপুরের জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ও ঐ স্থানে বহু সংগঠনমূলক কার্য্য করেন। ইং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ন্যাশন্যাল নবগোপাল মিত্র কর্তৃক স্বদেশী মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ সময়েই কলিকাতার পার্শীবাগানে উক্ত মেলাটির অধিবেশন হ'ত এবং ঋষি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় অধিকক্ষেত্রেই উহার সভাপতিত্ব করতেন। স্বদেশী মেলার অধিবেশনগুলির বক্তৃতার মাধ্যমে ঋষি রাজনারায়ণই সেই প্রথম স্বদেশজাত দ্রব্যকে অতি পবিত্রবোধে ব্যবহার এবং উচ্চমূল্যের বিনিময়েও ক্রয় করার স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন।

ঋষি রাজনারায়ণ হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, সেকাল আর একাল, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, বৃদ্ধ হিন্দুর আশা প্রভৃতি প্রায় পনের ষোলখানি বাংলায় এবং ইংরাজীতেও প্রায় বার তেরখানি পুস্তক ও প্রস্তাব প্রণয়ন করেন। এছাড়া তিনি ইংরাজী ও বাংলায় বহু ছোট ছোট প্রবন্ধ ও চতুর্দ্দশপদী ইংরাজী কবিতাও রচনা করেছেন। তাঁর মধ্যম জামাতা কৃষ্ণধন ঘোষ (মনীষী শ্রীঅরবিন্দের পিতা) যখন ইং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাত্রা করেন তখন তাঁহাকে উপদেশমূলক যে ইংরাজী কবিতা লিখেছিলেন তার কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—

"Go Son belov'd as pilgrim bold to lands
Beyond the stormy Oceans wide domain
Where commence, Art and Science freely rain
On freedom rare with lib'ral hands.
……Go thou still ours remain
Be not like apes, who change their manners dress
And language of their trip becoming vain.
Though different clad, religion true at end
Will Will the fight, such forms head perish true.

তিনি যখন ইং ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে Theistic Toleration and Diffusion of Theism নামক ধর্ম্ম-সমন্বয়মূলক পুস্তকখানি লিখেন তখন বিলাতের বহু সংবাদপত্রেও এই বলিয়া উচ্চ প্রশংসা ক'রেছিল যে —রাজনারায়ণ বাবুর ধর্ম্ম-সমন্বয়মূলক পুস্তকখানি বিক্রয় করে প্রচুর অর্থ সমাগম না হ'লেও পুস্তকখানি জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্ন সঞ্চিত করে রেখে গেল তাহা হীরা, মুক্তা ও জহরতের অপেক্ষা বহু সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। এই পুস্তিকা সম্বন্ধে বিলাতের তদানীন্তন ধর্ম্ম-যাজক রেভারেণ্ড ভোঁসে (Rev. Bharles Voysey) ইংরাজী ৫ঠা এপ্রিল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ঋষি রাজনারায়ণকে এক পত্র লিখেছিলেন।

এ ছাড়া তৎকালীন বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁকে যে কিরূপ প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন তাহা ইংরাজী ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক ঋষি রাজনারায়ণকে লিখিত এক পত্র থেকে কিছু বোঝা যায়। ঐ বৎসর সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। সভার সাফল্যে প্রীত হ'য়ে রাজনারায়ণ সুরেন্দ্রনাথকেএক ধন্যবাদজ্ঞাপক পত্র লিখেন। তার-প্রত্যুত্তরে উক্ত তারিখে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার মণিরামপুরের আবাস থেকে লিখেন—"বহুলোক আমাকে প্রশংসামূলক পত্র লিখেছেন বটে, কিন্তু আপনার প্রশংসাপত্রকে সর্ব্বশীর্ষে স্থান দেব, কেননা একমাত্র আপনাকেই আমি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করি।"

ঋষি রাজনারায়ণের মধ্যে বহু বিভিন্নমুখী প্রতিভার একত্র সমাবেশ হয়েছিল। তাঁকে বলা হত জাতীয়তা-সংগ্রামের পিতামহ। আবার এত গুণের আকর হ'য়েও তাঁর মধ্যে অহমিকার লেশমাত্রও প্রবেশ করে নি। তাঁর অন্তরটি ছিল শিশুর মত সরল। কে কারণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন—"তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মত তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়াছিল। এমন কি প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মত ছিলেন। একদিকে আপনার জীবন ও সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর একদিকে দেশের উন্নতি সাধন করিবার জন্য সর্ব্বদাই কত রকম সাধ্য ও অসাধ্য প্লান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই।"

দেশের বহুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থেকেও তিনি তাঁর বৃহৎ পরিবারটির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখতেন ও বিশেষতঃ নারীদিগের প্রতি অত্যন্ত সম্ভ্রম প্রদর্শন করতেন। তিনি প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় ভ্রাতা-ভগ্নী পুত্রকন্যা ও প্রতিবেশিগণের সঙ্গে একত্রে মিলিত হ'য়ে নিম্নরূপ পারিবারিক উপাসনা করতেন—

"হে পরম পিতা, পরম মাতা, পরমেশ্বর! আমরা পিতা পুত্রে, ভ্রাতা ভগিনীতে ও সকল প্রতিবেশিগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি পুরঃসর তোমার পূজা করিতেছি। তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ কর। তুমি সকলের ও আমাদের গৃহদেবতা, তোমাকে ব্যতীত আমরা অন্য কাহাকেও জানি না, তুমি আমাদের প্রতি করুণা কর। তুমি এই পরিবারকে তোমার মঙ্গলচ্ছায়া প্রদান কর। এই পরিবারের মধ্যে যেন কখনও বিরোধ ও কলহ উপস্থিত না হয়। যদি আমরা সম্পদে উত্থিত হই তবে সেই সম্পদে মত্ত হইয়া তোমাকে যেন বিস্মৃত না হই। যদি আমরা বিপদে পতিত হই, সে বিপদের মধ্যে তোমার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন অটলভাবে অবস্থান করি।

আমাদের ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ কর। তোমার নিকট আমাদের আর অন্য প্রার্থনা নাই। ওঁ শান্তি, শাঁন্তি, শান্তি।"

তাঁর শেষ জীবন দেওঘরে অতিবাহিত হয়। এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ভারত ও ভারতের বাহিরের বহু মনীষী প্রায় নিত্যই আসতেন। দেওঘরে তাঁকে তাঁর প্রবল জন-প্রিয়তার জন্য বলা হ'ত "দেওঘরের জীবন্ত বৈদ্যনাথ"। তাঁর দেওঘরের বাড়ীখানি বর্ত্তমানে হস্তান্তরিত হ'য়ে গেছে—ও বর্ত্তমান সত্বাধিকারী বাড়ীর নাম দিয়েছেন "অধরায়তন"। স্থানীয় সরকারের কর্ত্তব্য বাড়িখানি জাতীয় সম্পদ-রূপে পরিগণিত ও ঋষি রাজনারায়ণের নামানুকরণে প্রচলিত করা। সুখের বিষয় দেওঘরে ঋষি রাজনারায়ণের নামে একটি পাঠাগার স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিগণের উদ্যোগে স্থাপিত হ'য়েছে।

কঠিন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে ঋষি রাজনারায়ণ প্রায় ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁর দেওঘরের বাটীতে ৩১শে ভাদ্র ১৩০৬ সাল ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর এক কন্যা কবি লজ্জাবতী বসু পিতার মৃত্যুকালীন দৃশ্য দেখে তাঁর ডাইরীতে লিখেছেন—

"মৃত্যুকালে দেখিলাম, মহাপুরুষ বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া যেন কাঁহার আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া, গম্ভীর সৌম্য মূর্ত্তিতে রোগশয্যায় শয়ান আছেন। সাড়া নাই শব্দ নাই, কোন যন্ত্রণা নাই, যেন বাহিরের সব কোলাহল হইতে হৃদয়কে আনন্দে ডুবাইয়া, কি এক অমূল্য রত্ন পাইয়া মহা আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। ঠিক যেন মহাযোগীর মহাভাব। এ কি মৃত্যু না মোহযোগ!"

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ও তাঁর ভ্রাতাগণের সকল বংশধর এক ট্রাষ্ট-ডীড ও দানপত্র সম্পাদন ক'রে তাঁদের বোড়ালের সমুদায় সম্পত্তি রাজনারায়ণ বসু মেমোরিয়াল কমিটি নামক একটি রেজিষ্টার্ড সংস্থাকে দান ক'রেছেন। দুইটি পুষ্করিণী, বসতবাটী ও তৎসংলগ্ন জমী লইয়া একুনে এই দানের পরিমাণ প্রায় চার বিঘা। ইহার মূল্য আনুমাণিক প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। বোড়াল গ্রামবাসিগণের উদ্যোগে ও দেশের দানশীল ব্যক্তিগণের অর্থানুকূল্যে প্রায় দোঁদ্দ হাজার টাকা ব্যয়ে তাঁর স্তুপভুক্ত পৈতৃক বসত বাটীটির উপর একটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মিত হ'য়েছে। এই স্মৃতি-মন্দিরে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং প্রিয়নাথ লাইব্রেরী নামক একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হ'রেছে। এই স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণে সর্ব্ব ভারতীয় সমর্থন লাভ ক'রেছে। ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু, পরলোকগত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরলোকগত ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ও শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এই স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীকৃষ্ণ মেনন, শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী, স্বর্গীয়া সরোজিনী নাইডু, পরলোকগত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীএম, এস, আসে ও শ্রীঈশ্বরদাস জালান প্রভৃতি বহু মনীষী-পদবাচ্য ব্যক্তিগণ এই স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণে সক্রিয় সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এই কমিটির স্থায়ী সভাপতি হলেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আশা করি আজ স্বাধীন ভারতের সেই আদি রাষ্ট্রনায়ক ও প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের ১৩২ তম জন্ম বৎসরে দেশবাসিগণ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করবেন।

সার্থক প্রেম

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত

বিস্মৃতির মুক্ত বাতায়নে
শোন প্রিয় শোন মোর কথা—
সহজের পথে মোর নহে অভিসার
তোমারে পাইনি আমি
সমাজের প্রচলিত গড্ডালিকা পথে।
তা বলে কি মিথ্যা মোর প্রেম?
সত্য শুধু সমাজ নিগড়?
মন্ত্রপড়া বিধির খাঁচায় শুধু প্রেমের বন্ধন?
নহে কভু নহে।
রক্তাক্ত দুর্ব্বাসা চোখে
আমি নহি ধার্ম্মিকের দগ্ধ অভিশাপ,
বিস্মৃতির আবরণে—
ক্লেদকীর্ণ অতীতেরে যত্নে রাখি ঢাকি,
স্মরণের সব গ্রন্থি ছিঁড়ে,

তোমার প্রশস্ত বুকে
যবে সমর্পিনু তনুখানি মোর
নিভৃত নিরালায়,
ঝঞ্চা-ক্ষুব্ধ হৃদয়ের উদ্বেল আবেগ—
প্রশান্ত সমুদ্রে মিশে হারাইল সব চঞ্চলতা।
ছন্দের বন্যায় ঝঙ্কারি উঠিল মোর
হৃদয়ের ছিন্ন তারগুলি।

ক্লান্ত সন্ধ্যার দিক্ চক্রবাল—
হল উদ্ভাসিত নবারুণ রাগে,
জীবনের বদ্ধ বাতায়ন
খুলে গেল দক্ষিণ সমীরে।
উন্মীলিত হোল মোর হৃদয়ের অন্ধ শতদল
প্রশান্তির অনাবিল প্রেম প্রলেপনে।

অমৃত পুরাণ কথা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

—পাঁচ—

নিজ হস্তে রণসজ্জায় সুসজ্জিত ক'রে দানবরাজ শঙ্খচূড়কে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন তুলসী। কিন্তু এ কি! চিত্ত এমন অস্থির হয় কেন? কেন এমন অমঙ্গল চিন্তা সারা মনে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ছে! অশ্রুসজল নেত্রে তুলসী কেবলই স্বামীর চরণ ধ্যান করতে লাগলেন।

এদিকে দৈত্যরাজ শঙ্খচূড় সংখ্যাতীত সুশিক্ষিত সৈন্য সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে উপনীত হলেন। এ-স্থান কপিলমুনির তপস্যার স্থান। মহাপবিত্র। এর পশ্চিমসীমা—পশ্চিম সাগর, পূর্বসীমা—মলয় পর্বত, দক্ষিণসীমা—শ্রীশৈল, উত্তরসীমা—গন্ধমাদনপর্বত। এ-স্থানে প্রস্থে পঞ্চযোজন ও দৈর্ঘ্যে শতযোজন বিস্তৃত সলিলসম্পন্না শাশ্বতী পুষ্পভদ্রা-নদী প্রবাহিতা। পুষ্পভদ্রা হিমালয় থেকে নির্গতা হয়েছে এবং শরাবতীর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে গোমতী নদীকে বামভাগে রেখে পশ্চিম সাগরে নিঃশেষে মিশে গেছে।

শঙ্খচূড় সেখানে গমন করলেন। দর্শন করলেন—বিশাল বটবৃক্ষ-তলে উপবিষ্ট কোটিসূর্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন চন্দ্রশেখরকে। ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান আনন্দযুক্ত চন্দ্রশেখর যোগাসনে উপবিষ্ট। তাঁর বর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিকশুভ্র। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। তিনি শ্রীকরে ত্রিশূল, কুঠার এবং মস্তকে তপ্তকাঞ্চনতুল্য জটাজাল ধারণ ক'রে আছেন। প্রশান্ত মনোহর মূর্তি তাঁর। তিনি গৌরীকান্ত। ভক্তানুগ্রহতৎপর আশুতোষের বদনমণ্ডল প্রসন্ন হাস্যে রঞ্জিত। জ্ঞানানন্দ সনাতন শংকরকে দর্শন করলেন শঙ্খচূড়। দর্শন করলেন শংকরের বামপার্শ্বে মহাদেবী ভদ্রকালিকাকে এবং দেবসেনাপতি ময়ূরবাহনকে। দর্শনমাত্র রথ হতে অবতরণ করলেন দানবরাজ। তারপর সমুদয় সৈন্যসহ ভক্তিসহকারে দণ্ডবৎ হ'য়ে প্রণাম করলেন।

ভগবান মহাদেব প্রসন্ন মনে তাঁকে স্বীয় সমীপে আহ্বান করে মধুর স্বরে বলতে লাগলেন: শঙ্খচূড়, তোমার জন্মবৃত্তান্ত নিশ্চয়ই অবগত আছ। তুমি অবশ্যই জান, দানব দম্ভ শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবংতিনি সুদীর্ঘকাল পুষ্কর-তীর্থে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরমমন্ত্র জপ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের বরে তোমায় তনয়রূপে প্রাপ্ত হন? পূর্বে তুমি অষ্ট-গোপের অগ্রগণ্য পরম ধার্মিকগোপ ছিলে। তুমি ছিলে শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়। কিন্তু শ্রীরাধার অভিশাপে তোমার এইজন্ম লাভ সম্ভব হয়েছে। তুমি পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ব্যক্তি আব্রহ্ম সমস্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন। বৈষ্ণবের নিকট ইন্দ্রত্ব সুরেন্দ্র সামান্য, তাঁরা ব্রহ্মত্ব অমরত্ব পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন। সুতরাং রাজন, কি কারণে পরম কৃষ্ণভক্ত হয়েও তোমার—দেবতাদের ভ্রমাত্মক বিষয়ে এতাদৃশ আগ্রহ? শোন, এক্ষণে তুমি তাঁদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করে আমার প্রীতি সম্পাদন কর। তুমি সুখে স্বরাজ্য পালন করো। দেবগণও স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠান করুন। তোমরা সকলেই কশ্যপের বংশজ। পরস্পর ভ্রাতৃবিরোধ কর্তব্য নয়। অবশ্য এতে সম্পদের ও সম্ভ্রমের কিঞ্চিত হানি বোধ করতে পার! কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বিবেচনা করা উচিত যে, সকল অবস্থা সমভাবে অতীত হয় না। প্রাকৃতিক লয়ে ব্রহ্মারও তিরোভাব হয়। আবার প্রয়োজনে তাঁর আবির্ভাব হয়। লয় এবং আবির্ভাব, সুখ এবং দুঃখ, শান্তি এবং অশান্তি চক্রবৎ সমস্ত জীবের জীবনে ঘূর্ণায়মান। সূর্য উদয় হন আবার অস্ত যান। চন্দ্র শুক্লপক্ষে সম্পদযুক্ত আবার কৃষ্ণপক্ষে ম্লান। ইন্দ্রও কালে সম্পদশালী এবং কালভেদে ভ্রষ্টশ্রী। বলিরাজ বর্তমানে শ্রীভ্রষ্ট হ'য়ে সুতলে বাস করছেন। তিনিই আবার একদা ইন্দ্রত্বলাভ করবেন।—তাই বলি শঙ্খচূড়, জ্ঞাতিদ্রোহ পরিত্যাগ করো। দেবতাদের রাজ্য দেবতাদের প্রত্যর্পণ করো। বৃথা যুদ্ধে প্রাণীহত্যা করো না। বৈষ্ণবের হিংসা লোভ অহংকার মহাপাপ।

কিয়ৎকাল নীরব থেকে শঙ্খচূড় বিনয়পূর্বক বললেন: দেব, আপনি যা ব্যক্ত করলেন সমুদয় সত্য—প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু তথাপি আপনার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনার সময় কিঞ্চিৎ হরণ করবো ক্ষমা করবেন। জ্ঞাতিদ্রোহ মহাপাপ যদি—তবে কিজন্য সর্বস্ব গ্রহণ করে বলিরাজকে পাতালে প্রেরণ করা হ'ল? হে ঈশ্বর, সেই গদাধরও যা উদ্ধার করতে সমর্থ নন, আমি সুফল থেকে সেই সমস্ত উত্তম ঐশ্বর্য বহুক্লেশে, বহু যত্নে উদ্ধার করেছি। আর বলুন, দেবগণ কি কারণে সভ্রাতৃক হিরণ্যাক্ষ ও শুম্ভাদি অসুরগণকে সংহার করলেন? পূর্বে সমুদ্র মন্থন কালে সুরগণ অমৃত ভোজন করলেন, আর আমরা কেবল ক্লেশের ভাগী হলাম। প্রভু, এই বিশ্ব, মূল প্রকৃতিরূপী পরমাত্মার ক্রীড়াভাণ্ড, তিনি যে সময় যাকে যেরূপ ঐশ্বর্য প্রদান করেন তিনি সেই সময় সেই রূপ ঐশ্বর্যের ভোগী হন। বারংবার দেব-দানবগণে রণ পরস্পর হিংসা ও বিবাদবশতই হ'য়ে থাকে; কিন্তু উভয়ের জয়পরাজয় ভাগ্যের পরে নির্ভরশীল। আমাদের এই বিরোধে আপনার আগমন নিষ্ফল। কারণ আপনি মহাত্মা ঈশ্বর এবং আমার আত্মীয়শ্রেষ্ঠ ও বন্ধু। আপনার প্রথমতঃ লজ্জার বিষয় এই যে, আমাদের সহিত যুদ্ধে যদ্যপি পরাজয় ঘটে,তবে তা আপনার অকীর্তি ঘোষণা করবে।

ত্রিলোচন হাসলেন এবং সস্নেহে দানবরাজের মস্তকে হস্তার্পণ করলেন।

: শঙ্খচূড়, তোমরা ব্রহ্মবংশোৎপন্ন। তোমাদের সহিত যুদ্ধে পরাজয় ঘটলে আমার লজ্জার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আর বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। হয় দেবতাগণের রাজ্য পরিত্যাগ করো, আর না হয় আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও। আর বৃথা কালক্ষেপের প্রয়োজন নাই।

শঙ্খচূড় পুনর্বার ভক্তিসহকারে অবনত মস্তকে মহাদেবকে প্রণাম করলেন। তারপর অমাত্যগণের সঙ্গে গাত্রোত্থান করলেন।

অতঃপর শংকর তৎপর হলেন। তিনি নিজ সৈন্য ও দেবতাগণকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করলেন। দানবরাজ সসৈন্যে সংগ্রাম আরম্ভ করলেন।

তুমুল সংগ্রাম শুরু হ'ল। সে সংগ্রাম বর্ণনাতীত। দেবতা-দানবের রণ! মহাপরাক্রমশালী দানব সৈন্যগণ ভয়ংকররূপে আক্রমণ করলো দেবতাবৃন্দকে। দেবতাগণ সে আক্রমণে অস্থির হ'য়ে পড়লেন। দানবদের সংগ্রাম প্রতিরোধ অসম্ভব হ'য়ে পড়লো দেবতাগণের পক্ষে। ক্রমেই দেবতাগণ ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়তে লাগলেন। পলায়িত হলেন অনেকে। ক্ষতবিক্ষত দেহে ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাদেবের সকাশে বিষণ্ণ-বদনে এসে দাঁড়ালেন।

প্রশান্ত হাস্যে তখন মহাদেব, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়কে যুদ্ধ-গমনের আদেশ করলেন। কার্তিকেয় রণে অবতীর্ণ হয়ে ভীষণ সংগ্রাম শুরু করলেন। বাণে বাণে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। দানবরা এবার প্রমাদ গণলেন। কতো দানবের তপ্ত রুধিরে রঞ্জিত হয়ে গেল রণক্ষেত্র। ত্রাস কম্পিত কলেবর দানবগণ যথেচ্ছ পলায়ন করতে লাগলো। আর্তের চীৎকারে রণস্থল শিহরিত হতে লাগলো। এমন সংগ্রাম কল্পনারও অতীত।

এতাবৎ নিশ্চেষ্ট হ'য়ে স্বর্ণরথের উপর দানবরাজ শঙ্খচূড় আরাম-আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু আর নয়। ময়ূরবাহনকে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। নচেৎ একটি দানব সৈন্যও বুঝি আর জীবিত থাকবে না।

শঙ্খচূড় গাত্রোত্থান করলেন। সরবে আশ্বাস প্রদান করলেন আপন সৈন্যদের। তারপর নিজে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

আকাশ অন্ধকার, বাতাস স্তব্ধ। সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়। দেবতা-মণ্ডলী শঙ্কিত, দানবকুল ভীতত্রস্ত।

মহাদেব কিন্তু তেমনি শান্ত, তেমনি নির্বিকার তেমনি যোগাসনে আত্মভোলা উপবিষ্ট।

শঙ্খচূড় রথভ্রষ্ট হলেন। রথভ্রষ্ট হলেন কার্তিকেয়।

শিবনন্দনের বাণের প্রহারে কখনো শঙ্খচূড় সংবিৎ হারা হ'য়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলেন, কখনো শঙ্খচূড়ের বাণের প্রহারে জর্জরিত হ'য়ে শিবনন্দন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হ'তে লাগলেন। শঙ্খচূড় এক মহা শক্তিশালী বাণের সন্ধান করলেন। বিষ্ণু দত্ত বাণ। সে বাণ বৈষ্ণব তেজে তেজীয়ান। সহস্র সূর্যের প্রভায় যেন প্রভান্বিত। চতুর্দিকে অগ্নি বিচ্ছুরণ করতে করতে সে ভয়ংকর বাণ কার্তিকের প্রতি প্রধাবিত হ'ল। দেবসেনাগণ প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল আর্তনাদ করে উঠলেন। পলায়নের পথ নাই। চারিদিকে যেন প্রজ্জ্বলিত হুতাশন প্রাচীর নির্মাণ ক'রে দিয়েছে। এবার বুঝি দেবতাগণের অমরত্ব অবলুপ্ত হয়। আর দেব সেনাপতি কার্তিকেয়? তিনি প্রাণপণে সে বাণের গতি নিবারণ করার প্রয়াস ক'রে নিরাশ হ'লেন। সবেগে এবং সশব্দে সে-বাণ এসে তাঁর বীরবক্ষে পতিত হ'ল। বিলুপ্তচৈতন্য হ'য়ে তিনি মৃতবৎ মৃত্তিকার আশ্রয় নিলেন। দেবপক্ষে হাহাকার উত্থিত হ'ল।

ভয়ংকরী ভদ্রকালী নক্ষত্র বেগে ধাবিত হ'য়ে এলেন ধরাশ্রয়ী বাণ-স্পৃষ্ট মৃতকল্প পুত্রের সকাশে। ত্বরিতে পুত্রকে বক্ষে তুলে দিগম্বরী রণক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে দেবাদিদেব শংকরের নিকট আগমন করলেন।

ভগবান শংকরের স্নেহ-কটাক্ষে মুহূর্তে ময়ূরবাহন চেতনাপ্রাপ্ত হলেন। অতঃপর পুত্রকে বিশ্রামের অবকাশ দান ক'রে ভদ্রকালী নিজে রণে অবতীর্ণা হলেন।

দূর হ'তে জগন্মাতা ভৈরবী দেবীকে দর্শন ক'রে দানবরাজ ত্বরান্বিত হ'য়ে রথ হ'তে অবতরণ করলেন এবং পরম ভক্তিসহকারে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জ্ঞাপন করলেন। প্রণাম সমাপনান্তে তৎক্ষণাৎ পুনরায় রথারোহণ ক'রে সমরে প্রবৃত্ত হলেন।

প্রচণ্ড বিক্রমে রুদ্রাণী ভয়াবহ সংগ্রাম করতে আরম্ভ করলেন। দানব সেনাগণ প্রাণ ভয়ে পলায়ন তৎপর হ'ল। দানবদলনী অবশেষে বহু দানবের প্রাণ সংহার ক'রে শঙ্খচূড়কে আক্রমণ করলেন।

শঙ্খচূড়ের রথাশ্ব নিহত হ'ল। রথভগ্ন হ'ল। তিনি ভূমিতে দণ্ডায়মান হ'য়ে শংকরীর সংগ্রাম সংবরণ করতে লাগলেন।

পরিশেষে সন্ধ্যা সমাগমে যুদ্ধের বিরতি ঘোষিত হ'ল।

শংকরী শংকর সমীপে আগমন ক'রে বললেন: বহু দানব দলন করেছি আমি। আর সামান্যই বর্তমান আছে। কিন্তু শঙ্খচূড় অতিশয় ধার্মিক দানব। সে আমার প্রতি কোনো বাণ নিক্ষেপ ক'রে নাই, কেবল আমার নিক্ষিপ্ত বাণ সকল প্রতিরোধ করার প্রয়াস পেয়েছে। আমি তার অশ্বসকল নিহত করেছি, হস্তীগুলি সংহার করেছি। তার রণরথ ভগ্ন করেছি। যথেচ্ছ ক্লেশ প্রদান করেছি। অবশেষে বাহুযুদ্ধে তাকে আহ্বান ক'রে যৎপরনাস্তি প্রহার করেছি। কিন্তু আশ্চর্য, মহাধার্মিক দানবরাজ অশেষ পীড়ন সহ্য করেও আমার প্রতি রোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করে নাই বা আমাকে পীড়ন করার এতোটুকু চেষ্টা করে নাই। শুধুমাত্র আপনাকে রক্ষা করারই প্রয়াস করেছে। সহস্র দৈহিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও অধৈর্য হয় নাই কিংবা আমার প্রতি শ্রদ্ধার শৈথিল্য ঘটে নাই। আমি তাকে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করেছি, লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় সে আমার পদতলে সবেগে পতিত হয়েছে। সংজ্ঞা লুপ্ত হয়েছে তার। কিন্তু সংজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র আমাকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করে পুনরায় আমার নির্যাতনের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে।

মহাদেব স্মিত আননে নীরবে ভদ্রকালীর রণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করলেন। তারপর ধীর মধুর স্বরে প্রশ্ন করলেন: তথাপি দেবতাকুলের অরাতি দানব শঙ্খচূড় নিধন সম্ভব হ'ল না?

—না। কারণ, যে মুহূর্তে আমি মন্ত্রপূতঃ পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ করতে যাবো শঙ্খচূড়ের প্রতি, তৎক্ষণাৎ দৈববাণী হল—দেবী ও অস্ত্র সংযত করুন। মহাত্মা দানবরাজের মৃত্যু পাশুপতাস্ত্রে হবে না। যাবৎকাল শঙ্খচূড়ের কণ্ঠে হরি-কবচ বিদ্যমান থাকবে এবং দানবপত্নী তুলসী দেবীর অঙ্গ অন্য কোনো পুরুষ দ্বারা স্পর্শিত না হবে, তাবৎ-কাল দানবেশ্বরের নিকট জরা মৃত্যু পরাভূত হবে এবং দানবরাজ একমাত্র ভগবান শংকর ব্যতীত কারো বধ্য নয়। তাও নির্দিষ্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং আমি অস্ত্র সংবরণ করতে বাধ্য হলাম।

হাস্য করলেন মহাদেব। তেমনি হাস্য সহকারেই প্রশান্ত উদার স্বরে বললেন: আমি জানি। দানব শঙ্খচূড়-সংহার সহজসাধ্য নয়। কল্য আমি স্বয়ং দানবযুদ্ধে গমন করবো। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভাষা-সমস্যা

শ্রীমতিলাল দাশ এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি

রতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর সর্ব্বভারতীয় একটী রাষ্ট্রভাষার য়োজন একান্ত জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের শাসনতন্ত্রে হিন্দীকে ষ্ট্রভাষায় আসন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে চারিদিকে হিন্দী ষার বিরুদ্ধে প্রবল আক্রোশ সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহা অকারণ নহে যদি শান্ত, সংহত, ঐক্যবদ্ধ মহাভারত আমরা গড়িতে চাই, তাহা ইলে হিন্দীকে রাষ্ট্র ভাষা করা চলিবে না।

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কেরা অধীরবুদ্ধি, ক্ষমতার অতিদর্পে তাহারা ত্যর সহজ রূপকে দেখিতে পাইতেছেন না। ভারত-বিভাগ মাদের জাতীয় জীবনে এক পরম ভ্রান্তি—সংকীর্ণতার আবেগে, ক্ষমতার র্ষার লোভে এবং ভেদবুদ্ধির দানবীয় উন্মত্ততায় খণ্ড ভারতের সৃষ্টি। দেশী শাসক লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছিলেন—ভারত-বিভাগ অসম্ভব— রতকে যে ভাবে ভাগ করা হইয়াছে, তাহা অযৌক্তিক, অন্যায়। টিশ কূটনীতির অসহ চক্রান্ত।

জিন্নার কথা বুঝিতে পারি—তিনি বলিয়াছিলেন—হিন্দু ও মুসলমান ই জাতি, দুই জাতির জন্য দুই রাষ্ট্র চাই। আমাদের কংগ্রেসী কর্তৃ- ক্ষ এই দ্বিজাতিতত্ত্ব মানিয়া লইয়াছেন, কারণ তাহারা ভারত বিভাগে মত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে আজ ৪ কোটীর অধিক মুসলমান খে ও স্বচ্ছন্দে এবং হিন্দুদের চেয়ে পরম সমাদরে আব্দার করিতেছেন। তএব দ্বিজাতিতত্ত্ব আমরা বাস্তবে মানি নাই—দ্বিজাতিতত্ত্ব আমরা নে প্রাণে স্বীকার করি নাই।

কিন্তু একান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়—এই কথাটি আমাদের রাষ্ট্র- নতারা কেহ কখনও প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না—কারণ তাহা হইলে াহাদের বলিতে হইবে যে, পাকিস্থান থাকা অসম্ভব—ভারতবর্ষের নসর্গিক চতুঃসীমা একান্তভাবে ভারতবর্ষেরই—তাহাকে বিভাগ করা বাস্তব, অন্যায় এবং সেই অন্যায় চলিতে পারে না। কিন্তু বৃটিশের দাঘাত ও লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করিবার কোনও আয়োজন কোথাও নাই। ত্যমেব জয়তে আমাদের প্রতীক—কিন্তু সত্য ভাষণের এবং সত্য চারের সৎসাহস দেশের কুত্রাপি নেই।

ভারত-বিভাগ বিদেশীয় চক্রান্তের ফল, আমরা চক্রান্তপ্রসূত এই বভাগ মানিব না—কিন্তু তাহারা একথা বলিতে সাহসী নন। দিল্লীর সনদে বসিয়া যে আরাম, যে ভোগসুখ, যে ক্ষমতার গর্ব্ব আজ াহারা পাইয়াছেন, কোনও সত্যের জন্য তাহারা তাহা বিসর্জ্জন দিতে রেন না।

এই প্রসঙ্গে আমার সেই চীনা গল্পটি মনে পড়িতেছে। "এক পরম ত চান সম্রাটকে আসিয়া বলিল—'মহারাজ! আমি আপনার জন্য কটা অপূর্ব্ব কাপড় বুনিয়া দিব—আপনার সম্মুখে বুনিব—মণিমুক্তা হীরকে বিচিত্র এই বস্ত্র—কিন্তু যে পাপী, যে অন্যায়কারী সে দেখিতে পাইবে না। তারপর ধূর্ত্ত সম্রাটের সম্মুখে বসিয়া মিথ্যামিথ্যি তাঁত চালাইয়া যায়, কখনও কাপড় বোনে না—অথচ দিনের পর দিন রাজকোষ হইতে মণিমুক্তাদির মূল্য বাবদ বহু অর্থ নিতে থাকে। সদস্যেরা কেহই কাপড় দেখিতে পায় না—কিন্তু দুর্নামের ভয়ে কেহই সত্য কথা বলিতে সাহসী হয় না। একদিন একটী ছোট বালক পিতার সহিত সভায় আসিয়া কাপড় দেখিতে গিয়া বলিয়া উঠিল—"কই, কোথাও ত কাপড় নেই?" তাহার কথায় সকলের চমক ভাঙ্গিল—সকলেই তখন ধূর্ত্তকে আক্রমণ করিল এবং সে দুষ্ট শাস্তি ভোগ করিল।

সেই বালকের মতই বলিব—দ্বিজাতি কোথায়? অতএব পাকিস্থান- সৃষ্টি একটী প্রকাণ্ড কৌতুক—একটী প্রহসন। সেই প্রহসনের শেষ হউক—বহুজনে বহু দুঃখ বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াছে। সেই লাঞ্ছনার প্রতীকার হউক।

কিন্তু আমি জানি, ভোগ-লোলুপ আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা এই সত্য, এই যথার্থ পথ গ্রহণ করিবেন না। তেমনই হিন্দী ভাষা প্রবর্ত্তনের মধ্যে যে অন্যায়, যে অভিসন্ধি দেখা যাইতেছে—তাহা হইতেও তাহারা প্রতি- নিবৃত্ত হইবেন না।

দেশে আড়ম্বর ও আস্ফালন যথেষ্ট হইতেছে, কিন্তু আসলে কোনই কাজ হইতেছে না। অনাচার, কুশাসন এবং নির্য্যাতনের ধূমায়িত বহ্নির মত বিদ্রোহের অগ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে—একদিন তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে এবং ক্ষমতাদৃপ্ত বর্ত্তমানের ধ্বংস করিয়া বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়শীল সত্যনির্ভর মহাভারত গড়িবে।

সেই মহাভারতের যোগসূত্র কি হইবে? অতীতে যে যোগসূত্র ছিল—সেই যোগসূত্রই অসীমগৌরবে দ্যুতিময় অসীম মহিমা প্রকাশ করিবে। অতীত ভারতবর্ষে সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছিল দেব- ভাষা সংস্কৃত—ভারত-ধর্ম্ম, ভারত-সভ্যতা এবং ভারত-সংস্কৃতির ধারকও বাহক সংস্কৃত ভাষা। প্রত্যেক স্বাধীন এবং বিবেকবান ভারতবাসীকে তাই সংস্কৃত শিখতে হবে, সংস্কৃত না শিখিলে কেহই চিন্ময় ভারত-আত্মার দর্শন পাইতে পারে না, ভারত অমৃত বিদ্যায় ভাস্বর এবং বলীয়ান হইতে পারে না।

ভারতবর্ষ যদি তাহার ঐতিহ্য, যদি তাহার বৈশিষ্ট্যকে না জানে, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা ব্যর্থ, ভারতের এই মুক্তি মুক্তি নয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে তিনি ভারত-সংস্কৃতি নামক কোনও সংস্কৃতিকে চেনেন না, জানেন না। তিনি না জানুন, না চিনুন, ক্ষতি নাই। চল্লিশ কোটি ভারতীয় নাগরিকের মধ্যে তিনি মাত্র একজন নাগরিক। অতীতে অনেক কালাপাহাড় জন্মিয়াছিল—

তাহাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিয়া ভারত-ভারতী বাঁচিয়া আছেন—জহরলালের দাম্ভিকতা এবং ভারত-সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা তাহার ক্ষমতা লোপের সঙ্গে সঙ্গেই লোকে ভুলিয়া যাইবে, কিন্তু ভারতের দিব্য সাধনা এবং সৃষ্টি যেমন শত বিবর্ত্তনে বাঁচিয়া আছে—তেমনই বাঁচিয়া রহিবে, বরং নবজাগ্রত শক্তিভাবপ্রবাহে ভারত-সংস্কৃতি নবরূপে রূপায়িত হইবে এবং অতীতে যেমন একদিন জগজ্জয় করিয়াছিল ভবিষ্যতেও তাহা করিবে।

শাসন তন্ত্র যে চৌদ্দটি ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে—সেই সব ভাষা সেই সেই প্রদেশে আত্মগঠন এবং আত্মোপলব্ধির প্রকৃষ্টতম বাহন হইবে। প্রত্যেক স্বাধীন ভারতীয় নাগরিক তাই আপন মাতৃভাষা শিখিবে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমেই আত্ম-বিকাশের প্রয়াস করিবে। মাতৃভাষার পর সামগ্রিক ভারতীয়তার জন্য তাহাকে সংস্কৃত ভাষা শিখিতে হইবে। সংস্কৃত ভাষাকে সরল, সহজ ও সুগম করিয়া শিক্ষা দিলে অচিরেই সংস্কৃত ভারতের Linga Franca হইবে এবং তাহাতে কাহারও গাত্রদাহ হইবে না—ভারতের সকলেই তাহাদের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ভাষা, ঐক্য, সংহতি এবং সাংস্কৃতিক অভ্যুদয় ঘটাইয়াছে, তাহাকে সমাদরে মানিয়া লইবে।

হিন্দী ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হইলে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা নহে, তাহারা রাষ্ট্রের প্রত্যেক বিভাগে হিন্দী-ভাষীর তুলনায় গুণশালী হইয়াও পদে পদে লাঞ্ছিত হইবেন—তাহাদের প্রগতির চেষ্টা ব্যাহত হইবে। তখন দক্ষিণ ভারতবর্ষ বা পূর্ব্ব ভারতবর্ষ থাড়ি বোলি হিন্দীর এই প্রাধান্য কিছুতেই মানিবে না—তাহারা বিদ্রোহ করিবে এবং ভারতবর্ষ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইবে।

কিন্তু শুধু মাতৃভাষা এবং সংস্কৃত শিখিলেই আমাদের চলিবে না। আজ বিশ্বজগৎ পরস্পরের অতি নিকট হইয়াছে—সর্ব্বমানুষের সান্নিধ্য আজ ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে। তাই আন্তর্জাতিক মিলনের ক্ষেত্রে এবং লেনদেনের ব্যবসায়ে ইংরেজীই একমাত্র ভাষা। ইংরেজ গিয়াছে যাউক, কিন্তু তাহার সর্ব্বতোভদ্র ভাষা, তাহার প্রবৃদ্ধতম সাহিত্যকে বর্জ্জন করিবার আদৌ হেতু নাই। আমি নিজে বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরেজী ভাষা মাত্র জানি—সারা দুনিয়ায় ঘুরিয়াছি, কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই পৃথিবীর দেশে দেশে ভারতের শাশ্বত বিদ্যা, ভারতের অমৃতধনকে অন্যদেশের মানুষের কাছে বিতরণ করিয়াছি।

আমরা যদি আজ হঠকারিতায় ইংরেজী ভাষাকে বর্জ্জন করি, তাহা হইলে আমরা মধ্যযুগীয় মনোভাবে আড়ষ্ট হইয়া চলমান বিশ্ব-সংস্কৃতি হইতে অধঃপতনের নিম্নতম খাদে নামিয়া যাইব। বিজ্ঞান-যন্ত্র-বিদ্যা সর্ব্বজাগতিক বিদ্যা গঠন ও পঠনে, অনুশীলন এবং অধিগমে অক্ষম হইয়া পশ্চাৎগামী হইব। অতএব যিনি যাহাই বলুন, প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিবান্ মানুষ স্বীকার করিবেন যে তিনটি ভাষা শেখাই যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য। ইংরাজী ও হিন্দী ভাষা শেখা একান্ত ভার হইবে এবং অকারণে এই ভার আমরা বহন করিব না।

দেশ আজ ভয়ে কাতর। স্বাধিকার আমাদের দেয়নি—সত্যভাষণের দৃঢ়তা; লোভ এবং আত্ম-স্বার্থবোধের বিরাট পিপাসা জাতীয় চরিত্রকে কলঙ্কের দুরবগাহ পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছে এবং করিতেছে—। সেই কলঙ্ক মুছিয়া সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক নাগরিকেরা বলুন—ক্ষমতাদৃপ্ত মুষ্টিমেয়ের খামখেয়ালি চলিবে না। জনসাধারণ যাহাদিগকে আজ মর্য্যাদার সিংহাসনে বসাইয়াছে—তাহারা যদি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হন, তাহারা যদি প্রাদেশিকতার মোহে অন্যায় করেন—তাহাদিগকে আসন ত্যাগ করিতে হইবে। আজ তাহাদের দর্প, তাহাদের ক্ষমতার নিরঙ্কুশ প্রভাব তাহাদিগের অন্যায়কে ক্ষণিকের জ্যোতি দিলেও, মহাকাল তাহা মানিবেন না। মাত্র একটি ভোটের জোরেই সংস্কৃতকে গ্রহণ না করিয়া হিন্দীকে সংবিধান সভায় রাষ্ট্রভাষা রূপে নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল। সেই নির্ব্বাচন অসঙ্গত ও অন্যায় হইয়াছে। আমরা বলিব অবিলম্বে সংবিধানের সংশোধন হউক। সংস্কৃত ভাষাই ভারতের সংস্কৃতির ভাষা। স্বতস্ফূর্ত্ত ও সর্ব্বব্যাপী প্রভাবের দ্বারা সংস্কৃতই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে। অতএব কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ হইতে সারা ভারতবর্ষে সংস্কৃতের পঠন ও পাঠন, প্রচার এবং ব্যাপক অনুশীলনের জন্য মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় হউক।

যতদিন না সংস্কৃতকে আমরা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য জাতীয় ভাষায় পরিণত করিতেছি, ততদিন ইংরেজীই আমাদের সহকারী ভাষা হইবে। হিন্দীর জন্য যে অর্থ রাজকোষ হইতে ব্যয় হইতেছে তাহা অপব্যয়। সে ব্যয় অচিরেই বন্ধ করা হউক।

বহু ভাষা, বহু ধর্ম্ম, বহু ভাবধারণের সমন্বয়ে গঠিত এই বিচিত্রদেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু Renou র কথাটি যেন আমরা মনে রাখি—

There is no living culture without a living tradition. If India is beloved and cherised among the elite of the west, it is on account of her traditional culture. And this culture is embodied above all in the treasure of Sanskrit. Sanskrit and India are inseperably connected inspite of all the transitory harangues of the politicians.

আমরা যাহারা সংস্কৃতির উপাসক ও ভক্ত—রাজনীতির কলকোলাহল যাহাদের অসহ্য—তাহারা আজ একত্র হইয়া তারস্বরে বলিব—রাজনীতিকের বিবদমান কণ্ঠকে নীরব করিয়া ভারতের স্বতন্ত্রা প্রজ্ঞা অম্লান অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যে প্রোজ্জ্বল রহিবে। সেই প্রজ্ঞার প্রকাশ সংস্কৃত ভাষায়। সেই ভাষাই রাষ্ট্রভাষায় একমাত্র উত্তরাধিকারী—হিন্দীকে নিয়ে যে মাতামাতি, তাহা শুধু জল ঘোলাই করিবে—সে মন্থনে কোনও অমৃতের কমল উঠিবে না, বরং সংস্কৃতকে মন্থন করিলে অমৃতের সুধারসে জাতির হৃদয় সুস্থ, সবল ও চির সংস্কৃত রহিবে।

পরিকল্পনা ও রাস্তাঘাট

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকে, কি সাংস্কৃতিক, কি সামাজিক, কি প্রশাসনিক, কি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবহন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে। আমাদের মত এই বিশাল অনগ্রসর উপমহাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল রূপায়নের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তৃতি অপরিহার্য। কোন দেশেরই আর্থিক উন্নতি সম্ভব নয়, যদি সেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ না থাকে। পরিবহন ব্যবস্থা সেই যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার অন্যতম সহায়ক। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তৃতি ও উন্নতির প্রয়োজনীয়তা পরিকল্পনা কমিশনেরও যথাযথ স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যার জন্য আমরা দেখ্‌তে পাই এইখাতে সমগ্র পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত ব্যয়ের একটা মস্ত বড় অংশ নির্দ্ধারিত হয়েছে।

গত তিন শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবহনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে আমরা দেখ্‌তে পাই, খাল-খনন ইত্যাদি জলপথের প্রভূত উন্নতি বিধান করে নৌকা জাহাজ চলাচলের সুবিধা করে দিয়ে ফরাসীবাসীর অর্থনৈতিক জীবনে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে আবার আমরা যুক্তরাজ্যে দেখ্‌তে পাই রেলপথের উন্নতি সাধন করে স্থলপথে যাতায়াতের ও মাল চলাচলের সুবিধা করে দিয়ে ইংরাজ জাতি শিল্প বিপ্লব তথা এক অর্থনৈতিক বিপ্লব আনতে সক্ষম হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে অনুরূপভাবে আমরা দেখি মোটরগাড়ী প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র রাস্তাদির আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উন্নতি বিধান করে শিল্প জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে শিল্পের অভূতপূর্ব্ব বিকাশ সাধন করে। পরিবহনের এই রাস্তাদির অভাবিত প্রসারই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান কারণ—একথা আজ সর্ব্ববাদীস্বীকৃত। আমাদের মত অনগ্রসর দেশের কাছে গল্প বলে প্রতিভাত হবে যে গত ৫০ বছরে সে দেশে (যুক্তরাষ্ট্রে) ৩০, লক্ষ মাইল রাস্তা নির্ম্মিত হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা (রেলগাড়ী প্রভৃতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে এবং স্বল্প সময়ে) অব্যাহত রাখতে—মোটরগাড়ী চলাচলের সুবিধার জন্য।

ভারতবর্ষে আজ শিল্পও কৃষি উন্নয়নের জন্য তথা সমগ্র জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের জন্য পরিবহনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ রাস্তাঘাটের উন্নতি ও বিস্তৃতি অত্যাবশ্যক। এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই ১৯৫০ সালে আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম কেন্দ্রীয়সরকারের অধীনে Central Road Research Institute (কেন্দ্রীয় রাস্তানির্ম্মাণ গবেষণাগার) স্থাপিত হয় এবং যার অনুকরণে বিভিন্ন রাজ্যসরকারও Road Research Laboratory স্থাপন করেছে এবং আরও করছে। আমাদের দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও 'রাস্তাঘাট' (Road) বিকাশের দিক দিয়ে কত পেছনে পড়ে আছে নিম্নলিখিত বিভিন্ন দেশের রাস্তাঘাটের মাইলের হিসাব থেকেই জানা যাবে :—

দেশ	লোক	মাইল
যুক্তরাষ্ট্র	১০০০০০	১,৮৩৪
ফ্রান্স	"	১,৫০২
যুক্তরাজ্য	"	৩৮৪
স্পেন	"	২৫১
ইরাক	"	২৪২
সিংহল	"	১১৫
মালয়	"	১১০
ফিলিপাইন	"	৮৭
ভারত	"	৮২

আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম রাস্তাঘাট বিকাশের সর্ব্বভারতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ১৯৪৩ সালে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরে। নাগপুরে গৃহীত পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল সেদিন দুইলক্ষ কুড়ি হাজার মাইলের দৈর্ঘ্যকে বাড়িয়ে তিনলক্ষ একত্রিশ হাজার মাইল দৈর্ঘ্যে উপনীত করা। কিন্তু এই পরিকল্পনা পরিকল্পনাই থেকে যায় বিদেশী শাসকবর্গের উদাসীনতার জন্য। কারণ বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর যতটা লক্ষ্য ছিল শোষণের দিকে—জাতীয় উন্নয়নের দিকে ততটা নয়। তাই আমরা দেখি প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে এই পরিকল্পনার কোন বাস্তব রূপদান সম্ভব হয় নাই। স্বাধীনোত্তর কালে আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গ জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম উপায় হিসাবে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এইদিকে দৃষ্টি দিতে সুরু কর্লে'ন। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা কালে যোগাযোগও পরিবহন খাতে ৫৫৮ কোটী টাকা অর্থাৎ পরিকল্পনার মোট বিনিয়োজিত অর্থের শতকরা ২৪ভাগ নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং তারমধ্যে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য ব্যয়িত হয়েছিল ১১৫ কোটী টাকা। প্রথম পরিকল্পনা থেকে রাস্তাঘাটের আশানুরূপ উন্নতি না হলেও তুলনামূলকভাবে যে লক্ষ্যণীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছিল নিম্নের হিসাব থেকেই তা জানা যাবে :—

	বাঁধানো পাকারাস্তা (Surfaced) মাইল	কাঁচা রাস্তা (Un Surfaced) মাইল	মোট (Total) মাইল
১৯৪৩-৪৪—	৮৮,০০০	১৩২,০০০	২২০,০০০
১৯৫০-৫১—	৯৭,৫৪৬	১৫০,৯৬৩	২৪৮,৫০৯
১৯৫৫-৫৬—	১২১,৬১৭	১৯৫,০৫১	৩১৬,৬৬৮

অর্থাৎ প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা সুরু হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গত সাত বছরে যত মাইল রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করা হয়েছিল প্রথম পরিকল্পনা শেষে দেখা গেল যে তার চেয়ে আড়াইগুণের মত অধিক রাস্তা তৈয়ারী হয়েছে। ১৯৫১ সালের ৩০শে মার্চ্চ অবধি নির্ম্মিত রাস্তাঘাটের পরিমাপ ছিল ২৮,৫০৯ মাইল। সেই পরিমাপ বৃদ্ধি পেয়ে প্রথম পরিকল্পনা শেষে ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত দাঁড়ায় ৬৮,১৫৯ মাইল।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার তুলনায় দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থার খাতে তুলনামূলকভাবে ব্যয় বরাদ্দ অধিক করা হলেও, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় ব্যয় বরাদ্দ কম করা হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় পরিবহন ব্যবস্থার দরুণ ২৪ শতাংশ ধার্য্য ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ৮ শতাংশই ব্যয়িত হয়েছিল রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের ব্যয়ের হার ২৮ শতাংশ ধার্য্য হলেও রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হার ঠিক করা হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ। দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার অন্যান্য খাতে বরাদ্দের হার বাড়ান হয়েছে। রাস্তাঘাটের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৬৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। যাই হোক দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের লক্ষ্য হল কাঁচা পাকা রাস্তা মিলিয়ে আরও ৬২,০০০ মাইল। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আমাদের দেশে কিঞ্চিদধিক পৌনে চারলক্ষ মাইল রাস্তাঘাট নির্ম্মিত হবে। ১৯৪৩ সালের নাগপুর-পরিকল্পনার লক্ষ্যকে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাকালে অতিক্রম করা সম্ভব হবে। অবশ্য এখনও আমাদের রাস্তাঘাট বিকাশ ও বিস্তৃতির দিক্ দিয়ে অনেক পিছনে রয়েছে। সিংহল ও স্পেনের মত দেশে পর্য্যন্ত প্রতি বর্গমাইল যায়গায় ০·৩৮ মাইল রাস্তা আছে, সেখানে আমাদের দেশে প্রতি বর্গমাইল যায়গায় মাত্র ০·২৫ মাইল রাস্তা রয়েছে। তবে আশার কথা এই যে আমরা এই বিষয়ে ক্রমেই উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগোচ্ছি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালীন জাতীয় রাজপথগুলির দৈর্ঘ্যের হার বৃদ্ধি পেয়ে ১৩০০০ মাইল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই জাতীয় রাজপথগুলিই হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার অন্যতম উপায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যতীত আরও ১২ কোটী টাকা পাওয়া গেছে আমাদের জাতীয় রাজপথ উন্নয়নের জন্য রাজ্যের সিমেন্টের ব্যবসায় অধিক মুনাফা ও শুল্কলাভের দরুণ। স্থিরীকৃত হয়েছে যে এই অতিরিক্ত প্রাপ্ত অর্থ প্রধানতঃ দুইটি জাতীয় রাজপথ উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হবে প্রথমতঃ মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোর পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিহার পর্য্যন্ত রাজপথ দুইটির প্রস্থকে ১২ থেকে ২৪ ফুট পর্য্যন্ত বাড়ান হবে। এই দুইটি রাজপথে কেবলমাত্র বিশেষ দ্রুতগামী এক্সপ্রেস মোটরগাড়ীর চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে। অপেক্ষাকৃত মন্থরগামী যানবাহনের জন্য আলাদা পার্শ্বরাস্তার ব্যবস্থা করা হবে। জাতীয় রাজপথগুলির এই জাতীয় উন্নয়ন ব্যবস্থার জন্য প্রত্যেক মহল থেকেই অকুণ্ঠ সমর্থন আসবে বলেই আশা করি। ১৯৫৭ সালের গত ডিসেম্বর মাসে পাটনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত পরিবহন ব্যবহর্ত্তা সভায় (All India Transport users Conference) পরিবহনমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর বলেছেন, "It is no longer the question as to what we have to do to develop road transport for that is now all very well known. The question is how to do it. অর্থাৎ এখন আর আমাদের কাছে প্রশ্ন এই নয় যে রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্য আমাদের কি কর্ত্তে হবে—আমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে কেমন করে ইহা কর্ত্তে হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৭ কোটী থেকে ২৮ কোটী টন মাল চলাচলও বহন ব্যবস্থার লক্ষ্য ধার্য্য করা হয়েছে। আমাদের দেশের বৃহত্তম পরিবহন ব্যবস্থা রেলগাড়ীর পক্ষে সম্ভব কিঞ্চিদধিক ১৮ কোটি টন মালবহনের ব্যবস্থা করা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে। জলযান দ্বারা সম্ভব ১ কোটী টনের কিছু ঊর্দ্ধে ব্যবস্থা করা—কাজেই বাদবাকী ৭ থেকে ৮ কোটী টনের চলাচল ও পরিবহন ব্যবস্থার দায়িত্ব পড়েছে রাস্তাঘাটের উপর। কিভাবে এই গুরু দায়িত্ব পালন করা সম্ভব সেই দিকে নজর দিয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাস্তাঘাট উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের ও বৃদ্ধি প্রয়োজন। সেইদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন—অন্যথায় শুধু রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও উন্নয়নের ফল হবে না। মোটরগাড়ী চলাচলের সংখ্যাও অনুপাতিকভাবে বাড়াতে হবে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে আমাদের দেশে পথ-চলাচলের কোন ভিড় না বাড়িয়েই বর্ত্তমানে ৭ লক্ষ থেকে ৮ লক্ষ মোটরগাড়ির চলাচলের ব্যবস্থা সম্ভব এবং তাও শুধু পাকা রাস্তায়ই (Surfaced Road) অর্থাৎ কাঁচা রাস্তার (Unsurfaced Road) হিসাব বাদ দিয়েই। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের দেশে—১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাবে দেখি যে, ৩১৬, ৬৬৮ মাইল দৈর্ঘ্য রাস্তায় (কাঁচা রাস্তা এবং পাকা রাস্তা সহ) আমাদের দেশের মোটরগাড়ীর সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৪ লক্ষ ১৮ হাজার এবং এই সংখ্যার ভিতরেও আবার রয়েছে চল্লিশ হাজার মোটর সাইকেল। প্রতি মাইল রাস্তায় অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও আমাদের দেশে মোটরগাড়ী চলাচলের সংখ্যা কত নীচে, নিম্নের তালিকা হতেই তা প্রতিভাত হবে—

দেশের নাম	প্রতি মাইল রাস্তায় মোটর গাড়ীর সংখ্যা
যুক্তরাজ্য	২৫
যুক্তরাষ্ট্র	২১
মালয়	১৩
সিংহল	৮
কানাডা	৭
ফ্রান্স	৬
অষ্ট্রেলিয়া	৪
ভারতবর্ষ	১·৩২

রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও বিস্তৃতি যেমন যাতায়াতের সুবিধা করে দিয়ে শিল্প ও কৃষির উন্নতি বিধানে সহায়ক হয়, সহায়ক—হয় আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রমোদ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উন্নতির তেমনি—আমাদের দেশের

অন্যতম প্রধান সমস্যা বেকার সমস্যা সমাধানেরও যথেষ্ট সহায়ক হয়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য আমাদের দেশে বর্ত্তমানে সাড়ে সাত লক্ষ লোক নিয়োজিত এবং মোটর যানবাহন প্রভৃতিতে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ অর্থাৎ রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও বিস্তৃতির জন্য নিয়োজিত লোক সংখ্যা হল প্রায় সাড়ে উনিশ লক্ষ। আমাদের দেশ রাস্তাঘাটের দিক দিয়ে এখনও অন্যান্য দেশের তুলনায় কত পিছনে পড়ে রয়েছে পূর্ব্বেই বলেছি এবং সেই দিক থেকে আমাদের মত অনগ্রসর দেশের পক্ষে এই সংখ্যা নিতান্ত উপেক্ষণীয় ত নয়ই, পরন্তু যথেষ্ট উৎসাহোদ্দীপক। বিশেষ করে আশাব্যঞ্জক এই কারণে যে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থা রেলওয়েতে নিয়োজিতের সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ১১ লক্ষ মাত্র। এই সমস্ত হিসাব ও তথ্য থেকে আজ ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিভাত ও প্রমাণিত যে জাতীয় অর্থনীতির উন্নতিবিধানে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের ও বিস্তৃতির অবদান অনস্বীকার্য্য। সেইদিকে দৃষ্টি দিয়েই জাতীয় স্বার্থে রাস্তাঘাটের উন্নতি বিধানের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। রাস্তাঘাটকে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শিরাউপশিরা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এরজন্য প্রথমেই দরকার পাকা রাস্তার হার বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়তঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার অক্ষুণ্ণতার জন্য প্রয়োজনীয় সেতুগুলি অবিলম্বে তৈয়ার করা এবং তৃতীয়তঃ রাস্তাগুলির পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১৯৫৮ সালের গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে আমাদের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ "ইণ্ডিয়ান রোড্ কংগ্রেস" এর দ্বাবিংশতিতম অধিবেশনে যাহা বলেছিলেন তাঁর সেই মূল্যবান উক্তি দিয়েই আমি আমার এই প্রবন্ধ শেষ করব। তিনি বলেছিলেন, "Without accomplishing a good road system, India's plan for economic development would remain incomplete and infructuous, অর্থাৎ উপযুক্ত রাস্তাঘাটের বিকাশ ও বিস্তৃতি ব্যতীত আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রসঙ্গতঃ ১৯১৮-১৯ সালে ভারতের এডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টের (Administration report of India) রাস্তাঘাট প্রসঙ্গে অনুরূপ মন্তব্যই করা হয়েছিল : "the most indispensible of all requirements to India's prosperity" অর্থাৎ ভারতের উন্নতির জন্য রাস্তাঘাটের বিকাশ ও বিস্তৃতির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য।

একটি পথ

দিলীপকুমার রায়

নয় তো সহজ বন্ধু তোমায় ভালোবেসে চাওয়া।
আরো কঠিন—ভালোবেসে তোমায় ভুলে যাওয়া।

ছলে বলে হয় না তো প্রেম, ধনমান-যৌবনে,
পায় যে কৃপা—সেই শুধু পায় ঠাঁই রাঙা চরণে।
(তোমায়) ছেড়ে থাকা কঠিন, আরো কঠিন
কাছে যাওয়া।

জানতে চেয়ে হারে জ্ঞানী, পায় না ধ্যানে ত্যাগী
সন্ন্যাসী ধায় বৃথাই বনে, তপ করে বৈরাগী।
দাও না ধরা প্রেম বিনা, তাই কঠিন তোমায় পাওয়া।

নেই রূপ গুণ, নেই ধ্যান জ্ঞান, নই তো বনবাসী।
জন্ম জন্ম তোমারি পায় মীরা, তোমার দাসী,
জানে তবু তোমায় চেয়ে তোমারি নাম-লওয়া।

বিবর্ণ দিন

প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

ধুলায় রুক্ষ কঠিন শুকনো পথ
সাহারায় কোথা তৃষ্ণার বারি পাই
আগুনে ভস্ম সোনার ফসল যত,
আশার স্বপ্ন ব্যর্থ হ'লো যে ভাই।
ফাঁকা বচনের মূল্য খুঁজে কী হ'বে,
বাঁচবার আশে মন তবু উল্লাসে'
উঞ্ছজীবী নিষ্ঠুর করাঘাতে,
হৃদয় ভরেছে প্রলাপের উচ্ছ্বাসে !
অকৃপণ হাতে কবে যে ভরাবে মন,
ফসলের দিন সোনায় ভরিয়ে দিয়ে ;
দগ্ধ হৃদয় বেদনায় ব্যথা হত,
কী হ'বে হায় ব্যর্থ এ দিন নিয়ে ?
চিতার ভস্মে স্বপ্ন ফুলের দেখি,
উপবাসী মন পিরামিডে প'ড়ে ঢাকা,—
অহল্যা কার স্পর্শে জাগ্‌বে বলো,
মহাকাল কী ঘুরিয়ে দেবে না চাকা ?



তিব্বতের গল্প

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

তিব্বত ঘুরে এসে ভ্রমণ কাহিনী কেন লিখলুমনা, সেই কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে অনেকের কাছে। নতুন কোন দেশ দেখে এলেই লেখ ভ্রমণ কাহিনী, এই রেওয়াজই চলেছে সব দেশে। তার ওপর আমি দেখে এলুম এমন দেশ, যার নামেই গায়ে কাঁটা দেয়। কিছুদিন আগে তো সেখানে যাবারই অধিকার ছিল না। তবু লোকে বই লিখেছে 'তিব্বতে তিন বছর', 'তিব্বতে সাত বছর', 'তিব্বত অতীত ও বর্তমানের', আরও কত কি! অথচ আমি একটা প্রবন্ধও লিখলুমনা, আপরাধটা গুরুতর বৈকি!

কেন লিখলুম না, সেই সত্য কথাটা বলবার সাহস নেই। আমি তো ঠিক দেশ দেখতে যাইনি, চিনতে গিয়েছিলুম সে দেশের মানুষগুলোকে, আর কিছু ছবি তুলতে। দেশের সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে মানুষগুলোর কথাই আগে মনে পড়ে যায়। তাদের সুখ দুঃখ আশা-নিরাশার কথা, তাদের অসহায় অজ্ঞানতার কথা। দুঃখ হয় সেই মানুষগুলোর জন্যে। কান্নার মত একরকম তীব্র বেদনা অসাড় করে আনে আমার মনের স্নায়ুগুলো, নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলি।

এমন সরল ধর্মান্ধ মানুষ আমি নিজের দেশে কখনও দেখিনি। শুনেছি, আমাদের দেশেও নাকি ধর্মান্ধতা আছে। কিন্তু ঠিক এমনটি কি? শিশু যেমন হাসতে হাসতে আগুনের শিখায় হাত বাড়িয়ে দেয়, তারপর পুড়ে গেলে কাঁদে, এখানকার মানুষও তেমনি। ধর্মের নামে আত্মসমর্পণ করে অনায়াসে, তারপর সারাজীবন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত।

পেম্‌বা, ডাওয়া, পামার—কার কথা বলব! সব মেয়েই তো একই রকমে পুড়ে মরে। আর এদের পুড়িয়ে মারতে লামারও অভাব নেই এদেশে। তালে লামা, পেনছেন লামার দেশ। যুগ যুগ ধরে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে যে দেশের মানুষ, সেই দেশেও জন্মায় আলচু টুলকু বা শাবডুং লামার মত লোক, যারা পারে না সংসারে এমন কাজ নেই।

এই তো সেদিন নিজের চোখের সামনেই শাবডুং লামার কাণ্ড দেখলুম। তখন আমি লাসা থেকে শিগাসে হয়ে দেশে ফিরছি। শীত শেষ হয়ে বসন্ত পড়েছে। ক্যাকা পাখীগুলো জমির ওপর নেমে প্রবল উদ্যমে ঝগড়া শুরু করেছে। একটা ক্যাকা আর একটাকে হয়তো ঠুকরে ঠুকরে মেরেই ফেলবে। আর সবাই দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে আর কলরব করছে, ঝগড়া থামাতে এগিয়ে আসছেনা কেউই। দূরের মাঠে কিয়াং ঘোড়াগুলো ঘুর-পাক খেতে খেতে রাস্তার এপার থেকে ওপারে চলে যাচ্ছে। একটা দুটো নয়, একদল বেয়াড়া বন্য ঘোড়া। ধরে পোষ মানাবার উপায় নেই। চেষ্টাও দেখিনি কারও। সবাই বলে, ও পোষ মানবার জীবই নয়। আমাদের দেশ হলে অত সহজে যে আমরা হার মানতুম না, তা জানি। অন্তত চেষ্টার ত্রুটি রাখা হত না।

সাংপো নদীর ধারে একদল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারা খাম আর ডাম গিয়াশো থেকে খাং রিম্‌পোছের তীর্থ করতে যাচ্ছে। সোমাডাং এ অবগাহন করে খাং রিম্‌পোছে তিনবার প্রদক্ষিণ করবে। কেউ কেউ এই প্রদক্ষিণ করবে দণ্ড কেটে কেটে। কৈলাস আমাদেরও তীর্থ। আমরাও মানস সরোবরে স্নান করে কৈলাসে উঠি।

এরা কিন্তু আমাদের মত তীর্থ করে না। রথ দেখা বেরিয়ে এরা কলাও বেচে। নিজেদের দেশে যা কি উদ্বৃত্ত হয় এদের, তা ইয়াকের পিঠে বেঁধে এরা বেরো সেই সব জিনিষ বিক্রী করে পুরাং, গ্যানিমামণ্ডি গ্যাকার্কোর বাজারে। ফিরবে ভারতীয় জিনিষ নিয়ে

ভারতের টাকা, প্রবাল আর রেশমি কাপড় এদের বড় পছন্দ। মেয়েরা ভারতীয় টাকার মালা পরবে গলায়। ছেলে পরবে প্রবাল আর কড়ির হার, রেশমি কাপড় পরবে বড়লোকের ছেলে-মেয়ে।

বিরাট এক যাত্রীদল। কী জানি কী খেয়ালে আমিও এই দলে ভিড়ে গেলুম। ভাবলুম, সিকিমের ভেতর দিয়ে যা গিয়ে কৈলাস আর মানস-সরোবর দেখে আলমোড়া হয়ে দেশে ফিরব। এতদিনই যখন এদেশে কাটালুম, তখন আর দু-একটা মাসে কী এসে যাবে!

একে ঠিক খেয়াল বলব না। কৈলাস আমাকে টানলেন। গভীর রাতে স্বপ্ন দেখলুম। কৈলাসের স্বপ্ন। দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যানমগ্ন মৌন মূর্তি দেখলুম না। দেখলুমনা তপস্যারতা পার্বতীকে। আমার চোখের সামনে এক উজ্জ্বল তুষার স্তূপ আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রইল। মনে হল আমি যেন এক মুকুরের ওপর নিজের প্রতিবিম্ব দেখছি—ত্রিদশবনিত্যদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ। দুপাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীর মত নিজেকে অজ্ঞান অসহায় বোধ করলুম। এক রকম অদ্ভুত অস্থিরতা নিয়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। তাঁবু ছেড়ে মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালুম।

রাত তখন শেষ প্রহর। একটা একটা করে লোক তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসছে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। তাঁবুর ভেতর থেকেই একটা বিড়ি কিম্বা চুরট ধরিয়ে বার হচ্ছে তারা। বাইরের দুরন্ত হাওয়ায় সে কাজ অসাধ্য হবে।

দূরে খটখট আওয়াজ করে একদল যাত্রী তাঁবু তুলছিল। তাদেরই একটা লোক ককিয়ে ককিয়ে গাইছে: ইয়া ইয়া গ্যু গ্যু জের।

শেষ রাতের হিমেল হাওয়া তীরের ফলার মত বিঁধছে। নিচে থেকে পায়ের ডোক্‌চা উঠেছে হাঁটু অবধি। আর গায়ের আলখাল্লাও নেমেছে হাঁটুতে। জট পাকানো চুলের ওপর উলের টুপি। তবু বুকের হাড় কখানা ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে ওঠে। আর সেই লোকটা গায়: ইয়া ইয়া গ্যু-গ্যু-জের।

আমি আশ্রয় পেয়েছিলুম পেম্‌বাদের তাঁবুতে। পেম্‌বার স্বামী নেরেভু খামের একজন সমৃদ্ধ গৃহস্থ।

খাম! ঐ নামেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। খামের লোকের নামে ভয় পায় না, এমন লোক গোটা তিব্বতে নেই। ওরা ঠিক মানুষ নয়। মানুষ শুধু চেহারাতে। তা না হলে হাসতে হাসতে মানুষ মারতে পারে! একটা চেঙ্কু মারতে আর দশজনের যে মায়া, তার কিছুও কি এদের আছে মানুষের জন্যে। আমি এদের ভেড়া কাটতে দেখেছি। মেয়েরা বাটি ভরে তাজা রক্ত নেয়, আর ছাতু খায় সেই রক্ত মেখে। একবার আমাকে খেতে দিয়েছিল, আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছিলুম।

পাঁচজনের পরামর্শে তবু এদেরই আশ্রয় নিয়েছি। এরা নাকি আশ্রিতের গলায় চট্ করে ছুরি দেয়না। তারপর সঙ্গে নেরেভুর স্ত্রী আছে। মেয়েদের সামনে খুন জখমের রেওয়াজ নেই। লাসা ছাড়বার আগে এক তিব্বতী বন্ধু এইসব পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করেছি।

পেম্‌বা কখন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল টের পাইনি। টের পেলুম সামনের তাঁবুর বুড়ো লামার দিকে চেয়ে। কুয়াশার ঘোর তত গভীর নয়। অনেক ফিকে হয়ে এসেছে। রাস্তার ওপিঠের লোক দেখতে তেমন অসুবিধা হচ্ছেনা। লামাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম।

প্রথমটায় মনে হয়েছিল, বুঝি তাঁর ছোট ছোট চোখে আমার দিকেই চেয়ে আছেন। খানিক পরেই সে ভুল ভাঙল। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম, তিনি পেম্‌বাকে লক্ষ্য করছেন গভীর আগ্রহ নিয়ে। রাতে তাঁরা কখন এসে তাঁবু খাটিয়েছেন খেয়াল করিনি। বিকেলের পর থেকে কত লোকই তো এমনি করে আসতে থাকে। একজনকে দেখে আর একজন যাত্রা ভঙ্গ করে, তাঁবু খাটায়। সকলের সঙ্গেই একপাল ভেড়া ইয়াক আছে। তারাই মাল বয়, দুধ দেয়। দুটো একটা কুকুরও থাকে পাহারার জন্যে। আর গোটা কয়েক চাকর। মাইনে করা চাকর নয়, ক্রীতদাস। বাপে ধার নিয়ে শোধ দিয়ে যেতে পারেনি, ছেলে বেগার খেটে সেই ঋণ শোধ করছে। মালিকের হুকুম পেলে তারাই মালপত্র নামাবে ইয়াকের পিঠ থেকে, তাঁবু খাটাবে। চোঙার ভেতর চায়ের সঙ্গে নুন মাখন মিলিয়ে সেচা বানাবে। তারপর শুকনো মাংসের সঙ্গে মদের বাটি দেবে এগিয়ে। রাতে পাহারা

দেবে। তারপর আবার তাঁবু তোলা, ইয়াকের পিঠে মাল বাঁধা—আর গান গাইতে গাইতে পথ চলা।—ইয়া ইয়া শ্যু শ্যু-জের।

আমার দিকে চোখ পড়তেই লামা অপ্রতিভ হলেন। আমি যে তাঁকে লক্ষ্য করছি, তা তিনি দেখতে পাননি। এবারে দেখতে পেয়েই তার বুকের ভেতর থেকে মণি-চক্র বার করলেন। আর ডান হাতে ঘোরাতে লাগলেন অর্ধনিমিলিত নেত্রে। আমাদের দেশে যেমন মালা জপের রীতি, তিব্বতে তেমনি মণিচক্র। এই মণিচক্রের ভেতর তিব্বতের ইষ্টমন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁং' লেখা আছে একলক্ষ বার, একবার ঘোরালে তাই লক্ষ জপের ফল। লামা নিবিষ্ট মনে তাঁর চক্র ঘোরাতে লাগলেন।

কোনও এক শনিবারে জন্ম, তাই নাম হয়েছে পেম্বা। অল্পদিন বিয়ে হয়েছে, বয়সও বেশি নয়। কাল নিজেই বলছিল যে তার বয়স হল বাইশ। অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছে বলতে হবে। লামার চাহনি দেখে কী বুঝল সেই জানে, বলল: অমন করে কী দেখচে বলতে পার?

সবে পরিচয় হয়েছে, তবু রহস্যের লোভটুকু ছাড়তে পারলুম না। বললুম: তোমাকে দেখচে।

আমি কি দেখবার জিনিষ?—জিজ্ঞেস করল পেম্বা।

হেসে বললুম: না হলে দেখবে কেন!

সামনে দিয়ে ইয়াক তাড়িয়ে চলেছিল একটা দল। একটা চাকর তার ভাঙ্গা গলায় গান গাইছে টেনে টেনে।—

ছো পো লেহ—তোঙ্ শর নেঅ
ভা ডো তাঙ্ নে ইয়োঙ্ ইয়ো অ
নে ছেন্ পো তা লা রু
ক্রী মা শর জে লেব ছ্যান
সো সো সু—

যতক্ষণ লোকটা সামনে দিয়ে গেল, ততক্ষণ কথা কইতে পারলুম না। দূর থেকেও তার গানের শব্দ আসছে: সো সো সু—

একসময় আমার তাঁবুও ভাঙল। উঠল ইয়াকের পিঠে। আমরাও যাত্রা করলুম, রাত্রি তখনও প্রভাত হয়নি।

নেরেভুরা আমায় হিন্দু বলে ডাকতে শুরু করেছে। বলল: হিন্দু, তোমাদের দেশেও কি লোকে এমনি করে পথ চলে?

বললুম: চলত, এখনও অনেক জায়গায় চলে। তবে আর বেশিদিন চলবেনা।

পায়ে না হেঁটেও সে পথ চলা যায়, নেরেভু এই গল্প শুনেছে ভুটিয়া ব্যবসায়ীদের কাছে। বলল: তোমাদের দেশ একবার দেখতে ইচ্ছে করে।

বললুম: চলনা আমার সঙ্গে।

নেরেভু বুঝি চমকে উঠল, কথা কইলনা।

বললুম: ভয় পেলে নাকি?

ভয়! ভয় কিসের: নেরেভু জবাব দিল: কিন্তু যাই বললেই কি যাওয়া যায়! পেম্বা সঙ্গে আছে, বাপের অনুমতি নেয়া হয়নি, তার ওপর এত জিনিষপত্র!

তা বটে।—আমি তাকে সমর্থন করলুম।

পেম্বা বলল: আসল কথা অন্য। তোমার কাছেও লুকোচ্ছে।

তাই নাকি?—নেরেভুকে আমি প্রশ্ন করলুম।

কৌতুকের হাসি হেসে পেম্বা বলল: বলনা সত্যি কথা।

সত্যি কথা বলতে আমি ডরাই নাকি: উত্তর দিল নেরেভু: কোথাও গেলে আমি পেম্বাকে সঙ্গে নিয়েই যাব।

পেম্বা বলল: এবারে যা কাণ্ড করল, ফিরে গিয়ে আমি কাউকে মুখ দেখাতে পারবনা।

তাই নাকি!—আমি বিস্ময় প্রকাশ করলুম।

পেম্বা আমাকে তার লজ্জার কথা শোনাল। বলল যে, ওরা তিন ভাই। ছোটটা এখনও নাবালক। তার বদলি আছে ওদের বাপ, বিপত্নিক সে।

তিব্বতী শাস্ত্র মতে পেম্বার ওপর এদের সবার সমান অধিকার। মেয়েরা ছোট থেকেই একথা জানে। তাই এই অদ্ভুত সমাজ-ব্যবস্থায় সহজেই নিজেকে মানিয়ে নেয়।

পেম্বা বলছিল: এর বাপেরই আসবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ব্যবস্থা কেন বদলাল, একেই জিজ্ঞেস কর।—বলে হাসতে লাগল।

নেরেভুর মুখ দেখে মনে হল, এ প্রসঙ্গ সে চাপা দিতে চায়। পিছনে শব্দ শুনে এই সুযোগ সে পেয়ে গেল। ইয়াকের পিঠে চড়ে সেই লামা আমাদের ধরে

ফেললেন। নেরেভু নত হয়ে তাঁকে নমস্কার জানাল: চাক্ ওয়াং।

লামা খুশি হলেন। ঝপ করে নেমে পড়লেন ইয়াকের পিঠ থেকে। আশীর্ব্বাদ শুধু নেরেভুকেই নয়, আমাদেরও করলেন।

লামাকে এইবারে ভাল করে দেখলুম। যত বুড়ো মনে হয়েছিল, ততটা নন। মাঝবয়সীই বলা উচিত। মুখের ভাব বড় রুক্ষ, বড় অপ্রসন্ন। আর দশজন লামার মত সৌম্য স্নিগ্ধ স্মিতদর্শন নন। তবে কথাগুলি মিষ্টি! বললেন: তোমরা ভাগ্যবান। বুদ্ধ তোমাদের আশীর্বাদ করবেন।

নেরেভুর সারামুখ খুশিতে উজ্জ্বল হল। আরও কিছু শোনবার জন্যে নিঃশব্দে আগ্রহ প্রকাশ করল।

পেম্‌বার দিকে চেয়ে নেরেভুকে প্রশ্ন করলেন: তোমার স্ত্রী?

গদগদভাবে নেরেভু মাথা নাড়ল।

চোখ জোড়া ছোট করে লামা হাসলেন: সেইজন্যেই বলেছিলুম তোমরা ভাগ্যবান। তোমাদের ঘরেই বুদ্ধ আবার জন্ম নেবেন।

চলতে চলতে নেরেভু দাঁড়িয়ে গেল। বিহ্বল হল তার দৃষ্টি। লামা আবার ইয়াকের পিঠে লাফিয়ে উঠলেন। সবাইকে ফেলে হাট হাট করে এগিয়ে গেলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত নেরেভু কোন কথা কইতে পারল না। কথা কইল পেম্‌বা, বলল: ছেলেবেলায় আর এক লামাও আমায় এই কথা বলেছিলেন। তখন থেকে—

নেরেভুর চোখের দিকে চেয়ে পেম্‌বা থেমে গেল।

আমি জানি, পেম্‌বা কী বলতে গিয়ে চেপে গেল। এদের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাটিয়ে এই সত্যটুকু জেনেছি। এদেশের মেয়েরা বুদ্ধের মা হবার স্বপ্ন দেখে। ভাবে তার নারী জীবন সার্থক হবে বুদ্ধকে কোলে পেলে। তাই তারা লামার ঘরণী হতে চায়। বিশ্বাস করে যে নেরেভুর মত সাধারণ পুরুষের নেই বুদ্ধের জনক হবার পবিত্র অধিকার। কিন্তু নেরেভুকে একথা বলা চলে না।

পাথরের মত কঠিন রুক্ষ পথ। সবুজের আমেজ নেই কোন দিকে। দক্ষিণ থেকে হিমেল হাওয়া আসছে, বুকের হাড় কাঁপানো হাওয়া। কুয়াশা কেটে গিয়ে আলো ফুটছে। কিন্তু প্রাণে শান্তি নেই, এই আলো দেখতে দেখতে তীব্র হবে, চোখে জ্বালা ধরাবে। চোখ মেলে আর চলতে দেবে না। হাওয়াতেও তো সূচের মত ধার। দেহের অনাবৃত অংশ ফেটে ফেটে রক্ত ঝরবে। জীবন তো নয়, এ যেন নরক বাস। তবু ভাল লাগে।

নেরেভু অনেক এগিয়ে গিয়েছিল। কিম্বা আমিই পিছিয়ে পড়েছিলুম। পেম্‌বা তারই সঙ্গে ছিল। ছোট একটুখানি জলের ধারা পেরবার সময় একখানা পাথরের ওপর বসে পড়ল। আমি কাছে আসতে আমাকেও বসতে বলল।

জলের ধারার কাছে গোটা কয়েক কাঁটার গাছ গজিয়েছিল। এখন শুধু ডাঁটা আর কাঁটাই দেখতে পাচ্ছি। পাতা যা ছিল তা ইয়াকগুলো মুড়িয়ে খেয়ে গেছে। সেই দিকে চোখ রেখে পেম্‌বা বলল: তুমি হিন্দু, বিদেশী। তোমাকে বলতে তো বাধা নেই। আমি একজন লামাই বিয়ে করতে চেয়েছিলুম।

তাই নাকি!—আমি তার গল্প শোনবার জন্যে উৎসাহ জানালুম।

পেম্‌বা বলল: সত্যি বলচি। আমাদের গ্রামে ছিলেন এক বুড়ো লামা! তিনি তো হেসেই আকুল। বললেন, আমায় বিয়ে করবি? তারপর বোঝালেন ভাল করে, সংসার ছেড়েচে বলেই তো লামা। মঠ ছেড়ে সংসার পাতলে সেকি আর লামা রইল! সেও তখন সাধারণ মানুষ।

একটু থেমে পেম্‌বা বলল: আমি তাই বুঝেছিলুম হিন্দু। কিন্তু এখন অন্য রকম দেখছি।

আমি আশ্চর্য হলুম তার কথা শুনে। বাকিটুকু শোনবার জন্যে তার পাশে আর একখানা পাথরের ওপর বসলুম।

পেম্‌বা বলল: এখন দেখচি, সংসার করতে লামারা তো ধর্মত্যাগ করেন না। এই তো সেদিন ঠং তু জাতের একটা মেয়ে লামা বিয়ে করল। কী সুখে সে ঘর করচে দেখে এলুম।

হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল: তোমাদের দেশেও কি মেয়েদের অনেক স্বামী থাকে?

বড় বিষণ্ণ দেখলুম পেম্‌বার দৃষ্টি। মনে হয়, সত্যি কথা শুনলে সে আরও দুঃখ পাবে। বললুম: দ্রৌপদীর পাঁচজন স্বামী ছিল।

উত্তরে পেম্‌বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সামনের ইয়াকগুলোকে আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বাঁকের কাছটায় নেরেভুকে দেখা গেল। রাস্তার পাশের উঁচু জমিটায় হেলান দিয়ে সে বুঝি আমাদেরই অপেক্ষা করছে। বললুম: চল, এবারে এগোন যাক।

এ দেশের মেয়েদের দুর্বলতার কথা আমি জানি, জানি তাদের ধর্মান্ধতার কথা। ছেলেরা জন্মেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে লামা হবার। শৈশবে খানিকটা কৃচ্ছ্র-সাধন করতে পারলেই সারা জীবন সুখে কাটাবার আনন্দ পাওয়া যাবে। সংসার সুখ? সাধ থাকলে সেও ভাগ্যে জোটে। রাজা হবার দায়িত্ব আছে অনেক, লামার শুধু সুখ। সাধারণের ধারণা তো এই।

আর মেয়েদের কথা?

শুনেছি অনেক, দেখেছিও কিছু। মেয়েদের চোখে লামা যেন মানুষ নয়, বুদ্ধের অবতার তারা। লামার তৃপ্তির চেষ্টায় তিব্বতী মেয়ের কোন সঙ্কোচ নেই, নেই লজ্জা। দেহ তো পূজার নৈবেদ্য, মন আরাধনার মন্ত্র। কুমারী মেয়ের পাগলামির কথা শুনেছি, শুনেছি বিবাহিত নারীরও কথা। কিন্তু বিস্মিত হয়েছি এদের স্বামীদের কথা শুনে। স্ত্রীর উচ্ছৃঙ্খলতায় তারা নাকি আত্মপ্রসাদ পায়। বংশ পবিত্র হল বলে স্ত্রীকে সম্মান করে, সমাজে প্রতিষ্ঠা খোঁজে। এত বাড়াবাড়ি আমার বিশ্বাস হয় না।

সন্ধ্যেবেলায় নেরেভুকে বড় বিচলিত দেখাল। তাঁবুর বাইরে বসে আমি একবাটি স্বেচা খাচ্ছিলুম। নুন মাখন মেশানো তিব্বতি চা। ব্যস্তসমস্ত ভাবে নেরেভু এসে ধপ করে বসে পড়ল। বললুম: কী হল?

বলবার জন্যেই নেরেভু এসেছিল। বলল: দুপুরের সেই লামা ঢুকেচে পেম্‌বার তাঁবুতে।

বললুম: তার জন্যে ভাবনা কিসের?

ভাবনা!—বলতে গিয়ে নেরেভুর গলা কেঁপে গেল।

সাহস দিয়ে আমি বললুম: লামা তোমাদের ধর্মগুরু, তোমাদের ভালই হবে।

নেরেভুর একথা বিশ্বাস হলনা। বলল: এ আমাদের গ্রাম নয় হিন্দু, এ আমাদের বাণিজ্যের পথ। এ পথে স্বার্থ নিয়ে সবাই বেরিয়েচে।

বললুম: তীর্থ যাত্রারও এই পথ। মঙ্গলও এই পথে আসবে।

নেরেভু উত্তর দিলনা। কিন্তু তার দুর্ভাবনা জেগে রইল তার অশান্ত মনে।

কয়েক চুমুকে চায়ের বাটিটা নিঃশেষ করে মাটিতে নামিয়ে রাখলুম। বললুম: তুমি ভয় পাচ্চ কেন?

ভয় পাবনা: রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিল নেরেভু: ওরা কী বলল জান?

বললুম: কারা?

কেন, ঐ যাদের সঙ্গে লামা আসছে। বলে একখানা তাঁবু দেখিয়ে দিল।

জিজ্ঞেস করলুম: কী বলল তারা?

একটা মুহূর্ত ইতস্তত করল নেরেভু। তারপর বলল: পুরাংএর মণ্ডিতে সব বেচে দিতে বলচে। ও নাকি গুণে দেখেচে যে পুরাংএর মণ্ডিতে সব বেচে দিয়ে জ্ঞানিমার মণ্ডিতে জিনিষ কিনলে লাভ বেশি হবে ওদের।

তাতে ভয় পাবার কী আছে? আমি জানতে চাইলুম।

ভয় পাবার নেই: আমার প্রশ্ন শুনে নেরেভু আশ্চর্য হল, বলল: হাতে টাকা নিয়ে এত পথ কি চলা যায়?

আমি হাসলুম তার ভাবনার কথা শুনে। বললুম: আমাদের দেশে জিনিষ নিয়েই লোকে চলতে চায় না, বলে ঝামেলা।

এ দেশে টাকা নিয়ে চলা যে নিরাপদ নয়, তা বেশ বুঝি। তবু তাকে সাহস দেবার জন্যেই নিজের দেশের কথা বললুম। পকেটে টাকা নিয়ে চলা আমাদের দেশেও নিরাপদ নয়।

নেরেভু আপত্তি জানাল, বলল: তোমাদের দেশের কথা রাখ।

তারপর তার শৈশবের এক গল্প শোনাল আমাকে। বলল: ছেলেবেলায় একবার বাবার সঙ্গে এই পথে এসেছিলুম। আমার মাও ছিল সঙ্গে। ঠিক এমনি করে এক লামা মাকে বুঝিয়েছিল পুরাংএর মণ্ডিতে সব বেচে দেবার কথা। পুরাং ভারতের কাছে, লোকেরা জিনিষের বেশি দাম দেয়। তারপর—

নেরেভুর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

তারপর? আমি প্রশ্ন করলুম।

একটু সংযত হয়ে নেরেভু বলল: আমরা সব হারালুম। জলের দরে ইয়াক আর ভেড়াগুলো বিক্রি করে আমরা দেশে ফিরে এলুম।

হেসে বললুম: সেবারে হয়েছিল বলে যে এবারেও হবে, তাই বা কেন ভাবচ?

না না, তুমি জানো না: বাধা দিল নেরেভু, বলল: এই সব লামাদের কথা শুনলেও বিপদ, না শুনলেও বিপদ।

মাংস আর মদ নিয়ে এদের চাকর ঢুকছিল পেম্‌বার তাঁবুতে। দরজা ফাঁক করতেই ভেতর থেকে এল হাসির শব্দ। লামার সঙ্গে পেম্‌বাও হাসছে। অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখলুম, নেরেভু শিউরে উঠল।

বললুম: বেজায় শীত পড়েচে আজ, তাই না?

নেরেভু উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল: চল ভেতরে যাই।

ভেতরে গিয়েও শীত কমল না। কম্বলে আজ শীত মানবে না। পেম্‌বার টুকটুক আছে তারই তাঁবুতে। দশ বারো সের ওজন, শক্ত কাপড়ের লেপ। গরমের চেয়ে দুর্গন্ধ বোধহয় বেশি। নেরেভুর শোক উঠল ঐখানার জন্যে। বলল: লামা আজ টুকটুকের ভাগ বসাবে না তো!

প্রথমটায় সেই সন্দেহই হয়েছিল। খাওয়া আর গল্প তাদের শেষ হয়না যেন। আমরা কখন খেয়ে নিয়েছি। অন্যদিন হলে হয়তো ঘুমিয়েই পড়তুম। কিন্তু নেরেভু জেগে রইল। একবার গিয়ে দেখেও এল পেম্‌বার তাঁবুর ভেতর উঁকি দিয়ে। ফিরে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বললুম: কী হল?

মেয়েটার নেশা ধরে গেছে।—নিরাসক্তভাবে নেরেভু উত্তর দিল।

লামা শেষ পর্যন্ত বিদায় নিলেন। চাকর সেই সংবাদ দিয়ে গেল। সারাদিনের শ্রান্তিতে নেরেভুর তন্দ্রা এসেছিল। ধড়মড় করে উঠে বসল। বলল: টুকটুক খানা? ও পেম্‌বার তাঁবুতে আছে।

উঠে দাঁড়িয়ে তার নিজের কম্বল দুখানা আমার গায়ের ওপর ফেলে দিল। বলল: তুমি ঘুমোও হিন্দু, আমি পেম্‌বার কাছেই যাই।—

বলেই বেরিয়ে গেল।

আমি আশ্চর্য হই এই ভেবে যে এত অল্প সময়ে এত ঘনিষ্ঠতা হয় কী করে! লামা বলেই বোধহয় এই অসাধ্য-সাধন সম্ভব হয়।

পথ চলতে চলতে নেরেভুকে সেই কথা জিজ্ঞেস করি। বলি: আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

উত্তর না দিয়ে নেরেভু আমার মুখের দিকে তাকাল।

পেম্‌বা আজ এগিয়ে চলেছে। লামার সঙ্গে ইয়াকের পিঠে চড়ে, তাদের দেখিয়ে বললুম: পেম্‌বার সঙ্গে আমি যদি এমন ভাব করতুম, তুমি আমায় সহ্য করতে?

নেরেভু গম্ভীর হয়ে রইল, কোন উত্তর দিলনা।

বললুম: নিশ্চয়ই সইতে না।

নেরেভু সংক্ষেপে বলল: আমারা খাসের লোক।

কেটে ফেলতে, না?—আমি জানতে চাইলুম।

আরও গম্ভীর গলায় নেরেভু উত্তর দিল: তোমার কলজের রক্তে একবাটি ছাতু মেখে খেতুম।

তার বলার ভঙ্গীতেই আমার গা শিউরে উঠল। বুঝতে পারলুম, লোকটার বুকের রক্তে আগুন লেগেছে। রক্ত ভিজে বলেই নিবে আছে, সময় লাগছে জ্বলে উঠতে।

কদিন ধরেই পেম্‌বার পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করছি। নতুন জামা পরেছে। রুক্ষ চুলের ওপর কড়ির নতুন মালা জড়িয়েছে, তার ওপর প্রবাল আর রঙীণ পাথর। নতুন করে রঙ্ মেখেছে মুখে। থিকথিকে ময়লার ওপর লাল রঙ্। নোংরা দাঁত বেরিয়ে পড়ছে কথায় কথায়।

নেরেভুও যে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। সারাক্ষণ তাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। কথা না বলালে কথা কইতে চাইছেনা। খটখটে রাস্তার ওপর হোঁচট খেয়েছে বার কয়েক। সাবধান হয়ে পিছিয়ে পড়েছে বার বার।

বললুম: লামার খবর কিছু রাখ?

নেরেভু চমকে উঠল।

বললুম: শুনেচি, বেড়াপুরীর লামা, কৈলাস হয়ে বেড়াপুরী চলে যাবে।

নেরেভু উত্তর দিলনা।

বললুম : ফেরার পথে তোমার ভাবনা নেই। আমিও থাকবনা, লামাও খসবেন।

উত্তরে নেরেভু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বললুম : কথা বলচ না যে ?

নেরেভু তবু নিরুত্তর।

ভাবচ, কৈলাস অনেক দূর : উত্তরটা আমিই দিলুম : দূর আর নয়। লামা বলছিল সামনেই পুরাংএর মণ্ডি। আর পুরাং থেকেই তো কৈলাসের পথ।

পুরাং এর নামে ক্ষেপে উঠল নেরেভু। বলল : পেম্‌বা কী জেদ ধরেচে জানো ? বলচে, পুরাংএর মণ্ডিতে সব সওদা বেচে দিতে। বলচে, লামা গুণে বলেচেন, তবে আমাদের লাভ হবে।

আমি তাকে অভয় দিলুম, বললুম : তাতে কী হয়েচে, লাভ না হলে বেচবেনা।

বেচবনা : নেরেভু ককিয়ে উঠল : অমান্য করব লামার কথা। পেম্‌বা বলচে, তাহলে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবেনা।

এই মুহূর্তে আমার মনে হল, নেরেভু যেন খাসের লোক নয়। বাংলাদেশের শিশু যেমন জুজুর ভয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকোয়, নেরেভুও তেমনি একটা আশ্রয় খুঁজছে। চারিদিকের পাহাড় আর পাথরের দিকে চেয়ে সেই আশ্রয়ের আশ্বাস কোথাও পাচ্ছেনা। ভেতরে ভেতরে সে তাই আজ গুমরে উঠছে।

তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কিনেও ফেলো।—আমি পরামর্শ দিলুম।

তোমার কথামত তো আমি চলতে পারিনা : নেরেভু উত্তর দিল। লামার অন্য আদেশ। যতদিন জ্ঞানিমার মণ্ডি না পৌঁছাচ্চি, ততদিন সমস্ত টাকা পেম্‌বার কাছে গচ্ছিত থাকবে।

বললুম : তাহলে আর ভাবনা কী ?

গম্ভীরভাবে নেরেভু বলল : সেইজন্যেই তো ভাবনা। মদ খেয়ে পেম্‌বা আজকাল বেহুঁস হচ্ছে।

পরক্ষণেই তার দুচোখ জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল : আমি খাসের লোক !

এ সত্যের পরিচয় নেরেভু এখনও দেয়নি। দিল পুরাংএর মণ্ডিতে পৌঁছে।

সকালবেলায় বেশ ভাল দরেই তার জিনিষ বিক্রি হচ্ছিল। উল, চামর আর চমরীর মাখন। ভাল দর পাচ্ছে দেখে আমারও ভাল লাগছিল। কিন্তু দুপুরে খাবার সময় চমকে উঠলুম। একজন চাকর পাথরের ওপর একখানা চকচকে ছুরিতে শান দিচ্ছে।

কী হচ্ছে রে ?—আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম।

লোকটা সংক্ষেপে উত্তর দিল : মালিকের হুকুম।

এত বড় ছুরি দিয়ে কী হবে ?—আমি জানতে চাইলুম।

লোকটা তার নোংরা দাঁত বার করে হাসল খানিকক্ষণ। তারপর বলল : আজ একটা ভাল ভেড়া কাটবেন, বলেচেন মালিক।

তার হাসিটা কেমন রহস্যজনক। ভয়ে গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠল।

নেরেভুকে সারাদিন আজ ব্যস্ত দেখেছি। সমস্ত মণ্ডি ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, এসব মণ্ডিতে লোকে শুধু জিনিষ বেচতে আসেনা। বেচা কেনা দুইই হয়। নগদ টাকার কারবার কম। তাইতেই বোধহয় নেরেভুকে বেশি ছুটোছুটি করতে হচ্ছে।

খানিকক্ষণের জন্য পেম্‌বার দেখা পেয়েছিলুম। বড় হাসিখুসি ভাব তার। কিছুদিন আগে হলে হয়তো ভাল লাগত। কিন্তু আজ লাগল না। তবু তাকে ডাকলুম, বললুম : আমার কাছে একটু বসবে ?

পেম্‌বা কাছে এসে পাশে বসল, বলল : তুমি নাকি চলে যাচ্ছ ?

বললুম : তা যাচ্চি। তোমরা থাংরিম পৌঁছে যাবে জ্ঞানিমা গিয়া কার্কো হয়ে। আমি যাব সোজা পথে। সোমাভাং আর রাক্ষসতালের মাঝখান দিয়ে। কিন্তু যাবার আগে তোমায় একটা কথা বলে যাব।

পেম্‌বা আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : তুমি ভুল করচ। বুদ্ধের বাপমা ছিলেন তোমার আমার মত সাধারণ মানুষ। তাঁকে আনা যায়না, তিনি নিজে আসেন।

পেম্‌বা যে বিরক্ত হচ্ছে, তা স্পষ্ট দেখতে পেলুম। তবু বললুম : তুমি সত্যিই ভুল করচ।

কিন্তু পেম্‌বা আমাকে আর কিছু বলবার অবকাশ

দিলনা। দুচোখে বিরক্তি ছড়িয়ে আমার কাছ থেকে সরে গেল।

সন্ধ্যেবেলায় ক্লান্ত দেহে নেরেভু আমার পাশে এসে বসে পড়ল। বলল: ওরা কোথায়?

আমি আঙুল দিয়ে পেম্‌বার তাঁবু দেখিয়ে দিলুম।

চাকর স্‌চো এনেছিল বাটিতে করে। এক চুমুকে বাটি নিঃশেষ করে ধমক দিল। বলল: গরম স্‌চো।

চাকর গরম চায়ের জন্যে ছুটল।

আমার দিকে চেয়ে বলল: খবর পেয়েচি, ডাম গিয়াশোর লোক। নাম শাবডুং লামা। ডাম গিয়াশোর লোক তো আমাদেরই মত খুনে ডাকাত বলে জানি।

বললুম: তাই নাকি!

উৎসাহ পেয়ে নেরেভু বলল: বাকি খবরটুকুও পেয়ে যাব। সেখানকার লোক আছে আমার চেনা। তারা তাঁবুতে ফিরুক।

নেরেভু সত্যিই এক সময় তাদের খবর আনল। একেবারে মারমুখো হয়ে এল। বলল: আমার ছুরি কই?

চাকর তৈরিই ছিল। চক্ষের নিমেষে ছুরি এনে হাজির করল।

আমি কী করব ভেবে স্থির করবার আগেই উন্মাদের মত পেম্‌বার তাঁবুতে ঢুকল নেরেভু। তার পরেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

ভেবেছিলুম, সব শেষ করে দিয়েছে। কিন্তু চাকরদের মুখে অন্য কথা শুনলুম। লামা পালিয়েছে। পেম্‌বাকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেক রাত অবধি আমরা জেগে রইলুম। কেউই ফিরল না। শুধু সামনের তাঁবুর লোকেরা লামার খোঁজ করতে এসেছিল। খবর শুনে শুম্ভিত হয়ে ফিরে গেল। তার কিছু পরেই কান্নার শব্দ পেলুম। চাকররা খবর আনল, তাদের টাকাকড়ি সব চুরি গেছে।

পুরাংএর মণ্ডিতে আরও কয়েকদিন ছিলুম। চাকররা আমার কাছে হুকুম চাইছে তাঁবু তোলবার, আর তা না পেয়ে বিরক্ত হচ্ছে। বলছে: এদেশে যারা যায়, তারা আর ফেরে না। শুধু শুধু সময় নষ্ট করে লাভ কী?

সেদিন শেষ রাতে চলবার হুকুম দিলুম। তাদের আনন্দ আর ধরে না। খট খট শব্দে তাঁবু তুলতে লেগে গেল। গান গাইতেও জানে একটা লোক। টেনে টেনে সুর ধরল: ইয়া ইয়া গ্যু-গ্যু-জের।

এক সময় তাঁবু তোলা শেষ হল, শেষ হল ইয়াকের পিঠে বোঝা বাঁধা। ঝুপ করে বসে পড়ে মুখ ভেঙিয়ে তারা ছাক্‌ওয়াং জানাল। তাদের দিশী প্রথার প্রণাম তার পরেই ইয়াক তাড়িয়ে এগিয়ে চলল।

এক রকমের অদ্ভুত বেদনায় আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল। কিন্তু সেই লোকটা গান গাইছে টেনে টেনে:

ছো পো লেহ-তোঙ্‌ শর নেঅ
ঙা ডো তাঙ্‌নে ইয়োঙ্‌ ইয়োঅ
নে ছেন্‌ পো তা লা রু
ক্রী-মা শর জে লো ছুনে•
সো সো সু—

গল্প যদি এইখানেই শেষ করতে হত, তাহলে এত কষ্ট করে এতখানি লিখতুম না। আমি তো লেখক নই। লেখক হলে এতদিনে একখানা আস্ত ভ্রমণ-কাহিনীই লিখে ফেলতুম। সেদিন একখানা ছবি দেখে এই গল্প মনে পড়ে গেল। আমার এক ফটোগ্রাফার-বন্ধুর দোকানে বসে আড্ডা দিচ্ছিলুম।

কৈলাস-ফেরৎ এক ভদ্রলোক খান কয়েক ছবির ডেলিভারি নিতে এসেছিলেন। কৈলাসের ছবি শুনে আমার কৌতূহল হল। তাড়াতাড়ি ছবিগুলো দেখে দেবার সময় বুকের ভেতরটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। একটি পাগলের ছবি। বললুম: একটু বসবার সময় হবে কি আপনার? বেশি না, মাত্র মিনিট পাঁচেক।

আশ্চর্য হলেও ভদ্রলোক বসলেন।

আমি আমার বন্ধুর সহকারীকে নেগেটিভ দিলুম এনলার্জ করবার জন্যে।

মিনিট কয়েক পরেই ভিজে ছবি হাতে এল। ঠিকই ধরেছি। ফটোগ্রাফারের চোখই কি শুধু ক্যামেরার লেন্সের মতই?

ছবিখানি এগিয়ে ধরে বললুম: কোথায় নিয়েছিলেন এই ছবি?

ভদ্রলোক ঝুঁকে দেখলেন একটুখানি, তারপর বললেন: কৈলাসের নিচের এক গোম্‌ফায়, তিব্বতীরা যেখান থেকে দেশে ফেরে। ছুতেন ফুক, না কী নাম গোম্‌ফার, ভুলে গেছি।

একটু থেমে বললেন: ঝুঁকে পড়ে আমাদের মুখ দেখছিল, আর জড়িয়ে জড়িয়ে কী বলছিল। দোভাষী বলল, বলে, হিন্দু ঠিকই বলেছিল।

আমিও জানতুম, একদিন সে তার ভুল বুঝবে। কিন্তু বড় দেরীতে বুঝল।



বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর

বিদ্যাসাগরের ভাষায় তৎসম শব্দ আর দীর্ঘ সমাস খুব বেশি থাকলেও সুপ্রযুক্তভাবে আছে। রচনার অর্থবোধে কোন অসুবিধা হয় না। তাঁর চেষ্টায় গদ্যভাষা প্রথম রসসৃষ্টিসমর্থ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি সর্বাংশে সত্য—"গ্রাম্য পাণ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।" আর্যভাষারূপে গঠন করার জন্যেই বিদ্যাসাগর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ভঙ্গিতে ধ্বনিগাম্ভীর্যময় তৎসম শব্দাবলীর প্রয়োগ করেছেন এবং তদ্ভব শব্দের লঘু আর কতক পরিমাণে খেলো চাল তাঁর পছন্দ হয় নি। পরে তিনি অ-তৎসম শব্দাবলী আর দেশীয় বাক্যপ্রয়োগরীতির যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন।

১৮৪৭ সালে প্রথম বই হিন্দি "বৈতাল পচ্চিসী-"র প্রায়ানুবাদ "বেতাল পঞ্চবিংশতি" প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে যে সার্বভৌম আধিপত্য লাভ করলেন, তা প্যারীচাঁদ আর কালীপ্রসন্নও ক্ষুণ্ণ করতে পারেন নি। তাঁর যুগের প্রত্যেক গদ্যলেখক তাঁর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে উপযুক্ত ছেদচিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ করলেন এবং নিজের ভাষা আদ্যন্ত মার্জিত করে নিলেন। বিদ্যাসাগর যে অক্ষয়কুমারের লেখা শুধরে দিতেন, তা স্বয়ং রাজনারায়ণ বলে গেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রাধান্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। বঙ্কিমের প্রথম দিকের লেখায় তাঁর কিছু প্রভাবও ছিল। ১৮৭২ সাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যরচনার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে তাঁকে অতিক্রম করেন। সেই সময় থেকে বিদ্যাসাগর কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যচর্চায় হাত দেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্যক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে সমাজসংস্কারবিষয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা ও সম্ভবত কিছু বেনামি রচনা তিনি লিখেছিলেন। এ সময়ে তাঁর জীবনের প্রধান কাজ ছিল সমাজ সংস্কার। তার জন্যে অত্যাবশ্যক গদ্যপ্রবন্ধ রচনা ব্যতীত অন্য ধরণের লেখায় তিনি বড় একটা হাত দেন নি। বেনামি রচনাগুলো তাঁর লেখা হলে তাঁর শ্লেষ-প্রয়োগের শক্তি যে উচ্চাঙ্গের ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুসংখ্যক রচনার মধ্যে "বেতাল পঞ্চবিংশতি"-র পর সংস্কৃত নাটক "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"-এর বিশুদ্ধ গদ্যানুবাদ "শকুন্তলা" উল্লেখযোগ্য। অনেকের মতে, সাধুভাষার ক্ষেত্রে এর ভাষা সর্বোত্তম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ১৮৫৪ সালের সেই গদ্যের কিছু নিদর্শন এখানে দেওয়া হল :—

"বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস কেন? তখন শকুন্তলা গদ্গদ বচনে কহিলেন, বাছা! ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।"

এই অংশটুকু যেভাবে উপযুক্ত বিরতিস্থাপনার দ্বারা সুগঠিত করা হয়েছে, তার ছন্দের বিশ্লেষণ করা যাক :—

বালক | শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র | মা মা করিয়া | তাঁহার নিকটে | উপস্থিত হইল | এবং জিজ্ঞাসিল | মা! | ও কে? | ওকে দেখে | তুই কাঁদিস কেন? | তখন শকুন্তলা | গদগদ বচনে | কহিলেন | বাছা! | ও কথা আমায় | জিজ্ঞাসা কর কেন? | আপন অদৃষ্টকে | জিজ্ঞাসা কর |

কোন সন্দেহ নেই যে, ঠিক এইভাবে গদ্যে ছন্দঃসুষমা প্রবর্তন বিদ্যাসাগরের আগে আর কেউ করেন নি।

পরবর্তীকালে এই গদ্যছন্দের রূপান্তর সাধন করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এই ধরণের কবিতা :—

এমন সময় | আওয়াজ এল কানে |
দাদামশায়! | কিছু লিখেছ নাকি? |
ওকে আমার | কবিতা শোনাবার দাবি | সকলের আগে |

এ ধরণের কবিতার যতিস্থাপনকৌশল বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর বহুদিন আগেই প্রয়োগ করেন। তাঁর "সীতার বনবাস", "ভ্রান্তিবিলাস" প্রভৃতি বই পড়লে দেখা যায়, সর্বত্রই ঐ রকম সতর্ক পদক্ষেপ তাঁর ভাষার গতিবেগ সুনিয়মিত করেছে।

বিদ্যাসাগরের অনুগামীদের সংখ্যা বড় কম ছিল না। তাঁদের মধ্যে "কাদম্বরী"-র অনুবাদক তারাশঙ্কর তর্করত্ন তাঁর রচনায় সাহিত্যরস সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের মতোই কৃতকার্য হয়েছিলেন। ১৮৫৪ সালেই তাঁর লেখা বিদ্যাসাগরপ্রভাবিত ভাষার এই দৃষ্টান্ত বিশেষ উপভোগ্য :—

"ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্বতশিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যাসমীরণে তরুশাখাসকল সঞ্চালিত হইলে বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলিসংকেত দ্বারা আহ্বান করিল। * * * জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল।"

বিদ্যাসাগর ও তর্করত্ন দুজনেই অনুবাদে কাব্যসৌন্দর্যকে প্রাধান্য না দিয়ে গদ্যভাষা গড়ার প্রয়াসে আত্মনিয়োগে বাধ্য হন। এইজন্যে তাঁরা তাঁদের রচনাবলী পূর্ণভাবে মূলানুগ করতে বা খুব বেশি আলঙ্কারিক জ্যোতি বিকীরণে সমর্থ হন নি। মূল রচনার লিখনরীতি বা কবিতা ও নাটকের উপযুক্ত ভাবাবিন্যাসও তাঁরা আদৌ রক্ষা বা সে-চেষ্টাও করেন নি। নাটক, কাব্য, উপন্যাস—সব রচনার অনুবাদেই গদ্যরচনার উপযোগী ভাষারীতি অনুসৃত হয়েছে। তা হলেও তাঁরা অনুবাদ-সাহিত্যে খাঁটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করে প্রশংসনীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর শেক্স্‌পিআরের নাটক Comedy of Errors-এর গদ্যানুবাদ "ভ্রান্তিবিলাস" প্রকাশ করেন। "শকুন্তলা"-র মতো এটিও উপন্যাসের আকারে রচিত। "ভ্রান্তিবিলাস" পড়্‌তে ঠিক উপন্যাসের মতো লাগে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম তিনখানি উপন্যাস এই সময়ে প্রকাশিত হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যের সেই সব প্রথম মৌলিক রোমান্টিক উপন্যাসের তুলনায় ভ্রান্তিবিলাসের সাহিত্যিক সৌন্দর্য অকিঞ্চিৎকর। এই বইএ তাঁর লেখা গদ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য নমুনা পাওয়া যায় :—

"অনন্তর লাবণ্যময়ী ও সোমদত্ত, উভয়ে নিঃস্পন্দ নয়নে, পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ ও প্রভূত বাষ্পবারি বিসর্জন, করিতে লাগিলেন।

সর্বাংশে একাকৃতি দুই চিরঞ্জীব ও দুই কিঙ্কর নয়নগোচর করিয়া অধিরাজ বাহাদুর কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া সন্দিহান চিত্তে কত কল্পনা করিতেছিলেন ; এক্ষণে লাবণ্যময়ী ও সোমদত্তের আলাপ শ্রবণে সর্বাংশে ছিন্নসংশয় হইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন," সোমদত্ত ! তুমি প্রাতঃকালে আত্মবৃত্তান্তের যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলে, তাহার অনেক অংশে আমার বিলক্ষণ সংশয় ছিল ; কিন্তু এক্ষণে তোমাদের স্ত্রী-পুরুষের কথোপকথন শুনিয়া সকল অংশে সম্পূর্ণরূপে সংশয় নিরাকরণ হইল।"

এর সঙ্গে তুলনা করা যাক দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা :—

"দিন যায়। তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা কর, দিন যাবে, রবে না। পথিক, বড় দারুণ ঝটিকা বৃষ্টিতে পতিত হইয়াছ ? উচ্চ রবে শিরোপরি ঘন গর্জন হইতেছে ? বৃষ্টিতে প্লাবিত হইতেছ ? অনাবৃত শরীরে করকাভিঘাত হইতেছে ? আশ্রয় পাইতেছ না ? ক্ষণেক ধৈর্য ধর, এ দিন যাবে, রবে না। ক্ষণেক অপেক্ষা কর ; দুর্দিন ঘুচিবে, সুদিন হইবে ; ভানুদয় হইবে ; কালি পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দের সঙ্গীতঝঙ্কার বিদ্যাসাগরের রচনায় অনুপস্থিত। বিদ্যাসাগর তাঁর রচনায় ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎকালের রূপে যে-"ক" প্রত্যয়টি ব্যবহার করতেন, পরবর্তীকালে তার ব্যবহার উঠে যায়। "করিবেক," "হইবেক" প্রভৃতির অনাবশ্যক-"ক" ধ্বনি উঠে গেলেও সেযুগের আর এক বৈশিষ্ট্য পুনরুক্তি বাচক ২ সংখ্যা বসানো অনেকদিন পর্যন্ত বজায় থাকে। বিদ্যাসাগর যে দীর্ঘ সমাস ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহারের জন্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তা খুব বেশি উৎকট নয়। তিনি "প্রাড্‌বিবাক," "মলিম্লুচ," প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করতেন বটে এবং এই ধরণের সমাসবদ্ধ বাক্যও তাঁর রচনায় পাওয়া যায় :—

"তদ্দর্শনে তিনি তৎক্ষণাৎ বস্তুমাত্রের পতননিয়ামকগুরুত্বাধারণকারণ বিষয়িণী পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।"

কিন্তু এই ধরণের বাক্যগঠন বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার মধ্যেও দেখা যায় :—

"তিনি একবার নবচূতপল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য সেই উজ্জ্বল শ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন।"

তবে, বঙ্কিমের সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিদ্যাসাগরে দেখা যায় না। মোট কথা, বিদ্যাসাগরের লেখা তাঁর যুগে খুব সহজবোধ্য বলেই পরিগণিত হয়েছে। তাঁর অনুগামী রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছেন, সেযুগের পণ্ডিতদের মতে, বিদ্যাসাগরী ভাষার প্রধান দোষ এই যে, তা অনায়াসে বোঝা যেত।

এই যুগেই প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন ও দীনবন্ধু বাংলা গদ্যে ও নাটকীয় সংলাপে আরো বেশি সরল ভাষার প্রচলন করলেন। ১৮৫৫ সালে "আলালের ঘরের দুলাল" নামে বাংলা ভাষার প্রথম নভেল ধরণের উপন্যাস, "মাসিক পত্রিকা"-র প্রথম বর্ষের (১৮৫৪-৫৫) সপ্তম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হতে সুরু করে। এর মধ্যে চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের নিম্নশ্রেণীর লোকের ব্যবহৃত কথ্যভাষার প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, বইটি মোটের উপর সাধুভাষায় লেখা। কেবল বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মধ্যে সাধু ও চলতি ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। লেখকের বর্ণনা দেওয়ার ভাষাতেও মাঝে মাঝে কথ্য ভাষার অসমঞ্জস প্রয়োগজাত গুরুচণ্ডালিদোষ দেখা যায়। কিন্তু বইটি আদ্যোপান্ত বিশুদ্ধ কথ্যভাষায় রচিত নয়। এতে ব্যবহৃত ভাষা নতুন প্রয়োগ-পরীক্ষা হিসেবে যত সমাদর লাভেরই যোগ্য হোক না কেন, তার জন্যে এই ভাষা গ্রহণীয় নয়। কথ্য ভাষায় লিখতে হলে আদ্যন্ত কথ্য-ভাষার প্রয়োগ যেভাবে অব্যাহত রাখা দরকার, তার শিক্ষা ও সাধনা তখনকার লেখকদের ছিল না। কৃষ্ণমোহন বলেছিলেন, ইতর জনের মুখের ভাষায় গদ্যভাষা গঠন করা অনুচিত ; কথ্যভাষার গদ্য হবে সাধুজনের মুখের ভাষায় গঠিত। প্যারীচাঁদ বুঝতে পারেন নি যে, কৃষ্ণমোহনের ইঙ্গিত অনুসারে কলকাতার ভদ্রসমাজের মুখের ভাষায় গদ্য রচনা করা দরকার। তা ছাড়া তখনও আদর্শ কলকেতিয়া কথ্যভাষা এখনকার মতো গঠিত ও প্রবল না হওয়ায় লেখকেরা বুঝতে পারতেন না যে, ঠিক কোন কথ্যভাষা ব্যবহার্য ; প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন দুজনেই একই ভুল করে

উপভাষাশ্রিত গ্রাম্য কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। টেকচাঁদ ঠাকুর জানতেন না যে, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক কথ্যভাষার স্বাতন্ত্র্য বিকাশের ফলেই নতুন নতুন ভাষার উদ্ভব হলেও কোন ভাষায় জেলা-ওয়ারি উপ-ভাষা বা সঙ্কীর্ণ এলাকায় আবদ্ধ কথ্যভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে এই জন্যে গ্রহণ করা সঙ্গত নয় যে, তাতে সমগ্র জনসাধারণ বিশেষ উপভাষাটি সকলের পক্ষে জানা সম্ভবপর না হওয়ায় সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে পারে না। ঠকচাচার মুখের ভাষা রচনায় লেখক সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু ঠকচাচার ভাষা চট্টগ্রামের লোক হয়ত বুঝবে না। সব জেলার কথ্যভাষা সকলের পক্ষে শিখে রাখার কথাই উঠতে পারে না। আদর্শ কথ্যভাষায় গদ্যভাষা গঠন করলে তবেই সেই গদ্য সমস্ত লোকের কাছে সমাদৃত হতে পারে। আর, আদর্শ কথ্যভাষা হচ্ছে শিক্ষিত জনের শিষ্ট সমাজে বলা মুখেরই ভাষা; কারণ, এই শিষ্ট মুখের ভাষা নেহাৎ খেলোও নয়, আবার বেশি জটিলও নয়। এতে সূক্ষ্ম ও উচ্চ ভাব সহজেই রূপায়িত করা যায়, অথচ দুর্বোধ্যতার সৃষ্টিও হয় না। প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন হয়ত বুঝতে পারেন নি যে, আদর্শ কথ্যভাষার আশ্রয় কোথায়। সুতরাং তাঁদের উপভাষার প্রয়োগ ক্ষমার্হ হতে পারে। কিন্তু বাংলা গদ্যে নতুন রীতির পথনির্দেশকের সম্মান তাঁদের দেওয়া যায় না। তাঁরা উৎসাহী ও দুঃসাহসী অভিযাত্রী; কিন্তু সার্থক নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। তাঁরা নিজেরা পথ খুঁজে ফিরেছিলেন বটে, কিন্তু পথ খুঁজে পান নি।

টেকচাঁদ ঠাকুর সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য খর্ব করে বাংলা ভাষাকে স্বকীয়তা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, এটাই যথেষ্ট কৃতিত্বের কথা। বিদ্যালঙ্কার থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত প্রবাহিত সংস্কৃতপ্লাবিত বাংলা গদ্যের ধারা তাঁর প্রয়াসে ধীরভাবে নিজের স্বাভাবিক গতিপথ থেকে অবাঞ্ছনীয় রীতির শৈবালদাম অপসারণে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমেই আদর্শ কথ্যভাষা এবং তার ভিত্তিতে গঠিত গদ্যভাষার সন্ধান না পেলেও তিনি উপভাষার প্রয়োগের দ্বারা বাংলা গদ্যে এমন একটা পরিবর্তন আনলেন যাতে বাংলা গদ্য তিনশো বছর আগের অর্থাৎ ১৫৫৫ সালের রাজকীয় পত্রালাপের সময়ের ভাষার স্বচ্ছন্দতা ফিরে পেল। ১৫৫৫ সালের চিঠির উপর উত্তর বঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব ছিল; ১৮৫৫ সালের উপন্যাসে দক্ষিণবঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব দেখা যায়। প্যারীচাঁদের সুহৃৎ মধুসূদন তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি ও দিব্যতর প্রতিভার সাহায্যে এ-সত্য ধরতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষিত সাধারণের মুখের ভাষায় একদা বাংলা গদ্যসাহিত্য ও নাট্যসাহিত্য রচিত হবে, আর সে-মুখের ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে তৎসম শব্দও থাকবে। শিক্ষিত মন ভাবপ্রকাশের জন্যে গালভরা তৎসম শব্দ ব্যবহার করবেই, তাঁর এই ধারণা পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। তিনি তাঁর নাটকের সংলাপের ভাষায় চলতি অথচ তৎসম শব্দবহুল গদ্য ব্যবহার করে প্রগাঢ় দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যদিও সেজন্যে প্যারীচাঁদ তাঁকে বিদ্রূপ করেছিলেন। মধুসূদনই নাটকে আদর্শ কথ্যভাষার ব্যবহার প্রথম করলেন (১৮৫৮)। সম্পূর্ণ গদ্যে লেখা নাটকে যখন তিনি সম্পূর্ণরূপে ঐ নিখুঁত কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন তখনও হুতোম প্যাঁচার আবির্ভাব ঘটেনি। মধুসূদনের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকে ব্যবহার্য গদ্যভাষার চরমোৎকর্ষ বিধান করেন। বাংলা সাহিত্যে আদর্শ কথ্যভাষার প্রথম ব্যবহার হয় নাটকে এবং তার গৌরব মধুসূদনের প্রাপ্য। বাংলা গদ্য-সাহিত্যে আদর্শ কথ্যভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনার গৌরব রবীন্দ্রনাথের, একথা আগে বলা হয়েছে। সুতরাং বাংলা গদ্যে কথ্যভাষার প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রথম কৃতিত্ব দুজন কবি—মহাকবি ও বিশ্বকবি—অর্জন করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কোন বিশুদ্ধ গদ্যসাহিত্যিকের দ্বারা এই সাফল্য লাভ করা যায়নি।

১৮৫৫ সালে প্যারীচাঁদের উপন্যাস, ১৮৫৮ সালে মধুসূদনের নাটক "শর্মিষ্ঠা," তারপর মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাট্য ও প্রহসন গ্রন্থাবলী—আর ১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের নক্সাখানি গদ্যের ক্রমবিবর্তনের ধারায় আগামী যুগের বিস্ময়কর পূর্বাভাষ সূচিত করে। শিক্ষিত সমাজের বেশির ভাগের মনে তখন একটা সকৌতুক অবজ্ঞার সৃষ্টি করলেও এই চারজন অগ্রদূতের উদ্যম তাঁদের অসামান্য প্রতিভা ও প্রগতিশীলতার নিদর্শন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের পন্থা গ্রহণে সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিদ্যাসাগর-তারাশঙ্কর-ভূদেব এবং প্যারীচাঁদ-মধুসূদন-কালীপ্রসন্নের ধারা দুটির সামঞ্জস্য সাধনের একটা প্রয়াস দেখা গেল। কিন্তু নাটকে কথ্যভাষার সুন্দরতম প্রয়োগ দেখা গেল দ্বিজেন্দ্র-লালের রচনায় আর সাধারণ গদ্যসাহিত্যে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের লেখায়; ইতিমধ্যে বঙ্কিম-সমসাময়িক যুগে আর কেউ এই দুই ক্ষেত্রে পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নি।

এখন "আলালের ঘরের দুলাল"—এর ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমে দেখা যাক, স্বয়ং লেখক কোন্ ভাষায় বর্ণনা ও মন্তব্য রচনা করেছেন:—

"লোকের সর্বপ্রকারে সুখ প্রায় হয় না ও সর্ববিষয়ে বুদ্ধিও প্রায় থাকে না। বাবুরামবাবু কেবল ধন উপার্জনেই মনোযোগ করিতেন। কি প্রকারে বিষয়বিভব বাড়িবে—কি প্রকারে দশজন লোকে জানিবে—কি প্রকারে গ্রামস্থ লোকসকল করজোড়ে থাকিবে—কি প্রকার ক্রিয়া-কাণ্ড সর্বোত্তম হইবে—এই সকল বিষয় সর্বদা চিন্তা করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল।"

এই ভাষা বিদ্যাসাগরের প্রভাবাধীন। এই ছিল সে-যুগের আদর্শ সাধুভাষা। এর পর দেখা যাক বাবুরামবাবুর ছেলে কোন্ ভাষায় কথা কয়:—

"আরে বামুন! তুই যদি হ, ব, ব, র, ল শিখাইতে আমার নিকট আর আসবি, ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তোর চাউল-কলা পাইবার উপায় শুদ্ধ ঘুচাইয়া দিব, কিন্তু বাবার কাছে গিয়া একথা বল্লে, ছাদের উপর হতে তোর মাথায় এমন এক এগার ইঞ্চি ঝাড়িব যে, তোর ব্রাহ্মণীকে কালই হাতের নোয়া খুলিতে হইবে। * * বড় যে বসে বসে ভাবচিস্? টাকা চাই? এই নে, কিন্তু বাবার কাছে গিয়া বল্ গে, আমি সব শিখেছি।"

এই ভাষায় সাধু ও কথ্য ভাষার গুরুচণ্ডালি মিশ্রণ দেখা যায়। এ

ধরণের ভাষা মতিলালের মতো ছেলে তো নয়ই, কেউই ব্যবহার করে না। "শিখাইতে", "গিয়া", "পাইবার" প্রভৃতি অস্বাভাবিক কথ্যভাষার নিদর্শন।

এবার দেখা যাক মতিলালের ফার্সিশিক্ষক বা মুন্সি সাহেবের ভাষা কেমন :—

"আরে রে পড়্! * * * এস্ মাফিক বেতমিজ আওর বদ্ জাত লেড়কা কবি দেখা নাই—এস্ কামসে মুল্‌কমে চাস্ কর্না আচ্ছি হ্যায়। এস্ জেগে আনা বি হারাম হ্যায়। তোবা, তোবা, তোবা!"

এর সঙ্গে তুলনীয় ঠকচাচার ভাষা :—

"কি বল্‌ব, এ পুলিস, দুসরা জেগা হলে তোর উপরে লেফিয়ে পড়ে কেমড়ে ধরতুম। * * মুই বুক ঠুকে বলছি, যেত্‌না মামলা মোর মারফতে হচ্ছে, সে-সব বেলকুল ফতে হবে—আফদ্ বেলফুল মুই কেটিয়ে দিব—মরদ হইলে লড়াই চাই—তাতে ডর কি?"

এর তুল্য বাহুল্যের ভাষা :—

"দোস্ত! ও সব বাত দেল থেকে তফাৎ কর। দুনিয়াদারি মুসাফিরি—সেরেফ আনা যানা—কোই কিসিকা নেহি—তোমার এক কবিলা, মোর চেটে! সব জাহানম্মে ডাল্ দেও। আবি মোদের কি ফিকিরে বেহতর হয়, তার তদ্বির দেখ।"

এ সব হল চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের মুসলমানের ভাষা। এর কৌতুকরস উপভোগ্য। স্বাভাবিকতা রক্ষার জন্যে মুসলমানের মুখে উর্দুর প্রয়োগ সুসঙ্গত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসখানিতে এই ভাবে তিন রকম ভাষার মিশেল থাকলেও রচনায় সরসতা ও নিরবচ্ছিন্নতার কোন অভাব ঘটে নি। প্যারীচাঁদের অন্যান্য রচনাতে গদ্যভাষার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। তিনি সমানে এই ধরণের ভাষা ব্যবহার করে গেলেও নাটকের বাইরে এক কালীপ্রসন্ন ছাড়া আর কেউ গদ্যরচনায় চলতি ভাষার সাহায্য নেন নি। তবে, প্যারীচাঁদের মতো মিশ্র ভাষা কেউ কেউ ব্যবহার করেছেন।

১৮৬২ সালে "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" প্রকাশিত হলে এক অভিনবত্বের সৃষ্টি হল। এই রচনাটির ভাষা সম্পূর্ণরূপে কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের কথ্যভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। সে-কথ্যভাষাও শিষ্টতার অভাবে পীড়িত; সুকুমার ভাবসমূহ তাতে রূপ নিতে পারে না। এর ভাষার একটু নমুনা দেওয়া হল; এর সবচেয়ে বড় যোগ্যতা এই যে, এতে অবাধে মনের কথা কওয়া চলে, সে কথা "গম্ভীর সুরে গম্ভীর কথা" না হলেও :—

"আজকাল বাঙ্গালীভাষা আমাদের মতো মূর্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে। বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা তৈরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রেই একটা-না-একটা পুতুল তৈরি করে খেলা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেউ ওয়ারিসান থাকত, তাহলে স্কুলবয় ও আমাদের মতো গাধাদের দ্বারা নাস্তানাবুদ হতে পেতো না—তাহলে হয়ত এতদিন কত গ্রন্থকার ফাঁসি যেতেন, কেউ-বা কয়েদ থাকতেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালীভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিষ নাই যে, আমরা তাতেই লাগি। সকলেই সকলরকম নিয়ে জুড়ে বসেছেন। বেশির ভাগ একচেটে; কাজেকাজেই এই নক্সাই অবলম্বন হয়ে পড়ল।"

এই কথ্যভাষার মস্ত সুবিধা এই যে, এতে মুখের ভাষায় ব্যবহৃত ফার্সি বা উর্দু শব্দ ঠিক তৎসম শব্দের মতোই প্রয়োগ করা যায়—একটুও শ্রুতিকটু হয় না। সুতরাং বিদ্যাসাগরের সাধুভাষার তুলনায় হুতোমি ভাষার শব্দআহরণবৈচিত্র্য আর শব্দবহনসামর্থ্য অনেক বেশি। এখানেই যেমন-তেমন কথ্যভাষারও উৎকর্ষ। রামরাম বসুর পর প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্ন গদ্যভাষায় স্বচ্ছন্দভাবে সহজ ফার্সি শব্দ ব্যবহার করলেন। পরে এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র-গৃহীত কৌশলটির সার্থকতা বিচার করা যাবে।

গদ্যে লেখা নাটকে দীনবন্ধু খুব ভালো কথ্যভাষার প্রয়োগ সর্বত্র করতে পারেন নি। তিনি সমাজের নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের সংলাপ তাদের উপযুক্ত ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু ভদ্র শ্রেণীর ভাষায় তিনি সামঞ্জস্যের অভাবে গুরুচণ্ডালি দোষ এনে ফেলেছেন। শিষ্ট সমাজের ব্যবহার্য কথ্য-ভাষার রূপ সাহিত্যে কেমন হওয়া উচিত, তা তিনি ধরতে পারেন নি। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত "নীলদর্পণ" নাটকে তোরাপ, আদুরী, ক্ষেত্রমণির ভাষা ঠিকভাবে রচিত হয়েছে; কিন্তু নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, ডেপুটি প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপের ভাষা ত্রুটিপূর্ণ। উদ্বন্ধনে মৃত পিতাকে দেখে বিন্দুমাধব সাধুভাষায় বলছে :—

"এ কি, এ কি! আহা, আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি, কি মনস্তাপ! পিতা আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন!"

এটা খুবই অস্বাভাবিক। পরবর্তী নাটকগুলিতে, বিশেষত ১৮৬৬ সালের "সধবার একাদশী" নাটকে, এই দোষ অনেকটা সংশোধিত হয়েছে।

নাটকের প্রয়োজনে সংলাপের জন্যে চরিত্রানুযায়ী খাঁটি কথ্য-ভাষার ব্যবহার নাট্যকারবৃন্দ মধুসূদনের সময় থেকে করে আসছেন। কিন্তু নাটকের বাইরের গদ্যসাহিত্যে তেমন আশু প্রয়োজন না থাকায় সেটা হতে দেরি হল। অভিনয়ে স্বাভাবিকতা রক্ষার গরজে অর্থনৈতিক কারণে নাটকে চলতি-ভাষা প্রয়োগ করতে নাট্যকারেরা বাধ্য ছিলেন। মধুসূদন "শর্মিষ্ঠা" নাটকের ভাষা সম্বন্ধে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, সাধারণ নাট্যামোদীর পক্ষে ঐ ভাষা হয়ত একটু দুর্বোধ্যই হবে :—

"The only fault found with it is that the language is a little too high for such audiences as we may expect now to patronise it."

১৮৫৮ সালের "শর্মিষ্ঠা"-র ভাষা এই রকম :—

"দৈত্য। (স্বগত) আমি প্রতাপশালী দৈত্যরাজের আদেশানুসারে

এই পর্বতদেশে অনেকদিন অবধি তো বাস কচ্চি ; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না ; কারণ, ঐ দূরবর্তী নগরে দেবতারা যে কথন্ কি করে, কথনই বা কে সেথান হতে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। * * তা, এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও তো অনুমান কত্তে পাচ্চি না ; যা হোক, আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত।"

সামান্য দু একটি তৎসম শব্দ বদলে দিলে এই ভাষা আধুনিকতম আদর্শ কথ্যভাষা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৫৯ সালে লেখা মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে গদ্যভাষা আরো নিখুঁত কথ্যভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৬৬ সালেও দীনবন্ধু সেই ভাষাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। "একেই কি বলে সভ্যতা ?"-য় মধুসূদন লিখেছেন :—

"কালী। আজ্ঞে আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজি চর্চা হয়েছিল। তা, আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই। তাই এই সভাটি সংস্কৃত বিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।"

এই হচ্ছে আদর্শ কথ্যভাষার প্রকৃত রূপ। মধুসূদনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আজ প্রায় এক শতাব্দী পরেও আমরা সভা-সমিতিতে, বেতার বক্তৃতায়, ভদ্রমণ্ডলীর উদ্দেশে এর চেয়ে বেশি পরিণত কথ্যভাষায় কোন বিষয় আলোচনা করতে পারি না, লেখা তো দূরের কথা, ১৮৭৮ সালের আগেই বাংলা নাটকে বাংলা গদ্যের মূল এবং স্বাভাবিক রূপটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে-রূপের আশ্রয়ে সবরকম ভাব ও নাট্যরস যে ফুটিয়ে তোলা যায়, মধুসূদন তা দেখিয়েছেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্ট কথ্যভাষা আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কালীপ্রসন্ন যদি তাঁর ভাষাটি গ্রহণ করতেন, তাহলে "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" সম্বন্ধে সুকুমার সেন মহাশয়কে এই মন্তব্য করতে হত না যে, "একেবারে উপভাষা-ঘেঁষা কথ্যভাষায় লেখা হওয়াতে রচনা নেহাৎ খেলো হইয়া গিয়াছে। এ ভাষায় ব্যঙ্গ উপহাস ছাড়া কিছুই জমে না।" মধুসূদন কথ্যভাষা ব্যবহার করেই দেখিয়েছেন যে, তাতেই সব ভাব সরস করে জমানো যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে গদ্যসাহিত্যে মধুসূদনের দক্ষতা কেউ প্রয়োগ করতে পারলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত সত্য বুঝেও এ ব্যাপারে উপযুক্ত প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

পঞ্চম অধ্যায়

(১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল)

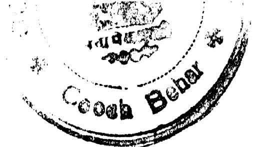
১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশ করলেন, তখন তিনি বিদ্যাসাগরের ভাষায় বেশি পরিবর্তন করেন নি। যেটুকু পরিবর্তিত হয়েছিল, সেটা শব্দে উপাদানগত নয়। সে-উপাদান দুজনের ভাষায় প্রায় এক রকম। যা প্রভেদ দেখা যায়, তা উল্লেখ করার মতো নয়।

কিন্তু তাই বলে দুজনের ভাষা কি এক ? এক দিক থেকে দেখতে গেলে বিদ্যাসাগরীয় ভাষার মতো কোন বঙ্কিমি ভাষা নেই। কিন্তু অন্য অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। ঐ পার্থক্য একটা যুগান্তর সূচনা করে। ঐ ভাষাগত পার্থক্য শব্দের জাতিগত ভিন্নতা এবং পরিমাণ প্রভেদ কিম্বা বিভিন্ন উপাদানের অনুপাতের উপর নির্ভরশীল নয়। এই স্বাতন্ত্র্যের মর্ম অনুধাবন করলে দেখা যায়, ফরাসি পণ্ডিত জর্জ লুই লেক্ল্যার্ক দে ব্যুফ মহাশয় তাঁর বিখ্যাত ১৫ খণ্ডের বই "L 'Histoire Naturelle"-এ যে সত্যকে রূপদান করেছেন, বঙ্কিমরচিত ভাষার মূল তত্ত্বও তাই—"Le style est l'homme meme (যাকে এদেশে অনেকে ভুল করে লেখে, "Le style c'est l'homme !), অর্থাৎ রীতিই ব্যক্তিত্বনির্দেশক। ব্যুফ বলেছিলেন যে, মতবাদ, আবিষ্কার, তথ্য—এ সবই সকলের বেলায় একই রকম হতে পারে ; কিন্তু একটা ক্ষেত্রে এসে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে পৃথক ; সেখানে মানুষ, বিশেষত প্রতিভাবান্ মানুষ স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল ; সেটা হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের style বা রীতির প্রভেদ। এর চেয়ে খাঁটি কথা কমই আছে। ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের সঙ্গে লেখকের পার্থক্য রচনাশৈলীগত, স্বাতন্ত্র্য উপস্থাপনায়, বৈষম্য পরিবেশন ভঙ্গিতে। পূর্ববর্তী লেখকদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্থক্য রীতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রকট—শব্দভাণ্ডারের সম্পদগত পার্থক্য সামান্যই।

প্রথম আবির্ভাবের পর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ রীতি জিনিসটির প্রবর্তন করলেন, বলা যেতে পারে। আগেও লেখকদের মধ্যে রচনাশৈলীর প্রভেদ দেখা গেছে। কিন্তু সে-প্রভেদ অনেকটা শাব্দ উপাদানের উপর নির্ভরশীল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে এই পার্থক্য ভাষার শব্দের পরিমাণ বৈচিত্র্য-নিরপেক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করতে লাগ্‌ল। আগে যেখানে তৎসম শব্দের বাহুল্য ও বিরলতা, দীর্ঘপদ বাগ্‌বিন্যাস ও সংক্ষিপ্ত বাক্যরচনা, চল্‌তি বাগ্‌ধারা প্রয়োগ করা না করা প্রভৃতি তারতম্যের উপর রচনাশৈলীর সূক্ষ্ম বৈষম্য নির্ভর করত, এখন সেখানে উপস্থাপনার কৌশল, আন্তর চেতনার গূঢ় ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ, বৈচিত্র্যপূর্ণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রভৃতির স্বতন্ত্রতার জন্যে রীতির বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। শব্দের উপাদান নিয়ে আন্দোলন ছাড়াও একই উপাদানে ভাষায় লেখকের ব্যক্তিত্বভেদ অনুসারে রচনার কলাকৌশলের আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা গেল।

এই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সাধু ও চলতি ভাষার লেখকদের মধ্যে যা কিছু পার্থক্য দেখা গেছে তাকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম প্রভেদ শ্রেণীগত ; সাধুভাষার লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে চলতি ভাষার লেখকগোষ্ঠীর শব্দে উপাদানগত একটা পার্থক্য দেখা যায় ; এটি গুরুতর প্রভেদ নয়। দ্বিতীয় প্রভেদ ব্যক্তিগত ; এই পার্থক্য রীতিগতভাবে দুটি লেখককে তাদের শ্রেণীনিরপেক্ষভাবে আলাদা করে রেখেছে। এটিই গুরুতর বৈষম্য ; এর জন্যেই অনেক সময় সাধুভাষার দুই লেখকের প্রভেদ এক ধরণের শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা সত্ত্বেও রামমোহন ও কালীপ্রসন্নের পার্থক্যের চেয়েও বেশি হয়েছে। চল্‌তি ভাষাতেও, একজন লেখকের সঙ্গে আর একজনের পার্থক্য অনেক সময় সাধুভাষার লেখকের সঙ্গে শ্রেণীগত পার্থক্যকেও হার মানিয়েছে। সাধুভাষার একজন লেখক এ যুগে চলতি ভাষার যে কোন লেখক থেকে উপাদান ও রীতি, দু'দিক থেকে পৃথক্। বরং দুই শ্রেণীর উপাদানগত বৈষম্য বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটা মিলিয়ে গেছে, রীতিগত তারতম্যই এখন ঢের বেশি প্রবল।

(ক্রমশঃ)



সৃষ্টি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ে চেতনা উদ্বোধনের আয়োজনে জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্বন্ধে যে তত্ত্ব বিবৃত করলেন শ্রীভগবান, তার আলোচনায় স্পষ্ট বোধ হবে প্রকৃতির খেলা? প্রকৃতি অনাদি। প্রকৃতিই সৃষ্টি কেন, স্থিতি ও প্রলয়ের শক্তি-ত্রিগুণ তত্ত্ব আলোচনা করলে সে বোধ জন্মে। প্রকৃতির এই লীলা মায়া। মায়াময় এ সংসার। মায়া ত্যাগ করলে মোক্ষ। তার রহস্য না বুঝলে মায়া অপরিহার্য।

মানুষ ভুলে যায় সে কথা। আপাতমনোহর মধুর কর্ম্মে হয় লিপ্ত। তাই জন্মজন্মান্তর সে ঘুরে বেড়ায় সংসারের গহন গোলক ধাঁধায়। ক্ষেত্রজ্ঞ সৃষ্টি কর্ত্তা পরব্রহ্ম জ্ঞেয়। তাকে যে জ্ঞানে জানা যায় সে জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হলে প্রসার সম্ভব। মাত্র জ্ঞানের উদ্বোধনে নয়—সে জ্ঞান নির্দ্দিষ্ট প্রথায় কর্ম্ম প্রবৃত্ত হ'লে জীবের উদ্ধার। তাই এ অধ্যায়ে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ বর্ণনায়, তিনি জ্ঞানের কতকগুলি রূপ দিলেন। সেই সব সদ্গুণ অর্জ্জন করলে জ্ঞেয় হন জ্ঞানগম্য। ভক্তি ভরে তাঁর শরণ গ্রহণ করলে—প্রকৃতির তিন গুণের বাঁধন হ'তে মুক্তি পাওয়া যায়। আমার মনে হয় জ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞানের রূপ নির্ণয় করলে—পর-ব্রহ্মের ইচ্ছা ও অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি-গড়া মায়াময় এই অখিলের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

অমানিত্ব অদাম্ভিত্ব—জ্ঞান। সুতরাং মায়ার গড়া সংসারের প্রধান রূপ—জীবের আত্মম্ভরিতা শ্লাঘা ও দম্ভ এরা মায়ার রূপ। অহংকার—বিভিন্ন কর্ম্মের সংযোগ এবং সংশ্লেষনে প্রয়োজন। কিন্তু সেই অহংকারে বিমূঢ় ব্যক্তি শ্লাঘা এবং দম্ভরূপ অজ্ঞানের কবলে পড়ে। এইরূপে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত জ্ঞানের প্রত্যেক লক্ষণের বিপরীত—অজ্ঞান যা' বেঁধে রাখে মানুষকে এ সংসারে। সমষ্টি অজ্ঞানই মায়া। অপরে অপরাধ করলে আমাদের আত্ম-শ্লাঘা মার্জ্জনা করবার অবকাশ দেয় না। হিংসা জগৎজুড়ে! হিংসা বাঁধে অহিংসা বাঁধন খোলে। সরলতার অভাব দৃষ্ট হয় পৃথিবীতে সর্ব্বত্র। তাই ঋজুতার বিপরীত ভাব মায়া জগতের এক উপকরণ। যার কাছে উপদেশ পেতে পারে লোক, মায়া তাকে করে অশ্রদ্ধ। মনের ময়লা জীবের শুদ্ধতা রুদ্ধ করে। বলাবাহুল্য স্ত্রীপুত্র ও সংসার ভুলিয়ে রাখে জীবকে এ সত্য হ'তে যে সে অবিভক্ত জগতের অংশমাত্র। মায়া ভুলিয়ে দেয় অধ্যাত্মজ্ঞান, ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান প্রভৃতি। তাই মনে হয় এই ধর্ণনীর অজ্ঞানের রূপ নির্ণয় করলে ফুটে ওঠে মায়ার রূপ।* জীবের অন্তরে আছে বৈরাগ্যের সঙ্কেত. অধ্যাত্ম জ্ঞানের সুপ্ত ধারণা, আসক্তি ও অনভিষঙ্গ। এরাও মায়ার খেলা। কিন্তু তাদের না বোঝা না মানা ও মায়া।

জ্ঞান এবং অজ্ঞানের রূপ নির্ণয় করলেন শ্রীকৃষ্ণ। অজ্ঞান—প্রকৃতির বেঁধে-রাখা মায়া সংসার অরণ্যে। আর জ্ঞানও প্রকৃতি—সাত্বিকগুণ। সে স্পষ্ট হলে বাঁধন কাটে। বাঁধন কাটে তাঁর সন্ধান পেলে যিনি জ্ঞেয়।

ক্ষেত্রজ্ঞের স্তোত্র ভক্তি জাগায় প্রাণে বাস্তবের পটভূমিতে। এ শ্লোক এখানে কেন সন্নিবেশিত হ'ল? প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের শিক্ষায় অনাদি অনন্ত বিভূতি যাঁর তাঁর এ প্রসঙ্গে সে বিভূতি বর্ণনা করা হ'য়েছে। তা হ'তেও সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা হয় সপ্রকাশ। সাংখ্যের পুরুষের মত তিনি দ্রষ্টা অথচ ভোক্তা। তিনি প্রকৃতি হ'তে ভিন্ন নন। প্রকৃতি স্বতন্ত্র অনাদি তত্ত্ব নন। তিনি স্বয়ং যে প্রথায়, সে যন্ত্রে সৃষ্টি করেন সে তাঁর প্রকৃতি। এই প্রকৃতিতে তিনি আচ্ছাদন করেন তাঁর নিজের রূপ। অথচ সৃষ্টির প্রতি অংশে রয়েছে বীজ যার পরিণতিতে অজ্ঞান রূপ বৃক্ষ লুপ্ত হয়।

সে স্তোত্রে আমরা শুনি তিনি সর্ব্বত পাণিপাদ, সর্ব্বত্র চক্ষু, শির ও মুখ বিশিষ্ট এবং সর্ব্বত্র কর্ণ বিশিষ্ট। তিনি প্রাণীসকলে কেন, সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া অবস্থিত। বলেছেন ক্ষেত্রের উপকরণ। ক্ষেত্র প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রকৃতি তাঁরই এক স্বভাব এই কথার স্পষ্ট উপলব্ধি হ'বে বুঝলে যে ক্ষেত্রের বা দেহের যে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক তিনি তাদের মাঝে অবস্থিত। মন্দ কথা শুনে, মন্দ দৃশ্য দেখে, মন্দ গন্ধে, রসে বা স্পর্শে তাঁকে পরিত্যাগ করা যায় না। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান তাঁদের মাধ্যমে না উপজিলে ভ্রান্তির গহন গোলক ধাঁধায় বিচরণের অভিনয় এবং তার মাঝে দুঃখ ভোগের নিবৃত্তি অসম্ভব। এই হ'ল সৃষ্টির লীলা।*

এ প্রসঙ্গে একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে। শুভ বা অশুভ ভাব উভয়েই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু সৃষ্টিতে উভয়েই বিরাজিত। এরা চিরন্তন নয় তাই এরা মায়া। অশুভ দর্শন, অশুভ শ্রবণ ইত্যাদি অশাশ্বত। এ জ্ঞান লাভ হ'লে জ্ঞেয় হন জ্ঞানগম্য। তখন মায়াবসান। এই লীলা সৃষ্টি।

---

* অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্,
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ।৭।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ।
জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্ ।৮।

অসক্তিরণভিষঙ্গ পুত্রদার গৃহাদিষু
নিত্যং চ সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ।১০।
ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্ত দেশ সেবিত্বমরতির্জন সংসদি ।১১।
অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

* সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।১৪

এবার ক্ষেত্রজ্ঞের যে বিভূতি শুনি, তাতে আমাদের জ্ঞান প্রসারলাভ করে। তাঁর ইন্দ্রিয় নাই কিন্তু ইন্দ্রিয় গুণের তিনি সঞ্চয় হ'তে বঞ্চিত হননা। সকল পদার্থ ধারণ করে আছেন তিনি অথচ অসক্ত। প্রকৃতি তাঁর। গুণ প্রকৃতির। তিনি তো নিগুর্ণ কারণ তিনি স্রষ্টা তিনি বদ্ধ নন গুণে। অথচ গুণের ভোক্তা তিনি। কারণ ক্ষেত্র যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। ভোক্তা অর্থে সুখী সুখে, দুঃখী দুঃখে নন। তিনি জ্ঞাতা। তিনি জানেন জীবের সুখদুঃখের কথা।*

তিনি সর্ব্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে। তিনি স্থাবর এবং জঙ্গম, পৃথিবীতে যে ভেদজ্ঞান হয় সে জ্ঞানে ক্ষেত্রজ্ঞের উপাধির চেতনা আসে না। তিনি সে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। তাঁর সে রূপ তো বিদিত হওয়া যায় না—এ স্থূল বুদ্ধিতে। দূরেও তিনি নিকটেও তিনি। অনন্ত বিশ্ব-সংসারের কোনো অণু পরমাণু তো তাঁর বাহিরে নাই। অজ্ঞের পক্ষে তাঁর উপলব্ধি সুদূর পরাহত। জ্ঞানী তাঁর উপাধির নিকটে পৌছতে পারে মাত্র—কিন্তু তিনি অবাঙমানস গোচর।†

তিনি সর্ব্বভূতে অবিভক্ত। কারণ সমস্ত জগৎ মণিরূপে তাঁর সূত্রে গাঁথা। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা বশতঃ সকল জীব, সকল পদার্থ এমন কি আপনার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিভিন্নরূপে উপলব্ধি করি। অথচ তিনি আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল অংশ ধারণ ক'রে আছেন। আবার সংহর্ত্তাও তিনি এবং উৎপাদকও তিনি। সংহার রূপ পরিণতি। সৃজন নূতন রূপ। প্রকৃতি অনাদি কিন্তু বিভিন্ন বিকাশ ছায়াচিত্রের মত পরিবর্ত্তনশীল। মায়া পরিণাম প্রদায়িনী।‡ তিনি জ্যোতি সমূহের জ্যোতি। আমরা পৃথিবীতে যেমন সূর্য্যের জ্যোতিতে সকল পদার্থ দেখতে পাই তেমনি জ্ঞানের জ্যোতিতে স্পষ্ট রূপ দেখি জীবের ও পদার্থের অন্তরের ও বাহিরের। সূর্য্যালোক এমনকি প্রদীপের আলোকও অন্ধকার দূর করে। জ্যোতি জ্ঞান, অন্তরদৃষ্টি, তমসা আঁধার আবরণ। পরব্রহ্ম জ্যোতি হতে জ্যোতি। পূর্ণ জ্ঞান তো অজ্ঞান আঁধারের বিনাশ ভূমি। জ্ঞানে জ্বলে ওঠে চিত্ত। জ্যোতিতে বুঝি সৃষ্টি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যাপার। সেই জ্যোতি যখন পূর্ণ হয় অবিভক্ত সৃষ্টির বিভাগের গণ্ডী যখন দূর হয় তখন বোধ আসে তাঁর। সে বোধ পূর্ণ হলে ধ্যানীর চিত্ত ভরে ওঠে জ্যোতিতে। অব্যভিচারিণী ভক্তি এবং শুদ্ধজ্ঞান যখন ধ্যানীর চিত্ত-বৃত্তিনিরোধ করে তখন উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতম ব্রহ্মজ্ঞান ভুল ভ্রান্তি বিনাশ করে। সে জ্যোতিকে ঢেকে রাখে আঁধার। আঁধার মায়া। কিন্তু এ জ্যোতিদর্শন সম্ভব জীবের পক্ষে কারণ ভগবান সং হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত।* এই স্তরের পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হ'লে সং থাকেনা যে তিনি স্রষ্টা। প্রকৃতি তাঁর যন্ত্র মাত্র। প্রকৃতির দ্ব তিনি সৃষ্ট জীবের জ্ঞানকে সীমা-বদ্ধ করেন যদা তার প্রতীতি জ যে সে বিভক্ত—ক্ষুদ্র—তমসাবৃত। প্রকৃতির এ আবরণে তি বিশ্ব-সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির মধ্যে তিনি। কিন্তু মাত্র এই সৃ পরমেশ্বর নন। তিনি বিশাল।

এইভাবে ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ প্রভৃতির পরিচয় দিয়ে তাই তিনি বল্লেন—

যদা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।১৩।৩২

যেমন আকাশ সর্ব্বগত। সে সূক্ষ্ম। তাই সে লিপ্ত নয় কে পদার্থে। সেইরূপ আত্মা সর্ব্বত্র অবস্থিত কিন্তু তিনি লিপ্ত নন।

সৃষ্টির এই তত্ত্ব বুঝলে পরম গতি প্রাপ্ত হয় জীব। আমার ম হয় এ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞেয়, জ্ঞান, অজ্ঞান—এইসব প্রসঙ্গে এই সূ সন্নিবেশের সঙ্কেত স্পষ্ট। যা প্রত্যক্ষ দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, ঘ্র করি বা আস্বাদন করি—তা জড়। প্রকৃতির বিকার। ক্ষিতি, অ তেজ, মরুৎ ও ব্যোমই সৃষ্টির পূর্ণতা—এই বোধ অজ্ঞান। এরা এদের তন্মাত্র বা অন্তরের তত্ত্বই সর্ব্বস্ব কিম্বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্য যাকে না জানা যায়, অলীক তার অস্তিত্ব, এ ভাবনা মিথ্যা। সে মিথ্যাকে মিথ্যারূপে জানাবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ বোঝালেন—প্রকৃত জ্ঞে কী এবং আসল কর্ত্তাই বা কে।

এ অধ্যায়ে বর্ণিত জ্ঞানের বিপরীত কী তা' জানলে "মায়াময়মি মখিলম" কী তার রূপ ফুটে উঠবে। সে রূপ নিত্য দেখি জীবনে আবার স্রষ্টার রূপ—তার অন্তরে। সে রূপ ফুটে উঠ্‌লে—কাঞ্চন কাঞ্চন-রূপী কাঁসা পিতলের আচ্ছাদন হ'বে উন্মোচন। আরও মনে হ প্রকৃতি যন্ত্র—যন্ত্রী পরব্রহ্ম।

এ কথার আবার অবতরণ করলেন পরের অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জগতকে অনেকে জানে—ব্রহ্মাণ্ড। তিনি বল্লেন সে ব্রহ্মা—প্রকৃতি সে অণ্ড প্রসব করে কিন্তু পিতা আমি। তাই বল্লেন—

মমযোনির্ম্মহদ্‌ ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দদাম্যহম।
সম্ভবং সর্ব্বভূতানাং ততোভবতি ভারত।১৪।৩

মহদাদি তত্ত্ব প্রকৃতি মাতা আমি পিতা। তা' হ'তে সর্ব্বভূতে উৎপত্তি।

তারপর তিনি ত্রিগুণের বিশ্লেষণ করেছেন। সে কথা অন্যত্র আ আলোচনা করেছি।

এ আলোচনায় কয়েকটি উপনিষদের বাণী উপলব্ধি করলে আর স্পষ্ট বোঝা যাবে গীতার শিক্ষা।

[illegible] বলেছে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সমগ্র জগত

---

* সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নিগুর্ণং গুণভোক্তৃচ। ১৫

† বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরম্ চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকেচতৎ।১৬।

‡ অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ। ১৭

* জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।১৮

ব্রহ্মময়। জগৎ ব্রহ্মে জাত, লীন এবং জীবিত হয়। সুতরাং শান্ত-ভাবে, রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত হয়ে তাঁর উপাসনা করবে। রাগদ্বেষ প্রকৃতির কর্ম্ম তাই মনে চাই শান্তি। মানুষ সংকল্প প্রভব। সংকল্প সুষ্ঠু না হ'লে তার ফলভোগ করতে হ'বে।

বৃহদারণ্যক ও ঐ কথা বলেছেন যে ব্রহ্মেবেদং সর্ব্বম। এ সমস্তই ব্রহ্ম হতে জাত।

গীতার যে শ্লোক শুনেছি ঠিক তেমনি শ্লোক শুনি শ্বেতা-শ্বতরোপনিষদে।

তিনি হস্তবিহীন অথচ গ্রহণ করতে পারেন, পদহীন হ'য়েও দ্রুত ভ্রমণ করতে পারেন। চক্ষুহীন তবু দর্শন করতে পারেন। কর্ণহীন তিনি শ্রবণ করতে সক্ষম। তিনি সকলেরই জ্ঞাতা, কিন্তু কেহ তাঁকে জানতে পারেনা। জ্ঞানীজন তাঁকেই আদি এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষ জানেন।

অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা,
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্য বেত্তা
তমাহু অগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।৩।১৯

পরে বলা হ'য়েছে—এই দেবতা বিশ্বের স্রষ্টা, মহান আত্মাস্বরূপ এবং সদা মনুষ্যের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। ইনি হৃদয়, বুদ্ধি এবং মনের দ্বারা প্রকাশিত হন। যে ব্যক্তি তাঁকে জানেন সে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।*

অতএব না জানা জন্মজন্মান্তর মায়া-জগতে অভিনয়। স্পষ্ট জানলে অমৃতলোক।

গীতার বাণী এবং উপনিষদের শ্লোকের সমন্বয় জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ—এ বাণী গীতায় বহুভাবে শুনি। তিনি প্রকাশিত হন—ভক্তিপূর্ণ হ'লে হৃদয় শুভকর্ম্মে এবং বুদ্ধিও জ্ঞানের সংযোগে। তাঁকে যিনি জানেন—মায়া সাগর উত্তীর্ণ হন তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

এবার স্পষ্ট বোঝালেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ—কোনো কোনো বিদ্বান লোক স্বভাবকে (প্রকৃতিকে) আবার কেহ বা কালকে বিশ্বের মূল ব'লে নির্দ্দেশ করেন। তাহারা ভ্রান্ত। কারণ ভগবানের বিরাট শক্তিতে কালচক্র ঘূর্ণায়মান।†

তৈত্তিরীয় উপনিষদে শুনি ঐ একভাবের বাণী—যাঁহা হ'তে এই সকল জীব সৃষ্ট হ'য়েছে, যাঁর দ্বারা তারা সৃষ্ট হ'য়ে জীবন ধারণ করে এবং যাঁহাতে তারা প্রত্যাবৃত্ত ও প্রবিষ্ট হয়—তাঁকে উত্তমরূপে জানবার চেষ্টা কর। তিনিই ব্রহ্ম।১

তিনি আনন্দময়।

কঠোপনিষদের বাণী বড় শিক্ষাপ্রদ। গীতাতেও সে বাণী শুনি। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী এবং মনকে জানবে লাগাম।২

কিন্তু এ রথের অশ্ব কে? ইন্দ্রিয়। পথ কি? রূপাদি বিষয়ই বিচরণ পথ। আর ইন্দ্রিয় ও মনের অধিস্বামী আত্মা ভোক্তা। কিন্তু কোন্ সারথি বিষ্ণুরূপ পরমপদ লাভ করতে পারে? সেই বুদ্ধিরূপ সারথি যখন হয় বিজ্ঞান এবং মনরূপ লাগায় যখন মানুষ উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে পারে—তখনই মানুষ ভব-কাণ্ডারী বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করলে পারে।৩

বলা বাহুল্য—মানবদেহ তাঁরই সৃষ্টি। এই দেহের অন্তরেই বিরাজ-মান আত্মা। এই দেহের মাধ্যমেই জানতে হবে—সেই আত্মাকে। ভ্রান্তিও তাঁর সৃষ্টি। ভ্রান্তিকে ভ্রম বলে জানলে তবে তার হবে শেষ।

বৃহদারণ্যক বোঝালেন—

"আমরা এই (নশ্বর) দেহে থাকিয়াই সেই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হ'তে পারি। যদি জানা সম্ভব না হ'ত তা হলে সে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের তো জ্ঞান হ'ত না। তা না হ'লে তো আমরা জন্ম-মৃত্যুর কবল হ'তে পরিত্রাণ পেতাম না।৪

এই "মহতী বিনষ্টিঃ" বোধ করতে পারে না, জীব অজ্ঞানের সেবায়ও প্রভাবে।

সদাই মানুষকে প্রার্থনা করতে হবে—এবং প্রার্থনা বাক্যের অর্থকে হৃদয়ের অন্তরতম সুরে গাঁথতে হবে—

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।১।৩।২৮ ৫

---

* এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।৪।১৭

† স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।

১ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তৎ ব্রহ্মেতি।৩.১

২ আত্মানং রথিনং বিদ্ধি রথমেব চ শরীরম
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।১।৩.৩

৩ ইন্দ্রিয়াণি হয়মাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান,
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।
বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ
সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম।

৪ ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদী মহতী-বিনষ্টিঃ।
যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি।৪।৪।৪১

৫ আমাদের অসত্য হতে সত্যে নিয়ে চলো (হে পরমেশ্বর)।
(অজ্ঞান) অন্ধকার হ'তে (জ্ঞান) জ্যোতিতে নিয়ে চলো।
মৃত্যু হতে অমৃতত্বে নিয়ে চল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—"চিরসুন্দরের বাহু পাশে তুমি চিরদিন বাঁধা। সংসারের সমস্ত পর্দা সরিয়ে ফেলে, সমস্ত লোভ, মোহ, অহংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে, একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করো—সত্য হ'ক তোমার জীবন, তোমার জগৎ। জ্যোতির্ময় হোক অমৃতময় হোক।"

সৃষ্টির অসত্য উপলব্ধি, তামস উপলব্ধি, মৃত্যুর উপলব্ধি সব মায়ার বাঁধা প্রকৃতির লীলা। কিন্তু তার অন্তরে বিদ্যমান—সত্য, জ্যোতি, অমৃত, তার আবাহনই সাধনা।

আজ আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও।
যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দাও।

ধুলা মায়া, ঘুমের জাল মায়ার জাল। এরা সৃষ্টির বিভূতি কিন্তু অশাশ্বত। কারণ ধুলা ধোয়া যায়। ঘুমের জাল কাটা যায়। সৃষ্টির মূলের বোধ অরুণ আলোর সোনার কাটি—যা অজ্ঞানের নিশিকে শেষ করে। এই উষার রাত্রি অবসানের চেতনায় জ্ঞানী বলে—

জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হ'ক জ্যোতির্ময়।
এস অপরাজিত বাণী অসত্য হানি—
অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়॥
এসো নবজাগ্রত প্রাণ, চিরযৌবন জয় গান।
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা জড়নাশা—
ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয়।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাপ্রভুর শিক্ষার সার বিবৃত করেছেন আদ্য-লীলায়। এ বিষয় শ্রীচৈতন্য বুঝিয়ে ছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে যার ফলে তিনি তাঁর দার্শনিক মত পরিবর্ত্তক করেছিলেন। গীতা এবং উপনিষৎ হ'তে যে শ্লোকের উল্লেখ করেছি এ প্রবন্ধে তার কয়েকটির সরল ব্যাখা করেছেন শ্রীচৈতন্য।

আদ্যলীলায় কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

জগৎ কারণ নহে প্রকৃতি, জড়রূপা।

প্রকৃতি গৌণ কারণ সৃষ্টির। কারণ—

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয় জারণ

প্রকৃতি জড় সেই জড় ভগবানের শক্তিতে চালিত হ'য়ে পৃথিবী সৃষ্ট করে। আরও স্পষ্ট করে বোঝালেন কবিরাজ গোস্বামী—

ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার।
কৃষ্ণকর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র দণ্ডাদি উপায়। আদিলীলা।৫।১৪

ব্রহ্মই স্রষ্টা। প্রকৃতি যন্ত্র। একমাত্র বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা—

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ব্রহ্ম বিনা কিছু নাই। তাই শুনি বিভূতি বর্ণনায়—

যচ্চাঽপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম।

ভূতসমূহের মধ্যে যা কিছু আছে তার আমিই বীজ। আমা-ভিন্ন হ'তে পারে এমন কিছু নাই।

শক্তি ও শক্তিমান অভেদ—সে তত্ত্ব অতি-সংক্ষেপে ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন পরমহংসদেব—

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, দুটো ব'লে বোধ হয়।"

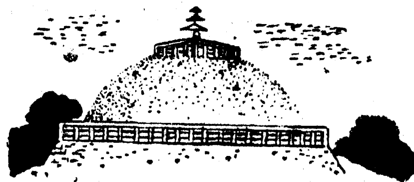
ব্রহ্মানন্দ কেশবকে তিনি বলেছিলেন—"হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই।

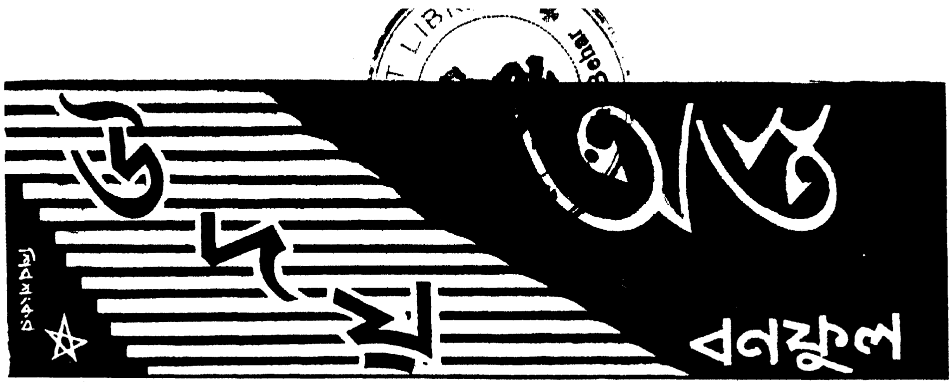
—ব্রহ্ম আর শক্তি যেমন অগ্নি আর দাহিক শক্তি।...সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না। সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না।

—আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোনো কাজ করবেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এইসব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি, নামরূপ ভেদ।"

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম, তরন্তি তে—বলেছেন ভগবান। সে বিষয়ে ঠাকুরের শিক্ষা কী?

—"ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন। ঈশ্বর লাভ না করলে হয়না। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া ঈশ্বরকে জানতে দেয় না। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছেন।"





(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কুমার তখন ল্যাংড়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুই হাঁস-গুলো ছাড়িয়ে কুটে এখানে ঠিক করে' রাখ। এখন ওগুলোকে ওই কেরোসিন কাঠের সিন্ধুকটার ভিতর ঢুকিয়ে রেখে দে। তারপর বাড়ি থেকে বাসনপত্তর, মশলা, পেঁয়াজ, রসুন আর তোলা উনুনটা নিয়ে আয়। সব ঠিক হ'য়ে গেলে তারপর উনুনের আঁচটা দিয়ে দিস্"

ল্যাংড়া এসব কাজ করিয়া অভ্যস্ত, সে কাজে লাগিয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, "মাংস কি এখানে রাঁধবে নাকি"

"বাড়িতে যে কাকাবাবু রয়েছেন। বৌদি এসব হাঙ্গামা বাড়িতে করতেই দেবেননা। এমনি হাঁসটাঁস মারাতে ওর মনে মনে আপত্তি যথেষ্ট। এখানেই বেশ হবে"

"বেশী ঝালটি কিন্তু দিওনা বাপু—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "ডাকরোস্টই তো ভালো সবচেয়ে"

"সে আর একদিন খাওয়াবো আপনাকে। আজ কারি হোক"

"কি কি হাঁস পেয়েছেন। চখা তো রয়েছে দেখছি। ওগুলো কি—"

"বেশীরভাগই টিল। আর ওই বড়টা Spoonbile। এদেশে বলে পস্‌নি ঠোরা"

সন্ধ্যা নাকটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আঁশটে গন্ধ হবে না তো"

"না। ঠেসে পেঁয়াজ রসুন দেব"

সন্ধ্যা দূরে চাহিয়া বলিল, "মেজদি আসছে। এবার বকুনি খাবার জন্যে প্রস্তুত হও"

সকলে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল উষা আসিতেছে। তাহার গায়ের লাল র‍্যাপারটা প্রতিফলিত সূর্য্য কিরণে আগুনের মতো দেখাইতেছিল। দূর হইতে তাহাকে মূর্ত্তিমতী রোষ-বহ্নির মতোই দেখাইতেছিল, কিন্তু নিকটে আসিতে দেখা গেল সে হাসিতেছে। কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া সে আর একটু হাসিল এবং আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

"আরে আরে আমাকে প্রণাম করছিস কি! তুই ব্রাহ্মণের মেয়ে, ব্রাহ্মণের বউ, আমি ছত্রি"

"বাঃ, আপনি যে কাকাবাবু—"

"এই কাণ্ড দেখ"

তাহার পর উষা রঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "খাবে না? ক'টা বেজেছে জান?"

"তা তো জানিনা, ঘড়ি কাছে নেই"

সন্ধ্যার হাতে সুদৃশ্য একটি রিষ্ট-ওয়াচ ছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "দেড়টা"

"এতক্ষণ বসে গল্প করছিলি, তোর হুঁস থাকা উচিত ছিল"

"কবরেজ কাকা এসে পড়লেন যে"

উষা হাসিমুখে কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "খুব গল্প জমিয়েছিলেন বুঝি। আহা, আমি শুনতে পেলুম না। কিন্তু চল সব, আর দেরি নয়। রান্না হ'য়ে গেছে, বাবা তোমাদের সকলকে নিয়ে খাবেন বলে' অপেক্ষা করছেন। ওগুলো কি—"

ঘরের বারান্দার উপর স্তূপীকৃত হাঁসগুলি এইবার সে দেখিতে পাইল।

সন্ধ্যা মুচকি হাসিয়া বলিল, "ছোটদা মেরে এনেছে"

"ও বাবা, এত বেলায় অত তত্ত্ব এখন করবে কে"

"আমি এখানেই রান্না করব"

"তুমি তো শুধু খুন্তি নাড়বে। মশলাপত্তর হাঁড়ি-কুড়ি ঘি তেল মশলা সব বয়ে বয়ে আনতে হবে। কে করবে অত কাণ্ড!"

কুমার বলিল, "তুই ভাবছিস কেন, ল্যাংড়া করবে সব"

"আমি তোমার সঙ্গেই থাকব ছোটকাকা"—স্বাতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল।

উষা ল্যাংড়ার নিকট আগাইয়া গেল এবং তাহাকে আদেশ করিল, "দেখ মেটেগুলো সব আলাদা করে' রাখিস। আলাদা চচ্চড়ি হবে"

কবিরাজ মহাশয় স্মিতমুখে ইহাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিতেছিল না, মুগ্ধ অভিভূত হইয়া তিনি কেবল দেখিতেছিলেন ইহাদের, লোকে যেমন ভালো ফুলের বাগান দেখে।

ল্যাংড়ার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া উষা বলিল, "চল,চল, আর দেরি নয়। বাবা অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য। গগনের বউ গীটার বাজিয়ে শোনাবে বাবাকে। কাকাবাবু চলুন, গল্প শুনব আপনার কাছ থেকে। কাকীমা কেমন আছেন। ভালো আছেন তো—"

"খুব প্রবলভাবে ভালো আছেন। বয়স তিনকুড়ি পার হয়েছে, কিন্তু বুড়ি হয়নি। এখনও শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে খায়। যখন কথা বলে মনে হয় কামান গর্জ্জন করছে। তার ভয়েই তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই—"

"খুব বকেন বুঝি আপনাকে"

"আমি ছাড়া আর কাকে বকবে। আর তো কেউ নেই"

কবিরাজ হাসিমুখে উষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উষার সহসা মনে পড়িল কবিরাজ-কাকার দুটি মেয়ে ছিল। সব মারা গিয়াছে। চুপ করিয়া রহিল সে।

কবিরাজ বলিলেন, "আমি যখন থাকি না তখন ভগবানকে বকে। বকে আর কাঁদে। চোখে ঘুম নেই। রাত্রেও বকে। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনা ভগবানের কান নেই, আর মৃত্যু পৃথিবীর নিয়ম। সবাই মরবে। আগে আর পিছে। বলি কিন্তু বোঝে না"

হঠাৎ এই শোকাবহ পরিস্থিতির চেহারা বদল হইয়া গেল পোস্টমাস্টারবাবুর আবির্ভাবে। তিনি একটি টেলিগ্রাম লইয়া আসিয়াছেন।

"পিওনটা ফেরেনি এখনও। তাই আমিই নিয়ে এলাম"

কুমার সানন্দে অনুভব করিল রাধানাথবাবুর ঔষধ ধরিয়াছে।

টেলিগ্রাম খুলিয়া কুমার বলিল, "সেজদা কাল আসছে"

উষা সানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল।

"সেজবৌদিও আসছে তো"

"হ্যাঁ। লিখেছেন—Reaching with family"

"বাবা শুনে খুব খুশী হবেন। উনি ভাবছেন। মেজদার কোন খবর নেই?"

"এখনও পাইনি তো—"

"কি যে কাণ্ড মেজদার—"

কবিরাজ মহাশয় সান্ত্বনা দিলেন।

"দেখ সবই যদি একরকম হ'ত, তাহলে একঘেয়ে হয়ে যেত দুনিয়াটা। ভগবান দু'টি মুখ একরকম করেননি। হাতের পাঁচটি আঙুল পাঁচরকম। পৃথুবাবু নতুন সুর বাজিয়েছেন একটা। যখন শুনব তখন ভালোই লাগবে মনে হয়—"

রঙ্গনাথ পকেট হইতে একটা খাতা বাহির করিয়া তাহাতে লিখিতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে যে সব কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল তাহাই টুকিয়া রাখিতেছিলেন। এরকম খাপছাড়া ডায়েরি লেখা তাঁহার স্বভাব।

স্বাতী সহসা চেঁচাইয়া উঠিল, "ছোট পিসি, তোমার পিঠের উপর প্রকাণ্ড একটা পোকা বসেছে—"

সন্ধ্যা নিজের মনে দস্তানা বুনিতেছিল, আর ভাবিতেছিল দিদি আসিয়াই কবিরাজ-কাকাকে প্রণাম করিল, কিন্তু সে তো করে নাই। অন্যায় হইল কি? সকলকে প্রণাম করা কি উচিত? না, কেবল প্রণম্যদের প্রণাম করাই ঠিক। কিন্তু সত্যই কি কেহ প্রণম্য আছে—এই সব কথা ভাবিতেছিল সে। ভাবিতেছিল ইহা লইয়া

একটা প্রবন্ধ লিখিবে। স্বাতীর কথায় সে লাফাইয়া উঠিল না। মৃদুকণ্ঠে কেবল বলিল, "ফেলে দে না—"

"ও বাবা, ওর গায়ে আমি হাত দিতে পারব না। প্রকাণ্ড বড়—"

উষা বলিল, "গঙ্গা ফড়িং। গঙ্গায় কত জল জিগ্যেস করলেই পা তুলে দেখাবেন গঙ্গায় কত জল—ওই দেখ পা তুলছে। বাঃ সুন্দর সবুজ ফড়িংটি তো। এত বড় প্রায় দেখা যায় না। যাক আমি ফেলে দিচ্ছি—"

রঙ্গনাথ মৃদু হাসিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন বাঘের কবলে পড়েছিলে—

"তার মানে?"

"পোকার জগতে গঙ্গা ফড়িং হচ্ছে বাঘ"

দূরে দেখা গেল শান্তা আসিতেছে।

"ওই শান্তা আবার আসছে। চল, চল, বৌদি রাগ করছেন ঠিক—"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

কুমার পোষ্টমাস্টারবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি পাখীর মাংস খান তো"

"খাই—"

"তাহলে আজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে খাবেন? হাঁস শিকার করেছি আজ—"

"হ্যাঁ, বন্দুকের আওয়াজ পেয়েছিলাম একটু আগে"

"রাত্রি দশটা নাগাদ আসবেন"

"আচ্ছা"

পোস্টমাস্টার অন্তরের অন্তস্তলে যাহা অনুভব করিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও করেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত একটা আনন্দ হইতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর স্বাতি শশব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। দেখা গেল বাগানের বাহিরেই যে মাঠটা আছে সোমনাথ সেখানে এক দুই তিনকে লইয়া ঘুড়ি উড়াইতেছে। এক লাটাই ধরিয়া আছে, চমৎকার একটি লাল ঘুড়ি আকাশে উড়িতেছে।

উষা বলিল, "ওদের নিয়ে এমনিই তো আমি নাকানি-চোবানি খাচ্ছি, এর উপর তুমিও যদি ওদের সঙ্গে যোগ দাও, তাহলে তো আমি আর পেরে উঠব না, হাল ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। চান টান হয়ে গেছে তোমার?"

সোমনাথ হাসিয়া বলিল, "ভোরেই তো চান করেছি"

"চল এখন খাবে চল। এই এক ঘুড়ি লাটাই থাক, এখন খাবি চল—"

এক ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, "বাঃ, একটু আগেই তো লুচি তরকারি পেট ভরে খেয়েছি। আমার এখন খিদে পায় নি"

দুই বলিল, "আমারও পায় নি"

তিন বলিল, "আমালও"

তিনের বয়স যদিও ছয়, কিন্তু তাহার আধো-আধো কথা এখনও আছে, এখনও সে পরিষ্কারভাবে 'র' উচ্চারণ করিতে পারে না।

উষা ধমকাইয়া উঠিল।

"তোমাদের তো কোন সময়েই খিদে পায় না, ঘাড় ধ'রে খাইয়ে দিতে হয়। চল, যা পার খেয়ে নেবে। বউদি কতক্ষণ বসে থাকবে তোমাদের জন্য"

সুতা গুটাইতে গিয়া একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। বাবলা গাছে ঘুড়িটা আটকাইয়া শেষ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া গেল।

"ওই যাঃ—এ কি হ'ল"

এক প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

"ও ঠিক করে' দেব আমি। তাছাড়া গঙ্গাকে আরও চারটে ঘুড়ি, দুটো লাটাই, আর অনেক সুতো আনতে দিয়েছি আমি। চল না, খেয়ে দেয়ে আবার ওড়ানো যাবে—"

ছেঁড়া ঘুড়িটা গুটাইয়া সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল আবার।

১১

সূর্য্যসুন্দরের ঘরেই খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঘরটি প্রকাণ্ড হলের মতো। সকলেরই বেশ কুলাইয়া গেল। সূর্য্যসুন্দরের বিছানার পাশে যে তেপায়াটা ছিল তাহার উপর প্রকাণ্ড একটি কাঁসার গ্লাসে ডালসুদ্ধ এক ঝাঁক রক্তজবা শোভা পাইতেছিল। পুরসুন্দরী গ্লাসটি কাঠের সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সূর্য্যসুন্দরের বাবার গ্লাস, ওই গ্লাসেই তিনি প্রত্যহ নাকি জল পান করিতেন। অত বড় গ্লাস আজকাল দেখা যায় না, যেমন বড় তেমনি ভারী। খালি গ্লাসটাই কিরণ সহজে একহাতে তুলিতে পারে নাই। জলভরতি এই গ্লাস ঠাকুরদা প্রত্যহ

এক হাতে অবলীলাক্রমে তুলিতেন, এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। সূর্য্যসুন্দর গ্লাসটিতে জল ভরাইয়া তাহাতে কিছু জবাফুল সাজাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। জবাফুল তাঁহার বাবার খুব প্রিয় ছিল, প্রত্যহ জবাফুল দিয়া কালীপূজা করিতেন তিনি। শেষ-জীবনে নিজের বাসার আঙিনায় দুইটি জবার গাছও তিনি পুঁতিয়াছিলেন। এই গাছ দুইটির এবং তাঁহার পোষা হরিণটির সেবা করা তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। পোষা হরিণের শিং দুইটিও সূর্য্যসুন্দর সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। সেটি সামনের দেওয়ালেই টাঙানো ছিল। তাহাদের ঘিরিয়াও একটি জবাফুলের মালা দুলিতেছিল। সূর্য্যসুন্দরের আদেশে উর্ম্মিলাই মালাটী গাঁথিয়াছিল। আজ সহসা তিনি যেন একটু বেশী কল্পনা-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাবার স্মৃতি-চিহ্নগুলিকে সাজাইয়া একটু যেন বেশী তৃপ্তি পাইতেছিলেন। এই সবের ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তর শুধু বাবাকেই নয়, পৃথ্বীশকেও যেন স্পর্শ করিতে চাইতেছিল। তিনি তাঁহার মনের ভাব অবশ্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি জানেন কথায় প্রকাশ করিয়া বলিলে এ সবের মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। আপনার মনেই মশগুল হইয়া বসিয়াছিলেন তিনি। পত্নী রাজলক্ষ্মীর অয়েলপেন্টিংখানাও সামনের দেওয়ালেই বিলম্বিত ছিল। উর্ম্মিলা তাহাতেও একটা কুন্দফুলের মালা টাঙাইয়া দিয়াছিল।...একটা কাঁসার গ্লাস, এক জোড়া হরিণের শিং, আর রাজলক্ষ্মীর ছবিটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে জগত মনে সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা ঠিক স্বপ্নও নহে, উভয়ের সংমিশ্রণে একটা অদ্ভুত জগত। তিনি কল্পনা করিতেছিলেন এই যে আজ তিনি ছেলেমেয়ে নাতি-নাতিনী-নাতবৌ লইয়া খাইতে বসিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বাবা এবং রাজলক্ষ্মী অদৃশ্যভাবে উপস্থিত আছেন। পৃথ্বীশও। তিনি ডাক্তার, এই সেদিন পর্য্যন্ত প্র্যাক্টিস করিয়াছেন। মানুষের স্থূল শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার ছিল। কিন্তু স্থূল শরীরের কারবার করিতে করিতেই এমন সব ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যাহার তাৎপর্য্য অ্যানাটমি, ফিজিওলজি বা প্যাথোলজির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, সূর্য্যপথে রহস্যলোকে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার মর্ম্ম বোঝা যায়। পরলোক বলিয়া যে কিছু একটা আছে তাহার আভাস একাধিকার তিনি ইহজীবনেই পাইয়াছেন। সেদিন বিশেষ করিয়া চৌধুরীজির কথাটা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। বছর দশেক আগে চৌধুরীজির মৃত্যু হইয়াছে। তিনিই তাঁহাদের গৃহচিকিৎসক ছিলেন, চৌধুরীজির শেষ চিকিৎসাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর প্রায় বারোঘণ্টা পূর্ব্বে চৌধুরীজী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। শেষে কাহাকেও আর চিনিতে পারিতেছিলেন না। বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছিলেন বুঝা যাইতেছিল না। সূর্য্যসুন্দর সন্ধ্যা হইতেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন এবং ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়াইতেছিলেন। জোর করিয়া মুখ ফাঁক করিয়া খাওয়াইতে হইতেছিল, ঔষধের সবটা পেটেও যাইতেছিল না, কস বাহিয়া পড়িয়া যাইতেছিল। চৌধুরিজির বড় ছেলে ফাগুবাবু রাত্রি দশটা নাগাদ শুইতে গেলেন। তাঁহারও জ্বর হইয়াছিল। সূর্য্যসুন্দরই জোর করিয়া তাঁহাকে শুইতে পাঠাইলেন। যখন ঘটনাটি ঘটিল তখন রাত্রি একটা। সূর্য্যসুন্দরেরও একটু ঢুল আসিয়াছিল। হঠাৎ একটা চীৎকারে তাঁহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন—নিশীথ নীরবতাকে বিদীর্ণ করিয়া নীচে যেন কে ডাকিতেছে—ছক্কু, ছক্কু, চল আমি এসেছি। ডাকটি শুনিবামাত্র চৌধুরিজি তড়াক করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। সূর্য্যসুন্দর দেখিলেন, তাঁহার আচ্ছন্নভাব নাই—চোখের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল।

"ছক্কু ছক্কু বলে' কে ডাকলে, না?"

"হ্যাঁ"

"শুনেছেন আপনি?"

চৌধুরিজিকে বেশ উত্তেজিত বোধ হইল।

"শুনেছি। কেউ বোধহয় চাকর-টাকরকে ডাকছে। ছক্কু বলে' আপনাদের কোন চাকর আছে কি? যাইহোক আপনি উঠেছেন যখন—তখন এই ওষুধটা খেয়ে নিন"

"না, আমি আর ওষুধ খাব না। বাবুলাল আমাকে ডাকতে এসেছে, আমারই ডাক নাম ছক্কু"

সূর্য্যসুন্দর একথা জানিতেন না।

"বাবুলাল কে?"

"আমার বাল্যবন্ধু। অনেকদিন আগে মারা গেছে।

কথা ছিল, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে আগে মারা যাবে সে অপরের মৃত্যুকালে ডাকতে আসবে। বাবুলাল ডাকতে এসেছে। আমি চললাম—"

চৌধুরিজি বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। একটু পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই ঘটনাটা মনে পড়িবার পর তাঁহার বাল্যবন্ধু মন্মথকে মনে পড়িল। সে-ও তো অনেকদিন আগে মারা গিয়াছে। সে কি তাঁহার মৃত্যুকালে ডাকিতে আসিবে? কোনও কথা হয় নাই তো।

কিরণ আসিয়া প্রবেশ করিল।

"চম্পাকে আগেই খাইয়ে দিলুম। গগনের জেদ! গগন বলছে তোমরা যখন খাবে তখন চম্পা এই কোনের ঘরে বসে' গীটার বাজাবে। তুমি গীটার শুনতে চেয়েছ না কি"

"হ্যাঁ"

"বৌদি কিন্তু খুব চটে গেছে। বলছে শ্বশুর-শাশুড়ি স্বামী-দেওর কেউ খায়নি ও আগে খাবে কেন"

"তাতে কি হয়েছে। শাশুড়ির ধারা ধরেছে দেখছি বড় বউ। ও পোয়াতি মানুষ, ওকে আগেই খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ডেকে দাও আমি বলে' দিচ্ছি"

"ডাকতে হবে না, আমি বসিয়ে দিয়েছি। খাবে তো ভারি। আমি উর্মিলাকেও বসিয়ে দিয়েছি, ও তো আপনাকে খাওয়াবে"

কিরণ আবার চলিয়া গেল। ক্রমশঃ



পংঢরপুর সর্বোদয় সম্মেলন

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজীর মৃত্যুরপর গান্ধী-অনুরাগী গঠনকর্মীরা পরস্পরের সঙ্গে মিলনের জন্য সর্বোদয় সমাজ গঠন করেন। গান্ধীজীর ধ্যানের ভারত গঠন করা এই সর্বোদয় সমাজের লক্ষ্য হলেও কোন সংগঠনের আকার একে দেওয়া হয় নি। এ যেন সর্ব-সমন্বয়ের প্রকৃত কল্যাণকামী মানুষদের এক ভ্রাতৃসম্মেলন। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা, আর বৎসরান্তে সম্মেলনে সমবেত হওয়াই এর প্রধান কর্ম ছিল। অবশ্য গান্ধীজীর আরব্ধ কাজগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁরই প্রতিষ্ঠিত অখিল ভারত চরখা সংঘ, গ্রামোদ্যোগ সংঘ প্রভৃতি গঠনকর্ম সংস্থাগুলির একত্রীকরণ করে সর্বোদয় সংঘ নামে এক নতুন প্রতিষ্ঠানেরও স্থাপনা হয়েছিল এবং সাংগঠনিক কাজের দায়িত্ব তার উপর দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় সর্বোদয় সম্মেলনের কিছু পরেই ভূদান যজ্ঞের কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। আর ১৯৫২ সালের চতুর্থ সর্বোদয় সম্মেলনে সর্বোদয় সমাজ ও সর্ব-সেবা-সংঘ ভূদান আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই থেকে বিনোবাজীকে কেন্দ্র করেই প্রতিবছর সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বছর মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত তীর্থস্থান পংঢরপুরে গত ৩০-৩১শে মে ও ১লা জুন দশম সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পংঢরপুর বোম্বাই রাজ্যের শোলাপুর জেলায় অন্তর্গত সিরাজ-কোতুর লাইট রেলওয়ের উপর একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এর একপাশ দিয়ে ভীমা বা চন্দ্রভাগা নদী প্রবাহিত। এখানে পাণ্ডুরঙ্গ বিঠলদেব, রুক্মিনী এবং পুণ্ডলীকের মন্দির আছে। পুণ্ডলীক সম্পর্কে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। পুণ্ডলীক মা-বাবাকে ঈশ্বর জ্ঞানে একাগ্রচিত্তে সেবা করতেন। ভগবান পাণ্ডুরঙ্গ একবার পুণ্ডলীকের সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। পুণ্ডলীক তখন মা-বাবার সেবায় নিমগ্ন। তিনি তাঁর কাজে অবিচলিত থাকলেন এবং ভগবানের অভ্যর্থনায় তাঁর দাঁড়াবার জন্য একটি ইঁট বাড়িয়ে দিলেন। এইজন্য এখানে বিঠলদেব বহু বছর ধরে মূর্তিরূপে একটি ইঁটের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এখানকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানে দূর থেকে মূর্তিকে দর্শন করলেই চলবে না। ভক্ত এখানে ভগবানকে স্পর্শ করেন এবং ভগবানও তাঁকে আলিঙ্গন করেন, এই রকম কল্পনা করা হয়েছে। প্রত্যেক বছর প্রধান চারটি একাদশীতে—শয়ন, উত্থান, পার্শ্ব ও ভৈম—লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারী এখানে সমবেত হন। অন্যান্য একাদশীতেও এখানে লোক সমাগম হয় প্রচুর, আর বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

বিনোবাজী পদযাত্রা করে পংঢরপুরে এসে পৌঁছান ২৮শে মের প্রত্যূষে। আর ২৯ তারিখে ওখানেএক অপূর্ব ঘটনা ঘটে। বিনোবাজীর পদযাত্রী দলে বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকেন। দেবমন্দিরে প্রবেশের ইচ্ছা থাকলেও তিনি স্থির করেছিলেন যে, তাঁর সাথী আগ্রহশীল অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যদি মন্দিরে প্রবেশের অধিকার না দেওয়া হয় তবে তিনিও মন্দিরে যাবেন না। এর আগে হরিজনরা সংগে ছিল বলে বৈদ্যনাথধামে পথ থেকে তাঁকে প্রায় প্রহৃত হয়ে ফিরে আসতে হয়।

পুরীতে তাঁর সঙ্গে একজন ফরাসী মহিলা ছিলেন বলে দরজা থেকে চলে আসতে হয়। কেরলের গুরুবায়ুর মন্দিরেও তিনি প্রবেশ করতে পান নি। কিন্তু এখানে তাঁর ইচ্ছাপূর্ণ হয়। পংঢরপুরে পৌঁছবার আগেই এখানকার বিভিন্ন মন্দিরের ট্রাষ্টি ও পুরোহিতেরা বিনোবাজীকে সংগী-সাথীসহ মন্দিরে আসার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ জানান। ২৯শে মে বিনোবাজী সদলবলে বিগ্রহগুলি দর্শন ও স্পর্শ করেন। পরবর্তী সভাগুলিতে এই কথার উল্লেখ করে বিনোবাজী একে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বর্ণনা করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, ভারতবর্ষের সমস্ত মন্দির একে অনুসরণ করবে। তিনি মনে করেন যে, মন্দিরগুলির দ্বার সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের জন্য উন্মুক্ত করার দ্বারা হিন্দু ধর্মের সহনশীলতা ও উদারতাকে আরও অগ্রসর করে দেওয়া হবে।

অন্যান্য বারের মত এবারও সম্মেলন উপলক্ষে কুটীরশিল্পের এক প্রদর্শনী করা হয়। বিরাট জায়গাজুড়ে প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কুটীর শিল্পজাত জিনিসের সমাবেশ করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর একদিকে ছিল বিক্রয়ের ব্যবস্থা, আর অন্যদিকে নানাবিধ তথ্য। এরই অঙ্গ স্বরূপ একদিকে ছিল সর্বোদয় সাহিত্যের প্রদর্শনী। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত সর্বোদয় সাহিত্য একত্র করে এখানে দেখানো হয়েছিল। এই দুটি প্রদর্শনীরই উদ্বোধন করেন বিনোবাজী। ৩০শে মে সাহিত্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে বিনোবাজী যে বক্তৃতা দেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা এক অমূল্য সম্পদ। তিনি বললেন যে, বিশ্বের রূপ গঠনে ঈশ্বরের শক্তি ছাড়া আর তিনটি শক্তি কাজ করে। সেগুলি হল বিজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ও সাহিত্যের শক্তি। বিশ্ব-জীবনের রূপ দান করে বিজ্ঞানের শক্তি, আত্মশক্তি দেয় তার আকার—আর এই দুটির মধ্যে সেতুর কাজ করে সাহিত্যের শক্তি। তাঁর কথায়, "বিশ্ব গঠনের তৃতীয় শক্তি হল সাহিত্যিকদের। বাল্মিকী, ব্যাস, শেক্সপীয়র, হোমার, শঙ্করাচার্য, রবীন্দ্রনাথের মত লোকেরা পৃথিবীতে এসেছেন আর এমন জিনিস তাঁরা এখানে রেখে গিয়েছেন যা থেকে চিরদিন সহায়তা পাওয়া যাবে। যখন শান্তির প্রয়োজন ছিল তখন তাঁরা শান্তির বাণী শুনিয়েছেন। যখন উৎসাহের প্রয়োজন ছিল তখন তাঁরা উদ্দীপনাময়ী জিনিস দিয়েছেন! যখন আশা জাগাবার প্রয়োজন ছিল তখন তাঁরা তা দিয়েছেন। যখন যে-সমাজে যা প্রয়োজন হয়েছে, তখন সেই জিনিসই এঁরা লোকদের দিয়েছেন। তার ফলে সমাজ জীবনের পরিবর্তন হয়েছে। যে সব বড় বড় বিপ্লব হয়েছে তার পিছনে ছিলেন চিন্তাশীল ব্যক্তি আর সাহিত্যিক। এঁরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন। এই তিনটি শক্তিই আজ পর্যন্ত বিশ্বকে গঠন করেছে আর ভবিষ্যতেও করবে। বিজ্ঞানের দ্বারা বাহ্যরূপের পরিবর্তন হয় এবং মনের উপর প্রভাব বিস্তারের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিজ্ঞান সোজাসুজি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বাণী আরও অগ্রসর হয়ে সোজাসুজি হৃদয়কে স্পর্শ করে; তাকে আঘাত করে। আত্মজ্ঞান অন্তরকে আলোকিত করে। বিজ্ঞান বাইরে থাকে, আত্মজ্ঞান অন্তরে থাকে আর এই দুটির মধ্যে সেতু নির্মাণ করে বাণী। সে দুটির মধ্যে যোগসাধন করে আবার উভয়কে আলোকিত করে।"

এইদিনই দুপুরবেলা আধ ঘণ্টা সমবেত সুত্রযজ্ঞের দ্বারা সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হল। এবারে সভানেত্রী হল শ্রীমতী রমা দেবী। তিনি যে কেবল উড়িষ্যার বিশিষ্ট গঠনকর্মী পরলোকগত গোপবন্ধু চৌধুরীর স্ত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীর ভ্রাতৃজায়া রূপেই পরিচিতা তা নয়, উড়িষ্যার প্রত্যেকটি গঠনকাজেই তাঁর সাক্ষাৎ যোগ আছে। আর সেজন্য সর্বত্রই তিনি মাতা রমা দেবী বলে পরিচিতা। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রায় তের হাজার প্রতিনিধি এবার সম্মেলনে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে গিয়েছিলেন ৪৫৮ জন। প্রতিনিধিদেরও এবার সকলকে এক সংগে থাকার ব্যবস্থা না করে পংঢরপুরের শতাধিক ধর্মশালায় ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রথম দিনের অধিবেশনে আগত শুভেচ্ছা বাণীগুলি পাঠ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাঁর শুভেচ্ছা বাণীতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "যখন ভারতবর্ষের চারিদিকে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হচ্ছে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে ভূমি সংস্কারের, ছোট বড় শিল্পগঠনের, সমাজ সংস্কার ও সমাজ কল্যাণের আড়ম্বর সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবাদ রয়েছে, ভাষা ও প্রদেশের সীমানা নিয়ে বিরোধ বর্তমান, যখন এক দিকে দেশের ঐক্য বিনষ্ট করবার জন্য বিভিন্ন কার্যকলাপ আর আকার দিয়ে একতা রক্ষা করবার জন্য আবেদনের ছড়াছড়ি, যখন নিরাশা ও অসহিষ্ণুতার প্রাবল্য রয়েছে, যখন সমগ্র ভারত আপনাতে আপনি বিচলিত এবং গতিশীল অবস্থার মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে তখন বিনোবাজীর ক্ষীণকায় মূর্তি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের মত দৃঢ়তা, নম্রতা ও বিনয়ের সংগে দণ্ডায়মান আছে। তাঁর মধ্যে প্রাচীন ভারতের সামর্থ্যের আলোক আছে এবং তাঁর চোখে ভবিষ্যৎ ভারত দর্শনের দৃষ্টি আছে। তাঁর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আমাদের মতৈক্য বা মতভেদ যাই থাক, আমাদের মত তুচ্ছ লোকের এই অধিকার নেই যে, তাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছু সিদ্ধান্ত করে নেব। কেননা তিনি এই রকম সিদ্ধান্তের উর্দ্ধে। গান্ধীজীকে এবং ভারত আত্মা ও ভারতীয় ভাবধারাকে তিনি যেমন প্রতিনিধিত্ব করেন আর কেউ তত করে না।"

প্রথম দিনের ভাষণে বিনোবাজী সর্বোদয় সম্মেলনকে স্নেহ সম্মেলনের আখ্যা দিলেন। তিনি বললেন যে, আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই নানা রকমের সম্মেলন হচ্ছে। এই সব সম্মেলনে কোথাও প্রতিযোগিতার কথা, কোথাও সংঘর্ষের কথা, কোথাও বা শান্তির নামে অশান্তি সৃষ্টির কথা ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু আজ পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হল স্নেহ অর্থাৎ প্রতিরোধী প্রেম। প্রেমের প্রতিদানে প্রেম নয়, বিদ্বেষ ও হিংসার সামনে যে প্রেম তারই নাম সত্যাগ্রহ—আর তার ফলে বিশ্বমানব সঙ্কটমুক্ত হতে পারে।

পরদিন বিভিন্ন নেতার পরিচালনায় গোষ্ঠী বৈঠকের আয়োজন হয়। কর্মীরা আপন আপন রুচি অনুযায়ী গ্রামস্বরাজ, সত্যাগ্রহ, ভাবী কার্যক্রম, শান্তিসেনা ও তন্ত্রমুক্তি—এর যে-কোন একটি বৈঠকে যোগদান

করেন। বৈকালিক অধিবেশনে বিনোবাজী বিশেষ করে মহিলাদের শান্তিসেনার দায়িত্ব নিতে বলেন। তিনি বলেন যে, মাতৃশক্তিই করুণার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

অন্যান্য কয়েকবারের মত এবারও রাষ্ট্রপতি সম্মেলনে এসেছিলেন। তৃতীয়দিনের অধিবেশনে তিনি বক্তৃতা দেন। সুখের সাধনের সংগে সংগে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়, ত্যাগময় জীবনের দ্বারাই যে মানুষ প্রকৃত সুখী হতে পারে, এই কথা তিনি বললেন। তিনি স্বীকার করলেন যে, ভারতীয় পরম্পরায় সর্বোদয়ের পথই শ্রেষ্ঠ।

গান্ধীজীর একান্ত-সচিব প্যারেলালজী এবার সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। গান্ধীজীর শেষ দিকের জীবনের উপর দুটি বই লিখতে তিনি এতদিন ব্যস্ত ছিলেন। সম্প্রতি তিনি তা শেষ করেছেন। গান্ধীজী স্বাধীনোত্তর ভারতে কিভাবে অর্থনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত করতে চাইছিলেন, সেকথা তিনি সমাগত প্রতিনিধিদের বললেন। গান্ধীজীর অছিবাদের কল্পনা যে ধীরে ধীরে সর্বোদয় আন্দোলনে মূর্ত হয়ে উঠছে, একথাও তিনি বললেন।

সমাপ্তি ভাষণে বিনোবাজী বিচার প্রচারের গুরুত্ব সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান কথা বললেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখলে দেখা যায় যে, এখানে যখন যে বিচার বা আদর্শ এসেছে ভারতবর্ষ তাকে গ্রহণ করেছে, নিজের সংগে মিলিয়ে সমন্বয় করে নিয়েছে। গত সাতবছর ধরে ভূদান-গ্রামদানের যে কাজ চলছে তা-ও এক বিচার প্রচারের কাজ। পৃথিবীর ইতিহাসে বিচার প্রচারের কয়েকটি সাধন দেখা গিয়েছে। শুধু বিচারের কথাই বলে গিয়েছিলেন মহাবীর। গৌতমবুদ্ধ বিচার প্রচারের সংগে যজ্ঞে বলিদান বন্ধ করতে কত কাজও হাতে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিচার-প্রচারে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য নেওয়া হয় এবং তারও পরে নতুন আদর্শ প্রচারে সৈনিক শক্তি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হিংসার পথ গ্রহণ করা হয়। বিনোবাজী আরও বলেন যে, যদিও তিনি গত সাত বছর ধরে একটি কর্মসূচীকে অবলম্বন করে নিরন্তর পদযাত্রা করে চলেছেন, তবু শুদ্ধ বিচারেই তাঁর আস্থা ক্রমশ বর্ধিত হয়ে চলেছে। তাঁর কাছে বৃত্তির চেয়ে শব্দ বা বাণী অধিকতর শক্তিশালী, আর শব্দের চেয়ে মৌনতা বা নিঃশব্দ শ্রেষ্ঠ।

বিনোবাজী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই সময় মণ্ডপের একাংশে একটু ঠেলাঠেলি ও গোলমাল হয়। তার ফলে বিনোবাজী এই কথা বলে তার বক্তৃতা বন্ধ করে দেন যে, মৌনতার মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্য আরও ভালভাবে প্রকট হবে। তাঁর এই কথায় মণ্ডপের প্রায় কুড়ি হাজার প্রতিনিধি ও দর্শক সম্পূর্ণ শান্তভাবে পাঁচ মিনিট মৌনতা অবলম্বন করেন এবং এইভাবে দশম সর্বোদয় সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

সর্বোদয় সম্মেলনের নিয়ম হল যে, এখানে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় না। তবে সম্মেলনের সময় সর্ব সেবা সংঘ এক বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেন, আর তা সম্মেলনে উপস্থিত করা হয়। এবারকার প্রস্তাবে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য বারের মত আগামী বছরের কর্মসূচীর কোন ইঙ্গিত এই নিবেদনে নেই। কয়েকটি মৌলিক কথার উল্লেখ এতে আছে। হিংসার হানাহানি থেকে মানুষকে যদি মুক্তি পেতে হয় তবে হিংসার কারণ দূর করতে হবে। গ্রামদানের মাধ্যমে গ্রামস্বরাজ গঠন সেদিকে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সহযোগিতামূলক এবং বৈষম্যহীন সমাজ অর্থাৎ সর্বোদয় সমাজ গঠন গ্রামস্বরাজের পথেই সম্ভবপর। আর এরই সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হল শান্তি সেনার কাজ। শান্তি সেনার দ্বারা গ্রাম স্বরাজের সংরক্ষণ হবে এবং জনগণও নিজেরাই নিজেদের রক্ষার কাজ করতে পারবে। এজন্য শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই শান্তিসেনার কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা অনুকূল। এজন্য সর্ব সেবা সংঘকে ব্যাপক করে গান্ধীজীর কল্পিত লোক সেবক সংঘে রূপান্তরিত করায় অগ্রণী হওয়া দরকার।

এবারকার সম্মেলনের আগে অন্ধ্র প্রদেশের কর্মীরা স্থির করেছিলেন যে, পংঢরপুর সম্মেলনের স্মৃতি স্বরূপ তাঁরা সম্মেলনের আগেই আরও একশ'টি গ্রামদান-প্রাপ্তি করবেন। আনন্দের কথা যে, তাঁরা এই সঙ্কল্প পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। সম্মেলনের সময় ১৯,৬৭৫ একর জমি ও ৩,৬৮৯ পরিবার বিশিষ্ট ১২৫টি গ্রামদানের উপহার তাঁরা সভানেত্রীর কাছে অর্পণ করেন।

৩১ তারিখের ভোরে বাংলাদেশের একশ জন কর্মী বিনোবাজীর সংগে মিলিত হলেন। এইভাবে প্রত্যেক প্রদেশের কর্মীরাই বিনোবাজীর সংগে মিলিত হন। এবারে বিনোবাজী আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৯৫৯ সালে তিনি কাশ্মীর যাবেন এবং তার পরে আসামের দিকে যাত্রা করবেন। বাংলাদেশেও তিনি যাতে কিছু সময় থাকেন বাংলার কর্মীরা সেই আহ্বান তাঁকে করলেন। বিনোবাজী তাতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু বললেন যে, মানচিত্রে যে পথের চিহ্ন আছে তা ছাড়াও ভগবানের কাছে যাবার আর একটি পথ আছে। সেখানে যেতে কোন যানের প্রয়োজন নেই। শুধু ডাক আসার অপেক্ষা, তিনি তাঁর জন্য প্রস্তুত। সুতরাং তাঁর আগমনের অপেক্ষায় বাংলাদেশের সঙ্ঘ যেন প্রস্তুত থাকে। বাংলাদেশে পারস্পরিক বিরোধ থাকলেও সেখানে সকলের হৃদয়ে ভক্তির ধারা প্রবাহিত। বাংলাদেশ শ্রীচৈতন্যের দেশ। এখানে প্রেমের শক্তি প্রথম। সংগঠনের মাধ্যমে অন্যান্য প্রদেশে কাজ হলেও এখানে তা হবার নয়। প্রতিরোধী প্রেম আর ভক্তির পথেই বাংলাদেশে কাজ হবে। বাংলার কর্মীরা সেই পথে অগ্রসর হয়ে কাজ সমাপ্ত করুন, আর বিনোবাজী যখন আসবেন তখন তাঁকে এই কথা বলেই যেন স্বাগত করা হয় যে, তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি এখন স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশে বাস করে বাংলার সংগীত শিক্ষা করতে পারেন।

একথা বলার সৌভাগ্য কি বাঙ্গালীর কোনদিন হবে?





অনুবাদ সাহিত্য

সাইমনের বাবা

(গী দ্য মোপাসাঁ)

অনুবাদ ঃ গোপাল দাস

বারোটা বেজে গেছে। স্কুল-বাড়ীর দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল ছেলের দল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় একজন গিয়ে পড়ল আর এক-জনের ঘাড়ের ওপর। কিন্তু সেদিন আর কেউই সোজা বাড়ীর পথ ধরলে না রোজকার মতো। একটু দূরে গিয়েই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল। রাস্তার উপরেই জটলা বাঁধতে লাগল। আর শুরু হল তাদের গুজগুজ ফিসফাস কথাবার্তা।

লা ব্লানশটের ছেলে সাইমন সেদিনই প্রথম ওই স্কুলে গেছে পড়তে। এই হচ্ছে ব্যাপার।

ছেলেরা সবাই জানত সাইমনের মাকে। সকলের দাওয়াতেই লা ব্ল্যানশটকে নিয়ে আলোচনা হত। এমনিতে সবাই ভাল ব্যবহার করত তার সঙ্গে। কিন্তু মায়েরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার সময় ঘৃণাই প্রকাশ করত তার সম্বন্ধে। তাই দেখে ছেলেছোকরাদের মনো-ভাবও গড়ে উঠল সেইভাবে। অবশ্য এর কারণটা ঠিক করতে পারলে না তারা।

সাইমনকে তারা জানত না মোটেই। গ্রামের রাস্তায় কিংবা নদীর ধারে কখনও ছেলেদের সঙ্গে খেলতে আসেনি সাইমন। বাড়ী থেকেই বেরুত না সে। কাজেই কেউ ভালবাসত না তাকে।

বিশেষ একটা কথা নিয়েই আজকের দিনে মেতে উঠেছে সবাই। কথাটা বলতে কিংবা শুনতে অদ্ভুত একটা মজা লাগছিল তাদের! কথাটা অবশ্য যুগিয়ে দিয়েছে চোদ্দপনের বছরের একটি ডেঁপো ছেলে। এ সম্বন্ধে হয়ত সব কিছুই জানত সে।—জানিস সাইমনের বাপ নেই! ধূর্তমি-ভরা একটা খারাপ ইঙ্গিত ছিল তার কথার মধ্যে।

লা ব্ল্যানশটের ছেলে তখন স্কুল-বাড়ীর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সাত কি আট বছর হবে তার বয়স। একটু ফ্যাকাসে দেখালেও বেশ পরিচ্ছন্ন। একটু ভীরু রকমের আর অপ্রস্তত ধরণের তার চালচলন।

সে ফিরে যাচ্ছে বাড়ীতে তার মায়ের কাছে। তাকে দেখেই ঘোঁট-পাকানো ছেলের দল শুরু করলে কানাকানি আর ফিসফিসানি। দুষ্টুমির সঙ্গে একটা নিষ্ঠুর ভাব ফুটে উঠেছে তাদের চোখেমুখে। দেখতে দেখতে সবাই ঘিরে ফেলল তাকে। হতবুদ্ধি সাইমন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সকলের মাঝখানে। তাকে নিয়ে ওরা করবে কি—তা সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। তারপর যে ছেলেটি ওই খবর সংবাদটি বহন করে এনেছে সেই সামনে এগিয়ে এল। একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরে সে এখন রীতিমত গর্বিত। জিজ্ঞেস করলে—কি নাম তোমার?

—সাইমন, সে উত্তর করলে।

—সাইমন কি? আবার প্রশ্ন করলে ছেলেটা।

সাইমন একেবারেই ঘাবড়ে গেছে। এক কথাই বললে—সাইমন।

—সাইমন একটা কিছু ত' হবে, ধাড়ী ছেলেটা চেঁচিয়ে বলে উঠল।—শুধু সাইমন কারুর নাম হয় না।

—সাইমনই আমার নাম রাখা হয়েছে, চোখের জল চাপতে চাপতে সে তৃতীয় বার উত্তর করলে।

ফ্যা ফ্যা করে হাসতে লাগল ছোকরার দল। দলের পাণ্ডা সেই ধাড়ী ছেলেটা বিজয়-গর্বে দিলে গলার স্বর চড়িয়ে—ওর যে বাপ নেই। এবার সবাই ঠিক বুঝতে পারলে।

একদম চুপ হয়ে গেল সবাই। এ যেন একেবারে অসম্ভব অদ্ভুত এক ব্যাপার। সচরাচর দেখা যায় না। ছেলেটার কিনা বাপ নেই! ওকে একটি অস্বাভাবিক জীব বলেই মনে হল তাদের। এক রকমের করুণাও জাগতে লাগল ওর জন্যে।

একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সাইমন। আর একটু হলে পড়েই যেত সে। একটা চরম দুর্ঘটনায় যেন সে হয়ে গেছে পঙ্গু। এমনি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। উত্তর দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কি বলবে উত্তরে। বাপ নেই—এই সাংঘাতিক অভিযোগ ত' আর অস্বীকার করতে পারে না সে। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ আমার বাবা আছে।

—কোথায় সে? সর্দার ছেলেটা জানতে চাইল।

চুপ করে থাকে সাইমন। সে কি জানে তার বাবা কোথায়! টিটকিরি দিয়ে উঠল ছেলেগুলো। উত্তেজনায় তারা অধীর। খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষের সন্তান ওরা। জন্তুর মতো ওদের স্বভাব। ওদের মনে উদগ্র হয়ে উঠল একটা নির্দয় বাসনা। খামারের সুস্থ-দেহ মুরগীগুলো যেমন একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে তাদের সদ্য-আহত সঙ্গীটিকে, ওদের মনেও জাগছিল তেমনি একটি নিষ্ঠুর আকাঙ্ক্ষা।

হঠাৎ একটি ছোট ছেলের দিকে নজর পড়ল সাইমনের। এক বিধবার সন্তান। তারই এক ক্ষুদে প্রতিবেশী। ওর নিজের মতোই ছেলেটি তার মায়ের সঙ্গে একা একা ঘুরে বেড়ায় সবসময়।

—আর তোমারও নেই, ওই ছোট ছেলেটির দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল।—কখখনো তোমার বাবা নেই।

—হ্যাঁ, আমার আছে।

—কোথায় সে? জিজ্ঞেস করে সাইমন।

—মারা গেছে, খুব জাঁক দেখিয়ে বললে ছোঁড়াটা। কবরের ভেতর রয়েছে। ওই হচ্ছে আমার বাবা।

ওই উজবুক ছোঁড়াগুলোর ভেতর একটা সাড়া পড়ে গেল। তাদের সঙ্গীই জিতেছে। মরে গেলেও ত' গোরের নীচে রয়েছে ওর বাপ। আর সাইমনটার যে একেবারেই বাপ নেই। কোন কালেই নেই। ওই ক্ষুদে বদমায়েসগুলো চারদিক থেকে ক্রমেই চেপে ধরছিল সাইমনকে। যেন ওর জন্ম অবৈধ বলেই ওকে শ্বাসরোধ করে পিষে ফেলবে ওরা, ওই বৈধজন্মার দল। আর ওই বৈধ সন্তানদের বাপেদের অধিকাংশই হচ্ছেন বজ্জাত, মাতাল, চোর আর স্ত্রীনির্যাতনকারী।

সাইমনের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিল যে ছোঁড়াটা, হঠাৎ সে জিব বার করে ভেংচে বলে উঠল—বাপ নেই, বাপ নেই!

সাইমন দুহাত দিয়ে তার চুল টেনে ধরে দমাদম লাথি মারতে লাগল তার গায়ের ওপর। হিংস্রভাবে দিলে তার একটা গালে কামড় বসিয়ে। তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। লড়াই শেষ হয়ে গেলে দেখা গেল—মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে সাইমন। বেদম মার খেয়েছে। প্যান্ট, জামা গেছে ছিঁড়ে। শরীরের অনেক জায়গাই গেছে থেঁতলে। আর তার চারদিক ঘিরে উল্লাসে জয়ধ্বনি দিচ্ছে ওই ভবঘুরে ছোঁড়ার দল। গায়ের ছোট জামাটার ধুলো ঝেড়ে যন্ত্রের মতই সে উঠে দাঁড়ায়। অমনি ওই দলের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল—যা, বলগে তোর বাবাকে।

মনটা খুবই দমে গেল সাইমনের। ওদের গায়ের জোর তার চাইতে অনেক বেশী। মেরেছেও ওরা খুব। কিন্তু তবুও তার উত্তর দেবার কিছুই নেই। সে ত ভাল করেই জানে যে সত্যিই তার বাবা নেই। অনেক কষ্টে চোখের জল চেপে রেখেছিল এতক্ষণ। গলা বুজে আসছিল কান্নায়। জোর করে চোখের জল আটকাতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। তবু ডাক ছেড়ে কাঁদল না সে। ফোঁপাতে লাগল। ভীষণ আবেগে ফুলে ফুলে উঠছিল তার ছোট্ট দেহখানা। একটা হিংস্র আনন্দের সাড়া পড়ে গেল তার শত্রুদলের ভেতর। ওকে ঘিরে তারা পরস্পরের হাত ধরে বৃত্তাকারে নাচতে শুরু করে দিলে। হত্যার পূর্বে বন্দী মানুষ কিংবা জন্তুকে ঘিরে বর্বর মানুষেরা যেমন জুড়ে দেয় ভয়ঙ্কর নৃত্য। আর সকলে একসঙ্গে সুর মিলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল—বাপ নেই! বাপ নেই!

সাইমন হঠাৎ বন্ধ করলে তার ফোঁপানি। একটা উন্মত্ততায় পেয়ে বসল তাকে। তার পায়ের কাছে পড়েছিল নুড়ি পাথর। তাড়াতাড়ি কতকগুলো তুলে নিলে হাতে। তারপর দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল তার নির্যাতনকারীদের ওপর। দু তিন জনের গায়ে গিয়ে লাগল সেগুলো। তারা পালাল চেঁচাতে চেঁচাতে—তার সেই দুর্দমনীয় ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে সকলে কিরকম ভয় খেয়ে গেল। ক্রোধোন্মত্ত ব্যক্তির সম্মুখ থেকে বিদ্রূপকারী জনতা যেমন ভীরুর ন্যায় পালিয়ে যায়, তারাও তেমনি রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে পড়ল সেখান থেকে। সাইমন একাই রইল সেখানে। ওই পিতৃপরিচয়হীন বালকটি তখন মাঠের দিকে ছুটে চলল। হঠাৎ একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল তার। অমনি একটা সিদ্ধান্তও করে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। নদীর জলে সে ডুবে মরবে।

দিন আষ্টেক পূর্বে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল এক হতভাগ্য ভিকিরী। একেবারেই পয়সাকড়ি ছিল না লোকটার। যখন তাকে তুলে আনা হয়েছিল জল থেকে, তখন সাইমনও ছিল সেখানে, বেঁচে থাকতে লোকটাকে কি কুৎসিত আর বিশ্রীই না দেখাত। কিন্তু এখন তার ওই ফ্যাকাসে মুখ আর পলকহীন স্থির চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা গভীর শান্তির ভাব ফুটে উঠেছিল। তখন তার দিকে তাকাতে খারাপ লাগেনি সাইমনের। বরং ভালই লেগেছিল।

কে একজন বলেছিল—মারা গেল লোকটা।

আর একজন বললে—সম্পূর্ণ সুখীই এখন সে।

টাকা ছিল না তাই মরেছে ওই অভাগা লোকটা। আর বাপ নেই সেই জন্যে ডুবে মরবে সে। একদম জলের কাছে এসে দাঁড়াল সাইমন।

তরতর করে বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ জলের স্রোত। কতকগুলো মাছ একেকবার মাথা তুলছিল জলের ভেতর থেকে। মাঝে মাঝে ওপরে লাফিয়ে উঠে ফড়িং ধরছিল। তাই দেখে কান্না থামাল সাইমন। মাছের অমনি ধারা খাওয়া দেখতে খুবই আমোদ পাচ্ছিল সে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনের ওপর ঝড়ের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল এই চিন্তাটা—আমার ত বাবা নেই, তাই ডুবে মরব আমি।

দিনটা ছিল খুবই ভাল। কচি নরম ঘাসের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে উষ্ণ রোদ। একখানা আরশির মত চকচক করছিল নদীর জলটা। কিছুক্ষণের জন্যে মনটা শান্ত হল সাইমনের। একটা অবসাদ এসে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল তাকে। দুপুরের এই মিঠে উষ্ণ রোদে নরম ঘাসের ওপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

এমনি সময় তার পায়ের তলা থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল একটি ছোট সবুজ রঙের ব্যাঙ। ওটাকে ধরবার চেষ্টা করলে সাইমন। পালিয়ে যাচ্ছিল ওটা। ছোটাছুটি করে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলল ব্যাঙটাকে। ওটার একটা পেছনের পা ধরেছিল সে। সামনের পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে ব্যাঙটা পালাবার চেষ্টা করল তার হাত থেকে। তা দেখে হেসে ফেলল সাইমন।

সোনালীবৃত্ত দিয়ে ঘেরা গোল গোল চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল ব্যাঙটা। আর সামনের পা দুটো বার বার শূন্যে ছুঁড়ে মারছিল ঠিক যেন দুখানা হাত। তা দেখে সাইমনের মনে পড়ল একটা খেলনার কথা। ঠিক এমনিভাবে সামনের দিকে একটি কাঠি ঠেলে দিয়ে তার সঙ্গে আটকানো খেলনা-সৈনিক কসরৎ দেখায় হাত ছুঁড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় তার বাড়ীর আর মায়ের কথা। আবার যেন তার দুঃখের পাথার উথলে ওঠে। হাঁটুমুড়ে বসে পড়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে সাইমন। কোন দিকেই আর নজর নেই তার।

হঠাৎ সে কাঁধের ওপর অনুভব করে একখানি ভারী হাতের স্পর্শ, মোটা গলায় কে একজন বলে উঠল—ওগো খোকন সোনা, কিসের জন্যে এত দুঃখ তোমার?

সাইমন মুখ ঘুরিয়ে দেখে। দীর্ঘকায় একজন মজুর সদয়ভাবে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। মুখভর্তি তার কাল দাড়ি, আর মাথায় কোঁকড়ান চুল।

—ওরা মেরেছে আমায়—আমার—আমার—বাবা নেই সেইজন্যে। কোন রকমে বললে সাইমন। গলার স্বর ভারী।

—মানে! হেসে বললে লোকটি—কেন, সকলের ত বাবা আছে।

—কিন্তু আমার—আমার যে বাবা নেই। অনেক কষ্টে কান্না সামলে উত্তর করলে ছেলেটি।

এবার গম্ভীর হয়ে গেল শ্রমিকটি। লা ব্র্যাশোর

ছেলেকে সে আগেই চিনতে পেরেছিল। এ পল্লীতে সে নবাগত হলেও লা ব্লানশটের ইতিহাস কিছুটা জানা ছিল তার।

—আচ্ছা বেশ, লোকটি বললে।—এখন শান্ত হও ত তুমি। তারপর চল আমার সঙ্গে তোমার মায়ের কাছে। তিনিই ঠিক বলে দেবেন—কে তোমার বাবা।

দুজনে রওনা হল এক সঙ্গে। ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে চলেছে লোকটি। নতুন করে আবার হাসি ফুটল তার মুখে। লা ব্লানশটের সঙ্গে দেখা করতে হবে বলে সে দুঃখিত নয় মোটেই। গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে লা ব্লানশটের সৌন্দর্যের খ্যাতি। তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে হয়তো একটা ক্ষীণ আশা উঁকি দিচ্ছিল বার বার। যে মেয়েটি জীবনে একবার ভুল করেছে সে হয়তো আর একবারও ভুল করতে পারে।

একখানা ছোট্ট পরিচ্ছন্ন শাদা রঙের বাড়ীর কাছে এসে পৌছল তারা।

—এই যে, এসে গেছি, চেঁচিয়ে বলে উঠল ছেলেটি। তারপর হাঁক দিলে—মা!

দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় মেয়েটি। শ্রমিকটির মুখ থেকে নিমেষে মিলিয়ে গেল সবটুকু হাসি। ওই নিরানন্দ দীর্ঘাঙ্গী বালিকাটিকে যে পুনর্বার বোকা বানানো সম্ভব হবে না সে কথা সে মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করল। তার দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছিল একটা দৃঢ়তাব্যঞ্জক কাঠিন্য। যে বাড়ীতে এসে কোন পুরুষ একবার বিশ্বাসঘাতকতা করে গেছে তার সঙ্গে, সে বাড়ীর দোরগোড়া রক্ষার জন্যে যেন সে আজ সঙ্কল্পবদ্ধ। অন্য কোন পুরুষের পক্ষেই আজ আর সম্ভব নয় সে বাড়ীর দরজা অতিক্রম করা।

তাই দেখে ভীত হয়ে পড়ল লোকটি, টুপিটি হাতে নিয়ে আমতা আমতা করে বললে—দেখুন, আপনার খোকাকে ফিরিয়ে এনেছি আপনার কাছে। নদীর ধারে সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

কিন্তু দুহাত দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে সাইমন—না, মা। আমার বাবা নেই, সেইজন্যে ওরা আমায় মেরেছে। ভয়ানক মেরেছে। আর তাই মরতে যাচ্ছিলুম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে রক্তিম হয়ে উঠল তরুণীর সমস্ত মুখখানা। মনেও সে আঘাত পেল খুব। আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরল ছেলেকে। আর তার দুচোখ থেকে অবিরল ধারায় গড়িয়ে পড়তে লাগল তপ্ত অশ্রু। এই দৃশ্য বিচলিত করে তুলল লোকটিকে। কেমন করে সেখান থেকে চলে যাবে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। কিন্তু সাইমন হঠাৎ দৌড়ে এল তার কাছে। বললে—তুমি কি আমার বাবা হবে?

একটা গভীর নীরবতা নেমে এল। মূক হয়ে গেছে লা ব্লানশট, লজ্জায় কাতর হয়ে বুকের ওপর দুখানা হাত জড়ো করে সে দাঁড়িয়ে ছিল দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

ছেলেটি কোন উত্তর না পেয়ে বললে—যদি তুমি না চাও, তাহলে আবার গিয়ে ডুবে মরব আমি।

শ্রমিকটি ব্যাপারটাকে একটা পরিহাস হিসেবে ধরে নিয়ে বললে—কেন, আমি সত্যিই তাই হতে চাই।

—তাহলে বল তোমার কি নাম। তোমার নাম জানতে চাইলে যেন আমি বলতে পারি ওদের।

—ফিলিপ, উত্তর করলে লোকটি।

এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থাকল সাইমন। যেন স্মৃতিতে গেঁথে রাখবার চেষ্টা করলে নামটা। এবার সত্যিই সান্ত্বনা পেয়েছে সে। সামনের দিকে দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—তাহলে তুমিই হচ্ছ আমার বাবা ফিলিপ।

শ্রমিকটি তাকে তুলে নিলে মাটি থেকে। চুমো খেল তার দুগালে। তারপর দ্রুত পায়ে চলে গেল সেখান থেকে।

পরদিন সাইমন স্কুলে যেতেই বিদ্রূপের হাসি ফুটল সবাইর মুখে। ছুটির পর ছোঁড়াগুলো তার পেছনে লাগতে যাবার আগেই ঢিলের মতোই একথাটা ছুঁড়ে মারল তাদের মুখের ওপর—তাঁর নাম হচ্ছে ফিলিপ, আমার বাবা।

চারদিক থেকে একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

—কে ফিলিপ? কি করে ফিলিপ? ফিলিপ বলে কেউ আছে নাকি পৃথিবীতে? কোত্থেকে কুড়িয়ে আনলে তোমার ফিলিপ?

কোন উত্তর করলে না সাইমন। দৃঢ় প্রত্যয়ে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চোখের ভাষায় তার দারুণ অবজ্ঞা। সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে ওদের হাতে মরে শহীদ হতেও সে প্রস্তুত! শেষ পর্যন্ত স্কুলের একজন

শিক্ষক এসে উদ্ধার করলে তাকে। সে ফিরে এল বাড়ীতে মায়ের কাছে।

তিন মাস কেটে যায় দেখতে দেখতে। ফিলিপ প্রায়ই লা ব্ল্যানশটের বাড়ীর কাছ দিয়ে যাতায়াত করে। জানালার কাছে সে হয়তো বসেছে একটা সেলাই নিয়ে। তখন ওই দীর্ঘ দেহ মজদুরটি সাহস করে এসেছে তার সঙ্গে আলাপ করতে। গম্ভীর থেকে সর্বদাই ভদ্রভাবে উত্তর দিয়েছে সে। পরিহাস করতে যায়নি তার সঙ্গে, কিংবা তাকে বাড়ীর ভেতরও আসতে দেয়নি কখনো। তা সত্বেও আর সব বোকা পুরুষদের মতো ফিলিপেরও মনে হত—তার সঙ্গে কথা বলবার সময় যেন আরও বেশী গোলাপী হয়ে ওঠে লা ব্ল্যানশটের সুন্দর মুখখানা।

কতো ঠুনকো মানুষের সুনাম। একবার তা নষ্ট হয়ে গেলে ফিরিয়ে আনা কি শক্ত! লা ব্ল্যানশটের লজ্জাসংযত ব্যবহার সত্বেও পাড়ায় কানাঘুষো শুরু হয়ে গেছে এরই মধ্যে।

সাইমন কিন্তু তার এই নতুন পাওয়া বাবাকে ভালবাসত খুব। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় বেড়াতে বেরুত তার সঙ্গে। স্কুলেও যেত নিয়মিতভাবে। আত্মমর্যাদার সঙ্গে মিশত ছেলেদের সঙ্গে। তাদের কথার জবাব দেওয়ারও দরকার মনে করত না সে।

আগেকার সেই ধাড়ী ছেলেটা একদিন আবার তাকে বললে, মিথ্যে কথা বলেছ তুমি। ফিলিপ নামে তোমার কোন বাবা নেই।

—কেন বলছ এ কথা? জানতে চাইল সাইমন। বেশ বিচলিত দেখাল তাকে!

হাত রগড়াতে রগড়াতে ছেলেটি বললে—কেউ তোমার বাবা হলে সে তো তোমার মায়েরও হবে স্বামী।

এমন অকাট্য যুক্তিতে গোলমালে পড়ে গেল সাইমন। তবুও উত্তর দিলে, তা হলেও তিনিই আমার বাবা।

—তা বলতে পার তুমি, টিপ্পনী কেটে বললে ছেলেটা, কিন্তু সে তোমার বাবা নয় মোটেই।

লা ব্ল্যানশটের ছেলে তার ছোট মাথাটি নীচু করে ভাবতে ভাবতে চলেছে রাস্তা দিয়ে। সে চলেছে বুড়ো লয়জনের কামারশালার দিকে। সেখানেই কাজ করে ফিলিপ।

কামারশালার চারদিক ঘিরে ছিল ঘন বৃক্ষের প্রাচীর। ভীষণ শব্দ করে নেহাইয়ের ওপর একই সঙ্গে পড়ছিল পাঁচ-পাঁচটি হাতুড়ির ঘা। জ্বলন্ত চুল্লীর গনগনে আগুনের আভায় দীপ্ত হয়ে উঠছিল পাঁচটি মুখ। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মতোই কাজ করে যাচ্ছিল তারা। নেহাইয়ের ওপর ফেলে রাখা অগ্নিতপ্ত লোহার দিকেই নিবদ্ধ ছিল তাদের একাগ্র দৃষ্টি।

সকলের অজ্ঞাতে সাইমন গিয়ে ঢুকল সেখানে। তার বন্ধুর জামার আস্তিন ধরে টানল আস্তে আস্তে। ফিরে তাকাল ফিলিপ। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সকলের হাতুড়ি-পেটা। লোকগুলো খুবই মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে দেখছিল তাকে। তারপর ওই নিস্তব্ধতার ভেতরে শোনা গেল বাঁশীর মতো সাইমনের গলার স্বর।

—তুমি নাকি মোটেই আমার বাবা নও। স্কুলের সেই ছেলেটা আজ আমায় বললে। বল সত্যি কিনা।

—তা কেন হবে? কামারটি উত্তর করলে।

—তুমি যে আমার মায়ের স্বামী নও—সরল বিশ্বাসে বললে ছেলেটি।

কেউ হাসল না এ কথা শুনে। হাতুড়ি-ধরা বলিষ্ঠ হাত দুটির ওপর নুয়ে পড়ল ফিলিপের মাথা। চিন্তা করছিল সে। তার ওপর নজর রাখছিল তার চারজন সঙ্গী। আর উত্তরের আশায় ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছিল সাইমন। হঠাৎ তাদেরই একজন ফিলিপকে বললে—লা ব্ল্যানশট বাস্তবিকই একটি ভাল মেয়ে, ঘা খেয়ে ও এতটুকু ভেঙে পড়েনি, যে কোন সৎ মানুষেরই স্ত্রী হবার যোগ্যতা তার আছে।

—একথা সত্য, মন্তব্য করলে অপর তিনজন।

—সে কি পতিতা হয়েছে নিজের দোষে? সেই কামারটিই বলতে লাগল।—বিয়ে করবে বলেই কথা দিয়েছিল তাকে। বার বার বিপথে-যাওয়া অনেক মেয়েকে ত আমি জানি। সতী-সাধ্বী বলে সমাজে আজও কেমন সম্মান পাচ্ছে তারা।

—একথা ঠিক, ওই তিনজন বলে উঠল সমস্বরে।

—ছেলেটিকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে একা একা কি অমানুষিক পরিশ্রমই করছে ওই দুর্ভাগা মেয়েটি—কামারটি আবার বলতে শুরু করলে।—একমাত্র গির্জের

যাওয়া ছাড়া বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেরয় না সে। শুধু ভগবানই জানেন, কি কান্নাটা সে কেঁদেছে।

—তাও সত্য, স্বীকার করে নেয় অপর তিনজন।

তারপর কিছুক্ষণ কেটে গেল নিঃশব্দে। শুধু হাপরটাই গর্জন করে যাচ্ছিল একটানা।

হঠাৎ ফিলিপ নীচু হয়ে সাইমনের কানের কাছে মুখ নিয়ে তড়বড় করে বললে—তোমার মাকে গিয়ে বল যে তার সঙ্গে কথা বলতে যাব আমি।

সাইমনের কাঁধ ধরে তাকে পৌছে দিয়ে এল কামারশালার বাইরে। তারপর এসে যোগ দিলে নিজের কাজে। নেহাইয়ের ওপর আবার একসঙ্গে পড়ল পাঁচটি হাতুড়ির ঘা। সন্ধ্যে পর্যন্ত তাদের কাজ চলল। কিন্তু উৎসবের দিনে বড় গির্জের প্রকাণ্ড ঘণ্টাটা যেমন অন্য সব ঘণ্টার শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে বাজতে থাকে ঢং ঢং করে, তেমনি অন্য সব হাতুড়ির শব্দকে ছাপিয়ে উঠছিল ফিলিপের হাতুড়ির কর্ণ-বধির-করা ভীষণ আওয়াজ।

লা ব্ল্যানশটের বাড়ীর দরজায় এসে যখন সে ঘা দিলে তখন নক্ষত্রেরা মেলা বসিয়েছে আকাশে। গায়ে তার রবিবারের ব্লাউজ আর নতুন একটা কামিজ। সুবিন্যস্ত তার দাড়ি। যুবতীটি এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—এভাবে রাত্রিবেলায় আপনার আসা ঠিক নয়, মিঃ ফিলিপ।

উত্তর দেবার ইচ্ছে হয়েছিল ফিলিপের, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

যুবতীটিই আবার বললে—আপনি বেশ বুঝতে পারছেন আমার সঙ্গে আর কথা বলাও উচিত নয় আপনার।

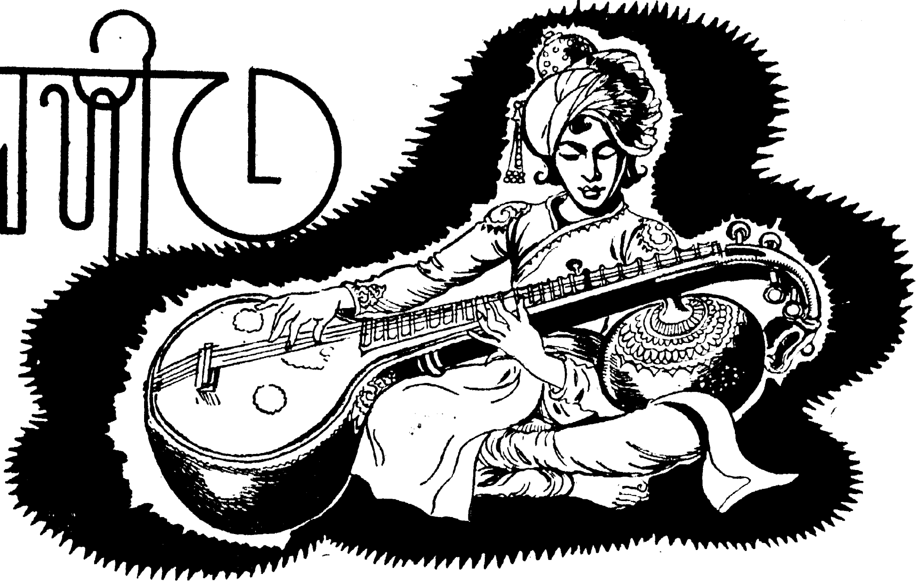
—তুমি যদি আমার স্ত্রী হও তাহলে এতে আর কি ক্ষতি হবে আমার। হঠাৎ বলে উঠল ফিলিপ।

কিন্তু তার একথার জবাব দিলে না কেউ। অন্ধকার ঘরের ভেতর একজন মানুষের পতনের শব্দ শুনতে পেল সে। দ্রুত সে ঢুকে গেল ভেতরে। সাইমন তখন শুয়েছিল বিছানায়। স্পষ্ট একটি চুম্বনের শব্দ তার কানে গেল। মায়ের কোমল কণ্ঠস্বরও শুনতে পেল সে। একটু পরেই সে ধরা পড়ল তার বন্ধুর দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহুর বন্ধনের মধ্যে। ফিলিপ তাকে শূন্যে তুলে ধরে উচ্চকণ্ঠে বললে—তোমার স্কুলের পড়ুয়াদের এবার গিয়ে বলবে যে তোমার বাবা হচ্ছে কর্মকার ফিলিপ রেমি—যে কেউ তোমার ক্ষতি করবে তিনি তারই কান দুটো দেবেন ছিঁড়ে।

পরদিন স্কুল বসেছে। পড়া শুরু হতে যাবে। এমনি সময় উঠে দাঁড়ায় সাইমন। থর থর করে কাঁপছিল তার পাতলা ঠোঁট দু'খানি। পরিষ্কার গলায় সে বলে উঠল—

—আমার বাবা হচ্ছে কর্মকার ফিলিপ রেমি। আর তিনি বলে দিয়েছেন—যে কেউ আমার পেছনে লাগবে তিনি তার মাথায় মারবেন গাঁট্টা।

এবার আর হাসল না কেউ। তাদের সকলের কাছে খুবই পরিচিত ফিলিপ রেমি। কর্মকার ফিলিপ রেমি। আর তাকে পিতৃরূপে লাভ করতে পেয়ে পৃথিবীর যে কোন ছেলেরই গর্বিত হবার কথা।



ছম্ ছম্ কালো রাত কিছু যেন বল্‌বে
বোবা চোখ ছল্‌ছল্ জল বুঝি ঝরবে।
কত তার ব্যথাভার বুক ভরে রয়েছে
মুখ তাই মূক হোয়ে বেদনায় মরেছে
কালো চোখ তাই যেন কেঁদে কেঁদে চল্‌বে॥

কি যে সেই কাহিনী আঁকা আছে এ রাতে
মিল যার নেই কিছু চাওয়া আর পাওয়াতে।
নিদারুণ অভিমান রাত্রিকে ঘিরেছে,
মিটি মিটি তারা তাই হাতছানি দিয়েছে,
বলে ওগো কালো রাত, আর কত জ্বল্‌বে॥

কথা—শ্রীগোপী ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদ্বিজেন ভট্টাচার্য্য

II { গা । । । I সা । । । I ধা । । । I সা । । । } II
ছ ম্ ছ ম্ ছ ম্ ছ ম্

{ গা । সা । I ধা সা গা । I মা গা রা সা I না সা রা । } II
ছ ম্ ছ ম্ কা লো রা ত কি ছু যে ন ব ল্ বে

ধ্‌া ণ্‌া ণ্‌া সা I রা । রা । I { ধ্‌া সা রা জ্ঞা I গা । সা । I
০ ০ ০ ০ ০ ০ বো বা চো খ ছ ল্ ছ ল্

ধা । পা মা I গা রা গা । I ধা দা পা মা I গা রা গা । } I
জ ল্ বু ঝি ঝ র বে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মা গা রা সা I ন্‌া সা রা । I ধ্‌া ণ্‌া ণ্‌া সা I রা । রা । I
কি ছু যে ন ব ল্ বে ০ ০ ০ ০ ০ ০

{ গা । সা । I ধা সা গা । I মা গা রা সা I না সা রা । } II
ছ ম্ ছ ম্ কা লো রা ত (কি ছু যে ন ব ল্ বে •)

II ধা ধা ধা দা I ধা ণা ধা । I ধা ধা মা মা I রা রা রা । I
ক ত তা র ব্য থা ভা র বু ক ভ রে র রে ছে •

রা মা ধা । I ধা । ধা । I রা মা ধা । I ধা । ধা । I
হা ০ হা ০ হা • হা ০ হা ০ হা • হা ০ হা ০

পা মা রা সা I ধ্া । । । I { ধা রা রা রা I সা গা গা গা I
হা ০ ০ ০ হা ০ ০ ০ মু খ তা ই মূ ক হ য়ে

রা মা মা মা I গা মা ধা । } I { ধা । । পমরা I ধা । । । } I
বে দ না য় ম রে ছে ০ ০ ০ ০ ০ ০

র্সা র্সা ণা ণা I ধা ধা পা পা I মা মা রা রা I সা সা ধ্া ধ্া I
কা লো চো খ তা ই যে ন কেঁ দে কেঁ দে চ ল্ বে ০

{ । । ধ্া সা I গা । গা । } I { মা গা রা সা I না সা রা । I
০ ০ ০ কি ছু যে ন ব ল্ বে

ধ্া ণ্া ণ্া সা I রা । রা । } II
০ ০ ০ ০ ০ ০

II { গা মা পা গা I গা মা ধা । I (গমা ক্ষপা ধা ধা I ধা । ধা ।) I
কি যে সে ই কা হি নী ০ ০ ০ ০ ০ ০

র্সা র্সণা ধা ধা I পা মা গা । I (র্সা না ণা ধা I পা মা গা ।) } I
আঁ কা আ ছে এ রা তে • ০ ০ ০ ০ ০ ০ • •

{ গা মা মগা রা I রা গা গরা সা I সা রা রা মা I রা সা ধ্া । I
মি ল্ যা০ র নে ই, কি০ ছু চা ওয়া আ র পা ওয়া তে ০

মা । রা । I সা । ধ্া । } I ধা না না র্সা I র্সা র্সা র্সা ণা I
• • ০ ০ নি দা রু ণ অ ভি মা ন

ণা । ধা দা I ধা ণা ধা । I { ধা । রা মা I ধা । । । } I
রা ০ ত্রি কে ঘি রে ছে ০ ০ ০ ০ ০

ণা ণা ধা ধা I ণা ণা পা পা I মা মা রা রা I সা সা ধা ধা I
মি টি মি টি তা রা তা ই হা ত ছা নি দি য়ে ছে ০

{ রা । সা । I ধ্া । । । } I { ধ্া সা । ধা I সা । রা মা I
০ ০ ০ ব লে ০ ও গো ০ কা লো

ধা । । । I । । । । I ধা র্সা ণা ধা I পা মা গা । I
রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত আ র ক ত জ্ব ল বে ০

র্সা । ধা । I মা । রা । I মা গা রা সা I না সা রা । I
০ ০ ০ ০ কি ছু যে ন ব ল্ বে

মা । রা । I সা । ধ্া । } II
০ ০ ০ ০

অনুরোধ

জসীম উদ্দীন

তুমি এসো মেয়ে, আমার নিকটে এইখানে বস এসে,
দোষ নিওনাক শাড়ীর আঁচল মোর গায়ে যদি লাগে
উতল বাতাসে ভেসে।
তোমার চুলের গন্ধ আসিয়া পশিছে আমার নাকে
যদি সেথা কোন কথার ভোমরী ডাকে মনে মনে
বকিয়া দিওনা তাকে।
তুমি বস মেয়ে, তোমার নিশাস লাগুক আমায় গায়,
তোমার দেহের উষ্ণতা যেন মোর পানে বয়ে যায়।
তোমার ও-রাঙা মুখখানি মেয়ে ফিরাও আমার দিকে
ঈষৎ হাসির নক্সায় আজি ভর মোর ধরণীকে।
তোমার রূপের চন্দ্রিমা জ্বালি একটি একটি করে,
হৃদী সরসীর কুমুদগুলিরে দাও বিস্তার করে।

তুমি বস মেয়ে যদি কোন কথা জাগে আজ মোর মনে,
সে কথা তোমারে বলি বিব্রত করিবনা অকারণে।
যদি কথা থাকে হৃদয় হইতে হৃদয়ে গড়ায়ে যাবে,
নিশাসে নিশাসে হবে বিনিময় ভাব হ'তে আর ভাবে।
যদি কথা থাকে সে কথা লইয়া সুদূর আকাশপারে,
যদি মেঘে মেঘে রঙ হয়ে হাসে দোষ দিও নাক কারে!
যদি নিশীথের নীলাম্বরে একটি একটি কথা
তারায় তারায় জ্বলে মিটি মিটি, ভাঙিওনা ভুরুলতা।
যদি জোনাকীর আখর হইয়া বন হ'তে আর বনে
ঝিল্লির সুরে করে ঘোরাঘুরি দুষিওনা অকারণে।
যদি তরুলতা বাতাসে দুলিয়া আমার এ হাহুতাশ
দিকে দিগন্তে বয়ে বয়ে যায়। করোনা মন্দ-ভাষ।

তুমি যে কন্যা কমল সরণী কোমল তোমার মন,
একথা ভুলোনা যখন ভাবিবে আমার মতন জন।



(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ক্ষীরভবানী

আগে থেকেই বলা ছিল। ওমপ্রকাশজী কেবল একবার চুপি সাড়ে বলে গেলেন—আপনি পূজা করে আসুন। যত দেরী লাগে। আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি, আর কিছু নয়।

আমি ছুট লাগালাম।

কেন এই ব্যাকুলতা? ভেক, ভড়ং, বোকামী না দুর্বলতা? আমি তো তাত্ত্বিক নই, সদাচারী তো নই-ই; ধর্ম আর আমি—শ্রীচৈতন্য আর কালাপাহাড়। তবু যেন মনে হয় কোথায় আমার আত্ম-কেন্দ্রিক মননশীলতার নাভিকেন্দ্রটি চণ্ডীর মন্ত্রে লুকানো। বিক্ষিপ্ত মন ঘুরছে আর ঘুরছে; পাকে পাকে জড়াচ্ছে। কিন্তু চণ্ডী যেন 'পীভট্', লাটিমের নাল; ঠিক ঐ জায়গাটিতে ভর করে ভ্রমণ, ঘূর্ণন যেন একটা স্থৈর্য্য, একটা ব্যালান্স পায়। যেন গভীরে ডুবে যেতে পারি সহজে।

চণ্ডী আমার পূজা নয়, আমার পাঠ নয়, আমার ঐহিক, পারত্রিক কিছু নয়। চণ্ডী কেবল আমাকে মানতে, আমাকে ছুঁতে সাহায্য করে। চণ্ডী আমার কি—ওকে এ কথা না জানালেও কাশ্মীর ইতিকথা বলতে বাধতো না। বিশ্বমানার এ কথা জানুক এ-ও বাসনা নয়। তথাপি মনে হয় চণ্ডীপাঠে প্রত্যয় আছে শুনে দশে যেন কোথায় একটু কটাক্ষ-লাঞ্ছনা বোধ করেছি। এই অসহিষ্ণু অবহেলা বহু মন্দভাগ্যের পক্ষে ফ্যাশন হয়েছে, মডার্নিজম্, র‍্যাশনালিজমের আঙ্গিক হয়েছে। তাই একটু বলতে বাধা নেই যে কোনও পাঠই পাঠ বলেই নগণ্য, ঘৃণার্হ বা প্রিমিটিভনেসের বর্বরতার সাক্ষ্য নয়। মেঘদূত পড়ে যে আনন্দ, হ্যামলেটের অভিনয় দেখে যে আনন্দ, রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার নাট্যরূপ দেখেশুনে যে আনন্দ, তার যদি সত্তারূপ থাকতেপারে, সেআনন্দ গ্রহণের পাত্র যদি মানুষের চিত্ত হতে পারে, চণ্ডীই বা কারু কারু আনন্দের উৎস হবেনা কেন? আইনষ্টাইন অঙ্ক পেলে সমাহিত হতেন; রবীন্দ্রনাথ সূর্য্যোদয় দেখলে সমাহিত হতেন, কেউ হয়তো টাকার সুদ কষতে সমাহিত হয়, কেউ কৃষ্ণ বললে সমাহিত হয়। এতে কৃষ্ণ-ভক্তকেই কেন আলাদা করে বুজরুক বলবো আমি বুঝিনা। কেন গ্রহণ করবনা যে ঐ মাঝিটার অন্তরকোঠার চাবী "আল্লা" নামে বাঁধা, যেমন তোমার বাঁধা ভীমনাগের সন্দেশে, রামের বাঁধা গোঁফের ডগা সমান করে ছাঁটায়, শ্যামের বাঁধা কাব্যে, শিপ্রার বাঁধা শান্তিপুরী শাড়ীর সংগ্রহে। এই নাম যদি কেউ আল্লায় পায়, কেউ পায় কৃষ্ণে, কেউ পায় রামে, কেউ চণ্ডীতে—আপত্তির কারণ কোথায়? অসহিষ্ণুতার অবকাশ কোথায়? বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ নামেই মাধুরী আস্বাদন করতেন, হনুমানজী রামনামকেই সুধাস্রাবী বলে গেছেন। কিন্তু হায়লী,

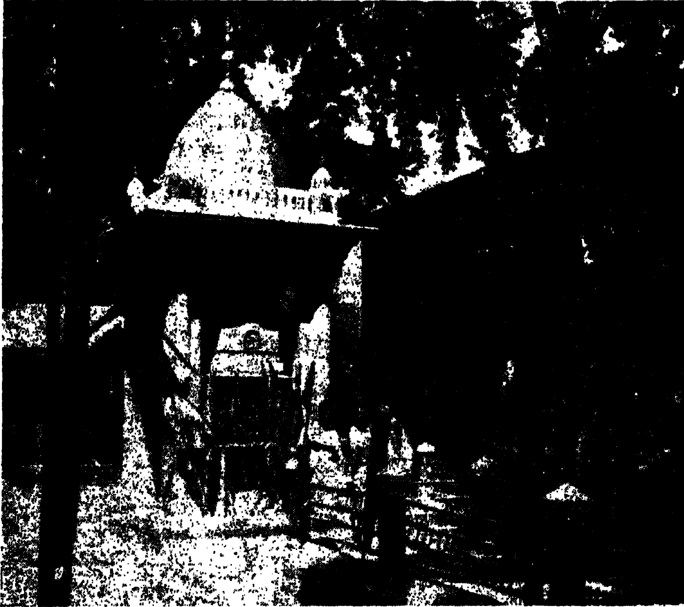


বিরাট অঙ্গন ছায়াস্নিগ্ধ হয়ে আছে

আর মন্ যখন বলেন যে যোগসাধনা, আত্মসমাধি, দেখে শুনে বুঝে নেবার মাল—তখন আবার চম্‌কাই।

রাগের কারণ নেই। কিন্তু চণ্ডী পড়ি শুনে অনেকে অদ্ভুত প্রশ্ন করেন; যে প্রশ্ন করেন না ভারবী বা ভর্তৃহরি পড়ি শুনলে।

তাই মন শান্তি পায়, ভারকেন্দ্র খুঁজে পায় চণ্ডী পড়লে। হেঁটে চলেছি। প্রকাণ্ড চত্বর ঘিরে আধুনিক রেলিং। সমস্ত আবহাওয়াটা অর্বাচীন। বড় বড় চিনার গাছ: শতাধিক বর্ষ বয়স হবে এমনি গাছই আছে দশ বারোটা। সমস্ত অঙ্গন, বিরাট অঙ্গন ছায়াস্নিগ্ধ হয়ে আছে। কাশ্মীরে যেখানে যেখানে হিন্দুমন্দির দেখেছি—কী শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে, কী মার্ত্তণ্ডে, কী পরিহাসকেশবে, কী অমরনাথে, সর্বত্রই এ প্রকৃত রমণীয় স্নিগ্ধ পরিবেশটা পেয়েছি। দূর থেকে ধূপের গন্ধ পাচ্ছি। অঙ্গনের ধারে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে নির্ঝরিণী। তার ওপরে কাঠের সাঁকো। সাঁকো পার হয়ে বাঁধানো চত্বর। চত্বরের পারে বাঁধানো রেলিং ঝুঁকে দেখা যায় জল। সেই চৌকো বাঁধানো জলের মধ্যে ছোট্ট মন্দিরে দেবীর প্রতিমা, যার কোনও আকার নেই। কাপড়ে ঢাকা, একখানা পিতলের মুখ লাগানো; এর অর্থই এই যে আসল মূর্ত্তি পাথরই শুধু; আকার আছে আকৃতি নেই। এ মন্দিরে যাবার সরাসরি পথ নেই। রেলিংয়ের বাইরে ঢাকা দালান। তার মধ্যে সরাসরি বহু ব্রাহ্মণ বসে নানা স্তব, আবৃত্তি পাঠ করছে। বহু যাত্রী, ভক্ত সমবেত হয়ে দেবীর পূজায় ব্যস্ত। জলাশয়টা বেশী বড় নয়। ত্রিশ ফুট সমচতুষ্কোণ। গভীরতা হবে পনের ফুট কি দশ ফুট। তলায় জল। সেই জলে থালা থালা জমাট ক্ষীর ফেলছে ভক্তরা। ফুলে, পাতায়, ক্ষীরে জলটার আসল রং আর দেখা যাচ্ছেনা। কিম্বদন্তী এবং কাশ্মীরের প্রচার পুস্তিকাতেও লেখা—এই জল নাকি নানা বর্ণ ধারণ করে। আমি তেমন কিছু দেখিনি। যা দেখেছি তার কারণ, ক্ষীর সংক্রান্ত স্নেহ পদার্থের স্পর্শে জলের বিচিত্র রামধনু বর্ণ ধারণ।



ছোট্ট মন্দিরে দেবীর প্রতিমা—যার কোনো আকার নেই

মন্দিরের পূজকের আসনই হবে বুঝি। কাঠের বেশ বড় আসন, তার ওপর গালিচার আসন। জলাধার, পুষ্পাধার প্রভৃতি কাছাকাছি পাতা। আমি দৌড়ে আসার পথেই ফুলমালা কিনে এনেছিলাম। পোঁটলা খুলে চিনির ভোগ তৈরি করে সোজা সেই আসনে বসে আচমন সেরে পূজায় বসে গেলাম।

পরণে চুড়িদার পাজামা আর আচকান। গ্রাহ্য করিনি। মায়ের নামে ডাকব, শুচিঅশুচির প্রত্যবায় মনে স্থান পায়নি। সহজ মনে পাঠ আরম্ভ করে দিলাম। অল্পক্ষণেই আনন্দের সপ্তম লোকে বিচরণ করছি, আর খুসী যেন উপচে পড়ছে। কাণে আসছে চারিধার থেকে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা আমার সঙ্গে এক হয়ে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে চণ্ডীপাঠ করছে।

রোমাঞ্চ হয় ভাবতে সেদিনের কথা। ঐ ব্রাহ্মণরা আমার কে নয়, কোনও পরিচয় নিয়ে যাইনি, কোনও পরিচয় রেখে আসিনি, কখনও জানিনি; কখনও জানবনা, কিন্তু সেই দুইঘন্টা কাল আমরা যেন এক হয়ে গেলাম; কোনো বাধা, শঙ্কা, বিভ্রম, বিচ্যুতি নেই।—

ঈষৎ সহাসমমলং পরিপূর্ণ চন্দ্র
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তম্……

পড়ছি, আর মন যেন আনন্দে শিহরণ তুলছে!

থেমে গেল গান। পাশে বসে চোখ বুঁজে মিসেস শর্মা। তাঁর পাশে তাঁর বড় ছেলে। ওধারে বেনু। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে অসিত বাসের ছেলেরা ফিরে বসেছে।

মেয়েদের টান রান্নাঘরে। এখানেও ওরা মন্দিরের রন্ধনশালা দেখে এলো। কতদিনের তীর্থ! কত দূরদূরান্তর থেকে যাত্রী আসে। তাই আছে অতিথিশালা, পান্থশালা, ভোগশালা—পাঠশালা। বড় বড় উনুনে বিরাট বিরাট পাত্রে রান্না চলেছে। দোকান আছে কয়েকখানা। সবই ভোগপ্রসাদ কেনার। "চা পাওয়া যায়না আবার মন্দির!" অসিত চিমটি কাটলো। "আর পান?" জিজ্ঞাসা করে জগজীবন।

"দাদার তো অরুচিতেই রুচি। পূজা পাঠ করে কি হবে শুনি, যদি পান আর চা না মিল্‌লো ?"

মাথাটা টিপ্ টিপ্ করছে। মন খুশী, কিন্তু কেমন একটা অবসাদ শরীরে, কেমন একটা হাল্কা বোধ।

"বোসো, বোসো। এই জলটুকু খেয়ে নাও। এই প্রসাদ মুখে দাও।" বেনু বললো।

বসলাম চত্বরের একধারে।

প্রাচীন তীর্থ এই ক্ষীরভবানী—ভূক্ষীর বাটীকা ঐতিহাসিক নাম। তন্ত্রপদ্ধতি এলো তিব্বত, মধ্য এসিয়া থেকে, আর পশ্চিম প্রান্ত থেকে পণ্ডদের কাছ থেকে এলো অন্য পদ্ধতি—তাই আহার ব্যবহার হলো নানা রকমের। শিবায়ত ধর্ম। কে কি খায় তা নিয়ে মাথা ঘামায় না! রশুনখেকো বামুনদের একটা দলের সঙ্গে বিরোধ লাগলো বৈষ্ণব ধর্মের আমেজ-লাগা সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণদের। রাজা তার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই ভুক্ষীর বাটীকায় তিনি রশুনখেকোদের জায়গা করে দিলেন; আর পবিত্র ব্রাহ্মণদের জন্য জায়গা দিলেন বশিচক নগরে। আর একেবারে আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদের স্থান করলেন খাসটা নগর। এসব গোপাদিত্যের কীর্ত্তি। কহ্লন বলেছেন :—

"ভুক্ষীর বাটিকায়াং যো নিবাস্ত লশুনাশিনঃ
খাসটায়াং ব্যধান্ বিপ্রান্ নিজাচার বিবর্জিতান্।"

এই যে তন্ত্র, শৈব ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমন্বয় ক্ষীরভবানী, এ নাকি সিংহল থেকে আমদানী করা এক সমন্বয়-নীতি থেকে জাত। এমন কথাও কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন। তবে সেটা কিম্বদন্তী। প্রামাণ্য কিছু পাওয়া যায়না।

আমাদের আগে তিন চারখানা বাস্ চলে গেছে। অথচ আমার জন্যে বৈজয়ন্তীর দেরী হয়েছে। রুদ্ধ ক্রোধ গর্জন করছে—ব্যবহারে ও ভাষার অসঙ্গতিতে। বারংবার বৈজয়ন্তী আপশোষ করছেন, "সকলে চলে গেল, আমরাই শেষে।"

রুক্মিণী বললে—"কীই বা দেখবো শেষে গিয়ে। সব ফুরিয়ে যাবে।"

মন্দার বল্লে—"সিনেমা শো নাকি উলার, যে দেরী হলে ফুরিয়ে যাবে ?"

জগজীবন মন্দারকে ঠাট্টা করে বললে—হয়তো গিয়ে দেখবো উলারে আর জল নেই। সবাই মিলে খেপে উলারের জল শুকিয়ে দিয়েছে।

গাড়ী চলতেই উষ্মা ধীরে ধীরে নিভে এলো। পথের সুর এখন উঁচুর দিকে। ধান ক্ষেত ছাড়া আর কিছু নেই। পথের দুধারে পপ্‌লারের বর্ডার। কিন্তু জমী কেমন ক্রমশঃ দুধারে নীচু হয়ে যাচ্ছে, মাঝে পথ উঠছে।

আসল উলার একটা বলয়ের মধ্যে। এই বলয়ের চারধারে পাহাড়। কিছু কিছু পাথরের পাহাড়ও আছে। পীর পঞ্জোলী একদিকে খাড়া হয়ে আছে। হ্রদ চোখে পড়লো, তার চারধার দিয়ে মোটর পথ। পৃথিবীর বৃহত্তম পানীয় জলের হ্রদ। উলার হ্রদ একদিনে দেখা যায়না, একভাবে দেখা যায়না। কিন্তু আমাকে তাই দেখতে হবে।

হঠাৎ সামনে সারি সারি মোটর দাঁড়িয়ে। দুর্গতির ইতিহাস শুনি। প্রথম দুখানা বাস চলে গেছে। তৃতীয় বাসখানা ভেঙ্গে পড়ে। অথচ এতো সঙ্কীর্ণ পথ যে গাড়ী ঠিক না হলে অন্য গাড়ী চলার স্থান নেই। কাজেই সমস্ত গাড়ী, এমন কি যারা আমাদের আগে চলে আসার জন্য শ্রীমতী বৈজয়ন্তীর এতো ক্ষোভ সে সব গাড়ীও দাঁড়িয়ে। কাজেই শ্রীমতী বৈজয়ন্তীর এতক্ষণের রাগকে নিয়ে সকলেই কৌতুক করতে লাগলো।

রুক্মিণী বললে, "আমার হাসতে ইচ্ছে করছে।"

অবস্থা দেখে নেমে পায়ে চলা সুরু করলাম। যতটা চলি চলবোই; এলে আবার বন্দিত্ব গ্রহণ করবো। সঙ্গে অবশ্য ওরা সবাই চলা সুরু করলো।

দূরে চকচক্ করছে উলারের জল। সেই জলের কিছু অংশ বিস্তীর্ণ হয়ে আছে এধারে, সৃষ্টি করেছে জলাভূমি। এই জলাভূমির ওপরে জল দাঁড়িয়ে আছে দুফুট, তিনফুট—তলায় জন্মেছে এক ধরণের শরগাছ, কোথাও বা পাটের মতো, কোথাও পানফলের ক্ষেত। ছোটো ছোটো নৌকায় চড়ে মুসলমান ছেলে জল থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলে রাখছে একজাতীয় শ্যাওলা। না পরিষ্কার করলে ক্ষেত খারাপ হয়ে যাবে।

অসিত মাঝে মাঝে ছবি নিচ্ছে, আর থলে থেকে খোবানী বার করে খাচ্ছে। বেনু আর অসিত জাবর কাটেনা তবু চোয়াল চালায় সর্বদা। বেশ লাগে দেখতে; যেন ধবলী শ্যামলী ধরণের নিস্পৃহতা। ভোজ্য ছাড়া ভোগ্য কিছু নেই।

বেশীক্ষণ চলতে হয়নি। বাস এসে গেল। আমি দেখলাম ক্ষীরভবানীতে না দাঁড়ালে দুঘণ্টা কাল পথ চলতেই হোতো। নৈলে দাঁড়িয়ে থাকতে হোতো—সে তো আরও ভীষণ।

ক্রমশঃ





সুপ্রীতির মন

অজয় দাশগুপ্ত

লিমটনের বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেবাশীষ প্রায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল, এমন সময় ও এল। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল একবার দেবাশীষ; ঘন ঘন ক'য়েকটা টান দিল প্রজ্জ্বলিত সিগারেটে, তারপর ও সামনে আসতেই বলল, এত দেরী হল যে ?

হাসল মেয়েটি। তাড়াতাড়ি হাঁটবার জন্যে থেমে পড়ে একটু দম নিল। তারপর বলল, দেরী কোথায় ? কেবল তো পাঁচটা পাঁচ।

—আমি পৌনে-পাঁচটা থেকে দাঁড়িয়ে আছি। হাতের সিগারেটটা শেষ ক'রে ফেলে দিয়ে দেবাশীষ বলল, এই নিয়ে তিনটে সিগারেট হল।

—মাত্র তিনটে ! আবার হাসল ও।

দেবাশীষ ওকে বাধা দিল, থাক থাক হয়েছে—দেখো সুপ্রীতি—খালি পেটে তোমার ওই ব্যঙ্গ আমার ধাতে সইবে না, চলো আগে কিছু খেয়ে নি।

—চলো, সেই বেশ। সুপ্রীতি জবাব দিল, খাওয়ার পরই অন্য কিছু জমবে ভাল।

পাশাপাশি ওরা দু'জনে এগিয়ে চলল। গোটা ড্যালহাউসী চত্বর দিয়ে ঘরমুখী লোক চলছে। ট্রাম বাস গাড়ি মানুষে বোঝাই এই অফিস পাড়ায় হালকা সন্ধ্যা নেমেছে। যান্ত্রিক আর লোকের চলার মুখরতা মিলিয়ে একটা দিনের কর্ম অবসানের কেমন এক অদ্ভুত সুর। উপরে আকাশে তখনো বর্ণাঢ্য মেঘের ধূসরতা। তার নিচে নিয়নের বিজ্ঞাপন—ইলেকট্রীকের আলো। অথচ এত সব থাকা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে কেমন একটা নিস্তব্ধতা। যেন কথা হারিয়ে ফেলে সেই কথা খোঁজারই মূক ব্যর্থতা। লিমটন থেকে সোজা দক্ষিণমুখো হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছল। এতক্ষণের দীর্ঘ নীরবতা ভেঙ্গে সুপ্রীতি বলল, কোথায় যাচ্ছ এদিকে ?

—অন্নপূর্ণায়। দেবাশীষ বলল।

—বড় ভিড় ওখানে, লোক গিসগিস।

—তবু সস্তা, আর খাবারগুলো ভাল।

অন্নপূর্ণায় ঢোকবার আগে আর কোনো কথা হল না ওদের মধ্যে। দেবাশীষ কুপন কিনে খাবার আনতে গেল। সুপ্রীতি বসল এসে কোণ ঘেঁষে একটা চেয়ারে। দু'ডিস খাবার, দু'কাপ চা নিয়ে দেবাশীষ ফিরে এল। খেতে সুরু করল দু'জনে। খেতে খেতে দেবাশীষ বলল এক সময়ে, কাল কিন্তু দেরী করলে চলবে না।

—কেন ? সুপ্রীতি অদ্ভুতভাবে তাকাল।

—ভাবছি সিনেমায় যাব। মেট্রোয়—সেভেন ব্রাইডস ফর সেভেন ব্রাদারস্।

—ও। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকল সুপ্রীতি। চা শেষ ক'রে একটা সিগারেট ধরাল দেবাশীষ। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। সুপ্রীতিরও খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ও বলল, তার চেয়ে কাল থাক—আরেক দিন যাব।

—কাল অসুবিধে কি, ন্যাকামী রাখ—দু'টোর সময় হাজির থাকবে তুমি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ওরা। বেরিয়ে এল বাইরে। তখন সন্ধ্যেটা জমাট হয়ে নেমে এসেছে। এসপ্ল্যানেডের মোড়টা আলোয় আলোয় হেসে উঠেছে। একটা রাত্রির খুশির দমকা এখানে-ওখানে ছিটকে পড়ছে। সুপ্রীতি কী ভাবছিল চলতে চলতে। মুখ নিচু ক'রে ওর চলাটা বেশ লাগছিল দেখতে। দেবাশীষ পাশে পাশে। নিশ্চুপ সিগারেট খাচ্ছিল এক মনে।

ট্রাম টারমিনাসে এল ওরা। এত চুপচাপ বুঝি

দেবাশীষের আর ভাল লাগছিল না। তাই বলল হঠাৎ থেমে পড়ে, তোমার হল কি ?

—কই ? চমকেই উঠল সুপ্রীতি। তারপর হাসল। বলল : কিছু না।

—কাল আসছ তো ?

—তুমি জোর করলে কী আর করব বল! আমি ভাবছিলাম—

—কি ভাবছিলে ?

—ভাবছিলাম কাল আর আমরা দেখা করব না। সুপ্রীতি একটু থামল।

—তারপর ?

—তারপর একেবারে সোমবার বেশ মজা ক'রে ছুটীর পর অনেকক্ষণ কাটাব। তোমার কেমন লাগে কথাটা ?

সুপ্রীতি কথা শেষ ক'রে সুন্দরভাবে তাকিয়ে রইল দেবাশীষের দিকে।

—আমার—দেবাশীষও ওর চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গেল। আটকে গিয়ে শেষমেষ বলল, দুত্তুরি ছাই আমার ও-সব সাজিয়ে কথা আসে না—তুমি বলছ কাল যাবে না, ঠিক আছে তাই হবে। শ্যামবাজারের একটা ট্রাম এসে ওদের সামনে থামল। তাড়াতাড়ি দু'জনেই উঠে পড়ল। সুপ্রীতি বসবার জায়গা পেল। দেবাশীষকে কিন্তু দাঁড়াতেই হল। ভিড়ের ভেতর আর কোনো কথা হল না।

ট্রাম থেকে নেমে গলির ভেতর একটু ফাঁকায় এল ওরা। হাঁটতে লাগল মন্থর পায়ে। এতক্ষণের স্তব্ধতাকে ভেঙে সুপ্রীতিই কথা বলল, তুমি রাগ করো নি তো ?

—রাগ! দেবাশীষ বুঝতে পারল না। কেন বলো তো ?

—কাল যাব না বলে, তুমি হয়'তো ভাবলে—

দেবাশীষ হাসল। তুমি তা হলে এখনো আমাকে চেননি বলব। যাহে না এর জন্য রাগ হব কেন ?

—যাক বাঁচলাম! সুপ্রীতি খলখল ক'রে হেসে উঠল। আমার তো বলবার পর থেকেই ভয় হচ্ছিল।

—এখন ভয় গেছে তো ?

—উঁ-হুঁ।

—উ-হুঁ: আবার কীসের!

—তা বলব না, শুধু শুনে রাখ তোমাকে নিয়ে আমার সব সময়ই ভয়। দু'জনেই কথা বন্ধ করল। আবার শুধু ওদের চলার শব্দ। একটু দুরে এসে দেবাশীষ থামল। বলল, চলি তবে!

—সে-কি, বাড়ি যাবে না ?

—আজ আর না, তুমি যাও।

—সোমবার থাকছ তো ? প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় সুপ্রীতি চোখ মেলে দাঁড়াল।

—নিশ্চয়ই। দেবাশীষ বলল, তুমি কিন্তু দেরী ক'রো না। যাই কেমন ?

—আচ্ছা, মধুরভাবে হাসল সুপ্রীতি।

ওর হাসি মেখে নিয়েই স্তিমিত আলোর গলিতে দেবাশীষের চেহারাটা জুতোর একটা অদ্ভুত শব্দ তুলে অদৃশ্য হল। সুপ্রীতি আর না দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

সপ্তাহের প্রায় দিনই ওদের দু'টিকে অফিসের ছুটির পর এভাবে দেখতে পাওয়া যায়। গত দু'মাস ধরে, ঠিক ওই লিমটনের বারান্দার নিচে—সুপ্রীতি আসে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে, দেবাশীষ স্টিফেন হাউস। ওদের মধ্যেকার দু'মাসের গড়ে ওঠা এই সম্পর্কটা খুবই আকস্মিক সবার কাছে। হঠাৎ এমন একটা দিন এল, যখন ওরা নিজেদের দেখতে পেল ঘনিষ্ঠভাবে। দেবাশীষ প্রথমটায় এতটা ভাবতে পারে নি। সামান্য কয়েক ঘণ্টার বিয়ে-বাড়ির কোনো এক হুল্লোড়ের মুহূর্তের পরিচয় যে এত নিবিড় হতে পারে কেউই তা মনে করেনি। বাড়ি ফিরে দেবাশীষ এই কথাগুলোই ভাবছিল। একা একা ভাবতেও যেন ভাল লাগে। কী ক'রে যে গত দু'টো মাস এক দ্রুততর গতির মধ্যে কেটে গেল তা ও ভাবতেই পারে না।

অরুণেন্দুর বিয়েতে গিয়ে মনে হয় এখন যেন দেবাশীষ নিজেই এক স্থিরতর ভবিষ্যতের জালে পড়ে এগিয়ে চলেছে। ও জানে বন্ধু-বান্ধব সবাই এটা ধরে নিয়েছে—আত্মীয়-স্বজনরাও খানিকটা কানাঘুঁসো করছেন। বিয়ের-রাতটার কথাই মনে পড়ে। লগ্ন প্রায় শেষ রাতে। সবাই চলে গেলেন, আর্দ্ধেক বিয়ে দেখেনের ছিল ওরা ক'জন অরুণেন্দুর পাশে। কন্যাপক্ষের

ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। কণের নিজের ক'য়েকটি বোন, মা, ঠাকুমা আরো এ-ও দু'একজন। সুপ্রীতি তারই মাঝে চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল! মাঝে মাঝে ঠাট্টা ক'রে বিব্রত করছিল অরুণেন্দুকে। আর সেই সঙ্গেই চকিতে কটাক্ষ হেনে বিভ্রান্ত করছিল ওদের ক'-জনকে। একটা মেয়ের ফাজলামি আর চোরা-চাহনি বেশিক্ষণ বসে সহ্য করবার মত ছেলে দেবাশীষ নয়—তবু তাকে সহ্য করতে হচ্ছিল, বসে থাকতে হচ্ছিল শান্ত-তার একটা নির্বিকার ভাব নিয়ে। একসময়ে গুরুজনরা চলে গেলেন ওদের রেখে। চঞ্চল হয়ে উঠল দেবাশীষ, এতক্ষণে যেন একটা কিছু করবার মত খুঁজে পেল সে। বেঁধে গেল ওদের মধ্যে কথার দ্বন্দ্ব।

সুপ্রীতি ক'য়েকবার চোখ মেলে বেশ ভাল ক'রে দেখল ওকে। কে জানে কী দেখেছিল সে—তারপরই সমানে মুখ চালিয়ে গেল দু'টিতে। বিয়ে বাড়ির গভীর রাতে ওদের এই বাক-চাতুর্য কারোরই খারাপ লাগছিল না। উপরন্তু দু'পক্ষেরই অন্য ক'জন মাঝে মাঝে ওদের ঝিমিয়ে আসা কথা কাটাকাটিকে মুখর ক'রে তুলল টিপ্পনি কেটে।

বিয়ে কাটল, বাসি বিয়ে—কাটল বউভাত। বউ-ভাতের দিনই ওদের ওই বিয়ের রাতের মুখর করা কথার লড়াই থেকে সন্ধি হল। পরিচিত হল দু'জনে। দেবাশীষ আর সুপ্রীতি। এ-দিনই আরো একজনের সঙ্গে পরিচিত হল সুপ্রীতি। অমিতাভর সুন্দর শান্ত ভাবটাও চঞ্চল দেবাশীষের মতন হয়েই ওর কাছে ভাল লাগল। আসবার সময় বার বার ক'রে দু'জনকে বলেছিল সুপ্রীতি—আমাদের বাড়ি যাবেন কিন্তু।

দেবাশীষ উত্তর দিয়েছিল, নিশ্চয়ই যাব—আপনাদের এমন আলাব দেখবেন। আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে—সুপ্রীতি উত্তর দিয়েছিল, আপনার তো শুধু মুখেই যত বড়াই—আর আপনি আসছেন তো অমিতাভবাবু? দেবাশীষের মনে পড়ে সুপ্রীতির প্রশ্নে অমিত একটু থমকে গিয়েছিল। তারপর বলেছিল, দেখি সময় পাই তো যাব, সামনেই আমার পরীক্ষা। ও-সব অজুহাত শুনব না, আপনাদের একেই যেতে হবে। বিশেষ এক হাসি ছড়িয়ে কথা-ল সুপ্রীতি সেদিনে চলে গিয়েছিল।

দেবাশীষ নিজের মনে হাসল। তারপর এই দু'মাসেই কতবার ওদের বাড়ি গেল। অবশ্য সুপ্রীতি অফিসে কাজ করে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। অফিস-ফেরতই গিয়েছে, কোনো দৃষ্টিকটুতার অবতারণা হয়নি। একদিন অমিতাভও গিয়েছিল ওদের বাড়ি। দেবাশীষের সঙ্গেই। সুপ্রীতি খুব খুশি হয়েছিল। বলেছিল, শেষ পর্যন্ত এত দিনে তা হলে এলেন! এ-বার বাড়ি চিনলেন—মাঝে মাঝে মনে ক'রে আসবেন—ভুলবেন না কিন্তু।

খুব বেশিক্ষণ ছিল না অমিতাভ। ও যেন পালাবার জন্য ছটফট ক'রে উঠেছিল ক'য়েক মিনিটেই। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচল। অমিতাভ চলে যেতে খল খল ক'রে হেসে উঠেছিল সুপ্রীতি; বলেছিল, দেখলেন দেবাশীষবাবু, ওঁর ভাবটা দেখলেন—যেন জলে পড়েছিলেন। একদম ছেলেমানুষ। আমার খুব ভাল লাগে।

এরপর বহুদিন কেটেছে। নিয়মিত ওরা দু'জনে লিমটনের বারান্দার নিচে মিলিত হয়ে অফিসের পর গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরেছে। সুপ্রীতিদের বাসা শ্যাম-বাজারে, দেবাশীষরা থাকে ভবানীপুরে। উল্টোপথ হলেও সুপ্রীতিকে প্রায়ই পৌছে দিয়ে দেবাশীষ ফিরত। কোনো কোনো দিন ফিরতে রাত হত। হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকত ময়দানের ঝিম-মারা অন্ধকারের ভেতর।

অফিসে বাড়িতে ক্লাবে সব জায়গাতেই দেবাশীষকে নিয়ে এক গুঞ্জন। ওদের নিয়ে কথাবার্তা। অফিসে হয় তো কোনো একটা ফাইল নিয়ে মশগুল দেবাশীষ। হঠাৎ একজন এসে ঝুঁকে পড়ল, কি-রে কি লিখছিস—প্রেমপত্র নাকি?

—কেন তোমার চোখ নেই বুঝি বাপধন, ফাইল দেখেও বোঝ না—খেঁকিয়ে উঠত দেবাশীষ।

—চটছিস কেন, তাই বল না, তোর মনোযোগ দেখে ভাবলুম আর কি—আর তাছাড়া তোর লেখার মত লোকও রয়েছে কিনা—

—দ্যাখ অনন্ত, কাজের সময় বিরক্ত করলে ভাল হবে না বলছি, ইয়ারকির একটা সময় আছে। দেবাশীষ আবার খেঁকিয়ে উঠত।

—বেশ, নে তুই কাজ কর—অনন্ত চলে যায় সেদিনের মত।

ক্লাবে তো আজকাল যাওয়ার ফুরসৎই হয় না। যাবে কখন? ফিরতেই রাত ন-টা কখনো-সখনো দশটাও বেজে যায়। বাড়িতে মা। এই তো সেদিন-ই ফিরতে বেশ একটু রাত হয়ে গিয়েছিল সুপ্রীতিদের ওখান থেকেই। বাড়ি ফিরতেই মা ডাকলেন, খোকা শোন—

ঘাড় চুলকে দেবাশীষ মার সামনে এসে দাঁড়াল।

বললেন মা, আজকাল দেখছি ক্রমেই তোমার উন্নতি হচ্ছে, আর্ধেক রাত বাইরে কাটিয়েই ফিরছ, বলি ব্যাপার কি?

—একটা কাজে গিয়েছিলাম মা, তাই দেরী হয়ে গেল।

—কীসের কাজ শুনি?

মিথ্যে কথা বলে মার প্রশ্নে মুশকিলে পড়ে গেল দেবাশীষ। বার ক'য়েক মাথা চুলকে জবাব দিল, অফিসেরই কাজ—মানে একজনের—

—থাক, থাক বুঝতে পেরেছি—ওকে থামিয়েই মা বললেন, তোমাকে আর বিশদ ক'রে বলতে হবে না—তা তোমার এ কাজগুলো কি অন্য সময়ে করা চলে না।

দেবাশীষ চুপ হয়ে গেল। কি বলবে কথা খুঁজে পেল না।

মা-ই আবার কথা বললেন, যাও হাত-মুখ ধুয়ে এস—মিথ্যে আর রাত বাড়িয়ে লাভ কি?

এতগুলো কথা এক সঙ্গে ভেবে আবার একটা খুশির হাসি ফুটে উঠল দেবাশীষের মুখে। সবাই একটা কিছু সন্দেহ করেছে। মাও। মাকে এবার একদিন খুলেই বলতে হবে। দেবাশীষ ঠিক করল, সুপ্রীতিকে একদিন নিয়ে আসব। তারপর মাকে খুলে বলব সব। মনে মনে সমস্ত ঘটনাকে সাজিয়ে নিয়ে দেবাশীষ যেন হালকা হল।

সোমবার অফিসের পরও সেই লিমটনের বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। পাঁচটা বাজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রীতি এল। বলল, আজ কিছু বলতে পারবে না, পাঁচটার সাথে সাথে এসেছি।

—তা এসেছ। নির্বিকার দেবাশীষ সিগারেটের ধুয়ো ছাড়ল।

—বাব্বা! আগে আসা কি সহজ নাকি, দেখে ফেললেই কেউ না কেউ কমপক্ষে পনের মিনিট নষ্ট করিয়ে ছাড়বে।

—ওসব কথা এখন রাখ—হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে দেবাশীষ বলল, তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা আছে। চল মাঠে গিয়ে বলা যাবে।

সূর্য ডুবু ডুবু। ময়দানের ঘাসের পর দিন শেষের ছায়ামাখা ম্লান আলো পড়ে আছে একটু। এ-টুকুও শেষ হয়ে যাবে এখুনি। ক'টা চিল উড়ছে অনেক উঁচুতে। কিছু নানা-বয়েসী লোক এখানে-ওখানে। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে ওরা বসল। ধারে-কাছে কেউ নেই। দূরে ফুটবল মাঠগুলোর শূন্য গ্যালারী। একটু হালকা ছায়া এবার। বসে পড়েই সুপ্রীতি বলল, কই—বলো।

—বলছি। আরেকটা সিগারেট ধরাল দেবাশীষ। কিছুক্ষণ ধুয়ো ছাড়ল বুক ভরে। ক'টা ঘাস ছিঁড়ল সুপ্রীতি। নড়ল-চড়ল একটু। তারপর দেবাশীষ বলল, বেশ আশ্চর্য না।

—কি আশ্চর্য? সুপ্রীতি বিস্মিত হল বেশ।

—আমাদের এই অদ্ভুত মেলামেশা। দেবাশীষ কথা ক'টা বলল আকাশের দিকে মুখ করেই।

—ও তাই বলো; সুপ্রীতি বলল, আমি ভাবলাম অন্য কিছু।

ওর কথা বলার ঢঙে দেবাশীষ একটু আঘাতই পেল মনে। বলল, সুপ্রীতি, দয়া ক'রে এখন তোমার হালকা ভাবটা একটু থামাও। ওর জন্যে বহুদিন পড়ে আছে। আমি বলছিলাম—

দেবাশীষ থেমে পড়ল। কেন যেন কথা শেষ করতে পারল না।

—কি বলছিলে তুমি? এবার সুপ্রীতির কৌতূহল দেখা দিল।

—আমাদের বাড়ি চল একদিন। যাবে? দেবাশীষ হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, মা তোমাকে দেখলে খুশি হবেন নিশ্চয়ই।

—তোমাদের বাড়ি? কথাটাকে টেনে টেনে উচ্চারণ ক'রেই যেন সুপ্রীতি বুঝে ফেলল দেবাশীষের জরুরী কথার পেছনে লুকিয়ে থাকা উদ্দেশ্যটা।

—হ্যাঁ, তোমার কি কোনো আপত্তি আছে? কেমন অদ্ভুত শোনাল দেবাশীষের গলা।

—আপত্তি! সুপ্রীতির তন্দ্রা ভাঙল যেন। বলল, না না আপত্তি কীসের?

এবার হাসল সুপ্রীতি। হেসেই যেন উড়িয়ে দিল কথাটা, বেশ তো যাব একদিন—তা এত তাড়া কীসের?

—অনেকদিনই তো হয়ে গেল। আপত্তি না থাকলে আর বাধা কোথায়? দেবাশীষের গলায় আগ্রহ ঝরে পড়ল: এর মধ্যেই চল একদিন।

সুপ্রীতি উত্তর দিল না কোনো। অনেকক্ষণ কাটল চুপচাপ। সন্ধ্যের ছায়াও নেমে এসেছে চার পাশে। চিলগুলো আর নেই। ফাঁকা আকাশে গুটি কয়েক তারা শুধু। দেবাশীষ যেন এভাবে চুপ করে আর থাকতে পারছিল না। বলল, কি কথা বলছ না যে?

সুপ্রীতি চোখ তুলে তাকাল। অনেক পরে বলল, আজ বড় ক্লান্ত লাগছে আমার। দোহাই তোমার আজ থাক, আর কয়েকদিন বাদে বলব তোমাকে।

আবার চুপ দু'জনেই। একটু বাদে এবার সুপ্রীতিই নীরবতা ভেঙ্গে বলল, চল, ওঠা যাক।

চল। ভারী নিঃশ্বাস ফেলে দেবাশীষ উঠে দাঁড়াল।

টারমিনাসে এসে লোকজন শব্দের ভেতর ওদের স্তব্ধতাটা যেন হালকা হয়ে গেল। ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে সুপ্রীতি বলল এক সময়ে, অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি একাই যাই।

দেবাশীষ কথা বলল না। শুধু ঘাড় নাড়ল।

ট্রাম এলে চলে গেল সুপ্রীতি।

পরদিন আবার দেখা হল। কিন্তু বিশেষ কথা হলনা দু'জনের। সুপ্রীতি যেন একদিনেই অনেকটা গম্ভীর হয়ে গেছে। বলল, শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে কাল থেকেই।

তারপর দিনও দেখা হল লিমটনের নিচে। নিয়মিত বারান্দায়। চুপচাপ হেঁটেই অনেক সময় পার ক'রে দিল ওরা। দেবাশীষ বলল, আজ তাহলে যাই আমি।

—আচ্ছা। সুপ্রীতি ট্রামে উঠে পড়ল উত্তর দিয়ে।

কিন্তু পরের দিন সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত দাঁড়িয়েও যখন সুপ্রীতি এল না তখন একটু বিস্মিত হল দেবাশীষ, কি হল—ও-কি তবে অফিসে আসেনি। একাই একটা চিন্তা নিয়ে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরল দেবাশীষ। না আসবার হলে, কাল তো বলতই। আরো দু'টো দিন কাটল দেবাশীষের। সুপ্রীতি আজো এল না। কী যেন ভাবল দেবাশীষ। ওর কোনো অসুখ-বিসুখ করেনি তো! বাড়ি ফিরে সমস্ত রাত ভাবল দেবাশীষ। কেমন একটা খাপ-ছাড়া মন। সকালে ঘুম থেকে উঠতে অনেক বেলা হয়ে গেল। রাত্রের অত চিন্তার পরেও ছুটির সকালে কোথায় বেরোল না। ঘরেই বসে রইল গুম হয়ে। বেলা বাড়লে মা দু'একবার ডেকে গেলেন, খোকা চান ক'রে খেয়ে নে। আর কত দেরী করবি?

দেবাশীষ শুনেও মার কথা শুনল না।

এবার মা এসে বললেন, তোর কি হয়েছে বল তো?

চমকে উঠল দেবাশীষ, কই কিছু না। এমনি।

—তা এভাবে মুখ গোমড়া ক'রে ঘরে বসে আছিস সকাল থেকে। মা তাড়া দিলেন, নে ওঠ ওঠ—চান কর।

—যাই। দেবাশীষ উঠে পড়ল আলসেমি ছেড়ে।

চান-খাওয়া হতে হতে প্রায় দু'টো বাজল। সকালের কথাটাই ভাবল দেবাশীষ। যাব না-কি ওদের বাড়িতে। আবার ভাবল থাক—কাল তো দেখা হবেই। তার চেয়ে অন্য কোথায় ঘুরে আসি।

কাপড়-জামা পরে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মাথার ভেতর আবার কথাটা চাড়া দিয়ে উঠল।

অসুখ-বিসুখ তো করতেই পারে। আর ওদের বাড়িও অনেকদিন যাই না। যাই ঘুরেই আসি। যদি ভাল থাকে ও—

আবার ভাবতে থাকে দেবাশীষ, তা হলে বেশ হয়। আজ বাইরে কোথায় দু'জনে বেড়িয়ে আসব। দক্ষিণেশ্বর কিম্বা ঢাকুরিয়া। অসুস্থ হলে আমার তো যাওয়াই উচিত, কে জানে কি হয়েছে? আর ক'দিন পর যখন—

যাবার জন্তই নিজের মনকে তৈরী করল দেবাশীষ। একবার তাকাল নিজের হাত-ঘড়ির দিকে। তিনটে বেজে পঁচিশ। যেতে যেতে সাড়ে চারটে। না, আর দেরী করা যুক্তিসঙ্গত নয় কোনো মতেই।

এতগুলো কথা ভেবে বেশ খানিকটা সহজ হয়ে পা



যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
FOR SAVING LIFE
FOR PRESERVATION OF HEALTH
SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
LIFEBUOY SOAP

বাড়াল দেবাশীষ। ক্রমশঃই তার চলার গতি বেড়ে চলল। মনে হল অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে তার।

বাস ট্রামের ভিড়ে পৌছতে পৌছতে সত্যিই সাড়ে চারটা বাজল দেবাশীষের। বিকেল হয়ে গেছে। রোদের তেজ কমে এসেছে। ওদের বাড়িটার সামনে এসে একবার থামল ও। দরজাটা খোলাই; ভেজান ছিল। ঠেলতেই খুলে গেল। তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে ঘাম বেরিয়ে গিয়েছিল ওর। আরেকবার হাতঘড়ি দেখল দেবাশীষ, চারটে চল্লিশ। ভেতরে ঢুকে দেবাশীষ সিঁড়ির দিকে চলল। সিঁড়ির মুখে এসেই থমকে দাঁড়াল ও। সুপ্রীতির গলা পাওয়া যাচ্ছে। কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে নেমে আসছে, তুমি কিন্তু ভীষণ দেরী ক'রে এসেছো অমিত। এর জন্য তোমার শাস্তি হওয়া উচিত।

—বারে! কোথায় দেরী করলাম, কথাটা প্রায় বাঁকের মুখে এসে পড়ল। ঠিক সময়েই এসেছি আমি।

বাঁক ঘুরতেই মুখোমুখি দেখা! স্তম্ভিত তিনজনেই। দেবাশীষের চোখ দু'টো বোবা হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। স্পষ্ট ক'রে সে দেখল সিঁড়ির বাঁকের মুখেই দাঁড়িয়ে পড়া সুপ্রীতির সঙ্গে নেমে আসছিল অমিতাভই। যে অমিতাভ মাত্র একদিন তার সঙ্গে এখানে এসে লজ্জায় পালিয়ে বেঁচেছিল।

কিছু সময় চুপচাপ কাটল। কেউই কথা বলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সুপ্রীতিই নড়ে উঠল। নামল আর এক ধাপ। বেশ সহজ হয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ কি মনে ক'রে দেবাশীষদা?

কথা বলতে বলতে আরো অনেকটা কাছে এল সুপ্রীতি।

আমতা আমতা ক'রে উত্তর দিল দেবাশীষ, এদিকেই এসেছিলাম। ভাবলাম একবার দেখা ক'রে যাই।

—ও। সুপ্রীতি বলল, বেশ করেছ—ওপরে যাও, সবাই আছে। সুপ্রীতি আর দেবাশীষের দিকে তাকাতে পারল না। কথা শেষ ক'রেই মুখ নামিয়ে ফেলল।

—কোথায় যাচ্ছ? জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল না, তবু দেবাশীষ কৌতূহলী প্রশ্ন ক'রে বসল।

—একটু বাইরে। অমিতাভ উত্তর দিল এবার।

সুপ্রীতি আরো নিচে নেমে এল। দেবাশীষের পাশ দিয়ে একটু এগিয়ে গেল। বলল, আমরা আসি দেবাশীষদা, চলি।

দেবাশীষ দাঁড়িয়ে রইল স্থানুর মত। কেমন স্তব্ধতায় ও-যেন পাথর হয়ে গেছে। সব যেন শূন্য শূন্য এবং সুপ্রীতির মনটাও। সুপ্রীতির মনের নাগাল পেতে গিয়ে আসলে কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, একা একা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সেই কথাটাই ভাবছিল দেবাশীষ।

ক্লান্ত

সুনীল বসু

অনেক সাগর পেরিয়ে আজকে
এথানে এলাম তবে।
তোমার শরীর বিকেলের চর
হাজার পাখির রবে।
আমার শরীর এখনো জড়ায়
ক্লান্তি অক্টোপাশ,
অবশ দেহের ছায়ামুখ থেকে
ঝরে পড়ে নিশ্বাস।

আমি আজ এক জখম জাহাজ
নরম বালির চরে,
আমি ভেঙে গেছি ধারালো কাজের
খেপাটে ধুলোর ঝড়ে।
তুমি ত আমার অসীম ক্লান্তি
ঢেকে দেবে জলস্রোতে,
সেই আশাতেই সাগর সাঁতরে
এসেছি যে কোনো মতে॥



বেদান্ত দর্শন—শঙ্কর ভাষ্য

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

অনুমান

"অনুমিতি-প্রমা-করণম্ অনুমানম্" (বেদান্তপরিভাষা), অনুমিতির যথার্থ জ্ঞান যাহাদ্বারা হয়, তাহাই অনুমান। অনুমিতিশ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্যা। ব্যাপ্তি-জ্ঞান রূপে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, তাহা হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুব্যবসায়, স্মৃতি ও শাব্দজ্ঞান অনুমিতি নহে। ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপেই ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির হেতু, বিষয়রূপে (যেমন অনুব্যবসায়ে) অথবা পদার্থজ্ঞানত্ব-রূপে (যেমন শাব্দজ্ঞান) অথবা সমান বিষয়ানুভবত্বরূপে (যেমন স্মৃতিতে) নহে।

ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণ। ব্যাপ্তিজ্ঞান ও অনুমিতির মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার ব্যাপ্তিজ্ঞানের সংস্কার। ব্যাপ্তির স্মরণ হইলে অনুমিতি হয়। ব্যাপ্তির যে সংস্কার মনে থাকে, তাহাই অনুমিতির হেতু।

প্রাচীন ন্যায়ে পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্য তো দৃষ্ট এই ত্রিবিধ অনুমান স্বীকৃত। নব্য ন্যায়ে ইহাদিগকে কেবলা-ন্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকি ও অন্বয় ব্যতিরেকি, বলা হইয়াছে। কারণ হইতে কার্য্যের অনুমানের নাম পূর্ব্ববৎ। কার্য্য হইতে কারণের অনুমান শেষবৎ। মেঘ দেখিয়া ভাবী বৃষ্টির অনুমান পূর্ব্ববৎ, ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান শেষবৎ। কার্য্য ও কারণ ভিন্ন হেতু হইতে অনুমান সামান্যতোই দৃষ্ট। উৎপত্তি দেখিয়া ভাবী বিনাশের অনুমান এই শ্রেণীর। পূর্ব্ববৎ অনুমানে কেবল অন্বয় ব্যাপ্তি থাকে বলিয়া তাহা কেবলান্বয়ি, শেষবৎ অনুমানে থাকে কেবল ব্যতিরেক। যেখানে মেঘ সেখানেই বৃষ্টির সম্ভাবনার অনুমান কেবলান্বয়ী। যেখানে ধূম নাই সেখানে অগ্নিও নাই, এই অনুমান কেবল-ব্যতিরেকি। অন্বয় ব্যাপ্তিও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি উভয় হইতে যে অনুমান, তাহা অন্বয় ব্যতিরেকি। যেখানে ধূম, সেখানে অগ্নি এবং যেখানে ধূম নাই, সেখানে অগ্নিও নাই। সুতরাং ধূম হইতে অগ্নির অনুমান অন্বয়-ব্যতিরেকিও হইতে পারে।

বেদান্ত মতে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি হইতে অনুমান হইতে পারে না। বেদান্তী অন্বয় ব্যতিরেকি অনুমান স্বীকার করেন না।

নৈয়ায়িকের ন্যায় বেদান্তও স্বার্থও পরার্থভেদে বিবিধ অনুমান স্বীকার করেন। নিজের অনুমিতির জন্য যাহার প্রয়োগ হয়, তাহা স্বার্থ অনুমান।

বহুবার বন্ধনশালায় ধূমের সঙ্গে অগ্নি দেখিয়া লোকের ধারণা হয়, যেখানে ধূম, সেখানেই অগ্নি। তাই পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া সেখানে অগ্নি আছে এই অনুমান হয়। ইহাতে ন্যায়ের পঞ্চ অবয়বের ব্যবহার হয় না। কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে হইলেই ন্যায়ের অবয়বগুলির ব্যবহার করিতে হয়। এই অবয়ব-সমন্বিত অনুমানকে পরার্থ অনুমান বলে। বেদান্তী পাঁচটি অবয়বের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। তাহার মতে তিন অবয়বই যথেষ্ট : বেদান্তের তিন অবয়ব—(১) প্রতিজ্ঞা (পর্ব্বতো বহ্নিমান), (২) হেতু (কেননা ইহা ধূমযুক্ত), এবং উদাহরণ (যাহা যাহা ধূমযুক্ত তাহাই বহ্নিযুক্ত), যেমন মহানস। বেদান্তমতে অনুমানের অবয়ব নিম্নলিখিত রূপও হইতে পারে।

যাহা যাহা ধূম-যুক্ত, তাহাই বহ্নিযুক্ত (উদাহরণ) পর্ব্বত ধূমযুক্ত (উপনয়) সুতরাং পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত (নিগমন)। পাশ্চাত্য ন্যায়ের অবয়বগুলি এইরূপ।

শব্দ ও অর্থ

শঙ্কর স্ফোটবাদ স্বীকার করেন নাই। যে যে বর্ণদ্বারা কোনও শব্দ গঠিত হয়, তাহাদের অতিরিক্ত সেই শব্দের একটি অখণ্ড রূপ আছে, ইহা তিনি স্বীকার করেন না।

বেদান্ত পরিভাষায় শব্দ ও তাহার অর্থবোধ সম্বন্ধে যে মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে নিম্নে তাহার মর্ম্ম দেওয়া হইল।

"যস্য বাক্যস্য তাৎপর্য্যবিষয়ীভূত সংসর্গো মানান্তরেণ ন বাধ্যতে, তৎবাক্যং প্রমাণং"—যে বাক্যের অর্থদ্বারা প্রকাশিত সম্বন্ধ অন্য কোনও প্রমাণ দ্বারা বাধিত হয়না, সেই বাক্য প্রমাণ।

কোনও বাক্য দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহার কারণ চারিটি

—আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসত্তি এবং তাৎপর্য্য জ্ঞান। বাক্যের মধ্যে যে সকল পদ থাকে, তাহাদের যাহা অর্থ, তাহাদিগের পরস্পরের জিজ্ঞাস্য হইবার যোগ্যতাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। বাক্যের মধ্যস্থ ক্রিয়াপদে কর্ত্তার, কর্ত্তৃপদে ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে। "কৃষক জমি চষিতেছে" এই বাক্যে "চষিতেছে" এই ক্রিয়া পদে কর্ত্তায় (কৃষক) আকাঙ্ক্ষা, কৃষক এই কর্ত্তায় ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা, এবং জমি এই কর্ম্মে, ক্রিয়ার আকাঙ্ক্ষা আছে।

বাক্যের যাহা তাৎপর্য্য তাহার সম্বন্ধের বাধার অভাবের নাম "যোগ্যতা"। "জল দ্বারা সেচন করিতেছে" এখানে জলের সঙ্গে সেচন ক্রিয়ার সম্বন্ধের বাধা নাই। সুতরাং অর্থ-গ্রহণে বাধা হয় না। কিন্তু যদি থাকিত "অগ্নি দ্বারা সেচন করিতেছে", তাহা হইলে বাধা হইত। অর্থ-গ্রহণও হইতে পারিত না।

অব্যবধানে পদোৎপন্ন পদার্থের উপস্থিতি আসত্তি। "অশ্ব দেখিতেছে" বাক্যে "অশ্ব শব্দ" উচ্চারণ করিয়া দুই ঘণ্টা ব্যবধানে "দেখিতেছি" শব্দ উচ্চারণ করিলে অর্থবোধ হয় না। "দেখিতেছি" শব্দ "অশ্ব" শব্দের অব্যবহিত পরেই উচ্চারিত হওয়া চাই, যাহাতে উহার অর্থ উচ্চারিত অশ্ব শব্দের অর্থের সঙ্গে মিলিত হইতে পারে। স্থান বিশেষে কোনও পদ অনুক্ত থাকিতে পারে, তখন অনুক্তপদ অধ্যাহার করা যাইতে পারে। যেমন যজুর্বেদের প্রথম মন্ত্রে "ইষেত্বা উর্জ্জেত্বা ইত্যাদি। এখানে "ছিনদ্নি" পদ অধ্যাহার করিয়া আসত্তি রক্ষা করা হয়।

পদার্থ (পদের অর্থ) দ্বিবিধ—শক্য ও লক্ষ্য। অর্থ বিষয়ে পদের মুখ্য বৃত্তিকে শক্তি বলে। যেমন 'ঘট' বলিলে স্থূল উদর-বিশিষ্ট দ্রব্য বুঝায়। নৈয়ায়িকদিগের মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এক এক শব্দের এক একটি নির্দিষ্ট অর্থ হয়। এই ঈশ্বরের ইচ্ছায় সংকেতের নাম শক্তি। ইহা কোনও স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। বেদান্তীর মতে শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থ, কেন না কারণের মধ্যে কার্য্যের অনুকূল শক্তিমাত্রকেই বেদান্তী পৃথক পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। "ঘট" শব্দের উচ্চারণ হইতে ঘটের জ্ঞান হয়। ঘটের জ্ঞান কার্য্য, ঘট শব্দ কারণ। কারণে অবস্থিত কার্য্যানুকূল শক্তি সেই জন্য স্বতন্ত্র পদার্থ। শক্তি-বিষয়ত্বই শক্যত্ব।

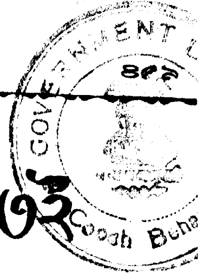
এই শক্যত্ব জাতিতে থাকে, ব্যক্তিতে নহে। "গো" শব্দে জাতিও বুঝায়, ব্যক্তিও বুঝায়। শক্যত্ব গো জাতিতে থাকে। ব্যক্তির সংখ্যা অনন্ত। প্রত্যেক ব্যক্তিতে শক্তি থাকে বলিলে "গৌরব" হয় (বেশী বলা হয়)। কিন্তু "গো" শব্দে ব্যক্তিও বুঝায়। ব্যক্তিতে শক্যতা যদি না থাকে, তাহা হইলে "গো" শব্দে কেবল জাতিই বুঝাইত। উত্তরে বেদান্তী বলেন ব্যক্তি ও জাতির জ্ঞান এক সঙ্গেই হয়। ব্যক্তিগত শক্তি (স্বরূপবতী হেতু) 'গো' প্রভৃতি শব্দে স্বরূপে থাকে, তাহা জ্ঞাত হয় না। জাতিগত শক্তি আমাদের দ্বারা জ্ঞাত হইয়া জাতি জ্ঞান উৎপন্ন করে (জ্ঞাতা হেতু)। জাতি-শক্তির জ্ঞান হইতেই ব্যক্তি-জ্ঞান হয়। সুতরাং ব্যক্তিতে শক্তির অস্তিত্ব মানিবার প্রয়োজন নাই।

যে শক্তি জ্ঞাত হয় তাহার বিষয় বাচ্য। সুতরাং জাতিই শব্দের বাচ্য। "গো" শব্দের বাচ্য গো-জাতি (universal), গো ব্যক্তি নহে। ইহাও বলা যায় যে "লক্ষণা" দ্বারা জাতি বাচক গো-শব্দ হইতে গো-ব্যক্তির জ্ঞান হয়। 'নীল ঘট'—এখানে নীল শব্দের অর্থ নীল বর্ণ হইলেও, "নীলবর্ণ বিশিষ্ট" এই অর্থ লক্ষণা দ্বারা বোধগম্য হয়।

'লক্ষণার' বিষয়ই লক্ষ্য। লক্ষণা দ্বিবিধ—কেবল ও লক্ষিত। শক্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধের নাম "কেবল লক্ষণা"। "গঙ্গা" শব্দের শক্যার্থ গঙ্গা নামক জল প্রবাহ। "গঙ্গায় ঘোষ" শব্দের অর্থ গঙ্গা তীরে গোপালক। এখানে গঙ্গা তীরের সঙ্গে গঙ্গার জল প্রবাহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বলিয়া এই লক্ষণা "কেবল লক্ষণা।" কিন্তু যেখানে শক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সাক্ষাৎ নহে, সেখানে যে লক্ষণা তাহার নাম "লক্ষিত লক্ষণা।" যেমন "দ্বিরেফ" শব্দে যখন ভ্রমর বুঝায়, তখন লক্ষিত লক্ষণা, "ভ্রমর" শব্দে দুইটি 'র' আছে বলিয়া ভ্রমরকে দ্বিরেফ বলে। এখানে ভ্রমরের সঙ্গে দ্বিরেফের সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে।

পদের অর্থের উপস্থিতি (স্মরণ—অব্যবহিত ভাবে) আসত্তি। আসত্তিই শব্দবোধের কারণ। অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হয়। পরস্পর অন্বয়-যোগ্য পদার্থের উপস্থিতি হইলে শব্দবোধ হয়, উপস্থিতি না হইলে হয় না। আবার অবান্তর (অন্তর্ভুক্ত) বাক্যগুলির অর্থবোধ হইতে মহাবাক্যের অর্থবোধ হয়।

অর্থবোধ উৎপাদন করিবার যোগ্যতার নাম তাৎপর্য্য



চিত্রতারকাদের লাবণ্যের মতই

আপনার লাবণ্য সুন্দর হয়ে উঠুক

মালা সিন্‌হা সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী। ওঁর সৌন্দর্য্যের গোপন কথাটি কি জানেন? মালা সিনহা বলেন—"আমি আমার ত্বক মসৃন ও সুন্দর রাখার জন্যে লাক্স টয়লেট সাবান প্রত্যহ ব্যবহার করি।" লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করলে আপনার ত্বকও সুন্দর হয়ে উঠবে। আজই লাক্স টয়লেট সাবান কিনুন।



বিশুদ্ধ, শুভ্র

লাক্স
টয়লেট সাবান

[illegible]কাদের
[illegible] সাবান



সুন্দরী মালা সিন্‌হা
কে এস ফিল্মের
"লুকোচুরী"
চিত্রের তারকা

…লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS. 381-X52 BG

—যদি সেই শব্দ বা বাক্য উদ্দিষ্ট বস্তু ভিন্ন অন্য প্রতীতির উৎপাদনের ইচ্ছায় উচ্চারিত না হয়। যে বাক্য যে প্রতীতি উৎপাদনের যোগ্য, তাহা যদি তদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রতীতি উৎপাদনের ইচ্ছায় উচ্চারিত না হয়, তাহা হইলে সেই বাক্য উদ্দিষ্ট বস্তুর সংসর্গপর। "সৈন্ধব" শব্দের অর্থ লবণ ও অশ্ব উভয়ই হয়। ভোজন কালে যখন বলা হয় "সৈন্ধবমানয়" তখন উদ্দিষ্ট বস্তু হইতেছে লবণ। এই উদ্দেশ্যে উক্ত বাক্য উচ্চারিত হয়, (অশ্ব যদি অর্থে নহে) তাহা হইলে উক্ত বাক্য লবণ—সংসর্গপর। প্রতীতি' উৎপাদনকারী তাৎপর্য্যই শাব্দ জ্ঞানের হেতু।

ন্যায় মতে ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়াই বেদ নিত্য। মীমাংসা মতে বেদ নিত্য বলিয়া মানবসুলভ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্র-লিপ্‌সা, ইন্দ্রিয়াপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) প্রভৃতি দোষ শূন্য সেই জন্য ইহার প্রামাণ্য। কিন্তু বেদান্তমতে বেদ নিত্য নহে। কেননা ইহার উৎপত্তি আছে। শ্রুতি-তেই আছে, ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ মহান্ পরমাত্মার নিঃশ্বাস। সুতরাং শ্রুতি দ্বারাই বেদের উৎপত্তি প্রমাণিত হয়। নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে বেদ তিন ক্ষণমাত্র-স্থায়ী। বেদান্ত তাহা স্বীকার করেন না। বেদ যদি তিনক্ষণমাত্র স্থায়ী হইত, তাহা হইলে যে বেদ দেবদত্ত পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন, তাহা তো লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমি এখন তাহা পাঠ করি কিরূপে? গ প্রভৃতি বর্ণও ক্ষণ স্থায়ী নহে—কেননা বহু পূর্ব্বে পাঠ্য গ-কারকে পরে আমরা গ-কার বলিয়া চিনিতে পারি। বর্ণাপদ ও বাক্য সকলের সমষ্টিস্বরূপ বেদ সৃষ্টিকালে উৎপন্ন ও প্রলয়ে বিনষ্ট হয়—আকাশ প্রভৃতির ন্যায়। সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে বর্ণ সকল অনবরত উৎপন্ন হইয়া তৎক্ষণেই বিনষ্ট হইতেছে বলিলে "গৌরব" হয়, অর্থাৎ বাড়াবাড়ি হয়। বর্ণ সকল যখন উচ্চারিত হয় না তখনও তাহারা বিদ্যমান থাকে, কেবল উচ্চারিত হয় না বলিয়া জ্ঞানগোচর হয় না। ধ্বনিদ্বারাই বর্ণ অভিব্যক্ত হয়। ধ্বনিরই উৎপত্তি হয়। বর্ণের নহে।

বেদ নিত্য না হইলেও পৌরুষেয় নহে। স্বজাতীয় কোনও উচ্চারণের অপেক্ষা না করিয়া যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা পৌরুষেয়। সৃষ্টিকালে ঈশ্বর পূর্ব্ব সৃষ্টিতে সিদ্ধ বেদেরই ঠিক সদৃশ বেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পৃথক কিছু করেন নাই। এইজন্য বেদ পৌরুষেয় নহে। মহাভারত প্রভৃতি পৌরুষেয়। কেননা তাহাদের উচ্চারণ তজ্জাতীয় কোনও উচ্চারণের অপেক্ষা করিয়া কৃত নহে।

বাস্তব

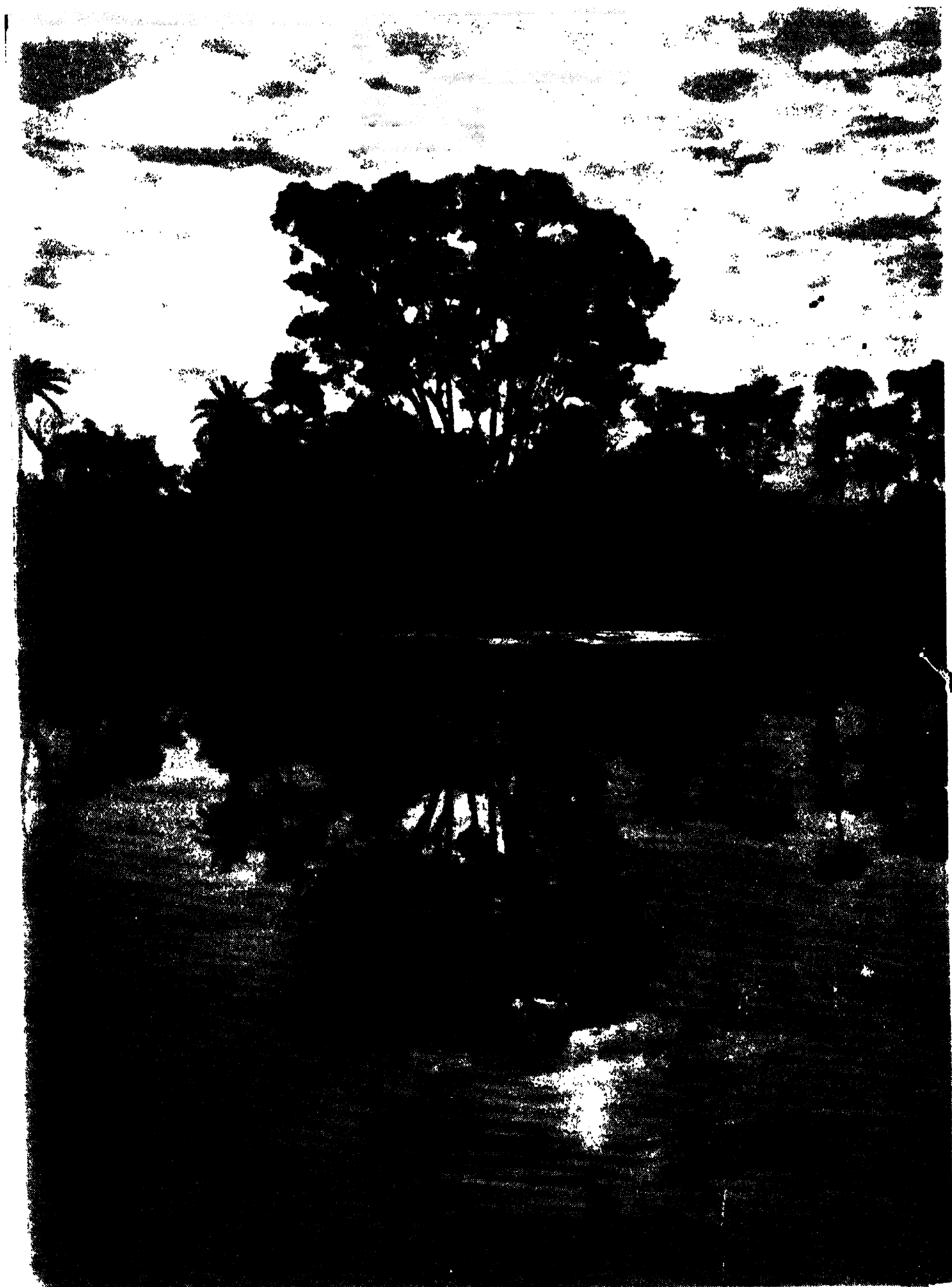
শ্রীঅমরনাথ গুপ্ত

অনাদরে ফিরে যাক্ বসন্ত এবার।
মুছে ফেলো আঁখিজল। ঝরে যাবে ফুল!
একাই জাগিয়া রবে নিদ হারা চাঁদ;
আমারে বলিতে দাও কোথা তব ভুল!

সুখ সে অনুভূতি দারিদ্র্য বাস্তব।
জগত জুড়িয়া তাই জাগে আর্তনাদ!
সময় সাগর পারে হতাশায় কাঁদি।
জীবন ভরিয়া উঠে তিক্ততার স্বাদ!

সুখের স্বপন আর কল্পনা যে হায়
লজ্জাকর ইতিহাস। তাই অলসতা
মনুষ্যত্বের মুখে কশাঘাত করি
মানুষেরে দেয় শুধু পশুত্বের ব্যথা।

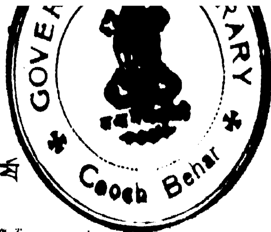
দিন রাত সারাক্ষণ নয় স্বপ্নময়।
কর্মের প্রেরণা দেয় অদৃশ্য ইংগিত
বেদনায় সে-ও আজ বোবা হয়ে গেছে
তাই আজ থেমে গেছে জীবন সংগীত!



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

প্রতিবিম্ব

ফটো : তুলসীদাস সিংহ



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ | প্রাকৃতিক | ফটো : রণেন্দ্রশেখর ঘোষ



জেনে রাখ

উপানন্দ

ফলের চাষের ইতিহাসে প্রাচীনতম স্থান অধিকার করে রয়েছে আঙুর। প্রায় ছয় হাজার বছরের ওপর ধরে এই রসালো উপাদেয় ফল মানুষের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে তৃপ্তি দিচ্ছে।

*   *   *

এতদিন জানা ছিল যে, অরিগার নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত এপ্সিলন নক্ষত্রটী সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম তারকা। সূর্য্যের অপেক্ষা এর ব্যাসার্দ্ধ তিন হাজার গুণ বেশী। কিন্তু এর দর্পচূর্ণ হয়ে গেল। সম্প্রতি হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জভুক্ত এল্ফাকে দেখে সে ধারণা বদলে গেছে। এই নক্ষত্রটী এপ্সিলনের চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ। সূর্য্যের ব্যাসার্দ্ধ অপেক্ষা এল্ফার ব্যাসার্দ্ধ দু' লক্ষগুণ বেশী। বলোতো, সোজা কথা! একখানি জেট প্লেনে চড়ে যদি এই তারকার নিরক্ষ বৃত্তাঞ্চলে (Equator) যাওয়া যায়, তা হোলে সেখানে পৌঁছুতে লাগবে আশী হাজার বছর। বর্ত্তমানে আমাদের সৌরমণ্ডলে হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের এ্যাল্ফা তারকাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলে সমাদৃত হয়েছে।

*   *   *

সূর্য্যগ্রহণের সম্ভাব্য চরম স্থিতিকাল হচ্ছে ৭ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তাঞ্চলে এটা মাত্র সম্ভব হোতে পারে। কিন্তু ৭১৭ খৃষ্টাব্দের পর ২০শে জুন ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে দেখা গেছে সূর্য্যগ্রহণের সব চেয়ে বেশীক্ষণ স্থিতি হয়েছিল ৭ মিনিট ৮ সেকেণ্ড।

*   *   *

দড়ির ওপর ঝুলে ঝুলে বেড়িয়ে যাঁরা পৃথিবীতে এযাবৎ নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় বলে স্থান পেয়েছেন জনৈক ফরাসী। এঁর নাম জাঁ ফ্রাঁকা গ্রেভলেট ('ব্লণ্ডিন' ১৮২৪-১৮৯৭) ১,১০০ ফিট দীর্ঘ তিন ইঞ্চি দড়ির ওপর দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে দুরন্ত নায়েগ্রা জলপ্রপাতের ১৮০ ফিট মাথার ওপর দিয়ে পার হয়েছিলেন।

*   *   *

একশো বছর আগে সাম্যবাদ বা কমিউনিজমের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্যে তাঁরা অনেক কল্পনা আর পরিকল্পনা করে অনেক কিছু লিখেছিলেন কিন্তু তাঁদের তত্ত্বের গোড়াতেই গলদ রয়ে গেছে। তাঁদের ধারণা ছিল জার্ম্মানী, গ্রেটব্রিটেন প্রভৃতি বৃহৎ শ্রমশিল্প অধ্যুষিত দেশগুলিতে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হবে। এই সব দেশের লোক হবে সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্ট। কিন্তু তাঁদের চিন্তাশক্তির দুর্ব্বলতা প্রমাণ করে দিল মহাকাল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক আন্দোলন ও বৈপ্লবিক চেতনার সুযোগ নিয়ে লেনিনকে এটা রুশজাতির ওপর প্রয়োগ করতে দেখা গেল।

*   *   *

১৯১২ সালে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে যে সন্ত্রাসবাদ দমনের আইন করে অপরাধীদের হত্যা করা হোতো রুশিয়াতে—সেই আইনই সোভিয়েট শাসিত হাঙ্গেরীতে বর্ত্তমানে তীব্রভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

*   *   *

পুঁথি পাত্তাড়ি নিয়ে শুধু পড়াশুনা করে পাস করলেই যে বিদ্বান হওয়া যায়, তা নয়—হাতে কলমে না শিখলে জ্ঞান হয় না, এই সত্য স্কাণ্ডিনেভিয়ানরা বুঝেছে। তাই ষ্টকহলমের কাছে একটি সুইডিস বিদ্যালয়ে পণ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এখানে কেনাবেচার মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা মুদির দোকানগুলিতে গিয়ে অঙ্ক শেখে, পোষ্টাফিসে গিয়ে ভূগোল শেখে, সুসজ্জিত ঘরের ভেতর গিয়ে শেখে গার্হস্থ্য বিদ্যা আর বিদ্যালয় সংলগ্ন কারখানায় গিয়ে শেখে যন্ত্রপাতির কাজ। ছেলেমেয়েরা মেকানিক্স শিখতে গিয়ে পায় প্রচুর আনন্দ। এই কারখানায় তারা মোটর ইঞ্জিন, বাইসাইকেল আর খেলনার আকারের বৈদ্যুতিক

ট্রেণগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৈয়ারী ও মেরামতি কাজে হাত দিয়ে যন্ত্রসভ্যতায় উৎকর্ষ লাভ করে।

* * *

উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে ক্রমশঃ তুষার ঘনীভূত হয়ে উঠছে—উত্তরোত্তর তুষারশীর্ষ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে অনেকেই চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। তুষারাচ্ছাদিত মেরু মহাদেশের ওপর সারা পৃথিবীর শতকরা নব্বই ভাগ বরফ জমে জমে গড় পড়্‌তায় দু'হাজার থেকে আটহাজার ফিট পুরু হয়ে উঠেছে। স্থান বিশেষে দশ হাজার ফিট পর্য্যন্তও পুরু দেখা যাচ্ছে। যদি এই সব বরফ গল্‌তে থাকে, তাহোলে সমুদ্রের জল ন্যূনপক্ষে ৫৮ ফিট উঁচু হয়ে উঠবে, শেষপর্য্যন্ত ৪০০ ফিট হয়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে সমুদ্রতীরবর্ত্তী অধিকাংশ বড় বড় বন্দরগুলি সমুদ্রগর্ভে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ক্যালিফোর্ণিয়ার অধ্যাপক রবার্ট পি সার্প বলেছেন, যারা সমুদ্রবর্ত্তী অঞ্চলে বাস করে তাদের মাথায় ঝুল্‌ছে ড্যামোক্লিসের খাঁড়া। অবশ্য এ বিপদ হঠাৎ আস্‌বে না, আস্‌তে অন্ততঃ লাগবে দশ থেকে বিশ হাজার বছর।

* * *

ভারতের প্রচলিত মুদ্রার সঙ্গে অন্যান্য দেশের মুদ্রার কত অংশ পার্থক্য নিয়ে দেখানো যাচ্ছে। ভারতের বাইরে গিয়ে টাকা ভাঙাতে গেলে যেরকম হিসেবে দর পাবে তা তোমাদের জেনে রাখা উচিত।

	দেশ	মুদ্রা	এক টাকার কত অংশ বিনিময় হার
১।	গ্রেটব্রিটেন	পাউণ্ড	০'০৮
২।	মার্কিণযুক্তরাষ্ট্র	ডলার	০'২১
৩।	ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক	৮৩'২০
৪।	অষ্ট্রেলিয়া	পাউণ্ড	০'১০
৫।	জার্ম্মানী	মার্ক	০'৮৮
৬।	ইটালী	লিরা	১৩১'২৮
৭।	জাপান	ইয়েন	৭৫'৫২
৮।	সিংহল	টাকা	১\

* * *

পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ জমি পতিত অবস্থায় রয়েছে। উপযুক্ত বৃষ্টি হয় না বলেই ঐসব অঞ্চলে কোন গাছপালা জন্মায় না। ফলে মানুষ বা অন্য কোন জীব জানোয়ার বাস করতে পারে না। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৬,৪০০,০০০,০০০ একর জমি অনুর্ব্বর অবস্থায় রয়েছে। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ জমির চাষ আবাদ হয়, এটা হচ্ছে তার আড়াইগুণ। এই পরিমাণ অনাবাদী জমিতে খাদ্যশস্যাদি উৎপন্ন করতে পারলে কোটি কোটি লোকের খাদ্য সমস্যার সমাধান হোতে পারে। আমাদের দেশে কয়েক লক্ষ একর জমি অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে। এসব জমিতে চাষ কর্‌বার দিকে কারও দৃষ্টি নেই, তাই এসেছে আমাদের অশেষ দুর্গতি। অন্নাভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, অভাব দূর কর্‌বার দিকে কারও লক্ষ্য নেই—কিছুকাল এই ভাবে চল্‌লে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে।

—

গড়গড়া গাঙ্গুলীর গল্প

বীরু চট্টোপাধ্যায়

সাত বছরের ঘণ্টে নামতা পড়ছিল, ছ-সাতে বিয়াল্লিস···ছ-আটে আটচল্লিস···ছনম্—

—চোপ! গাঙ্গুলীমশায় থামিয়ে দিলেন, তবে শোন একটা গল্প বলি।

আমরা সবাই বাগিয়ে বসলাম।

গাঙ্গুলী মশায় শুরু করলেন, এই 'ছনম্' নিয়ে আমার ছেলেবেলায় এক বিরাট কেলেঙ্কারী হয়েছিল।

আমাদের গাঙ্গুলী ডাই-নেস্টির কথা তোরা জানিস, আমরা শৌর্যে বীর্যে বুদ্ধিতে অর্থেতে সব দিক দিয়ে দিকপাল ছিলাম—একমাত্র আমাদের লেখাপড়াটাই কারুর বিশেষ এগোয়নি। এর কারণ অবশ্য আমাদের পূর্বপুরুষদের একজন লেখাপড়ায় ঝোঁক দিতে গিয়ে মারা যান। সেই থেকে আমাদের নিষেধ ছিল বেশী পড়াশোনার দিকে কাউকে যেন জোর না দেওয়া হয়। আমার ঠাকুদ্দা মশায় তো টিপসই দিয়েই কাজ চালিয়ে গেছেন।

জ্যাঠামশাই ও বাবা সই-সাবদটা করতে, পারতেন তবে গোণাগুণতির ব্যাপারে মানে অঙ্কের দিকে খুব একটা মাথা খেলান নি। ঐ আঙ্গুল গুণেই কাজ চালিয়ে নিতেন। নামতা ছ'য়ের ঘর অবধি শিখতেই হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন।

যখনকার কথা বলছি তখন আমার বয়েস দশ বছর হবে, প্রথম ভাগ ছাড়িয়েছি, যোগ বিয়োগ শেষ করে গুণ আরম্ভ করেছি। হাসছিস কেন? দশ বছরে প্রথম ভাগ ছাড়িয়েছি বলে? যা যা তোদের মত একরত্তি বয়সে বিদ্যের পাথরে মাথা ভারী করবার বান্দা আমরা ছিলাম না। যাই হোক একদিন হল কি, গুণ করতে গিয়ে আটকে গেল। ছনম্ কত হয় কিছুতেই মনে পড়লো না।

চলে এলাম বৈঠকখানা ঘরে। সেখানে বাবা আর জ্যাঠামশাই বসেছিলেন। ঢুকে জিগ্যেস করলাম, ছনম্ কত?

বাবা পাখীর পালক দিয়ে কাণে সুড়সুড়ি দিচ্ছিলেন।

সঙ্গের কথা শুনে বোধ হয় বিরক্তই হলেন। যেন কথাটা তার কাণে যায় নি এমনি ভাবে কাণে সুড়সুড়ি দিয়ে চললেন।

জ্যাঠামশায় সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল বিরাট। তিনি মহা বিদ্বান এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না—কেননা তিনি হাতে গুণে কাজ সারতেন না; আর রামায়ণ মহাভারত বানান করে করে হলেও পড়তে পারতেন। আরেকটা কারণ ছিল সমীহ করবার। জ্যাঠামশায়ের কোন ছেলেপুলে ছিল না, সম্পত্তির সে অংশটিও আমিই পাব, যদি তাঁর মন জুগিয়ে চলতে পারি—এ কথাটা মা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু আমি নয়, বাবা পর্যন্ত জ্যাঠামশায়কে সমীহ করে চলতেন। তার মুখের ওপর কোন কথা বলতেন না।

বাবা যখন আমার প্রশ্নে কাণ দিলেন না, আমি জ্যাঠামশায়ের দিকে চাইলাম। তিনি খড়কে দিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে মাংসের কুচি বের করছিলেন। জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন, ছনম্—ছাপ্পান্ন!

শুনে নিয়ে আমি যথানিয়মে অঙ্কটি করে ফেললাম। এই না হলে বিদ্যে—কেমন ঝট্ করে বলে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম বাবা কাণ থেকে পালকটা নামিয়ে রেখে বলে উঠলেন, ওটা বোধ করি চুয়ান্ন হবে!

—কি চুয়ান্ন হবে? জ্যাঠামশায় চোখ কটমট করে জিগ্যেস করলেন।

ঐ মানে, মানে ছনম্ আর কি। মিনমিনে কণ্ঠে বাবা বললেন।

আমি বাবার অজ্ঞানতা দেখে খুব লজ্জিত হলাম। জ্যাঠামশাই তেমনি গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, না ছাপ্পান্ন হবে।

—তা হলে কি নামতা পালটেছে বলতে চান?

—না। জ্যাঠামশায়ের মুখ তলো হাঁড়ির মত, চিরকাল ছাপ্পান্ন ছিল আজও ছাপ্পন্নই আছে। কেন না আমার স্পষ্ট মনে আছে সাত আট্টে ও যা ছয়নম্ও তাই—একই উত্তর। আমার কখনো ভুল হয় না।

অত বড় কথার পর বাবা কোন উত্তরই দিতে পারলেন না। চুপচাপ রইলেন। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তাঁর মন থেকে গেল না। ভালভাবে সে রাত্তিরে খেলেন না—ঘুমও বোধ করি ভাল হল না—কাক-ভোরে উঠে বাগানে পায়চারি করলেন—মুহুর্মুহু তামাক খেলেন—তারপর পুরো আঠাশ ঘণ্টা বাদে পরদিন যখন আবার জ্যাঠামশাই ও তিনি খড়কে দিয়ে দাঁত আর পালক দিয়ে কাণ খোঁচাচ্ছিলেন, বাবার কণ্ঠ শোনা গেল, ভাল কথা দাদা—কালকে যেন কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

হিটলারী পোজ্ নিয়ে জ্যাঠামশায় দাঁত খোঁচাচ্ছিলেন, জড়ানো গলায় বললেন, সেই নামতার বিষয়, ছনম্—ছাপ্পান্ন!

—না ওটা চুয়ান্নই হবে।

—কক্ষণো নয়, জ্যাঠামশায়ের চোখ অগ্নিসম জ্বলে উঠলো, ওটা ছাপ্পান্নই।

প্রমাদ গণলাম। এবার বুঝি সামান্য একটা নামতা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠালাঠি উপস্থিত হয়—গৃহযুদ্ধ বাধে। আর তার ফলাফল বড় সাঙ্ঘাতিক হবে—বিশেষ আমার পক্ষে—সম্পত্তি পাওয়ার আশা দয়ে মজবে। হায় হায় কী সর্বনাশই হবে।

জ্যাঠামশাইর চোখ সহসা সামান্য নিভে এলো, বললেন, শোন্ তা হলে—

বাবা বাধা দিয়ে বললেন, আপনিই আমার কথা শুনুন দাদা। আচ্ছা ছ আটে আটচল্লিশ এটা তো মান্‌বেন? তাহলে ছনম্—

—ছাপ্পান্ন!! যেন বজ্রধ্বনি হল জ্যাঠামশায়ের মুখ বিবর থেকে।

বাবা কি একটা প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঠোঁট নড়াই সার—পুনরায় জ্যাঠামশায় দাঁতের কাঠিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বললেন, ওসব বাজে তর্ক রাখো। সোজা কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। সাত আট্টে কত? ছাপ্পান্ন নয়? বেশ, তাহলে ঐ সাত থেকে এক কমিয়ে এনে সেটা ঐ আটের সঙ্গে যোগ দাও। এখন ছয় আর নয় হল কিনা বলো তবে?

বলে বিজয় গর্বে তিনি তার গোঁফ পাকাতে লাগলেন। বুঝলাম বাবা সম্পূর্ণ পরাজিত। সাধে কি জ্যাঠামশাইকে আমি মহাপণ্ডিত ভাবি।

কিন্তু বাবার গোঁ ছিল ভয়ানক। তিনি এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। বিকেলে একটা দেশলাই

খুলে তার কাঠিগুলোকে নটা নটা করে ছ-ভাবে সাজিয়ে গুণতে লাগলেন। কিন্তু কিছুদূর গোণবার পর, বিড়ি নিভে যাওয়ায় ধরাতে গিয়ে অজান্তে কখন যে এক একটা কাঠি ধরিয়ে ফেলে দিতে লাগলেন টের পেলেন না—তাতে এক একবার এক এক রকম উত্তর হতে লাগলো। ওতে কোন সুফল ফললো না। বিজ্ঞানে সুবিধে করতে না পেরে এবার ধর্মের সাহায্য নিলেন।

আমাদের কুল পুরোহিত সে সময় টিকি নাড়তে নাড়তে আর নস্যি টানতে টানতে এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। ভরসা হল এবারে যথার্থ উত্তর পাওয়া যাবে। পুরোহিত মশাই পণ্ডিত ব্যক্তি।

কিন্তু তাঁকে ছনম্ কত জিগ্যেস করতেই তাঁর টিকি নড়া স্তব্ধ হয়ে গেল—মুখ শুকিয়ে আমসিপনা হল, আমতা আমতা করে বললেন, অহম অঙ্কে চিরকালই কিঞ্চিত অপক্ক; তবুও চেষ্টাম করিষ্যামি।

মানে ঐ ধরণেরই কি একটা কথা সংস্কৃত বলে ছিলেন। তারপর ভাবতে ভাবতে গলদ্‌ঘর্ম হতে লাগলেন।

বাবার গোঁ বড় গোঁ। তিনি এবারে কাগজ এনে পেন্সিল দিয়ে ছটা করে দাড়ি ন-ভাগে দিলেন। তারপর অতি সন্তর্পণে এক দুই তিন করে গোণা আরম্ভ করলেন। কিন্তু বিধি ছিল বাম—একবার হল বাহান্ন, পরের বার হল পঞ্চান্ন।

কুল পুরোহিত মশাই গুণে দেখলেন একান্ন হয়, পরে চশমা পরে গোণাতে হল তিপান্ন।

—নাও নাও সবাই বিদ্যে দিগ্‌গজ, বলে জ্যাঠামশাই কাগজখানা টেনে নিয়ে মেঘমন্দ্রধ্বনি সহকারে গুণে গুণে শেষ করলেন পঞ্চান্ন—ছাপ্পান্ন।

চারিদিকে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। জ্যাঠামশাই যে দৃষ্টিতে চাইলেন, বাবা মাথা নিচু করলেন, কুল-পুরোহিত গুটি গুটি পায়ে সেথান থেকে পালালেন।

কিন্তু বাবার মাথায় যে কি ভূত চেপেছে। তিনি কিছুতেই হাল ছাড়লেন না। সারারাত ছটফট করলেন। তার মনোভাব এস্পার কি ওস্পার। জ্যাঠামশাইর সম্পত্তি বুঝি এই ঝগড়ার ঠ্যালায় আমার হাত ছাড়া হয়েই গেল। পরদিন সকালে বাবা আমায় বললেন, স্কুলের মাষ্টারের কাছে শুনে আসবি ছয়নম্ কত?

হায় হায় কি বিপদ। দুর্গা বলে স্কুলে গেলাম। শেষ হলে বাড়ী ফিরছি—পা আর চলছে না। হায় হায় কি বলবো গিয়ে। মাষ্টারও যে বাবার উত্তরই বললে। ছি ছি জ্যাঠামশাই এর সামনে একথা কি ভাবে বলবো। জ্যাঠামশাই পরাজিত হবেন—তিনি মূর্খ প্রমাণিত হবেন—ফলে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যাবেন, তারও ফলে আমায় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন—কী ত্রিশঙ্কু অবস্থায় না পড়লাম।

বাড়ী ঢুকতে না ঢুকতেই বাবা জিগ্যেস করলেন, কত হবে বললে মাষ্টার?

পাশেই দেখি বসে আছেন জ্যাঠামশাই। নির্বিকার-ভাবে দাঁতে কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছেন। সৌম্য ধীর স্থির মূর্তি। এখুনি আমি যদি সঠিক উত্তর বলি, তাঁর মাথা কি নীচুই না হয়ে যাবে।

নাঃ—মনে মনে স্থির করে ফেললাম। জ্যাঠামশাইকে বাঁচাতেই হবে। সম্পত্তি আগে। তারপর সত্য ভাষণ।

বাবা বললেন, চুপ করে রইলি যে। বল কত বলেছে মাষ্টার?

আমি নিষ্কম্প গলায় বললাম, ছাপ্পান্ন!!

এরপর জ্যাঠামশায়ের যে কণ্ঠ ও বাণী শুনলাম তাতে নিজের কাণকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না।

—তাহলে তোমার মাষ্টার একটি আস্ত গাধা, জ্যাঠামশায় বলে উঠলেন, তোমার বাবা যা বলেছেন সেটাই ঠিক। ছনম্ চুয়ান্নই হবে। আমি কাল রাত্তিরে এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি।

বলে গাঙ্গুলী দাদু গড়গড়া টানতে লাগলেন।

তরুণ আমায় কাণে কাণে বললে, আরেকটি বিদেশী গল্প।

আমি ফিস ফিস করে বললুম, কেন মানুষকে মিছে সন্দেহ করিস।

আজ এই শরতে

শ্রীপ্রভাতকুমার বসু

দূর ঘন-নীলাকাশে
বক-সাদা মেঘ ভাসে
ধীর গতি বায়,

কাশবন ওঠে দুলে
টলটলে নদী কূলে
ফুলে ভরা কায়।

টুপটাপ ঝরে তলে
শেফালিকা দলে দলে
ম্লান মুখখানি।
শিশিরেতে ভেজা পথে
এলো বুঝি চড়ে রথে
শরতের রাণী।

মাঠ বন সব আজ
ভরা কেন সবুজে?
কাক-চোখ দীঘিজল
বোঝে নাকো অবুঝে।

কাঁচা-সোনা-রোদ্দুর
চোখ যায় যদ্দুর
আজ এই শরতে—
হাসি-খুশী নব-সাজ
প্রাণে প্রাণ ভরা আজ
দেখি এই মরতে।

পাখীর পালক

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমরা তাঁকে পাখীদাদু বলে ডাকতাম। পাগ্‌লাটে ধরণের চেহারা ছিল তাঁর—সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াতেন পাখীর পালক সংগ্রহের কাজে। বয়সটা এমনি করে করেই বুড়িয়ে এলো—কিন্তু এই বিদ্‌ঘুটে নেশাটা ছাড়তে পারলেন না। নানা ধরণের পাখীর জানা-অজানা সমস্ত পালকই তিনি জোগাড় করেছেন—ঘর ছিল তাঁর পাখীর পালকে বোঝাই। কিন্তু সে ঘরে ঢুক্‌বার অধিকার দিতেন না তিনি কাউকেই। শুধু একবার অনেক ধরাধরির পর আমাকে ঢুকতে দিয়েছিলেন একদিন।

আমি সে ঘরে ঢুকে বিভ্রান্ত হোয়ে গিয়েছিলাম—অবাক হোয়ে গিয়েছিলাম, পাখীর পালক দেখে আমার মনে এ'কথাটাই বারংবার উঁকি মারছিল যে আমি কি কোনো আদিমযুগের পাখীর রাজ্যে প্রবেশ করেছি—আমি এক অচিনপুরের রাজপুত্র, আর ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে পাখাদাদু উনি হচ্ছেন এ'রাজ্যের যাদুকর—আমাকে এ'রাজ্যে প্রবেশের অধিকার দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। আমাকে রাজপুত্রের সম্মানে ভূষিত ক'রেছেন। কত বিচিত্র রকমের পাখীর পালক: সমস্ত গুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। লাল-নীল-হল্‌দে-কালো-ধূসর-সাদা-সোনালী-রুপালী শতশত রঙের শতশত ধরণের পাখার পালক। পাখীদাদু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন—সে হাসিতে ছিল আনন্দমিশ্রিত গর্বের আভাস। অবাক পৃথিবী—অবাক করলে তুমি। এতো বিচিত্র ধরণের পাখী আছে এ' পৃথিবীতে। সমস্ত পৃথিবীর পাখীর পালক জোগাড় করেছেন তিনি—সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন, লাখ লাখ টাকা খরচ করেছেন। এ' এক বিচিত্র খেয়াল—পাগল আর বলে কাকে—বাবার অগাধ সম্পত্তি এই এক খেয়ালের পিছনে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। তবু ক্ষান্ত হবার মতো পাখীদাদুর নিরুৎসাহ দেখতে পাচ্ছি না—তার দেহের দিক হতে বা মনের দিক হোতে।

'কি রে কি দেখ্‌ছিস্‌ অবাক হোয়ে যাচ্ছিস্‌ তো—এটার দাম কত জানিস্‌—Bird of Paradise। এর পালক জীবন দিয়ে কিন্‌তে হয়েছে আমাকে—এ' পালক মেলাই দুষ্কর। আমেরিকার আমাজন নদীর তীরে এ' পাখা পাওয়া যায়—ওখানে গেলে কেউ আর জীবিত অবস্থায় ফিরতে পারেনা—ওখানকার লোকগুলো মানুষ ধরে খায় বুঝেছিস্‌?'

'তাহলে আপনি পেলেন কি করে?'

আমি জিজ্ঞাসা করি। বালকসুলভ মন, নানা রহস্যের চাবিকাঠি জানতে ইচ্ছা করি। পাখাদাদু আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। তারপর মুচ্‌কী হেসে বল্‌তে সুরু করেন আমাকে—পাখীর পালকটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে।—অদ্ভুত পালক—অতি অদ্ভুত তার রং-জৌলুস্‌! স্বর্গের পাখী মর্ত্তে এসেছে—হবে নাই বা কেন?

"তবে বোস্—যে গল্প কাউকে কোনদিনও বলিনি—আজ তোকে সে কাহিনী বল্‌বো। পাখীর পালকের গল্প—আমাজন নদীর তীরের কাহিনী শুনে তুই রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌বি।"

পাখী-দাদু ঘরের মাঝে পাখার পালকে ঢাকা চেয়ারে বসলেন এবং আমাকেও আর একটাতে বসালেন। সন্ধ্যা হোয়ে এসেছে। নিজেই একটা আলো জেলে আন্‌লেন তার শয়ন ঘর থেকে—চাকর গোবিন্দ ছিল, কিন্তু তাকে ঢুক্‌তে দেবেন না তিনি এ-ঘরে; তাই নিজেই আনলেন তিনি আলো জেলে। আলোয় সারা ঘরখানা যেন ঝিল্‌মিল করে উঠ্‌লো—বিদ্যুৎ জ্বলে উঠলো—পাখীর পালকের আভায় চমকে উঠলাম আমি। মৃত পাখীদের আত্মাগুলো যেন মুক্তির আলোয় একবার সকলে মিলে চমকিত হোয়ে চোখ পিট পিট করে তাকালো আমার দিকে—আমি আগন্তুক কিনা তাই!

বাইরে আঁধার ঘনিয়ে আসছে ক্রমশই—ঘরের ভেতর আমরা দুটী প্রাণী। পাখীদাদু আর আমি। রাজপুত্র আর যাদুকর—পাখীর রাজত্বে এসে প্রবেশ করেছি! পাখীদাদু গল্প বল্‌তে করলেন সুরু—আমাজন নদীর কাহিনী—সত্যময় তার জীবনের এক অভিযানের অধ্যায়।

আমাজন নদীর তীর ধরে আমি আর আমার বন্ধু ব্রাউন এগুতে লাগলাম। স্বর্গীয় পাখা-পালক এখানেই পাওয়া যায়। নেশা আমার চেপে বসলো—যেমন করেই পারি এ' পাখার সোনালী পালক আমার চাইই চাই। তাই বন জংগল পার হোয়ে ছুটতে লাগলাম আরো আরো ঘন জংগলের ভেতর। আমাজন নদীর দু'তীরে তখন সবে সকাল নেমেছে—গভীর জংগলে তার কিন্তু প্রবেশাধিকার নেই। আমার বন্ধু ব্রাউন জানতো এ' আমাজনের ভীষণতা কোনখানে লুকিয়ে আছে—তবে আমাদের হাতে বন্দুক ছিল তাই আর কোনো ভয় বা ভাবনা না করে এগিয়ে যেতে লাগলাম। পাখীর পালক আমার দরকার। ও'পাখীর পালক সংগ্রহ করতে যদি জীবন যায় তাও স্বীকার। চারিদিকে ভীষণ আঁধার ভালুক-হায়নার চিৎকারধ্বনি শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। ব্রাউন খুব সাহসী—অমিতবিক্রম! পাখীর পালকের নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে। হঠাৎ ব্রাউন উৎফুল্লভাবে চিৎকার করে উঠলো:—

'দেখো! দেখো! কি চমৎকার পাখী—ওই তো Bird of Paradise স্বর্গীয় পাখী—ওরই পালক তোমাকে জোগাড় করে দেবো বলেই তোমাকে এনেছি এই গভীর জংগলে।'

আমি দেখলাম। সত্যিই চমৎকার পাখী একটা গাছের ওপর বসে আছে।

"ওরই পালক আমার চাই ব্রাউন! তুমি আমাকে দাও—ধরে দাও ওই পাখীটা আমাকে—আমার জীবনের বিনিময়ে আমি চাই ওই পাখীর পালক!"

হঠাৎ ব্রাউনের বন্দুক গর্জন করে উঠলো—আমার কোলের কাছে এসে পড়লো সেই স্বর্গীয় পাখীটা এক লহমায়! আমি ততক্ষণে মহামূল্য সম্পদের মতো সেই পাখীটাকে আমার পিঠে-ঝোলানো থলির মাঝে পুরে ফেলেছি। আনন্দে সারা শরীরটা আমার তখন কাঁপছে—অমূল্য সম্পদ আমি লাভ করেছি আমার বন্ধু ব্রাউনের জন্যেই!

"ধন্যবাদ—ধন্যবাদ তোমাকে ব্রাউন—অজস্র ধন্যবাদ।"

আমার হাতখানা ব্রাউনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম তার করমর্দন করার জন্যে। কিন্তু কই? ব্রাউন কোথা? তাকে আমার চারিপাশে কোথাও দেখতে পেলাম না! আমার বন্ধু ব্রাউন কোথায় লুকালো—তবে কি ব্রাউন আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে আমাকে একলা রেখে তামাসা দেখছে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে?

"ব্রাউন! ব্রাউন! কোথায় তুমি? ব্রাউন সাড়া দাও ভাই! মিছেমিছি লুকিয়ে থেকো না! ব্রাউন—ব্রাউন!"

আমার চিৎকার সারা বনভূমিতে প্রতিধ্বনি তুল্‌লো। কিন্তু ব্রাউনের সাড়া পেলাম না কোনোখান থেকেই। আশ্চর্য্য! অতিশয় অবাক্ হলাম আমি। কিন্তু আশ্চর্য্য হবার তখনো অনেক-অনেক বাকি ছিল আমার!

একটু পরে ব্রাউনের বন্দুকটা আমার পায়ের কাছে এসে পড়লো—বন্দুকটা আমি তার কুড়িয়ে নিলাম। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে আমার চক্ষু ছানাবড়া হোয়ে উঠলো—সারা দেহখানা আমার কে যেন বরফ দিয়ে ঢেকে দিয়ে গেল।

বিরাট একটা ওক গাছের ওপর আমার বন্ধু ব্রাউন একটা ততোধিক বিরাট অজগরের মুখ গহ্বরে। অজগরটা ব্রাউনের মুখের দিক থেকে গিলতে আরম্ভ করেছে। পা দুটো ঝুলছে শুধু আমার বন্ধুর!

পর পর বন্দুকের গুলির সব কয়টাই ফায়ার করলাম—অজগরের দেহ সে গুলি বিদ্ধ করতে পারলো না!

একটু পরে বন্ধু ব্রাউনের শেষ চিহ্ন মিলিয়ে গেল অজগরের পেটে—বিদায় ব্রাউন—বিদায়!

আমি হতবাক্ হতভম্ব হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ—তারপর স্বর্গীয়পাখীর পালকগুলোকে ছিঁড়তে লাগলাম পাগলের মতো—চোখে আমার জলের ধারা। এ' পালকে সে জলের দাগ আজো তুই দেখতে পাবি!

—

শরতের হাসি

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

এমন ক'রে সবাই যে আজ
হাসছে কেন, কে জানে!
সবার মুখে জোগায় হাসি
এমন উৎস কোন্‌খানে?
ভাই-বোনেরা খেলে বেড়ায়
এ-ওর ধরে হাত,
আজকে তো আর নেই এ' বাধা
'নেইক' কোন জাত!
ঠাক্‌মা হাসেন ফোক্‌লা দাঁতে
ঠাকুরদাদাও তাই,
এমন হাসি হাসছেন আজ
তুলনা তার নাই।
মৌমাছিরা উড়ছে যে আজ
চার দিকেতে ছেয়ে,
মনের সুখে বেড়ায় উড়ে
ফুলের মধু খেয়ে।

রাতের বেলায় শিউলি ফুটে
বাড়ি আমোদ করে,
সকাল বেলায় উঠে দেখি
হাসছে নিচেয় পড়ে।
চারি দিকেই শুনছি যে আজ
আনন্দেরই গান,
হাসি-খুশি ভরা দেখি
আজকে সবার প্রাণ।

——



কা-কা

পরিতোষ মুখোপাধ্যায়

কা-কা। আ-হা, মরে যাই আর কি। একেবারে কোকিলকণ্ঠ! কোকিলকণ্ঠ বৈ কি। কাকের ইতিহাস তো জান না। তাই অমন বলতে পারলে তুমি। তবে শুনে রাখ গল্পটা, যদি ধর্মে নেয় তো অমনটি আর বলো না।

বেগমদের হারেমে, বেদানার মত গায়ের রং, থাকতো একটা পাখী। দাঁড়ে দোল খেত। বেগম-বিবিরা কাজের ফাঁকে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসত, ঘোট পাকিয়ে। পাখী গাইতো। কী মিষ্টি গান! তখন কোকিলের জন্মই হয়নি। তুমি বলছ কোকিলকণ্ঠী, বুঝেছি বাঁকা কথা কইছ; কিন্তু বলি শোন—কোকিলের থেকেও অনে-ক বেশী মিষ্টি ছিল এই পাখীর গলা।

কে ওই পাখীটা? কা-কা করে ঘুম তাড়ানো, নেশা ভাঙানো ডাক হাঁকছে যে বিতিকিচ্ছিরি কাকটা, সেই কাকই হল ওই পাখী। তাহলে!

সে কাকের আজ এমন দশা হল কেন?

বাদশার একশো বেগম। জলতরংগের মত মিষ্টি ছন্দে দিন বয়ে যায় তাঁর। কিন্তু দুঃখ—একটা কাঁটার মত বিঁধছে তাঁর বুকে—একটা শিশু এল না ঘরে। সব কিছু আনন্দের মুখে যেন ছাই চাপা পড়ল।

অনেক সাধু সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো পড়ল বাড়ীতে। অনেক তাগা তাবিজ গায়ে চাপল বেগমদের। কত গাছের বাকল, শিকড়—কিছুতে কিচ্ছু না। সে এল না—যে কাঁদবে, যে হাসবে।

রাজপুরী কেঁদে উঠে দিনে দুপুরে—রাতবিরেতে, দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠা ভয়ার্ত কুকুরের মত।

এমনিই যখন অবস্থা, সেই সময় একদিন গ্রামে গ্রামে খবর রটে গেল: ছোট বিবির সন্তান হবে।

দিন যায়, মাস যায়। দুঃখ যায়, সুখ আসে। সাত রাজার ধন এক মাণিক ঘর আলো করে দিলে। রাজ্যে ধুম ধাম। উৎসবের ঢেউ বইল নগরে গ্রামে কুটিরে।

শীত সকালের নরম রোদ্দুরে এক মাসের দুধের বাচ্চাটা হাত পা ছুঁড়ে খেলছিল। কী সুন্দর চেহারা, টলটলে দুটো চোখ। হাজার হলেও রাজপুত্তুর তো, দেবশিশুর মতই দেখতে হয়েছে ওকে।

দাঁড়ের পাখী গায়, আর দেখে চেয়ে-চেয়ে। দেখতে দেখতে—কী আর বলব, সাধুর মনও বিপথে যায়। আর ওতো কোন ছার! গান থামিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাক করল ওই পাখীটা। তারপর যখন কেউ কোথাও নেই, বুড়ী আয়াটাও গেছে জলসিঁড়ি গাঙে নাইতে—সেই ফাঁকে এক ছোঁ মেরে কচি খোকার একটা চোখ উপড়ে নিলে পাখীটা। ওয়াঁও—ওয়াঁও—ওয়াঁও: কী কান্না রাজপুত্তুরের।

ছোট রাণী এসে দেখে সব্বোনাশ। প্রথমেই এর সন্দেহ হল পাখাটাকে কিন্তু—পাখীটা তো অমন নয়। কেঁদে ফেললে রাণী।

এরই মাঝে ফিরে এল বুড়ী আয়াটা। সে তো ঠায় বসে পড়ল মেঝেয়। এদিক-ওদিক ভিজে চোখে দেখতে দেখতে এক সময় ও চেঁচিয়ে উঠল: রাণী মা, এ ওই কাকের কর্ম্ম। দেখুন ওর চোখ দুটো কেমন টলটল করছে।

বেদানা রং—কাকের কালো চোখ টলটল করছে। তাইতো আমরা বলি কাকচক্ষু।

রাণী কেঁদে কেঁদে বললে: হায় কি হল আমার, খোকার টলটলে চোখটা তুলে নিয়েচে পাখাটা।

ওই টলটলে চোখ খেয়েছে বলেই তো কাকের চোখ দুটো অমন হয়েছে।

জলতরংগ থামল। দুঃখ আর বিষাদের ছায়া মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল রাজবাড়ী। বাদশার মনে শান্তি নেই। বেগমদের চোখের জল থামে না।

এই যে বাদশা—উনি ছিলেন খুব দানশীল। ওঁর কথা স্বর্গের দেবতারাও স্মরণ করতেন। এমন একজন দানশীল রাজার এই করুণ অবস্থার কথা শুনে দেবরাজ স্বয়ং একদিন এসে হাজির রাজসভায়।—এত বিমর্ষ কেন, বাদশা? বাদশা খুলে বললেন ঘটনা।—শুনে দেবরাজের পা কাঁপতে লাগলো রাগে। তিনি অভিশাপ দিলেন: আজ থেকে তোর গলার শব্দে কুকুর পালাবে, আর গায়ের রং হবে আগুনে পোড়া মাটির হাঁড়ির মত।

অভিশাপ ফলল। কাক বুঝতে পারল তার ভুল। কিন্তু ইন্দ্রের কথা তো আর ফেরানো যায় না! সেই থেকে কাক ডাকে: কা-কা, মানে আ-হা! কী অনুশোচনার কান্না বলতো। কাকের নিজেরই কি মনে শান্তি আছে?



জোলিও কুরী

সলিল বসু

একি রহস্য, একি কি বিস্ময়, আনন্দ রোমাঞ্চ বিজড়িত একি অনির্বচনীয় অনুভূতি। আসতে না চাওয়া ঘুমও শেষরাতে অজান্তে এসে প'ড়েছিল, তাই ভোরে বেশ কিছু দেরীতেই ঘুম ভাঙ্গল ইরিনের। মাথার কাছের জানালার একটা পাল্লা খুলে দিল, ঢুকে প'ড়ল' কিছুটা রোদ। ছোট্ট রোদ, মিষ্টি রোদ, হাল্কা রোদ। জানালার ধারের পপলার শাখার পাতাগুলো সেইন নদীর জলে ভেজা বাতাসে দোল খেয়ে চঞ্চল, দূরের আকাশে ঝলমল করে আইফেল টাওয়ারের চূড়ো।



ফ্রেদারিক জোলিও-কুরী।



ইরিন জোলিও-কুরী।

১৯২৫ সালের প্যারিসের একটা সুন্দর সকাল। ইরিন এসে ঢুকল রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটে তার মা মাদাম কুরীর ঘরে। মাদাম কুরী তখন কতকগুলো নতুন জার্ণালের মধ্যে ডুবে ব'সে ছিলেন।

"আচ্ছা মা, রেডিয়াম আইসোটোপের বইটা কোথায়?"

"ঐ ত, ওপাশের আলমারিটায়" মাদাম কুরী আবার কাজে মন দিলেন। ইরিন কিন্তু আশেপাশেই ঘোরাফেরা ক'রতে লাগল'। হঠাৎ মাদাম কুরী ইরিনকে ঘুরতে দেখে প্রশ্ন করেন, "কিরে! বইটা পাস নি?"

"হ্যাঁ, এই ত'। এই দেখ, তোমার সঙ্গে একটা··· হ্যাঁ···একটা···"

"কিরে! কি ব'লবি বল না"

"আচ্ছা মা, তোমার ফ্রেদারিককে কেমন লাগে?"··· মানে···"

"ফ্রেদারিক!" মাদাম কুরীর চোখের সামনে ভেসে উঠে পঁচিশ বছরের এক প্রতিভাদীপ্ত যুবকের প্রাণচঞ্চল মুখ, "তা' ভালই ত', বেশ ছেলে।"

"হ্যাঁ, বেশ ছেলে, তাইত' বেশ ছেলে। তাইত', বেশ, না, বেশ···হ্যাঁ···মানে···না···ঠিক তা'···মানে·"

মাদাম কুরী এবার পরিপূর্ণ মুখতুলে তাকালেন তাঁর

মেয়ের দিকে, আটাশ বছরের উদ্ভিন্নযৌবনা ইরিন ; কান-ছোঁয়া দুই চোখে জলজ্বলে বড় বড় তারা।

* * *

সেই ফ্রেদারিক—পূর্ণ নাম জঁা ফ্রেদারিক জোলিও।

১৯০০ সালের ১৯শে মার্চ উত্তর ফ্রান্সের এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। আর্থিক দৈন্য স্বভাবতঃই রাজনীতি পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক, তাই ছোটবেলা থেকেই ফ্রেদারিক জোলিওর উপর রাজনৈতিক প্রভাব বেশ কিছু প'ড়েছিল। তা' ছাড়া ফ্রেদারিকের বাবা ছিলেন ১৮৭১ সালের ফ্রান্সের শ্রমিক বিপ্লবের একজন বিশেষ পাণ্ডা। এই সব মিলিয়ে ফ্রেদারিকের ছোট বেলায় লেখাপড়ায় যথেষ্ট বাধাবিপত্তি সৃষ্টি হ'য়েছে। লাক্সেমবার্গের আরাবড ইস্পাত কারখানায় কিছুদিন কাজ করে তিনি শেষ অবধি অধ্যাপক লঁ্যাগেভিঁ (Langevin) এর L' Ecole de Parisএর ছাত্র হ'লেন। ছাত্রজীবনে তিনি বেশ ডানপিটে ছিলেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা, বিশেষতঃ পদার্থবিদ্যায় তাঁর ছিল অসাধারণ অনুরাগ। দূরদর্শী অধ্যাপক লঁ্যাগেভিঁ এই প্রাণচঞ্চল তরুণের চোখে দেখলেন এক অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। লঁ্যাগেভিঁর সঙ্গে প্যারিসের কুরী পরিবারের ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, কারণ বিজ্ঞানী পিরি কুরীর Piezo electricity গবেষণার সময় তিনি সহায়তা ক'রেছিলেন। এই সূত্রে পিরী কুরীর বিশ্ববিশ্রুতা স্ত্রী মাদাম কুরীর সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তাই ১৯২২ সালে ফ্রেদারিক যখন School of Industrial Physics and Chemistry থেকে গ্র্যাজুয়েট হলেন, তখন অধ্যাপক তরুণ যুবক ফ্রেদারিককে পাঠালেন মারী কুরীর কাছে। পিরী কুরী তখন বহুদিন হ'ল আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, কিন্তু মারী কুরী একাগ্রচিত্তে চালিয়ে চ'লেছেন তাঁর গবেষণা, দিনে দিনে সমৃদ্ধ ক'রে তুলছেন তাঁর Institute of Radium। সঙ্গে একনিষ্ঠ সহকারী হিসেবে পেয়েছেন অনেকের সঙ্গে তাঁর নিজের মেয়ে ইরিনকেও। ১৯২১ সালে ইরিন সোর্বোনের বিজ্ঞান সংস্থার (Science Faculty), সহকারী হ'য়ে গেলেন, আর তারপরই 'পোলোনিয়ামের আল্‌ফা কণা বিচ্ছুরণ' সম্বন্ধে একটা ভাল গবেষণাপত্র প্রকাশিত হ'ল। লঁ্যাগেভিঁর সুপারিশে ফ্রেদারিক জোলিও Institute of Radium গবেষণাগারে একজন Junior Assistant এর কাজ পেলেন। বিজ্ঞান অনুরাগী ছাত্র পেল তার মনের মত পরিবেশ—আর মাদাম কুরীর মত অসাধারণ প্রতিভাশালিনী শিক্ষিকা। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মাদাম কুরীর খুবই প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলেন। শোনা যায় মাদাম কুরী নাকি কি ব্যাপারে একবার জানতে পারেন যে কোন একটা বিশেষ পদের শিক্ষাগত গুণ ফ্রেদারিকের নেই, তবুও ফ্রেদারিক নাকি সেই কাজ ক'রছেন। তখনই তিনি ফ্রেদারিককে সেই কাজ থেকে বিরত হ'তে বলেন, আর সেই সঙ্গে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী জীবনে ফ্রেদারিক জোলিও কলেজ দ্য ফ্রান্স ও সোর্বোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন। রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটের থাকার সময়েই মাদাম কুরীর বিজ্ঞানী মেয়ে ইরিনের সঙ্গে তাঁর গবেষণাগত ও হৃদয়গত যোগাযোগ হয়।

১৯২৬ সালে ২৬ বছরের জঁ্যা ফ্রেদারিক জোলিওর সঙ্গে ২৯ বছর বয়সের ইরিন কুরীর বিয়ে হ'ল। ফ্রেদারিকের নতুন পরিচয় হ'ল জোলিও কুরী নামে, ফ্রান্সের তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী পরিবারের সঙ্গে তিনি একাকার হ'য়ে গেলেন।

তারপর চলল তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল যুগ্ম-গবেষণা জীবন। ১৯৩০ সালে 'ডক্টরেট' পেলেন রেডিও আইসোটোপের বিশেষ গবেষণায়। তখনকার পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞান গবেষণার প্রধান আকর্ষণ ছিল রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি থেকে বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয় রশ্মির ও পরমাণুর গঠন ভঙ্গিমা নিরূপণ। বোথে (Bothe) ও বেকার (Beeker) নামে দু'জন জার্মান বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছিলেন যে পোলোনিয়াম থেকে প্রাপ্ত আল্‌ফা-কণা দিয়ে যদি হাল্কাধাতু বেরিলিয়ামকে আঘাত করা যায়, তা' হ'লে একরকম বিশেষ ধরণের শক্তিশালী বিচ্ছুরণ পাওয়া যায়। ইরিন ও ফ্রেদারিক এই বিচ্ছুরণের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। তাঁরা লক্ষ্য ক'রলেন যে এই নতুন বিচ্ছুরণের কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই, আর প্যারাফিন ওয়াক্স জাতীয় হাইড্রোজেন সমন্বিত পদার্থের মধ্য দিয়ে যদি এটাকে চলাচল করান যায়, তা' হ'লে হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস খুবই গতি-সম্পন্ন হ'য়ে ছুটে যায়। এই মর্মে তাঁরা সুবিখ্যাত

Natur পত্রিকায় একটা পত্রও (paper) প্রকাশ করেন। এই পত্রটি পরমাণু বিজ্ঞানের মহারথী লর্ড রাদার-ফোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাদার-ফোর্ড বিজ্ঞানী স্যাড্উইক্‌কে এটার বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রতে বলেন। স্যাড্উইক্ এই গবেষণা থেকেই আবিষ্কার ক'রলেন নিউট্রন। এইসব গবেষণার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ফল হ'ল, পজিট্রন বা পজিটিভ অর্থাৎ ধনাত্মক ইলেকট্রণ কণিকার আবিষ্কার ১৯৩২ সালে। বিভিন্ন রকমের পরমাণু ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ ক'রে এই পজিট্রন। ইরিন ও ফ্রেদারিক জোলিও কুরী এইসব বিষয় নিয়ে জোর গবেষণা চালালেন। তাঁরা লক্ষ্য ক'রলেন, পোলোনিয়াম থেকে প্রাপ্ত আল্‌ফা-কণা যদি এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর উপর বর্ষণ করা যায় তা' হলে ধাতব পদার্থটি গা' থেকে পজিট্রন বিকীরণ হ'তে থাকে। শুধু তাই নয়, একবার বিকীরণ সুরু হওয়ার পর আল্‌ফা কণার উৎসটাকে সরিয়ে নিলেও বিকীরণ চ'লতে থাকে। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকীরণ থেকে যেমন ঋণাত্মক ইলেকট্রন পাওয়া যায়, পজিট্রন বিকীরণটাও কতকটা সেই রকম। এ' থেকে বোঝা গেল যে আল্‌ফা কণার সাহায্যে এ্যালু-মিনিয়ামকে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় ক'রে তোলা সম্ভব। এটা যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তাতে সন্দেহ নেই এবং এ' উপায়ে অনেক পদার্থকেই কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় ক'রে তোলা গেল'। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়া নিয়ে তার আগে পর্য্যন্ত যে সব গবেষণা হ'য়েছিল তা থেকে মনে হ'য়েছিল যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একটা আইসো-টোপকে তার একটা মৌলিক থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। কোন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ এমন একটা পদার্থ যার পরমাণু-ক্রমাঙ্ক মৌলিকটিরই পরমাণু-ক্রমাঙ্কের সমান, কিন্তু বিভিন্ন তাদের পরমাণু ভর (Atomic wt)।

জোলিও কুরীর আবিষ্কারের আগে মৌলান্তরীকৃত, (transmuted) পরমাণু নিউক্লিয়াসের রূপটাকে বোঝা খুবই আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের পর বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে একটা বেশ সহজ-সাধ্য উপায় পাওয়া গেল। এই আবিষ্কারের পর রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফার্মি অনেকগুলো মৌলিক পদার্থের মধ্যেই নিউট্রনের সাহায্যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা আনতে সক্ষম হ'লেন। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া আবিষ্কারের স্বীকৃতিতে ১৯৩৫ সালে ইরিন ও ফ্রেদারিক জোলিও কুরীকে রসায়নশাস্ত্রে 'নোবেল প্রাইজ' দেওয়া হ'ল।

বিজ্ঞান গবেষণার এই বিরাট সাফল্যে কিন্তু তরুণ-দম্পতি তাঁদের কর্মতৎপরতা হারালেন না। তাঁরা এই তেজস্ক্রিয়া নিয়ে গবেষণা চালালেন। সে সময়ে আমেরিকা ও ইউরোপের সমস্ত উন্নত গবেষণা মন্দিরেই এই সব নিয়ে জোর গবেষণা চ'লেছে। ফার্মি দেখালেন যে নিউট্রন কিন্তু প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ ইউরেনিয়ামের নিউ-ক্লিয়াসের মধ্যে প্রবেশ করে। আল্‌ফা কণা বিকীরণ ক'রেই সাধারণভাবে ইউরেনিয়ামের (৯২ ক্রমাঙ্ক) ক্ষয়ীভবন চ'লতে থাকে, কিন্তু নিউট্রন আত্মঘাতের পর এটা বিকীরণ করে একটা ইলেকট্রন। এর ফলে একটা পরমাণু ক্রমাঙ্ক যায় বেড়ে, ৯৩ ক্রমাঙ্কের একটা নতুন মৌলিক সৃষ্টি হয়। নতুন মৌলিকসৃষ্টি কিন্তু এইখানেই থেমে যায় না, তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ী-



কুরীদম্পতির সাধনাধন্য প্যারিসের রেডিয়াম্ ইনষ্টিটিউট্।

ভবনের ফলে জাত ৯৪, ৯৫ ও ৯৬ ক্রমাঙ্কের একটা বিশেষ নাম দেওয়া হ'য়েছে Trans Uranic element। ১৯৩৭ সালে বার্লিনের কাইজার উইলহেল্‌ম্ ইনষ্টিটিউটের কর্মাধ্যক্ষ অটো হান ও তাঁর সহকর্মীদ্বয় মাইৎনার ও স্ট্যাসমান এই মৌলিক পদার্থগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা সমতা খুঁজে পেলেন এবং এই গুলোকে তিনটে বিশেষ গোষ্ঠীতে সাজালেন। কিন্তু ইরিন ও ফ্রেদারিক জোলিওকুরী নিউট্রন বর্ষিত ইউরেনিয়াম থেকে এমন একটা মৌলিকের খোঁজ পেলেন যেটা ঐ বিশেষ শ্রেণীতে পড়ে না। তাঁরা যে শুধু নতুন পদার্থ পেলেন তাই নয়, তার সঙ্গে পেলেন একটা নতুন সক্রিয়তা। ১৯৩৯ সালে ৬ই জানুয়ারী হান্ ও স্টাসমান্ এই জাতীয় পরীক্ষা থেকে ইউরেনিয়াম পরমাণু নিউক্লিয়াসের বিভাজন সন্দেহ ক'রলেন। জানুয়ারী মাসে বিভিন্ন জায়গায় এই নিয়ে গবেষণা চ'লল। কোপেন হেগেনে বোর, ফ্রিশ ও মাইৎনার, বার্লিনে হান ও স্ট্রাসমান, আমেরিকায় ফার্মি ও অন্যান্য অনেকে। ১লা ফেব্রুয়ারী প্যারিসের Le Temps পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হ'ল French Academy of Science এর অধিবেশনে ইরিন ও ফ্রেদারিক জোলিওকুরী ইউরেনিয়াম বিভাজন গবেষণার ফলাফল ঘোষণা ক'রেছেন। ঐ দিনই লণ্ডনের Times পত্রিকায় আমেরিকার ও জার্মানীর সফল গবেষণার কথা প্রকাশিত হ'ল, আর সেদিন বিকেলেই ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে ইরিন ও ফ্রেডারিকের গবেষণার ফলাফল এসে পৌছল। আধুনিক বিজ্ঞানের তারপর এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় সূচনা হ'ল নিউট্রন বর্জিত ইউরেনিয়াম পরমাণুর 'চেন রিয়্যাকসন' আবিষ্কারে যা পরমাণুশক্তি প্রাপ্তির প্রধান উপায়ে। আধুনিক জগতের সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। বিরাট সাফল্যপূর্ণ পরমাণুশক্তি আহরণে অমর হ'য়ে রইলেন ইরিন ও ফ্রেদারিক জোলিওকুরী।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেঁধে উঠল, আর ১৯৪০ সালের প্রথমার্দ্ধেই ফ্রান্স জার্মানীর পদানত হ'ল। দেশের এই ঘোর দু'র্দিনে জোলিও কুরী নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকতে পারলেন না, সরাসরি ভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এই সময়ে তাঁকে কয়েকবার গ্রেপ্তার করা হয় ও অন্য লাঞ্ছনাও হয়। ১৯৪২ সালে তিনি সক্রিয়ভাবে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। প্যারিসের পতনের সময়ে যখন বিজ্ঞানী হালবন ও কাওয়ারস্কি বেশ কিছু 'ভারীজল' নামীয় পরমাণু গবেষণার এক অপরিহার্য সামগ্রী নিয়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে যান, তখন জোলিও কুরী তাঁদের খুবই সাহায্য করেন।

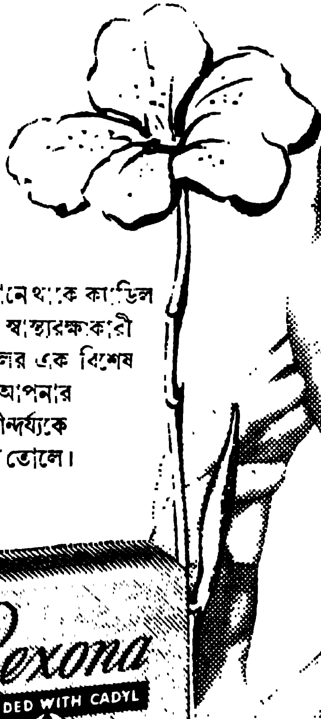
মহাযুদ্ধের শেষে ১৯৪৬ সালে ফ্রেদারিক জোলিও কুরী ফরাসী পরমাণু কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হ'ন এবং দীর্ঘ চার বছর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তারপর রাজনৈতিক কারণে তাঁকে সে পদ ছেড়ে দিতে হয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার বিশেষ আসন (chair) তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। জোলিও কুরী শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না, ছিলেন পৃথিবীর জনগণের এক দরদী সাথী। বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে যখন বিপন্ন-মানবতা ভীত, ত্রস্ত; তখন আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছেন রাজনৈতিক দুঃশাসনদের দুরভিসন্ধি দূর করার। তিনি প্রকাশ ক'রতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের মানবিক রূপ, মানবের কল্যাণেই বিজ্ঞান, আর সেখানেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। বিশ্ব-বিজ্ঞানকর্মীসংস্থা ও বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতি পদ তিনি বহুদিন অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন। ১৯৫১ সালে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ তাঁকে Stalin Peace Prize পুরস্কার দেন।

আজ হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। এক দেশের বিজ্ঞানী সমাজ গবেষণা ক'রেছে এমন মারণাস্ত্রের জন্য, যে মারণাস্ত্র সহজে আর এক দেশকে ধ্বংস ক'রতে পারে, পরাজিত ক'রতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারায় উত্তরকূটের যন্ত্র-বিশারদ বিভূতি ব'লেছে—তার শক্তি আছে বাঁধ বাঁধবার, 'শিবতরাইএ'র কার ভুট্টারক্ষেত শুখিয়ে গেল', তাতে তার কী আসে যায়? কিন্তু উত্তর কূটের অভিজিৎকে ঠেকানো যায় নি, সে বাঁধ ভেঙ্গেছে, শিবতরাইএর ক্ষেত সিঞ্চিত হ'য়েছে। জোলিও কুরীও ছিলেন এই নব্যবিশ্বের মানবহিতকামী অভিজিতের পথিকৃৎ।

১৯৫৬ সালে তাঁর জীবন-সাথী ইরিন লিউক্যামিয়ায় পরলোকগমন করেন। গত ১৪ই আগষ্ট, ১৯৫৮ তারিখে তেজস্ক্রিয়াজনিত রক্তক্ষরণের ফলে অবিস্মরণীয় ফ্রেদারিক জোলিও কুরীর জীবনাবসান হয়। আজ সেই বিরাট মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা জানাই তাঁরই দেশের এক প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রীর ভাষায়, "আমরা আমাদের শিক্ষা বাজেটের বরাদ্দ দ্বিগুণ ক'রে দিতে পারি, যদি প্রতি একশ' বছরেও একজন ক'রে জোলিও আমরা পাই।" বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহিমার তাঁকে আখ্যা দিয়েছেন—শ্রেষ্ঠ 'বিজ্ঞানী মানব' বলে। কবিগুরুর ভাষায় আমরা বলি, "এনেছিলে সাথে ক'রে মৃত্যুহীন প্রাণ; মরণে তাহাই তুমি ক'রে গেলে দান।"



আপনার লাবণ্য **রেক্সোনা**
ব্যবহারে ফুটে উঠবে



রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাডিল
অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ
সংমিশ্রণ যা আপনার
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে
বিকশিত করে তোলে।



একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

RP·151·X52BG

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিমিটেড এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

জামাইবাবু

(একাঙ্কিকা)

নরেন্দ্রদেব

পাত্র	পাত্রী
শ্বশুর	শাশুড়ী
জামাই	শালী
শালা	শালাজ
চাপরাশী	মেয়ে
প্রতিবেশী	আয়া

স্থান : শ্বশুরবাড়ী। দৃশ্য : শ্বশুরের লেখাপড়ার ঘর। সময় : সন্ধ্যা নির্দেশ : ঘরখানি সুসজ্জিত। একখানি সেক্রেটেরিয়েট টেবিলে বসে শ্বশুর নিবিষ্ট মনে পত্র লিখছেন। টেবিলের উপর একটি দামী টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল। চিঠিখানি জরুরী। শ্বশুর লিখছেন আর ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছেন। মানুষটি আধাবয়সী। চেহারা দেখে রাশভারী বলে মনে হয়। টেবিলের একধারে একটা হাল-ফ্যাশানের রিভলভিং বুক-কেস, আর একদিকে স্টীলের তৈরী কার্ড-ইনডেক্স-ক্যাবিনেট একটা। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। টেবিলের একধারে সাদা ও কালো এক-জোড়া টেলিফোন রয়েছে। টেবিলের ওপর নানাবিধ ষ্টেশনারি সরঞ্জাম সাজানো। ঘরের কোণে একটি প্রমাণ আকারের আয়না দাঁড় করানো।

শ্বশুর দর্শকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে লিখছিলেন। তাঁর পিছন দিকে একটি খোলা জানালা। জানালার ধারেই ঘরের ভিতর দিকে একটি বড় চায়না ভাশে একটি ভাল পাতাবাহারী গাছ। শ্বশুরের ডাইনে বাঁয়ে ঘরে যাওয়া আসার দুটি দরজা। দরজায় দামী পরদা ঝুলচে।

শ্বশুর একমনে চিঠি লিখতে ব্যস্ত

এমন সময় দেখা গেল তাঁর পিঠের দিকের জানালা দিয়ে সেই প্রায় প্রদোষান্ধকারের মধ্যে একটি তরুণ যুবক অতি সন্তর্পণে এবং সন্দেহজনকভাবে উঁকিঝুঁকি মারছে। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় মাঝে মাঝে তার মুখ দেখা যাচ্ছিল। ছেলেটি সুদর্শন। দেখলেই বোঝা যায় ছোকরার লাজুক প্রকৃতি। ঘরের মধ্যে ঢুকতে ইতস্ততঃ ক'রছে। ঘরের দু'পাশের দুটি দরজা দিয়ে ঢুকলে একেবারে শ্বশুরের সামনে পড়ে যেতে হবে বলে, ছেলেটি কম্পাউণ্ড আর বাগানের ওধার দিয়ে ঘুরে পিছনের জানালাটিতে উঠে নিঃশব্দে উঁকি মারছিল।

উঁচু প্লিন্থের উপর বড় জানালা। গরাদ দেওয়া নেই। ছেলেটি বাইরে থেকে সেই জানালার ধারিতে কোনও রকমে উঠে ঘরের ভিতর চোরের মতো উঁকি মেরে দেখছিল এবং জানালা টপকে নিঃশব্দে চুপিসাড়ে ঘরের মধ্যে নেমে পড়া যায় কিনা তারই চেষ্টা করছিল। দু'তিনবার জানালা টপকে ঘরে ঢোকার চেষ্টার পর শেষে একবার ঝুপ করে জানালা ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে সে লাফিয়ে পড়লো। কিন্তু, তার এ অভিযান নিঃশব্দে সম্পন্ন হলনা। দুর্ভাগ্যক্রমে লাফ দিয়ে ঘরে এসে পড়বার সময় তার পা এসে পড়লো সেই দামী পাতাবাহারী গাছসমেত বড় চায়না-ভাশে। ফ্লাওয়ারপটটি সশব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এবং ছেলেটিও পপাত ধরণীতলে।

শ্বশুর মশাই সে আওয়াজে একবার চমকে উঠলেন বটে, কিন্তু জরুরী চিঠি এখনি শেষ করে সন্ধ্যা ৬টার ডাকে ছাড়তে হবে বলে তিনি আর চিঠি লেখা বন্ধ করে পিছন ফিরে তাকালেন না। ছেলেটি তখন উঠে পড়ে পোষাক [illegible] সেই সদ্যভাঙা চায়নাভাশের দিকে চেয়ে দেখে, তারপর বারদুই চোরের মতো শ্বশুরের দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখে হেঁট হ'য়ে ভাশের ভাঙা কাচের টুকরোগুলি কুড়িয়ে তুলতে শুরু করলে। ভাঙা টুকরোগুলো তুলে দু'হাতে জড় করে নিয়ে সেই হেঁট হওয়া অবস্থাতেই শ্বশুরের পিঠের দিকে সাবধানে দু'একপা এগিয়ে এসে পিছন থেকেই বলতে চেষ্টা করলে :—

জামাই : (অপরাধীর মতো জড়িত কুণ্ঠিত কণ্ঠে) নমস্কার!

শ্বশুর : (চিঠি লেখায় ব্যস্ত)

জামাই : নমস্কার সার! বড় অপরাধ করে ফেললুম।

শ্বশুর : (চিঠি লেখায় ব্যস্ত)

জামাই : খুবই লোকসান হ'য়ে গেল। এ রকম রেয়ার ওল্ড চায়না আর পাওয়া যায়না। আমারই দোষে এই ক্ষতি হয়ে গেল আপনার : আমাকে ক্ষমা করুন—

শ্বশুর : (চিঠি লেখায় ব্যস্ত। জবাব দিলেন না)

জামাই : (একটু উঁচু গলায়) আজ্ঞে···এই যে··· নমস্কার সার। শুনচেন? একটা বড় কু-কর্ম করে ফেলেছি—

শ্বশুর : (চিঠি লেখায় ব্যস্ত)

জামাই : (অসহায়ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে) নমস্কার সার!

শ্বশুর : (তখনও চিঠি লেখায় ব্যস্ত)

জামাই : (নিরুপায়ের মতো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিৎকার করে উঠলো) নমস্কার সার !

শ্বশুর : (তথৈবচ)

জামাই : (বিরক্ত হয়ে) শুনচেন ? একটা কাণ্ড করে বসে আছি—

শ্বশুর : (চমকে উঠে) গাধার মতো চেঁচাচ্ছে কে ? (চিঠিখানি লিখতে লাগলেন)

জামাই : (হতাশভাবে) ভদ্রলোক দেখছি একেবারে বদ্ধ কালা ! আগে জানলে আর ওঁর মেয়েকে বিয়ে করতুম না ? ওঁর কন্যাটি যদি এইরকম পিতৃপরায়ণা হ'তেন তাহ'লে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো ! দেখি আরও একটু চেঁচিয়ে ডাকি—বলি, শুনচেন ? বাবামশাই ! আমি এসেছি—আমি—

শ্বশুর : (চিঠি লিখতে লিখতে মুখ না তুলে) কে তুমি ?

জামাই : (এবার সাহস করে পিছন থেকে সামনে এগিয়ে এসে) এই যে—আমি। নমস্কার বাবামশাই ! আমি এসেছি—আপনার জামাই—

শ্বশুর ; (চিঠি লিখতে লিখতে বিরক্ত হয়ে) চোপরাও ! Shut up !

জামাই : (এই ধমকে চমকে উঠে তিনহাত পিছিয়ে আসতে গিয়ে চেয়ারে ঠোক্কর লেগে হোঁচট খেলে ! হাত থেকে চায়না-টব ভাঙা কাচের টুকরোগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝেয় ছড়িয়ে পড়লো।

শ্বশুর : (এবার আওয়াজে চমকে উঠে মুখ তুলে চেয়ে দেখে) আরে কে ও ? বাবাজী না ? কখন এলে তুমি ?

জামাই : (হাঁফ ছেড়ে) যাক্ বাবা : শশুর যোগ-নিদ্রা ভাঙলো এতক্ষণে ! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ ! আমি। অনেক্ষণ এসেছি। নমস্কার !

শ্বশুর : (অন্যমনস্কভাবে) কেন বলো তো ? ও ! আচ্ছা, আচ্ছা বেশ করেছো। একটু বসো বাবা ! পাঁচ-মিনিট। আমি এই চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। ভারি জরুরী চিঠি। এখনি ডাকে দিতে হবে। এই ছটায় মেলটায় যেমন করে হোক এ চিঠি আমাকে 'এক্সপ্রেস' ডেলি ভারিতে পাঠাতেই হবে···(চিঠি লিখতে বসলেন)

জামাই : (টেবিলের ধারে গিয়ে বিজ্ঞের মতো) ওঃ ! তাই বলুন ! আচ্ছা ঠিক আছে। (হাতঘড়ি দেখে) আমাকে দিন চিঠিখানা। আমি একেবারে জি, পি, ও, নানা ইজি-পি-ও, বা কেন ? সোজা হাওড়া স্টেশন একেবারে 'আর, এম, এস' এ গিয়ে পোষ্ট করে আসছি। দিন—

শ্বশুর : (বিরক্ত হয়ে) চিঠিখানা শেষ করতে দাও আগে—তবে তো গিয়ে পোষ্ট করবে—

জামাই : আজ্ঞে হ্যাঁ সার ! সে তো একশো বার। (হাতঘড়ি দেখে) কিন্তু, বলছিলুম কি—চিঠি শেষ করতে গেলে আর ৬টার মেল ধরা যাবে না······

শ্বশুর : (ব্যস্ত হয়ে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো ঠিকই ! এই যে ! চিঠি শেষ হয়ে এসেছে প্রায় ! ফাইন্যাল টার্মস্-গুলো লিখছি। আর এক মিনিট···

জামাই : (হাতঘড়ি দেখে) যে আজ্ঞে সার ! এক মিনিট কেন, আমি আপনার আদেশে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে পারি। কিন্তু, একটা কথা কি জানেন ? ঐ এক মিনিট সময়ই মাঝেমাঝে এতদীর্ঘ-এত লম্বা-মনে হয়—বিশেষ করে যখন—কোনো সভাসমিতিতে কোনও সদ্যস্বর্গগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সভাপতি মহাশয় সকলকে এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়াতে বলেন !··· স্তব্ধ তো হয় কতো ! ওঠবার সময় একবার দু'হাজার চেয়ার ঠেলা-ঠেলির আওয়াজ, আবার, বসবার সময় দু'হাজার চেয়ার টানাটানির আওয়াজ ! আর ঐ একটা মিনিট যেন কিছুতে কাটতে চায় না। অনেক সময় মনে হয় সভাপতি মহাশয়ের ঘড়ি হয় তো শ্লো যাচ্ছে, নয়ত বন্ধ হয়ে গেছে !

শ্বশুর : (চিঠি লিখতে লিখতে) একটু স্থির হয়ে অপেক্ষা করো···

জামাই : (উৎসাহিতভাবে) একটু কেন সার ? আমি আপনার চিঠি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যুগযুগান্ত ধরে অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ! কিন্তু, মুস্কিল কি জানেন ? (হাত ঘড়ি দেখে) ৬টার মেল তো কারুর জন্যে অপেক্ষা করবে না সার ? ঘণ্টা বাজলেই হুইসল দিয়ে ফ্ল্যাগ নেড়ে হুস্ হুস্ করে বেরিয়ে যাবে। আর, আমি ছুটতে ছুটতে হাঁফাতে হাঁপাতে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে ছেড়ে-যাওয়া মেলের

দিকে বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবো! উপায় কি বলুন? গাড়ীর ভেতরে যদি থাকতুম, না হয়, এর্লাম চেন টেনে ঝুলে পড়ে গাড়ীখানা থামাতে পারতুম, কিন্তু···

শ্বশুর: (নিজের হাতঘড়ি দেখে) ব্যস্ত হয়ো না। যথেষ্ট সময় রয়েছে এখনও। এই তো সবে···

জামাই: (বাধা দিয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ! সময় আছে ঠিক। এবং হয়তো যথেষ্টই আছে। কিন্তু, জানেন তো আপনি? আপনার বয়স নিতান্ত কম হয়নি। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে সময় কারুর হাত ধরা নয়। কালের অনির্বাণ চক্র নিয়ত ঘূর্ণ্যমান। সে কখনো কারুর জন্ত একটিবারও থামে না, 'নিরবধি কাল: বিপুলা চ পৃথ্বী:' সময়ের তো আদি অন্ত নেই: কালের অবিরাম প্রবাহ চলেছে অনন্ত কাল ধরে। কোথায় চলেছে কে জানে? ফিলজফিতে আমার অনার্স ছিল। তবু, এ খবর জানতে পারিনি। তবে, এটা ঠিক যে, এই নশ্বর পৃথিবীতে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর: তার মধ্যে একমাত্র সময়ই অবিনশ্বর। এই অখণ্ড কালের গতিকে আয়ত্ত করা মানুষের সাধ্যাতীত! তাই সে দণ্ড পল ঘণ্টা মিনিট দিবা রাত্রি বর্ষ মাস, ইত্যাদিতে তাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছে। সময় তাই মানুষের কাছে এত বেশি মূল্যবান। জীবনের মেয়াদ তো প্রতিদিন কমে যাচ্ছে। তাই বেঁচে থাকার প্রতি মুহূর্তটি আমাদের কাছে অত্যন্ত দামী···

শ্বশুর: হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝিচি। সময়ের তত্ত্বালোচনায় সময় নষ্ট কোর না আমার। তুমি এখন বাড়ীর ভিতর যাও। মেয়েদের সঙ্গে দেখা করগো—

জামাই: (লজ্জিত হয়ে) যে আজ্ঞে। আমি যাচ্ছি। (দু এক পা যেতে গিয়ে আবার ফিরলো) দেখুন, আমায় মাফ করবেন। স্ত্রীলোকদের পিছনে ঘোরা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। বিশেষ করে আমাদের দেশের মেয়েরা এমন বদ-রসিকতা করেন জামাইকে নিয়ে। একটা কথা আপনি জেনে রাখুন, জগতে যত জীব আছে তার মধ্যে এই স্ত্রী জাতি হল সকলের চেয়ে ভয়াবহ। আমার জীবনের মটো হ'ল 'নারীনাং শত হস্তেন:—

শ্বশুর: (উত্যক্ত হয়ে) আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ। তুমি তবে আমার কাছেই একটু বসো বাবা। কিন্তু, আর একটি কথা নয়! একেবারে চুপ্!

জামাই: (অপ্রস্তুত ভাবে) যে আজ্ঞে! এই বোবা হয়ে বসলুম একেবারে?

হাসিমুখে শ্বশুরের সামনের চেয়ারে বসে টেবিলের উপর সাজানো সরঞ্জামগুলি নিয়ে, যেমন—পেপারওয়েট্, কলিংবেল, রুটরুলার, পিন-কুশন, অ্যাশট্রে, ব্লটার ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

শ্বশুর: (সেই মুহূর্তে চিঠি লেখা শেষ করে ব্লটার খুঁজতে খুঁজতে) ব্লটারখানা টেবিলের ওপর থেকে কোথায় উধাও হয়ে গেল? ওরে! কে আছিস—

জামাই: (ব্লটার নিয়ে খেলা করছিল) ওহোঃ! আপনি বোধহয় এই ব্লটারখানাই খুঁজচেন! এই যে! দিন আমি ছেপে দিচ্ছি (তাড়াতাড়ি উঠে ব্লটার নিয়ে চিঠিখানি ছাপতে গিয়ে অসাবধানে কালিভর্তি দোয়াতটি সগু-সমাপ্ত চিঠিখানির উপর উল্টে ফেলে দিলে।)

শ্বশুর: (ক্ষেপে উঠে) ন্যুইসেন্স! একটা মূর্তিমান উৎপাত! কী সর্বনাশ করলে বলো তো? (কালি তখন চিঠির ওপর থেকে গড়িয়ে তাঁর জামাকাপড়ে পড়ছিল)

জামাই: (দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে) ইস্। তাইতো! ছি ছি ছি! আমি বড়ই লজ্জিত। আর, দুঃখিত হচ্ছি তার চেয়েও বেশি। আমায় ক্ষমা করুন। আমি বুঝতে পারিনি যে দোয়াতটা একপেট কালি-কারণ পান করে এমন মাতালের মতো অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছে

শ্বশুর: (রেগে) মাতাল তুমি নিজে! এযে মাতালেরও বেহদ্দ কাণ্ড করলে—

জামাই: (হাত জোড় করে) আজ্ঞে হ্যাঁ! ছি ছি ছি! মাফ্ করুন আমাকে, আমি একটা গাধা! একটা উল্লুক! একটা আস্ত বাঁদর! (বলতে বলতে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানি ধোপদস্ত রুমাল বার করে কালি মুছতে শুরু করলে।

শ্বশুর: (ভীষণ বিরক্ত হয়ে কলিংবেল টিপলেন)

জামাই: (চমকে উঠলো। নেপথ্যে শোনা গেল 'হুজুর!'—চাপরাশির প্রবেশ)

শ্বশুর: (জামাইকে দেখিয়ে চাপরাশিকে কঠোর-ভাবে) আভি এ লৌণ্ডাকে অন্দর মে লে যাও!"

জামাই : (একবার শ্বশুরের দিকে একবার চাপরাশির দিকে তাকাচ্ছিল)

চাপরাশি : (জামাইকে) আইয়ে জনাব—

শ্বশুর : (কালি-লাগা চিঠিখানি উল্টেপাল্টে দেখে, হাতঘড়ির দিকে চেয়ে) হোপলেস্! আজ আর এ চিঠি গেল না!

চাপরাশি : (দরজা দেখিয়ে) হুজুর! মেমসাহেব আ-গিয়া—

শাশুড়ীর প্রবেশ

শাশুড়ী : (ধমকে উঠে) আবার মেম সাহেব বলছিস? হতভাগা বলে দিয়েছি না, মাঠাকৃরুণ বলবি—

চাপরাশি : (সেলাম করিয়া) জী হুজুর-মা ঠেকরোণ!

শাশুড়ী : (হেসে) মরণ আর কি? দুরহ' হারামজাদা—

চাপরাশি : যো হুকুম হুজুর!

সেলাম করিয়া প্রস্থান

শাশুড়ী : (জামাইকে) এসো বাবা এস: কতক্ষণ এসেছো? ভেতরে যাওনি কেন ধন?

জামাই : (প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে) সেই তো একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছি মা!

শাশুড়ী : (জামাইয়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে) এই মাত্র আয়া বললে, মা! সাহেবের ঘরে জামাই-বাবুকে দেখলুম। তাই ছুটে আসছি। তা' হ্যাঁ বাবা, তুমি একলা যে! আমার মেয়ে কৈ? শীলা-মা ভাল আছে তো? তাকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন? তোমার শালাজ আর শালী যে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছুটে আসছে—

জামাই : (ইতস্তত: করে) তাকে আনতে পারলে হয়ত' এ দুর্ঘটনা আর ঘটতো না? কিন্তু, আনা যে সম্ভব হল না! মানে-আমাকে—অর্থাৎ—

শাশুড়ী : (ভীত হয়ে) অর্থাৎ কি? ব্যাপার সব খুলে বলো বাবা! আমি যে তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছিনি—শীলাকে আনলেন কেন?

জামাই : (কুণ্ঠিতভাবে) আপনি ব্যস্ত হবেন না মা, হয়েছে কি জানেন? দুঃসংবাদ বটে, কিন্তু আমি সেজন্যে বড় দুঃখিত—ব্যাপারটা সত্যিই শোচনীয়! তবে কিনা—

শাশুড়ী : (অধৈর্য হয়ে) তবে কি? স্পষ্ট করে বলোনা। শীলার কি শরীর ভাল নেই? অসুখ বিসুখ করেছে? কী হয়েছে বাবা? শক্ত কিছু নয় তো?

জামাই : (ব্যস্তভাবে) না না, আপনি এমন কাতর হবেন না মা! দুশ্চিন্তার কারণ একটু হয়েছিল বটে, কিন্তু এতক্ষণে সব বুকে চুকে শেষ হয়ে গেছে।

শাশুড়ী : (কেঁদে উঠে) এ্যাঁ! শেষ হয়ে গেছে? শীলা কি আমার নেই? ওগো, মা গো! কী হল গো! ভগবান! আমার এ কী সর্বনাশ করলে? শীলা যে আমার বড় আদরের মেয়ে! আমার প্রথম সন্তান! বড় লক্ষীমন্ত-পয়মন্ত মেয়ে। সে আসবার পরই তো কর্তার বাড়বাড়ন্ত—ওগো আমার কী হল গো—

শ্বশুর : (হাতে সেই কালিমাখা চিঠি নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে জামাইকে ধমক দিয়ে) তুমি একটা স্টুপিড্! একটা নিরেট গাধা! এতবড় একটা দুঃসংবাদ তুমি আমায় জানাওনি কেন আগে? যাও তোমার শাশুড়ীকে নিয়ে এখনি বাড়ীর ভিতর যাও। এটা বার-বাড়ী। আমার বসবার ঘর! এখনি বাইরের লোক কেউ এসে পড়তে পারে—যাও ভেতরে যাও তোমরা—

শাশুড়ী : ওগো বাবা গো! আমার কী হল গো! ওমা শীলা আমার, কোথায় গেলি মা?

জলখাবারের থালা হাতে শালাজ এবং চায়ের কাপ ডিস নিয়ে শালীর প্রবেশ

শালী : কী হয়েছে মা? (বিস্মিত হয়ে) তুমি এমন করে কেঁদে উঠলে কেন? জামাইবাবু কি দিদির কোনো দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন—?

জামাই : না না, সে এমন কিছু নয়! একটা বড় শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তাই আমি একাই ছুটে চলে এলুম—

শালী : দুর্ঘটনা! (শিউরে উঠে) দিদির?

হাত থেকে চায়ের ডিস কাপ পড়ে গেল

শাশুড়ী : শীলা মা আমার! (রোদন) আর কি

তোকে দেখতে পাব না? আমাদের কি জন্মের মতো ছেড়ে চলে গেলি মা?

শালাজ: (কাতর হয়ে) কী বলছো মা তুমি? ঠাকুরঝী কি নেই তবে—

কম্পিত হাত থেকে জলখাবারের রেকাব মাটিতে পড়ে গেল

শ্বশুর: (কালিমাখা চিঠির দিকে চেয়ে) ছি ছি ছি! কার মুখ দেখে যে উঠিছিলাম আজ? বিপদের উপর বিপদ! এই স্টুপিড আমায় এতক্ষণ কিছুই বলেনি!—রাস্কেল একটা—

মেয়েদের সকলের মিলিত ক্রন্দন

জামাই: (ব্যস্ত হয়ে) আপনারা এমন করেছেন কেন? স্থির হোন একটু।

শ্বশুর: (চিৎকার করে) চোপরাও! ফু-ফুল্ কোথাকার! এতবড় একটা দুর্ঘটনা হ'য়ে গেছে, আর তুমি আমায় এতক্ষণ কিছুই বলোনি? কী হয়েছিল মেয়েটার? শীঘ্র বলো। কবে হল? কেমন করে হল?

জামাই: (কাতরভাবে) দোহাই! আপনারা এমন অস্থির হবেন না। আপনার জরুরী চিঠিখানা যাতে ৬টার মেল ধরতে পারে—তাই আমি—

শ্বশুর: (রেগে) শাট্ আপ্ রাস্কেল! চিঠির দফা তো রফা করে দিয়েছো! এখন মেয়েটাকে কি করে সাবাড় করলে শীঘ্র বলো—নইলে আমি তোমায় পুলিশে দেব—

জামাই: (ভীষণ ভয় পেয়ে) এ্যাঁ! পুলিশ! পুলিশে দেবেন?

জামাই ঘামতে শুরু করেছিল। অন্যমনস্ক হয়ে হাতের সেই কালি-মাখা রুমাল দিয়েই মুখ পুঁছতে শুরু করলে। মুখখানা কালি লেগে কালো হয়ে উঠলে

শালার প্রবেশ

শালা: (বিরক্ত হয়ে) আঃ! ব্যাপার কি তোমাদের? করছো কি? বাড়ীতে কাক চিল বসতে দিচ্ছনা! এত কান্নাকাটি করছো কেন সবাই মিলে—এমন পাইকিরি হিসাবে? (জামাইকে দেখতে পেয়ে) আরে! এ লোকটা আবার কে? (আঙুল দেখিয়ে) কাফ্রীর বাচ্চা? না-নিগ্রো-বয়? কি চায় এখানে?

শালাজ: (চুপি চুপি গা টিপে) চুপ! চুপ! (চোখ মুছতে মুছতে) কাকে কি বলছো? উনি যে ঠাকুর জামাই—তোমার ভগ্নীপতি—

শালা: (ভাল করে দেখে) মাই গড্! সত্যই তো! সেই শালাই তো বটে। তা' কী হয়েছে ওর বলো তো? অমন পোড়ার মুখ হল কি করে? (জামাইকে) কী ভায়া? মাত্রা বেশি হয়ে গেছে বুঝি? লালপানিতে সাঁতার কেটে কি কালাপানির খানায় গিয়ে পড়েছিলে? এমন প্রিন্স অফ্ 'ঘানা' সেজে এলে কোন গোল্ডকোস্ট্ অন্ধকার করে? থিয়েটারের সাজঘর থেকে পালিয়ে আসছো না তো? ওথেলোর পার্ট দিয়েছিল বুঝি?

শ্বশুর: পারফেক্ট্ ন্যুইসেন্স! শীলা একটা এ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে আজ, ও এতক্ষণ কিছুই বলেনি আমাদের!

শালা: বলেন কি? কী সর্বনাশ! এ কি সত্যি?

শ্বশুর: ঐ বাঁদরকে জিজ্ঞেস করো: ঈশ্! আমার যে কি রাগ হচ্ছে?...ওকে গুলী করবো, না পুলিশে দেবো—ঠিক বুঝতে পারছি নি—

জামাই: আজ্ঞে, গুলিই করুন! পুলিশে দেবেন না! দোহাই—!

শালা: অমন মুখ পুড়িয়ে এসেছ কেন?

জামাই: (হাতের কালি-মাখা রুমালের দিকে নজর পড়তে ব্যাপারটা কতক অনুমান করতে পেরে বোকার মতো সবার মুখের দিকে চেয়ে ঘরে একখানা আয়না রয়েছে দেখতে পেয়ে সেই আয়নার কাছে গিয়ে মুখখানা দেখে) আরে ছি ছি ছি! রাম! রাম? এ হয়েছে কি?

লজ্জায় সে ছুটে ঘর থেকে পালাতে গেল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঘরের মেঝেয় ছড়িয়ে পড়া সেই চা জলখাবারের উপর তার পা পিছলে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল!

শ্বশুর শাশুড়ী শালী শালাজ হাঁ হাঁ করে ছুটে এল ধরতে! জামাই কিন্তু চিৎপাত হয়ে পড়েই রইল।

শালা: বলেছি তো, শালা নেশা করে এসেছে! হাত পায়ের ঠিক নেই? শীলার কী এ্যাক্সিডেন্ট হ'য়েছিল বলবার কি আর ওর অবস্থা আছে?

আয়ার প্রবেশ

আয়া: দিদিমণি শ্বশুর বাড়ী থেকে এইমাত্র এলেন মাঠাকরুণ! এই ঘরেই আসছেন তিনি।

শাশুড়ী : (ব্যগ্রভাবে) দিদিমণি? কোন দিদিমণি রে?

আয়া : শীলা দিদি? আমাদের বড় দিদিমণি?

শাশুড়ী : (উৎসুকভাবে) শীলা? ঠিক দেখেছিস? অবিকল আমার মেয়ের মতো দেখতে কি?

আয়া : হাঁা গো মাঠকরুণ! দিদিমণি নয়ত কি তাঁর ভূত দেখেছি আমি?

ব্যস্তভাবে বড় মেয়ে শীলার প্রবেশ

মেয়ে : ভূত নয় গো মা! আমি তোমার জল-জান্ত মেয়ে শীলা!

শালা : থ্যাঙ্ক্ গড্! (হেসে) তাহলে বেঁচে আছিস তুই?

শ্বশুর : (জামাইয়ের দিকে চেয়ে) ষ্টুপিড! রাস্কেল!

শাশুড়ী : (ছুটে এসে মেয়েকে বুকে জাপটে ধরে) আঃ! বাঁচালি মা আমাকে। জামাই যে ভয় দেখিয়েছিল!

মেয়ে : তোমাদের জামাইয়ের সঙ্গেই তো আসছিলুম এখানে। পথে সে কি ভীষণ এ্যাক্সিডেণ্ট! একখানা বেবি-ট্যাক্সী তীরের মতো ছুটে এসে এক রিকশাওয়ালাকে দিলে চাপা! ঈশ্! গা শিউরে উঠছে। গাড়ী চুরমার? রিকশওয়ালা ক্ষত-বিক্ষত। রাস্তা রক্তে লাল হয়ে উঠলো। দেখতে দেখতে লোকের ভীড় জমে গেল। ট্রাফিক জাম? পুলিশ এসে পড়লো, তোমাদের জামাইকে জানো তো? পুলিশ দেখলেই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া। পুলিশ আসতেই নার্ভাস হয়ে আমাকে পথের মাঝখানে ভীড়ের মধ্যে একলা ফেলে রেখে দে-ছুট! এখানে এসে লুকোয় নি ত তোমাদের গুণধর জামাই?

শালা : ওই যে—কালোমাণিক মেঝেয় পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছেন?

মেয়ে : (উঁকি মেরে দেখে চম্‌কে উঠে) ও মাগো! এ আবার কে গো? এ যে একেবারে কালো ভূত!

জামাই : (কাতরভাবে) শীলা! মাইডিয়ার! আমি—আমি! আমায় তুমি চিনতে পারছো না? দেখ, ভাল করে দেখো—

মেয়ে : (হাঁউ মাউ করে ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে) ওগো বাবা গো? এ কে গো?—

শ্বশুর : এ ভেরিটেব্‌ল ন্যুইসেন্স! ষ্টুপিড! রাস্কেল্!—

জামাই : (চিৎকার করে) শীলা? আমায় চিনতে পারছো না? আমি—আমি—আমি তোমার—

দ্রুত এক প্রবীণ প্রতিবেশীর প্রবেশ

প্রতিবেশী : ব্যাপার কি? আপনার বাড়ীতে কী হয়েছে মশাই? কান্নাকাটি, গোলমাল, চিৎকার (জামাইকে ভূপতিত অবস্থায় দেখে) ইশ্! তাইতো! এযে সাংঘাতিক রকম দুর্ঘটনা দেখছি! ভদ্রলোক আছাড় খেয়ে একেবারে কালিবর্ণ মেরে গেছেন! শিগ্‌গির এ্যাম্বুলেন্স্ ডাকুন! হাসপাতালে রিমুভ করুন এখনি। পুলিশকে ইন্‌ফর্ম করুন—

জামাই : (ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে) পুলিশ! (শালাকে) কে হে মুরুব্বিটি? আম্বুলেন্স্, হাসপাতাল, পুলিশ, বড় বড় সব কথা বলছেন?

শালা : বিলক্ষণ! ওঁকে তুমি চিনতে পারলে না। উনি তোমার এই শ্বশুরবাড়ীর পাশেই থাকেন! আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী—

জামাই : তাই নাকি? তাহলে উনিতো আমার পাড়াতুতো শ্বশুর!

প্রতিবেশী : (বিরক্ত হয়ে) ধেত্তর নিকুচি করেছে! আপনারা বুঝি থিয়েটারের রিহার্শাল দিচ্ছিলেন! তা ভদ্রলোকের পাড়ার ভেতর কেন? কোনও ক্লাবে বা স্কুলবাড়ীতে যান—

সকলেই : (উচ্চ হাস্য)

শালা : (জামাইকে) তোমার পাড়াতুতো শ্বশুর সুপরামর্শ ই দিয়েছেন। চলো কালিঝুলি ধুয়ে ক্লাবে যাই।

সকলেই : (উচ্চ হাস্য)

যবনিকা

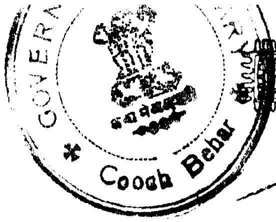


ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল



মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিনু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রূক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এন্কোর, এন্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিনু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিনুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিনু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"



মেয়েদের কথা

কেমন করে মন জয় করতে হয়

সুপ্রিয়া ঠাকুর

মানুষের জীবন দুভাগে বিভক্ত। একটা বাইরের জগত, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন ও সমাজ নিয়ে। আর একটা একান্ত আভ্যন্তরিক জীবন, স্বামী স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে। জীবনকে সুন্দর করতে হলে বাহিরের প্রতিষ্ঠা যেমন চাই, আভ্যন্তরিক জীবনে তেমনই শান্তিরও দরকার। এই শান্তি পেতে হলে স্বামীকেও যেমন হতে হবে নির্ভরযোগ্য, স্ত্রীকেও তেমনই হতে হবে মনোরমা—সুশীলা, স্নিগ্ধ-প্রেম ও মমতাময়ী, যা পুরুষ চিরকাল ধরে কামনা করে আসছে এদেশে: ভার্যাং মনোরমাং দেহি। আমাদের সমাজে স্বামী চিরদিনই পরমগুরু পর্য্যায়ে অভিহিত হয়েছে। বস্তুতঃ এই আখ্যার যথেষ্ট সার্থকতাও আছে। ভাল মন্দের বিচার করতে চাই না। যে সমাজে বিধবারা পর্যন্ত আর একবার বিয়ে করতে পারে না, সেখানে বনিবনাও হল না বলে স্বামী বদলে নেওয়ার কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। তা ছাড়া পাঁচজনকে নিয়ে আমাদের সংসার। তাদের মানিয়ে অন্তত চলতে হবে তো, না হলে থাকবেন কি নিয়ে। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মন কষাকষি চলতে থাকলে কোন স্ত্রীই খুসী মনে থাকতে পারে না। ফলে, সামান্যতেই চটে ওঠে। কারও সামান্য একটু ভাল দেখলেই হিংসা হয়। অকারণেই সকলের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা করে, এমন কি ঠাট্টা তামাসা-গুলোকেও অনেক সময় উল্টো মানে করে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তোলে। আত্মীয় স্বজনরাও তখন বাধ্য হয়ে তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। এতে অশান্তি যায় আরও বেড়ে। আমি বলি, সবার থেকে আলাদা হয়ে নিজের মনে গুমরে গুমরে মরবেন কেন? তার থেকে স্বামীকে দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট রাখলে যদি সব গোল মিটে যায়, আপনার নিজের এবং সংসারের শান্তি আসে, তাতে ক্ষতি কি? আপনার সঙ্গে আর একজনের বনিবনাও হয় না কেন? যে হেতু তার কতকগুলো দোষ আপনার চোখে পড়ে, যে গুলো আপনার মোটেই ভাল লাগে না।

কোন দেবতারই দোষগুণের বিচার আপনি কখনও করেন কি? না। তাই কোন দেবতার সঙ্গেই কোন মানুষের ঝগড়াও হয় নি কোন দিন। তেমনই আপনার স্বামীর দোষগুণের বিচার যদি আপনি না করেন, তাঁর সঙ্গেও আপনার মন কষাকষি হবেনা কোন দিন। দেখুন, একটু চিন্তা করলেই আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন যে আপনি হচ্ছেন আপনার সংসারের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। পরিচালনা ভাগবাঁটোয়ারা প্রভৃতি আপনার সংসারের ভেতরকার যা কিছু সবটুকুই আপনার হাতে। অতএব সংসারের শান্তিরক্ষার দায়িত্বও আপনারই নয় কি? তাছাড়া, আমরা মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি সব কিছুকে মানিয়ে নিতে পারি, পুরুষরা তা পারে না। তাই মহাভারতের যুগ থেকে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীরা সংসারের শান্তিরক্ষার জন্যে মেয়েদেরই উপদেশ দিয়ে আসছেন। মহাভারতের বনপর্বে দ্রৌপদী কেমন করে তাঁর পঞ্চস্বামীর মন জয় করে সংসারে শান্তি রেখেছেন এবং কি করলে স্বামীর মন পাওয়া যায় সত্যভামাকে তার উপদেশ দিয়েছেন। বর্ত্তমান কালের পণ্ডিত ডেল্‌কার্নেগি এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেক জায়গায়।

এবার কি কি বিষয়ে আপনাকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে, আমরা বলে যাচ্ছি :

১। আপনার ঘরখানিকে পরিপাটি করে রাখবেন

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সাজান-গোছান সবাই ভালবাসে। আপনার নিজের কথাই ধরুন না কেন। হয়ত কোন আত্মীয়ের বাড়ী গেছেন। বাড়ীর মধ্যে যাঁর ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাজান-গোছান তাঁরই ঘরে আপনি বসেন বেশীক্ষণ।

আরও একটা কথা জানেন তো, মনটা খুসী হলে দেহের ক্লান্তিও কমে যায় অনেকখানি। ধরুন, আপনার স্বামী বাইরের কাজকর্ম সেরে বাড়ী এলেন। একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার হয়ত তাঁকে বেরোতে হবে। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখলেন ঘরের মেঝেয় এখানে কতকগুলো ছেঁড়া কাগজ পড়ে, ওখানে ছাদ থেকে তুলে-আনা কাপড় চোপড়গুলো তখনও জড় করা। টেবিলের ওপর কতকগুলো বই এলোমেলোভাবে ছড়ান। খাটের ওপর ধোপাকে দেবেন বলে ময়লা কাপড়ের স্তুপ। দুপুরে হয়ত আপনার ছোট ছেলে খেলা করেছিল; তার খেলনার ভাঙ্গা টুকরোগুলো গোটা ঘরময় ছড়িয়ে আছে। ঘরের অবস্থা দেখে প্রথমেই তো তাঁর মন গেল খিঁচড়ে। হয়ত একঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পারতেন, তার জায়গায় কোনরকমে আধঘণ্টা কাটিয়ে বাইরে চলে গেলেন। মুখে আপনাকে কিছু বলে গেলেন না, কিন্তু মনে তিনি বিরক্ত হয়ে গেলেন খুবই। সংসারের প্রতি আপনার মনও নাই, টানও নাই—এমন কথা মনে করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয় কিন্তু।

২। পোষাক পরিচ্ছদের দিকে নজর রাখবেন

বাইরে কোথাও যাবার সময় আপনার স্বামীর পছন্দমত সাজ-গোজ

এবং পোষাক পরিচ্ছদ করলে যে তিনি খুশী হন—একথা আপনাকে আর বলে দিতে হবে না। মনে করিয়ে দিলাম মাত্র। কিন্তু বাড়ীতেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করবেন এবং তাঁর রুচিমত কাপড় জামাও পরবেন।

হ্যাঁ, শুধু নিজের পোষাকের দিকে নজর রাখলেই চলবে না, তাঁর কাপড় জামার প্রতিও আপনার দৃষ্টি রাখতে হবে। ধরুন, তাঁর অফিস যাবার কাপড় জামাটা হয়ত ময়লা হয়ে গেছে। আপনি তা দেখেও অনেক সময় বের করে দেওয়ার ঝঞ্ঝাট আছে বলে চুপ করে থাকেন। এমনটা কখনও করবেন না। বাইরে হয়ত কোথাও নেমন্তন্ন যাচ্ছেন, যে জামাটা তিনি পরছেন সেটা হয়ত তাঁকে ঠিকমত মানাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে বদলে দেবেন। কিছুতেই পরতে দেবেন না। নিয়মিত দাড়িটা কামিয়ে ফেলারও অনুরোধ করবেন।

৩। রুচিমত রান্নার ব্যবস্থা করবেন

মানুষ খেয়ে যত আনন্দ পায়, তত বোধহয় আর কিসেও পায় না। দেখেন না, প্রত্যেকটি উৎসব, প্রত্যেকটি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ খাওয়া ছাড়া শেষ হতেই পারে না। আমরা অতিথি-সৎকার করি খাইয়ে, কাকেও অভ্যর্থনা করি খাইয়ে। এমন কি ভালবাসার নিদর্শন পর্যন্ত দেখাই খাইয়ে।

আপনার বাড়ীতে হয়ত রান্না করার জন্য ঠাকুর আছে। থাকলেই বা। তবুও রান্না ঘরে যাবেন আপনি এবং নিজের হাতে দু একখানা তরকারীও রাঁধবেন। কারণ, আপনার হাতের রান্না খেয়ে আপনার স্বামী যত তৃপ্তি পাবেন—ঠাকুর যত ভাল করেই রাঁধুক না কেন, তার শতাংশের একাংশও তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। মাঝে মাঝে পাঁচরকম খাবার তৈরী করেও বিকেলে দিতে ভুলবেন না। মোটকথা এই সবের মধ্যে দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া যে তাঁর খাওয়া-পরা করে প্রত্যেকটি ব্যাপারে আপনার সব সময় সজাগ দৃষ্টি আছে।

৪। স্বামীর আত্মীয়দের প্রতি ভাল ব্যবহার করবেন

আত্মীয়দের সন্তুষ্ট না করে দেবতাদেরও সন্তুষ্ট করা যায় না। জানেন বোধহয়, যেকোন ঠাকুরেরই পুজো করার আগে পঞ্চদেবতা, দশদিকপাল ইত্যাদির পুজো করতে হয়। অতএব আপনার স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে হলে তাঁর মা, বাবা, ভাইবোনদের প্রতি আপনার সদয় ব্যবহার সবচেয়ে বেশী দরকার। সব সময় মনে রাখবেন, আপনি ছিলেন তাঁর সংসারের বাইরের একজন। অতএব আপনার কথাবার্ত্তা, আপনার আচার ব্যবহার, আপনার চালচলন—এই সবের মধ্যে দিয়েই আপনাকে তাঁদের কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করে নিতে হবে।

অনেক সময় দেখবেন বিনা কারণেই হয়ত তাঁদের অনেকেই আপনার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করছেন। এইসব জায়গায় কিন্তু আপনাকে খুব সংযত হতে হবে। মোটেই রাগ করলে চলবে না। মনে রাখবেন আপনার স্বামী এতদিন ছিলেন একান্ত তাঁদেরই প্রিয়জন। কোথা থেকে আপনি এসে তাঁর সবটুকু অধিকার করে বসেছেন। রাগ হওয়া তাঁদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। আপনার মিষ্টি ব্যবহারই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের শান্ত করবে এবং ক্রমশঃ আপনার প্রতি তাঁদের সহানুভূতি আনবে। তারপর একদিন দেখবেন, তাঁরাই আপনাকে পরমাত্মীয়ের মত ভাল বাসছেন, আপনার শাসন মানছেন, আপনার রাগ-অভিমানের মূল্য দিচ্ছেন। এসব অবস্থায় যদি সংযত হতে না পারেন তবে সংসারের কারও কাছে তো ভাল হতে পারবেনই না, আপনার স্বামীও আপনাকে এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করবেন।

৫। স্বামীর আর্থিক অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকবেন

অর্থের অভাবে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই শান্তি নষ্ট হয়েছে দেখা যায়। একটু খোঁজ করলেই দেখতে পাবেন যে, স্ত্রীদের অভিযোগ ও দোষারোপই এর একমাত্র কারণ।

চালাতেই যদি না পারবে তো বিয়ে করেছিলে কেন? তোমার অভাব তো কোনদিনই মিটবে না, তোমার হাতে পড়ে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল—এই ধরণের কথা অনেক স্বামীকেই প্রায় শুনতে হয়। আপনি কিন্তু কখনও এরকম বলবেন না। একটু বিবেচক হোন। ঠাণ্ডা মাথায় জিনিষটা একটু চিন্তা করে দেখুন। তিনি ইচ্ছে করে আপনাকে বা আপনার ছেলেমেয়েকে কষ্ট দিতে পারেন না। বরং সারাদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করেও আপনাদের এই অভাব দূর করতে পারছেন না বলে তাঁরও দুঃখের সীমা নাই। তার ওপর আপনার কাছ থেকে ও যদি এতটুকু সহানুভূতি না পান এবং আপনারই বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হতে থাকেন বেশী করে, তা হলে তাঁর কাজেই বা আর উৎসাহ থাকবে কি করে। বুঝতেই পাচ্ছেন বোধহয়—তাঁর উৎসাহহীনতায় আপনার সংসারের অভাব যাবে আরও বেড়ে।

দেখুন, মানুষের এই অভাব বস্তুটা এমনই যা কোনদিনই কেউ দূর করতে পারে না। আপনার জীবনে যদি ওঠা-পড়া কখনও এসে থাকে, তাহলে একথা আপনি নিজেও বেশ বুঝেছেন। রাস্তায় যারা ভিক্ষে করে তাদের দুঃখ—দুটি খাওয়া পরার। যারা আবার খেতে পরতে পায় তাদের দুঃখ বড়লোক হওয়ার। বড়লোকের দুঃখ আরও বড়লোক হতে পাচ্ছে না বলে। যে সব চেয়ে বড়লোক—তার দুঃখ দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষ তাকে ভয় করছে না কেন, তাকে শ্রদ্ধাভক্তি করছে না কেন। যার এ দুঃখও হয়ত ভগবান রাখেন নি তার দুঃখের আর শেষ নাই। সে ভগবান হতে চায়।

তাহলেই বুঝুন, অভাব দূর হওয়ার নয়। তার চেয়ে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে নিজেকে এবং আর সবাইকে সুখী করার চেষ্টা করা উচিত নয় কি? এ সম্বন্ধে পৃথিবীর দুটি বিখ্যাত নারীর জীবন কাহিনী শুনুন:

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গুণীর সমাদর করতেন। তখনকার দিনে নবদ্বীপের পণ্ডিতচূড়ামণি রামনাথের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা জানত না এমন লোক তখন বাংলাদেশে খুব কমই

ছিল। কিন্তু তাঁর দারিদ্র্যের কথা জানত না অনেকেই। কেমন করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কানে এল তাঁর অসীম দারিদ্র্যের কথা। তিনি নিজেই একদিন গিয়ে হাজির হলেন পণ্ডিতের গৃহে। সশিষ্য পণ্ডিত মশাইয়ের আনন্দের সীমা নাই। অনেক কথাবার্ত্তার পর মহারাজা কিছু আর্থিক সাহায্য করতে চাহিলেন তাঁকে। উদাসীন পণ্ডিত বললেন যে তাঁর সংসারের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। এ সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রী হয়ত বলতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত-গৃহিণীর কাছে গিয়ে তাঁর অভিপ্রায় জানালেন। সুযোগ্য গৃহিণী পেয়েছিলেন পণ্ডিত-প্রবর। হাসিমুখে তিনি রাজাকে বললেন, অভাব হলে নিশ্চয়ই তিনি রাজাকে জানাবেন। আপাততঃ সংসারে তাঁর অভাব কিছুরই নাই। কারণ, চাষে যা চাল হয় তাতে ভাতের অভাব হয় না, বাড়ীর কর্ত্তা তেঁতুল পাতার ঝোল খেতে ভারি ভালবাসেন। তেঁতুল গাছও তাঁদের আছে। তাছাড়া মাটির হাঁড়ি, পাথরের বাসন, কাঠের পিঁড়ি, মাদুর—অভাব তো তাঁর কিছুরই নাই।

প্রথমটা হয়ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। কিন্তু পরে তিনি এই সুখী-দম্পতির কথা চিন্তা করে নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে একমাত্র নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারলেই মানুষ শান্তি পেতে পারে। অর্থের অভাব মানুষের অশান্তির কারণ নয়।

এবার শুনুন, অর্থের লোভ মানুষের জীবনে কত বড় অনর্থ ঘটাতে পারে।

সাহিত্যিক এবং দার্শনিক লিও টলষ্টয় তখন রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ এবং বিখ্যাত লেখক বলে গণ্য হয়েছেন। সংসারে টাকা পয়সার অভাব নাই। ছেলেমেয়েদের হাসি হুল্লোড়ে তাঁর বাড়ী মুখর হয়ে আছে সব সময়। বাইরের থেকে আসছে অজস্র মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্মান। সুখী হয়েছিলেন টলষ্টয়। কিন্তু সুখী হতে পারলেন না তাঁর গৃহিণী। সব কিছুর সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন আরও অর্থ। বড়লোক হতে চেয়েছিলেন স্বামীর পাণ্ডুলিপিগুলি চড়া দামে বিক্রী করে। টলষ্টয় একমত হতে পারলেন না তাঁর সঙ্গে। তিনি মনে করতেন, অর্থের বিনিময়ে সাহিত্য বিক্রয় করাই মহা অন্যায়। তার ওপর আবার দর কষা-কষি, ছি ছি, এর থেকে নোংরামি সভ্য সমাজে আর কিছু থাকতে পারে না।

এই নিয়ে সুরু হল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য। ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে শেষ পর্য্যন্ত একদিন জ্বলে উঠল চরম অশান্তির আগুন। ৮২ বৎসর বয়সে টলষ্টয় একটা শীতের রাত্রে উত্যক্ত হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেশী দূর যেতে হল না অবশ্য। একে বৃদ্ধ, তার ওপর রুগ্ন। রাস্তাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। পথচারীরাই তুলে নিয়ে গেল তাঁকে হাসপাতালে। দিন পনের পরে নিমোনিয়ায় মারা গেলেন টলষ্টয়। শোনা যায়, হাসপাতালে যারা তাঁকে দেখতে আসত তাদের সবাইকেই দিন ·টি অনুরোধই করতেন যে তাঁর স্ত্রী যেন এখানেও তাঁকে জ্বালাতে যে আ না পারে। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষকে বলে তারই একটা ব্যবস্থা জাগবাটে ১।

৬। অন্যের সঙ্গে স্বামীর তুলনা করবেন না

আপনার প্রতিবেশী কিংবা আপনার আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আপনার স্বামীর চেয়ে বেশী রোজগার করেন। কেউ হয়ত লেখাপড়া শিখেছেন অনেক বেশী। কারও স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য যে আপনার স্বামীর চেয়ে বেশী থাকবে না এমন কথাও নাই। তাই বলে তাঁদের সঙ্গে তুলনা করে আপনার স্বামীর যোগ্যতার প্রতি কটাক্ষপাত করবেন না। এতে তিনি অপমান বোধ করবেন। শুধু তাই নয়, এতে অন্যের চোখেও আপনার স্বামীর দাম যাবে কমে। তাঁকে অন্যের চেয়ে ছোট প্রতিপন্ন করতে গেলে আপনি নিজেও তো ছোট হয়ে যাবেন।

৭। স্বামীর ভুলের খোঁটা দেবেন না—

ভুল মানুষের জীবনে ঘটবেই। আপনার নিজের কথাই ধরুন না কেন, আজ পর্য্যন্ত ছোট বড় করে অনেক ভুলই তো আপনিও করেছেন। তা নিয়ে আপনাকে কেউ কোন দিন যদি খোঁটা দিয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই আপনি বিরক্ত হয়েছেন, দুঃখও পেয়েছেন। নিজের ভুলের জন্যে কম-বেশী অনুতপ্ত হয় সবাই। তার ওপর সেইটা নিয়েই যদি কেউ খোঁচা দেয় তাতে রাগ বা দুঃখ হওয়ার কথাই। কিন্তু সেই সময় যদি কারও কাছ থেকে সান্ত্বনা বা সহানুভূতি পান, অনেকখানি হালকা হয়ে যাবেন নিশ্চয়ই। এবার একটু ভেবে দেখুন দেখি, এই সব সময়ে আপনার স্বামীর কাছ থেকেই সহানুভূতি বা সান্ত্বনা বেশী করে আশা করেন না কি? তেমনই আপনার স্বামীও তাঁর ভুল, ত্রুটি ও দুঃখের সময় সব চেয়ে বেশী আশা করে আপনারই মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। কিন্তু তার বদলে আপনি তার দুর্ব্বল জায়গাটিতে খোঁচা দিতে দিতে তাঁর দুঃখ দিলেন আরও বাড়িয়ে। তখন তিনি করবেন কি জানেন? তাঁর নিজের দোষটিকে অকারণেই আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপনার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠবেন।

আমার বিশেষ পরিচিত একজন ডাক্তারের কথা আমি জানি, চিকিৎসার ভুলে তাঁর নিজেরই এক শিশুপুত্র মারা যায়। কেউই জানত না, এ কথা। এমন কি পরে অন্যান্য ডাক্তার যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও তাঁর এই ত্রুটির কথা ধরতে পারেন নি। কিন্তু তাতে কি হয়? অনুতাপ এবং আত্মগ্লানিতে ডাক্তার জর্জ্জরিত হতে লাগলেন। শেষ পর্য্যন্ত সহ্য করতে না পেরেই বোধহয় একদিন তাঁর স্ত্রীকে নিজের ভুলের কথা বলে ফেললেন। ডাক্তার হয়ত আশা করেছিলেন স্ত্রীর কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়ে কিছুটা নিজেকে সামলে নিতে পারবেন। কিন্তু ফল হল উল্টো। স্ত্রী মুখে কিছুই বললেন না বটে, কিন্তু তারপর থেকে তাঁর অন্যান্য সন্তান—এমন কি তাঁর বাপের বাড়ীর কোন আত্মীয়েরও চিকিৎসা আর স্বামীকে করতে দিলেন না। মাস ছয় পরে ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা ব্যবসা তো ছেড়েই দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন তিনি।

তাই বলছিলাম প্রকারান্তরেও তাঁর ভুলের সমালোচনা কখনও করতে যাবেন না।

৮। মতের অমিল হতে দেবেন না—

এক সঙ্গে বাস করতে গেলে কোন না কোন ব্যাপারে মতের অমিল হবেই। সেটা এমন কিছু দোষের ব্যাপার নয়। কিন্তু আপনার স্বামী যখন তাঁর মতটাই ঠিক এবং নির্ভুল বলে জিদ ধরে বসেছেন, তখন আর তর্কাতর্কি না করে তাঁরটাই মেনে নেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন ভান করবেন যেন আপনারই একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে যাচ্ছিল। মনে রাখবেন যদি আপনার মতটাই তাঁকে মানাতে চান তবে এখনকার এই মেনে নেওয়াটুকুই পরে আপনাকে খুব সাহায্য করবে।

যখন দেখবেন আপনার স্বামী বেশ খুসী মনে আছেন, অন্য কথাবার্ত্তার মধ্যে দিয়ে খুব ধীরে ধীরে আবার তুলবেন কথাটা এবং আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তিগুলো দিয়ে আপনি এমনই ভাণ করবেন যেন এই যুক্তিগুলো হঠাৎই আপনার মনে এল, অথচ সেগুলো কিছুতেই বুঝতে পারছেন না।

৯। কোন কারণেই রূঢ় হবেন না

একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন এমন অনেকে আছেন যাঁরা অন্যের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেন, কিন্তু নিজের স্বামীকে সুবিধে পেলেই কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত এঁদের জীবন অশান্তিময় হয়ে উঠবেই। মনে মনে তাঁরা যত গভীর ভাবেই তাঁদের স্বামীদের ভালবাসুন বা ভক্তি করুন না কেন, তাঁরা কিন্তু বিরূপ হয়ে যাবেনই। সব সময় মনে রাখবেন, মানুষ আপনার অন্তরের চেয়ে আপনার মুখের কথাটাই বেশী করে ধরে।

১০। স্বামীর পছন্দকে সমর্থন করবেন

ওর পছন্দ আর কিছুতেই হয় না—এমন কথা আপনার স্বামীকে কখনও মনে করতে দেবেন না। অনেক সময়েই কাপড় জামার রং বা গয়নার প্যাটার্ণ আপনার পছন্দ হয় না। সেটা দোষের নয় মোটেই। কিন্তু দেখেই নাক তুলবেন না। বরং এই রং এমনই প্যাটার্ণ আপনার অনেকদিনের সখ ছিল—আপনার খুব পছন্দ হয়েছে—এমন কথাও বলবেন। যেটা বদলাতে হবে অর্থাৎ যেটা আপনার একবারেই পছন্দ হচ্ছে না সেটার সম্বন্ধে বলবেন, "এটা তোমায় দোকানদার নিশ্চয়ই গছিয়ে দিয়েছে। এ পছন্দ তোমার অন্ততঃ কিছুতেই হতে পারে না। দেখবেন, আপনি বারণ করলেও সেটা তিনি বদলে আনতে যাবেন।

১১। তাঁর বুদ্ধি বিবেচনার উপর আস্থা রাখবেন

শুধু তাঁর কেনা জিনিষপত্রই নয় তাঁর কাজেরও সমর্থন করবেন। তিনি যে সব কাজই বেশ বুদ্ধি এবং বিচার বিবেচনা করে করেন—তাঁর সব দিকেই যে সমান লক্ষ্য আছে—এমন কথাও বলবেন মাঝে মাঝে। কারণ, নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনাকে অন্য কেউ প্রশংসা করছে, মানুষ মাত্রেরই ভাললাগে সেটা।

১২। আমুদে হবেন

যে কোন আমোদ প্রমোদের ব্যাপারে আপনিই বেশী উৎসাহী—এইটুকু বুঝতে পারলেই আপনার স্বামীর মনে একটি সুন্দর প্রতিক্রিয়া হবে। তাঁর ধারণা হবে বিবাহিত জীবনে নিশ্চয়ই আপনি খুব সুখী হয়েছেন। যে কোন স্বামীর কাছেই এর চেয়ে সুখের আর কিছু নাই।

রসাল আলাপ এবং ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে দিয়ে তাঁর চিন্তাগ্রস্ত মনকে হালকা করে দিতে পারলে দিনের পর দিন তিনি আপনার প্রতি আরও বেশী করে আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন। কিন্তু তার আগে আপনার স্বামীর সেই সময়কার মানসিক অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। মানে, আপনার রসিকতা তাঁর মানসিক অবস্থার সঙ্গে যেন বেখাপ্পা না হয়ে যায়। যদি দেখেন যে তাঁর মন গভীর কোন দুশ্চিন্তায় ভারি হয়ে আছে তবে প্রথমেই জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন দুশ্চিন্তার কারণটুকু, তারপর দরকার মত তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবেন এবং উৎসাহ দেবেন। তাঁকে একথাও জানাতে ভুলবেন না যে তাঁর দুঃখের ভার আপনিও হাসি মুখে গ্রহণ করতে চান। এতে তাঁর মন কিছুটা হাল্কা হবেই।

১৩। তাঁর সব বিষয়ে সঙ্গিনী হওয়ার চেষ্টা করবেন

আপনার স্বামীর রুচি, প্রবৃত্তি ও ধর্মকে নিজের করে নিতে পারবেন বলেই তো আপনি সহধর্মিণী। রুচির মিল হলে মনের মিল হবেই।

ধরুন আপনার স্বামী হয়ত গান-বাজনা ভালবাসেন, আপনিও গানের অনুরাগিণী হওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনার স্বামীর যদি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থাকে তবে আপনি সাহিত্যিক হতে না পারলেও অন্ততঃ বোঝাবার চেষ্টা করবেন। আপনার স্বামী হয়ত খেলা দেখতে ভালবাসেন। তাঁর সঙ্গে মাঠে আপনি না গেলেও খেলার এবং খেলোয়াড়দের খোঁজখবরটা অন্ততঃ খবরের কাগজ থেকে রাখবেন।

১৪। তাঁর বিশেষ সংস্কারগুলি মেনে চলবেন

(ক) একা একা বাইরে বেরোবেন না।

(খ) সামান্যতেই ঔৎসুক্য বা কৌতুহল প্রকাশ করবেন না।

(গ) উঁকি ঝুকি মারা বা আড়ি পেতে শোনার অভ্যেস থাকলে ত্যাগ করবেন।

(ঘ) আপনার স্বামীর যদি ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি থাকে বা তাঁর পুজোআর্চা করার ইচ্ছে থাকে, তাতে বাধা তো দেবেনই না, বরং তাতে আপনি নিজের থেকেই সাহায্য করবেন।

১৫। লজ্জাবতী হবেন

মেয়েদের লজ্জা বস্তুটিকে পুরুষরা শুধু ভালবাসে নয়, মেয়েদের প্রতি আরও বেশী করে তাদের আকৃষ্ট করে। নির্লজ্জ মেয়েদের পুরুষরা মনে মনে ঘৃণাই করে জানবেন। তাই আপনাদের দাম্পত্য আনন্দকে দৃঢ় এবং দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে আপনি লজ্জাবতী হবেন। তাই বলে কি তাঁর বন্ধুবান্ধব এলে তাঁদের সামনে বেরোবেন না বা কথা বলবেন না। কিন্তু শালীনতা বজায় রাখবেন সব সময়।

১৬। স্বামীকে অহেতুক সন্দেহ করবেন না—

অধিকাংশ স্ত্রীই এই ব্যাধিতে ভুগে থাকেন। এটাকে ব্যাধিই

বলছি। কারণ, এতে তিনি নিজেও কম দুঃখ পান না, তবুও ত্যাগ করতে পারেন না এই অভ্যাস। আপনি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন এই রোগ থেকে। আপনার মত স্ত্রী ঘরে থাকতে আপনার স্বামী কুপথগামী হবেন কেন?

আর যদিই এমন দুর্ঘটনা ঘটে তখন কিন্তু খুব শক্ত হতে হবে আপনাকে। একটুও ভেঙ্গে পড়া চলবে না। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে আপনাকেই। কারণ, আপনি ছাড়া আর কেউই তাঁকে ওই পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। প্রথমেই দেখতে হবে কেন বাহিরে তাঁকে এমনি করে টেনে নিয়ে গেল। নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা তিনি আপনার কাছ থেকে পান না। এমন হয়ত হতে পারে যে তাঁর সে অভাব পূরণ করতে গেলে আপনার আত্মসম্মানে ভীষণ আঘাত লাগবে। তবুও কিন্তু গোঁ ধরে থাকবেন না। আগে তিনি ফিরে আসুন তারপর আস্তে আস্তে তাঁকে এই কথাই বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে আপনার সম্মান যাওয়ার জন্যে দুঃখ নাই, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও যে নিজের কাছে অপমানিত হচ্ছেন—এটা আপনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না।

১৭। স্বামীর গোপন কোন ব্যাপার জানার চেষ্টা করবেন না

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা প্রত্যেক মানুষের কিছু থাকবেই। আপনারই কি নাই? আপনি সে কথা কাকেও জানতে দিতে চান না। তেমনই আপনিও জানতে চাইবেন না তাঁর কথা। অনেক সময় এমন হয়েছে যে স্বামীর গোপন কথাটুকু জেদা-জেদি করে জেনেই তাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তির আগুন জলে উঠেছে।

১৮। যৌন ব্যাপারে সংযমী হবেন

একথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আপনার সংযমই তাঁকে আপনার দিকে আরও বেশী করে আকৃষ্ট করে।

১৯। আপনার চরিত্রে তিনি যেন কোনরকমেই সন্দেহ করতে না পারেন

এর থেকে প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ আর বোধহয় কোনটিই নয়। আপনার দাম্পত্য জীবনের বুনেদও বলতে পারেন একে। আপনার সমস্ত প্রেম ভালবাসা, আপনার সব আদর যত্ন, আপনার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে তাহলে। যেমন তরকারীতে তেল, ঘি, চিনি, মশলা—যা যা দরকার সবই ঠিক ঠিক দিলেন। শুধু ভুলে গেলেন নুন দিতে। আপনার পরিশ্রম, আপনার রান্নার নিপুণতা সব ব্যর্থ হয়ে গেল। তরকারীটা গেল মাটি হয়ে। তেমনই আপনার ও সব কিছুই আপনার স্বামীর বিশ্বাসের অভাবে আলুনি হয়ে যাবে। আরও একটা কথা মনে রাখবেন, এ রোগ তাঁর মনে একবার ঢুকলে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে আপনার উপর তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আপনার জীবনকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলবে, বিষময় করে তুলবে।

আবার এমন দু'একজনকেও আমি দেখেছি যাঁরা স্বামীর সঙ্গে তামাসা করার জন্যে সময় সময় এই বিপদজনক খেলায় মেতে ওঠেন। অর্থাৎ স্বামীকে দেখান যে তিনি অন্যের প্রতি অনুরক্ত। এমন আপনি কখনও করবেন না। কারণ মানুষের মনের মত এত অস্থায়ী বস্তু বোধ হয় দুনিয়াতে আর কিছুই নাই। বদলে যেতে একটা সেকেণ্ডও সময় লাগে না—বিশেষ করে আপনার বিরুদ্ধে। তাই এ বিষয়ে বরং একটু বেশী রকমই সাবধান থাকবেন। সন্দেহের রেখাপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা দূর করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। গোপন করতে যাবেন না মোটেই। তার ফল আরও বিষময় হয়ে ওঠে।

এ সম্বন্ধে আরও একটি কথা জেনে রাখুন আপনার স্বামী যে মেয়েকে চরিত্রহীনা বলে মনে করেন তিনি আপনার যত বড় বান্ধবীই হোন না কেন, তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবেন না। আমি বলি, কথা পর্যন্ত বলবেন না।

২০। স্বামীর বুদ্ধি বৃত্তিতে আনন্দ দান করবেন

নতুন ভাল বই বা নাম করা বইগুলো পড়বেন। পত্রিকা, খবরের কাগজ ইত্যাদি পড়ে অবসর সময়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবেন। এতে আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির ওপর তাঁর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বাড়তে থাকবে এবং আপনার সঙ্গে অন্যান্য কৌশলগুলি বিস্তার করার সুবিধা হবে।

তা বলে শুধু অভিনয়ই করবেন না যেন। তাতে ফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কৌশলগুলি প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও সব বিষয়ে খাঁটি হতে হবে।



ক্ষীরাম্র

সমস্ত দুধটা মেরে যে ক্ষীর হয়, তাকে খোয়া ক্ষীর বলে। এই ক্ষীর দিয়ে ক্ষীরাম্র প্রস্তুত করাই প্রশস্ত। খোয়া ক্ষীর বাজারেও পাওয়া যায়। খুব ভাল দেখে টাটকা খোয়া ক্ষীর বাজার থেকে আধসের কি একসের কিনে নিয়ে আসতে হবে; এর সঙ্গে আনতে হবে অন্যান্য উপকরণ। খোয়া ক্ষীর আধসের নিলে, উপকরণরূপে নিতে হবে আড়াই তোলা কাশীর চিনি, আধ কাচ্চা গোবরা চিনি, আন্দাজ মত ছোট এলাচ আর আমআদা।

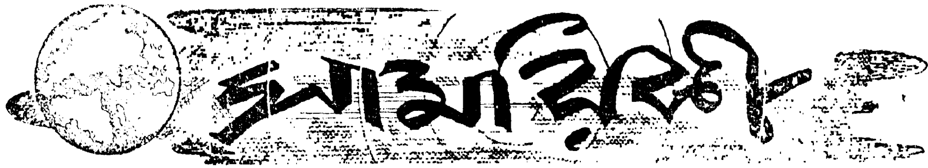
গুঁড়ো এলাচ এক্ষেত্রে দরকার, আর দরকার আম-আদার রস।

একটি লোহার কড়াতে উনুনে চাপিয়ে দিয়ে খোয়াক্ষীর কিছুটা দুধে ঢেলে দিতে হবে, আর খুন্তি দিয়ে আস্তে আস্তে নাড়্তে হবে। কিছুক্ষণ পরে ক্ষীরটা বেশ ঘন হয়ে এলে, আদার রসটা রেখে বাকী উপকরণগুলো ক্ষীরের মধ্যে ছেড়ে দেবে, তারপর খানিকক্ষণ নাড়াচাড়ার পর শক্ত হয়ে এলে নামিয়ে ফেলা দরকার, কিন্তু নাড়াচাড়া বন্ধ করা চল্‌বে না—উল্টেপাল্টে নাড়াচাড়া কর্‌তে হবে। অবশেষে এক একটি দলা পাকিয়ে অনেকটা আমের মত করে অথবা আমের ছাঁচে ফেলে টিপেটুপে নিলেই ক্ষীরাম হয়ে যাবে। এটী অত্যন্ত উপাদেয় খাবার।

ক্ষীর-সন্দেশ

চিনির রস দেড়সের, খোয়াক্ষীর একপোয়া, আধসের ছানা, একছটাক বাদাম, চারিআনার ছোট এলাচের দানা, আন্দাজ মত পেস্তা বাটা বা কুঁচানো, বাদাম একছটাক পরিমাণ—মালমশলা নিয়ে ক্ষীরসন্দেশ কিভাবে করা যায় তাই বল্‌ছি। এক্ষেত্রে ছানা ও চিনি মিশে গিয়ে যখন আটা-আটা হয়ে আস্‌বে, তখন খোয়াক্ষীর উত্তমরূপে বেটে নিয়ে তার সঙ্গে পেস্তা বাদাম দিয়ে ক্রমাগত নাড়্‌তে হবে। পাকটা ঠিক হয়েছে কিনা দেখে নেবে—নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে দেখ্‌বে সন্দেশটা শক্ত হ'য়ে এসেছে কিনা, তারপর কড়া থেকে সমস্ত সন্দেশটা চওড়া কোন পাত্রে, (বারকোষ হোলেই ভালো হয়) উঠিয়ে হাত দিয়ে ময়দা চট্‌কানোর মত বেশ করে চট্‌কে নিয়ে ইচ্ছেমত আকারে বা ছাঁচে গড়ে নেবে। ছোট এলাচের গুঁড়ো আগে অথবা পরে চট্‌কাবার সময়ও দিতে পারা যায়।

—শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী



আসন্ন দুর্ভিক্ষ—

১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হয় নাই—তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে ধান অধিক উৎপন্ন হয় নাই—তদুপরি উত্তরবঙ্গ এবং মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্দ্ধমান,প্রভৃতি জেলায় বন্যার ফলেও বহু শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ১৯৫৮ সালে দেশে দারুণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইয়াছে। দেশজাত চাল এত কম পাওয়া গিয়াছে যে এ বৎসরের প্রথমে ৬ মাসকাল কলিকাতা ও সহরতলীর লোককে আমেরিকা হইতে আমদানী করা সাদা-চাউল ব্যবহার করিতে হইয়াছে। রেশনের চাউলের দাম সের প্রতি ৭ আনা—কিন্তু ৭ আনায় যে চাল দেওয়া হইত তাহা অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় লোক ৯ আনা সের দরে সাদা মার্কিণ চাউল ব্যবহার করিয়াছে। সস্তা দরের চাউলের দোকানে মাথা পিছু সপ্তাহে ১ সের চাল ও এক সের গম দিবার ব্যবস্থা আছে—কিন্তু দোকানে এত কম চাল ও গম দেওয়া হয় যে অধিকাংশ সময় ক্রেতাকে শুধু হাতে দোকান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়—গমও সব সময় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায় না। ফলে কালো বাজারে—তাহাই এখন সাধারণ বাজারে পরিণত হইয়াছে —মানুষ ১২ আনা ১৪ আনা সের দরে চাল এবং ৯ আনা ১০ আনা সের দরে গম কিনিতে বাধ্য হয়। চাল ও গম মানুষের প্রধান খাদ্য—পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা পূর্বে গম খাইত না—খাইলেও অতি কম পরিমাণ গম ব্যবহার করিত—কিন্তু অবস্থার দাস হইয়া এখন সকলে অধিক গম ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। চাল বা গম কম পরিমাণে খাওয়া যায় না—কাজেই চাল ও গম কিনিতে যখন সব অর্থ ব্যয় হইয়া যায়—তখন মানুষ অভাবের তাড়নায় ছুটাছুটি করিতে বা দুর্নীতিপরায়ণ হইতে বাধ্য হয়। এই ভাবে মানুষ গত প্রায় এক বৎসর কাল কি ভীষণ কষ্টের মধ্য দিয়া দিনযাপন করিতেছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন, তাহা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে সরকারী ব্যবস্থা চরম ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে। এক বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী যুদ্ধোত্তর কালের মত রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গকে প্রয়োজনীয় চাল ও গম দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়, সব সময় সকল দেশ ঠিকভাবে গম ও চাল সরবরাহ করিতে পারে না—তাই কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীও পশ্চিমবঙ্গকে প্রয়োজন মত খাদ্য দিতে পারেন নাই। কিন্তু ঐ কথা বলিয়া বাড়ীর ছেলে-মেয়েদেরও না খাইতে দিয়া কেহ থাকিতে পারে না—কাজেই চালের দাম ১৪ আনা সের ও গম ১২ আনা সের হইয়া গেলে মানুষ অখাদ্য খাইতে বাধ্য হয় এবং নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া যায়। শিশু-হাসপাতালে বসিয়া দেখি, দলে দলে লোক রুগ্ন শিশু লইয়া তথায় আগমন করে। শিশুকে পর্য্যাপ্ত খাদ্য দিতে পারে না—মাতা অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হয়—কাজেই শিশু জন্মের পূর্বেই রোগগ্রস্ত হয়—জন্মিবার পর আরও অধিক রোগ তাহাকে আক্রমণ করে ও দেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া যায়। দুঃখের কথা, কি সরকার, কি জনসাধারণ কেহই এ বিষয়ে মনোযোগী হন না। দেশবাসী খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আদৌ অবহিত নহেন—কি করিয়া অধিক খাদ্য উৎপাদন করা যায় কেহ সে কথা চিন্তা করেন না—কি করিয়া ফাঁকি দিয়া বা জুয়াচুরি করিয়া অধিক অর্থ উপার্জন করা যায়, সে জন্য সর্বদা সকলকে সচেষ্ট দেখা যায়। ইহাই যুগধর্মে পরিণত হইয়াছে। বাংলা দেশে পতিত জমীর পরিমাণ এখনও কম নহে—তথাপি আমাদের বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকা মূল্যের খাদ্য আমদানী করিতে হইতেছে। বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ বা অন্যান্য শ্বেতসারজাত শিশু-খাদ্য আমদানী করা হইত, কেন্দ্রীয় সরকার সে আমদানী কমাইয়া দেওয়ায় চারিদিকে

লোক সরকারী ব্যবস্থার নিন্দা করিতেছে—৪ টাকা দামের শিশু-খাদ্য ১০ টাকা দিয়া কিনিতেছে—কিন্তু তথাপি কেহ গো-পালনের কথা বা সমবায় প্রথায় দুগ্ধ উৎপাদনের কথা চিন্তা করে না। কিছু টাকা হইলেই লোক কলিকাতা বা সহরতলীতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বাড়ী করার কথা মনে করে, কিন্তু কেহ গ্রামে যাইয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা নিজের বা দেশবাসীর খাদ্য উৎপাদনের কথা একবারও ভাবিয়া দেখে না। পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে ফলের বাগান লোপ পাইয়াছে—কাঠের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় সকল লোকই গাছ কাটিয়া বিক্রয় করিয়াছে—তাহার পর ১০।১২ বৎসর চলিয়া গেল—কোথাও একটি নূতন ফলের বাগান তৈরার হইল না। এ দেশে নারিকেল, সুপারি প্রভৃতির গাছ করিলে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়—কিন্তু কে তাহা করিবে? নারিকেলগুলি সহরে আনিয়া ডাবরূপে ব্যবহার করার ফলে নারিকেল আর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না। জাম, জামরুল, পেয়ারা, লিচু—এমন কি শসা, কলা প্রভৃতিও কেহ আর উৎপাদন করিতে আগ্রহশীল নহেন। সম্প্রতি আমরা সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকটি স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম—বহু উর্বর জমী চাষের অভাবে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—ধনী, শিক্ষিত তরুণের দল সেখানে যাইয়া ৫ বিঘা করিয়া জমী লইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিলে অনায়াসে মাসিক তিনশত টাকা উপার্জন করিতে পারেন। ২৪ পরগণা জেলার কাঁচরাপাড়ার নিকট হরিণঘাটার পথে চারাপোল গ্রামে এক ভট্টাচার্য্য পরিবার একটি ছোট ভূখণ্ডে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিয়া কি ভাবে সংসার প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা পশ্চিমবঙ্গের যুবকগণের দেখিয়া আসা উচিত। যতদিন আমরা এইরূপ হাজার হাজার কৃষি-ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে না পারিব, ততদিন দেশ হইতে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দূর করা যাইবে না। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুও সে জন্য শেষ পর্য্যন্ত ভারতের সকল রাষ্ট্রের কৃষিমন্ত্রীদিগকে দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারী কৃষি বিভাগগুলি অধিকতর শক্তিমান করা না হইলে জনসাধারণও কৃষিকার্য্যে উৎসাহ বা সাহায্য লাভ করেন না। প্রতীকারের উপায় আছে, কিন্তু সে বিষয়ে চিন্তা বা কাজ করার লোক নাই। দেশে এরূপ দারুণ খাদ্যাভাব থাকিলে কি করিয়া আমরা নূতন ভারতবর্ষ গঠন করিব, তাহা জানি না। কয় বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক কারখানার মালিক বা পরিচালককে শ্রমিকদের জন্য খাদ্য উৎপাদনে চেষ্টিত হইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন—মাত্র ২১৪টি স্থানে সে নির্দেশ পালিত হইয়াছে। কারখানার পরিচালকদের ধনবল বা জনবলের অভাব নাই, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে—কৃষি-বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া খাদ্য উৎপাদনে অবহিত হইতে পারেন। আমরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শুধু বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে না—কি কি উপায় অবলম্বন করিলে, ছোট ছোট বা বড় বড় পরিকল্পনা দ্বারা অধিক খাদ্য উৎপন্ন হয়, আজ প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীর সেজন্য অবহিত হওয়া বা আগ্রহশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সীমান্ত সমস্যা—

পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় চারি ধারে ভারতীয় রাষ্ট্রের দেশগুলি অবস্থিত—পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বহু স্থান—কয়েক শত মাইল পূর্বপাকিস্তান সীমান্ত রহিয়াছে—বিহার, ত্রিপুরা ও মণিপুরের ধারেও পাকিস্তানের জমী। আসামের উত্তরপূর্ব অঞ্চল বন ও পাহাড়ে পূর্ণ—তথায় নাগাজাতীয় বন্য লোকদের বাস। ব্রহ্ম সীমান্তে—অর্থাৎ আসামের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকেও বন ও পাহাড় থাকায়, সে সকল সীমান্ত রক্ষাও সহজ নহে। কয়েক বৎসর হইতে আসামের নাগারা স্বতন্ত্র উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ গঠনের দাবী করিতেছে। এই সকল সমস্যা ভারতরাষ্ট্রের প্রায় স্থায়ী সমস্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্বভারতের উত্তরে তিব্বত, নেপাল ও ভুটান রাজ্য বর্তমানে কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত—কাজেই ঐ সকল দেশের সীমান্তেও লোক শান্তিতে বাস করিতে পারে না। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের সহিত পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত-রেখা স্থির না হওয়ায় প্রায় ৭ শত মাইল সীমান্ত লইয়া গত কয় বৎসর নানারূপ মনোমালিন্য সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার পাশে যে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত—তথায় প্রায়ই পাকিস্তানীরা হানা দিয়া গরু, বাছুর, ছাগল, হাঁস, মুরগী, এমন কি মানুষ পর্য্যন্ত চুরি করিয়া লইয়া যায়।

সীমান্তে শস্য উৎপন্ন হইলে পাকিস্তানী চোরের দল রাত্রিতে ভারতরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া ফসল চুরি করিয়া লইয়া যায়। এ প্রায় দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। এত বড় সীমান্তকে ঘিরিয়া ফেলাও যেমন ব্যয়সাধ্য—তথায় পাহারার ব্যবস্থা করাও তেমনিই বিরাট খরচের ব্যাপার। প্রতি এক মাইল অন্তর পাহারার ঘাঁটী করিয়াও পাকিস্তানী আক্রমণ হইতে ভারতীয় সীমান্তবাসীদিগকে রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। আসাম রাষ্ট্রের অবস্থাও ঐরূপ হইয়াছে। তথায় সুদীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় পাকিস্তানীদের হানা লাগিয়া আছে। চুরি-ডাকাতির ত সংখ্যাই নাই—প্রকাশ্য দিবালোকে পাকিস্থানী দস্যুরা—ভারতরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া টাকা কড়ি পর্য্যন্ত লুট করিয়া লইয়া যায়। এ সকল ব্যাপারে শ্রীজহরলাল নেহরু শত শত পত্র লিখিয়া পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন ফললাভ করিতে পারেন নাই। হয় ত পাকিস্তানী হানাদারেরা চায় যে ভারত রাষ্ট্র হইতে পাকিস্তান আক্রমণ করা হউক, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে রাষ্ট্রসংঘের শরণাপন্ন হওয়া সহজ হইবে। কাশ্মীর সমস্যা-সমাধানের জন্য পাকিস্তান যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোন উপায়ের কথা ভাবিতে পারে না। সেখানে আজ ধীরবুদ্ধি মানুষের অভাব হইয়াছে—গত ১১ বৎসর বহুবার মন্ত্রি-সভার পরিবর্তন দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছে। পাকিস্তানী নেতারা দেশবাসীর স্থায়ী সুখ-শান্তির কথা চিন্তা করে না—যে কোন উপায়ে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি বা প্রাধান্য বজায় রাখিতে সর্বদা ব্যাকুল। কাজেই দেশবাসীর জন্য কেহ চিন্তা করে না। ফলে কি পূর্ব-পাকিস্তান, কি পশ্চিম-পাকিস্তান—সর্বত্র অন্ন-বস্ত্রের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে। তথায় মানুষকে অন্যায় কার্য্য করিতে উৎসাহ দান করা হয়—ফলে দলে দলে মানুষ ভারতরাষ্ট্র আক্রমণ করে ও যাহা পায়, তাহাই লুঠ করিয়া লইয়া যায়। সীমান্তে ধানের গোলায় ধান রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না, গোয়াল হইতে প্রত্যহ গরু চুরি হয়, পুকুরের মাছ, গাছের ফল, ক্ষেতের শস্য কিছুই রাখা সম্ভব হয় না। ফলে ভারত সীমান্তের গ্রামগুলি ক্রমে জনহীন হইয়া অরণ্যে পরিণত হইতেছে—পাকিস্তানীরা তাহার সুযোগ লইয়া বনের মধ্য দিয়া আসিয়া পরবর্তী গ্রামগুলিতে হানা দিতেছে। সীমান্তস্থিত উচ্চ বিদ্যালয়-গুলিতে ছাত্র নাই—কারণ অভিভাবকগণ শান্তিতে সীমান্তে বাস করিতে পারে না। পুলিশ পাহারা এ বিষয়ে কখনই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না—কারণ ৭ শত মাইল সীমান্ত পাহারা দেওয়া কখনই সম্ভব হইতে পারে না। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব না স্থাপিত হইলে সীমান্তবর্তী ভারত রাষ্ট্রসমূহের স্থানগুলি সমস্যা হইয়াই থাকিবে। আমরা সম্প্রতি সীমান্তবর্তী বহু স্থান ঘুরিয়া আসিয়াছি, সর্বত্র মানুষ ভয়ে ভয়ে বাস করে—পাকিস্তানী আক্রমণের ভয়ে ঘরে কোন জিনিষ রাখিতে সাহসী হয় না। বাগানের তরিতরকারী পর্য্যন্ত রাত্রিতে চুরি যায়—দামী জিনিষের ত কথাই নাই।

সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর সহিত পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী সার ফেরোজ খাঁ নুনের এ বিষয়ে আলোচনা হইল—কিন্তু তাহার ফল কল্যাণজনক হইবে বলিয়া কেহ মনে করে না।

আজ পরমাণবিক অস্ত্রের যুগে প্রত্যেক দেশই যুদ্ধকে ভয় করে—কিন্তু বিভ্রান্ত পাকিস্তানীরা যুদ্ধকে ভয় করে না। বহু খ্যাতনামা পাকিস্তানী নেতা মধ্যে মধ্যে যুদ্ধের হুমকী দিয়া থাকে। মনে হয়, তাহারা ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির নিকট যুদ্ধের সময় সাহায্য লাভের আশা রাখে। ভারত চিরদিন যুদ্ধের বিরোধী—বিশেষ করিয়া বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু যে কোন উপায়েই হউক জগতের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান। যদি ও হয়ত যুদ্ধ বাধিলে রাশিয়া, লাল-চীন বা জার্মানী ইঙ্গ-মার্কিণের বিরোধী হইয়া ভারতকে যুদ্ধ ব্যাপারে সাহায্যে করিতে অগ্রসর হইবে—কিন্তু এ সময়ে যুদ্ধের ফলে যে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে, ভারতের নেতা শ্রীনেহরু সর্বদা তাহা অনুভব বা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কাজেই পাকিস্তান যুদ্ধের জন্য যতই ব্যাকুল হউক না কেন, শ্রীনেহরু সহজে যুদ্ধ বাধাইয়া উন্নতিশীল ভারত রাষ্ট্রকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে সম্মত হইবেন না। এ কথা পাকিস্তান জানে—সে জন্য সে শ্রীনেহরুর কোন অভিযোগে কর্ণপাত করে না, এমন কি হানাদারী আক্রমণ সম্বন্ধে শ্রীনেহরু যে সকল পত্র প্রেরণ করেন, তাহার উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বলিয়া মনে করে না। এ সময়ে জগতের শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিলে ভারত-পাকিস্তান সমস্যার



তাজা ঝরঝরে ও সুন্দর হয়ে উঠুন হিমালয় বোকের সাহায্যে



এই ঠাণ্ডা এবং স্নিগ্ধ স্নোটি আপনাকে সুরভিত ও সতেজ রাখবে।

হিমালয় বোকে স্নো



এই মোলায়েম সুগন্ধ পাউডারটি দিয়ে আপনার প্রসাধন সম্পূর্ণ করুন আর দেখুন আপনাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে।

হিমালয় বোকে টয়লেট পাউডার

HBS. 14-X52 BG

এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

সমাধান হওয়া সম্ভব নহে। ভারত ক্রমশঃ পৃথিবীতে সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে চলিয়াছে—ইহাও পাকিস্তানের হিংসার অন্যতম কারণ। হিংসার বশীভূত হইয়া পাকিস্তান নিজেকে ধ্বংস করিতে প্রস্তুত—একথা সে একবারও চিন্তা করে না। আজ এই সংকটের মধ্যে ভারতকে অবস্থান করিতে হইতেছে—কে মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ মিটাইবে তাহা বুঝা যায় না—কারণ জগতের দুইটি শক্তিমান গোষ্ঠী ভিন্নমতাবলম্বী, তাহাদের একমত করিতে না পারিলে এ দারুণ সমস্যার সমাধান হইবে না।

প্রদেশ কংগ্রেসের স্বাধীনতা উৎসব—

অন্যান্য বৎসরের মত এ বৎসরও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলিকাতায় ৭ দিন ব্যাপী উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৭ই আগষ্ট রবিবার সকালে কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং পশ্চিমবঙ্গ সেকেণ্ডারী শিক্ষাবোর্ডের স্কুল-ফাইনাল, ইণ্টার ও গ্রাজুয়েট পরীক্ষায় সাফল্যমণ্ডিত ৭৫জন ছাত্র-ছাত্রীকে ডাক্তার রাধা বিনোদ পালের দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া ২৫ টাকা মূল্যের করিয়া পাঠ্যপুস্তক ও একখানি করিয়া মানপত্র প্রদান করা হয়। সভায় ডাক্তার শিশিরকুমার মিত্র সভাপতিত্ব করেন এবং প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও কলিকাতার মেয়র ডাক্তার ত্রিগুণা সেন ছাত্রগণকে আশীর্বাদ করেন। ১৭ই সন্ধ্যায় শ্রীপাহাড়ী সান্যালের সভাপতিত্বে এক সভায় খ্যাতনামা চিত্র-নট শ্রীছবি বিশ্বাসকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ১৬ই আগষ্ট সন্ধ্যায় বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে এক সভায় খ্যাতনামা ঐতিহাসিক আচার্য্য শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ১৮ই আগষ্ট সোমবার সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিচালক শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে এক সভায় খ্যাতিমান সঙ্গীত-সাধক শ্রীরাইচাঁদ বড়ালকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ২০ আগষ্ট সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে শিল্পী, ভাস্কর ও সাহিত্যিক শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীকে সম্মানিত করা হইয়াছে। ১৯শে আগষ্ট বিশিষ্ট কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভায় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। ২১শে আগষ্ট সন্ধ্যায় উৎসবের সমাপ্তি দিবসে অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উৎসবে বাংলা সংস্কৃতির অন্যতমা ধারিকা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে ও বিশ্বভারতীর সেবা করিতেছেন। তিনি পরলোকগত সাহিত্যিক বীরবল প্রমথ চৌধুরীর পত্নী এবং রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। এইভাবে এবার বার্ষিক গুণীজন সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল।

দানবীর প্রমথনাথ রায়—

গত ২২শে আগষ্ট রাত্রিতে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের পুত্র দানবীর কুমার প্রমথনাথ রায় ৭৯ বৎসর বয়সে তাঁহার শোভাবাজারস্থ বাসগৃহে থ্রম্বসিস রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে ট্রাষ্ট গঠন করিয়া তিনি এক কোটি টাকা দান করেন এবং সারা জীবন আরও বহু লক্ষ টাকা জনহিতকর কার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্ররূপে বহু কোটি টাকার মালিক হইয়াছিলেন এবং সারা জীবন দান করিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ দান সকলেরই অনুকরণযোগ্য। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদি বর্তমান। ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের অর্থ গল্পের বিষয়। প্রমথনাথ ঐ অর্থের সার্থক ব্যবহার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

হস্তশিল্প শিক্ষণকেন্দ্র—

১৯৫৮-৫৯ সালে নিখিল ভারত হস্তশিল্প বোর্ডের সুপারিশ ক্রমে ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৫৮টি নূতন হস্ত-শিল্প শিক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপন করিবেন—তন্মধ্যে ৪১টি কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে ৭ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে—বাকী ১৭টি কেন্দ্রের ব্যয় শীঘ্র টাকা দেওয়া হইবে। ঐ সকল কেন্দ্রের প্রত্যেক শিক্ষার্থী মাসে ২৫ টাকা হইতে ৫০ টাকা বৃত্তি পাইবেন। শিক্ষার পর শিক্ষার্থীদের সমবায় গঠন করিয়া উৎপাদনে উৎসাহ দানের জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া হইবে। এইভাবে হস্তশিল্প শিক্ষাদান করিয়া মানুষকে গ্রামে বসাইতে পারিলে শুধু শিল্প সমৃদ্ধি বাড়িবে না, দেশ ও উন্নত হইবে।

সমবায় ব্যবস্থা ও পল্লী উন্নয়ন—

গত ২৪শে আগষ্ট দিল্লীতে কৃষি-অর্থনীতিবিদগণের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলিয়াছেন—কৃষকদের সমবায় সংস্থার উন্নতি সাধনই দেশের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থ-নৈতিক অবস্থা উন্নয়নের একমাত্র পথ। সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকগণ সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করিয়া কৃষিপণ্য হইতে লাভ করিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস, এ ব্যবস্থায় খাদ্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে ও ভবিষ্যতে বৎসরে ১০০ কোটি টাকার খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী করার প্রয়োজন থাকিবে না। এখনও আমাদের দেশের লোক সমবায় প্রথা মানে না ইহাই পরিতাপের বিষয়। সে জন্য সরকারী ব্যবস্থাকেই অধিক দায়ী করা যায়।

স্বগ্রামে সহীদ ক্ষুদিরামের মূর্তি—

সহীদ ক্ষুদিরাম বসুর পৈতৃক বাসভূমি ছিল মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার মোহবনী গ্রামে। গত ১১ই আগষ্ট ঐ গ্রামে ক্ষুদিরামের একটি আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্বে ঐ দিনেই কিশোর ক্ষুদিরাম দেশমাতৃকার সেবায় আত্মদান করিয়াছিলেন! গ্রামে এই ভাবে বীরপূজার ব্যবস্থা করিলে গ্রামবাসীদের মনে দেশাত্মবোধ সদাজাগ্রত থাকিবে।

মহাজাতি সদন উদ্বোধন—

গত ১৯শে আগষ্ট সকালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরিকল্পিত মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিয়াছেন। ১৯ বৎসর পূর্বে ১৯৩৯ সালের ১৯শে আগষ্ট কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নেতাজীর আহ্বানে ঐ সদনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ ৪ তলা গৃহ নির্মাণে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সদনের সুসজ্জিত প্রাচীর-গাত্রে মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের প্রতিকৃতি শোভা পাইতেছে এবং মঞ্চোপরি নেতাজী সুভাষের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি রক্ষিত হয়। ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর গৃহনির্মাণ বন্ধ ছিল—বিধানচন্দ্রের মন্ত্রিসভা সে অসমাপ্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাবৃত্তি—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৮-৫৯ সনের জন্য ৮২০টি শিক্ষা-বৃত্তি দিবেন (অনুন্নত শ্রেণীকে প্রদত্ত বৃত্তি উহার মধ্যে পড়িবে না)—তন্মধ্যে আই-এ প্রথম বার্ষিক ছাত্রকে মাসিক ২৫ টাকা, ১৪ জন বি-এ তৃতীয় বার্ষিক ছাত্রকে মাসিক ২০ টাকা, বি-এসসি তৃতীয় বার্ষিক ১৬০ জন ছাত্রকে মাসিক ২৫ টাকা, পঞ্চম বার্ষিক এম-এ ১৫ জন ছাত্রকে মাসিক ২৫ টাকা ও পঞ্চম বার্ষিক ৩০ জন এম-এসসি ছাত্রকে মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে। গুণী ও দরিদ্রগণই ঐ বৃত্তি পাইবেন। প্রিন্সিপালগণের নির্দ্দেশ অনুসারে দ্বিতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীরও কয়েকজন ছাত্র ঐ বৃত্তি পাইবে। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ স্কুল-ফাইনাল ও ইণ্টার-পরীক্ষার্থী এবং অনার্স বা ডিস্‌টিংসনে পাশ করা গ্রাজুয়েট পরীক্ষার্থীরাই বৃত্তি পাইবে। এই ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে উৎসাহ দান ব্যবস্থা অবশ্যই প্রশংসনীয়। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ ইহার দ্বারা উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ পাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৩টি কার্য্য—

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫৮-৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৩টি কার্য্যে অর্থদান করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয়ে রাজ্যসরকার সকল কাজ করিবেন। কার্য্যগুলি এই—(১) বৃহত্তর কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ (২) দুর্গাপুরে কয়লা চুল্লী প্ল্যাণ্ট (৩) গোয়েঙ্কা কমার্স কলেজের উন্নতি (৪) কাঁচরাপাড়া ও ডিগ্রীতে যক্ষ্মা হাসপাতাল (৫) কলিকাতায় সংক্রামক রোগ চিকিৎসা হাসপাতাল (৬) মানসিক ব্যাধির হাসপাতাল (৭) নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের উন্নতি (৮) দন্ত চিকিৎসা কলেজের উন্নতি (৯) কলিকাতা কর্পোরেশনের জল সরবরাহ ও ড্রেন ব্যবস্থা (১০) শিল্প শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণে সাহায্য (১১) অল্প আয়ের লোকদের গৃহ নির্মাণ (১২) বস্তী অপসারণ ও ঝাড়ুদারদের গৃহ নির্মাণ (১৩) কল্যাণী সহর নির্মাণ। কলিকাতার জল-সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য কর্পোরেশন ইতিমধ্যে ৮০ লক্ষ টাকার ষ্টীল চাদর ক্রয় করিয়াছে—বিদেশ হইতে আরও ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকার যন্ত্র ও ষ্টীলের চাদর ক্রয়ের জন্য ভারত সরকারকে ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। উপরোক্ত

ব্যবস্থাগুলি সম্পাদিত হইলে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে বহু সুবিধা লাভ করিবে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার—

বর্তমান বৎসর (১৯৫৮-৫৯) ও পরবর্তী ২ বৎসরে সারা ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথাক্রমে ১৫ হাজার, ২০ হাজার ও ২৫ হাজার করিয়া মোট ৬০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে। ঐ সময়ে ১২ শত জন শিক্ষা পরিদর্শকও নিযুক্ত হইবেন এবং ৬০ হাজার মহিলা শিক্ষিকার জন্য বাসগৃহ নির্মাণ করা হইবে। এই ভাবে কাজ চলিলে দেশে কোন শিশুই আর প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিবে না।

জাতীয় অধ্যাপক পদ—

দীর্ঘ ৯ বৎসর পরে ভারত সরকার দুই জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিককে আবার জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়াছেন—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডাঃ কে-এস কৃষ্ণান। উভয়েই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। ১৯৪৯ সালে প্রথম নিযুক্ত জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ সি-ভি-রমণও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নিয়োগে বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব বোধ করিবেন। আমরা আচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত—

ভারতের ৪ জন সংস্কৃত পণ্ডিত ও একজন আরবী পণ্ডিত সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন। সকলেই সনদ ও পোষাক ছাড়াও বার্ষিক ১৫ শত টাকা বৃত্তি পাইবেন। পণ্ডিতদের নাম (১) শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য —৮৫ বৎসর (২) গিরিধর শর্মা চতুর্বেদী—৭৫ বৎসর (৩) ডাঃ পাণ্ডুরং বামন কানে—বয়স ৭৮ বৎসর (৪) শ্রীশ্রীপদ কৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রী—বয়স ৯২ বৎসর ও (৫) ডাঃ মহম্মদ জুবাইর সিদ্দীকি বয়স ৬০ বৎসর। ডাঃ সিদ্দীকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

হারুয়া বাঁধ—

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার হারুয়া গ্রামের জনসাধারণ টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে ৭ দিনের মধ্যে ১০ ফিট চওড়া, ২৫০ ফিট লম্বা ও ২২ ফিট উচ্চ একটি মাটীর বাঁধ মুণ্ডেশ্বরী নদীর একটি খালের উপর নির্মাণ করিয়াছে। তাহার ফলে পুড়শুরা থানার শ্যামপুর ইউনিয়নের ৬ হাজার একর, খানাকুল থানার ৪ হাজার একর কৃষি জমীকে সেচ ব্যবস্থা সম্ভব হইবে। ঐ কাজ করিতে নগদ মাত্র সাড়ে ৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে—৫ শত গ্রামবাসী স্বেচ্ছাশ্রম দান করেন এবং ৫ শত বাঁশ ও ৬ কাহন খড় দিয়াছেন। স্থানীয় কংগ্রেসকর্মী ও সমাজসেবকগণ এই কাজে অগ্রণী হইয়াছিলেন। গ্রামবাসীদের এইরূপ প্রচেষ্টা সর্বত্র অনুকৃত হওয়া উচিত। নিজের অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা নিজেরা করিলে বহু কার্য্য সম্পাদিত হইবে—সরকারী সাহায্যের অপেক্ষায় বৎসরের পর বৎসর বসিয়া থাকিতে হইবে না।

বাৎসরিক খাদ্য আমদানী—

১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতকে মোট ১০৬ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্র হইতে ১৬৮৫৪০০ টন গম, ব্রহ্ম ও ভিয়েৎনাম হইতে যথাক্রমে ৩৩০৭ লক্ষ টন ও ৬৫০০ লক্ষ টন চাউল আমদানী করা হইবে। তাহা ছাড়া কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতেও গম আমদানী করা হইবে। ধান, গম ছাড়াও বহু প্রকার খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় —দুগ্ধজাত দ্রব্য আমদানীর পরিমাণ কম নহে।

আত্মহত্যা—

খ্যাতনামা সাংবাদিক ও অধ্যাপক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেনের একমাত্র পুত্র দীপক সেন ২২ বৎসর বয়সে বন্দুকের সাহায্যে গত ২৯শে আগষ্ট আত্মহত্যা করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইলাম। সে আই-এস সি পরীক্ষা ফেল করিয়া মানসিক রোগে ভুগিতেছিল। আমরা ধীরেনবাবুর এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

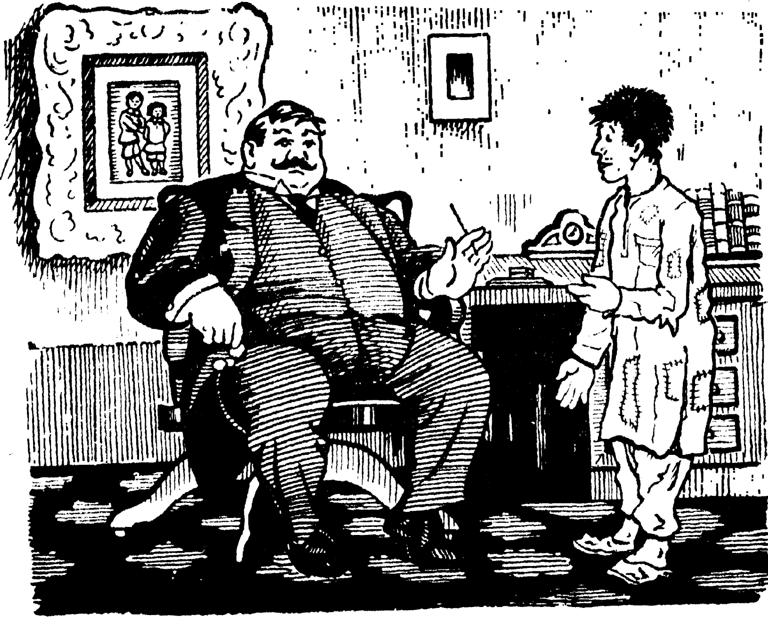
কাম্বোডিয়ায় শরীর-শ্রম—

কাম্বোডিয়ার প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স নরোদম সিংহানুক সম্প্রতি গণতন্ত্রী চীন দেশ দেখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন—প্রত্যেক মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীকে বৎসরে একমাস কৃষিক্ষেত্রে যাইয়া কাজ করিতে হইবে। সশস্ত্র বাহিনীর সৈনিকগণও এ ব্যবস্থা হইতে বাদ যাইবে না। অপর পক্ষে সকল ছাত্রকে সপ্তাহে অর্ধ দিবস কারখানার কাজ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষে আচার্য বিনোবা ভাবেও সকলকে এই ভাবে শ্রমদান করিতে বলিয়া থাকেন। শ্রীজহরলাল নেহরু কি আচার্য ভাবের কথায় সাড়া দিবেন ?

গৃহনির্মাণে ঋণ দান—

পূর্বে সরকারী ব্যবস্থায় যাহারা মাসিক ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত আয় করেন, তাহাদের নিজ গৃহ নির্মাণের জন্য ৮ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ ভাবে বহু গৃহহীনকে বাসগৃহ পাইতে সাহায্য করা হইয়াছে। সম্প্রতি ৫ শত টাকা হইতে ১৫ শত টাকা মাসিক আয়ের লোকদিগকে গৃহ নির্মাণবাবদ ২৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ২৫ বৎসরে সুদ সমেত ঐ টাকা ফেরত দিতে হইবে। এইরূপ বহুবিধ ভাবে ভারতের বাসগৃহ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে।

উপদেশ



পুঁজিপতি—বেকার !···দারিদ্র্য !··· বুঝলে বাপু···দুঃখ-দারিদ্র্যভোগ না করলে মানুষ
হতে পারবে না !···

কর্ম্মপ্রার্থী—আজ্ঞে, তাহলে আপনার নিজের ছেলেদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

স্বপ্নসম্ভোগ

শ্রীকালিদাস রায়

আমাদের এই ঘরে   উনপঞ্চাশের পরে
দীপ কেন ? অন্ধকারই ভালো।
নিষ্ঠুর সত্যেরে বাতি   দেখায় যে সারা রাতি,
চাইনা ক তাই তার আলো।

কল্পনা আঁধারই চায়,   সৃষ্টি তার পুড়ে যায়
প্রদীপের শিখার আঘাতে,
সহে না সে বর্ত্তিকায়   ফুঁ দিয়ে নিবায় তায়
মুদাইয়া দেয় আঁখিপাতে।

চল সখি যাই ফিরে   মোদের যৌবন-নীড়ে
কল্পনার ব্যোমচারী রথে,
সকল ইন্দ্রিয় রুধি   ক্ষীণতেজ চক্ষু মুদি
অন্ধকার অভিসারপথে।

চল সখি সেথা গিয়া   মনের মাধুরী দিয়া
এই তনু ভাঙি পুন গড়ি।
হারানো সে দিনগুলি   গিয়াছি যা এবে ভুলি
স্মরি তনু উঠুক শিহরি'।

যৌবন গিয়াছে চলি,   ক্ষোভ কেন তাই বলি' ?
আছে মন তেমনি সরস,
অন্ধকারে তা যে পারে   দেহ থেকে হরিবারে
অনায়াসে বিশটি বরষ।

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনার কেন্দ্র অকস্মাৎ পশ্চিম-এশিয়া হইতে পূর্ব্ব-এশিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। পশ্চিম-এশিয়া হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারিত হয় নাই; তবে আরবরাষ্ট্রগুলির আগ্রহে জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল এখন এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের জন্য তৎপর হইয়াছেন। অবশ্য, জাতি-সঙ্ঘের উপর মধ্যপ্রাচ্যের অভিভাবকত্ব ছাড়িয়া দিতে প্রগতিশীল আরবরাষ্ট্রগুলির প্রবল আপত্তি। সুতরাং তাহাদের মনোভাবের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এই অঞ্চলে শান্তি রক্ষার কি ব্যবস্থা হয়, এবং বৈদেশিক সৈন্যের অপসারণ সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকা কি নীতি অবলম্বন করে, তাহা লক্ষ্য করিবার মত।

মধ্যপ্রাচ্য—

আগষ্ট মাসের প্রথমে মঃ ক্রুশ্চেভ পিকিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার আলোচনার জন্য জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ৯ই আগষ্ট তারিখে জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের জরুরী অধিবেশন আরম্ভ হয়। জাতি-সঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল প্রথমে নিম্নলিখিত পাঁচ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন: (১) লেবাননে জাতিসঙ্ঘের পর্য্যবেক্ষক দলের কলেবর বৃদ্ধির এবং এই রাজ্যটি সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘের আগ্রহ প্রকাশের কোনও নূতন ব্যবস্থা; (২) জর্ডান সম্পর্কে যুদ্ধ-বিরতি তদারকের বিশেষ ব্যবস্থা; (৩) আরবরাষ্ট্রগুলির পক্ষ হইতে অনাক্রমণের নীতি ঘোষণা; (৪) তৈল উৎপাদনকারী ও তৈল স্থানান্তরকারী দেশগুলির সহযোগিতায় জাতি-সঙ্ঘের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে অর্থ-নৈতিক ও কারিগরী সাহায্য দিবার ব্যবস্থা; (৫) সাধারণভাবে আরব জাতিকে এই আশ্বাস দান যে, তাহারা স্বাধীনভাবে তাহাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। এই প্রস্তাবের প্রথম দুই দফায় লেবানন ও জর্ডানকে জাতি-সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে লইবার ইঙ্গিত ছিল। স্বভাবতঃ আরবরাষ্ট্রগুলিতে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। চতুর্থ দফায় জাতি-সঙ্ঘের নাম করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে রুশিয়াকে বাদ দিবার প্রস্তাব ছিল; কারণ মধ্যপ্রাচ্যে তাহার তৈল-স্বার্থ নাই। বস্তুতঃ, প্রস্তাবে প্রকৃত মীমাংসার কোনও সূত্র ছিল না। ইহাতে বিতর্ক বাড়িয়াই উঠিত।

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার স্বয়ং সাধারণ পরিষদের এই জরুরী অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁহার ছয় দফা প্রস্তাব—(১) লেবাননের জন্য জাতি-সঙ্ঘের আগ্রহ; (২) জর্ডানে শান্তিরক্ষার জন্য জাতি-সঙ্ঘ কর্ত্তৃক ব্যবস্থা অবলম্বন; (৩) বাহির হইতে গৃহ-যুদ্ধে উস্কানি দেওয়া বন্ধ করা; (৪) জাতি-সঙ্ঘের শান্তিসেনা মজুত রাখা; (৫) আরবজাতিগুলির জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য রচিত আঞ্চলিক অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়তা দান; (৬) অস্ত্র সরবরাহে প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা। এই প্রস্তাবের প্রথম দফায় "লেবাননের জন্য জাতি-সঙ্ঘের আগ্রহের" যে কথা বলা হইয়াছে, সে আগ্রহের প্রকৃত প্রয়োজন সেখানে মার্কিণ সৈন্যের অবস্থিতির জন্য; মার্কিণ সৈন্যবাহিনী অপসারিত হইলেই এই রাজ্যটি শান্ত হইবে। বস্তুতঃ মার্কিণ সেনাবাহিনী লেবাননে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সরকার পক্ষের সহিত বিদ্রোহীদের আপোষের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। বাহির হইতে লেবাননের বিদ্রোহীরা যে সশস্ত্র সাহায্য পায় নাই, তাহাও জাতি-সঙ্ঘের পর্য্যবেক্ষকগণ স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাকে বিপ্লব ঘটিবা-মাত্র লেবাননে মার্কিণ সৈন্য পাঠাইয়াই আমেরিকা এখানকার সমস্যা জটিল করিয়াছে। লণ্ডনের "অবজার্ভার" পত্রিকার জর্ডানস্থিত সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন—বৃটিশ সৈন্যের সমর্থন হারাইলে রাজা হুসেনের রাজত্ব পাঁচ মিনিট হইতে ছয় মাস টিকিতে পারে। আইসেনহাওয়ারের প্রস্তাবের দ্বিতীয় দফায় গণ-সমর্থনবিহীন এই পাঁচ মিনিটের রাজত্বকে স্থায়ী করিবার আগ্রহ রহিয়াছে। তৃতীয় দফায় বাহির হইতে গৃহ-যুদ্ধে উস্কানি বন্ধ করার ব্যবস্থা অবশ্য ভাল কথা। কিন্তু যে দুইটি রাজ্য হইতে বৈদেশিক সৈন্য প্রত্যাহারের প্রশ্ন এখন সর্ব্বাগ্রে, সে দুইটি দেশের সহিত আপাততঃ ইহার কোনও সম্পর্ক নাই: লেবাননের প্রেসিডেন্ট চামুন এবং জর্ডানের রাজা হুসেন বাহিরের উস্কানিতে জন-প্রিয়তা হারান নাই—হারাইয়াছেন দেশের জনমত-বিরোধী নীতি অনুসরণের জন্য। চতুর্থ দফায় জাতি-সঙ্ঘের "শান্তি-সেনা" মজুত রাখিবার যে আগ্রহ, ইহা স্পষ্টতঃ শূন্যতা পূরণের বা স্থায়ী অভি-ভাবকত্ব প্রতিষ্ঠারই কথা। কোনও আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন জাতি এই ধরণের অছিগিরি নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে পারে না। পঞ্চম দফায় অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধনের এবং ষষ্ঠ দফায় অস্ত্র সরবরাহের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার প্রস্তাব অবশ্য খুবই ভাল কথা। কিন্তু আশু প্রয়োজন মধ্য-প্রাচ্য হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ করিয়া সেখানে স্বাভাবিক অবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা; স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইহার পরে অবলম্বিত হইতে পারিবে। হামারশীল্ড ও আইসেনহাওয়ারের প্রস্তাবের পর সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ গ্রোমিকো মধ্যপ্রাচ্য হইতে অবিলম্বে বিনা সর্ত্তে সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে যখন এইভাবে তুমুল বিতর্ক জমাইয়া আসিতেছিল, সেই সময় আরবরাষ্ট্রগুলি সম্মিলিতভাবে এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। ইহা উত্থাপিত হইবার পর বাহিরের কোনও শক্তির পক্ষে আরব অঞ্চলের জন্য মাথা ঘামাইবার সঙ্গত কারণ আর রহিল না। আরব প্রস্তাবটি পরিষদে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। আরব-প্রস্তাবে আরব-লীগের চুক্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, ঐ চুক্তির ৮ম অনুচ্ছেদ অনুসারে সভ্যরাষ্ট্রগুলি অন্যান্য সভ্যরাষ্ট্রের সরকার-গঠন-পদ্ধতি, রাজ্যগত অখণ্ডতা ও সার্ব্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। এই প্রস্তাবে জাতি-সঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেলকে অবিলম্বে মধ্যপ্রাচ্যে যাইয়া লেবানন্ ও জর্ডান সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘের সনদ অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য এবং সত্বর বৈদেশিক সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ জানান হয়। আরব অঞ্চলের উন্নতির জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠনে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন আরব গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিবার অনুরোধও সেক্রেটারী জেনারেলকে জানান হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেক্রেটারী-জেনারেলকে রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হয়।

আরব প্রস্তাবের ফল শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে, তাহা বলা শক্ত। হামারশোল্ড এই প্রস্তাবের মর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,ইহা "radio armistice" এর প্রস্তাব। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর জর্ডান্ ও লেবাননের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রেডিও প্রচার বন্ধ হইয়াছে। ইতিমধ্যে লেবাননে সকল পক্ষের সমর্থনে জেনারেল চেহাব প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবে। তাহার পর এই রাজ্যের সমস্যা কতকটা সরল হইলেও জর্ডানের পরিস্থিতি অপরিবর্ত্তিতই থাকিবে। সাধারণ পরিষদের আরব-প্রস্তাব এবং তৎপরবর্ত্তী মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে "নিউ ষ্টেট্স্‌ম্যান এণ্ড নেশান" পত্রিকার মন্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: "The sudden and superficial resurgence of Arab unity at the U. N, last week got the Assembly out of an apparently insoluble difficulty, but it has not necessarily settled any of the problems of the Middle East......

...It looks,......as if we are in for a temporary detente, which should certainly last long enough for the "neutral" Chehab regime to take over in Beirut at the end of September. But Jordan? Once British troops have left, the Palestinians are capable of overthrowing Hussein with or without assistance from Nasser, and this would immediately pose the problem of Israel's intentions towards the West Bank.

সুদূর প্রাচ্য—

অগাষ্ট মাসের শেষ হইতে আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনার কেন্দ্র পশ্চিম-এসিয়া হইতে পূর্ব্ব-এশিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। অবশ্য, ইহা অপ্রত্যাশিত নহে; কারণ জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশন আসন্ন এবং সেখানে কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণের প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা নিশ্চিত। সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসিবার পূর্ব্বেই কম্যুনিষ্ট চীনকে আন্তর্জ্জাতিক দরবারে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে। সম্প্রতি মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন, তাঁহারা কেন পিকিং গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিবেন না এবং কেন কম্যুনিষ্ট চীনের জাতি-সঙ্ঘে প্রবেশে তাঁহাদের আপত্তি। এই বিবৃতি সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি। আপাততঃ শুধু এইটুকু স্মরণ রাখিতে বলি যে, কিময় দ্বীপে কম্যুনিষ্ট চীনের গোলাবর্ষণ সম্বন্ধে যে চীৎকার আরম্ভ হইয়াছে, তাহা জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের আসন্ন অধিবেশন এবং আমেরিকার মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, কিময় ও মাৎসু দ্বীপ দুইটী চীনা ভূখণ্ডের সংলগ্ন। এময় বন্দরের মুখে কিময় এবং ফুচাও বন্দরের মুখে মাৎসু চিয়াং-চক্রের হাতে থাকায় এই দুইটি বন্দরের ব্যবহারে বাধার সৃষ্টি হইতেছে। দ্বীপ দুইটিতে অবস্থিত চিয়াং-এর দুইলক্ষ সৈন্য এবং অন্যান্য সমরায়োজন এখানকার শোভা বর্দ্ধনের জন্য নয়; ক্রমাগত উপকূলখণ্ডে আক্রমণ চালাইয়া কম্যুনিষ্ট চীনকে বিব্রত রাখার চেষ্টা হয় এই দ্বীপ দুইটি হইতে। কম্যুনিষ্ট-চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক তৎপরতার জন্য এই দ্বীপ দুইটির প্রয়োজন—ফরমোসা রক্ষার জন্য ইহাদের প্রয়োজন নাই। ফরমোসার প্রতি কম্যুনিষ্ট চীন তাহার সঙ্গত দাবী ত্যাগ করে নাই সত্য। কিন্তু ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনের পর হইতে সে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ফরমোসা পাইবার সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানে কিময় দ্বীপে কম্যুনিষ্ট চীনের গোলাবর্ষণ ফরমোসা সম্পর্কে তাহার গত চার বৎসরের নীতি পরিবর্ত্তনের আভাষ নয়। ফরমোসা সম্পর্কে প্রতীক্ষা করিবার নীতিতে অবিচলিত থাকিয়াও সে কিময় ও মাৎসু হইতে চিয়াং-চক্রকে বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইতে পারে; উপকূলভাগে ক্রমাগত আক্রমণাত্মক তৎপরতা বন্ধ করিবার জন্য এবং এময় ও ফুচাও বন্দর নিরাপদ করিবার জন্য ইহা তাহার প্রয়োজন। কিময় দ্বীপে কম্যুনিষ্ট চীনের গোলাবর্ষণ ফরমোসা আক্রমণের পূর্ব্বাভাষ বলিয়া আমেরিকার যে চীৎকার এবং তাহার সামরিক আয়োজনের প্রসার, উহা সম্পূর্ণ অভিসন্ধিমূলক; কারণ...there is no specific commitment to defend Matsu and Quemoy. American military opinion is reported to be that Formosa could be more easily defended if they were given up.—Economist. 23. 58.

গত ১৯৫৫ সালে আমেরিকা যখন ফরমোসা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তখন শুধু ফরমোসা ও পেস্‌কাডোরেসের কথাই বলা হইয়াছিল,—

উপকূলের সংলগ্ন দ্বীপগুলি যে কম্যুনিষ্ট চীনের, তাহা প্রকারান্তরে মানিয়া লওয়া হয়। এই সময় প্রেসিডেণ্ট আইসেন্‌হাওয়ারের ঘোষণা সম্পর্কে লণ্ডন 'টাইম্‌স্' মন্তব্য করেন, "The distinction (between Formosa-Pescadores and other islands) is based on practical considerations. Formosa has become a part of American defence chain and the Pescadores are part of Formosa defence. The other islands scattered along the west of China are of no real strategic value to the United States and have always been a part of China proper'.—Times 24.1.55. আমেরিকা এই সব দ্বীপ সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ না করিলেও এইগুলি হইতে চিয়াং কাইশেকের সৈন্য অপসারণের পরামর্শ সে দেয় নাই; তখন কেবল তাচিন্ দ্বীপ হইতে সৈন্য অপসারিত হইয়াছিল। মাৎসু ও কিময় দ্বীপকে আমেরিকা তখন কূটনীতির "বড়ে" হিসাবে ব্যবহার করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল। ঐ সময় আমেরিকা "দুই-চীন" (অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট চীন এবং চিয়াং চক্র শাসিত ফরমোসা) নীতি চালাইতে চেষ্টা করে। ফরমোসার স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা যদি পিকিং কর্তৃপক্ষ মানিয়া লয়, তাহা হইলে চীন আক্রমণের পাদভূমি মাৎসু ও কিময় ছাড়িয়া দিয়া আন্তরিকতার প্রমাণ দিবে বলিয়া সে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু পিকিং কর্তৃপক্ষ কূটনৈতিক চালে সাড়া দেন নাই। ইহার পর আমেরিকা ফরমোসা রক্ষার জন্য তাহার একক দায়িত্বকে বৃটেন, ফ্রান্স ও কমন্‌ওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করে, এবং এই সকল রাষ্ট্রের দ্বারা ফরমোসার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সত্তা স্বীকার করাইয়া "দুই-চীন" নীতি প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হয়। তখনও মাৎসু কিময় প্রত্যর্পণের প্রস্তাব ছিল উৎকোচ। কিন্তু এই মার্কিণ চালও ব্যর্থ হয়। বিশেষ-ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন—মাৎসু ও কিময় চীনা ভূখণ্ডের একেবারে সংলগ্ন এবং চীন আক্রমণের পাদভূমিরূপেই ইহাদের গুরুত্ব।

চীনের সঙ্গত অধিকার—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কেন চীন সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিতে পারে না, এবং কেন জাতিসঙ্ঘে তাহার প্রবেশের দাবীও তাহার পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দপ্তরের সাম্প্রতিক বিবৃতিতে কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক কারণ দেখান হইয়াছে। একটি কারণ, পিকিং গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লইলে এশিয়ার নূতন স্বাধীন দেশগুলি মনে করিবে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহাদিগকে ত্যাগ করিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে এশিয়ায় স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা "পরিত্যক্ত হইয়াও" চীন সাধারণতন্ত্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। পশ্চিম এশিয়ার একমাত্র লেবানন ও জর্ডান ব্যতীত সকল রাষ্ট্রের সহিতই চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক রহিয়াছে। হ্যাঁ, চীনকে স্বীকার করে নাই আমেরিকার অনুগৃহীত দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম্ ও ফিলিপাইন্‌স্। ইহারা যদি এশিয়ার প্রতিনিধি শক্তি হয়, তাহা হইলে সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় যুক্তি, যে সকল চীনা এখনও নূতন শাসন ব্যবস্থাকে মন হইতে মানিয়া লইতে পারে নাই, তাহারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিতে নূতন শাসন ব্যবস্থার নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হইবে। এই চুক্তির নির্গলিতার্থ—নূতন শাসন ব্যবস্থায় চীনে যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্যে আমেরিকা এই আশার আলোক ধরিয়া রাখিয়াছে যে, একদিন এই শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু চীনের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্ভব বলিয়া কোনও সুস্থ-মস্তিষ্ক মানুষই মনে করে না। আর, সে পরিবর্ত্তন সাধনের চেষ্টায় যে বিরাট ধ্বংসের আগুন জ্বালিতে হইবে, তাহা হইতে চীনের এই মার্কিণ-মুখাপেক্ষী গুটিকতক মানুষ ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি কি পরিত্রাণ পাইবে? আমেরিকা চীনকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান করুক, আর না-ই করুক, জাতি-সঙ্ঘে তাহার আসন লাভের অধিকার অবিসংবাদিত। ইতিমধ্যে একত্রিশটি রাষ্ট্র নূতন চীনকে স্বীকার করিয়াছে। ইহাদের জনসংখ্যা এবং চীনের জনসংখ্যার সমষ্টি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্দ্ধেক। গত বৎসর জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি নূতন চীনের জাতি-সঙ্ঘে প্রবেশের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে বৃটেনের (তৎসহ অনেকগুলি কমনওয়েলথ রাষ্ট্রেরও) বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবের পক্ষে সাতাশটি ভোট হইয়াছিল। বস্তুতঃ, জাতিসঙ্ঘে নূতন চীনের প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠান পূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব পাইতেছে না; এখানে সুদূর-প্রাচ্যের প্রতিনিধিত্ব নাই বলিলেই চলে। এই বাস্তব সত্য এখন সর্ব্বত্র উপলব্ধ হইতেছে। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন চীনকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার জন্য আমেরিকার অন্যায় জিদ্ ক্রমেই সমর্থন হারাইতেছে। এই জন্যই মার্কিণ পররাষ্ট্রীয় দপ্তর সমর্থক জুটাইবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাহ্নে বিবৃতি ছাড়িয়াছেন। কিন্তু এই ধরণের তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তিতে বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বৃটিশ শ্রমিক নেতা মিঃ বেভান্ এই বিবৃতি পাঠ করিয়া প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "If they (United States) persist in their present policies then the smaller powers should concert among themselves to defy a leadership so myopic, so smugly self-satisfied, so dangerous and so unequal to the imperious needs of the times." Tribune", 15.8.58.

পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ—

আমেরিকা ও বৃটেন শেষ পর্য্যন্ত সর্ত্তাধীনে পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ স্থগিত রাখিতে এবং এই সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইয়াছে। দ্বিধাগ্রস্ত-চিত্তে উত্থাপিত এই আলোচনা প্রস্তাব সোভিয়েট রুশিয়া সঙ্গে সঙ্গেই মানিয়া লইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে পরমাণবিক রাজনীতির গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া ক্ষীণ আশার আলোক দেখা যাইতেছে বলা

...হইতে পারে। বৃটেন ও আমেরিকার সিদ্ধান্ত—উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণ-ব্যবস্থায় বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য রুশিয়ার সহিত যেদিন আলোচনা আরম্ভ হইবে, সেইদিন হইতে তাহারা এক বৎসরের জন্য বিস্ফোরণ বন্ধ রাখিবে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে,এক বৎসরের জন্য বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার এই সিদ্ধান্ত রুশিয়ার সহিত আলোচনা আরম্ভ হইবার সর্ত্তাধীন এবং রুশিয়া যদি বিস্ফোরণ আরম্ভ করে, তাহা হইলে তখনই এই সিদ্ধান্ত বাতিল হইবে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, বৃটেন তাহার আসন্ন বিস্ফোরণের ব্যাপার শীঘ্রই মিটাইয়া ফেলিবে, এবং তাহার পর আগামী ৩১শে অক্টোবর হইতে সে সোভিয়েট রুশিয়া ও আমেরিকার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত। অর্থাৎ, এই বৎসর গ্রীষ্মকালে আমেরিকার প্রচণ্ডতম বিস্ফোরণগুলি শেষ হইলে বৃটেনের আয়োজিত বিস্ফোরণগুলিও নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইবে। তাহার পরই রুশিয়া যাহাতে বিস্ফোরণে প্রবৃত্ত হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে দুইমাস পূর্ব্বে এই আলোচনার প্রস্তাব তুলিয়া তাহার হাত বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এত কূটনৈতিক বুদ্ধি খরচ করিয়া যে প্রস্তাবের রচনা, মঃ ক্রুশ্চেভ্ তাহা নিরুদ্বিগ্নচিত্তে মানিয়া লওয়ায় প্রকৃত নৈতিক জয়টা তাঁহারই হইল, তিনি নূতন করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে, রুশিয়ার বিস্ফোরণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তটা আন্তরিকতাবিহীন চালবাজী নয়।

পরমাণবিক বিস্ফোরণের উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণ সম্ভব কিনা, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য গত জুন মাসের শেষে অ-কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট জগতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা জেনেভায় মিলিত হইয়াছিলেন। তাহারা প্রায় দুই মাস আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিস্ফোরণ বন্ধের জন্য আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি হইলে সে চুক্তির "টেক্‌নিক্যাল্" প্রয়োগ সম্পূর্ণ সম্ভব। সম্মেলন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভূপৃষ্ঠে ১৭০ হইতে ১৮০টি এবং সমুদ্রবক্ষে জাহাজে ১০টি পর্য্যবেক্ষণ কেন্দ্র যদি স্থাপিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর কোথাও বিস্ফোরণ হইলে এই সব কেন্দ্রে তাহা ধরা পড়িবেই। উত্তর আমেরিকায় ২৪টি, ইউরোপে ৫টি, এশিয়ায় ৩৭টি, অষ্ট্রেলিয়ায় ৭টি, দক্ষিণ আমেরিকায় ১৬টি, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ২টি, এবং বিভিন্ন দ্বীপে ৬০টি পর্য্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, বিমানের সাহায্যে বাতাসের নমুনা সংগ্রহের এবং সন্দেহজনক ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় মেঘ সংগ্রহের নির্দ্দেশও দেওয়া হইয়াছে। সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দুইটি পর্য্যবেক্ষণ-কেন্দ্রের দূরত্ব এক হাজার কিলোমিটার হইতে সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার হইবে। কিন্তু কোন্ কোন্ দেশে কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন, তাহার কোনও উল্লেখ রিপোর্টে নাই। জেনেভা সম্মেলনের এই সিদ্ধান্তের পর বিস্ফোরণ বন্ধের চুক্তি সম্পাদনে সচেষ্ট না হইলে বিশ্বের জনমতের নিকট পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের আর কোনও কৈফিয়ৎ ছিল না।

৭।৯।৫৮

লালী দু

হীরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি

দিন তো নয়, জগদ্দল পাথরের মত এক-একটা আলো-আঁধারের, পিণ্ড যেন গায়ে গায়ে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে চলে চড়াই-এর তুঙ্গ থেকে উৎরাই-এর ঢালু পথে। বিরাম নাই। নিঃশ্বাসের অবকাশ নাই। নিরন্ধ্র ঠাসা-ঠাসি। হলদে আর কালো।···বিদায়ের হা-হুতাশ নাই। অভিনন্দনের উৎসাহ নাই। পুরানো দিনটা নিঃশব্দে সরে যায়; নূতনটা আসে গতানুগতিক অবসাদের সুর টেনে। তবুও ওরা ছোটে; তাড়া-খাওয়া ভেড়ার পালের মত দড়বড় ক'রে ছুটে চলে খটখট শব্দে প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙিয়ে। বস্তির চাপা অন্ধকার ঠেলে বেরিয়ে পড়ে আলোর পথে নতুন দিনের সম্বলের আশায়।

অতসীর ইচ্ছা করে না বিছানা ছেড়ে উঠতে। জীর্ণ মাদুরখানার সঙ্গে পাঁজরাগুলো যেন মিশে যেতে চায়। খোকা যতদিন ছিল ওর বুকে, পাঁজরার ফাঁকে ফাঁকে নরম হাত দুখানা জড়িয়ে ওকে সজীব করে তুলতো। ওর ঝিমিয়ে-পড়া সলতেটা উসকে দিত কচিকচি আঙুলে বুকটা আঁকড়ে ধ'রে। খোকার নখে যেন জীবনীশক্তি লুকানো ছিল। মন চাইতো না একতিলও বেঁচে থাকতে। তবু খোকা যখন নখের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ক'রে ওর শীর্ণ বুকে দুধ খুঁজে বেড়াতো, অতসীর সারা গায়ে জেগে উঠতো জীবনের সাড়া। শিরা-উপশিরাগুলো চঞ্চল হয়ে উঠতো। খোকাকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে মনে মনে শপথ করতো—না না, বাঁচতে ওকে হবেই। যেমন করে হোক, পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে দুমুঠো চাল যোগাড় করে এনে, ফেন-ভাতে চটকে এক-কাঁকর নুন দিয়ে খোকাকে খাওয়াবে। বুকের দুধ যে শুকিয়ে গেল!

মরা ছেলেটাকে নিবারণবাবু যে কখন ওর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিমতলার ঘাটে পুড়িয়ে এলো, হতভাগী তা টেরও পায় নি।

আপনি সয়ে যায় সব। দেখতে দেখতে ওরও সয়ে গেল।···তখন টের পেলে, ছেলেটাকে সহজে ছেড়ে দিত না নিবারণবাবুর হাতে। ডুকরে কেঁদে উঠতো। ক'দিন ধরে কাঁদতো ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে। তারপর ওই পুঁটি গয়লানির মতন আস্তে আস্তে কান্নার সুরটা নরম হয়ে যেত।

পুঁটি গয়লানির আবার জুটেছে একজন নতুন সাঙ্গাৎ। আখড়াধারী এক বাবাজী ছিটকে পালিয়ে এসেছে ওদের বস্তিতে। ভাঙা বাড়ী যতদিন ধ্বসে না পড়ে, জোড়াতালি দিয়ে আবার নতুন বাসিন্দা এসে ঘর পাতে। পুঁটিরও হয়েছে তাই। বয়েস ছিল। বাবাজী এসে কাঁচা পারার পলতে-পোড়া ধোঁয়া দিয়ে ওর সেই ব্যামোটা সারিয়ে দিয়েছে। দু'দিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘরের কোণে পড়ে ছিল। তারপর আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। ঠিক সেই আগেকার মতন ঝলমলিয়ে উঠেছে ওর যৌবন। বয়েস যেন গায়ে ধরে না! কিনারে কিনারে ছাপিয়ে উঠেছে।

ছেলে-মরার শোক ভুলেছে। বাবাজীর কাছে ভেক নিয়ে, নাকে রসকলি কেটে পুঁটি আবার ঘরকন্না পেতেছে ওই ঘরে।

কি গো নিবারণবাবু! দু'দিন ধরে ঘরের কপাট খুলছো না কেনে?

পদ্মর গলার আওয়াজটা কানে যেতেই অতসী ধড়-ফড়িয়ে উঠে বসে: সত্যি তো! সত্যি তো নিবারণবাবু আজ দু'দিন বেরোয়নি ঘর থেকে! জ্বর-জ্বালা হয়নি তো?···অসুখ বিসুখ?

অতসী লজ্জা বোধ করে। নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হয়।…এত করেছেন নিবারণবাবু। মুখে একফোঁটা জল দিতেও যখন ছিল না কেউ, আধমরা হয়ে ঘরে পড়ে ছিল দুধের ছেলেটাকে বুকে নিয়ে, ওই নিবারণবাবুই যুগিয়েছিল ওর ওষুধ-পথ্যি। ছেলেটাকে দুবেলা দুধ এনে খাইয়েছে বাজার থেকে কিনে। অতসী কত অনুনয়-বিনয় করে মানা করেছে। তবুও শোনেনি। কোনো পিত্যেস তো ছিল না তার! কিন্তু অতসী এই দুদিনের ভিতর একবার উঁকি মেরেও খবর নেয় নি নিবারণবাবুর।

নিবারণবাবুর হাতের পয়সা যে ফুরিয়েছে, অতসী তা অনেক আগেই টের পেয়েছে। কিন্তু জেনেশুনেও কিছু করতে পারেনি। ভিক্ষের চাল দুমুটো ফুটিয়েও একদিন মুখের সামনে তুলে ধরতে পারেনি অতসী।… একবার ডেকে জিজ্ঞেসও করেনি, খাওয়া হলো কিনা! দুদিন ধ'রে লোকটা ঘরে শুয়ে আছে!…গ্লানিতে মনটা ভরে ওঠে।

তালি-দেওয়া আঁচলটুকু গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে অতসী বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। নিবারণের দরজায় কান পেতে তখনও পদ্ম দাঁড়িয়ে ছিল শিকলটা ধ'রে।

অতসীকে বেরিয়ে আসতে দেখে, একমুখ হেসে পদ্ম বলে—কিলো ফুলটুসি! মিন্‌সে বুঝি সারারাত জ্বালাতন করে, আর দিনভোর পড়ে পড়ে ঘুমোয়?

হাঁ।

সহজভাবে উত্তর দেবার প্রবৃত্তিটা পর্যন্ত নিমেষে খরিয়ে ওঠে। পদ্মর মুখপানে একনজর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অতসী চোখদুটো নামিয়ে নেয়।

আধা-বয়সী ফেরিওয়ালাটা পেঁয়াজী রঙের একখানা শাড়ি কিনে দিয়েছে পদ্মকে। ঘুম থেকে উঠেই পদ্ম স্নান করে নতুন শাড়িখানা প'রে বেরিয়েছে টহল দিতে। মাথাটা ঝাঁকিয়ে, ভিজে চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়িয়ে নিয়ে পদ্ম ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে। দুপা এগিয়ে এসে অতসীর গা-ঘনিয়ে দাঁড়ায়। নেবু-তেলের গন্ধ ভুরভুর করে গম্নাকাটির মাথায়।

এতদিনে তা হলে তোর সুবুদ্ধি হয়েছে, বল?

তাই: পাশ কাটিয়ে অতসী নিবারণের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঝন্‌ঝন্ করে শিকলটা নেড়ে ডাকে—নিবারণবাবু, ও নিবারণবাবু! দরজাটা খুলুন তো একবার।

পদ্ম অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে ওর রকম-সকম দেখে। অন্যদিন হলে সে এতক্ষণে অতসীকে বিপর্যস্ত করে তুলতো তার গম্নাকাটা ঠোঁটের ধারাল হাসিতে। ছলকানো যৌবন দুলিয়ে টিপ্পনী কেটে বলতো—অত গিদের করিস না লো! হাতের শোল পিছলে গেলে, হাত কচলে মরবি।

কিন্তু আজ আর কিছু বললে না। অতসীর চোখমুখ দেখে মনটা কেমন পিছিয়ে গেল। ও ভাবতেও পারেনি যে, ভিতরে ভিতরে অতসী এতখানি এগিয়ে গিয়েছে। কপাল ওর সত্যি ভালো!

খিলটা খুলে দিতেই অতসী নিবারণের ঘরে ঢুকে পড়লো। পদ্মর মুখের ওপর সশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

পদ্ম অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল উৎকর্ণ হয়ে। নিদারুণ পরাজয়ের গ্লানিতে ওর সর্বাঙ্গ যেন বিষিয়ে উঠেছিল। অতসীকে টিটকারি দিয়ে ও আনন্দ পায়। কাচুমাচু মুখে অতসী যখন কাঙালের মত অসহায় দৃষ্টিতে ওর মুখপানে তাকিয়ে বলে—ছি, ও কথা বলো না, পদ্মদিদি! পদ্ম আহ্লাদে আটখানা হয়। পদ্মর বুকের ভিতর হিংস্র নারী খুশীতে ভরে ওঠে। মনে মনে ও কোনদিনই সইতে পারেনি অতসীকে। অতসী যেদিন গাঁটছড়া বেঁধে দীনুকে জুটিয়ে এনেছিল ফুটপাত থেকে, পদ্মর মাথায় বাজপাখীর টনক নড়েছিল। সইতে পারেনি। অনেকবার ছোঁ মারবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অত চেষ্টা করেও যখন পারেনা দীনুকে হাত করতে, নিশুতি রাতে চোরের মত অতসীর ঘরে ঢুকে তার চুলের গোছায় দিয়েছিল টিকের আগুন ছুঁইয়ে। মাথাভরা অমন ঢেউ-খেলানো চুল চোখের নিমেষে গলে-গলে পড়েছিল। মাথা না কামিয়ে ছুঁড়ি পারেনি আর পথে বেরুতে।…উল্লাস! জয়ের উল্লাস বয়ে গিয়েছিল পদ্মর শিরায় শিরায়। অতসী যত গালাগালি করেছে, পদ্ম তত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

ভাবতে ভাবতে পদ্ম যেন উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। স্থির হয়ে একমুহূর্তও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে এগিয়ে যায় পুঁটির ঘরের দিকে।

হঠাৎ কি ভেবে চালাঙ্কিতে থমকে দাঁড়ায়: পুঁটি! অ পুঁটি!

পুঁটি ঘরে নাই। বাবাজী বসে বসে তেল ঘষছে গায়ে। রোজ তু-বেলা হাতে-পায়ে তেল ঘষে মিন্‌সে শরীরটাকে শান দিয়ে নেয়।···মরেও না!

একমুহূর্ত ইতস্তত ক'রে পদ্ম আবার ফিরলো চরকির মত মাজাটা ঘুরিয়ে নিয়ে। নিবারণের দরজা ছেড়ে যেতে, পা-তুটো যেন ওর কেবলই পিছিয়ে আসে। মনটা ছোঁক ছোঁক করে।···অতসী ঢুকেছে ঘরে!···ধড়াস করে কপাট বন্ধ ক'রে দিয়েছে ওর মুখের ওপর!

যেমন লম্বা লম্বা পা ফেলে পদ্ম এসেছিল, তেমনি হনহনিয়ে আবার ফিরে গেল নিবারণের ঘরের দরজায়।

কপাটে কান লাগিয়ে শুনবার চেষ্টা করে। অদম্য অস্থিরতায় তোলপাড় করে বুকের ভিতরটা। একবার পিছিয়ে আসে, একবার এগিয়ে যায়। তারপর এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে দিয়ে, উৎকট হাসির সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে বলে—অত দেমাক করিস না লো, মাথার ওপর ভগমান আছে।

স্থির শান্তস্বরে অতসী উত্তর দেয়: ভগবান! ভগবান আছেই তো পদ্মদিদি।

পদ্ম আর দাঁড়াতে পারে না। ঈশের মূল-ছোঁয়ানো সাপের মত মাথাটা নীচু করে ধীরে ধীরে ফিরে যায় নিজের ঘরে।

পরদিন থেকে আবার অতসী নিয়মিত বের হতে লাগলো ভিক্ষেয়। সারাটা সকাল পাড়ায়-পাড়ায় সেধে যে তু'মুঠো চাল আর তু'চারটে পয়সা সে পায়, তাই দিয়ে নিবারণকে কোনদিন আলু আর উচ্ছেভাতে-ভাত, কোনদিন বা চালে-ডালে ফুটিয়ে দেয়। নিজের ভাগ্যে হয় একমুঠো জোটে, না-হয়, তু'পয়সার মুড়ি চিবিয়ে এক মগ জল খেয়ে শুয়ে থাকে ছেঁড়া আঁচলটা মেঝেয় পেতে।

তুদিনের সর্দিজ্বরে নিবারণ বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। দেহমনে জমে উঠেছিল দারুণ নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু অতসীর অযাচিত সমবেদনার স্পর্শে মন ওর আবার সজীব হয়ে উঠলো। এতখানি আশা সে করেনি কোনদিন। কোনদিন ভাবতে পারেনি যে, এত কাছাকাছি অতসী এসে দাঁড়াবে ওর অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে।

নতুন করে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় নিবারণ আবার উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

অতসী যখন নিবারণের ঘরে কলাপাতাখানা পেতে, জলহাতে মুছে, গরম খিচুড়ির মালসাটা কাৎ করে ঢেলে দিচ্ছিল, হঠাৎ নিবারণের চোখ পড়লো মালসাটার ভিতর। অবশিষ্ট যা থাকবে, তাতে অতসীর আধপেটাও হবে না।

সঙ্কোচে নিবারণ কেমন জড়সড় হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—না না।···ওকি! সবটাই যে ঢেলে দিলে আমার পাতে!

অতি শান্ত মৃদুহাসির সঙ্গে নিবারণের মুখপানে চেয়ে অতসী বললে—ও আর কতটুকু! দিনান্তে একবার খাওয়া। রাতের বেলা তো আর জুটবে না কিছু। তু' পয়সার খই না-হয় মুড়ি খেয়ে কাটাতে হবে সারাটা রাত।

কিন্তু তোমার?

ও! তাই বুঝি ব্যস্ত হয়েছেন। মেয়েদের হাঁড়ি পুরুষদের দেখা বারণ। জল-দেয়া ভাত যা একবাটি আছে, তাই লাগবে না আমার।

নিবারণকে দ্বিতীয় কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে, অতসী তাড়াতাড়ি খিচুড়ির মালসাটা আড়াল করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিবারণ অভিভূতের মত চেয়ে রইল অতসীর দিকে। তাকে অস্বীকার করবার শক্তি ওর ছিল না।

পরের দিন ভোর বেলায় নিবারণ বেরিয়ে গেল কাজের সন্ধানে। অতসীকে জানিয়ে গেল, ফিরতে তার রাত হবে। খাওয়াটা বাইরেই সেরে নেবে আজ।

অতসী কতখানি আশান্বিত হয়েছিল বলা যায় না। তবে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিল এই ভেবে যে—পুরুষ মানুষ, চেষ্টা করলে এত বড় সহরে একটা না-একটা কিছু জুটবেই।

সকালে অতসী আর ভিক্ষেয় বেরোয় নি। সারাদিন শুয়ে শুয়ে ছেঁড়া মনটাকে বারবার জোড়া দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সন্ধ্যা না হতেই।

চাকরি নয়। একটা শার্ট আর ছাতাটা বিক্রি করে নিবারণ অনেক কিছু যোগাড় করে এনেছে। কারবারের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে কাগজ-কলম, ছাপ, আরও সব জিনিষপত্র নিয়ে। ওর এই নতুন উৎসাহ দেখে অতসী নিশ্চিন্ত হয়েছে। আবার নিঃশব্দে সে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে নিবারণের তদারক থেকে।

পদ্ম মাঝে মাঝে এসে হানা দেয়। নিবারণের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে, পা টিপে-টিপে অতসীর ঘরে ঢোকে : কিলো ছার-কপালি ! আবার কি মতিচ্ছন্ন ধরলো তোর ? সুখে খেতে ভূতে কিলোয় !

অতসী উত্তর দেয় না। একবার চোখ মেলে পদ্মর মুখপানে চেয়ে, চোখদুটো বন্ধ করে। পদ্মকে সে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু পদ্ম রেহাই দেয় না। ওর জীবনে শনিভূতের মতন লেগেছে এই গন্নাকাটি !

থুতনিটা নেড়ে দিয়ে পদ্ম চুম্‌কুড়ি কেটে বলে—কপাল তোর ভালো, তাই চাঁদের পরে চাঁদ জোটে …হেলাফেলা করিস না লো, শেষে কেঁদে মরবি।

তোমার পায়ে পড়ি পদ্মদিদি, আমাকে রেহাই দাও। মরতেই তো আমি চাই। হাড় কখানা জুড়োবে।

অতসীর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। কিন্তু পদ্মর মন তাতে নরম হয়না। কাটা ঠোঁটখানা জিব দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে বলে—মান করা ভালো। কিন্তু বেশী মান সইলে হয় ! না সওয়াই ভালো। ভালো !…একে তো আমসি। তার ওপর মানের দায়ে উপোস ক'রে ক'রে পোড়া কাঠ হয়ে উঠলি যে ! এর পরে কাকেও ঠোকরাবে না।

কাক কোকিল কোন কিছুতেই আমার দরকার নাই। তোমরা সুখে আছো, তাই থাকো পদ্মদিদি।

পদ্মকে বেশীক্ষণ থাকবার সুযোগ না দিয়ে অতসী উঠে বসে। কাপড়ের আঁচলটা সাবধানে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, কলাই-চটা বাটিটা হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে।

অগত্যা পদ্ম ওর পিছু পিছু বাইরে এসে দাঁড়ায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্ষণকাল মুখপানে চেয়ে থেকে বলে—এই অবেলায় ভিক মাগতে বেরুবি ?

হাঁ।

দরজার শিকলটা তুলে দিয়ে অতসী গলির দিকে এগিয়ে যায়। পদ্ম সরে দাঁড়ায় নিবারণের ঘরের সামনে। পা দুটো যেন তার আঠায় আটকে যায় এই জায়গাটিতে এসে।

অর্ধোদয় যোগ। পুণ্যলোভাতুর নরনারীর ভিড় জমেছে শহরের প্রাসাদে ও পথে, অলিতে-গলিতে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছে অজগর মহানগরী। অর্ধোদয় স্নানে হবে শতজন্মের পাপক্ষয়। মহাপাতক নাশ হবে এই দুর্লভ মহাযোগের পুণ্যস্নানে। তাই চঞ্চল জনতা। কাতারে কাতারে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে এসে জুটেছে অন্ধ-কুঠে-নুলো ভিকিরীর দল। পাপের তাড়নায় নয়, পেটের জ্বালায়। ওদের শতজন্মার্জিত পাপ রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে জীবনের মর্মভেদ ক'রে। মুক্তি ওরা চায় না। স্নানদান একমুঠো খুদ-কুঁড়ো না-হয় একদলা বাসিভাত, একটা-দুটো পয়সা, দুখানা শুকনো চাপাটি।

কাপড়ের আড়ালে যে পাপ ঢাকা আছে ওই উন্মত্ত জনতার সর্বাঙ্গে, সে-পাপ ওদের মজ্জায় মজ্জায় ঘুণ ধরিয়েছে অনেক আগে। ধুয়ে ফেলবার তিলমাত্র অবকাশ দেয়নি। তাই আজ আর ওদের পুণ্যের লোভ নাই। আছে শুধু হাহাকার। একমুঠো ভাতের জন্যে জঠরের উলঙ্গ তাড়না।

অতসী !

একটু ইতস্তত করে নিবারণ ঘরে ঢুকলো।

অতসী তখন বুকের কাপড়টা দাঁতে চেপে ছেঁড়া আঁচলটা সেলাই করছিল। নিবারণকে দেখে তাড়াতাড়ি আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বললে—কিছু বলবেন ?

না, তেমন কিছু নয়। বলছিলাম কি—কাল সকালে যাবে একবার গঙ্গার ঘাটে ?

না, নিবারণবাবু। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে কি করবো বলুন ?…চান করে এ পাপ তো ঘুচবে না।

স্নানের কথা বলিনি।

তবে ?…দান কুড়োতে ! চাল-ডাল-পয়সা আঁচল ভরে পাবে ভিকিরীরা। আমার তো দরকার নাই নিবারণবাবু।

কোন রকমে দিনটা কাটলেই বাঁচি। তার বেশী চাই না কিছু।

নিবারণ বিব্রত বোধ করে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা সুস্পষ্ট করে বলে—ভিক্ষের কথা বলিনি আমি। আমি জানি, ভিক্ষে তোমার ভালো লাগে না। কেনই বা লাগবে? ভিকিরীর ঘরে তো জন্মাওনি তুমি।

অতসীর মনে স্বস্তির স্পর্শ লাগে। চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে: যেন অন্ধকারের ভিতর দেখেছে একটা ক্ষীণ আলো।

একটু থেমে, নিবারণ আবার বলে—মানুষের দয়া কুড়িয়ে কে বেঁচে থাকতে চায়, বলো! তাইতো বাড়তি যে-দু'একটা জিনিস ছিল, বিক্রি ক'রে কিছু মালমশলা যোগাড় করেছি ব্যবসা করবো ব'লে।

ব্যবসা!···ভালো, খুব ভালো করেছেন নিবারণবাবু। আপনি ভদ্দরলোকের ছেলে, এমনি করে বস্তির এই ঘরে পড়ে থাকা কি আপনার মানায়?···আমি মেয়েমানুষ। অসহায়, তাই পড়ে আছি।

হাঁ। নিশ্চয়ই করবো। কিন্তু তুমি আমাকে সাহায্য করবে অতসী?

কাল সকালে মহাযোগের স্নান। গঙ্গার ঘাটে লাখ-লাখ লোকের ভিড় হবে। ধর্মেকর্মে মানুষের মতি তো এখনও কিছু কিছু আছে।

অতসী ভেবে পায় না, কি সাহায্য করবে সে! প্রশ্ন ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিবারণের মুখপানে।

নিবারণ জানে যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতসীকে দিয়ে কোন-কাজ করানো যায় না। তাই সে অনেকখানি আশ্বস্ত হয়ে ওঠে অতসীর চোখমুখের দিকে চেয়ে। একটু হেসে বলে—ভগবান সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছেন। সামনে অর্ধোদয় যোগ। অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি বৃন্দাবনের রজ, আর লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি। ছোট ছোট খামের প্যাকেট করেছি। লাল আর নীল খামের ওপর রবার-ষ্ট্যাম্পের ছাপ দেওয়া আছে। দু'পয়সা করে দাম। স্নান করে উঠে এ জিনিস পেলে, লোকে ধন্য হয়ে যাবে।··· পারবে না, থলে করে সাজিয়ে দিলে, গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রিকরতে?

অতসী নীরব হয়ে যায়। হঠাৎ যেন ওর কথাগুলো সব হারিয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠলো বিস্মৃত জীবনের আবছা-আবছা স্মৃতি। ছোটবেলার কথা। চল্লিশ দিন সান্নিপাতিকের জ্বরে ভুগে বাবার চোখ দুটোয় যখন জাল পড়ে গেল, ওর মা বামুনবাড়ী থেকে চেয়ে এনেছিল বৃন্দাবনের রজ আর জগন্নাথের মহাপেসাদ। বারবার মাথায় ছুঁইয়ে, বাবার চোখেমুখে বুলিয়ে মা রজ আর মহাপেসাদ দিয়েছিল তার মুখে।···

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ভুগে ভুগে শরীরটাও গেল, সেই সঙ্গে চোখ দুটোও গেল জন্মের মতন। তারপর একে একে সব গেল ধুয়ে মুছে। বাকী রইল শুধু সে একা।

পরদিন সকালে নিবারণের নির্দেশমত অতসী স্নান সেরে বেরিয়ে গেল তার থলে-ভরা মহার্ঘ বেসাতি নিয়ে। নিবারণ বেরিয়ে গেল অন্য পথে। সহরতলীর মেটে পথের ধুলো নিবারণের হাতে হয়ে উঠলো মহার্ঘ পণ্য: ব্রজের রজ আর লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি।

অনেক রাতে নিবারণ ফিরলো পকেটভরা পয়সা আর সিকি দু'আনি নিয়ে। কিন্তু অতসী ফিরলো না। বিপুল জনসমুদ্রের স্রোতে হয় নিরালম্ব তৃণের মত ভেসে গেল, কিংবা লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট হয়ে গেল তার অনশনক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ; না-হয় ভিকিরীর আস্তানায় আস্তানায় খুঁজে মরে দীনুকে। ওর বান-চাল নৌকা সারা রাতেও তীরে ভিড়লো না।

ক্রমশঃ

সীতারামের শ্রীচরণে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

৬ বৎসর পূর্বে হুগলীর নিকট ডুমুরদহ গ্রামে শ্রীরাম আশ্রমে যাইয়া ভক্তপ্রবর ও সাধকোত্তম সীতারামদাস ওঙ্কারনাথের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতে এক দিকে যেমন ছোট হউক, বড় হউক, যে কোন দেবালয়ের কথা শুনিলে তথায় যাইয়া মন্দির ও বিগ্রহ দর্শনের বাসনা হয়, অন্য দিকে তেমনই সাধুসন্তদের খবর পাইলেই তাঁহাদের কাছে যাইয়া থাকি। দরিদ্র মানুষ, দূরে যাইবার সামর্থ্য ও অর্থ নাই—কাজেই পশ্চিম বাংলার—পূর্বে সারা বাংলার—গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াই—গ্রাম দেখা হয়—খরচও কম পড়ে। ১৯১৯ সালে বন্ধুবর প্রাক্তন ডেপুটি-মিনিষ্টার শ্রীগোপিকাবিলাস সেনের সহিত পূজার পর প্রায় ২০।২৫ দিন বীরভূম জেলার গ্রামে গ্রামে পদব্রজে ঘুরিয়া আসিয়াছিলাম। অর্থের প্রয়োজন ছিল না—জামা, জুতা ত্যাগ করিয়া অতিরিক্ত একখানি বস্ত্র, একখানি গামছা ও একটি ছাতা মাত্র এবং সামান্য কিছু পয়সা লইয়া ২জনে পায়ে হাঁটিতাম—ঠাকুর বাড়ী বা সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ী পাইলে অতিথি হইতাম—যত্রতত্র রাত্রিবাস করিতাম। বোধ হয় মাত্র ৫।৭ বেলা আমাদের চিড়া, মুড়ি কিনিয়া খাইতে হইয়াছিল, বাকী সব দিনই "ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ" জুটিয়াছিল। তাহার পরও বহু সময় ২।৪ দিন করিয়া ঘুরিয়াছি। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলেও গ্রামে গ্রামে দেব মন্দির দেখার সুযোগ লাভ হইয়াছে। একবার কয়েক-দিন রাণাঘাট, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর অঞ্চলেও ঘুরিয়াছিলাম। বাড়ীর কাছের স্থানগুলির ত কথাই নহে—যখনই সুযোগ হইয়াছে, দেব-মন্দিরে বা সাধু-দর্শনে গিয়াছি। সীতারামের অগ্রজপুত্র শ্রীমান বিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সীতারাম লিখিত পুস্তক উপহার দিতে আসিয়া আশ্রমে যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—সেই নিমন্ত্রণেই প্রথমবার শ্রীরাম আশ্রমে যাওয়ার সুযোগ হয়। তাহার পর কয়েকবার সে সুযোগ লাভ হইয়াছিল—মেমারীতে যখন সীতারাম নামযজ্ঞ করেন, একদিন সেখানে যাইয়াও সারাদিন তথায় কাটাইয়া আসিয়াছিলাম। সীতারাম কলিকাতায় আসিলে এত ভিড় হয় যে কাছে যাওয়া যায় না—২বার দেখা করিতে যাইয়াও দূর হইতে মাত্র দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। মধ্যে তিনি বৎসরাধিক কাল ওঙ্কারেশ্বরে যাইয়া মৌনী ছিলেন—তাহার পর ফিরিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন—কাজেই তাঁহাকে দেখিবার ও নিকটে পাইবার জন্য মন কাঁদিলেও সে সৌভাগ্য হয় নাই।

তিনি ৪ মাস মগরা বাজারের নিকট অস্থায়া আশ্রম করিয়া চাতুর্মাস্য পালন করিতেছেন—সংবাদপত্রে সে সংবাদ পাইয়া শ্রীমান বিমলকৃষ্ণকে পত্র দিলাম—কোন একটা বৃহস্পতিবার দর্শনে যাইব। সোমবার ও শুক্রবার তিনি মৌনী থাকেন—বৃহস্পতিবার গুরুবার—কাজেই ঐ দিন ঠিক করিয়াছিলাম। ঠাকুরের কৃপায় সীতারাম দর্শনের সুযোগ হইল। প্রথম যে দিন যাইব ঠিক করিয়াছিলাম, সে দিন অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় যাওয়া হয় নাই। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা শিবনারায়ণ দাস লেনের কাত্যায়নী প্রেসের বন্ধুবর শ্রীমান প্রকাশ সরকার ও ভাট-পাড়ার সহকর্মী সুহৃদ শ্রীমান গোপী ভটাচার্য্য আসিয়া প্রায় ধরিয়া লইয়া গেলেন। প্রকাশচন্দ্র সস্ত্রীক সীতারামের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। আর গোপীমোহনের পিতা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত পূজনীয় শ্রীহরিচরণ স্মৃতিতীর্থ সীতারামের বিশেষ পরিচিত, সে হিসাবে গোপীও ঠাকুরকে পূর্বে দর্শন করিয়াছেন।

বেলা সাড়ে ৩টায় আমরা তিনজন সীতারামের আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও শত শত লোক প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে—স্ত্রী ও পুরুষের দল বিভিন্ন স্থানে আহারে বসিয়াছেন—তাহাদের মধ্য দিয়া আমাদের ঠাকুরের বাসগৃহে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় প্রবেশের পর এক পরিচিত বন্ধু জুটিলেন, গোপী আমার নাম করিতেই সাগ্রহে তিনি পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। একখানি ছোট ঘরে ঠাকুর থাকেন—তাহার সম্মুখে একটি বারান্দায় আমাদের বসিতে দেওয়া হইল। শুনি-লাম, মাত্র ১৫ মিনিট পূর্বে ঠাকুর বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। ভক্তের দল শুনিল না—তখনই যাইয়া আমাদের আগমন-বার্তা ঠাকুরকে দিয়া আসিল ও সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাদের সহিত মিলিত হইলেন। সে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি—যিনি সীতারামকে না দেখিয়াছেন, তাঁহার কাছে বর্ণনা করিয়া বুঝান যাইবে না। তপক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ—সদাহাস্যময় মুখ গুম্ফশ্মশ্রুমণ্ডিত—একখানি অতি ক্ষুদ্র বহির্বাস পরিহিত—মালা তিলকধারী সীতারাম সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিলেন—প্রণাম করিতেই সাদরে বুকে জড়াইয়া লইলেন—দেহ ও মন এক অপূর্ব তৃপ্তিতে পূর্ণ হইল। চির পরিচিত বন্ধুর মত আনন্দে আত্ম-হারা হইয়া তিনি বলিলেন—"হয়ত আমাকে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন—তাই প্রায়ই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া অভিভূত হইলাম। যে বৃহস্পতিবার আমার যাওয়ার কথা, সে দিন তিনি দুপুরে নিকটস্থ এক স্থানে যাইয়া আটকাইয়া পড়িয়া-ছিলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি যাইয়া তাঁহাকে না পাইয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া ফিরিয়া গিয়াছি। দয়াময় যে সেদিন ঐ জন্যই আমাকেও অন্য কাজে আটক করিয়াছিলেন, তাহা কি করিয়া জানিবেন? এত স্নেহ, এত প্রীতি, এত মমতা, এত কৃপা না থাকিলে কি লক্ষ লক্ষ লোকের ত্রাণকর্তা হওয়া যায়। সীতারামের কথা শুনিতে শুনিতে বার-বার দয়াময়ের দয়ার কথা মনে হইতেছিল—যিনি সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্টদের দমনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, তাঁহার আগমনের পূর্বে ক্ষেত্র প্রস্তুত করারও ত প্রয়োজন আছে। জগদ্বাসী মানুষ তাঁহার

আগমনের জন্য প্রার্থনা না করিলে, সে জন্য ব্যাকুল না হইলে—তিনি ত আসেন না। মনে হইল সীতারাম সে জন্য মানুষের মন প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলে মাথা বা হাত আর সে স্থান ত্যাগ করিতে চাহে না—তাই যে তিন ঘণ্টাকাল তাঁহার নিকট ছিলাম, বার বার সীতারামের শ্রীচরণে মাথা ঠেকাইয়া বা হাত দিয়া যেন আশা পূর্ণ হইতেছিল না। শত শত মানুষ—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেখানে আসিয়া বার বার তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। এই প্রণাম গ্রহণ করিতেই তাঁহার প্রত্যহ কত সময় ব্যয় করিতে হয়—বিরক্তি নাই, ক্রোধ নাই, অধীরতা নাই, সর্বদা শান্তভাবে হাসিমুখে তিনি সকলকে প্রাণ ঢালিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। দেখিতেছিলাম, আর বিস্ময়ের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি বাড়িয়া যাইতেছিল। একজন আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল—আজ ১২ মণ চাল সিদ্ধ করা হইয়াছে। ভাণ্ডারী আসিতেই ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন—যে দিন তোমার ভাণ্ডারে চালের পরিমাণ ২ শত মণের কম হইবে, সেদিন তোমার চাকরী যাইবে। বলা বাহুল্য, ইহা পরিহাসের কথা। সীতারামের ওখানে বেতনভুক চাকর নাই—সকলেই স্বেচ্ছা-শ্রমিক। অহোরাত্র কাজ করিয়া যাইতেছেন। ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করিবার জন্য সকলে ব্যাকুল। কোথা হইতে জিনিষ আসে জানি না—কিন্তু দয়াময়ের কৃপায় সেখানে কোন অভাব আছে বলিয়া মনে হইল না। যে আসিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে, তাহাকেই বলিতেছেন, "আমি এখানে আরও আড়াই মাস আছি—এখানে থাকিয়া যাও—প্রসাদ গ্রহণ করো—বহু গৃহ আছে, যেখানে ইচ্ছা বাস করো—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" লোকের প্রার্থনা শুনিতে শুনিতে একবার হাসিয়া বলিলেন—"ঠিক করিয়াছি, এবার ২টি গাছ পুতিব। একটি গাছে 'চাকরি' ফলিবে, যত ইচ্ছা তাহা পাড়িয়া চাকরীপ্রার্থীদের দান করিব। আর একটি গাছে 'পাত্র' ফলিবে—কন্যাদায়গ্রস্তদিগকে সেই গাছের ফল 'পাত্র' দিয়া সন্তুষ্ট করিব।" হাসিয়া বলিলাম, ঠাকুর আমার জন্য একটা টাকার গাছ পুতিও—দরকার হইলেই যেন আসিয়া টাকা পাই। তিনি প্রায় প্রত্যহ শত শত লোককে দীক্ষা দান করিয়া থাকেন। শ্রীমান প্রকাশ যেদিন সস্ত্রীক দীক্ষা গ্রহণ করে, সেদিন—একই দিনে তাঁহাকে ১৩ শত লোককে দীক্ষা দিতে হইয়াছিল। অশান্তিময় জগতের মানুষ শান্তিলাভের জন্য ছোটাছুটি করিয়া বেড়ায়—তাই ঠাকুরের শ্রীচরণ শীতল জানিয়া তপ্তপ্রাণকে তথায় রক্ষা করিতে ব্যাকুল হয়।

আমরা যাইবার পরই ঠাকুর এক ভক্তকে ডাকিয়া বলিলেন, "ইহাদের হাত পা ধুইবার জলের ব্যবস্থা করো ও আমার ঘরে তিনজনের জলযোগের ব্যবস্থা করো।" তিনি নিজে উঠিয়া আমাদের সঙ্গে লইয়া ঘরে গেলেন—শিষ্যরা শুধু ফল ও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"ইহারা সকাল ৮টায় ভাত খাইয়াছেন, ক্ষুধার্ত—কাজেই মুড়ি আনিয়া দাও। আমার আলমারীর মধ্যে আচার আছে—আচারের তেল মাখিয়া লঙ্কা দিয়া মুড়ি খাইতে দাও।" শুনিয়া আনন্দে আপ্লুত হইলাম। সত্যই তিনি প্রেমময়—তাই সকলের সকল কথা সর্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন। নিজে বসিয়া থাকিয়া আমাদের খাওয়াইয়া আবার বারান্দায় লইয়া গেলেন। তখন বারান্দা মানুষে পূর্ণ হইয়াছে। শিষ্যেরা প্রণামকারীদের এক দিক দিয়া ঠাকুরের নিকট আনিয়া অন্য দিক দিয়া বাহির করিয়া দিতেছে—তাহাদের বেশীক্ষণ থাকিতে দেয় না। সকলেই আমার মত বহুক্ষণ কাছে থাকিয়া ঠাকুরকে দেখিবার ও বার বার তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু কাহারও আশা পূর্ণ হইবার উপায় নাই।

দেখিলাম, বহু পরিচিত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছেন। (১) আমার হিতবাদী অফিসের সহকর্মী শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের ভ্রাতা, অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ শ্রীপ্রবোধ ঘোষ মহাশয়—তিনি বালীগঞ্জ প্লেসের অধিবাসী (২) বালীর কেদার ভবনের শ্রীমান সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় (৩) প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী (৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দূর হইতে আমাদেরই মত তীর্থদর্শনে গিয়াছেন। নিকটস্থ গ্রামসমূহের কর্মির দল, হাইস্কুলের শিক্ষকবৃন্দ প্রভৃতি নিজ নিজ প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত—আর অগণিত কৃপাপ্রার্থীর দল ত সর্বদা যাতায়াত করিতেছেন। ১২ মণ চাল সিদ্ধ হইয়াছে—ফলে ঐ দিন প্রায় এক সহস্র লোককে অন্নদান করা হইয়াছে। ইহারা কাহারা? ইহারা ত ভিক্ষুক নহে—সকলেই সীতারামের কৃপাপ্রার্থী। শুনিলাম, প্রত্যহই এইরূপ লোকসমাগম হইয়া থাকে। সোম ও শুক্রবারে মৌনী থাকিয়াও সীতারাম সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যতক্ষণ ছিলাম, যে আসিয়াছে, তাহার সহিত সানন্দে সীতারাম আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন—আমাকে পাইয়া তাঁহার যে কত আনন্দ, তাহা বুঝিতে পারার শক্তি আমার নাই।

বহুদিন হইতে তাঁহার কৃপাকণা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি সুপণ্ডিত ও সুলেখক—বহু গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ—কখনও লোক দিয়া, কখনও বা ডাকে পাঠাইয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার আশ্রম হইতে প্রকাশিত মাসিকপত্র 'দেবযান' প্রতি মাসেই নিয়মিত ভাবে পাইয়া থাকি। তাহাতেই ঠাকুরের কার্য্যসমূহের বিবরণ প্রকাশিত হয়। অন্যান্য বহু লোক যাতায়াত করা সত্ত্বেও যতক্ষণ সীতারামের কাছে ছিলাম, সকল সময়েই তাঁহার কৃপা আমার উপর বর্ষিত হইতে দেখিয়াছিলাম।

বিদায় গ্রহণের কয়েক মিনিট পূর্ব হইতে বহুবার তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিলাম—কিন্তু কিছুতেই যেন মন তৃপ্ত হইতেছিল না। মনে মনে প্রার্থনা করিতেছিলাম, আবার যেন সত্বর ঐ শ্রীচরণ স্পর্শ করার সৌভাগ্যলাভ করি। ঠাকুর নিজে আমাদের সঙ্গে অনেকটা পথ আসিয়া আমাদের মোটরে তুলিয়া দিয়া গেলেন। ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা হইতেছিল না—তথাপি কর্তব্যবোধে তাঁহাকে ছাড়িতে হইল। এইভাবে একদিন পৃথিবীর মায়া ও ত্যাগ করিতে হইবে।

সেদিন বার বার সীতারাম শ্রীমান বিমলের কথা বলিয়াছিলেন। বিমল শ্রীরাম আশ্রমে ডুমুরদহে থাকেন—কাজেই পূর্বে খবর না দেওয়ায়

তাহার সহিত দেখা হইল না—সে জন্য মনে বেদনা অনুভব করিতেছিলাম —ঠাকুর বোধহয় তাহা জানিয়াই বার বার বিমলের কথা বলিতেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরের আত্মজ শ্রীমান্ রঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থের সহিতও পরিচয় হইল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান সদানন্দ চক্রবর্তী (ইনি সে দিন তথায় উপস্থিত ছিলেন) সীতারামের জীবন কথা প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, বর্তমানে বয়স ৬৮ বৎসর। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বংশে জন্ম, পৌরোহিত্য ব্যবসায়ী। সীতারাম টোলে সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন—তাহার পর শ্রীগুরুর কৃপা লাভ করিয়া সাধনা ও তপস্যা দ্বারা বর্তমান জীবন লাভ করিয়াছেন। রুদ্রাক্ষের মালা হাতে ও গলায় ধারণ করেন, জটামণ্ডিত মস্তক—সর্বদা গুরুপাদুকা বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন। সর্বদাই রাম নাম করেন ও সকল মানুষকে সর্বদা রাম নাম করিতে বলেন। কোটি কোটি রাম নাম লেখা কাগজ সংগৃহীত হইতেছে—মন্দির নির্মাণ করিয়া ঐ সকল কাগজ তথায় রক্ষা করা হইবে। প্রতি ভক্তকে তিনি প্রত্যহ রাম নাম লিখিতে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার প্রার্থনা অবশ্যই অপূর্ণ থাকিবে না। গত দোল উৎসবের দিন তিনি কলিকাতা দেশপ্রিয় পার্কে বিরাট নাম-উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ লোক সেদিন তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

আমাদের বিশ্বাস, বিগ্রহ দর্শনের মত জীবন্তবিগ্রহ সাধু সীতারামকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে পুণ্যলাভ হয়। পাপে-ভরা জগতের মানুষকে ত্রাণ করিবার জন্যই মহাপুরুষগণ তাঁহাদের বাণী দান করেন—ভাগবতী-কথা প্রচার করেন। বর্তমান যুগে তাহার প্রকৃষ্ট সময়। ঘন অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা দেখিলে পথিক যেমন পুলকিত হয়, তেমনই ইহকাল-সর্বস্ব, জড়বাদজর্জরিত দেশে সীতারামের মধ্যে অসাধারণত্ব দর্শন করিয়া আমরাও আশ্বস্ত হইয়া থাকি। তাঁহার সাধনা সিদ্ধিলাভ করুক, দুর্গত দেশবাসীকে তিনি সুপথে পরিচালিত করিয়া তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করুন, সর্বনিয়ন্তার নিকট সর্বদাই ইহা প্রার্থনা করি।

অনেক লিখেও—

প্রভাকর মাঝি

অনেক সে লিখে গেছে: আরো হয়তো লিখবে অনেক।
ইতালী, জার্মানী চেক
নানা ভাষান্তরে তার রূপ পাবে নানান লেখাই।
তাই, তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, হুড়োহুড়ি পড়ে যেতে পারে
যেমন হুল্লোড় জমে চিড়িয়াখানার চার ধারে
খাঁচায় আবদ্ধ পোষা সিংহটার কাছে।
পাছে,
সদ্য-শেষ-করা বই কেড়ে নেয় চৌরঙ্গীর দুঁদে প্রকাশক
তাই নিয়ে লম্বা কিউ ঘরে তার চলবে সন্ধ্যা তক।
মাসিকে ও সাপ্তাহিকে জলজ্বলে নাম তার দেখে
অমুক বাবুর নামে হয়তো ছেলের নাম রাখবে অনেকে।

শব্দের প্রয়োগ তার আশ্চর্য নিখুঁত,
রূপকল্প বর্ণনাও ভারি অদ্ভুত!
কিছুটা রবীন্দ্রগন্ধী ভাষা হোক, ভালো ভাবনাটি;
কিন্তু সেই জানে তার সব ফাঁকি; কিছু নয় খাঁটি।
সে অনন্ত প্রাণ-শক্তি কোথাও কি রয়?
এক জীবনের কান্না আর এক জীবনে যাতে সঞ্চারিত হয়?
মিথ্যা ডামাডোল মাঝে একমাত্র জানে সেই জন,
—এ শুধু অভ্যাস-বশে শব্দের সমুদ্রে সন্তরণ।
রং ঢং এ খ্যাতির আড়ালে
কেউ কি দেখেছে তার দগ্‌দগে ঘা'টা কোন কালে?
আলোকিত সভামঞ্চে উন্নাসিক অধ্যাপক গদ্গদ ভাষায়
বিব্রত করবে তারে বাছা বাছা বিশেষণে হায়।
ভক্তের কোমল কণ্ঠে উঠবে তরল কলরব,
এ দেশে সকলি সম্ভব।
তারপর সাঙ্গ হোলে মালা আর চন্দনের তপ্ত সমারোহ,
টুটে গেলে দু'দণ্ডের মোহ,
স্তব্ধ নিশীথিনীর নির্জনে
নিঃসঙ্গ শয্যায় এসে ভাববে সে আপনার মনে,
—ব্যর্থতার সব লেখা, সব স্তুতি, যা কিছু দুরাশা।
জীবনে পেয়েছে সে কি একটি মেয়ের ভালবাসা?

পাট ও পীঠ

শ্রীশ

॥ বিদেশের বাজার ॥

ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো রাজ্য-সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে কয়েকটি ভারতীয় চিত্র বিদেশে বেশ সমাদরের সঙ্গেই গৃহীত হয়েছে এবং তিনি আশা করেন বিদেশে ভারতীয় চিত্রের চাহিদা আরও বাড়বে। তবে বিদেশের বাজারের জন্য চিত্র নির্ম্মাণ করতে হলে বিদেশীদের রুচি ও পছন্দের দিকে নজর রেখে চিত্র প্রস্তুত করা উচিত, আর তাতে চলচ্চিত্রের সত্যকার উন্নতিও ঘটবে।

শ্রীকানুনগোর এই অভিমতের প্রতি আমরা ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্ম্মাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় চিত্র পুরস্কার লাভ করে সম্প্রতি বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেছে। কিন্তু এই পুরস্কারলাভ করেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না—আর্থিক দিক দিয়েও যাতে ভারতীয় চিত্র সাফল্য লাভ করতে পারে সে চেষ্টাও করা একান্ত প্রয়োজন এবং তা করতে হলে বিদেশের বাজারে প্রভূত পরিমাণে ভারতীয় চিত্র যাতে প্রদর্শিত হতে পারে তার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে, আর তার জন্য বিদেশীদের পছন্দ অনুযায়ী চিত্র নির্ম্মাণের প্রয়োজন দেখা দেবে। বিদেশের বাজারে অধিকার বিস্তার করতে হলে বিদেশীরা কিরকম ধরণের চিত্র পছন্দ করে ও তাদের রুচি কিরকম সেদিকে দৃষ্টি রেখে এবং তার সঙ্গে অবশ্যই ভারতীয় বৈশিষ্ট্যকেও যোগ করে দিয়ে বিদেশীদের মনোমত অথচ ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চিত্র নির্ম্মাণ করতে হবে। আশা করি ভারতীয় চলচ্চিত্রের কর্ণধারগণ এ বিষয়ে অবহিত হয়ে বিদেশের বাজারে বিদেশী চিত্রের সঙ্গে পাল্লা দেবার উপযোগী চিত্র নির্ম্মাণে উদ্যোগী হবেন।

* * *

খবরাখবর ঃ

জাপানী গভর্ণমেণ্ট ও জাপানী মেসিনারী এক্সপোর্টারস এসোসিয়েসান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি প্রতিনিধিদল সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছিলেন। বোম্বাইএ একটি সম্বর্দ্ধনা সভায় এই জাপানী দলের নেতা মিঃ উচিদা বলেন যে জাপানে চলচ্চিত্রের যন্ত্রপাতি শিল্পটি সম্প্রতি খুবই প্রসার লাভ করেছে এবং দরকার হলে ভারতের চাহিদাও তাঁরা মেটাতে পারবেন। বিদেশী মুদ্রাবিনিময়ের অসুবিধার জন্য জাপান থেকে ভারতে এখন চলচ্চিত্রের যন্ত্রপাতির রপ্তানি খুবই কম, তবে ভবিষ্যতে যাতে এই অসুবিধা দূর করা যায় তার চেষ্টা তাঁরা করবেন। জাপানী যন্ত্রপাতি ভারতের বাজারে সুলভ হলে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি ঘটবে বলেই আশা হয়।

* * *



দুটি গৃহহীন কিশোর, একজন অন্ধ আর একজন পঙ্গু, প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে একদিন সংসারের দুরূহপথে পা বাড়ালো। তাদের সেই রোমাঞ্চকর পদক্ষেপের চিহ্ন বহন করবে অগ্রদূত পরিচালিত নবধর্ম্মী চিত্র 'লালু ভুলু'।

*　　*　　*

শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় মাদ্রাজের এ, ভি, এম ষ্টুডিওর সহযোগিতায় "আকাশ পাতাল" চিত্রটির প্রযোজনার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রথম চিত্র-প্রযোজনায় অবতীর্ণা হয়েছেন। চিত্রটির গল্প লিখেছেন শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়। পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায় এখন টাটানগর, বার্ণপুর, কুলটি প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে চিত্র গ্রহণের স্থানের জন্য ঘুরছেন। অরুন্ধতী দেবী ছাড়াও ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রা দেবী, দুর্গা খোটে, পাণ্ডারীবাঈ প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অভিনয়াংশে থাকবেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শ্রীনচিকেতা ঘোষ।

*　　*　　*

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এইচ, এন, সি, প্রোডাকসন্সের সামাজিক চিত্র "ইন্দ্রানী" মুক্তি প্রতিক্ষায় রয়েছে। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী, তপতী ঘোষ প্রভৃতিকে এই চিত্রে দেখা যাবে, তবে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনই এই ছবিটির প্রধান আকর্ষণ। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন শ্রীনীরেন লাহিড়ী এবং সঙ্গীত পরিচালক হচ্ছেন শ্রীনচিকেতা ঘোষ।

*　　*　　*　　*

এল, বি, ফিল্মস ইণ্টারন্যাসনালস্-এর পরবর্ত্তী চিত্র শ্রীসমরেশ বসুর গল্প "অকাল বসন্ত"-র পরিচালনাভার নিয়েছেন শ্রীঋত্বিক ঘটক।

মতিমহল থিয়েটারস-এর নতুন চিত্র "নারী ও নগরী"-র মোহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে। গল্পটির লেখক শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করবেন শ্রীমধু বসু।

পরিচালক শ্রীতারাশঙ্কর নালন্দা ফিল্মস-এর "আম্রপালি" চিত্রের চিত্রগ্রহণ আরম্ভ করেছেন। চিত্রটির গল্পাংশ তৈরী হয়েছে বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে।

*　　*　　*　　*



শ্রীমতী ধারা রায় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীভি, কে, কৃষ্ণমেননের হাত থেকে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর (অপেশাদারী) সার্টিফিকেট গ্রহণ করছেন। বসুশ্রী সিনেমায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ শিল্পীদের যে সার্টিফিকেটগুলি দেওয়া হয় তা ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন বেঙ্গল ফাইন আর্ট সোসাইটির সভাপতিরূপে প্রচার করেন।

বিদেশী খবর ঃ

এবারকার ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ সম্মান—গোল্ডেন লায়ন্ অফ্ সেণ্ট মার্ক—পেয়েছে একটি জাপানী চিত্র। চিত্রটির নাম "দি রিক্সাম্যান্"।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে খ্যাতনামা ব্রিটিশ অভিনেতা আলেক গিনেস্ কে "দি হর্সে'স মাউথ" চিত্রে অভিনয়ের জন্য এবং শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেছেন ইতালীর জনপ্রিয়া অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন "ব্ল্যাক্ অর্কিড" নামক চিত্রে অভিনয় করে। শ্রেষ্ঠ পরিচালকরূপে যৌথভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন ফরাসী পরিচালক লুই মাল ও ইতালিয়ান্ পরিচালক ফ্রান্সেস্কো রোজি এবং ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রিটিকদের পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে চেকোশ্লোভাকিয়ার চিত্র "দি উলভস লেয়ার"।

*   *   *   *

লেখক-পরিচালক-প্রযোজক George Seaton তিন বৎসর কার্য্যের পর অবসর গ্রহণ করায় তাঁর স্থলে পরিচালক-প্রযোজক George Stevens হলিউডের Academy of Motion Picture Arts and Science-এর সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন। George Stevens পরিচালিত সাম্প্রতিক কালের চিত্রগুলির মধ্যে "Giant" যাতে তিনি ১৯৫৬ সালে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার 'Oscer' লাভ করেন, "Shane", "A Place in the Sun", "An American Tragedy" ও "I Remember Mama" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

*   *   *

খ্যাতনামা ব্রিটিশ অভিনেতা Robert Morley Metro-Goldwyn-Mayer-এর "The Journey" নামক চিত্রে এক ব্রিটিশ ব্রড্‌কাষ্টিং জার্ণালিষ্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। এই চিত্রের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করবেন Yul Brynner ও Deborah Kerr. চিত্রটির পট-ভূমিকাটি হচ্ছে হাঙ্গেরীর কম্যুনিষ্ট বিরোধী অভ্যুত্থান এবং ছবিটির চিত্রগ্রহণ ইউরোপেই করা হবে।

*   *   *

গায়ক অভিনেতা Maurice Chevalier Metro-Goldwyn-Mayer-এর "The Blessing" চিত্রে Deborah Kerr-এর সঙ্গে অভিনয়ের পর "Gigi" চিত্রে Leslie Caron ও Louis Jourdan এর সঙ্গেও অভিনয় করেছেন, আর অধুনা কলিকাতায় প্রদর্শিত "Love in the Afternoon" চিত্রে Gary Cooper ও Audy Hepburn-এর সঙ্গে সুন্দর অভিনয় করে দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছেন।

*   *   *

ছত্রিশটি দেশ থেকে প্রায় তিনশ চলচ্চিত্র এবারকার এডিনবার্গ চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠান হয়েছে। চলচ্চিত্র প্রেরণকারী দেশগুলির সংখ্যা এবার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও এই স্কটিস রাজধানীতে পৃথিবীর নানা জাতির সংস্কৃতিবান লোকেদের ভিড় লেগে গেছে।

*   *   *

পূজারিনী খোল খোল মন্দির দ্বার

কুমারেশ ভট্টাচার্য

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া পরগণার পশ্চিমপাড়া গ্রাম। শ্যামল প্রান্তরে ঘেরা পূর্ববাংলার একটী আদর্শ পল্লী। সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্যজীবন। গ্রামবাসীদের মোটা ভাত-কাপড়ের নেই কোন অভাব-অভিযোগ। ঐশ্বর্যে তারা প্রলুব্ধ হয় নি, দারিদ্র্যেও হয় নি ম্রিয়মাণ। বার মাসে তের পূজাপার্বন। সেই সঙ্গে যাত্রা-থিয়েটার, গান-বাজনার আনন্দে গ্রামখানা ছিল মুখর।

আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর পূর্বের কথা। উক্ত গ্রামের বিখ্যাত চক্রবর্তী-বংশের আট-ন' বছরের একটী বালককে রোজই প্রায় দেখা যেত আপন মনে গান গেয়ে চলেছে গ্রামের পথে-মাঠে-ঘাটে। পথিক ক্ষণেকের জন্যে থম্‌কে দাঁড়াত বালকের অতি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে, একতারা হাতে কোন বোষ্টম বা বোষ্টমী ভিক্ষার কথা ভুলে গিয়ে অবাক্‌বিস্ময়ে চেয়ে থাক্‌ত বালকটীর দিকে, শুনত তার গানের অপূর্ব সুরঝংকার। কলসীকাঁখে পুকুরের ঘাটের দিকে যেতে যেতে লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠনবতী গ্রাম্যবধূগণের গতি হ'ত মন্থর—বালকটীর গানের সম্মোহনশক্তিতে। সেদিনকার সেই বালকই আজ ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত সংগীতসাধক সংগীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী।

বাংলা ১৩১৫ সালে চৈত্র মাসে নিষ্ঠাবান পণ্ডিতবংশে তারাপদবাবু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃপুরুষগণ প্রায় সকলেই ছিলেন প্রকৃত সংগীতসাধক। সুতরাং সংগীতে ছিল তাঁর সহজাত অনুরাগ ও অধিকার। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি তবলা সংগত করেছেন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞদের সংগে। এ যেন তার বিধিদত্ত ক্ষমতা। তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় কুলচন্দ্র চক্রবর্তীমশাই বিশেষ আগ্রহে ও যত্নে পুত্রকে সংগীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তিনি নিজেও ছিলেন সংগীতে বিশেষ পারদর্শী। এদিকে তারাপদবাবুর সংস্কৃত চর্চাও চলল নিয়মিত। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে লাভ করেন অসাধারণ জ্ঞান। পিতৃদেবের ইচ্ছানুসারে মাত্র ১৬ বছর বয়সে তারাপদবাবু দারপরিগ্রহ করেন। এর কয়েকমাস পরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

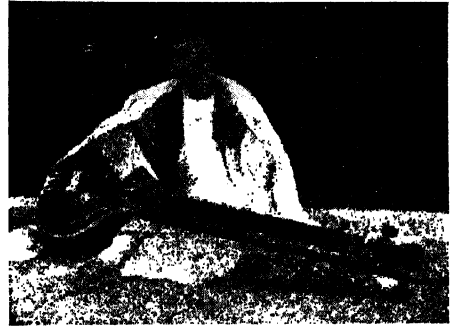
১৮ বছর বয়সে প্রতিভাবান শিল্পী প্রথম এলেন কোলকাতায়। আশ্রয় নিলেন মাতুলের বাসায়। আর্থিক অবস্থা তখন তাঁর অত্যন্ত শোচনীয়। সুপ্রসিদ্ধ অন্ধগায়ক স্বর্গীয় সাতকড়ি মালাকার মশাইয়ের কাছে আরম্ভ হল সাধকের সংগীত শিক্ষা—খেয়াল ও টপ্পা। সাধনার পথ কোনদিনই কুসুমাস্তীর্ণ নয়—কণ্টকাকীর্ণ। চরম দুঃখ-দারিদ্র্য প্রভৃতি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও সাধক যদি থাকতে পারেন অচঞ্চল, ধৈর্যশীল, তবেই তাঁর সাধনা হয় জয়যুক্ত।

একাদিক্রমে পাঁচবছর ধরে চলল তারাপদবাবুর কঠোর সংগ্রাম ও সাধনা। মাত্র কয়েক মাস মাতুলালয়ে থাকবার পরই তিনি আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন কোলকাতার রাস্তায়। কোন বাড়ীর উন্মুক্ত বারান্দায় অর্ধাহারে ও অনাহারে কেটেছে তাঁর বহুদিন—ভোগ করতে হয়েছে পাহারাওয়ালা পুলিশের উপদ্রব। এ সময়কার একদিনের একটা কৌতূহলজনক ঘটনা বলছি—রাস্তার পাশে একটী খোলা বারান্দায় তারাপদবাবু শুয়ে আছেন। গভীর রাত। এক পাহারাওয়ালা পুলিশ এসে তাঁকে ডেকে তুলল, সন্দেহবশে জিজ্ঞেস করল নানা প্রশ্ন। তারাপদবাবু জানালেন সংগীত শিক্ষাই তার একমাত্র কাজ। পুলিশটা বিশ্বাস করলোনা প্রথমে। শুনতে চাইলো তাঁর গান। অগত্যা শিল্পী তাকে একখানা হিন্দী গান শুনিয়ে দিলেন। অবাক হয়ে শেষে সে বললো—বাবু, এমন সুন্দর গান তুমি গাইতে পার অথচ এভাবে রাস্তায় থাক কেন? উত্তরে একটী দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল শিল্পীর বুকখানা থেকে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, বর্তমানে কণ্ঠসংগীতে বাংলার মুখোজ্জ্বলকারী এই সাধকের প্রথম যৌবনের কতদিন কেটে গেছে কোলকাতা মহানগরীর রাজপথে—কপর্দকহীন অবস্থায়। যেখানে কোন জলসার আয়োজন হ'ত তারাপদবাবু সেখানে যেতেন। যে সুর একবার তাঁর কানে যেত, তা তিনি আয়ত্ত করে নিতেন খুব সহজেই।

এভাবে চরম দুঃখ ও কষ্টের ভেতর দিয়েও তিনি একাগ্র সংগীত সাধনায় মগ্ন ছিলেন। ভাগ্যক্রমে, একদিন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ রাইচাঁদবাবুর সংগে হয় তাঁর প্রথম আলাপ এবং তাঁরই চেষ্টায় কোলকাতা বেতার কেন্দ্রে সামান্য বেতনে তিনি তবলাবাদকের একটী চাকরী পান। ঐ সময় একদিন নির্দিষ্ট এবং বিখ্যাত শিল্পী স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামীর অনুপস্থিতিতে বেতার কর্তৃপক্ষঅনুরোধ করেন তারাপদবাবুকে গান গাইতে। সেদিন তিনি খেয়াল গানে শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করেছিলেন। জনসাধারণের কাছে পরিচিতি লাভের সেই তাঁর প্রথম সুযোগ। ক্রমে ক্রমে তাঁর খ্যাতি ও যশ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে।

এর আট-ন' বছর পরে ভারতের শ্রেষ্ঠ সংগীতসাধক স্বর্গীয় গিরিজাশংকর চক্রবর্তী মশাইয়ের কাছে তিনি শিক্ষা করেন সংগীতশাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব। এ যেন মণিকাঞ্চন যোগ। অল্প সময়ের মধ্যে সাধক ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুংরী গানে সিদ্ধিলাভ করেন। ক্রমশঃ তাঁর নাম ও যশ বাংলা পেরিয়ে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার বাইরে বহুস্থানে তিনি সংগীত অধিবেশনে বহুবার যোগদান করেছেন। লাভ করেছেন বিপুল খ্যাতি ও বহু স্বর্ণপদক।

তারাপদবাবু একজন সুর স্রষ্টা ও স্বভাব কবি। তাঁর



শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী

প্রায় প্রত্যেকটী গানই স্বরচিত। হিন্দুস্থান, মেগাফোন, হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস্ কোম্পানীতে তাঁর বহু গান রেকর্ড হয়েছে। 'পূজারিনী খোল খোল মন্দির দ্বার', 'কোথা গেল শ্যাম' প্রভৃতি রাগ প্রধান গান সবাইকে মুগ্ধ করে।

গত ৪ বছরের মধ্যেও কলকাতা বেতার কেন্দ্রে বাংলার এতবড় শিল্পীর কণ্ঠস্বর শোনবার সুযোগলাভে জনসাধারণ বঞ্চিত। এর কি নিগূঢ় কারণ তা আমরা বুঝতে পারি না। কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ কোলকাতায় তিনি 'সুরতীর্থ' নামে একটী সংগীত কলেজ খুলেছেন এবং 'সুরতীর্থ' নামে একটী গীতি কাব্যও রচনা করেছেন। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই আজ বেতারকেন্দ্রের শিল্পী। তারাপদবাবুকে নানাদিক দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য ক'রেছেন তাঁর ছাত্রী শ্রীনীহারকণা মুখোপাধ্যায় এম-এ এবং তাঁর স্বামী পশ্চিমবংগ ব্যবস্থা পরিষদের সুযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীঅজিতপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

তারাপদবাবুর বয়স এখন ৪৯ বছর। তিনি একজন সত্যিকারের নীরব সংগীতসাধক। আত্মপ্রচার আর অর্থই তাঁর লক্ষ্য নয়। সাধনাই তার একমাত্র লক্ষ্য। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এই অমায়িক, নিরহঙ্কার, আত্মভোলা প্রকৃত সংগীতসাধকের জীবন হোক সুদীর্ঘ ও শান্তিময়।







শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম ঃ

সন্তরণে ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম ক্রীড়াজগতে এক দুঃসাহসিক অভিযান। ইংলিস চ্যানেলের এক তীরে ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজ (Cape Gris Nez) এবং বিপরীত তীরে ইংলণ্ডের ডোভার। বিশ্বখ্যাত ইংলিস চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতার দূরত্ব পথ হ'ল কেপ গ্রিজ নেজ থেকে ডোভার—২১ মাইল জল পথ। ১৯৫৮ সালের এই ইংলিস চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা সহ ৩০ জন যোগদান করেন। আমেরিকার ডেনিস মহিলা সাঁতারু গ্রেটা এণ্ডারসন সর্বপ্রথম লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে বাটলিন ট্রফি এবং নগদ ৫০০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত বছরও গ্রেটা এণ্ডারসন প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এই সন্তরণ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত তিনি ছাড়া আর কোন সাঁতারু উপর্যুপরি দু'বছর প্রথম স্থান লাভ করতে পারেন নি। আগামী বছর তিনি যদি প্রথম স্থান লাভ করতে পারেন তাহলে উপর্যুপরি তিনবার প্রথমস্থান লাভ করার কৃতিত্ব স্বরূপ চিরকালের জন্যে ১,০০০ গিনি মূল্যের বাটলিন কাপ পেয়ে যাবেন। ১১ ঘণ্টায় ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম ক'রে গ্রেটা এণ্ডারসন সময়ের দিক থেকে মহিলাদের মধ্যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিল ব্রিটেনের ব্রেণ্ডা ফিসারের (১২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট)।

প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানবাসী ব্রজেন দাস দ্বিতীয় স্থান লাভ ক'রে ৫০০ পাউণ্ড পুরস্কার পান। দূরত্ব পথ অতিক্রম করতে তাঁর ১৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় লাগে। প্রথমবারের চেষ্টায় ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম ক'রে তিনি রাতারাতি বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে খ্যাতিলাভ করেছেন। এশিয়া-মহাদেশের সাঁতারু হিসাবে তিনিই প্রথম ইংলিস চ্যানেল অতিক্রম ক'রে পুরস্কার লাভ করলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, ব্রজেন দাস কলকাতায় অবস্থানকালে বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষ ও শ্যামাপদ গোস্বামীর শিক্ষাধীনে থেকে প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারের কলাকৌশল শিক্ষালাভ করেন এবং পাকিস্তানী সাঁতারু হিসাবে উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৪৮-৫০) পশ্চিমবঙ্গ সন্তরণ চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থান লাভ করেন। দেশ বিভাগের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দাস ক'লকাতার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য ছিলেন।

ইউরোপীয় এ্যাথলেটিক অনুষ্ঠান ঃ

ষ্টকহলমে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় এ্যাথলেটিক অনুষ্ঠানে রাশিয়া পদক-লাভের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করে। রাশিয়া মোট ১১টি স্বর্ণপদক পায়।

ইংলণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ড ঃ

নিউজিল্যাণ্ড : ১৬১ (পেত্রী ৪১)
ও ৯১ (৩ উইকেটে)

ইংলণ্ড : ২১৯ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ওভালে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম নিউজিল্যাণ্ডের ৫ম বা শেষ টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত শেষ হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত পণ্ড হয়। ২য় দিন মাত্র ১০ মিনিট খেলা হয়, রাণ কোন হয় না। ৩য় ও ৪র্থ দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। ৫ম দিনে ইংলণ্ড ৯ উইকেটে ২১৯ রাণ তুলে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ফলে ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলায় ৫৮ রাণে অগ্রগামী হয়।

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মের খুবই আশা ছিল, তিনি তাঁর বোলারদের নিয়ে নিউজিল্যাণ্ডকে হারাতে পারবেন। কিন্তু সাটক্লিফ এবং রীডের ৪র্থ উইকেটের জুটী ইংলণ্ডের সমস্ত আশায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। খেলা শেষ হ'তে আড়াই ঘণ্টা থাকতে নিউজিল্যাণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। নিউজিল্যাণ্ডের ৩টে উইকেট পড়ে যায়। ৪র্থ উইকেটে সাটক্লিফ এবং রীড জুটী বেঁধে শেষ পর্য্যন্ত অপরাজেয় থেকে যান।

পাঁচটি টেষ্ট খেলার ব্যাটিং গড়পড়তা তালিকায় ইংলণ্ডের পক্ষে মিলটন শীর্ষস্থান লাভ করেন। দুটো খেলায় দুটো ইনিংস খেলে তাঁর গড়পড়তা দাঁড়ায় ১৪০.০০ রাণ। দ্বিতীয় স্থান পান পিটার মে ৬ ইনিংসের খেলায় গড়পড়তা রাণ ৬৭.৪০।

নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ে শীর্ষস্থান লাভ করেন মোয়ের—৩টে ইনিংসে গড়পড়তা ৭৪.০০ রাণ। বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় ইংলণ্ডের পক্ষে শীর্ষস্থান পান লক্—ওভার ১৭৬, মেডেন ৯৩, রাণ ২৫৪, উইকেট ৩৪, গড়পড়তা ৭৪.৭। নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে বোলিংয়ে শীর্ষস্থান লাভ করেন ম্যাকগিবন—ওভার ১৭৫, রাণ ৩৮৯, উইকেট ২৯, গড়পড়তা ১৪.৪৫।

রেঙ্গুন সফরে ভারতীয় ফুটবল দল ঃ

রেঙ্গুন সফরে অল-ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন একাদশ দল পাঁচটি খেলায় যোগদান করে। ভারতীয় ফুটবলদল ৩টি খেলায় জয়ী হয় এবং ২টি খেলায় হার স্বীকার করে। সংক্ষিপ্ত ফলাফল : ভারতীয় দল ১ : বার্মা ডিফেন্স সার্ভিসেস দল—০। ভারতীয় দল ৩ : বার্মা ডিফেন্স সার্ভিসেস দল ১। বার্মা বাছাই একাদশ—২ : ভারতীয় দল—১। বার্মা বাছাই একাদশ—১ : ভারতীয় দল—০। ভারতীয় দল—৫ : আপার বার্মা বাছাই দল—৩।

রেলওয়ে ফুটবল ঃ

১৯৫৮ সালের অল-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইষ্টার্ণ রেলদল ২-০ গোলে সাউথ ইষ্টার্ণ রেলদলকে (মারুণ) পরাজিত করে।

কাউণ্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

ইংলণ্ডের কাউণ্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসাপ প্রতিযোগিতায় (১৯৫৮) সারে ক্রিকেটদল চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এ নিয়ে সারে দল উপর্যুপরি সাত বছর কাউন্টি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান হ'ল। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এতবার কোন দল উপর্যুপরি চ্যাম্পিয়ান হ'তে পারেনি।

আমেরিকান লন্ টেনিস ঃ

১৯৫৮ সালের আমেরিকান লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনালে পুরুষদের সিঙ্গলসে অষ্ট্রেলিয়ার এ্যাসলি কুপার, মহিলাদের সিঙ্গলসে আমেরিকার মিস এ্যালথিয়া গিবসন এবং মিক্সড ডাবলসে নীল ফ্রেসার (অষ্ট্রেলিয়া) এবং মিসেস মার্গারেট ডু পণ্ট (আমেরিকা) জয়লাভ করেন। ফাইনালে কুপার পরাজিত করেন স্বদেশবাসী মল এ্যাণ্ডারসনকে। এ্যালথিয়া গিবসনের কাছে পরাজিত হ'ন আমেরিকার ডার্লিন হার্ড। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এবছরের উইম্বলডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতায় এ্যাসলি কুপার এবং এ্যালথিয়া গিবসন যথাক্রমে পুরুষ এবং মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে জয়লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু ও ব্লেজার ঃ

স্বর্গীয় বীমাবিদ পূর্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের পৌত্র ও শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীঅনিরুদ্ধ রায়



শ্রীঅনিরুদ্ধ রায়

রোয়িংএ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু ও ব্লেজার সম্মান পেয়েছেন। শ্রীমান অনিরুদ্ধ প্রেসিডেন্সি কলেজের এম-এ ক্লাসের ছাত্র। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের মার্শাল

অফ্ স্পোর্টস, ফুটবলের ক্যাপ্টেন ও সেক্রেটারী এবং রোয়িংয়ের সেক্রেটারী। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ও রোয়িংয়ের বিভিন্ন আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় তিনি যোগদান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তিনি কলম্বো ও কলকাতায় বহু বাইচ প্রতিযোগিতায় মনোনীত হ'ন। অন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বাইচ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের তিনি সভ্য ছিলেন।

ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি ঃ

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর সভানেত্রীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির ৩৬তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমিতির সভ্য এবং সভ্যারা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'মনসা মঙ্গল' নাটকটি নৃত্য ও গীত সহযোগে জলক্রীড়ার মাধ্যমে অভিনয় ক'রে উপস্থিত দর্শকদের চমৎকৃত করেন। এই জল-নাটিকায় গৌরাঙ্গ মল্লিক, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল দাশগুপ্ত, প্রতিমা মুখার্জি, রীণা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দিরা সেনরায় তাঁদের নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় ক'রে দর্শক সাধারণের প্রশংসা লাভ করেন।

প্রত্যয়

শ্রীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়

যে কথা মোর বাজছে আজি প্রাণে
বলে যাবো বিদায় বেলার গানে
এই তো অবসর।
ভালবাসার মিথ্যা ছলনাতে
খেলা শুধু করেছি তোর সাথে
বাঁধবো বলে ঘর।
এখন আমার শুধু মনে হয়
বলেছি যা মনের কথা নয়
সরম লাগে তাই।

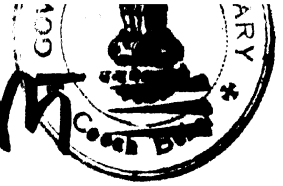
ফাঁকি তোমায় দিয়ে গেছি বলে
আমিও ফাঁকি পেয়েছি প্রতিপলে
স্বীকার করে যাই।
দিইনি কিছু করেছি দেবার ভাণ
তবুও তুমি চাওনি প্রতিদান
বেঁধেছো প্রেমরাখি।
অনুতাপে জ্বলছে হিয়া হায়
যাবার বেলা ক্ষমা চেয়ে যায়
সজল দু'টী আঁখি।

না পাওয়ার পরাজয়

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

অনুরাগে এত ব্যথা হয়?
আকাশের মত উদাসী এ প্রাণ
তারকার চোখে চেয়ে রয়!
নীল ছোঁয়া হায় অসীম বাতাস
নিশ্বাসে কত কেঁদে বয়।
কত ভালবাসা কত প্রেম
সবই গেল কিগো মুছিয়া,
ভেবেছিনু এই নিকসিত হেম
পাবো একদিন খুঁজিয়া।
মিলনের হবে জয়।
গোধূলির ধূলি আঁধার করিল
এ দুটি চোখ।
সন্ধ্যামণির পরশে না আছে
কোনো আলোক।
সবুজ জীবনে পাতা ঝরা জল,
শিশিরের কণা করে টলমল,
বুক ফাটা সে যে,
না পাওয়ার পরাজয়!
অনুরাগে এত ব্যথা হয়।

সাহিত্য সংবাদ



স্বপন বুড়োর মজার গল্প ঃ স্বপনবুড়ো

আলোচ্য গ্রন্থে দশটী মজার গল্প আছে। শুধু ছেলেমেয়েরা নয়, বয়স্করাও পড়ে হাসি চাপ্‌তে পারবে না এম্নিভাবে প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বপন বুড়ো পাকা হাতের মুন্সিয়ানা দেখিয়ে গল্পগুলিকে রসোত্তীর্ণ করেছেন। গ্রন্থকার যে রসের ভাঁড়ারী একথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রথমেই মনের মত ভাড়াটে পেয়েও শেষে জগদ্দুলবাবু নিজের নাক ডাকার দোষে একটির পর একটিকে হারালেন, পাড়ায় বিশৃঙ্খল অবস্থাও ঘটলো। শেষে বাধ্য হয়ে বিজ্ঞাপন দিলেন—'বধির পরিবারের আবেদন সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হইবে—' কণ্টকিত কাহিনীতে মুস্ট্ তেনজিং হবার যে কল্পনা করেছিল, তা ব্যর্থ হয়ে গেল। ঝাঁকা মুটের মাথায় চড়ে বাড়ী আস্‌তে হোলো বেল কাঁটা পায়ে ফুটে যাওয়াতে,—পায়ের কাঁটা কোন রকমে বের করলো বিস্তি খেলাঘরের খুন্তি দিয়ে। মন্দির প্রবেশেও পল্টুর অবস্থা কাহিল করে তুলেছিলেন শুচিবায়গ্রস্তা ঠাকুমা—কিভাবে চোর ধরা পড়লো সেও শুনবার মতো। এই রকম সব গল্প আছে। কিশোর রচনা প্রতিযোগীতায় শশীর অবস্থা, খোদনের জ্যাঠামশায়ের উপদেশ ও কাণ্ডকারখানা, ফেকুচাঁদের ফটোর ফ্যাসাদ বহুরূপীর মধ্যে গোঁসাইজীর কাণ্ড ছেলেদের অভিনয়ের সময়ে, বরযাত্রী ট্যাপ্‌নার বিপদ, পয়লাগোপেশের ভোজ, বনভোজনে জিলিপির আর্ত্তনাদ খুব উপভোগ্য হয়েছে। খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীমান রেবতীভূষণের চিত্রাঙ্কণ ও প্রচ্ছদ সজ্জা চিত্তাকর্ষক। আশা করা যায় ছেলেমেয়েদের মহলে গল্পগুলি খুব সমাদর পাবে, আমরা পড়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছি। গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

[প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্‌লিসিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭, মূল্য—এক টাকা আট আনা।]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গীতায় ঈশ্বর বাদ ঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

১৩৬২ সালে ৫৩ বৎসর পূর্বে মনীষী ও সুধী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই গ্রন্থ যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন হইতেই ইহা বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইহার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। প্রকাশক ১৩৬৫ সালে ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য জগতের ধন্যবাদ ভাজন হইলেন।

[ষষ্ঠ সংস্করণ, মূল্য ৩'০০ টাকা। প্রকাশক শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪]

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কি ছিল, কি হল ঃ শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

উদ্বাস্তুদের নিয়ে অনেকে অনেক কবিতা, নাটক, উপন্যাস লিখেছেন। ছায়াচিত্রও তৈরী হয়েছে কিছু। উদ্বাস্তুজীবনের দুঃখকষ্টই তুলে ধরেছেন অনেকে। এ গ্রন্থেও তা আছে। কিন্তু ইহাই এর শেষ বক্তব্য নয়। জীবনের দুঃখদারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার কথা বলতে গিয়ে তিনি পূর্ববাঙলার যে ছবি এঁকেছেন সত্যি তা' হৃদয়স্পর্শী। কেন বাঙলার এমন হল তার মূল তিনি সন্ধান করেছেন, আবিষ্কার করেছেন। শুধু তাই নয় সে-সব গ্লানি, অবিচার অনাচার এখন ভারতেও দুর্লভ নয়। তার থেকে মুক্তিলাভের উপায় তিনি ভেবেছেন,—আশার আলোও দেখতে পেয়েছেন।

জলধরবাবু প্রবীণ নাট্যকার। তার উপন্যাসের নাটকীয় পরিস্থিতি যথেষ্ট রয়েছে। তাছাড়া যে কয়টি গান তিনি সন্নিবেশিত করেছেন, সেগুলি খুব উঁচুদরের। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হলে দেশের কল্যাণ হবে।

[প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী। ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলিকাতা ৬। মূল্য তিন টাকা]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

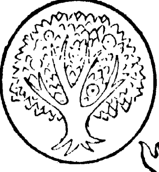
সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

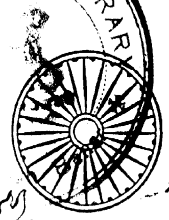
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



"বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

শিল্পী : শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।" ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্











ভারতবর্ষ

কার্ত্তিক—১৩৬৫

প্রথম খণ্ড | ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

দুর্গাপূজার মাস

শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

বর্ত্তমান যুগ বিচারবাদের যুগ। রামায়ণ কবি-কল্পনা, না সত্য—এই প্রশ্ন বিন্দুমাত্র অসম্ভব নয়। যাঁহারা সত্য ঘটনারূপে রামায়ণকে স্বীকার করিয়া থাকেন অথবা যাঁহারা ইহাকে আদিকবির মহাকাব্যমাত্র—এই আখ্যা দিয়া থাকেন, শারদীয়া পূজার কাল উভয়েরই আলোচ্য বিষয়। শ্রীরামচন্দ্র কি অকালে বোধন করিয়াছিলেন?

শ্রীরামচন্দ্রের ৺দুর্গাপূজার কাল সম্বন্ধে সাধারণতঃ তিনটি মত দেখা যায়। শ্রীরামচন্দ্র আশ্বিন মাসেই শ্রীদুর্গোৎসব করিয়াছিলেন। অন্যে অন্য কথা বলিয়া থাকে—দুর্গাদেবী চৈত্র মাসেই শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছিলেন। আর একদল শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবই অস্বীকার করেন।

প্রথম মতের অনুকূলে বলা যায়—৺দুর্গোৎসবের বোধনের মন্ত্র ইহা সমর্থন করে।

রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা।
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্ বোধয়ামি সুরেশ্বরী॥

দেবী পুরাণ॥

কালিকাপুরাণেও ইহার অনুরূপ অভিমত দৃষ্ট হয়—

রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেধ মহাদেবী ব্রহ্মণো বোধিতা পুরা॥
ততস্তু ত্যক্ত নিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনেসিতে।
জগাম নগরীং লঙ্কাং যত্রাসীদ্ রাঘবঃ পুরা॥

গণের কবি কৃত্তিবাসও ঐ পথেরই পথিক হইয়াছেন—

সেদিন নাহিক আর পূজা হবে কি প্রকার
শুক্লা ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে।
কন্যারাশি মাস বটে কিন্তু পূজা নাহি ঘটে
অত্র যোগ সব হৈবে যাতে॥

* * * *

"অকালে বোধন করি পূজ দেবী মহেশ্বরী
তরিবে এ দুঃখ পাথার॥"

পুরাণ ও কাব্যের সহিত তন্ত্রও সমস্বরে বলিতেছে—

রাম রাবণয়োর্যুদ্ধে দুর্গা রামেন পূজিতা।
অবধীদ্ রাবণং রাম ইষেমাসি প্রপূজনাৎ।
তেন লোকাশ্চরিষ্যন্তি দুর্গায়া শারদোৎসবম্॥

রাম রাবণের যুদ্ধে রামচন্দ্র আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা করায় রাবণকে বধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে লোকে শরৎকালে দুর্গাপূজা করে।

অন্য মতে যথেষ্ট বক্তব্য আছে। রামচন্দ্রের অভিষেকের ব্যবস্থা হইয়াছিল চৈত্র মাসে এবং এই সময়েই পরদিন বন-গমন করেন। বনবাসের কাল চতুর্দশ বর্ষ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। চৈত্র মাসের পূর্বে চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব চৈত্র মাসেই দুর্গাপূজা হইয়াছিল। রাম-চন্দ্রের অভিষেক সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণে দশরথ মন্ত্রীদিগকে বলিতেছেন—

চৈত্রঃ শ্রীমানয়ঃ মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিত কাননঃ।
যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্বমেবোপকল্পকাম্॥ অযোধ্যা।

চৈত্র মাস পুণ্যমাস! রামের অভিষেকের সকল আয়োজন করা হউক। ইহা হইতে জানা যায় অভিষেকের ব্যবস্থা চৈত্র মাসেই হইয়াছিল। ঐদিন তিনি বলিয়াছিলেন—

বনে বৎস্যামি বিজনে বর্ষাণীহচতুর্দশ।
ততোহস্থৈব গমিষ্যামি দণ্ডকানাং মহদ্বনম্॥
(ঐ ১৯।২৪)

চতুর্দশ বর্ষ বনে বাস করিব। মহাবনে দণ্ডকারণ্যে অদ্যই যাইব।

চৈত্র শুক্লা দশমীই রামচন্দ্রের বনগমনের প্রথম দিন। তাহা হইতে চতুর্দশ বর্ষ পূরণ হইতে হইলে চৈত্র মাসেই হইবে। বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে কার্য সমাধা হইয়াছে। বিন্দুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নয়। বিশাল ঐশ্বর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। অযোধ্যা উদ্দেশে যাত্রা করিয়া পথে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

পূর্ণে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ।
ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা ববন্দে নিয়তো মুনিম্॥
লঙ্কা ১২৬।১

রামচন্দ্র চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হইলে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ভরদ্বাজ মুনিও অভ্যর্থনা জানাইলেন—

অহমপ্যত্র তে দদ্মি বরং শস্ত্রভৃতাং বর।
অর্ঘ্যং প্রতি গৃহাণেদমযোধ্যাং শ্বোগেমিষ্যসি॥
(ঐ ১২৬।২০)

আমি তোমাকে বর দিতেছি। তুমি আমার অর্ঘ্য গ্রহণ করতঃ কল্য অযোধ্যায় যাইও। চৈত্রী শুক্লা দশমী বনবাসের প্রথম দিন হইলে চৈত্রী শুক্লা নবমীতে রাবণ বধের দিন ধার্য্য হইলেই চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হয়। তাহা হইলে রামচন্দ্র চৈত্রে দুর্গাপূজা করিয়াছেন।

তৃতীয় মতেরও বক্তব্য যথেষ্ট। প্রমাণেরও অভাব নাই। বাল্মীকি রামায়ণ ইহাদের মতের পরিপোষক। রামচন্দ্র দুর্গাপূজাই করেন নাই। অগস্ত্য মুনির উপদেশে রাবণ বধের পূর্বদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যের পূজা ও আদিত্য-হৃদয় জপ করতঃ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

উপাগম্যাব্রবীদ্ রামমগস্ত্যো ভগবাংস্তদা॥
রাম রাম মহাবাহো শৃণুগুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্বানরীন্ বৎস সমরে বিজয়িষ্যসে॥
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সর্বশত্রুবিনাশনম।

ভগবান্ অগস্ত্যদেব রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন—হে মহাবাহো রাম, গুহ্যতম কথা শ্রবণ কর। যাহার প্রভাবে সকল শত্রু জয় করিতে পারিবে। পূত আদিত্য-হৃদয় সকল শত্রু বিনাশ করিয়া থাকে।

তিনটি মতের আলোচনা করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। প্রথমেই তৃতীয় মতের আলোচনা করিতে

হইবে। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার কাল বা মাসাদি-নির্ণয়ের কোন অবকাশই নাই। বহু ক্ষেত্রেই সামগ্রিক জ্ঞানের অভাবে অনেক অদ্ভুত মতবাদের সৃষ্টি হয়। কল্প-কল্পান্তর দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করা হয়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—বহু বারই হইয়াছে এবং রাম রাবণও প্রতিবারেই আসিয়াছে।

ইতি বৃত্তং পুরাকল্পে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
প্রাদুর্ভূতা দশভুজা দেবী দেবহিতায় বৈ॥
নৃণাং ত্রেতাযুগস্যাদৌ জগতাং হিতকাম্যয়া
পুরাকল্পে যামাবৃত্তং প্রতিকল্পে তথা তথা।
প্রবর্ত্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ॥
প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষস।

কালিকা পুরাণ (৬০ অ:)

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মনুষ্য লোকের ত্রেতা যুগে রাবণবধের জন্য দশভুজা দুর্গাদেবী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রতি কল্পেই রাম ও রাবণের আবির্ভাব হয়।

কোন কল্পে রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করিয়া, কোন কল্পে সূর্য্য-হৃদয়াদি পাঠ করিয়া রাবণ বধের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিয়া-ছিলেন। অতএব রামচন্দ্র যে দুর্গাপূজা করেন নাই—মত যুক্তিসহ নয়। দ্বিতীয় মত আপাতত যথার্থ বলিয়া মনে হইলেও বিরোধের অবকাশ আছে। যদিও চৈত্রী শুক্লা-নবমীতে চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হইল, কিন্তু রামচন্দ্র ঐ দিন অযোধ্যায় না গিয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। ভরত বলিয়াছিলেন—চতুর্দশ বর্ষের একদিন অতীত হইলে তিনি অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন (অযোধ্যা ১১২।৬৫)। তাঁহারও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। উভয় চরিত্রই ক্ষুণ্ণ হয়। এই মতও স্বীকৃত হইতে পারে না।

প্রথম মত সমর্থন করা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে—আশ্বিন মাসে পূজা চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হয় না—ছয়মাস অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ইহার সমাধান করা যাইতে পারে। বৎসর তিনভাবে গণনা করা হয়—সৌর, সাবন, চান্দ্র। সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ডে, সাবন বৎসর ৩০ দিনে মাস ধরিয়া ৩৬০ দিনে, চান্দ্র বৎসর ৩০ তিথিতে মাস ধরিয়া ৩৫৪ দিনে হইয়া থাকে। চান্দ্র বৎসর প্রতি আড়াই বৎসর অন্তর মলমাস হওয়ায় প্রতি পঞ্চমবর্ষে ২ মাস বৃদ্ধি পাইয়া থাকে—পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌমাসা-বুপচীয়ত (বিরাট ৫২।৩)। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকাল চতুর্দশবর্ষ বলা হইয়াছে। কিন্তু সৌর আদির কথা উল্লিখিত হয় নাই। চান্দ্রবর্ষ ধরিয়া বনবাসের কাল নির্দ্ধারণ করা হইবে।

চান্দ্রবর্ষে প্রতি পঞ্চমবর্ষে ২ মাস বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে ১৫ সাবনবর্ষে তদপেক্ষা ১৮০ দিন বর্দ্ধিত হয়। অতএব প্রতিবর্ষে ১২দিন বৃদ্ধি পায়। সুতরা ১৪ বৎসর গণনায় ১৮০ দিন হইতে ১২ দিন কম হইলে ১৬৮ অবশিষ্ট থাকে। চৈত্রের শুক্লা নবমীর ১৬৮ দিন পূর্বে চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণা পঞ্চমীতেই ১৪ বর্ষে পূর্ণ হয়। অতএব দুর্গোৎসব ১৪ বর্ষের মধ্যে হওয়ায় আশ্বিন মাসেই হইয়াছিল। কেহ পূর্বপক্ষ করিতে পারেন—যুদ্ধ ভাদ্রমাসে আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ৬॥০ মাস চলিয়াছিল। তাহার উত্তরে বলা যায়—

দেবদানব যক্ষাণাং পিশাচোরগ রক্ষসাম্।
পশ্যতাং তন্মহদ্‌যুদ্ধং সর্বরাত্রমবর্ত্তত॥
নৈব রাত্রিং ন দিবসং ন মুহূর্ত ন চ ক্ষণম্।
রাম রাবণয়ো যুদ্ধং বিরামমুপগচ্ছতি॥

(লঙ্কা ১০৯।৩৭।৩৮)

সেই মহাযুদ্ধ সর্বদাই চলিয়াছিল। দেব দানব যক্ষ পিশাচ উরগ প্রভৃতি যুদ্ধ দর্শন করিতেছিল। কোন সময়েই রাম-রাবণের যুদ্ধের বিরাম ছিল না। অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ ৬॥০ মাস চলিতে পারে না। রামচন্দ্র রাবণ বধের পূর্বেই দুর্গা-পূজা করিয়াছিলেন। রাবণবধ চৈত্র মাসে হইলে পূজাও চৈত্র মাসেই হইবে। সেইজন্য ইহার বিচার প্রয়োজন। রাত্র শব্দে দিবারাত্র বুঝায়, যেমন ত্রিরাত্র অশৌচ।

সর্বশব্দ হইতে দিন পাওয়া যায় কি না দেখা যাইতে পারে। সর্ব—স র ব। স শবর্গের বা উষ্মবর্গের তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ ৩, র য বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ অর্থাৎ ২, ব ঐ বর্গের চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ ৪ হয়। সর্ব হইতে পাওয়া যায় ৩+২+৪=৯ দিন অর্থাৎ আশ্বিনী শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত রামরাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং রাবণবধ আশ্বিনী নবমীতে হওয়ায় আশ্বিন মাসেই রামচন্দ্র দুর্গাপূজা যে করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণিত হইল। অতএব রামচন্দ্র অকালে আশ্বিন মাসে শারদীয়া দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন ইহা সমর্থনীয়।

মন্দির ফিরে আনো

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নিপীড়নে দেছ সে 'জিজিয়া-কর', দারুণ লাঞ্ছনায়,
দাও মন্দির-মাথট আজিকে দরদী স্বইচ্ছায়।
চূর্ণ করেছে কোটী মন্দির—
প্রাণ দিল জনগণ
ভক্ত-রক্তে পূর্ণ হয়েছে মন্দির অঙ্গণ।
গড়িতে দেয়নি, গড়িতে পাওনি নিজ দেবতার ঘর,
বিড়ম্বনা ও অসহ যাতনা সহেছ নিরন্তর।
দূরীকৃত আজ জঘন্যতম বর্ব্বরতার যুগ,—
তোমার বুকের শাশ্বত প্রেমে পুনরায় দাও রূপ।
সকল দানের শ্রেষ্ঠ যা সেই মন্দির কর দান,
জাগ্রত দেশ, জাগ্রত জাতি,
জাগ্রত ভগবান।

২

বিরাম বিহীন ব্যাকুল কণ্ঠে প্রাণভরি দাও ডাক—
কাল সাগরের মধ্যে উঠুক
মাথা তুলে মৈনাক।
কর আহ্বান, স্বাগত জানাও,
ডাকো করি জোড় হাত,—
আবার উঠুক রূপান্বিত হোক অনির্ব্বাপিত সাধ।
মেঘ গড়িতেছে সুনীল আকাশে সারি সারি মন্দির,
বহিতেছে তার প্রতিচ্ছায়া যে তেরো তটিনীর নীর,
ছায়া হয় কায়া,
ভাবই তো করে মূর্ত্তি পরিগ্রহ,—
গড় মন্দির, ভুলাও অতীত বেদনা দুর্ব্বিষহ।
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক জাতির মনস্কাম—
না রয় ভারতে একটীও যেন মন্দির-হীন গ্রাম।

৩

দম্ভী, দর্পী বিচার বিমূঢ় বড় ভাবে পশুবল,
'তূনী' টাঙাইয়া মারিতে সে চায়
রূপ-সাগরের জল।
পাষাণ ভাঙিয়া খর্ব্ব করিবে সুবিশাল হিমালয়,
জানে না তাহাতে বৃদ্ধি আসিবে,
হবেনা তাহার ক্ষয়।
তক্ষক ভাবে দংশনে আমি মেরেছি পরীক্ষিত—
ভাবেনা সর্প যজ্ঞের গেল সেই দিয়ে ইঙ্গিত।
যত মন্দির ভেঙ্গেছে তাহার বিশ গুণ গড়া চাই
মর্ম্মন্তুদ অতীত ব্যথার
আর প্রশমন নাই।
প্রতি বুক হোক মন্দির আর মন্দির প্রতি ঘর
কালজয়ী দানে কর এ ভারতে পুনঃ শুচি সুন্দর।





মোহিনী

হরিনারায়ন চট্টোপাধ্যায়

—জয় রামজীকি বাবুজী।

—কে?

—আপনি আমাকে চিনবেন না। একটু ফুরসত হবে আপনার?

অনন্ত ফুরসত। একটা গানের আসরের নিমন্ত্রণে কাশীতে এসেছি। রোজ বিকেলে এক এক বাড়িতে আসর বসে। ওস্তাদ তুকারামের কৃপায় দু একটা আসরে গাইতে হয়। গুণীজনের আসর, সেখানে আমার মত লোকের ঠাঁই পাবার কথা নয়, কিন্তু আমার গান নাকি লোকের ভাল লেগেছে, সেজন্য প্রায় শেষের দিকে দু একজন খোঁজ করে।

—আইয়ে বাঙালীবাবু।

আসরে যাবার পথ করে দেয়। তানপূরা এগিয়ে দেয়। তবলচী উঠতে উঠতে বসে পড়ে তবলার সামনে, আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে।

গুরুজীর কাছে শেখা ঠংরী শুরু করি। গানের ঝোঁক আমার ছেলেবেলা থেকে। এর জন্য লেখাপড়া ছেড়েছি, মা-বাপ ছেড়েছি, ঘর-গৃহস্থালী ছেড়েছি। বরোদা, পুণা, মহীশুর—যেখানে গুণীজনের গন্ধ পেয়েছি, অন্ধের মতন ছুটেছি সেখানে। নাড়া বেঁধেছি, রেওয়াজ করেছি কিছু-দিন, কিন্তু মন ভরে নি। এঁদের যেন প্রাণের অভাব। গানের মধ্যে ডুবে যায় না কেউ। আসর মাতাবার মতন সস্তা গান দু একটা শিখিয়ে দেন। বড় বড় রাগরাগিণী

গানের আসর শেষ হ'তেই উঠে দাঁড়ালাম। বাড়ির মালিককে সেলাম জানিয়ে নিচে আসতেই মুখোমুখি দেখা।

ঠিক সিঁড়ির নিচে। প্রৌঢ়া মহিলা। মাথায় ঘোমটা। এ বাড়ির কেউ ভেবে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল।

ভেঙে দু একটা চটকদার সুর, তার বেশী নয়। কিন্তু এর জন্ম পাগলের মত সব পিছনে ফেলে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াইনি আমি।

তারপর ভগবান জুটিয়ে দিলেন। সাসারাম স্টেশনে গাড়ি থেমেছে। প্ল্যাটফর্মে খুব ভিড়। কি ব্যাপার। খবর পেলাম পণ্ডিত তুকারাম বাইরে সফর শেষ করে বাড়ি ফিরছেন। পণ্ডিত তুকারামের নাম শুনেছিলাম, এও শুনেছিলাম তিনি বাইরে কোথাও গাইতে যান না, নাড়াও বাঁধেন না, কারুর সঙ্গে, সাকরেদ নেন না। আত্ম-সমাহিত শিল্পী। ভগবানকে অর্পণ করেন। বলেন, যাঁর জিনিস তাঁকেই দিচ্ছি।

ট্রেণ থেকে নেমে পড়লাম। তারপর কোন কিছু না ভেবে তাঁর পিছু নিলাম। বছরে পণ্ডিতজী একবার বাইরে যান। গুরুদেবের স্মৃতিমন্দির রাজস্থানের এক গণ্ডগ্রামে। সেখানে সাতদিন ধরে গানবাজনা করেন।

কতকষ্টে যে পণ্ডিতজীর কৃপা পেয়েছিলাম তা বলার নয়। তাঁর এক গুরুভাই থাকতেন কাশীতে। তিনি বছরের পর বছর অনুরোধ, উপরোধ ক'রে এবার তুকারামকে কাশীতে নিয়ে এসেছেন। সঙ্গে আমি।

—ফুরসত? হ্যা হবে। কি আপনার দরকার বলুন।

—একটু আসবেন আমার সঙ্গে?

ব্যাপারটা বুঝলাম। বোধ হয় নতুন কোন গানের আসর বসাতে চায়। কিন্তু আসরের কথাবার্তা সাধারণতঃ গৃহস্বামী নিজেই বলেন। বাড়ির স্ত্রীলোকদের পাঠান না। তা ছাড়া গুরুজীকে জিজ্ঞাসা না করে কোন আসরে যোগও দিতে পারব না আমি।

—আপনার সঙ্গে? কোথা?

মহিলা অকুণ্ঠ গলায় বলল, এই কাছেই বাড়ি, বেশী হাঁটতে হবে না আপনাকে।

দু এক মিনিট একটু দ্বিধা, সামান্য সঙ্কোচ। তারপরেই ভাবলাম ক্ষতি কি। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কে আছে আপনার বাড়িতে।

মাথার ঘোমটাটা হাত দিয়ে সামান্য সরিয়ে মহিলা মুখ তুলল।

—আমার বেটি আছে বাড়িতে। অনসূয়া বাঈয়ের নাম শুনেছেন?

অনসূয়া বাঈয়ের নাম? শুনেছি বই কি, খুব শুনেছি। প্রথম যৌবনে এই তো আমার একমাত্র নেশা ছিল। যেখানে যত খানদানী গাইয়ে আছে তাদের তালিকা যোগাড় করা। ক'লকাতায় কেউ এসেছে শুনলে ধর্ণা দেওয়া। গানের আসরে ঢোকবার জন্ম আপ্রাণ পরিশ্রম।

অনসূয়াবাঈয়ের বয়স বেশী নয়। বার দুয়েক ক'লকাতায় এসেছিল। সব মিলিয়ে বড় জোর খানচারেক গান, কিন্তু তাতেই রসিক সমাজ মুগ্ধ। এত অল্প বয়সে এমন ঠুংরীর গলা শোনাই যায় না। গলা যেমন মিষ্টি, গলার ছোটখাটো কাজও তেমনি সূক্ষ্ম। আশ্চর্য, তারপর আর খোঁজ পাওয়া যায় নি। পরের বছর কর্মকর্তারা তাকে আনাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আগ্রায় নেই। লোকেরা খবর আনল, অন্ধ হ'য়ে গেছে অনসূয়া বাঈ। সেজন্ম কোথাও যেতে চান না। আগ্রা ছেড়ে হরিদ্বার চলে গেছেন। তীর্থে তীর্থে ঘুরবেন। সঙ্গীত জীবনের ইতি।

মনে খুব ধাক্কা খেয়েছিলাম। চোখ যদি যায় তো কি ক্ষতি। সত্যিকারের সাধককে তার জন্ম গান ছাড়তে হবে কেন। বাইরের চোখ যাওয়ার লোকসানটুকু ভেতরের চোখ দিয়ে পুষিয়ে নিতে হবে। পৃথিবী তার আলো আর অন্ধকার নিয়ে মুছে গেল, সেইজন্মই নতুন করে সুরের প্রদীপ জ্বালাতে হবে নিজের অন্তরে।

সব কথা মনে পড়ে গেল। মহিলার দিকে ফিরে বললাম, অনসূয়াবাঈ? আগ্রার?

মহিলা ঘাড় নাড়লেন।

—যিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ বাবুজি।

—আর সময় নষ্ট করলাম না। এক পা এগিয়ে বললাম, চলুন, যাচ্ছি।

কাশীর অপরিসর গলি। দুজনে পাশাপাশি যাবার উপায় নেই। মহিলা আগে। আমি পিছনে।

জরাজীর্ণ বাড়ি। শ্যাওলা-ধরা চাতাল। ভাঙা পাইপের জল বেয়ে পড়ছে। একটু অসাবধান হ'লেই পিছলে যেতে হবে। খুব সন্তর্পণে পা ফেলে উঠলাম।

ঠিক দরজার মুখে মহিলা দাঁড়াল।

—একটা কথা বাবুজী?

—বলুন।

—আমার বেটির অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। অল্প বয়সে চোখ হারিয়ে মাথার ঠিক নেই। আপনি দয়া করে আপত্তি করবেন না। যা বলে শুনে যাবেন।

সব কিছু কেমন রহস্যময় মনে হ'ল। অন্ধলোকের কমতি নেই পৃথিবীতে। অন্ধগায়কগায়িকাও আছে, কিন্তু দৃষ্টি হারিয়ে অপ্রকৃতিস্থ হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশী নজরে পড়েনি।

যাহোক্, শেষ না দেখে ফিরব না, তাই মহিলার কথায় সায় দিলাম।

অন্ধকার বারান্দা। ঝাড়লণ্ঠন, গালিচা, পাথরের টেবিল সবই রয়েছে—কিন্তু অযত্নে, অব্যবহারে মলিন। বহুদিন যেন এখানে লোক আসেনি।

একটু এগিয়ে মহিলা আবার থামলেন। হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, এই ঘর। চলে যান সোজা।

আমি ইতস্ততঃ করতেই মহিলা আরো কাছে সরে এলেন। অস্পষ্ট গলায় বললেন, ঘরে আর কেউ নেই। ও একলাই আছে।

এগোবার সঙ্গে সঙ্গেই বাধা পেলাম। হাতের ওপর একটা স্পর্শ।

একেবারে কানের পাশে অস্ফুট গলার স্বর, কথাটা মনে রাখবেন বাবুজী। যা বলে শুনে যাবেন, বাধা দেবেন না।

প্রথমে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। মিটমিটে হ্যারিকেনের আলো। আলো দেখানোর চেয়ে অন্ধকারই বাড়াচ্ছে। মেঝেতে শতছিন্ন কার্পেট। কোণে পাথরের টিপয়ের ওপর একরাশ লাল গোলাপ। জানালায় রঙীন চিক। একেবারে কোণের দিকে ফিকে সবুজ রঙের শাড়ি জড়ানো একটি যুবতী।

ঘর সাজানোর তারিফ করতে গিয়েই মনে পড়ে গেল অনসূয়া অন্ধ। এ কাজ অন্য কেউ করেছে।

পায়ের শব্দ হতেই অনসূয়া মুখ তুলল। বয়সের হিসাবে ভরা-যুবতী হয়তো আর বলা যায় না, কিন্তু চেহারা দেখলে বয়সের হিসেব গোলমাল হয়ে যায়। ভাদ্রের ভরা নদীর মতন টলটলে, জল কানায় কানায়, কিন্তু কুল ছাপায় নি। শাঁখসাদা রং, গালে গোলাপীর ছিটে। অনিন্দ্যসুন্দর দুটি ভ্রূ, তার নিচে কটাক্ষহীন দুটি চোখ। অনেক ঠাওর করে দেখলে তবে বোঝা যায়।

—এসেছ।

অন্তরঙ্গ আহ্বানে একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম, কিন্তু সামলে নিয়ে বললাম, হুঁ।

—কত বছর পরে দেখা বল তো? বোধহয় বারো বছরেরও বেশী।

খুব সাবধানে বললাম, তা হবে।

—তোমার গলা শুনে কিন্তু আমি ঠিক তোমাকে চিনতে পেরেছি। বিশেষ করে ওই গানটা, মেরে পিতম্ ইয়াদ করো, ইয়াদ করো। মনে পড়ে কবে প্রথম গানটা গেয়েছিলে?

মনে করার চেষ্টা করলাম। ক'বছর আগে গানটা খুব চালু হয়েছিল। যে কোন জলসায় গুণীশিল্পীদের মুখে এ গানটা শোনা যেত। রাজস্থানের আমীর হোসেন বোধহয় প্রথম এ গানটা গেয়েছিলেন—অন্ততঃ তাঁর কাছেই আমি শুনেছিলাম সবচেয়ে আগে।

—কি মনে করতে পারলে না?

—ঠিক মনে পড়ছে না।

গলার শব্দে কুণ্ঠার স্পর্শ আনলাম।

—মনে পড়ছে না? সেদিনের সব কথাই বুঝি ভুলে গেছ? নাকি মুন্না বারণ করেছে সেদিনের কোনকিছু মনে রাখতে।

—মুন্না! অন্ধকার থেকে আরো গভীর অন্ধকারে চলে গেলাম। এমন একটা সর্বনেশে খেলায় না মাতলেই যেন ভাল ছিল। ধরা পড়লে লজ্জার সীমা থাকবে না।

চুপ করে রইলাম।

অনসূয়া দৃষ্টিহীন দুটি চোখ তুলে দেখল। কিছুক্ষণ মুখ নামাল না—তারপর বলল, তুমি কি দাঁড়িয়ে আছ নাকি? বসতে না বললে বসবে না? এমন কুটুম্বের ব্যবহার শুরু করলে যে।

আমি কার্পেটের ওপর বসে পড়লাম। সামান্য ব্যবধান রেখে। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে অনুসূয়া অনুভব করল। হাতটা আমার হাঁটুতে ঠেকতেই হেসে বলল, এই তো লক্ষ্মীছেলে। ভয় নেই তোমাকে বেশীক্ষণ আটকে রাখব না। এতদিন পরে দেখা, দুএকটা পুরোনো কথা

বলবার জন্যই তোমাকে ডাকলাম। মাকে বলতে মা কিছুতেই রাজী নয়। বলল, না, যদি চিনতে না পারে, যদি আসতে রাজী না হয়। কিন্তু আমার মন বলল, তুমি ঠিক আসবে। আমার নাম শুনলে তুমি না এসে পারবে না। কি কথা বলছ না যে?

—তোমার কথা শুনছি।

—অনেক কথা! স্বল্প আলো, কিন্তু তাতেই মনে হল যেন গোলাপের আভা জাগল দুটো গালে। ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল।

—আমার কথা কি আর ভাল লাগবে। আগে হয়তো লাগত, অনেক আগে, মুন্না আসার আগে পর্যন্ত।

আমি একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখলাম অনসূয়া বাঈকে। মুন্নার খবর জানি না। অনসূয়া বাঈকে যখন দেখি তখন আমার বয়স বেশী নয়, অনসূয়ার বয়স আরো কম। অনসূয়া মঞ্চে এসে দাঁড়াতেই শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছিল। তার গলা শোনার আগেই সবাই রূপে মুগ্ধ হয়েছিল। তারপর কোকিল কণ্ঠের মূর্ছনায় যারা চেতনা হারিয়েছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন।

ইচ্ছা ছিল জলসার শেষে আলাপ করব, কিন্তু লজ্জা আর সঙ্কোচ এসে বাধা দিয়েছিল। অনসূয়ার বয়স একটু বেশী হ'লে, এ অসুবিধা হত না।

আজ সেই অনসূয়ার মুখোমুখি বসেছি। এটুকু বুঝতে পেরেছি, অনসূয়া আমাকে যা মনে করেছে আমি তা নই। কিন্তু সে কথা তখন বলা যায় না। শুধু অনসূয়ার মার বারণ আছে বলে নয়, নিজের পরিচয় দিলে অনসূয়ার জীবনকাহিনী শোনার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হব।

—মুন্না বলে আমার কথা? অনসূয়া আচমকা প্রশ্ন করল।

হঠাৎ কথাটা মনে এল। কেন এমন কথা মনে হল জানিনা। খুব আস্তে বললাম, মুন্নার কথা জানি না।

—জানো না, সেকি?

—মুন্না থাকে না আমার সঙ্গে।

মনে হ'ল অনসূয়ার সমস্ত শরীর যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। আবার একটা হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটু স্পর্শ করল। ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করল, মুন্না থাকেনা তোমার সঙ্গে? তবে সে কোথায় থাকে?

বললাম, জানি না।

কিছুক্ষণ অনসূয়া কথা বলল না। নিজের শাড়ির আঁচল নিয়ে আঙুলে জড়াল, আবার খুলল।

অনেকদূর থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে এমনি উদাসকণ্ঠে বলল, এ আমি জানতাম। এমনটা যে হবে, আমি অনেক আগেই জানতাম। প্রথম যখন তোমাদের ঘনিষ্ঠতা দেখেছিলাম, তখনই এ কথা আমার মনে হয়েছে।

কথাবার্তায় একটু সাহস এল। মরীয়া হয়ে বললাম, কেন তুমি তখন আমাকে সাবধান করে দাওনি।

লাগসৈ কথা। অনসূয়া আমার দিকে চেয়ে হাসল। বাসি গোলাপের মত নিস্তেজ হাসি। হাসি থামিয়ে বলল, তখন কথাটা তুমি বিশ্বাস করতে না। দুনিয়ার আর কারো কথা বিশ্বাস করার মত মনের অবস্থা তোমার ছিল না।

চুপ করে রইলাম। এটুকু বুঝতে পারলাম, অনসূয়ার দয়িতকে কোন এক মুন্না এসে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার কাছ থেকে। সে আঘাত অনসূয়া এখনও সামলে উঠতে পারেনি।

অনসূয়া কথা বলল, মুন্না আমার আপন খুড়তুতো বোন তাতো জানোই। খুড়ো মারা যেতে ফৈজাবাদ থেকে মা তাকে আমাদের আগ্রার বাড়িতে নিয়ে আসে। তখন তার বয়স বছর কুড়ির বেশী নয়, কিন্তু সে বয়সেই সারা ফৈজাবাদে তার দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। গানের গলা মুন্নার ছিল না, কিন্তু রূপ ছিল চোখ-ধাঁধানো। সেই রূপের আগুনে অনেক জাঁদরেল পতঙ্গের পাখনা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। রহিস আর খানদানী ঘরের ছেলেরা পাগলের মত ওর চারপাশে ভিড় করত। ওকে নিয়েই খুনোখুনি হয়ে গিয়েছিল দুজনের মধ্যে। এইসব দেখেশুনেই মা ওকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিল। আমার ওস্তাদ হালিম সায়েবের কাছে গানও শিখতে পারবে, আর আমাদের শাসনেও থাকবে।

অনসূয়া থামল। বলল, এসব কথা তোমার জানা। তবু পুরোনো মানুষের কাছে বসে পুরোনো দিনের কথা বলতে ভাল লাগছে। তোমার যখন শুনতে খারাপ লাগবে, বল, আমি থেমে যাব।

—না, না, তুমি থেমো না। শুনতে খুব আমার ভাল াগছে। পুরোনো কথা হলেও নতুনের মত লাগছে।

—তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল হালিম সায়েবের াড়িতে। হালিম সায়েবের অসুখ শুনে টাঙ্গায় করে খা করতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখলাম তুমি তার সেবা রছ।

তখনই মাঝে মাঝে দুএকটা আসরে যেতে শুরু রেছি। গানপাগল দুএকটা বড় ঘরের ছেলে গান ানার ছলে কাছে বসতে আরম্ভ করেছে। তাদের হারাও নিন্দার নয়, কিন্তু তোমার চেহারা দেখে আমি নেকক্ষণ চোখ ফেরাতে পারিনি। এক মাথা কোকড়ানো ল, আগুনের মত রং, খাড়া নাক, টানা চোখ, দীর্ঘ দেহ, ানের দেবতার মত। বারো বছর পরে জানি না তুমি মন দেখতে হয়েছ, কিন্তু আমি অন্ধ চোখের মধ্য দিয়ে মার সেই চেহারাই দেখছি।

হাসবার চেষ্টা করলাম। অনসূয়ার দৃষ্টি থাকলে ঘরে াকার সঙ্গে সঙ্গেই বরবাদ হয়ে যেতাম। এত কাছে সবার সৌভাগ্য হ'ত না। শুধু কণ্ঠস্বরের মিল, এই য়ে অন্তরঙ্গতার উপকূলে অবতরণ, প্রায় অসম্ভব হ'ত।

—তারপরের কথা তোমার অজানা নয়। মাকে লুকিয়ে ত রাতে যমুনার ধারে তোমার সঙ্গে দেখা করেছি। মি বাংলাদেশের ছেলে, কোন এক জমিদার বংশের শেষ দীপ। গানের সখের জন্য বাড়ি থেকে বিতাড়িত। মার আমার মিলন অসম্ভব। তখন এসব ছোটখাটো ধা মন মানতে চায়নি। চাঁদ সাক্ষী রেখে, যমুনার ালো ঢেউ সাক্ষী রেখে, নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ রেছিলাম। তুমিও আমায় গ্রহণ করেছিলে।

মা জানতে পারেনি, কিন্তু ওস্তাদজীর চোখে ধরা পড়ে গলাম।

একদিন গান শেখাতে শেখাতে তিনি হেসে বললেন, নসূয়ামায়ীর গলায় এবার দানা বাঁধছে। দরদ আসছে লায়। সত্যিকার ভালবাসা জীবনে না এলে এ জিনিস য় না। মীরা ভালবাসতেন রণছোড়জাকে তাই তাঁর লায় এত প্রাণ ছিল, এত দরদ।

অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে ছিলাম। ওস্তাদজী মাথায় াত বুলালেন। স্নেহভরে বললেন, আমি বলছি মায়ী, এতে কোন দোষ নেই। শেখর আমাকে সব বলেছে। সে খানদানী ঘরের ছেলে। তার কথাও নড়চড় হবেনা।

মুন্না না এলে হয়তো তোমার কথার নড়চড় হতোও না। প্রথম মুন্নাকে দেখার কথা তোমার মনে আছে?

—সব আমার মনে আছে। তবু তুমি বল, তোমার মুখ থেকে শুনতে খুব ভাল লাগছে।

মনে হ'ল অনসূয়া খুশী হল। বলতে লাগল খুব মৃদু গলায়, তুমি ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠেছিলে। তোমার ধারণা আমি একলাই ঘরে আছি। কিন্তু সেদিন সকালে মুন্না এসে পৌছেচে। মুন্না একটু বেসামাল ছিল, তুমি ঢুকতেই শাড়ি ঠিক করে ভাল হয়ে বসেছিল। সেই মুহূর্তে আমার অস্তিত্ব তুমি ভুলে গিয়েছিলে। একদৃষ্টে মুন্নার দিকে তুমি চেয়েছিলে। মুন্নার যৌবনের দিকে।

আমিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি হাত যোড় করে নমস্কার করেছিলে, মুন্না ঘাড় নেড়ে সে নমস্কার ফেরত দিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করলাম—সেদিন আমাদের রেওয়াজ জমল না। বার বার তানপুরার তার ছিঁড়ে গেল, বেসুরো লাগল তোমার গলা। তবলচী হাল ছেড়ে সরে বসল। বলল, বাবুজীর তবিয়ৎ ঠিক নেই। আমি হেসে বলেছিলাম, বাবুজীর তবিয়ৎ ঠিক আছে, খারাপ হয়েছে দিল।

ইঙ্গিতটা তুমি হয়তো বোঝনি, কিংবা বুঝেও না বোঝার ভাণ করেছিলে। মুন্না উঠে অন্য ঘরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি জরুরী কাজের অছিলায় বাইরে গিয়েছিলে।

তারপরে অবশ্য তুমি অনেকটা সামলে নিয়েছিলে। আবার আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা, মন দেওয়া-নেওয়ার পালা চলেছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে তুমি মুন্নার খোঁজ করতে। জিজ্ঞাসা করতে তার কথা।

মুন্নার গানের গলা ছিল না। হালিম সায়েব তার দায়িত্ব নিতে রাজী হয়নি, তোমার অনেক সুপারিশ সত্ত্বেও। বলেছিলেন, বড় চঞ্চলমতি। সাধনা করার জন্য যে একাগ্রতার প্রয়োজন, তার একান্ত অভাব।

মুন্না গান শেখেনি, সারেঙ্গী শিখতে আরম্ভ করেছিল। ওস্তাদ মইনুদ্দিনের কাছে। তিনি আসতেন না, মুন্নাকে যেতে হ'ত তাঁর আস্তানায়।

এমনি সময় হালিম সায়েবের কলকাতায় যাবার ডাক এল। একলা নয়, স-সাকরেদ। তোমারই যাবার কথা, কিন্তু তুমি আচমকা পেটের ব্যথায় বিছানা নিলে। ডাক্তার বদ্যি হার মানল। তখন তোমার জন্য চিন্তিত হয়েছিলাম, কিন্তু পরে বুঝেছি, নকল ব্যথার উপশম করতে ভগবানও পারেন না, হাকিমবদ্যি কোন ছার।

তুমি গেলে না, তাই আমায় যেতে হ'ল। আসরে নাম কিনলাম, কিন্তু ফিরে এসে দেখি সব হারিয়েছি।

মুন্নার সঙ্গে আলিগড়ের এক জমিদারের ছেলের ভাবসাব চলছিল, এটা আমি দেখে গিয়েছি। অনেকবার সাবধান করে দিয়েছিলাম, মুন্না কান দেয়নি। ঠাট্টা করে বলেছে, তোর ওই বাঙ্গালী ফতোবাবুর চেয়ে, ব্রিজমোহন অনেক রেস্তাদার; এর মধ্যে আমাকে কি দিয়েছে জানিস। মুক্তোর মালা, মুক্তোর দুল, ঝুটো নয় আসলি। তুই এতদিন গা ঘসাঘসি করে কি পেলি ?

তর্ক করিনি। কি পেয়েছি তা মুন্নার মত দেহসর্বস্ব মেয়েদের বোঝবার চেষ্টা করে লাভ নেই—শুধু জড়োয়া অলঙ্কার দেওয়াটাই যারা পরম পাওয়া বলে মনে করে।

তোমার বাড়ির অবস্থার কথা মুন্না জানত না। আমি থাকতে সেটা জানার তার অবকাশও হয়নি। আমি অবশ্য জানতাম, তুমি বাপের ত্যাজ্যপুত্র হলেও, মাসে মাসে চুপি চুপি তোমার মা যা পাঠাতেন তার অঙ্কটা কম নয়। অন্ততঃ মুন্নার ব্রিজমোহনের ছুটকো জমিদারীর আয়ের তুলনায় নেহাৎ কম নয়। তুমি দিতে চাইলেও আমি কিছু নিইনি। বলেছি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে। দুজনের সামনে অন্ধকার দিন, পথ চলতে বার বার হোঁচট খেতে হবে। বিয়ের কথা জানাজানি হ'লে তোমার মাসোহারাও বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আমাদের পেট চলবে কিসে! এদেশে গানবাজনার কদর এমন নয় যে দুজনের দিনের পর দিন তাতে স্বচ্ছলভাবে চলে যাবে।

তুমি আমার কথা শুনেছিলে। ফুল ছাড়া তোমার কাছ থেকে আমি কিছু নিই নি। তার চেয়ে বড় উপহার কামনাও করিনি তোমার কাছ থেকে। তোমরা দুজনে দুজনকে এড়িয়ে যাবার ভাণ করতে, এমন ভাব দেখাতে যেন পরিচয় ছাড়া আর কোন অন্তরঙ্গতা বাসা বাঁধে নি তোমাদের মধ্যে। কিন্তু মেয়েছেলের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তুমি না আসা পর্যন্ত মুন্না ছটফট করত। ঘর আর বারান্দা। তুমি এলে ও এসে এক পাশে বসত। কিছুই শুনছে না এমনি ভাব দেখিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতো তোমার প্রত্যেকটি কথা। তোমার অবস্থাও তাই। আমার সঙ্গে কথা বলতে বটে, কিন্তু মন থাকত মুন্নার দিকে, কান রাখতে ওর পায়ের শব্দ শোনার আশায়।

এর পরের বছরও আমি কলকাতা গেলাম হালিম সায়েবের সঙ্গে। এবার আমারও নিমন্ত্রণ এসেছিল। কর্মকর্তারা হালিম সায়েবকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য।

রওনা হবার দু একদিন আগে ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ল। সারা দুপুরটা অস্বস্তি লাগছিল। মুন্না বসে বসে সারেঙ্গীতে রেওয়াজ করছিল। কর্কশ শব্দ। এতদিনেও ওর হাত ঠিক হল না। ঠিক মনে হল যেন একটা পাখিকে গলা টিপে ধরেছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় সে চিৎকার করছে।

কদিন তুমি আসছ না। জানি তোমার মন থেকে আমি সরে গিয়েছি, তবু ইদানীং তোমাকে দেখে সান্ত্বনা পেতাম।

বিকেল হ'তেই বেরিয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম মুন্নাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব, কিন্তু খোঁজ করে জানলাম মুন্না নেই। কখন বেরিয়ে গেছে।

ইচ্ছা ছিল যমুনার ধারে গিয়ে বসব। সেই জায়গাটায় যেখানে প্রথম তোমাকে নিবিড় করে পাই। কিন্তু এগোতে পারলাম না। ঠিক জায়গায় তুমি বসে রয়েছ মুন্নাকে পাশে নিয়ে। একটা হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরছ। একমনে কি সব কথা বলছ তাকে। বোধহয় নতুন কোন প্রতিশ্রুতি, ঘর বাঁধার নতুন সংকল্প।

খুব আস্তে সরে এলাম। যেন পায়ের শব্দ না হয়। তুমি ফিরে তোমার পুরোনো প্রতিশ্রুতির কঙ্কালরূপ না দেখতে পাও।

তারপরেও তুমি মাঝে মাঝে এসেছ। আমার সঙ্গে ছলনার অভিনয় করেছ। বসে বসে একরাশ আবোল-তাবোল কথা বলেছ।

তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পার নি। আমাকেও নয়, হালিম সায়েবকেও না।

একদিন গান আরম্ভ করার আগেই কাঁদতে শুরু করলাম। গানের লাইন ছিল, বলম, তু ঘর যা।

হালিম সায়েব কি বুঝলেন জানি না। মাথায় হাত রেখে বললেন, মানুষ মাত্রেই বোকা মা, কিন্তু যে মানুষ হীরে ফেলে কাচে গেরো দেয়, তার মত আহম্মক আর কেউ নেই।

তারপর তুমি আসা প্রায় বন্ধ করে দিলে। মুন্নার কাছেই শুনলাম তুমি আগ্রা ছেড়ে বরোদায় চলে যাচ্ছ নতুন ওস্তাদের সন্ধানে। স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলাম মুন্নাকে, তুমিও সঙ্গে যাচ্ছ তো?

মুন্না চমকে উঠল, আমি, আমি কেন যাব?

—আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা কর না মুন্না। মেয়েছেলের চোখ অন্ততঃ এসব বিষয়ে ভুল দেখে না।

কোলের ওপর সারেঙ্গীটা রেখে মুন্না তারের ওপর ঝঙ্কার তুলছিল, হঠাৎ বিশ্রী শব্দ করে এক গোছা তার ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুন্না হেসে উঠল, ওই বাঙালী ফোতোবাবুকে আমার মোটেই পছন্দ নয়। বাবুই আমার পেছন পেছন ঘুরছে। একদিন স্পষ্ট কথা এমন বলে দেব, আমার ধারে কাছে ঘেঁষবে না।

মুন্না সত্যি কথা বলেছিল কিনা জানি না, তবে ইদানীং মুন্নার রং বেরংয়ের নতুন শাড়ী আর দামী অলঙ্কার দেখে সন্দেহ হয়েছিল, তোমার আমার ভবিষ্যতের রসদ ভেঙে ভেঙে হয়তো এইসব হচ্ছে। মুন্নাকে প্রশ্ন করাতে সে বলেছিল, তার মার গয়না আর কাপড় তোলা ছিল, এতদিন পরে বের করেছে।

মুন্নাই একদিন খবর আনল, তুমি চলে গেছ। বরোদা নয় বাংলায়। দেশে গিয়ে বিয়ে থা করে সংসারী হবার আশায়।

ইদানীং তোমার সঙ্গে আমার মিলনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। তবু আশা করেছিলাম আগ্রা ছাড়বার আগে হয়তো দেখা করবে। নিছক ভদ্রতা হিসাবেও।

সারারাত ধরে কাঁদলাম। হালিম সায়েবের কাছে গান শেখা ছেড়ে দিলাম। পৃথিবীর সব কিছুতে বিতৃষ্ণা এল। মানুষের ওপর তীব্র ঘৃণা। মরতে ভয়, অথচ জীবনেও সুখ নেই, অদ্ভুত এক জীবন্মৃত অবস্থা।

দিন পনেরো পর চোখের জ্বালা শুরু হ'ল। দুচোখে ঝাপসা দেখতে লাগলাম। মা হকিম আনলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, চোখের দোষ ছিলই, অবিশ্রান্ত কান্নার ফলে রোগ বেড়েছে। যত্ন না নিলে অবস্থা খুব খারাপ হ'তে পারে।

মলম দিলেন। সকাল, দুপুর, বিকেল তিন বেলা লাগাতে হবে। অন্ততঃ মাসখানেক। অসুখ চলল, সেই সঙ্গে পরিচর্যা। মাই দেখাশোনা করতেন। হঠাৎ শীত কালে মার হাঁপানী বাড়ল। বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারতেন না, সেই সময় আমার সেবার ভার পড়ল মুন্নার ওপর।

আমার দুচোখে ব্যাণ্ডেজ। দিনের আলো একেবারে সহ্য করতে পারতাম না। অন্ধকার ঘরে ব্যাণ্ডেজ খুলে মুন্না রোজ তিনবেলা মলম লাগিয়ে দিত।

সেদিনের কথা বেশ মনে আছে। চোখের ব্যথা অনেকটা কম। সন্ধ্যা হয়েছে, তখনও ঘরে বাতি জ্বলে নি। চুপচাপ বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছি। মুন্না এসে ঘরে ঢুকল।

—তোমাকে দেখলেই আমার ভয় করে। আমার কথাটা শুনে মনে হ'ল মুন্না যেন থমকে দাঁড়াল। খুব আস্তে বলল, ভয় করে? কেন, ভয় করে কেন?

—এলেই তো ধরে বেঁধে ওষুধ দিতে আরম্ভ করবে।

মুন্না হেসে উঠল। ঝাড়লণ্ঠনে দমকা হাওয়া লাগার শব্দ। তারপরই মুন্না এগিয়ে এল। সাবধানে ব্যাণ্ডেজ খুলে মলম লাগিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম। তরল আগুনের ছিটে। মনে হল কে যেন পুড়িয়ে ছাই করে দিল চোখদুটো।

—ইস, একি করলে, কি ওষুধ দিলে?

মুন্না গভীর গলায় বলল, হকিম সায়েব ওষুধ বদলে দিয়েছেন। এটা নতুন ওষুধ।

প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল, যত দিন গেল, সন্দেহ বাড়ল। মা রোগশয্যায়। মার হাঁপানা যখন বাড়ে, মাস দুই তিনের ধাক্কা। তার আগে বিছানা ছাড়তে পারে

না। মুন্না ঘরে আসত। আর ওষুধ দিত না। বলত, হকিম সায়েব খুব কড়া ওষুধ দিয়েছেন, সারলে এতেই সারবে। আর ওষুধ দেবার দরকার নেই।

আর দরকারও হ'ল না। একদিন টেনে ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললাম। দু চোখের সামনে জমাট অন্ধকার। সে অন্ধকার আর তরল হল না।

অনসূয়া আর্তনাদ করে উঠল। ফাঁকা বাড়ির দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হ'ল সে আর্তনাদের সুর। চারপাশের সব কিছু যেন কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

আবিষ্টের মত বসে বসে শুনছিলাম। আর্তনাদ নয় হাহাকার। অনসূয়ার হৃদয়ের শূন্যতা যেন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। এমন একটা বিয়োগান্ত নাটকে মুখে রং মেখে অভিনেতা সাজার ইচ্ছা করল না। ইচ্ছা হ'ল, খুলে বলি সব কথা। বলি আমি শেখর নই, আমি অমিতাভ। বিরাট জমিদারী নেই, বাপের ছোট-খাটো ব্যবসা সম্বল। গান শেখার ঝোঁকে বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছি।

কার্পেটে টান পড়তেই অনসূয়া উঠে দাঁড়াল।

—ওকি, তুমি উঠছ?

—হ্যাঁ, আজ চলি। আবার কাল আসব।

অনসূয়া চুপ করে রইল। অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। একসময়ে খুব মৃদুগলায় বলল, তোমার ওপর আমার জোর নেই। সম্ভব হ'লে এস, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব।

চলতে চলতে আমার কেমন দুর্মতি হ'ল। অনসূয়া দরজার কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দৃষ্টিহীন দুটি চোখ তুলে চেয়ে রইল।

আমি অনসূয়া বাঈয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি ভুল করেছিলাম, অনসূয়া। মুন্না তোমার যে এই সর্বনাশ করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অনসূয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল। আরক্ত সারা মুখ। কান্না জড়ানো গলা নয়, দৃপ্ত কণ্ঠস্বর।

—তুমি আজো বদলাও নি শেখর। মানুষকে প্রতারণা করার স্বভাব তোমার আজো যায় নি। শুধু দুটো চোখই তোমরা নষ্ট করে দিয়েছিলে, কিন্তু শোনার ক্ষমতা আমার ভালই ছিল। নতুন ওষুধ দেবার আগের মুহূর্তে তোমার গলা শুনতে আমার একটুও ভুল হয়নি। চোখ দুটো যাবার পরেও তোমাদের গলা অনেকবার শুনেছি। এ তুমি কেন করলে শেখর? তোমার দিকে চোখ তুলে চেয়েছি ব'লে সে দুটো চোখ তুমি নষ্ট করবে এমনভাবে? তোমাকে ভালবাসবার অপরাধে এই শাস্তি আমায় কেন তুমি দিলে।

আস্তে আস্তে সরে এলাম। মাথা নিচু করে, হাতড়ে হাতড়ে বাইরে যাবার পথ খুঁজতে লাগলাম। শেখরের সব অপরাধের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে সরে এলাম অনসূয়া বাঈয়ের সামনে থেকে। আরো দাঁড়ালে আরো কি শুনতে হবে ঠিক আছে।

বাইরে যেতে যেতেই শুনলাম অনসূয়া বাঈয়ের গুমরে গুমরে কান্নার শব্দ। অনেক আগে জলসার আসরে অনসূয়া বাঈয়ের সুর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু আজকের সোহিনীর সুর আরো করুণ, আরো মর্মস্পর্শী।

গলার কারসাজির সঙ্গে বুকের রক্ত না মিশলে এমন মাদকতা আসে না সুরে, হৃদয়তন্ত্রীতে এত মোচড় তোলেনা।



মানবতার সাগর-সঙ্গমে সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-সংসদের সহকারী সম্পাদক, এবং আন্তর্জাতিক মাসিক পত্রের সম্পাদক, শ্রীমান চিত্ত বিশ্বাস এক সুপ্রভাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে জানালেন—রুমেনিয়ায় যাবার জন্য জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মাঝেই আমাকে তৈরি হতে হবে।

—"সে কি! এই ত একসপ্তাহ আগে দিল্লীতে রুমেনিয়ান এম্‌ব্যাসিতে চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এলাম। য়্যাম্‌বাসেডার জানালেন, তিনি মাসখানেকের জন্য দেশে যাচ্ছেন। আমার যাবার কথা কিছুই ত বল্লেন না; কালচুরাল কাউন্সিলারও না। চা-চক্রে চতুর্থ কোন ব্যক্তি ছিলনা।"

আমার দীর্ঘ বিবৃতিতে চিত্ত বিশ্বাস যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি হয়ত ভাবলেন বুড়ো নড়তে নারাজ। তাই অস্ত্র ছাড়লেন—"দিল্লী থেকে রমেশ লিখেছে।"

—"রমেশ লিখেছে! তবে হয়ত প্লেনে সিটরিজার্ভও হয়ে গেছে; প্ল্যানিং ত নিশ্চিতই।" শুয়ে ছিলাম, উঠে বোসলাম।

চিত্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি বল্লেন—"রমেশ লিখেছে আপনাকে দু'খানা চিঠি লিখেও জবাব না পেয়ে আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তিত হয়েছে। প্রস্তাবটা রুমেনিয়ান য়্যামবাসাডারের জানবার অথবা জানাবার কথা হয়ত নয়। রুমেনিয়ান শান্তি কমিটির ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন হচ্ছে। তাতে আপনাকে ভারতের শান্তি আন্দোলন সম্বন্ধে বলতে হবে। ডক্টর কিচলুও উপস্থিত থাকবেন। ওই কন্‌ফারেন্স শেষ করে ওর পাশা-পাশি দেশগুলো ঘুরে স্টকহোলমে গিয়ে ভারতীয় ডেলিগেশনের সঙ্গে মিলিত হবেন আপনি।"

—"বলেছিলাম না, প্ল্যানিং কম্‌প্লিট। রমেশচন্দ্র ত!"

রমেশচন্দ্র বাঙালী নন, পাঞ্জাবী পরিবারের ছেলে, বিখ্যাত এক আই-সি-এস তনয়, নিখিল ভারত শান্তি-সংসদের জেনারেল সেক্রেটারী, বিশ্বশান্তি সংসদের বিশ্ব-ব্যুরোর প্রভাবশালী সদস্য। সুহাস, সুভাষ, কোমল প্রকৃতির, কমনীয় কান্তির এই অসামান্য কর্ম্মদক্ষ নবীন মানবপ্রেমিক নায়কটি ভারতীয় শান্তি-আন্দোলনের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। এমন সংগঠনশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞ তরুণ আমার এই সুদীর্ঘ-জীবনে বেশি দেখিনি। ইনি বিয়ে করেছেন একটি পার্শি-তনয়াকে। মিসেস পেরিণ রমেশচন্দ্র প্রকৃত অর্থেই স্বামীর সহধর্ম্মিণী, আধুনিক ভাষায় যাকে বলা হয় কমরেড। তাই বলে ওঁদের বিয়েটা কিন্তু কম্প্যানিয়নেট নয়।

চিত্ত বিশ্বাস বেঁটে মানুষ, বাংলা-ভাষায় বিত্তের প্রমাণ দিয়ে এম-এ পাশ করেছেন, কিন্তু কাব্যের ধার ধারেন না, কর্ম্মময় পুরুষ। তিনি রমেশচন্দ্রকে চিঠি লিখবেন, কি টেলিগ্রাম করবেন, অথবা ট্রাঙ্ক-কল্ করে আমার কন্‌ফার্মেশন জানিয়ে দেবেন, তার নির্দেশ চাইলেন।

—"কিন্তু চিত্ত, আমার পাসপোর্টের মেয়াদ যে রয়েছে জুনমাসের বারো কি বাইশ তারিখ পর্য্যন্ত। পাঁচ বছরের জন্য পেয়েছিলাম ত চীন যাবার সময়; সেই ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে।"

—"তাতে কি হয়েছে। একটা চিঠি লিখুন, আর পাসপোর্টখানা দিন আমাকে। আরো পাঁচ-বছরের জন্য করিয়ে আনছি।"—তিনি বল্লেন।

—"এত সহজেই হবে ভাবচ?"

—"আমাদের হবেনা, কিন্তু আপনার হবে।"

—"আমি যে তোমাদের সঙ্গে মিশে অচ্ছুতের পর্য্যায়েই পড়েছি! নিয়ে যাও আবেদন-পত্র আর পাসপোর্ট, কিন্তু দেখো ভোগান্তির অন্ত পাবে না।"

চিত্ত ভাবলেন তাঁর একটা কাজের সুরাহা হোলো। আমার সঙ্গে কতগুলো বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবার তাঁর আর ইচ্ছে রইল না। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"তাহলে রমেশকে জানিয়ে দি, সব ঠিক আছে।"

—"জানাও সব ঠিক, পাসপোর্ট ছাড়া।"

দিনের পর দিন যায়। কিন্তু পাসপোর্টের কি হোলো, তা আর জানা যায়না! চিত্ত ছুটোছুটি করেন, কিন্তু কোন খবরই পাননা। গোপাল হালদার এম-এল-সি। তিনিও জানতে পারেন না—সোবিয়েৎ আর সুইডেনের এনডোর্সমেণ্ট পাবেন কিনা। তাঁর পাসপোর্ট একখানা করা ছিল। শুধু ইউনাইটেড কিংডমে যাবার অনুমতি তাতে দেওয়া ছিল। তিনি অতিরিক্ত চেয়েছিলেন ফ্রান্সে আর ইতালীতে যাবার অনুমতি। কিন্তু তখন তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। অভিমান করে, অথবা বিরক্ত হয়ে, বিলেতেও তিনি গেলেন না। কিন্তু তাঁর পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি ছিল, প্রয়োজন ছিল শুধু সুইডেনের আর সোবিয়েতের এনডোর্সমেণ্ট। আমার পাসপোর্টের ভ্যালিডিটিই ছিল দিন কয়েকমাত্র; অবশ্য ইউরোপের সকল দেশেই যাবার অনুমতি ছিল তাতে।

গোপাল হালদার কাউন্সিলে বিধানবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে অবস্থাটা জানালেন।

তিনি বল্লেন—"ও ব্যাপারে আমার কিছু করবার নেই। ওই একসটার্ণাল অফিস যে মাতব্বরদের আমার রাজ্যে মোতায়েন করেছে, তারা আমাকেই গ্রাহ্য করেনা!"

পুলিশ-মন্ত্রী কালিপদ মুখোপাধ্যায় পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন দেখে বিধানবাবু গর্জ্জে উঠলেন—"আরে, গোপালবাবুর পাসপোর্ট নিয়ে তোমার সিকিউরিটি-পুলিশ গোলমাল করছে কেন?"

—"না, স্যার। তাদের ত গোলমাল করবার কথা নেই।" পুলিশ-মন্ত্রী নিবেদন করলেন।

—"কথা নেই ! কথা যেমন থাকে না, তেমন কাজও ত কর তোমরা। খোঁজ নাও। আর মনে রেখো কমিউনিষ্টগুলো যতদিন দেশের বাইরে থাকে, ততদিনই একটু শান্তি পাওয়া যায়। একেবারে দেশত্যাগ করলেও ত পারে!" বলতে বলতে গোপাল হালদারের দিকে বারেক না তাকিয়েই অন্যদিকে চলে গেলেন তিনি। কালীপদবাবু অবশ্য পরে গোপালবাবুকে জানিয়ে দেন যে, পশ্চিম বাংলার পুলিশ কোন বাধা দেয়নি, বিচার চলছে দিল্লীতে। একস্টার্নাল এ্যাফেয়ার্স যে গুরুতর ব্যাপার! ভাগ্যিস গোপাল হালদার এম-এল-সি হয়েছিলেন, তাই রাজনীতির এতবড় কথাটা জানতে পারলেন! অবশ্য পাসপোর্টের সুরাহা তাতেও কিছু হোল না। প্রতি ভোরেই যাত্রার দিন একটি একটি করে এগিয়ে আসতে লাগল।

ওই সময়ে আকাদেমীর কাজে আমাকে দিল্লী যেতে হয়। রমেশচন্দ্র বল্লেন—তিনি জেনেছেন আমার পাসপোর্ট আর আবেদনপত্র দিল্লীর অফিসে এসেছে। আমি নিজে গিয়ে যদি তদ্বির করি, তা হলে হয়ত হয়ে যায়।

আমি বল্লাম—"কাজ কি ব্যুরোক্রেশীকে খুঁচিয়ে। আমি না গেলে বিশ্ব-শান্তির আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে না, আর ভারত রাষ্ট্রও হয়ত রক্ষা পাবে। আমি যে রাষ্ট্রদ্রোহী নই, তার প্রমাণ কিন্তু আমি সাংস্কৃতিক ব্যাপারে একাধিক মিনিষ্ট্রির সঙ্গে সহযোগিতা করে আর রাজনীতিক্ষেত্র থেকে দূরে থেকে বুঝিয়েই দিচ্ছি।"

—"তবুও ত পাসপোর্ট পাচ্ছেন না।" আমার ডিসে এক চামচে পোলোয়া তুলে দিয়ে পেরিণ রমেশচন্দ্র বল্লেন।

আমি বল্লাম,—বাংলায় একটা কথা আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তোমাদের স্নেহের স্পর্শ নিয়েছি যে! শুনেছি, বাঘে আঁচড়ে দিলেও মানুষের গা থেকে বাঘের গন্ধ বেরোয়!

—"আপনি ত আর রাজনীতি করেন না।"

—"করলে ত রাজনীতিকরা আমাকে মানুষই মনে করতেন। আমাদের দেশে নাটুকেরা না মানুষ, না সাহিত্যিক। তোমরাও তাই মনে করতে। কিন্তু তোমাদের তীর্থ-দেবতারা তা মনে করেন না বলেই নাটুকেদের কিছুটা মানবার ভাণ কর তোমরা। তোমাদের এতবড় মুভমেণ্ট এ-দেশে নাট্য-সৃষ্টির প্রয়োজনীয় প্রেরণা দিতে পারল না, দেশ-জোড়া আজকার কালচ্যারাল মুভমেণ্টও পারল না—অথচ স্বদেশী আন্দোলন পেরেছিল, বৈপ্লবিক-আন্দোলনও পেরেছিল। সকলেই নিশ্চিত করে জেনে বসে আছে, কোনদিনই পারেনি; তাই এখনো পারছে না!"

কলকাতায় ফিরে দেখলাম পাসপোর্টের রিজিওনাল অফিসের এক চিঠি আমার সন্তোষজনক কৈফিয়তের দাবী নিয়ে অপেক্ষা করছে। তাতে জানতে চাওয়া হয়েছে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কত, বিদেশে যাওয়া-আসার এবং সেখানে থাকবার খরচ কে দেবে, সেখানে যদি মারা যাই আমার সৎকারের ব্যয় বহন করবে কে, আমার বিষয়-সম্পত্তি কি আছে? পিত্তি জ্বলে গেল! এর আগে এই গবর্ণমেণ্টেরই দেওয়া পাসপোর্ট নিয়ে তিনবার ঘুরে এলাম। কে আমার খরচ যোগায়, কে আমাকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখবার এবং মরে গেলে পোড়াবার দায়িত্ব নেয়, কে আমার জামিনদার, কিছুই যেন জানা নেই!

আমি লিখে দিলাম—"আমার টাকা-কড়ি নেই, বাড়ী-ঘর নেই, বিষয়-সম্পত্তি কিছুই নেই। আছে একটা সস্তা কলম। সেই কলমই আমাকে ন্যাশনাল আকাদেমীগুলিতে, স্থান দিয়েছে, আর আলাপ-পরিচয় করেই কিছু-কিছু বিদেশী আর্টিষ্টের প্রীতিও আমি পেয়েছি। ভারত সীমান্ত পার না হওয়া পর্য্যন্ত আমার যে ব্যয় হয়, তা আমার কাউন্সিল দেয়। সীমান্তে পার হবার পর আমার সকল দায়িত্ব নেন বিদেশীয় শান্তি কমিটিগুলি, যাঁরা আমাদেরকে আতিথ্য গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করেন। আমার দেহ-দাহ ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে জামীন রয়েছেন কোলকাতার শ্রেষ্ঠতম ডাক্তারদের একজন, যিনি আইন পরিষদেরও সদস্য।" তিনি যদিইবা তাঁর দায়িত্ব পালন না করেন, পৃথিবীর যে-কোন দেশেই আমি মরি না কেন, সেখানকার শান্তি কমিটি আমাকে যে শ্রদ্ধাভরে দাহ করবেন, অথবা কবর দেবেন, এমন ভরসা আমি রাখি, কেননা আমি ওয়ালর্ডকাউন্সিল অব পীস-এর সদস্য।"

জবাব যখন লিখি, তখন এ-চেতনা ছিল যে, চিঠিখানি যে-কর্তা লিখেছিলেন, তাঁর এতটুকু বুদ্ধি যদি থাকে, তাহলে তিনি লজ্জিত হবেন। আর তা যদি না থাকে, তাহলে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় দেবেন। শেষের কাজটিই তিনি করেছেন। আমি চেয়েছিলাম আরো পাঁচ বছরের পাসপোর্ট, এবং সকল দেশের জন্য। আমাকে দেওয়া হোলো চার মাসের জন্য, যার মেয়াদ আগামী মাসের মাঝা-মাঝি উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তাও আবার আমার পাসপোর্টে আর ব্ল্যাঙ্ক-পাতা নেই। তাসকেণ্ডে যে এশিয়ান লেখক-সম্মেলন হবে পয়লা থেকে পাঁচই অক্টোবরের মধ্যে, তার জন্য ভারতীয় প্রস্তুতি কমিটি নাটক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। যদি তা লিখি, আর যদি যেতে চাই, তাহলেও, পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি থাকা সত্বেও, ব্ল্যাঙ্ক-পাতা নেই বলে এই এক মাসের জন্য নতুন বই সংগ্রহ করতে হবে; নইলে সোবিয়েৎ সরকার ভিসা লিখবেন কোথায়? এখন থেকেই যদি চেষ্টা না করি, তাহলে হয়ত টাসকেণ্ড কনফারেন্স শেষ হয়ে যাবার পর নতুন বই পাব, যেমন এবার পাসপোর্ট পেলাম, রুমানিয়ার কনফারেন্স শেষ হয়ে যাবার পর। যদি আর একদিন পরে এবারকার পাসপোর্ট পেতাম, তাহলে ষ্টকহোলম কংগ্রেসেও যেতে পারতাম না। রুমেনিয়ায় যাইনি বলে রুমানিয়ার কোন ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি আমারও হয়নি, ভারতরাষ্ট্রেরও হয়নি। কিন্তু ভারতের লাভ হোতো যদি রুমেনিয়া ভারতের সংস্কৃতির কথা জানতে পারত তিরিশ বছর কাল সাংস্কৃতিক-ক্ষেত্রে যে কাজ করেছে, এমন একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে। রুমেনিয়ান নিমন্ত্রণ বহালই আছে। যখন সুবিধে হবে জানালেই তাঁরা আমার সব ব্যয়ের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু পাসপোর্ট? অন্ততঃ যতদিন ন্যাশনাল আকাদেমী-গুলির কাউন্সিলার রয়েছি, ততদিন সাংস্কৃতিক কাজের জন্য বাইরে যেতে বাধা দিয়োনা। তাতে যে তোমাদেরই ন্যাশনাল আকাদেমীর অমর্য্যাদা হয়। যদি আমাকে অবাঞ্ছিত বলেই মনে কর, তাহলে আকাদেমী

বরং আমাকে সরিয়ে দিক। স্বদেশী আন্দোলনের সময় গবর্ণমেন্টের পুরস্কার তাই দিয়েছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ফরোয়ার্ড পাবলিশিং হাউস দিয়েছিল, তোমরাও না হয় তাই দাও। সস্তা কলমটাত হাতে থাকবে।

কিন্তু এ-যে কেবল আমার বেলাতেই করা হয়েছে, তা নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলাতেও তাই করা হয়েছিল। তারাশঙ্করও দুটি আকাদেমীর কাউন্সিলার। তার উপরেও তিনি আকাদেমী-প্রাইজ উইনার, রবীন্দ্র-পুরস্কারে সম্মানিত; সর্ব্বোপরি এম-এল-সি। তাঁকেও একেবারে শেষ মুহূর্ত্তে পাসপোর্ট দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের আকাদেমীর সম্পাদিকা কুমারী নির্ম্মলা যোশী সকল রাষ্ট্র-নায়কদেরই অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। এমন সেক্রেটারী নেই, যিনি তাঁর যোগ্যতার পরিচয় না রাখেন। আকাদেমীর সম্পাদিকা হিসেবেই ব্রসেল্‌স্ সঙ্গীত-নৃত্য সম্মেলন কর্ত্তৃক তিনি আমন্ত্রিতা হলেন। আকাদেমী তাঁর ব্যয় মঞ্জুর করল ফিনান্স কমিটির অনুমোদনে। কুমারী যোশী পাসপোর্টের দরখাস্ত করলেন।

আমি ষ্টকহোল্‌ম থেকে ফিরে এসে আকাদেমীতে গিয়ে দেখে বিস্মিত হই যে, তিনি টেবিলে বসে কাজ করছেন।

—"আরে! তুমি আমার আগেই ফিরে এলে।"

—"আমার যাওয়াই হয়নি, দাদা।"

—"কেন?"

—"পাসপোর্ট আজও পাইনি।

—"কনফারেন্স?"

—"সে ত তোমাদের ষ্টকহোলম কংগ্রেস-বৈঠকের আগেই শেষ হয়ে গেছে।"

তাজ্জব বনে বসে বসে কফি খাচ্ছি। এক তাড়া চিঠি এলো। একপোষ্টে প্রেরিত হলুদ একখানা ফর্ম্ম পড়ে দেখে ন্যাশনাল আকাদেমী অব ডান্স, ড্রামা, মিউজিক এণ্ড ফিলম-এর সম্পাদিকা আকাদেমীর একজন প্রবীণ কাউন্সিলারের হাতে তা এগিয়ে দিলেন। পড়ে দেখলাম লেখা আছে—"তোমার পাসপোর্ট প্রস্তুত। নিজে এসে নিয়ে গেলে খুসি হব।"

কফির পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে বল্লাম লোকটার, আর যাই হোক্, সাংস্কৃতিক চেতনা আছে।"

—"ভাষা দেখে তাই কি মনে হয়? তিনি জানতে চাইলেন।

—"ভাষা দেখে তা অবশ্য মনে করবার কারণ নেই, কিন্তু দিল আছে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা পাসপোর্ট শ্রী-হস্তে গ্রহণ করলে ও খুসি হবে লিখেছে। তোমার নাকের ডগায় ছুঁড়ে মারলেও কারু কাছে ওকে কৈফিয়ৎ দিতে হোত না।"

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখতে বসে পাসপোর্টের কথা দিয়ে পাতা ভরিয়ে দিলাম বলে আপনারা হয়ত হতাশ হয়েছেন। কিন্তু ঝামেলাটা জেনে রাখা ভালো। কেননা টাকার অথবা মুরুব্বির জোর না থাকলে ও ঝামেলায় আপনাকেও পড়তে হবে। আমি এমন লোকদেরকে জানি, চব্বিশ ঘণ্টায় যারা শুধু পাসপোর্টই আদায় করে নেয় নি, ফরেন-এক্স্‌চেঞ্জও আদায় করে নিয়েছে। রাষ্ট্রের কাজে যাঁরা বিদেশে যান, তাঁদের কথা আমি বলছিনা।

পাসপোর্ট নিয়ে এইরকম গোলমাল যে কেবল আমাদের রাষ্ট্রীয় ধুরন্ধররাই করেন, তা নয়। নানা রাষ্ট্রেরই কর্ত্তাদের এই রকম স্বেচ্ছাচার চলে। এই নাকি কূটনীতি! রাজনীতিক কুসংস্কার কত যে রয়েছে, এ তারই একটা দৃষ্টান্ত।

দিল্লী থেকে আমাদের রাষ্ট্রসংসদকে জানানো হোলো—ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধিরা দিল্লী এসে সমবেত হচ্ছেন, বাংলা সম্বন্ধে সঠিক কিছু না জানায় তাঁরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। দিল্লী থেকে সাত আট জুলাই পর পর দুখানি প্লেন ভারতীয় ডেলিগেশন বয়ে নিয়ে কাবুল যাবে। বাংলা থেকে কারা পাসপোর্ট পেলেন, অবিলম্বে তা না জানালে তারা কোনই পাকা-ব্যবস্থা করতে পারবেন না। বাংলা শুধু ভারতের প্রাইম-মিনিষ্টারেরই নাইটমেয়ার নয়, সকলেরই! বাঙালীরও!

অবশেষে পাঁচই জুলাই তারিখে পাসপোর্ট পাওয়া গেল। ব্যারাক-পুরের এক উকিল ভদ্রলোক ছাড়া বাংলার সকল প্রার্থীই পাসপোর্ট পেলেন! শোনা গেল উকিল ভদ্রলোকটি সম্বন্ধে পুলিশ-রিপোর্ট পাস-পোর্ট দপ্তরে তখনো আসেনি। আজও এসেছে কিনা জানিনা।

আমরা বারো জন বাঙালী নর-নারী যে যে-ভাবে পারি, দিল্লী গিয়ে পৌঁছুলাম আট তারিখে সকালে। ওই দিনই ডেলিগেশনের অর্দ্ধেক লোক নিয়ে একখানা প্লেন দিল্লী ছেড়ে কাবুলের উদ্দেশে আকাশে উড়ল। ফিরে এসে পরবর্ত্তী সকালে আমাদের বয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু ভিসা? এক দুপুরেই ঠিক হয়ে গেল। আফগান কাজের ওপর ত পৃথিবীর থাকা-না-থাকা নির্ভর করে না! তাই কর্ম্ম-চারীদের ব্যবহারও যেমন ভালো, দক্ষতাও তেমন তুলনায় বেশি।

জুলাই মাসের নয় তারিখে সকাল বেলায় নিজ-নিজ আস্তানা থেকে দিল্লীর দ্বিতীয় এয়ারপোর্ট সফদরজঙ্গে হাজির হলেন ডেলিগেশনের দ্বিতীয়াংশ, ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পঁচিশ জন নর-নারী। প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই আনুষ্ঠানিক কাজগুলি চলতে লাগল। কাউকেই ঝামেলা পোহাতে হোল না; কাষ্টমস কাউণ্টারেও নয়। কিন্তু আরিয়ানার প্লেন আর আসে না।

আফগানি ওই বিমান-কোম্পানী 'আরিয়ানা' নাম নিয়েছে তাদের আর্য্যত্ব বোঝাবার জন্যে, অথবা আর্য্য-অভিযানের স্মৃতি রাখবার জন্যে তা আমি জানিনা। তবে 'আরিয়ানা' নামটা আমার কাছে আত্মীয়তা-সূচক বলেই মনে হোলো। সাড়ে নটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত পুষ্পক-রথের প্রত্যাশায় বসে রইলাম। কিন্তু আরিয়ানা পুষ্প আর চোখের সামনে ফুটে ওঠে না! নতুন বিমান-যাত্রীরা অধীর হয়ে ওঠেন। তাঁদের মন তখন নীলিমায়, আর দেহ মৃত্তিকায়। পুরাতন যাত্রীরা এমন অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত।

তিন-বছর আগে প্রাহা-এয়ারপোর্টে আমরা ষাটজন ভারতীয় নর-নারী-সারাদিন, এবং রাতেরও বেশিটা সময়, হা-পিত্যেস বসেছিলাম।

সেবার আরিয়ানার আশায় নয়, ইণ্ডিয়া এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশনের স্কাইমাষ্টারের আশায়। আমরা সাত-তাড়াতাড়ি এয়ার পোর্টে এসে বসেছিলাম। কিন্তু স্কাইমাষ্টার সাত ঘণ্টার মাঝেও যখন দেখা দিলেন না, তখন খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। ইউরোপের এয়ারপোর্ট-গুলিতে ঘন-ঘন বেতার-বার্ত্তার আদান-প্রদান চলতে লাগল।

কিন্তু প্রাহা-পোর্টে আমাদের সময়ের ভার বইতে হয়নি। ওই পোর্টের একটি হলে নন্-ষ্টপ সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। চেকো-শ্লোভেকিয়ায় সপ্তাহকাল সারাদিন, আর রাত্রেরও বেশি ভাগ-সময়, যাঁরা আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে তাঁদের সুন্দর দেশটি দেখাতেন, আর নানা রকমে আনন্দ দিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন যে আমরা বিদেশে রয়েছি, তাঁরা সকলেই পোর্টেও আমাদের পাশে-পাশে ছিলেন। খেয়ে, পান করে, গল্প করে, সিনেমা দেখে, সময়কে সংহার করতে কোন কষ্টই হয়নি।

ওরই মাঝে খবর নিতে-নিতে হঠাৎ স্কাইমাষ্টারের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি আমষ্টার্ডাম এয়ার-পোর্টে পাখা ছড়িয়ে বিশ্রাম করছেন।

তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হোলো—"বিশ্রাম নেবার জরুরি-কারণ কিছু ঘটেছে-নাকি ?"

আশ্বস্ত করবার জন্য তিনি শোনালেন—"বেশ বহাল-তবিয়তেই আছি; তবে হয়রানি হয়েছে বিস্তর। আসলে আমি জানতাম না ভারতীয় ডেলিগেশন হেলসিঙ্কি আছেন, না আর কোথাও।"

আমাদের দিক থেকে বলা হোলো—"এখন যখন জানলেন আমরা কোথায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে আছি, তখন দয়া করে প্রাহা-পোর্টে উড়ে আসবেন কি ?"

জবাব পাওয়া গেল—"অবশ্য। ওই কমিশন নিয়েই ত ভারতবর্ষ থেকে নীল-আকাশে পাড়ি জমিয়েছি। কিন্তু মুশকিল এই যে, এখুনি উড়তে পারছি না। কাপ্তেন গিয়েছেন শহর দেখতে। তাঁকে ধরে আনতে লোক পাঠাচ্ছি। তিনি এলেই আমরা উড়ব, আর নাগাদ রাত দশটায় প্রাহা-পোর্টে নামব।"

প্রাহা-আমষ্টার্ডাম সংবাদ সাস্‌পেন্স আর থ্রিল দুই-ই যুগিয়ে আমাদেরকে চাঙ্গা করে তুল্ল। রাত দশটা পেরিয়ে গেল, এগারোটাও অপেক্ষা করে রইল না, বারোটাও বারো বার ঘণ্টা বাজিয়ে চলে গেল। প্লেন তবুও এলো না।

কিন্তু সাঁজ-রাতে যে সাস্‌পেন্স আর থ্রিল আমাদের মনকে স্পর্শ করেছিল, কনিয়া'র তাপ পেয়ে তা আমাদেরকে একেবারে নাটুকে উত্তেজনায় মাতিয়ে তুল্ল। চেক আর ইণ্ডিয়ান হাত ধরা-ধরি করে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে অবিরাম আমরা চালাতে লাগলাম আবৃত্তি আর গান, আর নাচ। রাত প্রায় দুইটায় স্কাইমাষ্টার জানালেন, তিনি নামতে চান।

আমি খুব ঘটা করে বল্লাম—"ছেলে-মেয়েরা রাত-ভোর বাইরে পড়ে রয়েছে বলে মাদার-ইণ্ডিয়া বাড়ীটাকেই বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর দুরন্তপনা নয়। ঘরে ঢুকে যে যার যায়গায় গিয়ে শান্ত হয়ে শুয়ে পড়। সারা ইউরোপ ঘুরে দেশে পৌঁছুবে কাল সন্ধ্যায়, ভারতের কুটীরে-প্রাসাদে যখন সন্ধ্যা-দীপ জ্বলে উঠবে।" তিন বছরের সেই নিশীথ রাতটির স্মৃতি আজও যেন প্রভাতের আলোর মতোই আমার মন প্রসন্নতায় ভরিয়ে তোলে।

স্কাইমাষ্টার এসেছিল, আরিয়ানার পুষ্পকরথও এলো। এসেই পেটভোর পেট্রোল গিলে হাঁপ ছেড়ে বল্ল, চল, এখুনি উড়ব। ট্রেন মাটির বুকের উপর দিয়ে চলে। তাই তাড়া কম; কিন্তু তাড়া-হুড়োর ধুম-ধাড়াক্কা কত! প্লেন আকাশে ওড়ে, তাড়া বেশি; কিন্তু তাড়া-হুড়ো নেই। কখন মাল-পত্তর বোঝাই হয়, বোঝাও যায় না। আরোহীরাও প্লেনে গিয়ে ওঠে পায়ে পায়ে, মাটির পরশ নিয়ে নিয়ে—হয়ত তাদেরও অজানায়। পায়ের তলায় মাটি নেই চেতনায় এলেই মানুষ আঁতকে ওঠে। ধরিত্রী ছাড়া মানুষকে ধরবার, আর ধারণ করবার, অপর কেউ নেই ত!

উঠলাম সকলে আরিয়ানার রথে। জয়-যাত্রায় এগিয়ে দিতে যাঁরা এসেছিলেন, এন্‌ক্লোজারের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে-নেড়ে তাঁরা জানিয়ে দিতে লাগলেন তাঁদের প্রার্থনা—"ফিরে এসো, ফিরে এসো যেন!"

আরোহীরা যাতে না মাটির আর মানুষের মায়ায় মজে লাফিয়ে পড়ে, তারই জন্যে তাড়াতাড়ি দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া হলো; লাইট-সাইনে নির্দেশ দেওয়া হোলো আসনের বেল্টের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফ্যাল। রাণওয়ের ওপর দিয়ে প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত থেকে দ্রুততর দৌড়ে চল্ল রথ চাকায় ভর রেখে। তারপর এ-দিক ঘুরে, ও-দিক ঘুরে, গতি স্তিমিত করতে করতে স্তব্ধ হয়ে একসময়ে থেমে পড়ল। আর নড়েও না, শব্দও করেনা।

—"কল বিগড়েছে নিশ্চয়!" বল্লেন একজন।

—"ভাগ্যিস কয়েক সেকেণ্ড আগে বেগড়ালো।" আর একজন ফুট কাটলেন। অধিকাংশ আরোহীই নীরব। ওড়বার মুখেই বাধা। উড়ে না জানি কি হয়! মন ভারি হবারই কথা। মানুষের স্পর্দ্ধাও যেমন, অসহায়তাও তেমন।

ককপিট ছেড়ে পাইলট এসে আরোহীদের মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে বল্লেন—"বড়ই দুঃখিত…

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে একজন বল্লেন—"কল বুঝি অচল!"

—"না, সে দুর্ভাগ্য ঘটেনি।" হেসে পাইলট ভরসা দিলেন।

—"তবে?" একসঙ্গে অনেকেই জানতে চাইলেন।

—"অমৃতসর বলছে, আজ আর উড়োনা।"

—"কেন?"

—"সেখানকার আকাশে ঝড়-তুফানের ঘন-ঘটা।"

—"কেটে যাবে'খন। ঝড় আর থাকে কতক্ষণ!" অমৃতসরের অধিবাসী এক সর্দ্দার বল্লেন।

—"অমৃতসর পৌঁছুতেই বা কতক্ষণ"—বলে পাইলট আর কথা বাড়াতে

না পেয়ে ককপিটে ফিরে গেলেন এবং প্লেনখানা রাণওয়ে দিয়ে চালিয়ে যেখান থেকে আমাদের তুলে নিয়েছিলেন, সেখানেই নামিয়ে দিলেন আমাদেরকে। নিরুপায়! লাউঞ্জে গিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিলাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল না। লাউড-স্পীকার শুনিয়ে দিল আরিয়ানার প্যাসেঞ্জাররা জেনে রাখুন, আজ তাঁদের প্লেন উড়বে না। কাল ভোরে সাড়ে তিনটেয় সকলে পোর্টে উপস্থিত থাকবেন, চারটায় ফ্লাইট। ব্যাগেজ যেমন প্লেনে আছে, তেমন প্লেনেই থাকবে, পোর্টের প্রহরীদের হেফাজতে। কী আর করা যায়!

শেষ রাতে আবার সবাই এয়ার-পোর্টে ফিরে এলাম দিল্লীর দশ-দিগন্ত থেকে। প্লেন তৈরি, আমরাও তৈরি! যে-যার আসন নিলাম। একটি কাবুলীওয়ালা তাঁর দেশে যাচ্ছিলেন। কোথায় বসবেন তিনি তা মনে-মনে স্থির করতে পারছিলেন না। সাহেব-সর্দ্দারদের পাশে বসলে তাঁরা যদি আপত্তি করেন! তাঁকে ডেকে পাশে বসালাম। খুব খুসি হলেন। বসেই হেসে বল্লেন—"দেশে যাচ্ছি!" ওই দুটি শব্দে কতদিনের জমে-ওঠা কত কথাই না প্রকাশ পেল।

—"ছেলে-মেয়ে?"

—"চারটি, বাবুজি।" কিছুটা গর্ব্ব।

—"জরু?"

—"একটি।" লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌ল।

—"তারা জানে তুমি দেশে ফিরছ?"

—"চিঠি দিয়েছি, হাওয়াই ডাকে। পায়নি, বাবুজি?"

—"পেয়েছে বৈ কি! আকাশের দিকে চেয়ে তারা তোমারই অপেক্ষায় আছে।"

—"হাওয়াই-জাহাজ আমাদের গাঁয়ের ওপর দিয়েই উড়ে চলে, বাবুজি। আঙিনায় দাঁড়িয়ে কত দিন চেয়ে-চেয়ে দেখিছি।"

বেল্ট বাঁধবার নির্দ্দেশ পাওয়া গেল। তাঁর বেল্টটা আমিই বেঁধে দিলাম।

—"পড়ে যাবার ভয় আছে নাকি, বাবুজি?"

—"আছে। তবে পড়বে না হয়ত!"

তার চোখ-দুটোয় ভয়ের-ভাব প্রকাশ পেল। কিন্তু আমাকে আর কিছু না-বলে যুক্তকর প্রসারিত করে তার খোদার উদ্দেশে বিড়-বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। আরোহীদের আর কারু মনে তার ভগবানের কাছে আত্ম-নিবেদন করে ভয়-ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার চিন্তা ও-সময়ে উদিত হয়েছিল কিনা জানি না, আমার কিন্তু হয়নি। মুহূর্ত্তের জন্ম মন যেন লজ্জায় ভরে গেল কাবুলিওয়ালাকে প্রার্থনারত দেখে। তারপরেই আত্ম-সমর্থনের বুদ্ধি যুক্তিও যোগাল; ওর অশিক্ষিত মন, কুসংস্কারে ভরা! কিন্তু কাবুলিওয়ালা যখন তার যুক্ত কর আমার মাথায় রেখে বিড়-বিড় করতে লাগল, এবং তার মন্ত্র শেষ করে নির্ব্বাক হয়ে আমার মাথায় আর গায়ে দু-চারবার হাত বুলিয়ে দিল, তখন বেশ ভালোই লাগল। চেয়ে দেখলাম তার দৃষ্টি দিয়ে মানব-প্রীতি ঝরে পড়চে। অথচ কোলকাতার তার কুসিদজীবীরূপে যখন তাকে দেখা যায়, তখন তার এ পরিচয় ত পাওয়া যায় না। স্বদেশের, স্বজনের, আর ভগবানের চিন্তা, তার আসল রূপটিকে প্রকট করেছে। মানুষের ভগবান মানুষেরই জন্ম মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

আমি তার দিকে চেয়ে আছি দেখে সে একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বল্লে—"হাওয়াই-জাহাজে এই আমার প্রথম যাওয়া, বাবুজি।"

—"কোন ভয় নেই! বাড়ী গিয়ে সন্ধ্যের পর আলোর কাছে বসে যখন তোমার ছেলে-মেয়েদেরকে, তোমার জরুকে, এই ওড়বার গল্প শোনাবে, খুব খুশি হবে তারা।"

—"আপনার কথাও বলব, বাবুজি।"

মানুষ যেন পাদপপাদপ। ঠিক যায়গাটিতে স্পর্শ পেলেই মানবতার রস অন্তরে আর অবরুদ্ধ রাখতে পারে না।

কাবুলিওয়ালা আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল। আমি মুখ ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে দৃষ্টি বার করে দিলাম।

প্লেনে চোখে দেখবার বিষয় বড় পাওয়া যায় না। তাই মন কাজ করে বেশি। স্মৃতিও এসে মন জুড়ে বসতে চায়। একবছর আগেকার একটি ঘটনা। নাইট-প্লেনে কোলকাতা থেকে মাদ্রাজ যাব। হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে ইণ্ডিয়া এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশনের আপিসে বসে আছি। কর্পোরেশনের বাস যাত্রীদেরকে দমদম এয়ার-পোর্টে নিয়ে যাবে। তার অনেক দেরী। একটি কোণে বসে যাত্রীদের চলা-ফেরা, হাসা-বসা, চেয়ে-চেয়ে দেখছি। এক সময় একটি মাদ্রাজী তরুণীর চঞ্চল চলা-ফেরা আমার দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করল। মনে হোলো তিনি কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আর এক-কোণে দৃষ্টি পড়তেই দেখি গায়ক-অধ্যাপক ভূপেন হাজারিকা এক দঙ্গল তরুণ-তরুণী নিয়ে মজলিস জমিয়েছেন। মাদ্রাজী তরুণীটিও ওই দঙ্গলে ভিড়ে গেলেন। এক সঙ্গেই হয়ত যাবেন কোথাও।

বাসে গিয়ে বসবার নির্দ্দেশ পেলাম। ভূপেনকে বিরক্ত না করে একা গিয়েই বাসে বোসলাম। মাদ্রাজী তরুণীটিকে নিয়ে ভূপেন ঠিক আমার আসনের বিপরীত দিকে বোসল। তার দলের আর সকলে নীচেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ভূপেনের দৃষ্টি পড়ল আমার উপর।

—"দাদা! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" উঠে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল।

আমি বল্লাম—"মাদ্রাজ হয়ে কেরেলায়। তুমি?"

—"বোম্বাই। আসুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি!" আমি ভাবলাম মাদ্রাজী তরুণীটিই বুঝি ওর স্ত্রী। কিন্তু ভূপেন নীচে যারা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদেরই একজনকে ডেকে বল্লে—"এই ছাখ, ইনিই আমাদেরই শচীন দা।" আমার দিকে ফিরে বল্ল—"আমার স্ত্রী।" দু'চারটে কথা বলতেই বাস ছেড়ে দিল।

নাগপুর ডাক-বাহী বিমানের মিলন-কেন্দ্র। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আর কোলকাতার চারখানি নাইট-প্লেন এক সময় সেখানে হাজির হয়। সেইখানেই ডাক আর যাত্রীর বিনিময় হয়। রাত বারোটা থেকে দুটো আড়াইটা চার যায়গার যাত্রীদেরকে নাগপুরে অপেক্ষা করতে

হয়। ভূপেন, সেই মাদ্রাজী তরুণীটি, আর আমি কফি খেয়ে 'ইউসিস'-প্রদর্শিত আমেরিকান নিউজ-রীল দেখতে লাগলাম। বোম্বাই যাত্রীদের ডাক পড়ল। ভূপেন উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে—"আসি দাদা।"

তরুণীটি উঠলেন না। আমি তরুণীটিকে দেখিয়ে ভূপেনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ইনি?"

—"উনি? উনি ত মাদ্রাজ যাবেন। দেখে-শুনে নিয়ে যাবেন, দাদা। আপনার সব পরিচয় ওঁকে দিয়েছি।" ভূপেন চলে গেল।

তরুণীটি বল্লেন—"এই আমার প্রথম প্লেন জার্নি। নার্ভাস হয়ে এয়ার লাইনস অপিসে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ডক্টর হাজারিকার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।' দম-দম পোর্টে বসে উনি আপনারও পরিচয় দিলেন। আপনাদের দুজনারই নাম আমার জানা ছিল। আমি ধানবাদ মাইনিং কলেজে পড়াই।"

—"এখনো কি নার্ভাস আছেন?"

—"না, আপনি ত পাশেই থাকবেন।"

—"কিন্তু সত্যিই তেমন বিপদ যদি ঘটে, সাহায্যের সময় কি আর থাকবে?"

—"না, না, ও-সব কথা বলবেন না!"

মাদ্রাজ-যাত্রীদের ডাক পড়ল। যেতে যেতে বল্লাম—"পা চালিয়ে চলুন, যাতে পেছন দিকে আসন পাই।"

—"পিছনের দিকটা বুঝি নিরাপদ?"

—"আপৎকালে দু-ই সমান।"

—"আবারো ওই-সব কথা!"

—"পিছন দিকে বাম্পিংয়ের ধকল্ কম।"

—"বাম্পিংয়ে যদি আমার মাথা ঘুরে যায়, যদি বমি হয়?"

—"ও-সব যে হয়, তা জানলেন কেমন করে?"

—"শুনিছি।"

—"কিচ্ছু হয় না।"

মনে পড়ে, এই কাবুলিওয়ালার বেল্ট যেমন করে বেঁধে দিলাম, তাঁরও বেল্ট তেমন করেই বেঁধে দিতে হয়েছিল। তাঁর বালিশটা বার বার পড়ে যাচ্ছিল, আর বার বার তা তুলে দিতে হচ্ছিল। শেষরাত্রে শীতে যখন তিনি কাঁপছিলেন, কম্বল নামিয়ে গায়ে জড়িয়ে দিতেও হয়েছিল। সারা-রাতটা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটালেন তিনি।

সকাল-বেলায় ঘুম ভাঙতেই এই কাবুলীওয়ালার মতোই তিনি বল্লেন—"বাড়ী গিয়ে আপনার স্নেহের কথা আমার মাকে, বোনকে, সবাইকে বোলব। খুব খুসি হবেন তাঁরা।"

কিন্তু বলবার জন্য বাড়ী যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হোল না। মাদ্রাজ-এয়ারপোর্টে তাঁরা ওঁর অপেক্ষায় ছিলেন। নেমেই প্রথম কথা, কী যত্ন করেই না তাঁকে আমি নিয়ে এসেছি। এতটুকুও ভয় হয়নি তাঁর এই প্রথম এয়ার-জার্নিতেও। মা ধরে বসলেন, তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। হোটেলে রিজার্ভেশন রয়েছে জানিয়ে বিদায় নিলাম। যেতে যেতে ভাবলাম এয়ার-জার্নি অনন্তে যাত্রা বলেই মানুষ ছেলে-মানুষের মতো হয়ে যায়। সমুদ্রযাত্রাও অনন্ত যাত্রা। কিন্তু সেখানে মানুষ নিজেকে তত অসহায় মনে করে না। মানুষ জানে, জল হাওয়ার চেয়ে সলিড; বেশি ভার বইতে পারে।

তিন বছর আগেকার একটা ঘটনা বলি। আমষ্টারডাম থেকে হেলসিঙ্কি যাচ্ছি বল্টিক সাগরের উপর দিয়ে উড়ে। আকাশে মেঘ। কুয়াসাও দশদিক আঁধার করে দিল। ক্রমে বৃষ্টিও নামল। স্কাইমাষ্টার তার গতি বদলালো, সাগর ছেড়ে তীর ধরল। বেশী উপরে উঠতে পারে না বলে নীচু দিয়ে চলতে চলতে এক সময়ে পড়ে গেল ঝড়ের মাঝে, হেলসিঙ্কির কাছা-কাছি কোথাও। আর কী সে বাম্পিং! এক-একবার হাজার, দেড়হাজার ফুট নেমে যায়। পাইলট টেনে তোলেন তিন হাজার ফুট; কিন্তু সে লেভেলে ধরে রাখতে পারেন না। স্কাইমাষ্টার বেশ বড় প্লেন; যাত্রীই আছি আমরা বাষট্টি জন। প্লেন যখন হাজার দেড়হাজার ফুট ড্রপ করছে, তখন মনে হচ্ছে নীচেকার পাইন আর ফারের জঙ্গল লাখো-লাখো সঙ্গীণ উঁচিয়ে যেন উঠে আসছে খুঁচিয়ে প্লেনখানাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে। আকাশের দিকে চাইলে মেঘের তাণ্ডব চোখে পড়ে, আর নীচের দিকে চাইলে কুয়াসার আবরণের ভিতর দিয়ে ফার-পাইনের দানবীয় আস্ফালন দেখে গায়ের রোঁয়া খাড়া হয়ে ওঠে। প্লেন হাজার দেড়-হাজার ফুট নামা-ওঠা করছে। প্লেনের ভিতরে আর্তনাদ, বমনের বীভৎস আওয়াজ। হোষ্টেস, ষ্টুয়ার্ড, কাগজের থলে নিয়ে, স্মেলিং সল্ট নিয়ে, ছুটো-ছুটি করছেন। প্রায় আধা-আধি আরোহী এয়ার-সিকনেসে অচেতন প্রায়।

আমার পাশের আসনে ছিলেন যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীমান বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তিনি বল্লেন—"দাদা আর ত পারি না।"

—"না পারলেও কিছু করবার নেই। বাইরের দিকে চেয়ে দেখো না; চোখ বুজে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে বসে থাক।"

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় একেবারে কেঁদে ফেল্লেন। কাঁদতে কাঁদতেই বলতে লাগলেন—"আপনার কি! আপনি বুড়ো মানুষ, মরলে আপনার আর কতটুকু ক্ষতি হবে? কিন্তু আমার যে অনেক আশা···

—"থাম্, থাম্! আর কাব্য করতে হবে না। আমার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজে চুপ করে পড়ে থাক্।" জোর করে তার মাথাটা টেনে নিয়ে আমার কাঁধে ফেলে চেপে ধরে বসে রইলাম। শিশুর মতো সে পড়ে রইল; বমিও করল না, কথাও কইল না। ক্রমে প্লেন দুর্য্যোগের এলাকা অতিক্রম করল, আর কুয়াসায় অনেক ঘোরা ঘুরি করে হেলসিঙ্কি পোর্টের সন্ধান পেয়ে মাটি স্পর্শ করল। কাপ্তেনকে, পাইলটকে, হোষ্টেস প্রভৃতিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যখন মাটিতে পা দিলাম, তখন হেলসিঙ্কির একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী এগিয়ে এসে বল্লেন—"চার-ঘণ্টা এই দুর্য্যোগে তোমাদের পথ চেয়ে অপেক্ষা করছি। বড় ভয় হয়েছিল তোমাদের জন্যে!"

—"আমরাই বুঝি নির্ভয় ছিলাম! কল্পনাকে ধরে-ধরে নামাতে হয়, চেয়ে চেয়ে ত্যাখ।"

—"এবার ত আমাদের কাছে পৌঁছে গেছ, সেবার ত্রুটি হবে না দেখো।"

—"নাটক লিখে থাই। করস্পর্শেই বুঝে নিয়েছি স্নেহ তোমাদের মৃত সঞ্জিবনী।"

আকাশ তখনো মেঘাচ্ছন্ন। কুয়াসার আবরণ অনেকটা পাতলা হয়েছে সত্য, কিন্তু একেবারে গুটিয়ে যায়নি। তবুও হেলসিঙ্কির চোখের আর হোষ্টদের হাসিমুখ দেখে আর উষ্ণ পরশ পেয়ে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণ অতিক্রান্ত ভারতীয়-ডেলিগেশনের সদস্যদের মনে হয়েছিল, সৌরকর-বিরল দেশে বুঝি শত শত মানব-সূর্য্যের উদয় হয়েছে!

—"অমৃতসর! অমৃতসর!" সর্দ্দারদের উচ্ছ্বাস ক্রুর আঘাত হেনে মধুর স্মৃতির জাল টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দিল। কোথায় হেলসিঙ্কি, আর কোথায় অমৃতসর!

সেই হেলসিঙ্কি অতিক্রম করেও আরো উত্তরে চলেছি এবার; কিন্তু ভিন্ন পথে।

—"ওই ছ্যাখ, ওই ছ্যাখ আমাদের গোল্ডেন টেম্প্‌ল।" একজন সর্দ্দার বল্লেন।

বাঙালীরা এক-কণ্ঠে হুঙ্কার দিল—"জয়, গুরুজীর!" কেন, তা তারাই জানে। (ক্রমশঃ)



দেহি! দেহি!

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

নরকণ্ঠে যত সুর ওঠে নিত্য গগনে পবনে, তার মাঝে প্রবল ধ্বনি শুনি সকাতর—দেহি! দেহি! যে কথা নয় স্পষ্ট, রাঙতা-মোড়া যেথা আকাঙ্ক্ষা, সে কথারও মর্ম ভেদ করলে শুনি ঐ একই আবেদন—দেহি। মানুষের মনের মাঝে যদি কেহ ডুবতে পারে, অনুভূতি সন্ধান পায় অসংখ্য যাচ্ঞার।

এতে আশ্চর্য্য হবার কারণ কোথা? বেছে নিয়ে একটি মানুষ যখন পরীক্ষা করি তার মনোবৃত্তি, প্রত্যক্ষ করি এক দুর্ব্বল অসন্তুষ্ট জীব। জগতের আদিলীলা হ'তে যদি সে না দল বাঁধতো, যদি না বলতে পারতো—ওগো দেহি সঙ্গ, দাও বল, দাঁড়াও এসে আমার পাশে—অতিকায় জীব মনুষ্য জাতিকে নিশ্চিহ্ন করত এ ভুবনে। অতিকায় কেন? তুচ্ছ শৃগাল, কুকুর, অহি বা নকুল কারও সাথে শুধু হাতে লড়তে পারে না নিঃসহায় মানুষ। তাকে চাহিতে হয় অস্ত্র, ভিক্ষা করতে হয় সঙ্গ, এমন কি এই বুদ্ধিমান জীবকে চাহিতে হয় বুদ্ধি অন্যের কাছে আজিও।

চিরদিন মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ। আজ তার জ্ঞান তাকে বহু উচ্চে তুলেছে জগতে। কিন্তু জ্ঞান চায় আরও জানতে, কারণ সে অনন্তসন্ধানী। মানুষ মানুষকে ভালবেসেছে। কিন্তু প্রেমেরও তো অন্ত নাই। তাই সদাই বলে মন—দেহি জ্ঞান, দেহি প্রেম। যশও ঐ প্রেম-বৃক্ষের ফল। যে যাকে ভালবাসে সে গায় তার যশ। নিন্দুক অপ্রেমী। যশের গান তার সুরে নাই! হিংসুক চায়না পরের কীর্ত্তি। সেও বলে—দেহি, দেহি, নিপাত কর শক্তি তার—যার প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা আমাকে দগ্ধ করছে রাত্রি দিন।

তাই কান পেতে মনোনিবেশ ক'রে শুনলে সদা শুনি—দেহি, দেহি। ধন দাও, মান দাও, যশ দাও, জয় দাও, বিদ্যা দাও। মানুষের অভিব্যক্তিগত এ সংস্কার। আবেদনের পাত্রও বিভিন্ন। উপরে—যাচিঞা, নিম্নে—আদেশ। যেথা মানুষ বোঝে বাঞ্ছিত বিদ্যা, ধন, কীর্ত্তি বা বল তা' হতেও শক্তিমানের কবলে, সে প্রার্থনা করে। যেথা সে বোঝে বাঞ্ছিত দানের সামগ্রী তা হ'তে হীন-বলের করায়ত্ত, সে আজ্ঞা দেয়। মূলে এক—কিন্তু পাত্রভেদে দেহি শব্দের অর্থ বিভিন্ন। উপরে বলি দেহি—ভিক্ষার আশায়। নিম্নে বলি দেহি—নিজের শক্তিকে বড় মেনে। যেখানে মানুষ জগদীশ্বরের শক্তিতে আস্থাবান—সে ক্ষেত্রে তার ভিক্ষার আবেদন পৌঁছে যায় স্বর্গে। হয়তো তার ভাবের বা জ্ঞানের অভাবে সে মন স্থির করতে পারে না, স্পষ্ট ধারণা করতে পারে না শক্তির রূপের, যেথা পৌঁছে দিতে চায় আবেদন। তবু সে বোঝে দৈববল। সে মাথা হেঁট করে বলে—দাও প্রভু। এই যাচিঞার তাগিদ না থাকলে মানুষ পারতো না সাধন সমরে মাথা তুলে দাঁড়াতে—এ কথাও স্বীকার্য্য।

প্রার্থনা দীনতার অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সব

সময় মানুষ প্রার্থনা করে না অন্যের কাছে আপনাকে হীন প্রতিপন্ন করবার জন্য। একই দানের জন্য দুই বিবাদীর প্রার্থনা বিরোধী। অভিযান চায় অন্যের সর্ব্বনাশ—বিপন্ন তখন চায় অভিযানীর বিনাশ। উভয়েই যদি প্রার্থী হয় দেবদ্বারে—তা'হলে দান তো পেতে পারে না উভয়েই। কিন্তু ক্ষণিকের তরেও উভয় শত্রু দৈব-শক্তির নিকট মাথা হেঁট ক'রে শুদ্ধও হয়। আবার কেহবা হীনতা স্বীকার করে নিজের শক্তির প্রতি সন্দিহান হ'য়ে। প্রেম ও ঈর্ষা উভয়েই সংস্কার। তাই তারা সংগ্রামরত।

কাজেই ভগবানের বিচারে আস্থা থাকলে, ব্যক্তিগত প্রার্থনা সমৃদ্ধ করে আচরণ। অথচ বহু প্রার্থনা তামসিক, অনেক প্রার্থনা রাজসিক। সত্বগুণ শুদ্ধ করে জীবকে, তখন সে আত্ম-সমর্পণ করে জগদীশ্বরের বিচারে। সাত্বিক প্রকৃতির অন্তরাত্মাও প্রার্থনা করে, চায় শরণ। ভীষ্মদেবকেও বলতে হয়েছিল—

বিপরীতেষু কালেষু পরিক্ষীণেষু বন্ধুষু
ত্রাহি মাং কৃপয়া কৃষ্ণ শরণাগতবৎসল!

কাল যখন বিপরীত হবে—বন্ধুরা যখন পরিত্যাগ করবে তখন শরণাগতবৎসল কৃষ্ণ কৃপা ক'রে আমাকে পরিত্রাণ কর।

এ প্রার্থনার কারণ নিশ্চয় সাত্বিক নয়। কিন্তু দেহির মাঝে চরমের ইঙ্গিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।

যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, সেইভাবে আমি তাকে আশ্রয় দান করি।

অবশ্য খুনী হিংস্রক বা দস্যু, দুষ্ট প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেন না ভগবান নিশ্চয়। সকল প্রবৃত্তি, তাঁর ত্রিগুণের প্রকৃতির এক গুণের বিকাশ। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে যদি কোনো মানব তাঁর বিভূতি জেনে তাঁর আশ্রয় চায়—সে নিশ্চয়ই নরঘাতক বা দস্যু হতে চাহিবে না। তাকে ভজা মানে তাঁকে জেনে ভজা! তাঁকে জানলে দীনতা, হীনতা, নীচতাকে তাঁর আশ্রয় বোধ হবে না।

মহাপ্রভুও বলেছিলেন—যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভজে তৈছে। এখানে কৃষ্ণকে ভজনা করা চাই। কৃষ্ণ নাম মুখে কীর্ত্তন ক'রে মনে-প্রাণে—দৈনিক কর্মে অসুর ভজলে তো কৃষ্ণ ভজা হবে না। সুতরাং সে দেহি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাচনা নয়। অবশ্য তাঁর অযাচিত দয়া জগত ব্যাপী।

প্রভু যীশুর কথা—চাও পাবে, আঘাত কর দরজা খুলবে—ঐ ভাবে বুঝতে হবে। তাঁর স্বর্গের পিতাকে প্রকৃতরূপে জানলে কেহ তাঁর নিকট নররক্ত চাহিবে না—দুষ্ট পিপাসা মেটাবার প্রয়াসে। দান চাহিলে দাতার স্বরূপ জানতে হয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করবার পূর্ব্বে অর্গলা পাঠ করতে হয়। অর্গলা মানে—আগর, খিল। মনের কপাটের আগর বন্ধ ক'রে, চিত্তবৃত্তি নিরোধ না করলে হৃদয়ঙ্গম হয়না শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ।

কিন্তু সেই অর্গলাতে দেখি—দেহি দেহির প্রাচুর্য্য। মায় ভার্য্যা-মনোরমাং দেহি—এ আবেদনও সন্নিবেশিত সে মন্ত্রে। মনে সন্দেহ আসে, সংশয় জন্মে লঘুতার। তারপর চণ্ডীতে বর্ণনা দ্বন্দের কথা—সুরাসুরের সংগ্রাম—হত্যা—উচ্ছেদ—জয় পরাজয়ের হাসি কান্না।

সত্যই তো প্রকৃতরূপে না বুঝলে সন্দেহ দূর হয় না। মহামায়া মহালক্ষ্মীর স্তবে কত কথা শুনি—মহান উপদেশ, শুভবাণী। মন কিন্তু সন্দেহ দোলায় দোলে—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। এ দুর্ভোগ আমাকে ব্যথা দিয়েছে বহু দিন। কিন্তু বিজ্ঞদের উপদেশ ও আত্মানুসন্ধানের ফলে আজ আমি অন্ততঃ বুঝি যে লঘু সাহিত্য নয় সপ্তশতী চণ্ডী।

আজ অর্গলা সম্বন্ধে দুটা কথা নিবেদন করব। সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করব না। প্রতি হিন্দুর ঘরে এ পুস্তক থাকা সম্ভব।

প্রথমেই মহাদেবীকে সম্বোধন ক'রে বলা হয়েছে যে তিনি জয়ন্তী, তিনি মঙ্গলা, তিনি কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী। এ শব্দগুলির অর্থ না বুঝলে—দেহির তালিকার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়। তিনি দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বধা, স্বাহা। তাঁকে এ কথা নিবেদন করে নমস্কার—অর্গলার প্রারম্ভ। বলা বাহুল্য কোনো রচনা বুঝতে গেলে সংশ্লিষ্টভাবে বুঝতে হয়। মাত্র ভিক্ষাবস্তুর উপর মনোনিবেশ করলে ফল হয়না।

ত্রিকালজ্ঞ বস্তুর প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় না। এ তুলনায় ক্ষুদ্রত্ব কিছু নাই। তিনি জয়ন্তী—তুচ্ছ জয়ের দেবী নন—আত্মজয়ী হওয়া যায় তাঁর শরণে। তিনি মঙ্গলা মঙ্গল করেন কিরূপে? মঙ্গ অর্থে জন্ম-মৃত্যু বিকার। যাতি মানে নাশ করেন। সুতরাং মঙ্গল লাভ করতে গেলে এমন ভাবে জীবন যাপন করা প্রয়োজন—যার ফলে আশা নিরাশা, বাসনা বা শত্রুতার সংস্কার হ'তে নিস্তার পাওয়া যায়। তিনি মঙ্গল বিধান করেন তাই তো জয়ন্তী-জয়যুক্তা। সকল শব্দের এখানে অর্থ সন্নিবেশ করবার স্থান নাই। মোট কথা তাঁর উপাধির নির্ঘণ্ট হৃদয়ঙ্গম করলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মাবে যে যখন রূপং দেহি—প্রার্থনায় সাধক রূপ প্রার্থনা করবেন তখন তিনি স্ত্রী জাতি ভোলাবার জন্য কন্দর্পবিমোহন রূপের প্রার্থী নন। শিবা দেবী শান্তিদায়িনী চিৎ-শক্তি। কাজেই জয়ং দেহি অর্থে অশান্তির সৃষ্টি নয় একের উৎখাতে বা পরাজয়ে। দ্বিষো জহির তো কথাই ওঠে না—অহিংসা সংস্কৃতির সার দেশের সকল প্রার্থনায়। আর যশো দেহি—মানে মাথা ফোলাবার কীর্ত্তি-ঝঙ্কার নয়, কারণ যে উপাধি বর্ণনা ক'রে ভিক্ষা চাওয়া হ'চ্চে তার মাঝে আমিত্বের স্থান নাই।

পরমাশক্তি মহামায়া তিনি কালী—সময়কে নির্মূল করেন। কালই তো পার্থক্য ঘটায় প্রতি মুহূর্ত্তে, সপ্তশতীর কথায়, প্রতি কলাকাষ্ঠায়। তাইতো জগৎ অশাশ্বত। প্রকৃত কালীর সাধনায় মোক্ষ লাভ হ'লে তো কালের বাহিরে যায় আত্মা, লাভ করে অনন্ত জীবন। সেই জননী কালীর নামে অর্গলা আরম্ভ ক'রে মানুষ ভাবতে পারে না রূপ—দেহের সৌন্দর্য্য, জয়—অন্যের পরাজয়, যশ সংসারের তুচ্ছ যশ বা জমিজমা বখরার বা প্রতিযোগিতায় পরাজয়ের দ্বিষতা। অথচ কথার সাধারণ অর্থ পরিত্যাগ করাও সাহিত্য বা শাস্ত্রপাঠের রীতি নয়। একই শব্দের যখন বিভিন্ন অর্থ সম্ভব, তখন প্রজ্ঞা বলে বিষয় ও আনুসঙ্গিক কথা ও ভাবের সাথে মিলিয়ে বাক্যের অর্থ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

আর এক কথা। প্রথমে দেবীর কয়েকটি নাম উল্লেখ ক'রে, তাঁর এক এক বিশেষ কীর্ত্তির উল্লেখের পর বলা হয়েছে—রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রুকে বিনাশ কর। সে সব শ্লোক হ'তেও আমরা ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেতে পারি রূপাদি চারটি শব্দের। একই শ্লোকের শব্দের সামঞ্জস্য না থাকলে কথা হয় প্রলাপ। আমাদের বাঙ্গালার রসিকতা—ছাগলে কামড়ালে সীতা, ষোলো রাজা দুর্য্যোধন, ঐ শ্রেণীর। তাই পদের শেষের শব্দ পূর্ব্বশব্দের সঙ্গে আপনাকে সমন্বয় করে। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে তাকে বলে সিংহাবলোকন—কারণ পশুরাজ চলবার সময় ফিরে ফিরে পিছনে তাকায়। ব্যবহার শাস্ত্রে এরূপ অর্থ সংগ্রহকে বলে ejusdem generis।

এখন এই দৃষ্টিতে আমরা যদি অর্গলার দেহি শব্দের ভাবগ্রহণ করি, তা হ'লে কথঞ্চিত জ্ঞান জন্মে আমাদের মত সাধারণ পাঠকের। সাধকেরা আরও গভীরে দেখেন অন্তর্দৃষ্টিতে।

প্রথমে দেখি মধুকৈটভ ধ্বংসের কথা। তারপর মহিষাসুর নির্ণাশী প্রভৃতির উল্লেখ। এখানে স্মরণ করতে হবে এই সব সংগ্রামের তাৎপর্য্য এবং চিত্র।

মানুষের দীর্ঘ জন্মজন্মান্তরব্যাপী জীবনে সদাই চলছে দেবাসুরের সংগ্রাম। স্মরণ করতে হবে গীতার কথা—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন দৈব আসুর এব চ।

সংসারে দৈব এবং আসুর দুই প্রকার প্রবৃত্তি বিদ্যমান। প্রত্যেক মনের অভ্যন্তরে সংস্কাররূপে এরা বর্ত্তমান। অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি প্রভৃতি প্রাণে বিদ্যমান সকল জীবের। আমি পূর্ব্বে অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। তাদের সঙ্গেই বিদ্যমান আসুর সম্পদ সংস্কার-রূপে আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে। তারা দম্ভ দর্প অভিমান প্রভৃতি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এরা রূপ পেয়েছে। দেব বা দ্যোতেন শক্তি যখন পরাভূত হয় প্রত্যেক মনে বা সংসারে তখন অসুর শক্তি দম্ভ, হিংসা, ঈর্ষা প্রভৃতিকে দমন করবার জন্য আমরা দেব-শক্তির সার সংগ্রহ করি। অসুর-শক্তিকে দমন করে দেবশক্তি, উপনিষদের এই সত্যকে রূপ দিয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডী—সপ্তশতীচণ্ডী। সপ্তশতীতে বর্ণিত প্রত্যেক অসুরটিকে বুঝলে আশ্চর্য্য হতে হয় মনো-বিজ্ঞানের রূপায়ন।

মনের অসুর বধ করতে হলে শক্তির প্রয়োজন। তাই শুনি শ্রীশ্রীদেবী—নিঃশেষ দেবশক্তি সমূহমূর্ত্তা। তাঁর এই প্রকৃত মূর্ত্তি। আমরা কাঠে বা মাটিতে তাঁর প্রতিমা নির্ম্মাণ করি।

চিত্তে সেই শক্তি আবাহন কর্লে অসুর বিনাসের ব্যবস্থা হয়। সে কথার উল্লেখ করি যথন। স্তোত্রে বলি—

মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোঃ জহি—

মহিষাসুর বিনাশিনী এবং ভক্তগণের সুখদায়িনী, তোমাকে নমস্কার করি। রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, শত্রু বিনাশ কর।

মনের মহিষকে মারবার যে শক্তি তাঁকে আবাহন করছি। বলছি তিনি ভক্তের সুখের বিধান করেন। সে প্রসঙ্গে রূপ নিশ্চয়ই মনের রূপ, ভাবধারা প্রবৃত্তির রূপ যা সাত্বিক আচরণে হবে সমুজ্জল, জয় হবে মনের অসুরের ওপর, কীর্ত্তিমান হ'বে মনের ধারা, সঙ্গে থাকবে ভক্তি। মর জগত ছেড়ে অমৃতলোকে স্থান পাবার ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ কীর্ত্তি যার তার তো মরণ নাই। মৃত্যোর্মাঽ-মৃতং গময়। আর শত্রুবধ তো হিংসায় পুষ্ট জীবের বধ নয়। অসুর শত্রু—মন্দভাব—মহিষের মত ভ্রান্ত, অজ্ঞ, একগুঁয়ে, বদ্‌মেজাজী—নিজের মনের জন্তু। তাকে মারলে তো জীবের হ'বে উপকার। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়েছে অর্গলা—সর্ব্বমঙ্গলা—সবার মঙ্গল বিধায়িনীর করুণা।

অপর এক শ্লোকে এই স্তোত্রেই বলা হ'য়েছে—বিধেহী দ্বিষতাং নাশম্—শত্রু ভাব বিনাশ কর। নিশ্চয় এ নিজমনের কথা। মনই মনের শত্রু সে মনের মাঝে বিদ্যমান। তার নাশের আবেদন। একবার মন বলে—মাকে ডাক্। বল্ অভয় পদে প্রাণ স'পেছি। আবার পরক্ষণেই সে ভাবের বৈরী ভাব বলে—কিসের মা, যতদিন প্রাণ থাকে সুথে থাক, ঋণ ক'রে ঘৃত কর পান। এই শত্রুতার নাশের উপদেশ দিয়েছেন—অর্গলা—মনে খিল আঁটবার মন্ত্র। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলা হ'য়েছে—বিধেহি বলমুচ্চৈঃ। উচ্চ বল—দ্বিষতানাশের জন্য চাওয়া—দেহি।

সকল শ্লোক নিয়ে ব্যাথ্যা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। আমার হীন অভিমত প্রকাশ করলাম স্তোত্র ব্যাথ্যার। তবে ভার্য্যামনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীং—এ দেহির তাৎপর্য্য কি? ভার্য্যা শব্দের এক অর্থ ভক্তি। মনোবৃত্তি অনুসারিণী শুনে ঐ কথাই মনে হয়। কারণ ভক্তি মনোবৃত্তি। আর ভার্য্যা যদি ধর্ম্মপত্নী অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে, তাতেই বা ক্ষতি কি? গীতা, চণ্ডী এ-সব শাস্ত্র তো গৃহীর পথপ্রদর্শক। ভার্য্যা বিপরীত মনের হ'লে কী শান্তি সম্ভব? শান্তিহীনের চরিত্রের মাধুরী কেমন ক'রে হবে বিকশিত।

পূর্ব্বাপর বিষয় বুঝে অর্থঃ হৃদয়ঙ্গম করলে প্রার্থনার অতি সাংসারিক স্বার্থান্বেষী ভাব জাগে না মনে। অর্গলার যাচিঞা করা যায়—দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যম' সৌভাগ্য নিশ্চয়ই মাতৃ-আরাধনা, মহামায়ার নামকীর্ত্তনের সৌভাগ্য। আরোগ্য দেহ ও মন উভয়ের নিরোগিতা। নিরোগিতা না হ'লে আধ্যাত্মিক কর্ম্ম তো সম্ভব নয়। শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম। শরীরের নিরাময়তা আদি সংস্কার এবং কর্ত্তব্য। কল্যাণ—আধ্যাত্মিক শুভ ভাব, বিপুল শ্রী—মানসিক ঐশ্বর্য্য—ভক্তি, সাধনা, নতি, শরণ। শ্রী ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য—ঈশ্বর, ধর্ম্ম, বিভূতি। অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাশ, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, এবং কামাবসায়িতা। অবশ্য এ-সব বড় কথা। শ্রী-চিত্তের সৌন্দর্য্য। জগতের ছন্দের উপলব্ধি একতায়। বিদ্যাবন্ত যশস্বন্ত এবং লক্ষীবন্ত করবার মূলেও ঐ ভিক্ষা।

একটা কথা এ স্থলে মনে হয়। সাধারণ অতি-সংসারী, অতি-লোভী সহজে ধর্ম্মের পথে আসতে চায় না। তাদের মনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির আশা প্রণোদিত করে চার দফা দেহি। ক্রমশঃ তাদের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করিয়ে দেয় যে উচ্চদরের যশ, জয় এবং রূপ বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক বা গুরু যদি তাদের মনে প্রকৃত শ্রী ও যশের রূপ প্রতিফলিত করেন, স্বার্থান্ধের রাজসিক বৃত্তিই তাকে সাত্বিক পথে অগ্রগমন করবার উৎসাহ দেবে।

রূপং দেহি—আমাকে রূপ দাও। কিন্তু আমাদের সাধনার শেষ ব্রহ্মে লয়। তখন জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়। কে জানে রূপং দেহির—অন্তিম লক্ষ সেই এক অবোধের উপলব্ধি কিনা।

কবি জয়দেবের—দেহি পদপল্লবমুদারম—প্রেম ধর্ম্মের সারতত্ব বুঝলে সম্ভব হবে উপলব্ধি।

দেহি যখন জগদীশ্বরের নিকট ভিক্ষা, তখন এর মাঝে লজ্জার কারণ নাই যদি যাচিঞার মাঝে—পরের উৎসাদন বা নিজ চিত্তের সংকোচন না থাকে। আদি যুগ হতে

যাঁরা প্রার্থনা করছেন। তার মাঝে যথেষ্ট যাচিঞা আছে। অথর্ববেদের শান্তি পাঠ—পৃথিবী, দ্যৌঃ, ওষধি, বনস্পতি—সবার শান্তি প্রার্থনা। শুক্ল যজুর্ব্বেদের দেহি—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি
বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি
বলমসি বলময়ি ধেহি
ওজোঽস্যোজোময়ি ধেহি
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি

এর মাঝে নিকৃষ্ট কিছু নাই। তেজ, বীর্য্য, বল, শক্তি, মানসিক তেজ ও প্রভাব ভিক্ষা করা হয়েছে তাঁর নিকট যিনি ঐসব সদ্‌গুণের আকর।

ঋগ্বেদের স্বস্তি বচন ইন্দ্র, পুষা, বৃহস্পতি প্রভৃতিকে আবাহন করে যাচিঞা করেছে—আমরা যেন কর্ণে কল্যাণকর বিষয় শুনি, চক্ষের দ্বারা মঙ্গলময় দৃশ্য দেখি, যেন দেবনিহিত দীর্ঘায়ু হই এবং দৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে তোমাদের স্তব করতে পারি।

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেব, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি র্বশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

সত্যই তো প্রার্থনা—দীনতা-স্বীকার এবং আবেদন পৌঁছাবার আয়োজন তাঁর কাছে সকল শক্তির যিনি আধার। রবীন্দ্রনাথ বলেন—

যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন—শোনা গিয়াছে তাঁহারা কী বলেন। তাঁহারা বলেন একটি মাত্র প্রার্থনা আছে তাহা এই—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়
আবিরাবির্ম এধি,
রুদ্র তব দক্ষিণ মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।

"অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে অপ্রকাশ আমার নিকট প্রকাশ হও। রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহা আমাকে সদাই রক্ষা করে।"

জীবনের সকল কাজের মত দেহি বলা যায় তিন ভাবে। তামসিক ভিক্ষা সঙ্কীর্ণ করে মনকে, রাজসিক দেহি ও প্রসার করেন। সাত্বিক ভাবে চাহিতে হয় জীবকে এবং তার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। মনের আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেয় আবেদন। সত্য, জ্যোতি বা অমৃতের প্রেরণা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাকে স্থিতি করে।

তবে ভগবান যে দান-বীর। ইংরাজি কবি বলেছিলেন—More things are wrought by prayers than the world dreams of পৃথিবী স্বপ্নেও যা ভাবতে পারে না, প্রার্থনার দ্বারা এমন কর্ম্ম সাধিত হ'তে পারে।

কোলরীজের প্রবীণ নাবিক রাজহাঁস মারার পাপে বহু কষ্ট পেয়ে শেষে বলেছিলেন সেই কথা যা ভারতের কৃষ্টি। জীবে দয়া হলে প্রার্থনা মূর্ত্ত হয়। Ancient Mariner বলেছিল—

He prayeth well who loveth well
Both man and bird and beast.
He prayeth best who loveth best
All things both great and small,
For the dear God who loveth us
He made and loveth all.

সেই তো প্রার্থনা করে ভালো, যে উত্তমরূপে ভালোবাসে মানুষ, পাখী ও পশু সকলকে। তার প্রার্থনাই সর্ব্বোত্তম, যার প্রেম ও সর্ব্বোচ্চ ছোট বড় সকল পদার্থে। কারণ সেই প্রিয় ভগবান যিনি আমাদের সকলকে বাসেন ভালো—তিনি সৃষ্টি করেছেন সকলকেই, আর ভালোও বাসেন সবাইকে।

চাওয়ার শেষ নাই। কিন্তু জ্ঞান হ'লে চাওয়া মাত্র একরূপ নেয়—ঈশ্বরের বাণী শোনবার যাচিঞা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"যেমন সাত সমুদ্র গঙ্গা, যমুনা, নদী সব তাতে জল রয়েছে, কিন্তু চাতক বৃষ্টির জল চাচ্ছে। তৃষ্ণাতে ছাতি ফেটে যাচ্ছে তবু অন্য জল খাবে না।"

শিল্প ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' কথাটির আজকাল খুব প্রচলন। ছোট হইলে জলসা, বড় হইলে সম্মেলন। সঙ্গীত, কবিতাপাঠ বা আবৃত্তি ইহার প্রধান অঙ্গ; অবশ্য প্রয়োজনমত সভাপতি, উদ্বোধক, প্রধান-অতিথির ভাষণ ইহার সৌষ্ঠব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে। ইহার সহিত Art বা শিল্পকলার কোন সম্বন্ধ নাই, যদিও অংশগ্রহণকারীকে শিল্পী বলিয়া থাকি। ছবি আঁকিয়া যাঁহারা নাম করিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহাদের ছবির স্থান উপরোক্ত অনুষ্ঠানে নাই। সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি দ্বারা আমাদের সুপ্ত বা স্তিমিত ছন্দোজ্ঞান যেমন জাগরিত হয়, সুন্দর চিত্রের দ্বারা তেমনি আমাদের অবসন্ন চিত্র-বুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠে। অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচীর মধ্যে কুশলী শিল্পী দ্বারা চিত্র-বিশ্লেষণ একটি 'আইটেম' রাখিলে সাংস্কৃতিক শব্দটির বোধহয় ক্ষতি না হইয়া সম্পূর্ণ রূপায়ন হয়। বৈচিত্র্যের স্পর্শে প্রচ্ছন্ন বিরক্তিরও অপহ্নব ঘটে এবং আনন্দের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ব্যঙ্গচিত্র, প্যাঞ্চ বা শঙ্করম্ উইক্‌লী বা পূর্ণ চক্রবর্ত্তীর রামায়ণ-জাতীয় চিত্র তাহার প্রমাণ। গগন ঠাকুরের সামাজিক চিত্র অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

বহু প্রাচীনকালে চীনদেশে সুপ্রসিদ্ধ 'শু' (SHU) রাজত্বের গৌরব-মধ্যাহ্নে রাজানুগ্রহে জনগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করিত। ইহাতে সঙ্গীত, কবিতা ও চিত্রশিক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করিত।

সঙ্গীতের সম্মান সর্ব্বাগ্রে ছিল, কারণ মানুষে-মানুষে ও সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ের মধ্যে মনের মিল আনিবার জন্য ইহার অসীম ক্ষমতা আছে বলিয়া রাজপুরুষদের বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসের বশে "শু" বংশের সম্ভ্রান্ত যুবক যুবতীকে সামাজিক মর্য্যাদালাভের জন্য সঙ্গীত শিক্ষা করিতে হইত।

কবিতা বা কাব্যালোচনা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। কারণ ইহার মাধ্যমে রাজনৈতিক একতা সম্ভবপর হইত। রাজপুত্র বা উচ্চ রাজপুরুষেরা কোন বিষয়ে নীরসভাবে হুকুম না দিয়া কবিতার মাধ্যমে বিষয়টি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব কিনা দেখিতে বলিতেন এবং প্রজারাও কবিতার মাধ্যমে ইঙ্গিত দ্বারা উত্তর দিত। চারণ কবিরা কবিতা-রচনা করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিত কোন্ প্রদেশ সুশাসিত বা কুশাসিত। সেই যুগকে যথার্থ ই স্বর্ণযুগ বলা হইত।

চিত্রাঙ্কনের ছিল তৃতীয় স্থান। কারণ. ইহার দ্বারা নৈতিক উন্নতি সাধিত হইত। চিত্রকর প্রভূত সম্মানলাভ করিতেন।

ছবি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার বাহন হইয়াছিল। দৃশ্যবাদী এবং প্রকৃতি-বাদী চিত্রশিল্পী রূপকে রূপান্তরিত করিয়া চিত্রপদ্ধতি আবিষ্কারের শিক্ষা দিতেন। শিল্পের ভাষা ও রূপতত্ত্বের কথাগুলি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা চলিত। এমনভাবে পারিবারিক পরিবেশ, কথোপকথনের ভঙ্গী, দেওয়ালে পুণ্যকাহিনী সুকৌশলে অঙ্কিত হইত এবং তাহার পার্শ্বে গতানু অত্যাচারী রাজা ও নিষ্ঠুর কুকর্ম্মরত রাজপুরুষদের চিত্র যথাযথভাবে চিত্রিত হইত, যে বিশ্লেষণকারী প্রবীণ সাধু বা সম্মানার্হ ব্যক্তি সেই সকল চিত্র-অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত দর্শকগণকে বুঝাইয়া নৈতিক শিক্ষা প্রদান করিতেন।

প্রত্যেক মানুষ ও সম্প্রদায়ের পক্ষে স্বার্থত্যাগই ছিল সর্ব্বপ্রথম আদর্শ এবং আর্টকে সমাজে অতি উচ্চস্থান দেওয়ার বিশেষ কারণ এই যে তাহার দ্বারা শিল্পী গণ-মানসের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

"শু" বংশের রাজত্বকাল প্রায় ৫০০ বৎসর। কিছু পরেই আবির্ভাব হইল দুই মহাপুরুষের—কন্‌ফুসিয়স্ ও লাওসে।

লাওসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কন্‌ফুসিয়সের মানবকল্যাণবাদ (বা Common Good, Socialism)—এর মধ্যে দারুণ পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব ছিল না। বরং কন্‌ফুসিয়স্ লাওসেকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন। লাওসের অন্তরঙ্গ শিষ্য শোণীর রচনা প্রকৃতির বন্দনায় মুখর, বিবাদ বিসম্বাদ, সমালোচনার উর্দ্ধে মানুষকে তুলিয়া প্রেমের বন্ধনে বাঁধিবার জন্য সমুৎসুক—শান্ত ভাবগম্ভীর, পবিত্র।

কন্‌ফুসিয়স্ প্রচার করিলেন মানবিকতা ঈশ্বরের সমতুল। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁহার গভীর দরদ লইয়া শুনাইলেন ঐক্যই মানবের চরম সার্থকতা ও নৈতিক পরিণতি। এই নীতিই তাঁহাকে ধর্ম্মগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কবি ও চিত্রকর তাঁহার নিকট অযাচিত উৎসাহ ও প্রেরণা পাইয়াছে। তাঁহার দেহ রক্ষার কয়েক শত বৎসর পরে কোগাইশী নামক একজন কবি-চিত্রকর, লাওসের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের চর্চ্চা করিয়া একটি সত্য নির্ণয় করিয়াছেন—তাহা এই—চিত্রে চক্ষুর অঙ্কন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, কারণ উহারই উপর আলেখ্যটির সাফল্য নির্ভর করে।

তাঁহার বিষয়ে একটি শ্লোক প্রচলিত আছে—তিনি কবিতায় প্রথম, চিত্রাঙ্কনে প্রথম এবং নির্ব্বুদ্ধিতায় প্রথম।

[বোধহয় এখানে নির্ব্বুদ্ধিতা অর্থে সাংসারিক জ্ঞানে]

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার অ্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্ট'সের গৃহে মাননীয়া লেডি রাণু মুখার্জ্জির চেষ্টায় চীনদেশের চিত্র ও শিল্পকলার বিবিধ উৎকৃষ্ট নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বিখ্যাত-শিল্প সমালোচক শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী মহাশয় "য়ুরোপে আধুনিক চিত্রকলার প্রগতি" নামক একটি তথ্যবহুল তুলনামূলক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন; আমাদের দেশে চিত্রশিল্প ও শিল্পীদের দুরবস্থার কথা তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করিয়া তাহার অনেকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, আমাদের শিক্ষিত বাঙ্গালী এখনও ছবি দেখিতে, ছবি চিনিতে, ছবি বুঝিতে শেখেন নাই ; এমন কি ছবিকে শিল্পের বাহন বলে স্বীকার করে নিতে, বাঙ্গালী, তথা কোনও ভারতবাসী এখনও প্রস্তুত হয়ে উঠেন নি। সুচারু-রূপে, সুসম্বদ্ধ আলোচনা ও শিক্ষার উপযোগী আসল চিত্র (original) দেখবার সুযোগ আমাদের নাই। চিত্রের সঠিক প্রতিলিপি এদেশে এখনও ছাপা হয় না। আমাদের দেশে সাধারণ শিল্পশালা (Art Gallery) নাই বলিলেই চলে।

সকলেরই জানা আছে—প্রদর্শনীতে ছবি দেখিয়া শুধু বাহবা দিয়া চিত্রকরকে মিষ্ট কথা বলিয়া আমাদের ধনীরা প্রায়ই কর্ত্তব্য শেষ করেন। আর চিত্রকরগণকেও বলা যায় যে তাঁহারা মূল্যের পরিমাণ কিছু কম করিয়া রাখিলে, দর্শকদের মধ্যে কিনিবার ইচ্ছা অনেক সময় ফলবতী হইতে পারে। আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চিত্রকলার চর্চ্চা করার পক্ষে অনেকগুলি নজীর ও কারণ পাওয়া গেল। দর্শকদের মন কিছু পরিমাণে চিত্রকলা-প্রবণ হইলে নিঃসহায় অথচ কৃতী এবং আত্মসম্মান-জ্ঞানপূর্ণ চিত্রশিল্পীগণের প্রতি জাতির কর্ত্তব্য করা হইবে। বিবাহে, শুভকর্ম্মে, লৌকিকতায়, বস্ত্রালঙ্কারের পরিবর্ত্তে চিত্র উপহার প্রদানের প্রথা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর।

বাঙলা সাহিত্যে দু-জন সম্রাট

শ্রীশঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘূর্ণায়মান রথচক্রের মত মনীষাচক্রের আবর্ত্তে সাহিত্যের ধারা বয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। সীমাহীন অবিচ্ছিন্নভাবে। কিন্তু সাহিত্যের এই মনীষাচক্রকে ক্ষণকালের জন্য-ও 'তিষ্ঠ' বলে তাকে নির্দ্দিষ্ট গতিপথ হতে নূতনত্বের পথে চালিত করতে পেরেছেন—এমন মনীষী-সাহিত্যিকের সংখ্যা বাঙলায় দুর্লভ হলেও একেবারে বিরল নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গদ্য রচনায় দু'জনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম জন সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয়জন রস-সাহিত্য-সম্রাট ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

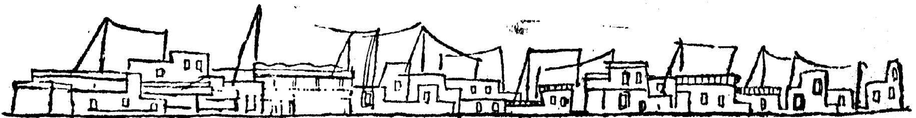
বাঙলা গদ্যের গঠনে এবং এর মাধ্যমে যুক্তি-তর্কমূলক আলোচনার প্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের দান চিরস্মরণীয়—এ সত্যটি তর্কাতীত। বস্তুতঃ আমরা এ হেন বঙ্কিমচন্দ্রকে ভুলি নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ইন্দ্রনাথ আজ বিস্মৃতির পথে—। আত্মমর্য্যাদা বিষয়ে বাঙালীর চেতনাহীনতার ইহা এক মর্ম্মান্তিক দৃষ্টান্ত। কারণ বাঙলা-সাহিত্যে বঙ্কিমের সর্বব্যাপী প্রতিভা এবং তাঁর অভিনব সৃজন ক্ষমতার উল্লেখ কালে তৎপরবর্ত্তী ইন্দ্রনাথের কীর্ত্তি স্মরণ করা বাঙালীর একান্ত কর্ত্তব্য। স্বীকার করি, ইন্দ্রনাথের প্রতিভা বঙ্কিমের মত ব্যাপক ছিল না। তথাপি ইন্দ্রনাথই সাহিত্যে সর্বপ্রথম জটিলতা হতে সরলতার উদারক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। মাতৃভাষায় বঙ্কিমের দানের তুলনা হয় না ; কিন্তু সাধারণের উপযোগী-ভাষা গঠনের দিক হতে এবং নবতম সাহিত্যাদর্শ-উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথও বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন এনেছিলেন। সহজ সরল অথচ আগ্নেয়গিরির দুরন্ত উত্তাপ তাঁর ভাষায়, তাঁর মনে সমাজ-চেতনার রৌদ্রোজ্জ্বল বিচিত্র রঙের কুণ্ঠাহীন প্রাচুর্য্য। তৎকালীন শান্ত গম্ভীর, বনেদী চালের সাহিত্যের জগতে তিনি কিছুদিন বজ্রঘোষিত বিদ্যুৎ কশাহিত মৌসুমী ঝড়ের মত বয়ে গেছেন। তাঁর কাহিনীর ধারা-নিয়ন্ত্রণে নিয়তি একেবারে আলাদা। মামুলী—গল্পের হাসি কান্নার দোলায় দোলানো চিরাচরিত বিন্যাস তিনি জানেন না। সাধারণ বিরহ-মিলন, সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতায় আলোছায়ার নক্সাকাটা কাহিনী-বিন্যাসে মুখে একটু হাসি ফোটাবার বা চোখ একটু অশ্রু সজল করবার দায় নিয়ে তিনি 'ক্ষুদিরাম', 'উৎকৃষ্টকাব্যম' প্রভৃতি গ্রন্থ সকল রচনা করেন নাই। কোষমুক্ত তরবারের মত তাঁর সৃষ্ট সমস্ত চরিত্র দুর্জ্জেয় এক শিল্প ও সমাজ নিয়তির নির্দ্দেশে আমাদের অগোচর মনের অনাবিষ্কৃত সমস্ত কোলে অদ্ভুত সমাজ চেতনাময় অনুভূতির বিদ্যুৎ স্পর্শ রেখে যায়। ব্যঙ্গ উপন্যাসের সূত্রপাত ইন্দ্রনাথই প্রথম করেন 'কল্পতরু' (১৮৭৪) লিখে। সম-সাময়িক ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষকে উদ্দেশ ক'রে, এঁর উপন্যাস ও ব্যঙ্গচিত্রগুলি লেখা। ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক সাহিত্যকে একজাতীয় সমাজ আলোচনাও বলা যায়। আরিষ্টফিনিস থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে প্রধানতঃ সমাজ সমালোচনার হাতিয়ার হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে। তাই বাঙালীর সমাজেও ইন্দ্রনাথের সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। ইন্দ্রনাথের রচিত 'পাঁচুঠাকুর' সে-কালে সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার শ্রেষ্ঠ প্রয়াস বলে স্বীকৃত হয়েছিল। তাঁর এই 'পাঁচুঠাকুর' বাঙলা সাহিত্যে এক বিচিত্র সৃষ্টি। সাহিত্যের কোন একটি বিশেষ সংকায় একে ফেলা যায় না। প্রথমে 'পঞ্চানন্দ' পত্রিকায় ও পরে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ 'পঞ্চানন্দ' রচনা করেন। এই 'পঞ্চানন্দ'কেই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময় লেখক এর নাম দেন 'পাঁচুঠাকুর'। 'পাঁচুঠাকুরকে' তার সমগ্র সাহিত্য জীবনের ফসলও বলতে পারা যায়। বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তরের ছাপ কিছুটা 'পাঁচুঠাকুরে' প্রতিফলিত—এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য ; কিন্তু বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তরের' বিষয়-বৈচিত্র্যও আঙ্গিক-বৈচিত্র্য যতই থাকুক না কেন, 'পাঁচুঠাকুরের' মজলিসী রসিকতা, সহজ সরলতার কাছে তা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অল্পমূল্য বহন করে

সাধারণ পাঠকের কাছে। কমলাকান্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক এক নন, কিন্তু ইন্দ্রনাথ ও 'পাঁচুঠাকুর' এক ও অভিন্ন। 'পাঁচুঠাকুরের' হাস্যরস মূলতঃ স্যাটায়ার ধর্ম্মী, 'উইট' ও 'ফান' জাতীয় হাস্যরসের পরিমাণও কম নয়। 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৮৯৫) এঁর পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুশীলন করেছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'মডেল-ভগিনীতে' (১৮৮৬-৮৮) ইন্দ্রনাথের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনা আতিশয্যতাদুষ্ট। তাঁর বিদ্রূপভাষণ কোন কোন সময় বীভৎস রসের মধ্যে প্রখরতা ও দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছে। ইন্দ্রনাথের রচনা সুক্ষ্মতর ও সু-কৌশলী। ধর্ম্ম ও আদর্শের চাপে যোগেন্দ্রচন্দ্র মাঝে মাঝে সহজ হাস্যরসের সুরটি হারিয়ে ফেলেছেন—ইন্দ্রনাথ সর্ব্বদা সহজ, স্বতস্ফূর্ত্ত ও সাবলীল। শুধু যে তার ভঙ্গিটুকুই সহজ সাবলীল তাই নয়। এর চলার গতিতেও ছন্দ আছে। সে ছন্দ মৃদু কিন্তু মুহ্যমান নয়; শিথিল কিন্তু শ্লথ নয়। যেন শরতের আকাশে নিরুদ্দেশ মেঘ। যা রস-সাহিত্যের প্রধানতম অঙ্গ। সে-কালের অন্যান্য হাস্যরসিকদের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: "দীনবন্ধুবাবুর মত তিনি, উচ্চহাসি হাসেন না, হুতোমের মত 'বেলেল্লাগিরি'তে প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু তিলার্ধ রসের বিশ্রাম নাই। যে রসও উগ্র নহে, মধুর সর্ব্বদা সহনীয়।" একালেও 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ 'পরম রমণীয়' গ্রন্থের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তারই প্রতিধ্বনি তুলে বলেছেন: "বইএর তাক থেকে আপনার প্রিয় লেখকদের সংকলনটি তুলে আনুন, দেখবেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার সংগে দুদণ্ড রসালাপ করবার জন্য উন্মুখ। ইন্দ্রনাথের সাহিত্যের পেছনে নিজেকে প্রকাশ করার এক তীব্র বাসনা পরিলক্ষিত হয়, লেখার বিষয়কে প্রকাশ করা নয়। এজন্যই তার রসসৃষ্টি সার্থক ও সুন্দর।* আর তার বৈশিষ্ট্য পড়বার সময় পাঠকের একবারও মনে হবে না যে, এ লেখা কষ্টকল্পিত। ইন্দ্রনাথের হাস্যরসের মধ্যে রুচিবোধও যথেষ্ট। তাঁর আদর্শ ছিল ফরাসী হাস্য রসিকদের রচনা।" ইন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন "আমি Saroreটাকে বাঙ্গালীর উপভোগ্য করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ফরাসী Satiristদের বহি পড়িয়া আমার এ সাধ হইয়াছিল।" (পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র হইতে)।

তাঁর রসবোধও ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আপাত সামান্য তুচ্ছ বিষয়-বস্তু নিয়েও তিনি সুন্দর নির্ম্মল হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারতেন। "জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না"—রসসাহিত্যের সংজ্ঞানির্ণায়ক এ উক্তি ইন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যে যথার্থতা ও পূর্ণতা পেয়েছিল। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে 'কলকাতা থেকে কলতলা, বড়বাজার থেকে বড়াথাম্বা, চৌরঙ্গী থেকে চৌবাচ্চা, মান থেকে পান, শোবার ঘর থেকে সমুদ্দুর' —বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অবাধ ভ্রমণ সম্ভব হয়েছে।

বলা বাহুল্য ইন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি দীর্ঘ বিস্তৃত কলেবর শুধু সুলভ হাস্যরসের নিদর্শন নয়—দেশ ও সমাজের নিপুণ চিত্রে তা পরিপূর্ণ। সমকালীন সমাজের নানা অসঙ্গতিতে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছে। বাঙলার অন্যতম সাহিত্যিক ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাই ইন্দ্রনাথকে 'Patriot Satirist' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর প্রতিটি রচনাই দেশপ্রেমিকতার পরিচয় দেয়। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর লেখনীর দানও কম নয়। উপরন্তু যে কোন রাজনৈতিক দেশনায়কের সহিত তুলনীয়। তাঁর 'ভারত-উদ্ধার' কাব্য পড়লে স্বাধীনতা প্রয়াস যে তাঁর কতখানি উগ্র ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল, ইন্দ্রনাথের কাব্যেও তা একটা বিশিষ্ট বাণীমূর্ত্তি লাভ ক'রে। স্বদেশ-প্রীতিতে, স্বাধীনতার স্বপ্নে, মানবতার মহিমায়, হৃদয়ের সুস্থ সবল আদর্শে ইন্দ্রনাথের সাহিত্য দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে যে একটা সমুচ্চ নৈতিক মহিমা, মনুষ্যজাতির উন্নতির স্বপ্ন ও বলিষ্ঠ মানবিকতার আদর্শ পরিলক্ষিত হয়, তা ইন্দ্রনাথ ব্যতীত সে যুগের অপরাপর সাহিত্যিকদের মধ্যে বিরল দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-খ্যাতি বঙ্কিমের ন্যায় একসময় শীর্ষস্থান লাভ করেছিল। সারা বাংলায় তাঁর পঞ্চানন্দ' বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় বলেছেন: "ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের আকাশে Hally's Comet,, যখন ফুটিয়া ওঠে, তখন উহার প্রভায় দশদিক আলোকিত হইয়া ওঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে কাহার কোন অন্ধকার কোলটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর দেশশুদ্ধ লোক তাহা দেখিয়া হাসিবে আর হাততালি দিবে।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও ইন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা কোন কোন বিষয়ে শ্রেণীগত পার্থক্য ও যথেষ্ট। বঙ্কিমের কল্পনাশক্তির দূরদর্শিতা, অভূতপূর্ব্ব ভাবাবেগ ও গূঢ় গহন দার্শনিকতা ইন্দ্রনাথের পক্ষে অনায়ত্ত। কিন্তু সমাজতত্ত্ব ব্যাখানে ও হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠায় ইন্দ্রনাথের সাহিত্য-চেষ্টা এত সম্যক পরিস্ফুট হয়েছিল—যে সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষাকৃত ম্লান। তাছাড়া বাঙলা সাহিত্যে সরস রসিকতাপূর্ণ 'ফিচার' লেখকদের ইন্দ্রনাথই বোধহয় পথকৃৎ। তাই বঙ্কিমের সমকক্ষ না হলেও বাঙলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথের দান চিরস্মরণীয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রনাথ যে সৃজনী-শক্তি ও শিল্প কুশলতা দেখিয়ে গিয়েছেন, তার জন্য সাহিত্য-সম্রাট ইন্দ্রনাথও বাঙলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারী—এ কথা যেন আমরা, বাঙালীরা বিস্মৃত না হই।





সাবধান !

(একাঙ্কিকা)

মন্মথ রায়

বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান প্রৌঢ় ধনী ব্যবসায়ী পুণ্যবান চৌধুরী সদ্য বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী পূর্ণিমা দেবীকে। পূর্ণিমা দেবী একটি মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে—রূপের জোরেই বিনাপণে ও বিনা যৌতুকে এই ধনী গৃহের গৃহিণী হইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। পিত্রালয় হইতে পূর্ণিমার সঙ্গে পোষা একটি ময়না ছাড়া আর কিছুই আসে নাই। সেই ময়নাটি এই সুখের সংসারে যে বিপত্তির সৃষ্টি করিল এই একাঙ্কিকাটি তাহারই কাহিনী। সন্ধ্যা রাত্রি। পুণ্যবান চৌধুরীর উপবেশন কক্ষ। পুণ্যবানের দুই বন্ধু, তারেশ তলাপাত্র এবং সাধুচরণ সমাদ্দার পুণ্যবানের সহিত চা-পানে রত। পূর্ণিমা চা ঢালিয়া দিতেছেন।

তলাপাত্র ॥ (পূর্ণিমাকে) বন্ধু পুণ্যবানের অনেক পুণ্য। সেই পুণ্যে এই সংসারে উদয় হয়েছেন আপনি—পূর্ণিমার চাঁদের মতো।

পূর্ণিমা ॥ বড় বেশী বলছেন আপনি শ্রীযুত তলাপাত্র।

সমাদ্দার ॥ না, না, পূর্ণিমা দেবী। তলাপাত্র এতটুকু বাড়িয়ে বলে নি। পুণ্যবানের স্ত্রী মারা যেতে এ সংসারটা একেবারে আঁধার হয়ে গিয়েছিল কিনা, তুমিই বল না পুণ্যবান!

পুণ্যবান ॥ সেই অমাবস্যা দূর করতেই তো খুঁজে খুঁজে ধরে এনেছি তোমাদের পূর্ণিমা দেবীকে। ওকে পেলাম বলেই বেঁচে গেলাম মনে হ'চ্ছে। সংসারে যদি মনের মত স্ত্রী না থাকে, না থাকে দু' একটা সন্তান—কেন খাটবো, কেন করবো রোজগার। গেরুয়া পরে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বো কিনা—এসব কথাও মনে আসছিল।

তলাপাত্র ॥ আর আজ ?

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

পূর্ণিমা ॥ নাঃ। দেখছি আমাকে পালাতে হবে।

পুণ্যবান ॥ তা'তে আপত্তি নেই। এদের সঙ্গে একটু জরুরি কথা সেরেই সিনেমায় যাবো। তুমি গিয়ে তৈরি হও।

পূর্ণিমা ॥ (বন্ধুদের প্রতি) আচ্ছা আসি। নমস্কার।

বন্ধুদ্বয় ॥ নমস্কার! নমস্কার!

তলাপাত্র ॥ চায়ের জন্য ধন্যবাদ।

সমাদ্দার ॥ ধন্যবাদ শুধু সুরু হলো পূর্ণিমা দেবী! এমন চায়ের লোভে রোজ যদি আসি, সেটা কি খুব দোষের হবে ?

পূর্ণিমা ॥ (হাসিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া) পুণ্যবান লোকেরা হয়ত বলবেন, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—(বন্ধুদের প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে) আমি অবশ্য তা' বলবো না। আসবেন।

নমস্কারান্তে প্রস্থান

সমাদ্দার ॥ ওরে বাবা, কথায় দেখছি বেশ ধার আছে।

পুণ্যবান ॥ বি-এ, পাশ মেয়ে।

তলাপাত্র ॥ (পুণ্যবানকে) তোমার তো দেখছি বড় বিপদ। ইংরেজিতে কথা বলা তোমার এখন ছেড়ে দিতে না হয়!

পুণ্যবান ॥ বাংলার ভুলও ধরা পড়ছে। সেদিন একটা চিঠি লিখেছিলাম, কম করে দশটা বানান ভুল ধরে দিল হে! তা' আমার ভালোই লাগছে। আমি যেন ওর ছাত্র—এমনি ওর শাসন। বেশ মজা লাগে আমার।

তলাপাত্র ॥ নাঃ, তোমার পছন্দের তারিফ করি।

সমাদ্দার ॥ বিনা পণে, বিনা যৌতুকে গরীবের ঘরের মেয়ে বিয়ে করে বাজারে যে সুনামটা কিনেছ, সেটা দেখছি সার্থকও হয়েছে।

পুণ্যবান ॥ নাও ভাই, এখন কাজের কথা হোক। এদিকে সিনেমা যাবার সময় হয়ে আসছে।

তলাপাত্র॥ ঐ টিম্বার সাপ্লাইটা। বড়বাবুর সঙ্গে কথা-বার্তা পাকা করে এসেছি। দশ আনা কাঠ দেব, ষোলো আনা বিল করবো। এ লাভের চার আনা আমাদের, দু'আনা বড়বাবুর।

সমাদ্দার॥ মাল ডেলিভারির তারিখ ঠিক হয়েছে এই মাসের বিশ তারিখ।

পুণ্যবান॥ তবে তো মেরে দিয়েছ হে! Good, very good. ঐ চার আনাতেই আমাদের হাজার চল্লিশেক টাকা ঘরে আসবে, কি বলো হে!

বন্ধুদ্বয়॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়!

তলাপাত্র॥ (টেণ্ডারের কাগজ পুণ্যবানের সম্মুখে ধরিয়া) টেণ্ডারটা আমি লিখে-পড়ে এনেছি। তাহলে এসো, এবার আমরা দুর্গা দুর্গা বলে তিন পার্টনার সই করে দি!

পুণ্যবান সইয়ের জন্য কাগজটি টানিয়া লইলেন। সই করিবেন—এমন সময় কক্ষের বারান্দার খাঁচায় রক্ষিত, একটি পোষা ময়না পাখী ডাকিয়া উঠিল—**'এই চোর সাবধান'**। তিন বন্ধুই ইহাতে চমকাইয়া উঠিলেন।

তলাপাত্র॥ একি!

সমাদ্দার॥ কে?

পুণ্যবান॥ নুইসেন্স! ও কিছু না—আমি সই করছি!

সই করিতে যাইবেন এমন সময় আবার পাখীটি চীৎকার করিয়া উঠিল—**'এই চোর সাবধান'**। অন্য দুই বন্ধু পুনরায় চমকিয়া উঠিলেন।

পুণ্যবান॥ আঃ!

বিরক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি সই করিলেন।

তলাপাত্র॥ 'এই চোর সাবধান!—মানে?

সমাদ্দার॥ কে বলছে?

পুণ্যবান॥ একটা পোষা ময়না। একটা নুইসেন্স! নাও, নাও—আমি সই করেছি, তোমরা সই কর।

তলাপাত্র॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। বাধা পড়লো।

সমাদ্দার॥ হ্যাঁ, ব্যাপারটা কি, ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা চুরি করতেই যাচ্ছি। যদি কোনো মানুষ বলতো, সাবধান, ধরতাম না। কিন্তু একটা পাখা—ঠিক সই করার সময় সাবধান হতে বলছে। আমার ভাই, মনটা কেন যেন সরছে না। হাতে দড়ি পড়বে না তো?

তলাপাত্র॥ পাখীটা কার? কোত্থেকে এলো—'এই চোর সাবধান' মুখে এই বুলিটি নিয়ে তোমার মতো পুণ্যবানের ঘরে?

পুণ্যবান॥ আর বলো কেন! আমার বিয়েতে এই এই একটি মাত্র যৌতুকই এসেছে। পাখাটা ছিল পূর্ণিমার বাবার। পুষেছিল পূর্ণিমা।

সমাদ্দার॥ আরে, পাখা তো কত লোকেই পোষে, সে সব পাখী পড়ে রাধা-কৃষ্ণের নাম—ধর্মের কথা—ভালো ভালো কথা।

তলাপাত্র॥ কিন্তু এ পাখীর একি সর্বনেশে বুলি! কেনবা এই বুলিটাই শেখানো হলো ঐ পাখীটাকে?

পুণ্যবান॥ পূর্ণিমাকে আমিও ঠিক এই কথাটাই জিজ্ঞেস করেছি।

সমাদ্দার॥ কি উত্তর পেলে?

পুণ্যবান॥ ওদের পাড়ায় এক সময় খুব চুরি হতে থাকে। ওদের বাড়ীতেও হয়। বুদ্ধিমান বাপ বুদ্ধি করে ময়নাটা কেনেন। পূর্ণিমার ওপর ভার দেন ময়নাটাকে এই বুলি শেখাবার।

তলাপাত্র॥ তা' দেখছি পূর্ণিমা দেবী ভালো মাষ্টারণী।

সমাদ্দার॥ হ্যাঁ। আমাদের পিলে চমকে গেছে।

তলাপাত্র॥ তারপর আর বোধ হয় তোমার শ্বশুর-বাড়ীতে চুরি হয়নি!

পুণ্যবান॥ হ্যাঁ। পূর্ণিমার এইটাই হয়েছে মস্ত এক গর্ব। পাখীটা সারারাত জেগে থেকে চোরদের সাবধান করে।

সমাদ্দার॥ হ্যাঁ, তা' করে বটে। অন্ততঃ আমি এ টেণ্ডারে সই করবো না। কুসংস্কার বলতে হয় বলো, কিন্তু এটা কি ঠিক নয়, এমনি সব শুভ কাজে আমরা যখন যাই, তখন হাঁচি-টিকটিকিও মেনে থাকি, আর এ তো শুনলাম যেন একটা দৈববাণী।

তলাপাত্র॥ আমারও তাই মনে হচ্ছে ভাই।

পুণ্যবান॥ এত বড় একটা দাঁও—সামান্য এই একটা কারণে ছেড়ে দেবে? না-না, ছেলে-মানুষি করো না।

সমাদ্দার॥ না ভাই, পারবো না। এসব আমি বড় মানি।

তলাপাত্র॥ আমিও। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে, তার ওপর আমার এখন আবার শনির দশা চলছে। আচ্ছা, আজ উঠি।

সমাদ্দার॥ হ্যাঁ। আজ উঠি। আমার গুরুদেব বলেছেন, কোনো কাজের আগে মনটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখবি। যদি আলো দেখতে পাস—এগিয়ে যাবি—আঁধার দেখলে কেটে পড়বি।

তলাপাত্র॥ হ্যাঁ। কেটেই পড়ছি আমরা আজ। ব্যবসা যদি চালাতে চাও, আগে ময়নাটি উড়িয়ে দাও—

সমাদ্দার॥ তুমি বলছো উড়িয়ে দাও, আমি বলি ওর ঘাড় মটকে ভবলীলা সাঙ্গ করে দাও। ওসব অযাত্রা নিজের বাড়ীতে রাখতে নেই, পরের বাড়ীতেও দিতে নেই।

পুণ্যবান॥ পরের কথা ভাবছিনে, নিজের কথাই ভাবছি। (হঠাৎ) আমি ভাই পাখীটাকে এখনি উড়িয়ে দিচ্ছি—পূর্ণিমা আসবার আগে।

তলাপাত্র॥ তারপর?

পুণ্যবান॥ চাকর-বাকরদের ওপর একচোট রাগারাগি করবো আমি—খাঁচার দরজাটা নিশ্চয় আলগা রেখেছিলি, তাই পাখিটা উড়ে গেল—সে আমি ম্যানেজ করব'খন, তোমরা ভেব না। তোমরা ব'স। পাখীটা তাড়িয়ে দিয়ে আমিও এসে বসছি। সইটা ভাই আজই করা দরকার।

সমাদ্দার॥ সে ভাই যা' করতে হয় করো, কিন্তু সই আজ হবে না।

তলাপাত্র॥ কিন্তু টেণ্ডারটা কাল সকাল দশটায় দাখিল করতে হবে। (ভাবিয়া) সইগুলো আজ হওয়াই উচিৎ। আচ্ছা ভাই আমরা আসছি—যাত্রা বদল করে আসছি।

সমাদ্দার॥ হ্যাঁ, সে বরং মন্দের ভালো। ইতিমধ্যে পাখীটাকে কিন্তু ভাই সাবাড় ক'রো।

তলাপাত্র ও সমাদ্দারের প্রস্থান। পুণ্যবান ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তারপর হঠাৎ বারান্দায় পাখীর খাঁচার দিকে চলিয়া গেলেন। অন্যধার-পথে সিনেমা যাওয়ার সাজে সজ্জিতা পূর্ণিমা দেবীর প্রবেশ।

পূর্ণিমা॥ (কাহাকেও না দেখিয়া) কই! কোথায়!

পুণ্যবানের প্রবেশ

পুণ্যবান॥ এই যে পূর্ণিমা!···ব্যাপার কি বলতো! তোমার ময়নাটা খাঁচাতে নেই।

পূর্ণিমা॥ নেই! সেকি!!

ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া শূন্য খাঁচা দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন

পূর্ণিমা॥ সত্যি তো, নেই! রামু নিশ্চয়ই খাবার দিয়ে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল—

পুণ্যবান॥ রামুকে এখনি আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

পূর্ণিমা॥ না না, সে কি! অতদিনের পুরোনো চাকর, সামান্য একটা ভুলের জন্য—না না, থাক।

পুণ্যবান॥ থাকবে কি! তোমার অত আদরের পোষা পাখী—

পূর্ণিমা॥ রামু চাকরটিও তোমার কম আদরের নয়। বরং ময়নাটা গেছে ভালোই হয়েছে। কষ্ট যে না হ'চ্ছে তা নয়, তবে কিনা, এ সংসারে ওর ঐ বুলিটা বড় বেমানান মনে হচ্ছিলো। এখানে চোর কোথায় যে সাবধান করবে!···কি ভাবছো? সিনেমায় যাবে না?

পুণ্যবান॥ ভাবছিলাম, তুমি কি নির্মম। এই ক'দিনেই পাখীটার ওপর আমারই কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল। শোন, আজ সিনেমা থাক্। ঐ তলাপাত্র আর সমাদ্দার খুব বড় একটা বিজ্‌নেসের খবর নিয়ে এখনি আবার আসবে বলে গেল।

পূর্ণিমা॥ বেশ তো, আমি তবে মামার বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি।

পুণ্যবান॥ চট্ করে এসো কিন্তু। ব্যবসার কথা-বার্তা সেরে এই রাতেই তোমাকে নিয়ে যেতে চাই হগ্-মার্কেটে। ময়না আমার একটা কিনতেই হবে তোমার জন্য! তার বুলিটা কিন্তু বেশ ভালো হওয়া চাই। কি বুলি পড়াবে তুমি এবার?

পূর্ণিমা॥ (আনন্দোজ্জ্বল চোখে) 'তুমি আমার কাছে এস।'

পুণ্যবান॥ Naughty girl!

পূর্ণিমা॥ আচ্ছা আসি—

হঠাৎ দরজায় শোনা গেল 'দুর্গা, দুর্গা।' সঙ্গে সঙ্গে আর একজন কে বলিয়া উঠিল—'আসবো?'

পুণ্যবান॥ বন্ধুরা ফিরে এসেছেন। (তাঁহাদের উদ্দেশ্যে) এসো ভাই, এসো।

সঙ্গে সঙ্গে তলাপাত্র ও সমাদ্দারের পুনঃপ্রবেশ

তলাপাত্র॥ এই যে বৌদি, নমস্কার!

সমাদ্দার॥ নমস্কার।

পূর্ণিমা॥ নমস্কার। আপনারা বসে আপনাদের বিজনেস করুন। আমি মামা-বাড়ী থেকে এখনি ঘুরে আসছি। আচ্ছা চলি।

পূর্ণিমা বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তলাপাত্র॥ (পুণ্যবানকে) পাখীটা?

পুণ্যবান॥ উড়িয়ে দিয়েছি।

সমাদ্দার॥ যাক, বাঁচা গেল। পথ দিয়ে এখনি একটা মড়া নিয়ে যেতে দেখলাম। এবারকার যাত্রাটা মনে হচ্ছে শুভ।

তলাপাত্র॥ হ্যাঁ। চটপট আগে সইগুলো সেরে ফেলা যাক।

পুণ্যবান॥ (সঙ্গে সঙ্গে টেণ্ডারের কাগজগুলি তাহাদের সামনে রাখিলেন)

তলাপাত্র॥ ব্রহ্মময়ী তারা! রাক্ষা কর বাবা!

সই করিতে গেলেন

সমাদ্দার॥ খুব কম করেও চল্লিশ হাজার টাকার দাঁও—জয়মা কালী! পাঁঠা দেব মা!

এমন সময় ময়না পাখীটি ডাকিয়া উঠিল—'এই চোর সাবধান'। সকলে চমকাইয়া উঠিলেন। তলাপাত্র সই না করিয়া পরম বিরক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সমাদ্দারও। পুণ্যবান ক্ষেপিয়া গেলেন। দেরাজ টানিয়া রিভলবারটি বাহির করিলেন।

তলাপাত্র॥ (পুণ্যবানকে) তুমি না পাখীটা উড়িয়ে দিয়েছিলে?

সমাদ্দার॥ ছিঃ ছিঃ! শুভ কাজে একি অযাত্রা!

ইতিমধ্যে পুণ্যবান রিভলবার লইয়া খাঁচার দিকে ছুটিয়া গিয়াছেন। এমন সময় পূর্ণিমা দেবীর পুনঃপ্রবেশ।

পূর্ণিমা॥ বাইরে গিয়েই দেখলাম, ময়নাটা উড়তে উড়তে আবার ফিরে এলো।

তিনি ছুটিয়া খাঁচার দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় রিভলবারের আওয়াজ শোনা গেল—গুড়ুম! গুড়ুম! সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

পূর্ণিমা॥ য়্যাঁ! একি!

রিভলবার হস্তে পুণ্যবানের প্রবেশ

পূর্ণিমা॥ (পুণ্যবানকে) একি, তুমি! কা'কে গুলি করলে?

দেখিবার জন্য ছুটিয়া বারান্দায় গেলেন। তিন বন্ধুর মুখে আর কোনো কথা সরিল না। পূর্ণিমা পুনরায় ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পূর্ণিমা॥ আমার ময়নাটা ফিরে এসেছিলো—তুমি তাকে গুলি করে মারলে?

পুণ্যবানের মুখে কোনো কথা সরিল না। অন্য দুই বন্ধুও নীরব রহিলেন

পূর্ণিমা॥ আমার বাপের বাড়ীতে ওটা যখন ছিল, তখন একটা চোর চুরি করতে এসে ওর ঐ বুলিতে চমকে ওঠে। পালাবার সময় চোরটা ওকে ঘাড় মটকে মারবার চেষ্টা করেছিল। ততক্ষণে আমরা জেগে উঠে ছুটে আসায় পাখীটা বেঁচে গিয়েছিল। সে ছিল চোর। কিন্তু তুমি? তুমি কেন পাখীটাকে গুলি করে মারলে?

পুণ্যবান॥ আজ আমার কাছে এর কোনো উত্তর তুমি পাবে না পূর্ণিমা।

সমাদ্দার॥ পাবেন। উত্তর একদিন পাবেন।

তলাপাত্র॥ সেদিন বুঝবেন, ব্যাপারটা বড়ই মর্মান্তিক।

সমাদ্দার॥ আজ শুধু এইটুকু বলা যায় পূর্ণিমা দেবী, পুণ্যবানও চুরি করেছে—মন চুরি।

তলাপাত্র॥ (হাসিয়া) হেঃ হেঃ হেঃ—আপনার।

সঙ্গে সঙ্গে টেণ্ডারের কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন

পূর্ণিমা॥ আপনারা যে কি—আমি বুঝলাম না।

বলিয়াই গম্ভীর ভাবে অন্দরে চলিয়া গেলেন। তিনবন্ধু পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিলেন।

যবনিকা

মহুয়া কাব্য পাঠের ভূমিকা

অধ্যাপক বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

(১)

রবীন্দ্রনাথের মহুয়া কাব্য বিদগ্ধজনের চিত্তে নূতন এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রসের সন্ধান দেয়। কাব্যটী এমনই একটী বিশেষ বিচিত্র রসমণ্ডিত এবং রবীন্দ্রকাব্যের অন্যান্য অংশ হইতে এমনই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-সমুজ্জ্বল যে ইহাকে ইহারই নিজস্ব আলোকে ছাড়া বিচার করিবার কোনো উপায় নাই। মহুয়া কাব্যের কবি তাঁহার কাব্যের মধ্যে এমন একটী নিজস্বতাকে রূপ দিয়াছেন যাহাতে তাঁহার যৌবনের শ্যামল সতেজতার সহিত প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কবির এই বিচিত্র রস-পরিক্রমার ইতিহাস সম্মুখে রাখিয়া মহুয়া কাব্যের রস আস্বাদন করিতে হইবে।

মানুষের জীবন কালচক্রের আবর্ত্তনের দ্বারা গঠিত। বাল্য ও কৈশোরের লীলা চাপল্য নব-যৌবনের মাধুরীর মধ্যে অস্তমিত হয়। যৌবনের মধুর দিনগুলি বার্দ্ধক্যের স্মৃতি বিজড়িত অস্তপথে মহাপ্রয়াণ করে। এ অনন্তপথযাত্রী মানুষ যৌবনে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব আনন্দকে উপলব্ধি করে। তাহার এই অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে দেহকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে—নয়ন তাহার রূপ দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে, শ্রবণ তাহার ভাষা শুনিয়া দূরস্থিত নির্ঝরিনীর মর্মরধ্বনিকে অনুভব করে, দেহ তাহার অপরূপ রূপ মাধুরীকে আশ্রয় করিয়া দেহাতীত লোকের এক অনির্বচনীয় আনন্দপথের আশ্রয় পায়। মানবজীবনের অতি স্বাভাবিক নিয়মে কবিকেও এই পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তিনি তাঁহার মানসবাসিনী বাসনারূপিণীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে থাকিয়া কবির সেই অলৌকিক মানব-মানসী বারংবার তাঁহার চিত্তলোকে যাতায়াত করিয়াছে, কবি নদীর কলধ্বনির মধ্যে তাহার ললিত যৌবনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, ফাল্গুনের বসন্ত বাতাসে তাহার চঞ্চল বাসনা-ব্যথার সুগন্ধি নিঃশ্বাসকে অনুভব করিয়াছেন। সেই চিরকালিনী মানব-মানসীর রূপ বর্ণনা করিয়া কবি বলিয়াছেন :

> অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছ্বল
> লাবণ্যের মায়া মন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
> বন্দী হ'য়ে আছে ; তারি শিখরে শিখরে
> পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র ললাটে-অধরে
> উরুপরে। কটি তটে স্তনাগ্র চূড়ায়
> বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
> ঝলকে ঝলকে   (বিজয়িনী)

তারই বিলোল হিল্লোলে :

> ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু মাঝে তরঙ্গের দল
> শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল
> তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা
> অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
> নাচে রক্তধারা   (উর্ব্বশী)

কবি তাহাকে সম্বোধন করিয়াই বলিয়াছেন :

> অয়ি প্রিয়া
> চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
> বাঁকায়োনা গ্রীবাখানি, ফিরায়োনা মুখ
> উজ্জল রক্তিম বর্ণ, সুধাপূর্ণ সুখ
> রেখো ওষ্ঠাধর পুটে—ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
> সম্পূর্ণ সুন্দর। নবস্ফুট পুষ্পসম
> হেলায় বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
> মুখখানি তুলে ধ'রো।
>
> (সোনার তরী—মানস সুন্দরী)

প্রাণ-রসোচ্ছল কবি তাঁহার জীবনের প্রথম প্রেয়সীকে লইয়া বাসনার তীরে ঘর বাঁধিয়া দেহের দুয়ারের মধুর মোহে মরিতে চাহিয়াছেন। ইহাই একান্তভাবে স্বাভাবিক। অন্যান্য সমস্ত মানুষের মত তাঁহার জীবনেও এমন সময় আসিয়াছিল যখন তাঁহার নিকটেও সব সুরই সাহানার বিলম্বিত মধুর আলাপ বলিয়া বোধ হইত, প্রতিটী রাত্রিই প্রথম বাসরসজ্জার উন্মাদনা বহন করিয়া আনিত, প্রতিটী আলাপ ক্রৌঞ্চমিথুনের অর্থহীন অথচ মধুর প্রণয় সম্ভাষণ বলিয়া মনে হইত। কাজেই জীবনের নব-বসন্তের সমাগমে কবি তাঁহার বিচিত্রভাবে ও ছন্দে তাহার জয়গান গাহিয়াছেন।

(২)

এই জগতে প্রতিটী দ্রব্যের একটা পরিণতি আছে। মানব প্রেমও তাহার ব্যতিক্রম নহে। কবির পরিণত বয়সে রচিত প্রেম-গীতিকাগুলির মধ্যে এইভাব আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। পূর্বের রচনাগুলির মধ্যে উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য্য ছিল, ভাবের আবেগ কবিকে তাঁহার জীবনের তটভূমি হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়াছে—সেখানে কবি নিজ জীবনে সেই তরঙ্গের উদ্দামতাকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার প্রাণরসোচ্ছ্বাসকে নিজ দেহ দিয়া স্পর্শ করিয়া অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলীর পরবর্তী রচনাগুলির মধ্যে অনর্থক উচ্ছ্বাস নাই, কেবলমাত্র একটী শান্ত দার্শনিকও আত্মপ্রকাশ করে নাই। রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে একটী সমাহিত প্রেমিক, যিনি আজ পূর্ণ-প্রশান্তির

মধ্যে মানব প্রেমের বিভিন্ন তরঙ্গভঙ্গকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাই এই সময়ের কবিতাগুলি দুশ্চর তপশ্চর্য্যার বিশীর্ণ দীপ্তিতে অস্বাভাবিক-ভাবে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বার্দ্ধক্যের শেষদিন গুলিতে স্মৃতি-মন্থন করিতে গিয়া কবির "যৌবন বেদনারসে উচ্ছল দিনগুলির" কথা মনে পড়িয়াছে—কেবল তাহারই মনে পড়ে নাই, তিনি মনে করাইয়াও দিয়াছেন :—

মনে আছে সেকি সব কাজ সখী
ভুলায়েছ বারে বারে,
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কন ঝংকারে।

(পূরবী—লীলাসঙ্গিনী)

পরক্ষণেই কবির মনে পড়িয়াছে যাহাকে লইয়া কবি এই প্রেম-রসতীর্থ পরিক্রমা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন সে দীর্ঘদিন হইল তাঁহাকে ছাড়িয়া গ্রহে সূর্য্যে-তারায় তারায় তাহার পদযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে—কেবল রাখিয়া গিয়াছে এক দুঃখ-মধুর এবং বেদনা-বিধুর স্মৃতি। নয়ন সম্মুখ হইতে সে অন্তর্হিত হইলেও কবি হৃদয়ে একটী চির-উজ্জ্বল অপরিম্লান দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়া গিয়াছে, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াই কবি বলিয়াছেন :

হে অভিসারিকা তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি পরশ
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গ সুধারস। (পূরবী—আহ্বান)

সেদিনের দেবযানী কচের বিরহ সহ্য করিতে পারে নাই। বিচ্ছেদের তীব্র দাবদাহে তাহার একান্ত প্রেমাস্পদের যাত্রাকে অভিশপ্ত করিয়া বিঘ্নিত করিয়াছে। কিন্তু পূরবীর কবি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন :

কোথা তুমি শেষবার যে ছোয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে
মহা নিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ রমণী
নীরব নিশীথে ? (ঐ)

যেদিন তিনি এই স্পর্শমণির ছোঁয়াতে পূর্ণতানে তাহার গান শেষ করিবেন সেই দিন :

তারপরে যাও যদি যেয়ো চলি, দিগন্ত অঙ্গন
হ'য়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর॥

(৩)

নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে কবি যে পরিপূর্ণ পরিণতিতে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা কবির মহুয়া কাব্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর কবিতায় আছে, ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন "প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে নিজের ভিতরকার বর্ণে, রসে, রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি করে অন্তরে-বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হ'তে থাকে। সেখানে ভাবে ভংগীতে, সাজে সজ্জায়, নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা ; সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য, তার কোনো কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।"

"মূল্যহীনেরে সোনা করিবার পরশ পাথর" যাহার হাতে আছে—যিনি নিত্যকালের মায়াবী—যিনি "কালের প্রয়াণ পথে" আগত নিদ্রিত যৌবনের চিরন্তন চঞ্চলতার স্পন্দন, পুষ্পে এবং পল্লবে, প্রান্তরে এবং পর্বতে বিচিত্র রসও উপলব্ধি করিয়াছেন, কেবলমাত্র তিনিই প্রেমের প্রসাধন কলা ও সাধন বেগের পরীক্ষা করিতে পারেন। আজ জীবনের অপর তীরে উত্তীর্ণ হইবার প্রাক্কালে যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে তাহার উপর চরম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কামনার কণ্টকিত আবিলতা কবিকে ব্যথিত করিয়াছে। তাই বলাকা-নৈবেদ্যের কবি ঠিক চিত্রা-ক্ষণিকের উচ্ছলতাকে আশ্রয় করিতে পারেন নাই। তিনি প্রসাধিত প্রেমকে উপস্থিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রেমের সেই ললিতরূপ অপেক্ষা তাহার রুক্ষ-কঠিন মাধুর্য্য নিষ্ঠার হিরণ্যাভায় মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রেমে প্রতীক্ষা আছে অবসাদ নাই, যন্ত্রণার তীব্র আকুতি আছে ভাবোচ্ছ্বাস নাই, বিরহ রহিয়াছে কিন্তু তাহাকেই চরমতম সত্য বলিয়া মানা হয় নাই। তাই চিত্ত সেখানে ক্ষণিক মিলনকেই পরমতম প্রাপ্তি হিসাবে ধরিয়া লইয়াছে—চির বিচ্ছেদকে জয় করিতে তাহার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নাই।

প্রসাধিত প্রেমের কবিতাগুলি মহুয়া গ্রন্থের নারীকাব্য খণ্ডে আশ্রয়-লাভ করিয়াছে—অবশ্য কাব্যের প্রথম দিকেও তাহাদের আবির্ভাব অপ্রতুল নহে। "কাজলী" "নাগরী" "ঝামরী" "শামলী" ইত্যাদি কবিতাতে নারীর বিচিত্ররূপের প্রকাশ আছে। তাহাদের নামোপযোগী ভঙ্গিমা এবং লাস্য কলা শক্তিমান কবির কাব্যে রসমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। তবে এই সমস্ত রচনাতে একটী জিনিষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করে যে কবি এখানে সর্বাপেক্ষা বেশী নির্ভর করিয়াছেন তাঁহার বর্ণনার উপর। তাঁহার কল্পনার তুলিকাতে সূর্য্যাস্তের নানা রঙে বর্ণনাগুলি রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। তবে একথা অস্বীকার করিবার সম্ভবতঃ উপায় নাই যে মহুয়া কাব্য গ্রন্থে ইহারাই মুখ্য হইয়া উঠে নাই। সমগ্র জীবনব্যাপী যে

সুর সাধন পথ মানুষকে অতিক্রম করিতে হয় তাহার নীরব স্পর্শও যেন তাদের মধ্যে বাঙ্‌ময় হইয়া উঠিয়াছে।

আ-যৌবন কবি প্রেমের কবিতা ও গান লিখিয়াছেন—কত ভাবে কত রীতিতে তাহারা প্রকাশ পাইয়াছে। আজ বার্দ্ধক্যে জরাশ্রিত দেহের মধ্যে মনের যে বাস তাহাতে প্রেমের নবকাকলী শোনা গেল— রবীন্দ্র জীবনী) মানব জীবনের নানাবিধ সত্য বিভিন্ন জীবনরসে জারিত হইয়া প্রতিনিয়ত নবতর রূপ পরিগ্রহ করে। তাহার গতি কেবলমাত্র একটী বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নহে ; তাহার ব্যবহার একটী বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে সীমিত নহে। মানবজীবনের যে বিচিত্র ছন্দ আমাদের মানস বৃত্তিতে নিত্য নূতন আলোড়ন আনে তাতাই বারংবার পরিশীলিত হইয়া আমাদের কাছে ফিরিয়া আসে। তাই কৈশোরের চপলতা যৌবনের নির্বন্ধ বাহুল্যের নিকট হীনপ্রভ হইয়া যায়। প্রৌঢ়ত্বের প্রজ্ঞা বার্দ্ধক্যের প্রশান্তির মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। মহুয়ার কবির ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছে—প্রেমের "চির পুরাতন সত্য জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় ও বোধের গভীরতায় পুষ্ট হইয়া বৃহত্তর পটভূমি পরিক্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন রূপে।" (ঐ)

এই নূতন রূপই প্রণয়ের সাধন বেগ। তাই কবি এই কথাই বারংবার পাঠকদের বলিয়া গিয়াছেন : "আমার বিশ্বাস তোমরা এই লেখার মধ্যে নতুন কিছু পাবে, আকারে এবং প্রকারে", এতদিন যাঁহারা তাহার প্রণয় রসাশ্রিত কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিলেন :—

তারা মোর নাম জানে নাহি জানে মান
তারা মোর কর্ম জানে নাহি জানে মর্মগত প্রাণ ॥ (মহুয়া)

আজ কবি তাঁহার মর্মগত প্রাণকে একেবারে অনাবৃত করিয়া দিয়াছেন। পরবর্তী এক রচনাতে এই মনোভাব প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে
তোমার অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে
মুক্তদ্বার। বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত
তোমার মাটীর পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত
নহে তাহা দীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি"
(সেঁজুতি ॥ জন্মদিন)

সেদিন এই কাব্যের সুর সেই দীন-ভিক্ষু লালায়িত লোলুপকে আশ্রয় করিয়া নাই। অদৌ প্রেমের এক অধরা অদেখা দূত শব্দহীন কলকণ্ঠে বাক্যহীন ভাষায় কথা বলিয়া আমাদের মনে এক অননুভূতপূর্ব শিহরণ তুলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। দেহসম্ভোগের চিন্তার বাষ্পমাত্রও তাহাতে স্থান পায় না। "কবি-মানসের যে রসধারা নিত্য প্রবহমান তাহারই বিচিত্র রূপ নব নব কাব্য—কখনো খণ্ডকাব্য, কখনো গদ্যকাব্য বা লিরিক। নদী প্রবাহের তরঙ্গ উত্তাল হইলে আমাদের দৃষ্টিভূত হয়। কিন্তু সে চলে নিরবধি ভাবস্রোতের ফল্গুধারায় যোগাযোগ, শেষের কবিতা ও মহুয়ায় সেই নিরবধি চলমান মনোস্রোতের কাব্য-তরঙ্গ। যোগাযোগে প্রেমের দ্বন্দ, শেষের কবিতায় প্রেমের আলাপ, এবং মহুয়ায় প্রেমের সংগীত শোনা যায়। বিচিত্র প্রেমলীলা তরঙ্গে তরঙ্গে উদ্ভাসিত, নব নব রূপে প্রকাশিত—স্তরে স্তরে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ও সূক্ষ্ম হইতে শীকর কণার অনির্বচনীয়তায় রূপায়িত" (রবীন্দ্রজীবনী)

মহুয়ার কবি সেই প্রেমকেই মূর্ত্তি দিয়াছেন—যে প্রেম সর্ব বন্ধন হইতে মুক্ত। ইহা ললিত প্রেমের অশ্রুগলিত গীত নহে। ক্ষণিকের বাসকশয়নের চিরকালীন মূঢ়তাকেও নিষ্ঠুর ভাঙ্গন এই প্রেমকে ছিন্ন করিতে পারে নাই। তাই মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াও সে বলিতে পারে :—

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে
মরুতাপ পথ দুজনে নিয়েছি সহে—
ছুটিনি মোহন মরীচিকা পিছে পিছে
ভুলাইনি মন সত্যেরে করি মিছে

প্রথম যৌবনের কল্পনার রঙ্গীণ আবীর আজ অপসৃত হইয়াছে। মৃত্যুতরঙ্গিণী ধারা মুখরিত ভাঙ্গনের ধারে বসিয়া কবির উন্মনা আঁখি সেই দেখারই গূঢ় গান গাহিতে চাহিয়াছেন যাহা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সুন্দর হইয়াছে প্রতিদিনে পূর্ণ হইয়াছে। এই প্রেম কনকচাঁপার কুঞ্জের কলকাকলি নহে, এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে, এ যাত্রা আসঙ্গ-লিপ্সার মোহমদিরা দ্বারা পরিকীর্ণ নহে। প্রেমের যে শৌর্য্য—যাহা আপন আলোকে স্বয়ংপ্রকাশ, আপন বীর্য্যে স্বয়ম্প্রতিষ্ঠিত এবং আপন সম্ভাবনাতে স্থির-সমুজ্জ্বল কবি আজ তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। তাই তাঁহাকেই তিনি চাহিয়াছেন, যিনি :

রিক্ত চিত্ত শুভ্রমেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশংকরের তীর্থে চলিল প্রবাসী
সেই স্নিগ্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্য্য করে
পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে চক্ষু নাহি জানে।

আজ আর বাসনা যখন কালো নয়নের প্রতি বিশ্বাস নাই, চিরন্তন প্রেমলীলার রূপগত মোহের দেহে কলঙ্ক যাহার উপর ছায়া ফেলে নাই, কবি তাহাকেই বরণ করিয়াছেন, কারণ : তুমি ফেলনি ছায়া ছায়ার মাঝারে

পূর্বেই বলিয়াছি বলাকা-পরবর্তী প্রেমকাব্যে কবি তাহার প্রণয় রচনাগুলিকে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিরহকেই জীবনের চরম সত্য বলিয়া না মানিয়া ক্ষণকালীন মিলনকেই শেষ মর্য্যাদারমাল্য পরাইয়া দিয়াছেন। Browningএর রচনাতে যে Instant made eternity'র—অনন্ত মুহূর্ত্তের কথা আছে—কবিগুরুর কাব্যেও

ঠিক সেই ক্ষণিক মিলনের সুন্দর মুহূর্ত্তগুলি চিরকালীন প্রেমরসে উজ্জ্বল হইয়াছে, স্বল্প কিছুক্ষণের জন্য পথে আমরা একত্রে চলিয়াছি; তাহার পর দয়িত তাহার ঈপ্সিত পথে যাত্রা করিয়াছে—রাখিয়া গিয়াছে ক্ষণিকস্পর্শের শুভ্র অনুরণন—ক্লান্ত যাত্রা শেষে তখন কি প্রেমের হাহুতাশ তাহার সম্মুখবর্তী দূর যাত্রাপথকে অশ্রুসজল করিয়া বিষাদাক্রান্ত করিয়া দিবে? মহুয়ার কবি আজ যে দৃষ্টিতে নারীকে দেখিয়াছেন—যে আপনার প্রেমের বীর্য্যে সম্পূর্ণরূপে অশংকিনী, যে ক্ষুদ্ধ সিন্ধু অতিক্রম করিয়া তাহার প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই—সেই নারীর পক্ষে তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়, তাই সে নিঃশংক চিত্তে বলিতে পারে:

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙ্গাল
একথা বলিতে চাও ব'লো
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল
তারপরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাব না আমি শপথ তোমার
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার
যাবার সময় হ'লে যেও সহজেই
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই
তবু ভালোবাস যদি বেসো

তাই,

বেলা চলে যাবে একদা যখন
ফুরাবে যাত্রা তব
শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন
হেথায় দাঁড়ায়ে রব
এই পথখানি রবে মোর প্রিয়
এই হ'বে মোর চিরবরণীয়
তোমারি স্মরণে রব স্মরণীয়
না মানিব পরাভব
তব উদ্দেশ্যে অর্পিব হেসে
যা কিছু আমার সব।

এই প্রেমে বন্ধন নাই, গ্রন্থি নাই, কারণ:—

বিরাজে মানব শৌর্যে সূর্য্যের মহিমা
মর্ত্ত্যে যে তিমিরজয়ী প্রভু
অজেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু

মহুয়ার প্রেম প্রত্যাশার চিন্তাতে চিন্তিত নহে। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দেওয়াতেই তাহার সার্থকতা। এ প্রেম প্রতিদান চাহে না, কেবল পরীক্ষা করিয়া দেখে সব কিছু সমর্পণ করিয়া একেবারে একাত্ম হওয়া সম্ভব কিনা। এ প্রেম বহু দুঃখে দগ্ধ, বহু যন্ত্রণায় নিকষিত, বহু বিরহে শোধিত। তাই কবি আজ সেই প্রেমকেই আশ্রয় করিয়াছেন—যাহা প্রতিনিয়তই পুষ্পের বাসে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহার সে ভাবের তারে ঝঙ্কার তুলিয়াছে, সকল আশার মহান বিষাদকে রূপদান করিয়া চিরমানবের প্রাণে উদাস শান্তি দান করিতেছে, ইহাতে বর্ণাঢ্যের শোভা হয়তো অনুপস্থিত। কিন্তু উমা যেমন "অবশ্য রূপতাং সমাধিমাস্থায়" মহেশ্বরকে জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এখানেও কবি সেই তপস্যাজাত প্রেমকে মুখ্য উপজীব্য—হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন—যে প্রেম নয়নকে উদ্দীপিত করেনা হৃদয়কে উজ্জীবিত করে—তাই তাহাতে কোনো প্রসাধনের প্রয়োজন হয় নাই, মৌনের স্তম্ভিত আবেগ, নিষ্ঠার কঠোর শান্তি এবং বিরহের উদার গাম্ভীর্য্য অবিচলিত প্রভাতে বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছে।

উপেক্ষিতা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১

রাজ দুলালি রাজার মেয়ে সুখ সোহাগের মাঝখানে।
কার সুমধুর হাত ছানিতে
মন ভোলালো কার বাণীতে
পরিণয়ে ধরা দিতে গেছিলি অসাবধানে॥

২

সে করেছে এমন আঘাত সখি এমন বুক ভাঙা।
সে-কি এত পাষাণ হৃদয়
নেই কো মায়া হায়রে নিদয়
বুক বেয়ে তোর ঝরছে কি জল কেন রে তার রং রাঙা॥

৩

কারে সঁপেছিলি পরাণ আন্‌রে সখি আন কেড়ে।
জগৎপতি রাধারমণ
প্রাণ দিয়ে ধর তারি চরণ
প্রাণান্তেও যাস্‌নে সখি কখনো তার কাছ ছেড়ে।



সীর গল্প

প্রফুল্ল রায়

গোরা গোরা বর্ণ, টানা চোখে বিজুরি খেলে, উছল দুই বুক। অঙ্গের দুটি কূল ছাপাছাপি করে বান ডেকেছে। নারী নয়, ভাদ্রের ভরা-নদী।

রসিক সুজনেরা বলে, 'লয়ন মালীর মেয়ের রূপ বটে একখান। বাহারে রূপ।'

রূপ থেকেই রূপসী। আসল একটা নাম তার ছিল। সে নাম আজ আর কেউ জানে না।

উজানিয়া নদীর তীরে সোনারঙ গ্রামে মালীদের বাস। মালীদের কুলকর্ম হল ফুলের কাজ, শোলার কাজ। তাদের নিজেদের কথায়, সাজের কাজ। এককালে সাজের কাজের কদর ছিল। রাজার ঘরে আদর ছিল, বাদশার ঘরে মান ছিল মালীদের।

সেই এককাল আর চিরকাল থাকে না। সেই রাজাও নেই, সেই বাদশাও নেই, সেই কালও নেই। কিন্তু মালীরা আছে।

এ কালের মালীদের মান নেই, আদর নেই। মালী-পাড়ার অনেকেই সাজের কাজ ছেড়ে অন্য পেশা ধরেছে। কেউ ধরেছে লাঙল জোয়াল, কেউ হয়েছে মাঝি, আবার কেউ উজানিয়া গাঙ পাড়ি দিয়ে শহরে বন্দরে চলে গিয়েছে। কুলকর্ম ছেড়ে নানান পেশায় অনেকেই জাতি দিয়েছে।

সেই রূপসী কুল মজাল। নন্দ ঢালীর ঘরে এসে জাতি-মান—সব দিল।

সেই রূপসী।

গ্রামের নাম সোনারঙ, নদীর নাম উজানিয়া, আর নারীর নাম রূপসী।

মালীদের সেই সুদিন নেই, মান নেই। কিন্তু অভিমান আছে।

মালীপাড়ার সবচেয়ে পুরানো মানুষ নয়ন মালী। বুড়ো নয়ন বলে, 'সেই কালই নাই! রাজাবাদশা নাই। এখন দুর্দিন। তবু আমাগোর জাতিই ভিন্ন। আমরা শিল্পীর জাতি। ছ্যাচড়া মানুষ আমাগোর মন্ম কি বুঝব! বুঝল রাজাবাদশারা, বুঝল বড় বড় সদাগররা। দুই হাত ভইরা যারা মোহর দিত। কিন্তুক সেই সুদিন আর নাই।'

বুড়া নয়ন আক্ষেপ করে।

রোদে হাত পা সেঁকতে সেঁকতে মাঝে মাঝে অভিসম্পাত দেয় নয়ন মালী, 'কুলকম্ম যারা ছাড়ছে, তারা বিজাত কুজাত। তাগোর (তাদের) ধম্ম নাই, পরকাল নাই। সাজের কাজের জন্যে আমাগোর পিথীমিতে আসা। সেই কাজ না করলে অপরাধ লাগে। অপরাধের ভোগ ভুগব ধরমনাশারা।'

আজও সাজের কাজ ছাড়ে নি নয়ন মালী। গঞ্জ-বন্দরে সাজের কাজ বিকোয় না। তবু অভ্যাসবশে ফুল দিয়ে কেয়ুর কঙ্কন বানায়, অঙ্গদ কুণ্ডল বানায়। শোলা কেটে কেটে মুকুট চাঁদমালা সাজায়।

নয়ন মালীর মেয়ে রূপসী।

সেই রূপসী, যে কুল মজিয়েছে। নন্দ ঢালীর ঘরে এসে যে জাতি-মান দিয়েছে।

রূপসীর রূপের ব্যাখ্যান মালীপাড়া পেরিয়ে উজানিয়া নদী পাড়ি দিয়ে কোথায় কোথায় চলে গিয়েছে। এমন রূপ নাকি রাজার ঘরে নেই, এমন রূপ বাদশার ঘরে মেলে না।

সেই রূপসী কাঁখে মাটির কলস নিয়ে নদীর ঘাটে চলেছে। সুঠাম চিকন মাজায় রাঙা বাহারে শাড়ি কি বশই না মেনেছে! মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে দুই চোখে ঠমক হেনে হেনে রূপসী চলেছে।

উজানিয়া নদীর কিনারে এক সারি মান্দার গাছ। তার একপাশে বউঝিদের ঘাট, আর এক পাশে মাঝিঘাট।

মান্দার গাছের তলে সুজনের সঙ্গে দেখা। চন্দ্র মালীর পুত সুজন মালী। কুলকর্ম ছেড়ে সুজন মাঝিগিরি করে। উজানিয়া নদীর এপার ওপার সওয়ারী নৌকা বায়।

সুজনকে দেখে দুই ভুরু বাঁকল রূপসীর। চোখের তারা স্থির হল। মাজাখানা বাঁকিয়ে বলল, 'তোমারে পেত্যয় বলি। এ হয় না সুজন! তবু তুমি আশায় থাক।'

সুজন বলে—'ক্যান হয় না! আমি তোমার স্বজাতি, মালীর ঝি রূপসী, তোমারে মন দিয়েছি। ফিরাইয়া দিও না।'

রূপসী হাসে। হাসিতে যত বাহার, তত ধার। হাসির বাহার বড় মনে ধরে সুজনের, কিন্তু ধারটুকু বড় দুর্বোধ্য।

রূপসী বলে, 'তুমি বাপের কাছে যাও। বাপের কাছে মনের কথা কও।'

মুখখান বড় করুণ দেখায় সুজনের। সে বলে, 'তোমার বাপ! আ আমার কপাল! আমি হইলাম জাতিনাশা, ধরমনাশা। সাজের কাজ ছেড়ে মাঝির কাজ ধরেছি। আমারে কি তোমার বাপ মেয়ে দেবে!'

রূপসী আর কিছু কয় না। মিটি মিটি হাসে। তারপর সুঠাম মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে নদীর ঘাটে যায়। পিছন ঘুরে আর তাকায় না।

রসিক সুজনেরা বলে, 'রূপসীর রূপের বাহারই আছে, মন নাই।' মান্দার গাছের তলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুজন ভাবে, কথাটা বড় খাঁটি। আবার ভাবে, মন যদি থাকেই রূপসীর, সেই মনে কি আছে, একমাত্র রূপসীই জানে।

উজানিয়া নদীর পারে একটি একটি করে দিন যায়, মাস যায়, ঋতুচক্রে সময় পাক খায়। নদীতে জোয়ার-ভাটির লহর খেলে।

নদীতে জোয়ারের পর ভাটি, ভাটির পর জোয়ার। কিন্তু কিশোরী রূপসী যুবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে রূপের বান ডাকল; সেই বানে আর টান ধরল না। রূপ তার দিনে দিনে কলায় কলায় বাড়ে।

রসিক সুজনেরা বলে, 'এমন রূপ যে না দেখে, তার জনম বৃথা। এমন রূপ যে বা দেখে, তার বুকে বড় জ্বালা।'

সেই রূপসীর রূপ দেখে জনম যেমন সফল হল মুকুন্দর, বুকে তেমন জ্বালা ধরল।

বছর তিনেক আগে মালীপাড়া ছেড়ে উজানিয়া নদী পাড়ি দিয়ে শহরে বন্দরে চলে গিয়েছিল মুকুন্দ। এতদিনে সেই মুকুন্দ ফিরে এল।

তিন বছর আগে রূপসী ছিল কিশোরী। সে সব দিনে চিকণ মাজায় তিন বেড় দিয়েও ডুরে শাড়ি বশ মানত না। বুকও এমন উছল ছিল না ; বুক তখন ফুটি ফুটি। চোখেও এমন বিজুরি খেলত না।

তিন বছর শহর বন্দরে ঘুরে ঘুরে কত দেখেছে মুকুন্দ, কত জেনেছে, কত শুনেছে। তার সাজে পোষাকে অচেনা বাহার, তার কথায় অজানা ধ্বনি। শিস দিয়ে দিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। তিন বছর শহরে বন্দরে ঘোরার গৌরবেই বুঝি বা মালীপাড়ার ঘরে ঘরে খাতির পায় মুকুন্দ, মান পায়। তার সাজের বাহারে, কথার বাহারে মালীরা বিস্ময় মানে।

তিন বছর শহরে বন্দরে ঘুরে ঘুরে কোন কিছুতেই আর বিস্ময় মানে না মুকুন্দ। সে যে অনেক শুনেছে, অনেক দেখেছে।

আশ্চর্য! সেই মুকুন্দ উজানিয়া নদীর পারে নগণ্য মালীদের গ্রামে এসে বিস্ময় মানল।

শিষ দিতে দিতে নয়ন মালীর ঘরে এসেছিল মুকুন্দ।

একটা শোলা চেঁচেছুলে মুকুট বানাবার জন্য তৈরি করছিল নয়ন মালী।

মুকুন্দ বলল, 'এলাম গো নয়ন জেঠা, কেমন আছ ?'

'কে রে, মুকুন্দা না ? বস্ বস্।' একখান জলচৌকি সামনে এগিয়ে দিয়ে নয়ন মালী বলে, শোনলাম, তিন বছর শহরে বন্দরে কাটাইয়া আসলি! শহরে বন্দরে কি কাম-কাজ করিস ?'

'আমার মনিহারি দোকান।'

জলচৌকিতে জাঁকিয়ে বসে মুকুন্দ। জুত করে মণিহারি দোকানের ব্যাখ্যান শুরু করে, 'আমার দোকানে শখের জিনিস, বাহারের জিনিস, সব মেলে। গন্ধ তেল, গুলাব সেণ্ট, পাউডার, স্নো'—কত নাম যে বলে যায় মুকুন্দ!

কিছু তার বোঝে নয়ন মালী; বেশির ভাগই তার অজানা।

নিজের খুশিতেই বলে যায় মুকুন্দ। হঠাৎ খেয়াল হয়, তার কথায় নয়ন মালীর কান নেই। মুকুন্দ থামে।

নয়ন মালীর মুখখানা বেজার দেখায়। বিষণ্ণ, ক্ষুব্ধ স্বরে সে বলে, 'শেষ তক কুলকম্ম ছাড়লি! শহরে বন্দরে গিয়া জাতি মান—সগল দিলি। আমরা শিল্পীর জাতি, গুণী ; সব তোরা ভুললি।'

নয়ন মালীর বুকখান কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

সিধা হয়ে বসে মনিহারি দোকানের গুণের ব্যাখ্যান শুরু করতে যাবে মুকুন্দ, এমন সময় রূপসী এল। ঠমকে ঠমকে তার চিকণ মাজা দোলে।

দেখে দেখে চোখ ফেরে না মুকুন্দর। চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। এত শহর বন্দর ঘুরে জীবনের সেরা বিস্ময়টা দেখার জন্য উজানিয়া নদীর পারে মালীদের গ্রামেই যে আসতে হবে, এমন কথা কি তার কোনকালে মনে হয়েছে!

রসিক সুজনেরা বলে, 'রূপসীর রূপে ঝাঁপ দিলে দুই পাখা পোড়ে। পাখা পুড়লে বড় জ্বালা; আবার পাখা না পুড়াইয়া সুখ যে নাই!'

রূপসীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথাটার সত্যটা বড় বেশি করে মানে মুকুন্দ।

এক সময় মুগ্ধ গলায় মুকুন্দ বলে, 'রূপসী না ?'

রূপসী হাসে। বলে, 'হ।'

বলেই আর দাঁড়ায় না রূপসী। সামনেই জলটুঙ্গি ছাঁদের ছয়চালা ঘর। ঘরের মধ্যে চলে যায় সে।

সেই শুরু, পরেরদিন আসে মুকুন্দ। তার পরের দিন। তারও পর দিনের পর দিন নিয়মিত।

খালি কি নয়ন মালীর জলটুঙ্গি ঘরেই আসে মুকুন্দ! রূপসীর পিছন পিছন উজানিয়া ঘাটে যায়, রবিফসলের চকে যায়, মালীপাড়ার এমাথায় ওমাথায় ঘোরে। নানান কথা কয়। শহর বন্দরের কথা। পরবাসের কথা ; মনিহারি দোকানের কথা। কত যে কথা, তার লেখাজোখা নেই।

উজানিয়া নদী থেকে একটা খাল বেরিয়ে এসেছে। মালীপাড়াটাকে বেড় দিয়ে পশ্চিমমুখে সিধা চলে গিয়েছে। খালের নাম মাতানিয়া খাল।

খালের উপর সাঁকো।

পশ্চিম আকাশটাকে নানান রঙে মাতিয়ে দিন ঢলেছে।

সাঁকোর মুখে রূপসীর সঙ্গে দেখা।

মুকুন্দ শুধায়, 'গেছিলা কোথায় রূপসী ?'

রূপসী খালের ওপারে এক অনির্দেশ্য দিকে আঙুল বাড়ায়। মুখে বলে, 'উই ওদিকে।'

মনে হয়, ঐদিকটা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় মুকুন্দ। বলে, 'বুঝলা রূপসী, আমার মনিহারি দোকানের কত নাম! বাবুভূইঞাদের মুখে মুখে আমার দোকানের নাম ঘোরে। আমার দোকানের পাউডার ইসেন্স না হইলে বিবিদের বদন ভার; দিনই চলে না।'

একসঙ্গে হাজার কথা কয় মুকুন্দ।

রূপসী অতল কালো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মিটি মিটি হাসে। সেই হাসি, যে হাসিতে গ্রামের মানুষ সুজন মালী দিশা হারায়; আবার শহর বন্দরের মুকুন্দর ধন্দ লাগে।

মুকুন্দ বলে, 'হাস যে রূপসী?'

'মন হয়।'

শহর বন্দরের মুকুন্দ এবার সিধা কথাখান সহজ করে বলে, 'এতদিনে আমার মন বোঝ নাই মালীর ঝি?'

রূপসী কথা কয় না। দুই ঠোঁটের ফাঁকে সেই হাসিখান নিঃশব্দে বেঁকে যায়। সুজনের মত মুকুন্দরও মনে হয়, রূপসীর হাসিতে যত বাহার, তত জ্বালা।

খালের নাম মাতানিয়া, নদীর নাম উজানিয়া, আর নারীর নাম রূপসী। মুকুন্দ ভাবে, মাতানিয়া খালের তল মেলে, বুঝি বা উজানিয়া নদীরও তল পাওয়া যায়। কিন্তু নদীর পারের নারীর তল মেলে না, কূল মেলে না। তিন বছর সোনারঙ গ্রাম ছেড়ে শহর বন্দরে রয়েছে মুকুন্দ। আর এই তিন বছরে কিশোরী রূপসী যুবতী হয়ে, এমন অগাধ অতল হয়ে যাবে, কোনকালে কি তার মনে হয়েছে?

মুকুন্দ একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে রূপসীর মনখান বোঝার চেষ্টা করে। রূপসীর মন বোঝা কি সহজ কথা!

মুকুন্দ আবার বলে, 'মনের কথা কইলা না রূপসী?'

'মনের কথা এখনও যে বুঝি নাই।'

হঠাৎ বড় রাগ হয় মুকুন্দর। রাগখান মাত্রা ছাড়ায়। মুকুন্দ বলে, 'মনের কথা তুমি ঠিকই বোঝ রূপসী। আসলে তোমার রূপের যত দেমাক, তত ঠেমাক। এই দেমাক তোমার ঘুচব।'

রূপসী কথা কয় না। মুকুন্দকে সাঁকোর মুখে রেখে চিকন মাজা নাচিয়ে নাচিয়ে মালীপাড়ার পথে নামে।

সেই কাল আর নেই। সেই রাজা বাদশারাই নেই; সেই সুদিনই বা থাকে কেমন করে?

হিজল আর মান্দার ফুলের সাজ বানাতে বানাতে বুড়ো নয়ন মালী পুরানো দিনের কথা ভাবে। সেই দিনে এই দিনে কোন মিল নেই। বাপের মুখে শুনেছে, সাজের কাজে খুশি হয়ে রাজাবাদশারা সোনার মোহর দিত। জলের দেশ থেকে, বিলান দেশ থেকে সাজের কাজ শেখার জন্য কত মানুষ উজানিয়া নদীর পারে মালীদের এই গ্রামে আসত। হাতে রাঙ্গা সুতা বেঁধে সাজের গুণী কারিগরকে গুরু মানত। সাধে কি আর নয়ন মালী বলে, আমরা শিল্পীর জাতি, গুণীর জাতি।

এখন দুপুর! রোদ জ্বলে, চরাচর জ্বলে। জলটুঙ্গি ঘরের পিছে মান্দার গাছের লাল ফুলগুলি জ্বলে।

এমন সময় নন্দ ঢালী এল। অসঙ্কোচে বলল, 'আমি আসলাম।'

ভুরুর উপর একখান হাত তুলে রোদ ঠেকায় নয়ন মালী। বলে, 'কে বাপু তুমি? তোমারে চিনি বলে তো মনে হয় না।'

'না, আমারে আপনি চিনেন না। নদীর ঐ পারে আমাগোর বাস। আমার নাম নন্দ—নন্দ ঢালী।'

'আমার কাছে কি মনে কইরা আসছ; তা তো বুঝি না।'

এদিক সেদিক তাকিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে নন্দ। তারপর বলে, 'আপনি যদি ভরসা দেন, একখান কথা কই।'

'কথা না শুনলে ভরসা দেই কেমনে?'

'আপনের নাম আমি অনেক শুনছি। এই কালে আপনের মত সাজের কাজের কারিগর নাই।'

নন্দ ঢালীর কথার বাহারে নয়ন মালীর মনখান ভিজে। নরম গলায় সে বলে, 'সগলই বুঝলাম, কিন্তুক আসল কথাখান তো কইলা না?'

'এইবার কই। আপনেরে আমি গুরু মানতে চাই। ছোট বয়স থিকা আমার সাজের কাজের গুণী হওয়ার সাধ। সাধখান আপনি মিটান।'

'কিন্তুক'—কেমন বিচলিত দেখায় নয়ন মালীকে। সে বলে, 'কিন্তুক, তুমি যে ঢালী। নীচা জাতি—'

'গুণের আবার জাতি আছে নাকি ? আপনি আমার হাতের কাজ গ্যাখেন। গুণ না পাইলে খেদাইয়া দিবেন।'

'ঠিক ঠিক, আমারই ভুল হইছিল। কিন্তুক—'

'আবার কি ?'

'তুমি ঢালীর পুত। কুলকম্ম ছাইড়া সাজের কাজ ধরলে তোমার স্বজাতিরা কইব কি ?'

'ঢালীর ঘরে জন্মাইছি বইলা কি গুণী হওয়ার মানা আছে! যা দিনকাল, কে আর কুলকম্ম করে! কুলকম্মে ভাত নাই! আমরা ঢালী, ঢাক-বাদ্যি বাজাইয়া পয়সা পাই না। পেটের ধান্দায় এক এক মানুষ এক এক পেশা ধরছে। নেশার দিকে কারো মন নাই, মনের সাধ মনেই মরে। সাধের দাম কানাকড়িও না। আমার সাধটা যদি মিটাইতে চাই, দোষখান কোথায় ?'

'তুমি বড় খাসা কথা কও; খাঁটি কথা; বাহারের কথা। তোমারে আমি শিষ্য নিমু। আমার সব গুণ তোমারে দিমু।'

নয়ন মালীর তুই চোখে আহ্লাদে ঝিকিমিকি খেলে। মনে মনে ভাবে, যে কাল পড়েছে, মালী পাড়ায় সাজের কাজের একটি মানুষও মিলবে না। মনের মত একটি শিষ্য জুটবে না। অথচ সাজের কাজের কাজীদের বিধি আছে, নিজের গুণ অন্যের মধ্যে রেখে যাওয়া। কিন্তু এ কালে গুণের উত্তরাধিকারী মেলা কি সহজ কথা!

হোক বিজাত, নন্দ ঢালীকেই শিষ্য মানল নয়ন মালী।

পরের দিন হাতে রাঙা সুতা বেঁধে, নতুন কাপড় পরে নয়ন মালীর/ হাতের গুণ নেবার পালা শুরু করল নন্দ ঢালী।

নয়ন মালীর একখান মাত্র জলটুঙ্গি ছাঁদের ঘর। সেই ঘরের পাশে একখান দোচালা ঘর উঠল; কঁ্যাচা বাঁশের বেড়া, ছ্যাচা বাঁশের চাল। নন্দ ঢালী থাকবে।

মালীপাড়ার এ মাথায় সে মাথায় কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। এতদিন পর নয়ন মালী মনের মত এক বিজাতি শিষ্য পেয়েছে।

মালী পাড়ার বুড়ারা এল সকালে। সকলে এক বাক্যে বলল, 'এই কি করলা বুড়া মালীর পুত! স্বজাতির মধ্যে শিষ্য জুটল না! বিজাতিরে শিষ্য নিয়া জাতি দিতে চাও!'

নয়ন মালী বলে, 'গুণের আবার জাতি কি রে? বিজাতি শিষ্য নিয়া আমি জাতি দিলাম; আর কুলকম্ম ছাইড়া তোরা জাতি দিস নাই ?'

মালী পাড়ার যুবারা এল বিকালে।

জলটুঙ্গি ছাঁদের ঘরের পাশে এক সারি মান্দার গাছ। ঝিরিঝিরি মান্দার পাতার ফাঁক দিয়ে বিকালের রাঙ্গা রোদ এসেছে।

উঠানে বসে শোলা দিয়ে পানমুকুট, হিমমুকুট, রাণী মুকুট—নানান ঢঙের মুকুট বানানো শেখাচ্ছিল নয়ন মালী। বুড়া বয়সে মনের মত শিষ্য পেয়ে উৎসাহ আর ধরে না। নিজের সব গুণ নন্দকে দিতে মনে কি আহ্লাদই না হয় নয়নের। এক কালের মানুষের গুণ এমন করেই তো পরের কালের মানুষ পায়।

গ্রামের যুবারা এসেছে। সুজন মালী এসেছে; শহর বন্দরের মুকুন্দ এসেছে। সকলে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

কালো কুরূপ নন্দ ঢালী; খাড়া খাড়া চুল, দীর্ঘ শীর্ণ তুই হাত, শুকনা কর্কশ মুখ। এমন কুরূপ যে চোখকে সুখ দেয় না। কিছুক্ষণ তাকাবার পর আপনা থেকেই চোখ বুঁজে আসে।

যুবারা বলে, 'তোমার নয়া শিষ্য দেখতে আসলাম গো লয়ন জেঠা।'

'গ্যাখ্ গ্যাখ্ লয়ন ভইরা গ্যাখ্'—একটু থামে নয়ন মালী। তুই চোখ তার চকমক করে। তারপর বলে, 'নিজের গুণ অন্যেরে না দিতে পারলে মরেও সুখ নাই। নন্দ আমারে বাঁচাইল। ও আমার মরা গাঙে বান আনল।'

শহর বন্দরের মুকুন্দ বলে, 'এইটা তুমি ভাল করলা না লয়ন জেঠা। আমাগোর মধ্য থিকা শিষ্য নিলে ভাল করতা।'

তুই চোখে যেন আগুন জ্বলে নয়ন মালীর। সে বলে, 'কিসে ভাল হয় কিসে মন্দ হয়, তোর কাছে শিখতে হইব না কি রে মুকুন্দা। যা যা, আমার ঘর ছাড়। তোদের কারো সঙ্গে আমার সম্পক্ক নাই। ধরমনাশা, জাতিনাশার দল—'

মুকুন্দ, সুজন মালী—মালীপাড়ার যুবারা চলে যায়।

কোন দিকে দৃষ্টি নেই নন্দ ঢালীর। মন পরাণ একাকার করে ফুল আর শোলা দিয়ে মুরলীমুকুট বানায়, অঙ্গদকুণ্ডল বানায়। সাজের কাজের যত গুণ, সব সে উজাড় করে নেয় নয়ন মালীর কাছ থেকে।

বড় বাহারের নেশায় পেয়েছে নন্দ ঢালীকে।

রসিক সুজনেরা বলে, 'রূপসীর রূপে পরাণ ঝলসায়; তবু পরাণ না পুড়াইয়া সুখ নাই।'

আশ্চর্য! যে রূপের ধ্যানে মালীপাড়া বিভোর, যে রূপের ব্যাখ্যান উজানিয়া নদী পাড়ি দিয়ে কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে, রূপসীর সেই রূপের দিকে একবারও তাকায় না নন্দ ঢালী।

প্রথম প্রথম খেয়াল করে নি রূপসী। খেয়াল যখন করল, অবজ্ঞা শুরু করল। রূপের দেমাকে দুই ঠোঁট তীব্র ভাবে বেঁকে গেল। তবু মানুষটার বিকার নেই, কোন-দিকে দৃকপাত নেই।

অবজ্ঞাই তো মনের শেষ কথা নয়। অবজ্ঞার পর মনে জ্বালা ধরল রূপসীর, বড় বিষম জ্বালা। এমন পুরুষ কোন কালে দেখে নি রূপসী। চিরকাল রূপের ধ্যানের কথাই সে শুনেছে। মুগ্ধ যুবার স্তুতি শুনতে শুনতে দিনে দিনে তার দেমাক বেড়েছে। এতদিনে সেই দেমাকে আঘাত লেগেছে রূপসীর।

রূপসী ভেবেই পায় না, কালো কুরূপ নন্দ ঢালী কিসের অহঙ্কারে তার রূপের দিকে তাকায় না পর্যন্ত?

প্রথমে ছিল অবজ্ঞা, তারপর জ্বালা। শেষ পর্যন্ত আকুল, অস্থির হয়ে উঠল রূপসী।

সিধা একদিন নন্দ ঢালীর কাছে এসে বসল রূপসী। বলল, 'মানুষজন দেখ না পরবাসী কালাচাঁদ!'

কালো কদাকার নন্দ; উজানিয়া নদীর ওপার থেকে এসেছে। তাই বুঝি রূপসী রঙ্গ করে বলল, 'পরবাসী কালাচাঁদ!'

বাঁশের সরু শলায় কাঞ্চন ফুল গেঁথে মুরলী বানাতে বানাতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল নন্দ ঢালী। চমকে উঠল। বলল, 'আমারে কিছু কইলা?'

'না। কইলাম ঐ আকাশেরে।'

'ও।'

বাঁশের সরু শলায় আবার ফুল গাঁথতে শুরু করে নন্দ ঢালী। কোনদিকে আর দৃষ্টি নেই। মন নেই।

এতকাল মনের মধ্যে জ্বালা ছিল রূপসীর। এবার সেই জ্বালা সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। বিষম আক্রোশে অঙ্গ মন জরজর হয়ে উঠল।

কালো কুরূপের অহঙ্কার রূপসী ঘুচিয়ে দেবে।

রূপসী লাফিয়ে উঠে পড়ল। আশ্চর্য! তবু খেয়াল নেই নন্দ ঢালীর।

সেই রূপসীকে এখন আর দেখা যায় না। সেই রূপসী, যে দুই চোখে বিজুরী খেলিয়ে, চিকণ সুঠাম মাজা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গৌর রূপের ঝিলিক হেনে হেনে মালী-পাড়াটাকে মাতিয়ে তুলত, জলটুঙ্গি ঘর আর উঠান ছাড়া এখন সে কোথাও যায় না।

রসিক সুজনেরা বলে, 'কালো রূপেই মজলো বুঝি রূপসী। রূপসীর পছন্দে বলিহারি যাই।'

রূপসী সম্পর্কে মালীপাড়ায় সবচেয়ে বেশি উৎসাহ সুজন মালী আর শহরবন্দরের মুকুন্দর।

একদিন দুপুরে রোদ যখন জলটুঙ্গি ঘরের চালে ঝকমক করে, তখন মালীপাড়ার বুড়া যুবাদের সঙ্গে নিয়ে সুজন আর মুকুন্দ আবার এল।

মুকুন্দ বলল, 'আমরা না হয় কুলকন্য ছাইড়া জাতি দিয়েছি। কিন্তুক তুমি কি করতে আছ লয়ন জেঠা'—

বিমূঢ় মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নয়ন মালী। বলল, 'কি কও তোমরা?'

'যা কইতে চাই, তা তুমি বোঝ লয়ন জেঠা।'

'কি বুঝি?'

এবার একজন বুড়া বলল, 'লয়ন ভাই, বিজাতিরে শিষ্য মানছ। আমাগোর আপত্ত (আপত্তি) নাই। কিন্তুক মেয়ে তারে দিলে যে জাতি যায়, কুল মজে! স্বজাতির ঘরে যুগ্য (যোগ্য) ছেলে ছিল না?'

অসহায়, করুণ স্বরে নয়ন মালী বলে, 'তোমরা কি কও, কিছুই যে বুঝি না।'

জলটুঙ্গি ঘরের কপাট ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রূপসী। সব শুনছে। কি এক কৌতুকে মিটি

মিটি হাসে রূপসী। চিরদিনের দুর্বোধ্য রূপসীর মনে কি যে আছে কে জানে ?

সুজন চেঁচায়, 'এর বিহিত চাই।'

মুকুন্দ গর্জে, 'এমন অধর্ম্ম মালীপাড়ায় চলব না।'

জলটুঙ্গি ঘরের পাশেই নন্দ ঢালীর কঁ্যাচা বাঁশের চালের, ছ্যাচা বাঁশের বেড়ার ঘর। সেই ঘরের বারান্দায় থরথর কাঁপে নন্দ ঢালী। সেই কাঁপ থামে না।

সহসাই ঘটনাটা ঘটে যায়।

মালীপাড়ার মানুষগুলিকে হতবাক করে, এতজোড়া চোখ নিষ্পলক করে দিয়ে জলটুঙ্গি ঘরের কপাট ছেড়ে সিধা নন্দ ঢালীর ঘরে আসে রূপসী। কালো কুরূপের অহঙ্কার ঘুচাবার এমন সুদিন কোনকালে আর বুঝি আসবে না। ভাবে, আর মিটি মিটি হাসে রূপসী।

রূপসী বলে, 'দেখ তোমরা, সগলে দেখ। কুলমান সব খোয়ালাম, জাতি দিলাম। দেখ দেখ, লয়ন ভইরা দেখ।'

রূপসী বলে। আর মালীপাড়ার সকলে অবাক হয়ে শোনে।

গ্রামের নাম সোনারঙ, নদীর নাম উজানিয়া, নারীর নাম রূপসী। এইটুকু সবাই জানে। কিন্তু রূপসীর মনে কি আছে, মালীপাড়ার কেউ জানে না।

শুধু চরাচর জানল সেই রূপসী কুল মজাল। নন্দ ঢালীর ঘরে এসে জাতি মান সব দিল।

সেই রূপসী !

সমাপ্ত



জীবনের মধু-মায়া আছে শুধু শরতে

অধ্যাপক শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

ভালো লাগে নীলাকাশ ঝিরঝিরে হাওয়াটি
শিশিরেতে ভেজা ঘাস বনপথে যাওয়াটি।
শেফালির আলিপন দুর্ব্বার বুকেতে,
মধুপের আলাপন কামিনীর কানেতে।
টুনটুনি দোল খায় নাচে ফিঙে বুল বুল,
চন্দনা গান গায় দোয়েলা যে চুল্‌বুল্।

বলাকারা মালা গাঁথে নীলিমার বুকেতে,
প্রকৃতির আঁখিপাতে স্বপ্নের সুখেতে
নামে মায়া, শান্তির মহিমায় ভরা দিক,
কল্যাণ-কান্তির পরশেতে গাহে পিক্।
মাঠ-ভরা কাশফুল, পাশে বহে তটিনী,
নেই ভুল, নেই ভুল, শরতের রাগিণী।

কত না আছে দুখ—তবু এই শরতে
আশাতে ভরে বুক ধূলিভরা মরতে।
দিবসের সোনা-আলো যামিনীর মায়া চাঁদ,
নয়নেতে লাগে ভালো স্বপনের ভাঙা বাঁধ।
অসাড় মনে জাগে সহসা যে শিহরণ,
তৃষিত মন মাগে কল্যাণ পরশন।

শরতের সোনাকাঠি স্পর্শের মায়াতে,
জীবনের কবিতাটি জাগে তারি-ছায়াতে।
লাগে চির-সুন্দর—আর বার ধরণী,
নহে আর মন্থর জীবনের সরণি।
জীবনের মধু-মায়া আছে শুধু শরতে,
তারপর শুধু কায়া সুকঠিন মরতে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুগের যুগমানব মহাপ্রাণ ঋষিকল্প আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার যে ছাত্রকে "জীবন্ত অভিধান" নাম দিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার জীবনে প্রায় সত্তর বৎসরকাল সারাদিন শুধু লিখন পঠনে অতিবাহিত করিয়া থাকেন, কর্ম্ম জীবনে যাঁহার এমন একটি দিনও নাই যেদিন অন্ততঃপক্ষে কয়েকঘণ্টা লেখনী পরিচালনা করেন নাই, যাঁহার অনন্য-সাধারণ স্মৃতিশক্তি তাঁহার ৮৩ বৎসর বয়সেও অটুট থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার বন্ধু-জনকে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত করিয়া থাকে, যিনি সাহিত্যের সকল-ক্ষেত্রে -কি কবিতা, কি গল্প, কি উপন্যাস, কি সাহিত্য-সমালোচনা বা রাজনীতিক-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ প্রভৃতি—সর্ব্বদা সমানভাবে রচনা দ্বারা সারা জীবন পাঠক-সমাজকে আনন্দ ও শিক্ষা দান করিতেছেন, সেই বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক, অশেষ গুণের আধার শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলিতে যাওয়া সহজসাধ্য নহে। প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল তাঁহার জীবন ও কর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বের, জ্ঞানের ও কর্ম্মপ্রতিভার যে পরিচয় লাভ করিয়াছি তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ; সকল সম্পদে বিপদে অটুট থাকিয়া যন্ত্রের ন্যায় তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছেন, কঠিন পীড়ার মধ্যে, দারুণ পারিবারিক শোকের মধ্যে—বিষম আর্থিক বা অন্যবিধ বিপদের মধ্যে, ট্রেণে পথ চলিতে চলিতে, জনতার মধ্যে অবস্থান করিয়া সকল সময়েই তিনি সংবাদপত্রের জন্য উচ্চতম প্রকৃতির সম্পাদকীয় রচনা করিয়া পাঠক-গণকে চমৎকৃত করিয়া থাকেন। তিনি সারা জীবন পরীক্ষার্থী ছাত্রের মত নূতন নূতন গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আধুনিকতম উপাদানে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ভগবান-দত্ত স্মৃতিশক্তি তাঁহার এতই প্রখর যে, কলেজে ছাত্রাবস্থায়—মহাকবি কালিদাস, সেক্সপীয়র, মিল্‌টন্, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতির লিখিত যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন আজিও সেগুলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবৃত্তি করিয়া শ্রোতাকে চমৎকৃত করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতাসমূহ—কবিগুরুর প্রথম যুগের রচনা হইতে শেষ জীবনের রচনা পর্য্যন্ত—হেমেন্দ্রপ্রসাদ এমনভাবে মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে সেগুলি উপযুক্তভাবে যথাস্থানে প্রয়োগ করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

তাঁহার সহিত যখন প্রথম পরিচিত হই তখন আমি কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বি-এ ক্লাশের ছাত্র, ছাত্রাবস্থাতেই নানা-কারণে সাংবাদিকতা আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। স্বর্গতঃ পণ্ডিত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয়ের কলিকাতাস্থ বাসাবাড়ীতে অবস্থানকালে তাঁহার মাসিক পত্র-সম্পাদনা কার্য্যে সাহায্যদান কালে সে ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠে। সেই সময়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদের এক সহকর্ম্মী কবিরাজ সতীশচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে বসুমতী কার্য্যালয়ে লইয়া হেমেন্দ্রবাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তাঁহার মূলে ছিলেন আমার অগ্রজের সহকর্ম্মী বন্ধু খিদিরপুর নিবাসী শ্রীসুধীশচন্দ্র পাল ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ম্মী—বাণীনাথ নন্দী। সেই সময়েই হেমেন্দ্রবাবু সবেমাত্র ইউরোপের রণক্ষেত্র দেখিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। গত প্রথম ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার ভারতের পাঁচজন খ্যাতনামা সাংবাদিককে রণক্ষেত্র দেখাইবার জন্য প্রথমে ইরাকে ও পরে ইউরোপে লইয়া গিয়াছিলেন, সে দলে ছিলেন কলিকাতা 'ইংলিশ ম্যানের' মিঃ স্যাণ্ডব্রুক, মাদ্রাজের হিন্দুপত্রের কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার, বোম্বাইএর মিঃ যোশী, লাহোরের 'পয়সা আকবর' নামক উর্দ্দুপত্রের সম্পাদক এবং দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। তখনই তিনি সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহারও দশ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যখন বন্দেমাতরম্ নামক ইংরেজী দৈনিকপত্রের ভার গ্রহণ করেন, তখন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ব্যারিষ্টার বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত তিনি বন্দেমাতরমের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তাহার পূর্ব্ব হইতে তিনি 'বঙ্গবাসী' 'হিতবাদী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্রগুলির জন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা করি-তেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রের নাম বঙ্গবাসী পাঠকদিগের নিকট অবিদিত নহে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ সাহিত্য সম্পাদনে সুরেশচন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি নিজেও কয়েক বৎসর 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ও সম্পাদনা করিতেন। তখন হইতেই তাঁহার রচিত কবিতা, গল্প ও উপন্যাস বাংলার পাঠক সমাজে আদৃত হইতে থাকে। তিনি ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই নিবন্ধ রচনায় সমান শক্তিমান। ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্র পরি-দর্শনের সময় তিনি মাদ্রাজে হিন্দু-সম্পাদক আয়েঙ্গার মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা করিয়া দিতেন এবং সেগুলি 'হিন্দুতে' প্রকাশিত হইয়া মাদ্রাজের পাঠকদের নিকট সমাদৃত হইত। তদবধি এখন পর্য্যন্ত হেমেন্দ্রবাবু হিন্দুতে রচনা প্রেরণ করিয়া কলিকাতার সহিত মাদ্রাজের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছেন।

বাংলা দৈনিকপত্রের সম্পাদক হইয়াও হেমেন্দ্রবাবু ইংরেজী নূতন নূতন সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক পাঠ ত ছাড়েন নাই, অধিকন্তু সর্ব্বদা 'কলিকাতা রিভিউ' 'মডার্ণ রিভিউ' ইণ্ডিয়ান রিভিউ, হিন্দুস্থান রিভিউ প্রভৃতি সাময়িক পত্রের জন্য ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা

করিতেন। ভাগ্যকুলের রায় বাহাদুর সীতানাথ রায় মহাশয় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া হেমেন্দ্রবাবুকে ব্যবস্থাপক সভার কাজের জন্য সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন এবং সিমলা ও দিল্লীতে অবস্থানকালে সর্ব্বদা হেমেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে রাখিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রদ্বয় যদুনাথ ও প্রিয়নাথ সারা জীবন হেমেন্দ্রবাবুকে তাঁহাদের শুভার্থী জানিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। স্বর্গতঃ রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয় কলিকাতা বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভায় হেমেন্দ্রবাবুকে তাহার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে—প্রত্যহ সারাদিন পরিশ্রমের পর তাঁহার বাড়ী ফিরিতে রাত্রি ১০টা-১১টা হইয়া যাইত। যে সময়ে 'বসুমতীর' অধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "মাসিক বসুমতী" প্রকাশ করিলেন তখন তিনি হেমেন্দ্রবাবুকে যোগ্যতম ব্যক্তি স্থির করিয়া অন্যান্য কাজের উপর তাঁহাকে "মাসিক বসুমতী" সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। প্রথম প্রকাশের সময় হইতে মাসিক বসুমতী কিরূপ জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা শুনিলে সকলে বিস্মিত হইবেন। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা পাঁচ হাজার মাত্র ছাপা হয়। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গেই চারি দিনের মধ্যে তাহা বিক্রীত হওয়ায় সতীশবাবুকে আরও পাঁচ হাজার কপি ছাপিতে হয় এবং দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে অধিক ছাপানোর ব্যবস্থা হয়। একখানি নূতন মাসিক পত্রের এত অধিক প্রচার সে সময়ে সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল; "মাসিক বসুমতী" প্রকাশের কয়েক বৎসর পরেই সতীশবাবু ইংরেজী বসুমতী নামে একখানি ইংরেজী দৈনিক প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য কলিকাতায় বাঙালী-পরিচালিত দৈনিক পত্রগুলির মধ্যে দৈনিক বসুমতী সর্ব্বপ্রথম রোটারী মুদ্রণযন্ত্র ক্রয় করিয়াছিল। তাহাতে ষোল পৃষ্ঠা কাগজ ঘণ্টায় চল্লিশ হাজার ছাপার ব্যবস্থা ছিল। দৈনিক বসুমতীর প্রচার সংখ্যাও সে সময়ে প্রায় অর্দ্ধলক্ষে পৌছিয়াছিল। কাজেই মুদ্রণ যন্ত্রকে খোরাক দিবার জন্য 'ইংরাজী বসুমতী' প্রকাশের প্রয়োজন হয়। তখন প্রভাতী বাংলা দৈনিকের মধ্যে দৈনিক বসুমতী ছাড়া একমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হইত, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের সাধারণ মেসিনে ছাপা হইত। কাজেই প্রচার সংখ্যার বৃদ্ধির উপায় ছিল না। বাংলাদেশের স্বরাজ্য দল সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রথম 'ফরওয়ার্ড' নামক ইংরেজী দৈনিক প্রকাশ করে ও "ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ" নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র উঠিয়া গেলে তাহার বিরাট ছাপাখানা ক্রয় করে। এখানেও রোটারী মেসিন ছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর চেষ্টায় ১৯২৭ সালের শেষভাগে "ফরওয়ার্ড" কার্য্যালয় হইতে "বাংলার কথা" নামক বাংলা দৈনিক প্রকাশের ব্যবস্থার পর হইতে দৈনিক বসুমতীর প্রভাব কমিতে আরম্ভ হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ট্রেণ দুর্ঘটনার পর ফরওয়ার্ড ও "বাংলার কথা"র নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই ছাপাখানা হইতেই "লিবার্টি" ও "বঙ্গবাণী" দৈনিক পত্রিকাদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এখনকারই মত হেমেন্দ্রবাবুকে আমরা গত চল্লিশ বৎসর কাল অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি। তিনি অতি প্রত্যুষে—কি শীত ও গ্রীষ্ম সকল সময়েই ৫টার পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া থাকেন। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গৃহে বন্ধুবান্ধবের আগমন আরম্ভ হয়। তিনি যখন শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের এক বিরাট বাড়ীতে বাস করিতেন তখন একতালার দুইতিনখানি বৈঠকখানা ঘর প্রত্যহ লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। সকলকে প্রাতে চা দিয়া আপ্যায়িত করা তাঁহার চিরদিনের রীতি ছিল। তিনি যশোহর জিলার চৌগাছা নামক স্থানের জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার পিতামহ তারিণীপ্রসাদ ঘোষ কৃষ্ণনগরে খ্যাতনামা উকিল-সরকার ছিলেন এবং জীবনে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তারিণীবাবুর একমাত্র পুত্র গিরীন্দ্রপ্রসাদ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ দুই শিশুপুত্র রাখিয়া অকালে পরলোকগমন করেন। হেমেন্দ্রবাবুর পিতামহী অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মনিপুণা মহিলা ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় তাঁহার পৌত্রদ্বয় উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার ব্যবস্থাপনায় তাঁহার স্বামী পরিত্যক্ত অর্থ ও সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। হেমেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার অপেক্ষা মাত্র আড়াই বৎসরের বড় ছিলেন। শুনিয়াছি উভয় ভ্রাতা যখন সাবালকত্ব লাভ করেন তখন তাঁহাদের সম্পত্তির বার্ষিক আয় ২৫ হাজার টাকারও অধিক হইয়াছিল। দেবেন্দ্রবাবু প্রায় সময়ই গ্রামের বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনিও কৃতবিদ্য ও লেখক হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার পুত্রকন্যারা কলিকাতায় খুল্লতাত ও খুল্লতাত-পত্নীর নিকট বাস করিতেন। উভয় ভ্রাতার সৌহার্দ্দ্য এত অধিক ছিল যে হেমেন্দ্রবাবু প্রথম জীবন হইতে সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চায় অবাধে অর্থ ব্যয় করিলেও দেবেন্দ্রবাবু কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাহিত্য ও রাজনীতি চর্চ্চাকে উৎসাহ দানের জন্য তাহাতে কোন আপত্তি করিতেন না। দেবেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ অরুণেন্দ্রপ্রসাদ শিশুকাল হইতেই হেমেন্দ্রবাবুর নিকট লালিত পালিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে এই দীর্ঘকাল পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অটুট আছে। হেমেন্দ্রবাবুর দুই কন্যা বৃদ্ধ পিতার সেবা করিয়া চলিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার হাওড়া জিলার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে বিবাহ হইয়াছিল এবং তাহার স্বামী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহার একমাত্র কন্যার ভবানীপুরের স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরিবারে বিবাহ হইয়াছে; হেমেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠা কন্যার চোরবাগানে মিত্র পরিবারে বিবাহ হইয়াছিল। হেমেন্দ্রবাবুর উভয় কন্যাই বহুদিন পূর্ব্বে বিধবা হইয়াছেন। হেমেন্দ্রবাবু কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আর, জি, কর মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী একদিকে যেমন বিদুষী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি কর্ম্মনিপুণা, দয়াবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি সংসারে থাকিয়াও অধিকাংশ সময় দেবার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতেন, শেষজীবনে তিনি কয়েক বৎসর পুরীধামে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানেই প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জগন্নাথ প্রাপ্তি হইয়াছে।

হেমেন্দ্রবাবু সারা জীবনই সাহিত্য-চর্চ্চাও রাজনীতি আলোচনা লইয়া সর্ব্বদা নিজেকে এত ব্যস্ত রাখিয়াছেন যে তাঁহাকে সাধারণ-ভাবে সংসারী লোক বলিয়া মনে হয় না। সেজন্য প্রভূত উপার্জ্জন করিয়াও তাঁহার পক্ষে কলিকাতায় নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। যৌবনেই তিনি কংগ্রেস তথা স্বদেশী আন্দোলন এবং বিশেষ করিয়া বিপ্লব আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন। বিপ্লবী কর্মীর দল সর্ব্বদা তাঁহার নিকট হইতে শুধু উৎসাহও প্রেরণা-লাভ করে নাই, অর্থ সাহায্যও লাভ করিয়াছে। নানা কাজের সহিত নিযুক্ত থাকার ফলে এবং ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান বলিয়া কলিকাতায় প্রায় সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত প্রথম বয়স হইতেই তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল এবং সকল রাজনীতিক কার্য্যের জন্য তিনি শুধু নিজের অর্থ ব্যয় করিতেন না, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া তাহা ব্যয় করিতেন। যশোহর-খুলনার তথা কলিকাতার সকল ধনী কায়স্থ পরিবারের সহিতই তাহার আত্মীয়তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং সেকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্ররূপেও তিনি অভিজাত সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি কলেজের তাঁহার বহু বন্ধু পরবর্ত্তী জীবনে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র-নাথের নিকট প্রথম রাজনীতি ও সাংবাদিকতার শিক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সেজন্য পরবর্ত্তীকালে উভয়ের মধ্যে রাজনীতিক ক্ষেত্রে মতভেদ উপস্থিত হইলেও তিনি সুরেন্দ্রনাথকে "গুরুজী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও সেইরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান দান করিতেন। অতি অল্প বয়সে তিনি যেমন সাহিত্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন, তেমনি রাজনীতিক আন্দোলনেও যোগদান করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ও পরোপকারী; সেজন্য তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি সকল সময়েই পরের মঙ্গলের জন্য নিযুক্ত করিয়া থাকেন। অতিথি-বাৎসল্য ও তাঁহার একটি অন্যতম প্রধান গুণ; মধ্যযুগের ধনী বদান্য জমিদারদিগের অনুকরণে তিনি সারাজীবনই বহুভাবে বহুদুস্থলোককে অর্থদান করিয়া আসিতেছেন। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ঐ কারণে তাঁহার জনপ্রিয়তা খুবই বেশী হইয়াছিল। তাঁহার মত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সংখ্যাও কম। যে কোনও তরুণ বিদ্যাশিক্ষার বা জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক সাহায্য ও উৎসাহদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সামাজিক লোক হিসাবে বাংলাদেশে তাঁহার সমতুল্য মানুষ অতি অল্পই দেখা যায়; অসাধারণ স্মৃতিশক্তি বলিয়া তিনি সকল লোককে অতি সহজেই আপন করিয়া লইতে পারেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহাদের সহিত পরিচিত হইয়াছেন তাহাদের কোন আত্মীয়স্বজন পঞ্চাশ বৎসর পরে আসিয়াও পূর্ব্বপরিচিতির স্বীকৃতিতে তাঁহার নিকট আপন জন বলিয়া গৃহীত হয়। কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ—যে কোনও লোকের পারিবারিক ইতিহাস একবার তাঁহার জানা হইলে কখনও তাহা বিস্মৃত হননা। সেজন্য বহু সময়ে বহু অপরিচিত লোক তাঁহার কাছে আসিয়া তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যান।

সারাজীবন ধরিয়া তিনি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। অধিকাংশ গ্রন্থই তিনি ক্রয় করিয়াছেন, উপহার হিসাবে তিনি বহু গ্রন্থ পাইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নূতন বই প্রকাশিত হইলে তাহা ক্রয় করা তাঁহার সারাজীবনের অভ্যাস; সেজন্য তাঁহাকে গ্রন্থের ঋণ শোধ করিতে অনেক সময় বেগ পাইতে হয়। বর্ত্তমানে তাঁহার গৃহে সংগৃহীত গ্রন্থরাজির মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা হইবে। পুস্তকের মত সকল কাগজ সংগ্রহ করিয়া রাখা তাঁহার সারা জীবনের অন্যতম অভ্যাস। প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে প্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া লইয়া তিনি নিজ খাতায় তাহা আঁটিয়া রাখেন। এইরূপ বহুসংখ্যক খাতায় তাঁহার কয়েকটী আলমারী পূর্ণ হইয়াছে। কর্ত্তিত অংশগুলির তিনি সূচী তৈয়ার করেন এবং সেই সূচীর আবার সূচী প্রস্তুত হয়। ফলে গত ৬০ বৎসরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিষয়সমূহ তাহার নখদর্পণে আছে। যে সকল বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ পাঠ করেন সে সকল গ্রন্থের প্রয়োজনীয় বাক্য বা অংশ তিনি নিজখাতায় লিখিয়া লন। সেই ভাবেরও বহু খাতা তাঁহার সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। তাঁহার গ্রন্থাগার হইতে কেহ যদি কোন গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য গ্রহণ করে তবে তাহার আর রক্ষা নাই। গ্রন্থ ফেরৎ দিবার সময় গ্রহীতা তাহা ভাল করিয়া পড়িয়াছে কিনা হেমেন্দ্রবাবু তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। প্রথম পরিচয়ের পর লেখকও ঐরূপ একখানি গ্রন্থ আনিয়া তাহা যথাসময়ে ফেরৎ দিতে যান। কিন্তু ফেরৎ দিবার সময় হেমেন্দ্রবাবু ঐ পুস্তকে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন যাহা শুনিয়া লেখক নিজেও সাবধান হন এবং যেসকল বন্ধুবান্ধব হেমেন্দ্রবাবুর পাঠাগার হইতে পাঠের জন্য পুস্তক লইতেন তাঁহাদেরও সাবধান করিয়া দেন। হেমেন্দ্রবাবুর স্মৃতিশক্তি এতই প্রখর যে কোনগ্রন্থের কোনস্থানে কোন্ প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিত আছে অনেক সময়ে সহজেই তাহা বলিয়া দিতে পারেন। তাঁহার বিরাট গ্রন্থাগারের কোন্ আলমারীতে কোন স্থানে কি পুস্তক আছে তাহা তাঁহার এত অধিক জানা যে, যে কোন সময়েই কোন পুস্তক খুঁজিতে তাহার বিলম্ব হয় না। কাহারও কোন রচনার মধ্যে কোন ভুল বা ত্রুটি দেখিলে তিনি সকল সময়েই তাহা লেখককে দেখাইয়া দিয়া থাকেন। শুধু সাহিত্য বিষয়ে নহে, খ্যাতনামা রাজনীতিক বা অর্থনীতিকদের পুস্তকের ভুল দেখাইয়া তিনি বহুসময়ে বহুলোকের রোষের কারণ হইয়াছেন। তাঁহার গুণ-রাশির তুলনায় তাঁহার জীবন উপযুক্তরূপ সাফল্য মণ্ডিত হয় নাই। সাংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণই তাহার অন্যতম কারণ। সাংবাদিকতা মানুষকে বহুবিধ বিষয়ের সহিত পরিচিত করে বটে, কিন্তু কোন বিষয়েই জ্ঞানের গভীরতা দানে সমর্থ হয়না। সেইজন্যই কবি হেমেন্দ্র-প্রসাদ, কথা-সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ বা সাহিত্য-সমালোচক হেমেন্দ্র-প্রসাদ কালের বিচারে তেমন মর্য্যাদা বা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মীরূপে, কংগ্রেস-আন্দোলনের সহিত সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরকাল ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে উহার অন্যতম নেতারূপে এবং কার্য্য উপলক্ষে কয়েক বৎসর সিমলা ও দিল্লীতে বাসের সময় ভারতের সকল রাজনীতিক কর্মীর সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি ভারতের প্রায় সকল প্রবীণ ও নবীন দেশ-সেবক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ-সেবীর নিকট সুপরিচিত। বাংলাদেশে তাঁহার মত সর্ব্বজনপরিচিত ও সর্ব্বজনমান্য দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ আছেন কি না সন্দেহ। অনেকে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে, সে বিষয়ের গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু হেমেন্দ্রবাবু বাংলাদেশের সকল স্তরের সকল মানুষের সহিত যেভাবে মিশিয়াছেন, সেরূপ মেলামেশা সাধারণত অপর কাহাকেও করিতে দেখা যায় নাই।

কি কৃষক, কি শ্রমিক, কি মৎস্যজীবী, কি ছোট ব্যবসায়ী, কি শিক্ষক, কি অধ্যাপক—যখনই যে সম্প্রদায়ের লোক বিপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছে, তিনি তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য সর্ব্ববিধ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। শুধু সংবাদপত্রে সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই—নিজেই সর্বত্র যাইয়া উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট অভাব অভিযোগ বা দাবী উপস্থিত করিয়া সকলকে তাহার প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে তিনি পরামর্শ বা উপদেশ দান করিয়া থাকেন। সেজন্য তিনি যে কোন লোকের কাছে যাইতে কখনও পরাঙ্মুখ হন না। তাঁহার নানা গুণের জন্য দেশের লোকও তাঁহাকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা সম্মান দান করিয়া থাকেন।

তিনি শুধু লেখক নহেন, তাঁহার বক্তৃতা দানের শক্তিও অসাধারণ। তিনি ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। গত ৬০ বৎসর কাল তাঁহাকে প্রত্যহ ত বটেই, বহুদিন একদিনে একাধিক সভায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। তাঁহার বাচন-ভঙ্গী ও পাণ্ডিত্য সর্ব্বদা সকল শ্রোতাকে আনন্দদান করিয়া থাকে। বাংলাদেশে সুললিত ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করায় লোকের সংখ্যা আজ কমিয়া গিয়াছে। আমাদের মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সুরসিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দরদী শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির অসাধারণ ভাষণ শোনার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। তাহার পর হেমেন্দ্রবাবু ছাড়া অপর প্রায় কাহাকেও আর সেভাবে বক্তৃতা করিতে শোনা যায় না। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি শক্তিও তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর বক্তাতে পরিণত করিতে সাহায্য করিয়া থাকে—কারণ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে ইংরাজি ও সংস্কৃত, বাংলা গদ্য ও পদ্যের বহু উদ্ধৃতি শ্রোতাকে সর্ব্বদা অভিভূত করিয়া রাখে। তাই আজও সকলে নিজ নিজ সভায় তাঁহাকে বক্তারূপে পাইবার জন্য এত অধিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং প্রতিদিনের দৈনিক সংবাদপত্র খুলিলেই কোন না কোন স্থানে হেমেন্দ্রবাবুর নাম সভাপতি, প্রধান অতিথি বা বক্তারূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার মত এত দ্রুত ও এত অধিক পরিমাণ রচনা করিবার শক্তি অতি অল্পলোকের দেখা যায়—এ বিষয়ে তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বহুবর্ষ ধরিয়া তিনি বহু কাজের মধ্যে একটি করিয়া ইংরাজি প্রবন্ধ রচনা করিতেন। সারা জীবনে কত আবেদন-নিবেদনের খসড়া যে তিনি লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। স্বনামে ও বেনামে কত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি ইংরাজি ও বাংলা ভাষার বহু সাময়িক পত্রে তাঁহার রচিত লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার হিসাব করা বা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করাও সহজসাধ্য ত নহেই, একরূপ অসাধ্য বলা যায়।

তিনি শুধু গুরু-গম্ভীর কবিতা রচনা করিয়া বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার লিখিত ছড়া বহু বৎসর, কলিকাতা জেলে-পাড়ার সং-এ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সে কাজ এক সময় প্রায় তাঁহার এক চেটিয়া হইয়া গিয়াছিল। বহু বৎসর তিনি বসুমতীতে বর্ষ শেষে "সালতামামী" অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়া প্রকাশ করিতেন। তাহা বর্ত্তমান দৈনিক বসুমতীর ২।৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী হইত। আমরা দেখিয়াছি ঐ বিরাট কাব্য রচনা করিতে তাঁহার মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় লাগিত।

পশুপক্ষী পালন ও ফলফুলের বাগান করা তাঁহার সারা জীবনের অভ্যাস। আজও তাঁহার বাড়ীর ছাদে টবে ফুলের বাগান দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক সময়ে তিনি পশুপক্ষী পালনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে কার্য্যে তাঁহার সাফল্যলাভ সম্ভব হয় নাই। এখনও প্রতি বৎসর তিনি বাংলা দেশের বহু বাগান হইতে চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতির গাছ আনাইয়া বাড়ীর ছাদ বা বারান্দায় বাগান বসাইয়া থাকেন।

সাংবাদিকের প্রধান গুণ—অপ্রিয় হইলেও সত্যভাষণ। হেমেন্দ্রবাবুর আজীবন সে গুণ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। বন্ধুই হউন আর শত্রুই হউন—কাহারও কোন দোষ দেখিলে তিনি তাহা বলিতে বা লিখিতে কখনই সঙ্কোচ বা দ্বিধাবোধ করেন না। সেজন্য হয় ত তাঁহাকে বহু আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে। তিনি নিজেই বলিয়া থাকেন "লোকের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিয়া আমি সারা জীবনে এত অধিক লোকের নিকট অপ্রিয় হইয়াছি, যে আমার শেষ দিনে সৎকার সমিতির গাড়ী ডাকিয়া আমাকে শ্মশানে লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, আমার 'শব' বহন করিবার জন্য একজন লোকও পাওয়া যাইবে না।" আমরা কিন্তু মনে করি যে তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অপ্রিয় সত্য কথা বলেন বলিয়াই বহুলোক তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দান করিয়া থাকেন।

তাঁহার সাংবাদিক জীবনের অধিকাংশ সময় পরাধীন ভারতে অতিবাহিত হইয়াছে। যে যুগে বৃটীশ শাসনের নিন্দা করিলে রাজরোষে পতিত হইয়া কারাগারে বাস করিতে হইত ও ইংরাজের প্রশংসা করিলে দেশবাসী রুষ্ট হইয়া মধুর সম্পর্কে অভিহিত করিত, সে যুগে হেমেন্দ্রবাবু আইন বাঁচাইয়া যেভাবে দিনের পর দিন একদিকে বৃটীশ শাসনের কঠোর সমালোচনা ও অপরপক্ষে দেশবাসীর ত্রুটির নিন্দা করিয়াছেন, তাহা মনে করিলে আর তাঁহার অপ্রিয় সত্য ভাষণের জন্য তাঁহাকে দোষী মনে করা যায় না। মুক্তি আন্দোলনের বিরোধী, জাতীয়তা প্রচারের পরিপন্থী,

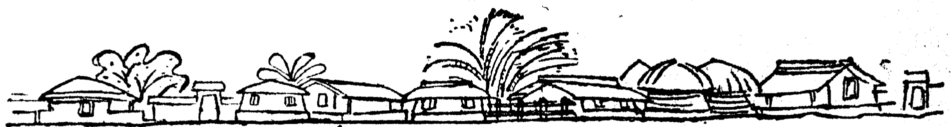
ইংরাজের স্তাবকদিগকে তিনি যে ভাষায় নিন্দা করিতেন, তাহা শুধু তাঁহার মত সংযমী, ধীর, আইনজ্ঞ লেখকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করিয়াও ইংরাজ সরকার বা সরকারী স্নেহপুষ্ট দেশবাসীরা কেহই তাঁহাকে বিপন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। বরং বহু ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী তাঁহার সাহসিকতা, দেশপ্রেম ও লিখন-চাতুর্য্যের জন্য শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার সঙ্গে ব্যবহার করিত।

মানুষ কাজ করিলেই এক দিকে যেমন তাহার কর্ম্মশক্তি-অক্ষুণ্ণ থাকে, আর একদিকে তেমনই বয়োবৃদ্ধি সত্ত্বেও শক্তি না কমিয়া বরং তাহা দিন দিন বাড়িয়া যায়। আমরা হেমেন্দ্রবাবুর জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি সারাজীবন নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত কাজ করিয়া থাকেন। আচারে, ব্যবহারে, আহারে, বিহারে, কোন কাজেই তিনি অমিতাচারী নহেন। সেজন্য অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া তিনি সারা জীবন ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া যাইতেছেন। জীবনে কখনও তিনি তাস, পাশা, দাবা খেলেন নাই—গত ৪০ বৎসরে কোন সময়ে তাঁহাকে কর্ম্মহীন হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। সর্ব্বদা লেখা ও পড়ার কাজ তাঁহাকে কর্ম্মব্যস্ত রাখিয়াছে। সেজন্য সাংবাদিকের বহুবিধ কর্ত্তব্য করিয়াও তিনি বহু উপন্যাস, গল্প ও কবিতা লিখিবার সময় পাইয়াছেন। তাঁহার অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হইলেও এখন পর্য্যন্ত কত লেখা যে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহার উপন্যাসগুলি "বসুমতী" সাহিত্য মন্দির হইতে কয়েক খণ্ড গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা ছাড়াও তাঁহার লিখিত বহু উপন্যাস ও গল্প পুস্তকাকারে বা অপ্রকাশিতভাবে আছে। কোন উৎসাহী প্রকাশকের দ্বারা সেগুলি প্রকাশের ভার গ্রহণ ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে স্থায়ী সাহিত্যের স্থান গ্রহণ করিবে।

বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে হেমেন্দ্রবাবু দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া নানাভাবে দেশের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। বর্ত্তমানে স্বার্থ-সিদ্ধির মোহে আমরা পদাধিকারী ব্যক্তিদেরই শুধু পূজা করিয়া থাকি—গুণের সম্যক আদরের কথা সর্ব্বদা ভুলিয়া যাই। যাহারা সর্ব্বদা নিজ নিজ কাজ করাইবার জন্য হেমেন্দ্রবাবুর নিকট যাতায়াত করিয়া থাকেন, তাহাদের সংঘবদ্ধ হইয়া এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান মহাপ্রাণ দেশ-নেতার প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার বিভিন্ন লেখার একখানি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করিলে বা তাঁহার জীবন কথা তাঁহার বিভিন্ন গুণ-মুগ্ধ ব্যক্তিদের দ্বারা লিখাইয়া তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিলেই তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে।

আনন্দের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়া হেমেন্দ্রবাবুকে অ[illegible] অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত করিয়া শুধু তাঁহাকে সম্মানিত করেন নাই, নি[illegible] গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য গি[illegible] অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইলেও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত স্বীকৃতি দান করেন নাই। নবগঠিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে কয়েকটি বক্তৃতা দানের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক, আজীবন পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হেমেন্দ্রবাবুকে স্বাধীন ভারত কর্ত্তৃপক্ষের যে স্বীকৃতি দান করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা ও করা হয় নাই। তাঁহার স্বাধীন-চিত্ততা ও সকল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনই হয় ত ইহার অন্যতম মূল কারণ। কারণ দেশ স্বাধীন হইলে ও শাসকগোষ্ঠী রাজনীতিক্ষেত্রে কাহারও স্বাধীন মত প্রকাশ সহ্য করিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। সেজন্য আজ ও বহু রাজনীতিক নেতা ও কর্ম্মী বর্ত্তমান শাসক-গোষ্ঠী কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হইয়া বরং অবহেলিত হইয়া আছেন। যে সকল রাজ-নীতিক বা সাহিত্যিক ভিক্ষা পাত্র লইয়া সরকারের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাদেরই অনুকম্পা-সূচক বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে—সরকারী বৃত্তি যে সম্মান দান করে, সে কথা দাতা বা গ্রহীতা—কাহারও উপলব্ধি করার সামর্থ্য আজও হয় নাই। সেজন্য হেমেন্দ্রবাবুর মত বহু গুণী রাজনীতিক বা সাহিত্যিক সে সম্মান লাভ করেন নাই। বাংলা-দেশে, শুধু হেমেন্দ্রবাবু কেন, বহু কর্ম্মী সারাজীবন ধরিয়া নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছেন, যাঁহাদের স্বীকৃতি বহু-দিন পূর্ব্বে হওয়া উচিত ছিল। কাহারও নাম করিয়া আমি অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাহি না, হেমেন্দ্রবাবুর মত বহু অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়েরও অজ্ঞাত নহে।

হেমেন্দ্রবাবুর সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা ও জীবনে তাঁহার দ্বারা কত উপকৃত হইয়াছি, তাহার বর্ণনা এই নিবন্ধে যথা-সম্ভব বর্জন করিয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে পিতৃস্নেহ লাভ করিয়া আমার বাল্যে পিতৃহীন জীবন ধন্য হইয়াছে এবং শিক্ষাগুরুর মত তিনি যে শিক্ষা দীর্ঘকাল ধরিয়া দান করিয়াছেন, তাহা জীবনের অমূল্যসম্পদ বলিয়া মনে করি। দীর্ঘ ১০ বৎসরকাল দৈনিক বসুমতীর সেবার সময় দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভ করিয়া তদনুসারে জীবনকে চালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং তাঁহার অনুগ্রহ এই দীন লেখককে সুপথে লইয়া গিয়াছে। সেজন্য সারাজীবন তাঁহাকে 'গুরুদেব' বলিয়া স্বীকার করি। তাঁহার ৮৩তম জন্মদিন উপলক্ষে আজ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া নিজকে সেজন্য কৃতার্থ মনে করিতেছি।



বীরবল-স্মৃতি

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ

আমার পিতৃদেব প্রাদেশিক বিচার বিভাগে কায করিতেন। আমি ছিলাম আমার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। আমার বাল্যকালে বিদেশে পিতৃদেব কাছারীতে এবং আমি স্কুলে চলিয়া গেলে আমার মাতৃদেবীকে নানা শিল্পকার্য্যে ও পুস্তকাদি পাঠে সময় অতিবাহিত করিতে হইত। "সাহিত্য" "ভারতী", "সাধনা" প্রভৃতি তাঁহার নিকট নিয়মিতভাবে আসিত, সন্ধ্যার পর অনেক সময় মাতৃদেবী তাহা পড়িয়া পিতৃদেবকে শুনাইতেন। আমার কোন ক্রীড়া-সঙ্গী না থাকায় অধিকাংশ সময় আমি মাতৃদেবীর নিকটই থাকিতাম এবং বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার পাঠ শুনিতাম। ক্রমে ক্রমে এই সকল পত্রিকা উল্টাইয়া সহজ সহজ বিষয় পড়িবার চেষ্টা করিতাম। সেকালে বাঙ্গালা লেখা অধিক ছিল না এবং প্রতি মাসে তাঁহাদের নাম দেখিয়া দেখিয়া নামগুলি আমার সুপরিচিত হইয়াছিল।

মনে হয় 'সাহিত্যে' একটী গল্প মূল ফরাসী হইতে অনুবাদিত করেন প্রমথ চৌধুরী। তখন (বাল্যকালে) আমার ধারণাই ছিল না যে বাঙ্গালী ফরাসী ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে। 'ভারতী'তে যখন সরলা দেবী 'খেয়াল খাতা' প্রবর্ত্তন করেন এবং প্রমথ চৌধুরীর নাম-সংযোগ দেখি, তখনই বোধ হয় তাঁহার রচনা আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

প্রমথ চৌধুরী বয়সে আমা অপেক্ষা ১৬।১৭ বৎসরের বড়, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থাদি প্রকাশ করেন পরিণত বয়সে।

আমি যখন আমার পিতামহ 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলীর প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ইংরাজী জীবনী ও রচনাবলী প্রকাশ করি (১৯১১-১২ খৃঃ) তখন সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশ সমাজপতি ও 'আর্য্যাবর্ত্ত'-সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়গণের সহিত পরিচিত হই এবং প্রায়ই তাঁহাদের নিকট যাইতাম। তাঁহারা আমাকে বাঙ্গালা লিখিতে উৎসাহিত করেন। 'সাহিত্যে' সমাজপতি মহাশয় সমালোচনায় যে বিদ্রূপের কশাঘাতে বড় বড় সাহিত্যিকগণকে জর্জ্জরিত করিতেন, বাল্যকাল হইতে তাহা নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়া আমি যে কখনও সাহিত্য সেবায় প্রবৃত্ত হইব এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা আমার মনে কখনও উদিত হয় নাই। সুরেশচন্দ্র ও হেমেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতে উৎসাহ পাই। আমি 'মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ' নামক একটী ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করি। সমাজপতি মহাশয় উহার আদ্যোপান্ত প্রুফ দেখিয়া দিয়াছিলেন এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ উহার একটী বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দেন। এই সময় প্রায়ই উভয়ের নিকট যাইতাম এবং প্রমথ চৌধুরী সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতাম। তাঁহার 'সনেট' ও সদ্যো-প্রকাশিত 'সবুজপত্র' রক্ষণশীল সাহিত্যিকগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হয় নাই। সুরেশচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন 'চলিত ভাষার সহিত আমাদে[illegible] নাই, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—এত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহার রচনায় সহজ চলিত বাঙ্গালাই ব্যবহার করেন। আমাদের আপত্তি সাধু ভাষার সহিত চলিত-ভাষার অবাধ সংমিশ্রণে, গুরুচণ্ডালী দোষের বিরুদ্ধে।" সমাজপতি ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ উভয়েই সাধুভাষায় পক্ষপাতীছিলেন এবং প্রথম প্রথম সবুজ-পত্রের ভাষা ও চৌধুরী মহাশয়ের mannerism (সাহিত্যিক মুদ্রা-দোষ) কানে লাগিত। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার লেখা যত পড়িতে লাগিলাম ততই তাহার প্রকাশভঙ্গী, মৌলিক চিন্তা ও রস আমাকে এরূপ মুগ্ধ করিত যে কোন পত্রিকায় প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের রচনা প্রকাশিত হইলে তাহা সর্ব্বাগ্রে পড়িতাম; আশা ছিল যে তাহাতে নিশ্চয়ই কোন নূতন চিন্তার খোরাক পাইব এবং এ আশা কখনও নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার রচনায় Wit Humour একটী বিশেষত্ব ছিল, যাহা অতি অল্প বাঙ্গালা লেখকের রচনাতে পরিদৃষ্ট হয়।

আমার কালীপ্রসন্ন সিংহ বিষয়ক প্রস্তাবটীর কথা শুনিয়া প্রমথনাথ কোনও বন্ধুর নিকটে উহা পাঠ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া আমি তাঁহাকে একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিই। তিনি উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লিখিয়াছিলেন :—

সবিনয় নিবেদন,

আজ ক'দিন হ'ল আপনার প্রেরিত ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের জীবনচরিত পেয়েছি। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ইতিপূর্ব্বে তার প্রাপ্তি সংবাদ আপনাকে জানাতে পারি নি।

আমার প্রবন্ধাদির সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে সিংহ মহাশয়ের কীর্ত্তি আমি কতটা অপূর্ব্ব মনে করি। আমার মতে তাঁর মহাভারতের ভাষা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের আদর্শ।* অপরপক্ষে বাঙ্গালীর মুখের কথার ভিতর যে কতটা ধার আছে তার পরিচয় আমরা হুতোম প্যাঁচার নক্সায় পাই। বাঙ্গলা গদ্যের এই দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন নমুনায়—আমাদের সাহিত্যে আর কোনও জুড়ি নাই।

সুতরাং বলা বাহুল্য যে সিংহ মহাশয়ের জীবন-বৃত্তান্ত জানবার জন্য আমার সবিশেষ কৌতূহল ছিল। আপনার লিখিত জীবনচরিত পাঠ করে—এ বিষয়ে 'সবুজপত্রে' কিছু লেখবার আমার ইচ্ছা আছে। আমি অবসর মত আপনার পুস্তক অবলম্বন করে একটা প্রবন্ধ লিখব এবং তৎপূর্ব্বে আপনার বই পড়ে আমার যা মনে হয় তা আপনাকে জানাব।

---

* এতদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদে তিনি সাধু ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন

আপনার উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করেছি—এবং তার জন্য আমার শত শত ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বশম্বদ

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় বোধ হয় প্রমথনাথ কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে কিছু লিখবার অবসর পান নাই। তাঁহার 'চার-ইয়ারী কথা' প্রকাশের পর তাহার একখণ্ড আমাকে উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন—

সবিনয় নিবেদন,

অবসরের অভাববশতঃ কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনচরিত অবলম্বন করে অদ্যাবধি কোনও প্রবন্ধ লিখে উঠ্‌তে পারি নি এই ছুটীতে লেখবার ইচ্ছে আছে। আমি পাঁচরকম কাজ হাতে নিয়েছি বলে সব সময়ে ইচ্ছানুরূপ লেখা লিখ্‌তে পারিনি।

"চার ইয়ারী কথা" আমার হাতের গোড়ায় আজ নেই। দু'একদিনের মধ্যে ছাপাখানা থেকে আনিয়ে তখনই আপনাকে পাঠিয়ে দেব। পড়ে কি রকম লাগল জানালে খুশি হব। ইতি—

বশম্বদ

শ্রীপ্রথমনাথ চৌধুরী

ইহার কয়দিন পরে (১৪ই অক্টোবর ১৯১৬) তিনি আমাকে তাঁহার নবপ্রকাশিত 'চার ইয়ারী কথা' একখণ্ড পাঠাইয়া দেন। বাঙ্গালা কথা-সাহিত্যে উহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে—এবং উহার গল্পের কিয়দংশ যে তাঁহার আত্ম-জীবনীমূলক ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে আমি নাটোরাধিপতি মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় ও 'বাঙ্গালায় মোপাঁসা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র নিয়মিত লেখক হইয়াছিলাম। মহারাজা অতিমাত্রায় সংস্কৃতানুসারিণী ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন, চলিত ভাষার লিখিত কোন প্রবন্ধাদি উক্ত পত্রিকায় সচরাচর প্রকাশিত হইত না। উহাতে প্রকাশিত আমার রচনা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার সময় প্রমথনাথের অগ্রজ স্যর আশুতোষ চৌধুরী উহার একটি সুলিখিত ভূমিকা লিখিয়া দেন। তিনি সাধু ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। নাটোর রাজ পরিবারের সঙ্গে, চৌধুরী পরিবারের বহুকাল হইতে আত্মীয়তা ছিল এবং প্রমথনাথ বাঙ্গালার সমস্ত উল্লেখযোগ্য পত্রিকা পড়িতেন। তাঁহার সহিত পরে কয়েকবার সাক্ষাৎকারের সুযোগলাভ করিয়াছিলাম এবং তিনি আমার রচনাদি মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছেন দেখিয়া আমি গর্ব্ব অনুভব করিতাম। 'মানসী ও মর্ম্মবাণীতে' আমি অনেকগুলি জীবনচরিত লিখিয়াছিলাম, তন্মধ্যে তাঁহার অগ্রজ স্যর আশুতোষের জীবনচরিত অন্যতম।

তাঁহার ব্রাইট ষ্ট্রীট ও মে-ফেয়ারের বাড়ীতে তাঁহার সহিত অল্পসল্প সাহিত্যালোচনার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাঁহার পুস্তক-সংগ্রহ ছিল বিরাট, তাঁহার পাণ্ডিত্যও ছিল অগাধ। একবার তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—খুব প্রাচীন চিঠিপত্র সংগ্রহ করিতে পারা যায় কিনা।

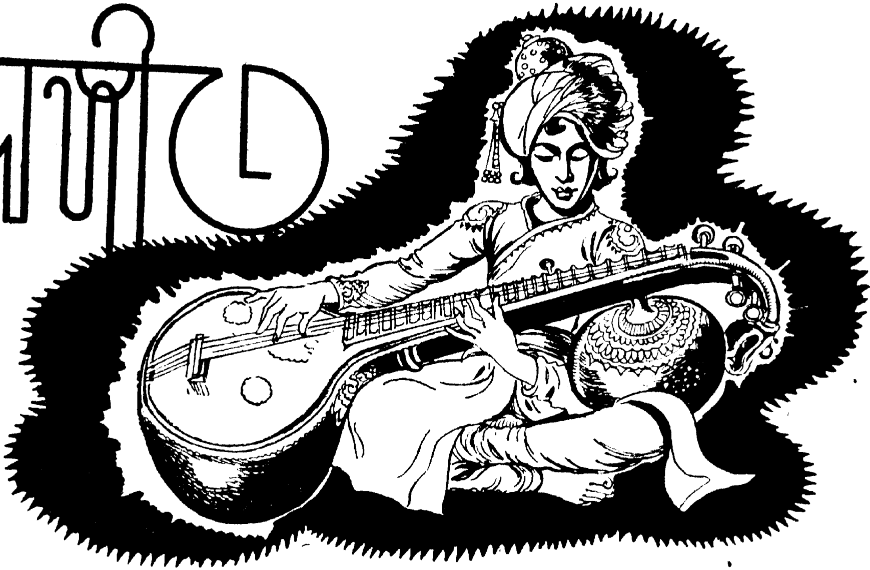
যখন আমি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন চরিত রচনা করি, তখন উপাদানসংগ্রহমানসে একবার স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন 'বিবির (মিসেস চৌধুরী) কাছে গেলে অনেক সংবাদ পাইতে পারিবে' এবং আমার সঙ্গে লোক দিয়া সেখানে পাঠাইয়া দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মিসেস চৌধুরী ছিলেন না, প্রমথনাথ ছিলেন। পরে, সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে 'অশ্রুমতী' লইয়া যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহা আমাকে প্রেরণ করেন। উহা আমার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তিনি আমাদের সাহিত্যসভা 'রবিবাসরে' কয়েকবার আসিয়াছিলেন। একবার কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা মহাশয়ের ভবনে রবিবাসর আহূত হয়, উহাতে 'আনন্দবাজার' সম্পাদক বন্ধুবর প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের 'সমালোচনা' সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পড়িবার কথা ছিল, এবং আমি ঐ অধিবেশনে সভাপতির আসনে ব্রতী হইয়াছিলাম। প্রমথনাথ ঐ সভায় উপস্থিত থাকায় আমি তাঁহাকে প্রথমে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সমালোচক হিসাবে সভার উদ্বোধন করিতে বলি। তিনি প্রথমেই বলিলেন যে তিনি সমালোচক নহেন—সমালোচনা করা তাঁহার কাজ নহে, কিন্তু পরে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল সমালোচনা সম্বন্ধে এরূপ অনর্গল (Extempore) বহুতথ্যসমন্বিত মনোজ্ঞ বক্তৃতা করিলেন যে মনে হইল কোন রিপোর্টার দ্বারা উহা অনুলিখিত না হওয়ায় আমাদের সাহিত্য একটী অমূল্য রত্ন হইতে বঞ্চিত হইল।

সাহিত্য-সেবক সমিতির রজত জয়ন্তীতে আলবার্ট হলে স্বর্গীয়া সরলা দেবীর সভানেত্রীত্বে কিছু বলিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম কোন কোন দুঃস্থ কবি ও কথা-সাহিত্যিকের গ্রন্থাদি বিক্রীত হয় না, কিন্তু পরে উহার স্বত্ব যৎসামান্য মূল্যে ক্রয় করিয়া প্রকাশকগণ বিজ্ঞাপন ও প্রচার দ্বারা সংস্করণের পর সংস্করণ বিক্রয় করিয়া যথেষ্টলাভ করেন। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে লেখকগণের একটী সঙ্ঘ স্থাপিত করা সম্ভব কিনা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত এবং যাহাতে প্রকাশকগণ চাপ দিয়া এই সকল দুঃস্থ সাহিত্যিকদিগকে নামমাত্রমূল্যে গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয়ে না বাধ্য করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়াছিলেন।

প্রমথনাথ গুণগ্রাহী ছিলেন। আমার এক জ্ঞাতি খুল্লতাত কান্তিচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'ওমর খৈয়াম' এর অনুবাদ পাইয়া তিনি কিরূপ আগ্রহের সহিত উহা প্রকাশিত করেন তাহা শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'চলমান জীবনে' উল্লিখিত আছে। তিনি উহার একটি সুলিখিত ভূমিকাও লিখিয়া দিয়াছিলেন।

প্রমথনাথ বাঙ্গালা রচনা রীতির একটী নূতন আদর্শ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাকে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কারণ 'সবুজ পত্র' প্রচার দ্বারা এবং তাঁহার গ্রন্থাদি প্রকাশ দ্বারা তিনি জীবিতকালে লাভবান হন নাই। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রবন্ধাদি পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, ইহা আনন্দের বিষয়। প্রমথনাথের সর্ব্ব প্রধান কৃতিত্ব, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করা এবং তাঁহাকে চলিত ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত করা।



আগুন

আগুন, আগুন, আগুন লেগেছে আকাশের নীল বুকে,
এ-কোন্ রুদ্র নাচে তাতাথৈ আত্ম পাসরি' সুখে ?
লেলিহান জটা খুলে পড়ে তার প্রতি পদ বিক্ষেপে,
পদতলে লোটে শত গ্রহ-তারা, দৃষ্টি ওঠে যে কেঁপে !
আগুন, আগুন, আগুন লেগেছে পৃথিবীর সারা গায় ;
প্রলয়-শিখরে তালে তালে তার উচ্ছ্বাস শোনা যায় ।
জলধরসম কালো সাগরের উর্মিশৃঙ্গ দলি'
আজ ক্ষণে ক্ষণে ভূধরে সঘনে উঠিছে বিজলী জ্বলি !

আগুন, আগুন, আগুন লেগেছে পাতালের গহ্বরে,
সূর্যদীপ্ত স্বর্ণপ্রসূন ফুটেছে সৃষ্টি 'পরে ।
অতীতের ঝরা-প্রাণের শুষ্ক কঙ্কাল রাশি রাশি
পাবক-পরশে তীব্র হরষে ওঠে যে সমুদ্ভাসি' !

আগুন, আগুন, আগুন লেগেছে মানবের সত্তায় :
বহ্নি-রবাবে কোন্ সুরকার নূতনের গান গায় ?

কথা ঃ—পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বর ও স্বরলিপি ঃ—তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

II	সা	গা	-া	|	গা	পা	-া	I	পা	না	-া	|	র্সা	র্গা	র্রা	I
	আ	গু	ন্		আ	গু	ন্		আ	গু	ন্		লে	গে	ছে	
I	র্সা	না	ধা	|	পা	গা	পা	I	পা	র্সা	-া	|	-া	-া	-া	I
	আ	কা	শে		র্	নী	ল্		বু	কে	০		০	০	০	
I	র্গা	র্গা	-া	|	র্রা	-া	র্সা	I	না	না	পা	|	র্সা	না	-া	I
	এ	কো	ন্		রু	০	দ্র		না	চে	তা		তা	থৈ	০	

I পা -া ধা | পা পা মা I পা গা - | -া -া -া I
আ ০ ত্ম পা স রি সু খে ০ ০ ০ ০

I র্গা র্মা পা | -া র্মা র্গা I র্গা র্স র্রা | র্গা র্মা -র্পা I
লে লি হা ন্ জ টা খু লে প ড়ে তা র

I র্সা র্সা র্রা | র্রা র্গা -া I র্সা র্গা -া | -া -া -া I
প্র তি প দ বি ০ ক্ষে পে ০ ০ ০ ০

I র্গা র্গা র্রা | র্রা র্সা র্সা I না না পা | র্সা না না I
প দ ত লে লো টে শ ত গ্র হ তা রা

I পা -া ধা | পা পা মা I পা গা -া | -া -া -া II
দৃ ষ টি ও ঠে যে কেঁ পে ০ ০ ০ ০

II সা মা -া | গা পা -া I মা ধা -া | না র্সা র্সা I
আ গু ন্ আ গু ন্ আ গু ন্ লে গে ছে

I র্সা ধা না | -র্সা র্রা না I র্সা -া -া | -া -া -া I
পৃ থি বী য় সা রা গা ০ ০ ০ ০ য়্

I র্গা র্মা র্পা | র্মা র্গা -া I র্মা র্মা রা | র্রা র্সা -া I
প্র ল য় শি খা য়্ তা লে তা লে তা য়

I র্গা -া র্রা | র্সা ধা না I র্সা -া -া | -া -া -া I
উ ০ চ্ছা স্ শো না যা ০ ০ ০ ০ য়্

I না র্সা র্রা | র্সা না ধা I পা ধা মা | গা পা -া I
জ ল ধ র স ম কা লো সা গ রে য়্

I র্সা -া রা | গা -া মা I পা গা -া | -া -া -া I
উ র্ মি শৃ ঙ্ গ দ লি ০ ০ ০ ০

I সা -গা গা | গা গা গা I গা মা পা | মা গা গা I
আ জ্ ক ণে ক্ষ ণে ভূ ধ রে স ঘ নে

I গা পা পা | ধা না পা I ধা র্সা -া | -া -া -া I
উ ঠি ছে বি জ লী জ্ব লি ০ ০ ০ ০

II র্সা র্গা -া | র্রা র্রা -া I র্সা র্সা -া | না র্রা র্সা I
আ গু ন্ আ গু ন্ আ গু ন্ লে গে ছে

I না না ধা | পা গা পা I পা ধা -া | -া -া -া I
পা তা লে র গ ০ হ্ব রে ০ ০ ০ ০

I ধা -া ধা | ধা -া ধা I পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া I
সূ র্ য দী প্ ত স্ব র্ ণ প্র সূ ন্

I পা ধা পা | গা -রা গা I রা সা -া | -া -া -া I
ফু টে ছে সৃ ষ্ টি প রে ০ ০ ০ ০

I সা রা গা | -া গা গা I গা গা গা | গা -া গা় I
অ তী তে র্ ঝ রা প্রা ণে র শু ষ্ ক

I গা মা পা | গা গা গা I সা মা -া | -া -া -া I
ক ঙ্ কা ল রা শি রা শি ০ ০ ০ ০

I মা মা মা | গা পা পা I পা -া পা | র্মা ধা ধা I
পা ব ক প র শে তী ০ ব্র হ র্ ষে

I পা না না | র্সা র্রা -ধা I না র্সা -া | -া -া -া I
উ ঠে যে স মু দ্ ভা সি ০ ০ ০ ০

I র্সা র্গা -া | র্গা র্পা -া I র্গা র্পা -া | র্গা র্গা র্গা I
আ গু ন্ আ গু ন্ আ গু ন্ লে গে ছে

I র্গা র্সা র্রা | র্গা র্মা র্পা I র্গা -া -া | -া -া -া I
মা বে র স ০ ত্তা ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I র্গা -া র্গা | র্রা র্রা র্সা I না -া পা | র্সা না -া I
ব ণ্ হি র বা বে কো ন্ সু র কা য়্

I পা ধা পা | পা গা -পা I ধা -া -া | -া -া -া I
নূ ত নে র গা ন্ গা ০ ০ ০ ০ য়্

I পা পা পা | পা গা -পা I র্সা -া -া | -া -া -া I
নূ ত নে র গা ন্ ০ ০ ০ ০ ০ য়্

I র্রা র্গা র্সা | র্সা র্রা -র্মা I র্গা -া -া | -া -া -া II
নূ ত নে র গা ন্ গা ০ ০ ০ ০ য়্

বিঃ দ্রঃ—এই গানটি ঈষৎ দ্রুত লয়ে গাহিতে হইবে।

কাব্যে প্রতীক

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাব্য কাকে বলে, তার সংজ্ঞা কী, তার বিচার বস্তু কী, তার উপজীব্য বিষয় কী, তার অলঙ্কার, তার বিভূষণ, তার অবলম্বন কিরকম হওয়া উচিত, ভাব ও ভাষার কতটা রসায়নে সার্থক কাব্যের সৃষ্টি হয় এসব প্রশ্ন হাজার হাজার বছর ধরেই চলে আসছে এবং আলঙ্কারিক, ভাষাবিৎ, দার্শনিক, কবিতে মিলে এই সব সমস্যা নিয়ে নানা আলোচনা ও তর্কও করেছেন ; কিন্তু প্রায় সকলেই এই কথাটা মেনে নিয়েছেন যে কাব্য শুধু জীবনের স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস বা জীবনস্রোতের প্রকাশই নয়। কবিতার মাধ্যমে কল্পনাশ্রয়ী মানব-মন শুধু বাইরের জগতকেই মনের লীলার সঙ্গে গ্রথিত করছে না, তাকে পদে পদে রূপায়িত করে, বৈচিত্র্যময় করে তাকে সঞ্জীবিত উদ্দীপিত করছে না—সে এক অসন্তুষ্টির সুরও বহন করে নিয়ে চলেছে—এ অতৃপ্তি শুধু ভোগের উপাদানের অভাবে নয়, অনেকের মধ্যেই এক উন্নততর বৃহত্তর জীবনের জন্য কান্না—যে জীবন জন্ম নিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, আমাদেয় মনে তারই প্রসব-বেদনা। আজকের 'সাগর থেকে ফেরা' কবি বলছেন—

এ জোনাকি মন জানি
কোনদিন পাবে না উত্তর
চারিদিকে অন্ধ রাত্রি তামসী দুস্তর
মৌন নিরন্তর

তবু কবি আঁধারের গূঢ় ধ্বনি শোনবার চেষ্টা করেন, সৃষ্টির ছপ্ ছপ্ বেয়ে চলার মধ্যে জোনাকির মত জিজ্ঞাসার স্ফুলিঙ্গকে দেখেন এবং জানা না জানার বাইরে অন্য উত্তরণের জন্য তিনি প্রয়াসী। তাই Lascelles Abercrombie বললেন "All language is Symbolic." ভাষাই হচ্ছে মনের প্রতীক্। একদা এই পৃথিবী যখন নবীন ও সতেজ ছিল তখন কথা বলাই ছিল কবি হওয়া, নামকরণ করার মধ্যেই ছিল অনুপ্রেরণা এবং মানুষের উদ্ভাবনী কল্পনা থেকে যে সহজ উপমা বেরুতো তাই হতো তার উদ্দীবন্ত ইন্দ্রিয়ের সহজ প্রকাশ। তাই শব্দ বা নাদ বা ধ্বনি পরম প্রকাশেরই চেষ্টা, কবির মনে যে মূর্ত্তি বা রস রূপ নিয়েছে তাকেই ব্যক্ত করবার প্রয়াস। তাই শ্রীঅরবিন্দের "Vision is the characteristic power of the poet, as is discriminative thought, the Essential gift of the philosopher and analytic observation, the naberal gift of the Scientist, অর্থাৎ কবি করছেন দর্শন, দার্শনিক করছেন বিচার, বিজ্ঞানী করছেন বিশ্লেষণ। এই দৃষ্টিভেদ বা মূল্যায়নের সংজ্ঞাকে অনেকেই হয়তো মেনে নেবেন না, কিন্তু সাধারণভাবে এই উক্তি অসঙ্গত নয়।

সাহিত্যের ইতিহাসে বহু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে যেখানে কবিদের দৃষ্টি একটা প্রতীককে (Symbol) কেন্দ্র করে কাব্যসৃষ্টি করে চলেছে। আমাদের পাঁচজনের কাছে যেটা অবাস্তব, কবির লিপিকায় ও তুলিকায় সেইটাই শুধু ভাস্বর হয়নি জীবন্ত হয়েছে। কালিদাসের মেঘদূত এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলঙ্কারিক ভামহ বললেন—কবির কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, অচেতন মেঘকে নিয়ে এ কী অযুক্তিমৎ ব্যবহার উন্মত্তের মত ভাবনা। কিন্তু সমালোচক দেখলেন না যে কবির চিন্তায় আর আবেগে সব কিছুই চৈতন্যময়, আবেগময়, সর্বং প্রাণং প্রজতি। তাই কবির কল্পনায় ধূম-জ্যোতি সলিলমরুতময় মেঘ হলো প্রতীক্। শেলীর স্কাইলার্ক, কীটসের নাইটেঙ্গল বা রবীন্দ্রনাথের হংসবলাকার মালিকা—এরা জড় নয় বটে কিন্তু এরাও প্রতীক্, আমাদের সুখ দুঃখের সাক্ষী, বিরহ মিলনের অংশী। তাইতো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ দিয়েই কবি বলেন—

এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর

তাই ঝড়ের মধ্য দিয়ে গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া সঞ্চারিয়া বজ্রের আলোতে যে চ্যুতপুষ্পদল বা ছিন্ন ভিন্ন শাখা কবি দেখেন তা হয় কখনো বা অনন্ত তমিস্র সেই বিস্মৃতির দেশের প্রতীক, না হয় সদ্যস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের জয়ধ্বনিময়।

প্রাচীন কাহিনীও অনেক সময়ে প্রতীক কাব্যের বাহন হয়ে থাকে, যেমন আর্থার কাহিনী অবলম্বনে বহু কাব্য লিখিত হয়েছে যার মধ্যে অন্য অর্থ আছে। শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী" প্রতীক কাব্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—A legend and a symbol. শ্রীঅরবিন্দ নিজেই ঋগ্বেদকে প্রতীকরূপেই দেখেছেন যে অগ্নি কবিক্রতু, ক্রান্ত প্রাজ্ঞ, যে অগ্নি বর্ধমান, যে অগ্নিকে বৈদিক কবি 'ইলে' 'ঈড় স্তুতৌ' পূজা করেছেন, স্তব করেছেন যে অগ্নি রমণীয় "রমণীয়ত্বাৎরত্নং—দধাতি 'ধাতুরত্রদানার্থ বাচীতি, তদিদং নিরুক্তকারস্য যাস্কস্য মন্ত্রব্যাখানম'—সেই অগ্নি শ্রীঅরবিন্দের কাছে উর্ধমুখী আস্পৃহা অভীপ্সারই দ্যোতক্। ফ্রান্সিস টমসনের "The Hound of Heaven" ও এই ধরণের কাব্য। ইয়েটস ও AEর বহু কবিতাই কাব্যের মাধ্যমে অন্য এক রহস্যলোকের বার্তা আনে অর্থাৎ প্রতীকের কাজ করে। ইয়েটসের মতে কাব্যের জগত হচ্ছে এক তন্দ্রাময় জগত। কাব্য হচ্ছে record of a state of trance ধ্বনিও ব্যঞ্জনা দিয়ে তাকে রূপ দেওয়া হয়। ভ্যালেরি, ব্যদলেয়র, মালার্মে, ভারলেন্‌ও সিম্বলিক কবি বলে বিখ্যাত। জর্জষ্টিফান ও আলেকজাণ্ডার ব্লকও এই দলের। আদর্শ সৌন্দর্য্য ও আদর্শ প্রেম নিয়েই এরা ব্যস্ত। ইয়েটসের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে between self and soul, কিন্তু এখানে কোন অপরা অনুভূতি নেই। কবির অতীন্দ্রিয়তা আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছয়নি। তবু এই সব সিম্বলিক কাব্যে একটা

অনুভূতি রয়ে যাচ্ছে যে স্থুলভূতের জগত সূক্ষ্মেরই দ্যোতক্। মহাকবি গ্যেটের ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—Two souls alas dwell in my breast, the one clings to the world, the other lifts itself to the realms of an Exalted ancestry. জীবন রসে জারিত চেতনায় ফাউষ্টকে ডাঃ শিশির মৈত্র বললেন—"Inverted Arjuna"—এই সব কবির কাব্যে অতীন্দ্রিয় কিছু না গেলেও আমরা পাচ্ছি একটা "increased awareness" তাঁরা পৃথিবীরই কবি, তার সুখ দুঃখ কাম-কামনার কবি, কিন্তু তবু অন্য একটু সুরও রয়েছে। আধুনিক ইংরাজী কাব্য হতে দু একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কবি Day Lewis তার Magnetic Mountain কবিতায় লিখলেন :

Somewhere beyond the rail road
Of reason, South or North
Lies a magnetic mountain
Riveting sky to Earth

* * * *

Iron in the Soul
Spirit steeled in fire
Needle trembling on truth
These shall draw me there.

কিম্বা Stephen Spenderএর 'A trance' বলে কবিতাটি ধরুন; কবি ও কবিপ্রিয়া শুয়েছেন—একজন জেগে একজন ঘুমিয়ে, নিদ্রাতুরা প্রেয়সী শ্লথ আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে বিছানায় সরে গেছেন। প্রিয় চেয়ে আছেন ঘুমন্ত প্রিয়ার দিকে—সুষুপ্তির জগত থেকে যে সব ভাব আসছে তা প্রতিফলিত হচ্ছে তার মুখে চোখে—ঘুমন্ত সে কেঁদে উঠছে, ককিয়ে উঠছে, আশ্রয় চাইছে—কবির মনে দুঃখ যে প্রিয়তমার কষ্টের ভাগ তিনি নিতে পারছেন না

I watch that precipice of fear
She treads among her naked distresses

তাই কবির সত্যানুভূতি হয়—মেদমজ্জা মাংসের পিছনে যে গভীরতা আছে—যে নতুন জগত আছে—

To that deep we are committed
Beneath the forests of our flesh
And Shuddering Scenery of these dreams
Where unmasked agony is permitted
And bones are bared of flesh that Seems
Our hands unravelling beauty's mesh
Meet our real Selves, our charms outwitted.

তাই হারবার্ট রিডের মত আজকের কবিও বলতে আরম্ভ করেছেন

Yesterday, tomorrow and today
Are in my single glance.

আজকাল-পরশু সবই এক।

বিখ্যাত জার্মান কবি রেইনার মারিয়া রিল্কের কথাই ধার যাক্—তাঁর Elegies ও Sonnets to orpheus সমধিক প্রসিদ্ধ। কবির পরিচিতা এক বান্ধবীর কন্যার অকালমৃত্যুকে অবলম্বন করেই কবির মনে যে গভীর সুর বেজে উঠলো তাকে সিম্বলিক বলাই চলে। এই মেয়েটি নাচতো চমৎকার, তার মধ্যে ছিল জীবনের প্রকাশকে রূপ দেবার একটা প্রচণ্ড চেষ্টা। সে অসুস্থ হলো—একদিন সে তার মাকে বললে যে সে আর নাচতে পারবে না, তার শরীর ভারী ও মেদবহুল হয়ে আসছে। কিন্তু তার জীবনী-শক্তি ছিল অদ্ভুত, সে গান শিখতে আরম্ভ করলে। কণ্ঠে সুরও একদিন থেমে গেলো—তবু দমলো না সে, সে ধরলে আঁকা। মায়ের চিঠিতে এই কাহিনী পড়ে কবি এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে এই প্রতীককে ঘিরেই তাঁর কাব্যলক্ষ্মী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো "Sonnets to Orpheus"। এই প্রতীকের মধ্য দিয়েই কাব্যে প্রকাশ পেলো সাধারণ দৃষ্টির বাইরের কতকগুলি অনুভূতি—যাকে সমালোচকের ভাষায় বলা হয়েছে—This conception of Existence as a wider orbit, including both life and death necessitated (or implied) a revaluation of all experience and particularly of love. জীবনের পরিধি, বেঁচে থাকার পরিধিটা কবির কাছে বেড়ে যায়। কবির অন্তর্দৃষ্টিতে প্রথম কবিতাতেই তিনি দেখলেন

A tree ascending there
O orpheus Sings !
All noise suspended,
What new beginning,
O pure transcension
O tall tree in the ear.
Yet in that suspension
Beckoning change, appear.

বনস্পতি উর্দ্ধে উঠেছে—অর্ফিউস অর্থাৎ জীবনও মৃত্যুরে যিনি সংযুক্ত করেন তিনি গান ধরেছেন—সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে আছে—তারই মধ্যে নূতনের আরম্ভ, নূতনের সুরে রূপান্তর। কবি শ্রীহারীন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত পাঞ্জাবের বিখ্যাত কবি ভাই বীরসিংহের 'বনস্পতি' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মৃত্যু শুধু রূপান্তর নয়, রসান্তর। মৃত্যু চলে, মৃত্যু চালায়—এও কবির অনুভূতি—মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। কবি রিল্কে বললেন

Be, in this immeasurable night,
at your Senses, crossways magic cunning,
be the Sense of their mysterious trnst
And should earthliness forget you quite

Murmur to the quiet earth : I am running
Till the running water—I Exist.

এই রূপান্তরিত অয়মহং ভোঃর গানই কবি গেয়েছেন। তাই তার শেষ কবিতাগুলির একটিতে (Soul in Space) তিনি বললেন

Here I am, here I am, Wrested
Reeling
Can I Dare ? Can I Plunge ?
But now,
Who would be impressed if I said
I am the Soul ?
Secret no more ;

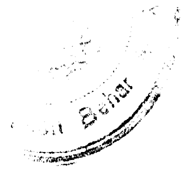
কবি রিল্কের কাছে জীবনের সব কিছু অনুভূতিই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন "for what he called transformation as a fuel or charge for some tremendous rocket into unknown Space." একটা গভীর আবেগ না এলে মানুষ তার চিহ্নিত সীমানা ছেড়ে যেতে পারে না—সেই জন্য তাঁর কাছে ত্যাগ বা ভোগ দুইই এক হওয়াই (Being) হচ্ছে আসল। অরবিন্দ-কাব্য ও সাধনারও এই মূল কথা। সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যেই এই গণ্ডীর সীমানা পেরিয়ে বেরিয়ে এসে নতুন রূপ নেবার যে প্রাকৃতিক রহস্য তাকেই বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নাম দিলেন ক্রমাভিব্যক্তি বা এভলিউশন্—এই যে বিস্তার, এই যে বিক্ষেপ, প্রকৃতির মধ্যে এই যে চিরন্তন আলোড়ন—একে খণ্ড খণ্ড করে দেখাই আমাদের স্বভাব। জুলিয়ান হাক্সলী বলেন যে অভিব্যক্তির নানা রূপগুলি কালে স্থির হয়ে আসে (eventually reach their limits and becomes stabilised)। মানুষই একমাত্র জীব যে এই অভিব্যক্তির গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তার প্রথম জয়লাভ যখন সে কথা কইতে পারলে, জানাতে পারলে এবং পরে লিখে রেখে যেতে পারলে তার চিন্তার ধারাগুলিকে। এই হলো তার দ্বিতীয় জয়লাভ—ক্রোম্যাগনন্ মানুষ যখন 'Survival value' কিছু দিয়ে যেতে পারলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। সে গুহাগুল্ফার গাত্রে আঁচড় কাটতে আরম্ভ করলে, সে তার কুঠারকে চিত্রবিচিত্র করতে শিখলে, সে আকাশের দিকে চেয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে, ঝড়ঝঞ্ঝায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সত্যকে জানতে চেষ্টা করলে। আজ তাই মণীষিদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে "Is it possible that humanity is on the eve of yet another break through on to a higher level, brought about this time by his own inner efforts and not by outer circumstances ?

মানবজাতি ও সভ্যতার আর একটা গণ্ডী পার হবার সময় এসেছে না কি ?

এর জবাব দিলেন Lowes Dickinson (A Modern Symposium) "Man is in the making but henceforth he must make himself. To that point Nature has led him out of the primeval slime. She has given him limbs, she has given him a brain, She has given him the rudiments of a Soul. Now it is for him to make or mar—that splendid torso. Let him no more look to her for aid, for it is her will to create one who has the power to create himself (Quoted by Kenneth Walker in his book on "A Study of Gurdjieff's Teaching).

এই উত্তর শুধু মণীষীর ও বৈজ্ঞানিকের নয়, সাধকেরও। কিন্তু সাধক বলতে আমরা ত একটি বিশিষ্ট অদ্ভুত কল্পনাশ্রয়ী জীবকে ধারণা করি না – সাধক হচ্ছেন তিনি—যিনি সত্যকে জানতে চান, দেখতে চান বুঝতে চান, সে খণ্ড ভাবেই হোক্ অখণ্ডভাবেই হোক্। বৈজ্ঞানিক ও সাধক, কবি ও তপস্বী তাদের দৃষ্টিও সত্যদৃষ্টি। যজুর্বেদে আছে আমি উঠেছি ভূ থেকে ভুবে, তারপরে গেছি স্বর্গে, সেখান থেকে আমি যাব সবিতার জ্যোতির্ময় লোকে। শ্রীঅরবিন্দ বললেন—এই তো উর্দ্ধগতি—আমার দেহ এই মাটির জড়ের উপাদান নিয়ে (Matter) তাই থেকেই আমি উঠি প্রাণময় রাজ্যে (Life), সেখান থেকে উঠি মনোময় রাজ্যে (Mind)। এই মনোময় রাজ্যের শেষ কথাই হোল অতি মানস। এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে। গল্পটি উপনিষদের—ভৃগু-বারুণি সংবাদ। বরুণ ঋষির পুত্র ভৃগু বললেন—পিতা, আমায় ব্রহ্মবিদ্যা দান করুন, ব্রহ্ম অর্থে কোন হস্তপদবিশিষ্ট দেবতার কথা না, সর্বমগুঢ়মনুপ্রবিষ্টম যে রহস্য তারি অনুসন্ধান। ভৃগু বসলেন তপস্যায়—দিনের পর দিন যায়, রাত্রি পর রাত্রি, চোখে উপর ফুটে ওঠে—অন্নময়ী এই পৃথিবী, শস্যমালিনী এই বসুন্ধরা, রূপরসগন্ধস্পর্শ নিয়ে শ্যামকান্তিময়ী—এতো মিথ্যা নয়, অন্নই ব্রহ্ম—অন্নেই সব বাঁচিয়ে রেখেছে—এই জড়ের দেহে প্রতিটি অণুতে রয়েছে সেই অন্নময় বীর্যের মহাশক্তি অবরুদ্ধ। সত্যের একটি পর্দা উঠলো। জড়ের রহস্যের পিছনে আছে প্রাণের রহস্য—জড়ত প্রাণেরই কঞ্চুক। ভৃগু আবার বসলেন তপস্যায়—স তপোঽতপ্যত—প্রাণো ব্রহ্ম যে প্রাণ Elan Vital বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাত্মীভূত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক হয়তো এইখানেই থামবেন সেই প্রাণের স্পন্দকে, ছন্দকে, নিয়মকে—Inner hermonyকে। বোধির চেতনায় একদিকে আমার আমি আর একদিকে তোমার তুমি এই মিলিয়েই চলছে বিশ্বলীলা—এরই মধ্যে ভাঙচে, গড়চে সৃষ্টির প্রবাহ, ফুটে উঠছে ঘটনার পুঞ্জ—আর থেকে যাচ্ছে নিত্যচক্রের আবর্তনে সৃষ্টিশীল বীজে অমর একটি সত্তা আইনষ্টাইনের ভাষায় "the creative and imperishable individuality—the personality". ভৃগু কিন্তু প্রাণের সন্ধান পেয়েই নিরস্ত হননি—তিনি আবার বসেছিলেন তপস্যায়, প্রাণের পিছনে খুঁজেছিলেন মনকে—মনের পিছনে বিজ্ঞানকে—যে জ্ঞান বিরাট বিপুল, বিশাল—তারপর পেয়েছিলেন আনন্দকে। যোগ হচ্ছে Return of the spirit to itself. তাই আকাশে বাতাসে ব্যষ্টির জীবনে, জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায় সমষ্টির লীলায় এই ক্রিয়া চলছে—গুটিয়ে নেওয়া, ছড়িয়ে দেওয়া—আত্ম-সম্প্রসারণ আত্ম-সংকোচন—ওঠা আর নামা—তাই যোগ মানে শুধু যুক্ত হওয়া নয়, মুক্ত হওয়াও—বিশ্বছন্দের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে আত্ম উন্মীলন—সমস্ত সত্তার Integration একত্রীকরণ। 'সিম্বলিক' কাব্য জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ তারই প্রয়াস। 'সাবিত্রীতে' এরই প্রকাশ।

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'



অলোক রায়

এপিক-পরবর্তী আধুনিক যুগে সাহিত্যের সকল বিভাগেই স্পষ্ট দেখা যায় যে তা ক্রমশঃ ব্যক্তি-নির্ভর হয়ে উঠছে। প্রাচীন কাব্য-নাটক প্রধানতঃ ব্যক্তিলীন বা অবজেক্টিভ। কিন্তু বর্তমানে কাব্য-নাটক এবং উপন্যাসের আত্মভাবাত্মক বা সবজেকটিভ হওয়ার এক বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছে : মোহিত লাল মজুমদার এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'নভেল নামক বিলেতী উপন্যাসের প্রধান লক্ষণ—তার কারেক্টার বা ব্যক্তি-চরিত্রাঙ্কন, ইহার মূলে আছে সমাজ চেতনার বিপরীত একরূপ ব্যক্তি-চেতনার উল্লেখ।' ১

সম্ভবতঃ এরই ফলে এযুগের উপন্যাস ক্রমশঃ ব্যক্তিনির্ভর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আত্ম-জীবনীমূলকও হয়ে উঠেছে। গলস্‌ওয়ার্দি, লরেন্স জয়েস, ম্যম প্রভৃতি সকলেই দেখি তাঁদের অধিকাংশ উপন্যাসে নিজেদের জীবনের স্মৃতিকথাকেই সাহিত্যিকরূপ দিয়েছেন এবং সে কথা তাঁরা বইয়ের ভূমিকায় বা ডায়ারিতে লিখে পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন। আসলে উপন্যাস রচনার রীতিই অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, উপন্যাস এখন হচ্ছে শিথিল সংবন্ধ—loose plotএর—তাতে মুখ্যতঃ কতক-গুলি ঘটনা ও চরিত্রই আমাদের সমধিক আকৃষ্ট করে ; বর্ণনা ও বিবৃতি-গুলি হয় কাব্যের মত উপভোগ্য ; প্লট থাক বা নাই থাক এগুলি উপন্যাসের উপাদান বটে এবং পৃথকভাবে রসোদ্রেক করে। প্লট না থাকলেও এই জাতীয় নায়ক চরিত্রের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহাই একগাছি ডোরের মত অবিন্যস্ত ফুলরাশিকে একটি মালার আকার দান করে। (মোহিতলাল মজুমদার : শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র)।

বাঙালী উপন্যাসিকদের মধ্যে বিভূতিভূষণই বোধহয় সবচেয়ে বেশি আত্মলীন ; তাঁর উপন্যাস-ব্যক্তিত্ব সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট। 'আরণ্যক'ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস—শহর কলকাতায় বসে ফেলে আসা ধূসর লবটুলিয়া বইহারের দিনগুলির স্মৃতি-রোমন্থন ঘটেছে এখানে। বিভূতি-ভূষণ এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তিও করে রেখেছেন তাঁর বিভিন্ন দিনলিপি-গুলিতে। 'স্মৃতির রেখা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত কয়েকটি বাক্য উপরিউক্ত অনুমানের সাক্ষ্য দেবে : 'নভেলে এই সব···স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করেছি মাত্র—কারণ মনের অভিজ্ঞতা জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোনো লেখকই যেতে পারেন না— গেলেই সেটা কৃত্রিম, Tour de Force হয়ে পড়বে।২

'এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৌর্য-পূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য-জীবনের ছবি। এই বন নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো—অন্ধকার—এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ করে যে সুঁড়ি-পথটা ভিটেটোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐরকম সুঁড়ি পথ এক বাথান থেকে আর একবাথানে চলে যাচ্ছে—পথ হারানো রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া করে ঘোরা, এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile active life, এই সন্ধ্যার অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি—এই সব।৩

(১) মোহিতলাল মজুমদার : সাহিত্য বিচার (পৃঃ ১০০)

(২) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতির রেখা (পৃঃ ৮৮)

'আরণ্যকে' তো এই জীবনেরই ছবি আঁকা হয়েছে। এমন কি 'আরণ্যকে'র অধিকাংশ ঘটনা এবং চরিত্রের উল্লেখ পর্যন্ত তাঁর মুদ্রিত দিনলিপিগুলিতে দেখতে পাওয়া যাবে। উপন্যাসটি তাই স্মৃতি চিত্রের অন্তরঙ্গতা লাভ করেছে। এতে স্মৃতির রসও আছে এবং বনের বর্ণনাও আছে। 'গল্প এবং কথাচিত্রের ফাঁকে ফাঁকে ভাবনা ও কল্পনার মসৃণ-চিক্কণ সূক্ষ্মবয়ন লেখকের বাতাবরণের মধ্যেই বিভূতিভূষণের মানসলোকের ছায়া সঞ্চারণ !' স্মৃতির মালা গাঁথার শিল্পে বিভূতিভূষণ অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'আরণ্যকে'র পূর্ববর্তী তিনটি উপন্যাস, 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতা' ও 'দৃষ্টি প্রদীপ'কেও আমরা 'স্মরণের কাব্য' বলেই অভিহিত করতে পারি, কারণ সেখানেও আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, অপু এবং জিতুতে বিভূতিভূষণেরই আত্মদর্শন। (অনুরূপভাবে বিভূতি-ভূষণের পরিণত মানসের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ইছামতী'র ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে বিভূতিভূষণের একাত্মানুভূতি একান্ত স্পষ্ট। ৪) বলাবাহুল্য এই জন্যই বিভূতিভূষণ আধুনিক ঔপন্যাসিকের লক্ষণাক্রান্ত—সমালোচক লিওন এডেল যে লক্ষণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : 'They were striking similarities in these works, behind their differences. They seemed to be essentially autobiographical. They contained an unusual in-fusion of the language of poetry. Their very titles suggested, if we include Ulysses, (James Joyce) a curious Kinship of search, voyage, pilgrimage Indeed all were Voyages consciousness. ৫

'আরণ্যক' সাধারণ উপন্যাস নয়, বিভিন্ন চরিত্র উপস্থিত করে কামনার সঙ্গে কামনার দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, জীবন প্রবাহে তজ্জাত আবর্তসৃষ্টি,

(৩) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতির রেখা (পৃঃ ৮৭)

(৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ইছামতী (পৃঃ ৩৭৫)

(৫) Leon Edel : The Psychological Novel (page 12) (Ruper Hart-Davis, London 1955).

কাহিনীতে জটিলতা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি—এ সকল বিভূতিভূষণের সাহিত্য-কর্মের লক্ষ্য নয়। 'আরণ্যকে' দেখা যায় সত্যচরণ (সমগ্র উপন্যাসটি প্রথম পুরুষ একবচন অর্থাৎ 'আমি'র জবানীতে লেখা, একবার মাত্র উপন্যাসের গোড়ার দিকে এই 'আমি'টিকে লেখক সত্যচরণ নামে অভিহিত করেছেন) জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী নিয়ে নিবিড় অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে উপস্থিত, সেই স্থানে এই অরণ্যের উৎসাদন এবং নবলব্ধ ভূমিতে প্রজার বাসস্থাপনই তার প্রধান কাজ। কিন্তু সত্যচরণের নির্জনতাবিমুখ মন কিরূপে দিনে দিনে অরণ্য সৌন্দর্যের নিকট আত্ম-সমর্পণ করলো,—কোন সমস্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার আন্তর সম্পদ-বৃদ্ধিতে সহায়তা করলো—সভ্য সমাজ সংস্পর্শ বর্জিত প্রকৃতিক্রোড়ে সত্য-চরণের চিত্তের যে দৈনন্দিন পরিবর্তন, এরই বিবরণ 'আরণ্যকে' প্রদত্ত হয়েছে কালানুক্রমিকভাবে। এই যে এক বিশিষ্ট মানস পরিণতি, যার ফলে অশিক্ষিত অমার্জিত পাহাড়ী বন্যমানুষদের সে ভালোবাসলো, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রকৃতির মধ্যে চেতন শক্তি তথা আধ্যাত্মিক শক্তির বন্য প্রকাশ অনুভব করলো—এই উপলব্ধি এই মানস ও অধ্যাত্ম পরিণতি যে একান্তভাবে বিভূতিভূষণেরই তা অনুমান করতে আমাদের কষ্ট হয় না। এই আত্ম-জীবনীমূলক উপন্যাসের নায়ক তাই স্বয়ং বিভূতিভূষণের জীবন ইতিহাস স্পষ্ট রেখা।

সমাজ এবং প্রকৃতি এই নিয়েই পৃথিবী। সাহিত্যে ঘটে এই দুইয়ের সমন্বয়। কিন্তু ব্যক্তিগত মানসগঠনের ফলে লেখকের সৃষ্টিতে দেখা দেয় একের প্রাধান্য, অন্যের গৌণতা। ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতায় বা টমাস হার্ডির উপন্যাসে প্রকৃতি প্রধান। কিন্তু তাই বলে এমন ধারণা হওয়ার কারণ নেই যে, মানুষকে বাদ দিয়ে উপন্যাস রচিত হতে পারে। আসলে চরিত্র-চিত্রণই হচ্ছে উপন্যাসের লক্ষ্য এবং লক্ষণা। এবং চরিত্রের মধ্যে থাকবে প্রাচীন সমালোচকদের মতে 'A struggle of opposite feelings'—আধুনিক সমালোচকের মতে 'A stream of consciousness' থাকলেই চলবে। কিন্তু যেহেতু শেষোক্ত "A stream of consciousness. (Principles of Psychology : William James) শব্দটি থেকে সুরু করে, প্রকৃত ব্যাপারটি পর্যন্ত মনস্তত্ত্বশাস্ত্র থেকে আহরিত. সেইজন্য আসলে চরিত্রচিত্রণ অর্থেই মানস চিত্রণ, এবং আমাদের সংস্কার অনুযায়ী এই 'মানস' ব্যাপারটি একান্তভাবে 'মানব' সম্পর্কিত। কাজেই উপন্যাসের নায়কচরিত্র নিরূপণে মানবের স্থানই অগ্রগণ্য।

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের পরিভাষায় নায়ক হচ্ছেন 'অঙ্গীরসের নেতা।' অর্থাৎ যাকে লক্ষ্য করে কবি সকল কার্য নির্দেশ করেছেন, এবং যিনি অধিকাংশ ঘটনার ফলভোগী। প্রকৃত পক্ষে কাহিনীর ফলশ্রুতি যে চরিত্রকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে তিনিই নায়ক। তিনিই কাহিনীর গতি পরিচালিত করেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, এবং অঙ্গী-রসের আলম্বন বিভাব তিনিই।

এখন আমাদের প্রশ্ন হবে 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি অত্যন্ত বেশি স্থান জুড়ে বসেছে, এবং তার প্রভাব সমগ্র কাহিনীর মধ্যে অনস্বীকার্য,ফলে নায়ক হবার দাবী তার কতখানি। 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি মুখ্য, তাতে সন্দেহ নেই—যেমন প্রদীপের আলোর প্রদীপটিই মুখ্য। কিন্তু প্রদীপটি মুখ্য হলেও তাকে স্বীকার করতে হবে তার আলোকিত শিখাটির মূল্য আরও বেশি। প্রকৃতি এখানে উদ্দীপন বিভাব সন্দেহ নেই, কিন্তু ফলশ্রুতি প্রকৃতি নয়। 'আরণ্যকে' ফলশ্রুতি নিঃসন্দেহে সত্যচরণের মানস ও অধ্যাত্ম পরিণতি। এখানে অঙ্গীরস বিস্ময়ভাব জাত এই বিস্ময় সত্যচরণের চিত্তের। প্রকৃতি অবশ্যই কেন্দ্রীয় চরিত্র, তাকে ঘিরে বিচিত্র মানুষের ভিড়—যে সমস্ত মানুষের জীবনও প্রকৃতি কর্ম বেশি পরিচালিত করে। কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে এই উপন্যাসে সে জাতীয় কোনও সক্রিয়তা নেই, যার ফলে প্রকৃতির একটা পরিবর্তন বা পরিণতি ঘটতে পারে। 'আরণ্যকে'র ধ্যানমৌন, স্বপ্নসুন্দর, রহস্যনিবিড় অরণ্য প্রভৃতি কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্থির শান্ত অবিচলিত।৬ এই অরণ্য শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনের কাছে ধরা দিয়ে উৎপাটিত হতে সুরু হয়েছে। কিন্তু কখনো তার মধ্যে মানুষের কাছে এই বশ্যতা স্বীকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শোনা যায়নি—লবটুলিয়া বইহার হার্ডির 'Egdon Heath' নয়—সে প্রতিহত করার কোনও চেষ্টাই করে না। ফলে সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে তাকে একটা সক্রিয় সৌন্দর্য উৎস ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

কিন্তু প্রকৃতি তো ঠিক এই রকমটাই না হলেও পারতো। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস, হেমিংওয়ের 'The oldmen and the Sea, উপন্যাসে 'সমগ্র প্রকৃতি'র নায়ক হবার কথা অনেক পাশ্চাত্য সমালোচক ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেখানে সমুদ্র প্রকৃতি শুধু যে অশান্ত অস্থির বাত্যা-বিক্ষুব্ধ তাই নয়—তার মধ্যে একটা প্রাণ চেতনা (Stream of consousness) ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। 'আরণ্যকে' সেই প্রচেষ্টার অভাব দেখি।

কিন্তু আবার বলি, প্রকৃতি এখানে উদ্দীপন বিভাব—এবং কাহিনী কেন্দ্রবিন্দুরূপে তাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। যেমনটী আলোকিত প্রদীপের প্রদীপটী—অরণ্য এখানে তাই কেন্দ্রীয় চরিত্র—আলোক শিখাটি হোলো সত্যচরণ—সত্যচরণই এ উপন্যাসের নায়ক।৭

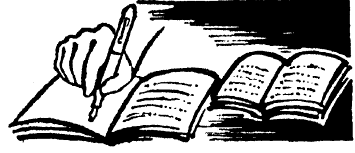
নায়ক এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে আপাত সাদৃশ্য প্রচুর। এবং তারই ফলে জুলিয়স সিজর কিম্বা মার্চেন্ট অফ ভেনিস নাটকে, ফাদার্স এণ্ড সন্স এবং ভ্যানিটি ফেয়ার উপন্যাসে নায়ক এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র বিচারে বিভিন্ন মতের প্রকাশ দেখা যায়। 'আরণ্যক' উপন্যাসে অরণ্য-প্রকৃতিকেই নায়ক বলে ভুল করার যথেষ্টই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সূক্ষ্মভাবে এবং সকল দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে সত্যচরণের নায়কত্ব সম্বন্ধেই নিঃসন্দেহ হই।

---

(৬) প্রকৃতির মধ্যে এক অপরিমেয় রহস্যবোধ অবিচল কেন্দ্র বিন্দুর ন্যায় স্থির হইয়া আছে।'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা (তৃতীয় সংস্করণ) পৃঃ ৪৮৭

(৭) প্রকৃতিকে বরং নায়িকা বলা যেতে পারে, এমন ইঙ্গিত লেখক উপন্যাসের মধ্যেই দিয়েছেন—'আমি প্রজা বসাইবার ভার লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম—এই অরণ্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করিতে আসিয়া এই অপূর্ব সুন্দরী বন্য নায়িকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি।' (নবম পরিচ্ছেদ) এখানে বলা বাহুল্য প্রকৃতির উপর চেতন আরোপ করা হয়েছে।—

অনুবাদ সাহিত্য



হত্যার প্রচেষ্টা

সুধাংশুকুমার গুপ্ত

১৮৯০ সালে বোহিমিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন কারেন ক্যাপেক। পিতা ছিলেন চিকিৎসক। প্রাগ্‌এ ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হন। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন তাঁর ভ্রাতা যোসেফ। শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর তিনি সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন একান্তভাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নাটক রচনা ও প্রযোজনায় অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করেন। নাট্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও ছোট গল্প রচনাতেও তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। মানবচিত্তের নিগূঢ় রহস্যের বিশ্লেষণে তাঁর প্রতিটি গল্পই অপূর্ব্ব। বক্ষ্যমাণ গল্পে তাঁর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রথম প্রেসিডেণ্ট মাসারিক ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৯৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে R. U. R., The Life of the Insects ও The Power and the Glory সমধিক প্রসিদ্ধ।

সেদিন সন্ধ্যায় নিভৃতে বসে বেতারে যন্ত্রসঙ্গীত উপভোগ করছিলেন মিঃ তোম্‌শা। ড্‌ভোরাকএর নাচের মন-মাতানো একটি সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছিল বেতারে। সুরের মোহময় আবেশে তাঁর মুখে চোখে বেশ একটি তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে—এমন সময় বাইরে দু'বার গুলী ছোঁড়ার শব্দ হল আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মাথার ঠিক উপরের জানালা থেকে সশব্দে ছিটকে পড়ল কয়েক টুকরো কাচ। যে ঘরে বসেছিলেন মিঃ তোম্‌শা সেটি নীচের তলায়।

তারপর এক্ষেত্রে আমরাও যা করি তিনিও করলেন তাই। প্রথম তিনি অপেক্ষা করলেন এক মুহূর্ত্ত—এর পর কী ঘটে তা লক্ষ্য করবার জন্য। তারপর—হ্যাঁ, ঠিক তার পরই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন মিঃ তোম্‌শা। কারণ কেউ যে তাঁকেই লক্ষ্য করে জানলার ভিতর দিয়ে দু'বার গুলী ছুড়েছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল ইত্যবসরে। ঠিক তাঁর বিপরীত দিকে দরজার কবাটের খানিকটা কোথায় উধাও হয়েছে এবং তারই নাচে বসে গিয়েছে গুলীটা। প্রথমটা তাঁর ইচ্ছা হল ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে বদ্‌মায়েসটার কলার ধরে কয়েকটা চড় কষিয়ে দেন তাকে। কিন্তু বয়স হলে মানুষকে কতকটা শালীনতা বজায় রেখে চলতে হয়, তাই মনের প্রথম আবেগটাকে দমন ক'রে দ্বিতীয়টির অনুকূলেই সিদ্ধান্ত করে সে। সুতরাং মিঃ তোম্‌শা বেগে ধাবিত হলেন টেলিফোনের দিকে এবং থানায় সংবাদ দিলেন পুলিসের সাহায্যের জন্য।

"হাল্লো!" চীৎকার করেন মিঃ তোম্‌শা, "এখনই কাউকে পাঠিয়ে দিন এখানে। এইমাত্র একটা চেষ্টা হয়েছে আমাকে খুন করবার জন্য।"

"কোথায়?" তন্দ্রাজড়িত অলস কণ্ঠের প্রশ্ন আসে।

"এখানে···আমার এই ফ্ল্যাটে।"

হঠাৎ রাগের আতিশয্যে ফেটে পড়েন মিঃ তোম্‌শা—যেন এ অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য পুলিসই দায়ী।

"বিনা কারণে এমনি বেপরোয়া গুলী ছোঁড়া—বিশেষ করে একজন নিরীহ শান্তিপ্রিয় নাগরিকের প্রতি—শুধু অন্যায় নয়, অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত হওয়া উচিত। সমাজে যদি এমনি বিশৃঙ্খলা চলে তাহলে···"

"বেশ, আমরা একজন লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার ফ্ল্যাটে," নিদ্রালস কণ্ঠের উত্তর শোনা যায়।

অত্যন্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করতে থাকেন মিঃ তোম্‌শা। পুলিসের কর্ম্মচারীদের শৈথিল্য দেখে মেজাজ ঠিক রাখা শক্ত হয়ে ওঠে তাঁর পক্ষে। বিশ মিনিট পরেই অবশ্য একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টার এসে হাজির হলেন, কিন্তু ঐ বিশ মিনিট বিশ ঘণ্টার চাইতেও দীর্ঘ মনে হয় মিঃ তোম্‌শার কাছে।

যে জানলাটির কাচ ভেদ করে গুলী এসেছিল ঘরের মধ্যে সেটি বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা ক'রে গম্ভীরমুখে ইন্‌স্পেক্টার বলেন, "এই জানলার দিকে লক্ষ্য ক'রে কেউ যে গুলী ছুড়েছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"

"ওকথা আমিও বলতে পারতাম। তখন ঐ জানালার ধারেই বসেছিলাম আমি," মিঃ তোম্‌শা বলেন উগ্রকণ্ঠে।

ছুরির সাহায্যে দরজার কবাট থেকে গুলীটা বের করে নিয়ে, বেশ করে পরীক্ষা ক'রে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ইন্‌স্পেক্টার বলেন, "সাত্ মিলিমিটার ক্যালিবার। মনে হচ্ছে পুরোনো ধরণের রিভলবারের বুলেট এটা। যে লোকটা এই গুলী ছুড়েছে সে দাঁড়িয়েছিল জানলার খুব নিকটেই। রাস্তার ওপর থেকে গুলী ছুড়লে গুলীটা উঠে যেত আরও উপর-দিকে। অর্থাৎ কিনা লোকটা গুলী ছুড়েছিল আপনাকেই লক্ষ্য ক'রে।"

"তাই নাকি? 'আমি ভেবেছিলাম সে বুঝি দরজাটা-কেই লক্ষ্য করে গুলী ছুড়েছে।"—শ্লেষবিকৃত কণ্ঠে বলেন মিঃ তোম্‌শা।

মিঃ তোম্‌শার শ্লেষ উপেক্ষা ক'রে ইন্‌স্পেক্টার প্রশ্ন করেন, "লোকটা কে বলুন দেখি?"

"তার ঠিকানা আপনাকে দিতে পারছি না বলে বিশেষ দুঃখিত," জবাব দেন মিঃ তোম্‌শা অসহিষ্ণুভাবে, "ভদ্রলোকটিকে আমি দেখিনি এবং তাঁকে ভিতরে আমন্ত্রণ করতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

"তাহলে অপরাধীকে খুঁজে বের করা কঠিন," নিরাসক্তভাবে বলেন ইন্‌স্পেক্টার। "কিন্তু আপনি সন্দেহ করেন কাকে?"

মিঃ তোম্‌শার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে।

"সন্দেহ?" বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলেন মিঃ তোম্‌শা—

"বদমায়েসটাকে দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু যদি সে অপেক্ষাও করতো যতক্ষণ না তাকে একটি প্রীতির চুম্বন ছুড়ে দিচ্ছি—তাহলেও অন্ধকারে চিনতে পারতাম না তাকে।···দেখুন মশাই, লোকটা কে তা যদি জানতাম তাহলে কি মনে করেন আপনাকে কষ্ট দিয়ে টেনে আনতাম এখানে?"

"হাঁ, কথাটা ঠিকই," সান্ত্বনার সুরে বলেন ইন্‌স্পেক্টার—"তবে আপনি হয়তো এমন কোন লোককে মনে করতে পারেন যে বিশেষ লাভবান হবে আপনার মৃত্যুতে, কিংবা যার কোন আক্রোশ আছে আপনার ওপর।··· দেখুন মশাই, চুরি করা লোকটার উদ্দেশ্য ছিল না। নিতান্ত বেকায়দায় না পড়লে চোর গুলী ছোড়ে না কখনো। কিন্তু এমন কোন লোক থাকতে পারে হয়তো, যে আপনার ওপর ভয়ঙ্কর ঘৃণা পোষণ করে। আর সেটা বলতে পারেন শুধু আপনি, আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমাদের যদি সেরকম কিছু খবর দিতে পারেন, তখন আমরা তদন্ত করে দেখতে পারি।"

হঠাৎ যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েন মিঃ তোম্‌শা। কৈ, এ চিন্তা তো একবারও মাথায় আসেনি তাঁর!

"আমি তো এমন কারো কথা ভাবতেই পারছি না," চাকরিজীবনের ফেলে-আসা বছরগুলোর দিকে চকিতে ফিরে তাকিয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলেন মিঃ তোম্‌শা।

"আমার ওপর কার আক্রোশ থাকতে পারে?" চিন্তিতমুখে বলেন মিঃ তোম্‌শা—"যতদূর জানি, আমার একজনও শত্রু নেই জগতে। হ্যাঁ, আমার যে কোন শত্রু নেই একথা একরকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।"

"আমার শত্রু থাকা একেবারে অসম্ভব," মাথা নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন তিনি—"কারো সঙ্গে ঝগড়া করি না আমি, মেলামেশাও নেই কারো সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের বালাই নেই, কারো কোন ব্যাপারে মাথা গলাই না পারতপক্ষে। আমার ওপর লোকের আক্রোশ হবে কিসের জন্যে?"

কাঁধটা ঈষৎ নেড়ে ইন্‌স্পেক্টার বিরসমুখে বলেন, "তা আমি জানি না মশাই। তবে কাল হয়তো এমন কিছু মনে পড়তে পারে আপনার, যা থেকে এ ঘটনার সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না।···এখানে একা থাকতে আপনার ভয় হচ্ছে না তো?"

"না," চিন্তিতভাবে জবাব দেন মিঃ তোম্‌শা।

ইন্‌স্পেক্টার চলে যাবার পর মিঃ তোম্‌শা যখন একা হলেন তখন এক অস্বস্তিকর চিন্তা তাঁর মনটাকে অধিকার করে বসল। বাস্তবিক এটা ভারী অদ্ভুত—মনে মনে তিনি বলেন, আমার মত নির্ব্বিবাদী লোককে খুন করবার চেষ্টা করতে পারে এমন লোকও আছে! এত লোক থাকতে আমার ওপর এ আক্রমণের কারণ কী? আমি

লো একরকম সংসারবিমুখ সন্ন্যাসী—অফিসে গিয়ে সারাদিন কাজ করি। তারপর সোজা বাড়ি ফিরে আসি—কারো সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বা আলাপ-আলোচনা করার সুযোগই ঘটে ওঠে না। আমাকে হত্যা করবার জন্য তবে এ আয়োজন কেন? মানুষের নিষ্করুণ ব্যবহারে মনটা তিক্ত হয় তাঁর। ভাবতে ভাবতে ক্রমশঃ নিজের প্রতি করুণায় সারা মন সিক্ত হয়ে ওঠে।

অফিসে কী খাটুনিটাই খাটতে হয় আমাকে। তাতেও কি রেহাই আছে? বাড়িতেও বয়ে আনতে হয় কাজ, সকল সময় শুধু খেটেই চলেছি। আমোদ আহ্লাদ করে অযথা পয়সা খরচ করি না, ভালো খাবারও খাই না কোনদিন, শম্বুকের মত নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে চলেছি নিজের খোলের মধ্যে—অথচ আমাকে মারবার জন্যে কিনা গুলী ছোড়ে মানুষে! মানুষের শয়তানির কথা ভেবে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান মিঃ তোম্‌শা। কারো কোন ক্ষতি করেছি আমি? কেন আমার প্রতি এমনি ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ পোষণ করবে অপরে?

রাত্রে বিছানার ওপর বসে ভাবতে থাকেন মিঃ তোম্‌শা—হাতে সত্য পা থেকে খোলা বুট জুতোটা। হয়তো ভুল হয়ে থাকবে লোকটার—যার ওপর তার আক্রোশ মনে করেছে আমিই বুঝি সে-ই। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন মিঃ তোম্‌শা। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা তাই—নইলে আমার ওপর কার বিদ্বেষ থাকতে পারে?

হঠাৎ কী যেন মনে পড়তেই জুতোটা খসে পড়ে মিঃ তোম্‌শার হাত থেকে। মিঃ তোম্‌শা একটু চঞ্চল হয়ে ওঠেন। সত্যি, ও কথা বলা মোটেই ভালো হয়নি আমার, কিন্তু ওটা আমার মনের কথা নয়, হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল অসাবধানে। রুবল্‌এর সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমি—কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় একটা কুৎসিত মন্তব্য করে ফেলি ওর স্ত্রীর সম্বন্ধে—যদিও ওকে আঘাত করার কোন ইচ্ছা ছিল না আমার। সবাই অবশ্য জানে, চতুরা সুন্দরী মেয়েরা গোপনে অনেকের সঙ্গেই প্রেমের কারবার করে। তাদের স্বামীরাও যে না জানে এমন নয়, কিন্তু তারা যে জানে এটা চাপা রাখতে চায় সযত্নে কেউ যদি হঠাৎ ওকথা উত্থাপন করে বসে—অমনি তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে রাগে। আর আমি—নিতান্ত গর্দ্দভ কিনা, তাই ওকথা ফস্ করে বলে ফেললাম ওর সামনে! মিঃ তোম্‌শার মনে পড়ে, কথাটা শুনে কেমন হতভম্ব হয়ে পড়ল রুবল্—তারপর তার হাতটা মুষ্টিবদ্ধ হল রাগে। বাস্তবিক, লোকটি ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েছিল মনে। মনে মনে মিঃ তোম্‌শা শিউরে ওঠেন যেন। হয়তো বা স্ত্রীর ওপর ওর ভালবাসাটা এমনি আন্তরিক যে তার চরিত্র সম্বন্ধে কোনরকম ইঙ্গিত বরদাস্ত করতে সে অপারগ। তারপর অবশ্য ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্য চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু মনের ঘা সহজে আরাম হতে চায় কি? হাঁ, একবার যেন সে দাঁতে ঠোঁট চেপে রুখে উঠেছিল। আমার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তার—ভাবেন মিঃ তোম্‌শা অনুতাপের সঙ্গে। জানি আমাকে মারবার জন্য গুলী ছোড়েনি সে, ওকথা ভাবা নিতান্ত বাতুলতা, তবে আমি সত্যিই আশ্চর্য্য হতাম না যদি…

মেঝের দিকে লজ্জিতভাবে চেয়ে থাকেন মিঃ তোম্‌শা। পুরোনো সেই দর্জ্জির প্রতি তাঁর ব্যবহারটাও সঙ্গত হয়নি মোটেই। পনেরো বছর ধরে বেচারী আমার কাজ করে এসেছে—একদিন শুনলাম ওর নাকি যক্ষ্মারোগ হয়েছে। যক্ষ্মারোগীর হাতে তৈরী পোষাক পরতে আপত্তি করাটা এমন কিছু অন্যায় নয়, কাজ করতে করতে কতবারই না ও কেশেছে পোষাকের ওপর, সুতরাং ওকে কাজ দেওয়া বন্ধ করে দিলাম। তারপর একদিন সে এল আমার কাছে, অনুনয় করে বললে, কাজকর্ম্ম ওর কিছুই নেই, স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত, ছেলেমেয়েগুলিকে অন্যত্র পাঠাতে পারে যদি আমার কাজটা ফিরে পায়। রোগে একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে লোকটা, রক্তহীন পাণ্ডুর চেহারা, কথা কওয়াও যেন কষ্টকর ওর পক্ষে।

"মিষ্টার কোলিন্‌স্কি", তাকে উদ্দেশ করে বললাম, "দেখো আমায় অনুরোধ করা বৃথা। একজন ভালো দর্জ্জি চাই আমার—তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি।"

"আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, স্যর," উদ্বিগ্নকণ্ঠে সে বলে—ভয়ে ও লজ্জায় সারা দেহ তার ঘামে ভিজে ওঠে

লোকটা যে কেঁদে ফেলেনি এটাই আশ্চর্য্য। আর আমি কিনা তাকে ভাগিয়ে দিলাম শুধু এই কথা বলে, "আচ্ছা, ভেবে দেখি।" ও আশ্বাসবাক্যের মানে যে কী তা ঐ হতভাগ্যরা ভালোরকমই জানে। হ্যাঁ, ঐ হতভাগ্য দর্জ্জির পক্ষে আমায় ঘৃণা করাটা আদৌ অসঙ্গত নয়, ভাবেন মিঃ তোম্‌শা। নিতান্ত প্রাণের দায়ে অপরের কাছে এসে কাকুতি মিনতি করা এবং শেষটা নির্দ্দয়ভাবে বিতাড়িত হওয়া—সত্যিই এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যাপার আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু ওর সম্বন্ধে কীই বা করতে পারতাম আমি? ওকে যদি কাজ দিতামও, তাহলেও ওর পক্ষে তা করা সম্ভব হত না, কিন্তু···

আরও যেন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েন মিঃ তোম্‌শা। আরও একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার উঁকি মারে মনের মধ্যে। সেদিন যেভাবে অফিসের বেয়ারাটাকে তিরস্কার করেছিলাম তা মোটেই সঙ্গত হয়নি। কি একটা ফাইল খুঁজে পাইনি বলে বুড়ো মানুষটাকে এমনিভাবে গালিগালাজ করেছিলাম সকলের সামনে যেন ও অর্ব্বাচীন স্কুলের ছাত্র। কাগজপত্র এইভাবে রাখতে হয় নাকি? তোমার মত মূর্খ তো দেখিনি কখনো—সামান্য একটা কাজ, তা'ও করতে পারো না ঠিকমত! জিনিসপত্র চারিধারে ছড়ানো—নোংরা অপরিষ্কার—কে বলবে সরকারী দপ্তরখানা এটা? তোমাকে এখনই বরখাস্ত করা উচিত—অপদার্থ কোথাকার!···তারপর খুঁজতে খুঁজতে ফাইলটা পেলাম আমারই টেবিলের ড্রয়ারে। বেচারী প্রতিবাদ করেনি একবারও, শুধু কাঁপছিল ভয়ে এবং আমার দিকে তাকিয়েছিল ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে।

ভাবতে ভাবতে মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। অধস্তন একজন কর্ম্মচারীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্ভব নয় মোটেই, মনে মনে বলেন ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে। কিন্তু ওরা না জানি উপরওয়ালাদের কত ঘৃণাই করে! আচ্ছা, ঐ বেয়ারাকে ডেকে এখন যদি পুরোনো জামাকাপড় কিছু দিই তো কেমন হয়? কি জানি, হয়তো এতে সে আরও অপমানিত বোধ করবে নিজেকে।

বিছানায় শুয়ে থাকা নিতান্ত অসহ্য হয়ে পড়ে মিঃ তোম্‌শার। নরম চাদরের নীচেও বুকটা হাঁপিয়ে ওঠে যেন। বিছানায় উঠে বসেন তিনি—দু'হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন অন্ধকারের দিকে। তরুণবয়স্ক মোরাভেকের সঙ্গে অফিসে যে ব্যাপারটা ঘটেছিল মনে পড়ে যায় বেদনার সঙ্গে। ছেলেটি সুশিক্ষিত, কবিতাও লেখে বেশ। কি একটা কাজে ভুল হয়েছিল ওর, রেগে গিয়ে বললাম, আবার ওটা গোড়া থেকে করো—এ রকম ভুল করলে তোমাকে দিয়ে অফিসের কাজ চলবে কি ক'রে?

চিঠির তাড়াটা আমি অবশ্য টেবিলের ওপর ছুড়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা গিয়ে পড়ল তার পায়ের নীচে। চিঠির তাড়া কুড়িয়ে নেবার জন্য যখন ও নীচু হল তখন লক্ষ্য করলাম, ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে, চোখ দুটোও বেশ লাল। ছি ছি, সামান্য কারণে ওরকম উত্তেজিত হওয়া মোটেই উচিত হয়নি আমার—আত্মগ্লানি জাগে মিঃ তোম্‌শার মনে। ছেলেটিকে সত্যিই ভালবাসি আমি, অথচ হঠাৎ কেমন চটে উঠে অপমান করলাম ওকে!

আর একখানি মুখ ভেসে ওঠে মিঃ তোম্‌শার মনে—সহকর্ম্মী ওয়াঙ্কল্‌এর শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ। বেচারী ওয়াঙ্কল্! মনে মনে বলেন মিঃ তোম্‌শা, ও চেয়েছিল ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা হতে, কিন্তু ঐ পদটা পেয়ে গেলাম আমি। ঐ চাকরিতে প্রমোশন পেলে বছরে আরও কয়েক শো ক্রাউন বেশী আয় হত ওর এবং ওর অর্থের দরকারও খুব। ছ'টি ছেলেমেয়ে ওর—শুনেছি, বড় মেয়েটিকে ভালো করে গান শেখাবার ইচ্ছে, কিন্তু সে সঙ্গতি নেই ওর।···ওকে টপ্‌কে ওপরে উঠে গেলাম আমি, কারণ লোকটা তেমন চালাক চতুর নয়, শুধু খেটে মরে গাধার মত। ওর স্ত্রী অত্যন্ত উগ্র মেজাজের, রোগা চিম্‌শে চেহারা, সব সময় মুখে বিরক্তির ভাব। অভাব অনটনের সংসারে মেজাজ ঠিক রাখা অবশ্য কোন গৃহিণীর পক্ষেই সম্ভব নয়। দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় শুক্‌নো রুটি ছাড়া আর কিছুই জোটে না ওয়াঙ্কল্‌এর। মনটা বেদনায় টন্ টন্ করে ওঠে মিঃ তোম্‌শার। হতভাগ্য ওয়াঙ্কল্! বেচারী যখন দেখে ওর চেয়ে আমি মাইনে পাচ্ছি ঢের বেশী—যদিও পরিবার পোষণ করার দায়িত্ব আমার নেই, তখন আমার ওপর ওর মনটা বিষিয়ে ওঠে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমার দোষই বা কী? ও যখন আমার দিকে তাকায় তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তখন ভারী অস্বস্তি বোধ করি আমি।

দারুণ অস্বস্তিতে কপালটা ভিজে ওঠে ঘামে—হাত দিয়ে কপালটা মুছে ফেলেন মিঃ তোম্‌শা। মনে মনে বলেন, হ্যাঁ, হোটেলের সেই চাকরটাও আমার ওপর চটেছিল খুব। লোকটা কয়েক ক্রাউন ঠকিয়েছিল আমায়। মালিককে ডেকে বললাম সে কথা, আর মালিক তাকে বরখাস্ত করলে সঙ্গে-সঙ্গে। "চোর···বদ্‌মায়েস—বেরিয়ে যাও এখান থেকে," রাগে গর্জ্জন করে ওঠে মালিক, "প্রাগ্‌এ যাতে কেউ তোমায় চাকরি না দেয় সে ব্যবস্থা আমি করবো।" লোকটা নিঃশব্দে চলে গেল একটিও কথা না বলে। বেচারী নিতান্ত অভাবগ্রস্ত—না খেয়ে শরীরটা যে তার শুকিয়ে গিয়েছে তা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

বিছানায় বসে থাকা অসহ্য মনে হয় মিঃ তোম্‌শার। বেতারযন্ত্রের পাশে এসে বসেন গান শুনে মনটাকে একটু হাল্কা করবেন বলে, কিন্তু যন্ত্র তখন নীরব—নিস্তব্ধ রাত্রির মাঝে সেও যেন মৌন হয়ে রয়েছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকেন মিঃ তোম্‌শা, মনের মধ্যে এসে ভীড় জমায় যত সব অদ্ভুত তুচ্ছ মানুষ—যাদের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি।

সকালবেলায় থানায় এসে হাজির হন মিঃ তোম্‌শা। মুখখানা বিবর্ণ, চোখের চাউনিতে অস্থিরতা।

"বলুন তো মশাই, আপনার ওপর আক্রোশ থাকতে পারে এমন কা'রো কথা মনে পড়ল কি আপনার?" জিজ্ঞেস করেন পুলিস ইন্‌স্পেক্টার।

মিঃ তোম্‌শা মাথা নাড়েন। ইতস্ততঃ করে বলেন, "না, কারো কথাই মনে করতে পারছি না।···দেখুন, এত বেশী লোকের আমার ওপর আক্রোশ থাকতে পারে যে তাদের মধ্যে কে যে···"

হাতের একটা ভঙ্গী করে নিজের অসহায়তা জ্ঞাপন করেন মিঃ তোম্‌শা। "আসল কথাটা এই যে, কত লোকের যে আপনি ক্ষতি করে থাকতে পারেন, তা বলা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। দেখুন, আর কখনো ঐ জানলার ধারে বসবো না আমি। আমি এসেছি আপনাকে অনুরোধ করতে এ নিয়ে আপনি যেন আর অগ্রসর না হন।"

পর্জন্য-সূক্ত

[ঋগ্‌-বেদ— পঞ্চম মণ্ডল; ত্র্যশীতিতম সূক্ত।

অনুবাদে কিছু পুনরুক্তি লক্ষিত হইবে। মূল সূক্তেও ঐরূপ আছে।

প্রথম স্তবকে ঋষভ শব্দটির অর্থ জল-বর্ষণকারী। ষষ্ঠ স্তবক মরুৎ-দেবতাদের উদ্দেশে পর্জন্য বৃষ্টির দেবতা এবং মরুৎগণ ঝড়ের দেবতা। সুতরাং এই দুইয়ের একত্র সমাবেশ খুব স্বাভাবিকই।]

অনুবাদক—শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

১

হে ঋত্বিক!
আহ্বান কর সেই পর্জন্যদেবকে
সকল শক্তির যিনি আধার;
চর্চা কর তাঁর
স্তুতি দ্বারা নমস্কার দ্বারা হবির্যুক্ত অন্ন দ্বারা।
গর্জনাকারী ক্ষিপ্রদান বৃষভ পর্জন্যদেব
বীজ-গর্ভিত করেন ওষধিকুলকে
প্রাণের বর্ষণে।

২

প্রতাপে তাঁর
মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গাছপালা

অন্ধকারের দস্যুরা হারায় প্রাণ।
সমস্ত সৃষ্টি তাঁর বজ্রভয়ে কেঁপে উঠে,
অপাপ যারা তারাও কাঁপে ভয়ে।
দুষ্কর্মাদের, হনন করেন পর্জন্যদেব
তাঁর ঘন ঘোর বজ্রের গর্জনে।

৩

রথী যেমন অভিচালিত করে তার রথাশ্বকে
কশার আঘাতে
তেমনি
পর্জন্যদেব
চালিত করেন বৃষ্টির দূতগণকে
পৃথিবীর দিকে।
দূর থেকে ভেসে আসে সিংহের গর্জন
যখন বর্ষণ-মেঘে ভরে যায়
আদিগন্ত আকাশভূমি।

৪

বাতাস আজ উদ্দাম,
দিকে দিকে ছুটে চলেছে বিদ্যুতের শিখা,
প্রোথিত হয়ে উঠেছে ওষধিদল;
পৃথিবী আজ জগদ্ধাত্রীমূর্তি;
পর্জন্যদেব
আজ অভিষিক্ত করেছেন পৃথিবীকে
বিপুল প্রাণের বন্যাস্রোতে।

৫

পর্জন্যদেব আজ সুব্রত:
পৃথিবী নিত্য করেন তাঁকে নমস্কার;
তাঁর আগমনে
হৃষ্ট হয় গৃহপশুরা;
তৃণলতা হয়ে উঠে বহুবর্ণ বিচিত্রবর্ণ।

৬

হে মরুৎগণ!
আকাশ থেকে দিয়েছ বৃষ্টি
আমাদের কল্যাণের জন্য;
বৃষ্টি দিয়েছ
ধারাকারে দিকে দিকে
সমস্ত আকাশ মেঘে আবৃত করে।
এই গম্ভীর-স্তনিত মেঘের সঙ্গে
এস আমাদের দিকে,
পালন কর আমাদের ঘন বর্ষণের ধারায়।

৭

এস আমাদের দিকে
হে স্তনিত-গম্ভীর!
এস তোমার মেঘের রথে দিক হতে দিগন্তর ছেয়ে
জলভারনত মেঘেরা আসুক,
তাদের বর্ষণে
পৃথিবীর বুকে উঁচু নীচু সব সমান হয়ে যা'ক;
গর্ভিত হ'ক বৃক্ষ, লতা, ওষধি।

৮

উন্মোচিত হ'ক
জলাধার মেঘের মুখ;
দৃপ্ত বেগে বহে চলুক প্রবুদ্ধ নদ ও নদীরা;
স্বর্গ ও মর্ত
পরিপূর্ণ হ'ক প্রাণের সত্ত্বে;
পালিত পশুরা তৃপ্ত হয়ে উঠুক
অজস্রধার তৃষ্ণার জলে।

৯

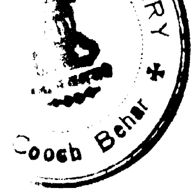
হে পর্জন্য!
তোমার অত্যন্ত নিনাদে
ধ্বংস হ'ক পৃথিবীর পাপকর্মাদের।
বিশ্বজগৎ আজ আনন্দে পরিপূর্ণ;
আনন্দে পরিপূর্ণ আজ আমাদের জীবলোক।

১০

হে পর্জন্য!
রসহীন এই পৃথিবীর বুকে বর্ষণ করেছ;
আজ আমরা
অবাধে চলে যেতে পারি
শুষ্ক মরুর বুকের উপর দিয়ে;
পৃথিবী আজ শস্য-সম্পদে পরিপূর্ণা;
পর্যাপ্ততায় পরিপূর্ণ তোমার সন্তানেরা;
সার্থক আজ তোমার দান!

।

সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা



শ্রীসতীরঞ্জন রায়

চর্যার কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বৈচিত্র্যময় সাহিত্য দিয়ে পূর্ণ করা হয়েছে সাহিত্যের ভাণ্ডার। সাহিত্যের আদিযুগের সাহিত্য-দপ্তরে সাধন-সিদ্ধির বিশ্লেষণ, সামাজিক পরিচিতির পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে যুগের সমাজ চেতনায় প্রতিটি মানুষের মঙ্গলামঙ্গল অপরের সংগে জড়িত ছিল না। পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে শিষ্য তার গুরুলব্ধ জ্ঞানে ও পথে একাগ্রচিত্তে সাধনা করে চলতো। তাই সেখানে সমাজের অপর মানুষের সহজ প্রবেশাধিকার ছিল না বলেই জ্ঞানভিক্ষু সাধু সন্তদিগের অন্তরে তাঁদের পরিচয় সেদিন লিপি-বদ্ধ হয়নি। সাধুসন্তগণ আত্মকেন্দ্রিক আচরণবিধির আবরণে আচ্ছাদিত ছিল। তাঁদেরই ধ্যান ধারণার কথা মানবের পূর্ণতর সমাজে না হোক বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে সংগীতের মাধ্যমে প্রচার করেছেন। সেই যুগের সংগীতের এই একক ধারা বহুমুখী হ'য়ে সাহিত্যের মধ্যনদীতে এসে উপস্থিত হলো। আজ সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা স্তিমিত। কিন্তু রেখাটি তার সূক্ষ্মতর হয়ে বহুদূরে সরে গিয়েছে। চর্যা-সাহিত্য বিশেষ একশ্রেণী কর্তৃক রচিত হলেও, সাধারণ সমাজের বিশেষ সম্প্রদায়ের যে সৃষ্টি সে কথা অস্বীকার করবার কিছু নেই, সাহিত্যেও মধ্যযুগ সাধারণ-সম্প্রদায়ের সাহিত্য সাধনারই যুগ। মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়েই কবি-গণের যাত্রা সুরু। চর্যার যুগের ভাবধারা সহজতর হয়ে মানব সমাজের কাছে আজ বোধগম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন মঙ্গলকাব্যের কবিবৃন্দ। বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীর সমষ্টি-জাত রসায়ন এই মঙ্গলকাব্য। মানুষ তখনো নিজের কথা বলতে শেখেনি, অলৌকিক কাহিনীর মধ্যেই রং চড়িয়েছে। তাই সাহিত্যের আদিরসের সংগমস্থলে নর এসেছে, নারী এসেছে. কিন্তু আসেনি শিশু। সমাজের কোনো প্রয়োজনে যে শিশুদের একটা ভূমিকা থাকতে পারে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তার কোনরূপ ইঙ্গিতই পাওয়া যায় না। নিজের কথা সেইযুগের কবিগণ বলতে শিখলে সাহিত্যের মধ্যে ঘরের কথার প্রতিরূপ স্পষ্ট হ'য়ে প্রতিবিম্বিত হতো। অবশ্য কোন কোন কবি পৌরাণিক কাব্যগাথার এখানে সেখানে ঘরের সহজ প্রকৃতি বেদনা-আনন্দ-মাধুরিমার রঙে রাঙিয়ে রেখেছেন।

চৈতন্যোত্তর যুগে রাধাকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণের বাল্যলীলার পরিচয় পাওয়া যায়। রাখাল-বেশী কৃষ্ণের জন্য মা যশোদার আকুল আহ্বানের কথার উল্লেখ আছে। এখানে যে ভূমিকায় কৃষ্ণকে রূপায়িত করা হয়েছে, তাতে বালকৃষ্ণকে না ফুটিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ফুটিয়ে তোলবার প্রেরণা থাকায় বালকৃষ্ণকে আমাদের ঘরের ছোট শিশুর মত ভাবতে পারি না।

সমাজের বিচিত্রতর জটিলতা প্রতিটি মানুষের মধ্যে ছিল না। সে যুগের চিন্তায় যারা ছিল বিপ্লবী—তাদের মধ্যেই কেবলমাত্র জটিলতার কঠিন গ্রন্থি অনুভব করা যায়। তারাই ভেংগে দিয়েছে সমস্ত সীমা, সমস্ত সংস্কার। সেইজন্য মানুষের চিন্তায় সাধারণ বা অসাধারণ শিশু-বালকদের সাহিত্যের পর্যায়ে টেনে আনবার কথা মোটেই দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। মানুষ শুধু আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে আদিরসের স্পর্শে রঙিণ হয়ে দিন অতিক্রম করেছে। বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে তারই প্রতিফলন বহু কবির কাব্যে এই যুগে বিস্ময়কর বলেই মনে হবে।

উনবিংশ শতকে সাহিত্যের প্রকৃত হাট বসেছে। সাহিত্যের বাজারে আড়ম্বর-অনাড়ম্বর অলংকারে সজ্জিতা সাহিত্যসুন্দরীর দল স্বয়ম্বরার মত বরণডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে রয়েছে জীবন-বোধ, নরনারীর আবরণ ছিন্ন করে শিশুদের মিছিল ভীড় করে এসেছে সাহিত্যের বাজারে। সাহিত্যে শিশুর ভূমিকা প্রসঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য যুগের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে এমন দু'টি নাটকের নাম করা যায়, যাদের মধ্যে শিশুর ভূমিকা একেবারে মূল্যহীন নয়। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটকে চারুদত্তের পুত্র রোহসেন অল্পবিস্তর মূল্যবান এক ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের শকুন্তলার পুত্র ভরতের ভূমিকাও কম আকর্ষণীয় নয়। মাটির শকটকে কেন্দ্র করেই মৃচ্ছকটিক নাটকের সূত্রপাত। রোহসেন মাটির গাড়ীর বদলে সোনার গাড়ীর জন্য বায়না ধরেছে। দাতা চারুদত্ত দরিদ্র, কিন্তু অপরের কৃপার দান তিনি কখনও গ্রহণ করেন না। বসন্তসেনা পুত্রের ক্রন্দন শুনে নিজদেহের সমস্ত অলংকার রোহসেনের মাটির গাড়ীতে দিয়ে বলে যায় সোনার গরুর গাড়ী তৈরী করে নিতে। পরমুহূর্ত থেকেই ঘটনার বৈচিত্র্যও জটিলতা দেখা দেয়। চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার সময়ও আর একবার রোহসেনকে ঘটনা ক্ষেত্রে টেনে আনা হয়েছে করুণরসের সৃষ্টি করতে। শূদ্রক অতি সুন্দর ও নিপুণভাবে রোহসেনের ভূমিকাটি সৃষ্টি করে ঘটনার প্রয়োজন অতিকৌশলে মিটিয়েছেন। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকে ভরত এক অপূর্ব চরিত্র। শরৎচন্দ্রের পণ্ডিতমশাইএর চরণ যে ভূমিকায় অবতীর্ণ, ঠিক একইরূপ ভূমিকায় দেখা যায় ভরতকে। চরণ ছিল পিতামাতার মধ্যে মিলনের সেতুস্বরূপ, আর অভিজ্ঞান শকুন্তলম্এ ভরত দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে যেন মিলনের সূত্র। কালিদাস অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন ভরত চরিত্র রূপায়ণের অপূর্ব কৌশলের সাহায্যে।

যারা সাধক, তাঁরা শুধু নিজেদের মধ্যে সমাধিমগ্ন থাকতে ভাল-

বাসেন। তাঁদের কথা, তাঁদের চিন্তা শুধু তাঁদেরই। তাঁদের ভাষা এবং সাহিত্য সবসময় সর্বজনের জন্ম নয়। তবে মানুষ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে তাঁদেরই ভাষা ও সাহিত্যকে আপনার করে নিয়ে। তাই হয়েছে সেই যুগে। বর্তমানযুগ সেই এককের যুগ থেকে সরে এসে দশের কথা বল্তে শিখেছে। আজ ভাবলে বিস্মিত হতে হ সেই যুগেও দশের কথা বলবার নাট্যকারের অভাব ছিল না। ত নরনারীর কথা বলেছেন এবং সেই নরনারীর মধ্যে শিশুদেরও স্থ রেখেছেন।

সেণ্টিমেণ্টাল

শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়

"কোন কবিতার কুসুমে ভরেছ
মন ফুলদানিটিরে ?"
"যে মাধুরী কাঁদে মুখর অতীতে
তারই ছল ছল নীরে
সিঞ্চিত করি প্রেম কবিতার
শিথিল বৃন্তটিরে
যতনে জীয়াই রঙের বাহার
মন ফুলদানি ঘিরে।"

"হে উদাসী কবি খোল, খোল আঁখি
শোন এ বর্তমান
সমুখে সুদূরে যে বাণী গুমরে
গাহে তারই জয়গান
দুর্মর তার দুর্জয় আশা
যন্ত্রযুগের সাগ্নিক ভাষা
পশেনি কী তব নীরন্ধ্র কানে
বাজেনি স্পন্দমান ?
আঁখি মুদে কবি পিছু ফিরে চল
ধীর পদাঙ্কে ধীরে
এলিজির ছাঁচে মমি গড় বসে
মরা অতীতের তীরে।"

"যে মাধুরী কাঁদে মুখর অতীতে
তারই ঢুল ঢুল নীরে
নিজেরে ডুবাই নিজেরে ভাসাই
চেনা জাহাজের ভীড়ে।

পূর্বাচলের সূর্যের ঝাঁঝ
ঝলসায় মোর অঙ্গন মাঝ
ভুল করে পোঁতা ডালিয়ার গাছ
শেষ গ্রীষ্মের শেষে।
শীত সায়াহ্নে বসিয়া বসিয়া
তুমি যারে ভালোবেসে।

আজিকার আজ কাল হবে সাঁঝ
সে কথা বন্ধু জানো
কাল হবে কাল অতীতের জাল
সে কথা বন্ধু মানো ?
ফুটো ফুটো সেই জাল পথবেয়ে
লাল-নীল-পীত ওই আসে ধেয়ে
কত বিচিত্র দিনের নৃত্য
স্মৃতি সমুদ্র তীরে।
যে মাধুরী কাঁদে মুখর অতীতে
তারই ঢুল ঢুল নীরে।

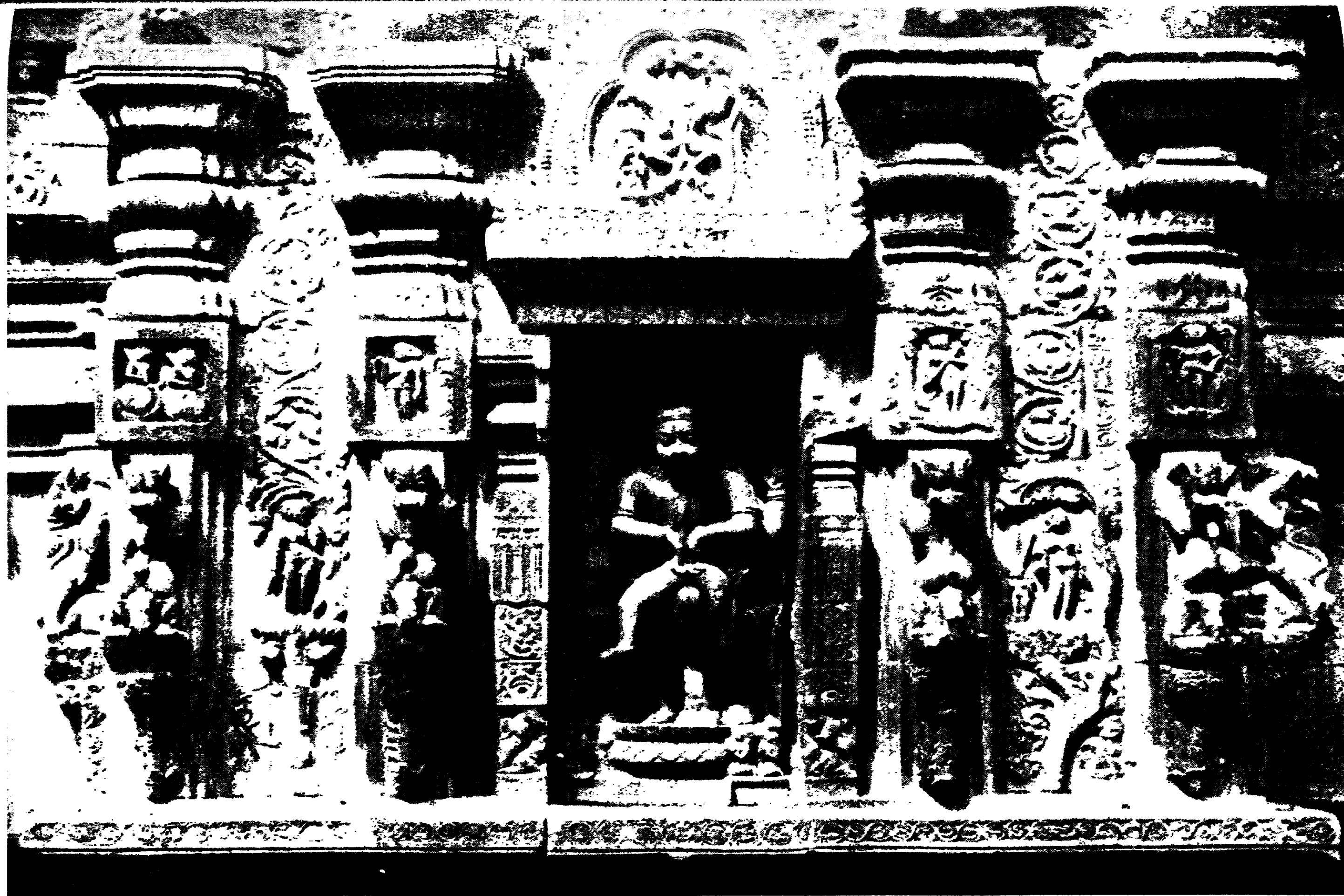
যা পেয়েছি তাই রাখি কোন্ ঠাঁই
নূতনে পাওয়ার আগে
যারে নাহি চাই তারে বল ভাই
রাঙাই সে কোন রাগে ?
তাই কবিতার কুসুমে ভরিয়া
মন ফুলদানিটিরে
প্রবীণে সাজাই নবীনের সাজে
মরা মাধুরীর তীরে।



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মায়ার বাঁধনে

ফটো : অমল সেনগুপ্ত



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

মায়ার প্রকাশ

(নৃসিংহ অবতার—সিংহাচলম)

ফটো : প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুকানের ঢপ

শ্রীজয়দেব রায়



হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রভাব বাংলাগানে সঞ্চারিত হইতে শুরু করে নিধু-বাবুর আমল হইতে। টপ্পা ভঙ্গিমা ক্রমে সমগ্র বাংলা গানের প্রধান রীতি পথ হইয়া উঠিল। কিন্তু কীর্তনের অনুশাসনও বাঙ্গালী গায়করা সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, এমনিতেই কীর্তনের চিরপরিচিত সুর ছাড়া অন্য কোন সুর শ্রোতাদেরও মনোমত হইত না। এই প্রকার যুগসন্ধিকালে আবির্ভাব মধুসূদন কিন্নরের।

মধুসূদনের গানও উচ্চাঙ্গের সুরমণ্ডিত। কীর্তন রীতিতে টপ্পার বৈচিত্র্য আনিয়া তিনি 'ঢপ' কীর্তন নামে একটি সময়োপযোগী রীতির প্রবর্তন করিলেন। কীর্তনের সৌন্দর্য আখরে, টপ্পার সৌন্দর্য তানে, মধুসূদনের ঢপ কীর্তনে উভয় রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

কিন্নর বা 'নট' নামক একটি প্রাচীন জাতি ছিল; এই জাতির উপজীবিকাই ছিল নৃত্যগীত। রাজারাজড়াদের সভায় তাহারা স-সম্মানে স্থান পাইত। মধুকান এই কিন্নরকুলে জন্ম গ্রহণ করেন।

এই জাতির সম্পর্কে ঐতিহাসিক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন—"ইহারা পাঠানদিগের অত্যাচারে গরিবপুর (নদীয়া) হইতে উঠিয়া যশোহর জেলার যাদবপুরের দক্ষিণে সামটা ও উলসী প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী হন। সেখানে ৪।৫ শত ঘর ছিল, এখন একমাত্র উলসী গ্রামে ১৪।১৫ ঘর আছে, তন্মধ্যে আবার পুরুষের সংখ্যা বড় কম। স্বল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ জন্য ক্রমে এই জাতির লোপ হইয়াছে।"

বর্তমানে কিন্নরেরা অধিকাংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। মধু-কানের দলের সদস্য তাঁহার প্রিয় শিষ্যদ্বয় হৃদয় এবং উদ্ধবও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যের উভয় মধুসূদনই সমসাময়িক; উভয়ের জন্ম-একই জেলা যশোহরে। মাইকেল জন্মগ্রহণ করেন ১২৩০ সালে, কিন্নর ১২২৫ সালে। মাইকেল ছিলেন ধনীর সন্তান, বিদ্যাচর্চার ও অভিজাত মহলে মিশিয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্নর ছিলেন দরিদ্রের সন্তান, লেখাপড়ার বিশেষ কোনই সুযোগ তাঁহার হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীত শুনিয়া সেকথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

সুর চর্চায় তাঁহার হাতে খড়ি হইয়াছিল ঢাকার বিখ্যাত ওস্তাদ ছোট খাঁ—বড় খাঁ-র নিকটে।.. ধ্রুপদ চর্চার যেমন পশ্চিমবঙ্গে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে ঘরোয়ানা সৃষ্টি হয়, খেয়াল অঙ্গের গানের ঘরোয়ানাও তেমনই প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায়। মধুকান ঢাকায় খেয়াল শিখিতে শুরু করেন। পরে যশোহরের রাধামোহন বাউলের কাছে তিনি নূতন পথের নির্দেশ পাইলেন।

হিন্দুস্থানী খেয়ালের সুরকে বাংলা গানে ব্যবহার করিয়া নবধারার গানের সূচনা করিতে রাধামোহন উদ্যোগী হন। তাঁহার কবিত্বশক্তি ছিল না, মধুকানের কবিত্বশক্তির সঙ্গে তাঁহার সুর রচনা শক্তির শুভ সম্মিলন ঘটিল। মধুসূদন শব্দাড়ম্বরের কবি, সেকালের প্রথানুযায়ী শ্লেষ যমক, অনুপ্রাস, উপমাদির অলঙ্কারে তাঁহার গানগুলি ভরপুর।

মধুকান তাঁহার জীবিতকালেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সুনাম প্রচারিত হয়। নানাস্থান হইতে তাঁহার দলের আমন্ত্রণ হইত।

বৃন্দাবনলীলাই তাঁহার গানের উপজীব্য; রাধাকৃষ্ণের মিলন বিরহ লইয়া সে সময়ে আর পদাবলী রচিত হইত না; তাহা সত্ত্বেও এগুলিকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর পদাবলী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

বৃন্দাবন অন্ধকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, যমুনায় আর সে জলকল্লোল নাই, কদমের শাখায় শাখায় শিখীদের আর নৃত্য নাই, বনে বনে আজ পাখীর কণ্ঠ নীরব, ফুল ফুটিয়া আজ আপনিই ঝরিয়া যাইতেছে মালা গাঁথিবার মনোবাসনা কাহারও নাই। বিরহ শয়নে শ্রীমতী একা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, তাঁহার মুখে কথা সরিতেছে না—

এখন বনে বনে বনে, যে কুস্বরে পঞ্চম স্বরে,
পঞ্চ স্বরে আর পদ না স্বরে,
যেন মারে বনে বনে মারে মারে সয় না প্রাণে,
প্রাণ হারাতে এলাম এ কাননে,
বিনা শ্যামের বাঁশীর স্বরে, কইতে কথা মুখ না সরে,
যদি সরে হাহাকার রবে॥

সর্বাপেক্ষা বেশি দুঃখ মায়ের প্রাণে, তাঁহার আদরের কানাই আজ মথুরার রাজা, সেখান হইতে ক্ষীর, ননী খাইবার জন্য সে তো আর কোনো দিন গোকুলে গোপালয়ে ছুটিয়া আসিবে না, মায়ের প্রাণ চিন্তায় ব্যাকুল—

যে থাকে না তিলেক ছেড়ে সে আমায় গিয়েছে ছেড়ে
জানলে ফিরে দিতেম ছেড়ে গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতেম সে দিনই॥
ওমা, যাই, যাই বলে, কারে বা শুধায় গো,
নে রে খা রে ক্ষীর ননী, কে তারে বা কয় গো,
কারে বা বলে জননী, কেবা দেয় ক্ষীর নবনী
খায় কিরে সে ক্ষীর ননী॥

সখীরা অভিশাপ দিতেছে সেই ক্রুর অক্রুরকে। সে যদি না আসিত তবে সুখের বৃন্দাবনের লীলারঙ্গ এভাবে অকালে ভাঙ্গিয়া যাইত না। রথের অশ্বদের দেখিয়া ভয় লাগিতেছে বলিয়াই তাহারা রথ আটকাইতে পারিল না। তাহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইচ্ছা না করিলে কি অক্রুর তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারে?—

একবার মনে করেছিলাম হয় গিয়ে হয় ধরি,
হেরিয়া তুরঙ্গ রঙ্গ আতঙ্কেতে মরি,
একবার ভাবি ধরি চক্র, ঘুচাই অক্রুর চক্র,
এখন দেখি চক্রীর চক্র, তুমি এত চক্র রাথ ॥

বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অক্রুরের রথ চলিয়া যাইতেছে, পশ্চাতে গোপীরা তাহাদের লীলার সাথীকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে কাঁদিয়া আকুল। আর তো কোনদিন যমুনাপুলিনে বাঁশীর প্রাণ-মাতানো রব উঠিবে না, আর কোনদিন কদম কেশরে ফুলশয়ন রচিত হইবে না, আর তো কোনদিন গোঠে ফিরিয়া আসা ধেনুদের ক্ষুরের ধূলার ফাগে গোঠপথ ভরিয়া যাইবে না। সখীরা আজ বিবশ বেশে অলস হইয়া বসিয়া আছে। আজ আর ধেনু চরাইবার আয়োজন নাই। আজ আর গুঞ্জাফলের মালা গাঁথিবার উৎসাহ নাই—

সব রাখাল লয়ে পাল দেখলাম ভূমিতে শয়ন।
পড়ে আছে গাভীর গায় গায় ;
কেহ কেঁদে কালার গুণ গায়,
কেহ বলে আর ময়না গায়, ত্যজিগে জীবন ॥

উপরের গানটি ঝিঁঝিট মধ্যমানে রচিত।

রাধাকে লইয়া সখীরা এলেন মথুরার রাজপুরে ; যে কৃষ্ণ রাধার দাসানুদাস হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য দ্বারীর পায়ে ধরিয়া সখীদের খোসামোদ করিতে হইতেছে—

তোমরা যেতে বল তীর্থে, তীর্থবাসী যায় গো তীর্থে '
ত্রিজগৎ যাচে যে তীর্থে, সেই তীর্থে এসেছে দ্বারি।
শুনেছ যে রাধাকৃষ্ণ দেখ নাই দ্বারি,
দেখ নিত্যপুরে নেত্র সেই রাধাপ্যারী ;
আগে কৃষ্ণ পেয়েছিলে, তাইতো এখন রাইকে পেলে,
পেয়ে আর যেও না ভুলে, যদি যুগল দেখবে দ্বারি ॥

সখীরা দ্বারকার রাজা শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীমতীর কথা নিবেদন করিতেছে —'তোমার বিহনে তার কি দুর্দশা হয়েছে দেখবে চলো'—

রাধা যদি মরে ওহে রাধানাথ,
কে আর বলিবে তোমায় রাধানাথ ?
মনে ভাবি তাই শ্রীদ্বারকানাথ,
রাধানাথ হ'লে বাঁচাতে রাধারে ॥

দেবকীর দুঃখ ও কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন নারী-হৃদয়ের চিরন্তন ঈর্ষ্যার ইঙ্গিত দিয়া—

পেয়ে তুমি যশোদা মায়, ভুলে গেছ মায়,
মায় পাসরি আসতে নার দেখিতে আমায় ;
কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, বেঁধেছিল যুগল করে,
সেই দুঃখেতে মরি ওরে, পাঠিয়ে দিত গোচারণ ;
ধেনুর সঙ্গে বনে বনে,
তাতে কত পেয়েছিস বেদন।
ডুবেছিলি কালীদহে, শুনে প্রাণ দহে,
বেড়েছিল দাবানলে, আর এত কি সহে,
সুদন বলে ও দেবকী, আর পরিচয় দিব বা কি,
যে সুখেতে ছিলেন নারায়ণ ॥

আবার যশোদাও অপেক্ষা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ আজ নূতন মা পাইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—

সে কি আমার থাকিবার ছেলে, ত্যাজ্য করে মা,
সবাই মিলে বলেছে মা,
ঐ দেবকী মা মা : মা পেয়ে ভুলেছে মারে,
আর কেন ডাকিবে আমায়ে, বুঝব এবার মায়ে মায়ে,
সেই হবে মা, গোপাল মা কবে যারে ॥

মধুসূদনের পর তাঁহার দল তাঁহার ভগ্নাগণ কিছুদিন চালাইয়াছিল। তাহাদের প্রভাবে কালক্রমে ঢপ-মেয়েদের গানের দল বা ঢপওয়ালীদের দল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণব ভিখারিণীরা চিরকালই গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে মধুকানের ঢপ গাইয়াই জীবিকা অর্জন করিয়া গিয়াছে।

ঢপ গানে দুইটি ভাগ—কীর্তন ও তুক্ক। সাধারণ কীর্তনের ন্যায় বাঁধা ধারা পালা ভাগ করিয়া মহাজন পদাবলী ইহাতে গাওয়া হইত না বটে, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার গানই ছিল ঢপের অবলম্বন। কীর্তনের আঁখরের ন্যায় ঢপে গদ্যাশ্রিত বাচন থাকিত, তাহাকে বলে 'তুক্ক'।

এই সকল তুক্কে কবিরা নানাভাবে নাটকীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেন। কলঙ্কভঞ্জন পালা হইতে কতটা তুক্ক উদ্ধৃত করা হইল—

শ্রীমতী—কস্মাৎ বৃন্দে প্রিয় সখি, কোথা হতে এলে ?

বৃন্দা—হরে পাদপদ্মাৎ—হরির পাদপদ্ম হতে।
শ্রীমতী—কুত্র সঃ—কই তিনি ?
বৃন্দা—কুঞ্জারণ্যে—কুঞ্জের তীরে।
শ্রীমতী—কিমৎনে। কুরুতে,—কি করেছেন তিনি ?
বৃন্দা—নৃত্য শিক্ষাং কুরুতে—নৃত্য শিক্ষা করছেন।

ঢপগানে গায়ককে পাঁচালীর ন্যায় একাই বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করিতে হইত। কে উক্তি করিতেছে তাহা প্রথমে বলিয়া দিয়া গায়ক বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন ভঙ্গীতে অভিনয় করিত। পাঁচালীর পালার ন্যায় কিন্তু ঢপের পালায় পারস্পরিক যোগসূত্র ছিল না ; যাত্রার ন্যায় ঢপের পালাতেও সংলাপ ছিল।

অক্রুর সংবাদ পালা হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিলে দেখা যাইবে কি ভাবে সামান্য দুই একটি কথায় গানগুলিকে গ্রন্থন করা হইয়াছে—

তখন—উন্মত্তা গোপী ধায় বসন নাহিক গায়,
ধায় রাধা যেন পাগলিনী।

আলুথালু কেশে যায় আর কাঁদি কাঁদি কয়,
কোথা গেলে পাব গুণমণি ॥
আহা—একে ব্রজের কঠিন মাটি
তাহে কমল কোমল পদ দুটী ॥

তখন ললিতা রথের সান্নিধ্যে গিয়া কহিতেছেন—

রথ রাখ অমনি ও মুনি হেরি গুণমণি,
যবে নিলে নীলকান্তমণি, ঐ এল সেই চাঁদবদনী ॥

তথাপি রথ স্থগিত করিলেন না। তখন শ্রীবৃন্দা আসিয়া কহিতেছেন—

দাঁড়াও হরি এল প্যারী, সকলে বদন হেরি ॥

তথাপি রথের গতি নিবৃত্ত হইল না। তখন বিশাখা—

রথ রাখ সারথি দেখাও রথি
দয়া নাহিক এক রতি।

তথাপি রথবেগ স্থগিত হইল না। তখন শ্রীরাধিকা রোদন করত কহিতেছেন—

রথ রাখ নন্দসুত।
বদন হেরি হে জন্মের মত ॥

আশ্বিনের চিত্রকল্প

সুনীল বসু

রোদ্দুরের পাড় দেওয়া মেঘের শাড়িতে
হুয়েছে আঁচল কার পাহাড়ে থাড়িতে।
কাশফুলে শাদা হাসি, জলে হাট মাঠ
দিগন্ত খোলে আজ সোনার কপাট।

বিকেলে আকাশ হবে সলজ্জ রঙ্
নদীর তন্ত্রীতে বাজে গৌড় সারং।
দিগন্তের চালচিত্রে তারার জরির
গাঁথা হবে ছোট ছোট লাল নীল তীর।

তারপর সারা রাত আশ্বিনের ঘরে
আনন্দের খুশি ফুল সোনা হয়ে ঝরে ;
স্বপ্ন কুটীর, নিকনো মাটির দাওয়ায়
একরাশ যুঁই ফুল কম্পিত হাওয়ায়।

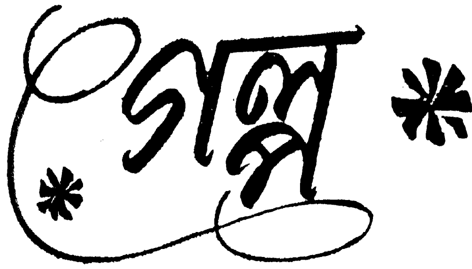
ট্রেনে করে দূরে এসে কাকে কাছে পেয়ে
জোছনার জলোচ্ছ্বাসে যাব গান গেয়ে।
হারিকেনের সলতেটা কমিয়ে নিভৃতে
মনে তার আলো চাই স্বপ্নে জেলে দিতে ॥

ব্যর্থ পরিক্রমা

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

কাগজ রঙা নকল ফুলে ঘর সাজাই,
কুসুমের দিন গেল কী বিস্মরণে ?
মেকি জীবনের রূপ দেখি বারে বারে :
ঝলসানো আলো—মায়ামৃগ ক্ষণে ক্ষণে !
সজীব মনেরে মৃত্যু দিয়েছে ঢেকে,
শুষ্ক তৃণে প্রাণের বিন্দু নাই—
ক্যামোফ্লেজ রূপ আজকের সম্ভার,
জানিনা বন্ধু, আমরা কী আজ চাই !

দ্রুত জীবনের তপ্ত মুখর স্রোতে
অন্ধ হয়েছি কিসের অন্বেষণে ?
মুখোস-লাগানো এই যে মিছিল চলে
কী হবে তার গভীর বিশ্লেষণে !
স্নিগ্ধ সবুজ রস সঞ্চারি মন
ডুবেছে অতল গহন অন্ধকারে ;
প্রলাপ জড়ানো অলীক স্বপ্ন চোখে
কারে খুঁজে মরে প্রতিদিন বারে বারে !
তবু হৃদয়ে আশার সূর্য্য জাগে,
থামবে নাকি তিক্ত এ পরিক্রমা ?
জোনাকীর আলো কতটুকু প্রাণ দেবে,—
হৃদয়ে যে আজ গভীর রাত্রি জমা।



বাসবীর মৃত্যু

সন্তোষকুমার অধিকারী

প্রথম দর্শনেই চমকে গেল ডক্টর জয়ন্ত রায়। বন্ধু অনিমেষের বাড়ী এসেছিলো সে চায়ের নিমন্ত্রণে। অনিমেষের একমাত্র বোন বাসবী। পোস্টগ্রাজুয়েটে দর্শনের ছাত্রী বাসবী দত্ত।

অনিমেষের বাপ ত্রিদিবেশ দত্ত মারা গেছেন মাত্র ছমাস আগে। জয়ন্ত তখন লণ্ডনে এল, আর, সি, পি, র জন্য তৈরী হ'চ্ছে। জয়ন্তর বাবা তাঁর বাল্যবন্ধু। মৃত্যুর আগে জয়ন্ত-বাসবীর যোগাযোগের ব্যাপারটাকে তিনি প্রায় পাকাই করে রেখে গেছেন। আর মেয়ের নামে রেখে গেছেন দক্ষিণ অঞ্চলে একটি বাড়ী।

কিন্তু সে কথা জান্‌তো শুধু অনিমেষ; আর কিছুটা বুঝি জয়ন্তও।

চায়ের টেবিলে বাসবীর আবির্ভাব পলকের জন্য। অনেকদিনের পর ভালো করে তাকে দেখবার সুযোগ পেলো জয়ন্ত। তার মনে হলো—একটি সুন্দর গোলাপ ফুল যেন রোদ না পেয়ে ফ্যাকাসে হ'য়ে যাচ্ছে। শুকিয়ে যাচ্ছে—এবারে ঝরে পড়তে পারে এমনি অবস্থা।

বাসবী হঠাৎ চলে যেতেই জয়ন্ত বললো—ও চলে গেল যে?

অনিমেষ উত্তর দিলো—বাবা যাওয়ার পর থেকেই এমনি হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে মিশতে চায় না। তুই দেখ্‌না—যদি ধরে আন্‌তে পারিস্‌।

কাজেই জয়ন্তও উঠে এলো ভেতরে—বাসবীর নিজের ঘরে।

—বাসবী।

পড়ার টেবিলটা সামনে রেখে চিৎ হয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিলো সে। হঠাৎ চমকে ফিরে তাকালো।

—আমায় বোধ হয় ঠিক চিন্‌তে পরোনি তুমি। কি বলো? সে কতদিন আগের কথা। আমি যখন লণ্ডন যাই তখনও ত' ফ্রক পরছো তুমি!

—না, না, বাসবীর কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো। ফ্রক পরার উল্লেখে ও'র গালে রক্তাভা জেগেছে। সোজা হয়ে বসে বললো—আপনি ত মাত্র সেদিন গেলেন। আর ফ্রক পরা ছেড়েছি আমি ছোট-বেলায়।

—কিন্তু ব্যাড্‌মিণ্টন্‌ খেলবার সময়?

বাসবী ঝাঁকিয়ে উঠলো—শাড়ী পরতাম।

জয়ন্তর মুখে কৌতুকের হাসি। বললো—আমার মনে পড়ছে, একদিন সকলে মিলে সিনেমায় গিয়েছিলাম। আর তুমি যেন পায়ে শাড়ী জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলে?

—বারে? সে আমি নাকি? সে ত বৌদি।

—হ্যাঁ, তাই হ'বে। কোন্‌ হাউসে যেন আমরা গেলাম?

বাসবী বললো—মেট্রোতে।

—আজ আবার গেলে হয়না? সকলে মিলে। তুমি আমি, অনিমেষ, আর বৌদি।

—না। আমি সিনেমায় যাই না। বাসবী এলিয়ে পড়লো ইজিচেয়ারে। বললো ম্লানস্বরে—ভালো লাগে না একটুও। কি বিশ্রী যে লাগে···! আর তাছাড়া হাঁট্‌লে, বেরোলে বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে।

—তবে? কি করো রোজ? কলেজ আর বাড়ী?

বাসবী চাইলো বিষণ্ণ চোখে—ছেড়ে দিয়েছি কলেজ যাওয়া। কি হবে? কদিনের জন্যে পড়বো? কি করবো এম-এ পাস করে? বলুন ত জয়ন্তবাবু, কতদিন আমি বাঁচতে পারি?

—তুমিই বলো।

বাসবী উদাসীন চোখে চেয়ে বললো—হয়ত দু'চার

বছর, হয়ত আর এক মুহূর্ত। কথা বলতে বলতে এই মুহূর্তে'ও ত' হার্ট বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে আমার। জীবন মুহূর্তের জন্য। কি লাভ এক মুহূর্তের ব্যাপ্তিতে? এবারে তীক্ষ্ণ হলো জয়ন্ত'র দৃষ্টি। মনে পড়লো তার বাসবী, দর্শনের ছাত্রী। তাই বললো সে—জীবন মুহূর্তের বলেই ত' সেই মুহূর্তকে পুরোপুরি পেতে হ'বে। ভালো করে উপভোগ করতে হবে। আর সৃষ্টির কাজ যখন চলছে তখন আনন্দকে বর্জ্জন করবো কেন? হতাশা ত মরার আগেই মরা।

এমন সময়ে ঘুরে এলো মীরা—অনিমেষের স্ত্রী মীরা। বললো—উনি জিজ্ঞেস করলেন—সন্ধ্যেটা কি ঘরে বসেই কাটবে ঠাকুরপো?

জয়ন্ত বললো—না, আমরা সিনেমা যাবো। না না, তোমার আপত্তি শুনছি না। লণ্ডনে পাস করা ডাক্তার আমি। আমার একটা কথাও ত শুনবে তুমি।

•

অনিমেষ বলছিলো জয়ন্তকে।—ওদের দর্শন পড়াতো কে এক ছোকরা লেক্‌চারার পিনাকী সোম। লোকটা "বুদ্ধ বুদ্ধ" করে পাগল। শুনলাম, বাসবীকে একদিন বলছে—পৃথিবীতে বাঁচা মানেই যন্ত্রণা। জন্ম মানেই দুঃখ। শান্তি শুধু মৃত্যুতে।

শুনে রাগ হ'লো। ঘরে ঢুকে বললাম—এ'কথা কে বললো আপনাকে?

বললো—বুদ্ধ।

বুঝলাম—নিছক মাথা খারাপের লক্ষণ। তখনই বলে দিলাম—আপনার এই বুদ্ধবাদ নিছক নাস্তিকতা। এ আমরা মানিনা।

পরদিন থেকে ওকে বাড়ীতে আসতেও নিষেধ করালাম। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই……অনিমেষ থামলো; রুদ্ধ হ'লো ওর গলার স্বর। বললো—বাবা মারা গেলেন হঠাৎ। টেবিলে বসে বসেই মারা গেলেন; হার্ট্‌ফেল। তারপর থেকে বাসবীও…হলো…যেমন দেখছো।

সিনেমার গল্পটা বড় করুণ। ফ্রান্সের রাজপরিবারের মৃত্যুকাহিনী। বাসবী মাঝখানে উঠে গেল হ'ল থেকে। সঙ্গে সঙ্গে গেল জয়ন্ত। বাইরে এসে গাড়ীতে উঠে বসলো বাসবী। বললো—আমাকে বাড়ীতে রেখে আসুক ড্রাইভার।

জয়ন্ত কথা না বলে পাশে বসলো ওর। বললো—ভালো লাগলো না একটুও?

—না। মানুষ বুঝি এত নিষ্ঠুর?

জয়ন্ত প্রশান্তির হাসি হাসলো। বললো—নিশ্চয়ই না। মানুষও এত নিষ্ঠুর নয়, জীবনও শুধু যন্ত্রণার নয়। এগুলো শুধু গল্পের সত্য।

গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে চৌরঙ্গির নির্জনে নিয়ে এলো জয়ন্ত।

—এখানে বেশ ঠাণ্ডা। তাই না?

বাসবী কথা না বলে শুধু চেয়ে রইলো শূন্যপথের দিকে।

জয়ন্ত পরের দিন আবার এলো। বললো—আমি ডাক্তার। তোমাকে নিয়ে খোলা হাওয়ায় ঘুরে আসবো বাসবী।

বাসবীর বোধহয় ভালোই লাগলো। তবু সে বললো—ভালো লাগছে না।

—পৃথিবীটা তোমার একার না। জীবনটাও নয়। তোমার ভালো না লাগা, আর আমাদের ভালো লাগার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য হওয়া চাই।

মীরার মুখে কৌতুকের দুষ্টুমির হাসি। বললো—একটু ঘুরে আয়না লক্ষ্মী, শুধুই কি তোর নিজের ইচ্ছে থাক্‌বে? আর কারুর না।

কাজেই বাসবী জয়ন্তর সঙ্গে গেল গঙ্গার কুলে কুলে। জয়ন্ত বললো—ওই ত নদীর ঢেউ। একটা পড়ছে আর একটা উঠ্‌ছে। কি সুন্দর বলোত? সমস্ত নদীটার দিকে চেয়ে কি একটা দুটো ঢেউয়ের কথা মনে থাকে?

বাসবী কথা বললো না। ভালো লেগেছে তার নদীর জলে সূর্য্যাস্তের ছায়া।

জয়ন্ত এলো একদিন পর। বললো—চলো যাই বেড়াতে।

বাসবীর আপত্তি সে মান্‌লোনা। জয়ন্ত গেল বোটানিক্যাল গার্ডেনে। বললো—দেখেছো কি সুন্দর সবুজ পাতা? আর কি গন্ধভরা টাট্‌কা ফুল?

—কালকেই ত' শুকিয়ে যাবে? ঝরে পড়বে?

বাসবীর কথায় উত্তেজিত হলো জয়ন্ত। বললো—কিন্তু

আজকের জীবন ত' মিথ্যে নয়, ব্যর্থ নয়। আজকে যে ওরা প্রাণভ'রে বাঁচছে, আজকে ওই একটু ফুলের গন্ধে বাগান ভরে উঠেছে—এটা কি তুমি মানবে না?

—কি লাভ? বললো বাসবী।

—লাভ?

জয়ন্ত গম্ভীর হ'লো। বললো—চেয়ে দেখোত' আমার চোখে। কোন উত্তর খুঁজে পাও কিনা।

একটা মালতীকুঞ্জের ওপরে বসে যে পাখীটা সমানে ডেকে চলেছে, তারই দিকে এগিয়ে গেলো বাসবী। উত্তর দিলোনা সে জয়ন্তের প্রশ্নের। জয়ন্ত আবার বললো—কী টকটকে লাল রঙ দেখেছো কৃষ্ণচূড়ার? কী উজ্জ্বল আলো আকাশের। কোনখানে কি—শুকিয়ে যাবার, ঝরে যাওয়ার, মরে যাওয়ার প্রকাশ আছে বাসবী? মৃত্যু নয় জীবনই সার্থকতা। যতক্ষণ বাঁচবো ততক্ষণ প্রাণভরেই বাঁচবো।

বাসবীর মুখের হাসি তবু ম্লান। ও' বলে—তবু মৃত্যুই যখন সত্য······

না, বলো জীবন যখন প্রত্যক্ষ! সত্য তার আশা, স্বপ্ন···!

—কিন্তু আমার এই দেহটা? হঠাৎ যদি রক্ত থেমে যায় শিরায় শিরায়, যদি বন্ধ হয় হৃদ্‌পিণ্ড, তাহলে সেই পচা নির্জীব দেহের মধ্যে বেঁচে থাকবে কি মনের আশা, স্বপ্ন?

—হ্যাঁ থাকবে। জয়ন্ত বললো—স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না। বুদ্ধ বলেছেন—একমুহূর্তের যে বাঁচা, সেটা এক-মুহূর্তের জন্যেও সার্থক।

—বুদ্ধ বলেছেন? বাসবীর কণ্ঠে বিস্ময়।

—হ্যাঁ, বলেছেন বইকি। জানো বাসবী, একসময় শুধু মৃত্যুই সত্য ছিলো। এক ও অদ্বিতীয় ছিলো। তারপর সৃষ্টি হ'লো জীবনের। জন্মমাত্র প্রাণ আপন ঐশ্বর্য্যে মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে গেল। মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে বলেই ত' সে জীবন। জীবন মৃত্যুর চেয়ে বড়।

তারপর তিনদিন এলোনা জয়ন্ত। তিনদিন পরে চিঠি পেলো সে বাসবীর কাছ থেকে।

—তোমার কথা ভাবতে চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি না। জীবন তোমার কাছে সত্য। কিন্তু মৃত্যু আমার কাছে। তোমার অনেক কিছু করার আছে, আমার কিছুই নেই। ভাবছি, যতদিন বাঁচবো ততদিনই আমার দুঃখ।

কাল থেকে অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি। শরীরে কষ্ট বড্ড বেশী। ডাক্তার হিসাবে একবার এসো।

জয়ন্ত প্রায় ছুটতে ছুটতে এলো।—কেমন আছো বাসবী?

বাসবী বললো—পায়ের শব্দ শুণছি।

—কার?

—যে আসবে তার।

জয়ন্ত বোধহয় হতাশ হ'লো। বললো—ভাবছিলাম বলবে—তোমার। আজ সকালে উঠে দেখছিলাম একটা কালো মেঘ সূর্য্যকে ঢেকে রাখবার জন্যে কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করছিল। কিন্তু পারলো না সে। ওই দেখো কী উজ্জ্বল সূর্য্য। দেখলাম গাছের ডালে একটা ছোট পাখী কী আগ্রহে না বাসা বাঁধছে। ছোট্ট একটা মরা ডালে কী সুন্দর একটা ফুল। আমি যাই।

—আর একটু বোসো।

বাসবীর কণ্ঠে অনুনয়।

—কি লাভ বলো?

জয়ন্ত উঠে পড়লো।

পরের দিন বাসবী সারাদিন অপেক্ষা করলো কিন্তু জয়ন্ত এলোনা। তারপরের দিন ছটফট করলো বাসবী। মীরাকে বললো—বৌদি, আমার বোধহয় খুব অসুখ করছে। এই দেখ, মাথার যন্ত্রণা, বুকে ব্যথা, কাশি, জ্বর-ভাব।

মীরা সচকিত হ'লো! বললো—তাইত। ডাক্তার ডাকতে বলি।

অনিমেষ এসে বললো—ডাক্তার দত্তরায়কে কল দিচ্ছি। জয়ন্ত ত' আসতে পারবে না।

আলগা করে খোঁপা বেঁধে ইজিচেয়ারে শুয়ে বাসবী তখন কারও পায়ের শব্দ শুণছিলো বোধহয়। হঠাৎ চমকে বললো—আসতে পারবে না? কেন?

—একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে। সিঁড়ির থেকে পড়ে গিয়ে বুকে চোট লেগেছে। কাল থেকে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে হাসপাতালে।

—সেকি? আমায় বলোনি ত? আমি যাই।

—তুই যাবি কিরে? তোর যে অসুখ? আর কি লাভ অত ব্যস্ত হ'য়ে?

—আমি চললাম।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে চোখ মেলে চাইলো জয়ন্ত। আর তার মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়লো বাসবী—কেমন আছো?

জয়ন্ত ম্লানভাবে হাসলো—অপেক্ষা করছি বাসবী।

—কার?

—যে আসবেই, তার। দেখছো না, আকাশ ম্লান হ'য়ে যাচ্ছে। ঝরে পড়ছে আলো।

—না, না, ওটা মেঘ। এখনই রোদ উঠবে।

—কিন্তু কি লাভ বেঁচে থেকে?

—বাঁচতে হ'বে, তোমায় বাঁচতে হবে।

বাসবী ব্যাকুল হ'য়ে চিৎকার করে উঠলো।

—আমার জীবন যে শূন্য। কার জন্যে বাঁচবো বাসবী?

—ওগো, আমি···আমি আছি। আমার জন্যে বাঁচবে তুমি।

জয়ন্ত তবুও চোখ বন্ধ করলো, বললো—কিন্তু বুদ্ধ বলেছেন······

—না গো না, বুদ্ধ বলেননি কিছু। বুদ্ধ মানে শূন্যতা নয়, পরিপূর্ণতা। আমি তোমায় বাঁচিয়ে তুলবোই।

জয়ন্তর বুকে মাথা রাখলো বাসবী।

—আমি বেঁচে উঠবো বাসবী।

মধুর তৃপ্তির হাসি জয়ন্তর মুখে॥



চিন্তার আতিশয্য দোষ

উপানন্দ

তোমরা বোধ হয় জানো, যা প্রয়োজন, তার অতিক্রম করাই আতিশয্য। আহার, বিহার, বিশ্রাম যে কোন বিষয়েই হোক, তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত হোলেই অনিষ্ট ঘটে। এইজন্য বাল্যকাল থেকে সংযমের অভ্যাস করা প্রয়োজন। সামঞ্জস্য রক্ষাই উন্নতির মূল। সামঞ্জস্যই প্রাকৃতিক নিয়ম। কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তা একেবারেই বর্জ্জনীয়।

বিশ্বাস করো আর নাই করো, আজকের দিনে বৈজ্ঞানিকদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না। তারা আমাদের বহির্জগতেও বহু উপনিবেশ স্থাপন করে বহু রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তারা বলছেন, যদি দীর্ঘজীবী হয়ে শারীরিক ও মানসিক শক্তি লাভ করতে চাও, তা হোলে তোমাদের মানসিক কর্ম্মতৎপরতা কিছু পরিমাণে শিথিল করতে হবে।

বইতে তোমরা বোধহয় পড়েছ, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যে বেশীর ভাগ সময়ে মননশীলতার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করা উচিত; ফলে তোমরা নানা অলস ভাবনা নিয়ে দিনগুলি হারাতে হারাতে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাও নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত দুরন্ত কাল স্রোতে। উপরোক্ত পুঁথিগত মতবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন যে অতিরিক্ত চিন্তা করা শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিজনক।

তাঁদের গবেষণার ফলে বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, চিন্তার আতিশয্যই আমাদের শারীরিক নানাপ্রকার জটিল ব্যাধি ও মানসিক বিশৃঙ্খলতার মুখ্য কারণ। কিছুদিন হোলো, সাধারণ জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ ও তার পরিণতি পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণার কাজ শেষ করেছেন গ্রেট ব্রিটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও আয়ুর্বেদাচার্য্য স্যার হেনিয়েজ ওগিলভি। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ ব্যক্তিই অত্যন্ত চিন্তাশীল।

ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকরা বলেন, যদি মানুষ তার মস্তিষ্ককে রাত্রিদিনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ সময় বিশ্রামের সুযোগ দেয়, তা হোলে মনোবিকলন বা মানসিক বিভ্রান্তিপ্রসূত কোন ব্যাধি শরীরে প্রবেশ করতে পারে না, আর অতিরিক্ত রক্তের চাপ বৃদ্ধি (High Blood pressure) ক্ষত, হৃদ্‌রোগ, কণ্ঠনালী প্রদাহ, পক্ষাঘাত বা এই ধরণের সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না। এইভাবে চলতে পারলে, দাম্পত্যজীবন সুখে অতিবাহিত হোতে পারবে, আর মানুষ সহজে সংসার ক্ষেত্রে অগ্রগমন করতে পারবে বাঁচা ও বুদ্ধির শক্তি নিয়ে—এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন স্বনামধন্য ভিষগাচার্য্য স্যার হেনিয়েজ।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রাজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ্ হিসাবে ডক্টর ডেভিড হ্যারল্ড ফিঙ্কের খ্যাতি আছে। চিন্তার আতিশয্য-দোষ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—মানুষের মস্তিষ্ক অনবরত চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। যতক্ষণ তারা জেগে থাকে, কেবলই বাস্তব আর অবাস্তব ভাবনা মনের মধ্যে তাড়িয়ে নিয়ে এসে আত্মমগ্ন হয়ে থাকে, তা ছাড়া তাদের কর্ম্ম-সম্পাদনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বা পরিণতি সম্পর্কে বিশ্লেষণের চেষ্টা করে নিজের ভেতর। এরূপ অবিরত অহেতুক মস্তিষ্কচালনাজনিত কর্ম্মতৎপরতা থেকে উদ্ভূত হয় চাপা উত্তেজনাগুলি। এরাই শুধু তাদের শরীর নষ্ট করে না, ভাবপ্রবণ সামঞ্জস্যহীনতার সহায়ক ও হয়ে ওঠে—এমন কি শেষ পর্য্যন্ত উন্মাদনা সৃষ্টি করে মানুষকে সাংঘাতিক অবস্থায় এনে দেয়।

ডক্টর ফিঙ্ক আরও বলেছেন—এইসব রোগীদের অনেকেই অনিদ্রায় কষ্ট পেয়ে থাকেন। অত্যধিক চিন্তা সক্রিয় হওয়ায় এঁদের মাথার খুলিটা পর্য্যন্ত গরম হয়ে ওঠে, চোখে ঘুম আসে না—সারারাত দুর্ভাবনা বাড়তে থাকে। চিকিৎসিত হবার আগে সকল রকম চিন্তা থেকে যাতে এ শ্রেণীর রোগীর মস্তিষ্ক বিরত হয় আর নিদ্রা আসে, সেদিকে সর্ব্বাগ্রে নজর দেওয়া দরকার।

ডক্টর ফিঙ্ক তাঁর রোগীদের বলেন, তাঁরা যেন অন্ততঃ একঘন্টা সমস্ত চিন্তা থেকে বিরত থাকেন, এরূপ অভ্যাস ভিন্ন ব্যাধিমুক্ত হওয়া অসম্ভব। গ্যেটে বলেছেন, নিষ্ক্রিয় চিন্তা একটি ব্যাধি। তাঁর এই কথা সমর্থন করেছেন সাম্প্রতিক মনস্তাত্ত্বিকরা। অলস চিন্তা যে অত্যন্ত মারাত্মক ও প্রাণনাশক, একথা তাঁরা সকলেই বলেছেন।

ডক্টর ফিঙ্ক বলেন—চিন্তায় সময় কাটাবে কম, আর কাজে পরিণত করবার জন্যে বেশী সময় নিয়োগ করবে—যা ভেবেছ তাকে নিয়ে। কাজের ভেতর ডুবে থাকলে চিন্তাও বেশী হবে না। অন্যথা মোটর গাড়ী চালাতে চালাতে ইঞ্জিনের বিকলতার মত দুর্গত অবস্থা হবে, শরীরও হয়ে উঠবে ব্যাধি মন্দির। অলস ব্যক্তিরাই বেশী চিন্তা করে থাকে, কাজে যাদের উৎসাহ ও আগ্রহ আছে, তারা কখন চিন্তা-ভারাতুর হয়ে সময়ের অপব্যবহার করে না। সংসারে তারাই উন্নতিশীল।

অলস ব্যক্তিরা তাদের বেশীর ভাগ সময় অতিবাহিত করে, কি করতে যাচ্ছে তারই জল্পনা কল্পনায়। আলনাস্কারের আকাশ-কুসুম রচনার মত তারা চিন্তার আবেষ্টনীর মধ্যে রচনা করে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার রঙীণ ফানুস, তারপর বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠে কাজের তালিকা করতে থাকে, অবশেষে এইসব কাজের বিষয়বস্তুগুলিকে মন থেকে অপসারিত করে আবার নতুন নতুন বিষয়ে চিন্তামগ্ন হয়, মনের ভেতর জেগে ওঠে অসংখ্য কল্পনা, আর পরিকল্পনা। আলস্যের জন্যে তারা কোন কাজে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করতে পারে না। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে শেষে দুর্গতির স্তরে নেমে আসে চিন্তা ভারাক্রান্ত মানুষ, স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অহিফেন-জর্জ্জরিত ব্যক্তির মত, আর তাদের সামনে দিয়ে চলে যায় বড় বড় সুযোগ।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই বইয়ের পাতা খুলে আবোল তাবোল চিন্তা করতে থাকো, ফলে পরীক্ষোত্তীর্ণ হবার সময়ে বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ো, শরীর ও মন ভেঙে যায়, আর দেহের ভেতর নানা জটিল ব্যাধি প্রবেশ করে জীবনটাকে দুর্ব্বিবহ করে তোলে।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে সময় অপব্যবহার না করে, কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই ভালো, কিন্তু কার্য্যে পশ্চাদপদ হয়ে নিছক চিন্তায় সময় অতিবাহিত করা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। তোমরা বোধহয় বহু পল্লীগ্রামে এমন সব মানুষ দেখেছ যারা শ্রমবিমুখ হয়ে বসে বসে মনের ভেতর শয়তানী মতলব আঁটছে, আর চেষ্টা করছে কি করে প্রতিবেশীর সঙ্গে কলহ, মারপিট, দাঙ্গাহাঙ্গামা করবে, মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িয়ে দিয়ে মানুষকে বিপন্ন করে তুলবে—আর পর-নিন্দা, পরচর্চ্চা, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও অশ্লীল উক্তি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করবে—আর অপরের সম্ভ্রম হানি করবে। এদের মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই উত্তেজিত থাকে, এদের মাথার ভেতর আছে শয়তানের কারখানা। এরাই সমাজ সংসারের চরম শত্রু আর মানব সভ্যতার চরম কলঙ্ক। কিন্তু তোমরা যারা মানব সভ্যতার দীপশিখা, প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠ শুভ কর্ম্মব্রতী হয়ে এইসব নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের দূরে রেখে।

যাহোক, সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানীরা বহু কারণ দেখিয়ে আমাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন কেন অতিরিক্ত চিন্তার ফলে মানুষ তার শারীরিক শক্তিসামর্থ্য হারিয়ে ফেলে, আর শেষে রোগে অশেষ দুর্গতি লাভ করে। তাঁরা বলেছেন চিন্তার আতিশয্যই আমাদের শরীরের রক্ত চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়, সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর বৈকল্য আনে, আর ধমনী শিরা উপশিরা প্রভৃতি দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্র ও কোষগুলিকে নিস্তেজ করে তোলে।

পরীক্ষার দ্বারা বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চিন্তা থেকে কোন রোগটী মানুষের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিকার করে জীবনী-শক্তির হ্রাস করবে তা ঠিকভাবে বলা কঠিন—চিন্তার আতিশয্যে শরীরের সমস্ত রক্ত দূষিত হয়ে পড়ে, আর আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি বিষিয়ে ওঠে, এটা তাঁরা বারে বারেই লক্ষ্য করেছেন।

দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর টেভিন উইওসর ওটুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জর্জ্জ বাচ্চ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, অত্যধিক চিন্তা করলে হাতের আঙুলগুলো কুঁচকে যায়। অত্যন্ত চিন্তাভারাতুর মানুষের শরীরে ও মনে যে সব মারাত্মক ব্যাধির উপসর্গ দেখা দেয় তাদের কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে চিকিৎসকরা বলেছেন—'ক্রনিক ফ্যাটিগ' বা দীর্ঘকাল স্থায়ী ক্লান্তি।

পৌনঃপুনিক নৈরাশ্য ও অসাফল্যের কঠোর অনুভূতি থেকে যে চিন্তাধারা বহমান হয়, তার ভেতর জন্মলাভ করে দুরারোগ্য ব্যাধির বীজাণু—অবিশ্রান্ত অবসাদ ও শ্রান্তি জীবনযুদ্ধে অকৃতী সৈনিকের মত মানুষকে পঙ্গু করে রাখে। ডক্টর ওয়াণ্টার ফ্রিম্যান নানা মানসিক ব্যাধি নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা আর চিকিৎসা করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা-লব্ধ কথা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে শ্রমবিমুখতা ও শারীরিক বিশ্রামই চিন্তার আতিশয্যপ্রসূত ব্যাধিগুলিকে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে। তিনিই তাঁর রোগীদের চিকিৎসা করে রোগমুক্ত করেছেন কিভাবে জানো? আমাদের দেশের ডাক্তারদের মত বোতল বোতল ওষুধ খাইয়ে নয়—তিনি তাদের ভালো করেছেন সন্তরণ, অশ্বারোহণ, দৌড়ঝাঁপ, হাইকিং প্রভৃতিতে নিয়োজিত করে।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর উইলিস আর হুইটনি বলেছেন, আমাদের সজ্ঞানস্তরের চিন্তাধারাগুলি বুদ্ধিবিকাশের দিকে অল্পপরিমাণে সাহায্য করে। বুদ্ধিবৃত্তির মূল উৎস রয়েছে আমাদের অবচেতন স্তরের মধ্যে, গৌণভাবে যার ওপর আমাদের অধিকার আছে দমন করবার। আমাদের মনের অবচেতন স্তরটা অত্যন্ত সংবেদনশীল। আমাদের অব-চেতন মনই জ্ঞানের প্রকৃত অমূল্য রত্নভাণ্ডার গড়ে তোলে। আমরা অনেককিছু ঘটনা বা কার্য্যের কারণ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে পরিজ্ঞাত হয়ে থাকি এরই আনুকূল্যে, কিন্তু আমাদের সজ্ঞান মন এমন বিষয়ে কোন সাহায্য করেনা। যখন আমরা মস্তিষ্কটাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম দিয়ে চিন্তা বিরত হই, তখনই আমাদের অবচেতন মনের বুদ্ধিবৃত্তিগুলির প্রয়োজনায় এটা সংবেদনশীলও সুগ্রাহী হয়ে উঠে।

ডক্টর হুইটনি বলেছেন, অসাধারণ সাফল্য লাভ করে যাঁরা বিশেষ ভাবে লোকসমাজে সমাদৃত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই অবচেতন

না যে তাঁদের অবচেতন মনের গুণগুলি কি অক্ষুতভাবেই না সক্রিয় হয়ে তাঁদের জয়ধ্বজা তুলে ধরেছে।

তিনি বলেন—'এঁদের বিশ্বাসও ধারণা যে এঁদের কঠিন সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে থাকে নিছক স্থায়যুক্তি ও চিন্তার মাধ্যমে, কিন্তু আসলে যে এঁদের সকল সমস্যার সমাধান হয় যখন এঁরা অবচেতন মনের স্তরে এসে উপস্থিত হ'ন একথা এঁরা বিশ্বাসই করতে চান না। কোন সমস্যার সমাধান করতে হোলে, মস্তিষ্ককে জোর করে আলোড়িত করবার চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং তাকে শিথিল করবার সুযোগ দিয়ে মনকে বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত—ডক্টর হুইটলি এই পরামর্শই সকলকে দিয়ে থাকেন।

তিনি আরও বলেন, যে সময়ে তোমাদের সজ্ঞান মন সক্রিয় হোতে বাধা পাবে সেসময়ে অবচেতন মনের বা অতীন্দ্রিয় স্তরের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি প্রকাশ পেয়ে তোমাদের কাছে নব নব আলোকসম্পাত করবে।

সি, জি, সুইট্স বহুদিন ধরে শ্রমশিল্প বিষয় নিয়ে গভীর গবেষণা করেছেন। ইনি বলেছেন—আজ পর্য্যন্ত আমাদের যে সব বড় বড় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার দেখা গেছে তার প্রত্যেকটী অবচেতন মনের প্ররোচনায় আর অতীন্দ্রিয় স্তরের বুদ্ধি বিকাশের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে, নিচক সজ্ঞান মন অবলম্বন করে ভাবনায় বুঁদ হয়ে বা কল্পনা পরিকল্পনায় সময় অতিবাহিত করে সম্ভব হয়নি।

তাঁর এই অভিমতের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছেন তিনি বহু উদাহরণ উপস্থিত করে। যেমন যন্ত্রপাতি, কলকব্জা আবিষ্কার হয়ে আমাদের যন্ত্রসভ্যতা বহুদূর এগিয়ে এসেছে, যেমন রেডিও, মোটর ইঞ্জিন প্রভৃতি, সেগুলিকে যাঁরা আবিষ্কার করলেন তাঁদের মাথায় উদ্ভাবনীশক্তি সঞ্চার হয়েছে হঠাৎ, আর তাঁরা আবিষ্কারের সূত্রগুলি পেয়েছেন অবচেতন মন থেকে যখন ক্ষৌর কার্য্য সম্পাদন করছিলেন বা স্নানাগারে ঢুকে সাবান মাখ্ছিলেন অথবা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন মুক্তবায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে।

ডক্টর সুইটস লক্ষ্য করেছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতিভাধর পুরুষদের ভীষণ পার্থক্য। এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি মনকে অনুত্তেজিত ও শিথিল অবস্থায় রেখে অবচেতন স্তর থেকে কখন প্ররোচনা বা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠ্বেন—তার জন্যে শান্ত সংযত ভাবে অপেক্ষা করেন। সাধারণ মানুষ তা করেনা—তাদের মন সর্ব্বদাই চঞ্চল ও উত্তেজিত থাকে। নানা ভাবনায় সে ডুবে থাকে, কোন কাজে সুস্থচিত্তে অগ্রসর হোতে পারে না—শেষ পর্য্যন্ত আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও বিফলতা নিয়েই কালাতিপাত করে, আর দেহ ও মন ব্যাধিভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

তাই বলছি তোমরা যদি জগতে সুখী, সমৃদ্ধিশালী, দীর্ঘজীবী ও সুস্থ সবল হোতে চাও, তাহোলে এইসব মনোবিজ্ঞানীদের কথামত কাজ করবার চেষ্টা করবে, আর তোমাদের মস্তিষ্ক চিন্তার আবর্জনায় ভরিয়ে তুলে নিজেদের ভবিষ্যতের উন্নতির পথরোধ করবে না।

আগমনী

শ্রীসুধীরকুমার রায়

আজ শরতে প্রণাম হয়ে ফুটছে হরেক ফুল,
পল্লী-মেয়ের পরশ আসে দুলছে দোদুল দুল।
উড়িয়ে আঁচল আসবে বালা
সাজিয়ে নিয়ে বরণ ডালা
তার চরণে নূপুর ধ্বনি উঠবে মুখর হয়ে,
চয়ন করে শিউলি-জবা ডালায় যাবে লয়ে।

ঢল নেমেছে নদীর বুকে ছুটছে পাগল পারা,
শরৎ উষায় আজকে যেন কতই কাজের তাড়া।
গানের সুরের লহর তুলে
ছুটছে ও যে আপন ভুলে
সেই সুরেতে সুর মিলিয়ে বৈরাগী সেও গায়,
একতারাতে সুর যেন তার ডাকছে উমা মায়।

ডাকছে আরও দুলিয়ে মাথা কাশ কুসুমের দল,
সোনা আলোয় ঢেউ খেলে যায় পুলক কোলাহল—
উড়ছে ভ্রমর পরশ আশে
গুন্‌গুনিয়ে কুসুম পাশে
সেই গানেতে চমকে চেয়ে কুসুমকলি জাগে,
আজ শরতে সোনা উষায় মধুপ-অনুরাগে।

খুশি ডানায় বিহগপাতি নীল আকাশের গায়,
সোনা রোদের চূর্ণী নদী সাঁতরে যেন ধায়—
নাম-না-জানা অচিন দেশে
গান গেয়ে যায় ভেসে ভেসে
শরৎ রাণীর আমন্ত্রণে পুলক ভরে ছোটে,
দিগ্‌বলয়ে আজকে শুধু আনন্দ-গান ওঠে।

আবাহনীর সিঁদুর আঁকি ভরা ঘটের গায়,
মন্ত্র পড়ি পুরুৎ ঠাকুর ডাকেন বিশ্বমায়।
ভক্তমনের আকুলতা
বোধন ঘটে জাগছে মাতা
ঢ্যাং কুড়্‌কুড় বাজনা বাজে—মায়ের আগমনী,
ছন্দে গাঁথি কথা-জবায় রাখি প্রণামখানি।



[কৌতুক চিত্র]

স্বামীদের যথারীতি ইস্কুল, কলেজ, অফিসে চালান করে দিয়ে সেদিন পাড়ার গিন্নীদের এক গোপন আসর বসল।

সত্যি, এমন করে আর সংসার চালানো যায় না। যুদ্ধ লাগেনি—তবু যে হারে জিনিসপত্রের দর চড়ে যাচ্ছে তাতে প্রত্যেকেরই সংসার ডিঙির চড়ায় আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা।

গিন্নিরা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছেন যে, পিপ্ড়ের পেট টিপে চিনি বের করলেও আর হালে পানি পাওয়া যাচ্ছে না!

গৃহিণী সঙ্ঘের সভানেত্রী গিরীন্দ্রমোহিনী প্রথমে আলোচনার সূত্রপাত করলেন।

বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বল্লেন, আমাদের সম্মুখে এক বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। বাড়ীর কর্ত্তারা নিজ-নিজ উপার্জ্জনের কম-বেশী টাকাটা গৃহিণীদের হাতে ফেলে দিয়েই নিশ্চিন্ত!

কিন্তু গিন্নিরা যে কীভাবে সারা মাস ধরে খরচ চালাবেন—সেকথা ভেবে তাঁদের আহারে রুচি নেই, রাতে নেই ঘুম। দুঃস্বপ্ন দেখে সবাই চম্‌কে চম্‌কে উঠ্ছেন।

বঙ্কিমবদনী বল্লেন, চিন্তায় চিন্তায় ঠিক মতো হজম না হওয়ায় আমার ত চোঁয়াঢেকুর সুরু হয়েছে।

শশীমুখী মন্তব্য করলেন, চারবেলা ধরে ছেলেমেয়ের পাতে যে কি দেবেন সেকথা ভেবে তার হিক্কে সুরু হয়েছে। অষুধ সেবনে সে হিক্কে সারানো যাচ্ছেনা!

কৈবল্যদায়িনী বল্লেন, কোন্‌টা বাদ দেবো? বাড়ী ভাড়া, ছেলেমেয়েদের ইস্কুল-কলেজের মাইনে, টিউটারের বেতন, রোজকার বাজার খরচ, জলখাবার, ঝি, চাকর, জমাদার, ধোপা, নাপিতের পাওনাগণ্ডা, লোক-লৌকিকতা, সিনেমা থিয়েটার, কর্ত্তার ক্লাব, ছেলের সঙ্ঘ, মেয়ের সমিতি—কিন্তু এদিকে আমি যে দম্ আট্‌কে মারা যাই—সেদিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না।

সভানেত্রী গিরীন্দ্রমোহিনীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

—আপনারা সবাই চুপ করুন॥ আমি সাতদিন না খেয়ে, না ঘুমিয়ে এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় আবিষ্কার করেছি।

ঘরে যে কোলাহল উঠেছিল—এই আশ্বাসবাণী পেয়ে একমুহূর্ত্তে তার গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল।

গিরীন্দ্রমোহিনী বল্লেন, সংসার সমুদ্রে পাড়ি দিতে হলে গৃহিণীদের কর্ত্তব্য হবে—নিজ নিজ কর্ত্তাকে উপরি-পাওনার প্রতি সচেতন করে তোলা।

উপরি-পাওনা!

একসঙ্গে কথাটা উচ্চারিত হল সেই কামরাতে!

স্থানীয় ব্যবসায়ী গিন্নি সুবর্ণসুন্দরী বিশেষ গর্ব্বের সঙ্গে জানালেন যে, ইতিপূর্ব্বেই তিনি সে পন্থা অবলম্বন করেছেন। এ বছর তাঁর কর্ত্তা সরষের তেলের সঙ্গে কি যে মিশিয়ে বেশ কিছু মুনাফা লাভ করেছেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী উৎসাহিত হয়ে উচ্চারণ করলেন; বংশকুলকে বাঁচতেহলে এই দুবৎসরে—স্বামীদের উপরি-পাওনায় সচেতন করাই হচ্ছে একমাত্র পথ।



সন্তানেত্রীর কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে একে একে সবাই নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে লাগলেন।

প্রথমেই উঠলেন, কাপড়ের আড়তদার ভজনরামের স্ত্রী লছমী দেবী। তিনি যা বল্লেন—তার সারমর্ম্ম হচ্ছে ইতো, ভজনরাম অনেককাল ধরে কাপড়ের গাঁট মজুত করে আসছেন। এখন এইসব গাঁটই দেড়া দরে বিক্রী হচ্ছে। তাদের উপরি পাওনার ব্যাপারে তাঁরা মোটেই পিছিয়ে নেই।

ওষুধের ব্যবসায়ী জীবন জোয়ারদারের স্ত্রী জিলিপি জোয়ারদার বল্লেন, আমার স্বামীর কর্ম্মতৎপরতা দেখে আমি সত্যি অবাক হয়ে গেছি। আসল অষুধ শিশি থেকে সরিয়ে রেখে কি কৌশলে আমার কর্ত্তা জলভরা শিশি বিক্রী করেন সে কাহিনী যাদুকরের যাদুবিদ্যার চাইতেও রোমাঞ্চকর।

জিলিপি জোয়ারদারের কথা তারিফ করে সবাই করতালি ধ্বনিতে তাঁকে সাধুবাদ জানালেন।

এরপরে উঠলেন পাড়ার বিশিষ্ট দুগ্ধ-ব্যবসায়ী ক্ষপণক খাসনবীশের গৃহিণী ক্ষণভঙ্গুর খাসনবীশ। তিনি বিনয় করে প্রথমেই জানালেন, আপনাদের মতো লেখাপড়া জানা



মেয়েদের সঙ্গে আমরা ত' মিশতেই সাহস পাইনে! গিরীনদিদি ডেকে পাঠালেন তাই ভয়ে ভয়ে আসতে হল। তবে উপরি-পাওনার ব্যাপারে আমরা সবাইকার ওপরে যাই—একথা হলফ করে বলতে পারি; চারটে খাটাল আছে আমাদের কর্ত্তার। ব্যবসা ভালো চলছে, লাভও খুব হচ্ছে। জলের ওপর দিয়েই যায়—দুধে কখনো হাত পড়েনা।

এই বলে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন—ক্ষণভঙ্গুর খাসনবীশ।

ক্ষণভঙ্গুরের কথা শুনে সন্তানেত্রী গিরীন্দ্রমোহিনী একটু

উসখুস করে উঠলেন। তারপর লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেল্লেন, তা হ্যাঁ বাছা ক্ষণু, তোমরা আমার নাতি-নাত্‌নীর দুধেও কি অম্‌নি করে জল মেশাও নাকি ?

ক্ষণভঙ্গুর বঙ্গললনার স্বাভাবিক সরমে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে উত্তর দিলেন, না দিদি, সে কাজ কথনো আমি করতে পারি ? মাথার ও'পর 'ধর্ম্ম' রয়েছেন না ?

ক্ষণভঙ্গুরের আগেকার স্বীকারোক্তিতে ঘরের মধ্যে একটা চাপা আলোচনা সুরু হয়েছিল। কেন না—পাড়ার সবাই নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্যে ওখান থেকেই রোজকার দুধ জোগাড় করে থাকে। তবে কি তারা সবাই এতদিন ধরে পয়সা দিয়ে খাঁটিজল সওদা করছেন ?



কিন্তু ওই মনক্ষোভ দূর করে দিলেন, পাড়ার মিষ্টান্ন-বিক্রেতা কানাইরাম দাসের স্ত্রী আন্নাকালী।

আন্নাকালী বল্লেন, দিদিদের কাছে গোপন করবার কিছুই নেই। মিষ্টির ব্যবসাতে বেশ লাভ থাকে। তা-ছাড়া বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পৈতে, জন্মদিনে বেশ ভালই হয় কর্ত্তা ত' সেই কথাই কাল রাত্তিরে বল্‌ছিলেন। এমাসে সেই লাভের টাকা থেকে আমায় নতুন বালা গড়িয়ে দিয়েছেন। আন্নাকালী আঁচলের তলা থেকে হাতদুটো বের করে দেখালো।

এই বুড়ো দেখে একঘর ভর্ত্তি মহিলাদের মধ্যে কয়জনের বুক টন্‌টন্ করে উঠ্‌ল—সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

সভানেত্রী গিরীন্দ্রমোহিনী একবার লতিকার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, লতিকা, এইবার তুমি তোমার কর্ত্তার গুণপণার কথা আমাদের জানাও। উপরি-পাওনার ব্যাপারে তোমরা কি ব্যবস্থা করেছ—সেকথাও গৃহিণী সঙ্ঘের সদস্যরা জান্‌তে চান—

কিন্তু কি উত্তর দেবে লতিকা ? তাঁর স্বামী হরপ্রসাদ একটি বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। যে বেতন মাস গেলে পাওয়া যায়—সে অঙ্কটা দশজনের মাঝখানে চেঁচিয়ে বল্‌বার মতো নয়। তাছাড়া সাহিত্যিক বলে আর একটা মাঝারি খ্যাতি আছে হরপ্রসাদের। নানা কাগজে তাঁর গল্প-উপন্যাস ছাপা হয়। তাতে আর যতটা না, হয় খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে তার চাইতে বেশী। মেল্‌বার মধ্যে মেলে একটি করে ফুলের মালা। "গৃহিণী-সঙ্ঘে" সেই উপরি-পাওনার কথা কি করে বল্‌বে লতিকা ?

কাজেই অধ্যাপক-গৃহিণী তরুণী লতিকা চুপ করেই রইলো। সভানেত্রীর বার বার জিজ্ঞাসায় মাথা নীচু করে বল্লে আমার স্বামীর কোন উপরি-পাওনা নেই।

ঘর শুদ্ধ মহিলার দল অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আজ্‌কের বাজারে উপ্‌রি-পাওনা নেই এমন গেরস্ত বাড়ী আছে নাকি ?

ভয়ানক অপমান বোধ করল লতিকা। এরকমটি হবে জানলে সে কিছুতেই গৃহিণী সঙ্ঘে আস্‌তো না। কি করে সংসারের আয় বাড়বে তার একটি হদিশ পাওয়া যাবে—এই বিবেচনাতেই সে বিশেষ উৎসাহ নিয়ে এখানে এসেছিল। সবাইকার সাম্‌নে সম্মান খুইয়ে মাথা নীচু করে বাড়ী ফিরে যেতে হবে, একথা সে আদপেই ভাব্‌তে পারেনি !

সেদিন কলেজ থেকে হরপ্রসাদের বাড়ী ফিরতে বেশ একটু দেরীই হয়ে গেল।

অন্যান্য দিন সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ উঠ্‌লেই লতিকার একটি উচ্ছল আনন্দের সাড়া পাওয়া যায় ! কিন্তু আজ বাড়ীটা এত নিঝুম কেন ? লতিকারও ত' কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছেনা ? অসুখ-বিসুখ করল নাকি কিছু ? লতিকার স্বাস্থ্য এমনি খুব ভালো। রোগ শয্যায় শুয়ে সে কখনো স্বামীকে জ্বালাতন করে না !

ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল—হরপ্রসাদ।

নাঃ—সে সব কিছু নয়!

কিন্তু ঘরে আলো না জ্বেলে, বিকেলবেলার খাবার তৈরী না করে চুপচাপ জানালার ধারে বসে আছে লতিকা।

কি ব্যাপার? বিরহের 'রিহার্সেল' দিচ্ছে নাকি লতিকা?

মানভঞ্জন করতে বেশ খানিকটা সময় গেল। তারপর কাহিনীর দ্বারোদ্ঘাটন হল—তাতে হরপ্রসাদ হাসবে কি কাঁদবে—ঠিক বোঝা গেল না!

গৃহিণী সঙ্ঘ ফতোয়া দিয়েছে, স্বামীদের উপরি-পাওনা-গণ্ডার ব্যবস্থা করতে হবে।

অধ্যাপক সাহিত্যিক প্রমাদ গণ্‌লে। কি উপরি-পাওনা সে আশা করতে পারে—একমাত্র ছেলেদের পরীক্ষার খাতার সাদা পাতা এবং সাহিত্যসভার ফুলের মালা ছাড়া?

কিন্তু লতিকা একেবারে নাছোড়বান্দা। উপরি পাওনা-গণ্ডার ব্যবস্থা না করলে লতিকা নাকি অনশন ধর্মঘট করবে!

হরপ্রসাদ নিরুপায় হয়ে উত্তর দিলে, কিন্তু আমাকে লোকে উপ্‌রি দেবে কেন? আমি কালোবাজারের অলি-গলিতেও হাঁটতে পারিনে, ঘিয়ে সাপের চর্ব্বি মেশাতে জানিনে, আর ওষুধের শিশি খালি করে তাতে নানা রঙের জল মেশাতেও শিখিনি!

লতিকার মুখে এইবার অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল। বল্লে, সেজন্যে তোমার ভাব্‌তে হবে না। আমি ফর্দ্দ করে রেখেছি—

ফর্দ্দ!

একেবারে আকাশ থেকে পড়ল যেন হরপ্রসাদ! কিছুটা কৌতুকও বোধ করল যেন!

চোখটা কুঁচ্‌কে উত্তর দিলে, আচ্ছা, দেখি তোমার ফর্দ্দ!

একেবারে মজুত করাই ছিল সে ফর্দ্দ। লতিকা ব্লাউজের তলা থেকে লম্বা একটা কাগজ বের করে হরপ্রসাদের হাতে দিলে;

গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেই তালিকা পাঠ করতে লাগ্‌লো হরপ্রসাদ—

(১) এবার থেকে কোনো প্যাণ্ডেলে প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করতে হলে সভাপতি বা প্রধান-অতিথির প্রাপ্য গরদের ধুতি চাদর অন্যথায় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান—

(২) সাধারণ সভায় সভাপতিত্বে সভাপতি বা প্রধান অতিথির প্রণামী—৫১৲ টাকা

(৩) বার্ষিক উৎসবের সভাপতিত্বে প্রণামী মোট ১০১৲ টাকা

(৪) কলিকাতার বাহিরে সভাপতিত্বের প্রণামী মোট ২৫১৲ টাকা, তৎসহ ধুতি চাদর এবং ১ম শ্রেণীতে যাতায়াতের খরচ।



(৫) কোনো অলঙ্কারের দোকান্‌ উদ্বোধনে সভাপতির গৃহিণীকে ১০ ভরির একটি গহনা দিতে হবে।

(৬) কোনো জুতোর দোকান উদ্বোধনে সভাপতি ও তাঁর পত্নীকে চারজোড়া ভাল জুতো দিতে হবে।

(৭) কোনো বিস্কুটের প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনে সভাপতির সংসারের জন্য সারা বছরের বিস্কুটের ব্যবস্থা রাখতে হবে—

(৮) কোনো মিষ্টির দোকান উদ্বোধনে সভাপতির বাড়ীর জন্যে প্রতি সপ্তাহে একসের করে ভালো রাবড়ী পাঠাতে হবে—

(৯) কোনো শাড়ীর দোকান উদ্বোধনে সভাপতির

স্ত্রীর জন্যে ভালো মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ী উপঢৌকন দিতে হবে।

(১০) কোনো জর্দার দোকান উদ্বোধনে সভাপতির সহধর্ম্মিণীর জন্যে সারাবছরের ভালো দামী জর্দা বরাদ্দ করে দিতে হবে।

তালিকাটি পড়তে পড়তে হরপ্রসাদের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

সে বাঁকা চোখে একবার লতিকার দিকে তাকিয়ে টিপ্পনী কাটলে—দেখ, লতু, তালিকাটি ত' ভালই হয়েছে। বেশ গুছিয়ে নিয়েছ তুমি। তবে একটা ব্যাপারে আমার মনে খট্‌কা জাগছে!

লতিকা স্বামীর দিকে ভ্রূভঙ্গী করে উত্তর দিলে, খট্‌কা আবার কিসের? সব জলের মতো পরিস্কার করে লিখে দিয়েছি—

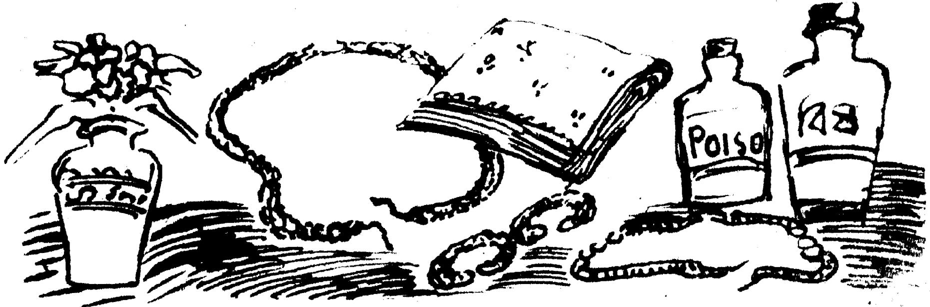
হরপ্রসাদ ঠোঁটের কোণে সেই বাঁকা হাসি বজায় রেখে বল্লে, দেখ লতু, অধিকাংশ সভাপতিত্বেই লাভের অংশ তোমার ভাগে পড়ছে দেখছি। যেমন ধরো শাড়ীর দোকান উদ্বোধন করলাম আমি;—শাড়ী লাভ হ তোমার। গহনার দোকানের দ্বারোদ্ঘাটন করলা আমি—গয়না কপালে জুটল তোমার। জর্দার দোকানে বেলাতেও তাই। আচ্ছা ধরো, আমি একটি ওষুধে দোকান উদ্বোধন করলাম। দোকানের মালিক খুশী হ একশিশি বিষ উপহার দিলেন। সেটা কার ভা পড়বে?—তোমার না আমার?

লতিকা স্বামীর মুখের দিকে একবার আড়চো তাকালে, তারপর ফর্দটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

একটুবাদেই দুম্ দুম্ করে সে ঘর থেকে বেরি গেল।

হরপ্রসাদ চিৎকার করে বল্লে, কিন্তু বড্ড খি পেয়েছে আমার। এক্ষুণি গরম পরটা আর আলুর দ চাই—

ওপাশ থেকে গৃহিণী-সঙ্ঘের সদস্যার আর কো সাড়া পাওয়া গেল না!



সংকল্প

শ্রীশৈলেনকুমার দত্ত

কিবা দিন কিবা রাতে চোখে দেখি চেয়ে—
নদী ঠিক নিজ বেগে চলিয়াছে ধেয়ে।
লাল রবি প্রত্যূষে প্রতিদিনই আসে,
সাঁঝ বেলা কাজ শেষে ডোবে নীলাকাশে।
চন্দ্রও দেখি রোজ এলে কালো রাতি,
ভোলে নাকো কভু দিতে নিজ দেহ-ভাতি।

সময় দেখি-ও তাই একভাবে চলে—
নিজ কাজ ফেলি' কভু মেশে নাকো দলে।
তাই তো আমিও কভু ভাবিব না হায়—
আজ কাজে অবহেলা—কাটাব বৃথায়।
জীবনে মহৎ যদি হতে কভু হয়—
মন মাঝে এই ব্রত লইব নিশ্চয়।

চড়ুই ভাতি

ডাঃ শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী
এম্ এ, পি আর এস, পি এইচ ডি

ছেলেমেয়েরা ধরলো যে রাজগীর-পাহাড়ের ওপরে চড়ুইভাতি কোরতে হবে। আমার ইচ্ছে ছিলো রাজগীর ছেড়ে যাবার আগে একদিন নীচের দোকান হ'তে গরম গরম খাবার কিনে নিয়ে পাহাড়ের ওপরে বসে খাওয়া। তারপর একটু বেড়িয়ে বিকেল নাগাদ ফিরে আসার সঙ্গে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে আসার মধুরেণ সমাপয়েৎ কোরে ফেলা। কিন্তু বাবলা লাণ্টুর তাতে হবে না। ওরা আগেই নাকি শুনে নিয়েচে যে আমি নাকি ছেলেবেলায় আমার ভাই-বোন আর মা-বাবার সঙ্গে মিলে রাজগীর পাহাড়ের তলে চড়ুইভাতি কোরেছিলুম। ওরাও তাই কোরবে—তবে পাহাড়ের তলে নয়, ওপরে। সুতরাং রাজী হতেই হলো।

মাটির হাঁড়ি, সরা, জলের বালতি, শতরঞ্চি, বালিশ, নুন, তেল, মশলা ইত্যাদি আর কিছু কাঠ 'কিনে চাকরের মাথায় চাপিয়ে দিলুম—নিজেও কিছু নিলুম—ওরাও ওদের সাধ্য মতো কিছু কিছু নিলো—যেমন জলের বোতল, হাতা, খুন্তী! তখন পুজোর ছুটি শেষ প্রায়। বিকেলের দিকে একটু শীত-শীত কোরবে বলে ওদের মা দুএকটি গরম কাপড়-চোপড়ও নিজস্ব ব্যাগটিতে ভরে নিলেন।

বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে আমরা পাহাড়ের বেশ খানিকটা ওপরে উঠলুম। বাঁধানো পথ হ'তে পাশের দিকে একটু সরে, পাহাড়ের গায়ে একটা মোটামুটি সমতল জায়গা বেছে নিয়ে সেখানেই চড়ুইভাতির জায়গা ঠিক হলো সর্বসম্মতিক্রমে। ওদিকে আয়োজন চলতে লাগলো। আমি একটা নিমগাছের ছায়ায় শতরঞ্চিটা পেতে একটা বই নিয়ে শুয়ে পড়লুম। কানে আসতে লাগলো চড়ুইভাতির দলটির উৎসাহ ও আনন্দের হাসি-মেশানো নানা কাজ ও কথাবার্তার শব্দ—"কি সুন্দর উনুনটা কোরলে লাগো?" বাবলার বিমুগ্ধ গলা।—"ও দিদিভাই অ্যাখ্ কি সুন্দর ফুল!" লাণ্টুর আনন্দ-স্বর!—"মাজী পানী ইঁহা রাখথেঁ?" ভৃত্য হাঁফাতে হাঁফাতে বলচে! "ও প্রয়াগ, লকড়ী-মসালা বরতন সব চুলহাকে পাশ রখ দও!" ভৃত্যের উদ্দেশ্যে গৃহিণীর ব্যস্ত কণ্ঠস্বর।—"মামণি, সব রান্না কিন্তু আমরা কোরবো—তুমি শুধু বলে দেবে—নাহলে আর চড়ুইভাতি কি হলো?" ভাই-বোনের মিলিত কণ্ঠ। এর ওপর মাঝে মাঝে ভাই-বোনের উজ্জ্বল করতালির সঙ্গে সুর উঠবে—"আজ আমাদের ছুটি রে ভাই…!"

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার কাছে চা-বিস্কুট আর চিঁড়েভাজা এসে গেলো। আমি সেগুলির সদ্ব্যবহার কোরে শরৎকালের মধুর আলো-হাওয়া আর বনলতার গন্ধের সাথে ছেলেমেয়েদের হাসি কাকলি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েচি। ঘুম ভাঙলো খিচুড়ীর চমৎকার গন্ধে কিদের ঠেলায়। উঠে বসে বললুম—"দেখি একটু চেখে!" ওরা চাখতে দিলে না—হৈচৈ কোরে বাবলা লাণ্টু বললে—মা শুধু খিচুড়ীটায় সব কিছু দিয়ে চড়িয়ে দিয়েচেন—জলঢালা আর খুন্তীনাড়া নাকি মার বিশেষ আপত্তি-সত্বেও ওরাই কোরেছে পালা কোরে। অতএব রান্নার প্রশংসাটা ওদেরই অর্দ্ধেকের বেশী প্রাপ্য। এখন চাকর গেছে নীচে আদা আনতে।' আদা আনা হয়নি—আর আদা নাহলে নাকি খিচুড়ী হয়না।

যাক্ কিছুক্ষণের মধ্যেই আদা এলো। তারপর পাঁপরভাজাও হলো। আলুর দম আর চাটনী আগেই হয়ে গেছে। চাটনীটা নাকি আলাদা একটি ছোট্ট উনুন কোরে, কাঠকুঠো ধরিয়ে বাবলা লাণ্টুই রেঁধেচে—আর ওইটাই নাকি সবচেয়ে ভালো হয়েছে—তাই আমায় সবচেয়ে বেশী দিয়েচে। দেখলুম ভালোই হয়েছে—যদিও ফোড়ন অনেক দিয়েচে, আর চিনি খুব ঢেলেচে। ওদের ভয় ছিলো যে মালমশলার অভাবে যাতে ওদের রান্নার বদনাম না হয়।

যাক্ খাওয়া-দাওয়ার পর আবার একটু ঘুমোবো স্থির কোরলুম। শতরঞ্চিটা একটু সরিয়ে ছায়াতে কোরে নিলুম। চারিদিক চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে—মধুর হাওয়া বইছে, আর নীচে সবুজ তরী-তরকারীর ক্ষেতগুলি যেন কার্পেটের মতো পড়ে আছে। বাবলা লালটু এই সময় এসে আবেদন করলে যে ওরা বাঁধানো রাস্তা বেয়ে একটু ওপরে উঠবে—চূড়োর ঐ যে মন্দির দেখা যাচ্ছে—সেইটেই ওদের লক্ষ্য। ভেবে দেখলুম পাহাড়-চূড়ার ঐ কয়টি মন্দির অবধি বাঁধানো সিঁড়ি—ভয় বিশেষ নেই এই দুপুর বেলায়। কিছু লোকও মাঝে মাঝে ওপরে উঠছে। চাকরের কাজ তখনও বাকী, তাকে বললুম ওদের ওপর একটু নজর রাখতে। অনুমতি পেয়ে তো ভাই-বোনে দেখতে দেখতে সিঁড়ির বাঁকে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো। শুয়ে শুয়ে আমারও আবার ঘুম এসে গেলো। কতোক্ষণ ঘুমিয়েচি জানিনে—হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলকে ঘুম ভেঙে গেলো। চেয়ে দেখি চড়ুইভাতির জায়গায় আমি একা—কেউ কোথাও নেই। কোথায় গেলো সব? বাবলা লালটু তো ওপরে গেছে—ভৃত্য প্রয়াগও ওদের অনুসরণ কোরেছে বোধহয়। আকাশে মেঘ জমেচে, এদিকে হু হু কোরে ঠাণ্ডা বাতাস বইচে—বাবলা-লালটুর মা তাহলে বাদলা দেখেই বোধহয় ওদের ডাকতে ওপরে গেছেন। আমি উঠে বসে চোখের চশমাটা দিয়ে দেখি আমার অনুমানই ঠিক—অনেক ওপরে আমার গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠচেন—একবার তিনি ফিরে নীচে চাইতে আমি হাত নাড়লুম—তিনি হাতের ইশারায় জবাব দিলেন ওদের খুঁজতে যাচ্ছি—বৃষ্টি এলো যে।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলুম—এই জিনিষের আগলদার থাকতে হবে বৃষ্টি এলে। শরীর তেমন ভালো নয়, নইলে কিছুক্ষণ তাড়াতাড়ি কোরে পাহাড় ওঠানামা—অসুখে পড়া নিশ্চিত—মন অসময়ে বাদলা—কে কোথায় রইলো, কি জন্যই এলুম…

ভেবে দেখলুম ছেলেবেলায় এই পাহাড়ে কয়েকবার উঠেচি। তখন বাঁধানো রাস্তা ছিলো না—তবু কি উৎসাহে উঠেচি। ওপরে তিন চারটি মন্দির পর পর পার কোরে গেছি চার পাঁচ মাইল চড়াই ভেঙ্গে। ওরা এতোক্ষণে প্রথম মন্দিরটি যদি পৌঁছে থাকে, তো সেখানে ঝড়-বৃষ্টির হাত হ'তে বাঁচতে পারে। তবে এই সব পুরানো ইঁটপাটকেলের ভেতর সাপ-খোপ বিছে থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। সব চেয়ে ভালো হয় যদি ওরা তাড়াতাড়ি নেমে আসে। এই স ভাবতে ভাবতে বৃষ্টি এসে গেলো চড়বড়িয়ে। আমি শতরঞ্চিটা গায়ে জড়িয়ে নিমের গুঁড়িতে ঠেশ দিয়ে বসে। সমুখে আমাদের চড়ুই-ভাতির উনুনটা জলে ভিজতে লাগলো। বাবলা ল্যাণ্টু ওদের খাবার জায়গায় ছুটো গর্ত খুঁড়েছিলো খুন্তী দিয়ে—সেখানে তাদের জলের গেলাশটা ভালো কোরে বসিয়ে রাখবে বলে—যাতে পড়ে না যায়। সেগুলোও দেখতে দেখতে ভরে গেলো জলে। আমার গায়ে বিশেষ জল লাগেনি। দুর্ভাবনার মধ্যেও একরকম মজা লাগছিলো। ভাবলুম দশ বছর আগে এরকম হলে কতো আনন্দই না পেতুম।

ওপর হ'তে কোনো খবর আসে না। বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে জলের ধারা তরতর কোরে নামছে—পাহাড় আকাশ বৃষ্টির ঝরঝরানিতে একাকার। সময় চলে যাচ্ছে—আঁধার করে এসেচে। ভাবলুম বাবলা লাণ্টুর মা বোধহয় এতোক্ষণে ওদের খোঁজ পেয়েছেন—আর কোনও গাছের তলে বসে আছেন—বৃষ্টি ছাড়লে নেমে আসবেন। ভাবতে লাগলুম যে ওপরে দু' একটা বড়ো গাছ আছে কিনা। হাঁ, আছে তো —যদি না কাঠুরিয়ারা তাদের কেটে ফেলে থাকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বৃষ্টি একটু ধরে গেলো, আর আমিও ততোক্ষণে বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠেচি—একদৃষ্টে চেয়ে রয়েচি আকাশের পাটে আঁকা পাহাড়ের সাদা বাঁধানো সিঁড়ির বাঁকে—আর খালি—"বাবলা-লাণ্টু!" বলে ডাকচি। সিঁড়ী দিয়ে নামচে দুএকজন—তাদের জিজ্ঞাসা কোরতে তারা কিছুই বলতে পারলে না।

এবার আর থাকতে না পেরে আমি সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে লাগলুম। বৃষ্টির পর বাতাস শীতল সজল, আর হেলেপড়া সূর্যের রেশটুকু আবার আকাশে বিচিত্র সব রঙের ছোপ দিয়ে গিয়েছে—মনের দুশ্চিন্তা না থাকলে উঠতে খুবই আনন্দ পেতুম। কিন্তু কারুর দেখাই নেই যে! এতোক্ষণে কারুর না কারুর নেমে আসা উচিত ছিলো তীর্থযাত্রীদের মধ্যে। এদিকে লাণ্টু আমার লাঠিটা নিয়ে গেছে বলে তাড়াতাড়ি উঠতেও পারছি নে। সত্যিই হাঁফিয়ে পড়ে শেষে একটা সিঁড়ির ধাপে বসে পড়লুম নিরাশার অকূল সাগরে ভেসে—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ভেসে এলো আমার ছেলেমেয়ের জুতার শব্দ আর কথা-হাসির আওয়াজ! আমার সমস্ত প্রাণে যেন স্বস্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে ছুটিতে আমার কাছে লাফিয়ে নেমে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে শুরু কোরলে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা।

—"জানো বাবা কি হয়েছিলো? সিঁড়ি দিয়ে অনেক অনেক উঁচুতে আমরা চলেছি তো চলেইছি—এমন সময় আমাদের মনে পড়ে গেলো মুনি-ঋষিদের কথা! গুহার মধ্যে তো ওরা তপস্যা করেন. আর এতোবড়ো পাহাড়ে কি আর গুহা নেই? একজন লোককে জিজ্ঞাসা কোরলাম সেও সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাচ্ছিলো। সে একটা বাঁক হতে পাহাড়ের মস্ত ঘোরালো জায়গা দেখিয়ে বললে—উঁহা হয় গোম্ফা! আমরা তো অনেক সাহস কোরে আস্তে আস্তে এগোতে লাগলুম সিঁড়ি ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে। এমন সময় এলো বৃষ্টি! তাড়াহুড়ো কোরে তো দুজনে ঢুকলুম গুহার মুখে—ভেতরে বড্ড অন্ধকার, ভয়ানক ভয় কোরতে লাগলো। এইসময় ফশ কোরে সেই অন্ধকার কোটরে আগুন জ্বলে উঠলো, আর আমরা দেখলুম একজন সাধু ধুনি জ্বালাচ্ছেন। সাধুও আমাদের দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা কোরলেন—কাঁহাসে আয়া বেটা? বাপমাই কাঁহা? আমাদের কথা শুনে বল্লেন, 'চল্ নীচে পৌঁছা দে?' আমরা বললুম—'না। আমরা কখনও এর আগে আসল সাধু দেখিনি—আমরা শুনবো আপনি কি কোরে থাকেন এখানে।' সাধু হেসে আমাদের বসালেন, একটু প্রসাদ দিলেন আর দিলেন দুগাছি রুদ্রাক্ষের মালা। আর অনেক গল্প বললেন—বললেন কতো ভগবানের কথা—সতোক্ষণ বৃষ্টি হলো ততোক্ষণ! জানো বাবা—তারপর বৃষ্টি থামতে তিনি বললেন, 'অব্ বাপমাইকে পাস আপস যা বেটালোগ।' আমরাও উঠচি তাঁকে প্রণাম কোরে এমন সময়—ওরে বাবা! এক এই বিরাট সাপ গুহার মধ্যে শনশন্ কোরে ঢুকে পড়লো। আমরা ভয়ে জড়োসড়ো। সাধু ইশারায় আমাদের চুপ কোরে দাঁড়াতে বলে তাঁর কমণ্ডলুর একটু জল আমাদের চারদিকে ছিটিয়ে দিলেন। সাপটা সোজা আমাদের দিকেই আসছিলো, কিন্তু জলের কাছে আসতেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেলো। সাধু তখন মন্ত্র পড়ে তার গায়ে ছুটি ছাই ফেলে দিতেই সাপ মুখ ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে গুহার বাইরে চলে গেলো, আর সাধু আমাদের হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে, অনেকটা এগিয়ে দিলেন!

এই সময়ে ভৃত্যের সঙ্গে গৃহিণী এলেন। কাজ শেষে প্রথম ওদের খোঁজে দ্বিতীয় মন্দির অবধি যান। নামবার পথে প্রথম মন্দিরের কাছে বাবলা লালটুর মার দেখা পেয়েছে।

মায়ের ব্যথা

শ্রীহরিপদ গুহ

খোকন কাঁদে মায়ের কাছে: নতুন-জামা দাও মা কিনে,
সবাই পরে নতুন জামা—আজকে যে মা পূজার দিনে।
মাও কাঁদে ছেলের সাথে—এমনি সে যে ভাগ্যহীনা,
স্বামী তাহার দু'দিন ভুগে, হঠাৎ চলে গেলেন কিনা।

লোকের বাড়ী চাকরী করে কোনও মতে দিন যে কাটে,
নতুন-জামা কোথায় পাবে? কি দিয়ে সে ব্যয় যা হাটে?

গত বছর পুজোর দিনে—যখন তার ছিলেন স্বামী,
দিয়েছিলেন নতুন জামা, দেখ্‌তে ভাল, অনেক দামী।

জাগলে মনে সে সব স্মৃতি দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গলে,
চুমা দিয়ে খোকাকে তার—রাখ্‌ল চেপে বুকের তলে।
মায়ের কাঁদন দেখে খোকা, বলে : মাগো, চাইনে জামা,
কিচ্ছু আমার চাইনে কো মা, এইবার তোর কান্না থামা!

ছেলের কথা শুনে মায়ের কান্না যে যায় আরো বাড়ি,
খোকাকে তার আদর ক'রে—উঠ্‌ল মাতা শয্যা ছাড়ি।
পরের বাড়ী কাজ সেরে সে, রাত্রে যখন ফিরল ঘরে,
খোকা তখন লুটায় ভূমে—গা পুড়ে যায় দারুণ জ্বরে।

যত্ন করে মাতা তখন নিলেন তারে বক্ষে তুলে,
স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলে—গায়ে, মাথায় কোঁকড়া চুলে।
সে জ্বর তার কমল না হায়, ক্রমেই তাহা যায় যে বাড়ি,
খুঁড়্‌লো মাথা, ডাক্‌লো কত দেব-দেবীরে কণ্ঠ ছাড়ি।

বধির সবে, শুন্‌ল না যে, বেদন-ভরা কান্না তার,
ভোরের সাথে সব ফুরালো—সেদিন যে গো বোধন মা'র।
কান্না তাহার শেষ হয়েছে, কাঁদবে সে আর কার লাগি?
ধরার পরে তাহার মত নাইকো বুঝি কেউ অভাগী?

শেয়ালের চাতুরী

প্রশান্ত মৈত্র

বাঘটা একটা বিরাট ফাঁদে ধরা পড়লো। বাইরে আসতে না পেরে কেবল ভীষণ জোর গর্জন করতে আরম্ভ করলো, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কেউ এসে তাকে সাহায্য করলো না। তাই বাঘটা চুপচাপ বসে বসে ভাবতে লাগলো, কি করে খালাস পাওয়া যেতে পারে।

ঠিক সেই সময়েই একজন কাঠুরিয়া সেখান দিয়ে বনে কাঠ কাটতে যাচ্ছিল। বাঘটা তো তাকে দেখেই খুব খুসি। তাই তাকে ডেকে বললো, "ও মশাই, দয়া করে আমাকে এই ফাঁদটা থেকে মুক্তি দাও না।"

কিন্তু কাঠুরিয়া জানত যে ছাড়া পেলেই বাঘটা তাকে খেয়ে ফেলবে। তাই সে বললো, "না আমি পারব না, তুমি আমাকে মেরে ফেলবে।"

তখন বাঘটা তার মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে বলতে আরম্ভ করলো, "তুমি মনে করো না যে আমি অন্য সব বাঘের মত। আমি একটুও তাদের মত নই। আমি খুব সৎ, আর মাংস আমি ভালবাসি না। আচ্ছা, তুমি আমাকে মুক্তি দিয়ে দেখই না কি হয়। যা বল্লাম সব সত্যি কথা।"

কাঠুরিয়া তার কথায় বিশ্বাস করে খাঁচার দরজাটা খুলে দিল। বাঘটা সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে লাফিয়ে এসে লোকটিকে বল্ল, "এখন তোমাকে শেষ করব।"

চেঁচিয়ে উঠে লোকটি বল্ল, "বাঃ! তুমি যে বা
মাংস খাও না।"

: তুমি যে একটা আ বোকা, কারণ সকা
যে বাঘ মাত্রেই মাংস খায়।

হঠাৎ সেখানে একটা শেয়াল এসে উপস্থিত

: কি হ'ল তোমাদের?

লোকটি শেয়ালকে সব কথাই খুলে বল্ল

শেয়ালটা একবার লোকটার দিকে—
দিকে ভালভাবে তাকিয়ে, মাথাটা চুলকি
বাঘটার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু ক
ঘটনাটা তাহলে ভালভাবে বুঝেই নি। লে
ফাঁদের মধ্যে আর—"

বাঘ বল্ল, "না না, আমি ছিলাম ফাঁদে।"

: আচ্ছা বুঝলাম, তুমি ফাঁদে ছিলে আর আমি
বাইরে?

: না না, লোকটা বাইরে ছিল।

: ও, ফাঁদটা বাঘের মধ্যে ছিল, আর—

: ওহে বোকা! আমি ছিলাম ফাঁদে।

: দাঁড়াও না—অত রাগছ কেন? আমাকে একটু ভালভাবে বুঝেই নিতে দাও না? তাহলে তুমি লোকটার মধ্যে ছিলে আর—

: তোমার কি কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই হে? এ'রকম গর্দ্দভ আমি জীবনে দেখিনি।

শেয়ালটা এই ভাবে একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে

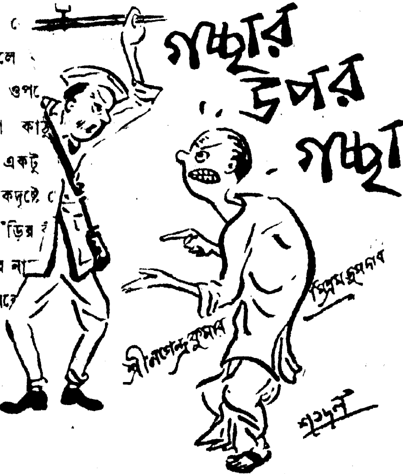
লাগলো দেখে বাঘটা ভীষণ রেগে গিয়ে বল্ল, "আচ্ছা আমি নিজেই দেখিয়ে দিচ্ছি কি ঘটনাটা হয়েছিল"—এই বলেই সে এক লাফে গিয়ে পড়ল খাঁচাটার মধ্যে—"এই দেখ, আমি এই ভাবে বন্দী ছিলাম আর লোকটা ছিল বাইরে।"

"ও বুঝলাম, তুমি এই ভাবে বন্দী ছিলে আর দরজাটা এই ভাবে বন্ধ ছিল"—চালাক শেয়াল এ'কথা বলেই দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিল।

বাঘটা এইভাবে আবার বন্দী হ'ল, আর বেচারী কাঠুরিয়া প্রাণে বেঁচে গেল।

("The fox that did not understand" গল্পের অনুবাদ।)

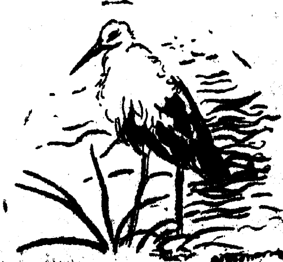
ধারা ত...
একাকার।
লাট্টুর মা ...
গাছের তলে ...
লাগলুম যে ওপ...
—যদি না কা...
মধ্যে বৃষ্টি একটু
উঠে চ—একদৃষ্টে ...
বাঁধানো সিঁড়ির ...
সিঁড়ী দিয়ে না...
বলতে পারে...
এবার
লাগলুম
টুকু



পকেটে নিয়ে একটি টাকা উঠ্‌ল ট্রামে গঙ্গানাথ,
কন্‌ডাক্‌টার চাইতে ভাড়া দিয়ে দিল তৎক্ষণাৎ।
ট্রামের ভাড়া তিন পয়সা কেটে নিয়ে কন্‌ডাক্‌টার,
পুরানো, নয়া পয়সা মিলে মিটিয়ে দিল প্রাপ্য তার।
সরু মোটায় সংখ্যা অনেক ভাঙানি সে গুণতে থাকে,
হিসেবে তার কমতি দেখে রেগে ভীষণ ডাক্‌ল তাকে।
বল্ল,—"ভায়া, বেশ দেখ্‌ছি কারবারটি খুলেছ ভালো,
অর্দ্ধেকেতেই একটি পুরো নেওয়ারও বেশ নিয়ম পালো।
দেবার বেলায় কাঁচু মাঁচু নেবার বেলায় দিব্যি দাও,
কর্ম্মচারী হুকুম তামিল কর্‌ছি বলে দোষ কাটাও।
ট্রামে, বাসে, ডাকঘরেতে বেড়িয়ে এসে সকাল বেলা,
একটি টাকা নয়া পয়সায় করে গেছি গচ্ছা খেলা।



গচ্ছা আবার দিতে বলো? শোনায় যখন গরম সুর,
তিন পয়সার স্টপেজ ছেড়ে ট্রামটি তখন অনেক দূর।
পরিদর্শক এসেই ধরে—"কোথায় দেখি টিকিটখানা,
চলবেনাতো এই টিকিটে নিয়মটি কি নেইকো জানা।
টিকিট কিনুন নতুন করে তিন পয়সা নগদ দিয়ে,
প্রশ্ন শুনেই গঙ্গানাথের ঘুরল মাথা বনবনিয়ে।
চেঁচামেচি করল অনেক রেহাই পাবার ওজর তুলে,
কাট্‌তে টিকিট হলও তবু সেই রাগেতে শরীর ফুলে।
"নয়া পয়সা গচ্ছা দিলুম, গচ্ছা দিলুম টিকিট আবার!"
এই চিন্তা গঙ্গানাথকে করল যোগাড় পাগল হবার!



জগাপিসির একদিন

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

আমাদের যোগেশবাবুকে দেশশুদ্ধ লোক জগাপিসি বলেই জানে, তিনি নিজে ছাড়া। তাঁর নিজের ধারণা তিনি খুব বুদ্ধিমান্, আর ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে করেন ভালোভাবে। ভোর চারটের সময় ওঠে তিনি গান ধরবেন।

সত্য সুন্দরো—ও-ও!

সে গানের যে সুর, তা শুনে পাড়ার লোক জেগে উঠবে, তার মনে করবে কোথায় যেন মারামারি হচ্ছে, কে যেন কাকে খুন করছে।

গিন্নি হরিপ্রিয়া ছেলে-পুলে ঝি চাকর সবাই যখন জেগে উঠবে, তিনি একটা ভারী চটি পায়ে পরে খটাস্ খটাস্ করে শব্দ ক'রে সমস্ত বাড়ীটা ঘুরে তখন কলে মুখ ধুতে যাবেন চতুর্দ্দিকে আলো জ্বালিয়ে বালতি গড়িয়ে ঘটাং করে ঘটা নর্দ্দমায় ফেলে, মনে হবে সকলকার, ওঁকে খুন ক'রে ফাঁসি যাওয়া ঢের ভালো।

তারপর উনি এসে ঘুমোবেন। আটটার আগে উঠবেন না।

ট্রাম ধর্ম্মঘট হয়েছে শুনে উনি রাস্তায় মজা দেখতে বেরোলেন। লোকে অফিস যাচ্ছে ঝুলতে ঝুলতে, ওঁর কোনো কাজ নেই, উনি তাদের ভিড়ে ঢুকলেন। মোটা দেহ নিয়ে একে ল্যাং মেরে তাকে পা মাড়িয়ে ওর কাঁধ ধরে শূন্যে ঝুলতে লাগলেন, তারপর কি কৌশলে ভেতরে চলে গেলেন, বোঝা গেল না।

একজন বললে, আপনি এই বয়সে এত কষ্ট ক'রে কেন চললেন?

মজা দেখতে।

মজা দেখবার এই কি সময়?

মজার আবার সময় অসময় আছে নাকি? তুমি তো বেশ মজার লোক দেখছি। হাসিটা যেমন তোমার বোকা-বোকা, বুদ্ধিটাও তেমনি মোটা। ট্রাম ট্রাম তো করো, ট্রাম কথাটা কোথা থেকে এলো জানো?

ভিতরে চাপে মানুষের প্রাণান্ত, পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টরের আনাগোনায় বাঙালীর পাঞ্জাবি ছিঁড়ে যাবার যোগাড়, এমন সময়ে 'ট্রাম কোত্থেকে এলো!'

তবু একজন লম্বা গোছের লোক গলাটা বাড়িয়ে বললে—বলুন দাদু, ট্রাম কোত্থেকে এলো?

ট্রাম বার করেছিলো আউটরাম। এ আউটরাম নয়, যার মূর্ত্তি উল্টে দিয়েছে। এ আউটরাম নয় যার ঘাট। এ অন্য আউটরাম। তার নামে হল আউটরামওয়ে—তা থেকে টেরামওয়ে। কিন্তু কণ্ডাক্টর, তুমি যদি আমার কাছে পয়সা চাও তো এমনি ঝগড়া লাগিয়ে দেবো, যে ডালহৌসি পর্য্যন্ত টিকিটই করতে পারবেনা। ভয় নেই, তোমার বাসেই আমি ফিরব, কোথাও নামবনা। তুমি বরঞ্চ ঐ বুড়োটার টিকিট করো, যে জানলার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, আর এই ছোকরার, যে প্যাণ্ট আর টাই সামলাতে ব্যস্ত, পয়সা বার করবার নাম নেই। বৌবাজারের মোড়ে গিয়ে হঠাৎ এমন একটি হাঁচি হাঁচলেন যে লেডিজ সীটের বৌটির কোল থেকে ছেলে প'ড়ে গেল, ড্রাইভারের হাত কেঁপে গিয়ে গাড়ী উঠলো ফুটপাথে, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি যাত্রীদের। পান খাচ্ছিলেন জগাপিসি, মুখের সুপুরিগুলো ছিটকে গিয়ে একজনের চোখ প্রায় কানা ক'রে দিলো।

একজন বলেছে, অমনি ক'রে হাঁচে মশাই? মনে হল যেন টায়ার ফাটলো।

জাগপিসি ক্ষেপে গিয়ে বললেন—তোমার কাছে হাঁচি শিখতে হবে? হাঁচি এসে গেল, হেঁচে ফেললুম। তুমি একটা হাঁচির ক্লাস খোলো, কেমন ক'রে হাঁচতে হয়, শেখাবে।

সেণ্ট্রাল এভিনিউ পার ক'রে একটি ঢেঁকুর তুললেন, বাপরে তার কি শব্দ! যে ছেলেটি গড়িয়ে প'ড়ে গেছলো, সে এবার ককিয়ে কেঁদে উঠলো।

মার্টিনের কাছে ভিড় নেমে গেল, যে বুড়োটি জানলার দিকে মুখ করেছিলেন, জগাপিসি যাঁর টিকিট করবার জন্যে কণ্ডাক্টরকে বলেছিলেন, তিনি এবার মুখ ফেরাতেই জগাপিসি বললেন, আরে ব্যাই যে! আমার একখানা টিকিট করেছেন? না নিজেরটি ক'রেই ব'সে আছেন?

আপনাকে দেখতে পাইনি বেয়াই মশাই! লজ্জায় প'ড়ে টিকিট কাটেন মেয়ের বাপ।

ছেলের বাপ এবার গ্যাঁট হ'য়ে বসেন।

পেন্সন নিতে যাচ্ছেন? জগাপিসির প্রশ্ন।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

চলুন আপনার সঙ্গে যাই। ফেরবার সময়ে ট্যাক্সি করবেন, নইলে বাসের ভিড়ে পকেট কাটা যাবে। আমিও ফিরব আপনার সঙ্গে।

কিন্তু তখন ভিড় অনেক কম্‌বে।

আপনার মুণ্ডু কম্‌বে! বলে—জগাপিসি তাঁকে ঠেলে ঠেলে চৌরাস্তা পার করেন।

বাড়ী ফিরে কিন্তু ট্যাক্সি ভাড়া নিজেই দেন। বলেন, না ব্যাই সে হবে না। আপনি যে সামান্য ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে মনে করবেন আমার মাথা কিনে রেখেছেন—আর মুখ্যুর মতন যাকে তাকে সেই কথাটি ব'লে বেড়াবেন, এ আমি কিছুতেই হ'তে দোব না। তবে এইখান থেকে আপনি হাঁটুন। বেলা একটার সময়ে মেয়েকে দেখবার নাম ক'রে মিষ্টিতে নোনতায় আমার আর বারোগণ্ডা পয়সা খরচ করবেন না।

বাড়ীতে ঢুকে গৃহিণীকে বল্‌লেন, আজ খুব জোর বেঁচে গেছি। ব্যাই এ বাড়ীতে ঢুক্‌ব ঢুক্‌ব করছিলো, তাকে তার বাড়ীর দিকে চালান করিয়ে দিয়েছি।

জগাপিসির বৌমা বল্‌লে, ওমা, বাবা এলেন, দেখা হ'ল না।

বাবাকে তো চিরকাল দেখছ বৌমা, জন্ম জন্ম দেখবে, আজ না হয় নাই দেখ্‌লে। যেদিন তোমার বাবা সন্দেশ নিয়ে আস্‌বেন, সেদিনে ভালো করে দেখা কোরো। এখন নাকে-কান্না বন্ধ করো।

সেদিন রাতদুপুরে হঠাৎ 'তারা ব্রহ্মময়ী পার করো মা ভবসাগর' ব'লে এমন এক হুঙ্কার ছাড়লেন যে পাশাপাশি তিনচারখানা বাড়ীর লোক চম্‌কে জেগে উঠ্‌লো।

পরদিন সকালে ওপরে হঠাৎ একটা আওয়াজ হল, ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ।

কি হল? হরিপ্রিয়ার প্রশ্ন নীচে থেকে।

জগাপিসির গম্ভীর গলায় উত্তর—হয়নি কিছু।

হয়নি কিছু তো শব্দ কিসের?

রেডিয়োটা ভাঙ্‌লো।

ভাঙ্‌লো কি ক'রে?

তা দেখাতে হলে আর একটা রেডিয়ো ভাঙ্‌তে হয়। আমি শুধু ওটার ওপর দাঁড়িয়ে ইলেকট্রীক পাখা ঠিক করতে গেছলুম।

শোনো কথা! রেডিয়ো কি ওপরে দাঁড়াবার জন্যে হয়েছে? এত টুল কি জন্যে রয়েছে তবে?

জগাপিসি বল্‌লেন—সামান্য একটা রেডিয়ো ভেঙেচে, সেটা কিন্তু বড়ো কথা নয়—যে অনুরোধের আসর' ওতে চলে, তাতে ভাঙাই উচিত। কিন্তু ওর ভেতরে আমার পা ঢুকে গিয়ে পা-টা যে জখম হল, সেটাই আগে দেখা দরকার নয় কি?

পা থেকে কিছু রক্তপাত হ'য়ে গেছে ব'লে তাড়াতাড়ি রক্ত করবার জন্যে তিনি মাংস, রাবড়ি, মুরগীর ডিম, হেমো-গ্লোবিন কি সব কিনে আনলেন।

বেশ দুর্ব্বল বোধ করছেন! অন্ততঃ আধ-চামচ রক্ত বেরিয়েছে। ওঁর ধারণা, এক মণ খাবার খেলে তবে এক চামচ রক্ত হয় তৈরী।

কোথায় পড়েছিলেন, মনে নেই।

বারোটি ছেলে মেয়ে নাতি নাৎনী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে, উনি গোগ্রাসে খেয়েই যান, মানে—গরুর মতন হাঁ ক'রে, মাংসর সঙ্গে রাবড়ি মিশিয়ে তাতে মুরগীর ডিম দিয়ে, তাতে দু দাগ হেমোগ্লোবিন দিয়ে। এবারে জোর পাচ্ছেন। আপরুচি খানা—নিজের রুচিমতন খাবে, যে যাই বলুক, এই ওঁর ধারণা।

——

শুম্ভ নিশুম্ভের গল্প

শ্রীকালীপদ কোঙার

পুরাকালে এক সময় শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুইজন অসুর প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুম্ভ ছিল দৈত্যগণের রাজা এবং নিশুম্ভ সেই দৈত্য-রাজের ভ্রাতা। শুম্ভ ও নিশুম্ভ বলের প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিভুবনের অধিকার কাড়িয়া লইয়া দেবগণকে স্বর্গরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তখন দেবতাগণ পর্ব্বতরাজ হিমালয়ে গিয়া দেবী মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। সেইকালে দেবী পার্ব্বতী গঙ্গার জলে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। দেবতাগণ কাহার স্তব করিতেছেন ইহা তিনি জিজ্ঞাসা করিতে পার্ব্বতীরই শরীর-কোষ হইতে এক দেবী উৎপন্না হইয়া জানাইলেন যে দেবগণ তাঁহারই স্তব করিতেছিলেন।

সেই অপরূপ সুন্দরী দেবীকে চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুইজন অসুর দেখিতে পাইয়া রাজা শুম্ভকে ইঁহার রূপলাবণ্যের কথা বলিল। তাহা শুনিয়া অসুররাজ শুম্ভ একটি দূত পাঠাইয়া দেবীর নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে ত্রিভুবনের সমস্ত সুন্দর জিনিষের অধিকারী শুম্ভ ও নিশুম্ভের যে কোন একজনকে বিবাহ করার জন্য দেবী যেন অবিলম্বে শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট যান। এই কথা শুনিয়া দেবী মনে মনে হাসিয়া কহিলেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন। অতএব শুম্ভ কিংবা নিশুম্ভ যেন যুদ্ধে তাঁহাকে জয় করিয়া লইয়া যায়।

দূত দেবীর এই দম্ভোক্তি শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং দৈত্যরাজকে গিয়া এই সকল কথা সবিস্তারে জানাইল। রাজা শুম্ভও তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাপতি ধূম্রলোচনকে ষাট হাজার সৈন্যসহ পাঠাইল এবং দেবী চণ্ডিকাকে কেশ ধরিয়া টানিয়া আনিতে বলিল। কিন্তু তাহারা যখন দেবীর সকাশে গিয়া উপস্থিত হইল তখন দেবী হুঙ্কার করিতেই ধূম্রলোচন ভস্ম হইয়া গেল এবং দেবীর বাহন সিংহ সমগ্র অসুর সৈন্যদলকে বধ করিল। তখন রাজা শুম্ভ এই সংবাদ পাইয়া চণ্ড মুণ্ডকে এক বিরাট সৈন্যদল সহ পাঠাইল।

সেই সৈন্যদল দেবীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলে দেবী ভ্রূকুটি করিলেন। ভ্রূকুটি হইতে এক ভীষণা কৃষ্ণবর্ণা দেবী জন্মগ্রহণ করিল। সেই দেবী কালী অসুর সৈন্য মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অসুর সৈন্য সকল খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। সমগ্র সৈন্যদলকে হত দেখিয়া চণ্ডাসুর বাণ বৃষ্টি করিতে করিতে আগাইয়া গেল। কালীও তখন চণ্ডাসুরের চুল ধরিয়া প্রচণ্ডবেগে খড়্গের আঘাতে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে কালী কর্তৃক মুণ্ড-ও নিহত হইল। এই দেখিয়া বাকী সৈন্যগণ ভয়ে পলাইয়া গেল। চণ্ড ও মুণ্ডকে সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া দেবী মহামায়া সেই কৃষ্ণবর্ণা দেবীর নাম দিলেন চামুণ্ডা।

চণ্ড ও মুণ্ডের হত্যার সংবাদ পাইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভ তাঁহাদের সমস্ত সৈন্য লইয়া যুদ্ধসাজে সাজিয়া বাহির হইলেন। তখন অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক ও ইন্দ্রের শরীর হইতে দেবশক্তি কতকগুলি দেবীর রূপে বাহির হইয়া আসিলেন। আর দেবী চণ্ডিকার শরীর হইতে এক দেবী বাহির হইয়া শিবকে দূতরূপে অসুরদের নিকট পাঠাইয়া এই কথা বলিতে বলিলেন যে যদি অসুরগণ বাঁচিতে চায় তবে তাহারা যেন পাতালে চলিয়া যায়। শিবকে দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া এই দেবীর নাম হইল শিবদূতী।

যাহা হউক, শিবদূতীর কথায় অসুররা কর্ণপাতও করিল না। তখন দেবতা ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হইল। অসুরদের মধ্যে রক্তবীজ নামক এক অসুর ছিল, তাহাকে লইয়া দেবী মহা বিপদে পড়িলেন। এই অসুরের এক বিন্দু রক্ত মাটিতে পড়িলেই তাহা হইতে রক্তবীজের মত মহাপরাক্রমশালী এক একটি অসুর উৎপন্ন হইল। সুতরাং যখন ইন্দ্রের শক্তি স্বরূপা ঐ স্ত্রী দেবীর সহিত তাহার যুদ্ধ হইল তখন তাহার রক্ত হইতে হাজার হাজার দৈত্য জন্মগ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ছাইয়া গেল। তখন দেবী মহামায়া রক্তবীজকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং দেবী চামুণ্ডা মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই সেই রক্ত খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপে রক্তবীজের সমস্ত রক্ত যখন শেষ হইয়া গেল, তখন রক্তবীজ নিস্তেজ হইয়া লুটাইয়া পড়িল এবং মরিয়া গেল।

এইবার শুম্ভ ও নিশুম্ভ দুইজনেই দেবীর নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং বাণ, গদা, ত্রিশূল, খড়্গ প্রভৃতি দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহাদের প্রতিটি আঘাতকে প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং দেবী নিশুম্ভকে বাণের আঘাতে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। তখন শুম্ভ আগাইয়া আসিলেন এবং শূলের আঘাতে দেবী শুম্ভকে মূর্চ্ছিত করিলেন। এদিকে নিশুম্ভের মূর্চ্ছা ভাঙিতে তিনি দেবীর সহিত আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। দেবী শূল দ্বারা এবারে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিতে তাঁহার বুক হইতে আর একটি অসুর বাহির হইল। দেবী তাহাকেও খড়্গাঘাতে কাটিয়া ফেলিতে নিশুম্ভ নিহত হইলেন। এদিকে চামুণ্ডা ও শিবদূতী এবং দেবীর বাহন সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রের অসুরদের খাইয়া ফেলিতে লাগিলেন।

শুম্ভের মূর্চ্ছা ভাঙিলে তিনি যখন দেখিলেন যে তাহার ভ্রাতা নিশুম্ভকে বধ করা হইয়াছে, তখন সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। তিনি দেবীর নিন্দা করিয়া বলিলেন যে, অন্যান্যের শক্তির সাহায্যে দেবী জয়লাভ করিতেছেন। এইরূপ জয়লাভের জন্য আবার অহঙ্কার কিসের! তাঁহার এই কথা শুনিয়া দেবী অম্বিকা অন্যসকল দেবীদের নিজ শরীরে লয় করিয়া লইলেন। তাহার পর দেবী এবং শুম্ভের মধ্যে বহুক্ষণ ভয়ানক যুদ্ধ হইল এবং শেষে শুম্ভের বুকে শূল বিঁধাইয়া দেবী তাঁহাকে বধ করিলেন। অবশিষ্ট অসুর সৈন্যগণ পাতালে চলিয়া গেল।

অসুর-নিধন হওয়ার পর সর্ব্বত্র শান্তি ফিরিয়া আসিল। দেবগণ তখন অপরাজিতা দেবী কাত্যায়নীর স্তব করিতে লাগিলেন। যখনই দৈত্যদের অত্যাচার হইবে, তখনই তিনি পুনরায় আবির্ভূতা হইবেন এই আশ্বাস দিয়া দেবী অদৃশ্য হইলেন। দেবগণ আবার স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন এবং সুখে বসবাস করিতে লাগিলেন।





॥ আশ্রমের শিক্ষা ॥

প্রাচীনকালে মুনিঋষিরা আশ্রমের শান্ত পরিবেশে তরুতলে শিষ্যদের শাস্ত্রচর্চা শিক্ষা দিতেন। বহুকাল সেই সরল শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আবার সেই সুপ্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। আজ পল্লী অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশে এই সহজ শিক্ষাই দ্রুত প্রসারলাভ করছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে শান্তিনিকেতনের এক বৃক্ষের ছায়াতলে ক্লাশ্ বসেছে। এরূপ শান্তিপূর্ণ পরিবেশই ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাভ্যাসের প্রধান সহায়। সহরাঞ্চলেও এরূপ প্রশান্ত পরিবেশে বিদ্যাভ্যাস করা বিদ্যার্থীদের পক্ষে সম্ভব হলে শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠবে।



সুধা হালদার ও সম্প্রদায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১

ন ধরেই হাত টানাটানি যাচ্ছিল পরেশের। বাজার চড়া জিনিসপত্রের দাম এত আক্রা যে মাথা ঠিক রাখা । বাজারে যাওয়ার আগে রোজই স্ত্রীর সঙ্গে এক ঝগড়া করে পরেশ বাজার থেকে যখন ফেরে মাছ কারির দাম দেখে আরও মাথা গরম হয়। পুঁজিপাটা ছিল তা প্রায় সবই শেষ হয়েছে। ঘরে বসে বসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও শেষ হয়। আর এ তো পরেশ হালদার। শ পরীক্ষা দিয়ে কোন সার্টিফিকেট জোগাড় করতে নি, অল্পসল্প গাইতে বাজাতে জানে, তাছাড়া কোন তর কাজ শেখেনি। নতুন করে কিছু শেখবার চেষ্টাও ই। নতুন কোন কাজকর্মকে যেন যমের মত ভয় করে রেশ। সংসারে কতজনে কত কাজ করে খায়। পেটের য যার মাথা আছে সে মাথা খাটায়। যে তা পারে না হাত পা খাটায়, দুখানি হাত দিয়ে মানুষ কত কাজ করে। স ছেলের আবার কাজের অভাব আছে নাকি? কিন্তু কাজের কথা বললে পরেশ যেন জঙ্গলে পড়ে, জলে ড়। তাকে যেন বাঘে কুমীরে খেতে আসে, চোখ-র এমনি দশা হয় তার। পুরুষ মানুষের এই ভয় দেখে আগে আগে হাসত। আজকাল আর হাসতে পারে এখন তো সে আর একা নয়। দুটি ছেলেমেয়ে ছে। আরো একটি আসছে। এখন পরেশকে ভয় পেলে চলবে কেন? এখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে কতজনে বল ভরসা সাহস পাবে।

পাথুরিয়াঘাটার সরু গলির মধ্যে দুখানা মাত্র ঘর। তারই ভাড়া গুণতে হয় মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আজকের এই কথান্তরটা ভাড়া নিয়েই শুরু হয়েছিল।

সুধা বলেছিল, 'কই, ভাড়া দিলে না। মাস যে শেষ হয়ে এল। বাড়িওয়ালা ব্রজবাবু এরই মধ্যে তিন দিন তাগিদ দিয়েছেন?'

পরেশ বলেছিল, 'দিক গিয়ে। তার কি। সে তো তাগিদ দিয়েই খালাস।'

সুধা হেসে বলেছিল, 'ওরা ঘর ভাড়া দিয়েছে, ভাড়ার জন্যে তাগিদ দেবে না? আমাদের মাসী যে মাসপয়লা দিনে গুণে গুণে ভাড়ার টাকাটা আদায় করে নিত।' বলে সুধা জিভ কেটে বড় লজ্জিত হয়ে পড়ে। পূর্ব-পাপস্মৃতি সে আজ মনে করতেও চায়নি, বলতেও চায়নি। মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে। বাড়ি ঘর যারা ভাড়া দেয় তারা যে অমন কড়া তাগিদই দিয়ে থাকে, আর ভাড়াটেকে সে টাকা হাসিমুখে নিয়মিত জুগিয়েও যেতে হয় স্বামীকে এই তত্ত্বটা বুঝিয়ে বলবার জন্যেই দৃষ্টান্তটা হঠাৎ মুখের আগায় এসে পড়েছে সুধার।' কিন্তু তাতে এমনই বা কোন দোষ হয়েছে। ঘরে তো পরেশ ছাড়া আর কেউ নেই। সে তো সব জানেই। নিজেই

দেখেছে শুনেছে। কত মাসীকে দেওয়ার জন্তে কত বোনঝির বাড়ি ভাড়া নিজের হাতে জুগিয়েছে। পরেশের তো কিছু আর অজানা নেই। পরেশ ছাড়া ঘরে আছে আর দুটি ছেলেমেয়ে। কোলের দেড় বছরের ছেলেটি এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। চার বছরের মেয়েটি সারা বাড়ি ভরে ঘুর ঘুর করছে আর নিজের মনে গাইছে, 'সব দিলে না বঁধু।'

ময়নার গলাটা ভালোই হবে। আর যখন যে গান শোনে তাই ও সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিতে পারে। কিন্তু ও গান গাইলেও ওসব কথা বুঝবার কি আর তার বয়স হয়েছে। কম পক্ষে আরো ন দশ বছর লাগবে। তত-দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে সুধার। জিভ আর মুখ আয়ত্বে আসবে। কোন বে-ফাঁস কথা আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেরিয়ে আসবে না।

কিন্তু কথাটা শুনেই পরেশ চোখ তুলে কটমট করে তাকাল স্ত্রীর দিকে। যেন এতক্ষণ পরে সে সুধাকে বাগে পেয়েছে।

পরেশ বলল, 'ফের ওই সব কথা? লজ্জা করে না তোমার? তিন সন্তানের মা হতে যাচ্ছ, তবু মুখের লবজ গেল না?'

সুধা আরো লজ্জিত হল, একটু হেসে বলল, 'মাফ করো। ঘরে তো বাইরের আর কেউ নেই। তুমি ছাড়া আর তো কেউ শুনতে পায়নি।'

'নাই বা পেল। ভদ্রলোকের পাড়া। আমিও ভদ্র-লোক। পাঁচ বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী হয়ে বাস করছি। তবু তুমি ওসব কথা তুলবে? ঘরের মঙ্গল অমঙ্গল ছেলে মেয়েদের ভালোমন্দ বিবেচনা করবে না?'

সুধা বলল, 'বললামই তো বাবা, আমার ঘাট হয়েছে। আর বলব না। নাও এবার বাড়িভাড়ার কি করবে তাই করো। আমি বলি কি, দুখানা ঘর রেখে আর দরকার কি। বাইরের ঘরখানা ছেড়ে দাও। পঁচিশ টাকা ভাড়া বাঁচবে।'

একথা সুধা অনেকদিন ধরেই বলে আসছে। ভাড়া দিতে যখন এত কষ্ট হয়, ও ঘরখানা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু পরেশ জানে—ওঘরের শুধু এক নম্বর নয় তিনচার নম্বর দরকার আছে। প্রথম হল ভদ্রলোকের একখানা বসবার ঘর রাখতেই হয়। তার সদর অন্দরের মধ্যে একটা মোটা কাপড়ের গাঢ়রঙের পর্দা না টাঙিয়ে রাখলে চলে না। পর্দার ওপাশে গ্রীণরুম, পর্দার এপাশে ষ্টেজ। বন্ধুবান্ধব যারা আসে তাদের সেবার জন্তে বাইরের ঘরখানা পুরোন চেয়ার আর কৌচ কিনে এনে ভালোভাবেই সাজিয়েছে পরেশ। একটা করে খবরের কাগজ ও রাখে। তাতে পাড়ায় তার মর্যাদা বেড়েছে। কিন্তু শুধু বসবার, গল্প করবার, কাগজ পড়বার ঘরই নয়, এ ঘর একই সঙ্গে তার অফিস আর রিহার্সাল রুম। বাইরে সুধা হালদার ও সম্প্রদায় নামের ছোট সাইনবোর্ডটি এখনো দেয়ালের গায়ে আটকানো রয়েছে। চার পাঁচ মাস এই দলের কাজ-কর্ম এখানে বেশ চলে। দরকার মত এদলের রূপ বদলায়। কখনো হয় অপেরা পার্টি, কখনো নাচ, কখনো বা লঘু রাগসঙ্গীত আর আধুনিক সঙ্গীতের দল। যখন যে রকম মেয়ে পাওয়া যায়। দলের বেশির ভাগ মেয়ের যে ধরণের গুণ যোগ্যতা থাকে, সেই অনুযায়ীই দলকে বদলে নিতে হয়। তাতে দলের নামটা ঠিকই থাকে আর অধিকারীরও বদল হয়না। আজকাল আর অধিকারী বলে না। পরেশও নিজেকে ম্যানেজারই বলে। সে একই সঙ্গে এই দলের ম্যানেজার প্রোপ্রাইটার ফাউণ্ডার—সব। এই দলের জন্তেই বাইরের ঘরখানাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু সুধা বলে 'ওই ঘরেরও দরকার নেই। তুমি এসব ছেড়ে দাও, আমি যেমন সেসব ছেড়ে এসেছি তেমনি তুমিও তোমার পেশা বদলাও।'

কিন্তু বারবধূর পক্ষে কুলবধূ হওয়া যত সহজ, পুরুষের পক্ষে এক পেশা ছেড়ে আর এক পেশায় যাওয়া তত সহজ নয়। সব ব্যবসা সবাইর হাতে জমে না। আর চাকরি-বাকরি তো সবই পরের হাতে।

মাত্র চার পাঁচ মাসের মরশুম। বর্ধমান বীরভূম মেদিনীপুর জেলা থেকে শুরু করে উড়িষ্যা বিহারের ছোট ছোট সহরে গ্রামে পরেশ তার দলবল নিয়ে যায়। বাংলা দেশের চেয়ে বাংলার বাইরে থেকে যে সব বায়না আসে সেইগুলি রাখতেই বেশি আগ্রহ পরেশের, গাঁয়ের যোগী ভিখ পায়না। মান নেই যার কাছে, মান নেই যাঁর কাছে। দেশে প্রতিযোগিতা বেশি—টাকা কম—মান-সম্মানও কম। কিন্তু বাইরে পরেশ বাঙালীর সংস্কৃতির, তার

নৃত্য আর গীত শিল্পের ধারক বাহক বলে নিজের পরিচয় দেয়। আর এখানকার পচীপদী হারানী কুড়ানীকেও ঘষে-মেজে ওসব অঞ্চলে উর্বশী মেনকা বলে চালিয়ে দিতে পারে পরেশ। যতদিন থাকে তাদের আদরযত্নে পান-ভোজনে দিব্যি আরামে দিন আর রাতগুলি কাটিয়ে দিয়ে আসে। ফিরে এসে বছরের বাকি সময়টা প্রায় পায়ের ওপর পা তুলে খায়। শেষের দিকে অবশ্য টানা-টানি পড়ে। তখন বন্ধুবান্ধব কি মহাজনের কাছে ধার-কর্জের জন্যে ছুটতে হয়। প্রায় গত পনের বছর ধরে এই অনিশ্চিত জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে পরেশ। এই দীর্ঘকালের অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া কি সহজ? আর ছেড়ে দিলেই বা অন্যনির্ভরযোগ্য জীবিকা তাকে কে দেবে?

পরেশ স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'তুমি ভেবনা, ভাড়ার টাকা আমি দু' একদিনের মধ্যেই জোগাড় করে আনব।'

সুধা বলল, 'আর খোরাকি!'

পরেশ বলল, 'হবে হবে, সব হবে। তুমি ভেবনা।'

বাইরের ঘরে এসে কৌচে ঠেস দিয়ে বসল পরেশ। সুখাসন এখন নেই। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। পুরোন বাজার থেকে সস্তায় কিনেছিল জিনিসটা, এখন পস্তাচ্ছে।

পরেশ বসে বসে বিড়ি টানতে লাগল। ভাবনার আর শেষ নেই। অর্থ চিন্তাটাই প্রধান এবং একমাত্র। পেশা বদলাবার চেষ্টা সে যে একেবারে না করে দেখেছে তা নয়। বিনা মূলধনে যা করা যায় সেই দালালীও করে দেখেছে। জমির দালালী, আসবাবপত্রের দালালী, ইনসিওরেন্সের দালালী—সবই দু একবার করে পরখ করেছে। কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হয়নি। ষ্টেশনারি দোকান দিয়েছিল একবার! কিন্তু এমন লোকসান যেতে লাগল, আর যে লোকের হাতে বেচাকেনার ভার দিয়েছিল সে এমন দুহাতে চুরি করতে লাগল যে পাঁচ ছ মাসের মধ্যে দোকান তুলে দিয়ে তবে রেহাই পেল পরেশ। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে মাথায় করে মোট তো আর বইতে পারে না—কি রিক্সাও টানতে পারে না। যা স্বাস্থ্য তাতে বাস ট্রামের কণ্ডাক্টরি করবার জো-ও নেই। তাই পরেশ যা করে আসছে তাই তাকে করে যেতে হবে। কিন্তু একথা সুধা কিছুতেই বুঝতে চায় না।

দোরের সামনে পিওন এসে দাঁড়াল। চিঠিটা সে বাকসে ফেলবার আগেই পরেশ তার হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিল পোষ্টকার্ডটা, বলল 'দাও, হাতেই দাও।'

চিঠিটা আগাগোড়া পড়বার পর খুসিতে ভরে উঠল পরেশের মুখ। প্রত্যাশিত সুখবরই এসেছে। ভুবনেশ্বর থেকে তার এজেন্ট মুকুন্দ মহাপাত্র লিখেছে—পরেশ যেন দু-চার দিনের মধ্যেই তার দল নিয়ে রওনা হয়ে পথে আর কোথাও দেরি না করে একেবারে সরাসরি ভুবনেশ্বরে গিয়ে হাজির হয়। মুকুন্দ এত বায়না জোগাড় করেছে যে তিন চার মাস ভুবনেশ্বর, কটক আর পুরী এই তিন জেলার গ্রাম আর গঞ্জেই পরেশ কাটিয়ে দিতে পারবে। গতবার যে গাওনা করে গিয়েছিল, তাতে সুধা হালদার ও সম্প্রদায়ের বেশ নাম হয়েছে। চাহিদা আরও বেড়েছে। আর্টিষ্টদের রূপ আর গুণ যেন দলের সেই মর্যাদা রাখতে পারে। যাতায়াত রাহা খরচা বাবদ একশ টাকা এম-ও করে পাঠাচ্ছে মুকুন্দ। পরেশ যেন রওনা হতে বেশি দেরি না করে। টাকার জন্যে ভাবনা নেই। এসে পৌছলে খাই খরচা, বাসা ভাড়া বাবদ আরো টাকা পাবে।

মুকুন্দ মহাপাত্র খুব নির্ভরযোগ্য এজেন্ট। পরেশের কাছ থেকে সে টাকায় ছ আনা কমিশন পায়। নিজের স্বার্থেই সে বায়নাপত্র জোগাড় করে। তাই তার কথায় অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। সমস্যার সমূহ নিরসন হল দেখে পরেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এবং স্ত্রীকে সুখবরটা দেওয়ার জন্যে ভিতরে চলে গেল।

কিন্তু যার নামে দল, যার নামটা নানা উপলক্ষে দেশ-বিদেশের লোকের মুখে মুখে ফেরে সে খুসি হল কই।

খানিক আগে থলিতে করে যে অল্প-স্বল্প মাছ তরকারি এনে দিয়েছিল পরেশ, সে সব কুটে ধুয়ে সুধা ততক্ষণে রান্নার ব্যবস্থা করছে।

পরেশ এসে বলল, 'শুনছ, মুকুন্দ একশ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, আর চিন্তা নেই।'

সুধা মুখ নাড়া দিয়ে বলল, 'একশ টাকা পাঠিয়েছে তবে আর কি, মহারাজা হয়ে গেছ। আমি তোমাকে হাজার বার বারণ করিনি ওই মাগীগুলিকে নিয়ে তুমি আর বেরোতে পারবে না? ও ব্যবসা তোমাকে ছাড়তে হবে। তবু তুমি গোপনে গোপনে মুকুন্দের সঙ্গে লেখালেখি

করতে গেছ কোন আক্কেলে ?' আমার নাম ধুয়ে খাবে, কিন্তু আমার একটা কথাও কি কানে তুলবে না ? আচ্ছা জ্বালায় পড়েছি।'

পরেশ হেসে বলল, 'যা বলেছিস সুধা। তোর নামের গুণেই তো আছি।'

মনে যখন বেশ স্ফুর্তি হয়, অকুল ভাবনার কিনারা পাওয়া যায়, তখন স্ত্রীকে তুমি ছেড়ে তুই বলেই ডাকে পরেশ। তাতে ওর সঙ্গে যেন আরো অন্তরঙ্গ হওয়া যায়। তুমিটা যেন বড্ড পোষাকি। তুইটা আট-পৌরে একেবারে দিলখোলা ডাক।

পরেশ মনের খুসিতে বলে চলল, 'সত্যিই তোর নামের গুণ আছে সুধা। তোর নামের গুণেই তো তরে যাচ্ছি। নইলে কি আর তরবার জো ছিল ?'

বিড়ির শেষটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরেশ গুণগুণিয়ে গান ধরল, 'সখি তব নাম লয়ে আজ্ঞাবহ হয়ে ঝাঁপ দিলাম আজি পীরিতি সাগরে।'

গানশুনে ময়না এসে বাপের কাছে দাঁড়িয়েছিল। ছোট সাদা সাদা দাঁত কটি বার করে হেসে বলল, 'বাবা, আমিও গাইতে পারি। গাইব ?'

পরেশ বলল, 'গা দেখি মা, গা তো।'

সুধা ধমক দিয়ে উঠল, 'থাক থাক। বাপ হয়ে মেয়েকে কি সব গানই শেখাচ্ছ। আর আমি কিছু বললে দোষ হয়, বাবুর তাতে জাত যায় অপমান হয়। এখন নিজে যে বেলেল্লাপনা করছ তার কি।'

পরেশ বলল, 'বেলেল্লাপনা নারে সুধা, একে বেলেল্লাপনা বলে না। ময়নার যা বয়স তাতে ওর কাছে সব নামই হরিনাম, সব গানই ভালো গান। সেই যে কথায় আছে না—আপ ভালো তো জগৎ ভালো। ময়না, আমার ময়না পাখি, পড়তো, আপ ভালো তো জগৎ ভালো।'

ময়না বাপের সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করল, 'আপ ভালো তো জগৎ ভালো।'

সুধা কড়ায় ডাল চাপাতে চাপাতে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কত যেভালো তুমি—কত যে গুণধর পুরুষ—তা তো আমার জানতে বাকি নেই। বাইরে যাবার কথা শুনেই তোমার মন উড়ুউড়ু হয়েছে। গলা দিয়ে সুর বেরোচ্ছে। আনন্দের আর সীমা নেই তোমার। কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখতো, আমি কী নিয়ে থাকি।'

অভিমানে মুখখানা ভার ভার হল সুধার। বয়স তিরিশ ছাড়িয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে দেহের বাঁধুনি বেশ আঁটসাঁট আর মজবুতই আছে। সুন্দরী নয় সুধা। গায়ের রঙ কালো। নাক চোখ একেবারে নিখুঁৎ না হলেও মুখের ডোলটা মন্দ নয়। কাজ চালাবার মত নাচ গান দুইই শিখেছিল। কিন্তু এখন দেহ ভারী হয়ে যাওয়ায়, ছেলেপুলে হওয়ায় পরেশ ওর নাচটা বন্ধ করে দিয়েছে। গানের গলা এখনো আছে। কিন্তু ঘরের বাইরে ওকে গাইতে দেয় না পরেশ। বলে, 'তুমি এখন ঘরের বউ, যা করবে ঘরে বসে কর।'

সুধার অভিমান-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে পরেশ একটু হাসল, 'কী নিয়ে থাকি মানে। ঘর আছে, সংসার আছে, ছেলেমেয়ে রয়েছে। মেয়েমানুষ যা যা নিয়ে থাকে তার সবই তো তোমার আছে সুধা! সবইতো দিয়েছি। তবু ও কথা কেন বলছ।'

সুধা বলল, 'বলছি যে কেন তা তুমি কি করে বুঝবে। মেয়েমানুষের প্রাণ নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলে বেড়াও। তার প্রাণের যাতনা তোমরা কি বুঝবে ?'

সুধার মুখে এধরণের কথা শুনে পরেশ একটু অবাক হল। পাঁচ বছর আগেও সুধা যেভাবে জীবন কাটিয়েছে তাতে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ সুধার কম ছিল না, সাধারণ পুরুষের চেয়ে বরং বেশিই ছিল। সে সব খবর যে পরেশ একেবারে না রাখে তাও নয়। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছর ধরে ঘরসংসার করে সুধা যেন একেবারে চিরকালের কুলবধূ হয়ে গেছে। কিন্তু পূর্বজীবন যেমনই হোক না কেন, কোন মেয়ে যদি অমন কাতরভাবে প্রাণের যাতনার কথা বলে পুরুষের মন না গলে পারে না, বিশেষ সে পুরুষ যদি স্বামী হয়, সুখদুঃখে ঘরসংসার করে, ছেলেমেয়ের বাপ হয়—তাহলে কি আর তার মন না গলে পারে! পরেশেরও মন গলল। ছোট জলচৌকিটা টেনে নিয়ে স্ত্রীর গা ঘেঁসে বসে বলল, 'খুব বুঝি সুধা, খুব বুঝি। কিন্তু পেটের জ্বালা যে বড় জ্বালা। সেই জ্বালাতেই যে ছুটে বেরোতে হয়। শুধু

তো নিজেরা দুজন নয়, ছেলেমেয়ে হয়েছে, তাদেরও তো খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

সুধা বলল, 'তাকি আর জানিনে? কিন্তু তোমাকে দু দিনের জন্যেও চোখের আড়াল হতে দিতে আমার ইচ্ছে হয় না। আর এ তো মাসের পর মাস। ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে দিয়ে তুমি আমাকে বেঁধে ফেলে মজা দেখছ। আমার পাখা দুটো কেটে নিজের পকেটে গুঁজেছ। কিন্তু তাই বলে তোমার ওড়া তো বন্ধ হয়নি। তোমার সঙ্গে এমন চুক্তি তো ছিল না। আমি একা ঘরে লক্ষ্মী বউ হয়ে থাকব, আর তুমি বেপরোয়া হয়ে আগের মতই একদল মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে—এমন সর্তে তো আমি রাজী হইনি, কোনদিন হবও না।'

পরেশ এবার বিরক্ত হয়ে বলল, 'ভালো জ্বালা যা হোক। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল ওই এক কথা। ও ছাড়া তোমার আর কি কোন কথা নেই?'

সুধা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফের রান্নায় মন দিল। স্বামীর কথার কোন জবাব দিল না।

পরেশও আর দেরি না করে ছিটের সার্টটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার এখন অনেক কাজ।

২

পরেশের দলটা যে সারা বছর একটি শতদলের মত থাকে, তা নয়। বরং পাপড়িগুলি ইতস্তত কোথায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে—বছরের মরশুমের সময় ছাড়া অন্য সময় তার কোন আর খোঁজই মেলে না। মরশুমের শুরুতে পরেশ আবার এক একটি করে গাইয়ে বাজিয়ে জোগাড় করে তাদের বহু টাকা রোজগারের লোভ দেখায়, নাম-যশের প্রলোভন সামনে তুলে ধরে। বেরোবার সময় দলের বন্ধনটা ঠিক থাকে, বিদেশে একই বাসায় একই হোটেলে আহার বাস এবং একই আসরে গান বাজনার ভিতর দিয়ে সেই সম্পর্কের বন্ধনটা আরো শক্ত হয়—কিন্তু কলকাতায় আসবার পর ফের আবার তা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ে। আবার তাদের কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড় করতে হয়। এমনি বছরের পর বছর চলছে। এতে কোন ক্লান্তি নেই পরেশের। প্রতি বছরই নিত্য-নতুন লোক, নিত্য-নতুন মেয়ে। দলের এই অদল বদলে আজকাল আর বিশেষ কোন আফশোস নেই পরেশের। দলের এই অনিত্যতাটাই নিত্য। যেমন জীবনের—ট্রাম-বাসে এক একদিন এক এক দল যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। তাই নিয়ে কি কেউ হা-হুতাশ করে? পরেশও তার এই দলের লোকদের কাজের যন্ত্র হিসাবেই দেখে। কাজের সম্পর্ক টাকা-পয়সা লেন-দেন ভাগ-বখেরার সম্পর্ক ছাড়া তাদের সঙ্গে পরেশের আর কোন সম্পর্ক থাকে না। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্যতিক্রম হয়। যেমন সুধার বেলায় হয়েছিল। কাজের যন্ত্র মাঝে মাঝে তার-যন্ত্রের মত বাজে আবার তা কখনো কখনো অন্য রকম যন্ত্রণার কারণও হয়ে ওঠে। ভাবের সম্পর্ক রসের সম্পর্ক কখন যে আস্তে আস্তে শুধু নীরস দরকারের সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়ায় টের পাওয়া যায় না। যখন টের পায় লোকে অবাক হয়ে থাকে।

লালবাজারের মোড়ে এসে ট্রাম থেকে নেমে পড়ল পরেশ। খানিকটা এগোলেই ডান দিকে নিমাই সরকারের ফার্নিচারের দোকান। সরু এক ফালি ঘেরা জায়গা সুড়ঙ্গ পথের মত বহু দূর চলে গেছে। সেই তুলনায় ঘরখানার প্রস্থ নেই বললেই চলে। দোকানে ঢুকবার আগে বাইরে এক মুহূর্ত চুপ করে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল পরেশ। বিড়িটা হাতে করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। নিমাই নিজের হাতেই একমনে একটা খাটের পায়া পালিশ শুরু করেছে। পিছনের গুদামে খাট আলমারি চেয়ার টেবিল আরো অনেক জিনিস আছে। ডানদিকে ঠিক রাস্তার সামনে ছোট এক জোড়া চেয়ার টেবিল। গোটা দুই খাতা, দোয়াত-কলম। নিমাই যখন বাবু হয়ে বসে, খদ্দেরের অর্ডার নেয়, টাকা নিয়ে রিসিট লিখে দেয়, তখন ওই চেয়ার টেবিলের দরকার হয়। অন্য সময় নিচে বসে নিজের হাতেই কাজ করে নিমাই। সিরিষ কাগজ দিয়ে ফার্নিচার ঘসে, পালিশ করে। পরেশের মনে পড়ে নিমাইয়ের বাবা নিকুঞ্জ সরকারও তাই করতেন। নিজের হাতে পালিশ, নিজের হাতে বেচা-কেনা করতেন তিনি। নিমাই সব দিক থেকেই একেবারে বাপকা বেটা হয়েছে। দেখতেও সেই রকম, সেই রকম লম্বা। সেই চোয়াল মুখ, নাক চোখ হাত পায়ের গড়নও একই রকম। নিজের চেহারায়, বেশে বাসে পেশায় মৃত বাপকে বাঁচিয়ে রেখেছে নিমাই।

কিন্তু পরেশের বাবার চেহারা পরেশের নিজের মতই ছিল কিনা এখন আর তা তার মনে নেই। কারণ খুবই অল্প বয়সে তার বাবা মা মায়া কাটিয়েছেন। শোনা যায়, তাঁদের দুজনের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক ছিল না। তিনি ভদ্র-লোকের জীবিকা—মার্চেন্ট অফিসের কেরাণীগিরিই শেষ দিন পর্যন্ত করে গেছেন। সে পথ ধরবার মত বিদ্যাবুদ্ধি পরেশের হয়নি। বহুদিন তাই পথে পথেই কেটেছে। বাপের বৃত্তি না পেলেও প্রবৃত্তি যেএকেবারে পায়নি পরেশ, সে কথা জোর করে বলা যায়না। হয়তো অফিসে বসে কলম পিষতে পিষতে তাঁর মন যে বাঁধন ছেঁড়া যাযাবরের স্বপ্ন দেখত পরেশের বাস্তব জীবন সেই স্বপ্নই খানিকটা সফল করেছে।

বিড়ির টুকরোটা বাইরে ফেলে দিয়ে পরেশ তার বন্ধু নিমাইয়ের দোকানের ভিতরে ঢুকে তার মাথায় আলগোছে একটা চাঁটি মেরে বলল, 'কি রে খুব পালিশ-টালিশ করছিস যে। কার ফুলশয্যার খাট সাজাচ্ছিস রে নিমু? এই অঘ্রাণ মাসের সরগুমে কটা বিয়ের অর্ডার ধরলি?'

নিমাই একটু চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, তারপর পরেশকে দেখে হেসে বলল, 'ও তুই? বোস বোস। দে বিড়ি দে।'

মালিকের বসবার জন্যে সেই হাতলহীন রাজসিংহাসন-খানা ছাড়াও একটি টুল আছে বসবার। পরেশ সেই টুলটা টেনে নিয়ে বলল, 'বাঃ, মজা মন্দ না, এলাম তোর দোকানে—আর তুই বিড়ি চাচ্ছিস আমার কাছে।'

তারপর পকেট থেকে দুটো বিড়ি বার করে একটা বন্ধুর হাতে দিল পরেশ, আর একটা নিজে ধরাল।

নিমাই পালিশের কাজ ফেলে রেখে হেসে বলল, 'আরে ছোট বড় সব নেশার ব্যাপারে তুই-ই তো হলি মহাজন। আমরা কেবল পালিস্ করে করেই গেলাম। আর ফুলশয্যায় নিত্য-নতুন ফুলকুমারী কোলে করে তুই এক জীবন ভোর করে দিলি।'

পরেশও হাসল, 'যা বলেছিস। জীবনটা একটা ফুল-শয্যার রাতই বটে। কিন্তু ফুলও একটা নয়, শয্যাও এক-খানা হলে চলে না। তবে তোর মুখে এ আফশোস কেন। তোরা শালা তো দু পুরুষ ধরে জীবনে উন্নতি করবার জন্যে আদা নুন খেয়ে উঠে পড়ে লেগেছিস, দু-বেলা কাঁচকলা সেদ্ধ ভাত খেয়ে সাত্ত্বিক আচার করছিস, পঞ্জিকার দিনক্ষণ দেখে বউকে সোহাগ করছিস, আর ব্যাঙ্কের টাকার অঙ্কের গায়ে হাত বুলাচ্ছিস।' তারপরই চট করে কাজের কথায় এসে পড়ল পরেশ, 'আমাকে শ দুই টাকার একটা বেয়ারার চেক লিখে দে তো নিমু। বড্ড দরকার।'

নিমাই সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলিস কি। টাকা কোথায় পাব। আমাকে কুচি কুচি করে কাটলেও তো দুশো টাকা বের হবে না।'

পরেশ বলল, 'আরে তা কি আর জানিনে? পকেট-মারদের মত ধরা পড়লে টাকা তুই গিলে ফেলতে পারিস নে। টাকা যেখানে রাখবার সেখানেই রাখিস। কিছু ওঠে গয়না হয়ে বউয়ের হাতে গলায় কানে। আর বাকিটা ব্যাঙ্কে। সেই ব্যাঙ্ক থেকেই টাকাটা তোকে তুলে দিতে হবে।'

নিমাই তার পালিশ মাখা হাত দুখানা জোড় করে বলল, 'মাফ করিস ভাই। এবার আর একটা পয়সাও আমি দিতে পারবনা। আমার নিজেরই ভারি হাত টানা-টানি যাচ্ছে। কাজ কারবার কিচ্ছু নেই। বেচা কেনা বন্ধ। শালার পালিশওয়ালা দুদিন ধরে আসছে না। দৈনিক রেট নিয়ে ঝগড়া করে চলে গেছে। অথচ যে করেই হোক,মাল আমাকে পরশুর মধ্যে ডেলিভারি দিতেই হবে। যা অশান্তি আর ঝামেলায় আছি, তা আর কহতব্য নয়। মেয়ে নাচিয়ে পয়সা করে বেড়াচ্ছিস। বেছে বেছে বিয়ে করেছিস এক বাইজীকে। সেও দু-হাত দু-পা দিয়ে রোজগার করছে। তোর পয়সার অভাব কিসে। তুই কেন টাকা চাইতে এসেছিস আমার কাছে?'

পরেশ রাগ করল না। হেসে নিমাইর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলল, 'এসেছি তুই আমার নেংটাকালের বন্ধু বলে। একই সঙ্গে স্কুল পালিয়েছি, অল্প বয়সে বিড়ি-সিগারেট মদ-মেয়েমানুষ ধরেছি। তারপর তুই শালা ধম্ম-পুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে সব ছেড়ে দিলি, আর সবগুলি কুগ্রহ আমাকে জড়িয়ে রইল। তবু তুই আমার প্রাণের বন্ধু, একমাত্র দোসর।' তোর বিপদ আপদে আমি আছি, আমার বিপদ আপদে তুই।' নিমাই ফের আবার পালিশের কাজে হাত দিল। পরেশ বলতে লাগল, 'তাছাড়া আমি কবে সাউকারি রাখিনি তাই বল। টাকা যেদিন যেমন,

দেব বলেছি তার দুদিন আগে ছাড়া পরে দিইনি। তুই যদি এবার সুদ চাস, তাও স্পষ্ট করে বল সেই সুদই আমি দেব।

নিমাই মুখ ফিরিয়ে বলল, বাজে বকিসনে। আমি অত দিতে পারব না। তবে যা পারি তা দেব। কাল আসিস।

পরেশ খুসি হয়ে উঠে নিমাইর মাথায় আর একটা চাঁটি মেরে বলল, এইতো চাই ওস্তাদ। সাবাস, আবার কি। তুই যা দিবি তাই ঢের। তুই হাত ঝাড়লেই আমার কাছে পর্বত। জানিস এবার আমার নারী বাহিনী নিয়ে প্রথমেই উড়িষ্যায় যাচ্ছি। এমন সব উর্বশীদের নিয়ে যাব যে তাদের দেখে স্বয়ং কাঠের জগন্নাথের চিত্তও চঞ্চল হয়ে উঠবে। তুই শালা কাঠুরে, তোরই কিছু করতে পারলাম না। তোর ব্যবসা কাঠের চেহারা কাঠের প্রাণটা কাঠ দিয়ে তৈরি। তুই একটা জাত কাঠ-ঠোকরা। কাঠের ব্যবসায় তোর উন্নতি হবেনা কেন ?

নিমাই হেসে বলল, 'বেশ আছিস। দে একটা বিড়ি দে।'

বিড়িটা এবার আর বন্ধুর হাতে দিল না পরেশ, তার দুই ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে বলল, 'খা যত পারিস বিড়ি খা। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ জয় করে যখন ফিরব, তখন এমনি করে মিনিটে মিনিটে গোল্ডফ্লেক সিগারেট গুঁজে দেব।'

পরেশ এবার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দোকান ঘর থেকে ফুটপাতে নামল।

নিমাই ফের পালিশের কাজে লাগবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে পরেশের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল, তারপর নিজের মনেই বলল, 'বেশ আছো।' চাপা একটা নিঃশ্বাস পড়ল নিমাইর। কেন তা সে নিজেই জানেনা।

বেশ পরেশ ছিলনা। কিন্তু মহাপাত্রের চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনও যেন মহাসমুদ্রের মত নেচে উঠেছে। এতক্ষণে নিজের কাজ খুঁজে পেয়েছে পরেশ। শুনতে পেয়েছে কর্ম সমুদ্রের ডাক। তাই এক মুহূর্তে সমস্ত অবসাদ আর নৈরাশ্য ঝেড়ে ফেলে সে উঠে দাঁড়িয়েছে, ছুটে চলেছে সামনের দিকে। যা তার পেশা তাই তার নেশা। বাকি পথটুকু পরেশ পায়ে হেঁটেই চলল। বেলা দশটা। 'ডালহৌসী' যাত্রী ট্রাম-বাসগুলিতে লোক বাদুড়-ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পূব-মুখো যানবাহনগুলিতে ভাড় নেই। তার কোন একটায় অনায়াসেই উঠে পড়তে পারে পরেশ। কিন্তু এখন তার হাঁটতেই ভালো লাগছে। বউ-বাজারের মোড়ে এসে উত্তরমুখী হয়ে কলেজ স্ট্রীটে পড়ল পরেশ। তারপর রাস্তা পার হয়ে প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে ঢুকে পড়ল। তারপর বড় রাস্তা থেকে ডান দিকের ছোট সরু গলি। কয়েকটি অচেনা বাড়ি ছাড়িয়ে একটি চেনা বাড়ির ভিতরে ঢুকে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে একেবারে দোতলায় উঠে পড়ল পরেশ।

প্রথমেই মুখোমুখি হল স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে। বাথরুম থেকে স্নান করে চওড়া পেড়ে একখানা শাড়ি পরে মানদা নিজের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে পরেশ অন্তরঙ্গ সুরে ডাকল, 'এই যে মাসী।'

মানদা হেসে বলল, 'বোনপো যে। তারপর কি খবর তোমার ?'

পরেশ বলল, 'এই তোমাদের খোঁজ-টোজ নিতে এলাম। বলি আছ কেমন ?'

মানদা বলল, 'আহা মাসীর জন্যে যে কত পরাণ কাঁদে তোমার, তা জানা আছে। কাঁদে যাদের জন্যে আমার সেই বোনঝিরা সবাই ঘুমে মরে আছে। কেউ ওঠেনি। কারো দেখাই এখন পাবে না।'

পরেশ বলল, মেজো সেজো কারোরই না ? মায়ার খবর কি ? যত রাত্রেই ঘুমোক, সে তো সকাল সকালই উঠত।'

মানদা বলল, 'তুমি আছ কোন রাজ্যে ? মায়া কি আর এখানে পড়ে আছে না কি ? তার কপাল খুলে গেছে গো, কপাল খুলে গেছে। ঘরে এসো সব বলি।'

পরেশ মানদার পিছনে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। পশ্চিমদিকের দেয়াল ঘেঁষে একখানা খাটপাতা। জোড়া বালিশ মলিন একটা চাদর দিয়ে ঢাকা। দেয়ালে কালী আর লক্ষ্মীর মূর্তি টাংগানো। আর একদিকে একটা দামী কাঁচের আলমারি। ওপরের তাকে কিছু মাটির পুতুল সাজিয়ে রেখেছে মানদা। নিচের তাকগুলিতে শাড়ী আর গরম কাপড়-চোপড় সযত্নে ভাঁজ করে রেখেছে।

পরেশ চেয়ারটায় বসে পড়ে বলল, 'মায়া কোথায় গেছে তাড়াতাড়ি বল, আমার সময় বেশি নেই।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মানদা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, 'বাব্‌বা, আমার বোনপো যে একেবারে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। কিন্তু ঘোড়াতেই চড় আর গাড়িতেই চড় সে পাখী উড়েছে। উড়ো জাহাজে চড়লেও তার আর নাগাল পাবে না।

পরেশ এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'আরে বলেই ফেলনা ছাই কী হয়েছে, কোথায় গেছে। দয়া করে আর হেঁয়ালী কোরোনা। আমার সত্যিই আজ তাড়া আছে।'

পরেশ একবার হাত ঘড়িটায় চোখ বুলিয়ে নিল।

মানদা তার ব্যস্ততা দেখে হাসল, 'তাড়া যদি থাকে চলে যাওনা। আমি তো আর কাউকে বেঁধে রাখিনি। কাউকে বেঁধে রাখবার মত দড়ি-কাছি তো ভালো,একগাছা সুতোও আমার নেই।'

পরেশ অধীর হয়ে বলল, 'দোহাই গৌরচন্দ্রিকা বাড়িয়ো না। এই পঞ্চাশ বছরেও তোমার কিচ্ছু যায়নি, সব আছে। এখন মায়ার খবরটা বল।'

মানদা বলল, 'কেবল মায়া আর মায়া। মায়া যে সবাইকে কলা দেখিয়ে সরে পড়েছে গো—কতবার বলব। এক সিনেমার বাবু এসেছিল। কাঁচা বয়স। মায়াকে দেখে তার গান শুনে মুখ-চোখ ঘোরাবার ভঙ্গি দেখে তার মাথা ঘুরে গেছে। মায়াকে বলেছে—তোমাকে সিনেমায় নামাব থিয়েটারে নামাব। অমুক করব, তমুক করব, গোটা কলকাতা সহরটা তোমার নামে লিখে দেব। ছুঁড়ী অমনি ভুলেছে। ভোলবারই যে বয়স, ভুলবে না কেন।'

পরেশ হতাশ ভাবে বলল, 'তারপর ?'

মানদা বলল, 'তারপর আর কি। পালিয়েছে এখান থেকে। মিথ্যে বলব না। ভাড়া-টাড়া সব দিয়েই গেছে। এত করে বললাম মায়া, অমন ভুল করিসনে। আজ যে মাথায় করে নিচ্ছে কাল সেই আবার নাথি মেরে তাড়াবে। কিন্তু মেয়ে কি শুনল। চোখে নেশা ধরে গেছে পেটে বাচ্চা এসেছে। এদিকে সেই বাবু ভরসা দিয়েছে স্ত্রীর মত রাখবে। বলে অমন অনেকেই। কতজনে রাখে তা আমার জানা আছে। কিন্তু তোমাকে দেখেছে কিনা, চোখের ওপর সুধার সুখ দেখেছে কিনা—তাই সেই সুখের সন্ধানে গেছে মায়া। মুখপুড়ী আবার এল বলে।'

সব শুনে পরেশ স্তব্ধ হয়ে রইল। মানদা যাই বলুক পরেশের উড়িষ্যা যাত্রার আগে যে আসবে তার ভরসা নেই। উনিশ-কুড়ি বছরের বেশি বয়স ছিল না। বেশ স্বাস্থ্যবতী দেখতে-টেখতে ভালোই ছিল। শিখিয়ে-পড়িয়ে তালিম দিয়ে মেয়েটাকে বেশ তৈরীও করে নিয়েছিল পরেশ। ওর ওপর অনেক ভরসা করেছিল। গেল মাথায় বাড়ি দিয়ে। 'অন্য ব্যবসা কর, অন্য কাজ-কর্ম কর বলে সুধা এমন উত্যক্ত করেই তুলেছিল যে এদিকে আর খোঁজ-খবর নিতে পারেনি পরেশ। টাকা ধারের চেষ্টায় এখানে ওখানে ছুটে বেরিয়েছে। নানা ফিকির ফন্দিতে দিনগুলি কেটে গেছে। আর সেই ফাঁকে তার দলের রত্ন মায়াকে আর একজন হাত ধরে নিয়ে গেছে। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল পরেশ। স্ত্রীর ওপর তার দারুণ রাগ আর আক্রোশ হ'তে লাগল।

মানদা তার ভাব-ভঙ্গি দেখে হেসে বলল, 'কি হল ম্যানেজার। তোমার ভাব-টাব দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘরের বউ পালিয়ে গেছে।'

পরেশ বলল, 'দলের সেরা মেয়ে বেহাত হয়ে গেলে তার চেয়েও বেশি দুঃখ হয় মাসী। এখন আমি কি উপায় করি। তোমার বাড়িতে আর কোন ভালো মেয়ে-টেয়ে আছে নাকি। গান বাজনা জানে এমন মেয়ে দিতে পার দুটি একটি ? মায়ার মত অত ভালো না হলেও কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত মেয়ে ?'

মানদা তার কালো কালো দাঁতগুলি বার করে হেসে বলল, 'কপাল আমার। এখন যেগুলি আছে সেগুলি একেবারে কাণাকড়ি আর অচল পয়সা। গান তো ভালো, গলা চিরে ফেললেও এক ছিটে সুর বেরোয় না। আর নাচের মধ্যে জানে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কেবল লাথি ছুঁড়তে। পেত্যয় না চাও সন্ধ্যার পর এসে নিজের হাতে বাজিয়ে দেখো। এখন তো সব ঘুমে অচেতন। এখন তো আর দেখা সাক্ষাৎ পাবে না।'

পরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'চলি মাসী।'

মানদা বলে, 'সে কিগো, চা-টা না খেয়েই উঠছ। বোসো বোসো চা আর সিঙ্গাড়া আনাই।'

কিন্তু পরেশ আর দাঁড়ায় না, ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বলে, 'এখন আর চা খাবার সময় নেই। সন্ধ্যার পর তো আসছিই, তখন এসে গল্প-টল্প করব। তুমি চান

করে এসেছ, এবার সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নাও। আমিও আমার কাজ-কর্ম দেখি গিয়ে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরেশ এসে ফের রাস্তায় নামে। বড় ছেনাল মেয়েমানুষ মানদা। ওর বোধ হয় ইচ্ছা নয়—তার বাড়ি থেকে কোন মেয়েকে আর পরেশের দলের সঙ্গে যেতে দেওয়া। যদিও তার জন্যে মানদাকেও কিছু সেলামি দেয় পরেশ, তবু সে খুসি নয়। এমনি করে ভালো ভালো মেয়েগুলি পালালে তার বাড়ি কাণা হয়ে যাবে এই বোধ হয় তার আশঙ্কা। বাইরে গেলেই চোখ কান ফুটে যায়, চালাক চতুর হয়ে যায় মেয়েগুলি। পরেশ নিজেও তা লক্ষ্য করেছে। বাইরে বেরোলেই ওরা জীবনের উন্নতির সিঁড়িতে পা দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কেউ মনের মানুষ নিয়ে ঘর বাঁধতে চায়, কেউ চলে যায় অন্য গানের দলে, সিনেমা থিয়েটারে—যেখানে বেশি মাইনে, বেশি রোজগারের আশা আছে। সবাই উন্নতি চায় জীবনের। যেদিক দিয়ে পারে সে কয়েক ধাপ উপরে উঠতে চায়। পরেশ নিজের হাতে কত মেয়েকে গড়ল, সুযোগ সুবিধা দিল, তারপর তারা দল ছেড়ে পালিয়ে গেল। পরেশকে কেউ আর পাত্তা দিল না। কেউ তার জীবনের উন্নতির দিকে তাকিয়ে দেখল না। প্রত্যেকেই যে যার নিজের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত। অন্য কারো দিকে তাকাবার মানুষের সময় কই। একমাত্র ব্যতিক্রম সুধা। তাকে আর যেতে দেয়নি পরেশ। কোথাও পালিয়ে যেতে দেয়নি। নিজের ঘরের মধ্যে সোনার শিকলে তাকে বেঁধে রেখেছে। ছেলে-মেয়ে সংসার সব দিয়েছে তাকে। কিন্তু অমন দেওয়া তো আর সবাইকে দেওয়া যায় না। ছিঁটে-ফোঁটা অনেককে দেওয়া যায়। কিন্তু ভরা পাত্র ধরে রাখতে হয় একজনের জন্যেই। সুধাকে যে ফাঁদে ধরে রেখেছে, তেমন করে কটি মেয়েকেই বা রাখতে পারে পরেশ? সুধাকেই কি পুরোপুরি রাখতে পেরেছে? স্ত্রী হয়ে আছে সুধা—তার সন্তানের মা হয়ে আছে। কিন্তু সে এখন দলের আর কোন কাজে লাগে না। তার গলা মোটা আর ভারি হয়েছে, গান তেমন আর বেরোয় না। দেহ ভারি হয়ে গেছে। নাচতে আর সে পারবে না। পায়ের ঘুঙুর মিঠে বোল দেবে না কোন দিন। দেহের সেই সুঠাম গড়ন তার সৌন্দর্য আর লাবণ্যও সুধার যেতে বসেছে। সব চেয়ে যা মারাত্মক কথা—সুধা নিজেই এখন নিজের দলের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু সে দলের পক্ষে নিজেই অকেজো হয়ে গেছে, তাই দলকেও সে আর কাজ করতে দিতে চায় না। যেহেতু সে নিজে অকেজো হয়ে গেছে তাই দলকেও ভেঙে চুরমার করে ফেলতে চায়। মেয়েরা এমন হিংসুটেই হয় বটে। বীণা যেমন ছিল সুধাও তেমনি হয়েছে। কিন্তু হাজার মেয়ে, আত্মবলি দিলেও নিজের দলকে ভেঙে দিতে পারবে না পরেশ। দল শুধু তার জীবিকা নয়, তার মুক্তি। তার বাইরে বেরোবার ছাড়পত্র। যেমন করেই পারুক—দল সে রাখবেই।' আর ভালো ভালো মেয়ে এনে দলের গৌরব বাড়াবে। তার জন্যে প্রাণ যদি পণ করতে হয় তাও করবে।

হাঁটতে হাঁটতে কানাই ধর লেনে এসে হাজির হল পরেশ। এখানে থাকে গোবিন্দ তালুকদার। দলের তবলচী। পরেশের অনেক দিনের পরিচিত মানুষ। গান বাজনার লাইনে বহুদিন ধরে আছে। একটি পুরোন দোতলা বাড়ির একতলায় সামনের দিকের ঘরগুলিতে দোকানপাট! মনোহারি দোকান, ফটো বাঁধাবার দোকান, একটা লণ্ড্রি। মাঝখান দিয়ে সরু এক ফালি পথ। সেই পথে এগিয়ে গিয়ে দুখানা ঘর ছেড়ে দিয়ে বাঁ দিকের তৃতীয় ঘরখানিতে গোবিন্দ থাকে। ভিতরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে তবলার বোলের শব্দে বোঝা গেল মালিক ঘরেই আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিতালটা শেষ না হল, পরেশ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। কড়া নাড়ল না। তাহলে গোবিন্দের মেজাজ নষ্ট হয়ে যাবে। আর ওর মেজাজ একবার বিগড়ালে আর কথা নেই। একেবারে প্রলয়-কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে গোবিন্দ। মুখ খারাপ করে, হাতের কাছে যাকে পায় তাকেই দু-একটি চড়-চাপড় বসিয়ে দেয়। ঘরের জিনিস-পত্র ভেঙে তছনচ করে। মাথায় এখনো বেশ ছিট আছে গোবিন্দের।

তবলার শব্দ বন্ধ হতে পরেশ দরজায় টোকা দিয়ে ডাকল, 'গোবিন্দ।'

ভিতর থেকে সাড়া এল, 'কে? পরেশ? এসো এসো।'

দরজা খুলে পরেশ তাকে ভিতরে ডেকে নিল।

ঘরের মেঝেয় একটা ছেঁড়া অপরিষ্কার মাদুর পাতা।

তার ওপর জোড়া দুই বাঁয়া তবলা। এক কোণে একটা তানপুরা, পুরোনো হারমনিয়ম।

একুশ বাইশ বছরের একটি সুদর্শন ছেলে বাঁয়া তবলা কোলের কাছে নিয়ে বসে ছিল। পরেশ তাকে চেনে। তার নাম মাণিক। গোবিন্দের ছাত্র। পরেশকে দেখে সে সবিনয়ে উঠে দাঁড়াল।

পরেশ বলল, 'বোসো, বোসো।'

গোবিন্দ বলল, 'না ওর আর এখন বসে দরকার নেই। মাণিক ওর কাজে যাক। ওর আজকের তালিম শেষ হয়েছে৷'

মাণিক বলল, 'কি রকম দেখলেন? আমার হবে তো গোবিন্দদা?'

গোবিন্দ অভয় দিয়ে বলল. 'হবে হবে। লেগে থাকলেই হবে। তুই কিচ্ছু ভাবিসনে। শুধু কাজ করে যা।'

মাণিক হেসে বলল, 'আপনাদের আশীর্বাদই তো সম্বল গোবিন্দদা।'

মাণিক গোবিন্দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, আর গুরুর বন্ধু বলে পরেশকে প্রণাম করে গেল।

ছেলেই হোক মেয়েই হোক, কেউ যখন পা ছুঁয়ে প্রণাম করে, তখন পরেশের গা-টা মাঝে মাঝে শির শির করে ওঠে —আর মনটা ছম ছম করে। মনে হয় সত্যিই তার ভালো হওয়া উচিত ছিল, মানুষের মত মানুষ হওয়া উচিত ছিল, কম বয়সীদের প্রণামের উপযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই হল না পরেশের। কোন ভালো কাজ করল না, কোন ভালো কিছু শিখল না। গান বাজনার লাইনে থেকেও কোন একটা জিনিস আয়ত্ত করতে পারল না। সে শুধু ম্যানেজারি করল, মানে দালালি করে গেল। একজনের জিনিস আর একজনের কাছে বিক্রি করে দিয়ে দু-পয়সা কমিশন পেয়েই সে সন্তুষ্ট রইল আজীবন। নিজের মূলধন বাড়াবার দিকে কোন দিনই চেষ্টা করল না। কেউ এসে প্রণাম করলে মাঝে মাঝে এই সব কথা মনে হয় পরেশের। শুধু ক্ষোভ নয়, আফশোস নয়, এই সব আচমকা প্রণাম মাঝে মাঝে তাকে চমকও দিয়ে যায়। মনে হয় এখনো বুঝি আশা আছে। এখনো চেষ্টা করলে নিজেকে খানিকটা তুলে নিতে পারবে, মরবার আগে অন্ততঃ দু একটা সৎকাজ করে যাবে, দু একটি ছেলে-মেয়ের দু' একবারের প্রণামের যোগ্য হবে। হঠাৎ কেউ এসে প্রণাম করলে মাঝে মাঝে মনের এই ধরণের এক অদ্ভুত অবস্থা হয়ে যায় পরেশের। এক এক সময় সে এমনও ভাবে—গোবিন্দের যেমন ভক্ত আছে ছাত্র আছে পরেশেরও যদি তেমন দু একজন থাকত আর তারা পরেশকে রোজ এসে প্রণাম করত তাহলে বোধহয়, আর কিছু না হোক, চক্ষুলজ্জায় পড়ে পরেশ নিজের চেষ্টায় মানুষ হিসাবে দু এক ধাপ ওপরে উঠত। কিন্তু তার ছাত্র হবে কে? তার তেমন কোন গুণ নেই, বরং দোষে আগাগোড়া ভরতি।

গোবিন্দ বলল, 'কি খবর ম্যানেজার 'আজ যে একেবারে সকালেই বেরিয়ে পড়েছ?'

পরেশের চেয়ে গোবিন্দ বেশ খানিকটা মাথায় লম্বা। পরেশ পাঁচ ফুটের ওপর ইঞ্চি দুয়েকের বেশি হবে না। গোবিন্দ তারও ওপর ছ' সাত ইঞ্চি বেশি। রোগাটে চেহারা বলে আরো লম্বা মনে হয়। আর মোটা সোটা বলে পরেশকে দেখায় বেঁটে। কিন্তু বেঁটে হলেও নির্গুণ হলেও প্রতাপ পরেশেরই বেশি। সে দলের ম্যানেজার আর গোবিন্দ তার সহকারী তবলচী মাত্র। গোবিন্দও সুপুরুষ নয়, মনে হয় যেন বাজপোড়া এক মরা তালগাছ। রুক্ষ উস্কোখুস্কো চেহারা 'লক্ষীশ্রী' কোথাও নেই। বিয়ে থা করেনি গোবিন্দ। শোনা যায় প্রথম বয়সে একটি মেয়েকে সে পছন্দ করেছিল, ভালোবেসেছিল। কিন্তু গান বাজনা নিয়ে আছে বলে সেই মেয়েটির বাপ মা গোবিন্দকে জামাই হিসাবে বরণ করতে চায় নি। স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন ঘরেই সে মেয়ের বিয়ে হয়েছে। তবু সে নাকি সুখী হয়নি। তার সেই সুখ না হওয়ার জন্যেই কি গোবিন্দের এমন শ্রীহারা চেহারা? গোবিন্দ অবশ্য তা স্বীকার করে না। বিয়ে না করার জন্যে অন্য অজুহাত দেখায়। হেসে বলে, 'আমাদের বিয়ে করা সাজে না ভাই। আমাদের রোজগারের স্থিরতা নেই। চালচলন, শোয়া বসা, খানাপিনা কোনটাই গৃহস্থ ঘরের যোগ্য নয়। আমার পক্ষে একটা মেয়েকে ঘরে আনা মানে—চিরকালের জন্য একটা জীবনকে নষ্ট করে দেওয়া। তার কি দরকার পরেশ।

নষ্ট করবার মত, নিজের খেয়ালখুশি মেটাবার মত

নিজের জীবনটাই তো আছে। অনাচার অত্যাচার তার ওপর দিয়েই যাক। কি দরকার তার সঙ্গে আর একটা জীবন জড়িয়ে। শুধু একটা কেন, সেই সঙ্গে আরো গোটা-কত কচি জীবন হয় তো পুড়ে যাবে। একটা পচা আপেলের সঙ্গে রেখে আরো পাঁচটা ভালো আপেলকে পচিয়ে দেওয়ার কি দরকার। তার চেয়ে পচা আঙুর, পচা আপেল হওয়ার সুখ একাই ভোগ করি।'

কিছুতে ধরা দেয়না গোবিন্দ! এমনি হেঁয়ালী রেখে কথা বলে। এতকাল একসঙ্গে আছে পরেশ, কিন্তু ওর দুঃখের কারণটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। ও নিজে মন খুলে কিছু বলে না বলে লোকে নানারকম গল্প ওকে নিয়ে তৈরী করেছে। কেউ বলে ও ছিল কিন্নরকণ্ঠ। ভালো ওস্তাদের কাছে মার্গসঙ্গীত শিখেছিল। গায়ক হিসাবে নামও করেছিল। কিন্তু গোবিন্দের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ওকে ভুলিয়ে এক বাঈজীর কাছে নিয়ে যায়। সেই বাঈজী ওকে আদর করে কি সব খাওয়ায়। তাতে কিছু-দিনের মত মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল গোবিন্দর। মাথাটা পরে অনেকখানি ভালো হয়েছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরটা আর ফিরে আসেনি। ভাঙা ভাঙা গলা। সে গলায় গান গাওয়া যায় না। তাই যন্ত্র হাতে নিয়েছে গোবিন্দ। তার-যন্ত্র তার হাতে বিশেষ খুলল না বলে তবলা বাজায়। ওই স্থূল বাদ্যযন্ত্রটির ভিতর থেকে গোবিন্দ মাঝে মাঝে এমন মিঠে বোল বার করে আনে যে শুনে অবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু তবলচী হিসাবে পরিচিত হতে গোবিন্দের ইচ্ছা নেই। কোন আসরে কি বৈঠকে সে যায় না। নিজের গুণ নিয়ে নিজের মন নিয়ে সে লুকিয়ে থাকে। পরেশ পীড়াপীড়ি করলে তার সঙ্গে যায়, নিঃস্বার্থভাবে দলের জন্যে খাটে। নিতান্ত দরকার না হলে পরেশের কাছ থেকে কিছু নেয় না। পরেশ এ নিয়ে কিছু বললে গোবিন্দ হেসে জবাব দেয়, 'কত লাখ পঞ্চাশ যেন তোমার দলের আয় যে তুমি বাঁটোয়ারা করতে এসেছ। তুমি বউ ছেলে মেয়ে ঘরসংসার করছ। আমার একটা পেট। তার জন্যে তো বেশি চিন্তা নেই। তা ভরাতে এমন কিছু বেগ পেতে হয় না।'

পরেশ গোবিন্দের এই ব্যবহারে, এ ধরণের কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। অবাক হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়। এত নির্লোভ, এত উদাসীন মানুষ হয় কি করে—পরেশ যেন ভেবে পায় না। কোন ধাতুতে গড়া এই মানুষটি। পরেশের মত কি শুধু রক্তমাংসেই তৈরী, না আরো অন্য কিছু আছে।

পরেশ মাঝে মাঝে বলে, 'গোবিন্দ, তুমি আমার চেয়ে শুধু মাথাতেই আধ হাত খানেক উঁচু নও—সব ব্যাপারেই উঁচু, সব ব্যাপারেই বড়। এমন দিল তুমি কোত্থেকে পেলে বল তো?'

গোবিন্দ লজ্জিত হয়ে বলে, 'কী যে বল। দিলের কী এমন পরিচয় পেয়েছ যে ওকথা বলছ?'

আজ পরেশের একটু চিন্তিত ভাব দেখে গোবিন্দ নিজেই আলাপ জুড়ে দিল, 'কি হে ম্যানেজার, কি হয়েছে তোমার? এসে অবধি যে মুখে সরা চাপা দিয়ে রইলে?'

পরেশ বলল, 'জানো গোবিন্দ, মায়া পালিয়েছে। কোন এক বাবুর সঙ্গে গিয়ে ঘর সংসার করছে। সে আর এ লাইনে আসবে না। অন্তত আমাদের দলে থাকবে না। কি উপায় করি বলতো। এদিকে মহাপাত্র চিঠি লিখেছে, ওখানে শুরু হয়ে গেছে মরশুম। আমরা দলবল নিয়ে দু-চার দিনের মধ্যে যদি সেখানে গিয়ে না পড়তে পারি সব মাটি হবে।'

এ কথা শুনে গোবিন্দও চিন্তিত হয়ে পড়ল। মাদুরের ওপর বসে গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'তাইতো ম্যানেজার, মহা মুসকিলেই ফেললে দেখছি। মায়াই যে দলের সবচেয়ে বড় আশা ভরসা ছিল। তোমাকে এত করে বললাম—সারা বছর দলটাকে চালু রাখবার ব্যবস্থা কর। তাতে দলের কাজও ভালো হয়। দেশের মধ্যে নাম যশও বাড়ে। সারা বছর ভরে দেখা সাক্ষাৎ যোগা-যোগ আর কাজ-কর্মের মধ্যে থাকলে মেয়েগুলিও এভাবে পালাতে পারে না।'

পরেশ বলল, আমারও তো তাই ইচ্ছা ছিল গোবিন্দ। কিন্তু বছর ভরে মাইনে দিয়ে একটা দলকে পোষা কি সোজা কথা। নিজেরই চলেনা, তা আবার ওদের খরচ জোগাব। আর এই সহরে কি আশে-পাশে আমাদের কেইবা বায়না করবে, কেইবা অত টাকা দেবে।'

গোবিন্দ বলল, 'সে কথা ঠিক বলেছ। সমস্যায় পড়া গেল দেখছি।'

অন্তত একটি দুটি মেয়ে যদি খুব ভালো না হয়, তা হলে দলই কাণা হয়ে যাবে। যে সব মেয়ে এর আগে দলে কাজ করেছে কিংবা যাদের কাজ করবার সম্ভাবনা আছে তাদের মধ্যে গোবিন্দ কারো নাম করল, পরেশ কারো নাম করল! তাদের কারো খোঁজ পরেশ রাখে, কারো বা গোবিন্দ। খোঁজ-খবর বিনিময়ের পর দেখা গেল তাদের কাউকেই পাওয়া দুষ্কর। কেউ সিনেমায় সুযোগ পেয়েছে কেউ বা থিয়েটারে, কেউবা অন্য কিছু না পেয়ে নিজের রূপ যৌবনের সম্বলকেই বড় করে তুলেছে। সামান্য টাকায়, যৎসামান্যের প্রলোভনে তাদের কেউ কয়েক মাসের জন্যেও কলকাতার বাইরে যেতে চায় না। যাদের টেনে হিঁচড়ে ধরে নেওয়া যায় তাদের নিয়ে দলের কোন লাভ নেই।

গোটা কয়েক বিড়ি পোড়াবার পর হঠাৎ গোবিন্দ বলল, 'একটা পথ আছে। আশ্চর্য, কথাটা এতক্ষণ মাথায়ই আসেনি।'

পরেশ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার?'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গোবিন্দের উৎসাহ যেন নিভে গেল, তবে নিজের মনেই বলল, 'তবে মালার মা কি রাজী হবে?'

পরেশ বলল, 'মালা? ও তোমার সেই ছাত্রী? তাকে পেলে তো কোন কথাই নেই। রূপে গুণে নাচতে গাইতে সব বিষয়েই সে ভালো। অমন মেয়ে আমাদের দলে আর আসেনি। গোবিন্দ তাকে পেলে তো কোন ভাবনাই থাকে না। তাকে পেলে মাথায় ক'রে নাচতে নাচতে নিয়ে চলে যাই। গোবিন্দ তাকে যদি দলে নিয়ে আসতে পার, আমি তোমার চিরকালের গোলাম হয়ে থাকব।'

গোবিন্দ হেসে বলল, 'তা তো থাকবে, কিন্তু ওর মা কি রাজী হবে? মেয়ে নিজেই কি রাজী হবে? মেয়ের রূপ গুণ অবশ্য আছে, কিন্তু দেমাকখানাও তেমনি।

পরেশ বলল, তা থাক। কমলের সঙ্গে কাঁটা থাকে গোবিন্দ। অমন দেমাক-ওয়ালীকে আমি অনেক দেখেছি।'

গোবিন্দ বলল, 'ছিঃ। মালা আমার ছাত্রী। মেয়ের কথা। ওর মা এখন পর্যন্ত ওকে খারাপ পথে যেতে দেয়নি। কোন থিয়েটার-সিনেমাতেও নামতে দেয়নি। তবে আমাকে ওরা খুব মানে-গোনে। আমার কথা না শুনে কিছু করে না। আমি যদি বলি—।'

পরেশ গোবিন্দের দুখানা হাত জড়িয়ে ধরল, 'তোমাকে বলতেই হবে গোবিন্দ। যেমন করে পার, ওই মেয়েটিকে দলে আনতেই হবে। নইলে দল নিয়ে এবার আর আমি বেরোতে পারব না। দল তো একা আমার নয় গোবিন্দ, দল তো তোমারও। তুমি তার মান রাখ।'

গোবিন্দ বলল, 'কিন্তু ওদের যে বড় খুঁৎখুতি। মালার মা অবশ্য ওই পাত থেকেই এসেছে। সেও ধোয়া তুলসী গঙ্গাজল নয়। কিন্তু আজকাল নাকি সে সব ছেড়ে দিয়েছে। আর মেয়েটাকে সৎপথে রাখতে চায়।'

পরেশ বলল, 'আমাদের পথটা যে অসৎ, সে কথা তোমাকে কে বলল।'

গোবিন্দ হাসল, 'না, আমরা খুবই সৎসঙ্গের পথিক। কিন্তু মেয়েটাকে বিয়ে থা দিয়ে গেরস্থ করে, সুখী করে তাই ওর মার ইচ্ছা। শেষে যদি কিছু একটা হয়, মালার মা পদ্মমণির কাছে আমি কিন্তু মুখ দেখাতে পারব না। পদ্ম আমাকে দাদা বলে ডাকে। মা মেয়ে দুজনই আমাকে গুরুর মত ভক্তি করে।'

পরেশ বলল, 'তুমি তাহলে গুরুর কাজও কর, বন্ধুর কাজও কর। 'আমাকে বাঁচাও।' গোবিন্দ বলল, তুমি তা হলে কথা দিচ্ছ? মেয়েটার যাতে মান সম্মানের হানি হয়, তা তুমি কিছুতেই হতে দেবে না।,

পরেশ বলল, 'বেশ' তাই। কোন খারাপ কিছু হলে তুমিই তো গ্যারাণ্টি রইলে।'

গোবিন্দ বলল, 'শুধু আমি না, আমাদের বন্ধুত্ব আর তোমার প্রাণকেও গ্যারাণ্টি রাখতে হবে। জানো তো আমাকে?'

পরেশ বলল, 'জানি ভাই জানি। সব জেনেই এ কথা বলছি। তুমি মালাকে আনবার ব্যবস্থা কর। কেউ তার হাতপা তো ভালো, 'কেশ স্পর্শ'ও করতে পারবেনা— তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি।

গোবিন্দ বলল, 'আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখি। কি হাঁ, না, হয়—সন্ধ্যার পর গিয়ে তোমাকে জানিয়ে আসব। 'তখন বাড়িতে থাকবে তো?'

পরেশ বলল, 'তুমি যদি যাও তাহলে নিশ্চয়ই থাকব।'

বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পরেশ বাইরে চলে এল। মীর্জাপুর ষ্ট্রীট পড়ে কলুটোলার দিকে এগোতে এগোতে নিজের মনেই বলল, 'ঢং দেখলে গায়ে জ্বর আসে। কী সব সতী সাধ্বীরা এসেছেন। গানের দলে এসে পান থেকে চুণ খসলেই তাদের জাত যাবে। আর গোবিন্দটাও হয়েছে একটা হ্যাকা। সব জেনে শুনেও ওদের কথা বিশ্বাস করবে। এমন ভাব করবে, যেন ওসব মানা না মানার সত্যিই কোন মানে আছে।

এসব হল দর বাড়াবার ছল। পরেশ কি আর তা বোঝে না? খুবই বোঝে। তবে এখন বুঝেও না বোঝার ভান করে নরম হয়ে পায়ের কাদা হয়ে থাকতে হবে। তারপর কাজ হাঁসিল হয়ে গেলে উপযুক্ত সময় এলে পায়ের কাদাই হবে মালার ইঁপাটকেল।'

বাড়িতে ফেরবার আগে পরেশ রামবাগানের ঘাঁটিটাও ঘুরে গেল। ওখানে থাকে চাঁপা মল্লিকা আর সুবাসিনী, তারা কেউ মূল নায়িকা নয়, সখী সহচরীর দল। দু'তিন বছর ধরেই তারা পরেশের সঙ্গে কাজ করছে। একটু তোয়াজ করে পিঠে হাত বুলিয়ে কথা বলতেই ওরা রাজী হয়ে গেল। বাইরে গেলে ওদেরই সব চেয়ে লাভ বেশি। অপ্সরী কিন্নরী বলে নিজেদের বেশ চালাতেও পারে, রোজগারও করে দু হাতে। তারা রাজী হবেনা কেন?

বাসায় ফিরে পরেশ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'মণিঅর্ডার পিওন এসেছিল?' সুধা ঘাড় নেড়ে বলল—'না। এত সকালে কবে মণি-অর্ডার পিওন এসেছে। তোমার গরজ বেশি বলেই তো দুনিয়ার নিয়ম-কানুন সব উল্টে যাবে না?' পরেশ বলল, উল্টে যাওয়ার কথা তো বলিনি। টাকা এলে বিটের পিওন এক আধ ঘণ্টা আগেও এদিকে আসতে পারে। সেটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সকাল থেকে কী তোমার হয়েছে বলতো। রস নেই কস নেই—কেবল কট কট করছ তো করছই।

'সুধা বলল, 'হুঁ', আমি একাই কট কট করি। আর তুমি দিনরাত মুখে মধু মেখে বসে আছ। তুমিই কম জ্বালাচ্ছ কিনা। শান্তি কি রাখতে দিয়েছ মনের? মিষ্টি কথা কোত্থেকে বেরোবে শুনি?'

পরেশ আর কথা বাড়াল না। স্নান করে খেয়েদেয়ে নিল। ছেলেমেয়েগুলির খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল সুধা তাদের ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে রেখেছে। তাদের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল পরেশ। বিড়ি টানতে টানতে আড়-চোখে দেখতে লাগল সুধাকে আর তার গৃহস্থালীকে। সত্যিই ঘরের বউ হয়েছে সুধা। রান্নাবান্না করে ছেলে-মেয়ে স্বামীকে খাওয়ায়। তারপরেও তার কাজের শেষ হয়না। ধোয়া-মোছা-নিকোনো চলতেই থাকে।

পরেশ মাঝে মাঝে তাগিদ দেয় 'কত আর বেলা করবে? খেয়ে নাও, খেয়ে নাও।'

সুধার ঘরকন্না দেখে পরেশের নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে। তার মাও এমনি করত। স্বামী পুত্র ঘর-সংসারকে কি ভালোই না বাসত। রাগ করত, গালা-গাল করত, চেঁচিয়ে, গলা ছেড়ে চীৎকার করে বলত, 'আর পারিনা। আমার হাড়মাস এরা সব চিবিয়ে খেল।' কিন্তু তারপর সময়ে সবই করত, স্বামী আর সন্তানের যত্নে পারতপক্ষে অবহেলা করতনা।

সুধাও তেমনি হয়েছে। অথচ পাঁচবছর আগেও সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের জীবন ছিল সুধার। মানদা মাসীর বোনঝিদের মতই তারও বেলা দশটার আগে ঘুম ভাংত না। পরকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ানো তো দূরের কথা, নিজের খাবারটাও হোটেল থেকে আনিয়ে নিত। নিজের শরীর ছাড়া আর কোনকিছুর যত্ন করতে জানত না, করবার দরকার বোধ করতনা। সেই সুধা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। নিজে সবচেয়ে পরে খায়, নিজের দেহের যত্ন সবচেয়ে পরে করে। অভাবের সংসারে খেটেখেটে ওর চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। এখন আর ইচ্ছা করলেও সেই আগের পেশায় ফিরে যাওয়ার জো নেই সুধার। এখন আর কেউ তারদিকে তাকাবেনা। এখন তাকাবে শুধু স্বামী আর ছেলেমেয়েরা। ভিন্ন ভিন্ন চোখে।

সুধাকে বিয়ে করে তাকে দিয়ে রান্নাবান্না করে খাচ্ছে শুনে নিমাই একদিন পরেশকে বলেছিল 'অমন কাজও করিসনে পরেশ। রাঁধুনী রেখে দে, রাঁধুনী রেখে দে॥'

পরেশ বলেছিল, 'কেন?'

নিমাই বলেছিল, 'তা না করলে ওই বউ একদিন

তোকেই রাঁধুনী করবে—না হয় রান্নার ভয়ে ঘর ছেড়ে পালাবে।'

কিন্তু পাঁচবছর তো গেছে। এর মধ্যে পালায়নি সুধা। এ ধরণের মেয়েদের যারা বিয়ে করে, তারা পত্নীকে উপপত্নীর মতই আদর যত্নে রাখে। কিন্তু সুধাকে তেমন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রাখতে পারেনি পরেশ। সুধা নিজেও তা চায়নি। এতদিন বসে বসে খেয়ে এখন নিজের হাতে করে কর্মে আর খাওয়ানোতেই সুধা যেন বেশি সুখ পেয়েছে, নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। মানুষেই ইচ্ছা করলে কতবার তার অভ্যাস চালচলন, স্বভাব বদলাতে পারে, এই একই পথে নতুন করে জন্মাতে পারে—চোখের ওপর সুধা তার প্রমাণ দিয়েছে।

স্ত্রীকে রান্নাঘরে নিঃশব্দে কাজ করে যেতে দেখে পরেশের মনটা একটু যেন কোমল হল, মায়া হল ওর ওপর। স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলল, 'সুধা শোন।'

কাছে এগিয়ে এল না সুধা। রান্নাঘর নিকোতে নিকোতেই মুখ তুলে সাড়া দিয়ে বলল, 'কি বলছ। অত মধুর ডাকে ডেকো না গো। মরে যাব। বাঁচব না।'

পরেশ হেসে বলল, 'ওসব সারা এখন থাক। খেয়ে নাও। বেলা একটা বাজল। মণি-অর্ডারের পিওন এই সময়েই তো আসে। এসে পড়লে ডেকে দিয়ো আমাকে।'

সুধা বলল, 'ডেকে দেব কেন, ফিরিয়ে দেব। আমি তো তোমার শত্তুর।'

পরেশ হাসতে লাগল, 'আরে নারে না। নারে না। তুই এখন সংসারে আমার একমাত্র মিতিন। গিন্নী-বান্নী সব।'

সুধা বলল, যাক যাক হয়েছে। এখন তোমার দলের বায়না হয়ে গেছে, কত ফূর্তি তোমার মনে। এখন আর তোমাকে পায় কে। সারাটা সকাল আর দুপুর তো বাইরে বাইরেই কাটিয়ে এলে। নতুন নতুন সব সখিদের নিয়ে রংতামাসা করলে তোমার কি।'

পরেশ বালিশ থেকে মাথাটা একটু তুলে নিয়ে বলল, 'সখি, না ঘোড়ার ডিম। ওদের দিকে তাকানো যায় নাকি। নিতান্তই কাজের সম্পর্ক, তাই ডাক খোঁজ করতে হয়। কনট্রাকটররা যেমন কুলি মজুর কারিগর খাটায়, আমিও তেমনি। লোককে খাটাতে না পারলে আমার পয়সা কোত্থেকে আসবে, আর এই কাচ্চাবাচ্চাগুলিকে কী খাইয়েই বা বাঁচিয়ে রাখব। অবুঝ হসনে সুধা। বুঝে কথা বল।'

সুধা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বুঝেছি গো বুঝেছি। তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর। আমি আর কিছুতেই বাধা দেবনা।'

পরেশের এবার ঘুম আসছে। সে পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'দোরের দিকে কান রেখো।'

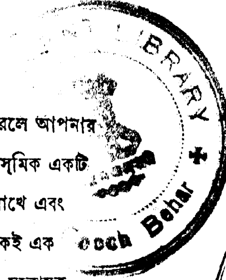
৪

খাওয়া সেরে একটা পান মুখে দিয়ে সুধা তক্তপোষের দিকে তাকিয়ে দেখল—পরেশ আর ছেলেমেয়ে দুটি ঘুমে অচেতন হয়ে রয়েছে। সুধা মুহূর্ত্তকাল সেদিকে তাকিয়ে রইল। সত্যি এতদিন কোথায় ছিল এরা? এদের তো আসবার কথা ছিল না। মাঝে মাঝে নিজেরই যেন ভেবে অবাক লাগে সুধার। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছে। জেগে উঠে দেখবে সে মানদামাসীর ছোট ভাড়াটে ঘরে একা একা পড়ে আছে। কি বড়জোর একটা অচেনা লোক এক পাশে মদের নেশায় বিভোর হয়ে ঘুমোচ্ছে। মেঝেয় ভাঙা বোতলের কুচি। এলোমেলো জিনিসপত্র। সারা রাত ঘরের মধ্যে ঝড় বয়ে যাওয়ার চিহ্ন।

এখন শান্তভাবে ভাঙের নেশায় ঘুমোলে কি হবে, পরেশেরও তখন মদ ছাড়া ঘুম পেত না। ঢক ঢক করে বোতল শেষ করে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় এসে তাকে জড়িয়ে ধরে পড়ে থাকতেই ভালোবাসত পরেশ। বলত 'যারা ভালোলোক তারা বলে এখানে আসা মানে আত্মহত্যা করা। আমি তাই রোজ একবার করে এসে আত্মহত্যা করি। নিজেকে নিজে খুন করি। কিন্তু পুলিসের হাতে ধরা পড়বার আগেই নিজেকে দিনের বেলায় ফের বাঁচিয়ে দিই। মরা মানুষ [illegible] নড়ে চড়ে ওঠে, হেঁটে চলে বেড়ায়। গোয়েন্দা পুলিশ [illegible] হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি রকম মজা তাই বলতো সুধা।'

সুধা পরেশের কথার ভঙ্গিতে হাসত, বলত, 'তোমাকে অমন মরতেই বা বলে কে, বাঁচতেই বা বলে কে?'

চুলের কতখানি যত্ন আপনি করছেন?



প্রত্যেকদিন এরাস্‌মিক পারফিউম্‌ড কোকোনাট হেয়ার অয়েল ব্যবহার করলে আপনার চুল ঘন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এরাস্‌মিক একটি বিশুদ্ধ নারিকেল তেল যা চুল ভাল রাখে এবং চুলের শোভা বাড়িয়ে তোলে। আজকেই এক বোতল কিনে পরখ করুন—আপনার মনোমত গোলাপ বা চামেলির সুগন্ধযুক্ত তেল পাবেন।





পারফিউম্‌ড কোকোনাট
হেয়ার অয়েল



বিশুদ্ধতা
গ্যারাণ্টেড

বেশিক্ষণ
সতেজ থাকে

পরেশ বলত, 'সব তুই বলিস সুধা, তুই ছাড়া আর কে বলবে। তুই চোখ দিয়ে যা বলিস, নিজের মুখে তাই আবার না করিস, কোন কথাই তো তোর মনের কথা নয়। তাই কিছু মনে রাখতে পারিস নে।'

সুধা বলল, মন প্রাণ যেন তোমাদেরই কত আছে। আচ্ছা, তুমি যে এসব জায়গায় আস, তোমার বউ কষ্ট পায় না?'

পরেশ বলত—'পায় আবার না? কষ্ট পাওয়াটাই তার স্বভাব। তার কষ্ট নেবে কে? আমি তাকে ভাতও দিই কাপড়ও দিই, আদর করি সোহাগ করি, যখন তার কাছে থাকি তখন বার বার বলি, ওগো, তোমা বই কিছু জানি না। কিন্তু সে কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করে না। এটা বোঝেনা—যে বিশ্বাসে মিলয়ে কেষ্ট, আর অবিশ্বাসে মিলয়ে কষ্ট। বিশ্বাসেই সুখ, বিশ্বাসেই শান্তি। কিন্তু সে তো কিছুতেই মানতে চায়না।'

সুধা বুঝতে পারে মানুষটি নিষ্ঠুর, মানুষটি খুব সৎ নয়। কিন্তু সৎলোক বিবেচক লোক সুধাদের কাছে যাবে কেন? চোর জোচ্চোর খুনী বদমাস, সমাজ সংসার পরিবার থেকে তাড়া খাওয়া হাজার কারণে, হাজার বার ঘা খাওয়া মানুষের হৃদয়-ব্যথা, মনের কথা জানবার জন্তেই তো সুধারা আছে। পরেশের মত মানুষ কি একজন? তার কাছে যারা আসে, তারা সবাই ওই রকম। উনিশ আর বিশ। তাছাড়া সবাই এক।

তবে পরেশ মানুষটা ওরই মধ্যে একটু অন্যরকম। ওর বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। কথাবার্ত্তা চালাক-চতুরের মত। মনে হয় এত বড় সকটা দুনিয়াকেও কেবল হেসে আর ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতে পারে।

জিজ্ঞেস করে করে পরেশের বউয়ের গল্প শোনে সুধা। বউয়ের নাম বীণাপানি। মাগো, আজকাল আবার অমন পুরোন নাম থাকে নাকি ঘরের বউয়ের?

পরেশ বলে, 'আমার কপালে সবই পুরোন। মানুষটাও একেবারে পুরোন আমলের। বউ তো নয়—যেন দিদিমা বুড়ি। যেমন শুচিবাইয়ে ভরা তেমনি ছিচকাঁদুনে। রাগ হলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

পরেশ বলে বউয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি লেগেই থাকে তার। বউ নাকি কথায় কথায় প্রায়ই বলে—তারবাপ মা না জেনে তাকে জলে ফেলে দিয়েছে। পরেশ জবাব দেয় 'আমি যদি জল হতাম, তোমার মনের আগুন সব নিবে যেত। আমি জল নয় বাতাস। তাই ছোঁয়ায় তোমার আগুনের হলকা আরো বাড়ে, আরো ছড়ায়। আমার সঙ্গে ঝগড়া করা মানে বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা। আগুন আর বাতাস কোনদিন ঝগড়া করে না। তুমি কর। কারণ তুমি নিজেকেও চেন না, তোমার সোয়ামীকেও চেন না।'

কিন্তু এসব ঠাট্টা তামাসায় বীণার মন ভেজে না। সে আরো রাগ করে ঝগড়াঝাটি করে অশান্তি বাড়ায়। তারপর রাগ করে ঘরের জিনিসপত্র ছত্রখান করে ফেলে দিয়ে চলে যায় হরতুকি বাগানে বাপের বাড়িতে। পরেশ সেখানে বউয়ের মান ভাঙাতে গিয়ে মুখ পায় না। বীণার ছোট ভাইরা ঘুসি বাগিয়ে আসে। বুড়ো বাপ পায়ের ছেঁড়া চটি খুলে তেড়ে এসে বলল—'দুর হ, দুর হ, জামাই না যম। দুর হ।'

পরেশ তাড়া খেয়ে থুড় থুড় করে চলে আসে বউ-বাজারে। যেখানে বাজার ভরা বউ। যে রাস্তায় প্রেম আর চাঁদ গড়াগড়ি যায়।

পরেশ অবশ্য হাসতে হাসতেই এসব কথা বলে। কিন্তু সুধার যেন কেমন মানুষটার জন্তে বড় দুঃখ হয়। সুধার মনে হয় এ লোকটার বুকেও ব্যথা আছে। লোকটা একেবারে অকারণে অমন নিষ্ঠুর আর শঠ হয়ে যায়নি। পরেশ যখন মাঝে মাঝে আসে, সুধা তাকে একটু বেশি খাতির যত্নই করে। মদ খেয়ে বমি করলে পরিষ্কার করে, জামাটামা নষ্ট করে ফেললে ছাড়িয়ে নেয়। পরেশের জন্তে বারবার বিছানার চাদর বদলাতে হয় তাকে।

সুধা শোনে পরেশের বউ রাগ করে মাসের পর মাস বাপের বাড়িতে পড়ে থাকে। ছ'মাস ন'মাস বাদে যদিবা ফের আসে, দু তিন দিন যেতে না যেতেই ফের ঝগড়াঝাটি লেগে যায়। নিজেও টিঁকতে পারে না, পরকেও টিকতে দেয় না। তাই কোনবার পরেশই আগে পালায়, কোনবার বউই আগে পালিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়।

সুধা মনে মনে ভাবে, 'আহা, দুঃখ তো কারোই কম নয়।'

কিন্তু পরেশ যেন কোন দুঃখকেই আমল দিতে চায়

না। ও যেন হেসেই সব উড়িয়ে দেবে, মদেই সব ভাসিয়ে দেবে।

তারপর একদিন পরেশ বলল, 'আমার একটা গান বাজনার দল আছে। আমি সেই দল নিয়ে মাঝে মাঝে দিগ্‌বিজয় করতে বেরোই। তুই আসবি আমার দলে? তুই তো গানও জানিস, আবার একটু একটু পা ছোঁড়া-ছোঁড়াও শিখেছিস।'

সুধা লোককে টানবার জন্যে ওস্তাদ রেখে কিছুদিন ধরে নাচগান অভ্যাস করেছিল। তার জন্যে মাসীর কাছে তার কদর ছিল বেশি। বাবুরাও আদর যত্ন করত। হিংসায় জ্বলত অন্য মেয়েরা। তারা বলত, 'তোর নাচ মানে তো কোমর দুলানি, আর গান মানে তো বেসুরো গলায় সিনেমার গানগুলি আউড়ে যাওয়া।'

সুধা বলল, 'যাই হোক। এরজন্যেই তোরা হিংসেয় ফেটে মরিস, এর জন্যেই সারা কলকাতা সহর আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। ওলো বিন্দি, আমার যা আছে তাই বা খায় কে? যা আছে তাই বা পায় কে?'

কিন্তু পরেশ যখন তাকে দলে যোগ দেওয়ার কথা বলল, একটু লজ্জা পেয়ে গেল সুধা। বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে আসরে দাঁড়িয়ে দশজনের সামনে গাইবার কি নাচবার ক্ষমতা সুধার কি আছে? লোকে হাসবে যে।

পরেশ বলল, 'সেজন্যে ভাবিসনে। আমার হাতে এমন ওস্তাদ লোক আছে যে তোকে শিখিয়ে পড়িয়ে তালিম দিয়ে ঠিক করে নিতে পারবে। তার চাঁটিতে বোবা তবলার বোল বেরোয়, বোবা মেয়ে গলা ছেড়ে গান করে, আর যে খোঁড়া সেও ময়ূরীর মত নাচে। যদি চাঁটি খেতে পারিস, গান-বাজনা তোকে আমরা শিখিয়ে নিতে পারব।'

একথা শুনে সুধার মন তখনই নেচে উঠল। সে যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। এই অন্ধকার গর্ত থেকে বেরিয়ে সে আলোর মুখ দেখবে, কত দেশবিদেশ, সমুদ্র আর পাহাড় পর্বত দেখবে। কত দেবদেবী কত তীর্থস্থান সে দেখে [illegible]।

পরেশ [illegible] তার কানে সেই মোহনমন্ত্র জপতে লাগল। কিন্তু বেশি জপবার আর দরকার ছিল না। সুধা দু'একবার শুনেই মুগ্ধ হয়ে গেছে। কত আর বয়স হবে তখন বছর উনিশেক। অবশ্য সংসারের হালচাল তার বার তের বছর বয়স থেকেই জানা। পুরুষরা কেমন মানুষ তা তার চিনতে বুঝতে আর বাকি নেই। কিন্তু পরেশের প্রস্তাব তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হল। দূরের হাতছানি তার চোখকে মুগ্ধ করল। প্রায় এক কথায় রাজী হয়ে গেল সুধা। মাইনেপত্র নিয়ে কোন-রকম দরকষাকষি করল না। মাসী অবশ্য সহজে ছাড়তে চায়নি। সে পরেশের সঙ্গে দরদাম করতে লাগল। আগাম কমিশন হিসাবে কিছু টাকা আদায় করে নিল। কিন্তু সুধার যেন ওসব কিছু দরকার ছিলনা। সে যে ট্রেণে করে নানা জায়গায় ঘুরতে পারবে, নানা জিনিস দেখতে পারবে—তার চেয়ে বড় পাওয়া যেন আর নেই।

সুধা লক্ষ্য করল—তার উৎসাহ আর আগ্রহ দেখে পরেশও খুব খুসি হয়েছে। সে বলল, 'তোকে আমি সব সুযোগ সুবিধা দেব। দলের সেরা মেয়ে হবি তুই।'

পরেশ সুধাকে নিয়ে তুলল তার দরমাহাটার বাসায়। তখন ওখানেই থাকত পরেশ। বউ বেশিরভাগ সময় রাগ করে বাপের বাড়িতে থাকে, আর সেই সুযোগে মেয়েদের নিয়ে রিহার্সেল দেয় পরেশ। অবশ্য বউয়ের সামনেও সে ওইসব মেয়ে নিয়ে হৈ হল্লা করতে পারত। পরেশের তো কোন লজ্জা সংকোচের বালাই নেই।

সেখানেই আলাপ হল গোবিন্দ তালুকদারের সঙ্গে। শুকনো কালো দড়ির মত পাকানো চেহারা। মাথার আধখানা পুড়ে খাক। প্রথমে দেখে সুধার তো মোটে ভক্তিই হয়নি। এমন লোক আবার কি শেখাবে। কিন্তু দু চারদিন তালিম নিয়েই সুধা বুঝতে পারল—গোবিন্দ যে সে লোক নয়। মানুষটি একেবারে গুণের খনি। শুধু তবলাই বাজায় না। গানের রাজ্যের অনেক সন্ধান জানে। সুধাদের মত মেয়ে তার পায়ের তলায় বসে বার বছর গান শিখতে পারে। কিন্তু গোবিন্দের উৎসাহ থাকলে কি হবে, সুধাকে বেশি কিছু শেখানো বেশ পরেশের ইচ্ছা নয়। শুধু দলের জন্য যেটুকু কাজে লাগবে সেইটুকু শিখতে পারলেই যথেষ্ট। পরেশ গোবিন্দকে প্রায়ই তাড়া লাগাত, 'হয়েছে হয়েছে। সুধা তুমি যেটুকু শিখেছ তাই ঢের। লোকে ওইটুকুই আগে দেখে

করুক দেখি।' বেশি দেরি করবার সময় ত নেই। দলের বায়না হয়ে গেছে। এবার তল্পিতল্পা বেঁধে ফেল।'

গানকে যদিও ব্যবসা হিসাবেই নিয়েছে, তবু পরেশের বেশিরকম দোকানদারির ভাব সুধার যেন সব সময় ভালো লাগতনা। পরেশের তাগিদ সত্ত্বেও গোবিন্দ সঙ্গত করে চলত, সুধা গাইতে থাকত। শুধু সস্তা হালকা গানই গোবিন্দের কাছে সে শেখেনি। কিছু কিছু খেয়ালেরও চর্চা করেছে। যদিও দলের কাজে তা লাগত না। কীর্তন, ভজন, খেমটা, গজলেরই চাহিদা ছিল বেশি। আর সুধারা তো সবসময় চাহিদা মেটাবার জন্যেই আছে।

সুধা প্রথম প্রথম গোবিন্দকে ওস্তাদজী বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বলল, 'আমি কোন ওস্তাদের পায়ের নখেরও যোগ্য নই। তুমি আমাকে গোবিন্দদা বলে ডেকো। সুধা বলেছিল, 'আমি যদি আপনাকে শুধু দাদা বলি তাহলে কি আপনি রাগ করবেন?'

গোবিন্দ হেসে বলেছিল, 'রাগ করব কেন, বরং খুব খুশি হব। তোমাদের মধ্যে একজন বোন পাওয়া তো সহজ নয়।'

সুধা হেসে বলেছিল, 'দোষ নেবেন না, আপনাদের মধ্যে ভাইই কি আমরা সহজে পাই?'

গোবিন্দের সঙ্গে ভাইবোনের ধর্ম-সম্পর্ক পাতিয়ে সেদিন বড় অদ্ভুত তৃপ্তি পেয়েছিল সুধা। তার জীবনে একজন দাদাকে পাওয়া সেই প্রথম। প্রথম প্রেমিককে পাওয়ার মত, প্রথম পুরুষের আদর পাওয়ার মত, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে একজন ভাইকে পাওয়া কম কথা নয়। বিশেষ করে সুধাদের জীবনে ভাইতো আসেনা, ভাইতো কেউ হতে চায় না। গৃহস্থ-ঘরের ঝি-বউদের পুরুষের সঙ্গে নানা সম্পর্ক। মুখে মুখে কত রকমের ডাক। কেউ বাবা, কেউ দাদা, কেউ ছোট ভাই, ভাইপো, বোনপো —আরো যে কত রকমের সম্পর্ক আছে তা জানে না সুধা। সে জানে শুধু স্নেহলোভী এক রকমের পুরুষকে। বাপের বয়সী যে আসে সেও প্রণয়ী, আবার ছোট ভাই কি ছেলের বয়সী যারা আসে তারাও তাই। সুধা লক্ষ্য করে দেখেছে—মাসী কি বেশি-বয়সী অন্য মেয়েদের ছেলের-বয়সীদের দিকেই লোভ বেশি। তাদের নিয়েই বেশি টানা-টানি। ঘরের টাকা ব্যয় করেও পরের ছেলেদের তারা ধরে রাখতে চায়। ওই ভাবেই মা হবার সাধ তারা মিটায় কিনা কে জানে।

ভাই-বোন সম্পর্ক পাতিয়ে নিলেও পরেশ কিন্তু গোবিন্দকে হিংসা করতে ছাড়েনি। ঠাট্টা করেছে, নানা-রকম চোখা চোখা কথা বলে খোঁচা দিয়েছে। পরেশের কাণ্ড দেখে লজ্জায় মরে গেছে সুধা। এই কত গভীর বন্ধুত্ব। একটু বাদেই বিশ্রী বিশ্রী কি সব কথা। একটা মানুষই যেন গোটা একটা চিড়িয়াখানা। ভিতরে জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই।

পরেশ হিংসা করে বলেছে—'তুই আমার চেয়ে ওই গোবিন্দটাকে বেশি ভালোবাসিস।'

সুধা বলেছে, 'ছি ছি ছি—কী যে বল। দুই ভালোবাসা কি এক?'

পরেশ বলেছে 'এক রকম ছাড়া তোরা আবার দুতিন রকমের ভালোবাসা জানিস না কি?'

সুধা জবাব দিয়েছিল—'আগে জানতুম না। তোমাদের দলে এসে শিখলুম। গোবিন্দদাকে আমি, খুব ভক্তি করি।'

তার উত্তরে পরেশ বলেছিল, 'খুব সাবধান। অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ।'

সুধা মনে মনে হেসেছিল। পরেশ নিজে যে চুরি করে বউকে ঠকায় তাতে কোন দোষ নেই। আর চুরি জোচ্চুরি যার পেশা তার জন্যেই যে লাইসেন্স নিয়েছে—তাকেই পরেশ বার বার হাতকড়ি পরাতে চায়।

পরেশের বাইরের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত রিহার্সেল হত। সুধা ছাড়াও আরো দুটি মেয়ে ছিল। তারাদাসী আর সিন্ধুবালা। সেকেলে নাম বলে পরেশ ওদের নাম দুটো বদলে রাখল ইরা আর বেলা।

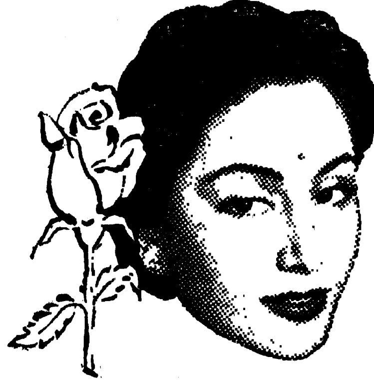
সুধা বলল, 'আমার নাম বদলালে না?'

পরেশ বলল, 'দরকার নেই। তোর নাম এমনিতেই বেশ মিষ্টি।'

একথা শুনে ইরা আর বেলা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল, আর পরেশের অসাক্ষাতে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ইরা বলল, 'কিসের মত মিষ্টি লো সুধা। মধুর মত, না গুড়ের মত?'





ফুলের মত…

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা ব্যবহারে ফুটে উঠবে!



নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্য্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।
রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেণার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।



রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড'এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

R.P. 146-X52 BG

সুধা বলল, 'কি জানি ভাই। গোবিন্দদা বলেছেন, সুধা কথাটার মানেও নাকি মিষ্টি। তা নাকি দেবতারা খায়।'

বেলা হিহি করে হেসে উঠেছিল—'খাবেই তো। তোর রূপ আছে, গুণ আছে, বয়স আছে, তোকে তো দেবতারাই খাবে। আমরা তো আর তেমন নই। আমাদের খেতে আসে যত রাক্ষস ভূত-প্রেত আর অপদেবতারা। তাও মধুর মত খায়না, কুইনাইনের মত খায়।'

রিহার্সেল শেষ হলে ওরা চলে যেত। কিন্তু সুধাকে পরেশ সহজে ছেড়ে দিতনা। বলত, 'এসো, আমার ভিতরের ঘরখানা একটু দেখে যাও, গুছিয়ে দিয়ে যাও।'

কিন্তু ভিতরে যেতে কেন যেন সুধার বড় গা কাঁপত। যদিও পরেশের বউ বীণা এখন বাড়িতে নেই, রাগ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে রয়েছে, তবু তার সেই ছেড়ে-যাওয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে পরেশের আদর নিতে নিতে সুধার বুকের ভিতরটা বড় কাঁপতে থাকত।

দেয়ালে টানানো পরেশের বউয়েরই একখানা আয়না। তার ফেলে-যাওয়া চিরুণী, সিঁদুর কৌটো, চুলের কাঁটা। হয়তো আলনায় ঝুলানো দুএকখানা পুরোন সাড়ি। তক্তপোষের ওপর পাতা বিছানায় চাদরে ঢাকা পাশাপাশি দুজোড়া বালিশ। দেখে দেখে সারা গা শিউরে উঠত সুধার। পরেশকে বাধা দিয়ে বলল, 'নানা এখানে না, এখানে না। এটা তোমার বউয়ের ঘর।'

পরেশ হেসে উঠত, 'নাম লেখা আছে নাকি ঘরে? আংটি তুমি কার? যার হাতে আছি। ঘর তুমি কার? যে বাস করে। মেয়ে তুমি কার? যে আদর করে। মন তুমি কার? যার ছোঁয়ায় নাচি। সে তো আমাকে ঘেন্না করে ছেড়েই চলে গেছে সুধা। সে তো আর আমার মুখ দেখেনা। তবে তোর অত লজ্জা কিসের?'

সুধা বলত,'লজ্জা নয় গো ভয়। ভয়ে আমার বুক কাঁপে।'

পরেশ বলত, 'ভয়ই বা কিসের—সে তো আর মরে ভূত হয়নি, যে বাতাসে ভেসে চলে আসবে। কি জানালা দিয়ে মুখ বাড়াবে। অত যদি ভয়ই পেয়ে থাকিস আমার বুকের মধ্যে আয়, বুকে মুখ গুঁজে থাক, সেখানে কোন ভয় নেই।'

যে দেবতারা সুধা খান তাঁরা হয়তো ষোলআনাই দেবতা। কিন্তু যে মানুষগুলি সুধাদের মত মেয়েমানুষের কাছে আসে তারা বোধহয় কোনটাই পুরোপুরি নয়। না মানুষ, না দেবতা, না রাক্ষস, না পিশাচ। এরা যাই হোক—এদের নিয়েই সুধাদের সমাজ সংসার, জীবনের সাধ আহ্লাদ, হাসি কান্না, উৎস আনন্দ। এদের বাদ দিয়েও সুধারা চলতে পারেনা, এদের হাত থেকেও সুধাদের রেহাই নেই।

দল নিয়ে সেবারও প্রথমেই উড়িষ্যায় গিয়েছিল পরেশ। বাসা বেঁধেছিল ভুবনেশ্বর সহরের একপ্রান্তে। খান তিনেক ঘর। ভাড়া কলকাতার তুলনায় খুবই সস্তা। জিনিসপত্রের দামও তাই। নানা রকমের রূপার গয়না, কত রঙ বেরঙের নক্সী পেড়ে সাড়ি। সুধার ইচ্ছা করত সব কিনে বাক্স বোঝাই করে।

ইরা আর বেলা হেসে বলত, 'অত হ্যাংলা কেনরে তুই। তোর ভাবনা কি। দলে ঢুকতে না ঢুকতেই রাণী হয়ে বসেছিস। এদেশেও রাজরাজড়ার অভাব নেই। তারা তোকে সিংহাসনের পাশে বসিয়ে রাখবে। কিছুতেই আর কলকাতায় ফিরে যেতে দেবেনা।'

সহরের একপ্রান্তে বাসা বাঁধলেও সুধারা শুধু যে সহরের মধ্যেই গান গাইত তা নয়। পরেশ দলবল নিয়ে অনেক দূরে দূরে গাঁয়ের ভিতরেও চলে যেত। সে সব গ্রামের খোলা-গা খাটো-ধুতী-পরা লোকজন দেখে সুধা অবাক হয়ে ভাবত—এরা আবার গান শুনবে কি, এরা আবার পয়সা পাবে কোথায়।

কিন্তু এইসব হাজার হাজার দীন দরিদ্রের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে দু'একজন বড়লোক বেরিয়ে পড়ত। তাদের কারো পরণে দামী দামী ধুতী পাঞ্জাবী চাদর—আবার কেউ বা খোদ সাহেব। মাথায় টুপি, মুখে পাইপ। কেউ বা বড় বড় সুন্দর সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা মোটর গাড়িতে। তাদের দেখে মনে হতনা দেশটা এত গরীব, এখানে বেশিরভাগ লোক খেতে পায়না। এসব রাজারাজড়া, জমিদার জোতদার, ব্যবসাদারদের দৌলতে এদেশে যে কোন দুঃখ কষ্ট আছে তা মনে হত না সুধার। বিশেষ করে রাত্রে গানের আসরে, আলোয়, ফুলের মালায়, বাজনায় বোতলে, গায়ের সুরে দেশটাকে মনে হত পরীর দেশ বলে। মাঝে মাঝে পুরস্কার টুরস্কারও মিলত।

অবশ্য পরেশের মাইনের চেয়ে উপুরি-রোজগারটাই বেশি হত ইরা আর বেলার। আসর শেষ হলে দু'একজন সমজদার শ্রোতার সঙ্গে তারা বেড়াতে বেরোত। কেউ নিয়ে যেত বাগান বাড়িতে, কেউ বা হোটেলে টোটোল। ফিরে আসত মুঠি মুঠি টাকা নিয়ে। যেদিন গান থাকত না, ইরা আর বেলা সেদিন কেবল বেড়িয়েই বেড়াত। আসরের কোন ক্ষতি না হলে পরেশ এ সব বিষয়ে কোন আপত্তি করতনা। ওদের রোজগারের অংশও চাইত না।

একদিন ইরা বলল, কি ব্যাপার, তুই যে এসে অবধি ঘরের বউ হয়ে রয়েছিল। বেরোচ্ছিস না কেন? কি লোকজন এলে ঘরে নিচ্ছিস বা কেন?

সুধা বলল, 'না ভাই আমার কেমন ভয় করে। বিদেশে বিভূঁইয়ে শেষে কি হতে কি হবে।'

একথা শুনে ইরা আর বেলা হেসে গড়িয়ে পড়ত। শোন শোন, আমাদের কনে বউটির কথা শোন। বিদেশী পুরুষকে না কি ওর ভয় করে।

বেলা বলত, 'আমাদের আবার দেশী বিদেশী কিলো। আমাদের ঘরে যে আসবে সেই আপন। কথা না বুঝলে ক্ষতি নেই। ভাবভঙ্গি ইসারাই যথেষ্ট। ওলো আমাদের আর কোন মিলেরই দরকার নেই। মনের মিলেরও না।'

কিন্তু সুধা কখনো মাথা ধরা, কখনো গা বমি বমি করার অজুহাত দিয়ে ওসব আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ-এড়িয়ে যেত। কেন যেন বাইরে এসে তার মনটা একেবারে বদলে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল দেবতার স্থানে এসব করা পাপ।

গোবিন্দ বলেছিল, 'ব্যবসা একেবারে না করে পারবে না। তোমাদের পক্ষে লোভ সামলানো কঠিন। কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করতে যেয়োনা। তাহলে আর গাইতে পারবে না। গান বাজনাটা সাধনার জিনিস, সংযমের জিনিস। গান নিজেই একটা বাড়াবাড়ি। যারা এই বাড়াবাড়ি নিয়ে মেতে উঠতে পারে, তাদের অন্য বাড়াবাড়ির দরকার হয় না।'

গোবিন্দর কথাগুলি মন দিয়ে শুনত সুধা। চোখের ওপর দেখত—একজন মানুষ শুধু একটা নেশা নিয়েই কি করে জীবন কাটিয়ে যেতে পারে। নিজেও দেখত—যখন গানের রেওয়াজ করে, রিহার্সেল দেয়, অনেক রাত পর্যন্ত আসরে মুজরো করে, তখন আর কোন রকম ক্ষুধাতৃষ্ণার সাধ-আহ্লাদের কথা যেন মনে থাকে না। এক গানের মধ্যেই সব যেন মিটে যায়।

বাইরের কেউ যখন সুধাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আসত সে একটা না একটা অসুস্থতার অজুহাত খাড়া করত। ভাবখানা এই—গোবিন্দদাকে সে দেখিয়ে দেবে সংযম কাকে বলে। পরেশকে দেখাবে, সে কতখানি নির্লোভ হতে পারে।

কিন্তু একবার বড় বিপদে পড়ে গিয়েছিল। জগৎ মহান্তি নামে ছোটখাট এক জমিদারের বাড়িতে সে রাত্রে গান হচ্ছে। সুধার কীর্তন শুনে আর রাধা-নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছেন জগৎবাবু। নিজের হাতে মালা ছুঁড়ে দিলেন, সোনার মেডেলের কথা ঘোষণা করলেন। আর এক রাত্রের বায়নার টাকা অগ্রিম দিয়ে দিলেন পরেশের হাতে গুঁজে, পরেশ তো মহাখুসি।

আসর ভাঙবার পর ডাক পড়ল সুধার। জগৎবাবু তার সঙ্গে আলাপ করতে চান। এ আলাপের মানে যে কি—তা সুধার বুঝতে বাকি নেই। তার মুখের হাসি আর চোখের তাকাবার ভঙ্গি দেখেই সুধা বুঝতে পেরেছে। ভদ্রলোকের বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। অল্প বয়সের মত ওই বয়সটাও মারাত্মক। সুধা অমন অনেককে দেখেছে। কিন্তু তারই বা ভয় কি। সে তো আর কুলের বউ নয়। বরং ফিরে আসবার সময় তার দু'হাত ভরে দেবেন জগৎবাবু।

কিন্তু সুধা বলল, 'না যাব না।' আমার শরীর ভাল না, মন ভাল না, যাব না আমি।

পরেশ বলল, 'সে কিরে। না গেলে যে কত বড় লোকসান তা ভেবে দেখেছিস। কত বড় লোক, কত ক্ষমতা। সুধা তার মুখোমুখি দাঁড়াল। স্থির দৃষ্টিতে পরেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ম্যানেজার, তুমিও এই কথা বলছ। আমার ওপর এই তোমার মায়া মমতা আর দরদ? তুমি কি শুধু নিজের বউকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে সোহাগ করতে পার? আর বিদেশে এসে বাইরের একজন লোকের হাত থেকে তোমারই দলের একটা মেয়েকে রক্ষা করতে পার না? এই তোমার মুরোদ?

ভাড়াটে বাড়ির বাসা। ঘরখানার মধ্যে তখন আর

কেউ নেই। অবশ্য বাইরে এদিকে সেদিকে আড়ি পেতে রয়েছে। গোবিন্দদা নিজের মনে বারান্দায় বসে বিড়ি টানছে। কেউ তাকে না ডাকলে এ সব ব্যাপারের মধ্যে সে বড় একটা আসতে চায় না।

সুধার বেশ মনে আছে তার কথা শুনে পরেশ তার দিকে এক মুহূর্ত বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিল। সুধার পরণে তখনো ছিল রাধারাণীর বেশ। মুখে রাধারাণীর ওড়না।

পরেশ তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আচ্ছা তুই ঘরেই থাক। তোর আর যেতে হবে না। জগৎবাবুর কাছে যা বলবার আমিই বলে আসছি।'

অন্ধকারের মধ্যে পরেশ তখনই বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে আসতে আধঘণ্টার বেশি দেরি করেনি। এসে বলেছিল, 'ঠিক আছে। তোর আর চিন্তার কারণ নেই।'

সুধা কৌতূহলী হয়ে বলল, 'কী বলে এলে জগৎ-বাবুকে?'

পরেশ বলল, 'সুধা আমার বিয়ে-করা বউ। ওর পেটে আমার সন্তান। ও তাই নিয়ে মহারাজার কাছে আসতে লজ্জা পাচ্ছে।'

সে কথা শুনে জগৎবাবু জিভ কেটে বলেছিলেন, 'ছি ছি ছি। তার আসতে হবে না, আসতে হবে না। এ কথা তুমি আগে বলনি কেন?'

পরেশের কথা শুনে সুধাও লজ্জায় লাল হয়ে উঠে-ছিল। 'ছি ছি ছি, ওকথা তুমি কেন বলতে গেলে?'

পরেশ বলল, 'না বললে উদ্ধার মিলত না।'

তখনও ময়না পেটে আসেনি। তার নামগন্ধও কোথাও নেই। তবু বানিয়ে মানিয়ে কত বড় একটা মিথ্যা কথা বলে এল পরেশ। মানুষটা সব পারে।

পরেশ আর গোবিন্দ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য বেরিয়ে গেলে ইরা, বেলা দুজনে এসে সুধাকে ঘিরে ধরল। কেউ উগু দেয়, কেউ হেসে গড়িয়ে পড়ে। দুজনেই বলল, 'আজ আমরা বাসর জাগব। বিয়ের খাওয়াটা কিন্তু ভালো করে খাওয়াতে হবে ভাই রাধারাণী। পোলাও মাংস ছাড়া আজ আর আমরা কিছু মুখে তুলছিনে।'

সুধা হেসে জবাব দিয়েছিল, 'বলগে তোদের ম্যানেজারের কাছে, আমি কি জানি।'

বেলা বলেছিল, আরে দিদি, আজ তো তুই ম্যানে-জারনি। ম্যানেজারের গিন্নী।

সেখান থেকে তারা যখন পুরীতে গেল, পরেশ দলের নাম দিয়েছিল সুধা হালদার ও সম্প্রদায়।

সুধা লজ্জিত হয়ে বলল, 'ও আবার কি নাম। আমার নামে দলের নাম রাখছ কেন?'

পরেশ বলল, 'রাখলাম তোর পয় ভালো বলে। তুই আসার পর থেকে দলের খুব লাভ হচ্ছে। নাম-ডাকও মন্দ হয়নি। আগে এতটা ছিল না।'

সুধা বলল, 'তা না হয় হল। কিন্তু আমি আবার হালদার হলাম কবে থেকে?'

পরেশ ঠাট্টার সুরে বলল, 'যবে থেকে তুই আমার বিয়ে-করা বউ হয়েছিস। যে সে মানুষ নয়, রাজাবাহাদুর জগৎমহান্তি সাক্ষী আছে।'

গোবিন্দদার কিন্তু এসব ঠাট্টা তামাসা ভালো লাগেনি। সে তখনই পরেশকে ধমক দিয়ে বলেছিল, 'বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে তোমার। ঘরে বউ রয়েছে। তার সঙ্গে আজই না হয় ঝগড়া। চিরকাল তো আর ঝগড়া থাকবে না। একদিন মিটমাট হয়েই যাবে। কথাটা কানে গেলে তার মনের অবস্থা কিরকম হবে বল তো।'

পরেশ বলেছিল, 'কিছুই হবে না। সে বরং বেঁচে যাবে। গোটাকয়েক ভগ্নীপতি আছে। তাদের মধ্যে একটা উপপতি। তাকে পুরোপুরি পতি করে নেবে। তার টানেই তো বাপের বাড়ি গিয়ে পড়ে থাকে। আমি কি আর তা জানিনে? আমার সেই ভায়রা বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সাক্ষাৎ এক ঋষি। আর তার শ্যালিকা-সুন্দরীর ঋষিপত্নী হবার ভারি সখ। আমি সবই খবর রাখি।'

গোবিন্দ বলেছিল, 'ছি ছি ছি। কি সব যা তা বলছ।'

পরেশের বউয়ের প্রসঙ্গ সুধারও ভালো লাগত না। তার কথা না উঠলেই সুধা সুখে থাকত, নিশ্চিন্তে থাকত। সেবার ফাঁকে ফাঁকে সুধাকে অনেক জায়গা, মন্দির, আর দেবদেবী দেখিয়েছিল পরেশ। পুরীর সমুদ্রে স্নান করিয়ে-ছিল, জগন্নাথের মন্দির দেখিয়েছিল। ভুবনেশ্বরের মন্দির তো আগেই দেখে এসেছে। পরেশের ভাব দেখে মনে হয়েছিল সে যেন গানের দল নিয়ে আসেনি, বেড়াতে

এসেছে। বাসে করে কোনারক বলে আর একটা জায়গায় সুধাকে নিয়ে গিয়েছিল পরেশ, জায়গায় জায়গায় ভেঙে গিয়েছে মন্দিরটা। যুগযুগান্তর আগের নাকি জিনিস। ভাঙবে না? তবু অনেক মূর্তিই আস্ত আছে। সুধার মনে হল যেন তারদিকে তাকিয়ে হাসছে। এক এক জায়গায় মেয়ে-পুরুষের সে কি যুগলরূপ। দেখলে সুধার মত মেয়েরও লজ্জা লাগে। চোখ বুজে থাকতে ইচ্ছা হয়। সুধা হেসে বলেছিল, 'ছি ছি ছি, এত লোকের সামনে লজ্জাও করে না। দেবতার বেলায় লীলা খেলা, আর মানুষের বেলায় বুঝি দোষ?'

পরেশ হেসে বলেছিল, 'দেবতা না রে, দেবতা নয়। ওরা আমাদের মতই মানুষ।'

সুধা অবাক হয়ে বলেছিল, 'মানুষ! ওরা দলশুদ্ধ কার শাপে এমন পাষাণ হয়ে রয়েছে গো?'

পরেশ জবাব দিতে পারেনি।

আর এক জায়গায় একটি মেয়ে খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে থেমে গেছে। পাষাণী হয়ে গেছে সেও। যত নাচিয়ে গাইয়ে সব পাষাণী।

সুধা এক একটা মূর্তির সামনে দাঁড়ায়, আর জোড় হাতে নমস্কার করে। আর একটি নাচিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুধা বলল, 'আচ্ছা, কারো শাপে আমিও যদি অমন পাষাণ হয়ে যাই কেমন হয় বল তো?'

পরেশ বলল, ও কথা বলছিস কেন সুধা? তুই পাষাণ হবি কোন দুঃখে।

সুধা বলল, 'আহা, মানুষ কি কেবল নিজের দুঃখেই পাষাণ হয়! এখানে এসে তোমার বউয়ের কথাটা আমার বড্ড মনে পড়ছে। দেখ, এর আগে কত লোক আমার ঘরে এসেছে, আবার বিদায় নিয়ে চলে গেছে। কেউ দুদিন, কেউ চারদিন, কেউ বড়জোর দুমাস কি তিন মাস। কাউকে চিরকালের জন্যে ঘর-ছাড়া করিনি। তোমাকে নিয়ে এত যে পাপ করছি তা কি ধর্মে সইবে? আমার বড় ভয় লাগে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দল থেকে তাড়িয়ে দাও। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে চলে যাই।

এ কথা শুনে সেই পাথরের রাজ্যে, সেই পাথরের মেয়ে-পুরুষগুলির মধ্যে পরেশও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল খানিকক্ষণের জন্যে—যেন পাথর বনে গিয়েছিল সেও। কথাগুলি বলে ফেলে সুধাও পাথরের মূর্তির মতই নিশ্চল হয়ে রয়েছিল। শত শত পাথরের মূর্তির মধ্যে যেন আর এক জোড়া মূর্তি বাড়তি হয়ে পড়েছে। আর যে সব যাত্রী এসেছে তারা কেউ লক্ষ্য করছে না, তাই বুঝতেও পারছে না। পাথরের মূর্তিগুলিকে সহজেই পাথর বলে চেনা যায় কিন্তু মানুষ যখন ভিতর থেকে পাথর হয়ে থাকে—তখন কি কেউ তাকে অত তাড়াতাড়ি চিনতে পারে?

একটু বাদে পরেশ তাড়া দিয়ে বলেছিল—'চল চল সন্ধ্যা হয়ে গেল চল এবার।'

কলকাতায় ফিরে এসে সুধা আবার তার মানদামাসীর বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু মন আর সেখানে যেতে চাইছিল না। গানের দল থেকে পাওয়া টাকা কটা ভেঙে ভেঙে খাচ্ছিল। ঘরে আর কেউ আসতে চাইলে বলে দিচ্ছিল 'শরীর খারাপ?'

মাসী তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'তোর কি হয়েছে বল তো?'

'কিছুই হয়নি।'

মাসী বলেছিল, 'পেটে বাচ্চা এসেছে এইতো? যখন সময় হবে আমিই সব বলে দেব। করে কম্মে দেব। তোর কোন ভয় নেই। সোমত্ত মেয়ে। এই তো বয়স। এখনই যদি হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবি, পরে কি করবি বলতো?'

সুধা বলেছিল, 'পরে যা হয় হবে। তুমি এই কটা মাস আমাকে রেহাই দাও। আমার ভেহে হয়না।'

মাসী তার থুথনি নেড়ে দিয়ে বলেছিল, 'আহাহা শরীল কি মাখন দিয়ে গড়েছিল নাকি লো? ননীর পুতুল হয়েছিস?'

—

কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই সেই কেলেঙ্কারি কাণ্ডটা ঘটে গেল। পরেশের বউ বীণা সরল গলায় ফাঁস লাগিয়ে। পরেশের ঘরে মরেনি। বাপের বাড়িতে গিয়েই মরেছিল। কিন্তু ঝগড়া করে গিয়েছিল পরেশের সঙ্গে। সুধাকে পরেশ বিয়ে করেছে—কি করে যেন এই খবর শুনে

গিয়েছিল বীণার। দলের কোন হিংসুটে মেয়েই এই সর্বনাশ করে থাকবে। সুধার নামের সঙ্গে পরেশ তার নিজের পদবী যোগ করে দেওয়ায়, সুধার নামে দলের নাম রাখায় বীণার সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

সেই বিষের জ্বালায় বাপের বাড়িতে আর টিকতে পারেনি। ছুটে এসেছিল স্বামীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

এ সব কথা পরেশই সুধাকে পরে বলেছে। সেই শেষ ঝগড়ার কথাও খুঁটে খুঁটে বর্ণনা করেছে। কিছুই গোপন করেনি।

পৃথিবীর মায়া কাটাবার আগে নিজের শোয়ার ঘর-খানা বীণা শেষবারের মত দেখতে এসেছিল। তার সেই বিছানা আয়না চিরুনী সিঁদুর কৌঠা, বাক্স তোরঙ্গ কিছুই তো সে নিয়ে যায়নি। শুধু নিজেই সরে গিয়েছিল। দখলী সত্ব, বজায় রাখতে চেয়েছিল শুধু জিনিসপত্র দিয়ে। তা কি থাকে?

বীণা স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি নাকি বাজারের এক বেশ্যা মাগীকে বিয়ে করেছ? আর সোহাগ করে গানের দল করেছ তার নামে?

পরেশ ঘাবড়ে গিয়ে বসেছিল, 'না না না। ও সব কথা কে বলেছে তোমাকে?'

বীণা বলেছিল, 'দেখ, যদি বাপের বেটা হও মিথ্যে কথা বলনা। মিথ্যে বললে আমার পায়ের জুতো তোমার কপালে ছুঁড়ে মারব।'

মেয়েমানুষের এই স্পর্ধা পরেশের সহ্য হয়নি। সেও মরীয়া হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'হাঁ', করেছি, হাজারবার করেছি। শুধু বিয়ে নয়, তার পেটে আমার বাচ্চাও আছে। সে বেশ্যাই হোক, আর যাই হোক, সে তোমার মত বাঁজা মেয়েমানুষ নয়।'

বীণা একপলকের জন্ত থ' হয়ে গিয়েছিল। তারপর চেঁচিয়ে বলেছিল, 'আমি বাঁজা না তুমি বাঁজা? ভালো করে হিসাব করে দেখ গিয়ে যাও। সে কার বাচ্চা, কার বলে চালাচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখ গিয়ে যাও। 'যেমন চোর, তেমনি বাটপাড়।'

পরেশ বলেছিল, 'চুপ! আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছ? যাও, বেরিয়ে যাও।'

বেরিয়ে যাওয়ার আগে বীণা পা থেকে জুতো খুলে পরেশের দুই গালে ঘা মেরে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি। আর মুখ দেখেনি, মুখ দেখায়নি। বাপের বাড়িতে গিয়ে সেই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়েছিল।

এসব ঘটনা পরেশের মুখেই শুনেছিল সুধা। পরেশ তাকে বলেছিল, 'চল আমার সঙ্গে।'

সুধা শিউরে উঠে বলেছিল, 'সে কিগো। কি দিয়ে গড়া তোমার অঙ্গ। লোহা না পাথরের। একটা বউ এই দুঃখে আত্মঘাতী হল, আর আমি যাব সেখানে? আমার কি প্রাণে ভয়ডর কিছু নেই?'

পরেশ বলল, 'ভয়ডর আছে বলেই তো বলছি। সে রোজ আমাকে জুতো নিয়ে তাড়া করে। আমি একা একা আর তার মার খেতে পারিনে সুধা। পাপ যখন দুজনে মিলে করেছি, এসো শাস্তিও দুজনে মিলে নিই, মরি তো দুজনে মিলেই মরি।'

একদিন ফিরিয়েছিল, দুদিন ফিরিয়েছিল, তিনদিনের দিন পরেশকে আর ফেরাতে পারলনা সুধা। তার দুঃখ দেখে মায়া হল। সত্যিই ভয় পেয়ে গেছে মানুষটা। তা দেখে সুধা অভয়া হল।

সুধা বলল, 'বেশ, যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু এই দরমাহাটার বাড়িতে আর না। তুমি অন্য বাসা দেখ।'

তারপর পাথুরেঘাটার বাসা ভাড়া করে পরেশ তাকে নিয়ে এল। সুধার মনের সন্দেহ ঘুচাবার জন্তে ময়না জন্মাবার মাসতিনেক আগে তাকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করল। মানুষটা একেবারে ভীতু নয়। সাহস আছে বটে। বন্ধুরা কত ঠাট্টা করল, টিটকিরি দিল, কিন্তু কিছুতেই দমেনি পরেশ। আর সুধাও সেই সাহসের মান রেখেছে। সব ছেড়ে দিয়ে দাসী হয়ে আছে পরেশের। একই হাতে করছে ঝি চাকর আর রাঁধুনির কাজ। যে বয়সে সে পায়ের ওপর পা তুলে খেতে পারত, সে বয়সে সে একটিমাত্র পুরুষের পায়ের তলায় পড়ে আছে। সে যদি কোনদিন পায়ে ঠেলে দুনিয়াতে কোথাও আর সুধার ঠাঁই হবেনা। বীণার মতই তাকে দুনিয়ার বাইরে চলে যেতে হবে।

কিন্তু তার জন্মে দুঃখ নেই সুধার। পরেশ তাকে অনেক দিয়েছে। সন্তান দিয়েছে। ছেলে-মেয়ে ঘর

সংসার দিয়েছে। কিন্তু এতদিয়েও পরেশ যেন তার সবখানিকে দেয়নি। সুধাকে দল ছাড়িয়েছে। দলটা এখনও সুধার নামে চলছে, কিন্তু সুধা তো আর দলের মধ্যে নেই। কী করে থাকবে। দু'বছর বাদেবাদেই তার কোলে ছেলে আসছে। একটি মাই ছাড়তে না ছাড়তে আর একটি এসে মাই ধরছে। সুধার আর নড়বার জো নেই। এদের ছেড়েও সে বেরোতে পারেনা, সে বন্দিনী হয়ে আছে ঘরে। তার গানবাজনা সব বন্ধ।

কিন্তু পরেশের তো কিছু বন্ধ হয়নি। তার সব চলছে। তার দলও আছে, দলে নিত্যনতুন সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে আনাও শেষ হয়নি। দলের রাধাকে নিয়ে পরেশ কী যে করে, তা কি সুধা নিজে রাধা সেজে জেনে আসেনি?

পরেশ যদিও বলে, 'দূর দূর। আমার সে সব অভ্যাস আর নেই।' কিন্তু সুধার সে কথা বিশ্বাস হয় না। সে বিশ্বাস করতে চায় কিন্তু পারে না।

যে কটা মাস পরেশ দল নিয়ে বাইরে কাটায় তখনকার দিনগুলি সুধার আর কাটতে চায় না। রাতগুলি আরো দুঃসহ হয়। চিন্তায় চিন্তায় শরীর শুকিয়ে ক্ষয় হয়ে যায় সুধার, মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ছেলেমেয়েগুলি মার খায়। অসাবধানে চায়ের কাপ, কাঁচের গ্লাস, তেলের শিশিগুলি ভেঙে ভেঙে চুরমার হতে থাকে। সারাটা সংসারকে মনে হয় কাঁচের ঘর বলে—তাসের ঘর বলে। যে কোন মুহূর্তে যেন ভেঙে পড়তে পারে।

অথচ পরেশকে দল থেকে ছাড়িয়ে আনারও উপায় নেই। দল ভেঙে দেওয়ার জো নেই। তাহলেও সংসার ভাঙে। ছেলেমেয়েগুলি না খেয়ে মারা যায়। এক বছর জোর করে পরেশকে ধরে রেখেছিল সুধা। কিন্তু সে যেন প্রাণহীন দেহকে ধরে রাখা। উপার্জ্জনহীন পুরুষকে ঘরে বসিয়ে রেখে লাভ কি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, পরেশ আর কোন কিছু করতে পারে না। রোজগারের একটিমাত্র পথই তার আছে। সে পথ শান্তির পথ নয়। তবু ওই পথে স্বামীকে ছেড়ে না দিয়ে উপায় নেই সুধার। তাকে পথে বের করে না দিলে ঘরেও শান্তি থাকে না।

পরেশ দল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর সুধা প্রতিবার ছটফট করে। দিন আর রাতগুলি তার যেন বিষে ভরে ওঠে।

সুধার মাঝে মাঝে মনে হয় হিংসুটে বীণা অপঘাতে মরে আর কোথাও যায়নি, সুধার বুকের মধ্যেই এসে বাসা বেঁধেছে। দরমাহাটার সেই ঘর ছেড়ে এলে কি হবে—সুধার বুকের মধ্যে সেই ঘর অমর হয়ে আছে। সুধার নিস্তার নেই, কিছুতেই নিস্তার নেই।

মাঝে মাঝে সে স্বামীকে ভয় দেখায়, 'আমিও তোমার আগের বউয়ের মত গলায় দড়ি দিয়ে মরব।'

পরেশ হেসে বলে, 'মরেই দেখ না।'

সে জানে সুধার আর মরবার জো নেই। তার দু'বছর বাদে বাদে ছেলেমেয়ে হচ্ছে। একটার পর একটা গিঁট পড়ছে সংসারে।

ঠক ঠক, ঠক ঠক।

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

মণিঅর্ডার পিওন বোধ হয় তাহলে সত্যিই এসে পড়ল।

সুধা সাড়া দিয়ে বলল, 'যাই।'

এবারও আর পরেশকে ধরে রাখা যাবে না। কড়া নাড়ার শব্দে এখুনি ও লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু তার আগে ছোট একটি কৌটো খুলে তার ভিতর থেকে একটা কবচ বার করল সুধা। এবার গিয়ে কালীঘাটের এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। পাঁচ টাকা সোয়া পাঁচ আনা পড়েছে খরচ। অব্যর্থ কবচ। এ কবচ পরে থাকলে খুবই ভালো। কেউ যদি জেদ করে না পরে, তাতেও ক্ষতি নেই। ঘুমন্ত মানুষকে শুধু একটু ছুঁইয়ে দিলেই যথেষ্ট। তাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি। এ কবচের ছোঁয়া যার গায়ে লাগবে অন্য কোন মেয়ে তার আর মন টানতে পারবে না, দেহ ছুঁতে পারবে না। শাঁখা সিঁদুর নিয়ে কবচ হাতে করে যে প্রথম ছুঁয়েছে, পুরুষ চিরকালের জন্যে তার হয়ে থাকবে।

সুধা আলগোছে পরেশের কপালে কবচটা ছুঁইয়ে দিল, তারপর সদরের কড়া নাড়ার শব্দে আর একবার সাড়া দিয়ে বলল, 'যাই।'

"আমার প্রিয় সাবানটি এখন একটি সুন্দর নতুন মোড়কে পাওয়া যাচ্ছে"

বলেন বৈজয়ন্তীমালা





সুন্দরী বৈজয়ন্তীমালা,
বি, আর ফিল্মের
'সাধনা' চিত্রের তারকা

সুন্দর গোলাপী মোড়কে লাক্স টয়লেট সাবান কিনুন। সুন্দরী বৈজয়ন্তীমালা বলেন—"লাক্স টয়লেট সাবান আমার লাবণ্যকে রক্ষা করে ...।" আপনার লাবণ্য মসৃণ ও সুন্দর করে তুলুন। সৌন্দর্য্যচর্চ্চায় বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের স্থান সর্বাগ্রে। বৈজয়ন্তীমালার কথা শুনুন—নিয়মিত লাক্স ব্যবহার করুন।

বিশুদ্ধ এবং শুভ্র

লাক্স টয়লেট সাবান



চিত্র তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।   LTS. 580-X52 BG



বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

ফরমোসা প্রণালীর পরিস্থিতি এখনও সঙ্কটপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। চীন আক্রমণের পদভূমি কিময় দ্বীপে শত্রু-শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য আগষ্ট মাসের শেষের দিকে কম্যুনিষ্ট চীন হইতে যে গোলা বর্ষণ আরম্ভ হয়, তাহা এখনও সমানভাবে চলিতেছে, কুয়োমিণ্টাং চক্রের সরবরাহ-জাহাজগুলি এই অঞ্চলে প্রবেশ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, এবং ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত মার্কিণ নৌবাহিনী পুনঃ পুনঃ চীনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া চীনা সমুদ্রাংশে প্রবেশ করিতেছে।

ফরমোসা প্রণালীতে—

আমেরিকা ও চীনের মধ্যে রাষ্ট্রদূতের পর্য্যায়ে এক মীমাংসার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল ১৯৫৫ সালে। কিন্তু কিছুদিন পরেই এই আলোচনা বৈঠকে অচল অবস্থা দেখা দেয় এবং আলোচনা স্থগিত থাকে। গত ৬ই সেপ্টেম্বর চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ-এন্-লাই পিকিং রেডিওর বক্তৃতাকালে ফরমোসা প্রণালীতে আমেরিকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা করেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানান যে, সুদূর প্রাচ্য সম্পর্কে মীমাংসার জন্য আমেরিকার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চীন এখনও প্রস্তুত। আমেরিকা এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে এবং তাহার পর দুই দেশের ওয়ার্স্বিত (পোল্যাণ্ড) রাষ্ট্রদূত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ফরমোসা প্রণালীর পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয় নাই। ইহার কারণ—আমেরিকার পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, তাহার মিত্ররাষ্ট্র (?) ফরমোসার সঙ্গত (?) অধিকার সম্পর্কে কোনপ্রকার আলোচনা ওয়ার্স সম্মেলনে হইবে না। পক্ষান্তরে পিকিং কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব—ওয়ার্স বৈঠকে আলোচনা হইবে চীন ও আমেরিকার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে; আর ফরমোসা প্রণালীর ব্যাপারটি একেবারে চীনের ঘরোয়া, ইহার সহিত আমেরিকার কোনও সঙ্গত সম্পর্ক নাই। তাহাদের যুক্তি—ফরমোসা এবং উপকূলবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ চীনের অচ্ছেদ্য অংশ, চীনের বিধিসঙ্গত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহী চক্র এই সব দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছে, যাহাদের কবল হইতে ইহাদিগকে উদ্ধার করা চীনা গভর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক কর্ত্তব্য; এই বিদ্রোহী চক্রের সহিত আমেরিকার যে সম্পর্ক, তাহা অবৈধ, অসঙ্গত এবং চীনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক।

বিদ্রোহী-ঘাঁটী কিময়কে ক্রমাগত গোলা বর্ষণের দ্বারা অবরোধ করিবার জন্য চীনের যে প্রচেষ্টা, তাহা ব্যর্থ করিতে আমেরিকা বদ্ধপরিকর। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া বিশ্ব-যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিলে বিশ্বের জনমতের নিকট ধিক্কৃত হইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমেরিকা সচেতন। তাই, মার্কিণ রাজনীতিকরা জোর গলায় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, কম্যুনিষ্ট চীন আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিয়াছে, সে বল প্রয়োগ করিতেছে ইত্যাদি। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি এক টেলিভিশন বক্তৃতায় আইসেন্‌হাওয়ার চীনকে আক্রমণকারী বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, সুদূর-প্রাচ্যে তোষণ-নীতি অনুসৃত হইবে না; মিউনিকে যে ভুল করা হইয়াছিল, সে ভুলের পুনরাবৃত্তি হইতে তাঁহারা আর দিবেন না। ইহার পর তিনি মঃ ক্রুশ্চেভের নিকট লিখিত পত্রে অনুরোধ জানান যে, চীনকে বল প্রয়োগের নীতি বর্জ্জন করাইবার জন্য রুশিয়া যেন তাহার প্রভাব ব্যবহার করে। কিন্তু কি টেলিভিশন বক্তৃতায়, কি ক্রুশ্চেভের নিকট লিখিত পত্রে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এমন কথা কোথাও বলেন নাই—এইরূপ ইঙ্গিতও তাঁহার কথায় নাই যে, চীন শান্তিপূর্ণ উপায়ে উপকূলবর্ত্তী দ্বীপগুলি লাভ করিবে, এবং শান্তিপূর্ণভাবে ফরমোসার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর মিঃ ডালেস্ বলেন যে, চীনের কম্যুনিষ্টরা শান্তির মূলনীতিকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে—তাহারা সশস্ত্র আক্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ক্রুশ্চেভ এই মর্ম্মে আইসেনহাওয়ারকে এক পত্র লেখেন যে, ফরমোসা অঞ্চল হইতে মার্কিণ সৈন্য অপসারিত হইলেই এই অঞ্চল শান্ত হইবে। মার্কিণ নৌবাহিনীর চীনা সমুদ্রাংশে প্রবেশের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি সতর্ক করিয়া দেন যে, চীনকে আক্রমণ করিলে সোভিয়েট রুশিয়া নিজেকে আক্রান্ত মনে করিবে। ক্রুশ্চেভ স্মরণ করাইয়া দেন যে, আণবিক অস্ত্রের দ্বারা গণ-চীনকে ভীতি প্রদর্শনের যে চেষ্টা, উহাতে চীনের বা সোভিয়েট রুশিয়ার হৃদয় কম্পিত হইবে না। মঃ ক্রুশ্চেভের এই চিঠিখানির ভাষা অশিষ্ট—এই অভিযোগ করিয়া উহা মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

মার্কিণ রাষ্ট্রনায়কদের মুখে গণ-চীনের উদ্দেশে "আক্রমণকারী" বিশেষণ, গণ-চীনকে তোষণ করা হইবে না বলিয়া হুমকী, মিউনিকের উল্লেখ প্রভৃতি শুনিয়া বিশ্বের নিরপেক্ষ জনমত কৌতুক বোধ করিবে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার তোষণ-নীতির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তোষণ-নীতি এতদিন প্রকৃতপক্ষে চীনই অনুসরণ করিয়াছে: শান্তিপূর্ণ উপায়ে ফরমোসা প্রাপ্তির জন্য সে প্রতীক্ষা করিতেছে আজ নয় বৎসর; ১৯৫৫ সালের হাঙ্গামার পর শান্তিপূর্ণ উপায়ে মাৎসু, কিময় প্রভৃতি উপকূলবর্ত্তী দ্বীপগুলি পাইবার জন্য সে চার বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। তাহার এই "তোষণ-নীতির" সুযোগ লইয়াই তো কিময় দ্বীপে আজ এক লক্ষ কুয়োমিণ্টাঙ্গী সৈন্য মজুত হইয়াছে এবং সেই

অনুপাতে সেখানে সামরিক সরঞ্জামও জমিয়াছে। এতকাল বৃথা আশায় প্রতীক্ষা করিয়া চীন শুধু নিজের বিপদই বাড়াইয়াছে; অন্য কোনও ফল হয় নাই। বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ফরমোসা রক্ষার জন্য কিময় দ্বীপের কোনও সামরিক প্রয়োজনীয়তা নাই, ইহা চীনকে আক্রমণের একটি অতি সুবিধাজনক পাদভূমি। এতকাল পরে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া এই আক্রমণ ঘাঁটীকে শত্রুমুক্ত করিবার চেষ্টাতে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের নিকট চীন আক্রমণকারী আখ্যা পাইল, এবং সে আখ্যা দিলেন সেই রাষ্ট্রের প্রধান, যে রাষ্ট্র চীনের মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়াছে, তাহাদিগকে অস্ত্র সম্ভারে সজ্জিত করিয়া চীন পুনর্বিজয়ের স্বপ্ন দেখাইতেছে, তাহাদের রক্ষার জন্য চীনের এলকোভুক্ত সমুদ্রাংশে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত নৌবাহিনী পাঠাইয়াছে। সুতরাং, আক্রমণকারী কে, আর আক্রান্তই বা কে, তাহা জগতের কোনও চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নিকট আজ অস্পষ্ট নাই। "আক্রমণকারী", "তোষণ-নীতি" প্রভৃতি কথাগুলির উল্লেখ করিয়া বিখ্যাত বৃটিশ সাংবাদিক কিংসলি মার্টিনের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি লক্ষ্য করিবার বিষয়:—

The value of the carefully timed reference to Munich, it will be seen, is that it effectively smother all the arguments about the legality or morality of America's support for Chiang Kai-Shek and makes it necessary to recall that for ten years this discredited leader of a corrupt and decadent rumh has been supported by the U. S. while he has threatened to invade China; that he has constantly harassed China's shipping and mainland towns and that, only recently, he has been allowed to pour troops into Quemoy, which is as much part of China as Long Island is part of the United States.

কিময় উপলক্ষ করিয়া আমেরিকা যে চীৎকারই করুক না কেন, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের জন্য চীনকে আক্রমণ করিয়া বিশ্ব-যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিতে সে চাহে না। অবশ্য, এক শ্রেণীর মার্কিণ সমরনায়ক যুক্তি দেখাইতেছেন যে, কম্যুনিষ্টদের সহিত লড়িতে হইলে আর বিলম্ব করা উচিত নয়; সোভিয়েট রুশিয়ার আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের সমকক্ষ অস্ত্র আমেরিকার নাই বটে; কিন্তু এখনও আমেরিকা ষ্ট্রাটেজিক বোমা বর্ষণের দ্বারা এই অস্ত্রের উপযোগিতা নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ; অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে। বিশ্বের জনমত উপেক্ষা করিয়া এই সমরনেতাদের পরামর্শ অনুযায়ী অগ্রসর হইতে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার প্রস্তুত নন বলিয়াই মনে হয়। তবে, কম্যুনিষ্ট চীনের অবরোধ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ফরমোজা ও কিময় দ্বীপমালার সংযোগ-ব্যবস্থা রক্ষার জন্য তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এই দৃঢ়তার জন্য চীনের সহিত আমেরিকার প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দীর্ঘস্থ হইবার আশঙ্কা অবশ্য রহিয়াছে, এক দিকে কিময় অবরোধ করিবার জন্য চীনের সামরিক তৎপরতা এবং অন্য দিকে সেই তৎপরতা বন্ধ করিবার জন্য আমেরিকার সামরিক প্রচেষ্টায় যে কোনও সময়ে দুই পক্ষে সংঘর্ষ বাধিতে পারে, এবং সে সংঘর্ষ যদি বাধে, তাহা হইলে এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে উহা সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হইবে কিনা, তাহা বলা শক্ত। বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমেরিকার ইউরোপীয় মিত্ররা ক্ষুদ্র কিময়কে উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধ সুরু করার খুবই বিরোধী। বৃটিশ শ্রমিকনেতা মিঃ গেইট্‌স্কেল্ বলেন, "Public opinion, not only in Britain, but we believe, in the whole of western Europe, is completely opposed to a war over Quemoy."

ইতিমধ্যে জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে চীন সংক্রান্ত প্রস্তাবে আমেরিকার জয় হইয়াছে। চীনকে জাতি-সঙ্ঘে আসন দানের জন্য ভারতীয় প্রস্তাব এবার পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয় নাই। প্রথমে ভারত সাধারণ পরিষদের ষ্টিয়ারিং কমিটীতে—আলোচ্যসূচী নির্দ্ধারণকারী কমিটীতে চীনকে জাতি-সঙ্ঘে আসন দানের প্রস্তাব আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করাইতে চাহে। এই প্রস্তাব ষ্টিয়ারিং কমিটীতে গৃহীত হয় না। তাহার পর পর পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে আটটি রাষ্ট্র—ভারত, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, নেপাল এবং আফগানিস্তান—ষ্টিয়ারিং কমিটীর সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া জাতি-সঙ্ঘে চীনের আসন সংক্রান্ত প্রসঙ্গটি আলোচ্য-সূচী অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই প্রস্তাবের পক্ষে ২৯টি ভোট হয়, বিপক্ষে হয় ৪০ এবং ১২টি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকে। জাতি-সঙ্ঘে মোট সভ্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ৮১। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য—যে সকল রাষ্ট্র বিপক্ষে ভোট দেয় তাহাদের মধ্যে ১৯টি দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র—যাহাদের ভোটকে আমেরিকার পকেট্ ভোট বলিয়া অভিহিত করা হয়।

লেবাননে নূতন গভর্ণমেণ্ট—

দীর্ঘ ছয় বৎসর লেবাননের প্রেসিডেণ্ট থাকিবার পর গত ২২শে সেপ্টেম্বর মিঃ চামুন প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন। নব-নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট জেনারেল ফুয়াদ চেহাব এইদিন কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শক্তির অনুরক্ত মন্ত্রিমণ্ডলও পদত্যাগ করেন। সত্তর বৎসর বয়স্ক বিদায়ী প্রধান-মন্ত্রী মিঃ সামি সোলের স্থলাভিষিক্ত হন সাইত্রিশ বৎসর বয়স্ক অন্যতম বিদ্রোহী নেতা মিঃ রসিদ কারামি। সাম্প্রতিক বিদ্রোহের সময় মিঃ কারামি ত্রিপলিতে বিদ্রোহীদিগকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের এই পরিবর্ত্তনের সময় ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট চামুনের সমর্থক খৃষ্টান ফ্যালাঞ্জিষ্ট দল বেইরুতে দারুণ দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ করে। নূতন গভর্ণমেণ্ট কঠোর হস্তে হাঙ্গামাকারীদিগকে দমন করেন।

মিঃ রসিদ কারামি প্রধান-মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াই অবিলম্বে মার্কিণ সৈন্যের অপসারণ দাবী করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন—বিদ্রোহী নেতা মিঃ সায়েব সালাম্ অভিযোগ করিয়াছেন যে, লেবানন-

স্থিত মার্কিণ সেনাবাহিনী ফ্যালাঞ্জিষ্টদিগকে সাহায্য করিয়াছে; ফ্যালাঞ্জিষ্টরা নাকি মার্কিণ-জীপগাড়ি ব্যবহার করিয়াছে। এই অভিযোগ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, মার্কিণ সামরিক কর্ম্মচারীরা যে ফ্যালাঞ্জিষ্ট নেতা মিঃ পিয়ারে জেমিয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং হাঙ্গামার সময় মার্কিণ বেতার ভ্যানগুলি হাঙ্গামাস্থলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সামরিক প্রধান কেন্দ্রে সংবাদ পাঠাইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। এই সঙ্গে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নূতন গভর্ণমেণ্টের মনোভাব মার্কিণ কর্তৃপক্ষের অজানা ছিল না; তাঁহারা যে মার্কিণ সৈন্যের অপসারণ দাবী করিবেন, ইহা জানা কথা। লেবাননে মার্কিণ সৈন্য প্রবেশের সমর্থনে এক মাত্র যুক্তি-সেখানকার ন্যায়সঙ্গত গভর্ণমেণ্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্য চাহিয়াছে। নব-গঠিত চেহাব-কারামি গভর্ণমেণ্টও ন্যায়সঙ্গত গভর্ণমেণ্ট; সেই গভর্ণমেণ্ট মার্কিণ সৈন্যের অপসরণ দাবী করিলে সেখানে ঐ সৈন্যের অবস্থানের আর কোনও বিধিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। ইহার পর লেবাননে মার্কিণ সৈন্য রাখিতে তাহার অন্য অজুহাত সৃষ্টি করা দরকার। নূতন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যদি বড় রকমের হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, তাহা হইলে যুক্তি দেখানো যাইতে পারে যে, অশান্ত লেবাননকে ফেলিয়া মার্কিণ সৈন্য আসিতে পারে না; যদি আসে, তাহা হইলে সেখানকার মার্কিণ অধিবাসীর জীবন বিপন্ন হইবে ইত্যাদি। যাহা হউক, ফ্যালাঞ্জিষ্ট অভ্যুত্থানের পশ্চাতে যদি মার্কিণ সামরিক কর্ম্মচারীদের গোপন হস্ত কাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; ফ্যালাঞ্জিষ্টদের দমন করিতে গভর্ণমেণ্টকে বেশী বেগ পাইতে হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন—ফ্যালাঞ্জিষ্টরা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, চামুন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যাহারা বিদ্রোহ করিয়াছিল, বৈদেশিক অস্ত্র কেবল তাহারাই পায় নাই,—চামুনের সমর্থক বেসরকারী দলও বৈদেশিক অস্ত্র পাইয়াছিল। বিদ্রোহে উস্কানিদাতা বলিয়া অভিযুক্ত সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রই (মিশর-সিরিয়া) কেবল অস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে অপরাধী নহে।

আল্‌জেরিয়ার "স্বাধীন" গভর্ণমেণ্ট—

আল্‌জেরিয়ার মুক্তি ফ্রণ্ট (এফ্‌-এল্‌-এন্‌) গত ১৯শে সেপ্টেম্বর কায়রোর মিঃ ফেরাৎ আব্বাসের নেতৃত্বে "স্বাধীন আল্‌জেরিয়ান্‌ গভর্ণমেণ্টের" প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া, সংযুক্ত-আরব সাধারণতন্ত্র (মিশর ও সিরিয়া) এই গভর্ণমেণ্টকে মানিয়া লয়। পরে, একমাত্র লেবানন্‌ ছাড়া সমস্ত আরব রাষ্ট্র এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। লেবাননের নূতন গভর্ণমেণ্টও জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা স্বাধীন আল্‌জেরিয়ান গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিবেন। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, যাহারা ঐ আল্‌জেরিয়ান্‌ গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিবে, তাহারা ফ্রান্সের মিত্র নহে। অন্ততঃ আরব-রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে এই হুসিয়ারীতে কোনও কাজ হয় নাই।

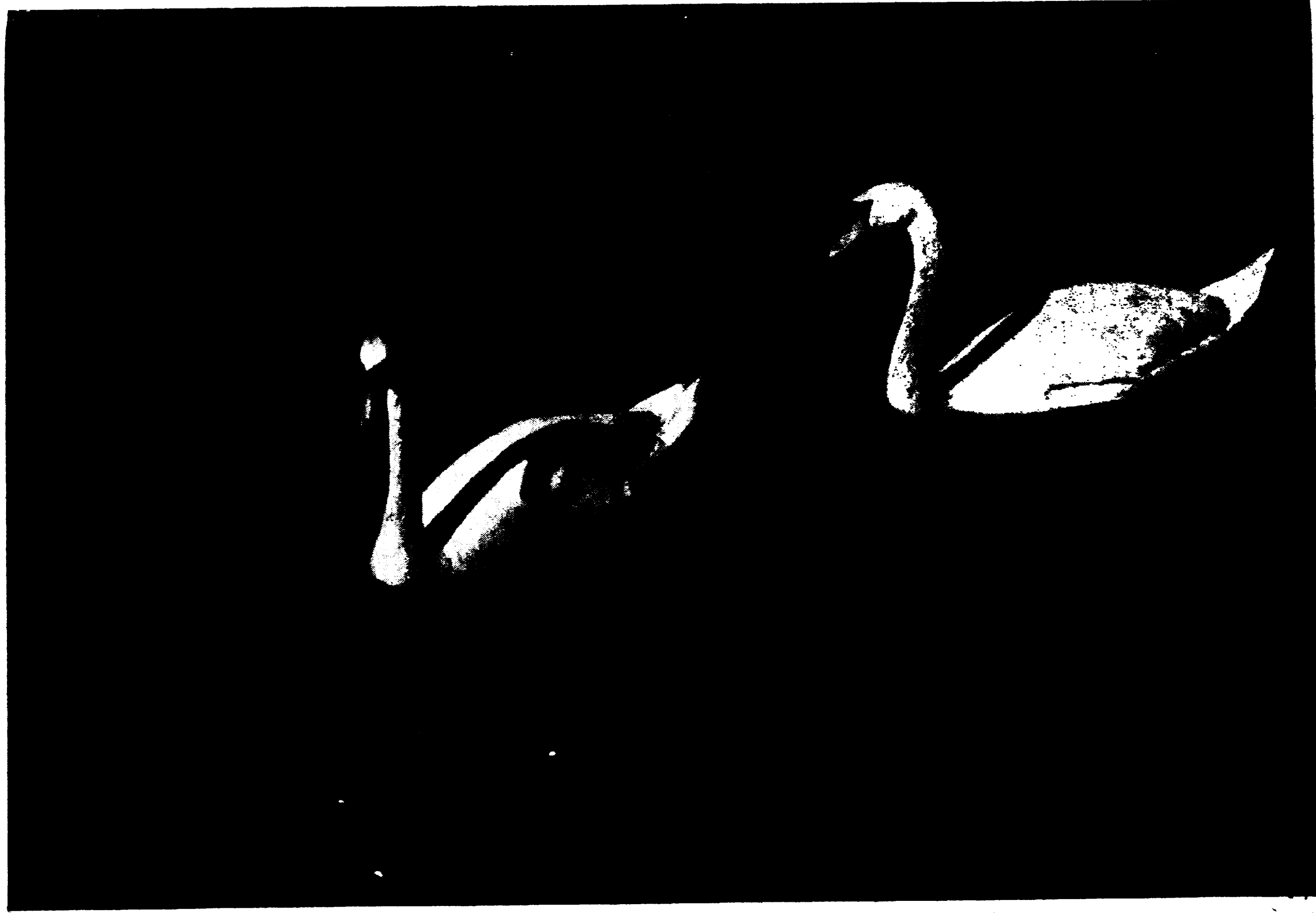
২৭।৯।৫৮



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

আহার

ফটো : রমেন বাগচী



ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

বিহার

ফটো : মঞ্জু সেন

দশপদী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(১)

বুনো হতে চায় কুনো বন ছেড়ে, কুনো হতে চায় বুনো।
বনে গেলে কুনো হয়ে যাবে কানা,
বিধাতার কাছে চাহিবে সে ডানা,
বনে এসে শেষে কোণে ফিরিতে সে চাহিবে পুনঃ পুনঃ।
বুনো কোণে এলে মরবে হাঁপিয়ে
জানালার পথে পড়বে ঝাঁপিয়ে
আঘাত পেয়ে সে সেই লাফে শেষে হয়ে যেতে পারে খুনও।
যে যেথায় আছে সেই সেথা থাক
ঠাঁই বদলালে ঘটবে বিপাক
নিজ অদৃষ্টে তুষ্ট কে রয়? কারো কথা নাহি শুনো।

(২)

উহারা কাঙাল ছিল—ছিল তবু সুখী ও সরল
হৃদয় ওদের ছিল পবিত্র নির্মল।
তোমরা আনিলে প্রলোভন
জ্ঞানবৃক্ষজাত ফল করালে ভক্ষণ।
সঞ্চারিলে ঈর্ষাবিষ ঈর্ষা হ'তে জনমিল লোভ,
লোভ হ'তে ক্রোধ, মোহ, মোহ হতে ক্ষোভ।
সিদ্ধ হলো তাহাদেরে সত্য সুখী করার প্রয়াস?
একবার করা ভালো হিসাব-নিকাশ।
খোদার উপর খোদকারি
কতটা সফল হলো দেখা ভালো নিভৃতে বিচারি।

(৩)

সাহিত্য রচনা শুধু সখ নয়, কর্ম্ম জানি তাও।
তোমরা এ কর্মফল হাতে হাতে পাও।
সবে মিলে কর্মফল নিজে কর ভোগ
তোমাদের এই কর্মযোগ।
আমরা এ কর্মফল করি শুধু ব্রহ্মে সমর্পণ
স্মরণ করিয়া সেই গীতার বচন
তোমরা বলিবে ইহা উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ,
জান না ত বেদান্তের তত্ত্ব গুহ্যতম।
অনলে, অনিলে, কীটে, মূষিকে, মানবে
ব্রহ্ম কোথা নাই এই ব্রহ্মময় ভবে?

(৪)

বই বেচে যেবা প্রকাশ করিয়া লয় তার পূরা দাম,
তারে দেওয়া যায় গ্রন্থবণিক নাম।
বই যেবা লেখে—বই লেখা যার ব্রত
গ্রন্থ-জীব সে ভিক্ষাজীবের মত।
গ্রন্থি দিয়া যে বই বাঁধে বারবার
তাহারেই জেনো আসল গ্রন্থকার।
পাণ্ডুলিপি ত গ্রন্থ নয়ক, কাগজও গ্রন্থ নয়,
ফর্মার গাদা গুদামভরতি মালই ত তারে কয়,
গাঁথিয়া ছাঁটিয়া আসল গ্রন্থে করে যেবা পরিণত,
গ্রন্থকার তো তারেই বলা সঙ্গত।

(৫)

মনের মানুষ যে তার কথা কি ফুরাতে চায়?
চির পুরাতন, হয়ে হারাধন ফিরে মাতায়।
তাজা-ব-তাজা-তা নিতি নিতি নব নবায়মান,
চির বিচিত্র, হয় কি তাহার লীলাবসান?
করিয়া নবীন তোলে, প্রতিদিন প্রভাত রবি,
প্রহরে প্রহরে নূতন করিয়া তাহারে লভি।
কত না তাহার রূপ বিভঙ্গ রচিনু গানে,
অনাবিষ্কৃত কত আছে আজো কেই বা জানে।
তাহার সীমার মাঝে অসীমার আভাস পাই,
তার পরিচয় তার কথা অফুরন্ত তাই

(৬)

রেখে গেলাম পুঁথির স্তুপে মোর জীবনের ধন,
কি আছে তায় দেখল না হায় ভুলেও কোন জন।
আমার মনের কুহর থেকে
বাহির ক'রে দিলাম রেখে,
চিত্ত আমার লঘু হ'ল, মিটল আকিঞ্চন।
আবিষ্কারের বস্তু হয়ে রইল আমার সব
সন্ধানীরে রেবে পাওয়ার আনন্দ গৌরব,
করবে কি ভোগ সে একাকী?
বন্ধুজনে আনবে ডাকি
তাদের পাণিপদ্মে সে ধন করবে বিতরণ।



আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গপ্পসপ্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন

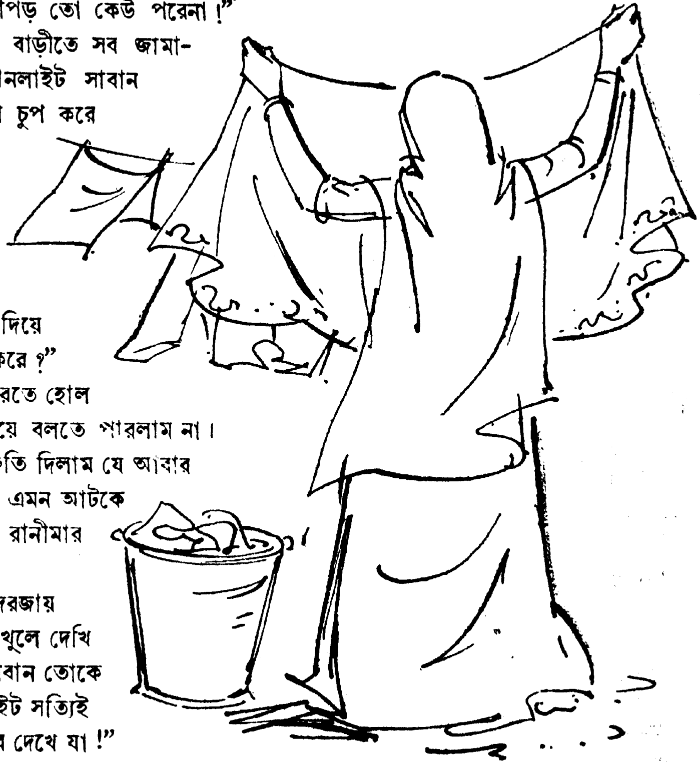
"দ্যাখ, আমি না হয় মুখ্যসুখ্যু মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁঃ যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন "আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিশুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

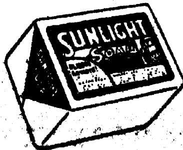
S. 261A-X52 BG

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা!" "কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামাকাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?" আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা। বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!" রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে…এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।" রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেনায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি…তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে…হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত



ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"

"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামাকাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"



শূন্য থেকে সংখ্যাতীত

সলিল বসু

ছোটবেলায় একটা খেলা ছিল, 'কে কত বড় সংখ্যা ব'লতে পারে। যখনই হয়ত' তুমি একটা বেশ বড় সংখ্যা ব'লতে, আমি সঙ্গে সঙ্গে সেই সংখ্যাটাই বলতুম তার পাশে একটা শূন্য দিয়ে। তুমি ব'লতে, বারে! শূন্যের ত' কোন দামই নেই। আমি মানতে চাইতুম না, বলতুম শূন্যের যদি কোন দাম নেই, তবে একের পিঠে শূন্য বসিয়ে যে দশ হয়, সেটাকি একের চেয়ে বড় নয়! দামই যদি না থাকবে তবে দশ একের চেয়ে বড় হ'ল কি ক'রে। বড়দের কাছে জানতে যেতুম, তাঁরা বুঝিয়ে দিতেন কোন সংখ্যার বাঁদিকে শূন্যের কোন দাম নেই। তবে ডানদিকে শূন্যের অনেক দাম। তুমি তবু হার মানতে চাইতে না, নতুন সংখ্যা ব'লতে গিয়ে ব'লতে, শিবের কড়ে আঙ্গুল, তার মানে একেবারে অসংখ্য। আমি তার পিছনেও একটা শূন্য বসাতে চাইতুম; তুমি ঘোরতর আপত্তি তুলতে। অসংখ্যই ত' সবচেয়ে বড় সংখ্যা, তার চেয়ে বড় সংখ্যা আবার কিছু হয় নাকি? আমিও ছাড়তুম না, কেন অসংখ্য অসংখ্য! কিন্তু সমস্যা মিটত' না, আমাদের তর্ক জটিল থেকে জটিলতর হ'তে হ'তে চুল টানাটানি আর কান্নাকাটি পর্য্যন্ত পৌঁছত'।

চুল টানাটানি আর কান্নাকাটি পর্য্যন্ত পৌঁছত।

শুধু আমরা নয়, বহুযুগ আগে পৃথিবীর মানুষকে এমনি সব সংখ্যা-বিভ্রাটের মধ্যে প'ড়তে হ'য়েছিল। এক একটা বড় সংখ্যা লিখতে গিয়ে তাঁরা তখন গলদঘর্ম হ'য়ে উঠতেন। কারণ মানুষ তখন ছোট্ট সংখ্যা 'শূন্য' সম্বন্ধে কোন ধারণা ক'রতে পারেনি'। আজ কোন সংখ্যার ডানদিকে শূন্য বসিয়ে বৃহৎ বৃহত্তর বৃহত্তম সংখ্যা অনায়াসে সৃষ্টি ক'রতে পারা যায়। কোন পরিশ্রমই তাতে হয় না। তাই মানুষের শূন্য আবিষ্কারই সবচেয়ে প্রথম পরিণত বুদ্ধির উন্মেষ, আর বিজ্ঞান চেতনার প্রথম সুরু। অনেকে হয়ত' ব'লতে পারেন মানুষের সভ্যতা ত' সম্ভব হ'য়েছিল আমাদের কোন এক অজানা পূর্বপুরুষ আগুন জ্বালতে শিখেছিলেন বলে। কথাটা সত্যি, কিন্তু আগুন জ্বালা শেখাটা একটা নিছক যান্ত্রিক ব্যাপার। সেখানে বুদ্ধি খাটানোর প্রশ্নটা বিশেষ উঠে না। তাই বিজ্ঞানী লাপ্লাস ব'লেছিলেন যে, বিজ্ঞানের জগতে শূন্য আবিষ্কারের মত এতবড় বিপ্লব খুব কমই হ'য়েছে। পরমাণু-বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামোও বলেন যে, যদিও শূন্য সংখ্যাটা আজ আমাদের কাছে কিছুই নয়, তবুও শূন্য সংখ্যাটা যদি আজও আবিষ্কার না হ'ত, তা' হ'লে হয়ত' বিজ্ঞানের কোন প্রগতিই আজ সম্ভব হ'ত না। আজকের পরিণত বিজ্ঞান প্রকাশের প্রধান ভাষা ত' গণিতের লিপিকা। এক (১) থেকে নয় (৯) পর্য্যন্ত নটা সংখ্যা আর শূন্য নিয়ে আমাদের এই সংখ্যা জগৎ। এর বাইরে কোন অঙ্কাক্ষর সম্ভব নয়। গণনার এই পদ্ধতি প্রথম উদ্ভাবিত হ'য়েছে আমাদেরই এই ভারতবর্ষে। এ' শুধু আমরা ভারতবাসীরাই যে দাবী করি তা' নয়, বিশ্বের সব দেশই এই মূল সত্যটি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তবে আমরা মনে রাখতে পারিনি সেই মহান মনীষীর নাম, যুগের বিবর্ত্তনে তিনি হারিয়ে গেছেন, তাঁর বিরাট কীর্তি রেখে গেছেন অনাগত ভবিষ্যতের কাছে।

শূন্য আবিষ্কারের আগেও মানুষ সংখ্যাকে প্রকাশ করত বিভিন্ন অক্ষরের মাধ্যমে। সংখ্যা যতই বড় হ'ত, অক্ষরও হ'য়ে উঠত' ততই জটিলতর। মিশরীয় পদ্ধতিতে কোন বড় সংখ্যাকে প্রকাশ করা হ'ত সেই সংখ্যার নির্দ্ধারিত অক্ষরটাকে ততবার লিখে। যেমন ৮৭৩২ সেদিনের মিশরবাসী প্রকাশ ক'রতেন :—

রোমানরাও মিশরীয় সংখ্যা প্রকাশের এই পদ্ধতিটা কিছুটা গ্রহণ ক'রেছিলেন, আর নিজেদের ভাষায় ঐ একই ৮৭৩২ সংখ্যাটাকে প্রকাশ ক'রতে হ'লে লিখতেন :—

MMMM MMMMDCCXXXII

সে যুগের কোন শিক্ষিত রোমানকে ১০ লক্ষ লিখতে ব'ললে, তিনি মহা বিপদে প'ড়তেন, কারণ তাঁকে তখন লিখতে হ'ত ১০ লক্ষটা M, আর তাতে নিশ্চয়ই তিনি গলদঘর্ম হ'য়ে উঠতেন। ভারতীয় বিজ্ঞানের



তাঁকে লিখতে হ'ত ১০ লক্ষটা M.

যে সংখ্যা প্রকাশের ধারা সেটা ভারত থেকে প্রথম মধ্যপ্রাচ্যে যায়, তারপর ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে। সে আজ প্রায় হাজার দু'য়েক বছর আগেকার কথা।

শূন্য অক্ষরের ব্যবহার যে প্রথম ভারতবর্ষেই শুরু হ'য়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে, আর পুরাণ পুঁথিপত্রের মাধ্যমে। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সময় ধরা হয় ১০০০ থেকে ১৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। ব্যাবিলনীয়রা দশের একটা গণিতিক অক্ষর উদ্ভাবন ক'রেছিলেন, আর ১০০ সংখ্যা প্রকাশ ক'রতে হ'লে সেই দশ সংখ্যাটাকে বেশ বড় ক'রে লিখেই প্রকাশ ক'রতেন। ভারতীয় মনীষীরা সেই বড় লেখা পথে না গিয়ে ডানদিকে একটা 'ফোঁটা' বসিয়ে সেটা লিখতেন। আজকে আমরা যেভাবে শূন্য লিখি প্রথমদিকে ঠিক সেভাবে লেখা হ'ত না, সেটা প্রকাশ হ'ত একটা 'ফোঁটা' অর্থাৎ dot দিয়ে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পেশোয়ারের মার্দান জেলায় একটা বাখশালি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এই পাণ্ডুলিপির কাল নিরূপণ হ'য়েছে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। এই পাণ্ডুলিপিতে শূন্য অক্ষরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ' ছাড়া খৃষ্টপূর্ব ৫০০।৬০০ বছর আগেকার যে সব মৃৎপাত্র প্রভৃতি পাওয়া যায় সেগুলোর কোন কোনটার গায়ে বিভিন্ন রকম অঙ্কের অক্ষর দেখা গেছে। আর সে সবগুলোর মধ্যে কোন কোনটায় আবার শূন্য অক্ষরটা বর্তমান। তা' ছাড়া খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগেকার মহেঞ্জদড়ো-হরপ্পায় যে সব মূর্তি নিদর্শন ও ধাতব শীল-মোহর পাওয়া গেছে সে সব থেকেও সে যুগের সংখ্যাপ্রকাশে শূন্য অক্ষরের ব্যবহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজ তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সিন্ধুগাঙ্গেয় উপত্যকার কোন এক তপোবনে কোন এক নাম-না-জানা সাধক পরিকল্পনা ক'রেছিলেন ছোট্ট একটা চিহ্ন 'শূন্য', আর তার মাধ্যমে প্রকাশ ক'রতে চেয়েছিলেন জগতের বৃহত্তম সৃষ্টি প্রচেষ্টাকে। ভারতীয় সাধনার সেই শাশ্বত সত্য :—

'অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মামৃতং গময় অবিরাবীর্ম এধি ॥

শূন্য চিহ্ন আবিষ্কারের কথায় দশমিক প্রথায় গণনার কথা আপনিই এসে পড়ে। এ' প্রথাও যে বিজ্ঞান ভাণ্ডারে ভারতেরই দান তাও আজ সর্বজনস্বীকৃত। দশমিক প্রথার মূল কথা হ'ল, দশকে ভিত্তি ক'রে গণনা পদ্ধতি। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক সাটন মন্তব্য ক'রেছেন যে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের দশকে ভিত্তি ক'রে গণনা পদ্ধতি প্রাচীন বিজ্ঞানে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ব্যাবিলনীয়রা প্রথম যুগে ষষ্ঠ ভিত্তিক গণনায় অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের দুটো অঙ্ক ছিল বহুল-প্রচলিত, একটা এক (১) আর অন্যটি ষাট (৬০)। কিন্তু দশভিত্তিক গণনা ভারতে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ ঋকবেদে আছে :—

আ—বিংশত্যা ত্রিংশত্যা যাহ্যর্বাঙ্ চত্বারিংশতা হরিভির্যুজানঃ
আ—পঞ্চাশতা সুরথেভিরিন্দ্রাস্ত সপ্তত্যা সোমপেয়ম ॥
আ—শিত্যা নবত্যা যাহ্যর্বাঙ্ শা তেন হরিভিরুহ্যমানঃ ॥

দশমিক প্রথায় গণনার আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল কোন অঙ্কের স্থানীয় মান নির্ণয় করা। এ সবেরও উল্লেখ পাওয়া যায় ভারতীয় প্রাচীন পুঁথি পত্রে। অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য তাঁর শারীরিক ভাষ্যের এক জায়গায় ব'লছেন, "…যদিও চিহ্ন একই, তথাপি স্থান পরিবর্ত্তনে ইহার মান কখনও এক, কখনও দশ, কখনও শত…" ইত্যাদি। এ' ছাড়া বাজসনীয় সংহিতাতেও এই জাতীয় প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়…"একা চ দশ চ দশ চ শতাং চ শতাং চ সহস্রাং—"। এই





মহেঞ্জদড়ো-হরপ্পায় প্রাপ্ত ধাতব শীলমোহর।
শূন্য অক্ষরের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

সব গণনার রীতিই পরে ভারত থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, আর সেইসব ব্যাপারে বৌদ্ধ শ্রমণদের বিশ্বপরিক্রমা অনেক সাহায্য ক'রেছিল।

এবার তোমার ঐ 'শিবের কড়ে আঙ্গুল' অর্থাৎ অসংখ্য সংখ্যাটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমাদের দেশে যেমন এক প্রদেশের লোক আর এক প্রদেশের লোক সম্বন্ধে নানা রকম মজার মজার গল্প বলে তেমনি সব দেশেই প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের লোকেরা বলে স্কচদের নিয়ে, আবার আইরিশম্যানরা বলে ইংলিশম্যানদের সম্বন্ধে। তেমনি ইউরোপ ভূখণ্ডের লোকদের মধ্যে হাঙ্গেরীয়ানদের নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। দুজন হাঙ্গেরীয়ান একদিন আমাদের ছোটবেলার খেলার মত একটা খেলা সুরু করেছিল। একজন আর একজন হাঙ্গেরীয়ানকে জিজ্ঞেস ক'রেছিল, দেখি তুমি কত বড় সংখ্যা ব'লতে পার। সেই ভদ্রলোক অনেক ভেবে ব'ললেন, 'তিন' আর দ্বিতীয় জনকে ব'ললেন—আর একটা, খুব বড় সংখ্যা ব'লতে। কিন্তু দ্বিতীয় জন ঘণ্টাখানেক ধ'রে মাথা ঘামিয়ে ব'ললেন, না: তুমিই জিতেছ', এর চেয়ে বড় সংখ্যা আমার জানা নেই। এটা অবশ্য নিছকই নিন্দুকদের গল্প, তবে শোনা যায় আফ্রিকার হটেনটটরা নাকি একসময় তিন সংখ্যার বেশী গুণতে পারতো না, তিনের বেশী হ'লেই তারা ব'লত 'অনেক'। এই অনেক কথাটা

ঘণ্টাখানেক পরে মাথা ঘামিয়ে ব'ললেন, না: তুমিই জিতেছ।

পৃথিবীর সবদেশের লোকেরাই ব্যবহার ক'রে থাকেন। অনেক মানে হ'ল এমন একটা সংখ্যা যাকে সঠিক গোনা যায় না। যেমন বাংলা দেশে কত কবি? উত্তর—অনেক। আকাশে কত তারা? না—অনেক। পুরীর সমুদ্রের ধারে কত বালি? তাও অনেক। কিন্তু আজকের উন্নত বিজ্ঞানে অসংখ্য খুব কমই আছে। প্রায় সবকিছুই গোণা যায়, বাংলা দেশের কবি, আকাশের তারা, সমুদ্র পাড়ের বালি। বিজ্ঞানী টলেমি বহু শতাব্দী আগে আকাশের তারা গুণেছিলেন ১২০০। বর্ত্তমানে এ সংখ্যা অবশ্য ভুল প্রমাণ হ'য়ে গেছে। খালি চোখে এখন প্রায় সাড়ে তিন হাজার তারা দেখা যায়। বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস সমুদ্রধারের বালি গুণে দেখার চেষ্টা ক'রে ছিলেন সেদিন। কিন্তু পারেন নি। বর্ত্তমানে আমেরিকার কণি দ্বীপের (Conny Island) সমুদ্রের ধারের বলি গুণে দেখা হয়েছে। সংখ্যাটা হ'ল ১ এর পরে ২০টা শূন্য।

এই হ'ল আমাদের বড় সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণার সুরু। প্রাচীন রোমানদের সবচেয়ে বড় সংখ্যা ছিল 'মিলে', (Mille) বর্ত্তমানের এক হাজার। গ্রীকদের ছিল 'মিরিয়াড' (Myriad), বর্ত্তমানের দশহাজার। এ বিষয়েও কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় মনীষায় অনেক উৎকর্ষ সাধিত হ'য়েছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতার সপ্তম কাণ্ডে একের পিঠে একটা শূন্য দেওয়া সংখ্যাকে বলা হ'য়েছে 'দশ', আর একের পিঠে উনিশটা শূন্য দেওয়া সংখ্যার নাম 'লোক'। এর মাঝে এক একটি শূন্য-বৃদ্ধির জন্যে এক একটি সংখ্যা সৃষ্টি ও তার নামকরণ করা হ'য়েছে। সংখ্যাগুলো যথাক্রমে, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যর্বুদ, সমুদ্র, মধ্য, অন্ত, পরার্ধ, উষস, ব্যুষ্টি, উদেষ্যৎ, উদ্যৎ, সুবর্গ, লোক। এখানে এই 'লোক' সংখ্যাটিকেই সবচেয়ে বড় সংখ্যা বলে ধরা হ'য়েছে, কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে এর চেয়ে বড় সংখ্যার উল্লেখও পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'ললিত বিস্তারে' গণিতবিদ অর্জুন ও বুদ্ধের বাক্যালাপের মধ্যে 'তল্লক্ষণ' নামে এক সংখ্যার উল্লেখ আছে। এই সংখ্যাটা একের পিঠে ৫৩টা শূন্য বসিয়ে লিখতে হয়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ভারতীয় মনীষার স্ফূর্তি, তা' আরও এগিয়ে গেছে [illegible] বলে :—

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমদুম্বরম্।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যোন তন্দ্রয়তে চরন্।
চরৈবেতি। চরৈবেতি॥"

জৈনগ্রন্থ অনুযোগ সূত্রে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হ'ল অসংখ্যেয়, একের পিঠে ১৪০টা শূন্য বসিয়ে লেখায় এর প্রকাশ। এর চেয়ে বড় সংখ্যার উল্লেখ পৃথিবীর কোথাও আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি'। আজকের পাশ্চাত্য গণিতে সবচেয়ে বড় সংখ্যা হ'ল 'গুগোল', একের পিঠে একশ'টা শূন্য। যা' ভারতীয় গণিতের অসংখ্যের চেয়ে অনেক ছোট। আধুনিক বিজ্ঞানের অনুপরমাণু-ভাঙ্গা অনেক ছোট ছোট অংশের আবির্ভাব হ'য়েছে। প্রমাণ হ'য়েছে যে এই সব ছোট্ট ছোট্ট অংশ নিয়েই তুমি, আমি, ফুল, পাখী, চাঁদ, পৃথিবী, সূর্য্য, বিরাট মহাবিশ্বের সব কিছুই গ'ড়ে উঠেছে। তা হ'লেই দেখা যাচ্ছে এই ছোট্ট ছোট্ট অংশের কত কত সংখ্যা না জানি অজানা আছে। আজকের বিজ্ঞানীরা নাকি সে সংখ্যাটাও নিরূপণ ক'রে ফেলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সংখ্যাটি কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানের 'অসংখ্যের' সংখ্যাকে অতিক্রম ক'রতে পারে নি'। তাই আজ নিঃসন্দেহেই বলা যায়, পৃথিবীর জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রথম উন্মেষ—এই ভারতেরই মাটিতে, এক নাম না জানা মহাবিপ্লবীর মহামন্ত্রে। আমার মোটামোটা ইংরিজী-জার্ণাল-বই পড়া জ্ঞান দেখি হেরে যাচ্ছে তোমার শিবের কড়ে আঙ্গুল অসংখ্যের কাছে, তোমার কাছে হার যে মানি সেই ত' আমার জয়।

আগমনী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

খুঁজেছি ব্যগ্র ব্যাকুল, পাইনি, চারিদিকে আবরণ
এত দিনে সে-কি সার্থক হ'ল আমার অন্বেষণ।
আকাশ পৃথিবী নদী অরণ্য, সকলি লাগিল ভালো,
দিগ্ দিগন্তে একি অপূর্ব্ব অশ্রুমুছানো আলো!
শেফালি-ছড়ানো শিশির-ভেজা সে সবুজ দূর্ব্বাদলে,
ধরার-অঙ্গে, জলতরঙ্গে আলোর ঝলক ঝলে।
সে আলো পশিয়া মনের গোপনে সোনার স্বপ্ন আনে,
তাহারি পরশ লেগেছে বাহিরে, লেগেছে আমার প্রাণে।
বিষণ্ণ দিন, বিষণ্ণ রাত, হ'ল বুঝি অবসান,
কে এল, কে এল? সুরু হ'ল কবে তার আগমনী গান?
দেখেছি দেখেছি যামিনীর রূপ, জাগর-চাঁদের মায়া,
মাধুরী যেন সে উছলিয়া পড়ে, জ্যোৎস্না ধরেছে কায়া।
উষার বিকাশ হেরেছি পূরবে, আকাশে আরতি বাজে,
প'ড়ে গেছে নব-জীবনের সাড়া নিখিল ভুবন মাঝে!
মিলে একাকার যেখানে সকল স্মরণ-বিস্মরণ।
সেই অনন্ত নীলিমার মাঝে মগ্ন হ'ল যে মন।
সুদূরযাত্রী শুভ্র মেঘেরা দিগন্তে হ'ল হারা,
দিবস-রজনী বাজে সে-কি সুর, পেয়েছি তাহার সাড়া।
স্নিগ্ধ পবনে শান্ত স্নেহের স্পর্শ করেছি লাভ,
হেরি যে শারদ আকাশের তলে তোমার আবির্ভাব।

স্কুল

প্রশান্ত চৌধুরী

১

রাত দশটা। দুটি বোন শুয়ে আছে তাদের শোয়ার ঘরে। বড়র বয়স চৌদ্দ, নাম রমা। ছোটর এগার, নাম বেলা। ঘর অন্ধকার। ঘরের দরজা খোলা।

বেলা : দিদি ?

রমা : উঁ ?

বেলা : ঘুমোলি ?

রমা : উঁহু।—ঘুম আসছে না।

বেলা : আমারও।—একটা কথা তখন থেকে ভাবছি।

রমা : আমিও।

বেলা : কি ভাবছিস রে ?

রমা : 'Believe' আর 'Receive'-এর মধ্যে কোন্‌টার বেলায় যে 'i'-এর পরে 'e', আর কোন্‌টাতে যে 'e'-এর পরে i',—তা' কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

বেলা : এর জন্তে ভেবে মরছিস ? ও তো খুব সোজা।

রমা : সোজা ?—বল্‌তো দেখি ?

বেলা : বলতে যাব কেন ? এগজামিনের খাতায় লেখবার সময় দুটো 'e' লিখব, তারপর তাদের মাঝখানে একটা ফুট্‌কি বসিয়ে দেব মাথার ওপর। দিদিমণিরা ঠিক বুঝে নেবেন কোন্‌টা 'e', আর কোন্‌টা 'i'.

রমা : ওঃ, চমৎকার আইডিয়া !—আর তুই কি ভাবছিলি ?

বেলা : আজকে ক্লাসে সাবিত্রিদি জিজ্ঞেস করলেন,—'আমরা পৃথিবীতে এসেছি কি জন্তে ?'—শান্তা ব'লে একটা মেয়ে অমনি দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—'আর পাঁচজনের উপকারের জন্তে।' শুনে সাবিত্রীদি বললেন,—'ঠিক। ভেরী গুড্।'

রমা : ঠিকই তো।

বেলা : ঠিক ?—তুইও বলছিস ?

রমা : হুঁ।

বেলা : আমরা এসেছি আর পাঁচজনের উপকার করতে ?

রমা : নিশ্চয়ই।

বেলা : তাহলে সেই আর পাঁচজন ? তারা কি করতে এসেছে ?

রমা : স্‌স্‌স্ !—চুপ !—বাবার ঘরে আলো জ্বললো। কথা কইলেই শুনতে পাবে।

বেলা : আমি তো খুব আস্তে কথা কইছি।

রমা : স্‌স্‌স্ !—চোখ বুজে শুয়ে থাক্। দালানের আলো জ্বললো। বাবা বোধ হয় এই দিকেই আসছে। জেগে থাকলে রাগ করবে। এই পিট্‌পিট্ করছে তোর চোখ। এক কাজ কর্, চাদরটা মুড়ি দে।

বাবা ঢুকলেন। অন্ধকার ঘরটা তখন ওদের দুই বোনের নাক ডাকার শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে। মুচকি হেসে আলোর সুইচ টিপলেন বাবা।

বাবা : বেলা ?…রমা ?…ও বাবা! ঘুমিয়ে সব কাদা হয়ে গেছে।…আহা, হবেই তো। সারাদিন কত কাজ, কত লেখাপড়ার খাটুনি।…

নাক ডাকার শব্দ আরো বেড়ে উঠল উৎসাহে

বাবা : নাঃ, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাই তাহলে। কি আর হবে। একটা জিনিষ এনেছিলুম ওদের জন্তে, আজ আর দেখানোই হল না। কাল সকালেই হবে'খন দেখানো।…চলি…

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে উশখুশুনি শুরু হয় ওদের

বাবা : আহা, সারাদিন দস্যিবৃত্তি কোরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে দুটিতে। এখন বোধহয় ঠেললেও ওরা উঠবে না; বাড়িতে ডাকাত পড়লেও উঠবে না। খুব গাঢ় ঘুম কিনা।

উশখুশুনি আরো বাড়ে

বাবা : চলি। আলোটা নিবিয়ে দরজাটা বন্ধ করেই দিয়ে যাই—

অগত্যা বেলাকে জাগতে হয়।

বেলা : (চোখ কচলাতে কচলাতে) কে? কে ঘরে? ওঃ, বাবা?

রমাও তাড়াতাড়ি চোখ খোলে

রমা : কিরে? বেলা? উঠে পড়লি কেন রে? ওঃ, বাবা?

বাবা : থাক্, থাক্, তোরা ঘুমো রে ঘুমো। আমি এই এমনি এসেছিলুম। এমনি। কিছু না।

বেলা : (নকল হাই তুলে) আমাদের কিছু বলবে বাবা?

বাবা : না, না, ঘুমো, ঘুমো তোরা। আমি যাচ্ছি।

বেলা : উফ্! আমার ঘুমটা একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। দিদি, তোর?

রমা : আমারও। আমরা সেই অনেকক্ষণ থেকে ঘুমোচ্ছি কিনা।

বাবা : এ-হে-হে! ত্থাখো দিকিনি, অমন গাঢ় ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম শুধু শুধু পায়ের শব্দ কোরে। ঘুমো, ঘুমো—আবার চোখ বুজে শো—মনে মনে কিছু ভাব্—ঠিক ঘুমিয়ে পড়বি আবার এক্ষুণি। আমি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাই।

বেলা : বাবা?

বাবা : কি রে?

বেলা : ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি কি স্বপ্ন দেখছিলুম জানো?

বাবা : কী রে?

বেলা : দেখছিলুম—তুমি যেন আমাদের জন্যে কি একটা ভাল জিনিষ এনেছ।

রমা : আমিও দেখছিলুম বাবা। তুমি যেন একটা জিনিষ এনে আমরা ঘুমোচ্ছি দেখে ফিরে যাচ্ছ।

বেলা : কী আশ্চর্য! ছজনেই ঠিক এক স্বপ্ন দেখেছি!

বাবা : এ স্বপ্নে মানুষ কত কি ত্থাখে। আমি একবার স্বপ্নে দেখেছিলুম, আমি যেন হাতীর পিঠে চেপে বরফের দেশে বেড়াচ্ছি, এমন সময় একটা পরী উড়ে এসে আমাকে হাতীর পিঠ থেকে ছোঁ-মেরে নিয়ে চলে গেল আকাশে। স্বপ্ন কি কখন সত্যি হয়? তোরা ঘুমোচ্ছিলি ঘুমো। আমি যাচ্ছি।

বেলা : বাবা?

বাবা : আবার কি?

বেলা : ভাল হচ্ছে না বলে দিচ্ছি।

বাবা : এই ত্থাখো! কিসের ভাল হচ্ছে না?

রমা : আহা, বুঝতে পারছ না বুঝি?

বাবা : উঁহু। কৈ? কি বুঝব?

বেলা : তুমি আমাদের জন্যে কিছু আনোনি?

বাবা : কৈ? না তো।

রমা : সত্যি আনোনি?

বাবা : দুর্! স্বপ্নে কি সব আবোল-তাবোল দেখেছিস-শুনেছিস। ঘুমো, ঘুমো।

বেলা : তবে তুমি এঘরে ঢুকে মিথ্যে কথা বললে কেন?

বাবা : এই ত্থাখো, কখন্ কী আবার বললুম?

রমা : তুমি এ ঘরে ঢুকে বলোনি যে—'একটা জিনিষ এনেছিলুম—দেখানোই হল না?'

বাবা : বলেছিলুম না কি? আর, যদি বলেই থাকি, তোরা তো তখন কাদার মত ঘুমোচ্ছিলি; শুনতে পেলি কি করে?

বেলা : শুনেছি—যাও!

বাবা : স্বপ্নে?

রমা : আমরা ঘুমোইনি, যাও!

বাবা : সে কী! ঘরে ঢুকেই শুনি সে কি ভীষণ নাক ডাকার শব্দ!

বেলা : সব মিথ্যে, যাও।

এবার হেসে উঠলেন বাবা হো-হো কোরে। হাসির শব্দে মা এসে ঢুকলেন

মা : কি হচ্ছে কী?

বাবা : (হেসে) তোমার কন্যাদের জিজ্ঞেস কর।

বেলা ও রমা : মা, মা—বল না বাবা আমাদের জন্যে কী এনেছে?

মা: তোদের জন্যে? বেলাটা তো অঙ্কে কাঁচা, তাই ওর জন্যে একটা নতুন ভাল অঙ্কের বই। আর, রমার তো ভূগোলেই যত গোলমাল, তাই ওর জন্যে ইয়া মোটা একটা ভূগোলের বই এনেছেন।

রমা: এ ম্যা গো!

বেলা: এই জন্যে বুঝি ছোট ছোট মেয়েকে ঘুম থেকে কেউ ঠেলে তোলে?

বাবা: তবে যে একটু আগে বললি যে তোরা ঘুমোস নি?

রমা: না ঘুমোলেও ঘুম-ঘুম আসছিল তো।

বাবা: ওগো—চল, চল—ঘুমটা বোধ হয় এখনো ঘর ছেড়ে পালায়নি। ওদের ঘুমোতে দাও।

বাবা চলে গেলেন

বেলা: ও মা?

মা: কিরে?

বেলা: বাবা সত্যি আমার জন্যে অঙ্কের বই এনেছে?

মা: আচ্ছা বাপু—অত কথায় কাজ কি? দৌড়ে ও-ঘরে গিয়ে নিজের চক্ষে একবার দেখেই আয় না।

বেলা: যাবি দিদি?

রমা: দূর্! ও ভূগোলের বই দেখলে সারা রাত্তিরে আমার আর ঘুমই আসবে না। তুই-ই যা।

বেলা: মা?

মা: কিরে?

বেলা: দালানটা অন্ধকার।

মা: (স্নেহ-হাস্যে) চল্, যাচ্ছি।

বেলা মার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং এক মিনিটের মধ্যে দৌড়ে ফিরে এল লাফাতে লাফাতে

বেলা: দিদি, ও দিদি, দিদি রে!

রমা: কিরে?

বেলা: সরস্বতী! কী সুন্দর ঠাকুর এনেছে বাবা! অ্যাত্তো বড় ঠাকুর! অ্যাত্তো বড় বীণা! অ্যাত্তো বড় হাঁস! দৌড়ে আয় দিদি, দৌড়ে আয়।

২

পরদিন। দালান। দুই বোনে সরস্বতী পুজোর জোগাড় যন্তর করছে এক মনে। মা এলেন

মা: বেলা? রমা? ওরে, আয়। নেয়ে খেয়ে নিবি চ।

রমা: একটু পরে।

মা: এই ছাখো। বেলা যে বারোটা বাজলো।

বেলা: কাগজের এই শিকলিগুলো তৈরী করেই যাচ্ছি বলছি।

মা: নেয়ে খেয়ে কি শিকলি তৈরী করা যায় না?

বেলা: আর কাজ নেই বুঝি?

মা: আবার কী?

বেলা: কাল না পুজো! বাসন্তী রঙে কাপড় ছুপোতে হবে না বুঝি?

মা: সে কখন্ ছোপানো হয়ে গেছে। ছাখ্ গে যা শুকোচ্ছে।

রমা: ওমা! তুমি ছুপিয়ে দিয়েছ? কোন্ শাড়ীটা ছোপালে?

মা: ঐ যেটা তোর শাঁখ-শাঁখ পাড়, সেইটে।

রমা: ওমা! তুমি কি করে জানলে? ঐ শাড়ীটাই তো আমি ছোপাবো বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম। ব্লাউজ ছুপিয়েছ?

মা: হ্যাঁ। সেই থ্রি-কোয়াটার হাতা, গলায় ফিতের কাজ, সেইটে।

রমা: রুমাল নিশ্চয়ই ছোপাওনি মনে কোরে?

মা: দুটো।

রমা: ওমা! কি বলবো! তোমার আদর করতে ইচ্ছে করছে।

মা: ওরে ছাড়্, ছাড়্—তোর আদরের জ্বালায় গেলুম।

বেলা: মা?

মা: কি রে?

বেলা: 'সুয়ো'-মেয়ের তো সব ছুপিয়েছ। আমার?

মা: তোর কি?

বেলা: ফ্রক ছুপিয়েছ আমার?

মা: উঁহু।

বেলা: কেন?

মা: তুই যে 'দুয়ো-মেয়ে।'

বেলা : সত্যি কথা বল কিন্তু, নৈলে আমি দৌড়ে গিয়ে দেখে আসবো ছাতে।

মা : (হেসে) দিয়েছি।

বেলা : আমার ফিতে ?

মা : হলদে রঙের সিল্কের ফিতে কিনিয়ে আনিয়েছি রামদীনকে দিয়ে।

বেলা : সত্যি !

মা : কিন্তু—রামদীন যে একটা কথা বলছিল।

বেলা : কি কথা ?

মা : বলছিল—বেলা দিদিমণি কুল খায়।

বেলা : ইস্ ! খায় বললেই খায় ?—সরস্বতী পুজো শেষ হবার আগে কুল খেতে নেই, জানি না বুঝি আমি ?

মা : কিন্তু রামদীন যে বললে—ভাঁড়ার ঘর থেকে তুই নাকি—

বেলা : বারে !—সে তো দিদিও।

রমা : এই ! আমি আবার কখন্ খেলুম ?

বেলা : বাঃ ! সেই যে…সেই…(গোপন-চিম্‌টি খায় এবার রমার কাছে)…মানে, খাসনি…দেখছিলি ! আমরা কেউই তো খাইনি—শুধু দেখছিলুম। না রে দিদি ?

রমা : হ্যাঁ তো।

মা : সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেলে কি হয় জান তো ?—বিত্তে হবে কাঁচকলা।

বেলা : আর গানও গাইতে পারবে না। না মা ?

মা : হ্যাঁ। সরস্বতী ঠাকুর তো গান-বাজনা-লেখা-পড়া-নাচ এইসবের ঠাকুর। যে কুল খাবে, তার কিচ্ছুটি হবে না। সবেতেই ঢেঁড়স !

বেলা : তাহলে রামদীনও সুর কোরে তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তে পারবে না মা ?

মা : রামদীন পারবে না কেন ?

বেলা : বাঃ ! ও যে কুল খেয়েছে।

মা : কখন্ ?

বেলা : বাঃ রে, আমি যখন—

মা : থামলি কেন ? বল্।

বেলা : আ-আমি কুল খাচ্ছিলুম তো। ভুলে-ভুলে খাচ্ছিলুম, মনে ছিল না, তা' রামদীন বললে 'হাম্‌ভি খাবে'…তাই ওকেও দিয়েছিলুম কিনা। আর ‥আর… দিদিকেও।

মা : ওঃ ! তাই বলি আমার কুলের ঠোঙা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে কেন ?

বেলা : মা ?

মা : কী ?

বেলা : ভুলে-ভুলে খেয়ে ফেললেও পাপ হয় ?

মা : না। ভুলে খেলে পাপ হয় না। তবে, ঠাকুরের কাছে মাফ্ চাইতে হয়।

বেলা : কি বলতে হয় ?

মা : কাল যখন পুজো হবে না সকালবেলা ? তখন, ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বলবি যে, ঠাকুর, আমার মনে ছিল না, তাই আমি কুল খেয়েছি, আর ভুলে-ভুলে রামদীন আর দিদিকেও খাইয়েছি। কাউকে পাপ দিও না ঠাকুর। ব্যাস্ এই কথা বলবি।

বেলা : বললে ?

মা : আর পাপ হবে না।

বেলা : রামদীন তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তে পারবে সুর কোরে ?

মা : হুঁ।

বেলা : দিদি গাইতে পারবে ?

মা : হ্যাঁ।

বেলা : আর আমি ?

মা : তুমি ? তুমি ধিতিং-ধিতিং করে নাচতে পারবে। আয়, আয়, ওরে ও' রমা, বেলাটাকে টেনে নিয়ে আয় মা। নেয়ে খেয়ে নিবি চ'।

রমা : যাচ্ছি মা। আর এই কটা লাল-নীল কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে নিয়েই যাচ্ছি।

(৩)

পুজোর দিনের সকাল। বারান্দা

বাবা : ওগো, তোমাদের সব তৈরী তো ? ভট্‌চাযি্য মশাই এসে গেছেন নিচে।

মা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব জোগাড় হয়ে গেছে। ঠাকুর-মশাইকে পাঠিয়ে দিতে বল ওপরে। আমি ঠাকুরঘরে যাচ্ছি।

মা চলে গেলেন। বাবা বারান্দা থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলেন—

বাবা : ওরে রামদীন, ভট্‌চাজ্যিমশাইকে বল্‌ ওপরে আসতে।

হঠাৎ নজর পড়ল বেলার দিকে

বাবা : আরে! এই যে! ওরে ব্বাবা! বেলা দেবীর আজ কি সাজের ঘটা! হল্‌দে ফ্রক, হল্‌দে ফিতে, হল্‌দে রুমাল। হৈহৈ কাণ্ড!

বেলা : আমাদের ঠাকুর সাজানো দেখেছ বাবা?

বাবা : হুঁ। চমৎকার হয়েছে।

বেলা : ঠাকুরের পেছনের ঐ চক্রটা না বাবা, আমি কেটেছি। দিদি অবিশ্যি পিজবোর্ডে এঁকে দিয়েছিল।

বাবা : কাটাটাই আসল শক্ত কাজ।

বেলা : রামদীনটা না বাবা, একেবারে বোকা! কিচ্ছু জানে না।

বাবা : কেন? কেন?

বেলা : ও বলছে, এ কী ঠাকুর! সব সাদা! সরস্বতী মাঈকি বুড্‌ঢি? চুল কালো করেনি কেন? ইচ্ছে করেই যে অমন সব সাদা করা হয়েছে, ও' তা' বুঝতেই পারেনি একদম। ও' ভেবেছে, সব রং লাগানো শেষ হবার আগেই বুঝি তুমি সস্তা দামে কিনে এনেছ।

বাবা : (হেসে) তাই নাকি?

বেলা : হ্যাঁ। আর, ও' কি করেছে জানো?

বাবা : কী?

বেলা : অঞ্জলি দেবার আগে তো আজ কিচ্ছু খেতে নেই?

বাবা : নেই-ই তো।

বেলা : ও' কিন্তু সকালবেলা ডন্‌-বৈঠক দিয়েই আদা-ছোলা খেয়ে বসে আছে॥

বাবা : ওটা একেবারে ভূত। ওটার কিচ্ছু হবে না।

মা এলেন বারান্দায়

মা : কই রে? এই যে বেলা—আয়, পুষ্পাঞ্জলি দিবি আয়। তুমিও এসো।

বেলা : দিদি?

মা : রমা ঠাকুরঘরেই আছে।—আয়।

(৪)

ঠাকুর ঘর। পুরুত ঠাকুর সকলের হাতে অঞ্জলির ফুল দিয়েছেন। পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্যে বাবা, মা, বেলা, রমা করজোড়ে দাঁড়িয়ে

পুরোহিত : ফুল নেওয়া হয়েছে সকলকার?

মা : হ্যাঁ। বেলা, ফুল ঠিক আছে তো?

বেলা : হুঁ। দিদি, ফুল নিয়েছি?

রমা : হ্যাঁ। বাবা, তুমি ফুল পেয়েছ?

বাবা : হ্যাঁ। মন্ত্র পড়ুন ভট্‌চাজ্যি মশাই।

পুষ্পাঞ্জলির পর প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন সকলে। বাবা বেরিয়ে গেলেন। মাও। বেলা তখনো চোখ বুজে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে চলেছে, আর বিড়বিড় করে বলে চলেছে,—

বেলা : ঠাকুর, আমার মনে ছিল না, তাই আমি পুজোর আগেই কুল খেয়েছি ভুলে-ভুলে। আর ভুলে-ভুলে রামদীন আর দিদিকেও—

প্রণামরত বেলার পাশে এসে রমা ডাকে—

রমা : এই বেলা, এই নে।

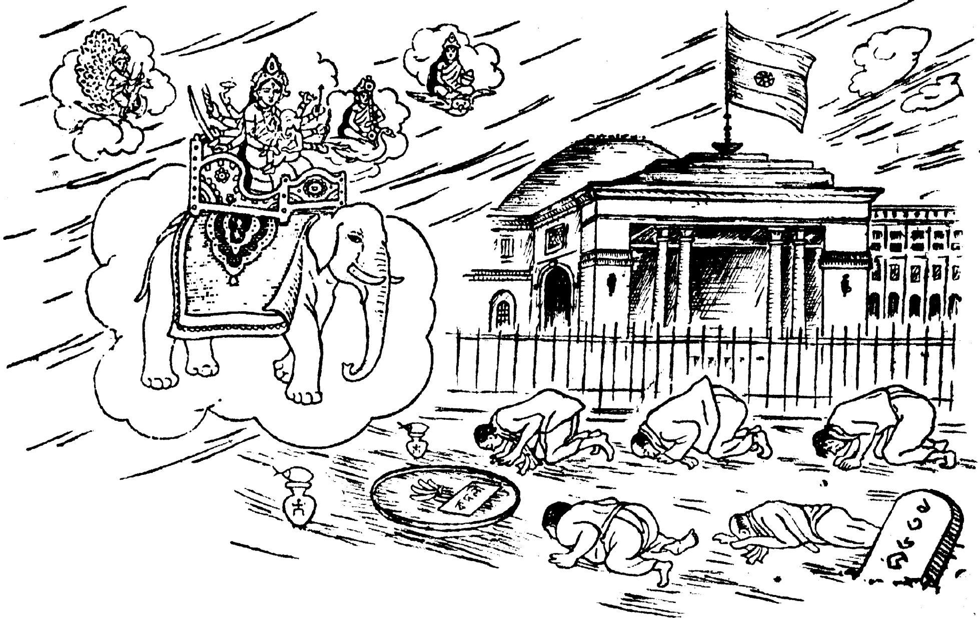
চোখ বুজে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রেখেই বেলা বলে—

বেলা : কি?

নৈবেদ্যের থালা থেকে একটা কুল তুলে নিয়ে প্রণামরত বেলার মুখে গুঁজে দিয়ে রমা বলে—

রমা : কুল। পুজো হয়ে গেছে। খেয়ে নে।

॥ আবাহন ॥



—এবার দেশে চাল নেই মা,
ভোগে শুধুই কলা!

শিল্পী : পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

অভিসারিকা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

দুপুর রাতের আকাশ কি হ'লো কালো,
চাঁদ গেল নিভে, ঝড় এল আরো বেগে?
হঠাৎ জাগায় এ নেশা লাগে যে ভালো,
শুনি ঝঞ্ঝা বিদ্যুৎ-নাচা মেঘে।
ধূ ধূ করে মাঠ মায়ার ঘোম্‌টা-পরা,—
কোন্ দিগন্তে মিশে গেছে কুয়াসায়,
অদেখা পায়ের ধ্বনিটি যায় যে ধরা
বন সীমান্তে মর্ম্মর-গীতিকায়।
আমার এ ঘরে ভাঙা জানালার পাশে
ভিজে ভিজে কার কবরী-গন্ধ আসে?

তবু জেগে আছি। হারানো অতীত থেকে
যদি আসে কেউ নিশীথ-অন্ধকারে,
যদি ডাকে কেউ হাতখানি হাতে রেখে—
"ভাল আছ কবি? এসেছি যে অভিসারে
আমি আসি যাই যুগযুগান্ত ধরি,'
তোমারি মনের গোপন আশাটি আমি;
এলে অতৃপ্ত অতন্দ্র শর্ব্বরী
দুর্যোগরাতে তব দ্বারে যাই থামি'।
চিনেছ? আমি যে তব তৃষা-মঞ্জরী
ফুটি বরষায় সজল আঁচল-ভরি'।

শরীর গঠনে খাদ্য ও ব্যায়াম

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

ব্যায়াম করলে শরীর ভাল হয় এও যেমন সত্য, আবার ব্যায়াম করলে শরীর খারাপ হয় তাও খুব সত্য কথা, ঠিক খেলে যেমন শরীর ভালও হয় আবার খারাপও হয়।—তাই নয় কি? সমস্যাটা একটু জটিল বোধ হচ্ছে না—সোজা ভাষায় এর ব্যাখ্যা করে দিলেই বোধ করি অনেকের ভুল চুক চুকে যাবে।—

ব্যায়ামের আসল ফরমুলা কি?—আসল ফরমুলা হলো যে সব জিনিষ খাব তা ভালই হোক আর খারাপই হোক—তার সার পদার্থটুকু যাতে খুব তাড়াতাড়ি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের চলার পথের নালার



লেথক

ভেতর দিয়ে নিয়ে রক্তের সঙ্গে মেশাতে পারে এবং সমস্ত গ্রন্থীগুলিকে তাদের নিজ নিজ রস সঞ্চালনে সাহায্য করতে পারে—তবেই শরীর ভাল হবে।—

আমাদের এই দেহটা তৈরীও যেমন অনেক রকম পদার্থের সমন্বয়ে—তেমনি ওকে রক্ষার বেলায়ও প্রয়োজন অনেক রকম পদার্থের। সেই অনেক রকম পদার্থ আমরা কিন্তু ব্যায়ামের ভেতর পাই না—পাই খাদ্যের মধ্যে,—অতএব শরীরকে সুস্থ সবল করার জন্য যে খাদ্য বিচার প্রয়োজন সে কথা কি অবিশ্বাস করবেন? কেউ করতে পারে না—। সুতরাং সেই বিচার শক্তি কোথায় আমাদের? ব্যায়াম যারা করতে চায় বা ব্যায়াম যারা করেন—হয়তো তাদের মধ্যেই কারো কারো খানিকটা সেই অভিজ্ঞতা থাকলেও—তা-তাঁরা কার্য্যতঃ না ফলিয়ে অবহেলাই করে থাকেন বেশী এবং এরই ফলে ব্যায়ামের উপযুক্ত ফলাফল থেকে তারা বেশীর ভাগই হয়ে পড়েন বঞ্চিত।—

আমি জানি, আজ যদি আমি ব্যায়াম বা ব্যায়ামাচারী সবাইকেই মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য খেতে বলি—নিশ্চয়ই আমার নিন্দা কোরবেন,—আমি কোন দিনই বোলব না—কারণ আমি নিজেও কোনদিন মূল্যবান খাদ্য-দ্রব্যের ভেতর দিয়ে শরীরচর্চ্চার আস্বাদ পাইনি—পেয়েছি খুব সামান্য মূল্যের খাদ্যদ্রব্য থেকে।

এখন আমার কথা হ'লো—ব্যায়াম করে শরীরটাকে সুস্থ সবল করে গড়বার জন্য কি কি জাতীয় খাদ্য প্রয়োজন—এবং সেই পদার্থগুলি কি এমন সামান্য-তম মূল্যের খাদ্যের ভেতর পেতে পারা যায়—যা খেয়ে ব্যায়াম করলে হজমের কাজে কোন গোলমাল হবে না। অধিকন্তু শরীর খুব ভাল হতে পারে।

অনেকেরই হয়তো পড়া আছে যে—"প্রোটিন"—মানে ছানা জাতীয় জিনিষ, এ যে কেবল ছানার মধ্যেই পাওয়া যায় এটা কিন্তু ভুল ধারণা—ছানা ছাড়াও পাওয়া যেতে পারে যেমন ধরুন—প্রায় সব রকম ডালে, গম জাতীয় সব কিছুতেই—কম-বেশী সব রকম শাকসব্জীতে,—কম বেশী সব রকম ফলে—মাছ মাংস-ডিম এতেও পাওয়া যায়।

তারপর ধরুন "ফ্যাট"—এ জিনিষটিতে যে দুধ আর মাখনেই আছে তা নয়—গমজাতীয় জিনিষে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়—অরহর—মশুর ডালেও কিছু পাওয়া যায়। কাঁঠাল বীচিতে পাওয়া যায়—শশায় পেতে পারেন, নারকেলেও পেতে পারেন এবং প্রায় সব ফলেই কম বেশী পেতে পারেন।—

তারপর আসছে—"কার্ব্বোহাইড্রেট"—এর কথা—মানে শর্করা জাতীয় খাদ্য—একি শুধু মিষ্টিতেই আছে? আর কোথাও নেই? নিশ্চয়ই আছে—দেখুন না—মুড়ি, চাল বা চালভাজা—খই ইত্যাদিতে প্রচুর পাওয়া যায়, তাছাড়া গমজাতীয় সবরকম জিনিষে। সবরকম ডালেও বেশ পরিমাণে পাওয়া যায়—শাক সব্জিতে যদিও কম—তবুও আছে—নেই কেবল নটে, পালং, ঝিঙে, উচ্ছেতে।—আর সবটাতে মোটামুটি বেশ পরিমাণে আছে। যাবতীয় ফলে আছে। আর নেই কেবল মাছ মাংসে।

এরপর দরকার হ'লো "মিনারাল সল্ট"—এর মানে শুধু যে নুনেই আছে তা নয়—খনিজ পদার্থ মাত্রেই এ জিনিষ পাওয়া যায়।—

তারপর হ'লো "ভাইটামিন"—মানে খাদ্য প্রাণ, অর্থাৎ কোন খাদ্যে

কতটুকু প্রাণশক্তি রয়েছে, এসব বিভিন্ন পদার্থগুলি কেউ বা শরীরের ক্ষয় পূরণ এবং উপযুক্ত মত শরীরের বাড়ন্ত গঠনকে আনায়—কেউবা শরীরে



পেশী সংকোচনে বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

কাজ করার মত ক্ষমতার জোগান দিয়ে, আবার কেউবা শরীরের উপযুক্ত অর্থাৎ প্রয়োজন মত তাপের একটা বেলেন্স রক্ষা করেই চলেছে,—সুতরাং চিন্তা করে দেখুন উল্লিখিত খাদ্যের প্রায় সব কিছুই কম বেশী আমরা প্রত্যহ পেয়ে থাকি, নয় কি? তবে কেন শরীর ভাল হচ্ছে না? না হবার সোজা কারণ হলো—কোন খাদ্যের সঙ্গে কোনো খাদ্যের সমতা নেই, সামঞ্জস্য নেই, যার ফলে পাকস্থলী মানে যেখানে খাদ্য যায় এবং অন্ত্রের মধ্যে (লম্বা নাড়ী) নানা রকম রসের ভীষণ কম ও ভীষণ বেশী পরিমাণে বাড়ে—যে খাবারগুলি খেলাম তা জীর্ণ হ'তে বেশ কষ্ট পেতে হয়। ঠিক এই কারণেই যে জাতীয় এসিডের সাহায্যে রক্ত ঐ সব খাদ্যপ্রাণগুলিকে গ্রহণ করতে পারে ও শরীরের বিভিন্ন কোষে পাঠাতে প্রস্তুত হয়—সেই কাজটি সুষ্ঠুভাবে কিছুতেই হতে পারে না।—তাই পেটে বায়ু—পেট কামড়ান, ক্ষিধা-মন্দা—মেজাজ খিট্‌ খিটু থাকে। এসব কারণেই স্মরণশক্তি বায় কমে—এবং ঐ দুরবস্থায় যারা ব্যায়াম করে থাকে তাদের শরীরের ক্রমশঃ ক্ষয় ক্ষতির সম্ভাবনাই থাকে বেশী, আর ধীরে ধীরে ব্যায়ামের বেলাও এসে পড়ে।

শরীর যদি সময় মত ও ঠিক পরিমাণ মত তার চাহিদা অনুযায়ী রসদ না পায় খাটবে কেমন করে? খাটলে তো ক্রমং আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়বে? এতে ব্যায়ামের দোষ কোথায়?—

এমন একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেমন করে বুঝবো পরিমাণ মত সব ঠিক পড়ছে কি না? এ প্রশ্নের মীমাংসা খুব সোজা—

আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন—যে শরীরে মন মেজাজ ঠিক আছে কিনা, পায়খানার পরিমাণ রং ও অবস্থা সুস্থ আছে কিনা—না—ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া—মত, প্রস্রাব পরিমাণ মত হচ্ছে কিনা,—যদি কোন ব্যতিক্রম দেখেন—সময় করে দেখুন না, ক'দিন খাদ্যের বিশ্রামের নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলে—দেখুন' আপনার মন ও শরীর আয়নার মত চক্ চক্ আর তলোয়ারের মত ধার থাকে কিনা?

খাদ্যে অবিচার করে বিশ্রামে অবিচার করে ব্যায়াম করলে কিছু ফল পাবেন না—পাবেন কুফল—তা কেউ পেতে চান কি-না?

পেটের বেগতিক দেখলেই খাবার সাবধান হয়ে খান, শরীরের অবস্থা বুঝে বেশ পরিমাণ ঠাণ্ডা জল খান—প্রয়োজন হয় অর্দ্ধ উপবাস করুন, সেদিন ব্যায়াম বন্ধ করুন, পরের দিন দেখবেন কি সুন্দর ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর মন।

উল্লিখিত খাদ্য পদার্থ তাপ ও শক্তি মূলক উপাদান—একে পরিপূর্ণ ভাবে দেহে স্থিতিলাভ করাবার জন্যই প্রয়োজন শারীরিক পরিশ্রম। যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী হয়—তাতে দেহে তাপ ও শক্তি হ্রাস পেয়ে দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ দুর্ব্বল অবস্থায় পরিণত হয়—তাই সেই পরিশ্রমের একটা বিজ্ঞান সম্মত "মান" নির্দ্ধারণের জন্যই প্রয়োজন ব্যায়ামের,—কারণ এতে মাত্রা থাকবে, নিশ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ম কানুন থাকবে—



১নং ও ২নং ব্যায়াম

সময়ের নির্দ্দেশ থাকবে। তাই সে সব ব্যায়াম সাঁতারেও হতে পারে—খালি হাতে হতে পারে—যোগ ব্যায়ামেও হতে পারে—আবার ব

নিয়েও হতে পারে—কাজেই খাদ্যও ব্যায়ামের মাত্রা এবং বিধি ঠিক একই নিয়মে চলা উচিত—অর্থাৎ যার যতটুকু প্রয়োজন। শরীরটাকে সুস্থ রাখার জন্য যেমন সবাই খালি হাতে ব্যায়াম অভ্যাস করতে পারেন তেমনি স্বাত্ত্বিক আহার সবাই গ্রহণ করতে পারেন—যার থেকে নিরোগ ও ঋজু দেহ লাভ সবার পক্ষেই সম্ভব।

ব্যায়াম এবং খাদ্যে আরও কত নিগূঢ় সম্বন্ধ লক্ষ্য করুন—যদি বিধিমত ব্যায়াম হয়ই তাতে আমরা যা-ই খাই সেই খাদ্যের উপাদানগুলি উপযুক্তরূপ পরিপাক হয়ে ক্ষুদ্রাবয়ব প্রদার্থে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের দেহরক্ত স্রোতে প্রবেশ করে রক্তের তেজ বৃদ্ধি করে, আর—শ্বেতসার আর শর্করা হতে যে রূপান্তরিত নতুন রকম পদার্থ জন্মে—তাকে কি বলে জানেন না? তাকে বলে "গ্লুকোজ."—আর আমিষ-জাতীয় খাদ্য থেকে পাওয়া যায় নানা রকম অ্যামিনো এসিড. এবং স্নেহ পদার্থ জাতীয় খাদ্যের পরিণত হলো "গ্লিসারিণ" ও কয়েকরকম জৈব অ্যাসিড। এই গ্লুকোজ, গ্লিসারিন এবং জৈব অ্যাসিড কার্ব্বণ ডায়কসাইডও জলে দগ্ধ হয়ে শরীরে তাপ এবং শক্তি সরবরাহ করে,—কিন্তু প্রোটিন-জাত অ্যামিনো এ্যাসিডগুলি বিশেষ করে নতুন মাংস পেশীর গঠন এবং ক্ষয়-প্রাপ্ত পুরানো পেশীগুলির ক্ষতি পুরণের কাজ করে। বেশী আর প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ ঐ গ্লুকোজের মতই শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে, —কাজেই মাছ বা মাংস বেশী খেয়ে হজম করতে পারলে ভাত বা রুটি একটু কম খেলেও কোন শক্তির ক্ষতি হতে পারে না।

তাই বলছি দেহের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী যেমন ক্রমশঃ ব্যায়ামে সময় এবং মাত্রা বাড়াতে হয় খাদ্যও ঐ ভাবে, ঐ পরিমাণে বাড়াতে হয়। তবেই ব্যায়ামে এবং খাদ্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগ থাকবে —কেউ কারো অভাব উপলব্ধি করতে পারবে না—পরন্তু দেহের শক্তি শ্রী-সামর্থ্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ একেবারেই ধ্রুব সত্য—আশা করি ব্যায়াম ও খাদ্যের গুরুত্ব মোটামুটি বুঝতে পারছেন।

এবারে মাত্র দু'টি ব্যায়াম এবং দুটি যোগব্যায়াম সম্বন্ধে কিছু বুঝিয়ে বলছি। আপনারা প্রকাশিত ব্যায়ামের ছবিগুলি দেখে বুঝে অভ্যাস করুন—পেটের রোগ—যকৃত, পাকস্থলি, মূত্রগন্থি এবং শরীরের বিভিন্ন পেশী ও স্নায়ুগুলির উপযুক্ত ব্যায়াম করে—সর্ব্ববিষয়ে কর্ম্মক্ষম করে তুলবে।

অতএব অভ্যাস কোরবেন—অসুস্থতায় ইন্ধন দৈহিক জড়তা দূর হয়ে কর্ম্মপ্রবণ আগ্রহান্বিত করে তুলবে আপনাকে।

এবারে আমি পর পর ব্যায়াম ও অভ্যাসগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছি।—

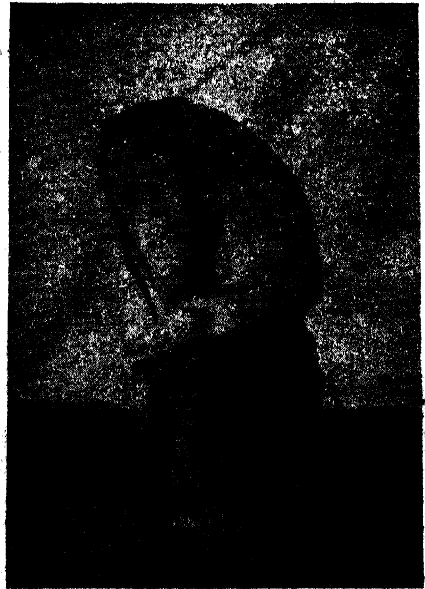
১—সিটিং সাইড ক্রশবেণ্ড—(Sitting Side crossbend.) চিত্রানুসারে হাঁটুর উপর দাঁড়ান। এবার দম নিয়ে ছাড়তে ছাড়তে ডান হাতে পায়ের গোড়ালীকে ধরুন ও বাঁ হাত মাথার উপর তুলে ঠিক চিত্রানুরূপ ডান দিকে বেঁকে যান। এবার দম নিয়ে উঠে ছাড়তে ছাড়তে হাত ও মাথা পরিবর্ত্তন করে পূর্ব্বে ন্যায় শ্বাস করুন।

একেবারে দু'দিক ৪×২=৮ মোট ৩বার অভ্যাস করতে পারেন।



৩নং ব্যায়াম

এতে কোমরের ও-পিঠের পায়ের এবং পেটের চাব্বি কমে যেতে সাহায্য করে।'



৪নং ব্যায়াম

২—লেগস্ আপ্ টু আরমস্ (Legs up to Arms.) সোজা

হয়ে দাঁড়ান, এবার দম নিতে ডান হাত দিয়ে ধরুন ও বাঁ হাত কোমরের পেছনে নিয়ে যান। ত্রিকোণাসনরূপ এইভাবে পুনরায় অপর দিকে অভ্যাস করুন, একবারে দু'দিকে ৮ × ২ = ১৬ বার মোট ৩বার অভ্যাস করুন।

এতে পায়ের, কোমরের, কিডনীর এবং শিরদাঁড়ার যথেষ্ট উপকার পাবেন।

৩—চক্রাসন—চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন, হাতের চেটো উল্টে কাঁধের কাছে রাখুন এবং হাঁটু দুটো ভাঁজ করে মাটিতে রাখুন। এবার হাত ও পায়ের জোরে চক্রাসনরূপ অবস্থায় মাটি থেকে দেহটা আলগা করে তুলুন, দম নিতে নিতে। আবার ছাড়তে ছাড়তে হাতও পায়ের অবস্থা পরিবর্তন না করে কাঁধ ও পিঠ মাটিতে ঠেকিয়ে দিন। পুনরায় দম নিতে নিতে উঠুন। এইভাবে ১ বার ৪।৫ বার করে পূর্ণ বিশ্রাম নিন, আধ মিনিট। আপাততঃ ৩।৪ দফে অভ্যাস করতে পারেন।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হবার যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি আছে। এছাড়া পেট ও পিঠের অস্বাভাবিক চর্বি কমতে সাহায্য করে। উপরন্তু হাত, পা, ঘাড়, এবং কোমরের শক্তি বর্দ্ধন হয়।

৪—পদ হস্তাসন—সোজা হয়ে দাঁড়ান, দম নিয়ে দম ছাড়তে ছাড়তে মাথা হাঁটুতে ঠেকান এবং হাত দিয়ে গোড়ালী ধরুন, এই অবস্থায় ২৫।৩০ সেঃ সাধারণভাবে দম ছাড়া নেওয়া করে থামুন। পুনরায় দম নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দম ছেড়ে দিয়ে শবাসনে শুয়ে বিশ্রাম নিন ৩০সেঃ। পুনরায় উল্লিখিত নিয়মে অভ্যাস করুন। আপাততঃ ৩।৪ বার অভ্যাস করতে পারেন। কোষ্ঠকাঠিন্য ও কোষ্ঠতারল্য দুয়েরই উপকার হয়। তাছাড়া পেটের চর্বি, শিরদাঁড়াও পায়ের স্থিতি স্থাপকতা এবং মস্তিষ্কের ভালভাবে রক্ত চলাচলের কাজটি খুব ভাল-ভাবেই হয়।

অপরূপ

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

অপরূপ দুটি চোখ যত দেখি তত লাগে ভালো,
আকাশের স্নিগ্ধ তারা দুটি চেয়ে দেখি বার বার
চকিত চাহনি যেন ক্ষণপ্রভা স্বরগের আলো
মনের মুকুরে দোলে কল্পনায় প্রতিচ্ছবি তার!
লীলায়িত তরঙ্গের ভাঙাগড়া উদ্বেল অধীর,
শ্বেত মর্মরের বুকে আঁকা ছবি কার—অপূর্ব ভাস্বর
অতল রহস্য ঘেরা দৃষ্টির বিভ্রমে করুণ-অস্থির,
সান্ধ্যরাগে সম্মোহিনী রঙের আরতি রূপান্তর!
অতৃপ্ত কামনা মোর প্রত্যহের অভিধান খুলে
অনন্ত স্মৃতির কূলে ভেসে যায় অজানা সন্ধ্যায়,
স্তব্ধ কোন ভীরু হরিণীর মত চোখ দুটি তুলে,
চেয়ে থাকে, অপলক দৃষ্টি তার কোথায় হারায়।
জীবনের স্মৃতিপটে পাংশু ম্লান বাসর গোলাপ
সোনার নাবিক এসে ডেকে যায় সুদূর বন্দরে,
আকাঙ্ক্ষার উর্মিমালা অন্তহীন ব্যাকুল প্রলাপ
গুমরি মরিছে কেঁদে অজানার হৃদয় কন্দরে।
কাল স্রোতে কেঁপে ওঠে যৌবনের রক্ত রাগ রবি,
তার লাগি কাব্য রচে দিনান্তের কল্পলোকে কবি।

সাহিত্য-সমারোহ

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

(প্রতিবাদ)

গত-শ্রাবণ সংখ্যার ভারতবর্ষে অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'সাহিত্য সমারোহ' বিষয়ক একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লী শহরে সাহিত্য-সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তিনি সেই সম্পর্কেই প্রবন্ধের আকারে একটি রিপোর্ট লেখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রিপোর্টটি যথাযথ হ'লে কিছু বলবার ছিল না ; আসলে এটি লেখকের সজ্ঞান বিদ্বেষের অশোভন বিষোদ্গারণ হয়ে প্রকটিত হয়েছে।

একথা কেন লিখছি তার একটু কারণ আছে। অনিলবরণ নিজে "ইনফরমেশন ও ব্রড্‌কাষ্টিং" এর একজন কর্মচারী হয়ে এবং ভেতরকার সমস্ত তথ্য জেনেও সাহিত্য-সমারোহের বক্তাদের প্রতি কটাক্ষপাত তো করেছেনই, উপরন্তু অধীনের প্রতি বিশেষভাবে বক্রোক্তি করতে দ্বিধা করেন নি। উদ্দেশ্য—সম্ভবতঃ দিল্লীতে বাঙালীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলে একটু বাহবা জুটতে পারে এবং অনেক সময় এর ফলে চাকুরী-ক্ষেত্রে অধিরোহণ পর্বের শেষ কিনারায় পৌঁছতেও পারা যায়। যাই হ'ক, তিনি কলকাতা ষ্টেশন থেকে যেভাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে দিতে একেবারে খাস দপ্তরে পৌঁচেছেন, সেইভাবে আর কিছু কৃতিত্বের মালমশলা সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করছেন কিনা জানি না।

এইবার আসল কথায় আসা যাক্। শ্রীমান অনিলবরণের লেখাটি নিয়ে আলোচনার পূর্বে এর পটভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

দিল্লীতে কিছুদিন পূর্বে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি সাহিত্য-সমারোহ অনুষ্ঠিত হয়। এ বৎসর সাহিত্য-সমারোহে নাটক-আলোচনা, নতুন নাটক পাঠ, মন্তব্য ইত্যাদি—প্রকাশ করার জন্য ভারতবর্ষের তেরটি প্রদেশ থেকে কয়েকজন নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক ও নাট্যানুরাগী সাহিত্যিক আমন্ত্রিত হন।

'সাহিত্য-সমারোহের' মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন প্রদেশের নাট্যকার ও প্রযোজকদের মধ্যে পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান ও বেতার ষ্টেশনের পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে প্রত্যেক নাট্য-সাহিত্যের অবস্থা কিভাবে উন্নত হতে পারে, পরিকল্পনা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

বেতার ষ্টেশনেই দুদিন ধরে বৈঠক বসে এবং এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা তর্ক বিতর্ক যথেষ্ট হয়। সময় দীর্ঘক্ষণ লাগবে ব'লে সেই সভার বক্তব্য ও আলোচনা রীলে ক'রে শোনানো হয়নি। তবে এই ভাবে এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের নাট্যকাররা যেসব নতুন নতুন একাঙ্কিকা নাটক লেখেন তা বেতার মাধ্যমে ক্রমশঃ প্রচার করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন। স্বয়ং ডিরেক্টর জেনারেল জে, সি, মাথুর সক্রিয়ভাবে এই সকল সভার অংশ গ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী দিবসে মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থ মহাশয় বিজ্ঞান-ভবনে এই সমারোহের সূচনা করেন। তারপর তেরটি প্রদেশের তেরজন বক্তাকে নিজ নিজ প্রদেশের গত একশত বৎসরের নাট্যসাহিত্য, রঙ্গমঞ্চ, নাটক ও সমসাময়িক নাট্যকারদের নাটক, রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাট্যকারদের সম্বন্ধ কতখানি থাকা কর্তব্য ও ভবিষ্যৎ নাট্যধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে মতামত প্রদান করার জন্য প্রত্যেককে মাত্র পাঁচমিনিট সময় দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য বক্তৃতাগুলি হয় ইংরাজীতে।

পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যে একশত বৎসরের নাটক সম্বন্ধে, বিশেষ বাংলার নাটক, রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকারদের সম্বন্ধে কোন বিশেষ তথ্যপূর্ণ আলোচনা যে সম্ভব নয় তা বালকদেরও বোধগম্য। প্রকৃত প্রস্তাবে সকল নাট্যকারদের নামোল্লেখ করাও সম্ভব নয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোনরকমে রঙ্গমঞ্চে নাট্যকারবৃত্তিকেই যাঁরা তাঁদের রচনার একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করে এসেছেন, শুধু তাঁদেরই নাম করা হয়েছে। সে নামের তালিকাও সম্পূর্ণ নয়।

সমসাময়িক প্রত্যেকটি নাট্যকার ও তাঁদের নাটকের নাম করতে গিয়ে দেখলাম পাঁচ মিনিট বক্তৃতার মধ্যে শুধু নাম উল্লেখ করাও অসম্ভব —তদুপরি সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দের মধ্যে বাছাই করে কারুর নাম বলা যায় না। তখন বাধ্য হয়ে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে আমি শুধু নাট্যকারদের (যাঁরা ঔপন্যাসিক নন তাঁদেরই) নাম করি।

অনিলবরণ যে-সমস্ত সাহিত্যিক নাট্যকারের নাম করেছেন, যাঁদের প্রতি দরদ প্রকাশ করে আমাকে অজ্ঞ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই আমার শুধু বন্ধু নন, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও তাঁদের বহু নাটক আমি রঙ্গমঞ্চে কিম্বা বেতারে নিজে প্রযোজনা করেছি। অনিলবরণ তাও ভালভাবে জানেন, অথচ যেন কিছুই জানেন না ভাব দেখিয়ে—আমার প্রতি-দোষারোপ করতে ইতস্তত করেন নি।

সমালোচনা যদি কিছু করার থাকতো, তাহলে তিনি যেখানে চাকরি করেন এবং যাঁরা পাঁচ মিনিট ঘড়ি ধরে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁদের বিবেচনা সম্পর্কে হয়তো কিছু বলতে পারতেন ; কিন্তু সম্ভবতঃ এভারেস্ট থেকে পতনের অবস্থা অনুমান করেই আর সে পথে পা বাড়াবার চেষ্টা করেন নি।

বাংলার নাটকের সূত্রপাত, পঁচাশি বছর ধরে, পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের স্থিতি, তার ইতিহাস বিস্তৃতভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কি আলোচনা করা সম্ভব ? কর্তৃপক্ষও তা জানতেন নিশ্চয়, কিন্তু তাঁরা একটু আভাষ পেতেই চেয়েছিলেন, বিস্তৃত ইতিহাস চাননি। অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে

হয়তো সংক্ষেপে তবু কিছু বলা যায়, কিন্তু বাংলার নাটক ও নাট্যকারদের মধ্যে সকল বিশিষ্ট নাটক ও নাট্যকারদের নাম ও সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা সম্ভবপর কিনা তা পাঠকরা বিচার করে দেখুন।

অনিলবরণ সব জেনে শুনেও তবু ন্যাকামী করে লিখেছেন—"বিভিন্ন ভাষায় সমসাময়িক কালের নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অধিকাংশ নিবন্ধকারই অত্যন্ত সহজলভ্য ও বহুজ্ঞানিত কিছু তথ্য পেশ করেই খানিকটা দায়-সারা গোছের কাজ করেছেন।"

অনিলবাবু 'বহুজ্ঞানিত' তথ্যের অনেক কিছু জানলেও প্রত্যেক প্রদেশের সকলে অপর প্রদেশের অনেক কিছুই যে জানতেন না, তা তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে বোঝা গেল। বাংলাদেশে যে স্থায়ী তিনটি পেশাদার রঙ্গমঞ্চ সুদীর্ঘ পঁচাশি বছর ধরে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অভিনয় করেন তাই বহুলোক জানেন না দেখলাম। আমরাও অন্যান্য প্রদেশের নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে এঁদের কাছ থেকে যেটুকু সামান্য জানলাম সেটুকুও কেউ জানতাম না। অনিলবরণ যে সব-ভাষার সব-কিছু জানেন তা যদি, বহুজ্ঞানিত' হত, তাহলে বোধ হয় এই নাট্য-সমারোহে কেউ মুখ খুলতেন না।

বাংলা নাটক সম্বন্ধে যেটুকু অতি সংক্ষেপে বলা যায়, আমি মাত্র সেইটুকুই বলেছি এবং দিল্লীতে সেই সভায় দর্শকদের কাছে তা যে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল তা সেখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই জানেন। তার সাক্ষ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র, মন্মথ রায় ও অন্যান্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, এমন কি স্বয়ং অনিলবরণ গদগদভাবে যে আমার বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি করে সভান্তে ছুটে এসে হাত ধরে ছিলেন, সেটাও উল্লেখ করলে ভুল করবো না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাত্র একটা মোটা রেখায় বাংলা নাট্যসাহিত্যের একশত বছরের অতি সংক্ষিপ্ত হিসাব পূর্ণভাবে কেউই দিতে পারেন না, অথচ শ্রীমান অনিলবরণ আক্ষেপ করে লিখছেন যে "প্রতিটি ভাষার সমসাময়িক কালের নাটক রচনার মূল সূত্র কী, তার স্বরূপ কী, তার উপজীব্য বিষয়ের প্রকৃতিই বা কী জাতের, নাটকের রূপায়ণে সমঝদার শ্রোতা ও দর্শকদের ঠিক মর্মকথাটি কী পরিমাণে ধরা পড়েছে, সর্বশেষে দৃশ্যনাট্য, চিত্রনাট্য, গণনাট্য প্রভৃতির শাস্ত্রীয় সংস্কার অনুযায়ী আধুনিক নাট্য-রচয়িতারা কি চিরাচরিত ধরাবাঁধা পথে এগিয়ে চলেছেন, না তাঁরা বিশেষ কোন নতুন পদ্ধতির অবতারণা করতে পেরেছেন—এই সব প্রসঙ্গের কোন উত্তরই আমরা পেলুম না।"

অর্থাৎ অনিলবরণের মতে নাট্যসাহিত্যের প্রতি শাখা প্রশাখায় বক্তাদের বিচরণ করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় যে ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি শাখা প্রশাখায় আরোহণ করে তাঁর সমান কোন ধুরন্ধর হয়তো দোদুল্যমান হতে পারতেন; কিন্তু নাট্যসাহিত্যের এই বিরাট বৃক্ষের শুধু মূল কাণ্ডটি আঁকড়ে ধরার সামর্থ্যও যে সেই সকল মহাপণ্ডিতের পক্ষে সম্ভবপর হত না একথা নিশ্চিত ক'রেই বলা যায়।

আশ্বিনে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

উড়িতেছে প্রজাপতি। সোনালি রদ্দুর
শারদ প্রভাতটীরে ক'রেছে মধুর।
শ্যামল উত্তরী গায়ে সুন্দরী বসুধা।
বন-কপোতের কণ্ঠে ক্ষরিতেছে সুধা!
ফুটেছে দোপাটি ফুল; রক্ত করবীর
পাঁপড়িতে পাঁপড়িতে 'ছড়ানো আবীর।
ফুটিয়াছে গন্ধরাজ; ঘাসফুলগুলি—
কে তাদের দলে দলে বুলাইলো তুলি?
প্রশান্ত আকাশ হ'তে ঝরিতেছে আলো!
এতই সুন্দরী তুমি! এত তুমি ভালো
হে পৃথিবী! কদর্য্যতা মানুষে কেবল
অকারণে একে অন্যে মারিছে ছোবল।
মানুষ যখন হানে আঘাত নির্দ্দয়—
মাটী মা, আমারে দাও শীতল আশ্রয়।

যাযাবর মন

শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র

ব্যথাদীর্ণ জীবনের পথ বেয়ে মন
চলে যায় পার হয়ে বন-উপবন
নিঃসঙ্গ যাত্রীর বেশে। যদিবা সে থামে
আশাহত অতীতের ক্লান্ত ছায়া নামে
প্রতপ্ত চলার পথে, আনে অবসাদ
নিস্তেজ দেহের মাঝে স্বপ্নের প্রসাদ।
সুরু হয় ধর্মবট শিরা ধমনীতে
নিদ্রালু হৃদয় ভরে নিঃশব্দ সঙ্গীতে
অতীতের। সুখস্বপ্ন একটি আমুক
যার তরে জীর্ণ প্রাণ একান্ত উৎসুক।
ভেঙে যায় ধর্মবট, জেগে অকস্মাৎ
পথের নেশায় ছুটে চলে দিন রাত।
অসীম অনন্ত খুঁজে যাযাবর মন
ফেলে যায় ক্ষণ পরিচিত পুরাতন।



সাময়িকী

শহীদগণের প্রতি সম্মান—

২৫শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হইল। ঐদিন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত মহাজাতিসদন গৃহে স্বাধীনতা সংগ্রামের একদল শহীদ, সংগ্রামী ও বরেণ্য নেতার তৈলচিত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সতীন সেন স্মৃতি সমিতির পক্ষ হইতে ঐ অনুষ্ঠান হয় এবং সেদিন ৯১টি তৈলচিত্র সংরক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সেদিন উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র উৎসবে বক্তৃতা করেন। মঞ্চের পিছনে নেতাজী বসু ও দুইধারে মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের চিত্র শোভা পাইতেছিল। নিম্নলিখিত শহীদদের চিত্র রক্ষিত হইয়াছে—সতীন সেন, যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যতীন দাস, ক্ষুদিরাম বসু, সূর্য্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সন্তোষ মিত্র, সুনীল দাশগুপ্ত, বিনয় বসু, রাজেন লাহিড়ী, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, শচীন মিত্র, মাতঙ্গিনী হাজরা, রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশ গুপ্ত, নির্মলজীবন ঘোষ, দীনেশ মজুমদার, ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ সাহা, চিত্ত মুখোপাধ্যায়, মণিকুমার বসু ঠাকুর, বাদল গুপ্ত, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজচক্রবর্ত্তী অনাথ পাঁজা, ভবানী ভট্টাচার্য্য, মতি মল্লিক, মৃগেন দত্ত, অমলেন্দু ঘোষ, আশুতোষ কুইলা, গান্ধার হাজরা, নলিনী বাগচী, অনিল দাস, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, প্রমোদ চৌধুরী, তারক সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার, গোপী সাহা, হরিগোপাল বল, জীবন ঘোষাল, প্রভাসচন্দ্র বল, মনোরঞ্জন সেন, রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, নবজীবন ঘোষ, অনন্তহরি মিত্র, সুনীল সেন ও তেগুরু বল। নিম্নলিখিত নেতাদের চিত্র রক্ষার ও ব্যবস্থা হইতেছে—বাল গঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপৎ রায়, শ্রীঅরবিন্দ, আবদুল রসুল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, মাডাম কামা, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মতিলাল ঘোষ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পি-মিত্র, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুবোধ মল্লিক, কৃষ্ণকুমার মিত্র, যাত্রামোহন সেন, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হরদয়াল নাগ, বীরেন শাসমল, ভগিনী নিবেদিতা, সি-এফ-এণ্ডরুজ, লিয়াকৎ হোসেন, কিরণশঙ্কর রায়, মানবেন্দ্র রায়, গুরুদিৎ সিং, পুলিন দাস, কিরণ মুখোপাধ্যায়, বিপিন গাঙ্গুলী, নরেন ঘোষ চৌধুরী, রাসবিহারী বসু, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ আশুতোষ দাস, গিরীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দাস ও এম-এন-সাহা। এই সকল চিত্র ছাড়াও ভবিষ্যতে যে সকল শহীদের চিত্র পাওয়া যাইবে, সেগুলির তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া মহাজাতিসদনে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। জাতির মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকদের প্রতি এইভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া দেশবাসী একটি বিরাট ঋণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের অভিনন্দিত করি।

পূর্ব্ব পাকিস্তান ত্যাগের হিড়িক—

পূর্ব পাকিস্তান হইতে দলে দলে সুস্থ ও সবল মুসলমান অধিবাসীরা নানা গোপন পথ দিয়া পশ্চিমবাংলা, বিহার প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রবেশ করিতেছে। কলিকাতা সহরে এরূপ বহু মুসলমান দেখা যাইতেছে। তাহারা বলিতেছে, পূর্ব-পাকিস্তানে খাদ্যাভাব ও কর্মাভাবই তাহাদের পলায়নের কারণ। কিন্তু রাজনীতিকগণ মনে করেন, এইভাবে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া তাহারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি কলুষিত করিতে চাহে। সম্প্রতি নেহরু-নুন বিবৃতি প্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গবাসী বহু মুসলমান যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে ভারতবাসী মাত্রই শঙ্কিত হইয়াছেন। ২৪পরগণা জেলার বসিরহাটের অন্তর্গত বাদুড়িয়া ও স্বরূপনগর থানার একাংশ পাকিস্তানকে দেওয়া হইবে, এরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া ঐ অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসীরা তথায় পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করে ও হিন্দুদের দেবমন্দিরগুলি দখল করিয়া লয়। ফলে ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও অত্যাচারিত হইয়াছে। এ বিষয়ে বসিরহাটের এম-এল-এ, খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বিবৃতি প্রকাশ করেন, সেজন্য ভারতবাসী মাত্রেরই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। মুসলীম লীগ দলের যেসকল মুসলমান ভারতে থাকিয়া কংগ্রেস দলে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ঐ সময়ে যে সাম্প্রদায়িকতা ও হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসী মুসলমান মাত্রেরই লজ্জানুভব করা

উচিত ও সেই সকল দুষ্কৃতকারীদের কার্য্যের নিন্দা করা উচিত। সুখের কথা, পুলিশ তৎপরতার সহিত ঐ সকল মুসলমানকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছে। নেহরু-নুন চুক্তির ফলে কেন যে—অতি সামান্য মাত্র অংশ হইলেও—ভারতের কোন কোন অংশ পাকিস্থানকে দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য। পাকিস্থানীরা গত ১১ বৎসর ধরিয়া কতবার পশ্চিম বাংলায় হানা দিয়াছে, কত সম্পত্তি লুঠ করিয়াছে, হিন্দুদের কত ক্ষতিসাধন করিয়াছে, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে। ইহার পিছনে যদি পাকিস্থানী রাজশক্তির সমর্থন না থাকিত, তাহা হইলে সাধারণ দস্যু তস্করদের পক্ষে এই সকল কাজ করা কখনই সম্ভব হইত না। একদল মুসলমান যে ভারতে বাস করিয়াও পাকিস্থানের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে, তাহা গত কয়দিন বসিরহাট অঞ্চলের ঘটনা সমূহ হইতে বেশ বুঝা যায়। এই সকল অনাচার অঙ্কুরে বিনষ্ট করা না হইলে ভারতের ভবিষ্যত কখনই নিরঙ্কুশ হইবে না। এমন কি, এমন কতকগুলি ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে ভারতের বহু উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্মচারী ও জড়িত আছেন—ঐ সকল ষড়যন্ত্রে পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্থানী প্রভাববৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছে। রাজনীতিক নেতা সাজিয়া, কংগ্রেসের উচ্চপদ গ্রহণ করিয়া যে সকল মুসলমান ভারতের অনিষ্ট সাধন করে, তাহাদের সে কাজের জন্য কিছুতেই ক্ষমা করা উচিত নহে। সরকারী কর্মচারীদের কথা ত স্বতন্ত্র। তাহারা যদি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া অবিলম্বে ঘোষণা করিয়া উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান করা কর্ত্তব্য। সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-সচিব শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় নিজে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থায় অবহিত হইয়াছেন। কিন্তু এখনও বন-পথ দিয়া বিনা পাসপোর্টে যে অসংখ্য মুসলমান খাদ্যাভাবের অছিলায় পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিতেছে ও সীমান্তে বহুস্থানে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে সত্বর উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কবে করা হইবে? পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত সমস্যার সমাধান আজও করা হয় নাই—এ বিষয়ে প্রয়োজন হইলে—বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে সীমান্তে হিন্দুদের পক্ষে বসবাস করা কখনই সম্ভব হইবে না। আমরা এ বিষয়ে দেশবাসী সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করি ও সকল হিন্দুকে এ বিষয়ে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আহ্বান জানাই।

বিশ্বভারতীর নূতন উপাচার্য্য—

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের এক সভায় ব্যারিষ্টার শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় নূতন উপাচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছেন। পুরাতন উপাচার্য্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ১লা অক্টোবর হইতে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া উপাচার্য্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তপনমোহন গত ১৯৪৮ হইতে ১৯৫১ সাল পর্য্যন্ত কয় বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাপরিপালক ও ন্যাসপাল ছিলেন। তিনি ১৯৪০ সাল হইতে ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া সাহিত্য সেবায় মন দেন ও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি পিতামাতার দিক দিয়া রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট। বহু বৎসর তিনি বিশ্বভারতী আশ্রমিক সংঘের সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার নিয়োগে তাঁহাকে আমরা অভিনন্দিত করি এবং বিশ্বাস করি, তাঁহার চেষ্টায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা ও ঝড়—

গত ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর অতি বৃষ্টি ও বন্যার ফলে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলার বহু স্থানের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় ৪৩ বর্গ মাইল এলাকা জলে ডুবিয়া গিয়াছিল এবং নৌকা ডুবি প্রভৃতিতে ১০ জন মারা গিয়াছে। সাহায্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে তিন দিন বিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরিয়া সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২৪ পরগণার মথুরাপুর থানায় কম ক্ষতি হয় নাই। স্থানীয় এম-এল-এ শ্রীবৃন্দাবন গায়েন সরকারী কর্মচারীদের লইয়া ঐ অঞ্চলে ঘুরিয়াও সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বন্যার জল মাত্র তিন দিন স্থায়ী ছিল—তাহার পরই জল নামিয়া যাওয়ায় বহু স্থানে শস্যের অবস্থা ভাল হইয়াছে।

ভূটান রাজ্যে শ্রীজহরলাল—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে সঙ্গে লইয়া ভারত হইতে দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া ২১শে সেপ্টেম্বর ষষ্ঠ দিবসে ভূটানের পারো সহরে উপস্থিত হন—তথায় ২৯ বৎসর বয়স্ক মহারাজা জিগমিদরজি ওয়াং চুক, মহারাণী কেশ-দেরজী ও রাজমাতা তাহাদের অভ্যর্থনা করেন। শ্রীনেহরু ৬ দিন ভূটানে অবস্থান করিয়া সেখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ইহার পূর্বে কোন বিদেশী রাজনীতিক নেতা ভূটান রাজ্যে গমন করেন নাই। ভারত হইতে ভূটানে যাতায়াতের পথ যাহাতে সত্বর নির্মিত হয়, সেজন্য শ্রীনেহরু ভূটানকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করিতে সম্মত হইয়াছেন! ভূটানে বহু প্রকার খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়—সেগুলির যাহাতে যথাযথ ব্যবহার হয়, সে জন্যও শ্রীনেহরু উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবেন। ভূটানের অর্থনীতিক উন্নয়ন হইলে তাহাতে ভারতও উপকৃত হইবে। তিন দিন ধরিয়া তিনি মহারাজার সহিত আলোচনা করিয়া নানা নূতন পরিকল্পনার কথা মহারাজাও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শ্রীজিগমীডোরজীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্রীনেহরুর বর্তমান সঙ্কটজনক সময়ে এক পক্ষ-

কাল ব্যাপী ভূটান সফর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার ফলে উভয় দেশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া সকলে মনে করেন। পরিণত বয়সে শ্রীনেহরু এই দুর্গম পথে যাইয়া অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী—

দিল্লীর ২৭শে সেপ্টেম্বরের খবর এই যে, ভারতবর্ষ সত্বর আমেরিকার নিকট হইতে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য ক্রয় করিবেন—সে জন্য ভারতবর্ষকে ২৩ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার দাম দিতে হইবে। এইরূপ অধিক মূল্য দিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য ক্রয় করিয়া ভারতবাসীকে খাদ্য জোগান হইতেছে—এ কথাটি কেহ একবার চিন্তা করিয়াও দেখে না। অথচ একটু চেষ্টা করিলে যে ভারতে আরও প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করা যায়, সে কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু সে বিষয়ে কি সরকার-পক্ষ, কি দেশবাসী কাহারও কোন আগ্রহ দেখা যায় না। স্বাধীন দেশের মানুষ যদি তাহাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য খাদ্য উৎপাদনের কথাই চিন্তা না করে ও সে বিষয়ে উদ্যোগী না হয়, তবে সে তাহার স্বাধীনতা কি ভাবে রক্ষা করিবে, তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। শ্রীজহরলাল নেহরু বা ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় একদিন একবার এ বিষয়ে একটা কথা বলিয়াই কর্তব্য শেষ করেন। সে বিষয়ে কাজ করিতে ভার দেওয়ার কি লোক পাওয়া যায় না। খাদ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীরা কি করেন তাহা সাধারণ লোক জানে না। জনগণেরও এ বিষয়ে আগ্রহশীল হইয়া কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা—

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর দিল্লীতে রাজ্য সভায় কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি মন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম আশ্বাস দিয়াছেন যে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হইবে। গঙ্গা নদীর খাত পরিবর্তিত হওয়ায় ১৯৫১ সালে এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান হইয়াছিল—তাহার বিবরণ কোন কাজে লাগিবে না——নূতন করিয়া অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ কার্য্য সত্বর সম্পূর্ণ করিতে কর্মীদিগকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে আলোচনার সময় সেচ উপমন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতী বলিয়াছেন—পাকিস্তানের আপত্তির জন্য বাঁধ নির্মাণে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সত্য নহে। আজ যে গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ পশ্চিম বঙ্গের স্বার্থের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়—সে কথা কেহ অস্বীকার করিবে না। ভাগীরথার উভয় তীরের গ্রাম ও সহরগুলির উন্নতি বিধান, কলিকাতা বন্দরকে সজীব রাখা, জল-সেচ, জল-সরবরাহ, কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি—প্রভৃতি সকল কাজের জন্যই গঙ্গা বাঁধ নির্মাণ করিয়া ভাগীরথীকে ১২ মাস জলপূর্ণ ও বহতা রাখা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গ ধ্বংস হইয়া যাইবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক অধিবাসী এই কার্য্য আরম্ভ হইতে দেখিবার জন্য আগ্রহে অপেক্ষা করিবে।

আমেরিকায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী—

১৯৬০ সালের মে মাসে আমেরিকায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের জন্য নিউইয়র্কে ঐ স্থানের কবি ও দার্শনিকগণ মিলিত হইয়া এক কমিটী গঠন করিয়াছেন। পেনিসেলভিনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে এসিয়া-সংস্কৃতি বিভাগের ডিরেক্টর অধ্যাপক নরম্যান ব্রাউন কমিটীর সভাপতি ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মুখার্জি সম্পাদক হইয়াছেন। শ্রীমুখার্জি ১৯০৬ সাল হইতে আমেরিকায় বাস করিতেছেন। সমিতি রবীন্দ্রনাথের জীবনী, রচনা ও আদর্শ আমেরিকাবাসী প্রত্যেক ছাত্রকে জানাইবার ব্যবস্থা করিবেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের কবি ছিলেন না, জগতের সকল অধিবাসীর হিতকামী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার জীবনাদর্শ গ্রহণ করিলে বর্তমান জগতের বহু প্রকার পাপ বিনষ্ট হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। আমেরিকার ধনতন্ত্রবাদের কুশিক্ষা দূর করার জন্য তথায় রবীন্দ্রনাথের কথা প্রচার করা বিশেষ প্রয়োজন।

ডাঃ পূর্ণেন্দুকুমার ব্যানার্জি—

ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মী ডাক্তার পূর্ণেন্দুকুমার ব্যানার্জি গত ১১ই আগষ্ট ঢাকায় ভারতের অস্থায়ী ডেপুটী হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি দিল্লীতে ডেপুটী সেক্রেটারীর কাজ করিতেছিলেন।

নদীয়া জেলা স্কুল বোর্ড—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার কংগ্রেসী সদস্য শ্রীফজলর রহমান সর্বসম্মতিক্রমে ৪ বৎসরের জন্য নদীয়া জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি বহু দিন দেশসেবার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং জেলার অন্যতম সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তি।

সংস্কৃত ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ—

দিল্লীর সাহিত্য একাডেমী হইতে সংস্কৃত ভাষায় এক যাণ্মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ভি রাঘবন্ তাহার সম্পাদক হইবেন। কলিকাতা হইতে ও শ্রীশ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথের চেষ্টায় সীতারাম বেদ বিদ্যালয় (দক্ষিণেশ্বর) হইতে একখানি সংস্কৃত ভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। পণ্ডিত শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ ও শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ঐ পত্রিকার সম্পাদনা করিবেন। সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবী উপস্থিত করার জন্য এইরূপ পত্রপ্রকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, সংস্কৃতই শেষে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইবে।

ভারত ও পশ্চিম জার্মানী—

ভারতের অর্থ-নীতিক উন্নতির জন্য পশ্চিম জার্মানী কর্তৃপক্ষও আগ্রহশীল হইয়াছে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে তাহারা ভারতকে ৪ কোটি ডলার মুদ্রা সাহায্য দান করিতে এবং পরে আরও ৬ কোটি ডলার সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। গত দ্বিতীয় যুদ্ধে যে জার্মানী একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, তাহার অধিবাসীরা গত ১২ বৎসরে এত অধিক উন্নত হইয়াছে যে আজ তাহারা ভারতকে অর্থ সাহায্য করিতেছে। সেখানকার মানুষ সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও ক্ষান্ত হয় না। মানুষের উৎপাদন শক্তি তাহারা কিরূপ বাড়াইয়াছে, তাহা জানিলে বিস্মিত হইতে হয়। আর আমরা ভারতকে কত বেশী ফাঁকি দিতে পারি, তাহার প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হই। ভারতবাসী কি নিজের দেশকেও ভালবাসিতে শিখিবে না ?

মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি—

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য গঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক কমিটীর একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে গত ২৪শে সেপ্টেম্বর নয়া দিল্লীতে উদ্বোধক ডাক্তার রাধাকৃষ্ণন বলিয়াছেন—সংস্থা যেন শুধু দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানের কথা চিন্তা না করেন—কি করিয়া মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা যায়, সে কথা আজ আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আজ মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে না পারিলে বিশ্বে স্থায়ী শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করা কিছুতেই যে সম্ভব হইবে না—এ কথা যেন আমাদের সর্বদা স্মরণ থাকে—তবে এই স্বাস্থ্য সংঘ গঠন সার্থক হইবে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৮৩ বৎসর বয়সে পদার্পণ করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন, হাওড়া টাউন হল প্রভৃতি নানাস্থানে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এই বয়সে তিনি অটুট কর্মশক্তি লইয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন —এরূপ অসাধারণ শক্তি অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরাও সকলের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি, তিনি শতায়ু হইয়া দেশকে অগ্রগতির পথে লইয়া চলুন।

হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষার ফল—

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত খ্যাতনামা মার্কিণ বৈজ্ঞানিক ডাঃ লিনাস পলিং গত ২২শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে এক সভায় বলিয়াছেন—এ পর্য্যন্ত যত হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহার ফলে দেড় লক্ষ রুগ্ন শিশু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে। ঐ সকল শিশুকে অতি কষ্টে জীবন-যাপন করিতে হইবে। আনবিক শক্তি যদি মানুষের কল্যাণ না করিয়া এইভাবে অকল্যাণ করে, তবে তাহা সত্যই ভয়ের জিনিষ হইবে। ইহার প্রতীকারে কি সভ্য জগত অবহিত হইবে না ?

কলিকাতায় ট্রাম ধর্মঘট—

১২ই আগষ্ট হইতে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতায় ট্রাম কোম্পানীর কর্মীরা ধর্মঘট করায় ট্রাম চলাচল একেবারে বন্ধ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহরতলীর বহুসংখ্যক বাসকে কলিকাতার মধ্যে চালিত করিয়া কিছু কিছু সুবিধা করিয়া দিলেও ৪২ দিন জনগণকে দারুণ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। এই ধর্মঘটের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ জিদ ধরিয়াছেন, ভাড়া না বাড়াইলে তাঁহারা কর্মচারীদের অধিক অর্থ দিতে পারিবেন না। অথচ নয়া পয়সা প্রবর্তনের ফলে কোম্পানীর বহু লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ভাড়ার হার ও বাড়িয়া গিয়াছে। কর্মীরা কাজে যোগ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। মুখ্য মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বিষয়টি বিবেচনা করিতে আশ্বাস দিয়াছেন। ট্রাম চলিয়াছে বটে, কিন্তু যত দিন না ট্রামের পরিচালন ভার সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়, অর্থাৎ সরকার কোম্পানীর নিকট হইতে ট্রামের ব্যবসা কিনিয়া লন, ততদিন কোন সুরাহা হইবে বলিয়া আশা হয় না। লাভ-লোকসান যাহাই হউক না কেন, ট্রাম-ব্যবসা জাতীয়করণে জনগণ অন্যান্য সকল সরকারী ব্যবস্থার মত ট্রামের ব্যবস্থা ও মানিয়া লইবেন। ট্রাম কোম্পানীর অধিকাংশ মূলধন বিদেশী—তাহাদের কবল হইতে কোম্পানীকে সত্বর উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন।

পূর্ব্বপাকিস্তানে ডেপুটী স্পীকার নিহত—

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্থান বিধান সভার ডেপুটী স্পীকার শাহেদ আলি সভার মধ্যেই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় আহত হইয়াছিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর বেলা ১টার সময় তিনি হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। দাঙ্গার দিন শাহেদ আলিকে হত্যার অভিযোগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার, ইউসুফ আলি চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী সৈয়দ আজিজলহক প্রমুখ বিরোধ দলের ৮ জন এম-এল-একে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

॥ দোহন ॥



শিল্পী : পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

মহাসিন্ধু তীরে

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সাগর-যাত্রীর দল কলকণ্ঠে গাহে জয়গান—
পথ বুঝি শেষ হ'ল বেদনার তপ্ত আঁখিনীরে,
আজি তার পুণ্যস্নানে দুঃখজ্বালা হবে অবসান
সম্মুখে উদার সিন্ধু—বক্ষে তার মণিমুক্তা ঝরে।

উত্তালতরঙ্গমালা চূর্ণ করে কঠিন পাষাণ—
ভীত ত্রস্ত যাত্রী কত দূর হতে করে দরশন ;
স্পর্শ করি বারি-কণা পূর্ণ করে কেহ পুণ্য-স্নান—
শোনায় স্বজনগণে সগৌরবে সমুদ্র-বর্ণন !

যে ডুবিবে পারাবারে তুচ্ছ করি' বিঘ্ন-মৃত্যু-ভয়
রত্ন দানে ধন্য তারে করিবে যে এই রত্নাকর,
তার সেই সিন্ধুযাত্রা সাড়ম্বর শোভাযাত্রা নয়,
বাক্যে নহে—কর্মে তার সাধনার মিলিবে স্বাক্ষর।

দুর্গম বন্ধুর পথ শেষ বুঝি হয় ধীরে ধীরে—
যাত্রীদল সমাগত সীতারাম—মহাসিন্ধু তীরে।

মেয়েদের কথা

নারী শুধু প্রিয়া নয়

সুপ্রিয়া ঠাকুর

যে গৃহে শিশুর কলরব নাই, সে গৃহ গৃহই নয়—অর্থাৎ ব্যর্থ হয়ে গেল সেই গার্হস্থ্য জীবন। অভিশপ্ত সেই দম্পতি। কিন্তু অনেক মানুষের জীবনে এমন দিনও আসে যখন সে ভগবানের কাছে অভিযোগ জানায়, কেন তাকে নিঃসন্তান করেননি তিনি। শুধু একটি দুটি বা পাঁচটি সন্তান লাভ করলেই সার্থক হওয়া যায়না, কুসন্তানের পিতা-মাতা হওয়ার চেয়ে বড় অভিশাপ বোধহয় পৃথিবীতে আর কিছু নাই। কারণ তাকে ফেলাও যায়না। আবার সহ্য করাও অসম্ভব। অন্যপক্ষে যে জননী তাঁর সন্তানের জন্যে গর্ব অনুভব করতে পারেন, তাঁর কাছে স্বর্গসুখও অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়। যে সন্তানকে কেন্দ্র করে আপনার জীবনে সুখ শান্তি, আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি পরিণতি লাভ করবে, আপনার জীবন সার্থক হয়ে উঠবে, সেই সন্তানের দিকে একটু বেশী করে মনোযোগ দেওয়াই দরকার নয় কি? আপনার ছেলে ভাল হবে কি মন্দ হবে, চোর হবে কি সাধু হবে, মহৎ হবে কি অসৎ হবে, তা সম্পূর্ণই আপনার ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে। আপনি হয়ত এখুনি আমায় জিজ্ঞেস করবেন যে কোন মা ই কি চায় তার ছেলে চোর হোক, অসৎ হোক? কিংবা একটা নামকরা গুণ্ডা বা ডাকাত হোক? না, তা চান না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তারা তাদের সন্তানদের এমনিভাবেই তৈরী করে ফেলে। এরজন্যে দায়ী অবশ্য তাদের অজ্ঞতা। ছেলে-মেয়েদের কি ভাবে পরিচালনা করলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সহজ, সুন্দর ও উন্নত হয়ে উঠতে পারে তা তারা জানেনা, তাই তারই বিষময় ফলভোগ করতে করতে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে আত্ম-সান্ত্বনা লাভ করে। ভাগ্য মানি আমিও। কিন্তু মানুষ ভাগ্যের অনেকখানিই কেমনভাবে নিজে সৃষ্টি করে, বলছি শুনুন। তার আগে কয়েকটি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি—যে কেন আমরা আপনার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের জন্যে আপনাকেই দায়ী করব এবং কেনই বা তাদের একমাত্র সুযোগ্য পরিচালিকা বলে আপনাকে গ্রহণ করব।

আপনারই দেহের রসরক্ত, আপনারই মন দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আপনার সন্তান। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত সেও আপনার দেহেরই একটি অংশ বিশেষ। ধরুন আপনার একখানা হাত। সেটাকে ইচ্ছে করলে আপনি নাড়াচাড়া করতে পারেন না কি? আপনার ইচ্ছেতেই আপনার ওই হাতখানা ভালমন্দ দুটো কাজই করে থাকে। আবার আপনারই ইচ্ছের উপর নির্ভর করে আপনার ঐ হাতখানা সুস্থ সবল হয়ে থাকবে, কিংবা অসুস্থ পঙ্গু হয়ে যাবে। কোন না কোন সময়ে আপনার হাত বা দেহের অন্য কোন জায়গা নিশ্চয়ই পুড়ে গিয়ে ফোস্কা উঠেছে বা কেটে গেছে। ফোঁড়া খোস বা চুলকণা ইত্যাদি চর্মরোগও হয়েছে। কিন্তু কেন হল? নিশ্চয়ই আপনি অসতর্ক ছিলেন বা অবহেলা করেছেন। তেমনই আপনারই দেহমন নিয়ে যে ছেলে ভূমিষ্ঠ হল, পৃথিবীর ভালমন্দ সম্বন্ধে যার ধারণা পর্যন্ত নাই, এমন কি যে নিজে খেতে বা ঘুমোতে পর্যন্ত পারেনা, সে খারাপ হল কেন? আপনি হয়ত বলবেন, জন্ম থেকেই সে তার সদ্ বা বদগুণগুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। কতকগুলো গুণ সে নিয়েই আসে সত্যি। কিন্তু আমাদের পরিচালনার দোষে, আমাদের অবহেলা এবং উপেক্ষায় অধিকাংশ বদগুণই তারা এখান থেকেই অর্জন করে এবং অনেক সদ্গুণের অপমৃত্যু ঘটে। কি জানেন, আমরা প্রথমেই একটা মস্তবড় ভুল করে বসি। আমরা ভাবতেই পারিনা যে শিশুদেরও মন বলে একটা বস্তু আছে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনেরও বিকাশের যে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ধারা আছে, এটা আমরা অনেকেই লক্ষ্য করিনা। ছেলের দুবছর আড়াইবছর বয়স থেকে অর্থাৎ যখন সব কথাগুলো মোটামুটি বলতে পারে বা কিছু কিছু কথা বুঝতেও পারে এবং ছোটখাট দুএকটা আদেশ ও পালন করে—আমরা মনে করি বয়স্কদের রীতি নীতি বুঝে কাজ করার সামর্থ্যও তাদের হয়ে গেছে। নিজেদের মন নিয়ে আমরা তাদের বিচার করতে যাই। কিন্তু শিশুর দৃষ্টিভঙ্গী বা তার রীতিনীতি বিচার যে আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, একথা আমরা ভুলে যাই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেরা আমাদের উপর বিশ্বাস হারায়,

বিরক্ত হয় বা মরিয়া হয়ে উঠে। ভবিষ্যতে তারই বিষময় ফলভোগ করে অনেক পিতা-মাতাই। আপনার ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করতে হলে তার মন নিয়েই তাকে বিচার করতে হবে। আপনারই মত তার জীবনেও যে কতকগুলি সমস্যা থাকবে তাও বুঝতে হবে এবং স্নেহ ও ধৈর্য সহকারে তার বড় হওয়ার পথকে সহজ করে তুলতে হবে।

এইপ্রসঙ্গে ডাঃ সুজান আইজ্যাকস্-এর কতকগুলি মূল্যবান উপদেশ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি—যেগুলি এই শাস্ত্রের প্রথম পাঠ বলে আমরা মনে করি। কারণ, বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই শাস্ত্রের বিশদ আলোচনা না করেও, কোন মা যদি এই উপদেশগুলি অন্ততঃ মেনে চলেন তাতেও অনেক উপকার হবে।

১। ছেলেকে কথনও বলবেন না, অমুকটা করো না, তারচেয়ে আপনার মনোমত কাজটি করতে উৎসাহ দেবেন।

২। বলবেন না, এ কাজটা মন্দ। তারচেয়ে বলুন, আমার এটা মোটেই ভাল লাগেনা।

৩। ছেলেদের সামনে তাদের কোন বিষয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করবেননা। ধরে নেবেন না যে, তারা আপনাদের কথা বুঝছে না বা শুনতে পাচ্ছেনা।

৪। ছেলে যদি খেলায় বা কাজে মেতে থাকে, অনিষ্টকর হলেও তাতে হঠাৎ বাধা দেবেন না। বরং তার আগে তাকে একটু সাবধান করে দিন।

৫। বাহ্যিক আদর দিয়ে ছেলেকে আপনার স্নেহের প্রমাণ দেবেন না। তারচেয়ে যা বললে বা যা করলে তার উৎসাহ বাড়ে তেমনই করুন। জিনিষপত্র দেওয়ার ব্যাপারেও সংযত হবেন।

৬। কোথাও গেলে ছেলেকে যে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন, ~~একথা যেন~~ সে মনে করতে না পারে। বরং এমনই ভাব দেখান, যেন আপনিই তার সঙ্গে যাচ্ছেন।

৭। একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে মাঝে মাঝে ছুটি-ছাটায় বাইরে যাবেন।

৮। ছেলের অসুথ করলে বা নিয়মিত না থেলে, তাই নিয়ে ছেলের সামনেই যেন হৈচৈ করবেন না। সংযত হয়ে কর্তব্য করে যাবেন।

৯। কোন কারণে ছেলেকে নিয়ে বিদ্রূপ করবেন না। তার সঙ্গে হাসির ব্যাপার উপভোগ করুন, কিন্তু তাকে হাস্যাস্পদ করবেন না কোথাও। যতদূর সম্ভব কম বিরক্ত করবেন তাকে।

১০। অন্যের কাছে ছেলের বাহাদুরী দেখাবেননা অর্থাৎ তাকে একটা দর্শনীয় বস্তু করে তুলবেন না।

১১। ছেলেকে কথনও সোজাসুজি নীতি-উপদেশ দেবেন না। আপনি যা করেন, ছেলেকে যদি তা করতে দেখেন, তাহলে হঠাৎ চটে উঠবেন না বা অবাক হবেননা।

১২। অনুমান করে নেবেন না যে, আপনি যা বলেন আপনার ছেলে তার সবটাই বোঝে। যেহেতু আপনি নিজে বোঝেন।

১৩। যদি রাগের বশে এমন কোন কাজ করে ফেলেন যা আপনার ছেলের মনের মত নয়, তথন যেন ভাণ করবেন না যে তারই মঙ্গলের জন্যে আপনি ওটা করেছেন। কারণ, রাগের চেয়ে ভণ্ডামি আপনার ছেলের কাছে বেশী ক্ষতিকর।

১৪। কোন ব্যাপারে ছেলেকে কথা দিয়ে কথনও তা ভাঙবেন না। তার চেয়ে যা করতে পারবেন না, তেমন আশ্বাস্ কথনও তাকে দেবেন না।

১৫। ছেলের কাছে মিথ্যে বলবেন না—বা তার কোন প্রশ্ন, তা যদি লজ্জাকরও হয়, তবুও এড়িয়ে যাবেন না।

এবার, আমাদের কি ধরণের ব্যবহার ছেলে-মেয়েদের চরিত্র গঠনে বাধা দেয়, তাই বলব। অবহেলা বা উপেক্ষা করে তাদের আমরা যেমন ক্ষতি করি, তেমনই তাদের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়েও আমরা কম ক্ষতি করি না। ছেলে-মেয়েদের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগিনী মায়েদের আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। একদল ছেলেদের অতিরিক্ত আদর দেন, অন্যেরা অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন। আপনি কিন্তু দুটোর কোনটাই করবেন না, দুরকম ব্যবহারই ছেলেদের মনে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া ঘটায়, তার মোটামুটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা আমরা করছি।

অতিরিক্ত আদর

এমন অনেক মা আছেন দেখবেন, যাঁরা ছেলেদের এতটুকু কান্না বা রাগ, দুঃখ, অভিমান সহ্য করতে পারেন না। অস্থির হয়ে ওঠেন এবং তাদের দাবী অন্যায় জেনেও অন্ধ স্নেহের বশে তা পূরণ করার চেষ্টা করেন। ছেলেরাও এমনি অনায়াসে সব দাবী পূরণ হতে দেখে বেশ একটা উল্লাস অনুভব করে এবং নিত্য-নূতন একটার পর একটা অভাব সৃষ্টি করে। তথন কোন কারণে কোন চাহিদা তার মেটাতে না পারলে, কিংবা পেতে একটু দেরী হলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধিয়ে বসে। কারণ, পাওয়াটাই তাদের কাছে তথন স্বাভাবিক। কোনকিছু পেতে গেলে যে চেষ্টা, যত্ন এবং অধ্যবসায়ের দরকার বা অন্যের জন্যে কথনও কথনও তার চাওয়ার বস্তুটিকে ত্যাগ করতেও হয়, এসব তার চিন্তার মধ্যেও আসে না। ফলে ছেলে জেদী, স্বার্থপর, আরামপ্রিয় ও অকর্মণ্য হয়ে ওঠে, বড় হয়ে যথন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে নিজেদের অক্ষমতার কথা বুঝতে পারে। কিন্তু ক্ষমতা অর্জন করার জন্যে যে

ধৈর্যের দরকার তা তাদের থাকেনা। মিথ্যে অহঙ্কারের জোরে অন্যের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি ইত্যাদি পাওয়ার চেষ্টা করে সকলের কাছে আরও হেয় হয়ে ওঠে। অন্যের উন্নতিতে হিংসে করে এবং নিজে তা পারছে না বলে আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। মানসিক সুস্থতা না থাকলে দৈহিক সুস্থতাও বেশীদিন অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না।

আর এক রকমের মা দেখেছি যাঁরা ছেলের দোষ অন্যের চোখ থেকে চাপা দেওয়ার জন্যে সব সময় ব্যস্ত। এতে ছেলেদের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার শক্তি বাড়তে থাকে। চুরি করা, মিথ্যে বলা ইত্যাদির বদ অভ্যাস হয়।

অতএব ছেলেদের আদর দেওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকবেন।

অতিরিক্ত কঠোরতা

ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ছেলে-মেয়েদের মার-ধর বা বকা-ঝকা করবেন না কখনও। অনেককে দেখবেন, সামান্য একটু এদিক ওদিক হলে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে চেঁচামেচি মার-ধর করে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন। সামান্য একটু দুর্নীতি দেখলে তো আর রক্ষা থাকে না। তাঁদের ধারণা, শক্ত হাতে রাশ টেনে রাখতে না পারলে ছেলেরা মানুষ হবে না। তাদের নৈতিক জীবন গড়ে উঠবে না। আমরা কিন্তু বলব সম্পূর্ণ ভুল পথে চলেছেন তাঁরা। এতে নীতি বা শৃঙ্খলা বোধ কোনটাই আসে না। মাঝখান থেকে ছেলেদের ভালবাসা এবং বিশ্বাস দুটোই যায় নষ্ট হয়ে। সব সময় ভয়ে ভয়ে থেকে তাদের মনের ইচ্ছে-আকাংক্ষাগুলো দুমড়ে যেতে থাকে। স্বাভাবিক গুণগুলো বিকাশলাভ করার সুযোগ পায় না। একটা চারা গাছ ওঠার সময় কোন ভারি জিনিষ তার ওপর চাপা দিয়ে রাখলে সেটা যেমন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না, তেমনই অতিরিক্ত কঠোরতার চাপে শিশুর স্বাভাবিক আনন্দময় জীবন নিরানন্দ হয়ে যায় এবং তার মানসিক বিকাশও স্বাভাবিক হতে পারে না। তাদের মনের দৃঢ়তা তো নষ্ট হয়ে যায়ই, নিজের শক্তির উপর পর্যন্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এই সব কারণে কর্মক্ষেত্রে যখন প্রবেশ করে, পদে পদে পিছিয়ে পড়ে এরা। নিজের কাজের উপর নির্ভর করতে পারে না বলেই শেষ পর্যন্ত নিরুদ্যম ও উৎসাহহীন হয়ে পড়ে। ক্রমাগত লাঞ্ছিত ও পরাজিত হতে হতে জীবন সম্বন্ধে হতাশা এসে যায়। এরাও শেষ পর্যন্ত খিটখিটে ও পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে এবং অত্যন্ত অসামাজিক হয়ে উঠে।

অবহেলা এবং উপেক্ষা

আপনি হয়ত বলবেন নিজের ছেলে-মেয়েকে কেউ উপেক্ষা বা অবহেলা করে না। সত্যি কথা, কিন্তু ছেলের স্বাস্থ্যের দিকটা দেখলেই চলে না। তার মনের দিকটা দেখারও দরকার আছে। আপনি যদি তার দেহের মত মনের অভাব-অভিযোগগুলো সাধ্যমত দূর করে তাকে উৎসাহ দান করতে পারেন তবেই তার জীবন সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠতে থাকবে। অন্যের পাশে নিজেকে বড় করার চেষ্টা মানুষের জন্মগত স্বভাব, তাই ছেলেদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাবেন—আমি বাবা হয়েছি। তার এই বড় হওয়ার আকাংক্ষা নানা দিক দিয়ে প্রকাশ পায়। সে চায় কেউ তাকে উৎসাহ দেয়, তাকে সাহায্য করে। অনেক সময় দেখবেন কোন বিষয়ে তার কোন বন্ধুর চেয়ে পিছিয়ে থাকলে তাকে হিংসে করে। এই সময় তাকে অন্য পথ দেখাতে হবে। যেদিকে সে বন্ধুর চেয়ে এগিয়ে গেছে বা যেতে পারে—এগিয়ে যাওয়ার জন্যে সাধ্যমত সাহায্য করতে হবে তাকে। ছেলেদের এই আত্মদীনতার প্রকাশ হয় তার কি কি আচরণের মধ্যে দিয়ে তাই বলছি। ১। অন্যের নামে নালিস করা ২। এক-গুঁয়েমি ৩। মিথ্যা বলা ৪। চুরি করা ৫। সামান্য কারণেই রাগ। এগুলি হল সক্রিয় দিক। নিষ্ক্রিয় দিকও আছে—১। অমনোযোগ ২। সহজে কোন কিছু বুঝতে না পারা ৩। ভুলে যাওয়া ৪। ভয় ৫। লজ্জা ৬। অকারণ উৎকণ্ঠা ৭। নির্জনতাপ্রীতি।

নিজেরাও একটু সংযত হয়ে চলবেন

আশে পাশের ঘটনা, আপনার এবং বাড়ীর অন্যান্যের চলা ফেরা, কথা বলার ভেতর দিয়েই শিশু তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজের জীবনের কাঠামো গড়ে তোলে। সব সময় মনে রাখবেন শিশুরা যেমন দেখে, যেমন শুনে তাদের মনে ঠিক তেমনই ছাপ পড়ে যায়। আপনি যখন কারও সঙ্গে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি করেন তখন যেন মনে করবেন না যে আপনার অবোধ শিশুটি চোখ কান বুজে আছে, সে কিছু বুঝতে পারছে না। এইসব পরিবেশ শিশুর জীবনে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে রাখবেন। ছেলেদের সামনে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবেন যাতে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ভব্যতা বজায় রাখতে পারেন।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব কেমন করে ছেলেদের মধ্যে চুরি করা, মিথ্যে বলা ইত্যাদি বদ-অভ্যাসগুলি আসে এবং আমরা মায়েরা এবিষয়ে কতখানি সাহায্য করি তাদের। কি কি উপায় অবলম্বন করলে ঐ অভ্যাসগুলি দূর করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা করব।

—



চম্‌চম্

উত্তম টাট্‌কা ছানা নিয়ে যতটা সম্ভব জল বের করে নিতে হবে। তারপর উত্তমরূপে ময়দার মত চট্‌কিয়ে নিয়ে চম্‌চমের আকারে ছানার গুটি পাকিয়ে তার ভেতর দু-চারটে এলাচের দানা ভরে রাখ্‌তে হবে। এমনভাবে একটি থালায় সাজিয়ে রাখ্‌তে হবে যাতে একটি আর একটির গায়ে না লাগে। ছানার সঙ্গে কিছু ক্ষীর মিশিয়ে নিলে চমচম উপাদেয় হয়। এদিকে উনুনে কড়ায় চাপিয়ে চিনির রস তৈরী করে নিতে হবে, হয়ে গেলে গুটিগুলো ফেলে দিয়ে মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করা দরকার। এভাবে কিছুক্ষণ জ্বাল দেওয়ার পর যখন দেখ্‌বে গুটি-গুলো বেশ শক্ত হয়েছে তখন নামিয়ে নেবে। রসের একটা অংশ আগে কড়া থেকে তুলে আর একটা পাত্রে ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে রেখে দিতে হবে। গরম গুটিগুলো ঝাঁঝরিতে ঝেড়ে ঐ ঠাণ্ডা রসের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু ভালো ডুব্‌বে না, ভাস্‌তে থাক্‌বে; তবুও ২।৩ ঘণ্টা তার ভেতর রেখে দেবে। এদিকে আর একটা পাত্রে সেরখানেক পরিমাণ রস জ্বাল দিতে থাক্‌বে। যখন খুব আঠা আঠা হবে তখন কড়াটা নামিয়ে বীচ মার্‌বে আর ঐ গুটিগুলো তার মধ্যে ছেড়ে দিয়ে মাখামাখা করে নেবে, তাহলেই সুন্দর চম্‌চম্ হবে।

—শ্রীমতী অম্বুজবালা দেবী

আলু-চিঁড়ার ডালনা

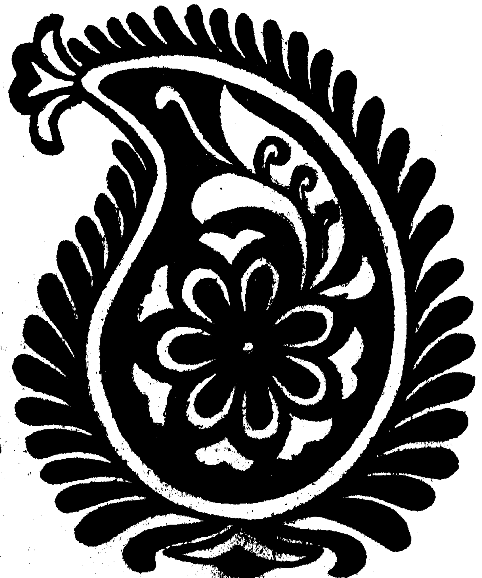
উপকরণ:—আলু, চিঁড়া (অভাবে চাল) পিঁয়াজ, তৈল, লবণ, গরম মসলা, আদা, লঙ্কা, হলুদ, চিনি এবং ঘি।

প্রথমে আলুগুলি ডুমা ডুমা ক'রে কেটে রাখুন। তারপর পিঁয়াজগুলি কুচিয়ে নিন। কড়াতে তেল না দিয়ে চিঁড়ে বা চালগুলি ভেজে রাখুন। তারপরে কড়াতে তেল দিয়ে পিঁয়াজগুলি ভেজে নিন। পিঁয়াজগুলি ভাজা হলে আলুগুলি দিয়ে দেবেন, তারপর আদা, লঙ্কা, হলুদ, পিঁয়াজবাটা দিয়ে আরও একটু তেল দিয়ে দেবেন। তার-পর কস্‌তে থাকুন। বেশ ভাল ক'রে কসা হলে পরিমাণ মত জল, নুন ও একটু চিনি দিয়ে ঢেকে দেবেন। আলুগুলি আধ-সিদ্ধ হয়ে এলে ভাজা চিঁড়ে বা চালগুলি দিয়ে দেবেন। আলুগুলি সিদ্ধ হয়ে গেলে অল্প জল থাকতে থাকতে ঘি ও গরম মসলা দিয়ে নামিয়ে নেবেন।

—শ্রীমতী রাণী চক্রবর্তী

বাগবাজার, চন্দননগর।

আল্পনা—



—ইন্দিরা বিশ্বাস

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'

॥ বিদেশে ভারতীয় চিত্র ॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র সত্যজিৎ রায় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্মিত চিত্র-রূপ "নিউ ইয়র্কে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গেই প্রদর্শিত হচ্ছে আরও জানা গেছে মিঃ হ্যারিসন শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত সব কয়টি ছবিকেই নিউ ইয়র্কে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শনের আয়োজন করবেন বলে স্থির করেছেন। পথের পাঁচালীর প্রথম সপ্তাহের টিকিট বিক্রীর অঙ্ক ৬৩৪৫.০০ ডলার (প্রায় ৩২০০০৲ টাকা) ফিফ্‌থ এভিনিউ সিনেমার, যেখানে 'পথের পাঁচালী' প্রদর্শিত হচ্ছে, রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। গত বৎসরের পাঁচটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত এই বাংলা চিত্রটি নিউইয়র্কের চলচ্চিত্র-অনুরাগী দর্শক ও সমালোচকদের মনে যে বিশেষ



অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত ও নর্মদা পরিবেশিত বরুণ পিক্‌চার্সের মুক্তি প্রতীক্ষিত চিত্র "জন্মান্তর"-এর একটি আবেগ বিহ্বল দৃশ্যে নায়িকা
শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

এবং আরও কয়েক সপ্তাহই শুধু নয়, কয়েক মাস ধরেই এরূপ ভাবে প্রদর্শিত হবে বলে পথের পাঁচালী'র নিউ-ইয়র্কের পরিবেশক এডওয়ার্ড হ্যারিসন্ আশা করেন। আগ্রহের সৃষ্টি করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নিউ-ইয়র্কের চিত্র সমালোচকরা চিত্রটির ভূয়সি প্রশংসা করেছেন, অবশ্য প্রোডাক্‌সনে যে যথেষ্ট খুঁত আছে

সে কথাও তাঁরা বলেছেন। অভিনয় ও শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পরিচালনার প্রশংসা সবাই করেছেন। 'পথের পাচালী' নামের অনুবাদ করেছেন মার্কিণ পরিবেশকরা "Song of the Road" বলে, যদিও Road-এর কথা এতে বিশেষ নেই।

* * * *

এ বৎসর ভেনিসের চলচিত্র উৎসবে যে কয়েকটি চিত্র বিষয়বস্তুর নতুনত্ব এবং গুণগত উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে তাদের মধ্যে বাংলা চিত্র "অযান্ত্রিক" অন্যতম। একটি বিশেষ প্রদর্শনে 'অযান্ত্রিক' এখানকার সমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। এ ছাড়া ভেনিস চলচিত্র উৎসব সমিতির যে নিজস্ব ফিল্ম লাইব্রেরী আছে ও যাতে গত ছাব্বিশটি উৎসবের বিশেষ গুণসম্পন্ন বাছাই করা চিত্র সকল সংরক্ষিত আছে, সেখানে রাখবার জন্য বর্ত্তমান উৎসবের বাছাই করা কয়েকটি চিত্রের মধ্যে 'অযান্ত্রিক'-ও স্থান পেয়েছে।

* * * *

ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের "ডাক্ হরকরা" গল্পের অগ্রগামী পরিচালিত চিত্ররূপ ইউরোপের বহুস্থানে সাফল্যের সঙ্গেই প্রদর্শিত হচ্ছে। আরও জানা গেছে সোভিয়েৎ গভর্ণমেণ্টও এই চিত্রটি টেলিভিসনে সারাদেশে প্রদর্শন করবার ব্যবস্থা করছেন। ফ্রান্সের Motion Picture Academy-ও তাঁদের ফিল্ম লাইব্রেরীর জন্য 'ডাক্ হরকরার' একটি প্রিণ্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন।

* * * *

কিছুদিন আগে রাজকাপুর পরিচালিত "বুট্ পালিশ" চিত্রটি নিউ ইয়র্ক শহরে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয়ে দর্শক ও সমালোচকদের প্রভূত প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। আমেরিকার "টাইম্স" পত্রিকা এই ছবিটিকে একটি দুর্লভ রত্ন ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন।

* * * *

খবরাখবর ঃ

"পথের পাচালী"-খ্যাত পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়কে ব্রাসেলস্-এ যে সব চলচ্চিত্রের স্থায়ী মূল্য আছে তাদের নির্ব্বাচনের জন্য অন্যতম জুরি রূপে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। এরূপ সম্মান ইতিপূর্ব্বে আর কোনও ভারতীয় চিত্র-নির্ম্মাতাকে দেওয়া হয় নি। শ্রীরায় শীঘ্রই ব্রাসেলস্ যাত্রা করবেন। তবে সম্ভবত তিনি 'জুরর'-এর আসন গ্রহণ করবেন না।

* * * *

এক সময়ের জনপ্রিয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী লীলা দেশাই তাঁর অবসর জীবন থেকে আবার চলচ্চিত্রক্ষেত্রে পুনরাগমন করেছেন—তবে অভিনেত্রীরূপে নয়, প্রযোজকরূপে। তাঁর প্রথম চিত্র হবে রবীন্দ্রনাথের "কাবুলীওয়ালা"র হিন্দী সংস্করণ। "কাবুলীওয়ালা"-র বাংলা সংস্করণটি প্রভূত সুনাম এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিও অর্জ্জন করেছে, তাই আশা হয় শ্রীমতী দেশাই প্রযোজিত এর হিন্দী সংস্করণটিও সাফল্যলাভ করবে। বোম্বের কারদার ষ্টুডিওতে 'কাবুলি-ওয়ালা'-র মোহরৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং শীঘ্রই পরিচালক ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম প্রকাশিত হবে।

* * * *

পরিচালক-প্রযোজক শ্রীবিমল রায়ের নতুন চিত্র "অমৃত কুম্ভের সন্ধানে" কলিকাতাতেই নির্ম্মিত হবে বলে জানা গেছে। শ্রীরায় "পাঁচ লাখ" নামে আর একটি নতুন হিন্দী কমেডি চিত্রও নির্ম্মাণ করবেন।

* * * *

রাজকাপুরের নতুন চিত্র "জিস্ দেস মে গঙ্গা বহতি হৈ"-এর কাজ বোম্বেতে আরম্ভ হয়ে গেছে। চিত্রটির প্রধান ভূমিকাদ্বয়ে অভিনয় করবেন রাজকাপুর ও দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী শ্রীমতী পদ্মিনী। ক্যামেরাম্যান্ শ্রীরাধু কারমারকারের ওপর চিত্রগ্রহণই শুধু নয়, চিত্র পরিচালনার ভারও দেওয়া হয়েছে এবং এটাই হবে তাঁর প্রথম চিত্র-পরিচালনা।

* * * *

পরিচালক শ্রীকার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় তাঁর "জল জঙ্গল" চিত্রের চিত্রগ্রহণের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁর দলবল নিয়ে ও সেই সঙ্গে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রতটের উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঘূর্ণাবাত্যা বয়ে গেল তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছেন,—আর এই দারুণ দুর্য্যোগের মধ্যেও বিপদ মাথায় করে এই

ভীষণ ঝড়ের কয়েকটি প্রকৃত দৃশ্য, যা ইতিপূর্ব্বে বাংলা চিত্রে দেখা যায় নি, তুলে এনেছেন।

* * * *

পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার 'আর্ট এণ্ড কালচার পিক্‌চার্স'-এর নতুন চিত্র "অগ্নি-সম্ভবা"-র কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

শ্রীসমরেশ বসুর উপন্যাস অবলম্বনে রচিত "কুহক" ছবিটির পরিচালনা করবেন অগ্রদূত। নামের ভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার।

অগ্রগামী পরিচালনা করবেন শ্রীনরেন্দ্র মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত "হেড্‌মাষ্টার" চিত্রটি।

বনফুলের জনপ্রিয় গল্প "কিছুক্ষণ" চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করবেন শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, আর সংলাপ রচনা করেছেন বনফুল নিজেই। নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

পরিচালক শ্রীসচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার তাঁর বিচিত্র চিত্র "যাত্রী"-র চিত্রগহণ প্রায় শেষ করে এনেছেন। পিপল্‌স প্রোডাক্‌শনের সহযোগীতায় 'যাত্রী' শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

ইন্দ্র প্রডাক্‌শনের নির্মীয়মান চিত্র "নৃত্যেরই তালে তালে'-র বহির্দৃশ্যের চিত্রগহণের জন্য প্রায় শতাধিক শিল্পীসহ পরিচালক শ্রীসুধীরবন্ধু মুসৌরী রওনা হয়েছেন। শিল্পীর দলে বোম্বাইএর গোপীকৃষ্ণ, মাদ্রাজের রাগিণী এবং বাংলার ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি আছেন।

'মা চিত্রম'-এর নূতন চিত্র 'কিশোর 'কবি-'র নাম পরিবর্ত্তন করে "আবার ভোর হবে" রাখা হয়েছে। ফুট্‌পাথের চলমান জনতার জীবনের কাহিনী নিয়েই চিত্রটি রচিত হচ্ছে। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন শ্রীপরেশ মজুমদার, সঙ্গীত পরিচালনায় আছেন শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং অভিনয় করছেন শ্রীকমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, শোভা সেন প্রভৃতি।

* * * *



মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের Brattleboro, Vermont-এর নিকটবর্ত্তী Dummerston-এ Robert Flaherty, যাঁকে "Father of the Documentary Film" বলা হয়, তাঁর স্মৃতিতে যে Annual Flaherty Seminar অনুষ্ঠিত হয় সেই উৎসবের চতুর্থ বার্ষিক সেমিনারে এবার 'পথের পাঁচালী'-খ্যাত ভারতীয় চিত্রপরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় উপস্থিত ছিলেন। চিত্রে প্রথমের সারিতে শ্রীরায়কে Robert Flaherty-র ভ্রাতা David Flaherty বিধবা পত্নী Mrs. Frances Flaherty-র সঙ্গে সেমিনারের শেষ দিনের সন্ধ্যায় গায়ক Richard Dyer-Bennett-এর সঙ্গীত উপভোগ করতে দেখা যাচ্ছে।

বিদেশী খবর :

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আর্ট ও টেক্‌নিক হিসাবে চলচ্চিত্র শিল্প শিক্ষা দেওয়া ক্রমশই বাড়ছে। মোসান্ পিক্‌চারস্ এসোসিয়েসন্ অফ আমেরিকা খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের ১৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৯১০টিতে চলচ্চিত্র আজকাল ক্লাসে পড়ানর বিষয় হয়ে

উঠেছে। এরূপ অনেক ইন্‌ষ্টিটিউসানে ষ্টুডিও ওয়ার্কসপ্‌ও আছে যেখানে চলচ্চিত্র বিষয়ে কিছুটা অগ্রসর ছাত্রদের তাদের জ্ঞান অনুযায়ী পরিচালনা-প্রযোজনা করে নিজেদের চিত্র নির্ম্মাণের সুযোগ দেওয়া হয়। এই রকম আটটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র বিষয়ে ব্যাচিলর ডিগ্রী প্রদান করে এবং চারটি দেয় মাষ্টারস ডিগ্রী। এছাড়া প্রায় সমস্ত স্কুলেই চলচ্চিত্রকে শিক্ষার সহায়করূপে কাজে লাগান হয়। ফিল্ম কোম্পানীগুলিও এ বিষয়ে সহযোগীতা করেন ক্লাসের জন্য প্রিণ্টের যোগান দিয়ে, আর প্রায় ১০০০০ প্রিণ্টস এখন ব্যবহৃত হচ্ছে।

* * *

এই বৎসর ইউনিভারসিটি অফ্ সাদার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া ৫৮টি চলচ্চিত্র প্রস্তুত করেছে। এই সংখ্যা হলিউডের যে কোনও বড় ষ্টুডিও কর্তৃক নির্ম্মিত চিত্রের সংখ্যার চেয়ে বেশি। এর মধ্যে এগারটিকে মনোনীত করা হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র বিভাগের বিশিষ্ট কার্য্যরূপে।

এই সাউদার্ণ ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুত চলচ্চিত্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র এবং বাহিরেও বেশ সাফল্যজনক ভাবেই প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ভেনিস ও এডিন্‌বার্গ চলচ্চিত্র উৎসবে কতকগুলি পুরস্কার লাভ করা ছাড়াও Screen Producers Guild Awards প্রদত্ত ১৫টি পুরস্কারের মধ্যে ছয়টি পুরস্কার গত পাঁচ বৎসরে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুত একটি ডকুমেণ্টারী চিত্র "The Face of Lincoln" ১৯৫৬ সালে Academy Award (Oscar) লাভ করেছে।

* * * *

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের Texas অঞ্চলের ২৩ বৎসর বয়স্ক পিয়াণ-বাদক Van Cliburn-এর নাম মস্কোয় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সঙ্গীত প্রতিযোগীতায় বিজয়ী রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। এই Tchaikovsky International Piano প্রতিযোগীতায় আরও একজন মার্কিণী Los Angeles-এর Daniel Pollackকে নয় জন ফাইনালিষ্টের মধ্যে সর্ব্বশেষে স্থান দেওয়া হয়েছে। Van Cliburn ২৫০০০ রুবল (৬২৫০) প্রথম পুরস্কার হিসাবে লাভ করেছেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে একটি ছোট Concert Ttour-ও করবেন। এই প্রতিযোগীতার ১৬ জন বিচারকের মধ্যে রাশিয়ার ছয় জন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

* * * *

২৩ বৎসর বয়স্কা জাপানী অভিনেত্রী Nobu McCarthy খ্যাতনামা হাস্যরসিক অভিনেতা Jerry Lewis-এর সঙ্গে Paramount film-এর "The Gaisha Boy" চিত্রে অভিনয় করছেন। Nodu কানাডার Ottawa অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করলেও জাপানেই বড় হয়েছেন এবং সেখানেই তাঁর অভিনেত্রী জীবনের সূত্রপাত। তাঁর আমেরিকান স্বামী David McCarthy-র সঙ্গে জাপানেই তাঁর প্রথম দেখা হয়।

* * * *

॥ "মায়ামৃগ"-র শততম অভিনয় ॥

রঙমহল রঙ্গমঞ্চে শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্তর "মায়ামৃগ" নাটক গত ২৩শে সেপ্টেম্বর শততম অভিনয় অতিক্রান্ত করেছে। এই উপলক্ষে রঙমহলে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার স্পীকার শ্রীশঙ্কর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন বিচারপতি শ্রী জে, পি, মিত্র। রঙমহলের শিল্পী ও কর্ম্মীদের পারিতোষিক রূপে গিরিশচন্দ্রের প্রতিকৃতযুক্ত রৌপ্যপদক বিতরন করেন শ্রীঅহিন্দ্র চৌধুরী।

অভিনয়ের দিক দিয়ে 'মায়ামৃগ' নাটকটি যে আকর্ষণীয় হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং আবেগময় অনেক দৃশ্য নাটকটির মধ্যে থাকায় সহজেই দর্শক মনকে অভিভূত করতে পারে। গল্পটিও চরম আধুনিক না হলেও বাস্তবতা বর্জ্জিত নয় এবং সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ, সে সন্তান পালিতই হোক বা নিজেরই হোক, যে কিরূপ, আর সেই অনির্ব্বাণ স্নেহের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তা এই নাটকটির প্রায় প্রতিটি দৃশ্যেই ফুটে উঠেছে, আর প্রায় প্রতিটি অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ই সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য—সাবিত্রীর ভূমিকায় নাট্যসম্রাজ্ঞী সরযূবালা, অমিয়নাথের ভূমিকায় নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিভূতির ভূমিকায় সত্য বন্দোপাধ্যায়, সীতার ভূমিকায় কেতকী দত্ত, মহেন্দ্রের ভূমিকায় রবীন মজুমদার এবং শুভ্রর ভূমিকায় নবকুমারের অভিনয়। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনাও প্রশংসাযোগ্য হয়েছে।

এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য কলিকাতার দর্শক সমাজ যে অধুনা নাটক অভিনয়ের প্রতি ক্রমশই আসক্ত হয়ে পড়ছেন তা কলিকাতার তিনটি রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকগুলির একশত, দুইশত বা তিনশত অভিনয় অতিক্রান্ত করার থেকেই প্রমাণ হয় এবং আশা করা যায় এরূপ ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার ফলে কলিকাতার রঙ্গালয়গুলির শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে, আর বাংলা নাট্যসাহিত্যও আরও উন্নতির পথে এগিয়ে চলবে।

শিল্পীর কথা

'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা'……

কুমারেশ ভট্টাচার্য

এ জগতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে সংগে নিয়ে পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল। জন্মান্তরের সাধনা ও সুকৃতির ফলেই এ জন্মে অনেকের মধ্যে দেখা যায়, শৈশব থেকেই সাহিত্য-সংগীত-বিজ্ঞান ও নানাবিধ শিল্পের প্রতি তাদের প্রবল অনুরাগ। তারপর অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগ পেলে তাদের প্রতিভা শতদলের মত হয় বিকশিত।

আজ থেকে ৪২ বৎসর পূর্বের কথা। কোলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী মাধবচন্দ্র দাঁ মশাইয়ের বাড়ীতে হ'চ্ছে সৌখীনদলের যাত্রাভিনয়। লোকে লোকারণ্য—তিল ধারণের স্থান নেই। ছ' সাত বছরের একটি বালক তার দাদার সংগে গেছে যাত্রা শুনতে। চোখে নেই তার ঘুম। একাগ্রমনে সে শুনছে গান। ছেলেটির ডাক নাম 'কালো'।

তার পরদিন থেকেই আপনমনে সে গাইত যাত্রার সেই গান। কী সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, কী অপূর্ব সুরঝংকার বালকটির গানে। বাড়ীর সবাই হলেন মুগ্ধ তার গান শুনে। মা অনুরোধ করলেন বাবাকে, 'কালো'র জন্যে ভাল একজন সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত করতে। স্বর্গীয় সংগীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ দত্ত মশাইয়ের কাছে শুরু হ'ল বালকের সংগীত শিক্ষা। বলরাম দে ষ্ট্রীটে নগেনবাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই আসতেন ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ বাদল খাঁ। একদিন সেখানে বালকটি গান গাইছে, নগেনবাবু ছাত্রকে দিচ্ছেন তালিম, এমনি সময়ে ওস্তাদ বাদল খাঁ এসে বালকের গান শুনে থমকে দাঁড়ালেন দরজার আড়ালে। কয়েক মিনিট উভয়ের অলক্ষ্যে তন্ময় হ'য়ে শুনলেন সেই গান। পরে ভেতরে এসে সস্নেহে বালকটিকে আদর ক'রে নগেনবাবুকে বললেন, এ বাচ্চা কোন হ্যায়? এ কাহা রতা হ্যায়? নগেনবাবু উত্তর দিলেন,



শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

আমার বন্ধুর ভাইপো—পাশেই থাকে। সেদিন থেকে বাদল খাঁ সাহেবের ইচ্ছা হয় যে তিনি বালকটিকে তালিম দেন। তারপর যোগাযোগ হ'লে খাঁ সাহেব আমৃত্যু তাকে আন্তরিকভাবে শিখিয়েছেন গান। বালকটির অপূর্ব গানে ওস্তাদজী সেদিন এমনিই মুগ্ধ হয়েছিলেন। জহুরীর পক্ষে জহর চেনা খুবই সহজ। সেদিনকার সেই বালকই বাংলার ও বাঙালীর গৌরব, সর্বজনপ্রিয় ভারত বিখ্যাত সংগীত-সাধক শ্রদ্ধেয় শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া গ্রাম ছিল সাধক বামাক্ষ্যাপার বংশধর অতি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ৺আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মশায়ের পৈতৃক বাসস্থান। তাঁর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ তারাপ্রসন্ন ও কনিষ্ঠ ভীষ্মদেব। ভীষণ ম্যালেরিয়ার ভয়ে ভীত হ'য়ে চট্টোপাধ্যায় মশাই সপরিবারে কোলকাতায় এসে বাস করতে থাকেন। পুত্রদুটীকে প্রকৃত মানুষ ক'রে তুলতে পিতামাতার চেষ্টা ও যত্ন ছিল অপরিসীম। তারাপ্রসন্নবাবু ছিলেন মেগাফোন কোম্পানীর সুযোগ্য ম্যানেজার এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় উক্ত কোম্পানী একদিন উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। সংগীত চর্চার সংগে সংগে ভীষ্মদেব প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে বিদ্যাসাগর কলেজে আই, এস-সি, পড়তে থাকেন। উপনয়নের পর বার বৎসর পর্যন্ত তিনি গেরুয়া পরিধান করেছেন, মাথায় রেখেছেন লম্বা চুল, সাত্ত্বিকতা বজায় রেখেছেন আহারে ও বিহারে। খেয়াল ও ঠুংরী গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে তিনি রূপোর সেতার পুরস্কার পান। উক্ত কলেজ থেকেই তিনি আই, এস, সি পাস করেন। তাঁর যখন ২২ বৎসর বয়স তখন মেগাফোন কোম্পানী তাঁর কয়েকখানা রাগ প্রধান হিন্দী ও বাংলায় খেয়াল ও ঠুংরী গান রেকর্ড করেন। তখনকার ঐ গানগুলো আজও বেতারে জনসাধারণ শুনতে পান। এর কিছুদিন পরেই তিনি মেগাফোন কোম্পানীর 'মিউজিক ডিরেক্টার' নিযুক্ত হন। এসময় বাংলাদেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ভীষ্মদেবের গানে। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর নাম ও যশ ছড়িয়ে পড়ে সারাভারতে।

ইংরেজী ১৯৩৫ সাল। বেনারস শহরে শুরু হয়েছে নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। ভারত বিখ্যাত প্রায় সমস্ত ওস্তাদই সমবেত হয়েছেন সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে। সারা শহর হয়ে উঠেছে যেন প্রাণবন্ত, চঞ্চল। অগণিত শ্রোতা। প্যাণ্ডেলের ভেতরে ও বাইরে তিলধারণের স্থান নেই। সংগীতের অপূর্ব সুরে শহরটী যেন প্রকম্পিত। বাংলা থেকে এসেছেন ২৪ বৎসর বয়স্ক যুবক ভীষ্মদেব তাঁর দাদার সংগে। প্রথমদিনে তিনি কোন প্রোগ্রাম পাননি। দ্বিতীয় দিন প্রায় অতীত হ'তে চলল, তবুও নয়। চিন্তিত হলেন তারাপ্রসন্ন, উৎকণ্ঠিত হলেন ভীষ্মদেব। হঠাৎ দেখা হোল কাশীপ্রবাসী বাঙালী সংগীতজ্ঞ ননীলাল মতিলাল মশাইয়ের সংগে। তিনি ছিলেন উক্ত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন। তিনি সম্মেলনের সম্পাদককে ব'ললেন, বাংলা থেকে এসেছেন ভীষ্মদেব, তাঁর প্রোগ্রাম দেওয়া হয়নি কেন? উত্তরে সম্পাদক ব'ললেন, প্রায় সাড়ে তিনশো আর্টিষ্ট এসেছেন। আমি সবাইকে ঠিকমত প্রোগ্রাম দিতে পারছি না। কিন্তু কালই ভীষ্মদেববাবুর প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে রেখেছি। আসলে কিন্তু বাঙালী বলে প্রথমে তিনি আমলই দিতে চাননি ভীষ্মদেববাবুকে। গত দুদিন ধ'রে পণ্ডিত ওঁকারনাথঠাকুর ও কৃষ্ণরতন ঝংকারের মধ্যে তর্ক চলছিল জোনপুর ও আসোয়ারীর আরোহী ও অবরোহী নিয়ে। তৃতীয়দিন রাত্রে পণ্ডিত ওঁকারনাথ আগে গাইলেন মালকোষ সুরে। তারপরেই ভীষ্মদেবও গাইলেন মালকোষ সুরের গান। যে মালকোষ সুরে রেখা পঞ্চম বর্জিত সেই মালকোষে রেখা পঞ্চম লাগিয়ে, যাকে বলে সম্পূরণ মালকোষ। সে গান শুনে শ্রোতৃবৃন্দ হ'লেন বিস্মিত ও আনন্দিত। বিখ্যাত ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ সাহেব অত্যন্ত তারিফ করলেন। পরেরদিন সকালে ভীষ্মদেব আবার গাইলেন টোরী ও ভৈরবী। তিনি প্রমাণ করলেন, বাঙালীও গান জানে।

১৯৩৬ সালে আগ্রায় অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনে যোগদান ক'রে ভীষ্মদেব লাভ করেন যথেষ্ট সম্মান ও সুনাম। আগ্রা থেকে ফিরে কোলকাতায় ইউনিভার্সিটি হলে অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনে যোগ দেন। সংগে আসেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ। খাঁ সাহেব সেই প্রথম কোলকাতায় এলেন।

১৯৩৭ সালে ফয়জাবাদে অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনে যোগদান করে ভীষ্মদেব লাভ করেন স্বর্ণপদক। সেখান থেকে যান এলাহাবাদ সম্মেলনে। সেখান থেকে আসেন কানপুর সম্মেলনে। এখানে মুসলমান ও বাঙালী বিদ্বেষ ছিল অতি তীব্র। উক্ত সম্মেলনে প্রথম রাত্রে খাম্বাবতী ও ঠুংরী এবং পরেরদিন সকালে দেশী টোরী ও ভৈরবী গেয়ে সবাইকে বিস্মিত করেন ভীষ্মদেব। শ্রোতৃবৃন্দ ছিল প্রকৃত সংগীতানুরাগী তাদের মধ্যে ছিল না মুসলমান বা বাঙালী বিদ্বেষ। এখানে ভীষ্মদেব লাভ করেন দুটী স্বর্ণপদক। তাঁর পরেই ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ গান করেন। কিন্তু খাঁ সাহেব প্রথমেই তাঁকে বললেন, আপনে এ্যায়সা সুর লাগায়া, আভি হামারা সুর লাগানা মুস্কিল হ্যায়।

কানপুর থেকে ভীষ্মদেব যান মথুরায় অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনে। সংগে ছিলেন ফৈয়াজ খাঁ। উক্ত সম্মেলনে সে

সব ওস্তাদ গান গাইতে আরম্ভ করেন শ্রোতারা তাঁকেই হাততালি দিয়ে, শীষ দিয়ে, বিদ্রূপ করে তুলে দেন। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ বললেন, ইন্‌লোগ্ কেয়া মাঙতা হ্যায়? তামাম্ হিন্দুস্তান মে গানা গায়া লেকিন্ কোই জায়গা মে সিটি তালি নেই দিয়া। হিঁয়াপর কেয়া গানা গায়েঙ্গে। পরে ভীষ্মদেবকে বললেন, পহেলে হামকো গা নে দিজিয়ে, হামারা পিছে আপ্ গায়েঙ্গে। খাঁ সাহেব গাইলেন গজল। তারপর ভীষ্মদেব তাঁর দাদার নির্দেশে বাহার খেয়াল ও ভজন গাইতে শুরু করেন। কী আশ্চর্য, অশান্ত শ্রোতৃবৃন্দ যেন মন্ত্রশান্ত ভুজংগের মত স্তব্ধ হ'য়ে শুনল তাঁর গান।

১৯৩৮ সালে সিন্ধী প্রদেশে শিকারপুর সম্মেলনে, এলাহাবাদ, দিল্লী ও আগ্রায় অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনে যোগদান ক'রে ভীষ্মদেব বাঙালী ও বাঙলার মুখোজ্জ্বল করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত সংগীত সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হ'য়ে তিনি যোগদান করেছেন তার কোনস্থান থেকেই তিনি কোনদিন একটি পয়সাও গ্রহণ করেননি। ইহাও তাঁর একটি বিশেষত্ব।

১৯৩৭ সালে ভীষ্মদেব মেগাফোন কোম্পানির চাকরী ছেড়ে দিয়ে ফিল্ম কর্পোরেশনের মিউজিক ডিরেক্টার নিযুক্ত হন।

১৯৪০ সালে তিন মাসের ছুটী নিয়ে আগষ্ট মাসে তিনি যান পণ্ডিচেরী আশ্রমে। তিনমাস কেটে যায় তবুও ফেরবার নামটী নেই—পত্রেরও নেই কোন জবাব। অবশেষে তাঁর বিশেষ অনুরক্ত ছাত্র পূর্ণিয়া জেলার বনেলী রাজষ্টেটের কুমার সামনন্দ সিংহ, দাদা তারাপ্রসন্ন, উৎকণ্ঠিতা মা ও ভীষ্মদেবের নাবালক পুত্র—এই চারজন যাত্রা করেন পণ্ডিচেরী আশ্রমের উদ্দেশে। সেখানে ভীষ্মদেবের সংগে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন যে সংসারে পুনরায় ফিরে যেতে তাঁর মোটেই ইচ্ছা নেই। তারপর তাঁর মায়ের একান্ত চেষ্টায় আশ্রমকর্ত্রী শ্রীমার অনুমতি পাওয়া গেল। মাত্র ১৫ দিনের জন্তে তিনি বাড়ী এলেন। কিন্তু বাড়ীর সকলের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় তিন মাস কেটে গেল। সবাই চায় তাঁকে সংসারে রাখতে। ভীষ্মদেববাবুরও আশ্রমে যাবার খুব ইচ্ছা ছিল না বটে কিন্তু যখনই তিনি আয়নার কাছে গিয়ে নিজের মুখ দেখতেন তখনই বলতেন, আমায় আশ্রমের শ্রীমা ডাকছেন। আমি আর বাড়ীতে থাকতে পারছিনা।

তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন পুনরায় আশ্রমে যাবার জন্তে। এ সময়ে তাঁকে রাখা হয় বনেলীরাজষ্টেটে তাঁর ছাত্রের বাড়ীতে। সেখানে থাকীবাবা নামে এক হিন্দুস্থানী সাধু বলেন—ওঁকে যেতে দাও আশ্রমে নতুবা ভীষণ ক্ষতি হবে। আবার তিনি চলে যান পণ্ডিচেরী আশ্রমে। বাড়ীর সবাই, বিশেষ ক'রে স্নেহশীলা মা অত্যন্ত আঘাত পেলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত সাধিকা। সে সময় থেকে তিনি শুধু চা ও আলুর খোসা সিদ্ধ খেয়ে মাসের পর মাস, বছরেরপরবছর কাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি বলতেন, ভীষ্ম আবার ফিরে আসবে। আমার সাধনার ফলে আর অন্তরের আকুল আহ্বানে সে ফিরে আসতে বাধ্য। মায়ের কথাই ঠিক হ'ল। ১৯৪৭ সালে ভীষ্মদেব বাড়ীতে এলেন পুনরায়। মা ফিরে পেলেন তাঁর হারানিধি।

তিনি বাড়ীতে এলেন বটে কিন্তু সাধক হিসেবে নয়—কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে। পৌঁছে দেবার জন্তে সংগে এলেন আশ্রমের দুটি লোক। তিনি বলতেন, আশ্রমে যাবার ছ'মাসের মধ্যেই আমার গান আমি শ্রীমাকে দিয়ে দিয়েছি—কারণ তিনি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন। কিন্তু পূর্বজন্মের এমনিই সাধনা যে বাড়ীতে এসে নিজের ইচ্ছামত তিনি গান গাইতেন।

পণ্ডিচেরী থেকেই তিনি হার্নিয়া, হাইড্রোসিল, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে আসেন। এবং ভোগ করতে থাকেন রোগযন্ত্রণা। গত বৈশাখ মাসে মেডিকেল কলেজের নামকরা সার্জেন সুধীর দত্ত মশাই অপারেশন করেন। নিয়মিত খবরাখবর নিতে থাকেন মাননীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বর্তমানে ভীষ্মদেববাবু সুস্থ আছেন।

ভীষ্মদেববাবুর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ ও সংগীতজগতে তাঁর পুনঃ আত্মপ্রকাশের আশায় তাঁর অনুরক্ত কয়েকজন সংগীতানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে ও উদ্যোগে সুপরিকল্পিতভাবে কয়েকদিন পূর্বে ৪৯, সিমলা ষ্ট্রীটে 'ভীষ্মদেব সংগীত পরিষদ' নামে একটি সংগীত-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর '৫৮ সন্ধ্যায় যুগান্তর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে বেশ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে উক্ত পরিষদের প্রথম আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। কোলকাতার মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন ছিলেন প্রধান অতিথি। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংগীতজ্ঞ শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে।

'নবারুণরাগে তুমি সাথী গো', 'জাগো আলোক লগনে' 'যদি মনে পড়ে সেদিনের কথা" প্রভৃতি ভীষ্মদেবের অসংখ্য গান বাঙালী কোনদিন ভুলবেনা। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শচীনদেব বর্মন, প্রতিমা ব্যানার্জী, যূথিকা রায়, কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী, প্রকাশকালী ঘোষাল প্রভৃতি সর্বজনপ্রিয় শিল্পী।

ভীষ্মদেববাবুর বয়স এখন ৪৯ বৎসর। আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি ভীষ্মদেববাবুর শারীরিক সুস্থতা, সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন। আমরা আশা করি, তিনি আবার নীরোগদেহে, বিপুল উৎসাহে সংগীত চর্চায় আত্মনিয়োগ ক'রবেন।





শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়



সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৮ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উভয় পক্ষে একটি ক'রে গোল হওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। মোহনবাগানের পক্ষে অধিনায়ক এস ব্যানার্জি প্রথম গোল করেন এবং এই গোলের অব্যবহিত পরেই মোহনবাগান দলের রাইট-হাফ কেম্পিয়ার আত্মঘাতি গোলে ফলাফল সমান ১-১ দাঁড়ায়। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষই আর গোল দিতে পারে নি। ফলে আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলাটি অমীমাংসিত থাকে। জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণের জন্য পুনরায় খেলার কথা, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে কিনা এবং হলেও কোন্ নির্দ্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ, পুলিস কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ আই এফ এ শীল্ড খেলাটি পুনরায় চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলানোর পক্ষপাতী অপর দিকে প্রতিদ্বন্দ্বীদল মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষ 'চ্যারিটি ম্যাচ' খেলানোর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এই তিন কর্তৃপক্ষের টানাপড়েনে শেষ পর্য্যন্ত আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলাটির কি দশা দাঁড়াবে—তা আপাততঃ দর্শক সাধারণ মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছেন। পূজার ব্যয় বরাদ্দ, আনন্দ-উৎসব, দুঃশ্চিন্তা এসব মিলিয়ে ক'লকাতা সহর সরগরম হয়ে উঠেছে। ১৯৫৮ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলার ভাগ্য আপাততঃ সিঁকেয় তোলা রইলো।

১৯৫৮ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় শেষ আটটি দলের সংক্ষিপ্ত ফলাফল দাঁড়িয়েছিল: মহামেডান স্পোর্টিং-৩ : মহমেডান স্পোর্টিং (ঢাকা)- ; মোহনবাগান-২ : জামসেদপুর-১ ; ইস্টবেঙ্গল-৩ : ওয়াড়ী-১ ; ইস্টার্ণ রেলওয়ে-১ : অন্ধ্র পুলিশ-৩। প্রথম ভাগের সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ১-০ গোলে প্রখ্যাত অন্ধ্রপুলিস দলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে ওঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ১-০ গোলে মহামেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত ক'রে দ্বাদশ বার আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার যোগ্যতা লাভ করে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবছর নিয়ে দশবার আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ওঠে। তাদের গত ৯ বারের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল পাঁচবার আই এফ এ শীল্ড জয়লাভ করে এবং সেই পাঁচবারের মধ্যে উপর্য্যুপরি তিনবার আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়। এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান পাঁচবার আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে এবং ১৯৫২ সালে মোহনবাগান-রাজস্থানের ফাইনাল খেলাটি দুটি অমীমাংসিত খেলার পর শেষ পর্য্যন্ত বাতিল হয়ে যায়।

ইলিয়ট শীল্ড ফাইনাল ঃ

১৯৫৮ সালের ইলিয়ট শীল্ড ফাইনালে সুরেন্দ্র কলেজ (আর্টস) ৩-০ গোলে গত বছরের বিজয়ী আশুতোষ কলেজকে পরাজিত করে।

সার্ভিসেস ফুটবল ঃ

১৯৫৮ সালের সার্ভিসেস ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় সাউদার্ণ কমাণ্ড ৭ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। এ নিয়ে তারা উপর্য্যুপরি পাঁচবার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলো।

সন্তরণে বিশ্ব রেকর্ড ঃ

ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত একসভায় মিলিত হয়ে ইণ্টার ন্যাশানাল সুইমিং ফেডারেশন (F. I. N. A) সন্তরণে যে সব রেকর্ডকে বিশ্বরেকর্ড হিসাবে অনুমোদন করেছেন তার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তালিকায় দেখা যায়, অষ্ট্রেলিয়ার সাঁতারুদের ৫২টি রেকর্ড বিশ্বরেকর্ড হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার এই ৫২টি অনুমোদিত বিশ্বরেকর্ডের মধ্যে আছে ৪৩টি ব্যক্তিগত রেকর্ড এবং ৯টি রীলে রেকর্ড। এই ৫২টি রেকর্ডের মধ্যে সিডনির ১৬ বছরের স্কুল-ছাত্র জন কনরাডস একাই বিশ্ব-রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন সাঁতারের ৪টি অনুষ্ঠানে এবং তাঁরই ১৪ বৎসরের ভগ্নী ইল্‌সা কনরাডস করেছেন ৬টি অনুষ্ঠানে। অর্থাৎ একই পরিবারের দু'জন—ভ্রাতা ও ভগ্নী মিলিত হয়ে ২০টি বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। ক্রীড়া জগতে এই রকমের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

পুরুষদের ফ্রি ষ্টাইল

২০০ মিটার—কনরাডস (অষ্ট্রেলিয়া), সময়—২ মিঃ ৪'৮ সেঃ ও ২ মিঃ ৩'২ সেঃ ; ইয়ামানাকা (জাপান) সময়—২ মিঃ ৩ সেঃ।

২২০ গজ—কনরাডস ; সময় ২ মিঃ ৪'৮ সেঃ ও ২ মিঃ ৩'২ সেঃ।

৪০০ মিটার—কনরাডস ; সময়—৪ মিঃ ২৫'৯ সেঃ ও ৪ মিঃ ২১'৮ সেঃ।

৪৪০ গজ—কনরাডস ; সময়—৪ মিঃ ২৫'৯ সেঃ ও ৪ মি ২১'৮ সেঃ।

৮০০ মিটার—কনরাডস ; সময়—৯ মিঃ ১৭'৭সেঃ ও ৯ মিঃ ১৪'৫ সেঃ।

৮৮০ গজ—কনরাডস ;—৯ মিঃ ১৭'৭ সেঃ ও ৯ মিঃ ১৪'৫ সেঃ।

১৫০০ মিটার—কনরাডস ;সময়—১৭ মিঃ ২৮'৭ সেঃ।

১৬০০ গজ—কনরাডস ; সময়—১৭ মিঃ ২৮'৭ সেঃ।

৪ × ১০০ মিটার—অষ্ট্রেলিয়া ; সময় ৩ মিঃ ৪৬'৩ সেঃ।

৪ × ১১০ গজ—অষ্ট্রেলিয়া ; সময় ৩ মিঃ ৪৭'৩ সেঃ।

৪ × ২২০ গজ—অষ্ট্রেলিয়া ; সময় ৮ মিঃ ২৪'৫ সেঃ।

৪ × ১০০ মিটার মিডলে রিলে—জাপান ; সময়—৪ মিঃ ১৭'৮ সেঃ ও ৪ মিঃ ১৭'২ সেঃ। অষ্ট্রেলিয়া, সময়—৪ মিঃ ১৪'২ সেঃ।

ব্যাকষ্ট্রোক

১০০ মিটার—জন মণ্ডকটন (অষ্ট্রেলিয়া) ; সময়—৬১'৫ সেঃ।

১১০ গজ—জন মণ্ডকটন ; সময়—৬১'৫ সেঃ।

২০০ মিটার—মণ্ডকটন ; সময়—২ মিঃ ১৮'৮ সেঃ ও ২ মিঃ ১৮'৪ সেঃ।

২২০ গজ—মণ্ডকটন ; সময়—২ মিঃ ১৮'৮ সেঃ ও ২ মিঃ ১৮'৪ সেঃ।

বাটারফ্লাই

১১০ গজ—ব্রায়ান উইলকিনসন (অষ্ট্রেলিয়া) ; সময়—১ মিঃ ৩'৮ সেঃ। ভি জেকো (রাশিয়া) : সময়—১ মিঃ ৩.২ সেঃ।

বুক সাঁতার

১১০ গজ—টেরী গ্যাথারকোল (অষ্ট্রেলিয়া), সময়—১ মিঃ ১৩'৫ সেঃ, ১ মিঃ ১৩ সেঃ ও ১ মিঃ ১২'৪ সেঃ।

২০০ মিটার—গ্যাথারকোল, সময়—২মিঃ ৪০'৫ সেঃ ও ২ মিঃ ৩৬'৫ সেঃ।

২২০ গজ—গ্যাথারকোল, সময়—২ মিঃ ৪০'৫ সেঃ ও ২ মিঃ ৩৬'৫ সেঃ।

মহিলাদের ফ্রি ষ্টাইল

১০০ মিটার—ডন ফ্রেজার (অষ্ট্রেলিয়া), সময়—৬১'৫ সেঃ, ৬১'৪ সেঃ, ও ৬১'২ সেঃ।

১১০ গজ—ফ্রেজার, সময়—৬২'৪ সেঃ, ৬১'৪ সেঃ ও ৬১'২ সেঃ।

২০০ মিটার—ফ্রেজার, সময়—২ মিঃ ১৭'৭ সেঃ ও ২ মিঃ ১৪.৭ সেঃ।

২২০ গজ—ফ্রেজার, সময়—২ মিঃ ১৭'৭ সেঃ ও ২ মিঃ ১৪'৭ সেঃ।

৮০০ মিটার—ইল্‌সা কনরাডস (অষ্ট্রেলিয়া), সময়—১০ মিঃ ১৭'৭ সেঃ, ১০ মিঃ ১৬'২ সেঃ ও ১০ মিঃ ১১'২ সেঃ ও ১০ মিঃ ১১'৮ সেঃ।

৮৮০ গজ—কনরাডস, সময়—১০ মিঃ ১৭'৭ সেঃ, ১০ মিঃ ১৬'২ সেঃ ও ১০ মিঃ ১১'৮ সেঃ।

৪ × ১১০ গজ—অষ্ট্রেলিয়া, সময়—৪ মিঃ ১৮'৯ সেঃ ও ৪ মিঃ ১৭'৪ সেঃ।

৪ × ১০০ মিটার মিড্‌লে রীলে—গ্রেট বৃটেন, সময়—৪ মিঃ ৫৪ সেঃ। হল্যাণ্ড, সময়—৪ মিঃ ৫২'৯ সেঃ।

৪ × ১১০ গজ মিড্‌লে রীলে—গ্রেট বৃটেন, সময়—৪ মিঃ ৫৪ সেঃ।

ব্যাকষ্ট্রোক

১০০ মিটার—ফিলিপা গোল্ড (নিউজিল্যাণ্ড), —সময় ১ মিঃ ১২'৫ সেঃ, মার্গারেট এডওয়ার্ডস (গ্রেট বৃটেন), সময়—১মিঃ ১২'৪ সেঃ, জুডি গ্রিনহাম (গ্রেট বৃটেন), সময়—১ মিঃ ১১'৯ সেঃ।

১১০ গজ—গোল্ড ; সময়—১ মিঃ ১২'৫ সেঃ, এডওয়ার্ডস, সময়—১ মিঃ ১২'৪ সেঃ, গ্রিনহাম, সময়—১ মিঃ ১১'৯ সেঃ।

সাহিত্য সংবাদ

রামগড়ঃ (দ্বিতীয় সংস্করণ)—অনুরূপা দেবী

আলোচ্য গ্রন্থখানি শ্রদ্ধেয়া গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যতম অবদান। গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী 'রামগড়' হ্রদ অবস্থিত। এই হ্রদ সম্বন্ধীয় যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তা অবলম্বন করে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে। কাহিনীর স্তরে স্তরে বৌদ্ধযুগের সমাজ জীবনের আলেখ্য অঙ্কিত হ'য়েছে। 'রামগড়' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত নানা বিবরণীর ভেতর থেকে বুদ্ধদেবের সমকালীন ইতিহাস, শাক্যবংশ ধ্বংসের কারণ, শাক্য ও বৃজি লিচ্ছবি সমাজের তদানীন্তন অবস্থা, রাজন্য পরিবারবর্গের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার গতি ও প্রকৃতি, সামন্তবর্গের ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি জ্ঞাত হবার অবকাশ আছে।

পুরোপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাসের দৃষ্টিতে রামগড়ের উপাখ্যানভাগকে দেখা চলে না। স্থানে স্থানে কিছু কিছু ঐতিহাসিক যোগসূত্রের ত্রুটী বিচ্যুতি থাকা সম্ভব, কল্পনার রঙও কিছু কিছু প্রতিফলিত হয়েছে—এজন্যে উপন্যাসটী অর্দ্ধ ঐতিহাসিক বলা যেতে পারে। বিশুদ্ধ রোমান্সের পরিবেশনে, রসের আভিজাত্যে এবং ব্যঞ্জনার মাধুর্য্যে শ্রদ্ধেয়া লেখিকার মৌলিক সাহিত্য শিল্পপ্রতিভা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

বহু চরিত্রের সমাবেশের ভিতর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়—মর্ম্মস্পর্শী রস সংবেদনা, হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও প্রাণের আবেগের তীব্রতা। স্থানে স্থানে চরিত্রাদর্শগুলি সমুন্নত হ'য়ে উঠেছে। রামগড়ের প্রথম আবির্ভাব বহু বৎসর পুর্ব্বে দেখা যায়, সে সময়ে গ্রন্থখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। বর্ত্তমানে নিঃশেষিত রামগড়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করে প্রকাশকগণ যে বরেণ্য বিবেচনা করেছেন, তার জন্যে তাঁরা প্রশংসাভাজন।

রামগড়ের কাহিনী জন্মলাভ করবার পূর্ব্বে যে ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে, সেটি এখানে আলিম্পিত করা প্রয়োজন বোধ করি। প্রসেনজিতের মৃত্যুর পর যুবরাজ জেতের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ও বৌদ্ধবিদ্বেষী বিরূঢকের সিংহাসনপ্রাপ্তি ঘটলে সিদ্ধার্থ শ্রাবস্তির জেতবন বিহারে আর প্রবেশ করেন নি, তৎপরিবর্ত্তে বৈশালীর বালুকারাম বিহারেই যখন তিনি বেশীরভাগ সময় অতিবাহিত কর্‌ছিলেন, তখন রামগড় উপন্যাসের কাহিনীর প্রাথমিক সূত্রপাত।

বিরাট শুষ্ক মহারণ্যের মধ্যে মহাকরুণার অবতার শ্রীবুদ্ধের চরণ মূলে যে নারীর আর্ত্ত হাহাকার শোনা গিয়েছিল, সেটি দিগন্ত প্রসারী হয়ে নানাদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। বুদ্ধের চরণপ্রান্তে যে করুণ ট্রাজেডির প্রারম্ভিকতা, তার পরিসমাপ্তিও হ্রদের অতল গর্ভে রামগড় দুর্গের বিয়োগান্তক হাহাকারে। সেই নারীর ক্ষুধিত ও পরিত্যক্ত শিশুর রোদন-রব বহুদূর থেকে ভেসে এসে ঐ মহামানবের কর্ণমূলে বারে বারে ধ্বনিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেল। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁরই ধর্ম্মপ্রচারের দিনে সেই শিশুর অনিন্দ্য যৌবনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে একাধিক রাজপরিবারে গৃহদাহের কারণ হয়েছিল,—তারই ব্যথাবেদনার ইতিহাস বৈশালী, শ্রাবস্তী, দেবগড় ও কপিলাবস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত বিবর্ত্তিত হয়েছে। সেই পরমা সুন্দরী যুবতীর জীবনের আলেখ্য অবলম্বন করে যে মহানাটক গড়ে উঠেছে, তারই মহানায়িকা সে—সেই মহারণ্যের মাতৃপরিত্যক্তা শিশু শুক্লারূপেই তাকে জেনেছিলাম। এই মহানাটকের মহানায়ক দেবগড়ের শাক্যকুলোদ্ভব পিতৃমাতৃহীন নির্ব্বাসিত হতভাগ্য যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ।

অম্বরীষ ছদ্মনামে পরিচিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ কোশলের মহা সেনানায়করূপে ঐতিহাসিক জয়যাত্রার মাধ্যমে নির্ম্মমভাবেই শুধু শাক্যকুল নির্ম্মূল করলো না, সুসমৃদ্ধ প্রাচীন রাজদুর্গ রামগড়ের বিজেতা কোশলেশ্বর বিরূঢক দেবের ধ্বংসসাধন করে নিজেরও অস্তিত্ব হারালো। আশ্রয়দাতাকে সে নিশ্চিহ্ন করে কৃতঘ্নতার পরিচয় দিল। ভূগর্ভ রামগড়ের একস্থানে যে গুপ্ত কৌশল ছিল, সে তারই প্রয়োগ করে বিরাট জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করলো, ফলে দুর্গের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত হ্রদের অতল তলে নিমজ্জিত হয়ে গেল, অসংখ্য লোকের জৈবলীলার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মহানাটকেরও যবনিকা পতন হোলো।

শাক্য ও বৃজি-লিচ্ছবি সমাজের অন্তরণ্যে অদৃষ্টের নেপথ্য ইঙ্গিতে যে ধ্বংসের তীব্র দাবানল জ্বলে উঠেছিল তার পশ্চাতে আছে দুইটী সকরুণ ঘটনা। জগতের সমস্ত দুর্ঘটনার মূলে যে আছে নারী,—এই চিরন্তন সত্য আলোচ্য উপন্যাসে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে—দুইটী ঘটনাতেও তা প্রত্যক্ষ করা গেছে। প্রথম ঘটনাটী হচ্ছে দেবগড়ের অধিপতি সুরজিতকে নিয়ে। ইনি যুবরাজ ইন্দ্রজিতের জ্যেষ্ঠতাত,—গোপনে শাক্যেতর বংশীয়া দরিদ্রা সুপ্রিয়ার প্রেমে পড়ে শেষে প্রথম যৌবনের মোহ বশে তার পাণিগ্রহণ করেন, একটি সন্তানও হয়। শাক্যবংশের চিরপদ্ধতি অনুসারে শাক্যবংশ ব্যতীত বিবাহে সামাজিক সম্মান ও রাজ্যাধিকার হয় না,—এই বোধটী তিনি প্রেমের তাড়নায় ভুলে গিয়েছিলেন এবং তার থেকেই হল যত অঘটনের সূত্রপাত।

দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে বিপ্রলব্ধা শুক্লা ও দেবগড়বাসিনী কুলকন্যাগণের সবিতৃমন্দির সমীপে বিপন্নতা এবং মৃগয়াবেশে আগত শ্রাবস্তির যুবরাজ পুষ্পমিত্রের ত্রাণকর্ত্তারূপে তাদের উদ্ধারকল্পে আকস্মিক আবির্ভাব।

এর পরই চলেছে ঘটনার স্তরে স্তরে সংঘর্ষ, বিচ্ছেদ, মান অভিমান

রোমান্টিক পরিবেশ, নৈরাশ্য, হাহাকার ও আত্মবিলাপ। যা হোক যে সব চরিত্র অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছে তন্মধ্যে শুক্লা, সুরজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, সুনন্দিণী, সুপ্রিয়া, বসন্তশ্রী, অরুন্ধতী ও অমিতা উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক চরিত্রই স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মনোজ্ঞ। বৌদ্ধ যুগের রাজতান্ত্রিক জীবনের গভীরতর রহস্যের ছায়াপাত করে, স্বেচ্ছাতান্ত্রিকতার বীভৎসরূপ প্রত্যক্ষ করবার অবকাশ দিয়ে এবং মানুষের উদার সুষমার ভাব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে শ্রদ্ধেয়া গ্রন্থকর্ত্রী রামগড় উপন্যাসকে সাহিত্য-শিল্প-সমৃদ্ধ করেছেন এবং শ্রী বুদ্ধের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ ব্যক্ত করিয়ে সর্বোত্তম আদর্শের দীপশিখা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হা।

গ্রন্থখানি আমরা সাগ্রহে পড়ে আনন্দলাভ করেছি। আশা করা যায় পাঠক পাঠিকাবৃন্দ উপহারোপযোগী এই গ্রন্থ পাঠ করে তৃপ্তিলাভ করবেন। প্রচ্ছদপট অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও প্রশংসনীয়।

[প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৪·৫০]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সুধাঞ্জলি : রচয়িত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, ইংরাজী অনুবাদ : শ্রীদিলীপকুমার রায়।

বইখানি হিন্দীভাষায় ছাপা, সুমুদ্রিত সচিত্র, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের মূল্যবান ভূমিকা সম্বলিত। পড়তে বসলে বোঝা যায় মীরাবাঈয়ের এই ভজন সংগ্রহের উপযুক্ত নামই দেওয়া হয়েছে। মীরার ভজন বলতে যা বোঝায় সুধাঞ্জলির সঙ্গীতগুলি কিন্তু ঠিক তা নয়। এগুলি পরম ভাগবত শ্রীমান দিলীপ কুমার রায়ের কন্যা ও শিষ্যা স্থানীয় কৃষ্ণ প্রেম পাগলিনী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর ভাব সমাধি অবস্থায় পাওয়া এবং গাওয়া 'হরিভক্তি-বিলাসিনী মীরাবাঈয়ের ভজন সমুচ্চয় অমিত ভক্তিমতী ইন্দিরা দেবী হরি গুণ গান শুনতে শুনতে যখন সমাধিস্থ হয়ে পড়েন তখন সেই শ্যাম সোহাগিনী মীরাবাঈয়ের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ঘটে এবং সেই অবস্থায় তাঁর মর্মবীণায় মীরার যে দিব্য ভজন সঙ্গীতগুলি অনুরণিত হয়ে ওঠে সেই গানগুলি তিনি তাঁর পুণ্য-স্মৃতিভাণ্ডার থেকে ভক্তবৃন্দকে পরিবেশন করে দেন। এঁর মধ্যে এমন কয়েকটি গানও আছে যা ইন্দিরা দেবীর আপন ভক্তি-রসোচ্ছলতায় স্বতোৎসারিত সঙ্গীত। এগুলি তাঁর স্বরচিত গান। ভক্ত সাধক শ্রীদিলীপকুমারের ইংরাজী অনুবাদগুলি হিন্দী অনভিজ্ঞদের কাছে বিধাতার আশীর্বাদ বলে মনে হবে।

মীরাবাঈয়ের যে অশ্রুতপূর্ব ভজনাবলী ইন্দিরা দেবীর কৃপায় আমরা পেয়ে ধন্য হয়েছি তার সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর স্বরচিত সঙ্গীতগুলির অনেকটা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ এঁদের উভয়ের হরিপ্রেমে উৎসর্গিত জীবন। গিরিধারী গোপালের প্রতি এই উভয় ভক্তিমতীরই প্রেমাসক্তি সমান প্রবল। "শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু" বলে এঁরা দু'জনেই শ্রীহরির চরণে আত্মনিবেদন করে দিয়েছেন। এঁদের নিজের আর পৃথক সত্তা কিছু নেই। এঁদের অবস্থা সেই "ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্, ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নম্।" সেই শ্রীকৃষ্ণ-গোপাল গদাধরই এঁদের সব।

কাজেই, ইন্দিরা দেবীর শ্রীমুখ নিঃসৃত যে ভক্তি রস-রাগ-রঞ্জিত রচনাবলী আমরা পেয়েছি তার তুলনা মেলা দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার এমন অপূর্ব দিব্য অভিব্যক্তি, প্রেমভক্তি, প্রীতি ও বিরহ মিলনের এমন তীব্র সুন্দর—অনুরাগ মনোহর আনন্দ লীলা কি ভক্তছাড়া আর কেউ এমন প্রাণময় করে বলতে পারে? প্রত্যেকটি ভজন পড়তে পড়তে মনে হয় এ তো কবি কল্পনা নয়, ছান্দসিকের রচনা কৌশল নয় ভাবুকের কাব্য বিলাস নয়! এ যে সর্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রেমানুভূতি ও আত্মোপলব্ধির পরম প্রকাশ! 'ভক্ত সাধকের এই সিদ্ধিলব্ধ প্রেমাবেশ। এ ভক্তজনের রসানুভবেরই সামগ্রী। সমালোচনার বস্তু নয়। এর অলৌকিক রহস্যময় প্রেম তত্ত্ব কেবলমাত্র তাঁদেরই প্রণিধানযোগ্য যাঁরা শ্রীকৃষ্ণচরণে সর্বস্ব সমর্পণের ফলে পরমানন্দ রসাস্বাদনের বিরল সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। ইতিপূর্বে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর আরও দু'খানি ভজন সংগ্রহ 'শ্রুতাঞ্জলি ও 'প্রেমাঞ্জলি' এমনিই ভক্ত-হৃদয়ের আকুল আকুতি নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা তাঁর এই ভগবৎ প্রেরণালব্ধ অপরূপ প্রেমভক্তির প্রসাদলাভে জন্ম ও জীবন সার্থক বোধ করছি। আমাদের কোনও সুকৃতি নেই, তবু যে এই দুর্লভ রসপোভোগের সুযোগ পেলুম এজন্য দিলীপকুমারের কাছে অসীম কৃতজ্ঞ।

[প্রকাশক—হরিকৃষ্ণ মন্দির ? পুনা। মূল্য ৩·৫০। ডিমাই ২০২ পৃষ্ঠা]

নরেন্দ্র দেব

আলোকতীর্থ (১ম খণ্ড) : শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল

গ্রন্থকার সুপণ্ডিত ব্যক্তি এবং নানা শাস্ত্রে বিশেষ করে সংস্কৃত ও হিন্দী সাহিত্যে যে তাঁর বিশেষ দখল আছে এ গ্রন্থের পাতা খোলা মাত্র তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রন্থভাগে শ্রীসুনীলকুমার রায় লিখেছেন—' "প্রচলিত বদ্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ সংস্কারের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও অপাত সত্য-ভ্রান্ত মত পথের নীতি খণ্ডনই মূলতঃ এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য।" উদ্দেশ্য যে সাধু তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু সর্ব্ব শ্রেণীর পাঠক গ্রন্থকারের সর্ব্বরকম মতের সহিত একমত হবেন বলে মনে হয় না। বিশেষ করে কয়েকস্থানে গ্রন্থকারের উক্তি সঙ্গত হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। যেমন,—

২৯১ পৃষ্ঠায় লেখক লিখেছেন "রামকৃষ্ণের প্রতি বিবেকানন্দের সংশয় বরাবরই ছিল।" আবার ২৫৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"তিনি (বিবেকানন্দ) সেখানে (বেলুড়মঠে) প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর ব্রহ্মস্বরূপ গুরুর (রামকৃষ্ণের) প্রতিমূর্ত্তি।" এই দু'টি উক্তির মধ্যে সংগতি লক্ষিত হয় না। আবার,

২৯৯ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন—"তাই বলে রামকৃষ্ণকে যুগাবতার বলে ঢক্কা নিনাদ করা ঠিক যেন কতকগুলি কানার মধ্যে যিনি ঝাপসা দেখেন, তাঁকেই অলৌকিক দৃষ্টি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ দিব্যদর্শী বলার নামান্তর।" এ উক্তির সঙ্গে অনেক পাঠকই একমত হবেন না। এ ছাড়া গ্রন্থকার সারা গ্রন্থে অনেক হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেছেন যার বাংলা প্রতিশব্দের অভাব নেই। বাংলা ভাষায় বাঙ্গালী লেখক যখন বই লেখেন তখন যতদূর সাধ্য বাংলাতেই লেখা উচিত, বিশেষ করে যদি উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাব না হয়। তবে কেউ কেউ আছেন যাঁরা হিন্দী, গুরুমুখী বা ভ্রষ্ট হিন্দী ভাষা-ভাষীর মুখে ধর্ম্ম কথা শুনলে সন্তের বাণী, দাতা দয়ালের বাণী প্রভৃতি মনে করে গদগদ হয়ে পড়েন।

যাই হোক, এ গ্রন্থ পাঠ করে ভারতের স্থানে স্থানে, মঠে, মন্দিরে, আশ্রমে, সৎসঙ্গে ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদের যেসব ভণ্ডামী চলছে পাঠকদের চোখে তা ধরা পড়বে।

[প্রকাশক—ডাঃ বঙ্কিম চৌধুরী। কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর। মূল্য—৭৲ টাকা]

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম" (৩২শ সং)—২৲
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "আলমগীর" (৮ম সং)—২·৫০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'পরিণীতা' (৪২শ সং)—১·৫০, "শ্রীকান্ত" (২য় পর্ব—১৭শ সং)—৩৲
শ্রীসুষমা সেন প্রণীত "হিন্দুনারী"—২·৫০
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত "শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে-অপ্রকাশিত রচনাবলী" (৪র্থ সং)—৫৲
শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবী প্রণীত "নতুন দিনের আলো"—৩৲
দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "চীনের নব-নায়ক"—২·২৫, মুগুরে দাওয়াই"—২·২৫, "ফুলের হীরার-হুল"—২·২৫
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পরলোকের গল্প"—২·২৫

নতুন বাংলা রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

"হিজ্‌ মাষ্টার্স ভয়েস"

N 82787—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবেগভরা কণ্ঠের দু'খানি আধুনিক গান, "ও আমার চন্দ্রমল্লিকা" ও "বনে নয় মনে মোর।"
N 82788—"সেই তুমি" ও "এতো গান নিয়ে এসেছি" আধুনিক গান দুটি মধুর কণ্ঠে গেয়েছেন কুমারী বাণী ঘোষাল।
N 82789—শ্রীমতী মঞ্জুলা গুহঠাকুরতার ভাবাপ্লুত কণ্ঠে গাওয়া দু'খানি রবীন্দ্র সংগীত "কী সুর বাজে" ও "কেন ধরে রাখা"।
N 82790—দু'খানি আধুনিক গান "সন্ধ্যালগনে স্বপ্ন মগনে" ও "চাঁদ তুমি এতো আলো" উদাত্ত মধুর কণ্ঠে গেয়েছেন সুবীর সেন।
N 82792—শ্রীমতী রমলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া দু'খানি সুন্দর আধুনিক গান "ঐ চাঁদ আর তুমি আমি" ও "তোমারেই আমি চিরদিন"।
N 82793—শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে জৌন পুরী ও দেশরাগে গাওয়া "তারি নুপুর" ও "কে রে বাদল মেঘে"।
N 32794—দু'খানি পল্লী গীতি "পাগল হইয়ে বন্ধু" "ও পঙ্খী উড়িয়া যাওরে" দরদী কণ্ঠে গেয়েছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী।
N 87550—দক্ষিণামো'হন ঠাকুর তড়িৎবীন্‌এর মাধ্যমে বাগেশ্রী রাগে আলাপ এবং জোড় ও ঝালা বাজিয়েছেন।
N 87552—ক্লি, বালসরা হারমোনিয়ম ও উইলিভক্সের মাধ্যমে 'বন্ধু' বাণীচিত্রের দু'খানি জনপ্রিয় গানের সুর বাজিয়েছেন।

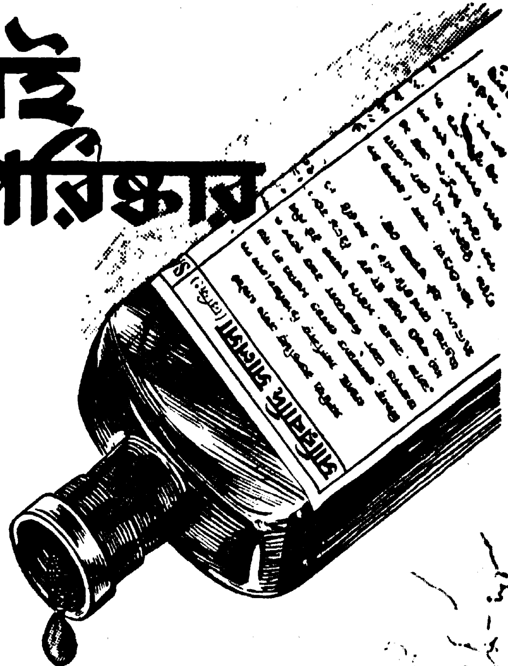
কলম্বিয়া

GE 24897—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া নতুন ধরণের দু'খানি আধুনিক গান—"শেষের কবিতা মোর" ও "তন্দ্রাহারা রাত ঐ"।
GE 24898—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি ভাবমধুর কীর্তন গান "সখি চিকণ কালা" ও "সই না কহ ও সব কথা"।
GE 24899—"বনে যদি ফুটলো কুসুম" ও "পুষ্প বনে পুষ্প নাহি" রবীন্দ্র সংগীত দুটি পরিবেশন করেছেন কুমারী পূরবী সরকার।
GE 24900—"কেন তুমি ডাকো আমায়" ও "আঁধারে প্রদীপ মোর" মন মাতানো সুর দু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন কুমারী গায়ত্রী বসু।
GE 34201—শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান শ্যামল "মাটির" ও "বন ময়ূরা ডাকা"।
GE 24902—দু'খানি অতুল প্রসাদী গান "ওরে বন তোর বিজনে" ও "কে গো তুমি আসিলে" গেয়েছেন শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়।
GE 24904—"মা তোর কিসের এতো" ও "আমার অশ্রুমতির মালা"—দু'খানি শ্যামা সঙ্গীত সার্থক পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।
GE 30400 এবং GE 30401। রেকর্ড দু'টিতে "নাগিনী কন্যার কাহিনী" বাণীচিত্রের তিনখানি গান পরিবেশন করেছেন কুমারী গায়ত্রী বসু, শৈলেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্ত পরিষ্কার করবে!



যে অসংখ্য কোষের সমবায়ে শরীর ও মস্তিষ্ক গঠিত হয়, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমেই তারা পুষ্টিলাভ করে; তাই রক্তকে প্রাণরক্ষার প্রধান উপাদান বলা হয়। সেই রক্তই যখন দূষিত হয়ে পড়ে, তখন স্বভাবতঃই বিবিধ কঠিন ব্যাধির আক্রমণে জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে ওঠে।



সারিবাদি সালসা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবত জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত শোধক মহৌষধরূপে প্রসিদ্ধ। সারিবাদি সালসা সেবনে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, খোস, পাঁচড়া, দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চর্ম্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু সংক্রমণজনিত সমস্ত কঠিন রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, লিভারের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে প্রচুর বিশুদ্ধ নূতন রক্ত সঞ্চারিত হয়।

সারিবাদি সালসা

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্ত পরিষ্কারক মহৌষধ



অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-সি-এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম-বি (কলিঃ), আয়ুর্বেদ-আচার্য্য। ৩৬নং গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

শাখা ও এজেন্সী-পৃথিবীর সর্ব্বত্র

ভাল ভাল উপন্যাস ও গল্প-গ্রন্থ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
স্বপ্নমঞ্জরী ৩৲

সুধাংশুকুমার গুপ্ত
দিব্যদৃষ্টি ২-৫০

চাঁদমোহন চক্রবর্তী
মিলনের পথে ২-৫০ **মায়ের ডাক** ২৲
রামনাথ (চিত্রোপন্যাস) ২-৫০

সনৎকুমার ঘোষ
উত্তরাধিকারী ৩-৫০

অনুরূপা দেবী
গরীবের মেয়ে ৪-৫০ **বিবর্তন** ৪৲
রামগড় ৪-৫০ **বাগ্‌দত্তা** ৫৲
পোষ্যপুত্র ৪-৫০ **পথের সাথী** ৩৲
হারাণো খাতা ৩৲ **মন্ত্রশক্তি** ৪-৫০
পূর্বাপর ৪৲

নিরুপমা দেবী
দিদি ৫৲ **পরের ছেলে** ৩৲

পুষ্পলতা দেবী
মরু-তৃষা ৩-৫০
নীলিমার অশ্রু ৩-৫০

শক্তিপদ রাজগুরু
কাজল গাঁয়ের কাহিনী ৪-৫০

জ্যোতির্ময়ী দেবী
মনের অগোচরে ২৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলকণ্ঠ ২-৫০

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত
পল্লীর প্রাণ ২-৫০

ভাস্কর
রুল্‌স্ অফ থ্রি ২-৫০

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র
উদাসীর মাঠ ২৲ **পরাজয়** ২৲

গোপালদাস চৌধুরী
নবপর্ণ ২৲

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
কলঙ্কিনীর খাল ২-৫০

কানাই বসু
পয়লা এপ্রিল ২৲
রঙছুট ১-৭৫

ননীমাধব চৌধুরী
দেবযানী ৪৲

শৈলবালা ঘোষজায়া
অরুণাদেবীর আশ্রম ২৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
উত্তরণ ২-৫০

গিরিবালা দেবী
খণ্ড-মেঘ ২৲

পঞ্চানন ঘোষাল
দুই পক্ষ ২-৫০
মুণ্ডহীন দেহ ৩৲
অন্ধকারের দেশে ৩-৫০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
নতুন আলো (গোর্কীর অনুবাদ) ২-৫০
অসাধারণ (টুর্গেনিভের অনুবাদ) ২৲
জনৈকা (মোপাসার অনুবাদ) ২-৫০
মুস্কিল আসান ২-৫০ **অস্বীকার** ২৲
রাঙামাটির পথ ৩৲ **আঁধি** ৩৲
এই পৃথিবী ৩৲ **নববসন্ত** ২৲

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বাধীনতার স্বাদ ৪৲
সহরতলী (১ম পর্ব) ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বয়ং-সিদ্ধা (১ম) ৩৲
ভুলের মাশুল ১-৫০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিবস্ত্র মানব ৪৲ **কার্টুন** ২-৫০
নিরুদ্দেশ ৪৲ **দেহ ও দেহাতীত** ৪৲
পতঙ্গ ১ম—২-৫০, ২য়—২-৫০
শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত) ৪৲

আশালতা সিংহ
মধুচন্দ্রিকা ২-৫০ **ক্রন্দসী** ১-৫০
লগন ব'য়ে যায় ১-৭৫

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
নিষ্কণ্টক ১-৫০ **ভুলের ফসল** ২৲
খেয়ালের খেসারৎ ২৲

উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
লক্ষ্মীর বিবাহ ১-৫০

ভোলা সেন
উপন্যাসের উপকরণ ২-৫০

সীতা দেবী
বন্যা ৪৲

অমরেন্দ্র ঘোষ
পদ্মদীঘির বেদেনী ৩৲
দক্ষিণের বিল ১ম ৪৲, ২য় ৪৲

গোর্কীর অনুবাদ।
রামপদ মুখোপাধ্যায়
কাল-কল্লোল ৪-৫০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
কালের মন্দিরা ৩-৫০
কানু কহে রাই ২-৫০
কাঁচামিঠে ৩৲ **আদিম রিপু** ৩৲
পথ বেঁধে দিল ২-৫০ **গৌড়মল্লার** ৪৲
বিজয়লক্ষ্মী ২-৫০ **কানামাছি** ২-৫০
পঞ্চভূত ২-৫০ **ঝিন্দের বন্দী** ৪-৫০
শাদা পৃথিবী ৩৲ **ছায়াপথিক** ৩৲
বহ্নি-পতঙ্গ ৩-৫০ **বিষকন্যা** ৩৲
দুর্গরহস্য ৩-৫০ **চুয়াচন্দন** ৩৲
ব্যোমকেশের গল্প ২-৫০
ব্যোমকেশের কাহিনী ২-৫০
ব্যোমকেশের ডায়েরী ২-৫০

প্রবোধকুমার সান্যাল
নবীন যুবক ১-৫০ **কলরব** ২৲
প্রিয় বান্ধবী ৩৲ **তরুণী-সঙ্ঘ** ২৲
কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲
দুই আর দু'য়ে চার ২-৫০

অশোককুমার মিত্র
দু'ঘণ্টা ২৲

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
গন্ধরাজ ৩৲
পদসঞ্চার ৫৲ **লাল মাটি** ৪-৫০
উপনিবেশ
১ম—২-৫০ ২য়—২৲ ৩য়—২-৫০

সরোজকুমার রায়চৌধুরী
বহ্ন্যুৎসব ১-৫০ **ক্ষণ-বসন্ত** ১-৫০

উপেন্দ্রনাথ দত্ত
নকল পাঞ্জাবী ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
ঝড়ো হাওয়া ২-৫০

বনফুল
পিতামহ ৩৲ **নবমঞ্জরী** ২-৫০
নঞ্‌-তৎপুরুষ ৩৲

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
মিলন-মন্দির ৩৲

প্রভাত দেবসরকার
অনেক দিন ৩-৫০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
গহনার বাক্স ১-৫০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
কাক-জ্যোৎস্না ৩৲

(গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

— * বিবিধ গ্রন্থ * —

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম ২৲

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

হে মহাজীবন (সচিত্র জীবনী) ৩৲

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু-অনুলিখিত

জলধর সেনের আত্মজীবনী ৩৲

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রণীত

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সচিত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

১ম খণ্ড (২য় সং)—৩৲ ২য় খণ্ড—৪৲

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত

লোকান্তর (পরলোক-তত্ত্ব) ৪-৫০

পারায়ণ (ঐ) ১-৫০

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন প্রণীত

কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ ৫৲

পদাবলীপরিচয় ৩৲

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সিরাজদ্দৌলা ৬৲

মীরকাসিম ৪৲

ফিরিঙ্গি-বণিক ৩৲

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী প্রণীত

জাহানারার আত্মকাহিনী ৩-৫০

কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা ২৲

শ্রীযামিনীমোহন কর প্রণীত

নবভারতের বিজ্ঞানসাধক

সচিত্র। দাম—১-৭৫

শ্রীতারকচন্দ্র রায় প্রণীত

বাংলা দার্শনিক সাহিত্য-ভাণ্ডারে নূতন সংযোজন

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ১০৲

সাংখ্য ও যোগ (ভারতীয় দর্শন) ৪৲

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস

১ম খণ্ড (গ্রীক ও মধ্যযুগ—পরিবর্ধিত ২য় সং)—৯৲, ২য় খণ্ড (নব্যদর্শন)—১০৲, ৩য় খণ্ড (সমসাময়িক দর্শন)—১০৲

শ্রীপ্রবুদ্ধকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

স্বরলিপি-কৌমুদী ২-৫০ **রাগেশ্বর** (১ম) ১-২৫

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর প্রণীত

নিভৃত-চিন্তা ২-৫০ **প্রভাত-চিন্তা** ২-৫০

নিশীথ-চিন্তা ২-৫০

পঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান (সচিত্র) ৫৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

দিল্লীশ্বরী (সচিত্র) ২৲

মজিয়ৎ ও নূরজাহানের জীবন-কথা।

গোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত

শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র ৫৲

ডাঃ শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ প্রণীত

সর্প ও বিষাক্ত কীটাদি দংশন চিকিৎসা ১৲

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রণীত

কোন্ পথে? ২-৫০

আটটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ।

ডাঃ জে, এম, মিত্র প্রণীত

মডার্ণ কম্পারেটিভ মেটিরিয়ামেডিকা (হোমিও) ১২৲

নগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত

মধু-স্মৃতি ১০৲

মহাকবি মধুসূদনের সচিত্র প্রামাণ্য জীবনী-গ্রন্থ

দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত

গৃহশ্রী ৩-৫০

উপহার দিবার উপযোগী।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত

হাসির গান

নূতন সজ্জায় নূতনসংস্করণ। রঙীন কাগজে রঙীন কালিতে ছাপা। ব্যঙ্গ-চিত্রযুক্ত প্রচ্ছদপট।

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রণীত

পঞ্চাশের পরে (খাদ্য-তত্ত্ব) ২-৫০

শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত

বাংলার নাটক ও নাট্যশালা ৪৲

কান্তকবি রজনীকান্তের

বাণী ২৲

কল্যাণী ২৲

বহুদিন ধরিয়া বাঙালী জাতিকে যুগপৎ হাস্যরস ও উচ্চভাবের প্রে...

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

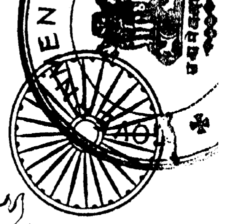


রামায়ণী কাব্যের প্রথম সুর

শিল্পী : বীরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্









ভারতবর্ষ



অগ্রহায়ণ—১৩৬৫

প্রথম খণ্ড	ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষ	ষষ্ঠ সংখ্যা

বাংলা ও বাঙ্গালী

প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন মহাজন মুখে উচ্চারিত হইয়াছিল যে বাংলা আজ যাহা করে অন্যে কাল তাহা করে। কিন্তু আজিকার দিনে এই কথা প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আত্ম-ভোলা বাঙ্গালী আজ নিজের বৈশিষ্ট্য ভুলিতে বসিয়াছে। এমন দিন কিন্তু এর পূর্ব্বে কখন ছিল না। বাঙ্গালী চিরদিনই তার স্বকীয়তায় ও মর্য্যাদা বোধে গরীয়ান ছিল। বাঙ্গালী জাতি একদিনে তাহার এই স্বকীয়তা লাভ করে নাই একথাও যেমন ঠিক, তেমনি এই জাতির গোড়া পত্তন হইতেই একটি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল একথাও তেমনি ঠিক। অনেক পণ্ডিতেরা বলেন যে বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণ হইতে একটি পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতেই বাংলায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা বিদ্যমান ছিল এবং সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাংলায় বৈদিক ধর্ম, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার কিছুই শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে বারে বারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আমদানি করিয়াও বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লোপ করা সম্ভব হয় নাই, বাংলায় যাগযজ্ঞাদির প্রচলন হয় নাই। এত আক্রমণেও বাংলা

এবং বাঙ্গালী জাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া স্বকীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। আগন্তুকদের নিজের বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিয়া নিজের স্বজাতি ও স্বধর্মী করিয়া লইয়াছিল। একথা সত্য যে বাঙ্গালী আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণের নিকট হইতে বহুতথ্য বহু সিদ্ধান্ত ও বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সে সকলই বাঙ্গালীর মনীষায় সুষমামণ্ডিত হইয়া কোমল পেলব ও স্নিগ্ধ মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালী এই স্বতন্ত্রবোধের জন্যই আর্য্যাবর্ত্তের অনুগামী হয় নাই বলিয়াই বোধ করি রোষে আর্য্যাবর্ত্তের পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তীর্থযাত্রা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশে বাংলাদেশে যাইলে বা বাস করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ও পুনঃ সংস্কার প্রয়োজন। আজিকে সেই বাঙ্গালীকে চিনি না, চিনিতে পারি না। সেই বাঙ্গালীর ধর্ম-কর্ম ভাবের ভাষা রসের ভাষা সব ভুলিয়া বসিয়া আছে। বাঙ্গালী কখনও কোন পূর্বতন যুগে তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। তাহার প্রকৃতির মূল লক্ষণটি সে চিরদিন বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। সেই মূল বস্তুটি তাহার স্বাধীনতাবোধ। বাংলা তথা বাঙ্গালী চিরদিন—কি সমাজের কি ধর্মের সকল প্রকার বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রকে মানিয়াও তাহার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়াছে। শাস্ত্র বন্ধনকে শিথিল করিয়াছে, নব্য ন্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের পুরাতন স্মৃতির শৃঙ্খল মোচন করিয়া নূতন স্মৃতির রচনা করিয়াছিলেন বাঙ্গালী স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন। ব্যবহারশাস্ত্র এবং অর্থনীতি সম্বন্ধেও বাংলা প্রাচীনকাল হইতেই আপনার নিজের একটি মত ও পথ গড়িয়া তুলিয়াছিল। বাংলার দায়ভাগও বাংলার বৈশিষ্ট্য, ইহার প্রচলন শুধু বাংলাদেশেই।

বাংলায় বৌদ্ধ যুগের অবসান হইতে বাঙ্গালী ধর্মসাধনে, সিদ্ধান্তে, মতবাদে ও সামাজিক আচার ব্যবহারে এমন একটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল যাহা ভারতবর্ষের অন্য কোন হিন্দু সমাজে হয় নাই।

তখন বাংলার মন এত অনুদার হয় নাই, আজ আমাদের জননীভগ্নীকন্যা দস্যু কর্তৃক অপহৃত হইলে সমাজ-ভয়ে আমরা তাহাদের গৃহে স্থান দিতে সঙ্কোচ বোধ করি। কিন্তু ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেও সমাজ এমন নিষ্ঠুর ও সঙ্কীর্ণমনা ছিল না। তখনও ব্রাহ্মণ্য সমাজ-আচার হোমাগ্নির মতই প্রদীপ্ত ছিল। তৎকালীন নিষ্ঠাচারী নির্লোভ কুলমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ তথাকথিত যবনাঘাতদুষ্ট মহিলাদের তাহাদের নষ্টনীড়ে পুনরায় স্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন—আমাদের কুল যায় নাই। আমরা সৎসাহসী ও দয়ার্দ্র, আমরাই শ্রেষ্ঠ কুলীন। দেবীবর ঘটক এই সামাজিক কুলাচার্য্য বীরগণের অগ্রগণ্য।

এই ত্যাগ, এই তেজস্বিতা, এই স্বাধীনমন্যতা ও সংস্কারমুক্তির বিবেক আদিম বাঙ্গালী-চরিত্রের বিশিষ্টতা ছিল। সমাজ ধ্বংসের পূর্ব পর্য্যন্ত এমন তেজস্বী পুরুষের অভাব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতেও সহরে ও পল্লীতে এমন অনেক তেজস্বী ও খ্যাতনামা পণ্ডিতের অভাব ছিল না। এখন এ তেজ নিভিয়া গিয়াছে। এই ব্রাহ্মণ্য তেজের শেষ স্ফুলিঙ্গ রাজা রামমোহন, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর।

শুধু সামাজিকতায় বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যই যে ছিল এমন নয়। ধর্মে সাহিত্যে সাধনাতে ও তাহার একটি বিশেষ স্বতন্ত্র স্থান ছিল। দেব-দেবীর কল্পনায় পৌরাণিক ইষ্টদেবীর পূজাপার্বণে শক্তি সাধনায় সর্বত্রই তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের রূপ পরিস্ফুট ছিল। দেব দেবীকে এমন করিয়া মানবাত্মারূপে কল্পনাও অন্য কেহই বোধ করি করিতে পারে নাই। দেবীর মাতৃরূপের কল্পনা ও পূজা এ ত বাঙ্গালীর নিজস্ব। গঙ্গাবিধৌত বাংলার শ্যামল পলিমাটির দেশেই মৃত্তিকা নির্মিত প্রতিমা পূজার প্রচলন হয়। এমন শ্যামল শোভান্বিত শ্রীর সহিত কি পাথুরে মূর্ত্তির মানান হইত। এই যে দুর্গাপূজার প্রচলন, এও তো বাংলার সৃষ্টি। মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা। ভারতের অন্য কোন্ জাতি দেবীকে এমন করিয়া মাতৃরূপে কন্যারূপে কল্পনা করিয়া কি এমন সার্বজনীন ভক্তিশ্রদ্ধার আসন দিতে পারিয়াছে? তাই তো কবি বলিলেন—দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা। বাংলার কবি ভিন্ন এমন কথা কে বলিতে পারে? এই পূজায় তাহার জাতীয়তার সজ্ঞান চেতনা যেন যুক্ত হইয়া আছে। সে কখনই হিন্দুস্থানী আর্য্য-সভ্যতাকে আমল দেয় নাই। কোন্ দেশের কবি এমন করিয়া গীত গোবিন্দ লিখিতে পারিয়াছেন? কোথায় এমন দেশাত্মবোধে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। এ সকলই বাংলার মাটির গুণে এবং বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্যই সম্ভব

হইয়াছে বলিয়াই মনে করি। বাংলার সঙ্গীতও একটি বিশিষ্ট ধারায় রচিত এবং বিশিষ্ট সুরে গীত হইয়াছে। কীর্তন ও রামপ্রসাদী সুর ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরবর্তী-কালে রবীন্দ্রনাথের গান ও সুর এই বৈশিষ্ট্যের পরিপূরক। গীতগোবিন্দ বাঙ্গালীর গীতকাব্যের অপূর্ব পূণ্যতীর্থ। বাঙ্গালার যে যেখানেই থাকুক—যে প্রবর যে-শাখা যে সম্প্রদায় হউক, সকলেই যেন এক গোত্রের। বাঙ্গালীর কীর্তন গানের মত এমন প্রাণ-গলান কোন্ গানে চোখের জলে বুক ভাসাইতে পারে? সখ্য দাস্য মধুর রস ভারতের আর কোন্ কবির কল্পনায় মূর্ত্ত হইয়া কলম দিয়া বাহির হইয়াছে। বেদের সামগীতি মানব হৃদয়ের আশ্চর্য্য উচ্ছ্বাস হইলেও সঙ্গীত পর্য্যায়ে পড়ে নাই বলিয়াই হারাইয়া গিয়াছে, কিন্তু জয়দেবের পদাবলী আজও সমভাবেই বাঙ্গালী হৃদয়ে চির নূতন হইয়া রহিয়াছে, সর্ব ভারতীয় মর্য্যাদাও লাভ করিয়াছে। সঙ্গীত চর্চায় বনের মধ্যে বনবিষ্ণুপুর দিল্লীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে কীর্ত্তন গানের রস-মাধুর্য্যের প্রভাবে বাংলাকে এক নূতন পথে ও মতে পরিচালিত করিয়াছে। শুধু বাংলা কেন, প্রায় সমগ্র ভারতই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার আর একটি নিদর্শন। অন্য প্রদেশের বৈষ্ণব ধর্ম হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। বাঙ্গালী সকল বিষয়েই চূড়ান্ত করিয়াছে। কীর্তন গানে উচ্চনীচ ভেদাভেদ নাই। কীর্তনক্ষেত্রে সকল জাতির পদরজের উপর সোপবীত ব্রাহ্মণ ও ভাবাবেশে গড়াগড়ি খান। এমন ধর্ম ও জাতি সমন্বয় আর কোথায় আছে? এও কি বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা নয়।

বিবাহেও বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্রতা ছিল। আগমবাগীশ ও ব্রহ্মানন্দগিরি বাংলায় শৈব বিবাহের প্রচলন করেন। রাজা রামমোহন রায়ের কাল পর্য্যন্ত বাংলায় শাক্ত-তান্ত্রিক সমাজে শৈব বিবাহের প্রচলন ছিল। রাজা রামমোহন নিজে শৈব বিবাহ করিয়াছিলেন। শৈব বিবাহে নারীর জাতি বিচার হয় না। শৈব বিবাহের প্রভাবে বাংলায় নানা জাতির সম্মেলন ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণবেরাও যে কন্তিবদল বিবাহ প্রচলন করেন তাহা এই শৈব বিবাহের অনুরূপ। ভরার মেয়ে—ভরা অর্থাৎ নৌকা বিশেষে করিয়া আনীত মেয়ের জাতিধর্মের খোঁজ লওয়া হইত না। বংশজ ও শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সমাজে এই ভরার মেয়ে বিবাহ করার প্রচলন ছিল। সমাজে সে বিবাহ সিদ্ধও ছিল। জাতি-কূলের পরিচয় লইয়া সমাজে ঘোঁট হইত না। ব্রাহ্মণ সমাজে গোঁড়ামি স্থান ছিল না। ঘনরাম প্রভৃতি মঙ্গল-কাব্য-রচয়িতা সকল কবিই ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহাদের লিখিত মঙ্গলকাব্যগুলির নায়ক-নায়িকা ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণেতর জাতি।

এই পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা গত যুগের বাঙ্গালীর জীবন কথা। ইহার পর বৃটিশ যুগের বাঙ্গালীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। এই যুগে বাঙ্গালী সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা সকলের মনে গ্রথিত হইয়া আছে যে বাঙ্গালী বিদেশী প্রভাবে স্বধর্মত্যাগী হইয়াছিল। যদিও ইহার একটি কারণ আছে বলিয়া মনে করি। মুসলমান যুগে বাঙ্গালী খানিকটা আত্ম-সংকোচনশীল হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালী মন খানিকটা সংস্কারমুক্ত হইল। হঠাৎ সংকীর্ণতার বন্ধন-মুক্ত হওয়ায় তাহার জীবন প্রবাহে যদি কিছু বিপ্লব ঘটিয়া থাকে তো তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। নব শিক্ষায় সে নির্ঝরণীর স্রোত বেগ লইয়া জীবন প্রবাহে আপন বেগে বহিতে আরম্ভ করিল। রুদ্ধ বাঙ্গালী-তেজ দ্বিগুণ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। শুধু প্রতিভায় বা মনীষায় নয়, একটা নবীভূত জীবন-শক্তির অকুতোভয়তায়।

এই যুগের প্রথম ভাগে তিনজন বাঙ্গালী তিনরূপে এই নব যুগের নূতন ভাবধারার বাহক হইয়াছিলেন। প্রথম রাজা রামমোহন, দ্বিতীয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর এবং তৃতীয় নব-কাব্যের জন্মদাতা মধুসূদন। রামমোহন বুদ্ধি, বিদ্যাসাগর হৃদয়বল এবং মধুসূদন স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রথম দুইজনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ্য যুগের বাঙ্গালী সংস্কৃতির দুইটি বিভিন্ন চরিত্রভঙ্গী। একটিতে নৈয়ায়িকবুদ্ধির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তত্ত্বনিষ্ঠা, অপরটিতে ব্যক্তির 'আত্ম-চর্চার' উপরে সামাজিক ন্যায় ও ধর্মনিষ্ঠাত্মক প্রতিষ্ঠা করার হৃদয়বত্তা ও তেজস্বিতা। আর মধুসূদনের জীবন একটা বন্ধনহীন বিপ্লব শক্তির মত প্রকাশ পাইয়াছে। মধুসূদনের সাহেবিয়ানা ও খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণের অন্তরালেও একটি বাঙ্গালী স্বভাব পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। তাই মনে হয় তিনি হিন্দুও নন খৃষ্টানও নন, তিনি খাঁটি নির্ভেজাল বাঙ্গালী। ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও সর্বশেষ

রবীন্দ্রনাথ আসিয়া বাঙ্গালীকে তাহার আত্ম-প্রত্যয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উনবিংশ শতাব্দী বাংলা দেশের একটি রেনেস াঁসের যুগ। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর জীবনধারা বদলাইতে লাগিল। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে সে জীবন্মৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় বলি—সকলের বিশ্বাস বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। ভিন্ন জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এই বিশ্বাস। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে কথাটা কতকটা যদিবা সত্য বোধহয়, তবে বলা যাইতে পারে বাঙ্গালীর এমন দুর্দশা হইবার অনেক কারণ আছে।

ইংরাজ আমলেও দেখিতে পাই যে বাঙ্গালীই সর্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন যুগ সূচনা করিয়াছিল। ইংরাজ চাহিয়াছিল বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর জাতি-ধর্ম হরণ করিয়া তাহার আত্মাটাকেও পরাধীন করিয়া গ্রাস করিতে। বাঙ্গালী সেই দুর্য্যোগকেই সুযোগরূপে পরিণত করিয়া স্বজাতির রেনেস াঁস আনয়ন করিয়াছিল। স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ১৩২৮ সালের চৈত্র মাসের বঙ্গবাণীতে লিখিয়াছেন—বাংলা সম্বন্ধে অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে আধুনিক বাংলাকে ইংরাজই গড়িয়া তুলিয়াছে। ইংরাজের এ অভিমান তো আছেই, অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেও এইরূপ একটা সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যেও যে এ সংস্কার নাই এমন নহে। * * * * আধুনিক বাংলার এই বিশেষত্ব কেবলই ইংরাজী শিক্ষার ফল নহে, কিন্তু বাংলার পুরাতন সাধনাও মনীষার উপরে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষার জ্যোতি পড়িয়া তাহার সেই প্রাচীন প্রাণধর্মকে অভিনব ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

বাঙ্গালীর কবিই একদিন গাহিয়াছিলেন—

শুনহে মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

আধুনিক যুগের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কবিও ইহার সুরে সুর মিলাইয়া গাহিয়াছেন—

কি আর বলিবরে, কে করিবে প্রত্যয়।
এই মানুষে আছে সত্য, নিত্য চিদানন্দময়।

বাঙ্গালীর মধ্যে চিরকালই একটি স্বাধীনতার ভাব একটি মানবতার স্পর্শ অজ্ঞাতসারে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। রাজা রামমোহন পুনরায় এই সকল বৃত্তির সংস্কার সাধন করিয়া বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা ও মানবতার মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তিনি বাঙ্গালীর জীবনে নূতন চেতনার প্রেরণা আনিয়া দিলেন।

বাঙ্গালী চিরদিনই অল্পে-সন্তুষ্ট জাতি। একখানি ধুতি, একটি উড়ানি ও এক জোড়া চটি পায়ে দিয়া সে সর্ব্বত্র সম্মান আদায় করিয়াছে। খড় বাঁশ দিয়া তাহার ঘর তৈয়ার করিয়াছে। শাকান্নে পরম তৃপ্তির সহিত উদর-পূর্ত্তি করিয়াছে। বাঙ্গালী চরিত্রের মূল লক্ষণ স্বাধীনতা-প্রীতি। তেঁতুল পাতা সিদ্ধ খাইয়াও সে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহে নাই। এই স্বাধীনতার জন্য সে ধনজন যেমন, তেমনি রাষ্ট্রীয় প্রতিপত্তিও তুচ্ছ করিয়াছিল। অথচ সে সন্ন্যাসীও নয়। ভারতে অন্য কোনো জাতি বাঙ্গালীর মতো এমন ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় করিতে পারিয়াছিল কিনা জানি না। সর্ব্বাধুনিক বাঙ্গালী কবি তাই বলিলেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

এমন কথা বাঙ্গালী ভিন্ন কে বলিতে পারে।

আজ কিন্তু বাঙ্গালীর তেজস্বিতা স্বাধীনতা প্রায় গত-যুগের কথায় দাঁড়াইয়াছে। তাহার কারণ একটা নয় অনেক। ইংরাজ-শাসনের শেষ প্রতিক্রিয়া দুর্ভিক্ষ মহামারী, তার উপর উদ্বাস্তু সমস্যা। বাঙ্গালী জীবন আজ পঙ্গু হইতে বসিয়াছে। সমগ্র জাতির উপর প্রচণ্ড বজ্রাঘাত। আজ সে নীতিহীন চরিত্রহীন নিষ্ঠাহীন অস্থিরচিত্ত। আজ বাঙ্গালীকে সকলেই গালি দেয়। সব চেয়ে গালি দেয় বেশী বাঙ্গালী নিজে নিজেকে। অথচ একদিন এমন ছিল যেদিন বাঙ্গালী ভারতমান্য ছিল। বাঙ্গালী নিজ বুদ্ধিমত্তায় একদিন সকল ভারতবাসীর উপর ছিল বলিয়াই কি আজ তাহার এই অধঃপতন। অথবা অপরে আজ বুদ্ধিমত্তায় তাহাকে ছাপাইয়া গিয়াছে বলিয়াই এই দশা। স্বাধীনতার ক্ষণ পূর্ব্ব ও পর হইতেই বাঙ্গালীর আরো অধঃপতন আরম্ভ হইল। অপর প্রদেশীয়েরা বাঙ্গালীকে যেন আর

সহ্য করিতে পারিল না। তাহার প্রমাণ সুভাষচন্দ্রের তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্ব তাহাদের সহ্য হইল না। ইহাকে কি বাঙ্গালীর তেজমন্ততার প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফল বলিবেন।

বাঙ্গালীর রক্তে বহুরক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছে বলিয়াই তাহার মেধা ও শক্তির প্রাচুর্য্য এবং এইজন্যই বোধ করি সকল স্তরের সকল জাতির অতিশয় অশিক্ষিত অনুন্নত নীচ অধস্তল হইতেও মহৎ চরিত্রের উদ্ভব অঘটন বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালীর এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সে মেধায় অন্য অ-বাঙ্গালী হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালীর ভিতর যত খ্যাতিমান প্রতিভাবান ব্যক্তি যুগে যুগে জন্মলাভ করিয়াছেন এমন অন্য কোনো ভারতীয় জাতির ভিতর বোধহয় জন্মায় নাই। বাঙ্গলার শহরে যেমন প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে পল্লীগ্রামেও তেমনি সমভাবেই প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়াছে।

বাঙ্গলায় গঙ্গার মূল্যও কম নয়। এই গঙ্গাকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙ্গালীর শিক্ষা সমাজ-সংস্কৃতি এক কথায় বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর।

বুকের নাড়ী বল ও শক্তিসঞ্চারিণী, আর প্রাণের নাড়ী সারা দেহে চৈতন্য সঞ্চার করে তাহা মৃত্যুকে ঠেকাইয়া রাখে।

আজ কিন্তু বাঙ্গালী গঙ্গাকে ভুলিতে বসিয়াছে—তাহার নাম হইয়াছে হুগলী নদী।

অধুনা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে বাঙ্গালী সর্ববিধ দায়িত্ব, মন্ত্রণা ও অধিকার হইতে বঞ্চিত ও বহিষ্কৃত হইতে চলিয়াছে। এমনটি যে আজ ঘটিয়াছে ইহার কারণ স্বরূপ হয় তো অনেকে বলিবেন যে জাতির উত্থান পতন আছে। দহু দোষে আজ বাঙ্গালীর পতন আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালীর এই পতন কালচক্রের কুটিল গতি কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু এ কথা আজ ঠিক যে বাঙ্গালীর উন্নতিতে পরশ্রীকাতর অন্য প্রদেশীয়েরা একজোট বাঁধিয়া বাঙ্গালীকে কোণঠাসা করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। আজ বাঙ্গালী মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত, সে আজ নিজ বাসভূমে পরবাসীর সামিল। যেখানে অন্নপূর্ণার পূজা হইয়াছে প্রতিগৃহে গৃহে সেখানে আজ শিব ভিখারী শ্মশানচারী। অন্ন বস্ত্রের জন্য ভারতের অন্য রাষ্ট্রের কৃপাভিক্ষার্থী কী দুর্দৈব! বাঙ্গালী আজ গৃহহীন অন্নহীন বস্ত্রহীন, দ্বারে দ্বারে পথ কুক্কুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাকে নিছক কর্মবিপাক বা দৈব দুর্ভোগ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও যে বাঙ্গালী ভারতের গুরু ছিল আজ সে চণ্ডালের মত অস্পৃশ্য। ভারতের অন্ধকার দূর করিবার জন্য একদিন সে আপনার মনোবল, হৃদয়বল, দেহবল ও বুকের রক্ত নিঃশেষে দান করিয়াছে আজ সে নিজের দাহতে ভস্মীভূত। দধীচির অস্থিতে নির্মিত অস্ত্রে ইন্দ্রের প্রয়োজন ছিল স্বর্গরাজ্য লাভের জন্য কিন্তু প্রয়োজন ছিল না দধীচিকে। তাই তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিল। এ ক্ষেত্রেও তাই। স্বাধীনতা লাভে বাঙ্গালীর ত্যাগ ও রক্তের প্রয়োজন ছিল, ছিল না বাঙ্গালীকে, তাই আজ বাঙ্গালীর ভস্মও গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইবে—না হইলে গঙ্গাও অপবিত্র হইয়া যাইবে এমনই তাহার অবস্থা আজ। যে স্বাধীনতা যজ্ঞে সে জীবনাহুতি দিয়াছিল যজ্ঞ শেষে সেই যজ্ঞের ভস্মের হোম শিখাতে তাহার তিলক কাটিবার অধিকারও নাই।

ভারতকে একটি নেশান করিয়া তোলার যে চেষ্টা এবং তাহার জন্য সে সাধনা তাহাও বাঙ্গালীর দান এবং বাঙ্গালীর উদ্ভাবনা। যে কংগ্রেস আজ ভারত উদ্ধার করিয়া শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া বসিয়াছে সেই কংগ্রেসের জন্মদাতাও বাঙ্গালী। ইহার প্রথম পত্তন হিন্দুমেলা নামে। স্বর্গীয় যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১৮৮০ সালে অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে তাহারই প্রাক্কালে হিন্দুমেলা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—ভারতের সমস্ত অধিবাসী বৎসরে অন্ততঃ একদিনও একত্র মিলিত হইতে পারেন এমন একটি উপলক্ষ চাই, এমন একটি স্থান চাই। মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে ভিক্ষা চাই। তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সন্যস্ত না করেন। আমাদিগের ভিক্ষা তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে হিন্দু মেলা নাম না দিয়া ভারত মেলা নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসী মাত্রেরই উৎসব স্থল হয়। আমরা ভারতবর্ষীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ রাখিব না।

কলিকাতার বুকে আলবার্টহলে প্রথম ভারতসভা

নামে এক নূতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিন ভারতের পুনর্জন্ম দিন। এইদিন ভারতে এক অপূর্ব রাজনৈতিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইল। সকল জাতি ও ধর্মের সকল লোকের সমান অধিকার শুধু ভারতের অধিবাসী হইলেই হইবে। কোন শ্রেণী-বিভাগ নাই। রাজা-প্রজা সকলেই যোগ দিতে পারে। ভারত সভার ইহাই মূল ভিত্তি এবং কংগ্রেসের জন্মসূচনা। আজ সে ইতিহাসও অন্য প্রদেশ ভুলিয়াছে। আজ কংগ্রেসে বাঙ্গালীর স্থান সঙ্কীর্ণ। সে অপাঙক্তেয় অচ্ছুত।

আজ এই নেশানের অজুহাতে কংগ্রেস হিন্দীর মত একটি অপরিপুষ্ট অপকৃষ্ট ভাষা গায়ের জোরে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া চাপাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর। গায়ের জোরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় না। কংগ্রেসের কর্ণধারেরা বেশীরভাগই অবাঙ্গালী এবং হিন্দুস্থানী, তাই এই গায়ের জোরের চেষ্টা। দীনতম ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দান। দুই একজন বাঙ্গালীও প্রথমে ইহার ইন্ধন জোগাইতে কম করেন নাই ইহাই সব চাইতে লজ্জার ও ক্ষোভের কথা। অনেকের মত যে বাংলা হাটে বাজারের ভাষা নয় যে সে রাষ্ট্রভাষা হইবে। অপূর্ব্ব যুক্তি বলিয়াই মনে হয়। ইংরাজী কি হাটবাজারের ভাষা এবং সেইজন্যই কি ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি সার্ব্বজনীন ভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বাংলা একটি পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট ভাষা, তাই রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী রাখে। কিন্তু মনে হয় এখানেও বাংলা প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া এবং জোর করিয়া কোন প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা দিলে তর্কের অবকাশ থাকিয়া যাইবে। অর্দ্ধভারতের আদিভাষা সংস্কৃতকে সেইজন্য রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দিলে বাঙ্গালীও সন্তুষ্ট হইবে এবং সর্ব্বভারতীয় ঐক্যও বজায় থাকিবে বলিয়াই মনে করি।

আজ বাংলার নিকট-প্রতিবেশী বিহার বাংলার প্রতি সব হইতে বিরূপ। ইহার কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে—উপকৃতের ঋণ স্বীকার না করার মত হীনমন্যতা। বাংলাই প্রকৃতপক্ষে বিহারকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। আজ সেই ঋণ স্বীকার করিতে তাহার গাত্রদাহ সব চাইতে বেশী। কবি বলিয়াছেন—উপকার যেন মধুর পাত্র, হজম করিতে জ্বলে যে গাত্র। একজন বাঙ্গালীই বিহারকে উর্দ্দুর কবল হইতে রক্ষা করিয়া তাহার মাতৃভাষাকে জাঁকাইয়া ছিলেন—তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন বিহারে স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বিহার হইতে উর্দ্দুর বোঝা নামিয়া যায়। হিন্দী পুস্তক প্রণয়নেও ভূদেববাবুর চেষ্টা ও কৃতিত্ব কম নয়।

বাঙ্গালীর ত্যাগ ও তপস্যার ফল সেদিনও অপরে ভোগ করিয়াছে, আজও করিতেছে। বাঙ্গালীর স্বদেশী-ব্রত পালনের সুযোগে আমেদাবাদের মিলগুলি গজাইয়া উঠিল। অন্য প্রদেশীয় তাঁতীর অন্ন বাঁচাইবার জন্য বাংলার মিলের ধুতির উৎপাদন হ্রাস করা হইল। ইহাও তো বাংলার প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বরূপ। বাঙ্গালীর মূল্যে অপরে ধন সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছে। বাংলা প্রেমধর্মের দেশ—সকলকেই বুকে আশ্রয় দিয়াছে আজও দিতেছে, আর তাহার পরিবর্ত্তে তাহারই বুকে তাহারা ছুরি চালাইতে মতলব আঁটিতেছে। আজ বাংলায় কোনো বলিষ্ঠ নেতা নাই যিনি এই দুর্ব্বার অধোগতি রোধ করিতে পারেন, বাঙ্গালীকে স্বাধিকারে পুনপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। বাঙ্গালীর এরূপ কোণঠাসা হওয়ার মূলে বাঙ্গালীর দোষও বড় কম নাই। তাহার নিজের মধ্যে বিরোধ, ক্ষমতালোলুপতা, পরশ্রী-কাতরতা এই সব দোষের জন্যও বাঙ্গালী ভারতসভা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালী নিজেকে নিজে দেখিতে পারে না, তাই তাহার প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন প্রদেশীয়েরা চাকুরী পায়। আর বাঙ্গালীর ছেলে চাকুরী ও ব্যবসা শিক্ষার অভাবে পথে পথে ঘুরিয়া মরে। কিন্তু ভিন্ন প্রদেশীয়েরা তাহাদের স্বজনকে সর্ব্বতোভাবে পোষণ করে, সকল বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়। জাতি হিসাবেও তাই বাঙ্গালী ধ্বংসোন্মুখ প্রায়।

লর্ড কর্জ্জন বাঙলার অঙ্গ ছাটিয়া কাটিয়া বিহারও উড়িষ্যার সহিত সংযুক্ত করিয়া ছিলেন। ভাগ বাঁটোয়ারার পর যেটুকু অবশিষ্ট রহিল তাহাও দুইভাগে ভাগ করিলেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ করাইল বাঙ্গালী, আর আজ তাহার পুরস্কার স্বরূপ পাইল খণ্ডিত বাংলা—স্বাধীনতার জন্য বুকের রক্ত দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ স্বাধীনতার পর আরো খণ্ডিত হইল। ইংরাজ ও কংগ্রেসের যোগসাজসে সে আরো ক্ষুদ্র ও পঙ্গু হইল। বাংলার প্রাণমূল্যেই ভারত স্বাধীন হইল। বাংলার ন্যায্য দাবীকে উপেক্ষা করিয়া কমিশন বসাইয়া যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করা

হইল। বাংলার এখনও যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আছে তাহারও বিলোপ সাধনে সকলে সচেষ্ট, আর যাহা নাই তাহা তো নাই।

একদিন বাঙালী যে জ্ঞান বিজ্ঞানে বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল—আজ তাহা অন্য প্রদেশের হিংসার কারণ হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের হীনমন্যতার জন্য। আজ বলিতে ইচ্ছা করে আমি বাঙ্গালী বড়ই অনুদার বড়ই দাম্ভিক, কিন্তু তুমি বিহারী হিন্দুস্থানী তুমি যদি মহৎ উদার—তবে তুমি আমার ঋণ স্বীকার করো না কেন। তাহার জীবনমরণ সমস্যায় তাহাকে বাঁচাইতে আগাইয়া না আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধর কেন। ইহা কি ঈর্ষা, না অন্যকিছু। এ গুণ হইতে উড়িষ্যা ও আসাম পিছাইয়া নাই। বাংলার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কী সদয় ব্যবহার।

বাংলা দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় আর এক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে—উদ্বাস্তু সমস্যা। ইহা ঠিক বোঝার উপর শাকের আঁটি নয়। উদ্বাস্তুদের লইয়া বাংলা আজ সকল রকমে উদ্বাস্তু ও ব্যতিব্যস্ত। উদ্বাস্তুরা আসিয়া বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। সমাজ ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় আনিয়াছে। সেখানেও যাহারা উদ্বাস্তু ছিল যাহাদের গৃহ ছিল না ভূমি ছিল না অন্নবস্ত্র ছিল না তাহারাও পশ্চিম বাংলায় আসিয়া উদ্বাস্তু সাজিয়া আমাদের কাছ হইতে ভাগের দাবী করিতেছে ন্যায্যতার ধূয়া তুলিয়া। কতকগুলি স্বার্থান্বেষী তথাকথিত দলচ্যুত দলপতি ইহাতে ইন্ধন যোগাইতেছে।

রাঢ়ের গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রদেশই বাংলা ভাষার রস-মাধুর্য্যের উৎস। নদীয়া তথা নবদ্বীপ বাংলার কৃষ্টিরও ভাষার প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিল। পূর্ব্বে যাঁহারাই এই পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন তাহারাই এই গাঙ্গেয় সভ্যতার ও ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আজ পূর্ব্ব-বঙ্গীয়েরা নিজেদের প্রাদেশিক ভব্যতা ও ভাষা জোর করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়া পরিপুষ্ট শ্রীমণ্ডিত বাংলা ভাষাকে শ্রীহীন করিবার অপচেষ্টা করিয়া ভাষার উপরও পীড়ন করিতেছে। স্থানবিশেষে প্রাদেশিক ভাষা হয়তো শ্রুতিমধুর হয়, কিন্তু অপকৃষ্ট ভাষার সর্ব্বত্র অপ-প্রয়োগ অমার্জনীয়। পদ্যের ন্যায় গদ্যেরও একটি ছন্দ আছে গতিবেগ আছে লালিত্য আছে। গুরুচণ্ডালি হইলে শ্রুতিকটু হয়। পদ্যে সাথে চলে, গদ্যে সহিত ও সঙ্গে চলে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রথায় গদ্যেও সাথে চলিতেছে। গদ্য পূর্ব্ববঙ্গীয়ের সাথে বলিয়া শ্রীহীন হইতেছে। ইংরাজী শব্দ যেগুলি বাংলায় বহুল-প্রচলিত সেগুলির উচ্চারণ ও বানান এখন অদ্ভুত হইয়াছে—ট্রেন-ট্রেইনগুলি, প্যাসেঞ্জার ডেইলি প্যাসেঞ্জার, মেল-মেইল। এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। বাংলা ভাষার এ এক নূতন দুর্দ্দৈব। বাংলার মাসিকপত্র ও খবরের কাগজগুলিতে এমন বানান বহু পাওয়া যায়। যাহা কিছু মাটি ফুঁড়িয়া উঠে বলিয়া তাহা যেমন উদ্ভিদ্ নয়—কেঁচোও সেইজন্য উদ্ভিদ্ পর্য্যায়ে পড়ে না, তেমনি যাহা কিছু লেখা হউক না কেন তাহা বাংলা ভাষা নয়।

বাঙ্গালীর নিজের ঘরে তাহার স্থান নাই। আজ অপরের দোষে সে অপরাধী, তাই তাহার আন্দামানে নির্ব্বাসন বাসের ব্যবস্থা।

বাংলার ও বাঙ্গালীজাতির আজ এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে মনে হয় এ জাতি আর রক্ষা পাইবে না। আমি নিরাশাবাদী নই, কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় মনে হয় ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী শুধু পরান্নভোজী অন্নহীন বস্ত্রহীন নয়, সে ধর্মহীনও হইয়াছে। ধর্মের নামে উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম পৈশাচিক নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালীর ত্রাণ কোথায় এ কথার উত্তর এবং পথ-নির্দ্দেশ কে করিবে? বর্ত্তমানে এই জাতির যাহারা গণ্যমান্য তাহাদের রীতি প্রকৃতি ও জীবন যাত্রার পদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় তাহারা যেন একটা মহামারণ উৎসবে মাতিয়াছে। বাংলার বুকে অন্যপ্রদেশবাসীর তো কথাই নাই। আজ বাঙলার সমাজ নাই, সমাজপতি নাই শুধু দল আছে—আর স্বার্থান্বেষী দলপতি আছে। গৃহপতিও নাই তাই ছেলেমেয়ের উপরও জোর নাই। বাংলাকে ইংরাজরা বিদায়-পদাঘাত মারিয়া গেল, পরে কংগ্রেস তাহার নাভিশ্বাস উঠাইয়া ছাড়িল। পরিশ্রম-কাতরতা এবং অন্যায় ও অহেতুক মর্য্যাদাবোধ বাঙ্গালীর অধঃপতনের অন্যতম কারণ। পূর্ব্বে পাইক বরকন্দাজ বাঙ্গালী ছিল পাচক ফিরিওয়ালা বাঙ্গালী ছিল গোয়ালা বাঙ্গালী ছিল। আর আজ সবই প্রায় হিন্দুস্থানীরা দখল করিয়াছে। দুধের যোগান এমন কি মচ্ছিখোরের দেশে মাছের যোগানও হিন্দুস্থানীর অধিকারগত। বড়

ব্যবসার কথা তো ছাড়িয়াই দিলাম। ইহা কতখানি দুঃখের ও লজ্জার বলিতে পারি না।

আমার এই কাহিনী ইতিহাসও নয় উপন্যাসও নয় কোন ভাববিন্যাশও নয়। যে ঘটনা ও কথা মনের মধ্যে আলোড়িত হইয়াছে তাহারই কিছু দুঃখে ও ক্ষোভে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র, এই আশায় যে যদি কিছু প্রতিকার হয়। আমি বাঙ্গালীর অতীত ও বর্ত্তমান জীবন ও চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র, যদি কেহ ধ্বংসোন্মুখ বাংলাকে ও বাঙ্গালীকে রক্ষা করিতে পারেন এই আশায়। শিক্ষাবিদ্‌দের নিকট অনুরোধ তাঁহারা বাংলা ও বাঙ্গালীকে বাঁচান। আজ বাংলার মতন এমন বহুবিধ সমস্যাসঙ্কুল প্রদেশ আর আছে কিনা জানিনা। অহরহ মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে যে বাঙ্গালী কি আজ সত্যই ধ্বংসের মুখে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। হাত পা মুণ্ড কাটিয়া তাহাকে তো কবন্ধ করা হইয়াছে, প্রাণটুকু কোনো মতে ধুক ধুক করিতেছে। এ প্রাণের স্পন্দন কখন একদিন থামিয়া যাইবে কে জানে? বাংলাকে বাঙ্গালীকে বাঁচাইবার কি কেহ নাই? এ প্রশ্নে আমি এ কথা বলিতে চাহিনা যে অপরে বাঁচাক। শুধু বলিতে চাই এমন বাঙ্গালী কি কেহ নাই যিনি বাঙ্গালীকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন? বাংলায় যুগে যুগে যুগাবতার আসিয়াছেন, আবার কি তাঁহার আগমন ঘটিবে না? এর উত্তর বোধ করি অনাগত ভবিষ্যতই দিতে পারেন। আমি শুধু রাষ্ট্রভাষায় প্রার্থনা করিতে পারি—সবকো সম্মতি দে ভগবান। বাংলায় বলিলে আমার প্রার্থনা হয়তো ভগবান নাও শুনিতে পারেন।

গতি-অবসন্নক্ষণে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

আমি শুধু চেয়ে দেখি, ছুটে যায় মায়া মৃগ দূরে দলে দলে,
প্রদোষের যূথিকারা স্বর্ণ-গোধূলির বুকে ফুটেছে বিরলে!
ক্লান্তির মর্ম্মরে মোর ম্রিয়মান মুহূর্ত্তেরা হোলো মর্ম্মাহত,
উৎস নহে উৎসারিত, বিজনে বিষণ্ণ ছায়া নম্র অবনত
এ দেহ অম্বরে আর দুরন্ত দুপুর নাহি, বিভা-বিকীরণে
কেমনে উৎসব করি যৌবন কাননে তব প্রণয়-বন্ধনে?

মেঘের অঞ্চল কবে মাধবী মঞ্জরী বুকে পড়েছে লুটিয়া
চিত্তের গহনে দিতে চঞ্চলতা,—সেই কথা উঠেছে ফুটিয়া
মরমে আমার। গতি-অবসন্নক্ষণে পাষাণ স্তব্ধতা মাঝে
পাখার স্পন্দন জাগে হৃদি-বিহঙ্গের—পত্র-অন্তরালে রাজে
কার ভগ্ন-নীড়! শ্মশান-মন্থিতভূমে উড়িতেছে পারাবত,
বিমূঢ় বাতাসে কাঁপে বনাকীর্ণ প্রেতান্বিত পায়ে-চলা পথ।

ফেলে-আসা কথাগুলি টানে মোরে বহুবার পিছনের পানে,
স্বপনের মাঝে তারা স্মরণের মণিহার প্রাণে গেঁথে আনে।
ধূপের সুরভিসম গেছে চলে জীবনের অসংখ্য প্রহর!
সায়াহ্নের ছায়া মেখে আজ আমি খুঁজিতেছি শ্রান্ত অবসর।
মনের ভূগোলে মোর গোবি-সাহারার রুক্ষ রুদ্ররূপ দেখে
হয়েছি কাতর। হৃদয়ের উষ্ট্র যাযাবর পদচিহ্ন রেখে—
গেছে কবে! স্মৃতি গেছে হারায়ে আমার। সাগর সমাধিতটে
অগণিত প্রহরের সকরুণ বাজে সুর দীর্ঘ ছায়ানটে।

ছিন্নপত্র বুকে লয়ে মৃত ইতিহাস মোরে করে বিচলিত,
মর্ম্মশিলা লিপি তুলে হেরি তারে কারা যেন করেছে দলিত!
চিত্তের অরণ্যতলে সেই সব পথ ডাকে যারা একদিন
পরিচয়হীন অতিথিরে দিয়েছে আশ্রয়—সবি হোলো লীন
প্রকৃতির করাঘাতে। আদিম প্রবৃত্তি শত লুপ্ত হয়ে আসে,
অরণ্য উল্লাস নাহি, আমার প্রাণের কাব্য অশ্রুনীরে ভাসে।
প্রণয়ের ফল্গুধারা সংসারের বালুগর্ভে উঠিছে গুমরি,
নিরাশার নদীকূলে সন্ধ্যা কেন নামে ধীরে মৌন রূপ ধরি!



—বাইশ—

শিবশঙ্কর অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছেন এ ক'দিনে। কেন বলা যায় না—ইন্দ্রজিতের গণ্ডগোলও কমে এসেছে অনেকটা। সেই রঘুর হাত কাটার রক্ত দেখবার পর থেকেই কী একটা ভয় ঢুকেছে ইন্দ্রজিতের মনে। চেঁচায় কম—প্রায়ই টেনিসন খুলে বসে থাকে—বিড় বিড় করে আওড়ায় 'লক্‌সলি হল।'

শুধু কিছুতেই ক্ষমা করেনি শিবশঙ্করকে—কোনোদিন করবে সে আশাও নেই। এ এক বিচিত্র অবস্থা ইন্দ্রজিতের। তার মনের অর্ধেক আলো, অর্ধেকটা অন্ধকার। অর্ধেকে স্বাভাবিক চেতনার ঢেউ উঠছে পড়ছে, বাকী আধখানায় বিশৃঙ্খলার ঝোড়ো হাওয়া। এই আলো আঁধারে, এই নিস্তরঙ্গতায় আর তুফানে, তার মনটা এক অপূর্ব জগতে বাস করছে। সেখানে থেকে থেকে সে এক-একটা বিকৃত বীভৎস রূপ দেখতে পায়—দেখতে পায় —একটা পৈশাচিক মূর্তি। সে মূর্তি শিবশঙ্করের—তার জীবনের দুর্গ্রহ।

কিছুতেই ক্ষমা করবেনা বাপকে। কিছুতেই বিশ্বাস করবে না তার দুর্ভাগ্যের জন্যে শিবশঙ্করের পাপ দায়ী নয়।

আর শিবশঙ্কর কী ভাবেন ইন্দ্রজিৎ সম্পর্কে? বোঝা যায় না। হয়তো এখন আর কিছুই ভাবেন না। মুখার্জি-ভিলার দেওয়ালে দেওয়ালে ফাটলের মতো,তেতলার পুবের বারান্দার বিপজ্জনক কোনাটার মতো ইন্দ্রজিৎ এখন তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে। যেমন নিজের ঘরের ভেনাস-অ্যাডোনিসের ওই নির্লজ্জ লালসার নগ্ন ছবিটা তাঁর মনে আজ আর কোনো প্রতিক্রিয়া জাগায় না, তেমনি ইন্দ্রজিতের সমস্ত কদর্য চিৎকার আর কল্পনাতীত অভিশাপ তাঁর নিরাশক্তির দেওয়ালে মাথা প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়।

শুধু একটা জিনিস সত্যজিতকে সব-সময়ে সন্তর্পণে আড়াল করতে হয়। প্রীতি আর রীতেনের ব্যাপারটা।

রীতেন যে-কদিন হাসপাতালে ছিল, প্রীতি নিয়মিত দেখতে গেছে তাকে, খবর নিয়েছে। অস্বস্তিকর অবস্থাটা এড়াবার জন্যে মধ্যে-মধ্যে সত্যজিৎ সঙ্গে গেছে, নইলে রঘুকে পাঠিয়েছে। বাধা দিলেও প্রীতিকে ঠেকানো যাবে না—ওই সার্কাসের ক্লাউনটার ভেতরে যেন রূপকথার রাজপুত্রকে আবিষ্কার করেছে সে। সত্যজিৎ জানে—যা অনিবার্য তাই ঘটতে চলেছে।

কিন্তু পরিণাম?

সে-কথা ভেবে আর লাভ নেই। মুখার্জি ভিলার যে নিয়তি আসন্ন হচ্ছে—তাকে রোধ করবার শক্তি কারো নেই। যে আঘাত শিবশঙ্করের পাওনা—কোনো মতেই তার হাত থেকে তাঁকে বাঁচানো যাবে না।

মাঝখান থেকে তারও তো ছেলেমানুষি কম হল না। সেই একটা অসম্ভব দুর্বল মুহূর্তে অকারণে সে কথা দিয়ে এসেছে পূরবীকে। পূরবী সরল, পূরবী গভীর। বনশ্রীর সঙ্গে যত সহজে বাঁধনটা কেটে গিয়েছিল, পূরবীর ক্ষেত্রে তা আর সম্ভব নয়। আজ ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি নিয়ে বনশ্রীর সঙ্গে গল্প করা চলে—হীরেন যাকে "ওল্ড-ফ্রেণ্ড" বলেছিল, তার শেষ ভস্মকণাটুকুও সময়ের বাতাসে উড়ে গেছে। কিন্তু ২১ আর ১৮ বছরে অনেক তফাৎ। আর এত অবলীলায় নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যাবেনা। সে-ও এখন ক্লান্ত, এখন তারও মনে একটা নিশ্চিত

আশ্বাস দরকার—একটা আশ্রয় দরকার। পূরবীর মধ্যে সে নিশ্চয়তা আছে—সেই আশ্বাস আছে। না—বনশ্রীকে আর ভয় নেই। মিথ্যেই সেদিন চম্‌কে উঠেছিল সে—সিঁথির একটা চকিত উদ্ভাস অকারণে তাকে চঞ্চল করে তুলেছিল। বনশ্রী আর যাই হোক—"সাইনারা" নয়—জীবনের কোনো উন্মাদ-লগ্নে দুটি মিলনোৎসুক অধরের মাঝখানে তার প্রেতের মতো ছায়ামূর্ত্তি নেমে আসবে না।

কিন্তু সে নিজে কি সত্যিই পূরবীকে ভালোবেসেছে? স্নেহ, করুণা, মমতা ছাড়িয়ে পূরবী কি তার রক্তে প্রবেশ করেছে সেই অনিবার্যতায়—যা প্রত্যেকটি সন্ধ্যাকে স্বপ্নে ভরে দেয়, দূর থেকে যে-কোনো একটি মেয়েকে দেখে যা বুকের ভেতরে ঢেউ তোলে।

পূরবী প্রতীক্ষা করে আছে। পূরবীর মতো মেয়েরা চিরদিনই প্রতীক্ষা করে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবে সত্যজিৎ? দূর হোক—দুর্ভাবনার কোথাও শেষ নেই। তাহার চাইতে পুরোনো আড্ডাটায় আবার যাতায়াত আরম্ভ করলে মন্দ হয় না। মনের এই নৈরাশ্যপীড়িত অবস্থা, এই ভাবনার বিলাস—এর কাছ থেকে তার এখন যথাসম্ভব মুক্তি পাওয়া দরকার। আবার নতুন করে পাঁচ বছর আপনার দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা যাক—আবার তর্ক জুড়ে দেওয়া যাক সুমিত্রের সঙ্গে—আবার চীৎকার করে প্রমাণ করা যাক: ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে আজও মধ্যবিত্তের নেতৃত্বের পালা শেষ হয়নি।

বেরুতে গিয়েও কেমন কুঁড়েমি ধরল, ঈজি চেয়ারটায় বসে পড়ে চুরুট ধরালো সত্যিজিৎ। বীথি এল এই সময়ে।

জামিনে আছে। ওদের কেস্ এখনো পেণ্ডিং। আর সেই জন্যেই বীথির কাজ-কর্ম এখন ভয়ানক বেড়ে গেছে—সব সময়ে নিদারুণ ব্যস্ত। কলেজে অবশ্য তাকে দেখা যায়, কিন্তু যতটা কমন-রুমে আর করিডোরে—ততটা ক্লাসে নয়। প্রিন্সিপ্যাল্ একদিন বলেছিলেন, প্রফেসার মুখার্জি, আপনার বোনটি যে দুর্দান্ত লীডার হয়ে উঠল, সময় থাকতে ওকে কণ্ট্রোল্ করুন। সত্যজিৎ মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিল, এখন বড় হয়েছে—ওরা কারো কণ্ট্রোলে আসতে রাজী নয়। শুনে প্রিন্সিপ্যাল্ চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন, ইয়েস, দে আর নাউ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ সিন্স ফিফ্‌টিন্থ অগাস্ট, নাইন্‌টিন ফিফ্‌টি সেভেন। দেশের অবস্থা যা হচ্ছে তা চমৎকার।

নিঃশব্দে মৃদু হাসিতে, দেশের দুর্গতিতে উত্তেজিত প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে একমত হয়ে টাইম্‌স্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্টে চোখ নামিয়েছিল সত্যজিৎ। ভেবেছিল পরে বীথিকে কথাটা সে বলবে, কিন্তু মনে ছিল না।

এ হেন বীথি—উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট থেকে যে স্বাধীনতা পেয়েছে, সেই মাননীয়া মেয়েটি এসে সত্যজিতের ঘরে ঢুকল।

—ছোড়দা!

চোখ দুটো আধবোজা হয়ে সত্যজিৎ চুরুটে টান দিয়ে বললে, কী খবর?

—দারুণ দরকার আছে।

—বিপ্লবের খবর কী? এসে পড়ল?

—প্রায়।

—সিগ্‌ন্যাল দিয়েছে?

বীথি হেসে ফেলল।

—সিগ্‌ন্যাল বলছ কি, প্রায় 'ইন্' করেছে।

—প্রায় কেন?—চুরুটের ধোঁয়ায় মুখের সামনে অস্থায়ী মেঘজাল সৃষ্টি করে সত্যজিৎ বললে, আসতে বাধাটা কোথায়?

—লাইন-ক্লিয়ারের জন্যে। তোমাদের মত পেটি বুর্জোয়া ইণ্টেলেকচুয়ালদের পয়েণ্ট্‌স্‌ম্যান করেই ভুল হয়েছে—গাড়ী আসবার মুখেই তোমরা ঝিমিয়ে পড়েছ!

—রিয়্যালি।—সত্যজিৎ এবার মুগ্ধ চোখ মেলল: বেশ বলেছিস তো। নাঃ—সত্যিই তুই এবার লীডার হয়ে উঠেছিস, কার সাধ্য রোধে তোর গতি—এবং তোদের ট্রেন।

মুখার্জি ভিলা যে হাসি অনেকদিন আগে ভুলে গেছে—সেই সুস্থ উজ্জ্বল হাসির লহরে লহরে বীথি ঘরখানাকে ভরিয়ে ফেলল। সত্যজিৎ আশ্চর্য হয়ে ভাবল: এ হাসি বীথি পেলো কোথা থেকে! এ হাসি শিবশঙ্করের নয়—ইন্দ্রজিতের নয়, প্রীতির নয়—সে নিজেও এর কথা বোধ হয় যুগান্তরের পেছনে ফেলে এসেছে।

হাসি থামিয়ে বীথি বললে, সত্যি, খুব দরকারী কথা। আচ্ছা ছোড়দা, দিদির কথা কিছু ভাবছ না?

—সব ঘোলা হয়ে গেল। এ-সব আলোচনা বীথি কেন করে? ওর মুখে এ যেন মানায় না?

—কী হবে ভেবে? ও যাতে সুখী হয়—তাই করুক।

—তার মানে? তুমি কি চাও—দিদি রীতেনকে বিয়ে করবে?

—ক্ষতি কী?

—ক্ষতি কী!—অকৃত্রিম বিস্ময়ে বীথির ভ্রূ দুটো প্রসারিত হয়ে গেল: রীতেনবাবুকে তো গাব্বে-হাউসের নতুন এক্জিবিট ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

—তোর আর প্রীতির চোখ এক নয়।

—অদ্ভুত!—বীথি খানিকক্ষণ বিমর্ষ হয়ে রইল: দিদির কি টেস্ট বলে কিছুই নেই?

—এটা বুর্জোয়া সেন্টিমেন্ট বীথি।—সত্যজিৎ নিজের মনের ভাবটাকেও লঘু করতে চাইল।

বীথি অত সহজে কথাটা ছেড়ে দিলে না। তেমনি ভুরু কুঁচকে বললে, রুচি জিনিসটা বুর্জোয়া কুসংস্কার—এমন থিয়োরি মার্ক্সিজমের কোথাও নেই। ঠাট্টা নয় ছোড়দা। ধরা গেল ছোড়দি ওকে ভালোবাসে। কিন্তু রীতেনের টাইপের ছেলেকে কি সত্যিই বিশ্বাস করা চলে? ও যদি দিদিকে বিট্রে করে শেষ পর্যন্ত?

এই কথাটাকেই সত্যজিৎ কোনো মতে মনে আনতে চায় না—প্রাণপণে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। আবার চুরুট থেকে একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে দিয়ে বললে, অ্যাণ্ড্ ইন্ দ্যাট কেস্—ইট উইল্ বি এ ভেরি ভ্যালুয়েবল এক্স্পিরিয়েন্স ফর প্রীতি।

বীথি আহত হল।

—সত্যি ছোড়দা—তুমি সিনিক্ হয়ে যাচ্ছ।

—রিয়্যালিটিকে সহজে স্বীকার করাকে কি সিনিক্ হওয়া বলে?—সত্যজিৎ আস্তে আস্তে বললে। আসল কথা হল, এখন সব জিনিসটাই তোর আমার ভাবনার বাইরে চলে গেছে বীথি। উই মাস্ট ওয়েট অ্যাণ্ড সী।

বীথি একটু চুপ করে রইল। হয়তো বুঝতে পারল না কথাটা।

—ঠিকই বলেছ। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। হয়তো মোহ ভঙ্গ হতে পারে।

পারে কি? ভাবতে চেষ্টা করল সত্যজিৎ। বারান্দায় রোদ পড়ে ক্যাক্টাস আর অর্কিডগুলো একরাশ বিকৃত আঙুলের মতো ছায়া ঢেলেছে। ওই আঙুলগুলো যেন গলা টিপে ধরতে আসছে মুখার্জি ভিলার। একটা চরম দুর্ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত ফিরতে পারে প্রীতি?

বীথি বললে, আমাকে গোটা ত্রিশেক টাকা দিতে হবে ছোড়দা।

—ত্রিশ টাকা? কী করবি রে?

—কন্ফারেন্সে যাব। সাউথে। পরশু বেরুতে হবে ম্যাড্রাস্ মেলে।

—সে কি! বাবা—

—সে আর ভাববার উপায় নেই ছোড়দা। যা হওয়ার হবে।

সত্যজিৎ স্তব্ধ হয়ে রইল। সত্যিই ভাববার উপায় নেই তার। মুখার্জি ভিলার অনিবার্য ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। অনেক প্রায়শ্চিত্ত বাকী আছে তার—অনেক আঘাত জমা হয়ে আছে শিবশঙ্করের জন্যে।

—তোদের অ্যানুয়াল আসছে যে।

—ঠিক প্রমোশন দেবেন প্রিন্সিপ্যাল্। আমাকে যতটা ডিজলাইক করেন—ভয় করেন তার চাইতেও বেশি।

সত্যজিৎ আবার নিঃশব্দে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ল কিছুক্ষণ।

—ত্রিশটা টাকা কিন্তু তোমাকে দিতেই হবে ছোড়দা। বাকীটা আমি ম্যানেজ করে নেব।

সকালেই বনশ্রীর পাবলিশার দেড়শো টাকার একটা বেয়ারার চেক পাঠিয়েছে—সেটা পড়েছিল টেবিলের ওপর। সেদিকে দেখিয়ে সত্যজিৎ বললে, ওটা ভাঙিয়ে কাল এনে দেব।

—কী বলে যে ধন্যবাদ দেব ছোড়দা—

—ধন্যবাদের দরকার নেই। বিপ্লব হওয়ার পরে আমাকে একটা ন্যাশানাল প্রফেসার করে দিস—তা হলেই হবে।

—নিশ্চয়। তখন তোমার কেস্ কন্সিডার করা হবে বই কি।—বীথি আবার হাসল: আমি বেরুচ্ছি, হাতে অনেক কাজ এখন।

বীথির হাতে অনেক কাজ। কিন্তু সত্যজিতেরই কোনো কাজ নেই। কেবল নিজের মনের মধ্যে মন্থন

করা—কেবল অনিশ্চয়তার একটা সীমান্তে দাঁড়িয়ে কালকে লক্ষ্য করে যাওয়া। কিন্তু কোনো অর্থ হয়না এর। একটা কোনো ভূমিকা নিতেই হবে। নিজের মানসিক অসুস্থতা থেকে বাঁচবার জন্যেও তার যা হোক কিছু করা দরকার।

সুমিত্রের বক্তৃতা মনে পড়ল। তৃতীয় পর্যায়ের বুদ্ধিজীবীদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করছে সে। ইণ্টেক্‌লেকচুয়ালি ডিক্লাস্‌ড্‌—অথচ তার বাস্তব রূপটাকে স্বীকার করবার শক্তি নেই; সংগ্রামকে জেনেছি, অথচ হাতে নেবার উদ্যম নেই। অকারণে ক্রিটিক্যাল্‌—সাবজেক্‌টিভ্‌—

ইন্দ্রজিতের চিৎকারে সে চকিত হয়ে উঠল। লীয়ার আউড়ে চলেছে। বায়ুবর্ষণতাড়িত হীথের মধ্যে প্রবঞ্চিত অভিশপ্ত লীয়ার বুকফাটা যন্ত্রণায় অভিশাপ দিচ্ছে।

কিন্তু লীয়ারের এই ভূমিকায় সত্যিই অভিনয়টা কে করবে? অকারণে সত্যজিতের মনে হল: এই ভূমিকাটা সত্যিই কা'র? শিবশঙ্করের না ইন্দ্রজিতের?

সত্যজিৎ উঠে পড়ল। নাঃ—আর নয়। এবার বেরুতেই হবে তাকে। সেই পুরোনো আড্ডায়। সুমিত্রের সঙ্গে সেই পুরোনো তর্কে। বীথিকে দেখে আজ তার হিংসে হচ্ছে। একদিন ও-রকম জীবন তারও ছিল।

সেই সময় রঘু নিয়ে এল চিঠিটা। বিকেলের ডাকে এসেছে।

খাম খুলেই রক্ত দুলে উঠল মাথার ভেতরে। পূরবী তাকে চিঠি দিয়েছে। সেদিনের পর পূরবীর কাছ থেকে তার প্রথম খবর—পূরবীর হাত থেকে পাওয়া তার প্রথম চিঠি।

—শ্রীচরণেষু, খুব বিপদে পড়ে ডাকছি। একবার আসতে হবে। কবে আসবেন?

—পূরবী

'আসবেন'—এর 'ন'টা পরে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয় তো লজ্জায়—হয় তো দাবিটা এখনো সম্পূর্ণ করতে পারছে না বলে'।

কিন্তু চিঠির প্রত্যেকটা অক্ষরে যেন একটা আশ্চর্য কাতরতা—একটা ব্যাকুল সজলতা অনুভব করল সত্যজিৎ। নিশ্চয় গুরুতর কিছু ঘটেছে। আজই যাবে সত্যজিৎ। এখুনি!

ক্রমশঃ

আমাদের দেশে চা-শিল্প

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

শহরের আকাশচুম্বী প্রাসাদ থেকে সুরু করে সুদূর পল্লীর পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আজ চা পানের প্রচলন কম বেশী দেখতে পাওয়া যায়, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বর্ত্তমানে এই পানীয়ের প্রতি একটা ক্রমবর্দ্ধমান আকর্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশের সকল স্তরের লোকের মধ্যে। এই আকর্ষণ ও প্রচলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে উৎপাদন বা ফলন বাড়িয়ে যাওয়ার ভিতরেই রয়েছে এর অর্থ-নৈতিক অবদান। অন্যথায় অর্থ-নৈতিক জীবনে আসতে পারে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়া—যেমন এসেছিল বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশকে ১৯৩২-৩৩ সালে। সমগ্র পৃথিবীর চায়ের বাজারে সেদিন যে বিরাট মন্দা দেখা দিয়েছিল তার একমাত্র কারণ ছিল যে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন গিয়েছিল অনেক গুণ বেড়ে। চা-উৎপাদক দেশগুলি সেদিন এই সত্য উপলব্ধি করেই পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় চা উৎপাদন ও বিদেশে চায়ের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের জন্য, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল প্রভৃতি সেই দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ ছিল অন্যতম প্রধান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতবর্ষে চা-উৎপাদনের গোড়ার কথা ও চা-শিল্প বিকাশের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্ব্বে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনে চা-শিল্পের স্থান আমাদের দেশে সর্ব্বাগ্রে।

চা প্রাচ্যের সম্পদ। পাশ্চাত্য দেশে প্রথমে চায়ের আমদানী হত সুদূর প্রাচ্যের মহাচীন হ'তে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্য্যন্ত মহাচীনই ছিল পাশ্চাত্য দেশের একমাত্র চা-সরবরাহক দেশ। তারপরে আস্তে আস্তে অবশ্য ভারত, সিংহল প্রভৃতি অন্যান্য দেশসমূহও চায়ের উৎপাদন প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়ে বিদেশে ইহার রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রসার করতে আরম্ভ করে। নিঃসন্দেহে এবং দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে যে, ভারতবর্ষ তার চা উৎপাদনের প্রথম প্রেরণালাভ করে ঐতিহ্যমণ্ডিত চীনদেশ থেকে এবং আমাদের দেশে প্রথম প্রচেষ্টা সুরু হয় সুদূর চীন থেকে চায়ের বীজ এবং চারা আনিয়ে ভারতের মাটিতে তার চাষের ব্যবস্থা দ্বারা। তারপরে অবশ্য আস্তে আস্তে গবেষণাসমৃদ্ধ ভারতীয় চায়ের বীজ এবং চারা অধিকতর লাভজনক ও উৎকৃষ্টতর বলেই প্রমাণিত

হয়। খুব গর্ব্বের এবং আনন্দের কথা যে বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীর চায়ের চাহিদার প্রায় অর্দ্ধেকের মতই মেটান হয় বা সরবরাহ করা হয় আমাদের দেশ থেকেই, ভারতের মত অর্থনৈতিক অনগ্রসর দেশের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। অবশ্য সম্প্রতি বৈদেশিক বাজারে নানা-কারণে চা-শিল্পকে খানিকটা প্রতিকূল আবহাওয়ার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সম্বন্ধে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করব।

আজ থেকে প্রায় ১৩৫ বছর পূর্ব্বে আসামে শিবসাগরের কাছে সদিয়া নামক এক সুদূর অঞ্চলে R. Bruce এবং C. A. Bruce নামে ইংরেজ দুই ভাই ১৮২৩ সালে আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম চায়ের চারা আবিষ্কার করেন। তারপর থেকেই সুরু হয় দেশজ এই সম্পদ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা। উত্তরকালে প্রমাণিত হয় যে এই ভারতীয় চারা-গুলি বিদেশ থেকে আমদানীকৃত চারাগুলির চেয়ে সকল দিক দিয়েই অধিকতর সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে আমাদের দেশের চা-উৎপাদনী ভূমির শতকরা ৭৫ ভাগই অবস্থিত আসাম-রাজ্যে এবং পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং এই দুটী জেলায় এবং শতকরা প্রায় ২০ ভাগ ভূমি অবস্থিত দক্ষিণ ভারতে এবং অবশিষ্ট প্রায় ৫ ভাগ অবস্থিত উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে। বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জ্জনকারী এই মূল্যবান সম্পদের উৎপাদন ও বিকাশের ধারার সঙ্গে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নাম চিরদিন যুক্ত থাকবে। তিনিই প্রথম এদেশে চায়ের উৎপাদনের কার্য্যকারিতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য ১৮৩৪ সালে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত একটী কমিটি নিয়োগ করেন। সেই কমিটি এই দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন ও অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে হিমালয়ের উপত্যকা, আসাম, দার্জ্জিলিং, নীলগিরি প্রভৃতি অঞ্চলসমূহ চা চাষ এবং চা উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত এবং সেই বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ-অনুযায়ীই এদেশে চা-উৎপাদনের ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হয়। তাতে যথেষ্ট সুফলও পাওয়া যায়। স্বভাবতই এদেশে চা চাষের এই সাফল্যে দেশী এবং বিদেশী শিল্পপতিদের দৃষ্টি-আকৃষ্ট হল এই দিকে। ১৮৩৯ সালে দেখা গেল দেশে এবং বিলেতে কতগুলি সংস্থা গড়ে উঠল চায়ের উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করবার জন্য। পরবর্ত্তীকালে নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই এই দেশী এবং বিলাতি কোম্পানীগুলি একত্রিত হয়ে একটী যৌথ সংস্থায় রূপান্তরিত হল যার নামকরণ করা হল "আসাম চা কোম্পানী।" তারও অনেক পরে ১৮৮১ সালে এদেশে "ভারতীয় চা সমিতি" (Indian Tea Association) নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। সেই সংস্থা বিংশ-শতাব্দীর একেবারে সুরুতে ১৯০০ সালে একজন বৈজ্ঞানিক গবেষক নিযুক্ত করে চা-শিল্পকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নততর পর্য্যায়ে তুলবার জন্য। সেই নবনি-যুক্ত গবেষক তাঁর প্রথম গবেষণার কাজ সুরু করেন কলিকাতায় অবস্থিত ভারতীয় যাদুঘরে। পরে অবশ্য এই গবেষণাগারকে আসামে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। পরবর্ত্তীকালে অনুরূপ-ভাবে দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গালোরেও একটী গবেষণাগার স্থাপিত হয়। এমনি করে ভারতের মাটীতে চা উৎপাদনের অগ্রগতি সুরু হল এবং ভবিষ্যতে ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জ্জনকারী শিল্পে পরিণত হল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৮৩৮ সালে সর্ব্বপ্রথম ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে অর্থাৎ বিদেশের বাজারে চা রপ্তানী করা হয় এবং তখন সেই চায়ের বিক্রয়-মূল্য ছিল তের টাকা করে পাউণ্ড।

১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের মূল্য দিয়ে ভারত স্বাধীনতা অর্জ্জন করল। দেশ-বিভাগজনিত আঘাতের ধাক্কা জাতির গোটা অর্থনৈতিক জীবনে প্রচণ্ড ঘা মারল—যার দরুণ জাতীয় জীবনে দেখা দিতে সুরু করল নানাপ্রকার জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা—যে সকল সমস্যার সমাধান আজও সম্ভব হয় নাই—আজও তার সমাধানের প্রচেষ্টা চলছে। যাই হোক্, চা শিল্পও সেই আঘাত থেকে রেহাই পেলেন। এই শিল্পের উপরেও এসে পড়ল তার ধাক্কা—যার ফলে প্রায় ৫৭,০০০ একর চা-উৎপাদনী ভূমি ভারতের হাতছাড়া হয়ে গেল। অবশ্য এই ক্ষতি-পূরণের জন্য আমাদের দেশের চা-শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক এবং মালিক উভয় পক্ষই চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। খুবই আশা-ব্যঞ্জক সংবাদ এই যে, উন্নততর বৈজ্ঞানিক উপায় এবং পদ্ধতি আরোপণে সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ৫৭,০০০ একর চা উৎপাদনী জমি হারিয়েও আমাদের দ্বিধা-বিভক্ত দেশে চা-উৎপাদনের হারকে হ্রাস পেতে দেওয়া হলনা। পরন্তু গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করা যেতে পারে যে উৎপাদনের হার এখন উর্দ্ধমুখী। এক নজরে আমাদের দেশের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের এবং স্বাধীনোত্তর যুগের একর প্রতি চায়ের উৎপাদনের হার নিম্নলিখিত তালিকা থেকে জানা যাবে :

সাল	জমি (একর)	উৎপাদন (পাউণ্ড)
১৮৮৬	২০৮,৪৯২	৪১,৯২৫,০০০
১৮৯০	৩৪৪,৭৪৪	১১২,০৩৬,০০০
১৯৩০	৮০৪,০০০	৩৯১,০২২,০০০
১৯৪০	৮৪০,০৪৬	৪৭৪,০২২,০০০
১৯৫০	৭৮২,৯৯৮	৬১৩,৩৫৪,০০০
১৯৫৭	৭৯২,৫৩৩	৬৬৪,৫৮৩,০০০
১৯৫৮	৮০০,০০০	৭৫০,০০০,০০০

পূর্ব্বেই বলেছি যে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে চা-ব্যবসায়ে ১৯৩২-৩৩ সালের মত মন্দার পুনরাবির্ভাব বন্ধ করার জন্য ১৯৩৩ সালে একটী আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল বিভিন্ন চা-উৎপাদনকারী দেশ-সমূহের মধ্যে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল চাহিদাও সরবরাহের একটা সামঞ্জস্য বিধান করে উৎপাদন ও রপ্তানীকে সুনিয়ন্ত্রিত করা। এই সময়োচিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে যথেষ্ট সুফলও দেখা দিল। উৎপাদনকে কেবল মাত্র নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বাণিজ্য বা শিল্পের প্রসার সম্ভব নয়। শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তৃতির জন্য প্রয়োজন—উৎপাদনের চাহিদাকে বাড়িয়ে তোলা এবং তার জন্য দরকার যথেষ্ট প্রচারের।

উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট চুক্তি-সম্পাদনকারী দেশসমূহও এই সত্য উপলব্ধি করল। তাদের বাণিজ্য-ক্ষেত্র প্রসারের জন্য তাই তারা উক্ত চুক্তি সম্পাদনের দুবছরের মধ্যে ১৯৩৫ সালে একটী আন্তর্জাতিক "চা প্রচার সমিতি" (International Tea Expansion Board) গঠন করল। এই সমিতির কাজ হল বিশ্বের বাজারে চায়ের জনপ্রিয়তা ও প্রচলন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচার কার্য্য পরিচালনা করা—যাহাতে বিশ্বের বাজারে চায়ের চাহিদা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়। এই প্রচার সমিতি গঠনে বেশ সুফলও পাওয়া গেল। চুক্তিকালীন সময়ে এই শিল্পে আর কখনও মন্দা ত দেখা দিলই না, বরং এই সময়ে চা-শিল্পের বাজার বেশ সন্তোষজনক ছিল। চা-উৎপাদনকারী প্রত্যেকটী দেশই এই সময়ে বেশ লাভবানই হয়েছে, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে ১৪২ কোটী টাকা মূল্যের চা বিদেশে বিক্রীত হয়। তাছাড়া নানাপ্রকার কর ও শুল্ক বাবদ আয় ত আছেই। প্রসঙ্গতঃ উপরে বর্ণিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় ১৯৫৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে। তারপরেই আবার অধিকতর লাভবান হওয়ার জন্য চা উৎপাদনকারী দেশসমূহের মধ্যে সুরু হয় উৎপাদন বাড়িয়ে তোলার প্রতিযোগিতা। ১৯৫৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের পর থেকে প্রত্যেক উৎপাদনকারী দেশ থেকেই চায়ের রপ্তানী লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে সুরু করে। এই উৎপাদন বৃদ্ধি প্রতিযোগিতার দরুণ আজ আবার পৃথিবীতে চাহিদার চেয়ে চায়ের উৎপাদনের হার গেছে বেড়ে। বিশ্বের বাজারে চায়ের উৎপাদন ও চাহিদার তুলনামূলক বৃদ্ধির হার নিম্নলিখিত তালিকা থেকে জানা যাবে :

সাল	উৎপাদন (পাউণ্ডের হিসাব)	চাহিদা (পাউণ্ডের হিসাব)
১৯৫৩	১২১১ মিলিয়ন	১২৪৯ মিলিয়ন
১৯৫৬	১৩৬৫ মিলিয়ান	১৩১৪ মিলিয়ন
১৯৫৭	১৪১০ মিলিয়ন	১৪০০ মিলিয়ন

এখানে উল্লেখ করা হয়ত বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ১৯৩৩ সালে চা-উৎপাদনকারী দেশসকল যে চুক্তি সম্পাদন করেছিল চা-শিল্পের উৎপাদন ও রপ্তানীর সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সেই চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির নামের তালিকা দক্ষিণ আফ্রিকাকে গ্রহণ করা হয়নি স্বল্প-উৎপাদনকারী দেশ বলে। আজ সেদিনের সেই অবহেলিত দেশেও চা উৎপাদন কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে নীচের হিসাব থেকেই তা জানা যাবে :

সাল	উৎপাদন (পাউণ্ডের হিসাব)
১৯৩৪	৭,১৪৮,০০০
১৯৪৪	২৩,৮৭৮,০০০
১৯৫৪	৩৭,৫৯২,০০০
১৯৫৫	৩৮,৯৯২,০০০
১৯৫৬	৪৬,৬৩৭,০০১

পূর্ব্বোল্লিখিত আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদনের জন্য পৃথিবীতে আবার সরবরাহ ও চাহিদার অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে এবং এর দরুণ চা-শিল্পে আজ যে সঙ্কটের আবর্ত্ত উঠেছে তার ঢেউ অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের চাশিল্পের উপর এসে বেশ জোর আঘাত করেছে। নিম্নে প্রদত্ত গত দুবছরের রপ্তানীর হার থেকেই এই সত্য জানা যায়—

সাল	রপ্তানী
১৯৪৬	৫২৩,৫৫৭,০০০ পাউণ্ড
১৯৫৭	৪৪৭,০৬৪,৭০০ পাউণ্ড

আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জনকারী এই মূল্যবান সম্পদের বর্তমান অবস্থার কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে এর উন্নতি বিধানের জন্য আজ আমাদের উপায় উদ্ভাবন কর্তে হবে। জাতীয় অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে উদ্ভাবন কর্তে হবে পথ—কি করে বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় আবার আমাদের এই জাতীয় সম্পদের হৃত বাজার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। ভারত থেকে বিদেশে যে পরিমাণ চা রপ্তানী করা হয়—তার অর্দ্ধেকের মত হচ্ছে সাধারণ চা এবং বাকী অর্দ্ধেক বিশেষ গুণসম্পন্ন চা। বিশেষ লক্ষ্যণীয় এই যে বিশ্বের বাজারে ভারতের এই বিশেষ গুণসম্পন্ন চায়ের চাহিদা আজও যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু সেই তুলনায় ভারতীয় সাধারণ চায়ের চাহিদা অনেক হ্রাস পেয়েছে। সেই স্থান আজকে আস্তে আস্তে দখল করে নিচ্ছে সিংহল, পূর্ব্বআফ্রিকা প্রভৃতি দেশসমূহ। তার কারণও রয়েছে, প্রধান ও প্রথম কারণ এই যে ভারতীয় সাধারণ চায়ের দামের তুলনায় সিংহল ও পূর্ব্ব-আফ্রিকার ঐ জাতীয় চায়ের দাম অপেক্ষাকৃত সস্তা। এর অনিবার্য্য ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বে আমাদের সকলের চেয়ে বড় গ্রাহক (Consuming) দেশ যুক্তরাজ্যে সামগ্রিকভাবে বর্ত্তমানে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও, সেই অতিরিক্ত চাহিদা সরবরাহ কচ্ছে পূর্ব্ব-আফ্রিকা, সিংহল প্রভৃতি দেশসমূহ—ভারতীয় চায়ের চাহিদা 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং। যুক্তরাষ্ট্রে ত ভারতীয় চায়ের বাজার আরও আশঙ্কাজনক। সেখানে আমাদের এই মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জ্জনের অন্যতম প্রধান সম্পদের চাহিদা খুব দ্রুত নিম্নাভিমুখী। নীচের প্রদত্ত হিসাব থেকেই প্রতিভাত হবে কি পরিমাণে আমাদের চায়ের চাহিদা আমেরিকার বাজারে পড়ে যাচ্ছে :

দেশ	সাল	ভারতীয় চায়ের চাহিদা (পাউণ্ডের হিসাব)
আমেরিকা	১৯৫৫	৩,৬৬,০০,০০০
আমেরিকা	১৯৫৬	৩,১৭,৫০,০০০
আমেরিকা	১৯৫৭	২,৮৪,০০,০০০

ভারতের চা শিল্পের রপ্তানী বাণিজ্যে আজ যে সঙ্কটের কালো মেঘ দেখা দিয়েছে অচিরেই সেই মেঘ দুরীভূত করবার প্রচেষ্টা না করলে অনাগত ভবিষ্যতে সেই মেঘ আমাদের এই শিল্পবাণিজ্যের আকাশ ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলতে পারে—এই আশঙ্কা অমূলক নয়। অনিবার্য্যরূপে তার কালোছায়া আমাদের অর্থ-নৈতিক জীবনের উপরেও এসে পড়বে। আমরা দ্বিবিধ উপায়ে বর্ত্তমানে চা শিল্পের এই সঙ্কট নিরসনে অগ্রসর

হতে পারি। প্রথমতঃ আভ্যন্তরিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি করে, দ্বিতীয়তঃ বহির্বিশ্বেও চাহিদা বৃদ্ধির পথে যে সকল অন্তরায় ও অসুবিধা আছে সচেষ্ট ও যত্নবান হয়ে সেগুলি দূর করে।

প্রথমে আভ্যন্তরিক বাজারের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে শতকরা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশটী পরিবারে চা পানের প্রচলন আছে। এখনও প্রায় অর্দ্ধেকের উপর ভারতীয় পরিবারে চা-পানের প্রচলন হয় নাই। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে চায়ের প্রচলন পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এবং একথা আমি গোড়ায়ই বলেছি যে ধনীর প্রাসাদ থেকে, সুরু করে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত আজ চা পানের প্রচলন ব্যাপ্তি লাভ করেছে, তাহলেও ব্যাপ্তির এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে। যথাযথ প্রচার দ্বারা সেই সুযোগ নেওয়া খুব কষ্ট-সাধ্য কাজ নয় বলেই মনে হয়। ১৯৫৫ সালে আমাদের দেশে ২১০ মিলিয়ন পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৫৭ সালে ঐ হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২২০ মিলিয়ন পাউণ্ডে। অর্থাৎ আমাদের দেশে বর্ত্তমানে মাথাপিছু চায়ের ব্যবহার কিঞ্চিদধিক ০·৫ পাউণ্ড। কাজেই এটা খুব উচ্চাশা করা হবে না—যদি দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আভ্যন্তরিক বাজারে চায়ের চাহিদা ২৫০ মিলিয়ন পাউণ্ডে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়; বিশেষ করে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রচয়িতাদের হিসাবানুযায়ী যখন দ্বিতীয় পরিকল্পনার সকল রূপায়নের শেষে অর্থাৎ ১৯৬১ সাল নাগাদ আমাদের দেশে মাথাপিছু শতকরা ১৮ ভাগ আয় বৃদ্ধি পাবে। এই ত গেল আভ্যন্তরিক বাজারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা। এবারে চাশিল্পের বহির্বাণিজ্যের কথা ধরা যাক। পূর্ব্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে বহির্বিশ্বে আমাদের দেশের বিশেষ গুণসম্পন্ন চায়ের চাহিদা এখনও একটুও হ্রাস পায় নি, পরন্তু তার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। চাহিদা হ্রাস পেয়েছে আমাদের দেশের সাধারণ চায়ের এবং তারও কারণ স্বরূপ দেখান হয়েছে যে অন্যান্য দেশের সমগুণ-সম্পন্ন চায়ের দাম আমাদের দেশের তুলনায় সস্তা। কাজেই আজ বিশ্বের বাজারে এই শিল্পকে তার হৃত-গৌরব ফিরে পেতে হলে প্রথমত আমাদের দেশের উৎপাদিত চায়ের গুণগত মান উন্নয়নের প্রচেষ্টায় অধিকতর যত্নবান হতে হবে। কারণ উন্নততর চায়ের চাহিদা বাজারে এখনও যথেষ্ট রয়েছে। উপযুক্ত সার ও বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে এ বিষয়ে যথেষ্ট সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যেসকল শুল্কের বেড়াজাল চা শিল্পকে ঘিরে আছে (যেমন Assam Road Tax অথবা transit tax, West Bengal Entry of goods tax, Sales tax, Excise duty প্রভৃতি) সেই সকল শুল্কের বেড়াজালকে তুলে ফেলতে পারলে আমাদের দেশের সাধারণ চায়ের দামের উপর তার যথেষ্ট শুভ প্রতিক্রিয়া হবে বলেই অনেক মহলের বিশ্বাস। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে আসাম transit tax এবং পশ্চিমবাংলার Entry tax বাবদই প্রতি পাউণ্ড চায়ের জন্য ব্যয়িত হয় ৫৫ থেকে ৫৭ নয়া পয়সা। তাছাড়া আমাদের দেশের ভালমন্দ নির্বিশেষে সকলপ্রকার চায়ের জন্য একই রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য হয়। আবার সেই রপ্তানী শুল্ক ও অনিশ্চিত, কারণ পূর্ব্বমাসের বিলাতে নিলামে ভারতীয় চা বিক্রয়ের গড় মূল্যের উপর সেই শুল্ক নির্দ্ধারণ নির্ভরশীল। এর ফলেও সাধারণ চায়ের দামের পড়তা বেশী পড়ে যায়। এই জাতীয় রপ্তানী শুল্ক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন চা শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিকাশের জন্য আশু প্রয়োজন। এর জন্য হয়ত প্রয়োজন হতে পারে সরকারের তরফ থেকে কোন বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা এবং তা অবিলম্বেই করা প্রয়োজন। আলোচিত ত্রুটিবিচ্যুতির বিস্তারিত পর্য্যালোচনা করে তাঁরা এর সংস্কারের জন্য যে সুপারিশ করবেন সেই সুপারিশ মত এই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনকারী শিল্পের সংস্কার সাধন করে জাতীয় অর্থ-নৈতিক জীবনকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাতীয় সরকারের পবিত্র কর্ত্তব্য! সেই বলিষ্ঠ পদক্ষেপেই অতিমূল্যবান এই "দুটি পাতা ও একটী কুঁড়ি" আমাদের জাতীয় শ্রীবৃদ্ধির পথে হবে সহায়ক। এতদ্ব্যতীত অষ্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার যে সকল দেশ-সমূহে আমাদের দেশের চায়ের প্রচার কার্য্য অত্যন্ত দুর্ব্বল, যথোপযুক্ত প্রচার দ্বারা সেই সকল দেশে অধুনা যথেষ্ট সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গত ৩১শে আগষ্ট (১৯৫৮ সাল) পুনর্গঠিত রপ্তানি উন্নয়ন উপদেষ্টা সমিতির (Re-Constituted Export promotion Advisory Council) প্রথম অধিবেশনে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীও বলেছেন—"There was Considerable room for increasing the exports of Indian Tea & Coffee. There were areas which had not yet been adequately tapped." অর্থাৎ এখনও ভারতীয় চা ও কফির রপ্তানী বাণিজ্যের পরিধি বাড়াবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এখনও এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে আমাদের চা ব্যবহারের জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা বা প্রচারকার্য্য চালান হয় নাই।

আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর বর্ত্তমান চায়ের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় বেশী। ১৯৫৭ সালে বিশ্বের চাহিদার চেয়ে বিশ্বের উৎপাদন ছিল ১০ মিলিয়ন পাউণ্ড বেশী। এই বিশ্বসমস্যার সমাধান কোথায়? সমাধানের পথ খুঁজতে খুব বেশী দূর যেতে হবে না। ১৯৩৫ সালের মত যদি পুনরায় একটী আন্তর্জ্জাতিক সংস্থা গঠন করা যায় চায়ের ব্যবহারের ব্যাপক প্রচারকার্য্যের জন্য তাহলে এক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এই অধিক উৎপাদন সমস্যার সমাধান মিলতে পারে। আমেরিকায় গড়ে মাথা প্রতি চায়ের ব্যবহার বছরে ০·৬ পাউণ্ড। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে যুক্তরাজ্যে মাথা প্রতি চায়ের ব্যবহার ৯·৫ পাউণ্ডের মত। আন্তর্জ্জাতিক কোন সংস্থার ব্যাপক প্রচারের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের ব্যবহার মাথা পিছু বছরে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত তোলা খুবই সম্ভব এবং এটা আশা করা মোটেই উচ্চাভিলাষের পরিচায়ক হবে না। এ দ্বারাই বিশ্বের সামগ্রিক উৎপাদন ও চাহিদার সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং সম্ভব চাশিল্পে আবার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-হিন্দোলোৎসব

সঙ্গীতম্

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চতুর্ধুরীণ বিরচিতম্

পূর্ণচন্দ্র-ত্রয়-যুৎপৎ-প্রকাশঃ।
নীলনভঃ ক্রোড়াশ্রয়— হিন্দোলাঙ্ক-শোভিদ্বয়—
ত্রিতয়-মিলিত-স্মিত-বিপুলবিলাসঃ ॥১
ভাবনম্র-কুমুদ্বদনী— দিবাভ্রান্ত কমলিনী—
বন্ধুজীব-সূর্যমুখী-হিতমিত-হাসঃ।
হারীত-সারস-পিক— পারাবত-চক্রবাক—
ভাগবত-প্রেমবশ-মধুর-সম্ভাষঃ ॥২
কালশুভ-শৃঙ্গ-ধ্বনিঃ,— বিশ্বমাতৃকাগমনী—
শরদুপযানবাণী-মিলন-সরসঃ।
কোটি-তারকাবিলোক— পুলকস্নাত-ভূলোক—
বিকচ কুসুমকোটী—মোহন সুহাসঃ ॥৩
মহাভাবপ্রেমঘন— বৃন্দাবনপ্রাণধন—
হিন্দোল-দোলন-সুখ-চরমবিকাশঃ।
দীনযতীন্দ্রহৃদ্দেশ— তমোরাশি-চিরনাশ—
প্রিয়ঙ্কর-কৃপাপর-সুবিমলভাসঃ ॥৪
জগজ্জননীরূপিকে— নন্দসুতপ্রাণাধিকে—
ভবতু যতিবিমলস্তব দাসদাসঃ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন সঙ্গীত

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী

বঙ্গানুবাদ

আজ তিনটী পূর্ণচন্দ্রের এক সঙ্গে উদয় হয়েছে।

একটী চন্দ্র নীল আকাশের ক্রোড় আশ্রয় করে আছেন; আর দুটী হিন্দোলা বা দোলার ক্রোড়ে শোভা পাচ্ছেন। এই তিনটীর মিলিত হাসিতে একটী বিপুল সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে ॥১

ভাবসুন্দর রাত্রির কুমুদ স্বভাবতই হাস্‌ছে; আর পদ্ম, বন্ধুজীব, সূর্যমুখী প্রভৃতি দিবসের পুষ্পসমূহ দিবাভ্রমে বন্ধু-সন্দর্শনজনিত পরিমিত হাস্যে সমুজ্জ্বল।

হারীত, সারস, কোকিল, পারাবত, চক্রবাক—পক্ষিসমূহ ভগবানের প্রেমের বশ্যতা স্বীকারপূর্বক মধুর সম্ভাষণে রত ॥২

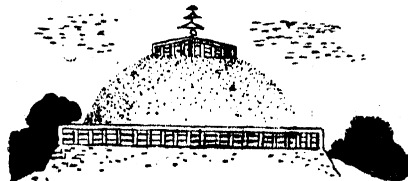
মহাকালের মঙ্গল শৃঙ্গের ধ্বনিতে জগজ্জননী শ্রীশ্রী-দুর্গার আগমনী গীতি শোনা যাচ্ছে; শরৎকালের আগমন-বাণীও তার সঙ্গে সংমিশ্রিত হওয়ায় তা'তে অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়েছে।

কোটি তারকার বিলোকন হেতু পুলকে স্নাত পৃথিবীতে যেন কোটি কোটি পুষ্প ফুটে উঠে সুন্দর হাস্য ছড়িয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে ॥৩

ফলে আজ রাধারাণীর প্রেমে সুপুষ্ট বৃন্দাবনের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনে দোলন সুখের চরম অভিব্যক্তি হয়েছে।

আর দীন যতীন্দ্রবিমলের হৃদয়ে যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়েছিল, তারও নাশ ঘটলো চিরতরে এবং ভগবানের কৃপার ফলে প্রোজ্জ্বলতম দীপ্তিতে চতুর্দিক্ উদ্ভাসিত হচ্ছে ॥৪

হে বিশ্বজননীর মূর্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিলাসিনি! যতীন্দ্র-বিমল যেন তোমার দাসের বা ভক্তের দাস রূপে থাকতে পারে ॥





কাশীনাথ কৃষিক্ষেত্র

শ্রীগোপী ভট্টাচার্য

স্বভাব আমার ঘুরে বেড়ানো। দেখা আর লেখা। অপ্রত্যাশিতভাবে আহ্বান এলো চারাপোল থেকে। ভাটপাড়ার শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য তাঁর হাতে-গড়া কাশীনাথ কৃষিক্ষেত্র দেখে আসবার জন্যে বলে পাঠালেন। ভাটপাড়ার অধিবাসী আমি। সম্পর্কে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র। সারাদিনের নিমন্ত্রণ। ফার্ম দেখা আর খাওয়া দুই-ই একসাথে। অনেকদিন ধরেই শুনে আসছিলাম কাশীনাথ ফার্মের কথা। হঠাৎ সুযোগটা ঘটে যাওয়ায় আনন্দ পেলাম খুবই। এই সঙ্গে মনে পড়ে গেল বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে। যিনি আমাদের সকল কাজের পুরোভাগে থেকে বুদ্ধি দিয়ে, উপদেশ দিয়ে, স্নেহ-সাহচর্য্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন সেই স্বনামধন্য সাংবাদিকোত্তম শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা। ভারতবর্ষের সম্পাদক ফণীদাকে বাংলাদেশের কে না চেনেন। সুতরাং তাঁর পরিচয় নতুন করে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘকাল ধরে এই মানুষটির স্নেহচ্ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে বুঝেছি, যেখানেই সাধারণ মানুষের আন্তরিক শ্রমনিষ্ঠার ফলে গড়ে উঠেছে কোন প্রতিষ্ঠান, সেখানে যেতে পারলে তিনি কতখানি আনন্দিত হয়ে ওঠেন। তাই সর্বাগ্রে তাঁরই কাছে গেলাম ছুটে চারাপোল যাবার প্রস্তাব নিয়ে। অনুরোধ করা মাত্র সানন্দে রাজী হলেন তিনি। তারপর শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্যের কাছে পৌঁছে দিলাম এই সুখবর। কর্ণওয়ালিশ ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার হরনাথ। তৎক্ষণাৎ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে এলেন ভারতবর্ষ অফিসে। উদ্দেশ্য ফণীদার যাবার কথাটা পাকা করে নেওয়া। দিনস্থির হোল ৩রা আগষ্ট রোববার।

আজ সেই দিন। কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে নেমে হরিণঘাটার বাসে চড়তে হবে। এগোতে লাগলাম চৌমাথার দিকে। দেখা হয়ে গেল স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীঅতুলকৃষ্ণ পালের সাথে। পায়ের ধুলো নিলেন তিনি ফণীদার। তারপর জেনে নিলেন আমাদের আগমনের কারণ। বাসে গেলে কষ্ট হবে এই কারণে নিজের মোটরে পৌঁছে দেবার আয়োজন করে দিলেন তৎক্ষণাৎ। অতুলবাবুর কল্যাণে বেশ আরামেই পৌঁছে গেলাম চারাপোল। জায়গাটার নাম কাঁপা-চারাপোল।

বীজপুর থানার অধীনস্থ জেটিয়া-মাঝিপাড়া ইউনিয়নের এলাকাধীন গ্রাম। কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন থেকে হরিণঘাটার পথে দু মাইল। বাসের ভাড়া দু আনা। সদর রাস্তার উত্তর দিকে গেট। পাথরের ফলক বসানো, তাতে লেখা "কাশীনাথ ফার্ম"। গেটের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললাম সোজা উত্তরে। দুপাশে ধান আর পাটের ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। কিছুদূর এগিয়েই নজরে এলো অপূর্ব দৃশ্য! রজনীগন্ধার রাজত্ব। ৪।৫ বিঘা জুড়ে শুধু রজনীগন্ধা গাছের সারি। মেঠো হাওয়ায় দুলছে ফুলের গুচ্ছ, আর সেই হাওয়া বয়ে বেড়াচ্ছে মন-মাতানো সুবাস। তারপরেই দেখলাম বাঁদিকে মস্ত পাকা বাড়ী। এগোলাম সেইদিকে। কাছে গিয়ে দেখলাম টিউবওয়েল, আর তার পাশে উঁচু থামের ওপর জলাধার। অভ্যর্থনা করল একটি সুদর্শন তরুণ। শুনলাম ক্ষেত্রস্বামী আরো দুজন অতিথিকে নিয়ে গেছেন বাগানে দেখাতে। তরুণ বাড়ীর মেজছেলে। এবার স্কুল-ফাইনাল দেবে। সে আমাদের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। দক্ষিণ মুখো প্রশস্ত ঘর। হাওয়ার বন্যা বয়ে চলেছে। মাঝখানে বড় চৌকির ওপর ঢালা বিছানা। একপাশে টিপয়ের ওপর ফুলদানী। তাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা, আর গ্লোরিয়সা-সুপার্বা (Gloriosa Superba) খবর চলে গেল মালিকের কাছে। দ্রুত পায়ে ফিরে এলেন তিনি। সঙ্গে অতিথিদ্বয়। অবাক হলাম আমি খুড়ো মশাইকে দেখে। পোষ্টমাষ্টারের ধোপদোরস্ত পোষাকে দেখে এসেছি এতকাল—তার সাথে আজকের পোষাক আর চেহারার মিল নেই কিছু। বুঝতে পারলেন বোধহয় আমার অবাক চাউনি দেখে। প্রাণখোলা হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন ফণীদাকে আর আমাকে। তারপর বললেন, 'এখানে আমি খাঁটি চাষা। ময়লা লুঙ্গি, খালি গা, পায়ে রবারের ছেঁড়া চটি। লুঙ্গি আবার যা-তা নয়। মেয়ের ছেঁড়া শাড়ী জুড়ে তৈরী!" পরিচয় হোল অতিথি দুজনের সাথে। ২৪পরগণা জেলার দক্ষিণে কোঁড়াল গ্রামের অধিবাসী তাঁরা। সেখানে কৃষিক্ষেত্র আছে তাঁদের। পরস্পর অভিজ্ঞতার আদান প্রদান করতে এসেছেন চারাপোলে। বাড়ীর বড় ছেলে শ্রীমান অশোক, আর একমাত্র মেয়ে এলো মিষ্টির রেকাবী, চা-এর ট্রে আর জলের গ্লাস নিয়ে। চা-পর্ব শেষ হতেই ঘড়িতে দেখলাম প্রায় বেলা এগারোটা।

এর ভেতরে দেখলাম ফণীদা তৈরী হয়ে গেছেন। জামা খুলে কাপড় প্রায় হাঁটুর ওপর গোটানো। খুড়ো মশায়ের বর্ণনা আগেই দিয়েছি। অতিথি দুজনও ফণীদার মতই। হংস মধ্যে বকের মত আমিই শুধু শহুরে লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। অদ্ভুত লাগছে দেখতে। সব থেকে আনন্দ পাচ্ছি ফণীদাকে দেখে। খোলা গায়ের ওপর মোটা উপবীত। হাঁটুর ওপর গোটানো কাপড়। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। প্রকৃতির কোলে এসে মাটির মানুষ যেন শিশুর মত নেচে উঠেছে। এখন আর চেনবার উপায় নেই চার জনের মধ্যে কে খাঁটি, আর কে অর্খাঁটি চাষা।

যাত্রা হোল সুরু। মাথার ওপর শ্রাবণের মেঘ-ভাঙা কড়া রোদ। পায়ের নীচে রোদে-পোড়া মাটি। ছাতা খুলে সুরু হোল পরিক্রমা। চলেছি দক্ষিণ দিকে। প্রায় ৪।৫ বিঘে জমীর ওপর বাতাসে দোল

খাচ্ছে সবুজ ধানের পুষ্ট শিষ। তার ওপাশে নেপিয়ার ও প্যারা ঘাস, পশুর খাদ্য। আর বাঁ দিকে পাটের চারা। বিঘে পাঁচেক জমীর ওপর তেজী পাট গাছ। আরো এগিয়ে কয়েকটি বাঁশঝাড়, কলাবন, আম, জাম, আর নারকেলের সারি। তারপরেই হরিণঘাটা রোড়। রাস্তার ধারে ধারে পুব-পশ্চিমে প্রায় দেড়শো ফুট লম্বা সীমানা। ঘুরলাম পুব দিকে। নানারকমের ফলের গাছ রয়েছে সেখানে। গোলাপজাম, জামরুল, বাতাবী লেবু, পেঁপে, আনারস, বেদানা, ডালিম, খেজুর, পাতি-লেবু—আরো কত কি। এরই মাঝে একটা নীচু ডোবার ধারে দেখলাম অদ্ভুত ধরণের এক বাঁশঝাড়। মাত্র দু'সনের বাঁশ। এরই মধ্যে এক একটা বাঁশের পরিধি প্রায় পনর বিশ ইঞ্চি। যেমন গোড়া তেমনি আগা। লম্বাও খুব। সাধারণ বাঁশের প্রায় দ্বিগুণ। এক একটা গাঁটের দূরত্ব প্রায় এক হাতের মত। কৃষি বিশেষজ্ঞ অতিথিদ্বয় স্বীকার করলেন এই জাতের বাঁশ তাঁরা দেখেননি এর আগে। বাঁশ ঝাড়ের বাঁ পাশে উঁচু জমীর ওপর ঢেঁড়স্ ক্ষেত। ফল নেই কোন গাছেই। অথচ প্রতিটি গাছ যেমন বড় তেমনি তেজী। শুনলাম, অতিরিক্ত সার আর জল পেয়ে গাছ এত বেড়ে গেছে। গাছ বেশী বেড়ে গেলে ফল দিতে পারে না। শীঘ্রই এসব গাছ কেটে দেওয়া হবে, আর আসছে বার জমী বদলে আরো কম সার দিয়ে ঢেঁড়সের চারা লাগানো হবে।

উত্তর ঘেঁসে এগিয়ে চললাম। জমী ক্রমশঃ ঢালু হয়ে চলেছে। শেষে এলাম যমুনার ধারে। কে বলবে এ সেই যমুনা। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী যুক্ত-ত্রিবেণীর অন্যতম প্রবাহিকা। দীর্ঘকাল অযত্নে আর সংস্কারের অভাবে আজ তার বৈধব্যের রিক্তরূপ। হরিণঘাটার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য মজা যমুনার দুপাশে বাঁধ দিয়ে ভাগীরথীর জল পাম্পের সাহায্যে টেনে তুলে জমা করা হয়, আর এই সংরক্ষিত জলাশয় থেকে হরিণঘাটায় জলসেচের কাজ চলে। অথচ এই পাঁচ মাইল দীর্ঘ আর দুশো থেকে দেড় হাজার ফুট চওড়া এই সুবৃহৎ জলাশয়—এর সংস্কার না করার ফলে এখন এটা কচুরী পানায় ভরাট হয়ে ম্যালেরিয়ার ডিপোতে পরিণত হতে চলেছে। শ্রীভট্টাচার্য বললেন, তাঁর কৃষি জীবনের প্রথম সূচনা এই মজা যমুনা থেকেই। যমুনা নাম ঘুচে গিয়ে এখন এই এলাকাটিকে বলা হয় মথুরা বিল। বিলের আয়তন প্রায় দু হাজার বিঘের ওপর। বছর দশেক আগেও এখানে কচুরী পানার নাম-গন্ধ ছিল না। ছিল পদ্ম ফুলের বন। কি তার শোভা! রাশি রাশি শতদল মেলে ধরেছে সাদা আর লাল পাপড়ী। মধুলোভী ভ্রমরের দল করে চলেছে গুঞ্জন ফুলের ওপর। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্থানীয় শ্রমিকেরা তুলে দিত সেই পদ্মফুল। আর কোলকাতায় ফুলের দোকানে সরবরাহ করতেন হরনাথ। তারপর ভাগীরথীর সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে মথুরা বিলের বদ্ধ জলায় দেখা দিল একটি দুটি করে কচুরীপানা। ক্রমে পদ্মবনকে গ্রাস করে বিস্তীর্ণ হোল কচুরীপানার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। পদ্মফুল দিয়েছিল মূলধন। সেই মূলধন নিয়ে সুরু হোল কৃষিক্ষেত্র। প্রথমে ১০ বিঘা তারপর ২০ বিঘা। এইভাবে আজ জমীর মোট পরিমাণ প্রায় ৪০ বিঘার ওপর। ইং ১৯৩৩ সাল থেকে ৫৮ সাল এই সুদীর্ঘ ২৫ বছরের একটানা শ্রমনিষ্ঠার ফলে সম্ভব হয়েছে এতটা। মথুরা বিলে মাছ প্রচুর। কয়েকজন উদ্বাস্তু একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ে মাছের ব্যবসা করে চলেছেন একচেটিয়া ভাবে। অথচ নতুন পোনা ছাড়ার ব্যবস্থা তাঁরা করেন না। সমবায় প্রতিষ্ঠানের নাম দিলেও আসলে সেটি কয়েকজনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। শুধু লোক দেখানো সমবায় প্রতিষ্ঠান নাম দেওয়া আছে মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগ অনায়াসেই এখানকার উৎসাহী ব্যক্তিদের ওপর ভার দিয়ে প্রকৃত সমবায় প্রথার মৎস্য চাষের সুবন্দোবস্ত করে দিতে পারেন। তাহলে এই দু হাজার বিঘা আয়তনের বিলটি প্রয়োজন মত সংস্কার করে নিয়ে একটি বৃহৎ মৎস্য চাষের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। সেই সঙ্গে বহু বেকারের কর্ম-সংস্থানও হয়। শ্রীভট্টাচার্যের পরিকল্পনানুযায়ী মাত্র হাজার দুয়েক টাকা খরচ করলে এই দীর্ঘ জলাশয়কে আবার কচুরীপানার কবল থেকে মুক্ত করা যায়। এ বিষয়ে তিনি আন্তরিক চেষ্টা করে চলেছেন। আশা করা যায় সরকারী সহযোগিতা লাভ করলে তাঁর পরিকল্পনা সফল হতে দেরী লাগবে না। পাশেই দেখলাম পাম্প ইঞ্জিন। পূর্ব্বে এখানে ছিল পার্সিয়ান হুইল। এই এঞ্জিন এখন ভারতে তৈরী হয় ও ডিজেলে চলে। যমুনার জল টেনে তোলা হচ্ছে ক্ষেতের জন্যে। সরু সরু অসংখ্য নালা দিয়ে সেই জল চলেছে প্রতিটি ক্ষেতের ভেতর। জলসেচের সুন্দর ব্যবস্থায় মুগ্ধ হলাম সকলে। আকাশের মুখাপেক্ষী হবার দরকার নেই। সারা বছর পর্য্যাপ্ত জল। অথচ এত সুন্দর সেচ ব্যবস্থার দরুণ খরচ অতি সামান্য।

এবার পশ্চিম দিক। নানা জাতের পেয়ারার অনেক গাছ। পেয়ারা ফলেছে অসংখ্য। আর রয়েছে ভালো জাতের বাছাই-করা কলমের আম গাছ। আকারে ছোট হলেও ফলন খুব। বছরে দুবার তিনবার ফলে এমন গাছও রয়েছে দেখলাম। আম গাছে ভালো ফল পেতে হলে গাছের প্রথম বোল ভেঙে দেওয়া দরকার। তাহলে পরের বছর থেকে ফলন ভালো হয়। পশ্চিম থেকে কৃষিক্ষেত্রের মাঝখানে আসবার পথে সজীর ক্ষেত। বেগুন, আলু, পেঁয়াজ, মুলা। আলুর চাষে শ্রীভট্টাচার্য একজন বিশেষজ্ঞ। কিছুদিন হইতে একই জমিতে বৎসরে দুইবার আলুর ফলনের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। কোলকাতার cold storage এ তাঁর আলু জমা থাকে। সেখান থেকেই চালান যায় কোলকাতার বাজারে। পল্লী অঞ্চলে কোথাও cold storage না থাকায় চাষীদের যে কি পরিমাণ অসুবিধার মধ্যে কাটাতে হয় সেটা অনায়াসেই বুঝতে পারলাম। আলুর চাষ থেকে আয় ভালোই। তবে মেহনত খুবই বেশী। ফার্মের একেবারে মাঝখানে এসে গেলাম। লঙ্কার ক্ষেত। সূর্য্যমণি, কালও সবুজ দুইপ্রকার লঙ্কায় অপূর্ব দেখতে হয়েছে কয়েক কাঠার ক্ষেতটি। খুবই লাভজনক এই লঙ্কার চাষ। দুহাত অন্তর লাইনে পৌনে দুহাত তফাতে লঙ্কার গাছ লাগালে, গাছ বাড়েও খুব, আর ফলনও হয় বেশী। ভালো রকম জলসেচ আর হাড়ের সার (Bone dust) জমিতে দিলে খুব যখন বেশী ফলতে থাকে তখন কাঠা পিছু ১৫ দিনে ১মণ পর্যন্ত লঙ্কার ফলন হয়। মাসে

বিঘা প্রতি ৪০ মণ। এর চাষ বছরের যে কোন সময় করা চলে। আর ফলনও হয় সারা বছর—গরমের সময় বাদ। তবে নজর রাখতে হবে যাতে লঙ্কার ক্ষেতে ঘাস বা আগাছা না জন্মায়, আর গাছের গোড়ার মাটি শক্ত হয়ে না যায়। এর এক পাশে কপির ক্ষেত। এখন শুধু জমী তৈরী করা হচ্ছে। ফুল কপি, বাঁধা কপির ফলন খুবই ভালো হয়, আর তা থেকে আয়ও যথেষ্ট। কপি চাষের জন্যে ভালোরকম manure দরকার। তার সুন্দর ব্যবস্থাও রয়েছে দেখা গেল। তারপরেই ৪।৫ বিঘে জমির ওপর রজনীগন্ধা। শ্রীভট্টাচার্যের ভাষায় বলি National Flower এর চাষ। বিশেষ যত্নের দরকার নেই। শুধু জল আর গোবরের সার পেলেই খুশী এই রজনীগন্ধার গাছ। বর্ষাকালেই এর Season। অন্য সময়ও ফুল হয়। তবে পরিমাণে কম। রজনীগন্ধা থেকেই ফার্মের আয় সব থেকে বেশী। কোলকাতার গ্লোব নার্শারীতে, মিউনিসিপাল মার্কেটের ফুলের দোকানে রজনীগন্ধার ফোটা ফুল আর কুঁড়ি শুদ্ধ ডাঁটি (stick) সরবরাহ করা হয় নিয়মিত। এখন প্রায় চল্লিশ হাজারের ওপর রজনীগন্ধার গাছ রয়েছে শুনলাম।

বেলা প্রায় দুটোর কাছাকাছি। ঘর্মাক্ত কলেবরে আবার ঢুকলাম দক্ষিণ খোলা ঘরের মধ্যে। ক্লান্ত আমরা। একে কড়া রোদ, তার ওপর অনভ্যাস। কৃষি-বিশেষজ্ঞ অতিথি দুজনও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আশ্চর্য লাগলো আমার খুড়ো মশাইকে দেখে। ছত্রহীন মস্তকে তিন ঘণ্টা ঘুরেও তিনি এখনো অক্লান্ত। এখনো অনর্গল বলে চলেছেন তাঁর ক্ষেত খামারের কথা। গাছ পালার কথা। সার আর যন্ত্রপাতির কথা। বলার সাথে সাথে তাঁর মুখে ফুটে উঠছে একটা পূর্ণ পরিতৃপ্তির ভাব। ভেতর থেকে এলো গৃহকর্ত্রীর তাগিদ। এলো টিউবয়েলের ঠাণ্ডা মিষ্টি জল। হাত, মুখ ধুতেই এত ক্লান্তি যেন নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হোল। তারপর উপবেশন—ঘরে মেয়েদের হাতে-বোনা কার্পেটের আসনের ওপর। সুরু হোল ভোজন পর্ব। ঘি-ভাত, বেগুন ভাজা, পটলভাজা, মাছের ডাল, মাছের কালিয়া, মাছের চাটনী, দই, মিষ্টি। ভোজন পর্বের সুরুতেই কৌতুকবাণ নিক্ষেপ করলেন খুড়োমশাই।

—'এই যে চাল খাচ্ছেন, এ কিন্তু চাল নয়। তামাক।' চমকে উঠলাম আমরা। তাই তো তামাকই খাচ্ছি নাকি! বুঝি সত্যিই পেটের জ্বালায় চাল-তামাকের জ্ঞান নেই কারুর। আবার সেই প্রাণ-খোলা হাসি। আমরা সকলেই বোকা বনে গেছি। বললেন, —'না না, খাওয়া বন্ধ করবেন না। চালই খাচ্ছেন। তার মানে গতবার কিছু তামাকের চাষ লাগিয়েছিলাম। তামাকও হয়েছিল যথেষ্ট। সেই তামাক বেচে টাকা নিইনি। তার বদলে নিয়েছি চাল। এ হোল আমার তামাকের বদলে পাওয়া চাল।' যাক, শুনে ঠাণ্ডা হোল প্রাণ। হাসি ফুটে উঠল সকলের মুখে। এমনি সদানন্দ আর রসিক শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য। শহুরে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কথা হচ্ছে কিনা জানি না। তাহলেও না বলে থাকা যাচ্ছে না—রান্নাটির গুণে খাওয়ার মাত্রাজ্ঞান রাখা কঠিন হয়ে উঠল। তাই, খেয়ে ওঠার পর আশ্রয় নিতে হোল বড় চৌকির ঢালা বিছানার ওপর তাকিয়ায় মাথা দিয়ে। গৃহস্বামী কিন্তু তখনো ঠিক আগের মতই সতেজ। মুখশুদ্ধি, পান, জর্দা যার যা প্রয়োজন এলো সবই। খুড়ো মশাই বললেন আবার এক সাংঘাতিক কথা—এখুনি সব দুগ্লাস করে আমার টিউবওয়েলের জল খেয়ে নিন। দেখবেন এক ঘণ্টার মধ্যে সব হজম হয়ে গেছে। অত্যন্ত হজমী জল। পেটে আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই। তথাপি এক গ্লাস কোন রকমে ক্ষেপে ক্ষেপে গলাধঃকরণ করা গেল। তারপর চললো আলাপ আলোচনা। বোড়াল গ্রাম থেকে যাঁরা এসেছিলেন তার মধ্যে একজন কোন সময় কি ফসল তুলতে হবে সে সম্বন্ধে কবিতায় ছড়ার আকারে একটি বড় খাতা বোঝাই করে লিখে এনেছেন। পড়িয়ে শোনালেন কিছু কিছু। চমৎকার লাগলো লেখাটি। জানিলাম তাঁর নাম, ইনিই শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত কৃষিবিদ্। শ্রীভট্টাচার্য দেখালেন তার লেখা কৃষি সম্বন্ধে যত প্রবন্ধ এ তাবৎ ছাপা হয়েছে আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতীর পাতায়। দেখালেন Visitors Book। খ্যাত অখ্যাত অনেকের মতামত রয়েছে লিপিবদ্ধ। প্রতি রবিবার অতিথি আসার কামাই নেই এখানে। এসেছেন কৃষি-মন্ত্রী, এসেছেন ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার। আরো কত সরকারী উচ্চ-পদাভিষিক্ত ব্যক্তি। সকলেই এক বাক্যে প্রশংসার স্বাক্ষর রেখে গেছেন Visitors Book এ।

ফণীদা দেখলাম উঠে বসেছেন চেয়ারে। পেটের তলায় নামিয়েছেন কোমরের বাঁধন। বেশ প্রফুল্ল দেখলাম ফণীদাকে। কাগজ আর কলম নিয়ে জেরা করতে বসে গেলেন ক্ষেত্র স্বামীকে। আর এই অধম শিষ্যের ওপর আদেশ দিলেন ভারতবর্ষের জন্যে চারাপোনের বিবরণ লিখে দিতে। প্রশ্নের জবাব দিয়ে বললেন শ্রীভট্টাচার্য। ফণীদা লিখে নিলেন তাঁর যা যা জানবার দরকার।

আলোচনার শেষ দিকে ক্ষেত্র-স্বামী বেশ জোরের সঙ্গে বললেন নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে যে—যদি ৫ বিঘে জমী নিয়ে কেউ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পৌনঃ পুনিক চাষ করেন তাহলে তিনি সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে মাসিক তিনশত টাকা উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। উপযুক্ত জল সেচ, সার আর শ্রমনিষ্ঠা থাকলে একই জমী থেকে বছরে পাঁচ বার ফসল ফলানো যায়। এ বিষয়ে তিনি হাতে কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। কথাটা শুনে যেন অন্ধকারে আলো দেখতে পেলাম।

অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ প্রায়। অতিথি দুজন অস্থির হলেন যাবার জন্যে। তাঁদের আবার চচুঁড়ায় এক কৃষিক্ষেত্র দেখতে যেতে হবে। এবার এলো যন্ত্রপাতি দেখার পালা। কত রকমের সব ছোট বড় যন্ত্রপাতি। মাটি কাটা, মাটি নিড়ানো, গাছের গোড়ায় মাটি দেওয়া, বীজ ছড়ানো আরো সব কত রকমের যন্ত্রপাতি। আমেরিকা থেকে আধুনিক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি আনিয়ে তা থেকে আবার অনেক যন্ত্র মাথা খাটিয়ে আবিষ্কার করেছেন তিনি। একটা যন্ত্র কত রকম কাজে লাগানো হয়, আর কত অল্প সময়ের মধ্যে কত বেশী কাজ দেয়, নিজে যন্ত্র চালিয়ে দেখিয়ে দিলেন আমাদের। এবার নিয়ে গেলেন বাড়ীর ভেতর। এক

কোণে হাঁসের ঘর। আর এককোণে গোয়াল। দুধওয়ালা ও দামড়া নিয়ে গরুর সংখ্যা ৯টি। হাঁস অনেকগুলি। এসব প্রতিপালনের জন্যে খরচ বিশেষ নেই। তাছাড়া আছে ক্ষেত পাহারার জন্যে কুকুর। গরুকে বিচালি খাওয়ানোর বিরোধী তিনি। নেপিয়ার ঘাস আর কলা গাছ খেয়ে গরুর স্বাস্থ্য দেখলাম অতি চমৎকার। দুধও হয় প্রচুর। মাসে প্রায় একশো টাকার মত। হাঁস চরে মথুরা বিলে। পচা পাঁকের ভেতর থেকে নিজেরাই খুঁজে নেয় নিজেদের খাবার।

দেখার পালা শেষ। সন্ধ্যের মুখোমুখী এলাম রজনীগন্ধার ক্ষেতে। সুমধুর গন্ধে সন্ধ্যার ফুরফুরে বাতাস স্থানটিকে করে তুলেছে রমণীয়। মনের ক্লান্তিকে ধুয়ে মুছে আবার নতুন প্রেরণা এনে দিচ্ছে। বিদায় নেবার জন্যে আমরা তৈরী। এলো ট্রেতে করে চা। তারপর এলো এক এক গোছা রজনীগন্ধার stick। এমনি সময় বেজে উঠল শঙ্খ, ঘণ্টা, শ্রীখোল, খঞ্জনী। গৃহদেবতা নারায়ণজীউর সান্ধ্য আরত্রিক। মন প্রাণ পবিত্র হয়ে উঠল যেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম। তখনো বলে বলেছেন শ্রীভট্টাচার্য—'যা কিছু দেখলেন এসবের মূলে কিন্তু বাড়ীর গৃহকর্ত্রী। নিজে আমি নামে মাত্র গৃহস্বামী। আসলে তাঁর অসীম ধৈর্য আর পরিশ্রমের ফলেই গড়ে উঠেছে এই কাশীনাথ কৃষিক্ষেত্র। তার সাথে আছে সাত ছেলে আর এক মেয়ের আন্তরিক শ্রমনিষ্ঠা। এরাই হোল এখানকার প্রাণ। এদের হাতের গুণেই স্বর্ণপ্রসূ হয়েছে এখানকার মাটি। সব কৃতিত্ব এদের। আমি কিছু নই।'

আরত্রিকের বাদ্যধ্বনি ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগলো। আমরা ধীর পায়ে এগোতে লাগলাম গেটের দিকে। ঠিক এমনি ধরণের—কৃষিক্ষেত্র আমাদের দেশে কতগুলো গড়ে উঠেছে জানিনা, কিন্তু একটি হলেও যাঁরা সেটি গড়ে তুলেছেন তাঁরা দেশের আদর্শ মানুষ। ভারতের স্বপ্নকে সফল করে তুলতে হলে এমনি শ্রমনিষ্ঠ মানুষের সংখ্যা যত বেশী হবে ততই দেশের মঙ্গল। ক্ষোভের সঙ্গে বলতে হয়—আজ আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে নিদারুণ খাদ্যাভাব। তার প্রতীকারের জন্যে চলেছে শুধু আন্দোলন আর বিধান সভার দিকে অভিযান। এ যেন অনেকটা কাঞ্চন ফেলে কাঁচের দিকে ছোটার মত। দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুব-সম্প্রদায় যদি আজ রাজনীতিক আন্দোলন থেকে সরে এসে গ্রামে গ্রামে ঢুকে পড়েন, আর ৫ বিঘে জমী সংগ্রহ করে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-বাসের কাজে তাঁদের সমস্ত উদ্যমকে নিয়োজিত করেন তা'হলেই অচির-কালের মধ্যেই গড়ে উঠবে অসংখ্য কৃষিক্ষেত্র। শিক্ষিতরা এগিয়ে গেলে সাধারণ মানুষও এগিয়ে আসবে এ কাজে। শুধু সরকারের বিরোধিতা করে, আর ময়দানে জড়ো হয়ে চীৎকার করলেই মুস্কিল আসান হবে না। মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত সন্তান শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্যের মত দলে দলে অগ্রসর হতে হবে নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে নিতে। যুগে যুগে কৃষিই ভারতের প্রধান উপজীবিকা। সেই পথ এবং সেই আদর্শ যতদিন আমরা চাষার কাজ বলে নাসিকা কুঞ্চন করে চাকুরীর পিছনে ঘুরে মরব ততদিন দেশের খাদ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারবে না। চীন, রাশিয়া, ইউরোপ, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কৃষক ও কৃষিকার্যকে মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে বলেই তারা আজ দুর্ভিক্ষের কবলমুক্ত। আজ আমাদেরও বাঁচতে হলে কৃষিকার্যে এগিয়ে আসা ছাড়া অন্য পথ নেই—নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

ত্রি-কালের পরে

সুনীল বসু

ভুলে যাওয়া ভালো, এই অপচয়
এ ভালোবাসার, শুধু মূর্খতা।
যার রূপে চোখ রঙে তন্ময়
সেখানে ঘনাবে জরার বারতা।

মিথ্যে সাজের কারু-প্রসাধনী
নিচে তার আছে হাড়-কঙ্কাল,
শ্মশান স্মৃতির ছায়া-আবরণী
সাজায় দু'বেলা দেহ-জঞ্জাল।

প্রেমের ফাঁকির রঙিন নেশায়
ঘুম এসে গেলে কাটবে আমেজ।
সেদিন কাঁপবে ঝড়ের হ্রেষায়
সাজঘরে রাখা বেলোয়ারি সেজ।

সেদিন বুঝবে ত্রিকালের হাতে
আমরা ভস্ম, শুধু জলস্রোত।
কামরা আঁকড়ে তবু মাঝরাতে
কেন ভালবাসি আয়ুর কপোত!



(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঠিক পাশের ঘরেই চম্পা গীটার বাজাইতেছিল।

সুরের এমন একটা অদ্ভুত পরিবেশ হইয়াছিল যে কিছুই যেন বে-মানান মনে হইতেছিল না। মলিন জামা-কাপড়-পরা খোঁচা-খোঁচা-গোঁফ-দাড়ি কবিরাজ মহাশয় ফিটফাট সদানন্দের পাশে বসিয়া খাইতেছিলেন, গগন একটা ডগমগে রঙের সিল্কের ঢিলা পাজামা পরিয়া খাইতে বসিয়াছিলেন, রঙ্গনাথ কাঁটা চামচ দিয়া খাইতেছিলেন। কিরণ উষা আর সন্ধ্যা পাশাপাশি বসিয়াছিল এবং নিম্ন-কণ্ঠে গল্প করিতেছিল, বিরুবাবু খাইতে খাইতেও ছোট একটা বই বাঁ হাতে ধরিয়া পড়িতেছিলেন—ইজিপ্টের সম্বন্ধে বই, সন্ধ্যা-বেলা নাতিদের গল্প বলিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহারই উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। চন্দ্রসুন্দর সকলের নিকট হইতে একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া আলাদা একধারে বসিয়া নিরামিষ সাত্ত্বিক ভোজন করিতেছিলেন, হাবুল মামা একটা রঙীনলুঙ্গীন পরিয়া একটি কাষ্ঠাসনের উপর উবু হইয়া বসিয়া খাইতেছিলেন, আর পাঁচজনের মতো সুখাসনে বসিয়া তিনি সুখ পান না। তাঁহার খাইবার ধরণটিও একটু অভিনব, খাবারগুলি যেন মুখের মধ্যে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া দিতেছিলেন। সূর্য্যসুন্দর বিছানার উপর বসিয়াই খাইতেছিলেন। তাঁহার সামনে এবং দুই পাশে ছোট ছোট টেবিল, পিছনে ঠেস দিবার জন্য ব্যাক্‌রেস্ট। উর্ম্মিলা গলায় একটা রঙীন তোয়ালে বাঁধিয়া দিয়াছিল, কোলের উপর আর একটি বড় তোয়ালে পাতা ছিল, খাবার পড়িয়া যাহাতে কাপড়-চোপড় বা বিছানা নষ্ট না হয় উর্ম্মিলা সে বিষয়ে সতর্ক হইয়াছিল। উর্ম্মিলাই চামচে করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াও দিতেছিল। এইরূপ নানারকম বিসদৃশ দৃশ্যের সমন্বয় হইয়াছিল ঘরটিতে। কিন্তু গীটারের সুরের আবহাওয়ায় সব যেন মানাইয়া গিয়াছিল।

সূর্য্যসুন্দর প্রতিটি তরকারি তারিফ করিয়া খাইতে-ছিলেন। তিনি সেকালের লোক, তাঁহার মতে কোনও শিল্প-কর্ম্মের সম্যক প্রশংসা না করিলে শিল্পীর অপমান করা হয়। খাবার খাইয়া, গান শুনিয়া বা যে কোন শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিয়া প্রশংসা না করাটা তাঁহার মতে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। তিনি এটাও লক্ষ্য করিয়াছেন আজকাল অনেকেই এ বিষয়ে কৃপণ-স্বভাবের, প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারে না, মুচকি হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে। অনেক সময় হাসেও না, গোমড়া-মুখ করিয়া সুখাদ্য খায় অথবা গানবাজনা শোনে। তিনি এ জাতের লোক নন, তাই রান্নার অজস্র প্রশংসা করিতেছিলেন। সুক্তোটা বিশেষ করিয়া তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। পুরসুন্দরী স্বহস্তে এটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ব্যঞ্জনটির প্রতি শ্বশুরের বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কথা তিনি জানিতেন। প্রশংসা শুনিয়া আর একটু আনিয়া দিলেন। কোনও রান্নার প্রশংসা করিবার পর সঙ্গে সঙ্গে তাহা আর একবার আনিয়া না দিলে মনে মনে অসন্তুষ্ট হ'ন, এটাও তাঁহার মতে অভদ্রতা।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন কবিরাজ মহাশয়। তাঁহাকে প্রতিটি পদ কখনও দুইবার, কখনও কখনও তিনবারও দিতে হইতেছিল। পার্ব্বতী একা তাঁহাকেই পরিবেশন করিতেছিল।

পুরসুন্দরী পরিবেশন করিতেছিলেন সূর্য্যসুন্দর এবং চন্দ্রসুন্দরকে।

কেবল নিরামিষ রান্না লইয়াই ছিলেন তিনি।

"দিগন্ত এই ফ্রাই চারটে নিয়ে যা আমার কাছ থেকে—"

গগন দিগন্তর দিকে চাহিয়া আদেশের সুরে বলিয়া উঠিল।

পার্ব্বতী বলিল, 'তুমি খাও না, ফ্রাই তো রয়েছে অনেক—"

গগন একথার উত্তর না দিয়া পুনরায় দিগন্তকে লক্ষ্য করিয়া ডাক দিল—

"নিয়ে যা এগুলো—"

দিগন্ত কৃষ্ণকান্তের পাশে বসিয়া খাইতেছিল, সে উঠিয়া গিয়া গগনের নিকট হইতে প্লেটটা লইয়া আসিল।

সন্ধ্যা মন্তব্য করিল, "নিজে ডাক্তার হ'য়ে কি করে' যে এঁটো তুই অপরকে খাওয়াস্।" গগন একথারও কোন জবাব দিল না, তাহার চোখের দৃষ্টি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল শুধু। ব্যাপারটার তাৎপর্য্য কেবল বুঝিলেন পুরসুন্দরী। নিজের খাবারের কিছু অংশ দিগন্তকে দিতে না পারিলে গগনের যেন খাইয়া তৃপ্তিই হয় না। ছেলে-বেলা হইতে ওই স্বভাব। পেয়ারায় এক কামড় দিয়া বাকিটা সে দিগন্তকে বরাবর খাওয়াইয়াছে।

পার্ব্বতী ছাড়িবার মেয়ে নয়।

"ফ্রাই ভালো হয় নি সেকথা মুখ ফুটে বললেই হয়। দিগন্তকে দিয়ে দেবার দরকার কি"

গগন সংক্ষেপে বলিল, "ফ্রাই ওয়াণ্ডারফুল হয়েছে"

"তবে দিয়ে দিলে কেন, আরও এনে দেব?"

"দে যখন ছাড়বি না"

পার্ব্বতী ফ্রাই আনিতে যাইতেছিল কিরণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "তোমার জামাইবাবুদের ভালো করে' জিগ্যেস কর—আর কি চাই। তোমার বড় জামাই-বাবুটি বেশ খাইয়ে লোক—"

"আচ্ছা—"

পার্ব্বতী প্রচুর ফ্রাই আনিয়া আবার সকলকে দিতে লাগিল।

চন্দ্রসুন্দর একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। পুরসুন্দরী পবিত্রভাবে আলাদা রান্নাঘরে তাঁহার জন্য নিরামিষ রান্না করিয়াছেন ইহা তিনি জানেন, নিরামিষ তরি-তরকারিও নানারকম হইয়াছে, সে বিষয়েও খুঁত ধরিবার কিছু নাই, তবু কিন্তু চন্দ্রসুন্দর যেন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার সামনে বসিয়া ছেলে-মেয়ে-জামাই একসঙ্গে খাইতেছে, ইহা তাঁহার আন্তরিক অনুমোদন লাভ করিতে পারে নাই, ইহার মধ্যে তিনি বৈদেশিক উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস পাইতেছিলেন। পরণে ঢিলা পাইজামা, রঙ্গনাথের কাঁটা চামচ দিয়া খাওয়া, চম্পার গিটার বাজান—কোনটাই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, কারণ দাদাই এ সব প্রশ্রয় দিয়াছেন। দাদার ছেলে-মেয়ে-জামাইদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যা-বৈভব প্রভৃতির বিরুদ্ধে আপাতত কিছুই বলিবার নয়, কিন্তু তাহাদের বিদেশী চাল-চলন মোটেই তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না। তিনি মনে মনে এই ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন—মজা বুঝবেন পরে, অতি বাড় ভালো নয়। এ কথাও তাঁহার মনে হইতেছিল সবই অদৃষ্টের খেলা, তা না হইলে তাঁহার অমন ভালো ছেলে, যাহারা দুইবেলা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জল খায় না, তাহাদের এ দুর্দ্দশা কেন। পার্ব্বতী যখন প্রচুর চিংড়ি মাছের ফ্রাই আনিয়া পরিবেশন করিতেছিল তখন সহসা চন্দ্রসুন্দর যেন অনুভব করিলেন তাঁহার গলার ভিতরটা কুটকুট করিতেছে। জিবের পাশটাও। মনে পড়িল বাড়ির পাঁছাড় হইতে কুমার প্রচুর ওল খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবিলেন বৌমা ঠিক সেই ওল এই পাচ-মিশেলি ছ্যাচড়ার মধ্যে দিয়াছে। সহসা তাঁহার গলাটা খুব বেশী কুটকুট করিতে লাগিল। তিনি এক টুকরো লেবুতে নুন মাখাইয়া চুষিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে একটা নিরুপায় ক্ষোভ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল ছেলে-মেয়ে জামাইদের জন্য পোলাও কোর্ম্মা কাবাবের আয়োজন করিয়া বড় বউ তাঁহার জন্য কেবল কতকগুলা শাক পাতা আর ওল সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মুখে কিন্তু

কিছুই বলিলেন না, কেবল সশব্দে লেবুটা চুষিতে লাগিলেন।

ব্যাপারটা পুরসুন্দরীর দৃষ্টি এড়াইল না। বাম হাত দিয়া মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া তিনি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কাকাবাবু, খাচ্ছেন না যে। আর একটু ডাল এনে দেব ?"

"বুনো ওল না শুকিয়েই তরকারিতে দিয়েছ মা, গলা কুট কুট করছে—"

"ওল তো রান্না হয়নি আজ"

"গলা কিন্তু কুট কুট করছে"

চন্দ্রসুন্দর মুখটা উঁচু করিয়া বাঁ হাত দিয়া গলা চুলকাইতে লাগিলেন। ইহাতে একটু রসভঙ্গের মতো হইল।

সূর্য্যসুন্দর বলিলেন, "তুই বোধহয় লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছিস। ছুটো রসগোল্লা খেয়ে ফেল"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "গরম গরম লুচি ভেজেছি। পায়েস দিয়ে তাই না হয় খান। ওসব খেতে হবে না, এই বাটিতেই হাতটা ধুয়ে ফেলুন—"

তাহাই হইল। চন্দ্রসুন্দর অসহায়ের মতো মুখ করিয়া পায়েস দিয়া গরম লুচি খাইতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে চম্পা গীটারে 'ধন ধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটা বাজাইতেছিল। গগন নিমীলিত নয়নে কাটলেট চিবাইতে চিবাইতে মনে মনে গাহিতেছিল 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ'…।

সূর্য্যসুন্দর নিজের অজ্ঞাতসারেই সুস্থ পায়ের পাতাটা নাড়িয়া তাল দিতেছিলেন।

ইহা যে অসুখের বাড়ি তাহা মনেই হইতেছিল না। মনে হইতেছিল এক অভিজাত খাম-খেয়ালী বৃদ্ধকে ঘিরিয়া উৎসব চলিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত মৃদুকণ্ঠে রঙ্গনাথকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, শাক ভাজাকে যদি ফ্রাই বলা যায়, তাহলে কি খুব ভুল হবে"

"হওয়াতো উচিত নয়। হঠাৎ এ কথা মনে হ'ল কেন"

"চলতি কায়দা অনুসারে তাহলে পার্ব্বতীকে ফরমাস করি"

"করুন"

"পার্ব্বতী আমার জন্যে একটু পালং ফ্রাই নিয়ে এস তো"

"সে আবার কি !"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "পালংশাক ভাজা চাইছেন"

"চিংড়ির ফ্রাই খেয়ে শাক ভাজা খাবেন ?"

"খাব। রসুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে চমৎকার হয়েছে ওটা"

কিরণ নিম্নকণ্ঠে মন্তব্য করিল—"সবই অদ্ভুত"

উষা সহসা উঠিয়া এক-ছুই-তিনের কাছে গেল। তাহার মনে হইল তাহারা খাইতেছে না।

"আয় খাইয়ে দি তোদের। পাগল করে' দিবি দেখছি আমাকে। খাচ্চিস না ঘাটচিস্ কেবল। সরে' আয়—"

স্বাতী সোমনাথকে শুনাইয়া উষার কানে কানে বলিল, "প্রতিটি তরকারি আজ ঝালে পুড়িয়েছে পার্ব্বতী। কি করে' যে খাই—"

আসলে প্রতিটি তরকারি তাহার খুব ভাল লাগিতেছিল কিন্তু তাহার শ্বশুর-বাড়িতে একেবারে আঝালা রান্না হয়, ভণ্ডামি করিয়া সোমনাথকে তাই সে জানাইয়া দিল যে ঝালে-পোড়া তরকারি তাহার পক্ষেও সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

সোমনাথ বলিল—"আমার তো চমৎকার লাগছে"

উষা স্বাতীর পাতের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোর পাতে তো কিছু পড়ে নেই"

স্বাতী মুচকি হাসিয়া বলিল, "উঃ, যা করে' খেয়েছি, পাছে পার্ব্বতী কিছু মনে করে"

হঠাৎ প্লেট হাতে করিয়া মিস্ বোস্ (ওরফে অনু) আসিয়া প্রবেশ করিল।

"বাঃ, আমাকে আলাদা করে' তাঁবুতে খেতে দিয়েছেন কেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে খাব—"

স্বাতীর পাশেই সে বসিয়া পড়িল।

সূর্য্যসুন্দর স্নেহভরে তাহার দিকে চাহিলেন।

কুমারের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, সে অনেকক্ষণ হইতেই উঠিবার জন্য উসখুস করিতেছিল। সে বলিল, "আমি এবার উঠি তিনটে বেজে গেছে। আপনারা

খান। আমি বাগানে গিয়ে হাঁসগুলোর ব্যবস্থা করি গিয়ে—"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হাঁ উঠে পড় তুমি কুমারবাবু। ও ব্যাপারটা বেশ ঝঞ্ঝাটের, সময় লাগবে"

কুমার উঠিয়া পড়িল এবং একটু পরে একটা পেট্রো-ম্যাক্‌স্ আলো লইয়া চলিয়া গেল।

সূর্য্যসুন্দর হঠাৎ বলিলেন, "চম্পাও এই ঘরে এসেই বাজাক না। ওঘরে বেচারি একা একা থাকবে কেন, এইখানেই আসুক"

পুরসুন্দরীর ইহাতে আপত্তি ছিল, চন্দ্রসুন্দরের তো ছিলই।

পুরসুন্দরী শ্বশুরের কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কেবল বাঁ হাত দিয়া মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এখানে বসবার জায়গা কোথা"

সূর্য্যসুন্দর গগনের দিকে চাহিলেন।

গগন সোৎসাহে দিগন্তকে আদেশ করিল—"ওই কোণের দিকে বড় মোড়াটা পেতে দে না—তা হলে হবে"

দিগন্ত এঁটো হাতেই উঠিয়া একটা বড় বেতের মোড়া খালি কোণটায় পাতিয়া দিল। তাহার পর পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "বৌদি, দাদু তোমাকে এইখানেই আসতে বলেছেন। মোড়া পেতে দিয়েছি, এস"

গীটারটি হাতে লইয়া চম্পা আনত মস্তকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

কমলা রঙের ঢাকাই শাড়িটিতে সুন্দর মানাইয়াছিল তাহাকে।

গগন তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "নতুন একটা কিছু ধর। দাদু, কি বাজাবে"

সূর্য্যসুন্দর উদ্ভাসিত মুখে চম্পার দিকে চাহিয়া ছিলেন। অনুভব করিতেছিলেন রাজলক্ষ্মীও অদৃশ্যভাবে তাঁহার নাত-বৌটিকে দেখিতেছে।

"ফরমাসটা তুমিই কর—"

"না তুমি কর—"

"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী—এ গানটা বাজাতে পারে"

চম্পা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল পারে।

"তবে ওইটেই হোক, গগনের ওইটেই তো মনের কথা—"

চম্পার মস্তক আর একটু নত হইয়া গেল।

একটু পরেই গীটারে গানটা বাজিতে লাগিল।

এই সব কাণ্ড দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মৃত্যু-পথ-যাত্রীর নিকট বসিয়া ব্রাহ্মণ-বংশের কুলবধূ গীটার বাজাইয়া গুরুজনদের সম্মুখে বাইজিদের মতো লাল্‌সার গান গাহিতেছে ইহা অপেক্ষা বেশী শোচনীয় ঘটনা আর কি হইতে পারে। মনে মনে তিনি 'ছি ছি ছি' করিতেছিলেন—কিন্তু বাহিরে প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না, স্বয়ং সূর্য্যসুন্দরের হুকুম। তখন তিনি পুরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বড় বৌ তোমার পায়েসটাও একটু ধরে গেছে মনে হচ্ছে—"

"তাই না কি, অত বুঝতে পারি নি তো—"

হাবুল মামা নিষ্পলক-নেত্রে চন্দ্রসুন্দরের দিকে চাহিয়া-ছিলেন।

চোখোচোখি হইতেই বার দুই জোরে নিশ্বাস টানিয়া মুচকি হাসিলেন একটু। তাহার পর চাহিলেন শূন্য পায়েসের বাটিটার দিকে, আবার বার দুই নিশ্বাস টানিয়া আবার একটু মুচকি হাসিলেন।

গীটারে বাজিতে লাগিল—

সখি জাগো—
মেলি রাগ-অলস আঁখি
অনুরাগ-অলস আঁখি
মম অন্তরে থাকি থাকি
সখি জাগো—।

সূর্য্যসুন্দর বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মীর ছবিটার দিকে তিনি চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে মনে দেখিতেছিলেন যে লজ্জিতা বধূটিকে তাহার নামও রাজলক্ষ্মী ছিল, কিন্তু সে এই ছবির রাজলক্ষ্মী নয়। তাঁহার চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল।

১২

আহারান্তে হাবুল মামা কবিরাজি ঔষধ 'চূরণ' খাইবার জন্য চন্দ্রসুন্দরের তাঁবুতে গিয়া উপস্থিত। পুরসুন্দরী একটি

শ্বেত পাথরের ছোট বাটিতে চন্দ্রসুন্দরের জন্য পান ছেঁচিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চন্দ্রসুন্দর তাহাই চিবাইতেছিলেন। হাবুল মামার মুখে পান নাই দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

"পান খাও নি?"

"আগে 'চুরণ'টা খেয়ে নি, তারপর খাব। একটু গুরুভোজন হয়েছে আজ। অনেকদিন এসব খাওয়া অভ্যেস তো নেই। তুমিও নানা বায়নাক্কা করলে বটে, কিন্তু মন্দ খাওনি"

"এ সব ম্লেচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে খেয়ে তৃপ্তি হয় না মামা। ওই ফ্রাই না কি, এমন বিশ্রী বোট্‌কা গন্ধ ছাড়ছিল, পেঁয়াজের কাঁচা রস দিয়েছে না কি দিয়েছে ভগবানই জানেন"

হাবুল-মামা বার দুই জোরে নিশ্বাস টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি খড়্গপুরে কত দিন ছিলে—"

"বছর দুই। কেন বল তো—"

"আমি যে কোয়ার্টারে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলাম সেই কোয়ার্টারেই বরাবর ছিলে?"

"হ্যাঁ কোয়ার্টারটি তো ভালই ছিল"

"কি করে' ছিলে তাই ভাবছি"

"কেন। কোন কষ্ট ছিল না, দক্ষিণ পুব পশ্চিম তিন-দিকই খোলা—"

"কিন্তু তোমার বাড়ির লাগোয়া থাকতেন এক মৌলভী সাহেব। তাঁর বাড়ির পেঁয়াজ ভাজার শব্দ পর্য্যন্ত তোমার ঘরে বসে' শোনা যেত। গন্ধ তো পাওয়া যেতই। তাঁর মুর্গি তোমার উঠোনে বারান্দায় রোজ উড়ে আসত এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ওখানে দু'বচ্ছর কাটালে কি করে!"

"পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে ছিলুম। কি করব বল। দারিদ্র্যো দোষো গুণরাশি-নাশী!"

হাবুল-মামা মুচকি হাসিলেন এবং চুরণটি মুখে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর চকিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন। গেলেন কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে।

গগন চুপি চুপি আসিয়া দাদুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপেল স্টাফিং কেমন খেলে দাদু? ভাল লাগল?"

"চমৎকার। আগে কখনও খাইনি"

"তোমাকে এবার একটা পর্ত্তুগীজ তরকারি খাওয়াব"

"কি"

"টম্‌ফ্র্যাডু—"

"সে আবার কি। মাংস, না মাছ?"

"লাউ। ছোটকাকার অনেক লাউ হয়েছে দেখছি। কাল করাব চম্পাকে দিয়ে"

"বেশী খাটিও না ওকে—"

"দিন-রাত তো বসেই আছে। বাজনা কেমন শুনলে—"

"খাসা"

"গানও মন্দ গায় না। সন্ধ্যের পর গাইতে বোলো, গাইবে"

উর্ম্মিলা আসিয়া পড়াতে এসব গোপন আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। গগন ছোট-কাকীর দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়াই তাহার দেখা হইয়া গেল দিগন্তর সঙ্গে।

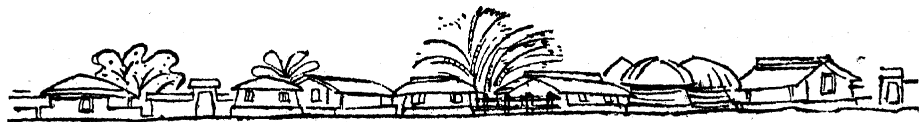
"দিগন্ত, ননীকে একটা টেলিগ্রাম করে' দে তো। ইংরেজি বাংলা কয়েক রকম পাক প্রণালী যেন পাঠিয়ে দেয় কিনে। আপেল স্টাফিং খুব ভালো লেগেছে দাদুর। দাদুকে রোজ একটা করে' নতুন রান্না করে খাওয়াক না চম্পা। এখনি টেলিগ্রামটা করে' দে। আরজেণ্ট টেলিগ্রাম করিস। আমার স্যুটকেসে টাকা আছে, তোর বৌদির কাছ থেকে চেয়ে নে—"

"টাকা আছে আমার কাছে"

"তাহলে যা। একটা চিঠিও লিখে দিস"

"আচ্ছা—"

ক্রমশঃ



উদয়কুমারের ছেঁড়া ডায়েরী

শ্রীচুণীলাল বসু

বিশ্বাস করুন বা না করুন এই কাহিনী উদয়কুমারের ছেঁড়া ডায়েরী থেকে উদ্ধার করা কয়েকটি সত্য ঘটনা।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে উদয়কুমার জন্মগ্রহণ করে শহর কোলকাতার বিখ্যাত একপাড়ায়, অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে।

ছোটবেলা থেকেই ডানপিটে ছেলে বোলে তার নাম ছিল। লাইব্রেরী, ক্লাব, এমন কি পাড়ার বুড়োদের আড্ডা—সব জায়গাতেই তার সমান আধিপত্য ছিল। কেবল একটা মজলীসে তা'কে কখনও দেখা যেত না—সে হচ্ছে মহিলা-মহল। সে পছন্দ করতো না, এমন কি সহ্য করতেও পারতো না মেয়েদের পাশ্চাত্য ঢঙে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলার ব্যাপারটা। অনেক সময় ক্লাবে বা কোনো মজলিসে উদয়ের সঙ্গে তথাকথিত প্রগতিবাদী ছোকরাদের পাশ্চাত্য ঢঙে মেয়েদের চলার ব্যাপারটা নিয়ে তর্ক হতো। এই ব্যাপারটার জন্য অনেক নব্য ছোকরা তার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধাচরণ কোরতে অনেকেই সাহস পেত না। অধিকাংশেরই একটা ধারণা ছিল, উদয়ের শত্রু হওয়ার চেয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ না কোরে মিত্র হওয়ায় লাভ অনেক বেশী।

এরপর ডায়েরীর প্রায় ষাট-সত্তরখানা পাতা উঁই একেবারে খেয়ে শেষ কোরে ফেলেছে। সেইজন্যে উদয়ের জীবনের বহু ঘটনা প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। কেবল যে অংশটুকু ডায়েরী থেকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হোয়েছে, তা নিয়ে প্রকাশ করা হলো।

১৯৪২ সালে হঠাৎ উদয় কলেজ ছেড়ে আগষ্ট আন্দোলনের কাজে যোগদান করে। তার দলে রবীন, পরেশ, মণ্টু, আর দেবী নামে চারজন সত্যিকারের বিশ্বস্ত কর্ম্মী ছিল। আর এদের অধীনে ছিল—হুজুকে মাতা প্রায় জন চুয়াল্লিশ যুবকের দল।

আগষ্ট আন্দোলনের প্রথম কাজ হলো—ট্রামের লাইন ধ্বংস করা—ট্রাম পোড়ানো। তৃতীয় কাজ হলো—কাশীপুরের গান্ এণ্ড শেল ফ্যাক্টরীটা, আর তার পাশের ইলেক্ট্রিক পাওয়ার হাউসটা উড়িয়ে দেওয়া।

তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ যখন ত্বরিত বেগে এগিয়ে চলেছে ঠিক সেই সময় উদয়ের বিশ্বস্ত চারজন সহকর্ম্মীর মধ্যে মণ্টু, পরেশ আর রবীন মারা যায়। আর সেই সঙ্গে মারা পড়ে দলের আরো জনদশেক যুবক।

অবশেষে কাশীপুরের ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসটা উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে মণ্টু আর সেই সঙ্গে চারজন যুবক মারা যায়। কেবল উদয় কোনো প্রকারে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচে যায়।

উদয় প্রিয় সহকর্ম্মীদের পুলিশের গুলিতে অকালে প্রাণত্যাগ কোরতে দেখে অত্যন্ত অস্থির হোয়ে ওঠে এবং শেষ পর্য্যন্ত সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে বোলে স্থির করে। সে গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় কোরে ফেল্লো। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারী নিধন যজ্ঞ আরম্ভ হোয়ে গেল। প্রথমদিন তারা চারজন পুলিশ কর্ম্মচারীর ভবলীলা সাঙ্গ কোরলো। কিন্তু তাদের দলের একজনও তাতে আহত হলো না। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বাধা পেল আর একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নেতার কাছ থেকে।

এই নেতার নাম ডায়েরী থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে তার পরিচয়টা যা উদ্ধার করা গেছে তাতে দেখা যায় তিনি ছিলেন। কোলকাতা হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এবং শ্রীঅরবিন্দের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। তিনি আজীবন নীরবে দেশের কাজ কোরে গেছেন। দেশের কাজ কোরে নাম প্রশংসা বা বাহোবা নিতে কখন আর পাঁচজনের মত তাঁকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়নি।

এই নীরব দেশকর্ম্মী ব্যারিষ্টার তার পরিবারের লোকজনের অজ্ঞাতে উদয়কে নানা বিষয়ে গোপনে সাহায্য কোরতেন। উদয়ের সঙ্গে ব্যারিষ্টারের যে এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তা কেউ জানতো না।

তিনি উদয়কে বলেন—শ্রীঅরবিন্দের কথা, যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটীশ আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে যেতে বাধ্য হবে। সুতরাং পুলিশ ও মিলিটারী নিধন যজ্ঞের কোনো প্রয়োজন নেই। স্বাধীনতা পেলে ট্রাম, ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস, গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরী সবই আমাদের হবে। ওসব এখন নষ্ট কোরলে শেষে আমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবো। নেকটাই আর হ্যাট পোড়ালেই দেশের লোকের মন থেকে বিদেশী মোহ চলে যাবে না। সেদিন আমার একজন ব্যারিষ্টার বন্ধু, তিনি তোমাকে চেনেন—তিনি আমাকে বল্লেন তুমি নাকি জোর কোরে তাকে তার মোটর থেকে নামাতে না পেরে শেষে তার মোটরটার বহু স্থানে ইট মেরে ভেঙ্গে দিয়েছে। সেই মোটরে তার মেয়েও ছিল। তোমার ইটের আঘাত থেকে সেও মুক্তি পায়নি। এতদিনকার বিদেশী মোহ তুমি একদিনে জোর কোরে নষ্ট কোরবে উদয়? তা হয় না উদয়—তা হয় না। এই বিদেশী মোহ স্বাধীনতা পাবার পর অনেকদিন লাগবে নষ্ট হতে। পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা কোরে যারা চাকরের কাজ কোরে এসেছে, তাদের রক্ত থেকে চট কোরে সেটা তাড়িয়ে দেওয়া অত সোজা নয়। তবে যদি কোনো সত্যিকারের আদর্শবাদী মহাপুরুষ স্বাধীনতা পাওয়ার পর দেশের পরিচালনায় ভার নেন, তবে তাঁর পরিচালনায় দেশের লোকের মন থেকে বিদেশী মোহ ঘুচতে পারে। নইলে দেখবে স্বাধীনতা পেয়েও পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়েছো।

সেই স্বাধীনতা হবে জনকয়েক সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষী দেশের হিতাকাঙ্ক্ষীর মুখোসপরা স্বার্থপর লোকের স্বাধীনতা। যদি সেই স্বাধীনতা প্রথমে আসে তবে সারাদেশে আস্‌বে মহামারী, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। আর সেই সঙ্গে একদিকে দেখা দেবে শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার যুবকদলের বর্দ্ধিত সংখ্যা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাকরীর বাজারের প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত হোয়ে যাবে মহিলাদের জন্যে। অবশেষে এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে জন্ম নেবে বিদ্রোহীর দল, যেখানে সেখানে জন্ম নেবে ভূঁইফোড়ের মত। তাতে হবে রক্তপাত। সেই রক্তপাতের পর আসবে শান্তির নিশান উড়িয়ে আগামীকালের স্বাধীন ভারতবাসী। যাদের মাতৃভাষা হবে দেশের রাষ্ট্রভাষা। তারা এসে ভারতবাসীর সকল মাতৃভাষাকে দেবে সমান মর্য্যাদা। তাই বলে ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী ভাষাকে তারা তুচ্ছ কোরবে না। তারা ঐসব বিদেশী ভাষা থেকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় ভাল ভাল জিনিষ অনুবাদ কোরে নেবে। আর জন শিক্ষার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ কোরবে মাতৃভাষায়, যা পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীনদেশের লোকেরা করে থাকে। তারা দেশের লোকের রুটী কেড়ে নিয়ে স্বার্থপরের মত ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় কোর্‌বে না। তারা কল্পনা কোরতে পার্‌বে না যে, একজন দেশবাসী দুধে-ভাতে থাকবে। আর একজন দেশবাসী না খেতে পেয়ে দিনে দিনে তিলে তিলে শুকিয়ে-কুঁকড়ে মর্‌বে। সেই স্বাধীন ভারতে থাক্‌বে মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাক্‌বার অধিকার সকলের সমানভাবে। আপনা থেকেই দেশ থেকে কমে যাবে চোর-ডাকাত ও জুয়াচোরের দল। সেইদিন হবে সত্যিকারের সুখের স্বাধীন ভারত। সেইদিনের অপেক্ষা তোমাকে কোরতেই হবে উদয়। সেদিন আমি থাকবো না, কিন্তু তুমি থাক্‌বে। তুমি দেখো উদয়, আমার কথা সত্যি হয় কিনা। আমার অনুরোধ রেখো উদয়—এ আন্দোলনে যোগদান কোরো না। আগামীকালের সেই স্বাধীন ভারতের জন্যে তোমাকে অপেক্ষা কোরতেই হবে উদয়—তোমাকে অপেক্ষা কোরতেই হবে।"

তারপর উদয় আন্দোলনে আর যোগদান করে নি। অবশ্য এর-পরের অধ্যায় ডায়েরীর ২য় খণ্ডে আছে। ২য় খণ্ডটি এখনও উদ্ধার হয় নি। উদ্ধারের অপেক্ষায় থাকুন।

পাণ্ডুলিপি

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

জীবন দুর্বোধ্য এক পাণ্ডুলিপি, পাতায় পাতায় শুধু
অস্পষ্টতা তার
কালের কান্নার জলে ভিজে গিয়ে মেঘলা আকাশ বুঝি
যেন একাকার,
কথাগুলো ছায়া হ'য়ে চোখে ভাসে পুরনো পাতার ভাঁজে
অচেনা অক্ষরে
অজানা ভাষার ধ্বনি কান পেতে কখনো যাবে না বোঝা
ফেনিল সাগরে।

মনের ইজেলে এসে ধরা দেবে আদিম তৃষ্ণার ছবি
কল্পনার রঙে
অনুভূতি জীবনের এঁকে যাবে কথাহীন তুলির আঁচড়ে
আর রঙে
শরৎ আকাশে ভাসা কালি মেঘে অজানা শিল্পীর হাত যেন
মনে পড়ে
মনে পড়ে ছুঁয়ে গেছে জীবনের যদি কিছু জল-ছাব
ছাপটুকু ধরে।

এ জীবন পাণ্ডুলিপি তবু ভাবি আশ্চর্যের, অস্পষ্টতা
পাতায় পাতায়,
গোড়া থেকে শেষ দিকে যত যাই মনে হয় আরো আছে
কত না ভাষায়;
অর্থটুকু পাঠ করা চেতনার গভীর সত্তার বুঝি প্রিজম
আলোকে
সম্ভাবনা নেই বলে সান্ত্বনার সুর ভাসে অন্য কোথা অন্য
কোন লোকে।

শরীরের শিরে শিরে সচঞ্চল কত রক্ত কণিকায় আয়ুর
চেতনা
আমাদের জীবনের বেঁধে রাখে নীল উপশিরা যত হৃদয়
বেদনা,
একটি গভীর কোন অনুভূতি অর্থহীন ছায়াটুকু তবু ফেলে
যায়
একটি প্রেমের চোখে চেয়ে থাকি প্রতিদিনে তবু ও তো
পাতায় পাতায়।

অমৃত পুরাণ কথা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

তুলসী-শঙ্খ-লীলা

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় রণবাদ্য বেজে উঠলো। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ উভয় দিকে সমবেত হ'ল। আজ স্বয়ং আশুতোষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। কোটি সূর্যের প্রভায় রণভূমি যেন ঝলমল করছে।

দানবরাজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে অবলোকন করলেন সেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ যোগীরাজ প্রলয়-অধীশ্বরকে। চন্দ্রশেখরের সে অপূর্ব রূপ বর্ণনার অতীত। বালারুণের রক্তরাগ, দুগ্ধের শুভ্রতা, মহাকাশের নীলাভ-নীল একত্রে মিশ্রিত হয়েছে যেন। কী মনোরম, কী বিস্ময়কর সৌন্দর্য!

করজোড়ে পরম ভক্তি ও চরম বিস্ময় সহকারে ত্রিলোচন শংকরের নিকট ধীরে ধীরে আগমন করলেন রাজা শঙ্খচূড়। সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানালেন তিনি নীলকণ্ঠকে।

—আমার দানব জীবন ধন্য। হে ত্রিপুরারি, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

আশুতোষ প্রসন্নচিত্তে আশীর্বাদ করলেন: বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ শঙ্খচূড়, তোমার অভীপ্সা পূর্ণ হোক। তুমি শ্রীহরির প্রসাদপ্রাপ্ত হও। কিন্তু শঙ্খচূড় এখনো বিবেচনার অবকাশ আছে। এখনো তুমি রণে বিরতি দাও। দেবতাগণের রাজ্য দেবতাগণকে প্রত্যর্পণ করো। স্বীয় রাজ্যে তুমি সুখ-বিলাসে অবস্থান করো। সংগ্রাম সীমানা পরিত্যাগ করো।

শঙ্খচূড় পুনরায় প্রণাম করলেন দেবাদিদেবকে।

—আর তা সম্ভব নয় প্রভু। আমার চিরদিনের অভিলাষ আপনার সহিত রণে প্রবৃত্ত হব। সমস্ত দেবতার শক্তি পরীক্ষা করেছি, কিন্তু হে সর্বশক্তিমান, আপনার—

—শক্তির পরিচয় এখনো পাওনি। বেশ, তাহলে আর কালবিলম্ব নয়, প্রস্তুত হও, আমার শক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করো।

শঙ্খচূড় প্রত্যাগমন করলেন আপন সৈন্যদের মধ্যে। অপেক্ষমান রথারোহণে যুদ্ধে রত হলেন।

কল্পনাতীত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হ'ল।

দেবাদিদেব চন্দ্রশেখর আপন রথের মধ্যে স্থির হ'য়ে ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে বসে আছেন। সংগ্রাম করছেন অন্যান্য দেবতাগণ। মাঝে মাঝে দানবরাজ নিক্ষিপ্ত এক একটা প্রচণ্ড বাণ ত্রিশূলীর সম্মুখ-প্রসারিত শূলে এসে আঘাত হানছে এবং মুহূর্তে সে বাণ খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে চৌদিকে ঠিকরে পড়ছে। এইরূপে বহুক্ষণ অতীত হ'ল।

অকস্মাৎ রণভূমিতে এক চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হ'ল। এক অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে কম্পিত কলেবরে রাজাধিরাজ শঙ্খচূড়ের সমীপে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের দারিদ্র্য বিচ্ছুরিত। ক্লেশ ক্লিন্ন জীর্ণ শরীর বেতসপত্রের ন্যায় ঘন কম্পিত। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জর্জরিত তিনি। জড়িত শুষ্কস্বরে এই সমরক্ষেত্রে সমস্ত বিপত্তি অগ্রাহ্য করে তার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন।

—আমি উপবাসী ব্রাহ্মণ। কোথাও একমুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা পাই নাই।

—কেন ব্রাহ্মণ?

শঙ্খচূড় সবিস্ময়ে ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার রাজ্যে তো কেউ অভুক্ত থাকে না।

—থাকে না, আজ আছে। আমি তার জ্বলন্ত প্রমাণ এবং এর হেতু তুমি নিজে।

—আমি!

—হ্যাঁ, তুমি। তোমার এই দেবতা বিদ্বেষ প্রসূত সমরই তার কারণ। তোমার রাজ্যের চারিদিকে আজ ভয়ংকর অরাজকতা বিরাজ করছে। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে আর তোমার কোনো প্রজা শ্রদ্ধা করে না—ভিক্ষা দেয় না। ভিক্ষা প্রার্থনা করলে সরোষে বিতাড়িত ক'রে দেয়। আজ আমি তোমার কাছে জানতে এসেছি—তোমার রাজ্যে আমার জীবনধারণের কোনো অধিকার আছে কি না।

—আছে ব্রাহ্মণ! নিশ্চয় আছে। আপনি আমার প্রাসাদে গমন করুন। সেখানে আমার পত্নী রাণী তুলসী আছেন। তিনি আপনার তুষ্টি বিধান করবেন।

—কিন্তু পুনরায় ওই দূরপথ গমন, আমার পক্ষে সম্ভব হবে কী? আমার প্রাচীন দেহে আর তিলমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নাই। মৃত্যুর আগমন আমি প্রত্যক্ষ করছি। অধিককাল আর আমি জীবিত থাকবো এমন বোধ হয় না। তোমার পত্নীর সেবা গ্রহণ আর আমার বোধ হয় সম্ভব হবে না।

সহসা ব্রাহ্মণ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালেন দানবরাজের কণ্ঠে দোলায়িত মঙ্গল কবচের প্রতি। বারংবার যুগল করে নেত্রদ্বয় মার্জনা ক'রে তাকাতে লাগলেন তিনি।

—তোমার গলদেশে ও কিসের কবচ রাজা? ও তো সর্বমঙ্গল কবচ অনুমান হ'চ্ছে। ও কবচ কণ্ঠে থাকলে তো মৃত্যু স্পর্শ করতে পারবে না দেহকে। রাজা, তুমি—তুমি আমায় ও কবচটি ভিক্ষা দিতে পারো। আমি ভীত—মৃত্যুর ভয়ে আমি সর্বদা ভীত। আমি মৃত্যুর শাসন হ'তে মুক্তি চাই। বাঁচার বড় সাধ আমার, বড় সাধ। পারো রাজা? পারো?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা ব্রাহ্মণের আপাদমস্তক লেহন করলেন শঙ্খচূড়।

—পারি। কিন্তু আপনি কে ব্রাহ্মণ? এই জীবন মরণ সন্ধিকালে—এই বীভৎস সমরক্ষেত্রে—ত্রিলোক বাঞ্ছিত কবচ আমার নিকট ভিক্ষা করে আমায় নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে দিতে এসেছেন?

—আমি এক দরিদ্র উপবাসক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ। মৃত্যুপথ যাত্রী। তোমার কাছে মৃত্যুঞ্জয় ওই সর্বমঙ্গল কবচ ভিক্ষা চাইছি। আমি প্রার্থী।

—ব্রাহ্মণ! তুমি প্রার্থী—

উচ্চ হাস্য ক'রে উঠলেন মহাদানব শঙ্খচূড়। সে হাস্য শব্দের তরঙ্গ রচনা করতে লাগলো আকাশে বাতাসে।

ব্রাহ্মণ বিরক্তবোধ করলেন।

—উপহাসের কোনো প্রয়োজন নাই। আমি প্রার্থী। ইচ্ছা হয় দান করো, নচেৎ—

—ক্ষমা করো ব্রাহ্মণ! বিরক্ত হয়ো না। আমি প্রার্থীকে বিমুখ করি না। আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করছি—উপস্থিত ক্ষেত্রে এই মঙ্গল কবচের অত্যন্ত প্রয়োজন তোমার।—এই নাও ব্রাহ্মণ, এই নাও মঙ্গল কবচ। আর জেনে যাও, তোমার সত্য পরিচয় ওই ছদ্ম আবরণেও আমার কাছে গোপন করতে পার নাই। আরো জেনে যাও—আমায় কবচ শূন্য করলেও এ সমর বিজয় দেবতাদের পক্ষে অসম্ভব।

দানবরাজ শঙ্খচূড়ের মানস নয়নে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো—সাধ্বী পত্নী তুলসী দেবীর কমনীয় মুখকমলখানি। উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো সেই বদরীকাননে তপঃক্লিষ্টা ধর্মধ্বজ দুহিতার ব্রীড়ানম্র কৌমারী মূর্তি—নারায়ণ প্রাপ্তির উদগ্র অভীপ্সা। মনে পড়লো প্রজাপতি ব্রহ্মার আগমন এবং তুলসীর প্রতি বর প্রদান—তোমার সতীত্ব যাবৎকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে, তাবৎকাল শঙ্খচূড় ত্রিলোকের অবধ্য।

অদ্ভুত এক প্রকার হাস্য রঞ্জিত হ'য়ে উঠলো শঙ্খচূড়ের আননে। তুলসীর সতীত্ব বর্মে আচ্ছাদিত তাঁর দেহ দেবতার বাণে কোনোদিনই বিদ্ধ হবে না! নির্ভয় তিনি। মঙ্গল কবচ ব্রাহ্মণকে দান করায় তাঁর কোনো অকল্যাণ সাধিত হতে পারে না। ব্রাহ্মণ তুমি যে-ই হও—তোমার অভিসন্ধি ব্যর্থ।

—ছয়—

সুদীর্ঘ একটি বৎসর অতিবাহিত হ'ল। একটি বৎসর দানবরাজ শঙ্খচূড় দেব-বিরোধী মহা সমরে লিপ্ত আছেন। আর দানব-দয়িতা সাধ্বী তুলসী এই সংবৎসর নিদারুণ দুশ্চিন্তা-নিপীড়িত চিত্তেও রাজকার্য পরিচালনা করছেন রাজ-অন্তঃপুর থেকে। প্রজা সাধারণ যেন রাজার অভাব অনুভব করতে না পারে। যেন রাজ্যে অরাজকতার আবির্ভাব না হয়। যেন কোনো প্রজা কোনো কারণে তাঁর যুদ্ধরত স্বামীর উদ্দেশে অভিশাপ বর্ষণ করতে না পারে। সজাগ প্রহরীর ন্যায় দেবী তুলসী রাজ্যের প্রজাবৃন্দের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সর্বদা সচেতন।

প্রতি দিনের যুদ্ধের সংবাদও উৎকণ্ঠিত চিত্তে সংগ্রহ করছেন তিনি। আর সর্বমঙ্গলবিধায়ক বিভু নারায়ণকে স্মরণ-মন্দিরে স্থাপন করে একাগ্র-মনে স্বামীর বিজয় প্রার্থনা করছেন।

আহার নিদ্রা পরিত্যক্ত হয়েছে তুলসীর। চিন্তায় জর্জরিত অন্তর। খিন্ন আনন, শরীর শীর্ণ।

—নারায়ণ রক্ষা করো স্বামীরে আমার। তোমার ভক্তে হে ভক্তপ্রাণ তুমি রক্ষা কোরো।

অহোরাত্র এই প্রার্থনা ধ্বনিত হ'চ্ছে তুলসীর কণ্ঠে। ধ্বনিত হ'চ্ছে: হে দেবতা! আমার কুমারী জীবনের সেই সুকঠোর তপস্যায় যদি কোনো পুণ্য লব্ধ হ'য়ে থাকে, তারই প্রভাবে আমার প্রিয়তমের জীবন রক্ষা করো। আমি স্বর্গ চাই না, অমরত্ব কামনা করি না। অমৃতের প্রয়াসী নই। আমি প্রার্থনা করি—যতোদিন প্রাণ ধারণ করবো যেন স্বামীর পাদপদ্ম পূজায় বঞ্চিত না হই। যেন স্বামীর বিয়োগ বেদনা আমার অন্তর মন্থন না করে।

সেদিন এমনি প্রার্থনায় রত ছিলেন তুলসী। মগ্ন ছিলেন স্বামীর চরণ ধ্যানে। অকস্মাৎ ধ্যান ভগ্ন হ'ল তাঁর। প্রার্থনার সূত্র হ'ল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। চকিত হ'য়ে উঠলেন তিনি। একি, বিজয় বাদ্য! তবে কি—

উৎকর্ণ হ'য়ে শুনলেন—পুরীর বহির্দ্বারে রাজঘোষক ঘোষণা করছে রাজার বিজয় বার্তা।

—রাজাধিরাজ শঙ্খচূড় দীর্ঘজীবী হোন। জয় দানবেশ্বরের জয়।

দূরে বিজয়বাদ্য ধ্বনিত হ'চ্ছে।

তুলসীর আনন ধীরে ধীরে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। তিনি চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। দেবতা-বিজয়ী স্বামীর পাদপদ্ম পূজার আয়োজনে সানন্দে ব্যাপৃত হ'লেন। দীর্ঘ বৎসরকাল পরে যুদ্ধক্লান্ত বিজয়ী স্বামী তাঁর সগৃহে প্রত্যাগমন করছেন, কিরূপ সেবায় তাঁকে তুষ্ট করবেন পুলকিত অন্তরে তাই চিন্তা করতে লাগলেন তিনি।

যথাসময়ে প্রাসাদপুরীতে আবির্ভূত হলেন দানবরাজ শঙ্খচূড়। সেই সৌম্য সহাস্য বদনমণ্ডল, সেই আয়ত উজ্জ্বল নেত্রদ্বয়ের প্রশান্ত দৃষ্টি, সেই স্বর্ণচম্পক সদৃশ বর্ণ—দীর্ঘ দেহ।

বহুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে অবলোকন করলেন তুলসী স্বামীকে। তার-পর প্রণতা হলেন স্বামীর পাদপদ্মে। পাদ্যার্ঘ্য প্রদান করলেন। স্বহস্তে স্বামীর বেশবাস পরিবর্তন ক'রে দিলেন।

মধ্যাহ্নে স্বামীর প্রিয়ভোজ্যে তাঁর তুষ্টি সম্পাদন করলেন এবং বিশ্রামকালে তাঁর পদসেবায় নিরত হলেন।

—তুলসী!

—প্রভু।

—তুমি তো যুদ্ধের সংবাদ জানতে চাইলে না?

—আপনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তাই আপনাকে বিরক্ত করিনি। আমি জানি আপনি যুদ্ধান্তে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। সুতরাং—

—সুতরাং জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, কেমন?

উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন শঙ্খচূড়।

—আচ্ছা তুলসী! এই সুদীর্ঘকাল তুমি কি ভাবে যাপন করেছ?

—অবিরত নারায়ণের পদে আপনার বিজয় প্রার্থনা করেছি।

—চমৎকার! কিন্তু তুলসী, নারায়ণ তো আমার মিত্র নয়। তিনি তোমার প্রার্থনা শুনবেন কেন?

—প্রভু, নারায়ণ মঙ্গলময়! তিনি সর্বজীবের মঙ্গল বিধান করেন। শত্রু মিত্র তাঁর নিকট নাই। তিনি ভক্তের ভক্ত—বাঞ্ছাকল্পতরু।

পুনরায় হাসলেন শঙ্খচূড়। মৃদু হাসি।

—যদ্যপি তাই হয়—তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, তবে জগৎ সংসারে এতো দুঃখ বেদনা কেন? কতো ভক্তের অশ্রুধারায় ধরণী পরিপ্লাবিত!

—কর্মফল প্রভু। কিন্তু সে যাই হোক! আমি এখন আপনার মুখে যুদ্ধের ফলাফল শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। যদি আপনার ক্লেশ না হয় তাহলে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করে আমার ঔৎসুক্য নিবারণ করুন।

কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান করে শঙ্খচূড় বললেন: যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার অনুমান কিরূপ তুলসী? কিরূপ বিবরণ শোনার প্রত্যাশা করো তুমি?

—আমি?

স্মিতহাস্যে আনন নত করলেন তুলসী।

—যুদ্ধ সম্বন্ধে কোনোরূপ অনুমান করতে আমি অক্ষম প্রভু। আপনার বিজয় বিবরণ শোনারই প্রত্যাশা করি আমি।

—কিন্তু রাণী, যুদ্ধ অসমাপ্ত। দীর্ঘ এক বৎসর সংগ্রামের পর অবশেষে আমি দেবাদিদেব শংকরের উপদেশ মান্য করতে বাধ্য হলাম। সত্যই জ্ঞাতি-বিরোধ অনুচিত। দেবতাগণ আমাদের জ্ঞাতি। তাঁদের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করা আমার অন্যায় এবং মনের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করাও উচিত নয়। আমি দেবতাদের রাজ্য দেবতাদের প্রত্যার্পণ ক'রে তাঁদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছি। তুমি কি আমার একার্য অনুমোদন করো রাণী?

—অবশ্যই। ক্ষমতার মোহে পরধন আত্মসাৎ করায় মহত্ত্ব নাই প্রভু। আপনি যোগ্য কার্য করেছেন। আপনিই প্রকৃত জয়ী। আপনিই প্রকৃত বীর।

পরম তুষ্ট হলেন শঙ্খচূড়। তিনি বাহু প্রসারিত করে তুলসীকে আলিঙ্গন করলেন।

—প্রিয়তমে!

পুলকিত আবেশে দেবী তুলসী দয়িতের নিবিড় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন। কিন্তু সে মুহূর্তেক মাত্র। অকস্মাৎ মর্দিত সর্পিনীর ন্যায় আর্ত-গর্জন ক'রে উঠলেন: কে—কে তুমি! আমার স্বামীর ছদ্মবেশে আমার সতীত্বে কলঙ্ক লেপন করলে? কে তুমি? তবে কি—তবে কি, যুদ্ধ-বিজয়-লালসায় ছলনার আশ্রয় নিয়ে, নারায়ণ, তুমি আমার—

বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারলেন না দেবী। অপমানে লজ্জায় শোকে—ছদ্মবেশী লম্পটের ঘৃণিত আচরণে রোদনরুদ্ধ কণ্ঠ-তুলসী সংবিদ হারালেন। তাঁর সমস্ত-পাপ-স্পর্শিত শরীর ভূমি শয্যায় লুণ্ঠিত হ'ল।

এই অবসরে শঙ্খচূড়ের বেশধারী সতীপাপ ভয়ে ভীত নারায়ণ সহসা অন্তর্ধান হইলেন।

শঙ্খচূড় সংহারের সমস্ত বাধা অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শংকর তাঁর হস্তস্থিত ভয়ংকর শূল নিক্ষেপ করলেন শঙ্খচূড়ের উদ্দেশে। সে শূলের ভীষণ গর্জনে যুদ্ধরত সমুদয় দানব হতচেতন হ'য়ে পড়লো। ভয়াবহ বেগে অগ্নি বৃষ্টি করতে করতে শূল বাতাসের বক্ষ চিরে ছুটে চললো।

আর রক্ষা নাই। শঙ্খচূড় সমাগত ভবিষ্যৎ চক্ষের সম্মুখে নিরীক্ষণ করলেন। ত্রস্তে অস্ত্র পরিত্যাগ করলেন তিনি, পরিত্যাগ করলেন যুদ্ধযান। ভূমিতে উপবেশন করে প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর ক্ষণে ইষ্টদেবকে স্মরণ করতে লাগলেন। আর সেই মুহূর্তে সবেগে, সশব্দে দেবাদিদেব নিক্ষিপ্ত শূল এসে তাঁর বক্ষে পতিত হ'ল। সে ভীম আঘাতের প্রচণ্ডতায় দানবরাজের বিশাল দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে গেল। যেন কোটি বজ্রের ধ্বনি ও পতনে পৃথিবী সত্রাসে কম্পিতা হ'য়ে উঠলেন। যেন একটা মহা প্রভঞ্জনে দিগদিগন্ত আলোড়িত হ'য়ে গেল। পুষ্পভদ্রা নদীর বক্ষ উত্তাল হ'য়ে উঠলো সে বিভীষণ আঘাতের তীব্রতায়। আর সেই প্রলয়ের মধ্যে দানবাধিপতি শঙ্খচূড়ের প্রাণহীন চূর্ণ-বিচূর্ণ দেহ রেণু রেণু হয়ে পরিকীর্ণ হ'য়ে পড়লো সারা যুদ্ধক্ষেত্রে।

শঙ্খচূড় বিয়োগ সংবাদ তুলসীর গোচরীভূত হ'তে বিলম্ব হয় নাই। শ্রবণমাত্র তিনি রাজপুরী পরিত্যাগ করেছেন। পরিত্যাগ করে সমরক্ষেত্রের উদ্দেশে উন্মাদিনীর ন্যায় আলুলায়িত কুন্তল, অসংবৃত বেশবাসে ধাবিত হয়েছেন। তাঁর চক্ষে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, বক্ষে বহ্নির উত্তাপ। বুঝি এই মুহূর্তে তাঁর উত্তপ্ত শোক বহ্নিতে ত্রিলোক ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে।

দেবতারা চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু সতীকে শান্ত ক'রে কে?

তিনি সমরভূমিতে পদার্পণ করে চতুর্দিকে অবলোকন করতে লাগলেন। চতুর্দিকে বীভৎস মৃত্যুর লীলা। সংখ্যাতীত দানবগণের মৃতদেহ তথাকার ভূমি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বাতাস গলিত শবের মন্দ-গন্ধে ভারাক্রান্ত। কিন্তু কোথায় তাঁর স্বামী দানবাধিপতি শঙ্খচূড়ের প্রাণহীন বীর দেহ!

উন্মাদিনী তুলসী সেই মৃতের পর্বতের মধ্যে শঙ্খচূড়ের দেহ অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

বহু অনুসন্ধানেও কিন্তু তিনি তাঁর পতির দেহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন না। সমগ্র দিবা অতিবাহিত হল, সমগ্র রজনী অতিবাহিত হ'ল, তথাপি সে-দানব-শব আবিষ্কৃত হ'ল না। তখন দেবী তুলসী সংবিগ্ন হৃদয়ে ধ্যানাসনে উপবেশন করলেন। কোথায় তাঁর প্রাণাধিক পতির শব? কোথায় অস্থি? এ যে তাঁর একান্ত প্রয়োজন। তিনি যে সহমৃতা হবেন!

সহসা চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন তিনি। তাঁর দেহ ঘন ঘন প্রকম্পিত হ'তে লাগলো। চক্ষে অগ্নি স্ফুলিংগ নির্গত হ'তে লাগলো। ধ্যান-যোগে অবগত হলেন তিনি : নারায়ণ প্রদত্ত এক মহাভয়ংকর শূলে মহাদেবের হস্তে সংহৃত হয়েছেন তাঁর স্বামী। এই দেবতা-দানব সংগ্রামে তাঁর ত্রিভুবন-বিজয়ী স্বামীর সংহার-সাধন নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীহরি নারায়ণ কৃপাহীন ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনিই ছদ্মবেশে তাঁর মহাপরাক্রমশালী রাজাধিরাজ স্বামীর মঙ্গল-কবচ অপহরণ করেন। তিনিই তাঁর স্বামীর ছদ্মবেশে দানব-রাজ-পুরীতে গমন করে তাঁর সতীত্ব বিনাশ করেন।

ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করলেন তুলসী। তাঁর অধর যুগল থর থর কম্পিত হ'তে লাগলো। রোষাবরুদ্ধ কণ্ঠে কেবলমাত্র উচ্চারিত হ'ল—নারায়ণ—

ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর সম্মুখে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি আবির্ভূত হলেন।

—দেবী, তোমার রোষ সংবরণ করো। শান্ত হও। সমস্ত দেবতাকুল তোমার অভিশাপ ভয়ে ভীত হ'য়ে পড়েছেন। তুমি শান্ত হও।

—কে? কে তুমি? কোন্ দেবতা?

—আমি—আমি তোমার বহু আরাধিত দেবতা। একদা যে দেবতাকে পতিত্বে বরণ করার কামনায় তুমি দীর্ঘ কঠোর তপস্যা করেছিলে। একদা অমরাপুরীতে তুমি যাঁর অন্যতমা প্রিয়া ছিলে—আমি সেই নারায়ণ।

আর্তনাদ ক'রে উঠলেন তুলসী।

—নারায়ণ!

—শান্ত হও দেবী। অধৈর্য হয়ো না। তুমি পরম জ্ঞানী। সংসারের জন্মমৃত্যু রহস্য সমস্তই অবগত আছ তুমি। তোমার স্বামীর মৃত্যুর প্রয়োজন হয়েছিল তাই—

—তাই ছলনার আশ্রয় নিয়ে, পাষাণ, তুমি তাঁর সংহারের হেতু হয়েছ?

স্বর সংসিক্ত হ'য়ে এলো তুলসীর।

নারায়ণ শান্ত মধুর ভাবে বললেন—তোমার পক্ষে এরূপ বিলাপ অনুচিত, তুলসী।

তুমি জানো তোমার পূর্ব জন্মের ইতিহাস? তুমি জানো তোমার এই ধর্মধ্বজ গৃহে মাধবী গর্ভে জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য? জানো তুমি, শঙ্খচূড় কে এবং তাঁর এই দানব জন্মের কারণ? শঙ্খচূড় পূর্বজন্মে আমার একান্ত প্রিয় সহচর ছিলেন, আর তুমি ছিলে আমার অন্যতম প্রিয়া। তোমার প্রেমে নিমজ্জিত হ'য়ে আমি লক্ষ্মী সরস্বতীকে পর্যন্ত অবহেলা করেছিলাম। যেজন্য লক্ষ্মী তোমায় অভিশাপ প্রদান করেন এবং তোমার এই জন্ম সম্ভব হয়। শঙ্খচূড়ও অভিশপ্ত। একদা তিনি তোমার রূপে আকৃষ্ট হন ও তোমায় কামনা করেন। ফলে তিনিও অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গচ্যুত হন এবং দানব জীবন প্রাপ্ত হন। অতঃপর সুকঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রে তিনি তোমায় পত্নীরূপে লাভ করেন। কিন্তু উপস্থিত তোমাদের পৃথিবীর কর্ম সমাপ্ত হয়েছে। তাই শঙ্খচূড় নিহত হয়েছেন।

—কিন্তু নিষ্ঠুর, পাষাণ!

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তুলসী সম্মুখে দণ্ডায়মান নারায়ণের প্রতি।

—আমার সতীত্ব ধর্ম তুমি কলুষিত করলে কেন? যেদিন কায়মনু-বাক্যে তোমায় আমি পতিরূপে কামনা করেছিলাম—সুদীর্ঘকাল দুশ্চর তপস্যা করেছিলাম, সেদিন তুমি কোথায় ছিলে? জন্মান্তরে তোমায় লাভ করবো—এ জন্মে পাব না, এই স্থির জেনে যাঁকে আমি আমার সর্বস্ব দান করে পতিত্বে বরণ করলাম তুমি হন্তা হ'লে তাঁর। বৈধব্যের যন্ত্রণা-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলাম আমি। তুমি আমার ধর্ম নাশ ক'রে আমার স্বামীর বিনাশ সাধন করলে। পাষাণ, আমি তোমায় অভিশাপ দেব। যদি এ জীবনে জ্ঞানে কোনো পাপ না ক'রে থাকি, যদি স্বামী ভিন্ন অন্য চিন্তা না করে থাকি, যদি আমার কুমারীকালের তপস্যায় কোনো পুণ্য অর্জিত হ'য়ে থাকে—আমি তোমায় অভিসম্পাত করি—যেমন পাষাণ হৃদয়ে তুমি আমার সর্বনাশ সাধন করেছ, তেমনি পাষাণে পরিণত হও তুমি। যাবৎকাল পৃথিবী থাকবে তুমি পাষাণরূপে পৃথিবীতে অবস্থান করবে।

অন্তরীক্ষে দেবতাকুল আর্তনাদ করে উঠলেন। আকাশে বাতাসে—প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে-আর্তরব প্রতিধ্বনি তুললো যেন।

নারায়ণ কিন্তু তেমনি প্রশান্ত, তেমনি নির্বিকার।

—তোমার অভিশাপ মিথ্যা হবে না দেবী।

—না। তুমি সর্বশক্তিমান নারায়ণ হলেও আমার অভিশাপ মিথ্যা হবে না।

রোদন-রতা তুলসী ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করলেন। এইবার তিনি তাঁর স্বামী শঙ্খচূড়ের অস্থি সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'রে প্রাণ ত্যাগ করবেন। ক্রন্দনাবেগে ঘন ঘন কম্পিত হ'চ্ছে তাঁর দেহলতা। চলৎশক্তিহীন অবশ চরণযুগল কোনোক্রমে তাঁর সন্তপ্ত দেহভার বহন ক'রে নিয়ে যেতে লাগলো। তিনি সমগ্র সমরভূমি হ'তে বহু ক্লেশে সংগ্রহ করতে লাগলেন তাঁর নিহত পতির অস্থি সকল। এক প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গভীর অনুসন্ধানে তিনি সমুদয় অস্থি সংগ্রহ করলেন। তারপর সংগৃহীত সেই অস্থি আপন মস্তকোপরি ধারণ করে শিথিল পদবিক্ষেপে পুষ্পভদ্রা নদী অভিমুখে গমন করলেন।

তথায় উপনীত হয়ে অশ্রুজলে তিনি স্বামীর অস্থি নিক্ষেপ করলেন পুষ্পভদ্রার সীমাহীন অতল সলিলে ও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম জানালেন স্বামীর উদ্দেশে। তারপর স্নান সমাপন করলেন এবং সিক্তদেহে উপ-বেশন করলেন নদীতীরস্থ এক শিলাসনে। এইবার তিনি স্বামী-চিন্তা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হ'য়ে প্রাণত্যাগ করবেন।

—তুলসী!

—কে?

অকস্মাৎ পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে চমকিত হলেন তুলসী। পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করতেই প্রত্যক্ষীভূত হ'ল সম্মুখে দণ্ডায়মান পরমব্রহ্ম নারায়ণ।

—তুলসী, প্রসন্ন হও।

—প্রসন্ন !

অট্টহাস্য ক'রে উঠলেন তুলসী। পরমুহূর্তে সে হাস্য সংবরণ ক'রে চিৎকার ক'রে উঠলেন : প্রতারক, নিষ্ঠুর, পাষাণ! তোমার প্রতি প্রসন্ন হব? তোমায় পুনরায় আমি অভিশাপ দিচ্ছি—তুমি শিলীভূত হও। আত্মবিস্মৃত হ'য়ে একটি জন্ম অতিবাহিত করো।

: তথাস্তু। সাধ্বি, আমায় লাভ করার জন্য একদা তুমি কঠিন তপস্যা করেছিলে। উপস্থিত ধরণীর কর্ম তোমার সমাপ্ত হয়েছে, তুমি বৈকুণ্ঠে গমন ক'রে রমার ন্যায় আমার পার্শ্বে অবস্থান করবে। আর তোমার এই দেহ দ্রবীভূত হয়ে ভারতে গণ্ডকী নদী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করুক। তোমার কেশকলাপ তুলসী নামে বিখ্যাত হোক এবং পবিত্র বৃক্ষরূপ ধারণ করুক। ঐ তুলসী যাবতীয় পুষ্প ও পত্র হতে দেবপূজায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক। তুলসীতরুরমূল পৃথিবীর সমস্ত তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপ ধারণ করুক। তুমি জগৎপূজ্যা হও। দেবতাগণ তোমায় মস্তকে ধারণ করবেন। তোমার স্বামীর অস্থি শঙ্খে পরিণত হবে। সমগ্র দেব পূজায় এবং মাঙ্গলিকে শঙ্খ হবে শ্রেষ্ঠ বাদ্য। আর তোমার অভিসম্পাতে আমি গণ্ডকী নদীর তীরে শৈলরূপী হ'য়ে অবস্থান করবো। সে স্থানে তীক্ষ্ণদন্ত কীট সকল সেই শীলার অভ্যন্তরে আমার চক্র রচনা করবে। জগতে শালগ্রাম শীলা নামে আমার পরিচয় ঘোষিত হবে। তুলসীপত্র ভিন্ন আমার পূজা হবে না। শঙ্খের বারি এবং তুলসীপত্র হবে আমার পূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। আমার শীলারূপী অবয়বের মস্তকে এবং বক্ষে, তুলসী, তুমি সর্বদা অবস্থান করবে। শঙ্খও তোমার আমার প্রসাদ বঞ্চিত হবে না।

ধীরে অতি ধীরে দেবী তুলসীর নবনীত দেহলতা স্বচ্ছ সলিল-রাশিতে পরিণত হ'ল। পরিণত হ'ল ধারায় ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে এক নতুনতর নদীরূপে।

গণ্ডকী নদী।

গণ্ডকী নদীর দুইপার্শ্বের সুবিস্তৃত তটভূমিতে প্রকাশিত হ'ল মনোহর তুলসী তরুর মঞ্জরীশোভিত বন।

আর সেই গণ্ডকী তীরে নারায়ণ শৈলরূপ ধারণ করলেন।

শেষ

সময় নির্ণয়

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

আলোক ও অন্ধকার লইয়া সময় নির্ণীত হয়। যেমন পেচক দিবাভাগে সূর্য্য আলোক সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধকারে পড়িয়া থাকে। সূর্য্যকিরণ বিদূরিত হইলে অন্ধকারে বিচরণ করিয়া আহারাদি করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র চড়াই পাখি, কাকাদি শীতকালে সুদীর্ঘ ১৪ঘণ্টা রাত্রির পর আহারাদি অন্বেষণে কাটাইয়া থাকে। তেমনি সুমেরু প্রদেশের অধিবাসিগণ ছয়মাস সূর্য্যকিরণে ও ছয়মাস অন্ধকারে জীবন যাপন করে। তাহাদের পরম দেবতা ইন্দ্র দক্ষিণায়ন কালে দক্ষিণ দিগন্ত বৃত্রাবৃত সূর্য্য, বৃষ্টি, ও উষাকে বৃত্ত পরাস্ত করিয়া লইয়া আসেন। তথায় উষা মাসকাল স্থায়ী এবং তাহার বৃষ্টি অতীব আশ্চর্য ব্যাপার, তেমনি প্রদোষও একমাসকাল স্থায়ী হয়। তথায় সূর্য দক্ষিণ হইতে উদিত হন।*

অন্ধকারে ছয়মাস বড় বড় নক্ষত্র পুঞ্জ—যেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল, শটকৃত্তিকাদি মৃগশিরাদি, মৃগব্যাধ, শুকতারা, বৃহস্পতি প্রভৃতির উদয় অস্তাদি লক্ষ্য করিয়া সময় নির্ণীত হইত। চন্দ্র, সূর্য্যের গতিবিধি সময় নির্ণায়ক বটে। প্রাচীনকালে বার্হস্পত্য মতে কাল গণিত হইত। তাহার চিহ্ন অদ্যাপি কালাশুদ্ধি ও কুম্ভমেলাদি ব্যাপারে পরিদৃষ্ট হয়।

চান্দ্রমাস অনুসারে মুসলমানগণও তাহাদের ঈদ আদি গণনা করিয়া থাকেন। আর্য্যগণের কাল নির্ণয় সাবন মানে (শায়ন), সূর্য্য মানে ও চন্দ্র মানে হইয়া থাকে। ৮ই চৈত্র বর্ত্তমানে শায়ন মানে মেষ সংক্রান্তি হয়। দিবারাত্রি সমান হয় এবং সৌর মানে ৩০এ চৈত্র মেষ সংক্রমণ বলিয়া স্নান দানাদি করা হয়। অচল নক্ষত্র ৩৬০ দিনে রাশিচক্র ভ্রমণ করেন, সূর্য্য ৩৬৫—১৬৷ ঘণ্টা দিনে ভ্রমণ করেন, চন্দ্র ৩৫২ দিনে ভ্রমণ করেন। ঋষিগণ ব্রহ্ম মানে, দেব মানে, পিতৃগণ মানে, মনুষ্য মানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ কাল গণনা করিতেন। মনুষ্যের ২৪ ঘণ্টায় দিবারাত্রি বা একদিন হয়, ৩৬০ দিনে দেবগণের এক দিবারাত্রি লইয়া একদিন হয়, পিতৃগণের শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষদ্বয়ে এক:দিবারাত্রি হয়। দেব মানের সহস্রযুগ দিবা ও সহস্রযুগ রাত্রি লইয়া কাম্য বৃক্ষের একদিন হয়। ইহার মধ্যে কল্প ভেদ আছে, ৩০ কল্পে এক দিবারাত্রি হয়, ১৫ কল্পে দিবা ও ১৫ কল্পে রাত্র হয়। ৩০টী কল্পের নাম (১) শ্বেতবরাহ (২) নীললোহিত (৩) বামদেব (৪) পাথান্তর (৫) রৌরব (৬) প্রাণ (৭) বৃহৎকল্প (৮) কন্দর্পঃ (৯) সত্য (১০) ঈশান (১১) ধ্যান (১২) সারস্বত (১৩) উদানঃ (১৪) গরুড়ঃ (১৫) কৌর্ম্মঃ (১৬) অয়ং ব্রহ্মণঃ পৌর্ণমাসী নারসিংহ (১৭) সমাধিঃ (১৮) আগ্নেয় (১৯) বিষ্ণুজ (২০) সৌর (২১) সোমকল্প (২২) ভাবনঃ (২৩) সুপুমালী (২৪) বৈকুণ্ঠ (২৫) অচ্ছিদ (২৬) বল্মীকল্প (২৭) বৈরাজ (২৮) গৌরী-

---

* ছাঃ তৃতীয় অধ্যায় ৮মখণ্ড ৪ মন্ত্রে সঃ যাবদ আদিত্য দক্ষিণ, উদেতি—

কল্প (২৯) মাহেশ্বর (৩০) পিতৃকল্প—৪৩২,০০০০০০০ বর্ষ মানব মানে এক কল্প। এখনও উত্তর প্রদেশে হরিদ্বার ক্ষেত্রে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান কালে ব্রাহ্মণগণ যে মন্ত্র পাঠ করান তাহা এইরূপ।

ব্রহ্মণো দ্বিপরার্দ্ধে শ্বেতবরাহ কল্পে সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি কলিযুগে শক নৃকপতে অষ্টাদশ শত অশিতি বর্ষে অমুক মাসে অমুককর্ম্মের অমুক তিথৌ স্নান মহংকরিষ্যে!

ইহার অর্থ ব্রহ্মমানে ব্রহ্মের পরমায়ু শতবর্ষ, তাহার পঞ্চশৎবর্ষ অপগত দ্বিতীয় পঞ্চাশত আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে নারসিংহাদি ১৫ কল্প অপগতে শ্বেতবরাহকল্প আরম্ভ হইয়াছে। যেমন পিতৃমানে শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ পঞ্চদশে পঞ্চদশে তিরিশ হইয়া থাকে ইহাও তেমনি। যেমন সূর্য্য উদয়ে দিবা আরম্ভ হয়, তথা হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ন বা পূর্ব্বার্ধ দিবস গণিত হয়। মধ্যাহ্ন হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপরাহ্ন বলিয়া গণিত হয়। তেমনি ব্রহ্মের পূর্ব্বাহ্ন গত অপরাহ্ন চলিতেছে। অপরাহ্ন শেষে সূর্য্য থাকেন না। প্রাণীগণ কর্ম্ম ত্যাগে নিদ্রাতুর হইয়া পড়ে। ইহাই প্রলয় অবস্থা। কেহ কেহ এই নিদ্রাগত অবস্থাকে দৈনন্দিন প্রলয় বলেন। Dr. Austin এর ভাষায় when matter is being formed দশা এবং অপরার্ধ when matter is in difusion অবস্থা ঘটে। উক্ত সঙ্কল্প মন্ত্রে মন্বন্তর শব্দটি প্রয়োগ হইয়াছে। তাহার অর্থ এক কল্পে ১৪টী মনু দশ দিক যুক্ত দৃশ্য জগৎ শাসন করেন। বর্ত্তমানে এই ব্রহ্ম পরার্ধে স্বায়ম্ভুবমনু, স্বারোচিষমনু, উত্তমিমনু, তামসমনু, রৈবতমনু, চাক্ষুষমনু এই ছয়টি মনুর কাল গত হইয়া বর্ত্তমানে সপ্তম বৈবস্বত মনুর কাল চলিতেছে। ইহার শাসন অন্তে অষ্টম সাবনী ভবিতা মনুর শাসন হইবে ইহা চণ্ডিতে লেখা আছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মধ্যে কেহ কেহ Precison of the equinoxal power দ্বারা সময় নির্ণয় করিয়াছেন। এই মতে সূর্য্যের চারদিকে পৃথিবীর যে কক্ষ অঙ্কিত আছে তাহা Electrical ঐ ইলিপত্রের বামদিকের Focusএ সূর্য্য অবস্থিত। এইজন্য যখন পৃথিবী দক্ষিণ দিকের Focusএর সন্নিকট হয় তাহাতে শৈত্যাধিক প্রযুক্ত তুষারপাত ঘটিয়া থাকে এবং যখন পৃথিবী বামদিকস্থ Focus'এর নিকটবর্ত্তী হয় তখন সূর্য্যের অতিশয় সান্নিধ্য বশতঃ অত্যন্ত গরম হইয়া থাকে। বাম হইতে দক্ষিণে Focus পৌঁছাইতে ২৫০০০ বৎসর লাগে। ইহাতে সময় গণনার প্রচেষ্টা দেখা যায়।

কেহ কেহ বলেন পুর্নবসু নক্ষত্র কতিপয় কাল পূর্ব্বদিকে মহাবিষুবের সান্নিধ্যে ছিলেন, তাহাই এক যুগ, পরে Precision জন্য মৃগশীর্ষা নক্ষত্র পূর্ব্ব দিকস্থ হন, তখন সেই Periodকে ইংরাজীতে orion period বলিয়া বর্ণিত করেন। Orion শব্দ সংস্কৃত অগ্রহায়ণ শব্দের বিকৃতি বটে, তা মুছিয়া দিয়া orion হয় তৎপশ্চাৎ Precesion বশে কৃত্তিকা নক্ষত্র পূর্ব্ব দিকস্থ হন, তাহাকে কৃত্তিকা Period বলে। এইরূপে নক্ষত্রের গতিতে সময় নির্ণীত হয়। স্বর্গীয় বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে—

১। খৃ-পূর্ব্ব—১০,০০০—৮০০০ শেষ তুষারপাতের পরবর্ত্তী ঘটনা। ইংরাজ প্রকৃতিবিদ মিঃ গেকি বলেন, শেষ তুষারপাত ৮৪,০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ২৫,০০০ বর্ষ, পর পর তুষারপাত ঘটে এই মতবাদিদের মতে মিঃ গেকির উক্ত সময় হইতে তিনটী তুষারপাত ৩×২৫০০০ জন্য ৭৫০০০ বর্ষ বিয়োগ করিলে ৯০০০ বৎসর অবশেষ থাকে। কোন মতে তুষারপাত দুইটী কোন মতে তুষারপাত চারিটী এইরূপ মতভেদের কারণ সম্ভবতঃ এরূপ যে সুমেরু প্রদেশে তুষারপাত হইয়া কোন বায়ু প্রবাহের প্রভাবে উহা পশ্চিম দক্ষিণ অভিমুখে গিয়া জনহীন আমেরিকা দেশে গিয়া পতিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব দক্ষিণে উহার প্রভাব কম থাকায় মেরু প্রদেশের জনগণ আমেরিকার দিকে না গিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণ-ইউরোপ, তৎনিকটবর্ত্তী এশিয়া বিভাগে স্থান লইয়াছিলেন। আমেরিকান মতে এইজন্য চারটী তুষারপাত বলে। Vascode Gama America ভুমি দেখিয়া আসার পর—Europe হইতে শ্বেতবর্ণেরা Americaয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। মহা বিষুবরেখার দুইধারে গ্রীষ্মমণ্ডলে Mexicoতে Red-Indianদের অবস্থিতি জানা যায়। ভ্রমণকারীগণ বলেন Mexicoর কোন কোনও স্থানে হিন্দুদের দেব দেবীর মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়—এবং তথাকার অধিবাসীদের আচার,ব্যবহার, রান্না-বান্নাদিও ভারতীয় ভাবাপন্ন বটে। আর্য্যগণ সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইয়া বাণিজ্য করিতেন ইহা ঋগবেদ পাঠে জানা যায়। ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব তীরে Palestineএর নিকটবর্ত্তী স্থানে Fonecia (Fenecia) নামক স্থানে ভারতীয় বণিকগণের উপনিবেশ ছিল এবং তাহার এক Branch উত্তর Africaয় Carthageএ স্থান লইয়াছিল। এই Carthage বাসী হানিবল-এর বিশ্ববিজয় কীর্ত্তি, ইতিহাস ঘোষণা করে। মহারাজা তিলক, উক্ত ৯০০০। ১০০০০, নির্ব্বিবাদ জানিয়া তুষারপাতের পরবর্ত্তীকাল গ্রহণ করিয়াছেন। আর্য্যগণ মেরু প্রদেশের চিরবীজ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, কারণ উহা বসতের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল, শেষে তুষারপাত জন্য তৎপর তাহারা Refuge ভাবে মাথা রাখার জন্য ভুমির অনুসন্ধানে বাহির হন।

২। খৃঃ পূর্ব্ব—৮০০০ হইতে ৫০০০—Precision of the Equinal দিগের মতে ইহার নাম পুনর্বসুর যুগ অর্থাৎ পুনর্বসু নক্ষত্র; মহাবিষুব রেখার সন্নিধিতে স্থিত। মহাবিষুব রেখা পূর্ব্বে পশ্চিমে বিস্তৃত। উহা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। মহাবিষুব রেখাতে যখন সূর্য্য আগমন করেন তখন দিবা রাত্র সমান হয়। ঐ সময়—বসন্তকালের উদয় হয়। দুঃখময় শীত অপগতে বসন্ত আগমনে এখন ও বাসন্তী রংএর কাপড় পরিধান করতঃ উৎসব হয়। দেখা যায় উত্তর প্রদেশে হরিদ্বারে এই মহাবিষুব রেখায় সূর্য্যের অবস্থানকালে বরাবর বৈশাখি মেলা জমিয়া থাকে। ঐ দিন মহাবিষুব-সংক্রান্তি বলিয়া স্নান দানাদি করে। বঙ্গদেশেও দেখা যায় চৈত্র মাসের শেষার্ধে এই শিবের পাট মস্তকে নিয়া যুবকেরা শিবের গীত সামাজিক সুখের গীত গাহিয়া চাউল ভিক্ষা করিয়া নক্ত ব্রত পালন করেন। বিষুব-সংক্রান্তির পূর্ব্ব রাত্রে শ্মশানে নীলের পূজা করে।

তারকেশ্বরে গাজন হয়। এবং বিষুব সংক্রান্তির দিন, চড়ক পূজা মেলা করিয়া থাকে। যাহারা ১লা মাঘ হইতে উত্তরায়ণ গণনা করেন তাহাদেরও প্রতিষ্ঠান নগরে যাহার বর্ত্তমান নাম প্রয়াগ তীর্থ, তথায় মাঘ মেলা হইয়া থাকে।

তিলক মহোদয় বলেন এই সময়ে আর্য্যগণ বিনষ্ট মেরু-ক্ষেত্র-ত্যাগে Refuge ভাবে উপযুক্ত গৃহাদির স্থান তল্লাসে Europe এর পূর্ব্বাংশ ও Asiaর পশ্চিমাংশ ঘুরিয়া ফিরিয়া একদল পারস্যে, আর একদল আর্য্যাবর্ত্তে আপন ভূমি গ্রহণ করেন। ঋগবেদে তৃতীয় মণ্ডল পাঠে জানা যায়—কুশিদগণের নেতা বিশ্বমিত্র বিপাশা নদী পার হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়াছেন। এবং রামায়ণ পাঠে বুঝা যায় তাঁহারা লঙ্কা ও সমমধ্যবর্ত্তী স্থানে জহ্নু নামক সম্পত্তি লাভ করেন এবং তথায় বিশ্বমিত্রের আশ্রম স্থাপিত ছিল। এই বিশ্বমিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী, তৎপিতা গাধী, তাহার পিতামহ কুশিক এবং তাহার প্রপিতামহ ঈষীরথ ইহারা Inter Glacial period এ জীবিত ছিলেন। ভারতে ছিলেন না তাহাও বুঝা যায়—ইহাদের দৃষ্ট মন্ত্র ঋগবেদে আছে। আনুসঙ্গিক একটি কথা বলা সঙ্গত মনে করি এই কুশিকগণ—ভরত অগ্নি নামক রুদ্রদেবের উপাসক ছিলেন। রু প্রকাশে দ্রুত দ্রাবণে, যাহার প্রভাবে মায়া ও উৎকার্য্য বিলয় পায় যেমন সূর্য-উদয়ে রাত্রি অন্ধকার—ভরত অর্থ যিনি উপাসককে ভরণপোষণ দিয়া রক্ষা করেন। সূত্রান্তরে বলে "একোহি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তস্থু। ভরণকর্ত্তা রুদ্রের উপাসনা করিয়া কুশিকগণ আপনাদিগকে ভারত বলিয়া গর্ব্ব করিতেন।*

এই ভারতগণ আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তে স্থান গ্রহণ করায় দেশের নাম ভারত হইয়াছে। কেহ বলেন ভাঃ-অতঃ=ভারতঃ এই ভারত হইতেই জ্ঞানের আলোক বেদের মহিমা জগতে প্রচারিত হইয়াছে। এইজন্য ইহাকে ভারত বলে। এইরূপ আরো দু চার ঋষি-বংশের ঋষিগণের আগমন দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন রাহুগণ গৌতম, মথব সহিত আসিয়া সদানীরাতিরের (কেহ বলে অত্রাই কেহ বলেন মহানন্দা) নিকট মিথিলা নগরী স্থাপনে তথায় অগ্নি স্থাপন করেন এবং মথবকে রাজা করেন। জেন্দাবস্তে বলে যে তুষারপাতের পূর্ব্বকালে অহুর মজদার প্রধান দেবতা যিনকে আদেশ করেন, অচিরেই তুষারপাত হইবে তুমি সমস্ত প্রাণীর বীজ রক্ষার জন্য একটী বড় নির্ম্মাণ কর। এই যিন অজিদকে নামা শঠচক্ষু ব্যক্তির দ্বারা পদভ্রষ্ট হন। তখন আপ্ত্যৈত্রেয় (আপ্ত্য-ত্রিত) যিনের সাহায্যার্থ আসিয়া শঠচক্ষুকে বধ করেন। সুতরাং এই যিন ও আপ্তত্রিত শেষ তুষারপাতের পূর্ব্ববর্ত্তী (Inter Glacial periodএর লোক) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঋগবেদে শঠচক্ষু বিশ্বরূপকে আপ্ত্যত্রিত ইন্দ্রাদেশে বধ করেন। তজ্জন্য বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা শুক্রাচার্য্য ভার্গব প্রভৃতি অসুরের পক্ষ আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করেন। যা ইন্দ্র বৃত্রাসুরের যুদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই আপ্ত্যত্রিত ও জেন্দাবস্তের শঠচক্ষুর বধকর্ত্তা একই ব্যক্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন। এই যুদ্ধ জয়ের বর্ণনা আপ্ত্যত্রিতের পৌত্র বিশ্বকর্ম্মা ঋষি (ইন্দ্রের শিল্পিকার বিশ্বকর্ম্মা নহে) ঋগবেদের ১০।১৫৭।৪ মন্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

হত্বায় দেবা অসুরাস্তদায়ন্দেবা দেবত্বমভিরক্ষমাণাঃ॥

সুতরাং যদি বিশ্বকর্ম্মা দেবাসুর যুদ্ধের সম সাময়িক হন তাহা হইলে ইহারা সকলেই Post Glacial periodএর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক হইবেন এবং তাহাদের দৃষ্ট মন্ত্রাদি ঋকবেদের অন্তঃভুক্ত বটে এবং সে সকল মন্ত্র Pre Glacial periodএ রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা স্বীকার না করিলে চলে না।

ভৃগু অঙ্গিরা অথর্ব দধিচি চবন ইহাদের ইতিবৃত্ত ঋগবেদের বহু স্থানে মিলে, কিন্তু ইহাদের দৃষ্ট মন্ত্র বর্ত্তমানে মুদ্রিত সকল গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। যেন্দাবস্তে দেখিতে পাই যে অসুর উপাসকগণের প্রধান দেবতা অসুর মজদার (অসুর মহত; Phycologically মহতের স্থানে স্থানে জ হইলেই অসুর মজদার হইয়া যায়। অসুর উপাসকগণের বক্ষার্ত্ত অসুর মজদার—ক্রমে ক্রমে ষোড়শটী স্থান নির্ম্মাণ করেন এবং—শতমন্যু ইন্দ্রের নেব রাজত্ব স্থাপয়িতা অঙ্গিরো মন্যু ঐ ষোলটী স্থান একে একে নষ্ট করিয়া ফেলেন। মন্যু বা যজ্ঞ হইতেই উৎপত্তি জন্য অঙ্গিরা মন্যু নামে অভিহিত। যে ষোলটী জায়গা অঙ্গিরা মন্যু—বিনষ্ট করেন তাহার একটীর নাম হপ্ত হেন্দু (শপ্ত সিন্দু) নগরীতে আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করেন। সে জন্য আর্য্য হিন্দুগণ হিন্দু বলিয়া আখ্যাত। এই অঙ্গিরায় পৌত্র বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজ যিনি ঋগবেদের উক্ত সপ্তর্ষিগণের মধ্যে একজন। এই অঙ্গিরস হইতে অঙ্গিরসবংশের ধারা চলিতেছে। ইনি Pre Glacial periodএর লোক অনুমিত হয়। ইঁহাদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অর্থবা নবগ্য অঙ্গিরস পুষ্কল হইতে অগ্নি চয়ন করেন। ভৃগু দেবগণ তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন। ঋগবেদে বর্ণিত আছে। তৎপর দধীচি অগ্নি চয়ন করিয়া যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তন করেন। অঙ্গিরা প্রথম ইন্দ্র পূজায় প্রবর্ত্তক। দধীচির অস্থি দ্বারা বৃত্র বধের জন্য বজ্র নির্ম্মিত হয়। এজন্য দধীচি ইন্দ্র বৃত্র যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তাঁহার পিতা অর্থর্ব্বা ভৃগু প্রভৃতিকে ঋগ্বেদে ১০।১৪।৬ তাহাদের আর্য্যজাতির পিতা বলা হইয়াছে। মন্ত্রটী অংগিরসো নঃ পিতরো নবগ্বা অর্থর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ। ইহারা Inter Glacial periodএর লোক স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যদি চারটি তুষারপাত স্বীকৃত হয় তবে প্রথম দুই তুষার পাতে মেরুর গৃহত্যাগ না করার কারণ কি? মহাভারত পাঠ করিলে সভাপর্ব্বের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে অর্জুনের দিগবিজয় বর্ণিত আছে রাজসূয় যজ্ঞোদ্‌ভূত দিগ্‌ বিজয় যে বর্ণিত আছে, তাহাতে অর্জ্জুন উত্তরাভিমুখে গমন করেন, অর্জুন উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া শ্বেত পর্ব্বত অতিক্রম করতঃ—হাটকে উপস্থিত হন। তথা হইতে মানস সরোবর হইয়া গন্ধর্ব্বদেশ জয় করেন। তৎপর উত্তরাভিমুখে গমন করতঃ হরিবর্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর কুরু অভিমুখে চলিতেছিলেন।

২৮ হইতে ৩২ দ্রাঘিমা (Latitude) ৮২ হইত ৮৪ অক্ষাংশ (Longitude) ইহার মধ্যে হরিবর্ষ ও উত্তর কুরুবর্ষ হইবে। পুরাণে সুমেরু বর্ণনে বলে সুমেরুর উত্তরে কুরুবর্ষ, এজন্য তাহাকে উত্ত

* ঋঃ—৩।৫৩।১২

কুরু বলে। প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নিধ্র তিনি তাঁহার রাজ্য তাহার নব পুত্রকে বিভাগ করিয়া দেন। তাহাতে হরিবর্ষ ও কুরুবর্ষ পরিদৃষ্ট হয়। মহাভারতের বর্ণনায় তিব্বতের উত্তর পশ্চিমাংশে হরিবংশ ও তাহার উত্তরে উত্তর কুরু বলিয়াছে। ইহাতে বলিতে হয় তুষারপাত জন্য মেরুপ্রদেশ ত্যাগে আর্য্যাবর্ত্তের দিকে আসিতে কিয়ৎকাল মহাভারত উক্ত হরিবর্ষ ও উত্তর কুরুতে কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন জেন্দাবস্তে বলে রমা নদীর উত্তরে দেবউপাশকগণের আবাস। দক্ষিণে অসুর উপাসকগণের আবাস। এই নদীটী ইন্দ্র উত্তরাভিমুখী করিয়াছিলেন। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর হইতে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী Caspian হ্রদে গিয়াছে তাহার নাম অত্রীকনদী। ঋগ্বেদে যে নদীকে ইন্দ্র বলপূর্ব্বক উত্তর বাহিনী করেন, তাহা এই অত্রীক হইতে বাধা নাই। নতুন জায়গায় গেলে পূর্ব্বস্থানের স্মৃতি রক্ষার্থ ত্যাজ্যস্থানের নাম নূতন স্থানে ব্যবহার দেখা যায়। যেমন Americaয় London New york প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। পশ্চাৎ কেহ ইরাণে কেহ আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয় তুষারপাত Americaয় প্রবল হইলেও পূর্ব্বদিকে ৩০ দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত স্বল্প তুষারপাত অনুমেয়।

মহাত্মা তিলকের মতে বসন্তের স্থান অনুসন্ধানে পুণর্বসু যুগে ঋষিগণ প্রাচীন আবাস ত্যাগ করেন। ইহাতে কোন অসমাঞ্জস্যের কারণ নাই।

বর্ত্তমানে মুদ্রিত ঋগ্বেদে সপ্তর্ষি শব্দ দ্বারা জমদগ্নি (ভার্গব) ভরদ্বাজ (অঙ্গিরস বৃহস্পতি-পুত্র), অত্রি, ভৌম, কশ্যপ (মরিচিপুত্র) বশিষ্ঠ, (মানস ব্রহ্মার পুত্র) বিশ্বামিত্র, (কুশিক) গৌতম (রাহুগণ) ইহাদের মধ্যে বামদেব গৌতম ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা, শুণক, গৃৎসমদ (ভার্গব) দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা। বিশ্বামিত্র তৃতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা। ভরদ্বাজ ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্রষ্টা। বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের দ্রষ্টা। অত্রি ও আত্রেয়গণ ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের দ্রষ্টা। ঋগ্বেদে নবম মণ্ডলে কাশ্যপগণের প্রাধান্য আছে। অষ্টম মণ্ডল আঙ্গিরস ঘোর শিষ্য কাম্বগণের দৃষ্ট। প্রথম ও দশম নানা বংশীয় ঋষিগণের দৃষ্ট মন্ত্র দেখা যায়। তাহা ধারাবাহিক কালানুসারি নহে কারণ বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলে প্রথম সুক্তের প্রথম মন্ত্রের দ্রষ্টা। বিশ্বমিত্র তৃতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা। দশম মণ্ডলের পরিসমাপ্তি কালে শেষ সুক্তের পূর্ব্ব সুক্ত মধুচ্ছন্দা পুত্র অঘমর্ষণের দৃষ্ট বটে। বেদের মধ্যে শুক্ল যযুর্ব্বেদ, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ হইতে নব্য। শুক্ল যযুর্ব্বেদে গ্রন্থখানি যাজ্ঞবল্ক সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত হন। তাঁহার মন্ত্রগুলি সবই নব্য তবে, প্রাচীন বহু ঋষির মন্ত্র তাহাতে আছে। যেমন শুক্ল চত্বারিংশৎ শেষ অধ্যায় অথর্ব্বা তনয় দধীচি দৃষ্ট। ঋগ্বেদে দধীচি মধুবিদ্যা বিশারদ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। উহারি অপর নাম ঈশ উপনিষদ। বিশেষ যাজ্ঞবল্কের আচার্য্য মহর্ষি উদ্দালক আরনী, তৎশিষ্য কুশর বিন্দু শ্বেতকেতু নচিকেতা প্রভৃতি কৃষ্ণ যজুর্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি, যাহা প্রাচীন বলিয়া উক্ত।

দধীচির ইন্দ্র বজ্র যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী। Pre Glacial period বলিতে হয়। Punorvaon যুগ যাহা ৺বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কোন অংশ Pre Glacial period এর অন্তর্গত কিনা অথবা মধ্য Period এর লোক তাহা অদ্যাপি নিশ্চিত হয় নাই। (Many Vedic hymns can be traced to the early part of this period)

তৎপর মার্গশীর্ষ যুগ, যাহাতে ইংরাজিতে Orion age বলে তাহাও বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের সমসাময়িক। ৺বালগঙ্গাধর তিলক বলেন এই সময়ের ঋষিগণ সুমেরু প্রদেশের আবাসস্থানের বিষয় ভুলিয়া যান নাই, ইহা 5000—3000 B. C.

তৎপরে কৃত্তিকা যুগে তৈত্তীরিয় সংহিতা ও বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ রচনার কাল বটে—3000 to 1400 B. C. তিনি বলেন এই সময়ে ভারতে আর্য্যগণ তাহাদের সুমেরু নিবাসের স্মৃতি মুছিয়া যাওয়া প্রাচীন বেদের ব্যাখ্যানে অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গ্রন্থখানি এইসময়ে রচিত হইয়াছিল।

তৎপরে Pre. Buddistic Period 1400—500 B. C. বলিয়াছেন। তখন Vernal equinox was in the east. এখানে Vernal equinox অশ্বিনি বা ভরনিতে থাকা উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে মনে হয় নক্ষত্র নামানুসারে যুগনাম দেওয়া পরিত্যাগ হইয়াছে। নক্ষত্র নাম অনুসারে যুগ গণনার মতে ২৫,০০০ বৎসর পর Cycle শেষ হইলে তুষারপাত ঘটিয়া থাকে। Electrical কক্ষে পৃথিবীর বিচরণের যে পথ নির্দিষ্ট আছে, তাহার বামদিকের Focusএ সূর্য্যস্থিত এজন্য তুষারপাতের পর ১২৫০০ বৎসরের সময় পৃথিবী সূর্য্যের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়ায় অতিশয় গরম হইবার বিধি আছে। খৃষ্টের ১০০০০ বৎসর পূর্ব্বে যে তুষারপাত ঘটে তাহা হইতে বর্ত্তমানে ১২,০০০ বর্ষ গত হইয়াছে, সুতরাং আমরা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি। সামনে আরোও গরম পড়িয়া যাইবে, শীতকালেও শীত হইবে না। এই যে গরম প্রবাহ চলিয়া গেল, ইহা প্রলয়ের বিষাণ নহে। কাজেই ইহা দু চার শ বৎসর পর অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন সূর্য্যের জন্ম হইতে এ পর্য্যন্ত তাহা হইতে বহু তেজাংশ বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহারা গ্রহ বলিয়া কথিত। তৎপর তেজ বিকীরণ করতঃ তাঁহার কলেবর কিছু নিস্তেজ হইয়াছে। তাহার ফলে তাঁহার কলেবরে অগ্নির ধুমাবরণের ন্যায় বাষ্পাবরণে দাঁড়াইয়াছে। তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার তেজ যাহা বাহিরে আসে তাহা স্বল্প। তেজ জীর্ণ হইলে অবয়ব বৃদ্ধি পায়—ছড়াইয়া যায়। শৈত্যের সংযোগে কলেবর হ্রাস পায় সঙ্কুচিত হয়। যেমন দুগ্ধ ঘনীভূত হইলে অল্প আয়তন বিশিষ্ট হয় তেমনি সূর্য্যে অবয়ব সঙ্কুচিত হইয়া অর্থাৎ ঘনীভূত হইয়া অল্প আয়তন হওয়ায় উহারও পৃথিবীর দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে দূরত্ব বৃদ্ধি হইলে আলোকের স্বল্পতা ও মাধ্যাকর্ষণের গোলযোগ ঘটে এবং পৃথিবী উপরে যে বলা হইয়াছে গ্রহ ও সূর্য্যের দূরত্ব যাহা বরাবর আছে তাহাতে সূর্য্য যে ভাবে গ্রহগণ আকর্ষণ করেন, যদি কোন কারণে সেই দূরত্বের আধিক্য ঘটে, তবে আকর্ষণের স্বল্পতা জন্য গোলযোগ অনিবার্য্য। যেমন একটি ঘোড়সওয়ার যতক্ষণ ঘোটকের লাগাম জোরে আকর্ষণ করিয়া থাকে ততক্ষণ সেই ঘোটক কদমে

চলে। যখন সেই আকর্ষণের সওয়ার টিপা দেয় তখন সেই ঘোটক স্বেচ্ছায় ধাপে চলে। যেমন একটি রেলের ইঞ্জিন সরল রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ বক্র রাস্তায় যাইতে হয়, তখন যদি driver ব্রেক না করে ইঞ্জিন বশে সরল ভাবে চলিয়া গর্ত্তে পতিত হয় এবং যাত্রীগণের মরণ ঘটে। তেমনি গ্রহ উপগ্রহাদি বক্রকক্ষে চলিতে চলিতে পথভ্রষ্ট হইতে বাধা নাই তেমনি সূত্রাত্মা গ্রহ উপগ্রহাদির আকর্ষণ সমতা রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রলয়ও তাঁহার একটি কর্ত্তব্য ব্যাপার। যদি সে প্রলয়ের প্রয়োজন বোধ করেন তবে আর তাহাতে বাধা দেন না। গ্রহ উপগ্রহগুলি চুরমার হইয়া যায়। আর যদি প্রলয় ঘটাইবার দেরী থাকে তবে সেই সর্ব্বশক্তিমান সূত্র আকর্ষণে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। তুষারাবৃত হন, যেমন সৌর কিরণে সল্পতা বশতঃ মেরুমণ্ডল চির তুষারাবৃত রইয়াছে। তথায় কোনও জীবজন্তু নাই। তথার সূর্য্য কিরণের প্রাবল্য অর্থাৎ মহাবিষুব রেথার উত্তরে দক্ষিণে জীবজন্তু বৃক্ষ লতাদির আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। তেমনি সৌর কিরণের সল্পতা বশতঃ পৃথিবী একটী বরফের বলে পরিণত হইবে। জীবজন্তু বৃক্ষলতা প্রলয় হইবে। ইহা প্রলয়ের বিষাণ বাজিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৪০০ হইতে ৫০০ খৃঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূত্র দর্শনের কাল হইলে একটী কথা মনে জাগে ব্রহ্মা হইতে চতুর্থ পরাশর যিনি ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টাও বটেন তিনি Pre Glacial period এর লোক বলতে হয়] বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা পরাশর পুত্র পারাশর্য্য উক্ত পরাশরের সহিত একী বলা কেমন বোধ হয়। বৃ আঃ এর ২য় অধ্যায়ের শেষে এক জাতকর্ম শিষ্য পারপর্য্য দৃষ্টি হয়। তিনি আসুরি হইতে ষষ্ঠ এবং নিরুক্তকর যাস্কের পরবর্ত্তী। বৃ আঃ ষষ্ঠ অধ্যায় শেষে যে বংশ আছে তাহাতে আসুরি বাজসনী যাজ্ঞবল্কের পরবর্ত্তী পঞ্চশিখ শিষ্য আসুরী একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তাহা হইতে ষষ্ঠ পারপর্য্য। সুতরাং এক এক পুরুষে ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলেও ৮ × ২৫ = ২০০ বৎসরের পরবর্ত্তী হন। শত পথ ব্রাহ্মণের বংশে চারজন পারাশর মিলে।

পুরাণাদি শাস্ত্রে বশিষ্ঠ বংশে শ্যাম পরাশর, শ্বেতপরাশর, নীল পরাশর ধুম্র পরাশর, কৃষ্ণ পরাশর দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু পুরাণের বক্তা পরাশর। তিনি ভবিষ্যৎ বংশ বলার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছেন— বিষ্ণু পুরাণ ৪।২০।১৩ শ্লোকে বলে যো হয়ং সাম্প্রতমেতদ্ ভুমণ্ডলম পণ্ডিতরেতি ধর্ম্মেন পালয়তীতি। ঐ ৪।২১।১ যোবয়ং সাম্প্রত অবনীপতিঃ তস্যাপি জনমেজয় শ্রুতসেনোগ্রসেন ভীমসেন পুত্রা চত্বারো ভবিষ্যন্তি।" ইহাতে পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয়ের জন্মের পূর্ব্বে পরাশর বিষ্ণুপুরাণ পরিক্ষিতের রাজত্বকালে রচনা করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমানে ব্রহ্মণদ্বিপরাধ্যে শ্বেত বরাহ কল্পে সপ্তম মনু বৈবশ্বতের মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি কলিযুগে বাস করিতেছি। মহাভারতের পরিশিষ্ট গ্রন্থ যাহাকে হরিবংশ বলে তাহাতে ৪১ অধ্যায়ে দেখিতে পান যাতুকর্ণ শিষ্য পারপর্য্য অষ্টাবিশংতি দ্বাপর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি বেদান্তসূত্র প্রণেতা। এই পারপর্য্য বিষ্ণুপুরাণের বক্তা পরাশরের পুত্র বটেন। তাহাতে ঋগ্বেদ উক্ত ব্রহ্মা হইতে চতুর্থ পরাশর যিনি ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টাও বটেন তিনি অন্ততঃ সত্যযুগের লোক। এই পারপর্য্য কলিকালের লোক, সুতরাং উক্ত বেদান্ত সূক্ত পারাশর্য্য উক্ত পরাশরের পুত্র নহে। বিশেষতঃ অন্য সমস্ত সূক্ত ও দর্শনশাস্ত্র সকল রচিত হইয়া প্রকাশিত হইবার পর উত্তর মীমাংসা প্রণেতা ঐ সকল সূত্র ও দর্শনের মতবাদ খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং তিনি সূত্রকারগণের সকলের পরবর্ত্তী।

এইসব সূত্র ও দর্শনের খণ্ডন জন্য ব্রাহ্মণগণ ব্যতিব্যস্ত থাকায় ব্যবহারিক সত্তায় স্থিত জনগণের শিক্ষার ক্রটী ঘটে। জনগণের শিক্ষার ব্যাঘাত দুর করার জন্য মহাবীর ও বুদ্ধদেব জনগণের প্রাকৃত ভাষায় ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রচার করেন। প্রাকৃত ভাষায় প্রচারের জন্য উহা অল্প সময়ের মধ্যে ভারত ব্যাপী হইয়া যায়। মহাত্মা কুমারিল ভট্ট ও ভগবান শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক। সুতরাং প্রায় (১২৫০) বারশত বর্ষকাল বৌদ্ধগণের উদ্ভব ও পতনের সময় বলিতে হয়। কুমারিল ভট্ট ও ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রচারে ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম লোপ পায়। অনেকের ধারণা বেদান্ত দর্শন শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ মাত্র। এইজন্য ইহাকে সাঙ্খ্য দর্শন বলিয়া অভিহিত করেন। অদ্বৈতবাদ ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্ত ও দশম মণ্ডলের ১২৯ প্রভৃতি সূক্ত হইতে গৃহীত। শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধ যুগের ও পূর্ব্বকালে বেদান্ত সূক্ত রচিত ও গঠিত হইয়াছিল জানা যায়। শঙ্করাচার্য্য সূত্রকার নহেন। সূত্রের ভাষ্যকার বটে। যেমন প্রতিবিম্ব বিম্বের অনুকরণ মাত্র করে। একচুলও অধিক করিতে পারেন না, তেমনি ভাষ্যকার বেদান্ত গ্রন্থের যাহা লিপীকৃত আছে, তাহার সরলভাবে বিবৃত করা ব্যতীত একচুলও অধিক কিছু করেন না। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ বিনিসৃত গীতা বাক্যকে স্মৃতি প্রস্থান বলিয়া প্রচার করায় গীতা যুগধর্ম্মের পুস্তক হইয়াছে। এইরূপে ভগবান শঙ্করাচার্য দশখানি উপনিষদ, বেদান্ত সূত্র ও গীতার প্রচারক মাত্র। কেহ কেহ শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদী বলেন। ইহা তাঁহাদের অল্প জ্ঞানের পরিচায়ক। ঋগ্বেদে আসুরী মায়া (আসুরী মায়া) ও দেবী মায়া (বিষ্ণু মায়া, ঐন্দ্রী মায়া বা শৈবী মায়া) বলে। সেই মায়া-ভেদ প্রকাশ করিয়া মায়ার সম্ভব অসম্ভব বলিয়াছেন অর্থাৎ মায়াবাদী বলা চপলতা মাত্র। বেদের জ্ঞান না থাকায় এইরূপ ঘটিয়াছে। তাহারা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত "বেদ বাদরতা পার্থ নান্যদ স্তুতিবাদিনঃ" দলভুক্ত বটেন। বর্ত্তমান যুগে Dr Ainstin দুরত্ব পরিমাপে Space (দেশ) চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন। Time Space এক শব্দ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, তাহার কারণ Newton এর Absolute of Space স্বীকারে মাধ্যাকর্ষণের বিষয়ক নিয়মাবলি স্থলে Gravitation Field ও Electro magnetic field কল্পনায় Space ও Absolate গ্রহণ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। তিনি Time দ্বারাই তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যখন Arcturns নামক সূর্য্য, আমাদের সূর্য্য হইতে শতাধিক গুণ বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট এবং আমাদের সূর্য্যকে ষষ্ঠ শ্রেণীর আলো প্রদাতা

করিয়া Sirns ও Arctums প্রভৃতিকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত আলো দাতা করিয়াছেন। এই Arctums হইতে যে আলো বহির্গত হয় তাহা ৩৮ বর্ষ পরে এই পৃথিবীর দ্রষ্টাগণের নেত্রগোচর হয়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,২৮৪ মাইল গমন করে। এইরূপ দ্রুতবেগে গমন করিয়া এক বৎসরে যত মাইল হয় তাহাই এক Standard Time এইরকম ৩৮ Standard Timeএ আমরা Arcturnsএর আলো গ্রহণ করি। মাইল না বলিয়া অর্থাৎ মাইল দেশাত্মক শব্দ তৎস্থলে এত মিনিটের রাস্তা বলা নিয়ম হইয়াছে।

সময় নির্ণয়ের জন্ম প্রাচীনকালে একটি ঘটের নিচে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তাহাতে সূত্র প্রবেশ করাইয়া জল ঢালিয়া ঘটটি জলে পূর্ণ করতঃ আর একটি ঘটের উপর রাখিত। উপরের ঘটের জল নিশ্বেশিতঃ রূপে নিচের ঘটে পতিত হইলে এক প্রহর হইল মনে করিত। তৎপর ডম্বুরাকার একটী পাত্রে মোটা বালু রাখিত, সেই উপরের বালু নিচে পতিত হইলে একঘণ্টা হইত। এইরূপ বালুঘড়ী থানাতে রাখা হইত। একঘণ্টা পর উল্টাইয়া দিত। তৎপর বৃক্ষাদি বিহীন অঙ্গনে একটী গোলাকার বৃত্ত অঙ্কন করিয়া তাহার কেন্দ্রমধ্যে একটি দ্বিহস্ত পরিমিত কাঠি বসাইয়া দিত। এ কাঠির ছায়াদৃষ্টে সময় নির্ণীত হইত। রাত্রিতে বিশেষ বিশেষ গ্রহ নক্ষত্র দৃষ্টে কাল নির্ধারিত হইত। এই সূর্য্যঘড়ী কালে Clock এ পরিণত হইয়াছে। এই যে সময় নির্ণয় ব্যাপারটি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে সময় তিন প্রকার বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ। কঠ উপনিষদে বলে "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্র অস্মাৎ কৃতা কৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্য ভব্যাচ্য ভব্যাচ্য যৎ তৎ পশ্যতি যতবদঃ, ইহাতে একটি ত্রিকালাতিত অবস্থায় আমাদিগকে উপনীত করে। বর্ত্তমানে যে সব watch ব্যবহৃত হয় তাহাতে একটি বৃহৎ আয়তন ঘণ্টার কাঁটা। একটি মিনিটের কাঁটা ১২টী প্রকোষ্ঠ ভ্রমণ করে। ঐ কাঁটাদ্বয়ের বন্ধন স্থানের নিম্নে একটি ক্ষুদ্র গোলায়তন বৃত্ত অঙ্কিত থাকে। তাহাতে ৬০টি দাগ থাকে। ক্ষুদ্র একটি কাঁটা ঐ ৬০ দাগ অনবরতঃ পরিভ্রমণ করে। ঐ কাটাটি যে দাগের উপর এখন দেখা গেল তাহার বামে স্থিত রেখাগুলি পার হইয়া এাটার্টি আসিয়াছে, উহা ভূতকালের অন্তর্গত। ঐ কাঁটাটির দক্ষিণ দিকে যে দাগগুলি আছে তাহা ঐ কাঁটা এখন ভ্রমণ করিবে উহা ভবিষ্যত অন্তরগত। সুতরাং কাঁটাটি যে দাগের উপর আছে তাহা ভূত ও ভবিষ্যতের সীমারেখা বলিতেই হইবে। কাঁটাটি যতটুকু সময় এবং দাগের উপর থাকে বলিয়া মনে হয়, তাহাই বর্ত্তমান। কাঁটাটি স্থির না থাকায় বর্ত্তমান দাঁড়ায় না। ভবিষ্যত ও ভূত কালের চুলের মুঠি কেহ ধারণ করিতে পারে না। এতদ উভয়ের সীমা রেখারূপ বর্ত্তমান কতটুকু। কেহ বলেন যদি কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান শব্দটী উচ্চারণ করিতে যায় প্রথম "ব" জিহ্বা হইতে নির্গত হইবেই, উহা অতীতের অন্তভুক্ত হইয়া পড়ে "র্ত্ত" তখনও ভবিষ্যতের কোলে শয়ান আছে। "ব" উচ্চারণ করিতে যদি Heart fail করে তবে "র্ত্ত" আর আসিল না। বর্ত্তমান কতক্ষণ time ? বর্ত্তমানকে ধরিতে না পারায় কাল থাকা বলা চলে কি ? সদাই কালাতীত ;

সারাৎসার

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

এক পাগলের মুখে বুলি শুধু এই,
'ছাই ভস্ম—সার কথা, আর কিছু নেই।'
"এ বিশাল বট তরু শুকাইয়া যাবে,
এ সুন্দর অট্টালিকা মাটিতে মিশাবে।
এই মনোহর নর, এ সুন্দর দেহ,
একদিন এরে দেখিবেনা কেহ।
ওই চন্দ্রাননা নারী, কি সুন্দর আঁখি,
চিতা বক্ষে পুড়ে ছাই, রবেনাক বাঁকি।
পথ বেয়ে যায় ওই পথিকের দল,
পদ্ম পত্রে জল যেন তরল চঞ্চল।
ওই পশু, ওই পাখী, দীর্ঘ রাজপথ,
কোথায় মিলায় যাবে ক্ষীণ ছায়াবৎ।
এ আকাশ, এ বাতাস, নীল সীমাহীন,
একদিন হয়ে যাবে কোথায় বিলীন।
সৈন্যদের সিংহনাদ, কামান-গর্জন।
নূতন আয়ুধ-তৃণ, যুদ্ধ আয়োজন।
সব শুদ্ধ হয়ে যাবে। পুড়ে হবে ছাই,
হিংসা দ্বেষ, শক্তি-দম্ভ—সকল বালাই।
এই আছে, এই নাই, জগতের রীতি,
সুধু জেগে রয় হেথা ভগবৎ প্রীতি।"

পাগলেরে নমঃ করি বলি বারবার,
তুমি শুনাইলে মোরে কথা সারাৎসার।



যবনিকা

তপোবিজয় ঘোষ

লোকটাকে চট করে চিনতে পারল না অলকা।

কিন্তু সে জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না মোটেই। দশ বছর আগের হারিয়ে যাওয়া একটা স্মৃতি, আর স্মৃতি-ঘেঁষা কয়েকটা টুকরো টুকরো ঘটনা—আজ যদি নেহাৎ না আসে তার মনে, চেষ্টা করেও কিছুতেই মনে না করতে পারে অলকা, বিকেলের ঘুম-ঘুম পাণ্ডুর আলোকে ওই লেকের পশ্চিম কোণে বসা লোকটাকে একান্ত অপরিচিত বলে মনে হয়—তবে তার সবটুকু দোষ অলকার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া কোন মতেই ঠিক নয়। বিশেষ করে দশ বছর আগে অলকার যে বয়স ছিল, সেটা কোন কিছু ধরে রাখার মত মোটেই নয়—সবটুকুই প্রায় এড়িয়ে এবং ছাড়িয়ে যাবার। বলতে গেলে অলকার সে বয়সটা জাগরণের দিন, নিয়ম বন্ধনের নয়। আজকের মধু-যৌবনা লাস্যময়ী অলকা সেদিনের এক নগণ্য স্কুলের শাড়ি ছুঁই-ছুঁই বয়সের ছাত্রী মাত্র।

স্কুলের গাড়িতে সেই ডাগর-চোখ মিষ্টি মেয়েটি নিয়মিত আসা যাওয়া করে বই-পত্র খাতা হাতে। নিতান্তই লক্ষ্মীমতী নিরীহ ভাবসাব। গভীরতা আছে কিন্তু চাঞ্চল্য নেই। নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে ভরিয়ে রাখতেই তখন তার ষোলো আনা আনন্দ। সেই অলকা।

শ্যামাকান্তবাবুর কথা।

অলকার ডাকসাইটে বাবা শ্যামাকান্ত নিজেও একজন জাঁদরেল স্কুল মাষ্টার। ঘরে-বাইরে তার হাঁক ডাকে সবাই তটস্থ। মেয়ের বয়োবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা মাত্রই তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছেন পুরো মাত্রায়। স্ত্রী আশালতাকে ডেকে ফ্রয়েড্ এলিস আউড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন: এই বয়সটা তেমন সুবিধের নয় মেয়েদের। সঙ্গদোষে মতি-ভ্রমের সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে। অতএব মেয়ের বাইরে বেরুনো, দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদি সব বন্ধ করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সকাল সন্ধ্যায় জপ করানোর মত স্ত্রীকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে নিজের দলে টেনে নিলেন শ্যামাকান্ত! আর এর ফলশ্রুতি হিসাবে অর্থাৎ বাপের শাসনে এবং মায়ের সতর্কতায় একেবারে একটি গোবেচারা নিরীহ ভালো মেয়ে হয়ে বড় হয়ে উঠছিল অলকা। সকালের সূর্য উঠা আর বিকেলের সূর্য ডোবা দেখে দেখে উপরের নীলাভ আকাশ আর নীচের অপরিসর উঠোনটুকুর সোঁদাগন্ধী ঘ্রাণ টেনে টেনে, এমনি অবাক বিস্ময়ের ঘোরে, জিজ্ঞাসু চোখের মুগ্ধতায় ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরল অলকা।

আর কি আশ্চর্য, শাড়ি ধরার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ মাটির রঙটা বেমালুম যেন পাল্টে গেল তার কাছে। সকালের অতবড় লাল সূর্যটা তাকে আর অবাক করতে পারল না, বরং কেমন যেন একটা বিমনা আবেশময়তায় ডুবিয়ে দিল তার অস্ফুরিত চেতনাটাকে। বিকেলের রক্তরাগ আলপনা তাকে কোন এক অজানা অধরা জগতের স্বাদ-ঘ্রাণ দিয়ে গেল। আকাশ ছেড়ে এবার পুরোপুরি তাকাল সে মাটির দিকে।

আর এই নিয়েই যত কাণ্ড।

শ্যামাকান্তবাবু একদিন স্কুল থেকে ফিরেই মারমুখী হয়ে উঠলেন। অলকা নামে একটি ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা কিশোরীকে চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। স্ত্রী আশালতা অবাক হয়ে ডুকরে উঠলেন:

ওকি, অমন করছ কেন হঠাৎ?

শ্যামাকান্ত গর্জে উঠে বললেন: হারামজাদীকে আমি খুন করব!

অলকা কেঁদে চোখের জলে বুক ভিজিয়ে বলল: তুমি বিশ্বাস কর বাবা, আমি ওসব কিচ্ছু দেখিনি!

ঘটনাটা সংক্ষেপে মাত্র এইটুকু : স্কুল থেকে ফিরে গা-হাত-পা ধুয়ে চুল বেঁধে জানালার কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অলকা, সে নিজে কিছুই লক্ষ্য করে নি। ইতিমধ্যে সামনের হলুদ রঙা প্রকাণ্ড বাড়িটার দোতালার একটি জানালা খুলেছে—খোলা জানালার রোমাঞ্চে একটি কলেজে-পড়া সুকুমারকান্তি পুরুষ-মুখের ছায়া পড়েছে; সে ছায়া সূর্যমুখার ব্যাকুলতায় কেমন অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে একতলা বাড়ির এই কৃষ্ণকলির সৌন্দর্যটির দিকে এবং চেয়ে চেয়ে দেখে দেখে কখন ক্রমশ ছটফটে হয়ে উঠেছে; সত্যি কথা বলতে এসব কিছুই লক্ষ্য করেনি অলকা। সে তখন সামনের পথটুকুর দিকে চেয়ে ছেলেদের মার্বেল খেলা দেখতে তন্ময়।

কিন্তু সে না দেখলে কি হবে, দুর্বাসার দ্বিতীয় সংস্করণ শ্যামাকান্তবাবুর সন্ধানী চোখ সমস্ত কিছুই দেখে ফেলেছে। পাশাপাশি এ দুটো বাড়ির ওই দুটো জানালা যে তাঁর এতদিনের যত্নসিদ্ধ সংস্কারের ভিত্তিমূলে ভাঙ্গনের হাত প্রসারিত করতে উদ্যত হয়েছে—ভবিষ্যৎদর্শী শ্যামাকান্তবাবু তা যেন সুস্পষ্ট দেখতে পেয়ে গিয়েছেন এবং দেখা মাত্র স্থান-কাল-রুচি-শিক্ষার জ্ঞান হারিয়ে মারমূর্তিতে আক্রমণ করেছেন ভাঙ্গনের প্রসারিত একটি কিশোরী হাতকে। সেইদিন থেকেই মেয়ের উপর বিশ্বাস হারালেন শ্যামাকান্ত। কঠোর স্বরে হুকুম জারি করলেন : ও জানালা আর খোলা চলবে না। স্নানের জন্য মাঝে মধ্যে কল থেকে জল আনত অলকা, তাও বন্ধ এবার থেকে। সেই সঙ্গে স্কুলটাও ছাড়িয়ে দেবেন কিনা ভাবছিলেন, শেষে কি মনে করে অতদূর আর এগুলেন না শ্যামাকান্ত। রাশ টেনে নিয়ে থেমে পড়লেন আচমকা।

ইতিহাস সূচনা হ'ল এখান থেকেই।

যে বয়সটা সবকিছু ভাঙ্গে আর ভাঙ্গে, কেবলই বাধা নিষেধের ভ্রূকুটি, শাসন তর্জনের অহমিকা, বর্ষণ গর্জনের কাঠিন্যকে ভেঙ্গে তছনছ করে—সেটা কৈশোরও নয় যৌবনও নয়, দুয়ের সন্ধিক্ষণ। অলকার বয়সটাও তখন ফ্রক-ছাড়া শাড়ি-পরা সন্ধিক্ষণের দোলায় দোলায়িত। ওই নিরীহ নির্জীব জানালা দুটো শেষ পর্যন্ত কোন বিপত্তিই হয়ত ঘটাত না, কিন্তু শ্যামাকান্ত নিজেই, বলা যায়, খাল কেটে কুমীর আনলেন ঘরে। কাজেই সন্ধিক্ষণের অস্থিরতা স্বাভাবিক নিয়মে নিজেই তার ইতিহাস রচনা সুরু করল।

বাপের চোখ মায়ের চোখ এড়িয়ে বন্ধ জানালা আবার খুলল। এ পাশের এবং ও পাশের—দুটোই। দুটোতেই দুটি তৃষ্ণার ছায়া ভাসল। কাঁপল দুলল হাসল। এ পারের কৃষ্ণকলি আকাশ মাটির-স্পর্শ-মাখা ও পারের সূর্যমুখী যৌবনের চোখে চোখ রেখে আর ভুরু কাঁপিয়ে আর ঠোঁট ভেংচিয়ে, ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ করল।

আবার শ্যামাকান্তর কথা।

স্কুল ফেরৎ না-সাবালিকা, না-নাবালিকা মেয়ের বই-পত্র ঘাঁটা ইদানিং নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শ্যামাকান্তবাবুর। জানালা পর্যন্ত এগিয়ে তার সদা-সতর্ক পিতৃপ্রাণের কর্তব্য রুদ্ধগতি হয় নি। এ খবর অলকা জানিত না। যেদিন জানল সেদিন ইতিহাসের বড় দুর্যোগ ঘন রাত্রি।

শ্যামাকান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেন চিঠিখানা। সুরু থেকে শেষ, প্রিয়তমাসু থেকে সোমনাথ পর্যন্ত। একবার দুবার তিনবার পড়লেন। শেষে সাতবারের বার মেজাজ ও তার সপ্তমে উঠল। হাত নিসপিসিয়ে আর পা টিপে টিপে তিনি এসে হাজির হলেন অলকার পড়ার ঘরে।

অসময়ে জানালা বন্ধ। অলকা শুধু খুঁজছিল। বইয়ের ভাঁজে খাতার পাতায়, আলমারিতে টেবিলে ড্রয়ারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা কিছু খুঁজছিল সে। ঘরে ঢুকে শ্যামা-কান্তবাবু অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায় বলিলেন : তুমি যেটা খুঁজছ, সেটা আমার হাতেই অলকা!

অলকা, ছোট নরম-ভিরু একটা পাখির মত যার এতটুকু প্রাণ, চমকে উঠল যতটা কেঁপে উঠল তার চেয়েও বেশী। কিন্তু আশ্চর্য, শ্যামাকান্তবাবু তেমন কিছুই করলেন না। না মারধোর না কিছু ধমকধামক। শুধু পাথরের মত ঠাণ্ডা জমাট মুখ নিয়ে আরো কয়েক পা এগিয়ে এলেন। এগিয়ে এসে নীল কাগজের রোমাঞ্চটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বললেন : যত্ন করে রেখে দাও, আমার মৃত্যুর পর কাজে লাগিও!

একটু থেমে, আরো একটু গম্ভীর হয়ে, আরও একটু কঠিন হয়ে ফের বললেন : কি বলছ, ওই একটা কাগজ

আমার মুখাগ্নির পক্ষে যথেষ্ট নয়? আরো কিছু দরকার? বেশ তো আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর তাহলে!.

এতক্ষণে ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল অলকা, আর সে কিছুতেই পারল না নিজেকে ধরে রাখতে। ঠোঁট কামড়ে নিশ্বাস বন্ধ করে—কিছুতেই না। শ্যামাকান্তবাবু যদি এমনি বরফ ঠাণ্ডা কথাগুলোর পরিবর্তে অন্য কিছু করতেন সেদিনের মত চুলে ধরে দুম দুমিয়ে কয়েকটা চড়চাপড় বসিয়ে দিতেন ওর নরম পিঠটায় অথবা চোখ রাঙিয়ে হাত পা ছুঁড়ে বিষম যা হোক একটা কাণ্ড বাঁধাতেন—তাহলে আজ আর কিছুতেই কাঁদত না অলকা। কিন্তু সে এমনটি সে আদপেই আশা করে নি। পিতৃদেবের নিরেট লোহার মত ওই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা ভাবটাই তাকে বিমূঢ় করে কাঁদিয়ে ছাড়ল।

এরপর অলকা নিজেই সরে এল দুই জানালার ইতিহাসের আঁচল থেকে। যে বয়সটা বাধা ঠেলে ঠেলে আর বাধা ভেঙ্গে ভেঙ্গে অপ্রয়োজনে রূঢ় হয়ে উঠেছিল; আক্রমণের নিষ্ঠুরতা থেকে আচমকা রেহাই পেয়ে সেটা কেমন যেন মিইয়ে গেল। নতুনতর আর কিছু করে আঘাতের-শাসনের অহমিকাকে ভাঙ্গবার অবলম্বন নেই বলেই—নিজেই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। আর তারপর থেকে ও পাশের জানালার সূর্যমুখী চোখ জোড়া এ পাশের একটি মধুমতী কৃষ্ণকাল মুখের আশায় চেয়ে চেয়ে আর চেয়ে চেয়ে কেবলই হতাশ হল। আর, সেই হতাশাই ক্রমে ক্রমে উন্মুখ পিপাসার্ত মনের সকল সুখময়তাকে তিক্ত ক্ষতাক্ত করে অবশেষে নির্বাণ লাভ করল. শ্যামাকান্তবাবুও এই সময় দেখে শুনে নতুন একটা বাড়িতে উঠে এলেন—ও পাশের সূর্যমুখী জানালাটার চেয়ে যেটা অনেকখানি দূরে। প্রায় নাগালের বাইরে।

শুধু মাত্র এইটুকু ঘটনা। দশ বছরের অথৈ সমুদ্র তলে নির্বাসিত অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য একটা দুর্ঘটনা। এমনি একটা বাল্য স্মৃতির জ্বালাকে বুকে ধরে বেড়াবে আজকের অলকা বসু তেমন পাত্রী মোটেই নয়। আর নিজের স্মৃতিশক্তি যে বড় দুর্বল এ কথা সে বরাবরই জানে। সূর্যমুখী জানালার একটি তৃষ্ণাতুর মুখ তো দূরের কথা, কবে যে সে স্কুলের সীমানা ডিঙিয়ে, কলেজের ছায়া মাড়িয়ে এই ছাব্বিশের কোঠায় পা দিয়েছে—পা দিয়ে রূপে গর্বে লাস্যে কটাক্ষে মৌচাকের মত ঝলমলে হয়ে উঠেছে—তাও আজ ভাল করে মনে করতে পারে না অলকা। শ্যামাকান্তবাবু মৃত্যুর সময় একমাত্র মেয়েকে ডেকে কি কি যেন বলে গিয়েছিলেন, চাকরীতে ঢুকবার মুখে অলকাই বা কি বুঝিয়ে মায়ের ভয় ভয় ঘরকুনো মনের আগল ভেঙ্গেছিল—এসব একটা কথাও আর ধরে রাখতে পারে নি অলকা। এত দুর্বল এত নির্জীব এত ভঙ্গুর তার স্মৃতিশক্তিটা। অলকা তাই চট করে চিনতে পারল না লোকটাকে।

এবার সোমনাথের কথা।

বালিগঞ্জের ঢেউ ঢেউ লেকটার পাশে, একটা কি যেন গাছের ছায়ায়, ছায়া জড়ানো ঘাসের গালিচায় পা ছড়িয়ে চুপচাপ শান্তশিষ্ট হয়ে বসেছিল সোমনাথ। চশমার খাপে ঢাকা তার চোখদুটো আর সূর্যমুখীর উপমেয় নয়—বরং বলা চলে অনির্দেশ্য অর্থহীনতার দুটো এলো মেলো উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। সে চোখ জল দেখছিল, জলের ঢেউ দেখছিল, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া নৌকা কটা এবং নৌকার সৌখীন আরোহী কজনকে দেখছিল। অথচ সব মিলিয়ে সব জড়িয়ে কিছুই দেখছিল না।

এই দেখতে দেখতে এবং না দেখতে দেখতে আচমকা তার চোখ পড়ল অলকার উপর।

বিকেলের পাণ্ডুর আলোক গায়ে মেখে, চুলেতে শাড়িতে জড়িয়ে, সুন্দর মিষ্টি এক স্তবক অগোছালো ফুলের মত পা ছড়িয়ে—ওই যে ও পাশের ঘাসের বিছানায় বসে আছে যে মেয়েটি, সে যে দশবছর আগে হারিয়ে যাওয়া একটি স্মৃতির ভগ্নাংশ মাত্র, তা চিনে নিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হল না সোমনাথের। কারণ, স্মৃতিশক্তি তার অত্যন্ত প্রখর এবং দশ বছর আগের সেই ব্যর্থ ইতিহাসটী সম্পর্কে সে এখনো পুরোমাত্রায় সচেতন।

একটা সিগারেট ধরাল সে ঠোঁট কামড়ে। ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আর ধোঁয়ার রিঙ তৈরী করতে করতে একমুহূর্ত কি যেন ভাবল; তারপর জ্বলন্ত সিগারেটটা সবুজ ঘাসের বুকে প্রচণ্ড একটা আক্রোশে ছুঁড়ে দিয়ে সটান উঠে দাঁড়াল সোমনাথ।

এবার অলকা আর সোমনাথ উভয়ের কথা।

সোমনাথ বলল: আশা করি চিনতে পারছ?

অলকা লজ্জিত ভঙ্গিমায় রক্তিম হয়ে উঠল ঃ পারছিলাম না, এতক্ষণে মনে পড়ছে !

সোমনাথ হাসল ঃ আমার ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন তাহলে !

—এবং আমারও ! অলকা ছেলে মানুষের মত খানিকটা অনাড়ম্বর উচ্ছ্বাস জুড়ল ঃ কতদিন পরে আবার দেখা, ইস কতদিন !

আজকাল কি করছ সোমনাথদা ?

—আমি ? সোমনাথ চোখ দুটো ছোট ছোট করল ঃ বাবা তাঁর বন্ধুদের বলেন, ডাক্তারি !

—তার মানে ? অলকা একটা হোঁচট খেল যেন ঃ তুমি কি বল ?

—কিছুই না ! আমার বন্ধুরা অবশ্য অনেক কিছুই বলে—

—যেমন ?

—বলে, আমার চেহারাটা খুবই সুন্দর এবং স্মার্ট বলে নাকি আমি এটাকে কাজে লাগাই, নাড়ী ধরার চেয়ে নারী ধরার দিকে, রোগীর চেয়ে নার্সের দিকে আমার নাকি বেশী পক্ষপাতিত্ব ! বলে, যেন সেই পক্ষপাতিত্বের গৌরবে গর্বিত হয়ে অদ্ভুত এক ধরণের হাসল সোমনাথ। অলকার ছেলেমানুষী উচ্ছ্বাসটুকু উবে গেল সেই মুহূর্তে। চোখে মুখে একটা বিকৃতির ছায়া ঘনাল। সারা দেহের ভাঁজে একটা বিরক্তির যন্ত্রণা, আর সারা বুকের পরতে পরতে অসহ্য একটা আঘাতের দাহ দাপাদাপি সুরু করল।

আর সোমনাথ নিঃশব্দে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ঠোঁট টিপে টিপে চোখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। নিজের চরিত্র সম্পর্কে এমন একটা মিথ্যা কথা বলতে বিন্দুমাত্র দুঃখ হচ্ছে না, বরং শুকিয়ে যাওয়া সেই সূর্যমুখীটা রাতের অন্ধকারে কিলবিলিয়ে উঠে যেন হিংস্র আনন্দে মাতাল হয়ে উঠেছে। দশ বৎসর আগের আচমকা একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া জানালার কৃষ্ণকলি মুখের সে হিংস্রতা নিশ্বাস ফেলছে অসম্ভব রূঢ়তায়।

তবু। এত কিছু শোনার পরেও, অলকার মনটা তবুও কিন্তু আস্তে আস্তে খুলে মেলে ধরছিলো নিজেকে। এত বিরক্তি এবং বিকৃতি সত্বেও কেমন যেন একটা অপরিচ্ছন্ন মোহ-ঘোরে নিশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল। সুঠাম সৌন্দর্য্য প্রাচুর্যে টলোমলো ওই স্পর্ধিত যৌবন সোমনাথের চোখে চোখ রেখে—সারাদেহের মাংসল তীক্ষ্ণতায় চোখের মুগ্ধ ছায়া ফেলে—একটু একটু করে নিজেকে প্রসারিত করতে চাইছিল অলকা। এককথায় দশবছর আগের সেই জানালাটিকে আবার খুলতে চাইছিল। ইচ্ছে করছিল আবার নতুন করে অপরূপ করে কৈশোরের সেই উচ্ছৃঙ্খলতাকে যৌবনের মধু রঙে রাঙিয়ে বিলিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে ছাব্বিশের সকল ক্লান্তিকে সর্বশ্রান্ত করে দিতে।

আর বুঝি বা সেইজন্যই আরো একটু ঘন হয়ে এল সে প্রায় গা-ঘেঁসে-বসা সোমনাথের পাশটিতে। নিজেকে নিটোল এবং নমনীয় করে এগিয়ে এল আরও খানিকটা। এবং—।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সোমনাথ উঠে দাঁড়াল সোজা হয়ে।

—আজ উঠলাম তবে।

—সে কি ! অলকার কণ্ঠস্বর নয়, যেন একটা অশরীরীর আর্তনাদে আধখোলা জানালার কপাট দুটো আবার বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

সোমনাথ তেমনি একধরণের রূঢ় কঠিন হেসে বলল ঃ হ্যাঁ, অনেক কাজ ফেলে এসেছি।

—কি কাজ ?

যদিও অবান্তর জিজ্ঞাসা, অনধিকারের ধৃষ্টতা, তবু প্রশ্নটা না করে পারল না অলকা।

সোমনাথ তেমনি নির্বিকার মুখে বলল ঃ সন্ধ্যাবেলায় একটা এ্যাপোয়েন্টমেণ্ট আছে মিস্ দাশগুপ্তের সঙ্গে, মেডিকেল কলেজ থেকে নতুন পাশ করে বেরিয়েছে মেয়েটি, ভেরি সুইট ! আচ্ছা, আবার হয়ত দেখা হবে ! বলে, পায়ে পায়ে হেঁটে, পায়ে পায়ে অবজ্ঞার উত্তপ্ত জ্বালার স্পর্শ রেখে, দাহ আর দাহের যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, সোমনাথ কিনা একখণ্ড পাথরের মত একটা স্মৃতির ভগ্নাংশকে ফেলে রেখে অনায়াসে চলে গেল ! আর সে চলে যাওয়ার পর, অলকা আস্তে আস্তে আকাশের দিকে, আকাশের নিঃসীম নিরবলম্ব শূন্যতা এবং শূন্যতার নির্বাপিতার দিকে চোখ রেখে একখণ্ড পাথরের মতই চুপ করে বসে রইল। বোধ করি এমনি ভাবেই যৌবনের যন্ত্রণা তার কৈশোরের উচ্ছৃঙ্খলতার শোধ নিল।



গান

রাগ—বাহার * ত্রিতাল (মধ্যলয়)

আজি শ্রাবণের গহন রাতে
ঝর ঝর বরিষণ ঝরিতেছে অবিরল
নিদ নাহি আঁখিপাতে।
আকাশের মেঘমালা
বক্ষে বিজুরী জ্বালা,
বিরহী প্রাণ কেন বর্ষণে মাতে ॥

হেথা আসে গন্ধ নীপ-নিকুঞ্জে,
গভীর রাতের মায়া থরে থরে পুঞ্জে।
হৃদয়ের মেলাঘর
কম্পিত থর থর,
উন্মনা মন চলে ঝড়ের সাথে ॥

কথা :—শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্য * সুর ও স্বরলিপি :—শ্রীঅমর সরকার

ণা ধা
আ জি

{ র্সা (র্সা) ণা পা I মা পা জ্ঞা মা I ণা া া ধা I র্সণা র্রর্সা (ণা ধা) }
শ্রা ব ণে র গ হ ন ০ রা ০ ০ ০ তে০ ০০ আ জি
০ ৩ + ২

II জ্ঞা জ্ঞা মা মা I রা রা সা সা I মা মা মা মা I মা ধাপা জ্ঞা া
ঝ র ঝ র ব রি ষ ণ ঝ রি তে ছে অ বি০ র ল

I মার্জ্জা । সর্া র্সা I র্রা র্সা নর্সা র্রর্সা I ণাধা পমা জ্ঞামা পাধা I
নি দ না হি আঁ খি পা০ ০০ ০০ ০০ তে০ ০০

II নর্সা নর্সা ণা ধা II
০০ ০০ আ জি



II মা মা ণা ধা I র্সা র্সা র্সা র্সা I র্জ্ঞা । র্মা র্মা I
আ কা শে র মে ঘ মা লা ব ০ ক্ষে বি

II র্রা র্রা র্সা র্সা I । সা মা মা I মাপা ধপা জ্ঞা মা
জু রি আ লা ০ বির হী প্রা ণ০ ০০ কে ন

ণা । ধা ণা I নর্রা র্রর্সা ণা ধা II
ব র ষ ণে মা০ তে০ আ জি

অন্তরা

সমা মা মা মা I মপা ধাপা জ্ঞা । I ণা পা জ্ঞা মা I রা রা সা সা I
মা মা ণা ধা I র্সা র্সা র্সানা র্রর্সা I জ্ঞা জ্ঞা মা মা I রা । সা । I
গ ভী র রা তে র মা০ য়া০ থ রে থ রে পু ন র্জে ০

II মা মা ণা ধা I র্সা র্সা র্সা । I র্জ্ঞা । মা মা I র্রা র্রা র্সা । I
হৃ দ য়ে র খে লা ঘ র ক ম্ পি ত থ র থ র

II সা মা মা মা I মা পা জ্ঞা মা I না ণা ধাণা র্সা I নর্সা র্রর্সা ণধা ণধা
উ ন্ ম না ম ন চ লে ঝ ড়ে র০ সা থে০ ০০ ০০ আজি



পূজার ছুটিতে

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

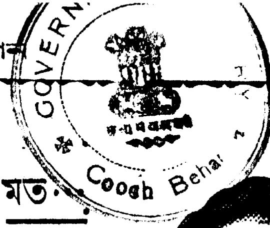
আমি চলেছি।

সত্যই পায়ে হেঁটে, সমস্ত পথটা মাড়িয়ে, মাটির স্পর্শ নিয়ে। মহাশক্তি যে অবরুদ্ধ সেখানে, মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি—যে বীর্য অলঙ্ঘনীয়।

তীর্থযাত্রী আমি নই, কোন মানত আমি করিনি, দেবদ্বিজে বিশ্বাস কম। সপ্তশতী চণ্ডীপাঠ আমার আসে না, গীতার ভূমিকা আমি লিখিনা। যাযাবর ভবঘুরে মন নিয়ে আমার কারবার নয়, পথে পথে ঘুরে বেড়াবার নেশা নেই আমার। নিতান্তই ঘরমুখী প্রাণী, আসক্তির ঘানিতে বাঁধা—নিজের ছোট্ট গণ্ডীতেই আবদ্ধ—তারই মধ্যে ঘোরে আমার প্রাণচক্র, কর্মফলেষু জুষ্টাম্।

তবু কাজে অকাজে মাঝে মাঝে পথে বিপথে এসে দাঁড়াতে হয়। পায়ের নিম্নের দিকে শুধু নয়—উপরের দিকেও তাকাতে হয়, দেখি কখনো দীপ্ত মধ্যাহ্নে তাপসী অগ্নিবর্ণা জ্বলচে, সন্ধ্যায় অনন্তযৌবন আকাশ হাতছানি দিচ্চে, অপরূপা তামসী রাত্রি ঘনান্ধকারে তারার ঘোমটা খসিয়ে লাজরক্ত চোখ দুটি তুলে মিনতি জানাচ্চে, মেঘের ভার নিয়ে বিদ্যুৎবাহিনী এলোকেশী আকাশ কালো করে নামচে। ভোরের আগের যে প্রহরে দেবতাদের ঘুম ভাঙে, সেইক্ষণের আগমনী কোথায়, যা নিয়ে আসবে কালোর বহির্বাস ছিঁড়ে দীপ্ত আলোর মাঙ্গলিককে। বহুযুগের বহুস্মৃতির চরণচিহ্ন আঁকা যে সেখানে, বহু বৃহস্পতির মনন। কালপুরুষ সিরিয়স হোরাসের দল আসর জমায়, অরুন্ধতীরা বাসরে আসে আশীর্ব্বাণীর বরণডালা সাজিয়ে। সব মিলিয়েই চলে জগন্নাথের রথ। তারি তালে তালে দুনিয়ার পদাতিক মানুষের কাব্য হয় গাওয়া, শতযুগান্ত আগে যে মানুষ যাত্রা সুরু করেছিল। ওগো কর্ণধার আমি কি তাদেরই উত্তর পুরুষ। যে আগুনকে তারা লালন করেছিলেন বুকের প্রেম দিয়ে, ধমনীর রক্ত দিয়ে, বাহুর শক্তি দিয়ে, প্রবঞ্চিতের দাহ দিয়ে, হিংসাদ্বেষ কামনা কলহের উপচারে, সে আগুন হারিয়ে গেলো কোথায়, দগ্ধ হলো কারা, কোন হোমশিখা হলো অনলবর্ষী, লুকালো কোথায় তার স্ফুলিঙ্গ। যে মহাস্রোতের ধারাতে পড়েছে শতসহস্র সমিধ, কতো আশাআকাঙ্ক্ষার সমাধি যেখানে রচিত হয়েছে, সেই কালস্রোতে ভেসে আশা মহাবীজের আমিই কি অধস্তন অধিকারী, উত্তরসাধক্। ভয় করে এতো ক্ষুরধার ভার আমি বইবো কি করে, এতো মার সইবো কি করে। যা পেয়েছি তার কতটুকু আমি দিয়ে যেতে পারবো আমার পরবর্তীদের, যা পাইনি তার বিক্ষোভ কতটুকু সঞ্চারিত হবে আমার পুত্রপৌত্র অনাগতদের মধ্যে। এই বিরাট যাত্রাযজ্ঞে আমরা সবাই যে চলেছি, সকলেরই নিমন্ত্রণ—এ পথে কেউ দেয়, কেউ নেয়, কেউ হয় নিষ্ফল, কেউ চলে রুদ্ধ আক্রোশ নিয়ে, কেউ চলে বন্ধ্যা জিজ্ঞাসা নিয়ে, তবু চলে সবাই, ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে, শ্রান্ত জল খায়, আবার চলে, মাতাল পৃথিবীর কণ্ঠ বিলগ্ন হয়ে শোনে যৌবনের গান, যার কোষে কোষে নবসৃষ্টির আশ্লেষ। তারপর একদিন শ্লথবৃন্ত ফলের মত টুপ করে ঝরে মিলিয়ে যায় বুদ্বুদের মত এক সীমাহীনের রহস্য-সাগরে, পরবর্তীরা স্থান পূরণ করে—মিছিলের কিন্তু শেষ হয় না, মঙ্গলঘটের বারি সিঞ্চিত হয়না, বৈরাগীর শান্তি-মন্ত্র পাঠও নয়। আকাশের তারায় তারায় গভীর পথ বেয়ে দেখেছি সেই পূর্বসূরীদের সংকেত, মাটির কাঁপনে কাঁপনে শুনেছি নব আগন্তুকদের আভাস। একদল হয়েছেন লয়, আর একদল পাবে আলয়—এই মহালয়ার মধ্য দিয়েই তিমিরাভিসারের যাত্রা কোন আলোর মালায়, কোন দীপাম্বিতায় শেষ হবে কে জানে। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে আছে ইন্দ্র জন্ম দিলেন সূর্যের, ফিরে পেলেন জ্যোতির সমষ্টি রাত্রির মধ্য থেকে দিনের প্রকাশ ঘটিয়ে।

আমি বলেছি, হোক না বালী থেকে বেলুড়—মনে হচ্ছে অনেক দূর—তারপরে যাবো দক্ষিণেশ্বরে, দক্ষিণপাণির ঘরে। দেখবো কি—ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা খাট, ভগ্ন নহবৎখানা, যেখানে পুরবী আর মেলেনা বিভাসে,



ফুলের মত







আপনার লাবণ্য **রেক্সোনা**

ব্যবহারে ফুটে উঠবে







রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে বিকশিত করে তোলে!

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিমিটেড এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত। RP. 152-X52 BG

বেহাগের সঙ্গে মালকোষের হয় না মিলন। আমি জানি দেবী ভবতারিণী তুমি হাসচো, বলছো—ছি, ছি একমাইল গিয়েই লিখবে লক্ষ মাইলের ইতিহাস, লক্ষ মনকে লক্ষ্যে না পৌছে দিয়ে করবে শুধু অন্ধ পরিক্রমা, ভাষার আড়ম্বরে ঢাকতে চাইবে ভাবের অভাব, মনের দৈন্য চিন্তার আবিলতা, কথার প্যাচের জাঁতাকলে পিষে মারবে যা বলতে চাইচো তাকে। ঘটা করে ঘণ্টাকর্ণ পূজো একেই বলে—এতো শুধু সৌখীন মজদুরী নয়, পুকুরচুরীও নয়, একেবারে ঘটি চুরী।

তবু আমি লিখছি আমার একঘণ্টা পরিক্রমার ইতিহাস। মহাপ্রস্থানের পথ এটা নয় জানি, কী দেখে এলাম বলতে পারিনা, মস্কোর আমেরিকার উনো দুনোর অভিজ্ঞতা এতে নেই, জাপানযাত্রীর পত্র এটা নয়, কোন দ্বীপময় ভারতের দীপ্তিময় সন্ধান দিতে পারিনি, এর মধ্যে নেই ইউরোপ আফ্রিকা বসে, রাজগী বা রাজসী।

একমাইল পথ, একটি মানুষ, একটি মন্দির, একটি মঠ, একটি বীরশিষ্য, একটি মেঘাঙ্গী বিগতাম্বরী কালী কপাল-ভরণা—"অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং" এই নিয়েই আমার রূপকথা। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে আসা রাজার ছেলের গল্প নয়, সওদাগর পুত্রের মনবনবিহারিণী কমলে কামিনী এখানে নেই, মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্রের তলোয়ার হয়ে গেছে ভোঁতা, বিহঙ্গম বিহঙ্গমীরা প্রেমের ফাঁদের ধাঁধার উত্তর দেয়না, ভোমরা-ভোমরীদের ভনভনানি গেছে হারিয়ে। সাতমাণিকের জলুষে ভরা সোনার জীয়নকাটি সাতশো হাত নীচে ডুবে গেছে মাটির পদ্ম-মূলে পদ্মাসনার কোলে। মেদিনী করেছেন রথচক্রগ্রাস।

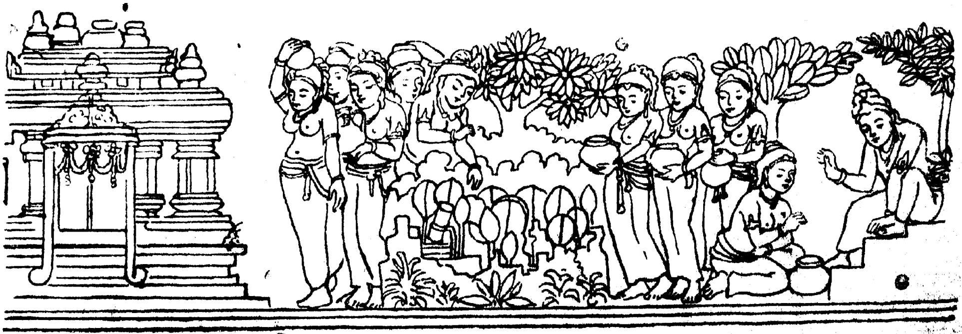
তুমি হাসলে, বললে—হয়েছে যাক্, ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কাজ কেন সামান্য লেখাও হয়না—রসসৃষ্টি ত নয়ই—একে রচনা বলবো না, গোরোচনাসিক্ত বলতে পারি বটে—রম্যত দূরের কথা, তবে কিঞ্চিৎ গব্য পদার্থ আছে বটে। সাহিত্যের অভিজাত মহলে হে অপাংক্তেয় ব্রাত্য তুমি, কর্ণপটাহ বিদ্ধ করে, ইনিয়ে বিনিয়ে ভাব ও ভাষা চুরি করে যে কোনো কাহিনী লেখো না কেন, দুন্দুভি বাজিয়ে তাকে তাড়া করতে কতক্ষণ লাগে—আশা করোনা যে কেউ তা উল্টেপাল্টে দেখবে, পয়সা দিয়ে কিনে পড়বে—যার মূল্য এক কানাকড়িও নয়। হয়তো তাই। তবু আমি চলেছি বেলুড়ে, দক্ষিণেশ্বরে—লিখছি তারই কথা, আমার মনের সিসমোগ্রাফে যে ওঠাপড়ার, ভাঙাগড়ার, দোলা লাগার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হচ্চে তারই কাহিনী। আর বলছি—হে অতীত তুমি কথা বন্ধ করো, আমায় ভাবতে দাও, হে মহাভবিষ্যৎ তুমি শুধু কথা কও—তুমি মুখর হও, প্রখর হও, নখর হও, বিদ্ধ বিদীর্ণ করো যত বাধা। সব পথ এসে মিশে থাক্ শেষে তোমার দুখানি নয়নে।

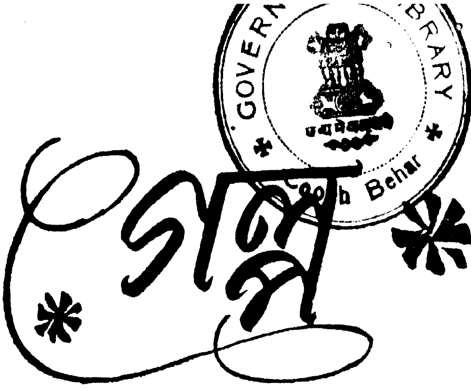
হ্যাঁ সব পথ এসে মিশে গেছে এখানে, সর্বমানবের ক্ষেত্রে, সর্ব উত্তেজনার প্রশান্তিতে, সর্বভাবের সমন্বয়ে—শুধু মুক্তিতে নয়, ভুক্তিতে, যে ভোগ প্রকাশ পায় সেবায়, জীবকে শিবজ্ঞানে, বহুরূপে সম্মুখে তোমার। নিত্য আর লীলা আমি দুটোই লই—নইলে আমার ওজনে কম পড়ে—জল স্থির থাকলেও জল, হেল্লে দুল্লেও জল।

তাইতো আজকের কবির ভাষায় বলি—

হৃদয়ে আমার উদয় যদি না হতে মা

মাটি শুধু মাটি থেকে যেতো হতো না তোমার প্রতিমা।





সমাধান

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ হবারি কথা।

যে অসফল স্বপ্ন এতদিন বাদে সফলতার সার্থকতায় রূপায়িত হল, তার জন্য যে আনন্দ হবে এতো জানা কথাই। অনেক দীর্ঘ অপেক্ষার পর এই পাওয়া, তাই এর স্বাদ এত মধুর, এর অনুভূতি এত তীব্র। সমরেশ আর সুপ্রিয়ার অনেক দিনের অনেক সাধের স্বপ্ন। কিন্তু বিয়ের পর এক এক করে যখন ছটা বছর পার হয়ে গেল, ক্রমে সে স্বপ্নের গায়ে ধরতে লাগল ধোঁয়াটে রঙ। সুপ্রিয়ার সদা-হাস্যময় মুখখানা দিনের পর দিন, ম্লান থেকে হতে লাগল ম্লানতর। ওর উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টি আর ক্লান্ত চরণ যেন রিক্ত শাখার বেদনা বয়ে বেড়াত। সমরেশ সুপ্রিয়ার এই পরিবর্তনের কারণ যে না বুঝত তা নয়। তাই ইদানীং ওর গাম্ভীর্য্য ও অন্যমনস্কতার মাত্রাটা খালি যাচ্ছিল বেড়ে। অথচ ওদের নির্ঝঞ্ঝাট ও সচল সংসারে এমনিতে আনন্দের অভাব থাকার কোন কারণ থাকতে পারে না। তবু কোন্ অদৃশ্য বিধাতার ইঙ্গিতে সেখানে একটা ফাঁকের হয়েছিল সৃষ্টি; আর সেই ফাটলের অদৃশ্য গহ্বরে সকল আনন্দ, দিনের পর দিন, যাচ্ছিল তলিয়ে।

এমনি এক সময় হঠাৎ সেই ফাঁকের ওপর পড়ল পলি-মাটীর স্তর। সুপ্রিয়ার ম্লান মুখ আর ক্লান্ত দেহ মাতৃত্বের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় রাতারাতি গেল বদলে। এক নিমেষে গুমোট অবস্থাটা গেল কেটে। খুশীর রৌদ্র ঝলমল করে উঠল সমরেশ আর সুপ্রিয়ার আকাশে।

হাল্কা মেঘের পরে ভর করে উড়ে চলছিল ওদের দিন-গুলো। আবার যেন বিয়ের প্রথম দিকের আনন্দোচ্ছল দিনগুলো ফিরে এসেছে ওদের জীবনে। কিন্তু এখন আর ওদের দুজনকে নিয়ে কথা নয়। এখন উপলক্ষ এক তৃতীয় প্রাণী—যার আগামী দিনের আসার অপেক্ষায় ওরা একটি একটি করে দিন গুণছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে, দুজনে মুখোমুখী বসে আগামী দিনের নতুন নতুন ছবি গড়তে গড়তে যায় বিভোর হয়ে। এমনি করে প্রতিটী দিন হয় শেষ, আবার ভোর থেকে হয় স্বপ্নরচা সুরু।

দেখতে দেখতে সেই দিনটা এসে গেল। সমরেশ ব্যস্ত হয়ে ছোটে ডাক্তারের বাড়ি। একটু পরেই ডাক্তার, নার্স আর কর্মব্যস্ততায় ছোট বাড়িটা উঠল ভরে। সমরেশের বুকটা দুরুদুরু করছিল। যদি সুপ্রিয়ার কিছু হয়, যদি ও আর না বাঁচে! মনের ভেতর ঐ সর্বনেশে কথাটার জোর করে গলা টিপে ধরে সমরেশ।

বেলা দুটো থেকে রাত্রি প্রথম প্রহর পার করে সুপ্রিয়ার কষ্টের অবসান হল। ঘর থেকে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। সমরেশ তখন ওদিকের বারান্দাটায় পাইচারী করছিল। ছুটে এল। দেখল ডাক্তারের মুখ গম্ভীর। বুকটা উঠল মুচড়ে। কম্পিত গলায় কি একটা বলে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন, তারপর জানালেন, ভয়ের কিছু নেই। ছেলে হয়েছে। প্রসূতি ও সন্তান দুজনেই ভাল আছে। বুক থেকে একটা পাথর নেমে গেল। হাসি-মুখে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দেখল ডাক্তার সে কথা শোনবার জন্যে না দাঁড়িয়ে তেমনি গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

খানিকটা বাদে আস্তে আস্তে ও সুপ্রিয়ার ঘরের দরজাটা ফাঁক করে মুখ বাড়াল। নার্স ওকে দেখতে পেয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। দেখল সুপ্রিয়া পাশ ফিরে শুয়ে আছে, আর কাপড়ের পুঁটলীর ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সদ্য-পৃথিবীর-বুকে-আসা খানিকটা প্রাণময় মাংস-পিণ্ড। ধীর পায়ে ও বিছানার কাছে এগিয়ে যায় একরাশ আনন্দ বুকে ও কৌতূহল চোখে নিয়ে। আশ্চর্য্য! বাচ্চাটা ঠিক যেন [illegible]দের মত রং পেয়েছে। ওরা তো এত ফর্সা

নয়, ওদের ছেলে এত ফর্সা হল কি করে? সুপ্রিয়া বোধ হয় এতটা ধকলের পর, পাশ ফিরে একটু ঘুমুচ্ছে। সমরেশ কাপড়ের পুঁটলিটা ফাঁক করে অদম্য আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে। সংগে সংগে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে ওঠে। এ কার ছেলে?·· মাথার চুল থেকে যার সমস্ত দুধের মত সাদা? সমরেশের সমস্ত হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে এসে আটকে গেল। ও ভুল দেখছে না তো? প্রবল বেগে ও ঠোঁটটা কামড়ে হাতটার ওপর চিমটি কাটল। না···স্বপ্ন নয়, ভুলও নয়···এই হল নগ্ন সত্য। সমরেশ আর সুপ্রিয়ার অনেক আশার স্বপ্ন ঐ হিমানীর তুষার শুভ্রতা নিয়ে সামনে পড়ে। আর সুপ্রিয়া? একটা বেদনার রাজ্য পার হয়ে, আরও তীব্র বেদনার দহন কি পাশ ফিরে সহ্য করছে?

ছুটে পালিয়ে এল সমরেশ নিজের ঘরে। সমস্ত মাথাটায় আগুন ছুটছে, গলাটার কাছে কান্নার ঢেউ এসেছে জমা হয়ে। দ্রুত পায়ে আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়াল। টান মেরে জামা, গেঞ্জি, কাপড় সব ছুঁড়ে ফেলে দিল। তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা চলল সর্বাঙ্গ ধরে। কই? তার তো কোন জায়গায়—কোন দোষ নেই? তবে? সুপ্রিয়ার? সুপ্রিয়ার সকল অঙ্গের ছবি সে মনে মনে চিন্তা করে দেখল। কই না। তবে, তবে, তবে?···

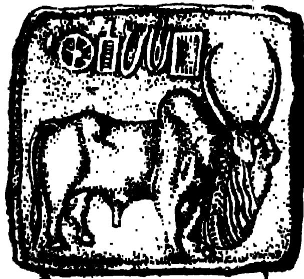
সারা রাত্রি সমরেশ পায়চারী করেছে নিজের ঘরটায়, মাঝে মাঝে চুলগুলো মুঠো করে ধরে অসহায় ভাবে চারিদিকে তাকিয়েছে, চোখ দুটো উঠেছে জ্বালা করে,···কিন্তু তবু তার উত্তর মেলে নি।

তিন দিন সমরেশ কি করে কাটিয়েছে, সে নিজেই জানে না। ও ঘরে নার্স আছে, সেই সুপ্রিয়াদের দেখছে। এ ঘরে তখনও সমরেশ পায়চারী করে চলেছে আর নিজের মনের গহনে, আকাশে বাতাসে হাতড়ে ফিরছে তার তবের উত্তর। অবশেষে তিনদিনের দি[ন] রাত্রি প্রথম প্রহরে সমরেশ সোজা হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল উত্তর না মিলুক, সমাধান সে খুঁজে পেয়েছে।

পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে সুপ্রিয়ার ঘরের সামনে দাঁড়াল।

নার্স তার কাজ শেষ করে পাশের ঘরে বিশ্রা[ম] নিচ্ছে। সমরেশ সুপ্রিয়ার ঘরের দরজায় হাত দিল হাতের আঙুলগুলো ওর বেঁকান সাঁড়াশীর মত এক কঠি[ন] প্রতিজ্ঞায় উদ্যত। চোখ দুটো কি সেই অমায়িক, সদা হাস্যময় সমরেশের?···

নিষ্ঠুর পৈশাচিক উন্মত্ততায় এখন তা রক্তাক্ত। একটা প্রচণ্ড জ্বালা যেন ফুটে বেরুচ্ছে ওর চোখ মুখ থেকে সমরেশ দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে ফেলল। আধো অন্ধকার ঘরে সমরেশ নিশি পাওয়ার মত এগিয়ে যায় কিন্তু আর এগোনো হয় না। বিস্ফারিত চোখে ও সামনে তাকিয়ে থাকে। সুপ্রিয়া পেছন ফিরে বসে পরম আদরে সেই সর্বাঙ্গ শ্বেতী বাচ্চাটাকে বুকে চেপে আছে, আর সে চক চক করে তার বুকের দুধ খাচ্ছে। সমরেশের সর্বাঙ্গ টলে মাথার ভেতর ঝিম ঝিম করে উঠল। এখুনি হয়ত ও অজ্ঞান হয়ে যাবে কিন্তু সুপ্রিয়া ওকে এখনো দেখতে পায় নি—এখনো ও[র] সর্বনাশা মূর্ত্তিটা চোখে পড়ে নি। তার কঠিন শীতল আঙুল গুলোর পেষণী থেকে বাঁচাবার জন্যেই বোধ হয়, সদা জাগ্রত মাতৃহৃদয় বাহু আগলে ওকে পাহারা দিচ্ছে সমরেশ টলতে টলতে পালিয়ে গেল ও ঘর থেকে।





কিশোর জগৎ



কেমন করে বক্তৃতা করতে হয়

উপানন্দ

কেমন করে বক্তৃতা করতে হয়, এটা শুধু জানলেই হবে না, অভ্যাস করতে হবে কেমন করে তোমাদের কথাগুলি উৎকৃষ্ট বক্তৃতায় রূপ নিতে পারে। তোমাদের এক একটি জীবন এক একটা শিল্প বিশেষ। বিশ্বের অদৃশ্য শিল্পী তোমাদের পাঠিয়েছেন তাঁর মন্দিরের এক একটি স্তম্ভ করে, এক সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ধারণ করতে তাঁর মন্দিরের চূড়াকে, তবু তোমরা সকলেই দাঁড়িয়ে থাকবে পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি ব্যক্তিত্বের রূপ নিয়ে আর জীবন শিল্পের সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। এইটাই জাগতিক নিয়ম।

শিল্পকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে গেলে কর্ম্মে চিন্তায়, মননে অভিব্যক্তিতে, ভাবে ও ভাষায় ফুলের মত বিশুদ্ধি রক্ষা করতে হবে। তোমরা যা ভাবো আর ভাবতে শেখো—তাই কথা হয়ে ফুটে ওঠে যাতে আমরা অনুধাবন করতে পারি তোমাদের মনের গতি ও প্রকৃতি। সেই কথাগুলি যখন তোমাদের কল্পনা ও পরিকল্পনার চিত্রগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে, তখন আমরা প্রত্যক্ষ করি তোমাদের শিল্পায়ন। তোমাদের সব কথা বক্তৃতা হ'য়ে ওঠে না, কিন্তু তোমাদের সব বক্তৃতা কথার মত কথা হয়ে উঠতে পারে, এ কথা ভেবে দেখবার চেষ্টা করবে।

যে যুগের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি এ যুগে বক্তৃতার সমাদরই বেশী, তার সর্ব্বপ্রকার প্রচারের বাহনই হচ্ছে বক্তৃতা—এখনকার দিনে কাজের চেয়ে কথাই দ্রুত চলে। কাজের যে সব গলদ থেকে যায় তা কথার আবরণে লোক চক্ষুর অন্তরালে পড়ে থাকে। এ যুগে যে মুখচোরা বক্তা দুরন্তভাবে কথা বলতে শেখেনি আর বক্তৃতা করে লোকের মন ভোলাতে অভ্যস্ত হয়নি, তার স্থান কোনদিন উঁচুতে দেখতে পাওয়া যাবে না। এ জন্যেই তোমাদের কাছে অনুরোধ কৈশোর অবস্থাতেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছেলে মেয়েদের মত উজ্জ্বলভাবে বলতে শেখো, বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে চর্চাকেন্দ্রে, বিতর্ক সভায়, বন্ধুমহলে কিছু কিছু বক্তৃতা করবার অভ্যাস করো—যাতে করে তোমাদের দেশের পূর্ব্বাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমান্য তিলক, নেতাজী সুভাষ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির মত বাগ্মিতায় পৃথিবীতে বিশেষ বরেণ্য স্থান অধিকার করতে পারো।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুললে তোমরা দেখতে পাবে একদা ইংলণ্ডে বার্ক, সেরিডন, ডিজরেলি, গ্লাডষ্টোন, পিট প্রভৃতি বাগ্মী আবির্ভূত হয়ে শুধু স্বজাতির অন্তরে নব নব প্রেরণা সঞ্চার করেন নি, সমগ্র পৃথিবীকে সত্যের আদর্শে ও উদ্ভাসিত করে গেছেন। আমাদের দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে তোমরা দেখতে পাবে নেতাদের বক্তৃতার অমোঘপ্রভাব সমগ্র জাতিকে কিভাবে মুক্তিযজ্ঞে আত্মাহুতি দেবার জন্যে প্রস্তুত করেছিল, দলে দলে মানুষ ভালোমন্দ বিচার না করেই দেশের নেতাদের অনুসরণ করে শাসন শক্তির সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতন ও দণ্ড হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা শুনে আসমুদ্র হিমাচল প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করতে। আজ স্বাধীনতালাভের পরও রাজ্যসভায়, লোকসভায় রাজনৈতিক দ্যূতক্রীড়ায় যারা প্রমত্ত, তাদের চৈতন্য সম্পাদন করবার জন্যে উৎকৃষ্ট বক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক। তা-ছাড়া স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ যখন স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরতন্ত্রে পর্য্যবসিত হয়, শক্তিমদোন্মত্ততা যখন স্বদেশের জীবনী শক্তিকে দুর্ব্বল করে তোলে আর ঐক্যসঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুরা সুযোগ নিয়ে দেশ আক্রমণ করবার চেষ্টা করে—তখন গণশক্তিকে সুদৃঢ় করে দেশকে সর্ব্বপ্রকার বিপন্নতা থেকে ত্রাণ করবার জন্যে এমন সব মানুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয় যাঁদের ওজস্বিনী বক্তৃতায় সমগ্র দেশ ভ্রমসংশোধন করে নিতে পারে, আর শৌর্য্যে-বীর্য্যে আদর্শে মহত্ত্বে মহান জাতিরূপে সমাদৃত হবার পুরোনো পথগুলি খুঁজে নিতে পারে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, মুখবদ্ধ হয়ে থাকাই তার সহজাতধর্ম্ম। ভাব ও বাণীকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে তার যৌথ জীবন। ভগবানের

সৃষ্টির ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের অন্তরে যে সৃষ্টির প্রেরণা বা আবেগ জাগে যে কল্পনা ও পরিকল্পনা তার মনে বিচিত্রিত হয়ে ওঠে, সেগুলি সে ব্যক্ত করে তার মুখে কথার পর কথা সংযোগ করে। আজকের দিনে প্রধানতম বিপ্লব চলেছে মানুষের মনে, তার চিন্তার রাজ্যে, তাই সে বক্তৃতা দিয়েই চিন্তার আন্দোলন উপস্থিত করে সমাজ সংসারে, আর তার সেই সব বক্তৃতা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তোমরা দেখেছ, পুঁথিগত বিদ্যাকে বোধগম্য করবার জন্যে বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে আর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা ও অধ্যাপকরা তোমাদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। গ্রন্থ পাঠের মতই বক্তৃতা শ্রবণও অপরিহার্য্য। প্রাচীনকালে শ্রুতির সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জ্জন করা হোতো। আমাদের দেশে কথকতার মাধ্যমে লোক-শিক্ষা দেওয়া হোতো,—কথকতা ও বক্তৃতারই অনুরূপ।

দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির দূরত্ব, তা অন্তরের ভাব বিনিময়ের দ্বারা অপসারিত হয় বক্তৃতার আনুকূল্যে, শেষে এরই প্রভাবে বিশ্ব মানবের একটা সংসারের আদর্শ গড়ে ওঠে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে।

বক্তৃতার বিষয় বস্তু ঠিক করে নিয়ে বক্তৃতা করতে হয়, আর তা'তে অবান্তর প্রসঙ্গ বা বিষয়-বহির্ভূত কোন কথার সংমিশ্রণ চলতে পারে না। যে সম্বন্ধে বলতে বলা হচ্ছে, মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে সে সম্বন্ধে বলতে হবে সংযতও সুচিন্তিত ভাব ও ভাষায়,নতুবা সে বক্তৃতা হয়ে উঠবে প্রলাপোক্তি —বক্তৃতা নয়। এই শিল্প কৌশলটী আয়ত্ত করতে হোলে ঘরের ভিতর বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন কিছু না কিছু বলবার অভ্যাস করতে হয়। প্রত্যহই মনে মনে ঠিক করে নেবে কি বিষয়ে বক্তৃতা করবে। অভ্যাসের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ার সাফল্য অর্জ্জন করা তোমাদের পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না।

কোথাও কোন বিষয়ে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ পেলে তা প্রত্যাখ্যান করবে না নিজেদের শৈথিল্য প্রকাশ করে। সাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ উপেক্ষা করলে কোনদিনই নেতৃত্ব করবার সুযোগ পাবে না। তোমরা বোধ হয় জানো, ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম মহানায়ক রুশো তাঁর আবেগময়ী ভাষায় যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সে সব বক্তৃতার পুঞ্জীভূত অগ্নিগর্ভ বাণীই সমগ্র ফ্রান্সের গণশক্তিকে অপরাজেয় করে তুলেছিল।

আজ আমাদের দেশে সর্ব্বত্র আবৃত্তি প্রতিযোগিতার দ্বারা ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করা হয়, এর সঙ্গে অন্যান্য দেশের মত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বক্তৃতা প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করা হোলে, ভাবীযুগের জনকজননীরা যে স্বদেশে মহামঙ্গলের দেউল গড়ে তুলতে পারবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কেতাদুরস্তভাবে পাঁচ বছর ধরে কাজ করে যে পরিমাণে সাফল্য হয়েছে, যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠা পাওয়া গেছে বা পরিচিত হওয়া সম্ভব হয়েছে তার বহু গুণ বেশী পাঁচ দশ মিনিট বক্তৃতা করেই—অর্জ্জন করা গেছে—এটা আদৌ মিথ্যা নয়।

আজকের দিনে যখন মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়েকে কোন সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতে দেখি, তখন অত্যন্ত আনন্দলাভ করি এইজন্যে যে এরাই একদিন দেশের সর্ব্বপ্রকার চিন্তার ওপর নেতৃত্ব করে জাতিকে নতুন পথের সন্ধান দেবে। স্বল্প পরিসর সময়ের মধ্যে তোমরা যদি সুন্দরভাবে মনের ভাবগুলি গুছিয়ে নিয়ে বক্তৃতা দিতে পারো আর শ্রোতৃমণ্ডলী তোমাদের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হয়, তা হোলে এটা ধ্রুব সত্য বলে জেনো যে, একদিন তোমরা অদম্য আত্মশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ নিয়ে বহু মানবকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে সমাজসংসারের নানাদিকে। তোমাদের নেতৃত্বই কাম্য হয়ে উঠবে তোমাদের স্বদেশের,—তোমরা বক্তৃতা করো, এটা তোমাদের দেশের আত্মপ্রচারধর্মী অগ্রজাতকেরা ইচ্ছা করেন না বা এ সম্পর্কে, উদাসিক, তাই অন্যান্য দেশের ছেলেমেয়েদের তুলনায় তোমরা পিছিয়ে রয়েছ ; কিন্তু আজকের দিনে পিছিয়ে থাকলে চলবে না, এগিয়ে যেতে হবে। ঋষিরা বলেছেন—চরৈবেতি, এগিয়ে চলো সর্ব্বপ্রকার জীর্ণ সংস্কারকে উচ্ছেদ করে দিয়ে—এইটাই হচ্ছে আমার অভাপ্সা। তোমরা জানো, সঙ্কোচনই মৃত্যু, নিজেরা যতই সঙ্কুচিত হয়ে থাকবে লোক দেখে, আর ভয় পাবে কিছু বলতে গিয়ে, ততই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলবে তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎকে, আর ভবিষ্যৎ ও হয়ে উঠবে তোমাদের প্রতিভার সমাধিক্ষেত্র।

বক্তৃতা করতে করতে অন্তরের ভাবগুলি ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ লাভ করে, আর সেগুলি ভাবের অলঙ্করণে ও ভাষার পারিপাট্যে চিন্তাগ্রাহী হয়। সবাই যে আলঙ্কারিক ভাষায় বা সাহিত্যিকতায় অপূর্ব্ব বক্তৃতা দিতে সক্ষম, একথা ভুলে যাও। যা বলবার তা গুছিয়ে বলতে পারলেই বক্তৃতার উদ্দেশ্য সার্থক হয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে বহু সভাসমিতিতে এমন অনেক বক্তার আবির্ভাব হয় যাঁরা বিষয় বস্তু থেকে দূরে সরে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক ভাষণ দিতে থাকেন, আর আত্মপ্রচারের কৌশল-জাল বিস্তার করে নিজেকে 'কেষ্ট বিষ্টু' প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্য্যন্ত অনেকের বক্তৃতা মশা তাড়ানো গল্প হয়ে ওঠে, বক্তৃতা হয় না। এগুলি আদৌ প্রশংসনীয় নয়—নিজের সম্বন্ধে যেখানে একান্ত বলার প্রয়োজন, সেখানে ভাববাচ্যে বলাই বিধেয়।

তোমরা বক্তৃতা করবার সময়ে কখন বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তা হোলে উপহাসাস্পদ হবে। বহু জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যখন কিছু বলতে উঠবে তখন মোটেই ভীত হবে না। অবশ্য সর্ব্বপ্রথম সাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা করতে উঠে অনেকে বিষয়বস্তুর সূত্রগুলি হারিয়ে ফেলে আবোল তাবোল কথাও বলেছেন। ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ, লয়েড জর্জ্জ, থিয়োডোর রুজভেল্ট, মুসোলিনি প্রভৃতি ঐতিহাসিক পুরুষগণের অবস্থা ঐরূপ হয়েছিল। পূর্ব্ব থেকে সাহস সঞ্চয় করে সভায় এসে বক্তৃতা দিতে হয়। প্রথমে গৃহে, পরে বন্ধুদের কাছে কিছু ক্ষণ ধরে কোন বিষয় নিয়ে কিছু বলবার অভ্যাস করবে। বক্তৃতা করতে গেলে ভাবুকতা ও গ্রন্থ-অধ্যয়ন বিশেষ প্রয়োজনীয়, এদিকে তোমরা বিশেষ লক্ষ্য দেবে। যে সম্পর্কে কিছু বলতে হবে, তা নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করবে।

এক শ্রেণীর বক্তা আছেন তাঁদের বক্তৃতা সারগর্ভ হয় না—চলন

…হয়ে ওঠে। তাঁদের বক্তৃতার ভেতর দেখতে পাবে কতকগুলি ছাঁচ …ছে, বিষয়বস্তু মাফিক সেই ছাঁচে ফেলে তাঁরা বক্তৃতা দিয়ে থাকেন; …লে দেখা যায় রবীন্দ্র জয়ন্তীর সময়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে … ছাঁচে বক্তৃতা করেছেন, সেই ছাঁচে ফেলেই বক্তৃতা দিয়েছেন শরৎ-…ন্দ্রের স্মৃতিবার্ষিকীতে—আর বছরের পর বছর ধরে সেই একই কথা পুনরাবৃত্তি করে আসছেন। এগুলি চিন্তার দৈন্য থেকেই সম্ভব হয়েছে, অথচ এঁদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে হয়, তারও পশ্চাতে অনেক কারণ থাকে—সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক। যিনি কোন বক্তৃতা করবার জন্যে প্রস্তুত হোতে পারেন না, তিনি দুচারটী রসিকতা করে বক্তৃতার ভেতর দিয়ে সভায় শোভাবর্দ্ধন করে আসেন। …ইফ্‌টের লেখা থেকে জানতে পারবে কি সুন্দরভাবেই না বলেছেন …দের সম্বন্ধে যাঁরা সাধারণের সম্মুখে পেশাদারী বক্তৃতা করে বেড়ান—আর একই ছাঁচে ঢেলে একই ধরণের বক্তৃতা করে আসেন নানা বিষয়ের ওপর,—সুরসিক সুইফট্ বক্তাদের চরিত্রগুলি আর তাঁদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের পরিচিতি এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। যাহোক মনে ভেবোনা বক্তৃতা দেওয়া শক্ত—শুধু কৌশল ও সাহসের প্রয়োজন। যদি কেউ আঘাত করে …স সময়ে অনর্গল কথা মুখ থেকে বেরোতে থাকে, এটা তো তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ, তাছাড়া রেগে গেলে বাড়ীতেও তোমরা বেশ বক্তৃতা করে থাকো, আর বাইরে এসেই বা পাঁচজনের সম্মুখে কিছু বলতে গিয়ে ভয়ে কাঁপবে কেন? কথা জড়িয়ে যাবে কেন? রাগের …ময় নানারকমের সুর, ভাব ভাষাও রঙ্ চড়িয়ে দিয়ে মুখে কথার …ই ফুটিয়ে তোলো যেমিভাবে, অমিভাবেই রঙ্ চড়িয়ে বলবে জনতার সম্মুখে শান্তসৌম্য রূপ নিয়ে।

এমার্সন বলেছেন—'যে কাজে ভয় পাও, সেই কাজই করবে, তাহোলে ভয়ের মৃত্যুও সম্পূর্ণরূপে সুনিশ্চিত হয়ে উঠবে—।' শ্রোতৃ-মণ্ডলীর ওজন বুঝে বক্তৃতা করবে—অতি সাধারণ শ্রোতার কাছে সাধারণভাবেই বলবে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করলে আসর ফাঁকা হয়ে যাবে, নতুবা হট্টগোলের সৃষ্টি হবে। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পড়ে বা বিশ্বকোষ অভিধান বা বক্তৃতার গ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষ মুখস্থ করে বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করো না, নিজেরা পড়ে শুনে আর চিন্তা করে যা বুঝেছ, যা উপলব্ধি করেছ তাই বলবার চেষ্টা করবে। বক্তৃতার ভেতর ক্রমাগত অপরের কথার উদ্ধৃতি শুধু বিরক্তিরই সৃষ্টি করে না, তোমাদের বক্তব্যকেও গুরুভারাক্রান্ত করে তোলে। …ক কি বলেছেন সে সব কথা যত কম পারো বলবে—তোমরা কি …ক বলতে চাও তাই সুন্দরভাবে বলতে পারলেই ভাষণ মনোজ্ঞ হয়ে উঠবে।

হৃদয় ও মস্তিষ্ককে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ না করলে উৎকৃষ্ট বক্তৃতা হয় না। যে বিষয়ে বক্তৃতা করতে হবে, পূর্ব্ব থেকেই সে বিষয়ে প্রস্তুত …ওয়া দরকার, নতুবা শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে হাস্যাস্পদ হবে। হ্যারি এমার্সন ফসডিক আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা। ইনি বলেন, দশমিনিট বক্তৃতা দিতে হোলে এঁকে প্রস্তুত হোতে হয় দশঘণ্টা ধরে—যেখানে ইনি কুড়িমিনিট বক্তৃতা করেন, সেখানকার ভাষণের জন্যে কুড়িঘণ্টা ধরে বক্তৃতার বিষয় বস্তু নিয়ে ভাবেন ও পড়াশুনা করে প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

ধরো, 'জনসাধারণ কি সৎ?' এই প্রসঙ্গে কোন সভায় তোমাদের বক্তৃতা করতে হবে। এক্ষেত্রে তোমরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করে দেখবে আজকের দিনে জনসাধারণ সৎ কি অসৎ—ট্রেনে, ট্রামে, বাসে দু'বেলাই নানাধরণের মানুষ দেখতে পাও, তাদের সম্বন্ধে তোমাদের কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে, যেখানে বাস করো সেখানে প্রতিবেশীদের সান্নিধ্যে এসে নিশ্চয়ই দেখেছ তাদের স্বরূপ, পল্লীগ্রামে যদি গিয়ে থাকো তাহোলে নিশ্চয়ই দেখেছ পল্লীসমাজ নীতি ও পল্লীসমাজের আচার ও আচরণ,—কিভাবে তারা পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার জন্যে চক্রান্ত করে, পরচর্চ্চা ও পরনিন্দায় অমূল্য মনুষ্য জীবনের অপচয় করে, মিউনিসি-প্যালিটি, ইউনিয়নবোর্ড, স্কুল, কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার প্রভৃতির ওপর দিয়ে রাজনৈতিক জুয়াখেলা করে, সহরেও এমন সব ব্যবসায়ীর কাছে যাবে যারা মানুষকে ধারে মাল দেয়—তাদের কাছ থেকে মন্তব্য শুনতে পাবে যারা ধার নেয় তারা সে ধার শোধ করে কিনা, তাছাড়া যারা জনসাধারণের সঙ্গে নানা প্রয়োজনে মেলামেশা করে, তাদের কাছ থেকেও জেনে নেবে আজকের দিনের মানুষের গতি ও প্রকৃতি—রাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তরে যারা আনাগোনা করে, তাদের কাছ থেকেও জানবার চেষ্টা করবে আজকের দিনে ঘুষ অবাধ গতিতে চলছে কিনা—আর এই ঘুষের বলে অসম্ভবও সম্ভব হচ্ছে কিনা, আইন বে-আইনে পরিণত হচ্ছে কিনা—এইসব তথ্য সংগ্রহ করে একটি সাধারণ পাঠাগারে বসে একঘণ্টা ধরে এমন সব বই পড়ে নেবে যেগুলি তোমাদের বিষয়বস্তুর পক্ষে অনেকটা সাহায্য করতে পারে।

তারপর এমিভাবে তথ্য সংগ্রহ ও চিন্তাধারার আনুকূল্যে যখন বক্তৃতা করতে উঠবে তখন চতুর্দ্দিক থেকে পাবে অযাচিত অজস্র প্রশংসা, আর তোমাদের চিত্তগ্রাহী বক্তৃতা ভাবী নেতৃত্বের পথরচনা করে তোমাদের কণ্ঠে জয়মাল্য দেবে। মনে রেখো, আজকের দিনে যারা জনতাকে খেলার মাঠের ফুটবল মনে করে, তাদের ভবিষ্যৎ তাদের সমাধি রচনার জন্যে সর্ব্বদাই ব্যস্ত হয়ে আছে। কাজেই শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোহরণ না করতে পারলে সব বক্তৃতাই অসার, ফাঁকা হয়ে যায়। বক্তৃতা দিতে দিতে যখন সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হ'য়ে উঠবে, আর তোমাদের কথা আরও কিছুক্ষণ শুনবার জন্যে শ্রোতৃমণ্ডলী আগ্রহ প্রকাশ করবে, তখনই তোমরা বক্তব্যের উপসংহার করবে। তোমাদের মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতার রেশটুকু সবার কানে কিছুক্ষণ ধ্বনিত হবার সুযোগ দিয়ে তোমরা আসন পরিগ্রহ করলে বেশ সুনাম অর্জ্জন করতে পারবে। বিষয়বস্তু উল্লেখযোগ্য না হোলে কখনও দশমিনিটের বেশী বলবার চেষ্টা করা উচিত নয়, তাতে বক্তৃতা

চিত্ত পীড়াদায়ক হয়ে উঠতে পারে, এদিকে লক্ষ্য রেখেই বক্তৃতা দিতে শুরু করবে।

আজ হেমন্তের উৎসব-মুখর দিনে যাঁরা মুখরিত করে তুলছেন নিজেদের কণ্ঠ নানাস্থানের সভামণ্ডপে, প্রীতি সম্মেলনে, সাহিত্য সংস্থায় আর বার্ষিক উৎসবে, তাঁদের বক্তৃতা শুনবার অবকাশ করে নিয়ে এইসব স্থানে উপস্থিত হবে—কিভাবে তাঁরা বক্তৃতা করেন তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অবসর মত বক্তৃতা দেবার অভ্যাস করবে ঘরে বাইরে, তাহোলেই আমার এ বক্তব্যের সার্থকতা হবে। তোমাদের মনকে অস্থির বিদ্রোহী করে পুজোর ছুটিতে ভাঙ্গনের গান গেয়োনা, সৃষ্টির গানই গেয়ে যাবে নিজেদের প্রতিভা দিয়ে, নিজেদের সাধনা দিয়ে, নিজেদের চিন্তা দিয়ে, এই অনুরোধটুকু রইলো আমার তোমাদের সকলের কাছে।

উড়িষ্যার ঘুম পাড়ানি গান

স্বপন বুড়ো

ওরে দুখী ধন দরিদ্র রতন
শুয়ে থাকো সোণামণি
বাগানের মাঝে ভূত জেগে আছে
তারে যে আপদ গণি।
শিখে লেখাপড়া টাকা পাবে বড়া
পালঙ্কে রবে শুয়ে
কত দাস দাসী সেবিবে সে আসি—
জুতো দেবে পা টা ধুয়ে।*

* উড়িষ্যার ঘুম পাড়ানি গান পুরী থেকে সংগ্রহ করে বাংলা কবিতায় অনুবাদ করা হয়েছে।—স্বঃ বুঃ

সংকেত

শ্রীপরেশকুমার দত্ত

মণিমামার মুখে শুনে গল্পটা আমি অবিশ্বাস করিনি; কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। গল্পটা শুনলেই তোমরা হয়ত বলে বসবে—এ হতেই পারেনা, ওইটুকু মেয়ের কখনোই অমন বুদ্ধি হতে পারেনা। অতগুলো পুলিশের সামনে কিছুতেই অমন সাহস হবে না। যাক গল্পটা বলেই ফেলি। সকলে না হলেও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করলেও করতে পারে। আর একান্তই যদি বিশ্বাস না কর আমি অপারগ। গল্পটা মণিমামার কাছে যেমন শুনেছিলুম তেমনই তোমাদের বলছি।

ঝাড়া একঘণ্টা বৃষ্টির পরও যখন থামবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, তখন আমরা তিন ভাইবোনে মিলে মণিমামাকে ঘিরে ধরলুম একটা গল্প বলার জন্য।

আকাশের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশ-বালিশটা কোলের ওপর টেনে নিলেন মণিমামা। বললেন, গল্পটল্প নয়, শোনো আজ একটা সত্যি ঘটনা বলব:—অঞ্জনা রায়চৌধুরীর নাম শুনেছ তোমরা? শোনোনি! ও:, শুনবেই বা কেমন করে। তোমাদের জন্মের আগেই স্বদেশী আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন। উনিশশো একত্রিশে রাজসাহী জেলে আমরা একই সময় জেলে ছিলুম। যেমন প্রাণোচ্ছল তেমনি সরল। ভয় ডর কাকে বলে জীবনে শেখেনি। অথচ তাদের বাড়ীর ইতিহাস শুনলে শিউরে উঠতে হয়। তার বাবা রাজেন্দ্রনাথ মারা গেছেন পুলিশের বেয়নেটের খোঁচায়, কাকা নরেন্দ্রনাথ জীবন উৎসর্গ করেছেন ফাঁসি কাঠে। ওকালতি করে প্রচুর পসার করেছিলেন রাজেন্দ্রনাথ। কিন্তু কিছুই রেখে যেতে পারেননি। শুধু জীবনটাই নয়, যথাসর্বস্ব ঢেলে দিয়ে গেছেন দেশের জন্য। তাই তাঁর মৃত্যুর পর অঞ্জনাদের সংসারে দারিদ্র্যের সীমা রইল না। ছেলে রঞ্জন আর মেয়ে অঞ্জনাকে নিয়ে বিধবা মা জ্যোতির্ময়ী অকুল পাথারে পড়লেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও ভোলেননি তাঁর স্বামী ও দেবরের অসমাপ্ত কথা। ভোলেননি পরাধীনতার কি দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তাঁরা। কিন্তু চরম দুঃখের দিনেও কারুর সাহায্য প্রার্থনা করেননি তিনি। নিদারুণ সঙ্কটের দিনেও হারিয়ে যায়নি তাঁর মুখের দৃপ্ত হাসিটুকু। সারাদিন চরকায় সুতো কেটে পাঠিয়েছেন হাটে বাজারে। নিজের হাতে শাক-সব্জির বাগান করেছেন বাড়ীর গায়ে।

শুধু চরকায় সুতো কাটাই নয়, প্রতিবেশীরা পর্যন্ত জানত না বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা। নিজের

সন্তানের মতো সেইসব ছেলেদের তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। আর তিনি কি শুধু একাই! তাঁদের বংশের রক্তেই যেন লুকিয়ে রয়েছে বিপ্লবের বীজ। রঞ্জন আর অঞ্জনা তারাও কিছু কম যেত না। এ সব ব্যাপারে চুপ করে শুধু বসে থাকবার পাত্রই নয় তারা। রঞ্জনের তখন কতই বা বয়েস, বছর তের চোদ্দ, আর অঞ্জনার আট নয়। সেই বয়সেই বিপ্লবীদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ করে চলেছে রঞ্জন। কখনো তাদের গোপন চিঠি পৌঁছে দিয়েছে ভাঙা কালীবাড়ীতে, কখনো তাদের নির্দেশ মতো জরুরি খবর পৌঁছে দিয়েছে।

যে সময়ের কথা বলছি তার মাত্র দিনকয়েক আগে বোমা পড়েছে এস-ডি-ওর মোটরে। বোমা ফাটেনি কিন্তু বিপ্লবীদের কপাল ফেটেছে। সারা চট্টগ্রাম সহরটাই নয়, সহরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত তোলপাড় করে ফেলেছে পুলিশ। এস-পি অর্ডার দিয়েছেন বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে দেখলেই যেন কুকুরের মতো গুলি করে মারা হয়। আর পুলিশের ইনটেলিজান্স ব্রাঞ্চ বুনো কুকুরের মতো সহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে বিপ্লবীদের আস্তানা।

রঞ্জনের একটা মস্ত সুযোগ ছিল এই যে পুলিশের লোকেরা তার মতো অল্প-বয়সী ছেলেকে সন্দেহের কথা চিন্তাই করতে পারত না। আর রঞ্জন ছেলেটিও কম বুদ্ধিমান নয়। কিন্তু কোনো প্রকারে একবার ধরা পড়লে তার পরিণতি কোথায় পৌছবে তাও তাদের কারুর অজানা ছিল না। কিন্তু যে বস্তু তাদের কাছে মৃত্যু-ভয়কেও তুচ্ছ করে দিয়েছিল তা হচ্ছে দেশের জন্ম তাদের নাড়ীর টান। দেশের ওপর কোনো কিছুকেই স্থান দিতে পারত না তারা। রঞ্জনের জীবনের সবচেয়ে বড়ো বাসনা বিপ্লবীরা কবে তাঁকে একেবারে দলের মাঝখানে টেনে নেবে।

মা আর বোনের জন্মও রঞ্জনের দুর্ভাবনার শেষ নেই। তবে ঐ বয়সেই অঞ্জনার বুদ্ধি দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। মা আর দাদার গোপন গতিবিধি, চোখে চোখে ইংগিত, ফিস্ ফিস্ কথা, আর মাঝে মাঝে বাড়ীর থমথমে আবহাওয়া দেখে তার বুঝতে বাকি থাকত না কি রকম সাংঘাতিক বিপদ আর ঝুঁকির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তারা সকলে।

প্রতি শনিবার রাত্রি ন'টার সময় তাদের বাড়ীতে যেন মৃত্যুপুরীর কালো যবনিকা নেমে আসত। সে সময় তাদের মনে হত পৃথিবীর গতি যেন হঠাৎ থেমে গেছে। প্রতি মুহূর্তেই তাদের জীবন সংশয়, কিন্তু বিশেষ করে শনিবার রাত্রে ঠিক ন'টার সময় তাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনও যেন থেমে আসত। চট্টগ্রাম সহরের দেড় মাইলের মধ্যেই তাদের বাড়ী। সন্ধ্যার পরই আশ-পাশের ঝোপে জঙ্গলে নিবিড় হয়ে আসত ঝিঁঝিঁর ডাক। শিয়াল ডাকত এখানে ওখানে। আর তারা তিনজন রুদ্ধশ্বাসে ঘড়ির কাঁটার দিকে অস্থিরভাবে তাকাত। ওয়াল্ ক্লকে ন'টা বাজার ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের পুকুরের দিকে জানলায় শোনা যেত পরপর পাঁচটা টোকা। রঞ্জনের সেটা পড়ার ঘর।

আশ্চর্য সময়-জ্ঞান বিনুদার। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, ঝড় নেই বাদল নেই, শনিবার ঠিক রাত ন'টায় এসে টোকা দেবেন। বিড়ালের মতো নিঃশব্দে এসে জানলার লোহার গরাদের মধ্যে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে দেবেন একটা কালো রঙের কৌটো। ফিস্ ফিস্ করে শুধু বলে দেবেন একটা সাংকেতিক সংখ্যা। দিনের আলোয় কোনদিন তাকে দেখেনি তাদের বাড়ীর কেউ। গ্রেপ্তার করার জন্ম ঝুলছে পুলিশের ওয়ারেন্ট, আর দশ হাজার টাকার পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তি।

উঠানে পেয়ারা গাছের একটা গোপন কোটরে তারা লুকিয়ে রাখত কৌটাটা। কৌটোর মধ্যে পাতলা কাগজে কি খবর থাকত তাও তাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়। তার প্রতিটি অক্ষরে মৃত্যুর স্বাক্ষর। তার একটি লাইন ইংরেজদের হাতে গেলে অনেক মানুষের জীবন সংশয়। ভোর হতে না হতেই দুটি বালতি হাতে এক গোয়ালা সেটি চেয়ে নিয়ে যেত।

কড়কড় করে বাড়ী পড়ল কোথায়। গড়্গড়্ করে ডেকে উঠল আকাশ। চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল সকলের চোখ। জানলার বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে মণিমামা বললেন, সেদিন শনিবার—এমনই দুর্যোগের রাত। অন্য দিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া-

দাওয়া সেরে ছেলেমেয়ের সঙ্গে জ্যোতির্ময়ী বসে গল্প করছেন পড়ার ঘরে। রাত তখন সাড়ে সাতটা। বাইরে বৃষ্টির সঙ্গে উদ্দাম হয়ে উঠেছে ঝড়। এমন সময় দরজায় ঘন ঘন প্রবল আঘাতের শব্দে চমকে উঠল সকলে। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার। মনে হল দেরী হলে এখনই ভেঙ্গে ফেলবে দরজাটা। বিবর্ণমুখে সকলে মুখ চাওয়া চায়ী করলেন। তারপর রঞ্জন উঠে গেল দরজা খুলে দিতে। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল তিনটি মানুষ। একজন জমাদার, একজন ইনস্‌পেক্টর, আর একজন ডি, এস্‌, পি—জাতে ইংরেজ। ভিতরে এসে দাঁড়াতে গায়ের রেন্‌কোর্ট থেকে জল ঝরে পড়তে লাগল। কোর্ট খুলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন তারা। অফিসার দু'জনেরই কোমরের বেল্টে রিভলভর।

ইনস্‌পেক্টরটি জাতে বাঙালী। এগিয়ে এসে জ্যোতির্ময়ীকে বললেন, দেখুন, আপনার বাড়ী আমরা সার্চ করতে এসেছি।

—বেশ করুন। নিস্পৃহকণ্ঠে সম্মতি দিলেন জ্যোতির্ময়ী।

সার্চ চলল প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। ঘরের আলমারী দেরাজ থেকে সুরু করে বিছানাপত্র পর্যন্ত কিছুই বাদ গেল না। এমন কি ভাঁড়ারের চাল ডাল পর্যন্ত উপুড় করে ঢেলে তন্ন তন্ন করে কি খুঁজতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই বার করতে পারলেন না। সার্চের পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ডি, এস্‌, পি নোট বই বার করে কী লিখলেন। তারপর রঞ্জনের পড়ার ঘরে এসে বসলেন।

জ্যোতির্ময়ী দেখলেন, ন'টা বাজতে আর পঁচিশ মিনিট বাকি। রঞ্জন বুঝল—বিনুদার আসতে আর মাত্র পঁচিশ মিনিট।

পশ্চিমের পুকুর পাড়ের এই ঘরেরই জানলায় সাংকেতিক টোকা পড়তে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। তারপর কি ঘটবে তা ওই ছোট্ট মেয়ে অঞ্জনার পর্যন্ত বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবে না। ইন্‌টেলিজান্স ব্রাঞ্চের দুজন অফিসার রঞ্জনের পড়ার টেবিলে বসে নিম্ন কণ্ঠে কি পরামর্শ করলেন; তারপর এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। অঞ্জনার মা আর দাদার মুখ থেকে একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্কের ছায়া অপসারিত হয়ে গেল।

একটু আগে বৃষ্টিটা সামান্য ধরেছিল, কিন্তু তাঁরা ঘরের বাইরে পা বাড়াতে না বাড়াতেই আবার মুষল ধারায় নামল। দরজা বন্ধ করে আবার ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন সকলে। তারপর ফিরে গিয়ে সেই টেবিলেই আবার বসলেন।

মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল অঞ্জনা। আর জ্যোতির্ময়ী ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলেন। সেই সঙ্গে রঞ্জনও। তাঁদের জীবনে ঘড়ির কাঁটা বুঝি আর কখনো এমন তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়নি।

ন'টা বাজতে তখন আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি।

অঞ্জনার মনে হল তার মা ও দাদার ঘন ঘন ঘড়ি দেখার ব্যাপারে কি একটা সন্দেহ করেছেন পুলিশেরা। নিজেদের মধ্যে আলোচনার ফাঁকে মাঝে মাঝে চোখের আড়ে তাকাচ্ছেন তাদের দিকে। ঠোঁটের কোণে কেমন এক ধরণের হাসি।

দমকা বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ঝাপটা আসছে ঘরের মধ্যে। রঞ্জন টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, দেখুন আমার কালকার স্কুলের পড়া তৈরি হয়নি, আপনারা যদি একটু পাশের ঘরে গিয়ে বসেন।

ডি-এস্‌-পি মুখ ফেরালেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই ইন্‌স্‌পেক্টর বলে উঠলেন, কেন, তুমি ঐ তক্তপোষে বসেই পড়তে পার। তোমায় পড়তে তো আমরা বারণ করিনি।

সকলে আরো চেপে বসলেন। পড়ার টেবিল থেকে রঞ্জন কয়েকটা বই তুলে নিয়ে তক্তপোষের এক কোণে বসল। এক জ্যোতির্ময়ীই বুঝলেন তার বুকের মধ্যে তখন কী হচ্ছে। বাইরে তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে থরথর করে কেঁপে উঠছে দরজা জানলাগুলো। এক একটা মুহূর্ত যেন হাজার মণি-পাথর। ঘড়ির কাঁটা দুরন্ত-বেগে এগিয়ে চলেছে ন'টার দিকে।

পুলিশ অফিসারদের ভাব-ভঙ্গী দেখে এবার জ্যোতির্ময়ীর আর কোনো সন্দেহ রইল না—কোনো উপায়ে পুলিশ হয়ত সংবাদ পেয়েছে এ বাড়ীর সঙ্গে বিনুর বা গুপ্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে তাদের সংশ্রবের কথা। পুলিশ জাল পেতেছে হাতে-নাতে ধরবার জন্য। সার্চের ব্যাপারটা ছল মাত্র। নিঃসংশয়ে বুঝলেন, সেদিন আর নিষ্কৃতি নেই।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রঞ্জন দেখলে জানলায় টোকা পড়তে আর মাত্র সাত মিনিট। আর পুলিশ অফিসারদের টেবিলের ঠিক পাশেই সেই জানলা।

ইজের আর জামাপরা একটা বড়ো ডল্ পুতুল নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অঞ্জনা। এতক্ষণ তাকে কেউ লক্ষ্যই করেনি। ঘুরতে ঘুরতে সে ডি-এস্-পি গ্রীণগ্র্যাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বড়ো বড়ো চোখ তুলে বললে, ও পুলিশ সায়েব, আমায় ধরবে তুমি?

টেবিলে বসে হাঁটুর ওপর পা নাচাচ্ছিলেন গ্রীণগ্র্যাস্। অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললেন, হাঁ হামি ঢরবে তোমায়। হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়ে তার কোলের পুতুলটা দেখিয়ে বললেন, এটা তোমার ডল্ আছে?

ওমা, জাননা বুঝি, এটা যে আমার ছেলে।

গ্রীনগ্রাসের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল অঞ্জনা।

—হোয়াট! ছেলে? ইউ মিন্ সন। হো হো হো হো! হাসিতে ফেটে পড়লেন গ্রীণগ্র্যাস্! তারপর অঞ্জনার কাঁধ ছোঁয়া রেশমের মতো নরম কোঁকড়ান চুল-গুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, টোমার ছেলে আমায় ডিবে? গ্রীণগ্র্যাসের কোলের কাছে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা বললে, হাঁ পুলিশ সায়েব তোমার মেয়ে আছে?

অঞ্জনার চিবুকটা তুলে ধরে গ্রীণগ্র্যাস বললেন, ইয়েস, টোমার মটো হামার ডটার আছে লিড্‌সে। অঞ্জনা বললে, জানো পুলিশ সায়েব পাশের বাড়ীর সবিতার সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে হয়েছে পরশু দিন। এই এত গয়না দিয়েছে মেয়েকে। দুই বাহু প্রসারিত করে দেখালো অঞ্জনা।

গোয়না! হোয়াটস্ ত্যাট?

গ্রীণগ্রাসের মুখের দিকে ডাগর চোখ তুলে চাইল অঞ্জনা, ওমা, গয়না কাকে বলে জাননা? তোমার মাথায় বুঝি গোবর আছে সায়েব?

তার কথার ভঙ্গীতে হেসে ফেললেন ইনস্‌পেকটর। মুসলমান জমাদার পর্যন্ত একজোড়া মোটা গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসলে। গ্রীণগ্র্যাস্ মুখ চাওয়াচায়ী করে কিছু না বুঝেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

অঞ্জনা বললে, গয়না দেখনি পুলিশ সায়েব? এই হাতে গলায় পরে।

গ্রীণগ্র্যাস চিন্তা করে বললেন, ইয়েস্...ইয়েস্...নাউ আই আণ্ডারষ্টাণ্ড...গোয়না। ইউ মিন্ অরনামেণ্ট।

রঞ্জন মুখ তুলে দেখলে, ঘড়িতে ন'টা বাজতে তখন আর মাত্র তিন মিনিট বাকি। আর ঠিক তিন মিনিট পর টোকা পড়বে জানলায়। আর সেই সাংকেতিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই ধূর্ত পুলিশ অফিসারেরা লাফিয়ে উঠবে বুনো নেকড়ের মতো। প্রবল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠল রঞ্জন। তার বুকের মধ্যে যেন প্রবল বেগে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। চরম মুহূর্তের জন্য প্রবল প্রস্তুত হল সে।

কিন্তু অঞ্জনার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। সে তখন বলে চলেছে, শুধু গয়না নয় পুলিশ সায়েব। সবিতা মেয়েকে আরো কী কী দিয়েছে জানো?...বেনারসী শাড়ী, খাট, বিছানা আরো কত কী। অঞ্জনা ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্রীণগ্র্যাস আর ইনস্‌পেক্‌টরের হাত ধরে টানলে, এসো না পাশের ঘরে সব আছে দেখাবো তোমাদের।

দমকা বাতাসে কাঁপা ভিজে জানলার দিকে একবার তাকিয়ে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়ালেন গ্রাণগ্র্যাস। ইন্‌স্‌-পেক্টরকে সকৌতুকে হেসে বললেন, কাম্ এলং মিঃ বোস্।

অঞ্জনা বললে, ও জমাদার সায়েব, তুমি বুঝি দেখবে না আমার ছেলের বউকে?

চারজনে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকতেই ওয়াল্ ক্লকে ঢং ঢং করে ন'টার ঘণ্টা বাজল। আর ঘণ্টা বাজা শেষ হতে না হতেই টোকা পড়ল বন্ধ জানালায়। রঞ্জন রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গেল জানালার দিকে।

বাইরে তখন বৃষ্টির সঙ্গে গর্জন করে চলেছে ঝড়।

মধুর উষা

রমেশ মজুমদার

শরৎকালের মধুর উষায় মেদুর বাতাস দোলায় মন,
আয় না সবাই ও শিশুভাই ঐতো হেথায় কুঞ্জবন।
ঘাসের উপর শিশিরকণায় মুক্তা হাজার রয়গো লিখা,
লক্ষ কুসুম দুধের মতন নামটি ওদের শেফালিকা।
কতই বাহার দেখ না ওদের হাসছে শুধুই মধুর ভোরে,
স্নিগ্ধ বাতাস ডাকছে তোদের মিষ্টি ভাবায় সকল দোরে।

দেখবি আবার পদ্মদীঘির পদ্মবধূর রঙাণ হাসি,
ডাকবে তোদের হাত-ইসারায় আজকে উষার সামনে আসি'।
পূর্ব্ব আকাশ রক্ত রঙীণ একটু পরেই উঠ্‌বে রবি,
আয় চলে আয় দোর খুলে আজ দেখ্‌বি নদি মোহন ছবি।

বরফ-দিদির কান্না

শ্রীপ্রভাতকুমার বসু

ওই যে ওই দূরে—আকাশ মায়ের কোলে উঁচু উঁচু পাহাড় —শুধু পাহাড় নয়—পাহাড়ের রাজ্যি—ওইখানেই নাকি বরফ-দিদির ঘর।

ঠাণ্ডা ভাইটী যতোদিন মাকে শুধিয়েছে, ওই একই জবাব পেয়েছে। বারে বাঃ দিদি। আমারই ত দিদি! তবে আসবে না কেন আমার কাছে—খেলবে না কেন আমার সাথে—হাত ধরে নিয়ে ছুটবে না কেন বনে জঙ্গলে! তারপর অন্ধকার ঘুরঘুট্টি রাতে, পাশে আঁচল পেতে শুয়ে চোখ জ্বালা বুড়ীর গল্প বলবে না কেন? না হয় বিয়েই হয়েছে। শ্বশুর বাড়ী গেছে। তাই বলে ছোট ভাইকে বুঝি একেবারে ভুলে থাকতে হয়?

ঠাণ্ডা ভাইটী কাঁদে। মায়ের কোলে মুখ গুঁজে কাঁদে। দেবদারু গাছের তলায় বসে। কান্না শোনে বাতাস। শোনে দেবদারু গাছের পাতা। আর ফিস-ফিসিয়ে কি সব বলে বাতাসের সাথে। সরসর করে পাতা খসে পড়লো একটা। একেবারে ঠাণ্ডা ভাইটীর পাশে। বললো চোখ পিটপিট করে, দাওনা লিখে এতে তোমার দিদির আসার কথা। লিখলো ভাইটী। কোথায় ছিলো বাতাস—এলো শনশনিয়ে। উড়িয়ে নিয়ে চললো ঠাণ্ডা ভাইটীর আঁকিবুঁকি।

বরফ-দিদি ঘরকন্নার কাজ করছিল বসে বসে। কোলের কাছে উড়ে এসে পড়লো পাতাটী। দেখলো—পড়লো; আর তারপর লিখে দিল, যাচ্ছি শীগ্‌গিরই। আবার উড়লো পাতা—এলো ঠাণ্ডা ভাইটীর কাছে।

ঠাণ্ডা ভাইটীর সে কি আনন্দ! দিদি আসবে। তার বরফ-দিদি আসবে! ছুটলো, মা-মণিকে খবর দিতে হবে না?

সেদিন কি হিমথিম ঠাণ্ডা। সব জমে যায় আর কি! বরফ-দিদি এলো, ঠাণ্ডা ভাইটীর মুখে হাসির ঝিলিক! মা-মণিও মেয়েকে দেখে সাদরে বুকে টেনে নেয়। আর ভাইটী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দিদিকে—কি ধবধবে সাদা বরফ-দিদি! ছোট ভাইটীকে আদর করে টেনে নেয় কাছে। মুখে চুমো খায়। যেমনটী ভেবেছিল ঠাণ্ডা ভাইটী, ঠিক তেমনি—মনের মতই তার বরফ-দিদি।

দিদির পাতে খায়—দিদির সাথে ঘুরে বেড়ায় হেথায় হোথায়—খেলা করে দৌড়-ঝাঁপ করে—আর রাত্তিরে দিদির পাশে শুয়ে টিমটিমে আলোয় গল্প শোনে—এক ছিল চোখ জ্বালা বুড়ী।···যাবার সময় ঘনিয়ে আসে। ঠাণ্ডা ভাইটীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু। এক্ষুনি চলে যাবে। চোখের জল উপচে পড়ে!

নিজের আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেয়, আদরে ভাইটীর।

: তোর সংগে যাবো দিদি।

: ওরে পাগল, সেখানে থাকবি কি করে?

কিন্তু ভাই নাছোড়বান্দা। মাকে বলে কয়ে ছোট ভাইটীকে নিয়ে চললো নিজের বাড়ী।

এ পাশে পাহাড়—ওপাশে পাহাড়—শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তারই মাঝে বরফ-দিদির ঘর। ওখানেই রইলো ঠাণ্ডা ভাইটী।

হাসে, খেলে, নাচে গায়। আবার মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে। দেখে দেখে আর ঘুরে ঘুরে আশ মিটতে চায় না যেন!

একদিন ঠাণ্ডা ভাইটী এলো এক ফুলের বাগানের কাছে। কি সুন্দর। বরফ রঙের হরেক ফুল দুলছে ঝিরঝিরে বাতাসে। আহা! হাত বাড়িয়ে তুললো একটা। রামধনুর রং গোলা। ওই ফুলটা কি? ওই যে দূরে—ওটা তো তুলতেই হবে। কিন্তু পথ যে খাড়া নেমে গেছে। নামলে কি হয়? দিদিটা যেন কি? সব তাতেই মানা—

দূর ছাই কি হবে? নেমেই পড়ে। কিন্তু একি! একি!! আরে—আরে—শুয়ে গড়গড়িয়ে চললো নীচের দিকে। আগে ও বোঝেনি এটা। আরে বাবা—ওটা আবার কি পথ জুড়ে রয়েছে। আরে—আরে—এসে গেল যে—

তারপর: উঃ······দোল হয়ে গেল জায়গাটা। দোল ফুল কতকগুলো এক সংগে ঝরে পড়লো যেন!!

এদিকে বেলা গেল—সন্ধ্যে হোল। ভাইটী গেল কোথায়? খোঁজ—খোঁজ। সারা পাহাড় তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কিন্তু কোথায় সে আদরের ভাইটী। অবশেষে এলো সেই বাগানের ধারে। ওই যে দূরে ও কিসের টকটকে লাল। পরম শোত্তুর পাথরটা যেন হাসছে মিটমিট করে। বুঝতে আর বাকি রইলো না কিছু। চোখ দিয়ে নামলো জলের ধারা—আহা অমন আদরের ভাইটী! এ ধারার আর বিরাম নেই সেই থেকে—তোমরা ওই ধারাকে 'নদী' বলে ডাকো—কিন্তু ওকি নদী? ও যে বরফ-দিদির চোখের জল!!

বিপিনচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এখন হইতে এক শত বৎসর পূর্বে ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে বাংলা দেশে এমনই দুইজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহাদের দানে শুধু বাংলার লোক নহে—বিশ্ববাসী উপকৃত হইয়াছে। আজ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের দানের কথা স্মরণ করিয়া ভারতবাসী তাঁহাদের উভয়ের জন্মশতবার্ষিক উৎসব পালনের ব্যবস্থা করিয়াছে। বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকপ্রবর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ৩০শে নভেম্বর এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈনিক, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার অধিকারী মণীষী বিপিনচন্দ্র পাল ৭ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতস্মরণীয়

সেই পথ পাইবার জন্য আজ আমরা তাঁহাদের কথা স্মরণ করিব। বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই তিনি বিপ্লবী। সঙ্গতিপন্ন পিতার সন্তান—সিপাহী-যুদ্ধের যুগে জন্ম। যুদ্ধ যেন তাঁহার প্রতি রক্তবিন্দুতে প্রবাহিত। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে আসিয়া নবযুগের ধারায় নিজেকে মিলাইয়া দিলেন। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস ছিলেন তাঁর সমবয়স্ক বন্ধু। উভয়ে একই চিন্তাধারার অনুগামী। বিপিনচন্দ্র নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের ছেলে। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কার্য্য তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। ক্রমে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে প্রেরণা লাভ করিয়া তিনি দেশসেবায় দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সাংবাদিকতার প্রতি অনুরাগী বিপিনচন্দ্র ১৮৮০ সালে সাপ্তাহিক 'পরিদর্শক' প্রকাশ করেন। অর্থার্জনের জন্য শিক্ষকতার বৃত্তির সহিত সারাজীবন সাংবাদিকতা করিয়া গেলেন। সে জন্য মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে দূরে বাস করিতে হইল—১৮৮৭-৮৮ সালে লাহোরের ট্রিবিউন পত্রের সহযোগী সম্পাদক ও এলাহাবাদের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দৈনিকপত্রের সম্পাদক (১৯১৯—২০) হইয়াছিলেন। নিজে ১৯০১ হইতে ১৯০৭ 'নিউইণ্ডিয়া' প্রকাশ করেন—পরে লণ্ডন হইতে পাক্ষিক স্বরাজ (১৯০৯), মাসিক হিন্দু রিভিউ (১৯১২—১৩) প্রভৃতি সম্পাদন করেন। ইংরাজি দৈনিক বন্দেমাতরমের তিনিই প্রথম সম্পাদক হন—পরে তাহাতে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ আসিয়া যোগদান করেন। দৈনিক লিবার্টি, দৈনিক বেঙ্গলী প্রভৃতি বহু পত্রের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৮৭৬ সালে দেশ সেবার দীক্ষা লইয়া ক্রমে কংগ্রেসের সহিত জড়িত হন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় প্রথম জীবনে ধনী পিতার সহিত মতান্তর হয়—পরে পিতা পুত্রকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছু কাল তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর (বর্তমান ন্যাশানাল লাইব্রেরী) কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

বিপিনচন্দ্রের মত অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও স্মৃতিশক্তি অতি অল্প রাজনীতিকের মধ্যেই দেখা গিয়াছে। তাহার সহিত তাঁহার অসামান্য বক্তৃতা-শক্তি তাঁহাকে আসমুদ্র-হিমাচল সকল স্থানে জনপ্রিয় করিয়াছিল। ১৮৯৯ ও ১৯০০ সালে তিনি বিলাতে ও আমেরিকায় যাইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনে তিনি রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির সহিত যেমন বাংলাদেশে, তেমনই মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবে লালালাজপৎ রায় প্রভৃতির সহিত একযোগে কাজ করেন। সে সময়ে বাল, লাল ও পাল সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদীদের শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন। ১৯০৮ সালে শ্রীঅরবিন্দের মামলায় সাক্ষ্য দান করিতে অসম্মত হইয়া তিনি ৬ মাস কারাবাস করেন ও সেই বৎসর বিলাত যাইয়া ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত তথায় বাস করেন—সে সময়ে তথায় তিনি স্বরাজ নাম ইংরাজি পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। ১৯১৬ সালে তিনি পুনরায় কংগ্রেস আন্দোলনে যোগদান করিলেও ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া যান। ১৯৩২ সালের ২০শে মে তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। বিপিনচন্দ্র শুধু রাজনীতিক নেতা ছিলেন না। বাংলা ও ইংরাজিতে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ১৮৮৪ সালে শোভনা উপন্যাস, ১৮৮৫ সালে ভারত সীমান্তে রুস, ১৮৮৯ সালে মহারাণী ভিকটোরিয়ার জীবন চরিত, ১৮৯২ সালে ভক্তি সাধন, ১৯০৮ সালে জেলের খাতা, ১৯১৬ সালে চরিত কথা প্রভৃতি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তাঁহার লেখা প্রবর্তক বিজয়কৃষ্ণ, নবযুগের বাংলা, মার্কিণে ৪ মাস প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার ইংরাজিতে লিখিত বহু গ্রন্থে হিন্দুধর্ম, ভারতীয় জাতীয়তা প্রভৃতি প্রচারিত হইয়াছে। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেও পরবর্তী কালে তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত আত্মজীবনী বাংলার একটি গৌরবোজ্জ্বল যুগের ইতিহাস। দেশবাসী তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উৎসবে শুধু তাঁহার কথা স্মরণ করিবে না—তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহ নানা ভাবে প্রকাশ করিয়া বর্তমান যুগের মানুষদিগকে তাঁহার কথা জানিবার ও বুঝিবার সুযোগদান করিবে। বর্তমানের বিভ্রান্ত মানুষ বিপিনচন্দ্রের মত স্থিতধী প্রাজ্ঞের রচনা পাঠ করিয়া নূতন পথের সন্ধান পাইবে। ৭ই হইতে ৯ই নভেম্বর কলিকাতা সহরে বিরাটভাবে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর মত বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, জগতের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের পরিচয় প্রদান সহজসাধ্য নহে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি করিয়া ৩০শে নভেম্বর হইতে তাঁহার জন্ম শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। জগদীশচন্দ্র বসু শুধু ভারতেরশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, তাঁহার প্রতিভা সমগ্র সভ্যজগতে স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়াছিল। ১৮৯৪ সালে প্রথম তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন জগদীশচন্দ্র কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক—তখনকার দিনে দেশীয় অধ্যাপকদিগকে কলেজের গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও সুযোগ দেওয়া হইত না। তাহা সত্বেও তিনি অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা বিজ্ঞানে বহু নূতন তথ্য প্রকাশ করেন। ১৯০০ সালে প্রথম প্যারিসের আন্তর্জাতিক পদার্থ বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁহার দ্বিতীয় গবেষণার কথা প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিসে ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার লেখায় সে দিনের জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার পার্শ্বস্থিত তাঁহার সহধর্মিণী অবলাবসুর, কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামীজি জগদীশচন্দ্রকে আশীর্বাদ ও তাঁহার সাফল্য কামনা করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্র ১৯০৫ সালে তাঁহার তৃতীয় গবেষণা আরম্ভ করেন ও ১৫ বৎসর পরে সে বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। ১৯২২ সালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি সেজন্য তাঁহাকে সম্মানিত করেন। ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতায় বসুবিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন—সে সময় ভারত সরকার বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা দান করিতেন ও জগদীশচন্দ্র ভিক্ষা করিয়া ১১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মন্দিরের জন্য জগদীশচন্দ্র ১২ লক্ষ টাকার একটি ট্রাষ্ট করিয়া যান ও তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী অবলা বসু সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে দান করেন। জগদীশচন্দ্র শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া কর্তব্য শেষ করেন নাই—তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহার রচিত বাংলা গ্রন্থগুলির সুলভ সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। আচার্য্য শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার গুরু জগদীশচন্দ্রের সুবৃহৎ বাংলা জীবনী প্রণয়নের ভার লইয়াছেন; উৎসবের সময় সে গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। উৎসব উপলক্ষে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে একটি বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী ও জগদীশচন্দ্রের বাসগৃহে তাঁহার স্মারক দ্রব্যের একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে। ৬০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া সাড়ম্বরে জগদীশচন্দ্র স্মৃতি শতবার্ষিক উৎসব সম্পাদনের আয়োজন হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে ১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া বিদেশী বিজ্ঞানীদের আনয়ন ও এদেশে বিজ্ঞান প্রচারের জন্য স্থায়ী ধন ভাণ্ডার স্থাপন করার চেষ্টা চলিতেছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস, জগদীশ-উৎসব ভারতের একটি স্থায়ী কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা প্রথম জীবনে বিপিনচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র উভয় মনীষীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিবার ও অতি নিকটে বার বার তাঁহাদের পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। স্বর্গত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের কৃপায় বহু সময়ে মনীষী বিপিনচন্দ্রের গৃহে গমন করিয়া ও তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া জীবনে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম, সে কথা সর্বদা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। ছাত্রাবস্থা হইতে দীর্ঘকাল বিপিনচন্দ্রের বিভিন্ন বিষয়ে বহু বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি। এমন কি, পানিহাটি গ্রামে (২৪পরগণা) আসিয়াও সুপ্রাচীন বটবৃক্ষতলে বিপিনচন্দ্র বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিয়া গিয়াছেন—সে দিনের কথা জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। আজ তাঁহার জন্ম শতবার্ষিক দিনে তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সৌভাগ্যে নিজেকে ধন্য মনে করি ও প্রার্থনা করি—তিনি দেশে যে নূতন রাজনীতিক জীবন ও বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা যেন সত্যে পরিণত হইয়া স্বাধীন দেশের মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণতা দান করে।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতি হইয়াছিলেন—সে সময়ে তাঁহাকে নিকটে পাইবার ও তাঁহার উপদেশাদি শ্রবণের বহুবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সর্বজনবিদিত। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁহাকে লিখিত পত্রগুলি পাঠ করিলে তাহার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যায়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী স্বর্গতা অবলা বসু শুধু তাঁহার স্বামীর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সহায়ক ছিলেন না, তিনি সারা জীবন সমাজ-সেবার কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন ও বিধবা আশ্রম তাঁহার উচ্চ অন্তঃকরণ ও কর্মদক্ষতার পরিচয় বহন করিতেছে। জগদীশচন্দ্র ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় নিজ ক্যামেরায় সকল মন্দির ও অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক দ্রব্যের চিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেগুলি যত্নের সহিত তিনি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন—উৎসবে সে সকল চিত্র প্রদর্শিত হইবে। জগদীশচন্দ্র তাঁহার কর্মের মধ্য দিয়া চিরজীবী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আজ দেশবাসী সকলেই ঋণ শোধ করিতে সমুৎসুক। আমরাও সকলের সহিত এই সাধনায় উজ্জ্বল আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া কৃতার্থ হইতেছি।



দেবভূমি কেদারনাথ

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

গিরিরাজ হিমাচলের প্রথম তীর্থ হরিদ্বার বা দরজা। এই দরজা দিয়ে ঢুকতে হয় হিমালয়ের অন্যান্য তীর্থক্ষেত্রে; তারপর হল ঋষিভূমি বা তপভূমি ঋষিকেশ ও লছমনঝুলা। এই তপভূমিতে আর্য্যাবর্ত্তের মহামানব ও স্বর্গের দেবগণ তপশ্চর্য্যা করেছেন বলে প্রবাদ আছে। এই তিন মহাতীর্থে কয়েকবার আসবার সৌভাগ্য ঘটেছে কিন্তু শ্রীশ্রীকেদারখণ্ডের অন্তর্গত শ্রীকেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম দর্শন ইতিপূর্বে ঘটে নাই। এবার সেই সুযোগ এলো। গত ১৩৬৫ সালের ৩০শে বৈশাখ স্ত্রী ও ছোট ছেলে শ্রীমান্ ভূপেন্দ্র ওরফে কেষ্টসহ যাত্রা করলাম। এই শুভযাত্রার উপলক্ষই কেষ্ট। সে বায়না ধরল যাবে হিমাচলের এই দুই মহাতীর্থে বন্ধুদের সংগে। তাকে একা ছেড়ে দিতে ভরসা হল না তাই আমরা স্বামী স্ত্রী তার সহযাত্রী হলাম।

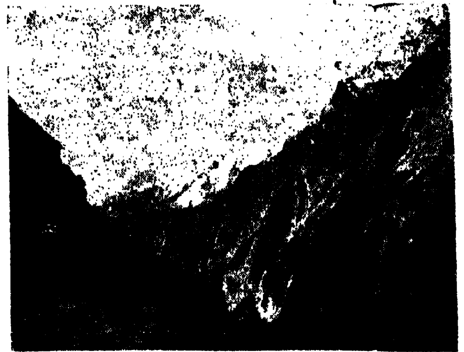
সবই ভগবানের ইচ্ছা-দয়া। মানুষের সাধ্য কতটুকু তা' আমরা প্রত্যহ প্রতি পদবিক্ষেপে অনুভব করছি!

অতি ভয়ে ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করে আমরা যাত্রা করলাম ১৩ই মে ডুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার অভিমুখে।

১৫ই মে তারিখে পৌঁছলাম হরিদ্বার—৯২০ মাইল রেলপথ। সেখানে আমার বন্ধুবর পণ্ডিত চিরঞ্জীলাল শর্ম্মাজী পরিচালিত 'গীতাভবনে' আশ্রয় নিলাম। পণ্ডিত গিরিজাশঙ্কর ও পান্নালাল শুক্ল এবং শ্রীধীরেন ভটের ছড়িদার খবর পেয়ে আমার সংগে দেখা করল। এবার চেষ্টা চলল কেদারনাথের পথের বাসের টিকেট সংগ্রহের। ৩দিন চেষ্টার পর পাণ্ডাঠাকুরদের লোক জানাল ঋষিকেশ পথে বাসের টিকেট পাওয়া যাবে না—কতদিনে মিলবে বলা কঠিন। তারপর পেলাম এক দুঃসংবাদ শ্রীনগর চটীর অনতিদূরে একটি বাস মন্দাকিনী গর্ভে পড়ে গেছে এবং বাসের ২৭জন যাত্রী ও বাসের চালক, কণ্ডাক্টর মারা পড়েছে। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যেন্দ্র তার বন্ধুদের সংগে আমাদের যাত্রার এক সপ্তাহ পূর্বে যাত্রা করেছিল কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম দর্শনে। এই সংবাদে আমরা হলাম বিচলিত ও চিন্তিত—পাণ্ডাঠাকুরদের লোকেরা বলল আমার পুত্র সেই বাস দুর্ঘটনার পূর্বেই কেদারনাথ-পথে গেছে। কিন্তু বাপ-মায়ের মন—চিন্তা ঘোচে কই!

আমরা ঋষিকেশ পথে না গিয়া যাত্রা করলাম ১৮ই মে কোটদ্বার ও পৌড়ি হয়ে শ্রীনগর। এই রাস্তা ৫৯ মাইল ঘুরে যেতে হয় কিন্তু রাস্তাটি বেশ নিরাপদ ও রমনীয়। রক্ষিত জংগলের মধ্য দিয়া। চণ্ডীপাহাড় থেকে এই বাস ছাড়ে এবং গঙ্গার উপরে কাঠের সেতুর ওপর দিয়া বাস চলল রিসার্ভড্ ফরেষ্টের মধ্যপথ ভেদ করে কোটদ্বার সমতলভূমিতে। সেদিন আমরা শ্রীনগরের বাস ধরতে পারলাম না। কোটদ্বারে ডাকবাংলায় রাত্রিবাস করে পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করলাম শ্রীনগরের পথে। কোটদ্বার হতে ক্রমশঃ সুরু হল বিরাট বিরাট পাহাড় পর্বত—পৌড়ি চ'ল গাড়োয়াল জিলার হেডকোয়াটার্স বা রাজধানী, একটি অত্যুচ্চ গিরিশৃংগের উপরে। সহরে ঢুকবার পূর্বে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হ'তে আদায় করল।০ আনা 'টোল' ট্যাক্স। এইস্থান হচ্ছে সমুদ্র হ'তে ছয় হাজার ফুট উর্দ্ধে। শ্রীনগর ঢুকবার পূর্বে যাদের কলেরা ও বসন্তের ইনজেকসন সার্টিফিকেট ছিল না তাদের স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তার দিল সেই 'ইন্‌জেক্‌সন্'। সেই সার্টিফিকেট সংগে রাখতে হ'ল প্রত্যেক ঘাঁটীতে দেখাবার জন্য। শ্রীনগর প্রাচীন গঙ্গাতীরে অবস্থিত গাড়ওয়ালের একটি প্রাচীন নগর। পৌড়ী ও ঋষিকেশ থেকে আগত বাসের সংযোগ স্থল। এখান হ'তে পৌড়ী ১৮ মাইল। এখানে হাঁসপাতাল, ডাক ও তারঘর, হাইস্কুল, মেয়েদের স্কুল, মঠর আড্ডা ও মন্দির আছে। এখান থেকে সোয়া দু' মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে কীর্তিনগর। মাঝে দুই স্থানকে বিভক্ত করেছে অলকানন্দা। বর্তমানে এই নদীর উপরে নির্মিত হয়েছে সুদৃঢ় পাকা পুল—শীঘ্রই পুলের উপর দিয়ে চলবে মটর, তাতে ঋষিকেশ-দেবপ্রয়াগ হ'তে আগত মটর বাসগুলি এসে মিলিত হবে শ্রীনগরে। এক্ষণে এইসব যাত্রীদের আসতে হয় হাঁটাপথে, না হয় শ্রীনগর এসে বাসে। পুল পার হতে ট্যাক্স দিতে হয় প্রতিজনে দু' পয়সা বা তিন নয়া পয়সা। ঋষিকেশ হ'তে কীর্তিনগর ৬২ মাইল, মটর ভাড়া ৪৷০ টাকা। শ্রীনগর হ'তে রুদ্রপ্রয়াগ ১৮ মাইল। মটর বেকল হওয়াতে আমাদের থাকতে হল শ্রীনগরে—সেদিন এক দুর্যোগ রাত্রি, ভয়ানক বৃষ্টি। রাত্রে হ'ল হরিমটর ভোজন এবং বাসে রাত্রিযাপন।

২০শে মে প্রত্যুষে চলল 'বাস্' রুদ্রপ্রয়াগ পথে। শ্রীনগরের অনতিদূরে যেখানে পড়েছিল 'মটর যান্' অলকানন্দার গর্ভে, দেখলাম সেই



অলকানন্দার পথ

স্থান। বাসখানি টুকরা টুকরা হয়ে আছে দেশলাই কাঠির মত। মৃতদেহগুলি নাকি তেমনি পড়েছিল ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে—সনাক্ত করার কোন উপায় ছিল না—সব ক'টি তীর্থযাত্রী ছিল দাক্ষিণাত্যবাসী।

এই হিমালয়ের বুকের উপর দিয়ে যখন মটর যায় প্রতি মুহূর্তে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে চালকের সামান্য অসাবধানতায়। পথ অত্যন্ত বন্ধুর—চড়াই উৎরাই আকাবাঁকা। তারপর রাস্তার পরিধি পাহাড়ের গা ঘেঁষে ১০ ফুট—হাঁটা পথের যাত্রীদের বাঁচাতে গিয়া সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিতে 'মটর' পড়ে যেতে পারে ৩০০০-৫০০০ ফুট নিচে অলকানন্দা বা মন্দাকিনীর গর্ভে। সুতরাং যাত্রীদের 'দুর্গা-নাম' জপ করা ছাড়া উপায় থাকে না।—বাঁ দিকে তাকালে পার্শ্বে ভীষণ নদীকূল, ডানদিকে অভ্রভেদী হিমাচল। এস্থানের গাড়োয়ালী চালকগণ খুব সুদক্ষ মটর ড্রাইভার। শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগের ভাড়া ৩৵০ আপার ক্লাস ৪॥৵০ আনা।

২০শে মে বেলা ৭॥০টায় আমরা পৌঁছলাম রুদ্রপ্রয়াগে। রুদ্রপ্রয়াগ মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সংগম স্থলে অবস্থিত—কি ভীষণ তার উত্তাল তরঙ্গ ও ধ্বনি! অলকার উপর বিরাট সেতু—সেই সেতু পার হয়ে গেলাম অপর পারে—সেখানে পেলাম মন্দাকিনীর স্রোতধারা—দু'দিকে ধারা এসে আছড়ে পড়ছে রুদ্রনাথের মন্দিরের সম্মুখস্থ সীঁড়ির উপরে। কি অপূর্ব দৃশ্য! সীঁড়ির মাঝখানে দেবীর মন্দির—উপরে বাবা রুদ্রনাথের মন্দির। সীঁড়িগুলি নেমে গেছে সংগমস্থলে, যেন পাতাল পুরীতে—সেই ঘাটে নেমে স্নান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। সকলেই ঘটিতে জল তুলছে অতি সন্তর্পণে ঘটি বা জল পাত্র তুলতে একটু অসাবধান হলেই সর্বনাশ ঘটে যাবে। দু'দিকের জল দুই রকম। মন্দাকিনীর জল খুব ঘোলাটে ও তাঁর দাপট খুব বেশি—অলকানন্দা স্বচ্ছ ও নীলাভ্রিত। আমরা পবিত্র বারি স্পর্শ করে মাতৃবন্দনা করলাম। নদীর তীরে উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত বাবা রুদ্রেশ্বর শিবমন্দিরে পূজা অর্চনা শেষ করে আমি গেলাম অগস্ত্যমুণি পর্য্যন্ত মটর বাসের টিকেট রিজার্ভ করতে। আর আমার পুত্র ও তার বন্ধু দেবু গেল কুলী ঠিক করে তাদের নাম রেজেষ্টারী করতে। এখানে ডুলি ও কুলী ঠিক করে তাদের নামধাম রেজেষ্টারী করবার জন্য রাজকীয় কর্মচারী আছেন।

রুদ্রপ্রয়াগে ডাকঘর, তারঘর, ঔষধালয় ও কালীকমলীর ধর্মশালা আছে এবং স্বামী সচ্চিদানন্দ হাইস্কুল, সদাব্রত, ডাকবাংলো আছে। মন্দাকিনীর বাম তীরে রুদ্রনাথের মন্দিরের পাশ দিয়ে কেদারনাথ যাবার রাস্তা। এক ফার্লিং দূরে মটর বাস ষ্ট্যাণ্ড—এখান হ'তে অগস্ত্যমুণি চটী ১১ মাইল, ভাড়া ॥৵০। এখানেই শেষ হল মটর রাস্তা। এখান থেকে সুরু হ'ল হাঁটা পথ অথবা কাণ্ডী, ডাণ্ডী বা অশ্ব পৃষ্ঠে।

অগস্ত্যমুণিতে ১৫ চটী, ডাক ও তার ঘর, ধর্মশালা আছে ও অপর পারে রুদ্রাক্ষের গাছ আছে। অগস্ত্যমুণির মন্দির আছে। স্থানটি মনোরম। এখান থেকে আমরা চললাম পদব্রজে বাবা কেদারনাথকে স্মরণ করে। পরবর্তী চটী সৌরী ২া০ মাইল—দ্বিতীয় চটী চন্দ্রাপুরী ২ মাইল। বেশ মনোরম স্থান—চন্দ্র-মন্দাকিনী সংগমে, শিবদুর্গার মন্দির। এখানে ১০টী চটী আছে—এখানে যাত্রীদের থাকবার বেশ ভাল স্থান। আমরা রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে ২॥ টার সময় যাত্রা করে অগস্ত্যমুণিতে মটর থেকে নামলাম ৩া০টায় এবং সন্ধ্যার পূর্বেই এসে পৌঁছলাম চন্দ্রাপুরীতে। আমার পুত্র পূর্বে পৌঁছে স্থান করেছিল বেশ একটি ভাল দোতালা ঘরে। এখানে আহার ও রাত্রিবাস করলাম।

প্রত্যেক চটীতে ভাল আতপ চাল, ঘৃত, ডাল, তেল, নুন ও যাবতীয় সমস্ত কাঠ ও আলু পাওয়া যায়। যার চটীতে থাকবেন সেই আপনাকে দেবে বিনাভাড়ায় বাসন পত্রাদি। স্থানীয় লোকদের ব্যবহার মধুর এবং কোন চোর ডাকাতের ভয় নাই। এখানে জংগলে কোথাও কোন হিংস্র জানোয়ার বা শ্বাপদ নেই। প্রতি চটীতে স্থানীয় স্বাস্থ্যবিভাগ সুবন্দোবস্ত করেছেন প্রস্রাব ও পাইখানার—সব সময়ে মোতায়েন আছে ঝাড়ুদার ও মেথর—রাস্তা, পাইখানা, প্রস্রাবখানা সাফ করতে। রাস্তায় আছে অসংখ্য ঝরণা কিন্তু কর্তৃপক্ষ লিখিত ভাবে নিষেধ করেছেন ঝরণার জল পান করতে। পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে পাইপ বা নল দ্বারা রাস্তায় ও প্রতি চটীতে। ডাক্তার ও কবিরাজ নিযুক্ত আছে প্রতি চটীতে অসুস্থ বা আহত যাত্রীর সেবাকার্যে।

এই তীর্থ পর্যটনে চাই মনের জোর ও ভগবৎ প্রেরণা। কত অন্ধ খঞ্জ চলেছে ভগবান দর্শনে। একই রাস্তা—কাহাকে রাস্তা জিজ্ঞাসা করতে হবে না। যাত্রীদল চলেছে কাতারে কাতারে—মুখে এক বুলি 'জয় বাবা কেদারনাথ জয় বাবা বদরীনারায়ণ।' সকলের হাতে একখানি সুদীর্ঘ লাঠী। কুলীভাড়া মাইল প্রতি ২-২॥০ টাকা। ঘোড়া ভাড়া ১৲ টাকা, কাণ্ডী ভাড়া ১॥০ টাকা ও ডুলি বা ডাণ্ডী ভাড়া ৩৲—৩॥০ টাকা মাইল প্রতি। রাস্তায় পাবেন সর্বত্র ঘোড়া, কাণ্ডী ও ডাণ্ডী কিন্তু বিনা রেজেষ্টারীতে এইসব যান বাহন বা কুলী নিলে আছে বিপদ। অগস্ত্যমুণি হতে চন্দ্রাপুরীর রাস্তা বেশ সমতল, হাঁটতে কষ্ট হয় না।

পরদিন প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে চা ও বিস্কুট খেয়ে যাত্রা করলাম গুপ্তকাশী অভিমুখে—৯ মাইল পথ, কিন্তু পথ চড়াই। ভীরী চটী ৩া০ মাইল, পথ সমতল, নারায়ণ চটী ১া০ মাইল, কুণ্ডচটী ২ মাইল—এখান থেকে সুরু হ'ল দম-ফাটা চড়াই। কুণ্ড চটীতে মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রাম করে আমরা যাত্রা করলাম গুপ্তকাশীর পথে—দুই মাইল রাস্তা চলতে সময় লাগল ৪ ঘণ্টা। সূর্য্যদেব যখন পশ্চিমাকাশে রক্তবর্ণ ধারণ করছেন সেই সময়ে আমরা পৌঁছলাম গুপ্তকাশীতে—উচ্চ পাহাড় থেকে দেখা গেল মন্দাকিনীর অপর পারের 'উখীমঠ'—৺কেদারনাথের পূজারী রাওয়ালের বাসস্থান—দপ্তর। শীতের কয়মাস এখানে পূজা হয় কেদারনাথের। গুপ্তকাশী পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট খাট সহর—এখানে আছেন ৺বিশ্বেশ্বর ও অর্দ্ধনারীশ্বরের প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের মধ্যস্থলে মণিকর্ণিকাকুণ্ডে গোমুখী ধারা, সেখানে স্নান করে নারিকেলের মধ্যে গুপ্তদান করতে হয়। পরে বিশ্বেশ্বর ও অর্দ্ধনারীশ্বরের বিগ্রহ দর্শন।

এখানে আছে পোষ্টাফিস, তারঘর, ধর্মশালা, সদাব্রত, বিদ্যাপীঠ ও দোকান ইত্যাদি। আমরা প্রত্যুষে গোমুখী ধারায় স্নানতর্পণ ও মন্দিরে পূজা দর্শন করে বেলা ১১টার সময়—(২৩শে মে) অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করলাম ত্রিযুগী নারায়ণের পথে। ত্রিযুগী নারায়ণ ও কেদারনাথের ভয়ানক চড়াই ও উৎরাইর কথা শুনে আমরা গুপ্তকাশী থেকে ঘোড়া ভাড়া করলাম—ভাড়া মাইল প্রতি ১৲ টাকা। আমার পুত্র কৃষ্ট ও তার বন্ধু দেবু চলল পদব্রজে। গুপ্তকাশী থেকে কেদারনাথ ভায়া ত্রিযুগী নারায়ণ ৩০ মাইল। প্রথম চটী ১ মাঃ নালা চটী—এখান থেকে উৎরাই পথে মন্দাকিনীর উপরস্থ সেতু অতিক্রম করে উখীমঠ হয়ে বদরীনাথ যাবার রাস্তা—কেদারনাথ হ'তে বদ্রীনাথ এই পথে ১০১ মাঃ এই পথে নালাচটী হতে উখীমঠ



বদ্রীনারাণের পথে

২৷৷০ মাঃ, গণেশ চটী ৩৷০ মাঃ, গোয়ালিয়াবগড়—১৮০ মাঃ, দৈড়া ১ মাঃ, পোথীবাসা ২৷৷০ মাঃ, দোগলভীটা ১৷৷০, বেনিয়াকুণ্ড ১৷০, চোপতা ১মাঃ, এখান থেকে তুঙ্গনাথ ৩ মাঃ, ভীষণ চড়াই, ভুলোকণা ১ মাঃ, পাঙ্গরবাসা ২৮০ মাঃ, মণ্ডলচটি ৩৷০ মাঃ, গোপেশ্বর—৫ মাঃ, তারপর চামেলী বা লালসাঙ্গা অলকানন্দার তীরে কেদারবদরীর ও রুদ্রপ্রয়াগ-কর্ণপ্রয়াগ বদরীপথের মিলন স্থান বা জংসন। স্থানটি অতি মনোরম, কিন্তু থাকার স্থান নাই; এখান থেকে বাসে পিপুল কোটে যাওয়া যায় কিন্তু স্থান পাওয়া যায় না। পাহাড় গাত্রে সহর আদালত আছে, অথচ থাকার খাবার স্থান নাই।

আমরা বেলা ১টার সময় পৌঁছলাম শাকম্ভরী দেবীর মন্দিরে। ৫ কুণ্ড আছে—স্নানে পুণ্য। সত্যযুগে শিব পার্ব্বতীর বিবাহ নাকি হয়েছিল এই স্থানে—সেই বিবাহের হোমাগ্নি এক্ষণেও জ্বলছে "ত্রিযুগধুনী" নামে। ৫টী কুণ্ডর জল মাথায় দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করা হল। দেড় ঘণ্টা পরে যাত্রা করলাম গৌরীকুণ্ড অভিমুখে—পথে ভীষণ উৎরাই—স্থানে স্থানে নামতে হ'ল ঘোড়া থেকে। ২৷৷০ মাইল দূরে শোনপ্রয়াগ, মুণ্ড-কাটা গণেশ ২৷৷০ মাইল জঙ্গলাকীর্ণ উৎরাই আরো আড়াই মাইল চড়াই উৎরাই পথ অতিক্রম করে পৌঁছলাম গৌরীকুণ্ড বা গৌরীতীর্থ সন্ধ্যার প্রাক্কালে। এখানে ভীষণ শীত অনুভব করলাম। ২টী কুণ্ড—একটির জল খুব ঠাণ্ডা, অপরটির জল বেশ তপ্ত। গরম জলে স্নান করলাম। মন্দাকিনীর জল বরফ গলায় জল, খুব ঠাণ্ডা।



মন্দাকিনীর ধারা

২৫শে মে প্রাতে আমরা যাত্রা করলাম বাবা কেদারনাথ পুরীর পথে। ২৷৷০ মাইল দূরে চীরবাসা ভৈরব চটী—অরণ্যময় তপোভূমি। আরো ঊর্দ্ধে ১৮০ মাইল দূরে রামওয়ারা চটী। এখানে ধর্মশালা, চটী ও সদাব্রত আছে—কেদারনাথ থেকে নেমে যাত্রীরা অনেকে এসে এখানে থাকে রাত্রে শীতের ভয়ে। আরো দু'মাইল চড়াই ভেঙ্গে আমরা উঠলাম এক অত্যুচ্চ গিরিশৃংগে। সেখান থেকে দেখতে পেলাম পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে বাবা কেদারনাথের মন্দিরের ধ্বজা। মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলে গেলাম চড়াই-উৎরাইয়ের পথ ক্লেশ, ক্ষুৎপিপাসা ও শরীরের গ্লানি। কণ্ঠ হতে অজানিতভাবে উচ্চারিত হ'ল "জয় কেদারনাথের জয়।" যেদিকে দৃষ্টিপাত করলাম শুভ্র বরফশ্রেণী, ঊর্দ্ধে শুভ্র আকাশ।

এখানে আমরা ছেড়ে দিলাম যার যার যানবাহন। বরফের উপর দিয়া হাঁটতে হবে ১৷৷ মাইল—লাঠি দিয়ে চলতি পথের সন্ধান করে একটু এদিক ওদিক হ'লে পড়তে হবে খাদে। আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ হওয়াতে তাকে ও নিতে হল এক কাণ্ডী যোগে। বেলা প্রায় ৩টার সময় আমরা পৌঁছলাম বাবার ধামে—বরফাচ্ছন্ন সেতু পার হয়ে। সেখানকার রাস্তাঘাট বরফাচ্ছন্ন, ঘরের চালে বরফ—মন্দিরের উপরেও চত্বরে বরফ। ভীষণ শীত। পাণ্ডা গুরুজী আমাদের আরামের জন্য গরম জল ও অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করলেন—রাত্রে ভূরি-ভোজন ও প্রতিজনকে ৫খানি করে লেপ দিলেন কিন্তু তবুও যেন মনে হ'ল লেপের ভিতরে ঢুকেছে বরফের টুকরা।

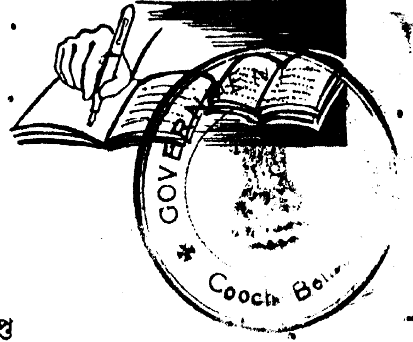
আমার স্ত্রী সেখানে পৌঁছে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কলিকাতায়

স্টকেডাস মেসার্স শরৎচন্দ্র চাটার্জি এণ্ড সন্‌স কোঃ লিঃ এর শ্রীরাধাচরণ চাটার্জির সৌজন্যে ও চেষ্টায় তিনি সুস্থ হলেন। তিনি অনেক ঔষধ পত্র সংগে নিয়েছিলেন। শ্রীচাটার্জির সংগে গিয়া দর্শন করলাম এক সাধুবাবাকে কেদারনাথের মন্দিরের পাশে। তাঁর বয়স একশত বছরের উপর এবং বাস্তবিকই একজন সাধুপুরুষ। শ্রীচাটার্জি তাঁকে কিছু মোটা টাকা প্রণামী দিয়াছিলেন, কিন্তু সাধু বাবা তাহা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনিই একমাত্র মানব যিনি প্রবল তুষারপাতের মধ্যে শীতকালেও কেদারে অবস্থান করেন।

সন্ধ্যায় আমরা কেদারনাথের আরতি ও শৃঙ্গার মূর্ত্তি দর্শন করলাম। পরদিন প্রত্যূষে আমরা পূজার দ্রব্যাদি নিয়া মন্দিরে উপস্থিত হ'লাম—একে একে যাত্রীদের প্রবেশ করবার অনুমতি দেওয়া হল। আমরা বেশ ভালভাবেই বাবার মূর্তি (বৃষের পশ্চাৎ ভাগ) দর্শন, পূজন ও গাত্রে ঘৃত লেপন করে ধন্য হলাম। কেদারনাথের মন্দিরটি অপূর্ব দর্শনীয়। বিশেষত এবারে মন্দিরের চূড়ায় ও গায়ে বরফাচ্ছন্ন থাকায় আরো রমণীয় দেখাচ্ছিল। কিম্বদন্তী পাণ্ডবগণ এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন—প্রথম দালানের চারিদিকে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তি। বামদিকে নরনারায়ণ এবং মধ্যে গরুড় ও ষাঁড়। দ্বিতীয় দরজায় দক্ষিণে পার্ব্বতী দেবী ও বামে লক্ষ্মীমূর্তি। পাণ্ডবগণ কেদারনাথকে পূজা করে গুরুহত্যা ও জ্ঞাতি হত্যার পাপ স্খালন করেন, এখান হ'তে দু'মাইল উত্তরে স্বর্গারোহণী এবং ব্রহ্ম গুহায় যজ্ঞান্তে তাঁরা স্বর্গারোহণ করেছিলেন বলে প্রবাদ। কেদারশিখর সমুদ্রগর্ভ হ'তে ১১,৫০০ ফিট উঁচু—শীত অসহ্য। অধিকাংশ যাত্রীরা সেই কারণে এখানে রাত্রিবাস করেন না—দিবাভাগে পূজান্তে ৩ মাইল নীচে রামওয়াড়া চটীতে গিয়া রাত্রিযাপন করেন। ধর্মশালা, কালীকমলীর ছত্র ও কয়েকখানি দোকানপাট। খাদ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্য, কিন্তু প্রকৃতির তীব্রতা, মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ও বাবার দর্শন যাত্রীর হৃদয়ে জাগ্রত করে স্বর্গীয়ভাব—সাধনার চরম চরিতার্থতা। মাথা নত করে যুক্ত করে উচ্চারিত হয়—

হর শম্ভো মহাদেব, বিশ্বেশং হরবল্লভম্।
শিব শঙ্কর সর্ব্বাত্মাং, নীলকণ্ঠ নমোঽস্তুতে ॥
কর্পূর গৌরং করুণাবতারম্, সংসার সারং ভুজগেন্দ্রহারম্।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দম্, ভবং ভবানী সহিতং নমামি ॥

অনুবাদ সাহিত্য



ঝড়

ডেভিড পিনস্কি

অনুবাদ—দীপক সেনগুপ্ত

আকাশের গায়ে কাল মেঘ জমে ওঠে ; পুরু ঘন থাক-থাক কালো মেঘ, যা ঝড়ের সঙ্কেত আনে। সহরের শেষ সীমানায় যেখানে ঐ ঘন অরণ্যের সুরু, তারই মাথায় জমে ছিল টুকরো টুকরো কালো কয়েকটা চাপ চাপ মেঘ ; নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছিল ওগুলো। তারপর কোন এক সময় যে ওগুলো ধীরে ধীরে এক হয়ে যায়, তা কেউই হয়ত লক্ষ্য করেনি। অরণ্যের ওপাশ থেকে তারপর আরও কয়েকটা এসে জড় হয়, তারপর আরও ; এমনি করে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে। আপনার পরিসর বিস্তার করে ঐ ক্ষুদ্র মেঘ শিশু। তারপর এক সময় সহসা এক দুরন্ত দৈত্য যেন আপনার প্রচণ্ড শক্তিবলে পাঠিয়ে দেয় ওগুলোকে সহরের ওপরে ; সারাদিন ধরে সুরু হয় ঐ দুরন্ত দৈত্যের দুরন্ত উৎপাত।

সমস্ত সহরটিকে কে যেন এক কালো চন্দ্রাতপের আবরণে ঢেকে দেয়, আর তারই তলায় সুরু হয় প্রচণ্ড ধূলি-ঝটিকার অবিশ্রান্ত আক্রমণ। দুর্ব্বল গৃহগুলো সে আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে ভূমি শয্যা গ্রহণ করে। বড় বড় বৃক্ষগুলো সমূল উৎপাটিত হয় সেই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে। আজ সপ্তাহের সপ্তম দিনটিতে, নিজের কৃত কর্ম্মের অনুশোচনা আর বিশ্রামের দিনটিতে গভীর স্তব্ধতার সঙ্গে যেন সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছে এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ।

সমস্ত সহরের অধিবাসীরা যেন এক অনাগত বিপদের আশঙ্কায় মূক হয়ে গেছে। উজ্জ্বল, পরিষ্কার দিবালোক পরিণত হয়েছে রাত্রির ঘনকৃষ্ণ কালিমায়, কোন এক পিশাচসিদ্ধ যাদুকরের নিষ্ঠুর সঙ্কেতে।

সহরের অধিবাসীরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দরজায় খিল তুলে দেয় ; ওদের জানালাগুলো সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ ঘরের মধ্যে নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য দুঃখিত ইহুদির মুখ আরও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, মন্ত্রপাঠকের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে আরও করুণ।

বাইরের আঁধার প্রতি মুহূর্ত্তে আরও গাঢ় হয়ে ওঠে ; বৃদ্ধা কেনী নিজের ধর্ম্মপুস্তক থেকে মুখ তুলে তাকান। পুরু চশমার কাঁচের মধ্য দিয়ে, জানালার সার্শির ভিতর দিয়ে বাইরের দুর্য্যোগের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। অন্তরের গভীর অন্তস্থল থেকে নির্গত হয় হতাশাপূর্ণ গভীর দীর্ঘশ্বাস। ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন তিনি ; তাঁর সমস্ত অন্তরটি ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রতি এক অসীম বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

আকাশের অবস্থা দেখে সন্দেহ হয়, এ দুর্য্যোগ শীঘ্র থামবে কিনা। আকাশের বুকে এখনও সমানে চলেছে মেঘের শোভাযাত্রা ; বাতাসের গর্জ্জনে সমস্ত সহর থরথর করে কেঁপে ওঠে ; প্রচণ্ড ধূলি-ঝটিকা এখনও জানালার গায়ে সমানে আঘাত করে চলেছে ; ঝন ঝন করে কেঁপে কেঁপে উঠছে জানালার সার্শিগুলো।

এ অবস্থায় ধর্ম্মপুস্তকে মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। ধীরে চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে দুই পাতার মধ্যে রেখে প্রার্থনাপুস্তকটি বন্ধ করে দেন। তারপর নিজের জায়গা থেকে উঠে পাশের ঘরে প্রবেশ করেন ; এঘরে তাঁর মেয়ে থাকে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করেন বৃদ্ধা—কেনী, তুই যেন তখন কি…

কিন্তু প্রশ্নটাকে শেষ করতে পারেন না; যাকে উদ্দেশ্য করে বলা সেই তখন ঘরে নেই।

বৃদ্ধা আশ্চর্য্য হয়ে ঘরের চারিদিকে তাকান; রান্না ঘরটা একবার ভাল করে দেখে নেন, তারপর আবার নিজের ঘরে ফিরে আসেন। তন্ন তন্ন করে চারিদিক খোঁজেন বৃদ্ধা; না, ওর মাথার টুপিটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কম্পিত হস্তে ওর পোষাকের বাক্সটি খোলেন। না ওর জ্যাকেটটাও নেই।

ও চলে গেছে! আজকের পবিত্র দিনটিতে অন্ততঃ বেরোতে নিষেধ করে ছিলেন। তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও পালিয়েছে। পালিয়েছে সেই বিধর্মী কলেজ-পড়ুয়া ছোঁড়াটার কাছে।

ওঁর বলীরেখাঙ্কিত মুখখানা কাল আকাশের মতই থম থম করে ওঠে। বাইরের প্রচণ্ড ঝড় যেন ওঁর বুকের ভিতরও তোলপাড় করে ফেলে। নিজের প্রচণ্ড ক্রোধ কমাবার জন্য ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করেন, দেওয়ালের গায়ে আঘাত করেন, টেবিলের ওপর রাখা কি একটা জিনিষ যেন মেঝের ওপর আছড়ে ভেঙে ফেলেন।

কালো আকাশের দিকে দুহাত তুলে অভিশাপ দেন বৃদ্ধা। ও মেয়েতে আমার কোন প্রয়োজন নেই, ও মরুক, ও মরুক।

আজকের এই পবিত্র দিনটিতে এমন ভয়ানক একটি অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করতে বৃদ্ধার হৃদয় বারেকের জন্যও কেঁপে উঠল না। অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তে যে কোন ভয়ানক অভিশাপ বাণীই উচ্চারণ করতে পারেন তিনি। মাথার সমস্ত চুলগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, পারেন নিজেই নিজের মুখে আঘাত করতে।

সহসা এক সময় নিজের শালটি দিয়ে মাথার ওপর ঢেকে দেন, তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আজই ওদের দুজনকে খুঁজে বার করবেন; এর একটা শেষ দেখে ফিরবেন, নইলে নয়।

এক ঝলক বিদ্যুত বাঁকা তলোয়ারের মতই কালো মেঘের রাশকে ফালফাল করে দেয়। কামান নির্ঘোসের মত প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি আকাশের বুককে করে দেয় বিদীর্ণ।

সহরের অধিবাসীরা কোন্ এক অজানিত আশঙ্কায় থরথর করে কেঁপে ওঠে। আজকের এই পবিত্র দিনটিতে একি দুর্য্যোগ! দুহাতের মধ্যে মুখ গুঁজে ওরা বিড় বিড় করে মন্ত্রপাঠ করে চলে; পরম পবিত্র মন্ত্র, —যা সর্ব্ব বিপদকে দূরে রাখে, সর্ব্ব ভয়কে নাশ করে।

বৃদ্ধা কেনী এসব কিছুই লক্ষ্য করেন না; লক্ষ্য করার সময়ই বা তাঁর কোথায়?

বাতাস আর প্রচণ্ড ধূলি-ঝটিকা, তাঁর দুচোথ অন্ধ করে দেয়; চোখের কোল দুটো করকর করতে থাকে; মাথার উপর দিয়ে জড়ান শালটা সহসা এক প্রচণ্ড ঝাপটায় কয়েকহাত দূরে চলে যায়, জামাটার ভিতর বাতাস ঢুকে প্রকাণ্ড এক বেলুনের মতই ফুলে ওঠে সেটা।

সমস্ত কিছু তুচ্ছ করেই এগিয়ে চলেন বৃদ্ধা। কোন কিছুই তাঁকে বাধা দিতে পারে না, বাতাসের প্রচণ্ড গর্জ্জন তাঁর কানে আসেনা, ধূলিঝটিকা তাঁর দুচোথ অন্ধ করে দিয়েও পরাজয় স্বীকার করে। তাঁর বুকের ভিতর যে প্রচণ্ড ঝড়ের অবিরাম সংগ্রাম চলেছে সেটাই তাঁকে ঠেলে নিয়ে যায়। তাঁর অন্তরের পুঞ্জীভূত ক্রোধ এসে জমা হয় তাঁর দুই চোথে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তকণিকায় চোথ দুটো হয়ে ওঠে রক্তিম।

সহরের অধিবাসীরা ভীত হয়ে ওঠে; জানালার সার্সির ভিতর দিয়ে বিস্ময় সচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকে এই ধূলিধূসরিত অপার্থিব মানুষটির দিকে। কিন্তু বৃদ্ধা এসব কিছুই লক্ষ্য করেন না। তাঁর অন্তরের প্রতিটি চিন্তা তাঁর অভিশাপ। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সাগরের মতই তাঁর সমস্ত অন্তরটি হয়ে উঠেছে তরঙ্গসমাকুল। বিষাক্ত অভিশাপ আর ক্রোধের সবুজ বিষে উত্তলিত হয়ে ওঠে ফেনিল জলোচ্ছ্বাস।

সহসা বৃদ্ধা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। সামনেই সেই বিধর্মী ছেলেটির বাড়ী। তারপর প্রচণ্ড ঝড়ের বেগেই প্রবেশ করেন বৃদ্ধা। এক ভীষণ শব্দে কবাটখানা দুদিকে আছড়ে পড়ে। ভিতরের অধিবাসীরা এই অভাবিত ব্যাপারে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে; মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ওঠে একটা ছেলে। মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে সকলে। এক ক্রুদ্ধ সর্পের কুটিল দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেন বৃদ্ধা। পরক্ষণেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করেন। নাঃ এ ঘরেও নেই। পায়ের কাছে কি একটায় যেন বাধা লাগে। দূরে লাথি মেরে সরিয়ে

দেন সেটাকে। এমনি ভাবে প্রতিটি ঘরের মধ্যে ঝোড়ো বাতাসের মতই তছনছ করে ঘুরে বেড়ান বৃদ্ধা।

নাঃ, এখানে কোথাও নেই, কোথাও নেই। তবে কোথায় গেল সে দুটো। বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এসে সহসা থমকে দাঁড়ান বৃদ্ধা। ক্রোধ-কুটিল ঘূর্ণায়মান চোখ দুটো বাড়ীটির সর্ব্বাঙ্গে বুলিয়ে আকাশের দিকে দুহাত তুলে চীৎকার করে অভিশাপ দেন, আগুন ধরে যাক, বজ্রপাত হোক। হে ভগবান যদি তুমি সত্যিই থাক, যেন পুড়ে ছারখার হয়ে যায় এ শয়তানের আড্ডা।

বৃদ্ধা চলে যান। বাড়ীর দরজাটি সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়। বাড়ীর অধিবাসীরা বিস্ময় আর আতঙ্কে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যায়।

তারপর···তারপর ঝড়ের সঙ্গে নেমে আসে বড় বড় জলের ফোঁটা। আকাশের বুকে জমে থাকা মেঘের রাশ যেন গলে গলে নেমে আসে। শুধু বৃষ্টিই নয়, শুরু হয় শিলা ঝটিকা। বড় বড় শিলাগুলো প্রচণ্ড বেগে নেমে এসে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়ে। তপ্ত ধরণী শীতল হয়, কিন্তু বৃদ্ধার ক্রোধ তাতে শীতল হয় না।

যেখানে ওদের থাকা সম্ভব তার প্রতিটি জায়গাই অন্বেষণ করেন বৃদ্ধা; পাগলা কুকুরের মতই ছুটে বেড়ান প্রতিটি কোণে কোণে। যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক বৃদ্ধা ওদের খুঁজে বার করবেন।

বিড়বিড় করে অভিশাপ দিয়ে চলেন বৃদ্ধা। কুঞ্চিত দুই ঠোঁটের কোলে পুরু হয়ে ফেনা জমে ওঠে।

সমস্ত জায়গা খোঁজা শেষ হলে বৃদ্ধা থমকে দাঁড়ান। আর কোথায়? আর কোথায় ওদের পাওয়া সম্ভব?

গৃহ অভিমুখে ফিরে চলেন বৃদ্ধা; হ্যাঁ তাঁর মন বলছে ও এবার বাড়ী ফিরেছে। ওকে বাড়ীতেই পাওয়া যেতে পারে।

বাতাসের সুতীব্র চীৎকারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের অত্যুজ্জ্বল আলোক রেখার মধ্য দিয়ে বজ্রের প্রচণ্ড নির্ঘোষের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধা গৃহে ফিরে চললেন।

কিন্তু ও এখনও ফেরেনি।

হতাশ হয়ে একটা চেয়ারের মধ্যে বসে পড়লেন, তারপর দু-হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে শিশুর মতই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা কেনী।

সহসা কোথায় যেন একটা ভীষণ শব্দে বজ্রপাত হয়। থর থর করে কেঁপে ওঠে চতুর্দ্দিক। সমস্ত প্রকৃতি যেন নিজেই নিজের ক্ষমতায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সহরের অধিবাসীরা জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে নেবার চেষ্টা করে কোন ক্ষতি হল কিনা। মন্ত্রপাঠকারী তার প্রার্থনা-পুস্তকের মধ্যে মুখটাকে গুঁজে দেয়। বিড়বিড় করে মন্ত্র পাঠ করে চলে; ওর গলার স্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বৃদ্ধা কেনীর কানে কি সেই ভীষণ শব্দ প্রবেশ করেছিল? বোধ হয়না। তখনও তিনি ছোট শিশুর মতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। সহসা তিনি রাগে, দুঃখে অপমানে চীৎকার করে উঠলেন। ও মরুক, মরুক। ওর মরা দেহটা লোকে আমার কাছে নিয়ে আসুক। হে ভগবান ওর মরা মুখ যেন আমি দেখি।

মেঘেরা করতালি দিয়ে ওঠে বজ্রের ধ্বনিতে, ঝোড়ো বাতাস যেন খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ওঠে তার সুতীব্র চীৎকারে।

সহসা তিনি চেয়ার থেকে উঠে পড়েন; তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসেন। ঝোড়ো বাতাস প্রচণ্ড বিক্রমে কখনও তাঁকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়, কখনও বা পোষা কুকুরটির মতই তাঁকে অনুসরণ করে।

বৃদ্ধা দৌড়াচ্ছিলেন; দৌড়াচ্ছিলেন সহরের শেষ সীমান্তে নতুন যে পীচ-বাঁধানো সড়ক বেরিয়ে গেছে অরণ্যের গা ছুঁয়ে সেই দিকে। সহসা তাঁর মনে পড়ে গেছে, ঐ রাস্তাটা খুঁজে দেখা এখনও বাকী রয়ে গেছে; আর ওরা ওখানে মাঝে মাঝে গিয়েও থাকে।

সরু সরু আঁকাবাঁকা গলির মধ্য দিয়ে বৃদ্ধা ছুটে চলেন। গাড়ী বারান্দার নীচেকার আশে পাশে, কোন খোঁজের আশ্রয়প্রাপ্ত কুকুরগুলো সচকিত হয়ে ওঠে তাঁর দ্রুত পদধ্বনি শুনে। তারা দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে। কেউ কেউ দীর্ঘ লাফ দিয়ে রাস্তা পর্য্যন্ত তাড়া করে আসে। বৃদ্ধা কিন্তু এসব লক্ষ্যও করেন না। একটা কুকুর তাঁর ভিজে সপসপে পোষাকের পিছনটি কামড়ে ধরে; কিন্তু বৃদ্ধার প্রচণ্ড টান সহ্য করতে না পেরে নিজেই শেষ পর্য্যন্ত ছেড়ে দেয় কিছুদূর গিয়ে।

অবশেষে বৃদ্ধা গিয়ে পড়েন সহরের শেষ সীমানায় যেখান থেকে নতুন পীচ-ঢালা রাস্তার সুরু। এখানে

বাতাসের বেগ আরও তীব্র। বাধাবন্ধহীন বাতাস এখানে প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে। বজ্রের শব্দ এখানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে দূর দূরান্তে মিলিয়ে যায়। বৃদ্ধা কোন দিকেই তাকান না। বৃষ্টি ঝরা ধূসর অস্পষ্টতার মধ্যে, সম্মুখের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে ছুটে চলেন বৃদ্ধা কেনী।

পথ কিন্তু পরিষ্কার নয়; অসংখ্য পাতা আর ছোট বড় মাঝারি ডালের তলায় হারিয়ে গেছে কালো মসৃণ অজগরের মত রাস্তাটা; দু একটা বড় বড় গাছও পড়ে আছে সমস্ত রাস্তাটা জুড়ে আড়াআড়ি ভাবে।

'কিন্তু এত বজ্রপাতের মধ্যেও কি ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তার মধ্যে'—বিড়বিড় করেন বৃদ্ধা। তাঁর ভিতরের অন্তরাত্মা সহসা যেন আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে। কিন্তু কেন এমন হয় ভেবে পান না বৃদ্ধা।

বৃদ্ধা ছুটে চলেন, যত জোরে সম্ভব। সহসা এক সময় থমকে দাঁড়ান। সামনেই কয়েক হাত দূরে ধূসর অস্পষ্টতার মধ্যে কি যেন একটা দেখতে পান।

জমে ওঠা ঝরা পাতায় জায়গাটা উঁচু হয়ে উঠেছে। তারই ওপর লুটিয়ে পড়েছে দুটো দেহ। একটা পুরুষ, একটা স্ত্রী। মুখ দুটো বীভৎস বিকৃত হয়ে উঠেছে। সমস্ত দেহটা কুঁকড়ে আছে। কালো মাটীর মতই ওদের মুখের রঙ। কেমন যেন একটা পোড়া গন্ধ বৃদ্ধার নাকে এসে লাগে। বজ্রাঘাতে দগ্ধ হয়েছে দেহ দুটো।

সহসা বিদ্যুতের আলো কালো মেঘের বুকে কতক-গুলো বিচিত্র আঁকা-বাঁকা রেখায় ছড়িয়ে পড়ে। একটা অত্যুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে চতুর্দ্দিক।

নিজের মেয়েকে চিনে ওঠেন বৃদ্ধা কেনী। কিন্তু মুখ দেখে নয়, তার পোষাক দেখে। অমন সুন্দর টানাটানা চোখ, অমন কালো চোখের তারা, কোঁকড়ানো একরাশ সোনালী চুল, কিছুই নেই। মেয়েটার এক হাত সেই বিধর্মী ছেলেটির পিঠের তলা দিয়ে জড়ান। ছেলেটার হাতের ছাতাটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

বৃদ্ধার বুকের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গমালা আছড়ে আছড়ে পড়তে থাকে। কণ্ঠ দিয়ে কি এক অভিশাপ বাণী নির্গত হতে গিয়েও সহসা আটকে যায়।

তাঁর চোখের সামনে সমস্ত যেন কালো হয়ে আসে। মাথার মধ্যে কে বুঝি গলিত সিসা ঢেলে দেয়। তাঁর ভিজা পোষাকটা যেন অসম্ভব রকমে ভারী হয়ে তাঁর সমস্ত দেহটাকে মাটীর মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। চোখের পাতা দুটো ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে।

বিদ্যুতের ঝলকে, বজ্রের প্রচণ্ড শব্দে সমস্ত আকাশ যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে।

বৃদ্ধার অন্তরের সমস্ত ঝড় যেন সহসা স্তব্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে জানু দুটো মাটীতে রেখে কন্যার পাশেই বসে পড়েন, কম্পিত হাত দুটো দিয়ে কন্যার দেহটিকে জড়িয়ে ধরেন; তাঁর চোখের তারায় একটা প্রদীপের মৃদু শিখা যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

তাঁর সমস্ত দেহটি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে; দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ লাগে।

সহসা এক কম্পিত ভগ্ন কণ্ঠস্বরে চীৎকার করে ওঠেন বৃদ্ধা কেনী।

—কেনী, সোনা আমার; আমার দুষ্টু মেয়ে, আমার লক্ষ্মী মেয়ে।



মেয়েদের কথা



অভিশপ্ত নারী

কুমারী জ্যোৎস্নারাণী দত্ত কাব্যভারতী

অভিশপ্ত নারী! বিংশ শতাব্দীর বিশেষতঃ এই বাংলা দেশের নারীজন্ম অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়!

একমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমরা এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই। তাঁরা নারী জাতিকে পুরুষের উপর অধিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। সেই জন্যেই বুঝি নারীকে পুরুষের দক্ষিণভাগে উপবিষ্ট হ'বার অধিকার দিয়ে গিয়েছেন।

প্রাচীনকালে মুনিঋষিরাও নারী-জাতিকে শক্তিভূতা সনাতনী রূপেই শ্রদ্ধা করতেন। তারা মনে করতেন সতী সাবিত্রী দময়ন্তীরই শুধু অংশভূতা এঁরা নয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়েরও অধিকারিণী এই নারী! তাঁরা নারীকে বিভিন্ন-রূপে কল্পনা করেছেন।

নারী বাল্যে সদ্যস্ফুট তরল হাস্যময়ী ক্রীড়ারতা গৌরী, কৌমার্য্যে দ্বাদশী কৌমুদীময়ী চাপল্যক্লান্তা ব্রীড়ানম্রা উমা-প্রতিমা, যৌবনে উচ্ছল জল কল্লোলময়ী অলকানন্দার ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, প্রৌঢ়ে স্নেহ করুণার পূত-নির্ঝরিণী বিশ্বপালিনী গণেশজননী এবং বার্দ্ধক্যে লোল চর্ম্মাবশেষা চিত্তবিভ্রমকারিণী জরতী ভীমা ধূমাবতী!

কিন্তু যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে সব কিছুরই আজ পরিবর্ত্তন হ'তে চলেছে। শুধু তাই নয়—আবহমানকাল হ'তে পুরুষ ও নারীর ভেতর যে সাধারণ পার্থক্যটুকু চলে আসছিলো আজ তার পেছনেও দেখি এক বিরাট স্বার্থ-পরতা।

স্নেহের সঙ্গে স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নেই একথা আজও যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা অন্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিবাদ হয়তো আসবে, কিন্তু তার প্রত্যুত্তরে আমিও বলতে চাই—একই ভালোবাসা, একই রক্তের সম্মিলনে ভূমিষ্ঠ হয় ছেলে কিম্বা মেয়ে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সেই ভাবী সন্তানের মাতা পিতা উভয়ে একবাক্যে ভগবানের কাছে আকুলভাবে নিবেদন জানান—শুধু তারাই বা কেন—মাসী-পিসী হ'তে সুরু করে পাড়া-প্রতিবাসী, অতিথি-ভিখারী পর্য্যন্ত কামনা করেন—আহা মেয়ে না হয়ে যেন একটা ছেলে হয়! তাদের এই আগ্রহ এতদূর স্পর্দ্ধাসূচক যে ভগবানের ওপর কলম চালানোর ক্ষমতা যদি তাদের থাকতো তাহলে বুঝি আর কথা ছিলোনা। কিন্তু কেন?

যথাকালে ছেলে কিম্বা মেয়ে ভূমিষ্ঠ হোলো। অমনি শঙ্খধ্বনি! মেয়ের অভিনন্দনে তিনবার শাঁখ বাজলো-আর ছেলের বেলায় সাতবার অনেক স্থানে একুশবার পর্য্যন্ত। পাড়া প্রতিবাসী সবাই সেই শঙ্খধ্বনির অঙ্ক গণনা করে বুঝতে পারলো নোতুন অতিথিটি কে? যদি মেয়ে হয়, পাড়া প্রতিবাসীতো দূরের কথা, বাপের বুকও দমে যায়, আত্মীয়স্বজনও মন্তব্য করতে থাকেন—আহা তবুও যদি ছেলেটা হোতো! আর যদি ছেলে হোলো বাপের বুক একেবারেদশহাত! অন্যান্য মঙ্গলাকাঙ্খীরাও হৈ হৈ করে উঠলো—আহা বেশ হয়েছে, বেঁচে থাক! অর্থাৎ মেয়ে হ'লে তার মৃত্যুই ভালো ছিল। জন্ম হ'তে এই যে স্বার্থপরতা ও পার্থক্যের সূচনা—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিমাণও বাড়তে থাকে। ছেলে যা কিছুই করুক না কেন তাই শোভনীয়, আর মেয়ের এতটুকুতেই এতটা, যেহেতু সে মেয়ে। কথায় বলে—"মেয়ে মেয়ে মেয়ে তুষ করলো খেয়ে।"

এরপর শিক্ষাব্যাপারেও এই স্বার্থপরতা প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হয়। ছেলেটি নেহাৎ হাবাগোবা কিম্বা নিরেট গণ্ডমূর্খ হ'লেও তার পেছনে ব্যয় করার প্রতি পিতা-মাতার এতটুকুও কৃপণতা নেই। কিন্তু আজ হোক কাল হোক মেয়েকে যখন বিয়ে দিয়ে পরের ঘরে পাঠাতেই হবে তখন আর তার পেছনে অযথা কতকগুলো টাকা অপব্যয়

করে লাভ কী আছে? একটি মুহূর্ত্তের জন্তেও তাঁরা ভেবে দেখতে চাননা যে বিয়ের অল্প কিছুদিন পর কয়েকটি শিশুসন্তান রেখে যদি তার স্বামী দেবতাটি ইহলোক ত্যাগ করেন তখন তার অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! সামান্য কিছু শিক্ষা থাকলে তবুও যাহোক্ হস্‌পিট্যালের নার্স, শিক্ষয়িত্রী অথবা ঐ ধরণের একটা কিছু করে অনাহারের কবল হ'তে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা নারীর ঐ অবস্থায় বেঁচে থাকা মৃত্যুরই নামান্তর!

এছাড়া বিবাহ ব্যাপারেও আমরা যে স্বার্থপরতা দেখতে পাই তা মনে রাখবার মতই বটে। ছেলের বিয়েতে পিতামাতা তো দূরের কথা, আত্মীয় স্বজনেরও বুঝি আনন্দের সীমা থাকে না। অকারণ একটা হৈ-হল্লা বাধিয়ে নিয়ে পাড়া প্রতিবাসী এমন কী ছেলেবুড়ো সবাই ছুটে আসে সেই আনন্দের অংশীদার হ'য়ে। কিন্তু মেয়ের বিয়েতে শোনা যায় পিতা মাতা নাকি পাগল হ'য়ে গিয়েছেন। অনেক স্থলে পিতা তাঁর কন্যাকে পাত্রস্থ করতে নাকি বাস্তুহারাও হ'য়ে পড়েন। কথাটি হয়তো একেবার অমূলক নয়। কিন্তু আমি জান্‌তে চাই—এর জন্তে দায়ী কী এই বাংলার মেয়ে—না সমাজ তথা সামাজিক ব্যবস্থা? কন্যাকে পাত্রস্থ করতে যে পণ প্রথার উদ্ভব হয়েছে তার জন্তেও কী দায়ী এই বাংলার নিরীহ মেয়ে জাতি? একটু চিন্তা করলে আরও আশ্চর্য্য হ'তে হয়, —যূপকাষ্ঠের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া ছাগশিশুর মত একটি উচ্চশিক্ষিতা মেয়েকে একরকম টেনে হেঁচড়ে একটি পুরুষের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিতে বাধ্য করার বিধান এই সমাজে আছে, কিন্তু একটি অশিক্ষিতা মেয়েকে কোন্ শিক্ষিত পুরুষের বিয়ে করা চলবে না। ওতে নাকি সংসার-যাত্রার পক্ষে ব্যাঘাত হয়। সোজা কথায়—অশিক্ষিত স্বামীকে নিয়ে শিক্ষিতা স্ত্রী অবাধে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে যেতে পারে; কিন্তু যত বাধা, বিঘ্ন ও অশান্তি অশিক্ষিতা নারীকে নিয়ে। এই তো সমাজ আর সামাজিক ব্যবস্থা! এর ওপর ভিত্তি করে বাংলার মেয়েদের ওপর আজও যে অকথ্য নির্য্যাতন চলছে তা ভাষায় প্রকাশ করা চলে না। অবশ্য তাদের চোখের জলে একদিন যে এদেশে বিপ্লবের সৃষ্টি হবে তার আভাষ যেন এখন থেকেই স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। তাছাড়া হিন্দুদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'মনু'ও বলেছেন—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে নান্দন্তে তত্র দেবতাঃ

যত্রৈ তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাকলাঃ ক্রিয়াঃ।

অর্থাৎ যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই—স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারে, সে দেশে উন্নতিরও আশা নেই!

শিক্ষয়িত্রীর জ্ঞাতব্য

অঞ্জলি চক্রবর্ত্তী বি-এ, বি-টি

পৃথিবী দ্রুততালে, প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে—সঙ্গে নিয়ে চলেছে মানুষের জটিলতর জীবনকে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক পরিবেশ মানুষের জীবনে এনেছে নানা সমস্যা। এই সমস্যার সঙ্গে যুঝ্‌তে নারীকেও শান্তিপূর্ণ গৃহ পরিবেশ হতে বের হয়ে জীবিকা-নির্ব্বাহসঙ্কুল দিনে অর্থের জন্য পুরুষের পাশে দাঁড়াতে হয়েছে।

নারী আজ পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে আর্থিক জগতে এগিয়ে চলেছে। বাংলাদেশের বহুলাংশে দেখা যায় গৃহের কন্যা বা গৃহিণীরা চাকুরি করে সংসারকে সাধ্যমত সাহায্যের চেষ্টা করছেন। চাকুরীজীবী নারীদের মধ্যে শিক্ষয়িত্রীর ব্রতকে গ্রহণ করেছেন একটা বিপুল অংশ।

শিক্ষাদানের ব্রত অতি মহান সন্দেহ নেই—কিন্তু এই মহান্ ব্রতকে আমরা কতখানি সার্থক করতে পেরেছি বা পারব সেইটাই প্রশ্ন। আমার ব্যক্তিগত জীবনে সামান্য যা দেখেছি তাতে মনে হয়েছে—আমাদের ঈর্ষাকাতর পরছিদ্রান্বেষী মন এ ব্রতকে পঙ্কিল হ'তে পঙ্কিলতর করে তুলেছে। আমরা আজও নিজেদের যথেষ্ট উন্নত করে তুলতে পারিনি।

বর্ত্তমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক্। সেখানে মোটামুটি সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় আলোক প্রাপ্তা। কিন্তু বিদ্যালয় পরিবেশে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। সেখানে কি পাই? কেবল ঈর্ষা,

পরনিন্দা অপরকে অপদস্থ করার কুটীল চিন্তা। শিক্ষয়িত্রী মণ্ডলীর মধ্যে একাধিক দল। একদল সহ্য করতে পারেন না অপর দলের ছাত্রীপ্রিয়তাকে। একের পদোন্নতি অপরের ঈর্ষা ছাড়া আর কোনকিছুই বাড়ায়না। এ অভিজ্ঞতা যে কেবল আমার কর্মজীবনেই তা নয়—ছাত্রীজীবনেও এটা দেখেছি। বিভিন্ন স্কুলের বান্ধবী কর্মীদের কাছ হতেও এই একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনেছি। আমাদের মনে এই নীচতা কেন?

বিদ্যালয়ের কমনরুমে যখন আলোকপ্রাপ্তা উন্নাসিক শিক্ষয়িত্রীমণ্ডলী সমবেত হন—বেশ লাগে দেখতে। সেখানে সকলে আনন্দ সহকারে কোন বিষয়ের আলোচনা করলে জ্ঞানমুখী হবে সে আলোচনা সন্দেহ নেই। এতে একদিকে সুযোগ রয়েছে যেমন মনের উদারতার, অপর দিকে রয়েছে জ্ঞানের বিস্তৃতির—কিন্তু কি পাই কমনরুমে? —জনকয়েক শিক্ষয়িত্রী এক একটা দলের সৃষ্টি করে নীচু-পণায় (সময় বিশেষে উঁচু-পণায়) গল্প করে চলেছেন আপন আপন শাড়ী, গহনা বা মহত্বের। কেউ কেউ নীরবে তাকিয়ে রয়েছেন বাইরে—কাল হয়ত সেই নীচু-পণার আলোচনায় ছিলেন। যিনি আরও সজাগ একমনে ছাত্রীদের খাতা কেটে চলেছেন। এই কি আমাদের শিক্ষার প্রকাশ?

শিক্ষার জন্য আমরা দম্ভ করি—কিন্তু প্রতিটি আচরণে অবমাননা করে চলেছি সেই শিক্ষার। আমরা মুখে অনেক বড় বড় কথা আওড়াই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভুলে যাই আমাদের আদর্শকে। শিক্ষকতার আদর্শ অতি উচ্চ আদর্শ। জ্ঞানের প্রদীপ হাতে ভবিষ্যতের পথকে আলোকিত করে তোলার ব্রত আমরা নিয়েছি। এ দায়িত্ব বিরাট-মহান। কিন্তু যাঁর হাতে প্রদীপ তিনি যদি কেবল হাতের আড়াল ক'রে পথ চলেন তবে প্রদীপ কতটুকু সার্থকতা পাবে? আজ স্বাধীন-ভারতকে গড়ে তুলতে এ দায়িত্বকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হবে—এখানে স্থান নেই ঈর্ষার, স্থান নেই কোন মানসিক গ্লানির। মন এখানে উদার, জ্ঞান এখানে অপর্যাপ্ত আচরণ এখানে অনাবিল। তবেই সার্থক হবে শিক্ষয়িত্রীর জীবন—উজ্জ্বল হবে ভারতের ভবিষ্যত।



চিংড়ির কাটলেট

চিংড়ি, বড় পোনা আর ভেটকি মাছই সাধারণতঃ কাটলেটের পক্ষে উপযোগী। গলদা চিংড়ির কাটলেট সব চেয়ে ভালো হয়। সমান সাইজের কয়েকটি গলদা চিংড়ি এনে দাঁড়া প্রভৃতি ফেলে দিয়ে মাথাটা কেটে রাখতে হবে, লেজের উপর অংশের খোসাটা ফেলে দিয়ে ভেতরের অংশটা নিতে হবে। তারপর একখানি ধারালো ছুরি দিয়ে মাছগুলো লম্বালম্বি ভাবে এমনভাবে চিরতে হবে যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। চিরলে দেখা যাবে ভিতরে কালো সুতোর মত একটা জিনিষ। সেটা ফেলে দিয়ে আবার ছুরি দিয়ে মাছগুলো পাতলা করে কেটে নিতে হবে। এ সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রত্যেকটা অংশ প্রত্যেকটার সঙ্গে যুক্ত থাকে। এরও অংশগুলো লম্বা হবে। এর পর এই মাছে নুন, লঙ্কাবাটা, হলুদ বাটা, আদাবাটা, পিঁয়াজবাটা বা তার রস মাখিয়ে অথবা দই বা ডিমের তরল অংশে ঐ মসলা বেশ করে গুলে নিয়ে তার মধ্যে মাছ ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ভেজে নিলেই চিংড়ির কাটলেট হয়ে গেল।



তীতু মীর

শ্রীঅশোককুমার মুখোপাধ্যায়

বীর-প্রসবিনী বসিরহাটে বিপ্লবের প্রথম বর্তিকা-বহনকারী তিতু মীরের বীরত্বকাহিনীর একটী বিবরণী বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি। তীতু মীর প্রকৃত প্রস্তাবে একজন ওহাবি-সম্প্রদায়ভুক্ত বীর সন্তান ও স্বদেশ-প্রেমিক হইলেও, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত মসীলিপ্ত করিয়া অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত এই বিপ্লবী-বীরের একটী ঐতিহাসিক জীবনী বিরচিত হয় নাই।

স্বনামধন্য মুরশিদ কুলী খাঁর শাসনকালে বঙ্গে যে উন্নতি ও শান্তি দেখা গিয়াছিল, তাঁহার পরবর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দিন খাঁর সময় হইতে তাহার অবনতি দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার পরে সরফরাজ খাঁ নবাব হইয়া রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রতাপাদিত্যের পরলোক-গমনের পর তৎ-পিতৃব্যপুত্র চাঁদ রায়ের ২-জন পৌত্র নীলকণ্ঠ ও শ্যামসুন্দর উভয়েই যশোহর-চ্যূত হইলেন। দেশের সামাজিক ব্যবস্থা তখন অত্যন্ত শিথিল। ফৌজদার মুরুলা খাঁর দেওয়ান রামভদ্র রায়ের পুত্র পুঁড়াবাসী রুদ্রদেব রায় নীলকণ্ঠের পুত্র মুকুন্দদেবকে সমাজপতি খাড়া করিয়া ও নিজে তদধীনে নায়েব গোষ্ঠীপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে সমাজ স্থাপন করেন তাহা যমুনা-ইছামতীর বাম বা পূর্ব্বতটবর্ত্তী পুঁড়া হইতে শ্রীপুর পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। অপর দিকে টাকীর কৃষ্ণদাস চৌধুরীর সন্তানগণ বিপুল বিত্তশালী হইয়া কাটুনিয়া নিবাসী রাজা শ্যামসুন্দরের বংশধরদিগকে সমাজপতি বরণ করিয়া নিজেরা তাঁহাদের অধীনে গোষ্ঠীপতি হইয়া যমুনা-ইছামতীর অপর বা দক্ষিণ তীরে যে সমাজ গঠন করিলেন তাহারও বিস্তৃতি হইল মালঙ্গপাড়া হইতে নূরনগর পর্য্যন্ত।

দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া তখন বিষাক্ত। ওহাবি আন্দোলন তখন ক্রমেই মুসলমানদিগের মধ্যে বিশেষতঃ অশিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে সজাগ শাসকদিগের নজর উপেক্ষা করিয়া বা অলক্ষ্যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে। তাহা ছাড়া সেই সময় হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়, সেইরূপ বসিরহাট অঞ্চলে মুসলমান সমাজের মধ্যে "সরার মত" নামে একটী বিশিষ্ট সম্প্রদায় ছিল—যাহাদিগের রাজনৈতিক চেতনা ছিল সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশী। এইরূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার যুগে ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত হায়দারপুর গ্রামে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিতু মীর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা কলিকাতা রিভিউ হইতে তিতুর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহাতে তীতুর জন্মভূমির নাম দিয়াছেন চাঁদপুর। যাহাই হউক, তীতু বাদুড়িয়ার নিকট ও পুঁড়ার নিকট একটী মুসলমান-প্রধান যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও যেখানে তাঁহার বাল্য ও শৈশব কাটাইয়াছিলেন সেই অঞ্চলে 'সরার মত' প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত সরার মত প্রচারকারী মৌলবীগণের আবেদন শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানগণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। নবীন ব্রাহ্মগণ যেমন সামাজিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করা একটা গৌরবজনক কাজ মনে করিতেন, সেইরূপ সরার মতাবলম্বীগণ সামাজিক বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া বেশ কিছুটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। এই পুঁড়া অঞ্চলের মুসলমানগণ বেশীর-ভাগ ছিলেন জোলা। নবীন ব্রাহ্ম যুবকগণকে যেমন প্রাচীনপন্থী বয়স্ক হিন্দুগণ ভাল চক্ষে দেখিতেন না, ঠিক সেইরকমই রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত বয়োবৃদ্ধ মুসলমান গ্রাম্য-প্রধানগণ নবীন মুসলমান যুবকগণের সমাজ-দ্রোহিতা ভাল চক্ষে দেখিতেন না। রুদ্রদেব রায়ের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণদেব রায় তখন পুঁড়াখোড়গাছি অঞ্চলের প্রবলপ্রতাপ জমিদার। তৎকালীন ব্যবস্থা মত মুসলমান গ্রাম্য বৃদ্ধগণ জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের কাছে এই অর্বাচীন উদ্ধত ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান যুবকগণের নামে নালিশ করিলেন। জমিদারী-মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রকৃত জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তীতুকে শাসন করিতে "ভীমরুলের চাকে ঘা" দিলেন।

যমুনা ইছামতী তীরবর্ত্তী রাউখাটী এক তৎকালীন গণ্ডগ্রামে। এখানে ক্রমে ক্রমে দুইটী ফকীরের আস্তানা গড়িয়া উঠে। একটী আস্তানা হইতে তীতু মীর তাহার প্রচারকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। যুবক মুসলমানগণ সকলেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কৃষ্ণদেব রায় জমিদারের শাসনের অবসান ঘটাইবার প্রথম পরিকল্পনার চরম বিকাশ হইল হিন্দু ও ইংরাজদিগের সর্ব্বপ্রকার শাসন ও শোষণের মূলোৎপাটন করিয়া দেশে আবার মুসলমান রাজত্ব পুনঃস্থাপন করা।

এইখানে তীতুর জীবনের পূর্ব্বের ঘটনা কিছু বলা যাউক। তীতু যৌবনকালে জমিদারী সরকারে চাকুরী করিতেন। তীতু অত্যন্ত সাহসী ও অমিতবলশালী ছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তীতুকে কলিকাতায় একজন পেশাদারী পালোয়ানরূপে দেখা যায়। তাহার পর তীতু নদীয়ার এক জমীদারের অধীনে লাঠিয়ালের কর্ম্ম করিতে করিতে এক দাঙ্গার মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন ও বিচারে তাঁহার জেল হয়। কারাবাসকালে তাঁহার চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হয়। কারাগার হইতে বাহির হইয়া তীতু কোনরকমে দিল্লী গমন করেন ও ৪৯ বৎসর বয়সে, অমৃতবাজার পত্রিকার মতে দিল্লীর রাজবংশীয় কয়েকজন তীর্থযাত্রীর সহিত মক্কা যাত্রা করেন। সেখানে গিয়া তীতুর ওহাবী ধর্ম্মপ্রচারক সৈয়দ আহম্মদের সহিত দেখা হয় ও তীতু তাঁহার গুণমুগ্ধ শিষ্যে পরিণত হয়েন। মক্কা হইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া তীতু ওয়াহবী ধর্ম্মের একজন প্রচারকের কার্য্য করিতে করিতে স্বদেশে ঘুরিয়া আসেন।

রাউখাটী গ্রামের যে ফকীরের ২টী আস্তানার কথা আমরা পূর্ব্বে

বলিয়াছি তাহার ১টী হইল এই তিতু মিঞার আস্তানা ও অন্যটার মালিক ছিলেন মিস্কিন ফকীর। তীতু কিছুটা উগ্রধরণের ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। এক হস্তে কোরাণ ও আর এক হস্তে তরবারী লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া 'গাজী' হওয়া ছিল তাঁহার পরম কাম্য। তীতু ক্রমে শুধু হিন্দুবিদ্বেষী, ইংরাজবিরোধী বা জমিদারবিরোধী হইয়া উঠিলেন না, তিনি এত পরমতা-সহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন যে এক শ্রেণীর মুসলমানও তাঁহাকে আদৌ সুনজরে দেখিত না। জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ব্যতীত গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় জমিদারগণও তীতুর জন্য বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে তীতু ক্রমে ক্রমে হিন্দু ও ইংরাজগণের, জমিদারদিগের, শাসক সম্প্রদায়ের মায় স্বজাতীয় বৃদ্ধ গ্রাম্য 'মাতব্বর' মুসলমানগণেরও সহানুভূতি হারাইয়াছিলেন। তাঁহার হটকারিতার ও উগ্রতার জন্য একসঙ্গে এত লোকের বিরাগভাজন হইয়া না উঠিলে দক্ষিণ বাংলার ইতিহাস হয়ত অন্যরূপে লিখিত হইত। তীতু সবেমাত্র বলসঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই বল তখন সুশৃঙ্খলিত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজ শক্তি সুসংবদ্ধ করার সুযোগ পাইবার পূর্বে তাঁহার উদ্ধত যুবক শিষ্যগণ এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিল।

এই সময় একদিন পুঁড়ায় হিন্দুদিগের এক "বারোয়ারী" পূজা উপলক্ষে উৎসবাদি হইতেছিল। সরার মতাবলম্বী ও ওহাবি মতপুষ্ট একদল উদ্ধত ধর্মোন্মত্ত যুবক ইংরাজশক্তির বিলোপ সাধন করিয়া বাদশাহী আমল ফিরাইয়া আনিবার স্বপ্নে মসগুল হইয়া হঠাৎ এই বারোয়ারী তলায় উপস্থিত হইল। তাহারা জোর করিয়া বারোয়ারী তলায় গোবধ করিল। কৃষ্ণদেব রায় এই মারমুখা জনতার সম্মুখীন হইতে সাহস করিলেন না। এই রণোন্মত্ত ধর্মান্ধ স্বপ্নবিলাসী যুবকগণ গোরক্তরঞ্জিত দেহে সেই মৃত গোদেহ লইয়া সোজা উপস্থিত হইল রাউখাটীতে। সেখানে তাহারা তীতুমীরকে বাদশাহ ও ময়জদ্দিকে উজীর ঘোষণা করিয়া এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপনা করিল। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তীতুর অনুচরগণের এই হঠকারিতা অনুমোদন করা ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। তীতুর চারিসহস্র ধর্মান্ধ যুবকশিষ্যের কাছে প্রথম আহুতি হইল গোবিন্দপুরের শ্রোত্রীয় রায় বংশজ জমিদার রতিকান্ত রায়ের পুত্র দেবনাথ।

১২৭৭ সালের ৩১শে ভাদ্র তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় এই ঘটনার ও পরবর্ত্তী ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে লিখিত হইয়াছে—১৮৩১ খৃঃ অঃ মুড়াগড়গাছির জমিদারবাবু কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাহার ওহাবি প্রজাদিগের প্রতি দাড়ীর উপর ২।৹ টাকা করিয়া একটী কর বসান। "পুঁড়া খোড়গাছি" ও "কৃষ্ণদেব রায়" পত্রিকায় যথাক্রমে "মুড়াগড়গাছি" ও "কৃষ্ণচন্দ্র রায়" রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু ইহাকেই একমাত্র বা প্রত্যক্ষ কারণ বলিয়া বোধ হয় না। তীতু-মীরের অত্যাচারের ফলে সকলেই যখন সন্ত্রস্ত ও পরে যখন বৃটিশ শাসকগণ সৈন্য দিয়া তীতুমীরের কেল্লা ধ্বংস করিয়া ফেলেন, তখন স্থানীয় হিন্দু সাধারণ, জমিদারমণ্ডলী প্রভৃতি প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। সেইজন্য এইরূপ "দাড়ীর উপর" করধার্য্য হওয়া বিচিত্র নহে। তীতুর কেল্লা ধ্বংসের পর ইংরাজসিপাহীগণ কিছুদিন দাড়ি দেখিলেই, নির্বিচারে গুলি চালাইয়াছিল। তখন মুসলমানগণ হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য হইয়া নাপিতদিগকে অসম্ভব পারিশ্রমিকও পুরস্কার দিয়া দলে দলে দাড়ি ত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। নিকটস্থ বড় হাট বাদুড়িয়াতে দাড়ী কামাইবার জন্য হুড়াহুড়ি লাগিয়া যাইত। গ্রাম্য প্রবচন তার প্রমাণ—

"কাল বেদুড়ের হাট
চাচা, দাড়ী কাস্তে দিয়ে কাট।"

ক্ষুর দিয়া দাড়ী চাঁচিবার তখন সময় ছিল না, কাঁচি দিয়া দাড়ি ছাঁটিয়া লোকে প্রাণরক্ষা করিত। কাস্তে দিয়া দাড়ী কাটাটা তারই অতিশয়োক্তি।

এইবার আমরা বাদশাহ তীতুমীরের "জহাদ" বা "জেহাদ" অর্থাৎ ধর্ম্মযুদ্ধের বর্ণনা দিব। বাদসাহ তীতুমীরের সৈন্যেরা গোবিন্দপুরের জমিদারপুত্রকে হত্যা করিয়া, কৃষ্ণদেব রায় ও গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় জমিদারবাবুকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তীতু দেখিলেন যে কেবলমাত্র হিন্দু জমিদারগণের উপর অত্যাচার করিয়া লাভ নাই। তিনি কৌশলে চাকার মোড় ঘুরাইলেন। ওহাবী দলের প্রভাব তলে তলে কাজ করিতে লাগিল। তখন এইদেশেও নদীয়া যশোরে বহুস্থানে সাহেব-দিগের নীলকুঠি ছিল। তীতু তাঁহার সৈন্যদিগকে এইসব কুঠিয়াল অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিলেন। তীতু দেখিলেন যে তাঁহার তিনসহস্রাধিক যুবক বীর-সৈন্য যুদ্ধের জন্য অধীর হইয়া রহিয়াছে। যাহাতে তাহারা দেশের উপর অত্যাচার করার কথা চিন্তা না করিতে পারে সেইজন্য "নীলবাঁদরদের" উপর তাহাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন রাজার-জাতি সাহেবদের সম্ভ্রম জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর। একজন ইংরাজেরও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সমস্ত বৃটিশশক্তি তখন গর্জ্জিয়া উঠিত। তীতু দেশের লোকদিগকে রক্ষা করিতে যাইয়া যাহাদের বিরুদ্ধে লাগিলেন সমস্ত রাজশক্তি তাহাদের পশ্চাৎ হিমালয়ের ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়াইল।

তখন বারাসতে নূতন চৌকী বসিয়াছে। পুঁড়া নারিকেলবেড়িয়া হইতে তখন বারাসত বহু দূরে। যাতায়াতের ভাল পথ ছিল না। কালীনাথ মুন্সীর টাকী রোড তখনও তৈয়ারী হয় নাই। কলিকাতা হইতে বারাসাত, মছলন্দপুর, বাদুড়িয়া হইয়া তখন ইচ্ছামতীর অপর পারবর্ত্তী পুঁড়া অঞ্চলে যাইতে হইত। সুতরাং দিনকয়েক তীতুমীর বাদশাহী করিবার সুযোগ পাইলেন। এই সুযোগে তীতু শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইচ্ছামতীর বাঁকের উপর নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে উজির ময়জদ্দী ও সেনাপতি গোলাম মসুমের তত্ত্বাবধানে এক প্রকাণ্ড বাঁশের কেল্লা তৈয়ারী হইতে লাগিল। গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের কর্ণে এই সকল সংবাদ, বিশেষতঃ ইংরাজ কুঠিয়ালগণের উপর অত্যাচারের সংবাদ ক্রমে পৌঁছাইতে লাগিল। প্রথমতঃ রাজ-পুরুষগণ ইহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ক্রমশঃ তাঁহারা দেখিলেন যে তীতুকে দমন করা আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। চৌকী

বারাসতে তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন। তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আলেকজাণ্ডারের উপর তীতুকে দমন করার ভার পড়িল। মিঃ আলেকজাণ্ডার বারাসত হইতে ২০জন সিপাহী, একজন জমাদার ও একজন হাবিলদার লইয়া তীতুকে দমন করিতে বাহির হইলেন। পথ হইতে থানার দারোগা চৌকীদার, জমীদারদের বরকন্দাজ ইত্যাদি আরও ১২০জন যোদ্ধা আলেকজাণ্ডার সংগ্রহ করেন। কিন্তু ১মবার আলেকজাণ্ডার তীতুর কাছে পরাভূত হয়েন। তার দলের একজন দারোগা ও বিস্তর সিপাহী-বরকন্দাজ মারা পড়ে। তীতুর অদ্ভুত সাহস, অপূর্ব্ব রণকৌশল ও অনন্য-সাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধ্য সাধন করিল। দেশীয়দিগের হাতে বিদেশী ইংরাজরাজের প্রথম সাময়িক পরাজয় ঘটিল বসিরহাটের বুকে। ইংরাজের "প্রেষ্টিজ" (Prestige) ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। উদারহৃদয় বেণ্টিঙ্কের পর্য্যন্ত টনক নড়িল। এবারে তাঁহার বিশেষ আদেশে ২টী কামান, ১০০ গোরা সৈন্য ও ৩০০ সিপাহী সৈন্যের একটি দল মিঃ আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে আবার প্রেরিত হইল। ক্রমে ইংরাজ সৈন্য নারিকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা ঘেরাও করিল। ইংরাজ সেনাপতি দূত মারফত তীতুর কাছে সরকারের স্বাক্ষরিত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বারংবার দেখাইলেন। বীর তীতুমীর আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইংরাজসরকারের আদেশ ছিল সম্ভব হইলে তীতুকে জীবন্ত গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনা। তাহা হইল না। ইংরাজ পক্ষ অবশেষে কামান দাগিলেন, কিন্তু অনাবশ্যক রক্তক্ষয় নিবারণ করার জন্য ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। কামানে গর্জ্জন ও ধূম্রজাল বাঁশের কেল্লায় কিছু ভীতির সঞ্চার করিল নিশ্চয়। কিন্তু তীতু যখন দেখিলেন যে কামানের গর্জ্জন শারদ মেঘের গর্জ্জনের মত অন্তঃসারশূন্য, তখন তীতু ও মিসকিন ফতোয়া দিলেন যে "গোলা খা ডালা।" ইহাতে তীতুর অনুচরগণের সাহস বা দুঃসাহস যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। 'জেহাদ' চালাইবার তাহাদের বাসনা উদগ্র হইয়া উঠিল। এইবার ইংরাজ সেনাপতি প্রকৃত কাজ আরম্ভ করিলেন। প্রথম গোলার আঘাতেই বাঁশের কেল্লা ভগ্ন হইল ও শীঘ্রই 'কেল্লা ফতে' হইল। তীতুর সৈন্যগণ দলে দলে মরিতে লাগিল। বাঁশের কেল্লার আর কিছুই রহিল না। অনেকে বলেন যে তীতু শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে করিতে একটী গোলা তাহার দক্ষিণ উরুতে লাগে ও অনতিবিলম্বে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। আবার অনেকে বলেন যে নানা সাহেবের ন্যায় তীতুও ইংরাজের চক্ষে ধূলি দিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। ময়জদ্দী উজির এই যুদ্ধে নিহত হন। সেনাপতি মাসুম ইংরাজদিগের হাতে ধরা পড়েন ও যুদ্ধাবসানে নারিকেলবেড়িয়ায় কেল্লার সামনেই তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। কেহ কেহ বলেন—মাসুমের ফাঁসী হয় বিচারের পরে আলিপুর জেলে। এই যুদ্ধে ইংরাজগণ ৩৫০ জন তীতুর অনুচরকে বন্দী করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই দীর্ঘদিন কারাবাস ভোগ করিতে হয়। তবে ফকির মিসকিনের শেষ পরিণতির কোনই হদিস পাওয়া যায় না। তিনি ইংরাজদিগের হস্তে ধরা পড়েন নাই—ইহা নিশ্চিত। অনেকে মনে করেন মিসকিন সিদ্ধপুরুষ পীর ছিলেন। অত্যাচারী ধর্ম্মধ্বংসী মুসলমানগণকে তীতুর সাহায্য কৌশলে তিনিই ধ্বংসসাধন করান ও পরে অন্তর্হিত হয়েন। তীতু স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে কখনও পীরের সম্মান পান নাই—তাঁহাকে জনসাধারণ "গাজী" উপাধিও দেয় নাই। কিন্তু রহস্যময় সন্ন্যাসী-ফকির মিসকিন জনসাধারণের নিকটে ছিলেন ও আছেন "পীর"।

জেহাদ নিবৃত্তির পর দেশে পুনঃ শান্তি সংস্থাপন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। শাসনসৌকার্য্যার্থ ইংরাজ সরকার কয়েকটি ভূমিসংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থা করিলেন। বসিরহাট সহরের এতদিন কোনও প্রাধান্য ছিল না। সোলাদানায় একটি নিমকী চৌকী ছিল, রেনেলের ম্যাপেও সোলাদানা নিমকী চৌকীর উল্লেখ দেখা যায়। এবারেও বসিরহাটে চৌকী বসান হইল, বারাসতে চৌকীসহ ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠি স্থাপিত হইল। এইগুলি হইল তীতুমীরের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ফল। তীতুমীরের নারিকেলবেড়িয়া সংগ্রাম হয় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর।

তিতুমিরের বিদ্রোহের পর বসিরহাট অঞ্চলে শান্তি পুনঃস্থাপিত হইলে এই অঞ্চলে ঐ সংঘর্ষ উপলক্ষে অনেক গ্রাম্য ছড়ার ও গীতের প্রচলন হয়। তাহারই একটী উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপর যবনিকা টানিলাম।

"কৃষ্ণদেব রায় হতে, লড়াই দিতে, মেতে গেল নেড়া।
ফকীরের বুজরুকীতে হল পুঁড়া ছাড়া॥
কতকটা জোলা মিলে, তাঁত ফেলে মৌলবী সব হ'ল।
মুলুকগিরি করি ফিরি, রাউঘাটিতে গেল॥
সেথা করে মজা, তুলে ধ্বজা, লড়াই ফতে করে।
রতিকান্ত রায়ের বেটা দেবনাথকে মারে॥
তিতুমীর বাদশা হ'ল হুকুম দিল, উজীরের তরে।
ময়জদ্দী উজীর হয়ে হুকুমজারী করে॥
বলে আল্লা, বানায় কেল্লা, বাঁশের বেড়া দিয়ে।
মাসুম হল সেনাপতি সোজা সেথায় গিয়ে।"



লী না মি পু



হীরেন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

লীনা মস্কো পালিয়েছে বিভোরের ছোট ভাই সঞ্জয়ের সঙ্গে। ওরা দমদম ছেড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও কেউ জানতে পারেনি ওদের আয়োজনের কথা। লীনার মা কল্পনা মোতাহার চৌধুরীই নিঃশব্দে করে দিয়েছিলেন ওদের যোগাযোগ। তিনিই উৎসাহিত করেছিলেন সঞ্জয়কে। এগিয়ে দিয়েছিলেন লীনাকে সুকৌশলে বিভোরের অগোচরে। বিভোরকে ওঁর ভালো লেগেছে লীনার চেয়েও বেশী···তাই।

লীনা টের পেয়ে বলেছিল ঃ আমরা যে অনেক দূর এগিয়েছি মা!

মায়ের মন মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে রক্তস্রোত বাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল—এগনো আর পিছনো, একই কথা। থার্মোমিটারের পারা তাত পেলেই এগিয়ে যায়, আবার ঝাঁকানি দিলেই পিছিয়ে আসে। মেয়েদের মন! এক হাত থেকে অন্য হাতে যেতে যেটুকু দেরী। নতুন গায়ের তাত বেশী হলে, মনের পারা লকলক্ ক'রে আবার এগিয়ে যাবে। হয়তো বেশীও যেতে পারে।

কিন্তু তুমি—'

মেয়েমানুষ তো তুইও লীনা।

তা মানি। তবুও—

এতে 'তবুও' ভাববার কিচ্ছু নেই লীনা। মোতাহারকে বিয়ে করবার আগে প্রণাক্ষ ব্যানার্জি কম টাকা ঢালেনি আমার পায়ে। আমিও এগিয়েছিলাম, সত্যি এগিয়েছিলাম শেষ সীমা পর্যন্ত।···শেষটায় তোর কল্যাণে মোতাহারের হাতে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল।

আমার কল্যাণে?

হাঁ। তোমার আগমনকে অস্বীকার করবার তখন আর কোন উপায় ছিল না।

লীনা চমকে উঠেছিল। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গিয়েছিল মিসেস্ চৌধুরীর মুখপানে চেয়ে।

ক্ষণকাল নীরব থেকে লীনা অর্ধ-মনস্কভাবে বলেছিল—কিন্তু বিভোর কি ভাববে মা?

মিসেস্ চৌধুরীর মুখে পাতলা এক চিলকে হাসি ফুটে উঠেছিল। একটু দম নিয়ে বলেছিলেন—বড় জোর ভাববে ফ্লার্ট, এই তো! কয়েক বছর আগে আমার জন্ম ব'লে, আমায় ওরা ভাবে ফ্ল্যাপার। তফাৎটা কি শুনি? যে পুরুষ বুদ্ধিমান সে ভাববে—নাগাল পায়নি। ইডিয়ট হলে, যা ভাবে ভাবুক। কিছুই যায়-আসে না।

লীনা উন্মনা হয়ে উঠেছিল। মায়ের চোখের ওপর থেকে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল—বিভোর সেন ইডিয়ট কিনা, সে কথা আমার চেয়ে তুমিই হয়তো ভালো জানো মা।

জানি বলেই তো সঞ্জয়ের হাতে তোমায় ছেড়ে দিতে চাই।···যত বুদ্ধিমানই হোক, আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ মেয়েদের মনের সন্ধান পায়নি। পাবেও না কোনদিন। যদি কেউ পেয়ে থাকে, সত্যি সে আনলাকি—আন্হ্যাপী ক্রিচার। অনুকম্পার সঙ্গে চলে—বেচারা!

লীনা হকচকিয়ে উঠেছিল মিসেস্ চৌধুরীর কথা শুনে। বুঝে উঠতে পারেনি কি বলতে চেয়েছিলেন তিনি। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে বলেছিল—আন্লাকি তুমি, না আন্লাকি ছিলেন প্রণাক্ষ ব্যানার্জি?

প্রথমে হয়তো আন্লাকি ছিলাম আমি। তারপর হয়েছিল প্রণাক্ষ। উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে গোপন অন্যের কথা

পুরুষেরা বললেও মেয়েরা প্রিয়জনের কাছে বলে না কোনদিন। সে দুঃসাহসিকতা মেয়েদের মনে যখনই আসে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন যায় ভেঙে। তাদের কল্পনার তাজমহল হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। মেয়েরা যখন দেহের শতদল তুলে ধরে পুরুষের সামনে, তাদের মনের শামুক নিঃশব্দে হাত-মুখ গুটিয়ে বুকের তলায় ঝিম কাটে। মনের এই শামুক নিয়ে খেলা করাই নারীর ধর্ম। অকপট সত্য তারা বলে না। বলতে নেইও কোনদিন।

তার মানে?

মানে নিজের মনকেই জিজ্ঞেস ক'রো। প্রণাঙ্ক যা পেয়েছিল তাই নিয়ে যদি খুসী থাকতো, তন্ন-তন্ন করে আমার মনের অনুসন্ধান করবার অত চেষ্টা যদি না করতো তার সুখ-স্বপ্ন কোনদিনই ভাঙতো না।

কথা না বাড়িয়ে মিসেস্ চৌধুরী হঠাৎ তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের বোরখাটা মুড়ি দিয়ে সুইচ-বেল টিপে ড্রাইভারকে ডেকেছিলেন।

ইচ্ছা থাকলেও লীনা আর দ্বিতীয় কথা বলবার সুযোগ পায়নি। মন্থরপদে পড়ার ঘরে গিয়ে বসেছিল টেবিলে মাথাটা রেখে।...মুহূর্তে ওর অতীত ও বর্তমান যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে গিয়েছিল।

মোতাহার চৌধুরী অনেক আগেই আশ্রয় নিয়েছেন কফিনের তলে। রেখে গিয়েছেন ঐশ্বর্য, পার্ক স্ট্রীটের বাড়ী আর জাহাজে রসদ সরবরাহের সদাগরী আপিস। সে ঐশ্বর্যের অধিকারিণী কল্পনা। উত্তরাধিকারিণী লীনা।

স্লিপিং 'গাউনটা প'রে লীনা অনেকক্ষণ পায়চারি করেছিল নির্জন বারান্দাটায়। ঘুমপাড়ানি রাতের ভিজে বাতাস ওর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিয়েছিল পর্যাপ্ত মমতার স্নেহস্পর্শ।

মিসেস্ চৌধুরী তখনও ঘুমোননি। ঘরের কোণে লাইট মিনস্ট্রেলের নীল আলোটা তখনও মিটমিট করে জ্বলছিল।

একটু ইতস্তত করে একবার উঁকি দিয়ে লীনা আস্তে দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকেছিল। পা টিপে টিপে বিছানার পাশে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিল মিসেস্ চৌধুরীর মুখের কাছে।

কে?...মিসেস্ চৌধুরী চোখ না খুলেই প্রশ্ন করেছিলেন।

আমি—লীনা।

এখনো ঘুমোও নি?

না।

কেন ঘুমোওনি এখনো? রাত জাগা তোমার সয়না। চোখের কোলে কালি পড়বে। শুয়ে পড়গে যাও। বেশী রাত করো না।

না। এখনই ঘুমোবো। শুধু তোমায় বলতে এলাম—

কি? পারবে না, সেই কথা?...সে তো আমি জানি।

না-না, তা নয়।...পারবো। নিশ্চয়ই আমি পারবো মা। আমার জন্যে তুমি অনেক কিছু সহ্য করেছো। আর তোমার জন্যে আমি পারবো না একখানা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড গাড়ী ছেড়ে নতুন গাড়ী নিতে!...আর মস্কো যাওয়া? সে তো সুবর্ণ সুযোগ!...নিভাদি ওয়েস্ট-জার্মানিতে চলে গেছে তার ছোট ভাই-এর বন্ধু কমলকে বিয়ে করবে ব'লে। কমল তার চেয়ে আট বছরের ছোট। ছেলেবেলায় কমল আর অসীমকে সে কতদিন নিজেহাতে কাজল পরিয়ে দিয়েছে। তাই দেশে থেকে চক্ষু লজ্জায় পারেনি নিজেকে সফল করতে। আড়ালে-আবডালে শুধু মনটাকে তালিম দিয়ে নিয়েছিল। এবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার যৌবনের নীল সমুদ্রে।...কমলকে নিভাদি আদর করে ডাকতো সেক্সপীয়র ব'লে। সেক্সপীয়র ছিলেন তাঁর স্ত্রীর চেয়ে আট বছরের ছোট।

জানি। লাকি উইমেন গেট ইয়াংগার হাজব্যাণ্ডস্।

মিসেস্ চৌধুরীর মুখে হালকা একটু হাসির রঙ লেগেছিল। লীনার মাথাটা সস্নেহে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলেছিলেন—ঘুমোও গে যাও। এরপর ঘুম হয়তো আর আসবে না চোখে।

আসবে। ঋণ-শোধের আনন্দে, ঘুম আমার আপনি আসবে মা।

ঋণ! কিসের ঋণ লীনা?

লীনা আর অপেক্ষা করেনি। দরজাটা টেনে দিয়ে ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে।

মিসেস্ চৌধুরী চোখ দুটো বন্ধ করেছিলেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

চেরি ক্লাবের সায়ন্তনীতে তেমনি চলে মৌমাছিদের আনাগোনা। ছোট-বড় চক্রে রাণীমাছিদের ঘিরে কামালি মাছির ভিড়। নেশার মৌতাতে মশগুল মক্ষীদের প্রণয় গুঞ্জনে মুখর হয়ে ওঠে চৌরঙ্গী টেরাসের ফ্ল্যাট। সন্ধ্যা থেকে নিশুতি রাত পর্যন্ত চলে পান্থশালার উৎসব : মনের বাজারে কেনা-বেচা—হৃৎস্পন্দনের নামা-ওঠা।

সঞ্জয়ের সঙ্গে লীনার আকস্মিক মস্কো-যাত্রা যেন অতর্কিতে ঢিল ফেলেছে ওদের মৌচাকে।

উন্মনা হয়েছে সুরেখা। তার চেয়েও বেশী চঞ্চল হয়েছে শিপ্রা। শিপ্রার মন অস্বস্তিতে ভরে উঠেছে। কি যেন হয়নি! কি যেন হলো না! পরাজয়ের একটা অব্যক্ত গ্লানিতে তোলপাড় করে ওর মন। বিক্ষুব্ধ চিন্তা বারবার ফণা তোলে জয়ন্তর উদ্দেশে।···সঙ্গের সেই লোকটা পাভিলিয়ন থেকে বেরোবার পথে শিপ্রাকেই শুনিয়েছিল—হাপ্-গেরস্ত কথাটা। জামা-কাপড়ে ভদ্র হলেও ভদ্রলোক সে মোটেই নয়। শিপ্রা ভাবতে পারে না কেমন ক'রে জয়ন্ত সয়ে নিয়েছে তার সঙ্গ!···অভাব! অভাবের জন্যে এত নীচে নামতে পারে জয়ন্ত? টাকা তো সে নিজেও তাকে দিতে চেয়েছে অনেকবার। সুরেখাদি ধন্য হয়ে যেত জয়ন্ত তার কাছে টাকা নিলে। কিন্তু নেয় নি জয়ন্ত। ধার নেওয়াকে সে বলে ভিক্ষের নামান্তর।···ইডিওসিন্‌ক্রাটিক ছাড়া কি!

আশ্চর্য বিভোর সেন! কোথাও দাগ লাগেনি এতটুকু। শুধু তফাৎ—অন্য দিন দাবা নিয়ে বসে, আজ বসেছে তাস নিয়ে। অন্যদিন মুখে থাকে সিগারেট, আজ চুরুট। সিগারেটের শাদা ধোঁয়া ঘরের চার দেয়ালে বাঁধা পড়ে, চুরুটের নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী চৌরঙ্গী টেরাসের সীমানা ছাড়িয়ে বাতাসে ভেসে যায়। হয়তো বা হৃৎস্পন্দনের রেশ বাতাসের তরঙ্গে মিশে আঘাত করে গিয়ে ক্রেমলিনের টাওয়ারে। চুরুটের গন্ধ লীনা সইতে পারে না।

সুরেখা ঢুকলো থাণ্ডেলওয়াল আর ক্লিটনকে সঙ্গে নিয়ে। হলঘরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বিভোরের ঘরে উঁকি দিয়ে বলে—তাস যে! পেশেন্স বুঝি?

না। আপনাদের খেলা আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি : বিভোর হাসে।

সুরেখা থমকে দাঁড়ায় : "আমাদের মানে?

মেয়েদের। তিন তাসের খেলা!

জাগ্‌লারি। তিন রঙের তিনখানা তাস পাশাপাশি তোলা আর ফেলা।···হাতের ধাঁধায় হঠাৎ দেখে যেটা মনে হবে হরতন, তুলে দেখবেন আসলে সেটা ইস্কাপন।

মুহূর্তের জন্যে সুরেখার মনে একটা ঝাঁকানি লাগে। পরক্ষণেই উচ্ছল হাসিতে সেটা ভাসিয়ে দিয়ে বলে—দ্যাটস্ ভেরি নাইস। বুঝলে কিছু, মিস্টার ক্লিটন?

নো। ক্লিটন ঘাড় নাড়ে।

ওরা হলঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই, শিপ্রা পশ্চিমের নির্জন বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়ালো বালকৃষ্ণণকে ডেকে নিয়ে :

কৃষ্ণন্, রাত্রি ছিল তাই চোখ ঝলসানো দিনগুলোকে মানুষ সইতে পেরেছে, না?

হাঁ।

বালকৃষ্ণন এখন বেশ বাংলা বোঝে।

দুজনে পাশাপাশি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে রেলিঙে ভর দিয়ে। বাইরের দিকে চেয়ে থাকে আনমনা হয়ে।

হঠাৎ বালকৃষ্ণণের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে, শিপ্রা একটা সিগারেট বের করে। আলগোছে সিগারেটটা ঠোঁটে চেপে, জিভ দিয়ে গোড়াটা ভিজিয়ে দেয়।

বালকৃষ্ণণ অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে ওর মুখপানে। শিপ্রাকে সে দেখেনি কোনদিন সিগারেট খেতে।

শিপ্রা হাসে মুখটিপে-টিপে। তারপর সিগারেটটা আর একবার জিভে ছুঁইয়ে বালকৃষ্ণণের দিকে তুলে ধরে। ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে বলে—খাও।

নিজেই দেশলাইটা জ্বেলে দেয়।

ওপাশের ঘরে তখন মিসেস্ চৌধুরী গিটার বাজাচ্ছিলেন। ইতালিয়ান নোট : সুরটা মিনতিতে ভরা।

থাণ্ডেলওয়াল যেন দিন দিন কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। সুরেখার সঙ্গে তালে তালে পা বাড়িয়ে চলতে কখন অলক্ষ্যে পিছিয়ে আসে ওর মনের গতিবেগ।

শনিবার বিকেলে সুরেখার যৌবনে যখন জাগে বসন্তের সমারোহ—চঞ্চল মন চঞ্চলতর হয়ে ওঠে রেস্ কোর্সের

নেশায়, খাণ্ডেলওয়াল কাজে-অকাজে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে—সওদাগরি তাগাদায়।

মুক্তি সুরেখা দেয়। তবুও অভিমান করতে ছাড়ে না। আড়ালে হাতখানা দুহাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে বলে —আমি জানি, তোমার আর ভালো লাগে না।

খাণ্ডেলওয়াল নির্বাক্ চেয়ে থাকে সুরেখার মুখপানে। ধাঁধা কাটিয়ে উঠতে পারে না। একটু থেমে, হাসি টেনে এনে বলে : না-গো, না।···মোটা টাকা লোকসান হয়েছে ফাটকায়। কারবারে মন না দিলে—

মন তো দুটো নয়, যে এক সঙ্গে দু' জায়গায় দেওয়া চলে। থাক···ওঁরা অপেক্ষা করছেন বাইরে।

যাও।

যেতে গিয়ে সুরেখা একটু থামে। পা বাড়িয়ে আবার পিছিয়ে আসে : সামনের শনিবার যাবে তো ঠিক ?

হাঁ।

সুরেখা হাসি ছড়িয়ে বেরিয়ে যায় : [illegible] তো নয়, চাইনীজ ওয়াল। ইচ্ছে না থাকলে, কার সাধ্য টলাতে পারে !

সুরেখা চলে গেলেও কথাগুলো রিমরিম করে খাণ্ডেলওয়ালের মগজে। ফিকে নেশাটা আবার যেন আস্তে আস্তে জমে ওঠে ঝিরঝিরে বাতাস লেগে। চেষ্টা করেও খাণ্ডেলওয়াল বাঁধন খুলতে পারে না। নাটাগাছের লিক্‌লিকে ডালের বেষ্টনী, একদিক খুলতে আর-একদিক জড়িয়ে যায় গায়ে-পায়ে।

খাণ্ডেলওয়াল আত্মস্থ হওয়ার আগেই ওরা গাড়ীতে স্টার্ট দেয়। ওরা মানে সুরেখা, ক্লিটন আর চোপরা। আজকাল প্রায় শনিবারই সুরেখা নিজে ড্রাইভ করে। ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে চোপরার জাগুয়ার গাড়ীখানায় উঠে বসে সুরেখা স্টিয়ারিংটা ধ'রে।

ক্লিটন আর চোপরা পাশাপাশি বসে পিছনের সীটে।

ক্লিটন হেসে বলে : এক্‌সিডেণ্ট করবে না তো ?

হোপ সো। হলে বেঁচে যেতাম।

মানে ?

দেয়ার উড হ্যাব বীন অ্যান এণ্ড অব মনোটনি।··· একঘেয়ে লাইফ আমার ভালো লাগে না।

সুরেখা হাসে। পাতলা ফিন্‌ফিনে ঢাকাই মসলিনের মত একখানা হাসির ওড়না যেন ওর মরাল গ্রীবা থেকে হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়ে ক্লিটন আর চোপরার মুখেচোখে।

চোপরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ক্লিটন উৎসুক হয়ে বলে—আই ক্যান হেলপ ইউ, ইফ ইউ সো লাইক।

লাইক !···আই উড লাইক মিস্টার ক্লিটন। এসে ব'সো আমার পাশে। হেল্‌প মি হোয়েন আই ফল্‌টার।

ক্লিটন দ্বিধা করে না।

তা-ই চেয়েছিল সুরেখা। চেয়েছিল, ক্লিটন বসবে ওর পাশে। চোপরা থাকবে পিছনের সীটে। ইচ্ছে ক'রে মাঝে মাঝে স্পীডের ওপর চেক দিয়ে মৃদু ঝাঁকানির সৃষ্টি করবে। গায়ে গা লাগবে ক্লিটনের। চোপরার বুকে জেলাসির শিখাটা শীষিয়ে উঠবে চোখের নিমেষে।

কম্ ইন, মিস্টার ক্লিটন : সুরেখা সরে বসে।

ক্লিটন উঠে আসে সুরেখার পাশে।

টপ গীয়ার দেয় সুরেখা।···সেদিন রেস ছিল বারাকপুরে।

লীনা ঝড় তুলেছে। ঘূর্ণী বাতাসের ঝাপটা দিয়েছে শিপ্রা আর সুরেখার মগজে। সর্ষে ফুলের মধু-খাওয়া মৌমাছির মত শিপ্রা হয়ে উঠেছে মাতাল। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরেছে ঝাঁজালো মধুর উত্তপ্ত মাদকতায়। সইতেও পারে না, অস্বীকার করতেও পারে না। লীনা যেন হঠাৎ রঙের গোলাম তুরুপ করে সেরা বাজী জিতেছে ওদের চোখের সামনে। কী ছিল ওর দেহে ! রূপ আর রঙের জলুস হয়তো কোনদিন ছিল ওর। কিন্তু বিবাহিত জীবনের প্রথম ঝোঁকে না-চাওয়া এক সন্তান এসে যখন কয়েক মাসের জন্যে আশ্রয় নিয়েছিল ওর দেহে, ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে ওর সেই সম্পদ।···স্মৃতি মুছে গেছে, কিন্তু দাগ মোছেনি। তার আগমনের চিহ্ন আঁকা আছে লীনার গায়ে। তবুও—তবুও হয়েছে লীনা বিজয়িনী। সে কথা শিপ্রা অস্বীকার করতে পারে না।···ভাগ্য ওর ভালো। সঞ্জয়ের জীবনে লীনাই প্রথম নারী। তাই সে বোঝেনি, কোনদিন বুঝবেও না ওর অঙ্গের সেই হায়রোগ্লিফিক ভাষার অর্থ।

ওদের চেরিক্লাবের অলিন্দ আর লাউঞ্জে উঁকি-ঝুঁকি

দিতে সুরু করেছে নতুন কয়েকটা মেয়ে—কেউ কলেজী, কেউ বা অফিস-ফেরত করণিকা না হয় আধা-ফিরিঙ্গী দিশি সাহেবের স্টেনোগ্রাফার। অফিস ফেরত ট্রাম-বাসের ভিড় ঠেলে আসতে ঘামের ছোপ ধরেছে রুজ আর লিপস্টিকে।...লীনার মস্কো-যাত্রার খবরটা হয়তো পল্লবিত হয়ে পৌচেছে ওদের কানে। তাই সরু সুতোর ছিপ নিয়ে ওরা ঘোরা-ফেরা করে আড়ালে আবডালে নতুন চার ফেলবে ব'লে।

সুরেখার চলার পথে ঋগ্বেদী ছন্দ যেন আবার দ্রুততর হয়ে উঠেছে। চোখে-মুখে জেগে উঠেছে মার্লান ডিট্রেক্টীকের সচেতনতা। ঠোঁটের হাসি ফুটে উঠবার আগেই চোখ দুটো জ্বলজ্বল ক'রে ওঠে হাসির দীপ্তিতে।

ক্লিটনের টিপস্ ভালো। চোপরা হারে, কিন্তু ক্লিটন হারে না কোনদিন। ক্লিটন আর চোপরার টিপস্-এ থি'-লেগ ক'রে সুরেখা খিলখিল ক'রে হাসে।

হঠাৎ যেদিন চোপরা জিতে যায় আপসেট কোন বাজীতে, তির্যক দৃষ্টিতে তার মুখপানে চেয়ে সুরেখা হাসি চুরি করে। মিষ্টি হাসির মাদকতা ছড়িয়ে দেয় চোপরার ঠোঁটের কাছে, ক্লিটনকে আড়াল ক'রে।

চোপরা বুঝে উঠতে পারে না কিসে ও সত্যি খুসী হয়। একটু সমঝে নেবার চেষ্টা ক'রে বলে—মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল! আপনি—

মিসেস্ খাণ্ডেলওয়াল নয়। সুরেখা—রেখা।...নিজের নাম তো আছে আমার।

একজ্যাক্টলি!...ক্লিটন সমর্থন করে। হাসিমুখে পাইপটা দাঁতে চেপে ধ'রে সুরেখার মুখপানে চায়।

সুরেখার চোখ দুটো হাসির দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঝক্‌ঝকে দাঁতে ঠোঁটের একটা কোণা টিপে ধ'রে চোপরার দিকে এগিয়ে যায়: স্বপনপুরীর রাজকুমার!...শেঠজি!

সেদিন ওরা তিনজনই জিতলো। কেউ কম, কেউ বেশী।

শ্রান্ত দেহ আর উজ্জীবিত মন নিয়ে সন্ধ্যায় যখন সহরে ফিরে এলো ওরা, মহানগরী সায়াহ্নের রূপসজ্জায় ঝলমলিয়ে উঠেছে। স্বপ্নের আবেশ ছড়িয়ে পড়েছে পথে ও প্রাসাদে, ফুটপাতের কিনারায় কিনারায়।

ফিরবার পথে তিনজনেই ঢুকলো গিয়ে নানকিঙের রেশমি পর্দার অন্তরালে।

মৃত্যুক্লিন্ন জীবনের পান্থশালায় নির্লজ্জ রাত্রির আবরণে তখন অমৃতের উৎসব ফেনিল হয়ে উঠেছে। হল ঘরে সুরু হয়েছে কাবারেট আর্টিস্টদের নৃত্যগীত।...ক্রিৎসি আর ডলফিন! অনাবৃত যৌবনের নৈবেদ্য সাজিয়ে, আরতি দীপের মত উলঙ্গ দেহ-শিখা তুলে ধরে জীবন-দেবতার চোখে। শিরায় শিরায় জাগে তৃষ্ণার্ত শিহরণ।

বয়কে ডিনারের ফিরিস্তি দিয়ে ওরা শ্রান্ত দেহ এলিয়ে দেয়।...পাশাপাশি ক্লিটন আর চোপরা। সামনের চেয়ারে বসে সুরেখা।

মিনিটের কাঁটা ঘণ্টার ঘরে ঠেলে দেয় সহযাত্রীকে। নানকিঙের কক্ষে কক্ষে একের পর এক যাত্রী আসে আর যায়! সরাইখানার স্নায়ুতে জমে অবসাদ। বাতাস ভারী হয়ে আসে ভোজের গন্ধে। শাড়ির আঁচল লেগে হঠাৎ হয়তো পাশের কেবিনে কাটগ্লাসের বিয়ার-টাম্‌ব্লারটা উল্টে পড়ে। সুরেখা চমকে ওঠে ঝন্‌ঝন্ শব্দে:

চোপরা!

রেক্-খা!

রাইট। রাইট ইউ আর: ক্লিটন ঘাড় নাড়ে।

রাত অনেক হলো: চোপরা উঠে দাঁড়ায়।...যাবেন না?

হাঁ। যাবো—নিশ্চয়ই যাবো।

সুরেখা হাতখানা ক্লিটনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। উদ্‌গারের কড়া ঝাঁজটা সামলে নিয়ে বলে: পিক্ মি আপ, মিস্টার ক্লিটন। আ'ম্—

ক্লিটন ওর হাত ধরে তোলে। সুরেখার পা দুটো তখন টলছিল। চোপরার গা-ঘেঁসে ঘেঁসে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

সুরেখা গাড়ীতে উঠবার আগেই ক্লিটন বসলো গিয়ে স্টিয়ারিংটা ধ'রে। এবার আর সুরেখা কোন আপত্তি করলে না। পাশাপাশি বসলো চোপরার সঙ্গে পিছনের সীটে।

অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলো সুরেখা। এত দেরী কোনদিনও করেনি বাড়ী ফিরতে।

বাইরের বাতাস হিমেল হয়ে এসেছে। বড় বড় বাগানওয়ালা বাড়ীগুলোর ঘুমন্ত নিঃশ্বাস যেন ওর সলিটারি ঘুকের ফটকে এসে হানা দিয়ে যায়। মাধবীলতা আর মর্ণিং-গ্লোরির পাতায় ছিটকে-পড়া খানিকটা আলো চিক-চিক করে। দোতলার খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায় হল ঘরের ভিতরটা। অশান্ত পদবিক্ষেপে পায়চারি করছে খাণ্ডেলওয়াল!

ওরা চলে গিয়েছে গাড়ী নিয়ে। দূর থেকে একটা হর্ণের শব্দ কানে আসে। জাগুয়ারের এই হর্ণটা চিনতে সুরেখার ভুল হয় না কোনদিন।

সুরেখার পায়ের শব্দ পেয়ে বয়টা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। এখনও ঘুমোয়নি সে। ওর অপেক্ষাতেই এতক্ষণ জেগে বসেছিল বারান্দার একটি কোণে।

সাহেবের খাওয়া হয়নি?

নাঃ ছেলেটা পাশ কাটিয়ে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায়।

ক্ষিপ্রপদে সুরেখা ঢুকলো গিয়ে ড্রেসিং-এ।…এখনও খায়নি খাণ্ডেলওয়াল। খাবে না, খেতে পারে না, তা সে জানে। তবুও মনটা প্রশমিত করতে সময় লাগে।

সুট বদলে, স্নানঘর থেকে সুরেখা যখন বেরোলো তখন রাত্রি প্রায় বারোটা।

রাত্রি শেষের ঝড় বয়ে গেল শিউলি ফুলের বনে। ঝিরঝির করে ঝরে পড়ে শিশির-ভেজা শিথিল শেফালি।

সারাটা রাত ঘুমোয়নি খাণ্ডেলওয়াল। একবার ঘরে, একবার বাইরে শুয়ে বসে কাটিয়েছে। আজ আর একটী বারের জন্যেও আসেনি সুরেখার বিছানার পাশে। একটী বারও ডাকেনি রেখার নাম ধরে।

উচাটনে বারবার হালকা হয়ে এসেছে সুরেখার ঘুম। ঘুম-জড়ানো চোখ দুটো গিয়ে পড়েছে খাণ্ডেলওয়ালের বিছানায়। খাণ্ডেলওয়াল ঘুমোয়নি। একটীবারও গা ঢালেনি বিছানায়।

সন্ধ্যার উষ্ণতা ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসে সুরেখার রক্তে। উঠে বসে। চোখ দুটো ঘষে নিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে। আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে। তখনও সূর্য ওঠেনি। রাস্তার আলো নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। তবুও ঘুম জড়িয়ে আছে বাতাসের গায়ে গায়ে।

খাণ্ডেলওয়াল এতক্ষণে অবসন্ন দেহটা ছড়িয়ে দিয়েছে বিছানায়। চুপচাপ পড়ে আছে চোখ দুটো বন্ধ করে।

চুপি চুপি গিয়ে সুরেখা কপালের ওপর কপালটা রাখে: ডার্লিং! চাইনীজ ওয়াল! মাই প্রোটেক্শান!

খাণ্ডেলওয়াল সাড়া দেয় না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তার বুকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়!

রাগ করেছ?

না।…ইচ্ছা হলেও পারে না কপালটা সরিয়ে নিতে।

তবে? সারারাত একটী কথাও বলোনি যে! একটীবারও আসনি কাছে।…ইচ্ছে করে দেরী তো আমি করিনি। তোমার প্রেসটিজ রাখতে—

জানি।

জানো?…জানো তুমি?…আমিও জানতাম: যা-ই করিনা কেন, কোনদিন অন্য কিছু ভাববে না তুমি। ভাবতে পারো না।

তাই।… ভাবতে আমি পারি না। আর কিছুই ভাবতে পারি না আমি। মাথা আমার খারাপ হয়ে গেছে রেখা।

কেন? কি হয়েছে বলো?…আমার কাছে গোপন করবার কি আছে তোমার।…সুরেখা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনটা ওর জড়সড় হয়ে আসে।

ক্ষণকাল নীরব থেকে খাণ্ডেলওয়াল অস্ফুট কণ্ঠে বলে: ইন্‌সলভেন্সি নেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই আজ।

সুরেখা চমকে ওঠে: ইন্‌সলভেন্সি! দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাবে তুমি?…এই মান-সম্মান-ইজ্জৎ!

হাঁ।

সুরেখার পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠলো। বুঝে উঠতে পারে না কোথায় ছিঁড়ে গেল ওর সেতারের তার। কেমন করে হঠাৎ সব বেসুরো হয়ে গেল।

কোনদিন তো জানতে দাওনি সে কথা!…সুরেখার ঠোঁট দুটো কাঁপে।

নাঃ সুরেখার ঘাড়ের ওপর শিথিল হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে খাণ্ডেলওয়াল বলে—কোন লাভ হতো না সে কথা জেনে। আজও হয়তো লাভ নেই কিছু।

লাভ! লাভ-লোকসানের হিসাব কর তুমি আমার সঙ্গেও?

আগে কোনদিন করিনি। কিন্তু আজ করি।

থাক। সেটুকু দয়া না করলেও চলবে: মুহূর্তে সুরেখা অধীর হয়ে ওঠে। মাথা তুলে সরে দাঁড়ায় খাণ্ডেলওয়ালের চোখে চোখ রেখে। দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে: সেই ইচ্ছেই যদি ছিল, সময় থাকতে আমায় সরিয়ে দিলেই পারতে।

সরিয়ে?

হাঁ। দুর্নামের হাত থেকে বাঁচতাম।

কিসের দুর্নাম রেখা? তুমি তো ঠকাওনি কোন পাওনাদারকে। আমি—আমি—

পাওনাদার ঠকাইনি সত্যি। কিন্তু নিজেকে ঠকিয়েছি সব চেয়ে বেশী।···দেউলিয়া! তুমি দেউলিয়া হবে!···ছি-ছি! এ গ্লানির বোঝা আমার মাথায় না চাপালেই পারতে! কেন জানাও নি সময় থাকতে?

রেখা, ভুল বুঝো না তুমি: বিব্রত হয়ে খাণ্ডেলওয়াল উঠে বসে। কি বলবে, ভেবে পায় না। একটু ইতস্তত করে বলে: ইচ্ছে করে দেউলিয়া হয় না কেউ। তবু তোমায় জানতে দিইনি যে আমার ভিতে ভাঙন ধরেছে। জানতে দিইনি শুধু তোমার শান্তির ব্যাঘাত ঘটবে বলে। জীবনের অনেক সত্য তোমরাও ঠিক যে-কারণে পুরুষের কাছে গোপন কর, তা ছাড়া অন্য কোন কারণ ছিল না আমার মনে।

সুরেখা চমকে ওঠে। খাণ্ডেলওয়ালকে এমন করে কথা বলতে দেখেনি সে কোনদিন। মনে হলো, ওর বুকের ভিতরটা খাণ্ডেলওয়াল বুঝি কোন অসতর্ক মুহূর্তে নিঃশেষে দেখে ফেলেছে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও কেমন অস্বস্তি বোধ করে সুরেখা।

কামলা রোগীর মত কেমন একটা ফ্যাকাশে পীত হাসি ফুটে ওঠে খাণ্ডেলওয়ালের মুখে: পাওনা-দেনার হিসাব করবার অনেক আগেই তোমার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। নগদ আর শেয়ারে একলক্ষ বিশ হাজার টাকা—

আই হে'ট্।

স্লিপার জোড়াটা পায়ে গলিয়ে সুরেখা বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খাণ্ডেলওয়াল নির্বাক্ বসে রইল বাইরের দিকে চেয়ে। মালয়ান রোটামের গ্রীণ জারটা দরজার পাশে উল্টে পড়েছে সুরেখার আঁচল লেগে। রোটামটা সুরেখাই যোগাড় করেছিল দীপ্তি সান্যালের কাছে। গ্রীণ জারে বসিয়ে গাছটা ওকে উপহার দিয়ে দীপ্তি বলেছিল: আন্দামানের অপবাদ চিরায়ু হয়ে থাক এই রোটামের শাদা আর বাদামি রঙের ফাঁকে ফাঁকে কলঙ্কের কালো ছোপগুলো আছে বলেই রোটামটা এত সুন্দর!···রঙ্গস্বামী চাকরি ছেড়ে দেশে চলে গেছে।

তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে অলস রাজপথে। অজগরের মত অলস হয়ে আছে মহানগরীর রক্তবহা নাড়িগুলো। বাতাসে কেমন একটা রিক্ততা!

খাণ্ডেলওয়ালের মগজে রিমরিম করে, সুরেখার সে-দিনের কথাগুলো। মিষ্টি হেসে দীপ্তিকে বলেছিল: ভাই। সত্যি ভাই। কলঙ্ক আছে বলেই চাঁদ এত সুন্দর।

ক্রমশঃ





উলার—মহাপদ্ম সরোবর

ঝিলম বয়ে যাচ্ছে শ্রীনগর থেকে উত্তর পশ্চিম মুখে। গিয়ে পড়ছে উলার হ্রদে। প্রাচীন নাম উল্লোল হ্রদ। সেই উলোল—'রলয়োরভেদঃ' সূত্রে উল্লোল হোলো উলোর; উলোর—উলার একটা আংরেজিক রূপ। আরও আগে নাম ছিল মহাপদ্ম সরোবর।

শ্রীনগর থেকে উলার, এর মধ্যে ঝিলমের আশে পাশে বহুকীর্ত্তি, বহু মন্দির, বহু বিগ্রহ, বহু জনপদ নগরী,—আগেও ছিল, এখনও আছে। মহাকাল তার দণ্ড দিয়ে চাকা ঘুরিয়ে নতুন পাত্র গড়েছেনও, আর দণ্ডের আঘাতে বহু পাত্র ভাঙ্গছেনও। তবু এরই কাছে সম্বল। সম্বলের কাছেই গ্রাম পারিহাসপুর অর্থাৎ পরিহাসপুর। ললিতাদিত্যের প্রতিভা ছিল তাই তাঁর এই প্রধানা নগরীকে তিনি বন্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে একটা উঁচু জায়গায় আনলেন। কিন্তু জল এড়াতে গিয়ে জলাভাব ঘটলো। ফলে চমৎকার সহর, চমৎকার জায়গায় থাকলেও লোকবৃদ্ধি হোলো না। এখন আছে মাইলের পর মাইল ব্যাপী ধ্বংসাবশেষ। এই স্তূপের মধ্যে ললিতাদিত্যের উদারতার পরিচয় স্পষ্ট। কতো হিন্দু মন্দিরের পাশে কত বৌদ্ধ স্তূপ, চৈত্য। ললিতাদিত্যের যে এক তুর্কী মন্ত্রী ছিল—নাম চঙ্কুন—সে কথা এই সব স্তূপ থেকেই ধরা গেছে। বহু মুদ্রা পাওয়া গেছে। তা থেকে বোঝা যায় বিনয়াদিত্য, বিগ্রহ ও দুর্লভের সময়েও পরিহাসপুরের খ্যাতি ও মর্য্যাদা নগণ্য ছিল না। এখন গোর্দন গ্রাম আছে। এই গ্রামে ছিল ললিতাদিত্য স্থাপিত গোবর্দ্ধন মন্দির। তা থেকে একটু দূরে একটা নালার ওপর দিত্তর—আকমন গ্রাম, এই নগণ্য তিনটী গ্রামে কাশ্মীর রাজ্যের বিস্ময় তিনটী মন্দির ছিল পরিহাসকেশব, মুক্ত কেশব ও রামস্বামী মন্দির।

সম্বল, পারসপুর হয়ে গেলেই আসে পাটন। ঠিক ঝিলমের তীরে নয়, একটু পশ্চিমে—নদী থেকে সাত আট মাইল দূরে। ৮৮৩ থেকে ৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শঙ্কর বর্মন শঙ্করপুর পত্তন করেন ঝিলমের খালের ওপর। এখানেও বড় বড় মন্দিরের খ্যাতি ছিল, শঙ্কর, গৌরীশ্বর, সুগন্ধেশ ও রত্নবর্দ্ধনেশ।

ঝিলমের নীচে মানসবল হ্রদ একটি রমণীয় হ্রদ। আকারে ১°১২৮০ বর্গ মাইল হবে। ছোটো, কিন্তু সন্ধ্যার ঘুমের মত মিষ্টি, গ্রামের পথের মতো নিবিড় তন্দ্রিত। মানসবলের খ্যাতি দায়োগাবাগের জন্য। এ ছিল নুরজাহানের বাগান। আজ বাগানটা নষ্ট হতে চলেছে, কিন্তু মানসবল এখনও পর্যটকদের টানে।

এর পরেই আসে উলর। উলর আজ হ্রদ। বরাবরই এই হ্রদ ছিল না। প্রমাণ পাওয়া যায় এর আগে পাশের মাটির পাহাড় দেখে। এ পাহাড় ছুঁচলো নয়, বেশীর ভাগই মাথা চ্যাপ্টা। এ থেকে বোঝা যায় সমস্ত জায়গাটা জলের তলায় ছিল এককালে। এই মাটীর পাহাড় গুলির নাম—কারেওয়াহ্। পৃথিবীতে যাবতীয় অপরূপ দৃশ্য আছে উলার তীরের কারেওয়াহ্-প্রান্তর তার অন্যতম। বিস্তীর্ণ প্রান্তর এই মাটীর সমশীর্ষ সমতল চূড়ায় ভরতি। মাঝে মাঝে জলের স্রোতে কাটা দাগ যেন মহাকালের বলি রেখার মতো বিকীর্ণ হয়ে আছে। গভীর খাদে ভরতি এই প্রান্তর। যেমন রুক্ষ, উগ্র, শুষ্ক, তেমনি মাটীর পেলবতা ও নম্রতা জলাভাবের আর্দ্রতার সাক্ষ্য। খাড়াইয়ের গভীরে, আলোর ছায়ায়, রেখায়, বিপুলতায় এ এক অপূর্ব দৃশ্য। কোথাও বড় গাছ নেই, কোথাও নেই সবুজের আভাস। সোনালী মাটীর রং যেন তামাটে হয়ে আছে। সে রং মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ হয়ে বলিতে বলিতে, স্তরে স্তরে, থরে থরে এমন একটা প্রভাব বিস্তার করে -যার আভাস পাওয়া যায়—আমেরিকার গ্রাইন কানিয়নের সৌন্দর্য্যে।

আজ উলর গভীর নয় বেশী। লম্বায় ১৩ মাইল, চওড়ায় ৭ মাইল। বর্ষা ছাড়াও সারা বছর প্রায় ৭৮ বর্গমাইল জলে ঢাকা। কিন্তু এককালে উলর ছিল ৬০০ ফুট গভীর। ভারতের বৃহত্তর হ্রদ। বর্ষায় আবার এ জল যখন আরও বাড়তো তখন দেশে আনতো বন্যা। এখন চড়া পড়ছে উলারে। উলারে চড়া পড়া মানে বন্যা। সরকার যদি উলার সংস্কারে মন না দেন এমন একটা সম্পদের আকর নষ্ট হবে। উলার থেকে বাৎসরিক সিঙ্গাড়া-বা-পানিফলের আমদানী দেড় লক্ষ মণ। যখন উলার আরও বিস্তৃত ছিল, একশো বছর আগেও আমদানী ছিল চার লক্ষ মণ। কী পরিমাণ চড়া পড়েছে বোঝা যায় ভাবলে যে, যে, জয়নালঙ্কা জয়নাল আবেদীন উলারের মধ্যস্থলে নির্মিত করেছিলেন, এখন তা এক পাশে। আশম্ এবং সম্ভল্ উলারের বন্দর ছিল। এখন তা জলহীন দুটী নগণ্য সহর। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে প্রায় চার মাইল জমী উলার থেকে বেরিয়েছে! নজর না দিলে বিখ্যাত এই হ্রদটাই নষ্ট হবে না শুধু, কাশ্মীর বন্যায় ভেসে যাবে।

অবন্তীবর্মন রাজা ৮৫৫-৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যখন রাজত্ব করেন তখন হয় প্রবল বন্যা। রাজা আর কিছুতেই বন্যা নিবারণ করতে পারে না। বিতস্তা আর বেহাতের জল সমগ্র কাশ্মীরকে প্লাবিত করে দিল। তার সঙ্গে যোগ দিল সিন্ধুর জল। কাশ্মীর জুড়ে হাহাকার উঠলো।

গ্রামের একধারে কবে কোন চণ্ডালিনী কুড়িয়ে পায় এক শিশু।

তার সাধ্য নেই যে এই অগ্নিপিণ্ডকে মানুষ করে। এক শূদ্রাণী সখীর হাতে সমর্পণ করে সেই শিশুকে। শূদ্রাণী তাকে পালন করে। কিন্তু কার ছেলে এ? দুর্দম, সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতি এ ছেলে খেলায় যোগদান করে নতুন খেলা আবিষ্কার করে; বাড়ীর কাজে হাত দেয়, অভিনব পন্থায় সকল শ্রমকে লঘু করে আনে। খেলার মাঝে কবে কোন অসংলগ্ন উক্তি করেছে, "ভারী তো রাজা! জল রুখতে পারে না, রাজ্য শাসন করতে চায়। হতাম রাজা, দুদিনে সব জল বার করে দেশ খটখটে করে দিতাম।"

বাহ্বাস্ফোট অনুরণন তোলে। কথা সুবিধা পেলে হাঁটতে পারে। কথা উঠলো অবন্তীবর্মনের কাণে। "কে এই শূদ্র তরুণ?" তার ডাক এলো রাজসভায়। নাম সূর্য্য। সূর্য্যকে রাজা জিজ্ঞাসা করেন "আচ্ছা বলতো কি করে দুদিনে তুমি এই জল বার করতে পারো?"

সাহসী, অসীম-সাহসী এই তরুণ। আগুনের মতো রং, ভাঁটার মতো চোখ, পীরপংজলের চওড়া পাথরের মতো বুকের পাটা। সোজা দাঁড়িয়ে বললো,—"দুদিনের জন্য রাজকোষের মালিক যদি হই, জল বার করে দিতে পারি!"

"পার?" রাজা শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

সূর্য্য বলেন, "পারি; যদি না পারি আমায় পাঁকে পুঁতে ফেলবেন।"

সূর্য্য পেলেন রাজকোষের ভার। ঘোড়ার পিঠে বস্তা করে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে চললেন তিনি ঝিলমের ধারে ধারে যেখানে ঝিলম আবার বেরুচ্ছে উলার দিয়ে। বেরুচ্ছে বেহাত। পার হচ্ছে বরাহমুল গিরিবর্ত্ম। কতকালের গিরিবর্ত্ম। কতো পাথর কত নোংরা জমেছে জলে। এই বর্ত্মের মুখ পরিষ্কার করে চওড়া করলেই তো সব জল বেরুবে। দিলেন বস্তার মুদ্রা সেই জলে ফেলে। শত শত দরিদ্রকে আহ্বান করে বললেন "ফেললাম সোনা জলে। যে পারো কুড়িয়ে নাও।" শত শত ব্যগ্র হাত ছুটে গেল সোনা তুলতে। সামনের বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে সোনা সংগ্রহ চলতে লাগলো। মানুষ যায় যত গভীরে সূর্য্য সোনা ফেলেন ততো মুঠোয় মুঠোয়। পাথরের নুড়ি, স্তূপ সব সরানো হলো। দেখতে দেখতে যুগ যুগ সঞ্চিত আবর্জনা মুক্ত হলো; জল নেমে গেলো।

তারপর আয়োজন করলেন সূর্য্য গিরিবর্ত্মকে প্রশস্ততর করার জন্য। সমগ্র কাশ্মীরকে তিনি বিভিন্ন মণ্ডলে ভাগ করলেন। জলাভূমির জল নিকাশের ব্যবস্থা করে বহু চাষের জমী উদ্ধার করলেন। নদীতে নদীতে খাল দিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। সমগ্র কাশ্মীরে জলপথকে পথ করে তুললেন। বাঁধ দিলেন, সেতু করলেন। কাশ্মীরের রূপ বদলে গেল। কাশ্মীর ঐশ্বর্য্যে ঝলমল করে উঠলো। বর্ত্তমান কাশ্মীর সূর্য্যের কীর্ত্তি।

তখন সূর্য্য কাশ্মীরবাসীর পক্ষে দেবতা যেন। কোথায় জিনিষপত্রের দাম ছিল বার টাকা মন ধান,—দুর্ভিক্ষের অন্ন। দাম নেমে এলো দেড় টাকা মনে। প্রাচুর্য্যে কাশ্মীর স্ফীত হয়ে উঠলো। পন্টাইন্ মার্শ পরিষ্কার করে জুলিয়স সীজর এবং মুসোলিনী রোমের দেবতা হয়ে গেলেন। কাশ্মীরের ভূভাগ জলের গর্ভ থেকে জিনিয়ে, জলা পরিষ্কার করে সূর্য্যের তখন বিপুল খ্যাতি। রাজা সূর্য্যকে বললেন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে। সূর্য্য বললেন মন্ত্রী হবার প্রতি তাঁর লোভ নেই। "আমি দীনাতিদীন শূদ্র। মন্ত্রী হবার স্পর্দ্ধা নেই, যোগ্যতা নেই। অজ্ঞাত কুলশীল কে আমি, মাটীর বুকে পরিত্যক্ত মাটীর সন্তান। তাই মাটীর বেদনা, আর্ত্তি বুক দিয়ে বুঝি। মাথা দিয়ে প্রজারঞ্জন ব্রাহ্মণের কাজ; সমাজের মাথা যিনি। যা করেছি রাজ্যলোভে, যশোলোভে করিনি। মায়ের ব্যথা নিবারণ করতে করেছি। রাজা, আমি সূর্য্য, মাটীর ছেলে; আমায় মন্ত্রীত্ব দিওনা।"



উলার হ্রদের সুবিস্তীর্ণ জলরাশি

এই সূর্য্য, মাটীতে জলে সোনা ঢেলেছেন। এ কথা ইতিহাসে লেখে। এখনকার ইতিহাসকার অবশ্য 'সোনা ঢালা' ইতিকথার 'বিজ্ঞানসম্মত'

ব্যাখ্যা করেছেন,—এতো খরচ করে পূর্ত্তকার্য্য করেছেন সূর্য্য যে লোকপ্রবাদে তা 'সোনাঢালা' হয়ে গেছে। থাকুক। বিজ্ঞান সম্মতির বিদগ্ধ ব্যাখ্যা ;—আমার ভালোলাগে ভাবতে ডানপিটে ছেলের ডানপিটে দাওয়াই ডানপিটে রোগের চিকিৎসার জন্য। তরুণ সূর্য্য সমাজের পরিত্যক্ত ; বনে-বাদাড়ে আনাচে-কানাচে যথেচ্ছ ভাবে ঘুরে বেড়ান, উদাস দৃষ্টিতে দেশের মমতা নিয়ে। কোথায় নালা, কোথায় গিরিপথ, কোথায় বন ; সব তাঁর নখদর্পণে। কাশ্মীর জুড়ে জল জল বলে হাহাকার উঠলো। বন্যায় দেশ যায় যায়। মাটীর সন্তান সেই আর্ত্তনাদ কান পেতে শোনে। সে জানে কোথায় এর গলদ; কোন পথে এর মুক্তি। সে যে তার দেশের মা-টীর সব কথা জেনেছে শিশুর আকুতি দিয়ে। তাই সে সহজে আবিষ্কার করেছে মুক্তির পথ। আশ্চর্য্য লাগে না ভাবতে। সূর্য্য আমার চোখে পৃথিবীর প্রথম সার্থক পূর্ত্ত-এঞ্জিনিয়ার।

এতো বড় একটা বিপুল বিপদ থেকে যে মহাপ্রাণ কাশ্মীরকে উদ্ধার করলো রাজা তাকে ভুলতে পারে না। সেই গিরিবর্ত্মের মুখে—বেহাত আর বিতস্তার মুখে, যেখান থেকে বিতস্তা মহাপদ্ম সরোবর ত্যাগ করে যাত্রা করেছে পশ্চিমে সেইখানে প্রাচীন সহর ছিল—নাম কাম্বুভ। অবন্তীবর্ম্মণের মন্ত্রী কাম্বুভের নাম বদলে নাম দেন সূর্য্যপুর, সূর্য্যের প্রতি কাশ্মীরের শ্রদ্ধার নিদর্শন। আজও সোপুর বা সোপর সমৃদ্ধ নগর, উলারের পশ্চিম তীরে, বিতস্তার নির্গমন পথে। এই পথে নৌকায় ঝিলম দিয়ে কতলোক উরি, গির্গল, বারামুলা হয়ে শ্রীনগরের দিকে গেছে উলার পার হয়ে, ইয়ত্তা নেই।

উলারের ঝড় বিখ্যাত।

এ ঝড়ের বর্ণনা বহু পর্যটকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। আগে তো উরি-বারামুলার পথে বরাবর ঝিলম দিয়ে নৌকা বেয়ে আসা একটা সখ ছিল। সায়েবরা প্রায়ই এই পথে আসতো।

উলারে একটা দিন জলের বুকে কাটানো একটি সর্বোত্তম অভিজ্ঞতা। কাশ্মীরের আকাশের অবর্ণনীয় শোভার কথা আগে বলেছি। এমন স্বচ্ছ নির্মল আকাশ একটা দেশকে সমান ভাবে সারা বছর ঢেকে রাখে ভাবতেও তৃপ্তি। সে আকাশে মেঘের পর মেঘের খেলা ; পানসী বাওয়া মেঘ, তুলো পেঁজা মেঘ, মেঘের পালের মতো গুচ্ছ-ধরা মেঘ। তাতে একই দিনে অল্প সময়ের মধ্যে কতো বর্ণধারণ করে ! সেই বর্ণাঢ্য আকাশের প্রতিচ্ছবি উলারের বিস্তীর্ণ বুকে ভরে থাকে। সোনায় কখনও বা, কখনও জরদে, কখনও কমলায়, কখনও বেগুনীতে, কখনও গেরুয়ায়, কখনও পাটকিলেয়। নৌকা বেয়ে উলারের বুক বেয়ে চলায় এই বর্ণরাজ্যের নানা বিভ্রম চোখে পড়ে, মন জুড়ায়।

আর উলারের ঢেউ। কোথায় ছোটো ছোটো হাতছানি, কোথায় ছোটছেলের পশমী চুলের দোলন, কোথাও অজগরের ফণা, কোথাও উত্তাল স্রোত সঙ্কুল। সেখানে নৌকো চালানো দুষ্কর। পাল দেয়, বড় বড় নৌকায় বাতাসের সাহায্যে চলার প্রত্যাশায়। কিন্তু পঞ্জোলীর চূড়াণ রং দেখে মাঝি বোঝে এলো বুঝি ঝড়। সারাদিনে ঝড়কে একবার বুকে ধরা উলারের জলের অলঙ্ঘ্য পালনীয় ব্রত। যেন আকাশ আর জলের নিত্যদিনের অভিসার লীলা। যেন পবনে বরুণে নিত্যকালের কোলাকুলি। এই ঝড়ের বর্ণন যত প্রসন্ন, এর মধ্যে পড়ে যাওয়া ততো প্রসন্নতার দাবী রাখে না। সে এক মহা বিপদের কথা। পাল ছিঁড়ে, নৌকার পাটাতন ছিঁড়ে, দরজা জানলা ভেঙ্গে উলারের জল নৌকার ওপর ঝলকে ঝলকে তুলে দিয়ে শান্ত উলারের সহসালব্ধ দামাল দস্যি-পনা।

কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী নয়। সেই প্রলয়ঙ্কর নটরাজের নৃত্য অল্পক্ষণে শান্তং সুন্দরং হয়ে যায়। আবার উলার হয় শান্ত, আবার আকাশ হয় রমণীয়, পীর পঞ্জোলীর দুগ্ধফেননিভ চূড়া ঝলমল করে হাসতে থাকে। উলারের স্বপ্নাভিসার দেখার নির্বাক সাক্ষ্য হিসাবে তার কৌতুক আর ধরে না।

এই ঝড় পার হলে শান্ত উলার। তখন ঝিলমের স্রোত বেয়ে চলে যাও শ্রীনগর উজান পথে। উলারে এসে তিনটি নদী পড়েছে, উলার দিয়ে বেরিয়ে গেছে একটী নদী, মিশেছে মুজফফরাবাদে কিষণ গঙ্গায় গিয়ে। আজ মুজফফরাবাদের সীমা 'সীজ-ফায়ার লাইনের' ওপারে।

উল্লোল হ্রদ যখন ছিল মহাপদ্ম সরোবর তখনকার কাহিনী ছিল।

মহাপদ্ম নাগ ছিল। বিরাট নগরী ছিল তাঁর অধীন। বিরাট ব্যবস্থা। রাজা সুন্দর সেনের সময়ে মহানগরীর ঐশ্বর্য্যে আর প্রাচুর্য্যে স্ফীত হয়ে উঠলো পাপের ভার। ব্রহ্মণ্য ধর্মে অনাচার ব্যভিচার ঢুকলো। তিনি হলেন 'গো-ব্রাহ্মণ হিতায়' কৃষ্ণের শরণাপন্ন। তাঁর নগরীতে এতো পাপ তিনি সহ্য করতে পারেন না। বিহিত করতে হবে কৃষ্ণকে ধ্বংস করে। নাগবংশের মহাপদ্ম। কেউ কেটা ন'ন। কৃষ্ণকে রাজী হতে হোলো। কিন্তু কৃষ্ণ নিজে তো পাপ করতে পারেন না। নগরী ধ্বংস করতে গিয়ে যদি একটিও পুণ্যাত্মা নিহত হন কৃষ্ণের তা সইবেনা। তিনি তখন দেখতে লাগলেন কোনও পুণ্যশ্লোক আছে কিনা তাঁর স্থাপিত নগরে। অবশেষে তিনি দেখলেন নগরীর উপকণ্ঠে কটুল নামে এক কুম্ভকার নিত্য তার শ্রমপুঞ্জ দিয়ে মহাকালের সেবা করে। নিত্য তার শ্রম, নিত্য তার উপার্জন, সঞ্চয় করেনা, ঋণ করেনা ; পরমুখাপেক্ষী নয়, স্বাধীন, স্নিগ্ধচেতা। তিনি কুম্ভকারকে স্বপ্নে বলে দেন যে নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সে যেন আত্মরক্ষা করে। কটুল ভাবলো কেবল আত্মরক্ষা করে তার কোনও পুণ্য হবে না। নগর যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেই, তাকে জানাতে হবে অন্যান্য নগরবাসীদের।

বিলাসোন্মত্ত রাজপথে। কটুল চিৎকার করতে করতে যায় পথ দিয়ে, "সাবধান সবাই সাবধান"—এ নগর ত্যাগ করে আজই সব চলে যাও। মহাকাল উন্মত্ত হয়েছেন। পাপ আর তাঁর সইছে না। এ নগরী রসাতলে যাবে, বিনষ্ট হবে। প্রাণের মায়া থাকে পালাও।"

উন্মাদ বলে ঢিল মেরে জনতা তাড়িয়ে দিলো। একা একা সে বেরিয়ে এলো সেই নগরী থেকে। সঙ্গে এলো তার কুকুর, একটি পোষা

ক এবং কয়েকটা চিনারের চারা। একদিন পরে সমস্ত নগরী প্রবেশ করলো পাতালে। সেখানে উঠলো জল। যেন ন্যাথালিয়ন হথর্ণের গল্প 'ফিলোমেন এ্যণ্ড বসীস্।' সেই "মহানগরীব্যাপী জলই মহাপদ্ম সরোবর।

অভিশাপ মোচন হবে রাজার পুণ্য বলে; যে রাজার পুণ্যবল স্বয়ং শ্রীহরির মতো। জয়নাল আবেদীনের ইচ্ছা মহাপদ্ম সরোবরের মধ্যে নগরী নির্মাণ করেন। ব্রাহ্মণ এবং সমগ্র হিন্দু কাশ্মীরী জয়নালকে। সত্য সত্যই দেবতা মনে করতো। তারা উৎসাহ করলো উলারের মধ্যে নগরী স্থাপন, যেমন জয়াপীড়ের অন্তর্কোট। নগরী নির্মিত হোলো জয়নালঙ্কা। তীর থেকে জয়নালঙ্কায় যাবার সেতু। আকবর গড়ে ছিলেন তাঁর ধর্মসভা দীন-ই-ইলাহী প্রচারের স্থান ফতেপুরে সিক্রীতে। জয়নাল ভাবলেন এ নগরীর উপাস্য দেবতা কি। উলারের হ্রদের ওপর চতুষ্কোণ নগরী। তার চার কোণে তিনি চার মন্দির গড়ে দেন। একদিকে হিন্দুর মন্দির, অন্যদিকে মুসলমান মসজিদ, তৃতীয় দিকে বৌদ্ধ মন্দির, চতুর্থ দিকে পীর, ফকির, সন্ন্যাসী, পথিকের আস্তানা। আজ জয়নালঙ্কাও নেই, সেই সব কীর্তিও নেই। আছে—আছে—যা যায়না তা আছে, ভগ্ন স্তূপ, মাটীর সাক্ষ্য, সেই মন্দির মসজিদের ভগ্নাবশেষ।

হ্রদের উত্তর পূর্ব তীরে গরুর গ্রাম এককালে গরুড় নগর ছিল। এই গরুড় নগরে গরুড়ের অপরূপ মন্দির ছিল। আজ আছে কেবল গ্রামখানা, আর তার নাম গুরুর—উর্দ্ধতে গুরুর নামে অহংকার।

সময় নেই, সময় নেই। মহাপদ্ম সরোবর—উলারের বেড় পরিক্রমা করবো সে সময় নেই। উলারের পূবধার দিয়ে এসে বেড় দিয়ে উত্তর পূবধার পেরিয়ে গরুর গ্রামের পাশ দিয়ে পৌছালাম একটা ডাকবাংলায়। ডাকবাংলার পাশে খালের জল সরবরাহের একটা ছোটো দপ্তর। বাঁধ দিয়ে জল বেঁধে যে খালে জল সরবরাহ হয় তার ধরণ আমাদের জানা। কাশ্মীরের খাল এ ধরনের নয়। কাশ্মীরে খাল খুঁড়ে কয়েকটা লক্-গেট করে নিয়ে খালকে পরিষ্কার আর মজবুত রাখাই বড় কাজ। তেমন ব্যবস্থা করার দপ্তরই দপ্তর।

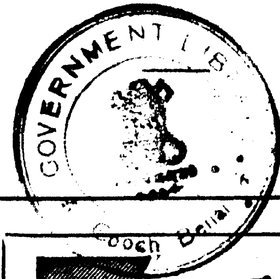
দপ্তরের দিকে আমরা না গিয়ে ডাকবাংলার বাগানটায় ছড়িয়ে পড়লাম।

সেই একা হয়ে যাবার আগ্রহ। কিন্তু অতীত নাছোড়বান্দা, একা থাকতে দেয় না। একা-থাকার আগ্রহটা জাহির করে—একা থাকায় আনন্দ নেই। সঙ্গীকে অবহেলা করছি—এ বোধ পরিস্ফুট ভাবে প্রকাশ পাবার পর সঙ্গের মর্য্যাদা বেশ কমে আসে। অথচ সত্যিই সব সময়ে সঙ্গ ভাল লাগেনা। যেমন উলারের তীরে সেই ক্লান্ত মধ্যাহ্নটীতে লাগেনি। পশ্চিম দক্ষিণ দিকে তীর প্রায় দেখা যায় না। দেখা যায় বহুদূর দিগন্তে নীলাভ গিরিশ্রেণীর শিখরে ধবধবে সাদা বরফের স্তূপকে ঢেকে ধোঁয়াটে একটা আবছায়া। পীরপাঞ্জাল। উত্তর পশ্চিমটায় হরমুকের শাখা। ঝকঝকে রোদ পপলারের পায়ে এসে পড়েছে। কাশ্মীর উপত্যকায় দুষ্প্রাপ্য কয়েকটা পাইন এবং অনেকগুলি সিলভার-বার্ক গাছ ডাকবাংলোর চৌহদ্দীর মধ্যে। পুরু ঘাসের গালিচা। আমি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম।

খাওয়া সেরে আবার বাসে চলেছি উত্তর ঘুরে পশ্চিম তীরে। এবার যাবো বারামুলা। পথের গতি উর্দ্ধমুখে। প্রায় তিন মাইল পথ খাড়াইয়ের পর এবার নীচে আর নীচে।

এখন চলেছি বারামুলা—বরাহমূল—আমাদের যুদ্ধ বিবাদের স্থান বারামুলা—উরী, পুঁছ, নওশেরা। না না উরী, পুঁছ, নওশেরা নয়; বারামুলা। বারামুলার পথে দাঁড়িয়ে প্রণাম করবো পথের পারে যেসব ভারতীয় আত্মদান করেছে আফ্রিদি হানাদারদের রুখতে গিয়ে। গৃহ-বিবাদ সঙ্কুল কুরুক্ষেত্র যদি তীর্থ হয়, বারামুলা আমার তীর্থ।

ক্রমশঃ



মানবতার সাগর-সঙ্গমে, সুইডেনে আর সোবিয়েতে

শচীন সেনগুপ্ত

—দুই—

আরিয়ানার পুষ্পকরথ অমৃতসরে অবতরণ করল। আমরাও নামলাম। বরযাত্রীদের যেমন করে অভ্যর্থনা করা হয়, তেমন করেই রেস্তোরাঁর ম্যানেজার অভ্যর্থনা করে জানালেন ব্রেক্‌ফাস্ট তৈরি! যাত্রীদের কেউ কেউ হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন। অনেকে সে-সময়টুকুও অপব্যয় করতে গররাজী হয়ে সোজা টেবিলে গিয়ে বসলেন। আফগান কোম্পানী খাবার ব্যবস্থাটা ভালোই করেছিলেন। দুম্বার কাবাব যদিও ছিলনা, রুটি, মাখন, ডিম, কাটলেট, জেলি, জ্যাম, ফল প্রভৃতি দিয়ে প্লেট ডিস্ ভরতি করেই রেখেছিলেন। খেতেও কেউ কার্পণ্য করলেন না। কেউ কেউ দুধও চেয়ে নিলেন। প্রায় সকলেই দু'কাপ করে কফিও উদরস্থ করলেন।

কাবুলীওয়ালা বন্ধুটি খাবার টেবিলেও আমার পাশে স্থান করে নিল। কিছুকাল ছুরি আর কাঁটা হাতে নিয়ে চুপ করে সে বসে রইল।

আমি বললাম,—ওতে অসুবিধে হয় যদি, হাত দিয়েই মুখে তুলে দাও, খাঁ সাহেব। কিন্তু সে তা করল না। আরো কিছুকাল চুপ করে বসে সকলের হাতের কাজ লক্ষ্য করে ছুরি-কাঁটা ঠিক মতোই ব্যবহার করতে লাগল। মাঝে মাঝে কাঁটা থেকে খসে খসে যা পড়ে যাচ্ছিল, বেশ সপ্রতিভ ভাবে হাত দিয়ে তুলে নিয়ে সে তা মুখে পুরে দিচ্ছিল। টেবিলের আরো কেউ কেউ ও-কাজ করছিলেন, কিন্তু কৌশল করে; অমন সপ্রতিভ ভাবে নয়।

মাটিতে পা দেবার পর থেকেই কাবুলীওয়ালার ব্যবহারে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলাম। তা হচ্ছে এই যে, সে আর নিজেকে তেমন অসহায় মনে ত করছেই না, পরন্তু সকল বিষয়ে আর সকলের যে অধিকার আছে, তারও অধিকার যে তার চেয়ে কিছু কম নয়, তা সে বুঝে নিয়েছে। সে কেবল ওই এক টেবিলে বসে খাবার অধিকারটুকু পেয়ে। ওরা কিন্তু তাই খেতে অভ্যস্ত। চাকর বাকরদের সঙ্গে এক সঙ্গে বসে ওরা খায় কিনা তা জানি না। কিন্তু সোবিয়েতে দুটি শিক্ষিত পরিবারে পরিচারিকাদেরকে পাশে নিয়ে এক টেবিলে আমরা খেয়ে এসেছি এবং লক্ষ্য করেছি টেবল-টকে অংশ গ্রহণ করতে তারাও কুণ্ঠাবোধ করেনি, তাদের মনিবরাও তাতে বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। আমাদের দেশে যারা টেবিলে খাওয়া চালু করেছেন, তাঁরা পরিবারের সকলে এক সঙ্গে খান, কিন্তু চাকর-বাকরদেরকে টেবিলে স্থান দেবার কথা ভাবতেও পারেন না; আর যাঁরা টেবিলে খাওয়া চালু করেন নি, তাঁরা ত বাড়ীর মেয়েরাই খেলেন কি খেলেন না—তারই খবর রাখেন না; চাকর-বাকরদের কথা ত ওঠেই না। এ বিষয়ে আমার মনে হয় বাঙালীই সব চেয়ে বেশি উদাসী। খাবার এই প্রচলিত ব্যবস্থার এবং রান্নাঘরেরও সর্ব্বগ্রাসী দাবীর পরিবর্ত্তনের সময় আজ এসেছে; আর কোন কারণে না-হোক, অন্তত মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য।

পেট ভরে খেয়ে টেবিল ত্যাগ করে আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। মেঘের ফাঁক দিয়ে দিয়ে সূর্য্যের আলো মাঝে মাঝে এসে পড়ছে বর্ষাস্নাত বড় বড় গাছগুলির পাতায় পাতায়। অবারিত মাঠ। অমৃতসর শহরের চিহ্নমাত্র দেখা যায়না। কিন্তু এই মাঠও মনকে ভরিয়ে রাখল। একবারও মনে হোল না সময় পেলে শহরটা, অন্তত শিখদের স্বর্ণ-মন্দিরটা, দেখে আসা যেত! আকাশে-ওড়া মনে শহর, সৌধ, মন্দির, মসজিদ, সবই যেন অবাস্তর।

নির্দ্দেশ পাওয়া গেল, প্লেনে উঠ্‌তে হবে। ধীরে ধীরে সবাই গিয়ে প্লেনে উঠলাম, দেখলাম কাবুলীওয়ালাটি আগে-ভাগে উঠে পড়ে আমার আসনটি দখল করে বসেছে। কোন আসনের ওপর আমার অথবা কারুর কোন বিশেষ অধিকার ছিলনা। তবুও কাবুলীওয়ালাকে বল্লাম—ও আসনটি ছেড়ে দিতে হবে, খাঁ সাহেব।

সে আপত্তি করল না, আসনটি আমাকে ছেড়েই দিল। আসনে বোসেই যেন একটু ব্যথা পেলাম মনে। লোকটিকে কেন উঠিয়ে দিলাম! এটা ওর প্রথম বিমান-যাত্রা। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখবার কৌতূহল ওরও ত হয়!

আমি বল্লাম—এস খাঁ সাহেব, এই আসনেই বোস তুমি।

সে জবাব দিলে—না, বাবুজি, আপনিই বসুন। আমি যা দেখব, তার কিছুই বুঝব না। হয়ত আমার ভয়ই হবে।

আমি হতবাক্। তার মুখের দিকে আর আমি চেয়ে দেখতে পারলাম না, জানালা দিয়ে বাইরে দেখবারও প্রবৃত্তি রইল না। আমি চোখ বুজে বসে রইলাম। সহসা অনেকটা আর্ত্তনাদের মতোই নারীকণ্ঠের উক্তি আমাকে চমকে দিলে—একি!, এত নীচু দিয়ে চলছে কেন!

জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই খুব নীচু দিয়েই চলেছি আমরা। একটা তারের বেড়াও দেখলাম। কাবুলের আগে প্লেনের আর কোথাও ত মাটি স্পর্শ করবার কথা নয়! তবুও যে মেঘেই চলেছি, মাটি ছোঁয়-ছোঁয়।

আরোহীদের মাঝে সঙ্গত চাঞ্চল্য দেখা দিল। দেখা গেল কক্‌পিট থেকে মাঝে মাঝে এক-একজন কর্ম্মচারী বেরিয়ে এসে জানালা দিয়ে কী যেন দেখে আবার কক্‌পিটে ফিরে যেতে লাগলেন। আরোহীরা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন, কিন্তু কর্ম্মচারীরা কারুর প্রশ্নের কোন জবাবই দিলেন না। প্লেনের অত নীচু দিয়ে যাওয়া প্রথম

যিনি লক্ষ্য করে কারণ জানতে চেয়েছিলেন, তিনিই আবার বল্লেন—'ব্যাপারটা কী বলুন না, শচীনদা।'

শচীনদাই যেন জানেন! তাঁর যেন কিছুমাত্র উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও হয়নি! তবুও পরিস্থিতিটাকে কিছু লঘু করবার জন্য উৎকণ্ঠিতা শোভা চক্রবর্তীকে বল্লাম—তোমার মাথার ওপর দিকে চেয়ে ত্মাখত, শোভা।

—একি! ছাদের কাঠ বেরিয়ে পড়েছে যে! শোভা বল্লেন।

—তবেই বোঝ প্লেন নীচু দিয়ে চলছে কেন!

—না, না, এ ত ভালো কথা নয়।

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, চিত্ত বিশ্বাস টিপ্পনি কাটলেন—ফোর্স্‌ড্ ল্যান্ডিং ও বেশ বিপজ্জনক।

শোভা ঠিক উত্তরই দিলেন। তিনি বল্লেন—ব্যাকরণ দিয়ে বিপদ বারণ করা যায়না। এরোপ্লেনের ছাদের কাঠই বা বেরিয়ে পড়েছে কেন, আর এত নীচু দিয়েই বা চলছে কেন, তাই বল।

—ক্যাটস্, ক্যাটস্! খালি কোন্দল করে!—আমি বল্লাম। তার সঙ্গে জুড়ে দিলাম—'চেয়ে ত্মাখ কত উপর দিয়ে চলেছি আমরা।

—তাইত! মেয়েরা সমস্বরে বল্লেন।

ব্যাপারটা কি হয়েছিল স্টুয়ার্ড তখন তা খুলে বল্লেন। প্লেন যখন নীচু দিয়ে চলছিল, তখন ভারত-সীমান্ত পেরিয়ে আমরা পাকিস্তানে প্রবেশ করছি। আফগান প্লেন যাবার জন্য পাকিস্তান এক ফালি পথ স্থির করে দিয়েছে। ওর ডাইনে-বাঁয়ে সরে উড়ে গেলে আইনভঙ্গ করা হয়। ওই নিয়ে অনেকবার আরিয়ানাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে



সোভিয়েটের পথে ভারতীয় প্রতিনিধিদল

—বেশ বিপজ্জনক!—ঝাঁঝালো কণ্ঠে শোভা বল্লেন; আর সঙ্গে জুড়ে দিলেন—বিপদটা যেন ভীষণ আরামপ্রদ।

উমা সেহানবীশ মুখ টিপে টিপে হাসছিলেন। তিনি বল্লেন—চিত্ত বাংলা সাহিত্যে সেকেণ্ডক্লাশ অনার্স নিয়ে এম-এ পাশ করেছে, তাই বিপজ্জনক শব্দের আগে 'বেশ' ব্যবহার করতে ওর বাধে না। কিন্তু তুমি বাপু, 'আরামপ্রদ' শব্দটির আগে 'ভীষণ' বিশেষণটি জুড়ে দিয়ে কোন্ অবস্থাটা বোঝাতে চাও, বলত?

চিত্ত ভাবলেন উমা তারই অনুকূলে রায় দিয়েছেন। তাই তিনি বল্লেন—দাও, উত্তর দাও।

হয়েছে। পাকিস্তানের উপর দিয়ে-ওড়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে বলে অনেক হুমকীও কোম্পানীকে সইতে হয়েছে। পাইলট তাই অত নীচু দিয়ে উড়ে পথের ফালিটার নিশানা ঠিক করে নিচ্ছিলেন। আসলে ভয়ের কোন কারণ ঘটেনি।

—তা দয়া করে এই কথাটি তখন জানালেন না কেন? শোভা জানতে চাইলেন।

মৃদু হেসে ষ্টুয়ার্ড জবাব দিলেন—এয়ারক্র্যাফটের সব মুভমেণ্ট সব সময়ে যাত্রীদেরকে বলা নিয়ম বিরুদ্ধ।

এর ওপর আর কথা চালানো উচিত নয় বুঝে শোভা মুখ ঘুরিয়ে

জানালা দিয়ে দৃষ্টি ভাসিয়ে দিয়ে বল্লেন—এবার ত বেশ উঁচু দিয়েই উড়ে চলেছি।

আমি বল্লাম—এখন হয়ত আমরা আট হাজার ফুট উপর দিয়ে, অর্থাৎ দার্জিলিঙ পাহাড়েরও দু'হাজার ফুট উপর দিয়ে, চলেছি।

কাবুলীওয়ালাটি বল্লে—আমার দেশে খুব উঁচু-উঁচু পাহাড় আছে, বাবুজি।

—তারও অনেক উঁচু দিয়ে আমরা উড়ে যাব, খাঁ-সাহেব। বল্লাম আমি।

প্লেন বেশ সহজভাবেই এগিয়ে চলেছে। যাত্রীরা মৃদু গুঞ্জরণ করছেন। এইবার আমাদের দলের মেয়েদের, অর্থাৎ, মহিলাদের, পরিচয় দিই।

মিসেস শোভা চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পৌত্রী। তিনি ন্যাশনাল ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান উইমেনের একজন উদ্দীপনাময়ী কর্মী। নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা দিয়ে তিনি সবল রেখেছেন। তার চেয়ে বড় কথা তিনি সুগায়িকা। রবীন্দ্র-সঙ্গীত বড় ভালো গাইতে পারেন তিনি। শান্তি সংসদের একটি অনুষ্ঠানে প্রথম যে-দিন তার গান শুনেছিলাম, সে-দিন মনে হয়েছিল গায়িকাটি গুণী বটেন, কিন্তু লাজুক। এই শহরে বেরিয়ে দেখলাম তাঁকে তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। তাঁর কণ্ঠ মধুময়, কিন্তু প্রয়োজন হলে কণ্ঠের সেই [illegible] জিহ্বার ডগায় টেনে এনে নিমেষেই তিনি তাকে এ্যাসিডে রূপান্তরিত করতে পারেন। সে এ্যাসিড যার উদ্দেশে তিনি প্রক্ষেপ করেন, তার গায়ে যদি নিতান্তই গর্দ্দভের চামড়া না থাকে, সে তার সান্নিধ্য পরিহার করে চলবেই। আমি মনে মনে মানুষ পরখ করতাম। তাই মাঝে মাঝে বিশেষ-বিশেষ মানুষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি, জেনে নিতে চাইতাম। তিনি এমন নির্দ্দয় অথচ নির্ভুল সমালোচনা করতেন, এবং তাঁর অভিমত ব্যক্ত করবার জন্য এমন সুষ্ঠু ভাষা প্রয়োগ করতেন যে, আমি বিস্মিত হয়ে যেতাম এই ভেবে যে, এই মেয়েকে আমি একদিন কুণ্ঠিতা—আর একান্ত করে আপন কৃতিত্বের মাঝেই অবগুণ্ঠিতা মনে করেছিলাম! শোভা তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারিণী। সে বুদ্ধির যেমন তীক্ষ্ণতা আছে, তেমন দীপ্তিও আছে। তার মনে যেমন তেজ আছে, তেমন সঙ্গত ও শোভন বিনয় আর শালীনতারও অভাব নেই।

মিসেস উমাশেহনবীশ আমাদের স্নেহভাজন চিন্ময় শেহনবীশের স্ত্রী। কিন্তু তিনি স্ত্রী, কি কন্যা, কি মাতা, তাকে দেখে তা মনেই আসে না। তিনি সত্যই উমা, ওরিয়েন্টাল চেহারা, হয়ত মনেও ওরিয়েন্টাল—তুর্কি-আরবি ওরিয়েন্টাল নয়, ভারত-চৈনিক ওরিয়েন্টাল, হয়ত কিছুটা এশিয়-রুশী। তিনি শিক্ষিকা, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের ধাত্রী, দেশের নানা ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে যে কনভেনশনে আণবিক অস্ত্র ব্যবহার ধর্ম্ম-বিরোধী কাজ বলে ঘোষণা করেন, সেই কনভেনশনটি প্রধানতঃ তাঁরই অনলস পরিশ্রমে এবং অমায়িক ব্যবহারে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। যে-দায় সকলে এড়াতে চায়, সে-দায় তিনি নিজের কাঁধে তুলে নেবার জন্য এগিয়ে যান। বিশৃঙ্খলাকে সুশৃঙ্খল করবার আগ্রহও আছে, দক্ষতাও আছে। প্রয়োজন ছাড়া তিনি কথা বলেন না, কখনো কোন অভিযোগ করেন না, আর এক চিত্ত বিশ্বাস ছাড়া কাউকে শাসন করে করে সৎপথে রাখতে চান না—অবশ্য চিন্ময়ের সঙ্গে কি ব্যবহার করেন, তা আমার জানবার কথা নয়। সুমধুরভাষিণী হয়েও কেন তিনি স্বল্পভাষিণী, কখনো কখনো তাও আমি ভেবেছি। হয় যে পরিবেশে তিনি কাজ করছেন, কাজের ভিতর দিয়েই সব-কিছু তাঁর কাছে প্রকাশ পায়, নয় নিজেকে প্রকাশ করতে তিনি একান্তই নারাজ। তাঁর সম্বন্ধে যে-কথাটি নিঃসন্দেহে জেনেছি, তা হচ্ছে এই যে, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পৌত্রী শোভা চক্রবর্ত্তীর চেয়ে বেশি ব্রাহ্ম।

মিসেস রাণী রায়চৌধুরী শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু বীরেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরীর কন্যা, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্রী-বিভাগে ইংরেজী-সাহিত্যের লেকচারার। একেবারেই ছেলে মানুষ,—যেমন আকৃতিতে, তেমন প্রকৃতিতেও। মাঝে-মাঝে আমি জিজ্ঞাসা করতাম—আচ্ছা রাণি, তোমার ছাত্রীরা তোমাকে মানে?

—কেন, মানবে না কেন? তিনি জানতে চাইতেন।

আমি বলতাম—তুমি যে ছোট্ট একটি মেয়ে।

রাণী হেসে বলতেন—আমার ছাত্রীরা যে আমারো চেয়ে ছোট্ট, অনেক ছোট্ট। আমার চেয়েও অল্প বয়সের অধ্যাপিকা অনেক আছেন। আপনি সে-কালের মন নিয়ে এ-কালের কলেজ কল্পনায় দেখছেন যে!

সত্যিই ত! সে-কালের সঙ্গে এ-কালের পার্থক্যটা সব সময়ে মনে থাকেনা। আর থাকবেই-বা কেমন করে? একেবারে সে-কেলে লোক হয়েও যেমন করে এ-কালের তরুণ-তরুণীদের সকল আন্দোলনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দি, তাতে করে অতলে তলিয়ে যাবার পরেই কেবল বুঝতে পারব এ-কাল সে-কাল নয়।

রাণীও বেশ বুদ্ধিমতী। গোপাল হালদারের মুখে শুনিছি—ইংরেজি সাহিত্যে ওঁর অধিকার আছে, ইংরেজি ভাষায়ও দখল আছে। আমাদের ডেলিগেশনের সাংস্কৃতিক কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলাম আমি, রাণী ছিলেন সম্পাদিকা। কমিশনে আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে করে ছেলেমানুষ বলে তাকে উপেক্ষা করা যায় না, তাঁর স্বাভাবিক ছেলে-মানুষী সত্ত্বেও।

বাঙালী মহিলা ওই তিনজনই ছিলেন আমাদের এই ডেলিগেশনে। তিনজনাই তাঁদের কাজ দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে, এবং শালীনতা দিয়ে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে এসেছেন—ডেলিগেশনের পুরুষদেরকে অনেকখানি নিষ্প্রভও করেও রেখেছেন রূপের আর রঙ-বেরংয়ের শাড়ীর দৌলতে।

কিন্তু মহিলা আরো ছিলেন আমাদের প্লেনে, এবং ডেলিগেশনেও। তাঁদের মাঝে মিসেস রুক্মিণী অরুন্ধতী অসাধারণ নারী। বয়েস তাঁর ষাটেরও ঊর্দ্ধে, কিন্তু শ্রম করবার শক্তিতে এবং কর্ম্মোদ্দীপনায় তরুণীরাও তুলনায় অবলা এবং তাপহীনা। নানা উপলক্ষে তিনি প্রায় সারাটা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েছেন। মাদ্রাজে তিনি সমাজ-সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখেন। মাদ্রাজের ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘের সম্পাদিকা তিনি। কিন্তু কী অসাধারণ শক্তির তিনি অধিকারিণী, তা বোঝা যাবে একটি

ঘটনার বিবরণ থেকে। এই তেষট্টি বৎসর বয়েসের মহিলাটি মাসখানেক আগে দোতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন তাঁদের বাড়ীর কুয়োর মাঝে!

তাঁরই মুখে ঘটনাটা শুনে আঁৎকে উঠে বল্লাম—বলেন কি!

—আরে, সেইজন্যেই ত পাসপোর্ট সংগ্রহ করবার জন্য দৌড়-ঝাঁপ করতে পারলাম না, দেরী হয়ে গেল।

—কুয়োয় যখন পড়ে গেলেন, তখন করলেন কি?

—সবাই যা করে। কয়েক ঢোক জল গিলে ফেল্লাম।

—তারপর?

—তারপর হাতে পেলাম লোহার শিকলটা। শক্ত করে সেটা দুইহাতে ধরে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলাম। লোকজন ছুটে এসে আমাকে তোলবার ব্যবস্থা করল। দিনকয়েক মাত্র শুয়ে থাকতে হয়েছিল।

—দো-তলার ছাদ থেকে কুয়োয় পড়েও বেঁচে গেলেন!

—অনেকেই বাঁচে। রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?

একমাস আগে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। মাদ্রাজ থেকে তিনি পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে পারেন না সময়াভাবে। সোজা চলে আসেন দিল্লী এবং একদিনেই পাসপোর্ট সংগ্রহ করে নেন। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় দেখিছি দশদিনে যত বক্তৃতা হয়েছে, সবগুলি একাসনে বসে একাগ্রচিত্তে তিনি শুনেছেন। শোনবার যন্ত্রটি কখনো কান থেকে নামাননি তিনি। আমার মনে মনে অভিমান ছিল এ-সব কংগ্রেস-কনফারেন্সে ভারতীয়দের মাঝে আমিই সবচেয়ে নিষ্ঠাবান শ্রোতা। কিন্তু এবার দেখলাম জয়আম্মা আমাকেও হারিয়ে দিলেন। একটি নৈশ অধিবেশন এবার আমি ক্লান্তিবশত এড়িয়ে এসেছি। জয়আম্মা তাও করেননি। অবশ্য আমি তাঁরও বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি তাঁকে ডাকতাম—'মাই লিট্‌ল্ সিষ্টার।'

মাদ্রাজ থেকে দ্বিতীয়া মহিলা যিনি আমাদের দলে ছিলেন, তিনিও একজন সমাজ-সেবিকা, মিসেস পার্ব্বতী অম্মল। তাঁরও যেমন দেহের শক্তি, তেমন মনেরও তেজ। ডেলিগেশনের কোন্ সদস্য কোন্ ক্ষেত্রে কী অনুচিত ব্যবহার করলেন, তার প্রতি সর্ব্বদাই তিনি সচেতন থাকতেন। কিন্তু তাই নিয়ে গুল্‌তানি করতেন না, অপরাধীকে চ্যালেঞ্জ দিতেন, অন্যায়টা কোথায় তা বুঝিয়ে দিতেন। যাঁরা অপ্রতিভ হয়ে পড়তেন, তাঁরাও কিন্তু তাঁর উপর রাগ করতে পারতেন না।

মিসেস শান্তিলাবেন শুক্লা আমেদাবাদ মিউনিসিপাল এম্প্লইজ ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর নাম আছে। তিনিও বেশ স্পষ্টবাদিনী।

কেরেলা থেকে এসেছিলেন মিসেস সারদা কৃষ্ণাণ, কেরেলা গবর্ণমেণ্টের হোম-মিনিষ্টার শ্রীভি, আর, কৃষ্ণাণের সহধর্ম্মিণী, নারী-আন্দোলনের প্রখ্যাতা কর্মী। বড় মিষ্টি ব্যবহার তাঁর। সর্ব্বদাই স্বামীর পাশে-পাশে থাকতেন।

আরিয়ানার পুষ্পক-রথে ওই কয়েকটি মহিলা-ডেলিগেট দিল্লী থেকে আমাদের সঙ্গে যাত্রী করেন। পরে আরো কয়েকজন আমাদের সঙ্গে মিলিত হন, অথবা আমরাই তাঁদের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হই। তাঁদের পরিচয় পরে দোব। আবার যাত্রার কথাতেই ফিরে আসা যাক্। বেশ শান্তভাবেই প্লেন চলেছে পাখা মেলে, হেল-দোল কিছুই নেই। তাই যাত্রীরাও নিশ্চিন্তে বিশ্রম্ভালাপ করছে। কাবুলীওয়ালা দীর্ঘকাল নির্ব্বাক থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিল হয়ত।

সে জিজ্ঞাসা করল—আপনারা কোথায় যাবেন, বাবুজি?

—এখন কাবুল। তারপর অনেকদূর।

—কাবুলে কোথায় থাকবেন?

পিছনের আসন থেকে অলইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রতিনিধি সুধীর ঘোষ বল্লেন—কাবুলে আমরা তোমার বাড়ীতে গিয়েই উঠ্‌ব, খাঁসাহেব। খেতে দেবে ত?

—জরুর। দৃঢ়কণ্ঠে সে বল্লে।

সুধীর ঘোষ আবারো বল্লেন—এই এতগুলো লোককেই কিন্তু খেতে দিতে হবে।

আমি বল্লাম—দুম্বা আর রুটি।

কাবুলীওয়ালা বল্লে—হবে। দুম্বা মিলবে।

গোপাল হালদার দূর থেকে বল্লেন—কি দাদা, দুম্বার কাবাব খাচ্ছেন নাকি!

—খাচ্ছিনা, আপনাদেরকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করছি।

অলইণ্ডিয়া কিষাণ সভার সম্পাদক জগজিৎ সিং লায়ালপুরী বল্লেন—দাদা লোকটিকে একজন সরল গেঁয়ো লোক মনে করেছেন। ওর পেশা যে গলায় গামছা দিয়ে সুদ আদায় করে সিকিকে টাকা করা, দাদা তা ভুলে গেছেন।

সুধীর ঘোষ ফুট কাটলেন—দুম্বা যদিই বা খাওয়ায়, হাতীর দাম আদায় করে নেবে।

ওঁদের মন্তব্যগুলো আমার ভালো লাগলনা। আমি বল্লাম—পেশার গরজে মানুষ যা করে, তার অতিরিক্ত অনেক কিছু সব পেশাদারই করে থাকে। একজন মানুষের পেশা তার সবটুকু পরিচয় বহন করেনা।

লায়ালপুরী বল্লেন—দাদা আজ দুম্বা খাবেনই।

আমি কাবুলীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কাবুল শহরেই কি তোমার বাড়ী।

—না, বাবুজি, বিশক্রোশ তফাৎ।

—বি-শ ক্রোশ!

গোপাল বল্লেন—দুম্বা খাওয়া হোলো ত!

আমি জানালা দিয়ে দৃষ্টি ভাসিয়ে দিলাম। বেশ একটা বড় শহরের উপর দিয়ে উড়ে চলেছি! লাহোর নাকি?

ষ্টুয়ার্ড ঘোষণা করলেন—লাহোরের উপর দিয়ে উড়ে চলিছি আমরা। তাকিয়ে দেখলাম বাড়ী-ঘর, পথ-ঘাট, পার্ক-ময়দান, রেল-লাইন-খাল সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেন ছেলেদের একটি খেলনা-শহর কেউ আমাদের দৃষ্টির সামনে সাজিয়ে রেখেছে। লাহোরে প্লেন

নামবে না। কয়েক মিনিটে লাহোরকে পিছনে ফেলে আরিয়ানার ডাকোটা এগিয়ে চল্ল। আগে ভেবেছিলাম কাবুল যখন যাচ্ছি, তখন খাইবার-পাস্ দেখবার সুযোগ অবশ্যই পাব। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না।

অনেকের ধারণা মুক্ত-আকাশে এরোপ্লেন বুঝি অবাধে চলতে পারে। চলতে অবশ্য তা পারে, কিন্তু বাধাও আছে বিস্তর। সে বাধা প্রকৃতি দেয়না, দেয় মানুষ। রাষ্ট্র সুরক্ষিত রাখবার জন্য মানুষ যেখানে যেখানে সৈন্য রক্ষা করে, সামরিক প্রস্তুতির ক্ষেত্ররূপে যে-সব যায়গা ব্যবহার করে, যেখানে দুর্গ থাকে, অস্ত্রশালা থাকে, যে-সব যায়গাকে সামরিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তার ওপর দিয়ে, অথবা নিকট দিয়ে, কারুরই বিমান যেতে দেওয়া হয় না—না পরের, না নিজের ব্যবসায়ী বিমান। নিজের বিমানেও ত অপরের গুপ্তচর ছদ্মবেশে যাওয়া-আসা করতে পারে। পাকিস্তান সেই কারণেই তার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপর দিয়ে অপর দেশের কোন বিমানকে যাতায়াত করতে দেয় না, খাইবার-পাসকে তারা সামরিক গুরুত্ব দেয়। দেবার কারণও আছে। আলেকজাণ্ডার থেকে শুরু করে অনেক দিগ্বিজয়ীই ওই পথেই ভারতে ঢুকেছিলেন। আজ অবশ্য হিন্দুকুশ আর হিমালয়ের অনেক ঊর্দ্ধ দিয়ে উড়ে বোমারু বিমান যখন তখন ভারতে আর পাকিস্তানে হানা দিতে পারে। কিন্তু তাই দিয়ে সামরিক প্রতিরোধ-ব্যবস্থা যাতে না সহজে বানচাল করে দিতে পারে, তার দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে ত। আমাদের খাইবার-পাস দেখা এই কারণেই হোল না।

লাহোর থেকে বিমান দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ লক্ষ্য করে চলতে লাগল। যাত্রীদের গুঞ্জরণ অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। সকলেই শেষ রাতে শয্যাত্যাগ করে বিমান-বন্দরে এসেছিলেন। তাই অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। সামে পিছনে নাসিকা-গর্জ্জনও বেশ হচ্ছে। যাঁরা ঘুমোননি, তাঁরাও ক্লান্ত বলে নির্ব্বাক। আমি বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছি, ঝুঁকে পড়ে আট-নয় হাজার ফুট নীচু-করা ক্ষেত্র-শস্য-নদী-নালা, চোখ ভরে দেখে নেবার চেষ্টা করছি।

ক্রমশঃ

সীমানা

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

এই চেতনার সীমানা পেরিয়ে
কথনো আকাশ-নীলিমা ছোঁওয়া,
কথনো হৃদয় সীমাহীন তটে
কল-মন্দ্রিত সিন্ধু-দোলা।
আধ-তন্দ্রায়, আধ-জাগরণে,
নিমীলিত চোখ উতল মনা
তুমি আর আমি মুখোমুখি থাকি
স্বপ্ন-জাগরে আত্ম-ভোলা।
ইতিহাস নয়, ইতিকথা শোন—
হলুদ নদীর হলুদে লেখা,
হাওয়ায় ছড়ায় গন্ধ-মদির
যুঁই, চাঁপা, বেল, হাসনু হানা ;
আলোয়-আঁধারে একাকার করে
হৃদয় গহনে কী কথা বলা ?
বউ কথা কয়, পাতা ছায়া ফাঁকে
সময়ের নেই সঠিক রেখা।
কারা বলে শুনি সময় পালায় ?
চেতন-প্রজ্ঞা হিসাব ভাবে,
যতটুকু দাম দ্রষ্টা তাহার
সৃষ্টির সাথে সঠিক মাপে।
তবু যেন কোন বেহিসাবীক্ষণ
চেতনা-সীমানা পেরিয়ে এসে
সময় পাহারা এড়িয়ে খানিক
মুক্ত পাখায় জীবন খাপে॥

কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি

পুলক আঢ্য

যেটুকু বৈচিত্র্য আছে মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনে,
(যারপর কুড়িতেই বুড়ী হয় নারী,
ত্রিশেতেই ভেঙ্গে পড়ে যুবকের শক্ত শিরদাঁড়া,
সেই সব দিনগুলি, অর্থাৎ বিবাহ-পূর্ব
এবং পরের ক'টি গোনাগুন্তি দিন)
অতিক্রম করিয়াছি বহু বর্ষ আগে।
এবং করিয়া ব্যর্থ পরিবার-প্লান,
প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি—বৎসরে বৎসরে।

তথাপি জীবন সীতা চুরি করে নিতে
পারে নাই জীবিকা রাক্ষস।
(অবশ্য বেকারী রাহু—গ্রাস করে নেয় নাই
জীবিকা রাহুরে)
যদিও দৈন্যের দৈত্য—অভাবের অসুরেরা যত,
হানা দিয়ে বার বার ফিরে যায় বিড়ম্বিত হয়ে।

তথাপি যুবক আমি—অভাবে, অসুখে,
তথাপি হয়নি ভুগ্ন সেদিনের সেই শিরদাঁড়া।
তথাপি অমর্তলোক বন্দী আজও একটি মোহেতে,
সে মোহ ছন্দিত শুধু—আলো, আশা, গানে,
সে যাত্রা যৌবনদীপ্ত বৈচিত্র্যে মধুর,
সে যে গো তোমারে চেয়ে—তোমারে সৃষ্টির প্রেরণায়
তাইতো যুবক আমি এ জীবন বৈচিত্র্যে মধুর।

জেবুন্নিসার আত্মকাহিনী

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

দ্বিতীয় স্তবক

সলিমগড় দুর্গে পশ্চিম প্রান্তে এক নিভৃত কোণে অলিন্দে একা বসেছিলাম। পশ্চিম নীল আকাশের উজ্জ্বল তারাগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলাম। উদ্দেশ্যবিহীন শৃঙ্খলহীন ঘটনাগুলি একের পর এক মনশ্চক্ষের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল—ঐ আকাশের তারার মত একটির পর একটি। কোনটির সহিত কোনটির সম্বন্ধ নাই—অথচ প্রত্যেকটি আকাশের প্রচ্ছদ পটকে আলোকিত করে তুলেছিল। মুঘল রাজবংশের উজ্জ্বল পটভূমিকায় এই ঘটনাগুলি যেন এক পর একটি ঘনকৃষ্ণ মসীরেখা। আমার নয়নে ছিল অর্থহীন দৃষ্টি, মনে ছিল চিন্তার তরঙ্গ।

আমি কয়েকদিন আগের কথা চিন্তা করছিলাম—আমার প্রিয় শাহজাদা আকবরের দুর্ভাগ্যের কথা। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দিল্লীর রাজপথ আলোকিত হয়ে উঠল। বিরাট দামামা ধ্বনিতে দিল্লীবাসীর নিদ্রা টুটে গেল—রাজপথে কোলাহল, নকীব চীৎকার করে বলে উঠল—'মার হাবা' আলমগীর জিন্দাপীর, (সম্রাট আলমগীরের জয়) আমার পরিচারিকা গুলসম এসে সংবাদ দিল—অসংলগ্ন কয়েকটি বাক্য—শাহজাদা আকবরের বিশ্বস্ত বন্ধু তাহওয়ারখান আওরঙ্গজেবের শিবিরে নিহত, রাঠোরবীর দুর্গাদাস সসৈন্যে শাহজাদা আকবরের শিবির পরিত্যাগ করেছেন।

শাহজাদা আকবর পলায়িত, আকবরের শিবির লুণ্ঠিত।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—এই অসংলগ্ন উক্তিগুলি একত্রিত করতে চেষ্টা করলাম। নিজের মনেই অনেক প্রশ্ন করলাম, উত্তর দিলাম। একথা কি বিশ্বাস করব যে, রাঠোরবীর দুর্গাদাস স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে শাহজাদা আকবরকে পরিত্যাগ করেছেন? মনে হল—কনৌজাধিপতি জয়চাঁদ সিংহ তাঁহার জামাতা চৌহানবীর পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে তিরৌরীর যুদ্ধে বিদেশী বিধর্মী মুহম্মদ ঘূরীকে সাহায্য করেছিলেন; পাণিপথের যুদ্ধের পূর্ব্বে বাবরের নিকট শিশোদিয় রাণা সংগ্রাম সিংহের প্রতিশ্রুতি, ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধ। মনে পড়ে রাজপুতবীর বিহারীমল স্বেচ্ছায় স্বীয় ধর্ম্মনিষ্ঠা কন্যা যোধবাইকে আকবরের হস্তে সমর্পণ করে স্বীয় রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন। অম্বরাধিপতি বিহারীমল প্রতিদ্বন্দ্বী স্বজাতি শিশোদিয় রাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর মুঘলের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এই রাজপুত জাতি নিজের জাতির সম্মান বিসর্জ্জন দিয়ে বিধর্ম্মী মুঘলকে কন্যাদান করেছিল কোন স্বার্থে? মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করেছিল কোন্ প্রেরণায়? মুঘল দরবারে আমীরপদ লাভের জন্য? স্বীয় রাজ্যসীমা রক্ষার জন্য? বুদ্ধিমান আকবর বুঝেছিলেন, রাজপুত জাতির দুর্ব্বলতা। সেই দুর্ব্বলতার সম্পূর্ণ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। মনে পড়ে, সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে রাণা অমর সিং এবং রাণা করণ সিংহের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিতোরের স্বাধীনতা ক্রয় করেছিলেন। মনে পড়ে, শাহজাহান রাজা জয়সিংকে মির্জ্জা উপাধি দান করে রাজসভায় মনসবদার নিযুক্ত করে অম্বররাজের গরিমা ম্লান করে দিয়েছিলেন—রাজা যশোবন্ত সিংহের বীরত্বই ছিল সম্রাট শাহজাহানের অন্যতম ঐশ্বর্য্য। এই দুই রাজপুতবীর তরবারি স্পর্শ করে সম্রাট শাহজাহানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে উঠবে, ততদিন আমরা তৈমুর বংশের সম্মান রক্ষার্থে জীবনপণ করব, যতদিন সম্রাট আকবরের উদার নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের আদর্শ থাকবে, ততদিন মুঘল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য রাজপুতের তরবারি উন্মুক্ত থাকবে। সামুগড় ও ধর্মাটের যুদ্ধে এই রাজপুতবীর শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে আওরঙ্গজেবকে সহায়তা করেছিলেন। আজ শুনছি, রাঠোর বীর দুর্গাদাস শাহজাদা আকবরকে পরিত্যাগ করেছেন। অদ্ভুত এই রাজপুত জাতি! মিথ্যা অভিমানের বশীভূত হয়ে হয়ত তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অদ্ভুত ভাবপ্রবণ এই রাজপুত জাতি! প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য মুহূর্ত্ত চিন্তা না করে আত্মবলিদান করে। অন্যদিকে ধর্ম্মের জন্য, নারীজাতির সম্মানের জন্য, দেশের জন্য, রাজপুত পুরুষ নারী অকাতরে সর্ব্ব স্বার্থ ত্যাগ করে, প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়।

আমি অনবরত চিন্তার জাল বুনে চলেছিলাম—কোথাও এসে মনকে স্থির করতে পারি নি—এ যেন কোন মায়ার রাজ্য দিয়ে চলেছি। মনে হল যেন আমার আত্মা শরীর থেকে মুক্তিলাভ করেছে। আমার অশরীরী আত্মা কল্পলোকে ভেসে চলেছে—সে লোকে আলো নাই, অন্ধকার নাই; দিন নাই রাত্রি নাই—রাত্রি নিশীথে বিলীন হয়ে গেছে। নিশীথ প্রভাতে ফুটে উঠেছে—প্রভাতের ঐশ্বর্য সূর্য্যালোকে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সূর্য্য আবার রাত্রির অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল। আমার মধ্যে আশা নাই—আকাঙ্ক্ষা নাই, অথচ সব কিছুই আছে।

একটু পরে আমি আমার সম্বিৎ ফিরে পেলাম। বাদশাহ আলমগীরের দরবারে সুলেমান শিকোর বিহ্বল করুণ মুখখানি আমার নয়নে ভেসে উঠল। তারই পার্শ্বে দেখলাম বিভ্রান্ত শাহজাদা আকবরের মুখ। দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনের উজ্জ্বল হীরা মাণিক্য সমস্ত মুঘল রাজপরিবারকে লুব্ধ করে তুলেছে। বাদশাহ আলমগীর সদা সন্ত্রস্ত, শঙ্কিত—কারাগারে শাহজাহান আলমগীরকে অভিসম্পাৎ করেছিলেন—তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, তোমার পুত্রও তোমার সঙ্গে সেই ব্যবহারই করবে। সন্দেহাতুর ঔরঙ্গজেব সেই অভিশাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য নিরলসভাবে অহোরাত্র প্রত্যেকটি সন্তানের কার্য্যকলাপ অতি সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করে চলেছেন, প্রত্যেকটি শাহজাদার চতুষ্পার্শ্বে গুপ্তচর, সংবাদ-সংগ্রাহক। অন্তঃপুরে ভৃত্য পরি-

চারিকা। প্রাসাদে সূর্য্যোদয় হতে চন্দ্রাস্ত পর্য্যন্ত রাজপুত্রদের প্রত্যেকটি কর্ম্মের সংবাদ সম্রাটের নিকট নিবেদন করে চলেছে। রাজপুরীর বিলাস-বিভ্রম আনন্দ উৎসবের মধ্যে একটা ভারাক্রান্ত বাতাস মানুষের নিঃশ্বাস রোধ করছে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করে; প্রত্যেকের মনে একটা আশঙ্কার ছায়া। সামান্যতম ত্রুটির জন্য কিংবা কর্ত্তব্যে অবহেলার জন্য প্রায়ই সম্রাটের মোহরাঙ্কিত ফারমান শাহজাদাদের সতর্ক করে দিচ্ছে, শাস্তির ইঙ্গিত জানাচ্ছে। মুঘল রাজকুমারদের জীবন পরাধীন। দীনতম প্রজার যে স্বাধীনতা আছে, শাহজাদাদের তাও নেই। এই ছিল প্রাসাদের রূপ।

আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুহম্মদ সুলতান বাদশাহ আলমগীরের সিংহাসনারোহণের এক বৎসরের মধ্যেই গোয়ালিয়র দুর্গে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, অথচ আওরঙ্গজেব এই মুহম্মদ সুলতানের উপর আগ্রা-দুর্গ এবং শাহজাহানের ভার অর্পণ করেছিলেন। শাহানশাহ শাহজাহান সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে সুলতান মুহম্মদকে ময়ূর সিংহাসনদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিশ্বস্ত মুহম্মদ সুলতান ময়ূর সিংহাসনের লোভ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—পিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। সুদীর্ঘ বার বৎসর তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দীজীবন যাপন করতে হয়েছিল। প্রতি ছয়মাস অন্তর আলমগীর গোয়ালিয়র দুর্গে চিত্রকর প্রেরণ করে মুহম্মদ সুলতানের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন। বাদশাহের শঙ্কা ছিল বন্দী পুত্রের গতিবিধি এবং শাস্তি সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ গ্রহণ। আমাদের দ্বিতীয় ভ্রাতা মুহম্মদ মোয়াজ্জম মুহম্মদ সুলতানের অনুপস্থিতিতে ময়ূর সিংহাসনের স্বপ্ন দেখতেন। এই স্বপ্নের আবেশে একদিন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে মোয়াজ্জম ময়ূর সিংহাসনের প্রশংসা উচ্চারণ করেছিলেন—বাদশাহ আলমগীর মোয়াজ্জমের ধৃষ্টতা ক্ষমা করতে পারেন নি—মোয়াজ্জমের দুরাশা প্রতিহত করবার জন্য মুহম্মদ সুলতানকে ময়ূর সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান দান করলেন। তাঁর হৃত মনসব এবং বৃত্তি প্রত্যর্পিত হল। মুরাদ বক্সের কন্যা দস্তদার বানুর সঙ্গে দশদিনের মধ্যে বিরাট সমারোহে তাঁর বিবাহ দিলেন। রাজদরবারে অনেকেরই ধারণা হল-সুলতানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তিন বৎসরের মধ্যে মুহম্মদ সুলতান সহজভাবেই ইহলোক ত্যাগ করলেন। এই স্বাভাবিক মৃত্যু মুঘল রাজ পরিবারে অস্বাভাবিক, অনিয়ম। মহম্মদ সুলতান তোমাকে আমি ভাগ্যবান মনে করি—শেষ পর্য্যন্ত তুমি রাজরোষে কিংবা সিংহাসনের দ্বন্দ্বে পিতৃরক্তে অথবা ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করনি। অথবা তোমার রক্তে তাঁদের হস্ত কলঙ্কিত হয় নি।

মুহম্মদ মোয়াজ্জম আবার নূতন করে তোমার অদৃষ্ট পরীক্ষা আরম্ভ হল—সম্রাট আলমগীর তোমাকে শাহ আলম উপাধি দান করে সম্মানিত সন্তুষ্ট করেছিলেন। শাহজাদা আকবর! বাদশাহের একান্ত বশংবদরূপে সুদীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে, আফগানিস্তানে গোলকুণ্ডায় যুদ্ধ করেছ। তার প্রতিদানে কি পেয়েছ? হায়দরাবাদ লুণ্ঠনের পরে লুণ্ঠিত দ্রব্য রাজকোষে গচ্ছিত রাখ নি, এই সন্দেহে তুমি এবং তোমার পুত্র বন্দী হয়েছিল। বাদশাহ আলমগীরের আদেশে তোমার পত্নী নুরউন্নিসাকে খোজা ভৃত্যগণ অপমান করেছিল এমন কি তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করেছিল; ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সুদীর্ঘ অষ্ট বৎসরকাল শাহ আলম কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করেছিলেন। অদ্ভুত বাদশাহ আলমগীর—দয়া মায়া দাক্ষিণ্য ঔদার্য্য রাজবংশের সম্মান সব কিছু প্রয়োজনের আবেদনে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

একদিকে যেমন শাহ আলমের ভাগ্যাকাশ মেঘাচ্ছন্ন হল, অন্যদিকে তেমন মুহম্মদ আজমের ভাগ্যসূর্য্য মেঘমুক্ত হল। বাদশাহের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্দিষ্ট হল শাহজাদা আজমের আসন, জুম্মা নমাজের সময়ে মসজিদের প্রাঙ্গণে হল তাঁর স্থান। কিন্তু শাহজাদা আজ! তুমি ছিলে পারস্যের বিখ্যাত সাফাভী রাজবংশের সন্তান। সাফাভী ছিল তোমার সর্বপ্রধান গর্ব। তোমার পত্নী দারাশিকোর কন্যা জাহানজেব বানু ছিলেন বেগম সাহেবার অনুগৃহীতা। কিন্তু পারস্যের রাজরক্ত কিংবা বেগম সাহেবার স্নেহপ্রীতি তোমাকে পিতার ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তুমি ও রাজপ্রসাদে এক বৎসর বন্দী হয়েছিলে। এই এক বৎসর তোমাকে এ সুরাপান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এ কি তোমার সামান্য শাস্তি!

একদিন শাহজাদা আজম শুনলেন—বাদশাহ আলমগীর, শাহ আলমকে মুক্তিদান করবেন। তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন এবং প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানালেন। অনেকেই ধারণা করল, শাহজাদা আজম সম্রাটের শিবির আক্রমণ করবেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। দরবারে তখনও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের বহু প্রত্যক্ষদর্শী জীবিত ছিলেন; তাঁরা ভাবলেন—পিতা-পুত্রের সংগ্রামের পুনরাবৃত্তি হবে। কুট-কৌশলী আলমগীর শাহজাদা আজমের দুর্ব্বলতা জানতেন; আজম ছিলেন ভীরু কাপুরুষ। আলমগীর আজম পুত্রকে এক নিভৃতস্থানে আমন্ত্রণ করলেন এবং তাঁকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করে শাহ আলমের কারাগারের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তারপর প্রকাশ্যে বাদশাহ আলমগীর শাহজাদা আজমের নক্ষত্রকে শুভ সম্ভাষণ জানালেন। শাহজাদা শাহ আলমের ভাগ্য থেকে শাহজাদা আজমের ভাগ্য সুপ্রসন্ন; কারণ এমনিভাবে বাদশাহ আলমগীরের পিঞ্জর থেকে কোন অবাধ্য পুত্র বা আমীর কখনো অক্ষত প্রত্যাবর্ত্তন করে নি।

শাহজাদা আকবর! তোমার কথা ভাবছি। এক বৎসর বয়সে মাতৃহীন, অতি যত্নে তুমি প্রতিপালিত; সুলেমান শিকোর কন্যা তোমার পত্নী। মাত্র ঊনিশ বৎসর বয়সে তুমি রাজপুতযুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছিলে। রাজপুত যুদ্ধে বাদশাহ আলমগীরের শিবির লুণ্ঠিত হয়েছে। সে পরাজয় ত তোমার নয়, বাদশাহের কৃতকর্মের ফলে আজ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ শিথিল হয়ে গেছে। কারণ মুঘল রাজবংশ রাজপুত সাহায্য হারিয়েছে; অথচ সেই পরাজয়ের জন্য তোমাকে দোষী করা হয়েছে, সম্রাট তোমাকে দোষারোপ করে আত্মদোষ স্খালন করেছেন। এটা ত স্বাভাবিক। বাদশাহ আলমগীর বিস্মৃত হয়েছেন যে তিনি কাবুলে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর মাড়ওয়ার অধিকার করবার চেষ্টা করেছেন, যশোবন্ত সিংহের ধনরত্ন অপহরণের চেষ্টা করেছেন; পুণ্যশ্লোক আকবরের পরিত্যক্ত জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেছে; যশোবন্ত সিংহের পত্নী মহামায়া তাঁর

দুই শিশুপুত্রকে বন্দী করার চেষ্টা করেছেন—ধর্মের উপর আঘাত, নারীর প্রতি অসম্মানে রাজপুত জাতি ক্ষিপ্ত। সুতরাং যুদ্ধে মুঘল রাজশক্তির পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। শাহজাদা আকবর সেই পরাজয়ের জন্য সমস্ত অপমান সহ্য করেছে। অথচ তার জন্য দায়িত্ব তোমার ছিল না।

আকবর! রাজপুতদের সঙ্গে ব্যবহারে তুমি তো তাদের দুর্ব্বলতার পরিচয় পেয়েছো। মুঘল রাজপ্রসাদ ও প্রাসাদের আড়ম্বরে এই সবল-জাতির মেরুদণ্ড দুর্ব্বল দিয়েছে। আপন ভগ্না, কন্যার সম্মান বিনিময়ে তারা রাজানুগ্রহ লাভ করেছে। মুঘল ঐশ্বর্য্য রাজপুতদের মনে বিলাস-প্রীতি সৃষ্টি করেছিল। মুঘল রাজপরিবারের স্বভাব-সুলভ আড়ম্বর ও চাকচিক্য রাজপুত রাজপরিবারের নয়নে বিভ্রম সৃষ্টি করেছিল। তার ফলে রাজপুত জাতির শৌর্য্য ক্ষীয়মান। আকবর, তুমি রাজপুতদের বিশ্বাস করেছ। আল্লা তোমার বিশ্বাসের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। আকবর, তুমি কি উদীয়মান মারাঠাশক্তির পরিচয় পাওনি? তুমি তো দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যের শক্তিগুলির সঙ্গে পরিচিত! শিবাজী যেদিন আগ্রার দরবারে এসেছিলেন সে' দৃশ্য তোমার মনে পড়ে? বাদশাহ আলমগীর মীর্জা রাজা জয়সিংহের মধ্যস্থতায় মারাঠাবীর শিবাজীকে রাজোচিত সম্মান ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দরবারে আমন্ত্রণ করেছিলেন। মির্জা রাজা শিবাজীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, তাঁকে দাক্ষিণাত্যের নিযুক্ত করা হবে, বাদশাহ আলমগীরের উদ্দেশ্য ছিল—মুঘল দরবারের আড়ম্বর বিলাস এবং ঐশ্বর্য্যের চমকে নগণ্য পার্ব্বত্য জায়গীরদার পুত্রকে চমৎকৃত ও ভীত করে দেবেন। পর্ব্বতমূষিক সহজেই অনুভব করবে শিবাজী পনের শত স্বর্ণমোহর নজর এবং ছয় সহস্র রৌপ্যমুদ্রা নিসার দিয়ে বাদশাহকে সম্মানিত করলেন। কিন্তু মুঘলসিংহের সঙ্গে তার ব্যবধান ছিল বহুদূর। বাদশাহ আলমগীর দরবারের শেষপ্রান্তে পাঁচহাজার মনসবদারের শ্রেণীতে শিবাজী এবং তাঁর পুত্রের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট করেছিলেন। এই অপমান শিবাজী কখনও বিস্মৃত হন নাই। ক্রোধে, অপমানে, ক্ষোভে শিবাজী বাদশাহ আলমগীরের সম্মুখে প্রতিবাদ করলেন; পরমুহূর্ত্তে শিবাজী ক্রোধে মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়লেন। মূর্চ্ছার অবকাশে আওরঙ্গজেবকে স্পষ্ট বলেছিলেন—বাদশাহ আলমগীর আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। শিবাজীর কম্পিতস্বরে সমস্ত দরবারে একটা বিরাট কম্পন সৃষ্টি করেছিল। দিল্লীর বাদশাহ দুর্দ্দণ্ড প্রতাপ আলমগীরের সম্মুখে প্রকাশ্য দরবারে এই প্রতিবাদ প্রথম। মির্জ্জারাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিং ব্যাপারটি লঘু করবার জন্য বল্লেন—বন্য ব্যাঘ্র লোকালয়ে এসেছে। দরবারের জনসমাগমে অস্বস্তি বোধ করেছে। কম্পিত দৃষ্টিতে অত্যন্ত ব্যঙ্গ সহকারে বাদশাহ আলমগীরও বক্রোক্তি করেছিলেন, বন্য জীব লোকালয়ে এসেছে, অস্বস্তিবোধ স্বাভাবিক। তারপর তিনি ইঙ্গিত করলেন, বন্য জীবকে প্রহরীবেষ্টিত করে নিরাপদ করা হউক। রামসিংহ শিবাজীর নিরাপত্তা-আতিথ্যের ভার গ্রহণ করেছিলেন। দুর্গে প্রাচীরের বাহিরে জয়সিংহের প্রাসাদে শিবাজী নজরবন্দী হলেন। কোতোয়াল ফুলাদ খান শিবাজীর প্রহরীর ব্যবস্থা করলেন। বাদশাহ হিন্দুর উপর নির্ভর করেননি। দরবারের অনেকেই ধারণা করেছিলেন, শিবাজীর পক্ষে আলমগীরের কবল থেকে মুক্তিলাভ অসম্ভব। অনেকেই দুঃখিত হয়েছিল যে আলমগীর সত্যই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন, যুদ্ধকালে শত্রুর সঙ্গে ছলবল ও কৌশল যুদ্ধনীতির অঙ্গ, কিন্তু অতিথিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমন্ত্রণ করে বন্দী করেছেন এই কীর্তি মুঘল রাজবংশের অপরিমেয় কলঙ্ক। এই কলঙ্ককালিমা স্খালনের জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে উঠলাম।

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, আমি সম্রাট শাহজাহানের নিকট অভিযোগ করি, আমি বাদশা বেগমের নিকট আবেদন করি, তাঁরা মুঘল অতিথির সম্মানরক্ষার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করুন। পরমুহূর্ত্তেই আমার চেতনা ফিরে এল। শাহজাহান পরলোকে, বাদশাহ-বেগম শক্তিহীনা। আমি স্থির করলাম, আমিই মুঘলবংশের এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। মারাঠাবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি পিতার প্রতিনিধি হয়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। সম্রাট আকবর ছিলেন বীর—তিনি বীরের সম্মান দিতে জানতেন, সেইজন্যই রাজপুত জাতি মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রাণপণ করেছিল। রাজপুতজাতি স্বল্পে সন্তুষ্ট। অদ্ভুত এই রাজপুত জাতি!

আমি স্বগতঃ উচ্চারণ করলাম, মারাঠাবীর শিবাজী! আমি কি পিতার হয়ে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব, আপনি কি ক্ষমা করবেন না? আপনি উদার, মহাপ্রাণ, আপনি বাদশাহ আলমগীরের কষ্টিপাথরে মুঘলরাজবংশের মূল্য মান নির্ধারণ করবেন না; তৈমুর বংশের মর্য্যাদা বোধ সম্বন্ধে হীনধারণা করবেন না। এখনও মুঘল রাজপরিবারে এমন অন্ততঃ একজন মুঘল সন্তান আছেন যিনি যে কোন মূল্যের বিনিময়ে এই মুঘল রাজবংশের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত।

আমি কুমার রামসিংহের নিকট পিতার পক্ষ হয়ে গোপনে একখানি লিপি প্রেরণ করেছিলাম। সে লিপিতে আমি লিখেছিলাম মুঘল রাজবংশ অতীতে একদিন রাজপুত জাতির সাহায্যের উপর নির্ভর করেছিল, হিন্দু মুসলমানের মিলিত শুভেচ্ছাকে সম্পদ করে মুঘল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এইবার আবার নূতন করে মারাঠা মুঘলের মিলিত শক্তির উপরে নির্ভর করে সমগ্র ভারতব্যাপী সুবিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হউক। মহান পুরুষ আকবরের স্বপ্ন সফল হউক। ফতেপুর-সিক্রির ইবাদৎ খানায় আবার নূতন করে 'মহাভারত' সৃষ্টি হউক।

আমি জানি, মারাঠা বীরের পক্ষে বাদশাহ আলমগীরের কন্যার উক্তির উপর বিশ্বাস এবং নির্ভর করা কঠিন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি আছে—আপনি আপনার তৃতীয় নয়নের উজ্জ্বল আলোকে একবার দৃষ্টিপাত করে দেখুন। এই মুঘলমাতা অনেক সুসন্তানও প্রসব করেছিলেন—তাঁদেরই শুভকামনা এবং শুভকর্ম্মের জন্যই বিধাতা এই বংশের মর্য্যাদা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আপনি আমার শুভকামনায় বিশ্বাস করুন। আল্লাহ আপনার সহায়, কারণ, আপনি কুমার রামসিংহের আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। কুমার রামসিং বীর, আশ্রিত বৎসল, তাঁর আত্মসম্মান-বোধ আছে। তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। বাদশাহ আলমগীরের কোন গুপ্তঘাতক আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে

"আমার প্রিয় সাবানটি এখন একটি সুন্দর নতুন মোড়কে পাওয়া যাচ্ছে"

বলেন বৈজয়ন্তীমালা



সুন্দর গোলাপী মোড়কে লাক্স টয়লেট সাবান কিনুন। সুন্দরী বৈজয়ন্তীমালা বলেন—"লাক্স টয়লেট সাবান আমার লাবণ্যকে রক্ষা করে ...।" আপনার লাবণ্য মসৃণ ও সুন্দর করে তুলুন। সৌন্দর্য্যচর্চ্চায় বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের স্থান সর্বাগ্রে। বৈজয়ন্তীমালার কথা শুনুন—নিয়মিত লাক্স ব্যবহার করুন।

বিশুদ্ধ এবং শুভ্র

লাক্স টয়লেট সাবান



চিত্র তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS. 580-X52 BG

পারবে না। আল্লার নিকট প্রার্থনা করি, আল্লা আপনার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করুন আমি আপনার সাহায্য করব।

আশঙ্কা-বিজড়িত মনে আমি আমার পত্রের উত্তর প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু প্রতিদিন আমি জয়পুর প্রাসাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অপেক্ষা করতাম। ঐখানে, ঐ দূরে পাষাণ-কারা প্রাচীরের অন্তরালে মারাঠা বীর অবরুদ্ধ; ঐ ঐখানে। মুঘল কুলে কলঙ্ক প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে। প্রতিদিন যেন এক একটি বৎসর। আমার পত্রের উত্তর কি আসবে না? তবে কি মারাঠাবীর আমার পত্রকে নিতান্ত তাচ্ছিল্য করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছেন? না বাদশাহ আলমগীরের একটি কূট কৌশল মনে করে উদ্বিগ্ন হয়েছেন; আবার চিন্তা করলাম—কুমার রামসিং হয়তো এই পত্র বাদশাহ আলমগীরের নিকট প্রেরণ করেছেন। না না, এরূপ হীন কাজ রাজপুতবীর করতে পারেন না। কুমার রামসিংহ কখনই মুঘল রাজকুমারীর অমর্য্যাদা করতে পারেন না। তিনি জানেন এই গোপনপত্র প্রকাশের পরিণতি কোথায়? হয় তো বা মারাঠাবীর আমার লিপিখানি পাঠ করে যথোপযুক্ত উত্তর চিন্তা করছেন; তিনি কিছুই সিদ্ধান্ত করতে পারছেন না। হয় তো বা তাঁর জীবনে কোন মুঘল রাজকুমারীর এইরূপ পত্র এই প্রথম।

দ্বিধা, শঙ্কাজড়িত মনে আমি অপেক্ষা করছিলাম। একদিন আগ্রার প্রাসাদে প্রচারিত হল—মারাঠাবীর অসুস্থ, কঠিন পীড়াগ্রস্ত; তাঁর জীবন সঙ্কটাপন্ন। আতঙ্কে আমি শিউরে উঠ্‌লাম। এই পীড়ার সংবাদ কি তাঁর মৃত্যুর সংবাদের পূর্বাভাস? এই পীড়া কি বাদশাহ আলমগীরের কোন অভিসন্ধির অংশ? না শিবাজী সত্যই অসুস্থ? প্রতিদিন আমি গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম। জনশ্রুতি মারাঠা বন্দীর পীড়া কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে চলেছে। আমি আল্লার নিকট আমার রাত্রির নামাজের সময় প্রার্থনা করলাম—'হে আল্লাহ্‌, তুমি এই মারাঠা বন্দীর রোগ নিরাময় কর। আমন্ত্রিত অতিথি যদি সত্যই বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। মুঘলবংশের কলঙ্ক পৃথিবীর ইতিহাসে চিরন্তন হয়ে থাকবে। আল্লা, তুমি তো একদিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গবাসী জীন্নত মকানী হুমায়ুনের রোগ শয্যার পার্শ্বে, ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আকুল প্রার্থনা পূরণ করেছিলে। আমি আমার প্রাণের সকল আকুলতা দিয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করছি—আমার জীবনের সমস্ত সঞ্চিত পুণ্যের বিনিময়ে এই মারাঠা অতিথির রোগ নিরাময় কর—জীবনদান কর। প্রার্থনার পর আমার মন তৃপ্ত হল—কিন্তু তবু আশঙ্কা হয় তো এ রোগ রোগ নয়। বাদশাহ আলমগীরের······ (ক্রমশঃ)

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রসিত রায়চৌধুরী

শতাব্দীর ক্রান্তি লগ্ন, ত্রিযামা গভীর
ধ্বনিল গম্ভীর মন্ত্রে, 'বন্দেমাতরম',—
জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিস্তোত্র, আশ্চর্য্য পরম,
সঞ্চারিল ত্রস্ত প্রাণে, শৌর্য্য দধীচির।
যে কথা রচিলে ঋষি প্রবুদ্ধ ধ্যানীর
নয়নে হেরিয়া আহা, দেশের চরম
বেদনা-বিধুর-রিক্ত বিক্ষত মরম,—
সে সব অমূল্য-নিধি ঐ-বঙ্গবাণীর
ভুলিল কি, বঙ্গভূমি, হিমাদ্রি মহিমা,
সঞ্জীবনী সুধামাখা, বঙ্কিমের নাম,
'কৃষ্ণচরিতের সেই বিচিত্র ব্যাখ্যান?
ঐ জাতির লাঞ্ছনার নাহি পরিসীমা,
হতভাগ্য দেশ আজ, ওগো পুণ্যধাম,
তোমার বিপুল বীর্য্য করিছে আহ্বান॥

সবুজ-কন্যা

শ্রীবসন্তকুমার রায়

অঙ্কুরে তোমার প্রতীক্ষা, ফলস্বাদে তোমার পরিণতি,
বনস্পতির যৌবন বর্ণে, সূর্য করে তোমার মূরতি,
তোমার আনন্দ-প্রয়াস।
শরতের শস্যভরা মাঠে, সুমহান যৌবনে
কুমারীর মর্যাদা আর কুমারের সম্মানে,
তোমার সীমাহীন প্রকাশ।
সঙ্গীতের অমর মূর্চ্ছনায়, অলকাপুরীর সুবাসে,
ভগবতীর বৃন্তরসে আর বীরের স্মিতহাসে,
আছে ভাস্বর তব বিকাশ।
পঙ্গুতারে কর তুমি নিত্য বিনাশ।

এক নামে প্রাণ তুমি, তেজ তুমি আর
রস, রজঃ সকলই ব্যাখ্যা যে তোমার
তব তরে বেড়ে চলে অভীপ্সা আমার
হে যুগ-কুমারি! লহ নমস্কার।

ছিন্নবাধা

সমরেশ বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পাড়া ঘরে একথা কারুরই অজানা রইলনা, নিমির সঙ্গে অভয়ের মিশ খায়নি। নানান জনে নানান রকম তার ব্যাখ্যা করলে।

কেউ বললে, ডাগর মেয়ে, পাকা ঝিকুট। কোনো রাশ ছিল না। এখন ও মেয়ে এত সহজে বাগ্ মানাবে কেন? কেউ কেউ বিশুর সঙ্গে নিমিকে জড়িয়েও অনেক কথা বললে। বিশুর বউ হয়তো কিছু মনে করত না। নিমির হাবভাব দেখে, তার সন্দেহ দৃঢ় হল, তবে বুঝি শিকড় অনেক গভীরে। তাই সেও তাল দিলে সকলের সঙ্গে।

আর মানুষের মন এমনি বিচিত্র, যে-মুহূর্তে সকলেই জানল, সুবালাকে নিয়েই নাকি নিমির যত জ্বলুনি, সেই মুহূর্ত থেকে তাদের পবিত্র কর্তব্য হ'য়ে দাঁড়াল—অভয়কে সুবালার দরজায় পাহারা দেওয়া। কিন্তু সেখানে ঘটনা ব'লে কিছু নেই। কারণ, অভয় সুবালার কাছে যায় না।

না-ই বা গেল। 'অমুকে' নাকি দেখেছে অভয়কে সুবালির কাছে যেতে, পোহর ভর বসে বসে রঙ্গ রস করতে নাকি দেখেছে। 'অমুক' শব্দটার সবচেয়ে বড় সুবিধে, তার অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন হয় না। 'অমুকের স্থান নেই, কাল নেই, পাত্র হিসেবে সে ব্রহ্মের মত সর্বত্র বিরাজিত। 'অমুকের' পাথায় চড়ে, 'অমুকের' মুখ দিয়ে মানুষ সত্যি মিথ্যে সব কথাই বলতে পারে, সব রকম রটনা করতে পারে। তার কোন প্রমাণপত্রের দরকার হয় না। আইন 'অমুকের' নাগাল পায়না কখনো।

এই 'অমুক' মানুষের মনের বিচিত্র এক কথাশিল্পী। কল্পনায় তার জুড়ি মেলা ভার, কথার আঁটসাট বাঁধুনিতে সাহিত্য সম্রাট হার মানে।

সেই 'অমুকের' দেখা নানান কাহিনী নানানখানা হ'য়ে আলোচিত হয় পাড়ায়। উদ্দেশ্যটা, নিমির কানে কথাগুলি তুলে দেওয়া।

নিমি বিশ্বাস করে না, অবিশ্বাসও করে না। সংশয়েই জ্বলে মরে।

কারণ, বিকেল পাঁচটায় যখন কারখানার ছুটীর বাঁশী বাজে, তার কিছুক্ষণ আগে থেকেই, ঘড়ি না দেখেও নিমির মন আনচান করে। তারপর যখন বাঁশী বাজে, তখন সে নানান অছিলায় বাইরে উঁকিঝুঁকি মারে। উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে, চুল বাঁধতে বাঁধতে রাস্তার দিকে চোখ রাখে। পুকুরে গা ধুতে গিয়েও চোখ রাখে রাস্তার দিকে। তখন চোখে পড়ে, পাড়ার লোক, যারা কারখানায় কাজ করে, তারা ফিরে আসছে একে একে।

আইবুড়ো কালের তার প্রেমের ছেঁড়া সুতো জোড়া লাগাবার জন্যে বিশুর এই সময়টুকুই একমাত্র হাতে থাকে। কারণ সেও জানে, অভয় এখন বাড়ি ফিরবে না। নিমি এখন একলা। শৈলবালার সঙ্গে দেখা করবার ছল ক'রে, বাড়িতে আসে সে।

নিমি হয়তো তখন গা ধোয়ার শেষে, শুধু সায়া ব্লাউজ পরেই, ঘরের দরজায় নিশ্চিন্তে ব'সে আলতা পরে পায়ে। ধোয়া মুখ ঘষে, হিমানী মাখে। চাঁপা ফুলের সুবাসিত কুমকুমের টিপ্ দেয় কপালে। দিতে গিয়ে চমকে ওঠে উঠোনের ঝাঁপ খোলার শব্দে।

বিশু জিজ্ঞেস করে, মাসী আছে?

অর্থাৎ শৈলবালা। নিমি উদাস বেশবাস সামলায় না। খুব সহজভাবেই জবাব দেয়, না।

মিথ্যে নয়, একদিন এই বিশুর সঙ্গে প্রেম হয়েছিল নিমির। তখন বিশুকে ভালও লাগত। আসরে যাত্রা করার সময় বিশু যেরকম ঢংএ পার্ট বলে, সেই ঢংএ প্রেমের কথা বলত। শুনতে ভাল লাগত নিমির। বিশুর কাছে তখন নিজেকে সঁপে দিয়ে খুশি হত। আরো প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিল নিমির। কিন্তু নিমি বিশুর একেশ্বরী ছিল।

এখন আর বিশুকে ভাল লাগে না। শুধু ভাল লাগে না নয়, কেমন যেন ঘৃণাও হয়। বিশুর বউ ছেলেমেয়ে থাকা সত্ত্বেও নিমির ভাল লেগেছিল তাকে। কারণ বিশু ভালবাসতে জানত। তার আবেগ ছিল। নিমির ছায়া দেখলে, চকিত হত। চোখ মুখের ভাব যেত বদলে। আর নিমির জন্য বিশু যেন সকলের মাথায় পা' দিয়ে দাঁড়াতে পারত।

কিন্তু যে অভয়কে নিয়ে নিমির এত অশান্তি, সেই অভয়ের সামনে বিশুকে এখন যেন নিষ্প্রভ লাগে। পুরুষ যে শুধুই পুরুষ নয়, মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে অনেক তারতম্য। সেই কথাটি প্রথম অনুভব করছে অভয় বিশুকে দিয়ে। মানুষ হিসেবে বিশু যেন ছোট। তার বুক আর তেমন উদ্ধত মনে হয় না। যাত্রার সং বলেই মনে হয় এখন। চোখের চাউনির আবেগে শুধু একটি স্বার্থপর লোভ দেখা যায়। নিমিকে হারাবার ব্যথা সেই বিশুর মুখে, শুধু ক্ষুব্ধ আপশোস্। এ বিশু এখন লুকিয়ে আসে, মাথা নীচু ক'রে। সুযোগ বুঝে, পকেটে হাত দিয়ে, পকেট কেটে কিছু হাতিয়ে নেবার মতলবে যেন তার হাত নিষপিশ করে।

তবু, পুরনো প্রেমের কথা একেবারে চট ক'রে ভোলা যায় না। বিশুকে মুখের ওপর কোন কথা বলে না নিমি।

শুধু বিশু ভেবে পায় না, নিমি এমন নির্বিকার হল কেমন ক'রে। একদিনের অধিকার নিয়ে, এখন তাই তার রাগ হয়। যে-রাগটুকু নিমি টের পায়, তাতে নিমির ঘৃণাও যেন আরো বাড়ে। বিশুও তাই চিরকালের ভীরু আর হতাশ পুরুষের মত নিজের মনে মনে বাণী দেয়, 'মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করতে নেই।'

শৈলবালা নেই জেনেও বিশুর ফিরে যাবার তাড়া থাকে না। দাঁড়িয়ে সে পা ঘষটায়। মনের রাগ ঘৃণা হ'য়ে ওঠে, আর সেটুকুও বিশু চাপতে পারে না ঠিকমত। বলে, কেমন আছিস নিমি?

আয়নায় মুখ দেখতে দেখতেই জবাব দেয় নিমি, মরতে বাকী আছে।

কিন্তু বিশু বুঝতে পারে, মরার বাসনায় নিমি নিশ্চয় সাজতে বসে নি। সে শুধু তাকিয়ে থাকে। কথা যোগায় না মুখে।

কথা বললে তবু ভাল লাগে। কিন্তু লোভ ও রাগ নিয়ে শুধু এমন নীরবে চেয়ে থাকা দেখে নিমিরও রাগ হয়। ঘৃণা হয়। বলে, এখন যাও। মা গেছে পাড়ায় কোথায়। পরে এস।

বিশু বলে, এসেই বা লাভ কি?

নিমি বলে, লোকসান দিতে এস না তা' লে?

অভয়কে নিয়ে নিমির প্রাণের জ্বলুনিতে বিশু দুঃখ পায় না। বরং রাগে এবং বিদ্রূপে তার মুখ কুৎসিত হ'য়ে ওঠে। বলে, এদিকে তো শুনছি, গায়ক অন্য জায়গায় টোপ ফেলছে।

নিমিরও চোখ দপ্‌দপিয়ে ওঠে। বলে, তাই বুঝি তুমি পুরনো চার ঘেঁটে দেখতে এসেছ? তবে এই মুরোদে আর হবে না। তোমাকেও চিনে নেয়া হয়েছে।

—সত্যি?

—নয় তো?

—কী চিনলি?

—চিনলুম আবার কি? দেখলুম, নিমির জন্যে তোমার পেরান পুড়ছে। তবে জেনে রেখ, আমি তোমার ফাউয়ের মাছ নই।

কথাগুলি যত তীক্ষ্ণ, সুর অবশ্য তেমন তীব্র নয়।

বিশু চলে যায়।

এরকম কথা কাটাকাটি প্রায়ই হয়। বিশু যেটা বোঝে না, সেটা হল, যে-জিনিষ না হলে মেয়েমানুষই হোক আর পুরুষ মানুষই হোক, তার মন পাওয়া যায় না, সে জিনিষ সে কখনো নিমিকে দেয় নি। তাই আজ কারুর জন্যেই কারুর বাজে না। একজনের থাকে শুধু লোভ আর বিদ্বেষ। আর একজনের মনের মত না

পাওয়ার জ্বালা ও সুহৃদহীন জীবন। যে-সুহৃদ হবার কথা ছিল একমাত্র বিশুরই।

কিন্তু নিমির প্রতীক্ষার মধ্যে সংশয়ের আগুনই শুধু জ্বেলে দিয়ে যায় বিশু। তবু নিমি শাড়ি প'রে, ঝক্‌ঝকে পিতলের কলসী নিয়ে রাস্তার ধারের জল-কলে যায়। একটু অন্ধকার হলে জল আনতে যাওয়াই নিমির অভ্যাস। কিন্তু তর সয় না। জল ভরার ছল ক'রে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিটি মানুষের মুখ আড় চোখে লক্ষ্য করে।

কিন্তু চেনা অচেনা অনেক মানুষ আসে। অভয় আসে না।

রোজ রোজ না হলেও, সন্ধ্যার ঘোর ঘোর অন্ধকারে, মাথায় ঘোমটা টেনে নিমি মালীপাড়ার মধ্যেও ঢুকে যায়। অভয় আসছে কি না সেটুকুই শুধু নয়। সুবালার দোরগোড়ায় যদি একদিনও আবিষ্কার করা যায় অভয়কে।

অভয় আজকাল অনেক দেরী ক'রে বাড়ী ফেরে। সত্যি মিথ্যে নানান রকম শোনা যায়। অভয় কোথায় যায়, কোথায় সময় কাটায়, তার সঠিক সংবাদ নিমি পায় না। অভয় নিজেও সেকথা বলে না নিমিকে। যদিও এখন প্রতিদিনের বিবাদের সুত্রপাত, কথা-বন্ধ, উপোস দেওয়া ব্যাপারগুলি এই বাড়ি ফেরার ঘটনা দিয়েই শুরু হয়।

কিন্তু এই উপদ্রবে অভয় নির্বিকার থাকবার চেষ্টা করে। মহাভারত, রামায়ণ, তালাচাবির কারিগরী, নানানরকমের বই ছাড়াও, আরো অনেক বই আজকাল নিয়ে আসে অভয়। নিমি সে সব বইয়ের নাম জানে না, পড়তেও পারে না। তাদের সমাজে ও পরিবেশে বই মুখে দিয়ে বসে থাকার এমন অনাসৃষ্টি মানুষ ও কাণ্ড সে কখনো দেখেনি। তাই বইগুলির প্রতি তার অসীম ঘৃণা। প্রায় প্রত্যক্ষ সতীনের মত। পাড়ায় পুরুষেরা যাত্রা করে, বই প'ড়ে প'ড়ে 'পাট' ব'লে দেবার জন্য একজন লেখাপড়া জানা লোক আসে। লোকে তাকে বলে 'মাস্টের।' কিন্তু এই অসুর-সমাজে অভয়ের এ কেমন ধারা প্রহ্লাদ পনা? 'জজ-ম্যাজিস্টর' হবার মুরোদ নিশ্চয়ই নেই। তবে? বইগুলিতে বোধহয় যাদু শেখার কথা লেখা আছে। নয় তো গুণীনের মন্তর-তন্তর ফুক্-ফুক্ বশীকরণের ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়। আর ওসব যারা শেখে, তারা যে কি চরিত্রের মানুষ হয়, সেকথাও নিমি জানে।

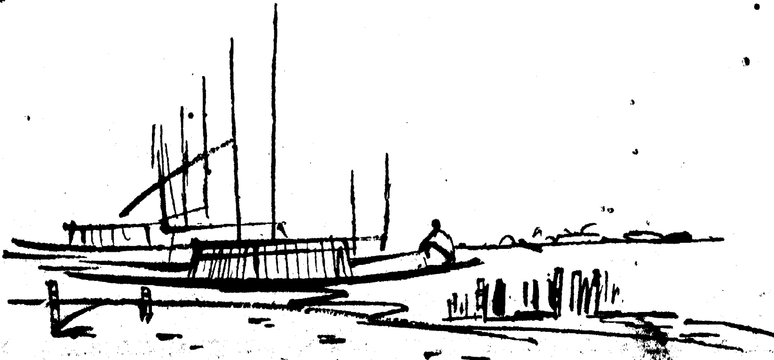
কিন্তু কাকে বশীকরণ করতে চায় অভয়, কাকে ওষুধ করতে চায়?

বইগুলি আছড়ে ফেললেও, মনের ঝাল মেটাবার জন্য ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে সাহস হয় না নিমির। আর বইগুলির কথা সারাদিন তার মনে থাকে না। অভয় রাত্রি জেগে, বিড়বিড় ক'রে, বানান ক'রে ক'রে যখন পড়ে, নিমির দিকে ফিরেও তাকায় না, তখন নিমির রাগ হয়।

নিমির সঙ্গে কি শুধু একটি-ই মাত্র সম্পর্ক? শুধু একটি ধর্ম পালন করলেই কি সব ফুরিয়ে যায়? তার পরেও কি এঘরে নিমির অস্তিত্ব থাকে না?

নিমি দু'চোখ ভ'রে ঘৃণা নিয়ে, বই ও তার পাঠকের দিকে তাকায়।

ক্রমশঃ





আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন।

একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গপ্পসপ্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন "দ্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যসুখ্যু মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁ: যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন-"আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিশুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

S. 261A-X52 BO

বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৮৬৫ সালে প্রধানতঃ রীতিগত পার্থক্যের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর-গোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক দলের পুরোধা লেখকরূপে গণ্য হলেন। তখনও সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য গদ্য লেখকের প্রভাব প্রবল ; ১৮৭২ সালের আগে বঙ্কিমচন্দ্র একটি নিজস্ব গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারেন নি। ১৮৬৫ সালে বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত রীতিমান্ গদ্য-লেখকের আবির্ভাব হলেও কেবল রীতির প্রভেদে সাহিত্যিক প্রতিভার তারতম্য বিচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হল বঙ্গদর্শন পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী গঠিত হওয়ার সময় থেকে। মোটামুটিভাবে ১৮৭২ সাল থেকে গদ্য-সাহিত্যে রীতির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। তার মানে এ নয় যে, সাধুভাষা ও চলতি ভাষার মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের দ্বন্দ্ব তখনই শেষ হয়ে গেল, কিম্বা সাধুভাষার বিবর্তন শেষ হল, অথবা চলতি ভাষার গঠনকার্য নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হল। স্বতন্ত্রভাবে সে-সব প্রচেষ্টা আগের মতো উদ্যমেই চলতে লাগল। নতুন এই আর এক ধারা গড়ে উঠল এবং সাহিত্য তথা সমালোচনার ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করল। ফল হচ্ছে এই যে, সাধুভাষার লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাষার ক্ষেত্রে পার্থক্য বিচারের অর্থ হল প্রধানতঃ তাঁদের রীতির স্বকীয়তা আলোচনা করা ; অতঃপর শব্দ উপাদানের তারতম্য-বিচার গৌণ স্থান লাভ করল।

১৮৭২ সাল থেকে এইভাবে বাংলা গদ্যে যে রীতিপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল, তা অক্ষুণ্ণ আছে। সাধুভাষায় রীতি-বৈচিত্র্যের প্রয়োগে যে নতুন ধরণের গদ্য রচিত হতে লাগল, তার ধারা আজ পর্যন্ত সমানে বয়ে চলেছে। এরই পাশের কয়েক বছরের মধ্যে প্রবলতা লাভ করেছে চলতি ভাষার গদ্য। ১৮৭৮ সাল বাংলা গদ্যের ইতিহাস শুধু সাধুভাষার গদ্যের নয়, চলতি ভাষায় লেখা গদ্যেরও ইতিহাস। তখন থেকে দুটি ধারার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় ; একটির শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, অন্যটির শ্রেষ্ঠ শিল্পী প্রথম প্রবর্তনের দিন থেকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। দুটিই রীতিময় ধারা। আজকের দিনে বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাই "রীতিরাত্মা কাব্যস্য।" বিশেষত, যখন বর্তমানে ১৮৭৮ সাল থেকে সুরু সাধু ও চলতি ভাষার তীব্র দ্বন্দ্ব প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

যদিও বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক তবু তিনিই আবার ছিলেন কথ্যভাষার একজন প্রবল সমর্থক। ১৮৭৩ সাল থেকে তাঁর গদ্যভাষায় চলতি ভাষার পরিমাণ ও প্রভাব ক্রমশ বাড়তে থাকে। শেষদিন পর্যন্ত তিনি সাধুভাষার লেখক হয়েই ছিলেন ; সমর্থন করলেও তিনি স্বয়ং তাঁর রচনাবলী চলতি ভাষায় প্রকাশ করেন নি। তাহলেও তাঁর সমর্থনে কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনার পক্ষপাতী প্রগতিশীল দল যে বিশেষ উৎসাহ পান আর তাঁর বিরূপতায় রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ধারার সমর্থকবৃন্দ একান্ত নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, ১৮৭৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চলতি ভাষাকে শ্রেয় বলে ঘোষণা করলেও নিজে চলতি ও সাধুভাষা নির্বিশেষে উভয় ধারার লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে থাকলেন সাধুভাষায় লেখা গদ্যের জোরেই। এর কারণ সহজবোধ্য। কোন একটা ধারার গদ্য শ্রেয় হওয়া এক কথা, আর সেই ধারায় শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ লেখকের আবির্ভাব হওয়া অন্য কথা। সাধারণভাবে সাহিত্যিক ও অন্য প্রয়োজনে কথ্যভাষা সাধুভাষার চেয়ে শ্রেয় হতে পারে। কিন্তু মহত্তর প্রতিভা সাধুভাষায় লিখতে আরম্ভ করলে তিনি কথ্যভাষার সাধারণ লেখকের রচনাবলীর শক্তি বহু গুণে অতিক্রম করে যেতে পারেন। তা ছাড়া রীতির সৌন্দর্য লেখকের প্রতিভা অনুসারে যে কোন ধারার গদ্যভাষাকে আশ্রয় করে সহসা এমনভাবে তার চরমোৎকর্ষ অভিব্যক্ত করতে পারে যে, সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে। কোন রীতিমান্ লেখকের রীতি হয়ত সাধুভাষার ধারায় পরম উৎকর্ষ লাভ করতে পারে। তাঁর পক্ষে চলতি ভাষায় লেখা বিড়ম্বনা মাত্র, এমনও হতে পারে। আবার, চলতি ভাষায় চমৎকার লেখেন এমন বড় লেখকও দেখা যায় যিনি সাধুভাষায় আড়ষ্টগতি হয়ে পড়েন। রীতির আকস্মিক উৎকর্ষ-অপকর্ষের জন্যে সাধারণ ভাষাগত উৎকর্ষ অনেক সময় মূল্যহীন প্রমাণিত হয়। ঐ কারণেই রীতিমান বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জ্যোতির্ময় প্রতিভার দীপনে যে সফলতার অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে গেছেন তা আজ পর্যন্ত কোন কথ্যভাষার লেখক ম্লান করতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যদি চলতি ভাষায় লিখতেন, তাহলেই যে তিনি আরো ভালো গদ্য রচনা করতে পারতেন, তা মনে হয় না। তবু একথা মনে করার স্বপক্ষে

যুক্তি প্রবল যে, শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ বিকশিত হবে কথ্যভাষাতেই, কৃত্রিম ভাষায় নয়। চলতি ভাষায় বিকাশের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। আজ না হলেও পরে একদিন সেই সম্ভাবনা বাস্তবে পূর্ণতা লাভ করবে। দুটি সমান দরের প্রতিভার রীতিগত উৎকর্ষ সমান হলে যার ভাষা চলতি ভাষা, তারই রূপসৃষ্টিতে বেশি সফল হবার কথা। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা সমান হলে মহত্তম প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর স্বাভাবিক মুখের ভাষায়; "স্বাভাবিক" অর্থে, মার্জিত স্বভাবের পক্ষে যা স্বাভাবিক।

দূর ভবিষ্যতের মাহেন্দ্রক্ষণের কথা ছেড়ে দিলেও এখনই দেখা যায় যে, সাধারণতঃ মনের কথা চলতি ভাষার গদ্যে বেশি করে ফুটিয়ে তোলা যায়, আর কম আয়াসেই তা করা যায়। সুতরাং যদি কারো দুই ধারার গদ্যেই সমান লিখবার ক্ষমতা থাকে এবং দুই ধারাতেই তাঁর রীতি সমান উৎকর্ষে ফুটে উঠে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই চলতি ভাষায় লেখা রীতিময়ী রচনাই গভীরতর ও ব্যাপকতর আবেদন রসিক মনের কাছে উপস্থাপিত করবে এবং বেশি পরিণত সাহিত্যসৃষ্টি বলে গণ্য হবে।

১৮৭৮ সালে এই সহজ কথাটা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, মৌখিক ভাষার পরিবর্তিত সাহিত্যিক রূপটিই সাহিত্যরচনার শ্রেষ্ঠ বাহন। সাধারণ লোকে তাঁর সেই বাণী কাজে পরিণত করতে তখনই এগিয়ে আসে নি। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের সাধুভাষার যুগ; চারদিকে নতুন উৎসাহে সাধুভাষায় লেখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে; বঙ্কিমের ভাষার সাফল্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরীয় গদ্যভাষার জয়জয়কার হল; চলতি ভাষার পক্ষপাতী অনেক লেখক মিশ্র গদ্যভাষার ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে আবার খাঁটি সাধুভাষার আশ্রয় নিলেন। "বঙ্গাধিপ-পরাজয়" নামক উপন্যাসের লেখক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে যদি-বা সামান্য পরিমাণে চলতি ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন, ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি একেবারেই সাধুভাষার অনুগত হয়ে পড়লেন। ১৮৭৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ৩৬ বছর কাল বাংলা গদ্যে সাধু ও চলতি, দুটি ধারার ভাষাই বর্তমান থাকলেও অবিসংবাদিত প্রাধান্য ছিল সাধুভাষার।

১৯১৪ সাল থেকে পরবর্তী ৪০ বছরে অবস্থা একেবারে বদলে গেল। বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হল। কথ্যভাষায় গদ্যরচনার পরিমাণ ও উৎকর্ষ দিন দিন বাড়তে লাগল। অবশেষে দেখা গেল, তখনকার শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক রবীন্দ্রনাথ তাঁর সব রচনাই চলতি ভাষায় সম্পন্ন করছেন। তাঁর মৃত্যুর পরও দেখা যাচ্ছে, গদ্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের প্রায় অর্ধেক কথ্যভাষার অনুরাগী। কথ্যভাষার এই বিজয়-অভিযান কেবল স্বাধীন গদ্যরচনায় সীমাবদ্ধ নয়, তার বিস্তার হয়েছে সাময়িক পত্রে, পাঠ্য বইএ, বেতার কেন্দ্রে আর সরকারি কার্যালয়ে। ১৯৩০ সালেও সাধুভাষায় বক্তৃতা দিতে শোনা যেত; এখন আর তা কোথাও শোনা যায় না। কথ্যভাষার এই বিপুল প্রসারের জন্যে রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রমথ চৌধুরীর উদ্দীপনাই বিশেষভাবে দায়ী।

আগেই বলা হয়েছে, এই যুগে সাধু গদ্যভাষার লেখকদের পার্থক্য রীতির দ্বারা নির্ণয় করতে হবে। রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তা বিশেষভাবে প্রবল ফার্সি ও সংস্কৃত শব্দাবলীর ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এমন প্রভেদ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের মধ্যে অকল্পনীয় ছিল বটে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে আদৌ কোন ভাষাগত পার্থক্য ছিল না, তাও নয়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, ভূদেব—পূর্ব-যুগের ছোট-বড় কোন লেখক পারতপক্ষে ফার্সি শব্দ ব্যবহার করতেন না, নিতান্ত দরকারের সময়ও না। প্যারীচাঁদ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তিনি দরকার হলে কাজ চালাবার জন্যে অসঙ্কোচে ফার্সি ব্যবহার করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও ভাষা গঠন করার সময় এই মূলনীতিটি মেনে নিলেন যে, বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করার জন্যে যখন যেমন দরকার তখন তেমন উপকরণ নেওয়া চলে, জাতিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা অমূলক। তিনি নিজে বর্ণনীয় বিষয় বোঝাবার জন্যে ফার্সি, ইংরেজি প্রভৃতি বৈদেশিক শব্দ অবাধে ব্যবহার করেছেন। তার ফলে, বাংলা গদ্যভাষার গ্রহণসামর্থ্য ও ভাবপ্রকাশশক্তি অনেক বৃদ্ধিলাভ করে।

ভাষা ও রীতির জন্যে যেমন, তেমনি বিষয়বস্তুর জন্যেও বঙ্কিম-রচনাবলী বিশেষ জনসমাদর লাভ করে। প্রথম মৌলিক রোমান্স ধরণের উপন্যাস রচনা, ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে উপন্যাস রচনা, উপন্যাসশিল্পে নানা বৈচিত্র্যসম্পাদন, ঔপন্যাসিক কলাকারুর আশ্রয়ে তত্ত্ব ও মতবাদের রূপায়ন, পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে উপন্যাস রচনা প্রভৃতি অসংখ্য অভিনবত্বের জন্যে তাঁর উপন্যাস-গ্রন্থাবলী এদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর হাতেই প্রথম প্রকৃত রসপ্রাণ প্রবন্ধ বা রচনাসাহিত্য নিটোল রূপে গড়ে উঠল। গদ্যসাহিত্যে স্বয়ং বহু বৈচিত্র্য প্রবর্তন করা ছাড়াও গোষ্ঠীপতি হিসেবে তিনি কত যে উদীয়মান শক্তিশালী লেখককে উৎসাহিত করে গেছেন, তার সংখ্যা অগণিত। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনা আমাদের প্রসঙ্গ-বহির্ভূত। বাংলা গদ্যের চলার পথে বঙ্কিম ঐ গদ্যভাষার উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছেন কেবল সেই আলোচনা আমাদের করণীয়।

বিদ্যাসাগরের রচনার সঙ্গে তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ভাষার বিশেষত্ব অনুধাবন করলে বোঝা যায়, শব্দভাণ্ডারে বিশেষ কোন পরিবর্তন না এনেও কি কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র একটা সম্পূর্ণ নতুন ভাষার জন্ম দিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস" (১৮৬০)—এর ভাষার নিদর্শন দেওয়া হল—যার সঙ্গে "দুর্গেশনন্দিনী-"র ভাষা তুলনা করে দেখা যায়, বিশুদ্ধ ভাষারচনার কৃতিত্বে বিদ্যাসাগর বেশি গৌরবান্বিত :—

"প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর, আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, প্রফুল্ল কমল সকল মন্দ মারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের নিরতিশয় শোভা সম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইয়া রহিয়াছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ মনের আনন্দে নির্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভার সম্যক্ অনুভব করিতে পারি নাই।"

এই ভাষার শৃঙ্খলা, সজ্জা, বিন্যাস, পারিপাট্য ও বিশুদ্ধির প্রশংসা করে শেষ করা যায় না। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপম লাবণ্যময়ী ভাষা :—

"কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায় নবস্ফুট, ব্রীড়াসঙ্কুচিত, কোমল, নির্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্ণের স্থল পদ্মের ন্যায়; নির্বাস, মুদ্রিতোন্মুখ, শুষ্ক পল্লব অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য নবরবিকরফুল্ল জলনলিনীর ন্যায়; সুবিকাশিত, সুবাসিত, রসপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত, না সঙ্কুচিত, না বিশুষ্ক; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।"

শব্দভাণ্ডার একরকম হলেও, বরং ব্যাকরণগত সামান্য ত্রুটিযুক্ত হলেও, অন্তর্লীন রোমান্টিক চেতনার দাক্ষিণ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এক মধুক্ষরা লাবণ্যোচ্ছলতার সঞ্চার হয়েছে। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা, সৌন্দর্য-আভায় দ্যুতিময় চিত্র কল্পনা, অন্তরঙ্গ বিবৃতি—এই সব গুণে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যেন এক ঐন্দ্রজালিক মোহ বিস্তৃত হয়েছে। ঐ জাদুকরী শক্তি তাঁর অন্তর্নিহিত কবি প্রতিভা ও রোমান্টিক রীতির দান; ঐ দুটি প্রেরণা বিদ্যাসাগরের ছিল না। তাই বিদ্যাসাগরের ভাষায় আর সব থেকে ও সম্মোহনশক্তি নেই। বিদ্যাসাগরের ভাষা প্রৌঢ়া সুন্দরী, রূপসী, কিন্তু বয়স কিছু বেশি; রূপের অভাব না থাকলেও চটক বা হ্লাদিনীশক্তি নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা যেন নবযৌবনা তরুণী, যার রূপের সঙ্গে চটক আছে, সুষমার সঙ্গে মোহিনীশক্তি আছে।

বহিরঙ্গের দিক থেকে দেখলে, বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটা কৌশল গ্রহণ করেছিলেন যার অভাবে বিদ্যাসাগরের ভাষা একটু একঘেয়ে; কিন্তু তারই জোরে বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাষা পাঠে বিশেষত উপন্যাস পড়ায় কখনও ক্লান্তি আসেনা। সেই কৌশলটি এই :—বঙ্কিমচন্দ্র বাক্যের দৈর্ঘ্য অনায়াসে যথেচ্ছ নিয়মিত করতে পারতেন। পূর্ববর্তী সকলের লেখায় বাক্য সচরাচর দীর্ঘ; বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে ছোট বাক্য ব্যবহার করেছেন, কিন্তু যেন একটু তালভঙ্গ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভ্রান্তিবিলাস বা বেতাল পঞ্চবিংশতির কথা বলা যায়। সে-সব বইএ কথোপকথনের ভাষায় ক্ষুদ্র বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু গম্ভীর ও দীর্ঘায়ত বর্ণনার মধ্যে সে-সব হ্রস্ব বাক্যবিন্যাস যতিভঙ্গদোষের সৃষ্টি করেছে। এ-যতি ছন্দের যতি নয়, শোভনতা ও সামঞ্জস্যবিধানের যতি। ভ্রান্তিবিলাসের নায়িকা যখন বলে, "তুমি জলধর, আমি সৌদামিনী; কিম্বা "আর কেন, গৃহে চল; কেন অনর্থক লোক হাসাইবে বল," তখন সুদীর্ঘ বাক্যাবলীর মাঝখানে ঐ সব কথা বিসদৃশ অসঙ্গতি বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে দীর্ঘ ও হ্রস্ব বাক্য অনায়াসে সুষম করে রচনা করেছেন—

"গ্রামখানি গৃহময়, কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে, ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন, ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে; শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না।"

"প্রদীপের দীপ্তি, পুষ্পের দীপ্তি, রমণীগণের রত্নালঙ্কারের দীপ্তি, সর্বোপরি ঘন ঘন কটাক্ষবর্ষিণী কামিনীমণ্ডলীর উজ্জ্বল নয়নদীপ্তি। সপ্তস্বরসম্মিলিত মধুর বীণাদি বাদ্যের ধ্বনি আকাশ ব্যাপিয়া উঠিতেছে, তদধিক পরিষ্কার মধুরনিনাদিনী রমণীকণ্ঠগীতি তাহার সহিত মিশিয়া উঠিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাললয়মিলিত পাদবিক্ষেপে নর্তকীর অলঙ্কারশিঞ্জিত মন মুগ্ধ করিতেছে। ঐ দেখ পাঠক! যেন পদ্মবনে হংসী সমীরণোত্থিত তরঙ্গহিল্লোলে নাচিতেছে; প্রফুল্ল পদ্মমুখী সবে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দেখ, দেখ, ঐ যে সুন্দরী নীলাম্বর পরিধানা, ঐ যার নীলবাস স্বর্ণতারাবলীতে খচিত, দেখ! * * * কে তুমি সুকেশি সুন্দরি? কেন উরঃ পর্যন্ত কুঞ্চিতালকরাশি লম্বিত করিয়া দিয়াছ?"

তা ছাড়া ফার্সি ও অন্যান্য বৈদেশিক শব্দের ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ভাষায় বদ্ধতাদোষ ও সঙ্কীর্ণ পণ্ডিতি মনোভাবকে প্রশ্রয় দেন নি। এইজন্যেও তাঁর রচনায় ক্ষেত্রোপযোগী ভাষা প্রয়োগে ত্রুটি হয়নি :—

"পিয়ালা! আহা? দে পিয়ালা! মেরি পিয়ারি! আবার কি? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ! সরাব! দে সরাব!"

অথবা,

"আমি পুনর্বার আসিয়াছি, এ বে-আদবি মাফ করিতে হইতেছে। বলিতে আসিয়াছি যে, দরিয়া বিবি হাজির আছে। * * রাগ কর কেন দোস্ত? তোমার নজরের লজ্জাতেই কাবুল পঞ্জাব ফতে হয়। তার উপর আবার হাতে ঢাল-তরবার—তুমি রাগিলে কি আর চলে? এই আমার পরওয়ানা দেখ—আর, এত্তেলা কর।"

অন্যত্র,

"দ্রবময়ী মহাদেবী ডেকাণ্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন। কটগ্লাসের কোষা পড়িল; প্লেটেড্ জগ্ তাম্রকুণ্ড হইল; এবং পাকশালা হইতে এক কৃষ্ণকূর্চ পুরোহিত হট্-ওয়াটার প্লেট নামক দিব্য পুষ্পপাত্রে রোস্ট্ মটন্ এবং কট্‌লেট্ নামক সুগন্ধ কুসুমরাশি রাখিয়া গেল।"

এছাড়া আরো বহু বিদেশী শব্দ যথা তস্‌লিম, কুর্নিশ, টব, সোপ, gloire প্রভৃতি তাঁর রচনাবলীতে ছড়িয়ে আছে। মোট কথা, শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না। এই ব্যাপারে তিনি পূর্ববর্তী সংস্কৃতানুরাগী লেখকদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

১২৮৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস; বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "বাঙ্গালা ভাষা" প্রবন্ধে লিখলেন (একটু সংক্ষেপে উদ্ধৃতি দেওয়া হল) :—

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম কথ্যভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। গদ্য গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। টেকচাঁদ ঠাকুর ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সাহিত্য কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। যদি একথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য, অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ পাঠকের বোধগম্য, তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।"

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলেই বাংলা গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের যে সিদ্ধিলাভ হয়েছিল, আজ পর্যন্ত তা আর কারো বেলায় দেখা যায় নি। ভাষাকে নিয়ে তিনি যা খুশি তাই করতে পারতেন, যে কোন রূপে তার প্রয়োগ ছিল তাঁর হাতের পাঁচ। সেইজন্যেই শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমের ভাষার অদ্ভুত শক্তিবিকাশ সম্বন্ধে বলেছিলেন :—

"What was in my mind was those achievements in which language reached its acme of perfection in one manner or another so that whatever the writer touched became a thing of beauty—no matter what its substance—or a perfect form and memorable. Bankim seemed to me to have achieved that in his own way as Plato in his or Cicero or Tacitus in theirs or in French literature, Voltairs Flaubert or Anatole France.

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাঁরা গল্পে বড় লেখক ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র খালি গল্পে বড় লেখক ছিলেন না, তিনি মহৎ গদ্যভাষারও স্রষ্টা। ১৮৭৮ সালের পূর্বোদ্ধৃত ঘোষণার দ্বারা তিনি কথ্যভাষায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। তাঁর ঐ প্রবন্ধে সুবোধ্য ভাষার ললাটে জয়তিলক অঙ্কন করা হয়েছে, তিনি তখনও "সকলের বোধগম্য" চলতি ভাষার সন্ধান পাননি বলে "অধিকাংশ লোকের বোধগম্য" সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন—সেই সাধুভাষায় তিনি ফরাসি গদ্যলেখকদের মতো উৎকর্ষ অর্জন করেছেন। ফরাসি গদ্যভাষাই বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্যভাষা, একথা সবাই জানেন। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরীও তাঁর প্রেরণা মূলত ফরাসি গদ্য থেকেই লাভ করেন।

ক্রমশঃ

জনান্তিকে

সনৎকুমার মিত্র

মুঠো মুঠো সোনা রোদ গাছেদের পাতায় পাতায়
সবে ছড়িয়েছে আর গড়িয়েছে ঘাসেদের শীষে,
জড়িয়েছে ডুবে যাওয়া নীল-স্বপ্ন পাখীর পাখায়;
ঘুম-চোখে সেইক্ষণে শুনেছি ও দেখেছি নিমিষে।

সেই দেখা সেই রেখা আজও বুঝি রয়েছে ভাস্বর:
এই মনে নেই কোনো সন্দিহান বাতাসের দোলা!
একজোড়া নীল চোখ, অনন্যার সে মধু অধর,
ভোলবার নয় সেই—মেঘারণ্য কালো চুল খোলা।

হরিণের হেঁটে যাওয়া স্বপ্নে দেখেছি কতবার,—
মেদুর মেঘের মাঝে আকাশের নীলে কিছু আশা;
কিছু মিল হয়তো বা খুঁজে পাই সেইখানে তার,
অমিল রয়েছে শুধু, সেই কথা সংগীতের ভাষা।

কত কত অন্ধকারে ঢেকে দিলো পৃথিবীর বুক,
দিনের আলোর ঢেউ ধুয়ে দিলো কতবার এসে,
কত হাসি কথা গান প্রয়াস পেয়েছে দিতে সুখ;
অমলিন সেই কথা—সেই গান তবু আসে ভেসে।

গ্রহ জগৎ

ফলিতজ্যোতিষের কথা

উপাধ্যায়

যে শাস্ত্রের আনুকূল্যে জ্যোতিষ্পথস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণ কাল, গ্রহণ, পরস্পরের অন্তর ও তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা আর তাদের গতি, স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে পার্থিব জীবনের শুভাশুভ বিষয় নিরূপণ করা যায়, তাকে জ্যোতিঃশাস্ত্র বলা হয়। জ্যোতিঃশাস্ত্র নানাভাগে বিভক্ত, প্রধানতঃ এটী তিন ভাগে বা স্কন্ধে বিভক্ত (১) গণিত (২) হোরা এবং (৩) শাখা। জ্যোতিষের সমস্ত বিষয় একসূত্রে গ্রথিত করে ঋষিরা জ্যোতিষ-সংহিতা প্রণয়ন করেছেন।

বিভিন্ন রাশিতে গ্রহগণের যথা বিহিত গতি, আকার, পরস্পরের দূরত্ব, পরিক্রমা প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা প্রথম স্কন্ধ বা বিভাগের মাধ্যমে জানতে পারি—এই বিভাগটীকে তন্ত্র ও বলা হয়। ফলিত জ্যোতিষ বা হোরা (Astrology) দ্বারা গ্রহনক্ষত্রদের গতি, স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ও মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের অবশ্যম্ভাবী ঘটনাগুলি জানা যায়, তাছাড়া তাৎকালিক (Horary Astrology) প্রশ্ন, রাষ্ট্রবিপ্লব, ঝড়বৃষ্টি, বিভিন্ন-রাষ্ট্রের শুভাশুভ অবস্থা, প্রভৃতি সম্পর্কে বহুবিষয়ের ফলাফল ফলিত জ্যোতিষ গণনার সাহায্যে পাওয়া যায়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে ফলিত জ্যোতিষ বহু শুভাশুভ ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে থাকে, যেমন সপ্তাহের মধ্যে মঙ্গলবারটি অশুভ। এ সম্বন্ধে বরাহ মিহির তাঁর বৃহৎ সংহিতার উপনয়নাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বলেছেন :—

'ক্ষিতিতনয় দিবস বারো ন শুভকৃদিতি
যদি পিতামহ প্রোক্তে
কুজদিনমনিষ্টমিতি বা কোঽত্র বিশেষো নৃ দিব্যকৃতেঃ ॥৪॥'

এর অর্থ হচ্ছে এই যে, পিতামহ ব্রহ্মা বলেছেন, মঙ্গলের অধিকৃত দিনটি অর্থাৎ মঙ্গলবার সপ্তাহের মধ্যে অশুভ দিন। আমাদের কালের লোকেরাও বলেছে যে, সপ্তাহের মধ্যে মঙ্গলের দিনটীতে কোন অনুষ্ঠান আরম্ভ করা বা কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া শুভফলদায়ক নয়, তাহোলে দেবতা আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর বরাহমিহির নিজেই দিয়ে বলেছেন যে, ব্রহ্মাই জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রবক্তা, এই শাস্ত্রকে বেদের অঙ্গীভূতই করে গেছেন তিনি। গর্গ আর অন্যান্য ঋষিরা তাঁর কাছ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করেন। মঙ্গলবার কেন অশুভ আর এদিনেই বা কেন অনিষ্ট ঘট্‌তে পারে, এ তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের ভার ফলিত জ্যোতিষের ওপর—গণিত জ্যোতিষের ওপর নয়।

বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের যেরূপ দ্রুত উন্নতি ঘটেছে সেরূপ উন্নতি ফলিত জ্যোতিষের ঘট্‌তে দেখা যায় না, তার কারণ এ সম্পর্কে গবেষণা কর্‌বার দিকে অনেকের ঔদাসীন্য প্রত্যক্ষ করা যায়, কোন মহাবিদ্যালয়ে ফ ত জ্যোতিষ সম্যক্‌ভাবে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা নেই। সাম্প্রতিককালে, অধিকাংশ লোকই ফলিত জ্যোতিষকে বুজরুকী বলেই থাকেন, এর ভেতরের কথা কেউ তলিয়ে বুঝ্‌বার চেষ্টা করেন না। তার কারণ মারাত্মক মানসিক আলস্য ও অবিশ্বাস এদেশের মনকে ছেয়ে ফেলেছে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও' ফলিত জ্যোতিষের বিষয়ে উন্নাসিততা প্রকাশ করে থাকে; অথচ প্রাচীনকালে ফলিত জ্যোতিষের যথেষ্ট আলোচনা হোতো, তার বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। এই শাস্ত্রের ভিতর যদি কোন সত্য না থাক্‌তো, তাহোলে এতকাল ধরে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে এর অস্তিত্ব

থাকতো না। বারম্বার বৈদেশিক আক্রমণের ফলে আমাদের বহুশাস্ত্রই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলির সংস্কার সাধনের দিকে বিশেষ চেষ্টা করা হয়নি আজও পর্য্যন্ত—যেটুকু অস্তিত্ব বজায় করা হয়েছে, সেটুকু বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার সমষ্টি মাত্র। ভারতীয় ইতিহাসে প্রাকমুসলমান যুগকে ঐতিহাসিকরা সুবর্ণাখ্যা দিয়েছেন। বিদগ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন—'For seven long centuries from the 12th to the 19th there is a period of decay and disaster, The Aryan mind achieved almost nothing new.' কাজেই কোন বিষয়ে সম্যক্‌ভাবে গবেষণা ও আলোচনা না হওয়ায় জ্যোতিষ গবেষণার অগ্রগমন হয়নি। ভৃগুসংহিতা প্রভৃতি আজ সাগরপারে ইংরাজ জাতির কুক্ষীগত, ব্রিটিশ আমলেও আমাদের বহু মূল্যবান পুঁথিপত্র ভারত থেকে উধাও হয়ে গেছে।

গুরু-শিষ্য প্রথা অবলম্বনের দ্বারা ভারতবর্ষে পূর্ব্বে শিক্ষা দেওয়া হোতো। সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার না হওয়াতে, বহুশাস্ত্রের তত্ত্ব ও তথ্য নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল অবস্থার ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে যা এসেছে, তার ভেতর অনেক প্রক্ষিপ্ত বচন ঢুকে গেছে, জলও ঢুকেছে অনেকখানি। জ্যোতিঃশাস্ত্রের আদিভাষ্যকারেরা বা প্রবক্তারা যেরূপ ত্রিকালদর্শী জ্ঞানী ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে যাঁরা এই শাস্ত্রের আলোচনা ও গবেষণা করেছেন তাঁরা সেরূপ বিজ্ঞ ছিলেন না। নিজেদের প্রাধান্য ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রেখে জ্যোতিষের ওপর [illegible] আধিপত্য রক্ষার উদ্দেশ্যে বহু জ্যোতিষী ফলিত জ্যোতিষের অনেক কথাই লুকিয়ে রাখতেন, নিজেদের সন্তানগণকে ছাড়া অপর কাউকে শিক্ষা দিতেন না, তাঁদের জ্ঞানগর্ভ অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্যোতিষের কোন বিষয়বস্তু যাতে পরহস্তগত না হয় তার জন্যে তাঁরা বিশেষ সতর্ক থাকতেন।

ভারতবর্ষ, মিসর, আরব প্রভৃতি দেশের প্রাচীনেরা এই বিদ্যায় অনন্য সাধারণ উন্নতি লাভ করেছিলেন। হাজার হাজার বছর আগে তাঁরা যথার্থতার সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করে আকাশের গ্রহতারা, পৃথিবীর আবর্ত্তন ও কক্ষ-পরিভ্রমণ, মানুষের ওপর এবং পার্থিব ঘটনার ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব, পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে গ্রহদের ব্যাস, তাদের গতি ও নানাপ্রকার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন, আজ সেগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ও উন্নততর অঙ্কপাতের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করে সাম্প্রতিক গাণিতিক জ্যোতিষীরা সেসব কথা সমর্থন করছেন। অধিকভাবে বিনা যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রাচীনেরা কিভাবে জ্যোতিষতত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, তা আজ বিস্ময়ের বস্তু হয়ে রয়েছে। ঋগ্বেদে জ্যোতিষশাস্ত্রের সূত্রপাত হয়, তদনন্তর তার ক্রমবিকাশ হয়ে নানা শাখা প্রশাখায় জ্যোতিষশাস্ত্র বিভক্ত হয়েছে। আমরা আজও ভেবে ঠিক করতে পারলাম না, সেই সব প্রাচীন পণ্ডিতেরা কিভাবে তাঁদের আবিষ্কারগুলি সুসম্পন্ন করেছিলেন—অতীন্দ্রিয় বা মানসিক শক্তির দ্বারা তাঁরা এইসব কাজ করেছিলেন, না উচ্চাঙ্গের অঙ্কশাস্ত্রের পটভূমিকাও শক্তি-সম্পন্ন চক্ষুযন্ত্রের সৃষ্টি করে, খগোলতত্ত্ব বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন, তা আজও আমাদের কাছে রহস্য হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার লীলাক্ষেত্র; অতি মানস চেতনা ও বোধির পূর্ণবিকাশ হয়েছে এখানে, যৌগিক ও অতীন্দ্রিয় স্তরে স্তরে হয়েছে অলৌকিক সাধনা, আজ অবশ্য এসেছে ভারতবর্ষের অধঃপতন জড়বাদের প্রাধান্যলাভের ফলে আর ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রও হয়ে এসেছে লুপ্ত প্রায়। অধ্যাত্মশক্তির বলেই যে ভারতের প্রাচীন মহাত্মারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই অবগত হোতে পারতেন একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং তাঁদের অলৌকিকতার দান এই ফলিত জ্যোতিষকে অবজ্ঞা করা বাতুলতা মাত্র।

জ্যোতিষ অতীব প্রাচীন শাস্ত্র। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচহাজার বৎসর আগে এই শাস্ত্র প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। কেবলমাত্র ভারতবাসীরাই যে এই শাস্ত্রবিদিত ছিলেন তা নয়, মিসর ও চীনের অধিবাসীরা এই শাস্ত্রে সম্যক্‌ বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে জ্যোতিঃশাস্ত্রের গৌরবময় অধ্যায়গুলি পাঠ করলে বিস্মিত হোতে হয়। তদানীন্তনকালের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যবন প্রগতি ও সংস্কৃতির ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন বরাহমিহির।

বিখ্যাত জ্যোতিষী ক্যালিসথেনিস মহামতি আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় অভিযানে তাঁর সাথী ও উপদেষ্টা হয়েছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার

পদ্ধতির সঙ্গে ভারতীয় চিন্তাধারার বিনিময় হয়েছিল। মিসরের ফারাওরা, পারস্যের নৃপতিবৃন্দ, চৈনিক সম্রাটগণও ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ তাঁদের সভাসদরূপে জ্যোতিষীদের রেখেছিলেন এবং তাঁদের পরামর্শ মত দৈনন্দিন কর্ম্ম সম্পাদন করতেন। ফলিত জ্যোতিষে বশিষ্ঠ, গর্গাচার্য্য, পরাশর, ভৃগু, মণিথা, যবনাচার্য্য, বিষ্ণুগুপ্ত, বরাহমিহির, মহাকবি কালিদাস, খনা, গার্গী, সারাবলী প্রভৃতির দান অবিস্মরণীয়। পাশ্চাত্যদেশেও গ্রীনউইচ মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ফ্লামষ্টিড, সেক্সপীয়র, ম্যানিলাস, মিলটন, ড্রাইডেন, ইয়ং এমার্সন প্রভৃতি মনীষী ও কবিরা এই শাস্ত্র আলোচনা করেছেন এবং এই শাস্ত্রে তাঁদের যথেষ্ট পারদর্শিতাও ছিল।

আধুনিককালেও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যদেশের অনেক মনীষী ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা করে থাকেন। দক্ষিণভারতে এর আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাহোক আমরা এই বিভাগে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা ও দ্বাদশ রাশির মাসিক ফলাফল দেবার সঙ্কল্প করেছি। অগ্রহায়ণ মাসের ফলাফল সংক্ষেপে দেওয়া গেল। আশাকরি আমাদের পাঠকপাঠিকারা তাঁদের রাশি অনুসারে শুভাশুভ ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন।

* * *

অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশ রাশির ফলাফল

মেষ—আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে। পত্নীর পীড়া হেতু মানসিক চাঞ্চল্য ও অর্থব্যয়ের যোগ। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে বা পরীক্ষা বিষয়ে ফল মন্দ হবে না। বৈষয়িক ব্যাপারে ভ্রাতৃবিরোধ। মিত্রলাভ বা মিত্রাদির সাহায্যে ব্যবসা বাণিজ্যে কিছু উন্নতি। কর্ম্মস্থলে গুপ্তশত্রুর দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা। মাতার স্বাস্থ্য মন্দ নয়। গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কারাদিতে অর্থ ব্যয়। অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্র জাত ব্যক্তির ভ্রমণ, কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির লক্ষ্মী বৃদ্ধি। ৬ই অগ্রহায়ণ শনির সঞ্চার সময়ে মেষ রাশির গোচর শুদ্ধি ও চন্দ্র শুদ্ধি না থাকায় অশুভ ফল দেখা যায়। স্ত্রী পুত্র কন্যা থেকে বিচ্ছিন্নতা, সম্মান হানি, বক্ষে বেদনা প্রভৃতি, ফলে দৈনন্দিন কাজ সম্যকভাবে সম্পন্ন হয়ে উঠবে না। নানা প্রকার বিশৃঙ্খল ও মানসিক কষ্ট। মাসের প্রথম পাঁচদিন অপেক্ষাকৃত অশুভ এবং ২২শে অগ্রহায়ণ থেকে মাসের শেষ দিকটা শুভ বলা যায়।

বৃষ—ভ্রমণ এবং শারীরিক অসুস্থতা বা ভগ্ন স্বাস্থ্য, মানসিক কষ্টভোগ, ভয়, অপবাদ, ক্ষতি—শেষ সপ্তাহে উত্তম আয়। মর্য্যাদা হানি। সম্পত্তি, চাকুরি ও ব্যবসা সম্পর্কে শেষ সপ্তাহটী ভালো যাবে। রোহিণী ও মৃগশিরা নক্ষত্রজাত ব্যক্তির লক্ষ্মীবৃদ্ধি।

মিথুন—বিপন্নতা, পীড়া ও দুঃখ ভোগ। অনিষ্টপাত। সন্তানলাভ। শত্রুভয়। অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যয়। শেষ সপ্তাহে মনস্তাপ, পারিবারিক কলহ ও স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য। মধ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ লাভ। শত্রুহানি ও সাফল্যলাভ মাসের প্রথমভাগে। আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রজাত ব্যক্তির লক্ষ্মীলাভ। উন্নতি যোগ।

কর্কট—মনস্তাপ, দুঃখভোগ, স্বাস্থ্যহানি, কার্য্যে ঝঞ্ঝাট ও হতবুদ্ধি ভাব নানা বিশৃঙ্খলার জন্য। প্রথম সপ্তাহে সুখ ও সম্পত্তি। পুষ্যা ও অশ্লেষাজাত ব্যক্তির ভয়। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রজাত ব্যক্তির লক্ষ্মীলাভ। পরিবর্ত্তন ও কষ্ট। ক্ষতি।

সিংহ—অসম্মান। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাপ্তিযোগ। পড়াশুনায় পুনঃপুনঃ বাধা। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক নয়। কর্ম্মস্থানে গুপ্তশত্রু। অর্থক্ষয়। কলহ। ভুলবুঝাবুঝির নিমিত্ত মনোমালিন্য। মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রজাত ব্যক্তির ভয়। উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে লাভ। ব্যয় বৃদ্ধি ও মানসিক অসুস্থতা। প্রথম দিকে শুভ ও সৌভাগ্যলাভ।

কন্যা—পিতার দীর্ঘকাল ব্যাপী পীড়াভোগের সূচনা। নিজের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট, উদ্বেগ, ব্যয়বৃদ্ধি, লাভ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। উত্তম প্রীতিভাজন ব্যক্তির

সান্নিধ্য লাভ। তরা অগ্রহায়ণের পর সম্পত্তি, চাকুরী ও ব্যবসাসম্পর্কে শুভ, কর্ম্মস্থলে আকস্মিক পরিবর্ত্তন। অপরের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ পেতে বিশেষ কষ্টভোগ। হস্তা ও চিত্রা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির পক্ষে লাভ।

তুলা—স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রজাত ব্যক্তির পক্ষে সুখ লাভ। লাভ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি, কিছু অর্থক্ষয়, স্ত্রীর দুর্ঘটনার ভয়, কলহ ও ক্লান্তিভোগ। প্রথমভাগে ব্যয়।

বৃশ্চিক—স্থান পরিবর্ত্তন। অর্থলাভ। মাসের শেষ সপ্তাহে সৌভাগ্য ও অর্থলাভ। মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা, বিপন্নতা ও অহেতুক ব্যয়ের সম্ভাবনা। অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির অপমান বা অপবাদের ভয়। বিক্রয় অপেক্ষা ক্রয় বাণিজ্যে অধিকতর উন্নতি। শত্রুনাশের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বচ্ছন্দতা। কর্ম্মক্ষেত্রে নানা ঝঞ্চাট।

ধনু—আশাভঙ্গ, মনস্তাপ ও বিত্তনাশ। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম সপ্তাহে লাভযোগ। কলহ ও পারিবারিক অশান্তি। শেষভাগে অর্থলাভ। মূলা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির জয়-লাভ। পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির কর্ম্মে সাফল্য। সম্পত্তি সংক্রান্ত গোলযোগের মীমাংসা হোলেও আংশিকভাবে ক্ষতিস্বীকার করতে হবে।

মকর—আয়স্থান মন্দ নয়, সঞ্চয়ের যোগ দেখা যায় না। কর্ম্মক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা। সাময়িকভাবে ঋণও হোতে পারে। চাকুরিক্ষেত্রে ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের দ্বারা অনিষ্টের আশঙ্কা। প্রথম সপ্তাহ শুভ বলা যায়। শত্রুবৃদ্ধি, মনোমালিন্য ও মতদ্বৈধ হেতু অশান্তি। সম্ভ্রমহানির ভয়। বিপন্নতার সম্ভাবনা। শ্রবণা নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির জয়, ধনিষ্ঠ নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির কর্ম্ম-সাফল্য।

কুম্ভ—শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির ভ্রমণ। অর্থপ্রাপ্তি, স্ত্রীলাভ, নারীর আনুকূল্য, লাভ, চিত্তের প্রফুল্লতা, মানহানি, স্ত্রীর বিপদ বা পীড়া। কলহ। মনোমালিন্য ও মতদ্বৈধ হেতু অশান্তি। স্বাস্থ্যোন্নতি, উপার্জ্জন বৃদ্ধি। বিদ্যাস্থানে বাধা।

মীন—উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত ব্যক্তির ভ্রমণ। ভয় ও পীড়া। ক্ষতি, মধ্যভাগে কিঞ্চিৎ অর্থলাভ, উদ্বেগ, অপবাদ, অবমাননা ও বিচ্ছেদ। বিপন্নতার আশঙ্কা। সন্তানদের পড়াশুনা আশানুরূপ নহে।

হেমন্তে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আরণ্য কপোত কণ্ঠে বৈরাগ্যের সুর ;
পাখীদের কাকলিতে প্রভাত মধুর !
পল্লবে পল্লবে খেলে মৃদুল বাতাস ;
ঊর্দ্ধে জাগে অবারিত নির্ম্মল আকাশ ;
রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠে মাঠে ঝলিছে শিশির ;
যত দেখি রূপতৃষা মেটেনা আঁখির !

অপরাজিতার নীল, জবার লোহিত,
শুভ্র শেফালিকা আর বনের হরিত,
পুষ্পে পুষ্পে কুসুমিত বাগান বিলাস,
মর্ম্মরিত বেণুবনে কার ভাবোচ্ছ্বাস !
সব নিয়ে অপূর্ব্ব এ পৃথিবী সুন্দরী !
জীবনেরে ভালো লাগে। তুচ্ছ মনে করি :

লোক-নিন্দা, মানুষের আঘাত নিষ্ঠুর।
প্রকৃতির স্পর্শে ব্যথা করি দেয় দূর।



বিজয়াভিবাদন—

বৎসরান্তে শ্রীশ্রীমহাপূজার পর ভারতবর্ষের চিরাচরিত প্রথানুসারে আমরা গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি—আগামীবর্ষে সকলেরই জীবন মধুরতর ও সমৃদ্ধতর হউক। সকলের নিকট এই শুভেচ্ছা প্রার্থনা জানাই—সকলের ইচ্ছা যেন আমাদিগকে কর্মে প্রেরণা ও শক্তিদান করিয়া 'ভারতবর্ষ'কে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। শত্রু যেন ভবিষ্যতে শত্রু না থাকে এবং মিত্র যেন প্রগাঢ়তর মিত্রতাপ্রাপ্ত হইতে পারে।

স্মরণীয় দিন—

২৮শে অক্টোবর পৃথিবীর ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন গিয়াছে। ঐ দিন ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী উ নু পদত্যাগ করেন ও রেঙ্গুনে তিনটি প্রধান রাজনীতিক দল একত্র মিলিত হইয়া জেনারেল নে-উইনকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করিয়াছেন। ব্রহ্মে বিদ্রোহ-দমন ও শান্তি স্থাপনের জন্য এই নূতন ব্যবস্থায় সকলে সম্মত হইয়াছেন। ঐ দিনই করাচীতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর-জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা স্বেচ্ছায় সরিয়া যাওয়ায় পাকিস্তানের সর্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও সামরিক আইনের প্রধান পরিচালক জেনারেল মহম্মদ আউব খাঁ রাষ্ট্রপতির কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আয়ুব খাঁ নিজ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া লইয়াছেন। ইস্কান্দার মির্জা পরে লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছেন ও তথায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপের মৃত্যুর পর ২৮শে অক্টোবর ভাটিকান নগরে খৃষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজকগণ মিলিত হইয়া ভেনিসের ধর্মযাজক ৭৬ বৎসর বয়স্ক এঞ্জেলো রনকালিকে নূতন পোপ নির্বাচিত করিয়াছেন। তিনি ২৩নং জন নাম গ্রহণ করিয়া দেশের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিন দিন ধরিয়া গুপ্তসভার পর নূতন পোপ নির্বাচন সম্ভব হইয়াছে। নূতন পোপ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই সহরের ও জগতের কল্যাণ কামনা জানাইয়াছেন। দিনটি এই তিনটি প্রধান ঘটনার জন্য স্মরণীয় হইয়া রহিল।

নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যান—

সোভিয়েট লেখক বরিস পাস্তারনাক এ বৎসর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন—কিন্তু ঘটনাচক্রে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পুরস্কার পাওয়ার খবর পাইয়া প্রথমে পাস্তারনাক আনন্দিত হন ও দাতা সুইডিস একাডেমীকে ধন্যবাদ জানাইয়া তার করেন। কিন্তু যে 'ডক্টর জিভাগো' নামক পুস্তক রচনার জন্য তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহাতে সোভিয়েট শাসনের নিন্দা করা হইয়াছিল। সে জন্য নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির সংবাদ প্রচারিত হইলে রুস দেশের লেখক-গোষ্ঠী পাস্তারনাকের কার্য্যের নিন্দা করেন ও লেখকগোষ্ঠী হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেন। এই সংবাদ পাইয়া পাস্তারনাক দেশবাসীর ও লেখকগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধে প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বইখানিতে সোভিয়েট-শাসনের বিরুদ্ধমত লিখিত হওয়ায় উহা রুসিয়ায় প্রকাশিত হয় নাই—ইতালীয় ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। বইখানি যে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুস্তক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করিলে পাস্তারনাককে হয় ত রুস দেশ ত্যাগ করিতে হইত ও বাকী জীবন বিদেশে অতিবাহিত করিতে হইত। তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া দেশে বাস করার জন্য প্রাইজ গ্রহণ করিলেন না। ঘটনাটি নোবেল প্রাইজের ইতিহাসে ও সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিল।

পোলাণ্ডে কবিগুরু সম্মানিত—

গত ২৩শে অক্টোবর পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ সহরে একটি নূতন রাস্তার নাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মেয়র ও গণপরিষদের সভাপতি শ্রীজেড গোরা কোৎস্কি স্মৃতি ফলকের আবরণ

উন্মোচন করেন। পোল-ভারত মৈত্রী সমিতির চেষ্টায় এই কার্য্য সম্ভব হইল। কবিগুরুর দেশবাসী আমরা তাঁহার এই সম্মানে নিজেদের সম্মানিত মনে করি। বিশ্ব-কবির প্রতিভা ক্রমে বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃত হইতে চলিয়াছে।

আমেরিকায় প্রাচ্যধর্ম প্রচার—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর প্রাচ্যভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও চিন্তাধারার সহিত পরিচয়ের জন্ম লোকের আগ্রহ খুব বাড়িয়াছে। সম্প্রতি তথায় এক পুস্তক প্রকাশক ৩ লক্ষ ভাগবদ্গীতা, দেড় লক্ষ উপনিষদ, আড়াই লক্ষ বুদ্ধ বাণী, ২ লক্ষ কনফুসিয়াসের বাণী ও সওয়া ২ লক্ষ তাও তেচিংএর জীবনযাত্রা পদ্ধতি পুস্তক ছাপাইয়াছেন। পৌনে ৪ লক্ষ কোরাণও তথায় ছাপা হইয়াছে। পুস্তকগুলি বিক্রয়ের জন্ম শুধু বই-এর দোকানে নয়, সংবাদপত্র ভাণ্ডার, খাবারের দোকান, বড় মনোহারী দোকান, ঔষধের দোকান প্রভৃতিতেও রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। পুস্তকগুলি খুবই সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের শকুন্তলা, কোরাণ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা আছে। প্রাচ্যের ভাবধারা জানিবার জন্ম আমেরিকার এই প্রচেষ্টা দেখিয়া মনে হয়, পাশ্চাত্যের জড়বাদ আর মানুষকে শান্তির পথ দেখাইতে পারে না—তাহার ফলে ধ্বংসের চেষ্টা ক্রমে বাড়িয়া চলায় সাধারণ মানুষ প্রাচ্যের চিরশান্তিময় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। ভারতের চিন্তাশীল মনীষীদের এ বিষয়ে পাশ্চাত্যকে সর্বপ্রকারে সাহায্যের জন্ম অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

কৃষিপণ্য উৎপাদন—

ভারতের আজ সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অভাব খাদ্যের। নানা ভাবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা নিষ্ফল হইতেছে। ফলে ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে কোটি কোটি টাকার চাল ও গম আমদানী করিয়া ভারতের মানুষকে বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা হইতেছে। এ কথা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। ১৯৫৮ সালের প্রথম ভাগে কয়েক মাস কাল ভারতের মানুষকে আমেরিকা হইতে আমদানী-করা সাদা চাল খাইতে হইয়াছে। সে জন্ম গত ২৬শে অক্টোবর হায়দ্রাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে একটি কৃষিপণ্য উৎপাদন কমিটী গঠিত হইয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ-এন্ ধেবর কমিটীর সভাপতি এবং সারা ভারতের ১৪ জন প্রতিনিধি তাহার সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন কমিটীর অন্যতম সদস্য। প্রত্যেক রাজ্যে এইরূপ কমিটী গঠন করিয়া কৃষি-পণ্য উৎপাদনবৃদ্ধির ব্যবস্থা না করিলে ভারত দিন দিন ধ্বংসের পথে আগাইয়া যাইবে। ভারতবাসীর জন্ম শুধু প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না—বিদেশে খাদ্য রপ্তানী করিয়া অর্থার্জন করাও প্রয়োজন। ভারতে জমীর অভাব নাই, সে জমীর উর্বরতাও যথেষ্ট আছে—অভাব শুধু উৎসাহী কর্মীর। সমবায় প্রথায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে একদিকে বেকার সমস্যা কমিবে—অন্য দিকে মানুষ পেট ভরিয়া খাইবার সুযোগ লাভ করিবে।

এডেনে গান্ধী-স্মারক ভবন—

গত ২৯শে অক্টোবর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীইউ-এন-ডেবর এডেনে যাইয়া তথায় গান্ধী-স্মারক ভবনের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। ৩০ হাজার পাউণ্ড ব্যয়ে এই ভবন নির্মাণ করা হইবে। এডেনের ভারতীয় সমিতি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। শ্রীডেবর উপস্থিত সকলকে জীবনে গান্ধী-নীতি গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

পাকিস্তান সমস্যা—

গত কয় মাসে পাকিস্তানের রাজনীতিক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে জগদ্বাসী স্তম্ভিত হইয়াছে এবং ভারতের মানুষ সন্ত্রস্ত হইয়াছে। এমন কি ভারতের প্রধান-মন্ত্রীর মত ধীর, স্থির ও দৃঢ়চিত্ত লোকও বিস্মিত হইয়াছেন। শ্রীজহরলাল নেহরু বার বার ভারতের মানুষকে ভয় পাইতে নিষেধ করিতেছেন বটে, কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসন তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিতেছে না। ইস্কান্দার মির্জাকে সকল ব্যবস্থা করিয়া দিবার পর যে ভাবে পাকিস্তান ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করা হইয়াছে, তাহা জগতের ইতিহাসে এক নূতন ঘটনা। জেনারেল আয়ুব খাঁ কি ভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা করেন, আমরা জানি না। কিন্তু পাকিস্তানের সর্বত্র অশান্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের সন্নিহিত পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, বিহার,

আগরতলা, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের সীমান্তগুলি প্রায়ই আক্রান্ত হইতেছে ও লোক তথায় নিরাপদে বাস করিতে পারে না। প্রায়ই ভারত রাজ্যের সীমান্তবর্তী বহু স্থান পাকিস্থানী হানাদারেরা আক্রমণ করিতেছে, সেখানকার শস্তসম্পদ ও ধনরত্নাদি লুণ্ঠিত হইতেছে এবং তাহারা জোর করিয়া বসিয়া আছে। কাশ্মীর রাজ্যের যে অংশ পাকিস্তানের মধ্যে আছে, সেখানে ত শান্তি নাই-ই, অধিকন্তু ভারত রাষ্ট্রের অধীনস্থ কাশ্মীরে এ হানাদারদের অত্যাচার বাড়িতেছে। কোন কোন পাকিস্তানী নেতা ভারতের নিকট হইতে কাশ্মীর কাড়িয়া লওয়ার কথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেছে। সীমান্ত অঞ্চলে বহু স্থানে সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে ও যুদ্ধের উপকরণ আনিয়া তথায় রক্ষা করার ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর যত্রতত্র অমানুষিক অত্যাচার করা হইতেছে, সম্রান্ত ধনী ব্যবসায়ীরাও আর পূর্ব-পাকিস্তানে বাস বা ব্যবসা করিতে ভরসা পাইতেছেন না। কোন হিন্দুকে পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিবার অনুমতিও সহজে দেওয়া হয় না—কাজেই হিন্দুদের পক্ষে তথায় পড়িয়া-মার-খাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এ অবস্থায় ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ঐসকল হিন্দুকে রক্ষা করার কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। ভারতরাষ্ট্র-কর্তৃপক্ষ আক্রমণের বিরোধী—কিন্তু কতদিন এই ভাবে পরের আক্রমণ সহ্য করা সম্ভব। জন-বিরল চর বা অরণ্য বহুল স্থান দখল করা ত পাকিস্তানীদের পক্ষে সহজ কাজ—আর তাহারা সর্বদা সে কাজ করিয়া চলিয়াছে। জনবহুল স্থানসমূহ হইতেও পাকিস্তানী হানাদারেরা দলে দলে আসিয়া বলপূর্বক, শস্য, গরু, ছাগল, মহিষ ও সময় সময় টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া যায়। ফলে সীমান্তের অধিবাসীদের সর্বদা ভয়ে ভয়ে সময় কাটাইতে হয়। ইহার উপর ছিট-মহল লইয়া গণ্ডগোল ত আছেই। সম্প্রতি আবদ্ধ নেহরু-নুন চুক্তি মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করায় তাহারা ভারতের মধ্যে থাকিয়াও যে অনাচার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার কথা আমরা গত মাসে উল্লেখ করিয়াছি। ছিটমহল সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত না হওয়ায় সর্বত্র শ্রীনেহরুর কার্য্য নিন্দিত হইতেছে। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ—তাহারা চায়, পাকিস্তানের ১০টি আক্রমণের পর ভারত অন্ততঃ একবারও পাকিস্তানকে আক্রমণ করুক। তাহার ফল কি হইবে না হইবে, সাধারণ লোক সে কথা বুঝে না। কাজেই শ্রীনেহরুর কার্য্যের নিন্দা করিয়া বসে। পাকিস্তানী সীমান্ত সমস্যার সমাধান না হইলে ভারতের উন্নতির ব্যবস্থা করাও কথনই সম্ভব হইবে না। এক দিকে ইঙ্গমার্কিণ শক্তি, আর এক দিকে রুষ-চীন শক্তি ভারতের সহিত পাকিস্তানের বিবাদ জিয়াইয়া রাখার সাহায্য করিতেছে। আমেরিকা যখন পাকিস্তানকে সৈন্য ও সামরিক উপকরণ দিয়া সাহায্য করে, তখন ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে তাহাতে বাধাদানের চেষ্টা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ফলে পাকিস্তান বহু যুদ্ধোপকরণ পাইয়া সর্বদা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আস্ফালন করিতেছে। স্বাধীনতা লাভের ১১ বৎসর পরেও পাকিস্তানে স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; কাজেই লোক মনে করে—অবস্থা এলোমেলো হইলেই সাধারণ মানুষের লুটে-পুটে খাওয়ার সুবিধা হইবে। যুদ্ধ হইলে তাহার পর কে থাকিবে, আর কে থাকিবে না—সে কথা কেহ চিন্তা করে না। একটি দেশ সর্বদা যুদ্ধ চাহে, আর তার পাশের দেশ যুদ্ধ চাহে না—জগতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নশীল—এই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী কতদিন রাখা সম্ভব, সকলেই তাহা চিন্তা করিয়া শঙ্কিত হন। যুদ্ধ-বিরোধী ভারতের পক্ষে পাকিস্তানী হানাদারদের কার্য্যে বাধাপ্রদানে কি কোন আপত্তির কারণ আছে? হানাদাররা ভবিষ্যতে যাহাতে আক্রমণে সমর্থ না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় রক্ষা-ব্যবস্থা অবলম্বনেই বা বাধা কোথায়? আজ সাধারণ মানুষের মনে সর্বদা এই প্রশ্ন জাগিতেছে।

দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তু প্রেরণ—

পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত প্রায় ৫০ লক্ষ উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গে স্থান দান করা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রের সীমান্তবর্তী তিনটি জেলা লইয়া এই পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। তথায় স্থান নদী-বহুল ও উর্বরা—একাংশ জঙ্গলে পূর্ণ, মাটীর মধ্যে বহু মূল্যবান ধাতুব পদার্থ আছে—জনসংখ্যা খুব কম—অধিকাংশ উপজাতি

বা নিম্নজাতির লোক। কাজেই তথায় অল্প ব্যয়ে ও সহজে ৩০ লক্ষ লোকের বাসস্থান ও কর্ম সংস্থান সম্ভব হইবে। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর হইতে অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনে যাতায়াতের ২টি বড় রাজপথ ও রেলপথ ঐ অংশের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে এত অধিক খনিজ সম্পদ পাওয়া যাইবে যে তথায় বহু কারখানা প্রতিষ্ঠা করা সহজসাধ্য ও লাভজনক। কয়েকটি বড় নদী ও ঝরণা থাকায় তথায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া ঐ অঞ্চলে সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। সে জন্য শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না তথায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের একদল বামপন্থী,যেমন সকল ভাল কাজে বাধা দেন, তেমনই এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা ব্যবস্থাতেও বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় বহু পতিত ও অনাবাদী জমী থাকা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুদিগকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করার প্রয়োজন কি? তাঁহারা জানিয়াও স্বীকার করেন না যে, মেদিনীপুর বা বাঁকুড়ার পতিত জমীগুলিকে কৃষিযোগ্য ও উর্বর করিতে এত অধিক টাকার প্রয়োজন, যে তাহা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। কলিকাতা ও সহরতলীর লোক সংখ্যা এত বাড়িয়াছে যে, সে সকল স্থান হইতে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবারকে না সরাইলে সে সকল স্থানের লোকদিগের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম-সংস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব। আমরা সহরতলী অঞ্চলের উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে ঘুরিবার সময় এ জন্য আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া থাকি। সে জন্য দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনায় আমরা উল্লসিত হইয়াছি—এবং সর্বদা সর্বত্র উদ্বাস্তুদিগকে পশ্চিম বাংলার বাহিরে যাইতে উৎসাহদান করিয়া থাকি। আমরা দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে—শুধু উদ্বাস্তুগণের পক্ষে নহে, পশ্চিমবঙ্গেরও একদল লোকের দণ্ডকারণ্যে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে এবং যাঁহারা যাইবেন তাঁহারা উপকৃত হইবেন। ধনী, শিক্ষিত তরুণের দল যাইয়া তথায় অল্প মূলধন নিয়োগে অধিক অর্থ উপার্জনে সমর্থ হইতে পারেন। গত ৩দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় দণ্ডকারণ্য সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকে তাহা ধীরভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে লোক দণ্ডকারণ্যে যাইবার সুযোগ সুবিধার কথা সম্যক অবগত হইবেন। একথা ঠিক যে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালী ঐ অঞ্চলে যাইয়া বসবাস করিলে তথায় নববঙ্গ গঠন করা আদৌ অসম্ভব হইবে না। যে ভাবে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে, কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায় বা নিউজীল্যাণ্ডে বৃটেনের অধিবাসীরা যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, সেইভাবে বাঙ্গালীদিগকেও দণ্ডকারণ্যে যাইয়া সকল অসুবিধা ও কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইবে। আজ যদি একদল বিভ্রান্তকারী রাজনীতিকদের কথা শুনিয়া উদ্বাস্তুরা এই সুযোগ গ্রহণে বিরত থাকেন, তাহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায়, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে সে জন্য কে দায়ী হইবে। সেজন্য আমরা সকল উদ্বাস্তুকে নিজ নিজ সুবিধা-মত দণ্ডকারণ্যের কথা চিন্তা করিতে ও তাথায় যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে অনুরোধ করি।



রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ জাপান ভ্রমণকালে জাপানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও পুরাতন রাজধানী "নারা"-তে গমন করেন। চিত্রে রাষ্ট্রপতিকে নারার বিখ্যাত "ডিয়ার পার্ক"-এ হরিণদের খাবার খাওয়াতে দেখা যাচ্ছে।

মহাজাতিসদনে শহীদদের চিত্র—

কলিকাতা মহাজাতিসদনে সম্প্রতি প্রায় একশত শহীদের চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। তথায় বহু শহীদের চিত্র

না থাকায় প্রায়ই বহুলোক অভিযোগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেজন্য কলিকাতা ৬৪এ ধর্মতলা ষ্ট্রীটের সতীন সেন স্মৃতি সমিতির সহ-সম্পাদক শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় জনগণকে জানাইয়াছেন যে—যে সকল শহীদের চিত্র তথায় নাই, যাহাতে সে সকল শহীদের চিত্র তথায় রক্ষিত হয়, সেজন্য দেশবাসী মাত্রেরই উদ্যোগী হওয়া কর্তব্য। বলা বাহুল্য সতীন সেন স্মৃতি সমিতির কর্মীরা সাধারণের অর্থ সাহায্যেই ঐ সকল চিত্র প্রস্তুত করিয়া মহাজাতিসদনকে দান করিয়াছেন। জনগণ যদি চিত্র প্রস্তুত করিয়া সমিতিকে দেন, সমিতি সেগুলি মহাজাতি সদনে রক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন। বহু শহীদের চিত্রও দুর্লভ—সে বিষয়ে ঐরূপ চিত্র কেহ সংগ্রহ করিয়া দিলেও সমিতি সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিবেন।

শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—

খ্যাতনামা কবি ও গ্রন্থকার শ্রীহারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি সিঙ্গাপুর ভ্রমণে যাইলে তাঁহাকে নিরাপত্তার বিঘ্নকারক বলিয়া সিঙ্গাপুর সরকার উপনিবেশ ত্যাগের আদেশ দিয়াছেন। হারীন্দ্রনাথ স্বর্গত সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা—তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য সর্বজনবিদিত। তাঁহার উগ্র রাজনীতিক মতই বোধহয় তাঁহার প্রতি এই আদেশের কারণ।

কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ—

শ্রীঅতুল্য ঘোষ ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পর পর ৪বার তিনি ঐ পদে নির্বাচিত হন। তিনি ভারতীয় লোকসভারও সদস্য। সম্প্রতি কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়াছেন—একই ব্যক্তি লোকসভার সদস্য ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থাকিতে পারিবেন না। তাহা ছাড়া একই ব্যক্তির একবারের বেশী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি থাকা ঠিক নহে। সেজন্য গত ১লা নভেম্বর অতুল্যবাবু প্রদেশকংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিজয়সিংহ নাহার প্রমুখ কার্য্যকরী সমিতির সকল সদস্যও পদত্যাগ করিয়াছেন। শীঘ্রই নূতন সভাপতি ও কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে।

পুরুলিয়ায় ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ—

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত ৬ই নভেম্বর একদিনের জন্য পুরুলিয়ায় যাইয়া নিস্তারিণী কলেজের একটি নূতন বাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সরকার ১৭ বিঘা জমি সমন্বিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাসগৃহ ক্রয় করিয়া তথায় দেশবন্ধুর মাতার নামে নিস্তারিণী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রবাবু পুরুলিয়ায় যাইয়া তাঁহার পুরাতন সহকর্মী ও লোকসেবক সংঘের নেতা শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। অতুলবাবুর পত্নী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ বর্তমানে পুরুলিয়া হইতে নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সভ্যা। রাজেন্দ্রবাবু পুরুলিয়ায় শ্রীজিমূতবাহন সেনের গৃহে যাইয়া তাঁহার বৃদ্ধা মাতার সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে রাজেন্দ্রবাবু বহুবার ঐ গৃহে অতিথি হইয়া বাস করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রপতির এই সৌজন্যে পুরুলিয়াবাসীরা সত্যই আনন্দলাভ করিয়াছেন কলেজে বক্তৃতাকালেও রাষ্ট্রপতি দেশবন্ধু দাশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও দেশবন্ধুর গুণাবলীর কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন।

আলিপুর চিড়িয়াখানা—

গত ৭ মাসে কলিকাতাস্থ আলিপুর চিড়িয়াখানায় ৫০টি প্রাণী মারা গিয়াছে। শুধু গত এপ্রিল মাসে চিড়িয়াখানায় ২৬টি প্রাণী মারা যায়। সকলে মনে করে, ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে এত প্রাণী এক সঙ্গে মরিয়া গিয়াছে। এবিষয়ে তদন্ত হইয়া প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

বিহারে বাঙালী ছাত্রীর কৃতিত্ব—

শ্রীমতী নমিতা চৌধুরী বিহার ইউনিভার্সিটির ১৯৫৮ সালের এম-এ পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তিনি মজঃফরপুর এল এস কলেজের ছাত্রী ছিলেন। বি-এ পরীক্ষাতেও তিনি দর্শনশাস্ত্রে অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়েও ডিস্টিংশন মার্ক পেয়েছিলেন। শ্রীমতী চৌধুরী ভাগলপুর প্যালেস হোটেলের স্বত্বাধিকারী পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা। আমরা তাঁর এই সাফল্যে অভিনন্দন জানাই এবং তাঁর গৌরবময় জীবন কামনা করি।

কলিকাতার নিকট নূতন বন্দর—

ভারত রাষ্ট্রের পরিবহন মন্ত্রী শ্রী এস-কে-পাতিল গত ৩০শে অক্টোবর মাদ্রাজে জাতীয় বন্দর বোর্ডের সভায় বলিয়াছেন—শীঘ্রই কলিকাতা অঞ্চলে আরও একটি বড় বন্দর নির্মাণ করা হইবে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশন এ বিষয়ে অর্থসাহায্য করিবেন। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচারের জন্য কলিকাতার নিকট নূতন বড় বন্দরের প্রয়োজন—কিন্তু তৎপূর্বে কলিকাতা বন্দরকে চালু রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে জন্য হুগলী নদীর প্রয়োজনীয় সংস্কার দরকার। আশা করি, সকলে সে বিষয়েও অবহিত আছেন।

শ্রীঢেবরের সমালোচনা—

কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীইউ-এন ঢেবর গত ৩রা নভেম্বর বরোদায় নিখিল ভারত যুব-কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কার্য্যের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—একদল কংগ্রেস নেতা তাঁহাদের নিজেদের কংগ্রেসের কর্তা বলিয়া মনে করার ফলে হরিজন, মহিলা, যুবক, শ্রমিক কেহই কংগ্রেসে পূর্ণভাবে যোগদানের সুযোগ লাভ করেন না। সে জন্য কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতেছে। তিনি কংগ্রেসের কায়েমী নেতৃবৃন্দকে অধিকার ত্যাগ করিয়া তাহা অন্যকে সমর্পণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, শুধু শ্রীজয়প্রকাশনারায়ণ নহে, কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা শ্রীঢেবরও একই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে কায়েমী নেতৃবৃন্দের চৈতন্য হইবে কিনা কে জানে?

সিকিমের কমলালেবু—

দার্জিলিং জেলা সংলগ্ন সিকিম রাজ্যের প্রধান ব্যবসার বস্তু কমলালেবু। সিকিমের উৎপন্ন কমলালেবুর শতকরা ৯০ ভাগ—অর্থাৎ প্রায় ২ লক্ষ মণ কমলা প্রতিবৎসর বিদেশে পাঠানো হয়। সিকিমের মহারাজ কুমার লেঃ কর্ণেল নামগিল সম্প্রতি একমাস জাপানে থাকিয়া সেখানকার ফল-সংস্করণ ব্যবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার দেশে সে ব্যবস্থায় কারখানা স্থাপন করিয়া বিদেশে রপ্তানী দ্বারা কমলালেবু হইতে অধিক অর্থ উপার্জন করিতে চান। নূতন কারখানা হইলে বহু বেকার লোক কাজ পাইবে, যে সকল লেবু পচিয়া নষ্ট হয়, সেগুলি কাজে লাগানো যাইবে ও ফলে প্রচুর অর্থাগম হইবে। তথায় প্রচুর আনারস, টমাটো ও অন্যান্য ফল বা তরকারী জন্মিয়া থাকে। সেগুলিও বিদেশে পাঠানো চলিবে। দার্জিলিং জেলায় ঐরূপ ফল-সংরক্ষণ কারখানা স্থাপন করিয়া সেখানেও বেকারসমস্যার সমাধান হইতে পারে।

বেআইনী ব্যবসা আবিষ্কার—

কলিকাতার পুলিস গত ২৯শে অক্টোবর বড়বাজারে একটি বড় বেআইনি ব্যবসার আড্ডায় হানা দিয়া ৪শত লোককে জুয়াচুরীর অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে ও নগদ ১ লক্ষ টাকা পাইয়াছে। তাহারা রূপা লইয়া ফাটকাবাজি করিত। বহু বেআইনি টেলিফোনও তথায় ধরা পড়িয়াছে। সংবাদটিতে বহু লোক আনন্দিত হইবেন। একদল দুর্বৃত্তের কার্য্যফলে আজ দেশের সাধারণ মানুষ দারুণ দুর্দশা ও কষ্ট ভোগ করিতেছে। কিন্তু ধৃত ব্যক্তিদের কি তথনই কোন শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। সংবাদপত্রে ধৃত ব্যক্তিদের নামও প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্র বা পুলিস কাহার নির্দেশে নাম প্রকাশে বিরত থাকেন? সাধারণ মানুষ মনে করে—বর্তমানে দেশের শাসক-গোষ্ঠী নামে-মাত্র দরিদ্রের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু পাত করে, কিন্তু আসলে জুয়াচোর ধনীদের সমর্থক। এই মনোভাব দূর করার ব্যবস্থা না হইলে দেশে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী—মানুষ কত দিন নীরবে কষ্ট সহ্য করিয়া যাইবে। সামান্য মাত্র অপরাধে দরিদ্র মানুষকে যে কষ্ট ও হায়রাণী সহ্য করিতে হয়, তাহার মাত্রা ক্রমে বাড়িতেছে, আর ধনী অপরাধীরা ধরা পড়িয়া ও অবাধে সমাজে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে; এ ব্যবস্থা আর কতদিন চলিবে?

বরিশাল ও নোয়াখালির বন্যা—

অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে হঠাৎ পূর্বপাকিস্তানে বরিশাল ও নোয়াখালি জেলায় সমুদ্রের জলোচ্ছাস ও ঝড়ের ফলে বহু গ্রাম বিধ্বস্ত ও জলমগ্ন হইয়াছে। কত লোক মারা গিয়াছে জানা যায় না, তবে উপকূল হইতে ২ শতের অধিক মৃতদেহ সংগ্রহ করা হইয়াছে। একদিকে রাজনীতিক বিপর্য্যয়ে পূর্ব-পাকিস্তান বিপন্ন—তাহার উপর প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—ইহার ফলে পূর্ব-পাকিস্তান ক্রমে জঙ্গল ও জলাভূমিতে পরিণত হইতে চলিল।

বৈদেশিকী

অতুল দত্ত

ভারতের দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি ভারতের জ্ঞাতি রাষ্ট্র ; একই রাজনৈতিক বংশোদ্ভূত দুইটি রাষ্ট্রীয় পরিবার একই ভৌগোলিক ভিটায় স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অন্যটি ভারতের সহিত একত্রে শতাব্দী কাল ধরিয়া বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীর জুতা খাইয়াছে। সুতরাং, ইহাদের উভয়ের সহিতই ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ; ইহাদের রাজনৈতিক ভাগ্য-পরিবর্তন ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং শিক্ষা গ্রহণ করিবারও বিষয়।

পাকিস্থানে সামরিক "ক্যূপ"—

পাকিস্থানে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য দলীয় বিবাদ সম্প্রতি অত্যন্ত কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বে পাকিস্থানে ডেপুটি স্পীকার এই দলীয় কোন্দলে বলি হন। কেন্দ্রে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের ব্যাপার একবারে ফাট্‌কাবাজারী কাণ্ডে পরিণত হয়। এই সময়—গত ৭ই অক্টোবর পাকিস্থানের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট জেনারেল মির্জ্জা প্রধান সেনাপতি জেনারেল আয়ুব খাঁর উপর দেশে সামরিক শাসন পরিচালনের ভার অর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের শাসনতন্ত্র বাতিল হয়, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও রাজ্য গভর্ণমেণ্ট বাতিল হন, জাতীয় পার্লামেণ্ট ও রাজ্য পরিষদগুলির উচ্ছেদ হয়, রাজনৈতিক দলগুলি নিশ্চিহ্ন হয়। সমগ্র দেশটি তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া তিনজন সামরিক কর্ম্মচারীর সামরিক শাসনাধীনে আসে। প্রথম দিকে বিভিন্ন বিভাগের সেক্রেটারীদিগকে লইয়া একটি উপদেষ্টা কমিটী গঠিত হইয়াছিল। পরে চারজন সামরিক কর্ম্মচারী এবং চারজন বেসামরিক ভদ্রলোককে লইয়া একটি তথাকথিত মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হয়। রাজনৈতিক অভিধান অনুসারে ইহারা অবশ্য মন্ত্রী নহেন ; কারণ ইঁহারা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহেন — ইঁহাদের নিয়োগকর্ত্তা প্রেসিডেণ্ট মির্জ্জাও জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিলেন না। পূর্ব্বের শাসনতন্ত্র অনুসারে জেনারেল মির্জ্জার যদি কিছু প্রতিনিধিত্বের অধিকার থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলেও শাসনতন্ত্র বাতিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে অধিকার বাতিল হয়। যাহা হউক, এই আট জন মন্ত্রীর উপরে জেনারেল আয়ুব খাঁ প্রধান মন্ত্রীরূপে অভিহিত হন এবং সর্ব্বোপরি প্রেসিডেণ্টরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন জেনারেল মির্জ্জা। গত ২৮শে অক্টোবর জেনারেল মির্জ্জা অকস্মাৎ পদত্যাগ করেন। শোনা যায়, সামরিক কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়াছিলেন ; ইহার জন্য নাকি তাঁহারা পিস্তল উঁচু করিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। মির্জ্জার অপসারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি পাকিস্থানের রাজনৈতিক অপকীর্ত্তির সহিত গভীরভাবে জড়িত ছিলেন ; সুতরাং, এই নূতন শাসনব্যবস্থার সহিত তাহার সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত নয়।

পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার সময় জেনারেল মির্জ্জা বলিয়াছিলেন যে, এখানে ক্ষমতার জন্য জঘন্য দ্বন্দ্ব চলিতেছে, সরল, সৎ, ও পরিশ্রমী জনগণকে নির্লজ্জভাবে শোষণ করা হইতেছে, ইস্‌লামের ব্যাভিচার চলিতেছে। তাঁহার এই কথায় বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন ছিল না, শুধু এই কলঙ্কজনক অবস্থার দায়িত্ব হইতে তাঁহার নিজেকে মুক্ত রাখিবার কৌশলী চেষ্টাটাই ছিল একটু অতি মাত্রায় অশোভন। যে সব রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী এবং দল ও উপদলের তিনি মুণ্ডপাত করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলের পাপ-আচরণের সহিত তাঁহার গভীর সংযোগ ছিল। প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি কাহারও পিঠ চাপড়াইয়াছেন, কাহাকেও গলা ধাক্কা দিয়াছেন, এক উপদলকে অন্য উপদলের পিছনে লেলাইয়া দিয়া পাকিস্থানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নানাবিধ উপভোগ্য অঙ্কের অবতারণা করিয়াছেন। মির্জ্জা সাহেব ব্রিটিশ আমলের সামরিক কর্ম্মচারী ; রাজনীতি তাঁহার পেশা নহে। কিন্তু পাকিস্থানের রাজনৈতিক সার্কাসে ভাগ্যান্বেষী প্রাণীগুলিকে খেলাইবার ব্যাপারে তিনি পাকা রিংমাষ্টারের মত দক্ষতা দেখাইয়াছেন। এমন যে ঘাগী মিঃ সুরাবর্দ্দী, তাঁহার মুখেও তিনি চুণ দিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত সুরাবর্দ্দি সাহেব যখন পূর্ব্ব পাকিস্থানে তাঁহার আওয়ামী লীগ মন্ত্রিমণ্ডলকে ঠেকাইবার চেষ্টায় কেন্দ্রে প্যাঁচ কষিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় মির্জ্জা সাহেব তাঁহার মিলিটারী দোস্তদের ডাকিয়া পাঠান। অবশ্য শেষ পরিস্থিতিতে এই দোস্তদের হাতে তাঁহার রাজনৈতিক মৃত্যু হইয়াছে, এখন তিনি লণ্ডনে। অবশিষ্ট জীবন তিনি বৃটিশ গণতন্ত্রের নির্ম্মল বায়ু সেবন করিবেন বলিয়া মনস্থির করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাকিস্থানের সামরিক শাসনবৃন্দ এখন সাধারণ লোকের নিকট বাহবা পাইতেছেন। যে সব চোরাকারবারী, মুনাফাবাজ ও পারমিট্‌ লাইসেন্স শিকারীর হাতে জনসাধারণ এতদিন অসহায় বলিস্বরূপ ছিল, তাহাদের সেই হাতে হাতকড়ি পড়িতে দেখিয়া সাধারণ মানুষ খুশী হইতেছে ; প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া তাহারা স্বস্তি বোধ করিতেছে। সমাজ-বিরোধীদের দমন করিয়া জনসমর্থন লাভের এই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শাসকবৃন্দ দেশের প্রগতিশীল নেতাদের যে জেলে পুরিতেছেন এবং প্রগতিশীল ভাবধারার গলা টিপিতেছেন, সে দিকটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে। পাকিস্থানের সামরিক "ক্যূপকে" ইরাকের সামরিক বিপ্লবের সহিত তুলনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এই দুই বিপ্লবে (যদি পাকিস্থানে ক্ষমতা হস্তান্তরকে বিপ্লব বলি) মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। ইরাকে বিপ্লব ঘটাইয়াছেন তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক

চেতনাসম্পন্ন প্রগতিশীল তরুণ সামরিক কর্ম্মচারীরা। আর, পাকিস্থানে ইহা জেনারেলদের বিপ্লব। অর্থাৎ বৃটিশ আমলের সমর বিভাগের চিন্তাধারায় ও জীবনযাত্রায় যাঁহারা অভ্যস্ত, বৃটিশের অপসরণে যাঁহারা রাতারাতি প্রমোশন পাইয়া সামরিক বিভাগের শীর্ষে উঠিয়াছেন এবং আজ এগার বছর স্বাধীন পাকিস্থানের ক্ষীরসমুদ্রে সাঁতার কাটিয়াছেন, এই বিপ্লবের নায়ক তাঁহারাই। পাকিস্থানে যদি কোনও সমস্যার সমাধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে এই উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীদের সমস্যা। পাকিস্থানের পরিস্থিতি ও সামরিক কর্ম্মচারীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে লণ্ডন ইকনমিষ্টের, জনৈক সংবাদ-দাতার নিম্নলিখিত মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

For ten years a medley of scheming, against politicians, landlords, lawyers and financiers have masqueraded as the Pakistan nation······The armed forces have remained almost complelety outside the squables of the last ten years. This aloofness has been made easy by entrenched privileges which no political party has yet dared to question. The forces are within the nation, with first priority for money, resources and manpower. The officer crops retains a high standard of living with unique access to amenities (English gin can be drunk in Pakistan only in officers' mess.) The social life of the pre-war Indian Army goes on much the same. with polo tournaments, race meetings, and dances at the club. (Economist 18.10.58)

দেশের রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া পাকিস্থানের সামরিক কর্ম্মচারীরা বৃটিশ আমলের সামরিক বিভাগের বিলাস ও আড়ম্বরের জীবন যাপন করিয়াছেন। তাহার পর পাকিস্থান পাশ্চাত্য সামরিক জোটে যোগ দেওয়ায় ইহাদের গুরুত্ব আরও বাড়িয়াছে। বিপুল পরিমাণে সামরিক সরঞ্জাম লাভ করায় পাকিস্থানের সমর-শক্তি যেমন বাড়িয়াছে, তেমনি সামরিক কর্ম্মচারীদের আত্মপ্রত্যায়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব সামরিক কর্ম্মচারীর অধিকাংশই জমিদার-নন্দন। ইহাদেরই পিতৃপিতামহের পশ্চিম পাকিস্থানের প্রজাদের দারিদ্র ও নিরক্ষর সন্তানরাই পাকিস্থানের সাধারণ সৈনিক। সেনাবিভাগে এই দুই চরম প্রান্তের মাঝখানে আছে তরুণ জুনিয়ার কর্ম্মচারীর দল। কিন্তু সামরিক 'কূপের' সহিত নীচের দুইটি তলার কোনও সম্পর্ক এই : ইহা সম্পূর্ণরূপে শীর্ষস্থানীয়দের ব্যাপার, যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব এবং নিজেদের পদমর্য্যাদা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য যাহারা পাশ্চাত্য শক্তির সামরিক সাহায্যের প্রতি নির্ভরশীল। স্বভাবতঃ, এই শ্রেণীর নিকট হইতে কোনরূপ প্রগতিশীল নীতি আশা করা যায় না। সাম্প্রতিক কালে পাকিস্থানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির স্বপক্ষে জনমত প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। বর্ত্তমান পররাষ্ট্র নীতির জন্য আরব জগতে পাকিস্থানের অমর্য্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সকল মহলে—এমন কি চরম প্রতিক্রিয়াশীল মুস্লীম্ লীগের মধ্যেও পাকিস্থানকে সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত রাখার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিয়াছিল। অথচ, সামরিক একনায়ক চক্র তাঁহাদের বিভিন্ন বিবৃতিতে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছেন যে, পাকিস্থানের পররাষ্ট্রনীতির কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। এই "জেনারেল তন্ত্রের" নিকট হইতে সে পরিবর্ত্তন আশা করাও অবশ্য স্বাভাবিক নয়। এই জেনারেলরা তাহাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপে তাঁহাদের বিদেশী মুরুব্বিদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছিলেন কি না, তাহার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। তবে, ইহা সত্য যে, পাকিস্থানকে নির্ভরযোগ্য সামরিক ঘাঁটীতে পরিণত করিতে হইলে তাহার রাজনীতিক্ষেত্রে অবিরাম অনিশ্চিতভাবে অবসান ঘটিয়া এমন একটি শক্তির প্রাধান্য প্রয়োজন, যে শক্তি বৈদেশিক ক্ষেত্রে সামরিক জোটের অনুগত এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্থৈর্য্য আনিতে সক্ষম। পাকিস্থানের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্ম্মচারীদের হাতেই সে শক্তি। সুতরাং, মির্জ্জা-আয়ুবের তৎপরতার পশ্চাতে তাঁহাদের বৈদেশিক মুরুব্বি—আমেরিকার গোপন উৎসাহ ও নির্দ্দেশ থাকা অসম্ভব নয়।

পাকিস্থানের সামরিক শাসকবৃন্দ অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে শাস্তি দিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই প্রসংশনীয়। কিন্তু পাকিস্থানের অর্থ নৈতিক দুর্দ্দশা মোচনের জন্য প্রয়োজন ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার এবং সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে দেশের শিল্পায়ন। কিন্তু পাকিস্থানের সামরিক শাসক চক্র সমাজের যে স্তরের প্রতিভূ, তাহাতে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার তাঁহাদের নিকট হইতে আশা করা দুষ্কর। আর, সামরিক জোট ত্যাগ করিয়া, সামরিক খাতে অপব্যয় বন্ধ করিয়া, বৈদেশিক শক্তিকে সামরিক সুবিধা দিবার সঙ্গে তাহাদের সাহায্য গ্রহণের নীতি বর্জ্জন করিয়া একাগ্রচিত্তে দেশের শিল্পায়নে তাহারা মনোযোগী হইতে পারিবেন বলিয়াও মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সামরিক শাসনের যন্ত্রটি বেশী দিন দুর্নীতিমুক্ত থাকিবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। সরকারী ও বেসরকারী মহলের দুর্নীতি দূর করিবার জন্য আত্মসচেতন জনগণের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন ; এই জনশক্তিকে সংগঠিত ও সক্রিয় করিবার জন্য চাই আদর্শনিষ্ঠ নেতৃত্ব। কিন্তু প্রথমতঃ, পাকিস্থানের বর্ত্তমান শাসকশ্রেণীর সহিত জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ নাই ; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের কোনও বলিষ্ঠ আদর্শ নাই—জনসাধারণকে উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদিগকে সংগঠিত ও সক্রিয় করিয়া তুলিবার উপযোগী নেতৃত্ব তাঁহাদের নিকট হইতে কখনই আশা করা যায় না।

পাকিস্থানে এই রাজনৈতিক পট-পরিবর্ত্তনে পাক-ভারত সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা এখনও কতকটা অস্পষ্ট। জেনারেল মির্জ্জা তাঁহার সামরিক সহযোগাদের হাতে ক্ষমতা দিবার সময় পাকিস্থানের দুর্নীতি দুষ্টরাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, অনেকে ভারতের সহিত যুদ্ধের কথা নিঃসঙ্কোচে বলিয়া থাকেন, কারণ তাহারা জানেন যে, যুদ্ধ বাঁধিলে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাঁহারা অনেক দূরে থাকিবেন। কিন্তু জেনারেল আয়ুব খাঁ ভারতকে জঙ্গী হুম্‌কী শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর ও খালের জল সম্বন্ধে ভারত যদি সঙ্গত মীমাংসায়

সম্মত না হয়, তাহা হইলে তিনি ভারতের সহিত যুদ্ধ করিবেন। আর এই "সঙ্গত মীমাংসার" অর্থ পাকিস্থানের সর্ত্তে মীমাংসা ; সে সর্ত হইল পাকিস্থানে নূতন খাল কাটিবার টাকা ভারতকে দিতে হইবে, খাল কাটিতে যে দশ পনর বৎসর সময় লাগিবে, সেই দশ পনর বৎসর ভারত-কে জল দিয়া যাইতে হইবে। আর, কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্থানের দাবী মানিতে হইবে। জেনারেল আয়ুবের এই উক্তিতে ভারতে যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে, হওয়া স্বাভাবিকও। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে—এই ভদ্রলোক খাজা মিলিটারী ; বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্যান্য রাজনৈতিক সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া কৌশলে কথা বলিবার শিক্ষা ও সংস্কার ইঁহার নাই। ভারতের উপর যতই রাগ থাকুক, পাকিস্থানের মন্ত্রী হিসাবে চাঁচা ছোলা ভাষায় বলা চলে না—ভারতকে গুঁতাইয়া ঠাণ্ডা করিব। ঠিক এই অর্থ প্রকাশেরই কূটনৈতিক ভাষা অন্য ; কিন্তু খাজা মিলিটারীর সে ভাষার সহিত পরিচয় হইবে কেমন করিয়া? এই গেল প্রকাশভঙ্গীর প্রশ্ন : তাহার পর আয়ুব সাহেবের প্রকৃত মতলবের কথা। এই উক্তি হইতেই ধরিয়া লওয়া যায় না যে, পাকিস্থান ভারতের সহিত লড়িতে আসিতেছে। এত কাল পাকিস্থানের রাজনীতিকরা জনসাধারণকে কাশ্মীর ও খালের জলের নাম করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে তাতাইয়াছেন। এই তপ্ত মনের কিছু খোরাক মিলিটারী বাহাদুরকেও দিতে হইবে বৈ কি? জনসাধারণের সমর্থন ছাড়া তাঁহারাও চলিতে পারেন না। যাহা হউক, হউক, ভারতের সহিত যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত যদি সত্য সত্যই পাকিস্থানকে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে মিলিটারী মেজাজ ঠাণ্ডা করিয়া সে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। সিদ্ধান্তটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এই মেজাজে সে সিদ্ধান্ত লওয়া চলে না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানের চোরাকারবারী নয়, যে মিলিটারী কোৎকা দেখাইয়াই তাহাকে ঠাণ্ডা করা যাইবে।

সামরিক শক্তি দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে পাইলে স্বেচ্ছায় সে ক্ষমতা ছাড়িতে চাহে না। পাকিস্থানে সামরিক চরিত্র নূতনভাবে প্রকট হইবে বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কতদিনের জন্য সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের সোজা উত্তর আয়ুব খাঁ দেন নাই। তবে, মির্জ্জা সাহেব লণ্ডনে যাইয়া এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পাকিস্থানী রাজনীতির জঞ্জাল সাফ করিতে তিন বছরের মত সময় লাগিবে। মির্জ্জা সাহেব পাকিস্থানী সামরিক চক্রে মনের কথা জানেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

পাকিস্থানের দুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক অপদার্থের দল দেশকে মহা অরাজকতার দিকে লইয়া যাইতেছিল। দক্ষিণপন্থী সামরিক কুপে সে অরাজকতা নিবারিত হইয়াছে, এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সামরিক একনায়কত্ব। তবে, এই প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শাসন পাকিস্থানে নিরঙ্কুশ থাকিবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ইহাদিগকে নবজাগ্রত যুবশক্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। পাকিস্থানে গত দশ বৎসরে একদিকে যেমন রাজনৈতিক কামড়াকামড়ি চলিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ধীরে ধীরে এক প্রগতিশীল যুবশক্তির বিকাশ হইতেছে।

ব্রহ্মে সামরিক শাসন—

গত মহাযুদ্ধের সময় একদিকে জাপানী ফ্যাসিজম্ এবং অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ—এই দুয়ের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্রহ্মদেশে ফ্যাসিবিরোধী গণস্বাধীনতা সঙ্ঘ (Anti-Fascist People's Freedom League) প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই সঙ্ঘে একত্র হয়। স্বাধীনতা লাভের পর এই সঙ্ঘের হাতে যখন ক্ষমতা আসে, তখন ধীরে ধীরে ইহাতে দুর্নীতি প্রবেশ করে। ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘকে দুর্নীতিমুক্ত করিয়া ব্রহ্মের রাজনৈতিক জীবনকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে গত ১৯৫৬ সালে প্রধানমন্ত্রী ইউ নু সাময়িকভাবে পদত্যাগ করিয়া গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ইউ বা স। ইউ নুর ঐকান্তিক চেষ্টাতেও ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘ অটুট ও শক্তিশালী রাখা সম্ভব হইল না। গত জুন মাসে ইউ বা স ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া ইউ কীয় নিয়েনের সহিত যোগ দেন এবং তাঁহাদের সোস্যালিষ্ট দলও ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। অবশ্য, স-নীয়েন্ ও তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ নিজেদের "আদি" ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘ বলিয়া পরিচয় দিতে থাকেন। অন্যদিকে ইউ নু ও তাঁহার সহকারী প্রধান মন্ত্রী থাকিন্ টিন্ নিজেদের "অকৃত্রিম" ফ্যাসি-বিরোধী সঙ্ঘ বলিয়া পরিচিত করেন। স-নীয়েনের দল সরকার-বিরোধী দলে পরিণত হওয়ায় ইউ নু কম্যুনিষ্ট-প্রধান জাতীয় ন্যাশান্যাল ফ্রন্টের প্রতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল হন। তিনি বিদ্রোহী কম্যুনিষ্টদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে আবেদন জানান। নির্দ্দিষ্ট তারিখের (৩১শে জুলাই) মধ্যে দুই হাজারের কিছু বেশী কম্যুনিষ্ট আত্মসমর্পণ করে ; কিন্তু শ্বেত পতাকা দলের (White Flag Communists) চার হাজার কম্যুনিষ্ট তাহাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তার স্বীকৃতি দাবী করিয়া আলোচনা দীর্ঘতর করিতে থাকে। কম্যুনিষ্টদের সহিত ইউ নুর এই দীর্ঘ আলোচনায় সামরিক বিভাগে অসন্তোষ দেখা দেয় ; দশ বৎসর ধরিয়া তাহারা যাহাদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিল, তাহাদের নিকট নতি স্বীকারের নীতি গৃহীত হইতেছে বলিয়া তাহারা অভিযোগ করে। স-নীয়েন ও তাঁহাদের সঙ্গীদের দল ত্যাগে ইউ নু কম্যুনিষ্ট ও তাহাদের সমর্থকদের প্রতি ক্রমেই অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছিলেন। আবার ঠিক এই কারণেই তাঁহার বিরুদ্ধে সামরিক বিভাগে অসন্তোষ বাড়িতেছিল। এই অবস্থায় তিনি বর্ম্মী সেনাবাহিনীর চিফ্ অব্ ষ্টাফ্ জেনারেল নে উইন্‌কে সাময়িকভাবে শাসনভার গ্রহণের জন্য আবেদন জানান। ব্রহ্মদেশে সাময়িকভাবে এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন যেমন রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তেমনি প্রতিনিধি পরিষদ ইহা সমর্থন করিয়া এই পরিবর্ত্তনের প্রতি গণতান্ত্রিক অনুমোদন করিয়াছে। গত ২৯শে অক্টোবর জেনারেল উইন্ আনুষ্ঠানিকভাবে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মনোনীত নয় জন বিশিষ্ট ভদ্রলোকও ঐ দিন শপথ গ্রহণ করেন। ইহারা প্রত্যেকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী ব্যক্তি ; তবে, কেহই পেশাদার রাজনীতিক নহেন। এই ক্ষমতা হস্তান্তর ছয় মাসের জন্য। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে ক্লেদমুক্ত করিয়া আগামী এপ্রিল মাসে শান্ত আবহাওয়ায় সাধারণ নির্ব্বাচন সম্ভব করাই ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্য। তখন দেশের প্রতিনিধিমূলক গভর্ণমেণ্টের হস্তে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করিয়া জেনারেল নে উইন্ ও তাঁহার সহযোগিবৃন্দ রাজনীতি হইতে বিদায় লইবেন, ইহাই বর্ত্তমান ব্যবস্থা।

প্যাট ও পীঠ

শ্রী'শ'

॥ ফিল্ম সঙ্কট ॥

ফিল্ম আমদানী কমে যাওয়ায় ভারতীয় চিত্র-নির্ম্মাতাদের আজকাল বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমাদের দেশে কাঁচা ফিল্মের নির্ম্মাণ আরম্ভ না করতে পারলে ভবিষ্যতে এই অসুবিধা আরও বাড়বে। তাছাড়া বিদেশ থেকে বেশি দামে ফিল্ম কিনতে হয় বলে আমাদের চিত্র-নির্ম্মাণের খরচও বেড়ে যায়। নিজেদের দেশে ফিল্ম নির্ম্মিত হলে জাপান প্রভৃতি দেশের মত কম খরচে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ সম্ভব হবে। ভারত বছরে ২.৪৯ কোটি টাকার ফিল্ম বিদেশ থেকে আমদানী করে, আর বিদেশে ভারতীয় ছবি দেখিয়ে বিদেশী মুদ্রা আমদানী করে ১.২৮ কোটি টাকা। এদেশে ফিল্ম নির্ম্মাণ আরম্ভ হলে ফিল্ম আমদানীর বিপুল ব্যয় সঙ্কুচিত হয়ে বিদেশী লেন-দেনের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করবে। এখন সিলোন, সিঙ্গাপুর, মধ্য-প্রাচ্য এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেই প্রধানতঃ ভারতীয় চিত্রের চাহিদা আছে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিদেশী অর্থ আহরণ করতে হলে ঐ সব দেশের চাহিদাকে আরও বর্দ্ধিত করতে হবে। তাছাড়া জাপান প্রভৃতি দূর প্রাচ্যের দেশে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার চলচ্চিত্র বাজারে ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শন যাতে আরও বাড়ে, আর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শন যাতে সম্ভব হয় সে চেষ্টাও করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ফিল্ম আমদানীর অভাবে অদূর ভবিষ্যতে ভারতে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ ব্যাহত হতে পারে এবং তাতে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষতিগ্রস্থ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত এখন চলচ্চিত্র নির্ম্মাণের সংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে। ফিল্ম অভাবে চিত্র নির্ম্মাণ ব্যাহত হলে তাকে অনেক পেছিয়ে পড়তে হবে। তাছাড়া বিদেশের বাজারে নতুন নতুন চিত্র যোগান দিতে না পারলে সে বাজার হাত ছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে। চলচ্চিত্রের মতন এ রকম একটি ভারতীয় সংস্কৃতি-প্রসারকারী ও বিদেশী অর্থ-আহরণকারী শিল্পকে সঙ্কুচিত হতে দেওয়া কখনই উচিত নয়, বরং সর্ব্বরকমে এই লোকপ্রিয় শিল্পটির প্রসার—স্বদেশের ও বিদেশের বাজারে—হওয়া উচিত।

* * * *



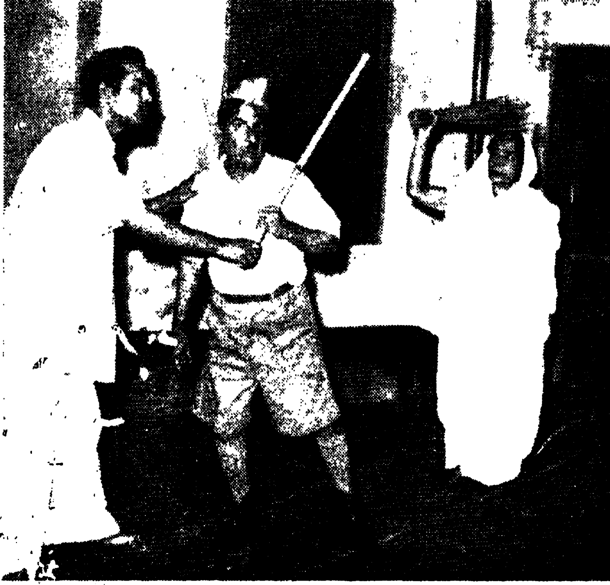
গেভাকলারে রঞ্জিত মুক্তিপ্রতীক্ষিত গীতিচিত্র "নৌকাবিলাস"-এর নায়িকা অনুরাধা গুহ।

খবরাখবর:

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী ছায়াচিত্রে রূপায়িত করবার আয়োজন করা হচ্ছে। প্রযোজনার কাজ শ্রীসত্যজিৎ রায় গ্রহণ করেছেন। চিত্রটি অবশ্য পূর্ণ দৈর্ঘ্যের হবে না—৪০০০ ফুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

তবুও এতে কবিগুরুর জীবনকে যথাসম্ভব দেখবার চেষ্টা করা হবে। তাছাড়া এই মূল চিত্রটির থেকে ডকুমেণ্টারী রূপে একটি ২০০০ ফুটের মতন ছোট ছবিও করা হবে।

* * *



রঙমহলে চলতি নাটক 'মায়ামৃগ'-র একটি হাস্যোদ্দীপক দৃশ্যে রবীন মজুমদার, হারাধন ও আশা দেবী।

আধুনিক ভারতের প্রথম মহান বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনী অবলম্বনে একটি ডকুমেণ্টারী চিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। আগামী ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী সপ্তাহ প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু কর্তৃক কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হবে, আর এই উপলক্ষে সারা ভারতে এই প্রামাণ্য চিত্রটি মুক্তিলাভ করবে। চিত্রটি ফিল্ম ডিভিসনের তত্ত্বাবধানে শ্রীতপন সিংহের প্রযোজনায় ও শ্রীপিযূষ বসুর পরিচালনায় তৈরী হয়েছে। লণ্ডন, প্যারিস ও জগদীশচন্দ্র ছাত্রাবস্থায় যেখানে ছিলেন সেই কেম্ব্রিজের Christ's College-এর কয়েকটি চিত্রও এতে নেওয়া হয়েছে।

* * *

সমগ্র রামায়ণকে একটি রঙিণ চলচ্চিত্রে রূপায়িত করবার জন্য প্রযোজক-পরিচালক শ্রীবিমল রায় বিপুল পরিকল্পনা ও বিরাট ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত রয়েছেন। এই যুগান্তকারী সৃষ্টির জন্য ব্যয় হবে প্রায় দশ কোটি টাকা, শ্রীরায় তাই পাশ্চাত্যের কোনও দেশের সহিত সহযোগিতায় এই চিত্র নির্ম্মাণ করতে চান। তবে সেরকম সহযোগিতা না পাওয়া গেলে শ্রীরায় নিজেই এই চিত্র নির্ম্মাণের সমস্ত ভার বহন করবেন এবং চিত্রটি সিনেমাস্কোপেই তোলবার তাঁর ইচ্ছা। হিন্দীতে চিত্রনাট্য রচনার জন্য, সঙ্গীত পরিচালনার জন্য ও শিল্প নির্দ্দেশনার জন্য লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ ও পরিচালক হিসাবে বহু লোককে নিযুক্ত করা হবে। সীতার ভূমিকার জন্য কোনও বিশিষ্ট অভিনেত্রীকে নেওয়া হবে। অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে নামকরা ও নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সুযোগ দেওয়া হবে। ছবিটি প্রস্তুত হতে প্রায় দু'বছর সময় নেবে।

* * *

গত ১৫ই নভেম্বর সকালে মাদ্রিদে বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা টাইরন পাওয়ার-এর মৃত্যু ঘটেছে। মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করলেও তিনি প্রায় একশতটির ওপর চিত্রে তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে দর্শকমন রঞ্জন করে এসেছেন এবং মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অভিনয় করে গেছেন, আর অভিনয়ের সাজে সজ্জিত অবস্থাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। স্পেন-এর মাদ্রিদ সহরে "সলোমন ও সেবা" চিত্রের চিত্র গ্রহণের সময় রাজা সলোমনের ভূমিকায় অভিনয়কালে একটি যুদ্ধের দৃশ্যে অভিনেতা জর্জ্জ স্যাণ্ডারস্-এর সঙ্গে তরবারি যুদ্ধের পর টাইরন পাওয়ার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে একটি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু পথিমধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর সময়ও তিনি অভিনয়ের সময়কার রাজা সলোমনের পোষাকেই ভূষিত ছিলেন।

* * *

এবারকার লণ্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের "দো আঁখে বার হাত" নামক চিত্রটি প্রদর্শিত হবে। ভেনিস্ উৎসবে প্রাপ্ত প্রিক্স প্রাপ্ত জাপানের ছবি "Muhomatsw, the Rickshaw Man ও "The Legend of Narayama, রাশিয়ার "The House Where I Live" ও "Ilya Muromets, পোল্যাণ্ডের "Last



"শ্রীশ্রীতারকেশ্বর" চিত্রে রাজা "ভারামল্লর" ভূমিকায় শ্রীকমল মিত্র।

Day of Summer", "Eva Wants to Sleep" ও ব্রাসেলসেপুরস্কার প্রাপ্ত "Two men and a Wardrobe" এবং সুইডেনের "Wild Strawberries" প্রভৃতি চিত্র লণ্ডনের এই দ্বিতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে। ১৮টির ওপর দেশ এই উৎসবে যোগদান করেছে। নর্থ আফ্রিকা, ঘানা প্রভৃতি দেশের ছোট ছোট ছবিও এই উৎসবে দেখান হবে।

*　　　*　　　*



শিল্পীর কথা

সঙ্গীত-ভগীরথ আচার্য্য গিরিজাশঙ্কর

সন্ধানী

দেবতার আশীর্বাদ-ধন্য এই বাঙলা দেশ। তাঁর এ করুণা বোধহয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশ লাভ করেনি তাই বুঝি এই পবিত্রদেশে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেছে কত মহামানব, কত সাধক। তাঁরা প্রচার করেছে অধ্যাত্মবাদ—দেখিয়েছেন মুক্তির পথ। কিন্তু শু আধ্যাত্মিক জগতেই নয়, সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীত জগতে বাঙ্গালীর দান অতুলনীয়।

আজ সঙ্গীতজগতের এমনি একজন সাধকের আ জীবনা আলোচনা ক'রব যাঁকে দ্বিধাহীন ভাবে ব যেতে পারে বাঙলার উচ্চাঙ্গসঙ্গীত জগতের অগ্রদূত।

অর্থের মোহে নয়, যশোলাভের আশায় নয়, প্রাণে একান্ত তাগিদে বাঙলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার প্রসারকল্পে যে একনিষ্ঠ সঙ্গীত-সাধক জীবনের শেষদি পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে গেছেন, বাঙলার সঙ্গী জগতকে এক অপূর্ব্ব আলোকে করেছেন উদ্ভাসিত, তি হ'চ্ছেন আদর্শ শিক্ষাগুরু, সঙ্গীত জগতের ভগীরথ, ভারতী বরপুত্র সঙ্গীতাচার্য্য ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

১২৯২ সালের ৪ঠা পৌষ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপু শহরে উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন গিরিজাশঙ্কর তাঁর পিতৃদেব স্বর্গীয় ভবানীকিশোর চক্রবর্ত্তী ছিলেন এ জন বিখ্যাত আইনজীবী। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছি পুত্রও তাঁরই মত আইনজীবী হ'য়ে লাভ করবে অর্থ সুনাম। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি।

বাল্যকাল থেকেই চিত্রাঙ্কন শিল্পে গিরিজাশঙ্করে ছিল বিস্ময়কর প্রতিভা। অতি অল্প বয়স থেকেই তি সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন। এদিকে মেধাবী ছ হিসাবেও পরিচয় দেন অসামান্য কৃতিত্বের। কলিকা আর্টস্কুলের তিনি ছিলেন একজন নামকরা ছাত্র। ও

অঙ্কিত কয়েকখানা সুন্দর তৈলচিত্র আজও শোভা পাচ্ছে মুর্শিদাবাদ নবাব-প্রাসাদে, কাশিমবাজার ও আজিমগঞ্জের রাজবাটীতে ও বহরমপুরের জমিদার বেণুরঞ্জন সেনের বৈঠকখানায়। সু-অভিনেতা হিসাবেও গিরিজাশঙ্কর লাভ করেছিলেন যথেষ্ট প্রশংসা। কিন্তু গীত ভারতীর দুর্নিবার আকর্ষণে শিল্পকলার বিভিন্নদিক ত্যাগ করে তিনি সঙ্গীত সাধনাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন।

ভারতের নানাদিক থেকে তখন যে সমস্ত সঙ্গীত কলাবিদ্‌গণের আবির্ভাব হত ক'লকাতায় তাঁরা প্রায় সবাই যেতেন মুর্শিদাবাদ নবাব-প্রাসাদে, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর রাজবাটীতে। এভাবে তখন মুর্শিদাবাদ হ'য়ে উঠেছিল ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের মিলনক্ষেত্র। তাঁদের সংস্পর্শে এসে গিরিজাশঙ্করের মন আকৃষ্ট হয় সঙ্গীতের মোহে।

৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় ছিলেন তখন বাঙলাদেশের স্বনামধন্য সঙ্গীত সাধক। কাশিমবাজার-মহারাজার সভাগায়কের পদও তিনি অলঙ্কৃত করেন এবং মহারাজার প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত সঙ্গীতগুরু রাধিকাপ্রসাদের শিক্ষাধীনে গিরিজাশঙ্কর একাগ্রচিত্তে সঙ্গীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। গুরুদেবের তিনিই ছিলেন প্রিয়তম ও শ্রেষ্ঠ শিষ্য। এ সময় বাঙলাদেশে ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রচলন ছিল খুব বেশী। তা ছাড়া নিধুবাবুর টপ্পাও বাঙলার ঘরে ঘরে আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিত। রাধিকাপ্রসাদের শিক্ষাধীনে গিরিজাশঙ্কর ধ্রুপদ ও ধামার গানে লাভ করেন যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও কলানৈপুণ্যের প্রভাবে বিস্তার স্রোত কী অপূর্ব সুরজাল!

উপযুক্ত শিক্ষাগুরু সঙ্গীতসাধক রাধিকাপ্রসাদের নিকট একাদিক্রমে ১০ বৎসর ধরে শিক্ষালাভ ক'রে গিরিজাশঙ্কর আসেন কলকাতায় ইংরেজী ১৯১২ সালে। এ সময়ে তাঁর জীবনের এক নূতন অধ্যায় সুরু হয়। আজীবন ব্রহ্মচারী, সঙ্গীতানুরাগী ৺শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে পরিচিত হলেন গিরিজাশঙ্কর। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন ক্ষেত্রীমশাই। ১০১ নং হ্যারিসন রোডে নিজ-বাসভবনে থাকবার জন্যে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন গিরিজাশঙ্করকে। ক্ষেত্রীমশাইয়ের বাড়ীতে তখন প্রায়ই সমবেত হতেন ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদ, যন্ত্রী সবাই। প্রায় রোজই বস্‌ত গানের মজলিস্। এরূপ অনুকূল পরিবেশে বাস ক'রে গিরিজাশঙ্কর অল্প-দিনের মধ্যে বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠেন ভারত-বিখ্যাত বিভিন্ন ওস্তাদদের সঙ্গে। এখানে হারমোনিয়াম যন্ত্রের অপূর্ব্ব সুরস্রষ্টিকর্ত্তা গণপৎরাওজী ও ঠুংরীগায়ক বিখ্যাত ওস্তাদ মৈজুদ্দিন খাঁ সাহেবের নিকট থেকে গিরিজাশঙ্কর অনেক কিছুই শিক্ষা করেন, যার ফলে তিনি ঠুংরীর এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশেষজ্ঞ বলে পরিগণিত হলেন। গিরিজা-শঙ্করকে লোকে 'ঠুংরীর রাজা' আখ্যায় অভিহিত করত।

এর কিছুদিন পর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যখন দিল্লী-দরবারে যোগদান ক'রবার জন্যে দিল্লী গমন করেন তখন গিরিজাবাবুকেও সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে তানরাজ বংশীয় ওস্তাদ মুজাফ্‌ফর খাঁর সঙ্গে গিরিজাশঙ্করের সাক্ষাৎ হয় এবং মহারাজার উপদেশ অনুসারে তিনি দিল্লীতে থেকে দু বছর ধ'রে খাঁ সাহেবের কাছে শিক্ষা করেন খেয়াল সঙ্গীত। এর পর তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়। এত শিক্ষা ক'রেও মন তাঁর পূর্ণ হ'ল না—তৃপ্ত হ'ল না সঙ্গীত-পিপাসা। তখন ৺শ্যামলালবাবুর উৎসাহ ও উপদেশে তিনি গমন করেন সঙ্গীতের পীঠস্থান রামপুরে—নবাবপ্রাসাদে। সঙ্গীত-রত্ন মিঞা তানসেনের অধস্তন বংশধর ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে গিরিজাশঙ্কর আয়ত্ত করেন উচ্চশ্রেণীর ধ্রুপদ ও হোরী গান। ওখানেই ওস্তাদ উজীর খাঁনের নিকটও ধ্রুপদ ও ধামার সঙ্গীত শিক্ষা করেন। রামপুরে অবস্থান কালে গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ হদ্দু খাঁনের জামাতা ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁনের নিকটে খেয়াল গানের অনেক রাগ-রাগিনী ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষা ক'রে গিরিজা-বাবু বর্দ্ধিত করেন তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডার।

উত্তর ভারতের আরও কয়েকস্থান পরিভ্রমণ করে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিজাশঙ্কর প্রত্যাবর্ত্তন করেন ক'লকাতায়। এত শিক্ষা ক'রেও জ্ঞান পিপাসা তাঁর পরিতৃপ্ত হ'ল না। আবার তিনি কলকাতার বাইরে যাবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু এ সময় কলকাতাতেই বিখ্যাত ওস্তাদ বাদল খাঁ আসেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন

গিরিজাবাবুণ খাঁ সাহেব জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত খেয়াল গানের জটিল কলাকৌশলগুলো আন্তরিকভাবে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তাঁর উপযুক্ত শিষ্য গিরিজাশঙ্করকে।

প্রৌঢ় বয়সে গিরিজাশঙ্কর এক নূতন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি লক্ষ্য ক'রলেন বাঙলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মান অনেক পিছিয়ে আছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিশেষ ক'রে খেয়াল সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে অদম্য উৎসাহে তিনি ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানে ব্রতী হলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় এই কলকাতা সহরেই ক্রমে ক্রমে স্থাপিত হ'ল 'সঙ্গীত-সম্মীলনী' 'সঙ্গীত কলাভবন' ও 'সঙ্গীত ভারতী'। গিরিজাশঙ্কর বাঙলাদেশে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের যে বীজ রোপন করে গেছেন তা আজ এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বর্ত্তমানযুগে তাঁর অগণিত কৃতী শিষ্যগণই বহন করছেন তার সাক্ষ্য। সুদক্ষ শিক্ষক হিসাবে তিনি এলাহাবাদ মিউজিক কনফারেন্সে লাভ করেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সম্মান ও মানপত্র। গিরিজাশঙ্করের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীসুখেন্দু গোস্বামী, শ্রীরথীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রী এ, কানন, শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী, শ্রীবনবিহারী মল্লিক, শ্রীযোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী ইভা দত্ত, শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল প্রভৃতি অসংখ্য সঙ্গীত শিল্পী আজ সর্ব্বজন পরিচিত।

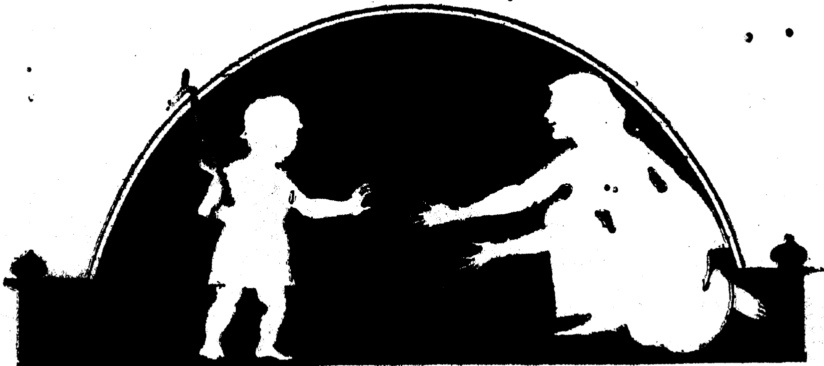
১৩৫৫ সালের ১৫ বৈশাখ বাঙলার তথা ভারতের অতিপ্রিয় সঙ্গীত সাধনার মহান ঋত্বিক গিরিজাশঙ্কর সমস্ত স্নেহ ও সুরের মায়া কাটিয়ে যাত্রা করেন পরপারে।

ভারতীয় সঙ্গীত শুধু সপ্তসুরের বহিঃপ্রকাশ নয়—ধ্যানের বস্তু। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে যুগে যুগে যাঁরা বহন ক'রে চলেছেন গিরিজাশঙ্কর ছিলেন



সঙ্গীতাচার্য্য ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

তাঁদের অন্যতম। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য সাজিয়ে চিরদিনই পূজা ক'রব তাঁর পুণ্যস্মৃতির।









শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল :

প্রথম খেলা : খেলা ড্র।

সার্ভিসেস : ১৭০ (গিলক্রায়েস্ট ২৩ রাণে ৩ উইকেট) ও ২০৮ (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড; সেনগুপ্ত নট আউট ১০০)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৩০৮ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড; হান্ট ৫৩, বুচার ৯৩) ও ৪২ (কোন উইকেট না পড়ে)

২য় খেলা : ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১৫৮ রাণে ১৯৫৮ সালের রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী বরোদাকে পরাজিত করে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ২৩৯ (হোল্ট ৯২, সোবার্স ৬১) ও ২২৩ (১ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড; হোল্ট ৯৪ নট আউট; সোবার্স ১২৮ নট আউট)

বরোদা : ১০০ (গিলক্রায়েষ্ট ৩১ রাণে ৪; রামাধীন ৭ রাণে ৩ উইকেট) ও ১৪৪ (ঘোরপাদে ৫৭; হল ৪১ রাণে ৫, রামাধীন ২৭ রাণে ৪ উইকেট)

৩য় খেলা : খেলা ড্র।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ : ৩১৬ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড; হান্ট ৫৪, কানহাই ৮০, স্মিথ ৫৬, সলোমোন ৫৫ নট আউট)

প্রেসিডেন্ট একাদশ : ১২৪ (হল ২৭ রাণে ৩) ও ২২৭ (নরী কণ্ট্রাক্টর ১১০)

দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল ট্রফি :

১৯৫৮ সালের দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ক'লকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১—০ গোলে গতবছরের বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করে।

ইংলণ্ড-বনাম রাশিয়া :

উইম্বলি ষ্টেডিয়ামে এক আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড ৫—০ গোলে রাশিয়ান ফুটবল দলকে পরাজিত করে।

প্রদর্শনী টেনিস খেলা :

সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী লন্ টেনিস খেলায় ভারতীয় ডেভিস কাপ অধিনায়ক নরেশ কুমার ৪—৬, ৭—৫, ৬—১ গেমে ১৯১০ সালের উইম্বলডন সিঙ্গলস বিজয়ী বাজপেটিকে পরাজিত করেন।

২য় খেলায় এক নম্বর ভারতীয় খেলোয়াড় আর কৃষ্ণান ৬—৩, ৬—৪ গেমে বাজপেট্রিকে পরাজিত করেন। ডবলসের খেলায় ভারতীয় ডেভিস কাপ খেলার জুটি আর কৃষ্ণান এবং নরেশকুমার ৭—৫, ৭—৫ গেমে বাজপেটি এবং প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন।

অল-ইণ্ডিয়া স্কুল হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ :

অল্-ইণ্ডিয়া স্কুল হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহীশূর ১—০ গোলে ভূপালকে পরাজিত করে।

ইষ্ট-জোন টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ :

কটকে অনুষ্ঠিত ইস্ট জোন টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ ফাইনালের ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলস : জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ান গৌতম দেওয়ান (বোম্বাই) ২১—১২, ২১—১৪, ১৬—

২১, ২২—২০ গেমে এইচ ভকিলকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: মিস এস দত্ত (বাংলা) ২১—১৩, ২১—১৩, ১৪—২১, ২১—৯ গেমে মিসেস কে শর্মাকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস: দীপক ঘোষ এবং সমীর মুখার্জি (বাংলা) ২১—১৪, ৯—২১, ২১—১৯, ২১—১৮ গেমে জি, দেওয়ান এবং এস ইরাণীকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস: এইচ ভকিল (বোম্বাই) ২১—১১, ২০—২২, ২১—১১, ২১—১৩ গেমে এ, চৌধুরীকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

রেলওয়ে বক্সিং ঃ

চক্রধরপুরে অনুষ্ঠিত ইণ্টার-রেলওয়ে বক্সিং প্রতিযোগিতায় সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ১০ পয়েণ্ট লাভ ক'রে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে।

রাজ্য বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১৯৫৮ সালের রাজ্য বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে সোমনাথ ব্যানার্জি ১,৬১৪—১,৪২৮ পয়েণ্টে এম মল্লিককে পরাজিত করেন।

রাজ্য স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

১৯৫৮ সালের রাজ্য স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে সোমনাথ ব্যানার্জি এস কে রায়কে পরাজিত ক'রে একই বছরে রাজ্য বিলিয়ার্ড এবং স্নুকার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছেন।

ভারতীয় অপেশাদার গলফ চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৯৫৮ সালের অল-ইণ্ডিয়া এ্যামেচার গলফ চ্যাম্পিয়ানসীপের ফাইনালে তরুণ গলফ খেলোয়াড় এস মালিক ২—১ ব্যবধানে প্রবীণ খেলোয়াড় আর কে পিতম্বরকে পরাজিত করেন।

রোভার্স কাপ ফাইনাল ঃ

১৯৫৮ সালের রোভার্স ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাব ৩—২ গোলে ক'লকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে। রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতার ৬৮ বছরের ইতিহাসে ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবই স্থানীয় ক্লাব হিসাবে প্রথম রোভার্স কাপ জয়ী হ'ল। তারা উপর্যুপরি চারবছর ফাইনালে খেলে পরাজিত হয়।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ ঃ

হায়দাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বোম্বাই ৫৪ পয়েণ্ট পেয়ে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। ওয়াটার পোলোর ফাইনালে বোম্বাই ৫—৩ গোলে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে।

কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা ঃ

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ১০০ মিটার ব্রেষ্ট স্ট্রোক বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেন। দূরত্ব পথ অতিক্রম করতে তাঁর ১ মিঃ ৩৮·৩ সেকেণ্ড সময় লাগে। মাত্র ·০৪ সেকেণ্ডের জন্য



কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা

তিনি ভারতীয় রেকর্ড করতে অক্ষম হ'ন। তিনি ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্যা। দিল্লীর গত জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সাঁতারুদের ক্যাপটেন ছিলেন।

রাজ্য সন্তরণ চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (পুরুষ বিভাগ): ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এ সি ৮৫ পয়েণ্ট পেয়ে উপর্যুপরি চার বছর চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভের গৌরব লাভ করে।

দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ (মহিলা বিভাগ): সেণ্ট্রাল এ সি—১৭ পয়েণ্ট।

সাহিত্য সংবাদ

মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য (বঙ্গানুবাদ):
ভূতনাথ সপ্ততীর্থ।

(ভৃগুপ্রোক্ত) মনুসংহিতা স্মৃতিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ইহার দ্বাদশাধ্যায়ে (প্রায়) ২৬৮৪ শ্লোকের মধ্যে লেখক প্রথম তিন অধ্যায়ের ৬৪৪টী শ্লোকের ও সেগুলির মেধাতিথিভাষ্যের অনুবাদ ও মধ্যে মধ্যে স্বীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্যাদি যোগ করিয়া গ্রন্থের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত (কলিঃ ৫০১৩) মনুসংহিতার ৩ অধ্যায়ে ২৮৬টী শ্লোক আছে ; লেখক ভাষ্যানুসারে ২৭৬টী পাইয়াছেন। তাঁহার [illegible] 'পুস্তক' সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে ঔৎসুক্য আসে।

১মাধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রকরণে ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের "তমঃ আসীৎ..." [illegible] বাইবেলাদির 'এক দেহ হতে পুরুষ ও নারী' ও পুরাণাদির 'সপ্তর্ষি প্রভৃতির সৃষ্টি' মতের অনুকূল মত রয়েছে ; পুরাণের মন্বন্তরাদি মতের ও ঋগ্বেদের 'পুরুষ সূক্তে'র ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তির মতও রয়েছে।

২য়াধ্যায়ে ধর্ম, কয়েকটী সংস্কার, গুরুর বিশেষতঃ ছাত্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ আছে।

৩য়াধ্যায়ে বিবাহ, পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। উক্ত তিনটী অধ্যায়েরই বিশেষ মূল্য আছে।

অন্যান্যদের মধ্যে ৫মাধ্যায়ের অশৌচনির্ণয়, রাজধর্ম্ম যুদ্ধাস্ত্রাদি বর্ণনা, ৮মের ব্যবহার (আইন) ও দণ্ড ; ও ৯মের দায়বিভাগই বোধ হয় সাধারণের নিকট অধিকতর প্রয়োজনীয়। আশা করা যায় অবশিষ্টাংশ, সম্ভব না হইলে সারাংশও, প্রকাশকেরা যথাসময়ে প্রকাশিত করিবেন।

অপর দিকে মনুর কাল, গ্রন্থের শেষ-সঙ্কলন-কাল ও টীকাকারদের কালের মধ্যে বিরাট ব্যবধান। শেষ ৭ম বৈবস্বত মনুকে গৌতম বুদ্ধ হইতে বংশক্রমানুসারে গণনা করিলে প্রায় ১৫০।১৭৫ পুরুষ পূর্ব্বে পাওয়া যায়। তাঁহারও বহুপূর্ব্বে ১ম স্বায়ম্ভুব মনু। আমাদের মূলমনু কোন কল্পের তাহা বলাও দুঃসাধ্য। মনু-পুরাণাদিপ্রোক্ত মন্বন্তরাদিকালের পরিমাণের মূল্য দিলে মনু অন্ততঃ বহুকোটী বৎসর পূর্ব্বের। স্বয়ম্ভু নামটী শতপথাদি ব্রাহ্মণগ্রন্থে গুরুপরম্পরার আদিতে আছে। বিভিন্ন মনুকে ঋষি প্রভৃতিরূপে ঋগ্বেদাদিতে পাই, কিন্তু 'স্বায়ম্ভুব' শব্দটী সেখানে দেখি নাই। ভৃগু সম্বন্ধেও এরূপ বলা যায়। এদিকে মনুস্মৃতিটী পাশ্চাত্য বা আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে (খৃঃ পূঃ ৯ম)— খৃঃ ২য় শতকের মধ্যে লিখিত বা পরিমার্জ্জিত হইয়াছেন। সেই জন্যই মনু ১।১০২এ

"স্বায়ম্ভুবো মনুর্ধীমান্ ইদং শাস্ত্রমকল্পয়ৎ" ও ২।৭এ

"যঃ [illegible] পরিকীর্ত্তিতঃ।
য স[illegible]নময়ো হি সঃ॥" রয়েছে।

বেদসংহিতার [illegible] সর্ব্ববেদজ্ঞ নন বলা যায় (এই প্রসঙ্গে মেধা [illegible] পৃঃতে দ্রঃ)।

এদিকে ভাষ্যক [illegible] ৯ম শতক ও রাজসাহী বাসী কুল্লুকভট্টের [illegible] মন্বন্তরপ্রসঙ্গে টীকায় লিখিয়াছেন—"অ[illegible]যাব্য ব্রহ্মণমাদের মধ্যেও প্রাচীন ভারতের [illegible] বর্ত্তমান যুগেও প্রচলিত ও এযুগের উপযোগী [illegible] আমরা ইহাতে পাই।

লেখক-কৃত [illegible] বহু শ্লোকের জটিলতারও আপাতঃসরল অ[illegible] রিস্ফুট হইয়াছে। অনুবাদ হইতেই ভাষ্যের জ[illegible]ত্যপূর্ণ যুক্তিমার্গ অনেকটা বোঝা যায়। মে[illegible] আপত্তিকারীর সম্ভাব্য মতগুলি উদ্ধৃত [illegible] উক্তি দ্বারা তাহা খণ্ডন করিয়াছেন বা ক[illegible] হইলে উহা আধুনিক বা পাশ্চাত্যপন্থী পণ্ডি[illegible]বে। বেদ, মনুসংহিতা ও ব্রাহ্মণ্যবাদ [illegible] ব্যাপক চেষ্টা মূলের মত ভাষ্যেও দেখা যায়। [illegible] বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছি,—
(১) "...ব্রাহ্মণত্ব [illegible], এই যে গোত্র ইহাও সেইরূপ অনাদি।... [illegible] তাহা লৌকিক গোত্রই হইয়া থাকে ;..." ([illegible] প্রামাণ্য দৃঢ় করিবার জন্য দেববিরুদ্ধ তর্ক উদ্ভা[illegible] ৩)—ইহার মধ্যে কূট-নীতি (৩) শাস্ত্রো[illegible] ও শূদ্রের শাস্ত্রাধ্যয়ন অনাবশ্যক (পৃঃ ১০ [illegible] দেবতা বলিতে প্রতিকৃতি বা মূর্ত্তি বুঝায় ([illegible] মূর্ত্তিপূজাবাদ সমর্থন ; প্রভৃতি।

সুকঠিন ভাষ্যের [illegible]দের বাংলা অনুবাদ ও ভাষ্য করিতে ২০শ [illegible] পাণ্ডিত্য প্রকাশ ও ক্লেশ হইয়াছে তাহা পুস্তকটি [illegible] সুবিস্তৃত সূচীপত্রটী গ্রন্থের সার বলা চলে। [illegible] যাঁহারা বিশেষজ্ঞ আর্য্য পণ্ডিতেরা এই পুস্তকখা[illegible] হইবেন বলিতে পারি।

[প্রকাশক—ডাঃ [illegible] সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা। মূল্য—[illegible]

[illegible]প্রসাদ মজুমদার

প্রতিশোধ :

আলেকজাণ্ডার পুসকিন-লিখিত, প্রথম খণ্ড। পার্থসারথী অনূদিত,

ভূমিকায় বর্দ্ধমান রাজকলেজের অধ্যাপক শ্রীঅবন্তী সান্যাল লিখিয়াছেন '—উনবিংশ শতকের রুশ সাহিত্যের দিক্‌পাল পুসকিনের দুবরা ভাসকির বাংলা অনুবাদ করেছেন 'পার্থসারথী'। জার-শাসিত প্রায় দাসতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমীদার পরিবারের নীতিহীন অর্থলিপ্সা, ক্ষমতাভিমান ও চিরন্তন নারী মনের নিখুঁত ছবি এই বইয়ে ফুটে উঠেছে। আমাদের দেশেও এ কাহিনীর আবেদন অতি ঘনিষ্ঠ।" অনুবাদ ভালই হইয়াছে। লেখকের ভাষাবোধ ও রসজ্ঞান আছে। পুসকিন রুসিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি—তিনি বহু গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। প্রতিশোধ পুসকিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তাহার অনুবাদ করিয়া অনুবাদক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধই করিয়াছেন। ছাপা ভাল নহে—সে জন্য পড়িতে অসুবিধা হয়।

[প্রকাশক—শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ হাজরা, রোহিনা পাড়া, বর্দ্ধমান। মূল্য—দুই টাকা]

ওরা কাজ করে (উপন্যাস) শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য খ্যাতিমান লেখক—আমরা ইতিপূর্বে তাঁর লেখা মরা-নদী, বিবস্ত্র মানব, দেহ ও দেহাতীত, পতিতা ধরিত্রী প্রভৃতি উপন্যাস পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। বর্তমান 'ওরা কাজ করে' বইখানিতে তিনি সভ্য মানুষের সহিত তথাকথিত অসভ্য কুলি মজুরের জীবনের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন, অসভ্য ভূমি মজুর—যারা কাজ করে—তাদের জীবনীশক্তিই অধিক—তারই সংকোচ সন্দেহ ত্যাগ করে জীবনকে ভোগ করে। পৃথ্বীশবাবুর পাকা হাতে ঘোড়ামারা গ্রামের রূপ ফুটে উঠেছে—সাবি ও সাধুর চরিত্র পাঠককে চকিত করে না—নিত্য ও শাশ্বত জীবনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আজ এই যান্ত্রিক দানব-সভ্যতার সংঘাতের দিনে লেখক আমাদের জীবন-সমস্যার সমাধানেরই ইংগিত দিয়াছেন। পাঠকগণ এই উপন্যাস পাঠ করিয়া শুধু তৃপ্তিলাভ করিবেন না—বিভ্রান্ত জীবনে আলোকের সন্ধান পাইবেন।

[প্রকাশক—দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ—৯৯এ তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য পাঁচ টাকা]

শ্রী[illegible]নাথ মুখোপাধ্যায়

কালপরিক্রমা : শ্রী[illegible]

বাঙলার যত কৃষ্টি, সভ্যতা ও [illegible] হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরব বেড়েছে তার [illegible] যাঁদের অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ আর অক্লান্ত পরিশ্রম। [illegible] সংগ্রামের [illegible] সাংবাদিকদের সাধনার কাহিনী কতই। [illegible]। লেখকের [illegible] রচনাগুণে সে-সকল কাহিনী আরও [illegible]। এ [illegible]ের সমাদর সুনিশ্চিত।

[প্রকাশক—ন্যাশনেল পাবলিশার্স। ১৪৫ বি সাউথ সিঁথি রোড। মূল্য চার টাকা]

রূপালী চাঁদ : শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগী

ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত এ নাটক সম্বন্ধে শ্রীদিলীপকুমার রায় লিখেছেন —তিনি সজাগভাবেই চান মানব-চরিত্রের ব্যাপক গ্লানি অশুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ফুটিয়ে তুলতে তার অন্তর্লীন মহত্ব, কারুণ্য, সৎসাহস ও দিলদরিয়া মহাপ্রাণতাকে।" এ কথা যে কতখানি খাঁটি তা এ নাটকের পাঠক-পাঠিকামাত্রেই উপলব্ধি করতে পারবেন আশা করি।

[প্রকাশক—আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১২। মূল্য, ২'৫০]

কার ভুলে : শ্রীক্ষীরোদ চট্টোপাধ্যায়।

চমৎকার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে থামা যায় না। পাঠক পাঠিকারা এর বিশেষ অনুরক্ত হবেন আশা করা যায়।

[প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রকুমার শীল, ৬, কামারপাড়া লেন, কলিকাতা —৬। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।]

বাঙলার মাটি : অপরাজিতা দেবী।

বাঙলার বিশেষ করে পূর্ববাঙলার একটি নিখুঁত ছবি [illegible] কথা লেখনী স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গ্রাম্য সমাজের অবস্থা, সেখানকার শাশুড়ী প্রতাপ, বধূ নিগ্রহ, সতীন কলহ, ভ্রাতৃসম্পর্ক, পারিবারিক প্রতিবেশীর সম্বন্ধ লেখিকার চিত্রিত চরিত্রগুলির মধ্যে অনবদ্যভাবে রূপায়িত হয়েছে। উপন্যাসখানার আদর হবে।

[প্রকাশক—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা—১২। ছয় টাকা মাত্র]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

চিরন্তন (উপন্যাস) : শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত।

গ্রন্থকার নবাগত। আলোচ্য গ্রন্থখানি চলন সই, আমাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করেনি। ঠাকুর মশাই আর মাষ্টার মশাইয়ের দুইটী জীবন গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে পৃথক ধারায় বহমান হয়ে শেষে জীবনকে পেয়েছে সত্য কিন্তু রয়ে গেছে উপন্যাসের ভেতর অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি। সমাপ্তির দিকটাও মর্ম্মস্পর্শী হয়নি। গ্রন্থকারের প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে 'চিরন্তন' পাঠক পাঠিকার কাছে উপেক্ষিত হবে না এরূপ বিশ্বাস আছে। ভারতের নানা তীর্থস্থানের কথা ও ছবি এর মধ্যে আছে। গ্রন্থকারের লিখনভঙ্গী মন্দ নয়।

[প্রকাশক—বিমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, তুফান প্রকাশনী। ৩৮।৩ পটারী রোড, কলিকাতা—১৫]

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডাঃ বিমলকান্তি সমদ্দার প্রণীত "রবীন্দ্র-কাব্যে কালিদাসের প্রভাব"—৫'৫০

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত ইতিহাস "সিরাজদ্দৌলা" (১১শ সং)—৬৲

দিলীপকুমার রায় প্রণীত "অনামী" (২য় সং)—৬'৫০

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "ভীষ্ম" (৮ম সং)—২'৭৫

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "কালকূট" (৩য় সং)—৩৲

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মেজদিদি" (২৩শ সং)—১'৫০, "শ্রীকান্ত" (১ম—২২শ সং)—৩৲, "চরিত্রহীন" (১৭শ সং)—৫৲, "দেবদাস" (২৩শ সং)—২৲, "রমা" (নাটক—১০ম সং)—২৲

শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত প্রদত্ত শরৎ ... শ্রী"—২৲

শ্রীজিতেন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদি ...

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত ... ২৲

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত "প্রাণ ...

আশাপূর্ণা দেবী প্রণীত "গল্প ভালো ...

দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত "ঠানদি ...

শশধর দত্ত প্রণীত "ব্যাঘ্র-সাহসী মো... ন"—২৲

সুনির্মল বসু প্রণীত "বরণডালা"—...

"হিজমাষ্টার্স ভয়েস" ও কলম্বিয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত ...

"হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস"

P 11933—"কথা দিয়ে এলেনা" ও "ফুটনারে ফুল" বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুন্দর আধুনিক গান—গেয়েছেন কুমার ...

N 82795—দু'খানি রবীন্দ্র সংগীত "সকাল বেলার কুঁড়ি আমার" ও "মেঘের পরে মেঘ জমেছে"— ... শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র।

N 82796—মান্না দে'র মধুকণ্ঠের মধুর গান—"এ জীবনে যত ব্যথা" ও "আমি সাগরের বেলা।"

N 82797—প্রখ্যাত শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া আধুনিক গান "এই নিরালা সাগর-বেলায়" ...

N 827..—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠের দু'খানি আধুনিক গান "ও রাজকন্যে" ও "চম্পাকলি ...

N 82799—কুমারী বাণী ঘোষালের সুমিষ্ট কণ্ঠে গাওয়া "জল টলটল্ তালপুকুরে" ও "অরুণবরণ কিরণ ...

N 82800—সুনিপুণ শিল্পী শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমধুর অতুলপ্রসাদী গান "... খন তুমি গাওয়াও গান।"

N 82801—মধুক্ষরা কণ্ঠের অধিকারিণী কুমারী আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া "বকুল গন্ধে ... "—নতুন ধরণের আধুনিক গান।

N 82802—"দুর্গোৎসব" ও "দেওয়ালী"কে আধুনিক গানে রূপায়িত করেছেন শিল্পী সনৎ সিংহ।

N 82803—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের দরদী কণ্ঠের আধুনিক গান "ঐ দূর আলেয়ার" ও "তুমি যে আম ...

N 82804—"চোখের নজর কম হ'লে" ও "কার মঞ্জীর বাজে" শ্যামল মিত্রের গাওয়া নতুন ধরণের গা ...

N 82805—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ অভিনীত কৌতুক নাটিকা "লেডী টাইপিষ্ট।"

N 82806—তালাত মামুদের কণ্ঠে আধুনিক গান "এলো কি নতুন" ও "সুন্দরতর তুমি।"

কলম্বিয়া

GE 24905—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের বলিষ্ঠ কণ্ঠের আধুনিক ও রাগপ্রধান গান "তোমার ভালো" ও "চাে ...

GE 24906—"মরমী গো" ও "এই নদী তীরে" আধুনিক গান দুটি রূপায়িত করেছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মু ...

GE 24907—... ভট্টাচার্যের আকুতি-ভরা কণ্ঠের শ্যামা-সংগীত "জেনেছি জেনেছি তারা" ও ...

GE 24908—কুমারী গায়ত্রী বসুর আবেগ মধুর কণ্ঠের আধুনিক গান "যেন গোলাপ হ'য়ে" ও ...

GE 24909—...শ্রী কুমার ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবালু কণ্ঠের ধর্মমূলক গান "দেহি দেবী দ ...

GE 24910—মধু-কণ্ঠী কুমারী ইলা চক্রবর্তীর গাওয়া "এতো কাছে পেয়েছি" ও "ঐ কোকিল ...

GE 24911—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অনুভূতি-মুখর নতুন ধরণের দু'খানি আধুনিক গান "দু ... "

GE 24912—কোকিল-কণ্ঠী শ্রীমতী লতা মঙ্গেশ করের ভাবমধুর আধুনিক গান "ও পলাশ ... ছিল।"

GE 24913—ভারত বিখ্যাত প্লে-ব্যাক শিল্পী শ্রীমতী আশা ভোঁসলের গাওয়া ... ও "আমার জীবনে তুমি।"

GE 24914—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিষ্টি কণ্ঠের মিষ্টি গান "চাঁদ ভাবে" ও " ...

GE 24915—শ্রীমতী গীতা দত্তের গাওয়া সুরের ইন্দ্রজালে ভরা "ফুলের, ... গলো" ...

GE 24916—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ কণ্ঠের ভাব মধুর গান "সাঁঝেরী হায়" ...

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রী... মুখোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ... ভট্টা... মুদ্রিত ও প্রকাশিত